

দধি-মন্থন

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২৮ [১ম সংখ্যা

আঁধি

(উপন্যাস)

১

প্রকাণ্ড নদী বাঘমতীর তীরে সুনন্দা গ্রাম। নদীর তীরে লোকের বসতি খুব কম। একধারে প্রকাণ্ড নদী সগর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে, নদীর কোলে মেটে পথ,—পথের অন্য ধারে ঘন জঙ্গল,—কোথাও বাঁশ-ঝাড়, কোথাও কালকাসিন্দার ঝোপ, কোথাও-বা ফণী-মনসা, ঘেঁটু ও এমনি-সব আগাছা উঁচু ঢিবির উপর সদলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চৈত্র মাসের শেষ। সেদিন সন্ধ্যার সময় সমস্ত আকাশটাকে ঘন কালো মেঘে ঢাকিয়া প্রবল ঝড় উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। নদী-তীরের মেটে পথ ধরিয়া দশ-এগারো বৎসর বয়সের একটি ছেলে সেই ঝড় মাথায় করিয়া জলে ভিজিয়া একশা হইয়া ছুটিয়া গাঁয়ের দিকে চলিয়াছে। মাথার উপর গাছপালা মট্-মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কড়কড় শব্দে বিদ্যুৎ আকাশটার এক দিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত চিরিয়া আগুনের লাইন টানিয়া ছুটাছুটি করিতেছে,—সমস্ত প্রকৃতি যেন চারিধার কাঁপাইয়া মরণের গোলা লইয়া ছুড়িয়া লোফালুফি করিয়া বিশ্বটাকে দলিয়া পিষিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে! এ-সব দিকে ছেলেটির ভ্রূক্ষেপও নাই। সে ছুটিয়াছে, ছুটিয়াছে, ছুটিয়াছে!

নদীর তীর ছাড়িয়া মোড় বাঁকিতেই সেই ঝড়-বৃষ্টির ঘন অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ একটা আলোক-রশ্মি ছেলেটির চোখে পড়িল। আলোর রেখা দেখিয়া ছেলেটি সেই দিকে ছুটিল।

একখানা গোল-পাতার বাড়ী। মাটীর জীর্ণ দেওয়ালের ফাঁক দিয়া আলোর একটা রশ্মি

তাহার চোখে পড়িয়া ছিল। ছেলেটি আসিয়া ছাঁচের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুতের আলোয় ঘরের দ্বারের নিশানা মিলিলে ছেলেটি সেই দ্বারে করাঘাত করিল। একবার, দুইবার, তিনবার। কাহারো কোন সাড়া নাই,—শুধু জলের ঝম্ ঝম্ আওয়াজ আর বাতাসের সোঁ-সোঁ গর্জ্জন! নিরুপায় হইয়া ছেলেটি দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। প্রচণ্ড হাওয়ায় জলের ছাট্ চাবুকের মত আসিয়া ছেলেটির অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল। ঠাণ্ডায় তাহার হাড় অবধি কাঁপিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল! উপায় কি! ছেলেটি তখন আপনার সমস্ত শক্তি লইয়া প্রাণপণে দুই হাতে দ্বারে আবার ঘা দিল। ভিতর হইতে কে বলিল—যাই গো।

ছেলেটি বর্ত্তাইয়া গেল। একটি স্ত্রীলোক,—হাতে প্রদীপ,—হাতের ঘেরে শিখাটীকে কোনমতে বাঁচাইয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বদ্ধ আলোর উজ্জ্বল রশ্মি মুখে পড়িয়া এমন এক স্নিগ্ধ বিভায় স্ত্রীলোকটির মুখখানিকে রঞ্জিত করিয়াছিল যে ছেলেটি সে মুখ দেখিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিল। স্ত্রীলোকটি বলিল,—আহা, কার বাছা বাবা! ভিজে সারা হয়ে গেছ, একেবারে! এসো, এসো, ভিতরে এসো।

ছেলেটি দুই হাতে মাথার মুখের জল ঝাড়িতে-ঝাড়িতে ভিতরে আসিল। স্ত্রীলোকটি দ্বার বন্ধ করিয়া আলো দেখাইয়া ছেলেটিকে দাওয়া পার করিয়া আর-একটা ঘরে আনিল। ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, আর সেই প্রদীপের আলোয় তক্-তকে নিকানো মেঝের উপর একটা ছেঁড়া মাদুর-বিছাইয়া দুইটী প্রাণী নীরবে বসিয়া ছিল; একজন পুরুষ, অপরটি বালিকা। ছেলেটিকে দেখিয়া পুরুষ বলিল,—একখানা গামছা এনে দাও গো—বড্ড ভিজেছে, দেখ্‌চি!

যে-স্ত্রীলোকটি দ্বার খুলিয়া দিতে গিয়াছিল, সে মুহূর্ত্তে কোথা হইতে একটা শুক্‌নো গামছা লইয়া আসিয়া ছেলেটির মাথা বেশ করিয়া ঘষিয়া মুছাইয়া দিল। পুরুষটি তখন ডাকিল,—সোনা। বালিকার নাম, সোনা। সোনার বয়স সাত কি আট বৎসর হইবে। সে বলিল,—কি বাবা?

বাপ বলিল,—একটা শুক্নো কাপড় দে ত রে!

সোনা একখানি বৃন্দাবনী কাপড় আনিয়া বাপের হাতে দিল।

পুরুষটি বলিল,—ও-সব ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলো, বাবা। এই কাপড়টা এখন পর, নাহলে অসুখ করবে।

ছেলেটি তখনো সেই ভিজা পোষাকে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। জিনের হাফ্ প্যাণ্ট, জিনের কোট্, পায়ে ফুল মোজা আর ভারী বুট—সমস্ত ভিজিয়া আরো ভারী হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বাঁধনের মত কষিয়া চাপিয়া ছিল। পোষাক খুলিয়া, জুতা-মোজা খুলিয়া শুষ্ক কাপড় পরিয়া ছেলেটি মাদুরের এক কোণে বিনা-দ্বিধায় বসিয়া পড়িল। পুরুষটি তখন বলিল,—ওগো, এক কাজ কর দেখি, এখন এই ভিজে ইজের-জামাগুলোকে বেশ করে নিংড়ে উনুনে সেঁকে দাও—যদি শুকোতে পারো! জামা নেই, তাই ত—ভালো কথা, ওরে সোনা—

—কি বাবা?

—তোর সেই কাচা দোলাইটা ও-ঘরের দড়িতে তোলা আছে, সেইটে নিয়ে আয়, দেখি। আহা, বড্ড শীত করছে!

সোনা পরম আগ্রহে গিয়া দোলাই লইয়া আসিল। ছেলেটি দোলাই গায়ে দিলে স্ত্রীলোকটি উঠিয়া একবাটি গরম দুধ আনিয়া বলিল—এইটুকু খেয়ে ফেলো ত বাবা। অত ভিজেছ—না হলে জল বসে সর্দ্দি-কাশী হবে, শেষে!

ছেলেটি অবাক হইয়া গেল। বহুকাল পূর্ব্বে সে একটা গল্প শুনিয়াছিল—এক রাজপুত্র বনে পথ হারাইয়া এক ভিখারীর বাড়ী আশ্রয় লইয়াছিল; সেখানে ভিখারীর যত্নে-দেওয়া বনের ফল খাইয়া রাজপুত্র যে আরাম পাইয়াছিল, রাজবাড়ীর মহার্ঘ্য ভোজ্যেও সে স্বাদ কখনো পায় নাই! গল্পটাতে রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের আরো বহু আশ্চর্য্য ঘটনা ও বহু পরিবর্ত্তনের কথাও ছিল—কিন্তু এই কাপড়, দোলাই আর দুধের বাটি পাইয়া সেই বনফলের কথাটাই বিশেষ করিয়া এখন মনে পড়িল।

দুগ্ধ পান করিয়া ছেলেটি একটা নিশ্বাস ফেলিল। পুরুষটি বলিল—তোমরা কোথায় থাকো বাবা? এধারে এসেছিলে কেন—এই ঝড়ে, এমন একলা?

ছেলেটি বলিল,—রোজই সন্ধ্যার আগে আমি বেড়াতে যাই কি না—এই নদীর ধারটী আমার খুব ভালো লাগে। আজ বেড়াতে বেড়াতে দেরী হয়ে গেল, আকাশের দিকে চেয়েও দেখিনি—তার পরই ঝড় আর বৃষ্টি এল।

পুরুষটি বলিল,—তাহলেও এমন বেরুতে আছে? ছেলেমানুষ! বিশেষ এই কাল-বোশেখীর সময়!

ছেলেটি বলিল,—একলা ত আসি না, সঙ্গে মাষ্টার মশাই রোজ থাকেন। আজ তিনি বললেন, তাঁর কি একটা কাজ আছে—তাই আমি একলাই বেড়াতে বেরিয়ে ছিলুম।

পুরুষটি বলিল,—তোমার নামটী কি বাবা?

—আমার নাম শ্রীনিখিলশঙ্কর রায়।

—তোমার বাবার নাম?

—শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াশঙ্কর রায়।

পুরুষটি আপনার মনেই বলিল—অভয়াশঙ্কর রায়! তারপর কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ছেলেটিকে বলিল,—তোমরা এইখানেই থাকো?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—ঐ যে শিবতলা বলে একটা জায়গা আছে না—? সেই যে মস্ত একটা পুকুর আছে, এক কোণে শিবের মন্দির—তারই একটু দূরে যে নতুন একটা বাড়ী হয়েছে—বড় বাড়ী, ফটকওলা, সামনে ফুলের বাগান—সেই বাড়ীতে আমরা থাকি।

পুরুষটি বলিল,—ও, ঐ যে শুনেছিলুম, বিদেশের কে জমিদারবাবু নতুন বাড়ী তৈরি করাচ্ছিলেন—সেই বাড়ীই তাহলে তোমাদের? তা ও বাড়ী ত অল্পদিন হল, তৈরী হয়েছে।

—হ্যাঁ। আমরা এই মাঘমাসের শেষে এখানে এসেচি।

—এইখানেই বরাবর থাকা হবে?

—তা জানি না।

—বেশ, বেশ। ওরে সোনা, বুঝেচিস্, তুই যে বলতিস্ অত বড় বাড়ী, ও কি রাজাবাবুর? এ বাবু সেই রাজাবাবুর ছেলে। জানলি!

মুগ্ধ বিস্ময়ে সোনা নিখিলের পানে চাহিয়া পিতার গা ঘেঁষিয়া বসিল। বলিল,—রাজপুত্তুর!

—হ্যাঁ।

—তাহলে রাজপুত্তুর বাবুর তালপত্তরের খাঁড়া আছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে?

—আছে বৈ কি!

—দেখতে যাব, বাবা?

—যাবি বৈ কি, যাস্। রাজপুত্তুর বাবুর সঙ্গে যখন ভাব হল, তখন যাবি নে কেন! তারপর পুরুষটি নিখিলের পানে চাহিয়া বলিল,—এইটি আমার মেয়ে, সোনা। নামটি সোনা হলে কি হয়, এদিকে ভারী দুষ্টু। আমরা গরিব মানুষ, বাবা। আমার একটু ছোট্ট দোকান আছে—ঐ সব চালানী নৌকো আসে,তারাই মাল-পত্তর কেনে,তাতেই আমার চলে। আমার কত বড় ভাগ্যি, যে, তুমি বাবা, আমার এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় পায়ের ধুলো দিয়েছ! তা গরিব হই, আর যা-ই হই, এই গাঁয়ের মধ্যে এ কথা কেউ বলতে পারবে না, বনমালী কারো সঙ্গে জুচ্চুরি করেছে কি কোন ফেরেব-বাজী করেছে! তোমাদের আশীর্ব্বাদে, বাবা, তাই এত দুঃখেও আরামেই আমার দিন কেটে যাচ্ছে। তারপর বনমালী নিজের মনেই আপনার অতীতের সহস্র কাহিনী বলিয়া চলিল। সুন্দরবনের ওদিকে এককালে তাহাদের মস্ত আবাদ ছিল,—জলের গ্রাসে সমস্তই গিয়াছে। সে সব থাকিলে তাহার আর ভাবনা কিসের, ভয়ই বা কি! একটা মেয়ে—সেটাকে সুপাত্রে দিতে পারিলেই তাহার ইহকালের কাজ চুকিল!

নিখিল চুপ করিয়া কথাগুলা শুনিয়া যাইতেছিল,—কতক বুঝিতেছিল, কতক আবার হেঁয়ালির মতই ঠেকিতেছিল—মন কিন্তু তাহার ছিল, ঐ সোনার পানে। সে ঐ আলোর সাম্‌নে কতকগুলা নুড়ি-পাথর লইয়া কি সব ছড়া বলিতেছিল, আর সেগুলাকে নাড়িতেছিল, নাচাইতেছিল, এবং মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিস্ময়ে সম্ভ্রমে নিখিলের পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছিল—ইহার মধ্যে সে যেন কেমন এক রহস্যের স্বাদ পাইল। বাহিরে ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে, ক্কড় মেঘ ডাকিতেছে, সোঁ সোঁ ঝড় বহিতেছে,—আর ভিতরে এই বনমালীর কাহিনী আর ঐ বালিকা সোনার কোমল সুরে ছড়া চলিয়াছে—ফুল, ফুল, একটা তুলে জোড়ার ফুল, দোগ্-ঘোন্ দোগ্-ঘোন্—কখনো বা সে খেলা ফেলিয়া তার কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ নাচাইয়া বাপের ঘাড়ে চড়িতেছে, মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, অত্যন্ত সহজ সলীল ভঙ্গীতে—মুগ্ধ নিখিলের চোখে এই সমস্তগুলা মিলিয়া এক বিচিত্র স্বপ্ন-মাধুরীর সৃষ্টি করিতেছিল! সে তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল।

২

যখন ঝড়-বৃষ্টি থামিল, তখন অনেকখানি রাত্রি হইয়াছে। বনমালী বলিল,—চল বাবা, তোমায় বাড়ী রেখে আসি—সেখানে সকলে কত ভাবছেন!

দুইধারে বাদামী কাগজ লাগানো, আর দুইধারে ময়লা কালি-পড়া কাঁচ-আঁটা একটা

ছোট লণ্ঠন হাতে লইয়া বনমালী নিখিলের সঙ্গে পথে বাহির হইল। নিখিলের পোষাক তখনো শুকায় নাই, কাজেই সেগুলা বনমালী হাতে করিয়া চলিল, আর নিখিলের পরণে রহিল, বনমালীর দেওয়া সেই বৃন্দাবনী কাপড় ও গায়ে সোনার দোলাই।

নির্জ্জন স্তব্ধ পথ। আকাশের কোলে খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ তখনো ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। ভিজা গাছের পাতা হইতে জলের বড় বড় ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল—ঝিঁঝির অবিশ্রাম রবে নিশীথের রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, আর ভিজা গাছপালার ঝোপে-ঝাপে রাশ রাশ জোনাকি আলোর চুম্‌কি আঁটিয়া বসিয়াছিল।

খানিকটা পথ চলিয়া আসিবার পর দূরে দুইটা হারিকেন লণ্ঠন দেখা গেল। লণ্ঠন কাছে আসিলে নিখিল দেখিল, মাষ্টার মশায় বাড়ীর দামু চাকরকে লইয়া সেই দিকেই আসিতেছেন—নিশ্চয় নিখিলের সন্ধানেই বাহির হইয়াছেন! মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া নিখিল বনমালীকে বলিল,—ঐ যে মাষ্টার মশাই! তুমি যাও, আর তোমাকে আসতে হবে না।

বনমালী বলিল,—সে কি হয়, বাবা, চল, তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

নিখিল বলিল,—না, না, আর আসবার কোন দরকার নেই। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

মাষ্টার মহাশয় ও দামু আরো কাছে আসিতেই মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—এই যে নিখিল। আঃ, বাঁচা গেল! দামু বলিল,—হেই যে দাদাবাবু, কোথাকে ছিলে? বাড়ীতে বাবু আর মাঠাকরুণ ভেবে তুলকালাম বাধিয়ে দেছেক্। এই রাত্তিরেতে চারধারে লোক ছুটেচে খোঁজবার লেগে!

বনমালী সগর্ব্বে বলিল,—ভয় কি! আমার বাড়ীতে উনি ছিলেন—এই ঝড়, এই বৃষ্টি—এতে কি করে আসেন!

দামু দাদাবাবুর পরিচ্ছদের পানে চাহিয়া বলিল,—পোষাক কোথাকে গেল?

এই যে—বলিয়া বনমালী নিখিলের পোষাকগুলা দামুর হাতে দিল।

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—এসো, বাড়ী এসো।

নিখিলের মন এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্ন-লোকে বিচরণ করিতেছিল—সেই বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ আওয়াজ, সোনার সেই সুর করিয়া নুড়ি খেলা—সহসা মাষ্টার মশায় আর দামুর কথা তাহাকে সে স্বপ্ন-লোক হইতে একেবারে কঠিন ভূমি-তলে নামাইয়া আনিল! মাষ্টার মশায়ের গা ঘেঁষিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল - বাবা খুব রাগ করেছেন, মাষ্টার মশায়,—না?

মাষ্টার মশায় আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—না, রাগ করবেন কেন! তবে খুব ভাবচেন। এই রাত্রে ঝড়-বৃষ্টিতে কোথায় গেলে—ভাবনা হবার কথাই ত!

নিখিল কহিল,—আপনি এদিকে এলেন কি করে?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—চারধারে লোক গেছে। তবে আমি জানতুম, তুমি এই ধারটাতেই বেড়াতে আস, তাই আমি দামুকে নিয়ে এই দিকটায় এলুম। আমারো কি ভাবনা কম হয়েছিল—কি ঝড়-বৃষ্টিই হয়ে গেল, বল দেখি!

তার পর চুপ-চাপ্ সকলেই চলিতে

লাগিল। খানিক দূর গিয়া নিখিলের মনে হইল, বনমালীও সঙ্গে আসিতেছে যে! সর্ব্বনাশ! বাপের সহস্র মানা ছিল, কোন ছোট লোকের সঙ্গে কখনো যেন সে মেলা-মেশা না করে—বাড়ীর সকলের উপর কঠিন আদেশ ছিল, নিখিল যেন তাহাদের সংসর্গে না যায়! বনমালী—আহা, বেচারা বনমালী! খোড়ো চালায় তাহার বাস বটে, সে গরিব হইতে পারে, কিন্তু সে ছোটলোক—এ কথা মনে করিতে তাহার মনটা খুঁত খুঁত করিতে লাগিল! এমন যত্ন, এমন আদর যে করিতে পারে, সে কি কখনো ছোটলোক হয়! আর বনমালীর বৌ,—সেই সোনার মা—কেমন সুন্দর তার মুখখানি, কেমন মিষ্ট তার কথাগুলি, কেমন মধুর তার যত্নটুকু—সাগ্রহে কত আদরে সে সেই দুধের বাটি তাহার মুখে ধরিয়াছিল! তার পর সোনা—কেমন লক্ষ্মী মেয়েটি! তবুও পিতার রোষ-রক্ত আঁখি দুইটা তাহার চিত্তে আগুনের হল্‌কার মত ছ্যাঁকা দিতে লাগিল। পাছে বনমালীকে দেখিয়া পিতা তাহাকে দুইটা কড়া কথা বলেন! যে-বেচারা তাহাকে এত যত্ন করিয়াছে, এই রাত্রে কত কষ্ট করিয়া তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে, —তাহার সে-যত্নটা না বুঝিয়া পিতা কঠিন কথা বলিলে সে বেচারার প্রাণে তাহা কতখানি বাজিবে, ইহা ভাবিয়া সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে জোর করিয়াই বনমালীকে বলিল,—তুমি বাড়ী যাও। আর আসতে হবে না তোমায়।

বনমালী বলিল—আমার কোন কষ্ট হবে না, বাবা।

—না, না, তুমি যাও—

নিখিলের এই সাগ্রহ অনুরোধের অর্থ বনমালী বুঝিল অন্যরকম। তাহার পিতাকে ত বনমালী চেনে না! কি কড়া মেজাজ! পিতার এই রাগ বা বিরক্তি লইয়াই ছিল নিখিলের ভয়! কিন্তু বনমালী ভাবিল, তাহার কষ্ট ভাবিয়াই নিখিল অতখানি অস্থির হইয়া উঠিয়াছে! তাহার আবার কিসের কষ্ট! কাজেই বনমালী বাড়ী ফিরিল না, নিখিলের সঙ্গেই চলিল।

নিখিল সারা পথ বুকে একটা দারুণ আশঙ্কা বহিয়াই চলিল। বনমালী ত জানে না বাড়ীতে কি কঠিন শাসনের মধ্যেই তাহাকে দিন কাটাইতে হয়, বাপের কড়া আইন-কানুন মানিয়া—তার এক চুল এদিক-ওদিক করিবার জো নাই। বনমালীর বাড়ীতে সে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার মেয়ে সোনার কি অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি! নিয়মের নিগড় কোথাও এতটুকু চাপিয়া দাবিয়া রাখে নাই—কিন্তু তাহার বাড়ীতে যে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের বন্দোবস্ত! এখানে চলিতে ফিরিতে হাঁচিতে কাশিতে কর্ত্তার মেজাজের পানে লক্ষ্য রাখিতে হয়!

বাড়ী আসিয়া ভিতরে ঢুকিবার সময় নিখিল বনমালীকে বলিল—এই বার আমি এসেচি ত, তুমি বাড়ী যাও। যাও না তুমি বাড়ী চলে!

বনমালী অবাক হইয়া গেল। সে কেমন হতভম্বের মত মাটীর পুতুল বনিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নিখিল ভয়-কম্পিত প্রাণে ফটকের মধ্যে পা দিল।

উপরে উঠিতেই সে দেখে, সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পিতা অভয়াশঙ্কর। পুত্রকে

দেখিয়া পিতা বলিলেন,—কোথায় ছিলে এত রাত্রি অবধি?

ভয়ে নিখিলের বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। সে কোন কথা বলিল না। পিতা বলিলেন, —এই ঝড়, এই বৃষ্টি—এ্যাঁ? বল।

মাষ্টার মহাশয় তখন সংক্ষেপে বলিয়া দিলেন, ঝড়-বৃষ্টির সময় নিখিল একটি লোকের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। জামা-কাপড় অবধি ভিজিয়া গিয়াছিল। পুত্রের পরিচ্ছদের পানে তখন পিতার দৃষ্টি পড়িল। পিতা বলিলেন,—এ কার কাপড় পরেছ? বল।

নিখিল ভয়ে ভয়ে বলিল,—বনমালীদের।

—বনমালী কে?

নিখিল বলিল,—ওদিকে তাদের বাড়ী—বাড়ীতে বৃষ্টির সময় গিয়ে বসেছিলুম। সব ভিজে গেছল, তাই তারা এই কাপড়টা পরতে দিয়ে ছিল! তার দোকান আছে।

—তাদের ঐ কাপড় পরতে এতটুকু ঘেন্না হল না তোমার! সেই ভিজে পোষাকেই তুমি বাড়ী এলে না কেন?

এ কথার কোন জবাব নাই! নিখিল কি নিজের ইচ্ছায় পোষাক বদল করিয়াছিল? জলে ভিজিয়া শীতে কাতর হইয়া সে কাঁপিতে-ছিল, তাই, কিন্তু—সমস্ত কথাগুলা সাহস করিয়া সে বলিতে পারিল না।

না বলুক, এই বেয়াদবির জন্য পিতার কঠোর দণ্ড উদ্যত ছিল। তখনি তাহার অঙ্গ হইতে কাপড় আর দোলাইটা টানিয়া লইয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া সম্মুখের ঘরে ঠেলিয়া দিলেন, নিখিল আচম্‌কা সে আকর্ষণের বেগ সামলাইতে না পারিয়া ঘরের ঠিক মাঝখান্‌টায় ছিট্‌কাইয়া গিয়া পড়িল। পিতা তখন সশব্দে দ্বারটা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—সারা রাত এই ঘরে তোমায় বন্ধ থাকতে হবে, আজ! এমনি ভাবিয়ে তুলেছিলে! বাড়ীর কথা মনে থাকে না—যে এখানে সকলে ভাবছে! আজ রাত্রে তোমার খাওয়াও বন্ধ!

হাকিমের রায় বাহির হইয়া গেল। মাষ্টার মশায় ও দামু নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির মতই দাঁড়াইয়া; কাহারো একটা কথা কহিবার সাধ্য নাই! অভয়াশঙ্কর সরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় এক তরুণী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দ্বার চাপিয়া ধরিলেন। দামু ও মাষ্টার মহাশয় ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

নারী বলিল—দাও, ওগো দাওগো, বাছাকে একবার দেখতে দাও। হাকিমের কঠোর আদেশ ধ্বনিত হইল,—না।

—আহা, ওর মুখের খাবার পড়ে আছে গো! একটু কিছু খেতে দাও। কখন্ বাছা সেই বেরিয়েছে গো! এই জল-ঝড়ে কত কষ্ট হয়েছে!

তবুও সেই এক উত্তর—না।

নারী বলিল,—এই অন্ধকার ঘরে সারা রাত থাকবে ও?

—হ্যাঁ, এই ওর শাস্তি।

—কিন্তু অপরাধ কি—ওর?

—সে কথা তোমায় বলবার কোন দরকার দেখচি না! নারী স্তম্ভিতের মত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তার পর একটা বুকভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি ওর মা, আমাকে ওর কাছে থাকতে দাও।

—না।

হায়রে অভাগিনী নারী! তোমার

মিনতিতে কোনদিন পাথরও গলিতে পারে, কিন্তু জমিদার অভয়াশঙ্করের মন তাহাতে এতটুকুও টলিবে না।

নারী তখন নিরুপায় চিত্তে দ্বারের প্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল,—সখেদে ডাকিল,—নিখিল, বাবা আমার!

মেঘের টুক্‌রাগুলাকে ভাঙ্গিয়া সরাইয়া ক্ষীণ চাঁদ তখন আকাশের কোণে দেখা দিয়াছে! মৃদু জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ সুধাধারার মতই অভাগিনী নারীর অঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। অভয়াশঙ্কর অচপল দৃষ্টিতে ভূলুণ্ঠিতা পত্নীর পানে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে পথে দাঁড়াইয়া একটা লোক তখন জমিদার বাবুর মুখের একটু কৃতজ্ঞ মধুর বাণীর প্রত্যাশায় প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীটার পানে অধীর সাগ্রহ দৃষ্টি লইয়া চাহিয়াছিল। ভাবের ঝোঁকে বেচারা বুঝিতেও পারিল না, এখানে বাড়ীর মধ্যে কত-বড় মর্ম্মভেদী নাটকের একটা অঙ্কের অভিনয় হইয়া গেল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ফুলের চিঠি

আজ্‌কে আমার মেঘের মত ঘুরতেছিল মন,
মাঠের মাঝে হঠাৎ পেলাম, এ কার নিমন্ত্রণ?
ফুল-ভরা ওই করবীতে
পড়লো আঁখি আচম্বিতে,
একেবারে পথিক-বধূর আঁখির আলাপন।

কুসুম-বধূর প্রীতির লিপি বহে বুকের মাঝ,
পার হয়ে হায় ভূধর-দরী ঘুরছি আমি আজ।
মেঘ পারে না পথ দেখাতে,
কি যে আছে তার লেখাতে,
পড়তে নারি, প্রেমের চিঠি খুলতে লাগে লাজ।

পান্থ আমি, কোথায় যাব, কোথায় আমার ধাম—
না সুধায়েই হস্তে দিলে, মোড়া রঙিন খাম্,
কেবল চাওয়া, কেবল হাসা,
বুঝবে না সে আমার ভাষা
কেমন করে নিই সুধায়ে তাহার প্রিয়ের নাম।

আলতা-রাঙা পাতগা খামের বক্ষ ভেদি হায়
স্বর্ণ আখর সজীব হয়ে বলতে কি যে চায়!
বন-দুলালীর হেম মরালে
কোন্ মানসের তীর স্মরালে
পদ্ম-বুকের বদ্ধ ভ্রমর গুঞ্জনে মাতায়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ফকিরদা

(গল্প)

১

ফকিরদা যেদিন আমাদের মেসের সিঁড়ির নীচের সেই স্যাঁত্-সেঁতে অন্ধকার ঘরখানা ভাড়া নিয়ে এসে ঢুক্‌লো, মেসে সেদিন একটা হুলস্থুল পড়ে গেল,—কেননা ওই ঘরখানা আজ দশ বছরের উপর খালি পড়ে আছে, কেউ যে ওটা কোনদিন ভাড়া নিতে পারে, এ কল্পনাও আমরা কখনো করিনি, কারণ আমরা জানতুম যে ওই চোর-কুট্‌রির মত একরত্তি ঘুট্-ঘুটে অন্ধকার আওতা ঘরখানা মানুষের বাসের একেবারেই যোগ্য নয়; আর এ ধারণা যে শুধু আমাদেরই একার তা নয়, মেসের অধিকারী যে হরু ঠাকুর—সেও এটা বিশ্বাস করতো; তাই ও ঘরটা সে এতদিন কেবল ঘুঁটে-কয়লা আর যত পুরানো লোহা-লক্কড়, ভাঙা-চোরা কাঠ-কাট্‌রা, ছেঁদা-ফুটো-বাতিল বাল্‌তি, মর্চ্চে-ধরা টীনের কানাস্তারা এই সব হরেক রকমের আবর্জ্জনায় বোঝাই করে রেখেছিল। হঠাৎ একটা ছুটীর দিনে সকাল বেলা দেখা গেল, মেসের ঝী জগ আর স্বয়ং হরুঠাকুর নিজে—এই দু'জনে মিলে ঘর-খানাকে তার এতদিনের সঞ্চিত জাল-জঞ্জাল থেকে বঞ্চিত কর্ব্বার বিধিমতে চেষ্টা করছে! আমরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি ঠাকুর—ব্যাপার কি? হঠাৎ ও ঘরখানার উপর আজ এত নেক্‌নজর হল কেন?"

২

হরুঠাকুর একটু মুচকে হেসে বললে, "আজ্ঞে দাদাবাবু, আর বলেন কেন? আজ ক'দিন ধরে একটী লোক হাঁটাহাঁটি করে পায়ের সুতো ছিঁড়ে ফেললে; বললুম তাঁকে যে, এ ঘরে থাক্‌তে পারবেন না মশাই,—তা সে কি শোনে?—দুটো পা জড়িয়ে ধরে বল্লে—দয়া করে ওটুকু আমায় দিতেই হবে! কি আর করি, বলুন, একমাসের ভাড়া আমায় দিয়ে গেল!"

শুনেই আমরা সকলে মিলে সমস্বরে বলে উঠলুম, "বল কি ঠাকুর—? সত্যি?—"

একজন বল্লে, "ভাড়া নিয়েছে?—ঐ ঘর?—"

আর একজন বল্লে, "পয়সা দিয়ে?"

হরুঠাকুর তার ট্যাঁক থেকে দুটো টাকা বার করে আমাদের দেখিয়ে বললে, "এই যে, দেখুন না,—টাকাদুটো এখনও খরচ হয়নি, ট্যাঁকেই মজুত রয়েছে!"

শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলুম! এমন লোকও আছে—যে ঐ রকম ঘরে বাস করতে পারে?—আবার ভাড়া দিয়ে? এ-হেন ঘরের ভাড়াটে লোকটি না জানি কেমন ভেবে তাকে দেখ্‌বার জন্যে আমরা মেস-শুদ্ধ লোক উৎসুক হয়ে উঠ্‌লুম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের মধ্যে তার একটা সম্ভবপর চেহারা আর বেশ-ভূষারও আন্দাজ চল্‌তে লাগল। অনেক তর্ক-বিতর্ক, চেঁচামেচি গাল-মন্দ এমন কি প্রায় হাতাহাতির উপক্রম

হবার পর শেষে অধিকাংশের মতে সাব্যস্ত হ'ল যে—লোকটা নিশ্চয়ই বুড়ো, জাতে খুবই খাটো, ভারী গরীব আর ছেঁড়া ময়লা কাপড়-চোপড় পরা, অতি নোংরা কদর্য্য চেহারা,—ইত্যাদি! কিন্তু আমাদের উপদেশ-অনুসারে সতর্ক হরুঠাকুর যখন ডাক দিলে, "কোথাগো দাদাবাবুরা, তিনি এসেছেন যে—" আমরা তখন সব যে যার ঘর থেকে বারাণ্ডায় বেরিয়ে পড়ে, রেলিং ধরে সাম্‌নে ঝুঁকে দেখলুম, আমাদের কারুর বিচিত্র কল্পনাই এই নতুন ভাড়াটের স্বরূপ আকৃতির অনুমান করতে পারেনি! আমরা পরস্পরে সবিস্ময়ে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম!

বয়স তার বছর চল্লিশেরও কম। ভদ্র চেহারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়, কিন্তু চোখে-মুখে একটা যেন কিসের দুরভি-সন্ধি মাখানো—ডান হাতে একটী ছোট ট্রাঙ্ক ঝুলিয়ে নিয়েছে—বাঁ হাতে একপ্রস্থ সতরঞ্চি মাদুর বালিশ বিছানা, বিছানার ভিতর থেকে আবার একটা বিবর্ণ ছাতিরও খানিকটা দেখা যাচ্ছে, বেশ করে সেগুলো বগল-দাবায় বাগিয়ে চেপে ধরেছে। আঙুলের ডগায় একটী হ্যারিকেন লণ্ঠন দুল্‌ছে, সিঁড়ির নীচের ঘরখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে! হরুঠাকুর তখন তার প্রকাণ্ড চাবির থোলো নিয়ে সেই ঘরের কুলুপটা খুলে দিচ্ছিল।

লোকটা একবারও আমাদের কারো দিকে চেয়েও দেখলে না! হরুঠাকুর ঘরখানা খুলে দিতেই সটান গিয়ে সে তার ভিতর ঢুকলো। সমস্ত দিনের মধ্যে একটিবার আর তাকে কেউ বেরুতে দেখেনি। তবে সন্ধ্যার পর সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করবার সময় ঘরের ভেজিয়ে-দেওয়া জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা বেরিয়ে আস্‌তে দেখে তার অস্তিত্ব তখনও পর্য্যন্ত টের পাওয়া যাচ্ছিল বটে।

২

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। লোকটি আমাদের কারো সঙ্গে একদিনও আলাপ-পরিচয় করবার চেষ্টা করেনি, আমরাও কেউ ওপর-পড়া হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করিনি। কতকটা ইচ্ছে করেও বটে, আবার কতকটা সুযোগ হয়নি বলেও বটে,—কেননা লোকটি ভোরবেলায় আমাদের ঘুম ভেঙে ওঠবার আগেই রোজ কোথায় বেরিয়ে যেতো, আমরা স্নান-আহার ক'রে যে যার কাজ-কর্ম্মে বেরিয়ে পড়তুম, তখনো সে ফিরতো না। তারপর সন্ধ্যাবেলা এসে শুন্‌তুম, সেই যে বেলা বারোটা নাগাদ সে এসে নেয়ে খেয়ে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি!

সন্ধ্যার পর বাসায় দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব এসে জুটতো, কোন ঘরে তাস, কোন ঘরে দাবার আড্ডা বস্‌তো, কাজেই তার খবর নেবার আর আমাদের ফুরসুৎ হতো না। ছুটির দিনও এই ব্যাপার! মাঝে মাঝে আবার শুন্‌তুম, দিনকতকের জন্যে তিনি নাকি কোথায় উধাও হয়ে থাকেন। কাজেই কিছুদিনের মধ্যে সিঁড়ির নীচের ঘরখানায় যে একজন লোক ভাড়া নিয়ে এসে আছে, এটা আমরা প্রায় একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু হঠাৎ একদিন বর্ষাকালে সন্ধ্যার পর কোথায় একটা কি নিমন্ত্রণ-উপলক্ষে বাসায় অনেকেই অনুপস্থিত

থাকায়, আমাদের তাসের আড্ডাটা লোকাভাবে জম্‌চে না দেখে একজন বল্‌লে—"এক কাজ করনা হে, সিঁড়ির নীচের দুষ্প্রাপ্য ঐ লোকটীকে আজ টেনে নিয়ে এসো না—, আমরা তিন জন আছি, আর একজনকে পেলেই তো বসা যায়!"

এমন বাদলার সন্ধ্যাটা মাঠে মারা যাচ্ছে দেখে অগত্যা আমি একটা ছাতি মাথায় দিয়ে সিঁড়ির নীচে নেমে এলুম, ভাগ্যক্রমে লোকটি সেদিন বর্ষার জন্যে বেরুতে পারেনি, দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল, কপাটে ঘা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "মশাই আছেন কি?"

"কে?" বলে লোকটি হারিকেন লণ্ঠনটা হাতে করে এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো, আমি আর কোনরকম ভূমিকা না করেই বললুম, "চিন্‌তে পার্‌বেন না বোধ হয়, কিন্তু আমরা এক গাছেরই পাখী—ঐ উপর-ডালে থাকি। আজ আপনাকেও একবার উপরে উঠ্‌তে হবে, বিশেষ দরকার!"

"তা বেশ তো, চলুন, যাচ্ছি।" বলে লোকটা লণ্ঠনের পল্‌তে কমিয়ে দিয়ে ঘরের এক কোণে সেটাকে রেখে, ছাতিটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলো; তারপর ঘরে একটা কুলুপ লাগিয়ে সাত বার টেনে দেখে আমার সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠল। সিঁড়িতে কেবল একবার জান্‌তে চাইলে যে, তার মত একজন অপদার্থ লোককে আজ আমাদের কি দরকার হতে পারে উপরে!—আমি তখন আসল ব্যাপারটা তার কাছে ভাঙ্‌লুম না! শুধু গম্ভীরভাবে বল্‌লুম, "তিনটী লোক আজ এখানে বড়ই বিপদে পড়েছে—এমন মুস্কিলে তারা আর কখনো ঠেকেনি! আপনি অনুগ্রহ করে একটু সাহায্য করলেই তারা এ যাত্রা উদ্ধার পেতে পারে!"

লোকটী একটুও আশ্চর্য্য হ'ল না, বেশ সহজভাবেই বললে, "বেশ! আমার দ্বারা তাঁদের যতটুকু উপকার হতে পারে, আমি তা কর্‌তে প্রস্তুত।"

ঘরে ঢুকতেই—"এই যে, আসুন, আসুন! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্!" ইত্যাদি এমন একটা সমস্বরে সকল রকমের অভ্যর্থনা হ'ল যে লোকটা একটু ভড়্‌কে গেল! বিনয় তাসের প্যাকেটটা বার-দুই সশব্দে কাটিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "মহাশয়ের নাম?"

ভদ্রলোক ছাতাটি না মুড়ে খোলা অবস্থাতেই বারান্দার এক কোণে রেখে ঘরের ভিতরে এসে বললে, "আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—!"

"ওঃ! ব্রাহ্মণ! প্রণাম হই—" বলে বিনয় তাসের প্যাকেট-শুদ্ধ হাত যোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লে, "বসুন মশাই, আপনার সঙ্গে আলাপ করে আজ বড় খুসি হওয়া গেল।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "বসোনা হে প্রবোধ, ফকির বাবুকে যখন পাওয়া গেছে, তখন আর দেরী করছ কেন? এক হাত আরম্ভ করা যাক্!" তাস জোড়াটা আর দু'চারবার জোরে ভেঁজে নিয়ে পাশের লোকের কাছে এগিয়ে দিয়ে বিনয় বললে, "কাটাও তো খুড়ো! তোমার হাত কাটে কেমন, দেখা যাক্!"

ফকিরবাবু সবে আসরে নাম্‌ছিলেন, ব্যাপার দেখে হঠাৎ শশব্যস্তে সরে দাঁড়িয়ে বললেন, "মাপ করবেন মশাই—আমার খেলাধূলো

করবার মোটেই সময় নেই!" বলেই তড়্ তড়্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে কোণ থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে হন্ হন্ করে নীচেয় নেমে গেলেন! আমরা সব অবাক্ হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ যে যার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম!

বিনয় বল্‌লে, "আচ্ছা লোক তো তোমার এই ফকির বাবুটী!—কি অভদ্র, দেখেচো?"

খুড়ো বললে, "বেজায় বেরসিক!" সেদিন থেকে এই লোকটীর উপর আমাদের অশ্রদ্ধা একেবারে দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

৩

শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রত্যেক বছর আমাদের মেসে চাঁদা তুলে খুব ঘটা করে সরস্বতী পূজা হতো। সে বছরও সরস্বতী পূজোর ক'দিন আগে থাক্‌তে মেসের এই বার্ষিক উৎসবের আয়োজন সুরু হ'য়ে গেল। চাঁদার খাতা নিয়ে প্রত্যেকের ঘরে আমরা জনকতক ডাকাতের মতো গিয়ে পড়ে নাম সই করিয়ে নিতে লাগলুম।

সব-শেষে আমরা যখন ফকির বাবুর ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লুম, তিনি তখন হারিকেন লণ্ঠনটি একটী উপুড়-করা খালি বিস্কুটের টিনের উপর বসিয়ে চশমা-চোখে একতাড়া কাগজ নিয়ে কি লিখছিলেন,—আমাদের এই অতর্কিত আক্রমণে আশ্চর্য্য হয়ে চশমাটি কপালের উপর তুলে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি তখন চাঁদার খাতাখানা তাঁর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললুম—"নিন্, লক্ষ্মী ছেলের মতন দশটি টাকা সই ক'রে দিন্‌ত।"

ফকিরবাবু বারকতক খাতাখানার দিকে, বারকতক আমাদের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের টাকা?"

তিন-চার জনে বলে উঠ্‌লুম, "চাঁদার!"

তারপর কিসের চাঁদা সেটা যখন তিনি স্পষ্ট করে জানতে চাইলেন, তখন তাঁকে বেশ করে বুঝিয়ে দেওয়ায় তিনি সমস্ত শুনে একটু যেন আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "এত টাকা আপনারা সমস্তই তুলতে পারছেন এই পূজোর নাম করে?—এ কি সেদিন সব খরচ হবে?"

এই প্রশ্ন শুনে আমাদের মধ্যে দু'এক জন একটু চটে গেল। তারা মনে করলে, চাঁদা না দেবার মতলবে ফকির বাবু বোধ হয় তাদের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তাই তারা একটু অভদ্রভাবেই জবাব দিলে—"সব খরচ হবে না তো কি কিছু-কিছু আমরা মনি-অর্ডার করে বাড়ী পাঠাবো!"

ফকিরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না—আমি তা বলচিনে—আমি বল্‌ছিলুম পূজোটাতে যে খরচটুকু না করলে নয়—তাতেই সেরে কিছু বাঁচাতে পারা যায় না কি?"

আমরা জানতে চাইলুম, "কেন! তাতে কি হবে?"

"যদি কিছু বাঁচাতে পারা যেতো, তাহ'লে সেটা অন্য কাজে লাগাতে পারতেন!"

"কি রকম শুনি?"

"এই ধরুন—কোন একটা ছোট-খাটো Charitable Dispensary খুলে দেওয়া বা এমনিধারা কিছু—"

"মাপ করবেন মশায়। আমাদের এ দেবতার নামে তোলা টাকা, এর একটি পয়সাও অন্য-কিছুতে খরচ করতে পার্ব্ব না।

এই ধরুননা কেন, শুধু প্রতিমাখানাই নেবে পঁচিশ টাকা—তার পিছনে সিনারী দেওয়া থাকবে কিনা!—নীল সরোবরে বিকশিত শ্বেত পদ্মের পাপড়ির উপর এলায়িত-কুন্তলা দেবী বসে বীণা বাজাচ্ছেন, এ-রকম ঠাকুরের দাম ঢের। তারপর ধরুন পূজোর খরচ আছে। নৈবিদ্যি আছে, দক্ষিণে আছে, তাতেও প্রায় গোটা পঁচিশ টাকা পড়ে যাবে! তা ছাড়া এই মেসশুদ্ধ লোক, বন্ধু-বান্ধব, নিমন্ত্রিত অভ্যাগত, এদের সব খাওয়ার একটা মোটা খরচ আছে—তারপর ঢুলি-বিদেয়—বিসর্জ্জনের খরচ, কুলি-ভাড়া, নৌকো-ভাড়া, ব্যাণ্ড, এসেটিলিন—"

ফকিরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "বুঝেচি। মাপ কর্ব্বেন, আপনাদের অনুরোধ আমি রাখতে পার্ব্বনা। বাজে পয়সা নষ্ট করবার মতো অবস্থা আমার মোটেই নয়। আপনাদের পূজোয় আমি একটি পয়সাও দেব না!"

আমরা সব তখন রাগে-অপমানে গর্‌গর্ করতে করতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। ব্যাপার শুনে মেসে একটা সোরগোল পড়ে গেল। ক্রমে জানতে পারা গেল যে লোকটা যে রকম দুরবস্থার ছুতো জানায়, বাস্তবিকই তার অতটা দুরবস্থা নয়—বরং বেশ স্বচ্ছল অবস্থাই বলতে হবে,—কেন না মাস গেলে নানা কাজে সে প্রায় শ' দেড়েক টাকা উপায় করে—সকালে বড়বাজারে এক মাড়োয়ারীর তাগাদায় বেরোয়, দুপুর বেলায় দালালির চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়, বিকেল-নাগাদ কলুটোলায় দিল্লীওয়ালা না কাদের দোকানে বসে, সন্ধ্যার মুখে কতকগুলো মুদী-মহাজনের খাতাপত্র লিখে দিয়ে বাড়ী ফেরে, আবার রাত্রে ঘরে বসে আদালতের মামলা-মকর্দ্দমার কাগজ-পত্র দলীল-দস্তাবেজ সব নকল করে দেয়। দালালি কাজটায় নাকি বেশ থোক-থাক্ মোটা টাকা মারে!--তবু কিনা মশায়,—এই বার্ষিক সরস্বতী পূজোয় একপয়সা চাঁদা দিতে সর্ত্ত পুরলো না—!

শুনে বিনয় বল্‌লে, "ওটা ছোট লোক! কিপ্টের শিরোমণি!—অত টাকা রোজগার করেও যে ও-রকম mean style-এ থাকে, তার কাছ থেকে চাঁদার আশা করাই তোমাদের অন্যায় হয়েছে! প্রবোধ যা মনে করেছিল এখন দেখচি সেইটেই ঠিক্! ও ঘরটায় আজও আবর্জ্জনাই পোরা রয়েছে!"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেসে রটে গেল যে অত বড় কঞ্জুষ কৃপণ চশম-খোর চামার আর দুটি নেই! সেদিন থেকে ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তাও আমরা বন্ধ করে দিলুম। সকলের চেয়ে জোর গলায় আমিই ফকির চাটুজ্যেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলুম যে ওর মুখ দেখলেও মহাপাপ!

৪

সে বছর কলকাতায় বসন্ত রোগটা বেজায় চেগে উঠলো। প্রথমেই আমাদের মেসের ঝী জগ, তারপর দু'একজন বোর্ডার শীতলা মায়ের অযাচিত অসীম অনুগ্রহে একসঙ্গে শয্যা নিলে, আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ঝী-মাগী, আর একজন বোর্ডার যখন ঐ রোগেই মারা পড়লো, তখন হরু ঠাকুরের মেস ছেড়ে বাবুরা সব যে-যার একে একে সরে পড়তে লাগলেন। আমিও পালাবো-পালাবো মনে করছিলুম, জিনিষ-পত্র গুছিয়ে গাছিয়ে বেঁধে ফেলেছি,

সব ঠিক ঠাক্—কাল সকালে উঠেই চম্পট দেবো, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যাওয়া আর আমার ঘটে উঠ্‌লো না,—সকালে যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, তখন সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, গলার ভিতরটা বিষফোড়ার মত টাটিয়ে উঠেছে—ভীষণ জ্বরে গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে!—চুপটি করে সমস্ত দিন বিছানায় শুয়ে পড়ে রইলুম।

এমনি অসহায় অবস্থায় সমস্ত দিন কেটে গেল; রাত্রি আর কাটে না,—সে কি যন্ত্রণা! সর্ব্বাঙ্গে যেন তপ্ত ছুঁচ বিঁধ্‌চে—হাত বুলিয়ে তখন অনুভব করলুম, বেশ ডুমো ডুমো হয়ে আমার সমস্ত মুখখানা একেবারে ভরে গেছে! প্রাণ যেন উড়ে গেল! বাসার সঙ্গী, যারা আজ এই ক'দিন হ'ল মায়ের অনুগ্রহে অসময়ে মারা গেছে, তারাই যেন আজ চারিদিক থেকে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে আমার দুর্দ্দশা দেখে প্রেতের মত অট্টহাসি হাসতে লাগ্‌ল! তাদের সেই দীর্ঘতর প্রেতমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে গুটির কালো কালো গভীর ক্ষত-চিহ্নগুলো জীবনের ওপারে গিয়ে যেন আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছিল! আমার এটা বেশ মনে আছে যে, আমি ভয়ে আঁৎকে উঠে পরিত্রাহি চীৎকার করতে সুরু করে দিলুম। তারপর আর আমার কিছু মনে পড়ে না।

যেদিন চোখ চাইলুম, দেখি, ফকিরবাবু এক আকুল আগ্রহ-দৃষ্টি নিয়ে আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে স্থির হয়ে চেয়ে আছেন। আমাকে চোখ মেল্‌তে দেখে একটা যেন আশাতীত আনন্দ-ভাতি তাঁর সমস্ত মুখখানায় সুস্পষ্ট ফুটে উঠ্‌লো,—ওধারে এধারে চোখ ফিরিয়ে দেখি, ঘরের ভিতর একজন সাহেব ডাক্তার, একজন বাঙালী ডাক্তার, আর একজন নার্স! পাশের একখানা টীপয়ে নানারকম ওষুধপত্র। শুনলুম, আজ তিন দিন আমি অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছি। বাসায় আর কেউ নেই, সবাই পালিয়েছে। ফকির বাবু একলা কেবল আমাকে আগ্‌লে নিয়ে এই শ্মশান-পুরী সরগরম করে বসে আছেন। তাঁর নির্ভয় হৃদয়ের অপরিসীম সহানুভূতি আর অক্লান্ত সেবা-যত্নে আমি সে যাত্রা বেঁচে গেলুম। আমার জন্যে অকারণ অর্থব্যয় করে তাঁর এই সমারোহ-চিকিৎসার ব্যবস্থা সার্থক হল।

প্রায় মাসখানেক পরে আমি যখন বেশ সেরে উঠলুম,—ফকির বাবুও তখন উপরে ওঠা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। ইতি-মধ্যে দেশে চিঠি লিখে কিছু টাকা আনিয়ে, আমি একদিন ফকির বাবুর কাছে গিয়ে বললুম, "দাদা, প্রাণ দিয়েছ তুমি, সে ঋণ শোধবার নয়, জানি, কিন্তু টাকাটা তোমায় নিতেই হবে!"

ফকিরদা হেসে বললেন, "থাক! পাগলামি করতে হবে না। ও টাকা এখন তোমার কাছেই থাক্, আমার যখন দরকার হবে, নেবো।"

অনেক সাধ্য-সাধনা করেও ফকিরদাকে কোনমতে টাকা নেওয়ায় রাজি করাতে পারলুম না; অগত্যা টাকা আমার কাছেই রইল।

দু'মাস না যেতে যেতে হরুঠাকুর আবার দেশ থেকে ফিরে এল। মেসের খালি ঘর-গুলোও একে একে নতুন লোক এসে অধিকার

করে ফেললে। আমি কিন্তু সিঁড়ির নীচের ঐ সবার-কাছ-থেকে-পালিয়ে-থাকা নিঃসঙ্গ স্বল্পভাষী লোকটীর যে বিশাল হৃদয় আর উদার অন্তরের পরিচয় পেয়েছিলুম, হোক্ সে কৃপণ, হোক্ সে কঞ্জুষ, তবু তার কাছ থেকে কিছুতেই আর নিজেকে দূরে রাখতে পারলুম না। সন্ধ্যার পর কখন ফকিরদা ফিরবে, উদ্‌গ্রীব হয়ে তার অপেক্ষা করতুম। ফকিরদা এলেই তাঁর সঙ্গে তাঁর সেই সিঁড়ির নীচের খোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকতুম। ফকির দাকে কত সাধাসাধি করেও উপরে উঠতে রাজি করাতে পারিনি—কাজেই আমাকেই নীচেয় নামতে হয়েছিল।

একটা কথা কিন্তু আমি কিছুতেই এখনও ভেবে ঠিক করতে পারিনি যে, ফকিরদার মত একজন মিতব্যয়ী সঞ্চয়ী লোক—অর্থাৎ আমরা যাকে স্পষ্ট ভাষায় কৃপণ বলি, তিনি—হঠাৎ আমার মত একজন অনাত্মীয় নিঃসম্পর্কীয় লোকের ব্যায়রামের চিকিৎসায় একেবারে মুক্তহস্ত হ'য়ে এতগুলো টাকা খরচ করে ফেললেন কেন? আর সে টাকা সমস্তই আমি তাঁকে ফেরৎ দেবার জন্যে এত পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও, তিনি তার একটি পয়সাও ফেরৎ নিলেন না, এরই বা মানে কি! এটা আমার কাছে একটা রহস্যের মতই দুর্জ্ঞেয় হয়ে রইল!

রোজ সন্ধ্যার পর তাড়া তাড়া কাগজ বগলে করে ফকিরদা এসে ঘরের ভিতর ঢুকতেন, আর হারিকেন আলোটী জ্বেলে মুখ টিপে বসে তার নকল করে যেতেন। আমিও চুপটি করে তাঁর কাছে বসে হয় বাংলা কাগজ, নয় একখানা উপন্যাস পড়তুম, মাঝে মাঝে দু'এক ছিলিম তামাক খেতুম, আর—ক্বচিৎ দু'টো-একটা কথা কইতুম। শেষটা কিন্তু রোজই তাঁর সেই সতরঞ্চির উপর পড়ে তোফা নাক ডাকাতে সুরু ক'রে দিতুম, যতক্ষণ না হরু ঠাকুর এসে—খাবার হয়েছে, খাবেন, আসুন—বলে তাড়া দিত! খেয়ে উঠেও ফকিরদার ঘরে বসে পান চিবুতে চিবুতে একছিলিম তামাক খেয়ে তবে আমি উপরে শুতে যেতুম। ব্যায়রাম থেকে উঠে অবধি এই ছিল আমার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। আর ফকিরদা খেয়ে এসেই আবার হারিকেনে-কমিয়ে-রাখা পল্‌তেটা বাড়িয়ে দিয়ে লিখতে বসে যেতেন!

একদিন জিজ্ঞাসা করলুম—"আচ্ছা ফকিরদা, তুমি এত খাটো কিসের জন্যে? তোমার ঘাড়ের উপর বুঝি একটা বৃহৎ পরিবারের অন্নসংস্থানের ভার?"

ফকিরদা লিখ্‌তে লিখ্‌তে ঘাড় না তুলেই একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, "পরিবারের মধ্যে আমি একা, প্রবোধ!"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "সে কি! তুমি কি তবে বে-থা করনি?"

"করেছিলুম বই কি!"

"তবে?"

"সে সব পাট চুকে গেছে!"

"ছেলে-পুলে ছিল না?"

"খুব ছিল!"

"তারা কোথায়?"

ফকিরদা কলমের ডগাটা দিয়ে কড়ি-কাঠের দিকে ইঙ্গিত করলেন; বুঝ্‌তে পারলুম, তারা সব স্বর্গে! সেদিন আর বেশী কিছু তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। লোকটিকে

যে চরম শোকের নিষ্ঠুর বজ্র বারবার আঘাত করে একেবারে পিষে দিয়ে গেছে,তা তার মুখের ভাব দেখে সে দুঃসংবাদ যেন তৎক্ষণাৎ আমার বুকের ভিতর একেবারে সেঁধিয়ে গেল !

৫

ফকিরদাকে রোজ অনেক রাত পর্য্যন্ত এই রকম পরিশ্রম করতে দেখে একদিন আর চুপ করে থাক্‌তে না পেরে বলে ফেললুম, "আচ্ছা ফকিরদা, তোমার তো ভাই খাবার লোক কেউই নেই,—তবে তুমি রোজগারের চেষ্টায় সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত এমন ক'রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শরীরটাকে মাটি করছো কেন, বল তো ? আর এত রোজগার করেও এমন দৈন্যদশায় থাকো কেন, তাও বল ? সেইজন্যেই তো লোকে তোমাকে কৃপণ বলে !"

ফকির দা হাস্‌তে লাগলো। এ সেই শোকের করুণ, কাতর, বেদনায় আর্ত্ত মলিন, বিবর্ণ হাসি। হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি বল্‌লেন, "আছে রে আছে, অনেক কারণ আছে—তার সঙ্গতি যেটুকু তা খুঁজে দেখবার মোটেই অপেক্ষা রাখি না। সে সব চোখের জলে ভেজা—বুকের রক্তে রাঙানো ইতিকথা। যদি সময় হয় তো আর একদিন শোনাবো, আজ শুধু এইটুকু জেনে রাখো প্রবোধ, যে, আমার যারা নিকটতম ছিল, তারা এম্‌নি ঘরেই শুয়ে-বসে, এম্‌নি খাওয়াই খেয়ে-দেয়ে হাসিমুখে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে ! তাদের আমি কখনো এর চেয়ে সুখে রাখ্‌তে পারি নি !"

আজ ক'দিন থেকে ফকিরদার ঘরে তালা-চাবি লাগানো রয়েছে। ফকিরদা যে কোথায় উধাও হয়েছে, কেউ জানে না। হরু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে সে বিরক্ত হ'য়ে বলে ওঠে, "কি জানি বাবু! তিনি কি আমায় বলে গেছেন ? এমন তো প্রায়ই মাঝে মাঝে তিনি ডুব মারেন। এক হপ্তা, দু'হপ্তা কখন-কখন তিন হপ্তাও কেটে যায়, তাঁর ফিরতে ! তা আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? এলেই তো জান্‌তে পারবেন।"

এ কথার পর আর হরুঠাকুরকে কিছু জিজ্ঞাসা করা চললো না। কিন্তু ফকিরদার জন্যে মনটা বড্ডই চঞ্চল হয়ে থাক্‌তো। থেকে-থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে বারাণ্ডায় ঝুঁকে পড়ে দেখতুম—দরজায় এখনও সেই প্রকাণ্ড তালাটা লাগানো আছে !

একদিন সন্ধ্যার পর একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে এসে বাসায় ঢুক্‌চি, দেখি, সদর থেকে উঠানে যাবার যে সরু গলি-পথটা—তারই মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে বাঁ হাতের উপর মাথা রেখে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শুয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই ধড় মড় করে উঠে পড়ে বুড়ী জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ বাবা, তোমারই নাম কি ফকির চন্দর ?"

বুঝলুম, বুড়ী ফকিরদাকে খুঁজচে। জানতে চাইলুম—"কেন, কি দরকার ?"

বুড়ী একেবারে দণ্ডবৎ হয়ে আমায় একটা নমস্কার করে বললে, "তোমার নাম শুনে বাবা ছুটে আস্‌চি, তুমি গরীবের মা-বাপ। শুনলুম, আমাদের কাদী কামারণীর শিবরাত্রির শল্‌তে ঐ ছিদাম ছোঁড়াকে তুমি নাকি যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছো, আমার গুপি-নাথকেও, বাবা, তোমাকে বাঁচাতেই হবে।"

আশ্চর্য্য হয়ে আমি বল্‌লুম, "সে কি বুড়ী ! আমি তো ডাক্তার নই, আমি তোর গুপীনাথকে বাঁচাবো কি করে ?"

বুড়ী আমার হাতখানা দু'হাতে চেপে ধরে বললে, "আমি সব শুনেচি, বাবা ! আমায় তুমি ভোলাতে পার্ব্বে না। তোমার পায়ের ধূলো পেলে গুপীনাথের আমার ডাক্তার-কবরেজের দরকার হবে না ! একবার দয়া ক'রে আমার কুঁড়েয় পা দেবে চল, লক্ষ্মী বাবা আমার—"

বিদ্যুতের ঝল্‌কানির মতো আমার বুকের ভিতর দিয়ে চিক্‌মিক্ করে চম্‌কে গেলো, আমার সেই রোগ-শয্যার বিচিত্র চিত্রখানা ! সংক্রামক মহামারীর ভয়ে পরিত্যক্ত জনমানবশূন্য বাড়ীর একখানা ঘরের ভিতর একলা আমাকে নিয়ে যে লোকটি মরণের সঙ্গে দিবারাত্র অবহেলায় যুদ্ধ করেছে, জলের মতো তার মুখ-দিয়ে-রক্ত-ওঠা পয়সা ব্যয় করে চিকিৎসার চূড়ান্ত করেছে, এ অভাগিনী তার রুগ্ন সন্তানকে রক্ষা কর্ব্বার জন্যে আজ তারই শরণাপন্ন হতে এসেছে। ফকিরদা থাক্‌লে নিশ্চয়ই ছুটে গিয়ে তাকে আশ্রয়ে টেনে নিতো ! আমি আর দ্বিরুক্তি না করে বল্লেম, "চল মা, তোমার ছেলের কি হয়েছে, দেখে আসি।"

গুপীনাথের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। সুযোগ্য চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আর স্নেহময়ী জননীর সেবা-যত্নে গুপীনাথ আরাম হয়ে উঠে যেদিন পথ্য করলে, বুড়ী চোখের জলে আমার পা দুটোকে সেদিন ভিজিয়ে দিয়ে বললে, "বাবা ফকিরনাথ, তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা, তোমার দয়াতেই আমার গুপীনাথকে আমি ফিরে পেলুম !"

বুড়ীকে হাত ধরে তুলে এইবার তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, আমি ফকিরনাথ নই, তাঁর বন্ধু। ফকিরদা আজ তিন হপ্তার উপর হোলো কোথায় চলে গেছেন, কেউ জানে না।

বুড়ী বললে, "আমি যে দিন ফকির বাবার সন্ধানে যাই, কাদী কামারণী আমায় বলেছিল বটে যে, বাবা এখন কলকাতায় নেই, দেশে হাসপাতাল হবে, তাই সেখানে দেখা-শুনো করতে গেছেন, ওদের এক গাঁয়েই বাড়ী কি না !"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, "তারা এখন কোথায় থাকে গুপীর মা ?"

গুপীর মা, আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ঐ যে বটগাছটা দেখ্‌তে পাচ্ছ, ওইখানে ঐ মোড়ের ব্যাঁকের মুখে ওদের বাসা। ও মা, এই যে নাম করতে না করতেই এসে হাজির। কি দিদি, কেমন আছিস্ ? ছিদাম ভালো আছে তো ?"

কাছুর কাঁকালে একটা বাজারের টুক্‌রি ছিল, সেটাকে নামিয়ে রেখে কলে হাত পা ধুতে ধুতে সে বল্‌লে, "আমাদের আর থাকা-থাকি দিদি ! অম্‌নি চলে যাচ্ছে এক রকম ! তোমার গুপীনাথের খবর কি, বল ! ফকির বাবার দেখা পেয়েছিলে ?"

বুড়ী গুপীনাথের রোগের, চিকিৎসার আর আরামের সবিস্তার বর্ণনা করে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে শতমুখে আমার প্রশংসা ক'রে আমাকে দেখিয়ে বললে, "কপাল-দোষে ফকির বাবার দেখা পাইনি বটে, কিন্তু এই বাবার দয়াতেই এবার আমার গুপীনাথকে আমি ফিরে পেয়েচি।" কতকটা বিস্মিত অথচ সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে

চাইতেই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কি ফকির বাবুর দেশের লোক ?"

কাদু ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ বাবা, কিন্তু দেশের লোক যদি নাও হতুম, তা হলেও তিনি আমার যে কর্‌নাটা করেছেন তার চেয়ে যে একটুও কম করতেন না, এ আমি বেশ জোর করে বল্‌তে পারি।"

আমি একটু কৃত্রিম বিশ্বাসের হাসি হেসে বল্‌লুম, "পাগল হয়েছো, আজ কাল কি তা কেউ করে থাকে !"

কাদু এই কথা শুনে একেবারে উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বল্‌তে লাগলো, "আর কেউ করুক আর না করুক, আমাদের ফকির বাবা যেদিন থেকে তাঁর ঘর-আলো-করা লক্ষ্মী-প্রতিমের মতো বউকে আর তাঁর চাঁদপানা ছেলেমেয়েগুলোকে তিন দিনের ওলাউঠোয় শিঙুড়ের শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেচে, সেদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছে যে, বিনা-চিকিৎসায় আর কাউকে সে মরতে দেবে না !"

ফকিরদার জীবনের এই বেদনাতুর বিষাদের রহস্যাবৃত দিকটা এমন সুস্পষ্ট হয়ে আর কখনো আমার চোখের সাম্‌নে পড়েনি —আজ যেমন ভাবে সেটা ধরা পড়ল ! তবু আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—যদিও আমার গলার স্বর তখন ভেরে এসেছে,—"ফকিরবাবু স্ত্রী-পুত্র বুঝি সব বিনা-চিকিৎসায় মারা গেছে ?"

কাদু এবার হেসে ফেল্‌লে ! আমার অজ্ঞতার পরিমাণ দেখে এ যেন তার কৃপা-মিশ্রিত অবজ্ঞার হাসি !—হাসতে হাসতে সে বললে, "নাও কথা !—সে কি আর এই কলকাতার সহর বাবা,—সেখানে ডাক্তার-কবরেজ মেলেই না ! তিরিশ কোশের ভেতরও একটা হাসপাতাল নেই ! তাইতো আমাদের ফকির বাবা তাঁর যথা-সর্ব্বস্ব দিয়ে দেশে একটা হাসপাতাল বানিয়ে দিচ্ছেন !"

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

ভারত ইতিহাসের ইংরাজ লেখক

ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ যুগের অনেক কাহিনী এখনও ইতিহাসের আলোক-পাতের অপেক্ষা করিতেছে। তার কারণ এই যে এই যুগের যাঁরা ঐতিহাসিক, তাঁরা যেমন ঐতিহাসিক উপাদান প্রচুর পাইয়াছেন, তেমনই আর-এক বিষয়ে তাঁরা প্রাচীন ঐতিহাসিকদের চেয়ে অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন বিস্তর। যে কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা কিম্বা মন্তব্য পাঠ করিলেই তাঁর পক্ষ-পাতিত্ব সহজেই ধরা পড়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সকল ইংরাজ লেখক এই যুগের কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁরা প্রায়ই ঐতিহাসিক হিসাবে না লিখিয়া জীবন-চরিত লেখক হিসাবেই তাহা লিখিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে যে অধ্যায়ের আলোচনা করিব, তাহার সম্বন্ধে নামজাদা লেখকের কোন অভাব নাই। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তার ভিত্তি

দৃঢ় করিয়াছিলেন এবং ক্লাইবের রাজত্বের দ্বিত্বশাসনের অর্থাৎ 'dyarchy'র অনেক দোষ সংশোধন করিয়া ভারত-শাসনকে সভ্য সমাজের অনেকটা উপযোগী করিয়াছিলেন। এই সব কারণে তিনি ইংরাজ জীবন-চরিত-লেখকদের নিকট এবং এই হতভাগ্য দেশে সাধারণ স্কুলবুক কমিটির পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা-দিগের নিকট প্রচুর প্রশংসা পাইয়াছেন। ফরেষ্ট তাঁর Administration of Warren Hastings নামক গ্রন্থে এবং কাপ্তেন ট্রটার তাঁর Warren Hastings গ্রন্থে ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল বা বড়লাট হেষ্টিংসের গুণাবলী যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁর স্থান ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেট বা নেপোলিয়নের পার্শ্বেই হওয়া উচিত। ফরেষ্ট তাঁর Selections from the State Papers preserved in the Foreign Department গ্রন্থে ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন-কালের মূল দলিল,সনদ ও চিঠি-পত্র ছাপিয়াছেন। তাহাতে আধুনিক কালে ঐতিহাসিক গবেষণার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভূমিকায় ফরেষ্ট আপনার যেটুকু অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেক সময় তাঁহার State Papers-এ প্রকাশিত কাগজপত্রের সহিত মিলাইতে গেলে ভুল প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাঁর মত বা ঐতি-হাসিক ঘটনার বিবরণ যাহাই হউক, তাঁর এই তিন খণ্ড পুস্তক ঐ যুগের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য্য গ্রন্থ। স্যর ফিট্‌জেমস্ ষ্টিফেন অনেক দিন ভারতবর্ষে চাকরী করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের অন্নে পরিপুষ্ট হইয়াও ভারত-বাসীর বিপক্ষে তাঁহার মজ্জাগত বিদ্বেষভাব একেবারে প্রশমিত হয় নাই। তিনি যে ভাবে তাঁর Story of Nuncoomar গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, হেষ্টিংস ও ইলাইজা ইম্পিকে একেবারে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক বলা যায় না। এ বিষয়ে ষ্ট্রাচির Rohilla War গ্রন্থ অনেক ভাল। তাঁর মতের সহিত আমাদের মতের মিল না হইতে পারে, তাঁর যুক্তি-তর্ক আমাদের বিচারবুদ্ধি গ্রহণ করিতে না পারুক, কিন্তু ঐতিহাসিকের যাহা প্রধান গুণ তাহা আমরা তাঁর গ্রন্থে দেখিতে পাই। তিনি হেষ্টিংসকে রোহিলাগণের সর্ব্বনাশ-সাধনের দোষ হইতে মুক্ত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন, এমন কি রোহিল-খণ্ড যে অযোধ্যার নবাব-উজীর ইংরাজের সহায়তায় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহারও সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি একটী কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁর ন্যায়পরতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিকের মত হেষ্টিংসের সপক্ষে বিপক্ষে যাহা-কিছু ঐতিহাসিক মাল-মসলা আছে, সবই পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। নিজের মন্তব্য হেষ্টিংসের অনুকূলে যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পাঠক তাঁর নিজের মত গঠন করিবার যথেষ্ট উপাদান তাহাতে পায় ; প্রতিকূল নজীর গোপন করিবার অভিযোগ লেখককে কেহ দিতে পারে না।

যে যুগের ঘটনা এই প্রবন্ধের বিষয়, তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক এখনও দুর্ল্লভ। একদিকে যেমন ফরেষ্ট,ট্রটার, ষ্ট্রাচি ও ষ্টীফেন ; অন্যদিকে আবার বার্ক,মিল ও মেকলে। কত চরিতাখ্যায়ক হেষ্টিংসের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করিলেন, কত ঐতিহাসিক তাঁহার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ

করিলেন, কত টেক্‌ষ্ট্‌-বুক-কমিটী রাজভক্ত গ্রন্থকারের পুস্তক অনুমোদন করিল, কিন্তু হেষ্টিংসের কালিমা আর ইতিহাস হইতে কিছুতেই মুছিল না। তার প্রধান কারণ বার্কের তেজস্বিনী বক্তৃতা, মিলের অমর ইতিহাস এবং মেকলের হৃদয়গ্রাহী ভাষা। হেষ্টিংসের চরিতাখ্যায়ক গ্রীগ কত সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইলেন যে রোহিলা যুদ্ধে হেষ্টিংসের কোন শয়তানী মতলব ছিল না। হেষ্টিংস তাঁহার প্রভু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সুবিধার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা লইয়া রোহিলখণ্ড জয় করিবার জন্য ইংরাজ সৈন্য অযোধ্যার নবাব উজীর সুজাউদ্দৌলাকে ধার দিয়াছিলেন। গ্রীগ খুব কাতরভাবেই বলিয়াছেন, "I really cannot see upon what grounds either of political or moral justce, this proposition deserved to be stigmatized as infamous." অর্থাৎ "রাজনীতি বা ন্যায়বিচার কোন দিক্ দিয়াই আমি বুঝিতে পারি না এই ব্যবস্থাকে কি ভাবে নিন্দনীয় বলা যাইতে পারে।"

মেকলে এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তার উপর মন্তব্য করিলেন—

"If we understand the meaning of words, it is infamous to commit a wicked action for hire, and it is wicked to engage in war without provocation.....The object of the Rohilla war was to deprive a large population who had never done as the least harm, of a good Government and to place them against their will under execrably bad one."

সোজা ভাষায় মেকলের টিপ্পনীর অর্থ এই যে "আমরা যদি কথার মানে বুঝি, তাহা হইলে মজুরী লইয়া একটা গর্হিত কাজ করা নিন্দনীয় এবং বিনা কারণে গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ করা গর্হিত কাজ···রোহিলা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল একটা বড় জাতি—যারা আমাদের কখনও কোন ক্ষতি করে নাই—তাদের সুন্দর শাসন ধ্বংস করিয়া একটা নিতান্ত জঘন্য শাসনের অধীনে তাহাদিগকে স্থাপন করা।"

কয়জন ইংরাজ বা ভারতবাসী—গ্রীগের গ্রন্থ পড়িয়া হেষ্টিংসকে বিচার করেন? মিল ও মেকলের রচনাবলী হেষ্টিংসের ললাটে চিরকলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছে। ইতিহাস-পাঠক মিলের কথাই সহজে গ্রাহ্য করেন। "Money was the motive to the eager passion for the ruin of the Rohillas অর্থাৎ অর্থলোভই রোহিলাদের সর্ব্বনাশ সাধনের তীব্র প্রচেষ্টার কারণ। সেইজন্য ষ্ট্রাচি ক্রোধে ও দুঃখে বিনাইয়া বিনাইয়া ঐতিহাসিকের ভাষায় বলিয়াছেন—

"Mill's account of the cicumstances attending the Treaty of 1772 between the Vizier and the Rohillas is very inaccurate.....Mill's misrepresentations regarding the campaign of 1773 are more serious···The truth is that in this and in other instances, Mill has entirely misrepresented the facts

which were before him, and has deliberately suppressed the most important part of Sir Robert Barker's evidences. It is not pleasant to use such expressions, but no milder terms would convey the opinion that I hold. অর্থাৎ "উজীর এবং রোহিলাগণের মধ্যে ১৭৭২ সালের সন্ধি-ঘটিত ব্যাপারের মিল যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভ্রমসঙ্কুল। ১৭৭৩ সালের যুদ্ধের সম্বন্ধে মিল গুরুতর মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। এই বিষয়ে এবং অন্যান্য ব্যাপারে সত্য কথা এই যে মিল তাঁর সম্মুখে যে সব সত্য খবর ছিল, তার মিথ্যা বিবরণ দিয়াছেন এবং স্যর্ রবার্ট বার্কারের সাক্ষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া দিয়াছেন। এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা মোটেই সুখপ্রদ নহে, কিন্তু এর চেয়ে নরম ভাষা ব্যবহার করিলে আমার যা মত তাহা ঠিক বুঝানো যাইত না।"

ষ্ট্রাচি ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে মিলকে মিথ্যাবাদী বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, একটু ঘুরাইয়া জুয়াচোরও বলিয়াছেন। এখন ইতিহাস-পাঠকদের মধ্যে কেহ কি ষ্ট্রাচি বা গ্রীগের গ্রন্থ পড়িয়া মিল বা মেকলের সিদ্ধান্তকে সহজে অগ্রাহ্য করিবেন? যতদিন ইংরাজ জাতি বাঁচিবে ও ইংরাজী ভাষা থাকিবে,যুগে যুগে দেশে দেশে নর-নারী মিল-মেকলের গ্রন্থ পড়িয়াই ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসন-কালের বিচার করিবে। সেইটাই একপক্ষে হেষ্টিংসের ও তাঁহার চরিত-আখ্যায়কদের বিশেষ দুর্ভাগ্য।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গরীবের দাবী

দীন সে কেন ধনীর দ্বারে
বল্‌বে কেঁদে—দাও?
কোন্ সাহসে বলবে ধনী—
'বেরোও, ভাগো, যাও!'
এক ধরাতে জন্মেছে সে,
যেমি আলো, হাওয়া,
অন্ন এবং অর্থও যে
তেমনি তারি পাওয়া।
ফাঁকি দিয়ে লক্ষ জনে
ধনী জমায় ধন,
দুঃখী কণা চাইতে এলে
করে প্রবঞ্চন!

পরের মুখের অন্ন কেড়ে
ধনীর জারিজুরি,
পরের ঘরে সিঁদ কেটে সে
কর্‌ছে বাহাদুরি!

* * *

ভিক্ষুক যে নয়ত হেয়,
সেও ত খাঁটি প্রাণ,
ঘৃণায় তারে গর্ব্বী ধনী
কর্‌বে অপমান?
ধনী, তোর ঐ অর্থ 'পরে
দুখীর আছে জোর,

লুটিস্ কেবল জমিয়ে রাখিস্
কিসের দাবী তোর ?
দয়া কিসের, দান বা কিসের ?—
পাওনা দিবি যে !—
দুঃখী এল তোর দ্বারেতে,
ভাগ্য মেনে নে !

সে এল না চাইতে কিছু
এল সে তার নিতে ;
তাড়িয়ে দিবি কোন্ সাহসে
হবেই তোরে দিতে !

* * *

ধনীরে, তুই বড় কিসের ?
ছোট বলিস্ কারে ?
দীনের পরাণ নয় মহীয়ান ?—
জিন্‌তে তোরে পারে !
ভিখারী সে দেব্‌তা এল—
আস্‌ছে দ্বারে যে বা,
অন্যায়ে তোর জমানো ধন
কর্ ন্যায়েতে সেবা !
প্রবল ধনী, লুট্‌লি প্রচুর,
কর্‌লি প্রবঞ্চনা ;
চুরির মুখে লজ্জা নাহি ?—
দেখাস্ বীরপনা !

* *

সার্ ধনীকে চুরির মালে
লুট্ করে দে ফেলে,
লক্ষ পেটের অন্ন যাহা
লক্ষে দে তা ঢেলে'।
নেইক ধনী, সবাই সমান,
ধনীরে কর্ দীন,
বিলিয়ে দিয়ে অর্থ তারি
চুকিয়ে দে সব ঋণ।
দুঃখী যে বা হীন কেন সে ?
দাঁড়াবে সে বলী,
যেথায় রবে গর্ব্বী ধনী
যাবে রে তায় দলি'।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

অবতার

১১

এই সকল ঘটনার দুই ঘণ্টা পরে, অলীক কৌণ্ট প্রকৃত কৌণ্টের নিকট হইতে অক্টেভের শিলমোহরে বন্ধ-করা এক পত্র পাইল।

হতভাগ্য অধিকারচ্যুত ব্যক্তির উহা ছাড়া আর কোন শিল-মোহর ছিল না। ইহার পরিণাম অদ্ভুত হইল। স্বকীয় কুলচিহ্নাঙ্কিত শিল-মোহর ভাঙ্গিয়া কৌণ্ট দেহধারী অক্টেভ পত্রখানা পাঠ করিল। বাধো বাধো হাতের লেখা ; মনে হয় নিজের হাতের লেখা নয়, আর কেহ লিখিয়া দিয়াছে। কেননা, অক্টেভের আঙ্গুল দিয়া লেখা, কৌণ্ট ওলাফের অভ্যাস ছিল না। পত্রে এই কথাগুলি লেখা ছিল :—"কতকগুলা অভাবনীয় ঘটনার পাকচক্রে বাধ্য হইয়া আমি এমন একটা কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি,—পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে যখন

হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা কেহ কখন করে নাই। আমি নিজেকে নিজেই লিখিতেছি। এবং এই পত্রের ঠিকানার উপর যে নাম দিয়াছি তাহা আমারই নাম,—যে নামটি তুমি আমার ব্যক্তিত্বের সহিত এক সঙ্গে চুরি করিয়াছ। আমি কাহার কূট চক্রান্তের কবলে পড়িয়াছি, কাহার প্রসারিত মায়াজালের ফাঁদে পা দিয়াছি, তাহা আমি জানি না—তুমি নিশ্চয়ই জান। তুম যদি ভীরু কাপুরুষ না হও, তাহা হইলে আমার পিস্তলের গুলি কিংবা আমার অসির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তোমাকে এই গুপ্ত কথা সম্বন্ধে এমন এক স্থানে জিজ্ঞাসা করিবে, যেখানে কি সৎ কি অসৎ সকল লোকেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে। আগামী কল্য আমাদের মধ্যে একজনকে আকাশের আলোক দর্শনে চিরকালের মত বঞ্চিত হইতে হইবে। এখন আমাদের দুজনের পক্ষে এই বিশাল জগৎটা অতীব সংকীর্ণ :—তোমার প্রতারক আত্মা যে শরীরে বাস করিতেছে, আমার সেই শরীরকে আমি বধ করব, অথবা যে শরীরে আমার ক্রুদ্ধ আত্মা আবদ্ধ রয়েছে, তোমার সেই শরীরকে তুমি বধ করবে।—আমাকে পাগল বলিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিও না—আমি ন্যায়সঙ্গত কাজ করিতে ভয় পাইব না ; ভদ্রজনোচিত শিষ্টতার সহিত, রাজদূত-সুলভ কৌশলের সহিত, তোমাকে আমি অপমান করিব ! কৌণ্ট ওলাফ-লাবিন্‌স্কি অক্টেভের চক্ষুশূল হইতে পারে, আর প্রতিদিনই ত অপেরা হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে গমন করা হয় ; আশা করি, আমার এই কথাগুলা অস্পষ্ট হইলেও তোমার নিকট একটুও অস্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। আর এক কথা,—তোমার সাক্ষীগণের সহিত আমার সাক্ষীগণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাল, স্থান ও নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে বোঝাপড়া করিয়া লইবে।"

এই চিঠিখানা অক্টেভকে বিষম মুস্কিলে ফেলিল। অক্টেভ কৌণ্টের এই আহ্বান-পত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না ; অথচ নিজের সহিত নিজে যুদ্ধ করিতে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি হইল না,—কারণ, এখনো তাহার আত্মার পুরাতন আবরণটির প্রতি কতকটা মমতা ছিল। একটা ভয়ানক অপমান অত্যাচারের দরুণ বাধ্য হইয়া এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, মনে করিয়া অক্টেভ এই যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিল। যদিও ইচ্ছা করিলে অক্টেভ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাগল সাব্যস্ত করিয়া, তাহার হাতে হাত-কড়ি লাগাইয়া তাহাকে যুদ্ধে বিরত করিতে পারিত, কিন্তু অক্টেভের কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইল। যদি মনের অদম্য আবেগ বশত সে একটা নিন্দনীয় কাজও করিয়া থাকে —যে রমণী সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের অতীত সেই রমণীর সতীত্বের উপর জয়লাভ করিবার জন্য যদি পতির মুখসে প্রণয়ীকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া থাকে, তথাপি সে আত্মসম্ভ্রমহীন ভীরু কাপুরুষ নহে ; তিন বৎসরকাল যুঝা-যুঝির পর, কষ্টভোগের পর, যখন প্রেমানলে দগ্ধ হইয়া তার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখনই অগত্যা এই অন্তিম উপায় সে অবলম্বন করিয়াছিল। সে কৌণ্টকে চিনিত না, সে কৌণ্টের বন্ধু ছিল না ; সে কৌণ্টের কোন ধার ধারিত না। এবং ডাক্তার বাল-

লুটিস্ কেবল জমিয়ে রাখিস্
কিসের দাবী তোর ?
দয়া কিসের, দান বা কিসের ?—
পাওনা দিবি যে !—
দুঃখী এল তোর দ্বারেতে,
ভাগ্য মেনে নে !

সে এল না চাইতে কিছু
এল সে তার নিতে ;
তাড়িয়ে দিবি কোন্ সাহসে
হবেই তোরে দিতে !

* * *

ধনীরে, তুই বড় কিসের ?
ছোট বলিস্ কারে ?
দীনের পরাণ নয় মহীয়ান ?—
জিন্‌তে তোরে পারে !
ভিখারী সে দেব্‌তা এল—
আস্‌ছে দ্বারে যে বা,
অন্যায়ে তোর জমানো ধন
কর্ ন্যায়েতে সেবা !
প্রবল ধনী, লুট্‌লি প্রচুর,
কর্‌লি প্রবঞ্চনা ;
চুরির মুখে লজ্জা নাহি ?—
দেখাস্ বীরপনা !

* *

সার্ ধনীকে চুরির মালে
লুট্ করে দে ফেলে,
লক্ষ পেটের অন্ন যাহা
লক্ষে দে তা ঢেলে' ।
নেইক ধনী, সবাই সমান,
ধনীরে কর্ দীন,
বিলিয়ে দিয়ে অর্থ তারি
চুকিয়ে দে সব ঋণ ।
দুঃখী যে বা হীন কেন সে ?
দাঁড়াবে সে বলী,
যেথায় রবে গর্ব্বী ধনী
যাবে রে তায় দলি' ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ।

অবতার

১১

এই সকল ঘটনার দুই ঘণ্টা পরে, অলীক কৌণ্ট প্রকৃত কৌণ্টের নিকট হইতে অক্টেভের শিলমোহরে বন্ধ-করা এক পত্র পাইল ।

হতভাগ্য অধিকারচ্যুত ব্যক্তির উহা ছাড়া আর কোন শিল-মোহর ছিল না । ইহার পরিণাম অদ্ভুত হইল । স্বকীয় কুলচিহ্নাঙ্কিত শিল-মোহর ভাঙ্গিয়া কৌণ্ট দেহধারী অক্টেভ পত্রখানা পাঠ করিল । বাধো বাধো হাতের লেখা ; মনে হয় নিজের হাতের লেখা নয়, আর কেহ লিখিয়া দিয়াছে । কেননা, অক্টেভের আঙ্গুল দিয়া লেখা, কৌণ্ট ওলাফের অভ্যাস ছিল না । পত্রে এই কথাগুলি লেখা ছিল :—"কতকগুলা অভাবনীয় ঘটনার পাকচক্রে বাধ্য হইয়া আমি এমন একটা কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি,—পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে যখন

হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা কেহ কখন করে নাই । আমি নিজেকে নিজেই লিখিতেছি । এবং এই পত্রের ঠিকানার উপর যে নাম দিয়াছি তাহা আমারই নাম,—যে নামটি তুমি আমার ব্যক্তিত্বের সহিত এক সঙ্গে চুরি করিয়াছ । আমি কাহার কূট চক্রান্তের কবলে পড়িয়াছি, কাহার প্রসারিত মায়াজালের ফাঁদে পা দিয়াছি, তাহা আমি জানি না—তুমি নিশ্চয়ই জান । তুমি যদি ভীরু কাপুরুষ না হও, তাহা হইলে আমার পিস্তলের গুলি কিংবা আমার অসির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তোমাকে এই গুপ্ত কথা সম্বন্ধে এমন এক স্থানে জিজ্ঞাসা করিবে, যেখানে কি সৎ কি অসৎ সকল লোকেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে । আগামী কল্য আমাদের মধ্যে একজনকে আকাশের আলোক দর্শনে চিরকালের মত বঞ্চিত হইতে হইবে । এখন আমাদের দুজনের পক্ষে এই বিশাল জগৎটা অতীব সংকীর্ণ :—তোমার প্রতারক আত্মা যে শরীরে বাস করিতেছে, আমার সেই শরীরকে আমি বধ করব, অথবা যে শরীরে আমার ক্রুদ্ধ আত্মা আবদ্ধ রয়েছে, তোমার সেই শরীরকে তুমি বধ করবে ।—আমাকে পাগল বলিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিও না—আমি ন্যায়সঙ্গত কাজ করিতে ভয় পাইব না ; ভদ্রজনোচিত শিষ্টতার সহিত, রাজদূত-সুলভ কৌশলের সহিত, তোমাকে আমি অপমান করিব ! কৌণ্ট ওলাফ-লাবিন্‌স্কি অক্টেভের চক্ষুশূল হইতে পারে, আর প্রতিদিনই ত অপেরা হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে গমন করা হয় ; আশা করি, আমার এই কথাগুলা অস্পষ্ট হইলেও তোমার নিকট একটুও অস্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না । আর এক কথা,—তোমার সাক্ষীগণের সহিত আমার সাক্ষীগণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাল, স্থান ও নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে বোঝাপড়া করিয়া লইবে ।"

এই চিঠিখানা অক্টেভকে বিষম মুস্কিলে ফেলিল । অক্টেভ কৌণ্টের এই আহ্বান-পত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না ; অথচ নিজের সহিত নিজে যুদ্ধ করিতে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি হইল না,—কারণ, এখনো তাহার আত্মার পুরাতন আবরণটির প্রতি কতকটা মমতা ছিল । একটা ভয়ানক অপমান অত্যাচারের দরুণ বাধ্য হইয়া এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, মনে করিয়া অক্টেভ এই যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিল । যদিও ইচ্ছা করিলে অক্টেভ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাগল সাব্যস্ত করিয়া, তাহার হাতে হাত-কড়ি লাগাইয়া তাহাকে যুদ্ধে বিরত করিতে পারিত, কিন্তু অক্টেভের কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইল । যদি মনের অদম্য আবেগ বশত সে একটা নিন্দনীয় কাজও করিয়া থাকে —যে রমণী সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের অতীত সেই রমণীর সতীত্বের উপর জয়লাভ করিবার জন্য যদি পতির মুখসে প্রণয়ীকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া থাকে, তথাপি সে আত্মসম্ভ্রমহীন ভীরু কাপুরুষ নহে ; তিন বৎসরকাল যুঝা-যুঝির পর, কষ্টভোগের পর, যখন প্রেমানলে দগ্ধ হইয়া তার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখনই অগত্যা এই অন্তিম উপায় সে অবলম্বন করিয়াছিল । সে কৌণ্টকে চিনিত না, সে কৌণ্টের বন্ধু ছিল না ; সে কৌণ্টের কোন ধার ধারিত না । এবং ডাক্তার বাল-

থাজার তাহাকে যে উপায় বলিয়া দিয়াছিল সেই দুঃসাহসিক উপায় অবলম্বন করিয়াই সে সফলতা লাভ করিয়াছে।

এখন সাক্ষীদিগকে কোথায় পাওয়া যায়? অবশ্য, কৌণ্টের বন্ধুবর্গের মধ্য হইতেই সাক্ষী সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু অক্টেভ যে দিন হইতে প্রাসাদে বাস করিতেছিল, তখন হইতে সেই সব বন্ধুদের সহিত তাহার ত মিলন ঘটে নাই।

চিম্‌নীর দুই জায়গা গোলাকার হইয়া দুইটা কৌটায় পরিণত হইয়াছে। একটা কৌটায় কতকগুলা আংটি, কতকগুলা আল্‌পিন, কতকগুলা শিল-মোহর এবং অন্যান্য ছোটখাটো অলঙ্কার, এবং আর একটা কৌটায় ডিউক, মার্কুইস্‌,কৌণ্ট প্রভৃতি অভিজাতবর্গের মুকুট-চিহ্ন-সমন্বিত,—পোলীয় রুশীয় হংগারীয়, জর্ম্মন, স্পেনীয় প্রভৃতি অসংখ্য নাম, ছোট বড় মাঝারি নানা হরফে সাক্ষাৎকারের কার্ডের উপর খোদিত রহিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, কৌণ্ট দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং সকল দেশেই তাঁহার কতকগুলি বন্ধু ছিল।

অক্টেভ উহার মধ্য হইতে দুইখানা কার্ড উঠাইয়া লইল ঃ—একখানা কৌণ্ট জামো-জ্‌কির, আর একখানা মার্কুইস্‌ সেপুল্‌ভেদার। তার পর অক্টেভ গাড়ী জুতিতে বলিল, এবং গাড়ী করিয়া উহাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। উভয়েরই সঙ্গে দেখা হইল। কৌণ্ট দেহধারী অক্টেভকে প্রকৃত কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি বলিয়া মনে করায়, অক্টেভের অনুরোধে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন না।

সাধারণ গৃহস্থ ধরণের মনোভাব তাঁহাদের কিছুমাত্র না থাকায়, তাঁহারা একথা একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একটা রফা হইতে পারে কি না, এবং যে কারণে দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হইবে সেই কারণ সম্বন্ধেও সম্ভ্রান্ত জনসুলভ সুরুচি অনুসারে একেবারে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন। একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

এদিকে, প্রকৃত কৌণ্ট অথবা অলীক অক্টেভ,—ইনিও এই একই-রকম মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। যাহাদের প্রাতর্ভোজনের নিমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সেই অ্যাল্‌ফ্রেড ও বাম্বোর নাম তাঁর মনে পড়িল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহাদের বন্ধু অক্টেভ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। কেন না তাঁরা জানিতেন, এক বৎসর হইতে অক্টেভ নিজের কোটর হইতে বাহির হয় নাই; এবং ইহাও জানিতেন, অক্টেভের শান্তিপ্রিয় মেজাজ, লাড়াক্কা মেজাজ আদপে নয়; কিন্তু যখন তাহা শুনিলেন একটা কোন অপ্রকাশ্য কারণে তুমি-মর কি আমি-মরি ধরণের যুদ্ধ হইবার কথা হইতেছে, তখন তাঁহারা আর কোন আপত্তি না করিয়া লাবিন্‌স্কি প্রাসাদে উপস্থিত হইবেন বলিয়া স্বীকার পাইলেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়মও স্থির হইয়া গেল। একটা মুদ্রা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া স্থির হইল, কোন্ অস্ত্র ব্যবহৃত হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা পূর্ব্বেই বলিয়া ছিল, অসিই হউক, পিস্তলই হউক, দুয়েতেই তাহাদের সমান সুবিধা হইবে।

প্রভাতে ৬টার সময় বোয়া-দে-বুলঙের-একটা বীথিকা-পথে একটা বিশেষ কুটীরের

সম্মুখে, যেখানে গাছপালা নাই, আর যেখানে বালুময় একটা পরিসর ভূমি আছে, সেইখানে দুই পক্ষের যাইতে হইবে।

যখন সব ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গেল, তখন রাত্রি প্রায় ১২টা। অক্টেভ কৌণ্টেসের মহলের দরজার দিকে অগ্রসর হইল। গত রাত্রির মতই ঘরে খিল দেওয়া ছিল, এবং কৌণ্টেস দরজার ভিতর হইতে, উপহাসের স্বরে এই-রূপ টিট্‌কারী দিয়া বলিলেন ঃ—

"যখন পোলোনী ভাষা শিখ্‌বে, তখন আবার এখানে এসো। আমি অত্যন্ত দেশভক্ত, কোন বিদেশীকে আমার বাড়ীতে আমি গ্রহণ করি না।"

অক্টেভ পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়ায়, ডাক্তার বাল্‌থাজার-শেরবোনো প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে অস্ত্রচিকিৎসার একটা ব্যাগ আর একটা পটির গাঁঠরী!—উহারা দুজনে একসঙ্গে এক গাড়ীতে উঠিয়াছিল। আর, কৌণ্টের সাক্ষীদ্বয়ও তাদের আপনাদের গাড়ীতে ছিল। ডাক্তার, অক্টেভকে বলিলেন ঃ—

বাপু হে,এ ব্যাপারটা দেখ্‌ছি শেষে একটা ট্র্যাজেডি হয়ে দাঁড়াল? তোমার শরীরের মধ্যে কৌণ্টকে আমার পালঙ্কের উপর হপ্তা-খানেক ঘুমতে দিলেই ঠিক্ হত। আমি সম্মোহন-নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সীমাটা অতিক্রম করে ফেলেছি। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সন্ন্যা-সীদের সম্মোহন বিদ্যা যতই অনুশীলন করা যাক না কেন, ওর কিছু না কিছু ভুলে যেতে হয়, খুব ভাল আয়োজন করতে পারলেও কিছু না কিছু ত্রুটি থেকে যায়। কিন্তু সে যাক্, কৌণ্টেস প্রাস্কোভি, এইরূপ ছদ্মবেশে তাঁর ফ্লরেন্সের প্রেমিককে কিরূপ অভ্যর্থনা করিলেন বল দিকি?

অক্টেভ উত্তর করিল;—আমার মনে হয়, আমার রূপান্তর সত্ত্বেও, আমাকে তিনি চিন্‌তে পেরেছেন, কিম্বা তাঁর রক্ষা-দেবতা আমাকে অবিশ্বাস করতে তাঁর কানে কানে কিছু ফুস্‌লে দিয়ে থাক্‌বেন। আমি তাঁকে এখনো সেই রকম মেরু-তুষারের মত শীতল ও শুদ্ধচিত্ত দেখতে পাই। তাঁর সূক্ষ্মদর্শী আত্মা নিশ্চয়ই জান্‌তে পেরেছে—যে দেহের উপর তাঁর ভালবাসা ছিল সেই দেহের ভিতরে এক অপরিচিত আত্মা এসে বাস করচে। আমি এই কথা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনি আমার জন্য কিছুই করতে পারেন নি। আপনি যখন প্রথম আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন আমার যে দুঃখের অবস্থা ছিল এখন তার চেয়ে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।"

ডাক্তার একটু বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন; —"আত্মার শক্তি-সীমা কে নির্দ্ধারণ করতে পারে? বিশেষতঃ যে আত্মাকে কোন পার্থিব চিন্তা স্পর্শ করে নি, যে আত্মা কোন মানবীয় কর্দ্দমে কলুষিত হয় নি, স্রষ্টার হাত থেকে যেমনটি বেরিয়েছিল তেমনিটিই রয়েছে, আলোর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যে ঠিক তেমনি বিচরণ করচে, এইরূপ আত্মার শক্তির কি কোন সীমা আছে?—হাঁ, তুমি ঠিক অনুমান করেছ, তিনি তোমাকে চিনতে পেরেছেন, লালসাময় দৃষ্টির সম্মুখে, তাঁর সতী-সুলভ বিশুদ্ধ লজ্জা শিউরে উঠেছিল, এবং সহজ সংস্কার বশে আপনা হতেই তিনি সতীত্বের রক্ষা-কবচে আপনকে আবৃত করেছেন। অক্টেভ, তোমার

জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়! বাস্তবিক, তোমার রোগ অসাধ্য। যদি আমরা মধ্য-যুগের লোক হতাম, তা' হলে তোমাকে বলতাম;—মঠে যাও, কোন মঠে গিয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কর।"

অক্টেভ উত্তর করিল;—"আমার অনেক সময় ঐ কথা মনে হয়েছে।"

উহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছে।—অলীক অক্টেভের গাড়ীও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়াছে।

এই প্রভাত কালে বোয়া-দে-বুলং ঠিক ছবির মত দেখিতে হইয়াছে। দিনের বেলা, যখন সৌখীন লোকের আমদানী হয় তখন এ শোভাটি থাকে না। এখন গ্রীষ্ম যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাতে সূর্য্য এখনো পত্রপুষ্পের হরিৎবর্ণকে ম্লান করিয়া তুলিতে অবসর পায় নাই। নিশির শিশিরে ধৌত হইয়া নীরন্ধ্র নিবিড় তরুপুঞ্জের পুষ্প সকল তাজা ও স্বচ্ছ আভা ধারণ করিয়াছে এবং নব্রীন উদ্ভিজ রাশি হইতে একটা সুগন্ধ নিসৃত হইতেছে। এই স্থানের বৃক্ষগুলি বিশেষ রূপে আরও সুন্দর। গাছের গুঁড়ি খুব জোরালো, শৈবালে মণ্ডিত সাটিনের মত মসৃণ একপ্রকার রূপালি ছালে বিভূষিত; বৃক্ষকাণ্ড হইতে কিম্ভূতকিমাকার শাখা-স্কন্ধ সকল বহির্গত হইয়াছে,—চিত্রকরের চিত্র করিবার সুন্দর মূল-আদর্শ! যে সকল পাখী দিনের গোলমালে চুপ হইয়া যায়, তাহারা এই সময়ে তরুপল্লবের মধ্য হইতে আনন্দে শিশ্ দিতেছে; চাকার ঘর্ঘর শব্দে ভীত হইয়া একটা খর্গোস তিন লাফে বালুকা-ময় পথের উপর দিয়া ছুটিয়া, ঘাসের মধ্যে লুকাইল।

বেশ বুঝিতেই পারিতেছ দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বন্দ্বীদ্বয়, ও তাহাদের সাক্ষীগণ প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্য্যের এই সব কবিত্ব লইয়া বড় একটা ব্যাপৃত ছিলেন না।

ডাক্তার শেরবোনোকে দেখিয়া কৌণ্ট-ওলাফের খারাপ লাগিল। কিন্তু তিনি এই মনের ভাবটা শীঘ্রই সাম্‌লাইয়া লইলেন।

অসি মাপা হইল, যুদ্ধের স্থান নির্দ্দেশ হইল। যোদ্ধাদ্বয় কোর্ত্তা খুলিয়া নীচে রাখিয়া আত্ম-রক্ষার ভঙ্গীতে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল।

সাক্ষীরা বলিয়া উঠিল—"এইবার!"

দ্বন্দ্বযুদ্ধমাত্রেই, এক-একবার গম্ভীর নিশ্চলতার মুহূর্ত্ত আসে; প্রত্যেক যোদ্ধা নিস্তব্ধভাবে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে, কোন্ সময় শত্রুকে আক্রমণ করিবে, তাহার মৎলব আঁটে এবং শত্রুর আক্রমণ আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। তার পর অসিতে অসিতে ঘসাঘসি ঠেকাঠেকির চেষ্টা হয়। এইরূপ বিরাম কয়েক সেকেণ্ড মাত্র স্থায়ী হইলেও, উৎকণ্ঠার দরুণ সাক্ষীগণের মনে হয় যেন কয়েক মিনিট, কয়েক ঘণ্টা!

এইস্থলে, দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়মগুলি, সাক্ষীদিগের নিকট সচরাচর ধরণের বলিয়া মনে হইলেও, যোদ্ধৃদ্বয়ের চোখে এরূপ অদ্ভূত ঠেকিয়াছিল যে, সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে,—তাহা অপেক্ষা বেশীক্ষণ তাহারা আত্মরক্ষায় ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া-ছিল। ফলতঃ প্রত্যেকেই দেখিল, তাহার সম্মুখে তাহার নিজের শরীর বিদ্যমান এবং যে মাংস গত-রাত্রেও তাহারই ছিল, সেই মাংসেরই মধ্যে কিনা আপন অসির তীক্ষ্ণ ফলা বসাইয়া দিতে হইবে!

—এ তো যুদ্ধ নয়—এ যে আত্মহত্যা!

এ কথা ত পূর্ব্বে মনে হয় নাই। যদিও অক্টেভ ও কৌণ্ট দুজনেই সাহসী পুরুষ, তথাপি নিজ দেহের সম্মুখে আপনাদিগকে দেখিয়া এবং নিজের শরীর নিজের অসিতেই বিদ্ধ করিতে হইবে মনে করিয়া, উভয়েরই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

সাক্ষীগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আর একবার বলিতে যাইতেছিল, "মহাশয়রা, আরম্ভ করুন না"—এমন সময় অসির আস্ফালন আরম্ভ হইল।

কয়েক বার উভয়েই উভয়ের আঘাত ঠেকাইল। সামাজিক শিক্ষার ফলে কৌণ্ট সিদ্ধলক্ষ্য ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বড় বড় ওস্তাদের সহিত অসি-যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু অসিযুদ্ধে দক্ষতা অপেক্ষা তাঁর পাণ্ডিত্যই বেশী ছিল। কৌণ্টের দেহ এখন অক্টেভের দেহ, সুতরাং অক্টেভের দুর্ব্বল মুষ্টি কৌণ্টের অসি ধারণ করিয়াছে।

পক্ষান্তরে, অক্টেভ কৌণ্টের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় সে এখন অজ্ঞাতপূর্ব্ব বল লাভ করিয়াছে, এবং অসিবিদ্যায় পারদর্শী না হইলেও, বুক দিয়া শত্রুর অসি ঠেলিয়া ফেলিতেছে।

ওলাফ শত্রুর শরীরে আঘাত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অক্টেভ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ও দৃঢ়ভাবে শত্রুর আঘাত ঠেকাইতে লাগিল।

ক্রমে কৌণ্টের রাগ চড়িয়া উঠিল, তাঁর অসিচালনায় আকুলতা ও বিশৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল! তিনি বরং অক্টেভ হইয়াই থাকিবেন কিন্তু যে দেহ কৌণ্টেস প্রাস্কোভিকে ঠকাইতে পারিয়াছে, সেই দেহটাকে তিনি নিশ্চয়ই বধ করিবেন;—এই কথা মনে করিয়া তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

শত্রুর অসিতে বিদ্ধ হইবার ঝুঁকি সত্ত্বেও তাঁর নিজের শরীরের ভিতর দিয়া তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর আত্মাতে—প্রাণের মর্ম্মস্থানে পৌঁছিবার জন্য সিধাভাবে অসি চালনা করিলেন, কিন্তু অক্টেভ তাহার অসি দিয়া শত্রুর অসিতে এমন সজোরে আঘাত করিল যে, শত্রুর হস্তচ্যুত অসি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, কয়েক পদ দূরে ভূমিতে নিপতিত হইল।

এখন ওলাফের প্রাণ অক্টেভের মুষ্টির ভিতর। এখন ইচ্ছা করিলেই অক্টেভ ওলাফের শরীর অসির দ্বারা বিদ্ধ করিয়া এফোড় ওফোড় করিয়া দিতে পারে। কৌণ্টের মুখ কুঞ্চিত হইল—মৃত্যুভয়ে নহে; তিনি ভাবিলেন, তাঁর পত্নীকে তিনি ঐ দেহ-চোরের হস্তে সমর্পণ করিতে যাইতেছেন, আর কিছুতেই তাহার মুখস খসাইতে পারিবেন না।

অক্টেভ, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা দূরে থাক্, তাহার অসি দূরে নিক্ষেপ করিল, এবং সাক্ষীদিগকে তাহার কাজে—হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিবার ভাবে ইঙ্গিত করিয়া, হতবুদ্ধি কৌণ্টের অভিমুখে অগ্রসর হইল। এবং কৌণ্টের বাহু ধারণ করিয়া নিবিড় বনের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

কৌণ্ট বলিলেন, "তোমার ইচ্ছাটা কি? তুমি ত এখন অনায়াসে আমাকে বধ করতে পার, তবে কেন করচ না? যদি তুমি নিরস্ত্র ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চাও, তা হলে আমায় অস্ত্র দিয়ে, তুমি ত এখনও যুদ্ধ করতে পার। তুমি ত বেশ জান, আমাদের দুজনের ছায়া একসঙ্গে মাটির উপর ফেলা সূর্য্যদেবের

কখনও উচিত নয়—আমাদের মধ্যে একজনকে পৃথিবীর গ্রাস করা চাই।"

অক্টেভ উত্তর করিল;—"আমার কথাটা একটু ধীরভাবে শোনো। তোমার সুখশান্তি এখন আমার হাতে। যে দেহের মধ্যে এখন আমি বাস করচি, আর যে দেহ তোমারই বৈধ সম্পত্তি, সেই দেহ আমি বরাবর রাখতে পারি। আমি খুসী হয়েছি, এখন কোন সাক্ষী আমাদের কাছে নেই, সাক্ষীর মধ্যে পাখীরাই একমাত্র সাক্ষী, তারাই আমাদের কথা শুনতে পারে কিন্তু তারা আর কাউকে বল্‌তে যাবে না। যদি আমরা যুদ্ধ আবার আরম্ভ করি, আমি তোমাকে বধ করব। আমি এখন কৌণ্ট-ওলাফের স্থানীয়;—কৌণ্ট-ওলাফ অসি-চালনায় অক্টেভের চেয়ে বেশী দক্ষ; আর তুমি এখন অক্টেভের শরীর ধারণ করে আছ, ঐ শরীরকে আমার এখন বিনাশ করতে হবে।"

কৌণ্ট উক্ত কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন; এই নীরবতায় তাঁহার গূঢ় সম্মতি সুচিত হইল।

অক্টেভ আরও বলিলেন;—"তোমায় নিজের ব্যক্তিত্ব ফিরে পাবার চেষ্টায় তুমি কখনই সফল হবে না। আমি তাতে বাধা দেব। তুমি ত দেখেছ, দুবার চেষ্টা ক'রে কি ফল হ'ল। তুমি আরও যদি চেষ্টা কর, তাহলে লোকে তোমাকে পাগল বলে ঠাওরাবে, তোমার কথা কেহই বিশ্বাস করবে না। যদি তুমি বল তুমিই আসল কৌণ্ট ওলাফ, লোকে তোমার মুখের সাম্‌নে হেসে উঠ্‌বে;—তার প্রমাণ বোধ হয় আগেই পেয়েছ। তোমাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে, আর সেখানে তোমার মাথায় ডাক্তাররা যতই ঠাণ্ডা জল ঢাল্‌তে থাক্‌বে—তুমি ততই বল্‌বে "আমি পাগল নই, আমি বাস্তবিকই কৌণ্টেস প্রাস্কোভির স্বামী"—এমনি করে' তোমার বাকী জীবনটা কেটে যাবে। তোমার কথা শুনে দয়ালু লোকেরা হদ্দ এই কথা বল্‌বে "আহা, বেচারা অক্টেভ!"

এই কথাগুলা গণিতের মত এতই সত্য যে কৌণ্ট হতাশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মস্তক বক্ষের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

"আপাতত তুমিই যখন অক্টেভ, তখন অবশ্য তুমি অক্টেভের দেরাজ হাতড়ে' তার কাগজপত্র দেখেছ, তুমি অবশ্য জানতে পেরেছ, অক্টেভ তিন বৎসর ধরে' থেকে কৌণ্টেসের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্চে; কৌণ্টেসের হৃদয় পাবার সব চেষ্টাই তার ব্যর্থ হয়েছে। অক্টেভের সে প্রেমের উৎকট আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই যাবে না—সে প্রেমের আগুন আমরণ প্রজ্বলিত থাক্‌বে।"

ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া কৌণ্ট বলিলেন;—"হাঁ, আমি তা জানি।"

—"তার পর, আমার মনের বাসনা পূর্ণ করবার জন্যে একটা ভয়ানক উপায়, একটা উৎকট উপায় অবলম্বন করলাম; ডাক্তার শেরবোনো আমার জন্যে এমন একটা কাণ্ড করলেন, যা কোনও দেশের কোন কালের যাদুকর এপর্য্যন্ত করতে পারে নি। আমাদের দুজনকে গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত করে' চৌম্বক শক্তির প্রক্রিয়ায় আত্মাকে আমাদের দেহ হতে স্থানান্তরিত করলেন। এই অলৌকিক কাণ্ড কোন কাজে এল না। নিষ্ফল হল। আমি তাই তোমার শরীর তোমাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্চি। প্রাস্কোভি আমাকে ভালবাসেন না। স্বামীর আকৃতির মধ্যে তিনি প্রেমিকের আত্মাকে চিন্‌তে পেরেছেন। সেই বাগান বাড়ীতে যে দৃষ্টিতে আমাকে দেখেছিলেন, সেই প্রেমশূন্য উদাসীন দৃষ্টি দম্পতীর শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশেও দেখ্‌তে পেলাম।"

অক্টেভের কণ্ঠস্বরে এমন একটা প্রকৃত দুঃখের ভাব ছিল যে, কৌণ্ট তার কথায় বিশ্বাস করিলেন।

অক্টেভ একটু মৃদু হাসিয়া আরও বলিলেন!—"আমি একজন প্রেমিক, আমি চোর নই। এই পৃথিবীতে যে একমাত্র ধন আমি চেয়ে ছিলাম, তাই যখন আমার হতে পারবে না, তখন তোমার পদবী, তোমার প্রাসাদ, তোমার ভূসম্পত্তি, তোমার-ধন ঐশ্বর্য্য, তোমার ঘোড়া-গাড়ী, তোমার কুলচিহ্ন—এ সবে আমার কি প্রয়োজন?—এসো, আমার হাতে তোমার হাত দেও—আমাদের বিবাদ সব মিটমাট হয়ে গেল—এখন সাক্ষীদের ধন্যবাদ দেওয়া যাক্। আমাদের সঙ্গে শেরবোনোকে নেওয়া যাক্,—আর তাঁকে নিয়ে যেখান থেকে আমরা রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম সেই সম্মোহন প্রক্রিয়ার পরীক্ষাগারে আবার যাওয়া যাক্। ঐ বুড়া ব্রাহ্মণের দ্বারা যা সঙ্ঘটিত হয়েছে তা আবার তাঁর দ্বারাই অঘটিত হতে পারবে।"

অক্টেভ বলিলঃ—"মহাশয়গণ, আরও কয়েক মিনিট কৌণ্ট ওলাফের ভূমিকাই বজায় রেখে আমরা দুই প্রতিদ্বন্দী আমাদের গোপনীয় কথা প্রকাশ ক'রে পরস্পরের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েছি, এখন যুদ্ধ করা অনাবশ্যক। তবে কিনা শিষ্টসজ্জনের মধ্যে, একটু অসির ঘসাঘসি না হলেও মন সাফাই হয় না!"

জামইজ্‌কি ও সেতুলভেদা, এবং আলফ্রেড ও রাম্বো তাঁদের নিজের নিজের গাড়ীতে আবার আরোহণ করিলেন। কৌণ্ট ওলাফ, অক্টেভ ও ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো একটা বড় গাড়ীতে উঠিয়া ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তার দিকে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কয়েকটি গান

(গুজরাটি গর্‌বার সুরে গেয়)

(১)

পার্‌বনা একলাটি আজ ঘরে পার্‌ব না রইতে!
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে!
নিরালার কোল-ভরা, ফুল জাগে আলো-করা,
যেচে কার খুন্‌সুড়ি সইতে।
অথই পাথার-পারা জোছনায় মাতোয়ারা—
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে।

(২)

শোন্ সখী ! গায় কারা আজ রাতে গুজ্‌রাতী গর্‌বা।
খঞ্জন-নর্ত্তন-হিল্লোল-গর্ভা।
প্রিয়া গন্ধর্ব্বের—হিয়া কন্দর্পের—
হার মানে ঠুঙ্‌রী কাহার্‌বা !
দুনিয়ার আদরের, ফুর্‌তির আতরের—
মনোহারী বেলোয়ারী কার্‌বা !

(৩)

চল্‌লরে দখিনায় হিল্লোলে সাগরেরি ছন্দ !
কোন্ বনে চন্দন কোন্ বনে গন্ধ !
মল্লিকা উল্লাসে স্বপ্নেরি হাসি হাসে
সৌরভে সাঁতারে আনন্দ !
আন্‌কো কী সুখ-ভরে আকুলি বিকলি করে
খুল্‌ছে যে পাপ্‌ড়িটি বন্ধ !

(৪)

খিল্-খোলা ফর্দ্দাতে যাব চল্, সাধ জেগেছে !
রইবে কে ঘরে আজ চাঁদ ডেকেছে !
আলো হোথা চুপি চুপি নিয়ে পাউডার থুপি
ফুল দিয়ে ফুল ঢেকেছে !
দিল্-দরিয়ার জলে উথ্‌লিয়ে ঢেউ চলে
নিস্তুতির বাঁধ ভেঙেছে !

(৫)

খিল এঁটে ঘরে থাক্, হ'সনে চাঁদের নাটে সঙ্গী !
জান্‌লা ভেজিয়ে দে রে ও চাঁদ কলঙ্কী !
যে জানে লো রীত্ ওর যে জানে চরিত ওর
যাবে না সে মানা মোর লঙ্ঘি;
সাতাশের ঘর করে সাতালি-বাসর-ঘরে
বাতাসে মাতাল করে রঙ্গী !

(৬)

শুন্‌ব না ! কোনো মানা মান্‌ব না ! জ্বলে যায় অঙ্গ !
চাঁদকে চেনেনি শুধু চিনেছে কলঙ্ক !

আঁধার যে ভুলিয়েছে, পাথার যে ভুলিয়েছে,
উথ্‌লিয়ে হৃদয়ে তরঙ্গ,
একা হয়ে এক্‌শ' যে—শত তারা যারে ভজে—
ধূলির তবু যে চায় সঙ্গ !

(৭)

জাগ্‌লরে নিদ্-ঘরে পাখী আজ নারে নিদ্ সইতে !
আঁখি হ'ল অনিমেষ আলো-থই-থইতে !
শোন্ সখী শোন্ মুহু কুহু কুহু কুহু
বুক-ভরা সুখ নারে বইতে !
সে সুরের মনোহরে—জোছনার সরোবরে—
শত তারা এলো জল-সইতে !

(৮)

কোন্ বনে নিরজনে কাজ-ভোলা কার বাঁশী বাজ্‌ল !
হিয়ার গহনে ফুল যৌবনে সাজ্‌ল !
হাওয়া ভুর ভুর্ তাই মহুয়া ফুলের হাই !
রূপহীনে রূপটানে মাজ্‌ল !
মউএর ঝাপট দিয়ে উলসিয়ে বিলসিয়ে
মানিনীর মান-মণি যাচ্‌ল !

(৯)

কার পাশে কে ও নাচে কার পানে চেয়ে ও কে হাসে !
উল্লাসে কারা ভাসে অনুভব-রাসে !
যত তারা তত সাধ যত সাধ তত চাঁদ
মণ্ডলে নাচে নীলাকাশে !
যত চাঁদমুখ আছে চাঁদ আছে কাছে কাছে
মনোভব মঞ্জু বিলাসে !

(১০)

আস্‌মানে রাস-লীলা গোপনের যবনিকা টুট্‌ল !
আলোক-লতারে ঘিরে হাসিমুখ ফুট্‌ল !
স্বপনেরি ঝরোকায় তারা উঁকি দিয়ে চায়
কাতারে কাতারে তারা জুট্‌ল,
স্মরণ-সরণি পরে ফুল ফোটে থরে থরে
পুলকে আঁখির ধারা ছুট্‌ল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

(১১)

লজ্জিত আঁখি নত অনুখন সঞ্চরে তারা !
উন্মদ মধুকর গুঞ্জন-হারা !
মৌন মূরতি ধরে মৌনে আরতি করে
স্বপন-রভস মাতুয়ারা !
মনোহর !—হরে মন—অবচন নিবেদন
বরিষণ চন্দন-ধারা !

(১২)

চন্দ্রেরি চিত ভরি কে গো আজ কে গো তুমি, চিত্রা !
চোখে চোখ ! কি পুলক ! পুষ্প-পবিত্রা !
পরিচয় চাউনিতে জোছনার ছাউনীতে
সুন্দরী ! সুদূর-সুমিত্রা !
ছুহুঁ চির দূরে দূরে আঁখি থির মন ঝুরে,
জাগরণ-সাগর-বহিত্রা !

(১৩)

কী ফুল ফোটায় হায় দুনিয়ায় চোখের চাওয়া !
চোখের চাওয়ায় কত হারানো, পাওয়া !
চোখে চোখে দেয়া নেয়া চোখে পাড়ি চোখে খেয়া
চাহনিতে চৈতী হাওয়া !
চাহনির উড়ো-পাখী মন হরে দিয়ে ফাঁকি !
চোখে-চেয়ে চামেলি-ছাওয়া !

(১৪)

মন হরে অজানার নয়নের-অচেনা চোরে !
কে কারে কখন্ বাঁধে কিসের ডোরে !
ভ্রমর আঁখির মেলা ! ভালোবাসা-বাসি খেলা
চোখে চোখে আরতি ক'রে !
নয়নে নাগর-দোলা এই ফ্যালা এই তোলা
ঢেউ-খাওয়া জনম ভ'রে !

(১৫)

অম্বরে জাগে চাঁদ তারকার ফুল-শেযে রাত-ভোর !
কি কথা বলিতে চায় ঘুমহারা ঘুম-চোর !

গগনের নিরালায় মন কোথা ভেসে যায়
জোছনায় মাখা আঁখি-লোর !
তারকার রূপশিখা মরতের মল্লিকা
কারে বেশী চায় মন ওর !

(১৬)

আকাশ-কুসুম চাষ করে চাঁদ তারার ক্ষেতে !
পাগল সে, আছে শুনি ওতেই মেতে !
খুঁজে খুঁজে হাসি-মুখ ভ'রে শুধু রাখে বুক
আলোকেরি মালিকা গেঁথে !
যুগে যুগে নিশি জাগে রূপের নিছনি মাগে
নাহি জানি কি ধন পেতে !

(১৭)

চাঁদমুখে আছে ভ'রে, বলে চাঁদ, হৃদয়ের আয়না !
ভালোবাসা ভালোবাসি আর কিছু চাই না !
আকাশ-কুসুম বনে তাই ফিরি আনমনে
কাজের বাটে তো মন ধায়না !
আঁখি দিয়ে পিয়ে সুধা মিটাই হিয়ার ক্ষুধা
ধনের মানের নেই বায়না !

(১৮)

চাই কারে জানি নারে আমি শুধু ফিরি স্বপনে !
ভালোবাসা ভালোবাসি, মন-গোপনে !
আকাশ কুসুম তুলি কুমুদের ফুলে বুলি,
দিক ভুলি, ফিরি ভুবনে !
জোছনার জাল পেতে জোনাকীর হার গেঁথে
কার ছবি জপি গো মনে !

(১৯)

নিশি নিশি জাগো চাঁদ ! নিরালায় নিতি নিরখি !
হারানো ছবির মালা জপ কর কি ?
কত আঁখি কত যুগে কত দুখে কত সুখে
আঁখি তব গেছে পুলকি,
ছাই হ'য়ে গেছে যারা তারা অতীতের তারা
একাকী তাদের স্মর কি ?

(২০)

কার কথা কবেকার কার কাণে দিলে আজ পৌঁছে !
আলুথালু হ'ল চাঁদ ঢুলু ঢুলু মৌজে !
জেনাকী সে জোছনায় মোহ পায় মূরছায়
পারুলী পিয়াল-ফুলী কোচে !
হাওয়া ডোবে বিহ্বলে কিরণের থির জলে
অবগাহি বাদশাহী হৌজে !"

(২১)

কার হাসি কার ঠোঁটে কার ভোলা দিঠি কার চক্ষে !
স্বপনের রাসলীলা মরমের কক্ষে !
কার "কথা কও" স্বরে মন কে উদাস করে
ইসারায় বলে কি অলক্ষ্যে !
মন করে চিনি চিনি হৃদয়ের স্বদেশিনী
বসতি বা ছিল এই বক্ষে !

(২২)

কে সে ভরেছিল মন, মনে পড়ে তারে ? সেই ভরণী ?
বিরহিনী যে রোহিণী নিয়েছিল ধরণী ?
কোথা রৈ চাঁদের রাধা কোথা সেই অনুরাধা ?
শ্রবণা শ্রবণ-মন-হরণী ?
কোথা অতীতের সাথী মুক্তা-হাসিনী স্বাতী ?
স্বপন-গাঙে কি বায় তরণী ?

(২৩)

অপ্সরী কোথা শাপভ্রষ্টা সে অশ্বিনী হায় রে ?
আর্দ্র-হৃদয়া হায় আর্দ্রা কোথায় রে ?
ভদ্রা দু'বোন তারা কোন্ মেঘে হ'ল হারা ?
কে বাঁধিল মৃগ-নয়নায় রে ?
ফল্গু প্রেমের সোঁতা ফল্গুণী গেল কোথা ?
বিশাখা কি নীহারিকা-ছায় রে ?

(২৪)

চৈতী এ জোছনায় একি হায় কুয়াশার কান্না !
কান্নার হাহা হাওয়া, গান না রে গান না !

আকাশের পরকোলা কাদের নিশাসে ঘোলা ?
তারালোকে খোলা যত জাল্না !
ভরা নয়নের কোলে মুকুতায় মুখ দোলে
ঠোঁটে চুনি চুলে তার পান্না !

(২৫)

কর্পূরে ফাগ ক'রে জ্যোৎস্নাতে চাঁদ হোলি খেল্ছে !
কর্পূরী কুঙ্কুম ফুলে ফুলে ফেল্ছে !
হিল্লোলি' উল্লাসে মাতি অনুভব-রাসে
মল্লিকা হাসি হেনে হেল্ছে !
উবে-যাওয়া রূপ কত তারা-ফুলে অবিরত
হীরার লাবণি-মণি মেল্ছে !

(২৬)

রং বিনা দোল-খেলা, প্রাণে স্রেফ্ জোছনারি রঞ্জন !
স্মৃতির মূরতি হারে রাস রমে কোন্ জন !
আজ পরাণের পুটে সরোজ-কুমুদ ফুটে—
একসাথে রস-ভুঞ্জন !
আকাশে ঝরোকা খোলা, তারা আঁকে, পথ-ভোলা—
স্বপনেরি চোখে অঞ্জন !

(২৭)

"প্রেম মানে প্রাণ পাওয়া, প্রাণে মরা প্রেম-হারাণো ;
এই ধারা দুনিয়ার মানো না-মানো।
নিশি নিশি অনিবার—মরে বাঁচে বারে বার—
তাই চাঁদ ; জানো না-জানো !
ভালোবাসা-রং-ছুট্ ফুল হয় ধূলো-মুঠ,
প্রেমে ফিরে পায় পরাণ ও !

(২৮)

ম'রে গিয়েছিলে চাঁদ ! বেঁচে ফিরে, ফিরে এয়েছ !
আঁখির আলোতে কার প্রাণ পেয়েছ !
কোন্ পুণ্যের বলে এমন নতুন হ'লে
কোন্ গাঙে তুমি নেয়েছ !
কোন্ সুধা পিয়ে এলে কোন্ আশা নিয়ে এলে !
রূপে ত্রিভুবন ছেয়েছ !

(২৯)

ফুটে ঝ'রে ফোটে ফুল বারেবার আকুল বনে !
কত মরা কত বাঁচা একই জীবনে !
কত না বিরতি-রতি পীরিতির গতায়তি
হাসা-কাঁদা মন-গোপনে !
মলয়া মরুর হাওয়া কত করে আসা-যাওয়া
চাঁদেরও সাধের স্বপনে !

(৩০)

ঝঙ্কারে রিম্ ঝিম্ ঝিঁঝি গায়, আজ না রে আজ না !
তনু ভরি মরি মরি নূপুরেরি বাজনা !
আজ নয় আজ নয় আজ কোনো কাজ নয়
অপরূপ ! ভোর না এ সাঁঝ না !
যে দূরে যে আছে কাছে সবারি হৃদয় যাচে
জোছনায় অলখেরি সাজনা !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

বরিশাল সম্মিলন
ও বিপিন বাবু

বিপিন বাবুর ছুটি—যাক্, চুকে গেল ! বিপিন বাবুর ছুটি—মঞ্জুর হয়েছে। আর তাঁকে দরবারের uniform-এর বোঝা বয়ে ভূতের বেগার খেটে বেড়াতে হবে না। সহজ বেশে স্বচ্ছন্দে নিজের কাজে মন দিতে পারবেন অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধির চরকা ছেড়ে নিজের চরকায় তেল দেবার অবসর হবে। ছুটির দরখাস্ত বহুদিন হতেই পেশ হচ্ছিল কিন্তু দরবারের মর্জ্জি হয়নি। নির্ম্মম নিষ্ঠুর ! সে যে শেষ শস্যকণাটুকু থাকতে ছাড়ে না—শেষ কাজটুকু আদায় না দিয়ে অব্যাহতি নাই। মহাকালের অদৃশ্য কুলোর নিয়ত নিঃশব্দ সঞ্চালনে শস্য হতে তুষ নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন হলো। নিষ্ফল তরু মূলে কুঠার পড়ল। যীশুখ্রীষ্টের সনাত মহাবাণী এম্‌নি করেই সফল হলো। অনায়াসে অতর্কিতে—অতি নির্ম্মমভাবে ! Let them grow together until the harvest, and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares and bind them in bundles to burn them, but

gather the wheat into my burn." "Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire."

ডিমোক্রেটিক ক্রোধ।—পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যের অভিনয়েও বিপিন বাবু চরিত্রের উদার মহত্ত্ব ও গভীর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নি ; সবশুদ্ধ কেমন একটা বিসদৃশ অসঙ্গত কিম্ভূতকিমাকার রসের সৃষ্টি করেছিলেন। ছুটি মঞ্জুর হয়েছে, ভাল কথা। প্রসন্ন মুখে দরবারকে সেলাম করে কুর্ণিশ করে সহজভাবে বেরিয়ে এসো। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এই সহজ কথাটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। মনের মত খেলনা না হলে আদুরে খোকা-বাবু যেমন খণ্ড-প্রলয় বাধিয়ে তোলেন—রেগে কেঁদে গালাগালি দিয়ে তিনিও তার রীতিমত সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি এদেশে ডিমোক্রেশীর প্রধান পুরোহিত। আজন্মকাল নাকি ঐ এক দেবতারই সেবা ও সাধনা করে এসেছেন ! কিন্তু সেখানেও এ কি বিরাট ব্যর্থতা ! তাঁর বিপুল আত্মম্ভরিতাই এতদিন Demos-এর মূর্ত্তি ধরে তাঁকে ছলনা করে এসেছে। আজ যেমনি সত্যিকার দেবতা জাগ্রত হয়ে স্বরূপে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকেই বলি কামনা করলেন, অমনি তিনি অম্লান বদনে তাকে অস্বীকার করে ফেললেন। বলে বসলেন, "কে তুমি দেবতা, কে তুমি জন-সংঘ, কে তুমি লোক্-মত, আমি তোমাকে চিনিনা। তুমি মূর্খ অর্ব্বাচীন, লজিক চাওনা ম্যাজিক চাও, লাইব্রেরী মানোনা মানুষ মানো, অকাট্য যুক্তির চেয়ে তোমার সরল ভক্তিকে বড় করে দেখো—আমার মতের কাছে যদি তোমার মত মাথা তুলে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা করে, আমি তোমাকে ঘৃণা করবো, অবজ্ঞা করবো, পদদলিত করার চেষ্টা করবো।" কি মর্ম্মান্তিক tragedy !

বিচার—জগৎ-জোড়া, মহাবিচার-শালার দুয়োর খোলা। অমোঘ বিচার চলছে —অবিরত—অলক্ষ্যে নিঃশব্দে—নানারূপে। যার যেখানে মোহ, যেখানে অমৃত, বিচারের সুরু হয় তার সেইখানেই। শৃঙ্গাভিমানী হরিণের মরণ-বাণ লুকানো ছিল তার সুদৃশ্য দীর্ঘ শৃঙ্গের মধ্যেই। বিপিন বাবুর উত্তুঙ্গ অভিমান আশ্রয় করেছিল তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সুসূক্ষ্ম বিচার-প্রণালী ও সুচারু বাক্‌পটুতাকে। ইহাই সঙ্গত, প্রায়শ্চিত্তটা আরম্ভ হবে সেই দিক হতেই। হলোও তাই। বাস্তবিক মনস্তত্ত্বের এ একটা অতি অদ্ভুত সমস্যা, বিপিন বাবুর মত সহস্র সভাবিজয়ী অত-বড় একা লোক দেশ-কাল-পাত্রসম্বন্ধে অতটা বেতালা হলেন কি করে ! কিন্তু এটা যে হওয়া চাইই। যখন সময় আসে, তখন বুদ্ধি অতিবুদ্ধির পথ বেয়ে নির্ব্বুদ্ধিতাতে পৌঁছায় এবং বাক্‌পটুতা দুষ্ট সরস্বতীর বাহনমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। পাণ্ডিত্যের বোঝা তখন কণ্ঠবদ্ধ জগদ্দল শিলার মতো গভীর হতে গভীরতর সঙ্কটের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। বিপিন বাবুর অভিভাষণ ও তাঁর শেষ বক্তৃতাটির ছত্রে ছত্রে এই সত্য জাজ্বল্যমান।

অভিভাষণ—বিপিনবাবু প্রথিত-যশা পুরুষ। তাঁর প্রতিভার প্রকৃতি সর্ব্বজন-বিদিত। এই অভিভাষণে সেই প্রতিভা আপনাকে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলেছে। সুতরাং

তাঁর অন্তর-প্রকৃতির দোষ-গুণ দুইই নিরাবরণ নগ্নতায় জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে। সুতরাং অভিভাষণটী না পড়েও পাঠকগণ সহজে অনুমান করতে পারবেন এতে কি আছে, আর কি নাই। আছে—অগাধ পাণ্ডিত্য, সুসংবদ্ধ বিচারপ্রণালী, সুচারু বাক্য-বিন্যাস, পাটোয়ারী বুদ্ধির তির্য্যক লীলা-ভঙ্গী, প্র্যাকটিক্যাল হওয়ার আত্মঘাতী অতি-চেষ্টা এবং স্বাধীন চিন্তার ছদ্মবেশী দাস-মনোভাব। আর নাই—সৃজনশীল প্রতিভার অবারিত স্ফূর্ত্তি ও উদার সরলতা, সত্যাগ্রহীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, মনের অবাধ বিচরণের অবকাশ এবং উপলব্ধির অনতিক্রমণীয় দুর্নিবার টান; এক কথায় মুক্তির অমৃত রসের আস্বাদন। হাতে সময়ের অতি-প্রাচুর্য্য থাকলে পাঠকগণ মিলিয়ে দেখতে পারেন। নান্-খেতাই খাবারের উপকরণ-সামগ্রীর মতো এতে আর সবই আছে, নাই কেবল জল—রসায়নের ভাষায় যাকে বলে universal solvent এবং রসের ভাষায় যার নাম প্রেম। আর এই এক অভাব যে কেমন অভাব তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে কেবল সে-ই, যার অন্তরের সহজ সামঞ্জস্য কোনও বিশেষ মতবাদের পায়ে দাসখত লিখে দিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করেনি। বিপিন বাবুর এই অতি-বিস্তৃত অভিভাষণটীর সমালোচনার প্রয়োজন দেখি না। তাতে না আছে উপকার, না আছে আনন্দ। তিনি লোকের চোখ লক্ষ্য করে যে তর্কের ধূলো উড়িয়ে ছিলেন, তাও তাদের চোখে পড়েনি সুতরাং সেটা ঝেড়ে ফেলার পরিশ্রম স্বীকারেরও কোন প্রয়োজন নাই। তবে তিনি অমৃত বলে যে অন্ন লোকের মুখের সাম্‌নে ধরেছিলেন এবং লোকে যা অদেয়মগ্রাহ্যম্ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে তার একটু পরিচয় দিলে ক্ষতি নাই। উক্ত অপূর্ব্ব সামগ্রীর প্রধান উপাদান দুটী—স্বাধীন ভারতের শাসন-প্রণালীর Scheme বা খসড়া এবং ইংরেজের সঙ্গে রফার (স্বরাজের দফা-রফার) সর্ত্ত। আর তার প্রধান মশলা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধির প্রতি কার্পণ্য ভাব! কার্পণ্য কথাটা ইচ্ছা করে ব্যবহার করেছি—আদিম আসল অর্থে। মহাত্মার প্রতি বিপিন বাবুর যে ভাবটী প্রকাশ পেয়েছে তাকে ঘৃণা বা বিদ্বেষ বলতে পারা যায় না, কারণ ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রকাশ করতে হলে অন্তরের যে ঋজুতাটুকু থাকা অত্যাবশ্যক এ লেখাটাতে সেটুকুরও সম্পূর্ণ অসদ্ভাব। স্বরাজের Scheme—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস এক কথায় এই অতি-দীর্ঘ গবেষণা-পূর্ণ Scheme-এর যে টিপ্পনী করেছেন, তা অতুলনীয়। তাঁর নিজের স্বরাজের Scheme কি, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, I am not a Scheming man, Scheme তো একটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জাজ্বল্যমান, কিন্তু এর মধ্যে Scheming কোথায় তার একটু বিশদ ব্যাখ্যা দরকার। গত নাগপুর কংগ্রেসের Creed এর আলোচনা-কালে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বাবু "স্বরাজ" শব্দটীকে 'ডিমোক্রেটিক' বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধির আপত্তি বশতঃ উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। সে সময়ে চিত্তরঞ্জন বাবুর সহিত বিপিন বাবুর সম্বন্ধের বিষয় বিবেচনা করে দেখলে উক্ত বিশেষণটী বিপিন বাবুর লজিক্যাল মাথার সৃষ্টি, এরূপ অনুমান করলে বোধ হয় মারাত্মক ভুল

হবে না। যাই হোক, শুভ অবসর উপস্থিত হবামাত্র তিনি এক ঢিলে দুটী নয় অনেক-গুলি পাখী শীকারের ব্যবস্থা করে ফেললেন। সেগুলি এই ঃ—(১) অবাঙালী কংগ্রেসের মাথায় বাঙালী কনফারেন্সের লগুড়াঘাত-দ্বারা বাঙালীর নষ্ট-প্রভুত্ব উদ্ধার। (২) বিশ্ববিজয়ী মহাত্মা গান্ধিকে কৌশলক্রমে পরাভব করার বিমলানন্দ উপভোগ। (৩) ভাবী স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্রের উদ্ভাবয়িতারূপে পুণ্য-শ্লোক হওয়া। (লজিকানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থ লজিকেল মাথার চিন্তা-প্রণালীটা একটু খুলে বলা দরকার। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে উপায় তলিয়ে যায়। স্বরাজই উদ্দেশ্য—নন্-কো-অপারেশন উপায় মাত্র, স্বরাজ লাভ হলে নন্-কো-অপারেশনের স্মৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসবে এবং সেই সঙ্গে গান্ধি যাবেন মিলিয়ে এবং দেদীপ্যমান হয়ে উঠবেন শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু—স্বরাজের Scheme যাঁর সৃষ্টি) শীকারটা খুব জম্‌কালো বটে, একেবারে মারি-তো-গণ্ডার-গোছের! কিন্তু সফলতার সম্ভাবনাটা? লজিক অবশ্য সে কথাও ভেবেছিলেন। এই দেখুন—

১। বাংলার শিক্ষিত Aristocracy ছাতুখোর খাকি-পরিহিত মহাত্মা গান্ধিকে ঠিক মনের সঙ্গে বরণ করতে পারেন নি। প্রমাণ সবুজ পত্র, এমন কি অমৃত বাজার পত্রিকা।

২। ওকালতী ও নেতৃত্ব একসঙ্গে চলবে না—মহাত্মার এই উপদেশে উকীল-বাবুদের প্রচণ্ড বিরাগ।

৩। কলিকাতা কংগ্রেসে বরিশাল-গুরু মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের নন্-কো-অপারেশনের অননুমোদন। একে-একে দুই হয়, সুতরাং সফলতার ষোল আনা সম্ভাবনাই ছিল। লজিকের দোষ দেওয়া যায় না। সে ঠিক হিসাবই করেছিল। কিন্তু গোল বাধালে ঐ ম্যাজিক যা বিপিন বাবু দু' চক্ষে দেখতে পারেন না। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বাবুর উপর ম্যাজিক কতটা কাজ করেছে, সে আর কারো জানতে বাকী নাই। কিন্তু লজিকের উঁচু পাড়ির তলে তলে ম্যাজিকের পদ্মার ভাঙন যে এতটা এগিয়ে গিয়েছে, সেটা বোঝা যায়নি। সুতরাং হলো যা হবার অর্থাৎ ম্যাজিকের নিকট লজিকের পরাজয়—যা হয়ে আসছে বরাবর, সেই সেকালের হিরণ্যকশিপুর আমল হ'তে একালের লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের আমল পর্য্যন্ত।

ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি বা রফা—বিপিন বাবু অকাট্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে এ-ছাড়া স্বরাজ-লাভের অন্য পন্থা নাস্তি। ইংরেজ ও আমরা দুই পক্ষই সমান পণ্ডিত, কাজেই অর্দ্ধং ত্যজতির সূত্রটা খাটবে ভালো।

সর্ত্তটা হবে এইরূপ (১) নন-কো-অপারেশন যে পূরা স্বরাজের চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পাত্রটী প্রায় আমাদের মুখ-বরাবর এনে ফেলেছে, কো-অপারেসেনের দ্বারা সেটী ইংরেজের মুখের দিকে ঠেলে দিতে হবে। কারণ মরা নাড়ীতে অতটা একেবারে সইবে না।

(২) ইংরেজ পার্লামেণ্টের পাকা দলিল দ্বারা এগ্রীমেণ্ট করবে যে দশ বৎসর পরে ঐ পাত্রটী ঠিক আমাদের ঠোঁটের আগে ধরে দেবে, যেহেতু চোরের রাত্রি-বাসই ভাল।

(৩) সবটা তারা খেয়ে না ফেলতে পারে এবং ১০ বৎসর পরে গর-রাজী না হয় সে জন্য

লজিকের সূত্র পাহারা দেবে। এই দশ বৎসর আমরা কি করবো,বিপিন বাবু খুলে বলেন নি। বোধ হয় মিনিষ্টার হয়ে সুখে ঘরকন্না করতে থাকবেন!

যা হোক এ হতে আমি দুটী তথ্য আবিষ্কার করেছি। (১) সিংহ-গর্জ্জনের পিছনে অধিকাংশ সময়ই সিংহ থাকে না। (২) সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে ও বিপিন পালের মধ্যে ব্যবধান একটা অতি সূক্ষ্ম স্বচ্ছ পরদা মাত্র।

বাংলা দেশ নব্য নায়ের জন্মভূমি। নব্যতর ন্যায়ের ভাষ্যেরও যে সেইখানেই উদ্ভব হবে এটা খুব স্বাভাবিক। আশা করি গৌড়ীয় সুধী সমাজ এজন্য বিপিন বাবুকে গোতম-উপাধি-দানে কৃপণতা করবেন না। সেটা তাঁর অবশ্য প্রাপ্য।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা ম্যাকসুইনির একটি উক্তি পাঠকদিগকে উপহার দেবার সম্পূর্ণ যোগ্য, মনে করি।

"Compromise is the death of a cause. Procrastination is the worst form of compromise. The present is the time to begin the struggle. On the understanding that we will be heroes to-morrow, we evade being men to-day……we realise not that the call is now, the fight is afoot and we must take the flag from its hidden resting-place."

মহাত্মা গান্ধির প্রতি মনোভাব—এটী যে ঠিক কি,এক কথায় তা' বুঝানো অসম্ভব। এতে শ্রদ্ধা আছে, বিস্ময় আছে, কিছু অবজ্ঞা, একটু বিদ্বেষের ছায়া এবং অনেকটা ঈর্ষা ও ভয় আছে। সব-শুদ্ধ যে ভাবটী জেগেছে তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে অসহনীয়তা। মহাত্মা গান্ধিকে বিপিন বাবু ঠিক সইতে পারছেন না। বিপিন বাবুর অভিভাষণে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এমন কি যেখানে প্রশংসা করেছেন, সেখানেও। বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধিকে অনেকেই সহ্য করতে পারছেন না—প্রকৃতি ও অবস্থার পার্থক্যানুসারে, নানা কারণে। মহাত্মা গান্ধি অনেকের জীবনকে একটা প্রকাণ্ড ধিক্কারে পরিণত করে তুলেছেন। তাদের অন্তরের মর্ম্মস্থানে তলব পৌচেছে কিন্তু জড়তা ও দুর্ব্বলতাবশতঃ তারা উঠতে পারছে না। ফলে তাদের প্রত্যেক জাগ্রত মুহূর্ত্ত তাদের কেবল চাবুক মারছে। আমার নিতান্ত আত্মীয়দের মধ্যে এরূপ লোক আছেন। আর একদল সহ্য কতে পারছেন না, যাঁরা বেশ দুধে-ভাতে আছেন। কখন্ কোন্ হাঙ্গামা বাধিয়ে দুধের বাটীটির হন্তারক হন, এই ভয়েই তাঁরা মহাত্মাকে জুজু দেখছেন। কিন্তু মহাত্মার সম্বন্ধে বিপিন বাবুর অননুকূল ভাবের এ দুটির কোনটিই কারণ নয়। সেটা আরও গভীর। উভয়ের অন্তর-প্রকৃতির গঠন, লক্ষ্য ও পথের মধ্যে এম্‌নি সাংঘাতিক পার্থক্য যে মিলনের আশা করা বাতুলতা মাত্র। বিপিন বাবু জ্ঞান-মার্গী, মহাত্মা প্রেম-মার্গী। আর প্রেম গভীর ও জীবন্ত হলেই কর্ম্মের ধারায় আপনাকে বাহিয়ে না দিয়ে থাকতে পারেনা, কাজেই কর্ম্ম-মার্গীও বটেন। জ্ঞান ও প্রেম মার্গের বিরোধ চির-প্রসিদ্ধ। সুতরাং বিপিন বাবুর লজিক যে প্রেমের বিশ্ববিজয়ী লজিককে ম্যাজিক বলে উড়িয়ে দিতে চাইবে, এটা খুব স্বাভাবিক।

প্রকাশানন্দের শিষ্যেরা সভয় বিস্ময়ে মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলেছিল,'ওর কাছে যেয়োনা, ও লোকটা যাদু জানে।" কিন্তু একটা রহস্য বুঝে দেখা দরকার। বিপিন বাবু জ্ঞান-পন্থী হলেও মিথ্যার সঙ্গে রফা করতে প্রস্তুত,—যদি তাতে কার্য্য সিদ্ধ হয়—অর্থাৎ তিনি deplomacyর ভক্ত। আর মহাত্মা জ্ঞানপন্থী না হলেও সত্যা-গ্রহী, অসত্যের স্পর্শ পর্য্যন্ত তাঁর নিকট অসহ্য। বিপিন বাবু জ্ঞানপন্থী অথচ উত্তেজনার সুরা-বিতরণে কল্পতরু, তাঁর অধিকাংশ বক্তৃতাই ওই ছাঁচের। মহাত্মা প্রেমপন্থী অথচ উত্তেজনা মাত্রেই তাঁর নিকট 'অদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম'।

বিপিন বাবুর ইংরেজ-বিদ্বেষ সর্ব্বজন-বিদিত অথচ ইংরেজী বা পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট তাঁর মাথা বেচা।

মহাত্মার ইংরেজ-বিদ্বেষ নাই কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার কাহাপাহাড় বিশেষ। বিপিন বাবু ডিমেক্রেসীর প্রধান পাণ্ডা হলেও জীবন-যাত্রায় যথাসাধ্য ফার্ষ্টক্লাসের গাড়ীতে যাওয়ার দিকেই তাঁর একান্ত ঝোঁক। মহাত্মা কখনও ডিমোক্রেসী কথাটা উচ্চারণ করেছেন কি না সন্দেহ, অথচ থার্ডক্লাশের দিকেই তাঁর প্রাণের টান,—যেখানে দীনতমেরও স্থান হতে পারে। বিপিন বাবুর 'স্বরাজে' 'স্ব' অপেক্ষা 'রাজের' প্রাধান্য বেশী, সেই জন্য তার উপায় Political organisation দ্বারা শক্তি-সঞ্চয়। মহাত্মার নিকট 'স্ব' 'রাজে'র চেয়ে অনেক বড়, সেই জন্যে তাঁর সাধনার পথ আত্মশুদ্ধি—যুগযুগান্তরের সঞ্চিত কলুষ-ক্ষালন। বিপিন বাবু কলি (কলী) যুগের মানুষ, কাজেই কলের উপর শ্রদ্ধা ও নির্ভর তাঁর মজ্জাগত, সে কল কাপড়ের হউক কিম্বা বিদ্যা বিচার বা রাজ-নীতিরই হোক। মহাত্মা সত্য যুগের মানুষ, সে যুগ বোধ হয় কেবল কবির কল্পনাতেই বিরাজ করে, কাজেই তাঁর কাছে মানুষের মর্য্যাদাই লক্ষগুণে বেশী। যেখানে প্রভেদ এমন মূলগত, সেখানে মিলনের আশা বাতুলতা মাত্র—যেমন পাগলামি হতো Phariseeদের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের মিলনের আশা করলে।

বিপিন বাবুর আশঙ্কা—বিপিন বাবুর মতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি অর্থাৎ স্বরাজ-লাভের পক্ষে একটী প্রধান বাধা ও অন্তরায় মহাত্মা গান্ধির অলোক-সাধারণ মহৎ চরিত্র। তাঁহার উক্তি এই—"The other limitation of the present movement is due like its strength to the influence of the mighty personality of Mahatma Gandhi himself……At the same time the inevitable danger of it (among other things) is this namely that if for any reason this personal influence is removed, the structure which kept it together falls to pieces."

তিনি কেবলমাত্র বিপদটা নির্দ্দেশ করেই ক্ষান্ত হন নি, সঙ্গে সঙ্গে নিবারণের উপায়ও বলে দিয়েছেন। জনসাধারণের বিচার-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—তাহলেই তারা কেবল মাত্র চরিত্র-মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে গণ্ডায় আণ্ডা মিশাবে না।

বিপিন বাবুর আশঙ্কা অনেকের পক্ষেই প্রলাপ বা প্রহেলিকা বলে বোধ হলেও কথাটা

খুবই সত্য। নানা কারণে বিপিনবাবু কথাটা খুবই খুলে বলতে পারেন নি; among other things ইত্যাদি ইসারায় জানিয়ে দিয়েছেন। একটু খুলে বললে কথাটা পরিষ্কার হবে। কংগ্রেস আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বহু চিন্তা, বহু সাধনের ফল। কংগ্রেসের দ্বারাই আমরা রাজনৈতিক সিদ্ধি-লাভ করবো আমাদের অনেকেরই এই বিশ্বাস, সুতরাং কংগ্রেসের কোনও ক্ষতি দেশের পক্ষে মহা-অমঙ্গল। আর যাঁর দ্বারা অনিষ্ট ঘটবে তিনি যত মহৎই হোন না কেন তাঁকে দেশের আপদ-স্বরূপ যদি কেহ মনে করেন ত তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধি যে কংগ্রেসের কিছু ক্ষতি করেছেন কেবলমাত্র তাই নয়—তাঁর অভ্র-ভেদী বিরাট আত্মার এক অংশ দিয়ে গোটা কংগ্রেসটাকেই আত্মসাৎ করেছেন। কংগ্রেসের কাজ এখন মহাত্মা গান্ধির আত্মারই কাজ। ক্রমওয়েল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের রুদ্ধ দুয়ারে 'House to let' বলে যে নোটিশ এঁটেছিলেন সেটা কংগ্রেসের ললাটেও ঝুলতে পারে। তবে দুজনের আত্মসাতের প্রণালীতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। যাই হোক কোনও আসল ডিমোক্র্যাট কোনও দিকেই ব্যক্তিত্বের অসাধারণ বিকাশ সহ্য করতে পারেন না। মধ্যবিত্ততাই তাঁদের সমাজের আদর্শ। রকফেলারের অগাধ ধন-সঞ্চয় তারা যেমন অন্যায় মনে করে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বা মহাত্মা গান্ধির মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের মনোভাবও কতকটা সেইরূপ। ঐ প্রতিভা বা ঐ মহত্ত্ব ভাগ করে ভোগ করতে দিলে যে বহুলক্ষ লেখক তরে যায় ও বহু কোটি অমানুষ মানুষ হয়, এ হিসাবটা সহজেই তাদের মনে ওঠে। বিপিন বাবু দস্তুর-মাফিক ডিমোক্র্যাট সুতরাং মহাত্মা গান্ধিকে যে ডিমোক্র্যাটিক স্বরাজ লাভের অন্তরায় ভাববেন, এটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

কিন্তু তিনি এই বিপদ নিবারণের যে উপায় নির্দ্দেশ করেছেন তা যে নিতান্তই হাস্যজনক, তা তিনি নিজে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। প্রথমতঃ বিচার-বুদ্ধির বিকাশ আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে একদিনে হয় না; বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা ও সাধনার দরকার। সমস্ত দেশের লোকের সে অবস্থালাভের বহুপূর্ব্বেই 'সব লাল হো যায়ে গা'।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বাবু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতির বিচার-বুদ্ধি যে স্বয়ং বিপিনবাবুর চেয়ে বেশী কম, এরূপ ভাবার কারণ নাই। তবুও তাঁদের এ দশা কেন?

আমার কয়েকটী বন্ধু বহু গবেষণা দ্বারা এ রোগের কয়েকটী ওষুধ আবিষ্কার করেছেন—তাতে ফল হওয়া সম্ভব।

১। মহাত্মা গান্ধিকে সকল অবস্থা বুঝিয়ে বলে বানপ্রস্থ-অবলম্বনে রাজী করা। তিনি স্বার্থলেশহীন মহানুভব—আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না।

২। মহাত্মা গান্ধির সম্বন্ধে আভাসে ইঙ্গিতে অস্পষ্ট ভাষায় অনির্দ্দেশ্য গ্লানি-প্রচার। কিছু কাজ করবেই, কারণ 'পরচিত্ত অন্ধকার' এ বাক্য জ্ঞানী-জনানুমোদিত।

৩। নিতান্ত দুকুড়ি সাত গোছের লোক-দিগকে নেতা নির্ব্বাচিত করা। তাদের

সম্বন্ধে লোকের মন সংস্কার-বিহীন, Neutral, সুতরাং বিচারশক্তি-পরিচালনের কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না।

৪। বেছে বেছে খ্যাতনামা চরিত্র-হীন লোকদিগকে নেতা নির্ব্বাচন করা। লোকের বদ্ধমূল অশ্রদ্ধার উপর যে লজিক জয় লাভ করবে, তা যে খুবই পোক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ থাকবে না।

রহস্য যাক্। শ্রীযুক্ত পাল মহাশয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

১। চাণক্যের সনাতন বাক্য 'সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্' কি মহত্ত্ব-সম্বন্ধেও প্রযুজ্য?

২। নেতার চরিত্রের অতি-মহত্ত্বে যদি কোনও অনুষ্ঠানের ক্ষতি হয়, সেই অনুষ্ঠানই এই চিরপতিত দেশে মুক্তি আনয়ন করবে—এই বিশ্বাসই কি পোষণ করতে হবে?

৩। মহৎ চরিত্রের প্রভাবে লোকের চরিত্র উন্নত হয়। সেই প্রভাব নষ্ট করে নৈতিক উন্নতির পথে বাধা দিয়ে স্বরাজ আনতে হবে? চরিত্র-হীনের স্বরাজ আমাদের কি মোক্ষ দিবে?

৪। আজ জাতির চিত্ত-প্রসারণের দিন। আজ তাকে নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আলোকে পথ দেখে চলতে বলার মানে তার উচ্ছ্বাস থামিয়ে দেওয়া—তাকে আত্মসঙ্কোচ করতে বলা। সেই কি আমাদের সিদ্ধির পথ?

৫। মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুই মানুষের সবটা নয়; এমন কি শ্রেষ্ঠ অংশটুকুও নয়! মানুষের জানা ও অজানা সবশুদ্ধ গোটা মানুষটাকে তুললেই তবে সে উঠতে পারে। সে কেবল পারে প্রেম। তর্ক নয়—লজিক নয়—ভোট নয়। আজ সেই প্রেমের ডাকে মানুষের সবটা যখন সাড়া দিতে সুরু করেছে, তখন তার পক্ষে কাণে আঙুল দিয়ে জোর করে বধির হওয়ার পরামর্শটাই সব-চেয়ে পাকা পরামর্শ?

৬। নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ-কর্ম্ম কার-খানা-কারবারই ভোটের দ্বারা চলে ভালো। জাতির মহাসঙ্কটের দিনে মহাপুরুষ চাই। গীতার 'যদা যদাহি' শ্লোক মনে করুন, হিরণ্য-কশিপুকে বধ করার জন্য অবতার হয়েছিল নৃসিংহের। আজ আবার বিশ্বব্যাপী বিপুল-কায় নৃসিংহ দৈত্যের বধের জন্য যে নৃদেব-অবতারের কামনায় মানুষ ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে আছে, কে বলতে পারে তিনিই অবতীর্ণ হন নি এই ভারতবর্ষে?

৭। কংগ্রেস নামে রাজনৈতিক কলটা যন্ত্রলীলা সংবরণ করে যদি মহাত্মা গান্ধির মধ্যে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেই থাকে, তা নিয়ে শোক করা মোহমাত্র, জ্ঞানীর লক্ষণ নয়।

বিপিনবাবুর ভবিষ্যৎ—এ সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ অনুমান করছেন। যদিও সাধারণতঃ এটা অনধিকার-চর্চ্চা কিন্তু এ ক্ষেত্রে নয়। কারণ বিপিন বাবু জন-নায়ক। কেউ বলছেন, যে জালে সার সুরেন ও হরকিশেন লালকে ধরা হয়েছে, সেই কাতলা-ধল্লা জাল এঁকে ধরার জন্যও ফেলা হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে জাল ফেলা হলেও ইনি ধরা পড়বেন না—জাল ছিঁড়বেন। কেউ বলছেন, তিনি সব দলের দল-ছাড়াদের নিয়ে, নূতন কীর্ত্তনের দল বেঁধে দেশ-ময় মান-ভঞ্জন ও কলঙ্ক-ভঞ্জন পালা গেয়ে বেড়াবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস চেষ্টা করলেও সেটা তিনি

পারবেন না। কারণ, দল কেবল লজিকে গড়ে ওঠে না, একটু ম্যাজিকও চায়। দু' একজন বলছেন, তাঁর Democratic Swaraj-এর Thesisটা পড়ে খুসী হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা (বহুবচনটা কি গৌরবে?) তাঁকে ডাক্তার উপাধি দিয়ে, Politicsএর অধ্যাপক নিযুক্ত করবেন, মনস্থ করেছেন। যাই হোক, এটা হলে ভালো হয় সকল পক্ষেরই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

প্রত্যাবর্ত্তন

(উপন্যাস)

সূচনা

শ্মশানে

শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছিল ধূ-ধূ, ধূ-ধূ—

দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি। পরপারের সীমা-রেখাকে অস্পষ্ট করিয়া যেখানে দুইটি নদী মিলিত হইয়াছে, তাহারই সঙ্গম-স্থলে অনেকখানি বালুর চর নদীগর্ভ হইতে তীরের দিকে খোলা-জমির সৃষ্টি করিয়াছে। সেই বালুচরের উপর শ্মশানঘাট। শ্মশানে তখন একটি মাত্র চিতা জ্বলিতেছিল। সূর্য্য সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে। ধূসর বর্ণের মেঘের ভিতর দিয়া অস্ত সূর্য্যের রাঙ্গা আলো আকাশেও যেন চিতার আগুন ধরাইয়া দিয়াছে! তরঙ্গহীন শান্ত নদীর জলে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়ায় জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেন একই ভাবের সমন্বয় চলিতে-ছিল। কথোপকথন-নিরত সহযাত্রী-দলের সঙ্গ এড়াইয়া চিতার অদূরে বসিয়া যে যুবক,—সে-ই জ্বলন্ত চিতায় এইমাত্র জীবনের সমস্ত সুখ-আশা বিসর্জ্জন দিয়াছে! তাহার বুকের মধ্যেও বুঝি চিতাবহ্নি এমনি লেলিহান বসনা মেলিয়াই জ্বলিতেছিল। যুবকের নাম গৌরীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। চিতায় যে দেহ জ্বলিতেছিল, তাহা তাহারই সহধর্ম্মিণী দুর্গাবতীর।

ক্রমে সূর্য্যাস্তের রাঙা আলোর সহিত চিতার আলো নিভিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। দাহকারীরা নদী হইতে কলসী ভরিয়া জল তুলিয়া আনিয়া চিতা ধুইয়া স্নান করিতে গেল। গ্রাম-সম্পর্কে একজন গৌরীপতির খুড়া হন্,—তিনি কাছে আসিয়া গৌরীপতির কাঁধে হাত রাখিয়া নাড়া দিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া কহিলেন,—"গৌরী, আর কেন বাবা, সব ত শেষ হয়ে গেল, এইবার স্নান করে বাড়ী চল।" গৌরীপতি এতক্ষণের পর যেন সসংজ্ঞ হইয়া আহবান-কারীর পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "খোকা—?" খুড়া-মহাশয় দূরে বৃক্ষতলে যেখানে কালী চাকর একটি সুন্দর বালককে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া দেখাইয়া কহিলেন, "খোকা ঐ যে কালীর কোলে। তার স্নান হয়ে গেছে—ছেলে একবারও কাঁদল না, গোপাল আমাদের যেন পাথরের গোপাল হয়ে গেছে—আহাহা, কি লক্ষ্মীই আমরা হারালুম।" বলিয়া অকৃত্রিম বেদনার অশ্রুসজল দৃষ্টি সদ্য ধৌত চিতার দিক হইতে ফিরাইয়া লইয়া গৌরীপতিকে একরকম জোর করিয়াই টানিয়া তিনি স্নান করাইতে লইয়া গেলেন। স্নান

সারিয়া সকলে তীরে উঠিলে কালী অগ্রসর হইয়া ছেলেটিকে গৌরীপতির কোলে দিয়া কহিল, "দাদা খোকাকে নাও—" ছেলেকে কোলে লইয়া দুই হাতে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলে এতক্ষণের পর গৌরীপতির চোখ দিয়া শোকের তীব্র দাহ অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল! দেখিয়া খুড়ামহাশয়-প্রমুখ সকলেই আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলেন, শোক এইবার সহ্যের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

প্রথানুসারে বালক গোপালকে দিয়া সেই যে তাহার মৃতা জননীর মুখাগ্নি করানো হইয়া-ছিল, তাহার পর দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গোপাল একবারো কাঁদে নাই, একটিও প্রশ্ন করে নাই! শুধু বড় বড় দুটি কালো চোখের অপলক দৃষ্টি নির্ব্বাক বিস্ময়ে ভরিয়া জ্বলন্ত চিতার পানেই চাহিয়াছিল। চিতা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। শেষকার্য্য শেষ হইল! তবু বালকের দৃষ্টি ও মন সেই একই ভাবে বদ্ধ হইয়া রহিল। বাড়ী ফিরিবার সময় যে প্রথম কথা কহিল, বলিল, "বাবা, মা যে একলা রইলো!" এ প্রশ্নের জবাব গৌরীপতি দিতে পারিল না। অপর একজন কহিল, "না গোপাল, মা ত একলা নেই ভাই, তিনি ঠাকুরের কাছে স্বর্গে চলে গেছেন কি না।" গোপাল দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, কেবল সংশয়িত বিস্ময়-ব্যাকুল চোখে মায়ের চিরানন্দময়ী মূর্ত্তি-দগ্ধকারী নির্ব্বাপিত-বহ্নি চিতাভূমির পানে বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মা স্বর্গে গিয়াছেন এ কথা সে কেমন করিয়া মানিয়া লইবে! স্বর্গ—সে ত ঐ নীল আকাশেরও ঊর্দ্ধে কোন্ জ্যোতির্ম্ময় আলোকের রাজ্যে! সেখানে দিব্য বেশে দিব্য রথে চড়িয়া যাইতে হয়। দেবদূতেরা পুষ্পমাল্য রক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া লইতে আসে যে! কিন্তু গোপাল নিজের চোখে দেখিয়াছে, তাহার মাকে ইহারা কাঠের ভিতরে চাপা দিয়া আগুনে জ্বালাইয়া দিয়াছে—বাবাও তাহাতে যোগ দিয়াছে—আর গোপাল—? নিজে সে তাঁর ঘুমন্ত মুখে চুমা না খাইয়া, গলা জড়াইয়া তাঁহার বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া না থাকিয়া, ঐ লোকগুলা তাহারই হাত ধরিয়া যে আগুনের জ্বলন্ত জ্বালা মার মুখে লাগাইয়া দিয়াছিল, সেই আগুনের খড় নিজের হাতে ছুঁইয়াছে যে,—তবে!

দাহকারীরা বাড়ী ফিরিতেই ক্রন্দনের চাপা আওয়াজ উচ্চ হইয়া উঠিল,—"ওরে বাবা, আমার সোনার প্রতিমা কোথায় বিসর্জ্জন দিয়ে এলি রে! আমার ঘরের লক্ষ্মীকে কার কাছে রেখে এলি রে বাপ—!"

গোপাল মন্দিরের সেবায়েৎ গৌরীপতির ছোট-খাট সংসারখানি অনেকের আদর্শ ও ঈর্ষার স্থল ছিল। স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য এবং বিদ্যা একাধারে এই ত্রিবেণী-সংযোগ গৌরীপতিকে গ্রামের মধ্যে আদর্শ আখ্যা দিয়াছিল! স্নেহ-ময়ী সন্তান-বৎসলা জননী, প্রেমময়ী পত্নী, বালক গোপালের প্রতিকৃতি তাহার বালক পুত্র গোপাল ভগবানের অজস্র করুণারই দান বলিয়া মানিয়া লইয়া নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করিত। "অতি-সুখ সহে না,—বিধির এই উক্তির সার্থকতা দেখাইতেই যেন কাল বিসূচিকা রোগে বারো ঘণ্টার মধ্যে গৌরীপতির সাংসারিক জীবনের সুখ-শান্তি অপহরণ করিল! সহধর্ম্মিণী দুর্গাদেবী সজ্ঞানে স্বামী ও শাশুড়ীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাসিমুখে স্বর্গারোহণ করিলেন, মরণের পূর্ব্বে সন্তানের মুখের পানে

চাহিয়া যে দীর্ঘশ্বাস উঠিতে চাহিতেছিল, সাধ্বী সবলে তাহা দমন করিয়া স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন,—"গোপাল এত ছোটবেলায় মা-হারা হচ্ছে, ওকে তুমি আর একটি মা এনে দিয়ো। আমাদের মারও সেবার ত্রুটী যেন না হয়, দেখো।" এ কথায় গৌরী শিহরিয়া ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিয়া বলিয়াছিল, "না দুর্গা, এ-রকম অনুরোধ তুমি আমায় করে যেয়োনা, গোপালকে দিয়ে তুমি ত আমায় পিতৃঋণে মুক্তি দিয়েচ! গোপাল আমার মার কাছেই সহস্র মায়ের স্নেহ পাবে, আর মার জন্য আমি ত রইলুম। এখানকার বাকী কটা দিন একলাই আমার কেটে যাবে, তারপর সেখানে তোমাকেই যে আবার আমি পাব!" এ কথার পর পরম সুখে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া স্বামীসৌভাগ্যবতী যে নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, মরণ-কালে তাঁহার মুখে যে গভীর নির্ভর ও বিশ্বাসের চিহ্ন ফুটিয়াছিল, সংসারের সহস্র ঘাত-প্রতি-ঘাতের মধ্য দিয়া অতি-দ্রুত-অগ্রসর জীবন-সায়াহ্নের প্রান্তে দাঁড়াইয়াও গৌরীপতি সে দৃষ্টি ভুলিতে পারে নাই।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া গৌরীপতি শোকাকুলা মাকে ডাকিয়া কহিল, "মা, তোমার গোপালকে নাও।"

সর্ব্বমঙ্গলা দেবী আঁচলে বারবার চোখ মুছিতে মুছিতে গোপালকে কোলে লইতে গেলে সে দুই হাতে দৃঢ়ভাবে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আপত্তির সুরে কহিল, "না, আমি বাবার কাছে থাকব।"

আকাশে সাড়ম্বরে মেঘ জমিতেছিল দেখিয়া খুড়ামহাশয় চিরপুরাতন সংসারের অনিত্যতার বাঁধা উপদেশ নূতন করিয়া শুনাইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনের পরামর্শ দিয়া চলিয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে যাঁহারা তখনো পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে আশ্বাস দিয়া ছেলের মুখ চাহিবার পরামর্শ দিয়া জানাইলেন যে, যে-ভাগ্যিমানি তপিস্তের জোরে গৌরীকে পতি পাইবার বর লাভ করিয়াছে, তাহার অনূঢ়া-কাল উত্তীর্ণ হওয়াতেই এই অল্প-ভোগিণী বধূটিকে এত-শীঘ্র নিজের পদ ছাড়িয়া দিয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে বাহির হইতে হইয়াছে—এ যে বিধাতার বিধি—মানুষের গড়া নয় ত! তবে হ্যাঁ, যেমনটি যায়, তেমন কি আর হয়? না, অসময়ের ফলে সময়ের ফলের স্বাদ পাওয়া যায়! ছেলের আবার বৌ হইবে বটে কিন্তু তাঁহার সুখ আর হইবে না! উদাহরণের মধ্য দিয়া ইহাও তাঁহারা জানাইয়া দিতে ত্রুটি করিলেন না যে, তেমন সুখের বরাতই যদি তাঁহার হইবে, তবে এমন দুর্ঘটনা ঘটিবেই বা কেন! পোড়া অদৃষ্ট যখন নিজেই পুড়িয়াছে, তখন অন্যের কাছে কিসেরই বা প্রার্থনা! আর সে পাওয়াতেই বা কোন্ সার্থকতা! যাই হোক মন বাঁধিয়া অতঃপর ছেলের মুখ চাহিবার উপদেশ দিয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলেন।

রাত্রেও গোপাল বাপের কাছ-ছাড়া হইল না। বাপের কম্বল-শয্যায় তাহাকে দুই হাতে হাতে জড়াইয়া সে শুইয়া রহিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গৌরীপতি জাগিয়া ছিল। কৈশোর-যৌবনের কত অতীত স্মৃতি আজ যেন ছবির মত তাহার মনোদর্পণে একে একে ফুটিয়া উঠিতেছিল, আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে ছিল। মনে পড়িতেছিল, কৈশোরের সেই

আনন্দময় অনাবিল, জীবনে কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম, বিদ্যাশিক্ষার কি প্রবল অনুরাগ! আর তাহার শিক্ষক? স্নেহময় উন্নত উদার-হৃদয় পিতা কত স্নেহে, কত কঠোর পরিশ্রমে কি মধুর তাহার সে শিক্ষাদান, তার পর কি আকস্মিক তাঁর অকাল-মৃত্যু, সহায়-হীনা শোক-কাতরা মায়ের সেদিনের সে মুখচ্ছবি তাহাকে কত শীঘ্র জীবন-যুদ্ধে প্রলুব্ধ করিয়া শোক সহিতে সক্ষম করিয়া তুলিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে আর একখানি চিত্র ফুটিয়া উঠিল। বিবাহের বর-কনে গৌরী ও দুর্গা একত্রে মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, মায়ের সেদিন-কার যুগপৎ হর্ষ-বিষাদের মিশ্র চিত্র, দুই কোলে দুইজনকে বসাইয়া চোখের জলে ভাসিয়া মা সেদিন বলিয়াছিলেন, "আজ আমার এত দুঃখ সয়ে বেঁচে থাকা সার্থক হলো গৌরী,—ভগবান তোদের দুটিকে যেন কখনো জোড়-ছাড়া না করেন, এই আমার আশীর্ব্বাদ!" বালিকা বধূ —কেহ শিখাইয়া না দিলেও মার সে আশীর্ব্বাদ কেমন সহজে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়া আপনা হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়াছিল। কি হইল আজ দুর্গামণি, সে কামনা আজ অটুট রাখিতে পারিলে কই! হাসি-মুখে দিব্য ত চলিয়া গেলে! চিরদিনের সঙ্গীটিকে সঙ্গে লইলে কই? এমনি সহস্র চিন্তা ধীরে ধীরে মানস-পটে ফুটিয়া আবার পরক্ষণেই ধীরে ধীরে মনের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছিল। চিন্তা করিতে করিতে সারাদিনের দুঃখ-ক্লেশ-মথিত শোকাতুর চিত্ত কখন যে বিশ্রাম-দায়িনী ঘুমের মধ্যে শান্তি পাইল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। সহসা বাহিরে প্রচণ্ড বজ্রনাদের সহিত প্রবলধারে বৃষ্টিপাতের শব্দে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গৌরীপতি তাড়াতাড়ি বিছানা হাতড়াইয়া ডাকিতে লাগিল, "গোপাল—গোপাল—" মনে পড়িল, খানিক আগেও ঘুমের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গোপাল তাহারই কণ্ঠালিঙ্গনে তাহাকে দুখানি বাহু-বেষ্টনে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। হয় ত তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া মা গোপালকে তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। তা'ই সম্ভব! আলস্যে ও অবসাদে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না! তবু প্রচণ্ড ঝড়ে বাহিরে দুম্‌দাম্ করিয়া দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দে বাধ্য হইয়া গৌরী বাহিরে আসিল; আসিয়া দেখে, কালীচরণ তাহার পূর্ব্বে উঠিয়া দ্বার জান্‌লা বন্ধ করিয়া উঠানে যেখানে একরাশ শুক্‌নো কাঠ জলে ভিজিতেছিল, তাহারই উদ্ধার-সংকল্পে দাঁড়াইয়া আছে। গৌরীপতির সাড়া পাইয়া সর্ব্বমঙ্গলা দেবী বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "গোপাল ভয় পাবে যে, তাকে একা রেখে এলে গৌরী? চল, ঘরে চল।"

গৌরীপতি কহিল, "গোপাল কোথায় শুয়েচে মা? তাকে কখন তুমি তুলে নিয়ে গেছ আমি ত কিছু জান্‌তেও পারিনি।"

"আমি নিয়ে গেছি! সে কি কথা—" বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলা দেবী এক প্রকার ছুটিয়াই ঘরে ঢুকিলেন। জলে, ঝড়ে হারিকেন লণ্ঠনটি কখন নিভিয়া গিয়াছিল। অনুসন্ধান করিয়া দিয়াশলাই বাহির করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া মাতা-পুত্রে প্রত্যেক ঘর আতিপাতি করিয়া খুঁজিলেন। কোথায় গোপাল—? গোপাল ত নাই। শয়নের পূর্ব্বে কালী নিজের হাতে বাহির দ্বারে হুড়কা লাগাইয়া দিয়া আসিয়াছে,

তবে এ দ্বার খুলিল কে? মুক্ত-বক্ষ কবাট দুইখানা বাতাসের জোরে তাঁহাদের বুকের পাঁজরার উপর হাতুড়ির ঘা দিয়া যেন সশব্দে বুঝাইয়া দিতেছিল, এই পথ দিয়াই সে বাহির হইয়া গিয়াছে রে! সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ও গৌরীপতি পাগলের মত ছুটিয়া বাহির আসিলেন। প্রবল ঝড় আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি, চোখে-মুখে তীরের ফলার মত আসিয়া বিঁধিতেছিল—বাহিরে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! পাঁচ বছরের ছেলে,—সে কি এই অন্ধকারে রাত্রে এই ঘন-দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতির কোলে একা বাহির হইতে কখনও সাহস করিতে পারে—না, না, এ অসম্ভব! তবু যদি সত্যই সে তা করিয়া থাকে? সারারাত্রি একবার ঘর—একবার বাহির—তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া পরিচিত-অপরিচিত অনেকের বাড়ী খোঁজ লইয়াও গোপালের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ভোরের দিকে জল-ঝড় কমিয়া সকালে বৃষ্টি থামিয়া গেল! এক রাত্রের প্রবল ধারাপাতে নদীর জল অনেকখানি বাড়িয়া ছোটখাট বালুচর গুলিকে ডুবাইয়া দিয়াছে। গৌরীপতির মনে পড়িল, গোপাল রাত্রে একবার বলিয়াছিল, "মার যদি ভয় করে বাবা—মা যদি ভাল হয়ে উঠে আমাদের খোঁজেন?" তখন সে কথার সে জবাব দেয় নাই অথবা কি-একটা দিয়াছিল, এখন আর তাহা স্মরণ নাই। কি জানি, মাতৃহীন বালক যদি সেই শ্মশান-ঘাটে মাকে খুঁজিতেই গিয়া থাকে! সে পথ ত গোপালের অচেনা নয়, তাহারই সহিত কতদিন ঐ পথ দিয়া বালক যে নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছে। প্রভাতে সূর্য্যোদয় ও সায়াহ্নে সূর্য্যাস্তের অপরূপ সৌন্দর্য্য মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিয়াছে। যুক্ত করে "সুরপতিভাগে, রক্তিমরাগে—" প্রভৃতি স্তোত্র পাঠে পিতার মনে আনন্দ সিঞ্চন করিয়াছে। তবু এই ঘনঘটাময়ী তামসী নিশীথে সে পথে বাহির হওয়া শিশুর পক্ষে কি সম্ভব! কে জানে! যদি সে তাই গিয়া থাকে আর অন্ধকারে অসাবধানে পিছল পথে চলিতে গিয়া নদী-গর্ভেই পড়িয়া গিয়া থাকে! গৌরীপতি শিহরিয়া উঠিল। সেখান হইতে গৌরীপতিকে তাহার অমূল্যনিধির বার্ত্তা কে আনিয়া দিবে! ক্ষুধিতা রাক্ষসী নদী গৌরীপতির প্রাণাধিকার চিতাভস্ম মাখিয়াও বুঝি তৃপ্তি পায় নাই, তাই স্ফীতবক্ষে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া ছুটিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে!

পরদিন সন্ধ্যার সময় কালীচরণের সহিত গৌরীপতি যখন শূন্যক্রোড়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, সর্ব্বমঙ্গলা দেবী সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ছাব্বিশ বছরের ছেলের মাথার সব চুলগুলি চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে!

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুড়ান ছেলে

ইন্দ্রনাথ জমিদারের ছেলে। পুরুষানুক্রমেই ইহারা জমিদার। এ বংশে কেহ কখনও পরের চাকরি করে নাই। বাণী-মন্দিরের দ্বারেও কাহারো পদধূলি বড় পড়ে নাই। জমিদারী-রক্ষার জন্য যতটুকু বিদ্যার প্রয়োজন, গৃহে মুন্সী রাখিয়া পণ্ডিত রাখিয়া ততটুকু শিক্ষা করাই এ গৃহের চিরন্তন নিয়ম। সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণের সহিত একাসনে

বসিয়া সামান্য শিক্ষকের শাসন-তাড়না সহিয়া শিক্ষালাভ করা এ বংশের প্রথাই নয়।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু চিরদিনের নিয়ম উল্টাইয়া ইংরাজী শিক্ষার জেদ ধরিল। সতেরো বৎসর পূর্ব্বে দুই বছরের শিশু পুত্রকে লইয়া কাত্যায়নী দেবী যেদিন এই বৃহৎ সংসারে অনাথা হইয়াছিলেন, সেদিন সেই ক্ষুদ্র-শিশুই তাঁহাকে সংসারের মায়াজালে বদ্ধ করিয়া মৃত্যু-কামনার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহারই মুখ চাহিয়া স্বামী হারাইয়াও আবার তিনি গৃহ-কর্ম্মে মন দিয়াছিলেন। নতুবা কিসের গৃহ, কাহার জন্যই বা সংসার? তারপর কত ঝড়ই না মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে! জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম বুঝিতে অনেক ক্লেশ ও সময় লাগিয়াছিল, তবু সবই তিনি সহিয়াছিলেন সেই বংশধরের মুখ চাহিয়া, তাহারই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। ছেলে যখন জেদ ধরিল, সে ইংরাজী শিখিবে, স্কুলে যাইবে, তখন বিমুখ চিত্ত সহস্রবার পিছনে ফিরাইলেও তাহার ঈপ্সিত পথে তাহাকে যাইতে দিতে মানা করিতে পারিলেন না। এ বংশের চিরদিনের নিয়ম-ভঙ্গে বিদেশী শিক্ষায় পাছে দেশের অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে অনেক দেবদেবীর মানত করিয়া ছেলের মাথায় অপরাধের জরিমানার মূল্য স্পর্শ করাইয়া পূজা তুলিয়া রাখিয়া মনে মনে দেব-দেবীদের উদ্দেশে তিনি বলিয়াছিলেন,—হে মা দুর্গা, হে বাবা শিব, বাছাকে আমার ভালয় ভালয় ঐ দায়ের পড়া সাঙ্গ করাইয়া দাও, আমি ভাল করিয়া তোমাদের পূজা দিব—মন্দির-চূড়া সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিব। মায়ের আশীর্ব্বাদে দেব-দেবীদের কৃপায় ও নিজের চেষ্টায় ইন্দ্রনাথ তাহার ঈপ্সিত ফল লাভ করিয়া বিদ্বৎ-সমাজে একদিন বরণীয় হইয়া উঠিল। দেশ-বিদেশ হইতে অনেক মূল্যবান পুস্তক আনাইয়া সে গৃহে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিল এবং সময়ের তৃতীয়াংশ কাল পরমানন্দে সেইখানেই কাটাইতে আরম্ভ করিল। মা এইবার বিবাহের জন্য জেদ ধরিয়া বসিলেন। ইন্দ্রনাথ হাসিয়া প্রত্যাখ্যান করিল—এই অধ্যয়নের পরমানন্দেই বাকী জীবনটা সে উৎসর্গ করিবে। সংসারের শোক, রোগ, অভাব-অভিযোগের মধ্যে কোনমতেই সে নিজেকে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম অনেকদিন পর্য্যন্ত অনুনয়, অনুরোধ, মানাভিমান অশ্রুবর্ষণের পর মাও হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এত বড় বনিয়াদি বংশ—সেই বংশ-লোপের ভয়ও যখন উহার নাই, তখন তিনিই বা আর করিবেন কি? মনে করিলেন, এ তাঁহারই কৃতকার্য্যের ফল। সন্তান-স্নেহে অন্ধ হইয়া চিরদিনের নীতি-পথ লঙ্ঘন করিয়া ছেলেকে বিদেশী শিক্ষা দিয়া যে মহাপাপ তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার ভোগ তাঁহাকেই যে ভুগিতেই হইবে! ইহার সহিত প্রবল অভিমানও জড়িত ছিল। মনে হইল, এ সংসারে আমি তবে কেহই নই, পেটের ছেলে,—সেও পর হইল, এতটুকু দিয়াও সুখী করিল না! মনে করিলেন, বিবাহ হয়ত আমি বাঁচিয়া থাকিতেই করিল না! ইহার পর সুগভীর অভিমানে একেবারেই তিন চুপ করিয়া গেলেন। জ্ঞানানন্দে বিভোর-চিত্ত ইন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মুক্তি পাইয়া একবার সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিল, হইল কি? মা যে বড় চুপ্‌চাপ্! তখনই নিজের অনুকূলে ধরিয়া লইল, মা এইবার তবে

নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন। যাক্, বাঁচা গেল!

সে বৎসর—কংগ্রেসের পর ইন্দ্রনাথ বাড়ী ফিরিতেছিল। ফিরিবার সময় স্থলপথে না ফিরিয়া জল-পথে ফিরিবার সে সংকল্প করিল। ইহাতে ট্রেনের গোলমাল না থাকায় মনের এবং জল-বিহারে শরীরের—এক ঢিলে এই দুই পাখী মারার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। মা খবর পাইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, তীর্থের পথে যদি যাওয়া ঘটে তবে তিনিও সঙ্গী হইবেন। ইন্দ্রনাথের আপাততঃ তীর্থ ভ্রমণের সাধ ছিলনা,—শুধু জল-বিহারে আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যেই সে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও বাধা পড়িল, জল-পথে শরীরের উপকার না হইয়া অপকারই হইতেছিল। বিরক্ত চিত্তে ইন্দ্রনাথ অবিলম্বে বাড়ী ফিরিবার হুকুম দিল।

পূর্ব্বরাত্রে ভয়ঙ্কর ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া সকাল বেলা আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। নিস্তরঙ্গ নদী-জলেও পূর্ব্ব রাত্রের বিশ্ব-গ্রাসিনী ভীমা মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে ছিলনা। ঝড়ের সময় বজরা তীরে বাঁধিয়া ইন্দ্রনাথ সদলে আশ্রয়ের সন্ধানে তীরে উঠিয়াছিল। কিন্তু নিকটে কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন না দেখিয়া অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া বজরা-বক্ষেই তাহাদের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অনুপায়ে রাত্রে কাহারও আহার হয় নাই। তাই সকাল বেলা সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত। কেহ রন্ধনের আয়োজনে ব্যাপৃত, কেহ কাছে কোন বাজার-হাট আছে কিনা তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত, কেহ-বা নদী-জলে স্নানাদি করিতেছিল। ইন্দ্রনাথ মুখ-হাত ধুইয়া জলযোগান্তে তীরে-তীরে একটু ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাত্রে অন্ধকারে স্থানটিকে ভাল বুঝিতে পারা যায় নাই। এখন দিনের আলোয় জনহীন স্থানটিকে নির্ব্বাসিতের দ্বীপের মত মনে হইতেছিল। নদী-তীরে বড় বড় গাছ—অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, আরও নানা জাতি বৃক্ষ, কোথাও ভগ্ন, কোথাও অর্দ্ধভগ্ন। পুরাতন শিকড় বাহির-করা বড় বড় গাছগুলি কেবল প্রকৃতির বিভীষিকার প্রতি তীব্র উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সমভাবে সতেজে দাঁড়াইয়া আছে। ইন্দ্রনাথ লক্ষ্যহীনভাবে তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কখন শান্ত নদী-বক্ষের পানে চাহিয়া দুর্য্যোগময়ী রজনীর তাণ্ডব নৃত্যের সহিত মানব-চিত্তের ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীলতার তুলনা করিতেছিল। সহসা চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, নদী-তীরে একেবারে জলের ধারে ঝুঁকিয়া পড়া একটা বৃহৎ বটগাছের শিকড়ের ফাঁকের ভিতর ও কি পড়িয়া রহিয়াছে? কাছে গিয়া ভালো করিয়া লক্ষ্য করিতেই ইন্দ্রনাথ বুঝিলেন, তাঁহার অনুমান মিথ্যা নয়—একটি ছোট ছেলে। হয়ত গতরাত্রির ঝড়-জলে নৌকাডুবি বা অমনি কোন কারণে জল-মগ্ন হইয়া বালক স্রোতে ভাসিয়া এখানে আসিয়া বৃক্ষ-কোটরে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ছেলেটি বাঁচিয়া আছে কি না বুঝিতে পারা যায় না। শ্বাস-পতনের চিহ্ন ছিল না। সারারাত্রি জলে ডুবিয়া থাকায় হাত-পা-মুখ সমস্তই কুঞ্চিত বিবর্ণ দেখাইতেছিল, তবে বিকৃত হয় নাই। গাছের ফাঁকে ফাঁকে শাখার আড়াল দিয়া যেটুকু রৌদ্রালোক আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছিল; তাহাতে মর্ম্মর মূর্ত্তির মুখে

যেন জীবনের রক্ত-আভা জাগাইয়া তুলিয়া ছিল। ইন্দ্রনাথ কাছে বসিয়া ছেলেটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, নিশ্বাস নাই—বক্ষস্পন্দনও থামিয়া গিয়াছে। বুকের উপর কান পাতিয়া অনেকক্ষণ পরে মনে হইল, বুঝি শ্বাস আছে, অতি ক্ষীণ, অতি অস্পষ্ট, তবু হয়ত আছে! চেষ্টা করিলে এখনও হয়ত এই মৃত দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার করিতে পারা যায়। পুঁথিগত বিদ্যার ইন্দ্রনাথের অভাব ছিল না। ডাক্তারি শাস্ত্রও সে অনুশীলন করিয়াছিল। জলমগ্নকে বাঁচাইবার জন্য যে-যে প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তাহার সমস্তই সমাধা করা হইল। ছেলেটিকে সাবধানে বজরায় তুলিয়া আনা হইল, এবং দূর গ্রাম হইতে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসককেও পাওয়া গেল। সমবেত যত্ন ও চেষ্টার ফলে একটু-একটু করিয়া ছেলেটির মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল। ধীরে ধীরে প্রথম সূর্য্যোদয়ে বিকশিত কমল-কলির মতই সে তাহার পদ্মপলাশ চক্ষুদুটি উন্মীলন করিয়া চারিদিকে বিহ্বলের মত চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সে দৃষ্টিতে জ্ঞানের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া গেল না। সদ্যজাত শিশু-দৃষ্টির ন্যায় তাহা স্বচ্ছ নির্ম্মল ভাবহীন। ইন্দ্রনাথ আশাতীত আনন্দ-লাভে পুলকিত চিত্তে ছেলেটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার জল-যাত্রা সার্থক হইয়াছে।

এই ছেলেটির জন্যই তাহাদের বাড়ী ফিরিতে আরো কিছু দিন বিলম্ব হইয়া গেল। ছেলেটি অত্যন্ত ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল। ক্রমে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সক্ষম হইল। ইন্দ্রনাথ, চিকিৎসক ও অন্য সকলেই বুঝিলেন যে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা পুনরায় আয়ত্ত হইবার আর কোন আশা নাই! নূতন করিয়া তাহাকে ভাষা হইতে সকল বিষয়ই শিক্ষা দিতে হইবে। অতীত জীবনের উপর যে কালো যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে, তাহা উত্তোলন করা এখন আর চেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। নিজের কথা সে কিছুই জানাইতে পারিল না, নাম, জাতি, গোত্র, দেশ,—এ-সব কথা কে জানাইবে! বালকের দেহে সে যে শিশুর জীবন লাভ করিয়াছে! ইন্দ্রনাথ কাছাকাছির মধ্যে তিন-চারি-খানি গ্রামে খোঁজ লইলেন, কেহ তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিল না। ছেলের ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় কাত্যায়নী দেবী ব্যাকুল হইয়া তাড়া দিয়া পত্র লিখিতেছিলেন। আর বিলম্ব করা অনুচিত বুঝিয়া ইন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের জন্য অনুসন্ধানের ভার তুলিয়া রাখিয়া আপাততঃ বাড়ী ফিরিবার দিকে মনঃসংযোগ করিল। ইন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলে কাত্যায়নী দেবী দেখিলেন যে একটি বছর পাঁচ-ছয়ের ছেলেকে সে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। ছেলেটির বিষয়ে ইন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই তাঁহাকে পত্রে সংবাদ জানাইয়াছিল, তাই বিস্মিত না হইলেও তিনি মুগ্ধ হইলেন। ছেলেটির কাঁচা সোনার বর্ণ, সুন্দর মুখ, বড় বড় কালো চোখে অর্থহীন দৃষ্টি—প্রচণ্ড বাত্যাপীড়িত পত্র-পুষ্পহীন শ্রীহীন তরুর মত শীর্ণ দেহ সহজেই মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া নিজের দিকে ফিরায়। ছেলেটিকে মার কোলে দিয়া ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল, "তুমি ছেলে চেয়েছিলে মা," তাই

ভগবান্ একে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েচেন—এ আমারি ছেলে।" মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ছেলেটিকে কাছে টানিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন,"আহা,কার বাছা কোল খালি করে এলো রে! আহা, এ ধন হারিয়ে বাপ্ মা যে বুক ফেটে মরে যাবে ইন্দু, কি করে তারা প্রবোধ দিয়ে জীবন ধারণ কর্‌বে, বাবা?" ইন্দ্রনাথ ছেলেটির উদ্বেগহীন শান্ত মুখের পানে চাহিয়া চিন্তিত মুখে কহিল, "তারাই কি বেঁচে আছে মা, তোমায় ত লিখেছিলুম, আগের রাতে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। হয়ত নৌকাডুবি হয়ে তাঁরা মারাই গেছেন। এও কি বাঁচত? তুমি যে বল মা, রাখে কৃষ্ণ মারে কে,—তা খুব সত্যি মা। ভগবান্ নেহাৎ একে বাঁচাবেন বলেই বাঁচিয়েছেন। নৈলে তেমন জায়গায় আমরাই বা বজরা বাঁধতে গেলুম কেন? সহর নয়, গাঁ নয়, কিছু না, একেবারে একটা পতিত জমি। ইচ্ছে করে সেখানে কেউ কখনো নামেনা। নেহাৎ ওর আয়ু আছে বলেই না ডাক্তাররা বল্‌ছেন ক্রমে ক্রমে আবার ওর জ্ঞান-বুদ্ধি ফিরে আস্‌তে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব স্মৃতি হয়ত কখনও ফিরবে না।"

কাত্যায়নী দেবী সনিশ্বাসে বলিলেন, "কি জাতের ছেলে, তাও ত বোঝা গেল না।" ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল, "বল্লেম ত মা, আমার ছেলে, তবে আর কি জাত হবে! ওর গলায় একটি রক্ষা-কবচ না কি ছিল সেটি খুলিয়ে বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি। তবে কি শর্ম্মা—এই টুকু পড়্‌তে পারা গেছল। ভূর্জ্জপত্রটুকু অনাবশ্যক ভেবে এমন করে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল যে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে। মাথাতেও ছোট একটি শিখা ছিল—আমার ছেলে যে! বামুন না হয়ে যায় কি!"

উচিত-বোধে ইন্দ্রনাথ কিছু দিন সংবাদ পত্রে ছেলেটির সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়াছিল। দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া ক্রমে বৎসর ঘুরিয়া গেল, কেহই সংবাদ লইতে আসিল না। ক্রমে এ চিন্তা ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নীর মন হইতে একেবারেই দূরে চলিয়া গেল, বরং ইদানীং মনে করিতে ভয় হইত, পাছে কেহ সহসা কোনদিন আসিয়া তাহাকে দাবী করিয়া বসে! অরুণকে ছাড়িয়া তাঁহারা বাস করিবেন কেমন করিয়া। সে যে কাত্যায়নী দেবীর অন্তরের কতখানি অংশ দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া তিনি সময়-সময় আশঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। ভরত রাজার মৃগশাবক-প্রীতির ন্যায় তাঁহারও শেষ-জীবনে এ কি দুশ্ছেদ্য মায়া-জালের বেষ্টন লাগিল! তবু এ জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি পাইতেও ইচ্ছা হয় না। ইহাকে স্নেহ করিয়া ভাল বাসিয়া, ইহার আবদার-বায়না শুনিয়া যে তাঁহার বন্ধন-প্রার্থী হৃদয় তৃপ্ত হইতেছিল। ছেলে সংসারী হইল না, এ দুঃখ অহরহ কণ্টক-ক্ষতের ন্যায় মনের ভিতর জ্বলিতে থাকিলেও মুখে কখন আর সে কথা প্রকাশ করিতেন না। সে যখন ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে দুঃখ দিতে বদ্ধ-পরিকর, সাধ্যসত্ত্বেও সে যে তাঁহার সংসারের কোন সাধ মিটাইতে দিল না, এ দুঃখ কি আর ভুলিবার! মনে পড়িল, একদিন অত্যন্ত জেদাজেদি করায় ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিল, সাধ করিয়া কেন কষ্ট ডাকিয়া আনিতে চাও মা,

আমরা মায়ে-ছেলেয় বেশ ত আছি। পরের মেয়ে সে কি তোমায় বুঝিবে, না তোমার উচিত মান্য-শ্রদ্ধা দিতে পারিবে! গভীর অভিমানে সেদিন কাত্যায়নী দেবী নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। মনে হইয়াছিল, ছেলে তবে তাঁহাকে এইরূপই বুঝিয়াছে। হায়রে, তিনি কি তাঁর সাতরাজার ধন সাগর-সেঁচা মাণিক ইন্দুর বৌয়ের মান্য-ভক্তিরই কাঙ্গাল! নাই বা করিল সে তাঁহার সম্মান! তবু ত সে তাঁহারই বুকের ধন, ইন্দুর বৌ! তাঁহার পতিকুলের, ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষকের জননী হইবে। অভিমানের অশ্রু অঞ্চলে মুছিয়া কাত্যায়নী দেবী মনে মনে উদ্দেশে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "মার সাধ ইন্দু তুই বিয়ে করে ছেলের বাপ্ হোস্, নৈলে কেমন করে বুঝ্‌বি, ছেলে কি জিনিষ!" সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, হয়ত সে প্রার্থিত দিনও আসিবে, কেবল দুর্ভাগিনী তিনিই তাহা দেখিয়া যাইতে পারিবেন না।

অরুণকে পাইয়া কাত্যায়নী দেবীর মনের ক্ষোভ দুধের অভাবে ঘোলেই অনেকটা মিটিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে অরুণ তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকিত। কিন্তু বিনা উপদেশেই সে কাত্যায়নীকে মা বলিতে সুরু করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের কড়া হুকুমে কেহ কখনও তাহার অতীত জীবন সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে পাইত না। জমিদার-পুত্রের মতই তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত হইল; দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই মনে করিল, ইন্দ্রনাথ নিশ্চয় ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র লইবে। অরুণকে পাইয়া কাত্যায়নী দেবী ছেলের দিক হইতে অনেকখানি মন সরাইয়া লওয়ায় ইন্দ্রনাথও খুসী হইয়াছিল। মাও কাজ পাইলেন, তাঁহার সংসার করা, ছেলে মানুষ করার সাধ মিটিবার একটুও যে অবসর মিলিল, এ ভালই হইল। ইন্দ্রনাথও এইবার নিশ্চিন্তভাবে নিজের ইচ্ছা-মত পড়াশোনা লইয়া থাকিতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সভ্যতার প্রতি

তোরাই শ্রেষ্ঠ তোরাই সভ্য সৃষ্টি-সেরা তোরাঁই শুধু
গর্ব্ব ক'রে বেড়াস্ ওরে মানুষ!
ক্রমোন্নতির শিরোভূষণ মাথার মণি তোরা সবাই
তোদের অসীম দীপ্তি এবং জলুস্!
টুটিয়ে আঁধার মগজ তোদের রংমশালের জ্বাল্‌চে মালা,
জগৎ-সভায় চুটিয়ে করিস্ দাবী;
ওরে মানুষ, ব'লে থাকিস্ বার করেচিস নিখিল বিশ্বে
সব রহস্যের কুলুপ-খোলা চাবি;—

সাম্‌নে এনে প্রমাণ ধরিস্ বিজ্ঞানের ঐ যন্ত্র-শালা,
রাত্রি-দিবা কচ্চে প্রসব যেটা,
সব-মেরিন ও উড়ো-জাহাজ বেতার-বার্ত্তা-বহন যন্ত্র
সংখ্যাতীত এটা ওটা সেটা।
ঘনিষ্ঠতা করবি স্থাপন শুন্‌চি অতি সত্বরেতেই
দূর-আকাশের গ্রহবাসীর সাথে,
পরলোকেও চল্‌বে তোদের কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান
এমন আশাও রাখিস্ মানুষ হাতে।
বুদ্ধদেবের ব্যর্থপ্রয়াস জরা-মৃত্যু ব্যাধির মুক্তি
এতদিনে সফল হোলো বুঝি ;
অনুবীক্ষণ লাগিয়ে চোখে বীজাণু সব তাদের নাকি
হাত্‌ড়ে তোরা বার করেচিস্ খুঁজি।
অহংকারে মাটির 'পরে পড়্‌চে না পা তোদের কারো
নীল আকাশের বুক চিরে তাই তোরা,
সভ্যতার ঐ উড়িয়ে নিশান উড়িস্ গোড়ে উড়ো-জাহাজ,—
ঊর্দ্ধদৃষ্টি স্তব্ধ বসুন্ধরা!
এইবারেতে হয়তো কোনো নতুন-যুগের নতুন কলম্বাসে
অসীম শূন্যে করবে আবিষ্কার,
আকাশ-সাগর মথন ক'রে নতুন কোন আমেরিকা
পরীরা সব বাসিন্দিয়া যার।
ধন্য তোরা ওরে মানুষ, ধন্য তোদের কীর্ত্তি-কলাপ,
সভ্যতার আর রাখ্‌লিনেকো বাকি ;
কিন্তু এ কি দেখ্‌চি চেয়ে এমন সবুজ সোনার বিশ্ব
আগা-গোড়াই রক্তে মাখামাখি।
মস্ত একটা কসাইখানা বিপুল বৃহৎ হত্যাক্ষেত্র
কাক-শকুনের লীলার ভূমি ক'রে,
তুল্লি গড়ে হায় রে মানুষ এই পৃথিবীর সমস্তটা
শতাব্দীর পর শতাব্দীটা ধ'রে।
আদিম যুগের বর্ব্বরতা ঘুচ্‌লোনাক একটু আজো
এখনো সেই হিংস্র পশুর মত,
পরস্পরের টুঁটি টিপে তেম্‌নি করিস্ ছেঁড়াছিঁড়ি
নিষ্ঠুরতার চিহ্ন এঁকে শত।

বর্ব্বরেরা রাগের মাথায় জ্বলে উঠে আগুন-সম
সটান ছুরি বসিয়ে দিত বুকে ;
রাষ্ট্রনীতির সমাজনীতির ধর্ম্মকথা কয়ে তারা
সয়তানিটা পুষ্‌তোনাক বুকে।
আকাশ থেকে টিপ ক'রে ঠিক মাথার উপর ছুঁড়তে বোমা
কি ক'রে হয় জানতোনাক তারা,
শক্ত ব্যাধির বীজাণু সব মিশিয়ে দিয়ে নদীর জলে
জান্‌তোনাক কায়দা শত্রু-মারা।
ইতিহাসের পাতায় পাতায় রক্তাক্ষরে স্পষ্ট লেখা
হত্যাকাণ্ড যুগ-যুগান্ত ধ'রে,
সভ্যতার এই ক্রমিক বিকাশ হত্যা-ব্যাপারটাকে শুধু
তুল্‌চে গ'ড়ে সূক্ষ্মশিল্প ক'রে!
যন্ত্রপাঁতি দিচ্চে যোগান বৈজ্ঞানিকের দলেরা সব
জ্ঞানীরা সব তত্ত্বকথা কয়ে,
মানুষ-মারার গাইছে সাফাই নির্লজ্জের মতন বসে
একশো মুখে বক্তৃতায় ও ব'য়ে।

যে সভ্যতার ইস্তনাগাৎ উচ্চৈস্বরে অষ্টপ্রহর
গর্ব্ব ক'রে বেড়াস্ ওরে মানুষ!
সে ত শুধু ছাইএ ভরাট্ নেহাৎ ভুয়ো ডেড্-সী-আপেল
সাবান-জলের ঠুন্‌কো ফাঁপা ফানুস।
হাতে মেরেই এক-রকমে নিষ্কৃতিটা দিতিস্ যদি
বাঁচ্‌তো তাতে অনেক চোখের জল,
বিশ্বব্যাপী কান্না এ যে তুল্লি তোরা ভাতে মেরে
ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌চে ভূমণ্ডল!
চর্ব্ব্য চোষ্যে পূর্ণ উদর ঘূর্ণি-বায়ুর মতন তোরা
হাঁকিয়ে মোটর করিস ছুটোছুটি,
নিরীহ প্রাণ অসংখ্য লোক চাকার তলায় প'ড়ে তোদের
দিবারাত্র খাচ্চে লুটোপুটি।
আয়ু যাদের ফুরিয়ে গেছে বল্‌চি তোরা মরবে তারা
মরবে এটায় না হয় আর একটাতে,

পথ চল্‌তে অশিক্ষিত অসাবধানী গ্রাম্য যারা
তাদের উচ্চিত মৃত্যু অপঘাতে,
সে জন্যে শোক মিথ্যে করা—হাঁকা জোরে হাওয়ার গাড়ী
বড় মানুষ, গরীব মানুষ মেরে ;
তোদের বিলাস হাঁড়িকাঠে হয় তো রোজই নরবলি
একরকম না আর একরকম ফেরে।
এই যে নিত্য যাচ্চে মারা অসংখ্য লোক অনাহারে
কাড়ছে মায়ে ছেলের মুখের গ্রাস,
এই যে নিত্য মর্‌চে রোগে একটি ফোঁটা ওষুধ বিনা
অসংখ্য লোক খাচ্চে নাভি-শ্বাস,
এই যে যত মুটে-মজুর দর্জ্জি ধোপা চাষা তাঁতি
কামার কুমোর শ্রমজীবির দল,
আহার-বিহার বিলাস-দ্রব্য জোগায় তোদের ভারে ভারে
বুকের কাঁচা রক্ত ক'রে জল,
নিজেরা হায় পায় না খেতে দুটি বেলা পেটে ভরা ভাত
ভগবানে ডাক্‌চে ত্রাহি ত্রাহি—
সভ্যতার এই শতাব্দীতে এই যে ভীষণ অত্যাচারটা
ইহার জন্য নয় কি তোরা দায়ী ?

ক্রমোন্নতির প্রথম সূত্র দুর্ব্বলেরা হট্‌বে পিছু,
যোগ্যতমের হবে উদ্বর্ত্তন ;—
সব দেশেরই ইতিহাসে এই কথারি দিচ্চে সাক্ষ্য
এই কথারি করছে সমর্থন ;
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার অলীক স্বপন দেখ্‌ছে যত
কাব্যপ্রিয় অন্ধ কাল্পনিক ;
আসমান-জমি রইছে ফারাক কল্পনা ও বাস্তবেতে
কালও যেমন আজো তেম্‌নি ঠিক।
অতএব এ মিথ্যে বিলাপ পৈশাচিকী নৃত্যলীলা
জগৎ জুড়ে হউক অভিনয়,
অত্যাচারে উৎপীড়নে যাক্ এ বিশ্ব ছারে খারে
হউক দুষ্ট সয়তানেরি জয় !

ভণ্ডামি আর বুজ্‌রুকিটা বুকের ভিতর থাকুক্ পোষা
মুখে থাকুক্ লেগে কপট হাসি,
ধার চাইতে একটি পয়সা তোমার গৃহে বন্ধু যদি
দ্বারস্থ হয়—দুহাত পাতে আসি,
ফিরিয়ে দিও দু-চার কথা সদুপদেশ দিয়ে বরং
সেই সুযোগে এম্‌নি সুকৌশলে,
দ্বিতীয়বার আর যেন সে তোমার বাড়ীর ত্রিসীমানা
মাড়ায়নাকো আবার কোন ছলে।
দল বেঁধে আর কোমর বেঁধে উঠে প'ড়ে সবাই লাগো
দেশের কাজে সমাজ-হিতের ব্রতে,
ধর্ম্মে বেজায় গ্লানির মাত্রা উঠ্‌ছে বেড়ে দিনে দিনে,
রহিত কর্‌তে সেইটে কোন মতে—
গলাবাজী কলমবাজী এই দুটো কাজ মিলে মিশে
চালাও কসে আচ্ছা ক'রে জোরে ;
নেপথ্যে ও অন্তরালে যা প্রাণে যায় ক'রে যেও
কে আর দেখ্‌ছে আগল ঠেলে ঘরে !

উন্নতি আর সভ্যতা কি একেই বলে ওরে মানুষ
যুগ-যুগান্তের পরিশ্রমের ফল,
ষোলআনাই ভেজাল মেকি গোয়ালিনীর দুধের মত
সেরেফ খাঁটি শাদা রঙের জল।
সভ্যতার এই খাঁচার ভিতর হাঁপিয়ে ওঠে পরাণ-পাখী
বর্ব্বরতার মুক্ত বায়ুর তরে,
বিষিয়ে ওঠে সমস্ত প্রাণ কলের যত ধুলোয় ধোঁয়ায়
কৃত্রিমতায় জ্যান্ত মানুষ মরে।
দূর ক'রে দে ইলেক্‌ট্রিকের পাখা আলা মোটর' ফেটিন
সভ্যতার সব বিলাস বাবুয়ানা।
সময় সময় ইচ্ছেটা যায় পালিয়ে যাই সেই বন্য দেশে
বর্ব্বরতা দিচ্চে যেথা হানা !
আফ্রিকা কি আমেরিকার আদিম অধিবাসীর সাথে
নগ্ন বেশে বেড়াই বনে বনে,

সভ্যতার এই বিলাস-সজ্জা ধুলোর মত ফেলি ঝেড়ে
মিথ্যে জ্ঞানের কাজল বোলাই মনে।
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এই রাবিস-পোরা মগজটাকে
উপুড় ক'রে উজোড় ক'রে ফেলি,
মিল ডাদ্‌উইন স্পেনসার আদির ভুল ঝুটো বুকনিগুলো
কি বায়রণ কি টেনিসন শেলী ;
রং-বেরঙের উল্কি আঁকি নক্সা কাটি গায়ের উপর
বনের পশু বেড়াই শিকার ক'রে,
সাপের সঙ্গে বাঘের সঙ্গে অষ্টপ্রহর নানান্ ব্যথা
ঘুরে বেড়াই বনে বনান্তরে।
মউয়া ফুলের মধুর সুরা পান করে নে' মেহোল্লাসে
পাহাড় পাহাড় বেড়াই নেচে নেচে,
অসুখ হ'লে ভুত ঝাড়াতে ডেকে আনাই রোজা গুণিন্
না হয় ত খাই গাছের পাতা ছেঁচে !
ডাক্তারির সব ফক্কিকারী উড়িয়ে দিয়ে একটি ফুঁয়ে
আবার সুস্থ সবল হয়ে উঠি,
হাত ধ'রে মোর বন্য-প্রিয়ার চাঁদের আলোয় নদীর তীরে
চাঁদের আলো দুহাত দিয়ে লুটি ;
গাছ-পাথর আর নোড়া-নুড়ির করি ফেটিস উপাসনা
আচার-ব্যাভার তাদের গ্রহণ করি,
তাদের রীতি তাদের নীতি তাদের প্রথা কুসংস্কার
বুকের ভিতর আঁকড়ে নিয়ে ধরি !
গির্জ্জে গৃহে মন্দিরেতে সকল আচার অনুষ্ঠানে
সর্ব্বনাশী এই যে কৃত্রিমতা,
ইহার চেয়ে অনেক ভাল সুস্থ-সবল সহজ জীবন
বন্য-জাতির নগ্ন বর্ব্বরতা !

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

কাব্যকথা

কল্পনা ও বাস্তব

এই যে ঘরের মধ্যে বসে' আছি—এর এমন জায়গা নেই, এর মধ্যে এমন জিনিষ নেই যার কোন একটি রং না আছে। কিন্তু এম্‌নি অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে,ছবিতে না এঁকে দেখা'লে সেই রং গুলি চোকে পড়ে না; এমনি দেখতে এর কোনোখানটায় রঙ্গীনতা দেখ্‌ছি নে। কোনো পোটো যদি এগুলিকে ঠিক ফোটাতে চায়, তবে তাকে কত করে' কত রকম রঙেরই না সমাবেশ করতে হবে, প্রত্যেক রংটির জন্যে কত পরিশ্রম করতে হবে! তারপর ছবিখানি আঁকা হ'লে তার সব রংগুলি আমাদের চোকে পড়বে। ছবিতে যে জিনিষটী এমন রঙীন, আসলে তার মধ্যে কোনো রঙের পরিচয় আমরা পাই নে।

তুলনাটা যে ঠিক-ঠিক হবে তা নয়, কিন্তু তবু বোঝাবার পক্ষে একটু সুবিধে হবে। বাস্তব মূর্ত্তি ও তার ছবিতে এই যে ধরণের প্রভেদ, বাস্তবে ও কাব্যে ঐ রকম একটা তফাৎ আছে বোধ হয়। ওখানে যে-জিনিষটা রং নিয়ে, এখানে তা রস নিয়ে। চোখের সামনে নিত্য যে সব ব্যাপার ঘটছে,তা দেখে রসোদ্রেক হয় না, কিন্তু যেই সেটাকে কোনো কবি বা ঔপন্যাসিক কাব্যের আকারে ধরে' দেন, অমনি প্রাণটাতে বেশ একটু মাধুরীর আবেশ লাগে, ওই যে রঙের কথা বলেছি, সেই রং—যার যেমনটি,—চোকে পড়ে।

এই জীবনটাই তা হলে কাব্য, অন্ততঃ কাব্যের বিষয় ত? এখন কাব্য হওয়া আর কাব্যের বিষয় হওয়ার মধ্যে বড় বেশী তফাৎ আছে কি? আছে বৈ কি—খুব তফাৎ!

ধর, আমি একটা ব্যাপার কতবার ঘটতে দেখেছি, একটা দৃশ্য কতবার আমার চোকে পড়েছে; কিন্তু যখন একজন কবি বা ভালো চিত্রকরের হাত দিয়ে তার বর্ণনা বা ছবি বেরুল, তখন সেটা যে সেই আমার দেখা জিনিষই, একটুও এদিক-ওদিক নয়, এ জ্ঞানও আছে, অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে বলছি—বা! কি সুন্দর! এমন সুন্দর বলে' বোধ ত আগে হয়নি! এর মানে কি?

এইখানে অনেকে বলে' উঠবেন জানি—'ওর কারণ আর কিছুই হয়, আসল জিনিষটা সত্যিই এত সুন্দর নয়, কবিরা বেশ একটু বাড়িয়ে,তাঁদের বাতিকগ্রস্ত স্বভাবের দরুণ একটি রঙীন মিথ্যার ফ্রেমে সেটিকে সাজিয়ে বসিয়ে দেন, সেইটুকু তাঁদের ভেল্কি—বাজীকরের মত আমাদের চোকে সেটাকে যেমন ইচ্ছে বদলে' তাক লাগিয়ে দেন। প্রাকৃতকে অতিপ্রাকৃত করে' তোলার ক্ষমতাই কবিত্ব—শাদা জলে একটু গুঁড়ো মিশিয়ে আমাদের নেশা করিয়ে দেওয়াটাই তাঁদের বাহাদুরী।'

কথাটা ঠিক বটে। সেই বাহাদুরী যে লেখার মধ্যে নেই, তা কারা নয়। কিন্তু ওই সত্যি-মিথ্যা কথাটার মধ্যে একটু গোল আছে। যাঁরা এই জগৎ ব্যাপারের রহস্য একটু বেশী করে' ভেবে দেখতে গিয়েছেন, তাঁরা অনেক সময়েই এটাকে প্রকাণ্ড ধাঁধা বলে' হাল ছেড়ে

দিয়েছেন—কোন্‌টা সত্যি, কোনটা মিথ্যা, এর মীমাংসা এক রকম অসম্ভব মনে হয়েছে। আসল কথাটা আর কিছু নয়, জীবনের যে দিকটা সকলকে সমান ভাবে স্পর্শ করে, অর্থাৎ, জীবন-যাপনের প্রয়োজনের মাপ-কাঠিতে বস্তু সকলের যে আকার,আয়তন ও অর্থ নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে—সেইটা বাস্তব তথ্য এবং তথাকথিত সত্য বলে' আমাদের একটা সর্ব্ববাদিসম্মত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। সেদিকটার রূপ আছে কিন্তু রং নেই, মূর্ত্তি আছে কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই, ব্যথা আছে কিন্তু সুর নেই। কিন্তু, প্রয়োজনের যা কিছু দাবী তা চুকিয়ে দিয়েও যার অন্তরে প্রাণশক্তি উদ্বৃত্ত থাকে,সেই একটু মুক্তি পায়; ঐ উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি,একটা খেলা—একটা লীলায় নিয়োজিত হ'তে চায়; চোকে তখন রং লাগে, প্রাণে তখন সুর বাজে, মনে তখন সুন্দর-বোধ জাগে। তখন যে-দিকটা তোমার-আমার চোকে পড়ে না, সেই দিকটা তার চোকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যদি বল, সেদিকটা তার মনের মধ্যেই আছে, বাহিরের উপর তাকে বসিয়ে দেওয়া হয় মাত্র—তবে উত্তরে এই বলি,সবই ত মনে-গড়া! ওই বাস্তব তথ্যের দিকটা—ওটাও মনে; তফাৎ এই যে, একটা হচ্ছে সাধারণ সার্ব্বজনিক প্রয়োজন-পীড়িত মনের দিক, আর একটা হচ্ছে, অসাধারণ প্রয়োজনমুক্ত সলীল স্বাধীন মনের দিক। বরং বিচার করে' দেখলে ওই শেষের দিকটা আরও সত্য, কারণ, সেটা মুক্ত মনের দিক—বন্ধন-অবস্থায় কখনো সত্যকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয়, সৌন্দর্য্যের দিকটাই সত্যের দিক—মিথ্যাই অসুন্দর। কোনো বস্তুকে যতক্ষণ অসুন্দর দেখ্‌ছ ততক্ষণ তাকে সত্য করে' দেখ নি। সে রকম দেখার শক্তি চাই—সেই শক্তিকেই মনীষা, প্রতিভা বলে। আশ্চর্য্য, এই বাস্তবই অসুন্দর, বাস্তবই সুন্দর! তা'কে জয় করে' না নিলে সে প্রেয়সী হবে না। সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, 'ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড—লয়ে বাম করে।' তার পাণিগ্রহণ করতে হলে ওই বিষভাণ্ডটি চুমুক দিয়ে হজম করতে হবে, তার পর আসল সত্যবস্তু যে ওই সুধাভাণ্ড—তাই দিয়ে চিরসুন্দরের স্বর্গে চিরকালের জন্য সে বরণ করে' নেবে। সুধাভাণ্ডটাই সত্য, তার কারণ, বিষই তার কাছে পরাজিত, সে বিষের কাছে নয়। তেমন শক্তিমান্ যিনি, তিনি এই রসের দিক,রঙের দিক যখন ফুটিয়ে তোলেন, তখন নিতান্ত নাস্তিক ছাড়া আর কেউ তাকে মিথ্যা বলে' অস্বীকার করতে পারে না। যে জিনিষ বাস্তবে ধরা দেয় না, সে কাব্যে ধরা দেয়; যেখানে প্রাণের সাড়া ছিল না, সেখানে প্রাণের সাড়া আশ্চর্য্য রকম জেগে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' পড়ার আগে বাংলার পল্লীজীবনের দীন-হীন বাস্তবতার মধ্যে এত সৌন্দর্য্য এত প্রাণের অতলস্পর্শতা ছিল তা কে ভাবতে পেরেছিল? শরৎচন্দ্রের গল্প পড়ার আগে গাঁজাখোর নীলাম্বর অনেকে দেখে থাক্‌বে, কিন্তু সেই গাঁজাখোরের মধ্যে অতবড় ট্রাজেডির নায়ক থাকতে পারে, ওই অত সামান্য মানুষটার মধ্যেই যে লিয়ার ওথেলোর আকাশস্পর্শী হৃদয়-তরঙ্গ খেলতে পারে তা কে ভেবেছিল? কাব্য বাস্তবকে নিয়েই বটে; বাস্তবে কাব্যে তফাৎ এই যে, বাস্তবের মধ্যে যে সত্যসুন্দর প্রচ্ছন্ন আছে, কাব্যে কবির চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হয়ে সেটা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয়। কবির সৃষ্টি ভাগবত

সৃষ্টিকে অতিক্রম করে না, উজ্জ্বলও করে না—অন্ধের নয়নগোচর করে মাত্র। শোনা যায় টার্ণারের ছবিতে লণ্ডনের কুয়াসার রং প্রথমে ফুটে ওঠে; সেই ছবিগুলি দেখে লোকে আবার যখন সেই কুয়াসা দেখতে লাগল, তখন দেখে, সত্যিই ত! এ যে ঠিক সেই সব রঙেরই খেলা!

তা হ'লে হচ্ছে এই যে, জগত ও জীবনই কাব্যের বিষয়। কিন্তু তার প্রতিবিম্ব কবির চিত্তফলকে সত্যসুন্দর রূপে ধরা দেয়। তবেই, কাব্য ও জীবনের এই বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধের মধ্যে যেন একটু রূপান্তরের মত ধারণা রয়ে যায়। বস্তু, ব্যক্তির সম্পর্ক এসে, একটু রূপান্তর হয় বৈকি। এই রূপান্তর হওয়াটাই সত্য রসসৃষ্টি, আবার ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দরুণ রসসৃষ্টির বৈচিত্র্যও অনেক। তা না হ'লে, একই বস্তু এবং একই প্রাণের সঙ্গে তার সম্বন্ধের জন্য যে রস, তা যুগে যুগে কাব্যসাহিত্যকে এমন নিত্য-নূতন ও উপাদেয় করে রাখত না। তবু কথা ওঠে—তবে কি কবির নিজস্ব দৃষ্টি, রসকল্পনাই বাস্তবকে কাব্য করে' তোলে? ফের সেই কথাই ঘুরে আসছে যে, বাস্তবটা উপলক্ষ্য মাত্র, তার সত্য আলাদা, কবির কল্পনাই কাব্যের সত্য। উত্তর—হাঁ, না, দুইই। আগেই বলেছি বস্তুগত সত্য বলতে যা বোঝায়,তা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সত্য, কিন্তু সে-দিকটায় সুন্দর নেই, কাব্যের উপজীব্য তা নয়। বস্তু যখন প্রাণের সম্পর্কে এসে দাঁড়ায় তখনই বৃহত্তর সত্য অর্থাৎ সত্যসুন্দর স্বপ্রকাশ হন। এই রসরূপ-সত্যসুন্দরের জন্ম শুধুই মানুষের মনে নয়, শুধু বস্তুতেও নয়; উভয়ের ঘনিষ্ঠ মিলনে,—বস্তু ও ব্যক্তির—প্রকৃতি ও পুরুষের বিবাহে—তার জন্ম হয় বলে' আমার ধারণা। পুরুষ ও প্রকৃতির অসঙ্গতা একরকম মুক্তির অবস্থা বটে, তার অর্থ শূন্য—সৃষ্টির যা উল্টা। রূপের মধ্যে রসাস্বাদ করে' যে মুক্তি, প্রকৃতি ও পুরুষের অদ্বয়-ভাবের যে আনন্দ, সেইটে পরম সত্য এবং মুক্তি তাকেই বলে।

আগেই বলেছি, জগৎ ও জীবন যখন প্রয়োজনকে ঠেলে দিয়ে প্রাণের মধ্যে লীলার অবসর দেয়, তখন তা অশেষ দ্বন্দ্ব ও বহুরূপ সত্ত্বেও একটি-বোঁটায়-সাজানো শতদলের মতো ফুটে ওঠে। সকল খণ্ডতা যখন অখণ্ডতার রূপ ধরে, তখন তা আনন্দ দেয় এবং সুন্দর হয়ে উঠে। সৃষ্টির এই মর্ম্মের পরিচয়, তার এই গভীর ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারই রসাস্বাদন। এই রসাবস্থায় জ্ঞান-ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়ে যায়, একটা আস্বাদন মাত্র থাকে—সেই আস্বাদন হচ্ছে চরম করে' পাওয়া। দার্শনিকের জ্ঞান-বৃত্তি এমন পাওয়া পায় না! কিছুকে জানা মানে তাকে পাওয়া—পাওয়া মানে স্বারূপ্য লাভ, একাত্মীভূত হওয়া। তাই কবিকল্পনার একটা প্রধান লক্ষণ, sympathy—একেবারে তন্ময় হওয়া। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তখন আর দুই সত্ত্বা থাকে না, এক হয়ে যায়, তাকেই বলে রসাস্বাদ।

এই বস্তু ও ব্যক্তির কথা নিয়ে, কাব্য ও কবিপ্রকৃতিতে দুইটা বিরোধী ধারা সাহিত্যে স্বীকার করে' নেওয়া হয়েছে; ইংরেজীতে Subjective বা Personal, আর Objective বা Impersonal—এই দুইটী নাম দেওয়া হয়েছে; আমাদের বাংলায় তার তর্জ্জমা হয়ে গেছে, ব্যক্তিতন্ত্র ও বস্তুতন্ত্র। নাম দুটী বাংলায়

হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ ও অর্থ নির্ণয় এখনো সুবিহিত হয় নি। মানুষের জ্ঞানে যখন সব জায়গাতে একটা করে' দ্বন্দ্ব আছে, তখন এ ব্যাপারটাতেই বা না থাকবে কেন! বস্তুতন্ত্র বা ব্যক্তিতন্ত্র বলে' কোনো ভেদ বাইরের দিক থেকে ধরা গেলেও, কাব্যবস্তু রস যখন এক, তখন এ রকম ভেদ-নির্দ্দেশ তত্ত্বসঙ্গত নয়। কাব্য নিজতন্ত্র, বস্তুতন্ত্রও নয়, ব্যক্তিতন্ত্রও নয়। সত্যের মধ্যে যখন কোনো কারণে গোলোযোগ ঘটে তখনই বিরোধ দেখা দেয়। কবির কল্পনায় যখন সত্যভ্রষ্টতা আসে তখনই একটা বাড়াবাড়ি হয়, এই বাড়াবাড়ির দুইটা দিক আছে, সত্যের নয়। মানুষের চিন্তার দুইটি বিপরীত প্রান্তে এই দুইটি বিপরীত জ্ঞান ফুটে উঠে। দার্শনিক বিচারে এই ভেদ আছে অস্বীকার করা যায় না। আমরাও সেই রকম বিচারে এই ভেদকে স্বীকার করে না নিলে আলোচনা বা ব্যাখ্যার সুবিধা হয় না। কিন্তু রসিকের মনে এ ভেদজ্ঞান আসে না!

আমাদের কবি এই দুই বিরোধী তত্ত্বের সমন্বয় করে দেখতে পেয়েছেন—'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।' অর্থাৎ সৃষ্টির মর্ম্মগত যে এক সত্য বা পরম সত্ত্বা—তা কখনো ভাবে, কখনো রূপে, বিরাজ করছেন। ভাবে তিনি সেই এক দিব্যসুন্দরকে দেখেন, রূপে যিনি বহুধা বিচিত্র হয়ে প্রকাশ হন। কিন্তু এই ভাব, রূপোদ্ধৃত অখণ্ড রস ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্তরের মধ্যে একাকার দিব্যজ্যোতিঃ রূপে তাকে দর্শন করা যায়, আবার বাইরের দিকে চাইলে তারই বহুবিচিত্র প্রকাশ,—সেই একই রস সাগরে তরঙ্গ চঞ্চল উচ্ছাস-ময় আনন্দ-প্রবাহ সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্ব প্রকৃত রসজ্ঞানে নিত্যমিলি—কবি সেই কথাই বলেছেন। তবু কখনো ভাবারূঢ় অবস্থায় জগৎ থেকে পৃথক কল্পনা করে', নিজের মনের মধ্যে সত্যসুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করে' আরতি করেন,—

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা,
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন জীবন বিহারী!

এইটি হচ্ছে প্রকৃত subjective বা personal রস। তাই—

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী!
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম জীবন গগনে
চারিদিকে চির যামিনী।
কিন্তু—জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিনী!

—এই রকম দু'বার করে' দু'দিকে চাওয়া আছে। ব্যক্তি এবং বস্তুর মধ্যে রসপ্রবাহের এই চলাচল-অবস্থায় দ্বন্দ্ব আছে, আবার সেই দ্বন্দ্বের মিলন-রহস্যও প্রকাশ হচ্ছে।

কবি বলেছেন, 'ভাব থেকে রূপে যাওয়া আসা'র কথা—ভাব থেকে রূপে, না রূপ থেকে ভাবে?—উভয়তঃ। কিন্তু কথাটা হচ্ছে—মানুষের জ্ঞানে রূপ আগে না ভাব আগে? fact আগে না idea আগে? Object এর perception আগে, না Subject এর consciousness আগে? মনোবিজ্ঞান বোধ হয় এ মীমাংসা টুকু অন্ততঃ ঠিকই করে। জগৎটাকে মায়া বলে' ধারণা করতে হ'লেও আগে তাকে স্বীকার করতে হয়।

ব্রহ্ম প্রতিপাদন করতে হ'লে সৃষ্টিকে প্রথমটা স্বীকার করতে হয়, নইলে যে উপায় নেই। এর মানে, যে-কোনো সত্যে পৌঁছতে হ'লে জগৎটাকে ভালো করে' দেখতে হয়। এই 'বহু'ই 'এক' কে প্রচার করছে, 'এক'-এ পৌঁছে 'বহু'কে যাঁরা নস্যাৎ করে' দেন, তাঁরা 'এক' এর সঙ্গে একত্ব লাভ করেন নি, তাঁদের মনে 'বহু'র বিবাদ মেটে নি! তাই 'তর্কে বহুদূর।'

কিন্তু প্রকৃত রসিক যিনি—তিনি রসাবস্থায় এই দ্বন্দ্ব সহজেই পার হয়ে যান। জগতের মধ্যে, প্রকাশের মধ্যে, রূপের মধ্যে—সকল জ্ঞানের আরম্ভ যেখানে—সেইখানে তার চরম পূর্ণতা উপলব্ধি করেন, আনন্দ পান। সেই এক সত্ত্বা, মনে ভাব (Idea), বাহিরে বস্তু (Fact) এবং হৃদয়ে বা আত্মায় রসরূপে অধিষ্ঠান করে। এই তিনের মধ্যে এক রসসূত্রে বিভিন্ন রূপে ঐ এক সত্ত্বা বিদ্যমান। এই তিন দিকেই কাব্য আছে, কাব্যে এই তিন দিক আছে বললে ঠিক হয় না; কারণ, এই তিন দিকের মধ্যে বিরোধ নেই। একই ব্যক্তির মধ্যে এই তিন দিক, তিন mood সম্ভব। জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যকারদের রচনায় এই ত্রিবর্ণ সূত্রই বেছে দেওয়া যায়। যাঁরা সত্যই মুক্ত, তাঁরা এই তিন ঘরেই অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন। তবে কে কোন ঘরে থাকতে ভালোবাসেন এবং সেইটি হচ্ছে তাঁর রীতি, এরকম সাহিত্যিক ভেদ নির্দ্দেশ করা যায় বটে। ওই তিন রীতি—একটি হচ্ছে বস্তুপ্রধান (Realistic), একটি ভাবপ্রধান (Idealistic), আর একটি হচ্ছে ধ্যানপ্রধান (Mystic)। ধ্যান হচ্ছে যোগের অবস্থা, একেবারে পূর্ণ রসাবস্থা বস্তু ও ব্যক্তি সেখানে পৃথক সত্ত্বা নয়; সে অবস্থায় কাব্যে যা' প্রকাশ হয় তা ভাবও নয়, রূপও নয়, একটা কিম্ভূত চেতনার আভাস। হৃদয়ের অতলস্পর্শ থেকে তা উঠে আসে, তার আকার সুপরিস্ফুট নয়, অপরের মনে যে সাড়া দেয়, সে যেন—Deep calls unto Deep.

বিশ্বসাহিত্যে কাব্যসৃষ্টির নানা আদর্শ আলোচনা করলে দেখা যায় যে ভাবরস বা চিৎ-রসের (mysticism) চেয়ে বস্তুরস-প্রধান কাব্যই সব চেয়ে ফুটেছে ভাল। রসের সব চেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ হয় ওই বাইরের রূপের মধ্যে দিয়ে। চিদ্‌ঘন আনন্দ, প্রকাশের একমাত্র উপায় যে বাণী, তাকে অতিক্রম করে' যায়, তাই তাকে ইঙ্গিতে ইসারায় সঙ্কেতে আভাসে আস্বাদন করান' যায়; প্রকাশের mediumটা তার পক্ষে বড় অসম্পূর্ণ বলে' কাব্য সেখানে নিরাকার—শিল্পহিসাবে বর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন। সে অরূপ-রস ধ্যানীর উপভোগ্য; মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রসার সেখানে অল্প, তাই, সে-কাব্য ও তা'র আর্টকে একটু স্বতন্ত্র স্থান দিলে ভালো হয়।

ভাবপ্রধান (Idealistic, Subjective, Personal) কাব্যে কবির অহং তাঁর মনোরথে চড়ে' এমন স্বাতন্ত্র্য সাধনা করে, যে তাতে বাস্তবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এ রকম কাব্যে 'ব্যক্তি'র 'যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা'র রস প্রবল হয়ে ওঠে। জগতের সত্ত্বাকে নিজের অহংজ্ঞান দিয়ে গ্রাস করে' উড়িয়ে দিয়ে, তার স্থানে যে ভাবজগতের প্রতিষ্ঠা হয়, তার সৌন্দর্য্য অল্প নয়। কিন্তু সেখানে

জগৎ সম্বন্ধে নাস্তিক্যবুদ্ধি আছে। আপন দৃপ্ত মনঃশক্তির যে লীলা সেখানে দেখ্‌তে পাই, তা'তে বাস্তববিমুখ অন্ধমনের কল্পনা-বিলাসের কেমন একটা একরোখা ভাব আছে, যেন সমগ্র-দৃষ্টির অভাব আছে বলে' বোধ হয়। জীবন ও জগৎ আপন মাধুরীতে ভরে' ওঠে না, কবির মন থেকে ধার-করা একটি পোষাক তার গায়ে সুন্দর মানিয়েছে, বোধ হয়। এ কাব্য আমাদের মনের অনেক নিভৃত ঘরের দ্বার খুলে' দেয় বটে, জীবন ও জগতের উপর আমাদের ভাব-প্রভুত্ব স্থাপন করিয়ে, আমাদের willকে মুক্ত করে' দিয়ে আমাদের রাজাসনে বসিয়ে দেয়, কিন্তু পূর্ণ মুক্তি দেয় না। 'অহং'এর বন্ধনই সব-চেয়ে বড় বন্ধন। বস্তুর মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তার বিষকে অমৃতে পরিণত করাতেই আনন্দ, সেইখানেই শক্তির পরিচয়। তাকে অস্বীকার করে' যে-কল্পনা স্বপ্নরচনা করে, সে চক্ষু বুঁজে' আনন্দ চায়, সেটা হচ্ছে মোহের আড়ালে আত্মরক্ষা, ক্রমাগত নেশা করে' আপনাকে মজিয়ে রাখা। সাহিত্যিক আর্টেও এ-কাব্যের একটা অসম্পূর্ণতা আছে। কারণ, জগৎ ও জীবনের মধ্য দিয়েই পরের সঙ্গে আমাদের যোগ—সেই জগৎ ও জীবনকে তুচ্ছ করে' আত্মরতির রস উদ্দীপন করাই এ-কাব্যের ব্রত; কাজেই পরের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে রসসঞ্চার করা যে শ্রেষ্ঠ আর্টের সাধনা—সে আর্ট এখানে ক্ষুণ্ণ হবেই।

এর কারণ, রসিকেরা বলেন, সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে সত্যের অভাব। যে-কাব্য বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অতিমাত্রায় ভাবপ্রধান, তার মধ্যে সৃষ্টিরহস্য প্রকটিত হয় না; জীবন ও জগতের বাস্তবতাকে নিংড়াইয়া সেখানে রসাস্বাদের চেষ্টা নাই। সুন্দর সত্যহীন নয়, সৌন্দর্য্য ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের রং নয়। সে বস্তু—জগতের অন্তরঙ্গ, বাস্তবের আসল বাস্তবতা, তথ্যের সত্য, অনর্থের অর্থ, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার। তাই দু'জন খুব বড় কবির একজন বলেছেন, "Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge; the impassioned expression which is in the countenonce of all science." আর একজন মন্ত্রদ্রষ্টার মত উচ্চারণ করেছেন, "Beauty is Truth, Truth Beauty." এই সত্যকে এই সুন্দরকে পেতে হ'লে, জীবনের মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে, সে-প্রতিমা গড়তে হ'লে এই পৃথিবীর ধূলোমাটি দিয়ে গড়তে হবে। ঘটে, পটে, মাটীতে সেই চিন্ময়ের অধিষ্ঠান, বাস্তবের—factএর ধ্যান করলে সে দিব্যদৃষ্টি লাভ হবে। যাঁর দৃষ্টি বাইরের দিকে রুদ্ধ, যিনি কল্পনার বিলাসকক্ষে মনোমুকুরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেই নিজে বিভোর, তাঁর গানে দিব্য সুর লাগে না—সে ভাবের মধ্যে একটা অভাব থেকে যায়। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রস-পরিচয় থেকেই যে-কাব্যের উৎপত্তি হয়, তা জীবনের মতই বিচিত্র, মানব হৃদয়ের মতই গভীর, এবং সৃষ্টির মতই অনন্ত। যে গভীর অনুভূতি থেকে এই রসরচনা সম্ভব হয়, তা' প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—A poet believes nothing but what he sees. এই বস্তুপ্রীতিই শ্রেষ্ঠ কাব্যের নিদান।

এখানে, যেন কেউ মনে না করেন, আমি বাঙালী সমালোচকের তথাকথিত বস্তুতন্ত্রের ওকালতি করছি। ওই কথাটি আমাদের সময়ে যে-অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে সে অর্থ করলে, কাব্য—ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, এমন কি অর্থনীতির সঙ্গে—এক হ'য়ে যায়। আমি যে বস্তুর কথা বলছি সে নিছক fact নয়। Pater এর কথায়, শুধুই fact নয়, কবির sense of the factই কাব্যবস্তু—fact as connected with soul, of a specific personality—শুধু জড় fact নয়—soul বা 'চিৎ'এর স্পর্শযুক্ত fact, এক কথায়, fact নয় fact-সংশ্লিষ্ট truth. সেই truthই সূক্ষ্ম ও সুমার্জ্জিত হ'য়ে কাব্যে প্রকাশ হয়; কারণ "all beauty is in the long run only fineness of truth." জগৎ ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে যখন এই সত্যদৃষ্টি আসে, তখন এই bare fact থেকেই মুক্তি লাভ হয়। সেই দিব্য দৃষ্টি আর ভুল করায় না; সে আলোয় কবি যা রচনা করেন তা' বাহিরের সঙ্গে বিরোধ করে না। সেই অবস্থা-তেই কবির প্রতি ঋষির এই উপদেশ সার্থক হয়, যে—

"সেই সত্য যা' রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে!' করি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো!"

কবির কাজ হচ্ছে—'To animate fact with Divine life.' Divine life হচ্ছে truth; fineness of truthই হচ্ছে beauty.

এ-রকম 'বস্তুতন্ত্র' কাব্যের কোন্‌খানটা subjective আর কোনখানটা objective—বলা শক্ত; আদর্শ কাব্যই হচ্ছে এই। কাজেই, আমি গোড়াতে এই ভেদ-নির্দ্দেশটা রস-বিচারে অনাবশ্যক বলেছি। তবে কল্পনার বাড়াবাড়ি উভয় দিকেই হ'তে পারে বটে, সেখানে এই সত্যভ্রষ্টতার জন্যে রচনা নির্দ্দোষ হয় না। কবি ও রসজ্ঞেরা এই সত্যকে স্বীকার করেন। গেটের কথা—Art is the highest representation of Life—ম্যাথু আর্ণল্ড স্বীকার করেছেন; তাঁর, সাহিত্যকে criticism of life বলার অর্থ—কাব্যে জগৎ ও জীবনের সত্যসুন্দর রূপ ফুটে উঠ্‌বে, তবে সে কাব্য। Pater, কি গদ্য কি পদ্য—উভয়বিধ সাহিত্যকলায় এই সত্য চান যে, জগৎ-গত তথ্যের যে রূপটি ব্যক্তির হৃদয়ে মুদ্রিত হয়, সেই রূপটি রচনায় একেবারে নিজস্ব আকার নিয়ে ফুটে উঠ্‌বে। প্রকাশই (Expression) আর্ট, এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হুবহু আকারই আর্টের সত্য। এখানে আর্টের সংজ্ঞাকে আরও উদার, আরও বৃহৎ করে' দেওয়া হয়েছে। কাব্যকলার আধুনিকতম বিকাশ লক্ষ্য করে', Pater কাব্যপ্রকৃতির এই যে মূল লক্ষণ নির্দ্দেশ করেছেন, আমার মনে হয়, আর্ট সম্বন্ধে এই হচ্ছে শেষ কথা।

গেটে যাকে 'কাব্য বস্তু বলে' ধরেছেন, সে হচ্ছে UNENDLICHE NATUR—'at whose breast all things in heaven and earth drink of the springs of life.'—কাব্যের ভিত্তিকে তিনি এমনি বিশালতা দিয়েছেন। 'অহং'এর চেয়ে 'ইদং'এর মধ্যেই যে আনন্দ-মুক্তির পরিসর আছে—সেই কথাই তাঁর কাব্যকীর্ত্তিতেও প্রচার হয়েছে।

যে emotion বস্তুপ্রত্যক্ষ নয়, তাকে তিনি বর্জ্জন করেছেন। বাস্তবের অনুসরণ করে' ধীর-স্থির চিত্তে তা'কে যথার্থ করে' ফুটিয়ে তোলায় যে রসসৃষ্টি হয়, তাই হচ্ছে তাঁর মতে সত্যসুন্দর। এই সত্যসুন্দর-রূপ ভগবান বিশ্বজগতের বাইরে, ঊর্দ্ধে বিরাজ করেন না, জগতের প্রতি বস্তুর প্রকৃত সত্তায় বিরাজ করছেন—সেই সত্তা উপলব্ধি করানোই কবির কাজ। ভাবপন্থী মানুষ এই জগৎ ও জীবনের বাইরে,তার থেকে বড় করে' একটা অতিপ্রাকৃত দুর্ল্লভ লোক, দুর্ল্লভ-আদর্শ-স্বরূপ ঈশ্বর, ও দুঃসাধ্য নীতির কল্পনা যা' করে এবং তারি অনুসরণে বাস্তবকে যেমন ভেঙ্গে চুরে গড়তে বা দমন করতে চায়—তা সত্যও নয়, তা আর্টও নয়। বাস্তবের জ্ঞান সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ বলেই এমন মিথ্যাচারকে তারা প্রশ্রয় দেয়। তবেই আমাদের শ্রেষ্ঠ দর্শনতত্ত্ব এখানে এসে পড়ে, যে —পাপ বস্তুর মধ্যে নেই, কোনোখানেই নেই; জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই পাপ-বিভীষিকার কারণ —অবিদ্যাই পাপ। "To know all is to pardon all'—'He who hates vices hates mankind'—এই সকল উক্তি গেটের বড় প্রিয় ছিল। ম্যাথু আর্ণল্ড্, সেই জন্য Shelley, Byron প্রভৃতি কবির সম্বন্ধে এই অভিযোগ করেছেন যে, সৃষ্টিশক্তি তাঁদের প্রচুর পরিমাণে থাকলেও, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের বড়ই অভাব ছিল—'they did not know enough'.

বস্তুতন্ত্র বলতে যে কি বোঝায় তা বোধ হয় এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। কাব্য বস্তুতন্ত্র মানে এই নয় যে, সে-কাব্য মানুষের দুঃখ, দৈন্য বা দুর্নীতি মোচন করবে। জগৎ, বা—the thing as it is in itself—রসসিঞ্চিত হয়ে উঠবে। জীবনই প্রত্যক্ষের মত অনুভব হবে, অথচ তার সঙ্গে অজ্ঞাতে রসাস্বাদ হওয়ার দরুণ সকল বেদনায় আনন্দের সুর বেজে উঠ্‌বে। এই রসসঞ্চার ব্যক্তিগত চিন্তার যে ধারায় হয় হোক্, তা'তে সত্যসুন্দর-বোধ জাগলেই হল। Subjective, Objective—কোনো ধারাই বস্তুকে বাদ দিয়ে কাব্য সৃষ্টি করতে পারে না; কাব্যের যা সত্য, তা ওই দুয়ের মধ্যেই থাকা চাই, নইলে যা সত্যহীন তা ব্যর্থ, তা' সুন্দরও হ'তে পারে না—তা' প্রাণকে স্পর্শ করে না, কাজেই তার মূর্ত্তিও স্পষ্ট হয় না, তার আর্টও প্রবঞ্চনা মাত্র। ভাব বড়ই হোক আর ছোটই হোক, যদি সে বস্তুহীন না হয়, তা'তে যদি seiousness ও truth থাকে, এবং যদি তা কবির প্রতিভাগুণে নিখুঁত হ'য়ে প্রকাশ পায়, তবে কাব্যসৃষ্টি সফল হয়েছে বলা যায়। কাব্যের এই গুণকে Pater 'good art' বলেছেন। কিন্তু, এই প্রকাশ-সৌন্দর্য্য ছাড়া কাব্যের বিষয়মহিমা বা কল্পনাগৌরব বলে' আর একটা গুণও তিনি স্বীকার করেন। যে কাব্যে highest criticism of life আছে, অর্থাৎ মানব-ভাগ্যে, শ্রেষ্ঠ আশা ও আনন্দের বাণী, অথবা মানব-প্রাণের গভীরতম বিপ্লব বা হাহাকার যা'তে ফুটে উঠেছে,—সেই দিব্যদর্শনজাত কাব্যকে Pater 'great art' বলেন; উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজী বাইবেল Divine Comedy ও Les Miserables এর নাম করেছেন।

মোট কথাটা হচ্ছে এই যে, কাব্য জিনিষটা তথ্যগত সত্যের চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান, আমরা যা'কে কবিকল্পনা বলে' উড়িয়ে দি

সেইটেই হচ্ছে সত্যভেদ করবার অব্যর্থ শরসন্ধান। মানবীয় কীর্ত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন কাব্য, তার মধ্যেই মানবের আত্মা, দেহ ও মন এই তিনের মিলিত সাধনার চরম ফল পাওয়া যায়। কিন্তু যে-কল্পনা এই সত্যকে প্রকাশ করে, তাই প্রকৃত কবিকল্পনা। যে কাব্যকলা জগৎ ও জীবনের সম্বন্ধে উদাসীন, তা সুন্দর হ'লেও কেবল খেয়াল মাত্র, কল্পনা নয়। বাস্তবের আসল মূর্ত্তি যাদের চোখে পড়ে না, তা'রাই এই কল্পনা ও সত্যের বিরোধী অর্থ করে, তারা কাব্যের সত্যকেও উপেক্ষা করে। বস্তু সম্বন্ধে সংকীর্ণ ধারণা ও ক্ষুদ্র সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে, কখনো 'অসম্ভব' বলে, কখনো নীতিসূত্রের দোহাই দিয়ে 'অসুন্দর' বলে। আবার যখন অসম্ভব-কে চোখের উপর ঘটতে দেখে, তখন বলে—Truth is stranger than fiction; কিম্বা সেটা যদি তাদের সংস্কারবিরুদ্ধ হয়, তবে তা'কে সৃষ্টির নিয়মেরও ব্যতিক্রম বলে' তার উপর পাপকল্পনা আরোপ করে। কাব্যের কল্পনা বলে' যেখানে তা'কে মাফ্ করে, অর্থাৎ বেমালুম হজম করে, সেইখানেই কবির ও কাব্যের জয়। কারণ যেখানে সত্যসুন্দর পূর্ণ প্রকাশ হয়, আর্টবস্তু ও আর্টরীতি যেখানে সত্য থেকে একটুও বিচলিত হয় নি—সেখানে এই রকম গ্রহণ তারা করবেই। এই সত্য, জগৎকে আশ্রয় করেই ফুটে আছে; এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যে রসজ্ঞানের দিব্যদৃষ্টি কবিরা লাভ করেন, সেই দৃষ্টিই কল্পনা—আর কিছুকে এ নাম দেওয়া যায় না। এই দৃষ্টি নিয়ে বস্তুর মধ্যে যে অবাস্তব রমণীয়তা তাঁরা দেখতে পান, তাই প্রকাশ করবার প্রাণান্ত আগ্রহে কাব্য সৃষ্টি হয়। বাস্তব ও কল্পনার এই সম্বন্ধটী আমার এক অখ্যাতনামা কবি-বন্ধু অতি সহজ কথায় একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন—তাঁর নাম না করে', কবিতাটি সবশেষে দিয়ে দিলাম; কারণ, আমার বোধ হয় এতখানি লিখে'ও আমি যে কথাটা হয় ত সুসঙ্গত করে তুলতে পারিনি, তার একটি অংশও এই কয় ছত্রে সুখবোধ্য ও সুখপাঠ্য হবে। যথা—

কবি যারে কাব্যে লেখে পোটো যারে পটে—
কল্পনারি নহে সে যে, জগতেরো বটে।
দুই জনই দেখিয়াছে চোখ দিয়ে তা'রে,
বিস্ময়ে ব্যাকুল তাই, তাই বারে বারে
ছন্দ আর রূপ আর সঙ্গীতকলায়
কতবার কতরূপে ধরিবারে চায়।
সেই সত্য, সেই রূপ এত সীমাহীন,
জীবনের ঊষা হ'তে সন্ধ্যা—সারাদিন,
কত সুরে কত রঙে নারিল ফুটা'তে,
কল্পনাও হার মানি' রহিল লুটা'তে!
সেই সত্য এত বড়—ক্ষুদ্র হয়ে গেল
কবির কল্পনা তুলি, শীর্ণ হয়ে এল।
কবি সে কাঁদিয়া, মরে শিল্পী উনমনা—
মোরা বলি, এও বেশী, এ শুধু কল্পনা!

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

পলাতকা

(মা-মরা খোকার মৃত্যুশয্যায় পিতা গাচ্ছেন)

(সুর—ঠুংরকালী মেঠো বাউল)

কোন্ সুদূরের চেনা-বাঁশীর ডাক শুনেচিস্ ওরে চখা ?
ওরে আমার পলাতকা !
পড়্লো মনে কোন্ হারা ঘর, স্বপন-পারের কোন্ অলকা ?
ওরে আমার পলাতকা !
জল ভরেচে চপল চোখে,
কোন্ হারা মা ডাক্লো তোকে রে ?
গগন-সীমায় সাঁজের ছায়ায়
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায়—
উতল পাগল ! চিনিস্ কি তুই চিনিস্ ওকে রে ?
যেন বুক-ভরা ও' গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, "আয়,
ওরে আয় আয় আয়,
কোলে আয়রে আমার দুষ্টু খোকা !
ওরে আমার পলাতকা !"
দখিণ্ হাওয়ায় বনের কাঁপনে—
দুলাল আমার ! হাত-ইসারায় মা কিরে তোর ডাক দিয়েছে আজ ?
এতদিনে চিন্লি কিরে পর ও আপনে ?
নিশিভোরেই তাই কি আমার নাম্লো ঘরে সাঁজ ?
ধানের শীষে, শ্যামার শিশে—
যাদুমণি ! বল্সে কিসে রে,
শিউরে চেয়ে ছিঁড়্লি বাঁধন ?
চোখ-ভরা তোর উছ্লে কাঁদন ?
তোরে কে পিয়ালো সবুজ-স্নেহের কাঁচা বিষে রে ?
ওই আচম্কা কোন্ শশক-শিশু চম্কে ডাকে হায়,
"ওরে আয় আয় আয়—
আয়রে খোকন্ আয়,
বনে আয় ফিরে ভাই
বনের সখা !
ওরে চপল পলাতকা !"

কাজী নজরুল ইস্লাম ।

মায়ের প্রাণ

(গল্প)

ছেলে রোগ-শয্যায়। মা শিয়রে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। মুখখানি ভাবনায় মলিন, বুকে যেন কে পাথর চাপিয়া ধরিয়াছে! ছেলের মুখ কাগজের মত শাদা, জ্বরের তাপে গা পুড়িয়া যাইতেছে, চোখদুটি মুদ্রিত। বড় কষ্টে ছেলে শ্বাস টানিতেছে—বুকের পাঁজরা-গুলা জোরে নিশ্বাস ফেলার জন্য ঘড় ঘড় করিতেছে! মার চোখের কোলে জলের ফোঁটা,—দৃষ্টি ছেলের মুখের পানে!

দ্বারে কে ঘা দিল। মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। এক বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করিল, নিঃশব্দে আসিয়া ছেলের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মা তার মুখের পানে চাহিলেন, চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ আপনার শীর্ণ হাতে ছেলের ললাট স্পর্শ করিল। ছেলে একবার চোখ চাহিল, পরে ছোট দুই মুঠি দিয়া বৃদ্ধের হাতটা চাপিয়া ধরিল। বৃদ্ধ মাকে কহিল,—"তুমি একটু উঠে যাও।"

"কেন গা!"

"আমি একে নিয়ে যাব।"

এই বৃদ্ধ মৃত্যু। বৃদ্ধ কোন কথা না বলিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইল। মা বারণ করিতে গেলেন, মুখে কথা ফুটিল না—হাত দিয়া ছেলেকে ধরিতে গেলেন, হাত পাথরের মত ভারী, উঠিল না। মা পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ বসিয়া রহিলেন—নড়িবার বা কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। কি এক মন্ত্র-স্পর্শে মার চোখ বুজিয়া আসিল। মা যখন চোখ চাহিলেন, তখন বিছানা খালি পড়িয়া আছে,—ছেলে নাই, বৃদ্ধ চলিয়া গিয়াছে।

ডুকরিয়া কাঁদিয়া পাগলের মত ছুটিয়া মা ঘরের বাহিরে আসিলেন। কোথায় গেল, বাছা? কোথায় রে? মা ছুটিয়া পথে বাহির হইলেন।

দীর্ঘ পথ,—স্তব্ধ, জন-মানবের চিহ্নও নাই। রাত্রি কাল। মাথার উপর আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। মা পথে ছুটিয়া চলিলেন,—ছেলের সন্ধানে।

কত দূর—কত দূর চলিয়া এক পাহাড়ের সন্ধান মিলিল, পাহাড়ের কোলে এক বৃদ্ধা বসিয়াছিল। মা উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রশ্ন করিলেন,—"আমার ছেলেকে দেখেছ মা? একটি বুড়ো মানুষের কোলে এই দিকে গেছে-?"

বৃদ্ধা কহিল, "হ্যাঁ মা, এই পথেই গেছে তারা। বুড়ো ঝড়ের মত চলে গেল—অম্নিই সে যায়, কত লোককে নিয়ে, কত মা-বাপের কল্‌জে ছিঁড়ে, কত ছেলে, কত মেয়ে, কত দুধের বাছাদের নিয়েই যে রোজ যায়, মা—"

মা আকুল স্বরে বলিলেন, "তবে কি তাদের দেখা আর পাব না?"

"পাবে বৈ কি মা, কেন পাবে না! তবে একটি কাজ করতে পারো—?"

মা বলিলেন, "কি কাজ?"

বৃদ্ধা বলিল, "ছেলেকে যা-যা বলে আদর করতে, যত কথা বল্‌তে, ঘুম-পাড়ানি গান, ছড়া, যা কিছু বলে তাকে ভুলুতে, সেই সব

সুর করে গেয়ে বল দেখি, আমি ঢের শুনেচি, যদিও,—এইখানেই বসে আছি চিরকাল কি না! আমার নাম রাত্রি—সেইগুলি গেয়ে বল। দেখি, কোন উপায় করতে পারি কি না!"

মা তখন অন্তর ছানিয়া বেদনার সুরে সেই গান গাহিলেন, বুকের ধনটিকে যে-যে কথায় ভুলাইতেন, যত আদর করিতেন—সেই সব কথা চোখের জলে ভিজাইয়া সুরের তার বুনিয়া চলিলেন। আর বৃদ্ধা রাত্রি স্তব্ধ হইয়া সে গান শুনিতে লাগিল। শুনিয়া রাত্রির সারা চিত্ত বেদনাতুর হইয়া উঠিল, রাত্রি কাঁপিতে লাগিল।

রাত্রি বলিল, "ঐ যে সাম্‌নে বন দেখচ মা, ঐ বনের মধ্যে দিয়ে বরাবর দক্ষিণে চলে যাও। তা হলেই তুমি তাদের দেখা পাবে।"

মা বনের মধ্য দিয়া চলিলেন। বড় বড় গাছ—আকাশে মাথা ঠেকিয়াছে, কি ঘন বিজন বন! ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্! শুধু একটি মাত্র রাগিণী সমস্ত বনটাকে ত্রস্ত চকিত করিতেছিল, শোঁ শোঁ শব্দে বায়ু বহিয়া গাছের পাতাগুলাকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

মা সেই বনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে একটা বাঁকের মুখে দাঁড়াইলেন; সামনে দুইটা পথ দুই দিকে গিয়াছে! কোন পথে গেল গো তারা? মা দাঁড়াইলেন।

একটা গাছ পাতা দুলাইয়া বলিল,—"তুমি কে গা,—এখানে দাঁড়ালে কেন?"

মা কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিলেন, "আমার ছেলে—একটি ছেলে, দুধের বাছা আমার, ওগো, তাকে নিয়ে কোন্ পথে যে গেল—"

গাছ বলিল, "তাকে খুঁজচ! ও,—তা এক কাজ কর, আমি বল্‌চি। শীতে আমার বুক জমে গেছে—তুমি তোমার ঐ বুকের গরম ভাব একটু দাও ত আমায়—আমার সাড় হবে, সব মনে পড়বে, তা হলে।"

মা দুইহাত দিয়া জড়াইয়া সেই গাছের কর্কশ রুক্ষ গা বুকে চাপিয়া ধরিলেন; গাছের গায়ে বড় বড় কাঁটা ছিল, সেই কাঁটায় মার বুক ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, রক্ত ঝুঁজিয়া পড়িল। ওদিকে গাছের সেই কাঁটায়-কাঁটা দেহে মার বুকের স্নেহের তাপে নব পুষ্পমঞ্জরী দেখা দিল, চিকণ পত্র-পল্লবে গাছের শুষ্ক দেহ ভরিয়া উঠিল। পুত্র-হারা মায়ের বুকে স্নেহের তাপ ছিল, এমনি গভীর!

গাছ বলিল, "ঐ ডাহিনের পথ ধরে চলে যাও।"

মা চলিলেন। অনেক দূর গিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড হ্রদ। জলের বুকে কুমুদ-কহ্লার-পদ্মের রাশি! পিপাসায় মার কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছিল,—মা গিয়া জলে পড়িলেন, একটু জুড়াইবার জন্য।

জল বলিল, "ওগো, তুমি কোথায় চলেছ গো, পাগলের মত, আমি তা জানি। আমায় ক'টি মুক্তো দিতে পারো? আমার মুক্তোর মালা ছিঁড়ে গেছে। মুক্তো যদি দাও, তাহলে তোমায় পথের সন্ধান বলে দি।"

আজও তবে পথের খোঁজ পাওয়া গেল না! হায়রে, কোথায় পাইব এখানে মুক্তা-মণি! মা কাঁদিতে লাগিলেন, চোখের জল দুই গাল বহিয়া হ্রদের জলে পড়িয়া বড় বড় মুক্তা ফুটাইয়া দিল।

জল বলিল, "ভারী সুন্দর মুক্তো এ, মা—

এর যে কত দাম, কোন জহুরী কষে তা বলতে পারে না। তুমি এক কাজ কর, সোজা এই পথে গিয়ে একটা পাহাড় দেখবে, সেই পাহাড়ের গুহায় তোমার ছেলের সন্ধান পাবে।"

"বুড়ো মানুষটি এই পথেই গেছে?"

"না,—সে এখনো এসে পৌঁছোয় নি। তার কত কাজ—কত লোক নিয়ে আসতে হবে, তোমার ছেলেকে সে আগেই পাঠিয়ে দেছে। সঙ্গে নিয়ে ঘোরবার জো কি তার!"

মা চলিলেন। পাহাড়ের গুহার সম্মুখে আসিয়া দেখেন, আর-একবৃদ্ধা সেখানে দাঁড়াইয়া।

মা বলিলেন, "আমার ছেলে? ওগো, আমার ছেলে—আমার দুধের বাছা, সে কোথায়? কোথায় গো?"

বৃদ্ধা বলিল, "তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত বাছা। এত গাছ, এত ফুল আজ ঝরে পড়েছে—মৃত্যু আবার কোথায় যে তাদের ছড়িয়ে পুঁতে দেছে, তার সন্ধান করা বড় শক্ত।"

মা বলিলেন, "গাছ, ফুল? এ সব কি বলছ?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হাঁ, তা বুঝি জানোনা! মানুষকে তোমরা মানুষই দেখ কি না! মানুষ, ফুল, পাখী, এরা সব এক, সকলের একই রকম প্রাণ, তা মানুষ বলে আলাদা কিছুতো আর এখানে নেই, এখানে সব ফুল আর গাছ। তোমাদের মানুষেরও প্রাণের ফুলগাছ এখানে আছে। কোন্‌টি শুকোচ্ছে, এখান থেকে দেখে—মরণ তাকে আনতে যায়। এই একটু এগিয়ে গেলেই ফুলের বাগান দেখবে—দেখগে দেখি, এ সব ফুলের মধ্যে প্রাণের সাড়া পাবে'খন তুমি গুঁজে দেখোগে, কোন্ ফুলটিতে তোমার ছেলের প্রাণের সাড়া পাও—বুক দিয়ে ছুঁয়ে দেখ'গে, সন্ধান পাবে। কিন্তু এত যে খপর দিচ্ছি, এই খপরের জন্যে আমায় কি দেবে তুমি?"

মা বলিলেন, "ওগো আমি দুঃখিনী মা, সন্তান-হারা জননী—আমার আর কি আছে—?"

"তোমার ঐ মাথার কালো চুল একগাছি আমায় দাও দেখি, তাতেই আমার হবে।"

মা মাথার একগাছি চুল ছিঁড়িয়া বৃদ্ধার হাতে দিলেন। কালো রেশমের মত নরম চুল!

বৃদ্ধা চুলগাছি হাতে করিল, অমনি মার মাথার সেই নরম কালো কেশের রাশি একেবারে সাদা শোণের নুড়ি হইয়া উঠিল। মার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, মা সেই ফুলের বাগানের সন্ধানে চলিলেন।

ঐ যে—ঐ গো! লাল নীল সাদা সবুজ জরদা রঙের ফুলে আলো-করা বাগান! যেন রাঙা রামধনু ফুটিয়াছে!

মা গিয়া ফুলের বাগানে বুক দিয়া পড়িলেন। ফুলের বুকে এত প্রাণের স্পন্দন! আঃ! কিন্তু সেটি—সেটি কৈ—মার বড় সাধের, বড় আদরের সেই ছোট্ট ফুলের কুঁড়িটি!

ছোট-বড় অসংখ্য গাছ, ফুলে ভরা। শুধুই কি ফুলের গাছ? তাল, তমাল, বট, অশ্বত্থেরও ঘন বন!

"ঐ, ঐ—ঐটি আমার সেই গো"—বলিয়া মা ছোট একটি জুঁইয়ের কুড়ির দিকে হাত বাড়াইলেন।

পিছন হইতে সেই বৃদ্ধা আসিয়া বলিল,—"উঁহুঁ, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না—একটু সরে এসে এইখানে দাঁড়াও। আগে মরণকে আসতে দাও; সে এলে তাকে বলো, তোমার ফুলটি বেছে যেন তোমায় দেয়, না দিলে ভয় দেখিয়ো, বলো, তার সমস্ত ফুল ছিঁড়ে তচ্‌নচ্ করে দেবে। তাহলে সে ভয় পাবে'খন। তাকে এই সমস্ত ফুলের, সমস্ত গাছের হিসেব দিতে হয় ভগবানের কাছে কি না! তার ফুল পরে ছিঁড়লে, সে ভারী জবাবদিহিতে পড়বে।"

মা অধীর আকুল প্রাণে দাঁড়াইয়া রহিলেন; সে কখন আসিবে? বৃদ্ধা চলিয়া গেল। একটু পরেই শীতের একটা দম্‌কা হাওয়া বহিয়া আসিল,—থর-থর কম্পিত ফুলের গাছে বরফের ঢেউ ছুটিল। সে এক বিচিত্র ব্যাপার! মৃত্যু আসিল, আসিয়াই মাকে বলিল, "কে তুমি? এখানে কি করে এলে? আমার আগেই বা এলে কি করে?"

"কি করে এলুম? ওগো আমি যে মা---"

মৃত্যু সেই জুঁইয়ের কুঁড়িটির দিকে হাত বাড়াইল---কিন্তু মা গিয়া কুঁড়িটি হাতে চাপিয়া ধরিলেন—ধরিলেন বটে, কিন্তু ভারী সতর্কে, অতি সন্তর্পণে পাছে পাপড়িতে ঘা লাগে! মৃত্যু আগাইয়া আসিল। মার হাতে উগ্র মৃত্যুর নিশ্বাসের স্পর্শ লাগিল—শীতে মার হাত অবশ হইয়া গেল।

মৃত্যু বলিল, "তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না—"

"কিন্তু মাথার উপর ভগবান আছেন, তিনি এর শাস্তি দেবেন।"

"শাস্তি! শাস্তি কিসের! আমি ত তাঁরই হুকুম তামিল করে ফিরি—নিজের ইচ্ছায় কিছু করি না ত। আমি এই বিশ্বের সৃষ্টির বাগানের মালী---এখানে দিবারাত্রি এই সমস্ত গাছ বাছাই-তোলাই করে-করে দেখি, যেগুলি সেরা, সেগুলি তাঁর নন্দনে পাঠাই। সেখানে কি হবে, তার খপর আমি অবশ্য রাখি না!"

মা বলিলেন, "ওগো দাও গো, আমার বাছাকে এই মার বুকে ফিরিয়ে দাও—দাও, ওগো, দাও—আমার সেই এক, আমার সেই সর্ব্বস্ব-ধনটিকে দাও—"

মৃত্যু কোন কথা বলিল না; মা বলিলেন, "দেবে না! যদি না দাও তাহলে তোমার এই সমস্ত ফুলের বাগান নষ্ট করে দেব, সব ফুল তুলে ছিঁড়ে একাকার করে দেব।" বলিয়া এক বোঁটায় দুইটি কুঁড়ি চাপিয়া ধরিলেন। মৃত্যু বলিল, "না, না, ছুঁয়ো না এদের। তুমি মা, ছেলের শোকে কাঁদচ, মার ব্যথা ত জানো! এর একটি ফুল ছিঁড়লে এর মাকেও তুমি এমনি ব্যথা দেবে!"

"এর মা!"

"হ্যাঁ—এই নাও, তোমায় দিব্য দৃষ্টি দিচ্ছি—তুমি এই দৃষ্টি নিয়ে ঐ দীঘির বুকে চেয়ে দেখবে, এস। ঐ যে কুঁড়িটি চেপে ধরেছিলে, সেটি কি, দেখতে পাবে।"

মা তখন দীঘির জলে চাহিয়া দেখিলেন, এক বোঁটায় দুইটি কুঁড়ি—সেই দুইটি।

কিন্তু এ কি—একটি ফুটিয়া উঠিয়া জগতে কতখানি রূপ, কত সুখ, কত শোভা, কত গন্ধ ছড়াইয়া দিয়াছে! আর একটি—?

দারিদ্র্য দুঃখে একেবারে জীর্ণ মলিন, শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে!

মা মৃত্যুর মুখের পানে চাহিলেন। মৃত্যু বলিল, "এ ভগবানেরই ইচ্ছায়। বুঝলে?"

"এ দুটি কাদের বাছা গা?"

"শুনবে তবে, শোনো। ওরি মধ্যে একটি কুঁড়ি...তোমার সেই হারানো ছেলে! তোমার ছেলের ভাগ্য-ফলে, তুমিই তার সমস্ত ভবিষ্যতের দায়ী। মাই ছেলের ভবিষ্যতের জন্য দায়ী, জেনো,—এর বেশী আর কিছু বলব না।"

মা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "মৃত্যু, না, না, বল, এর মধ্যে কোন্‌টি আমার? ঐ শুক্নো ঝরে-পড়চে যে কুঁড়িটি, ঐটি কি? তা যদি হয়, তবে দাও গো, আমার বাছাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও! এত কষ্ট, এত দুঃখ আমার পেটে জন্মাবার জন্য ওকে পরে সইতে হবে? না, না, আমার এ অন্ধ মায়া আমি ত্যাগ করচি, ওকে ঐ ভবিষ্যতের দুঃখ-বেদনার হাত থেকে উদ্ধার কর গো, উদ্ধার কর—মুক্তি দাও। ওকে ভগবানের নন্দনে নিয়ে যাও তুমি। আমি চাই না, চাই না ওকে—আমার এই দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে এনে ওকে কষ্ট দিতে চাইনে আমি। ও আমার সুখে থাকুক—আমার চোখের জল, আমার এ বেদনা, এ আমি সমস্ত ভুলব। আমি ওকে আর চাই না!"

"তাহলে তোমার ছেলেকে তুমি চাও না?"

"না, না—" মা যুক্ত করে আকাশের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবান, তোমার এত করুণা মুহূর্ত্তের শোকের বেদনায় ভুলে ছিলুম, প্রভু! তোমার কাজের বিরুদ্ধে অনুযোগ তুললে আর তুমি শুনো না, প্রভু। মার বুক-ফাটা কান্না দেখেও তুমি ভুল বুঝো না, ভুল করো না। তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক! মঙ্গলময়, করুণাময়, তোমার বিশ্বে এত করুণা, এত মঙ্গল, জ্ঞান-হীনা আমি, আমার তা চোখে পড়েনি, তাই এত কান্না তুলেছিলুম! আর না, আর কাঁদবো না আমি!"

মা ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মৃত্যু তখন সেই পুষ্প-কলি দুটীকে বুকে লইয়া কোন্ অজানা দেশে অদৃশ্য হইয়া গেল।*

শ্রীসুলেখা দেবী।

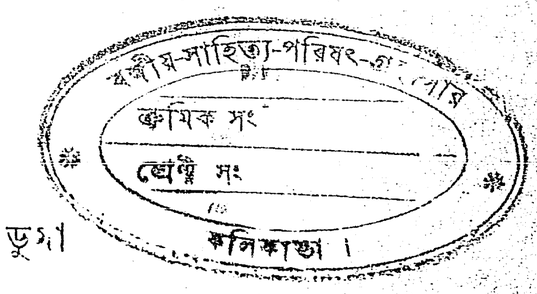

চয়ন

ঔপন্যাসিক ডুমা

আলেকজান্দার ডুমা সম্বন্ধে সংপ্রতি একটি ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তার সার-সংকলন ক'রে দিলুম।

"The Three Musketeers," "The Vicompte de Bragelonns" ও "Twenty Years After" প্রভৃতি উপন্যাস

* ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ লেখক হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডার্সেন রচিত গল্প অবলম্বনে।



ভিক্টর হুগো

পড়েন নি, এমন লোক কেউ আছেন কি? সুতরং ডুমার বিশেষ কোন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে তাঁর সৃজনক্ষম কল্পনা অবিশ্রাম উপন্যাস, উপাখ্যান ও নাটক প্রসব করেছে। এদিকে তিনি তুলনা-রহিত! তাঁর সেই বিপুল সাহিত্য-সাধনা বর্ত্তমান যুগেও যৌবনের আনন্দ-ভাণ্ডার হয়ে আছে।

তাঁর সাফল্য-লাভের গুপ্তকথা হচ্ছে এই যে, তিনি কলম ধরেছিলেন হিতোপদেশ দিতে নয়, চিত্ত-বিনোদনের জন্যে। ডুমা ইতিহাসের যে ছবি এঁকেছেন, তা স্কুলের সাল-তারিখ-নামের ফর্দ্দ নয়।

ভিক্টর হুগো আর ডুমা পরস্পরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই প্রীতির সম্পর্ক মাঝে মাঝে তিক্ত-রসে বিস্বাদ হয়ে উঠ্‌লেও, সেটা কখনো স্থায়ী হ'তে পারে-নি। ডুমার মৃত্যুর পরে হুগো যে মর্ম্মস্পর্শী প্রবন্ধ লিখেছিলেন, আমরা তার স্থল-বিশেষ উদ্ধার করছি।

'আলেকজান্দার ডুমা কেবল ফ্রান্সের নন, তিনি য়ুরোপের; কেবল য়ুরোপের নন, তিনি বিশ্বের। তাঁর নাটকগুলি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলি সকল ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তিনি সেই সকল লোকের মধ্যে অন্যতম, যাঁদের সভ্যতার বপনকারী ব'লে ডাকা যায়। এক প্রফুল্ল, সমুজ্জ্বল ও অবর্ণনীয় দীপ্ত দিয়ে, মনের ভিতরটা তিনি কুশলে আর স্বাস্থ্য-সম্পদে পরিপূর্ণ ক'রে তোলেন;—আমার মন ও যুক্তি-শক্তিকে তিনি উর্ব্বর ক'রে তোলেন,—অধ্যয়নের জন্য তিনি চিত্তের ভিতরে একটা ক্ষুধাকে জাগিয়ে তোলেন; তিনি মনকে জয় করেন এবং ঐশ্বর্য্যে তা ভ'রে দেন। তিনি বপন করেছেন ফ্রান্সের মূলতত্ত্ব বা মনোবৃত্তি। ফরাসী মনোবৃত্তির ভিতরে মানবতার এমন ভাব আছে, যাহা, যেখানেই যায়, সেখানেই উন্নতির কারণ হয়।'

ডুমার শেষ-জীবনের কথা তাঁর সাহিত্য-সমাজে বিখ্যাত পুত্রের বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি স্তব্ধভাবে সেই সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটিয়ে দিতেন,—যার নীলিমার ওপরে ধূসর ও কুয়াসাঢাকা আকাশের সঙ্গে শীতার্ত্ত তপনের অস্পষ্ট কিরণ এসে মিলিত হয়েছে।

একদিন আমার দিকে তিনি তাঁর সেই বড় বড়, মমতায় কোমল দৃষ্টি স্থাপন ক'রে, মায়ের কাছে ছেলে যেমন স্বরে অনুনয় করে, তেমনি স্বরে বল্‌লেন।

"আমাকে এখান থেকে উঠিও না, আমি বেশ আছি।" দেখতে দেখ্‌তে তাঁর মুখখানির উপরে একটা গভীর চিন্তা ও দুঃখের ছায়া এসে পড়্‌ল, তারপর তাঁর চোখদুটি জলে ভ'রে উঠ্‌ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি-জন্যে তিনি এমন বিমর্ষ হয়েছেন।

তিনি আমার একখানি হাত টেনে নিয়ে, আমার চোখের উপরে চোখ রেখে দৃঢ়স্বরে বল্‌লেন, "যদি তুমি পুত্রের মতন পক্ষপাতিতা না ক'রে, সমালোচকের মতন ক্ষমতা আর সহচরের মতন সরলতার সঙ্গে আমার কথার উত্তর দিতে অঙ্গীকার কর, তাহলে তোমাকে আমি সব কথা বল্‌ব।"

"আমি অঙ্গীকার করছি।"

—"প্রতিজ্ঞা কর।"

—"প্রতিজ্ঞা করছি।"

—"আচ্ছা—" একটু ইতস্তত ক'রে শেষটা তিনি বল্‌লেন, "আচ্ছা, আমার কাজের কিছু কি স্থায়ী হবে ব'লে তুমি বিশ্বাস কর?" ব'লে আমার দিকে তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

আমি আনন্দের স্বরে বললুম, "এইজন্যেই তোমার যদি এত ভাবনা হয়ে থাকে, তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার। তোমার কাজের অনেক অংশই স্থায়ী হবে।"

—"সত্যি?"

—"সত্যি।"

—"ধর্ম্মত বল্‌ছ?"

—ধর্ম্মত বল্‌ছি।"

আমার মনের আবেগ লুকোবার জন্যে আমি মুখকে আরো বেশী হাসিমাখা ক'রে তুল্‌লুম। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি আর একটিও কথা কইলেন না, যেন আর কিছু জানবার জন্যে তাঁর কোনই আগ্রহ নেই।

ডুমার রসিকতার ঢের গল্প আছে। একটির উল্লেখ করছি।

এক নাট্যকার বন্ধুর নাটক অভিনয়ে একবার ডুমা উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, দর্শকদের মধ্যে একজন নিদ্রিত হয়ে পড়েছে।

ডুমা তাঁর বন্ধুকে সেই দৃশ্য দেখিয়ে বল্‌লেন, "ওহে, দর্শকদের ওপরে তোমার নাটকের প্রভাব কতদূর, একবার চেয়ে দেখ।".....

ঠিক পররাত্রেই রঙ্গালয়ে ডুমার একখানি নাটকের অভিনয়। সেদিনও অভিনয়ের সময়ে দর্শকদের আসনে একজন লোক ঘুমোচ্ছিল। পূর্ব্বকথিত বন্ধুটি প্রতিশোধ নেবার আশায় উৎসাহিত হয়ে, সেইদিকে ডুমার দৃষ্টির আকর্ষণ ক'রে বিজয়গর্ব্বিত স্বরে বললেন, "ভাই ডুমা, দেখ! অতএব বুঝচ তো, কেবলি আমার নাটকের অভিনয়ের সময়েই দর্শকরা ঘুমায় না।"

ডুমা, তৎক্ষণাৎ পাল্টা, জবাব দিলেন, "ওহো, বন্ধু! ওটি সেই কাল্‌কেরই ঘুমিয়ে-পড়া ভদ্রলোক—উনি এখনো জেগে ওঠেন নি!"

রুসিয়ার মুকুটহীন সম্রাট

একজন সম্ভ্রান্ত-ঘরের মেয়ের বুকের জোর যে কতটা বেশী হ'তে পারে, মিসেস ক্লেয়ার সেরিডানের রুসিয়া-যাত্রায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মিসেস সেরিডান বিলাতের নামজাদা রাজনৈতিক উইন্‌ষ্টন চার্চ্চহিলের বোন।

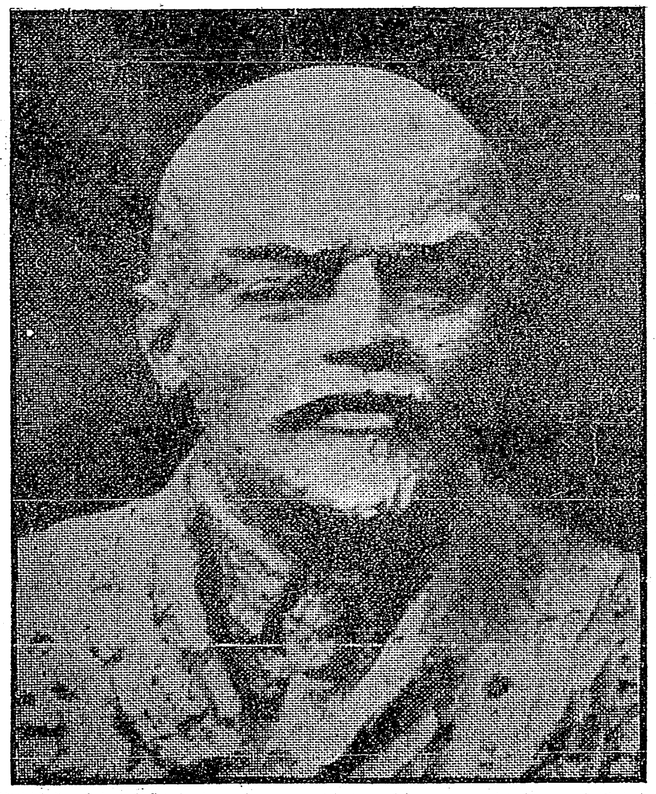

লেনিন

ভাস্কর্য্যে তিনি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।

সকলেই জানেন, রুসিয়ায় এখন বিপ্লবের দামামা বেজে উঠেছে, খুনজখম রক্তারক্তি এ-সব এখন সেখানকার সাধারণ ঘটনা। এমন দুঃসময়ে বিদেশী পুরুষরা পর্য্যন্ত রুসিয়ার গণ্ডীর ভেতরে পা বাড়াতে ভরসা পান না। কিন্তু মিসেস্ সেরিডান বিদ্রোহের মূর্ত্তিমান অবতার এবং বর্ত্তমান রুসিয়ার সর্ব্বেসর্ব্বা ও মুকুটহীন সম্রাট লেনিন ও ট্রট্‌জ্‌কীর প্রস্তর-মূর্ত্তি গঠন করবার জন্যে, বিনা-দ্বিধায় রুসিয়ায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। খালি তাই নয়,—তিনি আপনার কাজ না হাসিল ক'রে দেশে ফিরে আসেন নি।

মিসেস্ সেরিডান পাথরে ও কলমে—দুইয়েতেই লেনিন ও ট্রট্‌জ্‌কীর যে মূর্ত্তি ফুটিয়েছেন, তাতে এই দুটি দুর্ব্বোধ লোককে বুঝবার অনেকটা সুবিধা হবে। লেনিনের মসী-চিত্র থেকেও আমরা খানিকটা তুলে দিলুম।

"একজন লোককে কখনো আমি এতরকম মুখের ভাব প্রকাশ করতে দেখি নি। লেনিনের মুখেরওপর দিয়ে হাসির, বিরক্তির, চিন্তার, দুঃখজনক ও হাস্যোদ্দীপক ভাব পরে পরে প্রবাহিত হয়ে গেল। আমার মনে হোলো, তিনি যেন তাঁর মুখের ওপরে বিচিত্র ভাবের পসরা সাজিয়ে রেখেছেন—আমি বেছে নেব ব'লে। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর মুদ্রিত-নেত্র মুখের ভাবটি বেছে নিলুম। আশ্চর্য্য! মুখের এমন ভাব আর কারুরই নেই—এটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। লেনিন আমার হাতের কাজ দেখে খুসি হয়ে স্বীকার করলেন, নর-চরিত্রের যথার্থ বিশেষত্ব ধরবার শক্তি আমার আছে।

আমার অনুরোধে লেনিন যখন ঘূর্ণায়মান আসনের ওপরে গিয়ে উঠলেন, তখন তাঁর মুখ দেখে মনে হোলো, তিনি যেন ভারি আমোদ অনুভব করছেন। তারপর তাঁর মুখের নীচের দিকটা ভালো ক'রে দেখবার জন্যে, আমি যখন তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে বস্‌লুম, তখন তিনি যেন অত্যন্ত বিস্ময় ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লেন। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "রমণীর এ-রকম অবস্থানে আপনি বুঝি অভ্যস্ত নন?"

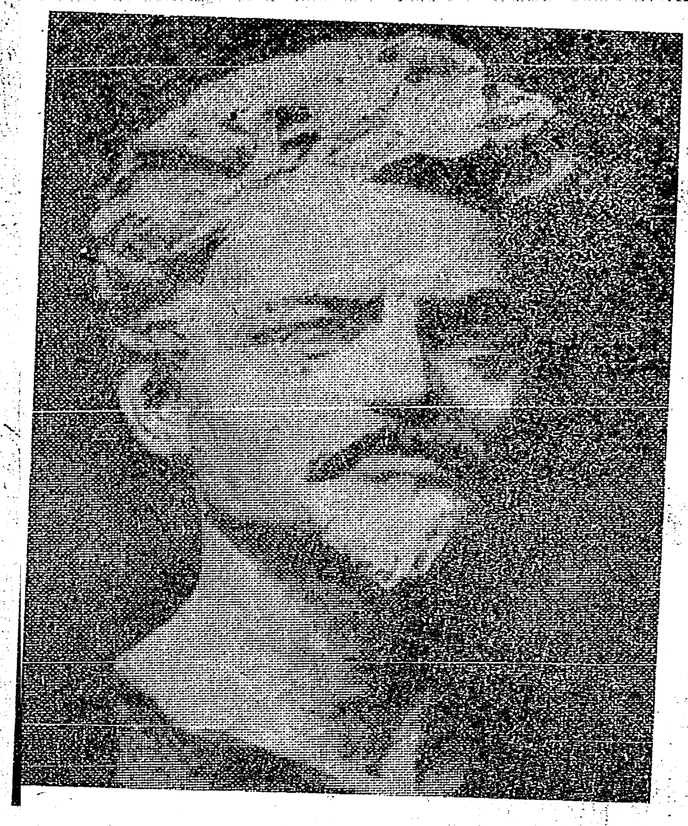

ট্রট্‌জ্‌কী

লেনিন আমার গড়া কতকগুলি মূর্ত্তির ছবি দেখলেন। "বিজয়-লক্ষ্মী"র মূর্ত্তিটি তাঁর পছন্দ হোলো না। তিনি বল্‌লেন, "বিজয়লক্ষ্মী"কে আমি বড় সুন্দরী করে গড়েছি।"

আমি বললুম, "আত্মত্যাগের জন্যেই "বিজয়লক্ষ্মী" সুন্দরী হয়েছে।

কিন্তু এ-কথা না মেনে লেনিন বল্‌লেন, "বাজারে আর্টের দোষই এই। সে সর্ব্বদাই রূপ নিয়ে ব্যস্ত।.....আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমার মূর্ত্তিকেও যেন কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করবেন না।"

আমেরিকার ভাস্কর

আধুনিক সভ্যতায় আমেরিকার ঠাঁই খুব উঁচুতে হ'লেও, সাহিত্যে আমেরিকা বড় বেশী নাম কিন্‌তে পারে নি। সাহিত্যক্ষেত্রে আমেরিকা প্রসর করছে অণ্ডন্তি, কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে অন্যান্য দেশের তুলনায় তাদের মূল্য খুব বেশী নয়।

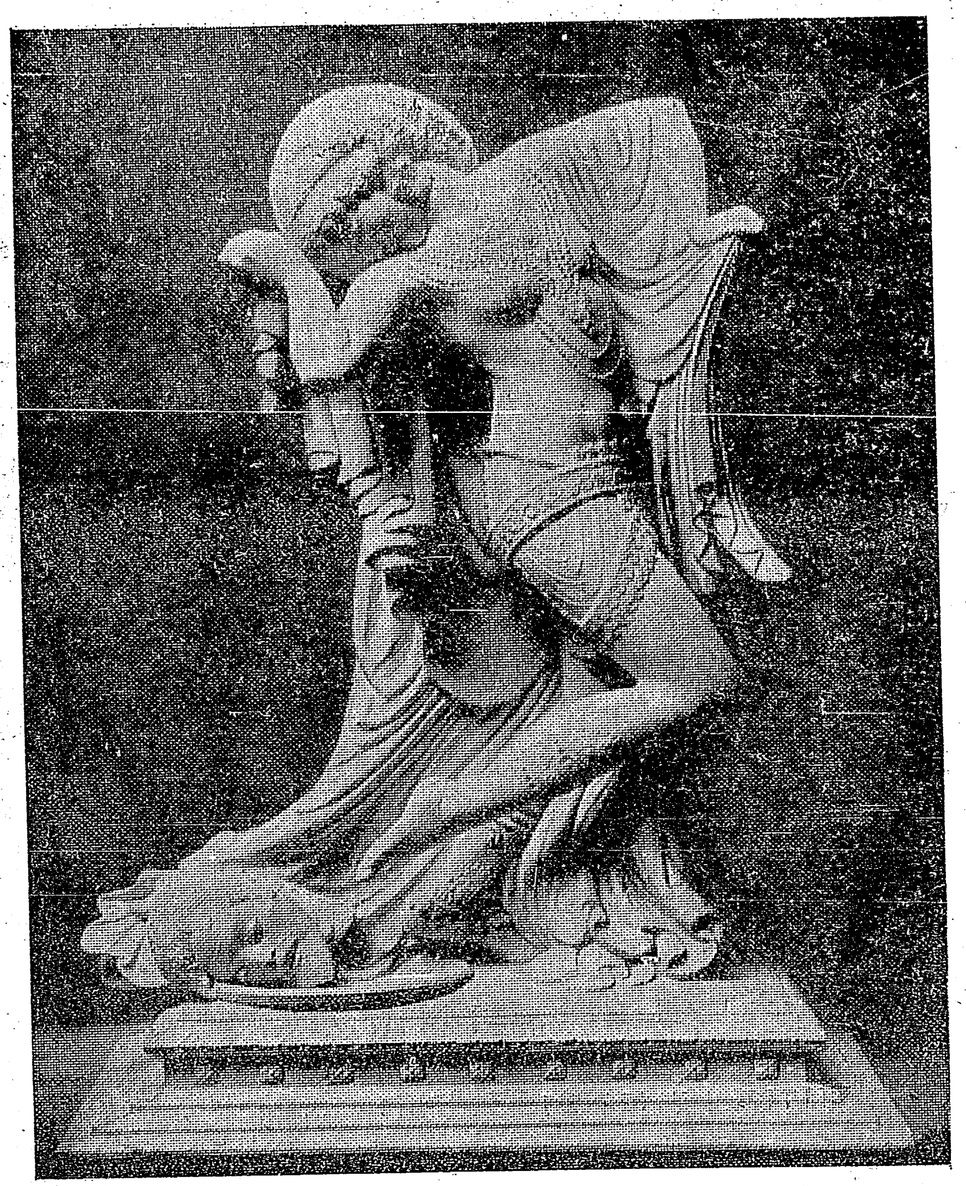

হিরডের রাজসভায় স্যালোমের নাচ

তবে ললিত কলার ক্ষেত্রে মূর্ত্তি-চিত্রকর সর্জেণ্ট এবং ভাস্কর পল ম্যানসিপ আমেরিকার নাম রক্ষা করেছে। সার্জেণ্টের নাম সকলেই জানেন। ম্যানসিপের সঙ্গে এদেশী রসিকদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ না হ'লেও, য়ুরোপে-আমেরিকায় এখন তাঁর প্রভাব-পতিপত্তি বড় সামান্য নয়।

ম্যানসিপের ভাস্কর্য্যে যে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ বিশেষত্ব না থাক্‌লে তাঁর নাম আজ এতটা সম্মান লাভ কর্‌তে পার্‌ত না।

সে বিশেষত্ব কি, এখানে সে সব কথা গুছিয়ে বলবার জায়গা নেই। আমরা এখানে তাঁর গড়া একটি মূর্ত্তির ছবি দিলুম। এর বিষয়, হিরডের রাজসভায় স্যালোম নাচছে। লক্ষ্য কর্‌লে দেখা যাবে, ম্যানসিপের হাতের কাজে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের গঠন-ভঙ্গি কতটা আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে উঠেছে!

সবল মাতৃত্বের উপাদান

এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমাদের দেশে ব্যায়াম, বিরোধী পুরুষ-সমাজের ভেতরেও দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের যতটুকু সুবিধা আছে, নারী-সমাজের মধ্যে ততটুকুও নেই।

ব্যায়ামের যতই অভাব থাক্‌,বাঙালী পুরুষরা অন্তত কাজের খাতিরেও বাধ্য হয়ে খোলা হাওয়ায় রাজপথে হাঁটা-হাঁটি করে থাকেন। কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরের মেয়েরা এ-সব সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। তাও যদি অন্তপুরে কোনরকম পদ্ধতিতে যৎসামান্য ব্যায়াম করবার প্রথাও প্রচলিত থাক্‌ত, তাহলেও কথা ছিল; কিন্তু মেয়েদের ব্যায়াম করবার নামেই এদেশী পুরুষদের পেটের পিলে বোধ করি বিস্ময়ে বিলক্ষণ চম্‌কে উঠ্‌বে। অন্তপুরে ব্যায়াম কথাটা বড়ই নূতন!

অথচ খোলা হাওয়ার যেখানে প্রবেশ নিষেধ, অবাধ আলো যেখানে অপ্রচুর এবং স্বাধীন অঙ্গ-সঞ্চালন যেখানে ইটের দেওয়ালে বাধা পায়, সেই অন্তপুরেই যে ব্যায়ামের দরকার আর সার্থকতা বেশী, যাঁরা যুক্তি-তর্ক মানবেন,এ সত্য তাঁদের স্বীকার কর্‌তেই হবে।

মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য একেই তো ক্রমাগত সন্তান-প্রসবের ফলে শীঘ্রই ভেঙে পড়ে, তার ওপরে সাধারণ দারিদ্র্য-সমস্যার ফলেও এঁদের দেহ পুষ্টিকর আহার থেকে বঞ্চিত। কেবলমাত্র এই দুটি কারণের জন্যেও বাংলার অন্তপুরে ব্যায়াম বা দেহচর্চ্চার প্রচলন করা উচিত।

বাঙালীর মেয়ে যে কুড়িতেই বুড়ী হয়ে পড়েন, খোলা আলো-বাতাস আর ব্যায়ামের অভাবই হচ্ছে তার মূল কারণ।

কিন্তু পাশ্চাত্য-দেশে নারী-সমাজে এত-বড় দুর্ভাগ্য নেই। সেখানে খোলা আলো বাতাস

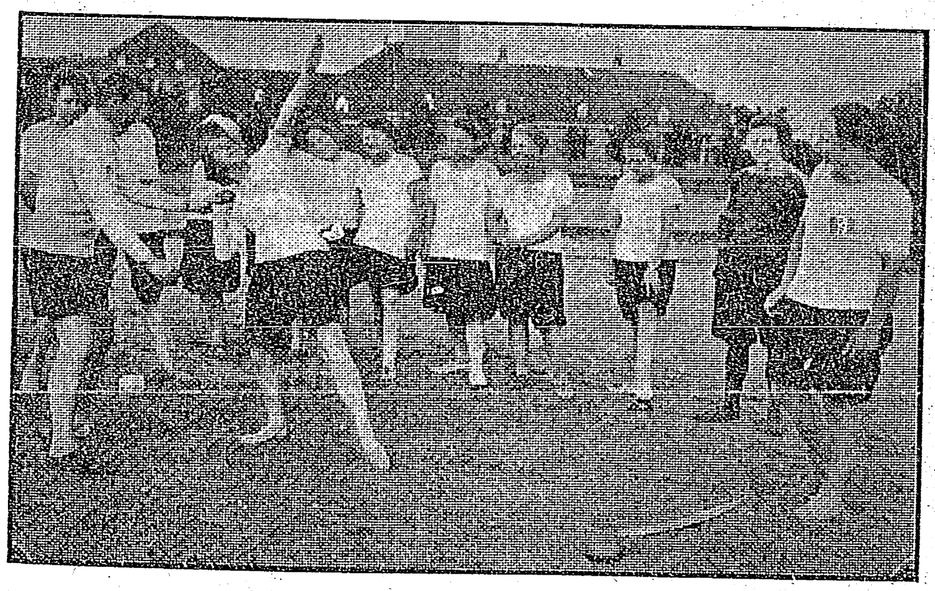

ব্যায়ামাগারে জার্ম্মান-নারী



সবল নারীত্ব

আর পদব্রজে যথেচ্ছ ভ্রমণের সুবিধা তো মেয়েদের আছেই, কিন্তু কেবল এইটেই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ব'লে বিবেচনা করা হয় না। গত যুদ্ধে দুর্ব্বল জার্ম্মানী, এখন আবার তার ভবিষ্য জাতীয় শক্তি-সংগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। জার্ম্মানদের মতে, মানুষের জীবনী-শক্তির মূল-ভিত্তি, দেশের নারী-সমাজকে সবল মাতৃত্বের জন্যে প্রস্তুত করা।

জিম্‌নাষ্টিক, ড্রিল, দ্রুতধাবন, উচ্চ লম্ফ, নৌকা-চালনা ও সাঁতার প্রভৃতি ব্যায়ামের দ্বারা জার্ম্মান যুবতীর শরীর এখন বলবান ও স্বাস্থ্যবান ক'রে তোলা হয়।

খালি জার্ম্মানী নয়—অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও এখন নারীকে সবলা ক'রে তুলে তাঁর 'অবলা' দুর্ণাম ঘুচাবার চেষ্টা হচ্ছে।



নাচের ভঙ্গীতে ব্যায়াম

চির-যৌবনের সাধক

কিছুদিন আগে ডাক্তার ভোরোনফ আবিষ্কার করেছিলেন যে, যুবক-বানরের গ্রন্থি-বিশেষ বুড়ো মানুষের দেহের ভিতরে চালিয়ে দিতে পারলে, মানুষের নিরুদ্দেশ যৌবন আবার ফিরে এসে দেহের ভাঙা মন্দিরকে নতুন ক'রে তোলে! কিন্তু অধিকাংশ বুড়োই যৌবনের লোভেও এদিকে ঘেঁস্‌তে বা নিজের দেহের উপরে এ-রকম পরীক্ষা করতে একেবারেই রাজি নন। তাঁদের ভয়, বানরের গ্রন্থির (gland) গুণে যদি তাঁদের মানুষী বুদ্ধিও শেষটা 'বানুরে' হয়ে যায়।

কিন্তু অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত Prof. Eugene Steinach, আজ বারোবৎসর সাধনার পরে, রুচিসঙ্গত উপায়ে মানুষের জরা-কাতর জীবনে চির-যৌবনের প্রতিষ্ঠা প্রায় সম্ভব ক'রে তুলেছেন।

তিন পদ্ধতিতে তিনি কাজ করেন। (১) মানুষের দেহের ভিতরকার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নল (ducts) একত্রে বেঁধে দেওয়া। (২) "এক্সরে"র সাহায্যে। স্ত্রী-দেহেই এই পদ্ধতিতে কাজ করা হয়। (৩) কোন যুবক স্তন্যপায়ী জীবের দেহ-গ্রন্থি-বিশেষ বুড়ো মানুষে দেহের ভিতরে জুড়ে দেওয়া। এর মধ্যে প্রথম পদ্ধতিটিই সবচেয়ে ভালো আর সোজা।

উক্ত প্রফেসর প্রথমে ইঁদুরের দেহ পরীক্ষা ক'রে সফল হন। তারপর তিনি অনেকগুলি মানুষকেও বার্দ্ধক্যের মরুভূমি থেকে যৌবনের উপবনে টেনে আন্‌তে পেরেছেন। তাঁর আবিষ্কারের ফলে দেখা গেছে, ষাট-সত্তর বৎসরের বুড়োও ফের যুবক হয়ে ওঠে। তার কেশহীন মাথায় নুতন চুল গজায়, কুঁজো বেঁকে-পড়া দেহ আবার সোজা হয়, শরীরের সমস্ত শিথিলতা ঘুচে যায়, বলিরেখা আর থাকেনা, এবং চোখের জ্যোতি, দেহের শক্তি ও কাজের ক্ষমতা আবার ফিরে আসে। চিকিৎসার আগে ও মাস-তিনেক পরের একই লোকের ফোটো দেখ্‌লে কেউ ধরতে পারেনা যে, এ দুখানি ছবি একই মানুষের —পরিবর্ত্তন হয় এতখানি! এই পরীক্ষায়, বুড়ীর গর্ভধারণের লুপ্তশক্তিও আবার জাগ্রৎ হয়।

এজন্যে যে অস্ত্র-চিকিৎসার দরকার, তাও যৎসামান্য। অস্ত্র-প্রয়োগের জন্যে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগেনা—আর এতে যাতনা-কষ্টও কিছু নেই বল্‌লেও চলে। স্থানীয় 'গম্ভীর বেদন' (local anaesthetic) ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। জরাকে গলাধাক্কা দিতে পারলে মানুষের পরমায়ুও খুব-সম্ভব যথেচ্ছভাবে বাড়িয়ে তোলা যাবে। সুতরাং এই আশ্চিবার যে পৃথিবীতে নবযুগ আনবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

বায়স্কোপের সূচনা

সভ্য-অসভ্য সমস্ত দেশেই এখন বায়স্কোপের চলন হয়েছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে কোন্ দেশে জীবন্ত চিত্রের কল্পনা জেগেছে, অনেক আলোচনা করেও এত-দিনে সেটা কেউ ঠিক কর্‌তে পারেন নি।



জাভার ছায়াবাজির পুতুল

সংপ্রতি শ্যামদেশের রাজা আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যকে কতক গুলি জাভাদেশীয় ছায়া-চিত্র ও পুতুল ভেট দিয়েছেন। এই পুতুলগুলি অত্যন্ত কৌশলে হরিণের চাম্‌ড়া থেকে কাটা। কোন কোন পুতুলের দেহের স্থান-বিশেষে সুতো বাঁধা,—বাঙ্‌লার পুতুল-নাচের পুতুলের দেহে হাত-পা-মাথা নাড়বার জন্যে যেমন দড়ি বাঁধা থাকে।

এই ছায়া-চিত্রগুলিকে জাভায় দর্শকদের সামনে পর্দ্দার উপরে ফেলে, সাম্‌নে ও পিছনে নড়িয়ে জীবন্ত চিত্রের মতন দেখানো হোতো এবং একজন কথক ছবির বিষয় বর্ণনা ক'রে যেত। পুতুলগুলিও পট ও আগুনের মাঝখানে রেখে, জীবন্ত ছায়া-চিত্রের খেলায় ব্যবহৃত হোতো।

এই ছায়া-চিত্রের কোন তারিখ না পাওয়া গেলেও লিখিত ইতিহাসের আগেও যে এর অস্তিত্ব ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাই মিঃ আলফ্রেড মেফিল্ডের মতে, জীবন্ত চিত্রের প্রথম জন্ম, জাভা দেশে।

প্রসাদ রায়।

সঙ্কলন

বাসগৃহ

কি সহরে, কি মফস্বলে, আমাদের দেশে বাসগৃহ নির্ম্মাণের প্রণালী বা ব্যবস্থা স্বাস্থ্য-নীতিসম্মত নহে; সহরে স্থানাভাব বশতঃ না হয় বাড়ীগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট,—সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রবেশের পথ রহিত; কিন্তু পল্লীগ্রামেও গৃহ-নির্ম্মাণে কোনরূপ শৃঙ্খলা বা নিয়মের অনুসরণ করিতে দেখা যায় না; যত্র তত্র যেমন তেমন ভাবে গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, গ্রাম্য প্রবচনে, গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে গৃহ-নির্ম্মাণকালে সে সকল উপদেশের অনুসরণ করা হয় না।

এরূপ অবস্থা হইবার কারণ কতকটা আমাদের সামাজিক রীতিনীতি। প্রাচীন কালের সাহিত্যে 'অসূর্য্যম্পশ্যরূপা' বলিয়া একটী বিশেষণ শব্দ পাওয়া যায়। কথাটি আমাদের সে কালের—এবং এ কালেরও বটে—সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাগণের পক্ষে বিশেষ গৌরবাত্মক। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা এমন ভাবে জীবন যাপন করেন যে, সূর্য্যও তাঁহাদিগকে দেখিতে পান না! এই শব্দটি যতই সম্ভ্রমসূচক হউক না কেন, আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মতে ইহা অতি দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। এই সকল অসূর্য্যম্পশ্যরূপা

মহিলারা যে গৃহে বাস করেন, সে বাসগৃহও এমন ভাবে নির্ম্মিত হয় যে তাহাতে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিবার উপায় থাকে না।

আমাদের অবরোধ প্রথাও বাসগৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। মহিলাগণের আব্রু রক্ষার্থ—যাহাতে বাহির হইতে কেহ দেখিতে না পায়, এমন ভাবে অন্তঃপুরের গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বাটীর চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালার আবরণ; তাহাতেও নিস্তার নাই। আব্রু রক্ষার পক্ষে তাহাও যথেষ্ট বিবেচনা না করিয়া, জানালাগুলি মেঝে হইতে অনেক উচ্চে নির্ম্মিত হয়; এবং তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট কম রাখা হয়।

সম্ভ্রান্ত ঘরের ব্যবস্থা এইরূপ। দরিদ্রের ব্যবস্থা আবার আরও মন্দ। মাটীর ঘরই দরিদ্রের ও মধ্য-বিত্ত গৃহস্থের প্রধান সম্বল। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনের কোন যত্ন না করিয়া, যেখানে হউক, ঘর তুলিতে আরম্ভ করা হয়; আর সেই ঘরের ঠিক পাশেই গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা হইতে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য মাটী সংগ্রহ করা হয়। যে কয়-খানি ঘর তৈয়ার করা হইবে—সাধারণতঃ দুই এক-খানির বেশী নহে—তাহার উপযুক্ত মাটী ঐ গর্ত্ত হইতেই লওয়া হয়। সুতরাং ঘরের সংখ্যা ও আয়তন অনুসারে গর্ত্ত ছোট, বড় বা মাঝারি রকমের হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল, এবং সকল সময়ে গৃহস্থের নর্দ্দামার জল ঐ গর্ত্তে সঞ্চিত হয়। রন্ধন ও পানার্থ জল অন্য বড় পুষ্করিণী হইতে সংগৃহীত হইলেও গৃহস্থের অপর সকল কার্য্য—যথা, বাসন মাজা, স্নান, শৌচ, এমন কি প্রস্রাব ত্যাগ পর্য্যন্ত ঐ জলে হইয়া থাকে। এই গর্ত্ত কেহ বুজাইয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলে গৃহস্থ অপমান বোধ করেন; কারণ উহারই চারি দিকে সামান্য একটু ঘেরিয়া লইয়া গৃহস্থের আব্রু রক্ষা হইয়া থাকে। বাড়ীর পাশেই যদি ভাল পুষ্করিণী থাকে, ঐ ডোবা যদি গৃহস্থের পক্ষে নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা বুজাইয়া ফেলা হয় বটে, কিন্তু সে বুজাইবার প্রণালীও আবার অতি বিচিত্র। প্রত্যহ গৃহের আবর্জ্জনা, উনুনের ছাই প্রভৃতি ঐ ডোবায় নিক্ষিপ্ত হয়; এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ঐ ডোবায় আবর্জ্জনাদি সঞ্চিত হইতে হইতে ক্রমে উহা ভরাট হইয়া আসে। এই দীর্ঘ কালে ঐ সকল আব-র্জ্জনা পচিয়া গৃহস্থের কত যে সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তাহা গৃহস্থ বুঝিতে না পারুন, বিবেচক লোক মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

যে সকল কারণে আমরা দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি, বাসগৃহ নির্ম্মাণের অব্যবস্থা ও কুব্যবস্থা তাহাদের অন্যতম। ইহার সংশোধন হওয়া অতীব আবশ্যক।

নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমেই উপযুক্ত ভূমি নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। সহরে অবশ্য যেরূপ ভূমি জুটে, বাধ্য হইয়া তাহাতেই বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামে ভূমি তত দুর্লভ নয়। ইচ্ছা থাকিলে সেখানে স্বাস্থ্যসঙ্গত ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কঠিন নয় টিলা (উচ্চ) ভূমি,—যেখানে বর্ষার জল দাঁড়ায় না—এমন ভূমি বাসগৃহের পক্ষে উত্তম। সেই ভূমি আবার একটু ঢালু হইলে আরও ভাল হয়। তাহা হইলে প্রবল বর্ষাতেও সে ভূমিতে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইয়া মাটী আর্দ্র রাখিবে না,—বৃষ্টির অল্প সময় পরেই সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইবে, এবং ভূমিও শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া উঠিবে। এঁটেল মাটী অপেক্ষা বেলেমাটীযুক্ত ভূমিই গৃহ নির্ম্মাণের পক্ষে প্রশস্ত। নিম্ন ভূমি, জলাভূমি বা যে ভূমি বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় আর্দ্র থাকে, এমন ভূমিতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা ত কখনই উচিত নয়—এই সকল ভূমি হইতে বাসগৃহ যত দূরে নির্ম্মিত হয় ততই ভাল। বাসগৃহের কাছে যেন শ্মশান বা গোরস্থান না থাকে। সকল প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও কোন ভূমি যদি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে ভূমি নির্ব্বাচন করাই শ্রেয়।

বাসগৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী ভূমি নির্ব্বাচিত হইলে সেখানে যদি গাছপালা, আগাছা বা জঙ্গল থাকে তবে তাহা কাটাইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। বাসগৃহের চারিদিকেই যেন কিছু খোলা জমি

থাকে, যাহাতে বাসগৃহে অবোধ রৌদ্র বা বায়ু সঞ্চালনের কোন ব্যাঘ্যাত না হয়। ছোট ছোট খানা বা ডোবা থাকিলে সেগুলি বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। বরং একটী মাঝারি গোছের পুষ্করিণী খনন করাইয়া সেই মাটীর দ্বারা বা বাটীর ভিত্তি খনন করিবার সময় যে মাটী উঠিবে তদ্বারা খানা ডোবা ভরাট করাইয়া ফেলা যাইতে পারে।

আমাদের একটী গ্রাম্য প্রবচনে বাটী নির্ম্মাণের ইঙ্গিত করা হইয়াছে; তদনুসারে বাটী নির্ম্মাণ করিলে বাসগৃহ বেশ স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। প্রবচনটি এই—

দক্ষিণ ছেড়ে উত্তরে বেড়ে
ঘর করগে যা ভেড়ের ভেড়ে।

আর বাসগৃহের

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ

অর্থাৎ, পূর্ব্বদিকে হংস বিচরণের উপযোগী পুষ্করিণী এবং পশ্চিম দিকে বাঁশ ঝাড় থাকিলে ভাল হয়।

অপর একটী প্রবচন—

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা;
পূর্ব্বদ্বারী তার প্রজা।
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই;
উত্তরদ্বারীর টেক্স নাই।

অর্থাৎ দক্ষিণদ্বারী ঘর সর্ব্বোৎকৃষ্ট; পূর্ব্বদ্বারী ঘর দক্ষিণদ্বারীর মত অতটা উৎকৃষ্ট না হইলেও নেহাৎ মন্দ নহে। পশ্চিমদ্বারী ঘর নিকৃষ্ট। আর উত্তরদ্বারী ঘর এতই নিকৃষ্ট যে নবাবী আমলে সে ঘরের খাজনা পর্য্যন্ত দিতে হইত না।

মোট কথা, দক্ষিণ দিকে খোলা জমি থাকিলে স্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবাহিত হইয়া বাসগৃহ স্বাস্থ্যকর থাকে। আর উত্তরে হাওয়া তেমন স্বাস্থকর নহে বলিয়া বাটীর উত্তর দিকে বাগান করিবার প্রথা আছে। বাগানের গাছপালার বাধা পাইয়া উত্তরে হাওয়া বেশী পরিমাণে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী থাকায় গৃহ বেশী গরম হইতে পারে না। পশ্চিম দিকে বাঁশ ঝাড় রাখার উদ্দেশ্য কতকটা তাই—প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণের উত্তাপ হইতে গৃহগুলিকে ঠাণ্ডা রাখা।

আমাদের বঙ্গদেশে সাধারণতঃ পাকা বাড়ী মৃৎকুটীর—এই দুই প্রকারের বাসগৃহ প্রস্তুত হ থাকে। বলা বাহুল্য ইষ্টক নির্ম্মিত দালানই সর্ব্বো কৃষ্ট বাসগৃহ। তবে চকমিলান বাড়ী অপেক্ষা সারিতে গৃহগুলি নির্ম্মিত হইলে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হয়। তবে উঠান যদি খুব বড় রাখা যাহাতে অবাধে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, হইলে ততটা অস্বাস্থ্যকর না হইতেও পারে।

কুটীরগুলির দেওয়াল হয় মাটীর, না হয় বাঁ বা ছিটে বেড়ার, দরমার কিম্বা গরাণের হইয়া থা

বাঁশের বা দরমার কিম্বা গরাণের দেওয়াল উহার উভয় পার্শ্বে পাতলা করিয়া মাটী লাগ লওয়া উচিত।

পাকা বাড়ীই হউক, আর কুটীরই হউক- গৃহের দেওয়ালে যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা অতীব আবশ্যক—যেন সেগুলি প্রয়োজনানুসারে বা বন্ধ করা যাইতে পারে। সকল বাড়ীরই মেঝে ভূমি হইতে অন্ততঃ দুইহাত উঁচু নির্ম্মাণ করা উচিত। ইহাতে অনেক সুবিধা মেঝে উঁচু রাখিলে ঘর ও মেঝে শুষ্ক থাকে; বি বর্ষাকালে বাঙ্গলার অনেক স্থানের ভূমি কয়ে ধরিয়া ডুবিয়া থাকে। ঘরেয় পোতা উচু প্লাবনের সময়েও ঘর তত ভিজা ও স্যাঁ হইতে পারে না; মেঝেয় যে সকল দ্রব্য ও রাখা হয় সেগুলিও ভিজিয়া নষ্ট হইতে পারে না।

ঘরের দেওয়ালে কেবল দরজা জানালা যথেষ্ট নহে। অনেক সময়ে দরজা বা ধারে হাঁড়িকুড়ি, বাক্স পেটরা রাখিয়া এম দরজা জানালাগুলিকে বন্ধ রাখা হয় যে সেগু না থাকা সমান কথা। এরূপ করা উচি দরজা জানালা দরকার লইলেই যাহাতে খুলি যায় এমন ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক।

আসল কথা, ঘরের ভিতর অবাধে বায়ু সঞ্চালনের যে কি উপকার সে জ্ঞানই আমাদের দেশের লোকের নাই। সেই দরজা জানালা খুব কম রাখা হয়; আর

তাহা প্রায় বন্ধ থাকে। দরজা জানালা রাখার উদ্দেশ্য ঘরের মধ্যে বায়ু, রৌদ্র, আলো আসিতে পারিবে। এই জ্ঞানটি জন্মিলেই লোকে যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখিবে।

কি পাকা দালান, কি মেটে বাড়ী—সকল বাসগৃহের ঘরের মেঝে পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা উচিত। খোয়া, রাবিশ, কাঁকর, চুনসুরকী প্রভৃতি দিয়া উত্তম রূপে পিটিয়া শক্ত করিয়া মেঝে সিমেণ্ট দিয়া লইলে অন্ততঃ টালি বিছাইয়া লইলে উত্তম হয়।

মেটে ঘরের চাল প্রায় খড়ের, গোলপাতার অথবা খোলার হইয়া থাকে। আজকাল করগেটেড টীন দিয়াও চাল নির্ম্মিত হয়। এই সকল প্রকার চালেরই কতকগুলি করিয়া সুবিধা ও অসুবিধা আছে। খড়ের বা পাতার ছাওয়া চাল দিয়া বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, এবং তাহা বেশী গরম হয় না। খোলার বা টিনের চাল সূর্য্যোত্তাপে গরম হইয়া উঠিতে পারে। এইজন্য চালের নীচে দরমার চন্দ্রাতপ থাকিলে ততটা গরম হয় না।

সকল প্রকার ঘরের দেওয়ালে যে দরজা জানালা থাকিবে, সেগুলি রুজু রুজু করিয়া বসানো কর্ত্তব্য। এরূপ করিলেই তবে বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা হয়। মেটে ঘরে দেওয়াল ও চালার মধ্যে যথেষ্ট অবকাশ থাকায় ঘরের দূষিত উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়। পাকা বাড়ীর দেওয়ালের উপরেই ছাদে নির্ম্মিত হয়। সুতরাং পাকা বাড়ীতে এই সুবিধা নাই। এজন্য ছাদের ঠিক নিম্নে দেওয়ালের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত রাখিয়া তাহা তারের জাল বা জাফরী দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে ঘরের মধ্যস্থ উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া যাইবার পথ খোলা থাকে।

বাটী নির্ম্মাণকালে পয়ঃ-প্রণালীর সুব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপার। বৃষ্টির জল, গৃহস্থের ব্যবহৃত ময়লা জল নিকাশের সুব্যবস্থা না করিলে, যতই উত্তম গৃহ হউক না কেন, তাহা অচিরে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। ঘরের মেঝে সিমেণ্ট দিয়া পাকা করিয়া এবং উঠান কাঁকর দিয়া অথবা টালি বা পাথর বসাইয়া পাকা করিয়া লইবার পর নর্দ্দামাও পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে; এবং সমস্ত জল যাহাতে নর্দ্দমা দিয়া গৃহ হইতে দূরবর্ত্তী কোন পুষ্করিণী, জলাশয় খাল বা নদীতে গিয়া পড়িতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বাটীর মধ্যে শয়নকক্ষগুলিই সর্ব্বপ্রধান হওয়া উচিত। কিন্তু স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবে, রুচির গুণে, শয়ন গৃহ অন্দর মহলে নির্ম্মিত হওয়ায় এবং অন্দর মহলটি প্রধানতঃ বাটীর মহিলাগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকায়, অনেক ধনী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাহিরের বৈঠকখানা নির্ম্মাণে যেরূপ যত্ন করেন, তাহার সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠববিধানে যেরূপ ব্যয় স্বীকার করেন, শয়ন কক্ষ নির্ম্মাণে তাহার শতাংশেরও একাংশ করেন কি না সন্দেহ। বৈঠকখানা ঘরে বায়ু, রৌদ্র ও আলো প্রবেশের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বড় বড় দরজা জানালা নির্ম্মাণ করা হয়। ছবি, ঘড়ি, আলমারি, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি দ্বারা বৈঠকখানা সজ্জিত হইয়া থাকে। ইহাতে অর্থব্যয়ও যথেষ্টই হইয়া থাকে। আর শয়ন কক্ষে দরজা জানালা আকারেও ক্ষুদ্র, সংখ্যাতেও কম। এরূপ ব্যবস্থা কোন ক্রমেই স্বাস্থ্যনীতিসম্মত নহে। শয়ন-কক্ষ সাধারণের চক্ষের অন্তরালে অবস্থিত বলিয়া তাহার সাজসজ্জার তত প্রয়োজন যদিই না থাকে, তথাপি, স্বাস্থ্যনীতির খাতিরে, শয়ন কক্ষে যাহাতে রৌদ্র, আলোক ও বায়ু অবাধে আসিতে পারে সেজন্য যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিয়া, যদি আব্রু রক্ষার্থ নিতান্তই আবশ্যক হয় তবে পাতলা কাপড়ের অর্দ্ধপর্দ্দার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

শয়ন গৃহের দক্ষিণ দিকে গোয়াল ঘর, অশ্বশালা বা আস্তাবল কিম্বা পায়খানা যেন না থাকে। জল নিকাশের প্রণালীও শয়নগৃহের দক্ষিণ দিকে না থাকিলেই ভাল। রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইলে শয়নকক্ষ হইতে যতটা দূরে হয় ততই ভাল, এবং তাহা প্রত্যহ উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত। শয়ন গৃহের-দক্ষিণে গোয়াল, পশুপালা, নর্দ্দামা থাকিলে দক্ষিণা বায়ুর দ্বারা বাহির হইতে যাবতীয় দুর্গন্ধ শয়ন গৃহে প্রবেশ করিতে পারে।

শয়নকালে এক একটী মানবের জন্য ১০০০ ঘন

ফিট স্থান আবশ্যক। এই নিয়মটি মনে রাখিয়া গৃহস্থের লোকসংখ্যা বুঝিয়া শয়ন গৃহের আয়তন স্থির করা উচিত। বরং কিছু অধিক স্থান রাখা ভাল; এবং শয়ন-কক্ষে আসবার পত্র বেশী রাখিয়া জায়গা কমাইয়া ফেলা উচিত নয়। শয়ন-কক্ষে কেবল খাট এবং রাত্রে আবশ্যক হইতে পারে এমন দুই একটী আসবাব থাকিলেই যথেষ্ট। পাকা ঘরের দ্বিতলের মেঝেয় শয়ন করিতে পারা যায়, তাহাতে ততটা ক্ষতি হয় না। কিন্তু একতল পাকা বাড়ী, বা মেটে বাড়ীর মেঝেয় শয়ন করা উচিত নহে। খাটের সুবিধা না হইলে খাটিয়া, তক্তাপোষ, ক্যাম্পখাট, অন্ততঃ মাচা বাঁধিয়া তদুপরি শয়ন করিতে হইবে এবং কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেরই মশারি ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শয়নকক্ষ হইতে একটু তফাতে রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করা উচিত। রন্ধনশালার ধূম নির্গমনের জন্য, সামর্থ্য থাকিলে, উঁচু চিমনি নির্ম্মান করা উচিত। অন্যথা ছাদের নিম্নে দেওয়ালের গায়ে খুবরী রাখা কর্ত্তব্য। অথবা, ছাদের মাঝখানে sky light বা ধোঁয়াঘর রাখিলেও চলিতে পারে। বলা বহুল্য, খাদ্য দ্রব্যাদি উত্তম অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য রন্ধনশালাতেও যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিয়া আলো ও বায়ু প্রবেশের পথ অব্যাহত রাখা উচিত। অন্ধকার ও রুদ্ধ বায়ু—এই দুইই খাদ্য বিকৃত করিয়া ফেলিতে পারে। শয়ন-কক্ষের ন্যায় রন্ধনশালার নিকটেও যেন পায়খানা বা গো-শালা অথবা নর্দ্দমা না থাকে। কারণ, এই সকল স্থানের দুর্গন্ধে খাদ্য দ্রব্য দূষিত হইয়া থাকে। রন্ধন শালায় যে খাদ্য রক্ষিত হয় তাহা দুর্গন্ধ হইতে রক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু না লাগে এমন ভাবে আবৃত রাখাও উচিত নয়। আবার, ইদুর সর্প, ভেক প্রভৃতিও যাহাতে খাবারে মুখ দিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। দুধ আদুড় থাকিলে সাপ আসিয়া সেই দুধ খইয়া যায়, এবং সর্প-মুখ-নিঃসৃত বিষে দুগ্ধ বিষাক্ত হইতে পারে; সেই বিষাক্ত দুগ্ধ পান করিয়া মানুষ মারা গিয়াছে এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়। এজন্য দুগ্ধ প্রভৃতি তারের জালের ঢাকা, অথবা সচ্ছিদ্র লৌহের ঢাকার দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। সাহেবেরা তারের জালের বা বেতের জাফরির আলমারির মধ্যে খাদ্য রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাতে খাদ্যে বায়ু লাগিবার ব্যাঘাত ঘটে না, অথচ তাহা দূষিত হইবার সম্ভাবনা কম। অবস্থাপন্ন লোকেরা এই পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

যে কারণে রন্ধন-শালায় বায়ু সঞ্চালনের পথ খোলা রাখিতে হইবে, ঠিক সেই কারণে অর্থাৎ ভাণ্ডারজাত দ্রব্যাদি উত্তম অবস্থায় রাখিবার জন্য ভাণ্ডার গৃহেও দরজা জানালা রাখিতে হইবে—যেন ঘরে রীতিমত বায়ু চলাচল করতে পারে; নচেৎ, ভাণ্ডারের জিনিসপত্রও পচিয়া খারাপ হইয়া যাইবে। ভাণ্ডার গৃহে যাহাতে ইন্দুরের উপদ্রব না হয় সেজন্য মেঝে উত্তম রূপে পিটিয়া বিলাতী মাটী দিয়া পাকা করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইন্দুর অনেক রোগের বিশেষতঃ প্লেগের বাহন। ইন্দুর-দষ্ট খাদ্যাদি বিষাক্ত হইয়া প্লেগবিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকে।

বাড়ীর অপরাপর কক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে স্বতন্ত্র ভাবে অথচ যাতায়াতের অসুবিধা না হয় এমন স্থানে পাকা করিয়া পায়খানা নির্ম্মাণ করা উচিত। কি পাকা ইমারৎ কি মেটে ঘর—পায়খানা সর্ব্বত্রই পাকা করিয়া নির্ম্মান করিতে হইবে। এবং পায়খানার ভিতর-বাহিরে দেওয়ালের গায়ে যতদূর পর্য্যন্ত জল লাগিবার সম্ভাবনা ততদূর পর্য্যন্ত এবং পায়খানার মেঝে বিলাতী মাটী দিয়া সিমেণ্ট করাইয়া লইতে হইবে। মেথর-খাটা পায়খানা ফ্লোরের উপর নির্ম্মাণ করিতে হইবে; ফ্লোরের নীচে যেখানে বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে তাহা হইলে পায়খানা শুষ্ক থাকিবে, এবং দুর্গন্ধও কম হইবে। সেকালের কূয়া পায়খানা এই বৈজ্ঞানিক যুগে একেবারেই অচল। খুব গরীব গৃহস্থের পক্ষে পায়খানা নির্ম্মাণের সামর্থ্য না থাকিলে লোকালয় হইতে দূরে মাঠে অগভীর গর্ত্ত করিয়া পায়খানার কাজ সারা কর্ত্তব্য; এবং গর্ত্ত হইতে যে মাটী উঠিবে তাহা শুকাইয়া চূর্ণ অবস্থায় থাকিবে—প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর সেই শুষ্ক চূর্ণ মৃত্তিকা চাপা দিতে হইবে। গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া গেলে অন্যত্র আবার ঐরূপ গর্ত্ত করিয়া তাহাতে মলত্যাগ

করিতে হইবে এবং ঐ ভাবে মাটী চাপা দিতে হইবে মল আবৃত করা এতই আবশ্যক যে ইতর প্রাণীরাও সহজাত সংস্কার বশে তাহা করিয়া থাকে। কুকুর বিড়ালাদি জীবজন্তুর আচার ব্যবহার একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। সেই জন্য বিড়াল কুকুরাদি নরম মাটীতেই মলত্যাগ করিয়া থাকে—তাহাতে মল মাটী চাপা দিবার সুবিধা হয়।

গোয়াল ঘর, আস্তাবল, অশ্বশালা—এসকল বাসগৃহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দূরে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এবং পালিত পশুদিগের স্বাস্থ্যের খাতিরেও বটে, আর গৃহস্থের নিজের স্বাস্থ্যের খাতিরেও বটে—গোশালা অশ্বশালা প্রভৃতি নিত্য নিয়মিতভাবে ধৌত করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিতে হইবে। প্রত্যহ, অন্ততঃ একদিন অন্তর কিম্বা সপ্তাহে দুইদিন ফেনাইল ইত্যাদির দ্বারা গোশালা অশ্বশালা ও নর্দ্দামা ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারলে আরও ভাল। পালিত পলিত পশুদিগের মলমূত্রাদি প্রত্যহ স্থানান্তরিত করা উচিত।

বাসগৃহের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ সূতিকা-গৃহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের গৃহস্থ ঘরে সূতিকা গৃহ গৃহস্তের কলঙ্ক স্বরূপ। প্রসূতি ও গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা বিবেচনায় ও কল্যাণ-কামনায় বাটীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষই সূতিকাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে হয় ঠিক ইহার উল্টা; অর্থাৎ বাটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কক্ষ; পশুদিগের পক্ষেও যাহা অব্যবহার্য্য এমন কক্ষ সূতিকাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং সেই কক্ষে নব প্রসূতি স্বীয় সন্তান সহ বাস করিতে বাধ্য হন। এমন সুযোগ পাইয়াও যদি শিশুকে পেঁচোয় (ধনুষ্টঙ্কার রোগে) না পায়, তবে আর পাইবে কিসে? বাঙ্গালা দেশে জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ সূতিকা গৃহে অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। সেই জন্য, স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে বাসগৃহে নির্ম্মাণ করিতে হইলে বাটির মধ্যে একটি কক্ষ সূতিকা গৃহের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে। এই কক্ষটি, অন্যান্য কক্ষ সংলগ্ন না হইলেও হানি নাই, অপরাপর কক্ষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া সূতিকাগার নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু কক্ষটি বাসের পক্ষে (তা তাহা মোটে একমাস হইলেও) সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য—এমন কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। রোদ আলো হওয়া এই ঘরে প্রচুর পরিমাণে থাকা চাই। ঘরটি শুকনো ঘটঘটে দুর্গন্ধশূন্য হওয়া উচিত।

বাসগৃহ তথা বাস-গ্রামখানি পর্য্যন্ত যে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য, এ কথা বিশেষ করিয়া কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন হয় না—ইহা সকলেই অবগত আছেন। নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং বাসগৃহ পরিষ্কার রাখা শুচিতার অন্যতম লক্ষণ। এবিষয়ে কেহ যে ইচ্ছা করিয়া অবহেলা করিয়া থাকেন, এ কথা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অবস্থা-বৈগুণ্যে এ দিকে বিস্তর ত্রুটি ঘটিতেছে। ইহার প্রধান কারণ গ্রামগুলি ক্রমশঃ জন-বিরল হইয়া আসিতেছে। যথেষ্ট লোকের অভাবে গৃহস্থদের বাটীর সকল অংশ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয় না; এবং এই কারণেই বাসগৃহের সন্নিকটে জঙ্গলের উৎপত্তি হইতেছে। অনেক গ্রামে দেখা যায়—এক সময়ে গ্রামখানি সমৃদ্ধ ছিল—গ্রামের সমৃদ্ধির পরিচায়ক অনেক বড় বড় অট্টালিকাও দেখা যায়। কিন্তু অধুনা তাহাদের ভগ্ন দশা। হয় গৃহস্থের অবস্থা এখন খারাপ হইয়াছে, নচেৎ বহু সরিকে বিভক্ত হওয়ায় সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; কিম্বা চাকুরী বা বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে কর্ত্তৃস্থানীয় লোকেরা প্রবাসী হওয়ায় বাস গৃহের যত্ন লইবার কেহ নাই। হয় ত দুই একটি বৃদ্ধা বিধবা উপায়ান্তরের অভাবে কিম্বা সাত পুরুষের ভিটার মায়া কাটাইতে না পারিয়া তুলসী তলার সন্ধ্যাদীপ দিবার জন্যই বোধ হয় সেখানকার মাটী কামড়াইয়া কোন রকমে পড়িয়া আছেন। প্রকাণ্ড বাড়ী সংস্কারাভাবে জীর্ণ, পরিষ্কার রাখিবার লোকাভাবে জঙ্গল ও আগাছায় পূর্ণ। ব্যষ্টিভাবে এক একটী গৃহের অবস্থা যেমন, সমষ্টি ভাবে সমস্ত গ্রামখানির অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। ইহার প্রতিকারের উপায় যাঁহারা প্রবাসে আছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া। তাঁহারা আবার গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলে গ্রামগুলির

পূর্ব্ব শ্রী-সম্পদ ফিরিয়া আসিতে পারে; জঙ্গল পরিষ্কার হইতে পারে; পুষ্করণীর পঙ্কোদ্ধার হইতে পারে; গ্রামের বাসগৃহগুলি এবং সমস্ত গ্রামখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

কিন্তু তাই বলিয়া এখন যাঁহারা গ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহারা যে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবেন তাহাও নয়। বাসগৃহ পরিষ্কার না রাখিলে তাঁহারাই বা কত দিন সেখানে বাস করিতে পারিবেন? অতএব গৃহের আবর্জ্জনা প্রত্যহ গ্রামের বাহিরে নিক্ষেপ করিতে হইবে; গোয়াল ও অশ্বশালার আবর্জ্জনা প্রত্যহ একটা চৌবাচ্ছায় সংগ্রহ করিয়া তথা হইতে গ্রামের বাহিরে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। পায়খানা মেথর দিয়া প্রত্যহ পরিষ্কার করাইতে হইবে। নর্দ্দামা দিনে দুই তিনবার ধৌত করিতে এবং সুবিধা হইলে প্রত্যহ একবার ফেনাইল প্রভৃতি দ্বারা শোধিত করিতে হইবে। বাড়ীর কাছে এমন কি গ্রামের মধ্যেও গ্রামের বাহিরে কিছু দূর পর্য্যন্ত জঙ্গল ও আগাছা কাটাইয়া জলনিকাশের পথ খোলা রাখিতে হইবে।

স্বাস্থ্য-সমাচার
চৈত্র, ১৩২৭।

সমালোচনা

ধান-দূর্ব্বা। শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। গিরীশ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। অনেকগুলি খণ্ড কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাবে-ভাষায় সেগুলি বিচিত্র-সম্পদশালী। ছন্দে সলীল প্রবাহ আছে, প্রাণ আছে। সমস্ত কবিতাগুলি উপভোগ্য, সুন্দর। তবে বাছাই করিতে গেলে বলিব, 'স্বর্ণমৃগ' কবিতাটি আমাদের খুব সুন্দর লাগিয়াছে; ভাবে ভাষায় জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতার পাশে স্থান পাইবার যোগ্য।

"চাঁদের হাসি ডুব্‌ল কবে পাহাড়গুলোর পিঠে?
সুধার নেশা লাগ্‌ছে না আর মিঠে।
বুড়ো হয়েই গেছে সে চাঁদ আমার সাথে-সাথে
নেই সে চুমু শারদ-জোছনাতে,
চুম্বকেরি টানে যখন যুগল এসে মিল্‌ত হাতে হাতে
টান পড়িত ফুলের সে ছিলাতে।"

এই কয় ছত্রে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলির ভাব-সম্পদের মতই ভাবৈশ্বর্য্যের সন্ধান মিলে। এই কবিতাটিতে কবি ছন্দের যে সহজ লীলা-ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, তাহা ভাবের সঙ্গে সমান তালে নাচিয়া চলিয়াছে; ছত্রের পর ছত্রে বিচিত্র ছবি ফুটিয়াছে। 'কুণাল-কাঞ্চন' গাথা কবিতাটিতে pathosটুকু চমৎকার ফুটিয়াছে। 'নববর্ষ', 'ভুল', 'বসন্ত-বিলাস', 'বাসন্তী', 'গগন', প্রভৃতি কবিতাগুলি lyric এর আনন্দ-বিহ্বলতার ও স্বপ্নময়তায় ভরপুর। কবির লেখনী নিতান্ত ঘরোয়া সাধারণ জিনিষকে মর্ত্ত্যের ধূলি-জঞ্জাল হইতে টানিয়া তুলিয়া এমন সোনার স্বপ্নে রঙীন করিয়া আঁকিয়াছেন, জ্যোৎস্না-রেণু মাখাইয়া তাহাদের এমনি রঙের ফোয়ারায় স্নান করাইয়াছেন যে তাঁহার শক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, পুলকিত হইয়াছি। 'বাংলা দেশের মেয়ের' তাহার পরিচয় পাই। ভাষার উপর কবিতার শক্তি অসাধারণ। ভাষা এই বেশ হালকা ঝর্‌ঝরে, আবার প্রয়োজনমত তাহা নিমিষে আবার গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে! এই কবিতাগ্রন্থখানি বাংলার কাব্য সাহিত্যে পরম সম্পদের সামগ্রী হইয়াছে, ব্যক্ত ও অব্যক্তের আভাষে পরম রমণীয়, এই কবিতাগ্রন্থ কাব্যামোদীমাত্রেরই চিত্ত অপূর্ব্ব পুলকে তৃপ্ত করিবে, মুগ্ধ করিবে। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই—অর্থাৎ ভিতর-বাহির, সমস্তই চমৎকার হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

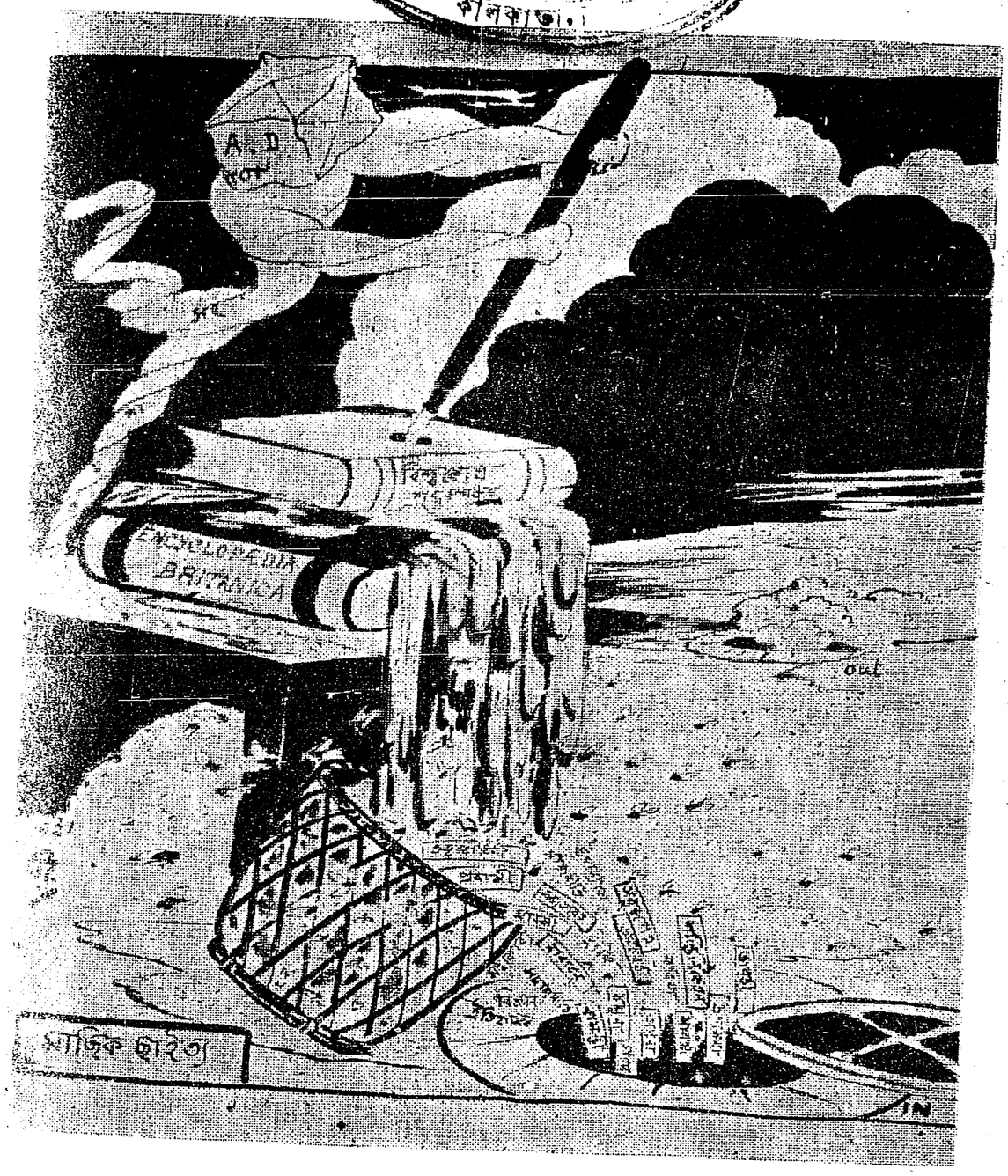

মাছিক ছাইত্য

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ [২য় সংখ্যা

শেষ-শয্যায় নূরজহান্

স্থান—লাহোর [প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে রোগশয্যায় নূরজহান্ ; পায়ের দিকে খোলা-জানালার ধারে প্রধানা-সহচরী জোহরা বসিয়া আছে। ভিতরের দিকে বড়-বড় খিলানময় জাফ্‌রিদার অতিদীর্ঘ বারান্দা। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের একাংশে বিশেষ করিয়া সাইপ্রেস্-(সরো)-গাছ গুলি দেখা যাইতেছে। বাহিরে দূরে জহাঙ্গীরের সমাধি শাহদারা] কাল—দিবাবসান।

জোহরা

সারারাত কাল ঘুমাওনি বুঝি ? সারাদিন আজ জাগিলে না যে !
বেলা পড়ে' এল, শাহী-নহবত্ প্রহর-ঘণ্টা মহলে বাজে।
নট্‌কান্-রাঙা আলোটি পড়েছে মিনার-চূড়ায় শাহদারায়,
এমন সময়ে তুমি যে গো রোজ বসে' থাকো থির-আঁখিতারায় !
মুয়াজ্জেন্ ওই মস্‌জিদে ধরে সন্ধ্যা-আজান্ মগ্‌রবের,
পিলু-বারোয়াঁয় বাঁশিটি ফোঁপায় কোথায় বিদায়-উৎসবের !
ফোয়ারায় জল ঢালিছে পাথরে—শোনা যায় যেন আরো সে কাছে,
টুক্‌টুকে-নখ নীলা-কবুতর্ আলিসার 'পরে আর না নাচে !
ঘরের দেয়ালে দূর-বাগানের পাতা-ঝিল্‌মিল্ কাঁপিছে ছায়া,
দুধে-পাথরের খিলানের গা'য় আকাশের লাল মেঘের মায়া !
ওঠো একবার ! নওরাতি আজ—শেষ নওরোজ হয়ত এই,
এদিনের মত স্মরণ-বাসর তোমার নসীবে আর যে নেই !

—পাদিশা-প্রেয়সী নূরজহান্ !

জেগে আছো মাগো—তাইত! দেখি যে চোখের কোণায় জল গড়ায়—
গোস্তাখি মাফ্ কর হজ্‌রত্! প্রাণ যে আমার ভুল করায়!
শুভদিনে আজ চোক চাহিলে না, ওক্ত যে সব বহিয়া যায়!
আজিকার দিনে খোদার দুয়ারে জানাবে না শেষ প্রার্থনায়?
এইখানে তুমি বসিবে, গায়িব হাম্‌দ্-গজ্‌ল্—তোমারি গান,
আজ নওরাতি—জ্বালাবে না বাতি? সাজাবে না তাঁর গোলাবদান?
ওকি হাসিমুখ! চাহনি তোমার হঠাৎ হ'ল যে কেমনতর!
হঠাৎ অচেনা মনে হয় তোমা—আজিকে কেন মা এমন কর'?

নূরজহান্

কেন মিছে ভয় করিস্ জোহরা? তুই যে আমার ছোট বহিন্!
শাহ-বেগমের গরব কোথায়! তোরও চেয়ে আমি অধম হীন।
আজ নওরাতি?—জ্বালাস্‌নে বাতি মরণ-শিয়রে আমার ঘরে,
যত বাতি আছে জ্বালা'তে ব'লে দে শাহান্-শাহার সমাধি 'পরে।
মোর তরে আর নমাজ নাহিরে, পাতিস্‌নে আর মুসল্লায়,
বিশ্বপতির দরবারে মোর সকল আরজ্ আজ ফুরায়!
দেহের-মনের ইদ্‌গাহে মোর মেহেরাবে জ্বলে হাজার বাতি,
আজ থেকে তাই অনন্ত মোর চিরমিলনের সে নওরাতি!
তুই জেগে থাক্ সেহেলি আমার—শেষ সহচরী! মাথার পাশে,
বাদামের জলে আফিম্ মিশায়ে দিস্ বারেবার—যাতনা নাশে।
আজ রাতে আর ঘুমা'ব না আমি, ঘুমেরি মাঝারে রহিব জেগে,
তুই চেয়ে দেখ্—কবরে কখন্ বাতি নিবে যায় বাতাস লেগে।

জোহরা

ঘুমাও ঘুমাও! আর জাগা'ব না, মেজাজ তোমার ভালো যে নাই,
সারাদেহে এ যে আগুনের জ্বালা! উঠিতে আজিকে পার নি তাই।
বক্সীরে আমি খবর করিগে, হাকিম আসেনি এ-বেলা কেন?
মরিয়ম আর সখিনা-বাঁদীরে ব'লে দেই—থাকে হাজির যেন।

নূরজহান্

এত ক'রে বলি, বুঝিস্ নে তুই! বোস্, কাছে আয়, হয়নি কিছু,
বুড়া হ'লি তবু বুদ্ধি হ'ল না, মিছে ঘুরে মলি আমার পিছু!

হাম্‌দ্ গজ্‌ল্—ভগবৎ-সঙ্গীত। মুসল্লা—নমাজের আসন।
ইদ্‌গাহ্—উপাসনাগার। মেহেরাব্—বাতি জ্বালাইবার বেদী।

আজ যে আমার সব ঘুচে গেছে, সব শোক-দুখ, সব বালাই!
এ-বিশ বছর যার ধ্যান করি, কাল তার দেখা পেয়েছি ভাই!
মাফ্ পেয়েছি যে—ছুটি আজ থেকে, হুকুম মিলেছে খোদা-তা'লার,
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার!
সারা রাত কাল স্বপন পেয়েছি, দিনে তা' জপেছি ঘুমের ভাণে,
মগ্‌রব্-বেলা ডাকিলি যখন, শান্তি নেমেছে সারাটি প্রাণে।
আর বেশীখন নয় রে জোহরা, রাতটা বুঝি বা হয় না ভোর—
মিছে শোক তুই কেন বা করিস্, আজ শেষ—আজ ছুটি যে মোর!
কাঁদিস্‌নে তুই! এত সুখে তবু কান্না দেখিলে কান্না আসে,
স্নেহমমতার সব শেষ, তবু দুঃখের নেশা ঘুচিল না সে!

জোহরা

কি যে বল তুমি আলি-হজ্‌রত্! এত-বড় শোক মানুষে পায়!
কি হ'য়ে, কি বেশে, ধরা হ'তে আজ চুপে-চুপে তুমি নাও বিদায়!
সুখ কোথা রাণি!—মহারাণী মোর! হিন্দ-রাজের শাহ-বেগম!
চেয়ে দেখ, ওই তাঁহারো শিয়রে আলো যেন আজ জ্বলিছে কম!
অগাধ আকাশে ওই যে হোথায় টুক্‌রা যেন সে জরীন্ ফিতা—
ওরি মত হাসি তুমিও হেসো না, ভুলে গেলে তুমি আছিলে কি তা!
আমি যে দেখেছি ওই চুলরাশ রুমাল খুলিয়া পড়িত খসে',
একাকার হ'ত ঝিনুক-বসানো আব্‌লুসে-গড়া তখ্‌তপোষে!
চোখের পাতার রেশ্‌মী ঝালরে হামামে দাঁড়া'ত জলের ফোঁটা,
সুর্ম্মা আঁকিতে হ'ত না কখনো, হাসিতে ঝরিত মুক্তা গোটা!
ওই হাতে ধরি' হাতিয়ার, ফের আঙুলে বুনেছ ফুলের ছবি!
ওই পায়ে তুমি পায়েলা পরিয়া বীর দলিয়াছ, ভুলেছ সবি?
মরণ-ডঙ্কা কণ্ঠে বেজেছে, বেজেছে সাহানা—পরীর সুর!
চাহনি তোমার শের-মোগলের শরাবের নেশা করেছে দূর!
সেই-চোখে আজ আঁধার নামিছে, সেই-মুখে আজ স্বপন-হাসি—
এত দুখ তব সুখ হ'ল আজ! সেইগুলা ছিল দুঃখরাশি?
কারে ভুলাইছ? কার কাছে তুমি হাসিয়া রুধিছ চোখের জল?
কায়-মনে আমি সেবিনু তোমায়, আমারে ভুলা'তে কেন এ ছল?
ওই হাসি তুমি পোরো না ও মুখে, বাঁধিও না ওই চোখের বাঁধ,
পায়ে মাথা রেখে কেঁদে নিই আজ, মিটাইয়া মোর মনের সাধ।

হামাম্—স্নানাগার।

মরেছে বটে সে ভাইঝি তোমার—আরজমন্দ ভাগ্যবতী,
অমন তখ্‌ত-তাউসে বসিয়া কাঁদে তার লাগি' দুনিয়াপতি !
ষোলটি-বছরে-জমানো অশ্রু জমাট্‌-পাথরে হ'তেছে গাঁথা,
প্রেয়সীর শেষ-শয়ন বিছা'তে মাটিতে বেহেশ্‌ত্‌ তুলেছে মাথা !
দীন্‌-দুনিয়ার মালিক যে জন তাঁর নাকি বড় ন্যায়-বিচার !—
মমতাজ পায় তাজের শিরোপা, নূরজহানের কাফুন সার !

নূরজহান্‌

চুপ চুপ ! ওরে অবোধ ভিখারী ! বলিস্‌ নে আর অমন কথা !
আমারি মনের শেষ মলাটুকু তোরও প্রাণে দেখি জাগায় ব্যথা !
যা ছিল আমার সব ভালো ছিল—খোদার শ্রেষ্ঠ দো'য়ার দান,
যা ঘটেছে মোর সারাটি জীবনে, গোড়া থেকে শেষ—সব সমান।
একতিল তার দেখি না যে তিত, সবই যে শিরীন্‌—করিনা শোক,
সব পাপ-তাপ দম্ভ-বিলাস—কামনার পথে অমৃতলোক !
জন্ম যাহার পথের মরুতে, মেটেনি প্রথম স্তনের তৃষা—
তনুটি তাহার অনলের শিখা, মনটি যে তার হারায় দিশা !
আগুনের লোভ করেছে যে-জন আপনি সে-জন ভস্মশেষ,
মন খানি বুঝে মাতাল যে-জন—পরা'য়েছে সেই রাণীর বেশ !
আমার পিপাসা সেই নিয়েছিল—আপন পাত্র গরলে ভরি',
ভুলা'য়ে রাখিল হীরার মুকুটে, নিজে তখ্‌তের পায়াটি ধরি'।
কোনো জ্ঞান মোর ছিলনা তখনো—কোথায় চলেছি কিসের খোঁজে,
চিনেছিল শুধু একজন সেই, প্রেম যার আছে সেই যে বোঝে !
রংমহলের হুর্‌-পরী-দলে নামটি দিল সে—নূরমহল।
ষোড়শীর রূপে মজেছিল সে কি ? যৌবন শেষ—তবু চপল !
আমার মাথায় তাজ দেখেছিলি—দুর্‌-মর্‌জান্‌-মোতি-বাহার ?
তারি শোকে তোর ধারা বয় চোকে ! বেইমান্‌, দাও দোষ খোদার !
তোর দোষ নেই, আমিও বুঝিনি, দেখিনি তখন এমন করে'—
শাহ-বেগমের নকল খেলায় আসলের নেশা গেছিল ধরে' !
মমতাজ !—আহা, রুহু যেন তার খোশ্‌হালে রয় আল্লা-তা'লা !
গগন-সমান গম্বুজ গড়ি' খুরম্‌ সাজায় অশ্রুডালা !

কাফুন—শব আচ্ছাদন করিবার বস্ত্র। রুহু—আত্মা।

মরণের পরে শোকের নিশানা অমর যেজন করিতে চায়—
আপনারে তার দেয় নি বিলা'য়ে—প্রেমেও গর্ব্ব ! হায়রে হায় !
আমারে যেজন ভালোবেসেছিল—নিজের মাথার মুকুট খুলে'
হিন্দুর মত প্রতিমায় তার অর্পিল সব, আপনা ভুলে'।
মহলের নূর ছিল যেই তার, তাহারে করিল নূরজহান্‌,
জীবনেই তারে জয়মালা দিল, ফিরায়ে নিল না আর সে দান !
আল্লারে মোর হাজার শোকর্‌—চলে' গেল আগে আমায় রেখে,
সেইদিন হ'তে বুঝেছি জোহরা, বুঝি নাই যাহা নিকটে থেকে।
যে-বাতাস তোর নাকের নিশাস তার চেয়ে বড় দখিনে-হাওয়া !
মরিয়া যেদিন বুঝাইয়া দিল, ছেড়ে দিনু সব দাবী ও দাওয়া।
রূপের গর্ব্বে ধিক্কার হ'ল—মরিল যেদিন শের আফ্‌কন্‌,
'নার্‌' গেল, 'নূর'—সে ও ঘুচে' গেল, নির্ব্বিষ হ'ল এ দেহ-মন !
তার পর হ'তে এ বিশ বছর একে একে সব গিয়েছে ধুয়ে,
জীবনের যত সুখ-দুখ-ফুল-ফল হ'য়ে আজ পড়িছে নুয়ে।
বোস্তান্‌ আর গুলেস্তানের রূপটি ধরেছে সব হায়াত্‌—
সাপ-শয়তান বুল্‌বুল্‌ হ'য়ে গায়িছে সারাটি জ্যোৎস্নারাত !
যত শোভা—সে যে বাসনারি রূপ, রূপের জগৎ কী সুন্দর !
বাসনায় যার বাঁশী বেজে ওঠে, ঘুচে যায় তার ইহ ও পর।
আগুনে যেমন সব বিষ যায়, প্রেমেও তেমনি সকলই শুচি,
কামনার কালি তাহার পরশে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে—হীরার কুচি !
তবু একটুকু আছিল আমার কলিজার তলে ব্যথার দাগ,
কোনোমতে তারে মুছিতে পারিনি—সেই টুকু ঘোর রক্তরাগ !

জোহরা

আম্মা-বেগম, কহিও না আর—ভয়-ভয় করে এসব শুনে',
এ যেন তোমার জ্বরের খেয়াল, এত জোর পাও কিসের গুণে ?
আরে একি হ'ল ! দেখ, দেখ, যেন আগুন লেগেছে শাহদারায় !
এত আলো হোথা কিসে হ'ল আজ ? এত বাতি আজ কারা পোড়ায় ?
আহা, তুমি কেন ?—উঠোনা উঠোনা !— আহা-হা, আবার ঘুরিল মাথা !
কি যে চাও তুমি আমারে বল' না ! কেন এতখন বকিলে যা'-তা' ?

নার—তাপ। নূর—আলোক। বোস্তান্‌—সৌরভময় স্থান।
গুলেস্তান—পুষ্পোদ্যান। হায়াত—জীবন।

শরবৎ দিব ?—ঘুমের আরক ?—শামাদান তবে শিয়রে দিই ;
ও-দেহে তোমার আছে আর কিবা ! চোকদুটি এই মুছায়ে নিই।

নূরজহান্

আমার কাহিনী তুই বুঝিবি না, বুঝেছে সে কথা আর একজন—
দুনিয়ার মাঝে দরদী যেথায়, করিবে অশ্রু বিসর্জ্জন।
যেদিন চেয়েছি কবরে তাঁহার ব্যথায় গুমরি' গভীর রাতে,
অমনি আলো সে জ্বলেছে দ্বিগুণ—আগুনের মত ঝঞ্ঝাবাতে !
একটু সে দাগ কিছুতে মোছে নি, তখ্‌তে বসিয়া ভুলিনি তবু !
তা'ও মুছে গেছে এপারে থাকিতে—স্বপনে সে আশা করি নি কভু।
জানিস্ জোহরা ! দর্শন দিতে বসেছি যখন দেওয়ানি-খাসে,
ঝরোকার তলে প্রজারা দাঁড়ায়, সেও দেখি আছে দাঁড়ায়ে পাশে !
সেই আলিকুলী শের-আফ্‌কন্—দৃপ্ত-সহাস, অমন বীর !
বক্ষকবাট যেমন বিশাল তেমনি ললাট, উচ্চশির !—
ম্লানমুখে সে যে রয়েছে দাঁড়ায়ে, ধূলায়-রক্তে ভরেছে বেশ !
বুক-ফাটা সে কি নীরব চাহনি !--কি যেন আরজ্ করিছে পেশ !
মূর্চ্ছার বশে টলিতে টলিতে ঘরে ফিরে' গেছি পাণ্ডাশ মুখে,
চীৎকার যেন গলায় চাপিয়া লাইলিরে মোর টেনেছি বুকে !
কতকাল হল, আর ত' দেখি নি ! তবু ভুলি নাই, ভোলা কি যায় !
মরণ-ধূসর মূরতি তাহার মনের মাঝারে মূর্চ্ছা পায় !
সব দুখ যবে সুখ হয়ে গেল, সব সুখ হ'ল মুক্তি-সেতু,
মরণে যখন লভিব বিরাম—সেই হ'ল শেষ দুঃখ-হেতু !
তাঁর সাথে মোর মিলনের পথে মরণেও বাদ সাধিল সেই !
এ কি এ বিষম গজব্ তোমার—প্রেমময় ! প্রেমে মাফ্ কি নেই ?
কাল রাতে তার জবাব পেয়েছি, হুকুম মিলেছে খোদা-তা'লার,
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার !
চোখ যদি থাকে দেখে নে জোহরা, আজিকার এই সুখের হাসি ;
শিশিরে-ধোয়া সে গুল্‌শন্ নয় ?—নওশার লাগি' ফুলের ফাঁসি ?
আলিকুলী আর আসিবে না ফিরে, আসিলেও আর চিনিবে না সে,
জরা-যৌবন এক যার কাছে—সেই বাঁধি' ল'বে বাহুর পাশে।

গুল্‌শন্—ফুলবীথি। নওশা—বর।

এই শাদা-চুলে সিঁথির সীমায় চুমা দিবে সে যে অশেষ স্নেহে,
চিরযৌবন-রৌশন্ রূপ ফুটিবে আমার জীর্ণ দেহে !
জোহরা ! জোহরা !—

জোহরা

কি বলিবে বল, চুপ কর কেন আম্মাজান্ ?

নূরজহান্

ওই শোন্—ওই !

জোহরা

এশার ওক্ত—মস্‌জিদে ও যে দেয় আজান !

নূরজহান্

না না, ও যে দূর বাঁশীর আওয়াজ ! শোন্ দেখি তুই কাণটি পেতে,
মাঝে মাঝে আমি কেবলই শুনি যে—শুনি ওই সুর দিনে ও রেতে।
জ্যোৎস্নায় যেন জুড়াইয়া দেয়—ক্লান্ত নয়ন মুদিয়া আসে,
কখনো গভীর আঁধার-নিশীথ—দুই চোখে দেখি শিশির ভাসে।
না,না,—কাজ নেই, সেই ভালো—আমি একাই ঘুমাব !—সে যদি কাঁদে ?
কোথায় ! কোথায় ! দূর—বহুদূর ! মাটির বাঁধনে তা'রে কি বাঁধে ?

জোহরা

আর কথা নয়—চোক জলে ভাসে ! কপালে তোমার হাত বুলাই,—
ঘুমাও দেখি মা একটু এখন ! আমি বসে' হেথা পাখা দুলাই।

নূরজহান্

তবু, দেহখান—যেখানে সে থাক্—তাঁর দেহ থেকে রবে না দূরে,
দেখিস্ তাঁহার কবরের ছায়া পড়িবে আমার বুকটি জুড়ে'।
ওরা যে বোঝে না, ভাবে—কত পাপ, কত সে পিপাসা প্রেমের নামে !
শা'জহান্ তাই বিচারে বসেছে, দিবে না আমারে শুইতে বামে।
আমি ত' চাহি নি' মর্ম্মর-বাস শাদা ধব্‌ধবে পাথরে-গাঁথা !
ধূলামাটী, সে যে জীবের জননী—আর কার কোলে রাখিব মাথা ?
এই ধরণীর দুলালী আমি যে, ধূলায়-কাদায় ভরি' আঁচল
ঢেলা ভেঙে আমি বুনেছি ফসল—রাঙা হৃদি-ফুল, অশ্রু-ফল !

রৌশন্—উজ্জ্বল।

শুধু পাশটিতে, একটু সে কাছে,—তা'ও সহিল না শাহজহান্!
মমতাজ বুঝি দিব্য দিয়েছে? তাজের মহিমা হইবে ম্লান?

জোহরা

ওই দেখ দেখি, ব্যথা নাকি নেই? সব মুছে গেছে—সকল জ্বালা?
বুকের ভিতরে সব চাপা আছে, কপালে বিঁধিছে কাঁটার মালা!
আমি যে তোমার মন ভাল জানি, কেঁদেছি কত যে ও-মুখ চেয়ে!
চোক ফেটে জল দেখেছি গড়ায় আপনি তোমার গণ্ড বেয়ে।
শেষ সাধটুকু, তা'ও পূরিবে না? মানুষের বুক এত পাষাণ!—
পাথরের রূপে মজিয়া করেছে কঠিন আপন কলিজাখান!

নূরজহান্

খসে'-পড়া বড় তারার মতন এতটা আকাশ আসিলে বেয়ে—
লাল হ'য়ে গেল পাণ্ডুর রাতি তোমার দেহের আলোক পেয়ে!
চেনাবের তীর, পিপাসা-অথির কেঁদে কেঁদে বয় পাহাড়ে নদী;
তোমার-আমার চেনা সে চেনার—এই গাছ-তলে বস'গো যদি!
বন্-গোলাপেরা চেয়ে আছে দেখ, হাসিমুখে নাই ভাবনাটুক্—
সুন্দরী ওরা, রূপের পসরা!—তবু কোনো দিন পায়নি দুখ!
অশ্রু-শিশিরে আতরের বাস, ঝরা-পাপ্‌ড়িও কেমন চায়!
ফুলের মতন হওয়া কি বারণ?—রূপ র'বে বিনা দুখের দায়!
কি এনেছ ভরি' স্ফটিক-সুরাহি? কওসর হ'তে আবে-হায়াত্?
তুমি আগে পিও, তোমার আননে এখনো ঘোচেনি কালিমাপাত!
স্বর্গের সুরা এই সে তহুরা!—আনিয়াছ ভরি' আমারি তরে?
চুমুকে-চুমুকে সব ব্যথা যাবে! সব স্মৃতি নাকি উদাস করে?
তুমি চাও না সে! কোনো দুখ নেই?—এখনো নয়নে নেশার ঘোর!
কোন্ মদ পিয়ে মাতোয়ারা তুমি—এত অচেতন, হে প্রিয় মোর?
আমি যে পারি না সহিতে সকল, দাও দাও মোর কণ্ঠে ঢালি'—
শুধু দুখ নয়!—সুখ সেও যাবে, সব বুকখান করিয়া খালি!
শুধু যাবে না সে নূরজহানের শাহীদরবার—শের-আফ্‌কন্?
যাবে তারি সাথে কুমারী-মেহের—শাহজাদা—আর সে চুম্বন?
নিষ্ঠুর তুমি! টলিছে না হাত! মিশা'লে না ফোঁটা আঁখির জল!
ব্যথা নাই! তবে সুখও নাই বুঝি? তবে কেন এলে—কেন এ ছল?

কওসর—স্বর্গনদী। আবেহায়াত্—সঞ্জীবনী বারি।

'ভালোবাসিয়াছি তোমারে পিয়ারী, তার বেশী মোর চাহি না সুখ,
'কওসর-বারি তহুরা-শরাব তুমি পান কর, জুড়াও বুক!
'আমার বলিয়া কিছুই নাহি যে—আমার পুণ্য, আমার পাপ—
'যা করেছি ফের করিতে যে পারি, কিসের দুঃখ, কি পরিতাপ?
'তুমি পান কর, ভুলে যাও সব, কাঁদিও না আর সে সব স্মরি'—
'মাগিয়া এনেছি তোমারি লাগিয়া এ-পানি খোদার আরস্ ধরি'।
'দুখ যদি সুখ না হয় সাধনে, প্রেম—সে যে শুধু পিয়াস-জ্বালা!
'কর পান কর, সব ভুলে যাও! নামাইয়া দাও ব্যথার ডালা।'
আর বলিও না! বুঝিয়াছি সব,—ওরে অভাগিনী অবোধ নারী!
আজ শেষ! আজ সকল গর্ব্ব-অভিমান দিনু চরণে ডারি'।
আমারে কুড়া'য়ে ধূলি হ'তে নাও, গেঁথে নাও বুকে মোতির সাথে!
কণ্ঠে দুলিব, ধু'য়ে গেছি আজ তব নয়নের আলোক-পাতে!
মিটিয়াছে ক্ষুধা, চাহি না ও সুধা—ফিরাইয়া দিও দয়ার দান,
আর জাগিবে না, কাঁদিবে না আর জহাঙ্গীরের নূরজহান্!
আজ নওরাতি! জ্বেলে দেরে বাতি, হেনা দিয়ে দিস্ দুখানি হাতে,
সুর্ম্মায় চোক ডাগর ক'রে দে, চুমিবে সে মোর নয়নপাতে!

জোহরা

আম্মাবেগম, বাতি নিবে যায়, জ্বালাইয়া ফের দিব কি তবে?
আকাশে দেখি যে বাদল নেমেছে—বাতাস উঠেছে—ওমা কি হবে!
ঘুমাইলে বুঝি? ঘুমাও ঘুমাও! কাজ নাই মিছা জাগিয়া আর—
ওই-যা! হোথায় আলো নিবে গেল!—কবর আঁধার শাহদারার!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

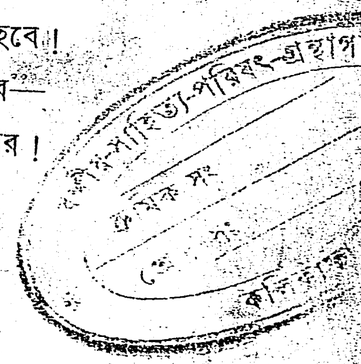

স্বখাত সলিল

ক

স্নানের সময় পুকুরঘাটে তার সঙ্গে আমার দেখা হত। ছোট সহরটির এক টেরে একই পাড়ায় আমাদের বাড়ী, মাঝখানে এই পুকুরটির মাত্র ব্যবধান, সে ব্যবধান ভোরে আর সাঁঝের বেলায় তর্‌তরে ঢেউয়ে তরঙ্গায়িত কল্‌মী কহ্লার ও অন্য নানাজাতি ফুলের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হত। সোনা পোকারা তাদের সোনালি পাখা কাঁপিয়ে ফুল থেকে ফুলে ভিড় করে উড়ে বেড়াত।

২

আমি দম নিয়ে ডুবে থেকে বল্‌তাম, 'দেখ্‌লে রাণী, কেমন এক ডুবে ওপার থেকে গিয়ে ফিরে এলাম ?'

সে বিপুল আগ্রহে নেচে উঠে বল্‌ত, 'কই, দেখি না আবার !'

আবার ডুব দিয়ে বল্‌তাম, 'দেখ্‌লে ?'

সে তার বড় বড় চোখদুটিকে বিস্ময়ে আরো বড় করে তুলে বল্‌ত, 'হাঁ, সত্যি ত ! তুমি যখন যাচ্ছিলে, উপরে থেকেও আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম।'

তার বুদ্ধি-সুদ্ধির কিছু কি অভাব ছিল ? তা নয়, আর অতটুকই ত মেয়ে ! তবে সেই বয়সেই তার সরল হৃদয়ের অকুণ্ঠিত বিশ্বাসকে সে আমার উপর ন্যস্ত করেছিল। আমাকে সে যে কি ঠাউরেছিল তা জানিনে, মাষ্টারের কাছে শেখা বোধোদয়ের ব্যাখ্যা আর ত্রৈরাশিকের নিয়মগুলোকে পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে যাচাই করে না নিলে তার তৃপ্তি হত না !

মনে আছে, পুকুরের এক কোণে তিনটে ডুমুর গাছ তাদের ঝাঁকড়া ডালপালা সুদ্ধ জলের উপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছিল। সেই-খানটায় ছিল অন্ধকার আর আমাদের শিশু-মনের হাজারো-রকম ভয়-কল্পনার রাজ্য। পারতপক্ষে সেদিকে আমরা যেতাম না। আর ঠিক সেইজন্যেই পাড়ার ছেলেদের সর্দ্দার সনাতন ছোঁড়াটা সকলের কাছে বাহাদুরি নেবার মৎলবে বাঁধা নিয়মে সেইদিক্ দিয়েই রোজ জলে নাম্‌ত।

একদিন দেখি সেই অভ্যাস অতিক্রম করে, গামছা কাপড় আর তেলের বাটি নিয়ে দিব্যি ভালোমানুষটির মতো সে আমা-দের ঘাটটিতে এসে জুটেছে। কোনোরকমে স্নান শেষ করে উঠে পড়্‌লাম, তারপর রাণীকে ডেকে বল্‌লাম, 'তোমার কি আজ আর হবে না রাণী ? সমস্ত দিন জলে পড়ে থেকে জ্বর না এনে বুঝি ছাড়্‌বে না ? যাই, তোমার মাকে বলিগে।'

ভিজে আঁচলটাকে তাড়াতাড়ি টেনে গায় জড়াতে জড়াতে জল ছেড়ে সে উঠে এল, তার চুলগুলি পর্য্যন্ত ভালো করে ভিজ্‌তে পেল না !

তার পরদিন স্নানের সময় রাণী যখন তার খেলা শেষ করে উঠে পড়্‌তে যাবে আমি বল্‌লাম, 'তুমি জানো না, এই খেলাঘরই হচ্ছে মেয়েদের ঘরকন্নার পাঠশালা। বড় হয়ে ঘর-সংসার করে যে তোমায় খেতে হবে সে কথা একবার ভাবো ?.....'

সে তার বড় বড় চোখদুটিতে ভয় ভরে নিয়ে একবার নূতন করে তার আধ-শবের খেলাঘরটির দিকে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে। তার প্রসন্ন হাস্যে আবার ঝুঁকে বসে খেল্‌তে লেগে গেল।

কয়েকটা দিন বেশ শান্তিতে নিরুপদ্রবে কাট্‌ল। আমি পুকুরের চারপাড় থেকে কল্‌মীর ডগা, তেলাকুচো, কচু প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। খড়িমাটি গুঁড়ো-গুলে দুধ আর পাকা পোক্ত শান গুঁড়ো করে মশলা তৈরি করে দি। রাণীর নিপুণ হাতের স্পর্শ পেয়ে সেগুলো নানা রকম চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসে ; বাড়ীর কুকুর বেরালগুলোকে জোরজুলুম করে টেনে এনে বসিয়ে বাটিতে বাটিতে তাদের সেবা

পরিবেষণ করা হয়, তাদের কোন আপত্তি শোনা হয় না।

খ

তখন আমার ক্লাশ বদলের এগ্‌জামিন। সমস্ত বছরের বাকী-বকেয়া পড়া দুটি মাসের মধ্যে সুদ সুদ্ধ আদায় কর্‌বার চেষ্টায় আছি, তাই রাণীর ঘরকন্নার তদ্বির করতে যেতে পারিনে। একদিন কি একটা কারণে সকাল সকাল ইস্কুলের ছুটি হয়ে যাওয়াতে লুকিয়ে তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, জামার আস্তিন গুটিয়ে মালকোচা মেরে মহা উৎসাহে সনাতন তার খেলাঘরের ভাঙা বেড়া সার্‌তে লেগে গেছে !

আমার হাতে ছিল ইংরেজি একটা ইতিহাসের বই। সেইটেকে চট করে কোঁচার নীচে লুকিয়ে আল্‌গোচে কয়েক পা পেছিয়ে গিয়ে ডাক্‌লাম, 'রাণী, তোমার জন্যে কি এনেছি দেখ'সে !'

সে চম্‌কে ফিরে চাইল, তারপর ঘর মেরামতের তদারক ফেলে ছুটে এসে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে, 'কই দেখি !'

আমি প্রচুর আড়ম্বর করে কোচার নীচে থেকে বইটি বার করে তার হাতে দিলাম। সে সেটাকে নেড়ে চেড়ে দেখে আমায় ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'বই না ছাই ! আমি ইংরেজি বুঝি ভারি ভালো জানি যে তুমি এই বই আমায় দিতে এনেছ ?'

আমি রাগ-দেখানো হাসি হেসে বল্‌লাম, 'ইংরেজির বিদ্যে নিয়ে কি কেউ জন্মায় বোকা মেয়ে ? না পড়্‌লে শিখ্‌বে কেমন করে ? চল তোমায় পড়াইগে।'

খোলা চুলগুলোতে একটা দোলা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বল্‌লে, 'চল।' এর পর তার আর এক মুহূর্ত্ত তর সয় না !...

সে ছিল সেই স্বভাবের মেয়ে যারা জীবনের কোনো একটি মুহূর্ত্ত কারো ওপর একটুখানি নির্ভর করে ছাড়া বাঁচ্‌তে পারে না। তাই বাইরে সনাতনকে তার যতই অগ্রাহ্য থাকুক, প্রয়োজন হতেই তার সঙ্গে জুটে যেতে সে দ্বিধা করেনি। কিন্তু সনাতনকে আশ্রয় করা তার যেমন সহজ, এ আশ্রয় থেকে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে বিচ্যুত করে আনাও তার ঠিক তেমনি সহজ। কোনোদিক দিয়ে ওজনের এতটুকু ফের পাওয়া যায় না যে তাই নিয়ে তাকে কিছু বল্‌ব।

কিন্তু ভাগাভাগির ব্যাপারে আমি নেই, তার চেয়ে না-পাওয়াটা বরং আমার ধাতে সয়। তাই এই ঘটনার পর থেকে রাণীর খেলার জগৎটার একচ্ছত্র আধিপত্য বিনাযুদ্ধে সনাতনকে আমি ছেড়ে দিলাম, আর তাতে আমার একটুও ক্লেশ বোধ হলো না। মনে কর্‌লাম, এইটেই বীরত্ব।

পুকুরপাড়ে রাণীদের বাড়ীর পেছনে আম্‌লকি গাছের সার দিয়ে ঘেরা যে ছোট একটুক্‌রা মাঠ ছিল সেইখানে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে দুজনে পাঠালোচনা আরম্ভ হলো। জীবনে সেই প্রথম অনুভব কর্‌লাম, বইয়ের কাগজের অস্ফুট সুন্দর সৌরভ, কালো হরফগুলির সুশ্রী সুগঠিত শৃঙ্খলা।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই দেখ্‌লাম, রাণীর ইচ্ছে, যতটুকু সময় আমার কাছে থাকে কেবলি পড়া জেনে নেয়। এইখানে বিরোধের সূত্রপাত হলো।

রাণীকে দিয়ে একদিকে যা তা যেমন করানো যেত, যা তা তাকে বিশ্বাস করানো যেত, অন্যদিকে একটা জায়গায় তার মধ্যে খুব একটা দৃঢ়তাও ছিল। যে জিনিসটাকে তার মন গ্রহণ করতে পারত না সেইটেকে স্বীকার না করা তার সাহসে কুলোত না, তার মনে হত গ্রহণ করাটা তার শক্তির বাইরে, সেইখানে কচুপাতায় ধরা বৃষ্টির ফোঁটাটুকুর মতো সে চঞ্চল। কিন্তু যে ব্যাপারটাতে একবার কোনোরকমে তার মন সায় পেত সেখানে সে ছিল অবিকম্প অবিচল, সেই ছোট্ট বয়স থেকেই।

আমাদের বাড়ী আগেকার মতোই সে আসে, পা টিপে টিপে আমার পড়বার ঘরটিতে এসে ঢোকে; আমি টের পেয়ে বই-টই ছুঁড়ে ফেলে যেই উঠে পড়তে যাই, সে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে, 'না না, তুমি পড়। তোমার কাজের ক্ষতি হবে। আমি চল্লাম।'

আমি যত বোঝাতে চেষ্টা করি, পড়াশোনাটা কিছু নয়, অন্তত এই আসন্ন বসন্তের দিনে, এই যখন ধরারাণীর সৌন্দর্য্যের অনির্ব্বাণ শিখাখানি স্তিমিত হয়ে জ্বল্‌চে, আলো দিচ্চে, জ্বালা দিচ্চে না; এই যখন শীতাবসন্ন পাতা-ঝরা আমের বন কোকিলদের বাচালতার দৌরাত্ম্যে নূতন-কিসলয়-বিকাশে লাল হয়ে উঠ্‌চে;—সে দুহাতে আমায় ঠেলে সরিয়ে দেয়, বলে, 'না, তুমি পড়।'

আমি শক্ত হয়ে বলি, 'আমার পড়তে ভালো লাগে না, আমি পড়ব না। এতক্ষণ ধরে তোমায় বল্‌চি কি তাহলে ছাই?'

সে বলে, 'যা ভালো লাগে তাই বুঝি কেবল করতে হবে?'

আমি বলি, 'তা জানিনে, কিন্তু আমি পড়ব না, তা তুমি যাও আর থাকো, এ আমি বলে রাখ্‌চি।'

সে বলে, 'বেশ ত পড়্‌ছিলে, আমি এসেই ভুল করেছি; আর আস্‌ব না।...'

এমনি করে আমার জীবনে আরও কয়েকবার বসন্ত এল এবং ব্যর্থ হলো, তারপর এল আমার জীবনের বসন্ত; যে রং ছিল বনের লতাপাতায় ফুলে পল্লবে আকাশে, সে রং আমার চোখে লাগ্‌ল। তখনকার কথাই বল্‌তে বসেছি।

গ

সনাতনের উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে শৈশবের আনন্দ-নিকেতন থেকে নিজেকে নির্ব্বাসিত করে নিয়ে এসে নিজেরই অজ্ঞাতে আমি বেজায় রকমের রাশভারি ভালো-ছেলে বনে উঠ্‌ছিলাম। ক্রমে সেইটে আমার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। যে লোক জীবন ভরে হনুমানের ভূমিকা অভিনয় করে, বানর-জাতির অকারণ কুৎসা শুন্‌লে সম্ভবত সে মনে মনে চটে যায়; আমারও হয়েছিল তেমনি। ক্রমাগত মূর্ত্তি লুকিয়ে চলে চলে আমার মেকি নকল রূপটাকেই একটু একটু করে আমার আসল চেহারা বলে আমার মনে হতে আরম্ভ হয়েছিল। আমি বাস্তবিকই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলাম, হাসি অফুরন্ত নয়, কথার শেষ আছে। দুটি চোখে তৃষ্ণার কারাবালা বয়ে নিয়ে ছুটে এসে রাণীর দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে যাওয়া, এই ছিল আমার কাজ!

দেখ্‌তাম, রাণীর সঙ্গে কি সুন্দর সহজ সনাতনের মেলা! সে আসে, হাস্‌তে হাস্‌তে আমাকে এড়িয়েই একেবারে রাণীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর হাসিগল্পের বান ডাক্‌তে থাকে! একদিন আমার সুমুখেই কি একটা কথার ঝোঁকে রাণীর একটি হাতকে তার হাতদুটোর মধ্যে সে তুলে নিলে। আমার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো একটা দারুণ অস্বস্তিতে আহত কীটের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল! ঐ জমাট জ্যোৎস্নার মতো শুভ্র হাতখানির এতটুকু একটু স্পর্শ পাবার জন্যে কত ছুতানাতা খুঁজে বেড়িয়েছি, আর আজ সনাতন তার অত্যন্ত সহজ পাওয়া দিয়ে আমার সেই পরম স্পৃহনীয় জিনিসটির কি চেহারাই না করে দিয়ে গেল! আমি এক ঝট্‌কায় মুখটাকে তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে নিলাম।

এমনি করে যেখানে যেখানে সনাতন এল সেইখান থেকেই আমার সমস্ত চিহ্ন মুছে নিয়ে আমি চলে গেলাম। জীবনের রস-বারিধিকে বরফের মতো জমাট করে তুলে ভাব্‌লাম, এর ওপর আর যাই থাকুক, দোলানি থাক্‌বে না। লড়াইটাকে ভাব্‌লাম বর্ব্বরতা। পূজা-নিবেদনের মতো অনায়াসে যেটা পাই এবং দিতে পারি সেইটেই সত্যিকারের পাওয়া এবং দেওয়া। কাজেকাজেই তার মধ্যেকার ভাবময়ী দেবীটিকে পাওয়ার গর্ব্বে তার মধ্যে যেটুকু রক্তমাংসের মেয়েমানুষ তার প্রতি কেবলি অবিচার হতে লাগ্‌ল। এমন সময়—

আমি এত অল্প নিয়ে খুসি ছিলাম, যে, সমাজ এ শক্রতাটুকু না করলেও পার্‌ত। আমার পূজামন্দিরের নিভৃত নির্ব্বাসনের মধ্যে আমার নির্বিরোধ অধিকার ছেড়ে দিলে তার কোনো ক্ষতিই হতো না। আমি এত সতর্ক হয়ে চল্‌তাম, তবু আমাদের সম্বন্ধে কানাকানির গুঞ্জনে হঠাৎ সে একদিন অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। সনাতন হেসে চোখ মট্‌কে বল্‌লে, 'বাবা! তোমার পেটেও যে এত, তা ত জান্‌তাম না!'

আমি তখন থেকেই রাণীর সঙ্গে দেখা করা ছেড়ে দিলাম, কোনো গতিকে দেখা হয়ে গেলে জোর করে মুখ ফিরিয়ে থাক্‌তাম। বাইরের ঐ কদর্য্য বর্ব্বর লোকগুলোকে কিছুতেই কি বুঝানো যায়, তারা আমাদের যা মনে করে তার চেয়ে আমরা কত বেশী উঁচুতে? তাই জীবনের সবচেয়ে বড় সুখকে, সম্ভবত তার চেয়েও বড় ধর্ম্মকে পায়ের নীচে পিষে ফেলে সেকথাটা আমি প্রমাণ করলাম।

দেখ্‌তাম, আমাকে দেখ্‌লেই রাণীর চোখ ছলছল করে ওঠে, কিন্তু আমার মুখ চেয়ে প্রাণপণ করে সে তার কাঁপ্‌তে-থাকা ঠোঁট-দুটিকে শক্ত করে চেপে থাকে।

আমাদের প্রণয়ের ধারাখানি যে বর্ণ-লেশহীন নিরাবিল, তা নিয়ে রাণীরও মনের কোনো-এক জায়গায় একটুখানি একটা গর্ব্ব ছিল। একদিন লুকিয়ে আমার একখানি ছবি চেয়ে পাঠিয়ে সে লিখেছিল, 'সম্ভবত এই জিনিসটির জন্যে পৃথিবী আমায় ঈর্ষ্যা কর্‌বে না।'

আমি তখনি জবাবে লিখ্‌লাম, 'পৃথিবী না করুক, আমি কর্‌ব। যে জিনিসে আমার একলার অধিকার, প্রাণ ধরে একটা

ছবিকে তার ত ভাগ দিতে পার্‌ব না!' সেইদিনই রাণীর কাছ থেকে আর-এক টুক্‌রা চিঠি পেলাম। সে লিখেচে, 'ঐ সঙ্গে তোমার পায়ের ধুলো একটু যদি পাঠাতে, আমি শিরে ধরে কৃতার্থ হতাম! হে নির্লোভ, এ কত-বড় লোভের থেকে তুমি আমায় বাঁচিয়েছ।'.....

৮

শেষ বিদায়ের ক্ষণটি মনে পড়্‌চে। কই, পার্‌লাম না ত! বড় যে দর্প করে বলে এসেছিলাম, 'তোমায় আমি নিলাম না রাণী, কিন্তু তোমার যে জিনিস আমি নিয়ে চলেছি সে যে কি বস্তু তা তোমাকেই আমি বোঝাতে পার্‌ব না।' বলে এসেছিলাম, 'চোখে তোমায় দেখ্‌তে চাওয়া, তার মতো ভুল কি আর আছে? অশ্রুর বান ডেকে চোখের দৃষ্টি যখন ঝাপ্‌সা হয়ে যায় তখনই যে তোমাকে সত্যি করে দেখা হয়!' অশ্রুর ত অনটন রইল না, কিন্তু.....

মনটাকে বোঝাতে বোঝাতে সে বুঝ মেনে গেল, জীবনের ধূলিমাটির মলিনতায় তাকে না টেনে এনে আমি ত ভালোই করেছি। সে থাকুক আমার মনে, আমার ভাব-নয়নের অপলক ধ্যানের গোচর হয়ে, আমার প্রতি মুহূর্ত্তের উপলব্ধির সঙ্গে মিশে। সেই পাওয়াই ত পাওয়া!.....আমার পরাজয় আত্মত্যাগের মুখোস পরে আমার মনের কাছ থেকে খুব বাহবা নিতে লাগ্‌ল।

কল্‌কাতায় এলাম। চরাচর জোড়া খোলা-মাঠের দেশের মানুষ, এতটুকু একটু জায়গার মধ্যে পৃথিবী কি বৃহৎ তাই দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মানুষ এখানে নগণ্য, অবিচিত্র, তাকে ঘিরে কোথাও এতটুকু রহস্যের কুয়াশা জম্‌বার অবকাশ পায় না; তার চারদিকটাতে তার নিজেরই সৃষ্টি এমন বিস্ময়কর রকমের বড় হয়ে উঠেচে, যে সে নিজে তার তলায় কোথায় চাপা পড়ে গেছে, তার দিকে চোখ পড়াই কঠিন। এমন জায়গায় আর যাই হোক, প্রেম হয় না। আমি নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচ্‌লাম।

রাণীকে চিঠি-পত্র কিছু লিখ্‌ব না ঠিক ছিল। একদিন হঠাৎ মনে হলো লেখ্‌বার দর্‌কার আছে, এবং এই উদ্ভাবনাটা অকারণে আমাকে অনেকখানি তৃপ্তি দান কর্‌লে। অনেক রাত জেগে তাকে লিখ্‌লাম:—

'রাণী!

আমাকে ভালোবাসো বলেই আর কারুকে বিয়ে কর্‌তে তোমার কিছু বাধা আছে, তোমার মন থেকে এই কুসংস্কারটাকে আমি তাড়িয়ে দিতে চাই। তুমি ত জানো, যে মানুষের সমাজে সুরু থেকেই বিবাহ ব্যাপারটার চল্‌তি ছিল না; সেজন্যে অনেকদিন ধরে তার ব্যবসাদারি সুবুদ্ধি অনেকখানি পেকে ওঠা প্রয়োজন হয়েছিল। এর গোড়ায় ছিল সুদ্ধমাত্র প্রয়োজনের তাড়না, সে প্রয়োজন বেশীটুকুই সমাজের, খুব কমটুকুই নিজের। কিন্তু প্রয়োজনের তাড়া জিনিসটা নিজেরই হোক আর সমাজেরই হোক, প্রাণের তাড়না থেকে স্বতন্ত্র। প্রণয় জিনিসটা কাঁচা, সাতপরত চাদরে তার চোখ বাঁধা। সে অতিবড় নির্ভয়, পুনর্নরকের ভয়ও তার নেই।

তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আই

ডিয়ার একটা অপ্সর-লোক যেমন থাকে, তেমনি আরেকটা দিক থাকে যেটাকে নিয়ে বাস্তব জগতের সঙ্গে তাকে কার্‌বার কর্‌তে হয়, সে জায়গায় ব্যবসাদারি বুদ্ধিকে কাজে খাটাতে হয় নিজের লাভ-লোকসান সম্বন্ধে তিলমাত্র অসতর্ক হলে চলে না। তোমার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ এবং সাংসারিক সবরকম সুবিধা-অসুবিধা বেশ করে বিবেচনা করে তোমাকে তাই আমি বিয়ে কর্‌তে পরামর্শ দিই; যদি তা না করো, বাস্তবতার নির্ম্মম আঁচড় তোমার গায়ে এসে লাগ্‌বেই, সেটাকে তুমি হয়ত সইতে পার্‌বে, কিন্তু সওয়াটা তোমার পক্ষে শোভন হবে না।' এইসব।

এগারো দিনের পর চিঠির জবাব পেলাম। সে লিখেচে, 'তোমার কথামতো চল্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। তার আগে একটিবার তোমাকে কি দেখ্‌তে পাই না?'

লিখ্‌লাম, 'না। ভালোবাসা জিনিসটাকে তুমি চোখের নেশা করে তুলো না, তোমার কাছে আমার এই মিনতি রইল।'

তারপর তার আর খোঁজখবর পাইনি।

৯

কাজ নিয়ে পড়্‌লাম। দালালির কাজে প্রথম দু'একটা বৎসর কিছুই সুবিধা হয়ে উঠ্‌ল না, তবু একবার একটা ভালোরকম দাঁও মার্‌বার আশায় ধৈর্য্য ধরে রইলাম। মায়ের জীবনবীমার হাজার-চারেক টাকা ছিল, সেইটে ভেঙে ভেঙে চালাতে লাগ্‌লাম। তাও যখন ফুরোল তখন কোনোদিকে আর পথ দেখ্‌তে পাইনে।

এক-একটা কাজে প্রায় সফলতার কাছাকাছি গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসি, কোন্‌দিক দিয়ে কিসে যে শৈথিল্য ঘটে একটুও যদি বুঝ্‌তে পারি! বন্ধুরা গাটেপা-টেপি করে হাসে, বলে, 'তুমি দেশে ফিরে গিয়ে চাষবাসের কাজে মন দাওগে, ঐটেতে তোমার সুবিধে হতে পারে।' আমিও হেসেই জবাব দিই, 'তা কর্‌লেও হয়। আর একলাই ত মানুষ; একটা পেটের জন্যে আবার ভাবনা!'

একটা পেটের জন্যে কিছুই যে ভাবনা নেই একথাটা কিছুতেই ভুল্‌তে পারিনে বলে, ভাবনা আমার মনের দুয়ার জুড়ে পড়েই থাকে, অভিমানে যেন নড়্‌তে চায় না। ক্রমে এমন হলো, আয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়কেও নিয়মিত করে আন্‌বার মতো উৎসাহ মনের তলানিতে অবশিষ্ট না থাকাতে যত জায়গায় হাত পাত্‌বার উপায় ছিল, হাত পাত্‌লাম, শেষে ধারও আর কেউ দিতে চায় না! আস্‌বাবপত্র দুটি-একটি করে নিলামে চড়িয়ে কায়ক্লেশে চল্‌তে লাগ্‌ল। ঘড়িটা আংটিটা বাঁধা দিয়ে কিছু কিছু টাকার জোগাড় হলো। শেষটা একটা পেটের ভাবনাও ভালো করেই ভাব্‌তে সুরু কর্‌লাম। তার ফল এই হলো, একটু একটু করে রাণীকে ভুল্‌তে লাগ্‌লাম। দেখ্‌লাম সুদ্ধমাত্র মনের যে সৃষ্টি তার আয়ু পুরো চার বছরও নয়।

প্রিয়া, আমার প্রিয়া! তোমায় ছেড়ে এসে এইরকম করে ত তোমায় আমি পেলাম! যে স্মৃতিটুকুর গর্ব্বে তোমার ছোট বুকটিতে এত বড় দাগা দিয়ে আমি চলে এসেছি, সে স্মৃতির পথ থেকে একচুল ভ্রষ্ট

হবার পাতক যে বড় বেশী করেই আমাকে লাগ্‌বে।

কিন্তু প্রাণপণ করে স্বপ্নকে যত আঁক্‌ড়ে ধর্‌তে যাই আমার ব্যগ্রতার চাপে সে আরো বেশী করে ভেঙে গুলিয়ে যায়, তাকে চেনা অবধি দুষ্কর হয়ে ওঠে। ক্রমে এমন হলো রাণীর কণ্ঠস্বরখানি মনে আন্‌তে পারিনে!—আমার রাণীর কণ্ঠস্বর! তার চোখদুটির সেই ধ্যানগভীর বিশেষ একরকমের দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণের বিশেষ একটু কুঞ্চন, মুখের উপরকার বিশেষ ধরণের একটি প্রতিভার আভা, স্মৃতির পটে সবই কেমন ঝাপ্‌সা হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে। মনের মধ্যে তাকিয়ে কাকে পাই? পূজার অর্ঘ্য কাকে দিই? এই পূজার গর্ব্বেই না আমার প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা?

মনে বড় ভয় হলো। আর উপায়ান্তর না দেখে এক বন্ধুকে ধরে পড়ে শিল্পকলার শরণ নিলাম। ছেলেবেলায় কাদা ছেনে উট আর ভালুক গড়া আমার এক খেলা ছিল। এবার প্ল্যাষ্টারে হাত পাকাতে সুরু কর্‌লাম। তরল ভঙ্গুর স্বপ্নকে কঠিনতার বুকে অটুট করে তোল্‌বার কঠিনতর সাধনা দিনের পর দিন রাতের পর রাত অবিশ্রাম চল্‌তে লাগ্‌ল।

এক-একদিন বুকভরা আগ্রহ নিয়ে তাকে ভাব্‌তে বসি। হঠাৎ চম্‌কে আমার ধ্যান ভেঙ্গে যায়। এ আমি কাকে ভাব্‌চি, এ ত সে নয়! মনে হয় তার কাছে আমি অবিশ্বাসী হলাম, মনে হয় আমার পাপের আর মার্জ্জনা নেই! তার কথা আর ভাব্‌তে পারিনে।—আমার রাণীকে আমি ভাব্‌তে পারিনে। নিজ হাতে মনের চোখ বেঁধে দিয়ে অন্ধের মতো কাজের ভিড়ে হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে পথ চল্‌তে থাকি; তাকেও ভুলি কাজও ভুল করি, কিন্তু সকাল না হতেই দরজায় এসে যারা 'দেহি দেহি' বলে ভিড় করে তারা কড়াক্রান্তির পর্য্যন্ত হিসাব চুকিয়ে নিতে ভুল করে না!

তবু আমার শিল্পসাধনা অব্যাহত ভাবেই চল্‌তে লাগ্‌ল। ঠোঁটের কুঞ্চনকে অনেক দিনের তপস্যায় একটু যেন ধর্‌তে পারি, উৎসাহিত হয়ে আর-একটুখানি সেটাকে ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা সমস্তটাকেই পণ্ড করে দেয়। হয়ত ঠোঁট হয়, চোখ-দুটি কিছুতেই হয়ে ওঠে না; চোখ হয়, চিবুকে ভুল থাকে।

কোনো-কোনোদিন স্বপ্নে তার দেখা পাই, একেবারে হুবহু সে। তাকে বলি, 'তোমাকে নাকি আবার ভুল্‌তে পারি?' ঘুম ভেঙে কিছু মনে আন্‌তে পারিনে!

পথে যেতে ক্বচিৎ কোনো বিদেশিনী মেয়ের মুখে তার মুখলাবণ্যের অতি তুচ্ছ একটুখানি আদল ধরা পড়ে। সেই মেয়েটিকে প্রেতের মতো আমি অনুসরণ করে ফিরি, পথে থেকে পথে, ট্রামে ষ্টীমারে ট্রেনে। তার পর বাড়ী এসে দুহাতে গায়ের জামা-কাপড় যেদিকে খুসি ছুড়ে ফেলে কঠিন পাথরের বুকে সেই অনবদ্য কোমল লাবণ্যকে ফুটিয়ে তুল্‌তে প্রয়াস পাই।

কিন্তু এত পরিশ্রম, এত অধ্যবসায় আমার ব্যর্থ হলো। কত মূর্ত্তিতেই ত তাকে গড়্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম। সেই তার জল ছেড়ে ভিজে আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে উঠে আসা; মুখ ফুলিয়ে বই ফিরিয়ে দিতে দিতে বলা,

'এ আমার চাইনে;' সেই দুহাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যানের মিনতি, 'না, তুমি পড়।' সমস্তই মর্ম্মরের স্বপ্নে অক্ষয় হয়ে ফুটে উঠ্‌ল, আমার ভাঙা স্বপ্নই কেবল আর জোড়া লাগ্‌ল না।

কিন্তু কে জান্‌ত, আমার এই শোচনীয় ব্যর্থতা সার্থক শিল্পসাধনার রূপ নিয়ে পৃথিবীর কাছে আমার মিথ্যা খ্যাতি প্রচার কর্‌বে। হঠাৎ একদিন দেখি, ভাস্কর আর চিত্রকর-সমাজে আমার সমাদরের আর শেষ নেই! আমার উদরান্নের ভাবনাও সেই সঙ্গে ঘুচ্‌ল।

৮

দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। দেশের খুব পরিচিত ঘরের একটি ছেলের সঙ্গে রাণীর বিয়ের কথাবার্ত্তা আমিই প্রায় একরকম পাকাপাকি হয়ে যেতে দেখে এসেছিলাম, হঠাৎ একদিন সনাতনের চিঠিতে জান্‌লাম, রাণীকে পাকা দেখে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসে সে-পক্ষের লোকেরা তার সম্বন্ধে কি-একটুখানি কানাঘুষো শুনে মহা সোর-গোল করে ফিরে গেছে। রাণীর মা পীড়িত ছিলেন, এতবড় অপমানের আঘাত সাম্‌লাতে পারেননি। পৃথিবীর ক্রোড়-বিচ্যুতা অনাথিনীকে সে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছে; এ অবস্থায় আমার কি মত?

মনে হলো, আমাকে শান্তিতে থাক্‌তে দেবে না, সমস্ত পৃথিবী-সুদ্ধ লোক যেন তার যুক্তি এঁটেছে। এত-সমস্ত গুরুতর ব্যাপার ঘটে গেল এর নীচে কেবল যেন আমাকেই নাড়াবার ও জব্দ কর্‌বার ফন্দি। সনাতনকে লিখ্‌লাম, 'বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া সমর্থ লোক-মাত্রেরই কর্ত্তব্য, এজন্যে আমার মতামতের কেন যে আবশ্যক হচ্চে সেটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি।'

এর পাল্টা জবাবে সনাতন স্বয়ং সশরীরে এসে উপস্থিত। কাঁধের চাদরটাকে আল্‌নায় ঝুলিয়ে রেখে একটা কেদারা নিয়ে বসেই তার দরাজ গলার বিষম চেঁচামেচির দাপটে সে আমার নির্ব্বাসনের শান্তিকে বিপর্য্যস্ত করে তুল্‌লে। বল্‌লে, 'ভীরু, অপদার্থ কোথাকার! একটা নিরপরাধ অসহায় মেয়ের মাথায় এতবড় ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে পালিয়ে আস্‌তে লজ্জা করেনি তোমার?

আমি বল্‌লাম, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, চেঁচিয়ে বল্‌লেই কথার জোর বাড়ে না। রাণীর যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্যে আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত, কিন্তু সেজন্যে আমাকে কি-বলে তুমি দোষী সাব্যস্ত কর্‌চ?'

'কি বলে কর্‌চি? দেশের লোক জানে তুমি তাকে ভালোবাস্‌তে।'

'সেইটেই কি আমার অপরাধ?'

'নিশ্চয় অপরাধ। তাকে ভালোবাস্‌বার কোন্ অধিকার ছিল তোমার, তাকে এই-সমস্ত অপমানের আঘাত থেকে যদি আড়াল করে না বাঁচাতে পার?'

আমি একটু হেসে বল্‌লাম, 'সে অধিকার আমার ছিল কি না তা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক কর্‌ব না।'

সে টেবিলটাতে চাপড় মেরে ঘরটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'তর্ক কর্‌ব না বল্‌লেই তুমি ছাড়ান পাবে ভেবেছ? আমি তোমাকে বল্‌তে এসেছি, এ মেয়েকে তুমি যদি না

বিয়ে করো, তবে আমার কুস্তির একটা আখ্‌ড়া ছিল জানো? তার বাছা বাছা চাঁই দুতিনটেকে লাগিয়ে তোমার পা-দুটোকে আমি ভেঙে দিয়ে ছাড়্‌ব।'

আমি বল্‌লাম, 'তা যদি দাও, তবে সেটাতে আমার বিপদ আছে স্বীকার কর্‌চি। কিন্তু আসল সমস্যাটার কোনো মীমাংসাই এতে হবে না। তার চেয়ে তুমি নিজে যদি তাকে বিয়ে করো ত সব দিক বজায় থাকে।'

সে আল্‌না থেকে চাদরটাকে পেড়ে কাঁধে ফেল্‌তে ফেল্‌তে চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌লে তারপর বল্‌লে, 'তাই কর্‌ব। সবাই যে তোমার মতন অপদার্থ নয় অন্তত এইটে তোমাকে জান্‌তে দেওয়ার জন্যেও এ অপকর্ম্ম আমায় কর্‌তে হবে।'

সিঁড়ির শেষ ধাপটি পর্য্যন্ত তার পায়ের দুপ দুপ শব্দ শুন্‌তে পাওয়া গেল। উঠে দরজাটাকে বন্ধ করে দিয়ে এসে একতাল প্লাষ্টার নিয়ে বস্‌লাম।

ছ

একদিন একটু অসময়ে আমার পাঠানো কতগুলি খোদাই কাজের তত্ত্ব নিতে সেবারকার এগ্‌জিবিশনের বাড়ীতে ঢুক্‌তে যাচ্চি, এমন সময় নীচের রাস্তায় ঘরমুখী একদল দর্শকের ভিড়ের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখ্‌লাম।···তেমনি একখানি ঋজু সুডোল গ্রীবা, তার উপর শিথিল চুলের খোঁপাটা তেমনি একখানি স্বপ্নালস অবসরের মতো গা এলিয়ে পড়ে আছে!

অতি কষ্টে গাড়ীর পাদানে পাটিকে তুলে সে ভিতরে উঠে বস্‌ল। তাড়াতাড়ি তার মুখখানি কেমন তা দেখা গেল না, কেবল দেখ্‌লাম, একটি পায়ে সে অল্প একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

একটা ট্যাক্‌সি ডেকে গল্পের গোয়েন্দার মতন আমি তাদের পাছু নিলাম। পথে যেতে অনেক-বার তাদের গাড়ীর পাশ কাটিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম, মাঝে মাঝে পেছনেও পড়্‌তে হলো, কিন্তু খুব চেষ্টা করেও তার মুখটিকে আমি দেখ্‌তে পেলাম না। তার পর যেখানে এসে তাদের গাড়ী থাম্‌ল সেটা আমারই বাড়ীর সুমুখকার অন্ধকার এঁদোপড়া গলি!

সকলে মিলে কলরব কর্‌তে কর্‌তে গাড়ী থেকে নেমে আমার পাশের বাড়ীটিতে তারা হুড়মুড় করে গিয়ে ঢুকে পড়্‌ল, সকলের শেষে খোঁড়া পাটিকে টেনে টেনে সে গেল, অন্ধকারে তার মুখখানি চোখে পড়্‌ল না।

বাস্তবিক মেয়েদের বিকলাঙ্গ দেখ্‌লে সেটা মনে বড় লাগে। ওরা হাত পা নাক মুখ চোখ এ-সমস্ত নিয়েই এত অসহায় যে তারও ওপর·····

তারপর থেকে প্ল্যাষ্টার ছান্‌তে আমার আর উৎসাহ নেই। পাশের বাড়ীর বারান্দায় চিকের আড়ালটির দিকে চেয়ে অলক্ষ্যে দিন কেটে যায়। কেমন অস্পষ্ট করে মনে হয়, ওইখানেই আমার এতদিনকার পথ-চাওয়া ব্যাকুলতার সমাপ্তি ঘট্‌বে, আমার সমস্ত দুঃখ বেদনার চরম মূল্যটিকে আমি পাব। সে যে কি বস্তু তা কোনোদিন তলিয়ে দেখ্‌তে চেষ্টা করিনি, সেইজন্যেই বোধহয় আমার ক্লান্তিবোধও ছিল না।

একদিন রাত্রে ঘুমোবার আগে মাথায় একটা আইডিয়া এল। ভাব্‌লাম, গড়্‌ব, পথের পাশে চিরন্তন পুরুষ ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছিল, চিরন্তনী নারী পঙ্গু পাটিকে নিয়ে পথ চল্‌তে চল্‌তে তার গা ঘেঁসে পড়ে গিয়ে তার সুপ্তি ভেঙে দিয়েছে।

আহার নিদ্রা ছেড়ে মূর্ত্তিটি গড়্‌তে লাগ্‌লাম, একদিন দিনশেষের আলো আমার প্রতিবেশিনীদের বাড়ীর ছাত ডিঙিয়ে তার সমাপ্তির উপর এসে পড়ে হেসে উঠ্‌ল। সেই আলোয় চেয়ে দেখ্‌লাম, সেইসঙ্গে রাণীকে ভোলাও আমার সম্পূর্ণ হয়েছে।

এতদিনকার বিনিদ্র সাধনায় গড়া বড় প্রিয় সেই মূর্ত্তিটিকে হাতুড়ির একটিমাত্র আঘাতে গুঁড়ো করে ফেলে কল্‌কাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, কোনও মেয়ের মুখের দিকে মুখ তুলে আর তাকানো নয়। মূর্ত্তি গড়াও এই পর্য্যন্ত, কাজেই খোঁড়া মেয়েটির মুখখানি কেমন সে খবর জান্‌বারই বা আমার দর্‌কার কি!

ভাব্‌লাম যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব; তাই ছেলেবেলার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিতে প্রথমেই ছোট সহরটির কল্‌মী-ফুলে ছাওয়া-পুকুরপাড়ের সেই নিভৃত পাড়াটিতে ফিরে এলাম।

সনাতন খুব শিষ্টাচারের সঙ্গে আমায় অভ্যর্থনা করে নিলে। রাণীদের বাড়ীর দিকে চাইতে সাহস হচ্ছিল না, দিনদুই ইতস্তত করে শেষটা তার কাছেই খোঁজ নিয়ে জান্‌লাম, রাণী কোথায় কি অবস্থায় কেমন আছে কিছু সে জানে না, সে বেঁচে আছে কি না তাও সে বল্‌তে পারে না!

যেন কোথাও কিছু হয়নি এমনি নির্ব্বিকার ভাবে সে কথাগুলো বল্‌লে। কিন্তু সেজন্যে তাকে কিছু বল্‌বার অধিকার ত আমি রাখিনি।·····তাছাড়া সেই বা কেন জবাবদিহি কর্‌তে যাবে।—রাণী তার কে ছিল?

তবু সনাতন সব দোষ তার নিজের ঘাড়েই নিয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইলে, তারপর বল্‌লে, 'তুমি নাকি তাকে বিয়ে কর্‌তে পরামর্শ দিয়েছিলে, বলেছিলে, প্রণয় হলেই পরিণয় হতে হবে এটা কুসংস্কার। কুসংস্কার কি না জানিনে ভাই; যাকে ভালো বেসেছিলে তাকে আপনার করে না পেয়েও তোমার দিন হয়ত একরকম কেটে যাচ্চে, কিন্তু যাকে ভালোবাসো না তাকে সারা জীবনের জন্যে গলায় ঝুলিয়ে নেওয়ার যে কি আরাম সে অভিজ্ঞতা জন্মাবার সুবিধা ভগবান যদি তোমায় করে দিতেন ত সুখী হতাম। রাণী তোমার উপদেশ-মত চল্‌তে পারেনি; তবে তোমার সান্ত্বনার জন্যে বল্‌চি, বিয়েতে তার অসাধ ছিল না। তার মনকে সে খুবই প্রস্তুত করেছিল; কিন্তু পৃথিবীতে কেউ যদি না তাকে ভালোবাসে, তাকে না নিতে রাজি হয় ত সে আর কি কর্‌বে বল ত?'

জ

কল্‌কাতার বাসায় ফিরে এসে দেখি ওপরে আমার ঘরে ঢোক্‌বার পথেই পাঁচ-ছ' বছরের রোগাপানা একটি ছেলে মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে শিকলে-বাঁধা আমার

হাউণ্ডটার সঙ্গে ভাব কর্‌বার চেষ্টা কর্‌চে। আমার সাম্‌নে পড়ে যেতেই অপরাধীর মতো মুখটি করে আমার দিকে তাকাল, যেন ঐ করে সে আমার মনের মধ্যেটাকে পরিমাপ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে। তাকে এড়িয়ে আস্তে-আস্তে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লাম। তাকে কোথাও দেখিনি, তবু কেমন মনে হতে লাগ্‌ল, সে আমার অনেক-কালের চেনা। যেন স্বপ্নে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

এরপর সে কখন আসে সেই খোঁজে আমি থাকি, সে এলে তার পেছনটিতে গিয়ে দাঁড়াই। মুঠোভরা খাবার কুকুরটাকে খাইয়ে তার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়্‌তেই ভয়ে মুখটিকে কালো করে একপাশে সে সরে দাঁড়ায়। আমি বল্‌বার মতো কোনো কথা খুঁজে পাইনে।

মাঝে-মাঝে একটা রবারের বল্‌ নিয়ে সে আমার ঘরের নীচেকার পথটিতে খেল্‌তে নেমে আসে, তখন তাকে দেখি।

একদিন এক অঘটন ঘট্‌ল। তার রবারের বল্‌টা কেমন করে আর জায়গা না পেয়ে দোতলায় আমার দরজার গোড়ায় এসে পড়ে রইল। আমি ঘরে বসে লিখ্‌ছিলাম, দেখ্‌লাম বল্‌টা পড়েই আছে। অনেকক্ষণ কেটে গেলেও কেউ যখন এল না তখন কৌতূহলী হয়ে জান্‌লার কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম নীচে রাস্তার ওপারে দুটি হাতকে পেছনের দিকে জোড় করে দুটি বড় বড় চোখে জলভরা অসহায় লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে বল্‌টির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। সেই কখন থেকে এইভাবেই হয়ত দাঁড়িয়ে আছে!...একটুখানি আমাকে ডেকে বল্‌লেই ত হত! আমার যে হৃদয় নেই, এতটুকু ছেলে সে খবর জান্‌লে কেমন করে?

দুহাত দিয়ে জড়িয়ে বুকের সঙ্গে বেঁধে তাকে ওপরে নিয়ে এলাম, সেখান থেকে ছাতে; ছাতে বসে আমাদের কথা যে হলো তার আর লেখা-জোখা নেই।

আমাদের দুটো বাড়ীর ছাত ছিল এক-টাই। সেই ছাতে উঠ্‌বার সিঁড়িও ছিল একটি, কেবল সেই সিঁড়িটিতে ছিল আমার একলার অধিকার, তার মধ্যে আর কেউ সরিক ছিল না। ছেলেটিকে নিয়ে এরপর প্রায়ই ছাতে যাওয়া চল্‌তে লাগ্‌ল। ছাতে উঠেই তাদের বাড়ীর ওদিক্‌টায় আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছিল তার কাজ। আমি তাকে শক্ত করে ধ'রে থাক্‌তাম, সে ঝুঁকে পড়ে কর্ণিশের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডেকে উঠ্‌ত 'দিদিমণি!'

দোতলার বারান্দার উপরে টালির ছাতে একদিকে যে একটুখানি ফাঁক ছিল, অমনি সেই ফাঁক ভরিয়ে চোখে পড়্‌ত—একখানি কাঁকণ-জড়ানো শুভ্র নিটোল হাতের কী সে ব্যাকুল অসহায় মৌন ইঙ্গিত,'সরে যা লক্ষ্মীছাড়া সরে যা, পড়্‌লে একেবারে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবে যে!' আমার চোখে অলক্ষ্যে অশ্রু ভরে আস্‌ত, তবু আমার স্নেহবঞ্চিত ক্ষুধিত মন তরুণীর এই স্নেহশঙ্কাকে সবটুকু অনুভূতি দিয়ে উপভোগ কর্‌ত।

খোকাকে একদিন জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'তোমার ঐ দিদিমণি ছাড়া আর কেউ নেই নাকি?'

সে বল্‌লে, 'বা রে, তা কেন হতে যাবে! মাসীমা, মেসো-মশায়, ছোট্টু, জিমি, নিস্তারিণী হরকিষেণ...'

বুঝ্‌লাম, সংসারে ঐ এক দিদি ছাড়া তার আপনার বল্‌তে আর কেউ নেই। এখানে পরের আশ্রয়ে খোরপোষের সঙ্গে সঙ্গে কত যে গালি-তিরস্কার লাঞ্ছনা-নির্য্যাতন বাঁধা বরাদ্দে তাদের জোটে, তবু এতবড় এই বিরূপ সংসারে তারা দুটিতেই পরস্পর পরস্পরের কতবড় মস্ত সান্ত্বনা।

কেন জানি না তাকে বুকে টেনে নিলাম, কেন জানি না অন্তরের সবখানি শুভেচ্ছা দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে ইচ্ছে হলো। আমার আয়ুর বদলে তার আয়ুকে কোনো-রকমে যদি বাড়িয়ে দেওয়া যেত, কোনো যাদুমন্ত্রের বলে!

খোকাকে কোনো জন্মে দেখিনি, তবু আমার মন বল্‌চে আমি তাকে দেখেচি। আচ্ছা, তার দিদিমণিকেও কি এমনি চেনা বোধ হবে? প্রথম দেখাতেই কি—

ওগো! আমার সমস্ত শৈশব আজ উদ্‌গ্রীব হয়ে ফিরে এসেছে তার বুকভরা সকৌতুক জিজ্ঞাসা নিয়ে; আমার কৈশোর দুয়ার জুড়ে এসে বসেছে তার সোনালি স্বপ্নখানির সঙ্গে তোমায় মিলিয়ে দেখ্‌তে; আর আমার যৌবন ত বসে আছেই।

আর ঐ পাখানি, খোঁড়া পাখানি! শাড়ীর লাল পাড় স্নেহবেষ্টনে ঐ পাটিকে যেন জড়িয়ে ধরে রেখেচে, তার শুভ্র পেলব-তাকে ঘিরে নিজেকে অনুরাগের একখানি শোণিমারেখার মতো এঁকে দিয়ে। অক্ষম, মনোরম ঐ পাখানি তার!...

৯

রোজকার মতে খোকাকে নিয়ে সেদিনও

ছাতে গিয়েছি। অজস্র ঘুড়ি উড়্‌ছে। দুজনাতে গল্প ভুলে নিবিষ্ট হয়ে একটা লাল আর একটা বেগুনি ঘুড়ির প্যাঁচ লড়া দেখ্‌চি। বেগুনিটা কেটে গেল। খোকাকে বল্‌লাম, 'ওটি তোমার চাই?'

সে নেচে উঠে বল্‌লে, 'হাঁ, হাঁ, লালটাও।'

ঘুড়ির সুতাটা হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে আস্‌ছিল। সেটার পেছন পেছন ছুটে তাদের বাড়ীর দিককার ছাতে চলে গেলাম। কর্ণিশের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে অতি কষ্টে সুতো-গাছটার নাগাল পেয়েছি, হঠাৎ দেখি, খোকাও দুখানি ছোট ছোট ব্যগ্রবাহু প্রসারিত করে একেবারে কর্ণিশের ওপর আমার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুড়ি ছেড়ে তাকে ধর্‌তে গেলাম, তাকে পেলাম না।

* * * *

সমস্তটা দিন দুবাড়ীর মাঝখানকার দেয়ালে কান পেতে বসে রইলাম, একটি চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দও শোনা গেল না! কত ত্রস্ত পদশব্দ কানে এল, কত সমবেদনার ভাষা, যা সেই স্তব্ধতার সঙ্গে তুলনায় মনে হলো চাপাহাসির উপহাসের মতো। কতজন তিনসার সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে অনাবশ্যক চেঁচিয়ে আমায় অভিসম্পাত করে গেলেন। খোকার দিদিমণির সাড়াই কেবল পেলাম না।

আজ খোকা নেই। তবু খোকার দিদি দিনমান ধরে তার কর্ত্তব্য-কাজগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কর্‌লে, তারপর সন্ধ্যার দিকে বাইরে চিকের আড়ালটিতে নিত্যকার মতো চুপচাপ এসে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার মনে হতে লাগ্‌ল, আমি পাগল

হয়ে যাব। যেন আকাশ জুড়ে নিবিড় মেঘাড়ম্বর, মিনিটে মিনিটে, বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, কিন্তু কোথাও এতটুকু শব্দ কিম্বা সাড় নেই। একটা আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত লাক্ষাস্রোত আকাশময় ছড়িয়ে গিয়ে যেন থেমে আছে, পড় পড় হয়েও পড়ে যাচ্ছে না। ইচ্ছে কর্‌তে লাগ্‌ল, চিকের আড়াল দুহাতে ছিঁড়ে সরিয়ে তার সাম্‌নে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তার খুব কাছে, একেবারে তার মনের মধ্যখানে! কেমন তার মুখখানি? কি আছে তার মনে? এই চিকের আড়াল যে সইতে পারিনে, এই স্তব্ধতার আড়াল যে সইতে পারিনে!

রাত কাট্‌ল। ভোরের আলো যেন খোকার খোঁজে এসে আমার দরজার গোড়ায় ব্যথিত হয়ে পড়ে রইল।

একটু পরে খোকার দিদিমণির ডাক এল। লোকে কাল আমার প্রতি অবিচার করেছে, আমার যে কোনো দোষই নেই একথাটা আমায় জানিয়ে দিয়ে সে তার কর্ত্তব্য কর্‌তে চায়।

খোলা জান্‌লায় বাইরের দিকে চেয়ে সে বসে ছিল। বাতাসে তার একটি-দুটি-স্রস্ত চুল আর নীল শাড়ীর আঁচল-প্রান্তটুকু মাত্র কাঁপ্‌ছিল। কতক্ষণ এভাবে কাট্‌ল জানিনে, মনে হলো অনেকক্ষণ। তারপর সে যখন ফিরে চাইল, দেখ্‌লাম—

দেখ্‌লাম রাণী! তার দৃষ্টি আমার দেহকে যেন স্পর্শ কর্‌ল না। যেন ব্রাহ্মণের শূদ্রকে আশীর্ব্বাদ, মস্তক আঘ্রাণ কর্‌তে এসেও সতর্ক হয়ে ছোঁয়া বাঁচায়।

বল্‌লাম, 'আমার জীবন দিয়ে তোমায় সমস্ত আঘাত অপমান থেকে আবৃত করে আমার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে দাও। দেহটাকে সুখের আলোয় যখন দেখ্‌লাম তখন তার কদর্য্যতাটাই কেবল চোখে পড়্‌ল। আজ দুঃখের মধ্যে দিয়ে তাকে দেখ্‌চি, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখ্‌চি বলে দেখ্‌চি তার জ্যোতির্ম্ময় রূপ। তুমি আমায় ক্ষমা কর রাণী।'

তার গলা কাঁপ্‌ল না, জিহ্বায় এতটুকু জড়তা দেখা গেল না; এ যেন ভাষা নয়, আরেকটা কিছু, এমনি ভাবে সে বল্‌লে, 'তোমার এ অধঃপতন কেমন করে হলো? কোথায় পড়ে ছিলাম আর তুমি কত উঁচুতে আমায় টেনে তুলে রেখে গিয়েছিলে তা কি ভুলে গেছ? তোমার মন্ত্র ত ব্যর্থ হয়নি গুরু। তার অনাকুল শিখাখানিই যে খোকাকে আমার চোখের দৃষ্টি থেকে অপসারিত করেও আমার মনের দৃষ্টিতে তাকে জ্যোতির্ম্ময় করে তুলেছে! আজ এমন দিনে তোমার মুখে এ কি কথা শুন্‌চি?'

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

অপরাধ ভঞ্জন

গৌরদাসের আখ্‌ড়া ছোট
আয়টা নহে কমি।
বাগান পুকুর তাহার উপর
বাহান্ন বিঘে জমি।
মহান্ত তাঁর প্রচুর টাকা
গেছেন তারে দিয়ে,
ভাবতো লোকে, সেই ভাবেনা
করবে কি তা নিয়ে।

'নন্দকিশোর' চতুর যুবক
খায় সে গাঁজা ভাঙ,
ভক্ত সাজে, গৌর বলে,
নয়কো সোণা—রাঙ।
গৌরদাসের সঙ্গে কে রে
সংকীর্ত্তনে নাচে,
সন্ধ্যা সকাল যখন দেখ
ফিরছে তাহার পাছে।
গ্রামের লোকে সবাই জানে
তাহার পরিচয়,
সকল জিনিষ সাম্‌লে রাখে
তাকেই বেশী ভয়।
'নান্নুর' থেকে গৌরদাস আজ
ফিরলে যখন ভোরে,
দেখ্‌লে ঘরে সিঁদ দিয়েছে
বাহির থেকে চোরে।
ব্যস্ততা তার কিছুই নাহি
করলে না হাঁক-ডাক,
কুকুর বিড়াল আসবে পাছে
বুজিয়ে দিলে ফাঁক।

নন্দকে আর পায়না খুঁজে
সুখেই ছিল বেশ,
দুদিন থেকে নিইয়ে দেখা
হঠাৎ নিরুদ্দেশ!
সপ্তাহ পর হাত বেঁধে তার
পালাল জমাদার,
করলে হাজির আখড়াতে আজ
রক্ষা নাহি আর।
কাঁধের ঝোলায় দেখতে পেলে,
পয়সা টাকা ঢের,
তাহার সাথে সোণার ছাতা
মুকুট গোপালের।
নদীর ধারে যাচ্ছিল সে
সতর্কতার সাথ,
হঠাৎ পুলিশ সন্দেহেতে
ধরলে তাহার হাত।
করলে কবুল এ যা তারি
আখড়া থেকে আনা
সত্য যা তা গৌরদাসের
কাছেই যাবে জানা।

গৌরদাস ত হেসেই আকুল
বল্লে "সাঙাৎ মোর,
এ ঝোলাটা আমার যে ভাই
ফেলে গেছিস্ তোর"।
বাহির ক'রে আন্‌লে কাছে
করলে হাজির ত্বরা,
একই রকম আর এক ঝোলা
মোহর টাকা ভরা।

পুলিশ ত হায় ব্যাপার দেখে
রেগেই বল্লে 'ছাই'
শুনেছিলাম দেখছি এরা
মাস্‌তুতো সব ভাই।
গৌর তখন তামাক সেজে
বন্ধুকে তার ডেকে,
বল্লে কোথায় পালিয়ে ছিলে
একলা আখড়া থেকে।
কঠিন পাপী লুটায় কাঁদি
সাধুর পাদমূলে,
বল্‌লে প্রভু আবার নিলে
নরক থেকে তুলে।
নিতাই করেন নিত্য লীলা
দেখতে পেলাম আজ,
জগাই মাধাই ত্রাণ করা যে
তাঁহার প্রিয় কাজ।
নন্দ এখন 'কীর্ত্তনীয়া'
নয়কো ডাকাত খুনে,
রত্নাকর হায় বাল্মীকি আজ
হরিনামের গুণে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

নৃতত্ত্ব *

সম্প্রতি বাংলাদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নৃতত্ত্বের আলোচনা হইতেছে। মার্কিণ প্রভৃতি দেশে পূর্ব্ব হইতেই ইহার যথেষ্ট গবেষণা হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। আমাদের শাস্ত্রগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে নৃতত্ত্বের বিষয় আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ একেবারে চিন্তা করেন নাই একথা বলা যায় না। মনুষ্য সৃষ্টির বিষয় অনেক শাস্ত্রে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের পঞ্জিকায় যে চারিযুগ পরিমাণ দেওয়া আছে, তাহা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। অল্পদিন হইল বিখ্যাত মার্কিণ পণ্ডিত হেন্‌রি ফেয়ার্‌ফিল্ড্‌ অস্‌বোর্ণ—আমেরিক্যান্‌ মিউজিয়ম্‌ অফ্‌ ন্যাচার্যাল হিষ্ট্রী সভায় যে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে বিশলক্ষ বা তদধিক বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে। অস্‌বোর্ণ সাহেব কেবল আন্দাজী কোন কথা লিখেন নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার বক্তব্য সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমাদের শাস্ত্র হইতে নৃতত্ত্বের যাহাকিছু পাওয়া যায় তাহা অদ্য আমার বক্তব্য বিষয় নহে। অদ্যকার বিষয় এই যে নৃতত্ত্ব বলিলে বর্ত্তমান জগতে কি বুঝা যায় তাহাই আমি বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের শাস্ত্রে নৃতত্ত্বের কিরূপ বিবরণ ছিল তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

* মেদিনাপুর সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মেদিনীপুর শাখার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে ইহা পঠিত হইয়াছে।

নৃতত্ত্ব বলিলে মানুষ-সংক্রান্ত যাহা-কিছু সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহা সমস্তই বুঝিতে হয়। এই যাহা-কিছুর ভিতর মানবের আদি-জন্মভূমি কোথায় তাহা একটী প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এসিয়ায় মানবের আদি-জন্মভূমি স্থির করিয়াছেন; কিন্তু এশিয়া মহাদেশের কোন্‌ প্রদেশ হইতে এই মানব-পরিবারের প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল তাহা স্থির করেন নাই। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার "মানবের আদি জন্মভূমি" নামক গ্রন্থে মঙ্গলিয়ার মধ্যগত আলটাই (ইলাস্থায়ী) বা মেরুপর্ব্বতের সানুদেশকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, ইলাব্রতবর্ষ মঙ্গলিয়ার অপর তিনটী নাম স্বঃ, দ্যৌ এবং যজ্ঞ। আদি স্বর্গ এবং যজ্ঞশব্দ আদিস্বর্গ অর্থে বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।

ঋগ্বেদ ১।৩৫।১৬৪।

এই যজ্ঞ জনপদ সকল প্রাণীর উৎপত্তি-স্থান। বিদ্যারত্ন মহাশয় বৈদিক আলোচনা দ্বারা তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, স্বর্গে দেবাসুরে যুদ্ধ হয়। দেবাসুর যুদ্ধের ফলে অসুরগণ জয়লাভ করেন। দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসেন। এই দেবগণই আর্য্য জাতির পূর্ব্ব-পুরুষ। তাঁহারা আবার তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান, আরব, চীন, জাপান, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহার প্রমাণের বিষয় সমস্ত প্রকাশ করিতে হইলে একটী বৃহৎ পুঁথি হইয়া পড়ে। সুতরাং পুঁথি বাড়াইতে না গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মঙ্গলিয়া সম্বন্ধে মতামত কি, তাহা বলিয়া মানবের আদি জন্মভূমির বিষয় সমাপ্ত করিব।

অস্‌বোর্ণ্‌ সাহেব এসিয়ার কোন্‌ প্রদেশ হইতে প্রথম মানবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। নিউইয়র্ক হেরাল্ড নামক একখানি মার্কিণ পত্রিকায় "ইন্‌ সার্চ্চ্‌ অফ্‌ দি প্রিমিটিভ্‌ ম্যান্‌" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পাঠে স্পষ্টই দেখা যায় যে, মিষ্টার্‌ আর, সি, অ্যাণ্ড্রুজ্‌ এবং মিষ্টার জন্‌ হেন্‌রি নিউম্যান্‌ উভয়েই একবাক্যে মঙ্গলিয়াকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বহুদিন অবধি চীৎকার করিয়া আসিলেও তাঁহার কথায় আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেহই কর্ণপাত করেন নাই। "গেঁয়ো যুগী ভিক্‌ পায় না।" এক্ষণে মার্কিণ দেশের পণ্ডিত-যুগল যখন মঙ্গলিয়াতে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন আমাদের আর বিদ্যারত্ন-মহাশয়কে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

মানবের আদি জন্মভূমি একরূপ স্থির হইল। তাহার পর মানবের কত দিন সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা নৃতত্ত্বের আর একটী বিষয় হইতেছে। এ বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ভূতত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, বহুলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে। যদি পৃথিবীর সৃষ্টির

সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্য সৃষ্টি না হইয়া থাকে তাহা হইলেও অন্ততঃ বিশ লক্ষ বা তদধিক বৎসর পূর্ব্বে যে মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

সৃষ্টির কাল-নির্ণয়ও হইল। এক্ষণে মানবের উৎপত্তির বিবরণ আর একটী নৃতত্ত্বের বিষয়। তাহা বলিয়াই অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব। মানুষ স্তন্যদায়ী প্রাণী-বিশেষ। স্তন্যদায়ী যে সমস্ত বৃহৎ জন্তু ছিল তাহারা প্রায় পাঁচলক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ক্ষয় পাইতে বসিয়াছে। তুষারময় যুগে মনুষ্য-জীবনের প্রথম উন্নতির সহিত ঐ সমস্ত বৃহৎ স্তন্যদায়ী জন্তু ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর প্রাণ-হরণকারী অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারের সহিত ঐ সকল জন্তু আরও অধিক পরিমাণে লোপ পাইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ণ বলেন, যে, বর্ত্তমান খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্য সময়ে মনুষ্য ব্যতীত যাবতীয় স্তন্যদায়ী জন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে এবং মনুষ্য বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার চরম সংখ্যায় উপনীত হইবে; তাহার পর জগতের মনুষ্য জাতির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইবে। মনুষ্যজাতির সংখ্যা চরম সীমায় পৌঁছিলে তাহাদের প্রলয় আরম্ভ হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত কয়েকটী বলেন যে, খ্রীষ্টীয় বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষে মনুষ্য সমাজ প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। আমরা অবশ্য তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। কলিযুগের মাত্র পাঁচ হাজার বৎসর গত হইয়াছে। এক্ষণে বহু বহু শতাব্দী বাকী, তাহার পর কলিযুগের শেষ। এবং কলিযুগ অন্তে মহা প্রলয় হইবে। তবে লোকসংখ্যা যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গত সেন্‌সসে পূর্ব্ব সেন্‌সসে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ঊনত্রিশ কোটি ছিল। গত সেন্‌সসে লোক সংখ্যা প্রায় একত্রিশ কোটি হইয়াছিল। এবার সেন্‌সসে লোকসংখ্যা আরও কয়েক লক্ষ বেশী হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত লোক-বৃদ্ধি পাইয়া মনুষ্যগণের যে দুঃখ দারিদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নৃতত্ত্বে কর্ম্মকাণ্ডের বিষয়ীভূত। এই বিষয়ে ইয়ুরোপে ম্যাল্‌থস্ সাহেব যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছিলেন। ম্যাল্‌থস্ সাহেবের মতামত সাধারণের বড় হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। এক্ষণে স্বদেশ-বিদেশের অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িতেছে তাহাতে আমাদের লোক বৃদ্ধি সম্বন্ধে এবং তাহার জন্য যে সমস্ত দুঃখ-দারিদ্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কিরূপে নিবারণ করা যায়, ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, মহাশয় নৃতত্ত্ব বিষয়ে কিরূপ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, তার আভাস দিয়াছেন। সুতরাং সে বিষয়ে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মনুষ্যসৃষ্টির কালস্থির করিতে হইলে ভূগর্ভ হইতে উৎখাতিত শিলীভূত মনুষ্য-কঙ্কাল সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহাদের মাথার খুলি, করোটী ও চিবুক দর্শন এবং মাপ করত কিরূপে বনমানুষ হইতে বর্ত্তমান মনুষ্য জাতি ক্রমোন্নতি সহকারে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার পর পর স্তর ঠিক করিতে হইবে। হইতে পারে আমাদের এক একটী যুগ এক একটী স্তর অথবা হয়ত কতকগুলি স্তরে এক-একটী

যুগ হইয়াছে। মনুষ্যজাতি বৃক্ষবাসী না হইলেও প্রথমে কতক কতক বৃক্ষে বাস করিত। বৃক্ষবাসীদের কঙ্কাল খুঁড়িয়া পাওয়া দুষ্কর। বৃক্ষবাসীদের যুগের পর মনুষ্য মাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করে। মনুষ্যজাতি মাটীতে বাস করিয়াই, প্রথম তাহাদের শব-সমূহ কবর দিত না। কবর দিবার পর হইতে যে সমস্ত মনুষ্যের মাথার খুলি, চিবুক ও দন্ত মাটী হইতে খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে নৃতত্ত্বের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। কবরে না দিলেও নদীর স্রোতে স্থানান্তরিত করা স্তূপীকৃত মৃত্তিকা হইতে এবং কঙ্কর হইতে প্রাপ্ত অনেক মনুষ্য শরীরের ভগ্নাবশেষ নৃতত্ত্বের অনেক তথ্য স্থির করিয়া দিয়াছে। নরসৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে বন-মানুষের সৃষ্টি হয়। বনমানুষের পূর্ব্বে বানরের সৃষ্টি হয়।

বোধ হয় ত্রেতাযুগে মনুষ্যজাতির পূর্ব্ব-পুরুষ বানরগণ নরোচিত কার্য্য করিয়া আমাদের রামায়ণের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছে। মানুষ ক্রমশঃ বানর হইতে ক্রম-বিধি অনুসারে উদ্ভূত হইলেও, বর্ত্তমানে যে সমস্ত বানর এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় কিম্বা শিলীভূতাবস্থায় ভূগর্ভ হইতে যে সমস্ত বানরের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাদিগের হইতেই যে ক্রমশঃ মনুষ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বলা বড় সুকঠিন। তবে মানবাকৃতি জীব (Anthropoid), বনমানুষ, আফ্রিকা-দেশীয় বড় বানর (Gorilla), মানুষের মত দেখিতে আফ্রিকা-দেশীয় বানর (Chimpanzee) ও উল্লুক (Gibbon) হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার তুলিতে রং ফলাইয়া ইহাদিগের হইতেই মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। আমেরিকান্ মিউজিয়মের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডব্‌লু কে গ্রেগরি মহাশয় এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। মানুষে এবং বানরে বিশেষ পার্থক্য এই যে, বানর সাধারণতঃ বৃক্ষবাসী, কিন্তু মানুষ তাহা নহে। কিন্তু বর্ত্তমান মনুষ্যজাতির ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে যে জীবরূপী পূর্ব্বপুরুষ ছিল, তাহারা বৃক্ষে বাস করে নাই এবং তাহারা সোজা-ভাবে দাঁড়াইতে পারিত। ত্রেতাযুগের বানর লইয়া গবেষণা করিলে অনেক বানর-বিষয়ক এবং মনুষ্যজাতির পূর্ব্ব-পুরুষ-বিষয়ক যে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারা যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবদ্বীপের অর্দ্ধনর অর্দ্ধবানরের (The Trinil apeman, the Pithecanthropus) করোটী দেখিলে বুঝা যায় যে, সেই বানরগণের করোটী মনুষ্যগণের করোটীর অনেকটা অনুরূপ। সুতরাং এই অর্দ্ধনর অর্দ্ধবানর যে মনুষ্যজাতির পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে পারে, তাহা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। এই বিষয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, হাওয়ার্ড্ ম্যাক্‌গ্রেগর সাহেব বিশেষ চিন্তা করিতেছেন।

ইয়ুরোপে ও মার্কিন দেশে নৃতত্ত্ব-বিষয়ক বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু এদেশে নৃতত্ত্বের অনেক মালমসলা থাকিলেও, আমরা এ-বিষয়ে মস্তিষ্ক আলোড়ন করি নাই। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, মহাশয়ের উপদেশ লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে, বিশেষ ফললাভ করা যাইবে আশা করা যায়।

একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। নৃতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, বিশেষতঃ জীবতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান থাকা এবং সেইসঙ্গে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বে সমধিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাহার পর ধীরে ধীরে মালমসলা সংগ্রহ করিয়া নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে নৃতত্ত্ব লইয়া নৃত্য করিলে চলিবে না।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অবতার

১২

যাত্রাকালে, অক্টেভ ডাক্তারকে বলিল :—

"দেখুন,ডাক্তার মশায়, আমি আর একবার আপনার বৈজ্ঞানিক শক্তির পরীক্ষা করতে চাই; আমাদের দুজনের আত্মা আবার আমাদের নিজের নিজের শরীরে আপনাকে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। এ কাজটা করা আপনার পক্ষে শক্ত হবে না; আশা করি, কৌণ্ট লাবিন্স্কি তাঁর প্রাসাদের বদলে এই দীনের কুটীরে থাকতে চাবেন না: আর, তাঁর বহুগুণালঙ্কৃত আত্মা আমার এই সামান্য দেহের মধ্যে বাস করতেও রাজি হবে না। তা ছাড়া আপনার যেরূপ শক্তি তাতে আপনার কোন প্রকার প্রতিশোধের ভয় নেই।"

এই কথায় সায় দিবার ভাবে একটা ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "এইবার প্রক্রিয়াটা গতবারের চেয়ে আরো সহজ হবে। যে সব অদৃশ্য সূত্রে আত্মা শরীরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে সেগুলি তোমার মধ্যে ছিন্ন হয়ে গেছে; আবার যুড়ে যেতে এখনো সময় পায়নি। আর, সম্মোহনের পাত্র সম্মোহনকারীর চেষ্টাকে স্বতই যেরূপ প্রতিরোধ করে, তোমার ইচ্ছাশক্তি সেরূপ বাধা দিতে পারবে না। আমার মত বুড়ো বৈজ্ঞানিক যে এইরূপ পরীক্ষার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে নি তজ্জন্য কৌণ্ট মহাশয় আমাকে মার্জ্জনা করবেন—কারণ এইরূপ পরীক্ষার পাত্র খুব কমই জোটে, তাছাড়া এইরূপ পরীক্ষা করতে করতে মনের এমন একটা সূক্ষ্ম অবস্থা হয় যে তখন সেই পরীক্ষাকারী ভবিষ্যৎ ঘটনা বল্‌তে পারে; যেখানে আর সবাই হার মানে, সে সেখানে জয়লাভ করে। আপনি এই ক্ষণিক রূপান্তরের ব্যাপারকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন বলে ভাবতে পারেন; আর কিছুকাল পরে, এই অনন্ত ভূতপূর্ব্ব অনুভূতি আপনার হয়েছিল বলে আপনি বোধ হয় দুঃখিত হবেন না; কেন না, দুই শরীরে বাস করবার অনুভূতি খুব কম লোকেরই হয়েছে। দেহান্তরগ্রহণ একটা নূতন মতবাদ নয়। কিন্তু দেহান্তর গ্রহণের পূর্ব্বে আত্মাদের বিস্মৃতি-মোহ-মদিরা পান করতে হয়। তবে, ট্রয়ের যুদ্ধে ছিলেন বলে পিথাগোরসের স্মরণ ছিল,—কিন্তু যে রূপ জাতিস্মর সবাই হতে পারে না।"

কৌণ্ট ভদ্রভাবে উত্তর করিলেন, "আমার

ব্যক্তিত্ব আবার ফিরে পেলে আমার যে লাভ হবে, তাতে অধিকারচ্যুত হওয়া প্রভৃতি সমস্ত অসুবিধারই ক্ষতিপূরণ হবে। অক্টেভ মহাশয় কিছু যেন মনে না করেন, আমি কোন কুমৎলবে এ কথাটা বল্‌চি নে। আমিই ত এখন অক্টেভ,—একটু পরে আর আমি অক্টেভ থাক্‌ব না।"

এই কথায়, কৌণ্ট লাবিন্স্কির ওষ্ঠাধরে অক্টেভের হাসির রেখা দেখা দিল; কেননা এই বাক্যটা এক ভিন্ন দেহরূপ আবরণের মধ্য দিয়া, অক্টেভের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। এখন এই তিনজনের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অসাধারণ অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলা কঠিন হইয়া উঠিল।

বেচারা অক্টেভের সমস্ত আশা অন্তর্হিত হইয়াছে সুতরাং তার মন যে গোলাপ ফুলটির মত উৎফুল্ল নয়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যাখ্যাত সমস্ত প্রেমিকের ন্যায়, সে মনে মনে এখনো ভাবিতেছিল, কৌণ্টেসের ভালবাসা সে কেন পাইল না—যেন ভালবাসার কোন "কেন" আছে! যাই হোক, সে বুঝিল সে পরাভূত হইয়াছে। ডাক্তার শেরবোনো ক্ষণেকের জন্য তার জীবনের কল-কাঠিটা ঠিক্‌ঠাক করিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ভূতলে নিক্ষিপ্ত হাত-ঘড়ির ন্যায় আবার তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। আত্মহত্যা করিয়া তার মার মনে কষ্ট দিতে তার ইচ্ছা ছিল না; সে মনে করিয়াছিল, কোন একটা বিজন স্থানে গিয়া নিস্তব্ধভাবে তার দুঃখানল নির্ব্বাপিত করিবে এবং এই অজ্ঞাত দুঃখের একটা বৈজ্ঞানিক নাম দিয়া লোকের নিকট একটা রোগ বলিয়া প্রচার করিবে। অক্টেভ যদি চিত্রকর হইত, কবি হইত কিংবা সঙ্গীত-গুণী হইত, তাহা হইলে তার দুঃখকষ্ট তার একটা উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে জমাট করিয়া রাখিতে পারিত; তাহা হইলে প্রাস্কোভি ধবল বাসে সজ্জিত ও তারকা-মুকুটে ভূষিত হইয়া, দান্তের বেয়াত্রিচের ন্যায়, ভাস্বর-দেহ এঞ্জেলের মত তাহার কবিত্ব-উচ্ছ্বাসের উপর উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা এই ইতিহাসের গোড়াতেই বলিয়াছি, সুশিক্ষিত ও বিশিষ্ট লোক হইলেও অক্টেভ সেই সব শ্রেষ্ঠ বাছা-লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যাঁহারা ধরাতলে তাঁহাদের পদচিহ্ন রাখিয়া যান। অক্টেভের একনিষ্ঠ দীন আত্মা ভালবাসা ছাড়া ও ভালবেসে মরা ছাড়া আর কিছুই জানিত না!

গাড়ী ডাক্তারের গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করিল। পাথরে-বাঁধা অঙ্গনে সবুজ ঘাস বসানো; সাক্ষাৎকারপ্রার্থী লোকদিগের অবিরাম পদবিক্ষেপে সেই ঘাসের উপর দিয়া একটা রাস্তা হইয়া গিয়াছে এবং অঙ্গনের ধূসরবর্ণ উচ্চ প্রাচীরের বিপুল ছায়ায় ভূতল পরিপ্লাবিত হইয়াছে। পণ্ডিতের ধ্যান-প্রবাহে বাধা না হয় এইজন্য অদৃশ্য প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় নিস্তব্ধতা ও নিশ্চলতা প্রহরীরূপে দ্বারদেশ আগ্‌লাইয়া রহিয়াছে।

অক্টেভ ও কৌণ্ট গাড়ী হইতে নামিলেন; ডাক্তার টপ্ করিয়া পা-দানির উপর পা দিয়া সহিসের হস্তাবলম্বন না করিয়াই নামিয়া পড়িলেন—এরূপ ক্ষিপ্রতা তাঁহার বয়সে কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

তাঁরা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার রুদ্ধ হইল। ওলাফ ও অক্টেভের অনুভব হইল যেন হঠাৎ একটা গরম বাতাসের আবরণে তাঁরা আবৃত হইয়াছেন। এই গরম বাতাসে ডাক্তারের ভারতবর্ষ মনে পড়িল; এবং তিনি বেশ সহজে ও আরামে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ডাক্তারের ন্যায় কৌণ্ট ও অক্টেভ ত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে অভ্যস্ত হন নাই, সুতরাং তাঁদের প্রায় শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। বিষ্ণুর অবতারেরা স্বীয় ফ্রেমের মধ্যে দন্তবিকাশ করিয়া হাসিতেছেন, নীলকণ্ঠ শিব তাঁর পাদ-বেদিকার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া অট্টহাস্য করিতেছেন। কালী তাঁর শোণিতাক্ত রসনা বাহির করিয়া আছেন। নৃমুণ্ডমালার আন্দোলনে যেন ঠকাঠক্ শব্দ শুনা যাইতেছে। ডাক্তারের এই আবাস-গৃহ একটা রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক ভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রথম রূপান্তর-প্রক্রিয়া যে ঘরে হইয়াছিল, ডাক্তার শেরবোনো সেই ঘরে সম্মোহন-পাত্রদ্বয়কে লইয়া গেলেন। তিনি তাড়িৎ-যন্ত্রের কাচের চাক্তিটা ঘুরাইলেন, সম্মোহন-বাল্তির লোহার হাতল নাড়িলেন; গরম বাতাসের মুখ খুলিয়া দিলেন, তাহাতে ঘরের উত্তাপ শীঘ্রই বাড়িয়া গেল। ভুর্জ্জপত্রে লেখা দুই তিনটা মন্ত্র পাঠ করিলেন; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে, কৌণ্ট ও অক্টেভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

"এখন আমি তোমাদের কাজের জন্য প্রস্তুত। কি বল, আরম্ভ করব কি?" ডাক্তার যখন এই কথা বলিতেছিলেন, কৌণ্ট উৎকণ্ঠিত হইয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন ঃ—

"আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ব, এই বুড়া যাদুকর না জানি আমার আত্মাকে নিয়ে কি করবে। বানর-মুখো এই ডাক্তারটা সাক্ষাৎ শয়তান হতে পারে না কি? আমার আত্মাকে আমার শরীরে ফিরিয়ে দেবে,—না, ওর সঙ্গে আমাকে নরকে নিয়ে যাবে? আমার ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দেওয়া—এটাও একটা নূতন ফাঁদ নয় ত? কি ওর উদ্দেশ্য জানি না, কিন্তু কোন বুজরুগি করবার জন্য এই-সব শয়তানি আয়োজন হচ্চে না ত? যাই হোক, আমার এখন যে অবস্থা তার চেয়ে আর কি-খারাপ হতে পারে? অক্টেভ আমার শরীর অধিকার করে আছে; আর সে আজ সকাল বেলায় ঠিক্ কথাই ত বলেছিল যে, আমার বর্ত্তমান শরীরে থেকে যদি আমি আমার কৌণ্ট নামের দাবি করি, তাহলে লোকে আমাকে পাগল ঠাওরাবে। যদি আমাকে একেবারে সরিয়ে ফেলবার তার ইচ্ছা থাক্ত, তা হলে আমার বুকে তার অসি বিঁধিয়ে দিলেই ত হ'ত। আমি নিরস্ত্র ছিলাম, আমার মরণ বাঁচন তারই হাতে ছিল। কোন রকম অন্যায় আচরণও হয় নি! দ্বন্দ্বযুদ্ধের পদ্ধতি ঠিক রক্ষিত হয়েছিল, সবই দস্তুর মত হয়েছিল। যাক্! এখন প্রাস্কোভির কথাই ভাবা যাক্, ছেলে-মানুষের মত মিছে কেন ভয় কর্‌চি? তার ভালবাসা ফিরে পাবার এই একমাত্র উপায়; এই উপায়টা একবার পরোখ করে দেখ্‌তে হবে।"

ডাক্তার শেরবোনো এখন সেই লোহার হাতলটা দুইজনকে ধরিতে বলিলেন, কৌণ্ট ও অক্টেভ দুজনেই হাতলটা ধরিল। চৌম্বক-

তরল-পদার্থে ঐ হাতলটা পূর্ণমাত্রায় ভরা ছিল,—ধরিবামাত্র দুজনেই অচেতন হইয়া পড়িল—দেখিলে মনে হয় যেন উহাদের মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তার হাতের ঝাড়া দিতে লাগিলেন, নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলেন, প্রথমবারের মত মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন; উচ্চারণ করিয়াই তাঁর সেই পিট্‌পিটে জ্বল্‌জ্বলে চোখের দৃষ্টি দুইজনের উপর নিক্ষেপ করিলেন; তারপর ডাক্তার, কৌণ্ট ওলাফের আত্মাকে আবার তার নিজ আবাস-দেহে লইয়া গেলেন; এই সময় ওলাফ, সম্মোহনকারীর অঙ্গভঙ্গীগুলা খুব আগ্রহের সহিত আড়চোখে দেখিতেছিলেন।

এদিকে, অক্টেভের আত্মা আস্তে আস্তে ওলাফের শরীর হইতে দূরে চলিয়া গেল; এবং নিজের শরীরে ফিরিয়া না গিয়া, মুক্তির আনন্দে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; মনে হইল যেন তার আত্মা শরীর-পিঞ্জরে আর বদ্ধ হইতে চাহে না। এই আত্মা-পাখীটি ডানা নাড়িতেছে আর ভাবিতেছে—আবার তাহার পুরাতন দুঃখের আবাসে ফিরিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় কি না—এইরূপ ইতস্তত করিতে করিতে ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। শেরবোনো এই স্থলে কিংকর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া, সেই সর্ব্ববিজয়ী দুর্নিবার মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক একটা বৈদ্যুতিক 'ঝাড়া' দিলেন; আত্মারূপ সেই কম্পমান ক্ষুদ্র আলোকটি ইতিপূর্ব্বেই আকর্ষণ-মণ্ডলের বাহিরে গিয়া, জানলা-শাশির স্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল।

ডাক্তার, বাহুল্য মনে করিয়া অন্য চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন এবং কৌণ্টকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিলেন। কৌণ্ট একটা আয়নায় নিজের পূর্ব্বমুখশ্রী দেখিতে পাইয়া একটা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহার পর ডাক্তারের হস্তমর্দ্দন করিয়া, অক্টেভের দেহাবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন কি না—এই বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার জন্য কৌণ্ট অক্টেভের নিশ্চল দেহের উপর একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎ মুহূর্ত্ত পরে, খিলান-মণ্ডলের নীচে গাড়ীর একটা চাপা ঘর্ঘর শব্দ শুনা গেল; এখন ডাক্তার শেরবোনো একাকী অক্টেভের মৃতদেহের সম্মুখে। কৌণ্ট প্রস্থান করিলে, এলিফ্যাণ্টা-ব্রাহ্মণের শিষ্য শেরবোনো বলিয়া উঠিলেন, "রাম বল! এ যে এক মুস্কিলের ব্যাপার; আমি খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছি, পাখী উড়ে গেছে; এর মধ্যেই পৃথিবীর আকর্ষণ-মণ্ডলের বাহিরে এত দূরে চলে গেছে যে এখন সন্ন্যাসী ব্রহ্মলোগমও তাকে ধরতে পারবে না। আমি একটা মৃত শরীর কোলে নিয়ে বসে আছি। আমি খুব একটা কড়া দ্রাবক-রসে ডুবিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে দিতে পারি কিংবা ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে প্রাচীন মিসরের মমির মত আরকে জারিয়ে রাখ্‌তে পারি; কিন্তু তাহলে খোঁজ হবে, খানাতল্লাসি হবে, আমার বাক্স সিন্দুক খোলা হবে, আর কত-কি বিরক্তিকর প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে।" এইখানে ডাক্তারের মাথায় বেশ একটা মৎলব আসিয়া জুটিল; অমনি তিনি একটা কলম লইয়া তাড়াতাড়ি এক-তক্তা কাগজের উপর কয়েক ছত্র লিখিয়া ফেলিলেন। তাতে এই কথাগুলি ছিল ঃ—

"আমার কোন আত্মীয় না থাকায়, কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি সাবিলের অক্টেভকে দিয়া যাইতেছি; আমি তাকে বিশেষরূপে স্নেহ করি। নিম্নলিখিত টাকা শোধ করিয়া যাহা থাকিবে সমস্তই তাহার প্রাপ্য:—১ লক্ষ টাকা সিংহলের ব্রাহ্মণ-হাসপাতালে, শ্রান্ত বা পীড়িত বৃদ্ধ জীবজন্তুদের আতুরাশ্রমে দিলাম। আমার ভারতীয় ভৃত্যকে ও আমার ইংরেজ ভৃত্যকে বারো হাজার টাকা দিলাম। আর এক কথা, মনুর মানবধর্ম্মের পুঁথিটা মাজারীণ পুস্তকালয়ে যেন ফেরৎ দেওয়া হয়।"

একজন জীবিত ব্যক্তি মৃতব্যক্তিকে উইল-সূত্রে দানপত্র লিখিয়া দিতেছে, আমাদের এই বিস্ময়জনক অথচ বাস্তব ইতিহাসের মধ্যে ইহাও একটা কম অদ্ভুত ব্যাপার নহে। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য এখনি উদ্ভাসিত হইবে।

অক্টেভের পরিত্যক্ত দেহে প্রাণের উত্তাপ এখনো ছিল। ডাক্তার অক্টেভের এই দেহ স্পর্শ করিলেন—স্পর্শ করিয়া অতীব ঘৃণার সহিত আয়নায় আপনার মুখ দেখিলেন; দেখিলেন, মুখ বলি-রেখায় আচ্ছন্ন, এবং কষ লাগানো হাঙ্গর-চামড়ার মত শুষ্ক ও কর্কশ। দর্জি নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া দিলে পুরাতন পরিচ্ছদ পরিত্যাগের সময় মনের যে ভাব হয় সেই ভাবে ডাক্তার আপন মুখ দেখিয়া একটা মুখভঙ্গী করিলেন। তাহার পর, সন্ন্যাসী ব্রহ্মলোগমের মন্ত্রটা আওড়াইলেন।

অমনি, ডাক্তার বালথাজার শেরবোনোর শরীর বজ্রাহতের ন্যায় কার্পেটের উপর গড়াইয়া পড়িল; আর অক্টেভের শরীর সবল হইয়া, সজাগ হইয়া, জীবন্ত হইয়া আবার খাড়া হইয়া উঠিল।

অক্টেভদেহধারী-শেরবোনো তাঁহার নিজের শীর্ণ, অস্থিময় ও নীলাভ পরিত্যক্ত নির্ম্মোকের সম্মুখে কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার এই পরিত্যক্ত দেহের মধ্যে শক্তিশালী আত্মা না থাকায়, সেই দেহে প্রায় তখনই জরার লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং অচিরাৎ ঐ দেহ শব-আকার ধারণ করিল।

"বিদায়! ওরে অপদার্থ মাংসখণ্ড; বিদায়, ওরে আমার শতছিদ্র চীরবস্ত্রখানি; এই ৭০ বৎসর তোকে টেনে-টেনে পৃথিবীময় নিয়ে বেড়িয়েছি! তুই আমার অনেক সেবা করেছিস্, তাই তোকে ছেড়ে যেতে আমার একটু দুঃখ হচ্চে। কত দিন থেকে একসঙ্গে থাকা অভ্যাস আমাদের! কিন্তু এই যুবার দেহাবরণ ধারণ করে আমি এখন বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে পারব, শাস্ত্রানুশীলন করতে পারব, যথোচিত পরিশ্রম করতে পারব, সেই বৃহৎ পুঁথির আরও কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করতে পারব; যে জায়গাটা খুব ভাল লাগবে সেই জায়গাটা পড়বার সময় মৃত্যু এসে সহসা বল্‌তে পারবে না—"আর না, যথেষ্ট হয়েছে, পড়া বন্ধ কর্।"

আপনার কাছে আপনি এই অন্ত্যেষ্টি বক্তৃতা করিয়া, শেরবোনো তাঁহার নূতন অস্তিত্ব অধিকার করিবার জন্য ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন।

এদিকে কৌণ্ট ওলাফ তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, কৌণ্টেশের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না।

ওলাফ দেখিলেন,—কৌণ্টেশ উদ্ভিদ-গৃহে শৈবাল বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। শৈবাল-গৃহের পার্শ্বদেশের স্ফটিকের চৌকা শার্শিগুলা একটু উপরে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া কবোষ্ণ জ্যোতির্ম্ময় বায়ু প্রবেশ করিতেছে—শৈবাল-গৃহের মধ্যস্থল বিদেশী ও গৃষ্মমণ্ডলের উদ্ভিজ্জে আচ্ছন্ন হইয়া যেন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কৌন্‌টেশ, নোভালিসের গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। যে সকল জর্ম্মান গ্রন্থকার প্রেতাত্মবাদ সম্বন্ধে অতীব সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে নোভালিস একজন। যে সকল গ্রন্থে খুব গাঢ় রং ঢালিয়া বাস্তব জীবন চিত্রিত হইয়াছে কৌণ্টেশ সেই সব গ্রন্থ পড়িতে ভাল বাসিতেন না। সৌখীনতা প্রেম ও কবিতার জগতে চিরদিন বাস করিয়া আসায় জীবনটা তাঁর একটু স্থূল বলিয়া মনে হইত।

তিনি পুস্তকটা ফেলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে চোখ্ তুলিয়া কৌণ্টের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কৌণ্টেশ ভয় পাইতে ছিলেন পাছে এখনো তাঁহার স্বামীর কালো চোখের তারার মধ্যে সেই আগ্রহপূর্ণ, গুহ্যভাবে-ভরা, ঝোড়ো-রকমের দৃষ্টি দেখিতে পান, যাহা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে তাঁর খুবই কষ্ট হইয়াছিল—এমন কি যা দেখিয়া (এটা মনে করা নিতান্ত আজ্‌গুবি যদিও) আর একজনের দৃষ্টি বলিয়া মনে হইয়াছিল!

ওলাফের নেত্র হইতে একটা প্রশান্ত আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, এবং সেই চোখে একটা বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। যে অপরিচিত আত্মা তাঁর মুখের ভাব বদলাইয়া দিয়াছিল, সেই আত্মা এখন চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে; প্রাস্কোভি এখন তাঁর হৃদয়ের আরাধ্য প্রিয়তমকে চিনিতে পারিলেন এবং তখনি তাঁহার স্বচ্ছ কপোলে একটা সুখের লালিমা ফুটিয়া উঠিল; যদিও ডাক্তার শেরবোনো-কৃত রূপান্তরের ব্যাপারটা তিনি জানিতেন না তথাপি একপ্রকার অন্তর্গূঢ় সূক্ষ্ম অনুভূতি হইতে এই সকল পরিবর্ত্তন তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন—যদিও তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন নাই। ওলাফ নীল মলাটের পুস্তকখানি শৈবাল-ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন:—

"তুমি কি বই পড়ছিলে প্রাস্কোভি?—আ! এ যে দেখ্‌ছি হেন্‌রি অফ্‌টর ডিঙ্গেনের ইতিহাস—এযে সেই বইখানা যা তুমি একদিন দেখে কিন্‌তে ইচ্ছে প্রকাশ করিয়াছিলে। সেই দিনই ঘোড়া ছুটিয়ে একজনের বাড়ীর টেবিলের উপর দুপুর রাত্রে ঐ বই তোমায় ল্যাম্পের পাশে এনে হাজির করে দিয়েছিলাম। ঘোড়াটার দম বেরিয়ে যাবার যোত্র হয়েছিল।"

"তাই ত তোমাকে বলেছিলাম আর কখনও আমার মনের কোন সাধ বা খেয়াল তোমার কাছে প্রকাশ করব না। তোমার চরিত্রটা কি-রকম জান?—স্পেনদেশের সেই বড় লোকের মত, যে তার প্রেয়সীকে বলেছিল,—"আকাশের তারার দিকে তাকিও না—কেননা তোমাকে তা এনে দিতে পারব না।"

কৌণ্ট উত্তর করিলেন:—

"তুমি যদি কোন তারার দিকে তাকাও প্রাস্কোভি, তা হলে আমি আকাশে উঠ্‌বার

চেষ্টা করব, আর ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তারাটা চেয়ে নেব।”

যখন প্রাস্কোভি স্বামীর এই কথাগুলি শুনিতেছিলেন সেইসময় তাঁর কেশ বন্ধনের একটা ফিতা বিদ্রোহী হওয়ায়, সেই ফিতাটি ঠিক করিবার জন্য হাত উঠাইলেন,—তাঁহার জামার আস্তিনটা একটু সরিয়া গেল; আর অমনি তাঁর সুন্দর নগ্ন বাহু বাহির হইয়া পড়িল। তাঁর হস্ত-প্রকোষ্ঠে নীলা পাথর-বসানো একটা গির্গিটি কুণ্ডলী পাকাইয়া ছিল। “কাসিনে”তে তাঁহাকে দেখিয়া যেদিন অক্টেভের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল সেই দিন তিনি এই অলঙ্কারাটি হাতে পারিয়াছিলেন। কৌণ্ট বলিলেন ঃ—

“তোমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তুমি যেদিন প্রথমবার বাগানে নেমেছিলে, তখন একটা ছোট গির্গিটি দেখে তোমার কি ভয়ই হয়েছিল; গির্গিটাকে আমার ছড়ির এক ঘায়ে মেরে ফেল্লাম; তারপর, তার থেকে সোনার ছাঁচ তুলে কতকগুলি রত্ন দিয়ে সেই সোনার ছাঁচটাকে ভূষিত করলাম। কিন্তু গির্গিটা অলঙ্কারে পরিণত হলেও, তুমি দেখে ভয় পেতে; কিছু কাল পরে, যখন তোমার ভয় ভেঙ্গে গেল, তখন তুমি অলঙ্কারটা পরতে রাজি হলে।”

—“ওঃ! এখন আমার বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে; সকল গহনার চেয়ে এই গহনাটাই আমি এখন পছন্দ করি; কারণ এর সঙ্গে আমার একটা সুখের স্মৃতি জড়ানো রয়েছে।”

কৌণ্ট বলিলেন ঃ—“সেই দিনই আমরা ঠিক করেছিলাম, তুমি তোমার খুড়ীর কাছে আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে রীতিমত প্রস্তাব করবে।”

কৌণ্টেশ প্রকৃত ওলাফের পূর্ব্বেকার দৃষ্টি আবার দেখিতে পাইয়া, তাঁহার কণ্ঠস্বর আবার শুনিতে পাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং স্মিতমুখে তাঁহার পানে চাহিয়া, তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া উদ্ভিজ্জ-গৃহে দুই চার বার ঘোর-পাক দিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে,—যে হাতটি মুক্ত ছিল সেই হাত দিয়া একটি ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া তার পাপড়ি-গুলা দাঁত দিয়া কাটিতে লাগিলেন। মুক্ত-দন্তে যে ফুলটি কাটিতেছিলেন সেই ফুলটি ফেলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন ঃ—

“আজ তোমার স্মরণশক্তির যেরকম পরিচয় পাচ্চি তাতে বোধ হয় তোমার মাতৃ-ভাষাও তোমার আবার মনে পড়েছে, মাতৃভাষায় তুমি বোধ হয় এখন আবার কথা কইতে পার—কাল ত তোমার মাতৃ-ভাষা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে।”

কৌণ্ট গোলীয় ভাষায় উত্তর করিলেন ঃ—“ওঃ! যদি প্রেতাত্মারা স্বর্গের জন্য কোন এক মানব-ভাষা স্থির করে থাকেন, তাহলে আমি সেখানে গিয়ে পোলীয় ভাষাতেই তোমাকে বল্‌ব—“আমি তোমাকে ভালবাসি।”

প্রাস্কোভি চলিতে চলিতে, ওলাফের কাঁধের উপর আস্তে আস্তে তাঁহার মাথা নোয়াইলেন এবং গুণ গুণ স্বরে বলিলেন ঃ—

“প্রাণেশ্বর; এইত সেই তুমি—যাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। কাল আমাকে বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে; অপরিচিত লোক ভেবে তোমার কাছ থেকে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম।”

তার পরদিন, অক্টেভের দেহে বুড়া ডাক্তারের আত্মা প্রবেশ করায় অক্টেভ সজীব হইয়া উঠিল। এবং একটু পরে কালো রেখার ঘের-দেওয়া একখানি পত্র পাইল। উহাতে বালথাজার-শেরবোনো মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিবার জন্য অক্টেভকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ডাক্তার তাঁহার নূতন দেহ ধারণ করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত পুরাতন দেহের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি-ভূমিতে গমন করিলেন; ঐ দেহ কবরস্থ হইল; গোর দিবার সময় যে বক্তৃতা হইল তাহা তিনি শোকগ্রস্তের ন্যায় দুঃখের ভাব ধারণ করিয়া মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হইল সে ক্ষতিপূরণ হওয়া অসম্ভব ইত্যাদি সেই বক্তৃতায় অনেক কথা ছিল।

ঐ দিনই সায়াহ্ন-সংবাদ পত্রের “বিবিধ সংবাদের” কোঠায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হইল ঃ—

“ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো—যিনি দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিবার জন্য, শব্দ-বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য, রোগ আরোগ্য করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত, গতকল্য নিজ কর্ম্ম-কক্ষে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত দেহ তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে, কোন আততায়ীকৃত সাঙ্ঘাতিক অপরাধ অনুমান করিবার কোনও হেতু নাই। অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে কিংবা কোন অসমসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে গিয়াই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। শুনা যায়, ডাক্তারের দফ্‌তরখানায় তাঁর অন্তিম-দানপত্রখানি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি তাঁহার বহুমূল্য পুঁথিগুলি মাদারীণ-পুস্তকালয়ে দান করিয়াছেন এবং সেবিলের অক্টেভ মহাশয়কে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন।” * †

সমাপ্ত

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* এই গল্পের লেখক Theophile Gautier (১৮১১—৭২) একজন কবি এবং ঊনবিংশতি শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে যে সকল গদ্য-লেখক আবির্ভূত হইয়াছিল তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। সাহিত্যিক মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার যেরূপ ছন্দের “কাণ” ও জ্বলন্ত স্বপ্নময়ী কল্পনা ছিল, তাহা অতুলনীয়। অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত ভব্য সাহিত্য এবং অবাধ কল্পনাপ্রসূত নব্য সাহিত্য এই উভয়ের যুদ্ধে তিনি নব্য সাহিত্যেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য গ্রন্থ Mademoiselle de Maupin আমাদের দেশেও অনেকে পড়িয়াছেন, কেননা ইহার ইংরাজী তর্জ্জমা আছে। লিখিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট গল্প-রচনা আছে তন্মধ্যে Avatar (অবতার) একটি। ইংরাজীতে বোধহয় ইহার অনুবাদ হয় নাই।

† ভ্রম-সংশোধন ঃ—পূর্ব্ব সংখ্যায় “অবতারে”—৩১ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তিতে “আরো কএক মিনিট কৌণ্ট ওলাফের ভূমিকাই বজায় রেখে”—এই অংশটি “মহাশয়গণ” এর পরে না বসিয়া পূর্ব্বে বসিবে।

অকারণের কান্না

মনে ছিল আশা
আমার এ ভালোবাসা
সারা হবে শুধু হাসি দিয়া;
আমি সেথা রব আর রবে মোর প্রিয়া।
যত কাছে যাই তার, হাসি ছিল যত
অগোচরে হয়ে ওঠে বেদনার মত
মিলায় নয়ন-জলে শেষে;
ভালো জ্বালা হলো ভালোবেসে!

প্রিয়ার কুটীর-দ্বারে, তার দুটি নয়নের ছায়
বিশ্বের আকুতি যত হেরি যে ঘনায়
ক্ষুধাতুর আকুল ক্রন্দনে।
শোণিত-চন্দনে
ঊষা তার দেহ লিপ্ত করে।
দ্বিপ্রহরে
দুরন্ত বাতাস আনে বুক-ভাঙা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
সন্ধ্যা আনে অন্ধ-করা অন্ধকারে গড়া নাগপাশ
মনে হয় যুগে যুগে দেশে দেশে
যাহারা মরেচে ভালোবেসে,
আজিও মরিছে যারা,
সবাকার আঁখি-ধারা
প্রিয়ারে দিয়াছে রূপ। বধির আতুর
অন্ধ খঞ্জ উপবাসী বিরহ-বিধুর
হতভাগা সকলের তপশ্চর্য্যা মিলে
তাহারে গড়েছে তিলে তিলে।
তাহারে আনিতে গৃহে, আনি তার সহ
এ বিশ্বের সকল বিরহ।
—অব্যক্ত ব্যথায় মোর অন্তর বিকল,
হাসি ফুটাইতে গিয়া শুধুশুধু চোখে আসে জল!
যত ভাবি, পলে পলে দিন শুধু কাটে,
বুকে টেনে নিতে তারে বুক মোর ফাটে!

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

আদর্শ-বিপর্য্যয়

'আদর্শের বিড়ম্বনার' (ভারতী, ফাল্গুন) লেখক মহাশয় যুধিষ্ঠিরের চরিত্র নূতন করিয়া লোক-চক্ষুর সম্মুখে বিচারার্থ টানিয়া আনিয়া যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একটু প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। হিন্দুর মজ্জার ভিতর ধর্ম্মরাজ-মূর্ত্তির একটা পূত উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়া ইহা নীরবে বহুদিন শয়ান ছিল, তাঁহাকে যে বিংশশতাব্দীর নীতিধর্ম্ম-দীক্ষিত তাঁহার বংশধরদিগের সম্মুখে আসিয়া সমালোচনার কঠিন পরীক্ষাতে পাশ করিয়া ফার্ষ্টক্লাস সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে, এটা যদি তিনি কোন দেবদূত সাহায্যে জানিতে পারিতেন, তবে অতটা নিশ্চিন্ত মনে স্বর্গে যাইতে পারিতেন না। যাহা হউক, যিনি যুধিষ্ঠির-চরিত্রে পরীক্ষার আঘাত করিয়া এতগুলি হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিবার দায়ীত্ব লইতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে

নমস্কার করিয়া আমার বক্তব্যটুকু বলিব, লেখক মহাশয় তাঁহার বিচারকের নীরস-গম্ভীর ভ্রুকুটীটা অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু সহানুভূতির হাস্য-রেখায় পরিণত করিলে মনে সাহস পাই।

মহাভারতটা যে আমাদের জাতীয় মহাকাব্য, এটা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এটা ইতিহাস কিনা, সে প্রশ্ন না উঠানই ভাল। কারণ ভাবপ্রবণ হিন্দু ইতিহাসকে ভাবের রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া সুখ-দুঃখময় জীবনকে তাহার সম্পূর্ণ সুন্দর ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখিতেন। অধ্যাত্মবাদীর হাতে কাব্য-ইতিহাসের প্রয়াগ-সঙ্গম ঘটিয়াছে। এই যুধিষ্ঠির চরিত্রকে আমরা কাব্যসৌন্দর্য্যের দিক দিয়া দেখিব। ইহা সুন্দর, মোহন হইয়াছে কিনা দেখিব;—ওকালতি করিবার ঔদ্ধত্য নাই।

হিন্দুর শিল্পকলার (art) মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই তাহার একটা বিরাটতার ভাব আমাদের চক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মহাভারতের এই সকল চরিত্রও বিরাট, গড়িবার উপকরণও বিস্তর—বিরাটেরই অনুরূপ, ব্যাপ্তিতে যেরূপ প্রকাণ্ড, উচ্চতাতেও সেইরূপ অভ্রভেদী। ঋষিগণ বুঝি বিন্ধ্য-হিমাচলের মত পর্ব্বত কাটিয়া ইহাদের মূর্ত্তি গড়িতেন। ইউরোপীয় আদর্শের ছাঁচে ফেলিয়া রোমীয় ভাস্কর্য্যের পুতুল মূর্ত্তির মত এই সকল চরিত্র ব্যবহারিক জ্যামিতির রেখাসূত্রানুসারে গড়িয়া উঠে নাই। যেখানে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি একীভূত হইয়া সাগর-সঙ্গমে মিশিয়াছে, এই চরিত্রগুলি সেই স্থান হইতে প্রেরণা লইয়া মানুষিক জগতের সহিত অতিমানুষিক জগতের সামঞ্জস্য ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাই পাণ্ডবদিগের জন্মবৃত্তান্ত অদ্ভুত, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিও রহস্যময়। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডুর জন্মকথাও অনেক নৈতিক শুচি-বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির নাসিকা-সঙ্কোচের কারণ হইতে পারে।

এই কাব্যের মানুষগুলি দেববিভূতি লইয়া জন্মিয়াছে,—প্রকৃত বা স্থূল জগতের পশ্চাতে সূক্ষ্ম জগতের ছায়াময় দৃশ্য। ইহাঁদের প্রতাপে বিশ্ব প্রকম্পিত হয়, তথাপি ইহারা আমাদের মতই মানুষ। আমাদের মাথার উপর গৌরব-লোকে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আমাদের নিতান্ত আত্মীয়; তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হাসি কাঁদি। আত্মার অমোঘ শক্তির সাধনায় তাঁহারা আপনাদিগকে বহু উর্দ্ধলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সংসারের মানুষ, অতিমানুষ নহেন। হিন্দুরা অতিমানুষ চরিত্রও অনেক গড়িয়াছেন! মহাদেব অতি মানুষ। তাহা যেন শুদ্ধসত্ত্বের জমাটভাব লইয়া রজত-গিরিনিভ রত্নকল্লোজ্জ্বলাঙ্গ হইয়া ধ্যানস্থ হিন্দুর মানসক্ষেত্রে শোভা পায়। তাঁহাদের কার্য্যকলাপগুলা মোটের উপর আমাদের সংসারের রুটিন-বহির্ভূত। এই অতিমানুষ জগতের রহস্যময় দৃশ্যের সম্মুখে সাংসারিক জগতের দৃশ্য ফেলিয়া হিন্দুরা আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এখন এই মানুষ-চরিত্রে তাঁহারা কি কি ভাবের অভিব্যক্তি দিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক। মহাভারতের কৃষ্ণের মধ্যে তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধির চরম সম্পত্তির অধিকারী লীলা-

রহস্যময় মহা-প্রতাপশালী বিরাট পুরুষের মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। ইহা ভগবানের জগতে প্রকাশ হওয়ারই সম্ভবময় চিত্র। তিনিই যেন ধর্ম্মচক্রের নিয়ন্তা; ইঁহার উপর যুধিষ্ঠিরের অটল বিশ্বাস। এই যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ—অবশ্য মানুষ ধর্ম্মরাজ এবং শুধুই মানুষ নহেন, জাতিতে ক্ষত্রিয়- এই ধর্ম্মচক্রে বিচরণ করিতেছেন। এখন এই মানুষ ধর্ম্মরাজ মূর্ত্তি ঋষিদের হস্তে কি ভাব-সৌন্দর্য্য লইয়া ফুটিয়াছে। ব্যাপকভাবে আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হইবে।

তাঁহারা ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝিতেন অনেক সময় আমরা সে কথাটা বিশেষ না ভাবিয়া দেখায়, বিলাতি নীতিশাস্ত্রের রিলিজিয়নের গর্ত্তে পড়িয়া যাই। তাঁহারা ধর্ম্ম বলিতে যে জাতিগত, ব্যক্তিগত, পার্থিব এবং পরমার্থিক ক্রিয়া-কলাপের একটা সুশৃঙ্খল নিয়মের ধারাকে মনে করিতেন, ইহা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে,—ভগিনী নিবেদিতা যাহা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, "It applies to the whole system of moral and complex action and interaction on planes moral, intellectual, economic, industrial, political and domestic which we know as India or the national habit." যে নিয়মচক্রে সৃষ্টি বিধৃত, এক কথায় তাহাই ধর্ম্মচক্র; তাই জীবনের মতই ইহার ব্যাপ্তি, মানুষের সমস্ত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম ভাবে ইহার গতি। ঘাতপ্রতিঘাতের ভীষণ সংঘর্ষে এই চক্র ঘুরিতেছে। এই সকল ঘাত-প্রতিঘাতকে অর্থাৎ এই জীবটাকে তাঁহারা কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে দেখিতেন সেটা দেখা আবশ্যক।

সমগ্র সৃষ্টিকে এবং সৃষ্টির প্রধান জীব (সম্ভবতঃ) মানুষকে তাঁহারা স্বত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যথাক্রমে আধিক্য অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আদি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন। এই সত্ত্বের সহিত রজস্তমের দ্বন্দ্বের সংঘাতে জীবন-চক্র ঘুরিতেছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা তাহার স্বভাব এই সত্ত্বে অবস্থান, নতুবা শান্তি নাই। রাম-রাবণের ও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে এই দ্বন্দ প্রতিফলিত। এই সত্ত্বস্থ মানুষ তাহার শুভ্রত্ব ও শান্তভাবের জন্য রাজসের উন্মাদনাময় নেশার চোখে অশোভন ঠেকে। রামচিত্র কবি মধুসূদনের হস্তে হীনপ্রভ হইয়াছে। যুধিষ্ঠির চরিত্রও অনেকের কাছে ভীরু বোধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। এই সত্ত্বস্থ মানুষের লক্ষণ, স্বমানিত পূজাযমনিয়মাদি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ষতা, শমদমাদি দৈবি সম্পত্তি, অসদাবরণ হইতে নিবৃত্তি—এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে। অবশ্য এই সকল তত্ত্বকথা এই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে—কোন কাব্যেরই হওয়া উচিত নয়। সৃষ্টিতত্ত্বের মূল চিরন্তন সত্যগুলি ঋষিদের দিব্যদৃষ্টিতে যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক সে বিষয়ে তর্ক স্থগিত রাখিয়া, আমাদের মনে রাখিতে হইবে, এই সকল সত্যজ্ঞানই তাঁহাদের ধ্যানধারণাকে আকার প্রদান করিয়াছে। এই সত্ত্বস্থ স্বধর্ম্মান্বিত চরিত্রগুলি হিন্দুদের কাব্যে শান্তরসের সৌন্দর্য্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি,

ত্যাগ, স্নেহ, দয়া, তিতিক্ষার শুভ্রমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; রজস্তমোর অবিরাম সংঘর্ষ ইহাকে প্রকটিত করিতেছে।

আমরা বিশ্বকেন্দ্রে এই দ্বন্দের সংঘাত দেখিয়া আসিতেছি—একদিকে দম্ভ, অভিমান, লোভ, বাসনা, অসূয়া—অন্যদিকে বিনয়-নিরভিমানিতা, ত্যাগ, ধৈর্য্য, ক্ষমা—একদিকে প্রবল অত্যাচারী, পরপীড়ক, স্বার্থান্বেষী, দুরাকাঙ্ক্ষা,—আর অন্যদিকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ, অটল ধৈর্য্যে অবস্থিত উৎপীড়িত ধর্ম্ম;—একদিকে অন্যায়কারী রাবণ, অন্যদিকে অন্যায়ের প্রতিবিধানকারী রাম,—একদিকে দুষ্ট যুদ্ধকারী দুর্য্যোধন—অন্যদিকে যুধিষ্ঠির, যুদ্ধে ধীর স্থির, সময়ে সময়ে যেন একটু অভিভূত, কিন্তু প্রবল ঝটিকান্তে পৃথিবীর ন্যায় নির্দ্দিষ্ট কক্ষে অবস্থিত। এইরূপ কল্পনাই যুধিষ্ঠিরের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক তাঁহার জীবনব্যাপী কার্য্যকলাপে কিরূপ ভাবে এই ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছে।

তপঃপ্রভাবসম্পন্ন—কুন্তীদেবীর ইনি জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রভঞ্জনতুল্য বলশালী ভীম, বিদ্যুৎগর্ভ-মেঘের ন্যায় শান্তভীষণ অর্জ্জুন, তাঁহার নিতান্ত অনুগত দুই বাহুস্বরূপ। তাঁহার স্বীয় বীর্য্যের অত্যধিক শান্তভাবের জন্যই সম্ভবতঃ আমরা সেটা উপেক্ষা করিতে অভ্যস্ত। কৃষ্ণের মতে তিনি ব্যতীত পাণ্ডবদের মধ্যে অন্য কেহই শল্যের তুল্য বলশালী ছিলেন না। তিনিই শল্যের একমাত্র প্রতিযোদ্ধা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে তাঁহার হস্তে পরাজিত বিধ্বস্ত দেখিতে পাই (কর্ণপর্ব্ব)। ফুৎকারে কৌরবনাশ করিবার ক্ষমতা রাখিয়াও তিনি দুর্য্যোধনের হস্তে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও অপমানিত। জতুগৃহের বিপত্তি, পাশাক্রীড়ায় অপমান, বনবাসের নির্য্যাতন তাঁহার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাঁহার মনে বিদ্রোহ জাগাইতে পারে নাই। ধর্ম্মে উন্মাদনা নাই; তাহার অগাধ শক্তি সংহত সুনিয়ন্ত্রিত। তিনি ক্ষত্রিয়, আঘাত হইতে রক্ষা করা তাঁহার ধর্ম্ম, আঘাত করা ধর্ম্ম নহে। বনবাস-গমনকালে তিনি চক্ষু আবৃত করিয়া ক্ষুব্ধ ধর্ম্মের কোপ হইতে শত্রুকেও রক্ষা করিতেছেন। যে ধর্ম্ম সংসার-যুদ্ধে পরাভূত হইয়া কাতর কান্তা বলিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করে, অথবা টাইমন অফ্ এথেন্সের মত সংসার-বিদ্বেষী হইয়া যায়, এ সে ধর্ম্ম নহে। এ ধর্ম্মরাজ বীর, তিনি নিজে জীবন-যুদ্ধে অটল তাহাই নয়, অনুগতদের আশ্রয়স্থল। তিনি শত্রুকেও বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের বিপদের প্রতি ঔদাসীন্য দেখান। ন্যায়ের মানদণ্ডের কাছে তিনি সসঙ্কোচ প্রণত। কঠোর ভবিতব্যতা তাঁহার ভীম বক্ষের উপর দিয়া ঝঞ্ঝার পদক্ষেপে পঞ্জর বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া যাইতেছে অথচ তাঁহাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিতেছেনা। তিনি বিজয়াকাঙ্ক্ষী। এই অদ্ভুত বিক্রমশালী ব্যক্তির উদার ক্ষমা ও নীরব সহিষ্ণুতার মধ্যে কি একটা মহিমময় বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না? এটা কি বড় সুন্দর নয়? 'নিরুপদ্রব অসহযোগিতা'মন্ত্রের প্রচারক কি এই বীরত্বেরই অনুকরণাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে হয় না?

আমরা যদি বাহির হইতে এই যুধিষ্ঠির-চরিত্র কতকগুলি কর্ম্ম-সমবায়ের একটা

কৃত্রিম ঠাট মনে করিয়া দেখিতে যাই, তবে বড় ভুল করিব। ইহা প্রকৃতি দেবীর জীবন্ত বস্তুরই মত অন্তরাত্মার মধ্য হইতে ঐশ প্রেরণা লইয়া প্রকৃতির নিয়মানুসারে কর্ম্মের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ব্যবহার-জগতের ভাষায় বলিব, এই কর্ম্মগুলি একটা নিগূঢ় কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা অনুস্যূত এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানের শিখায় প্রদীপ্ত, আস্তিক্যের দৃঢ় স্থিরদণ্ডকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জীবনের পরিধি পর্য্যন্ত ভ্রাম্যমান। অনুগত জনের প্রতি অটুট স্নেহ ইহাকে রসধারসিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। দেবদ্বিজ ও গুরুজনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ইহাকে মধুময় করিয়া দিয়াছে, স্বার্থবিদ্বেষের কলুষ ইহার অকলঙ্ক শুভ্রতাকে মলিন করে নাই। দমনিয়মাদি সঙ্গীতের তানলয়ের মত ইহাকে বাঁধিয়া সরল করিয়া দিয়াছে। যুধিষ্ঠির জীবন-রঙ্গমঞ্চে এই ধর্ম্মমার্গে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করার মত অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে বিচরণ করিতেছেন। দুর্য্যোধন তাঁহার বিদ্বেষ-বিরহিত হৃদয়ের কাছে সুযোধন। ধর্ম্মের নিকট তিনি মাতৃহীন সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবন ভিক্ষা করিয়া অনুজ-স্নেহ ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লাঞ্ছনা-অপমান পাইয়া তাহা ফিরাইয়া দিবার প্রবৃত্তি রাখেন না, ন্যায়ের উপর শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। "অনাসঙ্গ ধর্ম্মের মূর্ত্তি-স্বরূপিণী" পঞ্চভ্রাতার পত্নী দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া তিনি বিবাহের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন, তিনি ভোগপ্রয়াসী নহেন—অন্য বিবাহ নিষ্প্রয়োজন। তিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া পাশা খেলিয়াছিলেন। অধর্ম্মের আশঙ্কায় শকুনিকে কত অনুযোগ করিতেছেন কিন্তু যুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিবেন না। নিজেকে পণে হারিবার পর তিনি অবশেষে দ্রৌপদীতে মমত্বাভিমান থাকায় কর্ত্তব্যবোধে তাঁহাকেও পণ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জীবন-যুদ্ধে যাহা কিছু সাংসারিক অধিকার-বৈভব সমস্ত পণ রাখিয়া যেন ধর্ম্মের নিজস্বরূপে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন মাত্র। নিজেকে হারিবার পর দ্রৌপদীকে পণ রাখার অধিকার লইয়া প্রাজ্ঞেরা তর্ক তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহাতে যোগদান করেন নাই, কর্ত্তব্যের ফল হইতে অব্যাহতির আশায় ধর্ম্ম তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করে না। তাঁহার রাজ্য পণ রাখিবার অধিকার ছিল কি না এ লইয়া আমরা তর্ক করিতে পারি, কিন্তু যে কালে রাজারা রাজ্য দান করিত, সে কালের লোক ইহা লইয়া তর্ক করা বোধ হয় অধর্ম্ম মনে করিত। এ প্রশ্ন তখন উঠে নাই। যুদ্ধও তাঁহার কর্ত্তব্য, তিনি ভারতযুদ্ধকালে কই অর্জ্জুনের মত দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করেন নাই। বিপক্ষ গুরুজনের অনুমতি লইয়া তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জীবনের যাহা কিছু প্রিয়, সব বিসর্জ্জন দিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিলেন। সংসারযুদ্ধে তিনি বিজয়াকাঙ্ক্ষী, কিন্তু দুর্য্যোধনের মত "ঈর্ষাসিন্ধু মন্থনসঞ্জাত জয়রস" পান করিয়া মত্ত হইবার জন্য বিজয়াকাঙ্ক্ষী নহেন। যুদ্ধে জিতিলেন, কিন্তু হৃদয়ের পঞ্জর যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সিংহাসনে বসিয়া প্রজা পালন করিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন—রাজকর্ত্তব্য পালন করিলেন। কর্ত্তব্য সমাপনান্তে স্বর্গপথের পথিক হইলেন। ধর্ম্মের জয় বড় ট্রাজিক।

আমাদের মনে হয়, পাছে এত বড় ধর্ম্ম-মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে একেবারে অতিমানুষ ঠেকে, তাই কবি তাঁহাকে দিয়া ভারত-যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করাইয়াছেন। তিনি আপদ্ধর্ম্ম মানেন; উদ্যোগপর্ব্বে সঞ্জয়ের সহিত এই আপদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন। বিপদকালে যখন এই আপদ্ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তব্য মনে করেন, তখন তিনি মহাজ্ঞানী কৃষ্ণের উপর নির্ভর করেন। এই কৃষ্ণের কথাতেই তিনি দ্রোণ-বধে একবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌশলাবলম্বন যে তাঁহার পক্ষে কতদূর অস্বাভাবিক তাহা তাঁহার হস্তগজপ্রকারের বিপন্ন অবস্থা হইতে সুস্পষ্ট হয়। এইস্থানে কবি, তাঁহার ঊর্দ্ধলোক-বিহারী রথচক্রকে পার্থিব ধরিত্রীর সংস্পর্শে আনিয়া—তাঁহাকে মানবতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার নির্ম্মল জ্যোতির উদগ্র শুভ্রতাকে একটু মলিমলিন করিয়া দিয়া তাঁহাকে আমাদের চক্ষে পরিচিতের মত করিয়া দিয়াছেন—তাঁহাকে "faultily faultless, icily regular, splendidly null বা এককথায় dead perfection, dead perfection হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই সূত্র ধরিয়া কবি তাঁহাকে আবার স্বর্গে উঠাইবার সময় একবার নরক দর্শন করাইয়া মর্ত্ত্যের গ্লানিনির্ম্মোক হইতে মুক্ত ও শুভ্রস্বরূপ প্রদান করিয়া বিশিষ্ট বিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

জীবনের নিম্নতল হইতে অন্ধকার স্তর ভেদ করিয়া দীপ্ত ধূপের মত ঊর্দ্ধলোকে প্রয়াণ,—এরূপ চিত্রও না দেখিয়াছি, এমন নয়; কিন্তু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বিক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নিয়মের চক্রে পরিভ্রমণ—যুধিষ্ঠির চিত্র যেন এইরূপ—। তিনি স্বভাব-ধর্ম্মশীল--তাই জলের শৈত্যগুণের মত তাঁহার নিশ্চেষ্ট ধর্ম্মশীলতা অধঃপতিত আমাদের চক্ষে দৃঢ় না ঠেকিতে পারে। এখন যদি আমরা আমাদের মনের উপর সমষ্টিগতভাবে যুধিষ্ঠির-চরিত্রের প্রভাব লক্ষ্য করি তাহা হইলে এই স্তব্ধ সমুদ্রের মত প্রশান্ত, হিমাচলের মত অটল, সূর্য্যের মত তেজঃসম্পন্ন, মেঘের মত শ্যামস্নিগ্ধ, ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু, পূতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, এই কল্যাণ-কঠোরতাময় নির্ভীক ধর্ম্মভীরু সসঙ্কোচ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ মূর্ত্তিটী বড়ই সুন্দর ঠেকে না কি? ইহা বুঝি আর্য্য ভারতবর্ষের আত্মা ছানিয়া গঠিত করা হইয়াছে। ইহা কি আমাদের জাতীয় আদর্শ হইবার অযোগ্য? যখন কবি প্রশ্ন করিতেছেন—

"কহ মোরে বীর্য্যকার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব-চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজশিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—"

তখন কি তাঁহার সম্মুখে আমরা যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তি ধরিতে সঙ্কোচ বোধ করি? এ আদর্শ আমরা না চিনিতে পারিলে কি বলিব? জাতীয় অধঃপতন? না রুচিসাঙ্কর্য্য?

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়

প্রত্যাবর্ত্তন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাগ্য-পরিবর্ত্তন

মানুষের ইচ্ছা ও তাহার নিয়তি কখনো সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে না।

কিছুদিন হইতে ইন্দ্রনাথের অল্প-অল্প জ্বর হইতেছিল। বিকালের দিকে চোখ জ্বালা করে, মাথা টিপ টিপ করে, আবার সন্ধ্যার পর বা রাত্রে সে ভাবটা কাটিয়া যায়। স্বভাব-শিথিল ইন্দ্রনাথ বুঝিতেছিল, এ ভাবটা ভাল নয়! অল্প-একটু কাশিও সময়-সময় দেখা যায়—তবু ঔদাসীন্যবশতঃ এ-সব সে গ্রাহ্য করিল না। মা তাহার এই অক্ষুধা, কার্য্যে আলস্য ও শারীরিক শীর্ণতা স্পষ্ট বুঝিতেছিলেন। বলিলে ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিত, "মার কেবল ভয়! তুমি যে কেবল ছায়ার পিছনে ছুট্‌তে চাও।" বলিয়া মাকে সে থামাইয়া দিত। সে নিয়মিত স্নানাহার করিত; সারাদিন প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা চলিত, পড়া আর লেখা, লেখা আর পড়া—ইহারই কেবল সময়াভাব ছিল না—আলস্যও ছিল না—বরং শরীর যত খারাপ হইতেছিল, গ্রন্থ-রচনার উৎসাহ সেই পরিমাণে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কাত্যায়নী জোর করিয়া ডাক্তার আনাইলেন—ডাক্তার বিধিমত পরীক্ষান্তে যে রিপোর্ট দিলেন, তাহা বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের চেয়েও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। ডাক্তার বলিলেন,—রোগ থাইসিস্। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর দূত একেবারে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহা গ্যালপিং টাইপের।

কাত্যায়নী বা ইন্দ্রনাথ কাহাকেও ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানানো হইল না; যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও সহজ করিয়া বলা হইল। তবু ডাক্তারিতে অভিজ্ঞ ইন্দ্রনাথ চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ঔষধাদি দেখিয়া অনেকখানি অনুমান করিয়া লইয়া নায়েবকে ডাকিয়া উইল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। খবর শুনিয়া কাত্যায়নী মাথা কুটিয়া মাথা ফুলাইয়া ফেলিলেন। দেব-মন্দিরে নিত্য-পূজার বরাদ্দ বাড়াইয়া দিলেন, নায়েবকে ডাকাইয়া জানাইলেন, উইল-টুইল করা হইবে না। যাহাদের বয়সের গাছ-পাথর থাকে না, গঙ্গা-পানে পা বাড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারাই শুধু উইল করে—তাঁহার সোনার চাঁদ অন্ধের যষ্টি ইন্দুর কি এখন উইল করিবার বয়স! এই সব অনাচার ঘটিতে দিলে তাঁহার সাগর-সেঁচা মাণিকের অকল্যাণ ঘটিবে। দেওয়ান ইতস্তত করিতে লাগিলেন—দুদিন না হয় দেরীই হইবে, করা যাইবে কি—! গৃহ-কর্ত্রীর আদেশ ত অমান্য করা যায় না—তাড়াতাড়িই বা কি এমন!

কিন্তু তাড়াতাড়ি তাঁহাদের না থাকিলেও অন্যত্র যে ছিল, তাহা শীঘ্রই স্পষ্ট বুঝা গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে ইন্দ্রনাথ কহিল, "মা, আমি তোমার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ সন্তান,—কেবল তোমায় দুঃখ দিয়েই গেলুম, সুখী করতে পারলুম না।"

কাত্যায়নী উচ্ছ্বসিত আবেগ সবলে দমন করিয়া অর্দ্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "ইন্দু, বাবা আমার, তোমায় পেয়ে আমি যে কি অমূল্য নিধিই পেয়েছিলুম, সে কেবল আমিই জানি, বাবা। তুই যে আমার নারায়ণেরো উপরে রে—তাঁকেও যে আমি প্রাণ ভরে কখনো ডাক্‌তে পারিনা। তোর ভাবনাই আমার সবার উপর।"

ছেলের রোগশীর্ণ হাতখানি কাত্যায়নী বুকে চাপিয়া রহিলেন। ইন্দ্রনাথের মুদিত চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "বড় ভুল করে ছিলো, মা, কাঁচের পুতুল পেয়ে বুকের ঠাকুরকে মাটীতে বসিয়ে ছিলে, তাই ঠাকুর আমার ভালর জন্যেই সে ভুল শুধ্‌রে দিলেন—আবার শীঘ্রই আমরা একত্র হব, মা,—কিন্তু ঐ অনাথ—"কাত্যায়নী দাঁত দিয়া জোর করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া কষ্টে কান্না চাপিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "তুই ভাল হয়ে ওঠ্ ইন্দু, আমি কাশী গিয়েই থাক্‌ব। বিশ্বনাথের চরণে আমার সব লোভ সঁপে দেব বাবা,—সংসারের মায়া আর কোনদিনও কর্‌ব না।"

"না, না, কাশী যাওয়া তোমার আর হবে না, তুমি বল, আমি চলে গেলেও—ওকে, ঐ অভাগা ছেলেটাকে তুমি ফেল্‌বে না,—ওকে তুমি মানুষ করে তুল্‌বে,—বল। ওর জন্যে যা ভেবে রেখেছিলুম, তার কিছুই করে যেতে পারলুম না। তবু তার জন্যে আমার সব—"

বাকী কথা আর বলা হইল না। একটা আকস্মিক বেদনায় কিছুক্ষণের জন্য সে অভিভূত বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়া গেল। তারপর কতক-জ্ঞানে কতক-অজ্ঞানে আরও দুইটা দিন ও একটা রাত্রি কাটিয়া গিয়া দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় পরম শান্ত-মুখে শান্তভাবে ইন্দ্রনাথের আত্মা অনন্ত শান্তিতে মিলাইয়া গেল। ইন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত মনের ইচ্ছা—অরুণের ভাগ্য-নির্ণয় অমীমাংসিতই রহিয়া গেল। এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা স্মরণ করাইয়া দিল না, ইন্দ্রনাথেরও স্মরণ হইল না।

ইন্দ্রনাথের মৃত্যুতে দেশের লোক হায়-হায় করিয়া অনেকে বলিল, এমন জমিদার আর হইবে না। পরের জন্য ভাবিতে, দীন-দুঃখীকে দয়া করিতে, সুখে দুঃখে সহানুভূতিতে সকলের সহিত সম-চিত্ততায় দেশের জন্য দশের জন্য ভাবিবার লোক এমনটি আর জন্মাইবে না। প্রজারা তাঁর সত্য সত্যই সন্তান ছিল, আজ তাহারা পিতৃ-হীন হইল। সংসারে এইটুকুই বিচিত্র—যে দশের জন্য ভাবিত, সে কেবল নিজের জন্য ভাবে নাই!

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটিয়া গেলে বিস্ময়ের সহিত লোকে শুনিল, জমিদার দানপত্র বা উইল কিছুই করিয়া যান নাই। তাঁহার চরম ইচ্ছা মনে মনে সকলে জানিলেও মুখের কথা কিছুই কেহ পায় নাই। ইন্দ্রনাথের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা আলোকনাথ তাহার শ্রাদ্ধাধিকারী। উত্তরাধিকার-সূত্রে সেই এখন বিষয়ের মালিক। পুত্রের ঐকান্তিক ইচ্ছা কাত্যায়নীর জানা ছিল, তবু আলোকনাথের দলের কাছে ও তাহার আনীত উকিলের সাক্ষাতেও তাঁহাকে অন্যের অনুরোধে একথা স্বীকার করিতে হইল যে সমস্ত বিষয় অরুণকে দিতে হইবে এমন কোন আদেশ মুখে বলিবার অবসর ইন্দ্রনাথ পায় নাই। শ্বশুর-কুলের বংশকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া অজ্ঞাত-কুলশীল একটা পথের ছেলেকে সমস্ত সম্পত্তির মালিক করা কাত্যায়নীর ধর্ম্মজ্ঞানেও বাধিতে ছিল। তবু ইন্দ্রনাথের মনের ইচ্ছা

তিনি ভাল রকমই বুঝিয়া ছিলেন। কিন্তু এখন যে-কথার লিখিত মূল্য নাই, সাক্ষী-সাবুদ নাই, সে কথা কেই বা কানে তুলিবে? আর তুলিবেই বা কেন? যে বংশের তিলক, যাহার হাতে জল-পিণ্ড মিলিল এবং ভবিষ্যতে মিলিবার আশাও রহিল, তাহাকে বাদ দিয়া অচেনা অজানা পথে-কুড়ানো—কে জানে হয়ত যাহার জন্ম রহস্য অনাবিষ্কৃত থাকাই তাহার পক্ষে মঙ্গলের হেতু,—তাহাকেই কি না করিতে হইবে এত-বড় সম্পত্তির মালিক! এ যেন ঘুঁটে-কুড়ানীর পুত্রকে রাজহস্তীতে শুঁড়ে তুলিয়া রাজপাটে বসাইয়া দেওয়ার মতই। ইংরাজী-শিক্ষিত সাহেবী চাল-প্রাপ্ত বংশগৌরব-বিস্মৃত ইন্দ্রনাথ যাহা করিতে পারিত—ন্যায়-বিচারক ভগবান ত তাহা পারেন নাই, তাই মরণকালে জমিদারের মাথায় শুভ বুদ্ধি দিয়া তিনি মহা পাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, আলোকনাথকেও বাঁচাইয়া দিয়াছেন! নহিলে নিরপরাধ সে বেচারা ত একেবারেই ডুবিয়া ছিল। ফলে এত-বড় রাজসংসারে অরুণের মাথা গুঁজিবার মত এতটুকুও স্থান রহিল না। জমিদারের পালক পুত্র একদিন যে পোষ্যপুত্র রূপে বিষয়াধিকারী হইবে বলিয়া শত্রু-মিত্র কাহারো মনে সংশয় ছিল না,—আজ তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থার এই অভাব দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে মনে করিল, "এ হইল কি?" কেহ আন্তরিক কেহ বা মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়া অরুণকে জানাইলেন যে তাহার এই অপূর্ব্ব ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তাহারা সকলেই দুঃখিত। ইহার পর তাহাকে ভাগ্য-পরীক্ষার চরম অবসর দিয়া ইন্দ্রনাথের মৃত্যুর দ্বাদশ দিবসে কাত্যায়নী দেবীরও সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়া অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। ইন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কাত্যায়নী দেবীর বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এক দিন অর্দ্ধ-অচৈতন্যের ন্যায় অভিভূতভাবেই তিনি পড়িয়া ছিলেন। বাহিরে কে কি বলিতেছে, কে কি করিতেছে, কোন কথাই তাঁহার কাণে প্রবেশ করিতেছিল না। দেওয়ান অনেক বার তাঁহাকে কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি তাহা শুনিয়াছেন মাত্র, চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। কেবল মধ্যে মধ্যে জলরাশি-স্ফীত চক্ষে ম্লান মুখে অরুণ আসিয়া নীরবে তাঁহার গা ঘেঁষিয়া কাছে বসিতেছিল, তখনই তাঁহার মনে পড়িতেছিল, সংসারের সহিত সব সম্বন্ধ এখনও তাঁহার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই, কিছু বাকী আছে। ইন্দ্রনাথের নয়ন-মণি এই অনাথটার জন্য আবার একবার তাঁহাকে এত বড় আঘাতের পরও খাড়া হইয়া উঠিতে হইবে। আবার বিষয়-সম্পত্তির কথা শুনিতে হইবে, বলিতে হইবে। হয়ত আদালত পর্য্যন্ত মামলা লড়িতেও হইবে। আর একদিন এমনি এক দারুণ শোকের ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াও তাঁহাকে গা ঝাড়িয়া উঠিতে হইয়াছিল। তবু সে দিন বয়সের অল্পতায় ভবিষ্যতের আশায় অবসাদ-গ্রস্ত চিত্তেও নব বলের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এখন এ জরাগ্রস্ত বাহুতে সে বল তো আর নাই! ইন্দু যে সেখানাকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া গিয়াছে! এ সব চিন্তার সমাধান ত আর তাঁহাকে করিতে হইবে না। ভগবান সকল চিন্তার অবসান করিয়া দিয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্যা

উপকথায় শুনা যায়, যাদুকরের মায়া-যষ্টি-স্পর্শে রাজপ্রাসাদ অকস্মাৎ এক বিশাল অরণ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছিল! অরুণের ভাগ্যও তেমনি অপূর্ব্ব উদাহরণ দেখাইল। ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নীর মৃত্যুতে যে শোকের ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহা শুধু তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিল না, সে ঝড় তাহাকে উড়াইয়া ধূলি-মলিন অনাবৃত পথের প্রান্তে ফেলিয়া দিয়া গেল। গভীর নিশীথে স্বজন-বেষ্টিত নিশ্চিন্ত সুখ-শয্যায় নিদ্রিত লোক যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া চাহিয়া দেখে, অগ্নিতপ্ত বালুকাময় মরু প্রদেশে কেবল একা সে পড়িয়া আছে, তখন নিজের অবস্থা প্রথমটা তাহার স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হয়। অরুণের মনে হইল, সে বুঝি চোখ চাহিয়া তেমনি স্বপ্ন দেখিতেছে! সে শুনিল, শুধু ঐশ্বর্য্য নয়, ইন্দ্রনাথের মরণে সে পিতৃহীন হয় নাই—শুধু আশ্রিত আশ্রয়-দাতাকে হারাইল মাত্র, সে তাহা নয়, তাঁহার সন্তান নয়, রক্ত-সম্বন্ধীয় আত্মীয় নয়,—সে অজ্ঞাত-পরিচয় অনাথ। আলোকনাথের দলের কাছে সে জানিল, ইন্দ্রনাথ তাহাকে স্বগোত্রে উন্নীত করিয়া লইলেও লোকে তাহা স্বীকার করিয়া লইবে না। দেশের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক হইয়া তিনিই যদি সমাজের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার চালাইতে চান, তবে অপরেই বা সুবিধা-স্থলে দৃষ্টান্ত না লইবে কেন? বিচারকের আসনে বসিয়া দেশের জমিদার যদি অবিচার করেন, ধর্ম্ম ও সমাজ রাখিবে কে! ঝড় সহিবার শক্তি আছে বলিয়াই না ভগবান বড় গাছের আশ্রয় সৃষ্টি করিয়াছেন। স্নেহের অনুরোধে এত-বড় অন্যায়কে ত প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। কোথাকার কুড়ানো ছেলে,—যাহার জাতি পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই, তাহারই সহিত একত্র পান-ভোজন শোয়া-বসা কেমন করিয়াই বা চলিতে পারে! না পারিলেও ছেলেটা আবার অভ্যাস-দোষে দুঃখ পাইবে। অতএব উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য উহাকে দূরে রাখিয়া দেওয়াই তাহার সদ্-যুক্তি মনে হইল। অবশ্য উহার জন্য ব্যয় যাহা হইবে, আলোকনাথই তাহা বহন করিবে। সত্যই ত আর অনাথকে ফেলিতে পারেন না। এখন ইচ্ছা করিলে দিন কিনিয়া লওয়া না লওয়া তাহার হাত! ছুতারের কাজ শিখিতে পারে—কাঁশা-পিতল ঢালাইয়ের কাজ শিখিতে পারে—আরো কত কি কাজ আছে। কাজের জন্য আবার ভাবনা! বাবুর বদান্যতায় মোসাহেব পদ-প্রার্থীর দল ধন্য ধন্য করিয়া কেহ বলিল,—বাবু আমাদের দয়াময়, নহিলে শত্রুকেও এত দয়া। শত্রু নহেত কি আর—একটু হইলেই ত সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া বসিতেছিল। কেহ বলিল, বাবু আমাদের স্বয়ং বৃহস্পতি,—কেমন বুদ্ধি বাহির করিলেন, দেখ না—জাতি বাঁচিল—উহার মনে দুঃখও দিতে হইল না। সাপ মরিল, লাঠিও ভাঙ্গিল না—এই আর কি!

নিরপেক্ষ দলের কেহ কিন্তু বাহবা দিল না। তাহারা যে জানিত কি আশায় ইন্দ্রনাথ এই ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিতেছিল! অরুণের প্রতি স্নেহ-শীল লোকের যে অভাব নাই, বুদ্ধিমান আলোকনাথ তাহা বুঝিয়া ছিল। সেই জন্যই তাহাকে সে দূরে রাখিতে

চাহিতে ছিল। এ সংসারে স্বার্থপর কুটিলমতি কুপরামর্শ-দাতার ত অভাব নাই। কে কখন কুপরামর্শ দিয়া বিপদ বাধায় বলা ত যায় না কিছুই। বিশেষ ছেলেটাও আবার ইংরাজী-নবীশ। এ-সব লোককে কিছু বিশ্বাস নাই! ইহারা সবই করিতে পারে। সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্যই সে অরুণের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছিল। নহিলে উহার জন্য এক পয়সা খরচ করিতেও তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। পুত্রশোকে হতবুদ্ধি কাত্যায়নী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু না ঘটিলে কে জানে, স্রোতের গতি এতক্ষণ কোন পথে বহিত!

এ-সব কথা অরুণের কানেও আসিয়া পৌছিত। সে ইহার উত্তর দিত না, ইহাতে ব্যথাও অনুভব করিত না। যে অসীম দুঃখে তাহার তরুণ হৃদয় পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেখানে সংসারের এ-সব তুচ্ছ লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখিবার জায়গাই ছিল না। সে যে ইন্দ্রনাথের পুত্র নয়, এ দুঃখের কাছে সব দুঃখই তাহার খাটো হইয়া গিয়াছিল। যে যজ্ঞ-সূত্র অমল শুভ্র সুগন্ধি পুষ্প-মাল্যের ন্যায় এখনও তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া দুলিতেছে, এখনও দুইবেলা সে যে গায়ত্রী দেবীর উপাসনা করে, ইহাতে যথার্থ অধিকার আছে কিনা এমন সংশয়ও উঠিয়াছে! তাহার সম্মান লইয়াও কেহ কেহ কানাকানি করিতেছে! সে এ-সংসারের কেহ নয়! জমিদার ইন্দ্রনাথের পুত্র নয়, ময়ুর-পুচ্ছধারী কাকের মত এতদিন কেবল পরের ঐশ্বর্য্যের তলে নিজেকে সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এইবার তাহার বাহিরের খোলসখানা খুলিয়া গিয়া সত্যকার রূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে! সে একটা অনাথ ছেলে—পথের ভিখারী! কে জানে, কোথায় কোন্ পর্ণকুটীরে তাহার অজানিত পিতা হয়ত এখনও তাহাকে স্মরণ করিয়া দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলিতেছেন! তাঁহাদের মনের মধ্যে আজও সে বাঁচিয়া আছে। অথবা অসীম জলরাশির তলে তাঁহাদের অনন্ত শয্যা সেই কাল রজনীতেই বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে! হায়, কে তাহাকে জানাইয়া দিবে—সে কে—কোথা হইতে ঝড়ে উড়িয়া আসিয়া এই স্নেহের খাঁচায় বন্দী ছিল! ভাগ্য-বিপর্য্যয় অনেকের হয়—সুখ-দুঃখ-ভোগও জীব-মাত্রের কর্ম্মাধীন। অরুণও এ-সব তত্ত্ব-কথা বুঝিত না, কেবল বুঝিত, এমন করিয়া তাহার ন্যায় জ্ঞাতি-গোত্র হারাইয়া কেহ সর্ব্ব-হারা হয় কি না!

তাহার প্রতি স্নেহ-শীল কর্ম্মচারীর দল অনেকে তাহাকে পরামর্শ দিল, "খোকা-বাবু মকর্দ্দমা করুন—বিষয় ফিরে পাবেন। এ রাজার রাজ্যিপাট ছেড়ে কেন মিথ্যে রামচন্দ্রের মত বনে যাবেন! বাবুর ইচ্ছে ত আমরা সব জান্‌তুম। আমরা সাক্ষী দেব—সময় পেলেন না বৈ ত নয়—নইলে মাঠাকুরুণকে যা বলেছিলেন, তা আমরা স্বকর্ণে শুনেচি। বলে, যার ধন তার ধন নয়—এ যে দেখি তাই হচ্ছে—অনুমতি দিন, আমরা ত আছি।"

দাঁতে জিভ কাটিয়া অরুণ অসম্মতি জানাইল। "ছিঃ, মকর্দ্দমা কার সঙ্গে করতে বলেন! ওঁর যে ন্যায্য পাওনা! ধর্ম্মতঃ যদি আমার কোন দাবী থাকত, তাহলে বাবাও তা করতেন—মাও সময় পেতেন। যেখানে জজকোর্ট হাইকোর্ট প্রিভিকাউন্সিলে ধাপে-ধাপে বিচার, সেখানকার আদালতে বিচার-বিভ্রাট অনেক হয়, কিন্তু যেখানে এক-ছাড়া উপায় নেই, সেখানকার বিচারক ভুল করেন না।"

যুক্তি বলিত, ঠিক হইয়াছে। মনকে ধমক দিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া সে বলিতে চায়, মিথ্যার আবরণ ফেলিয়া সত্যকার মানুষ হইয়া তুমি যে দাঁড়াইবার অবসর পাইলে, এ তোমার পক্ষে ভালই হইল। তবু ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাটলে জন্মিয়া যে-সব আগাছা ভিত্তি-মূল পর্য্যন্ত শিকড় গজাইয়া তোলে, তাহাদেরই মত মনের অতি-নিভৃত অংশে গোপনে বসিয়া নৈরাশ্য বলিত, বুঝি, এতটা না হইলেও চলিতে পারিত। ঐশ্বর্য্য! ছাই ঐশ্বর্য্য—সে আজ অর্থের জন্য তো কাতর নয়! তাহার কাতরতা জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত যাহাকে সে অস্থি-মজ্জায় মিশাইয়া পিতা বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, যাঁহার অভেদ্য স্নেহ-দুর্গের অভ্যন্তরে বসিয়া এত-বড় বিপ্লবের সংবাদও তাহার কর্ণগোচর হয় নাই! যে সর্ব্বদুঃখ-বিনাশিনী স্নেহময়ীর মাতৃস্নেহের অক্ষয় বর্ম্মে আবৃত হইয়া তাহার শৈশব-জীবন অতি-বাহিত হইল, তাঁহারা তাহার কেহই নহেন! আর একমাস পূর্ব্বে সে যাহার নামও শোনে নাই, সেই আলোকনাথই তাঁহাদের আত্মীয়তম। এই গৃহ, এই গৃহের প্রত্যেক ইট-কাঠখানি পর্য্যন্ত—যাহারা তাহার ক্ষুদ্র জীবনের সহস্র সুখ-দুঃখের সহিত জড়িত স্মৃতিচিহ্ন—সেই এই-গৃহের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই! সুসজ্জিত গ্রন্থ-শালায় ঝক্‌ঝকে বাঁধানো বইগুলির মধ্যে বেশী বইয়ে তাহারই নাম সুবর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত। ঘরে-বাহিরে তাহারই নানা বয়সের নানা বেশের সজ্জিত আলোক-চিত্র ও তৈল-চিত্রের সমাবেশ। পাঠাগারে তাহারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য মূল্যবান কক্ষ-সজ্জা। এ গৃহের প্রত্যেক জিনিষটি এত দিন সে সম্পূর্ণরূপে নিজের বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছে। কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে এ-সব দুদিনের খেলা। অভিনেতা সাজিয়া সে যেন এতদিন অভিনয় করিতেছিল, সাজ-সজ্জা খুলিয়া রং-রাংতা মুছিয়া ভাল মানুষটির মত এইবার তাহার বাড়ী ফিরিবার পালা। কেবল জ্ঞান ও অজ্ঞানের ব্যবধান। তাহার চিরদিনের সুখ-দুঃখ আশা-স্মৃতি-মণ্ডিত স্নেহ-ভবন,—আজ আর তোমার কোলে অরুণের এতটুকু স্থান নাই। কোথাকার নগণ্য বিদেশী বালক—আজ আর এ গৃহের, এ সংসারের এখানকার সমাজের কেহ নয় সে! বিদায়, হে আমার চির-প্রিয়তম স্নেহময় আশ্রয়-নীড়, আমার করুণাময় আশ্রয়-দাতার স্বর্ণ-মন্দির, তোমার কাছে অনাথ বালক আজ চির-বিদায় মাগিতেছে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী

নোলক

কে তুমি আমারে কহ,
রে ক্ষুদ্র নোলক!
কে তুমি মানস-চোরা,
ঝলকিছ নয়ন-পলক?

নহ এক রতি—
রহস্য প্রচুর তব
রে উজল মোতি!

কে তুমি ?—তুমি কি কোন
বালিকা-বধূর
ফুল-শয্যার সেই
প্রণয়ের পরশে মধুর
ঠোঁট দুইখানি,
বেষ্টিত—জড়িত সুপ্ত
মৌন মধু বাণী।

কে তুমি ? তুমি কি কোন
রাজ-প্রেয়সীর—
ক্রন্দনে মুকুতা-ঝরা
নির্ব্বাসিতা সতীনের ঝির,
অশ্রু একফোঁটা—
উছসিত উথলিত
ব্যথাখানি গোটা !

অশ্রু নহ, অশ্রু নহ,—
তুমি যে পুলক,
সুরসিকা অপ্সরার
অন্তরের সুখের দোলক,
তরঙ্গ নাচের
কোন্ পারিজাত-বনে
মধু উৎসবের !

অথবা প্রেমের জ্যোতি
রাতির চোখের,
মুরছিয়া আছ তুমি
যখন সে ভোলা মহেশের
কোপে বর-তনু
ছাই হ'ল—ভস্ম-শেষ
হ'ল ফুল-ধনু !

কিম্বা বঙ্গ-বধূটির
শুভ্র লাজখানি,
রাঙা হ'য়ে উঠিতেছ
ওষ্ঠ-পুটে বুঝি অনুমানি'
দয়িতের পাণি
সহসা ঘেরিছে সেই
বক্ষে নিতে টানি !

আঁখি-সিন্ধু বিমথিত
লো ধবল মোতি,
ছেলেখেলা খেলে গেছে
কিছুক্ষণ বুঝি লক্ষ্মী-সতী
নধর অধরে—
প্রবালের দ্বীপে বসি'
প্রফুল্ল অন্তরে !

সাতটি কড়ায়ে তব
পূরিত অমৃত,
দৃষ্টি-ভোগে মিষ্টি তুমি,
আজ আমি বড় যে তৃষিত,
আঁখির পলক
ফিরাতে—ফিরাতে নারি
আমি রে নোলক !

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

Non-violent non-co-operation.

সুখ্য।

একেবারে গোড়ার কথা থেকে সুরু করা যাক্—যে কথা সকলেই বুঝবে। মানুষ কি চায়? নানা মুনির নানা মতের তর্ক-বিতর্ক এক পাশে সরিয়ে রেখে মোটের উপর এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে সে সুখ চায়। কিন্তু সুখ যে কাকে বলে? তার লক্ষণ ও পথ কি? এ সম্বন্ধেও মানুষের বুদ্ধি নানা মতের জটিল অরণ্য রচনা করে বসেছে। যাহোক এই জঙ্গলের মধ্যে বৃদ্ধ মনু যে কথাটা দেখিয়ে দিচ্ছেন সেটা ধরে গেলে গন্তব্য স্থানে ঠিক-মত পৌছতে পারা যাবে, আমার এই বিশ্বাস। তিনি বলেন,—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়ো॥"

অধীনতা ও স্বাধীনতার মাত্রার ওজনে সুখ-দুঃখের বিচার করতে হবে। সে হিসাবে আমাদের মতো দুঃখী আর নাই। কারণ, পরবশতা হিসাবে আমরা পৃথিবীর সকলেরই উপরে অর্থাৎ নীচে।

সংসারে মানুষ হয়ে জন্মালেই কতকটা পরবশতা অপরিহার্য্য। কেবল অপরিহার্য্য নয়—আত্মার বিকাশ ও লীলার পক্ষে অত্যাবশ্যক। (১) জড়শক্তির অধীনতা; (২) কামক্রোধাদি চিত্তবৃত্তির অধীনতা; (৩) সমাজের অধীনতা; (৪) রাষ্ট্রতন্ত্রের অধীনতা। এই সব রকমের অধীনতার যেটুকু মানুষ আপন আত্মার বিকাশের অনুকূল জেনে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়, সেটুকু তার আত্মারই সামিল হয়ে ওঠে। সুতরাং তার পরবশতা লক্ষণ ঘুচে গিয়ে সেটা স্বাধীনতা হয়েই দাঁড়ায়। তার বেশী যে অধীনতা তাই আত্মার পক্ষে পীড়াদায়ক। তার ফল দুর্ব্বলতা, অবসাদ ও পরিণামে মৃত্যু।

ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তির অধীনতার কথা আলোচনা করার দরকার নাই। সে সম্বন্ধে আলোচনার কোনও দেশেই অভাব নাই—ফল যাই হোক্‌না কেন। চিত্তবৃত্তির সামঞ্জস্যের অভাব যে সব রকম মুক্তির পথের অন্তরায় সে-কথা সকলেই বোঝে। ওটা ছেড়ে দিলে আমাদের স্বাধীনতা, স্বরাজ বা মুক্তি লাভের পথে প্রধান বাধা তিনটী। (১) একটী বিপুল প্রাচীন সভ্যতার প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান রীতিনীতির বিষম বোঝা; (২) আর একটী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি বস্তু-প্রধান, আয়োজন-বহুল, স্বার্থমগ্ন, বিলাস-জর্জ্জর, দ্বন্দ্বপরায়ণ সভ্যতার সাংঘাতিক বিষস্পর্শ; (৩) বিদেশী রাষ্ট্রতন্ত্রের বিপুল-কায় হৃদয়হীন শাসন-যন্ত্রটার অসংখ্য চাকার দারুণ নিষ্পীড়ন। এই তিন রকম অধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল—ভয়, লোভ, মোহ, মিথ্যা, দ্বেষ-হিংসা, দারিদ্র্য, সংকীর্ণতা ও নৈরাশ্য। এক কথায় দুর্ব্বলতা ও অবসাদ। আত্মবশে সুখ। আত্মা বলহীনের লভ্য নয়। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সুখ অসম্ভব। সুখ লাভ করতে হলে আমাদের স্বরাজ চাইই।

সার্থকতা।

সুখই কি মানুষের জীবনের শেষ কথা? তার অসীম আকাঙ্ক্ষা কি সুখের মধ্যেই সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতে পারে? তাহলে এ-সব কেন? এই আকাশের চেয়ে উদার প্রাণের বিস্তার—সমুদ্রের চেয়ে অতল প্রেমের গভীরতা—এই প্রতিমুহূর্ত্তের পুঞ্জপুঞ্জ মৃত্যুর উপর জয়ী অমৃতের পিপাসা? আমাদের বহু প্রাচীন পিতামহদের তপোবনের পবিত্র হোমাগ্নির যে শেষ শিখাটী বহু ঝঞ্ঝা-বিপ্লবের মধ্যে রক্ষা পেয়ে এসেছে, জগতের মহাশান্তি-যজ্ঞে হিংসা বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব অশান্তির শেষ আহুতি হওয়ার পূর্ব্বেই কি হঠাৎ সে শিখা নিবে যাবে? মানুষের বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত ব্যথাক্লিষ্ট তৃষাদীর্ণ প্রাণ কিছু না জেনেও নিগূঢ় সংস্কারবশেই চেয়ে আছে—এই ভারতবর্ষের দিকে শান্তিবারির জন্য। তাদের সে আকাঙ্ক্ষা কি ব্যর্থ হবে? আমাদের পরম সার্থকতা লাভ করতেই হবে। ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে। আমাদের জীবন-দেবতার অদৃশ্য অঙ্গুলির তাই ইঙ্গিত। কিন্তু এই জগদ্দল পাষাণের তলে নিত্য নিষ্পেষিত ক্ষীণ-প্রাণ, দীন আশা, ভয়-বিমূঢ় ক্লিষ্ট জাতির পক্ষে সে আলো জ্বালিয়ে রাখা অসম্ভব যাতে সমস্ত জগৎ পথ দেখতে পাবে—সে অমৃতের ধারা বহিয়ে দেওয়া স্বপ্নমাত্র যাতে সমস্ত বিশ্বাসী প্রাণ পাবে। সুতরাং আমাদের স্বরাজ চাইই।

স্বরাজ ঃ—সিংহাসনের সম্রাট থেকে পথের মুটে-মজুর পর্য্যন্ত সকলের মুখেই আজ স্বরাজের কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সকলের এ সম্বন্ধে ধারণা একও নয় পরিষ্কারও নয়। আমরা যে জিনিষ পাওয়ার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন কর্‌তে প্রস্তুত হচ্ছি, সে জিনিষটা আসলে কি এবং আমাদের অত-বড় ত্যাগের যোগ্য কি না—সেটা ভাল করে গোড়াতেই বুঝে দেখা দরকার।

১। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বরাজ বা ইম্পিরিয়াল স্বরাজ;—আমাদের বিদেশী প্রভুরা হিছুদিন থেকে ক্রমাগত বোঝাচ্ছেন "তোমরা ভাল ছেলের মত বিধিসঙ্গত ভাবে (অর্থাৎ তুড়ুম ঠোকার যত আইন ও বে-আইন এখন আছে ও ভবিষ্যতে হবে সে দিকে নজর রেখে) যদি তোমাদের ন্যায্য দাবী জানাও ও আমাদের দেওয়া রিফরমকে সাতরাজার ধন মাণিক ভেবে সন্তর্পণে রক্ষা কর, তাহলে কালক্রমে ঔপনিবেশিক স্বরাজ (colonial self-government) তোমাদের ঠোঁটের গোড়ায় ধরে দেওয়া যাবে।" আমাদের অনেক হোমরা-চোমরা মহারথীও সেই শুভ দিনের স্বপ্ন দেখছেন। কর্ত্তারা সত্যসত্যই ও জিনিষ আমাদের দেবেন কিনা, দিতে পারেন কিনা এবং দিলেও আমরা পাবো কিনা সে বিচার পরে কোর্‌বো। আপাততঃ দেখা যাক, ও জিনিষটার প্রকৃতি কিরূপ এবং ওর মূল্যই বা কত? উক্ত স্বরাজ যদি সত্যই পাই তাহলে আমাদের ঘরকন্নার কাজ-কর্ম্ম অবশ্য আমরা নিজেদের বিবেচনা বা মর্জ্জিমত চালাতে পারবো। আমাদের পাঁটা আমরা ঘাড়ের দিকে বা ল্যাজের দিকে যে দিকেই কাটিনা কেন, কেউ আটক কর্‌তে আসবেনা। তবে সাম্রাজ্যের বড় বড় চুরি ও ডাকাতির কাজে আমাদের

ধন-জন দিয়ে সাহায্য করতে হবে। অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল বাণিজ্য-নীতি ও যুদ্ধ-নীতিতে আমাদের যোগ দিতে হবে। যুদ্ধ ও বাণিজ্য নীতির এরূপ নাম-করণ অশিষ্টতা নিশ্চয়ই কিন্তু অসত্য কদাচ নয়। যাই হোক ইম্পিরিয়াল নীতি বৃদ্ধ বয়সে যদি তপস্যায় ব্রতী না হয়ে থাকে—আয়রলণ্ড, মিসর ও ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে দেখলে সেরূপ লক্ষণ তো কিছু নজরে পড়েনা—তাহলে তার সংশ্রবে থাকা কোনও চরিত্রবান ভদ্র-সন্তানের পক্ষে গৌরবজনক হতে পারে না।

২। সাধারণ স্বরাজ—অনেক লোক আছেন যাঁরা মনে মনে স্বরাজের কামনা করেন কিন্তু তাঁদের ঈপ্সিত স্বরাজের কোনো নির্দ্দিষ্ট চেহারা নাই। পরের তাঁবেদারী হতে রক্ষা পাওয়া ও পাঁচটা সুসভ্য স্বাধীন দেশের মতো ব্যবসা-বাণিজ্য, কারবার-কারখানা সন্ধি-বিগ্রহাদি চালাতে পারাটাই তারা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করেন। ইংলণ্ড আমেরিকা জাপানাদি দেশের—সালোক্য-লাভ তাঁদের রাজনৈতিক সাধনার চরম মোক্ষ। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার চেয়ে এ অবস্থা যে শতগুণে শ্রেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুকে-হাঁটা জীবেরা জীবজাতের সব চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর—তাদের মধ্যে যারা রুদ্ধ মনের আক্রোশে বিষ সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছে, তারাও। যারা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে চলে তারা নিশ্চয়ই অনেক উঁচু। সিংহ শিম্পাঞ্জি বাঘ ভালুক এমন কি হাতী পর্য্যন্ত। তবুও এ কথা না বলে থাকা যায়না যে ঝোড়ো হাওয়াতে বড় বড় স্বাধীন জাতের পেশাদারী থিয়েটারী পোষাকটা সরে গিয়ে যখন তাদের আসল নগ্ন চেহারার কিয়দংশও চোখে পড়ে, তখন সেটাকে এমন মনোরম জিনিষ বলে মনে হয় না যে তার অভাবটাকে জীবনের পরম দুর্ভাগ্য ভেবে বুক ফেটে মরতে পারা যায়। সর্ব্বস্ব পণ করবো কিসের আশায়? সুখ শান্তি, আরাম স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন করবো কোন্ লোভে? জগতের হানাহানি রেষারেষি রক্তারক্তির পরিমাণ আর একটু বাড়াবার জন্য? আমি তো এ চিন্তায় কোনও উৎসাহ পাইনে।

এই দলের কারো কারো আকাঙ্ক্ষার দৌড় আবার আর-একটু বেশী। তাঁরা আপনাদিগকে কেবলমাত্র ইংরাজের সমকক্ষ মনে করেই যথেষ্ট তৃপ্তি পান না। ইংরাজের সম্পূর্ণ নাজেহাল অবস্থা সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করতে না পারলে তাঁদের স্বরাজ ছবিখানি নিখুঁত হয় না। এ মনোভাবটা মনুষ্য সভ্যতার উত্থান অবস্থায় অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। মাংস শব্দটার আভিধানিক অর্থ যে আমায় এখন খাচ্ছে তাকে আমি পরে খাবো। শীকারের পক্ষে শীকারীকে শীকার-রূপে কল্পনা করার একটা দুর্দ্দমনীয় লোভ আছে। তবুও এ কথা ভুললে চলবে না যে শীকার হওয়ার চেয়ে শীকারী হওয়ার গৌরবটা যে খুব বেশী এমন মনে করার বিশেষ কারণ নাই। হিংসা কাণ্ডের ও দুটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। এ পিট আর ও পিট।

৩। কংগ্রেসী বা পার্লামেণ্টারী স্বরাজ—সহযেগিতা-বর্জ্জনের পথ দিয়ে এক বৎসরের মধ্যে যে স্বরাজ লাভ করার জন্য কংগ্রেস

সমস্ত দেশকে আহ্বান করছেন তার আকার-প্রকার চাল-চলন সম্বন্ধে তিনি কোনও বিস্তৃত বা পরিষ্কার আলোচনা করেন নি। ইচ্ছা করেই সে বিষয়ে নীরব থেকে গেছেন। কারণ এখন সেটা মুখ্য লক্ষ্য নয়। অবান্তর বিষয়ের আলোচনা-সূত্রে নানা মতের ধূলো উড়িয়ে আসল লক্ষ্যটাকে আড়াল করে ফেলা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় নয়—কাজ পণ্ড করারই পন্থা।

আমাদের সমস্ত দুর্দ্দশার ও অপমানের কারণ আমাদের একান্ত অসহায় ভাব ও পরের উপর নির্ভর করে থাকা। এই সাংঘাতিক পরবশতাটাকে সম্পূর্ণ দূর করে জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন তার পথ। এই পথে আমরা যত অগ্রসর হ'তে থাকবো, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ও তার ব্রত এবং লক্ষ্যের চেহারাটা ক্রমশঃ ততই পরিষ্কার হয়ে আসবে। এখন ঘরে বসে সে সম্বন্ধে নানা থিওরী খাড়া করা কেবলমাত্র কাজ না করা নয়, দস্তুরমত অকাজ করা। তবে ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে কংগ্রেস এইটুকু ইঙ্গিত করেছেন যে, সেটা দেশ-কালানুযায়ী কোনও একরকমের গণতন্ত্র হবে। ইংরাজের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ দাঁড়াবে, সেটাও কংগ্রেস ভবিষ্যতের উপর ফেলে রেখেছেন। তবে তাঁবেদারী যে বিন্দু-মাত্র থাকবে না, সে কথা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। কাজেই সম্বন্ধটা নির্ভর করবে ইংরাজের সুবুদ্ধির উপর। ইংরাজ যদি প্রভুত্বের তুঙ্গ শৃঙ্গ হ'তে নেমে এসে সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের ও দশের সেবায় লেগে যেতে পারেন, ভাল কথা। না পারলে তাঁকে অগত্যা অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। একা একা তো আর প্রভুত্ব চলে না।

কংগ্রেস যদিও ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য, ব্রত ও কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, তাঁর মনোগত অভিপ্রায় গোপন থাকে নি। এটা অবশ্য কংগ্রেস নিশ্চয়ই আশা করেন স্বাধীন ভারত পৃথিবীর দুর্ব্বলদিগকে স্বাধীনতা দান করতে যদি নাও পারে, স্বাধীনতা-হরণটাকেই স্বাধীনতার চরম গৌরব বলে মনে করতে পারবে না। দুর্দ্দমনীয় শক্তি-দম্ভ ও বিশ্বগ্রাস লোলুপতা নিয়ে পৃথিবীর বুকে একটা উৎপাতের মতো বিরাজ করবে না। কংগ্রেস স্বরাজ-লাভের যে পথ নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন তা' থেকেই এর সূচনা পাওয়া যাচ্ছে। এ পথ ত্যাগের পথ, সংযমের পথ, বিনয়ের ধৈর্য্যের পথ। উত্তেজনা, অধৈর্য্য বা উপদ্রবের কোনও স্থানই এতে নাই। এর যা-কিছু উৎপীড়ন, সে কেবল নিজের বিলাস, আরাম আলস্য ও জবরদস্তি ভাবের উপর অপরের প্রতি নয়। মহাত্মা গান্ধী বার বার এ পথকে জাতীয় শুদ্ধি বা National Purification নামে অভিহিত করেছেন। এই শুদ্ধির প্রক্রিয়া যত অগ্রসর হবে আমাদের শক্তির পরিমাণ ততই বাড়বে, ব্যুরোক্রেসীর বন্ধন ততই আল্গা হবে। এ পথে যদি স্বরাজ লাভ হয়, তাহলে তার পূর্ব্বেই জাতির চরিত্র, ত্যাগে, সংযমে, ধৈর্য্যে সহিষ্ণুতায়, ক্ষমায় এমনভাবে গড়ে উঠবে

যে তার পক্ষে অপরের প্রতি উৎপীড়ন একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

৪। মহাত্মা গান্ধীর উদ্দিষ্ট স্বরাজ—মহাত্মা গান্ধী আপনার অন্তরের অন্তরে যে স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, যে স্বরাজের সাধনা তাঁর জীবনের একনিষ্ঠ মহাব্রত সে স্বরাজের আদর্শ উল্লিখিত আদর্শগুলির চেয়ে অনেক উঁচু। এত উঁচু যে আপাততঃ অসম্ভব বলেই বোধ হয়। তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' নামে গ্রন্থে এই স্বরাজের আদর্শ ও সাধনার পথ নির্দ্দেশ করেছেন। Indian Home Rule নামে তার অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। বইখানি সকলকেই পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। মতের মিল সম্পূর্ণ না হলেও একটা বিপুল মুক্ত বিশ্বচেতন মানবাত্মার সংস্পর্শ মনের উপর উষার আলো ও সমুদ্রের উদার হাওয়ার মতো কাজ করবে। এ স্বরাজ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক স্বরাজ নয়। ইহা সম্পূর্ণরূপেই আধ্যাত্মিক। আত্মজ্ঞান, আত্মজয় ও আত্মশুদ্ধি এর সাধনার পথ। মোক্ষ বা জীবন্মুক্তি এর লক্ষ্য। চিত্তের এ অবস্থা লাভ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ অতি তুচ্ছ। একদিনেই তা সম্পন্ন হতে পারে—এক বৎসর লাগে না। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই সনাতন কষ্টিপাথর—যেনাহং নামৃতা-স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্—অকুণ্ঠিতচিত্তে বর্ত্তমান সভ্যতার বিপুল আয়োজন স্তূপের মূল্য নিরূপণে প্রয়োগ করেছেন এবং তার অনেকগুলিকেই বর্জ্জন করেছেন। কাজেই সাধারণ লোকের পক্ষে এ আদর্শ গ্রহণ করা কঠিন। মহাত্মা গান্ধী নিজেও সে কথা বোঝেন। সে জন্য উহা গ্রহণের জন্য তিনি এখনও দেশকে আহ্বান করেন নি। তাঁর নিজের মানসী আদর্শ রূপেই উহা এখন বিরাজ করছে। তবে তিনি এই আশা পোষণ করছেন যে রাজনৈতিক স্বরাজ লাভের দ্বারা দেশ যেদিন চিন্তার ও জীবনের পূর্ণ স্বধীনতা লাভ করবে সেদিন এ আদর্শ গ্রহণের সময় আসবে। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি এই :—'Now though I do not want to withdraw a single word of it, I would say to you on this occasion that I do not ask India to follow cut today the methods prescribed in my booklet. If they could do that they would have Home Rule not in a year but in a day…But it must remain a day—dream more or less for the time being".

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

একখানি চপ

'একখানা চপ্ দিন না—' বোলে ইস্কুল-ফেরত একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে একটা চেয়ারের উপর বোসে পড়লো।

চেয়ারের এক দিক্‌কার হাতাকে ভাত ফোটাবার জন্যে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে। যে হাতাটা আছে, সেটাও ঘাম আর তেল

লেগে বেশ মোলায়েম আর কালো হয়ে এসেছে। পায়ায় দুটো টিনের তাপ্পি। চেয়ারের নীচে সিমেণ্ট কোথাও আছে, কোথাও পায়ের কাদায় খোয়া ভরাট হয়ে গিয়ে সিমেণ্টের লেভেলে এসে পৌঁছেচে, কোথাও বা ছাড়িয়ে উঠেচে! সামনের তেপায়া টেবিল এখন দু'পায়ে দাঁড়িয়েছে। মার্টিন কোম্পানির শেওলা-ধরা একখানা আধলা ইট টেবিলের আর-একটা পায়ার স্থান অধিকার কোরে কোনো গতিকে সেটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। হোটেল-ওয়ালা গুণ-চটের পর্দ্দায় হাত মুছ্‌তে মুছ্‌তে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি চাই? একখানা চপ্?'

সামনের আর-একটা টেবিলে দুজনে খাচ্ছিল, ছেলেটি তাই দেখছিল। তারা অনবরত চপ্ আর কাটলেট মুখের মধ্যে পুরে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে একেবারে আধখানা চপ ভেঙ্গে ফেলচে, কিছুমাত্র দ্বিধা কর্‌চে না। ছেলেটি, একেবারে আধখানা চপ্ যে কি রকম কোরে ভাঙ্গা যেতে পারে, তাই ভাবছিল। এমন সময় হোটেল-ওয়ালা কানা-ভাঙ্গা একটা পিরিচে একখানা চপ দিয়ে বোল্লে, 'এই নাও তোমার চপ্।'

দুদিনের খাবারের পয়সা জমিয়ে সে আজ এই চপ্ খেতে এসেছে। আজ চপ খাওয়া হলে কাল আর সে খেতে পাবে না। আবার সেই পরশু, সে কি দু এক ঘণ্টার কথা? সবে সে চপের একটি কোণ ভেঙ্গে মুখে পুরেছে, এমন সময়ে পিছন থেকে তার ক্লাসের এক বন্ধু ডেকে উঠ্‌ল, 'কিরে অমিয়, কি খাচ্ছিস্! আমায় খাওয়াবি না কি?' বন্ধুর ডাকে সে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। কোনো গতিকে তার সবে-কেনা একখানি চপকে ঢেকে ফেলে চোখ পিট্ পিট্ কর্‌তে কর্‌তে সে তার বন্ধুর দিকে তাকালে।

'কি খাচ্ছিস্, বল্ না!'

'কিছু না ভাই। সত্যি! মা কালির দিব্বি! আমি কিছুই খাইনি, শুধু এক পেয়ালা চা।'

"ওঃ, চা তুই খেগে যা। আমি চা খাই না। আমি বাড়ী চল্লুম।'

বন্ধুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে চপের আর এক-টুকরো ভেঙ্গে মুখে দিয়েছে, এমন সময়ে হোটেল-ওয়ালা চেঁচিয়ে উঠলো, "শিগ্‌গির কোরে খেয়ে নাও না ছোকরা! দেখচো না, খদ্দের বসে রয়েছে।"

ছেলেটি ছল্ ছল্ কোরে চপের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে। তখনো আধখানা চপ্ তার খাওয়া হয় নি। তার প্রাণটা প্রায় ফেটে যাচ্ছিল—ঐ আধখানা চপ্ একেবারে খেতে। আধখানা চপ্ খেয়ে ফেলার চেয়ে হোটেল-ওয়ালার বকুনি খাওয়া ঢের ভালো!

একটুকরো ভাঙ্গতে যাচ্ছে, এমন সময় খোলার চালের উপর থেকে খানিকটা ঝুল এসে সেই আধ-খাওয়া চপের উপর পড়লো।

অমিয়র আঙুল-কটা কেঁপে উঠ্‌লো। মুখ তার মলিন হয়ে গেল। টেবিলের উপর থেকে শূন্য হাত ফিরে এল; চপের একটা টুকরোও তার সঙ্গে এল না।

দুদিনের জমানো ভোরের বেলার চিন্তা তার একখানি চপ—তাও শেষ করা হ'ল না!

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

চয়ন

রঞ্জন-রশ্মি

রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কারক প্রফেসার C. W. Rontgen অল্পদিন হ'ল অবসর গ্রহণ করেছেন। ১৮৯৬ সালে তিনি এই অদ্ভুত রশ্মির অস্বচ্ছ জিনিসের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা দেখিয়ে পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। যখন বাতাস-শূন্য একটা কাঁচের টীউবের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক প্রবাহ চল্‌তে থাকে, তখন এই অদৃশ্য কিরণ উৎপন্ন হয়। এ কিরণ চোখে দেখা যায় না। কারণ এ প্রায় সকল জিনিসের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে যায়, এর আলো প্রতিফলিত হতে পারে না। কিন্তু actinic rayর মত ফটোগ্রাফের প্লেটের ওপর রঞ্জন-রশ্মির ক্রিয়া বোঝা যায়।

রঞ্জন-রশ্মি দিয়ে ছবি নেবার সময় প্লেট আর Z' Ray bulb-এর মাঝখানে ছবি তোলবার জিনিস রাখা হয়। তারপর bulb-এর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক্ প্রবাহ চলতে থাকে। প্লেটের উপরে যে ছায়া পড়ে সেই ছায়াই রঞ্জন-রশ্মির ছবি।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রঞ্জন-রশ্মির অনেক উন্নতি হয়েছে। কয়েক বৎসর আগেও মানুষের শরীরের হাঁটু, মাথা ইত্যাদি জায়গার ছবি নিতে হ'লে অনেকক্ষণের জন্য exposure দিতে হ'ত। কিন্তু এখন যে-কোন জায়গার ছবি instant exposure-এই খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমেরিকার ডাঃ কুলিজ এই রশ্মির অনেক উন্নতি সাধন করেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত Bulb-এর রশ্মি পূর্ব্বেকার চেয়ে অনেক-বেশী তীব্র আর অনেক-বেশী কার্য্যকর। এই নতুন Bulb-এর সাহায্যে ১/১০ থেকে ১/১০০ সেকেণ্ডের মধ্যে ছবি নেওয়া যায়। রঞ্জন-রশ্মির সামনে শরীরের কোন অংশ বেশীক্ষণ রাখা ক্ষতিকর। আজ কাল এই নতুন Bulb দীর্ঘ exposure-এর প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে। এখন এই Bulb-এর সাহায্যে রশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি ক'রে সকল জিনিসের ছবি নেওয়াই সম্ভব হয়েছে।

এই উন্নত অবস্থার রঞ্জন-রশ্মি ডাক্তারদের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে এবং এর জন্যে রোগীদের যন্ত্রণাও অনেক লাঘব হয়েছে। এখন কোনো ভাঙ্গা হাড়ের জন্যে অস্ত্র-চিকিৎসা করবার আগে ডাক্তারেরা ছবি নিয়ে শুধু কোন্ জায়গার হাড় ভেঙ্গেচে, সে খোঁজ নেন না—কেমন ক'রে হাড় ভেঙ্গে রয়েছে, সে সমস্ত খুব ভাল এবং স্পষ্ট ক'রে বুঝে তবে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। মাথার মধ্যের যে কোনো জায়গার আব (tumour) এখন অতি সহজেই ধরা যায়। খাবারের সঙ্গে Bismuth আর Barium মিশিয়ে পাকস্থলী ও খাদ্যনালী প্রভৃতির ছবি তুলে অনেকরকম অসুখ এখন অতি-সহজেই চেনা যায়। মূত্রাশয়, পিত্তকোষ ইত্যাদির মধ্যে পাথর হ'লে এখন রঞ্জন-রশ্মি দিয়ে ছবি নিয়ে সেই পাথরের আকার, অবস্থান ইত্যাদির খোঁজ পাওয়া যায়।

ছবি নিয়ে দাঁতের চিকিৎসা এখন খুব প্রচলিত হয়ে পড়েছে।

অনেক কঠিন রোগের চিকিৎসাতেও রঞ্জন-রশ্মি আশ্চর্য্য ফল দেখিয়েছে। নালী-ঘায়ের চিকিৎসাতে রঞ্জনরশ্মি সফলভাবে খুব বেশী ব্যবহার হচ্ছে। ক্যান্‌সার সারাতে না পারলেও রঞ্জন-রশ্মি ক্যান্‌সারের প্রথম অবস্থায় বেশ সুফল দিচ্ছে।

বহুপ্রকারের চর্ম্মরোগে রঞ্জন-রশ্মি খুব ভাল ফল দেখিয়েছে। রঞ্জন-রশ্মি এখন দাদ সারাবার একটা ভাল উপায় বলে ব্যবহার হচ্ছে।

চিকিৎসা ছাড়া রঞ্জন-রশ্মির কাজ শিল্প-কার্য্যেও বিস্তারিত হ'য়ে পড়ছে। অনেকে ষ্টিল লোহা প্রভৃতি অস্বচ্ছ জিনিষের ভিতরের অবস্থা পরীক্ষা কর্ত্তে রঞ্জন-রশ্মি ব্যবহার কচ্ছেন।

এই রকম অনেক রকমে এবং অনেক কাজে রঞ্জন-রশ্মির ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু এর সব-চেয়ে নতুন রকমে ব্যবহার করেছেন আমষ্টার্ডামের ডাক্তার হেল্‌ব্রন। অনেকে সন্দেহ করেন যে, খৃষ্টিয় ষোল শতাব্দীর কতকগুলো ছবি পরবর্ত্তী যুগের চিত্রকরেরা কিছু কিছু বদ্‌লে ফেলেছেন। এম্‌নি একখানা ছবি ডাঃ হেল্‌ব্রন রঞ্জনরশ্মি দিয়ে পরীক্ষা করেন। সেখানা Cornelis En ellrochs n-এর Crucifix নামক ছবি। তিনি দেখতে পান ছবির সাম্‌নে ডানদিকে একজন মহিলার ছবির নীচে একজন যাজকের ছবি রয়েছে। তিনি তখন সে ছবিখানা আমষ্টার্ডামের রিজিক্স মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেন। সেখানে মহিলার ছবির রঙ উঠিয়ে ফেলা হলে যাজকের ছবি স্পষ্ট বেরিয়ে পড়্‌ল।

এভারেষ্ট শৃঙ্গ

অনেকেই শুনে ভারী খুসী হবেন যে, মাউণ্ট এভারেষ্টে ওঠ্‌বার জন্যে একটা সুশৃঙ্খল চেষ্টা চলেছে। এর বিরুদ্ধে যে সব বাধা ছিল, রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি আর আলপাইন ক্লাবের চেষ্টায় সে সব দূরীভূত হয়েছে।

যুদ্ধ আমাদের অনেকখানি শক্তিবান ক'রে তোলে বটে, কিন্তু মাউণ্ট এভারেষ্ট চড়বার চেষ্টায় আমাদের শক্তির, আমাদের সাহসের, আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজ কর্ব্বার এবং সংযম-শক্তির বড় কঠিন পরীক্ষা হয়। এ বড় আশার কথা যে, এই মহাযুদ্ধের পরে বিশ্রাম না নিয়েই মানুষ আবার এত-বড় একটা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হচ্ছে।

এ আশ্চর্য্য মনে হ'তে পারে যে, গত পঞ্চা বছর ধরে মানুষ শুধু দুটো মেরুর কথা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এক-আধজন ছাড়া কেউ এ শৃঙ্গে ওঠবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু এর জ আমরা আমাদের শৈলারোহিদের দোষ দিতে পারি না। তাঁদের পথে অনেক বাধা অনে বিপত্তি ছিল যা সম্প্রতি দূর হয়েছে।

সুশৃঙ্খল একটা ধারাবাহিক চেষ্টা না হলে এর মাঝে সাধারণের চোখের অন্তরালে অনে আবিষ্কারক, অনেক বৈজ্ঞানিক ধীরে ধী হিমালয়ের বুকে প্রবেশ করে অনেক দূ এগিয়ে অনেকদূরের মানচিত্র ও অন্যান্য খ সংগ্রহ করেছেন। নিঃস্বার্থভাবে তাঁরা কাজ করেছেন, তাতে এই নতুন দু

সাহায্য হবে। এঁদের মধ্যে আমরা Brigadier General the Hon. C. G Brace-এর নাম উল্লেখ না ক'রে পারিনা। পর্ব্বত সম্বন্ধে ও সেখানকার লোক সম্বন্ধে তাঁর অতুলনীয় অভিজ্ঞতা সকল পর্য্যটকদের উপকারে এসেছে ও আস্‌বে। সকল বাধা-বিঘ্নের কথা চিন্তা করলে আমরা বেশ বুঝতে পারি যে এই সমস্ত পর্য্যটকদের অভিজ্ঞতার সাহায্য না পেলে মাউণ্ট এভারেষ্টে ওঠ্‌বার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতো নিশ্চয়।

পাহাড়ীদের পরিচালন করা থেকে বাতাসের চাপের হ্রাস—এই রকম কত নতুন নতুন বাধা-বিপত্তি বার হয়েছে, এবং সে সবের জন্যে উপযুক্ত বন্দোবস্ত কর্ত্তে হয়েছে, এমন করে গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরে কতই আয়োজন হয়েছে। এখন এই সব আয়োজন নিয়ে এক পর্য্যটকের দল সাজানো হবে। এদের গরম ও শীতের জন্যে প্রস্তুত হয়ে,নদী,বাতাস ও বরফের বিপদ-আপদকে তুচ্ছ ক'রে, অনাহার অনিদ্রার ক্লেশকে ভয় না ক'রে পৃথিবীর সভ্যতার সীমান্তে যেতে মনঃস্থির কর্ত্তে হবে।

বিপত্তির সঙ্গে প্রথম সংগ্রাম আরম্ভ হবে সেইখানে, যেখানে মানুষের বসতির সঙ্গে মানুষের জানা দেশ শেষ হয়ে যাবে। হিমালয়ের প্রকৃতি এখনও শিশু, সেখানে পাহাড়-পর্ব্বত-উপত্যকা সব ভীষণ ও প্রকাণ্ড। কল্পনা সে বৃহত্ত্বের সঙ্গে চল্‌তে পারে না। যুগান্তের বিপুল তুষারের স্তূপ, বিশাল ভূপাত, ক্ষণস্থায়ী জলোচ্ছ্বাস, ধ্বংসোন্মত্ত ঝটিকা, এরা সব নিজেদের ইচ্ছামত পৃথিবী আর পাহাড়ের মাঝে বরফ আর তুষারের সঙ্গে প্রাকৃতিক খেলায় উন্মত্ত।

পর্ব্বত-শিখরের একমাত্র প্রবেশ-পথ সেখানকার ভীম হিমানী-স্তূপ, এবং এসব জায়গায় এরা এত জটিল যে এভারেষ্টের দিকে এগুতে খুব অল্প পথ অতিক্রম করতেও একাধিক ঋতু কেটে যায়। এমনি একটা পর্ব্বত-শিখর পার হতে অনেক সপ্তাহ লেগে যায়; কারণ এই রকম ভীষণ জায়গায় পর্য্যটকেরা অনেক পরিশ্রমের পর, অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েও দিনে একমাইলের বেশী কিছুতেই এগুতে পারে না।

শিখরের পাদদেশে আবার একটা নতুন সংগ্রাম আরম্ভ হয়। আমরা শুনেছি এ জায়গা উত্তর দিকে। এখানে যেতে হলে তিব্বতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ পথ এখনও আনুমানিক। কারণ কেহই এখনও এভারেষ্ট শিখরের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে পৌঁছতে পারেন নি। পর্ব্বতারোহীদের এখান থেকে বরফ এবং তুষারের সরলোন্নত দেওয়াল পর্য্যন্ত একটা সহজগম্য পথ বার কর্ত্তে হবে। এখানে একটু ভুল-যাত্রা কল্লে একটা বছর একেবারে বৃথা হয়ে যাবে।

এই আরোহণ 'লাফ দিয়ে' হবে না। কত বছরের অসফলতার অভিজ্ঞতা সফলতা-লাভের জন্য আক্রমণের একমাত্র পথ বার করেছে। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে পথের মাঝে পর্য্যটকদের তাঁবুর আস্তানা রেখে অগ্রসর হতে হবে। প্রত্যেক তাঁবুতে জনকয়েক লোক রেখে যেতে হবে, যারা তাদের নিজেদের এবং যারা এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য সেখানে শীত সহ্য কর্ব্বে।

সব-শেষ তাঁবু বোধ হয় শিখরের অল্প কয়েক সহস্র ফিট নীচে স্থাপিত হবে। তারপর শেষ বাছা-বাছা কয়েক জন, হয় ত জন-

চারেক শেষ যাত্রা কর্ব্বে। এই ভয়ানক উঁচু স্থানে এক দমে মানুষ কয়েকদিনের বেশী থাকতে পারে না। বাইরের বিপদের কথা ছেড়ে দিলে ত এখানে মানুষের ক্ষমতা, জীবনী-শক্তি এবং ধৈর্য্য বড় তাড়াতাড়ি ক্ষয় পেয়ে আসে। সেই জন্যে যারা শেষ যাত্রার যাত্রী হবে, তাদের চাই চরম শীতেও ক্লেশহীন ক্লান্তিশূন্য, অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। এ সময়ে একটু ভুলে, একটু অসহিষ্ণুতায় সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এম্‌নি সব স্থিরপ্রতিজ্ঞ শক্তিমান অবিচল লোকেরা মাউণ্ট এভারেষ্টে ওঠবার প্রথম সম্মান লাভ কর্ব্বে। এই যে পর্ব্বতারোহণ—এ মনুষ্যত্বের একটা বড় কঠিন ও বড় ভীষণ পরীক্ষা।

কিন্তু এই শেষ আস্তানাতে এসেও অনেক বাধা মিলতে পারে। রাস্তা, আবহাওয়া,—সবই ভাল থাক্‌তে পারে; যারা শেষ যাত্রা কর্ব্বে তারাও ঠিক থাক্‌তে পারে। কিন্তু এমন হতে পারে যে শিখর থাক্‌বে বরফে ঢাকা—সে এত উঁচুতে যে সেখানে পা ওঠানোই ভয়ানক ব্যাপ্যার—বরফ কেটে সিঁড়ি কর্ব্বার কল্পনাও সেখানে করা যায় না। আবার এমন হতে পারে যে সে জায়গা এমন ভাবে তুলোর মত তুষার দিয়ে ঢাকা যে মানুষের সকল শক্তি সেখানে তলিয়ে যায়।

যদি এ যাত্রা সফল হয়, তবে তা হবে অসীম শক্তি, অদ্ভুত সহিষ্ণুতা আর আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের মিলনে।

জন্তুদের বিচার

মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা যেমন অনেক ভয়াবহ ঘটনা দেখ্‌তে পাই, তেম্‌নি অনেক হাস্যোদ্দীপক কাহিনীও আমাদের সে যুগের বুদ্ধির বহর দেখিয়ে অবাক করে দ্যায়। এখানে ইউরোপের মধ্যযুগের যে একটা প্রথার কথা বল্‌ছি, স্থির-মস্তিষ্ক লোকেরা যে কি ক'রে সে প্রথার অনুমোদন কর্ত্তেন তা আমরা বুঝ্‌তে পারি না।

গরু, ইঁদুর, পাখী, জোঁক—এদের অপরাধের জন্য সাধারণ বিচারালয়ের বিচার আমাদের কাছে হাস্যোদ্দীপক মনে হ'লেও, মধ্যযুগে ইউরোপে এদের বিচার করা ও শাস্তি দেওয়া বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই নির্ব্বাহ হ'ত। এক ফ্রান্সেই ১১২০ থেকে ১৭৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই রকম বিরানব্বইটা মাম্‌লার সন্ধান পাওয়া যায়।

এ-সব মাম্‌লা শুধু মানুষের ওপরে পশুদের গুরুতর অত্যাচারের বিরুদ্ধেই রুজু হ'ত না। একটা ষাঁড়ে একজন মানুষকে গুঁতিয়েছে, একটা ছেলেকে একটা কুকুর কামড়ে ফেলেছে—এ সব ত ছিলই। তারপরে ছোট খাট অপরাধের জন্যেও তারা নিস্তার পেত না। এ-সমস্ত মাম্‌লা রীতিমত বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে চালান হ'ত। যদি কোন দোষী ইঁদুর কিম্বা মাছি কিম্বা কোন পশু লোক উৎপাত আরম্ভ কর্ত্ত, সাধারণে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু ক'রে তা

পক্ষে একজন উকীল নিযুক্ত করা হ'ত। আর তাদের আদালতে হাজির হ'বার জন্যে তিনবার পরওয়ানা বেরুত। যদি তিনবারের পরেও তারা হাজির না হ'ত, তবে তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার আরম্ভ হ'ত। তখন তাদের উকীল যদি ভাল কারণ না দেখাতে পার্ত্তেন, তবে একটা নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে তাদের সে দেশ ছেড়ে যাবার হুকুম হ'ত। আর হুকুম মান্য না কল্লে ওঝা ডেকে মন্তর পড়ে শাস্তি দেওয়া হ'ত। যদি মন্তর পড়ার পরেও তাদের অত্যাচার বেড়েই চল্‌ত, তবে লোকে সে দোষ শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিত।

১৪৫১ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের Lausanne সহরে একবার কতকগুলো জোঁকের বিচার হয়। তাদের অপরাধ, সেই দেশে ছড়িয়ে পড়ে মানুষেদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। তাদের কতকগুলোকে ধরে আদালতে হাজির করা হয়। তারপর বিচার করে তাদের নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। রেকর্ড আছে যে, তারা সেই নির্ব্বাসনের হুকুম অমান্য করায় ওঝা ডেকে মন্তর পড়ে তাদের বংশ লোপ ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে Autu এ ইঁদুরদের বিরুদ্ধে এক মামলা হয়। মঁসিয়ে স্যাসানসিঁ ইঁদুরদের উকীল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি প্রথমে ইঁদুরদের অনুপস্থিতির কারণ দেখান যে, সকলকে আস্‌তে বলা হয়েছে; কিন্তু কেউ কেউ অত্যন্ত ছোট, কেউ কেউ বৃদ্ধ এবং অসমর্থ। তাদের সকলের আস্‌বার জন্যে বন্দোবস্ত কর্ব্বার সময় চাই ত! আদালত সময় দিলেন। কিন্তু এতেও তারা হাজির হোল না। তাতে উকীল-মশায় কারণ দেখালেন যে, ইঁদুরদের যখন মহামান্য আদালত থেকে আস্‌তে বলা হয়েছে, তখন আদালত তাঁদের রক্ষার জন্যে দায়ী। কিন্তু পথে-ঘাটে বিড়াল, কুকুর আছে, তারা ইঁদুরদের যম। সেগুলোকে সয়ানো না হ'লে তারা কি ক'রে আসে? সেগুলো সর্‌লেই ইঁদুররা উপস্থিত হ'বে। আদালত থেকে বিড়াল কুকুর সরাবার হুকুম হ'ল। কিন্তু এ পর্য্যন্তও তারা সরেনি বলে মাম্‌লা মুল্‌তুবী আছে।

কলারের ইতিহাস

আগে আলাদা কলারের ব্যবহার ছিল না—এবং সেই জন্যই কেউ তা ব্যবহার কর্ত্তে পেত না। আলাদা কলার তৈরীর বেশ একটু মজার ইতিহাস আছে। আমেরিকার ট্রয় সহরে এক কামারের স্ত্রী এই আলাদা কলার আবিষ্কার করে। তার নাম হানা লউ মণ্টেগু। ১৮২৫ সালে একদিন সে তার স্বামীর সার্ট ধুতে-ধুতে লক্ষ্য করলে যে সার্টের গা ও কফের চেয়ে গলার কাছটাই বেশী ময়লা হয়। তার মনে হ'ল কলার আলাদা করে ফেল্‌লে সার্টও বেশী ধুতে হয় না। সে তখন আলাদা কলার তৈরী কর্ত্তে লাগ্‌ল। ক্রমে পাড়া-পড়্‌সীরা তার কাছ থেকে কলার কিন্‌তে লাগল। শেষে কলারের বিক্রী এত বেড়ে গেল যে, তারা একটা মস্ত ফ্যাক্টরী খুলে ফেল্লে।

তারপর এখন অবশ্য নানা দেশে নানা কোম্পানী কলারের কারবার খুলেছে।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

প্রিয়ার উদ্দেশে

২

ট্রেণ ছাড়বার বেশী দেরী ছিল না, কিন্তু তোমায় কিছু ফুল পাঠিয়ে দেবার মত সময়ের অভাব হয়নি। সেগুলো গোলাপ—গাঢ় লাল। আমাদের অপেরায় তুমি যে রঙের গোলাপ পোরে ছিলে, সেইরকম। আমি কিনেছিলুম অনেক, যেমন মনে লাগলো, তেমনি কিন্‌লুম, শেষ মুহূর্ত্তে আমার নামের কার্ডখানা গুঁজে দিতে ভুলে গেলুম—কে যে তোমায় ফুল পাঠালে, তা তুমি বুঝতে পারলে না—অবশ্য আন্দাজ করতে পেরেছ, বোধ হয়! মনে আছে কি, আগে তোমায় একবার ফুল পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু তুমি প্রাপ্তি-স্বীকার করনি? তোমার মনোভাব পাছে প্রকাশ পায়, সেই ভয়ে, বুঝি? যতদিন না ফুল গুলো শুকিয়ে যায় ততদিন তারা তোমায় আমার কথা মনে করিয়ে দেবে!

এখন আমি যেখানে আছি, ফুলের কথাটা সেখানে কিন্তু ভারি অদ্ভুত, ভারি অবান্তর!

নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম, কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছি। আর ভেবে অবাক হচ্ছি যে আমিই সেই লোক যে,তোমার পাশে-পাশে সেদিন বেড়িয়েছে! আমাদের আড্ডা হয়েছে একটা dug-out-এ, সেখানে বাইরের trench-এর যত জল একেবারে বৃষ্টির মত পড়ছে। ব্যাপার খুব চমৎকার! রসিক হুনরা ভালো কোরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁরা আছেন! আমাদের পদাতি সৈন্যদল খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কারণ শীঘ্রই এ[illegible] তীব্র আক্রমণের আশঙ্কা আছে! চারিদিকে যথেষ্ট পরিমাণে গোলা-গুলি-বর্ষণ চলেছে,এবং গ্যাসের গন্ধও অল্প অল্প পাওয়া যাচ্ছে। সংবাদ-বাহকেরা সংবাদ নিয়ে কেবলি যাওয়া-আসা করছে—সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় কোরে লোক আর বাইরের কাদা এনে ঘরের মধ্যে পুরছে। আমার কনুইয়ের কাছে একটা বাতি গোলে গোলে পড়ছে। একটা পেট্রোলের বাক্সের উপর গদীর বদলে দু-পাট কম্বল পেতে আমি বসে আছি। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, সারা রাত জেগেই কাটাতে হবে।

আজ তুমি কত দূরে—যা-কিছু আমি ভালবাসি সবই কত দূরে! বোধ করি, তুমি তোমার কর্ত্তব্য তুমি করছ। মানস-চক্ষে তোমায় দেখছি—তোমার সেই অসহায় শিশুর দল কেমন দিব্য আরামে বিছানায় শুয়ে আছে! তুমি ত বলেছ যে হুনেরা তোমাদের উপরে সময় সময় গোলা চালায়, গ্যাস ছাড়ে। নিতান্ত স্বার্থপরের মত আমি ভাবছিলুম—না, তুমি যে পুরুষদের সঙ্গে এই খেলায় যোগ দিয়েছ এতে আমি খুব খুসী। মনে হচ্ছে, তোমার সুন্দর বেশ-ভূষা সব দূরে সরিয়েছ, প্যারিস বোধ হয় সব পড়ে আছে—এখন তোমার ধাত্রীর বেশ! তুমি ত ক্যাপ্‌টেন, তাই না! তা হলে তুমি আমার উপরে, কারণ আমি মাত্র sub-altern, তোমার সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছি, তুমি তার চেয়েও উপরে! বিলাসিতার সমস্ত আরাম ছেড়ে বিপদে

সামনে পরের ছেলের ভার নেওয়া কম সাহসের কাজ নয়। তোমার মধ্যে এই বীরত্বের সম্ভাবনা কোনো দিন আমার মনে জাগেনি। প্যারিসে যতদিন ছিলুম, তোমাকে সবার-সেরা সুন্দরী বলেই শুধু জেনেচি,—তার চেয়ে আর বেশী কিছু নয়! যত মেয়ে দেখেছি, তাদের সবার চেয়ে ভদ্র, শান্ত আর মমতাময়ী। যখনই তোমার ধাত্রী-হিসাবে দেখি, তখনই ধর্ম্মের একটা জ্যোতি যেন তোমায় ঘিরে থাকে! আন্তরিক সেবার মধ্যে এমন একটা পবিত্রতা আছে যা সৌন্দর্য্যকে ছাপিয়ে ওঠে!

আমার শেষ লাইনের শেষে যে কালি ছড়িয়ে গেছে, সেটা সব দোষে নয়। আমাদের dug-out এর দরজায় একটা শেল্ এসে পড়লে একজন মারা পড়লো, দুজন জখম হলো আর বাতিটা নিবে গেল। দুটো লোকের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এই শেষ করলুম। মরা লোকটা পথের উপরে পড়ে আছে—একটা কম্বল তার উপরে চাপানো। বেচারা নেহাৎ ছোকরা! এই সে দিন সে আমাদের দলে যোগ দিয়েছিল। এ-রকম দুর্ঘটনা আমাদেরই দোষে হয়—আমাদের উপর শুধু এগিয়ে যাবার ভার, সবাই অন্তত তাই আশা করে, কাজেই যে সব trench আমরা জয় করে দখল করি, সেগুলোর সম্বন্ধে মনোযোগ দেবার আমাদের সময় থাকে না, শত্রু যখন ছিল, তখন এর মুখগুলো ঠিক দিকেই ছিল, কিন্তু আমাদের বেলা শত্রুর গোলার অব্যর্থ সন্ধানের জন্যেই শুধু সেগুলো আছে—এই ত যুদ্ধ!

যুদ্ধে যোগ দিতে আমার বেশী দেরী হয়নি—কত দেরী? William Tell অভিনয় শোনা আর সেই বিচিত্র বিদায় নেবার চার রাত পরেই। যাত্রাশেষে গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছে ঘোড়া কি সহিস কারুরই খোঁজ পেলুম না। আমার division-এ টেলিফোন করলুম—কতক্ষণ অপেক্ষা করবার পর প্রায় মাঝ-রাতে ঘোড়া নিয়ে লোক এল। মালগাড়ীর সার ধরে যেতে পথে ভয়ানক ঠাণ্ডা পেলুম। পথের মাঝে ডোবা আর খালের জল জমে বরফ হয়ে কাচের পাতের মত দেখাচ্ছিল। বেশীর ভাগ পথ ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হলো—তারা বিড়ালের মত পা পিছলে চল্লো। আকাশের চাঁদ যেন বাটালি দিয়ে খোদা শক্ত পাথর! বিপর্য্যস্ত গ্রামগুলো যেন প্রেতপুরীর মত ভয়ানক ও গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সবে সেই দিন আমাদের দল সেখানে উঠে এসেছে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলার এক-শেষ!

রসদ-গাড়ীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় তিনটে—ঘোড়াগুলো দীর্ঘ ভ্রমণে প্রায় কাবু হয়ে পড়েছিল। জায়গাটা একটা গ্রামের ধ্বংসাবশেষ—একটা গোলা-বাড়ীতে সৈন্যেরা জড়ো হয়েছে। বেশীর ভাগ বাড়ীতে দেওয়ালগুলোই কেবল দাঁড়িয়ে আছে, আর সব ভেঙ্গে পড়েছে। আমরা অনেক চেষ্টার পর quarter masterকে জাগালুম। তিনি আবার ঠিক জানেন না,আমার থাক্‌বার জায়গা কোথায়! এত রাত্রে খোঁজাখুঁজি করেই বা কে? বিছানাটা পেতে জুতো খুলে দিব্যি শুয়ে পড়লুম—হোটেলের বিলাসিতা,গরম স্নানাগারে ধবধবে সাদা চাদরের বিছানার আরাম থেকে এ অবস্থায় আসা মস্ত একটা পরিবর্ত্তন নয় কি? এখন বোধ হয় বুঝেছ তোমায় এত দূরে মনে হচ্ছে কেন?

এর চেয়ে অনেক আকস্মিক পরিবর্ত্তন

আমার ভাগ্যে ছিল। পরদিন প্রাতে ছ'টার পরেই আর্দ্দালী এসে আমায় জাগিয়ে দিলে—শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণকারী দলের সঙ্গে আমায় যেতে হবে—সাজগোজ করতে বেশী দেরী হল না—পোষাক পোরে শোবার এই একটা মস্ত সুবিধা। বেচারা ক্লান্ত ঘোড়াটির পিঠে আবার জিন কসা হল—তারপর পিছলে, পা ঘোসে ঘোসে সেই কাচের মত পথে আমরা যাত্রা করলুম। এত তাড়ার কারণ আর্দ্দালীর কাছে শুনলুম, মেজরের লোকের অভাব, তাই আমায় চাই।

গিয়ে দেখি, আমাদের Battery একটা সরু উপত্যকার মধ্যে জমা হয়েছে—এ উপত্যকার নাম তুমি জানো, কিন্তু নাম আমি বলবো না। বছর খানেক আগে ফরাসিরা এখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ কোরে একে বিখ্যাত করেছে! সে হাতে হাতে যুদ্ধ—এত কাছাকাছি যে সঙ্গীন দূরের কথা, সৈনিকেরা ছোরা মুখে কোরে হাত দিয়ে বেয়ে বেয়ে উপরে উঠছিল। তলায় ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অনেক মৃত দেহ এখনও পড়ে আছে—তাদের ওপর দুমুঠো মাটী ছড়িয়ে দেবারও কেউ নেই। এখন বরফে তারা চাপা পড়েছে বটে কিন্তু পায়ের তলায় তাদের হাড়গুলো ফুটছে, বেশ বুঝতে পারা যায়। খানিক দূরে ছোট একটা গাছের ঝোপের মধ্যে আমাদের কামান লুকানো আছে—এরো-প্লেন থেকে যাতে দেখতে না পাওয়া যায় তার উপায়ও করা হয়েছে। ঘোড়া রেখে পথটা হেঁটে গেলুম, নতুন পথ তৈরী কোরে লাভ কি? তা ছাড়া বরফের উপর পায়ের চিহ্ন খুব স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

মাটির নীচে একটা গর্ত্তের মধ্যে আমরা মেজরকে পেলুম—"তুমি এসেছ, বেশ, খুব খুসি হলুম! এই কাজে তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিলুম কিন্তু না দিয়েই বা কি করি, বল? খবর যা কিছু সংগ্রহ করেছি, তোমায় দিচ্ছি, কিন্তু কোয়ার্টার খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়া চাই।"

তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিলুম। Telephonistদের সংগ্রহ কোরে নিয়ে অগ্রসর হলুম; এখানে আজ নিয়ে তিন দিন আছি—সৈন্য-দলে যোগ দিলে ভাববার বা দুঃখ করবার সময় থাকে না—সেটা কম লাভ নয়! আমার অবস্থা প্রায় সাধারণ সৈনিকের মত হয়ে পড়েছে—আমার না আছে কম্বল, না আছে বালিশ, না কিছু—তাড়াতাড়িতে সব জিনিষ-পত্র ফেলে চলে এসেছি। রাত্রে trench-coatটা মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকি। কম্বল নেই বোলে বিশেষ যে অসুবিধে হচ্ছে তা নয়, কারণ সারা রাত ত জেগে এদিক ওদিক কোরে বেড়াতে হয়, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার সময় পাওয়া যায় সকালে ছ'টা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত—থামতে হলো—কি একটা হচ্ছে···।

* * * *

না, ব্যাপার কিছু নয়, কে একজন আ পেয়ে বিপদে সাহায্যের জন্যে যে হাউই ছোড়ে তাই ছেড়েছে—হুনদের লাইন লক্ষ্য কোরে কিছুক্ষণ গোলা বর্ষণ করলুম—যদি তারা কিছু ভেবেও থাকে, তবে সে মতলব ত্যাগ করেছে—চারিদিক প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে, শুধু দূরে আমাদের বাঁ দিকে, মাঝে মাঝে আনাড়ি-হাতে টেপা type-writer

মত machine-gunএর পট্ পট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। শত্রুদের আড্ডায় সেই অজানার দেশ থেকে মাঝে মাঝে হাউই আকাশের দিকে উঠছে—সেগুলো যেন অন্ধকারের বুক চিরে মোটর গাড়ীর মত ছুটচে। যদি ভালবাসায় পড় আর প্রচুর কল্পনা থাকে তবে এমনি রাতে অনেক পরীর গল্প রচনা করতে পার। সেই সব শাদা আলোগুলো আকাশে উঠছে, ছুটচে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে একটা অবাস্তব পরীরাজ্যের সৃষ্টি করছে, আর আমায় Parisএর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

তোমার স্মৃতি অকস্মাৎ মনে আসে—তোমার অঙ্গভঙ্গী, চলাফেরা, কথাবার্ত্তা—যা তখন লক্ষ্য করিনি। Hotel pavillon এ যে রাত্রে দুজনে গিয়েছিলুম, সে রাত্রির কথা তোমার মনে আছে? আমেরিকান পুরুষরা সেখানে জড়ো হয় আর মেয়েরা সব জিনিষ-পত্র বিক্রী করে। সে রাত্রে তুমি সিগারেট বিক্রী করছিলে—বোসে বোসে তোমায় দেখছিলুম—কত লোক কিনবে বোলে ভিতরে এল—প্রথমে তোমায় কেউ লক্ষ্যই করেনি—যখন তোমায় দেখতে পেলে, তাদের চোখের আর পলক পড়লো না, এক-দৃষ্টে তোমার মুখের পানে চেয়ে রইলো। তোমার সঙ্গে এলো-মেলো আলাপ জমাবার চেষ্টা করলে, ভদ্রতার খাতিরে তারা বেশীক্ষণ থাকতে পারলে না, কিন্তু একবার একটা কিছু কেনা শেষ হয়ে গেলে আবার কিছু কেনবার ছল কোরে ফিরে এল। তোমায় আর একবার দেখাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কথা কইবার সময় তুমি হাত দিয়ে মুখ ঢাকছিলে। নিজেকে তুমি সাধারণ দোকানি-মেয়ে বোলে চালাবার চেষ্টায় ছিলে এবং নিজের জ্ঞাত-সারে সবাইকে মুগ্ধ করছিলে। মাথায় তোমার ছোট একটা টুপি ছিল মখমলের, কপালের উপর বাঁকাভাবে সেটা বসানো ছিল তাতে তোমার ভ্রূর সূক্ষ্মতা আরও সুন্দর ফুটে উঠেছিল। আমেরিকায় আমাদের সেই ক্ষণিক মিলনের দিনে তুমি এই টুপিটিই পরেছিলে।

কে তুমি? কি তুমি? আমার কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছ—এর মধ্যেই অবাস্তব হয়ে উঠেছ। এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দেশের সঙ্গে তোমার চিন্তাকে আমি কোন মতেই খাপ খাওয়াতে পারছি না।—প্রাণ চাঞ্চল্যের তুমি যে প্রবল স্ফূর্ত্তির মত—জীবনের তুমি যে প্রতিমূর্ত্তি! আমার জন্যে তুমি কি একটুও ভেবেছ—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও? যে জীবনে আমি ফিরে আসছিলুম তার ছবি কি কোন দিন চোখের সামনে এঁকেছ? আমি কি শুধুই একটা ঘটনা—বেশ এক হাসি-খুসি-ভরা মজার লোক, ক্ষণিকের তরে এসে চলে গেল—! সামনে বা পিছনে কি আছে, আমাদের মধ্যে সে কথার আলোচনা কোনদিন হয় নি—যে ক' ঘণ্টা হাতে পেয়েছি আমরা তা উপভোগ কোরে নিয়েছি। কিন্তু আমার সেই সমস্ত সুখের মধ্যে একটা বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল—আমাদের বিচ্ছেদের চিন্তা আমার মনে সব সময়েই জেগে থাকতো। কে যেন ভিতর থেকে সাবধান করতো—"এই শেষ—এই শেষ—শেষ!" তোমায় যদি আগে পেতুম—যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে, তা হলে সগর্ব্বে তোমায় প্রেম জানাতুম, কিন্তু এখন আর তা

পারবো না। মুখ ফিরিয়ে সেই পথটার দিকে দেখছি—আমি তার বুট দেখতে পাচ্ছি – কম্বলের নীচে তার দেহের আভাষ পাচ্ছি – Stretcher টা দেখতে পাচ্ছি। একদিন সেও মানুষ ছিল—এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার সুর শেষ হয়ে গেল—যা এখানে পড়ে আছে তাই তার অবশেষ! হয়ত সেও কোনো মেয়েকে ভালোবাসতো! সে কথা বোধ হয় সে মেয়েটিকে জানিয়েওছে। না জানিয়ে চুপ কোরে থাকলেই ভাল হতো। কিন্তু সেই যে তোমার বন্ধু বলেছেন —"তাকে বিয়ে করলে ভালই করতুম!" এ একটা সমস্যা। আমার নিজে দিক থেকে দেখলে তোমায় বল্লেই বেশ হতো, চুপ কোরে থাকার চেয়ে অনেক বেশী ন্যায় করতুম নিজের উপরে; তা হলে সেটা সবটুকু তোমার উপর নির্ভর করতো। কিন্তু সে পথ স্বার্থপরের পথ বলে তার উপর আমার কিছু মাত্র শ্রদ্ধা নাই।

এই আর একটা চিঠি লিখলুম, যা কোন দিন তোমার চোখে পড়বে না। যে চিঠি তুমি পাবে তা একেবারে অন্য রকমের! তোমার উপাধি ধোরে তোমার সম্বোধন করবো—গোটাকত কথা জানাব যে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসেছি, আর জানতে চাইব তোমার কেমন চলছে। ভাবছি—তুমি আমায় চিঠি লিখবে কি? তোমায় যখন সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তুমি সলজ্জভাবে মাথা দুলিয়েছিলে, সেটা কি ভদ্রভাবে অস্বীকার করার ইঙ্গিত? তুমি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে যাচ্ছ আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি—তুমি ফিরে চাইলে না। যদি আর মিনিট-খানেক তুমি আমার কাছে থাকতে, তা হলে হয়ত সেই সব কথা তোমায় বলে ফেলতুম—যা না বলে আমি ভালই করেছি। ভাবছি—তুমি বোধ হয় সা জানতে!

প্রায় সকাল হয়ে এল! কিছু আর ঘটবার নেই—এবার একটু বিশ্রামের আয়োজন করা যাক্।

৩

এইমাত্র ডাক এল। গোলা-গুলি যে গাড়ীতে আসে তাইতে ডাকও আসে। ডাক এসেছে—কথা দুটো কাণে বাজলো আর সঙ্গে লোকদের দৌড়-ধাপের শব্দ শুনতে পেলুম। ভাবতে ভারী আশ্চর্য্য লাগে চিঠিগুলো কত দূরে আসে যায়—কেমন নিরাপদে এসে পৌঁছয়—অবিরাম গোলা-বর্ষণের মধ্যে—গ্যাসের ভিতর দিয়ে, ডাক-হরকরার থলিতে, রসদ-বাহী জানোয়ারের পিঠে আর গোলাগুলির গাড়ীতে। কামান-গুলো যেখানে আছে দিনের বেলা সেখানে নড়া-চড়া সম্ভব নয় বলে রাত্রেই আসে। চিঠি বিলি হবার আগে গোলা-বারুদ সব নামিয়ে নিতে হবে, কারণ কামানের লাইনের কাছে জানোয়ারগুলোকে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। লোকগুলো কি তাড়াতাড়ি কাজ করছে! তারা লম্বা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে—হাতাহাতি কোরে shell গুলো মাটীর নীচে বারুদ রাখবার গর্ত্তের মধ্যে জমা করছে। যতক্ষণ না সব জিনিষ নির্ব্বিঘ্নে জমা করা হবে ততক্ষণ তাদের মায়ের স্ত্রীর প্রণয়িণীর চিঠি থলির মধ্যেই বন্ধ পড়ে থাকবে।

যেই শেষ shellটা রাখা হয়ে গেল তারা সার্জ্জেণ্ট মেজরের dug-out এর দিকে ভিড় কোরে ছুটলো। তিনি থলির উপর ঝুঁকে মোমবাতির আলোতে যত চিঠির খামের উপরে লেখা নাম চীৎকার কোরে পড়তে লাগলেন। থলি ক্রমে খালি হয়ে গেল—শূন্য থলিটা তিনি একবার উল্টো কোরে ঝেড়ে দেখলেন। এর পর সারা দিন-রাত বাড়ী থেকে আর কোন খবরই পাওয়া যাবে না। ভিড় ছড়িয়ে পড়ছে—সেই অন্ধকার আবার নির্জ্জন হয়ে উঠলো।

আমার মত যারা সেনা-নায়ক তাদের বোসে বোসে অপেক্ষা করতে হবে, কারণ আর্দ্দালিতে তাদের চিঠি এনে দেয়। আমাদের ধৈর্য্যের এও এক বিষম পরীক্ষা। উচ্চপদের কিছু দান এম্‌নি করেই দিতে হয়। আজ রাতে মনে করলুম, তোমার চিঠি পাবই—যেই দেখলুম ডাক এসেছে আমার হুঁস-মর্য্যাদা ভুলে বেরিয়ে পড়লুম, যেন জন্তু-গুলো লাইনের বাইরে রাখা হয়েছে কিনা দেখাই আমার উদ্দেশ্য! কি রাত্রি! তারা আর তুষার যেন আবলুষের উপর রূপার মিনা করা—shell রাখবার গর্ত্ত থেকে আগুনের আলো আসছিল—লোকেরা এরই মধ্যে তার চারদিকে নীরবে বোসে গেছে, কম্পিত চঞ্চল অগ্নিশিখার আলোতে তারা চিঠি পড়ছে। মায়ের তলায় বরফ চুর হয়ে গেল। মনে হল, যেন ক্ষণেকের জন্যে যুদ্ধের সব হাঙ্গাম থেমে গেছে—সবাই যেন ক্ষণকালের জন্যে শান্তি, শান্তি ও স্নেহের কোলে ফিরে গেছে।

পথে আমার চাকরের সঙ্গে দেখা হল সে এক-তাড়া চিঠি নিয়ে আসছে। "নায়কদের চিঠি আপনি নেবেন।" মাটির নীচে গর্ত্তের ভিতর আমাদের মেসে ফিরে গেলুম। টেবিলের উপর সেগুলোকে জমা করলুম—এক চাহনিতেই দেখে নিলুম, তোমার কাছ থেকে কোন চিঠিই আসে নি। আমার নামে তিনখানা চিঠিই চেনা হাতের লেখা—কথাটা শুনতে ভারি অদ্ভুত লাগছে না কি? জগতে আমার বলতে যা আছে, সবার চেয়ে তোমার দাম আমার কাছে বেশী—সবার চেয়ে তুমি আমার কত আপন, অথচ তোমার হাতের লেখা আমি কখনও দেখিনি! এ থেকে স্পষ্টই বুঝচি, পরস্পরের কাছে আমরা কতখানি অপরিচিত!

আমাদের মেসের সবাই আজ কিছু না কিছু পেয়েছে এবং সব-চেয়ে বেশী পেয়েছে Jackho; তার স্ত্রীর কাছে থেকে চিঠি এসেছে চারখানা। বছর-দুই আগে তাড়া-তাড়ি সে বিয়ে করেছে—মোটে এক সপ্তাহের আলাপ, এই ত শুনলুম—বিয়ের পর চার দিন honey-moon, তার পরেই সে ফ্রান্সে চোলে এসেছে—সমস্ত জীবনে যদি সে ত্রিশদিন স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়ে থাকে, তবে সেটা তার পক্ষে যথেষ্ট! এমন কোরে কোন লোককে প্রেমে পড়তে দেখিনি। আমি কিনা তার সব-চেয়ে বেশী বন্ধু, তাই তার কোন কথাই আমার কাছে গোপন থাকে না! আমাদের মেজর পেয়েছেন মাত্র একখানি চিঠি। তাঁর প্রণয়িণী তোমারই মত ফরাসী হাস-পাতালে কাজ করেন। আমার ধারণা সে মেয়েটি এঁকে মাঝে মাঝে বেশ এটু নাকাল করে। আমাদের দলপতির সঙ্গে কেউ যে চালাকি করতে পারে তা কিন্তু বিশ্বাস কর

দায়—এঁকে খুব খুসী দেখছি না—গম্ভীর ভাবে বসে ভ্রূ কুঞ্চন করছেন। তার পর Bill Lane, এ ভদ্রলোকের অবস্থা মন্দ নয়—একটু চঞ্চল বটে কিন্তু কাজে বেশ চটপটে। তাঁর প্রণয়িণী আছেন ইংলণ্ডে—আগামী ছুটিতে তাঁকে বিয়ে করবার মত্‌লব চল্‌ছে—সে সারাদিন ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে বিয়ের আগেই কোনদিন গোলার আঘাতে তার সব চুকে যায়। তা বোলে তাকে কম সাহসী বলা যায় না—বিপদের মুখে আমাদের সবায়ের মতই সে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যায়। চিঠির পাতা ওল্টাচ্ছে আর হাসছে—শুধু এই সময়টির জন্যে বেচারী যা একটু বিশ্রাম পায়।—সে সুখী—ভুলে যাচ্ছিলুম—আমাদের Stephen-এর কথা তোমায় বলি—সে চমৎকার নক্সা আঁকে। তাকে কেউ কখনও চিঠি-পত্র লেখে না। সে দেখতে যেমন ভাল, তার ব্যবহারও তেমনি চমৎকার—চিঠিগুলো যখন বিলি হয় তখন সে একটুও চঞ্চল হয় না, কারণ সে কখনও কারও কাছে কিছুরই প্রত্যাশা করে না। আমরা যখন চিঠি পড়ি, সে তখন টেবিলের আলোকিত অংশে মাথা নীচু কোরে ম্যাপের লাইন কাটতে ব্যস্ত থাকে।

তুমি আমায় লেখ না কেন? আমি দিন গুনছি—যত দিন দেরী হওয়া সম্ভব তা হাতে রেখেও দেখছি যে, কাল তোমার একখানি চিঠি আসা উচিত ছিল—আজ নিশ্চয়ই আসবে মনে করেছিলুম। আদি কাল থেকে প্রেমিকরা মনের হতাশা দূর করবার জন্যে যত-রকম মিথ্যা ওজর মনে মনে রচনা করে, আমিও তাই করছিলুম। তুমি ব্যস্ত—তুমি লিখেছ—ডাকে ছাড়তে ভুলে গেছ—ডাকে দিয়েছ পথে হয়ত দেরী হচ্ছে! মনের কোণে আবার অন্যরকম ভাবনা জোমে উঠছে—তুমি আমার কথা ভাবোনা—আমি যে তোমায় ভালবাসি এ সংবাদে তুমি হয়ত বিস্মিত হয়ে যাবে। আমি তোমায় ভালবাসি এ-কথা জান বলেই হয়ত লেখ না—চোখ বুজে আমি স্মৃতির ধ্যান করি—তোমার মুখখানি মনের চোখে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এমন কোরে যখন তোমায় মনে করি,তোমার করুণার কথাই বেশী কোরে অনুভব করি। আমায় তুমি হয়ত দয়া কর না, কিন্তু তা বোলে তোমার প্রাণে দয়ার ত অভাব নেই—যদি মনে করতুম তা হলে তুমি আমায় দরদ করতে কিনা নিজেই দেখতে—তোমায় যে অমন কোরে জানবো এই ছিল আমার আশার অতীত—আমার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী। যুদ্ধের মধ্যে প্রেমের আসন পড়বে এ যে একেবারে অভাবনীয়—সারা-জীবন ধরে আমি এর জন্যে অপেক্ষা করেছি—তার পর স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে যুদ্ধের মধ্যে ছুটে এলুম তোমাকে পেলুম। এ যে ভগবানের দান। এ কথা হয়ত তুমি কোনদিনই জানবে না, আমি কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট।

এই অদ্ভুত রাজ্যে,যেখানে সাহস কর্ত্তব্যের ছদ্মবেশে ঘুরছে, আমরা সব আশা পিছনে রেখে তবে এসেছি। খুব বেশী কোরে আশা করা মানে কাপুরুষতাকে ডেকে আনা—সাহসী হ'তে হ'লে প্রতিদিনের জন্যে যেন বাঁচতে হবে। আগে কি স্বার্থপর ছিলুম! সুখের নানা কল্পনায় ও মত্‌লবে এবং

বারে বিভোর! বলিষ্ঠ জীবন যাপন করবো—এই হবো—এত করবো—হাতের মুঠোয় জগৎকে ধরবো!

ভবিষ্যতে চল্লিশ বছরের মত নানা রকমের মত্‌লব ঠিক কোরে ফেলেছিলুম—মনে হয়েছিল যে অনেক পুরুষ-পরম্পরা মানুষের ভাগ্য আমার কাজের উপর নির্ভর করছে। তার পরই এই যুদ্ধের আবির্ভাব। কোন কালে যে যুদ্ধ করতে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কোন লোককে আমি হত্যা করতে পারি, এ যে চিন্তার অতীত ছিল—শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আমি একটা বিভীষিকা দেখতুম। উচ্চাশা ও ব্যক্তিত্ব ডুবিয়ে—যা শিক্ষা পেয়েছি তা দূরে ফেলে এমন পথ নিতে হবে যা নিজের কাছেও ভারি বিশ্রী। এমন অবস্থায় নিজেকে আনতে হবে, যাতে নিজের শক্তি পঙ্গু হয়ে যায় এবং অচিরে মরবার জন্যে সব সময়ে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে!—

তোমার সম্বন্ধে কোন আশাই আমি বুকের মধ্যে পুষ্‌বো না। তাহলে খুব দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আমার জীবনে তোমার ক্ষণেকের আবির্ভাবই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর একবার যদি চিরকালের মত তোমাকে দেখতে পেতুম—মনে মনে আমার গোপন মনোবেদনা জানাতে পারতুম—আমার সাহস আরও বেড়ে যেতো! তোমায় আর কিছু লিখব না মনে করছি। নির্জ্জনতার মধ্যে বসে এই সব চিঠি লিখে লিখে জমিয়ে রাখা আমার একটা কেমন সখ হয়ে উঠছে, যার পরিণাম আদৌ শুভ নয়। এতে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দাম অসম্ভব রকম বেড়ে যাচ্ছে। আমি আজ বুঝতে পারছি, কত মধুর কত গৌরবান্বিত করা যায় এই জীবনকে। যদি আজই এই জীবনকে বিদায়-সম্ভাষণ দিতে হয়, তা হলে আমার মনে শান্তি আসে। বিদায়ের ক্ষণে তুমি মাথা না ফিরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে গিয়েছিলে, ঐ-রকম কোরে জীবন থেকে বিদায় নিতে আমার ভারী সাধ হচ্ছে।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

দুখের কবি

দুখের মাঝে আঁধার রাতে প্রাণ
গুপ্ত সুখে হর্ষে তোলে তান।
বর্ষা যথা ধরার বুকে সুখ
দুঃখ আসে তেম্নি ভরে' বুক।
দুঃখ যেন কূল-ছাপানো বান—
তার আবেগে কাব্য রচি গান।

দুঃখে যবে কেবল হানে বাজ
হৃষ্ট হিয়া ক্ষিপ্র লহে কাজ;
নিবিড় ব্যথা সরস হয়ে যায়—
বক্ষ টুটে' কাব্য-সুধা ধায়।
কাব্য মোরি দুঃখ-সেঁচা ধন,
দুঃখ সাথে তৃপ্তি ঢালে মন।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতের বাহিরে ভারতীয় শিল্পকলা

ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ, লায়োস প্রভৃতি ভারতের পূর্ব্ব প্রদেশ-সমূহে এবং বিশেষভাবে যবদ্বীপে যে উচ্চ অঙ্গের শিল্পকলা ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ক্রমশঃ উন্নত ও পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার উৎপত্তি-স্থান এই ভারতবর্ষ। উক্ত উপভারতীয় কলার অধিকাংশই বৌদ্ধ যুগের শিল্প এবং তন্মধ্যে যবদ্বীপের কলা-প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রধান। খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথম যুগে ব্রাহ্মণানুশাসিত হিন্দুর দ্বারাই যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপিত হয়, কিন্তু অল্পদিন পরেই তথায় অধিকাংশস্থলেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান বিজয়কাল পর্য্যন্ত তথায় পরস্পরের প্রতিবেশী-রূপে বিদ্যমান ছিল।

বড়বুদ্ধের স্তূপই যবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম বৌদ্ধ শিল্প-কীর্ত্তি। এই মন্দিরের প্রদক্ষিণ-মঞ্চ প্রায় দুই সহস্র ভিত্তি-গাত্রোৎকীর্ণ চিত্রে পরিশোভিত। চিত্রগুলি সমস্তই ধারাবাহিক—এবং ললিত-বিস্তর, দিব্যাবদান ও জাতকোল্লিখিত বুদ্ধের জীবনী ও চরিত্র-বিষয়ক বিবিধ কাহিনী সম্বলিত। প্রত্যেক প্রাচীরোৎকীর্ণ চিত্র এত বৃহৎ যে, সবগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে প্রায় দুই মাইলের উপর বিস্তৃত হইতে পারে।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে পশ্চিমাঞ্চল হইতে চীনে একটি সুবর্ণ প্রতিমূর্ত্তি আনীত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিটিও সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের। পার্থিয়া হইতে একদল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকও ঐ শতাব্দীতেই চীনে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু

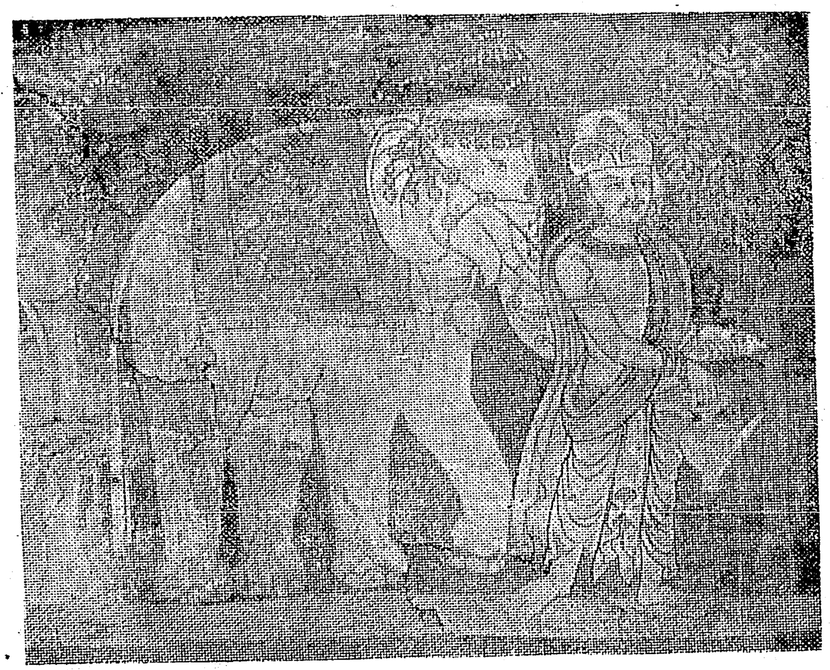

রাজপুত্র বুদ্ধদেবকে ঐরাবত উপহার দিতেছেন। মিরান (চীন-তুর্কীস্থান) হইতে প্রাপ্ত।

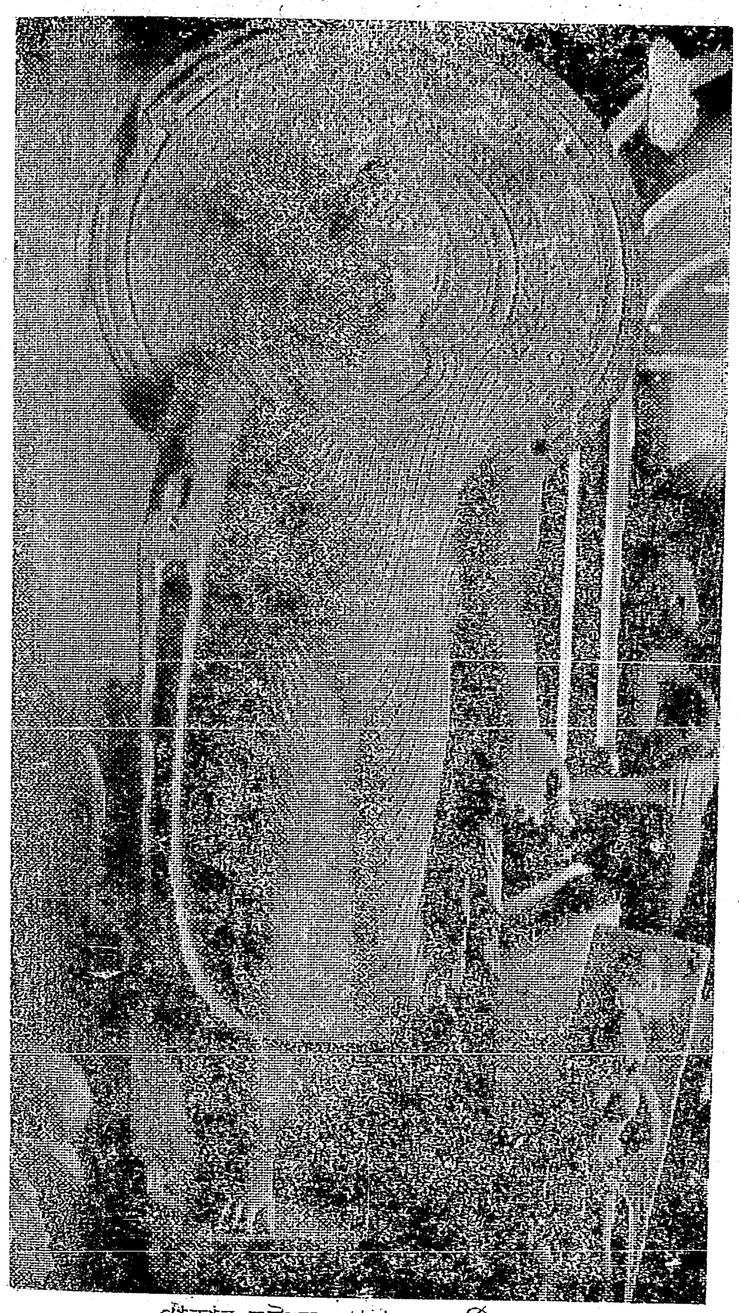

গান্ধার হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধ-মূর্ত্তি।

বৌদ্ধধর্ম্ম উহার অব্যবহিত কালেই তথায়—সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালের ন্যায় চীনেরা তখনও কতক কন্‌ফিউশিয়াসের অনুবর্ত্তী, কতক তায়ও মতাবলম্বী এবং কতক বৌদ্ধ সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল। পশ্চিম এসিয়া হইতে চীনে প্রথম বৌদ্ধ প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল বলিয়া স্বভাবতই চীন-বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রথম অবস্থাটায় কিছু কিছু গান্ধারের গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পের সংশ্রব পরিদৃষ্ট হয়,—কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বের কোনও কলা-চিহ্ন এখন আর বর্ত্তমান নাই, এবং সে সময়ে শিল্পের গ্রীক-রোমক প্রকৃতিটুকুও প্রায় বিরল হইয়া আসিয়াছিল। যদি বা কোথাও যৎকিঞ্চিৎ দেখা যাইত, তবে সে হয়ত শিল্প-সংক্রান্ত কোন গঠন-পদ্ধতি বা সূক্ষ্ম কারু-কার্য্যের মধ্যে।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম-ভাগে উত্তর উয়েই (wei) বংশের শাসন-কালে চীন-দেশে শিল্প-চর্চ্চার একটা প্রবল উৎসাহ দেখা দিয়াছিল। তালঙের পর্ব্বত ও গিরি-গুহাগুলিতে অতি ক্ষুদ্রতম হইতে বিরাটকায় পর্য্যন্ত নানা আকারের অসংখ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল; উহাই চীন-বৌদ্ধ শিল্পের আদিম নিদর্শন-স্বরূপ। কোরিয়াতে ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য শিল্পের প্রভূত উন্নতি ও বিস্তার ঘটিয়াছিল। চীনদেশের ন্যায় সেখানেও অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত এবং লোক-লোচনের



বোধিসত্ত্বকে নর্ত্তকীদ্বয় মালা পরাইতেছেন। মিরান হইতে প্রাপ্ত।

অন্তরালে অবস্থিত, অবিকৃত স্বভাব-সম্পন্ন শৈলরাজি হইতে ঐ সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

ভারতে যেরূপ অজন্তা গুহা, সেইরূপ পূর্ব্বাঞ্চলে আরও অন্যান্য বৌদ্ধ শিল্প এমনই স্বভাবশোভাময় মন-মুগ্ধকর দৃশ্যাবলীর মধ্যে বিরাজিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ এবং সুদূর পবিত্র স্থানে তীর্থের প্রতিষ্ঠান না থাকিলে পরবর্ত্তী কালের জাপানী নিসর্গ-চিত্র,—যাহা শিল্প-জগতে অপূর্ব্ব মহিমা বিকীর্ণ করিয়াছে, তাহার মূল উৎস কোথায় তাহা অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করা দুরূহ হইয়া উঠিত।

কোরিয়া হইতেই বৌদ্ধ দর্শন ও শিক্ষা পরে জাপানে প্রসারিত হইয়াছিল। প্রথিত-যশা নৃপতি উয়িমায়াদ উহার প্রবর্ত্তক। ইনিই জাপানী অনুশাসনের সুপ্রসিদ্ধ সপ্তদশ বিধি রচনা করিয়াছিলেন এবং নাগার্জ্জুনের উপদেশ-সম্বলিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সূত্রের সুবিখ্যাত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শিল্প কলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া ইনি অদ্যাপি শিল্পী ও কারিকরগণের পূজা পাইয়া থাকেন। জাপানী বৌদ্ধ শিল্পকলার মধ্যে আমরা যে বিশুদ্ধ গভীর অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই, কেবলমাত্র প্রবলতম ধর্ম্মপ্রাণতা হইতেই তাহার উদ্ভব হওয়া সম্ভব। ভারতের ন্যায় চীন ও জাপানেও শিল্পের ভিতর দিয়া চিন্তা ও কল্পনার ধারা ঈষৎ ভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আদিম যুগের সেই সাঙ্কেতিক চিত্রের জড় সংগঠন ক্রমশ উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়া জীবনের ক্ষুদ্রতম তত্ত্বের বিশুদ্ধ পরিচয় পর্য্যন্ত প্রতিফলিত করিয়াছে। মিঃ বিনিয়ন তাঁহার একটি সুলিখিত প্রবন্ধের একস্থানে দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় চিন্তার ধারার প্রভাব চীন ও জাপানের ললিতকলার আদর্শকে কি-ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। তিনি বলেন—"চীন ও জাপানের শিল্প বৌদ্ধ আদর্শে অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধ মতে এ জগৎ অনিত্য ও পাপ-তাপে পরিপূর্ণ; এ শরীর কু-বাসনার বোঝামাত্র; স্বার্থজ্ঞান শৃঙ্খল-স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত সকল দেশের প্রাচীন শিল্প-কলার মধ্যে এই ভাবটুকু যদিও জীবনের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মানবোচিত সদ্ব্যবহার প্রভৃতি কর্ত্তব্যের ভিতরই পর্য্যবসিত,—এবং মানব-জাতির ভিতরের সেই সনাতন পুরুষ যদিও মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দুঃসাহসিক বীরত্বের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তথাপি





টুন-হুয়াং (চীন-তুর্কীস্থান) হইতে প্রাপ্ত বহু পুরাতন বৌদ্ধ-পতাকা ; মধ্যে বোধিসত্ত্বদিগের মূর্ত্তি

ভারতীয় আদর্শের ভক্ত সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—কর্ম্মের কোলাহলের অপেক্ষা ধ্যানের সৌন্দর্য্য সকলের চিরন্তনের মনোনীত মূল প্রসঙ্গ।"

চীন-তুর্কীস্থান ও চীনের কান্‌সু প্রদেশের সীমান্ত-সংলগ্ন ভূমিতে যে বৌদ্ধ শিল্পের অস্তিত্ব রহিয়াছে তৎপ্রতি ফরাসী, জর্ম্মানী, ইংলণ্ড ও সুইডেন প্রভৃতি প্রদেশের য়ুরোপীয়

যাত্রীরা সম্প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ঐ দেশের দক্ষিণেও প্রথমে গান্ধার-শিল্প ও পরে ভারতীয় মধ্যযুগের ললিতকলা প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে। অর্থাৎ মূর্ত্তিগুলি পাষাণে উৎকীর্ণ না হইয়া মৃৎপিণ্ডের সাহায্যে গঠিত হইয়াছিল; কারণ সেখানে ভাস্কর্য্য-শিল্পের উপযোগী পাষাণ-ফলকের অভাবে শিল্পীরা মৃত্তিকা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। খোটান হইতে আরম্ভ করিয়া আরও উত্তর-পশ্চিমে কাশগড়ের মরুদ্বীপ উত্তীর্ণ হইয়া মরালবাসির উত্তর-পূর্ব্বে তামচুক্ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ শিল্প প্রসারিত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানে বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল চিত্রের বিষয় ও অঙ্কন-পদ্ধতিও ভারতীয়, সামান্য মাত্র চীন ও ইরাণী প্রভাব সংমিশ্রিত আছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পর্য্যটক সার্ অরেল্ ষ্টীন্ কুচার পূর্ব্বাঞ্চলে লবণোর হ্রদের জলাপ্রদেশে আরও অনেক প্রাচীর-চিত্রের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল চিত্রে অসাধারণ কলা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় এবং উহার শিল্পভঙ্গীটি গ্রীক-কলা-পদ্ধতির অতি নিকট-সম্পর্কীয় বলিয়া মনে হয়। পরিশেষে তুর্কিস্থানের বহিঃ-সীমান্ত-সন্নিকটস্থ তুণ্ডহুঙের সহস্র বুদ্ধের কন্দরে ষষ্ঠশতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া দশম শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত বৌদ্ধ শিল্পের একাধিক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে ভারতীয়, চীন, পারস্য ও তিব্বতীয় কলা-পদ্ধতির অদ্ভুত সংমিশ্রণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঢেউ

আঁধার আলোয় ঐ যে চলে, ঐ যে ভাঙা ঢেউ
ধরতে পারে কেউ?
ঐ যে তাদের একটুখানি
ব্যাকুলতায় কাণাকানি
চুপি চুপি শুনতে পাওয়া যায়,
কে আছে রে ঐ তাহাদের ফিরিয়ে নিতে চায়?

আলো-কালোর স্রোতের টানা টানছে,—এবার তবে
ওমনি করেই চলতে মোদের হবে।
ঐ যে টানা অবিরত টেনেই শুধু চলে
তীর বিনে সেই অকূল কালো জলে,
কখন্ কোথায় পাবে নূতন ঠাঁই
যেথায় ঢেউয়ের কান্না, হাসি, চলা,—কিছুই নাই।
ব্যাকুল হয়ে ধরতে পারে কেউ
ঐ জীবনের ঢেউ?

শ্রীঅরুণকান্তি বাগচী।

আঁধি

৩

রাত্রের সেই অত জল-ঝড়ের ব্যাপারটাকে দুঃস্বপ্নের মত উড়াইয়া দিয়া প্রভাতের প্রথম আলো যখন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল, তখন ভিতর হইতে দ্বার-নাড়ার শব্দে বাহিরে সুষমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভিতর হইতে নিখিল অতি মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "মা—" পিঞ্জরা-বদ্ধ শাবককে দেখিয়া পক্ষী-মাতা যেমন বাহিরে পিঞ্জরের গায়ে নিষ্ফল আবেগে শুধু চঞ্চু আঘাত করিয়া আরো-নিরাশায় জর্জ্জরিত হয়, সুষমার মনটাও এই একান্ত অসহায় নিরুপায়তার মধ্যে তেমনি দ্বার-প্রান্তে মিথ্যা মাথা কুটিয়া মরিতে লাগিল। স্বামীকে সে ভালো করিয়াই জানে—দয়া করিয়া নিখিলের মুখে 'মা'-ডাকটুকু শুনিবার অধিকারই শুধু দিয়াছেন—নহিলে কোন্ মা ছেলের উপর এমন সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারে! অভয়াশঙ্করের কড়া আইন কোনমতেই এতটুকু টলিবার নয়—কাজেই এই নেহাৎ-অল্প পাইয়াই নিখিল ও সুষমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। সে শাসন-যন্ত্রের কাছে ক্ষুদ্র একটা নালিশ বা মিনতি তুলিবার সামর্থ্য তাহাদের কাহারো ছিল না।

তবু আজ এই অসহ্য নির্য্যাতনে সুষমার ভীরু প্রাণ একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। যা হইবার হইবে, আর না—ভাবিয়া ভবিষ্যতের পানে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হইয়াই ছুটিয়া সে স্বামীর কাছে চলিল—ভাবিল, তাঁহার পায়ে পড়িয়া ভিক্ষা চাহিবে,—ওগো, সারা রাত্রিটা কাটিয়া গেল ত—যথেষ্ট হইয়াছে—এবার বাছাকে মুক্তি দাও।

ভিতরে দ্বারের ফাটলে চোখ রাখিয়া নিখিল আবার তেমনি মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, —মা—

—এই যে বাবা, সারা রাত আমি এখানে এই তোমারই কাছে ত রয়েছি ধন। যাই, ওঁকে ডেকে এনে দরজা খুলিয়ে দি। তুমি আর একটু চুপ করে থাকো, বাবা।

সুষমা উঠিয়া স্বামীর কাছে গেল। ঘরের দ্বার খোলা ছিল। খাটের মশারি তোলা। অভয়াশঙ্কর খাটে বসিয়া সাম্‌নের খোলা জানালা দিয়া বাহিরে কোথায় কোন্ সীমাহীন সুদূর আকাশের পানে আপনার উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিলেন। সুষমা যতখানি সাহস লইয়া আসিয়াছিল, ঘরের মধ্যে পা দিতে তাহার অনেকখানি যে কোথায় উবিয়া গেল, সে তাহা জানিতেও পরিল না। সুষমা আসিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর শয্যা-প্রান্তে বসিল। স্বামীর পায়ের নখের উপর অতি সন্তর্পণে আপনার হাতটি রাখিয়া নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। অভয়াশঙ্কর হঠাৎ চোখ তুলিয়া বলিলেন,—এ কি, তুমি যে হঠাৎ এখানে, এমন সময়? রাত্রে ঐ ঘরের দোরেই পড়ে ছিলে, বুঝি?

—হাঁ। অতি মৃদুস্বরে কম্পিতভাষে সুষমা শুধু বলিল—হাঁ।

অভয়াশঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন,

পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—এত বড় বেয়াদবি ওর কাছে আমি মোটেই প্রত্যাশা করি নি। ঠিক শাস্তিই দিয়েচি।

সুষমার অন্তরের মধ্যে যে নারীত্ব, যে মাতৃত্ব অপূর্ব্ব দীপ্ত মহিমায় আসন পাতিয়া বসিয়াছিল, মুহূর্ত্তে সে জাগিয়া উঠিল—জাগিয়া নির্ভয় মুক্ত কণ্ঠে বলিল—কিন্তু ছেলেটা যে মরতে বসেছে! যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে গো, সারা রাত একলাটি বন্ধ ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা—এবার ওকে খুলে দাও।

—ও কিছু বলেছে?

—কি আর বলবে! যতক্ষণ জেগেছিল, কেবলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। দোরের এ-পাশ থেকে শুধু তার কান্নাই শুনেছি! তার সে চাপা কান্নায় আমার প্রাণ একেবারে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে। অথচ, কিছু করবার উপায় নেই, অধিকারও নেই আমার। জানিনা, কি দিয়ে ভগবান তোমার প্রাণটাকে গড়েছিলেন! এতও তুমি পারো! তবু ও তোমার নিজের ছেলে,—আর আমি ওকে পেটে ধরিনি!

—সুষমা—অভয়াশঙ্করের স্বরে একটা তীব্র সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

সুষমা বলিল,—তোমার কাছে বলেই বল্‌চি। দেখতে পাচ্ছ কি, ছেলেটা দিন-দিন কি-রকম শুকিয়ে যাচ্ছে! রাত-দিন ও কি-সব ভাবে, বোধ হয়! ও যখন আমায় মা বলেই জানে, তখন আমার বুক থেকে অমন নিষ্ঠুরভাবে ওকে ছিনিয়ে নিয়ো না। তোমার ছেলে, ও তোমারই থাকবে—তবু যদি আমায় মা বলে ডাকে, একটু স্নেহের কাঙাল হয়ে যদি দুটো আব্দার জানাতে আসে ত আমায় সে স্নেহটুকু দিতে দিয়ো গো—সে আব্দারটুকু ওর যেন আমি রাখতে পারি—এইটুকু শুধু দয়া করো, এইটুকু ভিক্ষে দিয়ো। এটুকুর জন্যে তোমার সংসারে যদি সকলের নীচেও আমাকে থাকতে হয়, আমায় সবার অবজ্ঞা সইতে হয়, তাও আমি হাসি-মুখে সইতে পারব।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমার মনে আছে, সুষমা—তোমার সঙ্গে আমার কি কথা ছিল?

—মনে আছে। ছেলে শুধু মা বলে আমায় ডাকবে, আর আমি তার মা না হয়েও মা সেজে তাকে ভুলিয়ে রাখব। বুঝব যে, না, সে মাতৃহীন হয় নি। এ-ছাড়া ছেলের উপর আমার কোন অধিকার থাকবে না! তুমি ত জানো, এই পাঁচ বছর আমি নিখিলকে বুকে পেয়েচি, কখনো তোমার টানা গণ্ডীর বাহিরে যেতে দেখেচ তুমি আমাকে? সে অধিকারের সীমা আমি কোনদিন কি লঙ্ঘন করেচি? না। বুক আমার মমতার তৃষ্ণায় শুকিয়ে হা-হা করেচে, প্রাণ স্নেহের তাড়নায় খাঁ-খাঁ করেচে, তবু আমি জোর করে সে তৃষ্ণা মেটাতে যাইনি! আজ বড় অসহ্য বোধ হয়েচে, তাই বলচি—তাই এই মিনতি জানাতে এসেচি। দেখ আমি নারী হলেও আমার মনটাকে একেবারে ছেঁটে ফেলতে পারিনি—এ মনে স্নেহ-ভালবাসা এখনো অগাধ অজস্র হয়ে ফুটে রয়েছে,—সেটার পানে চেয়ে একটু অধিকার আমায় দাও, শুধু ছেলেকে ছেলে বলে বুকে নেবার অধিকারটুকু!

—হুঁ—বলিয়া একটা বড় নিশ্বাস ফেলি

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—তুমি চাও, নিখিলকে এখন ছুটি দেব? কেমন—?

হাঁ।

—বেশ। চল, যাচ্ছি।

অভয়াশঙ্কর শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। সুষমা তাঁহার পায়ে হাত দিয়া বলিল,—ওগো, ঘরের চাবিটা আমার হাতে দাও,—আমি মা, আমি তাকে কোলে করে তুলে এখানে তোমার কাছে নিয়ে আসি।

মুখটা একটু বিকৃত করিয়া অভয়াশঙ্কর বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া সুষমার পায়ের কাছে মেঝের উপর ফেলিয়া দিলেন। সুষমা চাবি লইয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বার খুলিতে নিখিলের যে-মূর্ত্তি সুষমার চোখে পড়িল, তাহাতে সে চমকিয়া উঠিল! গালদুটি শীর্ণ পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে! অমন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ,কে যেন দুই হাতে ঘন করিয়া তাহাতে কালি মাখাইয়া দিয়াছে! আহা, বাছারে!

—মা—বলিয়া নিখিল সুষমার বুকে মুখ ঢাকিল—সারা রাত্রির একটা ক্ষুব্ধ অভিমান কান্নার শতধারে মুহূর্ত্তে অমনি ফাটিয়া পড়িল। সুষমাও চোখের জল সামলাইতে পারিল না। তার পর আঁচলে নিখিলের দুই চোখ মুছাইয়া গাঢ় স্বরে সুষমা বলিল,—ছি, বাবা আমার, সোনা আমার, লক্ষ্মীধনটি, আর কেঁদো না। চল, ওঁর কাছে চল। ওঁকে বলবে চল, আর কখনো অমন দুর্য্যোগে বাড়ীর বাহিরে থেকে ওঁকে ভাবাবে না! উনি বড্ড ভাবছিলেন কি না—বাবা, ঐ জলে-ঝড়ে সোনার ছেলে কোথায় পড়ে রইল—কত বিপদ হতে পারে—তাই উনি রাগ করেছিলেন।

করুণ স্বরে অভিমানের তীব্র বেদনা মিশাইয়া নিখিল বলিল,—কিন্তু আমি ত ইচ্ছে করে ছিলুম না মা। সেই জলে-ঝড়ে অন্ধকার পথে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, ভিজে কাঁপছিলুম,—চলতে পারছিলুম না আমি, তাই একটু ওদের বাড়ী দাঁড়িয়ে ছিলুম। তার পর একটু থামিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া আবার সে বলিল,—আমারও সারাক্ষণ কি ভয় হচ্ছিল না? কেবলি ভাবছিলুম, কখন বৃষ্টি থামবে, কখন বাড়ী যাব। মা-কালীকে কেবলি ডাকছিলুম—তারপর যেই বৃষ্টি থামল, অমনি তাদের সেই বনমালীকে নিয়ে চলে এসেচি।

নিখিলের দুই চোখ দিয়া হু-হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। পরম স্নেহে তাহার অশ্রু-ভরা চোখদুইটি আবার মুছাইয়া দিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিয়া সুষমা বলিল,—ওঁরও মন খুব খারাপ হয়ে আছে—চোখ ফুলে রয়েছে—সারা-রাত উনিও ঘুমুতে পারেন নি। কেঁদেছেনও কত! ও ঘরে বসে আছেন, তোমাকে ডাকচেন, এসো বাবা—

চলি-চলি করিয়া নিখিলের পা যেন কিছুতেই আর চলিতে চাহিতেছিল না। স্নেহ-হীন কঠিন পিতার সম্মুখে আবার এই সকালে না জানি আরো কত ভৎর্সনা মিলিবে!

সুষমা তাহাকে বাহুর আশ্রয়ে লইয়া এক-রকম বুকে করিয়াই স্বামীর ঘরে আনিল। অভয়াশঙ্কর তখন খোলা জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভিজা গাছের ডালে দুইটা কাক তখনো কেমন নিঝুমভাবে বসিয়া আছে। চারিধারে প্রভাতের স্নিগ্ধ সোনালি আলো ছিটাইয়া পড়িয়াছে, তবুও কালিকার

সেই দুর্য্যোগের অত-বড় নিরানন্দ ভাবটা সে-আলোয় যেন একেবারে কাটিয়া যায় নাই!

সুষমা নিখিলকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া বলিল,—এই নিখিল এসেছে। তুমি ওকে একটু আদর করে মুখ ধুয়ে নিতে বল ত গা। আমি ওর জন্যে খাবার নিয়ে আসি।

অভয়াশঙ্কর ফিরিয়া পুত্রকে ডাকিলেন—নিখিল—

নিখিল মুখ তুলিয়া চাহিল। অভয়াশঙ্কর কোনরূপ ভূমিকা না ফাঁদিয়াই বলিলেন,—কাল তুমি খুব অন্যায় করেছিলে। আর কখনো যেন অমন না হয়। সাবধান! যাও, মুখ ধুয়ে খাবার খাও গে! খেয়ে পড়তে বসবে।

নিখিল যেন আরাম পাইয়া বাঁচিল। পিতার কাছে আর ভৎর্সনা মিলিল না,—অন্ততঃ একটু কঠিন সুরও—এ যে সে একেবারে কল্পনাও করিতে পারে নাই। মার উপর কৃতজ্ঞতায় মন তাহার ভরিয়া উঠিল।

পিতার কাছ হইতে সরিয়া বাহিরে নীচে নামিয়া সে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল এবং মার বুকে মুখ রাখিয়া বারবার উচ্ছ্বসিত মৃদু কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—মা, মা, মাগো আমার।

৪

সাত বৎসর পূর্ব্বে অভয়াশঙ্করের যখন পত্নী-বিয়োগ ঘটে, তখন নিখিলের বয়স সাড়ে তিন বৎসর। অভয়াশঙ্করের রিপু কয়টার প্রতাপ চিরদিনই দুর্জ্জয় রকমের—শুধু এই পত্নী লীলাই তাঁহার সেই দুর্জ্জয় রিপু কয়টাকে কোনমতে স্ববশে রাখিয়া ছিল। পত্নী লীলার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ এবং স্বভাবটুকুও অত্যন্ত কোমল—লীলার হাতে অভয়াশঙ্কর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন এবং নির্ভর করিয়া কোনদিনই তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। এই জন্যই ক্রমে লীলার হাতে অভয়াশঙ্কর আপনার অস্তিত্বটুকুকে বিসর্জ্জন দিয়া এমন হইয়া বসিয়াছিলেন যে সর্ব্ব-কর্ম্মে লীলার হাত লীলার পরামর্শ না হইলে তাঁহার সমস্ত কাজই অকাজ হইয়া দাঁড়াইত।

এই পত্নীকে অকস্মাৎ হারাইয়া তাঁহার জীবনটা চক্রহীন রথের ন্যায় একেবারে মন্থর অচল হইয়া পড়িল। অথচ এরূপ জড়-পদার্থের মত পড়িয়া থাকিলেও চলে না! ঐ যে শিশুটি মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত হইয়া সংসারের কঠিন ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে সেই কঠিন ভূমিশয্যা হইতে তুলিয়া ধরিতে হইবে—তাহাকে মানুষ করিয়া তোলায় একটা গুরু রকমের দায়িত্ব আছে—নহিলে অভয়াশঙ্করের পুত্র যে কালে বওয়াটে বখা হইয়া সমাজে বিচরণ করিয়া তাঁহার নাম ডুবাইয়া দিবে, এই আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়ে অহর্নিশি কাঁটার ন্যায় খচ্‌খচ্ করিতে লাগিল। অথচ সংসারে কোন আকর্ষণ বা স্পৃহা নাই - আঁটিয়া বাঁধিবার মত শক্তিও হারাইয়া বসিয়াছেন। অনুগত আত্মীয়-জনের প্রাণহীন সেবা-পরিচর্য্যায় প্রাণটাকে কোনমতে বাঁচাইয়া রাখা গেলেও সে ঐ খাইয়া পরিয়া পঙ্গুর মতই পড়িয়া থাকে মাত্র। তাহার স্নায়ুগুলা যে বিকল হইয়া গিয়াছে, আপনা হইতে নড়িবার বল যে পায় না—হাত দিলে চলে, নহিলে অচল অক্ষম হইয়া যায়—তাঁহারও জীবনটা ঠিক এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিখিলও

বাড়ীর চাকর-বাকর ও অনুগত জ্ঞাতি-কুটুম্বিনীদের হাতে-হাতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে মাত্র—সম্পূর্ণ কেন্দ্রহীন লক্ষ্যহীন হইয়াই তাহার ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে—সে ভবিষ্যৎ দাসী-চাকরের কচ্‌কচি ও সনাতন উপদেশ-বাক্যের একটা জড়স্তূপ মাত্র—বর্ত্তমানের সহিত বা প্রাণের সহিত তাহার কোন যোগ নাই—এ যেন নিতান্তই খাপছাড়া এলোমেলো ধরণের একটা রূঢ় ভবিষ্যৎ! কোনদিন ইহাদের মনোযোগের মাত্রা বেশী হইল ত দিনে অমন সাতবার সাতজনে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া খাওয়াইয়া দিল, যত্ন করিল, আবার যেদিন একজনের মনোযোগ একটু শিথিল হইল ত সেদিন সকলেই সে শিথিলতায় গা ঢালিয়া দিল। নিখিলের ভাগ্যে সেদিন আর কিছুই মিলিল না- কাঁদিয়া-কাটিয়া বিপর্য্যয় রকমের গণ্ডগোল তুলিয়া সে বাড়ী-শুদ্ধ সকলকে বিব্রত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

এমনই গতিক দেখিয়া একদিন রাগের ঝোঁকে ছেলেকে তাহার দিদিমার কোলে ফেলিয়া দিয়া অভয়াশঙ্কর পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রথমেই গেলেন, কাশী। সাধু-সন্ন্যাসী-দের দিকে কোনদিনই তাঁহার ঝোঁক ছিল না, তাই কাশীতে সে ধারটায় তিনি মোটেই ঘেঁস দিলেন না। দুই-চারিজন পরিচিত বন্ধু-বান্ধব আসিয়া সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া বৃথা শোকে কাতর হইতে নিষেধ করিল। কেহ পরামর্শ দিল—একটা মস্ত যজ্ঞ যখন কাটিয়াছে, তখন ছেলের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া বাকী সময়টুকু ধর্ম্মে উৎসর্গ করিয়া দাও—অর্থাৎ সাধুদের জন্য আশ্রম খুলিয়া মঠ তুলিয়া আর্ত্তের সেবার ভার লইলে পরকালে চরম শান্তি-সুখ-ভোগের অধিকারী হইবে। এমনি নানা উপদেশের মধ্যে তিনি যখন তাঁহার জমিদারী ও অর্থরাশিকে নিজেদের কাজে খাটাইয়া লইবার পক্ষে ঐ-স বন্ধুদের অদম্য রকমের উৎসাহ দেখিতে পাইলেন, তখন কাশী ছাড়িয়া একেবারে আসিলেন, লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া বড় বড় পথ-ঘাট, ধূলি ও লোকের জঞ্জাল এবং মসজিদ মিনার প্রভৃতির ভিড়ে ভারী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, লক্ষ্ণৌ আর ভালো লাগিল না—অমনি ছুটিলেন, প্রয়াগে। এমনি করিয়া একবৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া মন যখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন শ্বশুরবাড়ী হইতে এক টেলিগ্রাম গিয়া উপস্থিত, খোকার খুব অসুখ।

হায়রে, এত ঘুরিয়াও সংসারের মায়া, কৈ, ঘুচিল না ত! ঘুচাইতে চায় কে? এমন সুন্দর পৃথিবী—ঐ চাঁদ, এই স্নিগ্ধ বাতাস, ঐ স্বচ্ছ নীল আকাশ,এই লোক-জন—ইহাদের ছাড়িয়া কোমরে গেরুয়া জড়াইয়া কোথায় কোন্ অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে দুর্লভ মনুষ্য-জন্মটাকে খোয়াইয়া একেবারে জড়স্তূপে পরিণত করিয়া তুলিবেন! তা-ছাড়া নিখিল? সে বেচারা একেই ত মাকে হারাইয়াছে, আপনার বলিয়া কাহার মুখের পানে সে চাহিবে? যখন বড় হইয়া সে দেখিবে, তাহার খেলার সঙ্গীরা বেদনা পাইয়া, দুঃখ পাইয়া, কলহ করিয়া মায়ের কোলে চলিয়াছে—জুড়াইবার জন্য,—তখন সে তার করুণ চোখদুটি মেলিয়া কাহার কোল খুঁজিবে? বাপ! সেই বাপ এত দূরে! না,—অসম্ভব!

তল্পী গুটাইয়া অভয়াশঙ্কর দেশে ফিরিলেন।

নিখিল সারিলে শাশুড়ী বলিলেন,—খোকাকে আমার কাছেই রাখো, বাবা। তবু ওকে দেখলে আমার বুক একটু জুড়োয়।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—ওকে ছেড়ে আমি একলা থাকব কি করে?

শাশুড়ী বলিলেন—আমার কাছেই তুমি যদি থাকো, বাবা—

—না।

সে কি হয়! অভয়াশঙ্করের কত বড় নাম—বংশের ইজ্জৎ কতখানি! ছেলে মামার বাড়ী থাকিয়া তাহাদের প্রথা মানিয়া বড় হইবে, মামার বাড়ীর চাল-চলনেই অভ্যস্ত হইবে, আর পিতৃ-বংশের কথা কিছুই সে জানিবে না—এত বড় আশঙ্কা যেখানে, সেখানে কি ছেলেকে রাখিয়া মানুষ করা চলে? না।

নিজেরও কিন্তু চারিদিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া চালাইবার মত শক্তি নাই! এইটুকু ছেলের প্রত্যেক খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিয়া পুরুষের পক্ষে চলা—সেও যে এক অসম্ভব ব্যাপার! সে ধৈর্য্যই বা কৈ! তাঁহাকেও ত কিছু একটা কাজ লইয়া থাকিতে হইবে! অভয়াশঙ্কর একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু শুধু বসিয়া চিন্তা করিলেও চলিবে না ত! তাই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া নিখিলকে লইয়া নিজের গৃহে ফিরিলেন।

সেই পরিচিত ঘর,—প্রেমের অজস্র স্মৃতি-ভরা সেই সহস্র সুখের লীলা-কুঞ্জ! এতদিনের অনুপস্থিতিতে এই ঘরের প্রত্যেক ইটখানা অবধি যেন সেই স্মৃতির সৌরভে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। দাসী-চাকর অনুগত আত্মীয়-স্বজন আবার বুক পাতিয়া নিখিলকে বুকে তুলিয়া লইল। তাহার পরিচর্য্যার আবার তেমনি ঘটা পড়িয়া গেল। অভয়াশঙ্কর দেখিলেন,—মস্ত একটা সোর-গোল চলিতেছে! তিনি কি-ভাবে ছেলেকে মানুষ করিতে চান,—তাঁহার ছেলের মনের গতি তাঁহারই অনুরূপ হইবে—তাঁহার রুচি-অরুচি তাঁহার প্রকৃতি ছেলেতে যদি না বর্ত্তাইল, তাহা হইলে যে বংশ-ধারার মস্ত একটা শৃঙ্খল কাটা থাকিয়া যাইবে! কিন্তু এ শৃঙ্খল কি করিয়া অটুট রাখা যায়! এই চিন্তাই অভয়াশঙ্করকে নেশার মত পাইয়া বসিল। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, একটি মাত্র উপায় আছে। পিতার পুত্রের মধ্যে এই শৃঙ্খলের কাজ করে,—স্ত্রী আজ যদি লীলা থাকিত, তাহা হইলে কি আর নিখিলকে লইয়া এত ভাবনা ভাবিতে হয়! নিখিলের চলা-ফেরায়,সকল কাজে লীলা তাহাকে সতর্ক করিয়া দিত—ছি বাবা, ও এটা ভালো বাসেন না, করো না।—এইটে খুব ভালো লাগবে, তুমি করলে।—এই দ্যাখো ওঁর ছেলে-বেলার ছবি—কেমন দেখ্‌চ? এমনি করিয়া বাপের প্রকৃতি-গত প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি ছেলের চোখের সামনে ধরিয়া দিলেই না ছেলে বাপের প্রতিবিম্ব হইয়া দাঁড়াইতে পারে! বাপ কি বইখানি পড়িতে ভালোবাসেন, বাড়ী ফিরিয়া নিখিলের মুখ হইতে কোন্ আচরণ,কিরূপ অভ্যর্থনাটুকু পাইলে আনন্দ পাইবেন, বাপের সঙ্গে সে কি ব্যবহার বলিবে, কোন্ ছড়াটি নূতন শিখিয়া শুনাইবে—এ-সব কথা তেমন করিয়া ছেলেকে বুঝাইবে! ছেলের বাপের প্রতি একটা দুর্দ্দম

আকর্ষণ জন্মিবে,বাপকে সে কায়-মনে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে কি করিয়া? বাপকে ছেলে ভালবাসিতে শিখিবে, ছোট-খাট সেবায় বাপের প্রাণের মধ্যে মণিদীপ জ্বালিয়া দিবে! কাজ-কর্ম্মের সকল শ্রান্তি তবেই না বাপ ছেলের মুখ দেখিয়া ভুলিতে পারিবেন! এমনি করিয়াই ছেলে বংশের মর্য্যাদা শিক্ষা করে, এমনি করিয়াই বংশের চিরন্তন জীবন-তরঙ্গটুকুতে সে নিজের জীবন-তরঙ্গ মিশাইতে পারে।

অভয়াশঙ্কর ভাবিলেন—যদি দেখিয়া শুনিয়া একটি বুদ্ধিমতী তরুণীকে বিবাহ করিয়া তাহারই হাতে ছেলের এই প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পণ করা যায়—! বিবাহ করিলেই কি আর সে লীলার আসন অমনি কাড়িয়া লইতে পারে? অসম্ভব! লীলা—সে যে অন্তরের ধন, অন্তর-ময়ী হইয়া অন্তরেই সে মিশাইয়া রহিয়াছে—সে ত আলাদা স্বতন্ত্র জীব নয়, সে যে এই অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া কায়ে মনে এক হইয়া গিয়াছে—তাহার সহিত যে মিলন, মৃত্যুর কঠিন কুঠারেও তাহা ছিন্ন হইবার নয়—বাহিরের খোলসটা সে ছিঁড়িতে পারে, ভিতরটা তেমনি পরিপূর্ণ আছে, অটুট আছে, এবং চিরদিন তেমনি থাকিবে!

৫

সন্ধান করিয়া পাত্রী মিলিল, সুষমা।

সুষমা লীলারই দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয়-কন্যা। সুষমার পিতার অবস্থা ভালো না হইলেও কল্‌চারের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল বিলক্ষণ। মেয়েটিকেও তাই সর্ব্ব-গুণসমন্বিতা করিয়া তুলিয়া ছিলেন। লেখাপড়ায় সুষমার যেমন মন ছিল, রান্না-বান্না,সেবা-শুশ্রূষা, সংসারের এমনি সহস্র কাজে-কর্ম্মেও তেমনি তাহার অনুরাগ ছিল। রূপে লক্ষ্মী আর গুণে গুণময়ী মেয়ে। সুষমার পিতার মনে এ আশা বিলক্ষণ ছিল, তাঁহার অর্থ নাই বটে, তবে যদি কোন শিক্ষিত ধনীর চোখ থাকে, তবে সে অর্থ ফেলিয়া তাঁহার মেয়েকে শুধু চোখে দেখিয়াই বধূ করিয়া বুকে তুলিয়া লইবে,—এবং লইলে তাহাকে এতটুকু ঠকিতে হইবে না।

সুষমার বয়স যখন তেরো বৎসর—বিবাহের সন্ধান চলিতেছে,—তখন তাহার স্নেহময় পিতা অনেক টাকা দেনা, রুগ্না স্ত্রী ও এই অরক্ষণীয়া মেয়েটীকে রাখিয়া ইহলোকের সহিত সব সম্পর্ক কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। অভয়াশঙ্করের শাশুড়ী সংবাদ পাইয়া সুষমা ও তাহার মাকে আপনার বাড়ীতে আনাইলেন। সুষমার রুগ্না মাতা রুগ্ন দেহে স্বামীর শোক সহিতে পারিলেন না; এবং স্বামীর মৃত্যুর ঠিক চারমাস পরে তিনিও স্বামীর অনুগমন করিলেন। সুষমা অনাথ হইল।

এই সময় শাশুড়ীর অসুখ হইলে অভয়াশঙ্কর তাঁহার অনুরোধে নিখিলকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, এবং শাশুড়ীর কথায় নিখিলকে আনিয়াই লইয়া যাইতে পারিলেন না। নিখিল দিদিমার কাছে রহিল—তাহার দেখা-শুনার ভার লইল সুষমা। মাসি—বলিয়া ডাকিতে শিখাইলেও সে সুষমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া থামিয়া গেল, বাকীটুকু কিছুতেই বলিল না। সুষমা লজ্জায় রাঙা হইয়া নিখিলকে বুকে টানিয়া তাহার মুখে অজস্র চুম্বন বর্ষণ করিল। নিখিল সুষমার একান্ত বশীভূত হইয়া উঠিল।

শাশুড়ী আরোগ্য হইলে অভয়াশঙ্কর নিখিলকে লইতে আসিলেন। নিখিল বাপের কোলের কাছে আসিয়া ডাকিল,—মা। বাবা মাকে তুমি দেখচ?

অভয়াশঙ্কর চাহিয়া দেখেন, ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চাঁদের মত কান্তি লইয়া এক যৌবনোন্মুখী বালিকা। এই সুষমা! অভয়াশঙ্কর সস্মিত দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া বলিলেন—শুনছিলুম, এ না কি তোমার ভারী বশ হয়েছে!

সলজ্জ মৃদু হাসির কণা ঠোঁটে ফুটাইয়া সুষমা বলিল—আমায় খুব ভালবাসে, নিখিল।

—নিখিলকে যদি নিয়ে যাই, তাহলে ওকে ছেড়ে তুমি থাকবে কি করে?

সুষমার মুখখানি নিখিলের অসন্ন বিরহের আশঙ্কায় মলিন হইল। সে কোন কথা বলিল না!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তাহলে তোমার খুব মন কেমন করবে, না?

সুষমা শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—হাঁ।

এমন সময় শাশুড়ী সেইখানে আসিয়া বলিলেন—সুষু, যাও ত মা, অভয়ের জন্যে পাণ সেজে আনো ত। আর ঐ আমার ঘরে টেবিলের উপর জলখাবার রেখে এসেচি—এদের বাপ-বেটার জন্যে, তাও অমনি নিয়ে এসো, মা।

সুষমা চলিয়া গেলে শাশুড়ী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। নিখিল তখন মামার কুকুরের নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশলের কাহিনী বলিতেছিল—অভয়াশঙ্কর অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে ছেলের মুখে মধুর সুরের সে কাহিনী শুনিতেছিলেন। হঠাৎ নিখিল বলিল, দেখবে বাবা,—ঐ কুকুরের গলার জন্যে ঘুঙুর-বাঁধা কেমন ফিতে মা তৈরি করে দেছে! মা কেমন ভালো! আমি যা বলি, মা তাই শোনে, বাবা। বাবা, আমার সঙ্গে মাকেও কিন্তু বাড়ী নিয়ে যেতে হবে, নাহলে আমায় সেখানে খাইয়ে দেবে কে? নাইয়ে দেবে কে? আমি বামুনদির হাতে আর খাব না, যে হলুদের গন্ধ! ভর্ত্তুর কাছেও নাইব না আর, হুঁ—বলিয়া সে কুকুরের গলার ঘুঙুরবাঁধা ফিতা আনিতে ছুটিয়া গেল।

নিখিল বাহিরে গেলে শাশুড়ী বলিলেন—বাবা, তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে।

অভয়াশঙ্করের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—বুঝি, তাঁহারই অন্তরের কথা চোখের দৃষ্টি দিয়া বেফাঁস্ হইয়া গিয়াছে! তিনি বলিলেন,—কি, বলুন?

—বলতে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে বাবা, তবু আমি না বললেই বা কে বলে! তুমি আর একটি বিয়ে কর বাবা—কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই শাশুড়ীর চোখে জল আসিল।

অভয়াশঙ্কর মাথা নীচু করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—তোমার এই বয়স,—তা ছাড়া এই ছেলেটাকেই বা কে দেখে-শোনে, বল। ঝী-চাকরের হাতে কি ছেলে মানুষ হয় কখনো? ছোটলোকের হাতে রাখলে ছেলে পিলের প্রবৃত্তিও ছোট হয়ে যায়! ঐ ছেলের মুখ চেয়েই তোমায় আবার বিয়ে করতে হবে। আমার বরাত—না হলে এ কথাও আমার মুখ দিয়ে বার করতে হল!

আমি জানি, আমি তখন ছোট ছিলুম ত, তবু আমি কাঁদিনি, সত্যি। মার জন্যে আমি কেঁদেচি কি, বাবা? বুজু কাঁদে। তার মা সেদিন তাকে রেখে বুজুর মামার বাড়ী নেমন্তন্ন গেছল, আর বুজুর কি কান্না! বুজু বোকা মেয়ে। মা কোথাও গেলে কাঁদে বুঝি? মা ত আবার আসবে! না দিদিমা?

দিদিমা, অভয়াশঙ্কর, সুষমা,—তিনজনেই নিঃশব্দে নিস্পন্দ বসিয়া। কাহারও মুখে কথা নাই! দেখিয়া নিখিল বলিল—বারে, তোমরা গল্প করবে না? আমি যাই তবে বুজুদের ঘরে। বুজু কি করচে, দেখিগে। তাকে ডেকে আনি, বলিগে,আয় ভাই খেলি। আবার বাবার সঙ্গে চলে গেলে খেলা হবে না ত! বলিয়া সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

শাশুড়ী ডাকিলেন,—সুষু, কাছে আয় ত মা। সুষমা কাছে আসিলে তিনি তার ডান হাতটি ধরিয়া জামাতার কাছে আসিলেন, এবং একান্ত স্নেহে তাঁহার হাতটা তুলিয়া সুষমার হাত সেই হাতে রাখিয়া বলিলেন,—একে নাও বাবা—আমার লীলার বদলে লীলার জায়গায় আজ থেকে একেই বসাও তুমি। সব দিকে তোমার ভালো হবে। আমি মা—প্রাণ খুলে আজ এ আশীর্ব্বাদ করচি। সুষু, নিখিল সত্যিই তোর ছেলে। ওর সব ভার তোর হাতে দিয়ে আমিও এখন নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব। তোরা দু'জনে আমার এ শেষ সাধটুকু পূর্ণ করিস্—এটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত করিস্ নে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

যজ্ঞ-কথা।—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। কলিকাতা, ১৩ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নববিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা দুই আনা। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক যজ্ঞ-সমূহের উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছিলেন,—অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযোগ ও পশুযোগ সোম-যাগ, পুরুষ যজ্ঞ—সেইগুলি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলিতে স্বর্গীয় আচার্য্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় সর্ব্বত্র পাই; প্রবন্ধগুলি জ্ঞান-গম্ভীর হইলেও এগুলির ভাষা এমন সরল, রচনার ভঙ্গী এমন সহজ যে নিতান্ত অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও এ প্রবন্ধপাঠে চমৎকৃত হইবেন, বিষয়গুলি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিচিত্র জগৎ।—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। কলিকাতা, এম্বারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে বিজ্ঞান-বিভায় বাহ্যজগৎ, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ, বাঙ্ময় জগৎ, জড়জগৎ, বৈজ্ঞানিকের আকাশ, প্রাণময় জগৎ, প্রাণের কাহিনী, প্রজ্ঞার জয়, চঞ্চল জগৎ,—এই কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। অনন্য-সাধারণ সরল ভাষায় ও সহজ ভঙ্গীতে বিজ্ঞানের এত বড় বড় কথার আলোচনা পাঠ করিয়া আচার্য্য-প্রবরের চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্য, এবং বুঝাইবার শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শাশুড়ী চোখের জল মুছিলেন—জল মুছিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন—আমি ত তোমায় জামাই বলে দেখিনে, কোনদিন—তুমি আমার পেটের ছেলেই। আমার বলাই যে, তুমিও সে—তা দেখো বাবা, এই যে মেয়েটিকে দেখলে, সুষু—ওর নাম সুষমা—যেমন বুদ্ধি, তেমনি গুণ—আমার লীলারই ছায়া যেন! মনে হয়, আমার সে-ই আবার আমার কাছে সুষমা হয়ে ফিরে এসেচে। মা-বাপ নেই,—সংসারে আপনার বলতে কেউ নেই—ওর মুখের দিকে চাইতে কেউ নেই, আহা! এই মেয়েটির সব ভার এখন আমারই উপর। আমি যদি আজ চোখ বুজি, তা হলে ওকে পথে দাঁড়াতে হবে। তাই বাবা বলছিলুম,—তাছাড়া তোমার নিখিলের উপর ওর কি মায়া—আর ছেলেটাও তেমনি, ওকে মা বলতে অজ্ঞান! যত বলি, মাসি বলবি—তা বলবে না—কেবলি ঐ নাম বলে ডাকবে! উঃ—শাশুড়ী চুপ করিলেন; তাঁহার দুই চোখ বহিয়া অজস্রধারে জল নামিল। অভয়াশঙ্করের চোখও সজল হইয়া উঠিল। মনে পড়িল, এই ঘরেই একদিন ডিপায় ক'টা পাণ পড়িয়াছিল বলিয়া লীলা সকৌতুক অভিমান করিয়া বলিয়াছিল,—আমার হাতের পাণ মুখে আর রোচে না বুঝি! বেশ, নতুন দেখে একটি আনো—এনে নতুন হাতের পাণ খেয়ো—! তখন তিনিও জবাব দিয়াছিলেন—নতুন হাতে চুন বেশী হবে। শেষে নতুন হাতের পাণ খেয়ে গাল পুড়িয়ে ফেলব কি!

আর আজ এ সেই ঘর—আর এই এক দিন! আর এই-সব কথাবার্ত্তা—নতুন হাত,—সে-ও পাণ সাজিয়া আনিতে গিয়াছে, তাঁহারই জন্য! অদৃষ্টের কি কঠিন পরিহাস!

শাশুড়ী চোখ মুছিয়া বলিলেন,—বল বাবা—সুষুকে নেবে ত? আমার মা-হারা নিখিল ওকে মা বলে ডেকেছে যখন, ওকেই তখন ও মা বলে জানুক, সুষুই নিখিলের মা।

অভয়াশঙ্কর কিছু বলিতে পারিলেন না—পাশে একটা শোফা ছিল—সেই শোফায় বসিয়া পড়িয়া মুখ গুঁজিলেন। তাঁহার সমস্ত মনটা গলাইয়া ভাসাইয়া চোখে অশ্রুর সাগর উছলিয়া উঠিল।

এমন সময় সুষমা জল-খাবারের রেকাবি লইয়া ঘরে ঢুকিল—পিছনে অমনি নিখিল আসিয়া—মা, বাবাকে দেখাচ্ছি, তোমার তৈরী ঘুড়ু-বাঁধা ফিতেটা—এসো না মা, বাবার কাছে। দিদিমা ছাখো না, তুমি। জুবুর মা কেমন জুবুর সঙ্গে আর তার বাবার সঙ্গে বসে গল্প করে—আমি মাকে বলছিলুম, তা মা বলেছিল, বাবা এলে অমনি-ধারা মাও বাবাকে নিয়ে আমাকে নিয়ে এক সঙ্গে বসে গল্প করবে। আজ বাবা এয়েচে, তবু মা শুনচে না!

শাশুড়ী বলিলেন—শোনো বাবা অভয়, ছেলে সব গড়ে রেখেচে—ওর এ সুখটুকু ভেঙ্গে দিয়ে ওকে এ জিনিষ থেকে আর বঞ্চিত করো না, বাবা।

নিখিল তখন দিদিমার কাছে গিয়া বলিল—ছাখো না দিদিমা, মা বাবার সঙ্গে কথাও কইবে না,—বাবার কাছে আসবেও না! হুঁ, আমি জানি গো, সব জানি—মার খুব অসুখ করেছিল বলে মা হাওয়া খেতে গেছল, তাই বাবার কাছে আমি একলাই ছিলুম।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

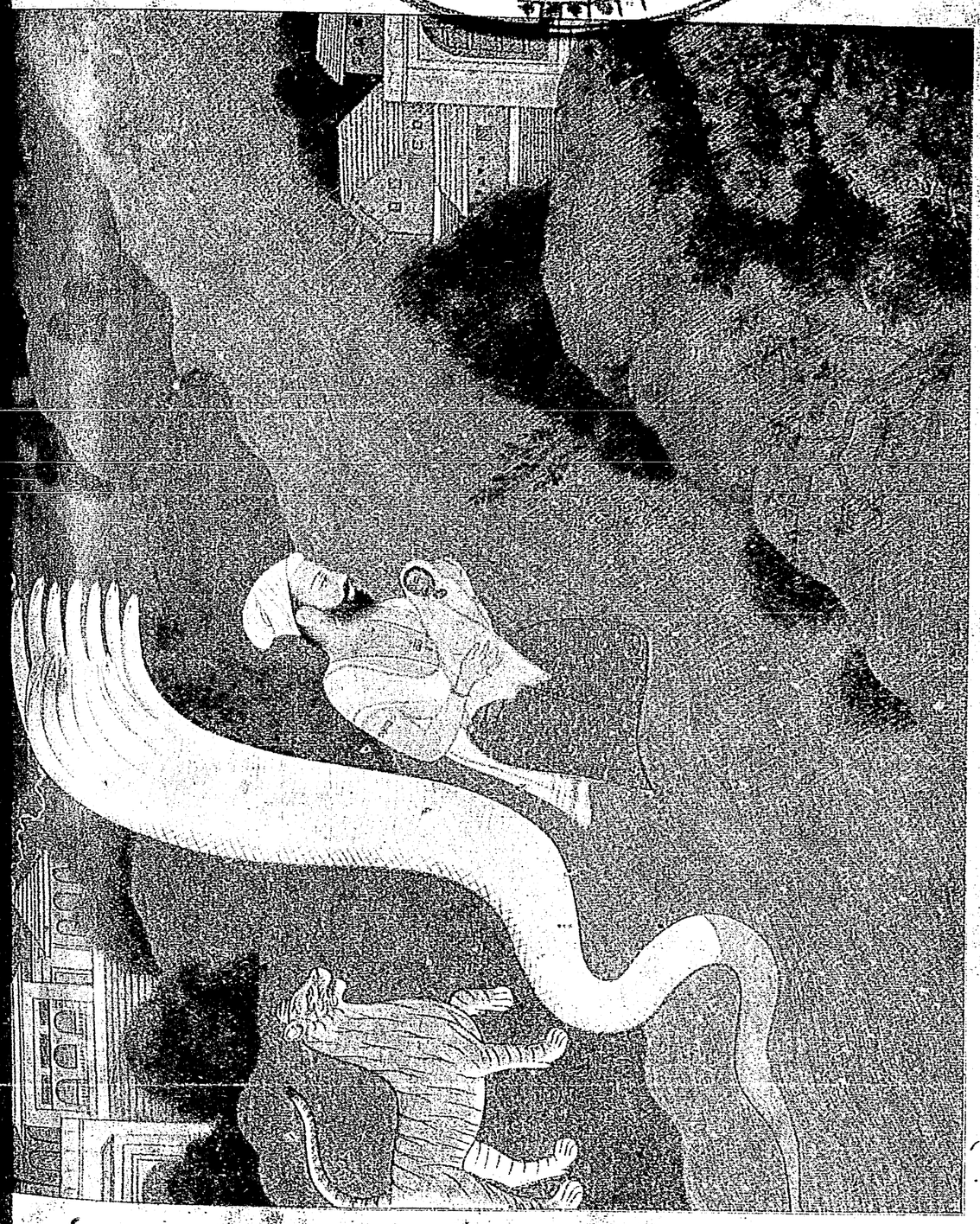

জন্মাষ্টমী (প্রাচীন চিত্র)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হাওড়া
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২৮ [৩য় সংখ্যা

ব্রিটিশ-শাসনের এক যুগ

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসন-কালে চারিটী বিশেষ ঘটনা ঘটে। তাহাদের মধ্যে একটী বঙ্গের প্রসিদ্ধ রাজা নন্দকুমারের সম্বন্ধে; অপর তিনটি বঙ্গের বাহিরের ঘটনা। একটী রোহিলা যুদ্ধ, দ্বিতীয় বারাণসী-রাজ চৈৎসিংহের রাজ্যচ্যুতি এবং তৃতীয় অযোধ্যার বেগমদিগের ধন-সম্পত্তি-অপহরণ।

ভারতে ইংরজে-শাসনের ভিত্তি যাঁহারা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্থান সর্ব্বাগ্রে। কিন্তু হেষ্টিংসের সময়ে নানা যুদ্ধ-বিগ্রহসত্ত্বেও কোন নূতন দেশ, সুবা বা পরগণা ইষ্ট-ইণ্ডিয়াকোম্পানির অধিকার-ভুক্ত হয় নাই। এই প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদয় হয় যে, কিরূপে হেষ্টিংস ইংরেজ-রাজত্বের সীমা স্থির রাখিয়া Empire-builder বা সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা আখ্যা লাভ করিলেন? তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ক্লাইব বঙ্গদেশ জয় করিয়া ও মোগল-বাদশাহের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ করিয়া, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় ইংরেজ রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ণওয়ালিস টিপু সুলতানকে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অর্দ্ধেক রাজত্ব অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মারহাট্টাগণকে আর নিজামকে তাহাদের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য কিছু ভাগ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজ-রাজ্য তৃতীয় মহীশূর-যুদ্ধের পর বেশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। হেষ্টিংসের শাসন-কালে যুদ্ধ-বিগ্রহ ত কম হয় নাই—রোহিলাযুদ্ধে ১৭৭৪ সালে হেষ্টিংস রোহিলখণ্ড জয় করিয়াছিলেন, মারহাট্টা-যুদ্ধে রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষে নানা ফাড়ন্‌বিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় মহীশূর-যুদ্ধে হায়দার আলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রাজ্য তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত করেন নাই। রোহিলখণ্ড অযোধ্যার নবাব

পাইলেন, হেষ্টিংস কেবল ৪০ লক্ষ টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে হায়দার আলির মৃত্যুর পরে টিপুর সহিত মাঙ্গালোরে যে সন্ধি হয় তাহাতে দুই পক্ষই নিজেদের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন। কেবল মারহাট্টা-যুদ্ধে ইংরাজ সালসেট ও এলিফেণ্টা এবং দুটী ক্ষুদ্র দ্বীপ পান। হেষ্টিংসের ১৭৭২ সাল হইতে ১৭৮৫ সাল অবধি ১৩ বৎসর-ব্যাপী সুদীর্ঘ ভারত-শাসনকালে এই তিনটী স্থান ইংরেজ রাজত্বের আয়ত্তে আসে। হেষ্টিংস ব্রিটিস সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা আখ্যা যে লাভ করিয়াছেন, তাহা বিস্তৃত ভূখণ্ড জয় করিয়া নহে, তাহা অন্য উপায়ে। কাশীরাজ চৈৎসিংহের তিনি অনেক লাঞ্ছনা করেন, তাহাতে কাশীর অধিবাসীগণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ হেষ্টিংস প্রশমিত করিলেন, কিন্তু বারাণসী তিনি কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত করিলেন না, চৈৎসিংহের বংশের এক বালককে কাশীর সিংহাসনে বসাইলেন। তিনি কলে-কৌশলে প্রত্যন্ত-নৃপতিগণের গর্ব্ব একেবারে খর্ব্ব করিয়া এবং রোহিলখণ্ড ও বারাণসী স্বপক্ষীয় রাজন্যবর্গের অধীনে আনিয়া ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিস্তৃতির পথ সুপ্রশস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালের সুপ্রসিদ্ধ চারিটী ঘটনার মধ্যে একটী এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বারাণসী রাজবংশের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিশেষ সদ্ভাব ছিল। ইহার বিশেষ কারণও ছিল। উপকারে না আসিলে ইংরেজের সহিত সদ্ভাব থাকে না। আর এ-যুগে যাহাকে আমরা Co-operation বা সহযোগ বলি, কাশী-রাজ ইংরেজদিগের সহিত সেইরূপ Co-operation খুব বেশী-রকম করিয়াছিলেন, এমন কি নিজেদের প্রভুর বিরুদ্ধেও। বলবন্ত সিংহ তখন কাশীর রাজা। ১৭৬৪ সালে ইংরেজের সহিত অযোধ্যার সুবেদারের মনোমালিন্য হইল। কাশীরাজের বিশেষ বিপদ, তিনি কি করেন? তাঁহার অবস্থাও সুবিধার নয়। তিনি তখনও নামে সামন্ত-রাজ, তাঁহার প্রভু অযোধ্যার সুবেদার। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বাধীন নৃপতির সর্ব্ব অধিকার ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সহিত সুবেদারের যুদ্ধ বাধিলে তিনি কি করেন? নূতন শক্তি যে বাঙ্গলাদেশ জয় করিয়া ভারত-ভূমি ক্রমে ক্রমে করতল-গত করিতেছে, তাহার সহিত যোগদান করিয়া পুরাতন প্রভুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন, কি সামন্ত-রাজের যাহা কর্ত্তব্য—মীরকাসেম ও সুবেদারের জন্য নিজের শক্তি, অর্থ, প্রাণ সব পণ করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিবেন? এই সঙ্কট-কালে ধূর্ত্ত বিবেচক বলবন্ত, বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহা করেন তাহাই করিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে সুবেদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন না বা ইংরেজের পক্ষে যোগও দিলেন না। বাহিরে এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন তিনি কোন পক্ষেই নাই, একেবারে নিরপেক্ষ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি ইংরেজের যথাসাধ্য সহায়তা করিলেন। ইংরেজ তাঁহার উপর বিশেষ প্রসন্ন হইলেন, বিলাতে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া ডেস্‌প্যাচ পাঠানো হইল। তাহার উত্তরে ডাইরেক্টরগণ ১৭৬৮ খৃঃ অঃ ২৬শে মে তারিখে যে চিঠি বঙ্গদেশের গবর্মেণ্টকে পাঠাইয়াছিলেন, মিলো

ইতিহাসে (পঞ্চম খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়) তাহার উল্লেখ আছে। রাজা বলবন্ত ভাবিলেন যে, তাঁহার উপকার ইংরেজ সহজে ভুলিবেন না—ডিরেক্টরগণ তাঁহার সহায়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন! কিন্তু উপকারের কি প্রত্যুপকার তাঁহার বংশধর ইংরেজের নিকট পাইবেন, তিনি তখন তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

ইংরেজের সহিত সুবেদারের যুদ্ধ যখন শেষ হইল, বলবন্ত তখন আরও বিপদে পড়িলেন। সুবেদার তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বলবন্ত যদি বিশ্বাসঘাতকার জন্য কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, তাহাতে ইংরেজের বিপদ। সেইজন্য ইংরেজ তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন; এবং এলাহাবাদে যে সন্ধি হইল তাহাতে বলবন্তের স্বপক্ষে এক সর্ত্ত রহিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহার জামিন স্বরূপ রহিলেন।

১৭৭০ সালে রাজা বলবন্ত সিংহের মৃত্যু হয়। অযোধ্যার নবাব-উজীর তখন আবার বারাণসী নিজ-করতলগত করিতে চেষ্টা করিলেন। যাহাতে বলবন্তের পরিবারভুক্ত কেহ কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় না হন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। এবারও ইংরেজের সহায়তায় বলবন্তের পুত্র চৈৎসিংহ পিতার সিংহাসন লাভ করিলেন। এই সুযোগে অযোধ্যার নবাব কাশীর বার্ষিক রাজস্ব কিছু বৃদ্ধি করিয়া লইলেন। ১৭৭৩ সালে এই সব সর্ত্ত পুনরায় হয়। হেষ্টিংস স্বয়ং সেই সময় কাশীতে যাইয়া নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং চৈৎসিংহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া বন্দোবস্ত বজায় রাখেন। তাঁহার সম্মুখেই দলীলে সহি হয় এবং তিনিও তাহাতে সাক্ষীস্বরূপ সহি করিয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত আমরা হেষ্টিংসের ১৭৭৩ সালের বিপোর্টে পাই। তাহা ফরেষ্ট সাহেবের State papers গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ৫৬ পৃষ্ঠায় ছাপা আছে।

১৭৭৫ সালে নবাব সুজাউদ্দৌলা কাল-গ্রাসে পতিত হন। আসফউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব-উজীর হইলেন। এই সুযোগে ইংরেজ বারাণসীর উপর নবাব-উজীরের যে অধিকার তাহা এক সন্ধির দ্বারা পাইলেন। রাজা চৈৎসিংহ পূর্ব্বের মত কাশীর অধিপতি রহিলেন। নিয়ম-মত এক নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক কর দেওয়া ব্যতীত স্বাধীন নৃপতির অন্য সকল অধিকার তাঁহার বজায় রহিল। এই সন্ধির বলে তিনি অযোধ্যার নবাব-উজীরের সামন্ত-রাজ না থাকিয়া ইংরজে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসিলেন। এই বন্দোবস্তের কি বিষময় ফল চৈৎসিংহের অদৃষ্টে ছিল, ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

রাজা চৈৎসিংহ তাঁহার বার্ষিক কর নিয়মমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দিতেন। মিল বলিয়াছেন যে, চৈৎসিংহের মত হিন্দুস্থানের কোন রাজা এরূপ নিয়ম-মত রাজস্ব পাঠাইতেন না। বোধ হয় ইহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ। ১৭৭৮ সালে গবর্ণর জেনেরাল হেষ্টিংস টাকার অভাবে বিপদে পড়িলেন। হেষ্টিংস আদেশ করিলেন, যেন চৈৎসিংহ সে বৎসর বার্ষিক কর এবং ৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর দেন। চৈৎসিংহ সেরূপ অতিরিক্ত কর দিতে কোন

রূপে বাধ্য ছিলেন না। ইংরেজ ঐতিহাসিক অনেকে ফরেষ্ট, ট্রটার, উইলসন প্রভৃতি বলেন যে, চৈৎসিংহের নিকট এরূপ অতিরিক্ত কর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দাবী করিতে পারিতেন। মিল, মেকলে, বার্ক,—ইঁহাদের অন্য মত। এই বিষয়ের স্থির-মীমাংসা সহজসাধ্য নহে। পরে আমরা ইহার আলোচনা করিব। তবে ইহা নিশ্চয় যে ১৭৭০ সালে সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পরে বারাণসী যখন ইংরেজের অধিকার-ভুক্ত হয়, তখন চৈৎসিংহের বার্ষিক কর ভিন্ন আর কোন অতিরিক্ত কর দানের কোন সর্ত্ত স্থির হয় নাই। যাহা হউক চৈৎসিংহ হেষ্টিংসের আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে ৫ লক্ষ টাকা ইংরেজ-সরকারে প্রেরণ করিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পাহাড়ে

চলন্ত রেল গাড়ীর মধ্যে বসে নব-বিবাহিত দম্পতী হিরণ ও সুধা অনিমেষ নয়নে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখছিল। দার্জ্জিলিং মেল তখন ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে-খেতে শ্রান্ত অজগরের মত পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে চলেছে। ছোট ছোট ঝর্ণার পাশে কত রকম ফুল, লতা,—দেখতে দেখতে সুধার ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল, কিন্তু চোখ আর সে ফিরিয়ে নিতে পারছিল না,—পাহাড়ে ওঠা তার জীবনে এই প্রথম।

কলকাতার একটি কুণো গলির মধ্যে পুরোনো শেওলা-ধরা বাড়ীগুলির ছাদে টবের নকল বাগানে ধরা-বাঁধা বসন্ত যখন তার রঙীন পতাকাখানি একটু একটু করে মেলে ধরছিল, সেই সময়ে হিরণ সুধাকে বিয়ে করে আনে।

সে বড় লোকের ছেলে, নিজেও কিছু উপার্জ্জন করে। তার কলকাতার বাড়ীতে অনেক লোকের আর অনেক কাজের গোলমাল নিত্যই লেগে আছে। এই নূতন-পাওয়া মিলনটীকে নিবিড়তর করে তোলবার কোনো সুবিধে সে-বাড়ীতে না হওয়ায় হিরণ সুধাকে নিয়ে দিনকতক সাহেবদের মত হনি-মুন করতে বেরিয়ে পড়েছিল; কেন না এতে বাধা দেবার মত আত্মীয়-স্বজন হিরণের কেউ ছিল না।

তখন সীজন্ চলেছে; বন্ধু-বান্ধবেরা দার্জ্জিলিং যেতেই পরামর্শ দিলেন। শুনে সুধা বল্‌লে, "সেই বেশ হবে, আমি কখনো পাহাড় দেখিনি, আমার পাহাড় দেখা হবে।"

এর পর আর তখন হিরণের অন্যমত হতে পারে না; কাজেই তারা দার্জ্জিলিং-এর যাত্রী হল। হিরণ খুব উৎসাহ করে সুধাকে এটা সেটা দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলেছিল।

সুধা কচি মেয়েটি নয়। নতুন জায়গায় এসে কান্নাকাটি করা তার আর তখন মানায় না! তবু ছেলেবেলাকার আশ্রয় মা-বাপ, ভাই-বোনদের স্নেহের ডোর থেকে বেরিয়ে এসে বিচ্ছেদের একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা তার বুকে বিঁধেই ছিল, আর তার

ব্যথাটাই হিরণ বিশেষ করে অপছন্দ করতো!

স্বামী যে এতে খুসী নয়, সুধা তা টের পেতো, তাই সে এ বেদনা চেপেই থাকতো, তবু জীবনের দ্বিতীয় অঙ্কের এই সবে আরম্ভ হতে-হতেই প্রথম অঙ্কটা তার ঝাপ্‌সা হয়ে যেতে পারেনি।

ট্রেন যখন দার্জ্জিলিং পৌঁছে গেল, তখন সেখানকার আকাশও বেশ পরিষ্কার ছিল। রিক্‌সয় উঠে বসে মুগ্ধ চোখে চারিদিকে চেয়ে সুধা বল্‌লে, "বাঃ, চমৎকার!"

হিরণ তার পাশেই বসে ছিল, সে বল্‌লে, "চমৎকার! আজ আকাশও এমন পরিষ্কার হয়ে আছে যে সব সুন্দর দেখাচ্ছে,—তুমি এসেছ কি না!"

সুধা হাসিমুখে বল্‌লে, "হ্যাঁ, এখানকার দেবতাও আমার জন্যে সন্ত্রস্ত, কেমন!"

ঠিক এমনি সময়ে আরো জনকতক লোক সেইখানে রয়েচে দেখে সুধা তার অভ্যাস-মত মাথায় কাপড়টা টেনে দিতে গেল, হিরণ বাধা দিয়ে বল্‌লে, "ও কি,—অমন করে এক হাত ঘোমটা দিয়ো না, ভারী অসভ্য দেখাবে যে তা-হলে!"

"মাথায় কাপড় দিলে অসভ্য দেখাবে?"

"নাগো—ঘোমটা দিলেই বিশ্রী দেখায়। মাথায় কাপড় তো খুল্‌তে বল্‌চিনে।"

বাসা আগেই ঠিক-করা ছিল। ছোট্ট লাল রংয়ের বাড়ীখানি উঁচু রাস্তা থেকে খানিকটা নীচে নেমে যেতে হয়, গেট্‌টী ঠিক পথের ধারেই। রিক্‌স-ওয়ালাদের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হিরণ মালপত্র বুঝে নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। সুধা আগেই এসে ঘরের ভিতরকার একটা কৌচে বসে পড়েছিল. হিরণের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে সে জানালে যে বাড়ীখানি তার বেশ পছন্দই হয়েছে।

চাকর এসে জিজ্ঞাসা করলে, চিমনি এখন জ্বালবার দরকার আছে কি না? সুধা আপত্তি করে বল্‌লে, "না, না, ঘরের মধ্যে এখন অগ্নিকুণ্ড জ্বাল্‌তে হবে না।"

চাকর চলে গেল। সুধা এ-ঘর ও-ঘর বেড়িয়ে তার সংসার গুছিয়ে নিতে লেগে গেল। কতটুকুই বা তোলা সংসার! দুদিনেই সব ঠিক করে নেওয়া হলে তাদের নিত্য কর্ম্ম হয়ে উঠ্‌লো, ঘুরে বেড়ানো।

অলস দুপুরটাতে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়া হিরণের অনিবার্য্য অভ্যাস ছিল, কিন্তু তা বলে সুধা যে সেই ফাঁকে সার্শির কাছে বসে বসে বাপের বাড়ীর ভাবনায় মন খারাপ করবে, এটাও তার ভালো লাগতো না, তাই যেমন ভাত খাওয়া হল, অমনি সুধাকে নিয়ে সে পাহাড়ের ছায়া-স্নিগ্ধ পথে বা কোনো মরা ঝর্ণার পাশে বসে গল্প করে দিন কাটিয়ে দেওয়া সুরু করলে!

সে দিনটা মেঘ্‌লা হয়েছিল, তার উপর প্রচুর কুয়াশায় পাহাড়ের গা এমন ঢেকে গিয়েছিল যে ঘরের একটু পাশেই চাকরদের থাকবার লম্বা টিনের ঘরখানা অবধি দেখা যায় না!

ঘরের মধ্যে বসে থেকেও সুধার মনে হচ্ছিল, সে যেন ষ্টীমারে বসে আছে, আর বাইরের উঁচু-নীচু ঘর-বাড়ী গাছ-পালা সব শীতকালের নদীর মত একাকার হয়ে গিয়েছে!

বেলা বারোটা বেজে গেল, তবু একটু আলোর দেখা নেই। ঘরে বসে বসে বিরক্ত হয়ে হিরণ বলে উঠ্‌লো, "দূর ছাই, আর পারা যায় না চুপ করে বসে থাক্‌তে। চল, একটু ঘুরে আসি।"

সুধা তখন বেশ একটা ঘোরালো-প্লটের নভেল নিয়ে বসেছিল; সে বল্‌লে, "তা যেতে হয়, তুমি যাও, আমি যাবো না।"

হিরণ তাড়া দিয়ে বল্‌লে, "নাও ওঠো, চল, বার্চ্চহিলের ওদিকটায় যাই।"

"ও মা, সেকি গো,—যদি বৃষ্টি নামে, তখন ভিজ্‌তে হবে যে!"

হিরণ একবার আকাশ-পানে চেয়ে দেখে বল্‌লে, "নাঃ, বৃষ্টি আর হবে না,—নাও, ওঠো!"

সুধা তবু একটু-আধটু আপত্তি করে তারপর অগত্যা উঠে পড়লো, নইলে আবার হিরণ গরম হয়ে ওঠে! সেও তার কাছে বড় সুবিধের ব্যাপার নয়! আর তার যে বৃষ্টির জন্যেই বেরোতে অমত ছিল, তা ত নয়, নভেলটা ছেড়ে উঠ্‌তে তার মন সরছিল না, সেইটেই ছিল আদত কথা।

পথে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়াতে তারা যখন বার্চ্চহিলের কাছাকাছি গোরস্থানের ফটকের কাছে এসে পৌঁছেচে, সেই সময় বৃষ্টি এমনি ঝেঁপে এলো যে ছাতিতে আর তা আটকানো যায় না!

তারা তো হুড়-মুড় করে একটা শেডে গিয়ে আশ্রয় নিলে। সুধা বল্‌লে, "কেমন! আমি তখনি বলেছিলুম তো যে বৃষ্টি আস্‌বে। এখন হল তো?"

হিরণ শেডের বেঞ্চখানা রুমাল দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে, "তাই তো!"

সুধা পা ঝুলিয়ে বেঞ্চে বসেছিল, হঠাৎ একটা ভারী নিশ্বাসের শব্দ পেয়ে পা তুলে নিয়ে বল্‌লে, "এই বেঞ্চিটার নীচে কুকুর-টুকুর আছে বোধ হয়—"

"কুকুর? আচ্ছা, দাঁড়াও দেখ্‌চি—" বলে হিরণ হেঁট হয়ে দেখে বল্‌লে, "বাবা, এ আবার কি?"

"কি গো?" বলেই সুধা বেঞ্চ থেকে তড়াক্ করে নেমে দাঁড়ালো, তার পর নিজেও ঝুঁকে পড়ে দেখলে যে, একটী বছর এগারো বারো বয়সের নেপালী ছেলে শীতে কুকুর-কুণ্ডলী হয়েই ঘুমোচ্ছে! নোংরা ছেঁড়া জামা গায়ে পা-জামাটা এককালে হয় তো বেশ ভাল কাপড়েরই ছিল, কিন্তু এখন তার এমন দশা যে রং চেনবার জো নেই।

যে-শীতের তাড়ায় সুধা এক-রাশ গরম জামা গায়ে দিয়েও কাঁপছিল, সেই শীতে সেই অস্থি-চর্ম্মসার ছেলেটির হাত, পা, কান সব নীল হয়ে গিয়েছিল, কেবল বুকের শ্বাসটার জন্যেই তাকে জ্যান্ত বলে চেনা যাচ্ছিল। তার মাথার কাছে একটা খালি বার্লির টিন পড়েছিল, সম্ভবতঃ সেটা তার ভিক্ষাপাত্র! সুধা ব্যথিত স্বরে বল্‌লে, "আহা!"

হিরণ গোরস্থানের ফটকের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল, আপাততঃ বৃষ্টি ছাড়বার লক্ষণ কিছু আছে কি না! সে ঘাড় ফিরিয়ে বল্‌লে, "এখনো তুমি ওই দেখছো? থাক্, ঘুমুক। ওর শান্তিভঙ্গ না করে, আমরা বাসায় ফিরি।"

"ভিজ্‌তে-ভিজ্‌তেই?"

"তা ছাড়া উপায় নেই তো। এ বৃষ্টি সারা দিন থমকে ছিল, এখন কি আর ছাড়বে?"

"বেশ, তবে চল।" শেড্ ছেড়ে তারা আবার বাসার দিকে চল্। তখনো বৃষ্টির বেগ একটুও কমেনি, কাজেই তাদের ভিজতে হল। বাড়ীতে এসে ভিজে কাপড় ছেড়ে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে দুজনে যখন দু'ঘণ্টা ধরে চিমনির আগুনের তাতে শরীরটাকে গরম করে নিয়েছে, সেই সময় চাকরদের ঘরের দিকে একটা গোল শোনা গেল।

হিরণ ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে দাঁড়াল। বাদল রাতের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে উঠেছে! খোলা দুয়ারের ফাঁক দিয়ে যে বিদ্যুতের আলো ঘর থেকে বাইরে পড়েছিল, তারি ছটায় দেখা গেল, সেই নেপালী ছেলেটাই শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বার্লির কৌটোটি পেতে দাঁড়িয়েছে, তার কিছু খাবার চাই। তার গা মাথা থেকে বরফের মত ঠাণ্ডা বৃষ্টির জল ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছিল,—চাকরেরা তাকে খেদিয়ে দেবার যোগাড়েই ছিল; কিন্তু সশরীরে মনিবকে দেখে তখন তাদেরও নবার শরীরে দয়ার জোয়ার বয়ে এল।

হিরণ ও সুধা দুজনকার তদারকে রাত-টুকু কাট্‌তে না কাট্‌তেই ছেলেটির চেহারা ফিরে গেল। তবে হিরণের ফুটবল খেলবার পুরোনো হাফ-প্যাণ্টটা, আর আধ-পুরোনো গরম সোয়েটারটী যে সেই ছেলেটার দেহে কেমন মানিয়েছিল, সে একটা দেখবার জিনিষ বটে! দু-চার দিন না যেতেই এই বিদেশী ছেলেটি তাদের নিতান্ত আপনার জন হয়ে উঠল।

২

খুব ভোরে সূর্য্যের লাল আলোয় কাঞ্চন-জঙ্ঘার বরফের দিক চাইলে সোনার পাহাড়ের মত দেখায়। সেদিন হিরণ তার বসবার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন-জঙ্ঘা দেখ্‌ছিল, সুধাও একটা জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

হিরণের বন্ধু সতীশ এসে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "কি হে, একেবারে তন্ময় যে!"

হিরণ মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, "এক রকম তাই বটে! কিন্তু সকালেই যে সাজ-গোজ করে বেরিয়েছ, দেখ্‌চি,—যাচ্ছো কোথায়?"

সতীশের সঙ্গে তার ক্যামেরা ছিল ফটো তোলবার,—সে বল্‌লে, "এমন ওয়েদার বড় একটা পাওয়া যায় না, আজ আমি এই ফাঁকে খানকতক ফটো তুলে নেব, ঠিক করেচি।"

হিরণ একটু হেসে বল্‌লে, "আমাদের নাকি?"

"কেন, তাতে আপত্তি আছে কি কিছু?"

"কিছু মাত্র না,—বরং লাভ আছে।"

"তবে আর কি!"

হিরণ বল্‌লে, "তা হলে কিন্তু এখন তোমায় একটু অপেক্ষা করতে হবে। কেন না, আমি এখনো চা-টা খাই নি।"

সতীশ হিরণের সঙ্গে তার বসবার ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে

বল্‌লে, "তবে নাও, তোমার চা-ইত্যাদি প্রাতঃকৃত্য সব সেরে নাও।"

হিরণ বল্‌লে, "তুমি ?"

"না, আমি খেয়ে বেরিয়েচি, দু'বার চা আমি খাইনে।"

হিরণের চা পান শেষ হলে সতীশ তাদের নিয়ে অল্প-দূরেই একটা ঝর্ণার মাঝখানে নেমে দাঁড়াল, এইখানেই সে একটা ফটো তুল্‌বে ঠিক করেছিল।

এ ঝরণাটী বর্ষাকালে খুব পুষ্ট থাকে, তাই তার মাঝখানটায় সাঁকো-বাঁধা, নীচেটা অনেকখানি চওড়া, ছোট-বড় নানা রকম টুকরো পাথরে বোঝাই, নির্ব্বিষ সাপের মত এখন তার শীর্ণ জলের রেখা পাথরের গায়ে আলপনা এঁকে বয়ে যাচ্ছিল। হিরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সরু জলের রেখাটিকেই ছাতির বাঁট দিয়ে নাড়ছিল।

সতীশ অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে তার ক্যামেরা ঠিক করে নিচ্ছিল আর সেই নেপালী ছেলেটা সুধার পায়ের কাছে বসে অবাক হয়ে যেন তাই দেখছিল। সুধা তাকে জিজ্ঞেসা করলে, "ওটা কি, বল্ তো ?"

সে বল্‌লে, "কি জানি ?"

"জানিস্ নে! আচ্ছা, ওটাতে কি হয়, তা জানিস ?"

সে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, না তাও সে জানে না। সুধা বল্‌লে, "ওতে মানুষের ছবি—এই মানুষের চেহারা ওঠে—"

"চেহারা,—ফটোগ্রাফ ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো জানিস তো, দেখ্‌চি।"

ছেলেটির মুখের চেহারা এক মিনিটেই বদ্‌লে গেল। সে বিষণ্ণভাবে বল্‌লে, "ওঃ,—ও আমি জানি, আমার কাছেও একটা ফটো আছে।"

"আছে নাকি ? কৈ, দেখি, কার ফটো ?"

ছেলেটী তার বুক-পকেট থেকে ময়লা কাগজে মোড়া একখানি ফটো বের করে সুধার হাতে দিলে!

ফটোটি কোনো একজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার। তাঁর মুখখানি করুণায় ভরা, তবু সে মুখে মাতৃ-মহিমার চেয়ে কুন্দেন্দু-তুষার-ধবলা বীণাপাণির সঙ্গে মিলই বেশী।

সুধা বল্‌লে, "এ কার ফটো, তা জানিস তুই ?"

জল-ভরা চোখে সে বল্‌লে, "জানি, আমি যাঁর ছেলে, তাঁর।"

"তবে তো খুব জানিস্ দেখ্‌চি, বোধ কোথাকার!"

"হ্যাঁ জী, তাঁরই,—কিন্তু তিনি আর নেই,—ভগবানের কাছে চলে গিয়েছেন।"

এতক্ষণে সতীশ তার ক্যামেরার দিক থেকে চোখ তুলে এই ছেলেটীর দিকে চাইলে, বল্‌লে, "আরে, চার্লি না ? এ যে সেই লেডি ডাক্তারের পুষ্যিপুত্তুর, এ এসে জুট্‌লো কেমন করে ?"

হিরণ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "তুমি চেনো না কি ওকে ?"

"বিলক্ষণ চিনি। ও হতভাগাটাকে এখানে বোধ হয় সবাই চেনে। ওর কাহিনীও যে একটা নভেল গোছের। প্রথমে তো আঁতুড়ে মরা মা ওর ওকে আঁতুড়ে রেখেই মারা গিয়েছিলেন, তার পর ওই লেডি ডাক্তারটি নিজে খরচের ভার নিয়ে আর একজনকে দিয়ে ওকে মানুষ করছিলেন।

খন বছর-তিনেকের ছেলে, তখন সেও রে গেল, লেডি ডাক্তার তখন ওকে নিজের াছেই এনে রাখলেন, ওকে সন্তানের তই ভালবাসতেন। তিনি নিজে কুমারী ছলেন, ভেবেছিলেন, তাঁর সঞ্চিত টাকা দিয়েই তিনি ওটাকে একজন মানুষ করে লবেন। কিন্তু কি যে ওই ছোঁড়াটার পাল, গেল-বছর একদিন রাত দুপুরে ঠাৎ হার্ট ফেল করে তিনিও মারা গেলেন। ওর কিছুই করে যেতে পারলেন না, কেন না, তিনি বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন নি য মরণটা তাঁর এত এগিয়ে এসেছে।"

"তার পর ?"

"তারপর তাঁর ভাই-পোরা এসে সব দখল করে নিয়ে ওকে পথে খেদিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে ও এনেছে কেবল ঐ বার্লির কৌটোটা, যা এখন ওর ভিক্ষে নেবার পাত্র!"

চার্লি পাহাড়ের গায়ে ফুল তুলছিল। তক্ষণ পরে সকলে চেয়ে দেখ্‌লে, সে কোন্ সময়ে সেখান থেকে সরে পড়েছে!

৩

একটা বড় চেয়ারে শুয়ে শুয়ে হিরণ বরের কাগজ পড়্‌ছিল, ঘরের আর এক কে বসে সুধা বাড়ীতে তার বোন্‌কে ঠি লিখছিল, এ দেশের কোথায় কি খেছে, কোন্‌টা কেমন, এই সব বর্ণনা রে লিখ্‌ছিল বলে চিঠিখানা শেষ না তই বার পাঁচ-ছয় হিরণের হাত থেকে র এসেছিল,—এতক্ষণে সেখানাকে ইতি রে সুধা খামে মুড়্‌ছিল; হঠাৎ আবার রণের চোখ পড়ায় সে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লো, "ও কি মুড়চো নাকি ? দাঁড়াও, দেখি।"

"কতবার দেখ্‌বে ?"

"শেষটা যে দেখিনি! কি লিখ্‌লে ?"

"কি আর লিখ্‌বো, আমরা তিন-চার দিনের মধ্যেই ফিরবো, তাই লিখে দিলুম।"

চিঠি পড়ে সুধার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হিরণ বল্‌লে, "আঃ, আবার সেই বাড়ীর কাজ আর কাজ,—বেশ ছিলুম ক'দিন!"

সুধা একটু হাস্‌লে, হেসে বল্‌লে, "আমার বাড়ীই বেশ লাগে।"

"হুঁ,—টের পাবে মজাটি বাড়ী গিয়ে, সেখানে কি এমনি করে আমরা দু'জনে মিল্‌তে পাবো, ভাবচো ?"

"কেন, বাড়ী ছেড়ে তো আর কোথাও যাবে না তুমি! ভালো কথা, আমরা তো যাচ্চি, চার্লির কি হবে ? তাকে তুমি নিয়ে যাবে না ?"

"তা যেতে পারি। তবে তাকে বলে-কয়ে ঠিক করে নাও সে যাবে কি না ?"

চার্লি তখন একটা হেলে-পড়া লতাকে নানা কায়দায় ঠিক করে রাখ্‌ছিল, সুধার ডাক শুনে ছুটে এসে সামনে দাড়াল। সুধা তাকে বললে, "আমাদের সঙ্গে যাবি চার্লি, আমাদের দেশে ?"

চার্লি প্রথমে খানিকটা অবাক হয়ে চেয়ে রইল, তারপর বল্‌লে, "কোথায় ?"

"কলকাতায়। আমরা সেইখানেই থাকি। যাবি আমাদের সঙ্গে ?"

চার্লি সোজাসুজি ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "না।"

আশ্চর্য্য হয়ে সুধা বল্‌লে, "কেন্ রে ?"

"সেখানে যে আমার কেউ নেই—"

"কি জ্বালা! এখানে তোর কে আছে, শুনি?"

"সবাই আছে। মাটীর নীচেয় তো আছে।"

অনেকক্ষণ ধরে অনেক রকম কথা বলেও সুধা সে অবোধ ছেলেটাকে বোঝাতে পারলে না যে, মাটীর নীচে যিনি আছেন, তিনি এখন সকল সম্পর্কের অতীত, তিনি আর এখন তার কেউ নন, তাঁকে আঁকড়ে পড়ে থাকায় কোনো লাভ নেই। চার্লি এ সব কথা একটুও বুঝলে না, বুঝতে চাইলেও না, অবশেষে বিরক্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে সুধা হাল ছেড়ে দিয়ে বস্‌লো!

বাড়ী যাবার সময় কাছাকাছি এসে পড়লো বলে সুধা তার বেড়াবার জায়গা-গুলি বেশী করে করে দেখে রাখ্‌ছিল। সেদিন তারা আবার সেই গোরের ফটকের কাছে নীচে এসে পড়লো, যেখানে শেডের বেঞ্চির চার্লিকে ঘুমন্ত অবস্থায় প্রথম দেখা গিয়েছিল।

অনেক ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষ ফুটন্ত ফুল হাতে করে পাহাড়ের গায়ের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলেছে দেখে সুধাও হিরণের সঙ্গে নাম্‌তে লাগ্‌লো। থাকে-থাকে কত শত লোকের অনন্ত বিশ্রাম-শয্যা পাতা; পাশ দিয়ে একটা পরিপুষ্ট নির্ঝর গলানো রূপোর মত ঝর ঝর করে গোরের হাওয়ার উদাস গানে তাল দিয়ে চলেছে!

অনেকটা হেঁটে এসে সুধা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই চড়াই-সিঁড়ি ওঠ্‌বার আগে খানিক জিরিয়ে নিচ্ছিল, হিরণ এদিক ওদিক ঘুরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে, "ঐটে বোধ হয় সেই চার্লির পালয়িত্রী মেমের কবর, দ্যাখো।"

সুধা বল্‌লে, "কৈ?"

"ওই যে ওদিকে।"

একটু এগিয়ে গিয়ে সুধা দেখ্‌লে একটী মার্ব্বেল-বাঁধানো কবরের উপর কত গুলি ফুল রেখে দিয়ে চার্লি উপুড় হয়ে প কাঁদছে! হিরণ বললে, "ডাকবো ওকে?"

"আহা, না, না, কোনখানে কেউ দেখে মন হাল্‌কা কর্ত্তে কাঁদচে, কেন ওকে ডাক্‌বে,—আমাদের সঙ্গে তো আ আসেনি।"

"তবে কাঁদুক, এখন তাহলে ফে আমার আবার একটা নেমন্তন্ন আছে দেরী হয়ে যাবে নইলে।"

সুধা উঠ্‌লো, দু-চার ধাপ সিঁড়ি উঠ্‌ শোনা গেল চার্লি "মা" "মা" করে উঠেচে! সে স্বর এমন করুণ, এমন যে শুনেই সুধার চোখে জল এসে ছিল, দিকে চেয়ে লজ্জা পেয়ে সে চোখ ফেল্‌লে!

৪

"এখনো ভেবে দ্যাখ্ চার্লি, চল্ আ দের সঙ্গে,—এখানে থাক্‌লে তুই মরে যাবি!"

সুধার কথার উত্তরে চার্লি মাথা করে বললে, "জী, না, সে দেশে গেলে আমি মরে যাবো।"

"তা কেন রে? সেখানে তুই এখানক মত এমনিই থাক্‌বি, মরবি কেন? তো রয়েচি।"

চার্লি সুধার মুখ-পানে চেয়ে কি-এ ভাবলে, কোনো উত্তর দিলে না;— ঘা-খাওয়া প্রাণে হয়তো সে ভেবেছিল তুমিও যদি মরে যাও?

সুধা তখন ষ্টেশনে চলেছিল, তাই শেষবার চার্লিকে বোঝাতে বসেছিল। হিরণ রেগে গিয়ে বললে, "কেন তুমি একশোবার করে ওই হতভাগাটাকে খোসামোদ করছো—? ও না যায়, না যাবে, তাতে আর ক হয়েছে?"

চার্লি জল-ভরা চোখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুধা বল্‌লে, "এমন বোকা ছেলে আমি জন্মে কখনো দেখিনি।"

ট্রেণে ওঠ্‌বার সময় সুধা ভেবেছিল যে শেষ-সময় চার্লি নিশ্চয়ই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই বিদায় নেবে! কিন্তু সে পাহাড়ী ছেলে,—বেশ সহজভাবেই মোট্‌মাট সব গুছিয়ে তুলে দিয়ে তার পর মাথা নীচু করে সেলাম জানালে!

তার রক্ত-হীন সাদা গালদুটীতে সুধারই স্নেহ-যত্নে তার জাতি-গত লাল রং ফুটে উঠেছিল, আবার সবই নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে ক্ষুণ্ণ মনে সুধা চুপ করে ছিল।

ট্রেণ ছেড়ে দিলে সুধা জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, চলন্ত ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে বনের পাশ দিয়ে চার্লি হেঁটে চলেছে,—অনেকদিন পরে তার হাতে আবার সেই খালি বার্লির টিনের কৌটোটা দেখা গেল!

উঁচু-উঁচু মেঘ-চুম্বী পাহাড়ের আর বন-জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে রক্তিম অস্তালোকচ্ছটা তার বেদনা-ভরা মুখে রং ফলিয়ে দিয়েছিল!

সুধা চেঁচিয়ে বললে, "এ যে বন, চার্লি, এদিকে তুই কোথায় চলেছিস্?"

উত্তরে একটু থম্‌কে ঘাড় নেড়ে সে যে কি বল্‌লে, তা বোঝাই গেল না; কিন্তু চার্লির হাঁটাও থামলো না। বনের মাঝে তখন বর্ষার সন্ধ্যা বেশ ঘটা করেই ঘনিয়ে আস্‌ছিল। হঠাৎ গলা ছেড়ে চীৎকার করে চার্লি কেঁদে উঠ্‌লো—"কোথায় আছ মাগো? নিয়ে যাও আমায়, আর যে আমি পারিনে!"

কিন্তু কোথায় তার মায়ের করুণা-ভরা স্নেহাঞ্চল! ঘন বনের মাঝে তখন সন্ধ্যার অকরুণ কালো পরদাখানি ধীরে ধীরে বিছিয়ে পড়্‌ছিল!

শ্রীনীহারবালা দেবী।

বাদল রাতে

ভাদর নিশির বাদর ধারার
গোপন আদর বুঝবে কে?
(প্রিয়া বই আর বুঝবে কে)
সে যে শুনতো জলের কলধ্বনি
বুকের কাছে বুক রেখে।
যুঁই মালতীর দূর পরিমল,
আন্‌তো অধীর সমীর সজল,
ফির্‌তো অতীত প্রীতির গীতি—
স্মৃতির সুখ ও দুখ মেখে।

কি এক নিবিড় আলস লালস
ছড়িয়ে দিত অঙ্গেতে,
বাদল বায়ে ঝুল্‌তো ঝুলন
দুল্‌তো প্রাণ একসঙ্গেতে।
বাতায়নে মুখ ঝুঁকি হায়
মারতো উঁকি ক্ষণপ্রভায়
উঠতো হঠাৎ চম্‌কে প্রিয়া
চকিত সলাজ মুখ ঢেকে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা-বর্জ্জন

(২)

পথের কথা

স্বরাজের ধারণার রকম-ফেরের কথা আলোচনা করেছি। এবার পথের ধারণাটা কার কিরূপ দেখা যাক্! সত্য কথা বলতে গেলে লক্ষ্যটাও যেমন অধিকাংশ লোকের কাছে অনির্দ্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে পথটাও তেমনি বা ততোধিক। সেটা হবারই কথা। কারণ, টাকা রোজগার করতে হবে, বা সংসার-ধর্ম্ম করতে হবে, এর যেমন একটা গরজ প্রায় সকলেই অনুভব ক'রে থাকে, স্বরাজ লাভ সম্বন্ধে তেমন ঐকান্তিক গরজ প্রায় কারুরই দেখা যায় না! আমাদের অধিকাংশেরই স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা বিদেশী হাওয়ায় উড়ে আসা পর-গাছার বীজের মতো মনের চামড়াটার উপরে অঙ্কুরিত হয়েছে। অন্তরের গভীরতার মধ্যে তার মূল নাই। ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের সমস্ত অস্তিত্বের বুক-ফাটা কাঁদন নয়। স্বরাজের খোলা হাওয়াটা যে আমাদের বেঁচে থাকার মতো বেঁচে থাকার পক্ষে প্রাণ-বায়ু, এ তথ্যটা আমাদের কাছে রাষ্ট্রনৈতিক হাইজিনের পুঁথির বাঁধা গৎ মাত্র। ওটা লাভ করার জন্য আমাদের কোনরূপ সত্যিকার তাগিদ নাই। কাজেই পথের আলোচনা যা হয়ে থাকে, তা কলেজের ডিবেটিং ক্লবের সীমানা ছাড়িয়ে বড় বেশী দূর এগোয় না। যাই হোক একবার সব রাস্তাগুলো ঘুরে আসা যাক্—কোন্‌টা কোথায় পৌঁছিয়ে দেয়।

১। সরকারী সড়ক, রাজপথ বা Royal Road—প্রথমেই অবশ্য সরকারী সড়কটা চোখে পড়ে। খাসা তকৃতকে ঝকৃঝকে প্রকাণ্ড চওড়া ম্যাকাডেমাইস্‌ড্ রাস্তা। তেল ঢেলে ধূলো মেরে রাখা হয়েছে যাতে বর বর যাত্রীদের—শ্রীবিষ্ণু—স্বরাজ-যাত্রীদের সৌখীন পোষাকে তিলমাত্র ময়লা না লাগে। কাঁটা কাঁকর চোর ডাকাত বাঘ ভালুক প্রভৃতি পথের সাধারণ উপদ্রব সমস্তই সযত্নে তফাৎ করা হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। খালখন্দ সব চমৎকার পুলবন্দী ক'রে ফেলা হয়েছে। আম-কাঁঠালের অর্থাৎ চাকুরি ব্যবসা বাণিজ্য ওকালতী প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল-বান গাছের বাগান, কেবল ছায়ায় ছায়ায় যেতে নয় পেট ভরে খেতেও বটে, রাস্তার দুধারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাজভক্তির টিকিট কিনে ডায়ার্কি তার সংশোধিত শাসন-প্রণালীর মোটর-বাসে উঠে পড়। তার পরে নভেলের পাতা উল্টাতেই থাকো বা চোখ বুজে আয়েসই করো কিছু যাবে আসবেনা। দশ বৎসরের মধ্যে একেবারে স্বরাজের গোলক-ধামের সিং-দরজায় উৎরে দেবে।

যদিও দেশের মান্য-গণ্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বিস্তর লোক এই পথে স্বরাজ-লাভের স্বপ্নে উৎফুল্ল হয়ে আছেন এবং তাঁদের জেদে দেখা স্বপন ভাঙানো মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় তা জানি, তবুও কাজটার নিষ্ঠুরতা

স্বীকার ক'রে নিয়েও একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত মনে হয়। স্বপন জিনিষটা যখন সনাতন নয় তখন ভাঙ্গবে একদিন নিশ্চয়ই। সময়-মতো ভাঙ্গলে হয়তো একটু আধটু সুবিধা হ'লেও হতে পারে।

প্রথমেই আমার এই জিনিষটা আশ্চর্য্য ঠেকে যে, স্বরাজ লাভটা ভীমনাগের দোকানের সন্দেশ-খাওয়ার মতো এমন আরামের সঙ্গে চলতে পারে, এতগুলি বুদ্ধিমান জীব এ কথাটা বিশ্বাস করছে কি করে? যীশুখ্রীষ্ট যে বলেছিলেন, Enter ye in at the strait gate; for strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life and few there be that find it. Wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in there at. সে কথাটা কেবল তাঁরই কথা নয়, সমস্ত মানবজাতির অভিজ্ঞতার ঐ এক সাক্ষ্য। উপনিষদও কল্যাণের পথ সম্বন্ধে ঐ এক কথাই বলেন। দুর্গমং পথ-স্তৎ কবয়ো বদন্তি। যাই হোক্, এতগুলি বড় বড় লোক যখন ঐ আরামের পথটাকেই স্বরাজের পথ বলে বিশ্বাস করছেন, তখন তার কারণটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। আমার তো মনে হয় বড় বড় ইংরেজ প্রফে-সরের নোটের সাহায্যে দেশ-বিদেশের দুস্তর পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হয়ে উক্ত নোটের অধম-তারিণী শক্তি সম্বন্ধে আমাদের সুদৃঢ় সংস্কার জন্মে গেছে। আমরা স্বরাজ লাভকেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের সামিল ধরে নিয়েছি।

রিপন সাহেব আমাদিগকে স্বরাজ-স্কুলের লাষ্টক্লাসে বহু সুপারিশ করে ভর্ত্তি করে দেন। তারপর ক্রমশঃ প্রমোশন পেয়ে মর্লি-মশায়ের আমলে স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে উঠি। তার পরে সম্প্রতি মণ্টেগু সাহেব দয়া ক'রে ডবল প্রমোশন দিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে তুলে দিয়েছেন। দশবৎসর এই পড়া পড়ে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড-কৃত "Swaraj made Easy" মুখস্থ ক'রে জলপানি সমেত পরীক্ষা পাশ হতে পারবো, এ ভরসা বিলক্ষণ আছে। তারপরে যথাসময়ে কলেজের ডিগ্রী নিয়ে বেরোনো কিছুমাত্র কঠিন হবে না। আজ-কালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মতো তা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের কোনও বর্গসাধনের কাজে কাণা-কড়া না লাগলেও আমাদের অহঙ্কার পরিতৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট হবে। আমরা যে এত সহজে স্বরাজ লাভ করবো, কাজটাকে পরীক্ষা পাশের মতো করে দেখাই বোধ হয় তার প্রথম কারণ। তোতাপাখীও বোধ হয় সহজে হরিনাম আওড়াতে শেখে বলে নিজেকে পরম হরিভক্ত মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ অনুভব ক'রে থাকে।

আমরা সরকারী পথে অতি সহজে স্বরাজ লাভ করবো, এ বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় জ্যোতিষিক। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যখন শুভদৃষ্টি হয় তখন লগ্নটা বোধ হয় একেবারে নিখুঁৎ ছিল। আসল সুতহিবুক যোগ। কি সোণার চোখেই ইংরেজকে আমরা দেখেছিলেম বলা যায় না। আঘাত বার বার লাগছে তবুও আমাদের ভক্তি টলেও টলছে না। রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রথম

আমলে জাল-জুয়াচুরি ফেরেব-বাজী লুঠ-তরাজ প্রভৃতি সনাতনপ্রথা-সম্মত অধর্ম্মের কোনটাই বাকী রাখেন নি। তার উপর অবশ্য ফাউ ছিল হালফ্যাসানের নানারূপ শুভ্রবেশী অধর্ম্ম। এখনও সাম্রাজ্য রক্ষার অছিলায় ঐ সব জিনিষের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করতে কিছু মাত্র ত্রুটি করছেন না। আমরা যে কেবল সুচক্ষে ঐ সব দেখছি, কেবলমাত্র তাই নয়, স্বহস্তে ঐ সব কাজের সাহায্যও করছি। সুতরাং না জানার দোহাই দেওয়ার উপায় নাই। তা সত্ত্বেও আমরা মনের মধ্যে ঠিক দিয়ে বসে আছি যে, দুর্গতির মরুতট হতে শ্রীবৃদ্ধির শ্যামল কূলে আমাদের দেশটাকে নিয়ে যাওয়ার কাণ্ডারী ক'রে ভগবান ওঁদেরই পাঠিয়েছেন।

এটাও খুব সম্ভব, আমরা আসলে ওটা বিশ্বাস করিনে, মনের উপরিভাগে ভাসা ভাসা একটা ভক্তি-বিশ্বাস জাগিয়ে রাখি মাত্র। তা নইলে আমাদের চাকুরী, ওকালতী ও কারবার-কারখানায় অন্ন ও আরাম ঠিক মতো হজম করা সম্বন্ধে একটু গোল বাধে; কারণ ইংরেজ আমাদিগকে যেটুকু বিদ্যা তার কাজ চালাবার সুবিধার জন্য দিতে চেয়েছিল, দৈবগতিকে তার চেয়ে একটু বেশী শিখে ফেলেছি। হোক না মুখস্থ বিদ্যা, তবু মনের মধ্যে একটা নাড়া দিয়েছে। সেই নাড়াতে অন্তর্যামী এক-আধটা পাশমোড়া দিচ্ছেন ও দু-একবার চোখ মেলেও তাকাচ্ছেন। ঠিক যে জেগে উঠেছেন সে কথা অবশ্য বলা যায় না।

তবুও তিনি চোখ চাইলেই একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা ক'রে পুনরায় ঘুম পাড়াতে না পারলে মাছের মুড়ো ও বন্দুকের হুড়ো দুই জিনিষই হজম করা কঠিন হয়ে উঠে। আমাদের বিশ্বাসটা অন্তর্যামীর নিকট মনের সেই কৈফিয়ৎ। আর ইংরেজও এই বিশ্বাসটাকে কায়েমী করার জন্য ইস্তক-নাগাইত বিবিধ-মত চেষ্টা করছে। তাদের লেখকদের লিপি-চাতুর্য্য ও রাজনীতিজ্ঞদের বচন-বৈদগ্ধীতে আমাদের চোখে ও কাণে এমন ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে যে, যেখানে দেখা উচিত ছিল সরষেফুল, সেখানে দেখছি আমরা পারিজাত প্রসূন; শোনা উচিত ছিল মৃত্যুনিশীথের ঝিল্লীরব, শুনছি সেখানে বিদ্যাধরীর ভূষণ-শিঞ্জন! আমরা চিরকাল পড়ে আসছি ও শুনে আসছি যে, ব্রিটনের খোলা হাওয়ার মায়াস্পর্শে দাসের পায়ের লোহার শিকল আপনি খসে পড়ে। আমরা আমাদের আবেদন ও নিবেদন পত্রে তাক-মাফিক ঐ কথাটা লাগিয়ে বুকের মধ্যে স্ফীতি অনুভব ক'রে থাকি। কিন্তু খতিয়ানের সময় হিসাব মেলেনা, গোঁজা-মিলটা বেরিয়ে পড়ে। পৃথিবীর কার পায়ের শিকল ব্রিটনের স্পর্শে কবে খসে পড়ল তাতো দেখতে পাইনে। বরঞ্চ পৃথিবীর অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোকের পায়ের দিকে নজর পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় সেখানে মোটা-সরু-মাঝারি যতরকমের শিকল আপনাদের অটল অয়স মহিমায় বিরাজ করছে, তার সবগুলিতেই ব্রিটনের শিকলের কারখানার হেড্ আফিস, ব্র্যাঞ্চ আফিস বা এজেন্সি আফিসের ছাপ মারা। ব্রিটনের নিতান্ত ঘরের দুয়ারের প্রতিবেশী আয়ারলণ্ডের পায়ের শিকল ওদের সংস্পর্শে পাঁচশত বৎসর

ধরে কেমন ক'রে খসে পড়ছে, তার ঝঙ্কারটা ইতিহাসের গ্রামোফোন রেকর্ডে কাণ পাতলে কতকটা শুনতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি আবার ঐ শৃঙ্খল মোচনের মহাসঙ্গীতের মাধুর্য্যটা এতদূর বেড়ে উঠেছে যে, পৃথিবী-শুদ্ধ শ্রোতাদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হওয়ার যোগাড় হয়েছে।

যাই-হোক আমাদের দুটো কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখা উচিত। (১) ইংরেজের পক্ষে আমাদিগকে সত্যিকার স্বরাজ দেওয়া সম্ভব কিনা? (২) দৈবগতিকে তারা যদি দিয়েই ফেলে, আমরা পাবো কি না?

১। ইংরেজের পক্ষে আমাদিগকে প্রকৃত স্বরাজ দেওয়া সম্ভব কি না?

পূর্ব্বে যা লেখা হয়েছে তা থেকেই প্রশ্নটার উত্তর যে কি হবে সকলই অনুমান করতে পারবেন। তবুও আর একটু খোলসা আলোচনা ক'রে দেখা যাক্। প্রথমে নজীর অনুসন্ধান ক'রে দেখা যাক্। ইংরেজ যদি আর কাউকে কখনও স্বাধীনতা বা স্বরাজ দিয়ে থাকে তবে আমাদিগকেও না দিতে পারে এমন নয়।

কিন্তু নজীরের বইএর উপসংহারের শেষ অক্ষর হতে আরম্ভ ক'রে উপক্রমণিকার প্রথম অক্ষর পর্য্যন্ত তো উজান পাড়ি দেওয়া গেল, অনুকূল নজীর তো একটাও দেখলাম না। প্রতিকূল নজীরের অবশ্য কোনই অসদ্ভাব নাই। দু-রকমের দুটো দেখলেই বেশ জলের মতো জিনিষটা বোঝা যাবে। প্রথম আয়ারল্যাণ্ড—পায়ে ধরা ছেড়ে সে এখন ঘাড়ে ধরেছে। ব্রিটিশ বুনো ওলের উপযুক্ত সিনফিনিস্‌মের বাঘা তেঁতুল ব্যবস্থা করেছে। দ্বিতীয় আমেরিকা। বহুদিন হলো সে আপনাকে ব্রিটনের কবল হ'তে মুক্ত করেছে বটে, কিন্তু সেটা কেবল কবলের যথেষ্ট বলের অভাব-বশতঃ। ওর মধ্যে দানের কোনই স্থান নাই অর্থাৎ দান শব্দটার সোজাসুজি চলিত অর্থে। কিন্তু শব্দটার আভিধানিক ত্যাগ অর্থ গ্রহণ করলে, একটা দান-ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়ে ছিল বটে, কিন্তু তার কর্ত্তা ব্রিটন নয়, আমেরিকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নজীর বড় সুবিধার নয়। যে ব্যবহার আয়ারলণ্ড বা আমেরিকা পায়নি আমরা তার প্রত্যাশা করবো কিসের জোরে? "দৃষ্ট" কোনও কিছুর জোর তো দেখতে পাইনে! "অদৃষ্টের" জোর যদি থাকে সে কথা আমি বলতে পারবোনা। ভৃগুসংহিতা ও হনুমান-চরিত্র এ দুয়ের কোনটাতেই আমার কিছুমাত্র দখল নাই।

নজীরের মধ্যে এক দক্ষিণ আমেরিকার বোয়ারদিগের নজীর দেখতে পাওয়া যায়, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু সেতো "উড়ো খই গোবিন্দায় নমো।" উক্ত খইএর উপহার যে গোবিন্দ-ভক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কোনও ভক্তি-শাস্ত্রই এ কথা অনুমোদন করবেনা। ভারতবর্ষ যদি কোনও দিন ইংরেজের পক্ষে উড়ো খইএর সামিল হয়ে উঠতে পারে—মহাত্মা গান্ধীর কল্যাণে সেরূপ হওয়া কিছুমাত্রই বিচিত্র নয়—তাহলে গোবিন্দায় নমো বলে ভক্তি জাহির করা তাদের পক্ষে অনিবার্য্য স্বীকার করি।

আর একটা ভাবার কথা আছে। ইংরেজ যে পথ দিয়ে জাতীয় সার্থকতা লাভ করেছে, সে পথের প্রতি ধূলিকণা আপনার বুকের

রক্তে রাঙিয়ে তবে তাকে এগোতে হয়েছে। এখনো হচ্ছে। সে যে অমন কষ্টলব্ধ জিনিষ-টাকে পথের ধারের কুলগাছের ফলের সামিল ক'রে দেবে, পথচল্‌তি লোক যার খুসী দু-চারটে পেড়ে খেয়ে যাবে, এমন তো কিছুতেই মনে হয় না। প্রতিপক্ষ বলবেন, এমন কি দেখা যায়না যে লোক ছেলেবেলায় অন্নের জন্য হা হা ক'রে বেড়িয়েছে, অবস্থা ভাল হলেই নিজের কষ্টের কথা স্মরণ ক'রে সে অপরের জন্য অন্নসত্র খুলে দিয়েছে। এ কথা অবশ্যই মানতেই হবে। কিন্তু ইংরেজের রাজছত্র যে আমাদের জন্য স্বরাজ-ছত্রে পরিণত হবে, এ লক্ষণ তো বিন্দু মাত্র দেখা যায় না। আর যদিই বা হয়, দূরে হতে ইংরেজের বদান্যতার বাহবা দিয়ে আবার দৈনিক পাথর ভাঙার কাজে লেগে যাবো। ছত্রের অন্নে পেট ভরে বটে কিন্তু দান দিতে হয় আপনার মনুষ্যত্ব গৌরব। আমি সেজন্য একেবারেই প্রস্তুত নই। Man liveth not by bread alone।

আর এক দিক দিয়ে বিষয়টাকে দেখলে ঐ পথে স্বরাজ-লাভের আশা যে নিতান্তই প্রকাণ্ড প্রত্যাশা, সে কথা বুঝতে কারুরই বাকী থাকবে না। 'স্বরাজ' কথাটা কাগজে-কলমে তিনটি অক্ষর মাত্র, সুতরাং কাগজে-কলমে যদৃচ্ছাক্রমে ও-জিনিষটার দান-খয়রাৎ আদান-প্রদান হতে কিছুমাত্র বাধা নাই। ষ্টাম্পের মাশুলও লাগেনা। তবে কথাটা ব্যবহার সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা ছিল। খোদ ভারত-সম্রাটের শীল-মোহরের কল্যাণে সম্প্রতি সেটাও দূর হয়েছে। কিন্তু কথাটার মানে খতিয়ে দেখতে গেলেই ঐরূপ যদৃচ্ছা আদান-প্রদান ব্যাপার যে কিরূপ হাস্যকরভাবে অসম্ভব, তা সহজেই বুঝতে পারা যাবে। একবার কথাটার মানে খতিয়ে বুঝে দেখার চেষ্টা করা যাক্।

আমরা সত্যিকার স্বরাজ লাভ করলে সব আগে নিশ্চয়ই শাসন-যন্ত্র-সংস্কার ও তার ব্যয়-ভার লাঘবের কাজে লেগে যাবো। এখন শাসনের কাজেই দেশের আয়ের প্রায় সবটা খরচ হয়ে যায়, পালনের খরচা বড় বেশী বাকী থাকেনা। নানা রকমের লাগাম ও ডোর কিনতেই তহবিলটা তলায় ঠেকে, কাজেই ঘোড়াটার দানার বরাদ্দ কমাতে হয়। এক সমর-বিভাগই অর্দ্ধেক প্রায় গ্রাস ক'রে ফেলে, তার উপর পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রক্ত-বীজের ঝাড় আছেন। দেশটা গরীব, কাজেই স্বরাজ পেলে শাসন-প্রণালীটাও গরীবানা চালেই চালাতে হবে। কাজেই শ্বেতহস্তীর যতই বাহার থাকুকনা কেন, ও সখটা আমাদের ছাড়তেই হবে। সুতরাং ঐ সব বেকার শ্বেতহস্তীর ভরণ-পোষণের ভার নিতে হবে ইংলণ্ডকেই। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থায় অতগুলি জ্ঞাতি-কুটুম্ব প্রতিপালন যে কিরূপ কাণ্ড ঘটাবে তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ পরের ধনে পোদ্দারী ও পরের ঘরে সর্দ্দারী ক'রে ঐ সব জ্ঞাতি-কুটুম্বের পেটের বহর ও মেজাজের উগ্রতা দুইই বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক রূপে।

আমাদের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হবে নিশ্চয়ই দেশের ধনবৃদ্ধির চেষ্টা করা। এই কাজের তিনটী অঙ্গ। প্রথম দেশে অধিক ধন উৎপন্ন করা। দ্বিতীয়, দেশের যে ধন অন্যায়ভাবে বিদেশে বেরিয়ে যাচ্ছে তার প্রতিরোধ। তৃতীয়, বিদেশের ধন প্রচুর পরিমাণে আমদানী

করা। তৃতীয়টার বিষয়ে যাই হোকনা কেন, প্রথম দুটী কাজের সোজা বাংলা মানে ইংরেজকে হাতে না মেরে ভাতে মারা। ইংরেজ যে উপায়ে আমাদের দেশের বস্ত্র-শিল্প ও অন্যান্য অনেক শিল্পের দফা রফা করেছেন সে কথা মনে ক'রে কেউ যদি সে সময়ে একটু শোধ তোলার ইচ্ছা করেন, তা হলে রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে নিতান্তই যে অন্যায় হবে সে কথা বলা যায় না। কিন্তু সে কথা ভুলতে সক্ষম হ'লেই ক্ষমার পরিচয় দেওয়া হবে নিঃসন্দেহ। যাই হোক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে এই—যে দেশে যে জিনিষ উৎপাদনের স্বাভাবিক সুবিধা আছে, সে দেশ তাই উৎপন্ন করবে, যে জিনিষ উৎপাদনের সুবিধা নাই তা অপরের নিকট হতে কিনবে। কিন্তু মানুষ যেমন প্রায় সকল বিষয়েই যথাসাধ্য প্রকৃতির নিয়ম ওলট পালট ক'রে দিয়েছে, দুর্দ্দমনীয় লোভের বশে এ-ক্ষেত্রেও তার কিছু ত্রুটি করেনি। বাণিজ্য-তরীকে এখন দেশ-বিদেশে টেনে নিয়ে চল্‌ছে রণতরী। তার পক্ষে সেরূপ না ক'রে যে উপায়ান্তর নাই। যন্ত্রবিজ্ঞানের যে দানবকে সে মাল উৎপাদনের কাজে লাগিয়েছে, সে উৎপন্ন করছে অজস্র। কিন্তু তার সঙ্গে সর্ত্ত এই যে, সে একদণ্ডও চুপ ক'রে থাকবেনা। তার কল-কারখানা বন্ধ হলেই সে ঘাড় মটকাবে। কাজেই এই অজস্র উৎপাদিত মালের জন্য চাই অসংখ্য খদ্দের। সুতরাং ছলে বলে কলে কৌশলে পৃথিবীর অনেকগুলি দেশকে মাল-উৎপাদন কাজে একান্ত অক্ষম ক'রে রাখা আত্মরক্ষার পক্ষেই একান্ত আবশ্যক। সকলেই জানেন, জার্ম্মানি গত যুদ্ধের কৈফিয়ৎ খাড়া করেছিল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য। সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু সে আত্মরক্ষাটা সাধারণ আত্মরক্ষা নয়, পূর্ব্বোক্ত দানবের হাত হতে আত্মরক্ষা। ইংলণ্ডের জোর কপাল। ঠিক মাহেন্দ্র ক্ষণেই ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড হাটটা তার হস্তগত হয়েছিল। এখানকার তিরিশ কোটী লোক তার পূর্ব্বে সকলেই কিছু নগ্ন বর্ব্বর বা নাগা সন্ন্যাসী ছিল না। প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি নিজেরাই উৎপন্ন করতো। কিন্তু ইংরেজের আগমনের কিছুদিনের মধ্যে তাঁতী ও অন্যান্য শিল্পকার-গণের মধ্যে দারুণ স্মৃতি-বিভ্রম রোগের এপিডেমিক আক্রমণ হলো। সকলেই নিজের নিজের ব্যবসায় ভুলে যেতে লাগল। কাজেই ইংলণ্ডকেই আমাদের ঐ সব জিনিষ সরবরাহের ভার নিতে হলো। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যে ইংলণ্ড ইয়োরোপীয় শক্তি-সমূহের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর উপরদিকে বা জোর দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচের দিকে ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সে উঠল প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম স্থানে। ইংলণ্ডের প্রাধান্য নির্ভর করছে টাকা ও জাহাজের উপর। এই দুয়েরই জন্ম হয়েছে তার বিপুল বাণিজ্যের কল্যাণে। কিন্তু স্বরাজ পেলে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক নিয়মটাই মানবো। কোনও-রূপ জোর-জবরদস্তী চালাকির ধার ধারবোনা। কাজেই সর্ব্বপ্রথম বন্ধ হবে ম্যান্‌চেষ্টারের বড় বড় কাপড়ের কল, তার পরে শেফিল্ড বার্ম্মিং-হামের লোহা-লক্কড়ের কারখানা। তারপর ক্রমে ক্রমে আরো অনেকে ঐপথ অনুসরণ করবে। যা বাকী থাকবে তার আয় হতে ইংলণ্ডের নেকটাইএর কড়িও জুটবে কিনা সন্দেহ।

এ সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনা করার দরকার নাই। যেটুকু লেখা গেল, তার থেকেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন, স্বেচ্ছায় ইংরেজ আমাদের হাতে স্বরাজ তুলে দিবে, এ আশা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত। তাই ব'লে আশা করতে আমি কাউকে অবশ্য বারণ করছিনে। কারণ বারণ করলেও কেউ শুনবেনা। বিশেষতঃ আশা ধরে থাকার আরাম আছে যথেষ্ট এবং সেজন্য টেক্‌সও লাগেনা এক পয়সা।

২। ইংরেজ বদান্যতাবশতঃ স্বরাজ দিলেও আমরা পাবো কি না?

মনে কর যদি কোনও শুভ মুহূর্ত্তে ইংরেজের এমন শুভবুদ্ধির উদয় হয় যে, আমাদের হাতে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা—ওঁ বিষ্ণু—স্বরাজ সমর্পণ ক'রে জেরুজেলাম-বাসী হয়, তাহলেও ও-পদার্থ আমরা পাবো কিনা এবং আমাদের ভোগে লাগবে কিনা। যাঁরা স্বরাজ জিনিষটার স্বরূপ বিন্দুমাত্র বুঝেন তাঁদের নিকট এ প্রশ্নটা, সোণার পাথরবাটি হ'তে পারে কিনা,এই প্রশ্নের মতোই হাস্যকর। ইংরেজ আমাদিগকে সমস্ত ভারত-সাম্রাজ্য—ভারত সাম্রাজ্য—কেন তাদের সূর্য্যাস্তবিহীন নিখিল সাম্রাজ্য খয়রাৎ করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ কিছুতেই দিতে পারে না। দেওয়ার যো নাই। স্বরাজের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের জমিতে নয়—আমাদের মনে প্রাণে চরিত্রে, আমাদের সাধনায় আশায় আকাঙ্ক্ষায় আমাদের আদর্শে—এমনকি আমাদের স্বপ্নে। 'রাজ' তো পড়েই আছে কিন্তু যত দৈন্য-দুর্ব্বলতা আমাদের 'স্ব'য়ে। এ দৈন্য-দুর্ব্বলতা আমাদের যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত কলুষ কলঙ্ক পাপের ফলে। একান্ত নিষ্ঠাভরে পরম ধৈর্য্যে একাগ্র সাধনায় পলে পলে ঐ কলঙ্কের কালি বিন্দু বিন্দু ক'রে ক্ষালন করতে হবে; পাপ ও অবসাদের নাগপাশ বন্ধন একটী একটী ক'রে মোচন করতে হবে। মহান দুঃখ পরম ত্যাগকে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়ে আপনার আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন, ইংরেজ আমাদের পাপের বহির্বিকাশ মাত্র। কি হবে ইংরেজকে তাড়িয়ে বা ইংরেজ স্বেচ্ছায় চলে গেলে যদি আমাদের সেই পাপের ভারা পূর্ণই থাকে। সেই পাপ জাপান, আফগান, জার্ম্মানি, বল্‌শেভিক বা অন্তর্বিপ্লবের মূর্ত্তি ধরে আমাদের উপর প্রভুত্ব করবেই। ক্ষুদ্র স্বার্থের তুচ্ছ আরামে, একান্ত আলস্যে চোখ বুজে সে পাপের পথ বেয়ে এই দুর্দ্দশার মাঝখানে এসে পৌঁছেছি, সেই পথকে পুণ্যের পথে পরিণত করতে করতে আমাদিগকে ফিরতে হবে তার প্রত্যেক ধূলিকণাটীকে মাড়িয়ে, মহাদুঃখের পরিচয় নিয়ে নিয়ে, একে একে স্বার্থ বলি দিতে দিতে আপনার সবখানিকে জাগিয়ে রেখে। সেই তো আমাদের প্রায়শ্চিত্ত।

তারপর আর একটা কথা আছে। আমরা যে পরাধীন হয়েছি এবং পরাধীনতার পাশ কিছুতেই মোচন করতে পারছিনে, তার কারণ আমাদের বাহুবল বা বুদ্ধিবলের অভাব নয়। আমাদের জাতীয় আত্মা তেমন প্রবল হয়নি ব'লে, দেশাত্মবোধ তেমন পরিস্ফুট ছিল না ব'লেই আমাদিগকে এই চরম দুর্গতির মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হচ্ছে। যে জাতির প্রবল দেশাত্মবোধ থাকে সে বার বার যুদ্ধে পরাভূত হতে পারে, কিন্তু কখনই বহুদিন

পরাধীনতা সহ্য করেনা। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ কোনও দিন দেশাত্মবোধের অনুশীলণ করে নি—ও জিনিষটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেনি। মুসলমানেরও দেশাত্মবোধ তেমন পরিস্ফুট ছিল না বটে, কিন্তু বিজয়ী ধর্ম্মের প্রবল উৎসাহ তার সে অভাব ভালরকমেই পূরণ করেছিল। ইংরেজের দেশাত্মবোধের তুলনা নাই! যেদিন ইংরেজ ডাক্তার বৌটন বাদসাহ ফেরোক্‌শিয়রের কন্যার চিকিৎসা ক'রে পুরস্কার-স্বরূপ ধন-সম্পত্তি না নিয়ে ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রার্থনা করল, সেইদিনই বুঝা গেল এই জাতই ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যের অধিকারী হবে। ইংরেজের একচ্ছত্র আধিপত্যের ছায়ায় বাস ক'রে এবং এক পাদুকার পীড়ন সহ্য ক'রে আমাদের একরকমের দেশাত্মবোধের উদ্বোধন হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেটা আসল জিনিষ নয়—একটা জোড়াতাড়া দেওয়া কৃত্রিম ভাব মাত্র। ওর উপর কোনও ভরসা নাই। যেদিন উপরের চাপ সরে যাবে, কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো ঠিক নাই—আমাদের মিথ্যা দেশাত্মবোধ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে। ঐ মিথ্যাকে আমাদের সত্য ক'রে তুলতে হবে। আমরা আমাদের শাসন-সংরক্ষণ, বিচার-শিক্ষা, স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে, নানা প্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে নানারূপ ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে সফলতার দিকে যতই এগোতে থাকবো, ততই আমাদের প্রকৃত দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হতে থাকবে। একব্রত, একলক্ষ্য, এক ব্যর্থতা, এক সার্থকতা, দেশাত্মবোধের বিকাশের পক্ষে এগুলি যে কেবমাত্র অত্যাবশ্যক তা নয়, একেবারে অপরিহার্য্য। পঞ্চায়তের বিচারে ন্যায়ের তুলাদণ্ড একটু আধটু হেলতে পারে, জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার পাণে চুণের প্রয়োগের মাত্রা যথাযথ নাও হতে পারে, চরকার সুতোর কাপড়ে সভ্যতার কোমল অঙ্গে আঘাত লাগতেও পারে, কিন্তু তবুও ঐগুলিকে আমাদের অবলম্বন করতেই হবে। নতুবা আমাদের আত্ম-কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস ও দেশাত্ম-বোধ কোনও দিনই উদ্বুদ্ধ হবে না।

দেশের কাজের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই দেশাত্মবোধ স্থায়ীভাবে জেগে উঠে। অন্য পথ নাই। গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ দ্বারা হবে না—উত্তেজনা-পূর্ণ কবিতা দ্বারা হবে না—'বঙ্গ আমার জননী আমার' পথে পথে গেয়ে বেড়ালেও হবে না।

ইংরেজ যে আমাদের প্রকৃত স্বরাজ দিতে পারে না, কেবলমাত্র তাই নয়—আমাদের দেশাত্মবোধ যতদিন না পূর্ণ-পরিণতি লাভ করে, ততদিন ইংরেজের এখানে থাকা এবং কতকটা প্রতিকূলভাবে থাকাই আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ইংরেজ যদি আমাদিগের উপর কোনওরূপ শোধ তুলতে চায়—যদি আমাদিগকে চিরদিনের মতো স্বরাজ লাভ হ'তে বঞ্চিত করতে চায়—তাহলে তার একমাত্র উপায়, এই সময়ে পোঁটলা-পঁটলী বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দেওয়া। এতে তাদের যে বিশেষ বেশী ক্ষতি হবে তা মনে হয়না, কারণ তাদের আধিপত্যের মায়া একদিন কাটাতেই হবে। কেবল দু-একদিনের আগু-পিছু মাত্র। কিন্তু আমাদের স্বরাজ লাভের আশা চিরদিনের

মতো না হোক্, অন্ততঃ বহুদিনের মতো অন্তর্হিত হবে।

আসল কথা, দেবার মতো জিনিষ কেউ কোনও দিন কাউকে দিতে পারে নি—দিতে পারেও না।

অপরে দয়া-পরবশ হয়ে খুব ভাল চশমা দিতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিটা আপনাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়—পুষ্টিকর খাদ্য দিতে পারে, কিন্তু হজমটা আপনাকেই ক'রে নিতে হয়—খুব দামী দামী ওষুধ দিতে পারে কিন্তু স্বাস্থ্যটা আপনাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়—সুখের আয়োজন আসবাবে ঘর ভ'রে দিতে পারে, কিন্তু সুখটা আপনার প্রাণ হ'তেই সৃষ্টি করতে হয়। ইংরেজ বড়-জোর আমাদের স্বরাজ লাভ বিষয়ে কতকটা সাহায্য করতে পারে—তার বেশী কিছু পারে না—আশা করাও পাগলামি।

Evolution ও Revolution। আর একটা কথা বলেই এই প্রবন্ধটা শেষ করবো। এই সব পাণ্ডিত্যাভিমানী মহাত্মা সর্ব্বদাই বলে থাকেন তাঁরা Evolution (অভিব্যক্তি) এর পথ দিয়ে স্বরাজ লাভ করতে চান—Revolution (বিপ্লব) এর পথ দিয়ে নয়। ইংরেজের সহকারিতা, মণ্টেগু-প্রদত্ত রিফর্ম্‌কে সফল ক'রে তোলা তাঁদের মতে এভোলিউসনের পথ। সহ-যোগিতা বর্জ্জন ক'রে বরখাস্ত করার চেষ্টা রেভোলিউসন। কথাটা শুনতে বেশ। ডারউইন, স্পেনশার প্রভৃতির কল্যাণে Evolution কথাটার চারধারে এমন একটা শ্রদ্ধা ও সম্মানের আকাশ রচিত হয়ে গেছে যে, ঐ কথার দোহাই দিয়ে অনেক মিথ্যা, অর্দ্ধ-সত্য পার হয়ে যায়ে স্থতরাং যে জিনিষটাকে তাঁরা এভোলিউ বলে চালাতে চান তার সম্বন্ধে এভোলি সনের নিয়মগুলি খাটে কি না তলিয়ে দেখা দরকার। এভোলিউসনের নিয়ম কা করে প্রাণের তত্ত্বের উপর। মূলে জীবনে বীজ থাকা চাই। অনুকূল ও প্রতি পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতে সেই নানা বৈচিত্র্যে বিকাশ লাভ করে। দি গোড়াতেই যদি প্রাণের তত্ত্ব না থাকে জীবনের বীজ না থাকে, অভিব্যক্ত কে? বিকাশ লাভ করবে কি? মণ্ট-ফে রিফর্ম্ পাঁচ মিস্ত্রীর হাতে গড়া পাঁচমিশা রকমের রঙিন পুত্তলিকা মাত্র। তা নানারূপ দামী পোষাকে সাজিয়ে খোকাদের ছেলেখেলা চলতে পারে—কি সে যে জীবন্ত মানুষের মতো কাজে লাগ এরূপ আশা করা পাগলামি মাত্র। সম্বন্ধে যা খাটে তা এভোলিউসনের নি নয়, বোধোদয়ের উক্তি। "পুত্তলিকার দ আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনি পায় না" ইত্যাদি। Revolution বা বি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার এ স্থান ন তবে এইটুকু বলতে পারি, সংসারের আদু খোকাবাবুরাই ও-জিনিষটাকে জুজুর ভয় করে, মানুষের মতো মানুষে করে না Revolution সুপ্ত প্রাণ-শক্তিকে জাগি তোলার অমোঘ উপায়। সে যখন একবা জেগে ওঠে, তখন তার বিকাশ ও গঠনে কাজ আরম্ভ হয়—Evolution-এর অনু নিয়মানুসারে।

Conscience of the British peop—এঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমরা রাজ পাবে এ ভরসার ভিত্তি কি? এবং উপায়টাই বা কি? এঁরা অম্লান বদনে উত্তর দিয়ে থাকেন, উপায় appeal to he conscience of the British people ংলণ্ড-বাসীর ধর্ম্মবোধের উদ্বোধন। জগতের লোকের ধর্ম্ম-জ্ঞানকে জাগিয়ে জগতের কল্যাণ াধন করতে হবে,—অন্য উপায় নাই—মহাত্মা ান্ধীর কৃপায় এ-কথা বুঝতে আজ কারো বাকী াই। কিন্তু বৃটিশ নেশনের ধর্ম্মবুদ্ধি জাগিয়ে তালার পথটা কি! সে কি তোমাদের ডিপ্লো-মাটিক মিথ্যা দরখাস্তের সেতু-বন্ধন? জয় াধে দুটো ভিক্ষে পাই মা? না God save he Kingএর কোরাসে কপট উচ্ছ্বাস-ভরে যোগ দেওয়া? এ পথও যে প্রশস্ত পথ তা ীকার করি, কিন্তু সেটা লাটগিরি বা লর্ড

উপাধি লাভ করার পক্ষে। এ পথের পথিকরাও ফল লাভ ক'রে থাকে সন্দেহ নাই এবং সেটা হাতে হাতে। Verily I say unto you they have their reward. কিন্তু ধর্ম্মের দ্বারাই ধর্ম্মবোধ জাগে, সত্যই সত্যকে প্রবুদ্ধ ক'রে থাকে, আলো হ'তেই আলো জ্বলে —অন্ধকার হ'তে নয়। আমরা দেশ-শুদ্ধ লোক দেশের জন্য যদি একটা প্রকাণ্ড ত্যাগের পরিচয় দিতে পারি, পরম দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিতে পারি, ওদের চেয়ে বড় হয়ে ওদের বিস্ময়াকুল শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে তুলতে পারি, তবেই ওদের ধর্ম্মবোধকে জাগাতে সমর্থ হবো, unless "your righteousness shall exceed the Righteousness of the Pharisees ye shall not enter the kingdom of Heaven."

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

প্রত্যাবর্ত্তন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে ছোট একখানি পল্লী! দৃশ্য-হিসাবে পল্লীখানির কোন মনোহারিতা ছিল না। সেইখানে আলোক-নাথের ইচ্ছানুসারে তাহারই আত্মীয়-সম্পর্কীয়া এক প্রৌঢ়ের গৃহে অরুণের থাকিবার স্থান হইল। তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হয়—কিন্তু উপায় কি! একগুঁয়ে অবাধ্য অরুণ যখন নিজের মঙ্গল বুঝিবে না, তখন জোর করিয়া সদুপদেশ গিলাইয়া আলোক-নাথ কেমন করিয়াই বা তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-জীবন গঠনের উপায় করিয়া দিবেন? ইংরাজী বিদ্যার শোকে সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। ছেঁড়া কাঁথায় বসিয়াও অনেকে রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন দেখে যে! পাশ করিলে জজিয়তীই বা মিলিয়া যায়! ওরে অবোধ, যদি তাই হইবে, তবে বঁড়শীর বিদ্ধ মৎস্য অগাধ জলে পলাইবে কেন? একটা চলিত কথা আছে, জিস্‌কো না দেয় খোদাতালা, উস্‌কো দেনে

না শকে আসফউদ্দৌলা। খোদাতালা না দিলে দান-বীর আসফউদ্দৌলাও কাহাকেও কিছু দিতে পারেন না।

ভগবান্ না দিলে মানুষের সাধ্য কি, কেহ কাহাকে কিছু দিতে পারে! এই যে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণই ত এই আলোকনাথ! মানুষে ঠকাইতে চাহিলে হইবে কি? দেনেওয়ালা যা তাহার ভাগ্য-ফলকে পাওয়ার তালিকাই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এই অমত ও বিরুদ্ধ ব্যবহার-সত্ত্বেও আলোকনাথকে আমরা দোষ দিতে পারি না। সে মানুষ। মানুষের লোভ, মোহ, ভয় অবিশ্বাস—সবই তাহার চিত্তে বিদ্যমান। নিজের স্বার্থ কে না চায়? আর স্বার্থের পথের প্রধান অন্তরায়কে কে-ই বা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে পারে? আমরা সত্য কথা বলিব। অরুণের চোখের জলে সত্যই তাহার মন ভিজিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে সে যে তাহার স্বার্থের পথে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, নিজের ও হিতৈষিবর্গের এ ধারণা সত্ত্বেও সে তাহাতে কোন বাধা দিল না। কাছে রাখিতে সাহস না করিলেও গ্রামান্তরে তাহারই জ্ঞানিত লোকের আশ্রয়ে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষা-লাভের সুযোগ করিয়া দিল—ইহার অধিক চিরশত্রু প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য কে আর বেশী কি করিতে পারে? অপরিচিত দেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক-দের সংস্রবে অজ্ঞাত জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহে প্রথম প্রথম অরুণের খুবই কষ্ট হইয়া-ছিল। অপরিমিত ভোগ-সুখ-পালিতের পক্ষে দরিদ্র গৃহের সহস্র অভাব ও অসুবিধা প্রতি পদক্ষেপে বাধা জন্মাইতে ছিল। সহিষ্ণু শান্তচিত্ত বালক তাহার এতটুকু আভা বাহিরে প্রকাশ করিত না। অদৃশ্য অদৃষ্টের সে যখন মানিয়াই লইয়াছে, তখন ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট পথে কণ্টক-গুল্ম, খানা-ডোবা দেখিয়া মুখ ফিরাইলে চলিবেই বা কেন? পথের শেষে যদি পৌঁছিতেই হয় ত বীরের ন্যায় উঁচু মাথা সরল গতিতে পৌঁছানো চাই! পায়ে-পায়ে বাধিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে হুঁচট খাওয়ায় যাত্রার সার্থকতা কোথায়?

তবু এই নূতন আশ্রয়ে তাহার একান্ত অভাব অনুভূত হইত, সঙ্গী-হীনতায়। সংসারের অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ যতই থাকুক, উপস্থিত মনের অবস্থায় সে সকলের দুঃখ সে তখন তেমন করিয়া আর অনুভব করিতে পারিতেছিল না। কেবল সময় সময় নিজেকে বড় একা, বড় অসহায় মনে হইত।

বাড়ীর কর্ত্রী মুক্তা ঠাকুরাণী অত্যন্ত রাশ-ভারি মানুষ। কাজের কথা ছাড়া তিনি কখনো বাজে কথা একটিও কহিতে ভাল বাসিতেন না। তা-ছাড়া ইহাঁর সহিত কি কথাই বা সে কহিবে? তাহার মনের অভাব মিটাইবার শক্তি কি ইহার আছে? বাড়ীতে একটি ঠিকা ঝী দুইবেলা বাসন মাজিয়া উঠানে-দালানে গোবর-মাটী লেপিয়া বাজার করিয়া দিয়া যাইত এবং রাত্রে মুক্তা ঠাকুরাণীর কাছে আসিয়া সে শয়ন করিত। বাড়ীতে তাহার ছেলে আছে। বৌটি ছেলেমানুষ—ঘর-কর্ণা দেখিতে হয়, তাই বাকী সময়টুকু সে নিজের বাড়ীতেই থাকিত। অরুণ আসিলে তাহার রাতের চৌকি দেওয়ার কাজে ছুটী মিলিল। অল্প-বয়সী হউক, তবু

পুরুষ মানুষ একজন বাড়ীতে রহিল ত, আর কি-ই বা এমন সোনা-দানা, শাল-দোশালা তাঁহার আছে,—যাহার জন্য এত ভয়!

মুক্তা ঠাকুরাণীকে গ্রামের লোকে সম্মান করিত। তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখে এমন একটি তেজস্বিতার ভাব ছিল, যাহাতে ছেলে-বুড়া সকলকে তিনি অনায়াসে বাধ্য করিতে পারিতেন। মনে যত বড় অনিচ্ছাই থাক্, মুখ ফুটিয়া তাঁহার কাজে বা কথায় কেহ কখনো প্রতিবাদ করিতে পারিত না। পাড়ার বধূ-কন্যারা দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিলে সসঙ্কোচে বেচাল সংশোধন করিয়া লইত। সম্বোধনসূচক পদবী-যোগে কেহ জেঠাইমা, কেহ খুড়ী, কেহ মাসি, কেহ দিদি প্রভৃতি পাতানো সম্পর্ক ধরিয়া "ঐ লো ঐ—আস্‌চেন" বলিয়া চোখে চোখে সতর্কতার টেলিগ্রাম পাঠাইয়া বিশেষ ভাবে সকলে নিজ নিজ কার্য্যে সতর্ক, মনোযোগী হইত। না জানি, মুক্তা ঠাকুরাণী এখনি আবার কাহার কি ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া দুই কথা শুনাইয়া দিয়া যাইবেন! কিছুই ত বলা যায় না। লেখা-পড়া হিসাব-বোধ বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসায় পাড়ার মধ্যে মুক্তা-বামুনির নাম বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শোনা যায়, মামলা-মকর্দ্দমা-সংক্রান্ত ব্যাপারেও পাড়ার প্রাচীনেরা নাকি তাঁহার পরামর্শ লইয়া থাকেন। পাড়ার দলাদলি ব্যাপারেও তাঁহাকে না বলিয়া কাহারো কোনরূপ রফা করিবার সামর্থ্য ছিল না।

মুক্তা ঠাকুরাণী এই গ্রামেরই মেয়ে। অন্য সন্তান-সন্ততি কিছু না থাকায় বাপ গৃহ-জামাতা করিয়া তাঁহার স্বামীকে ঘরেই রাখিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, এই উপায়ে ছেলে-মেয়ের সব সাধই মিটাইয়া লইবেন,—বাল-কণ্ঠের কল-কাকলীতে তাঁহার গৃহপূর্ণ হইবে। কিন্তু মানুষের আশা প্রায়ই পূর্ণ হয় না। যৌবনাগমের পূর্ব্বেই মুক্তা ঠাকুরাণী বিধবা হইয়া মা-বাপের সকল সাধের শেষ করিয়া দিলেন; এবং পতি-গৃহের সহিত সেইদিন হইতে সম্বন্ধ চুকিয়া গেল। পল্লীগ্রামে ঝিউড়ী মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ আঁটা-আঁটি নাই। মুক্তা ঠাকুরাণী অসঙ্কোচে সকলের সহিত কথা কহিতেন, সবার সম্মুখে বাহির হইতেন। তবু সেই তেজস্বিনী বাল-বিধবার সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও কেহ কখনো নিজের কোন কথা বলিতে পারিত না। বাপের কাছে তিনি লেখা-পড়া শিখিয়া ছিলেন। দুপুর-বেলা রামায়ণ, মহাভারত, শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পড়িয়া পাড়ার মেয়েদের শুনাইতেন। তাঁহার গৃহে দ্বিপ্রহরিক বৈঠকের সভাটি বড় ছোট-খাট হইত না। সামান্য জমি-জমা যাহা-কিছু ছিল, তাহাই বিলি করিয়া প্রজা বসাইয়া কোন রকমে সংসার চালাইতেছিলেন, খাজনা-আদায় প্রভৃতিও তিনি নিজে করিতেন। দূর হইতে উন্নত-নাসা শুভ্রবসনা শ্যাম-কান্তি বিধবাকে আসিতে দেখিলে দেনাদার তটস্থ হইয়া পড়িত; মুক্তা ঠাকুরাণীর পাওনা যেমন করিয়াই হউক এখনই ফেলিয়া দিতে হইবে। 'দিচ্চি' 'দিব' এ-সব ওজর-আপত্তির কর্ম্ম নয়। কি জানি, ঠাকুরাণী যদি রাগ করিয়া বসেন—তবেই যে মুস্কিল! শুধু জবরদস্ত বলিয়াই যে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নয়, অন্তরের ঐশ্বর্য্য নিজ হইতেই লোক-চিত্তে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিল। লোকে

তাঁহাকে যেমন ভয় করিত, তেমনি ভক্তিও করিত। দেশের লোকের আপদে-বিপদে রোগে-শোকে আগে গিয়া তিনি বুক দিয়া পড়িতেন। পীড়িতের সেবায়, রাত্রি-জাগরণে, শোকার্ত্ত পরিবারের উপস্থিত প্রয়োজনে, যজ্ঞ-বাড়ীর যজ্ঞ-রক্ষণে সর্ব্বত্রই তাঁহার কুশল হস্তের সহৃদয়তা ও দক্ষতা দেখা যাইত।

কোথায় কোন্ গরীব গৃহস্থ মানের দায়ে ভিক্ষায় বাহির না হইয়া দুইদিন উপবাসী রহিয়াছে, কাহার অভিমানিনী বধূ-শাশুড়ীর গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া আত্ম-নাশের উপায়-সন্ধানে চেষ্টা করিতেয়ছ, কোন্ তরুণ যুবা বুড়া মা-বাপের মুখ না চাহিয়া বধূ লইয়া উন্মত্ত, বা কোন্ ক্ষুদ্রচিত্তা বধূ শাশুড়ীর সম্মান না রাখিয়া যথোচ্ছাচারে প্রবৃত্তা,—এ সকল সংবাদ মুক্তা ঠাকুরাণীর এজলাসে আগে আসিয়া পৌঁছাইত এবং তাহার যথাসম্ভব প্রতিবিধানও বাদ পড়িত না। একবার জানাইতে পারিলেই অভিযোক্তা দায়ে খালাস। তার পর কেমন করিয়া কি করিতে হইবে, সে ভাবনা বিচারকের।

সংসার শক্তির বশ। যে বৃহৎ গ্রহের শক্তি অধিক, সে নিজের কেন্দ্রে স্থির থাকিয়াও ক্ষুদ্র গ্রহ-উপগ্রহগুলাকে অনায়াসে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ইচ্ছামত ঘুরাইয়া লইতে পারে। শুধু শারীরিক বলেই সকল স্থলে কার্য্যোদ্ধার হয় না, মানসিক শক্তিই মানবের জড়ত্ব-নাশের প্রধান সহায়। এই জন্য গৃহস্থালীতে কর্ত্তা-গৃহিণী, রণ-ক্ষেত্রে সেনাপতি, সমবেত কার্য্যে নেতার প্রয়োজন। যেখানে নেতার শক্তির অভাব, সেইখানেই নেতৃত্ব বিশৃঙ্খল। সৃষ্টি-রক্ষার্থে মহাশক্তি তাই সদা-জাগ্রত।

শক্তিশালিনী মুক্তা ঠাকুরাণী লোকের অভাব-নিবারণে যেমন সক্ষম, তাহাদের দোষ-ত্রুটি পাইলে রসনার তীক্ষ্ণ ব্যবহারেও আবার তেমনি নির্ভীক। তাঁহার নিকট দোষীর কাঠগড়ায় যে একবার দাঁড়াইবে, সহজে তাহার আর নিষ্কৃতি ঘটিবে না। এটুকু সবাই জানে, যে নাকের জলে চোখের জলে মিলাইয়া "ঘাট মানা" তাহার ভাগ্যে অনিবার্য্য। "আপনার" বলিতে তাঁহার বড় বিশেষ কেহ ছিল না! তাই বসুধৈব কুটুম্বকম্—সকলকেই তিনি আপনার করিয়া লইয়া ছিলেন। আপনার বলিতে কেবলমাত্র তাঁহার এক ভাগিনেয়ী ছিল। সে বিদেশে স্বামীর কাছে থাকিত। বিবাহের পূর্ব্বে সময়-সময় সে মাতুলানীর পিতৃ-গৃহে আসিয়া বাস করিত, এবং বিধবার শূন্য অন্তঃকরণের অনেকখানি অংশ ভরাইয়া রাখিত। এখন সেও পর হইয়া গিয়াছে। তবু সে তাঁহার একমাত্র নিকটতম আত্মীয়। সম্প্রতি তিনি তাহার বৈধব্যের সংবাদ পাইয়াছেন। আর সেই জন্য তাঁহার গম্ভীর মুখ আরও বেশী গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। স্বল্প ভাষা আরও স্বল্প হইয়া গিয়াছে। এমন সময় অরুণ আসিয়া তাঁহার নিরানন্দ গৃহে আপনার নিরানন্দ জীবনের নূতন পর্ব্ব আরম্ভ করিল। জমিদার দয়া করিয়া তাহার জন্য মাসিক পনেরো টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিল। পল্লীগ্রামে খাওয়া-পরা ইহাতে অনায়াসে চলিতে পারে। কিন্তু বই কিনিবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক তাহার সংকুলান হয় না। অরুণ খাওয়া খরচ দশ টাকা করিয়া তাঁহাকে দিতে চাহিলে মুক্তা ঠাকুরাণীর গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হইয়া

গেল, কিন্তু তিনি একটুও অসম্মতি জানাইলেন না। মনে করিলেন, টাকা কয়টি মাস-মাস উহারই কোন ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য তুলিয়া রাখিবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে দুই বেলা দুইমুঠা শাক-ভাত খাইবে, তাহার কি আবার মূল্য লইতে হইবে! এ কি সহরের হোটেলখানা! গলায় দড়ি! গৃহস্থ-বাড়ীতে অতিথি যে গুরু! মুখে কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিলেন না। অরুণ টাকা দিলে তিনি বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন। সংসারে সব হারাইলেও অরুণ দুইটী অনন্য-সাধারণ বস্তু হারায় নাই। এক,—দৈহিক সৌন্দর্য্য, দ্বিতীয় সচ্চরিত্র। মানুষ মাত্রেই সৌন্দর্য্যের উপাসক। রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হয় কে? সুন্দর ফুল, বিচিত্র প্রজাপতি হইতে বৃহৎ চন্দ্র-সূর্য্য পর্য্যন্ত তাই আমাদের মুগ্ধ নেত্রে অসীম আনন্দ প্রদান করে। অরুণের সুন্দর মুখ, প্রসন্ন স্নিগ্ধ দৃষ্টি, বিনীত শান্ত ভাব, সুকুমার কান্তি—ছেলেটিকে কি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারা যায়? তাহার তরুণ ললাটে বিষাদের যে নিবিড় ছায়া এই বয়সেই আসন বিছাইয়া ছিল, লোক-চক্ষে তাহাতেও সহানুভূতির সৃষ্টি করিত। সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। পাড়ার প্রবীণেরা তাহাকে স্নেহ জানাইতেন, পাঠে উৎসাহ দিতেন। নবীনেরা বন্ধুত্ব করিতে চাহিত। ইহার অধিক সে দরিদ্র পল্লী বেশী আর কি দিতে পারে! নিখিল মিষ্টভাষে সকলের সহিত কথা কহিত, মিশিবার চেষ্টাও করিত। কিন্তু চিরদিনের অনভ্যাসের ব্যবধানে বাধিতে থাকিত। তাহার ভিতর-বাহিরের অসহ্য শূন্যতা তাহাকে অনেক দূরে ঠেলিয়া রাখিত। প্রাণ খুলিয়া সে কাহারো সহিত মিশিতে পারিত না। নিজের অন্তরের দীনতা সে কাহারো কাছে প্রকাশ পাইতে দিত না। পাছে গরীব বলিয়া কেহ তাহার প্রতি দয়া করিতে চায়, এই ভয়ে অভাবের কথা কাহারও কাণে সে তুলিত না। এত দিন জমিদার-পুত্ররূপে যে শত শত দীন-দরিদ্রের অভাব মোচন করিয়াছে, আজ সে দয়া চাহিয়া কাহার কাছে মাথা নামাইবে? বরং এই যে তাহার অন্ন-বস্ত্রের মূল্য—আলোক-নাথের কৃপার দান বলিয়া যেটাকে মনে হয়, ইহার ভার নামাইতে পারিলে সে বুঝি লঘু নিশ্বাস লইয়া আবার সুস্থ হইতে পারে! দানের সুখ যে পাইয়াছে, যাচকের দুঃখ যে তাহার পক্ষে মরণাধিক দুঃখকর!

মুক্তা ঠাকুরাণীর স্বল্পায়তন বাড়ীর বাহিরের একমাত্র ঘরখানি দখল করিয়া অরুণ তাহার অল্প-স্বল্প জিনিষ বই-খাতা প্রভৃতি গুছাইয়া লইল। ঘরে টেবিল-চেয়ার আল-মারি কিছুই ছিল না; বহুকালের একখানি ঘুণ-ধরা তক্তাপোষ—তাহার চারিটি পদ চারিখানা অর্দ্ধভগ্ন ইষ্টক-খণ্ডে স্থাপিত করিয়া একমাত্র গৃহসজ্জারূপে অবস্থিতি করিতেছিল। প্রয়োজনানুসারে এইখানিই টেবিল ও খাটের অভাব পূর্ণ করিত। অনিচ্ছাতেও তাহার পূর্ব্বের সুসজ্জিত পাঠা-গার বহুমূল্য মেহগ্নি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ডেক্‌সটি আর ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নী দেবীর চির-স্নেহময় হাসি-ভরা মুখ বার বার তাহার মানস-নেত্রে ফুটিয়া অশ্রুবাষ্পের কুয়াশায় মিলাইয়া যাইতেছিল। মানুষ যে সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ, অরুণ তাহা নিজেকে

দিয়াই অনুভব করিতেছিল। এই যে যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন, ইহাও ত সে বেশ সহিয়া লইল। আর একবার এমনি আঘাত,—যাহা সে শত-চেষ্টাতেও স্মরণ করিতে পারে না, তাহাও ত সহিয়াছিল। হস্তচ্যুত সুদূর অতীত, অরুণের জীবনের সব আশা-আনন্দই যে তোমার আনন্দময় আলোকোজ্জ্বল অঙ্কে বিলীয়মান। ভবিষ্যৎ—বৈচিত্র্যহীন দুঃখ-ময় তিমিরাবৃত ভবিষ্যৎ, না জানি, তোমার দুর্ভেদ্য রহস্য-ময় গর্ভে আবার কি ইঙ্গিত তাহার জন্য গোপনে সঞ্চিত রাখিয়াছ!

সংসারের সব-কিছু হইতে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিয়া সে এখন যোগীর ন্যায় একমনে পাঠাভ্যাসেই নিজেকে নিযুক্ত রাখিল; কোন বাধা, কোন অসুবিধাই তাহার গ্রাহ্যে আসিল না। পূর্ব্ব-স্মৃতি ভুলিয়া থাকিবার, বর্ত্তমানকে কাটাইয়া তুলিবার একমাত্র উপায়,—সে এই শিক্ষা-লাভের আনন্দেই পাইয়াছিল।

দুই বেলা অনেক পথ হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হয়। অল্প বয়সের ক্ষুধা—অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে দয়া করিত না। তাই সে যখন বৈকালে অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিয়া যথাসাধ্য ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিয়া বাড়ী ফিরিত, তখন তাহার মুখখানি শুষ্ক দেখাইত। মুক্তা ঠাকুরাণী কিছুদিন হইতেই ইহা লক্ষ্য করিতে ছিলেন। তাহার সুন্দর মুখ ও নিষ্পাপ মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক দৃষ্টি ধীরে ধীরে এই সন্তান-বঞ্চিতা নারীর হৃদয়ে সন্তান-স্নেহ জন্মাইয়া তুলিতেছিল। অরুণের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাহাকে দুপুরবেলা কিছু কিনিয়া খাইবার জন্য চারিটি করিয়া টাকা দিতে চাহিলে, অগত্যা অরুণকে তাহা লইতে হইল। বাক্-বিতণ্ডা করিতে সে দক্ষ নয়, তা ছাড়া স্নেহের কাঙাল স্নেহের দান ফিরাইতে ব্যথা বোধ করিল। আশ্রয়-দাত্রীর সম্বন্ধে বেদনায় তাহার চোখে কৃতজ্ঞতার সহিত যে জলের আভাষ ফুটিয়া ছিল, তাহা গোপন করিবার জন্য সে তখন ব্যস্ত থাকিলেও দাতার চক্ষে সেটুকু ধরা পড়িতে বিলম্ব ঘটিল না।

আড়ম্বর-হীন দরিদ্র জীবন ধীরে ধীরে তাহার মনে শান্তি আনিতেছিল। পূত-চারী ঋষি-বালকের ন্যায় নিজেকে সে ধর্ম্মে ও জ্ঞানে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। দুই বেলা স্নান করিয়া নিয়মিত সে সন্ধ্যা বন্দনা করিত। আলোকনাথ যাহাই বলুক, সে তাহার নবজীবন-দাতা মহানুভব পিতার অবশিষ্ট দান এই যজ্ঞোপবীতটুকু কাহারও কোন কথায় ত্যাগ করিবে না। স্কুল হইতে ফিরিয়া সে গৃহ-কর্ত্রীর সঙ্গে বাগানের প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া দিত। বাগানটীতে লাউ-কুমড়া সিম্ ও পালমশাক ছাড়া অন্য কিছু বড় জন্মিত না। দুই-চারিটি গাঁদা দোপাটি অপরাজিতা প্রভৃতি ফুলের গাছও ছিল। একপাশে একটুখানি কবিরাজী গাছ-গাছড়ার ক্ষেত করা হইয়াছিল। তুলসী, আদা, ব্রাহ্মীশাক, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মুক্তা ঠাকুরাণীর চিকিৎসা-বিদ্যার সাক্ষ্যস্বরূপ প্রতিবেশীদের সাহায্যে সযত্নে রক্ষিত হইত। অরুণের চেষ্টায় এইখানে একটু উন্নতি দেখা যাইতেছিল। বাগানের কাজ নিজ হাতে না করিলেও ইন্দ্রনাথের শিখা দিবার পদ্ধতিতে এ বিষয়ে অনেকখানি

অভিজ্ঞতা তাহার জন্মিয়াছিল। সেখানে সকালে উষা-ভ্রমণ-কালে ইন্দ্রনাথ তাহাকে শুধু গল্পচ্ছলে যে কত শিক্ষা দিত, তাহা তখন না বুঝিলেও এখন সে বুঝিতে পারে। শারদ সন্ধ্যায় যখন সে তাহার সহিত ছাদে বা বাগানে বসিয়া থাকিত, তখন আকাশের ঐ সব নক্ষত্রাবলীর পরিচয় সে তাহার কাছে কত সহজ ও সরল উপায়ে লাভ করিয়াছিল। সে তখন বুঝিতেও পারিত না যে পিতা তাহাকে কোন কঠিন বিষয়ে শিক্ষা দিতেছে! এমনি সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে সে তাহাদের নাম শিখাইত। কোন্‌টি কোন্ গ্রহ, সে অনায়াসে বলিয়া দিতে পারিত। কোন্‌টি শনি, কোন্‌টি শুক্র,—এ সব সে জানিত; গুণাবলীর পরিচয়ও দিতে পারিত। যে গ্রহের অবস্থান যেখানে থাকুক, অবলীলায় নিত্য-পরিচিত পুরাতন বন্ধুর মত তাহাদের সে চিনিয়া লইতে পারিত। পক্ষী-তত্ত্বেও সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের পক্ষী-পালনের সখ থাকায় পাখীদের জন্য জাল ঘেরিয়া বৃহৎ বাস-ভবন নির্ম্মাণ করানো হইয়াছিল; সেখানে নানা-জাতীয় পক্ষী ছিল। এমন কি যে সব পক্ষী বাস করিত, উড়াইয়া দিলেও তাহারা আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাঁধে বা হাতের উপর বসিত। তাহাদের কোমল পালকের স্পর্শ বুলাইয়া মানুষের মতই তাহারা নিজেদের আদর জানাইত। কেনেরী পাখীর খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিলেও সে উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিত না, বরং গান গাহিয়া তাহাদেরই মুগ্ধ করিত। দূরে আকাশের গায়ে কৃষ্ণকায় ছোট পাখিটি উড়িয়া গেলেও সে অনায়াসে বলিতে পারিত, সেটী কোন্ জাতীয় পাখী? ঝিলে ডিঙ্গি চড়িয়া কতদিন সে এ-পার ও-পার করিয়াছে; নিজের হাতে দাঁড় টানিতে শিখিয়াছে, সাঁতার কাটিতে শিখিয়াছে। পুস্তকের শিক্ষা অপেক্ষা ইন্দ্রনাথ তাহাকে এই সকল শিক্ষাই অধিক শিখাইয়াছিল। তাহার শরীর ও মন এমনি করিয়া সে গঠিত করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই হয়ত সে সাধারণের চেয়ে সাহসী, সত্যবাদী, কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরার্থপর হইবার অবসর পাইয়াছিল। যে বয়সে যে-শিক্ষাটির প্রয়োজন সেই বয়সে তাহা যথাযোগ্য হইলে তাহার ফল ভালই হয়। শিশু বংশ-দণ্ডকে অনায়াসে নোয়াইতে ও ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারিলেও বংশকে নত করা যায় না। শিশু অবস্থায় মানব-প্রকৃতি যখন কমনীয় ও নমনীয় থাকে, তখনই তাহাকে বশীভূত করিয়া সুগঠিত করিবার শুভ সুযোগ। স্বেচ্ছাচারিতা, জেদ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি আগাছা গুল্ম একবার জন্মিবার অবসর পাইলে আগা-ছার মতই তাহার শিকড় বহুদূর-বিস্তৃত হইয়া যায়, তখন তাহাকে আর ইচ্ছামত ফিরানো যায় না।

এখানে পাঠ ছাড়া অরুণের কিছুই শিখিবার বা করিবার ছিলনা। তাই সে তাহার সমস্ত মনটুকুকে পাঠে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টির বাধা না জন্মিত, ততক্ষণ সে একমনে পাঠাভ্যাস করিত। কলিকাতার ন্যায় এখানে গ্যাসের আলো নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বৃক্ষচ্ছায়াময় পল্লীগৃহে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত, তৈল পুড়াইবার অর্থাভাব—তাই সন্ধ্যার পর

প্রায় তাহার সে পাঠ বন্ধ রাখিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা করিত। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে তাহার বর্ত্তমান জীবন অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছিল। মানুষ অবস্থার দাস। যখন যেমন, তখন তেমন চলিতে সে বাধ্য, তাই সক্ষমও সে। ক্লাস-পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেদিন বাড়ী ফিরিয়া অরুণের চোখের জল আর বন্ধ থাকিতে চাহিতেছিল না। আজ যদি ইন্দ্রনাথ থাকিত! এ অশ্রু কে বারণ করিবে? কে আর তেমন করিয়া তাহার সহিত আনন্দের অংশ সমানভাবে ভাগ করিয়া লইবে? এখানেও তাহাকে অনেকে স্নেহ করে, তাহার সাফল্যে বাহবা দেয়। কিন্তু সুখের সুখী, ব্যথার ব্যথী, অন্তরের মধ্যে সে কাহাকেও খুঁজিয়া পায় না। তাই অতীতকে ভুলিতে চাহিলেও সে তাহাকে থাকিতে ভুলিয়া দেয় না!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

লিঙ্গরাজ মন্দির

শ্রীযুক্ত ই,বি, হেভেল তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে (A Hand-book of Indian Art) লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিখরের শিল্প-গৌরব, সুরুচিসঙ্গত বহিঃসৌষ্ঠব (purity of outline) ও অনাড়ম্বর কারুকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত অন্যান্য মন্দিরগুলি কতকটা বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত থাকায় মূল মন্দিরের বিশেষ সৌন্দর্য্য-হানি ঘটিয়াছে (১)। তিনি 'মন্দিরটি সপ্তম-শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল' এই জনপ্রবাদ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে বহুমন্দির-সমাকীর্ণ দেব ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে ভুবনেশ্বরের অবস্থান হইতে ইহাই যে প্রাচীনতম দেউল এ অনুমান সম্ভব বলিয়াই মনে হয়। খৃঃ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে উড়িষ্যায় যে রাজবংশ রাজত্ব করিতেন সার্ এডোয়ার্ড গেইট মহোদয় তাহাদিগকে 'কর'বংশীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২)। তাম্রপট্টে ও শিলালিপিতে ইহাদিগের নাম পাওয়া গিয়াছে। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহার লিপিসমূহের অনুশীলন-কালে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্ষোদিত একখানি লিপিতে প্রাপ্ত, শান্তিকর নামক উৎকলরাজের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৩)। 'কর' শব্দান্ত নাম-বিশিষ্ট অপর কয়েকটি নরপতির উল্লেখ কটকের কোনও জমিদারের গৃহে সংরক্ষিত একখানি তাম্র লিপিতে

(১) A Handbook of Indian Art. p. 55. etsqq.

(২) J. B. O. R.S, Vol, VI. pt. IV. 1920. p. 463

(৩) Ep. Indic. Vol XIII, no. 13. p. 167.

পাওয়া গিয়াছে। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে উড়িষ্যার নরপতি যে বৌদ্ধ মহাযান মতাবলম্বী ছিলেন, তাহা চীনদেশীয়দিগের লিখিত বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে তারানাথ নাঙ্গিয়োর পুস্তক তালিকাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ (৪)। রাজা শুভকর কেশরী স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী না হইলে চীন সম্রাটের নিকট খৃঃ ৭৯৫ অব্দে 'বুদ্ধাবতংসক সূত্র' নামক মহাযান ধর্ম্মগ্রন্থ প্রেরণ করিতেন না (৫)। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বোক্ত তাম্রলিপির যে পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষেমঙ্কর দেব, শিবকর দেব, শুভকর দেব (৬) এই তিনটি রাজার নাম উল্লিখিত আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে এই নেউলপুর তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। 'কর' শব্দান্ত রাজগণ যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহাও উক্ত লিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। শুভকর দেব ও কেশরী অভিন্ন কি না তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু উভয়েই যে বৌদ্ধ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইঁহারা উভয়েই খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। বৌদ্ধ রাজা এরূপ বিশাল হিন্দুমন্দির অজস্র অর্থব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করিবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং মন্দির-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের সমর্থিত জনপ্রবাদ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করার যথেষ্ট অন্তরায় আছে। 'কর' নামধেয় বৌদ্ধরাজাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন হিন্দু নরপতির অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলে, ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয় যে, হয় মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয় নাই, নতুবা ইহা বৌদ্ধদিগেরই উপাসনার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত হইয়াছে। শেষোক্ত অনুমান গ্রহণীয় নহে, কারণ অদ্যাপি কোনও বৌদ্ধমূর্ত্তি বা বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত ভাস্কর্য্য-নিদর্শন লিঙ্গরাজ মন্দিরে আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই মন্দিরের গঠন-বৈশিষ্ট্য ও স্থাপত্য-রীতি যে শিল্পোৎকর্ষের পরিচায়ক, তাহা অত প্রাচীনযুগে সম্ভবে না। বস্তুতঃ নির্ম্মাণ-প্রণালী হইতেই ভাস্করেশ্বর প্রভৃতি মন্দির লিঙ্গরাজ মন্দির অপেক্ষা প্রাচীনতর, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। শ্রীযুক্ত হেভেল বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রাচীন দেবায়তন আচ্ছাদন করিয়া তাহারই উপরে পরবর্ত্তী কালে বর্ত্তমান লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিখরাংশ বিনির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব নহে। মন্দিরে যাঁহাদিগের প্রবেশাধিকার আছে এবং যাঁহারা গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া দেবদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথার সমর্থন করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। শিখর অপেক্ষা অন্য কোন প্রাচীনতর দেবগৃহ যে লিঙ্গরাজ মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থিত নাই এ কথা আমরা বলিতেছি না। একটী সুপ্রাচীন শিবমন্দিরের গৃহকুট্টিম মন্দির প্রাঙ্গণের নিম্নে অবস্থিত এবং তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত

(৪) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৪২।

(৫) J. B. O. R. S. 199. p. 325.

(৬) Ep. Indic Vol XV pp. I. 1, 2, 5.

শিবলিঙ্গটী যে প্রাঙ্গণ হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট্ নীচে বিদ্যমান, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (৭)। সুতরাং শ্রীযুক্ত হেভেলের অনুমানের এইটুকু মাত্র মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেও এই স্থানের সান্নিধ্যে প্রাচীনতর দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শ্রীযুক্ত হেভেল অন্য একস্থলে বলিয়াছেন যে, মন্দির নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সভাস্থলীরূপে ব্যবহৃত হইত এবং তথায় পৌর ও জানপদসমস্যা বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক মীমাংসিত হইত। আবার প্রয়োজনমত নৃপতিগণ উহার কোন অংশ দরবার-গৃহরূপেও ব্যবহার করিতেন। উড়িষ্যার দেবমন্দিরে রাষ্ট্রনৈতিক অনুশাসন-লিপি ক্ষোদিত হইত, ইহা অস্বীকার করা যায় না (৮)। আজিকালিকার দিনে যেরূপ সরকারী কার্য্যালয়ের বিজ্ঞাপন-পটে বহুবিধ রাজাদেশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনী সাধারণ্যে প্রচারার্থ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, এই লেখাগুলিও ঐ প্রকার উদ্দেশ্যেই মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করা হইত। ইহা হইতে মন্দির-মধ্যেই যে রাজসভার অধিবেশন হইত, এ অনুমান সমর্থিত হইতে পারে না। লিঙ্গরাজ মন্দির-গাত্রস্থ রাজা কপিলেশ্বর দেবের লিপিতে দেখা যায় যে, রাজা 'পূজাবকাশে' রাজগুরু ও জনৈক মহাপাত্রের সম্মুখে যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই উৎকীর্ণ করা হইয়াছে, কেহই অস্বীকার করিবেন না।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

মীমাংসা

(গল্প)

গ্রামের একপ্রান্তে মাঠের মাঝে একটা ছোট প্ল্যাটফরম-ওয়ালা ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণটা থামিয়া গেল। একসঙ্গে কুলী ও যাত্রীর দল চীৎকার করিয়া স্থানটাকে মুখরিত করিয়া তুলিল। আমি এই কোলাহলের চির-আনন্দময় সুরটুকু উপভোগ করিতেছি, এমন সময় ট্রেণ-চলার ধাক্কায় আমার মাথাটা ঠুকিয়া গেল। আমার চমক ভাঙ্গিল।

আহত স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে হঠাৎ সাম্নের গাড়ীখানার দিকে নজর পড়িল। পড়িতেই দেখি, দুইজন আরোহী মুখোমুখি বসিয়া রহিয়াছে। একজন একটা ছোট লোমশ কুকুর কোলে লইয়া আদর করিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইতেছেন, অন্যজন পকেট হইতে সিগারেটের মশলা বাহির করিয়া কাগজে রাখিয়া সিগারেট পাকাইতেছেন। সিগারেট

(৭) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৬৭।

(৮) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৫৬, পুরীর কথা পৃঃ ১৫০-১৫১।

তৈরি হইবামাত্র ভদ্রলোকটি যেমন তাহার মুখাগ্নির জন্য দেশলাই জ্বালিয়াছেন, অমনই প্রথম ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—এ হতে পারে না, মশায়। সিগারেটটা আপনাকে নিবিয়ে ফেলতে হবে, কারণ ওর ধোঁয়ায় আমার মাথা ধরে। সুতরাং রেল-কোম্পানির নিয়ম-অনুসারে আপনাকে সিগারেট টানা বন্ধ কর্ত্তে হবে, বুঝলেন মশায়। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটির কিন্তু বুঝিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি চক্ষু বুজিয়া এক লম্বা টান দিয়া অনেকটা ধোঁয়া মুখ হইতে বাহির করিলেন।

প্রথম ভদ্রলোকটি, দেখি, টপ্ করিয়া উঠিয়া খপ্ করিয়া সঙ্গীর মুখ হইতে সিগারেটটা ছোঁ মারিয়া টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি, দেখি, আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া কুকুরটাকে মেঝে হইতে তুলিয়া লইয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিলেন।...

চক্ষের নিমেষে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

কুকুর-স্বামী জামার হাতা গুটাইয়া ঘুসি পাকাইতেই, সিগারেট-সেবীও হাতটাকে মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

এতক্ষণ আমি স্থির হইয়া দেখিতেছিলাম, কিন্তু এখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। কারণ হাতাহাতি কাণ্ড,—পাছে রক্তারক্তি ব্যাপারে পরিণত হয়, এই ভয়ে উঠিয়া গাড়ীর শিকল টানিয়া দিলাম।

মাঠের মধ্যে ট্রেণও অমনি থামিয়া পড়িল।

হঠাৎ ট্রেণ থামিতে দেখি, দুই যোদ্ধৃ-প্রবরের আর যুদ্ধ করা হইল না। তাঁহাদের হাতের ঘুসি হাতেই রহিয়া গেল, দুইজনেই রণং দেহি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইত্যবসরে গার্ড সাহেব আসিয়া আমার কাছে উপস্থিত।

আমি তাহাকে সবিস্তার ঘটনা বলিলাম। তারপর দুইজনেই গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

তখনও তাঁহারা রণোন্মত্তভাবে দাঁড়াইয়া—বিবাদটাকে থামাইবার জন্য গার্ড গিয়া দুইজনের মধ্যে দাঁড়াইলেন।

"Mind your own business sir" বলিয়া দুইজনে একটু সরিয়া গিয়া আবার ঘুসা-ঘুসির উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়, দেখি, সেই কুকুরটা সিগারেট মুখে লইয়া, জানালার মধ্য দিয়া লাফাইয়া সেই কম্পার্টমেণ্টে আসিয়া ঢুকিল।

কুকুর-স্বামী ঘুসি খুলিয়া কুকুরটাকে কোলে করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সিগারেট-সেবী সিগারেটটা তুলিয়া লইয়া বসিলেন।

গার্ড হাসিতে হাসিতে বিদায় লইল।

আমি প্রশংসা-বিস্ফারিত নেত্রে কুকুরটার দিকে চাহিয়া রহিলাম—ভাবিলাম, দুইজন মানুষের বিবাদ—কুকুরের মত একটা প্রাণী তাহার কেমন সুন্দর সমাধান করিয়া দিল!

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

ভারি নিষ্ঠুর!

চাঁদপানা মুখখানা ঢেকে মেঘলায়,
কার পথ চেয়ে সখি বসে জান্‌লায় ?
সারারাত জেগে চোখ করে কর্ কর্,
সইচে না গায়ে তিল বাতাসের ভর,
ফিকে হয়ে গেল গালে গোলাপের রং,
কি জানি কি ভাব্‌নায় বুক ছম্ ছম্,
জমা-করা বাসি ফুল দাও ক'রে দূর,
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর !

এত ক'রে ধরে ধরে বাঁধ্‌লি যে চুল !
পাতা কেটে টিপ এঁকে কাণে দিলি দুল।
জাম-রঙ সাড়িখানি জরি-দেওয়া পাড়,
আর কেন পরে' সখি মিছিমিছি ?—ছাড়্ ;
সরু ক'রে টেনে দেওয়া সুর্‌মার দাগ
জলে ভিজে মুছে গেল ; উঠে যায় যাক্,
কাঁদ-কাঁদ মুখখানি বেদনা-বিধুর,
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর।

ঢং ঢং ঘড়ি বাজে বেড়ে যায় রাত,
গাড়ি যায় রাস্তায়, বুক করে ছাঁত,
একবার খাটে আর মেঝে একবার,
থেকে থেকে মুখখানি মনে পড়ে তার,
ঠেলে ওঠে চোখে জল সাম্‌লানো দায়—
কখনো বা অভিমানে কভু শঙ্কায় ;
ম্লান হয়ে এলো আলো শরদিন্দুর,
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর।

কত সুখ ছিল সখি, মনে মনে কাল!
লাল হাসি ফেটে পড়ে রাঙা দুটি গাল।
কি কথা সে কয়েছিল গেয়েছিল গান,
তোলপাড় বুকময় সারা দিন্ মান!
খণে খণে আর্‌সিতে দেখ্‌ছিলে মুখ
যদি কোনোখানে কোনো থাকে ভুলচুক,
জল্ জল্ জ্বলে সরু সিঁথিতে সিঁদুর,
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর!

আজই ডাকে এক্ষুনি চিঠি লিখে দাও—
—এসে দুটি পায়ে ধর যদি ভালো চাও—
না, না, সখি গুম্ হয়ে ক'রে থাকো মান,
দেখই না আছে কিনা আছে তার টান!
ফাঁদে ধরা দিয়ে পাখী যাবে কোথা আর,
সাত দিন গেলেই ত ফিরে শনিবার,
এই কটা দিন কি লো সবেনা সবুর?
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর!

ওঠো সখি, মুখ ধোও, মোছ আঁখি-নীর,
মনে মনে ঠাওরাও একটা ফিকির—
অবাধ্য বঁধু যাতে সায়েস্তা হয়,
আশ্‌কারা অতখানি দেওয়া ভালো নয়;
কখনো বা নোল দিলি, কখনো বা রাশ
রাখিস্ লো কসে টেনে যদি ভালো চাস্,
পিরীতির এই রীতি এই দস্তুর,
এলোনা সে, এলোনা সে ভারি নিষ্ঠুর!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চতুষ্পাঠী

(চিত্র)

১

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। সেই সময় বিজনপুর গ্রামে যুগলকিশোর বসু নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন ; তিনি অপুত্রক অথচ প্রভূত-সম্পত্তিশালী, এজন্য ধর্ম্মে-কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-গুলিতে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন, এবং গ্রামের পার্শ্বে মাঠে এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই চতুষ্পাঠীতে পনেরো-ষোলটি ছাত্র এবং একজন অধ্যাপক থাকেন। অধ্যাপকের নাম শিবচন্দ্র স্মৃতিরত্ন। অধ্যাপক মহাশয় কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা-কার্য্য খুবই চলে, তবে কখনও কোন ছাত্র কোথাও পরীক্ষা দিয়াছে বা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এরূপ কোন প্রবাদ শোনা যায় যায় না। চতুষ্পাঠীর অপর ছাত্র অপেক্ষা চারটি ছাত্রের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম ছাত্র অবিনাশ, দ্বিতীয় শেখরেশ্বর, তৃতীয় বিধুভূষণ, চতুর্থ রাম-গোপাল। অবিনাশ ও শেখরেশ্বর স্মৃতির ছাত্র, বিধুভূষণ কাব্যের ; এবং রামগোপাল ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে এই চতুষ্পাঠীতে আসিয়াছিল। সে বহু কালের কথা, এখনও ইহাকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতে দেখা যায়। রামগোপাল ছাত্রটি নিরীহ ভদ্রলোক, আহারে বিলক্ষণ দক্ষতা, সামান্য একটু তেঁতুল ও লবণ-সংযোগে চারিটি জোয়ান লোকের অন্ন অকুণ্ঠিত ভাবে উদরসাৎ করিতে পারে। শরীরে বলও বিলক্ষণ। বাবুদের দ্বারবানদের সহিত রামগোপালের প্রায়ই হাতাহাতি হয়, তাহাতে রামগোপালের পরাজয়ের সংবাদ কখনও কেহ শোনে নাই। টোলের অপরাপর ছাত্রেরা বলিত, যদি এক পয়সার মুসুরির ডাল দুই বেলায় চব্বিশ জনকে না খাইতে হইত, তাহা হইলে রামগোপাল একজন পালোয়ান বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিত। রামগোপালের দুইটি নাম ছিল—গ্রামের সাধারণ লোক তাহাকে খুড়ো বলিয়া ডাকিত, আর অধ্যাপক মহাশয় তাহার নাম রাখিয়াছিলেন বৈয়াকরণ খম্বাচী—এই নামের সহিত রামগোপালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, কারণ তাহাকে কোন পদ বা সন্ধি জিজ্ঞাসা করিলেই অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকাইয়া সে নীরব হইয়া থাকিত। রামগোপাল অত্যন্ত পরোপকারী। শব-দাহ করিতে, বরযাত্র যাইতে, ভোজবাড়ী অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতে তাহার অসীম উৎসাহ। অন্য সময়ে রামগোপালের বিলক্ষণ বাক্‌চাতুর্য্য দেখা যাইত, কিন্তু পড়া ধরিলেই কর্ণের যুদ্ধ-বিদ্যার মত এককালে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সে মৌনাবলম্বন করিত। অবিনাশ ছাত্রটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। ছাত্রেরা অবিনাশকে চাঁইদাদা বলিয়া ডাকিত।

শেখরেশ্বর পরকে হাসাইতে খুব মজবুত,

সেই জন্য তাহার নাম হইয়াছিল—বিদূষক। শেখর যেদিন হাসাইতে আরম্ভ করিত,—সেদিন খাওয়া-দাওয়ার বড়ই বিভ্রাট ঘটিত। হয় ভাত ধরিত, নয় তরকারিতে লবণাধিক্য হইত, এমন কি অধ্যাপক মহাশয়েরও সন্ধ্যা-আহ্নিক স্থগিত থাকিত। শেখর লেখাপড়ায় তেমন ভাল ছিল না। একখানি বাঁধাই তিথি-তত্ত্ব অনবরত পাঁচ-ছয় বৎসর শেখরের হাতে বিচরণ করিয়া তাহার সুদৃঢ় মলাট দুই খানি ত হারাইয়াই ছিল, অধিকন্তু "বিজয়া-বটিকার" বিজ্ঞাপন কয়খানিকেও হারাইতে বসিয়াছিল। তথাপি বেশ সুবিধামত একটি পংক্তিও তাহার উদরস্থ হয় নাই। বিধু "বড় বিদ্যায়" বিশেষ অভিজ্ঞ, পরের গাছে চুরি করিয়া নারিকেল, আম, বাতাবি লেবু, আনারস, এই সব সংগ্রহ করিতে সে বিশেষ দক্ষ। এমন কি গাছের তলায় লোক থাকিলেও সে বেমালুম ফল পাড়িত।

২

যুগল বাবুর টোলের উপর আর ততটা আস্থা নাই, কারণ তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, স্কুলের মত খুবই পড়াশুনা চলিবে, কিন্তু এখন দেখিতেছেন, সারাদিনই প্রায় ঘুম এবং তামাক খাওয়া, ও অবসর-মত একটু আধটু পড়া ছাড়া আর বিশেষ কিছুই হইল না। এই জন্য যুগল বাবু অধ্যাপক মহাশয়কে বলিয়াছেন, ভাল কিছুই হয় নাই। অধ্যাপক মহাশয় উত্তর দিয়াছেন, "মহাশয়, আপনি অনর্থক চেষ্টা করেন, টোল কখনও স্কুল হয় না। টোল টোলের নিয়মেই চলিবে, তাহাতে আপনার ইচ্ছা না হয় উঠাইয়া দিবেন।" যুগল বাবু চতুষ্পাঠী উঠাইয়া দিতেন, কিন্তু চতুষ্পাঠী হইতে তিনি যে সাহায্য পান, সে-জন্য চতুষ্পাঠীর সমস্ত ত্রুটি তিনি অবাধে সহ্য করিতেন। তাঁহার বাড়ী কাজ-কর্ম্ম-উপলক্ষে টোলের ছেলেরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিত এবং তিনি বেশ জানিতেন, টোল তাঁহার সহায় থাকিতে শত্রুপক্ষ তাঁহার কিছু করিতে পারিবে না। এই সব কারণে তিনি চতুষ্পাঠীর কার্য্য-কলাপের উপর ততটা লক্ষ্য রাখিতেন না। অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ী ছিল টোলের অনতিদূরেই। তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক, পৈত্রিক পুঁথিগুলির যত্ন, ব্রাহ্মণীর রক্ষণাবেক্ষণ ও দশকর্ম্ম,—ইহা লইয়া বড়ই ব্যস্ত থাকিতেন, চতুষ্পাঠীর কার্য্য একরূপ অবিনাশই চালাইত।

আজ একাদশী। কেহ আর ভাত খাইবে না, সকলে রুটী খাইবে। প্রত্যেকের পারি আধসের হিসাবে ময়দা আসিয়াছে, সেইগুলির রুটী প্রস্তুত হইবে, আর গুড় আসিয়াছে এবং তরকারী সামান্যই আছে। রামগোপাল দোকান হইতে জিনিষগুলি আনিয়া অবিনাশকে হিসাব বুঝাইয়া দিতে দিতে কহিল, "চাঁইদাদা, দোকানী বলছিল, আপনারা এত ময়দা নিলেন, ঘী নিলেন না!" "তুমি কি বল্‌লে?" "আমি বল্‌লাম, আমরা ভঁয়সা ঘী খাই না। ঘরে গাওয়া ঘী আছে।" অবিনাশ একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তা বলেছ মন্দ নয়, তবে আর কোন দিন আনতে গেলে মুস্কিল হবে।" বিদূষক কহিল, "তার আর মুস্কিল কি চাঁইদাদা! আমরা ত এক পয়সার বেশী প্রায় কিনব না, সেদিন বলব, ফোড়ায় দিতে হবে।" এই প্রকার কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া কার্য্য

কর্ম্ম হইতেছে, বিধুভূষণ গম্ভীরভাবে কহিল, "আপনারা অপেক্ষাকৃত ত্বরাবান্ হোন, ৬।৭ সের গোধূম তাকে পিষ্টকাকারে পরিণত করতে হবে। তাতে বিলক্ষণ সময়-বাহুল্যের সম্ভাবনা।" এই প্রকার হাস্য-পরিহাসের মধ্যে রুটী প্রস্তুত হইতে লাগিল। বিদূষক কহিল, "আচ্ছা ভায়া, বল দেখি,—ক' দিস্তায় এক রীম হয়?" এমন সময় বিধুভূষণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "রামগোপাল দাদার মুখ নড়চে কেন?" রামগোপাল বড়ই বিপদে পড়িল, সে বেশ সুবিধা করিয়া একেবারে দুইখানি রুটি বদনে পুরিয়াছে, ইত্যবসরে এই বিভ্রাট! শেখর একবার রোষকষায়িত নেত্রে অবিনাশের দিকে চাহিয়া কহিল, "দাদা, ভাগের সময় আমায় কর্‌তে দিয়ো ত।" ব্যাকরণের ছোট ছোট ছেলেগুলি অনবরত তামাক সাজিয়া সাজিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ ভয়ে বিছুই বলিতে পারে না। ইত্যবসরে বিধুভূষণ ভয়ে ভয়ে বলিয়া উঠিল, "চাঁইদাদা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রুটীগুলি ভাতের হাঁড়িতে ঠেকে গেছে,—এখন উপায়?" সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল,—ভট্টাচার্য্য মহাশয় আজ বাড়ীতে অসুখ বলিয়া টোলে খাইতে চাহিলেন, আর তুমি এই কর্ম্ম করিলে! অবিনাশ রুক্ষ স্বরে কহিল, "ওরে বিধে, গর্দ্দভ, তুই হাট্ কর! যা বলি তাই শোন, গঙ্গা গঙ্গা বল্ আর রেখে দে।"

বিধুভূষণ বিষণ্ণ মুখে কহিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যে—।" অবিনাশ আবার রুক্ষ-স্বরে কহিল, "ওরে, তা আমি জানি, যদি রুটীতে একাদশীর প্রয়োজকতা থাকে, তবে যে কোন উপায়ে রুটী পেটে পৌঁছুলেই হবে, তা সে রুটী ভাতে-ঠেকাই হোক্ আর না হোক্।" শেখর কহিল, "যদি এমন কথাই বলি—ভাত সংযোগের অভাববান্ রুটি—" রামগোপালের ক্ষুধা তখন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সে বড়ই বিরক্ত হইতেছিল, এইবার সুযোগ পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ও শেখর দাদা, তোমার ভুল হয়েছে। অভাববতী রুটী হবে।" "আর কাজ নেই, মরে গেলুম ক্ষিদেয়, শীঘ্র দাও।" অবিনাশ ঐতক্ষণ রুটী ভাগ করিতেছিল, বলিল, "প্রত্যেকের ভাগে ২৪খানা করে "একাদশী" পড়েছে।" রামগোপাল কহিল, "যে যাহা খাইতে না পারিবে, ওই ধারের পাতাখানায় রাখিয়া দাও।"

৩

আজ গ্রামে একজনদের বাড়ী বিবাহ। টোলের ছাত্রেরা আশা করিয়া আছে, নিশ্চয়ই তাহাদের নিমন্ত্রণ হইবে। সেই আশায় রান্নার আয়োজন আর কিছুই করে নাই; নানারূপ গল্প-গুজব ও তামাক খাওয়া ইত্যাদি চলিয়াছে! এইরূপে রাত্রি ১১।১২টা বাজিল। তথাপি নিমন্ত্রণ হইল না এবং ডাকও পড়িল না, তখন অগত্যা "মিত্রেরা" যে অত্যন্ত কৃপণ এবং বদলোক, ইহা স্থির করিয়া এবং "ভঁয়সা ঘীয়ের" অজস্র নিন্দা করিতে করিতে সকলে রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল। রামগোপাল আপন-মনে বলিতে লাগিল, "পরান্নং প্রাপ্য দুর্ব্বুদ্ধে মা শরীরে দয়াং কুরু। পরান্নং দুল্ল ভং তত্র, শরীরং জন্ম-জন্মনি।" বিধুভূষণ কহিল, "রামগোপাল দাদার বড়ই মর্ম্মান্তিক হয়েছে।"

অন্ন প্রায় প্রস্তুত, এমন সময় সকলের মনে হইল, তরকারীর কোন যোগাড় নাই -- সকলে অবিনাশের শরণাপন্ন হইল। অবিনাশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে বিধুভূষণকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাহির হইল। যেখানে অবিনাশের বুদ্ধি এবং বিধুর যোগ হইয়াছে সেখানে একাকার হইবে। শেখর কহিল, "আচ্ছা রামগোপাল দা ভবিষ্যতে তুমি কি করবে? তোমার মতলব কি?" রাম গোপাল কহিল, "আমি ছোট বেলায় যখন পাটীগণিত বিক্রী করে পায়রা কিনি, তখনই আমার বাবা বলেছেন, তোর কিছু হবেনা! তাঁর কথা যে মিথ্যে হবার নয়, তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবু টোলে পড়ে আছি, তার মানে বিদ্যে যত হোক্ আর না হোক, দশ টাকা বেতনের ঠাকুর হবার জোগাড় ত হচ্ছে।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় অবিনাশ ও বিধু প্রবেশ করিল, বিধুর মাথায় একটা হাঁড়ি। সে খুব চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা এ কার সর্ব্বনাশ করেছ?" অবিনাশ কহিল, "যে কাল বলবে, টক খেয়েছে না···খেয়েছে, বুঝবে তারই।" তারপর ভোজন আরম্ভ হইল। সকলের এই গোলযোগে, কখন কাহার পা ঠেকিয়া ল্যাম্পটি উল্টাইয়া গিয়াছে, সে দিকে হুঁস নাই। অন্ততঃ আধ-পেটা খাওয়ার পর বিধুভূষণ বলিল, "দাদা কাজটা ভাল হল না, মাগীর যে কদর্য্য মুখ, কাল আর ও বাকী রাখ্‌বেনা।" অবিনাশ কহিল, "সে ভার আমার। ওর আরো দু'দিন চুরি গেছে, আজও গেল,—তাতে ওর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, ওর ঘরে ভূত আছে। ও আমাদের ততটা সন্দেহ করবে না, বরং দেখ, ওর বাড়ী আবার ফুস্‌লে ফাস্‌লে পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করে ফেলি—" সকলে বলিয়া উঠিল, "ওই জন্যেই ত মহামূল্য চাঁই উপাধিটি তোমার জন্যে ব্যবস্থা করেছি।"

৪

ভবসুন্দরীর গৃহে খাদ্য-সামগ্রী মধ্যে মধ্যে এমন প্রায়ই অন্তর্হিত হয়। তাহার অত্যন্ত ভয় হইয়াছে। সে টোলে ব্যবস্থা জানিতে আসিল, আসিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলে তিনি কহিলেন, "ও সম্বন্ধে আমি কি বল্‌ব? যারা ও-সব ভূতের ব্যাপার জানে, এমন কোন রোজা এনে দেখাও!" ভবসুন্দরী প্রস্থান করিল, ছাত্রেরা অধ্যাপকের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তিনি একটা স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা না দিয়া একেবারে হাত-ছাড়া করিয়া দিলেন!

অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার একমাত্র কন্যা তুলসীর বিবাহের জন্য বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার মনোমত পাত্র কোথাও মিলিতেছে না। একটা বাসনা তাঁহার মনে মধ্যে মধ্যে উদিত হয়। অনেক বিবেচনা করিয়া তিনি দেখিয়াছেন, অবিনাশ ছাত্রটি সব রকমেই ভাল,—কিন্তু সে ছাত্র—তিনি অধ্যাপক হইয়া অশাস্ত্রীয় কাজ কি বলিয়া করিবেন! কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজেই গোপনে গোপনে পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক মহাশয় কহিলেন, "আমি আজ গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ-পত্রের বিদায়ে চলিলাম—তোমরা কেহ কোথাও যাইও না। পড়াশুনা

দেখ" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। এমন সময় ব্যাকরণের একটি ছোট ছেলে আসিয়া সংবাদ দিল, আজ রাত্রে ভবসুন্দরীর বাড়ী ভূত ধরা হইবে, রোজা আনিতে লোক গিয়াছে।

ছাত্রেরা যুক্তি করিতে আরম্ভ করিল ব্যাপার কি দেখিতে হইবে। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় ভবসুন্দরীর ভগ্ন গৃহের প্রাঙ্গনে বহুলোক-সমাবেশ হইয়াছে, রোজা বলিয়াছে ক্ষীর, সন্দেশ, কলা, দধি, প্রভৃতি নানারূপ খাদ্য সেই গৃহের মধ্যে রাখিতে হইবে। তাহাই হইয়াছে, আয়োজন সব ঠিক, ইতিপূর্ব্বেই ক্ষীরের হাঁড়ি এবং সন্দেশের থালা রামগোপালকে বিলক্ষণ প্রলুব্ধ করিয়াছে।

সেই গৃহের পশ্চাৎদিকের দেওয়াল কতকটা ভাঙ্গা ছিল। রামগোপাল শেখরকে সেই ভগ্ন স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া রন্ধ্র দিয়া স্বয়ং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, রোজার আদেশ-মত গৃহের পশ্চাদ্ভাগে কোন লোক ছিল না, সুতরাং রামগোপাল নির্ব্বিবাদে ক্ষীরের হাঁড়ি ও সন্দেশের থালা দেওয়ালের ভগ্ন অংশ দিয়া গলাইয়া শেখরের হাতে দিল, এবং স্বয়ং বাহির হইয়া পড়িল; পরে সেগুলিকে যথাস্থানে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আবার ভদ্রলোক সাজিয়া ভূত ধরা দেখিতে চলিল। ভূত ধরা পড়িল না অথচ আহারীয়গুলি অদৃশ্য হওয়ায় সিদ্ধান্ত হইল, "খুব চালাক ভূত!" সে রাত্রে টোলের ছাত্রদের হাসির ধূমে পাড়ার লোক অস্থির হইয়াছিল। এই ব্যাপার কেবল টোলের ছাত্রেরাই জানিল, আর কেহ জানিল না। শুনিয়াছি, যতদিন না ভবসুন্দরী স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন, ততদিন ভূতের উপদ্রব সমানভাবেই ছিল। স্বস্ত্যয়ন করিলে তবে বন্ধ হয়।

৫

গ্রামের লোক সামান্য কাজে-কর্ম্মে টোলে নিমন্ত্রণ করিত না, কারণ টোলের ছাত্রেরা প্রত্যেকেই বিলক্ষণ ভোক্তা। আজ গ্রামে এক জায়গায় ছাত্রদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, নিমন্ত্রণের আমোদে ব্যাকরণের ছাত্রগুলির তামাক সাজিয়া সাজিয়া হাতে ফোস্কা পড়িবার যোগাড়। অবিনাশ কহিল, "রামগোপাল, আমার জন্যে দু'পয়সার মুড়কি কিনে আনো ত।" রামগোপাল কহিল, "তা যাচ্ছি, কিন্তু পেসাদ দিতে হবে।" অবিনাশ কহিল, "দুপয়সার মুড়কির আবার যদি পেসাদ দিতে হয় ত আমার আর দরকার কি?" রামগোপাল কহিল, "আচ্ছা, না দেন্ ত আমি রাস্তাতেই পেসাদ পেয়ে আসব এখন।"

রামগোপালের একজোড়া অতি-পুরাতন চটী জুতা ছিল; সেইটিকে টোলের ছাত্রেরা বলিত, "রামগোপালের মুখোষ।" রামগোপাল সেই জোড়াটিকে লইয়া দোকান-অভিমুখে প্রস্থান করিল। বিদূষক কহিল, "আজিকার নিমন্ত্রণ বাড়ীতে সর্ব্বতোভাবে—পারিব না—এ কথাটি বলোনা। আর তার পর যে মাটিতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে—তবে গিয়ে উদ্‌-যোগিনং পুরুষসিংহং" ইত্যাদি মহাবাক্যগুলি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা চাই।" বিধু কহিল, "বাঢ়ম্"। শেখর কহিল, "তোমরা নিমন্ত্রণে মাস-কাবারের গল্প জানো?" সকলে বলিল, "না"। শেখর বলিতে আরম্ভ করিল "ধর, যেদিন নিমন্ত্রণের তারিখ, তার দুদিন পূর্ব্ব

হতে নানারকম গল্পগুজবে আমোদে আহ্লাদে কেটে যাবে, তার পর নিমন্ত্রণের দিন যে একটা কি হয়ে গেল, তা বুঝ্‌তেই পারা যাবে না, তার পরদিন ঠিক হবে, নিমন্ত্রণ খেয়েছিলুম। তারপর দিন চোঁয়া ঢেকুর, তার পরদিন চিকিৎসা, তার পরদিন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, তার পরদিন আশা, তার পরদিন পথ্য—এই রকম নিমন্ত্রণ যদি মাসে ৩।৪টি জোটে, তবে মাস-কাবার না হবে কেন?"

বিধু কহিল, "ও-রকম নিমন্ত্রণে মাস-কাবার হয় ঠিক্, সময় সময় বোধ হয় ভোক্তাও কাবার হয়।" শেখর কহিল, "আহা, সেটা বরাত, না খেয়েও লোকে মরে!" তারপর সকলে নিমন্ত্রণ-গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল, একটি ব্যাকরণের ছাত্রের নিকট একখানি গামছা দিয়া একটি পুঁটুলী প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। কারণ তাহার মধ্যে ছাঁদা বাঁধিয়া লওয়া হইবে। তার পর অধ্যাপক মহাশয়কে অগ্রে করিয়া সকলে প্রস্থান করিল।

৬

অধ্যাপক মহাশয়ের আজ ভয়ানক বিপদ। তাঁহার প্রাণের প্রাণ সংসারের শ্রেষ্ঠ বস্তু একমাত্র কন্যা তুলসীর কলেরা হইয়াছে, ডাক্তারেরা তাহার জীবন-সম্বন্ধে হতাশ হইয়া জবাব দিয়াছেন।

এই রোগে গ্রামের লোক কেহ কিছু সাহায্য করিল না, তাঁহার একমাত্র সহায়, টোল! টোলের ছাত্রেরা নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যাহার দ্বারা যাহা হয় করিতেছে। তাহাদের আহার-নিদ্রা নাই, মুখ বিষণ্ণ। অধ্যাপকই টোলের ছাত্রদের সর্ব্বস্ব—অধ্যাপকের বিপদ তাহাদের নিজের বিপদ। অবিনাশ তুলসীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া অনবরত শুশ্রূষা করিতেছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই। অবিনাশ ভাবিতেছে, বিধাতা আমার জীবন লইয়া তুলসীকে ফিরাইয়া দেন ত আমি ধন্য হই। অবিনাশ তুলসীকে আন্তরিক ভাল বাসে, ছোট বেলায় কত কোলে-পিঠে করিয়াছে, দুষ্টামি করিলে প্রহার করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে ভাল বাসার গতি কোন্‌দিকে তাহা সে বেশ বোঝে, তাই অতি-গোপনে হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। যে বুঝিয়াছে, তার আশা মিটিবার নয়, শাস্ত্র মন্থন সব তার অন্তরায়। যদি তুলসীর কাছে জীবন লাগাইয়া দিতে পারা যায়,—তাই প্রাণ-পণে সে তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। অধ্যাপক মহাশয় অন্তরাল হইতে অবিনাশের বিষণ্ণ ভাব লক্ষ্য করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, "অবিনাশ, বাবা, যদি আজ তুলসী বাঁচে ত সে তোমারই যত্নে—আমি বুঝেচি, আমার চেয়েও তুলসী তোমারই যত্নের।" তিনি আর বলিতে পারিলেন না, চক্ষু জল-ভারাকুল হইল, যদি অবিনাশের মত জামাতা পাইয়া আমায় সমাজে পণ্ডিত-মধ্যে অবজ্ঞেয় হইয়া থাকিতে হয় সেও ভাল, তবু এমন রত্নকে অগ্রাহ্য করিব না।

একান্তভাবে ভগবানকে যে ডাকে ঈশ্বর তাহার কথা শোনেন, হইলও তাই। তুলসীর একটু-একটু করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তুলসীর কথা সংজ্ঞালাভ হইল, তখন অবিনাশ উঠিয়া চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন। চতুষ্পাঠীতে

উপস্থিত হইয়া দেখেন, ছাত্রেরা এক বিভ্রাট বাধাইয়া বসিয়াছে। এই বিজনপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কোন এক বৈষ্ণব বহুরূপী সাজিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, তাহার দুর্ব্বুদ্ধি, সে একদিন গোয়ালিনী সাজিয়া টোলে আসিয়া বলে, "তোমরা দুধ খাইয়াছ, দাম দাও।" শেখর প্রভৃতি ছাত্রেরা বলে, "এক রাত্রি এখানে না থাকিলে দাম দিব না। আজ রাত্রে এখানে থাক, কাল দাম লইয়া যাইও"—এই ভাবে তাহার সহিত বকাবকি করিয়া তাহার পরচুলা নোলক চুড়ি প্রভৃতি সব কাড়িয়া লইয়াছে! অবিনাশ এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত হইল—বলিল, "তোমাদের কি কোনও আক্কেল নাই? অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ী এই বিপদ, আর তোমরা এমনি আমোদে মত্ত!"

অবিনাশের কথায় সকলে তাহার আভরণ ও কিঞ্চিৎ পয়সা দিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

৭

প্রদেশস্থ অধ্যাপকগণ একবাক্যে বলিলেন, ছাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইতে পারে না। অবশ্য জনকতক অধ্যাপক একটু রকম-ফের করিয়া বলিলেন, হইতে পারে, তবে যুক্তি-বিরুদ্ধ। গ্রামের দুই-এক জন বলিল, যদি উনি এই অশাস্ত্রীয় কাজ করেন, আমরা উঁহাকে সমাজে রহিত করিব। এই সব ব্যাপারে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া অধ্যাপক মহাশয় আজ চতুষ্পাঠীতে আসেন নাই।

সন্ধ্যা হইতেই বাদলা আরম্ভ হইয়াছে, টিপি-টিপি জল পড়িতেছে। সকলেই আহারে এক প্রকার অনিচ্ছা জানাইয়া যে যার বিছানায় শুইয়াছে। ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। এমন সময় রামগোপাল কহিল, "শেখর দাদা, সত্যই কিছু খাবে না?" শেখর বলিল, "ক্ষিদে পেয়েছে, খেলেও হয়।" বিধু বলিল, "দাদা, আমার ভয়ানক ক্ষিদে—মরে গেলুম।"

তখন সকলে রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিল। ঘরে চাল ছাড়া অন্য কোন জিনিষই নাই। বিধু বলিল, "আমি পদ্মা ময়রার গাছ থেকে আম পেড়ে আনি, তোমরা ভাত চড়াও।" বিধু টোল-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ময়রা বাড়ী উপস্থিত হইল, এদিক ওদিক একটু চাহিয়া নিঃশব্দে আমগাছে উঠিল। এমন সময় ময়রাদের একটি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইয়া "গাছে কে রে? গাছে কে রে?" এই শব্দে ডাকিতে লাগিল। বিধু শুনিয়া খুব ধীরভাবে উত্তর করিল, "আমি"। স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কে? গাছে কি হচ্ছে?" বিধু উত্তর করিল, "ফুলগুটি পাড়ছি।" স্ত্রীলোকটি অবাক্ হইয়া কহিল, "আমগাছে ফুলগুটি কি-রকম?" বিধু বেশ শান্তভাবে কহিল, "তা নেই নেই, নেমে যাচ্ছি,—তার আবার কি?" এই বলিয়া ধীর ভাবে গাছ হইতে নামিয়া প্রস্থান করিল। স্ত্রীলোকটি অন্ধকারে মানুষ চিনিতে পারিল না, কহিল, "মিন্সে ক্ষ্যাপা, বোধ হয়।" টোলে আসিয়া বিধু কোঁচড় হইতে আমগুলি বাহির করিয়া দিল এবং "ফুলগুটি" পাড়ার বৃত্তান্ত বলিলে সকলে হাসিয়া অস্থির হইল।

৮

সম্প্রতি যুগল বাবুর মৃত্যু হইয়াছে,—খুব ধূমধামে শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, তাহারই

জের আজ অবধি চলিতেছে। নানা দেশের নানা অধ্যাপক আসিয়া ছিলেন,—সভায় শাস্ত্রীয় তর্কও খুব হইয়াছিল। "ঘটের অভাব কোথায় থাকে ?"—ইহার জন্য অধ্যাপক মহাশয়েরা বিস্তর মাথা ঘামাইয়া ছিলেন। আজ পর্য্যন্ত কতক গোলযোগ যাইতেছে,—কয়দিন ভোজ খাইয়া ছাত্রদের খুবই আমোদ হইয়াছে, কিন্তু একটি কারণে তাহারা বড়ই দুঃখিত, টোল উঠিয়া যাইবে। কারণ যুগল বাবুর মৃত্যুর পর আর কে টোলের খরচ চালাইবে ? তাদের যে পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে,এই তাহাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ। তাই তাহারা ভাবী বিরহের আশঙ্কায় বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। তাহারা আজও যায় নাই, তাহার কারণ আর তিন-চার দিন পরে তুলসীর বিবাহ। অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন, তোমরা এই কাজ সারিয়া স্থানান্তরে যাইও,—নতুবা একলা আমি বড়ই বিপন্ন হইব। এ বিবাহে অবিনাশের কোন সুখ নাই। তাহার চির-সঞ্চিত আশা সমূলে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। সে যে অনেক আশা করিয়াছিল! তুলসীর কলেরার দিন সে যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দিবা-রাত্রি শুশ্রূষা করিয়াছিল! অবিনাশ স্থানান্তরে যাইতে বিপুল চেষ্টা করিয়াছিল, কেবল অধ্যাপক মহাশয়ের অনুরোধে যাইতে পারে নাই। কিন্তু তাহার যে কি মর্ম্ম-বেদনা হইয়াছে, তাহা সে-ই জানে। এই দারুণ মর্ম্মপীড়া বুকে চাপিয়াও সে কেবল অধ্যাপক মহাশয়ের অনুরোধে স্বচক্ষে অন্যের সহিত তুলসীর বিবাহ দেখিতে প্রস্তুত হইয়াছে!

৯

অধ্যাপকের বাড়ীর কাজে তত ধুমধাম কিছুই হইবে না, তাঁহারা যজমান-বাড়ীতে খরচ-বাহুল্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সামান্য-সামান্য রকম আয়োজন সব হইয়াছে, একধারে বরযাত্রীদের বসিবার স্থান—ছাত্রেরা সকলে খুব ব্যস্ততার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অবিনাশও কাজ-কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু ম্লান মুখে। এমন সময় শেখর কহিল, "ভাই আমাদের প্রীতি উপহারখানা একবার বার কর। কেমন হলো, দেখা যাক্।" রামগোপাল পড়িতে আরম্ভ করিল,

"বাংলা পদ্য লিখ্‌তে হবে ব্যাপার বড়ই শক্ত, টোলে কভু বাস করে না বাংলা ভাষার ভক্ত। খুঁজে পেতে দেখি একবার রঘুনন্দন মূলটা— একটুখানি তামাক সাজ, দিতে ভুলোনা গুলটা— এ কি হ'ল ব্যাপার,ভায়া,চাঁইদাদার নাই ফূর্ত্তি। বিদূষকের বুদ্ধিটি ত স্মৃতির বচনে পূর্ত্তি!"

এই প্রকারে কয়েক লাইন পদ্য পড়ার পর নাম সহি পাঠ করিল, "চতুষ্পাঠীর ভূতেরা— সাং যুগল বাবুর চিড়িয়াখানা।"

লগ্নের প্রায় সময় হইয়াছে,অধ্যাপক মহাশয় বড়ই ব্যস্ত, কিন্তু এখনও বর আসিয়া পৌঁছিল না। অধ্যাপক মহাশয়ের মাথার ঠিক নাই —তিনি যে কি বিপন্ন হইয়াছেন, তাহা এই অবস্থায় ভুক্তভোগী লোকই ভাল বুঝিবে। এমন সময় বরপক্ষের পরামাণিক আসিয়া সংবাদ দিল, "বরের পিতা বলিয়াছেন, আর দুই শত টাকা পণ বেশী না দিলে পাত্র আসিবে না।" অধ্যাপক মহাশয় সংবাদ শুনিবামাত্র পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া অবিনাশের হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "বাবা, এ বিপদে

তুমিই আমার ভরসা।" অবিনাশের চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। অবিনাশ কহিল, "চলুন, যাচ্ছি।"

* * * *

চতুষ্পাঠীতে খুব আনন্দ! অবিনাশের সহিত তুলসীর বিবাহ হইয়া গেল। সেদিন খুব আমোদে কাটিল বটে কিন্তু তার পর দিনের মত দুঃখ ছাত্রেরা জীবনে পায় নাই। চতুষ্পাঠী ভাঙ্গিয়া গেল, যে যার নিজের নিজের বাড়ী চলিল। প্রফুল্ল শ্বশুর-বাড়ী যাইলে নিশি-দিবা প্রভৃতির ন্যায় ছাত্রেরা অবিনাশকে রাখিয়া সাশ্রু-নয়নে অধ্যাপকের চরণ-প্রান্তে বিদায় গ্রহণ করিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু বিবাহের আধ্যাত্মিকতা

হিন্দু বিবাহের আধ্যাত্মিকতার কথা সর্ব্বদাই আমরা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকি। ইহা যে অন্যান্য দেশের বিবাহপ্রথার চেয়ে অনেক ভালো, তাহা স্বীকার করিলেও নিরপেক্ষভাবে ইহাকেই আদর্শ বলা কত-দূর সঙ্গত তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। হয়ত মানুষের স্বভাবের অসম্পূর্ণতার জন্যই কোন স্থলে এ পর্য্যন্ত আদর্শ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইতে পারে নাই; কিম্বা প্রথা ভাল হইলেও মানুষের দুর্ব্বলতার জন্য ফলে বেশী লোক বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে নাই। সুতরাং বাহিরের ফল দেখিয়াই নির্ব্বিচারে কোন প্রথার দোষ দেওয়া উচিত নয়। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের চরিত্রের একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন না হইতেছে, ততদিন কোন নিয়ম বা প্রথার ফল সর্ব্বাংশে ভাল হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু কোন প্রথা বা নিয়ম ভাল কি না, বিবেচনা করিতে হইলে ভাল এবং নির্দ্দোষ প্রাণীর উপর সে প্রথার দরুণ কোন অত্যাচার হইতেছে কি না এবং কেবল প্রথাই তাহাদের সদিচ্ছাবিকাশের ও আদর্শ-লাভের অন্তরায় হইতেছে কি না, দেখা উচিত। আমাদের দেশের বিবাহ-প্রথার সপক্ষে এক-বাক্যে জয়ধ্বনি করিবার পূর্ব্বে এই সকল বিষয়গুলি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দেশের বিবাহে লোকে অসুখী হইলে, তাহা জানা কঠিন হয় না। Divorce ইত্যাদি প্রথার জন্য সহজেই তাহা সকলের চোখে পড়ে! কিন্তু যাহারা সুখী হয়, তাহাদের কোন খবরই আমাদের কানে পৌঁছায় না। সেই জন্য আমাদের দেশের বিবাহে যে সকলেই সুখী হইতেছে, এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে আর বিলম্ব ঘটে না!

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের মত, প্রকৃত অবস্থা জানিবার সুবিধা থাকিলে আমাদের দেশের প্রথার সম্বন্ধেও বোধ হয় এতটা শ্লাঘা করা সম্ভব হইত না। পুরুষ ও নারী উভয়কে লইয়াই বিবাহ। সুতরাং দুই-পক্ষই

সুখী হইতেছে কিনা ও আদর্শ-লাভে বাধা পাইতেছে কিনা দেখিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে যে সকল কারণে Divorce ঘটে, আমাদের দেশে একপক্ষে যে তাহা ঘটে না, এ কথা কি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন? আর অপর পক্ষে তাহার বিন্দুমাত্র আভাস ঘটিলে নারীর কি দশা হয়, তাহা কি কখনো কাগজে-কলমে বাহির হয়? তবে সেজন্য কোন গোলমাল শুনিতে পাওয়া যায় না কেন? তাহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নয়, এবং তাহা হইলেই আমাদের বিবাহের আধ্যাত্মিকতা যে কোথায়, তাহা ধরা পড়িবে।

সে যে কোথায়, তাহা আর বলিতে হইবে না। সেই ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা নারীতেই—যাহার জন্য মনু হইতে আরম্ভ করিয়া অজাতশ্মশ্রু স্কুল-কলেজের ছেলেরা অবধি উপদেষ্টা ও অনুশাসিতার আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। এক তরফার কথায় সত্য-মিথ্যা নির্ণীত হইতে পারে না। সুতরাং একপক্ষ যখন এত কালের শাসন-পর্ব্বতের তলায় বাক্‌শক্তিহীন, জড়ত্বপ্রাপ্ত, তখন আমাদের দেশের বিবাহের প্রকৃত তত্ত্ব কিরূপে প্রকাশ পাইবে?

বাস্তবিক বিবাহ যখন দুইপক্ষের সম্বন্ধ, তখন কেবল একপক্ষের উপর সমস্ত শাসন-ভার চাপাইয়া কিরূপে যে আধ্যাত্মিকতা লাভ হইতে পারে, তাহা বোঝা কঠিন। আত্মোৎসর্গ আদায় করা যেমন হীন, বাধ্যতা বা জড়ত্ব-প্রণোদিত দানও তেমনি গৌরবশূন্য। হিন্দু নারীর মহিমা-কীর্ত্তনের সময় হিন্দু পুরুষ যে কতখানি খাটো হইয়া পড়েন, তাহা না বুঝিয়া কিরূপে তাহাতে গৌরব বোধ করেন, ইহাই আশ্চর্য্য!

বাস্তবিক বিবাহ আত্ম-বলিদানের জন্য নয়। দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কও তাহাতে এক-তরফা হইতে পারে না। স্ত্রী, পুরুষ—উভয়েরই পক্ষে বিবাহ একটি অতি-প্রয়োজনীয় সংস্কার। আত্মবিকাশ, মনুষ্য-জীবনের সম্পূর্ণতা, চিরজীবনের সাহচর্য্য, বিভিন্ন প্রকৃতির গুণে পরস্পরের অভাব-পূরণের সহিত সৃষ্টিরক্ষার জন্য যে একটী প্রধান প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহারও চরিতার্থতা ইহার মধ্য দিয়া হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার সার্থকতা দুইজনের জীবনের পরিপূর্ণতার উপর নির্ভর করে। একজনের বিলোপে তাহা হইতে পারে না। উভয়েই উভয়ের দ্বারা অধিকতর সম্পূর্ণ হইবে, ইহার বিবাহের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আমাদের প্রচলিত বিবাহ প্রথায় কতদূর সাধিত হইতেছে? আমাদের প্রথা প্রথম হইতেই একপক্ষকে বাদ দিয়া রাখিয়াছে। তাহার নিজের কোন সুখ, দুঃখ, অভাব বা আকাঙ্ক্ষার স্থান ইহাতে নাই। ইহাতে বাহিরে খুব সহজেই শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হইয়াছে দেখা যায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু সহজ পথই শ্রেষ্ঠ পথ কি না, ইহাই বিচার্য্য।

প্রকৃতির এমনি অমোঘ নিয়ম, তাহাকে এক জায়গায় চাপা দিলে তাহা অন্যত্র অন্য আকারে প্রকাশ পাইবেই। আমাদের দেশের বিবাহেও একপক্ষকে অস্বীকার করিতে গিয়া কোন পক্ষই সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। একজনকে যদি কেবলই দিতে হয় ও তাহার পাইবার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে দিবার উপযুক্ত ধন সে কোথায় পাইবে? তাহার সে রিক্ততার, সে দানের মূল্যই বা কি?

তার পর পাশ্চাত্য দেশের বিবাহিত জীবনের যে ব্যতিক্রম আমাদের এত বেশী চোখে পড়ে, আমাদের মধ্যে সে কারণগুলির যদি একান্ত অসদ্ভাব ঘটিত, তাহা হইলেও বা আমাদের গৌরব করিবার কিছু থাকিত! কিন্তু তাহার অস্তিত্ব যখন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, তখন আমাদের সমাজ তাহার কি মীমাংসা করিয়াছেন, দেখা যাক্; এবং তাহা সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ কি না তাহার বিচার করাও অনুচিত হইবে না। বিশ্বাস-ভঙ্গ এবং তাহার আনুসঙ্গিক পরিত্যাগ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদির জন্যই পাশ্চাত্য দেশে বিবাহ-ভঙ্গ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সে অবস্থায় সমাজ কি করিয়া থকে? স্বামীর দুশ্চরিত্রতা ও তাহার আনুসঙ্গিক নানা কদর্য্য ব্যাপারে আমাদের দেশের মেয়েদের নারীত্ব ও মনুষ্যত্ব যে কিরূপে পদ-দলিত হয়, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। যতই অকথ্য, অবর্ণনীয় অপমান বা যন্ত্রণা হউক না কেন, তাহাদের তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই! এমন কি আইনও যেখানে রক্ষা করে, সেখানেও তাহাদের ফল পাইবার কোন যোগ্যতা, অধিকার বা সুবিধা—সমাজ কিছুই রাখেন নাই। তাঁহারা কি ইহাকেও "আত্মোৎসর্গ" বলিতে চান? তা যদি বলেন, তাহা হইলে ঐ শব্দটী অভিধান হইতে উঠাইয়া দেওয়াই লাভ!

এদিকে স্ত্রীর বিষয়ে এতটুকু সন্দেহের কারণ ঘটিলে কি হইয়া থাকে? কোর্টের কোন বালাই না হইয়াই স্বামী তাহাকে যেখানে ফেলিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন। সত্য কারণ এতটুকু ঘটিলে, এমন কি বিপদে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইলেও তাহাকে নরক-কুণ্ডের পথে ফেলিয়া দিতেও দ্বিধা করেন না! ইহার নাম যদি আধ্যাত্মিকতা হয়, তাহা হইলে পৈশাচিকতা শব্দটী কোথায় প্রযুক্ত হইবে জানা দরকার। পাশ্চাত্য দেশের দুর্ভাগ্য, তাহারা এত সহজে এই সকল জটিল প্রশ্নের সমাধান শিখিতে পারে নাই। অবশ্য পাশ্চাত্য বিবাহও যে আদর্শ নয় এবং আমাদের বিবাহ-প্রথা যে তাহার চেয়ে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার গুণ-কীর্ত্তন সর্ব্বদাই হইতেছে, সুতরাং অন্য দিকটা কিছু দেখানোই আমার উদ্দেশ্য।

তার উপর বর যে-বয়সেরই হউন না, বা পূর্ব্বে যত বিবাহই করিয়া থাকুন না কেন, ১১।১২।১৩ হইতে আজকাল ১৫।১৬ বৎসরের কুমারীও আমাদের বিবাহের বাজারে প্রচুর মিলে। যখন একটী ৪০।৫০ বৎসরের (আরও ঊর্দ্ধবয়সের নাম না হয় নাই করিলাম) বিপত্নীকের সহিত ঐরূপ একটী কুমারীকে বিবাহ-সূত্রে জুড়িয়া দেওয়া হয়, তখনই বা সে বিবাহের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্থান কোথায় থাকে, জানিতে পারি কি? একটী কুমারীর পবিত্র জীবনকে প্রথম হইতেই বিশুদ্ধতার সমস্ত স্বাদ ও সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত করা অপেক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকারের অবমাননা আর কি হইতে পারে?

পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি উভয়ের সর্ব্ব প্রধান দাবী। সেইজন্যই সতীত্বের এত মহিমা। কিন্তু ঐ দাবী স্বামীর প্রতিও ঠিক সমানভাবে করিবার অধিকার ও সংস্কার পরমেশ্বর প্রত্যেক নারীর অন্তরেই দিয়াছেন। সমাজের ব্যবস্থা, শাসন, এমন কি আত্ম-উপলব্ধিরও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহা কতকটা ঢাকা আছে মাত্র। কিন্তু ত্রুটী এমন প্রবল সংস্কার যে এত শাসনেও সম্পূর্ণ চাপা পড়ে নাই। সুতরাং প্রথম হইতে সেই অধিকারটুকুরও স্থান না রাখা অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে? এক হিসাবে ইহা স্বাভাবিক বিবাহের পর স্বামীর দুশ্চরিত্রতার অপেক্ষাও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। কারণ তাহা যতই ঘৃণ্য ও অপমানকর হউক না, স্বামীর উপর স্ত্রীর দাবী ও অধিকার যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাতে তিনি প্রথম হইতেই অন্যের; এবং তাঁহাদের দাবী ও অধিকার পরবর্ত্তী অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই অধিক। তিনি নিজে না থাকিলেও তাঁহার গৃহে সন্তান, স্বামী, সমস্তই তাঁহার। নবীনা তাহাতে একান্তই অনধিকার প্রবেশ করেন মাত্র; সুতরাং বয়সের গুরুতর পার্থক্যের জন্য যে সকল অস্বাভাবিক জঘন্যতার সৃষ্টি হয়, তাহা ছাড়িয়া দিলেও একজন বিশুদ্ধ কুমারীকে বিপত্নীকের সহিত বিবাহ দেওয়ায় কুমারীরই অবমাননা করা হয়।

ইহা ভাবিলে যদিও বিবাহের প্রকৃত আদর্শ-অনুসারে স্ত্রী পুরুষ কাহারোই একাধিক বিবাহ একেবারেই সমর্থন-যোগ্য নহে, তথাপি মনুষ্য চরিত্রের বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া বিধবা-বিবাহও সমাজে প্রচলিত করা উচিত বোধ হয়। তাহা হইলে অন্ততঃ কতকটা সাম্য ও শীলতা রক্ষা হইতে পারে। বাস্তবিক "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্" ধরিয়া বিবাহে উচ্চ আদর্শ যদি খর্ব্ব করিতেই হয়, তাহা হইলে বয়স্ক বিপত্নীকের সহিত বয়স্কা বিধবার বিবাহ তবু কতকটা সঙ্গত হইতে পারে। সঙ্গীর হিসাবেও সংসারাভিজ্ঞ দুইজনেই দুইজনকে বুঝিয়া চলিতে পারে। সেইজন্য এরূপ বিবাহ আদর্শ-হিসাবে নিম্নশ্রেণীর হইলেও ইহাতে জঘন্যতা বা প্রকৃতির উপর কোন অত্যাচার ঘটে না।

বঙ্গ-নারী।

আব্‌দার

তোমার আদর মিষ্টি কথা
সবার তরে রেখো গো,
আমায় কেবল অম্‌নি ক'রে
আড়-নয়নে দেখো গো।
চক্ষে আসে স্বরগ নামি
সেই চাহনি চাই যে আমি,
তোমার নয়ন-সঙ্গীতের ওই
ইঙ্গিতে সই ডেকো গো।

তোমার আঁখির দরবারেতে
পাই যেন পাই নিমন্ত্রণ।
আমি তোমার পূজক কবি
ভক্ত তোমার চিরন্তন।
জীবন-তরী ঝঞ্ঝা-ব্যাকুল
যদিই কভু হারায় গো কূল,
স্বরগ-পথের আলোক-গৃহ
সম্মুখে মোর থেকো গো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

কিস্তিমাৎ

সকাল-বেলায় প্রাতঃস্নান ক'রে, দুর্গাকালী কুট্‌নো কুট্‌তে যাচ্ছে, এমনসময়ে ঘরের ভেতর থেকে ভামিনী চেঁচিয়ে ডাক দিলেন, "দুগ্‌গাকালী, অ দুগ্‌গাকালী!"

"ঘুম্ না ভাঙ্‌তেই চ্যাঁচানি সুরু!" এই ব'লে দুর্গাকালী ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

ভামিনী বল্‌লেন, "গিন্নি, মস্ত এক সুস্বপ্ন দেখেচি; ভোরের স্বপন তো সত্যি হয়?"

দুর্গাকালী বল্‌লে, "সুস্বপ্ন! কি সুস্বপ্ন?"

ভামিনী বল্‌লেন, "দেখলুম, আমি ঘোড়-দৌড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েচি। অনেকগুলো ঘোড়া দৌড়োচ্চে। দৌড় থাম্‌লে দেখ্‌লুম, আমি যে ঘোড়ার ওপরে বাজী ধরেচি সেই ঘোড়াই প্রথম হয়েচে।"

দুর্গাকালীর উৎসাহ অল্পে অল্পে জেগে উঠছিল। সে ভামিনীর সাম্‌নে এসে দুই থাবা পেতে বসে আগ্রহভরে বল্‌লে, "তারপর?"

ভামিনী বল্‌লেন, "তারপর শুন্‌লুম, আমি পনেরো হাজার টাকার বাজী জিতেচি।"

দুর্গাকালী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "টাকাটা পেলে তো?"

ভামিনী একটু দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "হাতে পাবার আগেই আহ্লাদে আমার ঘুম ভেঙে গেল।"

দুর্গাকালী মুখভার ক'রে বল্‌লে, "তা আমি আগেই এঁচে নিয়েচি। জেগে জেগেই যে মানুষ সব কাজ পণ্ড করে, স্বপ্নেও সে বোকামি তো কর্‌বেই! আচ্ছা, তবু এমন স্বপনটা যখন দেখ্‌লে, তখন একটা কাজই করনা কেন! আজ তো আপিসের সায়েব মরেচে ব'লে তোমার ছুটি?"

—"হুঁ।"

—"আজ ঘোড়দৌড় আছে তো?"

—"আজ শনিবার, আছে বৈকি!"

—"তবে কপাল ঠুকে 'রেস' খেলে এস। ঘোড়দৌড়ের দিনেই ভোরবেলায় যখন সুস্বপন দেখেচ, তখন চাই-কি ফলে যেতেও পারে।"

ভামিনী সন্দেহের সঙ্গে মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "এমন আল্‌টপ্‌কা টাকা পাওয়া কি আর আমার অদৃষ্টে ঘট্‌বে! গিন্নি, কত লোকে কত পায়, আমি কিন্তু আজ-পর্য্যন্ত পথ থেকে কোনদিন একটা ডবল-পয়সাও কুড়িয়ে পেলুম না। আমাকে বল্‌চ রেস্ খেল্‌তে?—হায় রে!"

দুর্গাকালী বল্‌লে, "ঐতো! ঐ রোগেই তো ঘোড়া মরেচে! অদৃষ্ট কখন্ কার ওপরে প্রসন্ন হয়, তা কে বল্‌তে পারে? মনে নেই এটা মাঘ মাস, আর তোমার কর্কট রাশ? শাস্ত্রে লিখেচে, মাঘমাসে কর্কটের অর্থ লাভ হয়।"

ভামিনী কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়ে বল্‌লেন, "হুঁ, তা জানি বটে। কিন্তু কলিকালে কি শাস্ত্রবাক্য ফলে?"

দুর্গাকালী বল্‌লে, "এখনো চন্দর-সূর্য্যো উঠ্‌চে, শাস্ত্র আর ফল্‌বে না?—লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো, আজ ঘোড়দৌড়ে যাও, নিশ্চয় তুমি বাজী জিত্‌বে!"

হঠাৎ ভামিনী আঁৎকে উঠে খাট থেকে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে পড়্লেন।

—"ও কি! ও আবার কি হোলো?"

—"টিক্‌টিকি, টিক্‌টিকি! গায়ের ওপরে টিক্‌টিকি পড়েচে—রাম, রাম!"

—"টিক্‌টিকি পড়েচে? রোসো,—কোন্ দিকে গো,—ডানদিকে না বাঁদিকে?"

কোঁচা দিয়ে গা ঝাড়্তে ঝাড়্তে ভামিনী ঘৃণাভরে বল্লেন, "বাঁদিকে!"

দুর্গাকালী ভারি খুসি হয়ে ব'লে উঠল, "বাঁদিকে পড়েচে, বল কি গো! বাঁদিকে টিক্‌টিকি পড়্লে লাভ হয় গো, লাভ হয়! হে বাবা সত্যনারায়ণ! মুখ তুলে চাও বাবা, তোমার দোরে একটাকার সিন্নি চড়াব!"

এতক্ষণে ভামিনীরও একটু একটু বিশ্বাস হোলো। তিনি তাড়াতাড়ি পাঁজী খুলে দেখ্লেন,তার ওপর আজ আবার ত্র্যমৃতযোগ। তাঁর আর কোন সন্দেহ রইল না, নিজের সৌভাগ্য সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বল্লেন, "আজ আমার পোয়া বারো দুগ্‌গা, আজ আমার পোয়া বারো! এই দ্যাখো, আজ ত্র্যমৃতযোগ! পাঁজীতে লেখা রয়েচে, 'এই যোগ যাত্রাদিতে শ্রেষ্ঠ ও অভিমত ফলপ্রদান করে।' তুমি তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না সুরু ক'রে দাও, আজ যা থাকে কপালে—এক-বার 'রেস্' খেলেই দ্যাখা যাক্!"

দুর্গাকালী বল্লে, "কিন্তু আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

ভামিনী আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, "তুমি? তুমি যাবে কি বল?"

দুর্গাকালী বল্লে, "কি জানো, তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে আমার ভরসা হয় না। শেষটা হাতে লক্ষ্মী পেয়েও হয়ত পায়ে ঠেল্‌বে!"

ভামিনী বল্লেন, "না, না, তোমার আর গিয়ে কাজ নেই। জাননা, শাস্ত্রে আছে 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা'?"

"শাস্ত্রে"র এই বচনটা দুর্গাকালীর কোন দিনই ভালো লাগ্‌ত না। কিন্তু আজ ভালো না লাগ্‌লেও এই "শাস্ত্রবাক্য"টা অবহেলা কর্‌তে তারও ভরসা হোলো না। কাজেই সে বল্লে, "বেশ, আমি না হয় বাড়ীতেই থাক্‌ব। কিন্তু টাকা যদি পাও, খুব সাবধানে এন।"

ভামিনী বল্লেন, "তা আর বল্‌তে, একেবারে পেট-কাপড়ে বেঁধে আন্‌ব।"

দুর্গাকালী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "না, না, তোমার কাপড়ের কসি বড় একটুতেই আল্‌গা হয়ে যায়।"

—"তবে বুকপকেটে।"

—"সেই ভালো। কিন্তু দেখো, পকেট যেন কাটা না যায়!" এই ব'লে দুর্গাকালী হাত দুলিয়ে তাড়াতাড়ি রান্নার আয়োজন কর্‌তে চলে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'লে ভামিনী চট্‌পট্ কাপড়-চোপড় প'রে নিলেন।

দুর্গাকালী বল্লে, "নাও, কুলুঙ্গীতে সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন, ওঁকে আগে প্রণাম ক'রে নাও।"

ভামিনী কথামত কাজ কর্‌লেন। এত ভক্তিভরে গণেশকে তিনি আর-কখনো প্রণাম করেন নি।

দরজার কাছে একটি জলভরা কলসী রেখে দুর্গাকালী বল্লে, "এইবার এই কল্‌সীর দিকে তাকিয়ে ইষ্টিদেবতার নাম কর্‌তে কর্‌তে সোজা বেরিয়ে পড়ো।"

ভামিনীর স্ত্রীর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে বেরুতে যাচ্ছেন, এমনসময়ে পথ থেকে কে ডাক্‌লে, "ভামিনীবাবু বাড়ীতে আছেন?"

দুর্গাকালী দৌড়ে গিয়ে, জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে এসে বল্লে, "কে একটা মাকুন্দ লোক ডাক্‌চে!"

ভামিনী বল্লেন, "গলা শুনে মনে হচ্ছে নন্দ ঘোষ।"

দুর্গাকালী বল্লেন, "খবর্দ্দার, ওর সঙ্গে দেখাও কোরো না, সাড়াও দিও না! ও আগে চলে যাক্, তারপর তুমি বেরিও।"

—"কেন?"

—"কেন আবার—অযাত্রা! জানোনা, খনার বচনে আছে—

"যদি দেখ মাকুন্দ চোপা
এক পাও না বাড়াও বাপা।'

হতভাগা মিন্সে, ডাক্‌বার আর সময় পেলেন না, আর-একটু হ'লেই তো তোমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যেত!"

এই মূর্ত্তিমান অযাত্রাটি ডেকে ডেকে গলা ভেঙে যখন হতাশ হয়ে চ'লে গেল এবং দুর্গাকালী যখন 'লাইন ক্লিয়ার" আছে কিনা দেখ্‌বার জন্যে জান্‌লা দিয়ে আর একবার উঁকি মেরে ভরসা দিলে, ভামিনী তখন তাম্বূলারক্ত নিশ্চিন্ত মুখে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

তাঁর বাসা থেকে ট্রামের রাস্তা ছিল খানিক তফাতে। গরমও পড়েচে চরম,

ভামিনীর স্থূল বপুখানির স্বাভাবিক উত্তাপও যথেষ্ট;—কাজেই ছাতার আড়ালে আত্মরক্ষা ক'রেও অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠলেন।

এর ওপরে আর এক বিপদ! ঘোড়-দৌড়ের উত্তেজনায় ভামিনী একটু অন্যমনস্ক হয়েও পথ চল্‌ছিলেন,—আচম্বিতে তাঁর কাণের কাছেই ভোঁ ক'রে একটা ভয়ানক পরিচিত ভেঁপু বেজে উঠ্‌ল—ভামিনী চম্‌কে বুঝলেন, তাঁর ঘাড়ের ওপরেই মটরগাড়ী! পাশেই ছিল একটা কাণায় কাণায় ময়লা-ভরা 'ডাষ্টবিন'—দিগ্‌বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ভামিনী তার ভিতরেই হুম্‌ড়ী খেয়ে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেলেন।

কিন্তু যে ভেঁপু বাজিয়েছিল সে মটরগাড়ী নয়—একখানা সাইকেল মাত্র!

'ডাষ্টবিনে'র জঞ্জাল সর্ব্বাঙ্গে মেখে এবং দুর্গন্ধে ওয়াক্ থু কর্‌তে কর্‌তে ভামিনী কোন-রকমে বাইরে বেরিয়ে এস দেখ্‌লেন, এর-মধ্যেই সেখানে বেশ-একটি ছোটখাটো জনতার সৃষ্টি হয়েচে, আর সেই জনতার ভিতরে তাঁর পরিচিত বন্ধু গঙ্গারাম হাতীও কোথা থেকে এসে যোগদান করেছেন।

গঙ্গারাম তো ভামিনীর অবস্থা দেখে হেসেই খুন!

ভামিনী চটে বল্লেন, "আপনি কি মনে কর্‌চেন গঙ্গারামবাবু, যে আপনার হাসি এখন আমার বড্ড ভালো লাগ্‌চে?"

গঙ্গারাম অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন, "মাপ কর্‌বেন ভামিনীবাবু, হাসিটা আমার অজান্তে মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়েচে! কিন্তু আপনি কল্‌কাতার ছেলে, সামান্য একখানা সাইকেল

দেখেই ভড়্‌কে ময়লার কুপোর ভেতরে গিয়ে পড়েছিলেন কেন ?”

ভামিনী নাকের ঠিক ডগা থেকে অত্যন্ত দুর্গন্ধ কি-একটা বিশ্রী জিনিষ মুছে ফেলে বল্‌লেন, “কুপোর ভেতরে গিয়ে পড়েছিলুম স্বচক্ষে সর্ষেফুল দ্যাখ্‌বার জন্যে। কেমন, আপনার কৌতূহল মিট্‌ল তো ? আপাতত আপনারা পথ ছেড়ে দয়া ক’রে বিদায় হ’লে আমি দুঃখিত হব না। আপনাদের বোঝা উচিত, আমি সং নই।”

গঙ্গারাম বল্‌লেন, “ভামিনীবাবু, সাম্‌নেই আমার শ্বশুরবাড়ী, আসুন, স্নান ক’রে জামা-কাপড় বদ্‌লে ফেল্‌বেন।”

উপায়ান্তর না দেখে ভামিনী ম্লানমুখে আস্তে আস্তে গঙ্গারামের পিছনে পিছনেই চল্‌লেন। স্নান ক’রে পরিষ্কার হ’লে পর গঙ্গারাম তাঁকে একটি কোট, একখানি কাপড় আর একখানি চাদর পর্‌তে দিলেন। গঙ্গারামকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ভামিনী আবার ঘোড়-দৌড়ের মাঠের উদ্দেশে ছুট্‌লেন। কিন্তু পথে এই বাধা পড়াতে তাঁর মনটা ভারি দমে গেল।

* * *

আজ আর দুর্গাকালীর অন্য চিন্তা নেই। এমন-কি আজ দুপুরে পাড়া বেড়াতে যেতেও তার মন উঠল না।

সারাদিন নানান দেবতাকে সে ষোড়শোপচারে পূজো দেব ব’লে বারংবার প্রলুব্ধ করেছে এবং ঘন ঘন জান্‌লার কাছে গিয়ে দেখেছে যে, ভামিনীভূষণ হাসিমুখে ফিরে আস্‌ছেন কিনা !

[illegible] বাহুল্য,টাকাটা হাতে এলেই একখানা [illegible] পাদ্রাজী শাড়ী, একটা হালফ্যাসানের ব্লাউস, আর একছড়া মটর-মালার জন্যে স্বামীর কাছে মনের বাসনা প্রকাশ কর্‌বে, সেটাও সে ইতিমধ্যেই স্থির ক’রে ফেলেছ।

এদিকে বেলা পড়ে এল। ভামিনী তবু ফেরেন না কেন ? তবে কি ভোরের স্বপন, মাঘমাস কর্কটরাশ, বাম অঙ্গে টিক্‌টিকির পতন আর ত্র্যমৃতযোগ, সমস্তই মিথ্যে হয়ে গেল, না গাঁটকাটা কি গুণ্ডা এসে পথের মাঝেই টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়ে স’রে পড়্‌ল ?

দুর্গাকালীর উদ্বেগ যখন মাত্রা ছাড়াই ছাড়াই কর্‌ছে, তখন হঠাৎ নীচে থেকে ভামিনীর গলা পাওয়া গেল—“গিন্নি, গিন্নি !”

দুর্গাকালী হুড়মুড় ক’রে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল, আবেগে তার মুখ দিয়ে আর কথা ফুট্‌ল না।

ভামিনী বাড়ী কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌লেন, “দুগ্‌গা, কিস্তিমাৎ ! ব’লেই তিনি সাম্‌নের দিকে প্রাণপণে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন, দুর্গাকালীও তার ভিতরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে প’ড়ে ভামিনীর বুকের ওপরে মুখ রেখে চোখ মুদে চুপ ক’রে রইল।

আনন্দের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেল। দুর্গাকালী মুখ তুলে প্রথমেই জিজ্ঞাসা কর্‌লে, “কত টাকা জিত্‌লে গা ?—পনেরো হাজার তো ?”

ভামিনী বল্‌লেন, “হ্যাঁ, তুমিও যেমন, স্বপ্নে পনেরো হাজার টাকা পেয়েচি ব’লে সত্যি-সত্যিও তাই কি কখনো পাওয়া যায় ! অত টাকা পাইনি। তবে যা পেয়েচি, তাও বড় কম নয়—দু’হাজার তিনশো !”

দুর্গাকালী আগ্রহভরে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে, “কৈ, দেখি, দেখি !”

“এই যে, নোটগুলো কোটের ভেতর-দিক্‌কার পকেটে পূরে রেখেচি !”—ভামিনী কোটটা টপ্‌ ক’রে খুলে ফেলে তার ভিতরের পকেটে হাত চালিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ আর মুখ যেন কেমনতরো হয়ে গেল !

দুর্গাকালী ভয় পেয়ে বল্‌লে, “কি গো, টাকা কোথায় ?”

ভামিনী অস্ফুট স্বরে নিজের মনেই বল্‌লেন, “না, না, তাও কি হয়, ভেতরের পকেট থেকে তো টাকা আর চুরি যেতে পারে না !” তিনি আবার ভালো ক’রে পকেটের ভিতরে বাগিয়ে হস্ত-চালনা কর্‌লেন। এবারে তাঁর হাত পকেটের মুখ দিয়ে ঢুকে, অত্যন্ত অনায়াসে তলা দিয়ে ফুড়্‌ক্‌ ক’রে বেরিয়ে পড়্‌ল।

দুর্গাকালী কাঁদো-কাঁদো হ’য়ে বল্‌লে, “টাকা কই গো ?”

ভামিনী স্তম্ভিত নেত্রে গঙ্গারামের-দেওয়া জামার সেই ছিন্ন-পকেটের দিকে তাকিয়ে, চুপ ক’রে পাথরের মূর্ত্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলেন।

দুর্গাকালী বল্‌লে, “তবে বুঝি এতক্ষণ চালাকি হচ্ছিল, টাকা-ফাকা কিছুই পাও-নি ?”

বরাবরের মত ভামিনী এবারেও নিজের বোকামি ঢাক্‌বার জন্যে কাষ্ঠহাসি হেসে বল্‌লেন, “প্রিয়ে, স্বপন যদি সত্যি হোতো, তবে দুনিয়ায় আজ কি কেউ আর ফকির থাক্‌ত ? আর টাকা কি এত সহজে পাওয়া যায় ? এতক্ষণ আমি তোমাকে নিয়ে একটু মস্করা কর্‌ছিলুম !”

কিন্তু ভামিনী মনে মনে এটা বিলক্ষণই বুঝ্‌লেন যে, আজ তাঁর জীবনে স্বপ্নও সত্যি হয়েছে, টাকাও তিনি খুব সহজেই পেয়েছেন, আর সে টাকা চোর-ডাকাতেও কেড়ে নেয় নি,—কিন্তু কে জান্‌ত, ইষ্টুপিড্‌ গঙ্গারামের জামার পকেট এমন ভয়ানক ছেঁড়া ? ঐ ছিদ্রপথেই তো তাঁর সদ্যহস্তগত দুর্লভ ‘সৌভাগ্য’ আবার পলায়ন করেছে !

ভামিনী জামাটা টান মেরে একদিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলে গেলেন,—জীবনে যে একটা ডবল-পয়সাও কুড়িয়ে পায়-নি, তার পক্ষে ‘রেস’ খেল্‌তে যাওয়ার চেয়ে পাগলামি আর কি আছে ?

বলা বাহুল্য, দুর্গাকালী সে রাত্রে উনুনে আর আগুন দিলে না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

জাতি ও ভাষা

কোকিল-শিশু কাকের বাসায় প্রতিপালিত হলেও কাকের স্বরের অনুকরণ করে না ; কোকিল-শিশুর স্বরের প্রভাবে কাকের স্বরেরও মিষ্টতা জন্মে না। অশ্ব ও রাসভের মধ্যে আকৃতি-গত সাদৃশ্য থাকিলেও স্বরের সাদৃশ্য আদৌ নাই। কুকুর, বিড়াল, বানর,

বৃষভ সকল জাতীয় জন্তুরই স্বর বিভিন্ন জাতীয়। শক্তির অভাবে ব্যাঘ্র মহাশয় শৃগাল-ধর্ম্মী হইলেও শৃগালের স্বরের অনুকরণ করিতে পারিবেন না, অভিনব শক্তি লাভ করিয়া নীলবর্ণ শৃগাল তাহার স্বরের দ্বারাই পরিচিত হইয়াছিল। অপরের স্বরের অনুকরণ করিতে পারে,কেবল কাকাতুয়া প্রভৃতি কয়েকটী পক্ষী। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা-দিগকে ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং বহু গল্প ও আখ্যায়িকায় তাহাকে বক্তার আসন দেওয়া হইয়াছে। কাদম্বরী আখ্যায়িকায় শুক একটি অতি-প্রধান উপকরণ। বাগ্মী শুকের মুখনিঃসৃত আখ্যায়িকার প্রভাবে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য চণ্ডাল জাতিও রাজসভায় বরণীয় হইয়াছে। অপর জাতীয় জন্তুর স্বরানুকরণ-শক্তির হিসাবে ইতর প্রাণীর মধ্যে শুক শ্রেষ্ঠ। অন্য কোন প্রাণীই স্ব-স্ব স্বর পরিহার বা অন্যের ভাষা অনুকরণ করিতে অসমর্থ। আবার মনুষ্য-স্বরের বিশ্লেষণ সমর্থ শুক পক্ষীও মনুষ্যের ভাষা-গ্রহণে অসমর্থ। সে যে-শব্দের উচ্চারণ করে, তাহা তাহার নিকট নিরর্থক।

যদি ইতর প্রাণীরা ভাষা গ্রহণ বা ভাষার সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদেরও শিক্ষার উৎকর্ষ সম্ভবপর হইত এবং মনুষ্য ও ইতরপ্রাণীর মধ্যে প্রভেদ থাকিত না। হিতোপদেশের কাক-কপোত, গৃধ্র-শৃগাল বা সোপানৎসক বিড়ালের ন্যায়(Puss in boots) যাবতীয় জন্তুগণ যদি কথা বলিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে আমরা তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যালয় দেখিতে পাইতাম; এবং বুদ্ধধর্ম্মী রাজা অশোকের নিকট তাহারা তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়-পরিচালনার জন্য অর্থ-সাহায্য চাহিত! সংবাদ-পত্রেও বিজ্ঞাপন দেখা যাইত—"অমুক বিড়াল-বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক চার-কুড়ি টাকা বেতনে একজন এম-এ হেড্‌মাষ্টারের প্রয়োজন। বিড়াল-জাতীয়ের আবেদন সমধিক গ্রাহ্য হইবে এবং তাঁহার আবেদন মনোনীত হইলে তিনি তাঁহার জাতীয় স্বত্বের বলে আটশত হইতে দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতে পারিবেন। সত্বর সম্পাদক শুভ্রকায় কৃষ্ণকর্ণ মিউ-মিউ মহাশয়ের নিকট আবেদন করুন।" ফল কথা, ভাষাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব এবং ভাষা-হীনতাতেই পশুর পশুত্ব।

জন্মের অল্পকাল পরেই মনুষ্য-শিশু স্বভাবতঃ মনুষ্যের ভাষার অনুকরণ করিতে শিখে এবং কুকুর বিড়ালের স্বরের অনুকরণ দ্বারা বুঝে মিউ-মিউ প্রভৃতি শব্দে তাহাদের নামকরণ করিয়া নিজের ভাষা-সৃষ্টির শক্তির পরিচয় দেয়। আট বৎসর বয়সের বাঙ্গালী শিশু বঙ্গদেশের ভাষা বলিতে, বুঝিতে ও লিখিতে পারে। আট বৎসরের মধ্যে তাহাকে ইংলণ্ড-দেশীয় ভাষা শিখিয়া তাহার সাহায্যে ইতিহাস ভূগোল গণিত প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনুশীলন করিয়া সেই সেই বিষয়ের কৃতকার্য্যতার পরিচয় ইংলণ্ডীয় ভাষার দ্বারাই দিতে হয়। এবং এই সময়ের মধ্যেই তাহাকে অন্যূন আর-একটি ভাষার জ্ঞান লাভ করিতে হয়। সুতরাং মোট বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমের মধ্যেই বাঙ্গালী বালক তিন-তিনটী ভাষা শিখিয়া ফেলে। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতির বালকগণ এত শীঘ্র ভাষা শিখিতে পারে না। তাহাদের নিজেদের ভাষা ও নিজেদের মস্তিষ্ক যে-পরিমাণে অপরিপুষ্ট, তাহাদের

পরিমাণেই ভাষা-শিক্ষার শক্তির ন্যূনতা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তথাপি ইহা অতি সত্য যে তাহারা বিদেশীয়ের বা বিজাতীয়ের ভাষা-গ্রহণে সমর্থ। তবে বিদেশীয় ভাষা অধিগত করিবার শক্তির ন্যূনতার জন্য তাহাদের জাতিগত শিক্ষা ও সভ্যতার ন্যূনতা; তাই বীরভূমের গ্রামে গ্রামে কর্ম্ম-ব্যপদেশে ফিরিবার সময় তাহারা বঙ্গ-ভাষায় কথোপকথন করিলেও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতে পারে না এবং বিবিধ প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিতেও পারে না। কারণ তাহাদের নিজেদের ভাষাই এরূপ সমুন্নত নয় যে তদ্দ্বারা ভাবনিষ্কর্ষ বা abstraction দ্বারা কোনও প্রকার চিন্তা চলিতে পারে। সেইজন্য তাহারা ভাব-বাচক বিশেষ্য পদ ও বিশেষণ পদের প্রভেদ করিতে পারে না। বঙ্গবাসী ও সাঁওতাল জাতির মধ্যে এই যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা ভাষা-শিক্ষার শক্তির অভাবের পরিচায়ক নহে, তাহা জাতিগত সভ্যতার তারতম্যের জ্ঞাপক। ভাষা শিক্ষা করিবার শক্তি তাহাদের আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর ন্যায় সভ্যতা বা অধিকতর সভ্য জাতির ন্যায় চিন্তা করিবার শক্তি তাহাদের নাই। শিক্ষার সৌকর্য্য সংসাধিত হইলে তাহাদেরও সভ্যতা যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাহারাও যে কালে জটিল চিন্তার অনুশীলনে সমর্থ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক আদিম জাতিই এখন স্পেন-দেশীয় ভাষা শিখিয়াছে।

অবিকৃতভাবে জাতীয় স্বরের সংরক্ষণ ইতর প্রাণীর ধর্ম্ম এবং তাহা ঐ স্বরের পরিবর্ত্তনের অসমর্থতার পরিচায়ক। ইতর প্রাণীর বাগ্‌যন্ত্র এরূপ স্থূলভাবে গঠিত যে তাহাতে নানাবিধ স্বরের উৎপাদন অসম্ভব। তাই তাহারা মান্ধাতার যুগ হইতে যেরূপ শব্দ করিয়া আসিতেছে, আজিও তাহার কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। এই কারণেই "হুক্কা-হুআ," "মিউ-মিউ," "ঘেউ-ঘেউ," "ঘোঁৎ-ঘোঁৎ" প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল শব্দ-উচ্চারণ-কারী প্রাণিসমূহের নাম আমরা বলিয়া দিতে পারি। মানুষের ধর্ম্ম ঠিক বিপরীত প্রকারের। উচ্চারণ ও অর্থের পরিবর্ত্তন দ্বারা ভাষার ক্রমশঃ পরিপুষ্টি-সাধনই মনুষ্য-ধর্ম্ম। মানব জাতির ভাষা অবিরত পরিবর্ত্তনশীল। যুগে যুগে ভাষার পরিবর্ত্তন হয় এবং আমাদের সংস্কৃত ভাষা পূর্ব্ব-পুরুষগণের মতে যোজনান্তে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ভাষার পরিবর্ত্তন বা বিভিন্ন ভাষা গ্রহণ দৈহিক বাগ্‌যন্ত্রে ন্যূনশক্তিতার নিদর্শন নহে; এই পরিবর্ত্তনই সৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক। এই শক্তি-প্রভাবেই মানবজাতি ইতর প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই শক্তির অভাবেই ইতর প্রাণীর উন্নতি হয় না।

এলাহাবাদ-প্রবাসী বাঙ্গালী শিশু শৈশবেই বাঙ্গালা ও হিন্দী শিখে। জন্মের পর হইতেই সে চতুর্দ্দিকে হিন্দী ভাষা শুনিতে পায় এবং হিন্দী না বলিলে তাহার কথা কেহ বোঝে না। সুতরাং মাতৃ-ভাষার ন্যায় হিন্দী ভাষা তাহার আয়ত্ত হইয়া পড়ে। জন্মকাল হইতে যে প্রদেশে শিশু বাস করিবে, সেই প্রদেশের ভাষা সে স্বভাবতঃই শিখিবে। ইহার অন্যথা পরিদৃষ্ট হয় না। সেই জন্যই পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ভৌগোলিক সংস্থানের সহিত ভাষা-বিশেষের সবিশেষ সম্পর্ক আছে।

স্থান ও কালের উল্লেখ ব্যতিরেকে ভাষার বিবরণ হয় না। বুদ্ধ-ধর্ম্মিগণ যে লিখিয়াছেন—

সা মাগধী মূল ভাসা নরা যায়াদি কপ্পিকা।
ব্রাহ্মণা চস্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥

তাহাতে এইমাত্র বুঝা যায় যে মাগধী বা পালি ভাষা সেকালে প্রচলিত ভাষা ছিল, অশ্রুতালাপ শিশুগণ জন্মের পর মাতার মুখে শুনিয়া পালিভাষা শিখিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অনুশীলন আবশ্যক হইত। সমাজ-সম্পর্ক-বিহীন অশ্রুতালাপ শিশু পালিভাষা বা কোনও ভাষা শিখিবে, ইহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে।

দুইটী বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতি যদি একত্র হইয়া মিশিয়া এক দেশে বাস করে, তবে তাহাদের ভাষার পরিণাম কি হইবে? উভয় জাতিই যে পরস্পরের মধ্যে আলাপের জন্য স্ব স্ব ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিবে, তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। দুই ভাষার শব্দ-সম্পদ একত্র হইয়া উভয় ভাষার মিশ্রনে একটী আভনব ভাষার সৃষ্টি করিবে। উভয় ভাষার ব্যাকরণের সমাবেশে ভাব-প্রকাশের উপকরণ বাড়িয়া যাইবে, এবং উভয় জাতির অভিজ্ঞতার ফল এই নব-গঠিত জাতির মনুষ্যগণ ভোগ করিবে। অর্থাৎ যদি প্রথম জাতির ভাষার শব্দ-সংখ্যা ক হয় এবং দ্বিতীয় জাতির শব্দ-সংখ্যা হয় খ, তাহা হইলে নব-গঠিত মিশ্রভাষার শব্দ-সংখ্যা হইবে, ক+খ। আর যদি প্রথম ভাষায় ভাব-প্রকাশের জন্য অবলম্বিত কৌশলের সংখ্যা অ এবং দ্বিতীয় জাতির আ হয়, তাহা হইলে নব-গঠিত ভাষার প্রকৃতি হইবে, অ আ (ক+খ)। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগতে এ প্রকারের মিলন না ভাষায় না জাতিতে সঙ্ঘটিত হয়। উভয় জাতির সভ্যতা কখনই এক প্রকারের হয় না। উভয় জাতির মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কও এক জাতীয় হয় না। বিভিন্নতাই জগতের রীতি। হয় ত এক জাতি অতি সভ্য ও অপর জাতি অত্যন্ত অসভ্য হইবে। যেমন উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ ও আধুনিক যুগে কৃতোপনিবেশ ইউরোপীয়গণ। এ ক্ষেত্রে ইংলণ্ডীয় ভাষাই সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তবে আদিম জাতীয়দিগের শব্দ-সম্পদ যে কিয়ৎ পরিমাণেও সুসভ্য আমেরিকা-বাসিগণের ভাষায় স্থান পায় নাই, এমন নহে। এমন কি তাহাদের বহুসংযোগী (Polysynthetic) ভাষার ব্যাকরণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে আমেরিকার নূতন ভাষায় সংক্রামিত হইয়াছে। ফলে A stick-to-it-ive-policy, Stick-to-it-ive-ness, Know-not-what-place প্রভৃতি শব্দ ইংরাজী ভাষায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে যখন আর্য্যগণ প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তখন অনার্য্য আদিম নিবাসিগণ বন-জঙ্গল ও পর্ব্বত-গুহা আশ্রয়-গ্রহণ করিলেও তাহাদের মধ্যে সকলে পলায়ন করে নাই। তাহাদের কতকগুলি দাস বা পরিচারকরূপে আর্য্য জাতির সহিত মিশিয়া যায়। ফলে আর্য্যগণের সংস্কৃত ভাষার সহিত বহু দ্রবিড়ীয় অনার্য্য জাতির ভাষার উপকরণ মিশিয়া যায়। সংস্কৃত ট-বর্গ এই ভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। কারণ ইরাণীয় ভাষা তথা ইউরোপীয় ভাষাসমূহে ত-বর্গ ও ট-বর্গে প্রভেদ নাই। কেবল অনার্য্য দ্রবিড়ীয় ভাষায় ট-বর্গীয় বর্ণ-সমূহের উচ্চারণের ছড়াছড়ি। আবার মালা, ঘোটক, মলয়, মীন,

কুটীর, বিড়াল, ঠক্কুর, খুল্ল, কোটি, কুটী, প্রভৃতি বহু সংস্কৃত শব্দ দ্রবিড়ীয় উপাদান হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। বহুকাল এদেশে রাজত্ব করার ফলে মুসলমানগণ এদেশে একটি নূতন মিশ্র ভাষা উর্দ্দুর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এদেশীয় আধুনিক ভাষাসমূহে অসংখ্য মুসলমান শব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

আবার জাতি-সঙ্করতার পরিণামে সময়ে সময়ে ইহাও পরিদৃষ্ট হয় যে এক জাতির ভাষা একেবারে লোপ পাইয়াছে এবং কেবলমাত্র অন্য জাতির ভাষাই দেশে তিষ্ঠিয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে আগন্তুক জাতি সাধারণতঃ সভ্যতায় অগ্রগামী ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ইহুদীগণের জাতীয়তা সুনির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষা নাই। যে দেশে তাহাদের জন্ম হয়, তাহারা সেই দেশের ভাষা অবলম্বন করে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের নিগ্রোগণ ইংরাজী ভাষায় এবং হায়তী দ্বীপ-নিবাসী নিগ্রোগণ ফরাসী ভাষায় কথোপকথন করে। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বহু-সংখ্যক ইণ্ডিয়ান জাতি স্পেনীয় ভাষায় কথোপকথন করে। মালয় বা পলিনীসীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ হইতে মেলানিসীয়গণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় হইলেও তাহারা মালয়-পলিনীসীয় ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। রুষিয়ার মোঙ্গলীয় অধিবাসিগণের ইউরল-আল্‌তাই ভাষাসমূহের স্থানে একটী স্লাবোনিক (Slavonic) ভাষার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। সেমিতীয় আরবী ভাষা আফ্রিকার নিগ্রো ও ইথিয়োপীয় (Ethiopic) জাতি-সমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতবর্ষে দ্রবিড়ীয়গণ সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। ইটালীদেশে লিগুরীয় (Ligurian), এত্রোস্কীয় (Etruscan) এবং আইবেরীয় (Iberian) প্রভৃতি বিভিন্ন অনার্য্য ভাষার প্রচলন ছিল। লাটিন ভাষার বিস্তারের পর সে সকল ভাষা লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সকল অনার্য্য-জাতি আর্য্যগণের সহিত সঙ্করভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এই সকল ভাষার একমাত্র প্রতিনিধি সর্ব্বনাম-সংযোগী বাস্ক্ (Basqe) ভাষা স্পেন দেশে পীরেনীজ পর্ব্বতে ও তাহার উপত্যকায় অবরুদ্ধ হইয়াছে।

এই তো গেল সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন জাতি-সমূহের সঙ্করতায় ভাষা-বিশেষের সঙ্করভাব-প্রাপ্তি বা সম্পূর্ণ তিরোধানের কথা। কিন্তু এক-বংশীয় ভাষাসমূহের মধ্যেও এই প্রকার ভাষান্তরের বিতাড়ন পূর্ব্বক আত্মপ্রতিষ্ঠার উদাহরণও যথেষ্ট আছে। ভ্রাতৃবিরোধ মনুষ্য-সমাজের কলঙ্ক বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহাকে ত্যাগ করা মনুষ্য-সমাজের সাধ্যাতীত। ভাষার বিষয়েও সেই একই কথা। ভাষায়-ভাষায় মারামারি বা ঠেলাঠেলি মানব-জাতির ভ্রাতৃবিরোধেরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র। গল্ বা ফ্রান্স হইতে কেল্টিক (Celtic) ভাষাকে এবং ইটালীর দক্ষিণ অংশ হইতে গ্রীক ভাষাকে বিতাড়িত করিয়া লাটিন আপনার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কেল্টিক (Celtic) ভাষাকে কোণ-ঠেসা করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে, টিউটনিক (Teutomic) ভাষা। বর্ত্তমানে যেখানে জর্ম্মণ ভাষা প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে সেখানে স্লাবোনিক ভাষা ছিল,

কিন্তু এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নও নাই। অরমীয়, চাল্‌ডীয়, আরবীয় প্রভৃতি সেমিতিক ভাষাসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র তৃতীয়টির সত্ত্বা বিদ্যমান আছে; আর সব লোপ পাইয়াছে। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রেও আমরা ভাষার জ্ঞাতিত্ব হইতে জাতির জ্ঞাতিত্ব অনুমান করিতে পারি না। ঐতিহাসিক যুগে সেমিতিক ভাষা ও সেমিতিক জাতির অবস্থানের সীমা-রেখা কখনও অভিন্ন ছিল না। আরবজাতি ও আসীরীয় জাতির মধ্যে অনেক প্রভেদ। সুতরাং আরবী ভাষা আরব জাতির আদিম ভাষা নহে। ফ্রান্সে যে কেল্টগণ বাস করিতেন, তাঁহাদের ভাষার সহিত লাটিন ভাষার জ্ঞাতিত্ব ও সাদৃশ্য থাকিলেও জাতিদ্বয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ছিল না। সুতরাং লাটিন ভাষা ও কেল্টিক ভাষার মধ্যে জ্ঞাতিত্ব দেখিয়া উভয়-ভাষা-ভাষী জাতিদ্বয়ের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব অনুমান ভ্রমাত্মক হইবে।

এই-সকল কারণে যে-সকল রাষ্ট্রীয় জাতির এক একটী সাধারণ ভাষা আছে, তাহাদের মধ্যে জাতি-গত সঙ্করতা সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এক ফরাসী ভাষা যে জাতির জাতীয় ভাষা তাহাদের মধ্যে বেলজীয় (Belzae), কেল্টীয় (Celtae), আইবিরীয় বা Aquitani, ইটালীয়, টিউটনীয়, বারগণ্ডীয় ও স্কাণ্ডিনেবীয় জাতির একত্র সমাবেশ ও সঙ্করতা আছে। এই প্রকার ইটালী দেশে রয়েসীয় (Rhaetian), লিগুরীয় (Ligurian), গল্, এট্রুস্কীয় (Etruscan) আইবিরীয়, গ্রীসীয়, অম্ব্রীয় ও ওস্কীয় জাতির বংশধরগণের সঙ্করতা আছে। ইহাদের মধ্যে গথিক, লম্বার্ডীক, টিউটনিক ও স্পেনীয় জাতিরও অল্পাধিক মিশ্রন আছে। সুতরাং 'লাটিন জাতি' বলিলে কোন একটা অবিমিশ্র জাতি বুঝায় না। আবার ইংলণ্ডের প্রাচীন ভাষার নাম (Anglo-Saxon); আংলো-সাক্‌সন্ কেবল সংজ্ঞার সুবিধা ভিন্ন জাতিগত সঙ্করতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেয় না। কারণ ইহাদের মধ্যে আঙ্গল্, সাক্‌সন্, জুট্, স্কান্দিনেবীয়, আইবিরীয়, সিলুরীয়, গল্, বেলজীয় প্রভৃতি বহু জাতির অল্পাধিক সংমিশ্রন আছে।

এই সকল উদাহরণ ও ঐতিহাসিক তথ্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভাষা ও জাতির মধ্যে কোন মিল নাই। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, ভাষা-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানের সর্ব্ববাদিসম্মত সাক্ষ্য ব্যতীত আমরা কেবলমাত্র ভাষার সাম্য বা জ্ঞাতিত্ব হইতে জাতির সাম্য বা জ্ঞাতিত্বের অনুমান করিতে পারি না। ইতিহাসের সাক্ষ্য না থাকিলে আমরা কখনই অনুমান করিতে পারিতাম না, যে এককালে গল্ বা ফ্রাঙ্ক্ হইতে এক জাতীয় লোক আসিয়া এসিয়া মাইনরে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক সেখানে প্রায় সপ্ত শতাব্দী ধরিয়া গ্যালেতীয় নামক একটী ফরাসী-ভাষা-সম্ভূত ভাষার ব্যবহার করিয়া অবশেষে তুর্কীভাষা অবলম্বন করিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগেই যদি ভাষা ও জাতির গতি-বিধি বিষয়ে এত বিশৃঙ্খলা, তবে অনৈতিহাসিক প্রাচীন যুগে ভাষা-সমূহের তথা জাতি-সমূহের অভিসংক্রম, একত্র সমাবেশ, মিশ্রন, স্থানচ্যুতি ও বিনাশ প্রভৃতির বিবরণ কে বলিয়া দিবে?

যদি কোনও জাতি কোনও ভৌগোলিক

সংস্থানের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অন্য কোন জাতির সহিত সম্পর্ক-শূন্য হইয়া বহুকাল বাস করে, তাহা হইলে অবশ্য তাহাদের ভাষা অবিমিশ্রভাবে গঠিত হইবে। কিন্তু এরূপ ভাষার বা এরূপ জাতির উদাহরণ জগতে পাওয়া যায় কি না, জানি না। ফলতঃ ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় প্রমাদ-বর্জ্জনের জন্য আমরা (১) দুইটী জাতির মধ্যে আকৃতিগত ও ভাষাগত উভয়বিধ সাদৃশ্য না দেখিতে পাইলে কেবল মাত্র ভাষার সাক্ষ্য হইতে তাহাদের জাতিগত জ্ঞাতিত্বের অনুমান করিতে পারি না; এবং (২) যদি তাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য অভ্রান্তভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে ভাষার জ্ঞাতিত্বের অভাব-নিবন্ধন তাহাদের জাতিগত জ্ঞাতিত্বের অপ্রামাণ্য অনুমিত হইবে না।

কেবল যে ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতেই আমরা জানিতে পারি যে একজাতি অন্য জাতির ভাষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা নহে, প্রাকৃতিক নিয়ম হইতেও আমরা এটুকু অনুমান করিতে পারি। অবশ্য ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে ভাষা মনুষ্যের আকৃতিগত সম্পত্তি নহে, সমাজে অধিগত বিদ্যা। অর্থাৎ গাত্র-ত্বকের বর্ণ, মস্তিষ্কের গঠন, দীর্ঘতার অনুপাত, এবং কেশের প্রকৃতি আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে যে ভাবে জন্ম-মাত্র প্রাপ্ত হই, ভাষা সেরূপ উত্তরাধিকারের বিষয় নহে। জন্মের পূর্ব্বেই শিশুর ভাষা-জ্ঞান জন্মে না, জন্মের পর সে যাহাদিগের কথা শুনে, তাহাদিগেরই ভাষা শিখে। এই জন্যই বাঙ্গালীর শিশু মান্দ্রাজে ভূমিষ্ঠ হইলে তামিল ভাষা শিখিবে। এ বিষয়ে মান্দ্রাজী শিশুর সহিত তাহার কোনও প্রভেদ থাকিবে না। এরূপ স্থলে ভাষার জ্ঞাতিত্ব থাকা বা না থাকার জন্য শিশুর ভাষা-শিক্ষার পক্ষে কোনরূপ সুবিধা বা অসুবিধা ঘটিবে না। প্রাপ্তবয়স্ক যুবা বা প্রৌঢ় ব্যক্তির বাগ্‌যন্ত্র যখন কোনও ভাষা-বিশেষের উচ্চারণে অভ্যস্ত হইয়া যায় তখন তাহার পক্ষে নূতন ভাষার উচ্চারণ শিক্ষা করা অল্পাধিক পরিমাণে কষ্ট-সাধ্য ও সময়-বিশেষে অসম্ভব হইলেও শিশুর পক্ষে তাহা অনায়াস-সাধ্য; কারণ অভ্যাসের দ্বারা তাহার বাগ্‌যন্ত্র কঠোরতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাকে যেভাবে পরিচালিত করিবে, সেই ভাবেই পরিচালিত হইয়া অভ্যাসের দ্বারা শব্দ-উচ্চারণের শক্তি অর্জ্জন করিবে। সময়ে সময়ে শারীরিক আকারের বিভিন্নতা-বশতঃ বাগ্‌যন্ত্রের গঠনের বিভিন্নতা ও তন্নিবন্ধন উচ্চারিত ধ্বনির আকৃতি-গত (timbre) বিভিন্নতা ঘটে। কিন্তু তাহার ফলে উপভাষার (Dialect) সৃষ্টি হইতে পারে বটে, তবে নূতন ভাষা গ্রহণ অসম্ভব হয় না। উত্তর আমেরিকার ইউরোপীয় অধিবাসিগণের ইংরাজী ও তদ্দেশবাসী নিগ্রোজাতির ইংরাজীতে কেবল-মাত্র উপভাষাত্মক প্রভেদ সঙ্ঘটিত হইয়াছে বটে, তবে উভয় ভাষাই ইংরাজী ভাষা। নিগ্রোজাতির শিশু যদি কেবলমাত্র মাতা-পিতার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ইংরাজী ভাষা-ভাষী ইউরোপীয়গণের মধ্যে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে সে বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী ভাষা শিখিবে। তাহার বাগ্‌যন্ত্রের গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহার ভাষার বিভিন্নতা হইবে না।

মনোবিজ্ঞানের হিসাবে দেখিলেও ইহা

সহজেই প্রতীত হইবে যে (১) বিভিন্ন জাতি ভাষা-গঠন বিষয়ে অভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে। এইজন্য তুর্কীজাতি ও অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে জাতিগত প্রভেদ যথেষ্ট থাকিলেও ভাষার গঠন-বিষয়ে তাহারা অভিন্ন সমাসধর্ম্মিতা agglutination প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে; (২) একই ভাষা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রকার গঠন-প্রণালী অবলম্বন করে—যেমন ইংলণ্ডের প্রাচীন ভাষা Anglo-Saxon সংশ্লেষণ-ধর্ম্মী বা synthetic হইলেও আধুনিক ইংরাজী বিশ্লেষণ-ধর্ম্মী বা analytic; (৩) সর্ব্বপ্রকার ভাষাই মূলতঃ অভিন্ন প্রকার গঠন-কৌশল অবলম্বন করিয়াছে।

যদি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানব জাতি-সমূহের অবিমিশ্র অবস্থার বিবরণ পাওয়া যাইত, তাহা হইলেই সেই সেই জাতির আদিম ভাষার বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া সম্ভবপর হইত। কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই। বিভিন্ন মানব জাতির সৃষ্টির কাল হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত তাহাদের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আবিষ্কারের কোনও সম্ভাবনা থাকিলে হয় ত আমরা দেখিতে পাইতাম যে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। কিছু সে উপায় নাই। আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মানব জাতির সংখ্যা অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতি ভাষার সংখ্যা অনেক বেশী। এবং যদিও শতাধিক বিভিন্ন প্রকৃতির ভাষা এই সমগ্র জগতে পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ধ্বনি-গত ও গঠন-প্রণালী-গত সাদৃশ্য ও পার্থক্য এরূপ জটিল যে মানব জাতির শ্রেণী-বিভাগ-অনুসারে ঐ সকল বিভিন্ন ভাষার শ্রেণী-বিভাগ একেবারেই অসম্ভব। এক প্রকৃতির ভাষার ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন-রীতির বৈষম্যের ফলে এই সকল বিভিন্ন ভাষা সমুদ্ভূত হইয়াছে, না, আরও অধিক সংখ্যক ভাষার পরিণামে নানাবিধ অপচয় ও পরিবর্ত্তনের ফলে এই সমস্ত ভাষা গঠিত হইয়াছে—সে বিষয়ে চিন্তা নিতান্তই নিষ্ফল। ফল কথা, জাতিতত্ত্বে মানবজাতির যে প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, তাহার সহিত ভাষার শ্রেণী-বিভাগের কোন সামঞ্জস্যই নাই।

মানব-জাতি-বিজ্ঞানে (Ethnolgy) মানবের নানাপ্রণালীতে শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে। জগতের মানবগণকে পেশেল (Peschel) সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন:—(১) অষ্ট্রেলীয়, (২) পাপুনীয় (Papuan) অর্থাৎ নিগ্রো ও মিলনিসীয়গণ, (৩) মঙ্গোলীয় অর্থাৎ মালয় ও আমেরিকার আদিম নিবাসী জাতিসমূহ, (৪) দ্রবিড়ীয়, (৫) হটেণ্টট ও বুশমান, (৬) নিগ্রো বা কাফ্রি, এবং (৭) ভূ-মধ্য-সাগরীয় (Mediterranean) অর্থাৎ আর্য্য জাতি, সেমিতিক জাতি ও হেমিতিক জাতি। ফ্লাওয়ার (Flower) সমগ্র মানবজাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—কৃষ্ণ, পীত ও শুভ্র। কিন্তু এই সকল উপায়ে ভাষার শ্রেণী-বিভাগ আদৌ সম্ভবপর নহে। কেশের প্রকৃতি অনুসারে হেকেল (Heckel) নরজাতির যে শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন, মূলতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়া মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালী এবং কেশ ও চর্ম্মের বর্ণ লইয়া হক্সলী

(Huxley) নরজাতির নিম্নরূপ শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন:—

(ক) মসৃণ-কেশী—(Leiotrichi)

(১) গৌরবর্ণ দীর্ঘকপালী * (Leucous dolicho-cephalic) পীতচর্ম্মিগণ (the Xanthochroi);

(২) শুভ্র-কৃষ্ণ (Leucomelanous) অর্থাৎ কৃষ্ণকেশ ও শুভ্র ত্বকবিশিষ্ট অসিত-চর্ম্মিগণ (the Melanochroi).

(অ) দীর্ঘ-কপালী (dolicho-cephalic) আইবিরীয়, সেমিতিক, বর্ব্বর প্রভৃতি।

(আ) বিস্তৃত-কপালী (brachy-cephalic) মধ্য-ইউরোপীয়গণ (Rhaetians)।

(৩) পীতকৃষ্ণ (Xantho-melanous) অর্থাৎ পীতত্বক, ও কৃষ্ণকেশ-বিশিষ্ট।

(অ) দীর্ঘ বা মধ্য-কপালী (dolicho-or meso-cephalic)-এস্কিমো, অ্যাম্ফিনিসীয় ও আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ।

(আ) বিস্তৃত-কপালী (brachy-cephalic) মঙ্গোলীয়গণ।

(৪) কৃষ্ণকায় দীর্ঘকপালী (Melanous dolicho-cephalic)-অষ্ট্রেলীয় ও দ্রবিড়ীয়গণ।

(খ) রোমশকেশী (Ulotrichi)—

(১) পীতকৃষ্ণ দীর্ঘ-কপালী (Xantho-melanous-dolicho-cephalic) হটেণ্টট ও বুশমান।

(২) কৃষ্ণকায় দীর্ঘকপালী (Melanous-dolicho-cephalic) নিগ্রো, নিগ্রাইটো, পাপুয়ান।

পীত-কৃষ্ণ বিস্তৃত-কপালী মঙ্গোলীয় জাতির কোনও বিশিষ্ট-ধর্ম্মী ভাষা নাই। পীত-চর্ম্মী জাতিসমূহের মধ্যে চীনবাসিগণের ভাষা উচ্চারণ, শব্দসম্পদ ও গঠন-প্রণালী-অনুসারে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে, তাতার, জাপানী, হিন্দু ও টিউটনগণের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। একাক্ষরী অব্যয়ধর্ম্মী স্বরসঙ্কেতী স্থান-বিন্যাসী চীনা ভাষা যে কোনও প্রাগৈতিহাসিক যুগে বর্ত্তমান সমাস-ধর্ম্মী (agglutinating) ভাষা-ভাষী মঙ্গোলীয়দিগের ভাষার অনুরূপ ছিল কি না তাহা কে বলিবে? যদি শুভ্র-কৃষ্ণ দীর্ঘ-কপালী আইবিরীয়গণ ও শুভ্র-কৃষ্ণ দীর্ঘ-কপালী সেমিতিকগণের মধ্যে জাতিগত অভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়, তবে সর্ব্বনাম-সংযোগী (Pronoun-incorporating) সমাসধর্ম্মী বাস্ক্ ভাষার সহিত ত্রিব্যঞ্জন-ধাতুক অন্তঃ-স্বর-পুষ্ট (Vowel-infixing) বিচিত্রধর্ম্মী সেমিতিক ভাষার সাদৃশ্য কোথায়? রোমশ কেশী দীর্ঘকপালী কৃষ্ণকায় নিগ্রোজাতি ও মসৃণ-কেশী মধ্যকপালী পীতকায় পলিনীসীয়-গণের মধ্যে জাতিগত কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও ভাষার আকৃতির হিসাবে তাহারা উভয়েই সমাস-ধর্ম্মী (agglutinating) পীতকৃষ্ণ পলিনীসীয়গণের ন্যায় ইংরাজগণ তুল্য-ভাবে ভাষায় বিশ্লেষণ-ধর্ম্মিতার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। চীনা ভাষার ন্যায় ইংরাজী ভাষাও দিন দিন স্থান-বিন্যাসী (Positional) হইয়া পড়িতেছে। আবার স স্থানে হ উচ্চারণ গ্রীস, পারস্য ও নিউজিলণ্ডে সমভাবে প্রচলিত।

* কপাল Skull বা মাথার খুলির পরিমাণ-অনুসারে এই সকল নামকরণ হইয়াছে। বিস্তার ও দীর্ঘতা অনুপাত ৭৫:১০০ হইলে দীর্ঘকপালী; ৭৫ অপেক্ষা অধিক ও ৮০ অপেক্ষা ন্যূন হইলে মধ্য-কপালী; এবং ৮০ বা ততোধিক হইলে বিস্তৃত-কপালী বলা হয়।

প-কার ব-কার ও ত-কার দ-কারের উচ্চারণ-বিভ্রাট জর্ম্মণীতে যেমন,পলিনীসীয়াতেও তেমনি। জাতিগতভাবে বিভিন্ন মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে সদৃশ গঠন-প্রণালী ও সদৃশ উচ্চারণ-প্রণালী সমুদ্ভূত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং জাতিগতভাবে বিভিন্ন বহু সম্প্রদায়ের লোকে বিভিন্নপ্রকার গঠন-প্রণালী ও বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ-প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিভিন্ন জাতীয় মানব সম্প্রদায় দিগ্বিজয়-বাসনায় বা উপনিবেশ-স্থাপনের জন্য পুনঃ পুনঃ পৃথিবীর নানাস্থানে বিচরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এক জাতীয় লোকের ভাষা অন্য জাতীয় জনগণের মধ্যে বহুবার বহুস্থানে প্রচলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হয় ত আংশিক বা পূর্ণ মাত্রায় জাতি-সঙ্করতা সংঘটিত হইয়াছে। মানবগণের জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ ভাষার প্রকৃতি নাই। ভাষার সাক্ষ্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্যের অনুমান সম্ভবপর। কিন্তু জাতিতত্ত্ব (Ethnology) বিষয়ক কোনও তথ্য ভাষার সাক্ষ্য হইতে প্রতিপন্ন হয় না। ভাষার বহু-কাল-ব্যাপী সামাজিক সম্পর্কের পরিচয় প্রদান করে; কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু করিতে পারে না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সূর্য্যাস্ত

বেগুনি মিশেছে নীলে কমলা-জর্দ্দায়,
মেঘমালা চাদরের একটি ফর্দ্দায়
দুনিয়ার সব রং হাসে, জাফরান
আসমানী তারি পাশে ধূসরের টান,
হিঙুল হলুদ কালো আবীর সিঁদূর
কুসুম ফুলের বৃষ্টি ছেয়ে বহুদূর!
ঝালরের শেষ ধারে গেরুয়ার খেলা,
উদাসী চলেছে ছেড়ে সংসারের মেলা!

গুটানো আছিল দূরে শতরঞ্জখানা,
বিছানো হয়েছে জুড়ে আকাশ-সীমানা,
তারি পরে আকাশের রং-পরী যত
গুলাল কুঙ্কুম ফাগ খেলে অবিরত,
লাল মোলায়েম হল গোলাপী আভায়,
মিলনের পূর্ব্বরাগ স্বপনেতে ভায়,
রংগুড়ি ঝরে' পড়ে' নীলাম্বর হ'তে
রচে কনে-দেখা আলো ধরণীর পথে।

কাজলের মত কালো পরদার আড়ে,
চাঁদমুখ উঁকি দিয়ে যায় বারে বারে,
দিনমণি, দিবসের রাজ-অধিরাজ
কিরণে আলোক-রথ, নাহি সবে ব্যাজ,
অরুণ দিলেন ছেড়ে সপ্ত-অশ্ব তাঁর
সপ্ত বর্ণে ছেয়ে গেল আকাশ অপার!
তপন করেন ত্বরা শুদ্ধান্তঃ প্রবেশ,
ফুরাল রংএর খেলা, এল দিন শেষ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চয়ন

নূতন ব্যায়াম-পদ্ধতি

বাঙালী পিতা লেখাপড়ার দ্বারা সন্তানদের মানসিক উন্নতির চেষ্টা ক'রে থাকেন যথেষ্ট, কিন্তু ব্যায়ামের দ্বারা তাদের দৈহিক উন্নতির চেষ্টা কিছুমাত্র করেন না। তাঁরা জানেন না যে' মনের উপরে দেহের প্রভাব কতটা বেশী!

বাল্যে আর যৌবনে ব্যায়ামের অভাবে বাঙালীর দুর্ব্বল দেহ শীঘ্রই ভেঙে পড়ে। তারপরে আমরা ব্যায়ামের সার্থকতা বুঝি বটে কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও মনে করি যে, এ জীবনে আমাদের ব্যায়াম-চর্চ্চার বয়স পার হয়ে গেছে।

এটা ভুল ধারণা। মানুষের ব্যায়াম চর্চ্চার বয়স কখনোই একেবারে অতীত হয়ে যায় না। য়ুরোপের ব্যায়াম-গুরু বিখ্যাত ডাক্তার ক্রেজিউস্কিই তা প্রমাণিত করেছেন। একচল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম ব্যায়াম সুরু ক'রেও তিনি গায়ের জোরে সকলকে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। খালি তাই নয়, তাঁরই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির গুণে স্যাণ্ডো, প্যাজ উবিনি, পীয়ের বোন্‌স্, বিস্কো, সিজফ্রিড, অ্যাবার্গ, নুরিচ, কচ, ষ্টিন্‌বাচ্ ও হেকেনস্মিথ প্রভৃতি বিশ্বজয়ী পালোয়ানরা আপনাদের দেহ গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্যার জেম্‌স্ ক্যান্‌টি বিখ্যাত বিলাতী ডাক্তারও সম্প্রতি বলেছেন, "কোন পুরুষ বা নারী যেন মনে না করেন যে', বেশী বয়স হয়েছে ব'লে তাঁদের ব্যায়াম করবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।" এমন কথা ভাবাই ভুল। আমরা বাত ও লাম্বেগো প্রভৃতি পীড়ার জন্যে কষ্ট পাই। উপযোগী ব্যায়ামের অভ্যাস করুন। আপনার বয়স কুড়ি বৎসর কমে যাবে।

স্যার জেম্‌সের পরামর্শে এবং কর্ণেল ক্রুডনের তত্ত্বাবধানে লণ্ডনের "কলেজ অফ আম্বুলান্সে" আজকাল অনেক মাঝবয়সী স্ত্রী-পুরুষ নিয়মিত-ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ করেছেন। এই ব্যায়ামাগারে বয়স-সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই।

কর্ণেল ক্রুডেনের বয়স সত্তর বৎসর, কিন্তু আজও তিনি যুবকের মতন শক্ত সমর্থ দেহ-চর্চ্চার সম্বন্ধে সম্প্রতি তিনি যে বই লিখেছেন, প্রত্যেকেরই তা পড়ে দেখা উচিত।

তিনি বলেন, "আমার পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, দেহের কোন অঙ্গকেই সামান্যরকম আহত বা ব্যথিত না ক'রে, উপযোগী ব্যায়ামের দ্বারা দেহকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলা। আমরা তাঁর পদ্ধতি থেকে এখানে গুটিকয়েক ব্যায়ামের নিয়ম উদ্ধার ক'রে দিলুম। আপনারা পরখ ক'রে দেখলে উপকৃত হবেন।

প্রথম ব্যায়াম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাহু দুটি সরলভাবে কাঁধের সঙ্গে সমান রেখে সাম্‌নে বাড়িয়ে দিন। (৩য় ছবির মতন) হাতের আঙুলগুলি পরস্পরের গায়ে লেগে

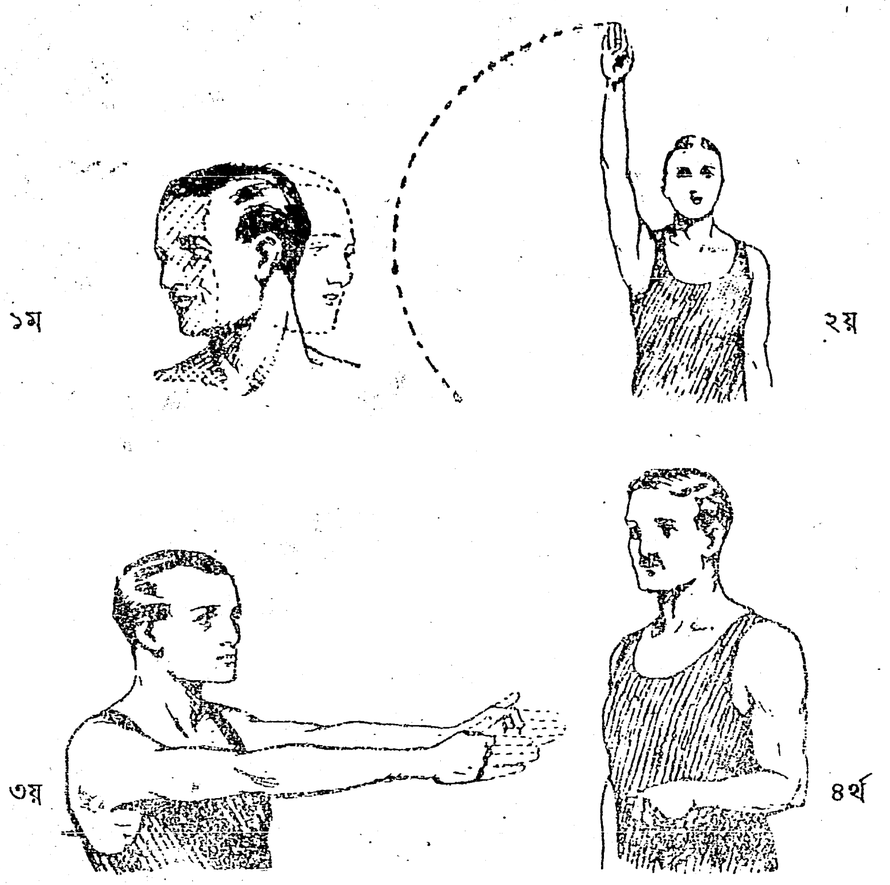

থাক্‌বে, দু'হাতের তালুও পরস্পরের সাম্‌না-সাম্‌নি থাক্‌বে।

বলুন—"এক!" সঙ্গে সঙ্গে দুইহাতই তাড়াতাড়ি ও শক্তভাবে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে ফেলুন। তারপর বলুন—"দুই!" সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠা আবার খুলে ফেলুন। এই ব্যায়াম প্রতিদিন ষোলোবার করতে হবে।

প্রথম ব্যায়ামের উদ্দেশ্য, আঙুলের গাঁটের ভিতরে রক্ত-চলাচলের সুবিধা ক'রে দেওয়া। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঙুলের সন্ধিস্থলে uric crystals জমে গ্রন্থির সৃষ্টি করে, ফলে আঙুল ক্রমে বেঢপ হয়ে পড়ে এবং সন্ধিস্থলে বাত, গাউট-বাত ও ফুস্কুড়ি প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। এই ব্যায়ামে এসব মুস্কিলের আসান তো হবেই, তাছাড়া আরো ঢের উপকার আছে।

দ্বিতীয় ব্যায়াম। প্রথম ব্যায়ামের মতই হাত বাড়িয়ে দিন, কিন্তু এবারে মুষ্টি-বদ্ধ ক'রে দুই মুঠার ভিতরদিক পরস্পরের সাম্‌না-সাম্‌নি থাক্‌বে। "এক" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কর-পৃষ্ঠ ঘুরিয়ে ফেলুন—অর্থাৎ মুঠার ভিতর দিক মাটির দিকে আনুন। "দুই" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মুঠা ঘুরিয়ে আবার পূর্ব্ব-অবস্থায় আনুন। এ ব্যায়ামও ষোলবার করুন। এর দ্বারা হাতের কব্জি শক্ত হবে এবং জরাক্রান্ত লোকের পুরোবাহুর মাংসপেশী আর তার বন্ধনীগুলো আবার আগেকার মতই কার্য্যক্ষম হয়ে উঠবে।

তৃতীয় ব্যায়াম। রক্ষী সৈনিকের মতন সিধে হয়ে দাঁড়ান। হাতদুটি ঝুলিয়ে রাখুন। বাহুর উপরার্দ্ধ দেহের দুইপাশে চেপে রাখুন। —"এক!" দক্ষিণ বাহুর নিম্নার্দ্ধ দেহের সাম্‌নে বাঁক'রে তুলে ফেলুন। (চতুর্থ ছবি দেখুন)—"দুই!" এবারে দক্ষিণ বাহু নামিয়ে পূর্ব্বাবস্থায় আনুন এবং ঠিক সেই সঙ্গেই বাম বাহুর নিম্নার্দ্ধ তুলে ফেলুন। ষোলোবার এইরকম করুন। এতে হাতের কনুই আর বাহুর উপরার্দ্ধের ব্যায়াম হয়।

চতুর্থ ব্যায়াম। সোজা হয়ে দাঁড়ান। —"এক!" সরল ভাবে দক্ষিণ বাহু মাথার উপরে তুলে ধরুন। এই কাজটি করবার সময়ে দেহকে সম্পূর্ণ স্থির রাখ্‌তে হবে,—মাথাও যেন একটুও না নড়ে।—"দুই!"—দক্ষিণ বাহু দেহের পাশে নামিয়ে এবং ঠিক সেই সঙ্গে বাম বাহু মাথার উপরে তুলে ফেলুন। (২য়ছবি দেখুন) এম্‌নি প্রত্যেক বাহু ষোলোবার সঞ্চালন করতে হবে। এতে বাহুর উপরার্দ্ধ, স্কন্ধদেশের ও বুকের ব্যায়াম হয় এবং ঐ-সকল অঙ্গের মাংসপেশীর মধ্যে রক্তচলাচলও বেড়ে ওঠে। এটি হচ্ছে নারীদের পক্ষে একটি চমৎকার ব্যায়াম,—কারণ এতে ক'রে তাঁদের বক্ষের উপরার্দ্ধ নিটোল এবং শীর্ণ ও কর্কশ কণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

পঞ্চম ব্যায়াম।—"এক!" কাঁধ না নড়িয়ে, মাথাটি আস্তে আস্তে ডানদিকে নিয়ে যান। (১ম ছবি দেখুন)—"দুই।" মাথা আবার দেহের সাম্‌নে আনুন। "তিন!" মাথা বাম দিকে ফেরান। "চার!" মাথা দেহের সাম্‌নে আনুন। এ ব্যায়ামও ষোলোবার করতে হবে। এটি বিশেষ ক'রে গলার ব্যায়াম।

ষষ্ঠ ব্যায়াম। দেহকে সরল রাখুন। —"এক!" মাথাটি পিছন দিকে যতটা পারেন নুইয়ে ফেলুন।—"দুই!" মাথা আবার পূর্ব্বাবস্থায় আনুন। "তিন!" চিবুককে গলার দিকে চেপে মাথা সাম্‌নের দিকে নুইয়ে ফেলুন।—"চার!" মাথা পূর্ব্বাবস্থায় আনুন। এম্‌নি ষোলোবার। এতে গলা ও মাথার উপকার হয়।

ভোরবেলায় উঠে, নিত্যক্রিয়া সেরে, খোলা জান্‌লার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, একমনে এই ব্যায়ামগুলি করবেন। অন্যমনস্ক ভাবে ব্যায়াম কর্‌লে তেমন উপকার হয় না। প্রত্যেক ব্যায়ামের সময়ে স্মরণ রাখ্‌বেন, কোন্ অঙ্গে মাংসপেশী সঞ্চালিত হচ্ছে। সকালে যাঁদের অসুবিধা হবে, তাঁরা রাত্রে ব্যায়াম করতে পারেন। কিন্তু যখনই ব্যায়াম করুন, একটা সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা চাই, আর ব্যায়ামও নিয়মিত হওয়া চাই। সপ্তাহে একদিন ছুটি।

পাঠকরা যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে আমরা দেহ, স্বাস্থ্য আর ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন উপকারী কথা ভবিষ্যতে প্রকাশ করতে পারি।

স্বপ্ন-বিচরণ

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেকেরই চলা-ফেরা করার অভ্যাস আছে। এ অভ্যাসের বিলাতী নাম "সোম্নাম্বুলিজ্‌ম্"। মানুষের মনের এ একটা গভীর রহস্য এবং আজও এর-কোন একটা হদিস্ পাওয়া যায় নি।

ঘুমন্ত মানুষ কি ক'রে উঠে দরজা

খোলে, অন্ধকারে পথ চিনে যায়, উঁচু পাঁচিলে ওঠে এবং এমন-সব কাজ করে যাতে জাগ্রৎ অবস্থার ইচ্ছাশক্তি আর বিচার-শক্তির দরকার ?

ইচ্ছাশক্তির অস্থায়ী অভাবের নাম দেওয়া হয়েছে, নিদ্রা। কিন্তু যে নিদ্রিত লোক শয্যাত্যাগ করে, জামা-কাপড় পরে এবং বাড়ীর বাইরে যায়, তার যে একেবারেই ইচ্ছাশক্তি নেই, তাই বা কি ক'রে বলা চলে ?

বাইরে থেকে দেখ্‌লে মনে হয় বটে, চলন্ত ঘুমন্ত লোকের সমস্ত সচেতনতা বিলুপ্ত হয়েছে। আপনাকে সে দেখতে পাবে না। তার দৃষ্টি স্থির—সাম্‌নের দিকে প্রসারিত। তার কোন কোন শক্তি জেগে থাকে, আবার কোন কোন শক্তি ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে উঠ্‌লে সে আর মনে কর্‌তে পারে না যে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে কি কাজ করেছে।

মনের ভিতরে আমাদের অজ্ঞাতে যে-সব বাসনা গোপন হয়ে থাকে, অনেক সময়ে তার জন্য নিদ্রা-বিচরণের অভ্যাস হয়। দেখা গেছে, একজন লোক ঘুমন্ত অবস্থায় একখানি উপন্যাসের তিন-চার পাতা লিখে ফেলেছে। জেগে উঠে সে আর কলম ধরে নি, কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় পাণ্ডুলিপিখানি আবার যখন তার সাম্‌নে ধরা হোলো, সেও অমনি তার অসমাপ্ত লেখা আবার লিখতে সুরু ক'রে দিলে !

সাধারণতঃ স্বপ্ন-বিচরণ একরকম 'ডিলিরিয়ামে'রই ফল, মানসিক দুশ্চিন্তায় তার উৎপত্তি। ষাঁড়ের আক্রমণে ভয় পেয়ে একটি স্ত্রীলোকের কয়েকদিন ধ'রে স্বপ্ন-বিচরণ রোগ হয়েছিল। ঘুমিয়ে সে ষাঁড়ের মতন ডাক্‌ত এবং লোককে আক্রমণ কর্‌তে যেত। কিন্তু জেগে উঠে সে-সব কথা তার আর কিছুই মনে থাক্‌ত না।

অনেক স্বপ্নচর নর-নারী অনায়াসেই ঘুমিয়ে উঁচু উঁচু সরু পাঁচিল নিরাপদে পার হয়ে যায়। এ-রকম স্বপ্ন-বিচরণের অভ্যাস কেবল রাত্রেই দেখা যায় এবং অনেকের এই অবস্থা আবার কয়েকদিন স্থায়ীও হয়। এই অবস্থার নাম "fugue" (উচ্চারণ "ফিউগ")।

এম্‌নি অবস্থায় একজন স্ত্রীলোক লিখ্‌তে না জেনেও লিখ্‌তে পেরেছিল। খুব শৈশবে সে লিখ্‌তে জান্‌ত বটে, কিন্তু তারপর ত্রিশবৎসর আর কালি-কলম না ছুঁয়ে লেখার কায়দা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। এত দিন পরে স্বপ্নে সে তার শৈশব-শক্তিকে আবার নূতন ক'রে লাভ করেছিল ! ফিউগের মহিমায় কত লোক দেশ ছেড়ে সুদূর বিদেশে গিয়ে পড়েছে, তারপর ক্ষুধ-তৃষ্ণায় জেগে উঠে নিজেকে এক অচেনা জায়গায় দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে !

স্বপ্ন-বিচরণের অভ্যাসটা সময়ে সময়ে বংশগত হয়। একই পরিবারে দুই বা তিনজন স্বপ্নচারীকে দেখা গিয়েছে। ভীরু সন্তানদের সাবধানে মানুষ না করলে, রাত্রে তারা ভয় পেতে বা স্বপ্নচারী হ'তে পারে। ঘুমিয়ে কথা কওয়া, স্বপ্ন-বিচরণের চেয়ে সাধারণ ব্যাপার। এ-শ্রেণীর অনেক লোক দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে জেগে ওঠে,—নিজের গলার আঁওয়াজেই ভয়াকুল হয়ে !

কেন্দ্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
দেশী সং
নারী-মনোবিজ্ঞান

আপনারা আজকাল খবরের কাগজে নারী-হন্তা লান্দরুর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। লান্দ্‌রু জাতে ফরাসী। এখনো তার বিচার চল্‌ছে।

কিন্তু সে যে খুনী তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। সে পরে পরে এগারো-জন সুন্দরী যুবতীকে প্রেমে ভুলিয়ে বিবাহ না করে হত্যা করেছে ! তাছাড়া আজ এই হত্যাপরাধের আসামী হয়েও অনেক ভদ্র মেয়েদের কাছ থেকে সে বিবাহের প্রস্তাব লাভ করছে ! অথচ এই বিবাহ-প্রার্থিনী নারীর দল তাকে চোখেও কখনো দেখে-নি—আর খবরের কাগজে তার গুণের ইতিহাস যা পড়েছে, তা এত ভয়ানক যে শুন্‌লেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে !

লান্দরুর বয়স হয়েছে ঢের—এমন-কি তাকে বুড়ো বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। তার চেহারাও ভালো তো নয়ই, বরং কুৎসিত। তবে মেয়েদের উপরে তার এই অসাধারণ প্রভুত্বের কারণ কি ? মেয়েরা তার বয়স দেখে না, তার রূপ-গুণ বাছে না, সে যে এগারোটি মেয়েকে খুন করেছে —এ খবরেও লান্দরুর উপরে তাদের বিরাগ হয়নি !

খালি লান্দ্‌রু ব'লে নয়,—পৃথিবীর আরো অনেক পাপিষ্ঠ, ধার্ম্মিক-নারীদের উপরে অসীম প্রভুত্ব বিস্তার কর্‌তে পেরেছে। তবে কি বলতে হবে যে, পাপিষ্ঠদের এমন এক বিশেষ শক্তি আছে, যার মহিমায় স্ত্রীলোকেরা না ভুলে থাক্‌তে পারে না ?

যে-সব পুরুষকে নারী-শিকারী বলা হয়, তারা নিশ্চয়ই মেয়েদের কোন সাধারণ দুর্ব্বলতার ছিদ্র দিয়ে তাদের মনের ভিতরে প্রবেশ করে। মেয়েরাও এই ভেবে ভ্রমে পড়ে যে, এতদিনে তারা মরমের যথার্থ মরমীর সন্ধান পেয়েছে। ফলে প্রতারকদের পশুত্ব আর রূপহীনতাকে আমোলে না এনে নারীরা নির্ব্বিচারে আত্মসমর্পণ করে।

হত্যাকারী পামারের কথাই ধরুন। তার দেহ ও মন দুইই ঘৃণ্য ছিল। কোন জায়গায় সে কাজ পর্য্যন্ত কর্‌তে পারেনি ; যেখানেই গেছে, চাকরি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। কিন্তু এমন যার চেহারা আর স্বভাব, ভদ্রবংশের সুশিক্ষিতা এক সুন্দরী যুবতী তাকেও স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছিলেন। খালি বিবাহ নয়, স্বামীকে তিনি প্রাণ-মন দিয়ে ভালোও বাসতেন। কিন্তু পাষণ্ড পামার পনেরো হাজার টাকায় তার স্ত্রীর জীবন বিমা করিয়ে, সেই টাকাটা তাড়াতাড়ি আদায়ের জন্যে বিষ খাইয়ে স্ত্রীকে মেরে ফেলেছিল।

জর্জ চ্যাপম্যানও বড় যে-সে লোক নয়। পরে পরে তিন-তিনটি যুবতী তাকে বিশ্বাস ক'রে বিবাহ করেছিল, কিন্তু চ্যাপম্যানের হাতে তিনজনেই নিহত হয়।

মৎস্য-নারী

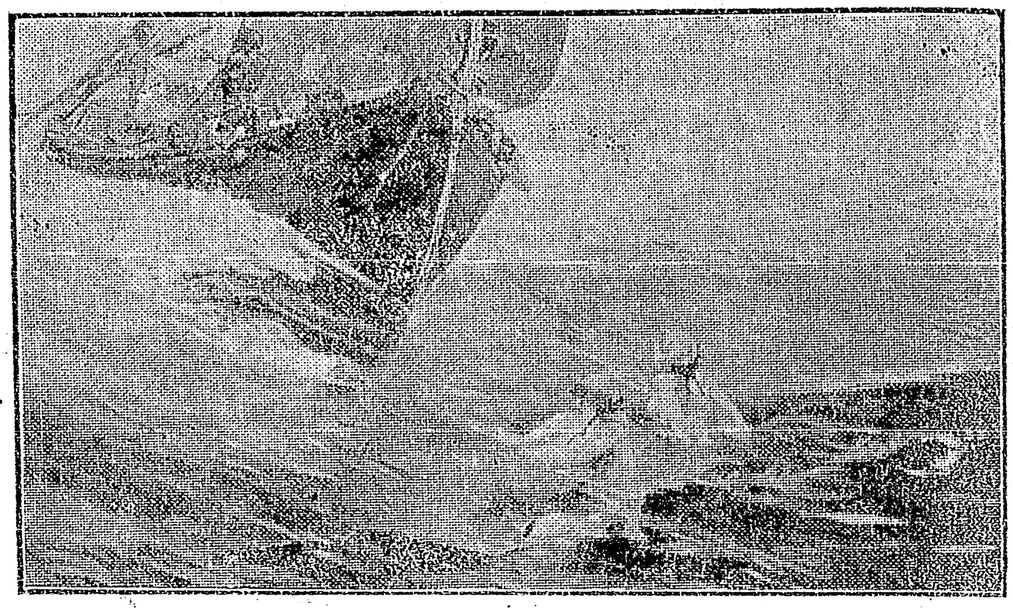

মৎস্য-নারী—কাল্পনিক

মৎস্য-নারীর কাহিনী আমরা কবিতায় আর রূপকথায় বরাবর শুনে আসছি। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর অস্তিত্ব নিশ্চয়ই কেউ কখনো চক্ষে দেখ্‌তে পাই নি।

তবু অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, মৎস্য নর বা নারীর কল্পনা কাব্যের মহিমায় অতিরঞ্জিত হ'লেও, হয়তো এই শ্রেণীর জীব সত্য-সত্যই পাতাল-পুরীর গভীর রহস্যের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছে। তার প্রমাণও পাওয়া গেছে।

ইতালীর কাছে বারগেগি দ্বীপের পাশে একজন জেলে একটি অদ্ভুত আকারের সামুদ্রিক জীব ধরেছিল। মাথা থেকে ল্যাজ পর্য্যন্ত সেটি প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা। তার দেহের আধখানা মানুষের মত এবং আর-আধখানা মাছের মতন।

গায়ের আঁশগুলো হল্‌দে থেকে ক্রমে গভীর পিঙ্গল ও সবুজ রঙে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যে অংশটা মানুষের মতন দেখতে, তার কোথাও চুল বা রোঁয়ার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই! মাথার পিছনদিকে বলি-রেখা আছে এবং পাঁজ্‌রার হাড়গুলোও যথেষ্ট স্পষ্ট। মুখ-মণ্ডল যার-পর-নাই কুৎসিত। চোখ আর মুখ অতিরিক্ত রকমের বড়। দাঁতগুলো ছোট ছোট, মাছের দাঁতের মত। প্রত্যেক হাতে পাঁচটা ক'রে আঙুল, এবং সব আঙুলেই নখ আছে। দেহের তুলনায় বাহুটি বানরের মতন লম্বা। এর নাম দেওয়া হয়েছে, মৎস্য-নারী। কিন্তু খুব-সম্ভব এটি মৎস্য-নর বা মৎস্য-শিশু। যাই হোক্, এর চেহারা দেখলে কবির কল্পনা যে উচ্ছ্বসিত হবেনা, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই!

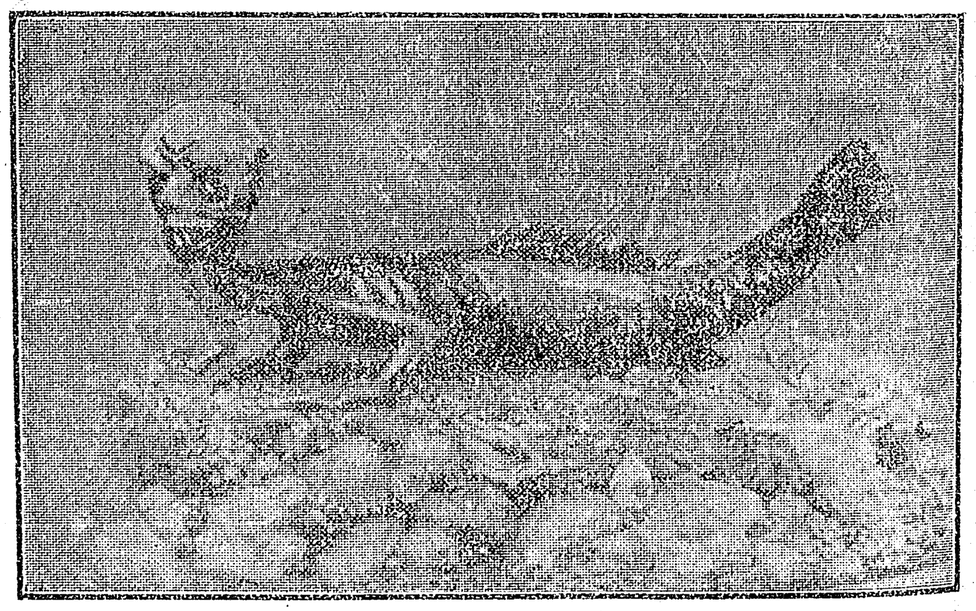

মৎস্য-নারী—বাস্তবিক

দুটি বেয়াড়া রীতি

নারী দুর্ব্বল ব'লে, বিধবা হ'লে আমরা তাদের উপরে অত্যাচারের মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে তুলি। স্ত্রী মারা গেলে পুরুষ দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে, তুড়ির তালে টপ্পা গেয়ে বেড়াবে এবং প্রথম সুযোগেই আবার বিয়ে করবে, কিন্তু স্বামী মার



উল্কির গোঁফ

গেলে বালিকা-স্ত্রীকেও সমস্ত সাজ-পোষাক ফেলে দিয়ে ভূমিশয্যায় আশ্রয় নিয়ে, শুভ-উৎসবের ক্ষেত্র থেকে নির্ব্বাসিতা হয়ে, একাদশীর দিনে জলবিন্দুটি পর্য্যন্ত পান করতে পাবে না। এ-সব অত্যাচার আদিম বর্ব্বরতার যুগেই সম্ভব এবং এখনো কেবল মাত্র অসভ্য জাতিদের মধ্যেই এই ধরণের নিয়ম বর্ত্তমান আছে। যেমন অষ্ট্রেলিয়ার লারাকিয়া নামে অসভ্য জাতের মেয়েরা। বিধবা হ'লে তাদের দেহকে নানারকমে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে রাখা হয়। সে সব ক্ষতের দৃশ্য ভয়ানক। কেউ কেউ খরধার অস্ত্র চালিয়ে পৃষ্ঠদেশে অসংখ্য মাংস-পিণ্ডের মতন ক্ষতচিহ্ন ক্ষোদন ক'রে রাখে। আমরা এই শ্রেণীর একটি বৈধব্য-চিহ্নের ছবি এখানে দিলুম।

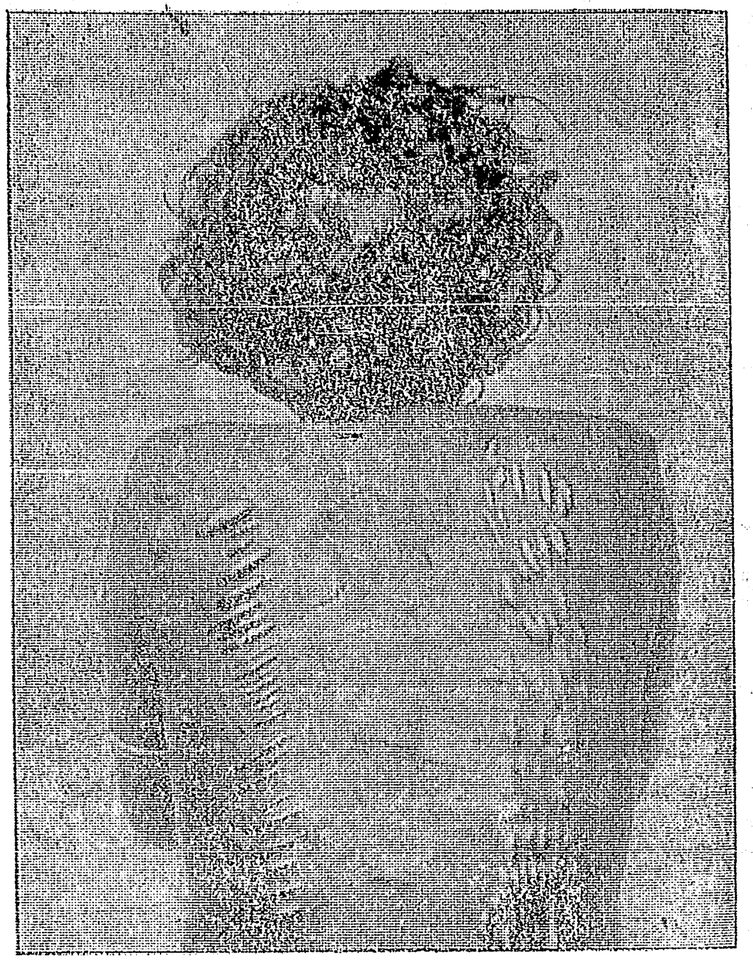

বিচিত্র বৈধব্য চিহ্ন

জাপানের "আইনু" জাতের মেয়েদের মধ্যে পুরুষের খাম-খেয়ালে বিশ্রী এক নিয়মের চলন হয়েছে। মেয়েদের বয়স বছর দুই হ'লেই তাদের প্রত্যেকের ওষ্ঠাধর এবং তার উপরেও—ঠোঁট ও নাকের মাঝখানে যাতনা-দায়ক এক-এক উল্কির দাগ দেগে দেওয়া হয়। তাতে তাদের ঠোঁট তো কালো হয়ে যায় বটেই,—বেশীর ভাগ নাকের তলাতেও এক-একটি নকল গোঁফের ছবি চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। যে-মেয়ের মুখে এমনধারা উল্কি নেই, পুরুষরা তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না। "আইনু" মেয়েরা বাঙালীর মেয়েদের চেয়েও পরাধীন। তারা খালি নিজেদের রূপের উপরেই অত্যাচার সহ্য করে না,—তাদের সমস্ত জীবনই পুরুষের পায়ের তলায় দাসত্বের ও পশুত্বের জীবন, কেবল মাত্র নামেই তারা মানুষ!

খুসিমত ঢ্যাঙা হওয়া

বাইবেলে আছে, Can a man by taking thought add a cub to his stature?

এ প্রশ্ন অনেকদিনের; তবু আজ পর্য্যন্ত এর জবাবে লোকে বল্‌বে, "না"। হিব্রু কিউবিটের পরিমাণ আঠারো ইঞ্চির কম নয়! ফস্ ক'রে লম্বায় আঠারো ইঞ্চি বেড়ে ওঠা কি মুখের কথা!

কিন্তু বিলাতের বিখ্যাত যাদুকর মিঃ আর্থার কার্লটন ফিল্ল্‌স্, আপনার দেহের দীর্ঘতা আঠারো ইঞ্চি না হোক, সাত থেকে আট ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়িয়ে তুল্‌তে পারেন! আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন, এখানে নিশ্চয়ই বাজিকরের কোন ছল-চালাকি আছে। কিন্তু এর মধ্যে সত্যসত্যই চোখে ধুলো দেবার কোন চেষ্টা নাই। কার্লটন ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা নিজের হাঁটু, কোমর, বুক, গলা আর দেহের অন্যান্য অংশের মাংসপেশী বাড়িয়ে তুলে এই অসাধ্য সাধন ক'রে থাকেন। আপনার চোখের সাম্‌নেই দেখ্‌তে দেখতে তিনি বেড়ে উঠ্‌বেন। কার্লটনের বাড়ীতে একবার উইলার্ড নামে এক আমেরিকান এসেছিলেন। তিনিই প্রথমে নিজের দেহ-বর্দ্ধন ক'রে কার্লটনের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেন। কার্লটন সেই লোকটির কাছ থেকেই দেহ বাড়াবার এই কায়দাটি শিখে নিয়েছিলেন। কিন্তু যাদু-বিদ্যাই কার্লটনের জীবিকা হ'লেও, এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটি তিনি সর্ব্বসাধারণকে দেখান না। কারণ তিনি

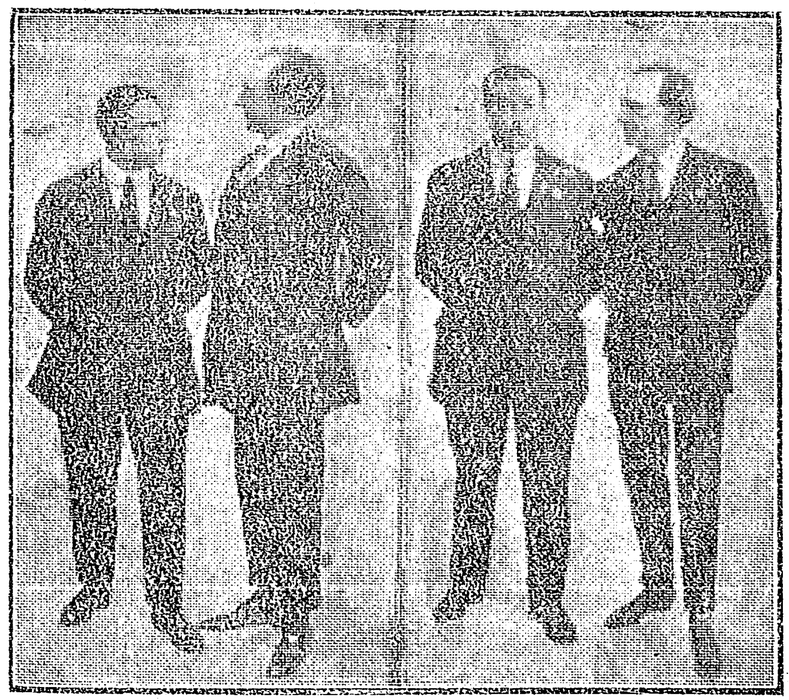

ডানদিকে কার্লটনের সহজ অবস্থার মূর্ত্তি। বামদিকের ছবিতে তিনি মাথায় বেড়ে উঠেছেন।

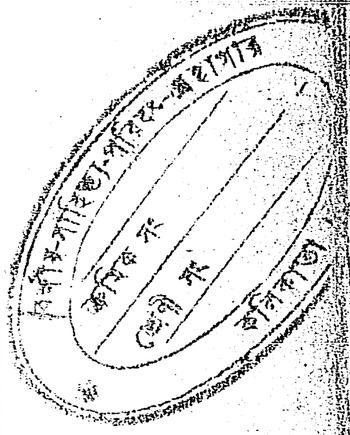

বলেন, এতে তাঁর দেহের নাকি অনিষ্ট হয়। ছ্যাঁচাড়রা দেহ বাড়াবার এই কায়দাটি জানে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা কাল্‌টনের এই না! তাহলে তাদের সনাক্ত করতে কি শক্তি দেখে বলেছিলেন, "ভাগ্যে চোর মুস্কিলেই পড়তে হোতো!"

ঠুঁটো টম

আপনি যদি হাত থেকে বঞ্চিত হন: তাহ'লে কি করেন? নিশ্চয়ই খুব দুঃখিত হন! কিন্তু বিলাতের টম ক্ল্যাক এ-হেন দশাতেও একটুও মুখ-ভার ক'রে থাকে না। জন্মাবধি হস্তহীন, অর্থাৎ ঠুঁটো হয়েও সে অক্ষমের মত বসে নেই। দুই বাহুর গোড়া দিয়ে কলম, পেন্সিল বা তুলি ধ'রে সে এমন খাসা খাসা ছবি এঁকেছে যে, মোটে চৌদ্দ বৎসর বয়সে London County Council থেকে আর্ট-স্কলারসিপ লাভ করেছে। ব্যঙ্গ-চিত্রেও তার দক্ষতা আশ্চর্য্য। খেলা-ধূলাতেও উৎসাহ তার কম নয়। টম খালি খেলা দেখে বা খেলার গল্প ক'রেই তুষ্ট নয়, ফুটবল, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ (যদিও তার মুষ্টি নেই)—এমন-কি ক্রিকেটেও সে রীতিমত নাম কিনেছে। শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবেন, দু বাহু দিয়ে হাতল চেপে ধরে সে এত জোরে সাইকেল চালাতে পারে যে, অন্যের

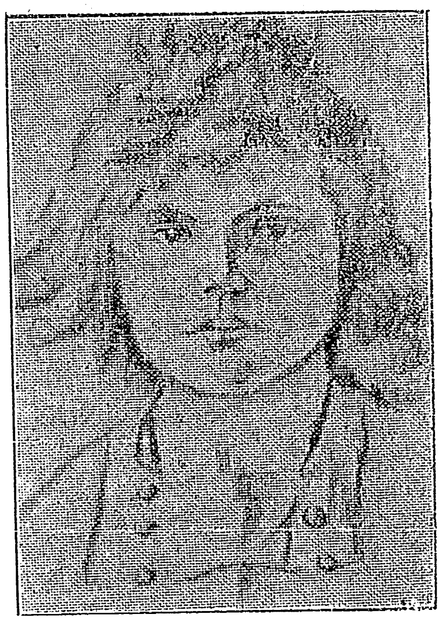

টমের আঁকা মূর্ত্তি-চিত্র

পক্ষে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই শক্ত হয়ে ওঠে। এই অল্প বয়সেই হাস্যরসিক ব'লেও সে বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। বাহাদুর টম ক্ল্যাক্, সাবাস!

প্রসাদ রায়।

সাঞ্চী ও উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য

উড়িষ্যার শিল্পকলা প্রসঙ্গে মাথুর (মাথুর প্রদেশের) ভাস্কর্য্যের আলোচনা-কালে, আমরা সাঞ্চী ও বরাহতের মৌলিক ও অবিমিশ্র ভারতীয় শিল্পধারা হইতে তত্রস্থ গঠনশিল্পে শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি বটে, কিন্তু উড়িষ্যার শিল্পের সহিত উহার যে কি সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে কোন বিশেষজ্ঞের মত ব্যক্ত করিবার অবসর পাই

নাই। ভৌতিক জীবনে যেরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, শিল্পেরও সেইরূপ আকার-গত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। একই আকৃতিতে উদ্বর্ত্তনের শেষ হয় না পরন্তু জীব-ধারার বিভিন্ন স্তরে উহা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়; প্রকৃত শিল্পও সেইরূপ অতীতের সহিত একেবারে সম্পর্ক-বিহীন নহে—উহা ঐতিহাসিক ও ধারাবাহিক পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিয়া আকারগত বিভিন্নতা লাভ করে মাত্র। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হেভেল কোনারকের সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত সাঞ্চীতে প্রাপ্ত একটি শীর্ষবিহীন বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, "উভয় মূর্ত্তিই ভারতীয় শিল্প-রীতিপরম্পরার অপূর্ব্ব অবিচ্ছিন্নতার (continuity) পরিচায়ক। যদিও মূর্ত্তি দুইটীর নির্ম্মাণ-কালের মধ্যে অন্ততঃ নয় শতাব্দীর ব্যবধান রহিয়াছে, তথাপি উভয়ের এরূপ পারিপাট্য-সাদৃশ্য যে উভয়ই একই যুগের একই শিল্পমতে দীক্ষিত শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। যেটুকু বৈলক্ষণ্য, তাহা কেবল মূরত দুইটীর ভঙ্গীতে। সূর্য্যমূর্ত্তির ব্যগ্র কর্ম্মনিরত ভঙ্গীটি ধৃতনভোমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের দণ্ডায়মান ভঙ্গির সহিতই তুলনীয়—নিখিল জগতের ধর্ম্মনীতি-শিক্ষয়িতা বুদ্ধদেবের সে গম্ভীর স্থৈর্য্য ইহাতে নাই।"

ভারতীয় শিল্প-বিষয়ে শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয়ের মত উপেক্ষণীয় নহে, তাই আমরা তাঁহার এ উক্তি সাদরে উল্লেখ করিলাম।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

শিশু-শিক্ষার নতুন ধারা

শিক্ষা আমাদের দেশের ছেলেদের কাছে যে বিভীষিকাময় মূর্ত্তি ধরে এসে দাঁড়ায়, তাতে ফল আর যাই হোক, শিক্ষা এবং শিক্ষকের উপর আমাদের আন্তরিক টানের যে অনেকখানি অভাব হয়, তা কেউ অস্বীকার কর্ব্বেন না। ইউরোপ আর আমেরিকা এই সহজ কথাটা বুঝতে পেরেছে—রক্ষণশীল দলের রাজা জন্‌বুলও আজ "শাস্তি না দিলে ছেলে ভাল হয় না" এই শাস্ত্রবাক্যের সত্যতায় সন্দিহান হয়ে উঠেছে। ইউরোপে তাই আজ শিশুশিক্ষায় নতুন ধারা প্রবর্ত্তিত হচ্ছে।

ইউরোপে আজকাল অনেক স্কুলে ক্লাস-শাসন মাষ্টার মশাই করেন না—শাসন-দণ্ড সেখানে ছেলেদের হাতে। ছেলেরা যে নিজেদের স্কুল নিজেরা শাসন কর্ব্বে, এ অনেকে খুব ভাল মনে কর্ব্বেন না। তাঁরা এমন-কোন স্কুলের 'সুশাসন' সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠবেন—এবং ছেলেরা যে 'ধিঙ্গি' হয়ে উঠবে না, তা বিশ্বাস কর্ত্তে চাইবেন না! কিন্তু এই 'স্বরাজ' ইউরোপের অনেক ইস্কুলই লাভ করেছে এবং সে-সব স্কুল বেশ ভাল ফলই দেখিয়েছে। লণ্ডনের একটা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ই, এ, ক্রাডক্ মহাশয় তাঁদের স্কুলের 'স্ব-শাসনে'র কথায় বলেছেন যে সেই স্কুলের শিক্ষার ভার শুধু শিক্ষকদের উপরে রেখে আর সমস্ত ভার ছেলেদের নির্ব্বাচিত একটা কমিটির হাতে দেওয়া হয়।

সেই কমিটি ক্লাস শাসন করে, বাড়ীতে তৈরী কর্ব্বার জন্যে পড়া নির্ব্বাচন করে দ্যায়, বাড়ীতে করা কাজের পরীক্ষা পর্য্যন্ত নেয়। প্রথম প্রথম এতে ছেলেদের একটু অবাধ্যতার লক্ষণ দেখা গেল। একবার ছেলেরা বাড়ীর জন্যে দেওয়া ফ্রেঞ্চ পড়া পরদিন লিখে পরীক্ষা কর্ব্বার বন্দোবস্ত করে। দু'জন ছেলে সেই পড়া করে না এবং পরীক্ষাতে চল্লিশের কম নম্বর পায়। একশ'র মধ্যে চল্লিশ না পেলে পাশ নয়। তাদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা কর্ত্তে মাষ্টার মশায় রাজী হলেন না। কারণ ওটা ছেলেদের জুরিস্‌ডিক্‌শন, তখন ছেলেদের কমিটি থেকেই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হল। কমিটি আদেশ করলে যে সেই ছেলে দুটো যে ফ্রেঞ্চ ক্রিয়াগুলো শিখে আসে নি, সেগুলো বাড়ী থেকে দুবার করে লিখে এনে পরদিন দেখাবে। পরদিন দেখা গেল যে তারা কমিটির আদেশ পালন করে নি। সেদিন কমিটি থেকে তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করে দেওয়া হল, কিন্তু তাতেও যখন তারা কিছু কাজ কল্লে না, তখন স্থির করা হল যে তাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য জুরী ডেকে আলোচনা করে স্থির করা হবে, সেদিন তাদের দুষ্কৃতি প্রকাশ করে এক নোটীশ প্রচার করা হল যে পরদিন বারোজন ছেলে-জুরী তাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর্ব্বে।

এ সমস্তের ফলে এই হল যে ছেলেরা তাদের এক-ঘরে করে রাখ্‌বে, শেষে তারা শাস্তি গ্রহণ করলে, তার পর থেকে আর কোনদিন এরকম অবাধ্যতা হয়নি এবং এই প্রণালী খুব সফল হল।

আর কতকগুলো স্কুলে—কতকগুলো মেয়ে-স্কুলেও—এই স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা আরও উন্নতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। টিপট্রি হল নামে এক স্কুল শ্রীযুক্ত নরম্যান ম্যাকমানের স্থাপিত। শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীরা বল্লে, আমরা যা বুঝি, এ স্কুলে তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ছেলেরাই এখানকার পড়ার এবং খেলার সময় নির্দ্দেশ করে। এই ছাত্র-শাসিত স্কুলের উপদেষ্টা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌মান। কোন কঠিন ব্যাপারে মাত্র তিনি উপদেশ দেন। এই ছাত্র-সঙ্ঘ যে শুধু নিজেদের শাসনই করে, তা নয়; তারা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক।

এই যে শিশু-শিক্ষার নতুন ধারা, এতে শিশুশিক্ষাকে যতদূর সম্ভব পরিণতদের কঠিন নিগড় থেকে মুক্ত কর্ব্বার চেষ্টা হচ্ছে। শিশুর নিজেদের ব্যক্তিত্বকে নিজেরাই পরিস্ফুট করে তুলুক, এ ধারার এই মন্ত্র। কেমব্রিজের পার্স স্কুলে ছোট ছেলেদের এই প্রথায় গড়ে তোলায় তাদের এমন কবিত্ব-শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়েচে, যে তাদের কবিতা ভাল ভাল সমালোচকদের মুগ্ধ করে দিয়েছে। এই শিশু কবিরা অলৌকিক বা অসাধারণ নয়; তারা সাধারণ সুস্থ সবল শিশু। এই কবিতা তাদের স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠ্‌বার ফল।

ইটালিয়ান মহিলা ডাঃ মন্টিসরীর শিক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষক এবং কতক পরিমাণে সাধারণের মধ্যেও খ্যাতি লাভ করেছে। ডাঃ মেরিয়া মন্টিশরীর পদ্ধতিতে ছেলেদের কিছু শিখিয়ে দেওয়া হয় না—তারা নিজে নিজে শিখে নেয়। মন্টিসরী স্কুলে কোন শিক্ষক নেই। সেখানে একজন পরিচালিকা আছে মাত্র।

সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে আজকালকার শিক্ষা ছেলেদের উপর কর্ত্তৃত্বের ভার ছেড়ে দিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান কর্ত্তে শিখেছে। আজকালকার শিক্ষা-পদ্ধতি ছেলেদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে বেড়ে ওঠবার সুযোগ দেয়, তাদের শিক্ষকদের ঢালা ছাঁচে গড়ে তোলবার জন্য বেত্র আস্ফালন এবং চোখ গরম করে না।

আমাদের ছেলেরা সেই হাতে-খড়ির দিন থেকে যাঁদের শৈশবের স্বপ্নময় রাজত্বের দৈত্য বলে ভয় করে আসে, তাঁরা এ সব বিষয়ে বেশী কিছু চিন্তা করেছেন কি?

শ্রীসোমনাথ সাহা।

বর্ষা-মিলন

বাহিরে ঝরঝরে আকুল জলধারা,
শাঙন ঘন মেঘে উজল রবি হারা,
এমন বরিষণে
আজিকে প্রিয়া-সনে
মিশিতে প্রাণে-মনে
আকুলি' উঠে প্রাণ।
আজিকে বুকে বুকে দোঁহায় ঘিরে রাখা,
দোঁহার মুখে মুখে অধর পিয়ে থাকা,
দোঁহায় নিরজনে
নীরব আলাপনে
আবেশ-ঘুম-সনে
দোঁহাতে দোঁহে দান।
ঝলকি' শোনা যায় জলের ঝরঝরি,
উতল বায়ু-সাথে পাতার মরমরি,
শাঙন ঘন ছায়া
রচিছে ঘোর মায়া,
মোদের দুটি কায়া
নিবিড়ে মিশে যায়।
তটিনী ছুটে যায় উছল ভরা প্রাণে,
গুঁকুরে বারিখানি উপছে কানে কানে,
মোদের দুটি বুকে
অধীর প্রেম সুখে
উপছি 'সব দুখে
ভরিয়া উথলায়।
গুমরি' যত ওঠে শাঙন কালো মেঘ
আকুলি' যত নামে অঝোর জল-বেগ,
ততই মোরা দুটি
শতেক বাধা টুটি'
দোঁহায় দোঁহে লুটি
ব্যাকুল বেদনায়।
কেবল চুমে' চুমে' অমিয়া পিয়ে থাকি,
কেবল ঘন ঘন দোঁহায় বুকে ঢাকি,
কেবল যেচে নেওয়া,
কেবল সেধে দেওয়া,
কেবল মিশে যাওয়া,
বিলানো আপনায়।
আজিকে ভরা ধরা,
ছায়া সে ঘুম-ভরা,
কেবল তৃষা-হরা
হিয়াতে হিয়া দান।
আজিকে বরিষণে
কেবল প্রিয়া-সনে
নিবিড়ে প্রাণে-মনে
মিশিতে চাহে প্রাণ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

আঁধি

৬

শাশুড়ীর কথায় চট্ করিয়া সুষমাকে না লইতে পারিলেও, কথাটা কয়মাস দিনরাত অভয়াশঙ্করের মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ তুলিল। নানা-ভাবে বিষয়টাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া এমন কি লাভ-লোকসানের হিসাবটাকেও বেশ করিয়া খতাইয়া শেষে তিনমাস পরে সুষমাকে হঠাৎ তিনি বিবাহ করিয়া বসিলেন।

বিবাহ করিয়া সুষমাকে লইয়া অভয়াশঙ্কর যেদিন গৃহে ফিরিলেন, সেদিন বাড়ীতে জ্ঞাতি-কুটুম্বিনী-মহলে অসন্তোষের একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। এতদিন নির্ব্বিবাদে নির্ঝঞ্ঝাটে এত-বড় সংসারটায় অবাধ কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া আসিয়া আজ হঠাৎ এই কোথাকার এক সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন বিয়ে-করা ধেড়ে বৌয়ের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে! মানুষের শরীরে এ অপমান সত্যই সহ্য হয় না! তাই অপরাহ্নে সুষমা যখন দোতলার ঘরের সম্মুখে খোলা ছাদ হইতে নিখিলের কাপড়-চোপড়গুলাকে রৌদ্রে দেওয়ার পর ঝাড়িয়া পাট করিয়া গুছাইয়া তুলিতেছিল, তখন তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া ঠিক নীচেকার রোয়াকে মেয়ে-মজলিসের চড়া গলায় কড়া রকমের মন্তব্য চলিতেছিল।

একজন বলিলেন—সৎমা করবে ছেলে মানুষ! কথায় বলে, সৎমা, সতীন-পো না সতীনের কাঁটা—! ওদের আর কি? সব ঠাটই বজায় হল—তবে যেতে ঐ ছোঁড়াটাই জন্মের মত ভেসে গেল! আর-একজন বলিলেন, —তা না ত কি! তার উপর শিখিয়ে-পড়িয়ে মানিয়ে-বনিয়ে যে নেব, তারও তো জো নেই দিদি। একেবারে ধাড়ী বৌ,—ধুম্‌সো মাগী বললেই চলে! তবে'গে আমাদের একবার ঘুণাক্ষরেও জানানো হল না! কেন বাপু, আমরা কি মানা করতুম, না বাধা দিতুম! এমনি করিয়া মন্তব্যের সুর চড়া হইতে ক্রমশঃ আরো চড়া পর্দায় উঠিতেছিল।—সুষমা জোর করিয়া মনটাকে সেদিক হইতে সরাইয়া লইলেও, কাণ তাহার অবাধে এই বিষ পান করিতেছিল। সতীন-পো না, সতীনের কাঁটা! কথাটা শুনিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এমনি মানুষের মন! হায় রে, কেন, সতীন-পো বলিয়াই বা ভাবো কেন? সে ত স্বামীরই ছেলে! এটাই বা কেন মনে হয় না!

সন্ধ্যার পর গা ধুইয়া কাচা কাপড় পরিয়া সুষমা নিখিলকে লইয়া ছাদে বসিয়াছিল, সে গল্প বলিতেছিল, আর নিখিল নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিল! এমন সময় নীচে হইতে মানদা ঠাকুরাণী আসিয়া নিখিলকে ডাকিলেন,—এসো দাদা, রান্না হয়েছে,—খাইয়ে দিই গে, এসো। তাঁহার আগমনে গল্পটা বন্ধ হইল। মানদা ঠাকুরাণীও এই যে-জীবটি বসিয়া আছে, তাহার পানে লক্ষ্যও করিলেন না, গ্রাহ্য করা দূরের কথা! গল্প বন্ধ হওয়ায় বিরক্ত হইয়া নিখিল বলিল—না, আমি মার কাছে খাব। মা আমায় খাইয়ে দেবে। এইখানে খাবার দিয়ে যেতে বল।

মানদা ঠাকুরাণী বলিলেন,—ছি দাদা, এসো আমার সঙ্গে। বায়না করে না!

নিখিল বলিল—না, আমি তোমার হাতে খাব না, যে নোংরা হাত তোমার! আমায় মা খাইয়ে দেবে, বলচি—না, তবু—

সুষমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—ছি বাবা, গুরুজন হন, গুরুজনকে মন্দ কথা বলতে আছে কি!

মানদা ঠাকুরাণী অপ্রসন্ন চিত্তে বলিলেন,—খাও তবে দাদা, খাও, মার রাঙা হাতেই খাও। তারপর বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন—অত যার দরদ বেশী, তারে বলে সেই যে কি—দেখো গো নতুন বৌমা, ছেলেটিকে একেবারে যেন কেড়ে নিয়ো না! ওর ধাত-টাত আমরা যেমন বুঝি, তেমন কি আর নতুন মানুষ, কালকের মেয়ে, তুমি বুঝবে? যা হোক্, খেলা সুরু করেছ মন্দ না! গোড়াতেই এত! না জানি, আরো কি দেখব! বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সুষমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ-সব কথা-গুলার অর্থ কি! সুষমা কি করিয়াছে? সে ত কাহারো সঙ্গে একটা কথাও বলে নাই, তবে তাহাকে এমন ভাবে এই সব কথা শুনানো কেন? সে ত কোন অপরাধেই অপরাধী নয়! তবে—?

নীচে তখন মানদা ঠাকুরাণীর তীব্র ঝঙ্কার শুনা গেল,—যাও গো বামুন-মেয়ে, ছেলের খাবার উপরে নিয়ে যাও। দরদী মা এসেছেন, তার হাতেই ছেলে খাবে। অভয়ের মনে যদি এই ছিল, তবে কেন এ মায়ার পাকে বাঁধলে বল দেখি! ছেলেটাকে আমার কোলে দিয়ে শেষ কেড়ে নেবে যদি! যত্ন কি আর আমি করছিলুম না, না, যত্ন জানি না? পেটে ধরিনি বটে, তবু ওর জন্যে নাড়ীটা যেন থেকে থেকে টন্‌টনিয়ে ওঠে!—মা—মা, ওরে আমার সাতপুরুষের মা—আদর করে গল্প শোনানো হচ্ছে! এর পর গলা টিপে রাজ্যেশ্বরী হয়ে বসবেন যখন—! হুঃ! দেমাক কি! আমাদের সঙ্গে একটু মেলা-মেশা নেই। মুখ টিপে ভিজে বেড়ালটি হয়ে, ছেলের জিনিষ-পত্তর নাড়া-চাড়া করছেন, ঘর-দোরের ধুলো ঝাড়চেন! আমরা কে? দাসী-বাঁদী বৈ ত নই! যেন ওঁরই সব—বরাত দিয়ে গেছলেন! আমরা যেন কিছুই দেখিনি শুনিনি! অত টস্ জানিনে বাপু,—সোনার লক্ষ্মীর রাজ্যিপাট—উনি কোত্থেকে এসে দখল করে বস্‌লেন দেখ না! —যাব কোথায়? বৌমা গো—আর কথা জোগাইতে না পারিয়া অতীতের শোকে মানদা ঠাকুরাণী সহসা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দোতলার খোলা ছাদে বসিয়া সুষমা কথাগুলা স্পষ্টই শুনিতে পাইল। আকাশে ছোট এক টুক্‌রা চাঁদ উঠিয়াছিল—তাহারই আশে-পাশে কতকগুলা খণ্ড মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতে-ছিল। সুষমা গল্প থামাইয়া উদাস নেত্র মেলিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। নিখিল কহিল,—বল না মা, তার পর কি হল? রাক্ষসীটা দাঁত বের করে রাজপুত্তুরকে তেড়ে গেল, তা রাজপুত্তুর কি করলে? ভয় পেলে না?

সে কথা সুষমার কাণেও গেল না, সে তেমনি অলসভাবেই আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। সত্যই ত, সারাদিনেও এই এতগুলি বর্ষীয়সী আত্মীয়ার সে কোন তত্ত্বই ত লয় নাই! কি করিয়াই বা লইবে? সে এই অপরিচিত ঘরে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ, সবে মাত্র এখানে আসিয়া পা দিয়াছে! তাঁহাদের

গায়ে পড়িয়া গিন্নি-বান্নীর মত সে আবার কি তত্ত্ব লইতে যাইবে? কৈ, তাঁহারা ত ডাকিয়া সুষমার সঙ্গে একটা কথাও বলেন নাই! অথচ সে বাড়ীর বৌ!

সুষমা ভাবিল, তবু সে ছোট, তাহারই উচিত ছিল, গিয়া সকলের সঙ্গে ভাব করা! কিন্তু অভয়াশঙ্করের আদেশ,—তাই ঘর-দ্বার দেখা-শুনা, নিখিলের প্রত্যেক খুঁটি-নাটি বুঝিয়া লওয়া—এ-সবগুলার দিকে আগেই সে মন দিয়াছিল। এ কর্ত্তব্য যে তার সকল কর্ত্তব্যের আগে। নিখিল বলিল,—বল না মা, গল্পটা। চুপ করে রইলে কেন?

সুষমা চমকিয়া বলিল—এই যে বাবা, বল্‌চি! তারপর গল্পের হারানো খেইটা ধরিয়া সুষমা কোনমতে সেটা শেষ করিল।

ওদিকে নিখিলের খাবার লইয়া বামুন-মেয়ে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। সুষমা বলিল,—একটা চাকর-বাকর কাকেও ডেকে দিন না—আমি ত চিনি না কাউকে। এখানে একটা আলো দিয়ে যাক্, নইলে অন্ধকারে খাবে কি করে?

বামুন-মেয়ে মাহিনার চাকর,—গতর খাটাইয়া খায়,—কর্ত্রীত্বও কখনো করে নাই, করিবার তোয়াক্কাও রাখে না! তার উপর সে দেখিয়াছে, এই মেয়েটি এখানে আসা অবধি নীচেকার মহলে তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ বিশ্রী ষড়যন্ত্র আর জল্পনা চলিয়াছে! অথচ বেচারী মুখের কথাটিও খসায় নাই! তার উপর সুষমার মিষ্ট কথায় তাহার প্রাণটাও একটু ভিজিল। সে বলিল,—এই যে মা, ডেকে দিচ্ছি—বলিয়া ব্রাহ্মণী খাবারের থালা রাখিয়া ওধারে গিয়া ডাকিল,—ওরে ও রামফল, —ও মেঘ্‌না—একটা হারিকেন দিয়ে যা এই দোতলার ছাদে। খোকা বাবু খে বসচে যে!

ব্রাহ্মণী আসিয়া সুষমার কাছে বসিল; কথায় তাহার পিতৃ-গৃহের পরিচয় লইয়া বলি —তুমি আমাদের সে বৌমার বোন্! বেশ হয়েছে মা। ছেলেটাকে দেখো বাছা ওঁদের ত আর মায়া ধরে না। ছেলেটা সত্যি ভেসে বেড়াচ্ছিল! যে অরাজক-পুরী হয়েছি মা—তারপর সে নিখিলের বায়না প্রভৃতি সবিস্তার পরিচয় দিতে লাগিল, পরে এক চাপা গলায় বলিল—বাড়ীতে যাঁরা আছেন, সব এক-একটী জ্যান্ত সাপ, বৌমা দুধ-কলা দিয়ে কর্ত্তাবাবু এদের পুষচেন আবার কর্ত্তাবাবুকেই উল্টে ছোবল দিতে সব বর্ত্তে যান্! তুমি মা ওঁদের একটু চলো! কথার কি ধার! কাউকে রো করেন না! সে বৌমা অমনি চব্বিশ ঘ একেবারে তটস্থ থাকতেন! পাণ থে চূণটুকু না খসে! আহা, বাছারে! বাবা বাবাঃ—কথায় বলে না, যার ধন তার ধ নয়, নেপোয় মারে দই? তা এখানকার কা কারখানাও ঠিক তাই!

হারিকনের আলোয় নিখিলকে খাওয়াই তাহার মুখ ধোয়াইয়া দিলে ব্রাহ্মণী এঁ তুলিয়া সুষমাকে বলিল,—তোমার খাবা এইখানেই নিয়ে আসি মা। তুমিও খে নাও।

সুষমা বলিল—থাক্, পরে খাব'খন। আ নীচে গিয়েই খাব। কেন আবার কষ্ট কর এখানে আনবে?

ব্রাহ্মণী বলিল—ওমা, এ আবার কষ্ট কে

ানটায় মা—? তোমারই ত চাকর আমি। া-ছাড়া এখনই খেয়ে নাও মা—। কার প্রত্যেশেই বা বসে থাকবে? ওঁরা ডেকে লবেন,—খাবে এসো, বৌমা? সে আশাও রো না বাছা। নিজেদের নিয়েই ওঁরা চব্বিশ ণ্টা মত্ত! তার পর কর্ত্তাবাবু—তা তাঁর বার ঐ ঘরেই ঢাকা থাকে। তিনি সেই ণ্টার পর উপরে উঠে খান। এ বাড়ীর ারা ত জানো না মা, তুমি।

৭

অনেক রাত্রে অভয়াশঙ্কর উপরে আসিয়া দেখিলেন, খাটের উপর তাঁহার শুভ্র বিছানা পাতা, আর তাহারই একটি াশে নিখিল শুইয়া ঘুমাইতেছে। নীচে একধারে তাঁহার খাবার ঢাকা রহিয়াছে এবং তাহারই পাশে সুষমা ভূমির উপর াঁচল বিছাইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘরে বড় আলো জ্বলিতেছে। সেই আলোয় অভয়াশঙ্কর দেখিলেন, সুষমার মুখখানি যেন ঈষৎ মলিন, অথচ সেই মলিনতাটুকুর উপর প্রসন্নতার একটা হাসি ফুলের উপর জ্যোৎস্না-রেখার মতই মাখানো রহিয়াছে। বেচারী সুষমা! অভয়াশঙ্কর ভাবিলেন, মুখ দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না ত! এ বিবাহ প্রেমের জন্য, আরামের জন্য বা আমোদের জন্য তিনি করেন নাই,—শুধু সংসারে একটু সুবিধা করিয়া লইবার জন্যই না এ বিবাহ! কর্ত্তব্যের পথটাকে প্রশস্ত অবাধ রাখিবার জন্যই তিনি এই অনাথা বালিকাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছেন, সে কথা ভুলিলে চলিবে না এবং এই কথাটাই সুষমাকে আজই ভালো করিয়া খুলিয়া বলা দরকার! সে যেন মস্ত-বড় আশা করিয়া শেষে নৈরাশ্যে না পস্তাইয়া মরে!

অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—সুষমা।

এই একটি ডাকে উঁ বলিয়া সুষমা ধড়-মড়িয়া উঠিয়া বসিল। অভয়াশঙ্কর একটা চেয়ারে বসিলেন। সুষমা গায়ের কাপড়-চোপড় টানিয়া আপনাকে সম্বৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অভয়াশঙ্কর কহিলেন,—কাছে এসো।

সুষমা অভয়াশঙ্করের কাছে গেল। অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, শোনো। বেশ স্থির হয়েই শোনো। সব অবস্থাই ত তুমি জানো। আর এও তুমি জানো, লীলাকে আমি কি ভালোই বাসতুম! তাকে হারিয়ে আর-একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কত শক্ত, তা তুমি হয়ত বুঝবে না! তবু বোঝবার চেষ্টা করো। স্ত্রীর আদর নতুন করে আর আমার পাবার নেই, তোমার কাছ থেকে আমি তা চাইও না। সে আদর আমি ভরপূর ভোগ করেচি, তার আর প্রত্যাশাও করি না। তবে এই নিখিলকে নিয়ে আমি বড়ই বিপদ্‌গ্রে পড়েচি। ওকে ঠিকভাবে মানুষ করতে গেলে, এমন একজনের সাহায্য চাই, যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে ওরই কাজে ঢেলে দেবে, তার প্রতিদানে কিছুরই আশা রাখবে না। সে আমার মনের সমস্ত পরিচয় নেবে, আর আমার মনের মত করেই নিখিলকে গড়ে তুলবে। আমি এমন একজন লোকই খুঁজছিলুম যে আমার স্ত্রী না হোক, তার মত হবে, বন্ধু হবে, খাঁটি বন্ধু। নিখিল তোমার খুব বশ,

তোমায় সে খুব ভালবাসে, তা-ছাড়া তোমাকেই সে তার মা বলে জানে,—মা বলে ডাকে। তুমিও নিখিলকে খুবই ভালবাস, তাই তোমাকে এই ঘরে এনে তার আসনেই প্রতিষ্ঠা করেচি। তুমি আচারে-ব্যবহারে সর্ব্ব-বিষয়ে তার মা হয়ে থাকো। ও যে মা-হারা, এইটুকু যেন ও না জান্‌তে পারে! ওকে কখনো সে অভাব তুমি বুঝ্‌তে দেবে না। পারবে কি সুষমা?

সুষমা মুখ নত করিয়া হাত দিয়া কাপড়ের আঁচল খুঁটিতে খুঁটিতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, পারিবে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমার কাছ থেকে ঠিক স্বামীর ব্যবহার নাও পেতে পারো তুমি, তার জন্য দুঃখ বা অনুযোগ করো না। তোমাকে ঠিক স্ত্রী বলে আমি গ্রহণ কর্‌তে পারব বলে মনে হয় না। তবে সব কাজে আমার সহায় হও, বন্ধু হয়ে থাকো আমার। আমাকেও তোমার বন্ধু বলে জেনো। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু, প্রাণের বন্ধু হলে! কেমন?

সুষমা এবারও কোন কথা বলিল না—ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—তোমার জীবনটা তুমি হয়ত ভাবচ, ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু তা নয়। একটা অনাথ মাতৃহীন শিশুকে যদি সব স্বার্থ, সাধ, আর কামনা বিসর্জ্জন দিয়ে মানুষ করে তুলতে পারো, তার মাতৃহীনতার মস্ত অভাব যদি তাকে বুঝ্‌তে না দাও, তাহলে সেটা খুব বড় কাজ করা হবে। ভগবান তোমাকে তার জন্যে আশীর্ব্বাদ করবেন, এ নিশ্চয় জেনো। তোমার সে নিঃস্বার্থ আন্তরিক সেবা কখনই নিষ্ফল হবে না; এও জেনে রেখো।

সুষমার দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। হায়রে, প্রথম যৌবনে স্বামীর তাহার এই প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ! সুষমার বয়স হইয়াছে, স্বামী কি বস্তু, তাহা সে বাঙালীর ঘরে জন্মিয়া এত খানি বয়সে খুবই বোঝে! তাহার তরুণ প্রাণে অজস্র সাধ আর কামনা পুষ্প-কলির মত অজস্রভারে ফুটি-ফুটি হইয়া রহিয়াছে। একটু প্রেম, একটু সোহাগ আর আদরের হাওয়ায় সেগুলা এখনি ফুটিয়া বিপুল শোভায় আর সৌরভে সকলকে মাতাইয়া তুলিতে পারে—কিন্তু সেগুলাকে আর ফুটানো গেল না! অফুট কলি অনাদরেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে! ভগবানের আশীর্ব্বাদ? সুষমা কি তাহার কাঙাল?

জোর করিয়া সে চোখের জল সম্বরণ করিল। নিখিলের মুখ চাহিয়া সে সমস্ত সহিবে, নিখিলের সুখের জন্য আপনাকে দিয়ে উৎসর্গ করিবে, বলি দিবে, ভাবিল। মা-হারা বেচারী নিখিল! বেশ, তাই হোক! তুচ্ছ একটা নারীর জীবন—বৈ ত না! সে জীবন এই নিখিলের সেবাতেই সার্থক হোক্!

অভয়াশঙ্কর কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন; কেমন একটা অধীরতা বুকে লইয়া ঘরের মধ্যে কয়বার পায়চারি করিয়া বেড়াইলেন, পরে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সুষমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। সুষমা তখনো সেই একই ভাবে চেয়ারের পাশে মুখ নামাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটা কথা প্রকাশের জন্য অভয়াশঙ্করের মনের মধ্যে তারী

জোরে ঠেলা-ঠেলি করিতেছিল। সুষমার পানে চাহিতে প্রাণে একটু মমতাও জন্মিল। সে মমতাকে দুই পায়ে চাপিয়া ধরিয়া তিনি কথাটা অবশেষে বলিয়া ফেলিলেন।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—আর-একটা কথা, সুষমা। ভিতরে আমাদের মধ্যে যে বন্দোবস্তই থাকুক, বাহিরে কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী। বাহিরের লোকে তোমাকে সর্ব্ববিষয়ে আমার স্ত্রী বলেই জানবে। এই বাড়ী,সংসার—বিষয়,এ সমস্তেরই কর্ত্রী তুমি! তুমিও সেইভাবে নিজেকে, আর সংসারকে চালাবে, তার একতিল কম নয়! আর দেখো, ঐ বিছানায় আমরা একত্রে দু-জনে না শুলেই ভালো হয়, বোধ হয়। খাটে তুমি আর নিখিল শুয়ো—আমি ঐ ওধারের ছোট স্প্রীংয়ের খাটটায় শোব'খন। কেমন?

সুষমা কোন কথা বলিল না। এতক্ষণে সে মনটাকে ঠিক করিয়া লইতেছিল—সমস্ত আদেশ সে বিনাবাক্য-ব্যয়ে শিরোধার্য্য করিয়া লইবে, স্থির করিল। তাই সে ঘাড় নাড়িয়া স্বামীর এ বন্দোবস্তটাতে নিঃশব্দেই সায় দিল।

অভয়াশঙ্কর তখন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খাইতে বসিলেন। সুষমা ধীরে ধীরে আসিয়া পাশে বসিয়া তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

৮

এমনি করিয়াই দিন কাটিতে ছিল। সুষমা নিখিলের মা না হইয়াও মা সাজিয়া নিখিলের সমস্ত অভাব ঢাকিয়া চলিতে লাগিল। অভয়াশঙ্কর শুধু দুই জনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিল,—যেন এই ভাবটায় কোথাও এতটুকু শৈথিল্য না আসিয়া পড়ে! বন্ধু বলিয়া মানিয়া লইলেও অভয়াশঙ্কর যে স্ত্রীর চক্ষে একেবারেই সুষমাকে না দেখিতেন, এমন নয়; তাহার উপর সকল বিষয়ে ক্রমে ক্রমে নির্ভর করিতেও লাগিলেন। এক-একবার মনে এমন আশঙ্কাও জাগিত, তাই ত, এ-একটা কি গোলমাল বাধাইয়া তুলিতেছি না ত! নিখিল সুষমাকে মা বলিয়া ডাকিতেছে, এজন্য এখন যেন কোথাও বাধিতেছে না। কিন্তু লীলা—তার স্থানটা কি জীবনের পৃষ্ঠা হইতে একেবারেই মুছিয়া ফেলিতে হইবে? লীলাকে কি একেবারে লোপ করিয়া দিবেন? নিখিল নিজের মাকে চিনিবে না? নিজের মার কোন পরিচয়ই জানিবে না? কখনো তাহার নামটুকুরও সম্মান করিবে না? এ ত লীলার স্মৃতির দস্তুরমত অপমানের ব্যবস্থাই তিনি করিয়া দিলেন! ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার সূত্রে এমনি জোট পড়িতে লাগিল যে তিনি বিরক্ত হইলেন এবং রাগটা গিয়া পড়িল শেষে বেচারী সুষমার উপর! জীবন-পথে সে যদি অমন করিয়া আসিয়া না জুটিত! নিখিলের সাম্‌নে অমনভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়া অমন স্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া ধরি সে না লইত, নিখিল যদি তাহার এতটা বশ না হইত! তাহা হইলে যে—

তাহা হইলে কে জানে, অভয়াশঙ্কর তাহাকে আনিয়া এখানে এই জটিলতা সৃষ্টি করিবার কল্পনাও করিতেন না! রূপের মোহ! অভয়াশঙ্কর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, কখনই না! নিখিলের জীবন-পথে আসিয়া না দাঁড়াইলে সুষমার পানে তিনি ফিরিয়াও তাকাইতেন না।

হায়রে, ইহারই নাম সংসারের পথ! সরল সোজা পথে চলিয়া যাইবার ভাগ্য যাহাদের হয়, তাহারাই শুধু ধন্য! আর সোজা পথে কাঁটার ঘা খাইয়া এই অন্ধকার গলির পথে যে হতভাগাদের ঢুকিয়া পড়িতে হয়, তাহাদের কি আর নিস্তার আছে রে! সুখ? শান্তি? সে আশা একেবারেই মিছা! পদে পদে মাথা ঠুকিয়া, পা পিছলাইয়া সে কি এক বিশ্রীভাবেই যে তাহাদের পথ চলা শেষ করিতে হয়! যখন এই দীর্ঘ যাত্রার মেয়াদ শেষ হয়, তখন সারা দেহ-মন ক্ষতের জ্বালায় বেদনার ঘায় অমনি টন্‌টন্ করিতে থাকে!

সুষমাকে আনিয়া প্রায় বৎসর কাল কোন মতে কাটাইয়া দিবার পর অভয়াশঙ্কর নিজে হইতে প্রতি পদে এমনি-নানান্ অশান্তি মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে লাগিলেন। সুষমার কি কোন দোষ ছিল? না। সে বেচারী এই তরুণ বয়সে ঐ নিখিলের সেবাতেই সমস্ত প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছিল! কম্পাসের কাঁটার মত সে ঐ নিখিলকে কেন্দ্র করিয়াই যা' এদিক-ওদিক নড়া-চড়া করিতেছে। যৌবনের সাধ, যৌবনের পিপাসা? যৌবন বস্তুটাকেই যে সে দুই হাতে ঠেলিয়া কোথায় সরাইয়া দিয়াছে, তাহার কোন নিশানাও মেলে না! সে ত আজ যুবতী নয়, স্ত্রী নয়, সে শুধু মা, নিখিলের মা। এ ছাড়া তাহার আর অন্য কোন পরিচয় নাই!

এমনি ভাবে থাকিয়া থাকিয়া এই জীবনটাতেই সে এমনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিল যে, নারীর শাস্ত্রে ঐ যে স্বামীর আদর, স্বামীর সোহাগ বলিয়া কতকগুলা কথা আছে,সেগুলা মোটেই তাহার কাছে ঘেঁস দিতে পারিল না, সেগুলা মনের কোণে ছোট একটা ঢেউও তুলিল না! যেন একেবারে সেই তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সের পর বালিকা-কাল কাটাইয়া সে হঠাৎ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর-বয়সে সন্তানের জননী ও গৃহের কর্ত্রীতে প্রোমোশন লইয়া বসিয়াছে! মধ্যকার বয়সটা যেন মোটে তাহার নাগালই পায় নাই, তাহাকে সে স্পর্শও করিতে পারে নাই!

এই আত্মপ্রসাদটুকু লইয়াই বিবাহের পরে একটা বৎসর সে বেশ একরকম কাটাইয়া দিল। পরে সহসা একদিন এটুকুতেও বাহির হইতে খোঁচা পড়িতে লাগিল।

সংসারে এমন মানুষ বিস্তর দেখা যায়, যাহারা নিজেদের কোন লাভ, কোন স্বার্থ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও পরের অনিষ্ট খুঁজিয়া বেড়ায়! অভয়াশঙ্করের সংসার-দুর্গে এই যে কুটুম্বিনীর দল প্রকাণ্ড অক্ষৌহিণীর মতই খাইয়া বসিয়া নিতান্ত অলসভাবে কালক্ষেপ করিতেছিল, তাহারা এখন উপস্থিত কোন কাজ হাতে না পাওয়ায় সুষমার বিরুদ্ধে দুই-চারিটা মিথ্যা অপবাদ তুলিয়া অভয়াশঙ্করের কাণ ভারী করিয়া তুলিতে লাগিল। সুষমা কোনদিন ইহাদের কাহারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া কাহারো অবাধ কর্ত্তৃত্বে হাত চালায় নাই ত! সংসারে নিজেকে সকলের পিছনে রাখিয়াছে, তবুও এই সব কুটুম্বিনীর দল আগে চলিতে চলিতেও ঘোড়ার মত পিছনে চাট্ মারিয়া বেচারীকে জর্জ্জরিত করিতে ছাড়িল না। সুষমার অপরাধ, সে শান্ত, সাত চড়েও তাহার মুখে কথা বাহির হয় না—আরো অপরাধ, নিখিল তাহাকে পাইয়া একেবারে অজ্ঞান। তার উপর সেবার পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবার সময় কর্ত্তা অমনি সোহাগ

করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন! কৈ, লীলাও ত বাড়ীর অত আদরের বৌ ছিল, সে কি কখনো পশ্চিমে গিয়াছে! তবে? কর্ত্তার সঙ্গে নিখিল একা গেলেই চলিত, চাকর-বাকরে কি আর তাহাকে দেখিতে পারিত না? না পারিলেও তাঁহারা ছিলেন ত,—ঐ সূত্রে অমনি দুই-চারি জায়গায় তীর্থটাও নয় সারিয়া আসিতেন! তা না, তাঁহারা রহিলেন ঘরে পড়িয়া, সংসার আগ্‌লাইয়া, আর সঙ্গে চলিলেন কে? না, দ্বিতীয় পক্ষের সোহাগের বৌ! অমন করিয়া চুপ-চাপ থাকিলে কি হইবে, ও কি কম মেয়ে! বাঙালীর ঘরে ধেড়ে বৌ কি কখনো ভালো হয়? তাহারা ঐ স্বামীটিকেই চেনে শুধু! বৌ ত বলিতে পারিত, উঁহাদের সঙ্গে নাও, তীর্থ করিবেন! সবই জানা আছে গো, জ্ঞাতি-কুটুম্বিনী আর এই আত্মীয়ার দল, যত ভালো, যত বড় সম্মানের পাত্রীই হোন না তাঁরা, দাও তাঁহাদের লুট্ করিয়া!

৯

নিখিল ইদানীং বড় দুরন্ত হইয়া উঠিতেছিল। সেদিন পড়িয়া হাত-পা ছড়িয়া ফেলিলে এই সব জ্ঞাতি-কুটুম্বিনীরা তখন অবশ্য দেখিতে আসিলেন না,—কিন্তু পরে এক সময় অবসর বুঝিয়া সুষমার অসাক্ষাতে বেশ সোহাগের ভঙ্গীতে তাহার বিরুদ্ধে অভয়াশঙ্করের কাণে লাগাইতে বসিল; বলিল,—ছেলেমানুষ বৌ, যাহোক্ পেটে এখনো একটি ধরেনি ত—ছেলের ধকল চব্বিশ ঘণ্টা ও সইতে পারবে কেন, বাবা? ওর নিজেরই এখন খেলবার বয়স। এই যে ছেলেটাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে তাড়া দিতেই বাছা গেল অমনি দুম্ করে পড়ে—রগের কাছটা ছিঁড়ে গেছে! ভাগ্যে ছুটে গিয়ে চারটি দুব্বো ঘাস ছেঁচে দিলুম!

অভয়াশঙ্কর মনে মনে বিষম চটিয়া গেলেন, কি পড়িয়া গেল, তা দেখা নাই, তার উপর আবার ভূতের ভয় দেখাইয়া ফেলিয়া দেওয়া! ঠিক! এ ত নিজের মা নয়, এ যে সাজা মা। নিজের মা হইলে কি আর এটা পারিত? কিন্তু এ রাগ তিনি প্রকাশ করিলেন না, মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

তার পর আবার সেদিন—সুষমা তখন গা ধুইতে গিয়াছিল। নিখিল সেই অবসরে ছোট আলমারির মাথায় চড়িয়া লীলার ছবির উপর সুষমা নিজের হাতে গাঁথিয়া মস্ত যে ফুলের মালাটা ঝুলাইয়া দিয়াছিল, সেইটা টানিতে গিয়া ছবিটাকে দুম্ করিয়া ফেলিয়া দিল। কাঁচ ভাঙ্গিয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। সেও অমনি তড়াক্ করিয়া লাফ দিয়া যেমন পলাইবে, পায়ে ভাঙ্গা কাঁচ ফুটিয়া গেল। কিন্তু সে কথা কাহারও কাছে বলা চলে না ত! সে সেই কাঁচ্-ফোটা পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে একেবারে ছাদের সিঁড়ি বহিয়া চিল-কোঠায় গিয়া আশ্রয় লইল। সুষমা আসিয়া কাণ্ড দেখিয়া অবাক! চীৎকার করিয়া ডাকিল,—নিখিল। নিখিলের কোন সাড়া নাই! ভৃত্যেরা খোঁজ করিয়া আসিয়া জানাইল,খোকা বাবু বাড়ী নাই। সুষমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চারিধারে লোক ছুটিল। অভয়াশঙ্কর গৃহে ছিলেন না। নিখিলের কোন সন্ধানই কেহ আনিতে পারিল না—ওদিকে সন্ধ্যাও গাঢ় হইয়া আসিল,—সুষমা অশ্রু-সজল চোখে কত দেবতার মানত করিতেছে, এমন সময় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিখিল আসিয়া

হাজির। সে চিল-কোঠায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে যে এত খোঁজ চলিতেছে, সে তাহার কিছুই জানিত না। মার বুকে মুখ লুকাইয়া ছবি ভাঙ্গার কথা সে ধীরে ধীরে বলিল। সুষমা বলিল,—ছি, তোমাকে না কত দিন বলেচি যে ও আলমারির উপর উঠবে না! কথা শোনোনি! আমি আর কখ্খনো তোমায় ভালোবাসব না, গল্প বলব না ত!

নিখিল কাঁদিয়া বলিল—না মা, সত্যি বলচি মা, আর-কখ্নো এমন কাজ করব না।

বাড়ীতে তখন হুলস্থুল বাধিয়া গেল। গরম জল,—নরুণ,—চুণ—ডাক্তার—শুনিয়া আত্মীয়ার দল উপরে উঠিলেন না,—কি জানি খাটিতে হয় যদি,—তাঁহারা নীচে বসিয়াই টিপ্পনী কাটিতে লাগিলেন।

সে রাত্রে অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিয়া ছবির কাঁচ ভাঙ্গা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। লীলার ব্রোমাইড এনলার্জ্জমেণ্ট--কত টাকা ব্যয়ে করানো হইয়াছে, কত যত্নের সামগ্রী—সেই ছবির এই দশা! সগর্জ্জনে তিনি ডাকিলেন—নিখিল।

নিখিল তখন নীচে রান্নাঘরে খাইতে বসিয়াছিল, সুষমা পাশে বসিয়া পাখা করিতেছিল, কাজেই তখনি উঠিতে পারিল না, যে মানদা ঠাকুরাণীকে বলিল—একবার যান্ না পিশিমা, তিনি এসে ডাকচেন, কি চাইছেন। নিখিলের খাওয়া না হলে আমি ত যেতে পারচি না, বামুনদিরও হাত জোড়া।

মানদা ঠাকুরাণী উপরে গিয়া কহিলেন—কি বাবা? নিখিলকে ডাক্চ? সে খাচ্ছে, বৌমা তাকে খাইয়ে দিচ্ছেন! তাও বলি, এখন ডাগর হচ্ছে, নিজের হাতে খেতে শিখুক। এখন থেকে অভ্যাস করা ভালো। ঠেসে খাইয়ে দিলে পেটের মাপ ত বোঝা যায় না। শেষে কি জন্মের মত লিভারের দোষ জন্মে যাবে? নতুন বৌমার সব ভালো, কেবল ঐ যে কি গোঁ, নিজে যেটি ধরবেন,—যত বলি, ওরে বেটী, তুই সেদিনের মেয়ে, এ-সব বুড়ীদের কথা মান্তে শেখ্—তা—যাক্, হ্যাঁ ভালো কথা, তোমার খাবার আনতে বলব কি বাবা?

অভয়াশঙ্কর বিরক্তির স্বরেই বলিলেন—না। তার পর নিজের মনে বলিলেন,—ছবিখানা ঝুল্চে কোথায় সেই তেশূন্যে, তা ওর উপর যুদ্ধু করতে যাওয়া কেন? নিখিল আজকাল ভারী পাজী হয়েচে, দেখচি!

মানদা ঠাকুরাণী বলিলেন—বকো না বাবা, আহা, মা-হারা কচি বাচ্ছা! ওর কি জ্ঞান আছে, বল? আর তাও বলি, ছেলেদের একটু দাবে রাখা ভালো। অত আদর দিলে যে মাথা খাওয়া হয়। তা ত বৌমা শুনবেন না! এ'ত আদর করা নয়, এ যে শত্রুতা-সাধন। এই যে আমাদের কাছে ও এদ্দিন ছিল—কৈ, এ রকম হয়নি ত! হবে কেন? কি বংশে জন্ম ওর!

অভয়াশঙ্কর আরো বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—থামো তুমি! কি কথায় কি কথা এল। মানদা ঠাকুরাণী তখন গালের মধ্যে একরাশ তামাকের গুল পুরিয়া খানিকটা পিক্ ফেলিয়া বলিলেন,—ঐ ছেলে কি ও-ছবি নামাতে পারে! বৌমার আমার যেমন ছেলেমানুষী, বল্লেন, আলমারির উপর দাঁড়িয়ে পাড়ো দেখি! ছেলেমানুষ টাল রাখতে

পারবে কেন? গেল ওটা দুম্ করে পড়ে। পায়ে কাঁচ ফুটে পাটাও যায়! শেষে কত করে কাঁচটা তুলে দিলুম। চুণ দিয়ে রেখেচি, আওরাবে না।

মানুষ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এমন অনর্গল মিথ্যা বলিতে পারে, চোখে না দেখিলে কে ইহা বিশ্বাস করিবে? কাজেই এ ধারণা অভয়াশঙ্করের মোটেই হইল না যে, কথাটা ভয়ঙ্কর মিথ্যা! তাই তিনি সুষমার উপর বিরক্ত হইয়াই বলিলেন,—কেন, ও ছবি পাড়বার কি দরকার হয়েছিল?

—বুঝি, কাঁচ-টাঁচ সাফ করবার জন্যে,—হবে।

—তা চাকর-বাকর কাকেও বললে চল্তো না! ঐ একরত্তি ছেলেকে ফরমাস করা!

—যাক্, বকো না বাবা, ও কথা আর তুলো না। ছেলেমানুষ ভয়ে অমনি কাঁটা হয়ে আছে, বেচারী! আমিও অনেক বুঝিয়েচি! তবে মনে থাকে না ত ওঁর! বড় হোন্, জ্ঞান হোক্, এ-সব দোষ তখন সেরে যাবে বৈ কি।

বিরক্ত হইয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—জ্ঞান আর কবে হবে! চিতেয় সেঁধুলে? আরো একজন মানুষও ত ছিল—কৈ, তার—

তাঁহার মুখের কথা লুফিয়া মানদা ঠাকুরাণী বলিলেন—হুঁ, কিসে আর কিসে! তাঁর মত বৌ কি আর জন্মায় গা? আমাদের যদি সে বরাতই হবে বাবা, তাহলে কি আর ঘরের লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে চলে যায়! মানদা ঠাকুরাণীর দুই চোখে জল আসিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—তুমি এখন যাও।

মানদা ঠাকুরাণী চলিয়া গেলেন। অভয়াশঙ্কর নিজের ঘরে আসিয়া কৌচটার উপর গিয়া পড়িয়া রহিলেন। বিশৃঙ্খলা—বিশৃঙ্খলা,—চারি দিকে বিষম বিশৃঙ্খলা! আসল যার যায়, নকল দিয়া সে কি না তার অভাবও পূরণ করিতে চায়? হারে মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা!

ওদিকে বেচারী সুষমা জানিতেও পারিল না, তাহার নামে স্বামীর মনে এখানে একজন কি বিষটাই ঢালিয়া দিয়া গেল! সে তাহার কোন শত্রুতা, তাহার কাছে কোন অপরাধই করে নাই ত, কাজেই সন্দেহই বা কেন হইবে?

অভয়াশঙ্কর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া গম্ভীরভাবে কৌচেই পড়িয়া রহিলেন। লীলা,—লীলা—লীলা! হায় রে, কি স্ত্রীই তিনি হারাইয়াছেন! সুষমার বিরুদ্ধে নালিশ তুলিয়া তিনি তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিবেন, এমন প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না। সেটাতে নিজেকে বড় খাটো করা হইবে! তবে—তবে—?

ভাবিয়া অভয়াশঙ্কর একটা পথ বাহির করিলেন। সুষমা নিখিলকে লইয়া ঘরে আসিলে অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন—নিখিল।

সে স্বরে নিখিল বেশ বুঝিল, এ বিচারকের কৈফিয়ৎ-তলবের সুর!

—বাবা—বলিয়া অপরাধী নিখিল বাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—ছবির কাঁচ ভাঙ্গলো কি করে?

বাপের মুখের পানে চোখ তুলিতেই নিখিল দেখিল, কি গম্ভীর, রোষ-রক্ত সে মুখ! ভয়ে তাহার মুখে আর কথা ফুটিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—বল।

সুষমা আসিয়া বলিল—ও আর কখনো করবে না, বলেছে। এবারটি ওকে মাপ করো।

—তুমি চুপ কর। অভয়াশঙ্করের স্বরে যেন বাজ হুঙ্কার দিয়া উঠিল। এমন স্বর সুষমা ইহার পূর্ব্বে আর কখনো শোনে নাই—তাহার সমস্ত মন চকিতে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমার বেয়াদবি বড্ড বাড়চে, নিখিল। কাল থেকে আমি আলাদা বন্দোবস্ত করচি, দাঁড়াও। আদরে-আব্দারে তুমি একেবারে গোল্লায় যেতে বসেচ—কাল থেকে সব ব্যবস্থা আমি উল্টে দিচ্ছি। পরে একটু স্থির হইয়া তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আজকের মত শোওগে যাও।

ফৌজদারীর আসামীর মতই অতি ধীর পায়ে নিখিল গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। অভয়াশঙ্কর কৌচটার উপর তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

সুষমা এতক্ষণ কাঁটা হইয়া গিয়াছিল—এখন মুখ তুলিয়া সে বলিল,—বসে রইলে যে! খাবে না?

—না।

—অত রাগ করেছ কেন? একটা কাঁচ অসাবধানে ভেঙ্গে ফেলেচে—

—অন্য দশখানা কাঁচ ভাঙ্গলে অত দোষ হত না। এ কোন্ ছবির কাঁচ, তা লক্ষ্য করে দেখেচ কি?

কথার শেষ দিকটায় স্বরে যেন অনেকখানি শ্লেষ মিশানো ছিল! সুষমা তাহা লক্ষ্য করিয়াও যেন লক্ষ্য করে নাই, এমনি ভাবে বলিল—জানি। দিদির ছবির কাঁচ। নিখিলের মার ছবি।

—হুঁ। বলিয়া অভয়াশঙ্কর সুষমার পানে চাহিলেন, পরে বলিলেন,—নিখিলের ভার,—এখন ও বড় হয়েছে—এখন আমিই নিতে পারব। এতদিন তুমি যা করেছ, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আর তোমাকে ওর জন্যে কষ্ট দিতে চাই না—কাল থেকে তোমার ছুটী!

হঠাৎ এ কথাটা এমনি বেমানান্ শুনাইল যে সুষমা প্রথমটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, এ-সব কথা কেন? এ কথার মানে কি? একখানা ছবির কাঁচ ভাঙ্গিয়াছে, তার জন্য ছেলে এত-বড় কি অপরাধ করিয়াছে যে কৃতজ্ঞতা, ছুটী—এমনি সব অর্থহীন মস্ত-মস্ত কথা তোলা!

সুষমা বলিল,—তুমি কি বল্‌চ, বুঝতে পারচি না। এ সব কথার মানে—?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—মানে আর কিছু নয়! তোমার নিজেরো আর শীঘ্রই ছেলে কি মেয়ে—একটা হচ্ছে ত—তাকে দেখা-শোনার ভার তোমার হাতেই পড়বে। এত তুমি পারবে কেন?

চকিতে একখানা কালো মেঘ সুষমার মনের উপর ভাসিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত স্বচ্ছতা-টুকুকে ঢাকিয়া দিল। গর্ভে তাহার সন্তান আসিতেছে, সত্য—কিন্তু সে কি তাহাকে চাহিয়াছিল? কোনদিন স্বপ্নেও ত সে ইহাকে চাহে নাই! নিখিল আছে, নিখিলকে সে তাহার পেটের বলিয়াই জানে—তবে আর-একটা নূতন সন্তান লইয়া সে কি করিবে? প্রয়োজন কি! স্বামী যে প্রায়ই রহস্য করিয়া বলেন,—তোমার পেটে যদি ছেলে হয়, তাহলে দু'বেটাতে জমিদারী নিয়ে লাঠালাঠি করবে আর কি! আজ এ কথায় তাহার মনে হইল,

সে ত তবে তামাসা নয়! আর গর্ভে এই [illegible] আসার সম্ভাবনা অবধি স্বামীর মনেও [illegible] অনেকখানি ভাবান্তর হইয়াছে! যে সব [illegible] কখনো তোলেন নাই, এখন প্রায়ই সেই [illegible] কথা তুলিয়া গুম্ হইয়া থাকেন! আজ [illegible] অভয়াশঙ্করের এই কথায় তাঁহার মনটা সুষমার [illegible] ভারী কষ্ট হইয়া উঠিল; কোথাও [illegible] এতটুকু ঝাপ্‌সা রহিল না। অমনি [illegible] অন্তর্নিহিত নারী-গর্ব্ব সজোরে মাথা [illegible] উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল—কি তুমি [illegible] বল দেখি! এই যে আসচে, [illegible]—ছেলে না মেয়ে? কিন্তু [illegible] স্বয়ং ভগবানও হন্, জেনো, [illegible] জন্যে, তোমার দুর্ভাবনা [illegible] একে দু' হাতে গলা টিপে [illegible] ফেলতে পারি। নিখিলের [illegible] এ? নিখিলকে আমি পেটে [illegible], তবু আমি জানি, ও আমারই [illegible] জন্মেচে, ও আমার এক—আমার সব। [illegible] মঙ্গলের পথে যে কাঁটা হবে, সে আমার [illegible] শত্রু। তুমি স্বামী, ইষ্টগুরু, তোমার বড় [illegible] আর কেউ নেই, তোমার এই দুই পা ছুঁয়ে শপথ করচি, যখন ঘুণাক্ষরেও এ সন্দেহ তোমার মনে জেগেচে, তখন জেনো, আজ থেকে ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে আমি এই প্রার্থনা করবো, যেন জন্ম নেবার আগেই এর মৃত্যু হয়—! আমি একে পেটে ধরচি, আমি এর মা—তবু সেই মা হয়েও বল্‌চি, এ মরুক্, —এই দণ্ডে মরুক্!

সুষমা চিরদিন অল্প কথা কয়, আজ সে এ কি হইয়া উঠিল? উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! অভয়াশঙ্কর চমকিয়া উঠিলেন।

সুষমার পায়ের তলায় মাটীটা তখন ভয়ঙ্কর বেগে যেন দুলিয়া উঠিয়াছে! সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। সমস্ত ঘরটা চকিতে যেন চোখের সাম্‌নে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এবং নিমেষে চারি-ধার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, অভয়াশঙ্কর তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার মূর্চ্ছিত দেহখানি শয্যার উপর বিছাইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

প্রভাত-স্বপ্ন।—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যো- [illegible] প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত হরিদাস [illegible]পাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কলিকাতা। [illegible] প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। [illegible] ছোট গল্পের বহি। প্রভাত-স্বপ্ন, ঘড়িওয়ালা [illegible] সত্যের আবরণ, বন্ধু, অন্তঃসলিলা ও [illegible]—এই কয়টি গল্প ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible]তে ঘটনা-সংস্থান আছে,—লেখার ভঙ্গীও মন্দ [illegible] তবে ছোট গল্পের আর্ট সব গল্পে তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। ঘড়িওয়ালা, বন্ধু ও বিবেচক—এই তিনটি গল্প চমৎকার হইয়াছে—নাটকীয় ভাবে অনুপ্রাণিত। রচনা আশাপ্রদ। তবে একটা ত্রুটি চোখে পড়িল—কথোপকথনে কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষা এক সঙ্গে বেমানান্‌ভাবে মিশিয়া বহু স্থানে রসভঙ্গ করিয়াছে। 'প্রভাত-স্বপ্ন' গল্পটি একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে—আর একটু ছাঁট-কাট করিলে গল্পটি জমিত ভালোই। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই মনোরম হইয়াছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত।—তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, দি নিউ ইরা পাবলিশিং হাউস, ১৬৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। প্রাচীন ও নব্য বঙ্গীয় সমাজের মিলনের মুখে পণ্ডিত শিবনাথের অভ্যুদয়। তাঁহার জীবনের কাহিনী নব্য-সমাজ-গঠনের কাহিনী—আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক, জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। শিবনাথের জন্ম হয় কলিকাতার দক্ষিণে, মজিলপুর গ্রামে, ইংরাজী ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে শিবনাথের বংশ-পরিচয়, বাল্যজীবনের কথা পরে নানা অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া কি করিয়া তাঁহার কর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিল, তাহার বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শিবনাথ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা ঠেলিয়া সংস্কার ঠেলিয়া কিরূপ অদম্য উৎসাহে, কিরূপ অকুতো-ভয়ে তাহার পিছনে চলিয়াছিলেন, কিরূপে সেই সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কন্যার দ্বারা লিখিত হইলেও রচনা কোথাও পক্ষপাত-দুষ্ট হয় নাই,—Boswellism ইহার কোথাও নাই, এ কথা দৃঢ়কণ্ঠে আমরা বলিতে পারি। রচনাটি প্রাঞ্জল—এবং শিবনাথ-চরিত্রের মূল সূত্রটিও এই সুদীর্ঘ গ্রন্থের কোথাও হারাইয়া যায় নাই—ইহা লেখিকার পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। শিবনাথের সহিত আমাদেরও সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল। প্রথম যৌবনে তাঁহার কাছ হইতে বিস্তর উপদেশ, বিস্তর পরামর্শ পাইয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। এমন সদানন্দ মুক্ত-প্রাণ, সরল-চিত্ত মহানুভব ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। সহানুভূতি, সর্ব্ব-ভূতে দয়া, ও জ্ঞানচর্চ্চায় বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কি অসাধারণ উৎসাহ ছিল! এসব দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছিলাম। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলা করিয়াছি—এ শুধু শিবনাথের পারিবারিক, সামাজি ও ধর্ম্মজীবনের কাহিনী নয়; এখানি বাঙলার সামাজি ইতিহাসের কয় পৃষ্ঠা—এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় গ্রন্থখানিতে বিদ্যাসাগর, আনন্দমোহন বসু, শিবনা পিতা-মাতা-পত্নী প্রভৃতির বহু চিত্র সন্নি হইয়াছে। যাঁহারা বাঙলায়, সুদৃঢ় মনুষ্যত্বের দেখিতে চান্ তাঁহারা এ গ্রন্থ পাঠ করুন।

সাহিত্যিকা।—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত প্রণীত। কলিকাতা, আর্য্য পাবলিশিং হাউস, মোহনলাল ষ্ট্রীট। মিত্র প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টা এখানি সন্দর্ভ-গ্রন্থ। কবিত্বের ত্রিধারা, সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য, মিস্‌টিক কবি, ইউরো ট্রাজেডি ও ভারতীয় করুণরস, আধ্যাত্মিকতা, ও তত্ত্ব, প্রতিভার কথা, শিল্পকলার কথা, চলিত ও সাধু ভাষা, সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য—এই কয়টি সন্দর্ভ গ্রন্থে গুচ্ছাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলা ধরণের গ্রন্থ খুব অল্পই আছে—'সাহিত্যিকা' সাহিত্যের সম্পদ-স্বরূপ হইয়াছে। প্রবন্ধগু করিয়া তরুণ লেখকের সমালোচনায় অসাধারণ চিন্তাশীলতার ও জ্ঞানের প্রচুর পরিচয় পাই। Li criticismsএ এমন হাত বাংলায় আজকাল সমালোচকেরই আছে। Critical study ক বলে, এ গ্রন্থ-পাঠে সকলে তাহার পরিচয় পাইবেন গুরুতর বিষয়ও লেখক যুক্তি-তর্কে এমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন, বিশ্ব-সাহিত্যের বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি-ভঙ্গী এমন পরিষ্কার সম্মুখে ধরিয়াছেন যে, এ গ্রন্থ বারবার পড়িয়া সাধ মেটে না। তরুণ লেখকের জীবন সাধনা সফল হৌক্—ইহাই আমাদের কামনা।

শ্রীসত্য

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২৮ [৪র্থ সংখ্যা

লিপিবিদ্যা

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে—Speech is silveren, silence golden. আমরাও বলি,—শতং বদ, মা লিখ। প্রবচন-দুটি আপাততঃ প্রতীপ মতের অনুকূল বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ প্রতীপ নহে। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, উভয় ভাষাতেই বাক্-সংযমের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে ইংরাজীতে মুখের কথাটি পর্য্যন্ত বর্জ্জনীয়, আর এদেশে বাচালতা বর্জ্জনীয় হইলেও অসংযত লিপি-চালনা নানা দোষের আকর বলিয়া বিবেচিত। মুখের কথাটা বেশীদিন স্থায়ী হয় না—কারণ মানব-মনের প্রকৃতিই হইল বিস্মৃতি-শীলতা। আর লেখাটা যেন ঐ কথাটারই ফটোগ্রাফ। যখন দেখিব, তখনই ফটোগ্রাফ-চিত্রিত বস্তু বা ভাবটীর স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিবে। তাই আমরা এরূপ স্থায়ী ভাষায় কথা বলার পক্ষপাতী নহি।

এরূপ উপদেশের মূলে এই একটি অভ্রান্ত তথ্য নিহিত আছে যে আমাদের কথা বলিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। যখনই আমরা দুইজন লোক একত্র থাকি, তখনই কিছু-না-কিছু বলিতে হইবে—চুপ করিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। আর চুপ করিয়া থাকা যাহার স্বভাব, সে নর-সমাজে নিন্দিত বা উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই আমাদের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত করিবার উপদেশ আবশ্যক হইয়াছে। তাই আমাদের দেশের বহুদর্শিতার উপদেশ—বোবার শত্রু নাই।

দুইজন লোক একত্র হইলে কথা বলিবার প্রবৃত্তি যদি স্বাভাবিক হয়, তবে যাহাকে তুমি ভালবাস, যাহার জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে, যাহার বিচ্ছেদ সহ্য করা তোমার পক্ষে কষ্টকর, তাহার বিচ্ছেদ-কালে তাহার সহিত মনো-ভাবের আদান-প্রদানের আবশ্যকতা বোধ করা তোমার পক্ষে অতি স্বাভাবিক, তাহার কুশল সংবাদ পাইবার জন্য আগ্রহও তোমার

হইবেই হইবে। তোমার সুখ-দুঃখ, তোমার মনের বেদনা, প্রাণের যাতনা তাহাকে না জানাইয়া তুমি থাকিতে পারিবে না। তাই সভ্য জগতে রাজকীয় ডাক-বিভাগের এত সমাদর। তিন দিন ডাক বন্ধ থাকিলে সভ্য সমাজে হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। যেখানে তুমি যাইতে অসমর্থ, সেখানে তোমার কথাও যাইতে পারে না। সুতরাং তোমার কথার একটা ফটো তুলিয়া, সেই ফটো লোক-মারফত বা ডাক-মারফত পাঠাইতে হয়। তোমার কথার ফটোটাই হইল লেখা বা লিপি।

আমাদের মনের ভাব বা প্রাণের বেদনা ভাষায় প্রকাশ পায়। সুতরাং ভাষাই আমাদের মনের ভাবের ফটো; আর এই ফটোর ফটো হইল, লেখা। রসনা যে শব্দটী উচ্চারণ করে, সেই শব্দের সহিত একটী মনোভাবের অবিনাভাব সম্পর্ক। অর্থাৎ শব্দটী শ্রুতি-গোচর হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাব আমাদের মনো-নয়নের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ শব্দটীর সহিত বিজড়িত যে-ভাব, তাহাকে আমরা ঐ শব্দের অর্থ বলি। শব্দটা ঐ অর্থের বাহন, কারণ অর্থ শব্দ দ্বারা বক্তার মন হইতে শ্রোতার মনে বাহিত হয়। আবার শব্দটাকে অর্থ বা মনোভাবের ফটো বা চিত্রও বলা যায়। কারণ যে বস্তুটীর অর্থ ঐ শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহার একটী চিত্র বা ফটো মনো-নয়নের সম্মুখে উদিত না হইলে মন তাহাকে চিনিয়া লইতে পারে না। ইংরাজীতে ইহাকেই Imagination বা কল্পনা বলে। 'গোলাপ' এই নামটী করিবা মাত্র গোলাপের একটী চিত্র বা image তোমার মনশ্চক্ষু দেখিতে পায়, তাই তুমি ঐ নাম-গ্রাহ্য বস্তু গোলাপটীর ধারণা করিতে পার। আমাদের লেখা বা লিপি আবার এই উচ্চারিত শব্দের ফটো বা চিত্র।

এই লিপি বা কথার ফটো আবার নানা জাতীয়। আমি ইংরাজী, বাঙ্গালা, গ্রীক, পারসী, ব্রাহ্মী, ফিণিসীয় প্রভৃতি লিপির বিভিন্নতার কথা এখানে বলিতেছি না। ধীরে ধীরে বলিয়া গেলে বালকেরা শ্রুতিলিপি লিখিতে পারে, তাড়াতাড়ি বলিলে পারে না। সুতরাং গড়ের মাঠে বা টাউন হলে বক্তৃতা হইলে তাহা লিখিয়া লওয়া লিপিবিদ্যা-কুশল বালকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সেই কারণে বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য Short-hand writing বা সংক্ষিপ্ত লিপি নামে এক অভিনব লিপি-প্রণালীর আবিষ্কার হইয়াছে। আবার টেলিগ্রাফের মেসিনে আমাদের বর্ণ-মালার অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া টেলিগ্রাফের জন্যও টক্কা ও টরে নামক দুইটী শব্দের সাহায্যে বর্ণমালার যাবতীয় বর্ণের উচ্চারণ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং টেলিগ্রাফ-প্রণালীও একপ্রকার ভাষার ফটো বা লিপি। কিন্তু ভাষায় উচ্চারিত শব্দের অক্ষুণ্ণ ফটো চিত্রিত হয়, গ্রামোফোন্ রেকর্ডে। ইহাও এক প্রকার লিপি বা ভাষার ফটো, তাই ইহার নাম রেকর্ড বা লিপি। সুতরাং লেখনী-সাহায্যে উৎপন্ন লিপি ব্যতীতও অনেক প্রকার লিপি আছে, যাহার সাহায্যে আমরা ভাষার ফটো অঙ্কিত করি।

আরও একপ্রকারের লিপি আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি—চিত্র। চিত্র-সাহায্যে আমরা

অনেক কথা বলিতে পারি। চিত্রে মনোভাব স্বাভাবিক লিপিতে প্রকাশ পায়, চিত্রিত ভাষা কৃত্রিম ভাষা নহে। তবে প্রকৃত বস্তুর প্রতিকৃতি যতদূর সম্ভব প্রকৃতের অনুরূপ হওয়া চাই। নতুবা কর্ণ-বিশিষ্ট শৃঙ্গ-বিহীন চতুষ্পদ জীবমাত্রেই অশ্বের বাচক বা প্রকাশক হইবে না। কারণ অশ্ব, মেষ, শৃগাল, গর্দ্দভ প্রভৃতি বহু পশুরই ঐ সকল গুণ আছে। সুতরাং চিত্র-বিদ্যা দ্বারা লিপিবিদ্যার কার্য্য চালাইতে হইলে লেখকের অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দররূপে বহু পদার্থের চিত্র আঁকিবার শক্তি থাকা চাই। কিন্তু লেখকের শক্তি থাকিলেও পাঠকের নিকট অভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং কেবলমাত্র চিত্র-শিল্পের দ্বারা লিপি-বিদ্যার কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায় না।

লিপিবিদ্যা আবিষ্কারের সর্ব্বপ্রথম স্তরেই কিন্তু এই চিত্র-বিদ্যা, কারণ বিনা বর্ণ-বিশ্লেষণে আধুনিক যুগের লিখন-প্রণালী যে আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। আবার কোনও প্রকার লিখন-প্রণালী আবিষ্কৃত না হইলে বর্ণ-বিশ্লেষণেরও যে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই, তাহাও প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এক-একটা অর্থ-প্রকাশক শব্দই আমাদের ভাষার উচ্চারণ-কালে একক বা Unit স্থানীয়। শিশু যখন কথা বলিতে শিখে, তখন বর্ণ-বিশ্লেষণ না করিয়াই সমুদায় শব্দটীর উচ্চারণ আয়ত্ত করে। পরে লিপি-বিদ্যার সহিত পরিচয় হইলেই সে বর্ণ-বিশ্লেষণ দ্বারা এক একটী শব্দের বাণান বা বর্ণ-যোজনা করে। বিনা বর্ণ-বিশ্লেষণেই শিশু জল, জপ, জন, জজ, জগ্, প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখে, অথচ লিপি-শিক্ষার আরম্ভকতা না হইলে বর্ণ-বিশ্লেষণের কথা ভাবিতে পারে না। কারণ বর্ণ-বিশ্লেষণ ব্যাপারটী abstraction বা ভাবনিষ্কর্ষ-সাপেক্ষ। কলম, কাগজ, কমল, করণ প্রভৃতি শব্দে যে 'ক' বর্ণের সত্ত্বা আছে, তাহা ঐ সকল শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করা যায়। কিন্তু কলম-কাগজ প্রভৃতি কোনও শব্দ বিশেষে নাই—এমন একটা যে ক-বর্ণ, তাহার সত্ত্বা লিখিবার কালেই অনুভূত হয়। সুতরাং বর্ণমালা-ঘটিত লিখন-প্রণালীর অভিব্যক্তি বর্ণমালা-আবিষ্কারের পূর্ব্বে হয় নাই; এবং সেই জন্যই ইহা প্রাথমিক লিখন-প্রণালী নহে।

অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার অসভ্য জাতিগণ লিখিতে জানিত না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনোভাবের আদান-প্রদানে একেবারে অনভ্যস্ত ছিল, তাহা নহে। অঙ্কন-বিদ্যা ও চিত্রের সাহায্যে তাহারা মনোভাব লিপিবদ্ধ করিতে পারিত। অবশ্য এ উপায়ে মনোভাব প্রকাশ যে সম্পূর্ণ বা অক্ষুণ্ণ হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। বায়োস্কোপে যেমন চিত্রের পর চিত্র সাজাইয়া চিত্র-সাহায্যে নাট্যের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, ঐ সকল অসভ্য জাতি সেই প্রকার এক-একটী সংবাদ বা অভিমত লিখিয়া পাঠাইবার জন্য কয়েকটী চিত্র একত্র সজ্জিত করিয়া পাঠাইত। ইহা দ্বারা জটিলতা-বর্জ্জিত ও ভাবনিষ্কর্ষবিহীন অতি-সরল মনোভাবসমূহ কোন রূপে প্রকাশিত হইত; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই প্রকার লিখনের ফলে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত এবং বিষ-দান স্থানে

বিষয়-দানের ন্যায় বিপরীত অর্থও প্রকাশ পাইত।

কথায় বলে—বোবার কথা কালায় বোঝে। অর্থাৎ উচ্চারিত ভাষা ভিন্ন কেবল-মাত্র অঙ্গ-ভঙ্গী বা সঙ্কেত দ্বারা যে ভাষা প্রকাশ করিবার চেষ্টা হয়, তাহা সকলের বোধ-গম্য হয় না। অবশ্য কতিপয় বিশ্বজনীন সঙ্কেত আছে, যাহা সকলেই বুঝিতে পারে —যেমন কর-প্রসারণ পূর্ব্বক আহ্বান, বা অঙ্গুলি-তর্জ্জনপূর্ব্বক ভীতি-প্রদর্শন। কিন্তু এ সকল সঙ্কেত দ্বারা অতি অল্পমাত্র মনোভাবই ব্যক্ত করা যায়। বাগিন্দ্রিয় সাহায্যে উচ্চারিত ভাষা না হইলে কোন রূপ জটিল ভাব প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং চিত্রদ্বারা ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টার ফলে এক-একটী চিত্রের এক-একটী অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইত—যেমন এক-একটী উচ্চারিত শব্দের এক-একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে। এই প্রকারে যে ভাষার অভিব্যক্তি হইত, তাহাও বিনা শব্দোচ্চারণে ভাব-প্রকাশের জন্য বক্তৃ-বোদ্ধব্যের মধ্যে এক একটা অর্থ পরিগ্রহ করিত। চিত্রদ্বারা ভাব-প্রকাশের চেষ্টার ফলে একটা convention বা সঙ্কেত-গ্রহণের ব্যবস্থা পরস্পরের মধ্যে না হইয়াই থাকিতে পারে না। অমুক চিত্র দ্বারা অমুক অর্থ প্রকাশ পাইবে, এরূপ একটা ব্যবস্থা না থাকিলে লিখন-কার্য্যে চিত্রের যোগ্যতা হয় না।

আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেনদেশীয় কর্ম্মচারিগণ যখন দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশে শাসন-কার্য্যাদি পরিচালনার জন্য গমন করেন, তখন তাঁহারা ঐ দেশের আদিম অধিবাসি-গণের মধ্যে এক প্রকার রজ্জু-লিপি বা কুইপু-লিপি প্রচলিত দেখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে উহারা বর্ণমালার বিশ্লেষণমূলক লিপিবিদ্যার অভ্যস্ত ছিল না এবং অদ্যাপি তাহাদের ভাষা লিখিবার জন্য কোন প্রকার বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই। কেবল ইউরোপীয় ধর্ম্ম প্রচারক-গণের প্রযত্নে উহাদের অলিখিত ভাষা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ইংরাজী, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি বর্ণমালা হইতে বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তাহার উপরে ও নীচে চিহ্ন দিয়া এক প্রকার বর্ণ-মালার সৃষ্টি করা হইয়াছে। আজকাল এই বর্ণমালার সাহায্যেই আমেরিকার আদিম-জাতির ভাষাসমূহ (Red Indian dialects) লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। Smithsonian Societyর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফ্রান্জ বোআস (Franz Boas) এই উপায়ে আমেরিকার ভাষার জন্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ব্যাকরণ ও পুরাণ, গল্প বা ছড়া কাহিনীই উল্লেখ-যোগ্য। সে যাহাই হউক, এই আমেরিকার মধ্যে পেরু দেশে যে কুইপু-লিপি প্রচলিত ছিল, তাহার দ্বারা সাধারণতঃ সন্ধি-বিগ্রহের সর্ত্ত বা অনুমতি এবং রাজাদেশ প্রচার এক অদ্ভুত উপায়ে লিপিবদ্ধ হইত। কুইপু একপ্রকার রজ্জু, দুই-তিন ফুট দীর্ঘ, নানাপ্রকার গ্রন্থিপূর্ণ ও বিবিধ বর্ণে চিত্রিত। রজ্জু মধ্যে রজ্জুর অবস্থান, গ্রন্থির সংখ্যা, সূক্ষ্ম ও স্থূল সূত্র, ও বর্ণ প্রভৃতির দ্বারা ভাব-প্রকাশ হইত, কোন বাস্তব বস্তুর বাচক ভাব প্রকাশ করিতে বর্ণ ব্যবহার হইত না; ভাব-নিষ্কর্ষ (বা abstract idea) প্রকাশের জন্য বিবিধ বর্ণ ব্যবহৃত হইত। শুভ্রবর্ণ দ্বারা রৌপ্য বা শান্তি (শান্তি এবং রক্ত বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ বা যুদ্ধ (বিগ্রহ

প্রকাশ করা হইত। বলা বাহুল্য, সর্ব্বসম্মত বিধান বা convention ব্যতিরেকে এই প্রকার মূর্ত্তি-বিশিষ্ট বহু-বর্ণ-চিত্রিত লিপিদ্বারা ভাব-প্রকাশ সম্ভব-পর হয় নাই। কিরূপভাবে গ্রন্থিসমূহ সজ্জিত করিলে, গ্রন্থির সংখ্যা কত হইলে, কি প্রকার বর্ণের (colour) ব্যবহার করিলে, কি প্রকার অর্থপ্রকাশ পাইবে, তাহা লিপিকরকে ও পাঠককে শিখিতে ও অভ্যাস করিতে হইত। অথচ সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ এই উপায়ে সম্ভবপর ছিল না। কোনও দার্শনিক গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক তথ্য এ প্রকার লিখন-প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করা যাইত না।

চীন দেশেও এক কালে বর্ণ-বিশ্লেষণ-মূলক লিপি-প্রণালী ছিল না। বিস্তৃত চীন-সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা ভাষার অস্তিত্ব সত্ত্বেও লিপি এক প্রকারেরই ছিল। এবং তাহাও বিনা বর্ণ-বিশ্লেষণে মনোভাবমাত্র প্রকাশ করিত। T. Nelson & Sons কর্ত্তৃক প্রকাশিত The World and its people মাধ্যমিক স্কুল পাঠ্য গ্রন্থশ্রেণীর Asia খণ্ডে এই চীন দেশের লিপির বিবরণ আছে :—

Chinese has no alphabet, but 214 simple words from which all the others are derived.

Here, for instance, is the character for the word *sun* 日. If we wish to write the word *morning*, we place the word *sun* above a line which stands for the horizon, and thus we get 旦. The character for *tree* is 木. If we place two of these characters together, thus 林, we have the sign for forest.

Now though all educated Chinamen know what is meant by these signs, they speak different languages in different parts of the Empire. You will understand this better when you remember that an Englishman, a Frenchman, a German. a Russian, or a Spaniard understands exactly what the figure 2 means when he sees it written or printed. The Englishman, however, says *two*, the Frenchman *deux*, the German *zei*, and thus they cannot understand one another unless they have studied each other's language. Each has a different name for 2, though all have the same sign. In the same way all Chinamen use the same sign for a particular thing though they give it a different name in different parts of the Empire. The sign for book-language is not spoken by any one.

অর্থাৎ চীনবাসিগণের বর্ণমালা বলিয়া কিছু নাই। ইহাদের আছে ২১৪টী মৌলিক শব্দ এবং এই ২১৪টী মৌলিক শব্দের সাহায্যেই যাবতীয় জটিল শব্দ লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহাদের এক একটী মৌলিক শব্দের জন্য এক একটী চিহ্ন আছে। চিহ্নের দ্বারাই

ঐ মৌলিক শব্দনিষ্পন্ন যাবতীয় জটিল শব্দ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যবস্থা বা convention আছে। একটী লম্বভাবে অঙ্কিত সরল রেখার দুই পার্শ্বে শাখা-প্রশাখা জ্ঞাপক তিনটী রেখা সংযুক্ত করিলে চীন দেশের লিপিতে বৃক্ষ শব্দ লিখিত হয়। দুইটী বৃক্ষ পাশাপাশি রাখিলে অরণ্য শব্দ, এবং তিনটী বৃক্ষ একত্র করিলে ছায়া শব্দ লিপিবদ্ধ হয়। এ লিপির সহিত ভাষার কোনও সম্পর্ক নাই। সমগ্র চীন সাম্রাজ্যে নানা ভাষার অস্তিত্ব সত্ত্বেও তাহাদের লিপি এক। এ লিপি দর্শনেন্দ্রিয়ের ভাষা। চক্ষু দ্বারা দেখিয়া এই সকল লিপিবদ্ধ শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। উচ্চারিত শব্দের যেমন একটা সর্ব্ব-সম্মত অর্থ আছে, এই সকল লিপিরও সেই প্রকার এক একটা সর্ব্ব-সম্মত অর্থ আছে। অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রকারে মনোভাব প্রকাশ করে, এই লিপি পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাই করিয়া থাকে। এই সকল লিপির জন্য নির্দ্দিষ্ট কোনও বাচনিক প্রতিরূপ নাই, অর্থাৎ এই লিপি কোনও প্রকার উচ্চারিত ভাষার চিত্র বা ফটো নহে, বক্তার মনোভাবের চিত্র বা ফটো। ইউরোপে (2) ২ দুই অঙ্কটী সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও বিভিন্ন ভাষায় ইহার বিভিন্ন নাম আছে। ঐ অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ্য ভাবটীর বাচক শব্দ সকল দেশে অভিন্ন নহে। ইংলণ্ডবাসী বলিবে *two*, ফ্রান্সবাসী বলিবে *deux*; কিন্তু জার্ম্মাণ বলিবে *zei*; কিন্তু ঐ অঙ্কটী দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে চিনিয়া লইবে এ ভাবটী বুঝিবে।*

এই প্রকার ভাষা-নিরপেক্ষ বুদ্ধি-মাত্র- লিপি ideograph বা ভাবলিপি অভিহিত। এই লিপির অনুবাচন হয় কারণ ইহার বাচনিক প্রতিরূপ নাই। বা উচ্চারণের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া মাত্র অনুমনন বা নিদিধ্যাসন বৃত্তির এই লিপির দ্বারা প্রকাশ্য ভাবটী সত্বই বুদ্ধি-গ্রাহ্য হয়।

লিপির অভিব্যক্তির পূর্ব্ব স্তরে এই লিপির আবিষ্কার প্রত্যেক জাতির হইয়াছে। বহুকাল এই ভাবলিপির সাহায্যে মনোভাবের আদান-প্রদান চলিয়াছে; লিপির অসম্পূর্ণতা বশতঃ নানা দেশে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে; নানা অসুবিধা পরিহার পূর্ব্বক যোগ্যতর লিপি প্রণালী আবিষ্কারের জন্য ধারাবাহিক বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা চলিয়াছে; অবশে বর্ণ-বিশ্লেষণ-মূলক লিখন-প্রণালীর অভিব্যক্তি হইয়াছে।

যদি ভাষার সাহায্য ব্যতীত এই প্রকা ভাব-লিপি বা ideographyর সাহায্যে সম্ব পৃথিবীতে মনোভাব-মাত্র প্রকাশের জন্য এক অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইত, তা হইলে নানা দেশে নানা ভাষা শিক্ষা আবশ্যকতা থাকিত না। বিভিন্ন দেশে লোকে এই ভাব-লিপি বা ideography সাহায্যেই পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারিত, এবং বাঙ্গালী শিশু

* বর্ত্তমান কালে চীনদেশে লিখন-পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

n, knight, doubt, debt প্রভৃতি
শব্দের বিচিত্র বর্ণ-যোজনা
দিশাহারা হইতে হইত না।
সমগ্র জগতের মধ্যে ভাষা-গত
ন্নতা সত্ত্বেও সমগ্র মানব-জাতির
একটা একতা সংস্থাপিত হইতে
রত। কিন্তু তাহা হইবার নহে। ভাবের
ভিব্যক্তি ভাষা অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দের
যেরূপ সুচারুভাবে সম্ভবপর, অন্য কোনও
কার সঙ্কেত বা ইঙ্গিতের দ্বারা তাহা হইতে
ারে না। বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উচ্চারিত
ষাই যখন সুচারুরূপে আমাদের মনোভাব
কাশের প্রকৃষ্টতম উপায়, তখন এই কার্য্যের
ন্য অন্য কোনও অভিনব উপায়ের আবিষ্কার
রিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ প্রকৃষ্টতম উপায়ের
ত্র বা ফটো লওয়াই লিপিবিদ্যার চরম
দ্দেশ্য। শ্রবণেন্দ্রিয় সাহায্যে শ্রোতব্য
ব্দের দর্শনেন্দ্রিয় সাহায্যে গ্রাহ্য চিত্র
চারুরূপে অঙ্কিত করিতে পারাই হইয়াছে
পিবিদ্যার চেষ্টা।

অঙ্কন-লিপি বা রজ্জু-লিপির দ্বারা শিক্ষিত
াজে লিখন-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না।
রে আমেরিকা-বাসিগণের মধ্যে যে এই
কার লিপি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে
ামরা তাহাদের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ কল্পনা
রি না। যে কারণে তাহারা সমগ্র বাক্যের
শ্লেষণ পূর্ব্বক শব্দের সত্ত্বা বুঝিতে পারে নাই,
ই মনোবৃত্তির খর্ব্বতা-নিবন্ধনই তাহারা
নোগত সমগ্র ভাবটীকে চিত্রিত করিবার
য়াস পাইয়া ছিল; কারণ বিশ্লেষণ-কার্য্য
াহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। F. Muller
লিয়াছেন—

For those, who, like the American Indians, possessed languages of the poly-synthetic type, and whose mental processes had not arrived at the analysis of the sentence into individual words, much less into individual sounds, no other method of ocular communication of thought-world suggest itself than one which expressed a whole conception as a unit. For the representation of the component elements, first, as far as words, then as far as syllables, and finally as far as sounds, it was necessary to find some new point of departure.

ভাব-লিপি বা ideographyর সাহায্যে এক-একটী শব্দ-গ্রাহ্য ভাব এক-একটী চিহ্ন দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। চিত্র-লিপি বা রজ্জু-লিপিতে যেমন সমগ্র ভাব-প্রকাশক বাক্য বা sentenceএর প্রতিলিপি একক বা unit স্থানীয়, ভাব-লিপি বা ideographyতে তাহা নহে। ভাব-লিপির সাহায্যে একটী বাক্য বা sentence কয়েকটী চিহ্ন বা symbol একত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং বাক্য-চিত্র বা sentence-writing অপেক্ষা ভাব-চিত্র বা ideographyর যোগ্যতা অধিকতর; কারণ এই লিখন-প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে, এবং বস্তুতঃ পক্ষে এই ভাব-লিপি বা ideography হইতেই বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে।

চীনবাসিগণ প্রাচীনকালে যে চিত্র-লিপির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মিশর দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ যে hieroglyphic বা চিত্রমূলক cuneiform লিপি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, এবং আমেরিকার অপেক্ষাকৃত সমুন্নত (Aztec) অজ্‌তেক জাতি যে প্রকার লিপির ব্যবহার করিত, তাহাতে এক-একটী শব্দ-বোধক এক-একটী চিত্র বা চিহ্ন পরিকল্পিত হইয়াছিল। সমগ্র বাক্য একটী চিহ্ন দ্বারা অভিব্যক্ত হইত না। প্রথমতঃ এক-একটী ভাবকে চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কারণ তাহা না হইলে হয়ত ভাব-প্রকাশে বাধা ঘটিতে পারে। কিন্তু স্পষ্টভাবে প্রত্যেক চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে লিপিকার্য্য সময় সাপেক্ষ ও কষ্ট-সাধ্য হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বসাধারণে সে প্রকার লিখন-প্রণালী অভ্যাস করিতে পারে না। সেইজন্য ক্রমে ক্রমে ভাব-প্রকাশক চিহ্ন-স্বরূপ চিত্রটীর সৌন্দর্য্যের সমাদর কমিয়া যাহাতে অল্পায়াসে বা অনায়াসে চিত্রটী অঙ্কিত করা যায়, তাহারই চেষ্টা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং অবশেষে যে মূল বস্তুটীর প্রতিকৃতি অবলম্বনে ভাব-প্রকাশক লিপির আবির্ভাব হইয়াছে, সেই মূল বস্তুর সহিত তাহার চিত্রের কোন সাদৃশ্যই রক্ষিত হয় না।

এইরূপ লিখন-প্রণালীতে কিরণ-জাল পরিবেষ্টিত বৃত্তের দ্বারা সূর্য্যরূপ-বস্তু-প্রকাশ্য ভাব লিপিবদ্ধ হইতে পারে। বৃক্ষ, চতুষ্পদ, মনুষ্য, পক্ষী প্রভৃতির জন্যও সহজে বুঝা যাইতে পারে, এই প্রকার এক-একটী চিত্রের কল্পনা স্বাভাবিক। কিন্তু abstract idea বা ভাব-নিষ্কর্ষ বুঝাইবার জন্য যে বস্তু হইতে ঐ ভাব নিষ্কর্ষণ-দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, সেই বস্তুর বা বস্তুদ্বয়ের চিত্র-লিপি স্থানীয় হইতে পারে। চীনদেশের প্রাচীন লিপিতে 'শ্রবণ' ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের চিত্রের পার্শ্বে একটী দরজার চিত্র পরিকল্পিত হইয়াছিল। এই প্রকারে পরস্পর-পরিশ্লিষ্ট হস্তদ্বয়ের চিত্রই উক্ত চীনদেশের লিপি-প্রণালীতে 'বন্ধুত্ব' শব্দের বাচক ছিল। মিশরের ভাব-চিত্রে তৃষ্ণা বুঝাইবার জন্য জলের চিত্রের পার্শ্বে ধাবমান গো-বৎস অঙ্কিত হইত। চীনদেশে পর্ব্বতের বাচক চিহ্ন ছিল তিনটী শৃঙ্গ বিশিষ্ট একটী পর্ব্বতের চিত্র ⅄ কিন্তু লিপিকরের সুবিধার জন্য এই চিহ্ন তিনটী মাত্র বিন্দুযুক্ত একটী রেখাতে পরিণত হইয়াছে, ⊥; দুই পদ যুক্ত ∧ চিত্রটি মনুষ্য শব্দের বাচক। মিশরের লিপিতে সিংহী শব্দের বাচক ছিল ইংরাজী ∠ অক্ষরের ন্যায় একটী অস্পষ্ট সিংহী-চিত্র &; এবং পরে এই চিত্র হইতেই ∠ অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে।

বস্তু-বিশেষের চিত্র হইতে তাহার ভাব-প্রকাশক চিহ্নের আবিষ্কার-মূলক লিখন-প্রণালীতে লিপি-সৌকর্য্যার্থ কালক্রমে ভাব-প্রকাশক লিপি বা চিহ্নগুলি যে মূল বস্তুর চিত্রের স্বরূপ হারাইয়া বসিবে, ইহাই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। চীন ও মিশর দেশে আন্দাজ খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বর্ষে এই ভাবলিপি-সমূহ মূল বস্তুর চিত্রের স্বরূপ হারাইয়া অঙ্কন-সৌকর্য্য-মূলক সরল ও বক্র রেখা প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত হয়।

এই প্রকার লিখন-প্রণালীর একটী প্রধান

অসুবিধা এই যে ইহাতে বস্তু বিশেষের ভাব লিপিবদ্ধ করিলেও ক্রিয়ার কাল বা বিবিধ সম্ভাবনাদির ভাব (tense and mood) লিপিবদ্ধ করিতে পারে না, বা পারিলেও অতি বিচিত্র উপায়ে পারে। তাহাতে দার্শনিক চিন্তা-প্রণালীর অভিব্যক্তি ত হইতেই পারে না, উপরন্তু দৈনন্দিন কার্য্য-সম্পাদনের উপযোগী ভাষাও লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই প্রকারের চিন্তা-প্রণালীতে 'যদি' শব্দ-গ্রাহ্য ভাব-প্রকাশক চিত্রের কল্পনা অসম্ভব। আবার এক-একটী বিচ্ছিন্ন ভাব লইয়া যদি এক একটী লিপির কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে মানুষের চিন্তা-গ্রাহ্য অসংখ্য ভাবের জন্য অসংখ্য লিপির কল্পনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই জন্য চীন দেশের বস্তু-বিশেষের ভাব বা অর্থ-প্রকাশক চিত্রমূলক চিহ্নগুলি তত্তৎ শব্দের উচ্চারণ-মূলক ধ্বনির চিহ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে homophone বা homonym বলা হয়। প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহাদের উচ্চারণে প্রভেদ না থাকিলেও অর্থগত বিভিন্নতা আছে। এই সকল শব্দকে homophone বা homonymবলে। অর্থের পরিবর্ত্তে ধ্বনির প্রকাশ-চেষ্টার ফলে চীন দেশের লিখন-প্রণালীর যথেষ্ট সরলতা সম্পাদিত হইয়াছে এবং এই সকল অক্ষর বা ধ্বনি-বোধক লিপির সংখ্যা হইয়াছে, আন্দাজ পাঁচ শত।

চীন দেশের ভাষায় সমোচ্চারণ ও বহু অর্থ-প্রকাশক শব্দের সংখ্যা এত অধিক যে অর্থের পরিবর্ত্তে ধ্বনি-প্রকাশের চেষ্টাতেও লিখন-প্রণালীর প্রকৃত সরলতা সম্পাদিত হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ—'হ্বঁ' শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শব্দের অর্থ—'ঈগল পাখী', 'রাজপুত্র', 'শীতল জল', 'ভয়' প্রভৃতি, এবং আরও কত অর্থ আছে। সুতরাং লিখিবার কালে ঐ ধ্বনির বাচক একটী চিত্রে কাজ চলে না। সুতরাং ঐ শব্দের দ্বারা প্রকাশ্য অর্থ যথেষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য ঐ হ্বঁ ধ্বনি-বোধক চিত্র বা চিহ্নের পার্শ্বে রাজপুত্র, শীতল জল প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য আর-একটী করিয়া চিত্র আঁকিয়া দিতে হয়।

মিশর দেশেও এই প্রকার সমোচ্চারণ শব্দ-সমূহের জন্য এক-একটী চিত্রের কল্পনা ঠিক এই ভাবেই হইয়াছিল, এবং তাহার অর্থ বুঝাইবার জন্যও ঐ প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, উদাহরণ স্বরূপ নেফের শব্দের অর্থ—'যৌবন', 'অশ্ব-শাবক', 'বীণা' প্রভৃতি হইলেও—নেফের্ *nefer* শব্দের পার্শ্বে স্বর, সুর বা sound শব্দের বাচক একটি চিত্র দিয়া বীণা শব্দের বাচক লিপি হইত।

এক একটী অর্থবোধক অক্ষর বা syllable লইয়া চীন দেশের ভাষা গঠিত বলিয়া চীনবাসিগণ আর তাঁহাদের লিখন-প্রণালীর সরলতা-সম্পাদনের চেষ্টাও করেন নাই। বর্ণ-বিশ্লেষণ তাঁহাদের আবশ্যকই হয় নাই।

কিন্তু মিশর বা Egypt দেশের ভাষা mono-syllabic বা অক্ষর মাত্রের সমষ্টিতে গঠিত নহে। ইহাদের এক-একটা শব্দে একের অধিক অক্ষর ছিল এবং উপসর্গ ও প্রত্যয় দ্বারা ইহাদের ভাষায় শব্দ গঠিত

হইত। সুতরাং বস্তুমাত্র-বোধক শব্দের বাচক অক্ষর লইয়া ইহাদের কাজ চলে নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইহাদের ভাষায় সোন্ (son) শব্দের অর্থ ভ্রাতা ; সোনা (sona) আমার ভাই ; সোন্‌ক্ (sonk) তোমার ভাই ; সোন্‌ফ্ (sonf) তাহার ভাই ; সোন্‌উ (sonu) ভ্রাতৃগণ ; সোন্‌ত্ (sont) ভগিনী। এই সকল প্রত্যয় হইতে বিশ্লেষণ করিয়া লইলেই পাঁচটী বর্ণ a, k, f, u, t পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণ ভাবে ভাষার কার্য্য-নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইহাদের লিখন-প্রণালীতে বর্ণ-বিশ্লেষণ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। তাই এক-একটী শব্দের বোধক চিত্র-লিপি অবশেষে এক-একটী বর্ণ বা অক্ষরের লিপি হইয়াছে। ঈগল পাখীর বাচক ahom শব্দের প্রতিলিপি হইতে a, মুখ-বাচক ro হইতে r, এবং সিংহী-বাচক laboi হইতে l অক্ষরের লিপি এই প্রণালীতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

এই প্রকারে যখন এক-একটী অক্ষরের বাচক পঞ্চবিংশতি লিপি উদ্ভাবিত হইল, তখনও মিশর-বাসিগণ সমগ্র শব্দ-বাচক ধ্বনির লিপি পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদিগের অতি-প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহে যে সকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অকারাদি বর্ণের বিশ্লিষ্ট লিপি ও সমগ্র শব্দের ধ্বনি-বাচক লিপি যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ইঁহারা পঁচিশটী বর্ণের আবিষ্কার করিলেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঐ পঁচিশটী বর্ণের লিপির ব্যবহার করেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত এই লিপিবিদ্যা যাঁহারা নিজেদের ভাষার লিখন-প্রণালীতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই বর্ণ-বিশ্লেষণ-মূলক লিপিসমূহের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক উপায়ে করিয়াছেন। বেবিলোনের ফিনিসীয়গণ ব্যবসায়-প্রসঙ্গে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন, তাঁহারা মিশর দেশের উদ্‌ভাবিত এই বর্ণমালা স্বদেশে লইয়া গিয়া ব্যবহার করেন এবং তাঁহাদের যত্নে এই বর্ণমালা পরিপুষ্টি লাভ করে।

এখন যে-যে স্তরে বর্ণমালা-মূলক লিপির আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক প্রবন্ধের উপসংহার করিব :—

(১) ভাব-প্রকাশক লিপি—

(ক) সমগ্র বাক্যের চিত্র—আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ।

(খ) এক-একটী শব্দ-গ্রাহ্য ভাবের চিত্র (ideograms বা ভাব লিপি)—মেক্সিকো-বাসিগণ, চীনের প্রাচীন অধিবাসিগণ ও আদি মিশর-বাসিগণ।

(২) ধ্বনি-প্রকাশক লিপি—

(ক) শব্দ-লিপি বা phonograms (এক চিত্রের দ্বারা বহু সমোচ্চারণ শব্দের লিখন) চীনের আধুনিক লিপি, প্রাচীন মিশরের লিপি।

(খ) অক্ষর বা syllable লিখিবার প্রণালী—জাপানী ও সেমিটিক বজ্রলিপি (cuneiforms)

(গ) বর্ণমালা-মূলক লিপি—(সম্পূর্ণ বর্ণ-বিশ্লেষণ হয় নাই, সমগ্র শব্দের ধ্বনি-বাচক লিপির প্রথম অক্ষরের উচ্চারণে ব্যবহার, ব্যঞ্জনবর্ণ মাত্র লিপিবদ্ধ, স্বরবর্ণ বিশ্লেষণ হয় নাই)—সেমিটিক। মিশরের লিপি এই সোপানে আসিয়া ক্ষান্ত হয়, পরবর্ত্তী প্রণালীতে উন্নীত হইয়াছিল।

(ঘ) বিশুদ্ধ বর্ণমালা-মূলক লিখন-প্রণালী (প্রত্যেক বর্ণের জন্য পৃথক পৃথক চিহ্ন) — গ্রীস ও ইটালি দেশে, উত্তর-কালে মিশর দেশে ও পারস্য দেশের বজ্র লিপিতে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কবে সে ডাক্‌লো কোকিল

কবে সে ডাকলো কোকিল,
ফুটলো বকুল,
হৃদয়ে ছুটলো তুফান,
ভাস্‌লো দুকূল !
কে এসে বাসিয়ে ভাল,
বাস্‌লে ভাল,
আদরে রাখ্‌লে বুকে,
বুক জুড়াল !
আকাশে লক্ষ চাঁদের
লক্ষ বাতি
দিল গো জ্বালিয়ে দিল
বাসর-রাতি !
বাতাসে ঘোম্‌টা খসে
পড়ল কখন,
হোলো সে চারটি চোখের
চকিত্ মিলন !

কত-না চাঁদ্‌নি রাতি
চাঁদের সনে
কেটেছে জাগিয়ে জেগে
সঙ্গোপনে !
কত সে প্রণয়-লীলা,
প্রেম-অভিনয় !—
হৃদয়ে হৃদয় রেখে
প্রাণ-বিনিময় !

তবুও মিট্‌তো সে কই—
প্রণয়-তৃষা ?
পিপাসা জ্বল্‌তো বুকে
দিবস-নিশা !
বিরহে পথটি চেয়ে
মিলন-আশে,
কত না দাঁড়িয়ে থাকা—
পথের পাশে !
কোকিলে দেয় না সাড়া
আর ত এখন,
ঝরেছে বকুল গোলাপ
হায় গো কখন !
দেখে সে ফুলের স্বপন
মনের ভুলে
কাননে ধায় ভ্রমরে
কান্না তুলে !
আকাশে সোনার চাঁদে
নিব্‌লো আলো,
ঢেকেছে মুখটি মেঘে
নিবিড় কালো—;
পরীরা আর নামেনা
স্নানের তরে,
জ্যোছনা অমল ধবল
শ্বেত সায়রে !

ছোটে না হৃদয়-নদী মেটেনি মিট্‌বে না আর
তুফান বুকে, প্রণয়-তৃষা—
খোলে না ঝর্‌ণা মধুর, পিপাসা জ্বল্‌চে বুকে
মিষ্টি মুখে। দিবস নিশা—।
ভেঙেছে সোনার স্বপন বিরহে পথটি চেয়ে
প্রেম-অভিনয় মিলন-আশে
জীবনে আর কভু নয় কাতরে দাঁড়িয়ে আজো
আর কভু নয়! পথের পাশে।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

গুলুর বে

(গল্প)

বয়স জিজ্ঞাসা করিয়া সাহেব যখন শশীর নিকট হইতে জবাব পাইলেন, যে, সে এণ্ট্রান্স ক্লাশ অবধি পড়িয়াছে, তখন তিনি মুক্তারাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এ রকম লোক আর কতগুলি আছে? এই সামান্য কথাটার জবাব দিতে না পারায় মুক্তারাম বাবু শশীর উপর খুব চটিয়াছিলেন, দাঁতে দাঁত দিয়া মুখে বাড়্ বাড়্ করিয়া কি বলিতেছিলেন। মুখের ভাব বদলাইবার চেষ্টা করিলেও সাহেব তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

"পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ইংরেজের মুখ কি কখনো দেখেচে? এই প্রথম, তার উপর আপনাদের উচ্চারণ,—ও ঘাব্‌ড়ে গিয়েছে, সাহেব।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "চাটার্জ্জি, স্কুলে গিয়েছিল অন্ততঃ এই রকম ছেলে দেখে এনো। যা হোক, একে আমি উপস্থিত unpaid apprentice নেবো, কি রকম কাজ করে দেখে মাহিনার বন্দোবস্ত করবো।"

মুক্তারাম বাবুর আশা ছিল না যে সাহেব এতটা দয়া করিবেন। তিনি ইহাতে কৃতার্থ হইয়া সাহেবকে অভিবাদন করিয়া নিজের কাজে আসিলেন।

মুক্তারাম চট্টোপাধ্যায় বার্টন ব্রাদার্স এর অফিসের বড় বাবু, বেতন মাসে দেড়শত টাকা মাত্র। অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন করিতে হয়, এজন্য আর্থিক অবস্থা তত সচ্ছল নয়। ডায়মণ্ড হারবার লাইনে গড়িয়া ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে নোনা গ্রামে তাঁহার নিবাস। তিনি নিরীহ প্রকৃতির লোক, কখনও তাঁহার সহিত কাহারও ঝগড়া বা বচসা হইয়াছে বলিয়া

শুনা যায় না। যথাসাধ্য লোকের উপকারই করিয়াছেন। কাহারও উপরোধ তিনি এড়াইতে পারিতেন না, এ-কারণ যে যখন তাঁহাকে চাকরির জন্য ধরিয়া বসিয়াছে, তিনি পাত্র-অপাত্র বিবেচনা না করিয়া নিজের অফিসেই হউক বা অনুরোধ-উপরোধ করিয়া অন্য কোন সওদাগরী অফিসেই হউক, চাকরি করিয়া দিয়াছেন। মুক্তারাম বাবুর অনুগ্রহে নোনা গ্রামের কেহ বেকার বসিয়া ছিল না। তাঁহার জনৈক বন্ধু স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক একদিন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া ছিলেন, "মুক্তো থাক্‌তে গ্রামের ছেলেদের লেখা-পড়া হবে না।" সত্যই স্কুলে শিক্ষকেরা যে সকল ছেলেদের লেখাপড়া শিখিবার জন্য কিছু পীড়াপীড়ি করিতেন, তাহারাই স্কুল ছাড়িয়া মুক্তারাম বাবুর শরণাপন্ন হইয়া পড়িত, চাকরিও পাইত। এই জোরেই বোধ হয় দয়াল চক্রবর্ত্তীর পুত্র শশী যখন তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিতে পারিল না, অভিভাবকের পত্র ও সেক্রেটারি মহোদয়ের অনুরোধেও যখন হেডমাষ্টার মহাশয় তাহাকে উঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন সে শিক্ষক-দিগকে ভয় দেখাইয়া ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া স্কুল পরিত্যাগ করিল। দিনের বেলায় ছিপ ফেলিয়া আর রাত্রে থিয়েটারের আখড়ায় গিয়া রিহার্শাল দিয়া কিছুদিন সে কাটাইয়া দিল। বাপ দয়াল চক্রবর্ত্তী তেজারতি কারবার করিয়া অনেক পয়সা করিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় টাকা ধার না দিলে গ্রামের অধিকাংশ লোকেরই কাজ-কর্ম্ম করা দুরূহ হইয়া পড়িত। শুনা যায়, তিনি নাকি টাকা ধার দিবার সময় প্রথম মাসের সুদটি কাটিয়া লইয়া বাকী টাকা দিতেন, আর হ্যাণ্ডনোট বা খতের সহিত তদুপযুক্ত মকর্দ্দমা খরচের জন্য নোটও গাঁথিয়া রাখিয়া দিতেন, পাছে ভবিষ্যতে টাকার অভাবে মকর্দ্দমা করিবার কোন অসুবিধা ঘটে। টাকা থাকিলে লোকে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকে। যাহা হউক, তাঁহার অবস্থা সকল বিষয়ে সচ্ছল হইলেও তিনি যে ইংরাজী জানেন না, সাহেবের চাকরি করেন না, আর লোকে তাঁহাকে দয়াল বাবু না বলিয়া চক্রবর্ত্তী-মশায় বলে, ইহাই তাঁহার বড় কষ্টের কারণ। সে কারণ পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া শশীবাবু করিবেন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ভগবান তাহাতেও বাদ সাধিলেন।

স্বামী-স্ত্রীতে প্রত্যহই কল্পনা করেন, মুক্তারাম বাবুকে ধরিয়া যদি একটি চাকরির জোগাড় করা যায়! আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও শশী কিছুতেই মুক্তারাম বাবুর কাছে যাইতে ইচ্ছুক নয়, কারণ স্কুল ছাড়া, থিয়েটার করা প্রভৃতি লইয়া তাঁহার পুত্র হরির সহিত তাহার সে দিন বিশেষ ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।

নিজের ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা মুক্তারাম বাবু বরাবর পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, সে কারণ পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে কলিকাতায় মেসে রাখিয়া পড়াইতেন, দেশের ছেলেদের সংসর্গে যাহাতে সে আসিতে না পারে! তাঁহার এ ইচ্ছা পূর্ণও হইয়াছিল। হরি প্রশংসার সহিত এণ্ট্রান্স ও ইণ্টার মিডিয়েট পাশ করিয়া এই বৎসর বি-এ দিয়াছে।

কলিকাতা হইতে সে যখনই বাড়ী আসিত, গ্রামের ছেলেদের সহিত মিশিত না। এজন্য তাহারা তাহাকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করিত। কিন্তু তাহাদের স্বভাব-চরিত্র আচার-ব্যবহার দেখিয়া হরির মনে বড়ই কষ্ট হইত। পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে তাহাদের মন অন্যদিকে ফিরাইতে পারে, এজন্য গত দুই বৎসর বদ্ধপরিকর হইয়া গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপন, ডিবেটিং ক্লাবর অনুষ্ঠান, সেবক-সমিতির প্রতিষ্ঠা, ব্যায়াম-চর্চ্চার ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক গুলি সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিতেছে। যখনই কলেজ হইতে অবকাশ পাইত, বাড়ী আসিয়া এই সব সম্বন্ধে কতদূর কি হইতেছে না হইতেছে, কোন্ কোন্ ছেলে খারাপ হইয়া যাইতেছে, স্কুলে কাহার কাহার পড়া-শুনার সুবিধা হইতেছে না-হইতেছে, এ-সব সম্বন্ধে সে বিশেষ তদন্ত করিত, এবং যথাসাধ্য প্রতিকারেরও চেষ্টা করিত। ফলে এ কাজে তাহার সঙ্গীও অনেক জুটিল, কিন্তু প্রকৃত কথা ধরিতে গেলে তাহার মিত্র অপেক্ষা শত্রুই অধিক হইয়া পড়িল। সে ছেলেদের নেতা হইয়া চলিতে চায়, যাকে-তাকে শাসন করিতে চায়, যাত্রা-থিয়েটারের আখড়া উঠাইয়া দিতে চায়, পর-নিন্দা পর-চর্চ্চার অন্তরায় হইতে চায়, এ-সব গ্রামের সকলে অবাধে সহ্য করিবে কেন? মুখে অনেকে সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারে না বটে, কিন্তু সর্ব্বদা তাহাদের ইচ্ছা, কিসে হরিকে জব্দ করা যায়। সম্প্রতি থিয়েটার উপলক্ষ্য করিয়া শশী ও অপর কয়েকটি ছেলে—ছেলে কেন—অনেক অভিভাবকের সহিত তাহার বিশেষ কলহ হইয়া গিয়াছে! থিয়েটার করিলেই লোক উৎসন্নে যায়, এটা নাকি তার ভুল ধারণা! থিয়েটার দেশের কত উপকার করিয়াছে, ভারতে বাঙ্গালী যে আজ বড় হইয়াছে, থিয়েটারই তার একটি কারণ। এই থিয়েটার করিয়াই লোকে জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। যাত্রা-থিয়েটার করা, সঙ্গীত আলোচনা করা প্রভৃতি সমাজের উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম উপায়! এ সকল তর্কে হরি কোন জবাব দিত না, কিন্তু ঐ লোকগুলার উপরে সে হাড়ে হাড়ে চটা ছিল। শশীকে স্কুলে ত্যাগ করিয়া ঐ দলে মিশিতে দেখিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলে ফল বিপরীত দাঁড়াইল। শশী হরির সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিল; আর এই কারণেই হরিদের বাড়ী আসিয়া সে তাহার বাবাকে চাকরির জন্য ধরিতে পারিতেছিল না।

পুত্র যখন কিছুতেই আসিল না, তখন একদিন চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী স্বয়ং মুক্তারাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। হরির মা বড়ই বিষণ্ণ, মেয়ের বিবাহের সব ঠিক, কিন্তু পণের টাকা কোথাও জোগাড় হইতেছে না, বিবাহের দিন ক্রমাগত পিছাইয়া দিতে হইতেছে। বরপক্ষীয়েরা এবার বলিয়া দিয়াছেন, ১৫ই বা ১৬ই তারিখে যদি বিবাহের দিন স্থির করা না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অন্যত্র পুত্রের বিবাহ স্থির করিবেন। মাত্র দশ দিন বাকী, টাকা কোথায়? তাহাদের কোন জবাবও দেওয়া যাইতেছে না। অবসর বুঝিয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী পুত্রের চাকরির কথাটা পাড়িয়া বলিলেন, "দেখ বৌ, শশে আমার ছেলে ভাল, নবীন মাষ্টার, তিন্ তিনটে পাশ, বলতো,

দিদি, তোমার ছেলে খুব ইংরজী জানে, আর এ পোড়া দেশের মাষ্টারেরা কিনা তাকে কেলাসেই তুললে না! যাক্ ভাই, যদি ঠাকুরপো শশেকে একটা চাকরি করে দেয়, টাকা ধারের জোগাড় আমিই করে দেব, ভাবতে হবে না।"

"আঃ, বাঁচালে দিদি! তোমার দেওর তো ঘরেই আছে, চল না ভাই।"

মুক্তারাম বাবু সমুদ্রে ভেলা পাইলেন। কত লোকের কত চাকরি করিয়া দিয়াছেন, আর শশের চাকরি করিয়া দিতে পারিবেন না? নিশ্চয়ই পারিবেন।

পরদিন প্রাতে যথাসময়ে শশী মুক্তারাম বাবুর বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলে হরি তাহার বাপকে বলিল, "বাবা, আপনি যে বসন্ত কাকাকে আশা দিয়েছিলেন, ফটিকের—"

ঠিক সেই সময় বসন্ত বাবু গামছা-স্কন্ধে দন্ত মার্জ্জন করিতে করিতে মুক্তারাম বাবুর পুষ্করিণীতে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে সেইখানে আসিলেন। শশীর পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া ইসারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? মুক্তারাম বাবু বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, ফটিকের কথাই তো বলেছিলুম, কিন্তু গুলের বে যে হয় না—হাজার টাকা কে দেয়, বল?" বসন্তবাবুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না, "তাতো বটেই" বলিয়া তিনি পুষ্করিণীতে নামিলেন। "মুখ্যুটার আবার চাকরি—!" বলিতে বলিতে হরি বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। কথাটা শশীর কাণ এড়াইল না; সে চটিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না।

২

কুঠীওলারা যাইবার দুই ঘণ্টাও বিলম্ব হইল না, গ্রামের মধ্যে একটা গুজ-গুজ ফুস্-ফুস্ চলিল—"হাজার টাকা দিয়ে চাকরি, ব্যাপার কি সোজা?" সকলেই অবাক্ হইয়া গেল, মুক্তারাম বাবু এমন ঘুষখোর!

পথে ও গাড়ীতে মুক্তারাম বাবু শশীকে সাহেব কি কি প্রশ্ন করিতে পারেন, সেই সব প্রশ্ন ও তাহার জবাবে কি বলিতে হইবে শিখাইতে শিখাইতে লইয়া গেলেন, কিন্তু ফলে সে এক প্রশ্নের উত্তরে অন্য জবাব দিয়া বসিল। সাহেবের নিকট অপ্রতিভ হইয়া মুক্তারাম বাবু শশীকে খুব কতকগুলা ভৎর্সনা করিলেন। শশী চটিয়া গেল। "চাকরি না করলে সে খেতে পাবে না এমন তো নয়, তবে আর দু'কথা শোনানো কেন?" সে এই ভাবিয়া তখনই বাড়ী যাইতে উদ্যত হইল। এখন স্বার্থ মুক্তারাম বাবুর, তিনি তাহাকে চাকরি-দেওয়াইবেনই, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, দু' একদিন মাত্র এপ্রেন্টিশ-গিরি করিয়া পরে বলিয়া-কহিয়া পাকা চাকরি করাইয়া দিবেন। শশীর কোন কথাই ভাল লাগিল না, সে আড়াইটার গাড়ীতে বাড়ী চলিয়া আসিল। সাহেব যাহাতে অন্ততঃ পনেরো টাকা বেতনও মঞ্জুর করেন, মুক্তারাম বাবু সেজন্য পুনরায় চেষ্টা করিতে উদ্যত হইলেন।

বাড়ীতে আসিয়া শশী মার নিকট কাঁদিয়া পড়িল। চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী তখনই পাড়া মাথায় করিয়া তুলিলেন। হরির মা কুঠি-ওলাদের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিলেন। গৃহিণী থামিয়া বাটীতে আসিলেন বটে, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় থামিবার পাত্র নন; স্ত্রীকে বলিয়া উঠিলেন, "জানিগো জানি, বোকারামের বেটা

মুক্তোরাম, তা আর কত ভাল হবে? আমার বাপের খেয়ে মানুষ হয়েছিল; এখন কি আর সে কথা মনে আছে? গলা দে' জল উলে গেছে। ও এখন মুক্তোরাম বাবু আর আমি শালা দয়াল চক্কোবত্তী! দেখবো, দেখবো, মেয়ের বের টাকা কে দেয়?"

বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর নিকট শশীর মার কথাগুলি শুনিয়া মুক্তারাম বাবু হাসিয়া ফেলিলেন, যথাযথ ঘটনা স্ত্রী-পুত্রকে বিবৃত করিলেন। হরি বলিল, "তখনই তো বলেছিলুম, ও-সব মুখ্যুদের নিয়ে গিয়ে সাহেবের কাছে কেবল খেলো হওয়া।"

যাহা হউক, পরদিন হরি আসিয়া চক্রবর্ত্তী-মহাশয়কে বলিয়া গেল যে, সাহেব শশীকে সেইদিন অফিসে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন, সে যেন আজ যায়। তাহার কথা শুনিয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী বলিলেন, "দেখলে, মুক্তো-ঠাকুরপো কি সে রকম লোক—আমার মাথার যত চুল, তত পেরমাই হোক—সোনার দোতকলম হোক—আসুক্ শশেটা—"

"ওগো, তুমি মেয়ে মানুষ, বোঝো না, বোঝো না, ফস করে একটা কথা বলে ফেল! মুক্তো ভেবেছিল, বেগ দিলে আরও হাজার টাকা বেরুবে। উঁহু, দয়াল চক্রবর্ত্তী সে ছেলেই নয়। এখন দেখলে সব যায়, ভাই—"

"হলোই না হয়। আর এক হাজার ধার! অম্‌নি তো আর নিচ্ছেনা, সুদও কোন্ ছাড়বে?"

"আজ-কালকার বাজারে শুধু হাতে টাকা দেবে কে?" বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুত্রের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। শশী সে দিন তাহাদের থিয়েটারের চাঁদা আদায় করিতে দূর গ্রামে অন্য একটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই তাহাদের "হরিরাজ" অভিনয় করিতে হইবে—সময় আর নাই।

অফিসের সময়ের মধ্যে চক্রবর্ত্তী তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না, সেও আসিয়া জুটিতে পারিল না, সুতরাং সে দিন তাহার আর অফিসে আসা হইল না।

শশী আসিতে পারিল না বটে, মুক্তারাম বাবু কিন্তু সাহেবের নিকট গিয়া অনেক ধরিয়া করিয়া তাহাকে কুড়ি টাকা বেতনে শিক্ষানবীশ করাইয়া লইলেন। কেননা সেইদিনই বড় সাহেবকে কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে, আর তিনি যে কবে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহারও স্থিরতা নাই। ম্যানেজার সাহেব স্বয়ংই তাঁহার বিশেষ বিশেষ কার্য্য দেখিবেন, ছোট সাহেব অ্যাশিষ্ট করিবেন।

ছেলের চাকরি হইল, চক্রবর্ত্তী এখন নিশ্চয়ই টাকা ধার দিবেন এই ভাবিয়া মুক্তারাম বাবু কালবিলম্ব না করিয়া কয়েকদিনের ছুটি লইয়া পাত্রের বাপের হাতে-পায়ে ধরিয়া তিন হাজার টাকার পরিবর্ত্তে নগদ দেড় হাজার টাকায় চুক্তি করিবার জন্য সেই দিনই আড়াই-টার সময় অফিস হইতে বহির্গত হইলেন। যাইবার সময় দয়াল চক্রবর্ত্তীকে দিবার জন্য স্বগ্রামবাসী নিমাই বোসের নিকট একখানি পত্র দিয়া গেলেন।

ভাগ্নে ফটিকের চাকরি হইল না। বসন্ত বাবু ছোট সাহেবকে ধরিয়া বসিলেন, তিনিও সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল কিছু হইল না। বড় সাহেব শশীকে এপ্রেন্টিস

লইবেন, মুক্তারাম বাবুর নিকট প্রতিশ্রুত। ছোট সাহেব বিলাত হইতে সবে আসিয়াছেন, অফিসে নূতন, অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। এ দেশের ধরণ-ধারণ শিখিতে বিলম্ব আছে। বড় সাহেবের কথায় ছোট সাহেব ক্ষুণ্ণ হইলেন, উপস্থিত কিছুই করিতে পারিলেন না, পরে সময় পাইলে তিনি মুক্তারাম বাবুকে দেখিয়া লইবেন বলিয়া বসন্ত বাবুকে আশ্বাস দিলেন।

শশীর চাকরি লইয়া মুক্তারামবাবুর স্বগ্রাম-বাসীরা, যাঁহারা যাঁহারা ঐ অফিসে ছিলেন, সকলেই তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাঁহার আড়ালে (সম্মুখে বলিতে কেহই সাহস করিতেন না) বলিয়া যাইতে লাগিলেন, এমন কি কি উপায়ে তাঁহাকে জব্দ করা যায়, তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিতে বিরত হইলেন না। মুক্তারাম বাবুর অপরাধ ভগবানই জানেন। তিনি এতদিন নিঃস্বার্থভাবে গ্রামের অনেকেরই চাকরি করিয়া দিয়াছেন, যখনই পারিয়াছেন উচ্চ পদগুলি স্বগ্রামবাসী-দিগকে দেওয়াইয়াছেন। সেই কারণে বসন্ত বাবু আজ তাঁহার সহকারী, নিমাই বোস খাজাঞ্চী, অধর রায় গুদাম-রক্ষক প্রভৃতি। বোধ হয় ইহাই তাঁহার প্রধান অপরাধ। এই সামান্য ব্যাপার লইয়া তাই ইহাঁরা আজ তাঁহার উপকারের প্রতিদান দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। জল খাইবার সময় এই আন্দো-লনটি তাঁহারা যেরূপ পাকাইয়া তুলিলেন, তাহাতে মনে হয় মুক্তারাম বাবু না জানি কি ভীষণ কাজই করিয়াছেন! আসল কথা, অফিসে মুক্তারাম বাবুর প্রতিপত্তি তাঁহাদের চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ বিশেষ দোষে মুক্তারাম বাবুর তিরস্কার আর তাঁহাদের সহ্য হয় না। তিনিও কেরাণী, তাঁহারাও কেরাণী, তবে তাঁহার এত কর্ত্তৃত্ব, এত প্রভুত্ব কেন?

জলখাবারের ঘরে মুক্তারাম বাবুর বিপক্ষে এই কুৎসা বিদ্রূপ একমাত্র নিমাই বোসের বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার প্রতি-বাদের ফল আরও ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল।

"হ্যাঁ হে, হ্যাঁ, চাকরি করতে এসেচি বলে আর তো জীবনটা বিক্রী করে দিই নি! একটা conscience তো আছে! অফিসে তো বড়বাবুগিরি ফলাবেনই, কিন্তু বাড়ীতেও কেন, বল? সমাজে তিনি এমনই বা কি বড় কুলীন?"

"আবার গিন্নিটি ভাবেন, তিনিই যেন আমাদের খেতে পরতে দিচ্ছেন।"

"সেও না হয় সহ্য হয়—ওদিকে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় ছেলেটি? যাক্ সে সব কথা—একবার পুলিশে খবর পেলে—"

"তা আর বাকি কেন থাকে, ভাই? কৃতজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় তো দিচ্চ, বেনামী চিঠিতেও বুঝি—"

"দেখ নিমাই, মুখ সামলে কথা কয়ো! এটা তোমার বাবুর বৈঠক নয় যে অন্যের নামে যা ইচ্ছে বলে যাবে। এটা কোম্পানির আপিস—"

"ওহে অধর, তুমিও যে পাগল হলে! থামো না!"

বসন্তবাবুর কথায় অধর প্রভৃতি সকলেই থামিয়া গেল। নিমাই "স্থান-ত্যাগেন দুর্জ্জনং" নীতির অনুসরণ করিল। তাহার পশ্চাতে একটা বিকট হাস্যরোল উঠিল।

বসন্তবাবুর ভয় হইল, পাছে নিমাই বেনামী চিঠির কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলে। কি উপায়ে তাহার মুখ বন্ধ করা যায়, ইহাই তাঁহার এখন প্রধান ভাবনা হইল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আপনার জায়গায় আসিয়া কাজে মনোনিবেশ করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু পারিলেন না; লেজারে debit ও credit sideএ পাঁচ টাকা দশ আনার অনৈক্য মিলাইতে পারিলেন না; বড়ই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সহসা কি-একটা বুদ্ধি তাঁহার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। তখনই নিমাইয়ের কাছে আসিয়া জেরেমী কোম্পানীর চেকটার কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখনও সেটি তৈয়ার হয় নাই শুনিয়া একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। "সমস্ত দিন ঝগড়াই করচে, তা কাজ করবে কখন! পারবে না বল্লেই হত, ছোট সাহেবকে বলে আসতুম।" বড় বাবুর অনুপস্থিতিতে বসন্তবাবুই কর্ত্তা, সুতরাং ছোট সাহেবই মনিব। বিনা বাক্যব্যয়ে নিমাই চেক-বুক লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন; তাহা দেখিয়া ছোটবাবু ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কই, Case টা কই? Hurry up. জানো ত আজ Mail day!" নিমাই Case দেখাইয়া দিল। ছোটবাবু তদ্দণ্ডেই জেরেমী কোম্পানীর কাগজ-পত্র, চেক-বুক প্রভৃতি এরূপভাবে টেবিল হইতে উঠাইয়া লইয়া ছোট সাহেবের ঘরে ফিরিয়া গেলেন যে, নিমাই বুঝিতেও পারিল না, তিনি কি কি কাগজ লইয়া গেলেন, আর কিই বা ফেলিয়া গেলেন।

বসন্তবাবুকে দেখিয়াই ছোট সাহেবের মুক্তারাম বাবুর নামে ম্যানেজারের নিকট বেনামী পত্রের কথা পাড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার নিজেরও ধারণা, বড়বাবু টাকা লইয়াই লোক-জনের চাকরি করিয়া দেন, সে জন্য অফিসের strength এত weak হইয়া পড়িয়াছে। ভাল লোক recruit হইতেছে না।

সর্ব্বনাশ! বসন্তবাবু যে ভয় করিতেছিলেন, ছোট সাহেব সেই প্রসঙ্গই তুলিয়া বসিয়াছেন! বিশেষ ধূর্ত্ততার সহিত সেটি চাপা দিয়া ওয়াট্‌সন ব্রাদার্সের debit noteটা, ক্যাম্বটন্ এণ্ড সন্‌সের invoiceটি, জেরেমী কোম্পানীর চেক্‌টি পেশ করিয়া দিলেন; যথাযথ সই করাইয়া কাগজগুলি সত্বর উঠাইয়া লইলেন। আজ mail day, সেগুলি despatch করা চাই। আসিবার সময় একখানি কাগজ তাঁহার হাত হইতে সাহেবের ঘরের মেজেয় পড়িয়া গেল, তিনি যেন তাহা দেখিতে পাইলেন না। সাহেবের টেবিল হইতে কোন প্রয়োজনীয় কাগজ পড়িয়া গিয়াছে বিবেচনা করিয়া চাপরাশি উহা সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল। কোন দেশীয় সদাগরের পত্র হইবে ভাবিয়া ছোট সাহেব একটি সরকারকে দিয়া সেটি পড়াইয়া লইলেন। আসিয়া অবধি যে অবসর তিনি অন্বেষণ করিতেছিলেন, আজ দৈবক্রমে তাহা মিলিল। পত্রখানি ম্যানেজার সাহেবের সম্মুখে ধরিয়া তাহার মর্ম্ম যেমন শুনিয়াছিলেন, বুঝাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে মুক্তারাম বাবুর বিপক্ষে বেনামী পত্রখানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু বড় বাবুর শত্রুপক্ষীয়েরা এই সব করিতেছে, তা ছাড়া কোন প্রমাণ না থাকায় আর

পত্রে আবেদনকারীর দস্তখত নাই বলিয়া তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু ছোট সাহেব এখন ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি পরদিন শশীকে ম্যানেজার সাহেবের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার এই চাকরির জন্য মুক্তারাম বাবুকে তাহার বাবা কত টাকা দিয়াছেন? সে ধার দেওয়ার ইংরাজী জানিত না, অথচ ইংরাজীতে এমন জবাব দিল যে, সাহেবেরা বুঝিলেন, ধার করিয়া তাহার বাপ হাজার টাকা মুক্তারাম বাবুকে দিয়াছেন। বেনামী চিঠি, মুক্তারাম বাবুর স্বহস্তে লেখা পত্র আর শশীর সাক্ষ্যে ম্যানেজার সাহেবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, মুক্তারামবাবু উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বাড়ী যাইবার সময় মুক্তারাম বাবুর পত্র খানি নিমাই খুঁজিয়া পাইল না, টাকার কথা লেখা আছে, সুতরাং অপরকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা শ্রেয় নয়। চক্রবর্ত্তীকে মুখেই সকল কথা বলিয়া দিবে মনস্থ করিয়া শেষ-ট্রেনে নিমাই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পত্রখানি কোথায় গেল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

৩

কয়দিন পরে ভাবী বৈবাহিকের বাটী হইতে বরাবর অফিসে আসিয়া ম্যানেজার সাহেবের হুকুম দেখিয়া মুক্তারাম বাবু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বসন্তবাবু তাঁহাকে কি বুঝাইয়া দিলেন, ভগবান জানেন। শুনিয়া তিনি নিমাইয়ের উপর আন্তরিক চটিলেন এবং তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও উচিত বিবেচনা করিলেন না। পদচ্যুত লইয়া কর্ম্ম করিতে ঘৃণা বোধ করিয়া কর্ম্মত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়া বাড়ী আসিলেন। ব্যাপার কি, নিমাইও কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বাড়ীতে আসিয়া তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না, মনের দুঃখ মনেই রাখিলেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুঁচড়োর ওরা কি রাজী হল?"

মুক্তারাম বাবু বলিলেন, "হাঁ।"

তাঁহার স্ত্রী বাহিরে আসিয়া সকলের নিকট সমাচারটা ব্যক্ত করিলেন, ভাবী বৈবাহিকের শতমুখে প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মুক্তারাম বাবু বিমর্ষ, শয্যায় শয়ন করিয়া ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। কেহই তাঁহার কষ্ট বুঝিল না। পরদিন প্রাতে স্ত্রী যখন রন্ধন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন মুক্তারাম বাবু বলিলেন, "এখন আর ব্যস্ত হতে হবে না, এত তাড়াতাড়ি রাঁধবার আবশ্যক নেই!"

"কেন, আপিস নেই?"

"না।"

"কিসের ছুটি?"

"একেবারে ছুটি।"

কথাটা স্ত্রী কিছুতেই ধারণা করিতে পারিলেন না, কেবল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। "চাকরি গেছে গো" বলিয়া মুক্তারামবাবু হাসিয়া গাড়ুটি লইয়া বাগানে চলিয়া গেলেন। স্ত্রী হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আপন-মনে বলিলেন, "ভগবান, তোমার মনে এই ছিল? সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে মেয়ের বে'র চেষ্টা করতে গিয়ে শেষ চাকরিটি পর্য্যন্ত গেল!"

মুক্তারাম বাবু একজন দক্ষ Book-keeper, সুতরাং সদাগর অফিসে তাঁর চাকরির

ভাবনা নাই। চেষ্টা করিলে কোন না কোন অফিসে জুটিয়া যাইবে, এ আশা তিনি রাখেন, কিন্তু উপস্থিত, কন্যার বিবাহের টাকা কে ধার দেয়, এই ভাবনাই তাঁহার প্রবল হইল। আহারে তাঁহার রুচি নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই; একই ভাবনা—কোথা হইতে টাকার জোগাড় করিবেন! ভোর হইতে না হইতে পুত্র হরি আসিয়া খবর দিল, জেলেরা আসিয়াছে। "বেশ তো, পুকুরে নামাইয়া দাও," বলিয়া তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই স্ত্রী আসিয়া বলিলেন, "ওগো, এখনো ওঠোনি, সন্দেশ-রসগোল্লা যে বসন্ত ঠাকুরপো এখনো আনেন নি। রাই ঘোষেরা যে এখনও এল না, তত্ত্ব যাবে কখন্?"

"হ্যাঁ, হরেকে একবার বসন্তর কাছে পাঠিয়ে দাও না।"

"পুকুরে যে জেলে নেমেছে, তাদের চোখে চোখে না রাখলে পাঁক তুলে মেরে দেবে।" কথা শেষ হইতে না হইতে বসন্তবাবু বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই নাও বৌদি, তোমার সন্দেশ-রসগোল্লা। কোথায় রাখবে? এই যে দাদা, এখনও ওঠেন নি যে!"

"রাত্তিরে তোমরা চলে গেলে, তখন তো দেড়টা, তার পর আর ঘুম এল না।"

"ঐ তো কেমন আপনার এক ভাব! আপনার চাকরির ভাবনা কি? সাম্‌স্ মার্টনের এজেণ্ট হার্টফিড সাহেব সেদিন কত খোসামোদই করেছিল, এখনো তারা লোক পায় নি, নিশ্চয়ই নেবে।"

"ও সব কথা ছেড়ে দাও বসন্ত, আমি চাকরির কথা ভাবচি-নে। নিমে আমার কি করবে? কথা হচ্ছে, টাকা চাই যে!"

"কেন, চক্রবর্ত্তী?"

"তার টাকা—"

"আহা, অম্‌নি তো নয়, হ্যাণ্ডনোট লিখে দেবেন।"

"হাঁ, তাতো দেবো—"

"আচ্ছা, চলুনই না, কি বলে, দেখা যাক্। গরজ তো আপনার।"

চক্রবর্ত্তীর বাটী আসিয়া উভয়ে টাকার কথা পাড়িলেন। চক্রবর্ত্তী বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি হে, নিমাই এসে খবর দেবা-মাত্র সেই রাত্রেই যে তোমার বৌদিদি টাকা দিয়ে এসেছেন।"

"সে কি—!"

"আহা, বৌমাকে ভাল করে জিজ্ঞেস্ করে এসো দেখি। মেয়েলি ব্যাপারে কোন কাজ করাই ঝকমারি!"

মুক্তারাম বাবু বাড়ী ফিরিলেন। বসন্তবাবু চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া শপথ করিতে উদ্যত হইলে বসন্তবাবু বলিলেন, "ওহে, চক্কোবর্ত্তী, তুমি যে এত কাঁচা কাজ কর, এ আমার ধারণা ছিল না। এখন অস্বীকার করলে কি করবে বল তো?"

"দোহাই তোমার, কি করব, বল? আমার যখের পুঁজি। এক এক টাকা আমার বুকের এক এক ফোঁটা রক্ত।"

"ওহে চক্কোবর্ত্তী, এত ব্যস্ত হলে কি চলে! বারেন্দরের ছেলে হয়ে এই বুদ্ধিটা মাথায় খেল্‌ল না দাদা? শোনো, বলি, শোনো, কানে কানে—"

"ঠিক বলেছ। হাঁ, হাঁ, ঐ কাজই ঠিক।" বলিয়াই অদূরে মুক্তারামবাবুকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "আঃ দাদা, বয়স হয়েছে পা বাড়িয়েই আছি। এখন কি আর সব কথা সব সময়ে মনে থাকে!"

"দয়াল-দা, ওরাতো বল্লে, বৌদি টাকা দেন নি—।"

"আহা, সেই কথাই তো বলছি! তোমার বৌদিদি টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়েছিল, বল্লে, কালীঘাট থেকে এসে দিলেই হবে। আমি বল্লুম, না, এখনই শশেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসো। আচ্ছা, আসুক কালীঘাট থেকে। উপস্থিত আমার কাছ থেকেই দিচ্ছি।"

"হ্যাঁ দাদা, তা হলে বাঁচাও।"

"দেখ, তোমাকে অবিশ্বাস করছিনে, তবে কি জান, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সব সময়েই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। তা একটা হ্যাণ্ডনোট—"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই, দোয়াত-কলমটা বার করুন, এখনি লিখে দিচ্চি। stampও আছে!"

মুক্তারাম বাবু হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলেন। চক্রবর্ত্তী বসন্ত বাবুকে দিয়া পড়াইয়া বলিলেন, "হাঁ, তা কি আর তুমি মিথ্যে বলবে! হ্যাণ্ডনোট যদি নাই থাকে!" চক্রবর্ত্তী হ্যাণ্ডনোট লইয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন; ঘণ্টাখানেক পরে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া অন্য কথার অবতারণা করিয়া গল্প ফাঁদিয়া দিলেন।

মুক্তারাম বাবু বলিলেন, "দাদা, আর কতক্ষণ বস্‌বো! আজ যে আমার ঢের কাজ।"

"হাঁ, এই যে নিমাইয়ের মা এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে দেরী হয়ে গেছে। আজকে আর বেশী খরচ-পত্র করো না, নমো-নমো করে সেরে ফেল না। আচ্ছা, এখন এস।"

মুক্তারাম বাবু হাসিয়া বলিলেন, "টাকাটা—?"

"টাকা? টাকা কি পাও নি! আমি দয়াল চক্রবর্ত্তী, আমার সঙ্গে জুচ্চুরি? মুক্তো, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে, তোমরা স্ত্রী-পুরুষে ছেলের চাকরি করে দেবে বলে একটা মেয়েমানুষকে ঠকিয়ে হাজার টাকা গাপ্ করবার চেষ্টায় ছিলে। আবার নিমাইয়ের মা—"

"এ কি বলছেন!"

"এখন একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে! যা হয়ে গেছে, যেতে দাও, আর পাঁচজনের কাছে বলে খেলো হয়ো না।"

কথায় কথায় বেশ বচসা হইয়া গেল। আদালতের আশ্রয় ব্যতীত যখন ইহা মিটিবে না, তখন এখানে বৃথা বিবাদ করিয়া ফল নাই। বসন্তবাবু মুক্তারাম বাবুকে লইয়া চলিয়া গেলেন। মুক্তারাম বাবুর চোখ ফাটিয়া জল আসিল; তিনি বলিলেন, "বসন্ত, এ বিপদে—"

"আমার কাছে টাকা থাক্‌লে কি আর চক্রবর্ত্তীর এই অপমানটা সহ্য কর্‌তে হত, না এর দোর তার দোর করতে হত? টাকা আছে নিমাইয়ের—"

"পাজিটার নাম করো না, বসন্ত। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, ও এত-বড় বিশ্বাসঘাতক। আমি ওর এমন কি অনিষ্ট করেছি যে, ও এই কাণ্ডটা করলে। খেতে পেত না, মা পরের বাড়ী ভাত রেঁধে বেড়াত, তাই ওকে পয়সা

খরচ করে লেখাপড়া শেখালুম, অফিসে চাকরি করে দিলুম। তার এই প্রতিদান!" মুক্তারাম বাবুর চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পড়িল। চক্ষু মুছিয়া তিনি বলিলেন, "পাজিটা সেদিন মেয়েদের কাছে সাউখুড়ী করতে এসেছিল,তখনই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। তা ওর কি লজ্জা আছে? হেসে চলে গেল। হাসির মানে আজ বুঝলাম, বসন্ত। চক্কবত্তীর বাড়ীতে ওর মা কেন এসেছিল, বুঝলে ত? চক্কবত্তী সাদা লোক, তার মাথার ভেতর এত প্যাঁচ নেই।" মুক্তারাম বাবু টাকার চেষ্টায় অন্যত্র চলিয়া গেলেন। বসন্তবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নিমাইকে খবরটা দিবার ইচ্ছা করিলেন। মার মুখে চক্রবর্ত্তীর বৃত্তান্ত কিছু কিছু শুনিয়া ব্যাপারটা জানিবার জন্য নিমাই আসিতেছিল, পথেই বসন্তবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বসন্তবাবু আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন—চক্রবর্ত্তীর হাজার হাজার টাকা একেবারে গাপ্, কৌশলে তাহার হ্যাণ্ডনোট লেখানো প্রভৃতি,—কেবল নিজের বুদ্ধিটুকুর পরিচয় দিলেন না।

"বসন্ত দাদা, এ হতে পারে না। কখনই নয়, কখনই নয়, আমি ও শুনতে চাই না। হয় চক্কোবত্তীর বদমায়েসী, না হয় শশেটার কারসাজী। সে ত পরের কথা, এখন উপায়? টাকা না পেলে যে মেয়ের বে হবে না, দাঁড়িয়ে অপমান—বসন্ত দা, তোমার তো ব্যাঙ্কে টাকা—"

"হ্যাঁ হে হ্যাঁ, লোকে আমারই টাকা দেখে। আর থাকেও যদি, দিয়ে শেষে আদালত ঘর করি আর কি! তোমার থাকে, দাও না কেন।"

"টাকা থাকলে এই দণ্ডেই দিতুম। দেখি, গহনা বন্ধক দিয়ে কিছু জোগাড় করতে পারি কি না?"

"আদায় করবে কি করে? শেষে একটা মনোমালিন্য হবে। তার চেয়ে Neither a lender, nor a borrower be."

"আচ্ছা" বলিয়া নিমাই বাটী চলিয়া গেল। মার নিকট সব কথা বলিল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই টাকার জোগাড়ে ব্যস্ত ছিলেন নিজের ও বৌয়ের নিকট হইতে নগদ দুই শত টাকা বাহির করিয়া দিলেন, আর বৌয়ের তাগা বালা লইয়া বন্ধক দিতে ছুটিলেন। মুক্তারাম অসময়ে তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার ছেলের পড়িবার খরচ দিয়াছেন, চাকরি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের আজ যাহা-কিছু সবই তো মুক্তারাম বাবুর দৌলতে। যাহা হউক সর্ব্বসমেত সাতশ' টাকা মাত্র জোগাড় হইল। নিমাই টাকাগুলি লইয়া অনতিবিলম্বে মুক্তারাম বাবুর বাটী ছুটিল। সদরে একটি মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া—তাহার সম্মুখে জনৈক সাহেব পদচারণা করিতেছেন। নিমাইকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,তাঁহার নাম মুক্তারাম বাবু কি না? ঘটনাচক্রে মুক্তারাম বাবুও সেই সময়ে বাটী আসিতেছিলেন, নিমাই তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "আমি নই, মুক্তারাম বাবু ঐ যে আসছেন।"

"Thanks" বলিয়া মুক্তারাম বাবুকে লক্ষ্য করিয়া সাহেব বলিলেন, "Good morning Mookaram Babu. Here is a warrant for you." মুক্তারামবাবু পুলিশ সাহেবের হাত হইতে আদেশটি লইয়া পড়িলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল,

বলিলেন, "Do your duty, sir. নিমাই, তোমার কি এত শত্রুতা সেধেছিলুম—?"

নিমাই হতভম্ব। দারোগা, জমাদার, কনষ্টেবল সকলে তখন বাটী প্রবেশ করিলেন। মেয়ের আজ গায়ে-হলুদ ও আইবুড়া ভাত। অনেক লোকজন নিমন্ত্রিত। আহারাদির জোগাড়-যন্ত্র, ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি হইতেছিল। কত জন-মজুর খাটিতেছিল। সকলে যে যাহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপার দেখিবার জন্য বাটীর ভিতর সমবেত হইল। পুলিশ স্ত্রীলোকদিগকে ঘাটে যাইতে বলিয়া দিল। পাঁত-সাত জন ভদ্র লোক ব্যতীত সকলকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া খানা-তল্লাসী আরম্ভ হইল।

হরির মা বসন্তবাবুর বাড়ী গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, বসন্তবাবু নড়িলেন না। তিনি কি করিবেন, কতদিন হরিকে বুঝাইয়াছেন যে, বদ ছোকরাদের সহিত মেসে তাহার থাকা উচিত নয়! তাঁহারা কি করিবেন? হারাধন বাবুর বাটী আসিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিলেন, "ঠাকুর পো, একবার আমাদের বাড়ী চল।"

"হাঁ, আমি পুলিশ ঘর করি, শেষে চাকরিটাও যাক। ছেলেকে শাসন করবার জন্য তখন যে আমরা কত বলেছিলাম···।"

এই হারুবাবুকেই মুক্তারাম বাবু জেল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন! যাহা হউক, হরির মা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া কাহারও হাতে ধরিলেন, কাহারও পায়ে পড়িলেন, কিন্তু গ্রামের কেহই আসিতে সাহস করিল না। বাড়ীর আশে-পাশে দাঁড়াইয়া সকলে মজা দেখিতে লাগিল। চক্রবর্ত্তীর হাজার হাজার টাকা উড়াইয়া দেওয়া, অফিসের আসবাব চুরি,—পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিতে লাগিল, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

বেলা একটার সময় খানাতল্লাসী শেষ হইলে সাহেব আর একটী আদেশ মুক্তারাম বাবুকে পড়িতে দিয়া তাঁহার পুত্র হরিকে বলিলেন, "Follow me!" মুক্তারাম বাবু বসিয়া পড়িয়া হরির দিকে চাহিলেন, চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কথা বাহির হইল না। হরি বাপ-মাকে নমস্কার করিয়া সাহেবের সহিত মোটরে উঠিল। হরির মা কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো, ওর যে এখনও খাওয়া হয় নি।" দারোগা বাবু বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নেই মা, আমরা খাওয়াব, আমরা তো মানুষ।"

"ওগো তোমরা যে পুলিশ।" বিকট শব্দ তুলিয়া মোটর ছুটিল, হরির মার পাষাণভেদী ক্রন্দনে গ্রামের লোক ছুটিয়া আসিল। মুক্তারাম বাবু বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

৪

পর দিন ১৫ই বৈশাখ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নোনাগ্রামে পাঁচসাত খানি মোটর গাড়ী ভোঁ-ভোঁ করিয়া প্রবেশ করিল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বাহির হইয়া পড়িল, "ব্যাপার কি?" কেবল গভর্ণমেণ্ট অফিসের বাবুরা স্ব স্ব বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া অপরের নিকট হইতে খবর পাইবার প্রত্যাশায় ছটফট করিতে লাগিলেন। যাহারা পুলিশ সাহেব,দারোগাবাবু, কনষ্টেবল সিংদের দেখিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, কাহাদের বর আসিয়াছে। "বর এসেছে", "বর এসেছে" বলিয়া একটা হৈ-চৈ

পড়িয়া গেল, সকলেই গণ্ডগোল করিতে লাগিল ; কিন্তু কেহই তো অভ্যর্থনা করিয়া বর আনিতে আসিল না। তখন বরকর্ত্তা ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, এইটি কি নোনা গ্রাম ?"

পার্শ্বস্থ ভদ্রলোক বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ !"

"মুক্তারাম বাবুর বাড়ী কি এইখানে ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তিনি কি বাড়ী আছেন ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"বলি, 'আজ্ঞে হ্যাঁ', তাঁর বাড়ীটা কোথায়, দেখিয়ে দিতে পারেন ?"

"আজ্ঞে, ঐ যে চণ্ডীমণ্ডপ দেখা যাচ্ছে, ঐটেই তাঁর।"

বিবাহ-বাড়ী যে এ-রকম নির্জ্জন হইতে পারে, তাহা কেহ ধারণা করিতে পারে না। বরকর্ত্তা রাগ করিয়া মোটর ফিরাইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু দুই-এক জন ভদ্রলোক উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন, "ওহে, অত রাগ করলে হবে কেন ? বিবাহের বন্দোবস্ত বোধ হয় অন্য বাড়ীতে। এ রকম তো হয়। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর—এই যে—এ কি হে, মুক্তারাম বাবুকে ধরাধরি করে আনছে, অ্যাঁ—" সকলেই মোটর হইতে নামিয়া অগ্রসর হইলেন। মুক্তারাম বাবু শ্রীধর বাবুর পা জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "বড়ই বিপদ, মশাই—আমার ছেলে—"

পাঁচ-সাতজনে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, বলেন কি—কি ব্যায়ারাম ?"

শ্রীধর বাবু মুক্তারাম বাবুকে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার গা আগুন ! "এ কি, আপনার জ্বর ?"

"সব বলচি, চলুন। ওঃ—বসন্ত—উঃ বাবা হরি—বসন্ত—" সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। বসন্তবাবু সে ত্রিসীমায় নাই। বরকর্ত্তা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কি করা কর্ত্তব্য। হরির দলের ছেলেরা মুহূর্ত্ত-মধ্যে মুক্তারাম বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে বরযাত্রীদিগের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে তথায় লইয়া গেল। মায়ের প্রাণ বাধা মানিল না, পুত্রের নাম ধরিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। অকল্যাণের দোহাই দিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে চুপ করাইয়া দিল। বরযাত্রীদের আহারাদির আয়োজন-উদ্যোগ চলিল।

সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বর অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকিয়া বসিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন না। তিনি সম্প্রতি ডেপুটিগিরির জন্য nomination পাইয়াছেন। এখন এরূপ-স্থলে বিবাহ করিলে তাঁহার চাকরি পাওয়া সম্ভব হইবে না। কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের অনেকেই পিতা ও পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন। মুক্তারাম বাবু ভাবী বৈবাহিকের হাতে-পায়ে ধরিয়া অনেক কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শ্রীধর বাবু লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কিছুতেই মত দিতে পারিবেন না। তিনি কলিকাতায় যাইবেন বলিয়া মোটরে উঠিলেন। মোটর ছাড়িয়া দিল। এমন সময় "হরি এসেছে, হরি এসেছে" বলিয়া একটা চীৎকার উঠিল। মোটর থামিল। শ্রীধরবাবু নামিলেন। মুক্তারামবাবু তখনও জ্বরে কাঁপিতেছেন, দুই একবার চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিলেন না, একদৃষ্টে হরির পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"বাবা, ও কিছু নয়, গ্রামের লোকে আমার নামে মিথ্যে কি লিখেছিল—"

"শুধু লেখা ? পুলিশকে ডেকে এনে বাড়ী দেখিয়ে দেওয়া—"

"অ্যাঁ, এমন লোকও আছে ?"

"তার অভাব নেই, মশাই ! (নিমাইকে আসিতে দেখিয়া) ঐ যে, ঐ রাস্কেলটাই আসছে। এখনও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নি ? আবার আমার বাড়ী—? (দয়াল চক্রবর্ত্তীকে দেখিয়া) এ কি ! দলকে দল যে ! ভগবান্, এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয় নি ?" আর সামলাইতে না পারিয়া কম্পিত ওষ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, না, দোহাই দয়াল দা, তোমার পায়ে পড়ি, ভদ্রলোকদের কাছে আর অপমান করো না। নিমাই, একটি দিনও যদি তোমার কোন উপকার করে থাকি, তা হলে আমি তোমার হাতে ধরে বলছি ভাই, আজ আমায় ক্ষমা কর, আজ আর কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দিতে এসো না—"

"বাবা, কি বলছেন ? ও-কথা বলবেন না, নিমাই-কাকাই তো খরচ-পত্র করে আপনাদের ম্যানেজার সাহেবকে ও আর একটি ভাল বারিষ্টার সাহেবকে নিয়ে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আমায় ছাড়িয়ে এনেছেন। নিমাই-কাকার কথায় ম্যানেজার সাহেব সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন,—এই দেখুন, আপনাকে তিনি চিঠি দিয়েছেন।"

শ্রীধর বাবু সাহেবের পত্রে আর কিছু বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, লাট-সাহেব যে হরিকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন, ইহাতে তিনি একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হরিকে লইয়া মুক্তারাম বাবু বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় সদর দরজায় দয়াল চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে হ্যাণ্ডনোটটি ফেরত দিয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর দাদা, লোকের পরামর্শে শশে টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়েও দেয় নি, আমি মুখ্যু-সুখ্যু লোক, ভাই, অত কৌশল বুঝতে পারিনি, কিন্তু তুইও তো পারিসনি ! যাহোক ভাই, শশের আর চাকরিতে কাজ নেই, ফটিকেরই করে দিও।"

"কি বলছ দয়াল-দা ?"

দয়াল চক্রবর্ত্তী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "পরে বুঝিয়ে বলব। নিমাই স্ত্রীর গহনা পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়ে টাকার জোগাড় করে এনেছে। আরও দরকার হয়, দয়াল চক্রবর্ত্তী হাজির আছে। শ্রীধর বাবু সম্মত আছেন, বে কবে হবে ? এখন ভদ্রলোকদের আহারাদির কি উদ্যোগ হল, দেখ।"

পাড়ার একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল, "নিমে-দা যখন আছে, কিছু দেখতে হবে না।" মুক্তারাম বাবু দরজার উপর বসিয়া পড়িলেন। নিমাই আসিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গেল, বিছানায় শোয়াইতে গিয়া দেখিল, তাঁহার চক্ষে জল। মুক্তারাম বাবু নিমাইয়ের হাত দুটি ধরিয়া কি বলিতে গিয়াও বলিতে পারিলেন না।

"করেন কি ! আমি যে ছোট ভাই, দাদা !" বলিয়া নিমাই তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিলেন। হরিকে কাছে থাকিতে বলিয়া নিমাই চকিতের মত বাহিরে আসিয়া বর-বরযাত্রীদের সভাস্থ করিয়া দিল।

ভিতরে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন চলিল—কাল গুলুর বে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ব্রিটিশ-শাসনের এক যুগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চৈৎ সিংহ যখন পাঁচ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর ১৭৭৮ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিলেন, তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এরূপ অতিরিক্ত টাকা আর তাঁহাকে দিতে হইবে না। মিল তাঁহার ভারতের ইতিহাসে সে কথা বেশ স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পর বৎসর হেষ্টিংস আবার পাঁচ লক্ষ টাকা চৈৎসিংহের নিকট চাহিলেন। চৈৎসিংহ এবার দিতে অস্বীকার করিলেন। হেষ্টিংস তখন ইংরাজ-সেনানায়ককে কাশী-রাজের নিকট হইতে বলপ্রয়োগ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিতে আদেশ দিলেন। চৈৎসিংহকে বাধ্য হইয়া পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হইল।

১৭৮০ সালে পুনরায় পাঁচ লক্ষ টাকার জন্য তাগিদ আসিল। রাজা চৈৎসিংহ এবার এক সহজ উপায় স্থির করিলেন। তিনি নিরুপায় হইয়া হেষ্টিংসকে দুই লক্ষ টাকা উৎকোচ দিলেন। হেষ্টিংস দুই লক্ষ টাকা লইলেন। চৈৎসিংহ ভাবিলেন যে তাঁহার বিপদ দূর হইল। হেষ্টিংসকে দুই লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহাকে বার্ষিক অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা আর কোম্পানীকে দিতে হইবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় চৈৎসিংহ হেষ্টিংসকে একেবারে চিনিতে পারেন নাই। হেষ্টিংস দুই লক্ষ টাকা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকার জন্য আবার তাগাদা পাঠাইলেন। অনেক ইংরাজ-লেখক বলিয়াছেন যে হেষ্টিংস উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই—চৈৎসিংহের প্রদত্ত দুই লক্ষ টাকাকে ঘুষ বলা উচিত নয়। মেকলে তাঁহার ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জীবন-চরিতে এই বিষয়ে বেশ সুন্দর লিখিয়াছেন, "তিনি (হেষ্টিংস) বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভা এবং বিলাতের ডাইরেক্টরগণ এই দুই পক্ষের নিকটই এই ব্যাপার কিয়ৎকাল নিশ্চয় গোপন করিয়াছিলেন; এবং পরেও এইরূপ গোপন রাখার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। ধরা পড়িবার ভয়ে অবশেষে তিনি প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।"

হেষ্টিংস ঐ দুই লক্ষ টাকা কোম্পানীর ভাণ্ডারে দিলেন এবং পুনরায় চৈৎসিংহের পাঁচ লক্ষ টাকার জন্য তাগিদ দিলেন। চৈৎসিংহকে পাঁচ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর এবং তাহার উপর জরিমানা স্বরূপ আরও এক লক্ষ টাকা দিতে হইল।

১৭৮০ সালে রাজাকে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য কোম্পানীর জন্য নিযুক্ত করিতে আদেশ হইল। রাজা বিষম বিপদে পড়িলেন। হেষ্টিংসকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবার বিশ লক্ষ টাকার লোভ দেখাইলেন। হেষ্টিংস বিশ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চাহিলেন। তিনি এখন ভিতরে ভিতরে বারাণসী অযোধ্যায় নবাবকে বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। বর্ক এই কথা

পার্লামেণ্টে হেষ্টিংসের বিচারের সময় জ্বালাময়ী ভাষায় বলিয়াছিলেন।

তৎপরে হেষ্টিংস স্বয়ং বারাণসী গমন করিলেন। রাজা চৈৎসিংহ যথাসাধ্য বিনীত ভাবে হেষ্টিংসের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। হেষ্টিংস রাজার সহিত মোটেই ভদ্রভাবে ব্যবহার করিলেন না। তারপরে রাজার বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ করিয়া বিস্তৃত এক চিঠি হেষ্টিংস রাজাকে পাঠাইলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই চিঠিখানি ফরেষ্ট সাহেবের State Paper গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ছাপা আছে (৭৮৩-৪ পৃষ্ঠা)। রাজাও পত্র পাঠমাত্র আপনাকে দোষমুক্ত করিয়া একটী উত্তর পাঠাইলেন। উত্তর পাইয়া হেষ্টিংস একেবারে ক্রোধোন্মত্ত হইলেন এবং রেসিডেণ্ট মার্কহাম সাহেবকে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন যেন রাজা চৈৎসিংহকে বন্দী করা হয়। রাজা কোনও আপত্তি না করিয়া মার্কহামের নিকট আপনাকে সমর্পণ করিলেন এবং এই অপমানে ব্যথিত হইয়া তাঁহার রাজত্ব কোম্পানীকে দিয়া সামান্য বৃত্তি লইয়া অবসর-গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

রাজা চৈৎসিংহ বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার প্রজাবর্গ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কোম্পানীর সৈন্যদিগকে নিহত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহাদের অপমানিত রাজাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিল। হেষ্টিংস অসুবিধা বুঝিয়া চুণারে পলায়ন করিলেন।

সমস্ত বারাণসীর প্রজাবর্গ তাহাদের লাঞ্ছিত অধিপতির অপমানকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। কিছুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহের পর কোম্পানী জয় লাভ করিল। চৈৎসিংহ সিংহাসনচ্যুত হইলেন। তাঁহার এক আত্মীয়কে বারাণসীর সিংহাসনে হেষ্টিংস বসাইলেন এবং রাজস্বও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

ইহাতে বাৎসরিক বিশ লক্ষ টাকা লাভের ব্যবস্থা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী করিলেন। কিন্তু চৈৎসিংহের যে গুপ্তধন যথেষ্ট আছে বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত ছিল তাহা একেবারে অমূলক প্রমাণিত হইল। হেষ্টিংস লোক-মুখে শুনিয়াছিলেন যে রাজা চৈৎসিংহের প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ দেড় কোটী টাকা গুপ্তধন আছে এবং সেই আশায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া তাহার সিকিও পাওয়া যায় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় কোম্পানীর অর্থানুকূল্যের জন্য চৈৎসিংহের উপর হেষ্টিংসের নির্য্যাতন হইয়াছিল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক হেষ্টিংসের কার্য্য নির্দ্দোষ বলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহা কোম্পানীর ভাণ্ডারে যায় নাই। কোম্পানীর সৈন্যেরা তাহা দিতে অস্বীকার করিল এবং হেষ্টিংস তাহা Prize money স্বরূপ সৈন্যদিগকে দান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রত্যাবর্ত্তন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমনিভাবে যখন দিন কাটিতেছিল, তখন একদিন তাহার বৈচিত্র্য-হীন জীবন-পথে একটু পরিবর্ত্তন আসিয়া নিরানন্দ জীবনটাকে যেন ধীরে ধীরে সহনীয় করিয়া তুলিল। সেদিন অপরাহ্ণ-বেলায় স্কুল হইতে ফিরিয়া অরুণ দেখিল, মুক্তা ঠাকুরাণী মজুর লাগাইয়া বাড়ীর আশ-পাশের জঙ্গল সাফ করাইতেছেন। বর্ষায় ঘাস ও আগাছা জন্মিয়া চারিদিক অপরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। পুকুর-পাড়েও বিস্তর বন্য ওল ও অপরিচিত অনাবশ্যক বন্য গাছের ভিড়। গৃহকর্ত্রীর অমনোযোগে এতদিন এগুলা সতেজে ও সগর্ব্বে বর্দ্ধিত হইবার অবসর পাইয়াছে।

অরুণকে আসিতে দেখিয়া ঠাকুরাণী বলিলেন, "আজ হিমুরা এসে পৌঁছুবে, সন্ধ্যের গাড়ীতে। চিঠি দিয়েচে। তুমি একবার ইষ্টিসানে যেয়ো ত বাছা। দালানে লণ্ঠনটা সাফ করিয়ে রেখেচি, হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেয়ো। যে আঁধার রাত!" কথা কয়টি বলিয়াই তিনি ফিরিয়া পুনরায় নিজের তদারক-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন দেখিয়া অরুণ নীরবে স্বীকার-উক্তি জানাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিল, ঘরে ঢুকিয়া তাকের উপর বই কয়খানি রাখিয়া দিয়া সে তাহার মাদুর-পাতা তক্তাপোষের বিছানায় শুইয়া পড়িল। শরীর এমনই ক্লান্ত মনে হইতেছিল যে কোটটি খুলিয়া রাখিতেও ইচ্ছা হইতেছিল না। অন্যদিন এ সময় সে তাহার সারাদিনের ইতিহাস, স্কুলের পড়া, শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে তর্ক, সহপাঠিদের বাক্-বিতণ্ডা ও সমালোচনা, নূতন শোনা কোন সংবাদ এই সমস্তই চিন্তা করিত। আজ আর সে-সব কিছু তাহার মনে পড়িল না। এখনি-পাওয়া নূতন অধিকারের চিন্তাই তাহার প্রধান হইয়া উঠিল। প্রথমেই তাহার মনে হইল, কে এই হিমু, আর কি জন্যই বা সে আসিতেছে? ইহাকে যে সে আনিতে যাইবে, তা চিনিবে কিরূপে! এই হিমু স্ত্রী কি পুরুষ, সে খবরও সে জানে না। যদি স্ত্রীলোক হয়, সধবা কি বিধবা, যুবতী কি বৃদ্ধা, তাহারও স্থিরতা নাই। অরুণ শেষটা স্থির করিল, পুরুষ হওয়াই সম্ভব। নহিলে ট্রেনে আসিতে সাহস করিত কি? মুক্তা ঠাকুরাণী আবার বহুবচনান্ত হিমুরা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে সে একা আসিতেছে না—সঙ্গে আরো লোক আছে। এই হিমুর চিন্তা তাহার ভাল লাগিতেছিল। যেই আসুক—যাহারাই আসুক, তবু একটু পরিবর্ত্তন ত মিলিবে। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত এই একঘেয়ে ভাব—এ যেন আর সহ্য হয় না!

অরুণ মনে করিল, ষ্টেশনে যাইবার পূর্ব্বে মুক্তা ঠাকুরাণীর নিকট প্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদ জানিয়া লইবে। কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেলে জামা খুলিয়া পুকুর-ঘাটে গিয়া সে মুখ-হাত ধুইয়া আসিল। পুকুর-পাড়ে বড় একটা বেল গাছ থাকায় লোকে তাহাকে "বেল পুকুর" আখ্যা দিয়াছিল। বেল পুকুরের জল বড় স্বচ্ছ ও স্বাদু; তাই পাড়ার ও দূরের অনেক লোক পানীয় জলের জন্য এই বেল পুকুরেই জল লইতে আসিত।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। স্বচ্ছ জলের উপর বাতাসের খেলা বড় মিষ্ট লাগিতেছিল। শরীর যেন জুড়াইয়া যাইতেছিল। কিন্তু অরুণ জানিত, এ সময় গাড়ার মেয়েরা জল লইতে বা গা ধুইতে আসিবে। বিদেশী হইলেও তরুণ বয়স দেখিয়া কেহ তাহাকে লজ্জা করে না, বরং উপযাচিকা হইয়া অনেকে তাহার সহিত কথাও কহিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে সে বিপন্ন হইয়া পড়ে। বাহিরের আঘাত লোকে দেখিতে পায়—ব্যথা সারিল কি না বুঝিতে পারে, কিন্তু অন্তঃকরণের ক্ষত, এ যে সহজে সারে না—সে খবর রাখিবার মত দরদীও ত সহজে মেলে না। লোকে তাহাকে প্রশ্ন করে, তাহার অতীত জীবনের সম্বন্ধে সকৌতূহলে। কিন্তু সে আলোচনা যে তাহার পক্ষে কি, সে খবর ত কেহ রাখে না! তাই কৌতূহল-লেশ-হীন মুক্তা ঠাকুরাণীর আশ্রয়ই তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। এখানে তাহাকে অতীত-বর্ত্তমানের কোন জবাবদিহিই করিতে হয় না।

বাড়ী হইতে ষ্টেশন প্রায় দুই মাইল দূরে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—একটু পূর্ব্বে যাওয়াই উচিত ভাবিয়া সে মুক্তা ঠাকুরাণীর উদ্দেশে ঘরের বাহির হইল। দুই বেলা আহারের সময় ছাড়া ঠাকুরাণীর বিনা-আহ্বানে সে বড় কখনো ভিতর-বাড়ীতে যাইত না; তাই একটু ইতস্তত করিয়া শেষে সে ঢুকিয়া পড়িল। উঠানের দুই ভাগে তিনখানি করিয়া ছয়খানি ঘর; তিনখানি পাকা, তিনখানি কাঁচা। পাকা তিনখানির মধ্যে যেখানির বাহির ভাগে দরজা সেই খানিতে অরুণ থাকে, বাকী দুইখানি ঠাকুরাণীর শয়ন ও উপবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাঁচা মাটীর গোময়-লিপ্ত আলিপনা-চিত্রিত দুইখানি ঘর পূজা ও ভাঁড়ারের; অন্যখানি রন্ধনের। এখন সেখানি অনাবশ্যক-বোধে খালি পড়িয়া আছে। এ ছাড়া উঠানের অন্য অংশে কাঠ প্রভৃতি রাখিবার জন্য একখানি দরমা-ঘেরা চালা ঘরও ছিল। গ্রীষ্মের দিনে রন্ধন-গৃহের বাহিরে মাটীর দালানে রান্না হয়।

অরুণ ভিতরে আসিয়া মুক্তা ঠাকুরাণীর উদ্দেশ পাইল না। শুইবার ও ভাঁড়ার ঘরের দরজায় তালা লাগানো। সম্ভবতঃ তিনি পাড়ায় কাহারো বাড়ী বেড়াইতে বা কোন রোগীর খবর লইতে গিয়াছেন। ষ্টেশন দূরে। ট্রেনের খুব বেশী দেরী নাই। বিলম্ব অনুচিত বুঝিয়া সে দালানের সম্মুখে রক্ষিত চৌকা কাঁচের আবরণী-বেষ্টিত পুরাতন দেশী লণ্ঠনটি হাতে ঝুলাইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। পকেটে দেশলাই লইল। এখনও কিছু বেলা আছে,—এখন হইতে অনাবশ্যক তৈল পুড়াইবার ইচ্ছা না হওয়ায় লণ্ঠনটা আর জ্বালিয়া লইল না।

ছুটির দিন প্রায়ই সে ষ্টেশনে বেড়াইতে আসিত। ষ্টেশন-মাষ্টার আশুবাবুর সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল। ষ্টেশনটি খুব ছোট, প্লাটফর্ম্মটুকুও তাই। গ্রামের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া তাহা মানাইয়াছিল ভাল। তবু সেই কটা রঙের কাঁকর-বিছানো ক্ষুদ্রকায় প্লাটফরমের পশ্চাৎভাগে রাঙা রং লাগানো কাঠের বেড়ার গা ঘেঁষিয়া যে সব নিত্য-পরিচিত ফুলের গাছ ফুলে ও পাতায় স্থানটিকে সুদৃশ্য করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অরুণের চোখে বড়

সুন্দর বোধ হইত। বেড়ার গায়ে তরুলতার, সরু পাতার সহিত রাঙা রাঙা সরু ফুলগুলি কি সুন্দর! দূরে যতদূর দৃষ্টি চলে, দর্শন-যোগ্য কিছুই ছিল না। হরিৎ ক্ষেত্রের নয়ন-লোভন দৃশ্যেরও এখানে অভাব। অসমতল সরু সরু মাটীর রাস্তা, ডোবা, খানা, ঝোপ, জঙ্গল, বাঁশবন, মাঠ ও পচা পুকুর—ইহাই এখানকার দর্শনীয় বস্তু। তবু স্থানাভাবে এইখানেই সে বেড়াইতে আসিত। যাত্রীপূর্ণ ট্রেনগুলি চলিয়া যাইত, সে তাই দেখিত। কেহ উঠিত, কেহ নামিত, ডেলি প্যাসেঞ্জার অনেকগুলি থাকিত। তাই ষ্টেশনটি ছোট হইলেও লোকের গমনাগমনে কোন বাধা ছিল না। কাজের অভাবে বসিয়া সে ষ্টেশন-মাষ্টারের কার্য্য দেখিত। আজও সে তাঁহার শরণ লইল। আশুবাবু হাসিয়া আশ্বাস দিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন আসিয়া পড়িল। অনেকগুলি ডেলি প্যাসেঞ্জার নামিয়া গেলেন। নিত্য আনাগোনা তাঁহাদের অভ্যাস হইয়া যাওয়ায় মুখে বা চোখে কাহারও কিছুমাত্র ব্যস্ত ভাব ছিল না! অরুণ থার্ড ক্লাশের স্ত্রীলোকদের কামরায় জানালার বাহিরে একখানি মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অনেকগুলি অপরিচিত মুখের মধ্য হইতে সেই মুখখানি বিশেষ করিয়া দর্শকদের চোখে পড়িতেছিল। সে একটি বছর দশেক বয়সের মেয়ের মুখ। মুখখানি বড় সুন্দর। একবার চোখে পড়িলে আবার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। তাহার সুন্দর মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটিয়াছিল। অরুণকে কাছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি কহিল, "এটা কোন্ ইষ্টিসান?"

অরুণ কহিল, "ঝাল্‌দা।"

"ঝাল্‌দা! বলেচি ত আমি। ও মা, নাবো, নাবো, গাড়ী ছেড়ে দিচ্চে যে—বাঃ—"বলিয়া সে একটা মস্ত পুঁটুলি টানিয়া নামাইয়া নিজেও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িল। পরে পুঁটুলি রাখিয়া অবগুণ্ঠনবতী এক বিধবা নারীকে নামাইয়া লইল।

"ট্রেনে জলের কল্‌সী রইল যে—"বলিয়া সে পুনরায় ব্যস্তভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইতে অরুণ তাহাকে থামাইয়া নিজে কল্‌সীটা নামাইয়া দিল। ততক্ষণে ষ্টেশন-মাষ্টারও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। অরুণের সহিত তিনিও প্রত্যেক কামরায় দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিতেছিলেন। "মুক্ত ঠাকুরুণের বাড়ী কে যাবেন?" বলিয়া তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করিতেছিলেন; অরুণকে ইহাদের প্রতি মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুক্তা ঠাকুরাণীর নাম শুনিয়াই মেয়েটির চোখে সাফল্য ও আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কহিল, "আমরা যাব!" আশুবাবু অরুণের পানে চাহিয়া, ইংরাজীতে বলিলেন, "You have found them, all right." বলিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতেও একবার পিছন ফিরিয়া মেয়েটির পানে চাহিয়া গেলেন। এমন জায়গায় এমন মুখ ত সাধারণত ত চোখে পড়ে না, কাজেই একবার চোখে পড়িলে বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ট্রেণ চলিয়া গেলে অরুণের যেন চমক ভাঙ্গিল। সে অপ্রতিভভাবে অগ্রসর হইয়া রমণীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "আসুন, আমি

আপনাদেরই নিয়ে যেতে এসেচি যে।" "মা, শুন্‌চ, দিদিমা আমাদের নিতে লোক পাঠিয়েছেন?" বলিয়া মেয়েটি মস্ত পুঁটুলিটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অগ্রসর হইল দেখিয়া মা জলের কলসী লইয়া অনুবর্ত্তী হইলেন। অরুণ লণ্ঠন জ্বালিয়া পুঁটুলি লইতে গেলে সে বাধা দিয়া কহিল, "নাও যদি ত কলসীটাই নাও। মা রোগা মানুষ, কষ্ট হচ্চে। তোমাদের অ-গঙ্গার দেশ কি না, তাই মা এক ঘড়া গঙ্গাজল নিয়ে এসেচে।" বলিয়া সে মায়ের নিষেধ না মানিয়া কলসীটা তাঁহার কাছ হইতে টানিয়া নামাইয়া অরুণের হাতে পুঁটুলিটা দিয়া নিজেই কলসী লইল। কলসীটি ছোট হইলেও অরুণের পক্ষে তাহা বহন করায় অসুবিধা হইত। হাতে ঝুলাইয়া অত পথ চলা সম্ভব নয়। অন্য উপায়ে লওয়াও তাহার পক্ষে মুস্কিল। তাই কৃতজ্ঞ হইয়া মনে মনে সে এই ছোট মেয়েটীর বিবেচনা-বুদ্ধির প্রশংসা করিল। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে পথের অন্ধকার খণ্ডিত করিয়া অরুণ আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া পল্লীগ্রামের পথে এখনই বেশ অন্ধকার জমিয়া উঠিয়াছে। আকাশে চাঁদ নাই। এ রাত্রে উঠিবার আশাও ছিল না—নক্ষত্র এখানে-ওখানে দুই-চারিটা সবে ফুটিতে সুরু করিয়াছে। অনভ্যস্ত পথে পশ্চাৎ-বর্ত্তিনীরা অতি-কষ্টে চলিতে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে পায়ে হুঁচট লাগিয়া মেয়েটি আঃ-উঃ করিতেছিল। মাকে সে যথাসম্ভব সাবধান করিতেছিল। "দেখে চল মা, এ দিকটায় একটা গর্ত্ত আছে। সাম্‌নে উঁচু,—বাঁ দিক ঘেঁষে এসো,—বৃষ্টির জল জমে আছে—" ইত্যাদি সতর্কতা-জ্ঞাপনের সহিত অসন্তুষ্ট মন্তব্য-প্রকাশেও তাহার বিরতি ছিল না। "মাগো, কি দেশ তোমার মামীর! যেমন বন, তেম্‌নি কি পথের ছিরি হতে হয়! হ্যাঁগা, দেশের মানুষেরা কি আলো জ্বালে না? তোমাদের কোথাও ত এক বিন্দু আলো দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বাঃ! ঐ যে আলো জ্বল্‌চে! দেশে বুঝি ঐ একটি ছাড়া আর মানুষ নেই?" বলিয়া সে অরুণের উদ্দেশে প্রশ্ন করিলে বাধা দিবার ভাবে একটুখানি রুক্ষস্বরে মা কহিলেন, "হিমু,—"মেয়ে বুঝিল, মা তাহাকে নীরবে পথ চলিতে আদেশ দিতেছেন। তাই কিছুক্ষণ সে চুপ করিয়াই চলিল। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকা তাহার স্বভাব নয়। তাছাড়া এই অন্ধকার অপরিচিত পথে শত বাধা বর্ত্তমান! কোথাও পথের ধারে কুকুর "ঘেউ" করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল; বনের ভিতর শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। কাছেই বাঁশবনে বাতাসের আন্দোলনে পাতায় সর্ সর্ মর্ মর্ ধ্বনি উঠিল। সে চমকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; কহিল, "ওমা, শোন, শোন—রায়পুরের মতন এখানেও আবার শেয়াল ডাকে। হ্যাঁগা, এখানে বাঘ বেরোয়? ফেউ ডাকে?" তাহার স্বরে যথেষ্ট ভয়ের আভাষ পাওয়া যাইতেছিল। অরুণ তাহাকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কিছু না—বাঘ-টাঘ এখানে নেই,—দিনের বেলায় দেখবে এখন—তেমন বনও এ সব নয়। এই যে এবার আমরা বাড়ীর কাছেই এসে পড়েচি।" বলিয়া এবার সে নিজে পিছনে থাকিয়া তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিল। বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরে ঢুকিতে রমণীর যেন

পা উঠিতেছিল না। অনেক দিনের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি মনের ভিতর আথালি-পাথালি করিতেছিল। নব বৈধব্যের শোকের তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিতে ছিল। তবু ধৈর্য্যশালিনী নারী কোনমতে দেহ খানাকে টানিয়া লইয়াই যেন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অরুণ মাটীর দাওয়ার উপর কাপড়ের পুঁটুলিটি নামাইয়া হিমুর কাঁখের জলের কলসীটি নামাইয়া পাশে রাখিল। দালানের শেষ প্রান্তে কাঠের দেরকোর উপর বাতাসে নিভু-নিভু হইয়াও একটি মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তাহারই অল্প দূরে বসিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী হরিনামের ঝুলি হাতে করিয়া মালা জপ করিতে ছিলেন। ইহাদের দেখিয়া জপের মালা মাথায় ঠেকাইয়া সে ছড়া ঝুলির ভিতর রাখিয়া দেয়ালের হুকে টাঙ্গাইয়া উঠানে নামিয়া আসিলে বিধবা নত হইয়া তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিলে দেখাদেখি মেয়েটিও তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিধবার শীর্ণ কম্পিত দেহখানি কাছে টানিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে মারে, কি বেশে তোকে দেখ্‌লুম্ রে—আমার রাণীর গায় এমন ছাই কে মাখিয়ে দিলে রে—!"

অরুণ নীরবে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে জানিত, এখন তাহাকে এখানে আর কোন প্রয়োজন হইবে না। নিজের অজ্ঞাতে তাহারও দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে ছিল। দুঃখের জ্বালা যে সে ভালো করিয়াই জানে। তাই দুঃখীর দুঃখে তাহার স্মৃতি-সমুদ্রও উথলিয়া উঠিয়া একবৎসরের পুরাতন শোককে আজ যেন আবার নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিল। ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নী দেবীর স্নেহমাখা মুখ সে কি কখনো ভুলিতে পারিবে! বুকের ক্ষত লোক-চক্ষে অদৃষ্ট থাকিলেও তাহার বেদনা ত ব্যথাতুরের অজ্ঞাত থাকে না। সকল-কিছুর ভিতর দিয়াই বোধ-শক্তি সেইখানেই যে আগে গিয়া পৌছায়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সহরে

(সকালে)

আকাশ হতে রোদের রেখা বাড়ীর মাথা চুমে,
শীতল ছায়া বিছিয়ে আঁচল লুটিয়ে রহে ভূমে,
পথখানি সে ঝাপ্‌সা ধোঁয়ায় কাহার পানে ধায়,
কোন্ অজানার গোপন কথা মরম উতলায়!

(দুপুরে)

বায়স হাঁকে, চড়ুই ডাকে, জড়িয়ে রোদে বাড়ী,
কাঁশারিদের ঝম্‌ঝমানি, কড়া নাড়ানাড়ি,
আস্‌ছে পাশের বাড়ী হতে শিশুর কল-কথা,
স্তব্ধতারি মধ্যখানে বক্ষে ব্যাকুলতা!

(সন্ধ্যায়)

সাঁঝের আলো বিদায়-কালে করুণ চোখে চায়,
গাছের পরে লক্ষ কাকে জায়গা নাহি পায়,
চল্‌ছে গাড়ী, ছুট্‌ছে ঘোড়া, কাজের নাহি শেষ,
আমার বুকে হাত বুলাল শান্ত সে কোন্ দেশ!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

হিমাদ্রি-অঙ্কে

এক রকম ভাবটা সব সময়ে ভাল লাগে না। নরম-গরমের ভিতর দিয়া জীবনটাকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিলে কতকটা আরাম পাওয়া যায়। ষোড়শোপচারে আহারের পর চাট্‌নির প্রশংসা সর্ব্বত্রই শুনা যায়। যদি একটা বিরাট অন্ধকার সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে তরু-শির চুম্বন করিয়া উদীয়মান কনক-কান্তি উষার অরুণ-ছটা এতটা নেত্র-প্রীতিকর হইত না।

একঘেয়ে ভাব বড়ই অসহ্য, উত্থান-পতন চাই, নহিলে জীবনটাকে ধরিয়া রাখা যায় না! ঔরংজীব কবে রাজা হইয়াছিল, সে কথা কি আর কাহারও মনে আছে? কিন্তু আজ যদি তাহার রাজ্যটা তেমনি চলিয়া আসিত, তাহা হইলে ঐতিহাসিকদের মাথা একেবারে গরম হইয়া উঠিত।

কলিকাতার দুর্ভাগ্য, কর্ম্মগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া একটা auto-maton হইয়া পড়িয়াছি। একটু ভাবিবার সময় নাই, একটা হাই তুলিবার সময় নাই; ঘড়ির কাঁটার মত অনবরত চলিয়াছি—সূর্য্যের সঙ্গে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা জুড়িয়া দিয়াছি! সেই সকালে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রটির মত সারাদিন ঘুরিয়া-ফিরিয়া রাত্রি এগারোটার পর শয্যায় অস্ত-গমন! সূর্য্যও হার মানিয়াছে;—তাহার ছুটী সাড়ে পাঁচটা কি ছ'টার পর—আর এ যে রাত্রি এগারোটা! জীবন যেন একটা তপ্ত মরুভূমি, সেখানে একটা অভ্রভেদী শৈল-শিখর নাই, একটা গিরিগাত্র-বাহিনী নির্ঝরিণীও নাই, একটা কুঞ্জ নাই, শ্যামা-দোয়েলের মধুর ঝঙ্কারও নাই! কতবার মনে করিয়াছি যে রুটিনটার একটু ওলট-পালট করিয়া দিই, একবার এই নির্ম্মম বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, মুক্ত আকাশের পাখীর মত উধাও বাহির হইয়া পড়ি, কিন্তু এই লোহার বাঁধন ছেঁড়ে কৈ! এ যে সেই "একদ এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল"র হাড়টি, সে হাড় আর বাহির হইতে চায় না, আড় হইয়া গলার মধ্যে আটকাইয়া গিয়াছে! কখনও কখনও দূরাগত বীণা-ধ্বনির মত আশার অমৃত-বাণী কানের কাছে গুণগুণ করিয়া গাহিতেছে, "টুট্‌ল বাঁধন, টুট্‌ল রে" কিন্তু তাহার ফলে সেই—

"বাঁধ মা বাঁধ মা মোরে, বাঁধ মা কঠিন ডোরে
বাঁধা যে পড়েছি আমি কোথা যাব বল না।"

হঠাৎ পুঁথির পাতা উল্টাইয়া গেল। যে চিন্তা এতদিন বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইত, দয়াময় বিধাতা আজ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চলিলেন। কলিকাতার চারিদিকে বড় বড় বুক-চাপা বাড়ীর মাঝখানে ছোট একটা বাড়ীতে বাস, আকাশ দেখিতে হইলে বাহিরে আসিয়া মুখ তুলিয়া চাতক পাখীর মত হাঁ করিয়া উপর-পানে চাহিতে হয়। এই রকম গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে শুইয়া শুইয়া আনমনে এটা-সেটা কত-কি ভাবিতেছি, এমন সময় গুরুজীর আহ্বান আসিল। সাক্ষাতে গুরুজীর সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা

হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে তিনি কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লইয়া, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভবন আশ্রম-পদ-সমূহে বিচরণ করিয়া কিঞ্চিৎ শান্তি-সুখ অনুভব করিবেন। বহুদিন হইতেই জানিতাম,তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে বৈরাগ্য-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তথাপি আমার প্রত্যয়-মন্থর চিত্ত এ কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। এ কথাও জানি যে তাঁহার কল্পনা টলিবার নয়, তথাপি আমি বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে নবীন তাপসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি বদ্রীনাথ যাচ্ছি, আপনিও চলুন।" আমি বলিলাম, "সে কি কথা! আর দুই-একদিন পরে, আমাদের স্কুল বন্ধ হবে, এই কটা দিন অপেক্ষা করুন, ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ব।"

তাহাই হইল। ১২ই মে আমাদের যাত্রার দিন।

আগ্রা, দিল্লী, দেরাদুন, মুশৌরি প্রভৃতি চঞ্চলশ্রী নগরী-দর্শনের ইচ্ছা কখনও আমার মনে স্থান পায় নাই। যে শান্ত-সৌন্দর্য্যে বিশ্ব-নিয়ন্তার চিরমধুর-শ্রী পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, প্রকৃতি দেবীর অনন্ত-সৌন্দর্য্য-নিলয়, সেই মহাতীর্থ-দর্শনই আমার চির-বাঞ্ছিত।

সে আজ অনেক দিনের কথা, কুমার-সম্ভবের পাতা উল্টাইয়া—

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং
ছায়ামধঃ সানুগতাং নিষেব্য
উদ্বেলিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে
শৃঙ্গানি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ ॥

এই শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে পাগলের মত উন্মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি জানি কেমন হইয়া গিয়াছিলাম।

আর আজ (আমি) সেই "অনন্ত-রত্ন-প্রভব" হিমালয়ের সৌন্দর্য্য-রাশির মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিতে যাইতেছি! এ চিত্তের গতি, অনুভূতি ও অবিরাম আনন্দ-স্পন্দন কেমন করিয়া বুঝাইব?

তখন টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, পথ-ঘাট ভিজিয়া একশা', আমার চোখের পাতাও একটু ভিজিয়া আসিল। বাদলা মাথায় লইয়া রওনা হইলাম। যাইবার সময় বড়দাদাকে বলিলাম,"দাদা, আসি।" তিনি বলিলেন,"এস;" স্বর গম্ভীর ও স্নেহপূর্ণ। আজও তাহা আমার মনের ভিতর ধ্বনিত হইতেছে। সেই একমাত্র "এস" শব্দে তিনি অনেক কথাই বলিলেন!

১২ই মে সোমবার রাত্রি সাড়ে নয়টার গাড়ীতে (বম্বে মেলে) আমরা প্রথমতঃ কাশী রওনা হইলাম। পুণ্য-তীর্থ কাশীধাম—জগতের কত ভাগ্যবান্ সেখানে আসিয়া ধন্য হইয়াছেন! আমার অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য এতদিন ঘটে নাই। মন আনন্দে নাচিতে লাগিল। কাশীধাম দেখিতে এমন হইবে, বিশ্বনাথজীর মন্দিরটা এত ফুট উঁচু হইবে, গঙ্গার জল শীতল ও অমৃতবৎ মধুর হইবে—ট্রেণে বসিয়া এইরূপ নানা কল্পনা করিতে লাগিলাম। ট্রেণে বড় ভিড়। প্রথমতঃ বসিবার,এমন কি দাঁড়াইবারও স্থান হইল না। তবে কথায় বলে, "বস্‌তে পেলে শুতে চায়!" আমাদেরও তাই হইল। কয়েকটি ভদ্রলোকের অনুগ্রহে আমরা একটু বসিবার স্থান পাইলাম। নানা রূপ সরস-নীরস কথাবার্ত্তায় কোন রকমে চলিয়াছি। মাথা রাখিবার স্থান নাই—নিদ্রা যাই কি করিয়া! ঘোড়ার মত দাঁড়াইয়া ঘুমানো অভ্যাস ত কখনও নাই।

ট্রেণ তেমনই চলিয়াছে—নদী, প্রান্তর, বন, উপবন, গিরিপথ অতিক্রম করিয়া সমানে চলিয়াছে। কতই অভিনব দৃশ্য চোখের সাম্‌নে আসিতেছে-যাইতেছে, কিন্তু এক নিদ্রার অভাবে সমস্তই নীরস। আমরা যে গাড়ীতে চড়িয়াছিলাম, সেই গাড়ীতে আর একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি গয়া যাইতেছেন। শুনিলাম, তিনি সেইখানেই থাকেন। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, তাঁর সেখানে বিশেষ প্রতিপত্তিও আছে। ভদ্রলোক "ঠিক হউক আর ভুল হউক" নানা বিষয়ে ঝাঁ ঝাঁ মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকেন। কোন ভদ্রলোক গুরুজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বদ্রীনাথ যে অতি দুর্গম স্থান, কেমন করে যাবেন? আর কেনই বা যাবেন?" তৎক্ষণাৎ সেই গয়া-নিবাসী উত্তর করিলেন, "মশাই, আপনি কি বুঝবেন? ওঁর প্রাণে এখন electric current ছুটেচে, দেখতে পাচ্ছেন না?" আমিও সহযাত্রী জানিয়া বলিলেন, "বৃথা! এঁর দ্বারা হবে না। Curiosity satisfy কর্ব্বার জন্য যাচ্ছেন—একটু গিয়েই ফিরতে হবে।" আমার শরীরটা কৃশ দেখিয়াই এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের যেরূপ অনুমান-শক্তি, তাহাতে একটা ন্যায়ের টোল খুলিয়া বসিলে পণ্ডিত-সমাজে একটু নাম করিতে পারেন!

১৩ই মে মঙ্গলবার মোগল-সরাইএ গাড়ী বদলাইয়া বেলা দশটার সময় কাশী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানে দুইটি ষ্টেশন—একটি কাশী, অপরটি বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট। আমরা কাশী ষ্টেশনেই নামিলাম। বেলা এগারোটার সময় গুরুজীর বন্ধু অনন্তরাম বাবুর বাড়ীতে পৌঁছিলাম। সেখানে যে সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলাম, সে কথা বলাই বাহুল্য।

কাশী—গঙ্গাই কাশীর প্রাণ,কাশীর সৌন্দর্য্য, কাশীর গৌরব। গঙ্গা বরুণা হইতে অসি পর্য্যন্ত আজ বৃত্তাকারে প্রবাহিত। জল মেঘ-মুক্ত নীল আকাশের মতই নির্ম্মল। অনেক রাজা ও জমিদার স্নানার্থীদিগের সুবিধার জন্য গঙ্গার সমগ্র তীর ব্যাপিয়া শত শত স্নান-ঘাট করিয়া দিয়াছেন। একধারে মানমন্দির হিন্দু জ্যোতিষের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দুটি ঘাটে শব দাহ করা হয়, একটি হরিশ্চন্দ্র-ঘাট, অপরটি মণিকর্ণিকা। মহারাজ চৈৎসিংহের রাজ-ভবন গঙ্গার উপরেই অবস্থিত—সমগ্র ভারতে যাঁহার যশোরাশি ছড়াইয়া রহিয়াছে,সেই মহীয়সী দেবী অহল্যারও একটি ঘাট দেখিলাম—সলিলান্তর্গামিনী অসংখ্য সোপানরাজি স্ফটিক-নির্ম্মল ভাগীরথী-তরঙ্গ চুম্বন করিয়া অসি হইতে বরুণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সোপান-শ্রেণীর উপর হইতেই বহুজনপূর্ণ সুমার্জ্জিত রথ্যা বিবিধ আপণ-শোভিত শিলাময় অগণিত বসতি-সমাকুল বিপুল নগরী ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করিয়াছে। গঙ্গা-বক্ষে বিচিত্র বেশ-ধারী নরনারীপূর্ণ নৌকাগুলি ইতস্তত ভাসিয়া যাইতেছে, তীরোপবিষ্ট শত শত সমাগত ভক্তের উপাসনাময়ী মূর্ত্তির শান্ত-ছায়া ধারণ করিয়া ভাগীরথী কুলু-কুলুস্বরে বহিয়া চলিয়াছে। প্রবাহিনীর অপর পার্শ্বে বালুকাময়ী শুভ্র সৈকত-ভূমি অতি-দূর পর্য্যন্ত গিয়া তরুরাজির নীল রেখার সহিত মিলাইয়া গিয়াছে! এই গঙ্গার তীরে, স্তিমিত-নেত্রে যুক্ত-কর শত শত ভক্তের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদু তরঙ্গোচ্ছ্বাসের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রুদ্ধ

দ্বার ভগ্ন করিয়া প্রাণের উৎস ছুটিয়া বাহির হইল—

কত নগ-নগরী ধন্য হইল, তব
চুম্বি চরণ-যুগ মায়ি!
কত নর-নারী ধন্য হইল মা,
তব সলিলে অবগাহি—
বহিছ জননি! ভারতবর্ষে
শত শত যুগ-যুগ বাহি
করিছ শ্যামল কত মরু-প্রান্তর
শীতল পুণ্য-তরঙ্গে।

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম। বেলা তখন পাঁচটা। নৌকা করিয়া নাগোয়ার কাছাকাছি গিয়া নৌকা হইতে নামিলাম; সন্ধ্যার হাওয়ায় গঙ্গাতীরে একটু বেড়াইয়া আবার নৌকায় উঠিলাম। সন্ধ্যার আগমনে নবোদিত শশিকলার স্মিত কিরণে উচ্ছ্বসিত মন্দানিল-স্পর্শে ঈষদান্দোলিত গঙ্গাবক্ষে এক অপূর্ব্ব হৃদয়-প্লাবিনী মধুময়ী শ্রী ধারণ করিল। গুরুজী গাহিতে লাগিলেন—"চাঁদ উদিল, ঐ শ্যামচাঁদ এলো কই?" ধীরে ধীরে সঙ্গীত-রব অনন্তে মিশিয়া গেল। মন হারাইয়া গৃহে ফিরিলাম।

২

রাত্রে লুচি-তরকারী তত ভাল লাগিল না। অনন্তবাবুর আত্মীয় বৈজমল আমাদের বড়ই যত্ন করিতেছে। কিন্তু রাত্রে যে ঘরে আমাদের শুইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেখানে বায়ুর নাম-গন্ধও নাই, গরমে ঘুম আসে না! রাত্রি এগারোটার পর আর সে ঘরের মধ্যে থাকিতে পারিলাম না। একটা কম্বল লইয়া আমরা বরাবর গঙ্গার ঘাটে চলিলাম। অহল্যা ঘাটে গিয়া দেখি, কতকগুলি কাঠের তক্তা পাতা আছে, তাহারই উপর কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। গুরুজী শুইবামাত্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন। বড় আরামেই শুইয়াছিলাম, ঘুম কিন্তু তখনই আসিল না, কারণ তখন আমি গুরুজীর মৃদু-মধুর নাসিকাধ্বনি হারমোনিয়মের প্রথম পর্দ্দার (সি শার্প) কাঁপানো সুরের সঙ্গে মেলে কি না, তাই ভাবিতেছিলাম। সকাল বেলা "এ শুৎনে-ওয়ালা ভাই উঠো" এই স্বরে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। একেবারে স্নানাদি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

আজ ১৪ই মে। গুরুজীর বন্ধু গোপাল বাবুর বাড়ীতে আহারাদি করিয়া বেলা সাড়ে নয়টার পর একখানি একা চড়িয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিলাম। তখন মেল ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। Cantonment stationএ মেল-ভ্রমে প্যাশেঞ্জার ট্রেণে চড়িয়া হরিদ্বার রওনা হইলাম। যাত্রী কম ছিল; বেশ নিদ্রা হইয়াছিল, কিন্তু দুই দিন ধরিয়া প্যাশেঞ্জার ট্রেনের মন্দদুলালী চালে প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্যাশেঞ্জার ট্রেণে এতদূর পথ পাড়ি মারা আমার অদৃষ্টে এই প্রথম। শুনিলাম, গুরুজীর এরূপ অনেকবারই হইয়াছে। যাহা হউক টাইম টেব্‌ল্ না দেখিয়া ট্রেণে চড়িবার আক্কেল সেলামি বেশ পাইলাম। পথে বৈজমলের কথা অনেকবার মনে হইল, ভদ্রলোকের যত্নে কেমন একটা আন্তরিকতা ও মধুরতা ছিল।

লুকসর ষ্টেশনে ট্রেণ বদলাইয়া দেরাদুন মেলে চড়িয়া বসিলাম। তাড়াতাড়িতে গুরুজী গায়ের চাদরটা আগের গাড়ীতেই ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ভারি 'বরাত-জোর, তাই একটি ভদ্রলোক

অনুসন্ধান করিয়া চাদরটি আমাদের কাছে পৌছাইয়া দিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। ইতিপূর্ব্বে একবার হরিদ্বার আসিয়াছিলাম, সেখানে আর না নামিয়া, হৃষিকেশ রোড ষ্টেশনেই নামিবার সঙ্কল্প করিলাম। ট্রেণ হইতে হরিদ্বারের গঙ্গা দক্ষিণে রাখিয়া চলিলাম। দূর হইতে গঙ্গার দৃশ্য অতি-রমণীয়—আরও দূরে নীলধারা দেখিতে পাইলাম; নীলধারার জল নীল আকাশেরই প্রতিচ্ছবি। লাইনের দুই দিকে জঙ্গল, দুই চারিটা ময়ূর এ-দিকে ও-দিকে খেলা করিতেছে; কোনটি বা পশ্চিমগগনশায়ী সূর্য্যের আলোকে তাহার পুচ্ছ মেলিয়া দিয়াছে।

আজ ১৫ই মে। বেলা পাঁচটার সময় হৃষিকেশ রোড ষ্টেশনে পৌছিলাম, এখান হইতে হৃষিকেশ ৭ মাইল। তখনই একটি টঙ্গা করিয়া (ভাড়া ১৷৷০) রওনা হইলাম। হৃষিকেশ যাইবার রাস্তাটি অতি সুন্দর, মাঝে মাঝে দুই-একটি গিরি-নির্ঝরিণী বিজন বন-ভূমির বক্ষ বহিয়া আনমনে কোথায় চলিয়াছে। তখনও আমাদের স্নানাদি কিছুই হয় নাই। পথিমধ্যে একটি স্বচ্ছ নির্ঝরের জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় স্নিগ্ধ-শ্রী হৃষিকেশ-ধামে উপনীত হইলাম।

হৃষিকেশ

টঙ্গা হইতে নামিয়াই দেখিলাম, মহাত্মা কালী কম্লীওয়ালার বৃহদায়তন ধর্ম্মশালা। সেইখানেই আশ্রয় লইলাম। ধর্ম্মশালার সম্মুখেই রাস্তা, রাস্তার দুইদিকে নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ অনেকগুলি দোকান। পথ প্রস্তরময় ও সুমার্জ্জিত। এই পুণ্যতীর্থ ক্রমে ক্রমে একটি নগরে পরিণত হইতেছে। চারি দিকেই বড় বড় রাস্তা। কোনটির নাম উড রোড, কোনটির নাম চন্দ্রশেখর রোড ইত্যাদি। এখানে P. W. D. র একটি সুদৃশ্য বৃহৎ বাংলো আছে। হৃষিকেশে ঢুকিলেই বাংলো দেখা যায়। ডাকঘর, তার-ঘর ও হাসপাতাল সবই আছে। খাবারের দোকান অনেকগুলি আছে, সেখানে কলিকাতার মত নানাবিধ মিষ্টান্নও পাওয়া যায়। এখানেও পাণ পাওয়া যায়, কিন্তু হৃষিকেশের পর হইতেই যাত্রীর কণ্ঠ-সরসকারী প্রিয়সখা 'পাণ' ডুস্থুরের ফুল হইয়া গিয়াছে। শুধু হৃষিকেশ কেন, কোথাও সিগারেটের অসদ্ভাব দেখিলাম না; কলম্বিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া কাঁচি, থ্রী ক্যাস্‌ল্‌স্, ষ্টেট এক্সপ্রেস্—সমস্তই পাওয়া যায়। ধন্য সিগারেটের মহিমা! যেখানে সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম, যেখানে পূতবাহিনী গঙ্গার বিমল সলিলে সকল বাসনা পরিতৃপ্ত হয়, সেই দূর হিমালয়-শিখরেও তোমার বিজয় পতাকা উড়াইয়া দিয়াছ!

হৃষিকেশজীর মন্দিরটি গঙ্গার একটু উপরেই অবস্থিত। মন্দিরাধিষ্ঠাতৃ দেবতা উচ্চে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট হইবে। মূর্ত্তি পাষাণময়ী, অতি গম্ভীর। দর্শন-কালে মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। কেন, তাহা বলিতে পারি না। মন্দিরের সম্মুখেই উন্মুক্ত আকাশ, নিম্নে গঙ্গা, দৃশ্য অতি মনোরম। অন্যপার্শ্বে গঙ্গার বাঁকের উপর শুভ্র বালুকা-শোভিত তীরে অনেকগুলি অগ্নিহোতা সাধুর আশ্রম দেখিলাম। অতিথির প্রতি তাঁহাদের আদর-যত্নের কোন ত্রুটি নাই। গঞ্জিকা-টঞ্জিকা তাঁহাদের বেশ চলে। বোধ হয় ঠাণ্ডা

বরদাস্ত করিবার জন্যই এই রকম একটা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার ধর্ম্মশালা হইতেই চলিয়া থাকে।

মহাত্মা কালী কম্লীওয়ালার ধর্ম্মশালার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। এখানে সাধু ও দরিদ্র তীর্থযাত্রীদিগকে সদাব্রত দেওয়া হয়। হৃষিকেশ-নিবাসী ও অন্যান্য সমাগত সাধু মাত্রেই এই ধর্ম্মশালায় প্রতিদিন অন্ন পাইয়া থাকেন। সদাব্রত-প্রার্থী সাধু ও দরিদ্র তীর্থযাত্রী হৃষিকেশ-ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষের নিকট হইতে সদাব্রতের অনুমতি-পত্র লইয়া বদ্রীনাথ গিয়া থাকেন। এইরূপ সদাব্রতের ব্যবস্থা মহাত্মা কালী কম্লীওয়ালার প্রত্যেক ধর্ম্মশালায় আছে, কিন্তু হৃষিকেশ ধর্ম্মশালা হইতে অনুমতি-পত্র না পাইলে অন্যত্র এই অনুগ্রহ পাওয়া যায় না। হৃষিকেশ ধর্ম্মশালাই কম্লীওয়ালার অন্যান্য ধর্ম্মশালার head-quarters; এখানে আরও কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে, কিন্তু ঐ সমস্ত ধর্ম্মশালার ব্যবস্থা কি রকম, তাহা জানি না, জানিবার সুবিধাও ঘটে নাই।

সে সময় যাত্রীর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে অনেক চেষ্টা করিয়াও অত বড় বাড়ীর মধ্যে একটা ছোট-খাট কামরাও আমরা পাইলাম না, সব কামরাই ভরিয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ কৃপা করিয়া তাঁহার বসিবার স্থানটি আমাদের বিশ্রামের জন্য রাত্রির মত ছাড়িয়া দিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মশালাতেও চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ফল হইল না। সর্ব্বত্রই সেই "ন স্থানং তিলধারণং"। যাত্রীর মধ্যে প্রায় সকলেই মাড়োয়ারী, বাঙ্গালীর মুখ দেখিলাম না। ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠাতা মাড়োয়ারী, অধ্যক্ষ মাড়োয়ারী, দোকানদারও বেশীর ভাগ মাড়োয়ারী। যে সমস্ত বড় বড় নূতন ইমারত তৈয়ারী হইতেছে, তাহারও অধিকারী মাড়োয়ারী। শুধু হৃষিকেশ নয়, সর্ব্বত্রই এই রকম। বদ্রীনাথ পর্য্যন্ত এই একই ভাব দেখিতে পাইলাম, এক কথায় সমস্ত উত্তরাখণ্ড মাড়োয়ারীর বলিলেও চলে। এই শত শত যাত্রী,—সকলেই অবশ্য বদ্রীনাথ যাইবে না, লছমন-ঝোলা পার হইয়া গঙ্গাজীতে স্নান করিয়া দেশে ফিরিবে; বদ্রীনাথের যাত্রী খুবই কম।

তার পর হোটেলের কথা। একটী মাত্র হোটেল—মালিক দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ। ডাল, ভাত আর হাতে গড়া মোটা মোটা চাপেটী রোটী সেখানে পাওয়া যায়—ডালটা রাঁধে ভাল—যাহারা রন্ধনাদি কার্য্যে অসমর্থ, অথচ ধর্ম্মশালার আতিথ্য-গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাহাদের গতি ঐ হোটেলে। দোকানে অবশ্য লুচি, তরকারি, সন্দেশ, দুধ সবই পাওয়া যায়। খাবার জিনিষগুলি কলিকাতায় খাবারের চেয়ে ভাল বলিয়াই বোধ হইল। এ রকম খাঁটী জিনিষে তৈয়ারী ভাল খাবার আরও দুই-এক জায়গায় পাইয়াছিলাম। বদ্রীনাথের খাবার অতি উৎকৃষ্ট। সেখানকার বড় বড় মালপোর কথা আমার আজও বেশ মনে পড়ে। কিন্তু অন্ন পাইলে এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালী লুচি-সন্দেশ ফেলিয়া দেয়। হোটেল-স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কেত্তা চাউর দেগা?" চাউর মানে ভাত! আবার আহারের Bill হইল, "চাউরের" পরিমাণ হিসাবে। দেখিয়া একটু হাসিলাম। চাউর ও ভাল তরকারীর তুলনায় দাম কিছু বেশী

পড়িল। যাহা হউক, এত ক্ষুধায় আহার বেশ তৃপ্তির সহিতই হইয়াছিল।

আহারাদি শেষ করিয়া গঙ্গাতীরে যাইতেছি, এমন সময় পথে একটি বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের দেখা হইল। তিনি পাগলের ভাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তায় বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় পাইলাম। আলাপ-পরিচয়ে জানিলাম, তিনি ইংরাজি ও সংস্কৃত বেশ জানেন। আমাদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গিয়া বালুচরের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "রাজোচিত শয্যাও ইহার নিকট মলিন, এ যে আমার মায়ের কোল রে!" এটা সেটা অনেক কথার পর "তবে বসুন, আমি আসি" বলিয়াই ঝড়ের মত সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। গুরুজী কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন, আমিও তদবস্থ। সম্মুখে গভীরনাদিনী, খরস্রোতা গঙ্গা,—চারিদিকে জ্যোৎস্নাপ্লুত পাদপ-মণ্ডিত গিরিশ্রেণী, উপরে সুবিস্তারী নীল নির্ম্মল আকাশ—এ যেন মহাভাবের নিত্য লীলাভূমি!

ক্রমেই রাত্রি বাড়িতে লাগিল। অনিচ্ছাকৃত অলস পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে গৃহের দিকে ফিরিলাম। আশ্রম হইতেই গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গ ও ছল-ছল কল-কল নাদ তীরবর্ত্তী বিস্ময়মুগ্ধ পথিকের হৃদয় ভগবৎ-ভক্তিতে পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল।

পয়সা খরচ করিয়া লোক এখানে আসে কেন? শুধু একা নয়, সবল সুস্থকায় যুবা নয়—যুবা, বৃদ্ধ, সকলেই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু-সন্তান গুলিকে লইয়া এই দূরদেশে দারুণ দুঃখ ও আপৎ মাথায় লইয়া আসে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর গৃহের কোণে বসিয়া পাওয়া যায় না—; ঐশ্বর্য্যে, শিক্ষায় ও সভ্যতায় সমৃদ্ধ দেশ-পর্য্যটনেও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। এ প্রশ্নের উত্তর চিরমধুর শান্ত প্রকৃতির কোলে, ইহার প্রতি অণু-পরমাণুতে ধ্বনিত হইতেছে! যে একবার এই নগ্ন বিরাট প্রকৃতির সামনে দাঁড়াইবে, সে-ই ইহার উত্তর পাইবে। ইহার এক একটি রেণুতে যে বিপুল সৌন্দর্য্য নিমেষে তরঙ্গায়িত হইতেছে তাহা পৃথিবীর নয়—স্বর্গের! ইহা শুধু নেত্রের তৃপ্তি-কর নয়—অন্তরের অতি-গভীর আনন্দ-স্পন্দন!

৩

বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলাম, ধর্ম্মশালায় আসিয়াই শুইয়া পড়িলাম। নিদ্রা অনেকক্ষণ হইতেই চোখের পাতা দুটিকে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। শুইবামাত্র অবাধে আপনার কার্য্য সে শেষ করিল। ভোরের হাওয়ায় ঘুম ভাঙ্গিলে হৃদয়-তন্ত্রীতে যেন কাহার মৃদু-মধুর স্নেহের আকর্ষণ বোধ করিলাম। বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলাম। এতদিন গাড়ীতে আসিয়াছি,—আজ হইতে হাঁটা পথ আরম্ভ হইল। সকাল বেলাতেই একটা মুটের মাথায় লোটা-কম্বল তুলিয়া দিয়া জয় নারায়ণ বলিয়া স্বর্গাশ্রমের দিকে চলিলাম।

১৬ই মে। হৃষিকেশ হইতে গঙ্গাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রায় ছয় মাইল পথ আসিয়া একটি আশ্রমে পৌঁছিলাম। সম্মুখেই একটি গেট, গেট পার হইয়া ভিতরে ঢুকিলাম। অনেকগুলি কক্ষ-বিশিষ্ট গৃহ,—তাহাই আশ্রম। মাঝের ঘরটি খুব বড়। সেই ঘরে নানাবিধ পুস্তক রহিয়াছে; একটি লাইব্রেরী বলিলেও

চলে। সামনে বারাণ্ডা, বারাণ্ডার পরই বাগান। U, P.র জজ মহাত্মা বৈজনাথ রায় বাহাদুর তাঁহার গুরু মহাত্মা সাধু রামতীর্থ স্বামী এম, এ মহোদয়ের স্মরণার্থে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্থানটি অতি মনোরম। আশ্রমের সামনেই লছমন ঝোলা যাইবার পাহাড়ি পথ। তাহার পরই একটি বৃহৎ স্নান-ঘাট, গঙ্গার স্বচ্ছ বারি ঘাটটির সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে।

গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ-যাত্রিগণ এইখান হইতেই মাল-পত্র লইয়া যাইবার জন্য কাণ্ডীওয়ালা ভাড়া করিয়া থাকেন। বদ্রীনাথ পর্য্যন্ত যাওয়া আসায় কাণ্ডীওয়ালার ভাড়া কিছু ৪৫৲ টাকার কম পড়ে না। খোরাকির দরুণ তাহাদিগকে দৈনিক দুই পয়সা, কখনো বা চার পয়সা করিয়া দিতে হয়। এইখানে ছাপান ডাণ্ডিও পাওয়া যায়। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, হৃষিকেশেও এইরূপ ডাণ্ডি ভাড়ার ব্যবস্থা আছে।

আশ্রমের বাহিরে আসিয়া নৌকার আশায় ঘাটের উপর বসিয়া পড়িলাম। এইখানে নৌকা পাওয়া যায়। পার হইয়া স্বর্গাশ্রম যাইতে হয়। যাহারা বরাবর লছমন ঝোলা হইয়া বদ্রীনাথ যায়, তাহাদের আর নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইবার প্রয়োজন হয় না। হৃষিকেশ ও লছমন ঝোলার মাঝখানে গঙ্গার অপর পার্শ্বে স্বর্গাশ্রম. সুতরাং এইখান হইতেই নৌকা করিয়া স্বর্গাশ্রম যাওয়াই সুবিধাজনক। এপার হইতেই স্বামীজীর সেই সৌম্য, সমুন্নত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। নৌকার বিলম্ব দেখিয়া গুরুজী বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমার মনে হইল লাফ দিয়া স্রোতস্বিনী পার হইয়া যাই। "এ না-ওয়ালে, তুরন্ত্ আও" বলিয়া বহু বার ডাকিলাম। কিন্তু ডাক শোনে কে, প্রত্যুত্তরে কেবল গঙ্গার কল-কল স্বরই কানে বহিয়া গেল। গুরুজী রসিক লোক, বেশ গাহিতে পারেন; তিনি ঘাটে বসিয়া গান ধরিলেন,

"আমি ভক্তের তরে ঘাটে ঘাটে
নিয়ে বেড়াই ভাঙ্গা তরী।"

আর দেরী সহ্য হয় না, বেটা না-ওয়ালে কি এখনও ঘুমাইতেছে? বড়ই রাগ হইল। কিন্তু রাগ করিই বা কাহার উপর, আর মাথা ভাঙ্গিই বা কাহার? পকেটে কতকগুলা ছোলা ছিল, বসিয়া তাহাই চর্ব্বণ করিতে করিতে রাগের শান্তি করিতে লাগিলাম। অবশিষ্ট ছোলা গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া মাছের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম—সময় বুঝিয়া মৎস্য-ভায়াও don't care করিয়া দিল।

এই প্রসঙ্গে হৃষিকেশের গঙ্গায় মাছের কথা মনে হইল। আটার গুলি করিয়া জলে ফেলিয়া দিবামাত্র ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসিয়া সেগুলি টপাটপ্ গলাধঃকরণ করিতে থাকে, সে এক অপরূপ দৃশ্য! এক এক ঝাঁকে আশি-নব্বইটা মাছ থাকে; মাছগুলি ওজনে পাঁচ-ছয় সের হইতে এক মণ দেড় মণ হইবে। ইচ্ছা করিলে দুই-একটা মাছ ধরিতেও পারা যায়, তাহারা একেবারে মানুষের কোলের কাছে আসিয়া পড়ে। আমাদিগকে বোধ হয় বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে

পারে নাই, নহিলে সাহস করিয়া এতটা কাছে আসিত না।

এই সবে সাতটা, গুরুজী ইহারই মধ্যে হায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বহু চেষ্টাতেও, দুধ ত দূরের কথা, একটু গুড়ও পাইলাম না। অবশেষে প্রতিপদের চাঁদের মত দূরে নৌকাখানি দেখা দিল। নৌকা ঘাটে না লাগিয়া আঘাটায় লাগিল; মুটিয়াকে ডাকিলাম, সে ইতি পূর্ব্বেই তাহার প্রাপ্য ছ'আনা পয়সা পাইয়াছিল; মুটিয়া কলির ধর্ম্ম পালন করিয়াছে, সুবসর বুঝিয়া বুদ্ধিমানের মত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে। কি করি, নিজে মুটিয়ার পদাভিষিক্ত হইয়া নৌকায় উঠিলাম। গঙ্গার মাঝে গিয়া নৌকা আর চলে না; নীচে বড় বড় পাথর, নৌকা তাহাতে আটকাইয়া গিয়াছে; মাঝিরা বহু কষ্টে নৌকা আরও কতকদূর লইয়া গিয়া সকলকেই নামিতে বলিল। কি জানি কেন, আমাদের উপর একটু দয়া হইল আমাদিগকে নামিতে নিষেধ করিল। কোনরকমে তীরে পৌঁছিয়া মোট মাথায় স্বামীজীর আশ্রমে গিয়া মোট রাখিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া একটা তক্তার উপর বসিয়া পড়িলাম।

তারপর স্বামীজির আদরের কথা—সে আর কি বলিব! যিনি জগতের প্রত্যেক মানবকে আত্মবৎ দেখেন, তাঁহার যত্নে যে কি এক মধুরতা, কি এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয়

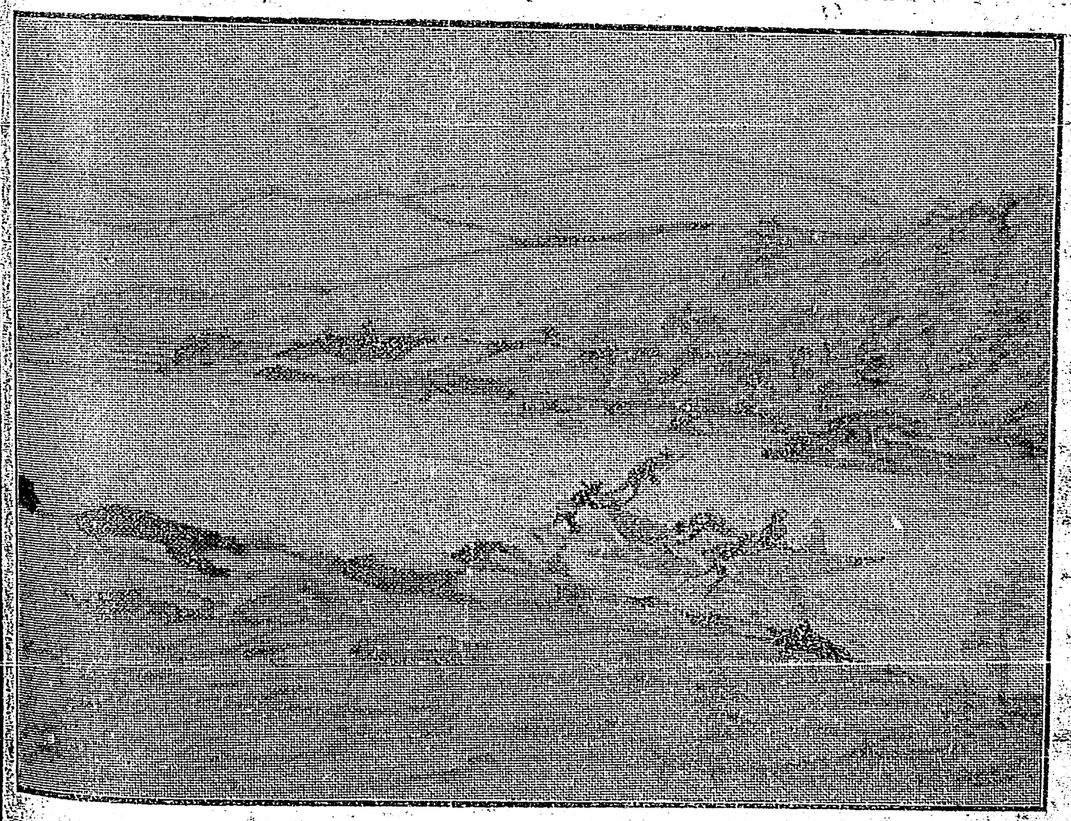

নীচে বড় বড় পাথর, নৌকা তাহাতে আট্‌কাইয়া গিয়াছে।

ভাব মাখানো আছে, তাহা বলা যায় না। স্বামীজীর মধুর উপদেশগুলি আমার সর্ব্বদাই মনে পড়ে। আমি বেশ বুঝিলাম, তাঁহার জীবনে প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক অনুষ্ঠানই উপদেশ-পূর্ণ! তাঁর প্রত্যেক কথাতেই এক একটী শাস্ত্রীয় সত্য নিহিত। একটা দৃঢ়তার, একটা মহা কর্ত্তব্য-পরায়ণতার ভাব তাঁহার কথায় ও কার্য্যে বেশ পরিলক্ষিত হয়—তাঁহার মহানুভবতা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করিয়াছি।

স্বর্গাশ্রমে মহাত্মা কালী * কম্বলীওয়ালার একটিধর্ম্মশালা আছে, সাধুত্তম আত্মপ্রকাশ স্বামী এই ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ, তাঁহারই যত্নে ও ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ শত শত সাধু ও দরিদ্র-নারায়ণ সমাদরে অন্ন পাইতেছেন। ধর্ম্মশালার পাশে একটু নীচেই স্বামীজীর আশ্রম, আশ্রম অতি রমণীয় ও নির্জ্জন। স্বর্গাশ্রম প্রকৃতই স্বর্গাশ্রম! সম্মুখেই পুণ্য-সলিলা খরস্রোতা কল-নাদিনী গঙ্গা! পরপারে অত্যুন্নত সুদীর্ঘ শৈলমালা প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় সকল সময়েই এই আশ্রম মধুময়! চন্দ্রালোকে স্নিগ্ধ তরুরাজির পল্লবান্তরবাসী ময়ূরগণের কেকারব তাপসগণের অলৌকিক আনন্দ উৎপাদন করে, বিহগকুলের শ্রুতিসুখদায়ী কলধ্বনি বায়ুমণ্ডলের স্তরে স্তরে মূর্চ্ছিত হইয়া আনন্দ তরঙ্গ ছুটাইয়া দেয়।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে স্বামীজী ও আর একটী সাধুর সঙ্গে আমরা আশ্রমের একটু দূরে একটা গুহা (সেখানকার লোকে গুহাকে গুফা বলে) দেখিতে বাহির হইলাম। গুহার নাম শুনিয়া মনে ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল, কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে ঔৎসুক্যের কোন কারণ ছিল না। তবে সেই স্থানটীর বৈচিত্র্য ভুলিবার নয়। তরঙ্গময়ী গঙ্গা গুহার দ্বার-দেশ ধ্বনিত করিয়া ঘোর রবে বহিয়া চলিয়াছে! এইখানে পাহাড়ের উপর চারি দিকেই নিবিড় জঙ্গল। স্বামীজী বলিলেন, এই জঙ্গলে সময়ে সময়ে দুই একটা বুনো হাতি দেখা যায়, ভালুকেরও ভয় আছে। একদিকে ভীষণতা, শৈলমালার দিকে অগ্রসর হইতে ভয়ে পা কাঁপিতে থাকে, অপর দিকে অনন্ত রূপরাশি ছড়াইয়া দিয়া হরিপদ-তরঙ্গিনী গঙ্গা। যখন সন্ধ্যার রক্তিম রাগে সমস্ত প্রদেশ উচ্ছ্বসিত, তখন নীরবে সুমন্দ পদক্ষেপে আশ্রমের দিকে ফিরিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় গুরুজীকে লইয়া একটু বিপদে পড়িয়া ছিলাম —সহসা ভাবাবেশে তিনি অত্যন্ত উতলা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আজ ১৭ই মে। আজও স্বামীজীর আশ্রমে। প্রাতঃকালে নৌকা করিয়া রামতীর্থের আশ্রমে গিয়া গঙ্গাকে দক্ষিণে রাখিয়া লছমন-ঝোলার দিকে অগ্রসর হইলাম। শুধু গুরুজী ও আমি—সঙ্গে আর কেহ নাই।

শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ।

---

* কাল কম্বল গায়ে দিতেন বলিয়া তাঁহার নাম "কালী কম্লীওয়ালা" কেহ কেহ এই কথাও বলিয়া থাকেন।

দুপুর-অভিসার

(গৌড় সারঙ্—দাদ্‌রা)

যাস্ কোথা সই একলা ও' তুই অলস বৈশাখে ?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ?
সাঁজ ভেবে তুই ভর দুপুরেই দুকূল নাচায়ে
পুকুর-পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাস্‌নে একা হাবা ছুঁড়ি,
অফুট জবা চাঁপা কুঁড়ি তুই !
ছাখ্ রঙ্ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগ্‌বধূ ফাগ থাবা থাবা ছুড়ি' ;
পিক-বধূ সব টিট্‌কিরি দেয় বুল্‌বুলি চুমকুড়ি
ওলো বউল-ব্যাকুল রসাল তরুর সরস ঐ শাখে ॥
দুপুর বেলায় পুকুর গিয়ে একূল ওকূল গেল দুকূল তোর,
ঐ চেয়ে ছাখ্ পিয়াল-বনের দিয়াল ডিঙে এলো মুকুল-চোর।
সারঙ্ রাগে বাজায় বাঁশী নাম ধরে' তোর ওই,
রোদের বুকে লাগ্‌লো কাঁপন সুর শুনে ওর সই।
পলাশ অশোক শিমুল-ডালে
বুলাস্ কি লো হিঙুল গালে তোর ?
আ'— আ' ম'লো যা' ! তাইতে হা ছাখ্
শ্যাম চুমু খায় সব সে কুসুম লালে !
পাগ্‌লী মেয়ে ! রাগ্‌লি নাকি ? ছি ছি দুপুর-কালে
বল্ কেম্‌নে দিবি সরস-অধর-পরশ সই তাকে ?

কাজী নজরুল ইসলাম।

একটি প্রশ্ন

বেদ-বেদান্তের উপর বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থাপিত নহে। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর, (Soul) ও হিন্দুর জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধ মতে "নির্ব্বাণ" অর্থ বিলীন হওয়া নহে। নির্ব্বাণ লাভের অর্থ—কুপ্রবৃত্তি বিনাশ, অজ্ঞতা বিনাশ ও প্রকৃত জ্ঞানলাভ দ্বারা ইহজীবনেই প্রকৃত শান্তিলাভ। অথচ বুদ্ধদেবকে আমরা অবতার বলিয়া মানি। ইহার কারণ কি ?

যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার সদুত্তর প্রদান করেন, তবে পরম বাধিত হইব।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গল্পের আর্ট

(গল্প)

দার্জিলিংএর ডাকগাড়ীতে একখানা প্রথম শ্রেণীর মেয়েদের কামরায় সেদিন যাত্রী ছিলেন দুটী তরুণী। বাঙালী ঘরেরই মেয়ে, দুজনেই বেশ সুন্দরী। সমানই বয়স দুজনের, হাব-ভাব, বিশেষ ধরণের পরা সাড়ীটী, সৌখীন জাঁকালো জামার ক্যুট্‌টী আর সব মিলে মোটের উপর সাদাসিধে পরিচ্ছন্ন সাজ-গোজটী এঁদের ঠিক একই রকমের।

সঙ্গে খবরদারি করবার জন্যে পুরুষ মানুষ কেউ নেই, অথচ এঁরা চলেছেন এই দীর্ঘ রাস্তা—সাড়ে তিনশ' মাইলেরও উপর—"সোমত্ত মেয়েমানুষ"—ব্যাপারটা "কি জানি বা আজকালকার" গোছের হলেও কথাটা সত্য এবং সেজন্য মেয়ে দুটীর কোনো-রকম শঙ্কা বা এতটুকু স্বস্তির অভাবও ছিল না। তাঁরা দিব্যি খোস্ হালে, বহাল-তবিয়তে আইন-কলেজের বাহাদুর ছেলেদের মতই বে-পরোয়া চলেছিলেন। মেয়েদুটী কুমারী, গ্রাজুয়েট, ইংরেজী সাহিত্যে এ-গ্রুপে এম-এ পড়েন।

একজনের নাম লালিমা রায়, আর এক জনকে বোর্ডিংএ মেয়েরা ডাকতো নেলী বলে, কিন্তু নাম জারী হয়েছিল নিলীনা দেবী নামে—আর সে খাঁটী আইন-সঙ্গত নামজারী, কারণ ডিগ্রির দলিল দু'খানা জজ পূজনীয় স্যর আশুতোষ নিজের হাতে দস্তখত করে দিয়েছিলেন।

লালিমার মামা মিঃ ভউমিক দার্জিলিংএ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করেন—টেলিগ্রাফের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট। এঁরা দুই বন্ধুতে মিলে মাঝে মাঝে শৈল-ভ্রমণে যান, এবারও এপ্রিলে গেছলেন। এবার পাহাড়ের সিক্ত হাওয়ায় স্বাস্থ্য আর মেঘলা দেশের মধুর শোভায় মন ভরে নিয়ে কলকতায় ফিরে চলেছেন!

লালিমা ইলেক্‌ট্রিক পাখাখানার নীচে গদির উপর বর অঙ্গের ভর না রেখে খুব একটানা মনোযোগে একখানা মাসিক কাগজ পড়ছিলেন। আর নিলীনা বালিশটার উপর হেলে পড়ে কখনো দেখছিলেন, গাড়ীর কাচের ন্যায় ঠকঠকে চোকোলেট বালিশের উপর আলোর নাচ্‌না, কখনো বা কাঁচের বন্ধনের ভিতর তার উজ্জ্বল, সরু, তারে-গড়া দেহটা, আবার কখনো চোখ বুজে ভাবছিলেন বুঝি, কাকার ছেলে ভণ্ডুলের চোখ-মুখ-ভরা দুষ্টুমির কথা!

ওদিকে লালিমাটি চুপ! এদিকে এই অশ্রান্ত, বিনিদ্র ডাকগাড়ী ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটেছে—আর লোহার রাস্তার উপর তার চাকার শক্ত আঘাতগুলো ঝণঝণ করে উঠ্‌চে—বেচারী আর কতক্ষণ পারে, এটা-ওটা-সেটা নিয়ে একলাটী আনমনে! স্তব্ধ নিশীথের এ নিঃশব্দ যাত্রা গল্পে গুলজার হয়ে উঠ্‌লেও না-হয় সহ্য হয়!

এবার তাই বাঁ হাতের সুগোল কনুইটীর উপর ঈষৎ [illegible] উঁচু হয়ে উঠে তিনি বল্‌লেন,

—"এই—তুই—রাখ্ বল্‌চি—নইলে কাগজ টেনে ফেলে দেব।"

"থাম্ না, একটু চুপ করে ঘুমো।"

"না—তা হলে তুই চেঁচিয়ে পড়্।"

"ভাবের পাকা জহুরী আর্টটা কষে দেখ্‌চি, চেঁচিয়ে পড়্‌লে ধরা-ছোঁয়া যাবে না।"

"আর্ট ধরে ছুঁয়ে আর কাজ নেই—তুই না হয় একটা গল্প বল্।"

লালিমা হ্যাঁ-না কিছুই না বলে কাগজের এ দিকটা উল্টে ও-পিঠের প্রথম লাইনটা আরম্ভ করে দিলেন। বাহিরের ভিজে হাওয়া খড়খড়ির ফাঁক্ দিয়ে এসে গায়ের উপর সির্‌সির্ করে উঠছিল বলে নিলীনা ফেরোজা রঙের শালখানা পায়ের উপর খানিক টেনে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন—সাড়ীর আঁচলটা ঘাড়ের কাছে বালিশের হুইপিং দেওয়া ফ্রিলটার উপর লুটোপুটি খেতে লাগলো।

খানিকক্ষণে পড়া শেষ করে মিস্ লালিমা উঠে বসবার উদ্যোগ করছেন—এমন সময় গাড়ী এসে একটা ষ্টেশনে দাঁড়ালো। প্ল্যাটফর্মের উপর উজ্জ্বল আলোর নাচে দাঁড়িয়ে একটী ফুটফুটে বাবু—চশ্‌মা-পরা—হাতে একখানা সরু বেতের ছড়ি—একজন বারান্দা-ওয়ালা টুপী-চড়ানো রেলের বাবুর সঙ্গে ব্যস্ত ভাবে কি কথা কইছিলেন—লালিমার দৃষ্টি হঠাৎ সার্সির স্বচ্ছতা ভেদ করে সেই বাবুটীর উপর গিয়ে পড়লো। তিনি পাশের খড়-খড়িটা ফেলে দিয়ে নিলীনাকে টুট্ করে টেনে এনে বাইরের দিকে দেখিয়ে বল্‌লেন—"অস্থির হচ্ছিলি, শোন্, গল্প বলি।"

"বা রে, গল্প বল্‌বি তা টেনে-টুনে বাইরের দিকে দেখিয়ে কি—?"

"থাম্, বেশ প্রস্তুত হয়ে সাড়ী-টাড়ী এঁটে-সেঁটে বোস্! মনে কর্, ঐ বাবুটীর নাম নীহার রঞ্জন রায় এম্, এস্, সি পাশ, ম্যাথেমেটিক্‌সে ফার্ষ্ট ক্লাস।"

"তা আমার কি?"

"তুই শ্রীমতী নিলীনা দেবী বি, এ ইংলিশে ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স পেয়েছিস্। সারা অঙ্গে তোর যৌবনের পূরো সাড়া—দিব্যি শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে। হ্রী দিয়েছে রং, ধী দিয়েছে কান্তি, উঁচু নাক, ডাগর চোখ, রাঙা গালে অঢেল স্বাস্থ্য, হাসলে টোল খেয়ে যায়, মিষ্টি হাসি, ফর্সা তনুর দিব্যি গড়ন। পরেছিস্ একখানা ঢাকাই শাড়ী, কোরা জমি, ফিকে সবুজের ধারি ভরে জরীর কারু-করা তার পাড়, ষ্টিচ্ দিয়ে ড্রেস্ করে তৈরী। বুটিদার আঁচলটা বুকের পাশ দিয়ে এসে নেমেছে বাঁ দিকে, পাশটা ঘাড়ের উপর সোনার ব্রোচে আঁটা। কষা বডিসের উপর ঢিলে ব্লাউশ—পিস্ কেটে এক সেলাইএ তৈরী, পিঠের দিকে বোতাম আট্‌কানো। এলানো চুলে জড়ানো খোঁপা। টেরির মত বেঁকিয়ে টানা সিঁথি, দু'পাশে চুল প্লেন করে আঁচ্‌ড়ানো। বাঁ হাতের মণিবন্ধে সোনার ব্রেস্‌লেটে ছোট একটি রিষ্টওয়াচ আঁটা। লঘু-রাঙা পায়ে চিক্‌চিকে কালো রেশ্‌মী মোজা পরা, আর সাদা ক্রোম লেদারের ঘুন্টি-বাঁধা জুতাজোড়ার পাত্‌লা দুটো হিল উঁচু করে তোলা, পেটী-কোটের হাতে-বোনা ক্রোসে লেশের চওড়া ঝালরটা তার গোড়া অব্‌ধি এসে পড়েছে।"

নিলীনার লাগ্‌ছিল নেহাৎ মন্দ না—আর এটাও তিনি জানতেন যে লালিমার হাত কিছুতেই এড়ানো চলবে না—গল্প যখন আরম্ভ

করেচেন, তখন শেষ না ক'রে তিনি ছাড়চেন না, কাজেই গল্প শোনবার জন্যে বেশ কায়েমী রকমে এক বেঞ্চের উপরেই মুখোমুখী হয়ে বসে বল্লেন, "কাপড়-চোপড়ের কথাটা অবিকল গ্রাফিক—একেবারে ফোটোগ্রাফ বল্লেও চলে! কিন্তু চেহারার কথাটা কি করে বলা যায়! পুরুষ মানুষও কেউ যে নেই কাছে।—আচ্ছা, মেনে নিলুম, গ্রাফিক্—granted."

"হ্যাঁ, description graphic না হলে চল্‌বে না—ঐখানেই আর্ট।——তারপর দার্জ্জিলিং থেকে ফেরবার পথে এই ষ্টেশনে দুজনের দেখা হয়ে গেল—হঠাৎ—সুমুখো-সুমুখি চোখোচোখি—কিম্বা আর একটু মোলায়েম কবিতা করে, আঁখিতে-আঁখিতে, —বুঝ্‌লি?"

"বুঝেচি, কিন্তু নিলীনা দেবী ডাগর ডোগরটী—ডব্‌গে উঠ্‌ছিলেন বলে—তরুণী মিস্ লালিমা কুমারীর মর্য্যাদা নষ্ট হতে দিতে তো তিনি কিছুতেই পারেন না—তাই মাঝে পড়ে নিজেই নীহার বাবুকে লুপে নিলেন।"

"না, নিলীনা কিছুতেই এ ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী হলেন না। কোন প্রয়োজন না থাক্‌লেও তিনি চট্ করে নেমে গিয়ে নীহার বাবুকে ছোট্ট একটী নমস্কার করে বল্‌লেন—'মাপ্ করবেন—ইন্‌ট্রুড্ কচ্ছি—এইটে কি ডাউন দার্জ্জিলিং মেল?' নীহার-বাবু হঠাৎ থতমত খেয়ে—কারণ তুই মেয়ে-মানুষ আর তিনি নেহাৎ পুরুষমানুষ—কোন মতে নম্—ও—স্-কার, আজ্ঞে হ্যাঁ-া-া-া" বল্‌তেই বেচারী ঘেমে—একদম্ জলে; রেলের বাবুটী গোল-করে বাঁধানো বেতের লাঠীর মত চেহারায়, ইংরেজীর ৭এর মত মুখ ফাঁক করে, মিঠে মিঠে গোলাপী হাসির সঙ্গে বল্‌লেন, 'This is madam, down Darjeeling mail—আপনি—অ্যাঁ—অ্যাঁ—mean to travel অ্যাঁ-this train?'

"নিলীনা কটাক্ষে তাচ্ছিল্য ব্যক্ত করে বল্‌লেন—"হ্যাঁ।" "তা—তা—if you ভালমনে করেন—আমি for the night আপনার একটা berthও reserve করে দিতে পারি—if your ladyship pleases!'—ইচ্ছে, যদি তোর একটুখানি হাসি কুড়িয়ে পায়—শিরোপার মত করে তুলে নিয়ে—booking officeএ গিয়ে দেখাবে—অর্থাৎ সত্যির উপর আরো দুপোঁচ লাল চড়িয়ে গল্প করবে। আহা বেচারীরে! থাক্, কিন্তু নিলীনা দেবী—মানে তুই, রেলের বাবুর বেলায় নেহাৎ কাঠখোট্টা, কৃপণের আঁদি—করুণা করে এককণা হাসিও বেচারীকে বিলিয়ে দিবি নে। নীহার বাবুকে নেশায় রাঙা ক'রে তোলাই ছিল তোর কল্প-কল্পনা। 'No, thanks, I decline' বলে নীহারবাবুর দিকে তাকিয়েই মনের মত মিষ্টি করে বল্‌বি—'ধন্যবাদ! কিছু মনে করবেন না।"

"নীহারবাবু এতক্ষণ—"বরফ" হচ্ছিলেন বুঝি—?"

"হয়ে গিয়েছিলেন—ঠাণ্ডা—হিম—ঝিম্-ঝিম্ খেয়ে ভদ্দর লোক বলবেন, 'না না-আপনার—goodness—আমার—মৌজ এ্যাঁ—না—এ আর মনে করবার কি?' 'না আর কিছু নয়, তবে একটি অপরিচিতা মেয়ে—এ-রকম করে হঠাৎ এসে আপনাকে প্রশ্ন কচ্ছে, আপনি

হয়ত নির্লজ্জা প্রগল্‌ভা মনে করবেন। কিন্তু—আমি গাড়ীখানা ঠিক চিন্‌তে পাচ্ছিলুম না, তাই আপনাকে বিরক্ত করলুম, ধন্যবাদ—নমস্কার।"

"এর পর তুই তাড়াতাড়ি এসে গাড়ীতে উঠলি; নইলে আর লেখাপড়া শিখ্‌লি কি! খুব smart, forward হওয়াই দরকার কি না—নয়ত আর ভাব কি হল—প্রস্ফুটিত হবে কি? এর পর শোন্—চার চোখের এই নিমেষের মিলন দুজনকারই মর্ম্মের উপর চিরদিনের জন্যে স্পষ্ট গভীর একটা দাগ টেনে দিয়ে গেল। প্রাণের হাজারো গোপন কথা—দৃষ্টির পথ দিয়ে বিদ্যুতের মত ছুটে গিয়ে ঠোঁটের কোণায় ফুটে উঠতে চাইলে—কিন্তু লজ্জা আর সঙ্কোচ এসে এবার দাঁড়ালো মাঝখানে দেয়াল রচনা করে'. আর পেতে না পেতেই ছাড়াছাড়িটা দিলে তার উপর কাঁটা, লোহার মোটা শিকে কঠিন বাধা-বেষ্টন গড়ে। তবু স্মৃতিটা এই ঘটনার অশরীরী অনক্ষর ইঙ্গিত দিয়ে দুজনেরই হৃদয়-বীণার লুকোনো পর্দ্দাটীতে মিঠা একটা সুর জমিয়ে তুল্‌তে লাগলো।"

"আর লালিমা নিখুঁত ক'রে তার স্বরলিপি রচনা করলেন!"

"স্বরলিপি তুমি নিজেই লিখ্‌লে গো ঠাকরুণ। কল্‌কাতায় ফিরে এসেই খবরের কাগজে নীচের এই বিজ্ঞাপনটী দিলে—"গত মঙ্গলবার রাত্রে.....ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্মের উপর জলের কলটীর সাম্‌নে আমি একখানি রুমাল হারিয়েচি। সাদা জমি, হাতে 'হেম্' দিয়ে বর্ডার মোড়া—তার নীচে সুতো টেনে বার করে সূচের কাজ করা। প্যাটার্ণটা কতকটা "H" এর ধরণের।—একপাশে "আস্‌মানী" silkএ একটা "N" অক্ষর তোলা আছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন, দয়া করে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হব।"

"নীহারবাবু যে এ বিজ্ঞাপনের জবাব দেবেন, তার কি মানে আছে?"

"মানে নিশ্চয় আর নির্ঘাৎ আছে। তুমি সত্যিই যে একখানা রুমাল চট্ করে তার পাশে ফেলে আস্‌বে।"

"তা রেলের বাবুটীও তো সেখানা কুড়িয়ে পেতে পারেন!"

"বুকের ভর-পুর গন্ধে প্লাটফর্ম্মের তপ্ত হাওয়া হাল্‌কা করে, সাড়ী দুলিয়ে রূপের বিদ্যুৎ চম্‌কিয়ে তুই চলে যাবি—রেলের বাবু তো তাতে—moon-struck—"

"নীহারবাবুই বা বাদ পড়বেন কেন?"

"তিনি—হাজার হলেও লেখাপড়া শিখেছেন কিনা,—একসঙ্গে হোঁদা, রাম্ আর কুৎকুৎ তিনটে কথ্‌খনো বল্‌বেন না—তোর দিকে হাঁ করে খানিকটা তাকিয়ে থাক্‌বেন, গাড়ী ছেড়ে না যাওয়া অবধি অবিশ্যি—তারপর খেয়াল হতেই দেখলেন, পাশেই রুমাল—গন্ধে ভুর্‌ভুরে! তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধর্‌লেন—নেহাৎ প্লাটফর্ম্মের উপর, তাই—নইলে চুমোও খেতেন, নিশ্চয়।"

"Dear me! বড় বেশী বল্‌ছিস্ কিন্তু!"

"থাম—আর্ট মাটী করিস্‌নে।—দিন দু-এক পর ছোট একটী প্যাকেট—রেজেষ্ট্রী ডাকে—তা বলাই বাহুল্য—আর ক' ছত্র লেখা তুই পেলি। নীহার বাবু নিজের হাতে

লিখ্‌ছেন,—'গাড়ী ছেড়ে গেলে রুমালখানা পেয়েছিলুম—ঠিকানা জানবার তো কোন উপায় ছিল না, তাই পাঠাতে পারিনি, ক্ষমা কর্‌বেন কি? নমস্কার!"

"আহা! অফুটন্ত ফুলের গোটা কুঁড়ি টাট্‌কা তুলে তারই রেণু গন্ধ মিলিয়ে, জমিয়ে গুঁড়িয়ে গড়া মন্মথের ফুল-তুণীরের তীক্ষ্ণ সে শর এসে লাগ্‌লো তোর মর্ম্মেরই মাঝ-খানে—কোথায় রে সেই মর্‌মী, মনের দরদী, প্রিয় বন্ধু তোর, সখা তোর, ওহো—হো, তুই বুঝি মূর্চ্ছা গেলি!"

"ঐ,—মোটে মাপ কর্‌বেন কথাটাতেই?"

"বারে! একজন গ্রাজুয়েট, কত-বড় sentiment তোর, গভীর গাঢ় করে তা ফুটোতে হবে তো!—তারপর তুই কৃতজ্ঞতার ভাবে ভরে চিঠি লিখ্‌বি:—

"বহু ধন্যবাদ! রুমালখানার সঙ্গে একটা বিশেষ স্মৃতি জড়িত ছিল বলেই এত আগ্রহ। ফিরে পাবার আশা ছিল না। কিন্তু পেলুম, আপনার এ অনুগ্রহ চিরদিন মনে থাকবে। কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর্‌লে সত্যই সুখী হব। একবার যদি দেখা হত, নিজের মুখে আপনাকে ধন্যবাদ দিতাম। নিবেদন, ইতি।

"এইবার লোকটা নিঃসন্দেহেই মারা গেল। একেবারে সোজা হৃৎপিণ্ডে এমন গুরু আঘাত! সে কোন্ স্বপ্নলোকের কল্পনা-বৈচিত্র্যে রঞ্জিত তার মন সোনার পাখায় ভর দিয়ে অপরূপ এক নীলিমার রাজ্যের পানে উধাও উড়ে গেল। ভাবলে—'একবার যদি দেখা হত!' —সত্যি একবার যদি দেখা হত! দু'জনেরই মনে যখন 'একবার যদি দেখা হত'—দেখাও তখন হলোই। নীহারবাবু হাইকোর্টে তাঁদেরই একটী মাম্‌লার তদ্বির কর্ত্তে কল্‌কাতায় এলেন। খোঁজ-খবর নেওয়া হল—অবিশ্যি সেটা মাম্‌লার সম্পর্কে নয়—শ্রীমতী নিলীনা দেবীর মোকাম সাকিম হাল-চাল সম্বন্ধে। কিন্তু একেবারে অপরিচিত—হঠাৎ গিয়ে তোর বাড়ীতে হাজির হন্ কি ভদ্রতায়? তাই একটা চমৎকার সুযোগের, আর ঈষৎ লজ্জা-নত একজোড়া কার ঘনকৃষ্ণ চক্ষু-পল্লবের সন্ধানে ঘোরাঘুরি আরম্ভ কর্‌লেন—আদ্ধির চুড়িদার আর বার্ণিস লপেটা উড়িয়ে, নাকের উপর চশমা, চুলের মাঝে টেরী বাগিয়ে তোদের বাড়ীর নীচে দিয়ে যাতায়াত কর্‌তেও ত্রুটি কর্‌লেন না—কিন্তু কি হতভাগ্য—দর্শন আর মেলে না—বেচারী এক রকম নিরাশই হয়ে পড়লেন। তুই ত আছিস রোজই আশায়—ডাকপেয়াদা কখন রসিকের রাঙা হাতের দুটী ছত্র এনে দিয়ে যায়—এমন সময় একদিন মঙ্গলবারে ক্লাশের পর, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএর গেটে তুই মোটরে উঠ্‌তে যাচ্ছিস্, হঠাৎ তোর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চ'লে গেল—সাম্‌নেই নীহারবাবু! মনে পড়লো, মঙ্গলবার—বারটা যে তোর বুকের গোপন কক্ষে হীরার অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। নীহারবাবু একবার থম্‌কে দাঁড়িয়েই—তোর মুখখানার দিকে চোখটা তুলেও না,—অথচ তুলেও—দেখাটা যেন তুই বুঝ্‌তে পারিস্‌ও, আবার বুঝ্‌তে পারিস্‌ও না, এই রকম করে আর কি তাকালেন। তুই অম্‌নি হাসিতে রতির অধরের কুঙ্কুম-রাগ ফুটিয়ে বল্‌লি—'এই যে, নমস্কার।'

"বেচারী তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার

করে—একটু কিন্তু-মতন হয়ে মাথা নীচু করলেন। তুই বল্‌লি—'আপনার দয়া আমি জীবনে ভুলবো না—রুমালখানা আমার সত্যিই বড়—বড়-বেশী প্রিয়।'

'এ আর দয়া কি! আপনার জিনিষ পেয়ে আপনাকেই ফিরিয়ে দিয়েছি,এ'ত সোজা সরল কথা, আমার কর্ত্তব্য।' তোর কানে বুঝি বাঁশী বেজে গেলরে—"বাজিল ঐ শ্যামের বাঁশরী যমুনায়"—তুই বেভুলভাবে বল্‌লি, 'না। আপনার দয়া নিশ্চয়ই স্বীকার কর্‌তে হবে। চলুন, রাস্তায় গল্পটা ভাল দেখায় না—Won't you see me home? আমি বাড়ীতে আপনার কত গল্প করেছি!' 'Most willingly—কিন্তু—' তুই বল্‌বি—কেন, 'আপনার কি কোথাও engagement আছে?'

'না—তা কিছু নেই,তবে—এক-মোটরেই?' তুই প্রাণের হো-হো হাসিটা চেপে মুখের কোণে মুচ্‌কিয়ে তুলে, একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেছিস্ যেন, এম্‌নিভাবে বল্‌লি—'বা, তাতে কি? আপনি তো আর বাঘ-ভাল্লুক বা সেইরকম কোনো জানোয়ার নন্ যে আপনার সঙ্গে একগাড়ীতে গেলে কিছু ভয়ের কারণ আছে—আসুন।' বেচারী নীহার বাবু আর আপত্তি না করে, এসে বস্‌লেন, মোলায়েম—মোলায়েম, চারিদিকে, নীচে,পাশে, শুধু মোলায়েম—এক মোলায়েম মোটরের গদি —আর এক মোলায়েম পাশে তুই—কিন্তু নিরীহ লোকটী পাড়াগেঁয়ে নায়ক, নেহাৎ জড়সড়-গোচ্ হয়ে কোঁচাটা বেশ করে সেরে সুরে নিলেন—কি জানি, পাছে কোঁচার ডগাটা উড়ে গিয়ে তোর গায়ে পড়ে—এইরকম একটা ন যযৌ ন তস্থৌ রকমের নাজেহাল অবস্থায় কোনোমতে বসে রইলেন, পায়ের তলা থেকে থেকে রি-রি শির-শির করে শিউরে উঠতে লাগলো, মোটরের পেট্রল-গ্যাস বুঝি অটো-মোবাইলের চাকা ছেড়ে ওঁরই অঙ্গের উপর তার ক্রিয়া আরম্ভ করলে! যা হোক্, তুই তার পর বাড়ী নিয়ে গিয়ে ড্রইং রুমের গদি-আঁটা সোফার উপর তাঁকে বসিয়ে, বৈদ্যুতিক পাখাখানা মাথার উপর ছেড়ে দিয়ে, চা-টা খাইয়ে ঠাণ্ডা স্থির করে তুল্‌লি। এর-পর থেকেই পদ্য সুরু হলো। তোর কাজল-চোখের অপাঙ্গ বেঁকিয়ে হাসি, গালের উপর ছোট্ট একটি টোল,—মুগ্ধ হয়ে গেল তরুণ! এম্‌নি যাওয়া-আসা, তাঁর পিয়ানো বাজিয়ে "তুমি কেমন ক'রে গান কর হে গুণী" গান, আর তোর—"অবাক হয়ে" শোনা, কত গল্প, আলাপ,—আস্তে আস্তে ওস্তাদের সেতারে সুরের মত প্রণয় ক্রমশঃ গাঢ়, জমাট বেঁধে উঠ্‌লো!—শেষ কালে একদিন রূপসীর মুখের উপর বারান্দার রেলিংএর অন্তরাল-ছিন্ন গোধূলির আরক্ত আলো পড়ে পরীর হাতে ফাগের আল্‌পনা চিত্র করে দিচ্ছিল যখন, তরুণ তোর মুখখানা তুলে ধরে ইত্যাদি, একবার মোটে শিউরে উঠে সুন্দরী তোর সারা অঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌লো।"

নিলীনার মুখের উপর থেকে কাণের মূল পর্য্যন্ত এবার সত্যিই লাল হয়ে উঠ্‌লো। সে চটে গিয়ে বল্‌লে,—"এ তোর বড্ড বাড়াবাড়ি, লক্ষ্মীছাড়ি!"

"চট্‌ছো কেন যাদু,—এইতো আর্ট, গল্পের আর্ট। এ একটা গল্প তো নয়—

নীলার টুক্‌রো, নীহারিকার জ্যোতি, এ হ্যাজেলিন স্নোর মত মোলায়েম, ফ্রেঞ্চ-বোকের মত সুগন্ধি ঝর-ঝরে ভাব, তর্ তরে ছন্দ। মেয়েরা যে রূপের ফাঁদ পেতেই বসে আছে—তরুণ পাখী ধর্‌বার জন্যে—যা-হয়, একটা দোয়েল, টুন্‌টুনি পেলেই হল!"

গাড়ী অনেকক্ষণ হলো ষ্টেশন ছেড়ে আবার ছুটতে আরম্ভ করেছিল, গল্প ত দুজনে বেড়ে জমে উঠে সমানে চলেছিল সোজা-সটান্। হঠাৎ "কুলী—কুলী চাই" শব্দে চমক ভাঙ্‌তেই খড়খড়ি ফেলে দিয়ে দুজনে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখেন—সান্তাহার এসে গেছে। তারপর তো ছন-ফুল আর ঘাস-বন, দিবি পরিষ্কার ফসা দিন,—চৈত্রের খর রৌদ্রে কি আর আর্ট জমে?

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
মিক সং
শী সং
কলিকাতা।

আদর্শ-বিপর্য্যয়

আদালতে একদল উকীল দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা মনে করেন, কেবল বচন-বিন্যাসে বা গলাবাজিতে কাজ সারবেন, তাই মকদ্দমার কাগজ-পত্র, সাক্ষীর জবানবন্দী বা আসামীর সওয়াল-জবাব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, সে সময়টা তাঁরা হয় কথার মালা গাঁথেন কিম্বা গলা শানিয়ে নেন। আমার সন্দেহ হয়, মুখুজ্যে মশায় যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ওকালতি করবার সময় (ভারতী জ্যৈষ্ঠ), সেই পন্থাই অনুসরণ করেছেন, কারণ সেটাই সহজ পন্থা—এমন-কি, তিনি যে লেখার প্রতিবাদ করেছেন, তাও শেষ-পর্য্যন্ত পড়বার ধৈর্য্য রাখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না,—যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্যের উপরে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও। তাঁর সৌজন্যের মাত্রাতিরিক্ততার অবকাশে তাঁর ক্ষুব্ধ হিন্দুত্বের অপমান-বেদনা বড় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাই অনন্যোপায় হয়ে, চোখে যা দেখা যায়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছেড়ে তিনি আমাদের সনাতন হিন্দুত্বের safcty valve,—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যদি ভাগ্য-ক্রমে মহাভারত আমার পড়া না থাকতো, তবে তাঁর কথায়, যুধিষ্ঠিরকে তিনি যেমন এঁকেছেন, তেমনই মেনে নিতুম, এবং তাঁর রচনাটি এমন পরিপাটী যে, আসামী এতদিন বেঁচে থাক্‌লে তাঁরও হয়ত সন্দেহ হত যে বর্ণনাটি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

যদি জানতুম, দেশের লোক মহাভারত পড়েন, তবে এ প্রতিবাদ লেখা প্রয়োজন বোধ করতুম না, কিন্তু উপস্থিত লেখক মশায়ের রচনা-পাঠে আমার সে বিশ্বাস দূর হয়েছে; তাই আবার লিখতে বসলুম—আমার নিজের কথা নয়, মহাভারত-কার এবং স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের আত্মীয়-স্বজন তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবতেন, সেই-সমস্ত নজীর উদ্ধৃত করে দেখাবার জন্য।

আমার নিজের কথা বলবার ছিল অনেক, কিন্তু স্থানাভাববশত সেটা মুলতুবি রইলো।

ার পূর্ব্ব-প্রবন্ধে যা লিখেছি তাও চাপা াক্, কারণ নিজের লেখা উদ্ধার করার মত রক্তি-জনক কাজ আর কিছুই নেই—মুখুজ্যে-শায় সেটা পড়েন নি, কিন্তু আমিও নাচার। ার কথামত এইবার যুধিষ্ঠির-চরিত্রকে াব্য-সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে দেখবার চেষ্টা রবো। কাব্য-সামালোচনায়, কবি যা লেখেছেন আমরা তার উপরেই নির্ভর করি ায় সমস্তটা, কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই; বশ্য কেবল ব্যাখ্যা নিয়ে যাঁরা ব্যবসা রেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন কথা লা দায়, কারণ ধর্ম্ম জিনিষটা সম্বন্ধে তাঁর ায়ে বহু মত-ভেদ ছিল এবং আপামর লেই স্বীকার করতেন যে, তার গতিও খুব ম্ব। তবে এ কথা সত্য যে, ধর্ম্মের উপরে ার বিশ্বাসের মূলে সাহস ছিল না, ছিল দৃষ্টবাদীর নিশ্চেষ্টতা ও সুযোগ-পন্থীর চাতুর্য্য; অথচ অপরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি ুক্ষকারের দোহাই দিতে ত্রুটি করেন না। বে ধর্ম্মাচার-পালনে তিনি যে ভাটপাড়ার াণ্ডিতকেও হারিয়ে দিতেন, এ-কথা আমি ীকার করতে বাধ্য।

যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার শুধু এখনকার কালের সুন্দর-রুচিদের কাছে নয়, তাঁর সম-সাময়িক লোকের কাছে এবং এমন-কি তাঁর সহোদর াই ও স্ত্রীর কাছেও যথেষ্ট ভীরু বলে োধ হয়েছিল, তবে তাঁরাও হয়ত রজ-মোর আধিক্যে তাঁর সত্ত্বগুণজ শান্ত ভাবকে শ্রদ্ধা করতে পারেন নি!

মানুষের চরিত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের আধিক্য অনুসারে মানুষ-বিভাগে যথেষ্ট গোল আছে, কারণ মানুষ প্রধানত মাটীর মানুষ, দেব-বিভূতি তার যতই থাক্ (মুখুজ্যে মশায় ত এই রকমই বলেন), কাজেই একটা বিশেষ গুণের চেয়ে এই তিন গুণের সমাবেশেই তার জীবন গড়ে ওঠে—এই তিনের দ্বন্দ্বেই তার চারিত্র্য। যুধিষ্ঠির-চরিত্রে নাকি সত্ত্বের প্রভাব ছিল বেশী! দেখা যাক্ তাঁর জীবনে শুভ্রত্ব ও শান্ত ভাব কতখানি প্রতিফলিত হয়েছিল। অবশ্য একথা একশোবার সত্য যে, তথা-কথিত সত্ত্বাশ্রিত যুধিষ্ঠিরের স্বভাব-ধর্ম্মশীলতা "জলের শৈত্য-গুণের মতো নিশ্চেষ্ট" (?) হয়ে উঠেছিল এবং কালক্রমে জড় পিণ্ডে পরিণত হতো যদি ভীমার্জ্জুনের মত সোদর ও দ্রৌপদীর মত স্ত্রী লাভ করবার সৌভাগ্য না থাকতো। আর্য্য ভারতের ইতিহাস পড়েছি, কিন্তু যে আত্মাটি ছেনে যুধিষ্ঠির-চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছে তার সাক্ষাৎ পাই নি—হয়ত Sir Oliver Lodge বা Sir Conan Doyle কালে এর পাত্তা দিতে পারবেন। কিন্তু যদি কোনকালে ভারতে ও-আত্মা জন্মগ্রহণ করে, তবে আমরা সভ্য জগতের hewers of wood and drawers of water হয়ে থাকবো, নিশ্চয়ই।

বিশ্বকেন্দ্রে দ্বন্দ্বের সংঘাতে যে দুটো দিকের কথা তিনি বলেচেন, ধরা যাক্, ন্যায়ের দিকে যুধিষ্ঠির সেই কল্পনায় মূর্ত্ত হয়েছেন। এই বার মহাভারত খোলা যাক্:—

ভীমার্জ্জুনের বাহুর পরিচয় আমরা বহুবার পেয়েছি, কিন্তু এই অদ্ভুত বাহু-বিশিষ্ট জীব-শরীরের যুধিষ্ঠির কোন্ অংশ, মুখুজ্যে মশায় তা লিখ্‌তে ভুলেছেন। যুধিষ্ঠিরের বীর্য্য

সত্যই অত্যধিক শান্ত! অথচ বকের পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছেন, "অস্ত্র-শস্ত্রই ক্ষত্রিয়ের ভাব, কাজেই তাঁর নিজের জীবনে এই নিশ্চেষ্ট বীরত্ব, নীরব কবিত্বের মতো অদ্ভুত ও হাস্যজনক নয় কি? শল্যের সঙ্গে তিনি লড়েছেন বটে,—কিন্তু শল্য যে কত-বড় বীর, তা আমরা কেন, সে সময়ের অনেকে তা জানতেই পারেন নি, তাই দেখি, দুর্য্যোধন শল্যকে সারথ্যে আহ্বান করে বার বার কর্ণের পরাক্রমের কথাই বলেছেন, কারণ তাঁর মতে "কর্ণের সাহায্য নিবন্ধন জয়াশা বিদ্যমান।"

জতুগৃহে যাবার আগে ও পরে যুধিষ্ঠিরের ধর্য্যের চেয়ে অসহায়তার পরিচয়ই মহাভারতে পাওয়া যায়, আর দ্যূত-সভায় তিনিই একমাত্র লোক যিনি চুপ করে ছিলেন, অসীম ধৈর্য্যে নয়, মহাভারত-কার বলেন, 'অচেতন-প্রায় হয়েই তুষ্ণীম্ভাব" অবলম্বন করেছিলেন, কারণ আমাদের সত্ত্বস্থ পুরুষ তখন বুঝতে পেরেছেন যে, এত-বড় বিপত্তি ও অপমান-লাঞ্ছনার মূল তিনিই। কর্ত্তব্য-বোধে জীবন-যুদ্ধে সাংসারিক অধিকার-বৈভব সমস্ত পণে রাখা বীরত্ব-ব্যঞ্জক, কিন্তু তার একটা সীমা আছে। অপরের দেহ, অপরের অর্জ্জিত সম্পদ বা অংশ-জাত সম্পত্তি পণে রাখা শোভা পায় বোধ করি, কেবল নিশ্চেষ্ট ধর্ম্মশীলের; কারণ অর্জ্জন-ক্লেশ তাঁকে কোন কালেই বহন করতে হয় না। দ্রৌপদীতে তাঁর মমত্ব-ভিমান তাঁকে পণে দেবার কারণ নয়, মহাভারত-কারকে বিশ্বাস করলে বলতে হবে, শকুনির বিদ্রূপই তার কারণ। দ্রৌপদীকে পণে বসানো সম্বন্ধে তর্ক প্রথম তুলেছিলেন দ্রৌপদী নিজে, প্রাজ্ঞেরা নয় (দ্যূতপর্ব্ব—পঞ্চষষ্ঠিতম অধ্যায়)! যুধিষ্ঠির ও প্রাজ্ঞদের মুখ-পানে তাকিয়ে যখন দ্রৌপদী বার বার এই প্রশ্ন করেছেন, তখন সব মহাত্মাই চুপ করেছিলেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন একমাত্র যুবক বিকর্ণ,—বিনা-দোষে অপমানিতা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার মত ভদ্রতারও তাঁর অভাব ছিল। কর্ম্মফল যুধিষ্ঠির আর কৈ ভোগ করলেন? শাস্তি পেলে শুধু নির্দ্দোষ ভায়েরা, বিনা-অনুমতিতে যাদের তিনি নিজের অধিকার-বিভবের সামিল করে পণে বসালেন।

মুখে কঠোর ভবিতব্য ও কর্ত্তব্য-বোধের দোহাই দিলেও যুধিষ্ঠিরের মনে গর্ব্ব ছিল প্রচুর, তাই যখন দ্বিতীয়বার দ্যূতে আহূত হলেন, তখন—"বহুতর লোকাপবাদ শ্রবণ করিয়াও লজ্জা ও ধর্ম্ম-ভয়ে" যুধিষ্ঠির দ্যূতে প্রবৃত্ত হলেন, আর শকুনিকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ কোন রাজাই দ্যূতে আহূত হয়ে প্রতিনিবৃত্ত হতে পারেন না। পূর্ব্বের সহস্র পরাজয় ও তন্নিমিত্ত লাঞ্ছনা ও অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের লজ্জাও তাঁকে গর্ব্ব থেকে রক্ষা করতে পারে নি। কারণ তিনি জানতেন, ভবিতব্যের ঝঞ্ঝা-পদক্ষেপে আর যার পাঁজরা ভাঙুক, তাঁর তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না; ভীমার্জ্জুন তাঁদের ভাঙা পাঁজরা নিয়েও জ্যেষ্ঠের সেবা করবেন, এ সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। দ্যূত-ক্রীড়ায় তাঁর কর্ত্তব্য-বোধের চেয়ে আসক্তি ছিল অনেক বেশী, অন্তত অর্জ্জুন কর্ণ-পর্ব্বে এই কথাই বলেছেন—তাঁর অন্য ভাইদের ও স্ত্রীর মতামত মহাভারতেই আছে, আশা

করি, মুখুজ্যে মশায় একবার সেগুলো পড়ে দেখবেন।

"ঈর্ষাসিন্ধু মন্থন-সঞ্জাত জয়-রস" পান করবার তাঁর সাধ ছিল খুবই, কিন্তু আত্ম-শক্তির অভাবে সে সাধ সম্পূর্ণ মেটাতে পারেন নি। কর্ণপর্ব্বে যখন অর্জ্জুনকে বাক্য-যন্ত্রণা দিয়ে যুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন, মুখুজ্যে মশায়কে একবার সেই অধ্যায়গুলি পড়তে অনুরোধ করি। সেইখানে তাঁর নিজের কথাতেই প্রমাণ হয়েছে, স্বার্থ-বিদ্বেষের কলুষ তাঁর তথা-কথিত অকলঙ্ক শুভ্রতাকে কতখানি মলিন করেছিল। "অনুজ-স্নেহ নিঃস্বার্থ-পরতার পরিচয় ও লাঞ্ছনা অপমান পাইয়া ফিরাইয়া দিবার অপ্রবৃত্তি" প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সত্য তত্ত্ব "রাজ্য"-লোলুপ যুধিষ্ঠিরের আত্মকথায় মিলবে, অবশ্য যদি তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না করা হয়।

শক্তিহীনের পক্ষে ক্ষমা কাপুরুষতার নামান্তর। অসহায় অবস্থায় ধার্ম্মিকতার গর্ব্বে ক্ষুব্ধ ধর্ম্মের কোপ থেকে শত্রুকে রক্ষা করাও সহজ, কিন্তু নিপতিত শক্তিহীন শরণাগত শত্রুকে ক্ষমা করা সাজে শুধু তাঁদের, যাঁরা সত্ত্বের অভিনয় না করে জীবনে তা পাবার চেষ্টা করেন। আমাদের ধর্ম্মভীরু ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠিরের জীবনে একদা যখন এই রকম শত্রুকে ক্ষমা করবার সময় এসেছিল, তখন তিনি কি করেছিলেন তার পরিচয় মিলবে গদাযুদ্ধ-পর্ব্বে। হৃদশারী হৃত-সর্ব্বস্ব অত্যাচারী দুর্য্যোধন যখন তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে, তখন তিনি যে শুধু তাকে ক্ষমা করতে পারলেন না তা নয়, অশেষ বাক্য-যন্ত্রণা দিয়ে, অপমানের পর অপমান কোরে বেচারীকে মরণের মুখে ছুটে যাবার মত বিঁধিয়ে তুললেন—বিদ্বেষ-বিরহিত হয়ে সুযোধন বোলে কোলও দিলেন না—মহাত্মা যীশুর মত ভদ্রভাবে ক্ষমাও করলেন না। অসপত্ন রাজ্য-শাসনের সাধটুকুও দুর্য্যোধনকে তিনি জানিয়ে দিতে ত্রুটী করেন নি।

তিনি ভোগ-প্রয়াসী নন, এ-কথা জোর করে বলা চলে না, তবে বিবাহ করা সম্বন্ধে তাঁর একটু বিপদ ছিল। তখন বিবাহ করতে হলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মার্কা নিলেই চলতো না—স্বয়ম্বর-সভায় বীর্য্যের পরীক্ষা দিতে হোত এবং বাঙালীর মেয়ের মত তখনকার মেয়েরা এত শস্তায় বাজারে বিকোতো না—উলূপীর মত, সুভদ্রার মত মেয়ে জিনতে পারতো একা অর্জ্জুন, তাই যুধিষ্ঠিরের মত ক্লীবকে কোন মেয়েই বিবাহ করতে সম্মত হন নি। একটিমাত্র মেয়ে—যিনি বাধ্য হয়ে তাঁর স্ত্রীত্ব স্বীকার করেছিলেন, তিনি হিন্দু-নারী হয়েও স্বামীকে মূঢ় উন্মত্ত বলতে ত্রুটি করেন নি, এবং কেবল শিষ্টাচারের খাতিরেই তাঁকে পতিত্বে স্বীকার করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের এ-কথা অবিদিত ছিল না, তাই অর্জ্জুন-প্রীতিই দ্রৌপদীর পতন-কারণ নির্দ্দেশ করে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন!

ধর্ম্মের জয় ট্রাজিক কি কমিক তা ঠিক জানি না, কিন্তু যুধিষ্ঠির-চরিত্রটি বেশ মজার বটে! শান্তি-পর্ব্বের অন্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বের সপ্তম অধ্যায়ে দেখি যে, কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রলয়ের বীভৎসতায় ভয় পেয়ে, আমাদের মহাপুরুষ, পাছে নানা পাপের ভাগী হতে হয়, তাই বেচারী ভায়েদের ঘাড়ে সব পাপ চাপিয়ে 'কা তব কান্তা' বলে বেমালুম সরে

পড়বার চেষ্টা করছিলেন; এবং হয়ত কৃত-কার্য্যও হতেন, যদি তাঁর চার ভাই ও দ্রৌপদী বারবার এইরকম ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে তাঁকে যথেষ্ট গালি না দিতেন। তাঁকে তাঁরা যা যা বলে গালি দিয়েছেন, তার মধ্যে সত্যের ভাগই বেশী এবং সে বহুপৃষ্ঠা-ব্যাপী উক্তিগুলো এখানে উদ্ধৃত করা অসম্ভব-বোধে মুখুজ্যে মশায়কে শান্তি পর্ব্বটা পড়ে দেখতে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করছি।

আমার মনে হয়, উদ্ধৃত কবির উক্তিটি যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রয়োগ করলে নিছক অত্যুক্তি হয়ে ওঠে, কারণ ওর একবর্ণও যে সত্যি নয় তার একমাত্র প্রমাণ মহাভারত, যার নজীর আমি যতদূর সম্ভব দেখিয়েছি। যুধিষ্ঠির-চরিত্রের বিচারে আমার রুচি-সঙ্কার্য্য কিম্বা মুখুজ্যে মশায়ের সত্যানভিজ্ঞতা ও অত্যুক্তি কোন্‌টা বেশী প্রকাশ পেয়েছে, তার বিচার নিরপেক্ষ পাঠকের হাতে দিয়ে আমি বিদায় নিতে চাই।

আদর্শই হোক্, আর সত্যই হোক্, যুগের পরীক্ষা-নিকষে রেখাপাত করেই তা অমরত্ব লাভ করে, এতে বিচলিত হবার কিছু নেই। যদি তার মধ্যে যথার্থই কিছু খাঁটী থাকে তবে তা নিশ্চয় বাঁচবে। বিচার করতে ভয় পায় শুধু তারাই,—মনের গোলামি যাদের সত্যকে জানবার সাহস দেয় নি! এ কথা জানা উচিত যে সাহসের আর যাই দোষ থাক্, সেটা অধঃপতনের পথ নয়।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

নবীনের দেশ

সেথা সোনালি ও রাঙা রাঙা
কচি কিসলয়,
সেথা, অবুঝের সবুজের
নব অভিনয়।
সেথা গুল্ বুল্‌বুল্
করে পয় পয় ভুল,
দোলে তুল্‌তুলে ঢুল্‌ঢুলে
বন্ ফুলচয়।

সেথা লালিমায় টুক্‌টুকে
অধরের লাল্
সেথা আলোকের চুমা চায়
গোলাপের গাল।

সেথা পাপিয়ার সুর,
ঢালে সুধা ভরপুর,
সেথা ফেলে চুপ্ অপরূপ
রূপ্ শরজাল।

সেথা কমলের সুরে বাজে
প্রণয়ের বীণ্
সেথা আব্‌ছায়ে পরীদের
নাচ্ রাতদিন।
জাগে উৎসব-রব,
সেথা উদ্দাম সব,
সেই পুলকের অলকাতে
সকলি নবীন।

সেথা ফুলধনু ধনু লয়ে
সঙ্কোচে ধায়,
সেথা উমা-মুখ-শশীপানে
মহাদেব চায়।
সেথা হাসে বধূ-বর
নাচে কিন্নরী-নর,
দেখে দেবতারা আসি হাসি
গগনের গায়।

সেথা বাসেরি আভাস আসে
মঞ্জরীতে,
নহে অলিকুল বীতরাগ
গুঞ্জরিতে!
সেথা অঞ্চলালোক
করে চঞ্চল চোখ্,
ছোটে রামধনু-আঁকা পথে
সঞ্চরিতে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রিয়ার উদ্দেশে

৪

তোমার চিঠি! কি মিষ্টি চিঠি তোমার—তুমি যেন চিঠিখানিকে ভরে আছ! আমার পাশে তোমার স্পর্শ অনুভব করছি—তোমার গলার স্বর যেন কাণে বেজে উঠছে। এ যেন তোমার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে নিয়েছি—Luxembur; বাগানের পিছল পথে তোমায় যেমন কোরে ধরেছিলুম। কতবার যে তোমার চিঠি পড়েছি তা গুণতে পারি না—বোধ হয় সবটা আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে, অথচ যে সব জায়গা ভাল লেগেছে, সে সব জায়গা বারবার না দেখে তৃপ্তি হচ্ছে না। তোমার কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয়ের বর্ণনাটি আমার খুব ভাল লেগেছে! তখন রাত হয়ে গেছে, সব আলো নেবানো, আর পথগুলি যেন বদ্ধ কালো নদীর মত শব্দহীন, প্রাণহীন, মরণের বাসা! তারপর আকাশে অকস্মাৎ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠলো—machine gunএর শব্দ শোনা গেল, জ্বলন্ত এরোপ্লেন নামতে নামতে চারদিক আলো করে দিলে। ঘরের ছাদের উপর বোমার শব্দ হল,—আচ্ছা, তুমি কি ভয় পাও নি? তোমার চিঠিতে ভয় পাবার কোন আভাষই নেই। তুমি লিখেছ, "নিজের দিক থেকে বিচার করলে এইটে ঘটার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। এ-থেকে আমি খুব ভাল কোরে বুঝতে পারলুম, এখানে আমার কত কাজ আছে"—এ স্বার্থপরতার মধ্যে বীরত্ব আছে, সাহস আছে। যুদ্ধের প্রথম লাইনে পুরুষেরা যেমন গৌরব বোধ করছি, তোমার কাজে তুমি ঠিক তেমনি গৌরব বোধ করছো। আত্ম-বিসর্জ্জনের এই মহান্ সুযোগ সবাইকে বিশেষ কোরে টানছে। আমার মনে হয়, শান্তির সময়েও এই সুযোগ ছিল,—শুধু দেখবার মত কারও চোখ ছিল না—হয়ত সে আত্ম-বিসর্জ্জন এখনকার মত এত মহৎ নয়—।

তুমি যে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছ, তা নিয়ে আমার ভাববার কথা অনেক; কিন্তু আমি ভাবচি না। বিপদের আগুন তোমার মনেও আলো জেলেছে এতে আমি সব-চেয়ে খুসী। একদিন ফ্রান্সকে রক্ষা করবার জন্যে Joan of Arc ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধে নেমেছিলেন, তোমার মধ্যে ততখানি নাটকত্বের অবকাশ নেই, কিন্তু বীরত্ব তোমার সমানই। তবে Ford car তোমার ঘোড়া, আর আমেরিকান, Red Cross এর uniform তোমার বর্ম্ম, এবং শিশু-হত্যা নয়, শিশু-রক্ষাই তোমার কাজ। সত্য কথা বলতে গেলে তোমার কাজটিই আমি বেশী পছন্দ করি। আমার দিকে চেয়ে হয়ত তুমি বলবে যে, তোমার কাজের আমি বেশী দাম দিচ্ছি—ব্যাপারটা সত্যিই খুব সাধারণ।—স্বীকার করি, ফ্রান্সে এটা খুব সাধারণ। পরের জন্যে নিজের প্রাণ দেওয়া ফরাসীদের অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে এ অভ্যাস কারও নেই, কেবলমাত্র নিজেকে নিরাপদ করবার চেষ্টা Fifth Avenueতে বিশেষ বিরল নয়।

কি অভাবনীয় বৈচিত্র্য! তোমরা আমেরিকানরা সাধারণতই রোমান্টিক নও। তোমার কাণ্ডজ্ঞান এত বেশী যে, তাতে আর সব মনোভাব চাপা পড়ে গেছে। তোমার কথাই ধর।—তোমার অতুল সম্পদ হাজারো বিলাস ছেড়ে তুমি হাজার মাইল দূরে দাসীর কাজ করতে এসেছ! মরনকে আলিঙ্গন করা কিছু অসম্ভব নয়, অথচ তোমার মধ্যে কোনোরকম উত্তেজনা দেখচি না! প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ আলোয় ধরে তোমার বীরত্বকে তুমি খ কর, যেন সেটা কিছুই নয়! ফরাসীরা কি একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের পা মাটীতেই পড়ে না, তারা যেন সারা জী এরোপ্লেন চড়ে আকাশে উড়ছে, তা বর্ত্তমানকে ইতিহাসের আলোয় দ্যাখে এ মনে করে, তাদের রক্ত ভবিষ্যতের ভিত দিয়ে লাল ধারায় গড়িয়ে চলেছে। আম ইংরেজরা নিজেদের গৌরব সম্বন্ধে য সচেতন—শুধু মুখে আমরা তার আলোচ করি না। আমরা খুব বড় কাজ করি বটে, কিন্তু আস্তাবলের সহিসের ভাষায় তা প্রকা করি। আমরা আত্ম-প্রশংসা আর মনোভাবে অতিমাত্রায় ডরাই। মনে যত-কিছুই অনুভ করি না কেন, অবহেলার ছলে সেটাকে ঢাকতে চাই। তোমাদের মধ্যে কিন্তু এই ছলে জুয়োচুরিটা নেই। তোমরা পরের জী বাঁচাতে যাও, কিম্বা tango নাচো,—তোমাদে মনোভাব কিন্তু একই থাকে, দুটো কাজে মধ্যে কোন রকমের প্রভেদ তোমাদের চোখে পড়ে না। যে কাজ করতে যাচ্ছ, সেটা করা মধ্যে মনন্‌টুকুই তোমাদের মুগ্ধ করে। কেব কাজটার জন্যে তোমাদের কোন উৎসাহ নেই, সেই কারণে যা-কিছুই কর, তাতে তোমাদে মাথা কখনো ঘুলিয়ে যায় না।

একটু আগে মনোভাবের কথা বলছিলুম। আমরা ইংরেজরা সেটাকে ঘৃণা করি, আর লুকোবার চেষ্টা করি। আমার কথাই ধর তোমার কাছে ভালবাসার কথা তুললুম কেন, বলতে পারো? পাছে তোমার মনকে আঘাত করি। যে লোক যুদ্ধক্ষেত্রে ফি যাচ্ছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করা মেয়েদের প

ক্ত নয় কি? লোকটার জন্যে তোমাদের মনে করুণা ছাড়া আর কোন ভাব াগে না, অথচ মনে হয়, সেটা যেন ভালো-বাসা। সেইজন্যে নিজের হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য-প্রকাশের লজ্জায় তোমাকে ভালোবাসা জানাতে চাই নি, অথচ সেই ভাবের বশেই এই ময়লা গর্ত্তের মধ্যে বসে কাগজের উপর াশি রাশি মনোভাব ঢালছি,—যার কোন দেশ্য নেই, মানে নেই, যা একেবারে াণ্ডশ্রম।

জীবনকে নিয়ে আমি মহা সমস্যায় পড়েছিলুম। যুদ্ধের আগে জীবনকে আমি ারী ডরাতুম। কোনো-কিছু ঠিক করে বা আমার ধাতে ছিল না। ভবিষ্যতের মধ্যে ই চালিয়ে নানারকম কল্পনা করতুম, কোন-কিছু করতে হলে কত দ্বিধা-সংশয় মনের াঝে জেগে উঠতো। সামরিক নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমি একটা উদ্দেশ্য পেয়েছি, সাহস করে বাঁচতে এবং প্রয়োজন হলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মরতে শিখেচি। বুঝতেই পারছো, তোমাকে দেখবার পর থেকে আমার আগেকার উদ্দেশ্য কি রকম ঘুলিয়ে গেছে। মেয়েকে ভালবাসবে অথচ ভবিষ্যতের মাঝে দৃষ্টিনিক্ষেপ করবে না; তার অভাব বোধ করবে অথচ প্রাণ ছেড়ে দেবে,—এ একেবারে অসম্ভব!

যতই কিছু বলি না কেন, আমাদের মনের অভাবনীয় বৈচিত্র্য আমাকে চঞ্চল করে তুলছে। এ যেন একেবারে মধ্য-যুগের ঘটনা। এ যেন পুরানো আখ্যায়িকার কথা ভরপুর। সাধারণ লোকে টেনিস-পার্টিতে ভাবী-স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম মেলে, থিয়েটারে অনুরাগ জানায়, আর গির্জ্জায় গিয়ে বিয়ে করে। তুমি আর আমি কিন্তু মোটেই তা করিনি। আমাদের প্রথম দেখা হল, হঠাৎ আমেরিকায়, বিদায়ের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে। তারপর দেখা উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে, প্যারিসে। আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিলুম, দুজনেই সৈনিকের কর্ত্তব্যে যোগ দেবো বলে। আমাদের জীবন সবে-মাত্র আরম্ভ হয়েছে—বিপুল বিশ্ব আমাদের সাম্‌নে দীর্ঘ বিস্তারে পড়ে আছে, তবুও অন্তরের একটা চির-দীপ্ত আদর্শের জন্যে আমরা সকল ভাল-বাসা, যৌবনের সকল সম্ভাবনা, আর এই ধরিত্রীর সকল মোহ ত্যাগ করলুম। সব-চেয়ে গৌরবের কথা, আমরা এটিকে অন্য সব জিনিষের চেয়ে বড় করে দেখি। আরও বিচিত্র যে, আমি হত্যা করি, আর তুমি বাঁচিয়ে তোলো; অথচ আমাদের উভয়ের কর্ত্তব্যের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী ভাব আছে—অভাবনীয় ধ্বংস ও দুর্গন্ধের মধ্যে থেকে তোমার লেখা পাতা আমার কাছে আসে, আর আমার গুলো তোমার কাছে যায় (কতকগুলো যায় বটে, আমি যা কিছু লিখি, তার সবগুলো যদিও নয়)। এই জরা, দুঃখ, দারিদ্র্য ও বেদনার উপরে আমাদের আত্মা জেগে উঠেছে। ইতিহাসের সব-চেয়ে কুৎসিত ব্যাপার আমাদের চারদিকে নিত্য ঘটছে, কিন্তু এই-সবের সঙ্গে লড়াই করতে হবে ব'লেই আমাদের আত্মা ভিতর থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে, আত্মপ্রসার লাভ করছে! এ কি অভাবনীয় রকমে আশ্চর্য্য নয়? প্রিয়া আমার, তুমি আমেরিকান, তোমার মনে কি কোন উত্তেজনাই জাগছে না?

তোমার চিঠি কেমন করে এল বল দেখি? তোমার প্রথম চিঠি?—উপত্যকার

পাশ দিয়ে লম্বা একটা ঢিবি আছে, মস্ত এক চড়াই—এখন সেটা বরফে ঢাকা পড়ে একেবারে কাঁচের মত হয়ে গেছে, এরই পাশে-পাশে গুহার মত ট্রেঞ্চের সার, এই ঝোপ-ঝাড়ের তলায় কত লোক অজানা ও অতীত অপরাধের ফলে মরে ছড়িয়ে পড়ে আছে। হুন্‌ই হোক, আর ফরাসীই হোক, আজ বছরখানেক পরে তাদের সমানই দেখাচ্ছে, Uniform এর তফাৎ ব'লে যা-কিছু বোঝা যাচ্ছে। ঢিবিটার উপরে আরও অনেক ট্রেঞ্চ আছে—একেবারে মৌচাকের মত; সেগুলো শত্রুর দৃষ্টির সাম্‌নে বলে এখন নষ্ট হয়ে গেছে। আমি যে ট্রেঞ্চে আছি, সেটা ঢালুর দিকে মাঝ-পথে। সেখানে হয় রাত্রে, না হয় সকালে, কুয়াশার অন্তরালে যেতে পারা যায়। একটা Dug-out বোমার ঘায়ে নষ্ট হয়ে গেছে, তার উপরে লুকিয়ে দেখবার একটা ফোকর আছে, সেই ফোকরের মধ্যে দূরবীন্ বসিয়ে জর্ম্মাণদের গতি-বিধির আভাস লক্ষ্য করাই আমার কাজ। কাল হঠাৎ কুয়াশার অন্ধকার খানিকটা কেটে গেলে আমি দেখলুম, শত্রুরা সব কাজে লেগেছে। জায়গাটা ম্যাপের কোন্ খানে, ঠিক করে নিয়ে গোলন্দাজদের 'ফোন্' করে কুয়াশার ঘোর কাটবার অপেক্ষায় রইলুম। দেখলুম শত্রুরা শ্র্যাপনেল নিয়ে খোলা মাঠের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা ছুটলো, আমি অনুসরণ করলুম, আমার দৃষ্টি-সীমা ক্রমাগতই বেড়ে চল্লো। নিরাপদ হবার পক্ষে তাদের একমাত্র বাধা ছিল, কাঁটা-তারের বেড়া। তারা সেই তারের তলা দিয়ে, মাঝ দিয়ে গোলে পালাবার চেষ্টা করলে, আর সেই-খানেই গুলির আঘাতে পেরেক-পোঁতা হয়ে গেল। আমি গুণলুম, দশজন মরেছে, আর এ সেই পরিমাণ লোক আহত হয়েছে। শান্তি সময়ে একটা কুকুর মারলেও আমার কষ্ট হোত আর এখানে নর-হত্যা করলেও আমার বিবেকে বাধে না। অদ্ভুত! এই অন্তরা আমি যেন ভগবানের মত বসে আছি, জগতের কাজ সব দেখছি, আর খেয়া মত নির্দ্দেশ করছি—কার মরবার পা পড়েছে!

ঠিক এইখানেই ভোরের বেলায় তোমা চিঠি পেলুম। খাবার নিয়ে আমার আর্দ্দালী গুঁড়ি মেরে ঢুকলো, চিঠিখানি তখন তার হাতে ছিল। তোমার চিঠি—! পড়লুম—এই যে লিখছি—এক-চোখে তোমার চিঠি পড়ছি, অ চোখে শত্রুর গতি-বিধি লক্ষ্য করছি। সম্ভব কুয়াশার আড়ালে বসে কোনো জার্ম্মা গোলন্দাজও ঠিক এমনই করছে। সেও আমা মত বাঁচতে চায়, তার ভালবাসার পাত্রী সে আমারই মত দেখবার জন্যে উৎসুক। আমার সঙ্গে তার কোনো শত্রুতাই নেই, অথচ যদি সুবিধা পায় তবে আমাকে স্বচ্ছ চিত্তে মেরে ফেলতে তার বাধবে না। বর্ত্তমা যুদ্ধে সব-চেয়ে ভয়ানক ব্যাপার এই যে, এ নিতান্ত যান্ত্রিক। যে-হাত আঘাত করছে সে-হাত কেউ দেখতেই পায় না। ক্রমওয়েলে সেন্যদল শত্রুদের সাম্‌না-সাম্‌নি লড়েছিল দায়ূদের গাথা গাইতে গাইতে তারা মরণে মুখে ছুটেছিল, আর আমরা কামানের জা ধোঁয়ার আড়ালে ট্রেঞ্চ থেকে লুকিয়ে বা হই, আর নিঃশব্দে শত্রু সংহার করি।

আমার মনের চোখ দিয়ে তোমায় দেখি তুমিও আমায় দেখনি। আমরা যে ধরণে

লোক, আমাদের সত্য প্রকৃতি যা, Parisএ পরস্পরের কাছে পূরোপূরিভাবে তা ধরা পড়ে নি। বেণ্ট আর বোতামের পিতল ঘষে মেজে চক্‌চকে করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, সামাজিকতা বজায় রেখে গল্প করেছি, সামান্য ত্রুটিতেই চমকে উঠেছি, খুব ওজন করে গম্ভীরভাবে খেয়েছি। লোকের মন হরণ করবে বলেই যেন তুমি পোষাক পরতে; মোটর না পেলে বা বৃষ্টি এলে তোমার জন্যে ভেবে আমি আকুল হতুম। আর এখন শুধু হত্যা করবার জন্যে সুযোগ খুঁজচি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু সেই জন্যেই অপেক্ষা করছি! আর তুমি সৈন্যদলের পিছনে ময়লার মধ্যে দিয়ে নিজের কাজে চলেছ! পরস্পরের কাছে সব কথা পরিষ্কার করে বলবার আর উপায় নেই, কিন্তু সেই সাধারণ তুচ্ছ জীবনের আবর্জ্জনা-স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, বলিষ্ঠ সাহস নিয়ে মরার মধ্যেও গৌরব আছে।

কুয়াশা উবে আসচে। এবার আমার দৃষ্টি আরও খরতর করতে হবে। এই আর একখানা চিঠি লেখা হ'ল। ভবিষ্যতে যেদিন যুদ্ধ থাম্‌বে, তোমায় সব কথা বলবার মত ফুরসুৎ পাবো, সেদিনের জন্যে একে অপেক্ষা করতে হবে। প্রিয়া আমার! Joan of Arc আমার! বিদায়—তোমার পাণ্ডুর গোলাপের সৌন্দর্য্য, তোমার মার্কিন রেড ক্রশের কর্ত্তব্য, সকলের কাছে বিদায়! Dormenর বনে Joan স্বপ্ন দেখেছিল! আর তুমি স্বপ্ন দেখেছ New York সহরের গগনস্পর্শী প্রাসাদ-কক্ষে! দু-জনেই তোমরা কর্ত্তব্যের আহ্বানে ছুটে বেরিয়েছ। তোমাদের জীবনের মাঝে যত শতাব্দীরই ব্যবধান থাক্, তোমাদের আত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই!

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্কলন

কুক্কুট প্রসঙ্গ

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-পাঠে জানা যায় যে, আর্য্যদিগের নানা প্রয়োজনে কুক্কুটের সম্পর্ক ছিল। ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতের উচ্চারণভেদ কুক্কুটের ধ্বনি হইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। এবিষয়ের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কুক্কুট ক্রমে যে তিনটি শব্দ করিয়া থাকে, যাহাকে স্থানবিশেষে সাধারণত লোকে মোরগের বাঁক্ বলে, সেই শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পাণিনি মুনি "উকারোঽজ্-হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতঃ" এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, টীকা-কারগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (১)।

মহাভাষ্য-পাঠে জানা যায় যে, বন্যকুক্কুট আর্য্যদিগের ভক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইত, এবং গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল (২)। মহর্ষি পরাশর উপদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, কুক্কুট-ডিম্বের পরিমাণানুসারে

১। উবর্ণে কুক্কুটরুতৌ প্রসিদ্ধাদ্বাদুবর্ণভাক্।

২। অভক্ষ্যপ্রতিষেধেন বা ভক্ষ্যপ্রতিষেধঃ। তদ্‌যথা অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ, অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকরঃ, ইত্যুক্তে গ্রাম্যত এতৎ আরণ্যো ভক্ষ্যইতি।

চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের গ্রাসব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তে যতগুলি গ্রাস খাইবার নিয়ম আছে, সেইগুলি মোরগের ডিমের মত করিতে হইবে, তাহা না হইলে পুণ্য হইবে না, এবং পাপও বিদূরিত হইবে না (৩)।

হেমাদ্রি-ধৃত লক্ষণকাণ্ডের বচন হইতে জানা যায় যে, কুক্কুটডিম্বের পরিমাণানুসারে বাণলিঙ্গের লক্ষণ অবধারিত হইয়াছিল (৪)। প্রাচীন যুগে কুক্কুটের লড়াই একটা বিশেষ আমোদের বিষয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে উদাহরণের অভাব নাই। উহা সজীব দ্যূতের অন্তর্গত। কাদম্বরী কাব্যের নায়ক চন্দ্রাপীড় বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়ে পথিমধ্যে কুক্কুট প্রভৃতির লড়াই দেখিয়াছিলেন (৫)।

বৃহৎসংহিতা পাঠে জানা যায় যে, সেকালে রাজ-বাড়ীতে কুক্কুট পোষা হইত, এবং তন্ন-তন্ন করিয়া তাহার দোষ-গুণের বিচার করা হইত। বরাহমিহির বলিয়াছেন যে, যে কুক্কুটের লোম এবং অঙ্গুলি সরল, মুখ নখ ও মাথার চূড়া তাম্রবর্ণ, এবং শরীরের বর্ণ শুভ্র, রাত্রির অবসানে যে মধুর শব্দ করে, সেই কুক্কুট রাজার রাজ্যের এবং রাজার অশ্বের বৃদ্ধি করিয়া থাকে (৬)।

টীকাকার ভট্টোৎপল গর্গের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই বচনগুলির অর্থ হইতে জানা যায় যে কুক্কুট শ্বেতবর্ণ, যাহার নখ ও চঞ্চু তাম্রবর্ণ, যাহার ঘাড়ের লোম সরল, যাহার অঙ্গুলি আবৃত নহে, এবং যাহার অঙ্গ সুঠাম ও মাথার চূড়া তাম্রবর্ণ, সেই কুক্কুট প্রশস্ত। যে কুক্কুট অত্যালাপী অর্থাৎ অধিক-ভাষী, যাহার ঘাড় যবের মত, যাহার মুখ সুন্দর, বর্ণ দধির মত, মুখ প্রশস্ত, মাথা বড় এবং চরণ হরিদ্রাবর্ণ, সেই কুক্কুট প্রশস্ত। মোটামুটি বলা হইয়াছে যে,—যে সকল কুক্কুটের চরণ খঞ্জ নহে, মুখ তাম্রবর্ণ এবং বর্ণ তৈলাক্তের মত, সেই সকল কুক্কুট প্রশস্ত। পক্ষান্তরে যে সকল কুক্কুট উৎসাহহীন, বিবর্ণ এবং বিকৃতস্বর, সেইগুলি নিন্দিত (৭)।

বরাহমিহির অপর একটি লক্ষণে বলিয়াছেন, যে বিহগ (কুক্কুট পাখী) যবগ্রীব অর্থাৎ যবসদৃশ গ্রীবাযুক্ত (টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন যে, লোকে যাহা "যবগিয়া" নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই "যবগ্রীব"), অথবা যে পাখী বদরসদৃশ অর্থাৎ সুপক্ক বদর ফলের মত রক্তবর্ণ, যে পাখীর মস্তক বৃহৎ এবং শ্বেত রক্ত নীল প্রভৃতি নানা বর্ণ-যুক্ত এবং নির্ম্মল, সেই কুক্কুট যুদ্ধে প্রশস্ত, অথবা যে পাখী মধুর মত বর্ণযুক্ত অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণ অথবা ভ্রমরের মত কৃষ্ণবর্ণ, সেই কুক্কুটও যুদ্ধে জয়প্রদ।

৩। কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণন্তু গ্রাসং বৈ পরিকল্পয়েৎ।
অন্যথা ভাবদোষেণ ন ধর্ম্মো ন চ নিষ্কৃতিঃ॥ ১-অ। ২।

৪। পক্কজম্বুফলাকারং কুক্কুটাণ্ডসমাকৃতিং।

৫। আবদ্ধ-মেষ-কুক্কুট-কুবর-কপিঞ্জল-লাবক-বর্ত্তিকাযুদ্ধম্।

৬। কুক্কুটস্তুজুতনুরুহাঙ্গুলিস্তাম্রবক্ত্র নখ-চূলিকঃ সিতঃ।
রৌতি সুস্বরমুষাত্যয়ে চ যো বৃদ্ধিদঃ স নৃপরাষ্ট্র-বাজিনাম্।
-৬২। অ ১

৭। শ্বেতস্তাম্রনখঃ শুক্লস্তাম্রাক্ষস্তু জুবালধিঃ।
অনাবৃতাঙ্গুলিঃ স্বঙ্গস্তাম্রচূড়ঃ প্রশস্যতে॥
অত্যালাপী যবগ্রীবো দধিবর্ণঃ শুভাননঃ।
প্রশস্তাস্যঃ স্থূলশিরা হারিদ্রচরণো দ্বিজঃ॥
অখঞ্জাস্তাম্রবক্ত্রাশ্চ স্নিগ্ধবর্ণাশ্চ পূজিতাঃ।
দীনাশ্চৈব বিবর্ণাশ্চ বিস্বরাশ্চ বিগর্হিতাঃ॥

বর্ণিত লক্ষণরহিত কুক্কুট প্রশস্ত নহে। যে কুক্কুটের শরীর এবং স্বর ক্ষীণ, অথবা চরণ খঞ্জ, সেই কুক্কুটও মঙ্গলকর নহে (৮)।

কুক্কুটীর লক্ষণ বলা হইয়াছে, যে কুক্কুটী মৃদু-মধুর শব্দ করে, যাহার শরীর স্নিগ্ধ অর্থাৎ তৈলাক্তের মত মোলায়েম, যাহার মুখ ও চঞ্চু সুন্দর, সেই কুক্কুটী রাজাদিগের সম্পৎ, যশ, যুদ্ধে জয় এবং বীর্য্যোৎকর্ষ প্রদান করে (৯)।

বরাহমিহিরের অপর একটি বচন পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন যুগে রাজছত্রে কুক্কুট-পক্ষ নিহিত হইয়া ছত্রের শোভাসম্পাদন এবং রাজার সৌভাগ্যবর্দ্ধন করিত (১০)।

প্রদর্শিত বচনাবলী হইতে রাজবাড়ীতে কুক্কুট পোষণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "প্রায়শ্চিত্তবিবেকে" পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, মার্জ্জার কুক্কুট ছাগ কুক্কুর শূকর এবং অন্যান্য পাখী পোষণ করিলে "রোম-পূয়বহ" নামক নরক-গামী হইতে হয়। এইরূপ যে বচন আছে, উহা জীবিকার জন্য মার্জ্জারাদি পোষণে দোষজ্ঞাপক এমত বুঝিতে হইবে (১১)। সুতরাং শাস্ত্রমতে আমোদের জন্য কুক্কুট প্রভৃতি পোষা গৃহস্থ মাত্রের পক্ষেই দোষাবহ নহে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
বৈশাখ ১৩২৮।

শিশু-মঙ্গল

ইংরাজীতে যাহাকে Child welfare বলে, একটু উদ্ভট শুনাইলেও বাঙ্গালায় তাহাকে বলিব শিশুমঙ্গল। খাঁটি বাঙ্গালায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, কি করিলে যথার্থভাবে শিশুকে মানুষ করা যায়, তাহাই আমাদিগের আলোচনার বিষয়। "মানুষ করা" বলিতে গেলে, তাহার সঙ্গে দেহের, মনের ও অপরাপর চিত্তবৃত্তির একাধারে ও সম্যক্ পরিমাণে স্ফূর্ত্তি বুঝায়। আপনারা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন—প্রত্যেক পিতামাতাই ত নিজ নিজ সন্তানকে "মানুষ করেন," তবে আবার সে কথা নূতন করিয়া আমি আর কি বলিব? ইহার উত্তর আমি দুইটি কথা বলিতে চাহি;—প্রথমতঃ এ দেশে পিতামাতা সন্তানকে যে ভাবে মানুষ করেন, তাহা যথার্থ ও যথেষ্ট নহে; এবং দ্বিতীয়তঃ; পিতামাতারা জানেন না, ও জানিতে চাহেন না যে, তাঁহারা কর্ত্তব্য যথেষ্ট ও যথার্থরূপে প্রতিপালন করিতেছেন না।

প্রথম উত্তরের প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, পিতামাতার কর্ত্তব্য যদি যথেষ্ট ও যথার্থরূপে প্রতি-

---

৮। যবগ্রীবো যো বা বদরসদৃশো বস্তু বিহগো
বৃহন্মূর্দ্ধা বর্ণৈর্ভবতি বহুভির্যস্তু রুচিরঃ।
স শস্ত সংগ্রামে মধু-মধুপ-বর্ণশ্চ জয়কৃন্ন
শস্তো যোঽতোঽন্যঃ কৃশতনুরবঃ খঞ্জচরণঃ॥ ২।

৯। কুক্কুটী চ মৃদুচারুভাষিণী, স্নিগ্ধমূর্ত্তি-রুচিরাননেক্ষণা।
সা দদাতি সুচিরং মহীক্ষিতাং শ্রী-যশো-বিজয়-বীর্য্যসম্পদঃ।

১০। বিচিত্রং তু হংসপক্ষৈঃ কৃকবাকু-ময়ূর-সারসানাং বা।
দৌকূল্যেন নবেন তু সমন্ততশ্ছাদিতং শুকদেহম্। ১।

পালিত হইত, তাহা হইলে এ দেশে প্রকৃত মানুষের অভাব হইত না। যদি স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাই যে, এদেশে কচি ছেলেকে বাঁচাইয়া, একটু বড় করা, কত দুরূহ ব্যাপার। এদেশে এক-বৎসরে ১৭,২৭,১৭৩ শিশু জন্মায়; তাহার মধ্যে, এক বৎসর ঘুরিয়া আসিতে না আসিতেই, ১৬,২৭, ৩৩১ শিশু মারা পড়ে! যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা যকৃতের দোষ. ম্যালেরিয়া; পেটের পীড়া, সর্দ্দি-কাশি, প্রভৃতি কত শত ব্যারামে ভুগিয়া তবে বাঁচে; তাহারা প্রাণে বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু রোগা ও রুগ্ন হইয়া সাগুবার্লির ও বিলাতী গুঁড়াখাদ্যের শ্রাদ্ধ করিয়া তবে বাঁচিয়া থাকে। এদেশে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া কয়টি শিশু জন্মায়? কয়টি শিশু হৃষ্টপুষ্ট হইয়া জন্মিয়া টুকটুকে হাসিমুখে নীরোগ হইয়া, চারিদিকে প্রাণের স্পন্দন ছড়াইয়া আনন্দ করিয়া বেড়াইতে পায়? এ দেশে শিশুরা রোগা ও রুগ্ন, স্ফূর্ত্তিহীন এবং তাহাদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি অত্যন্ত কম। এই ত গেল তাহাদিগের স্বাস্থ্যের অবস্থা। তাহার পরে যদি তাহাদিগের লেখাপড়ার কথা ধরি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? যাঁহারা "ভদ্র" নামে চলিত, তাঁহাদিগেরই মধ্যে লেখা-পড়ার কিছু চলন আছে—যাঁহারা তথাকথিত "ইতর" তাঁহারা একেবারেই অশিক্ষিত। আবার ভদ্রদিগের মধ্যে, স্ত্রীলোকেরা বেশীর ভাগই অশিক্ষিত। বলা বাহুল্য, শুধু বই পড়া বিদ্যা বা কেতাবতী শিক্ষাকেই আমরা শিক্ষার মাপকাটি ধরিয়া লইয়াছি—যদিও প্রকৃত শিক্ষা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ।

এইবার প্রকৃত শিক্ষার কথা ধরিয়া দেখা যাউক, আমাদিগের শিশুরা সে শিক্ষা কতটুকু ও কি ভাবে পায়। প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না ঘটিলে, ঘরে পিতামাতার এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্য্য না ঘটিলে, সজীব সমাজের প্রচেষ্টা ও সহানুভূতি, না থাকিলে, এবং দেশের রাজার সাহায্য না পাইলে—কখনো প্রকৃত শিক্ষা হয় না। যে শিক্ষা মানুষের দৃষ্টির বিস্তার ঘটায়, মনের উন্নতি আনে, চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির উপচয় করে এবং তাহার সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সজাগ ও কর্ম্মঠ করে, সে শিক্ষাই মানুষ গড়ার সহায়ক। যে মানুষের সে শিক্ষা ঘটিয়াছে, যে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, যে নিজে পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে পারে, সে সমাজের একজন চূড়া। তাহার দেহের স্বাস্থ্য অটুট, তাহার নৈতিক বল সুদৃঢ়, তাহার ধর্ম্ম নির্ম্মল। এ রকম শিক্ষা আমাদের দেশে কয়টী শিশু পায়? এই শিক্ষার প্রভাবে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়; ইহার অভাবে মানুষ অমানুষ হয়। কয়টি পিতামাতা বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের শিশু এই শিক্ষার কণামাত্রও পায়? আমাদের দেশের ছেলেরা ধর্ম্ম আচার ও অনুষ্ঠান-বাহুল্যের মধ্যে থাকে; অথচ উচ্ছৃঙ্খলতার বেশ পরিচয় দেয়। তাহারা সমাজের অষ্টবন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও অসংযম ও অধর্ম্মের পরিচয় প্রতি পদে দিয়া থাকে; কারণ নৈতিক মেরুদণ্ড কয়জনের আছে? আত্মনির্ভর, আপনার লোকের প্রতি বিশ্বাস, আপনার স্বজনের প্রতি আত্মবোধ, স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা, স্বমত পোষণ করিবার সৎসাহস কয়জনের মধ্যে দেখা যায়?

তাই বলিতেছিলাম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম—যে দিক দিয়াই দেখি, ছেলে মানুষ করার বিষয়ে বাঙ্গালী পিতামাতার অসাফল্যের পরিচয় চতুর্দ্দিকেই বর্ত্তমান।

কিন্তু আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এতটা অসাফল্য অতিশয় প্রকট হইলেও, আমরা তাহাকে দেখিয়াও দেখি না এবং বুঝিয়াও বুঝি না। আমরা সংবাদপত্রে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা পড়ি—কিন্তু শিহরিয়া উঠি না। আমরা নিত্য ঘরে ঘরে ব্যারামের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখি, কিন্তু তাহাতে বিচলিত হই না। আমরা যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাই, কিন্তু তাহারা দাঁড়ের পাখী ছাড়া আর কিছু যে হয় না—ইহা—বুঝিয়াও বুঝি না। বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, কতকটা একটা আন্তরিক অব্যক্ত মর্ম্ম-বেদনার তাড়নায় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে যখন বিদ্যালয় ছাড়িয়া সম্প্রতি বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেটা যে ষোল আনা হুজুগ বা সাময়িক উত্তেজনার

বশে করিয়াছিল, তাহা আমি মনে করি না। ভিতরে অসাফল্যের বৃশ্চিক-দংশনে পীড়িত ছাত্রগণ ঐ উত্তেজনাকে হেতু করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু ছাত্রেরা, নিজ ব্যথা কোথায়, ও কি আকারে রহিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে না পারিলেও, সেটাকে যে রীতিমত অনুভব করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু তাহাদিগের সে বেদনার বিষয়ে তাহাদের পিতামাতারা ও সমাজ উদাসীন। ছাত্রদিগের এই চাঞ্চল্যের উপরের ফেনাগুলিই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, অন্তরের স্রোত কোন্ দিকে বেগে যাইতেছে তাহা নিরূপণ করিবার এমন সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারাইলেন, এবং এমন সুযোগ তাঁহারা নিত্যই ত্যাগ করিতেছেন! কিন্তু তাই বলিয়া, বাঙ্গালীরা যে শিশুদিগের প্রতি মমত্বহীন, তাহা নহে। বস্তুতঃ এই বাঙ্গালা দেশে শিশুলাভ করিবার জন্য এবং শিশুকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিবার জন্য, এমন কৃচ্ছ্রসাধ্য কাজ বা ব্রত নাই, যাহা বাঙ্গালীর মেয়েরা পারেন না বা করেন না। বাঙ্গলা দেশে, নন্দের দুলাল, যাদুমণি প্রভৃতি যেমন গালভরা নাম-গুলি আছে, এমন আর কোথায় আছে? এই বাঙ্গালাদেশেই যখন হিন্দুরা সুস্থ ছিলেন, তখন প্রত্যেক শিশু যে কেবল তাহার নিজ নিজ পিতামাতার যত্ন ও আদরের সামগ্রী ছিল তাহা নহে—প্রত্যেক শিশুই নিজ সমাজের, দেশের ও নিজ রাজার যত্ন ও আদরের গচ্ছিত ধন ছিল। কিন্তু আজ অদৃষ্টের কি উপহাস, সেই পুণ্যভূমি বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়া, বাঙ্গালীরই কাছে আমাকে অতি দীনভাবে বাঙ্গালাদেশের শিশুর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে হইতেছে; এমনটি কেন হইল?

এই কথার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। জ্ঞানের অভাব, দৈন্য, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিদেশীর আধিপত্যই, প্রধানতঃ এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ চতুষ্টয়। আমরা একে একে সেই কথাগুলির আলোচনা করিব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া সেগুলি শুনিবেন।

প্রথম কারণ অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা নানাবিষয়িণী। আমাদের দেশে শুধু ভদ্রলোকেরাই বই পড়িয়া লেখাপড়া শিখেন। তাঁহারা অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন; কিন্তু নিজ নিজ দেহ-তত্ত্ব, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে একেবারে মূর্খ থাকিতেও তৃপ্তি বোধ করেন। তাঁহারা নিজ নিজ সংসারে স্ত্রীলোকদিগের মেয়েলি আচার মাথায় পাতিয়া লয়েন এবং সংসারে, স্ত্রীলোক-সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে ভালবাসেন। বাটীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে নাটক নভেল পড়া বিদ্যার বেশী লেখাপড়া শিখান কর্ত্তব্যও মনে করেন না। বাঙ্গালীর সমাজেও স্ত্রী শিক্ষার আদর নাই, বরং স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য-বিধায়িনী ব্যায়াম-বিধির প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে। এই গেল ভদ্র সমাজের কথা। তথাকথিত ইতর সমাজে, সকল প্রকার জ্ঞানের অভাবের সঙ্গে রাশীকৃত লোকাচার ও দেশাচারের বিড়ম্বনা যথেষ্ট আছে, এবং এই আচারের স্তূপ, অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফল কি কি, অতি সংক্ষেপে তালিকা দিলাম। এ দেশের অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে, লেখাপড়া শিখিলে, স্ত্রীলোক বিধবা হয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে দেহকে সুকোমল রাখাই তাহার "লক্ষ্মী-শ্রী," বজায় রাখিবার প্রধান সহায়—অঙ্গচালনা করিলে না কি দেহের সৌষ্ঠব নষ্ট হয়, রমণী পৌরুষভাবাপন্না হন। অন্তঃস্বত্ত অবস্থায় শিশুর মঙ্গল কামনা করিয়া অষ্টম মাসে কাষ্ঠে (অর্থাৎ যান-বাহনে) উঠিতে প্রত্যবায় আছে; —কিন্তু গর্ভবতী বধূকে সংসারে নিত্য গঞ্জনা-তাড়নায়, দুঃখের ভাতকে সুখে খাইতে দোষ নাই। গর্ভাবস্থায় এঁটো পাতে, রমণীকে অতিকষ্টে বমনকে দমন করিয়া খাইতে বাধা নাই; এবং জাতি ও শুচি-বিড়ম্বিত হিন্দুর বিষ্ঠা-থুথু মিশ্রিত পথের ধূলিসিক্ত গুরুজনের চরণ-ধূলি জিহ্বায় স্পর্শ করা দূষণীয় নয়। গর্ভ-ধারণ হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত নিত্যই সহজ-প্রসব মাদুলি, শিকড়, ঔষধ প্রভৃতি ধারণ বা সেবন করিয়া নিত্য ভয় পাওয়ায়, কোনও দোষ না কি হয় না! রমণীদিগের মধ্যে অজ্ঞতার কি ঘোর ঘনান্ধকার

—তাহা এই সামান্য কয়টি কথা হইতেই বুঝা যায়।

এই রমণীরা, স্বয়ং বালিকা থাকিতে থাকিতেই, সন্তান-সম্ভবা হন। যে বয়সে এই ব্যাপার ঘটে, সে বয়সে না দেহের, না জ্ঞানের, না বুদ্ধির পক্কতা লাভ হয়। অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিয়া রমণীরা নিজ স্বাস্থ্য সহজে হারান এবং শিশুদিগকে যথেষ্ট ভোগান। গর্ভাবস্থায় কি খাইতে হয়, কি ভাবে থাকিতে হয়, কি করিলে শিশুর মঙ্গল হয়, কি করিলে শিশুর অমঙ্গল হয়—এ-সব কথা তাঁহারা কিছুই জানেন না—অথচ ভাবী বংশধরের জননী হইয়া পড়েন। বাড়ীর কর্ত্তারা এ সম্বন্ধে নিজেরাই অজ্ঞ; কাজেই কতকগুলি মেয়েলি-শাস্ত্রসম্মত প্রথানুসারে সকল জিনিষেরই ব্যবস্থা হয়। সেই দুই-একটি প্রথার কথা বলিতেছি, শুনুন।

প্রথম ব্যবস্থা—আঁতুড় ঘর। হিন্দুদিগের মধ্যে আঁতুড় ঘরের মত অশুদ্ধ জায়গা আর নাই। দেহের যেমন-তেমন ময়লা অবস্থায়, যেমন-তেমন ময়লা কাপড় পরিয়া, আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে পারা যায়—কিন্তু আঁতুড় হইতে বাহিরে আসিলে, পরণের কাপড় ছাড়িয়া স্নান পর্য্যন্ত করিতে হয়। আঁতুড় ঘর এমন ঘোর অশুদ্ধ স্থান যে, সে ঘরে ঢুকিলে, দেবতার মাদুলি-কবচ পর্য্যন্তও মাহাত্ম্য হারায়। আঁতুড় ঘরে যত কিছু জিনিষ-পত্র দেওয়া হয়—সে সকলই ফেলিয়া দিবার কথা; কিন্তু কোনও কোনও সংসারে, একই আঁতুড়ের বিছানা-পত্র পর-পর বহু আঁতুড়ে ব্যবহৃত হয়। বাড়ীর মধ্যে সব-চেয়ে নিকৃষ্ট ও অকেজো জায়গায় আঁতুড় ঘর করা হয়। উঠানের মাঝে, পায়খানা বা পাতকুয়ার বা গোয়াল ঘরের কাছে, এমন একটি জায়গা বা ঘর বাছিয়া লওয়া হয়, যেটির কোনও রকমে গৃহস্থের কোনও দরকার নাই। আঁতুড় ঘরের সাজ-সরঞ্জাম—বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে অকেজো, সব চেয়ে কম দামী যে সব ছেঁড়া ভাঙ্গা পুরাতন জিনিষ তাহাই। কিন্তু আঁতুড় ঘরের পক্ষেসব চেয়ে অপরিহার্য্য, সব চেয়ে দরকারী জিনিষ কি, তাহা জানেন? সে জিনিষ দুইটি—একটী আগুন বা ধুনি, অপরটি পর্দ্দা। যদি ঘরের ভিতরে ঘর এবং তাহার ভিতরে ঘর কি জানিতে চাহেন, তবে আঁতুড় ঘরে যাইবেন। পাছে ঠাণ্ডা লাগে, অথবা পাছে অপদেবতার উৎপাত হয়, এই ভয়ে আঁতুড়ের ভিতরে-বাহিরে পর্দ্দার বাহুল্য এবং ঘরের যে কোনও রন্ধ্র থাকে, তাহাও সযত্নে বুজাইয়া দেওয়া হয়। এহেন নরককুণ্ডে, বাঙ্গালা দেশের ভাবী বংশধরেরা আসিয়া উপস্থিত হন। প্রসূতির আর্থিক অবস্থা যেমনই হউক না কেন, পুরাতন ছেঁড়া জামা-কাপড় ও জীর্ণ পুরাতন কম্বল ব্যতীত, তাঁহারও আর কিছু পাইবার যো নাই। এইরূপ নরককুণ্ডে আঁতুড় ঘর করার ফল কি, জানেন? এমন ঘরে প্রসব করিয়া অনেক স্থলে প্রসূতি ও শিশু দম আটকাইয়া মারা পড়ে; কোথাও প্রসূতির বাঁকা জ্বর হইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া যায়; সে জ্বরকে Puerperal fever বা আঁতুড়ের জ্বর বলে। এই জ্বরটা এত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রসবের তৃতীয় দিনে জ্বর হইবেই বলিয়া আমরা প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি; জ্বর হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হই না; না হইলে, বরং মনে মনে একটু চিন্তিত হইয়া পড়ি! এমন ঘরে প্রসব করিয়া সন্তানসহ প্রসূতি ধনুষ্টঙ্কারে মারা পড়ে—ছেলেদের ধনুষ্টঙ্কারকে "পেঁচোয় পাওয়া" ও প্রসূতির ধনুষ্টঙ্কারকে "বাতাস লাগা" বলে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা শুনুন। এদেশে মেয়ে জন্মিলেই তাহার যেমনই স্বাস্থ্য হউক না কেন, বিবাহ দিতেই হইবে; এবং বিবাহ হইলেই, অল্প বয়সে সন্তান হইতেই হইবে। আর, সন্তান প্রসবের পর সকলেরই আঁতুড়ে ধাই থাকা চাই। এই ধাইটি বাঙ্গালীর সংসারে মাতৃত্বের গৌরবে মহিমান্বিত; অর্থাৎ, হিন্দুশাস্ত্রে যত লোকে মাতৃপদবাচ্য, এই ধাইটি তাহার অন্যতম। এদেশে এত জাতি-বিচার, কিন্তু ধাইটি তথাকথিত অতি নীচ জাতীয়া হইলেও, সে নামগৌরবে ও পদমর্য্যাদায় বঞ্চিতা নহে। ধাইদের এত আদর কেন? তাহার উত্তরে বলিব—অজ্ঞতা। বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, ধাইয়েরা সুকৌশলে প্রসব করাইতে পারে, সেই জন্যই তাহাদের এত আদর। কিন্তু, অপর অনেক ভ্রান্ত ধারণার মত, এটাও একটা মস্ত ভ্রান্ত ধারণা। ধাই ত দূরের কথা, পাশকরা প্রবীন চিকিৎসকেরাও অনেক সময়ে প্রসব-কৌশল কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন না—এই জন্যই বিশেষজ্ঞ প্রসব-কৌশল-বেত্তা পুরুষ ডাক্তারের প্রয়োজন। শুধু এ দেশে কেন, সমস্ত পৃথিবীতে, কবে কোথায় কোন্ পাশ-করা প্রসব-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মেয়ে-ডাক্তার, প্রসব-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পুরুষ-ডাক্তার অপেক্ষা বড় হইতে পারিয়াছেন? অর্থাৎ, পাশ করার পর হইতে, ক্রমাগত মেয়েদের রোগ ও প্রসব-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও, ভাল ভাল পাশ-করা প্রবীণ-মেয়ে ডাক্তারেরাও যখন প্রসব-কৌশল-কুশলা বলিয়া নাম করিতে পারেন নাই,—তখন নিরক্ষর ধাই প্রসব-কৌশল সম্বন্ধে কি জানিবে বা কি বুঝিবে? কিন্তু এই জাতীয় রমণীদিগের প্রতি গৃহস্থের কি অগাধ বিশ্বাস, কি অচলা ভক্তি! তাঁহারা জানেন না যে, এই ধাইয়েরাই অধিকাংশ স্থলে সূতিকা জ্বর ও ধনুষ্টঙ্কারের হেতু। এই ধাইয়েরাই কতক স্থলে প্রসবে বিঘ্ন ও বিপত্তির হেতু হইয়া থাকে! একমাত্র আমাদিগের অজ্ঞতার জন্যই—"যার হাতে খাই নাই, সে বড় রাঁধুনী" হইয়া পড়িয়াছে!

তৃতীয় ব্যবস্থা নাড়ী কাটা। নাড়ী কাটা হয়, চেঁচাড়ী সাহায্যে। পল্লীগ্রামে, বেড়া বা বাঁশ ঝাড় হইতে এবং সহরে, ঠোঙা বা অপর অপর জিনিষ হইতে চেঁচাড়ী সংগ্রহ করা হয়। গ্রামের বাঁশঝাড়ের গোড়ায় যত কিছু আবর্জ্জনা সবই ফেলা হয়। আর সেই পবিত্র স্থান হইতে নাড়ী কাটিবার অস্ত্র সংগৃহীত হয়। হইবে না-ই বা কেন? যেমন আঁতুড়-ঘর তেমনি ধাই, কাযেই তাহাদিগের উপযোগী হাতিয়ারও সংগ্রহ করা ত চাই। বাহুল্য-ভয়ে, মেয়েদিগের অজ্ঞতার আর দৃষ্টান্ত দিব না। অনুগ্রহ করিয়া লক্ষ্য করিবেন যে, এই অজ্ঞতা শুধু নিরক্ষর রমণীকুলের মধ্যে নাই—এদেশের তথা-কথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও ইহা পুরামাত্রায় রহিয়াছে। এবং সব-চেয়ে অমঙ্গলের কথা এই যে, যাঁহারা অজ্ঞ, তাঁহারা জানেন না যে তাঁহারা অজ্ঞ; কাজেই, অজ্ঞতা দূর করার জন্য কোনও চেষ্টা নাই!

এদেশে শিশুদিগের অমঙ্গলের দ্বিতীয় হেতু, দৈন্য। এই দৈন্য শুধু আর্থিক দৈন্য নহে—এ ভাব-দৈন্য, হৃদয়-

দৈন্যও বটে। এ দৈন্য ঘটিয়াছে বলিয়া, আজ আমরা যেমন পেট পূরিয়া খাইতে পাই না, তেমনি আমরা সমপ্রাণতা কাহাকে বলে, তাহা ধারণাও করিতে পারি না, আমরা যে মানুষ এবং মানুষের যে কতকগুলি নৈসর্গিক দাবী ও কর্ত্তব্য আছে, তাহা কল্পনাও করিতে পারি না।

শিশুমঙ্গলের তৃতীয় অন্তরায়—সামাজিক বিশৃঙ্খলা-জীর্ণ ও আবর্জ্জনাময় পুরাতনকে যে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে, এ কথা আমি বলি না। জাতিভেদ, বিধবা বা বাল্য বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কথা এ স্থলে বলিতে চাহি না। কিন্তু যে সামাজিক বিধির কল্যাণে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর ন্যায় একত্র পল্লীবাসে থাকিয়া পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগী থাকিতাম, সেই সামাজিক বিধির মূলে কুঠারাঘাত হওয়ায়, আজ সর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট পাইতেছে—নিরপরাধ শিশুকুল। পল্লীগ্রামে জলকে আর নারায়ণ জ্ঞানে পবিত্র রাখা হয় না, গাভী আজ মাতৃজ্ঞানে পূজিতা নয়, উৎসৃষ্ট বৃষ গ্রামে আর স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে পায় না, দীর্ঘিকা খনন করান আর পুণ্যকার্য্য নহে, নবান্ন আজ আর জাতীয় উৎসব নয়, বিনা বেতনে বিদ্যাদান করা আর অধ্যাপকের কাজ নয়—যে হেতু, সমাজ আর অধ্যাপককে প্রতিপালন করে না, বৈদ্যগণ আর ভূস্বামীর অনুগ্রহ পান না বলিয়া, বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতে অক্ষম। ফল কথা, আমাদিগের সামাজিক প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে খান্ খান্ করিয়া আজ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। তাহার ফলে দেশের মধ্যে ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপ। গোচারণের ভূমি না থাকায় এবং উৎকৃষ্ট বৃষের অভাবে আজ গোজাতির নিরতিশয় দুর্দ্দশা—বাঙ্গালীর প্রধান খাবার দুধ-ঘী আর চক্ষে দেখা যায় না। শিশুরা দুধ না পাইয়া, সাগু, বার্লি ও বিলাতী গুঁড়া খাইয়া দেহ ও দেশকে দীন করিতেছে! ভাল জলের অভাবে গ্রামে গ্রামে আমাশয়, ওলাউঠা, বাত-শ্লেষ্মা-বিকার (যাহাকে Typhoid fever বলে) বাড়িতেছে—এবং তাহাতে কত শিশুর প্রাণনাশ ঘটিতেছে! আজ পল্লীগ্রামে সুপেয় জল নাই, যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য নাই, সহরে সুপেয় জল থাকিলেও

ভেজাল খাদ্যের অতি বাহুল্য। আমাদিগের নিজ সমাজ যদি আজ সজীব থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশে আজ ধর্ম্ম-রাজের অত মাশুল আদায় করিবার ক্ষমতা থাকিত না। কিন্তু আমরা ঘরের ঠাকুরকেও তাড়াইয়াছি এবং পরের কুকুরকেও তৎস্থানে বসাইতে পারিতেছি না বলিয়া ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছি! ব্যস্ত হইয়া ক্ষিপ্তের মত বেড়াইলে ত চলিবে না, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

আমাদিগের কর্ত্তব্য কি কি, এইবার সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

আমাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য—অনুভূতি আনা। যতক্ষণ না আমরা প্রত্যেকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে (যাহাকে চলিত কথায় 'হাড়ে হাড়ে' বলে) বুঝিব যে ব্যাপার কি ও আমরা কোথায় যাইতে বসিয়াছি, ততক্ষণ আমরা কোনও কাজ করিতে পারিব না। আমরা আজকাল অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়াছি। তাহা তামসিকতার লক্ষণ—যদিও আমরা মুখে নিজেদের সাত্ত্বিকতার বড়াই করিয়া বেড়াই। আজ আমাদিগের সকলকেই বুঝিতে হইবে যে—এদেশে শিশুমৃত্যু ও জীবন্মৃত শিশুর সংখ্যা বেশী হওয়ায়, এ দেশের দৈন্য ক্রমশই বাড়িতেছে। যাহারা জীবন্মৃত তাহাদিগের চিকিৎসায় ও ভরণ-পোষণে যে প্রভূত সময়, চেষ্টা ও অর্থব্যয় হয়, তাহা না হইয়া তাহারা যদি কাজের লোক হইতে পারিত, এবং যাহারা মারা পড়ে, তাহারা যদি বাঁচিয়া থাকিত, তবে আজ তাহারা কত টাকা রোজগার করিয়া দেশকে বড় করিতে পারিত! শুধু কি তাই? লোক-বল এ সংসারে একটা অতি-বড় বল। আমরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি, সে কথা ভাবিতে বা ধারণা করিতেও চাই না। আমরা কেহ কেহ এত বড় স্বার্থপর হইয়াছি যে, একটার বেশী দুইটা ছেলেকে মানুষ করিতে নারাজ—যে হেতু তাহার জন্য যে বেশী ব্যয় পড়ে সে ব্যয় করিতে গেলে নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভাগ কমিয়া যায়। আজ এ বিলাতি চিন্তার ধারা ভুলিয়া বিলাতী রজোগুণের আশ্রয় লইতেই হইবে। কিন্তু রজোগুণের উপযোগী কর্ম্মপ্রেরণা দিবে কে বা কি?—হাড়ে হাড়ে আপনাদের "অত্যস্ত" অনুভূতিই সে প্রেরণা দিতে পারে। একলা একলা ঘরে ঘরে, সকলেরই দেশের কথা ভাবা চাই এবং দলবদ্ধ হইয়াও এই সকল কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা চাই। সুধু মুষ্টিমেয় কতকগুলি শিক্ষিত লোককে লইয়া কাজ করিলে চলিবে না—যাহারা বহুবর্ষের আবর্জ্জনার মধ্যে নিজ মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে, সেই তথাকথিত ইতর লোককে ডাকিয়া লইয়া সকলে মিলিয়া একসঙ্গে হাড়ে হাড়ে পুনঃ পুনঃ অনুভব করিতে হইবে—তবে কাজ হইবে, নতুবা নহে।

আমাদিগের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—সমাজ গঠন করা চাই। জাতি-বিচারের রেষারেষি দলাদলি ত্যাগ করিয়া, সকলে সদ্ভাবে একত্র থাকিতে পারে, এমন ব্যবস্থা করিতেই হইবে। দল না বাঁধিলে, সমাজ গঠন না করিলে, সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে লোকমত সৃষ্ট হয় না। লোকমতের সৃষ্টি না করিতে পারিলে আমাদিগের ব্যক্তিগত আবেদন নিবেদন চিরকাল উপেক্ষিত হইয়াছে ও হইবে। যতদিন আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিলাম, ততদিন ইংরাজ আমাদিগের সঙ্গে মিশিতে ও সদ্ভাব রাখিতে প্রয়াসী ছিল; কিন্তু আজ আমরা স্ব স্ব প্রধান ও দলহীন হইয়াছি বলিয়া, ইংরাজ আমাদিগের কোনও কথায় কর্ণপাত করে না। শুধু তাহাই নহে; আজকাল বিলাতী বিলাসিতার অনুচিকীর্ষু ও মোহগ্রস্ত কোনও কোনও পিতামাতা, নিজ নিজ সন্তানকে আপনার নিম্ন ভাবিয়া মোহবশতঃ কতই না বিলাসের উপকরণ যোগান, কিন্তু স্থলবিশেষে এই ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলেও শিশুকুল মাত্রেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আজ যদি আমরা আবার সমাজকে জাগাইতে পারি, সেই সমাজ যদি আবার সকলের শিশুকে সমাজের গচ্ছিত ধন মনে করে, তবে শিশুমঙ্গল সাধন করা অতীব সহজ-সাধ্য হইয়া পড়ে। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কথা-প্রসঙ্গে বলি, আজো যখন কোন পুণ্য দিনে, ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মঙ্গল-শঙ্খ একসঙ্গে বাজিয়া উঠে, তখন, আমার বিদেশী ও বিজাতীয় বিক্ষালব্ধ ভাব দেশীয় কুসংস্কার বিদ্বেষ এ সকল কথা ছাপাইয়া, আমার এ ক্ষীণ দেহের ধমনীর মধ্যে শোণিতপ্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে—আমি হিন্দু এই ভাবটি অনুভব করি বলিয়া। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার এমনিই মহিমা।

আমাদিগের তৃতীয় কর্ত্তব্য—জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বম্ভর চাপে আমরা মরিতে বসিয়াছি—মনে, ধনে ও প্রাণে। আজকাল একটি ছেলেকে পড়াইতে যে কত টাকা ব্যয় হয়, তাহার হিসাব আমরা করি না; করিলে, বোধ হয়, আমাদিগের চোখ ফুটিত। তাহার উপরে, জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল শুধু পর-বিদ্যা অধ্যয়নেই কাটে। তবে স্বল্পায়ু বাঙ্গালী উপার্জ্জন কত বৎসর বয়সে ও কতদিন করিয়া করিবে? এই প্রকারে ধন ও প্রাণ দিতে রাজী আছি, যদি তদুপযোগী কিছু ফল লাভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষায় তাহা ত হয় না—বরং অপচয়ের মাত্রাই বেশী। তাহার দুই-একটা নমুনা লউন।—এ দেশে অতি শিশু, ও এম-এ ছাত্র, উভয়েই, বিদ্যালয়ে ১০৷৷০ হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পড়ে ও নানা বিষয়ের পুস্তক পড়ে—অর্থাৎ মুড়ি-মিছরির এ দেশে এক দর! এদেশে শিশুদিগের পরীক্ষাতেও বরযাত্র-ঠকানো প্রশ্ন করিয়া, চল-চেরা বিচার করিয়া নম্বর দেওয়া হয়। এদেশে কচি ছেলেদিগকে সপ্তাহান্তে, পক্ষান্তে ও মাসান্তে exercise বা অনুশীলনীর পেষণ-যন্ত্রে পেষণ করা হয়; তদুপরি ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক পরীক্ষাও গৃহীত হয়—অথচ বৎসরান্তে যে পরীক্ষা হয়, সে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে না পারিলে, বালকটি অনেক সময়ে, উপর শ্রেণীতে উঠিতে পায় না। মেধা যেমনই হউক না কেন, এদেশে প্রত্যেক ছাত্রকেই বহুবিদ্যার এককালে অনুশীলন করিতে হয়। অথচ এমনই শিক্ষার মহিমা যে, এদেশের ছেলেরা নিজ দেশের কথা জানে না এবং নিজ নিজ গৃহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছুই শিখে না। মোটের উপরে, এ দেশের কেতাবতী শিক্ষার ফলে, বালকদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে; বুদ্ধি-বিবেচনা আড়ষ্ট হইয়া আসে, স্বাধীন চিন্তাশক্তি লোপ পায়। ঠিক এই সকল কারণে, শিক্ষাকে অনতিবিলম্বে জাতীয় শিক্ষায় পরিণত করা অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজ্য-চালনার উপযোগী কর্ম্মচারীবৃন্দ-সৃষ্টিকারী এই বিকৃত ও বিচিত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে, প্রকৃত মানুষ-গড়ার আয়তনে লইয়া আসিতে হইবে—ইহার জন্য ক্ষণবিলম্ব করাও উচিত নয়।

আমাদের চতুর্থ কর্ত্তব্য—কর্ম্মী সৃষ্টি করা। এদেশে ত্যাগী ও কর্ম্মী লোকের অভাব নাই—অভাব আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া, একলক্ষ্য করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা কাজ আদায় করা। সুধু একটু নেতৃত্বের অভাবে, অনেক সময়ে, আমরা কত কাজ হারাই। মুখসর্ব্বস্ব, ভোগবিলাসী বা স্বার্থান্বেষী নেতার দ্বারা যে কাজ হয়, তাহা স্থায়ী হয় না। অপর দেশে, দশে মিলিয়া যে কাজ করে, তাহাই ভাল হয়; আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই, সকল অনুষ্ঠানেই এক ঢোল এক কাঁসির প্রাধান্য দেখা যায়—দশে মিলিয়া, হয় কাজ পণ্ড হয়, নতুবা দশজনের মধ্যে নয় জন, কতকটা নির্ব্বিকার ভাবে থাকেন—একজনে যাহা করে, তাহাতেই সায় দিয়া খুসী হন। আলস্যই ইহার মূল হেতু, ঈর্ষাও ইহার কথঞ্চিৎ কারণ বটে।

মোটামুটি ভাবে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিলাম বটে, কিন্তু এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা এইরূপ মোটা কথায় কাজে নামিতে চাহেন না; তাঁহাদিগকে কাজ বাছিয়া দিলে, তাঁহারা অনায়াসেই কাজে লাগিতে পারেন। যাঁহারা সেরূপ ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া দুই একটি কাজের তালিকা দিলাম।

প্রথম—খাঁটি দুধ চাই। কচি ছেলের পক্ষে, প্রায় একবৎসরকাল বয়স পর্য্যন্ত, মায়ের দুধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, আজ তাহার অভাব অত্যন্ত বেশী। কাজেই, গরুর দুধের প্রয়োজন। কিন্তু গোচারণের মাঠের অভাবে, উৎকৃষ্ট জাতির বৃষের অভাবে, উপযুক্ত গো-সেবার অভাবে, গোমাংস ভক্ষণের আধিক্য এবং দুগ্ধবতী গাভীর রপ্তানি বশতঃ, গো-দুগ্ধ আজ বিরল হইয়া পড়িতেছে। কাজেই, ফুকা দেওয়া, পালো মিশ্রিত, মাঠা তোলা, জলীয় দুধ ব্যতীত দুধ পাইবার যো নাই। অথচ, এই দুধ না পাইয়া, বিলাতী গাঢ় দুধ, বিলাতী গুঁড়া খাবার, সাগু, বার্লি, জঘন্য দোকানের খাবার কত শিশু যে খাইতে বাধ্য হয়, তাহা বলা যায় না। অবস্থা হিসাবে যদি পল্লীতে প্রত্যহ কতক পরিমাণে খাঁটি ফুটান দুধ বিতরণ বা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে অনেক শিশু বাঁচিয়া যায়!

দ্বিতীয়—শীতের সময়ে, শীত-বস্ত্র চাই। এ দেশে শীতের সময়ে গরীবদিগের কচি ছেলে-মেয়েরা যত সর্দ্দি-কাশিতে ভোগে ও মারা যায়,তত আর কেহ নহে। যদি শীতের সময়ে, দুঃখীদিগের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা যায়, তাহা হইলে অনেক শিশুর প্রাণ রক্ষা হয়। বিশেষতঃ, আজকাল ইন্‌ফুলুয়েঞ্জার যে রকম প্রকোপ, তাহাতে ঐরূপ করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। টুক্‌রা কাপড়ের মধ্যে তুলা ভরিয়া জামা করিয়া দিলে, শস্তায় ঐ একই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

তৃতীয়—গ্রামে গ্রামে ধাইদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। যাহাতে ধাইয়েরা এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, সে জন্য তাহাদিগকে, সামান্য খরচ করিয়া বিলাতী তুলা, টিংচার আইয়োডিন; সুতা, একটু লাইসল নামক পচন-নিবারক ঔষধ প্রভৃতি বিনামূল্যে দান করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইয়া দিতে হইবে—কি করিতে নাই। এতদ্ব্যতীত, যদি বৎসরান্তে একটা মহকুমার ধাইদিগের কাজের সুফল অনুসারে, কোন-রকম পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে আরো ভাল। এই সকল কার্য্যে শুধু যে পরিশ্রমী, ত্যাগী কর্ম্মীর প্রয়োজন, তাহা নহে, অর্থেরও প্রয়োজন যথেষ্ট।

চতুর্থ—প্রত্যেক গ্রামে, যাহাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমে, তাহা প্রাণপণে করিতে হইবে। ম্যালেরিয়া তাড়ান মুখের কথা নহে; কিন্তু ইহার প্রকোপ কমাইবার চেষ্টা করা কঠিন নয়। বন-জঙ্গল কাটান, খানা-খোঁদল বুজান, মশারি টাঙ্গাইয়া শোওয়া, যথেষ্ট মাত্রায় কুইনাইন খাওয়া—এগুলি গ্রামবাসীর সমবেত চেষ্টায় সম্ভব। শিশুরা যত সহজে এবং যত বেশী সংখ্যায় ম্যালেরিয়ার কো... অপরে তেমন ভোগে না। এই জন্য শিশু-মঙ্গলে... যত কিছু কর্ত্তব্য আছে, এটি তাহাদিগের ম... অন্যতম।

পঞ্চম—গর্ভিণী-পরিচর্য্যা। গর্ভবতী রমণীদের নি... প্রতি ও গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা যাহা... তাঁহারা জানিতে পারেন, তজ্জন্য কাগজ ছাপাইয়া ... বক্তৃতা দ্বারা, জ্ঞান প্রচার করা উচিত। ঘরে ঘ... সুশিক্ষিতা মেয়ে ডাক্তার বা রমণীকে পাঠাইয়া এ বি... ব্যবস্থা করা চাই।

আজ নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, আমাদিগ... সমস্ত শিশুরই ভার লইতে হইবে। শিশুর ভার ল... হইলে, শিশুর জননীর ভারও সেই সঙ্গে লইতে হ... যাহাতে তাহারা প্রাণে বাঁচে, যাহাতে তাহারা বাঁচি... মানুষ হইয়া ওঠে, দেশের ভাবী সম্পদ, ভাবী আ... সেই শিশুকুলের জন্য সকলকেই অবহিত হইতে হইবে। কেহই যেন নিজেকে ক্ষুদ্র বা ক্ষীণ মনে না করেন, যে যেন কাজের বহর দেখিয়া ভীত না হয়েন, যাঁহার যে শক্তি তিনি তেমনি ভাবে কাজ করিবেন।—মোট কথা সকলেরই কিছু না কিছু কাজ করা চাই। কাজ করিতে হইলে, যে জ্ঞান ও ধারণার আবশ্যক, যে প্রেরণা যোজনার প্রয়োজন, তাহাও যোগাইতে হইবে।

কাজ অনেক, সময় স্বল্প; কিন্তু এই বিঘ্নের নিয়... শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া, মহাত্মা গান্ধী... মঙ্গল-শঙ্খনিনাদে, সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের অগ্র... যে সকল মহাপ্রাণ দেশের কাজে ব্রতী হইয়াছে... তাঁহাদিগকে অনুসরণ করা ছাড়া আর গতি নাই।

("বাসন্তী" হইতে পুনর্মুদ্রিত)।

মিলিতোনা

(Theophile Gautierএর ফরাসী হইতে)

১৮৪০, জুন মাসের কোন সোমবারে, একটি সুশ্রী যুবাপুরুষ—কিন্তু দেখিলে মনে হয় মেজাজটা বড়ই খারাপ—বীর-ভূমি মাদ্রিদ্ নগরে সান্ বের্ণার্ডো রাস্তার ধারে অবস্থিত একটা গৃহের অভিমুখে চলিতেছিল।

এই গৃহের একটি জান্‌লার ভিতর দিয়া পিয়ানোর সঙ্গীত-স্বরলহরী বাহির হইতেছিল। যে অসন্তোষের ভাব যুবকের মুখে প্রকাশ পাইতেছিল, এই সঙ্গীত শ্রবণে তাহা যেন আরও বর্দ্ধিত হইল। প্রবেশ করিতে যেন ইতস্তত করিতেছে এই ভাবে সে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তথাপি দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, মনের সমস্ত বিতৃষ্ণাকে অতিক্রম করিয়া, যুবক দ্বারের অর্গল খুলিল—অর্গলের শব্দ হইবামাত্র, সিঁড়িতে ধপাধপ্ পায়ের শব্দ শুনা গেল—একজন তাড়াতাড়ি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

মনে হইতে পারে, হয়ত বেশী সুদে টাকা ধার করা, কিংবা কোনও ধার শোধ করা, কিংবা কোন বৃদ্ধ আত্মীয়স্বজনের কাছে ধম্‌কানি খাওয়া—এইরকম কোন একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারের চিন্তায়, ডন-আন্দ্রের স্বভাব-সিদ্ধ চিরহাস্যোজ্জ্বল মুখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু এ-সব কিছুই নহে।

ডন্-আন্দ্রের কোন ধার ছিল না; টাকা ধার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; তাহার আত্মীয়-স্বজন সবাই পরলোকগত; কোন উত্তরাধিকারসূত্রেও কোন সম্পত্তিলাভের তার প্রত্যাশা ছিলনা; তার কোনও চটা-মেজাজের খুড়ী কিংবা কোনও খামখেয়ালি খুড়োও ছিলনা যে তাহাদের নিকট হইতে সে তিরস্কারের আশঙ্কা করিবে।

নারীরঞ্জনপরতার হিসাবে তাকে প্রশংসা করিতে না পারিলেও এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, সে প্রতিদিন একবার করিয়া ডনা-ফেলিসিয়ানার দরবারে হাজ্‌রিসই করিত।

যুবতী ডনা-কেলিসিয়ানা উচ্চবংশের রমণী; দেখিতে বেশ সুশ্রী; যথেষ্ট ধনসম্পত্তি আছে; ইহার সহিত ডন-আন্দ্রের শীঘ্রই বিবাহ হইবার কথা।

অবশ্য ইহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহাতে ২৪ বৎসর বয়স্ক কোন যুবাপুরুষের মুখ অন্ধকার হইতে পারে, অথবা ষোড়শী-বয়স্কা কোন তরুণীর সহিত দুই এক ঘণ্টা কাটানো কোন যুবকের পক্ষে এমন-কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপারও নহে।

মেজাজ হাজার খারাপ হইলেও কৃত্রিম হাবভাব প্রকাশ করিতে কোনো বাধা হয় না। আন্দ্রে সিঁড়িতে উঠিবার সময়েই মুখের চুরোটটা ফেলিয়া দিয়াছিল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কাপড়ে-লাগা চুরোটের ছাই কাপড় হইতে সে ঝাড়িয়া ফেলিল; মাথার চুলে হাত বুলাইয়া চুলটা একটু দুরস্ত করিয়া লইল এবং গোঁফের ছুঁচালো অগ্রভাগ আর-একটু উপরে তুলিয়া দিল, এবং

মুখের বিরক্তি ভাবটা অপসারিত করিয়া ওষ্ঠাধরে মৃদু মধুর একটি হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল। ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াই তার ভাবনা হইল—যদি ফেলিসিয়ানার মাথার আসে,—যে যুগল-বন্ধ গানটা সেদিন শেষ হয় নাই, সেই গানটা আবার আমার সহিত এক সঙ্গে ২০ বার করিয়া গান করিবে, তাহা হইলে ষাঁড়ের লড়াইয়ের আরম্ভটা আমার দেখাই হইবেনা।

আন্দ্রে মনে মনে এই অশঙ্কা করিতেছিল, এবং সত্য কথা বলিতে কি, এই অশঙ্কার যথেষ্ট হেতুও ছিল।

ফেলিসিয়ানা একটা টুলের উপর বসিয়া ঈষৎ সম্মুখে হেলিয়া, স্বরলিপি-পত্রের যে অংশটা অতি দুরূহ ও জটিল, সেই অংশটা দেখিতেছিল আর পিয়ানোয় তাহা বাজাইতে চেষ্টা করিতেছিল; আঙ্গুলগুলা ফাঁক করিয়া, হাতের দুই কুনুই ও দেহ—দুইয়ের মধ্যে দুইটা কোণ রচনা করিয়া, পিয়ানোর পর্দ্দাগুলার উপর অঙ্গুলির আঘাত করিয়া এই দুরূহ অংশ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিল; এরূপ অধ্যবসায় কোন ভাল বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে আরও উপযুক্ত হইত সন্দেহ নাই।

ফেলিসিয়ানা তাঁর কাজে এরূপ ব্যাপৃত যে, আন্দ্রে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। বাড়ীর পরিচিত লোক ও ঠাকুরাণীর ভাবী পতি মনে করিয়া দাসী মনিবকে খবর না দিয়াই আন্দ্রেকে প্রবেশ করিতে দিয়াছে।

ফেলিসিয়ানা পিয়ানোর সহিত যুঝাযুঝি করিতেছে। আন্দ্রে তাঁর পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। এই বাজনায় বাধা দেওয়া উচিত কিনা—এই কথা আন্দ্রে যতক্ষণ মনে মনে ভাবিতেছে ততক্ষণ এই ঘটনার স্থানটা এক-নজরে যদি আমরা দেখিয়া লই, তাহা হইলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা।

এক-রকম অনুজ্জ্বল ফিকে রঙে দেয়াল রঞ্জিত। জান্‌লা ও দরজার চারিধারে কৃত্রিম ঢালাই কাজ, ধূসর রঙের অলীক ফ্রেম। নামজাদা ওস্তাদের কতকগুলা কালো রঙের তক্ষণ-চিত্র (engraving) ঠিক্ সৌষাম্য রক্ষা করিয়া সবুজ রেশমের রজ্জু দিয়া ঝুলান হইয়াছে। কালো ঘোড়ার বালাঞ্চির গদি বিশিষ্ট সোফা-কৌচ যাহার পৃষ্ঠদেশ "Lyre" বীণাযন্ত্রের আকারে গঠিত, কতকগুলো কেদারা, একটা আলমারি, একটা খোদাই কাজ-করা মেহগনি কাঠের টেবিল, একটা দেয়াল-ঘড়ি, দুই পাশে দুইটা বেলোয়ারি ঝাড়—ইত্যাদি সুরুচিব্যঞ্জক আস্‌বাবে ঘরটি সজ্জিত।

শার্শি-জান্‌লা,—ফুল-কাটা স্যুইস্-মস্‌লিনের পর্দ্দায় বিভূষিত। তাছাড়া কাচের কতকগুলা কুকুর, চিনামাটির কতকগুলি মূর্ত্তিপুঞ্জ (group); মিনার ফুলে বিভূষিত, রুপালী তারের জরাউ-কাজ করা ঝুরি; অ্যালাব্যাষ্টার পাথরের কাগজ-চাপা; স্পা-নগরের প্রসিদ্ধ রং-করা বাক্সো—এই-সব উজ্জ্বল বিলাস-দ্রব্যে ঘরের দাঁড়ানো-শেল্‌ফ্-তাক্ ভারাক্রান্ত। এই প্রকার সৌখীন দ্রব্য-সংগ্রহে ফেলিসিয়ানার কলানুরাগের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

ফেলিসিয়ানা প্যারিসে শিক্ষিতা, সুতরাং প্যারিসের সমস্ত প্রচলিত ঢং তিনি পুরামাত্রায় অবগত ছিলেন।

ফেলিসিয়ানার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার

পিতা পুরাতন আসবাব সকল বাজে জিনিসের গুদাম-ঘরে চালান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দশ-ডেলে ঝাড়, চার-বর্ত্তিকাবিশিষ্ট দীপ, রুশীয় চর্ম্মে আচ্ছাদিত আরাম-কেদারা, ড্যামাস্‌ক্ নগরের বুটিদার গোলাপি কাপড়, পারস্যদেশীয় গালিচা, চীনদেশের ছাতা, ঢাকা-দেওয়া দেয়াল-ঘড়ি, লাল মখ্‌মলের আস্‌বাব-পত্র, বিচিত্ররত্ন-খচিত বই-রেয় আল্‌মারী, বাদামী কাঠের প্রকাণ্ড টেবিল, চারি-কপাট-ওয়ালা বাসনের তাক্-আলমারি, দশ-দেরাজ-ওয়ালা কাপড়ের আল্‌মারি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফুলের টব্—এই-সব স্পেনদেশের বিশিষ্ট সৌখীন সামগ্রীর স্থান,—তৃতীয় শ্রেণীর কতকগুলা আধুনিক বিলাস-সামগ্রী অধিকার করিয়াছে। সভ্যতার আলোকে অন্ধ কতক-গুলি অবোধ লোক এই-সব খেলো জিনিসেই মুগ্ধ যাহা একজন সামান্য ইংরেজ দাসীও পছন্দ করিবে না।

শ্রীমতী ফেলিসিয়ানা দুই বৎসর পূর্ব্বেকার সৌখীন ঢং-এর পরিচ্ছদে বিভূষিতা; বলা বাহুল্য, তাঁর সাজসজ্জায় স্পেনদেশীয় কিছুই ছিল না। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের পরিচ্ছদে যাহা কিছু চিত্রবৎ নেত্রাকর্ষক, কিংবা কোন বিশেষ কুলপরিচায়ক, তাহা তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না; তাঁহার পরিচ্ছদের রং খুব ফিঁকে ও অস্পষ্ট;—ফুলকাটা কিন্তু ফুলগুলি প্রায় অদৃশ্য। এই কাপড় আসলে ইংলণ্ড হইতে আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু জিব্রাল্টারের সাহসী বে-আইন আমদানী-কারীরা প্রবঞ্চনা করিয়া উহা প্যারিসের কাপড় বলিয়া চালাইয়া দেয়। কোন মধ্যবিত্ত লোক তাহার কন্যার জন্য ঐ রকম কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় পছন্দ করে না। তাঁহার বুক-কাটা আঁটাসাঁটা অঙ্গরাখার খোলা অংশ হইতে অর্দ্ধব্যক্ত ভীরু সৌন্দর্য্যরাশি একটা জরির পাড় বিশিষ্ট একপ্রকার উত্তরীয়-বাসে সলজ্জভাবে আবৃত। পায়ের গঠনানুরূপ পায়ে সরু বুট-জুতা; পা যেরূপ ক্ষুদ্র ও সুবক্র, তাহাতে তাঁহার বংশসম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

তাছাড়া ইহাই তাঁহার বংশের একমাত্র নিদর্শন, নচেৎ তাঁহাকে সহজেই একজন জার্ম্মাণরমণী অথবা উত্তর-প্রদেশীয় ফরাসী রমণী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; তাঁর নীল চোখ, কটা চুল, সমস্ত মুখের রং গোলাপী;—নভেল প্রভৃতি পাঠ করিয়া স্পেন-রমণী সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহার সহিত উক্ত লক্ষণগুলির মিল হয় না। "ম্যান্‌টিলা" নামক স্পেন-দেশীয় নারীর ওড়না তিনি কখনই পরিধান করিতেন না। "ফাণ্ডাঙ্গো" ও "কাচুচা" নামক স্পেনদেশীয় নৃত্য তিনি জানিতেন না। কিন্তু "কুয়াড্রিল" ও "ওয়াল্‌ট্‌স্" নামক নৃত্যে তিনি পরিপক্ক ছিলেন। তিনি কখনই ষাঁড়ের লড়াই দেখিতে যাইতেন না; মনে করিতেন, উহা একটা বর্ব্বরোচিত তামাসা; পক্ষান্তরে, তিনি ফরাসী ভাষা হইতে অনুদিত প্রহসনাদি এবং ইটালীর সঙ্গীতাদি শুনিতে থিয়েটারে যাইতেন। সায়াহ্নে তিনি সাক্ষাৎ প্যারিস্ হইতে আনীত টুপি পরিয়া, সাধারণের হাওয়া খাইবার জায়গায় গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতেন।

তরুণী ফেলিসিয়ানা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে প্রথানুগামী ও কায়দা-দুরস্ত ছিলেন।

আন্দ্রে মনে মনে ভাবিতেন,—যদিও স্পষ্ট করিয়া মুখে ব্যক্ত করিতে পারিতেন না :—"সম্পূর্ণরূপে কায়দা-দুরস্ত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিরক্তিজনক !"

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে কেন আন্দ্রে, যাহাকে তেমন ভাল লাগে নাই, তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। ইহা কি ধনের লোভে ? না ; ফেলিসিয়ানার প্রভূত ধন-সম্পত্তি থাকিলেও আন্দ্রে তাহাতে প্রলুব্ধ হইতে পারে না—কেননা তাহারও ধন-সম্পত্তি কম ছিল না। এই অল্পবয়স্ক দুই ব্যক্তির পিতামাতারাই এই বিবাহটা স্থির করিয়াছেন ; পাত্র ও পাত্রী তাহাতে কোন আপত্তি করে নাই এইমাত্র ; এইক্ষেত্রে, ধনসম্পত্তি, বংশ, বয়স, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আশৈশব বন্ধুত্ব—সমস্তই একত্র মিলিত হইয়াছিল। আন্দ্রে, ফেলিসিয়ানাকে স্বকীয় ভাবীপত্নী বলিয়া মনে করিতে চিরদিন অভ্যস্ত ছিল। তাই আন্দ্রে যখন ফেলিসিয়ানার বাড়ী যাইত, তখন আন্দ্রের মনে হইত নিজের বাড়ীতেই প্রবেশ করিতেছে। তাছাড়া আন্দ্রে দেখিল, —যে সব গুণ থাকা আবশ্যক, ফেলিসিয়ানার সে সব গুণই আছে ; ফেলিসিয়ানা দেখিতে সুশ্রী, ছিপ্‌ছিপে-গড়ন ও ফর্সা-রং। ফেলিসিয়ানা ফরাসী বলিতে পারে, ইংরেজী বলিতে পারে, ভাল চা তৈরী করিতে পারে। তবে এ কথা সত্য, তাঁর হাতের তৈরী ঐ উৎকট পাচনটা আন্দ্রের রসনায় অসহ্য ছিল। ফেলিসিয়ানা নৃত্য করিত, পিয়ানো বাজাইত এবং জল-রঙের ছবিও ভাল করিয়া ধুইতে পারিত। খুব কড়াক্কড় পুরুষও ইহা অপেক্ষা অধিক কিছুই দাবী করিতে পারে না।

ফেলিসিয়ানা, জুতার মচ্‌মচ্‌-শব্দেই তাঁহার ভাবী পতির উপস্থিতি অবগত হইয়াছিলেন ; তিনি না ফিরিয়াই বলিলেন :— "ও ! তুমি আন্দ্রে !"

কোন তরুণ-বয়স্কা রমণী একজন পুরুষের ছোট নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছে দেখিয়া যেন কেহ বিস্মিত না হন। কিছুদিনে একটু ঘনিষ্ঠতা হইলেই স্পেনদেশে এইরূপ নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রথা আছে। আমাদের মধ্যে ভালবাসাবাসির স্থলেই এইরূপ ব্যাপ্‌টিজমের নাম ধরিয়া ডাকিবার রীতি আছে। কিন্তু স্পেনের রীতি সেরূপ নহে।

"আন্দ্রে তুমি ঠিক সময়ে এসেছ ; যে যুগলবন্ধ গানটা মার্কিসের ওখানে আজ আমাদের গাইতে হবে, সেইটে আর একবার অভ্যাস করব মনে করছিলুম।"

আন্দ্রে উত্তর করিল :—

"আমার মনে হয়, আমার যেন একটু সর্দ্দি হয়েছে।"

আর এই কথাটা সপ্রমাণ করিবার জন্যই যেন আন্দ্রে একটু কাশিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তার এই কাসিবার চেষ্টাটা বিশ্বাস জন্মাইতে পারিল না। ডনা ফেলিসিয়ানা তাঁহার ওজর আদৌ গ্রাহ্য না করিয়া, অতি নিষ্ঠুরভাবে বলিলেন :—

"ও কিছুই নয় ; ঐ গানটা আর একবার আমাদের একসঙ্গে গাইতে হবে। আরও একটু পাকাপোক্ত করে নিতে হবে। তুমি আমার জায়গায় পিয়ানোর সম্মুখে বসে আমার গানের সঙ্গে একটু পিয়ানোতে সঙ্গৎ করবে কি ?"

বেচারা আন্দ্রে ঘড়ির দিকে একবার

বিষণ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিল। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। হতাশভাবে, হস্তিদন্তের পর্দ্দার উপর হাত ফেলিল। বেশী আড়ম্বর না করিয়া, যুগলবন্ধটা শেষ করিয়াই আন্দ্রে আবার ঘড়ির দিকে তাকাইল। ফেলিসিয়ানা আড়চোখে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। ফেলিসিয়ানা বলিল :—"আজ দেখ্‌ছি তোমার মনের টান ঘড়ির দিকেই বেশী—ঘড়ি ছেড়ে তোমার দৃষ্টি আর কোথাও যায় না।"

"ও দৃষ্টিতে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না—সহজ ভাবেই ঘড়ির উপর আমার চোখ পড়েছিল।...সময়ে কি যায় আসে যখন আমি তোমার কাছে আছি।"

এই কথা বলিয়া, সসম্ভ্রমে ফেলিসিয়ানার হস্তের উপর আলগোচে একটি চুম্বন স্থাপন করিবার জন্য আন্দ্রে ফেলিসিয়ানার হস্তের উপর রসিক-জনের ধরণে মস্তক অবনত করিল।

—"হপ্তার অন্যদিনে দেখ্‌তে পাই ঘড়ির কাঁটার দিকে তোমার বড়-একটা লক্ষ্য থাকে না, কিন্তু সোমবারে দেখতে পাই অন্য রকম !"...

—"কেন, সময়টা ঐ রকম দ্রুত সকল দিনই যায় না কি ? বিশেষত যে সময় আমি তোমার সহিত একসঙ্গে সঙ্গীত অভ্যাস করি ?"

—"সোমবার ষাঁড়ের লড়ায়ের দিন ; আর দেখ আন্দ্রে, এটা তুমি অস্বীকার কর্ত্তে চেষ্টা কোরো না যে, আমার পিয়ানোর সম্মুখে বসে থাকার চেয়ে এই সময়ে ঐ লড়ায়ের জায়গায় উপস্থিত থাক্‌তে তোমার বেশী ভাল লাগ্‌বে ? তবে কি, তোমার এই ভীষণ আসক্তিটা কখনই ঘুচ্‌বে না ? যখন আমাদের বিবাহ হয়ে যাবে তখন আমি সভ্যরকমের নিরীহ ধরণের আমোদ-প্রমোদে তোমাকে আবার ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌ব।"

—"সেখানে উপস্থিত হবার স্পষ্ট কোন মৎলব আমার ছিল না.....তবে এ কথা আমি স্বীকার করি—যদি কথাটা শুনে তুমি অসন্তুষ্ট না হও—কাল আমি একটা লড়ায়ের আখ্‌ড়ায় গিয়েছিলুম, সেখানে গাভিরা প্রদেশের চারটে বড় বড় ষাঁড় এসেছে..... বেশ জাঁকালো রকমের তাদের গল-কম্বল, পা শুক্নো ও সরু, চন্দ্রকলার মত সিং ; আর এমন হিংস্র, এমন বুনো, যে একজন বৃষ-চালককে গুঁতিয়ে ঘায়েল করেছিল ! আজ মল্লদের মুষ্টি যদি বেশ দৃঢ় থাকে, মনে যদি বেশ সাহস ও ভরসা থাকে তাহলে তারা ষাঁড়ের উপর আজ সুন্দর কায়দায় ছোরার আঘাত করতে পারবে !" আন্দ্রে খুব উৎসাহের সহিত এই কথাগুলি বলিল।

আন্দ্রে যখন এইরূপ বর্ণনা করিতেছিল, ফেলিসিয়ানায় মুখে একটা ঘোর অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। ফেলিসিয়ানা আন্দ্রেকে বলিল :—

"তোমার উপরেই চিকন্‌চাকন, আসলে তুমি একজন আস্তো বর্ব্বর। তোমর ঐ বুনো জন্তুদের বর্ণনা শুনে আমার গা শিউরে শিউরে উঠছে—আর তুমি ঐ ভীষণ কাণ্ডগুলো কেমন আনন্দের সঙ্গে বল্‌চ—যেন অতি সুন্দর জিনিস।"

বেচারা আন্দ্রে মাথা হেঁট করিল ; কারণ

সে ইতিপূর্ব্বে এই মল্লক্রীড়ার বিরুদ্ধে কতকগুলা ভীরু ও বীর্য্যহীন ব্যক্তির আসার বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিল; এবং সেই বক্তৃতার কথা অনুসারে সে এখন আপনাকে "অবনতি সময়ের রোমক" বলিয়া, "কশাই" বলিয়া, "রাক্ষস" বলিয়া যেন একটু অনুভব করিতে লাগিল। অর্দ্ধ বিদ্রূপাত্মক একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া ফেলিসিয়ানা বলিলঃ—"দেখ আন্দ্রে গাভিরার বুনো ষাঁড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি—এ অভিমান আমার নাই; কিন্তু তোমার এই আমোদে আমি তোমাকে বঞ্চিত করতে চাইনে; তোমার শরীরটা আছে এইখানে, কিন্তু তোমার আত্মাটা আছে সেই লড়ায়ের আখ্‌ড়ায়; তোমাকে দেখে আমার দয়া হচ্চে; আচ্ছা, তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম কিন্তু শুধু এই সর্ত্তে যে তুমি সেই মার্কিসের সঙ্গীত-উৎসবে সকাল-সকাল এসে যোগ দেবে।"

আন্দ্রের হৃদয় অতি সুকুমার, সে অন্যকে পারতপক্ষে ব্যথা দিতে অনিচ্ছুক, তাই ফেলিসিয়ানার অনুমতি সত্ত্বেও তখনই সেই অনুমতির সদ্‌ব্যবহার করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না, আরও কিছুক্ষণ সে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল, এবং একটু বিলম্ব করিয়া ঘর হইতে বাহির হইল—যেন সে ফেলিসিয়ানার কথাবার্ত্তার মোহিনীশক্তিতেই আটকিয়া পড়িয়াছিল।

আন্দ্রে ধীরপদক্ষেপে চলিতে চলিতে যখন তাহার বাগ্‌দত্তার বারাণ্ডার দৃষ্টিবহির্ভূত হইল, তখন স্ফূর্ত্তির সহিত পা চালাইয়া শীঘ্রই ষাঁড়ের লড়ায়ের আখ্‌ড়ায় যাইবার রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

কোন বিদেশী লোক দেখিলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইত যে, পথিকেরা সবাই এক একদিকেই যাইতেছে; যাইতেছে সবাই, আসিতেছে না কেহই। সহরের লোক-চলাচলের এই অদ্ভুত দৃশ্য প্রতি সোমবারে ৪ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। আন্দ্রে চলিতে চলিতে আর একটা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। এই নানা নদী একত্র মিশিয়া যেরূপ সমুদ্রে আসিয়া পড়ে সেইরূপ এই ক্রম-ঢালু রাস্তাটা ক্রমশ চওড়া হইয়া শহরের দ্বার দেশে নামিয়া আসিয়াছে। এই সুন্দর চওড়া ক্রম ঢালু রাস্তাটি লণ্ডন প্যারিসকেও তাক্ লাগাইয়া দিতে পারে। রাস্তায় দুইধারে ধব্‌ধবে সাদা বাড়ীর সারা রাস্তাটা শেষ হইয়াছে দ্বারের মত একটা ফুকরে আসিয়া; সেই ফুকরের ফাঁকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিচিত্র বর্ণের নিবিড় জনতা যেন পিপীলিকার সারি ক্রমে স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া চলিয়াছে। চারিদিকে ধূলা উড়াইয়া, পাদচারী, অশ্বারোহী, গাড়ী, আড়াআড়ি ভাবে চলিয়াছে, ঠেলাঠেলি করিয়া জড়াজড়ি করিয়া চলিয়াছে। চারিদিক হইতে আনন্দ ধ্বনি ও চীৎকার কোলাহল সমুত্থিত হইতেছে। লোকেরা উন্মত্তভাবে বাজি রাখিতেছে। বেটো ঘোড়ার পৃষ্ঠদণ্ডের উপর প্রযুক্ত বেতের আঘাত শব্দে চারিদির প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অশ্বতরের মাথার সাজ হইতে লম্বমান, ঘণ্টিকা গুচ্ছের টন্‌টন্ শব্দে কর্ণ বধির হইতেছে।

এই মানব-সমুদ্রের মধ্যে, তিনকালগত ৪টা প্রাচীন অশ্বযোজিত তিমি মৎস্যাকার কতকগুলা স্পেনদেশের সে-কেলে গাড়ী এবং ঢিলা-নড়নড়ে চেরিয়াট্ গাড়ী দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; ঐসব

গাড়ীর গিল্টি মুছিয়া গিয়াছে, রং জ্বলিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে আধুনিক কালের প্রতিনিধি স্বরূপ অশ্বতরযোজিত অম্‌নিবস্ গাড়ীও ছুটিয়া আসিতেছে।

আন্দ্রে খুব স্ফূর্ত্তির সহিত দ্রুতপদে চলিয়াছে। এইরূপ দ্রুত চলা স্পেনবাসীদিগের একটা বিশেষত্ব। স্পেনীয়দিগের মত হাঁটিতে পৃথিবীর আর কোন জাতিই পারে না। তাঁর পকেটে কিছু টাকা পয়সা ও ছায়া-স্থানে বসিবার একটা টিকিট্ আছে। তাঁর স্থানটা বেড়ার খুব নিকটে। এই স্থানটা দড়ি দিয়া ঘেরা—পাছে ষাঁড়গুলা দর্শকদের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে। এই স্থানে চাষা লোকের সহিত ঘ্যাঁসাঘেসি করিয়া বসিতে হইবে, তাহাদের কাপড়ের ঘেমো গন্ধ, তাদের চুলে চুরোটের ধোঁয়ার গন্ধ সহ্য করিতে হইবে,—এই সমস্ত জানিয়াও সম্ভ্রান্তজনোচিত 'বক্‌স্' আসন ছাড়িয়া আন্দ্রে এই ইতর লোকদের স্থানই পছন্দ করিয়াছে। কেননা এখান হইতে লড়ায়ের সমস্ত খুঁটিনাটি ভাল করিয়া দেখা যায়, ও ঠিক্ বুঝিতে পারা যায়।

বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও আন্দ্রে, লেস্-দেওয়া মখ্‌মল কিংবা রেশমী কাপড়ের অবগুণ্ঠনে স্বল্পাধিক মুখ-ঢাকা সুন্দরীদিগের মুখচন্দ্র দর্শনসুখে আপনাকে কখনই বঞ্চিত করিত না। এমন কি, আন্দ্রে যদি কখন দেখিত, সূর্য্যোত্তাপ হইতে মুখবর্ণের মাধুর্য্য রক্ষা করিবার জন্য গালের একপাশে আতপত্রের মত হাত-পাখার আড়াল করিয়া কোন সুন্দরী রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, অমনি সে দ্রুত পা বাড়াইয়া তাহাকে এক নজরে দেখিয়া লইত, এবং তখনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, অবসর-মত সেই সুন্দরীর অর্দ্ধাবৃত মুখ-শ্রী মনে মনে ধ্যান করিত।

আজ, এই সুন্দরীসন্দর্শনকাজে সচরাচর অপেক্ষা আন্দ্রের যেন একটু বেশী যত্ন লক্ষিত হইল। সুন্দর মুখ দেখিলেই তাহার উপর আন্দ্রের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিপতিত হইতেছিল, তাহার কাছ দিয়া একটি মুখও এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। মনে হয় যেন আন্দ্রে এই জনতার মধ্যে কাহাকে খুঁজিতেছে।

ধর্ম্মনীতির উপদেশ অনুসারে, স্বকীয় বাগ্‌দত্তা ছাড়া (স্পেনীয় ভাষায় যাকে Novia নব্যা বলে) পৃথিবীতে আর কোন ললনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে নাই। কিন্তু এই কঠোর সত্যপালনধর্ম্ম রোমকজাতি ছাড়া অন্যত্র অতীব বিরল।

বিগত সোমবারে আন্দ্রে মল্লরঙ্গভূমির এক বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট একটি বালিকাকে দেখিয়াছিল, তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য এবং তাহার মুখের ভাবটি অতি অপূর্ব্ব। যদিও আন্দ্রে স্বল্পক্ষণমাত্র তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, তথাপি তাহার মুখশ্রী আন্দ্রের মনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ একটা ছবি দেখিলে যেরূপ হয় এই আকস্মিক নারীদর্শনের স্মৃতি তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী স্থায়ী হইবার কথা নহে—কেননা আন্দ্রে ও "মানোলা" তরুণীর মধ্যে কোনও অর্থপূর্ণ ইসারাও বিনিময় হয় নাই। তরুণী "মানোলা" নামক নিম্ন শ্রেণীর বলিয়াই মনে হয়। আন্দ্রে ও তরুণীর মধ্যে তাই অনেক গুলি বেঞ্চের ব্যবধান ছিল। তাছাড়া তরুণী আন্দ্রেকে

দেখিয়াছিল কিংবা তাহার প্রতি আন্দ্রের মুগ্ধভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, এরূপ বিশ্বাস করিবারও কোন হেতু আন্দ্রের ছিল না। তরুণীর দৃষ্টি রঙ্গভূমিতেই নিবদ্ধ ছিল। সেখান হইতে ক্ষণেকের জন্যও তাহার দৃষ্ট অন্যত্র ধাবিত হয় নাই। দেখিলে মনে হয়, রঙ্গ দর্শন ছাড়া আর কোন বিষয়ে তাহার যেন ঔৎসুক্য নাই।

এই ঘটনাটা শীঘ্রই ভুলিয়া যাইবার কথা, কিন্তু ইহা আন্দ্রের মনে এরূপ দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল যে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে ভুলিতে পারে নাই।

সায়াহ্নে,—অবশ্য অজ্ঞাতসারে, আন্দ্রে অন্য দিন অপেক্ষা বেশীক্ষণ ধরিয়া বেড়াইল। অন্য দিন যেখানে সৌখীন সম্ভ্রান্ত লোকেরা ভ্রমণ করে সেইখানেই তাহার বেড়াইবার আড্ডা ছিল—কিন্তু আজ সেই স্থান ছাড়াইয়া যেখানে "মানোলা" নামক নিম্নশ্রেণীর রমণীরা যাতায়ত করে সেই ছায়াময় সংকীর্ণ বীথি-পথে সে বেড়াইতে লাগিল। এবং তাহার 'অপরিচিতাকে' যদি দৈবক্রমে আবার দেখিতে পায় এই আশায় সে সম্ভ্রান্তজনোচিত শোভন বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল।

আজ আবার আন্দ্রে লক্ষ্য করিল—যাহা আগে কখনই তাহার চোখে পড়ে নাই—ফেলিসিয়ানা তার কটা চুলের কটা রং একটু কমাইবার জন্য অনেক কষ্ট করিয়া কলপ লাগাইয়াছে—এবং তাহার পাণ্ডুবর্ণ পক্ষ্মবিশিষ্ট চোখে কোন একটা ভাবের খেলা নাই—ভাবের মধ্যে, সুশিক্ষিত মহিলা-সুলভ একটা এক ঘেয়ে লাজুকতার ভাব আছে মাত্র। বিবাহ-কালে তাহার জন্য না জানি কি সুখ সঞ্চিত আছে তাহা ভাবিয়া আন্দ্রে একটা হাই তুলিল।

আন্দ্রে রঙ্গভূমির তোরণদ্বারের খিলান-পথ দিয়া যখন চলিতেছিল, তখন দেখিতে পাইল, জনতা ভেদ করিয়া একটা গাড়ি যাইতেছে—আর চারিদিক হইতে লোকেরা তাহার উপর সমস্বরে অভিশাপ বর্ষণ করিতেছে। কোন আমোদে ব্যাঘাত জন্মাইলে, স্পেনের লোকেরা পদ-চারীর প্রাধান্য সমর্থন করিবার জন্য আমোদের ব্যাঘাতকারীর প্রতি এইরূপে অসন্তোষ প্রকাশ করে।

এই গাড়ীর সাজসজ্জায় উল্লাসের বাড়াবাড়ি লক্ষিত হয়; গাড়ীর প্রকাণ্ড দুই চাকা রক্তবর্ণ—গাড়ীর গাত্র, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, ফুলশর-বিদ্ধ হৃদয় প্রভৃতি প্রেম-নিদর্শন ও চিত্রে সমাচ্ছন্ন।

গাড়ীতে জোড়া অশ্বতরের অর্দ্ধ দেহের লোম ছাঁটা। অশ্বতর স্বীয় শিরোভূষণ হইতে লম্বিত ঘণ্টিকা-গুচ্ছ মাথা ঝাঁকাইয়া নিনাদিত করিতেছে। সাজের কারিগর, এই সাজে ঝাপ্পা ঝোপ্পা, জরির জরাও ফিতা, মাথার চূড়াগুচ্ছ, নানারঙের চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে অলঙ্কার—কত কি দিয়া যে ভূষিত করিয়াছে তার ঠিকানা নাই। দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, অশ্বতর যেন একটা চলন্ত ফুলের তোড়ায় যোজিত হইয়াছে।

ভীষণদর্শন এক কোচ্‌ম্যান—লম্বা-হাতা কামিজ-পরা, কাঁধে জরির কাজ-করা চামড়ার পটি-লাগানো, চালকের আসনে বসিয়া, অশ্বতরের অস্থিময় পৃষ্ঠভাগের উপর এমন সজোরে চাবুক মারিতেছে যে তাহার আঘাতে অধীর হইয়া অশ্বতর আবার নবোদ্যমে চার পা তুলিয়া ছুটিয়াছে।

এই গাড়ী নিজগুণে যে বিশেষ বর্ণনার যোগ্য তাহা নহে—আমার এই গাড়ীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি, আর এক কারণে। গাড়ীখানা দেখিয়া আন্দ্রের মুখে একটা প্রীতিকর বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই ষাঁড়ের রঙ্গাঙ্গনে খালি গাড়ী প্রায় আসিতে দেখা যায় না। এই গাড়ীর ভিতর দুইটি লোক ছিল।

প্রথম, একটি বৃদ্ধা, বেঁটে ও স্থূলাকার, সেকেলে ধরণে কালো পোষাক পরা; তার এক-আঙ্গুল খাটো গাউনের নীচে হইতে হল্‌দে রঙের ঘাগ্‌রার ধার দেখা যাইতেছে;—কতকটা ক্যাষ্টেলের চাষা লোকদের মত। বৃদ্ধার মুখ চওড়া, চ্যাপ্‌টা, সীসবর্ণ; নিতান্ত সাধারণ ধরণের মুখ বলিয়া মনে হইত—যদি চোখের চারিধারে ভূষা রঙের রেখামণ্ডল-বিশিষ্ট জ্বলন্ত-অঙ্গারের মত দুইটা চোখ এবং ওষ্ঠাধরের উপর অঙ্কিত সুস্পষ্ট গোঁফের রেখা মুখে একটা হিংস্র ভীষণ ভাব আনিয়া অনন্যসাধারণ করিয়া না তুলিত। যদিও তার প্রেমের কাল বহুদিন হইল বিগত হইয়াছে—কোন কালে ছিল কিনা তাও সন্দেহ—তথাপি সে কাঁধের উপর মখ্‌মলের পাড়-ওয়ালা ম্যানিলা-বহির্বাস বেশ একটু মন-ভুলনিয়া ধরণে বিন্যস্ত করিয়াছে, এবং সবুজ কাগজের একটা বড় হাতপাখা বেশ একটু হাবভাবের সহিত বাগিয়া ধরিয়াছে।

ইহা সম্ভব নহে যে, এই অপরূপ সঙ্গিনীটির বদনচন্দ্র দর্শনে আন্দ্রের মুখে একটা সন্তোষের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি ১৬ বৎসর কিংবা ১৮ বৎসরের তরুণী—১৬ বৎসরের হওয়াই বেশী সম্ভব। একটা হাল্‌কা-ধরণের রেশমী 'মান্টিলা'-ওড়না একটা উচ্চ ঝিনুকের চিরুণীর উপরে বিন্যস্ত। তরুণীর বিপুল কেশজালে রচিত চাঙ্গারী-আকারের খোঁপা;—চিরুণী, খোঁপার চারিধার ঘিরিয়া আছে। ওড়নার বেষ্টনের মধ্য হইতে তরুণীর ঈষৎ পীতাভ সুন্দর নেত্রবিমোহন মুখখানি দেখা যাইতেছে। গাড়ীর মধ্যে সম্মুখ দিকে পা ছড়ানো—ছোট্ট পা-দুখানি; পায়ে ফিতা-ওয়ালা সাটিনের জুতো; পাত্‌লা সুকুমার হাত-দুটি—যদিও একটু রোদে পোড়া। তরুণী এক হাতে ওড়নার দুই খুঁট লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নাড়াচাড়া করিতেছে, আর এক হাতে একটা ফুর্‌ফুরে রুমাল ধরিয়া আছে—এই হাতের আঙ্গুলে রুপার আংটি ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে···মালোলা-শ্রেণীর রমণীদিগের অলঙ্কার-কৌটাস্থিত ইহাই সব চেয়ে দামী অলঙ্কার। তরুণীর জামার হাতায় কালো জেট্-পাথরের বোদাম ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। ইহাই তরুণীর সমগ্র পরিচ্ছদ—এই পরিচ্ছদ একেবারে নিছক্ স্পেনদেশীয়।

যে মুখ-খানি আট দিন ধরিয়া আন্দ্রের মনে অহর্নিশি জাগিতেছে সেই মধুর মুখখানি আন্দ্রে দেখিয়াই চিনিতে পারিল।

রঙ্গভূমির প্রবেশ-দ্বারে গাড়ী উপনীত হইবামাত্র, আন্দ্রে খুব দ্রুত চলিয়া একই সময়ে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল। কোচ্‌ম্যান গাড়ী হইতে নামিয়া ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, সুন্দরী উহার স্কন্ধের উপর অতি লঘুভাবে অঙ্গুলি-অগ্রভাগের ভর দিয়া গাড়ী হইতে নামিল; পক্ষান্তরে বৃদ্ধাকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিতে একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাই হোক্, কোনপ্রকারে বৃদ্ধাও

নামিয়া পড়িল। এই দুই রমণী আসন গ্রহণের জন্য কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। আন্দ্রে উহাদের পিছনে পিছনে চলিল।

সুরসিকা ভাগ্যলক্ষ্মী, আসনের নম্বরগুলি এমনভাবে বণ্টন করিয়াছিলেন যে, আন্দ্রের আসন দৈবক্রমে সেই তরুণীর আসনের পাশে পড়িয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চয়ন

আত্মার প্রমাণ

আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বরাবরই তর্কাতর্কি হচ্ছে। কেউ বলছেন, "আত্মা আছে", কেউ বল্‌ছেন, "নেই"। কোন্ পক্ষের মত্ ঠিক, আমরা তা জানিনা; কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী মাসিক পত্রের সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী মিঃ আলফ্রেড পিয়ার্স এ-সম্বন্ধে যে কথাগুলি প্রকাশ করেছেন, আমরা এখানে তার কতক অংশ তুলে দিলুম।ঃ—

"নীচে আমি যে ঘটনাগুলির বর্ণনা করেছি, তার দ্বারা আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লেও আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমি কিছুই বল্‌তে চাই না। প্রেতেরা মানুষকে দেখা দিতে এবং জীবিতের সঙ্গে কথা কইতে পারে কিনা, আমার তা জানা নেই। কিন্তু এ-কথা আমি জানি যে, আমাদের মধ্যে এমন-কিছু একটা আছে—যাকে আত্মা বা ব্যক্তিত্ব বা আর যাই-ই ব'লে ডাকুন—যা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লেও টিঁকে থাক্‌তে পারে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন একট জিনিষ আছে, যা অজর ও অমর।

প্রথম ব্যাপারটি ঘটেছিল আমার বালক-বয়সে। 'প্রিন্স কন্সর্ট'কে দেখবার জন্যে আমাকে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাজকুমার যখন সস্নেহে আমাকে মাথা চাপ্‌ড়ে আদর করলেন, তখন বিষম উত্তেজনায় হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লুম, আমার জ্বর হোলো। এই জ্বরের সময়েই আচম্বিতে আমি জান্‌তে পার্‌লুম যে, আমার যে দেহ বিছানার উপর পড়ে আছে, স্বচক্ষে তা দেখ্‌তে পাওয়া, আমার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়!

আমি স্বচক্ষে দেখলুম, আমার দেহ অজ্ঞান অবস্থায় শোয়ানো রয়েছে, আর ডাক্তার, 'নার্স' ও মা সকলেই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমার সেবা-শুশ্রূষা করছেন।—এই বিচিত্র দৃশ্যটা খানিকক্ষণ ধ'রে আমি দর্শন করলুম—তারপরেই আবার অন্ধকার! তারপরে "দেহবিশিষ্ট আমি" আবার হারা

জ্ঞান ফিরে পেয়ে, অসুখ থেকে খুব চট্‌পট্ সেরে উঠ্‌লুম!

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বহু বৎসর পরে। সে-সময়ে আমার পরিবারের সকলেই 'স্কার্লেট ফিভারে'র দ্বারা আক্রান্ত। পাছে আমারও অসুখ হয়, সেই ভয়ে ডাক্তারের উপদেশে আমি স্থানান্তরে গিয়ে বাস করছিলুম।

হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় জেগে উঠে আমি দেখলুম যে, যদিও আমার দেহ শয্যাশায়ী রয়েছে, তবু কিন্তু আমি আর সে ঘরে নেই—আমি রয়েছি আমার নিজের বাড়ীতে, আমার স্ত্রীর ঘরে,—আমার বাসা থেকে প্রায় এক পোয়া তফাতে! আমি লক্ষ্য করলুম, আমার স্ত্রীর বিছানাটি অন্যদিকে সরিয়ে আনা হয়েছে—এ কথা আমি আগে জান্‌তুম না। তারপর 'নার্স'কে সেই ঘরে ঢুক্‌তে দেখ্‌লুম। সে এসে গ্যাস নিবিয়ে দিলে এবং আমার স্ত্রীর বিছানার পাশে বসে ছোট একটি 'স্পিরিট ষ্টোভ' জ্বাল্‌লে।

দিনের বেলায় ডাক্তার যখন আমার স্ত্রীর রোগের 'রিপোর্ট' দিতে এলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আমার স্ত্রীর বিছানাটি সরানো হয়েচে কেন?"

ডাক্তার বল্‌লেন, "কে তোমাকে এ-কথা বল্‌লে? তবে বুঝি তুমি বোকামি ক'রে আবার তোমার স্ত্রীর পাশে গিয়েছিলে? তাহ'লে আমি স্পষ্টই ব'লে রাখ্‌চি, তোমারও অসুখ হ'লে সেজন্যে আমি দায়ী—"

তাঁকে বাধা দিয়ে আমি বল্‌লুম, "সত্যি বল্‌চি, আমি একবারও সেখানে যাই-নি।" এই ব'লে আমি যা দেখেছি তার প্রত্যেক কথাটি তাঁর কাছে প্রকাশ করলুম। ডাক্তার তো অবাক! তিনি তখনি 'নার্স'কে ডেকে পাঠালেন। সেও আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। কারণ আমি যা দেখেছিলুম, সত্যিই তা ঘটেছিল।

কলমের প্রলাপ!

নবীন লেখকদের রচনায় একটু অসামঞ্জস্য দেখলেই সমালোচকেরা একেবারে অধীর হয়ে ওঠেন। এটা যে দোষ, তাতে আর সন্দেহ নেই—কিন্তু এ দোষে খালি নবীনরা নন, —প্রবীণ ও প্রতিভাবান্ লেখকদের রচনাতেও কলমের এমন অনেক প্রলাপ দেখা যায়। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে দেখি, বাঙালীর মেয়ে শান্তি দেশী কাপড় প'রেই ঘোড়ার দুদিকে দুই পা রেখে ঘোড়ার পিঠের উপরে চ'ড়ে বসেছে!

কিন্তু সেক্‌স্‌পিয়ার অন্যান্য দিকের মতন এদিকেও বঙ্কিমচন্দ্রকে উঁচিয়ে গেছেন! তাঁর নাটকে কিং জন আর তাঁর ব্যারন্‌রা রণক্ষেত্রে দস্তুরমতন কামান ব্যবহার কর্‌তে ছাড়েন-নি—যদিও কামানের আবিষ্কার হয়েছে তার ঢের পরে! তাঁর আর একখানি নাটকের পাত্র মুদ্রাযন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন—ছাপা-খানা সৃষ্টি হবার ঠিক দুশো বৎসর আগে! "জুলিয়াস সীজারে" সেক্‌স্‌পিয়ার "Striking clocks"এর কথা বলেছেন!

থ্যাকারে তাঁর বেভুল মনের আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়েছেন। লেডি কিউকে এক জায়গায় তিনি মেরেছেন তো বটেই, তার উপরে তিনি তাঁকে কবরে না পূরেও নিশ্চিন্ত হন-নি। কিন্তু শেষকালে দেখা যায়, এই লেডি কিউই দিব্যি জ্বলজ্যান্ত বেঁচে-বর্ত্তে (প্রেতমূর্ত্তিতে নয়) রয়েছেন!

অ্যান্থনি থ্রোলোপ বর্ণনা করেছিলেন, "অ্যাণ্ডি স্কট মুখে চুরোট গুঁজে রাজপথে শীষ দিতে দিতে যাচ্ছে!"—অথচ এক শীষ দিতে ও চুরোট টান্‌তে পারে, দুনি এমন মানুষ বোধ হয় একজনও নে সমালোচকরা যখন এটি দেখিয়ে দি থ্রোলোপ তখনও প্রথমে ভ্রম-স্বীকারে হন-নি। তারপর নিজেও চুরোট টা টান্‌তে শীষ দিতে না পেরে, পরের সং বেচারী অ্যাণ্ডি স্কটের মুখ থেকে চুরো কেড়ে নেন!

নারী-ভক্ত বনমানুষ

জন ডেনিয়েল একটি গরিলার নাম। সম্প্রতি তার মৃত্যু হয়েছে।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে, বানর-জাতীয় জীবদের মধ্যে গরিলাই সব-চেয়ে বেশী হিংসুটে। পোষও সে সহজে মানে না। তাদের মেজাজ বড়ই খারাপ, তাই অনেক কষ্টে পোষ মানালেও তাকে বিশ্বাস করা চলে না—যে-কোন মুহূর্ত্তে চটে উঠে সে তার মনিবের ঘাড় মট্‌কে দিতে পারে। গরিলা একে দুর্ল্লভ, তার উপরে বন্দী-দশায় বেশী দিন বাঁচেও না। তাই এত-বড় আলি-পুরের চিড়িয়াখানাতে একটিও গরিলা নেই।

কিন্তু ডেনিয়েল মানুষের পোষও মেনেছিল যথেষ্ট, বেঁচেও ছিল অনেক দিন। বিছানা ভিন্ন তার ঘুম হোতো না; আদর্শ ভদ্রলোকের মতন সে আদব-কায়দা বজায় রেখে টেবিলে ব'সে খানা খেতে পারত, তারপর কারুর মুখাপেক্ষা না ক'রেই এঁটো কাঁচের বাসনগুলো নিজের হাতেই ধুয়ে-মেজে তুলে রেখে দিত। কারুর হুকুমে সে এ-সব কাজ করত না, অধিকাংশ অভ্যাসই তার মানুষের কা দেখে-শেখা।

নেশার দিকে ডেনিয়েলের বেজায় ঝোঁ ছিল। রোজ অন্তত বার-তিনেক মদ টান না পারলে তার চলত না। মদ না পেলে তা শরীর খারাপ হয়ে যেত—মুখ ভার ক বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে সে চুপচাপ ব'সে থাকত বন্দীদশায় এই বিষাদের ভাবই গরিলাদে দীর্ঘজীবী করতে পারে না। তাই নিয়মিতরূ তাকে মদ খেতে দেওয়া হোতো। মদে গেলাসে বোধ হয় সে তার সব দুঃখকে চুমু মেরে অন্যমনস্ক হয়ে থাকত! ডেনিয়ে বুঝে নিয়েছিল, বিমর্ষভাবে বসে থাকলে সে মদ খেতে পাবে। তাই পূরোমাত্রার উপরেও আরো দু-এক পা টান্‌বার মতলবে, মাঝে মাঝে চালাকি ক' বিমর্ষভাব ধারণ করত। কিন্তু তার পা ডেনিয়েলের এ জোচ্চুরি অনায়াসেই ধ ফেলত। লোকে জানে, গরিলারা আহা বিষয়ে চরম বৈষ্ণব—মাংস-টাংস স্পর্শ ক

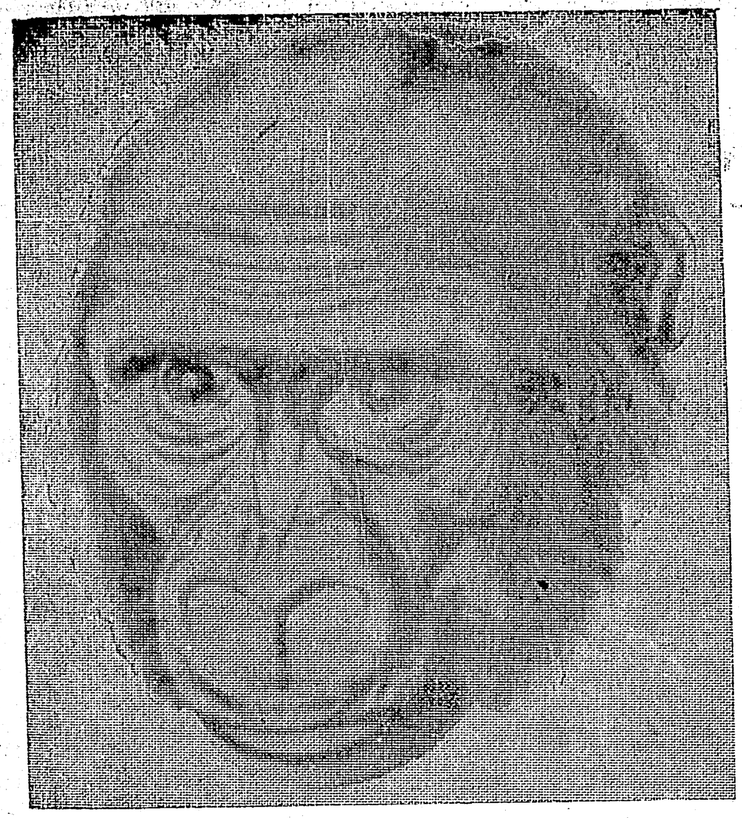

ডেনিয়েল

না। কিন্তু ডেনিয়েল ছিল দেব-কুলে দৈত্যের মত, প্রতিদিন অন্তত পোয়াখানেক মাংস না পেলে তার খ্যাঁট্ যুৎসই হোতো না।

ডেনিয়েল খুব ভালোবাস্‌ত বরফ, আর খুব ঘৃণা করত কডলিভার অয়েল। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কৌশলে ক'রে তাকে কড-লিভার খাওয়ানো হোতো। একটি পাত্রে খানিকটা কুল্‌পীর বরফের সঙ্গে কডলিভার অয়েল মিশিয়ে তার সাম্‌নে রেখে তার পালক বল্‌ত—"ডেনিয়েল, খবর্দ্দার! এটা তোমার খাবার নয়, তুমি যেন খেয়ে ফেলো না!" এই ব'লে সে চ'লে যেত। সে চোখের আড়াল হ'লেই কুল্‌পীর লোভ সাম্‌লাতে না পেরে, ডেনিয়েল চোঁ চোঁ ক'রে পাত্রটা খালি ক'রে ফেল্‌ত! পাছে পালক এসে বাধা দেয়,সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি করার দরুণ ডেনিয়েল কুল্‌পীতে কডলিভারের গন্ধ পর্য্যন্ত ধর্‌তে পার্‌ত না।

তিনবছর বয়সে মানুষের ছেলের যতটা ভাষা-জ্ঞান হয়, মানুষের ভাষায় ডেনিয়েলেরও ঠিক ততটাই দখল ছিল। ইংরেজীতে "ঐ কাগজের টুক্‌রোটা কুড়িয়ে আনো তো" এবং "অমন অসভ্য হোয়ো না" প্রভৃতি কথা সে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ত।

ডেনিয়েল সুন্দরী নারী পেলে পুরুষের দিকে ফিরেও তাকাতো না। তার খাঁচার সাম্‌নে যখন একদল পুরুষ এসে দাঁড়াত, তখন সে ভারি বিরক্তভাবে নিজের মনেই চুপ ক'রে ব'সে থাকত, কিন্তু মেয়ে দেখ্‌লেই ডেনিয়েল-মহাশয় খুসিমুখে সেকুহ্যাণ্ড করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিত। সুন্দরীর হাত নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে সুখী ও তৃপ্ত হয়ে ব'সে থাকত! ডেনিয়েলের চেহারা যখন বড়-সড়ো হয়ে উঠ্‌ল, তখন তাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। সেখানে গিয়ে মনের খেদে বেচারা মারা যায়।

মরবার সময়ে তার বয়স হয়েছিল মোটে সাড়ে-চার বছর। কিন্তু এই বয়সেই তার দেহের ওজন হয়েছিল দু'মণ এগারো সের। তার

বুকের মাপ ছিল আটচল্লিশ ইঞ্চি, গলা কুড়ি ইঞ্চি, উপর-হাত বারো ও সিকি ইঞ্চি, পায়ের ডিম এগারো ইঞ্চিরও বেশী। গায়ের জোরও ছিল তার অসাধারণ। তিনজন বলিষ্ঠ নাবিককে শিশু ডেনিয়েল, দড়ি ধ'রে এক হাতেই আনায়াসে হিড়্‌হিড়্‌ ক'রে টেনে আন্‌তে পার্‌ত!

প্রথম সাইকেল বা 'প্রেমিকের গাড়ী'

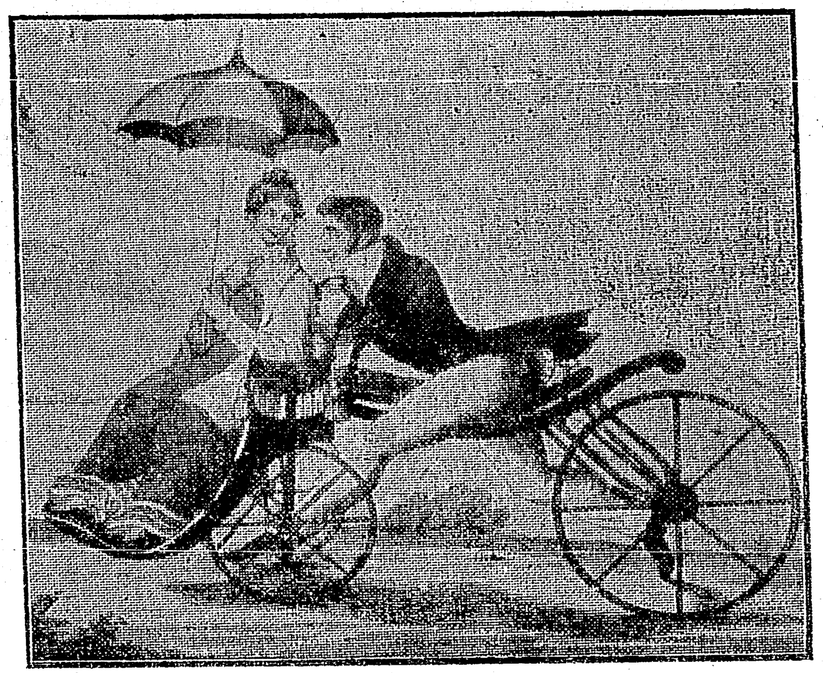

'প্রেমিকের গাড়ী'

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারন ড্রেইস "দোলা-ঘোড়া" উদ্ভাবন করেন। বিলাতে তারপর দোলা-ঘোড়ায় চড়া একটা সামাজিক ঢং হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারপর সাইকেলের চলন সুরু হয়। অবশ্য এ যুগের আর সে-যুগের সাইকেলে তফাৎ আছে আকাশ-পাতাল। প্রথম সাইকেল তৈরি হয়েছিল দুজনের বস্‌বার জন্যে। কোন রসিক সেই সাইকেলকে "প্রেমিকের গাড়ী" ব'লে বর্ণনা করেছেন। ছবিতে যে সাইকেলখানি দেখা যাচ্ছে, সে-যুগের সাইকেল অনেকটা এই রকমেরই ছিল। সাম্‌নের আসনে এক সুন্দরী বসে আছেন এবং পিছনে এক ভদ্রলোক গাড়ীখানিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন—আসলে তাঁকে ব'সে ব'সেই ছুটতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন, খুব তেলা ও ভালো রাস্তাতেও এমন-একখানা ভারি গাড়ীকে ঠেলে নিয়ে যেতে রীতিমত কষ্টদায়ক কস্‌রতের দরকার হোতো। তবে কিনা সে মেহনৎ সুদে-আসলে উঠে যেত,—সাম্‌নের আসনের সুন্দরী যখন ভঙ্গীভরে গ্রীবাটি বেঁকিয়ে, মুখ ফিরিয়ে একটুখানি মধুর হাস্য উপহার দিতেন। ছবিতেও দেখুন, শ্রীমতী দুর্ল্লভ হাস্যের দ্বারা শ্রীমানকে কতটা উৎসাহিত ক'রে তুলছেন!

চলন্ত মাছ

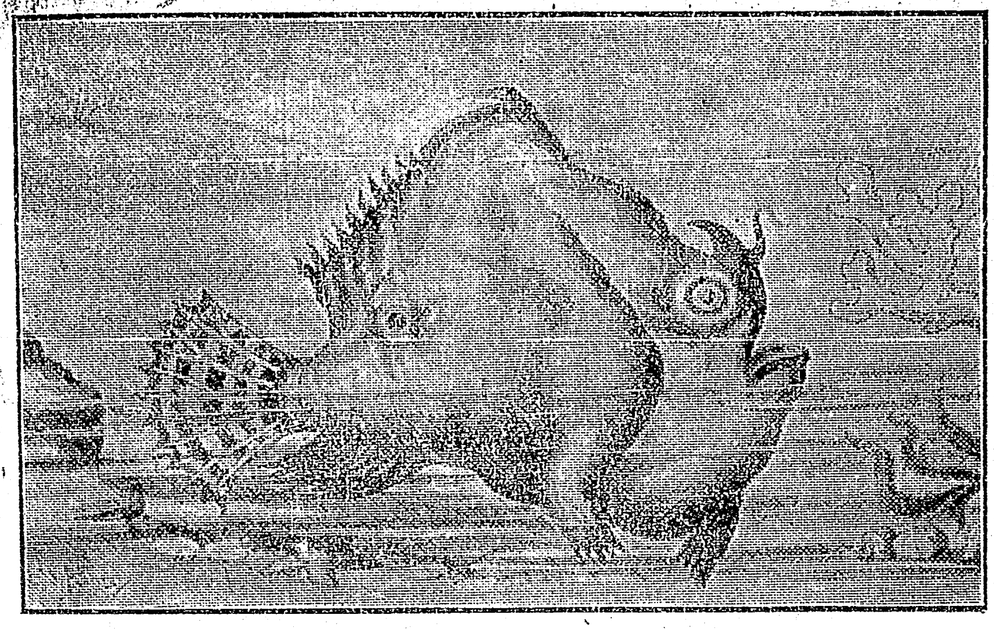

ঠেঙো মাছ

প্রকৃতি যেমন আলোক ও অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, জীবরাজ্যেও তেম্‌নি তাঁর বিচিত্র খেয়ালে সুরূপ-সুন্দরের সঙ্গে কত-না কিম্ভূত-কিমাকার প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে! মাছ তো অনেক-রকমের আছে, কিন্তু আপনারা চলন্ত মাছের অপরূপ চেহারা কখনো দেখেছেন কি? এর রং হল্‌দে, এখানে-ওখানে পিঙ্গল রঙের ছিটে কাটা ও ডোরা টানা। তার caspal হাড় (যে হাড়ে মানুষের কব্জি গড়ে) দুটো; অসাধারণ দীর্ঘ, হাড়দুটোর ডগায় ছোট ছোট দুখানা কঠিন ও পেশী-বহুল ডানা—সে ডানার জোরও বড় কম নয়। এ-ডানাদুটোকে আসলে নখওয়ালা থাবা ছাড়া আর-কিছুই বলা যায় না। এ মাছ বিদেশী নয়, আমাদেরই প্রতিবেশী, কারণ ভারত-সাগরে তার বাস।

মান্ধাতার কাকাতুয়া

কাপ্তেন হার্ব্বার্ট সি, কেন্ট একটি আশ্চর্য্য কাকাতুয়ার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "খাঁচার ভিতরে কাকাতুয়াটিকে যখন আমি প্রথম দেখ্‌লুম, তখন দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলুম। মস্ত-একটা পাখী, কিন্তু এমন ন্যাড়া যে, গায়ের কোথাও একটি পালক পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। সে ক্রমাগত তার মাথা দুলছিল আর নামাচ্ছিল। আমাকে দেখে এই বেয়াড়া জীবটি "হা, হা, হা," ক'রে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "চোখের মাথা খাও! আমার পল্লক নেই—আমি উড়্‌তে পার্‌চি না!" আমি বল্‌লুম, "কি হে বুড়ো ইয়ার,

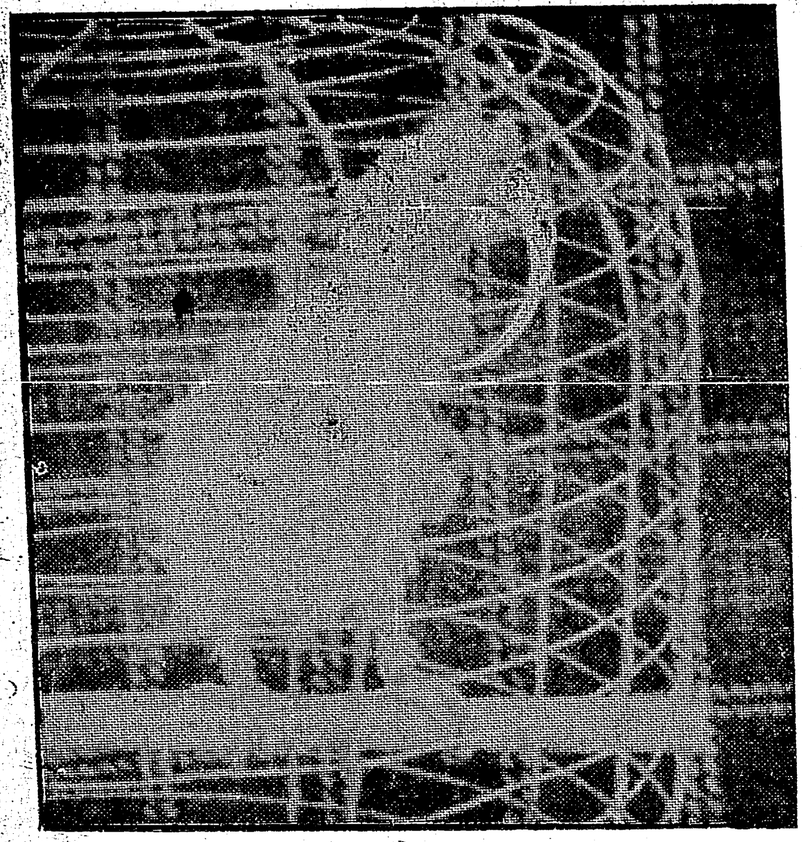

মান্ধাতার কাকাতুয়া

ব্যাপার কি?" সে বল্‌লে, "আমাকে একখানা বিস্কুট দাও! দেখ্‌তে পাচ্ছ না আমি উড়্‌তে পার্‌চিনা—আমার পালক নেই?" আমি তাকে খানকয়েক বিস্কুট দিয়ে খুসি করলুম।

যাঁর কাকাতুয়া, তিনি বল্‌লেন, "এই পাখীটি আমার কাছে আজ ত্রিশবৎসরের উপর থেকে আছে। আমি আবার যাঁর কাছ থেকে একে পেয়েছিলুম, তাঁর কাছেও এটি চল্লিশ বছরের চেয়েও বেশী কাল ছিল। জীব-বিজ্ঞানের পণ্ডিতরা একে পরখ ক'রে বলেছেন, এই কাকাতুয়ার বয়স একশো-চল্লিশ বছরের কাছাকাছি হবে।

এই কাকাতুয়ার চঞ্চু প্রতি-দশবৎসর অন্তর দু' ইঞ্চি ক'রে বাদ দিতে হয়। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, চঞ্চুর সবটা যদি বজায় থাকৃত, তা হ'লে আজ আঠারো ইঞ্চি লম্বা হয়ে উঠ্‌ত। এই কাকাতুয়া ঠিক মানুষের মতই কথা কইতে শিখেছে,—যখন যে-রকম দরকার, ঠিক সেই রকম কথা সে কেউ না ব'লে দিলেও লাগ-সৈ জায়গায় ব্যবহার কর্‌তে পারে। আমি যখন তাকে দেখে হোটেল থেকে বিদায় নিলুম, সে তখন আবার হা হা ক'রে হেসে ব'লে উঠ্‌ল, "চোখের মাথা খাক্! বিলের টাকা না সুধেই পালাচ্ছে!"

হাসির হদিস

মুখকে হাসিমাখা ক'রে তুল্‌তে এবং আতঙ্কের ভাব প্রকাশ কর্‌তে কতগুলো মাংসপেশীর দরকার হয়? প্রায় একুশ জোড়া! একখানি সুন্দর মুখ এগারোটি মাংসপেশীতে ভাঁজ-করা থাকে; নাকের মাংসপেশীর সংখ্যা পাঁচ থেকে ছয় এবং চক্ষুপুটের চার জোড়া। মস্তিষ্কের ভিতরকার পদার্থের উপরেই মুখ-ভাবের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং

মস্তিষ্কের মধ্যে রোগ হ'লে মুখের ভাবও বদ্‌লে যায়। এইজন্যেই কথায় বলে, "মুখ হচ্ছে আত্মার দর্পণ।" রূপসীর নিটোল কপোল যখন হাসির ধাক্কায় টোল খেয়ে যায়, তখন আমরা বড়ই তারিফ করি! রূপের পূজারী কবিরা তো সেই রাঙা গালের ছোট্ট দুটি কূপ ভরিয়ে তোল্‌বার জন্যে, কাব্য-রসের কলসীকে একেবারে উপুড় ক'রে দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন! কিন্তু আসলে সেই টোল-খাওয়া গাল রূপসীর একটি খুঁৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, কেবলমাত্র মংস-পেশীয় বিকৃতি বা অসম্পূর্ণতার দরুণই নর-নারীর গণ্ডদেশে টোলের জন্ম হয়!

প্রসাদ রায়।

আকাশ-যান

আকাশ-পর্য্যটনের যুগের সবে আরম্ভ হয়েছে। এ সম্বন্ধে যে সব নতুন অবিষ্কার হচ্ছে এবং হবে, সে সব আজকালকার উদ্ভাবিত আকাশ-যান ইত্যাদিকে নগণ্য ক'রে তুল্‌বে। আমরা অনেক দেখেছি, কিন্তু দেখ্‌বার কিছুই এখনো দেখা হয়নি বললে ভুল বলা হয় না। আমরা এতকাল আকাশে ওড়াকে বিস্ময়ান্বিত চোখে দেখেই এসেছি, এইবার আমাদেরও ওড়ার সময় এসেছে। এতে আমাদের জীবন কার্য্যতঃ দীর্ঘতর করে দেবে। এখন পথ চলতে যত সময়ের অপ-ব্যবহার হচ্ছে, তার অর্দ্ধেকও আর আবশ্যক হবে না। যে সময় বাঁচবে তা আমরা অন্য কাজে ব্যবহার কর্ত্তে পার্ব্ব। আজ যা মানুষের একটা জীবনে সম্ভব নয়, ঘণ্টায় একশো মাইল বেগের আকাশ-যানের কল্যাণে অদূর ভবিষ্য যুগে সেটা সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এরোপ্লেন চালানো আজ নব-উদ্ভাবিত মানুষী শক্তি-সম্পন্ন যন্ত্র দিয়ে সম্ভব হয়ে উঠেছে। এরোপ্লেন-চালককে এরোপ্লেনের উচ্চতা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয়। কতকগুলো রঙিন্ আলো তাকে এখন কুয়াশার মধ্যে এ সম্বন্ধে সাহায্য কচ্ছে। এক এক রঙের আলো এক এক-স্তর উচ্চতায় জ্বলে উঠে চালককে উচ্চতা জানিয়ে দ্যায়।

আজকালকার এরোপ্লেন তাদের আকারেরও খুব পরিবর্ত্তন করে ফেল্‌ছে। বাতাসের মধ্যে দিয়ে দ্রুত বেগে চল্‌বার সময় যত কম বাতাসের বাধা অতিক্রম কর্ত্তে হয়, এরোপ্লেনের ততই সুবিধা। আজকাল তাই মনোপ্লেন বাইপ্লেনের স্থান অধিকার কচ্ছে।

যুদ্ধের মধ্যে এবং পরে যে-সব পরীক্ষা হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশ-যানের পক্ষে জলযানের মত তার নিজের স্থানে ভেসে থাকাই সহজ—তার বারে বারে মাটীতে নামবার দরকার নেই। শীঘ্রই জাহাজে চড়ার মত এরোপ্লেনে চড়বার উপযুক্ত খুব উঁচু প্লাটফরম তৈরী হ'বে। সেই আকাশচুম্বী প্লাটফরমে ওঠবার জন্য লিফ্‌ট থাক্‌বে। সব-উপরে একটা ঢাকা-ঘর থাক্‌বে। সেই ঘরের ভিতর দিয়ে ঢাকাঢোকা পথের সাহায্যে যাত্রীরা এরোপ্লেনে চড়ে বস্‌বে। অনেক উঁচু বলে অনেকে ভয় করেন। কিন্তু এগুলো খুব ঢাকাঢোকা দিয়ে তৈরী হবে—সেইজন্য কারো

মাথা ঘুরে যাবার ভয় নেই। অনেকে আশা কচ্ছেন, খুবই শীঘ্র লণ্ডন থেকে আমেরিকা যাবার এই রকম পথ তৈরী হবে। তাতে অ্যাটলান্টিক পার হতে লাগ্‌বে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা।

আকাশ-যানের আর একটা বিস্ময়জনক আবিষ্কারের চেষ্টা চল্‌ছে। অনেকে পেট্রোলের এঞ্জিনের বদলে ইলেক্‌ট্রিক শক্তির সাহায্যে আকাশ-যান চালানোর আশা কচ্ছেন। এর অসুবিধে হচ্ছে এই যে, ইলেক্‌ট্রিসিটি বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সম্প্রতি তারহীন টেলিফোনের পরীক্ষায় এই স্থির হয়েছে যে, আকাশে তারহীন বৈদ্যুতিক প্রবাহের একটা পথ তৈরী হওয়া সম্ভব। এখন আশা করা যাচ্ছে যে, বোধ হয় গুরু-ভার পেট্রোল এঞ্জিনের স্থান শীঘ্রই লঘু ইলেক্ট্রিক মোটরে অধিকার কর্ব্বে। কেউ কেউ আবার তার-হীন ইলেক্‌ট্রিক-প্রবাহে চালিত চালক-হীন এরোপ্লেন চালাবার কল্পনা কচ্ছেন। বোধ হয়, ভবিষ্যতে এরোপ্লেনেরা নিজে নিজেই তাদের গন্তব্য পথে যাত্রা কর্ব্বে।

এই বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে এমন এক যুগ আস্‌বে, যখন হয়ত সে যুগের লোকেরা এই বিংশ শতাব্দীকেও ছেলেখেলার যুগ বলে মনে করবে।

পাখীদের দাঁত

পৃথিবীর প্রথম যুগে পাখীদের প্রথম উদ্ভবের সময় যে তাদের দাঁত ছিল, তার যে দুটো নমুনা পাওয়া গিয়েছে, তার প্রথমটা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে রেখে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি পশ্চিম ক্যানসাসে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেটা ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মে রাখা হয়েছে।

ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মের প্রোফেসার এইচ, টী, মার্টিনের মতে, দ্বিতীয়টি প্রায় আড়াই কোটি বছর আগের যুগের—সে যুগকে খড়ি-মাটির যুগ বলা হয়। এর প্রস্তরীভূত কঙ্কালে দশটা দাঁত আছে। এটা পাঁচ ফুট লম্বা। এর ছোট্ট-একটু লেজ ছিল, কিন্তু পাখা ছিল না। এ ছিল জলজ পাখী। আজকালকার পেঙ্গুইনের সঙ্গে এর অনেকটা মিল দেখা যায়।

ঘুম-পাড়ানি কল

একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক একটা ঘুমের কল আবিষ্কার করেছেন। কতকগুলো ছোট্ট ছোট্ট ব্যাটারী থেকে শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করে এই কল মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ আমাদের স্নায়ুকে শিথিল করে এমন একটা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে, যাতে সকলের পক্ষেই অতি সহজে ঘুমিয়ে পড়া সম্ভব হবে।

যাঁদের পক্ষে ঘুম খুব সুলভ নয়, তাঁদের কাছে এটা একটা মস্ত সুখবর।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

বর্ষায়

শ্রাবণ-দিনের শেষে
বরষা নেমেছে এসে
সন্ধ্যার অঞ্চল ধরি' ধরণীর স্তব্ধ গৃহতলে
মৃদুপদে মেঘাবগুণ্ঠিতা। রবি গেছে অস্তাচলে
দণ্ড চারি আগে।
ধরার চেতনক্লান্ত আঁখিপুটে ধীরে এসে লাগে
ঘুমের পরশখানি গুরুভার অবশ অলস।
তরুণীরা ফিরে গেছে কলরবে ভরিয়া কলস
ঘাট হতে; আম্রবন-ছায়ে
সে পদ-পরশ-স্মৃতি বুকটিতে জড়ায়ে জড়ায়ে
পড়ে আছে পথখানি আবেশ-নিঃসাড় স্পন্দহারা
আপনারি অস্ফুট আলোয়।—সহসা নামিল ধারা
বিপুল ঝর্ঝরে। সুপ্তা ধরণীর তন্দ্রা গেল টুটে
বাধা পড়ে' একেবারে আকাশের কোটি বাহুপুটে,
আঁখি না মেলিতে আঁখি ছেয়ে গেল চুম্বনে চুম্বনে।

আম্‌লকি বনে
গেয়ে উঠিল না পাখী, কলাপ বিস্তারি'
শিখীদল দাঁড়াল না পথের দুধারে সারি সারি
পুরচারিকার মতো পুষ্পঅর্ঘ্যবাহী। বকশ্রেণী
পারিজাত-হার তার কাজল জলদবেণী
জড়ায়ে দিল না রচি'।—কিছু কোথা নাহি,
নয়ন-সলিলে অবগাহি'
ধরণী নিরন্ধ্র এই অন্ধকার মহাশূন্যে চায়;
আজি এ নিবিড় বরষায়
বরষা সে নিজে নাহি!
তৃণপুঞ্জ ওঠে মর্ম্মরিয়া,
সিক্ত ভূমিতল হতে শ্বসি' ওঠে নিখিলের হিয়া,

'কে গো, কোথা তুমি? তব শীতল পরশ
রোমকূপে রোমকূপে সঞ্চারিল অমৃতসরস
প্রীতিরসধারা।
বাসর শিয়রে মোর নিবিয়াছে সব ক'টি তারা।
ছায়াপথ-পানে চেয়ে নিশিনিশি প্রহর-যাপন
পলকে করিয়া সমাপন
কে এলে অজানা হতে একেবারে হৃদয়ের পারে;
খোল গো, গুণ্ঠন খোল, লুকায়ে রেখো না আপনারে
হে নিষ্ঠুর!'

সাড়া তবু নাহি দিল কেহ,
একটি বিরাট বোবা স্নেহ
আরো সুনিবিড় করে বুক তারে লইল আবরি'
হিয়ার মন্দিরে বন্দী করি' অন্ধ করি'।
ক্ষণেক রহে সে অচেতন
সেই আলিঙ্গন পাশে সুখাবেশে মৃতের মতন,
তারপর ধৈর্য্য টুটে। ললাট-বহ্নিতে জ্বেলে বাতি
গগনেরে চিরি' চিরি' খুঁজিয়া করে
সে পাতিপাতি,
বজ্র হয়ে টলে পড়ে ধরাতলে ব্যর্থ মূর্চ্ছাহত।
উন্মাদের মত
উতলা বাতাসে যায় যথা তথা ছুটি'।
মুঠি মুঠি
বনের বিক্ষোভে ছেঁড়ে আপনার চুল!

দুখানি দোদুল
অশ্রুধারা আঁখিকোণে কখন্ জেগেছে নাহি জানি,
বাহিরের এ বরষাখানি

লুকায়ে নীরব-পায়ে পশিয়াছে আমারো এ গেহে,
তেমনি বিরাট বোবা স্নেহে
আমারেও ঘিরেছে কে ! একফোঁটা
মোর আঁখিজল
বুকে তার ঘনায়েছে বেদনা-বিহ্বল
কোটি বরষার মত।—কেঁপে ওঠে বুক !
অচেনা সর্ব্বস্ব ওগো খোল খোল
খোল তুমি মুখ।
তুমি জানো, আমি ভালো জানি,
তুমি কতখানি মোর—আমি যে তোমার কতখানি,
কেনতবে মিছে ছল ? এত কাছে, তুমি এত কা
মোর ইহ-পরকাল তব কেশপাশে ঢাকিয়াছে,
তোমারে দেখিয়া লই অন্তরের সঞ্চিত আলোয়।

আকাশের, মনের কালোয়
মিশেহয় একাকার। আঁখি মুছে চাহি সব ঠাঁই,
বাহিরে বরষা ঝরে, একা ঘরে আমি আছি,—
সে কোথাও নাই !

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

৩

সুড়ঙ্গ পথ ঃ—

আমি কখনো কখনো ভাবি, কাঞ্চীপুরের রাজপুত্রের মাথায় এমন দুর্ব্বুদ্ধি জাগল কি করে যাতে রাজার ছেলে রাজপুত্রের গৌরব ভুলে চোরের মতো সুড়ঙ্গপথে রাজকন্যা লাভ করাটাই পরম পুরুষার্থ বলে মনে করতে পারলেন। আর ওপথে যে রাজকন্যা লাভ হয় সে রাজকন্যা যে লাভ করার যোগ্য নয়, এই সহজ কথাটাও মনে উদয় হলোনা। ভাটমুখে তেমন রূপগুণের বর্ণনা শুনলে যে "মনের দ্বার" "খুলে যায়" এবং কবাট লাগে না সেকথা জানি। কিন্তু তাই বলে সেই খোলাদ্বার দিয়ে যুগ যুগান্তের শিক্ষা-সংস্কার মর্য্যাদা-জ্ঞান এমন উধাও হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে এইটেই আশ্চর্য্য। যাই হোক, মা কালীর বিশেষ বরে বিদ্যালাভটা যদিও কোনপ্রকারে ঘটেছিল কিন্তু কোটালের হাতে নাকালের মাত্রাটাও এমন চরমে উঠেছিল যে ভারত-চন্দ্রকেও তীব্র বেদনাভরে বলে উঠতে হয়েছিল,—

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥"

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কত চাঁদই যে রাহুর আহার হয়েছে সে কথা মনে হলে ক্ষোভে লজ্জায় ধিক্কারে প্রাণটা অস্থির হয়ে উঠে। কি সব সোণার চাঁদ ছেলে! ভগবান আপনার হাতে তাদের কপালে মনুষ্য-মর্য্যাদার রাজটীকে পরিয়েই পাঠিয়ে-ছিলেন, কিন্তু গ্রহের ফেরে দক্ষিণ মশানে চোরের মতো তাদের বলি হতে হলো।

আজ যদি তারা থাকতো তাহলে এই একান্ত প্রয়োজনের দিনে কেবলমাত্র চিত্তরঞ্জনকে সম্বল করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নিকট লজ্জায় মাথা হেঁট করে

থাকতে হতোনা আমি এই সব তরুণ যুবকদের কোনও দোষ দিইনে। আমাদের কবিরা লেখকেরা বক্তারা আমাদের এই কলঙ্কিত লাঞ্ছিত দাসজীবনের লজ্জা ও অপমান সম্বন্ধে তাঁদের অনুভূতিকে একান্ত উদগ্ররূপে সচেতন করে তুলেছিলেন। তাঁদের পক্ষে জীবনটা এক অখণ্ড ধিক্কারের মতোই বোধ হচ্ছিল, নিশ্বাস নেওয়ার বাতাসটুকু পর্য্যন্ত বিষাক্ত বলে ঠেকেছিল। তারা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করছিল স্বাধীনতা ভিন্ন জীবনটার এমন কোনো মূল্যই থাকতে পারে না যে, সেটাকে একটা ছেঁড়া দুর্গন্ধ ময়লা ন্যাকড়ার পুঁটলির মতো পরমায়ুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু, এই তাদের পণ। তারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করার জন্যই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে ত্যাগ পরম সম্পদের মূল্য, যে মৃত্যু অমৃতের সিংহদ্বার, যে দুঃখ বিধাতার চিরন্তন পাকা খাতায় ঋণের ঘরে জমা হয়ে ওঠে তার কথা তাদের কেউ শোনালেন না। দেশের নেতারা দেশ জুড়ে উত্তেজনার খোলা ভাটি খুলে দিলেন এবং যথাসম্ভব দূরে থেকে, তাদের উন্মত্ত মৃত্যু-অভিসারের জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। সেই ঘোর দুর্দ্দিনের অন্ধকারের মধ্যে একা রবীন্দ্রনাথ মর্ম্মান্তিক বেদনায় দীর্ণকণ্ঠে মরণযাত্রী দেশবাসীদিগকে আহ্বান করলেন, সেই চিরদিনের জীবনের পথে, যে পথের শিয়রে অনন্তকালের—ধ্রুব-তারা আপনার মৃদুস্নিগ্ধ শান্তজ্যোতি বিকীরণ করছে। কিন্তু মজ্জমান ব্যক্তি যেমন মরণের নেশায় বিভোর হয়ে উদ্ধারকারীকে আঁচড়ে পিঁচ্‌ড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে, সমস্ত দেশ তেমনি রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করতে প্রবৃত্ত হলো। রবীন্দ্রনাথ কবি ও ঋষি। তিনি যদি মহাত্মা গান্ধীর মত কর্ম্মীও হতেন তাহলে বাংলা দেশের ইতিহাসের ধারা অন্যপথে বইতো, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

মনোভাবের বিশ্লেষণ।—এই আঁধার পথে রসাতল-যাত্রা সম্বন্ধে সকল বৃত্তান্ত আমার জানা নেই, থাকতেও পারে না। ক্ষণিক বিদ্যুতের চকিত আলোকে যেটুকু চোখে পড়েছে, তাই থেকে যে ধারণা জন্মেছে সেইটেই খুলে বলবো। যে মনোভাবের দরুণ এই আত্মঘাতের পথটাই প্রশস্ত বলে মনে হয়েছিল, উপরে তার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেছি। আর একটু খুলে বলা দরকার। এই মনোভাবটাকে বিশ্লেষণ করে দেখলে নিম্নলিখিত কয়েকটী জিনিষ পাওয়া যায়। (১) দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা লিপ্সা। (২) ইংরেজের প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ। (৩) একান্ত অধৈর্য্য। (৪) রাজনৈতিক ব্যাপার-টাকে ধর্ম্ম হতে বিশ্লিষ্ট করে দেখার প্রচলিত কুসংস্কার। (৫) বাহুবল ছাড়া স্বাধীনতা লাভের অন্য উপায় নাই এই বিশ্বাস। (৬) ইয়ুরোপের প্রতি দাস-মনোভাব বশতঃ এনার্কিষ্ট ও নিহিলিষ্টদের কার্য্য-কলাপের প্রতি অন্ধ অনুরাগ। প্রথম চারটের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই। শেষ দুটো সম্বন্ধে একটু খুলে বলা দরকার।

মহাপুরুষেরা যদিও প্রাচীন কাল হতে ধর্ম্মবলের মহিমা কীর্ত্তন করে আসছেন,

মানুষের মনে সে কথার ছাপ তেমন ভাবে পড়েনি। মানুষ মুখে যাই বলুক, আদিম জানোয়ারী সংস্কার-বশে নখ-দন্তের বলের উপরই আসল আস্থা রাখে। যার নখদন্তের বহর ও ধার যত বেশী তাকেই সে তত বড় বলে ভাবে এবং শ্রদ্ধাও সম্ভবতঃ করে থাকে। কাজেই নখদন্তের ব্যবহার দ্বারাই যে ইংরাজকে তাড়িয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে হবে সে সম্বন্ধে এই সব যুবকদের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নখদন্তের ধারের পরীক্ষায় জয়লাভ করা পাগলের পক্ষেও স্বপ্ন। কাজেই কোনও একটা ফন্দীর দরকার। ফন্দীটাও ইয়ুরোপের কল্যাণে জানতে বাকী রইল না। সেখানকার নানা দেশের নিহিলিষ্ট ও এনার্কিষ্ট সম্প্রদায় কিরূপ নব নব উৎপাজের সৃষ্টি ক'রে সেখানকার বড় বড় গবর্ণমেণ্টগুলোকে পর্য্যন্ত কিরূপ বিধ্বস্ত করে তুলেছে—সেই সব বাহাদুরির কাহিনী নিয়ে একটা রীতিমত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেইটেই হবে এঁদের বেদ-কোরাণ। তার উপর জুটলেন গীতা। কারণ, ভারতবর্ষীয়ের—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ধাতে হত্যা—বিশেষতঃ গুপ্তহত্যা সইবেনা, এ ভয়টা গোড়া হতেই তাঁদের দস্তুরমতো ভাবিয়ে তুলল। ওই ধাতটার একটু পরিবর্ত্তন করা চাই-ই। ধাত-পরিবর্ত্তন বিষয় গীতা যে আমোঘ দৈব-ঔষধ, এটা ভারতবর্ষের বহুযুগের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। "ক্ষুদ্রহৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠপরন্তপ" গীতার এই মহাবাণী, কত অনার্য্যজুষ্টম স্বর্গম কীর্ত্তিকর ক্লৈব্য দূর করে, মানুষকে সোজা স্বর্গের আলোর পানে দাঁড় করিয়েছে, কত কার্পণ্য-দোষোপহত স্বভাব, ধর্ম্মসংমূঢ় চেতাকে নিশ্চিত শ্রেয়ের পথ দেখিয়ে দিয়েছে, কে তার হিসাব করবে? কিন্তু সকলেই জানেন অমৃতও মহাবিষ হয়ে উঠতে পারে প্রয়োগের দোষে। গীতার মর্ম্মগত মহাসত্যের অখণ্ড ঐক্য হতে বিচ্ছিন্ন করে গোটাকতক শ্লোককে এঁরা মানুষের স্বাভাবিক দয়া-মায়া-মমতার সংহার সাধনের কাজে লাগিয়ে দিলেন। তাঁরা নিজেদের মনকে বোঝাতে লাগলেন, "হত্যা! সেটা আর এমন বেশী কি? সে আত্মাকে পুরানো ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়ে নতুন কাপড় পরানো।" যাহোক নতুন কাপড় পরানোর কাজটা তেমন জোরে না হোক দিন-কতক একরূপ মন্দ চললনা। আর সেটা গীতার নামেই চলতে লাগল। একথা তাঁরা ভুলে গেলেন, গীতা মানুষকে যা করতে চায় তা "নির্ম্মম" বটে কিন্তু "ঘাতক" নয়, কঠিন বটে কিন্তু নিষ্ঠুর নয়। সে মানুষকে করতে চায় ভক্ত, যার প্রধান লক্ষণ "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এবচ

নির্ম্মমো নিরহঙ্কার সমদুঃখসুখ ক্ষমী।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ইত্যাদি।

এইরূপে মনটাকে শান বেঁধে নিয়ে তাঁরা কাজ সুরু ক'রে দিলেন। কাজটা এক কথায় বলতে গেলে মৌচাক-ভেঙে মধু খাওয়ার কাজ। অর্থাৎ লোকে যেমন ধোঁয়া দিয়ে বা অন্যরূপ উৎপাত ক'রে মৌমাছি তাড়িয়ে চাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করে, সেই ভাবে ইংরেজকে তাড়িয়ে স্বাধীনতার মধু পান করতে হবে। এই উৎপাতের সমস্ত অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ খুঁটীনাটির আলোচনা করার প্রয়োজন দেখি না। সেটা প্রীতিকরও নয়। মোটা-মুটি বলতে গেলে এইরূপ প্ল্যান ঠিক করা হোলো। সমস্ত দেশ জুড়ে গুপ্ত সমিতির জাল বুনতে হবে। সেখানে হত্যা-লুণ্ঠনাদি উৎপাতের সলা-পরামর্শ স্থির হবে। বিদেশ হতে অস্ত্রশস্ত্রাদির আমদানী করতে হবে। ঝোপে-জঙ্গলে গোপনে কুচকাওয়াজ ক'রে যুদ্ধ-বিদ্যাটা কতক আয়ত্ত ক'রে নিতে হবে। টাকা কড়ির জন্য বিশেষ বেগ পেতে হবে না কারণ মায়ের কাজে টাকা খরচ পরম পুণ্যের কাজ। সে পুণ্য কেউ যদি স্বেচ্ছায় লাভ করতে না চায় তাকে জোর ক'রে গছিয়ে দিতে হবে। অস্ত্রশস্ত্র কিছু যোগাড় হয়ে যুদ্ধ-বিদ্যাটা আয়ত্ত হলেই এক সময়ে নানাস্থানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের অবতারণা করতে হবে। এইরূপে কিছুকাল চালাতে পারলেই শাসন-চক্রটা একেবারে অচল হয়ে পড়বে এবং কাজে কাজেই ইংরেজের পক্ষে এদেশে রাজত্ব করার মায়া কাটানো ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। ইংরেজ চলে গেলেই বাস্ আর কি—একেবার হয় স্বাধীনতার চতুর্ব্বর্গ ফল হাতে হাতে প্রাপ্তি হবে।

এ পাথর ধর্ম্মাধর্ম্ম ভালো-মন্দর বিষয় আলো-চনা করার প্রয়োজন নাই। কারণ, সেটাতো একেবারে আকাশের আলোর মত দেদীপ্যমান। এযে একেবারে খাঁটী রসাতল-যাত্রার পথ সে সম্বন্ধে এ পথের যাত্রীদেরও বোধ হয় কোনও সন্দেহ ছিল না। তাঁদের চাল-চলন ও সে সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বহর দেখে সেটা বেশ বোঝা যায়। তবে একথা ঠিক কোনও রকমে তাঁদের মনে এ বিশ্বাস যে স্থান পেয়েছিল যে, রসাতলের চরম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছে একটা সূক্ষ্ম পর্দ্দা ঠেলে ফেললেই একেবারে বৈকুণ্ঠ-ধামে মা-লক্ষ্মীর পায়ের পদ্মফুলটির ঠিক তলায় গিয়ে পৌঁছান যাবে।

ইংরেজকে তাড়াবার পক্ষে এই পথটিই সব চেয়ে সোজা ও উপযোগী কিনা তা আমি জানিনে। জানার যে বিশেষ কিছু দরকার আছে তাও মনে করিনে। কারণ এটা আমি ঠিক জানি যে, আমাদের অন্তরের অধীনতা দূর না হ'লে ইংরেজ আইনের দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা দিতে পারে না, একথা যেমন সত্য, আলাদেব অন্তরে স্বাধীনতার পূর্ণ উপলব্ধি লাভ হ'লে, তারা আইনের দ্বারা একদিনও আমাদের অধীন করে রাখতে পারবে না, এ-কথাও তেমনি সত্য। গুটিপোকা পূর্ণ-পরিণতি লাভ করলেই প্রজা-পতি হয়ে মুক্ত আলো বায়ুর নিমন্ত্রণ-রক্ষা করলেই, কোষের আবরণ যতই কঠিন হোক তাকে আর আটকে রাখতে পারবে না। কিন্তু তাই ব'লে আবরণটা বিদীর্ণ ক'রে দিলেই পূর্ণ-পরিণত প্রজাপতির মুক্ত আলোকে বিহার-লীলা সুরু হবে, এমন আশা করলে আশাভঙ্গের দুঃখ আমাদের কপালে সুনিশ্চিত।

ইংরেজ তাড়াবার পথ এটা হোক না হোক, এটা যে স্বাধীনতা লাভের পথ নয় একথা সুনিশ্চিত। কারণ, স্বাধীনতার পথ মুক্ত উদার আলোকে প্রসারিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার পথ যে পথে, আবালবৃদ্ধবনিতা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেই বিরাট রথ টেনে নিয়ে যেতে পারে। এই যে কোটি নরনারীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরমধৈর্য্যে একান্ত নিষ্ঠায়

বৃষ্টিবাদল আলো-আঁধারে ঐ মহারথ টেনে নিয়ে যাওয়া, এতেই দেশাত্মবোধের জন্ম। ভৌগোলিক নামের একত্ব হতে নয়। এই দেশাত্মবোধ যতই ব্যাপক ও পরিণত হয়ে উঠবে, আমরা অন্তরের মধ্যে ততই বললাভ করবো এবং আমাদের যুগযুগান্ত সঞ্চিত যে পাপ অধীনতার মূর্ত্তি ধরে আমাদের এতদিন পদদলিত ক'রে আসছে তার প্রভাব ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসবে। কিন্তু উৎপাতের এই গোপন সুড়ঙ্গপথে সমস্ত দেশবাসীর দেশাত্ম-বোধ বিকাশের অবকাশ কোথায়? কোন্ লক্ষ্য,কোন ব্রত, কোন সাধন-অনুষ্ঠান,সাধারণ সুখ-দুঃখ, সফলতা-বিফলতার নানা ঘাত-প্রতি-ঘাতের মধ্যে দিয়ে তাদের মিলনের অটুট বাঁধনে বাঁধনে? ক্ষুধিতের অন্নের সংস্থান নয়, পীড়িতের আরোগ্যদান নয়, আর্ত্তের ভয়ত্রাণ নয়, লাঞ্ছিতের অপমান-মোচন নয়, অজ্ঞের শিক্ষা-বিধান নয়, কেবলমাত্র খুন ও লুঠের গোপন ষড়যন্ত্র, আমাদের স্বার্থমগ্ন সংকীর্ণ অনুভূতিকে তিরিশ কোটির সুখদুঃখের বিশাল ক্ষেত্রে প্রসারিত ক'রে দেবে? তিরিশ কোটি লোকের পক্ষে এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়ার আশা করা, দারুণ ব্যাধিগ্রস্ত উৎকট কল্পনার পক্ষেও অসম্ভব। তারাও সেটা ভালরকমের জানতো, সেইজন্যই গোপনতার জন্য তাদের এমন প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। তাদের নিতান্ত অন্তরঙ্গদলের লোকগুলি ছাড়া সমস্ত দেশটাকে তারা সন্দেহের চোখেই দেখত। যাদের উপর এত সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাদের স্বাধীনতা দান করা ইংরেজের পক্ষেও যেমন অসম্ভব, এদেশের লোকের পক্ষেও তেমনি। সন্দেহ ও অবিশ্বাস যে পথের অবশ্যম্ভাবী ফল, সে পথ যে স্বাধীনতার পথ হতেই পারেনা, সে কথা কোন প্রমাণেরই অপেক্ষা রাখেনা।

তারপর আর একটী কথা আছে। আমি পূর্ব্বে বলেছি স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে পারে না; অনুগ্রহ করেও নয় জোর করেও নয়। ইংরেজ চান অনুগ্রহ ক'রে দিতে, আর এঁরা চান জোর ক'রে। যারা স্বাধীনতা ভোগ করবে দুই পক্ষই তাদের এমন নগণ্য মনে করেন যে, তাদের মতামতটা হিসাবের মধ্যে আনা বাহুল্য বিবেচনা করেন। এঁদের উন্মার্গগামী পেটরিয়টিস্‌মের রথচক্রতলে সমস্ত দেশের লোকের স্বাধীনতাকে দলিত পিষ্ট ক'রে এঁরা ছুটেছিলেন সমস্ত দেশের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে। অকস্মাৎ পাষাণ প্রাচীরের সংঘাতে রথখানি চুরমার হয়ে তাঁদের রথযাত্রা কিরূপ অপঘাতে অবসান লাভ করে, সে কথা সকলেই জানেন। সেরূপ না হ'লেও আসল ফললাভ বিষয়ে যে বেশী কিছু তারতম্য হতো, সেরূপ মনে করার কোনও কারণ নাই। এঁদের স্বাধীনতার সঙ্গে কোনও দিন সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটেনি। যা কিছু পরিচয় হয়েছিল সে কেবল ইংরেজী কেতাবের ছবির মারফতে। সুতরাং আসল স্বাধীনতাকে দেখলেও চিনতে পারতেন না। যাকে রথে চাপিয়ে দেশে নিয়ে এসে রাজ-সিংহাসনে বসাতেন, সে হয় তো স্বাধীনতার মুখোস-পরা একটা প্রকাণ্ড জুলুম। স্বাধীনতার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় থাকলে অপরের স্বাধীনতাকে এমন অনায়াসে পদদলিত ক'রে যেতে পারতেন না। এঁদের স্বাধীনতার সঙ্গে যে কোনও দিনই পরিচয় হয়নি তার আর একটী প্রমাণ, এঁদের ঐকান্তিক গোপনের

প্রয়াস ও আলোকে-ভীরুতা। ও-জিনিষটীই এমনি যে মনে প্রাণে কর্ম্মে ওর সাক্ষাৎ উপলব্ধি হ'লে,উপনিষদের ঋষিদের মতো উদার অকুণ্ঠিত কণ্ঠে আপনিই উদ্গীরিত হয়ে উঠবে

"শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রা।"

স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে পারে না, সকলকে নিজে অর্জ্জন করে নিতে হয় একথা যেমন সত্য; স্বাধীনতার উদারবাণী প্রাণ হ'তে প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে ভয় মোহ অবসাদ দৈন্য দূর ক'রে তাকে পরম উপলব্ধির যোগ্য ক'রে তুলে, একথাও তেমনি সত্য। কিন্তু সে অনুষ্ঠান ইংরেজের ভয়ে ও দেশবাসীর প্রতি সন্দেহ-বশে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত কুণ্ঠিত ও আত্ম-গোপনশীল, তার মধ্যে এই উদার অকুণ্ঠিত প্রেরণা আশা করা বাতুলতা মাত্র।

ইংরেজ তাড়ানোঃ—এঁরা ইংরেজ-তাড়ানো-টাকেই সর্ব্বপ্রধান—এমন কি একমাত্র কাজ ব'লে মনে করেন, এতেই প্রমাণ হয় 'স্বরাজে'র প্রকৃত ধারণাটা পর্য্যন্ত এঁদের নাই। ইংরেজ চলে গেলেই কি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতি-স্থাপন হবে? অস্পৃশ্য জাতীয়েরা মাথা তুলে উঠবে? শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি বাণিজ্য শিল্পের সুব্যবস্থা আপনিই গড়ে উঠবে? দেশাত্মবোধ আপনিই জেগে উঠবে? পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহের বাঁধন নিজে হ'তেই খসে পড়বে? আসল কথা, স্বরাজের পাঁচ ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রেঁধে বেড়ে থালায় সাজিয়ে কেউ কোথাও অপেক্ষা ক'রে বসে নাই যে, পথটা কোনও রূপে মাড়িয়ে যেতে পারলেই তার পর ক্রমাগত চব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের ভূরি-ভোজনের পালা চলতে থাকবে। আমাদের প্রতি-পদক্ষেপে স্বরাজ গড়ে গড়েই চলতে হবে এবং এই গড়নের কোনও দিনই শেষ হবে না। কারণ মানুষের আত্মাদর্শও অসীম এবং তার অসম্পূর্ণতারও অন্ত নাই। যে পথ গোড়া হতেই স্বরাজ সৃষ্টির অনুকূল সেই পথই স্বরাজের পথ, অন্য পথ মরীচিকা মাত্র।

সম্মুখ সমর বা মহাজন যেন গত স পন্থা—

এইবার কিছু গোলে পড়া গেল। যুদ্ধ জিনিষটা যে আদিন জানোয়রী জিঘাংসাবৃত্তির চরম অভিব্যক্তির ফল এবং তরোয়াল হ'তে আরম্ভ ক'রে শস্ত্রশকট (Armoured car) ও ট্যাঙ্ক (tank) পর্য্যন্ত সে নখ দন্ত শৃঙ্গেরই পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত সংস্করণ সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের দিক দিয়ে বিচার করলে যুদ্ধ মাত্রই যে মোক্ষকামীর পক্ষে সম্পূর্ণ পরি-বর্জ্জনীয় তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আর মোক্ষ মুক্তি স্বরাজ স্বাধীনতা যখন একই জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা তখন মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে উহা পরিহার্য্য, একথাও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মানুষের অশ্রান্ত কল্পনা যুদ্ধের কি সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের কি স্বর্গপুরীই না রচনা করেছে! এক একটা সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এক একটা মহাযুদ্ধের মধ্যে আপনার চরমতম বিকাশ লাভ করেছে। এক একটা যুদ্ধের উন্নত ও প্রবল-তম ভাবোচ্ছ্বাস বেলাভূমিতে জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের রেখার মতো মহাকাব্য বা ইতিহাসের মধ্যে আপনার চিহ্ন রেখে গেছে। রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড প্রভৃতি মহাকাব্যে কবির অন্তর যুদ্ধকে অবলম্বন ক'রে যে অমৃতের ধারা উৎসারিত করেছে, তা চিরদিন মানুষকে অমরত্বের আস্বাদন দিয়ে আছে। রাম লক্ষ্মণ ভীষ্মার্জ্জুন লিওনিডাস, সিনসিনেটাস, ওয়াশিং-

টন প্রভৃতি মানবকুল-গৌরবেরা যুদ্ধকে অবলম্বন ক'রেই আপনাদের চূড়ান্ত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথি সখা ও গুরু। ন্যায়ের জন্য ধর্ম্মের জন্য সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন কেবল এদেশের নয়, সব দেশের ক্ষত্রিয়দের চোখেই প্রাণের চরম চরিতার্থতা। কেবল কুরুক্ষেত্র নয়, ম্যারাথন থার্ম্মাপলি হলদিঘাট প্রভৃতিও চিরদিন মানুষের কাছে মহা ধর্ম্মক্ষেত্র ও তীর্থ-ভূমি। মুসলমানের জেহাদ ও খ্রীষ্টানের ক্রুসেড, ধর্ম্মান্ধতার সংকীর্ণতা সত্ত্বেও চরিত্রের সুপ্তশক্তি-গুলিকে জাগিয়ে তুলে, কত নিতান্ত সাধারণ লোককে যে প্রতিদিনকার তুচ্ছতার গ্লানি হ'তে উদ্ধার ক'রে মহত্ত্বের শিখরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছে তার সংখ্যা নাই। কার্ব্বলার পবিত্র ক্ষেত্রে ইমাম হাসান ও তাঁর অনুবর্ত্তীরা-আপনাদের সমস্ত দেহ মন প্রাণকে যে মহাআত্ম বিসর্জ্জনের শিখারূপে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন, তার আলো আজ পর্য্যন্ত মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করছে। এক কথায় বলতে গেলে, মানুষের আদিম যৌন প্রবৃত্তির পঙ্ক হ'তে প্রেমের শতদল পদ্ম ফুটে উঠে যেমন সংসারকে ধন্য ক'রে তুলেছে, জিঘাংসাবৃত্তির বেলাতেও ঠিক সেইরূপই ঘটেছে।

কাজেই যুদ্ধব্যাপারটাকে মানুষের ইতিহাস হতে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করার দিকে আমার আন্তরিক ঝোঁক থাকলেও সে কথাটা খুব খোলা গলায় জোর ক'রে বলতে পারছিনে। যে কবি খুবতীব্র ঘৃণার সঙ্গেই "War is a blood-paste ring wind-pipe-slitting art" ব'লে যুদ্ধের সার্টিফিকেট সুরু করেছিলেন তাঁকেও পরের লাইনে সুরটা নরম ক'রে "unless its cause is sanctified by justice" এই মর্ম্মের একটা কথা জুড়ে দিতে হয়েছিল। কেবলমাত্র লেখায় জুড়ে দেওয়া নয়, আন্ত গ্রীক স্বাধীনতার যুদ্ধটাকেও জীবনের সঙ্গে জুড়ে না দিয়ে তিনি কোন রকমেই শান্তি পাননি। যুদ্ধ ব্যাপারটা মানুষের অন্তরকে এমনি অধিকার ক'রে বসেছে যে যাঁরা বাহুবলকে সম্পূর্ণ বরখাস্ত ক'রে দিয়ে জগতে প্রেম ও শান্তি বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেও বৈষ্ণবের বাড়ীর পূজার কুমড়ো বলির মতো সামরিক ভাষা বেমালুম প্রবেশ লাভ করেছে। প্রমাণ Salvation Army এবং মহাত্মা গান্ধীর চরকার Munition নামকরণ।

যুদ্ধটাকে মানুষের চাকরি হতে চিরদিনের মতো বরখাস্ত করা সম্বন্ধে আমি যে একটু সামান্য মাত্র দ্বিধা প্রকাশ করেছি, সেটা কেবল ধর্ম্ম ন্যায় ও স্বাধীনতার যুদ্ধ লক্ষ্য ক'রে, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ন্যায় ও ধর্ম্ম যে কোন পক্ষে সেটা ঠিক ক'রে নির্ণয় করা শক্ত। যে যুদ্ধটার জের এখনও মিটেনি, সেই চোখের সামনের যুদ্ধটাতেও ন্যায় কোন্ পক্ষে তা এখনো কেউ বুঝতে পারল না। মোকদ্দমার আসামী ও ফরিয়াদী দুই পক্ষই যেমন মা-কালীর নিকট জোড়া পাঁঠা মানত করে, বড় বড় খ্রীষ্টান জাতিরাও তেমনি নির্দ্দিষ্ট দিনে একত্র হয়ে আপন আপন অস্ত্রশস্ত্রের উপর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা ক'রে থাকেন, এটা অনেকবার দেখা গিয়েছে। যা হোক এটা একটা অবান্তর কথা। স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে যুদ্ধের উপযোগিতার সম্বন্ধে একটু আলোচনা ক'রে দেখা যাক্।

১। ভালো দিক :—

(ক) যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীনতা লাভের পথটা চিরদিনের চেনা পথ। আমি পূর্ব্বেই বলেছি এটা মহাজনের পথ।

(খ) যুদ্ধের উৎসাহ অতিসহজেই মানুষকে প্রাত্যহিক লাভ-ক্ষতির খুটিনাটী হিসাব হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে ত্যাগের জন্য উন্মুখ ক'রে দেয়।

(গ) মৃত্যুর সম্মুখে মুখোমুখী ক'রে এক মনে দাঁড়ালে হিন্দু-মুসলমান ও অস্পৃশ্যতার সমস্যা অতি সহজেই মিটে যেতে পারে।

(ঘ) কেবল সৈন্যেরাই যে যুদ্ধ করে তা নয়। ঠিক ভাবে দেখলে দেখা যায় সমস্ত দেশের লোকই যুদ্ধ করে। কাজেই দেশের সমস্ত ব্যাপারকেই রীতিমত ব্যবস্থার (organisation) সামিল ক'রে নিতে হয়। এতে জাতির কার্য্য শত গুণে বেড়ে উঠে।

(ঙ) লক্ষ লক্ষ লোক একব্রত একলক্ষ্য নিয়ে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত হ'লে তাদের মধ্যে অতি সহজেই একপ্রাণতা জন্মে। ঠিক ভাবে দেখলে মনে হয় এক একটি সেনাদল যেন এক একটি বিরাট ব্যক্তি।

(চ) দেশের জন্য যুদ্ধ করলে দেশাত্ম-বোধ একেবারে প্রাণে প্রাণে মুদ্রিত হয়ে জীবনের সামিল হয়ে উঠে। তার আর কিছু-তেই মার থাকেনা।

(ছ) ষড়যন্ত্রে যেমন চরিত্রে ভীরুতা নীচতা ও সংকীর্ণতা জন্মে থাকে সম্মুখ-যুদ্ধে সেরূপ হয় না।

(জ) যুদ্ধদ্বারা স্বাধীনতা লাভ করলে সেটা আর কেউ কেড়ে নেওয়ার আশঙ্কা প্রায়ই থাকে না।

২। মন্দ দিক

(ক) অস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন ন্যায় ও ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করার আর অন্য উপায় নাই, এরূপ মনে করা মানুষের পক্ষে নিতান্তই অপমানজনক। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন—

"—অস্ত্র দিয়া রাখিতে হইবে ধর্ম্ম ?
বাহুবল দুর্ব্বলতা করায় স্মরণ।"

একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাছাড়া ধর্ম্মের ন্যায়ের সত্যের নিজের এমন কোনো শক্তি নাই যে আপনাকে জয়ী করতে পারে—এই যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে যে পায়ের নীচের দাঁড়াবার মাটীটুকু পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না! ধর্ম্মের যদি সে বলটুকু পর্য্যন্ত না থাকে তাহলে জগৎ আশ্রয় পাবে কিসের উপর? জীবনটা যে তাহলে মাতালের স্বপ্নের মতো নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে মানুষ যে—

"অনীশ্বর অরাজক ভয়ার্ত্ত জগতে"

নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়বে! তাছাড়া এ-বিশ্বাসে পরিতৃপ্তিই বা কোথায়? চিরন্তন ধর্ম্ম আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে আমার ভিতর দিয়ে অধর্ম্মের উপর জয়লাভ করলেন, এ-বিশ্বাসে একটা গভীর পরিতৃপ্তি আছে। কিন্তু দৈবাৎ আমার অস্ত্রগুলো বেশী ধারালো হওয়াতে ন্যায়ধর্ম্ম জয়ী হলেন—এরূপ মনে করায় কোনই তৃপ্তি নাই। আর তৃপ্তি পায় না বলেই মানুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। রাম্যও বলতে হয় কাপড়ও তুলতে হয়। আসলে তার বিশ্বাসটা Powder dry রাখার উপর কিন্তু তবুও Trust in God ব'লে মনটাকে ভুলাতে হয়। আর আসল

জায়গাটাতে এরূপ মিথ্যার আক্রমণ ঘটায় মানুষের যা-কিছু চেষ্টা সবই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

(খ) এ-পর্য্যন্ত বাহুবলের দ্বারাই ন্যায় ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এ কথাটা ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমেরিকা যে স্বাধীনতা লাভ করেছিল তার কতটাই বা মনের বলে সেটার হিসাব করা শক্ত। ধর্ম্মের বলের সঙ্গে অস্ত্রের বলের ভেজাল ঘটায় মানুষ ধর্ম্মের বলটা যে কতদূর তা টের পাচ্ছে না। সেইজন্য এত মহাপুরুষের আবির্ভাব সত্ত্বেও মানুষের চিরদিনের মোহ কিছুতেই ঘুচছেনা। সভ্যতার গোড়ায় থেকে মানুষ তো পেনাল কোড দিয়ে অপরাধ শাসনের কাজে লেগে আছে, কিন্তু অপরাধের বোঝা তো বেড়েই চলেছে। স্পেনাল কোড অপরাধের বাহিরের প্রকাশটাকেই বন্ধ করতে পারে, তার বীজটাকে তো নষ্ট করতে পারে না, কাজেই সেই বীজ নব নব মূর্ত্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে।

(গ) যুদ্ধকে একবার আশ্রয় করলে আর তাকে ছাড়ানো শক্ত হয়ে ওঠে। তখন আত্মরক্ষার অছিলায় ক্রমাগত অস্ত্র-শস্ত্রের বহর বাড়াবার দিকেই রোখ চেপে যায়। তাছাড়া যুদ্ধের অভ্যাসটা ঠিক রাখার জন্য অন্যায় যুদ্ধের অবতারণাও দরকার হয়ে পড়ে।

(ঘ) যুদ্ধের পথে স্বাধীনতা লাভ করার চেষ্টায় একটা বিপদও আছে। দৈবাৎ কোনও পরাক্রান্ত সেনাপতি যদি সেনাদলের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে, তাদের সাহায্যে অনায়াসেই সে একাধিপত্য লাভ করতে পারে। বহুবার এরূপ ঘটেছে।

দুদিকের সব কথাই খুলে বললেম, পাঠকগণ বিচার ক'রে দেখবেন। আমার নিজের কথা বলতে পারি যুদ্ধটাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা সম্বন্ধে প্রথমে যে একটু দ্বিধার ভাব ছিল, এখন দেখছি তার অনেকটাই কেটে গেছে। এতে অসামঞ্জস্যের অপরাধ একটু হয়েছে হয়তো। তা হোক। সেই ভয়ে আমি চিন্তার স্রোতটাকে আটক ক'রে রাখতে প্রস্তুত নই।

আমি এতক্ষণ সাধারণ ভাবে যুদ্ধের দোষ-গুণ আলোচনা ক'রে এসেছি। আমাদের 'স্বরাজ' লাভের পক্ষে যুদ্ধের কোনও উপযোগিতা আছে কিনা, সে সম্বন্ধে একটী কথাও বলি-নি। বলার কোনও প্রয়োজনও দেখিনি। কারণ তাতে কেবল কাগজ ও কালী নষ্ট।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী।

আঁধি

১০

তার পর এক মাস ধরিয়া প্রত্যহই প্রায় সুষমার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। বাড়ীর লোকে ব্যাপারটাকে যখন ফিট্-না-ফাট্, ঢং—বলিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও টিট্‌কারীর বাণে খোঁচাইতে লাগিল, অভয়াশঙ্কর তখন কড়া মেজাজে চড়া দর দিয়া নিখিলের জন্য এক মাষ্টার মহাশয় আনাইয়া তাহাকে সেই মাষ্টারের জিম্মায় কায়েমী করিয়া দিতে নিযুক্ত রহিলেন; এ সংবাদ তেমন করিয়া তাঁহার কাণেও পৌঁছিল না। শেষে যখন এক প্রতিবেশিনী আসিয়া হঠাৎ খানিকটা ভয় দেখাইয়া গেল,—ঠিক এমনি অবস্থা ও-পাড়ার ঐ নকুড়ো বাগ্দীর দ্বিতীয় পক্ষের বৌটারও হইয়াছিল গো। বেচারী বৌটা মরা সতীনের হাওয়া লাগিয়া মরিতে বসিয়াছিল, শেষে কোথা হইতে সেই বিশে চাঁড়াল আসিয়া ঝাঁটার ঘায়ে ভূত তাড়ায়। বৌটা অমনি জল-সমেত দুই-দুইটা বড় কলসী দাঁতে করিয়া বহিয়া লইয়া গেল! শুনিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। তাই ত ভূত,—মুখের হাসি মুখে চাপিয়া মানদা-ঠাকুরাণী কমিটী ডাকিয়া প্রস্তাব করিলেন, বিশে চাঁড়ালকে এখনি আনোনা কর্ত্তব্য—না হইলে ভূতের সঙ্গে একত্র বাস নিরাপদ নয় ত, কিন্তু—

এই কিন্তুটা মর্ম্মে মর্ম্মে সকলেই বুঝিল। অভয়াশঙ্কর চিরদিন একরোখা,—ঠাকুর-দেবতাই মানিতে চাহেন না, এ'ত কথার কথা, কোথাকার ভূত-প্রেত! তাহার উপর অত সোহাগের বৌ মরিয়া ভূত হইয়াছে, এ কথা যাহার মুখে শুনিবেন, সে যত বড় গুরুজনই হোক্ না কেন, তাহার সেই মুখ তদ্দণ্ডে শাণের মেঝেয় ছেঁচিয়া দিবেন! কাজেই ভরসা করিয়া তাঁহার কাণে ব্যাধি ও প্রতিকারের উপায়টা কেহ তুলিতে পারিল না, শুধুই ভয়ে কাঁটা হইয়া টিপ্পনী কাটা কাজটাই বন্ধ করিল। তখন সুষমার বিপদ বাড়িল। এই কমিটি হইবার পূর্ব্বে মূর্চ্ছার সময় তবু দুই-চারিজন গিয়া একটু ধরিত, মুখে-চোখে জল-আছড়াও দিত, এখন ফিট্ হইলে সে ত্রিসীমাও কেহ মাড়াইতে চাহে না, বরং সেদিক হইতে বহু দূরে সরিয়া যায়।

সেদিন মধ্যাহ্নে ঘরের খড়খড়ির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ সুষমার ফিট্ হইল। ফিটের মাত্রাও সেদিন একটু বেশী; পাশে কেহ ছিল না। খড়খড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে সার্শির কাঁচ ভাঙ্গিয়া সুষমা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িল। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দে অভয়াশঙ্কর উপরে আসিলেন; আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া বিরক্ত হইলেন, কিন্তু বিরক্তির মধ্যে মমতাও যে একটু না জাগিল, এমন নয়। বেচারী! নিজেই মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিয়া, স্মেলিং শল্টের শিশির ছিপি খুলিয়া ঘ্রাণ দিয়া রোগীকে কোনমতে চাঙ্গা করিয়া তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এ ত বিষম উৎপাতে পড়া গেল। একটু স্বস্তিতে থাকিবার আশা করিয়া এ কি বিপত্তিই ঘাড়ে করিয়াছেন! এ সব বালাই কোন দিনই

ছিল না ত! গৃহে কাহারো অসুখ দেখিলে বিশ হাত দূরে থাকাই ছিল তাঁহার বিধি—কিন্তু এখন এ অবস্থা দেখিয়া সরিয়া থাকিলেও চলে না ত! বাড়ীতে এই যে এতগুলা স্ত্রীলোক তাঁহারই অন্ন ধ্বংস করিয়া শুইয়া বসিয়া আরামে গা গড়াইয়া লইতেছে, ইহাদের কি এতটুকু আক্কেলও হয় না? সুষমার দিকে তাঁহার মন ততটা নাই থাকিল, তবুও তাহাকে তিনি বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, এ গৃহের কর্ত্রীও এখন সুষমাই ত। উহারা সেই কর্ত্রীকে এ-রকম অবহেলা করিবে! উপরে অভয়াশঙ্করের হুঙ্কার শুনিয়া মানদা ঠাকুরাণীর দলের দুই-চারিজন সেখানে আসিয়া উদয় হইলে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এই যে লোকটা হাত-পা কেটে রক্তগঙ্গা হল, তা মুখে জল দেবার জন্যে তোমাদের কারো দেখা নেই! আমি সেই বাইরে থেকে এসে মুখে জল দি! তোমাদের দ্বারা এটুকু উপকারও হবে না!

ঠাকুরাণী-কোম্পানির দল ভাবিল, একবার ভূতে পাওয়ার কথাটা পাড়া যাক্, কিন্তু অভয়াশঙ্করের রাগের ঝাঁজে বাতাসটা তখনো এমন তাতিয়া ছিল, যে সে কথা বলিতে কাহারো আর সাহস হইল না! অভয়াশঙ্কর বিষম ক্রুদ্ধভাবেই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

অভয়াশঙ্কর চলিয়া গেলে রমণীরা সুষমার কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ বৌমা, এ ত ভাল কথা নয়, বাছা। রোজ রোজ এমন কাণ্ড—বিশেষ এই অবস্থায়! একজন রোজা ডাকিয়ে দেখানো দরকার। আচ্ছা, কি রকম ছায়া-টায়া দেখ, বল ত? পাশে পাশে ঘোরে শুধু, না, ভয়ও দেখায়? কার মত দেখতে, চিনতে পারো কি?

সুষমা কথাগুলার অর্থ না বুঝিয়া তাহাদের মুখের পানে কৌতূহল-দৃষ্টি তুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহারা তখন স্পষ্ট করিয়াই কথাটা খুলিয়া বলিল,—জানাইয়া দিল যে, এই প্রথম নয়, অমন কত জায়গায় দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রীরা মৃতা সপত্নীর হাতে বিষম নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে! স্বামীর ভাগ দেওয়া কি সহজ কথা! বাঁচিয়া নাই থাকিল, ঐ যে সুষমারও পেটে একটি আসিতেছে না,—কাজেই নিজের ছেলেটির কোন খোয়ার হয়, এই ভয়ে মৃতা সপত্নী সেইটির উচ্ছেদের উদ্দেশ্যেই এমন করিয়া লাগিয়া পড়িয়াছে! হোক বোন্,—এক স্বামী হইলে মার পেটের বোন্‌ও পর হয়, এ ত কোন দূর-সম্পর্কের বোন্ বৈ ত না—তাও জীবিত-কালে কেহ কারো মুখও দেখে নাই!

শুনিয়া সুষমার সমস্ত মন এমন ঘৃণায় ভরিয়া গেল যে কষ্ট হইলেও সে কোনমতে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ওদিকে অভয়াশঙ্কর ভাবিতেছিলেন,—সুষমার এই অবস্থায় প্রত্যহ এ রকম ফিট হওয়াটা ঠিক হইতেছে না ত! একজন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া যাক্। তার পরে দেখা-শুনার জন্য একজনকে সর্ব্বদা কাছে রাখা দরকার! কাহাকে রাখা যায়? ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন, শাশুড়ীর শরণ লওয়া ছাড়া উপায় নাই! কিন্তু তিনি কি আসিবেন? লীলার মৃত্যুর পর তাহারি সাজানো ঘরে পা দেওয়া—তবুও তিনিই যখন ধরিয়া-বাঁধিয়া আবার বিবাহ দেওয়াইয়াছেন, এবং সুষমা যখন তাঁহারই সম্পর্কীয়া ভাই-ঝী, তখন হয়ত আসিতেও পারেন!

ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইয়া তিনি শাশুড়ীকে পত্র লিখিয়া দিলেন। তাঁহার যে শীঘ্র আসা দরকার, চিঠিতে সে কথা বিশেষ করিয়াই লিখিয়া দিলেন।

১১

শাশুড়ী-ঠাকুরাণী নিজের বিষয়-সম্পত্তির একটা পাকা রকম বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থ-দর্শনে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অভয়াশঙ্করের ডাক গিয়া পৌঁছিল! তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অমনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সুষমার শীর্ণ শরীর দেখিয়া শিহরিয়া বলিলেন,—শরীরের এমন অযত্ন কর্‌ছিস্ কেন, মা? তোর হাতে যে মস্ত ভার রয়েছে। সকলের আগে সেই জন্যেই যে তোর নিজের শরীরের উপর নজর রাখা দরকার। না হলে এ ভার রাখতে পারবি কেন?

সুষমা পিশিমার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল,—শরীর ত আমার ভালই আছে, পিশিমা।

তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া পিশিমা বলিলেন,—সে ত দেখতেই পাচ্ছি।

দুপুর বেলায় আহারাদি করিয়া উপরে আসিয়া তিনি দেখিলেন, সুষমা ঘরের মেঝেয় আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। নূতন বন্দোবস্তে নিখিলের জন্য মাষ্টার মহাশয় আসিয়া ছিল। মাষ্টার মশায়ের কাছে তাহাকে এখন রুটিন-মত সারা সকাল ও দুপুরটা থাকিতে হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গেই সে খানিকটা হাঁটিয়া বেড়াইয়া আসে। অর্থাৎ অন্তঃপুরের সঙ্গে তাহার সম্পর্কটা খাওয়া-পরা বাদ একেবারে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিখিলের দিদিমা ভুবনেশ্বরী আসিয়া সুষমাকে বলিলেন—শুয়ে কেন, মা? অসুখ করছে কি?

সুষমা উঠিয়া বসিয়া বলিল,—না। এমনিই শুয়ে আছি, পিশিমা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—একটু গল্প-সল্প কর্ দিকি আমার সঙ্গে। এখানকার ব্যবস্থা ত আমি এসে ভাল দেখচি না, মা। তুই কি কিছু দেখিস্ না, শুনিস্ না?

সুষমা মুখ নীচু করিয়া নীরবেই বসিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না। ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কতক্ষণই বা এখানে এসেচি! তবু আমি সবই বুঝতে পারচি, মা। এদের ঝাঁজেই তুই এমন শুকিয়ে মলিন হয়ে গেছিস্, না? অমন যে কাঁচা সোনার বর্ণ—তাও বলি, এরা কে, বল্? অভয় ত যত্ন-আত্তি করে, তবে—?

সুষমা বিপদে পড়িল। সে কি বলিবে? স্বামী যত্ন-আত্তি করেন না, এ-কথা বলা চলে না। কেন না,তাহার অসুখ-বিসুখে দেখা-শুনা, ডাক্তার ডাকা,—তা-ছাড়া গহনা-পত্র কাপড়-চোপড় প্রচুর দিয়াছেন, দিতেছেনও—সংসারের কর্ত্তৃত্বও তাহারই হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন,—কিন্তু হায়, এইগুলাই কি নারীর সব পাওয়ার মধ্যে! নারী কি এইগুলা পাইয়া গৃহ-রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেই তাহার সকল দুঃখ ঘোচে?

সুষমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—আমার এও কেমন মনে হচ্ছে, মা, যে অভয় বুঝি তোকে তেমন ঘেঁষ দিচ্ছে না! তাকে তোর কাছে একটিবারও দেখলুম না,—এরি বা মানে কি? নিখিলই বা কোথায়?

সেই এসে যা একবার দেখেচি—এরা কোথাও গেছে নাকি ?

সুষমা বলিল,—না, নিখিল বাইরে মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়তে গেছে।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—মাষ্টার মশায় আবার কবে এল ?

সুষমা বলিল,—মাস-খানেক হবে। সকালে খাবার খেয়ে বাইরে যায়, তার পর ন'টার পর ভিতরে আসে, চাকরের কাছে নায়, নেয়ে ভাত খেয়ে আবার বাইরে যায়। মাষ্টার মশায় বাইরে ভাত খান কিনা, সেইখানে সেও তখন থাকে। দুপুর বেলা দুধ পাঠানো হয়। খেয়ে পড়ে, লেখে, তার পর চারটের সময় ভিতরে এসে জল-খাবার খেয়ে গা-টা মুছে বেড়াতে বেরোয়।

শুনিয়া ভুবনেশ্বরী কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে রহিলেন, পরে ডাকিলেন,—সুষু—

—পিশিমা—বলিয়া সুষমা ভুবনেশ্বরীর পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া দিল। তাহার দুই চোখের পিছনে জল ঠেলিয়া আসিয়া ছিল, কিছুতেই সে তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কাঁদিস্ নে মা। এর জন্য দায়ী আমি। কিন্তু এ-রকমটি যে হবে, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি! তাই ত, তোর জীবনটা, মা, এম্‌নি করেই আমি নষ্ট করে দিলুম! ভুবনেশ্বরী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

সুষমা বলিল,—এই নিখিলকে কেড়ে নেওয়াই আমার বড়-বেশী বাজচে, পিশিমা। আমার জন্যে আমি কিছু ভাবি না, কোন দুঃখই নেই আমার। আমি ত নিজের জন্যে কিছু তেমন প্রত্যাশাও করিনি কোনদিন। কাজেই সেজন্যে দুঃখ হবে কেন ?

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তা জানি, মা। তোমার এত-বড় উঁচু মন দেখে আমি ত খুবই বুঝেছিলুম। তাতেই ভেবেছিলুম, তুই আবার সব ঠিক করে নিতে পারবি, তোর কোন দুঃখ থাকবে না। কিন্তু এ কি হল! হায়রে, শুধু ঐ একরত্তি ছেলেটার মুখ চেয়ে নিতান্ত স্বার্থপর হয়ে তোর এত বড় সর্ব্বনাশ করে বসলুম! তারপর কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া, বসিয়া সুষমার মুক্ত কেশগুলার মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন,—অভয়কে আমি বলব একবার ?

সুষমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া শশব্যস্তে বলিল,—না না পিশিমা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। তুমি আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলো না ওঁকে, লক্ষ্মীটি।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তা বলে তুই এত-খানি হেনস্তা সয়ে পড়ে থাকবি—কিছু পাবি না—তোর সম্বল বলে, সান্ত্বনা বলে ? এত বড় পাপের ফল যে কখনো ভালো হতে পারে না মা—সেই ভেবেই যে আরো আমি শিউরে উঠ্‌চি।

সুষমা বলিল,—না পিশিমা, আমার ত এখানে কোন দুঃখ নেই। তোমায় ত বলেচি, এই এত বড় সংসারের কর্ত্তৃত্ব উনি আমারি হাতে তুলে দিয়েছেন। দাস-দাসী, লোক-জন, এ সমস্ত আমারই তাঁবে রয়েছে! নিজের হাতে আমি তাদের মাইনে দিচ্ছি, কাজ-কর্ম্ম দেখচি-শুন্‌চি—আমাকে তারা এতটুকু অমর্য্যাদা-অসম্মানও করে না ত—

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—এইটেই কি মেয়ে-মানুষের সম্বল ? এইতেই তার সব পাওয়া হল, এই কথা আমায় তুই বোঝাতে চাস্, সুষু?

সুষমা বলিল,—সব মেয়েমানুষের বুদ্ধি ত সমান নাও হতে পারে। কেউ কর্ত্তৃত্ব পেয়েই সব পায়, কেউ বা আর-কিছুর কাঙাল।

বাধা দিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কিন্তু তুই কি ঐ কর্ত্তৃত্বের কাঙাল—এই কথা আমায় বল্‌তে চাস্ রে ?

সুষমা কিছু বলিল না। ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—এ আমি জানি যে, তুই নিখিলের মধ্যে তোর সব কামনা ডুবিয়ে বসে আছিস্! সেই নিখিলকে তোর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তোকে একেবারে কাঙালের অধম করে যে ওরা ছেড়ে দেবে, এ আমার কখনোই সহ্য হবে না। আমার সে নেই—বল্‌তে গেলে—কেউই নেই, কিন্তু তোকে ধরেই তার সব আমি তেমনি অটুট্ তেমনি বজায় রাখতে চাই যে! তারপর আরো কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন,—নিখিলের সম্বন্ধে এমন বন্দোবস্ত হঠাৎ হল কেন ? নিখিল কি তোকে মানে না ? না, সে তোর কাছে আসতে চায় না ?

সুষমা বলিল,—আমায় আর তেমন পায় না বলে বেচারী কি মলিন শুক্‌নো মুখ নিয়েই ঘুরে বেড়ায়, পিশিমা। তার চেহারা দেখেচ ত—মুখে তার হাসির চিহ্নও নেই!

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—হুঁ, দেখেচি বটে—আমার কাছেও আসে না বড়। খাবার সময় আমি বল্‌লুম,—হ্যাঁরে, তোর মা গেল কোথায় ? আসেনি ? তা সে বললে, মার যে অসুখ, দিদিমা। নীচেয় নামতে মার কষ্ট হবে। বাবা বায়না করতে বারণ করে দেছে।—আহা, চোখদুটি অম্‌নি ছল্‌ছলিয়ে এল। তারপর ঐ মানদা বললে, নিজের হাতে না খেয়ে ওর অসুখ করছিল কি না, ডাক্তারে তাই বলেছে, কেউ যেন খাইয়ে না দেয়! ···তাছাড়া আমার অত ন্যাওটো ছিল, তা আমার সঙ্গেও দুটো ভালো করে কথা কইলে না রে, খাওয়া হতেই বাইরের দিকে ছুটল, বল্‌লে,—তুমি এখানে আছ দিদিমা, যাও, মার কাছে বসোগে, যাও। মার যে অসুখ, আমি বাইরে যাচ্ছি—মাষ্টার মশায়ের খাওয়া দেখতে হবে কি না আমায়।—তখন এত বুঝিনি ত!

সুষমা বলিল,—হাঁ, ঐ কথাই বলেছেন, যে নিখিল মাষ্টার মশায়ের খাওয়ার সময় তাঁর কাছে বসে তাঁর খাওয়া দেখবে, কোন অসুবিধা বা কষ্ট যেন তাঁর না হয়! বলেন, ছেলে বড় হচ্ছে, এখন থেকেই ওর সব দিকের শিক্ষা হওয়া দরকার।

—বটে!—বলিয়া ভুবনেশ্বরী চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

১২

ভুবনেশ্বরী স্থির করিয়াছিলেন, পাঁচ-সাত দিন এখানে কাটাইয়া তিনি তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িবেন—কিন্তু তাহা পারিলেন না।

এই বাড়ীটির মধ্যে অন্তঃপুরখানি দখল করিয়া অভয়াশঙ্করের অন্নে যে জীবগুলি শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছিল, তাহাদের কথাবার্ত্তা ও ধরণ-ধারণ হইতে ভুবনেশ্বরী স্পষ্টই বুঝিলেন,—সুষমার উপর কেহই বড় প্রসন্ন নয়। ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে সুষমার বিরুদ্ধে মিথ্যা করিয়া কিছু লাগাইতে পারিলে সকলেই যেন বর্ত্তাইয়া যায়,—অথচ সুষমার দোষ যে কি, তাহারও একটা সুস্পষ্ট

আভাষ কেহ দিতে পারে না। ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, এই যে একটা আড়্আড় ছাড়-ছাড় ভাব, সুষমার অসুখেও কেহ তাহার দ্বারে উঁকি দিয়া উদ্দেশটুকুও লইতে চাহে না—এই সহানুভূতির অভাবই যে সুষমাকে মারিয়া রাখিয়াছে! তিনি স্পষ্টই চোখে দেখিয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া সকলে নানা গল্প ফাঁদিয়া হাসির জমক তুলিয়া আসর জমাইয়া দিয়াছে, যেমনি সুষমা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি সকলের হাসি-গল্পের স্রোতে ভাঁটা পড়িল—কাজের অছিলা তুলিয়া কে কোথায় সরিয়া গেল। কেন—এ কেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া ভুবনেশ্বরী ইহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাইলেন না।

অথচ এই সবগুলার জন্যই যে তাহার মনে সুখ নাই, শরীর ক্রমশ কৃশ-দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, ইহাও তিনি বেশ বুঝিলেন। সুষমার এ অবস্থায় মনটাকে স্ফূর্ত্তিতে রাখা ভারী প্রয়োজন—নহিলে পেটের সন্তানটি কেন, তাহাকেও রক্ষা করা কঠিন হইতে পারে! ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, যতদিন সুষমা ভালয়-ভালয় প্রসব না হয়, ততদিন ত তিনি এখানে থাকিয়া যাইবেনই, তা ছাড়া অভয়াশঙ্করকে বলিয়া নিখিলকে সুষমার সঙ্গী করিয়া রাখার প্রয়োজনীয়তাটাও বুঝাইয়া তাহাকে এখন সুষমার কাছে রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

তাই সেদিন ভুবনেশ্বরী সুষমাকে বলিলেন,—আজ অভয় খেতে এলে আমি বলব'খন, যে-পর্য্যন্ত ভালোয় ভালোয় তোরা দু'জন দু'ঠাঁই না হোস, নিখিলকে যেন তোর কাছেই রাখে, তোর মনটাও তাতে ভাল থাকবে।

সুষমা মিনতির সুরে বলিল,—না পিশিমা, আমার কথা ওঁকে তুমি কিছু বলো না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কিন্তু তোর মনটা যে ভালো রাখা দরকার মা।

সুষমা বলিল,—তোমার যেমন কথা। আমার মন বেশ আছে, পিশিমা! কে বললে তোমায়, আমার মনে ফুর্ত্তি নেই?

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—যে শরীর হয়েচে, পেটের ওটা বাঁচবে কেন?

সুষমা উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ কেমন লজ্জা হইল, বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া গেল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—ন্যাখ্ মা, ঐ সব মাগীগুলোর দিকে ফিরেও তাকাস্ নে। এ ত আত্মীয় পোষা নয়, সাপ পোষা। তাকেও কি কম জ্বালান্ জ্বালিয়েছে, ঐ মানদা ঠাকরুণটি—ওঁর মুখের কি বিষ! এক বারের কথা বলি তবে, শোন্,—সেদিন দ্বাদশী, দ্বাদশীর দিন ভোর হবার আগেই মা আমার উঠে স্নান-টান সেরে ওঁকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ কাপড় পরে ওঁর জলখাবার সাজিয়ে দিত। সেদিনও তাই করে শ্বেত-পাথরের রেকাবিখানি সাজিয়ে যেই সামনে ধরে দিলে, জানিনা, ওঁর কি হয়েছিল,—উনি কট্মট্ করে চেয়ে সেই রেকাবিতে মারলেন এক লাথি—লাথি খেয়ে সে বেচারী ত মুখ থুব্ড়ে পড়ে গেল আর রেকাবিও অমনি দেয়ালে গিয়ে ঠেকে ভেঙ্গে চুরমার হল। মা আমার তখনি উঠে মাগীর সেই দুই পা ধরে সেধেছে, কি অপরাধ হয়েছে? এমন উনি! তা ওদের কথায় কিছু মনে করিস্নে! কে ওরা?

সুষমা বলিল,—না পিশিমা, আমি ত ও-সব কিছুই মনে করি না। ওঁদের খাওয়া-দাওয়া আমি নিজে সব দেখি-শুনি—সাধ্যমত কোন ত্রুটি থাকতে দিইনে ত—মুখ ফুটে নিন্দেও করিনি কোনদিন, তবে কারো মুখে হাসিও দেখলুম না কখনো, এই বড় দুঃখ, পিশিমা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—হাসির বরাত কি ওরা করে এসেছিল মা, যে ওদের মুখে তুই হাসি দেখবি! সব সংসারেই এই রকম গোমড়া-মুখো সাপ দু'একটা আছে। আমাদেরো একটু-আধটু ভুগতে হয়েছিল মা—তোদের বয়সে। তবে এতখানি নয়। যাই হোক্, অভয়কে বল্চি, আমি,—যে বাবা, ছেলে যদি মানুষ করতে চাও ত এ সংসর্গে তাকে রেখো না। অন্য ব্যবস্থা করো। অভয়ের মনেও এজন্যে অশান্তি কি কম! সে থাকতেও এটুকু ছিল, এখনো রয়েছে।

বৈকালে নিখিল খাইতে আসিলে দিদিমা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—তোর মার অসুখ নিখিল, তা তুই তোর মার কাছে দু'দণ্ড বসিস্ না কেন রে?

নিখিল বলিল—সেজঠাকুমা বলছিল, মার অসুখ, মার কাছে গিয়ে মাকে জ্বালাতন করতে বাবা বারণ করেছে—তাই যাই না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—মার জন্যে মন কেমন করে না বুঝি তোর?

নিখিল মুখে কোন জবাব দিল না—দিদিমার কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ একেবারে ছল-ছলিয়া উঠিল।

দিদিমা বলিলেন,—আয় দেখি মার কাছে। মার কত আহ্লাদ হবে'খন।

ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, এই যে নিখিল সুষমা-বেচারীকে সঙ্গ দিয়া তাহাকে একটু সুখে রাখিতে পারে, এটুকুর বিরুদ্ধেও ঐ সব রমণীগুলার কি এ নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র! অথচ কেন—সুষমা কি করিয়াছে? কি অপরাধ? কোন ধনে কাহাকেও সে বঞ্চিত করে নাই—কোন বাদ সাধে নাই ত! নামেই সে সংসারের কর্ত্রী—কিন্তু সকল কর্ত্তৃত্ব ত ইহাদের হাতেই!

নিখিলকে পাইয়া সুষমার খুবই আনন্দ হইল—নিখিলও কতদিন পরে মাকে পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেল। মার বুকে মুখ গুঁজিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে সে ডাকিল—মা,—

—নিখিল, বাবা আমার—বলিয়া সুষমা দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া তাহাতে অজস্র চুমা দিল। সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভুবনেশ্বরী সে দৃশ্য দেখিলেন। তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

সেদিন হইতে নিখিলের ব্যবস্থাগুলা একটু শিথিল হইল। সুষমার শরীর ও মন একটু যদি স্বস্তি পায়—পাক্! মাষ্টার মহাশয়ের কাছে পড়ার সময়টুকু ছাড়া দিনের বাকি সময়টা সে সুষমা ও দিদিমার কাছে গল্পে ও খেলায় কাটাইয়া দিবার অনুমতি পাইল।

১৩

দুই-তিনমাস মন্দ কাটিল না। তারপর একদিন শেষ রাত্রে হঠাৎ সুষমার সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া এক ভীষণ যন্ত্রণা ঠেলিয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল জ্বর দেখা দিল।

ডাক্তারের ভিড়ে বাড়ী ভরিয়া গেল—এবং অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে পাঁচ-সাতদিন কাটাইবার পর সুষমা এক মৃত সন্তান

প্রসব করিয়া একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল।

পাশ-করা নার্শের তদারকে ও ভুবনেশ্বরীর অক্লান্ত সেবায় প্রায় সপ্তাহ-পরে কঙ্কাল-সার দেহখানা নাড়িয়া সুষমা কোনমতে পাশ ফিরিয়া শুইল, পরে জীর্ণ চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি মেলিয়া ক্ষীণ স্বরেই ডাকিল,—পিশিমা—

ভুবনেশ্বরী নিকটে ছিলেন, বলিলেন,—কি মা ?

শীর্ণ অঙ্গুলিগুলি ভুবনেশ্বরীর পায়ের উপর রাখিয়া সুষমা বলিল—কৈ পিশিমা ?

ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, সুষমা কি চাহিতেছে। নার্শকে ইঙ্গিত করিলে নার্শ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

সুষমা ক্ষীণ কণ্ঠে আবার ডাকিল—পিশিমা—

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বুঝেচি মা, কি চাচ্ছ। আগে সেরে ওঠো, তখন দেখ্‌বে।

সুষমা বলিল—না পিশিমা, বল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—ছেলে।

সুষমার মুখে আনন্দের এতটুকু আভাষও দেখা গেল না। সে চুপ করিয়া চক্ষু মুদিল। ভুবনেশ্বরী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—এখন কথা কয়ো না মা, চঞ্চল হয়ো না। ডাক্তার বকবে। আগে সেরে ওঠো—সব পাবে।

ছোট একটী নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা বলিল,—বেঁচে আছে ?

নার্শ বলিল—আছে বৈ কি, বৌদিদি।

সুষমা বলিল,—এত এতেও আছে! কি হবে পিশিমা ?

ভুবনেশ্বরীর চোখে জল আসিয়াছিল—তিনি কিছু বলিলেন না, সজল চক্ষে সুষমার পানে চাহিয়া রহিলেন। সুষমা চোখ বুজিয়াছিল—তাহার চোখের কোণে জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সুষমা ডাকিল,—পিশিমা—

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—কেন মা ?

সুষমা অতি কষ্টে মৃদু স্বরে বলিল—ঠাকুর-দেবতাও কি মিথ্যা হল, পিশিমা? আমি যে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছিলুম গো—

—কি প্রার্থনা, মা ?

—যে, ও যেন মরে !

ভুবনেশ্বরীর দুই চোখে বাণ ডাকিল—আঁচলে চোখের জল মুছিয়া তিনি বলিলেন,—ষাট্, ষাট্—ও কথা বলতে আছে মা ? মা হয়ে সন্তানের সম্বন্ধে—ছি মা—

সুষমা বলিল—না পিশিমা, ওকে মেরে ফেলো—

—সুষু—

সুষমা ব্যস্ত হইয়া বলিল,—সত্যি মেরে ফেলো, পিশিমা। ও আমার নিখিলের শত্রু—তার বিষয়ের ভাগ নেবে, তার সঙ্গে লাঠালাঠি করবে! মেরে ফেলো, ওকে মেরে ফেলো !

—ছি, ছি, চুপ কর—ও সব কি বলছ মা ?

ভুবনেশ্বরী দেখিলেন, সুষমার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

নার্শ বলিল—আপনি ঘুমোন্ দেখি, বৌদিদি—

সুষমা বলিল—না,আগে ওকে মেরে ফেলো—তবে ঘুমোব। মেরে ফেলো। মারবে না ? তবে দাও, আমাকে দাও—বলিয়া সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। ভুবনেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—কাকে আর মারবে মা ? সে কি আছে ? সেই দিনই গেছে সে। হুঁঃ, তেমন বরাতই যদি তোর হবে, মা—

সুষমা বলিল,—এঁ্যা, গেছে ? সে নেই—মারা গেছে ? পিশিমা, সত্যি করে বল।

আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—সে কি বেঁচে এসেছিল, মা, যে যাবে? পেটের মধ্যেই তার সব শেষ হয়েছিল। যে তুমি পাষাণী মা—

—সত্যি, এ সত্যি পিশিমা ?

—হ্যাঁ মা—কেন মিথ্যে করে বলব! মা হয়ে তুমি যখন ঐ প্রার্থনাই করছিলে—

—সাধে করেছিলুম, পিশিমা!···আঃ বাঁচলুম! বলিয়া ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিল।

এমন সময় ডাক্তারকে লইয়া অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিলেন। ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া, বুক দেখিয়া ইংরাজীতে বলিলেন,—Progressing fairly, তবে ভারী সাবধানে রাখতে হবে। কোন রকম excitement না হয়।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—সাবধানে রাখতে হবে বৈ কি। যে ব্যবস্থা বলবেন, তাই করবো।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে সুষমা চমকিয়া আবার এ-পাশ ফিরিয়া অভয়াশঙ্করের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—এবারে আর তুমি রাগ করবে না, আমার উপর ? বল।

অভয়াশঙ্কর কাছে আসিলেন—সুষমার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া তাহার কপালে হাত রাখিলেন; রাখিয়া বলিলেন,—রাগ কেন, সুষমা ?

সুষমা অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল,—রাগ নয় ? নিখিলকে তবে কেড়ে নিয়েছ কেন! যদি ছেলে হয়, ঝগড়া করবে—বলে ? কেমন, বলেছিলুম ত,—প্রার্থনা করচি, সে মরবে। ঠাকুর সে প্রার্থনা শুনেচেন।—আর তুমি রাগ করবে না ? বল। সুষমা ধীরে ধীরে অভয়াশঙ্করের হাতখানি আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল।

অভয়াশঙ্করের বুকের মধ্যে কি একটা বেদনা ঠেলিয়া উঠিতেছিল। স্থির দৃষ্টিতে তিনি তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, মমতায় প্রাণটাও ভরিয়া গেল।

রোগ-শীর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া সুষমা বলিল—আর রাগ করো না, লক্ষ্মীটি। সে গেছে,—আর ত নিখিলের ভয় নেই। তুমিও নিশ্চিন্ত হলে ত! বল, রাগ নেই, আমার উপর ? বল!

অভয়াশঙ্কর কোন জবাব দিলেন না। তাঁহার পলক-হীন চোখ হইতে এক ফোঁটা গরম জল টপ্ করিয়া সুষমার গালের উপর ঝরিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সমালোচনা

গৃহ-শিল্প। বা দরিদ্রের অন্ন-সংস্থান। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। গৃহ-শিল্প প্রচার সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, কাত্যায়নী প্রেসে মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ। মূল্য আট আনা মাত্র। এই গ্রন্থে চরকা, সুতা ও তাঁত,—ইহাদের ব্যবহার, উপযোগিতা প্রভৃতির সম্বন্ধে বেশ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, "বঙ্গদেশে সাত কোটী লোকের বাস। তন্মধ্যে স্ত্রীলোক অর্দ্ধেকের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী হইবে। তথাপি আমরা ৩॥ সাড়ে তিন কোটী বলিয়াই স্ত্রীলোকের সংখ্যার হিসাব রাখিলাম। তন্মধ্যে শিশু, বালিকা, অতি-বৃদ্ধা প্রভৃতির সংখ্যা আড়াই কোটী বাদ দিলেও, এক কোটী স্ত্রীলোকে চরকার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন—তাহা হইলে একজনকে সাত-জনের আবশ্যকীয় সুতা জোগাইতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইবে, কার্য্যকালে একটী লোকের দ্বারা সাতজনের কেন, অন্ততঃ ৭০ জনের সুতা প্রস্তুত হইবে।" আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—তাঁহাদের হাতে সাধারণতঃ পয়সা-কড়ি থাকে না। বিধবা অসহায়া স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই—আত্মীয়-স্বজনের নিকট হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিয়াই অনেককে খাইতে হয়। দরিদ্র পরিবারে স্ত্রীলোকে সুতা কাটিয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন, ও তাহার দ্বারা সংসারে অনেকখানি সচ্ছলতা আনিতে পারেন।

লেস তোলা, জরির পাড় বোনা—এ সবগুলা সৌখীন কাজ,—ইহাতে অর্থেরও প্রয়োজন বেশী। ও-সব কাজের কাছে চরকায় সুতা কাটা ততটা সৌখীন না হইলেও, ইহার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, তাহা আজ দেশের লোকে বুঝিয়াছে। প্রত্যেক গৃহে যদি একটা করিয়াও চরকা চলে, তবে মোটা কাপড়টার সংস্থান সহজেই হইতে পারে। গ্রন্থে সুতায় রং করা ও অন্যান্য গৃহশিল্পের (Cottage industry) কথাও বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি উপাদেয়, তবে একটা জায়গায় লেখকের মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই—লেখক কল-কারখানার যথেষ্ট নিন্দা করিয়া-ছেন। আমাদের মতে, কল-কারখানায় টাকাটা দেশের দরিদ্র সাধারণের মধ্যে আরো বিস্তারিতভাবে ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ মিলে। এ গ্রন্থখানি সকলের পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

স্বরাজে বঙ্গমহিলার কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার গুপ্ত-ভায়া প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, গিরিশ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক দেশের এই দুর্দ্দিনে বঙ্গমহিলা-গণকে সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মীর এই গ্রন্থ পড়িয়া দেখা উচিত।

শ্রাদ্ধতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সঙ্কলিত। কাশীধাম, অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-সমাজরক্ষা মহাসভার পক্ষে শ্রীতারাচরণ শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতি লিমিটেড প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা মাত্র। লেখক বলেন, ইহলোক-বাসীর সহিত পিতৃলোকবাসীর অধ্যাত্ম সম্বন্ধকে সন্নিকট ও ঘনিষ্ঠতর করা কার্য্যকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলে। অনুষ্ঠাতার হৃদয়ের শ্রদ্ধাই হইতেছে, এই ক্রিয়ার প্রধান উপাদান—এই জন্যই ইহাকে বলা হয় শ্রাদ্ধ। শাস্ত্রীয় কথা ছাড়িয়া দিলেও, সেন্টিমেণ্টের দিক দিয়া যখন দেখি, ইহলৌকিক সর্ব্ব-প্রকার সম্পর্কবন্ধন যাঁহাদের সহিত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সহিত একটা মধুর পারলৌকিক সম্বন্ধ বিজড়িত রাখিবার জন্য এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, তখন মন কি এক পবিত্রভাবে ভরিয়া যায়। প্রতি বৎসর মৃত আত্মীয়ের মৃত্যু-তিথিটিতে মৃত ব্যক্তিকে এই যে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা—ইহার মধ্যে কেমন একটি মধুর সান্ত্বনাও নিহিত আছে! এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে পৃথিবীর নানা প্রাচীন-জাতির মধ্যে মৃত আত্মীয়স্বজনকে যে বিভিন্ন উপায়ে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করার প্রথা আছে, তাহা বিবৃত করিয়া লেখক হিন্দুর শ্রাদ্ধানু-ষ্ঠানকে শুধু শাস্ত্রের দিক দিয়া নহে, প্রাণের দিক দিয়া, মনের দিক দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার সে চেষ্টা সফল ও হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২৮ [৫ম সংখ্যা

প্রত্যাবর্ত্তন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মেয়েটির ভাল নাম হিমানী; কিন্তু লোকে তাহাকে হিমু বলিয়াই ডাকে। হিমু সুন্দরী। তাহার সুগৌর সুশ্রী দেহের মধ্যে সব-চেয়ে সুন্দর ছিল, তাহার চোখদুটি। ঘন-কৃষ্ণ, ছবিতে আঁকার মত অতিসূক্ষ্ম ভ্রূর নীচে যে দুটি আলো-করা কালো চোখ ছিল, তেমন চোখ সাধারণতঃ বড় একটা কাহারো চোখে পড়ে না। যদি বা ভাগ্যক্রমে কাহারও পড়িত, সে আর সেই যাদু-করা চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি হইতে নিজের মুগ্ধ দৃষ্টি সহজে ফিরাইয়া আনিতে পারিত না। হিমু বালিকা; সে তাহার সদা-চঞ্চল সদা-সহাস্য চক্ষে যে কতখানি মদিরতা ও মধুরতা মাখানো আছে, তাহার কোন হিসাব রাখিত না। তাই আত্মীয়-অনাত্মীয়, যুবা-বৃদ্ধা সকলকার পানেই অসঙ্কোচে অনায়াসে হাসিয়া চাহিতে তাহার এতটুকু কৃপণতা দেখা যাইত না। পুরুষ-মহলে তাই তাহার খাতির থাকিলেও মেয়ে-মহলে তেমন সুখ্যাতি-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। গ্রাম্য বালিকা-দলে মিশিয়া ইঁচড়ে-পাকা কাঁঠালের মত পাকিয়া উঠিয়া শৈশবেই নিজের স্ত্রীত্ব-বোধের কোন প্রমাণ না দিয়া সে ছেলেদের দলে মিশিয়া ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি, পুকুরে সাঁতার কাটা এবং সর্ব্বোপরি লজ্জার কথা, গাছে চড়িয়া কোথায় পেয়ারায় রং ধরিল, কোথায় আমের গাছে মুকুল টুটিয়া ফল দেখা দিল, কার বাগানের গোলাপজাম ও ফল্‌সা গাছের ফল অধিক মিষ্ট, তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপরতা দেখাইতে সুরু করিল,—ইহাতে তাহাকে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না। এই অকুণ্ঠিত নারীত্ব-বোধ-হীন সারল্য ও শ্রীমণ্ডিত মেয়েটির পানে চাহিয়া প্রথম দর্শনেই অরুণের মনে হইয়াছিল, এ মেয়ে

দেখিবার মত বটে! অবারিত-গতি বন্য-প্রকৃতি এই মেয়েটির সহিত আলাপ করিতেও তাহাকে এতটুকু ক্লেশ পাইতে হইল না। সে নিজেই উপযাচিকা হইয়া প্রথম দিনেই সাধিয়া ভাব করিয়া ফেলিল। তাহার বিশৃঙ্খল বহিগুলিও দড়ির আল্‌নার এলোমেলো কাপড়-জামাগুলি হিমু গুছাইয়া রাখিল; ঘরখানির চারিপাশ তক্তাপোষের নীচে পর্য্যন্ত ঝাঁট দিয়া এক রাশ ধূলা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। কুণ্ঠিত লজ্জায় অরুণ তাহার হাত হইতে ঝাঁটা লইতে গেলে হাত দিয়া তাহাকে নিবারণ করিয়া হাসিয়া সে কহিল, "বা রে! পুরুষমানুষ বুঝি কখনো ঘর ঝাঁট দেয়,আবার! সরো গো মশাই, সরো, ভারী ত জানো তুমি! আমি সব ঠিক করে দিচ্চি।"

স্বল্পভাষী লাজুক অরুণ ইহা লইয়া বেশী বাক্‌বিতণ্ডা করিল না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই অরুণ যখন দেখিতে পাইল, পাড়ার একটি সমবয়সী ছেলের সহিত মিশিয়া পদ্মফুলের লোভে বেলপুকুরের গভীর জলে রাজ-হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া দুইধারে জল ছড়াইয়া পূর্ণ জলে সূর্য্যালোকের হীরক দীপ্তি ফেলিয়া সাঁতার কাটিয়া সে-ই চলিয়াছে, তখন জানলার বহির্দ্দেশ হইতে নিজ বিস্মিত উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল দৃষ্টি ফিরাইয়া আপনার চির-প্রচলিত নিয়মে পাঠ্য পুস্তকে তাহা সংলগ্ন করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না।

মেয়েটি যখন-তখন ঝড়ের মত তাহার ঘরে অনাহূতভাবেই প্রবেশ করিতে লাগিল; আবার বিনানুমতিতে তেমনি করিয়াই সে বাহির হইয়া যাইত। কখনো উৎপাতে-উপদ্রবে তাহার পাঠের ব্যাঘাত ঘটাইত, অনর্গল অপ্রাসঙ্গিক বাজে কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিয়া দিত; আবার কখনো তাহার বই-খাতা গুছাইয়া ঘর ঝাঁট দিয়া কুঁজায় জল ভরিয়া অরুণের শত নিষেধ-মিনতি উপেক্ষা করিয়া তাহার বিছানা রৌদ্রে দিয়া অনেক প্রকারে তাহাকে সাহায্য ও আন্তরিক স্নেহ প্রদর্শন করিত। তীব্র রৌদ্রে বুক যখন শুকাইয়া ফাটিয়া ওঠে, তখন দুই-চারি বিন্দু বৃষ্টিধারা-কেও সে অল্প বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে না। স্নেহ-হীন পরাশ্রিত অরুণের পক্ষে এই যে অযাচিত অপূর্ব্ব স্নেহ,—তৃষাতুরের পক্ষে অমৃত-বিন্দুর মতই তাহা মোহকর। তাহার উদ্দেশ্য-হীন জীবনে সে যেন আবার উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাইতেছিল। ছুটির পর বাড়ী ফিরিবার পথে এখন মনে পড়ে, তাহার জন্য পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিবারও কেহ আছে। অনেক সময়েই তাহার আশা সফল হইত। হাজার খেলার প্রলোভন উপস্থিত থাকিলেও এ সময়টা হিমু কেবল তাহার জন্যই অপেক্ষা করিয়া থাকিত। বাড়ীর অনতিদূরে রায়েদের আম-বাগানের হেলিয়া-পড়া একটা বৃদ্ধ বটের মোটা গুঁড়ির আসনে বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া মৃদু সুরে নূতন শেখা "ওরে পাগল বেরুস্‌নে আজ পথে, রাজা বেরিয়েছেন আজ রথে—" গাহিতে গাহিতে হিমু তাহার কালো চোখের প্রতীক্ষা-ভরা দৃষ্টি পথের পানেই প্রসারিত করিয়া রাখিত। দূর হইতে চোখে চোখে মিলিলে চারি চক্ষে মিষ্ট হাসির আদান-প্রদানের সহিত দুই জনের চক্ষুই যেন বলিয়া উঠিত, "আশা-প্রতীক্ষা পূর্ণ হইয়াছে।" কোনদিন ছুটিয়া গিয়া অরুণের মানা না মানিয়া সে তাহার হাতের বহি-

গুলি কাড়িয়া লইয়া লঘু ত্রস্তগতি হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া চলিয়া যাইত। আবার কোন দিন যেন তাহাকে গ্রাহ্যই নাই, সে যেন কোথাকার কে একজন অপরিচিত পথিক মাত্র, এমনি অনাগ্রহ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে উদাস দৃষ্টিতে আনমনে চাহিয়া কষ্ট-সঞ্চিত এবং বহুক্ষণের যত্ন-রক্ষিত আম্‌ড়া ফল গুলির অম্ল রস-গ্রহণে একান্ত মনোযোগী হইয়া থাকার ভাণ করিত। অরুণ স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতির মানুষ। অবস্থা তাহাকে আরও সংযত ও কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে সহজে কাহারো সহিত মিশিত না, নিজ হইতে অগ্রসর হইয়া কাহারো সহিত আলাপ করিত না। তবু তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে কেহ গর্ব্বিত বলিয়া কোনদিন সন্দেহ করিত না। বিনীত শান্ত যুবকের সকরুণ কুণ্ঠা তাহাকে দূরে ঠেলিয়া না ফেলিয়া মানবের অন্তরের দিকেই আকর্ষণ করিত; তবু এই নির্লিপ্ত লাজুক ছেলেটিও অনেক সময় হিমুর নিকট তাহার সংযমের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইত। মন খুলিয়া ইহার সহিত গল্প করিয়া তাহার বুকের বোঝা সে লঘু করিয়া লইত। মনে হইত, জীবনের সার্থকতা আছে। ইহা শুধুই গর্দ্দভের ভার বহন নহে।

এই দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির নর-নারীর মধ্যে যে কেমন করিয়া এত শীঘ্র এতখানি ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল, তাহা যিনি মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্য নিয়ত সৃষ্টি করিয়াছেন, বুঝি, তিনিই বলিতে পারেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এতদিন এই বাড়ীতে বাস করিয়া দুই বেলা আহারের সময় ব্যতীত অরুণ কখনো বাড়ী ভিতরে যাইত না—যাইবার প্রয়োজনও হইত না। পূর্ব্বে কলসী হইতে জল গড়াইয়া কুশাসনখানি বিছাইয়া লইয়া সে আপনি আহারের স্থান করিয়া লইত। হিমু আসিবার পর এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল, "বা রে—পুরুষ মানুষ বুঝি নিজে নিজে ঠাঁই করে? সরো, সরো, ভারী ত জানো, অমনি করে বুঝি জল আছড়া দিতে হয়—" ঠাঁই করিয়াই রান্নাঘরে খবর হয়, "অরুণ দা এসেচে, ভাত বাড়ো।" ভাত গরম থাকিলে পাখা লইয়া অরুণের পাতের সাম্‌নে সে বাতাস করিতে বসিয়া যায়। অরুণের লজ্জারক্ত বিপন্ন মুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া সাহায্য করিতে গিয়া তাহাকে সে বিপন্ন করিয়াই তুলিত। নির্ব্বোধ বালিকা অরুণের সহিত নিজের পার্থক্যের কথা বুঝিত না,—তাই অনেক সময় অরুণের ব্যবহারের অর্থ না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইত। কখনও রাগ করিত, কখনও অভিমান করিয়া কথা বন্ধ করিত। অরুণ দুঃখিত হইত—কিন্তু সাধিত না। এক বেলা বা এক দিন সহস্র ছুতায়-নাতায় তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, এমনি ভাবে আনাগোনা করিয়াও যখন অরুণের তরফ হইতে মৌন বিষণ্ণ দৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যাইত না, তখন অগত্য দেওয়াল বা বইকে মধ্যস্থ রাখিয়া তাহারই সহিত কথা কহিয়া বালিকা আপনার মান রক্ষা করিত।

হাঁড়িকুড়ি বা পুতুল সাজাইয়া মেয়েলি খেলা তাহার ভাল লাগিত না। তদপেক্ষা দাঙ্গাহাঙ্গামায় পৃষ্ঠ দেওয়াই তাহার লাগিত ভাল। অবিরত ঠাকুরমার কাছে উপদেশ, প্রতিবাসিনীদের তীব্র মন্তব্য এবং মায়ের কঠোর তিরস্কার শুনিয়া শুনিয়া অনেক সময় আপনার অব্যাহত গতিকে সে সংযত করিবার চেষ্টা করিত, আবার কখনো বা বিদ্রোহী ভাবে বাঁকিয়া বসিত—বেশ,এখানে সে থাকিবে না। এ ছাইয়ের দেশ—এর চেয়ে আমাদের বাকুল ঢের ভাল, সেখানে মানুষরা মানুষের এত নিন্দা করিয়া বেড়ায় না।

অরুণ একদিন একখানা প্রথম ভাগ কিনিয়া আনিয়া তাহার লেখা-পড়া শিখিবার কথা তুলিলে প্রথমটা মুখে আঁচল চাপা দিয়া সে খুব এক চোট হাসিয়া লইল, তারপর গম্ভীর হইয়া কহিল, "লেখা-পড়া— মাগো, মেয়েমানুষে বুঝি আবার লেখা-পড়া শেখে ? তাহলে চাক্‌রি কর্‌তেও যায়, পাগড়ী বাঁধে, জুতো পরে ?"

নারীত্বের সম্বন্ধে এতখানি সজাগ সতর্কতা দেখিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহার বিরক্ত বিদ্রোহী চিত্ত বইখানাকে ছুড়িয়া ঐ বেল-পুকুরের জলে নৌকা ভাসাইতে চাহিত। সে প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিত, "কেন বাবু, আমি পড়ব না, পড়্‌ব না—পড়তে পারব না, এই রইল তোমার বই।" বলিয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অরুণ যখন তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া আপনার বই খুলিয়া নোট লিখিতে আরম্ভ করিত, তখন সে একটুখানি অপেক্ষা করিয়া জোর দিয়া পুনরায় বলিত, "শুন্‌চো অরুণ—আমি পড়্‌ব না!" অরুণ লেখা হইতে চোখ না তুলিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন অনাগ্রহ ভাবে "আচ্ছা" বলিয়া কাজ করিয়া যাইত। অগত্যা আবার তাহাকে বসিতে হইত এবং দুর্ব্বোধ্য স্মরণাতীত নিষ্ঠুর অক্ষর-গুলার উপর চোখ রাখিয়া তাহাদের দুর্ব্বোধ্য কর্কশ একঘেয়ে শব্দগুলাকেই মুখস্থ করিতে হইত। অরুণ যদি তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিত, জোর করিয়া বলিত, যে, না, তাহাকে পড়িতেই হইবে, তবে সেই দিনই সে পড়ার দফা রফা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারিত। কিন্তু এই যে মৌন আদেশ, নীরব অভিমান,—ইহার উপর জোর চলে না—ইহাকে লঙ্ঘন করিতে সাহস হয় না, ব্যথা দিতেও পারা যায় না।

এমনি করিয়া যখন প্রথম ভাগ সাঙ্গ হইয়া গেল, তখন দ্বিতীয় ভাগ পড়িতে আর সে কোন আপত্তি করিল না। পাঠের রস-বোধের সুখ অনুভব করিতে শিখিয়া তাহার মনে পুস্তকের গল্পগুলি যেন অভিনব এক নূতন দেশের নূতন আনন্দ আনিয়া দিতে লাগিল! দেখিয়া অরুণ মনে মনে হাসিলেও প্রকাশ্যে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কহিল, "তাইতো মেয়ে মানুষের যে লেখাপড়া শিখ্‌তে নেই, তা ত আমার জানা ছিল না। তবে আর কি হবে? যদু ময়রার মেয়ে কুসিকে সেদিন কলেজ যাবার সময় প্রথম ভাগ পড়তে দেখেছিলুম, না হয় বিকেল বেলা একবার করে তাকেই পড়তে শিখিয়ে আস্‌ব—বইখানা কি নষ্ট হবে!" হিমু অনাগ্রহভাবে "বেশ ত—"বলিয়া চলিয়া গেলে অরুণ আপনার পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিল।

পরদিন সেই দুই পয়সা দামের বিচিত্র চিত্র-শোভিত বর্ণ-শিক্ষাখানির কোন উদ্দেশ

পাওয়া গেল না—দুইদিন উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া ও অরুণের নিকট হইতে সুগভীর মৌনতা-ছাড়া ভৎর্সনা বা ক্রোধ কিছুই যখন পাওয়া গেল না—তখন অপরাধিনী তাহার চুরির মাল বাহির করিয়া দিয়া শান্তভাবে জানাইল যে এইবার সে পড়িতে শিখিবে এবং এমন অপরাধ আর কখনও করিবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এ সর্ত্তও রহিল যে অরুণ "যাকে-তাকে"—অর্থাৎ আর কাহাকেও পড়াইতে পারিবে না। অরুণ হাসিয়া তাহাতেই সম্মতি দিল—শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে আবার সন্ধি স্থাপিত হইল। একান্ত মনোযোগের সহিত অরুণ এই দুর্দ্দান্ত বন্য হরিণীকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ফলে অনেকখানি কৃতকার্য্যও হইল। প্রথম প্রথম এই বাঁধা-ধরা নিয়মের ভিতর বদ্ধ থাকাও দুর্ব্বোধ্য রেখাগুলার চেহারা ও নাম স্মরণ রাখা হিমুর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল—এমন কি, অনেক সময় সে-গুলা যেন বিস্মৃত-প্রায় কোন্ সুদূর স্বপ্নরাজ্যের কাহিনী রাখিয়া তাহার মনে হইত। মা ও দিদিমার মুখে সে রূপকথার অনেক নায়ক-নায়িকার অদ্ভুত ইতিহাস শুনিয়াছিল। তখন ছাপার অক্ষরেও সেই সব অভিনব গল্পাবলীর অপূর্ব্ব রহস্য-পাঠে সে শুধুই মুগ্ধ নয়,পুলকিতও হইত। কল্পনার সাহায্যে নিজেকে সেই সব রূপকথার রাজকন্যাদের আসনে বসাইয়া হীরা-মণি-মাণিক্যে সাজাইয়া পাতাল-পুরীর মাণিক-জ্বালা কক্ষের সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শায়িতার পানে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিত। কখনো মনে হইত, সে যদি সত্যসত্যই কঙ্কাবতী হইয়া যায়,—আর ঝিনুকের নৌকা চড়িয়া ঐ বেলতলার পুকুরে ভাসিতে থাকে! কেমন মজা হয়! মা আসিয়া ডাকিতে থাকে,—

"কঙ্কাবতী মা আমার, ঘরে ফিরে এসো না।
কাঁদিছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর করো না।
ভাত হল কড় কড়, ব্যঞ্জন হইল বাসি।
কঙ্কাবতী মা আমার সাতদিন উপবাসী।"

কঙ্কাবতী-রূপিনী হিমুও অমনি বলে,—

"বড়ই পিপাসা মা,না পারি সহিতে" ইত্যাদি।

কেমন মজা হয়—ভারী চমৎকার খেলা!

আচ্ছা, সে যদি কঙ্কাবতীই হয়, তবে খেতু হইবে কে? ঐ ত মুস্কিল। হিমু ভাবিল, আচ্ছা, অরুণদাদা খেতু হইলে কেমন হয়? দূর! এ মীমাংসা কিন্তু মনঃপূত হইল না। সে কি ভাল হইবে? অরুণদার জাম খাইয়াই না তাহার এমন দশা ঘটিয়াছে! তবে থাক্, খেতুকে আর আনিয়া কাজ নাই। সে তাহার কল্পনার ঝিনুকের নৌকা কূলে ভিড়াইয়া ঝুপ্ করিয়া তীরে নামিয়া পড়াই সদ্‌যুক্তি স্থির করিল। মায়ের কোল ছাড়িয়া বাঘের পিঠে চড়িয়া পাহাড়ের গুপ্ত গুহায় রাজ-অট্টালিকার লোভ করিয়া তাহার কাজ নাই!

হিমুর এই বিদ্যা-শিক্ষায় আনন্দ-লাভের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত, অরুণ। ক্রমে ঠাকুরমার ঝোলা, বেঙ্গমার দেশ, নেকড়ে বাঘ ও শৃগালের রাজ্য পার হইয়া সে এখন রামায়ণ-মহাভারতে আসিয়া পৌঁছাইল। পরীক্ষা দিয়া অরুণ ফলের মুখ চাহিয়া বসিয়াছিল। এ সময় তাহারও সময়ের অভাব ছিল না। তাই পঠন ও পাঠন খুব উৎসাহের সহিতই চলিতেছিল। পাঠে অনুরাগ বাড়িয়াছিল বলিয়া হিমুর যে স্বভাবেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; এই পাঠ লইবার ও দিবার সময় সে অরুণকে

সাধাইয়া বিরক্ত করিয়া তুলিত। আবার সে সত্য বিরক্ত হইলে ক্ষমা চাহিত, কাঁদিয়া অনর্থ বাধাইত। এই অত্যন্ত লঘু-প্রকৃতি মেয়েটিকে অরুণ তাই কোনমতেই পর মনে করিতে পারিত না। মেয়ের আবদার-বায়নার সমাধানে মাকেও অনেক সময় অরুণের প্রতি মনোযোগী হইতে হইত। স্বভাব-গুণে সে সকলেরই স্নেহ আকর্ষণ করিত। তাছাড়া জবরদস্তিতেও অনেক সময় তাহার পাওনার বেশী আদায় করিয়া লইত। মুক্তা ঠাকুরাণী "মেয়ে-ছেলের" এত আহ্লাদেপনা পছন্দ করিতেন না। তাই মালতী দেবীকে সাবধান করিয়া দিতে গিয়া বলিতেন, "রান্নু, ওর আখের নষ্ট করো না,মা—অত আদর দিয়ো না। শেষ পস্তাতে হবে।" মালতী দেবী সজল স্নেহ-ভরা চক্ষে মেয়ের পানে চাহিয়া সুধু ম্লান হাসি হাসিতেন। এই একটুখানি আদর-আবদারের সমাধান করা ছাড়া তাঁহার স্বর্ণ-প্রতিমাকে দিবার মত যে আর কিছুই তাঁহার ছিল না। এটুকুও সে চাহিয়া না পায় কেন? বিধাতা যদি ললাটে উহার দুঃখের ছবিই আঁকিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ত তোলাই আছে,—যে কয়দিন সেটা চোখে না পড়ে, সে কয়দিন তবু চোখ বুজিয়া কাটাইয়া দেওয়ায় ক্ষতি কি!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

শাক্যসিংহের ধর্ম্মের পরিণতি

যখন মানব শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে ও স্বীয় জাতির নিয়তি-নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত ছিল, তখন অতি অমনোযোগী দর্শকও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, পৃথিবীর কোন-কিছুই স্থায়ী নহে; সুউচ্চ বিটপী, সুন্দরতম কুসুম, বলবত্তম পশু, দৃঢ়তম গিরি—সকলই ধ্বংস-প্রবণ; এমন কি মানবও ধূলিসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং সেই ধূলিই তাহার অন্তিম পরিণতি। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা ধাতুর নিরন্তর পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে চন্দ্র নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হইয়াও অপরিবর্ত্তনীয়, উদ্ভিদের সৃষ্টিপ্রবাহ অব্যাহত, আর মানব-জীবন-স্রোতের গতি অবিশ্রাম প্রবহমান।

চিন্তার ধারা এইরূপে বহিতে বহিতে ক্রমশঃ ক্ষিতি অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্বিধ মূল ভূত সম্বন্ধে বিভেদ-জ্ঞান, তাহাদের শাশ্বততার বিষয়ে প্রতীতি ও আত্মার শরীরান্তর গ্রহণ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে। ক্রমে প্রজনন-শক্তিমতী সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতিকে দেবী বলিয়া ধারণা জন্মে। কিন্তু আবার মানব বুঝিতে পারে,তাহারই অন্তর্নিহিত এমন একটা অদৃশ্য শক্তি আছে, যাহা শারীরিক ক্রিয়াসমূহকে চালিত ও সংযমিত করে। এই শক্তির সম্বন্ধে—ইহাকে চৈতন্য প্রাণশক্তি অথবা অন্তরাত্মা যাহাই বলা যাউক—প্রথম প্রথম তাহার এই ধারণা হয়, যেন তাহা প্রকৃতিরই অংশীভূত, কিন্তু পরে তাহা স্বতন্ত্র ও প্রকৃতির অপেক্ষাও বড় বলিয়া পরিগণিত হইল।

পরে সেই শাক্ত ক্রমে পৃথিবীর মূলীভূত আদি কারণ অথবা সৃষ্টির আদিকর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হইল।

খুব সম্ভবতঃ গ্রীসে এবং ভারতে মানবের চিন্তা এই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছিল। কাল-ক্রমে উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আপনাদের দৃঢ়চিত্ততা-গুণে জনসাধারণকে নিজবশে লইয়া আসিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা পরমেশ্বরের মানবীয় বিকাশ, ও অবতার-স্বরূপ বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। মৃত্যুর পরও তাঁহারা দেবযোনি বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিলেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে দুই দেশেই তাঁহারা বীর (hero) শ্রেণীভুক্ত হইয়া পূজা, অর্চ্চনা ও ভক্তির পাত্র হইয়া রহিলেন। শাক্যসিংহের ধর্ম্ম-প্রচারের বহুপূর্ব্বে ক্রকুছন্দ, কনকমুনি ও কাশ্যপের স্মরণ-রক্ষার্থ 'স্তূপ' রচিত হইয়াছিল।

শাক্যসিংহ প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে হজশন সাহেবের মত এই, "Monastic asceticism in morals and philosophical scepticism in religion." প্রাচীনতর দুইটা দর্শন-সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার এই উক্তি বিশেষভাবে প্রযুজ্য। সেই দুটী সম্প্রদায়ের নাম স্বাভাবিক এবং ঐশ্বরিক। নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত পুস্তক হইতে তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। হজশন সাহেব মনে করেন যে, এতন্মধ্যে স্বাভাবিক তত্ত্বই মৌলিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকাশ বিশেষ। কিন্তু স্বাভাবিক ধর্ম্মমত জড়বাদেরই রূপান্তর হওয়াতে কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্য-মতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। এই তত্ত্ব প্রধান অথবা মহাপ্রধানকে মূল প্রকৃতি অর্থাৎ সকল বস্তুর মূল প্রভব বলিয়া ধরা হইয়াছে, এবং মূলপ্রকৃতি হইতেই বুদ্ধির উৎপত্তি। রাজগৃহে ছয়বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শাক্যসিংহ ঠিক এই মতবাদকেই বর্জ্জন করেন। কুশীনারে পরিনির্ব্বাণের সময়ে তিনি ভিক্ষুদিগকে যে অন্তিম অভিভাষণ করিয়াছিলেন, সেই অভিভাষণ স্বাভাবিকগণ-প্রচলিত শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধী। ইহাতে বৌদ্ধত্রয়ীতে বুদ্ধ (Supreme Intelligence 'পরম বুদ্ধি') ধর্ম্মের (material nature বা জড় প্রকৃতি) অগ্রে প্রথম 'রত্ন' স্বরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব শাক্যসিংহ-প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব "বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ" এই ত্রয়ীরই তত্ত্ব।

দার্শনিক এবং transcendentalএর দিক দিয়া বুদ্ধ মানে মন (mind চিৎ), ধর্ম্ম মানে জড়বস্তু (matter 'অচিৎ'), এবং সঙ্ঘ মানে এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অথবা প্রতি-ভাসিক জগতে প্রথমোক্ত বুদ্ধ ও ধর্ম্মের সংযোগ। ব্যবহার ও ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে, বুদ্ধ হইতেছেন এই ধর্ম্মের নশ্বর প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ, ধর্ম্ম তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, ও সঙ্ঘ সেই ধর্ম্মবিশ্বাসী অনুচরগণের একত্র অবস্থান।

সকল বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ভিতর একটা সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে—তাহা নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ। প্রবৃত্তি হইতেছে মানবের অবস্থা; আর নিবৃত্তি হইতেছে দেব অথবা স্বয়ম্ভুর—বুদ্ধই হউক আর ধর্ম্মই হউক—অবস্থা। ঐশ্বরিকগণের মতে পরমেশ্বর আদি বুদ্ধ, শূন্য অথবা গণিতবিদ্‌গণের বিন্দুর মত নিরাকার এবং (নিবৃত্তিতে) যাবতীয় বস্তু হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়াও অনন্তরূপধারী, সমস্ত জগদ্ব্যাপক, এবং (প্রবৃত্তিতে) সমগ্র জগতের

সহিত একীভূত। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার নিবৃত্তিই আকার, কিন্তু সৃষ্টির নিমিত্ত তিনি স্বয়ং ক্রিয়ান্বিত (ক্রিয়া-প্রবৃত্ত—তুঃ এক হইয়া বহু হইবার ইচ্ছা করিতেছি) হইলেন। এবং পঞ্চজ্ঞান ও পঞ্চধ্যান সাহায্যে তিনি পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত পঞ্চ দৈবীবুদ্ধ অথবা পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধের সৃষ্টি করিলেন। যথা—

বুদ্ধ	তন্মাত্র	ইন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয় বিষয়
১। বৈরোচণ	ক্ষিতি	দৃষ্টি	বর্ণ
২। অক্ষোভ্য	অপ্	শ্রবণ	শব্দ
৩। রত্নসম্ভব	তেজ	ঘ্রাণ	গন্ধ
৪। অমিতাভ	মরুৎ	স্বাদ	রস
৫। অমোঘসিদ্ধ	ব্যোম	স্পর্শ	ঘনতা

এই পঞ্চ দৈবীবুদ্ধ পঞ্চধাতু ও তদ্ধর্ম্মের মূর্ত্তি স্বরূপ (Hodgson regards them to be personifications of the active and intellectual powers of Nature).

কানিংহাম সাহেব বলিতেছেন যে বহু বোধিসত্ত্ব, লোকেশ্বর ও বুদ্ধশক্তিদের নাম আমি করিতে চাই না, কেন না আমার ধারণা যে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই; পরন্তু, শাক্যসিংহের ধর্ম্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, পরবর্ত্তী কালে ইঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত হন। এই সময়কার বৌদ্ধগণ শ্রমসাধ্য ধর্ম্মপ্রচার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অবসর-বিনোদনার্থ দর্শনের খুঁটীনাটী লইয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। আর ইহাও আমার ধারণা যে, যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করিতেছিল ও মানব ক্রমশঃ সেইদিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, তখন ব্রাহ্মণেরা এই প্রতিদ্বন্দ্বী বলবত্তর ধর্ম্মের সংঘাত হইতে আত্মরক্ষার্থ বাগ্‌বিন্যাসের একটু ইতর বিশেষ করিয়া উপচীয়মান ধর্ম্মের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইল। বৌদ্ধ দর্শন ও ব্রাহ্মণদের সাংখ্যের ভিতরে যে বহু সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তাহা কেবল পূর্ব্বোক্ত অনুমান সাহায্যেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কোলব্রুকও এই সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে দুই ধর্ম্মের মধ্যে সৌসাদৃশ্য এত বেশী যে একের মতবাদ হইতে অন্যের মতবাদ বাছিয়া দেওয়া শক্ত। বাগ্‌বিন্যাসের তফাৎ হইলেও অন্তর্গত ভাব (idea) একই; সেই জন্য বাহ্যতঃ কোন না কোন পার্থক্য থাকিলেও বস্তুতঃ কোন অনৈক্য ছিল না।

ব্রাহ্মণদের নিরীশ্বরবাদ (কপিলের) ও বৌদ্ধ স্বভাব-তত্ত্বের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই তত্ত্ব অনুসারে বৌদ্ধত্রয়ীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হইতেছেন মহাপ্রজ্ঞা (Hodgson. P. 77) তিনি স্ব-ভব অর্থাৎ নিজ হইতেই উৎপন্ন এবং তাহা হইতেই যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। স্বভাবক ত্রয়ীতে ধর্ম্ম স্ত্রীরূপে বিরাজিত।

ব্রাহ্মণদের সেশ্বর তত্ত্বের সহিত বৌদ্ধদের ঐশ্বরিক তত্ত্বের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। ঈশ্বরকে স্বীকার করে বলিয়া দুই তত্ত্বের নাম ঐরূপ হইয়াছে। বৌদ্ধদের মতে এই ঈশ্বরই বীজ-বুদ্ধি অর্থাৎ আদিবুদ্ধ, যাঁহা দ্বারা যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। এই ঐশ্বরিক ত্রয়ীতে প্রথম স্থান বুদ্ধের ও দ্বিতীয় স্থান স্ত্রীরূপী ধর্ম্মের।

এই স্থানে পঞ্চমানুষী বুদ্ধ পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ পঞ্চ বোধিসত্ত্বের একটা তালিকা দিতেছি :—

মানুষীবুদ্ধ	ধ্যানীবুদ্ধ	ধ্যানী বোধিসত্ত্ব
১। ক্রকুছন্দ	বৈরোচন	সমন্তভদ্র
২। কনকমুনি	অক্ষোভ্য	বজ্রপাণি
৩। কাশ্যপ	রত্নসম্ভব	রত্নপাণি
৪। গৌতম	অমিতাভ	পদ্মপাণি (অবলোকিতেশ্বর)
৫। মৈত্রেয়	অমোঘসিদ্ধ	বিশ্বপাণি

বোধিসত্ত্বদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে অধ্যাপক গুণ্‌ওয়েডেল সাহেব বলিয়াছেন—"যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল, তখন ধর্ম্মান্তর-গ্রহণকারিগণ তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাচীন হিন্দু দেবগণের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে নাই, পরন্তু নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও সেই শ্রদ্ধা প্রকাশের অবকাশ খুঁজিতেছিল। তাহারা দেখিতে পাইল যে বৌদ্ধ ট্রাডিশনের ভিতর ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রভৃতি পূর্ব্বতন ধর্ম্মের অনেক দেবতাই রহিয়াছেন। হীনযান নামক দক্ষিণ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল না, কেবল হিন্দুনামধারী বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও নারায়ণকে গ্রহণ করা হইল। কিন্তু মহাযান সম্প্রদায়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। হিন্দু দেবদেবীগণ তো গৃহীত হইলেনই, অধিকন্তু তাহাদের সৃষ্টি ক্রমান্তর্গত অপ্রমেয় যুগে যুগে তাঁহাদের স্থান করিয়া দেওয়া হইল; অতএব তাঁহারা ঐ তন্ত্রের সবিস্তারে নামমালায় ও পুরাণে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইন্দ্র অথবা শক্র হইলেন শতমন্যু ও বজ্রপাণি এবং তাঁহার স্বর্গের নাম হইল ত্রয়স্ত্রিংশলোক। বৌদ্ধ পুরাণে খ্যাত ব্রহ্মা তাঁহার প্রধান গুণসমূহের জ্ঞানপ্রদীপ, অতিপ্রাকৃত বল মঞ্জুশ্রীকে অর্পণ করিলেন। তখনও সরস্বতী ও লক্ষ্মী তাঁহার পত্নীই রহিলেন। বিষ্ণু অথবা পদ্মনাভের গুণাবলীর সহিত অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির সামঞ্জস্য আছে। বিরূপাক্ষ শিবের একটি বিখ্যাত নাম। সপ্ততথাগত ব্রাহ্মণ সপ্তর্ষির স্থান অধিকার করিলেন। এমন কি গণেশও বাদ গেলেন না; তিনি হইলেন বিনায়ক ও দৈত্য বিনতক (জাপানী বিনয়কিয়া)। বিরূপাক্ষ হইতেছেন পশ্চিমলোক দিক্‌পাল। অর্হৎ মৌদ্গললায়ন মহাস্থান অথবা মহাস্থানে প্রাপ্ত নামধারী বোধিসত্ত্ব হইলেন এবং শৈব ত্রিমূর্ত্তির অনুরূপ এক লৌকিক ত্রিমূর্ত্তি পর্য্যায় বুদ্ধ অমিতাভের বাম পার্শ্বে স্থান অধিকার করিলেন। ঐরূপ মৈত্রেয়েরও স্থান লাভ ঘটিল; শাক্যমুনি ও অবলোকিতেশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া আর একটী বৈকল্পিক ত্রিরত্ন গড়িয়া উঠিল।

হ্যাভেল সাহেব বলেন, বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রোক্ত দেবোৎপত্তি বিবরণ মতে পরমেশ্বর আদিবুদ্ধ (যাঁহার সহিত হিন্দুদের ঈশ্বরের সামঞ্জস্য আছে) এক হইতে বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন। সেই ইচ্ছার নাম প্রজ্ঞা। বুদ্ধ ও প্রজ্ঞা সংযুক্ত হইলেন। সেই ইচ্ছা সঞ্জাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ নামে পাঁচটি দৈব জীব উৎপন্ন হইলেন। এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ আপন আপন হইতে পঞ্চধ্যানী বোধিসত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন। এই বোধিসত্ত্বগণ বিশ্বের বিবর্ত্তন ও সংরক্ষণে স্বীয় স্বীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব দিগের বিষ্ণু যেমন, বৌদ্ধদের অবলোকিতে-

শ্বরও তেমনই; উভয়েই স্রষ্টা ও পাতা। বিষ্ণুর মত অবলোকিতেশ্বর নানা নিদর্শনাত্মক অলঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহার মস্তকে একটি ক্ষুদ্র অমিতাভের মূর্ত্তি আছে। মধ্যাহ্ন সূর্য্য যেমন বিষ্ণুর চিহ্ন, অমিতাভেরও সেইরূপ চিহ্ন।

বুদ্ধদেবের মহিমামণ্ডিত ব্যক্তিত্ব দার্শনিক ভিয়ানে পড়িয়া ক্রমশঃ ধ্যানীবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বে পরিণত হইল। বুদ্ধগণ রূপলোকে বাস করেন বলিয়া খ্যাতি আছে; ধ্যানীবুদ্ধগণ তাঁহাদেরই আধ্যাত্মিক সদ্বস্তু। লোকশিক্ষার্থ যে কোন বুদ্ধ কিয়ৎকালের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই উচ্চতর আধ্যাত্মিক কোনও এক ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিকল্প, কেবল মানুষ-দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। এক মানুষী বুদ্ধের তিরোভাব ও দ্বিতীয় মানুষী বুদ্ধের আবির্ভাবের শতাব্দীতে অবকাশে ধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ একজন মুখ্য ও পরিপালকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বিধায় ধ্যানীবুদ্ধেরা নিজ হইতেই স্বল্পবীর্য্য বোধিসত্ত্বগণের সৃষ্টি আপন হইতে করেন। অবশেষে এই সকল আধ্যাত্মিক আলোচনার ফলে এক পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা আদিবুদ্ধের কল্পনা করা হইল। অতএব কথার মার-পেঁচ ছাড়া মহাযান তন্ত্র ও হিন্দু দেবতা তন্ত্রে বাস্তবিক পক্ষে কোনও ভেদ নাই।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্মভূমি এই ভারত হইতে ইহা লোপ পাইল কেন? ইহার কারণ হইতেছে এই যে, হিন্দুদর্শনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন মতগুলি আর্য্য চিন্তাধারার মুখ্য স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া রহিল—যেমন যমুনা নিজস্রোত গঙ্গার সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। বৌদ্ধদের নীতি (ethics) এখন হিন্দুধর্ম্মশিক্ষার প্রধান উপাদান হইয়া রহিয়াছে এবং এই হিসাবে বুদ্ধের ধর্ম্ম-শক্তি আজিকার ভারতে তেমনই অটুট রাখিয়াছে, যেমন এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়।

Buddhism as a distinct sect disappeared from the land of its birth only because in the general evolution of Hindu philosophy, its doctrines merged into the main current of Aryan thought as the river Jumna is lost when it unites with the waters of the Ganges.

কানিংহাম সাহেব বৌদ্ধধর্ম্মলোপের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর বৌদ্ধধর্ম্মের পতন দ্রুত ও প্রবল হইয়া উঠিল। নূতন নূতন বংশের উদ্ভব হইল, তাহারা শাক্যকে চিনিত না। শিলাদিত্যের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সেস্থানে আসিল দিল্লীর তোমর, কনোজের রাঠোর ও মহোবার চান্দেল বংশ। অষ্টম শতাব্দীতে এই সকল বংশের উদ্ভব হইয়াছিল। তৎপ্রবর্ত্তিত অগণিত মুদ্রা ও খোদিত লিপি তাহাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুগত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। তবুও বৌদ্ধধর্ম্ম সারনাথ, মালব ও গুজরাটে কিছুদিন টিঁকিয়া ছিল। একাদশ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ উপাসকগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ বিতাড়িত হন, যাইবার আগে তাঁহারা মূর্ত্তিগুলিকে লুকাইয়া রাখিবার জন্য সারনাথে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। এখনও রাশি

রাশি ভস্ম ছড়াইয়া রহিয়াছে—তাহা হইতে বুঝা যায় যে অগ্নি সংযোগ করিয়া মঠগুলিকে ধ্বংস করা হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের কারণ হইতেছে এই যে, একটা ছাড়া মুক্তির সকল পথই রুদ্ধ হইয়াছিল। সেই একটা পথও সহজ ছিল না। মঠে প্রবেশ করিয়া এক স্তর হইতে ক্রমোচ্চ স্তরে উঠিয়া তবে মুক্তিলাভ হইত। অতএব অ-সন্ন্যাসী কাহারও মুক্তির আশা দুরাশা ছিল। আদর্শের অত্যুচ্চতা হেতু মুক্তি সাধারণের অনধিগম্য হইয়া উঠিয়াছিল। অটুট বিশ্বাস, নির্দ্দোষ ধর্ম্ম, পরম জ্ঞান—এই সব ব্যতিরেকে সংসারবন্ধন মোচন ও বুদ্ধত্ব লাভ অসম্ভব ছিল। যাঁহারা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন (দীক্ষিত হইয়াছিলেন), তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইত, সংযম ও কষ্টসহিষ্ণুতা সকলের কাছেই আশা করা যাইত,—সেইরূপ নিরন্তর প্রার্থনা ধ্যান ব্যতিরেকে অর্হৎ কিংবা বোধিসত্ত্বের পদলাভ সুদূর-পরাহত হইয়া উঠিত। অতএব একটী ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ না থাকায় সকলকেই—দুর্ভাগ্য-তাড়িত আশাহত ব্যক্তি, স্বামী-উপেক্ষিতা নারী, পুত্র-তাড়িতা বিধবা, ইন্দ্রিয়-সেবাজনিত অবসাদতুষ্ট মানব ও পরম ভক্ত—সকলকেই ঐ এক পথেরই পথিক হইতে হইয়াছিল। তাহার উপর মঠগুলি অগাধ ধন সঞ্চয় করিয়া ধনলোভী রাজা ও ঈর্ষান্বিত প্রজার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাজেই যখন সেগুলি ক্রমশঃ নৃপতিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতে লাগিল—তখন প্রজারা অবিচলিতভাবে সেই তামাসা দেখিতে লাগিল। যে ধর্ম্মাবাসের উপর তাহাদের তিলমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, তাহার রক্ষার জন্য কনিষ্ঠাঙ্গুলিও কেহ উত্তোলন করিল না! বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি যাহা ভারতবর্ষের মত সমগ্র মহাদেশ জুড়িয়া ছিল, তাহা সূর্য্যাস্তের ইন্দ্রধনুর মত নিমেষে লয় প্রাপ্ত হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার Modern Buddhism নামক পুস্তকে অনেকগুলি উড়িয়া ভাষায় লিখিত আপাতমন্য বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন যে, বাস্তবিক তাহা খাঁটী বৈষ্ণব গ্রন্থ নহে, তাহাতে আদিবুদ্ধ প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবগণের উল্লেখ আছে ও উড়িষ্যাতে এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম তথা তদবলম্বী বৌদ্ধগণ বিরাজিত। তাহাদিগকে এক হিসাবে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা যায়। ধর্ম্মপূজাও বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মেরই পূজা।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

---

* [প্রমাণ—১—১০, ১৬-১৭——Cunningham's 'Bhilsa Topes;' ১১—Monier Williams:—Buddhism; ১২—Grunwedell's Buddhist Art in India; ১৩-১৫—Havell's The Ideals of Indian Art; ১৮—N. N. Basu's Modern Buddhism]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জটাবুড়ি

এ ধরারে কর্‌লে ধনী অনেক ধনে,
কর্‌লে ধনী দেহে মনে।
ভোরের হাওয়া চুমোয় মাতায়
তরুণ তরু পাতায় পাতায়,
ভ্রমর মাতে কমল-বনে।

খর্জ্জুরেরই বক্ষ থেকে দিবস ভরে'
মরুর বুকে মধু ক্ষরে।
কুলিশ-কঠিন শিলার দেশে
রসাল এবং বারোমেসে
আঙুর আনার আপেল ধরে।

নিদাঘেরই তিয়াস-তাপের মুখে ধর
বাদল-বারি ঝর ঝর।
পাথর-কুচি বালুর তলে
ফল্গু-ধারা লুকিয়ে চলে
স্বচ্ছ শীতল স্নিগ্ধতর।

বিজন বিলে নাম-না-জানা ফুলের বাসে
কত কথাই মনে আসে!
জলকণাদের লাজুক ভাষা
বুকে তাদের বেঁধে বাসা
দিনের আঁখির আলোয় ভাসে!

* * * *

বিলের ধারে ফল্গুনদীর একটি বাঁকে
থুড় থুড়ো এক বুড়ি থাকে।
চুলগুলো তার ধূলোয় কটা,
রোদ-বাতাসে বেঁধে জটা
জড়িয়ে গেছে পাকে পাকে।

মাথার 'পরে রসে-ভরা বনের ফলে
পাখীদিগের আহার চলে।
আধ-মেলা তার মুখের 'পরে
শুক্‌নো পাতা খসে' পড়ে,
খিদে ডোবে চোখের জলে।

জল-পিপাসায় ফল্গুনদীর চড়ার বালি
দাঁত দেখায়ে হাসে খালি।
পাতার আতপত্র-তলে
মুখটি ঢাকা, বর্ষা জলে
দেহটিরে ধোয়ায় ঢালি'।

বনের পথে প্রণয়ীদের আনাগোনা;
লুকিয়ে কথা যায় যে শোনা।
বুড়ি ডেকে ফাটায় গলা,
শোনে কি কেউ, যায় না বলা,
পাতার আড়াল ঠেসে বোনা।

মায়েরা যায় ছেলে কোলে, গাগর কাঁখে,
বুড়ি কেবল চেয়েই থাকে।
ছেলের মুখে খেয়ে চুমো
কয় তারা, বাপ, ঘুমো ঘুমো,
জুজুবুড়ি পথের বাঁকে!

এম্‌নি করে জুজুবুড়ির দিবস কাটে।
শঙ্খ বাজে পল্লীবাটে।
মন্দিরে হয় রোজই অতি
জাঁক-জমকে দেবারতি,
হাজার উপচারের ঠাটে!

* * * *

তবু মাঝরাতে সুখ উঠে বসে শয্যা ছেড়ে,
ঘুম টুটে দুঃস্বপ্ন হেরে।
জটাবুড়ি ধূলার পরে
ঘুমায় শুয়ে অকাতরে;—
কোলের ছেলে কে নেয় কেড়ে?

প্রণয়ীরা পরস্পরে ভালোবেসে
বুকে টানে প্রেমাশ্লেষে।
পরস্পরের দেহের ভারে
বুকের শুধু ভারই বাড়ে,
রয় না প্রণয় রাত্রিশেষে।

এম্‌নি করে এই পৃথিবীর সকলখানে,
সকল সুরে, সকল গানে,
যেমন করেই যে তারে গায়
ক্রন্দনেরই সুর লেগে যায়
অজানা এক ব্যথার টানে।

কেউ জানে না এই যে ব্যথা, এর বাসা যে
জটাবুড়ির বুকের মাঝে।
দিবস-নিশি অগোচরে
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে,
সবার বুকে বুকে বাজে।

ধরা-রাণীর নয়ন দুটি হয়ে নত
রহে সেথায় নিমেষ-হত।
দেহভরা স্বাস্থ্য-জ্যোতি,
আভরণের হীরে-মোতি,
হৃদয়ে তাঁর বিষম ক্ষত!

* * * *

নিকট-দূরে সব মানুষের চিতে চিতে
বাঁধন জাগে অলক্ষিতে।
বিনি-সুতার মালা হতে
একটি যে ফুল ঝর্‌ল পথে,
শিথিলতা সবগুলিতে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

লছমন ঝোলা

রামতীর্থের আশ্রম হইতে লছমন ঝোলা দেড় মাইল। আশ্রম পার হইয়াই একটি ক্ষুদ্র চড়াই দেখিতে পাইলাম। পার্ব্বত্যপথে চলিতে অনবরত চড়াই ও উৎরাই পার হইয়া যাইতে হয়। আমরা এই প্রথম চড়াই পাইলাম। পরে যে সকল চড়াই দেখিয়াছি, তাহার তুলনায় এ সকল বল্মীক-স্তূপ বলিলেও হয়। দেখিতে দেখিতে লছমন ঝোলার নিকটে আসিয়া পড়িলাম, বামদিকে একটি রাস্তা পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া ঘন বনের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। সেই রাস্তার উপরে একটা কাষ্ঠ ফলকে কালো মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে, "Tehri reserve forest"। তাহার পর একটু নামিলেই লছমন ঝোলা, অতি রমণীয় স্থান; ইহাও একটী পুণ্যতীর্থ। দেশ-বিদেশের শত শত যাত্রী এই তীর্থে স্নান করিতে আইসে। আমরা যখন সেখানে পহুঁছিলাম, তখন যাত্রীর সংখ্যা খুব কমই ছিল; পাঁচ-সাত জনের বেশী হইবে না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহাদের মধ্যে একজন বদ্রীনাথ যাইতেছে। তিনি

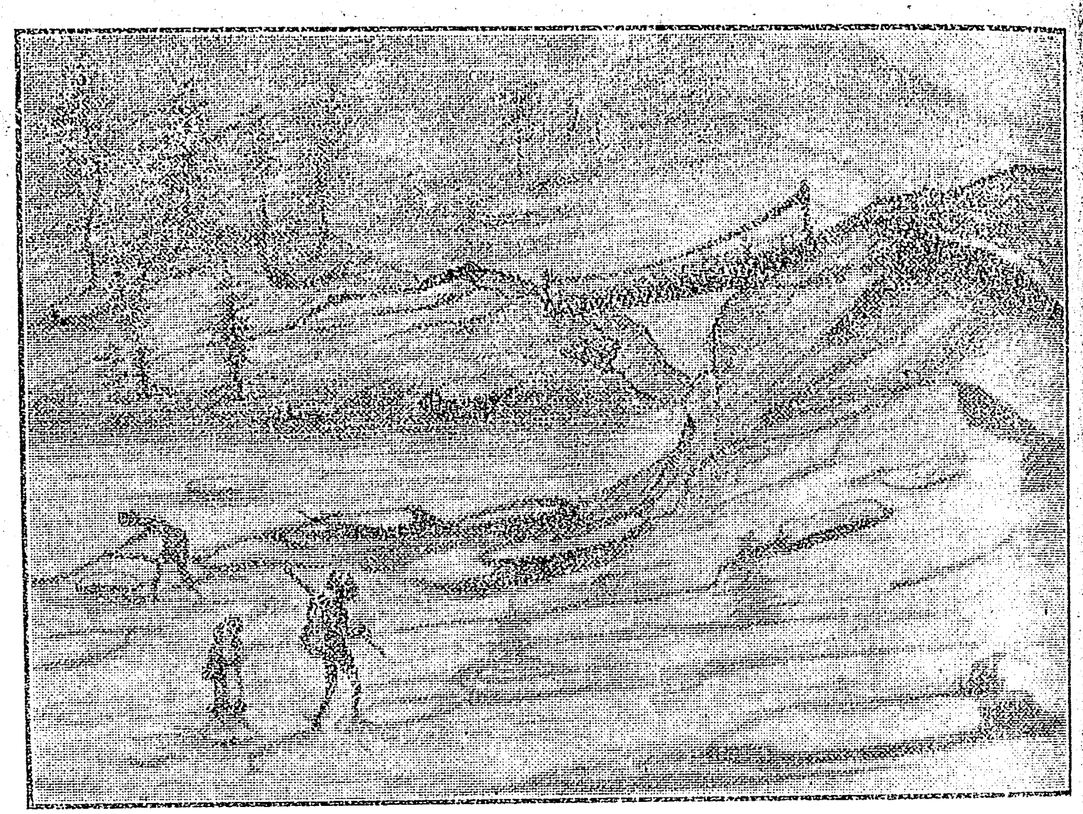

বর্ত্তমান লছমন ঝোলা। (গঙ্গাতীর হইতে)

পদব্রজে যাইতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক বলিয়া মনে হইল। অতি দূর পথ যাইতে হইবে বলিয়া ভদ্রলোক একটি ডাণ্ডী ভাড়া করিয়াছেন। ডাণ্ডী দেখিতে অনেকটা baby-carএর মত। Baby carগুলি একটু ছোট এবং সচক্র, কিন্তু এই ডাণ্ডীরূপ জিনিষটী অপেক্ষাকৃত বড় ও চক্রহীন। চারিজন মানুষে এই যান বহন করিয়া লইয়া যায়। এইরূপ যানের ভাড়া কাণ্ডী বা ঝাঁপানের চেয়ে অনেক বেশী। তীর্থে যাহারা জলের মত অর্থ ছড়াইতে চায়, ডাণ্ডী করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ তাহাদেরই পোষায়।

একটু গিয়াই রাস্তার বামদিকে একটি মন্দির দেখিলাম। এই মন্দিরে লক্ষ্মণজীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি আছে। আমরা স্বার্থশূন্য, ত্যাগী মহাপুরুষের চরণে প্রণাম করিলাম। মন্দিরের নিম্নেই গঙ্গা, মহাকায় পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া পতিত-পাবনী—রম্য তপোবন আভোগ পবিত্র করিয়া ছুটিয়াছে। গঙ্গার চোখ-জুড়ানো ভুবন-ভুলানো রূপটি ভাষায় বলিবার নয়, আঁকিয়া দেখাইবার নয়। এই রকমই কোন স্থানে বসিয়াই শঙ্করাচার্য্য বোধ হয়—

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে!
ত্রিভুবন-তারিণি তরলতরঙ্গে!"

এই ছন্দোময়ী বাণীর মধ্য দিয়া অমৃতের উৎস ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। কবির "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে" জননীর স্বচ্ছ তট-নিকটেই জন্মলাভ করিয়াছিল। সৌন্দর্য্য কোথায় লুকান রহিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। এই পর্ব্বত-গাত্রে উচ্ছ্বাসময়ী গঙ্গার চঞ্চল বক্ষে কোথায় যে এই সৌন্দর্য্যের,

এই মন-মজানো ভুবন-ভুলানো আকর্ষণের বীজটী লুকানো আছে, তাহা বলা যায় না; তাহা মানুষের জ্ঞানের বাহিরে। এইখানে আসিলে মন-প্রাণ সকলই হারাইয়া ফেলিতে হয়; কিন্তু কেন হারাই, কিসে হারাই, তাহা বলিতে পারি না। তীরে আরও দুই-একটি দোকান আছে। এই সকল দোকানে চাল, ডাল, আটা, 'নিমক,' 'ঘিউ' পাওয়া যায়। যাত্রীদের অনেকেই গঙ্গার এই পুণ্য-সলিলে স্নান করিয়া ডাল, চাল, 'নিমক,' ও 'ঘিউ'এর সংযোগে অপূর্ব্ব খাদ্যে পথ-হাঁটা ক্ষুধার শান্তি করিয়া গৃহের পথে ফিরিয়া থাকেন; বদরিকাশ্রমে যাইতে অনেকেই সাহস করেন না।

একটা কিংবদন্তী আছে যে রামানুজ লক্ষ্মণ দড়ির ঝোলার সাহায্যে তরঙ্গময়ী গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। আজকাল যাত্রীদের সুবিধার জন্য তীর্থভক্ত মাড়োয়ারীর অর্থে দড়ির ঝোলার স্থানে কাষ্ঠ ও লৌহ-নির্ম্মিত সেতু রচিত হইয়াছে। আর টলটলায়মান দড়ির ঝোলা হইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইবার ভয় তীর্থযাত্রীর নাই। আগে বোধ হয় লছমন ঝোলার নাম শুনিয়াই তীর্থযাত্রী দূর হইতে বদ্রীনাথকে নমস্কার করিয়া গৃহে ফিরিত। এই রকম দড়ির ঝোলা পার হইয়াও যাঁহারা সেকালে বদ্রীনাথ যাইতেন, তাঁহাদিগকে adventurous বলিলে বোধ হয় ক্ষমার অযোগ্য হইব না।

এই ঝোলা পার হইয়া বদ্রীনাথ-যাত্রীগণ গঙ্গাকে বামে রাখিয়া চলিতে থাকেন। এই স্থান হইতেই সহযাত্রীর সংখ্যা কমিতে থাকে।

জনশ্রুতি আছে যে পরমভক্ত বালক ধ্রুব এইখানে, এই গঙ্গাতীরেই তপস্যা করিয়াছিলেন। এখনও কয়েকটি সাধুর আশ্রম এখানে দেখা যায়। এইস্থান যে তপস্যার পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র তাহা একবার এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেই বুঝা যায়। এখানে যে আসিবে তাহারই প্রাণ গলিয়া যাইবে; সংসারক্লিষ্টচিত্ত ব্যক্তি প্রেমমুখর হইয়া বিভুগুণ গান করিবে। কতবার মনে হইল, সংসারশ্রান্ত অলস দেহকে কোমল বালুকা-রাশির উপর ঢালিয়া দিই। কতবার ধূলার উপর শুইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া গঙ্গার কল কল ধ্বনি শুনিতে লাগিলাম; নিজের কথা, দেশের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা—সব ভুলিয়া গেলাম। পুনঃ পুনঃ বালক ধ্রুবের তপোময়ী মূর্ত্তি মনে হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল। হায় ধ্রুব! হায় তপস্যা! হায় একান্ত নির্ভর! সন্তান-বিরহিনী জননীর স্নেহময় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া অতি শৈশবে জন-মানবশূন্য নিবিড় গিরি-বনস্থলীতে তুমি কাহার জন্য কাঁদিয়াছিলে? হে বীর তাপস! হে গুরু! এই নির্ভর আমাকে শিখাইয়া দাও। আমিও সব ভুলিয়া তোমারই মত "কোথায় হরি! দেখা দাও!" বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াই।

কঠিন প্রাণ হঠাৎ কোমল হইয়া গেল;—সংসারের শত চিন্তায় যাহাকে সর্ব্বদা দূরে দূরে রাখিতাম, আজ সেই চিরচঞ্চল মনের মধ্যে কিসের শান্তি-স্নিগ্ধ স্পর্শ-সুখ অনুভব করিলাম।

ধীরে ধীরে বালুচর হইতে উঠিয়া আশ্রমের দিকে ফিরিলাম। পথের দুই দিকে সারি সারি বন-পাদপ-শোভিত উটজশ্রেণী; বায়ুমণ্ডল সাধুগণের তানলয়সম্বলিত ভজন-গীতির সুরে মুখরিত! বড়ই আনন্দে পথ হাঁটিতে হাঁটিতে আশ্রমে ফিরিলাম। বেলা তখন প্রায় ১০ টা।

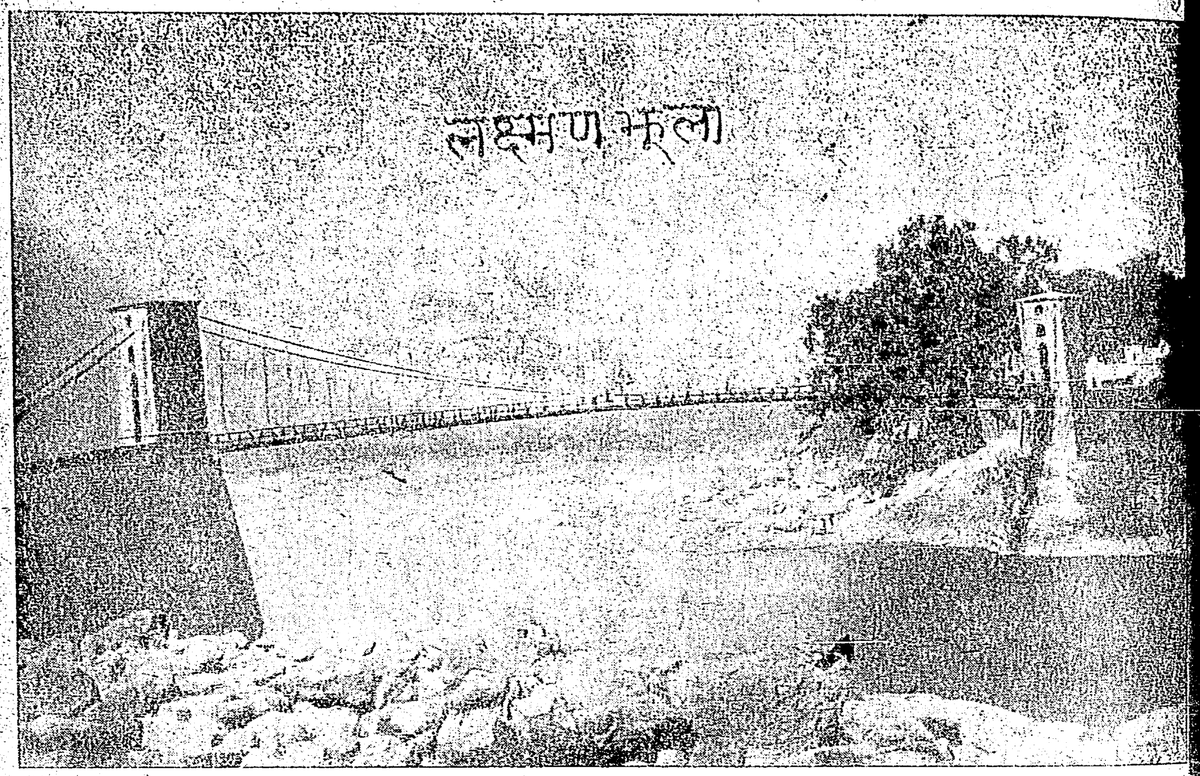

লছমন-ঝোলা

স্বামীজির আদর-যত্নে আমরা ফুলিয়া উঠিয়াছি। সে স্নেহ, সে যত্ন মানুষের নয়। এ যত্নে আমরা ঈশ্বরের করুণা দেখিতে পাইয়াছি। কি মহানুভবতা! শিশুর ন্যায় কি সরলতা! সংসারে এরকম সহৃদয়তা দেখিতে পাই কৈ?

স্বামীজি একখানি বই পড়িতে দিলেন, বইটির নাম, From Poverty to Power, By James Allen; অতি উপাদেয় গ্রন্থ, কতকটা পড়িলাম। চারিদিকে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি, বইএ চোখ দিয়া কি থাকা যায়? যাহা দেখি, তাহাতেই চোখ ভরিয়া যায়, প্রাণ ভরিয়া যায়! দিন বেশ সুখেই কাটিয়া গেল।

আজ ১৮ই মে; আজও স্বামীজির আশ্রমে। এমন আদর আর পাইব কোথায়? আজ আহারাদির পর বদ্রীনাথ রওনা হইব। স্বামীজি সঙ্গে একখানি বই দিলেন (The Path to the Masters of Wisdom), পথে পড়িব বলিয়া। বলিলেন, "পথে বড় শীত, আরও কম্বল লইয়া যাও"—এই বলিয়া ভাল ভাল দুই চারিটা কম্বল বাহির করিয়া দিলেন; যদি পথে টাকার অভাব হয়, তাই টাকাও দিতে আসিলেন। আবশ্যক-মত টাকা ও কম্বল আমাদের সঙ্গে ছিল, আর দরকার হইল না। পথে সকল জায়গায় তেল পাওয়া যাইবে না, তাই ভাল 'পুষ্পল তৈল' বাহির করিয়া দিলেন; চুলে জটা বাঁধিবে, তাই একখানি চিরুণীও দিলেন। নিজে কিন্তু তিনি এ সব ব্যবহার করেন না, নিজের জন্য তাঁর কোন খেয়ালই নাই।

আমাদের জন্য লুচি-তরকারি, নিজের সেই দেড়খানি শুক্‌ন রুটি! সংসারের ঠিক উল্‌টটি। এ কি যত্ন! সমস্ত হৃদয়টা পরের জন্য! এরই নাম সাধুত্ব! আরও কত উপদেশ তিনি দিলেন, পথে এই এই জিনিষ খাইবে; এই এই জিনিষ খাইবে না। শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে; বেশী জল বা বেশী টক (আম টাম)* খাইও না, পেটের অসুখ করিবে,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পিতার স্নেহ, মাতার যত্ন, গুরুর আশীর্ব্বাদ সঙ্গে লইয়া রওনা হইলাম। আশ্রম ছাড়িতে প্রাণ চাহিতেছে না; স্বামীজি বলিলেন, "আমারও দুই-এক দিন একটু ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইবে।" আহারাদির পর স্বামীজির স্নেহের কোল ছাড়িয়া তাঁহার পবিত্র চরণ বন্দনা করিয়া রওনা হইলাম। চোখের কোণে দুই-এক ফোঁটা জলও আসিয়া জমা হইল।

"জয় বদ্রী বিশাল লাল কি জয়"—এই জয়-শব্দে দিগন্ত মুখরিত করিয়া আশ্রম পশ্চাতে রাখিয়া চলিলাম। আশ্রমের একটি লোক শ্রীনগর যাইতেছিল; (শ্রীনগর স্বর্গাশ্রম হইতে ৫।৬ দিনের পথ) তাহাকে ডাকিয়া স্বামীজি বলিয়া দিলেন, "নারায়ণ দত্ত, তুমিও যাচ্ছ, ভালই হ'ল—এঁদের সঙ্গে সঙ্গে যেয়ো, তবু অনেকটা সুবিধা হবে।" দুঃখের বিষয় নারায়ণজি অতি দ্রুতগামী, পথে আর তার সঙ্গসুখ আমাদের অদৃষ্টে ঘটিল না।

আবার সেই লছমন ঝোলা! সেইখানে একটু বসিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। মনটা একটু কেমন কেমন করিতে লাগিল। বাঙ্গালীর মায়ের কোল ছাড়িতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে; একটু যেন কেমনতর হইয়া পড়িলাম। মুখে কথাটী ছিল না! মনের ফটো লইবার উপায় থাকিলে ফটো লইয়া দেখাইতে পারিতাম—সে কি এক অদ্ভুত ভাব, না দুঃখ, না আনন্দ; না শান্তি, না চাঞ্চল্য। স্তব্ধ, নির্ব্বেক, ঔদাস্যময়!

গঙ্গাকে বামে রাখিয়া চলিয়াছি; পথ ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। পাহাড়ের উপরে উপরে রাস্তা। বামে নিম্নেই স্বচ্ছ-সলিলা অনন্তরূপময়ী চঞ্চল-বাহিনী গঙ্গা। কখনও ঘন নিবিড় ছায়ায় সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে; আবার কখনও বা গাছে গাছে পাতায় পাতায়, প্রস্তর-পৃষ্ঠে গঙ্গাজলে সূর্য্যরশ্মি ফলিত হইয়া আলোকের তরঙ্গ ছুটাইয়া দিতেছে। মাঝে মাঝে পথের ধারে কুসুম-কাননে ভ্রমর-গুঞ্জনে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইতেছে, যেন স্বর্গের পথে চলিয়াছি! সমতল ক্ষেত্র আর দেখা যায় না, গঙ্গার দুইকূল চাপিয়া সোজাসুজি পর্ব্বতমালা উঠিয়া গিয়া আকাশ ছুঁইয়াছে। সকলই অভিনব, সকলই রমণীয়, পথ অতি দুর্গম, আবার মধ্যে মধ্যে অল্পাধিক চড়াই, তবুও ক্লান্তি বোধ হইতেছে না। গুরুজি প্রায়ই মন্থরগামী,—ভাবাবেশে কি পথ-পর্য্যটনে

* পথে মাঝে মাঝে কচি আম পাওয়া যাইত; রোদের সময় বড় ভালও লাগিত। পথে এক মালাবার কোষ্টবাসী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গী হইয়া ছিলেন, তিনি বেশ আমের চাটনি তৈয়ার করিতে পারিতেন। তাঁহার কৃপায় পাথুরে মুখটা মাঝে মাঝে একটু সরস করিয়া লইতাম।

অপটুতা-বশতঃ তাহা বলিতে পারি না। নধর নন্দদুলালের মত চেহারা পাহাড়ের সঙ্গে খাপ খাইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে দুই-একটি নবীন যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, আর অম্‌নি সেই জয়-শব্দ—"জয় বদ্রীবিশাল লাল কি জয়" পর্ব্বতে পর্ব্বতে ধ্বনিত হইয়া আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে। মালাবার-কোষ্ট-নিবাসী কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হইল; তাঁরা আমাদের মত ফকিরী চালে বাড়ী হইতে বাহির হন নাই; সংসার-শুদ্ধ মাথায় লইয়া তাঁহারা তীর্থের পথে পা দিয়াছেন—তাঁহাদের বাস্তু দেবতাটিকেও সঙ্গে লইয়াছেন—পথে দেবতাটির পূজাদিও খুব ঘনঘটার সহিত চলিত, প্রসাদে বঞ্চিত হইতাম না। আর যাহাই হউক, তাঁহাদের সঙ্গে পথ-হাঁটায় পান-তামাকের যোগাড়টা বেশ হইয়াছিল। ইঁহাদের কর্ত্তা যিনি, তাঁহার হৃদয়টি স্নেহে পরিপূর্ণ। তাঁর সেই স্নেহের পরিচয় আমরা অনেকবার পাইয়াছিলাম।

লছমন ঝোলা পার হইয়া দেড় মাইল আন্দাজ যাইতেই গরুড়-চটি পাইলাম; চটিটি দেখিতে মন্দ নয়। চটির পাশেই একটি বাগান, তাহাতে কলা, লেবু প্রভৃতি ফলের ও নানারকম ফুলের গাছ হইয়াছে ও সাম্‌নেই দক্ষিণে একটি ঝরণা পাহাড়ের গা দিয়া ঝুর ঝুর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। পাশেই গঙ্গা, সেই অনন্তরূপময়ী অমৃত-বাহিনী—। মনে হইলে বুকের ভিতরটা এখনও কেমন করিয়া উঠে!

মাঝে মাঝে দেখিতে পাইলাম, ধ্রুব-প্রহ্লাদের চেলার মত ছিটেফোঁটা-কাটা ছেলের দল ভক্ত তীর্থ-যাত্রীর অকাতরে দত্ত দুই একটি পয়সা হাতাইবার জন্য গাছের ছায়ায় বসিয়া বদ্রীনাথের স্তুতি-গান করিতেছে। কোথায় বদ্রীনাথ, তার কূল-কিনারা নাই, তবুও তাদের সেই গান শুনিয়া মনে হইল, আর একটু হাঁটিলেই বাবা বদ্রীনাথের পায়ের কাছে গিয়া পড়িব।

লছমন ঝোলা পার লইয়া মৌনা চটি পর্য্যন্ত পথটি প্রায়ই ঘনবনাচ্ছন্ন। যাইতে যাইতে একটু একটু গা ছম্ ছম্ করে। লছমনঝোলার চার মাইল উপরে ফুলবাড়ি চটি। বেলা প্রায় তিনটার সময় এইখানে পহুঁছিলাম। ডাল চাল আটা "নিমক মশালা" ছাড়া এখানে আর কিছুই পাওয়া যায় না। তবে গঙ্গা অতি নিকটে; সেই জলেই স্নান, সেই জলই পান—এইমাত্র সুবিধা; অন্যত্র আবার যাত্রীদের অদৃষ্টে এ সুবিধাটিও ঘটে না। স্থানে স্থানে চটিগুলি পাহাড়ের এত উপরে যে, সেখান হইতে কেবল দর্শনমাত্রই ঘটিয়া থাকে, স্পর্শন কল্পনাতীত, নামিতে ত্রিভুবন টলিয়া যায়। ফুলবাড়ির গঙ্গার ঢেউ বড় বেশী, ঢেউগুলি তালগাছের মত বলিলে তার আর নূতনত্ব থাকে না—পাহাড়ের কোলে পাহাড়ের মত ঢেউগুলি আসিয়া দুই কূল কাঁপাইয়া দিতেছে; ঢেউয়ের মুখে পড়িলে দুই-চারিটা হাতীও সদ্য সদ্য গঙ্গালাভ করিবে!

ইহার দুই মাইল উপরে গুলর চটি নামে চটি, আসলে একখানি অতি জীর্ণ খোড়ো চালা মাত্র; যাইবার সময় সেখানে যাত্রীর নাম-গন্ধও পাইলাম না। দূর হইতে দেখিলাম, আমাদের সেই নারায়ণজী বসিয়া বসিয়া তখনো হুঁকায় টান দিতেছে, তাহার পাশে আর একটা

লোক কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। আমাদের দেখিয়া নমস্কার করিল। আমরা তেমনই চলিয়াছি।

গুলর চটি পার হইয়া একটু যাইতে না যাইতেই আমরা যাহা দেখিলাম, তাহা অতি বিস্ময়কর ও ভয়প্রদ। এক বৃদ্ধা মাড়োয়ারী রমণী তীর্থ-দর্শনের আকুল উৎকণ্ঠায় প্রাণের মায়া ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে; রমণী অতি বৃদ্ধা, হাঁটিতে পারিতেছে না। লাঠির উপর ভর দিয়া—দুই-এক পা চলিতেছে, আবার থামিতেছে; পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, কে জল আনিয়া দিবে? পদে পদে পদস্খলিত, কে পদদ্বয়ে শক্তি-সঞ্চার করিবে? দুর্গম পার্ব্বত্য পথ, চারিদিকে নিবিড় অরণ্যানী, একাকিনী রমণী কিরূপে এই দূর দুর্গম পথ অতিবাহন করিয়া চলিবে? ধন্য প্রভু বদ্রীনারায়ণ! ধন্য তোমার আকর্ষণ! যমরাজের প্রচণ্ড দণ্ড চোখের সাম্‌নে দেখিয়াও বৃদ্ধা পশ্চাৎপদ হইতেছে না; তবুও চলিয়াছে, আকুল আবেগে, উদাস দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া আবার চলিয়াছে। কি অচল বিশ্বাস! এর-চেয়ে আর কি কঠোর তপস্যা থাকিতে পারে? গুরুজির প্রাণ গলিয়া গেল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না—"মা, আমাদের কাঁধের উপর ভর দিয়া চল"—এই বলিয়াই পিতার মত তাহার হাতটি কাঁধের উপর তুলিয়া লইলেন। তবুও কি বৃদ্ধা চলিতে পারে? তাই ত কি করা যায়, উপায় কি? সাত-পাঁচ ভাবিয়া বৃদ্ধাকে পিঠের উপর তুলিয়া লইয়া যাইতে চাহিলে বৃদ্ধা সাহস করিল না। অগত্যা দুইজনে বৃদ্ধার দুইটি হাত কাঁধের উপর রাখিয়া ধীরে

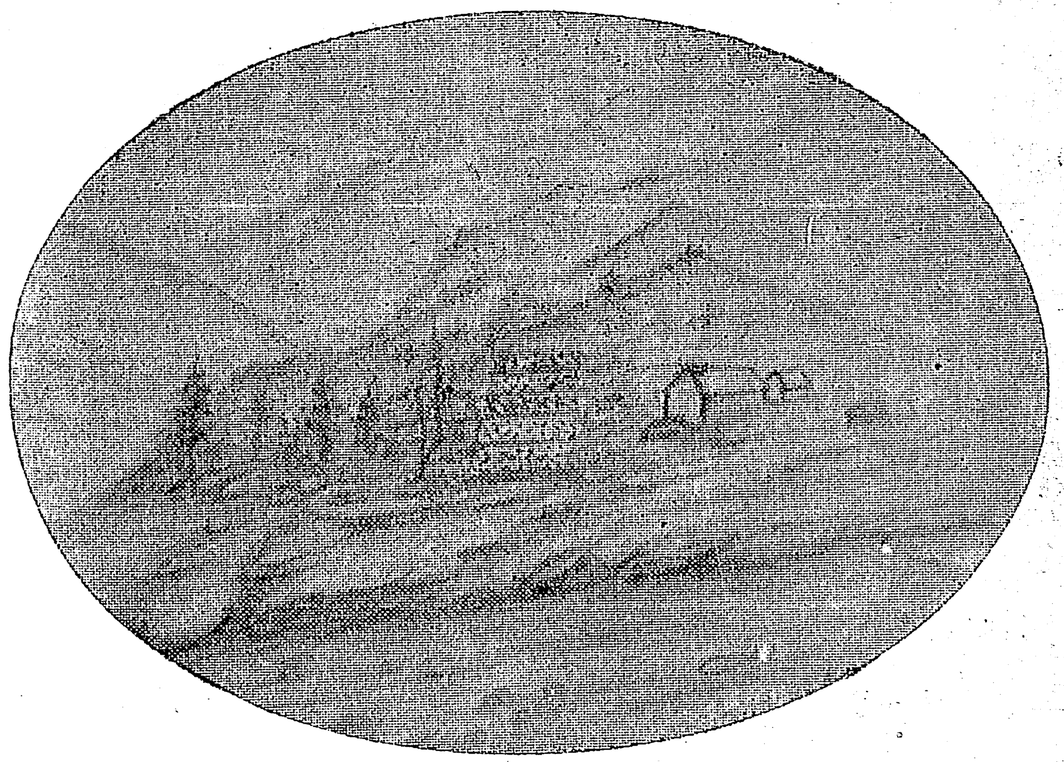

পাহাড়ের উপর ধানের ক্ষেত

ধীরে চলিতে লাগিলাম। মালাবার বন্ধুদের খুঁজিলাম, পাইলাম না, তাঁহারা অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছেন। এ ক্ষুদ্র সাহায্যে কি হইবে? সম্মুখে পথ অনন্ত,বৃদ্ধা সম্পূর্ণ নিঃশক্তি! বৃদ্ধাকে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে বলিয়া আমরা বৃদ্ধার অগ্রগামী সহযাত্রিদের অন্বেষণে ছুটিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, তাহার সহগামীর আনুকূল্যে বৃদ্ধা সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। পথে আমাদের সঙ্গে আর একবার দেখা হইয়াছিল, বৃদ্ধা তখন কাণ্ডীতে।

কাণ্ডী জিনিষটা কি, তাহা বোধ হয় পাঠকগণ কতক বুঝিয়াছেন। একটা খুব-লম্বা ঝুড়ির মত, তাহারই উপর পদব্রজে গমনে অসমর্থ যাত্রী বহুকষ্টে উপবেশন করে, আর সেই মানুষ-শুদ্ধ কাণ্ডিটা পিঠের উপর তুলিয়া লইয়া অতি কষ্টে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে পাহাড়ী কঠোর-প্রাণ দীন কাণ্ডি-ওয়ালা তাহার জীবিকা অর্জ্জন করে।

'ফুলবাড়ি' পার হইয়া আর গঙ্গা দেখিতে পাইলাম না। বরাবর গঙ্গার তটে তটে না গিয়া 'ফুলবাড়ি' পার হইয়াই যাত্রীদিগকে একটু বাঁকিয়া যাইতে হয়। গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখা নির্গত হইয়া আমাদের পথের পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। পাহাড়ের উপর ধানের ক্ষেত দূর হইতে দেখা যাইতেছে। তাহারই মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে এক একটি কুটীর বড়ই সুন্দর। নীরব পর্ব্বত-বক্ষে যেন চাঞ্চল্যের ছবি আঁকিয়া দিয়াছে!

গুলর চটির তিন মাইল উপরে মৌনাচটি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা সেই চটিতে পহুঁছিলাম। চটিগুলি সমস্তই খোড়ো, বারাণ্ডার মত, চারিদিক ফাঁকা, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাতেই কোনরকমে রাত কাটাইতে হয়। এখানে গুড় চিনি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়; চিনিটা তত ভাল নয়, দরও খুব বেশী (একসের ১।০), তাহাতে আবার কি মিশাইয়া দিয়াছে। এখানে অনেকগুলি যাত্রীর সহিত আমাদের দেখা হইল। বৃদ্ধার সহযাত্রীদিগকেও এখানে দেখিলাম; বৃদ্ধাকে আনিবার জন্য তাহারা একটি ঘোড়া ও সঙ্গে লোক পাঠাইয়া দিয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে দুই-চারিজন বাঙ্গালীও ছিলেন। পরে অনেক স্থানেই ইঁহাদের কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইবে।

পথ হাঁটিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; ক্ষুধা বেশ হইয়াছিল। "অবিয়ন্তীর ঠন্‌কার ঘা" ভাত রাঁধিলাম, একেবারে গলা! গুরুজি দেবতার ভোগ দর্শনের মত একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। আমি কি করি? নিজের রান্না কি খারাপ হয়, অতি-কষ্টে দুই-এক গ্রাস গলাধঃকরণ করিলাম।

মালবার দেশবাসী কোন এক ভদ্রলোকের সহিত আমাদের এইখানে দেখা হয়, অতি সুন্দর লোক, তবে দুঃখের বিষয়, তাঁহার সহিত কথা কহিতে মাথার টনক নড়িয়া যায়! তিনি বাঙ্গালা, হিন্দি, ইংরাজী কি সংস্কৃত কোন ভাষাই জানেন না। তবে কাজ চালাইয়া লইবার মত ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অনেক শব্দই তিনি জানেন। ইঙ্গিতাদির দ্বারা অনেক কাজই সারিয়া দেন। তাঁহার সঙ্গে একটি টেঁকঘড়ি ছিল; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,"সময় কত?" অম্‌নি তিনি মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ্যাঁ! time,কালঃ? সময়ঃ?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁর

ঘড়িটিও দেখাইলেন। ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিলাম; তখন তিনি অঙ্গুলি ও ভাষার সাহায্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন;—টু (two) টু (two) (সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলিপ্রদর্শন) অর্দ্ধ অর্দ্ধ (আঙ্গুল মুড়িয়া) half, half—এই ক্রমে তাঁর বক্তব্য তিনি শেষ করিলেন।

আহারাদি যে কেমন হইল, তা আত্মারামই জানেন, তারপর "নিদ্রাতুরানাং কিবা চাষবাড়ি" সেইখানেই কম্বল বিছাইয়া শয়ন ও নিদ্রা। মালাবার-বন্ধুও পাশে শুইয়া।

ইনি কথাবার্ত্তায় প্রায় অনুস্বার ব্যবহার করিতেন এবং "চল বা চলুন" না বলিয়া বলিতেন, "পোঁ পোঁ," এইজন্য আমোদ করিয়া আমরা তাঁর নাম রাখিয়াছিলাম, "ইঙো পোঁ।"

আমাদের সঙ্গে মুটিয়া বা কাণ্ডিওয়ালা ছিল না, কম্বল,গায়ের কাপড়, দুই-একটা জামা মাত্র সঙ্গে, ইহার জন্য আবার পরাধীনতা কেন? আর একটা কথা—ক্লেশ-স্বীকার, তীর্থদর্শনে "আরাম" বর্জ্জনীয়; তাই লোটা-কম্বল স্কন্ধে তুলিয়া পাহাড়ি পথ হাঁটিতে সুরু



অতি কষ্টে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে পাহাড়ী কঠোরপ্রাণ দীন কাণ্ডীওয়ালা তাহার জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

করিয়াছিলাম। কিন্তু পাহাড়ি "চড়াই উতরাই"এর ঠেলা সাম্‌লাইতে পরণের ধুতি-খানিও যে ভারী বোধ হয়, তা ত আর আগে জানিতাম না। জানিলে ক্লেশ-স্বীকারের কথাটিও মুখে আনিতাম না। গুরুজি ত—আর বলিব না—একেই কাতর, তার উপর লোটা-কম্বল! গায়ের ভার লাঘব করিবার জন্য হাতের ধুতিখানি একটি পথিককে ডাকিয়া বিলাইয়া দিলেন। তাই ঘুমাইবার আগেই একটি মুটিয়া ছোকরা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম।

ভোর না হইতেই যে যার আপনার পোটলা-পুটলি বাঁধিয়া কেহ বা স্বয়ং, কেহবা কাণ্ডিওয়ালার মাথায় পর্ব্বত-প্রমাণ লোটা-কম্বলের বোঝা তুলিয়া দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—আমরাও গা মেড়া দিয়া "জয় বদ্রীবিশাললাথ কি জয়" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। স্বামীজি একটি লাঠি দিয়াছিলেন, গুরুজির হাতে সেই "স্বামীজিওয়ালা লাঠি", আর মাথায় পগ্‌গ, সকালবেলা, নূতন তেজ, ঠাণ্ডা হাওয়ায় খুব চলিয়াছেন।

আজ ১৯শে মে সোমবার। সামনেই দুরন্ত চড়াই। পথ বরাবর উঠিয়া গিয়া আকাশ ছুঁইয়াছে; একটি পর্ব্বতের উপর উঠিতে না উঠিতেই সাম্‌নে আর একটি পর্ব্বত, তার পর আর একটি, তার পর আর একটি; পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, ক্রমশঃ উঠিয়াই চলিয়াছি; পথ আর ফুরাইতে চায় না। চড়াইয়ের অ নাই, কোন্ স্বর্গরাজ্য কাড়িয়া লইবার জ চড়াইয়ের পর চড়াই ক্রমশই মাথা ঠেলি উঠিয়াছে। যাত্রিগণ চলিয়াছে ধীরে ধীরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে; যেন সকলে এই নূত চলিতে শিক্ষা করিতেছে।

ধীরি ধীরি পাটি পাটি করিয়া চলিয়াছি যেন কে শিকল দিয়া পা-দুটি বাঁধিয়া ফেলি নীচের দিকে টানিতেছে। বুকের ভিত বর্ষাকালের বিজলী হাওয়া ছুটিয়াছে। যাত্রীর দুই-এক পা যায়, আবার দাঁড়ায়; বন্ধুবর ই পোঁর নিকট এক লোটা জল ছিল, তাই এ এক গণ্ডুষ পান করিয়া সকলে দম রাখিতেছি সকালবেলার ঠাণ্ডা হাওয়াও হার মানি যাইতেছে,ঘামের চোটে পরণের কাপড়টি প ভিজিয়া গিয়াছে। জামা কি আর গা রাখা যায়, চাদরটিও ভারি ঠেকিতেছে। মাথা চুলগুলো কামানো থাকিলে বোধ হয় ক অনেকটা লাঘব হইত। চট্টগ্রামের এ ভদ্রলোক ত রাস্তার উপর শুইয়া পড়ি যোগাড় করিয়াছিলেন। এখনও অনেক প ইহারই মধ্যে এই, না জানি, পরে আরও হইবে! আজ গুরুজির অবস্থা কিছু শোচনী ঈশ্বরের কৃপায় বপুটি ত কম বিপুল নয় পাহাড়ী চড়াই ঠেলা যে কি শক্ত ব্যাপার, এই রকম বপুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মিলিতোনা

২

যে সময়ে দর্শকেরা তুমুল কোলাহল সহকারে রঙ্গভূমি অধিকার করিল—গ্যালারির বাপগুলা ক্রমশ নিবিড় জনতায় কালিমবর্ণ ধারণ করিল, সেই সময়, পিছনের একটা দরজা দিয়া কতকগুলা মল্ল নেপথ্য হইতে বাহির হইয়া প্রবেশ করিল।

চুণ-কাম-করা একটা মস্ত দালান—বিষাদ-ময় ও নগ্ন। কেবল দেয়ালে ঝোলানো মেরী দেবীর ধূমায়িত চিত্র রহিয়াছে—মাতৃদেবীর সম্মুখে ছোট ছোট মোম-বাতির পীতাভ বিকম্পিত শিখা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সকলেরই মনে মৃত্যুর আশঙ্কা; মল্লগণ দেবীর একান্ত ভক্ত ও কুসংস্কারাপন্ন; প্রত্যেকেরই এক-একটা রক্ষাকবচ আছে; সেই রক্ষা-কবচের উপর উহাদের অগাধ বিশ্বাস; কতকগুলি পূর্ব্বসূচনা বা নিমিত্ত দেখিলে উহারা দমিয়া যায়, আবার কতকগুলি দেখিলে সাহস ও ভরসা পায়। উহারা বলে,—কোন্ লড়াই মারাত্মক হইবে তাহা উহারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারে। মাতৃদেবীর সম্মুখে মানৎ করিয়া একটা বাতি পোড়াইলে এই ভাগ্যলিপির সংশোধন হয় এবং বিপদ কাটিয়া যায়। তাই ঐ দিন, ১২টা বাতি জ্বালানো হইয়াছে। আন্দ্রে পূর্ব্বরাত্রে যে গাভীরার ভীষণ প্রচণ্ড ষাঁড়ের কথা ফেলিসিয়ানার নিকট বলিয়াছিল—তাহার সত্যতা ইহা হইতেই সপ্রমাণ হয়। প্রায় বারো জন মল্ল রণাঙ্গনে প্রবেশ করিল। কাচবৎ মসৃণীকৃত ছিট্‌বস্ত্রে পৃষ্ঠ আবৃত। মাতৃদেবীর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সকলেই খুব ঝুঁকিয়া মাথা নোয়াইল। এই কর্ত্তব্যটি শেষ করিয়া, উহারা টেবিলের উপর যে অগ্নিপাত্র ছিল তাহা লইবার জন্য গমন করিল। কাঠের হাতল-যুক্ত এই ক্ষুদ্র পাত্রটি অঙ্গারে ভরা, সিগারেট্-পায়ীদিগের সুবিধার জন্য ইহা টেবিলের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। উহারা সিগারেট্ হইতে ধূম ফুৎকার করিতে করিতে পায়চালি করিতে লাগিল অথবা দেয়াল ঘেঁসিয়া বরাবর যে কাঠের বেঞ্চ রহিয়াছে তাহার উপর গট্ হইয়া বসিল।

উহাদের মধ্যে কেবল একজন পরমারাধ্যা দেবী-চিত্রের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় কোন প্রকার ভক্তির চিহ্ন প্রদর্শন না করিয়া, একান্তে পৃথকভাবে বসিয়াছে এবং পায়ের উপর পা আড়ভাবে রাখিয়া স্নায়ুর উত্তেজনা-বশে ঘনঘন পা দোলাইতেছে। পায়ের রেশমি মোজা চিক্‌চিক্ করিতেছে; হঠাৎ মনে হয় যেন মার্বেলের পা। হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জ্জনী উহার খাটো হাতা-বিহীন চোগার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়াছে এবং তিনভাগ ভস্মীভূত সিগারেট্ ঐ দুই আঙ্গুলে খুব দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে। সিগারেটের আগুন প্রায় আঙ্গুলের মাংসে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কিন্তু ঐ মল্লবীরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। দেখিলে মনে হয় যেন কি এক সর্ব্বগ্রাসী চিন্তায় নিমগ্ন।

লোকটির বয়স ২৫ হইতে ২৮ বৎসরের মধ্যে। মুখের রং রোদে-পোড়া, চক্ষুদ্বয় জেট্-পাথরের মত কালো, চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া। এই সমস্ত লক্ষণে আণ্ডালুজ প্রদেশের লোক বলিয়া বুঝা যায়। সাহসী যুবকবৃন্দের জন্মভূমি সেভিল সহর হইতে নিশ্চয় আসিয়াছে—সেই সব যুবক যাহারা গিতার বাজায়, দুষ্ট অশ্বকে বশে আনে, বন্য বৃষদিগকে বল্লমে বিদ্ধ করে, যাহাদের বাহু লোহার মত শক্ত, যাহাদের হস্ত স্বল্প কারণেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। ওরূপ বলিষ্ঠ শরীর ও সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় দেখা যায় না। দৈহিক বল এমন এক সীমায় আসিয়া থামিয়াছে, যাহার পর দেহ কেবল গুরুভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কি মল্লযুদ্ধ, কি দৌড়ধাপ উভয়ের পক্ষেই শরীর বেশ সুগঠিত। বৃষযুদ্ধের মল্ল তৈয়ারী করিবার জন্যই যেন প্রকৃতিদেবী ইচ্ছা করিয়া তাহার এই শরীর গড়িয়াছেন। তাহার খাটো-হাতা-হীন চোগার খোলা-অংশের ফাঁক হইতে দেখা যাইতেছে—ভিতরকার মাংস-রঙের ফতুয়ায় কতকগুলো চুম্‌কি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

একটা আংটিতে তার গলাবন্দের প্রান্তদ্বয় আট্‌কানো রহিয়াছে—আংটির রত্নটি বেশ দামী বলিয়া মনে হয়; এই বহুমূল্য রত্নের সহিত সমস্ত পরিচ্ছদই তাহার উচ্চবংশ সূচিত করিতেছে।

এই মল্লবীরের নাম জুয়াঙ্কো। একজন সুশ্রী ও সুবেশী নারীবল্লভ যুবকের যাহা হওয়া উচিত—উহার চেহারায় কিন্তু সেরূপ একটা খোলা-খোলা ভাব ছিল না; আসন্ন যুদ্ধের ভয়ে তাহার চিত্তশান্তি কি বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল? এই যুদ্ধে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু জুয়াঙ্কোর মত বলিষ্ঠ নবীন যুবকের চিত্ত কোন বিপদের আশঙ্কায় কখনই আকুল হইতে পারে না।

ও-সব কিছুই নহে! এক বৎসর হইতে জুয়াঙ্কোর এইরূপ মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইছে। উহার সমবিপদভাগী সঙ্গীদের সহিত স্পষ্ট বৈরিতা না থাকুক, উহাদের সহিত মন-খোলাখুলি বা আমোদ-প্রমোদের ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। কেহ যদি উহার সহিত ভাব করিতে অগ্রসর হইত, সে তাহাকে বাধা দিত না—কিন্তু নিজে কাহারও সহিত গায়ে-পড়িয়া বন্ধুত্ব করিত না। যদিও আন্দালুস-প্রদেশের লোক, জুয়াঙ্কো ইচ্ছা করিয়া চুপ্‌চাপ্ করিয়া থাকিত। তথাপি, কখন কখন বিষণ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া জুয়াঙ্কো একটা কৃত্রিম উল্লাসের অসংযত উচ্ছ্বাসের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিত। অন্যসময়ে সচরাচর মিতপায়ী, কিন্তু এই সময়ে অপরিমিত সুরাপানে মত্ত হইয়া শুঁড়িখানায় গোলমাল করিত, তাণ্ডব-নৃত্য করিত, এবং অনর্থক ঝগড়া বাধাইয়া ছোরা চালাইতেও কুণ্ঠিত হইত না; তাহার পর যখন নেশার ঝোঁক চলিয়া যাইত, আবার সে মৌনভাব ধারণ করিত, আবার কি-এক চিন্তায় মগ্ন হইত।

স্থানে স্থানে সমবেত এই সব লোক-মণ্ডলীর মধ্যে, একসঙ্গে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল; প্রেমের কথা হইতেছিল, রাজ-নীতির কথা হইতেছিল—সবচেয়ে বেশী বৃষদের কথা হইতেছিল।

স্পেনীয় ভাষা-সুলভ আড়ম্বরময় শিষ্টাচারের

ভাষায় একজন মল্ল আর একজন মল্লকে সম্বোধন করিয়া বলিল:—"হজুর, মাজপুলের কালো ষাঁড়টার সম্বন্ধে আপনার কি মত? অর্জনা যে বল্‌ছিল, 'ষাঁড়টার নিকট-দৃষ্টি', তা কি সত্যি?"

—"ওর একটা চোখ্ 'নিকট-দৃষ্টি' আর একটা 'দূর-দৃষ্টি'; তার উপর বিশ্বাস করা যায় না।"

—"আর সেই লিজাসোর ষাঁড়টা—যার কালো রং—সে কোন্ দিক্ দিয়ে শিঙের গুঁতো দেবে মনে করেন?"

—"আমি তা বল্‌তে পারি নে; আমি আজে তাকে কখন দেখি নি; তোমার মত কি, জিয়াঙ্কো?"

যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া—সম্মুখস্থ যুবকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়াই জিয়াঙ্কো উত্তর করিল:—"ডান দিকের শিং দিয়ে।"

—"কেন?"

—"কেননা, সে তার ডান্ কানটাই সর্ব্বদা নাড়ায়, এইটেই অব্যর্থ চিহ্ন।"

এই কথা বলিয়া জুয়াঙ্কো, অবশিষ্ট সিগারেট্‌টা ঠোঁটে ধরিয়া একটানে উহাকে ভস্মে পরিণত করিল।

বৃষযুদ্ধের নির্দ্দিষ্ট সময় আসন্ন হইল। জিয়াঙ্কো ছাড়া আর সব মল্লেরাই আসন হইতে উঠিয়া পড়িল; কথাবার্ত্তা একটু ঢিমা হইয়া আসিল—বল্লমধারী আশ্বারোহী-দের বল্লমের আঘাতের চাপা আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল। উহারা একটা প্রাচীরের গায়ে বল্লমের আঘাত করিয়া বল্লমের তীক্ষ্ণ ধারের পরীক্ষা করিতেছিল। রক্ষীরা বাহুর নিম্নভাগের উপর উহাদের রক্তবর্ণ বহির্বাসের ভাঁজগুলা একটু গুছাইয়া রাখিয়া একটু 'ভাবন' করিয়া নয়নাকর্ষকভাবে সারি দিয়া দাঁড়াইল।

একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল; কেননা, রঙ্গস্থানে যে সময়ে মল্লেরা প্রবেশ করে, এই প্রবেশের মুহূর্ত্তটা বড়ই ভীষণ-গম্ভীর, যাহারা চিরহাস্যময় তাহারাও এই সময় বিষণ্ণ হইয়া পড়ে।

সকলের শেষে, জুয়াঙ্কো গাত্রোত্থান করিল; বহির্বাসটা খুলিয়া বেঞ্চের উপর ফেলিয়া রাখিল। তাহার পর তাহার অসি ও অশ্বতরকে লইয়া ঐ বিচিত্রবর্ণ লোক মণ্ডলীর মধ্যে মিশিয়া গেল।

তাহার ললাট হইতে চিন্তা-মেঘ অন্তর্হিত হইল। তাহার চোখ্ দুটা জ্বলিতে লাগিল, প্রসারিত নাসারন্ধ্র দিয়া সজোরে নিশ্বাস বহিতে লাগিল। একটা ঔদ্ধত্যের ভাব সমস্ত মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশেই যেন বুক ফুলাইয়া সদর্পে পদক্ষেপ করিতে লাগিল।

উহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ, উহার পোষাকও তেম্‌নি জাঁকালো।

শেষ তূরীধ্বনি হইয়া গেল; এইবার সময় হইয়াছে। এক্ষণে বল্লমধারী অশ্বা-রোহীগণ, ষাঁড়ের আগমন যাহাতে না দেখিতে পায় এইজন্য তাহাদের অশ্বের ডান চোখের উপর রুমাল নামাইয়া দিয়া, অন্য সহযাত্রীদের সহিত মিলিত হইল এবং শৃঙ্খলার সহিত রণাঙ্গনে প্রবেশ করিল।

যখন জুয়াঙ্কো রাণীর নির্দ্দিষ্ট আসনের

সম্মুখে নতজানু হইল, তখন জুয়াঙ্কোর উদ্দেশে দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে একটা বাহবা-সূচক গুঞ্জন সমুত্থিত হইল। জুয়াঙ্কো যুগপৎ বিনয় ও গর্ব্বসহকারে এমন শোভনভাবে জানু নত করিয়াছিল, যে পুরাতন রাজ-কর্ম্মচারীরা সকলেই একবাক্যে বলিল যে, এরূপ সুচারুভাবে পূর্ব্বতন প্রখ্যাত মল্লেরাও কেহ করিতে পারে নাই। এইসময় একজন সার্কাশের ভাঁড় ঘোড়া ছুটাইয়া আসিল; তার পা রেকাব হইতে বাহির হইয়া পড়ায়, পড়িবার ভয়ে সে ঘোড়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া যেন অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে এইরূপ ভয়ের অভিনয় করিতে লাগিল।

আন্দ্রে যুদ্ধ-ক্রীড়ার এই সব গৌড়চন্দ্রিমার দিকে বড় একটা লক্ষ্য করে নাই। ইতিমধ্যে একটা ষাঁড় শিং দিয়া একটা ঘোড়ার উদর বিদ্ধ করিয়া অন্ত্র বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। তখনও আন্দ্রে সকলের দিকে একবারও চাহিয়া দেখে নাই!

আন্দ্রের পাশে যে তরুণী বসিয়াছিল, আন্দ্রে তাহার দিকেই একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। যদি তরুণী তাহা জানিতে পারিত তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই খুব বাধো-বাধো ঠেকিত—সঙ্কোচ বোধ হইত। তরুণী আন্দ্রের নিকট পূর্ব্বাপেক্ষা আরও চিত্তমোহিনী বলিয়া মনে হইল অনেক সময় স্মৃতির সহিত মানসী মিশিয়া স্মৃতিকে অবাস্তব করিয়া তোলে; তাই প্রেমিক স্বকীয় স্বপ্ন-দৃষ্টাকে বাস্তব জীবনে যখন আবার দেখিতে পায়, তখন অনেক সময় তাহার মোহ ছুটিয়া যায়, ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। এই অপরিচিতার সৌন্দর্য্যকে কল্পনা তিলমাত্রও বাড়াইতে পারে নাই। বস্তুত স্পেনীয় সার্কাসের নীল প্রস্তরের আসন-ধাপের উপর ওরূপ পূর্ণ-আদর্শের রূপসী ইতিপূর্ব্বে কখনই উপবিষ্ট হয় নাই।

যুবক আন্দ্রে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া মনে মনে তরুণীর পার্শ্ব-মুখের তারিফ করিতেছিল। কি সুন্দর মুখের ডৌল; যেন ভাস্কর পরিষ্কার-রূপে পাথর হইতে খুদিয়া বাহির করিয়াছে। পাত্‌লা পাত্‌লা গর্ব্বিত নাসিকা, নাসারন্ধ্র ঝিনুকের ভিতরকার অংশের মত গোলাপী; কপালের পার্শ্বদেশ ভরাট ও পরিপুষ্ট, তাহার উপরে নীল শিরার জাল ঈষৎ দেখা যাইতেছে। ওষ্ঠপুট সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের মত তাজা, সুপক্ক ফলের মত সরস;—আধো-হাসিতে ঈষৎ-উন্মুক্ত, এবং মুক্তার মত দন্তপাঁতি যেন তড়িৎ-প্রভায় উদ্ভাসিত। বিশেষত ঘন-কৃষ্ণপক্ষ্মরাজি-শোভিত দুটি ডাগর চোখের দৃষ্টি তীরের মত মর্ম্মভেদী।

ইহা খাঁটি গ্রীক্ সৌন্দর্য্য, কিন্তু আরব-চরিত্রযোগে যেন আরও একটু পরিমার্জ্জিত—সেই একই বিশুদ্ধতা, কিন্তু উহার সহিত যেন একটু বুনোভাব মিশ্রিত; সেই একই রূপ-মাধুরী, কিন্তু উহাতে যেন একটু নৃশংসতার আমেজ আছে। অমল ধবল ললাটের উপর ধনুকের মত সুবক্র কালো ভ্রূযুগল চিত্রকর যেন তুলি দিয়া সুস্পষ্ট রেখায় আঁকিয়া দিয়াছে। চোখের তারা ভ্রমরকৃষ্ণ; ওষ্ঠপুট সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় টুকটুকে।

তরুণীর ন্যায় বৃদ্ধার দৃষ্টি ক্রীড়াঙ্গনের ঘটনাবলীর প্রতি নিবদ্ধ ছিল না; কুকুর যেমন চোরকে ঘ্রাণের দ্বারা ধরিবার চেষ্টা করে, ও তাহার উপর নজর রাখে, কতকটা সেই ধরণে সে শুধু আন্দ্রের ভাব-সাব আড়চোখে

আড়চোখে লক্ষ্য করিতেছিল। বৃদ্ধার মুখশ্রী কদাকার, ভ্রূকুটি-কুটীল ও অপ্রীতিকর; মুখের বলি-রেখাগুলা খুব গভীর; এবং তার চোখের চারিদিকে চক্রাকারে যে কালো রেখা পড়িয়াছে, তাহা কতকটা পেঁচার চোখের চারিদিককার পালকের ঘেরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার বরাহ-দন্ত তাহার শুষ্ক-কঠিন ওষ্ঠাধরকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছে। তার মুখ-ভ্যাংচানো মুখখানা স্নায়ব স্পন্দনে মুহুর্মুহু সঙ্কুচিত হইতেছে।

আন্দ্রেকে তরুণীর ধ্যানে অবিচলিতভাবে নিমগ্ন দেখিয়া, বৃদ্ধার চাপা কোপ ক্রমশ বর্দ্ধিত হইল; আপন বেঞ্চে বসিয়া একটু ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল; হাতের হাত-পাখাটা নাড়িতে লাগিল, পার্শ্বস্থ তরুণীকে ক্রমাগত কুনুয়ের গুঁতো দিতে লাগিল; এবং উহার দিকে যাহাতে মুখ ফিরাইতে বাধ্য হয় এই উদ্দেশে তাহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু, হয় সে সত্যই বুঝিতে পারিতেছিল না, কিংবা ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিল না,—দুই এক কথার উত্তর দিয়া আবার সে তাহার পূর্ব্বভাব—সেই গম্ভীর মনোযোগের ভাব ধারণ করিল।

আন্দ্রে আপন-মনে অস্ফুটস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিল:—"ডাইনী বুড়িটা জাহান্নমে যাক্!—পুড়িয়ে মার্‌বার প্রথাটা এখনো থাক্‌লে বেশ হ'ত! যে রকম চেহারা, সেকাল হ'লে, ওকে গাধায় চড়িয়ে চৌরাস্তায় নিয়ে দৌড় করাত।"

জুয়াঙ্কোর বৃষবধ করিবার পালা এখনো আসে নাই—রঙ্গাঙ্গনের মধ্যে সে অবজ্ঞার ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—প্রচণ্ড বৃষগুলাকে যেন নিরীহ মেষ মনে করিয়া তাহাদের প্রতি একবারও দৃক্‌পাত করিতেছে না! কিন্তু জুয়াঙ্কো যেই একটু গা নাড়া দিয়াছে, দুই তিন পা পূর্ব্বস্থান হইতে সরিয়া গিয়াছে, অম্‌নি প্রচণ্ড রোষাবিষ্ট বৃষটা গুঁতাইবার ভঙ্গী করিয়া উহার দিকে ছুটিয়া আসিল।

জুয়াঙ্কো তাহার সুন্দর জ্বল্‌জ্বলে কালো চোখের দৃষ্টিতে 'বক্স্'—'গ্যালারি'—'ষ্টল্' প্রভৃতি সকল আসনগুলি পরে-পরে একবার দেখিয়া লইল। ঐ-সব আসনে যেন অসংখ্য প্রজাপতির বিচিত্র রঙের হাতপাখা ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষ-স্পন্দনের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছিল। মনে হয়, জুয়াঙ্কো যেন দর্শক-দিগের মধ্যে কাহাকে খুঁজিতেছে। উহার দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া, অবশেষে যেখানে তরুণী ও বৃদ্ধা বসিয়াছিল, সেই নিম্ন-শ্রেণীর আসনে আসিয়া উপনীত হইল, তখন বিদ্যুতের ন্যায় তাহার শ্যামল মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। এবং সকলের দৃষ্টিগোচর না হয়—এইভাবে একটু মাথা নোয়াইল। রঙ্গপীঠে নটেরা যেরূপ একটু ইঙ্গিতে অভিবাদন করে, কতকটা সেইরূপ।

বৃদ্ধা মৃদুস্বরে বলিল:—

"মিলিতোনা, জুয়াঙ্কো আমাদের দেখ্‌তে পেয়েছে; সাবধান, বেশ ভদ্র হয়ে বোসো। ঐ যুবকটি তোমার পানে প্রেমের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে; আর জান ত জুয়াঙ্কোর কি-রকম সন্দিগ্ধ মন!"

মিলিতোনাও মৃদুস্বরে উত্তর করিল:—"তাতে আমার কি যায় আসে?"

—"তুমি ত জানো, যার উপর ও অসন্তুষ্ট হয়, তার আর রক্ষা থাকে না।"

—"আমি ত ঐ লোকটির দিকে তাকাই

নি। তা ছাড়া, আমার যা ইচ্ছা তা আমি কি করতে পারি নে? আমি কি আমার নিজের প্রভু নই?"

কিন্তু—একবারও আন্দ্রের দিকে তাকায় নাই,—মিলিতোনার এই কথাটি একটি ছোট-খাটো মিথ্যা কথা। তাকাইয়া দেখে নাই বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের তাকাইয়া দেখিবার দরকার হয় না—উহারা এক নজরেই সব দেখিয়া লয়। বর্ণনা করিতে বলিলে, বোধ হয় তরুণী আন্দ্রের শরীরের সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে পারিত।

আমরা সত্য ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি। অতএব সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তরুণীর আন্দ্রেকে একজন সুপুরুষ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তরুণীর সহিত কথাবার্ত্তা সুরু করিবার একটা উপায়-স্বরূপ আন্দ্রে একজন ফল ও মোরব্বা-বিক্রেতাকে ইসারা করিয়া ডাকিল। সে ঐ রঙ্গশালার ডাকা বারান্দায় কমলানেবু, ফলের মোরব্বা, লজেঞ্জিস্ ও অন্যান্য মিষ্টান্ন বিক্রী করিয়া বেড়াইতেছিল। উহারা দর্শকদের মধ্যে রসিক লোক বুঝিয়া ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে আনিয়া ধরে। আন্দ্রের পার্শ্বে একজন পরম রূপসী উপবিষ্টা দেখিয়া, একজন বিক্রেতা উহার কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভাবিল তাহার খাদ্যসামগ্রী ঐখানে অনায়াসেই গতাইতে পারিবে। একটা কাষ্ঠ-দণ্ডের আগায় বসানো মোরব্বার বাক্সো আন্দ্রের নিকট দিল।

আন্দ্রে একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া মোরব্বার খোলা বাক্স তরুণীর সম্মুখে ধরিল—এবং এই কথা বলিল:—

—"আপনার কিছু লজেঞ্জিস্ চাই?"

তরুণী চট্ করিয়া আন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইল এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত আন্দ্রেকে দেখিতে লাগিল।

আন্দ্রে উহাকে আরও প্রলোভিত করিবার জন্য বলিল "নেবুর মোরব্বা, পুদিনার মোরব্বা।"

মিলিতোনা, সহসা মনস্থির করিয়া, তাহার ছোট ছোট আঙুলগুলি বাক্সের মধ্যে দিল এবং একমুঠা লজেঞ্জিস বাহির করিয়া লইল। সেখানকার উপস্থিত একজন লোক গুন্ গুন্ করিয়া বলিল, "ভাগ্যিস্ জুয়াঙ্কোর পীঠ অন্য দিকে ফেরানো আছে—নৈলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হ'ত।"

তাহার পর আন্দ্রে, বৃদ্ধার সম্মুখে বাক্সটা বাড়াইয়া দিয়া, খুব ভদ্রভাবে ও মধুর স্বরে বলিল—"ঠাকরুণ, আপনারও কি কিছু চাই?" তাহার এই দুঃসাহসিক প্রস্তাবে একটু থতমত খাইয়া সব লজেঞ্জিসগুলিই সে উঠাইয়া লইল।

তথাপি, তাহার শুষ্ক হাতের মুঠায় মোরব্বাগুলি লইবার সময় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একবার রঙ্গশালার চরিদিকে চোরা-চাহুনী চাহিয়া লইল। এবং তাহার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল। ঠিক এই মুহূর্ত্তে মৃত্যুর বাজনা বাজিয়া উঠিল।

জুয়াঙ্কোর এইবার বৃষ মারিবার পালা। রাণীর box-এর দিকে অগ্রসর হইয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া বৃষ বধ করিবার অনুমতি চাহিল, এবং একটু জাঁকের ভাবে গাত্রের বহির্বাস খুলিয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল। যে জনতা এতক্ষণ তুমুল কোলাহল করিতেছিল, হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা আসিল।

সকলেই উৎকণ্ঠাসহকারে শেষ-পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যে বৃষকে জুয়াঙ্কো বধ করিবে, সে বৃষটা বড়ই ভীষণ। ঐ বৃষের পরাক্রম সম্বন্ধে সমস্ত খুটিনাটি বিবরণ আমরা পাঠককে বলি নাই—আমরা আন্দ্রে ও মিলিতোনার কথা লইয়াই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। পাঠকগণ আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ৭ টা ঘোড়া অস্ত্রশূন্য ও ছিন্নাঙ্গ হইয়া বালুভূমির উপর স্থানে স্থানে সটান পড়িয়া আছে। দুইজন বল্লমধারী অশ্বারোহী ঘোড়া হইতে পড়িয়া সমস্ত অঙ্গ থেঁৎলিয়া, গিয়াছে উহারা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলায়ন করিয়াছে। বেড়ার নিকটে যে সকল রক্ষী ছিল তাহারা সাবধানে কাঠের রেকাবের উপর পা রাখিয়াছে, তেমন তেমন বিপদ দেখিলে, রেকাবের উপর পায়ের ভর দিয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া পলাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। বিজয়ী পুঙ্গব রণাঙ্গণে সদর্পে মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে। রণাঙ্গণের স্থানে স্থানে রক্তের ডোবা জমিয়া গিয়াছে। রক্তের দাগগুলার উপর ধূলি ছিটাইয়া দিবে—সে ক্ষণ-ভৃত্যদিগের সে সাহসও হইতেছে না। বৃষ প্রমত্ত হইয়া দরজায় শিংএর আঘাত করিতেছে এবং বিচরণ-পথে অশ্বের মৃতদেহ লইয়া শিং দিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে।

জনতার মধ্য হইতে একজন ঐ ভীষণ বৃষটাকে সম্বোধন করিয়া বলিলঃ—"লাফাও দাপাও, দাপাদাপি কর, যাই কর বাছাধন, তোমার একটু পরেই জুয়াঙ্কো তোমাকে ঠাণ্ডা করে দেবে।"

বস্তুতই জুয়াঙ্কো ঐ ভীষণ পশুটার দিকে দৃঢ়পদে ও দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হইল। এইরূপ ভাব দেখিলে বৃষ ত বৃষ, সিংহও পিছু হটিয়া যায়।

আর একজন শত্রুকে অসিতে দেখিয়া বৃষটা বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, একটা চাপা-ধরনে কণ্ঠধ্বনি করিল, মুখ-গলিত লালা ঝাড়িয়া ফেলিল, পায়ের খুর দিয়া মাটি আঁচড়াইতে লাগিল, দুই তিনবার মাথা নোয়াইয়া তাহার পর, কয়েক পদ পিছু হটিল।

জুয়াঙ্কোকে চমৎকার দেখিতে হইয়াছে: অবিচলিত সঙ্কল্প তাহার মুখে প্রকাশ পাইতেছে, চোখে স্থির দৃষ্টি, সাদায়-ঘেরা কালো চোখের তারা জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে—সেই নেত্র-নিস্থত অদৃশ্য কিরণচ্ছটা তীরের মত বৃষকে বিদ্ধ করিতেছে; যে চৌম্বক আকর্ষণী-শক্তি দ্বারা প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রবশকারী ডান্-আম্বুর্গ্ ব্যাঘ্রদিগকে ভয়বিহ্বল করিয়া পিঞ্জরের কোণে বসাইয়া দিত, বৃষটাও অজ্ঞাতসারে যেন সেই আকর্ষণী-শক্তি অনুভব করিতে লাগিল।

জুয়াঙ্কো যেমন এক এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিল, পশুটা তেমনি এক এক পদ পিছাইতে লাগিল।

পাশব বলের উপর নৈতিক বলের এইরূপ জয়লাভ দেখিয়া, লোকেরা উৎসাহে মত্ত হইয়া উঠিল; উন্মত্তের ন্যায় উল্লাসধ্বনি করিতে লাগিল। করতালি, চীৎকারধ্বনি, ভূতলে পদাঘাত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুই শোনা যায় না। কতকগুলি সৌখীন লোক খুব শব্দ করিবার জন্য একরকম্ ঘণ্টা ও ঢোল্ সঙ্গে আনিয়াছিল—তাহাই সজোরে বাজাইতে ছিল।

উপরিস্থ সোপানের উচ্চ আসন সহসা

হইতে যে প্রশংসাধ্বনি হইতেছিল, তাহার তুমুল শব্দে রঙ্গশালার ছাদ যেন ফাটিয়া যাইতেছিল।

জুয়াঙ্কোর উপর অজস্র প্রশংসা বর্ষণ হইতেছে, জুয়াঙ্কোর চোখে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে;—এই সময় এই বাহবা বর্ষণ দেখিয়া মিলিতোনার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে জানিবার জন্য এবং তাহার নিকট হৃদয়ের প্রেমাঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্য জুয়াঙ্কো মিলিতোনার দিকে একবার মাথা তুলিয়া চাহিল।

সময়টা ঠিক্ বাছা হয় নাই। মিলিতোনার হাত হইতে হাতপাখাটা পড়িয়া গিয়াছিল। আন্দ্রে তাড়াতাড়ি ব্যগ্রভাবে উহা কুড়াইয়া দিল। প্রেমিকরা এইরূপ ছোটখাটো জিনিসের সাহায্যে স্বকীয় প্রেমের বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্ট করে। যখন পাখাটা কুড়াইয়া মিলিতোনাকে প্রত্যর্পণ করিল, তখন আন্দ্রের মুখে ও মুখভঙ্গীতে একটা অপূর্ব্ব সন্তোষের ভাব লক্ষিত হইল।

তরুণীও মৃদুমধুর হাসি মুখে বিকাশ করিয়া এবং একটু মাথা নোয়াইয়া আন্দ্রেকে ধন্যবাদ জানাইল। এই মৃদুহাসি জুয়াঙ্কোর নজরে পড়িল! জুয়াঙ্কোর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল,—সে ছোরার হাতলটা খুব কসিয়া ধরিল এবং তাহার অসির মুখ নিচুদিকে ছিল—সেই অসির মুখ দিয়া স্নায়বিক আক্ষেপসহকারে বালুরাশির মধ্যে দুই-চারিটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফেলিল।

জুয়াঙ্কোর মোহিনী দৃষ্টির প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, বৃষটা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে অগ্রসর হইল; জুয়াঙ্কোও সেই সময় আত্মরক্ষণে বিরত ছিল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই ভয়ঙ্কর রূপে কমিয়া আসিল। কয়েক জন লোক বলিয়া উঠিল:—

"বীরপুরুষ বটে, দেখ একটুও ভয় পাচ্চে না!"

আর করেকজন কোমল-প্রকৃতির লোক বলিয়া উঠিল,—"সাবধান হও, সাবধান হও! প্রাণের জুয়াঙ্কো, হৃদয়ের জুয়াঙ্কো, বৃষটা তোমার উপর এসে পড়ল যে! সাবধান হও।"

আর মিলিতোনা—ষাঁড়ের লড়াই দেখিয়া দেখিয়া তাহার হৃদয় একটু অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই হোক্, জুয়াঙ্কোর নিপুণতা ও পরাক্রমের উপর অসীম বিশ্বাস আছে বলিয়াই হোক্, কিংবা জুয়াঙ্কোর সম্বন্ধে তেমন কোন ঔৎসুক্য না-থাকা বশতই হোক্, মিলিতোনার মুখ বেশ প্রশান্ত ও অবিচলিত ছিল—যেন বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। কেবল তাহার গণ্ডস্থল একটু আরক্তিম হইয়াছিল এবং তাহার ওড়নার উত্থান-পতনে, তাহার বক্ষের দ্রুত-স্পন্দন লক্ষিত হইতেছিল।

দর্শকদিগের চীৎকারে জুয়াঙ্কোর জড়তা বিদূরিত হইল। সে চট্ করিয়া একটু পিছু হটিল এবং তাহার বহির্বাসের লাল ভাঁজগুলা বৃষের চোখের সাম্নে নাড়িতে লাগিল।

মিলিতোনা কি বলিতেছে তাহা দেখিবার জন্য তাহার যেরূপ ঔৎসুক্য ছিল, সেই সঙ্গে ঐ মল্লবীরের অন্তরে যোদ্ধৃসুলভ আত্মাভিমানও যুঝাযুঝি করিতেছিল। এই চূড়ান্ত মুহূর্ত্তে, চোখের দৃষ্টি একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই, এক সেকেণ্ডের ভুলচুক্ হইলেই তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে। কি ভয়ানক অবস্থা! জুয়াঙ্কোর মন সন্দিগ্ধ, যাহাকে সে ভালবাসে

সেই রমণীর প্রতি আর একজন আদর-যত্ন দেখাইতেছে; আর সে নিজে এখন সার্কাশের মধ্যস্থলে অবস্থিত, হাজার হাজার লোকের দৃষ্টি তাহার উপর রহিয়াছে। তাহার বক্ষদেশ হইতে ঐ ভীষণ বৃষের শিং এক্ষণে দুই ইঞ্চি মাত্র দূরে; এবং এই যুদ্ধের নিয়মানুসারে, একটা বিশেষ স্থানে, একটা বিশেষ প্রকারে ইহার প্রাণবধ করিতে হইবে। তা না করিতে পারিলে তাহার বিষম অপমান।

রণাঙ্গণে জুয়াঙ্কো আবার স্বকীয় প্রভুত্ব ফিরিয়া পাইল। দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়া, বৃষের মাথা নত করাইবার জন্য, অনেকবার তাহার সম্মুখে ছোরার আস্ফালন করিল।

তাহার এক ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, একথা ভুলিয়া গিয়া জুয়াঙ্কো মনে মনে ভাবিতে লাগিল:—না জানি ঐ অদ্ভুত লোকটা মিলিতোনাকে কি বলিয়াছে যাহা শুনিয়া মিলিতোনা তার দিকে তাকাইয়া এমন মধুর হাসি হাসিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অনিচ্ছাক্রমে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল। জুয়াঙ্কো যেই একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে অমনি বৃষটা এই সুযোগে জুয়াঙ্কোকে তাড়া করিল। জুয়াঙ্কো চট্ করিয়া একটু পিছু হটিল, তাহার পর অন্ধভাবে অগ্রসর হইয়া এলোধাবাড়ি রকমে ছোরার আঘাত করিতে লাগিল। ছোরা বৃষের শরীর কয়েক ইঞ্চি ভেদ করিয়া গেল। কিন্তু সুবিধামত স্থানে না লাগিয়া ছোরাটা একটা হাড়ে ঠেকিয়াছিল। প্রচণ্ড আঘাতে গাঝাড়া দেওয়ায় ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ছুটিয়া পড়িতে লাগিল এবং ছোরাটা হাত হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। জুয়াঙ্কো এখন নিরস্ত্র এবং বৃষটা জীবন-উদ্যমে পূর্ণ। এই আঘাত মারাত্মক না হইয়া বৃষকে বরং আরও রাগাইয়া তুলিল। রক্ষীগণ সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিল, এবং তাহাদের নীল ও সোনালী রং-এর বহির্বাস বৃষের সম্মুখে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

মিলিতোনার মুখ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হইল; বৃদ্ধা, "আহা আহা," "হায় হায়" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এবং গোঙাইয়া গোঙাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

লোকেরা, জুয়াঙ্কোর এই অপ্রত্যাশিত অদক্ষতা লক্ষ্য করিয়া খুব চীৎকার ও কোলাহল করিতে লাগিল—এইরূপ কোলাহল করিতে স্পেনের লোকেরা খুব মজবুৎ। অপমানের কথা, গালাগালি, অভিসম্পাত বর্ষণ হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে সবাই বলিতে লাগিল—"দূর হ', দূর হ'! কুত্তা, চোট্টা, আনাড়ি, কশাই, জল্লাদ! এমন খাসা বৃষ—সব মাটি করে দিলে!

তথাপি জুয়াঙ্কো, এই গালি-বর্ষণের মধ্যে অটলভাবে দাঁড়াইয়া, আপনার ঠোঁট কামড়াইতে লাগিল। ষাঁড়ের শিং-এর আঘাতে জামার হাতা খুলিয়া যাওয়ায়, বাহুর উপর একটা লম্বা বেগ্নী ক্ষত-রেখা দৃষ্টিগোচর হইল। মুহূর্ত্তের জন্য, জুয়াঙ্কো একটু টলিল, মনে হইল মনের প্রচণ্ড আবেগ-বশে বুঝি বেদম হইয়া পড়িয়া যাইবে; কিন্তু জুয়াঙ্কো শীঘ্রই আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল, এবং কি যেন একটা মৎলব আঁটিয়া, ছুটিয়া গিয়া ভূপতিত অসিটা কুড়াইয়া লইল। অসিটা বাঁকিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর পা চাপিয়া সোজা করিয়া লইল। এবং যে স্থানে মিলিতোনা বসিয়াছিল, সেই স্থানের দিকে পীঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

জুয়াঙ্কো একটা ইশারা করিবামাত্র, রক্ষীর দল, তাহাদের লাল কাপড় ষাঁড়ের সম্মুখে নাড়িয়া নাড়িয়া ষাঁড়টাকে জুয়াঙ্কোর সম্মুখে আনিল। এইবার জুয়াঙ্কোর অন্যমনস্ক হইবার আর কোন হেতু না থাকায়, দস্তুরমত নিয়মানুসারে উপর হইতে, নীচু হইতে, পশুটাকে আসির দ্বারা সজোরে আঘাত করিল। আঘাতের বেগে ষাঁড়টা, জুয়াঙ্কোর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল—যেন নতজানু হইয়া বিজয়ীর বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। তার পর, পশুটার সর্ব্বশরীর একবার কাঁপিয়া উঠিল, এবং চার পা আকাশে তুলিয়া ভূতলে গড়াইয়া পড়িল।

আন্দ্রে উৎসাহে মাতিয়া উঠিল, পার্শ্ব-সহচরীকে বলিল: "জুয়াঙ্কো এইবার খুব প্রতিশোধ নিয়েছে! কি চমৎকার অসির আঘাত! পুরানো ওস্তাদেরাও এমন সুন্দর রকম আঘাত কখনই করতে পারেনি, এবিষয়ে শ্রীমতীর মত কি?"

"মিলিতোনা, প্রায় ঠোঁট্ না খুলিয়া ও মাথা না ফিরাইয়াই খুব তাড়াতাড়ি বলিল:— "আপনাকে অনুনয় কচ্চি, মশায় আমার সঙ্গে একটি কথাও কবেন না" এই কথাগুলি এরূপ আদেশেব ভাবে ও সেই সঙ্গে এরূপ অনুনয়ের স্বরে বলা হইয়াছিল যে, আন্দ্রে বেশ বুঝিল, ইহার মধ্যে তরুণীর কোন চাতুরী নাই।

লজ্জাশীলতার দরুণ তরুণী যে এই কথাগুলি বলিয়াছিল তাহা নহে। কেননা আন্দ্রের কথাবার্ত্তায় এমন কিছুই ছিল না যাহাতে লজ্জা পাইতে হয়। মাদ্রিদের এই শ্রমজীবী শ্রেণীর রমণীরা স্বভাবতই আমুদে লোক, উহার একটুতেই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইবে এরূপ মনে হয় না। মিলিতোনার ঐ কথাগুলির মধ্যে বাস্তবিকই যে একটা বিভীষিকা ছিল—একটা বিপদের আশঙ্কা ছিল, তাহা আন্দ্রে অনুমান করিতে পারে নাই—মিলিতোনাকে লইয়াই যে এই বিপদ তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

আন্দ্রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিল:—ইনি কি একজন ছদ্মবেশী রাজকুমারী? আমি যদি এখন চুপ্ করিয়া থাকি তাহা হইলে আমাকে উনি নিতান্ত বোকা বা অরসিক ভাবিতে পারেন। আর যদি না-ছোড়বান্দা হইয়া কথা কহি তাহা হইলে, হয়তো এই তরুণীকে কোন এক অভাবনীয় বিপদে ফেলা হইবে; হয় তো একটা অপ্রীতিকর হাঙ্গামা উপস্থিত হইবে। তবে কি, বুড়ীর ভয়ে এই কথা বলিলেন,—না; কেননা, বুড়ীটা ত আমার প্রদত্ত সমস্ত লাজেঞ্জিসই উদরস্থ করিয়াছে; ঐ ব্যাপারে বুড়ীরও ত একটু যোগ-সাজোস্ ছিল—তরুণী ওর ভয়ে কখনই ভীত হয় নাই। কোন বাপ, কোন ভাই, কোন স্বামী, কোন সন্দিগ্ধচিত্ত প্রেমিক কি এখানে কেউ আছে?" মিলিতোনা যে সকল লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, তাহার মধ্যে এ শ্রেণীর কোন লোক থাকা সম্ভব নহে। উহাদের মুখে স্নেহ-মমতার কোন লক্ষণ নাই; মুখ একেবারে ভাবহীন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মিলিতোনার সহিত উহাদের কোন সম্পর্কই নাই।

লড়াইএর শেষ পর্য্যন্ত জুয়াঙ্কো দর্শক-দিগের আসনের দিকে আর দৃষ্টিপাত করে নাই—পর-পর দুই দুইটা প্রচণ্ড বৃষকে

নসদনে পাঠাইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন দর্শকবৃন্দ ধ্বনি দিয়াছিল, এখন আবার সকলে উচ্চৈস্বরে জুয়াঙ্কোর স্তুতিবাদ করিতে লাগিল।

আন্দ্রেকে কথা কহিতে নিষেধ করিবার পর আন্দ্রে একটি কথাও আর বলে নাই। এমন কি বৃষযুদ্ধ শেষ হইবার একটু পূর্ব্বেই আসন হইতে উঠিয়া পড়িল।

আন্দ্রে সোপান-ধাপ দিয়া নামিবার সময় একটি বুদ্ধিমান ও চালাকচতুর ছোক্‌রাকে মৃদু স্বরে দুই চারিটা কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

দর্শকবৃন্দ সবাই প্রস্থান করিলে, জনতার মধ্য দিয়া ঐ ছোক্‌রাটি মিলিতোনা ও বৃদ্ধার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। সে দুজনকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া লোক-প্রিয় একটা ষাঁড়ের গান গাইতে গাইতে, গাড়ীর পিছনে কোনপ্রকারে ঝুলিয়া রহিল।

গাড়ী ধূলাজাল উড়াইয়া সশব্দে ছুটিয়া চলিল।

আন্দ্রের সম্মুখ দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। আন্দ্রে মনে মনে করিল, সেই মার্কিসের বাড়ীতে যুগলবন্ধ গানটা গাহিয়াই সে ঐ রূপসীর ঠিকানা জানিয়া লইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধিয়া*

ইংরাজীতে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেক লেখা হইয়াছে, ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণও প্রচুর আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লইয়া ইংরাজীতে এত বই লিখিত হইয়াছে যে, তত বই ভারতবর্ষে কোন একটি প্রাদেশিক ভাষাতে দূরের কথা, সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাতেও আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং ইংরেজের নিকট আমাদের এ-দিককার ঋণ অপরিশোধ্য। কারণ বিদেশী ভাষা শিখিয়া বিদেশের ইতিহাস রচনা করা একেবারে অনায়াস-সাধ্য নহে, বিশেষতঃ যদি সে দেশে ঐতিহাসিক উপাদানের প্রাচুর্য্য না থাকে। বহু ইংরেজ মনীষী ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় যে নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা ভারতবর্ষে ত নিতান্ত সুলভ নহেই, ভারতের বাহিরে অন্য দেশেও একান্ত বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট এলফিন্‌ষ্টোন ভারতবর্ষের বড় লাটের পদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রত্যা-খ্যান করিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় সময়াভাব হইবে বলিয়া। স্যর উইলিয়ম জোন্স কত অসুবিধার মধ্যে কত কর্ম্ম করিয়া সংস্কৃত শিখিয়া ছিলেন তাহা কোন শিক্ষিত বাঙ্গালীর অবিদিত নাই। পাঠের ব্যাঘাত হয় বলিয়া ম্যাক্‌কলিক উচ্চ বেতনের সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া ১৫বৎসর কাল এদেশে থাকিয়া

* Sindhia otherwise called Madhoji Patel By H. G. Keene. C. I. E. M. A.

শিখ জ্ঞানীদিগের সহিত একত্র মিশিয়া শিখ-দিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার এই যুগাধিক কাল-ব্যাপী একাগ্র সাধনার ফল শিখ-ধর্ম্মের ইতিহাস। কানিংহ্যাম শিখজাতির অপক্ষপাত ইতিহাস রচনা করিবার জন্য প্রাণ-পাত করিয়া ছিলেন বলিলেও অন্যায় হইবে না, কারণ ম্যালিসনের মতে 'সম্পূর্ণ সত্য' বলার অপরাধে কানিংহ্যাম ডালহৌসির বিরাগ-ভাজন হন ও ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। আজকাল ছোট ছোট ছেলেদের পাঠ্য পুস্তকেও অশোক-অনুশাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে। এই অশোক অনুশাসনের উদ্দেশ্য ও বিষয় আজ একেবারেই অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত, যদি পণ্ডিত-প্রবর প্রিন্সেপ ইহার পাঠ-প্রণালী আবিষ্কার না করিতেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে মারাঠা বীর শিবাজীর জীবন-কথা সম্বন্ধে পাঁচখানি ইংরাজী বই প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে দুইখানি ইংরেজের, দুইখানি বাঙ্গালীর, ও মাত্র একখানি একজন মারাঠা কর্ত্তৃক লিখিত। তালিকা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই কথা বলিলেই চলিবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচনায় ইংরেজ আমাদের পথ-প্রদর্শক;—রাজনীতির জগতে তাহার সহিত আমাদের যে সম্পর্ক হউক না কেন। বিদ্যার ক্ষেত্রে তাহার সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করা আমাদের চলিবে না।

কিন্তু ইংরেজের নিকট বিদ্যার ঋণ অস্বীকার করা যেমন অন্যায় হইবে, চির-কাল দেশের ইতিহাস-রচনার ভার ইংরেজের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে থাকাও সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা অনেক বেশী অন্যায় হইবে। একটা জাতিকে বুঝিতে চাহিলে সহানুভূতি বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু কেবল সহানুভূতি দ্বারা একটি বিদেশী জাতির সামাজিক রীতি নীতির মর্ম্ম ও প্রকৃতির বিশেষত্ব নির্ণয় ক সহজ-সাধ্য নহে। যাহা আমাদের অ মজ্জাগত, ইংরেজের হয়ত তাহা গৌ গবেষণার বিষয়মাত্র। সুতরাং ভারতব ইতিহাস-রচনার ভার ভারতবাসীকেই এ করিতে হইবে। সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা বক্তৃতা প্রদান কালে বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ প ডাক্তার টমাসও এই কথাটি বেশ স্পষ্ট ক বলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার প বাধা-বিঘ্ন অনেক। ইহাতে যে এ সাধনার প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে তা দৃষ্টান্ত কোথায়? যে শিক্ষকেরা বা ছাত্রের প্রাণে এই প্রেরণা জাগাইয়া দি তাঁহারাই বা কোথায়? যে পাঠ্য পু তাহাদের মনেও অনুসন্ধিৎসা জাগা তাহাই বা কোথায়? বিদ্যালয়গুলিতে প পড়ানো হয় তাহা ইতিহাস নহে, কানিং যে 'সমগ্র সত্য' প্রচারের জন্য প্রাণ বি করিয়াছিলেন, সেই সমগ্র সত্য তা নাই, আছে ভারত-বিজয়ের একত বিবরণ, যাহা কোন আদালতে গৃহীত হ না। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে এই শে তথা-কথিত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া আমাদের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ক তখন তাহাদিগকে যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ ক বলা হয়, তাহাতেও ভারতবর্ষের নি ইতিহাস ত সব সময় পাওয়া যায় নির্ভুল বিবরণও তাহাতে সকল সময়ে

। এই জন্য শিক্ষক ও ছাত্রের বিশেষ ধানতার সহিত এই সকল বঁহি পড়ানো পড়া উচিত। কারণ নিজেদের অক্ষমতায় মাদের ধারণা এত বদ্ধমূল এবং ইংরেজের তিভায় আমাদের আস্থা এমন দৃঢ় যে, মরা ভুলিয়া যাই যে, সকল ইংরেজ গ্রন্থ-ই কানিংহাম নহেন। প্রিন্সেপের প্রতিভা, ত্র নিষ্ঠা, ম্যাক্‌কলিকের সাধনা তাঁহাদের লের নাই। সর্ব্বোপরি কেবল সাধনার নিষ্ঠা বা প্রতিভা দ্বারা ঐতিহাসিক া নির্ণয় করা চলে না। সুতরাং ইংরেজ কার লিখিত পাঠ্যপুস্তক বিশেষ সতর্কতার হিত ব্যবহার করিতে হইবে।

গত বৎসর শ্রাবণের ভারতীতে আমি ডাঃ ন্সেণ্ট স্মিথের নব-প্রকাশিত Oxford istory of Indiaর কয়েকটি মারাত্মক ট দেখাইয়া ছিলাম। এবার সেই ণালীতে কীন সাহেবের সিন্ধিয়া-চরিতের ালোচনা করিব। দুই বৎসর পূর্ব্বে এই খানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-ালিকা হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ও য় Rulers of India নামে এক গ্রন্থ-লা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থমালার সম্পাদক লেন স্যর উইলিয়ম হাণ্টার। হাণ্টার গদ্বিখ্যাত পণ্ডিত। কতকটা তাঁহার নামের গৌরবে, কতকটা এই গ্রন্থমালার কোন গ্রন্থের ন্যায্য খ্যাতিতে এই গ্রন্থমালার কল গ্রন্থই সাধারণের নিকট প্রামাণিক তিহাস বলিয়া পরিচিত। কীন সাহেবের ালোচ্য বহিখানিও এই গ্রন্থমালার ভুর্ক্ত, সুতরাং এখানিও অনেক ছাত্র ও শিক্ষক সিন্ধিয়ার নির্ভুল জীবন-কাহিনী বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ বহিখানি আগাগোড়া ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ। অসতর্ক-তার কুৎসিত চিহ্ন ইহার সর্ব্বাঙ্গ বিকৃত করিয়াছে। যে সকল ভ্রম প্রদর্শনের জন্য প্রমাণ প্রয়োগ ও যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন, সেগুলিকে আপাততঃ পরিত্যাগ করিয়া যে ভ্রম স্কুলের বালকেরও হওয়া উচিত নহে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখানো হইবে।

কীন সাহেবের গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায়ই ভুল আছে—নামের ভুল। শুনিয়াছি পর-লোকগত লালবিহারী দে মহাশয় রো সাহেবের ব্যাকরণের প্রথম পৃষ্ঠার ভুল না সংশোধন করিলে তাহা পাঠ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। আজ জীবিত থাকিলে তিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করিতেন বলিতে পারি না। কীন সাহেবের গ্রন্থের Sindhia otherwise called Madhoji Patel। এই otherwise called লইয়াই যত গোলমাল। সিন্ধিয়া তাঁহার সমকালীন মহারাষ্ট্রে 'পাটীলবু বা পাটীল মহাশয় নামে পরিচিত ছিলেন সত্য, কিন্তু সেকালের বা একালের কোন মারাঠাই মাধোজী সিন্ধিয়াকে চিনিবে কি না সন্দেহ। তাঁহার নাম ছিল মহাদজী, 'মাধোজী'ও নয়, 'মাধব'ও নয়, মাধাজীও নয়। কীন সাহেব একবার ভুলিয়াও সিন্ধিয়ার প্রকৃত নামের উল্লেখ করেন নাই। এই নাম-বিভ্রাট কেবল মহাদজীর বেলাতেই শেষ হয় নাই। তাঁহার প্রতিপক্ষ তুকোজীর নামটি লইয়াও কীন সাহেব একটু গোলমালে পড়িয়াছেন। কীনের গ্রন্থে কোথাও তুকোজী হোলকারের নাম

নাই—সাহেবের কৃপায় তিনি হইয়াছেন 'তাকুজী'। অথচ কীনের পূর্ব্বতন লেখকদিগের মধ্যে কেহই এই নামটি বিশুদ্ধ ভাবে তাঁহাদের গ্রন্থে লিখিতে পারেন নাই বলিলেও ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের প্রতি অযথা অবিচার করা হইবে।

পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় যেমন ভুল, সেইরূপ প্রথম অধ্যায়ের পূর্ব্বে প্রদত্ত বংশ-তালিকাখানিতেও ভুলের অভাব নাই। কীন সাহেবের মতে তাকুজী? (তুকোজী) মাধোজী বা মধুরাও? (মহাদজী) এবং জোতিবী এই তিনজন সিন্ধিয়া বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাতা রণোজীর জারজ পুত্র। আজ জোতিবী জীবিত থাকিলে বোধ হয় এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কীন সাহেবকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিতেন। জোতিবী মহাদজীর সহোদর নহেন। তিনি দত্তাজী ও জয়াপ্পার সহোদর। এই তিন সহোদর রণোজীর পরিণীতা পত্নীর গর্ভজাত। কিন্তু কীন সাহেব জ্যোতিবীকে নির্ভয়ে জারজ বলিতেছেন।

বাকী যে দুইটি ভুল প্রদর্শন করিয়াই আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিব, তাহা অজ্ঞতা-প্রসূত নহে, অসতর্কতা-প্রসূত। কীন সাহেব তাঁহার সিন্ধিয়ার ৬৭ ও ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—But before he could derive the advantage he hoyed for from these gratuitous attacks upon his neighbours, he was recalled to Poona by tidings of an event which threatened all his ambitious projects. The party opposed to him had already taken the precaution of removing the late Peshwa's pregnant widow to the security of a mountain fortress, where she was now safely delivered of a boy. This infant was at once proclaimed Peshwa by the ministers at Poona. ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কীন সাহেব নারায়ণ রাওয়ের হত্যার বিবরণ দিয়াছেন। সুতরাং এই বালকটি যে নারায়ণের পুত্র, ইহা তিনি জানিতেন অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ থাকিলে গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থের কয়েকটি পাতা উল্টাইলেই তাঁহার এই সন্দেহের নিরসন হইতে পারিত। গ্রাণ্ট ডফের বই দুর্লভ হইলে তিনি যে-কোনো একখানি স্কুল পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের আশ্রয় লইতে পারিতেন। কিন্তু কোন সন্দেহই তাঁহার ছিল না। তাই তিনি তাঁহার গ্রন্থের ১৬৩ পৃষ্ঠায় দ্বিধায় একান্ত নির্ভয়ে লিখিয়াছেন—Since then Raghuba had been put into confinement; and Madhava Rao II, brother of the murdered Narayan Rao, had been set up as Peshwa, the control of affairs being assumed by the Nana. এইরূপে কীনের কৃপায় দ্বিতীয় মাধব রাও নারায়ণের ভ্রাতা হইলেন। ৬৮ পৃষ্ঠায় যিনি নারায়ণের পুত্র ছিলেন, ১৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি হইলেন নারায়ণের ভ্রাতা! এই বিবরণের ফলে ডারুইন-প্রচারিত ক্রমবিকাশ-বাদ রূপান্তরিত হইবে কিনা তাহা বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন। কিন্তু এই প্রকারের ভুল কোন বাঙ্গালী ছাত্র কোন য়ুরোপীয় রাজার সম্বন্ধে করিলে তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা মিলিত না, ইহা নিশ্চিত।

এইরূপে কীন সাহেবের অনুগ্রহে প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই একস্থানে মলহার রাও হোলকারের পুত্রবধূ এবং স্থানান্তরে তাঁহার পুত্রের পুত্রবধূ হইয়াছেন। এদেশে পিতা পুত্রকে আদর করিয়া পিতৃ-সম্বোধন করিয়া থাকেন, সুতরাং সে হিসাবে মাতাকে পুত্রবধূ বলিয়া ভুল করা বিদেশী গ্রন্থকারের পক্ষে অসঙ্গত নাও হইতে পারে। কীন সাহেব দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে ছিলেন, সুতরাং তিনি বোধ হয় এ ভুলকে ভুল বলিয়াই গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু তাঁহার এই উক্তির ফলে তাঁহার কোন ইংরেজ পাঠক হয়ত ভারতীয় সামাজিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতে পারেন, যাহা ভারতবাসীর নিকট খুব শ্লাঘার বিষয় নাও হইতে পারে! সেইজন্য একটি পাদ-টীকায় মাতা কিরূপে পুত্রবধূ বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারে, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিলে কোন গোল থাকিত না।

কীন সাহেবের বহু সিদ্ধান্তের আলোচনা করা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহার স্থানাভাব, আর সময়ও খুব প্রচুর নহে। কিরূপ একাগ্রতা ও সত্য-নিষ্ঠার সহিত তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা গুণজ্ঞ পাঠক এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই অনুমান করিতে পারিবেন। দক্ষ পাচক একটি ভাত টিপিয়াই হাঁড়ি-শুদ্ধ ভাতের অবস্থা জানিতে পারে।

অথচ কীন সাহেব পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস লিখিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং খ্যাতিও প্রচুর অর্জ্জন করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সিন্ধিয়ার জীবন-কাহিনী রচনার কালে তিনি পরিশ্রম বা সতর্কতার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুগের ইংরেজ লেখকদিগের যে সত্যনিষ্ঠা দেখা যাইত, এখন তাহা অন্তর্হিত হইতেছে কেন? কীনের এই বহিও কিন্তু বিলাতের ভাল ভাল কাগজে প্রশংসিত হইয়াছে, সুতরাং বিলাতী প্রশংসা-মাত্রেরও মূল্য অনুমেয়!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

ঘরের বাঁধন

বেরিয়ে-পড়া এতই সোজা! বারে বারে তুই যে বলিস্?
কানুর-পিরীত-নেশায়-রঙীন্ অন্ধকারে তুই যে চলিস্!
পাঁয়জোরে তোর ঝম্‌ঝমাঝম্
ছিট্‌কে পড়ে শঙ্কা-সরম,
কাল্-ফণী সে লুটায় ফণা, পায়ের তলায় যখন দলিস্!
আল্‌তা পরায় পথ যে তোরে, গহন বনে যখন চলিস্
—কাঁটা দলিস্!

মাতাল তোমার দেহের দোলায় মূর্চ্ছা হানে বাঘের চোখে !
বাদল-রাতের নিবিড় কাজল গল্‌ছে অলখ্ চন্দ্রালোকে !
আকুল তোমার কেশের রাশে
জোনাক-পাঁতি যখন হাসে—
খুনীর ছুরী, বাঁধন-ডুরী শিথিল যে হয় ঘুমের ঝোঁকে !
চাইতে নারে কেউ যে তোমার সাগর-নীল ঐ ডাগর চোখে
---পাগল-চোখে !

বেরিয়ে-পড়া নয় ত' সহজ !—সে কাজ শুধু তোরেই সাজে,
ফাগুন-ফুলের মালা গাঁথে যে-জন আগুন-খেলার মাঝে !
মধুবনের মঞ্জরী সে
ভর্‌ছে নিশাস মন্দবিষে,—
কামনা যার মনের কোণেই গুম্‌রে মরে শতেক লাজে,
বেরিয়ে-পড়া তাঁর কি সাজে নিশীথ-রাতে পথের মাঝে—
স্বপন-মাঝে !

শ্যাম যে আমার নামটি ধরে' ডাক দিল না, হায় অভাগী !
সারা জনম গোঙাই একা—মনে-মনেই শ্যাম-সোহাগী !
কুলকে আমি সাধে ডরাই ?
শক্ত করে' তারেই জড়াই !
বাঁশীর ও-সুর বল্‌ছে না ত'—আমার তরেই সে বিবাগী !
নাম ধরে' ডাক ডাক্‌ল না ত'—এমন কপাল ! হায় অভাগী
ঘর-সোহাগী !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

কালো বউ

সৎমার অকারণ ঝাঁটা-লাথিটা কোনো-মতে বরদাস্ত করতে না পেরে নেহাৎ ছেলে-মানুষটাই এসে অমল অফিস-বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। এইখানেই একদিকে তার জরা-গ্রস্ত কৈশোর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদায় নিলে। তারপর যৌবন এসে ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌লো। মনের বনে ফাগুন মাস তার বসন্তের গান গেয়ে ফাগে ফাগে রঙ খেলে

সে রাঙা উত্তরীয়ের আঁচলখানি অমলের চোখের উপর দিয়ে উড়িয়ে ধর্‌লে। কিন্তু কুসুমকেতন যে সেবার তারই মর্ম্মের মাঝ-খানে তুলে মারবার জন্যে রক্তবরণ অশোক-মঞ্জরী কুঞ্জ উজাড় ক'রে কুড়িয়ে এনে তীক্ষ্ণ একটী তীর গড়্‌ছিলেন—তা অমল একে-বারেই জান্‌তো না !

ছোট-মাসি কমলা সেদিন অমলকে খাবার নেমন্তন্ন ক'রে, অনেক দিব্যি-টিব্যি দিয়ে আস্‌তে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঝুঁটি-ঝোলানো যে বেঁটে-মোটা উড়েটীর কাছে সে খবর সময়-মত পৌঁছে না দিলে—তার ধাঁকিড়ি, ঝাঁকিড়ি, কঁড়কিড়ি ইত্যাদি ঝঙ্কারে অমল কেন, বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই সন্ন্যাসের ব্যবস্থা দেখ্‌বার দরকার হবে—কাজেই ন'টা বাজতে না বাজতেই অমল চটী চট্‌পটিয়ে নেমে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুক্‌লো।

ঘরের ভিতর পা দিতেই সে হঠাৎ স্তম্ভিতের মত থম্‌কে দাঁড়ালো। অন্ধ-কারের মধ্যে আচম্‌কা একটা বিজ্‌লী-আলো জ্বলে উঠ্‌লে লোকের চেতনা যেমন হঠাৎ চকিত হয়ে ওঠে, অমলেরও মনটা ঠিক তেম্‌নি ক'রে চম্‌কে উঠ্‌লো। সে দেখ্‌লে, একটী সুন্দরী মেয়ে ;—সদ্য স্নান সেরে এসেছিল সে—সুগৌর পিঠের উপর দিয়ে কালো একরাশ ভেজা-ভেজা চুল এলো হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। লঘু-দীর্ঘ ঘাড়টী বেঁকিয়ে, চাঁপা কুঁড়ির মত আঙুল দুলিয়ে তরুণী বামুন ঠাকুরকে রান্না দেখিয়ে দিচ্ছিল সেখানে। একজন অল্প-বয়সী বালার চোখের কালোটা, বাহুর নীচে হাতের যে নিটোল বাঁকটী, দেহের উপরে দোল-খাওয়া একটা লীলা, সোনার উপরে গোলাপ-ছোপানো রঙ, প্রথম যৌবনে অমল আজ প্রথম দেখ্‌লে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রূপের খুঁটি-নাটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে বুঝি মুগ্ধ হ'য়ে গেল, ভাব্‌লে চমৎকার দেখতে তো এ মেয়েটী !

অমলকে অমন নিজেকে-হারিয়ে-ফেলা-বিস্ময়ে বিহ্বলতায় তার দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখে তরুণী কালো চওড়া-পেড়ে আঁচলখানা মাথার উপর তুলে দিলে। অমলের চমক ভাঙ্‌লো,—লজ্জিত মুখখানা ফিরিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, অপরিচিতা তরুণীর পানে অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা—ছি,কি অন্যায় !

কিন্তু এখন অমল যাবেই বা কোথায় ? —অথচ যাবেই বা কেন ? কিছুতেই সে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিল না। এ তার বুকের উপর হঠাৎ একটা কেমন আই-ঢাই, কি একটা অস্বস্তি চট্ ক'রে জেগে উঠ্‌লো কেন ? অমল উপরে উঠ্‌তে গেল, কিন্তু কিসের যেন ব্যথায় হাঁটু-দুখানা পঙ্গু হয়ে গেছে, মনে হ'ল। ভাবতে গেল—এটা কি তার ? কিসের ব্যাকুলতা মনের উপর যেন ঠেক্‌লো——একটা কিসের ভারী বোঝা চেপে রয়েছে ! ভাব্‌লে মাসির বাড়ী যাই, কিন্তু ঠাকুরকে তো খাওয়ার কথা,—না বলা হয়নি—অম্‌নি আবার মনে পড়ল সেই তরুণী—তার ঘন-কালো চোখদুটী। অমল ঠিক কর্‌লে, তখনি আবার ফিরে গিয়ে ঠাকুরকে বলে আসে, আজ সে খাবে না—সেই ফাঁকে যদি তাকে আর একবার দেখা যায় ! ফিরে গিয়ে সে রান্না-ঘরে ঢুক্‌লো—কিন্তু শূন্য সে ঘর, ফাঁকা—কেবল কতকগুলি কালি-ঝুলে ভরা কালো-কিষ্টি কেষ্টা উড়ের সেই পুরোনো হেসেল-

খানা। ঐখানে এসে সে দাঁড়িয়েছিল,—ঘর-খানাকে ধন্য ক'রে, আলো ক'রে—সে কিন্তু কোথায় গেল? অমল ভাবলে, জিজ্ঞেস করে ঠাকুরকে—কে সে অমন সুন্দরী? কিন্তু সাহস হলো না। খাবার কথা বারণ ক'রে দিয়ে বেরিয়ে—অমল বরাবর রাস্তায় এসে দাঁড়াল। লোকের স্রোত চলেছে! বাড়ীর গায় দোকানের সাম্‌নে সব বিজ্ঞাপনের কাগজ—"ওরিয়েণ্টালের চির-মধুর সাবান," "আর্য্য ফ্যাক্টারীর ষ্টীল ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স," "রায়ব্রাদার্স রবার ষ্ট্যাম্প-ওয়ালা" "৵০ এক আনায় এক বোতল কালি" এই সব পড়্‌তে পড়্‌তে সে চলেছে, কিন্তু কিছু মানে বুঝ্‌তে পাচ্ছে না! ট্রামগুলো চলেছে—মোটর গাড়ীর সাম্‌নে পাগড়ী-ওয়ালা সোফার ভিতরে ভুঁড়িওয়ালা বাবু, একটা বড় বাড়ীর গায় প্রকাণ্ড একখানা ছবি—"গোয়ালিনী-মার্কা গাঢ় দুগ্ধ—হস্ত-দ্বারা স্পর্শিত হয় নাই"—অমল হাঁ ক'রে তাকিয়ে সব দেখ্‌ছে, যেন কত বিচিত্র এ জন-যাত্রা, এই লেখা-রঙ।

গাড়ী-জুড়ি-কোলাহল,—এ বুঝি সে আর কখনো দেখেনি, আজই প্রথম। শূন্য-মনে কেবল কার একখানা মুখ অনবরত বিদ্যুতের মতন থেকে থেকে চম্‌কে উঠ্‌ছে, মাথায় এসে কোনো চিন্তাই কিন্তু দুদণ্ড দাঁড়াতে পারছে না। এম্‌নি ভাবে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একটা পানের দোকানের কাছে গিয়ে সে থম্‌কে দাঁড়ালো। পকেট থেকে একটা পয়সা তুলে ফেলে দিয়ে একটী সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে টান্‌তে টান্‌তে আবার চল্‌লো। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে মাসির বাড়ীতে গিয়েই শেষে উঠ্‌লো, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

মাসি বল্লেন—"কিরে, এত বেলা ক'রেছিস?"

অমল অন্যমনস্কে উত্তর দিলে—"বেলা হয়েছে?"

"ওমা, বেলা হয়নি? একটা বাজতে যায়! কোথায় কোথায় ঘুরছিলি?—রোদে দেখ্‌তো মুখখানা একেবারে যে রাঙা হ'য়ে গিয়েছে!"

কোন উত্তর না দিয়ে অমল তক্তাপোষের উপর ধপাস ক'রে বসে পড়্‌লো। মাসি ভাবলে, পিত্তি পড়ে ছেলের কাহিল বোধ কচ্ছে—তাড়াতাড়ি জায়গা ক'রে খেতে দিলে। আজ অমল খেতে বসে তেমন হো-হো করে হাস্‌লে না, বেশী কথাও বল্লে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বেরোবার জন্যে উঠ্‌লো। মাসি ব'ল্লেন—"এই রোদ্দুরে যাবি,"—

"হ্যাঁ, কাজ আছে" ব'লে বেরিয়ে বরাবর গোলদীঘিতে এসে একটা গাছ তলায় বসে সন্ধ্যে-অবধি শুধু সেই রান্নাঘরের ছবি-খানিই ভেবে ভেবে মনের পরতে পরতে সেটী অবিনশ্বর ক'রে এঁকে নিলে।

২

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এলে শ্রান্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরে তার ঘরখানার ভিতর মেঝেয় পাতা বিছানার উপর শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো। ছেলেরা যখন তাকে খেতে যাবার জন্যে ডেকে জাগিয়ে দিলে, অমল তখন স্বপ্ন দেখছিল—সেই তরুণী বেল, চম্পক আর হেনা ফুলে এক-গাছি মালা গেঁথে অমলের গলায় পরিয়ে দিতে এসেছে, অমল মালাছড়াটি কেড়ে নিয়ে তারই গলায় পরিয়ে দিয়ে ফুলের মত সে মুখখানা

তুলে ধরেছে—এমন সময় কে যেন ডাক্‌লে, "অমল, অমল"—অমলের ঘুম ভেঙে গেল। খেয়ে ফিরে এসে অমল তার বিছানার উপর বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—হঠাৎ যদি সে এইখানে এসে পড়্‌তো, তবে দু হাতে তার সুগোল হাতখানা ধরে নিয়ে এসে কাছে বসিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ চুলগুলি তার মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিতাম, কত কথা বল্‌তাম! না না, কিছুই বল্‌তাম না, বোধ হয়,—শুধু তার মুখের পানে চেয়ে চেয়েই সারাটা রাত কাটিয়ে দিতাম।

সে যেন পাগল হয়ে গিয়েছে—সেই একবারের নিমেষের দেখাতেই! ন'টা, দশটা ক'রে বারটা গজল দিয়ে ঘড়ি ঢঙ-ঢঙিয়ে উঠ্‌লো,—অমল তখনও বসে ভাব্‌ছে, আর কি তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না? আর একটী বার! তাকে পাবার আশা কি একেবারেই স্বপ্ন? কেন? যদি আমি তাকে বিয়ে করি! কিন্তু সে আমায় বিয়ে করবে কেন? নিঃসম্বল নিঃস্ব এক মূর্খকে? এই ত আমার ধন-দৌলত—ডবল টিনের ঐ টোল-খাওয়া, ভাঙা-চোরা বাক্সটা, এই সতরঞ্চি আর বিছানার চাদর, এই ওয়াড়-ছাড়া ময়লা বালিসটী—আর সে যে কাপড়-খানা পরেছিল, তা এখনো বিক্রি করলে যে আমার এ সম্পত্তি দুবার ক'রে কেনা যায়! তবে? আশা নেই, কিছু আশা নেই! অমলের বুকের ভিতর সত্যই একটা যন্ত্রণা বোধ হল। সে "উঃ" ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। তখনি আবার মনে হলো—বেশত যদি মন দিয়ে লেখা-পড়া শেখা যায়, যদি স্কলারসিপ পেয়ে বিলেত যাই! সেখান থেকে মানুষ হয়ে ফিরে আসি, তা হলে—?

আশা-হতের মনে অনেকখানি আশ্বাস এলো। এবার প্রাণপণে সে শিক্ষার সাধনা করবে, প্রতিজ্ঞা ক'রে শুয়ে পড়লো,—কিন্তু ঘুম ভালো হলো না। পরদিন থেকে অমল ভয়ানক পড়া আরম্ভ কর্‌লে,—সে আর বেড়াতে বেরোয় না, খেল্‌তে যায় না, কেবল খাতা নিয়ে লেখে আর বই কোলে ক'রে বসে পড়ে। কিন্তু বইএর পাতার উপর থেকে থেকে কার দু'খানি ভুরুর দুটী বাঁকা রেখা কালো হয়ে ফুটে ওঠে, লেখার ফাঁকে অন্যমনস্কে গৌরবর্ণ কার একখানা হাত এঁকে তুলে একগাছি ফুলের মালা আঙুল ক'টীতে এমন ক'রে ধরিয়ে দেয়, যেন কারো গলায় সে সে মালা পরিয়ে দিতে যাচ্ছে!

আর একটী বার তার মুখখানি দেখার আশায় অমল তারপর আরো কতদিন ন'টার সময় রান্নাঘরে গিয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ বুকে ব্যথা নিয়ে তাকে ফির্‌তে হয়েছে! তরুণী তার অরুণ সেই যুগল-ঠোঁটে ঘুমোনো হাসির আবছায়া জাগিয়ে নিয়ে তো আর রান্না দেখাতে আসেনি! ঘরের জানালাটা খুলে দিয়ে ভিতরের দিকে দিনে দশ বারই হয়তো চেয়ে দেখেছে,কিন্তু হায়রে,বাঁশের বুক বেঁকিয়ে গড়া আলকাতরায় কালো জাফরীর বেড়াটার এমন নিষ্ঠুর শাসন! সে আছে দৃষ্টির সম্মুখে, পাহাড়ের মতন একটা নিরেট বিরাট বাধা রচনা করে উঁচু করে দাঁড়িয়ে। বেড়ার আড়ালে মেয়েরা হেঁটে যাচ্ছে, তাদের পায়ের ধ্বনি, কুট্‌নো কুট্‌ছে, চুড়ির ঠুনঠুনি,—আঁচলটা সরিয়ে সেরে নিচ্ছে—চাবির ঝন্‌ঝনি—এ সবই স্পষ্ট শোনা যায়,—বেশ বুঝতে পারে—দেখতে তো পায়না কাউকেই! এই রকম উত্তেজনার

মধ্যে অমলের জীবন থেকে আরো তিনটে মাস খসে গেল। এখন সে ক্লাসের মধ্যে ভাল ছেলে। সেবারে পাশের পড়া তখনই তার খুব ভাল তৈরি হয়ে গেছে। চাওয়া-চাওয়ির লুকোচুরিটা ক্রমাগত ব্যর্থ হয়ে অমলকে সেদিকে এক রকম অমনোযোগীই করে তুললে। সে আর এখন বড় একটা তাকায়-টাকায় না;—নীরবে নিশিদিন তার অজানা প্রিয়তমার উদ্দেশে প্রাণের মৌন-মিনতি মনে মনেই নিবেদন করে, আর নিজের বড় হওয়ার তপস্যায় দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়।

৩

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন অমল কোথা থেকে তার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল—বই, খাতা, কাঁথা চাদর, গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে, কাউকে কিছু না বলে বাড়ী রওনা হ'ল। সে যখন ষ্টেশনে এসে পৌঁছুলো, তখন ডাকগাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে সে গাড়ীতে উঠে বস্‌লো—কিন্তু মুখের চেহারাটা তার তখন ভয়াবহ রকম বিষণ্ণ, বুকের ভিতরটা দপ্‌দপ কচ্ছে, প্রাণের নীচে থেকে একটা কি দুঃখের কান্না যেন চীৎকার করে বেরিয়ে আস্‌তে চায়!

এম্‌নি ভাবেই সারাটা রাত কাটিয়ে সকালে এসে অমল বাড়ী পৌঁছুলো। আবার সেই সৎমার রক্ত চক্ষুর রূঢ় ভঙ্গী, কলকণ্ঠে ঝঙ্কার তুলে কথা চিবিয়ে হাত-মুখ নেড়ে তাঁর বাৎসল্যের সম্ভাষণ, যখন-তখন দোষের ছুতো ধরে অনাহূত সে গুরু লাঞ্ছনা, অমলের পক্ষে বাড়ীটা অসহনীয় করে তোলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু অমল এবার নির্ব্বাক, মুখ গুঁজে, সব সহ্য ক'রে যায়। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে অমল চলে এসেছিলি হঠাৎ কেন, তা তুই-ই জানিস্, আর প'ড়তে যাবিনে?" অমল বল্‌লে, "আমি আর পড়্‌বো না।" আর সৎমা তখনি বলে উঠ্‌লেন, "তখনি তো বলেছি আমি, ও করবে পড়া-শোনা! ও ছেলে আমাদের গলায় কাঁটা হয়ে থাক্‌বে, শেষে একদিন বুকে ছুরি মার্‌বে। মার্‌বে, মার্‌বে, মার্‌বে, তুমি দেখো। এখন সেইজন্যে দু'বেলা কাঁড়ি কাঁড়ি খাইয়ে গায়ের তেল বাড়াও।"

অমল কোন উত্তর না দিয়ে নীচু মুখে তার ঘরখানির ভিতর ঢুকে দরজা দিয়ে বিছানার উপর পড়ে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে,—বুকখানা যদি তার তখনি ফেটে চৌচির হয়ে যেতো তো সে বাঁচ্‌তো, এই যন্ত্রণার হাত থেকে! তার যে কি দুঃখ, কি সে ক্ষত রোজ বেড়ে উঠে জীবনটাকে দুর্ব্বহ ক'রে তুল্‌ছে, তা শুধু সে-ই জানে।

বাড়ী থেকে অমল আর বেরোয় না—কোথ্‌থেকে রবিবাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলী একখানা যোগাড় করেছে, কেবল তাই পড়ে, আর খাতা ভরে পদ্য লেখে। সব লেখা-গুলোর ভিতরেই একটা যেন কান্নাকাটি করে বুকভাঙ্গা আর্ত্তনাদ নিয়ে সে দাপাদাপি করছে বলে মনে হয়, সুরটা যেন চোখের জলে ভিজে ভারী হয়ে গিয়েছে!

যতদিন সৎমা ইচ্ছে ক'রে তাকে খেতে দেয় নি—অমল কিছু না বলে পেটের ক্ষিধের সঙ্গে তার প্রাণের ক্ষিধে মিশিয়ে চেতনা-হীন মনোযোগে বসে সারাদিন শুধু কবিতা কি গল্পের বই পড়েছে; "চোখের বালির" পাতার উপর চোখ ঠিকরে রেখে দীর্ঘদিন আর

বিনিদ্র রাত কাটিয়ে দিয়েছে। পরদিন সৎমা যদি দয়া ক'রে কিছু দিয়েছেন তো অমল খেয়েছে, খাবার চেয়ে নেয়নি কখনো, কিম্বা না খাওয়ার অভিযোগও জানায় নি কাউকে।

কিন্তু সংসার যেমন উল্‌টে পাল্‌টে যায়, মনও তার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেম্‌নি করেই বদলায়। অমলের বাবা মারা গেলেন। অতএব সংসার সৎমা, সৎ ভাই-বোন, সবাইকে নিয়ে এসে চেপে পড়্‌লো তারি ঘাড়ে। অমলের এখন আর কাঁড়ি না গিলে কাঁড়ি যোগাবার কর্ত্তব্য বড় হয়ে উঠ্‌লো। অমল গাঁয়ের কাছেই একটা ইংরিজী ইস্কুলে মাষ্টারি চাকরি নিলে। দু-চার বিঘে জমি-জিরেত যা ছিল তাই দেখে-শুনে কোনোমতে সংসার চালিয়ে চলতে লাগ্‌লো, কিন্তু সৎমার রাস-ভারি সে ঝঙ্কার তবু মোলায়েম হয়ে এলো না। তিনি রোজই বলেন, "আমার ছেলেরওতো বাড়ী-জমির ভাগ আছে, আমাদের জিনিষই আমরা খাচ্ছি—ও কি করছে! আমাদের অমন ছেলে মরে যাওয়া ছিল ভাল।"

অমল সে কথায় কানও দেয় না। এর মধ্যে অমল হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি পেলে। আপিস-বাড়ীর কাকাবাবু অমলের দাদা-মশায় লিখেছেন:—

"ভাই অমলচন্দ্র, কল্যাণ হউক। তুমি এখন সংসারে ঢুকেছ, কাজ-কর্ম্ম কচ্ছ। এই বে-থা করবার সময়। তোমার চিঠি পেলে বিস্তারিত সব খবর দেব। ইতি।"

অমল উত্তরে লিখ্‌লে—"ও সব কথা থাক দাদা-মশায়, আপনি আমার প্রণাম নিন্। বিয়ে হয় তো আমি কর্‌বোই না। নিবেদন ইতি।"

দিন-দুইএর ভিতরেই আবার জবাব ঘুরে এল। আবার অমলের কল্যাণ চেয়ে দাদা-মশায় লিখ্‌লেন—

"বের কথা হলেই আজকালকার তোমরা ঐ রকম গুমোর-করা জবাব দাও। কিন্তু বিয়েতে যে মনকে নীতি-শৃঙ্খলার ভেতর সংযত, সংহত ক'রে তোলে, তা তো তোমরা বোঝ না। আমি মেয়ে পছন্দ ক'রে সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। মুক্তি মেয়েটী খুব সুশীলা, দেখতেও বেশ—তুমি বোধ হয় আমাদের অনুর বউকে দেখেছ, অনেকটা সেই রকম। আশা করি, আর অন্যমত করবে না। ইতি"

চিঠি পড়ে অমলের মনটা লাফিয়ে উঠলো। একটী যে তীব্র স্মৃতি অমলের অন্তরের ভিতর খোঁচার মত হয়ে অনবরত খচ্ খচ্ করতো, এই চিঠিটায় যেন সেটা হঠাৎ অনেকখানি কমে গেল। সে তখনি লিখ্‌লে—

"আপনি যেমন লিখেছেন, সে যদি ঠিক তেম্‌নি দেখতে হয়, তবে আমি বিয়েতে রাজী আছি।"

কাজেই শুভদিন ঠিক হয়ে গেল। তখন অমলও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাজনা-টাজনা বাজিয়ে অনুর বউএর মতো বউ আন্‌তে চল্‌লো। কিন্তু তবু এই আনন্দের কলরোলের মধ্যে অমলের চিত্ত এক-একবার নুয়ে আসতে লাগ্‌লো—বাজনার সে তালে তার হৃৎপিণ্ড যেন তেমন করে বাজলো না, শানাইএর সে সুরে অমলের প্রাণ গান গেয়ে উঠ্‌লো না। শুভ লগ্নে, শুভ কাজ শেষ হয়ে গেল। "বরণের" পর "সাতপাক" হয়ে গেলে একটী তরুণী গাল-ভরা হাসি হেসে বল্লেন, "বর এইবার শুভ-দৃষ্টি

কর।" অমল নিমেষে চকিত হয়ে উঠে প্রথম শুভ-দৃষ্টি-বিনিময় করলে সেই তরুণীর আঁখি দুটীর সঙ্গে, তারপর মুক্তির মুখের দিকে তাকালে। অমলের মুখের উপর দিয়ে যেন কে কালি-পোরা পিচকিরি মেরে গেল। সে হঠাৎ বিষম রকম দমে গিয়ে উপরের দিকে তোলা দৃষ্টিটা তার নামিয়ে নিলে। এ তো তার কাছ দিয়েও যায় না! কালোর উপর পাউডার জাঁকিয়ে কি অমন যে চম্পক বর্ণ, তা ফলানো যায়? এ যে কালো, ভয়ানক কালো! আর মন্মথেরও মন-ছোঁয়া রুচির চারু-তার রঙের গৌরব অনুর বউএর তনুর সঙ্গে এ তরুণীর অঙ্গ গড়নের কোনো তুলনাই চলে না। ভুল হয়েছিল তার না দেখেই বিয়েতে মত দেওয়া। অমল চুরি করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লে। শেষে আচার্য্য অমলের হাতের সঙ্গে এই অচেনা মেয়েটার কালো হাতখানি ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'র্‌লেন—"এ বাঁধন অটুট থাক্, অক্ষয় হোক।" অমলও "আমি তোমার সখা হই, তুমি আমার সখী হও, আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার হোক" বলে মুক্তিকেই আপনার ক'রে নিলে। অনুর বউ পরের ঘরের লক্ষ্মী পরেরই ছিল, পরেরই রয়ে গেল, শুধু অমলের হৃদয়ে রইল একটা হায়-হায়!

৪

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে অমল বড়দি—মানে মুক্তির দিদিকে জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ বড় দি, কাল যে মেয়েটী আমায় শুভদৃষ্টি কর্‌তে বলেছিলেন—তিনি কে?"

ঠিক সেই সময় সেই তরুণী খাবারের থালা হাতে ক'রে ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, "কেন, তাঁর উপরও দৃষ্টি পড়েছে না কি অমল বাবু?"

অমল একেবারে থতমত খেয়ে গিয়ে বড়দির উপরকার দৃষ্টিটা তার বেঁকিয়ে এনে এই সুন্দরীর ছবির মতো মুখখানার উপর মায়া-কিরণের মত চঞ্চলভাবে ফেলে অবাক হয়েই রইল। বড়দি বল্লেন, "এ যে মণি, মুক্তির বড়, অবিশ্যি আমার ছোট। আমাদের বড় মাসিমার মেয়ে! মণি যে আপিস-বাড়ীর অনুরূপ বাবুর স্ত্রী। কেন, তুমি ওকে চেন না?"

অমল শুধু বল্লে, "হ্যাঁ, চিনি বোধ হয়, তবে উনি যে অনুরূপ বাবুর স্ত্রী, তা আমি খুব ভাল করেই জানি; আর—"

মণি বল্লেন, "আর কি অমল বাবু?"

"আর আপনি তা হলে হলেন আমার আপনার চেয়ে আপনার।"

কথাটা বলে অমল আর একবার মণিকে তাকিয়ে দেখলে—আজ এইখানেই শেষে অমলের অতি-নিকট সে যে দূর থেকেও দূরে থেকে অমলের দেহ থেকে প্রাণটাকেই বুঝি এক দিন দূর ক'রে দিতে চেয়েছিল।

মণি বল্লেন, "আপনার তার চেয়েও আপনার?"

অমলের বুকের মাঝখানটা এবার দ্রুত স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌লো। "ও কি! এত ক'রে আমার দিকে তাকাবার অধিকার তো কাল আচার্য্যের এজলাসে ছেড়ে এসেছেন, অমলবাবু" বলে মণি মুখটা টিপে, ঠোঁট দুখানা চেপে মুচকি হাস্‌লেন।

অমল জোর ক'রে একটুখানি হেসে উত্তর দিলে,—"কি করি বলুন? চোখ দুটী বড়

...দি, আমি বারণ কল্লেও শোনে না। ঐ ...পানেই কেবল তাকিয়ে থাক্‌তে চায় ...কি কালো যে ও দুটী!"

..."কেন, এ দুটী কি তার চেয়ে কিছু কম ...লো?" বলে মণি মুক্তির মুখখানা উঁচু ক'রে ...তেই অমল বল্‌লে, "কালো কম না হ'তে ...রে, তবে অত ডাগর তো নয়।"

...মুক্তি এবার একটা ঝাঁকি মেরে মণিদির ...ছাড়িয়ে ছুটে পালালো। অমল একটুখানি ...ক'রে থেকে বল্‌লে, "বড়দি, একটা গল্প ...বে?"

..."বল না, সকালটা জমে উঠ্‌বে বেশ।"

...অমল বল্‌তে লাগ্‌লো। তার ব্যর্থ ...মের সবটা গল্প কান্নায় কান্নায় ভরে তুলে ...বারে শেষ করে তরুণীদের শোনালে। ...ণের যখন বল্লে, তরুণের জীবনটা মরুভূমির ...নীরস, বিফল, মিছে হয়ে গেল, তার ...তের সব আলো একেবারে কালো ...কারে ভরে গেল সেইদিন—যেদিন ঠাকুরের ...খোঁজ নিয়ে সে জান্‌লে যে তাকে সে-...রানা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যিনি, তিনি আর ...নের, তাঁর সিঁথিতে সিঁদূরের রক্ত রেখা ...দেবার অধিকার এ জন্মে আর কারো ...—সেইদিনই মর্ম্মের মাঝখানে টন্‌টনে ...ভরা গভীর ক্ষত নিয়ে সে-বাড়ী ছেড়ে ...চলে গেল—তার এ-জন্মটাই চিরদিনের ...নিরর্থক হল।

...শুনে বড়দি বল্লেন, "আচ্ছা!" আর ...গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ...অশ্রু-ছলছল চোখে তখনো তাকিয়ে ...তাঁর পিঠের সুডোল টানা বাঁকটা। ...বিকেলে মণিদি অমলের হাতখানি ধরে নিয়ে ড্রইংরুমে বসিয়ে নিজে একখানা কৌচের উপর তাঁর অঙ্গের ভর রেখে বস্‌লেন। অমল বল্‌লে, "সে কি, মণিদি, খবর কি আপনার? এমন ক'রে আমায় টেনে আন্‌লেন কেন?"

দুঃখ-জড়িত একটু হাসি হেসে মণিদি বল্লেন, "মুখখানা দেখাবার জন্য।"

"সে কি, এ বেলা আবার নূতন ক'রে দেখবো?" ব'লে অমলও হেসে ফেল্‌লে, কিন্তু তার চারিদিকে একটা ক্ষোভের কাতরতা দিয়ে যেন সীমা টানা ছিল।

খুবই গম্ভীর হয়ে গিয়ে মণিদি বল্লেন, "আজ অতি কাছাকাছি ধরা দিয়েছি অমলবাবু, যতবার ইচ্ছে করে, আজ চেয়ে দেখুন, কিন্তু এর চেয়ে আর এগোবার আমারও অধিকার নেই, আপনারও নেই, মানুষ হিসেবেও নেই, স্বামীর দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন বলে সে হিসেবেও নেই। আমার বুকের ভিতর আপনার নিরাশ প্রাণের গল্প যে কি ব্যথা পুঞ্জীভূত ক'রে দিয়েছে, তা আপনাকে বলে বোঝাতে পার্ব্ব না। আমিই একটা রূঢ় অভিশাপের মতো আপনার সমস্ত জীবনটাকে এমন ব্যর্থ করে দিলাম!" মণিদির চোখের কোণে এক ফোঁটা জল দেখা গেল।

অমল বল্‌লে, "যাক্ ও কথা।"

"না, সবগুলো কথা শেষ ক'রে বলবো বলেই আপনাকে নিয়ে এসেছি। আমি আজ সত্য কথাই বল্‌ছি—যদি আমি সেদিন কুমারী থাকতাম আর শুন্‌তাম, আমার জন্যে আপনার মানুষ হবার সাধনা, এই একখানা ছাই মুখের উপর এমন প্রাণভরা দৃষ্টি, তা হলে যত বড় আপনি হতে চেয়েছিলেন, তা না হলেও—আপনাকেই আমি বরণ কর্‌তাম।"

"করতেন ?" বলে অমল হঠাৎ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লো।

মণিদি বল্লেন, "হ্যাঁ, করতাম, কিন্তু —"

"আবার কিন্তু কেন, মণিদি ? ঐটুকুই যে আমার বাকী জীবনটাকে সোজা ঠিক পথে চলিয়ে নিতে পার্‌তো।"

"কিন্তু আমাকে নিয়ে সুখী হতে পার্ত্তেন না। অমল বাবু, আমি বড় অভিমানিনী। কত রাত্রি মিছে একটা ছোট কথার উপর অশ্রু ঢেলে আমি কাটাই, খুঁটি-নাটি নিয়ে মুখ ভারী করে সারাদিন যায়। সংসার আপনার সুখের হতো না। আজ যাকে পেয়েছেন, সে আমার চেয়ে ঢের বড়, দেখ্‌বেন,—ঐ একটা কালো বুকের আচ্ছাদনে কত বড় একটা হৃদয় লুকিয়ে আছে, কতখানি আত্ম-নিবেদন নিয়ে সে আপনার দুয়ারে লক্ষ্মীটীর মত গিয়ে দাঁড়াবে, নিত্য কল্যাণ কাজে। আজ তাই আপনার কাছে আমার একটা জিনিষ চাইবার আছে—"

অমল মুখ নীচু করেই বল্‌লে, "বলুন।"

"যদি কোন দিন আমাকে ভালবেসে থাকেন, তবে সবটা সেই ভালবাসার দাবী নিয়ে আমি চাইছি। স্বীকার করুন, আমাকে ভুলে যাবেন, মুক্তিকে ভাল বাস্‌বেন।"

"আপনাকে একেবারে ভুলে যাওয়া সে বুঝি পার্‌বো না মণিদি, তবে মুক্তিকে আমি ভাল বাস্‌বো, সরল অকপট ভালবাসাই বাস্‌বো।"

"আমি চিরদিন আপনাকে মনে রাখ্‌বো, আপনার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌বো।"

"তবে আমিও পার্‌বো, এ আঘাত সামলে নিতে। আজ শ্রদ্ধা-ভরে আপনাকে প্রণাম ক'রে বল্‌ছি, আপনি আমার মণিদি—আর মুক্তি আমার কালো বউ"—ব'লে অমল দুই হাত দিয়ে মণিদির পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলে।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পুরুষ ও নারী

পুরুষ এতদিন আপনার ইচ্ছামত নারীকে গড়িয়া আসিয়াছেন। তাই তাঁহার স্বভাব ক্রমে সাধারণ মনুষ্যত্ব হইতে স্খলিত ও বঞ্চিত হইয়া একমাত্র স্ত্রীত্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবলমাত্র বিশেষ করিয়া স্ত্রীজাতির কাজগুলি ছাড়া আর কিছুই করিবার অধিকার, যোগ্যতা বা সুবিধা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার মধ্যে সাধারণ মনুষ্যত্বের উপযোগী কোন গুণের চর্চ্চা দেখিলেই পুরুষের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, বুঝিবা তাঁহার নারীত্ব সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল! তাঁহারা যেরূপভাবে নারীকে গড়িয়া আসিতেছেন, তাহা ছাড়াও তাঁহার অন্যরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নতুবা নারীর দেহের গঠন যেমন বদলাইতে পারে না, মনের সম্বন্ধেও যদি সেইরূপ নিশ্চিন্ত ভাব থাকিত, তাহা হইলে এরূপ ভয় পাওয়ার কোন কারণ থাকিত না।

বাস্তবিক পুরুষের ভয় পাইবার কার

তাঁহারা এ পর্য্যন্ত নারীকে যে ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতেছেন, তাহার অধিকাংশই কৃত্রিম। নারী কেবলমাত্র স্ত্রী-জাতীয় জীব নহেন, মনুষ্যও বটে। তাঁহার সেই অংশ সম্পূর্ণ চাপা পড়ায় তাঁহার স্বভাবই বিকৃত হইয়া গিয়াছে। পুরুষকে যদি এতকাল কেবল পুরুষমাত্র হইয়া স্বামী, পিতা ইত্যাদির কর্ত্তব্যগুলি পালন করিয়াই থাকিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার দশাটা কেমন হইত মনে করিয়া দেখিলে হয়। মনুষ্যত্বের সকল অংশই তাঁহারা একচেটিয়া অধিকার করায় নারী তাঁহার বিশেষ কার্য্যগুলি ভিন্ন কিছু করিতে গেলেই পুরুষের কার্য্য করা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেগুলি কাহারও ইজারা-করা নহে, মনুষ্যমাত্রেরই তাহাতে সমান অধিকার। সেই সাধারণ মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিয়াও পুরুষ যখন এ-পর্য্যন্ত পুরুষই আছেন, তখন নারীর সম্বন্ধেও ভয় পাইবার কারণ নাই। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিলেও নারী নারীই থাকিবেন।

এই প্রসঙ্গে উভয়ের শিক্ষা, দীক্ষা, সুবিধা, অধিকারের মধ্যে গুরুতর বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়া উভয়েরই যে কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা মনে না আসিয়া যায় না। পুরুষ-নারীর মধ্যে কেবল তাহার চর্চ্চাই হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের একান্ত সাধনা-সত্ত্বেও বুদ্ধি, বিবেচনা, শিক্ষা ইত্যাদি সাধারণ মনুষ্যোচিত সমস্ত গুণগুলিই বাদ পড়ায় সেগুলিও সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই।

এদিকে নারীর দাবী ও অধিকার হইতে পুরুষ আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া স্বাধীন মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাহাতেও ফল হইয়াছে এই যে, বুদ্ধি-বৃত্তির এত চালনা-সত্ত্বেও পূর্ণ মনুষ্যত্ব-লাভ তাঁহারও ভাগ্যে অল্পই ঘটিয়াছে। কখনও কখনও তিনি নারীকে বন্ধন-জ্ঞানে সংসার হইতে একান্ত মুক্ত হইয়া ধর্ম্মচর্য্যার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও প্রকৃতির একান্ত বিরোধী হওয়ায় সাধারণতঃ তাহা না পারিয়া নিজেদের জন্য একটী স্বতন্ত্র সুবিধাজনক নৈতিক আদর্শ খাড়া করিয়াছেন। তাহাতে নারীর সহিত সম্বন্ধটাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া অন্য নানা বিষয়ে আপনাদের বুদ্ধি-বৃত্তি চালনা করিয়াছেন। ইহাতে হইয়াছে এই যে, তাঁহাদের বুদ্ধি নক্ষত্রলোকের সন্ধানে ব্যাপৃত হইলেও প্রকৃতির একটী প্রধান বৃত্তি, উপযুক্ত ব্যবহারের শিক্ষা না পাইয়া, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের সংস্কার তাঁহাদের এ পর্য্যন্ত বর্ব্বর যুগের অবস্থা হইতে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বাস্তবিক নারীকে অস্বীকার করিতে গিয়া তাঁহাদের বড়ই মুস্কিল হইয়াছে। Marcus Aurelius এর কথায় তাঁহাদের অবস্থা "Either uneasy without them or imtemperate with them."

নারীকে বাদ দিতে গিয়াই নারী তাঁহার বন্ধনের কারণ হইয়াছে। নতুবা উভয়ে মনুষ্যত্ব লাভের তুল্য সুযোগ পাইলে এবং উভয়ের প্রতি উভয়ের দাবী ও অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত হইলে নারীই তাঁহার প্রকৃত মুক্তি ও মনুষ্যত্ব লাভের সহায় হইতে পারে। নারীই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সংযমন-শক্তি, নারীকে অস্বীকার করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা ও সর্ব্বনাশ হইতে কে তাঁহাকে রক্ষা করিতে

পারে? নারী পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান স্থিতিশক্তি বলিয়াই এত বন্ধন-সত্ত্বেও তিনিই তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। নারীর অবমাননা ঘটিলেই তিনি তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠেন। ইহা প্রকৃতির অমোঘ প্রতিশোধ মাত্র।

বাস্তবিক সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিলে প্রকৃতির ব্যভিচার করিতে গিয়া মানুষের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, সহজেই তাহা চোখে পড়ে। বুদ্ধি, ধন, বংশ-গৌরবে যাঁহারা সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশেরই ভিতরকার খবর সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সমাজ নিছক পুরুষের সমাজ, ইহাতে নারীর কোন স্থানই নাই, (যদি থাকে, তাহাও বিশেষ লোভনীয় নহে); সুতরাং পুরুষ আপনাদের মধ্যে ব্যবহারে কাজ-কর্ম্ম, বুদ্ধি, ভদ্রতা ইত্যাদির পরিমাপ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, নারী-ঘটিত সংস্কারটী তাঁহাদের বিশেষ স্পর্শ করে না, সুতরাং খবর লওয়া তাঁহাদের কাছে অনাবশ্যক। বড় জোর ঐ বিষয়টী তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কৌতুক ও পরিহাসের কারণ মাত্র হইতে পারে, এবং অনেকেই তাহা লইয়া বেশ একটু আমোদও অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা আমোদ বোধ করিলেও প্রকৃতি ভুলিয়া থাকেন নাই। তাই এরূপ লোকের স্থান পুরুষের গড়া সমাজে যত উচ্চেই হউক না কেন, মনুষ্য-পর্য্যায়ে তাঁহাদের স্থান যে কোথায়, তাহা তাঁহারা যে-সকল স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে দিন কাটান, তাহা দেখিয়াই নির্ণীত হইতে পারে। সমাজ কেবল ঐ স্ত্রীলোকগুলি-কেই পঙ্কের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফলে নিজেদেরও সেইখানে আসি[illegible] কাদা মাখিতে হইয়াছে। দুইজনের [illegible] বিভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করিতে যাওয়ায় এমন[illegible] বিড়ম্বনা!

অনেক বলেন, নারী চরিত্র-হীন হইলে [illegible] মন্দ হয়, পুরুষ সেরূপ হয় না। কিন্তু তাহা[illegible] সামান্য স্খলন হইলেই আর কোন পথ [illegible] রাখিয়া তাহাকে পাপ-পঙ্কে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। শিক্ষা, সম্মান দূরে থাকুক, এমন কি সে নারী[illegible] জীবিকা-নির্ব্বাহেরও আর কোন উপা[illegible] রাখা হয় না। এমন অবস্থায় সে মন্দ না হইয়া আর কি হইতে পারে, কল্পনা ক[illegible] দুঃসাধ্য। কিন্তু সমাজের শীর্ষস্থানীয় পুরুষে[illegible] শিক্ষা, সম্মান, বংশ-মর্য্যাদার সকল সুযোগ পাইয়াও যে ভিতরের প্রকৃতিতে তাহাদের সমান স্তরে থাকিয়া যান, ইহাই আশ্চর্য্য!

এক-তরফা নৈতিক আদর্শ সৃষ্টি করিতে গিয়া পুরুষ নিজে ত ডুবিয়াছেই, নারীকেও ডুবাইয়াছে। কারণ নারীর সম্বন্ধে শাসন যতই কঠোর হউক না কেন, নারী না হইলে পুরুষের দুষ্প্রবৃত্তির চর্চ্চাও হইতে পারে না। সুতরাং নারীকে তাহার দুষ্প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইতেই হইয়াছে। বাস্তবিক নারীর প্রতি পুরুষের দাবী অদ্ভুত বটে! স্ত্রী-হিসাবে তাহার অকলঙ্ক বিশুদ্ধতাও চাই, আবার তাহাকে নরকে ডুবাইয়া দুষ্প্রবৃত্তির ইন্ধনও চাই! সকল দিকে আপনার স্বার্থ ষোল-আনা বজায় রাখিবার বেশ কৌশল খেলা হইয়াছে!

আগে শুনিতাম, প্রাচীনেরা বলিতেন, নারীর দুষ্প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল, সুতরাং তাহাকেই সবিশেষ শাসনে রাখা উচিত। এখন

শুনিতেছি, পুরুষেরই ঐ সংস্কারটী অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে অতটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম খাটিতে পারে না! ফল এরূপ গুরুতর না হইলে কথাগুলি বিশেষ কৌতুকজনক হইতে পারিত বটে। কিন্তু পুরুষের ঐ সংস্কারটীর বাস্তবিকই যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তাহা তাহার কৃত কর্ম্মেরই ফল। কারণ নারীকে অস্বীকার করিয়া তিনি ঐ প্রবৃত্তির সংস্কার, সংযমের অভ্যাস কখনই করেন নাই। যে পুরুষ বুদ্ধি, বিদ্যা ও প্রতিভা-বলে বিজ্ঞান, কাব্য, কলাদির এত উচ্চ শিখরে উঠিতে পারিয়াছেন, তিনি যে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিলে মানুষের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য আপনার শরীর-মনকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখা—তাহাতে অসমর্থ হন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। এ বিষয়ে একান্ত অবহেলার দ্বারা বিকৃত সংস্কারের সৃষ্টি না করিলে বাহিরে এত সৌন্দর্য্য ও আর্টের চর্চ্চা করিয়া তাহার সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র নিজ জীবনে তাহার বিকাশ করিবার চেষ্টায় কখনই পরাঙ্মুখ হইতে পারিতেন না। বাস্তবিক ধর্ম্ম ও নীতির দিকের কথা আপাততঃ না বলিলেও জীবন-যাত্রাতেই যদি আর্টকে অস্বীকার করা যায়, তবে তাহার স্থান আর কোথায় থাকে? এ-বিষয়ে প্রচলিত সাহিত্যের রুচি যে কেমন বিকৃত, তাহা একটু দেখিতে গেলেই ধরা পড়িবে। এখনকার উচ্চশ্রেণীর realistরা নায়িকাকে যেখানে ভাল রংয়ে দেখাইতে চেষ্টা করেন, সেখানে তাহাকে একেবারে কোন সত্য পাপের মধ্যে ফেলিতে সঙ্কুচিত হন। তাহাতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিতে (Aesthetic sense) আঘাত লাগে। কিন্তু নায়কের সম্বন্ধে—তাহাকে যতই মহৎভাবে দেখান, তাহাকে নানারূপ পাপ ও পতনের মধ্যে ফেলিয়া,—তাহা না হইলে যেন তাহার জীবনের পূর্ণতালাভ হইতেই পারিত না,—এইরূপ ভাবে দেখানো হয়। ইহাতে তাহার জীবনটাও যে ঠিক সেই রূপই মলিন হইয়া সৌন্দর্য্যানুভূতিতে আঘাত দিতে পারে, তাহা তাঁহাদের একদেশদর্শী বিকৃত রুচি বুঝিতে দেয় না! কোন কোন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তি আপনাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়াও মহৎ হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই, পাপপঙ্কে নিমগ্ন হওয়া একটা মহত্ত্ব-লাভের উপায় হইতে পারে না। তাঁহারা তাহা সত্ত্বেও মহৎ হইতে পারিয়াছেন, তাহার জন্য নহে। আর তাঁহাদের মহত্ত্বের মধ্যেও সব-দিক যে সমানভাবে পূর্ণ ও মহৎ ছিল না, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। এমন কি তাঁহারাও অনেক সময়েই পূর্ব্বজীবনের কাদার ছাপ শরীর ও মন হইতে কখনই সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারেন নাই। আর প্রত্যেককে প্রত্যেক বিষয়ে আপনার শরীর-মন দিয়া সব পরীক্ষা করিয়া করিয়া লওয়াই যদি অভিজ্ঞতা ও পূর্ণতা-লাভের একমাত্র পথ হয়, তাহা হইলে ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি কিছুরই কোন আবশ্যকতা থাকে না। মনীষীদের জ্ঞান সঞ্চয় ও লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যই ত এই যে, তাঁহাদের ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে। ভবিষ্যৎ নর-নারীরা উত্তরাধিকার-সূত্রেই তাহা পাইয়া আপনাদের জীবন অনেক অযথা দ্বন্দ্বে সংঘর্ষে ক্ষয় ও নষ্ট না করিয়া

পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার অধিকতর সুযোগ লাভ করিতে পারে। বাস্তবিক পুরুষ, নারী—সকলের ক্ষেত্রেই জীবনের এক সময়, এক অবস্থা দুইবার আসিতে পারে না। যিনি যত বড় কবি বা সাহিত্য-রসিক ইত্যাদি হউন না কেন, তাঁহার তৃতীয়, চতুর্থ প্রণয় কখনই প্রথম হইতে পারে না। ইহা অঙ্কশাস্ত্রেও যেমন, জীবনেও তেমনি সত্য।

নারীজাতির মনুষ্যত্ব-লাভের কথা হইলেই এ বিষয়গুলি মনে না আসিয়া থাকিতে পারে না। কারণ পুরুষ স্বামী-হিসাবে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দাবী ও অধিকারের যে অবমাননা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বাগ্রে লাভ করা আবশ্যক। এদিকে আবার পুরুষের দুষ্প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইবার জন্যও যাহাদের নরককুণ্ডে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদেরও উদ্ধার হওয়া দরকার। দুইটীই পরস্পর-সাপেক্ষ, একটী ছাড়িয়া অপরটী হইতে পারে না। বাস্তবিক নারীদিগের মনুষ্যত্ব স্বীকৃত হইলেই তাঁহাদের স্বামীর প্রতি সমান দাবী, অধিকার এ বিষয়ে দিতেই হইবে। আবার তাঁহাদের কেবল দুষ্প্রবৃত্তির খোরাক যোগাইবার জন্য ক্রীতদাসী করিয়া রাখাও চলিবে না। অর্থাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটিলেই মার্কা-মারা না করিয়া মনুষ্যজীবনের উপযুক্তভাবে রুচি, যোগ্যতা ও সামর্থ্য-অনুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহ ও জীবন-যাপন করিবার সুযোগ, সুবিধা তাঁহাদেরও ঠিক সমানভাবেই দিতে হইবে; এবং এই ব্যাপার লইয়া মনুষ্য-সমাজের স্কন্ধে নারীর অপমানের উপর প্রতিষ্ঠিত বিষম স্বকৃত পাপের বোঝা লইয়া যে বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে, তাহা সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে। নতুবা নারীর শিক্ষা বা স্বাধীনতার কোন অর্থই দেখিতে পাওয়া যায় না।

বঙ্গনারী।

শেরী

সুন্দরী সে নামটি 'শেরী', বেদুইনের মেয়ে
রূপের কমল উঠলো যেন আগুন থেকে নেয়ে।
চাঁদ-কপালে থাক্ দিয়ে ওই উড়ছে কাল চুল,
গোলাপবাগে চরতে এলো, কোকিল করে ভুল।
খলিফাদের ছাউনি চেয়ে চাউনী তাহার দামী,
'জুনো'র ছবি প্রাণ পেয়ে আজ আস্‌লো যেন নামি'।
স্বাধীন সরল দস্যুবালা ফণির মাথায় মণি
ভাগ্য কাহার করবে উজল, যাপছে দিবস গণি'।

যুবক 'ইরাক' দস্যুনেতা উটের পিঠে ঘর,
দিল-দরিয়া দেমাক ভরা, নাইক বুকে ডর।
গভীর রাতে মরুর সাগর একলা সে দেয় পাড়ি,
দৌড়ে তাহায় উট্‌পাখীরা লজ্জাতে যায় হারি'।
ভোর বেলাতে উষ্ট্র চেপে চলছে কত লোক,
হঠাৎ তাহার ঠেক্‌লো আজি 'শেরী'র চোখে চোখ।
চম্‌কে যেমন তাহার পানে চাইলে যুবা ফিরে,
জয়-পত্র লট্‌কালে প্রেম আর্‌বী ঘোড়ার শিরে।
জ্যোচ্ছনাতে সেই পথেতে ইরাক ফেরে রোজ,
সেই দুটী চোখ্ কোথায় গেল পায়না তাদের খোঁজ,
চক্ষু সেকি ?—একটা গোটা স্নিগ্ধ মরুস্থান,
গোলাপ ফোটে, হরিণ চরে, কপোত করে স্নান!
আন্‌মনা সে বেড়ায় ঘুরে, নাইক কোন কাজ,
শালের খুঁটা সারঙ হ'ল চোখের ঘায়ে আজ।
দিবস নিশি কোন্ রাগিণীর অন্বেষণে চলে,
দীপক যে যায় বেহাগ হয়ে নয়ন-জলে গলে'।
কোথায় 'শেরী' কোন্ সুদূরে বিরাট মরুর কোণে,
ইরাকের সে প্রণয়-গীতের রেশটি বুঝি শোনে।
মরুর শেরী, আজ দেওয়ানা, জোচ্ছনারি রাতে—
নিদ্রা তাহার আর আসে না ডাগর আঁখি-পাতে।
সান্দ্র মরু চন্দ্রালোকে কালো মেঘের ছায়া,
ঘনায়ে তার বক্ষে আনে অচেনা কোন্ মায়া,
ব্যাকুল হয়ে উধাও সেযে মেঘের পিছে ধায়—
উষ্ট্র চেপে গান গেয়ে তার বুকের বঁধু যায়।
পাঁচটি গোটা ইদ্ মহরম্ আস্‌লো গেল ফিরে,
হঠাৎ দেখা দুই জনাতে 'ইউফ্রেতিসে'র তীরে।
কাটাকাটি চল্‌ছে ভীষণ দুই বেদুইন দলে,
লুটায় কত মুমূর্ষু প্রাণ পাণ্ডু ধরাতলে।
উষ্ট্র চ'ড়ে আহ্লাদেতে আস্‌ছে কে সর্দ্দার
জিৎ যে আজি তাহার দলের অন্য দলের হার।
এনেছে হায় বন্দী ক'রে পাগলী না এক হুরী,
মরু তাহার ঠাঁই নহেক হারেম তাহার পুরী।

করলে হাজির গৌরবেতে সর্দ্দারেরি কাছে—
সুর্ম্মা-আঁকা সেই সে আঁখি আজ্‌কেও, যে আছে!
শত্রু হাতে পড়ার ভয়ে বিষ করেছে পান,
অলস আঁখি জানিয়ে দিলে মিলন অবসান!
শুষ্ক কঠিন 'কারবালা'রি শোকের ভূমে আসি'
পিপাসু হায় বক্ষ অধর রইলো উপবাসী।
ইরাক পিয়ে সেই নয়নের নূতন ঢালা বিষ,
আজও মরুর ঝড়ের মত ফির্‌ছে অহর্নিশ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

(৪)

তিনটে পথতো ঘুরে আসা গেল। পথশ্রমই সার হলো—আসল গম্যস্থানের নিশানা মিলল না।

প্রথমটা সহযোগের পথ! এই পথের পথিকেরা যাঁদের সহযোগী, তাঁরা সত্য সত্যই কিছু আর যোগী নন; নিষ্কামভাবে ভারতবর্ষীয়দের স্বারাজ্য-সিদ্ধির সাধনা করতেই এই পুণ্যভূমিতে শুভাগমন করেন নি। তাঁদের আসল সাধনা নিজেদের অষ্টৈশ্বর্য্য সিদ্ধি। তাঁদের সহযোগীদেরও এই সাধনারই উত্তর সাধকতা করতে হবে—জ্ঞাত-সারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক। তাঁরা যদি মনে ঠিক দিয়ে বসে থাকেন যে, দোহারকি (Diarchy) দ্বারা কালক্রমে অধিকারী মশায়ের পদলাভ করবেন, তাহলে তাঁদের সাধের মানব-জন্ম দোহারকি করেই কাটাতে হবে। আমাদের সদা-সপ্রতিভ অধিকারী মশায় এ আসরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা গাইতে এসে বীর হনুমানের নামটা ভুলে বসবেন এবং দায়ে পড়ে "আজ হতে হোলো ভাগ সমান সমান" এই ধুয়া ধরবেন, সে আশা বিন্দুমাত্র নাই। অধিকারী-মশায়কে মহাবীরজির নাম ভুলিয়ে দেওয়ার দাওয়াই যে কিছু নাই, এমন নয়, তবে সেটা, আর যাই হোক, সহযোগিতা নয়। "ভবতি বিজ্ঞতম ক্রমশো জনঃ" শ্লোকটা উদ্ভট হ'লেও কথাটা উদ্ভট নয়। কিন্তু ওটা সত্য, জন বা মানুষের বেলায়,—অমানুষ বা কলের পুতুলের বেলায় নয়। তা নইলে এ বিজ্ঞতাটুকু তাঁরা অনায়াসে লাভ করতে পারতেন—তাঁরা যে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে, "তোমার চরণে আমারি পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি, সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী"

এই কীর্ত্তনের তুক্ গেয়ে বেড়াচ্ছেন, বরাবর যদি ঠিক সেই ভাবেই চলতেন তাহলে তাঁদের অতি সাধের ডায়ার্কির দিল্লীর লাড্ডু-লাভটাও অদৃষ্টে ঘটত না।

সাবেক কালের কংগ্রেসের লক্ষ্য যদিও ছিল সহযোগিতা, কিন্তু সেটা ছিল প্রতিকূল সহযোগিতা। সেকালে কংগ্রেসের সাম্বৎসরিক কোরাস গানটা যদিও আসলে ভিক্ষার গান কিন্তু তার সুরটা ঠিক ব্যুরোক্রেসীর শাসন-চক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনির সঙ্গে মিল করেই রচিত হয়নি। কোরাস গানের পাকা সমজদার ইংরেজ গানটাকে তেমন ভয় করেনি, যেমন করেছিল কোরাসটাকে। সেইজন্য কোরাসটা ভেঙ্গে দেবার জন্য ছলে বলে-কৌশলে বিধিমত চেষ্টা করেছিল। কোরাসটা বাঁধা থাকলে সুরটা ও গানটা বদলাতে বেশীদিন লাগে না, ইংরেজ তা বেশ ভালই জানে। সুরটাও ক্রমশঃ দীপক রাগিণীর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। কাজেই ইংরেজ বুঝলেন, গাইয়েদের রসনাগুলিকে ব্যাপৃত রাখার জন্য এমন একটা জিনিষের সৃষ্টি করা দরকার, যা চিবিয়ে গলাধঃকরণ করে হজম করার যো নাই অথচ বাইরে থেকে চেটে চুটে একটু আধটু রস পাওয়া যেতে পারে। কাজেই বহু গবেষণা খরচ করে এই ডায়ার্কি জিনিষটার সৃষ্টি হলো। কেবল কংগ্রেসের কোরাস গান নয়, স্বদেশী হাঙ্গামার সময়ের "রসগোল্লা"রও বোধ হয় এই—বদান্যতার ব্যাপারে একটু হাত আছে।

যাই হোক সহযোগীরা খোষ-মেজাজে বাহাল তবিয়তে দিল্লীর লাড্ডু চাটতে থাকুন। অসহযোগ-আন্দোলন আর কিছুদিন চললে, আরও কিছু কিছু রসাল জিনিষ তাঁদের অদৃষ্টে আছে—এ কথা নিশ্চয়। কিন্তু তাঁরা যেন স্বপ্নেও মনে না করেন—এ সব তাঁদের বৈধ আন্দোলনের (constitutional agitation) ফল। গাঁটছড়া বাঁধার পর হতে তাঁদের constitutional agitation রীতিমত দাম্পত্য-কলহের সামিলই হয়ে পড়েছে। আবদার রক্ষা না হলে তাঁরা যখন ঘর-সংসার ফেলে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ভয় দেখান, ইংরাজ পাকা গৃহিণীর মতো মুখে ভাবনার ভাব দেখালেও মনের মধ্যে মুখ টিপে টিপে হাসেন। বেশ জানেন, পোষ-মানা প্রাণীটি যথাসময়ে সুড়সুড় করে ফিরে এসে অভ্যস্ত বোঝাটি ঘাড় পেতে নেবেন। পাঞ্জাব বিভ্রাটের রেজোলিউসনটি লাটসাহেব নাকোচ করে দেওয়ার পর শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মশায় এইরূপ সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প করেছিলেন। পরে কি হলো সে কথা সকলেই জানেন। এই তো গেল সহযোগের পথের কথা।

দ্বিতীয়টা হলো উৎপাতের পথ। সমস্ত দেশের লোককে হাত পা চোখ বেঁধে টেনে হিঁচড়ে ভয় দেখিয়ে স্বরাজ-ধামে উত্তীর্ণ করে দেওয়া, এই পথের পথিকদের লক্ষ্য! এটা যে স্বাধীনতা লাভের পথ নয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয়টা হলো মহাজনের পথ অর্থাৎ যুদ্ধের পথ। কিন্তু এ পথ আমাদের পথ নয়। আমাদের ঢালও নাই খাঁড়াও নাই, সুতরাং সর্দ্দারীর আশাটা পোষণ করা—সখের দুঃখ ডেকে আনা মাত্র। আর যদি কোনও গতিকে ঢাল খাড়া জুটেই যায়, তাহ'লে আমরা ক খ শিখতে না শিখতে যারা

এখন যুদ্ধবিদ্যায় সার্ব্বভৌম পণ্ডিত, তারা আরো এতদূর এগিয়ে যাবে যে, তাদের নাগাল পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে, নিছক দৈব কৃপা ভিন্ন। আর দৈব যদি অত সদয়ই হন, তাহলে যুদ্ধের জন্য ছেলেমানুষী চেষ্টার ছটফটানি ছেড়ে আরামে নিদ্রা দেওয়াই প্রশস্ত। তাতে নিদ্রার সুখ ও স্বাধীনতা লাভের সুখ—দুই সুখই লাভ হবে। তাছাড়া আরো একটা ভাবনার কথা আছে। যাকে পথের সঙ্গী করবে, সে তোমার চিরদিনের ঘরের সঙ্গীও হয়ে উঠবে, এইটেই সাধারণ নিয়ম। End justifies means থিওরিটার বিপদই ঐখানে। যে অন্যায়কে তুমি উপায় বলে বরণ করবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও সে তোমার সঙ্গে-সঙ্গেই লেগে রইবে। এই বরণ করা মানেই ন্যায়ান্যায়ের পার্থক্য বোধের তীব্রতাকে কতকটা ভোঁতা করে ফেলা। যুদ্ধের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ হলে সেই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই আবার যুদ্ধের কায়েমী আয়োজন করে রাখা দরকার হয়ে পড়ে। কেবল আয়োজন মাত্র নয়—আর কে কি করছে তার গুপ্ত সন্ধান রেখে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আয়োজন! তার পরে আবার অস্ত্র-শস্ত্রগুলোতে মরচে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে মাঝে মাঝে সেগুলির একটু আধটু ব্যবহারের বন্দোবস্ত করাও দরকার হয়ে পড়ে। রইলো আর সব কাজ শিকেয় তোলা, কেমন করে দেশটা রক্ষে হবে সেই ভাবনাটাই ভূতের মতো পেয়ে বসল! অথচ যা সব থাকলে দেশটা রক্ষা করার যোগ্য হয়ে ওঠে—সে দিকে বিশেষ আর নজর রইল না। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, এ ছবিটা একেবারেই অতিরঞ্জিত নয়। অন্যে পরে কা কথা, স্বাধীনতার লীলাভূমি আমেরিকাও যেরূপ প্রচণ্ড উদ্যমে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুতের কাজে লেগে গেছে, তাতে যুদ্ধ জিনিষটাকে আর কোনও রকমে একটুও প্রশ্রয় দেওয়া মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কারণ বলে মনে করতে পারিনে।

তিনটে পথই তো নাকোচ করে দেওয়া গেল, এখন উপায়! তবে কি চিরদিনই এম্‌নি চলবে?

দীন প্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণ ভার;
এই চির পেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার,
মনুষ্য-মর্য্যাদা গর্ব্ব চিরপরিহার!

এ তো হ'তেই পারে। কেন হতে পারে না, জিজ্ঞাসা করলে আমার একমাত্র সোজা উত্তর এই—আমার বিশ্বাস তাই। আমার এই বিশ্বাসের কারণ কি—মূল কোথায়—ভিত্তি কোন্‌খানে? সব জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন, সব অনুমান সিদ্ধান্ত উপপত্তি যার উপরে ভর্ করে দাঁড়িয়ে আছে সেইখানে, অর্থাৎ বিশ্বাসে। আমার বিশ্বাস

ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাত-কালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্ম্মধামে। দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতি-পথে বাধা
আচারে-বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।

সমস্ত তিমির
ভেদ করি দেখিতে হইবে ঊর্দ্ধশির
এক পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে অনন্ত ভুবনে।
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে
"ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মত।"

এত দুঃখ দৈন্য দুর্গতি অপমান অবসাদ লজ্জার মধ্যে সহস্রের ভ্রূকুটির নীচে কুব্জপৃষ্ঠ নতশিরের অন্তরের মধ্যে এ বিশ্বাস এখনো অটুট আছে—কিসের জোরে?

'তব চরণের আশা ওগো মহারাজ
ছাড়ি নাই। এত যে হীনতা এত লাজ,
তবু ছাড়ি নাই আশা। তোমার বিধান
কেমনে কি ইন্দ্রজাল করে যে নির্ম্মাণ
সঙ্গোপনে সবার নয়ন অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার নির্দ্দিষ্টকালে
মুহূর্ত্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে
চির প্রতীক্ষিত চির সম্ভবের বেশে।
আজ তুমি অন্তর্য্যামী এ লজ্জিত দেশে
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হয়ে,
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ
আমি ছাড়ি নাই আশা ওগো মহারাজ।

এই যে আশা, এ যদি স্বদেশ-প্রেমিক কবির প্রবল গভীর দেশানুরাগের মিথ্যা আশ্বাস মাত্র হয়? তেমন তো হতে পারে। কিন্তু কবির ভাব-প্রবণ অন্তরই এর একমাত্র সাক্ষী নয়, বাইরেও প্রচুর এবং প্রবল প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাও এই উদার আশা বুকে ক'রে কোন্ সুদূর অতীত হতে যাত্রা ক'রে নানা ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এক মহাপরিণাম এক বিপুল চরিতার্থতার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। "অতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের এক একটী অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপ মাত্র নহে—ইহারা পরস্পর গ্রথিত—ইহারা কেহই একেবারে স্বপ্নের মতো অন্তর্ধান করে নাই, ইহারা সকলেই রহিয়াছে। ইহারা সন্ধিতেই হউক সংগ্রামেই হউক ঘাত-প্রতিঘাতে বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব্ব বিচিত্র রূপে সংরচিত করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোনও দেশেই এত বড় বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই—এত জাতি, এত শক্তি, এত ধর্ম্ম, কোনও তীর্থস্থানেই একত্র হয় নাই, একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। আর সর্ব্বত্র মানুষ রাজ্য বিস্তার করুক—ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এককে ব্রহ্মকে জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্ম্মশালার কঠোর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্ম্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক্—ভারত-ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে।" আজ সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ দ্বন্দ্ব বিরোধ বিদ্বেষের বিষে জর্জ্জর হয়ে যে পরম শান্তি-সুধার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, সেই অমৃত ভারতের তপোবনের উদার বাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ভারতবর্ষ আপনার অজ্ঞাতসারে সেই অমৃত-ধারা

আপনার গোপন প্রাণের গভীরতার মধ্যে ফল্গুধারার মতো বহন করে চলেছে। সে ধারা যে আজও শুকায়নি লোপ পায়নি তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। সেই তপোবনের অমৃত বাণীই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভাবসঙ্গীত-সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তিতে এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে কর্ম্মমঙ্গল-প্রেমময়ী মূর্ত্তিতে আপনাকে অভিব্যক্ত ক'রে তুলেছে। রবীন্দ্র নাথ ও গান্ধীর উদ্ভব অন্ধ নিয়তির আকস্মিক খেলামাত্র নয়। কোটি কোটি মানুষ যেমন আপনাদের ব্যক্তিগত সংকীর্ণ সুখ-দুঃখের চৌহদ্দির মধ্যে আপনাদের ক্ষণিক খেলা খেলে ঝরে পড়ে, এঁরা সেরূপ ব্যক্তি মাত্র নন। ভারতের সমস্ত অতীত সাধনা শিক্ষা তপস্যা মানুষের সুদূর ভবিষ্যতের আহ্বানে এঁদের মধ্যে মূর্ত্তি ধরে উঠেছে। যে জাতির মধ্যে এমন অলোক-সাধারণ অনুভূতির আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে, সে জাতি বাইরে যতই জীর্ণ অবসন্ন মৃতপ্রায় হোক না কেন, তার গভীর প্রাণের নিভৃত স্তরে এমন এক চির-জীবনের নির্ঝর এখনো বিদ্যমান আছে—যারা শক্তি-দম্ভের তীব্র মদিরার উচ্ছল ফেন-রাশিকে জীবনের লীলা বলে ভুল করে, তাদের মধ্যে সেই অমরত্বের অক্ষয় পাথেয় নাই।

যুগযুগান্তর ধরে এক পরম লক্ষ্য অনুসরণ ক'রে যে বিপুল আয়োজন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে সেতো আর বালিকার উদ্দেশ্যহীন খেলাঘর মাত্র নয়। সুতরাং যুগ-যুগান্তের মহাবিধানকে সার্থক করার জন্য এ জাতিকে আবার জাগতেই হবে।

এ আশা যদি অন্ধ স্বদেশ-প্রেমের ছলনা মাত্র হয়, এ জাতি যদি নবীন প্রাণের গৌরবে আবার মহিমান্বিত হয়ে উঠতে না পারে, তাহলে আলো-বায়ু-রহিত সঙ্কীর্ণ কারা-প্রাচীর-বদ্ধ জীর্ণ মৃতপ্রায় ত্রিশ কোটি লোকের লাঞ্ছিত অপমানিত ধিক্কৃত জীবনের ঘন সন্নিবেশ হতে যে ভীষণ আধ্যাত্মিক মড়কের বিষের সৃষ্টি হবে, তার প্রভাবে সমস্ত মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন যে সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মানুষ আপনার ক্ষণিক শক্তি-দম্ভের মোহে আপনাকে যতই স্বতন্ত্র মনে করুক না কেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর নাড়ীর যোগ ছাড়িয়ে যাওয়া কারো সাধ্যায়ত্ত নয়। মানব-সভ্যতার এই দারুণ পরিণাম আমি কল্পনাও করতে পারিনে, বিশ্বাস করাতো দূরের কথা।

কিন্তু আশা যতই বলবতী মহতী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হোকনা কেন, সেটাকে বুকে পুষে ঘুমানো আশাটা পূরণ করার প্রকৃষ্ট উপায় নয়। "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।" ঘুমন্ত সিংহেরই যখন এই দুর্দ্দশা ঘুমন্ত শশকের দশা যে কিরূপ হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। ইতিহাসের নির্দ্দেশ ও বিধাতার বিধান যতই সুস্পষ্ট হোকনা কেন, তা আকাশ-কুসুমের ফলের মতো শূন্য হাওয়ায় আপনা আপনি ফলে উঠবেনা। সে সফল হয়ে উঠবে আমাদের মধ্যেই এবং আমাদের দিয়েই। সুতরাং আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে তুলে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে সফলতার সদুপায়টীকে অবলম্বন ক'রে এগোতে হবে।

অনায়াসেই তো সদুপায় কথাটা ব্যবহার ক'রে বস্‌লেম, কিন্তু কোন্ উপায়টা যে সদুপায় সেইটে ঠিক করাই মুস্কিল। যাহোক একটু চেষ্টা করে দেখা যাক্। উপায়টি যথার্থ সদুপায় কিনা সেটা ঠিক করতে হলে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটাকে ভাল করে বুঝে দেখা দরকার। পূর্ব্বে যেরূপ আভাস দিয়েছি, তাতে এবিষয়ে পাঠকদের কতকটা ধারণা নিশ্চয়ই জন্মেছে, তবুও আর একটু খুলে বলা মন্দ নয়। আমাদের আসল উদ্দেশ্য দু'টী। প্রথম, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বিধাতার যে পরম নির্দ্দেশ বহন করে আসছে তাকে সার্থক করে তোলা—অর্থাৎ অতিপ্রাচীন কাল হতে এ-পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে নানা উপলক্ষে নানা উদ্দেশ্যে নানা ঘটনায় যে বহুবিধ জাতি-ধর্ম্ম সভ্যতার একত্র সমাবেশ হয়েছে তাদের এক গভীর ঐক্য বন্ধনে বেঁধে মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলা। দ্বিতীয়,—ভারতের প্রাচীন তপোবনের যে শিক্ষা দীক্ষা তপস্যা এখনো আমাদের এই দেশব্যাপী বিস্তীর্ণ বালুকা-রাশির তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বয়ে যাচ্ছে তাকে ভাগীরথীর উদার ধারার মতো "স্বার্থদৃপ্ত লুব্ধ সভ্যতার" বিদ্বেষ-বিষ-জর্জ্জর মানব-সমাজের উপর বইয়ে দেওয়া। কিন্তু এই দুটী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের মনে প্রাণে চিন্তায় কর্ম্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া অত্যাবশ্যক। আমাদের চূড়ান্ত সম্ভাবনাকে আমাদের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজ, কংস-জরাসন্ধ অথবা যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র যাই হোক্‌না কেন, একথা নিশ্চিত, তাঁর আওতায় আমরা পলে পলে শীর্ণ হয়ে উঠছি। সুতরাং আমাদের তৃতীয় ও আপাততঃ মুখ্য উদ্দেশ্য এই আওতা দূর করা—অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বরাজ লাভ।

কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ স্বরাজ লাভ করলে চলবে না। আমাদের এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতি-সঙ্গত। আমি পূর্ব্বে বলেছি, উপায়টা ক্ষণিক পথের সঙ্গীমাত্র নয়। তার ছাপ চিরদিনের মতো মনের গায়ে লেগে থাকে। স্বরাজ যদি আমাদের আসল উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিঘ্ন হয়, মানব-জীবনের চরম চরিতার্থতা লাভের প্রতিকূলতা করে, তাহলে আমার নিকট সে স্বরাজের মূল্য কাণাকড়িও নয়। "রাজে'র লোভে 'স্ব'কে খুইয়ে বসার জন্য আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নাই। সুতরাং পথটা একটু ভালরকম যাচাই করে বেছে নিতে হবে।

কোন্‌টী যে পথ সে বিষয়ে পরে বলবো—কোন্‌টা যে পথ নয় সে কথাটা আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া মন্দ নয়। আমাদের যুগযুগান্তের সংস্কার-বশে এই পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে এত রকমের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যে, পুনরুক্তি দোষ স্বীকার করেও এ কাজ অনায়াসে করতে পারা যায়। তবে কোনও পাঠকেরই যে ধৈর্য্যচ্যুতি হবে না, এ কথা শপথ করেই বলতে পারি; কারণ এবারে যে কথাগুলি বলবো সেগুলি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের।

(১) বৈধ আন্দোলন বা Constitutional agitation এর পথ। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেন—

(ক) মনে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম যে ইংরাজ জন্মান্তরের সুকৃতি ও জন্ম-কালের শুভগ্রহ স্বরূপ আমাদের কর্ম্মহীন জোড়কর-পুটে আমাদের সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া দিবে।

(খ) শুধু কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা
চোখে কারো নাই নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে' বহে' নতশির। ইত্যাদি।

(গ) যাঁহারা পিটিশন বা প্রটেষ্ট, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ীর বাঁধা রাস্তাটীতেই ঘনঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে দলের লোক নই।

আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা দেশহিতব্রতীদের নায়কতা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা রাজ-পথের শুষ্ক বালুকায় অশ্রু ও ঘর্ম্ম-সেচন করিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

(ঘ) কেহ যদি দরখাস্ত কাগজের নৌকা বানাইয়া সাত সমুদ্র পারে সাত রাজার ধন-মাণিকের ব্যবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারো কারো কাছে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকার বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খরচ করিতে পরামর্শ দিই না।

(ঙ) বাঁধ বাঁধা কঠিন বলিয়া সে স্থলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অনুরোধ করা—কন্‌ষ্টিটিউসন্যাল অ্যাজিটেশন নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ বটে—কিন্তু সহজ উপায় নহে।

আর বেশী উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। যা তোলা গেল তাতেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন মডারেট মশায়রা যে পথ ছাড়া "নান্যেব নান্যেব নান্যেব গতিরন্যথা" মনে করেন, সেটাকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখেন।

২। উপদ্রবের পথ ঃ—

(ক) প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরিয়া তাহা সংক্ষেপ করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না কাজও নষ্ট হইবে।

(খ) বিধাতার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়—তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্য্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।

(গ) অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্ম্ম-সাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি, তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যাইবে। ন্যায়-ধর্ম্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে—কর্ম্মের স্থিরতা থাকে না—তখন বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম ব্যবহার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট-জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

(ঘ) প্রশস্ত ধর্ম্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা—তাহাই মানুষের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা; মানবের মনুষ্য-ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস।

যে কটী অংশ তোলা গেল তাতেই থেকে পাঠকেরা উৎপাতের পথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনের ভাব কিরূপ, তা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। যুদ্ধের পথ সম্বন্ধে তিনি স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলেননি—বোধ হয় কিছুমাত্র আবশ্যক মনে করেননি। কারণ, ইংরেজের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের কল্পনা—কল্পনারও নিছক বাজে খরচ। তাছাড়া আমি রবীন্দ্রনাথকে যেরূপ বুঝেছি

—তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই যে তিনি যুদ্ধকেও উৎপাতের সামিল বলেই মনে করেন—যদিও সভ্য সমাজ এই উৎপাৎটার ধোবা-নাপিত এখনো বন্ধ করেননি। কিন্তু যুদ্ধের পথ দিয়ে স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে তিনি স্বতন্ত্র-ভাবে কিছু না বললেও তাঁর মনের ভাব অগোচর থাকেনি। "এই প্রকারে—অত্যন্ত চিত্ত-বিক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর কোনও গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট ভাবিতেই চাহি না।"

স্বরাজ লাভের অপথ ও বিপথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি মত দেখা গেল—সুপথ সম্বন্ধেই বা তিনি কি বলেন, দেখা যাক্।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারতের প্রাচীন তপোবনের যে সনাতন ঋষিটী এখনো বসে তপস্যা করছেন তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে অনায়াসে বলে ফেললেন—একমাত্র সুপথ তপস্যা। রবীন্দ্রনাথের গোত্র-প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য ঋষিও বোধ হয় রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে এত অবলীলাক্রমে "তপস্যা" কথাটা উচ্চারণ করতে পারতেন না। অথচ রবীন্দ্রনাথ আজকের পৃথিবীতে নবীনদের মধ্যে নবীনতম। তাঁর অন্তরের মধ্যে নিত্য নবীনতার যে চিরন্তন নির্ঝর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মানুষের অদৃষ্টে তা কদাচিৎ ঘটে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা দ্বারা ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে, এবং তপস্যার ফলকে এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করিয়া দেয়। ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়।"

রবীন্দ্রনাথ যাকে তপস্যা বলেছেন চৌদ্দ বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধী ঠিক সেই পদ্ধতিকেই Soul purification বলে বর্ণনা করেছেন। আর শান্তি ও সংযম অর্থাৎ non-violenceএর ভিতরের তত্ত্বটী রবীন্দ্রনাথ যেমন সুন্দর ও বিশদভাবে বুঝিয়েছেন—তেমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" রবীন্দ্রনাথের শান্তি ও সংযমের কথায় দেশের লোক তাঁর উপর কিরূপ অশান্ত ও অসংযত ব্যবহার করেছিল তা অনেকেই জানেন। সুখের বিষয়, চৌদ্দ বৎসরে মানুষের মনোভাবের অনেক উন্নতি হয়েছে—তারা এখন মহাত্মা গান্ধীর non-violenceএর উপদেশ খুব সাদরেই গ্রহণ করেছে। খুব সম্ভব ধ্যানযোগী রবীন্দ্রনাথের ধ্যানলব্ধ সত্য সাধারণের উপলব্ধি-যোগ্য হওয়ার জন্য কর্ম্মের মধ্যে তার মূর্ত্তি পরিগ্রহের অপেক্ষা ছিল। মহাত্মা গান্ধী সেই অভাব পূরণ করে দেওয়ায় এত সহজে তা লোকের হৃদয় অধিকার করতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ তপস্যাকে একমাত্র পথ বলে নির্দ্দেশ করেই ক্ষান্ত হননি—সেই তপস্যা কি প্রণালী ও পদ্ধতি অবলম্বন করবে সে সম্বন্ধেও সবিস্তার উপদেশ দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর গোটাকতক উক্তি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

(ক) পদ্ধতি—"তাই বারম্বার বলিয়াছি

ও বারম্বার বলিব শত্রুতা বুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলি বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া (১) ঐ পরের দিক হইতে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখটাকে ফিরাও (২) আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটীর উপর নামিয়া আসে, তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, (৩) নানা দিগভিমুখী মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্ব্ব প্রকারে বাঁধিয়া ফেল (৪) কর্ম্মক্ষেত্রকে সর্ব্বত্র বিস্তৃত কর—এমন উদার করিয়া এতদূর বিস্তৃত কর যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে। (৫) আমাদের প্রতি রাজার সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু কখনই আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না—আমরা জয়ী হইবই—বাধার উপর উন্মাদের মত নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে—অটল অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ অতিক্রম করিয়া কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে, কার্য্যসিদ্ধির সত্য সাধনাকে দেশের মধ্যে চিরদিনের মত সঞ্চিত করিয়া তুলিব—আমাদের উত্তর পুরুষদের শক্তি চালনার সমস্ত পথ একটী একটী করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।

আজ ঐ যে বন্দীশালার লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে—দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে ইহাকেই অত্যন্ত বড় করিয়া জানিয়ো না। যদি কাণ পাতিয়া শোন, তবে কাণের মহাসঙ্গীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়।

টীকা—সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত আমার করা—উদ্দেশ্য, বর্ত্তমান আন্দোলনের অঙ্গগুলির সঙ্গে তার কেমন চমৎকার মিল আছে তাই দেখানো।

(খ) শক্তির কেন্দ্র—"আমার মনে সংশয় মাত্র নাই আমরা বাহির হইতে যত বারম্বার আঘাত পাইয়াছি সে কেবল সেই ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য।

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে ইহার নিকট আমাদের প্রার্থনা চলিবে। তখন আমরা যে যুক্তি প্রয়োগ করিব তাহাকে কার্য্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে।

এইখান হইতেই যদি আমরা দেশের বিদ্যাশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বাণিজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করি, তবে আজ একটা বিঘ্ন, কাল একটা ব্যাঘাতের জন্য যখন তখন তাড়াতাড়ি, দুই-চারিজন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টাউনহল মীটিং-এ দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না।

টীকা—রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান কালের কংগ্রেস অনেকটা পূরণ করেছে মনে হয়।

(গ) স্বদেশী—"আমরা সাধ্যমত বিলাতী পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিব—ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব, এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্ব্বে আমি লিখিয়াছিলাম—

"নিজ হস্তে শাক অন্ন তুলে দাও হাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা-বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
তাহে লজ্জা ঘুচে।"

(ঘ) সরকারী উপাধি—"দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারের দত্ত রাজা মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল।"

টীকা—কংগ্রেসে উপাধি বর্জ্জনের মন্তব্য গৃহীত হবার বহুপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ কেমন অবহেলায় 'সার' উপাধিটাকে ছেঁড়া চটিজুতার মতো গবর্ণমেণ্টের মুখের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, সেটাও স্মরণীয়।

(ঙ) দেশনায়ক—"আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যতশক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে তাহা ঐক্যবদ্ধ—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকান বাজার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া সর্ব্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব-আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে উহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা—তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।"

"দশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদ-বিবাদ করা যায়—দশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই।"

টীকা—রবীন্দ্রনাথের সমাজ-পতির আকাঙ্ক্ষা কেমন ভাবে মহাত্মা-গান্ধীর মধ্যে সফল হয়েছে সে কথা লেখা বাহুল্যমাত্র। সমস্ত দেশ তাঁকে দেশনায়ক বলে স্বভাবতই মেনে নিয়েছে। তবু এম্‌নি আমাদের দুর্ভাগ্য, যে সব অতিপণ্ডিত কেতাবী ডিমোক্রেশীর বাগ্বিতণ্ডাকে আসল কাজের চেয়ে বড় মনে করেন, তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব ক্ষুণ্ণ কবার জন্য দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ও মাসিক পত্রের বিবিধ প্রসঙ্গে নানাবিধ কলা-কৌশল বিস্তার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। জানি না, তাঁরা রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও আপনাদের স্বাধীনতার বড়-সমজদার বলে মনে করেন কিনা।

(চ) অর্থাগম—"সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্প পরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তাছাড়া প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্ম্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ মনে হয় না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না।

টীকা—কংগ্রেস এই উপায়টির প্রতি মনোযোগ দিলে বিশেষ উপকার হবে মনে হয়।

(ছ) পঞ্চায়েৎ—"ইংরেজের আইন আমাদের সমাজ রক্ষার ভার লইয়াছে।... পূর্ব্বকালে সমাজ-বিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। সেই রফা অনুসারে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত।

"যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিশম্যান ডাকিতে হয়—সেদিন আর পরিবার রক্ষার চেষ্টা কেন? সেদিন বনবাসই শ্রেয়।"

(জ) কংগ্রেসের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন—"যখন দেশের মনটা জাগিয়া উঠিয়াছে তখন দেশের কর্ম্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লইতে হইবে। এইরূপ শুধু নির্ব্বাচনের নহে, কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্‌সের কার্য্য-প্রণালীরও বিধি সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।"

টীকা—এতদিন পরে কংগ্রেস এই সত্য উপলব্ধি করেছেন।

(ঝ) হিন্দু-মুসলমান সমস্যা—"যে রাজ-প্রসাদ আমরা এতদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা যেন আমরা সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের সীমা যেখানে সেখানে পৌছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তি লাভ ব্যতীত লাভ নাই, এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে এক দেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্ম্মহানি এবং ধর্ম্মহানি হইলে কখনই স্বার্থরক্ষা হয় না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টায় মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।"

(ঞ) মাতৃভাষা—"ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর, পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর" ইহাতে আমাদের নানাকাজে যে কিরূপ অসঙ্গতি ঘটিতেছে, প্রতি প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্‌স্ তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ কনফারেন্স দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত অথচ ইহার ভাষা বিদেশী।"

টীকা—ঠিক এই মনোভাব হতেই মহাত্মা গান্ধী হিন্দীকে নিখিল ভারতের সম্মিলনের ভাষারূপে পরিণত করার জন্য এতটা ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন।

সার-সঙ্কলন—রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে এই লিখেছেন যে তার মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ অংশগুলি বেছে নিলেও একখানি স্বতন্ত্র বই হয়ে পড়ে। আমি আর একটী মাত্র অংশ উদ্ধৃত করবো—আমাদের কর্ত্তব্যের ধারা তাতে যেমন সুন্দর ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট হয়েছে, এমন আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

"অতএব এদেশের যে ধন লইয়া পৃথিবীতে তাঁহারা (ব্রিটীশ) ঐশ্বর্য্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন, সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাঁহারা তো আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থায় যে সংঘাত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে—তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। ইহার উপরেও যাঁহারা অনাহত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্ম্মের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন? কাজের কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব—কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিব না—দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের শক্তি অনুভব করিব, দেশের বিদ্যা-শিক্ষাকে স্বায়ত্ত করিব, সমাজকে দেশের কর্ত্তব্য সাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব;—

তাহা করিতে গেলে ঘরে পরে দুঃখ ও বাধার অবধি থাকিবে না। সে জন্য অপরাজিত চিত্তে প্রস্তুত হইব—কিন্তু বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে; তাহা সংযমীর দ্বারা যোগীর দ্বারা সাধ্য।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা হতে যে সব অংশ তোলা গেল, তাথেকে কারো বুঝতে বাকী থাকবে না, আজকের এই ভারতব্যাপী আন্দোলনের মর্ম্মগত সত্য ও তার সাধন-পদ্ধতি তাঁর মানস চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিল। কেবল মাত্র প্রবন্ধে নয় কাব্য নাটক ও উপন্যাসেও এই কথার প্রমাণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রায়শ্চিত্তের ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র যেন ভবিষ্য-গান্ধী চরিত্রেরই পূর্ব্বচর। নিখিলেশের চরিত্রে ধর্ম্মবেদনা, স্বাধীনতা-বোধ বিশেষতঃ non-violence এর যে মহত্তম আদর্শ ফুটে উঠেছে,—তা যেন কোনও সুদূর ভবিষ্য যুগের মহাসভ্যতার পৃষ্ঠা হতে উড়ে এসে পড়েছে। আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলনের নেতারা ঐ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেশের পরম উপকারে লাগবে। ঋষি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে যে সত্য ভাবরূপে আবির্ভূত হয়েছিল, মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে তাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। এইরূপই হয়ে থাকে। আর্য্যঋষিরা যে অহিংসা ধর্ম্মকে ভাবরূপে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই শাক্য সিংহের মধ্যে প্রাণের বাস্তবতা লাভ করেছিল। অদ্বৈতাচার্য্যের বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শই শ্রীচৈতন্যে রূপ ধারণ করেছিল।

একটা কথা উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সহযোগিতা-বর্জ্জনের কথা তেমন করে বলেন নি। একেবারে যে বলেন নি তা নয়। তিনি গবর্ণমেণ্টের দিক হতে মুখ ফেরাবার কথা নানাস্থানেই বলেছেন—ভ্রূকুটি-কুটিল ও ভিক্ষা-করুণ দুইরূপ মুখই। রাগের সহযোগিতা-বর্জ্জন নয়, সত্যকার সহযোগিতা-বর্জ্জনের মূলতত্ত্ব তিনি যেমন উপলব্ধি করেছেন এমন আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। এই দেখুন। "আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়াই লইতে হইবে। যে কর্ম্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে।" তবে এ কথা অবশ্য খুবই সত্য, 'না'র চেয়ে 'হাঁ'র দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। তাঁর অন্তর-প্রকৃতির গঠনই সেইরূপ। কিন্তু যেখানে 'না' বলা অপরিহার্য্য, সেখানে তাঁর চেয়ে জোরের সঙ্গে যে কেউ বলতে পারেন মনে হয় না। পাঞ্জাব উপদ্রবের সময় সে কথা ভালরূপেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম নন-কোঅপারেটর। অন্যায় ও অধর্ম্মের সঙ্গে কোনরূপ সংশ্রব রাখাই তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

'মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর! সেথায় যে পদক্ষেপ করে
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে
হোকনা সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই—দেবদ্রোহী বলে
সর্ব্বশক্তি লয়ে ঘোর!"
"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।"

এর পর কারো বোধ হয় বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারেনা যে, অন্যায়-কারী গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্রব রাখতে তিনি কাউকে উপদেশ দিতে পারেন না। তবে এই সংশ্রব-বর্জ্জন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে হয়, এই তাঁর মত। ওটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অসঙ্গত ও লজ্জাজনক। তাতে বিদ্বেষের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। বিদ্বেষ Non-violence এর একান্ত বিরোধী। সুতরাং এক্ষেত্রেও মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁর কোনও রূপ প্রকৃত মতদ্বৈধ আছে বলে মনে হয় না। একটী কথা মনে রাখা বিশেষ দরকার। মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতা-বর্জ্জন চিরন্তন 'না' মাত্র নয়। সেটী যে খাঁটী 'হাঁ' বা প্রকৃত সহযোগিতা লাভের সোপান মাত্র মহাত্মা একথা বার বার বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও তাই বলেন। "আমি বলিতেছি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্র সম্বন্ধ মাত্রেরি মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষাই রাখে না তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ; তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।"

সে যাই হোক পাঠকগণ রবীন্দ্রনাথের লেখা হতে উদ্ধৃত অংশগুলি যদি তলিয়ে বুঝে থাকেন, তাহলে সহজেই তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন। সেটী এইঃ—গবর্ণমেণ্ট কি করেন না করেন সেদিকে দৃকপাত মাত্র না করে আমাদের সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের জাতীয় শক্তির কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। আমাদের পক্ষে এইটেই হবে আমাদের আসল গবর্ণমেণ্ট। আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের শক্তি যতই বেড়ে উঠবে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সেই পরিমাণেই হ্রাস হবে। শেষে এমন একটা অবস্থা সুনিশ্চয় আসবে যখন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে হয় গ্রাস করে ফেলবে, নয় দুই পক্ষের মধ্যে একটা সম্মানজনক রফা বন্দোবস্ত হবে।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনেরও যে অবিকল এই লক্ষ্য, আশা করি কোনও অভিজ্ঞ পাঠককে একথা বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না।

আমি লিখছিলেম, বর্ত্তমান অসহযোগ-আন্দোলনের বিষয়, কিন্তু লিখে ফেললেম রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব লাভের কি উপায় নির্দ্দেশ করেছেন সেই সম্বন্ধে। আমার এইরূপ বিসদৃশ আচরণ,অনেক পাঠকের বিস্ময় ও বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি উপযুক্ত কৈফিয়তের জন্য পাঠকদের নিকট ঋণী।

আমার প্রথম কৈফিয়ৎ এই—বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনের মূলতত্ত্ব মর্ম্মগত সত্য এবং তার প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল বহুদিন পূর্ব্বে, রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে। আমি এবিষয়ে যা কিছু ভেবেছি তা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ধারারই অনুসরণ করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আমার মনকে বর্ত্তমান আন্দোলনকে গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ করে রেখেছিল বলেই তা এত সহজে আমার চিত্ত অধিকার করে বসেছে। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু আলোচনা

করতে হলে যে পথটা আমার সব-চেয়ে চেনা সেই পথ দিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

আমার দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ এইঃ—বর্ত্তমান আন্দোলনের ভিতরের কথাটা বুঝতে হলে, রবীন্দ্রনাথের লেখা হতে যে পরিমাণে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে, খুব অল্প স্থান হতেই সেরূপ পাওয়া সম্ভব। অনেক তথ্য মহাত্মা গান্ধীর আলোচনা অপেক্ষাও তাঁর আলোচনায় বেশী ফুটে উঠেছে। সুতরাং আমি মনে করি, বর্ত্তমান আন্দোলনের বিশুদ্ধিতা রক্ষা-কল্পে এ লেখাগুলির উপযোগিতা খুব বেশী।

আমার শেষ কৈফিয়ৎ এই—এরূপ না করে আমার পক্ষে অন্য উপায় নাই। আমি যেখান থেকে যে সত্যই লাভ করিনা কেন, যে মন দিয়ে তাকে আপনার করে নিই, সেই মনের গঠনে যত শক্তি কাজ করেছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রবলতম। মহাত্মা গান্ধীর অলোক-সাধারণ চরিত্র ও ত্যাগ-মাহাত্ম্যের নিকট আমার মাথা যে আপনিই নুইয়ে পড়বে, এটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এই বিপুল চরিত্র-মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে খুব একটা বড় গোছের ত্যাগ স্বীকার করে ফেলাও আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আমি বল্‌তে বাধ্য যে, মহাত্মা গান্ধী আমার গুরু নন, আমার অন্তরের দেবমন্দির-সংলগ্ন অতিথি-শালায় তিনি পূজ্যতম শ্রেষ্ঠ অতিথি মাত্র। আমার অন্তরের সমস্ত কক্ষগুলি যাঁর চরণ-ধূলি-স্পর্শের গৌরব লাভ করেছে, তিনি রবীন্দ্রনাথ। তিনিই আমার গুরু। তিনিই আমার কাব্য-প্রীতি, সৌন্দর্য্যানুরাগ, মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা, মানব-প্রীতি, ঈশ্বর-প্রেম—আমার সমস্ত অনুভূতি-সমেত আমার অখণ্ড চেতনাকে, নিবিড় স্পর্শে ধন্য ক'রে, বিপুল পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নাম মাত্রে আজ এই প্রৌঢ় বয়সেও অন্তরের মধ্যে যে পুলক-বেদনার তড়িৎ খেলে যায়, তাকে ভক্তি বল, প্রেম বল, আত্মনিবেদন বল আর যাই বল তা অনির্ব্বচনীয়। মহাত্মা গান্ধী গোখেলকে যে চোখে দেখতেন আমি রবীন্দ্রনাথকে ঠিক সেই চোখেই দেখে থাকি।

আজকের মতো বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বে আমি অসহযোগ আন্দোলনের কর্ম্মীদিগকে রবীন্দ্রনাথের একটী ছোটো কবিতা উপহার দিতে চাই। সব সময় মনে রাখতে পারলে তাঁদের ও দেশের বিশেষ উপকারে লাগবে।

"তুমি সর্ব্বাশ্রয়—একি শুধু শূন্য কথা?
ভয় শুধু তোমাপরে বিশ্বাস-হীনতা
হে রাজন। লোক-ভয়? কেন লোকভয়
লোকপাল? চিরদিবসের পরিচয়
কোন্ লোক-সাথে? রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র! তুমি যার বিরাজ' অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবন-ময়
তব ক্রোড়,—স্বাধীন সে বন্দীশালে! মৃত্যুভয়
কি লাগিয়া হে অমৃত! দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান
এত প্রাণ-দৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব?
কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার?
তুমি নিত্য আছ আমি নিত্য যে তোমার।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

ভালো

ঐ ত রবি, ঐ ত শশী, ঐ ত তারার আলো
পাখীর কণ্ঠে ঝরছে জগৎ, এইত কুসুম,
এই ছিল মোর ভালো।
আজ মনে হয় সকল ফাঁকি
ভিড় করে' সেই চেয়ে থাকার মেলা
কতই না দিন সঙ্গে তাদের কাটিয়ে ছিলেম্
সাঁজ-সকালের বেলা
আর না ওরে আর না ওরে
আর বাসিনে তাদের এখন ভালো
সেই পাখী আর ফুলের মালা,
আকাশ ছেয়ে অধীর-করা আলো।
এখন আমি বাসছি ভালো তারেই
যারে, কুড়িয়ে সেদিন পেয়েছিলাম পথে
ঐত সে যে চল্‌ছে বেয়ে আমার মনোরথে।
ওগো পরাণ-চোর
রাত্রিদিনে প্রেমে প্রেমে তুলছ ভরে' জীবন-আয়ু মোর।
যখন তুমি ধরো মোরে,
ওগো প্রিয়, নিবিড় ঘরে আপন বাহু-পাশে
তখন দেখি কূল-হারা সেই শান্ত আকাশে
তারার আলো, চাঁদের আলো, ঐ সে রবির আলো—
কাঁপ্‌ছে থরে থরে; বইছে ধীরে মৃদুল দখিন বায়
সেই ক্ষণে মোর পূর্ণ আঙিনায়
পাখীর গানে ভর্‌ছে জগৎ; বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে
কুসুম-কলি উঠছে ফুটে লতার শাখে শাখে।

শ্রীঅরুণকান্তি বাগচী।

"বাহুতে দাও মা শক্তি"

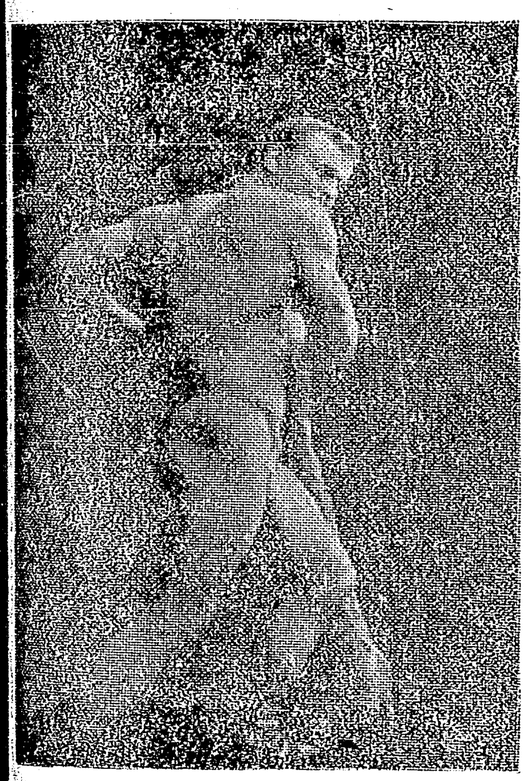

স্যাণ্ডো

ছেলেবেলায় বাপ-মা পড়াশুনোর জন্যে আমাদের যার-পর-নাই শাসন করেছেন এবং আমাদের ধম্‌কিয়ে ও চম্‌কিয়ে মগজের মধ্যে বারংবার এ সত্যটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে,—লেখাপড়া না শিখ্‌লে মানুষ কখনো 'মানুষ' হয় না।

কিন্তু তাঁরা এ-কথাটা কখ্‌নো আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা পান-নি যে, লেখাপড়ার দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করাটাও মানুষের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য।

বাপ-মার এত চেষ্টা-সত্ত্বেও লেখাপড়া কতখানি শিখেছি এবং 'মানুষ'ই বা কতটা হয়েছি, সে কথা হাটের মাঝে জাহির না ক'রে মানে-মানেই চেপে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যদিকে ব্যায়ামাদির ধার না-মাড়িয়ে দৈহিক মনুষ্যত্ব লাভও যে এতটুকু হয়নি, সে কথা ব'লেও মিছে মুখ ব্যথা ক'রে লাভ নেই।

আজ এতদিন পরে বয়স যখন তিরিশের কোঠা পেরিয়েছে এবং শরীরের বাড়ও যখন অনেক দিন আগেই থেমে পড়েছে, তখন প্রতি পদে ঠেকে ঠেকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, আমাদের একূল ওকূল দুকূলই গোল্লার দোরে নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে! এত বয়সে ব্যায়াম সুরু ক'রে স্বাস্থ্য লাভ হয়েছে বটে, এবং এই ক্ষীণ দেহের অনুপাতে জোরও হয়ত কিছু কিছু বেড়েছে, কিন্তু ভগবানের সুন্দর দান এমন যে নরদেহ, তা যেমন কুদর্শন ছিল, তেম্‌নিই রয়ে গেল। কারণ, 'পাকা বাঁশ নোয় না'।

সত্য, ভদ্র ও শিক্ষিত বাঙালীর দেহ দেখ্‌লেই চোখ ফেটে জল আসে! বৈকালে কলেজ ষ্ট্রীটে গিয়ে দাঁড়ালে কি শোচনীয় দৃশ্যই আমাদের দৃষ্টিকে আহত করে! ঐ যে সব বাঙালীর সন্তান,—বয়সে যারা যুবক, দেশের যারা ভবিষ্যতের আশা-ভরসা এবং আর্থিক অবস্থাতেও যারা উন্নত,—বিশ্ববিদ্যাযন্ত্রে ক্রমাগত নিষ্পেষিত হয়ে হয়ে তাদের মুখ হয়েছে রক্তহীন পাণ্ডু, চোখ হয়েছে স্বল্পদৃষ্টি, কোটরগত, এবং দেহ হয়েছে জীর্ণ-শীর্ণ রুগ্ন-ভগ্ন! তারা চলে ফেরে সঙ্কুচিত ভাবে, কথা কয় চিঁ-চিঁ ক'রে, আমোদে যোগ দেয় মমূর্ষু হয়ে!

এই বয়সেই খাবার তাদের হজম হয় না, এক ঘা খেলে দু ঘা তারা ফিরিয়ে দিতে জানে না এবং কোনরকম রোগের আক্রমণে সহজে তারা বাধাও দিতে পারে না। ভদ্র-ঘরের মেয়েদের অবস্থা ততোধিক ভয়ানক। কারণ মুক্ত বায়ুতে পথে-ঘাটে চলা-ফেরা করার দরুণ ছেলেদের যেটুকু উপকার আর অঙ্গসঞ্চালন হয়, মেয়েরা তাথেকেও বঞ্চিত! এই-সব যুবক-যুবতী আবার যে-সকল ছেলে-মেয়ের বাপ-মা হবেন, তাদের কথাটাও সকলে একবার কল্পনা-নেত্রে ভেবে দেখ্‌বার চেষ্টা করুন! বাংলা দেশে কেন যে এত আধি-ব্যাধি আর অকাল-মৃত্যু, তার কারণ বোঝা কিছুমাত্র শক্ত নয়। আর, এই ভাবে আরো কিছু কাল গেলে, বাংলা দেশ যে জ্যান্ত-মড়ার মুল্লুক হয়ে দাঁড়াবে, তাতেও আর কোনই সন্দেহ নেই। 'স্বরাজে'র জন্যে এত যে বাক্য-বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ, এত যে দলাদলি, দাপাদাপি, কিন্তু সেই সুদুর্লভ স্বরাজ আমাদের হস্তগত হ'লে তা ভোগই-বা কর্‌বে কে, আর রক্ষার ভারই-বা নেবে কে? ধরণী যে বীরভোগ্যা!

দৈহিক সৌন্দর্য্যও একটা অবহেলার জিনিষ নয় এবং সুন্দর গঠন যে দৈহিক সৌন্দর্য্যের একটা প্রধান উপাদান, সে কথাও বলা বাহুল্য। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন জাতির কাছেই এ-বিষয়ে বাঙালী মাথা হেঁট্ করতে বাধ্য। দুঃখের কথা বল্‌ব কি, এদেশে যাঁরা বলচর্চ্চা করেন, তাঁরাও এমন উপযোগী

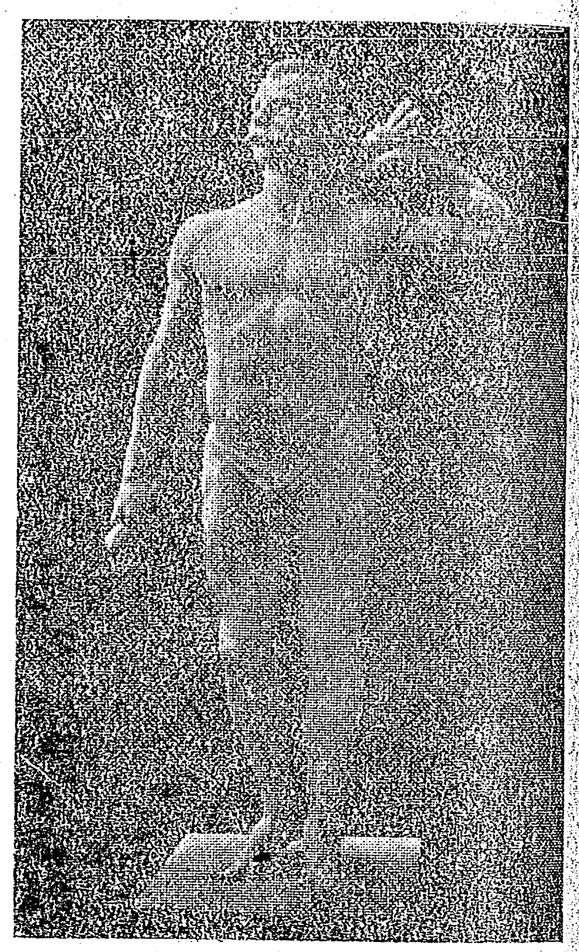

মুলার

ব্যায়াম করেন না, যাতে দেহের গড়ন দেখ্‌তে সুশ্রী হয়। গড়ের মাঠে ফুটবল খেলার ময়দানে গেলেই দেখ্‌তে পাবেন, ইংরেজ—এমন-কি ফিরিঙ্গী—খেলোয়াড়দের পাশে বাঙালী খেলোয়াড়দের কুশ্রী, শীর্ণ দেহের গঠনহীনতা কতখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে!

দৈহিক গঠনের প্রতি এই বিরাট অবহেলা খালি বাংলাদেশে নয়—সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিরাজ কর্‌ছে। এখানকার কুস্তিগীর পালোয়ানরা রীতিমত নর-হস্তী হবার জন্যে এমন উঠে পড়ে লেগে যান যে, দেহের স্বভাব-সুন্দর গঠন পর্য্যন্ত সেই বিপুল মাংস-স্তূপের চাপে থেঁৎলে

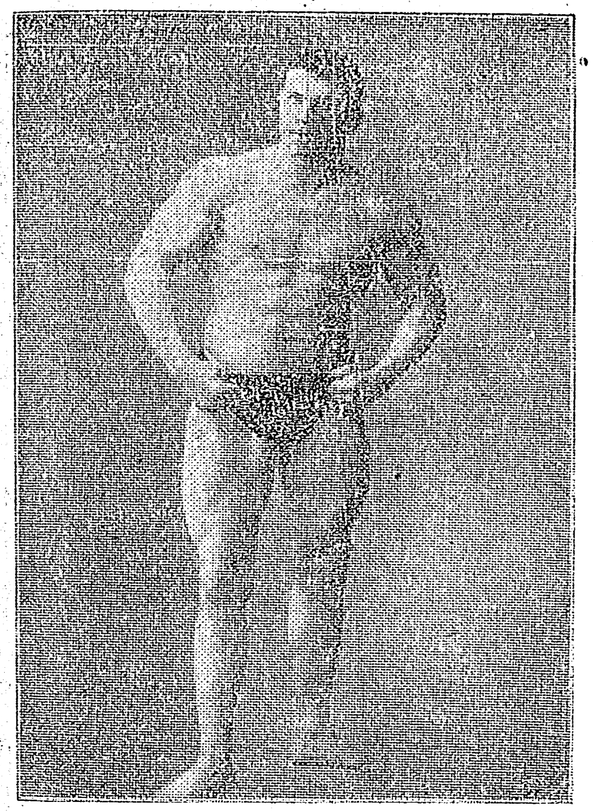

হেকেনস্মিথ

বেঢপ হয়ে যায়! পাশ্চাত্য দেশের তিন শ্রেণীর ব্যায়ামের তিন বিখ্যাত পুরুষ হেকেনস্মিথ, স্যাণ্ডো ও মুলারের কাছে গঠন-সৌন্দর্য্যে টেক্কা দিতে পারে, ভারতে এমন 'ভুড়ি'হীন পালোয়ান আছেন কিনা, জানিনা; থাক্‌লেও, খুব কমই আছেন। কিন্তু য়ুরোপে-আমেরিকায় অধিকাংশ পালোয়ান বা ব্যায়াম-বীরেরই গঠন পরম-সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ভাস্করের আদর্শ হবার যোগ্য। প্রাচীন গ্রীসে মানুষের দেহ নিখুঁত ছিল, ভাস্কর্য্যও তাই হয়ত অতটা বিকাশলাভ কর্‌তে পেরেছিল। বাংলায় নিখুঁত দেহের অত্যন্ত অভাব, তাই ভাস্কর্য্য-শিল্পেরও বিকাশ নেই। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

বাঙালী যে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভীরু ও কাপুরুষ নাম কিনেছে, তার একমাত্র কারণ দৈহিক দুর্ব্বলতা। সাহসের জন্ম বলিষ্ঠ দেহে। ব্যায়াম-চর্চ্চার অভাবে বাঙালী স্বেচ্ছায় দুর্ব্বলতা অর্জ্জন করেছে এবং পথে-ঘাটে তাই সে অবলা নারীর মতই অসহায় ও সঙ্কুচিত। সম্ভ্রান্ত লোকের বংশ বা অর্থ বা বিদ্যার তিন গৌরব একত্রেও তাঁকে রক্ষা কর্‌তে পারে না,—একজন মূর্খ, দরিদ্র ও অসভ্য কাবুলিওয়ালা পর্য্যন্ত যখন-তখন তাঁর সর্ব্বাঙ্গে পদাঘাত ক'রে অনায়াসে হাসিমুখে চ'লে যেতে পারে। দেশে ব্যায়ামের কদর থাক্‌লে আজ খবরের কাগজে সবুট পদাঘাতে প্লীহা-ফাটার কাহিনী এবং নীরবে অপমান হজম ক'রে পরে খবরের কাগজে নির্লজ্জ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত আমরা নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পেতুম না। আজ পর্য্যন্ত কোন ইংরেজ মার খেয়ে খবরের কাগজে এমন ক'রে নিজের মুখে নিজেই চুণ-কালি মাখায় নি—তার চেয়ে তারা আত্মহত্যাকে সহজ মনে করে। ঢাক পিটিয়ে নিজের কাপুরুষতা নিজেই রটিয়ে দেওয়া, এটা বোধ হয় এই দুর্ভাগ্য বাংলা তথা ভারতবর্ষেই সম্ভব!

বাঙালী স্বরাজ পেয়ে নিজের দেশ নিজে রক্ষা কর্‌তে চায়, অথচ তারা নিজেদের প্রাণ, ধন-মান, এমন-কি বসত-বাড়ীখানা পর্য্যন্ত স্বহস্তে রক্ষা কর্‌তে অক্ষম! দেউড়ীতে গিয়ে দেখুন, কিছুকাল আগেও যেখানে বাঙালী লাঠিয়ালরাই পাহারা দিত, আজ সেখানে পশ্চিম থেকে দ্বারবান আনিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে! বাঙালীর জন্মক্ষেত্রে সবল

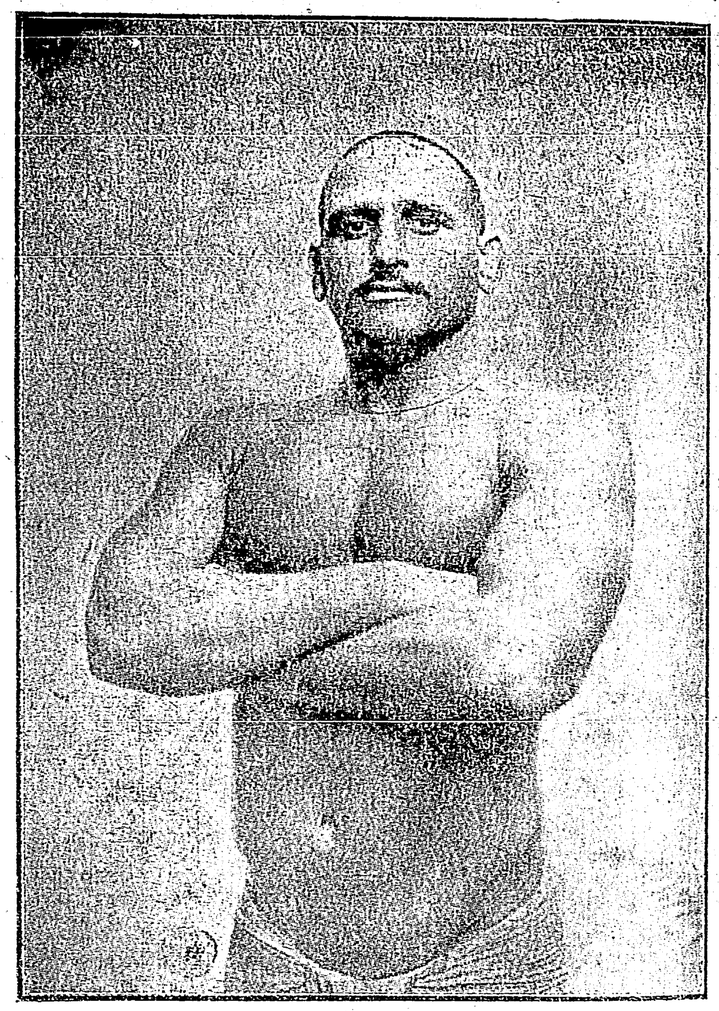

ফত্তা

পুরুষত্বের এতই অভাব! হায় স্বরাজের স্বপন! যার আত্মরক্ষার যোগ্যতা নেই, যে নিজের পায়ে নিজের জোরে দাঁড়াতে পারে না, দেশরক্ষার অধিকার তার কোথায়? স্বরাজের আন্দোলন করা খুবই ভালো, কিন্তু সেইসঙ্গে আত্মশক্তি বাড়াবার সাধনা করাও কি আমাদের পক্ষে উচিত নয়?

বাংলা দেশে মহাত্মা গান্ধীর 'নন্-ভায়োলেন্সে'র মন্ত্র প্রচার করা বাহুল্য মাত্র। কারণ 'নন্-ভায়োলেন্সে'র লক্ষণ নিয়েই বাঙালী জননীর জঠর থেকে জন্মগ্রহণ করে—তার জাতিগত ধর্ম্মই হচ্ছে 'ভায়োলেণ্ট' না হওয়া! তবে মহাত্মা গান্ধীর অনুগ্রহে আমাদের এই চির-নিরীহ অক্ষমতা বা কাপুরুষতা এখন যে একটা সম্মানজনক, মস্ত-বড় নামের আড়ালে লুকিয়ে লজ্জা-নিবারণ কর্‌তে পার্‌বে, আমাদের পক্ষে এইটুকুই বোধ হয় সান্ত্বনার কথা—অর্থাৎ যাকে বলে প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা!

দেশে আজকাল এমন অনেক অন্ধ ও চিন্তাহীন লেখক দেখা দিয়েছেন, যাঁরা সর্ব্বদাই গলাবাজির কারসাজির দ্বারা বল্‌তে চান যে, 'আমাদের এই দুর্ব্বলতা ও স্বাস্থ্য-হীনতার একমাত্র কারণ দারিদ্র্য-সমস্যা। যে পেটে খেতে পায় না, সে দেহ-চর্চ্চা কর্‌বে কি?' এটা হয় ভ্রম, নয় মিথ্যাকথা। দারিদ্র্য-সমস্যা আমাদের দুর্ব্বলতার গৌণ কারণ মাত্র। দেশে ধনীও আছেন যথেষ্ট এবং অন্নাভাবে হাহাকার করেন না, এ-রকম সম্পন্ন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকও অসংখ্য। দেহ-চর্চ্চায় তাঁরাও অমনোযোগী কেন এবং তাঁদেরও দুর্ব্বলতার হেতু কি? দুর্লভ, সুস্বাদু ও পোষ্টাই আহার্য্যে পরিতৃপ্ত ধনী বাঙালীর চেয়ে তাঁদের নিরামিষভোজী দ্বারবানরা তো বড়লোক নয়, তবে তাদের দেহ মনিবদের চেয়ে অতটা বলবান, পুরুষোচিত ও স্বাস্থ্যসুন্দর হয় কেন? পথের গরিব মুটেদের দেহও ধনী বাঙালীর

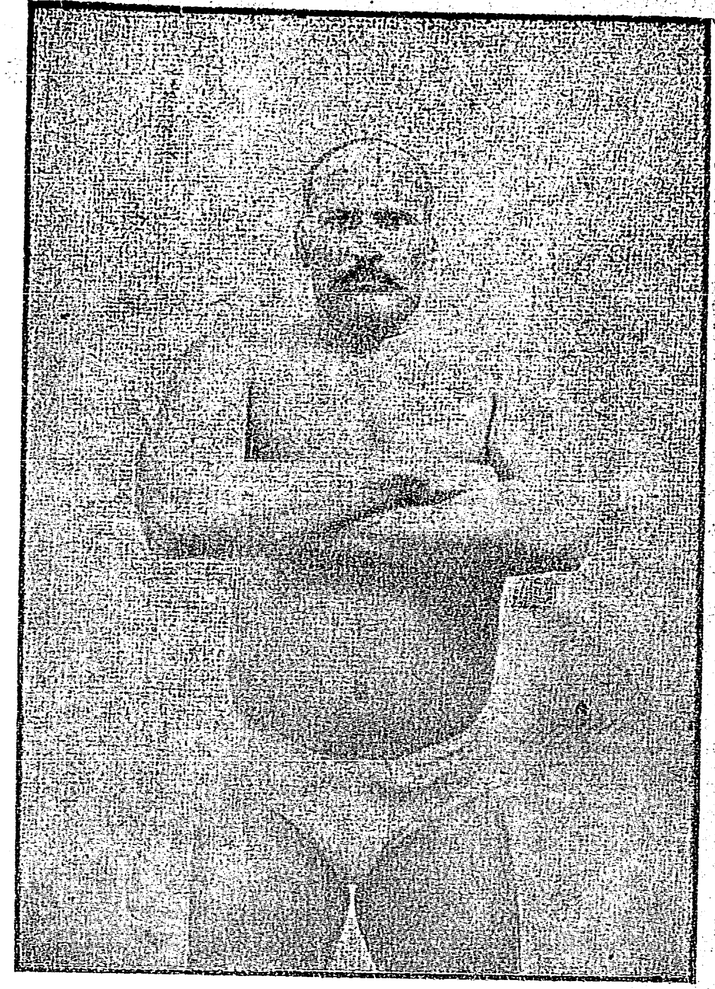

গুত্তা সিং

চেয়ে সবল হয় কেন? তারাও কি দারিদ্র্য-সমস্যায় কাতর নয়? এরাও কি ভালো খাবার খায়, ভালো কাপড় পরে, ভালো জায়গায় বাস করে? এমন সহজ সত্যও যে আমাদের মনে থাকে না, এইটেই হচ্ছে সব-চেয়ে আশ্চর্য্য! একেই কি বলে সজাগের নাসাগর্জ্জন?

বাপ-মায়েরা ছেলেদের ব্যায়াম-শিক্ষায় উৎসাহিত তো করেন না বটেই, উল্টে কেউ যদি সেদিকে একটুও ঝুঁকে পড়ে অম্‌নি তাঁরা বেঁকে ব'সে ব'লে ওঠেন, "এ-সব উড়ো আপদ কেন রে বাপু? তোরা গুণ্ডা হবি, না লোকের বাড়ীতে দরোয়ানি কর্‌বি? জানিস্, ডাংপিটের মরণ গাছের আগায়?" তাছাড়া অভিভাবকদের মনে আরো-একটা বিশ্বাস আছে যে, এতে নাকি পড়াশুনোর বড়ই ক্ষতি হয়!

আসলে, ব্যায়াম-চর্চ্চা কর্‌লে ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার যে উন্নতি হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা, সেটা কিন্তু খুব কম বাপ-মা-ই তলিয়ে বোঝেন বা বোঝ্‌বার চেষ্টা করেন। ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে ভালো ছেলের মন বরং আরো ভালো হয়েই ওঠে—কারণ রুগ্ন-ভগ্ন দেহের মধ্যে থাক্‌লে শিক্ষিত ও ধারালো মনও অকেজো ও ভোঁতা হয়ে পড়ে।

দুর্ব্বলতা, কুস্বাস্থ্য ও আধি-ব্যাধির জন্যে আমাদের জাতীয় শক্তি কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার একটা হিসাব কি কেউ ক'রে দেখিয়েছেন? ইস্কুল-কলেজে, আপিসে বা অন্য চাকুরিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, গৃহস্থালীতে—এমন-কি সাহিত্য-ক্ষেত্রে বা মানসিক চিন্তারাজ্যেও এই ক্ষতির ছাপ্ স্পষ্ট পাওয়া পাওয়া যায়। জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই সবল যতটা পরিশ্রম কর্‌তে পারে, দুর্ব্বল তা পারে না—কারণ তার সহ্য-শক্তি কম। এইখানেই দুর্ব্বল নিজেও ঠক্‌ছে এবং পরকেও ঠকাচ্ছে। স্বাস্থ্যহীনতার দরুণ মানুষের পরমায়ু কমে যায় এবং অসুখী মনও যথাশক্তি কাজ কর্‌তে পারে না। মাইকেল, বঙ্কিম,

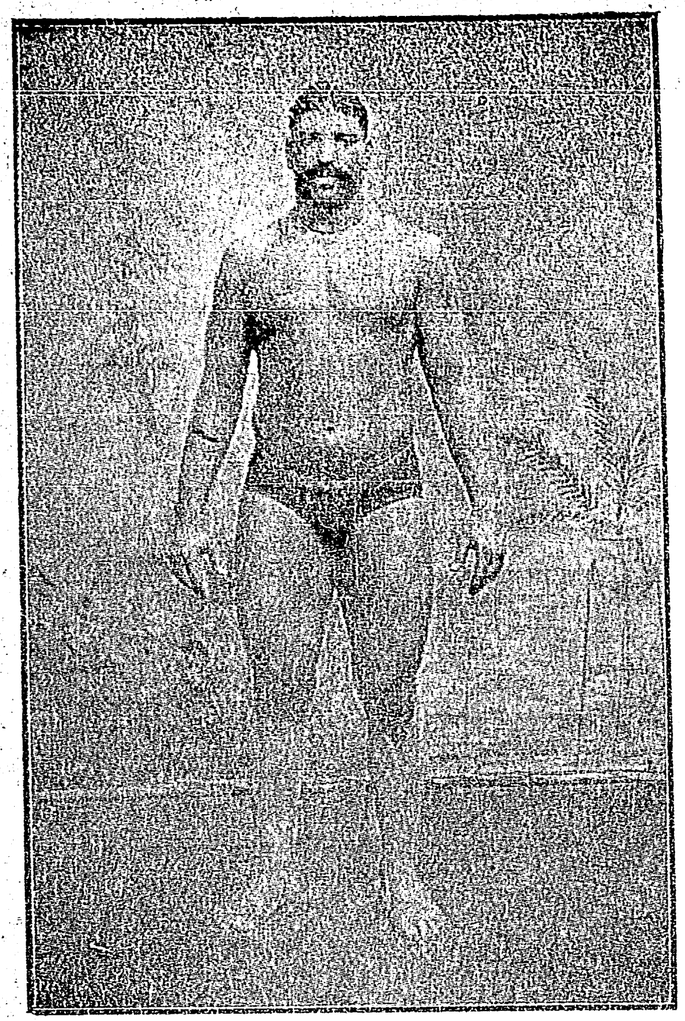

ইমাম্‌বক্স

এবং অনেক অসুখ একেবারেই হয় না। ছোট-বড় নানান রোগ প্রায়ই যাঁদের পিছনে লেগে থাকে, তাঁরা অতি-বড় কর্ম্মী হ'লেও প্রায়ই কাজে কামাই না দিয়ে পারেন না। এম্‌নি নানান দিক্ থেকে দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায় যে, অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙালীর জাতীয় শক্তির অপচয় হয় অত্যন্ত অধিক। এই বিপুল অপচয়ের পরিমাণ, লক্ষ লক্ষ লোকের জন্ম-বেকার হয়ে ব'সে থাকার সমান-কর্ম্ম-ক্ষেত্রে থেকেও তারা কাজ কর্‌তে পার্‌ছে না!

কিছুকাল আগে বিলাতে একটি রাজকীয় তদন্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল—তার সভ্য ছিলেন দেশের জন-কয়েক বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। বিশেষভাবে খোঁজ খবর নিয়ে সমিতির সভ্যরা শেষটা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন :—

১। মানসিক শিক্ষার মত দেহ-চর্চ্চাকেও সমান দরকারি ব'লে মনে কর্‌তে হবে।

২। বিদ্যালয়ে বালকদের মত বালিকা-দেরও দেহ-চর্চ্চার দিকে সমান মন দিতে হবে।

৩। কি সহরে আর কি পাড়াগাঁয়ে—নির্ব্বিচারে সকলকেই নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম-শিক্ষা দান কর্‌তে হবে।

মানুষ একালেই বিলাসী হয়ে নিজের দীনবন্ধু, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেক প্রতিভাবানদের কেউ স্বকৃত অত্যাচারের ফলে এবং কেউ বা দেহকে অবহেলা ক'রে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে অকালে ইহলোক ত্যাগ কর্‌তে বাধ্যহয়েছিলেন। তাঁরা দীর্ঘজীবী হ'লে দেশের ও জাতির চিন্তা-ভাণ্ডারকে নিশ্চয়ই আরো কত দিকে সমৃদ্ধ ক'রে যেতে পার্‌তেন। তারপর র‍্যায়াম-চর্চ্চায় অসুখ-বিসুখ যে কম হয়, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সবল দেহে রোগজীবাণুরা শীঘ্রই কাবু হয়ে পড়ে

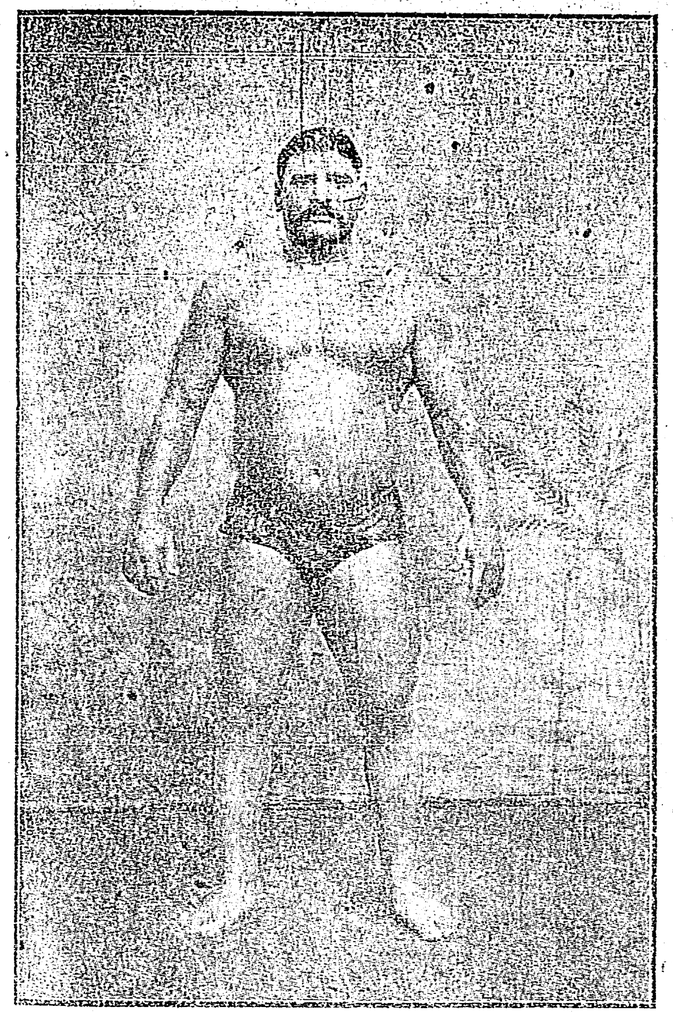

গামা

পায়ে নিজেই কুড়ুল মার্‌ছে। সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে এদিকে সে উন্নত না হয়ে বরং অবনতই হয়ে পড়্‌ছে। সেই সাবেক কালেও প্রাচীন গ্রীসের বাসিন্দারা ব্যায়ামের উপযোগিতা যতটা বুঝেছিলেন, একালের সভ্য আমরা তার শতাংশের একাংশ বুঝতে পার্‌লেও বর্ত্তে যেতুম। পাঁচ বৎসর বয়স হ'লেই গ্রীক বালকরা ব্যায়ামে হাতে খড়ি দিত। খালি বালক নয়, বালিকা এবং যুবক-যুবতীরাও সেখানে সাধারণ 'প্যারেডে'র জমিতে সমবেত হয়ে দৈনিক ব্যায়াম-চর্চ্চা কর্‌ত। গ্রীসে এমন সহর প্রায় দেখাই যেত না, যেখানে ব্যায়াম শালাছিল না। এমনকি, গ্রীক সহর চেন্‌বার প্রধান বিশেষত্বই ছিল ব্যায়ামাগার। রোমও যখন উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে, তখন সম্রাট থেকে গরীব প্রজারা পর্য্যন্ত সকলেই নিয়মিত ভাবে কতকটা সময় দেহ-চর্চ্চায় কাটিয়ে দিত।

একালেও য়ুরোপের অধিকাংশ দেশে ও আমেরিকায় ব্যায়াম-চর্চ্চার দিকে মানুষের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে। কোন কোন দেশের (যেমন আমেরিকায়) নারীরা ব্যায়ামের দ্বারা এমন ভাবে দেহ-গঠন করেছেন যে, অনেক বাঙালী বাবুই তাঁদের সঙ্গে হাতাহাতি কর্‌লে পাঁকা ছ'টি মাসের জন্যে নিশ্চিত ঝোল-সাবু খেতে বাধ্য হবেন।

ভারতবর্ষেও অনেক জাতির ভিতরে ব্যায়াম-চর্চ্চা এখনো লোপ পায় নি। বিশেষ ক'রে পঞ্জাবেই দেহ-চর্চ্চার দিকে বেশী ঝোঁক দেখা যায় এবং সেইজন্যেই ভারতের আর সব দেশের চেয়ে পঞ্জাবই প্রথম শ্রেণীর সৈনিক ও পালোয়ান যোগাতে পারে বেশী।

বাংলা দেশে জনকতক ব্যায়াম-বীর ও পালোয়ান আছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ও প্রসিদ্ধ হয়েছেন স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত, অম্বু গুহ, ক্ষেতু গুহ, শ্রীযুত যতীন্দ্র গুহ (গোবর-বাবু)

ও ভীম ভবানী। গোবরবাবু বিলাতে গিয়ে কয়েক বৎসর আগে সেখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানকে হারিয়ে নাম কিনেছিলেন। এখন তিনি আমেরিকায়। সংবাদপত্রের খবরে জানা গিয়েছে, গোবরবাবুর হাতে সেখানকারও কয়েকজন নামজাদা পালোয়ানের পতন হয়েছে। বাঙালী যুবকরা যাতে দেহ-চর্চ্চার দ্বারা যথার্থ পুরুষ হয়ে উঠ্‌তে পারে, সেদিকে গোবরবাবুর প্রাণের টান অত্যন্ত অধিক। চেষ্টা কর্‌লে বাঙালীর চেহারা কেমন সুন্দর ও গায়ের জোর কত বেশী হয়, গোবরবাবুর সাকরেদ্‌দের দেখ্‌লেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

কিন্তু যেখানে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ শত শত পালোয়ানের জন্ম দিয়েছে, সেখানে এখন বাঙালীর সবে-ধন-নীলমণি হচ্ছেন এই গোবরবাবু। কোটি কোটি পুরুষের জন্মক্ষেত্র বাংলাদেশের পক্ষে এ গৌরব কতটুকু! এযে সিন্ধু-মাঝে বিন্দু নীর! গোলাম, কাল্লু, কিক্কর সিং, সুচেৎ সিং, গামা, ইমামবক্স, হোসেন বক্স ও গুট্টা সিং প্রভৃতির মত শত শত পালোয়ান কি বাংলাদেশে কখনো দেখ্‌তে পাব না? একমাত্র গোবরবাবুকে নিয়ে আমাদের দারিদ্র্যের সবটা যে ঢাকা পড়া অসম্ভব! বাঙালী ভাবের রাজ্যে অনেকবার দিগ্বিজয় করেছে, এবার সে সবল পুরুষত্বের পরিচয় দিয়ে আপনার বিখ্যাত কলঙ্ক মোচন করুক্,—খালি জ্ঞান-বিজ্ঞান-রসায়ন-সাহিত্যে, ধর্ম্মে ও দার্শনিকতায় নয়—সেইসঙ্গে সে দেহে বলী হোক্, স্বাস্থ্যে বলী হোক্, পুরুষত্বে বলী হোক্,—এই আমাদের একান্ত কামনা। বর্ত্তমান যুগে একসঙ্গে আত্মার

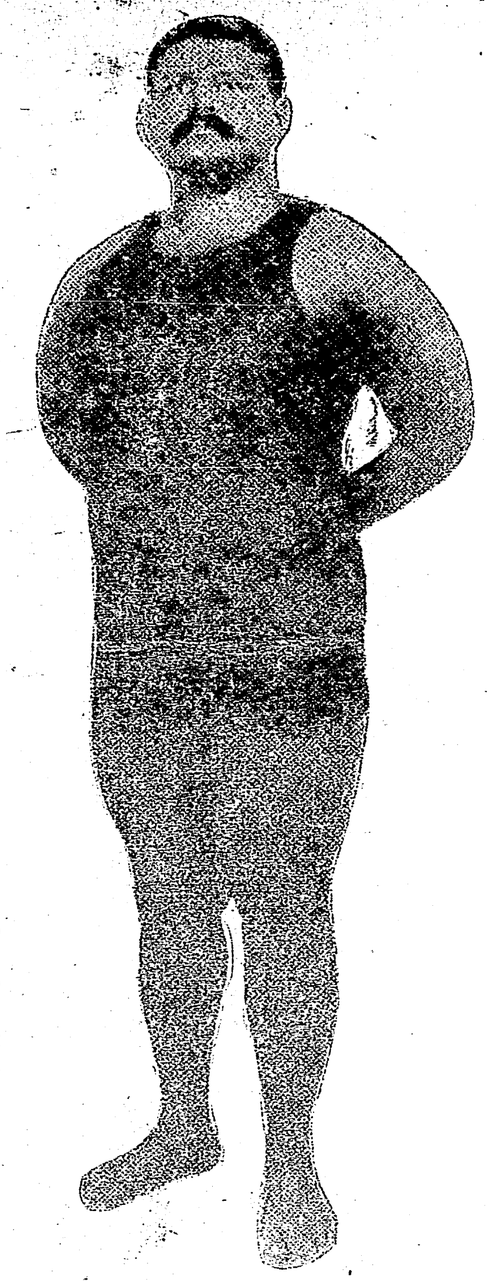

গোবর

শক্তি ও দেহের শাক্ত, এই দুই শক্তি-সাধনাই কর্‌তে না শিখ্‌লে জীবন-সংগ্রামে আমরা টিঁক্‌তেও পার্‌ব না এবং পরিপূর্ণভাবে বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর্‌তেও পার্‌ব না। রুগ্ন, দুর্ব্বল, অল্পায়ু, ভীরু-কাপুরুষের জীবনের মত ঘৃণ্য ও নগণ্য আর কি আছে?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আঁধি

১৪

প্রায় তিনমাস পরে সুষমা তাহার শীর্ণ শরীরটাকে কোনমতে খাড়া করিতে পারিলে ডাক্তার আসিয়া পরামর্শ দিলেন, রোগীর একবার পশ্চিমে যাওয়া দরকার; বাহিরের জল-বাতাসে চট্ করিয়া সারিয়া উঠিবেন।

তখন বাড়ীতে কমিটি বসিয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষ সাব্যস্ত করিলেন, লোকজন সঙ্গে দিয়া সুষমাকে তাহা হইলে কাছাকাছি এই দেও-ঘরেই পাঠানো যাক্। অভয়াশঙ্করের যাওয়ার সুবিধা হইবে না; সম্প্রতি বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তদারক একটু ঢিলা পড়িয়াছিল, সেটাকে আবার টাইট্ করিয়া লইতে হইবে; এবং নিখিলের পক্ষে যাওয়াও সম্ভব নয়, কারণ নূতন করিয়া তাহার পড়াশুনার বন্দোবস্ত হইয়াছে; তাছাড়া তাহাকে দূরে পাঠাইয়া অভয়াশঙ্কর একা এখানে গৃহে তিষ্ঠিতে পারিবেন না। তবে সুষমার সঙ্গে ভুবনেশ্বরীকে যাইতে হইবে, নহিলে সে বেচারী ছেলেমানুষ, তাহাকে দেখিবে কে?

ভুবনেশ্বরী বলিলেন—নিখিল সঙ্গে গেলে ভাল হয়, বাবা। ওরও শরীর সারতে পারে। তাছাড়া একলাটী নিখিলেরই বা এখানে মন টিকবে কেন?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমার কাছে থাকবে নিখিল,—তাছাড়া নিখিলকে পাঠিয়ে আমি একলা থাকতে পারব না ত।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তুমি মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখে এসো'খন।

অভয়াশঙ্কর এ কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

দুপুরবেলায় নীচে আবার কথাটা উঠিল। ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—নিখিলকে আমি নিয়ে যাব। ওর মন পড়ে থাক্‌বে সেখানে, আর ও ভালো থাক্‌বে? কখনো না।

মানদাঠাকুরাণী বড় একটা ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া গলায় এক-ঘটি জল ঢালিয়া বলিলেন, —বাপ্‌রে, ওকে পাঠিয়ে আমরা এ শূন্যপুরীতে থাকবো কি করে? বলে, ও আমাদের চোখের মণি—

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তোমাদের দিক না দেখে ছেলের দিক্‌টা দেখতে হবে ত।

মানদাঠাকুরাণী বলিলেন,—ছেলে বেশ থাক্‌বে, বেয়ান্, সে জন্যে তুমি ভেবো না। বাপের কাছে আদরটা কি ওর কম! বলে, ওকে তিলেক না দেখে অভয় অস্থির হয়ে ওঠে, হুঁঃ!

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—মার জন্যে ছেলে হেদুবে না?

মানদাঠাকুরাণী বলিলেন,—তা হেদুবে না। আমরা রয়েছি—তা ছাড়া ও ভারী সেয়ানা ছেলে বেয়ান, ও সব বোঝে। বাছা মুখে কোন কথাটি বলে না—না হলে ও জানে সবই। দেখেচ ত, এ বৌমার কাছে আজ-কাল মোটে ঘেঁষতে চায় না! হবে কেন? রক্তের টান ত নেই কিছু—!

মানদাঠাকুরাণীর এ ইঙ্গিতের অর্থ ভুবনেশ্বরী সবই বুঝিলেন,—কিন্তু এই নীচ ইতর আভাষ-

ইঙ্গিতগুলা লইয়া কোনরূপ আলোচনা করিতে তাঁহার ঘৃণা হইল, কাজেই তিনি ও-প্রসঙ্গ একেবারে চাপা দিয়া নিঃশব্দে ভোজন সারিয়া লইলেন,—সারিয়া উপরে সুষমার কাছে গিয়া বসিলেন।

সুষমা তখন ঘরে একটা মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিল, পাশে বসিয়া নিখিল। নিখিলের মুখখানি মলিন,—আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় একান্ত কাতর বিষণ্ণ বলিয়াই মনে হয়। ভুবনেশ্বরী আসিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—হ্যাঁরে, মা ত পশ্চিমে যাচ্ছে। মাকে ছেড়ে থাকতে পারবি ত তুই? মার জন্যে মন কেমন করবে না?

নিখিল এ কথায় একেবারে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আমি যাব।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—ছি বাবা, এখন লেখাপড়ার সময়। এখন লেখাপড়া করতে হয়। মার অসুখ কি না, তাই মাকে নিয়ে আমি হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছি। মা বেশ সেরে-টেরে আসবে—আবার তখন মার সঙ্গে থাকবে—কেমন? এখন সেখানে গেলে তোমার লেখাপড়া বন্ধ যাবে যে ধন!

নিখিল অভিমানের সুরে বলিল,—কেন, সেখানে বই নিয়ে গেলে বুঝি পড়া হয় না? মাষ্টারমশাই ত সঙ্গে যেতে চাইছেন।

এ কথার কি জবাব দিবেন ভুবনেশ্বরী তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি নিজের মনে বুঝিতেছেন ত,—ঐটুকু ছেলে, ভারী তার পড়া যে দু'মাস বাহিরে গেলে একেবারে সব রসাতলে যাইবে, বটে! তবু এ ব্যাপারে সমস্ত কদর্য্যতার দিকটা দুই পায়ে মাড়াইয়া ধরিয়া তিনি খুব হাল্‌কা সহজ ভাবেই তাহার সমাধান করিয়া দিতে চাহিলেন।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বাবা যে একলা থাকবে এখানে, তুমি কাছে না থাকলে বাবাকে দেখবে কে?

নিখিল বলিল,—বেশ ত,বেশ ত, সব যাও আমায় নিয়ে যেয়ো না। আমি এখানে না ঘুমিয়ে রাত্তিরে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে খুব অসুখ করব'খন। দেখো---বেশ করে হাওয়া খাওয়া হবে তোমাদের।

ভুবনেশ্বরী তখন চুপ করিয়া নিখিলকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত চাপড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণটা একেবারে ডাক ছাড়িয়া বিরাট ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; কোনমতে সে কান্নার বেগ চাপিয়া একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—ছি দাদা, ও সব কথা বলতে আছে কি! তুমি বড় হয়েছ, বুদ্ধি হয়েছে—এখন এরকম বায়না করে কি? তাহলে মারও অসুখ সারবে না! সেটা কি ভালো হবে? তখন কে আদর করবে, গল্প বলবে? কার কাছে বায়না করবে, মাণিক?

নিখিল আর কোন কথা বলিল না; দিদিমার বুকে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

১৫

নির্দ্দিষ্ট দিনে কয়েকজন দাস-দাসী সঙ্গে লইয়া ভুবনেশ্বরী ও সুষমা দেওঘর রওনা হইলে ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিখিল চুপিচুপি সুষমার বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুইটাকে ফুলাইয়া রাঙা করিয়া তুলিয়া শেষে সেই

বিছানাতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। অভয়াশঙ্কর কি-একটা কাজে ঘরে আসিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, পরে নিঃশব্দে বাহিরে গিয়া বারান্দার রেলিঙ্ ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—আকাশে একরাশ নক্ষত্র অজস্র জুঁই ফুলের মতই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক-টুক্‌রা কালো মেঘের আড়ালে ত্রয়োদশীর ফুটন্ত চাঁদ ঢাকা পড়িয়াছে; তাহার একটা আলোর আভাষ চারিদিকে আধ-জাগা-গোছ ছড়াইয়া রহিয়াছে। অভয়াশঙ্করের মনে হইল, সমস্ত আকাশটায় যেন এই বিচ্ছেদের করুণ শোকের ছোপ্ লাগিয়াছে—সারা বাহিরটা তাই বেদনার অশ্রু কোনমতে স্তম্ভিত রুদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া আছে! তিনি ভাবিলেন,—তাইত, কাজটা বড় রূঢ় হইয়াছে, বটে! নিখিলকে এখানে এমন করিয়া ধরিয়া রাখা ঠিক হইল না ত! বেচারী সুষমা---বেচারা নিখিল! একটা ক্রূর ঈর্ষার বশে দুই-দুইটা প্রাণীকে এই বিচ্ছেদের কষ্ট দিলাম! ঈর্ষা? ঈর্ষা ছাড়া আর কি! পড়াশুনার কষ্ট প্রভৃতি কথাগুলা—ছল, ছল, শুধু ছল! উহারা কোন দোষ করে নাই ত। তবে---তবে? অভয়াশঙ্করের মনে বিবেক তীব্র একটা কশাঘাত করিল!

ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় নিখিলের পাশে শুইয়া অভয়াশঙ্কর তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন,—তাহার ঘুমন্ত মুখে বারবার চুম্বন করিলেন। নিখিলের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে ডাকিল,—মা।

—বাবা—বলিয়া অভয়াশঙ্কর আবার পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন; ডাকিলেন,—নিখিল।

নিখিল ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—দেওঘরে যাবে নিখিল?

নিখিল সন্দিগ্ধভাবে বাপের মুখের পানে চাহিল,—কোন কথা বলিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এদের জন্যে মন কেমন করছে?

নিখিল বাপের কথায় সহানুভূতির সুর পাইয়া বলিল,—করছে। চোখ তাহার ছল-ছলিয়া উঠিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন, – দেওঘরে যাবে?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, যাইবে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—বেশ, যাব, আমরা দুজনেই যাব। এখন এসো দেখি, দুজনে আমরা একসঙ্গে গিয়ে খেয়ে আসি।

নিখিল অভয়াশঙ্করের সঙ্গে খাইতে চলিল। মুখে কিছু দিতে পারিল না—বুকের মধ্যে কি একটা বেদনা ঠেলিয়া উঠিয়া কণ্ঠনালীটাকে চাপিয়া ধরিতেছিল—দুই গ্রাস গিলিয়া, দুইবার ওয়াক্ তুলিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—থাক্, আর খেতে হবে না। শুধু দুধটুকু খেয়ে নাও।

মানদাঠাকুরাণী আসিয়া আদর করিয়া বলিলেন,—এসো ধন, আমি খাইয়ে দি, এসো। কেমন গল্প বলব'খন। খাও ত দাদা—বলিয়া একগ্রাস মুখে দেওয়াইতে গেলেন, নিখিল সেটা তুলিয়া ফেলিল।

অভয়াশঙ্কর একেই বিরক্ত হইয়াছিলেন—এই যে ছেলেটা একলা ঘরের মধ্যে পড়িয়া

ছিল, খাওয়া-দাওয়া করে নাই, তা এ লোকগুলার সেদিকে হুঁসও নাই! তিনি নিজে তাহাকে খাওয়াইতে না আনিলে নিখিলের খাওয়াই হইত না! সুষমা থাকিলে এগুলায় কোন গোল বাধিত না! হায় রে! ইহারা করিবে ছেলে মানুষ, ছেলের তদ্বির! নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই চব্বিশ ঘণ্টা সকলে মত্ত! ইহার উপর মানদাঠাকুরাণীর এই মন-জোগানো ভাবের আদর দেখিয়া রাগিয়া বলিলেন,—বলচি, ও আর খাবে না, শুধু দুধটুকু খাক্,—না, আবার গিলিয়ে দিতে এল! একটা ধমক দিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—যাও, তোমরা ওকে বিরক্ত করো না। ওর যা খুসি খাক্—জোর করে গিলিয়ে দিতে হবে না।

ধমক্ খাইয়া মানদাঠাকুরাণী সরিয়া পড়িলেন, নিখিল দুগ্ধ পান করিয়া পিতার সঙ্গে উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল।

১৬

দেওঘরে যে বাঙলাখানা লওয়া হইয়াছিল, সেটা নন্দন-পাহাড়ের কাছাকাছি; বেশ ঝর্-ঝরে বাঙলা; দেখিয়া সুষমা বলিল,—পিশিমা, নিখিল এলে কি চমৎকারই হোত! এই খোলা জায়গায় পাহাড়-টাহাড় দেখে ভারী খুসী হত সে।

ভুবনেশ্বরী কোন কথা বলিলেন না। সুষমা বলিল,—কেমন এক সঙ্গে সকলে বেড়িয়ে বেড়াতুম। এ-মিছে আসা হোল, পিশিমা।

তবুও সকালটা বিকালটা গোলমালে বেড়াইয়া এক রকম কাটিয়া যাইত; দুপুর ও সন্ধ্যার পর হইতে সময়টা অত্যন্ত ভারী হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিত। একান্তে নির্জ্জন ঘরে দুইটি রমণী তখন প্রাণের মধ্যকার সমস্ত বেদনা নিঃশেষে নিংড়াইতে বসিত—তাহার তীব্র বিষাক্ত রসে দুইজনের মনই জর্জ্জর অবসন্ন হইয়া পড়িত। দুইজনের চিন্তা একই—নিখিল এখন কি করিতেছে? কাহার কাছে আছে? কে দেখিতেছে? আহা, সে হয়ত মুখখানি চূণ করিয়া খোলা জানালাটির সামনে বসিয়া আছে—জানালার বাহিরে ওধারে অনিবিড় বন স্তম্ভিত হইয়া তাহার শিশুচিত্তের নির্ব্বাক বেদনার সাক্ষ্য লইতেছে! আহা, বেচারা নিখিল! বাছা রে!

সেদিন বৈকালের দিকে নন্দন-পাহাড়ের নীচে দুই-তিনটি তরুণী বাঙালী-নারী ছেলে-মেয়ে লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছিল। ছেলে-মেয়েরা চঞ্চল হরিণ-শিশুর মত নাচিয়া নাচিয়া লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল, আর তরুণীরা তৃণশয্যায় বসিয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছিল। এই অপরিচিত ছেলেমেয়েদের খেলার লীলা-ভঙ্গে তাহার ক্ষুব্ধ মন কোন্ সুদূর পল্লীগৃহে অমনি একটি লীলা-চঞ্চল অন্তরের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিরস বদনে একান্ত মন্থর পঙ্গুর মত কোন্ নির্জ্জন কোণে সে কাতর হইয়া পড়িয়া আছে! সুষমার মন এক অসহ্য যাতনায় ভরিয়া উঠিল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—চল না মা, বস্‌লে কেন! চল, একটু পাহাড়ের উপর বেড়িয়ে আসিগে।

সুষমা বলিল,—আজ আর পারচি না পিসিমা, এইখানেই একটু বসো, রোজই ত পাহাড়ে উঠচি।

ভুবনেশ্বরী বুঝিলেন, এই ছেলেমেয়ে-গুলিকে দেখিয়া সুষমার নিঃসঙ্গ মন মাতৃত্বের ক্ষুব্ধ বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন,—তবে বেশ এইখানেই বসি।

সুষমা বলিল,—ওরা কারা, পিশিমা? ওদের চেনো কি? ঐ দেখো, আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। ভাব করলে হয় না? এখানে ত নেহাৎ একলা রয়েচি, এসে অবধি কারো সঙ্গে ভাব-সাব হল না।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তা মন্দ কি!

তখন দুইজনে উঠিয়া তরুণীদের কাছে গিয়া বসিলেন। তিনটি তরুণী; দুইটি সধবা, একটি বিধবা; আলাপ করিয়া জানিলেন,—সধবা তরুণী দুইটি সম্পর্কে জা,—ননদটি বিধবা, বয়স অল্প। কলিকাতায় বাড়ী—দুই ভাই পরিবার লইয়া চেঞ্জে আসিয়াছে। কনিষ্ঠা জা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী,—নিজের ছেলেপিলে হয় নাই, সপত্নীর একটি পুত্র ও একটি কন্যাকে সেই মানুষ করিতেছে। ছেলে-মেয়ে উহাকেই নিজের মা বলিয়া জানে।

সুষমা ছোটটিকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম কি ভাই?

ছোট জা বলিল,—আমার নাম মণিকা।

ভুবনেশ্বরী সুষমার পরিচয়টুকুও সংক্ষেপে বলিলেন; শুনিয়া বড় জা বেলা বলিল,—ওমা, ছেলেকে রেখে এসেছ! আহা, বেচারীর কত মন কেমনই করছে, না জানি!

ভুবনেশ্বরী পাকা গৃহিণী; তিনি ভিতরকার ব্যাপারগুলাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য বলিলেন,—ছেলে বড় হচ্ছে, এখন লেখা-পড়ার সময় ছুটোছুটি করলে লেখা-পড়া-মাটী হবে যে মা।

বেলা বলিল,—তা হোক্। ছেলের শরীর-মন আগে, না, লেখাপড়া আগে? আপনার জামাই ভালো কাজ করেন নি কিন্তু। এই যে আমার দেওর, ঐ ছেলে-মেয়েদুটি তার চোখের তারা বললেও চলে, তা এই মণিকা যখন বাপের বাড়ী-টাড়ী যায়, কখনো তাদের আট্‌কে রাখে না, সঙ্গে পাঠায়। বাপের বাড়ীতে মণিকা অমন একমাস অবধি কাটিয়ে আসে। আমাদের কত মন কেমন করে, বলি, ছেলেটি ত আমার কম ন্যাওটো নয়—তা আমি যদি বলি, অমিয় আমার কাছে থাকুক, ত তাতে আমার দ্যাওর বলে,—না বৌদি, তুমি বোঝোনা, ওর সঙ্গ ছাড়া থাকলে ক্রমে একদিন বুঝে ফেলবে, বুঝি, এ আমার মা নয়, সব ছেলেই মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, আমিই বা থাকি না কেন! আসল গাছের ডালটি নয় যখন, এক গাছের ডাল অন্য গাছে বেঁধে দিয়েচি, তখন তিলেক ছাড়াছাড়ি করা ঠিক নয়, —এক সঙ্গে মিশে বাড়বে কেন! সে ঐ ছেলে-মেয়ের উপর মণিকে অবাধ কর্ত্তৃত্ব দিয়েছে। ব্যবহারে ঠিক পেটের ছেলের মত, আদর-শাসন, যখন যা দরকার, করবে, তাতে কখনো হাত দেয় না। বরাতে এ রকম অবস্থা হলই যখন, তখন মানুষের হাতে গড়া সম্পর্কটাকে বড় করে তুলতে হলে, চারধার থেকে জোগান্‌ও তেমনি দেওয়া চাই বৈ কি, নাহলে কোথায় একটু আল্‌গা থেকে সমস্ত বাঁধনটাকেই ঢিলে করে আচম্‌কা একদিন খুলে ফেলতে পারে!

ভুবনেশ্বরী মনে মনে এ কথা খুবই বোঝেন, —কিন্তু অভয়াশঙ্কর যে কেন এ বিষয়ে রাশ-টাকে একটু ঢিলা করেন না, এইটিই তাঁর সব চেয়ে বড় দুঃখ। মেয়ে ত গিয়াছেই—

কাঁদিয়া কাটিয়া তাহাকে ফিরিয়া পাইবার যখন কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন তাহার যে স্মৃতি, যে চিহ্নটুকু বর্ত্তমান আছে, সেটাকে অটুট খাড়া করিয়া রাখিতে গেলে আশে-পাশে যে কৃত্রিম খুঁটির আগড় বাঁধিয়া দেওয়া দরকার,সেগুলাকে বেশ কায়েমী করিয়া তোলাও যে একান্ত দরকার, নহিলে যেটুকু আছে, সেটুকুকে তেমন খাড়া রাখা যাইবে কেন ?

সুষমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুদূর আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ভাগ্যবতী মণিকার পাশে আপনাকে তাহার এত ক্ষুদ্র মনে হইতে লাগিল, যে ইচ্ছা হইতেছিল, এখান হইতে উঠিয়া ছুটিয়া সে তাহার গৃহের কোণে গিয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু পা দুইটা পাথরের মত ভারী বোধ হইতেছিল,—নাড়া যায় না !

নানা গল্পে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায় হইলে সকলে গৃহে ফিরিল। ফিরিবার সময় ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—আমাদের বাড়ী এসো মা একদিন, বেশী দূরে ত নয়। এই কাছেই—ঐ যে সাহেবদের বাংলাটা আছে, তার ঠিক পাশেই। সামনের ফটকে পাথরে লেখা আছে, মার্টল্ লজ্। সেই বাড়ীতে আমরা থাকি, ছেলেপিলে নিয়ে এসো, মা—নেহাৎ একলা আছি, আমরা।

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া সুষমা সেদিন গুম্ হইয়া রহিল। চোখের সামনে তাহার সুদীর্ঘ জীবন-পথটা প্রচণ্ড মরুভূমির মতই ধূ-ধূ করিতে লাগিল ! দুঃখ-ক্লান্তি ঘুচাইতে মাথা গুঁজিবার জন্য কোথাও এতটুকু আশ্রয় নাই,—সুদীর্ঘ পথে এমন একটা শ্যামল বৃক্ষগুল্মও কোথাও দেখা যায় না, যাহার ছায়ায় দুই দণ্ড লুটাইয়া পড়িয়া সে একটু বিশ্রাম করে ! প্রাণ-ঝল্সানো তপ্ত রৌদ্রে চারিধার অম্নি খাঁ খাঁ করিতেছে ! হায়রে, এখানে কোথায় মিলিবে স্নেহ-শীতল স্নিগ্ধ একতিল আশ্রয়-ভূমি !

ভুবনেশ্বরী ডাকিলেন,—সুষু—

—কেন পিশিমা ?

—এখানে থেকে আর কি হবে ! খুব হাওয়া খাচ্ছিস্ ! চল্, বাড়ী যাই। তোকে সেখানে রেখে আমিও বেরিয়ে পড়ি। যা দেখ্‌চি, তোকে দগ্ধে মরতে হবেই,—আমিই তার জন্যে তোর চারিধারে বেড়া আগুন নিজের হাতে জ্বেলে দিয়েছি। তবু জেনে জেলে দিইনি মা, এইটুকু ভরসায় ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইচি। তা বলে, তুই দিবারাত্রি জ্বলবি, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখব, প্রাণটাকে এত কঠিন করে এখনো গড়ে তুলতে পারিনি।

—তুমি কোথায় যাবে, পিশিমা ?

—তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব। আর-জন্মে অনেক পাপ করেছিলুম মা, তাই এ-জন্মে এত যন্ত্রণা ভোগ করছি। একটা মেয়ে—সেটাকে খুইয়ে সব শোক-দুঃখের জড় মেরেই বসেছিলুম ত, আবার কোথা থেকে তোকে ধরে এনে কি এ নতুন শোক-দুঃখ গড়ে তুললুম, বল্ দেখি !

—তুমি চলে যাবে পিশিমা, নিখিলের কথা ভাবচ না ?

—নিখিল ! কে সে আমার, মা ? কাঁটা একটা—দিবারাত্রি খচ্ খচ্ করছে। কাজ নেই মা আর আমার নিখিল-টিখিলকে জড়িয়ে।

নিখিল যার ছেলে, সে তাকে দেখবে'খন। এই ত আমি তাকে দেখতে এসেছিলুম,পারলুম কি দেখতে ! ভগবান্ সে অধিকার দেন্‌নি ত মা, আমাকে ! তার বাপ বেঁচে থাকুক, শত বর্ষ পরমায়ূ নিয়ে, আমার ও পরের ধনে গিঁট বেঁধে দিতে গিয়ে কাজ কি ! তবে মাঝ থেকে তোকে যে আগুনে ফেলেচি, এইটিই হয়েছে আমার মস্ত জ্বালা।

—আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল, পিশিমা, তোমাকে দেখব-শুনব।

—তা কি হয়, মা ! তোর এই বয়স—যৌবনেই যোগিনী হবি কি ? সংসারের কোন স্বাদই ত পেলিনে !

—সংসারের কোন স্বাদ আমি পেতেও চাইনে পিশিমা। ভগবানের বোধ হয় তা ইচ্ছেও নয়। নাহলে পিশিমা, ভাবো দেখি, ছেলেবেলা থেকে কি ঘটনা-চক্রেই না পড়চি ! তা ছাড়া সংসারও আমায় চায় না, পিশিমা —তুমিও ত স্বচক্ষে সব দেখেচ,—আমার জন্যে সংসারে কারো কোথাও এতটুকু আটকাবে না।

ভুবনেশ্বরীর প্রাণটা দুঃখে গলিয়া গেল। করুণ দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—তবু মা, আশা রাখো। এর মধ্যেই নিরাশ হয়ো না। সংসার মস্ত পরীক্ষার জায়গা—ভারী ধৈর্য্য নিয়ে চল্‌তে হয় এখানে —একটুতে অধীর হলে সংসার ছারে-খারে যায়, মা।

—কিন্তু এ কি একটু, পিশিমা ?

পিশিমা কোন জবাব না দিয়া সুষমার মুখের পানে চাহিলেন, দেখিলেন, সুষমার দুই চোখে জল অমনি টল্‌টল্ করিতেছে। কিছু-ক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—সংসার ছেড়ে আমার সঙ্গে ঘুরতে যাবি, বলছিস—তোর নিখিলের মায়া ছাড়তে পারবি ?

মৃদু হাসিয়া সুষমা বলিল,—নিখিল আমার কে পিশিমা ? তার উপর আমার কি জোর, কিসের অধিকার আছে যে—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না,—মুখের সে মৃদু হাসিটুকুও অদৃশ্য কিসের আঘাতে মুহূর্ত্তে প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটির মতই দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল—গলার স্বরও কিসের বেদনায় ভারী হইয়া বাধিয়া গেল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—নিখিল তোমার কে, তা তুমি জানো না মা, আমিও জানিনা—তোমার অন্তর্য্যামী যিনি, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—না মা, আমি মিথ্যা কথা বলছিলুম এতক্ষণ। আমার মন এখনো স্বার্থের বিষে ভরে আছে; তাই তোমায় সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারব না। তোমাকে থাকতেই হবে সুষু। আমার নিখিলকে ঐ একরোখা জামাই আর তার বাড়ীর সেই রাক্ষসীগুলোর হাতে রেখে আমি কোথাও নড়তে পারব না। তোমার যত কষ্টই হোক্, তুমি সব সয়ে নিখিলেকে নিয়ে থাকবে,—বল, থাকবে ? আমার সব-হারা অন্তরের আশীর্ব্বাদে, চিরদিন তোমার এ দুর্দ্দশা কখনোই থাকবে না সুষু, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। যদি আমি যথার্থ হিঁদুর মেয়ে হই, যদি সতী হই, তাহলে আমি বলচি, আজ যে-পুরীতে তোমায় দু'পায়ে সকলে থেঁৎলে বেড়াচ্ছে, সেই পুরীই আবার একদিন মাথায় তুলে তোমায় সেখান-

কার সিংহাসনে বসাবে, তুমি সে পুরীতে রাজরাজেন্দ্রাণী হয়ে বসবে! এ যদি না হয়, ত তোর পিশির সতীর গর্ভে জন্ম হয়নি, জানিস্ আর জানিস্, তোর পিশি নিজেও অসতী।

উত্তেজনায় ভুবনেশ্বরীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিয়াছিল। সুষমা তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বলিল,—তুমি ক্ষেপেছ পিশিমা, এ-সব কি বলছো! ছি ছি, চুপ কর।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—না মা, আর পারি না। যেদিন অভয়ের ওখানে তোমাকে দেখতে ঢুকেছিলুম, সেইদিন থেকে সব দেখে-শুনে ভিতরে ভিতরে গুমে গুমে জ্বলে ছাই হচ্ছিলুম, আর চুপ করতে পারলুম না। তোর কাছে আমি মস্ত অপরাধ করেছি—কিন্তু তাও জানি, তোর মন বড় উঁচু,—এ পৃথিবীর কাদা-মাটীতে গড়া নয়,—আমার জহুরীর চোখ মা, প্রথম দিন তোমায় দেখেই এ আমি বুঝতে পেরেছিলুম। লীলাকে হারিয়ে আমার প্রথম বড় ভাবনা হয়েছিল, এমন একজনকে এনে তার জায়গায় বসাবো, যাতে আমার সব বজায় থাকে। আমায় তুই চিনতিস্ না—ভাবতিস্, পিশিমা তোকে কত আদর-যত্ন করে—কিন্তু ঐ এক স্বার্থের জন্যেই তোকে এই বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিয়েছিলুম—বুকে রেখেওচি এখনো, রাখবোও। জানতুম, পুরুষ মানুষের বৌ-মরার শোক দু'দিনের। জানতুম, দু'দিন, নয় দশদিন, নয় দশমাস, নয় দু'বছর পরে অভয় আবার বিয়ে করবেই, তখন কোথাকার কে-একটা এসে সব ভাসিয়ে একাকার করে দেবে, তাই তাড়াতাড়ি তোকে তার হাতে অমন করে গছিয়ে দিয়েছিলুম। আমি যথার্থ বল্‌চি মা, যতদিন বাঁচব, তীর্থে তীর্থে যত দেবতার কাছে পরকালের কোন প্রার্থনা জানাবো না—নিজের কোন কামনা নয়, শুধু এই প্রার্থনা করবো, যেন সংসার তোকে চিন্‌তে পারে, চিনে তোর যোগ্য মর্য্যাদা তোকে দেয়—ঐ সংসারে আমার নিখিলকে কোলে নিয়ে তুই রাজরাজেন্দ্রাণী হয়ে বস্‌বি একদিন, তোর পিশিমার এ প্রার্থনা পূর্‌বেই সুষু, সে সতীর গর্ভেই জন্মেছে মা, আর নিজেও সে সতী।

১৭

সুষমার দেওঘরে আসিবার তিন মাস পরে হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা অভয়াশঙ্করের কাছ হইতে এক টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত—নিখিলের অসুখ, সকলে এখনি ফিরিয়া এসো।

ঠাকুর-দেবতার পায়ে প্রাণের অজস্র মিনতি ঢালিয়া সুষমা ও ভুবনেশ্বরী আসিয়া ট্রেনে উঠিল। উদ্বেগে ভুবনেশ্বরীর প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল। বুঝি, অবহেলার মস্ত পাপের ফল এইবার ফলিতে বসিল। ভগবান নিরপরাধীর উপর এ অত্যাচার সহিবে কেন? সুষমা শুধু কাতর অন্তরে ডাকিতে লাগিল—ঠাকুর, হে ঠাকুর—

সন্ধ্যার পর প্রকাণ্ড বাড়ীর দ্বারে আসিয়া গাড়ী থামিলে সুষমা সম্মুখে কাহাকে দেখিতে পাইল না। বিরাট পুরী এক দুর্ভাবনায় গুম্ হইয়া রহিয়াছে,—আর তাহার অন্তর ভেদ করিয়া নিঃশব্দতার এক ভৈরব হুঙ্কার যেন বিশ্রী সাড়া দিতেছিল। ভুবনেশ্বরী ও সুষমা পাগলের মত পুরী প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিতেই সম্মুখে দামু চাকরকে দেখিয়া বলিলেন,—খপর কি রে, দামু?

দামু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—খোকাবাবুর বড্ড অসুখ দিদিমা। কেবল মাকে ডাকছে, মার কাছে যাবে বলে কেবলি কেবলি বায়না ধরছে।

—কি অসুখ, বল্?

—খুব জ্বর। আজ সাতদিন একজ্বরী, দিদিমা। কলকেতা থেকে দু'জন বড় ডাক্তার এসে মাথার শিয়রে বসে আছে। ঘড়ি-ঘড়ি ওষুধ খাওয়াচ্ছে।

ভুবনেশ্বরী ও সুষমা ছুটিয়া নিখিলের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। ঘরে লোক গম্ গম্ করিতেছে, মার বিছানার উপর ঐ জীর্ণ পাতের মত ছোট্ট দেহখানি পড়িয়া—কপালে পটী আঁটা, মাথায় রবারের ব্যাগ ধরিয়া অভয়াশঙ্কর পাশে বসিয়া রহিয়াছেন—ঐ ত নিখিল! আহা, বাছারে!

সুষমা কোন বাধা না মানিয়া একেবারে তাহার শিয়রে গিয়া বসিল—অভয়াশঙ্করের হাত হইতে রবারের ব্যাগ কাড়িয়া খুব সহজভাবেই নিজের হাতে লইল। অভয়াশঙ্কর নিঃশব্দে তাহার হাতে ব্যাগ ছাড়িয়া নিতান্ত অপরাধীর মত একটু সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখের পিছনে অশ্রুর একটা গুপ্ত জমাট বাধিয়া ঠ্যালা দিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরী জামাতার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া বলিলেন,—আছে ত, বাবা?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আজ একটু ভালো আছে। জ্বরটা কমছে।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বাঁচবে?

কাছেই যে ডাক্তার বাবুটি মেজর গ্লাসে ঔষধ ঢালিতেছিলেন, তিনি বলিলেন,—ভোর নাগাদ জ্বর ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে। ভারনা নেই—সেরে যাবে বৈকি! তার উপর ওর মাকে এনেছেন ত—মার জন্যেই ভাবনা কি না! সেই ভাবনা থেকেই ত অসুখ।

শুনিয়া ভুবনেশ্বরী এমন এক কঠিন দৃষ্টিতে অভয়াশঙ্করের পানে চাহিলেন, যে সে দৃষ্টির অর্থ অভয়াশঙ্কর মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন—সে দৃষ্টি জ্বলন্ত চাবুকের মতই তাঁহার হাড়ে গিয়া বিঁধিল।

অনেক রাত্রে অভয়াশঙ্কর বলিলেন—সুষমা, তুমি এসে মুখ-হাত অবধি ধোওনি, যাও, হাত-পা ধুয়ে মুখে কিছু দাও গে, দিয়ে এখানে এসে বসো। ব্যাগটা আমায় দাও ততক্ষণ। বরফটাও ফুরিয়ে গেছে—বলিয়া ব্যাগ লইবার জন্য তিনি হাত বাড়াইলেন। সুষমা সেদিকে একটুও লক্ষ্য করিল না—চকিতের জন্য একবার উঠিয়া জল ফেলিয়া ব্যাগে আবার বরফ পুরিয়া নিখিলের মাথায় সেটা চাপিয়া ধরিয়া বসিল। চোখের অপলক দৃষ্টি নিখিলের মুখের উপর।

ভুবনেশ্বরী নিখিলের কপালে হাত রাখিয়া বলিলেন,—এসে যা দেখেছিলুম, তার চেয়ে নরম পড়েছে না জ্বরটা?

সুষমা কপালে হাত দিয়া বলিল,—হাঁ।

মানদা ঠাকুরাণী আসিয়া বলিলেন,—তুমি উঠে কিছু মুখে দিয়ে এসো বৌমা, আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, আমরা রয়েছি ত!

দুই চোখে তীব্র ঘৃণা ভরিয়া ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—সে বরং তুমি ঘুমোওগে বেয়ান, খেয়ে দেয়ে একটু না গড়াতে পেলে তোমার আবার অসুখ হতে পারে!

এ কথার পর মানদা ঠাকুরাণী ঘর হইতে সরিয়া পড়া একটু কঠিন ভাবিয়া প্রথমে

খানিকটা সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে মেঝেয় চুপ করিয়া বসিলেন, এবং আরো কিছুক্ষণ পরে গা গড়াইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ভোরের দিকে—মা—বলিয়া নিখিল চোখ মেলিল। বাহিরে তখন ভোরের পাখী প্রভাতের বন্দনা-গান সবেমাত্র জাগাইয়া তুলিয়াছে। নিখিল চোখ খুলিয়া ডাকিল,—মা।

সুষমা বলিল,—এই যে বাবা, আমি।

—তুমি এসেচ, মা?

—এই যে আমি এয়েচি, বাবা।

নিখিল খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া সুষমাকে দেখিল, পরে তাহার একটা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল,—হ্যাঁ মা, তুমি আমার সত্যি মা নও? তোমার পেটে আমি হইনি?

সুষমার বুকে কে যেন মুগুরের ঘা মারিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। বাপ্‌রে, এ কি কথা! সুষমা বলিল—ছি বাবা, আমিই ত তোমার মা—আমার পেটেই ত হয়েছ তুমি।

মানদাঠাকুরাণী তখন ভোরের হাওয়ায় ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন,—দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া ঘুম ছাড়াইবার অভিপ্রায়ে খোলা জানলার পানে চাহিয়া আছেন।

নিখিল বলিল—না মা, তুমি মিছে কথা বল্‌ছ। তুমি যদি সত্যি মা, তবে আমায় কেন পশ্চিমে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাওনি? হ্যাঁ, মিছে কথা বল্‌চ। আমি জানি—আমি আর-এক মার পেটে জন্মেছি, আমার ভালো মা, ঐ ছবির মা,—আমি সব জানি।

সুষমা বলিল,—কে বলেচে ও কথা? ছি, বলতে নেই—তুমি আমার এই পেটেই হয়েচ, আমিই তোমার মা—

নিখিল আব্দার তুলিয়া বলিল,—না, তুমি আমার মা নও, সেজ ঠাকুমা বলে,—তুমি সৎমা। আমি বুঝি বোকা, কিছু জানি না?

সুষমা তখন ভৎর্সনার স্বরে বলিল,—ছি নিখিল, পাপ হয়, মাকে ও কথা বল্‌তে নেই। তোমায় যে বলেচে, সে জানে না, মিছে কথা বলেছে—বলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে সে মানদা ঠাকুরাণীর পানে চাহিল।

অভয়াশঙ্করও সেই মুহূর্ত্তে দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া মানদার পানে চাহিলেন—সে দৃষ্টি মানদাকে নিমেষে একেবারে দগ্ধ করিয়া দিল। মানদা দ্রুত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অভয়াশঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠিলেন—পাজী, হতভাগা মাগী—যার খাবে, তারই বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে! শয়তানী!

সুষমা তাড়াতাড়ি বলিল—ছি ছি, ও কি বলছ গো? চুপ কর। তোমার ঘরে এই রোগা ছেলে,—এখনি গাল দেবে, শাপ-মন্যি দেবে—!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথ*

য়ুরোপ যাত্রার কারণ

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর মাঝে মাঝে ঐ প্রাইজের সর্ত্ত অনুসারে নোবেল-বক্তৃতা দিবার জন্য কবির নিমন্ত্রণ আসিত। পরে য়ুরোপের অন্যান্য দেশ হইতেও নিমন্ত্রণ-লিপি আসিতে লাগিল। যতদিন য়ুরোপের মহাযুদ্ধের অবসান না হয়, ততদিন এই সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করা দুরূহ ছিল। তদনন্তর কেবলই যে এই সকল য়ুরোপীয় ভক্তবৃন্দের কামনা পূর্ণ করার সুযোগ আসিল তাহা নহে, কবিবর সমর-শশ্মানভূমি য়ুরোপে নব-নির্ম্মাণ কার্য্য কেমন চলিতেছে তাহা দেখিবারও সুবিধা পাইলেন।

যাত্রারম্ভ

১৯২০ সালের ১৫ই মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ বোম্বে হইতে Merca জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। সমুদ্রবক্ষে বাসকালে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। ঐ জাহাজে আলোয়ারের রাজা, সার করিমভাই ও শ্রীযুক্ত এস, আর, বোমান্‌জি তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। [আলোয়ারের মহারাজা কবির প্রতি বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, এবং প্রায়ই তাঁহার নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আসিতেন। কবির ঐ সময়ে লিখিত যে পত্রাবলী ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, যে তিনিও মহারাজার সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।]

বিলাত

বিলাতে পৌঁছিলে ১৭ই জুন তারিখে শ্রীযুত এম্, এন্, ব্যানার্জ্জি মহাশয় Y. M. C. A.-গৃহে একটি অভ্যর্থনা-সভার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ উক্ত সভায় জাতীয় পরিচ্ছদে যোগ দিয়াছিলেন, এবং খাঁটি দেশীয় ধরণে জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল। ১৯শে জুন তারিখে তিনি অক্সফোর্ডে যান ও তথায় ভারতীয় ও ইংরাজ ছাত্রবৃন্দের সম্মিলিত সভায় "তপোবনের বাণী" শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভায় মেসোপটেমিয়ার খ্যাতনামা কর্ণেল লরেন্স উপস্থিত ছিলেন। ২রা জুলাই তারিখে Y. M. C. A.—গৃহে রাইট অনারেবল মিঃ ফিশারের সভাপতিত্বে তিনি "ভারতীয় সাধনার একটি কেন্দ্রস্থান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাকালে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যানের মত মানস-তৃপ্তিকর সামগ্রী সত্যই দুর্লভ।

খ্যাতনামা ইংরাজ মনীষি মিঃ ডিকিন্‌সনের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ ২৮শে জুলাই তারিখে কেম্ব্রিজে যান, সেখানে সুপরিচিত বাঙ্গালা-ভাষার অধ্যাপক পরলোকগত মিঃ এণ্ডারসন তাঁহার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে ছিলেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের একতাসাধন

---

* ইংরাজী 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ-লিখিত বিবরণের অনুবাদ।

সমিতি'র উদ্যোগে তাঁহার কয়েকখানি নাটকের অভিনয় প্রদর্শনে জুলাইএর শেষ সপ্তাহটা অতিবাহিত হইয়াছিল।

এইখানে অবস্থান কালেই ক্যাক্সটন-হলে যে সম্বর্দ্ধনা-উৎসব হয়, তাহাতে একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী কবির উদ্দেশে রচিত লরেন্স বিনিয়নের একটি কবিতা পাঠ করেন। রয়টার এবং 'ইংলিশম্যান'-পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা এই অনুষ্ঠানের বিবরণ এদেশে তারযোগে জানাইয়াছিলেন।

ফ্রান্স

৭ই আগষ্ট তারিখে কবিবর ফরাসী দেশে আসিয়া পারিসে একমাস যাপন করেন। এই সময়েই কবিবরের সঙ্গে মসিয়ে বের্গসঁ ও মসিয়ে সিলভ্যাঁ লেভির দেখা-সাক্ষাৎ হয়—এ সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে যথাকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে পুনরায় জর্ম্মাণী ও হল্যাণ্ড হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিল। মার্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রুডল্‌ফ্‌ তাঁহাকে ২৪শে আগষ্ট তারিখের পত্রে একস্থানে লিখিতেছেন—

কয় সপ্তাহ হইল আমি আপনাকে জর্ম্মাণীতে আসিবার নিমন্ত্রণপত্র পাঠাই; বিশেষ করিয়া ইজ্‌ন্যাক নগরীস্থ 'খ্রীষ্টিয়ান সুহৃদ্‌-সংঘ' নামক সভার ২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে আপনাকে আহ্বান করি। ঐ সঙ্গে আমার বন্ধু ডার্মস্‌ট্যাড্‌ সহরের ডাঃ ফ্রিক্‌কে বলিয়া পাঠাই যে 'সর্ব্বধর্ম্ম-মিলন-সংঘ' স্থাপনের জন্য উক্ত সহরে ৬ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমরা যে সভা করিতেছি, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য আপনাকে যেন আহ্বান করা হয়। আমি পুনরায় আপনাকে আমার সাদর নিমন্ত্রণ জানাইতেছি। আইজন্যাক্‌ সহরে ঐ তারিখে ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতিশীল একদল বন্ধুর সহিত আপনার মিলন হইবে, তাঁহারা আপনার মুখে আপনার ধর্ম্মমত ও দার্শনিক চিন্তা অবগত হইবার জন্য আপনাকে আদরে বরণ করিয়া লইবেন।"

কবিবরের জর্ম্মাণীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ঐ সময়কার রয়টারের সংবাদে যে একটু ইঙ্গিত ছিল, তাহা কতখানি অসঙ্গত তাহা দেখাইবার জন্য জর্ম্মাণী হইতে এই আন্তরিকতাপূর্ণ নিমন্ত্রণ-পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইল। ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এই যে, যখন ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্স হইতে জর্ম্মানি যাত্রা করিবার জন্য টিকিট ক্রয় করিতে পাঠাইলেন, তখন সীমান্তদেশের তদানীন্তন বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে টিকিট লইতে হইলে যে অন্ততঃ এক সপ্তাহকালের নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন ইহাই তাঁহাকে জানান হয়, কারণ তৎপূর্ব্বে নাকি কি কি বিষয়ে খবর লওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কবিবরের হল্যাণ্ড পৌঁছিবার কথা থাকায় তিনি এক সপ্তাহ-কাল অপেক্ষা করিতে পারেন নাই এবং এই মর্ম্মে জার্ম্মাণ-বন্ধুদিগকে তার করিয়া পাঠান। এ দেশের কোন কোনো ন্যাশন্যালিষ্ট সংবাদপত্রে যে মন্তব্য বাহির হয়—যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই এ বিষয়ে প্রতিকূলতা করিয়াছেন—তাহাও সত্য নহে; কারণ চাহিবা-মাত্র বিলাত হইতে তাঁহাকে সকল দেশের পাসপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল।

ওলন্দদেশে

১৮ই ডিসেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ হল্যাণ্ডে আসিলেন। সেখানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি জাতীয় অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, উহার জন্য দেশের প্রত্যেক বড় বড় কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া কমিটি ছিল। কবি পৌঁছিয়াই দেখিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার জন্য একটি প্রোগ্রাম স্থির করিয়া রাখা হইয়াছে, কেবল আয়োজনের ভিতর-কার অঙ্গগুলি কিরূপ হইবে তাহাই তাঁহার সহিত পরামর্শের জন্য অপূর্ণ রাখা হইয়াছিল। তিনি আম্‌স্টার্‌ডাম সহরে তিনটি বক্তৃতা করেন, তৎপরে লীডেন্‌, রটারডাম, হেগ, ইউট্রেক্‌ট্‌ সহরে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা করেন।

রটারডাম সহরে ডাঃ জে, জে, ভ্যান ডার লিউর গৃহে কবিবর অতিথি হইয়াছিলেন। ইনি অন্যত্রও কবিবরের সহগামী ছিলেন ও তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে আপনার মনোভাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯২১ সালের মার্চ্চ সংখ্যার 'মডার্ণ-রিভিউ' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলে মন্দ হইবে না।

'এই সর্ব্বদর্শী কবি যখন হল্যাণ্ডে আগমন করিলেন তাহার বহু পূর্ব্বেই সেখানকার জনমণ্ডলী তাঁহার ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরিচয় পাইয়াছে, তাহারা সকলেই তাঁহার আগমনে উৎফুল্ল, তাঁহার গুণমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ সকলেই তাঁহার ও তাঁহার রচনার একান্ত পক্ষপাতী। হল্যাণ্ডে, রবীন্দ্রনাথ নবযুগের মুখ্য ব্যক্তিগণের অন্যতম বলিয়া সকলের ধারণা; ইংরেজিতে ও ডচ্‌ভাষায় অনূদিত তাঁহার বহুগ্রন্থের বহু ভাবগ্রাহী পাঠক তথায় বিদ্যমান। এখানে "ঠাকুর-কবির ভাব" বলিতে, জগৎ ও জীবনকে দেখিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী বুঝায়, এবং এই বাক্যের ব্যবহার ক্রমেই বহুপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে।

অতএব কবিবর যখন "থিওসফিক্যাল সোসায়েটি" ও "স্বাধীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে"র আহ্বানে হল্যাণ্ডে আসিলেন তখন চারিদিকে অনুরক্ত ভক্তমণ্ডলীর দেখা পাইতে লাগিলেন। যেখানেই যান সেখানেই তাঁহাকে গৃহে আনিয়া লোকে ধন্য। এমন কোনো য়ুরোপ-বাসীর কথা ত' আমার মনে পড়েনা, যিনি ইদানীন্তন কালে হল্যাণ্ডে এই মহাকবির মত সম্মান লাভ করিয়াছেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই এ দেশবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। তাঁহার সহিত যে হৃদয়ের সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহা তাঁহার বক্তৃতায় এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের একটি মোহিনীশক্তিতে আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। তাঁহার মধ্যে যে জ্ঞানের একটি মাধুরী আছে এবং জীবনযাত্রার একটি সহজ আনন্দময়তা আছে—উহাই আমাদিগকে সমধিক চমৎকৃত করিয়াছে, তাঁহার দর্শনলাভ যেন পুণ্যের মত বোধ হইয়াছে।

যে এক পক্ষকাল এখানে ছিলেন তাহার মধ্যে তিনি আম্‌স্টারডাম, হেগ, রটারডাম প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে, লীডেন, ইউট্রেক্ট, ও আম্‌স্টারডামের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আম্‌স্ফুট নগরের দর্শন-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই সুভাগৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না, সহস্র সহস্র লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল—

তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক সমাগম হইয়াছিল। ইউট্রেক্‌ট্ সহরে সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া তাঁহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করা হয়,—হল্যাণ্ডের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃতের পঠন-পাঠন হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বাধিক সম্মান করা হইয়াছিল রটারডাম নগরে,—সেখানে কেবল গীর্জ্জার মধ্যে নয়, একেবারে বেদীর উপরে বসিয়া তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। এদেশে এই প্রথম একজন অ-খ্রীষ্টানকে এত বড় সম্মান দেওয়া হইল এবং এই সম্মানের অর্থ এই যে, ধর্ম্মোপদেষ্টা হিসাবে কবির প্রতিষ্ঠা এমনি অসাম্প্রদায়িক যে, খ্রীষ্টিয় উপাসনা-মন্দিরের বেদিকার উপর দাঁড়াইবার অধিকার তাঁহার আছে।

সেদিনেয় দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছে তাহারা আর ভুলিবে না। পর্য্যাপ্ত পুষ্পসম্ভারে বেদীটি ভূষিত হইয়াছে, এই পুষ্পচ্ছদের মধ্যেও স্ফুটতর দেহে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তাঁহার বাণী বিঘোষিত করিলেন—তাহার নাম, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন"। অবশেষে যখন অভ্যর্থনা-সমিতির অধ্যক্ষ, আমাদের দেশে আসিয়া এ কয়দিন অবস্থানের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন, এবং কবি কয়েকটি কথায় বিদায় জানাইয়া তাহার উত্তর দিলেন—সেই ক্ষণে সকলের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল—তাঁর কথাগুলি সকলের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল।"

বেলজিয়মে

হল্যাণ্ডে অবস্থানকালে কবিবর বেলজিয়ম হইতে নিমন্ত্রণ পান—যে, অ্যাণ্টওয়ার্প ও ব্রসেল্‌স্ নগরে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইবে। শেষোক্ত নগরে 'প্যালে-দ্য-জাষ্টিস'-গৃহে তিনি বক্তৃতা করেন।

বেলজিয়ম হইতে পুনশ্চ প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া, ১৯২০ সালের ২ শে অক্টোবর তারিখে কবিবর 'রটারডাম' নামক জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করেন।

আমেরিকা

আমেরিকায় কয়েকটি প্রধান প্রধান নির্দ্দিষ্ট স্থানে বক্তৃতা করিয়া ফ্রেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি বিলাত যাত্রা করেন।

আবার বিলাত

বিলাতে পঁহুছিয়া Y. M. C. A. ছাত্রাবাসের "সেক্‌স্‌পীয়ার কুটীরে" কবিবর দুইটি নিবন্ধ পাঠ করেন—একটি, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন", তাহাতে মিঃ লেভিন্‌সন্ সভাপতি ছিলেন; অপরটি, "বাঙ্গালার বাউল", সভাপতি হইয়াছিলেন সার ফান্সিস্ ইয়ংহস্‌ব্যাণ্ড।

আবার ফ্রান্স

১৬ই এপ্রিল তারিখে কবিবর আকাশযানে ফ্রান্স যাত্রা করেন। প্যারিসে আসিয়া Autor du Monde-এ বাসা লইলেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে "ফরাসী দেশের প্রাচ্যজন-সম্মিলন" সভার উদ্যোগে Musee guimetতে "ভারতের লোকধর্ম্ম" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। ২৪শে এপ্রেল তারিখে উক্ত সভা "অন্তরঙ্গ সমাজ"-গৃহে কবির সম্মানার্থ একটি ভোজের অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। আহারাদির পর ফরাসীদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা মসিয়ে কোপ্যাঁ ফরাসী ভাষায়

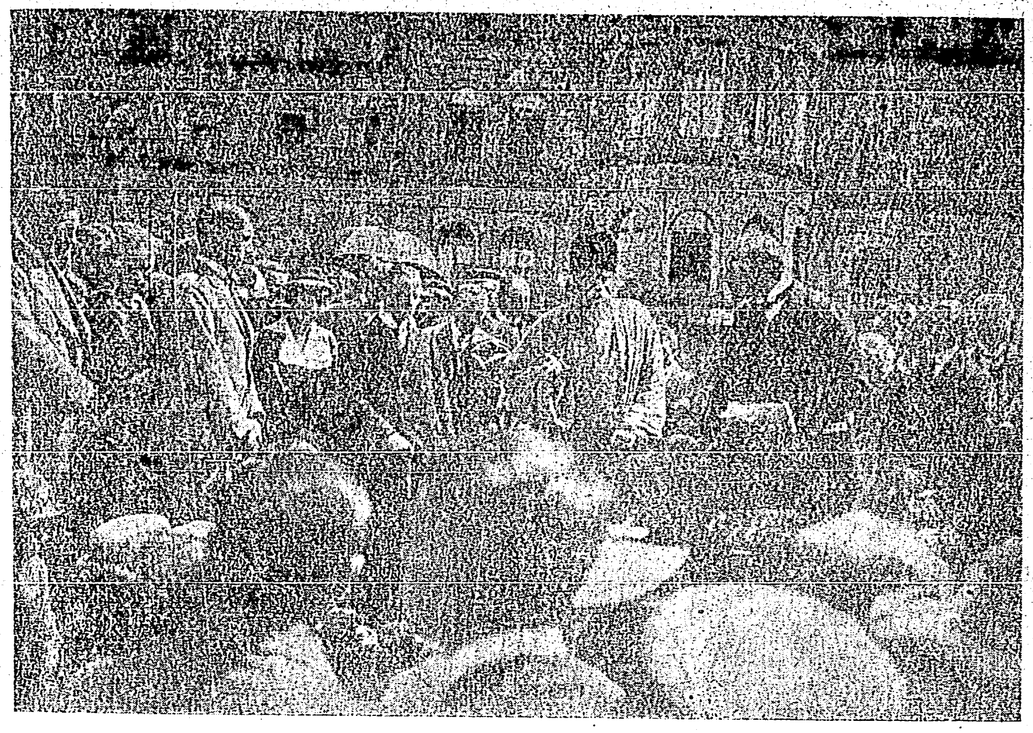

ভার্‌ষ্টাটে "ঠাকুর-সপ্তাহ"-সপ্তাহব্যাপী সম্বর্দ্ধনা ('প্রবাসী'র সৌজন্যে)

"ডাকঘর" আবৃত্তি করেন। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সহিত ফরাসী দেশের পণ্ডিতাচার্য্যগণের আলাপ-আলোচনা হয়; তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে "ভারতে জন-প্রীতি" বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করেন। ২৮শে এপ্রিল তিনি সিল্‌ভেঁ লেভি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ষ্ট্রাস্‌বার্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যান। "মর্ডার্ণ রিভিউ" পত্রে সেই বক্তৃতার সংবাদ (অপোবনের বাণী) প্রকাশিত হইয়াছিল।

সুইজারল্যাণ্ডে

৩০শে এপ্রিল কবিবর জেনেভা নগরীতে পৌঁছিলেন। ৪ঠা মে 'লে'থেনী' গৃহে "জ্যঁ জ্যাক্‌স্ রুসো ইন্‌ষ্টিটিউটে"র আকিঞ্চনে আপনার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া শুনান। ইহার পর তিনি সমগ্র সুইজারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন। ১০ই মে বেসেল-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন; ঐদিন সন্ধ্যায় অধ্যাপকেরা মিলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। ১১ই তারিখে জ্যুরিক সহরের "ওয়াল্‌ডার হাউস ডল্‌ডার' গৃহে 'সাহিত্য-সভার' উদ্যোগে একটি বক্তৃতা করেন। ১২ই তারিখে স্থানীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'আউলা'তে 'কবির ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ইটালী যাত্রা স্থগিত

এখান হইতে তাঁহার ইটালি যাইবার কথা ছিল। সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনার সকল আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু অবিলম্বে সুইডেনে যাইবার জন্য 'সুইডিশ একাডেমি' হইতে পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ তার আসিতে লাগিল। কাজেই, ইতালী যাত্রা তখন আর হইয়া উঠিল না।

জর্ম্মাণীতে

১৩ই মে জার্ম্মেণীতে পৌঁছিয়া কবিবর এক দিন কাউণ্ট কেসারলিং-এর গৃহে বাস করেন। ১৫ই তারিখে তিনি হ্যাম্‌বার্গে যান। ১৭ই তারিখে প্রিন্সেস্ বিস্‌মার্কের নিমন্ত্রণে Fridrichruhe-সহরে Bismark Castle-এ বেড়াইতে যান। সেখানে অধ্যাপক Meyer-Benfeyর গৃহে স্বরচিত গ্রন্থাবলী হইতে কোনো কোনো স্থান পাঠ করেন। ২০শে তারিখে হামবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আউলা'তে, Hamburges Kunstgesselschaft-এর উদ্যোগে 'তপোবনের বাণী' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।

ডেনমার্কে

১৯২১ সালের ২১শে মে রবীন্দ্রনাথ কোপেনহেগেনে আসেন। রেলষ্টেশনে আনন্দোন্মত্ত জনতার উচ্ছ্বাস এত অধিক হইয়াছিল, যে কবিবর অনেক কষ্টে ট্রেন হইতে নামিতে পারিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যে জন-সমাগম হইয়াছিল, সেরূপ আর কোথাও হয় নাই।

কবিকে কাঁধে করিয়া তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হয়—তাঁহার বসন-প্রান্ত চুম্বন করিবার জন্য অসম্ভব হুড়াহুড়ি হইয়াছিল। ভিড়ে কবির সমভিব্যাহারী মিঃ বোমানজী তাঁহার টুপি হারাইয়া ফেলেন, এবং কবিবরের পুত্র ভিড়ের মধ্যে এতদূর হটিয়া গিয়াছিলেন যে পিতার সহিত আসিয়া জুটিতে তাঁহার বেশ কিছুক্ষণ লাগিয়াছিল। জনসংঘের এই উচ্ছ্বাস ষ্টেশন হইতে কবিবরের বাসস্থান পর্য্যন্ত সারাপথ সমান মাত্রায় চলিয়াছিল।

মশাল-আলোকের শোভাযাত্রা

২২শে মে রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-সম্মিলনীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-শেষে একটি যেমন জাঁকালো-তেমনি-সুন্দর উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ছাত্র ও যুবজনেরা কবিকে তাঁহার বাসায় পৌঁছাইয়া দিবার সময় একটি মশালধারীর মিছিল বাহির করে—ও-দেশে এইরূপ মিছিল বড় সুন্দর হয়—প্রত্যেক ছাত্রের হাতে একটি করিয়া প্রজ্জ্বলিত মশাল! কবি বাসায় ফিরিলে পরও জনতার হ্রাস হয় নাই, জনমণ্ডলী তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী রাজপথসমূহে ও সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে তাহাদের উল্লাস জ্ঞাপন করিতে ছাড়িল না। তাহাদের ইচ্ছানুসারে কবিকে কয়েকবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া দু'চারিটি কথা বলিতে হইয়াছিল। ডেনমার্কের অধিবাসিবৃন্দ সম্মিলিত কণ্ঠে "ভারতের জয়" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে, কবি তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষার প্রতিদানে বাংলায় "ডেনমার্কের জয়" বলিয়া উঠেন।

সুইডেন

২৪শে মে কবিবর ষ্টক্‌হল্‌মে পৌঁছিলেন। ষ্টেশনে সুইডিশ একাডেমির সেক্রেটারী ও সুবিখ্যাত কবি ডাঃ কার্লফিল্‌ড, কাউণ্টেস উইলিয়ামোভিজ, কাউণ্টেস ট্রোল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশনে জনতা খুব হইয়াছিল এবং যতদিন তিনি ঐ দেশে ছিলেন, তাঁহার বাসার চারি পাশে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জনতার বিরাম ছিল না—তিনি যখন বাহির হন বা ভিতরে যান, তখন একবার তাঁহাকে দেখিয়া লইবে।

২৫শে মে নগরীর প্রেস-অ্যাসোসিয়েসন্ সেখানকার 'কন্‌সার্ট হলে' বক্তৃতার জন্য এক সভার আয়োজন করেন। এই কন্‌সার্ট-হল ষ্টক্‌হল্‌ম সহরের সর্ব্বাপেক্ষা বড় হল, দুই



বার্লিনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('প্রবাসী'র সৌজন্যে)

হইতে তিন হাজার লোক এখানে বসিতে পারে। এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়। যতগুলি লোক বক্তৃতা শুনিতে আসে তাহাদের এক চতুর্থাংশ মাত্র টিকিট পায়, বাকী লোকেরা অতিশয় কলরব করিতে থাকে; তাহাদের দুঃখের কথা কবির কর্ণগোচর হইলে তিনি পরদিন আর একটি বক্তৃতা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাহারা কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হয়। নগরে অবস্থান কালে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তন্মধ্যে নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত বিখ্যাত সেল্‌মা লোগেন্‌লেফ্, জাতিসংঘের পূর্ব্বতন প্রেসিডেণ্ট ব্রান্‌টিং, স্বেন হেডিন, ও 'আপ্‌সালা'র আর্কবিশপের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। ২৬শে মে তারিখে নরওয়ে-রাজের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে।

নোবেল-বক্তৃতা

২ শে মে তারিখে 'সুইডিশ একাডেমি'-গৃহে কবিবর তাঁহার নোবেল-বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতাদান নোবেল-প্রাইজ পাওয়ার একটি সর্ত্ত। ১৯১৩ সালের পর ইতিপূর্ব্বে তাঁহার য়ুরোপে আসা আর ঘটে নাই বলিয়া ঐ সর্ত্ত রক্ষা করার সুযোগ এত দিনে আসিল। 'সুইডিশ একাডেমী'তে তাঁহার এই বক্তৃতার কথা লইয়া এ দেশে যে গুজব উঠিয়াছিল, যে তিনি এ বৎসরও নোবেল-প্রাইজ পাইবেন, তাহা ভিত্তিহীন।

ঐ দিবস নোবেল-কমিটির উদ্যোগে 'একাডেমী'তে তাঁহার সম্মানের জন্য একটী ভোজ দেওয়া হয়। আপ্‌সালার প্রধান পুরোহিত (আর্ক বিশপ) ঐ উৎসবের নায়করূপে ভোজনান্তে যে বক্তৃতা করেন, তাহার শেষে এই কয়টি সারগর্ভ কথা ছিল:—"নোবেল প্রাইজ তাঁহারই জন্য—যিনি একাধারে ঋষি ও কলাবিদ্। এ পর্য্যন্ত যতগুলি পুরস্কার দেওয়া

হইয়াছে তাহার মধ্যে ঠাকুরের পুরস্কারই সার্থক হইয়াছে।”

যতদিন কবিবর ষ্টক্‌হল্‌মে ছিলেন, স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সম্মুখ-পৃষ্ঠা তাঁহার কার্য্যকলাপের বর্ণনায় পূর্ণ থাকিত—প্রত্যহ তাঁহার অভ্যর্থনাকালীন আলোকচিত্র অথবা বক্তৃতাকালীন অবয়বভঙ্গির পেন্সিলচিত্র বাহির হইত—স্তম্ভের পর স্তম্ভ তাঁহার সংবাদেই ভরিয়া যাইত। তাঁহার সহিযুক্ত একখানি পত্র ছাপিতে পাইলে, তাঁহার স্কুলে অর্থ দান করিবে, Svsenka Tageblatt নামক একটি প্রধান দৈনিকের পক্ষ হইতে এইরূপ প্রস্তাব আসিয়াছিল। শহর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কবিবর এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, কেবল সৌজন্যবশতঃ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ২৮শে মে, যেদিন তিনি উক্ত সহর ছাড়িয়া যান সেইদিনই Svsenka Tageblatt-পত্রিকায় কবিবরের এই পত্রখানি বাহির হইল; তাহার শিরোনামা চার কলমব্যাপী,এবং তাহার সঙ্গে কবিবরের একখানি অতি অভিনব চিত্র, চিত্রের নিম্নে কবির স্বহস্ত-লিখিত নামটি মুদ্রিত হইয়াছে।—

“এই পশ্চিম দেশে আমার সম্মানের জন্য যেরূপ উল্লাস দেখিতেছি, তাহাতে অবাক্ হইয়া ভাবি, ইহার অর্থ কি? শুনিয়াছি আমি নাকি মানবজাতির বন্ধু বলিয়া আমার এই সম্মান। আশা করি তাই যেন সত্য হয়, যে—আমার লেখার মধ্যে সর্ব্বত্র মানব-প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহা সকল গণ্ডী ছাড়াইয়া সকল জাতির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। যদি তাই সত্য হয় তবে আমার লেখার মধ্যে এই যে সব চেয়ে বড় সুরটি—ইহাই যেন আমার জীবনেরও মূলমন্ত্র হয়। সেদিন হ্যামবার্গের হোটেলে আমার ঘরে একাকী বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে দুইটি ব্রীড়াময়ী মধুরহাসিনী জর্ম্মান্ বালিকা আমার জন্য একটী গোলাপ-গুচ্ছ উপহার লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাদের মধ্যে একটী মেয়ে ভাঙ্গা ইংরেজীতে বলিল, “ভারতকে আমি ভালবাসি।” আমি বলিলাম, “কেন তুমি ভারতকে ভালবাস?” বালিকা উত্তর করিল “আপনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন বলিয়া।” এত বড় প্রশংসা গ্রহণ করিবার মত আত্মপ্রসাদ আমার নাই। তবে আমার বিশ্বাস ইহার অর্থ এই যে,আমার কাছে ঐরূপ তাহারা আশা করে, এবং এজন্য ইহা প্রশংসা না হইয়া আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইল। অথবা, হয়ত তাহারা এই বলিতে চাহিয়াছিল যে, আমার দেশ ভগবানকে ভালবাসে সেইজন্য তাহারা আমার দেশকে ভালবাসে। এরূপ প্রত্যাশার অর্থও বেশ বোঝা যায়। সকল জাতি আপন আপন দেশকে ভালবাসে, কাজেই পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে। জগৎ এখন এমন দেশ চায় যেখানে লোকে ভগবানকেই ভালবাসে, নিজের দেশকে নয়; সেই দেশই সকল দেশের সকল মানবের ভক্তি অর্জ্জন করিবে। নিজের প্রতি বা স্বজাতির প্রতি ভালবাসার একমাত্র ফল স্বার্থের সংঘর্ষ; ভগবানে প্রীতিই আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা। সকল সমস্যার মীমাংসা ইহার মধ্যে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

২৮ শে মে তারিখে পুরোহিতরাজের নিমন্ত্রণে কবিবর কাউণ্টেস ওয়ালামোভিজের

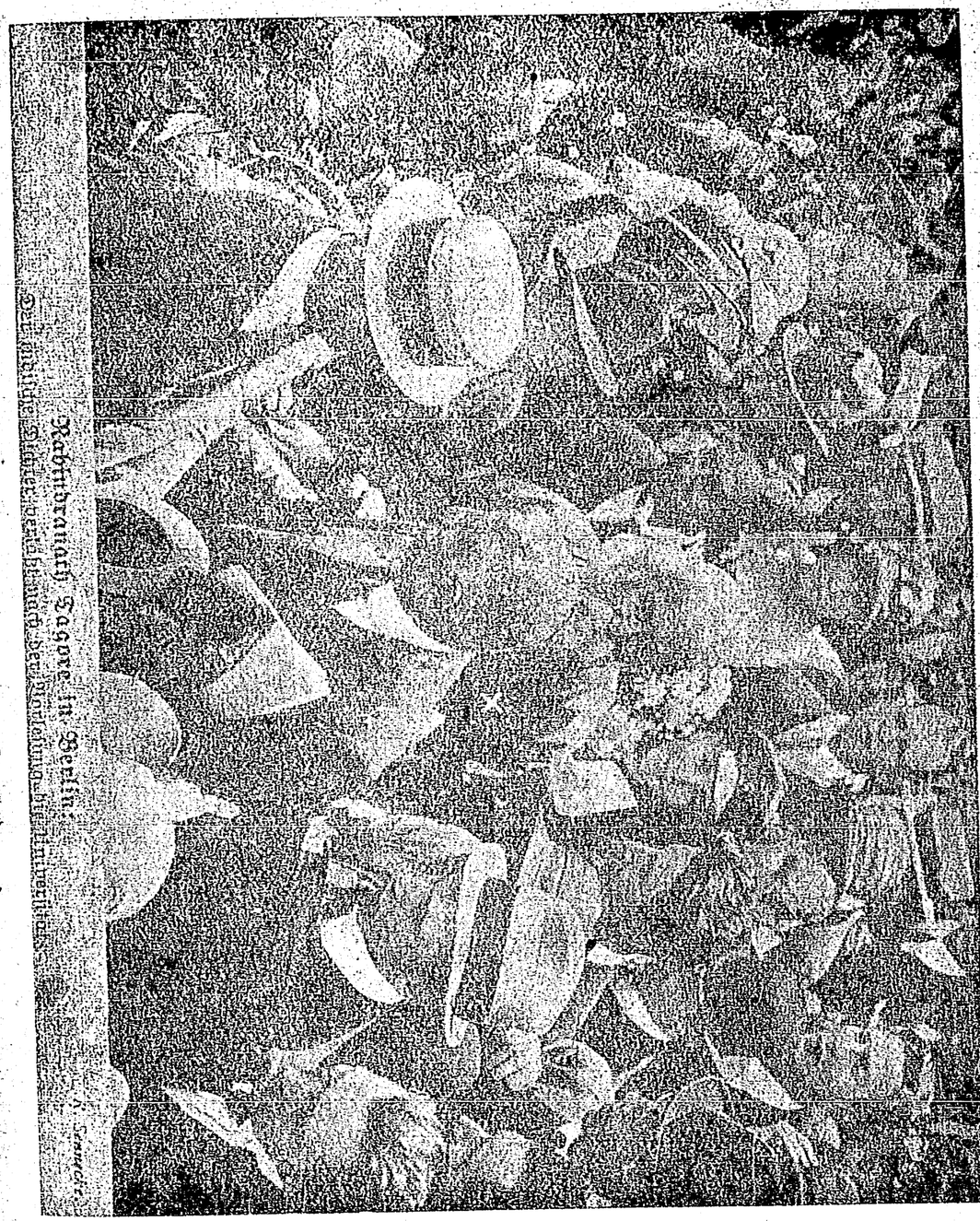

সঙ্গে আপ্‌সালায় যান। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বহু গুণানুবাদ সহকারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করে, কবিবরও তাহার যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন।

রবীন্দ্রনাথ সুইডেনে থাকিতে তাঁহার 'ডাকঘর' নাটকখানি Volksbingen থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। কবিকে সান্ধ্য অভিনয়ে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। অনিবার্য্য কারণে তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অভিনয় আরম্ভ হয়। তাঁহার গমনাগমনের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার সাহায্য করিয়া-

ছিলেন, এবং যাহাতে জর্ম্মানিতে প্রত্যাগমন সহজ হয় তাহার জন্য তাঁহার ব্যবহারের জন্য দুইখানা হাইড্রোপ্লেন নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ষ্টক্‌হল্‌ম ত্যাগ করিবার দিন সন্ধ্যাকালে যখন কবি ব্রিটিশ কন্‌সালের সঙ্গে দেখা করিলেন, তখন কন্‌সাল মহাশয় বলেন যে, মণ্টেগু সাহেব তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, কবির যখন যাহা প্রয়োজন তাহা যেন ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার ব্যাপার দেখিয়া কন্‌সাল্ মহাশয় একটু লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বলেন "আপনার জন্য আমি আর কি করিতে পারিতাম ?"

আবার জর্ম্মানীতে

২৮শে মে তারিখের বৈকালে রবীন্দ্রনাথ বার্লিন যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য ষ্টেশনে বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। পরদিন বার্লিনে পৌঁছিয়া কিছু দিন তিনি জর্ম্মানীর শ্রমশিল্পব্যবসায়ীদের অগ্রগণ্য হিউগো ষ্টিন্‌সের অতিথি হইয়াছিলেন—ইনি তাঁহার সহিত দেখা করিবাব জন্য দক্ষিণ জর্ম্মানী হইতে চলিয়া আসেন।

বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

২রা জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টরের আহ্বানে কবিবর বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতে যান। বাহিরে এত অধিক জনতা হইয়াছিল যে কবি প্রায় তিন কোয়াটার কাল বিশ্ববিদ্যালয় গৃহের প্রবেশ-দ্বারে পৌঁছিতে পারেন নাই। কবির প্রতিজনগণের এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের বিবরণ বিলাতী পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল; আমাদের দেশেও দেশী ও ইংরাজী সংবাদপত্রে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

একখানি কাগজে সংবাদটি এমন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, যেন কবির কোনো কোনো মতের বিরুদ্ধেই জনমণ্ডলী এইরূপ উপায়ে তাহাদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিল। 'মডার্ণ রিভিউ'-পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় ব্যাপারটির তথ্যনিরূপণ-চেষ্টায় সব দোষ রয়টারের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে। বস্তুতঃ রয়টার ঠিক সংবাদই দিয়াছিলেন, অবশ্য সংবাদটি বড় সংক্ষিপ্ত ছিল। রয়টার এই মর্ম্মে তার পাঠাইয়াছিলেন যে, বার্লিনে বক্তৃতা কালে ররীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মহোৎসাহে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এই ব্যাপারে কবির প্রতি যে অসম্মান করা হইয়াছে, এই ইঙ্গিতের জন্য 'টাইম্‌স্'-পত্রের বার্লিনবাসী সংবাদদাতাই দায়ী; এবং 'টাইম্‌সে'র সংবাদই এখানকার ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, এবং তাহার উপর একটি দেশী পত্রে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। এই সম্বর্দ্ধনাকাণ্ডের যথার্থ সংবাদ বিলাতের 'ডেলিনিউস্' পত্রের বার্লিনস্থ সংবাদদাতা দিয়াছিলেন এবং তাহা কয়েকখানি দেশীয়পত্রে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু তদ্দ্বারা পূর্ব্বেকার ধারণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। আমরা নিম্নে 'ডেলিনিউস্' ও অন্যান্য বিলাতী সংবাদপত্রের রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

অদ্য বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতাকালে মহাপুরুষ-পূজার মত উন্মত্ত আচরণ লক্ষিত হইয়াছিল। স্থান সংগ্রহের জন্য এত ঠেলাঠেলি হইয়াছিল যে অনেকগুলি ছাত্রী ভিড়ের মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং কেহ কেহ পদদলিত হইয়াছে।

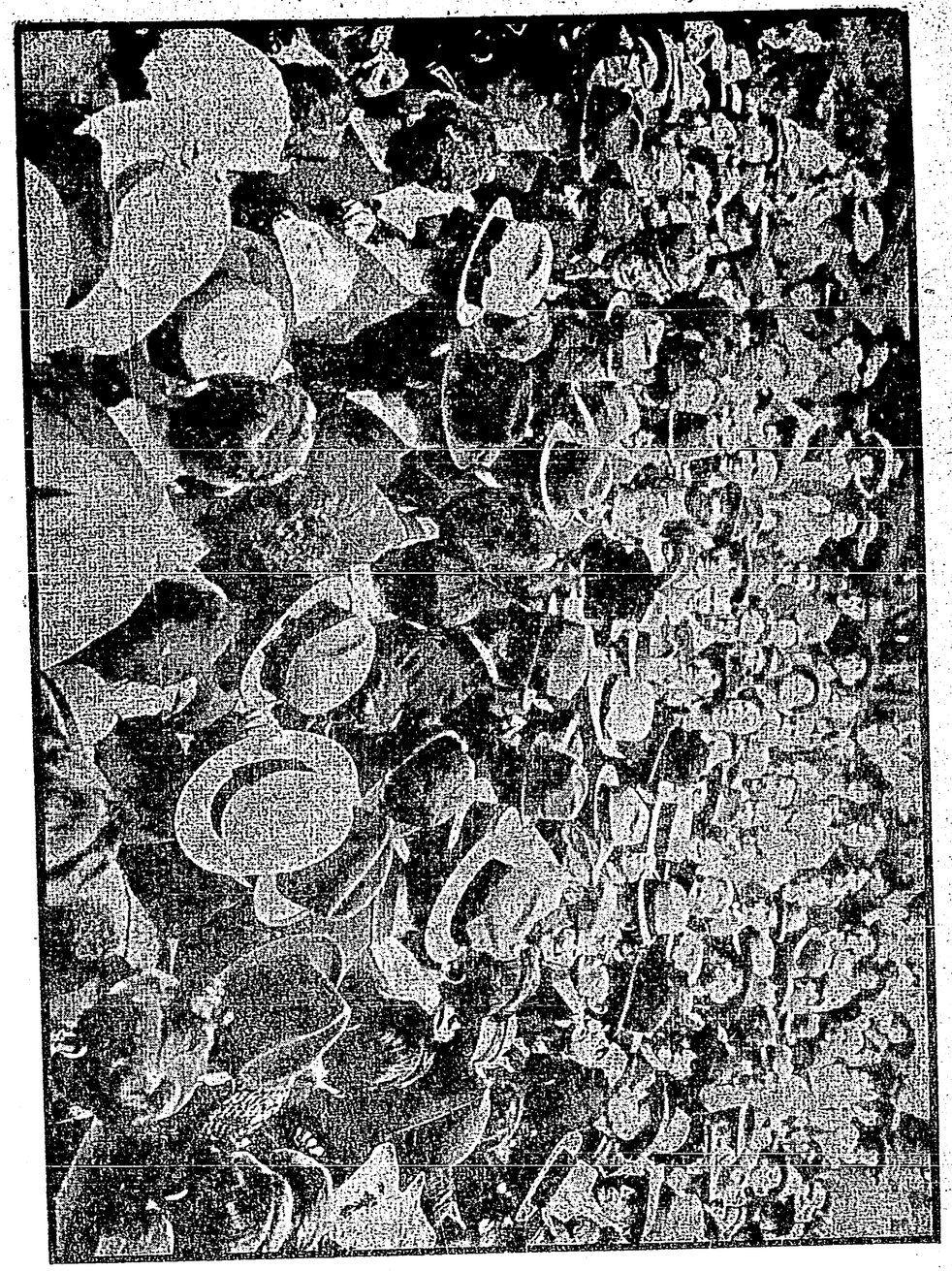

বার্লিন ইউনিভারসিটিতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('প্রবাসী'র সৌজন্যে)

ঠাকুরকে সংবর্দ্ধনা করার ঘটায় এত অসংযম প্রকাশ পায় যে, বিখ্যাত ঈশতত্ত্ববিদ্ হার্ণাক সভাপতির আসনে বসিয়া সভাকে শান্ত রাখিতে পারেন নাই; বক্তৃতাটি পরদিন আবার দেওয়া হইবে বলিয়াও শত শত ছাত্রকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই—ইহারা প্রবেশ করিতে না পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। শেষে পুলিশ ডাকিয়া তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

ঠাকুর ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন,—বক্তৃতার বিষয় ছিল, "বাঙ্ময় ব্রহ্ম"।—*Daily News* (*London*)

* * *

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে গতকল্য বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতাকালে জনগণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইয়াছিল। জনগণ বক্তৃতাগৃহে ভাঙ্গিয়া পড়ে, কতগুলি স্ত্রীলোক পদদলিত হয়; গোলযোগটা খুব বেশী হইয়া দাঁড়ায় কবির আগমনের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে। তাঁহাকে পুলিসের রক্ষণাধীনে ভিতরে আনা হয়—বহু উত্তেজনাকারীকে পুলিস তাড়াইয়া দেয়।

কবির বক্তৃতার নাম ছিল—"ভারতের তপোবন ও ভারতের আত্মা", কিন্তু গোলযোগে বক্তৃতা এতবার বন্ধ করিতে হয় যে কবিবর আগামী কল্য পুনরায় ঐ বক্তৃতা করিবেন বলিয়াছেন।

Central News Telegram (In "Glasgow Evening News.")

বার্লিন ও প্রেগ সহরের সচিত্র সংবাদপত্রগুলিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাহিরে কিরূপ জনতা হইয়াছিল তাহার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। বক্তৃতাগৃহের বাহিরে রাজপথে প্রায় পনর হাজার লোক দাঁড়াইয়াছিল। য়ুরোপীয় সংবাদপত্র সমূহে যে সকল ফোটো-গ্রাফ বাহির হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে জনসংঘ কেবলমাত্র কবির কথা শুনিবার জন্য এত অধীর হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার দিন ডাঃ বেকার Deutsche Gesselsshaft—গৃহে, তাঁহার সম্মানার্থ একটি ভোজ দেন, ঐ ভোজে নিম্নলিখিত পদস্থ ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

১। বেকার, শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী। ইনি পূর্ব্বে আরবী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন।

২। সিমন্‌স্, অধুনা অবসর-প্রাপ্ত বিদেশ-সচিব।

৩। ভন হার্ণাক, জাতীয় পুস্তকাগারের সাধারণ ডাইরেক্টর। ইনি ঈশতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন।

৪। ব্যবহার-শাস্ত্রের অধ্যাপক সেকেল্; ইনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর।

৫। ট্রোয়েল্‌শ্, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক (বার্লিন)।

৬। অটো, ঈশতত্ত্বের অধ্যাপক (মারবার্গ)।

৭। সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক লিউডার্‌স্। ইনি প্রুসীয় সর্ব্ববিদ্যাপরিষদের দর্শনশাখার সম্পাদক।

৮। মিলকান, জাতীয় পুস্তকাগারের সাধারণ অধ্যক্ষ।

৯। ভন শিলিংস্, ইনি অপেরা-রচয়িতা ও জাতীয় অপেরা-মন্দিরের পরিচালক।

১০। রিক্‌টার, শিক্ষাসংসদের মন্ত্রী। ইনি পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

১১। ব্রান্‌স্, শিক্ষাসংসদের মন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-অধ্যাপক।

১২। ইয়াএক্, অধ্যাপক ও রাজনীতি-বিদ্।

২৩। ভন গ্লাসেনাফ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষার প্রাইভেট ডোজেণ্ট।

৩রা জুন শ্রীযুক্ত নোবেল (পুত্র) তাঁহাকে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করেন; নিমন্ত্রিতবর্গের মধ্যে সুইডেনের রাজদূত উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতিশ্রুতি

অনুসারে পুনরায় বক্তৃতা করেন—এবারে আর লিখিয়া নহে, সত্য-সত্য। ইহা নাকি বড় সুন্দর হইয়াছিল। ঐ দিনই বার্লিনের ভারতীয় সমাজ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন, জর্ম্মাণীর পুনর্গঠন-সচিব শ্রীযুক্ত হার রাথেনানের সহিত তিনি আহারে বসেন।

পরদিন, ৪ঠা জুন, বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয় কবিবরের কণ্ঠস্বর তাম্র ফলকের মধ্যে ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার বক্তৃতা ও গানের কণ্ঠস্বর, ছবি ও হাতের সহি, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভূতল-গৃহে রক্ষিত হইবে। ঐ দিন শার্লটেনবার্গে আপনার কাব্য হইতে পাঠ করিয়া শুনান, পরে মিউনিক যাত্রা করেন।

মিউনিক

৫ই জুন কবিবর মিউনিকে আসিয়া ৭ই জুন বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে 'তপোবনের বাণী' শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করেন। এইখানে তাঁহার গ্রন্থবিক্রয় ও বক্তৃতালব্ধ অর্থ হইতে দশহাজার মার্ক শহরের অনাহার-পীড়িত বালকবালিকার দুঃখমোচনকল্পে দান করেন। ৮ই জুন কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তির বৈঠকে তিনি নিজ গ্রন্থ হইতে পাঠ আবৃত্তি করেন। এই বৈঠকে টমাস্ ম্যান, বিয়র্ণসন্ (পুত্র) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ডার্ম্‌স্টাডে 'ঠাকুর-সপ্তাহ'

এই সময়ে জার্ম্মাণীর চারিদিক হইতে ক্রমাগত নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল, কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় কবিবর সেগুলি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এ জন্য স্থির হইল যে, তিনি ডার্ম্‌ষ্টাড্ শহরে এক সপ্তাহ কাল থাকিবেন, ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার যে সকল ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার কথা শুনিতে চান, তাঁহারা তথায় আসিয়া সাধ মিটাইতে পারিবেন। এইরূপে যাহা এখন 'ঠাকুর-সপ্তাহ' নামে পরিচিত তাহার সূত্রপাত হয়—জর্ম্মাণীভ্রমণকালে এই ব্যাপারটি সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কবিবর ৯ই তারিখে এই সহরে পৌঁছিয়া গ্র্যাণ্ড-ডিউক-অব-হেসের গৃহে অতিথি হইলেন।

দর্শকগণের ভিড় অতিরিক্ত হয়, এজন্য যাহাতে সকলেই কবির সহিত কথা কহিতে পান তজ্জন্য এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই একটি দিন-তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। সপ্তাহ ধরিয়া সারা জার্ম্মাণী হইতে বহুলোক আসিতে লাগিল। প্রত্যহ প্রাতে ৯ ঘটিকায় ও বিকালে ৪ ঘটিকায় বাগানে মুক্তাকাশতলে সভা বসিতে লাগিল; যে যাহা জিজ্ঞাসা করে, কবিবর ছোট ছোট বক্তৃতার মত করিয়া তাহার উত্তর দেন, কাউণ্ট কেসারলিং তাহা অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে থাকেন। কবির এই সকল কথাবার্ত্তার বিবরণ প্রত্যহ প্রকাশিত হইয়া দেশময় প্রচারিত হইতে লাগিল। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে এই সকল বক্তৃতা কাউণ্ট কেসারলিঙের "জ্ঞান-শিক্ষাশ্রম" সম্পর্কিত—এবং ইহার যে তার-বার্ত্তা ২০শে মে তারিখের "Brooklyn Eagle and Philadelphia Public Ledger"—পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ—

শিক্ষক রূপে ঠাকুর-কবি

ভারতীয় কবি জার্ম্মাণ 'জ্ঞান শিক্ষাশ্রমে'র শিক্ষাসমিতিতে যোগ দিয়াছেন।

ডারমষ্টাড্, ২১শে মে।—জর্ম্মাণ দার্শনিক কাউণ্ট কেসারলিঙ্ ডারমষ্টাডে যে জ্ঞান-

শিক্ষাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ভারতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানকার শিক্ষাদার্শনিকের পদে বৃত হইয়াছেন। শত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন গ্রীসের সত্যযুগে প্লেটো ও অন্যান্য দার্শনিক পণ্ডিতেরা যেরূপ "একাডেমী"তে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন তাহারই আদর্শে এই আশ্রমটি স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর-কবির পূর্ব্ব হইতেই কাউণ্ট কেসারলিঙের সহিত পত্র-ব্যবহার ছিল, এবং তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে হতগর্ব্ব জর্ম্মাণীই নূতন চিন্তাধারার উপযুক্ত ভূমি। কবিবর সম্প্রতি কেসারলিঙের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ শেষ করিয়াছেন এবং জুন মাসে ফিরিয়া আসিয়া 'একাডেমী'র কার্য্যে যোগ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ও কেসারলিঙ নানা দিগ্দেশাগত জ্ঞানপিপাসুগণের হৃদয়ে, সঙ্গ ও সাক্ষাৎ আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞান সঞ্চারিত করিবেন। রাজ্যচ্যুত গ্রাণ্ড-ডিউক-অব্-হেস্ ইঁহাদের একজন প্রধান শিষ্য, ইনিই অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত সার্ব্বজনিক সভাগৃহে তাঁহার গ্রন্থ হইতে পাঠ আবৃত্তি হইয়াছিল। ১১ই জুন তিনি 'পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন' বিষয়ক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতায় পূর্ব্ব-রাজপরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

১২ই জুন বিখ্যাত "বন-মেলা" উৎসব সম্পন্ন হয়। লোকসংখ্যা চারি হাজারের উর্দ্ধ হইয়াছিল। এই উৎসব একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সম্পন্ন হয়, পূর্ব্ব হইতে কোনো বন্দোবস্ত ছিল না, কোনো বিধি ব্যবস্থা করা হয় নাই। সমবেত জনমণ্ডলী হঠাৎ গান আরম্ভ করিল, সে গানে প্রত্যেকে যোগদান করিল। প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ চলিল। যে প্রতিবেশের মধ্যে উৎসবটি সমাধা হইল তাহা বড়ই সুসমঞ্জস হইয়াছিল। কবি নাকি বলিয়াছিলেন যে, য়ুরোপে এই দিনটিই তাঁহার সবচেয়ে মধুর লাগিয়াছে। উৎসবশেষে কবি দুঃস্থ শিশুগণের সাহায্যকল্পে দশহাজার মার্ক দান করার কথা জ্ঞাপন করিলেন।

ষষ্টিতম জন্মতিথি

এ বৎসর য়ুরোপে থাকিতেই কবির ষষ্টিতম জন্মদিন সমাগত হইল। জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ এই উপলক্ষে তাঁহাকে গ্রন্থরাজি উপহার দিবার মানস করিলেন, তদুপলক্ষে তাঁহারা জনসাধারণকে জ্ঞাপনার্থ যে পত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহা 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গেটের বাসস্থান উঈমার-নগরীতে জার্ম্মাণ ন্যাশনাল থিয়েটারে গান ও তাঁহার গ্রন্থাবলী লইতে আবৃত্তির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কবি যখন সুইজার-ল্যাণ্ডের লুসার্ণ-নগরে, তখন তাঁহার জন্মদিন আসিল। জার্ম্মাণীর সকলস্থান হইতে রাশি রাশি অভিনন্দন-পত্র আসিতে লাগিল। একখানি পত্রে সংবাদ আসিল, জর্ম্মাণজাতি কবিকে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে এক হাজার গ্রন্থ দান করিয়াছে।

ফ্র্যাঙ্ক্‌ফর্ট্

১০ই জুন তারিখে রবীন্দ্রনাথ ফ্র্যাঙ্ক্‌ফর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার "বাঙ্গালার বাউল" শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিতে যান। রেক্টর মহাশয় কবিকে সভাস্থ করিবার কালে বলেন :—

"আপনার মহিমান্বিত নামের খ্যাতি আমি বহুপূর্ব্বে শুনিয়াছি, আজ আপনাকে দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। আজ আপনকার সঙ্গলাভ করিয়া ও আপনাকে চাক্ষুষ করিয়া আরও ভাল করিয়া বুঝিতেছি, আপনার ধ্যানধারণা কত উচ্চ, আপনার অন্তরের সাধুভাব কত পবিত্র, আপনার দৃষ্টি কত সুদূরপ্রসারী। আমরা যখন ভিতরের দিক দিয়া নবজীবনলাভের কঠোর ও দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তখন আপনি আপনার মহাপ্রাণসুলভ অনুচিকীর্ষার বশে জর্ম্মাণীতে আমাদের নিকটে আসিয়াছেন। আপনার অভিপ্রায়, উপদেশ দানে আমাদের সাহায্য করা—আপনি চান, আপনার হৃদয়ের মধ্যে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চিত রহিয়াছে, আমরা তাহার অংশ গ্রহণ করি। আমাদের নিজেদের শক্তি ও কর্ম্ম-সামর্থ্যের উপর দৃঢ়বিশ্বাস আছে; এ প্রত্যয় আমাদের আছে যে,যে-জাতি পরিশ্রম করে তাহার বিনাশ নাই, তথাপি আপনার এই আন্তরিক মানব-প্রীতির পরিচয়ে ধন্যবাদ জানাইতেছি; আপনি যে আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ফ্র্যাঙ্কফর্টে আসিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং আপনাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বাগত-সম্ভাষণ করিতেছি।"

বক্তৃতা-শেষে রেক্টর মহোদয় অনেকগুলি গ্রন্থ শান্তিনিকেতনকে দান করেন।

স্থানীয় শ্রমিক সম্প্রদায় তাঁহাকে লিখিয়া জানায় যে এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবিধা তাহারা পায় নাই। এজন্য তাঁহাকে একদিন তাহাদের মধ্যে গিয়া তাহাদেরই একজনের মত করিয়া বসিতে হইয়াছিল। ১৪ই জুন তারিখে তিনি "শ্রমজীবি-গৃহে" বক্তৃতা করেন।

অষ্ট্রিয়া

কবি যখন ডার্ম্‌ষ্টাডে ছিলেন তখনই অষ্ট্রিয়া ও জেকো-শ্লোভাকিয়া হইতে সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে আরম্ভ হয়। ঐ স্থানে ভিয়েনা হইতে একটি প্রতিনিধিদল তাঁহাকে অষ্ট্রিয়ায় লইবার জন্য দেখা করিতে আসে ও অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করে; কবি তাহা অস্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন দেশে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, কাজেই তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ সহকারে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহারা বড় বেশী পীড়াপিড়ি করায় অবশেষে তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হন,এবং তাঁহাদের সঙ্গেই অষ্ট্রিয়ায় গমন করেন।

তিনি ১৬ই তারিখে ভিয়েনায় পৌঁছিয়া তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে "তপোবনের বাণী"—বক্তৃতাটি পাঠ করেন। অষ্ট্রিয়ার নব রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটিশ-রাজদূত ঐ বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন কবিকে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে আনন্দ করা হয়।

১৭ই তারিখে অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক মন্ত্রিসভা-গৃহে কবির সম্মানার্থ একটি ভোজ দেন। এটি হইয়াছিল একটি পুরা সরকারী অনুষ্ঠান। সকল বৈদেশিক রাজদূত এ দিন উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যাকালে "কন্‌সার্ট-হলে" নিজের রচনা পাঠ করিয়া শুনাইয়া, গবর্ণমেণ্ট-দত্ত স্পেশাল সেলূন গাড়ীতে তিনি জেকো-স্লোভাকিয়া যাত্রা করিলেন। জেক্-রাজদূত গবর্ণমেণ্ট ও জনগণের পক্ষ হইতে ঐকান্তিক আগ্রহপূর্ণ নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহার

যাত্রার সকল আয়োজন করিয়াছিলো। জেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ সংস্কৃত-ভাষার অধ্যাপক লেস্‌নী, জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক উইন্‌টারনিজ এবং বৈদেশিক-মন্ত্রি সভার একজন ব্যবস্থাপক এই যাত্রা পথে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

জেকো স্লোভিকা

১৮ই জুন প্রেগ্ সহরে পৌঁছিয়া জেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার অবস্থানের সকল বন্দোবস্ত তরুণ সাধারণ-তন্ত্র গবর্ণমেণ্ট করিয়া দেন। ১৯শে তারিখে ছাত্র-সম্মিলনীর উদ্যোগে "কন্‌সার্ট-হলে" তিনি স্বরচিত গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করেন। কবির শ্রোতৃসংখ্যা এখানে যত অধিক হইয়াছিল এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। ঐ গৃহের শ্রবণশালা অতি বৃহৎ ছিল, তাহার মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথের জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন-মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐদিন সন্ধ্যাকালে অধ্যাপক লেজ্‌নীর গৃহে অতিথিসেবার আয়োজন হইয়াছিল।

প্রেগ্ সহরে একটি স্বতন্ত্র জর্ম্মান বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে, ২০শে তারিখের অপরাহ্ণ-বেলায় কবিবর তথায় বহু লোকের সমক্ষে বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অধ্যাপক উইন্‌টার-নিজের গৃহে কবির সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ হয়। তাঁহার প্রত্যাগমনের জন্য নবীন গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট দুইখানি আকাশযানের ব্যবস্থা করেন, তার মধ্যে একখানিতে বোমান্‌জী প্যারিস যাত্রা করেন, কিন্তু আকাশের অবস্থা ভাল না থাকায় তাঁহাকে ষ্ট্রাস্‌বার্গে নামিয়া পড়িতে হয়; কাজেই কবিকেও ট্রেনে করিয়া ষ্ট্রাস্‌বার্গ অভিমুখে রওনা হইতে হইল—সেখানে তিনি ২২শে জুন তারিখে আসিয়া পৌঁছিলেন। ২৩শে তারিখে ষ্ট্রাস্‌বার্গে রবীন্দ্রনাথের সম্মানার্থ একটি হিন্দু-উৎসব হয়, তাহাতে কবির সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা হয়, এবং অনেক গানও হইয়াছিল। এই উপলক্ষেই কবির রচিত বিখ্যাত 'জনগণ-মনঅধিনায়ক'-গানটির সিল্‌ভেঁ লেভি-কৃত ফরাসী অনুবাদ গীত হইয়াছিল।

২৪শে জুন রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে পৌঁছিলেন, এবং ১লা জুলাই ভারতের পথে মারসাইয়ে যাত্রা করিলেন।

ইতালী, স্পেন, পোর্ত্তুগাল প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে কত অনুরোধ, কত আহ্বান আসিতে লাগিল। বড় বড় মনীষিরা য়ুরোপব্যাপী পুনর্গঠনকার্য্যে তাঁহার উপদেশ ও সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কতজন তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন, য়ুরোপ মহাদেশের যে কোন কেন্দ্র-স্থানে তাঁহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার আদেশ ও প্রেরণা মতে কাজ করিতে চাহিলেন। কিন্তু তখন কি একটা আকর্ষণে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিতে ব্যাকুল হইয়াছেন, য়ুরোপে থাকিতে আর ইচ্ছা হইল না। আমরা কি এরূপ মনে করিতে পারি না, যে তাঁহার ফিরিয়া আসাটা বিধাতারই ইচ্ছা, কারণ এক্ষণে তাঁহার নিজের দেশে দেশবাসীদিগের উপকারের জন্য তাঁহার উপস্থিতির বড়ই প্রয়োজন।

শ্রীমধুব্রত।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালী দ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার



ধ্রুবের বন-গমন

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে অঙ্কিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২৮ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

ব্রিটিশ-শাসনের এক যুগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক্ষণে হেষ্টিংস ও চৈৎসিংহ এই দুইজনের মধ্যে এই শোচনীয় ঘটনার জন্য কে দোষী, তাহা স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে—চৈৎসিংহের কিরূপ অধিকার ছিল? এই প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে ঐতিহাসিক এই ব্যাপারে কখনই ন্যায়বিচার করিতে পারিবেন না। হেষ্টিংসের মিত্র ও শত্রু উভয় পক্ষই চৈৎসিংহের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছেন। পার্লামেণ্ট মহাসভায় হেষ্টিংসের বিচার-কালে বার্ক বলিয়াছিলেন এবং বহু পরিশ্রম করিয়া বিবিধ উপায়ে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, চৈৎসিংহ স্বাধীন ভূপতি ছিলেন; এবং ইংরেজসরকারে বাৎসরিক ২৩ লক্ষ টাকা কর দান ব্যতীত তিনি সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন ছিলেন। মিল ঐতিহাসিক কি না, তাই বার্কের ন্যায় অতটা ওকালতি করিতে পারেন নাই। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে চৈৎসিংহ নৃপতি ছিলেন। Select Committeeর রিপোর্টে চৈৎসিংহকে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর রাজা" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। হেষ্টিংস পার্লিয়ামেণ্টে কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন যে, রাজা চৈৎসিংহ কেবলমাত্র একজন "জমীদার" ছিলেন।

এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে দেখা কর্ত্তব্য—চৈৎসিংহ কি সত্যই স্বাধীন নৃপতি ছিলেন? ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে ইহা নিশ্চয় বলিতে হইবে যে, তিনি যাহা-কিছু হউন স্বাধীন ভূপতি কখনও ছিলেন না। বারাণসী প্রদেশে স্বাধীনতা জিনিসটা একটু বেশী প্রাচীন বলিয়া ইতিহাস প্রমাণ দেয়। চৈৎ-

সিংহের ছয় শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই পুণ্য বারাণসী-ধাম স্বাধীনতা হারাইয়া যবন-করতা-গত হইয়াছিল।

মিলের ইতিহাসের টীকাকার উইলসন্ সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, বারাণসী খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই স্বাধীনতা হারাইয়াছিল (মিলের ইতিহাস, উইলসন্ কৃত সংস্করণ, পৃঃ ৩৬২)। এ বিষয়ে হেষ্টিংসের চরিতাখ্যায়ক ফরেষ্ট সাহেবও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত অন্য অনেক বিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত অনেকটা নির্ভুল। ফরেষ্ট সাহেবের মতে রাজা চৈৎসিংহ পূর্ব্বে নবাব সুজা-উদ্দৌলার এবং পরে ইংরেজের অধীন ছিলেন। আর একটু ভাবিয়া দেখিলে এই বিষয়ে বিশেষ মতভেদের সম্ভাবনাই থাকে না। ইহা স্থির নিশ্চয় যে, "রাজা" চৈৎসিংহ প্রথমে অযোধ্যার নবাব-উজীরকে এবং পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নিয়মিত বার্ষিক কর দিতেন; এবং ইহাও স্থির যে, "রাজা" চৈৎসিংহের রাজধানী বারাণসীধাম ১৭৭৫ সালে অযোধ্যার নবাব-উজীরের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লাভ করেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চৈৎসিংহ কখনও স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না। সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজের পদানত হয় নাই। তখনও অনেক স্বাধীন নৃপতি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রে পেশোয়াগণ, মহীশূরে হায়দর আলি এবং অন্যান্য প্রদেশে বিবিধ নরপতিবর্গ স্বীয় প্রাধান্য তখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। রাজা চৈৎসিংহ নামে "রাজা" আখ্যা ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না। কোনও স্বাধীন নৃপতি অন্য কোনও রাজ-সরকারে বার্ষিক রাজস্ব প্রেরণ করেন না, বা পাট্টা সনদ গ্রহণ করিয়া নিয়মিত কর-দানের অঙ্গীকার-যুক্ত কবুলতি প্রদান করেন না। ১৭৭৬ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক রাজা চৈৎসিংহকে প্রদত্ত পাট্টা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে রাজা চৈৎসিংহ কোম্পানীর অধীনে সামন্তরাজের অধিকার ভোগ করিতেছিলেন।

এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের মতে কেবল একটী প্রশ্ন ঐতিহাসিকের নিকট উত্তরের অপেক্ষা করে। চৈৎসিংহ কি বার্ষিক রাজস্ব ব্যতীত অতিরিক্ত কোন কর কোম্পানীকে দিতে বাধ্য ছিলেন? উইলসন্ সাহেবও এই কথা বলিয়াছেন, যে দিক্ দিয়া এই ঘটনার যুক্তিযুক্ত মত বিচার করিতে হইবে—কোম্পানী অতিরিক্ত কোন রাজস্ব বা কর চাহিলে রাজা চৈৎসিংহ কি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন?

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক্ষণে অতীব সহজ। ফরেষ্ট সাহেব তাঁহার State Papers গ্রন্থে যে সকল সনদ, পাট্টা, কবুলনামা ও কবুলতি ছাপিয়াছেন এবং অন্যান্য দলিল যাহা পরে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, রাজা চৈৎসিংহ তাঁহার নির্দ্ধারিত বার্ষিক রাজস্ব ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু দিতে বাধ্য ছিলেন না।

প্রথম দলিল যাহা আমরা এই বিষয়ে পাই, তাহা ফরেষ্ট সাহেবের State papers

গ্রন্থের প্রথম ভাগে ৫৬ পৃষ্ঠায় ছাপা আছে। সেটী নবাব সুজাউদ্দৌলা কর্ত্তৃক রাজা চৈৎসিংহকে প্রদত্ত কবুলনামা। এই কবুলনামা হেষ্টিংসের সম্মুখে স্বাক্ষরিত হয় এবং হেষ্টিংস স্বয়ং উহাতে সাক্ষীরূপে সহি করেন। তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে যে, কবুলতিতে নির্দ্ধারিত জমার অতিরিক্ত ভবিষ্যতে কখনও কিছু চাহিবে না।

এই দলিলটীর সম্পাদনে একটু গূঢ় ইতিহাস আছে এবং হেষ্টিংসের তাৎকালিক একটী পত্র পড়িলে তাঁহার সত্য কি অভিপ্রায় তাহাও উপলব্ধি করা যায়। হেষ্টিংস ১৭৭৩ সালে নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত কাশীতে সাক্ষাৎ করেন। তথায় বারাণসী-রাজ সম্বন্ধে দুইজনের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হয় এবং হেষ্টিংসের অনুরোধেই নবাব রাজা চৈৎ সিংহের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত সমর্থন করেন। হেষ্টিংস্ Select Committee-কে ১৭৭৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে যে বিস্তৃত রিপোর্ট দেন, তাহাতে সকল কথা লিখিত আছে। হেষ্টিংস্ লিখিয়াছেন—"আমার সম্মুখেই কবুলনামা স্বাক্ষরিত হয় এবং আমি তাহাতে সাক্ষীরূপে সহি করি। উজীর তাঁহার পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত মোটেই বলবৎ মনে করেন না এবং তিনি বার বার আমার অনুমতি চাহিতেছিলেন যাহাতে তিনি রাজার নিকট হইতে লতিফ্‌গড় এবং বিদ্‌গিগড় দুর্গদ্বয় কাড়িয়া লইতে পারেন এবং রাজস্ব ব্যতীত রাজার নিকট হইতে আর ১০ লক্ষ টাকা আদায় করিতে পারেন। আমি অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তিনি অত্যন্ত অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেন। উজীর তর্ক করিলেন যে, এলাহাবাদের সন্ধির সর্ত্ত দুর্ব্বল রাজা বলবন্ত সিংহের সম্বন্ধে খাটে, তাঁহার উত্তরাধিকারীর পক্ষে উহা আর চলে না। আমি স্বীকার করিতেছি যে, সন্ধির ভাষায় এই কথার বেশী বলা চলে না, কিন্তু আমি মনে করিতে পারি না যে রাজা কিম্বা লর্ড ক্লাইভ এই মনে করিয়া ঐ সন্ধি করিয়াছিলেন। কোম্পানী কিম্বা এই গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অন্য রকম বুঝিয়াছিল, এবং উজীরও রাজা চৈৎসিংহের জমিদারী পাইবার সময় তাঁহার কার্য্যের দ্বারা এই বিষয়ে সকল সংশয় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, রাজার উত্তরাধিকার এবং সম্ভবতঃ তাঁহার জীবনও কোম্পানীর আশ্রয় ব্যতীত আর নিরাপদ নহে এবং ন্যায়, ধর্ম্ম, বিষয়-বুদ্ধি সকল দিক্ হইতেই তাঁহাকে আমাদের আশ্রয় দান করা একান্ত কর্ত্তব্য।"

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়—যে, হেষ্টিংস্ রাজা বলবন্ত সিংহের সকল অধিকার যাহাতে রাজা চৈৎসিংহ ভোগ করিতে পান, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। পূর্ব্বোক্ত রিপোর্ট সত্যই প্রমাণ করে যে, হেষ্টিংসের মতে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট চৈৎসিংহের সকল দাবী ও অধিকার যাহাতে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং তাহার অণুমাত্র অন্যথা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মতে অমার্জ্জনীয়। সেইজন্য কবুলতিতে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত ছিল—"ভবিষ্যতে কখনও রাজস্বের অতিরিক্ত কর চাওয়া হইবে না।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নবাবের সহিত রাজার না-হয় এইরূপ ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাহাতে কোম্পানীর পূর্ণ-অধিকারের

কেন ব্যতিক্রম হইবে? তাহার উত্তর এই যে,কোম্পানীর বারাণসী-রাজের উপর অধিকার নবাব-উজীরের অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না, কারণ সন্ধির দ্বারা নবাবের অধিকারই কোম্পানী লাভ করিয়াছিল। তাহার বেশী কিছু দাবী করিতে হইলে সেরূপ সর্ত্ত স্পষ্ট লেখা থাকা চাই। রাজা চৈৎসিংহের অবস্থা নবাবের অধীনে যাহা ছিল, তাহার নূতন প্রভু কোম্পানীর অধীনেও তাহাই থাকিবে। এ বিষয়ে বৃথা তর্ক না করিয়া কাশীরাজের বিদ্রোহের পর কোম্পানী কর্ত্তৃক ১৭৮১ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে প্রচারিত ইস্তাহার পাঠ করিলে পাঠকমাত্রেই নিঃসংশয় হইতে পারিবেন। উহা State Papers গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ৭৯৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। তাহাতে কোম্পানীর পক্ষে স্পষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছিল, যে "রাজা তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রভু নবাবের অধীনে যে সকল অধিকার ভোগ করিতেছিলেন তাহা কোম্পানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে গবর্ণর-জেনারেলের দ্বারা তাঁহার যথাযথ বজায় ছিল।"

কোম্পানী যে বার্ষিক রাজস্বের অতিরিক্ত কিছু রাজা চৈৎসিংহের নিকট হইতে দাবী করিতে পারিতেন না, তাহা ১৭৭৫ সালের ৩রা মার্চের কৌন্সিল মিটিংএর রিপোর্টে আরও স্পষ্টভাবে হেষ্টিংস্ ও বারওয়েল সাহেবদের মন্তব্যে লিখিত আছে। ফ্রান্সিস্‌ও সেইরূপ মন্তব্য আরও তীব্র ভাষায় লিখিয়াছিলেন। বারাণসী নবাবের নিকট হইতে কোম্পানীর হস্তগত হওয়ার পরেই ১৭৭৫ সালে ১২ই জুন কলিকাতার বোর্ডের সভা হয় সেই সভায় রাজা চৈৎসিংহের সম্বন্ধে হেষ্টিংসের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, যতদিন রাজা চৈৎসিংহ বার্ষিক রাজস্ব নিয়মিতভাবে দিবেন, তাঁহার উপর কখনও কোন কারণে কোম্পানী আর কোন দাবী করিবেন না; এবং কেহ তাঁহার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, কিম্বা কোন প্রকারে তাঁহার রাজ্যে শান্তির ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না।" কেহ যদি State Papers গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে ৪০২ পৃষ্ঠা দেখেন তাহা হইলে একটা বড় বিস্ময়কর জিনিস দেখিবেন। হেষ্টিংস্ কেবল চৈৎসিংহের সুবিধা করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে তাঁহার ভবিষ্যতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার জন্য রাজা চৈৎসিংহের অধিকার অর্থে কি বুঝায় তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন। রাজার "অধিকার" অর্থে— "A complete and un-controlled authority under the acknowledged sovereignty of the Hon'ble Company in the Government of the country dependent on him in the collection of the revenues, and in the administration of justice"—"কোম্পানীর প্রাধান্য স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার অধীনস্থ ভূখণ্ডে রাজস্ব-সংগ্রহ এবং বিচার-কার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ এবং অক্ষুণ্ণ অধিকার।"

কোম্পানী রাজাকে যে সনদ দিয়াছিলেন তাহাতে বার্ষিক ২৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ ব্যতীত আর কোন কথা ছিল না। রাজা যে কবুলতি সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিয়মিত করদানের প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন এবং অবশেষে এই কথা লিখিয়া

ছিলেন, "নির্দ্ধারিত করদান ব্যতীত আমার উপর কোন দাবী থাকিবে না, সেই মর্ম্মে আমি এই কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম।"

হেষ্টিংসের চরিতাখ্যায়ক উইল্‌সন্ এবং ফরেষ্ট সাহেব ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, চৈৎসিংহের নিকট বার্ষিক রাজস্ব ব্যতীত অতিরিক্ত কর ন্যায়তঃ আদায় করিবার অধিকার কোম্পানীর ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ উইল্‌সন্ ও ফরেষ্ট সাহেব উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

রাজা চৈৎসিংহের কবুলতির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া ফরেষ্ট সাহেব তাহার উপর মন্তব্য করিয়াছেন। কবুলতিতে রাজা চৈৎসিংহ অঙ্গীকার করিয়াছেন—"আমার দেশের শান্তি এবং মঙ্গলের জন্য যাহা-কিছু আবশ্যক তাহা আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিব।" ইহা হইতে ফরেষ্ট সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "দেশের শান্তি এবং মঙ্গলের জন্যই চৈৎসিংহের নিকট অর্থ ও সৈন্য কোম্পানী চাহিয়াছিলেন এবং তাহা দিতে অস্বীকার করায় চৈৎসিংহের অঙ্গীকার-ভঙ্গের গুরুতর অপরাধ হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহাকে শাস্তি দেওয়াই বিধেয়" ফরেষ্ট সাহেব বেশ চতুরভাবে কবুলতির এই সর্ত্ত হেষ্টিংসের স্বপক্ষে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কবুলতি তিনি নিজেই তাঁহার State Papers গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ৫১৫ পৃষ্ঠায় ছাপিয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়। কারণ, উপরিউক্ত কয়েক ছত্রের পরেই কবুলতিতে আছে, রাজা চৈৎসিংহ অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তিনি জনগণের উন্নতির জন্য, কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য এবং রাজস্ব-বৃদ্ধির জন্য বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিবেন। এ কথায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাজা চৈৎসিংহ দেশ-অর্থে বারাণসী প্রদেশই বুঝিয়াছিলেন; ফরেষ্ট যে 'দেশ' অর্থে সমগ্র ভারতবর্ষ ধরিয়াছেন, তাহা তাঁহার কপোল-কল্পিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রিয়ার উদ্দেশে

(৫)

তোমার সেই প্রথম চিঠির পর তিন সপ্তাহ কোন চিঠিই পেলুম না। তোমার কাছ থেকে চিঠি পাবার আশা করবার অধিকার আমার কোথায়? তুমি আমায় লিখবেই বা কেন? তোমার কাছে পথিক বই আমি ত আর কিছু নই! তোমার কাছে আর কিছু হবার যদি ইচ্ছে থাকতো তবে সেটা পরীক্ষা করে দেখলেই চলতো। বিদায়ের রাতে যদি তোমার কাছে সব কথাই বলতুম—আচ্ছা, যদি বা বলতুম—তা হলে দুজনের কি উপকারই হ'তো! তুমি কেমন করে আমায় গ্রহণ করতে তা বুঝতেই পারছি না। কিন্তু তবুও তুমি যে আমার অভাব বোধ করছো একথাটা জানতে আমার ভারি সাধ যায়। কোন্

মেয়ে আমার জন্যে ভাবছে এ জ্ঞানটা এই নিঃসঙ্গ নিরালা জীবনে বড় প্রীতিপদ—মনে বলের সঞ্চার করে।

কি লিখলুম পড়ে দেখছি। যা লিখেছি তা মোটেই পুরুষোচিত হয়নি। এই যে নিজের উপর করুণা এটি সৈনিকের সব চেয়ে বড় শত্রু। সহ্য করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে ভোলা—নিজের দেহ, নিজের দুঃখ-বেদনা, নিজের যা-কিছুর দাম না দেওয়া—এই জীবন-মৃত্যুর খেলা—যে আদর্শের জন্যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছি এইটিই সব চেয়ে বড় করে দেখা।

প্রতি সৈনিকের জীবনে এমন একটা অবস্থা আসে যখন সে আর সহ্য করতে পারে না! দেহে সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হতে পারে, কিন্তু সে বুঝতে পারে যে সেই দিনটা ক্রমেই এগিয়ে আস্‌ছে যেদিন সে মনে ও দেহে একেবারে ভেঙে পড়বে। অনেক-দিন অপেক্ষার পর হয়ত সেদিন এল না, কিন্তু ভেঙে পড়বার দিন যে এগিয়ে আসছে এই নিঃসংশয়তায় সে একেবারে ভয়ে অভিভূত হয়ে যায়। ছোটখাট ব্যাপারের মধ্যে তার এই দুর্ব্বলতা ও ভয় আত্মপ্রকাশ করে। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা এতদিন তাকে বিশ্বাস করে এসেছেন, কিন্তু এই সময় থেকে তাকে চৌকি দিতে থাকেন, তার সাহসকে সন্দেহ করেন।

আমাদের দলে এমন একজন ছিল। সুদক্ষ নিশানাদার টেলিগ্রাফার প্রভৃতির দল থেকে দুঃসাহসীদের নিয়ে একটা দল তৈরী হ'ল। তাদের কাজ হচ্ছে এগিয়ে এগিয়ে চলা—পর্য্যবেক্ষণ-কর্ম্মচারীর সঙ্গে গোলন্দাজদের নিশানা দেওয়া। যেমন করেই হোক সব রকম বিপদের মুখে গোলন্দাজদলের সঙ্গে তাদের সংস্রব রাখতে হবে। খবর পাঠাবার তার যদি নষ্ট হয়, গোলাবর্ষণ যতই ভীষণ হোক, লাইনস্‌ম্যানকে গিয়ে তা সেরে আসতে হবে। আমি যার কথা বল্‌ছি সে লাইনস্‌ম্যান। যুদ্ধের প্রথমেই সে যোগ দিয়েছিল—সাহসের জন্যে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। প্রায় দু'বছর ধরে গোলাবর্ষণ সহ্য করে তার স্নায়ুর জোর যেন কমে গেল। প্রথমে আমরা তা বিশ্বাসই করিনি—শীগ্‌গীরই কিন্তু তা সকলের চোখে পড়লো। তার দৃষ্টি এলো-মেলো হয়ে এল—যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাতে না পালাতে হয় তার জন্যে সে যেন বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলো। গোলাবর্ষণের মধ্যে শ্রান্ত ঘোড়ার মত সে কেঁপে কেঁপে উঠতো। অবশ্য তাকে ছুটি দেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের দলে অনেকে মারা পড়েছে, কাজেই তাকে ছাড়তে পারলুম না। এই অবস্থায় কোনরকম দয়া দেখানো উচিত নয়। তার ফলে এ ভয়টা সংক্রামক হয়ে উঠতে পারে। সৈনিকের কাছে তার কর্ত্তব্যটুকুই শুধু আশা করা হয়, তার দিক থেকে কোন ওজর, আপত্তি গ্রাহ্য করা হয় না, এবং যখনই সে অকৃতকার্য্য হয় তখন সবাই তাকে চৌকি দেয়। এ বেচারী একদিন বীর ছিল, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে দেখতে লাগলো যে ক্রমেই সে কাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কয়েকজন তার এই অবস্থার কথা জানতে পেরেছি এই ভাবনাটা তার কাল হয়ে উঠলো। অন্তরে তার সাহসের

অন্ত ছিল না, কারণ শেষ পর্য্যন্ত সে হাল ছাড়ে নি।

আমরা যেখানে ছিলুম সেখানে জার্ম্মাণ-গোলা সারা দিনরাত আমাদের ব্যস্ত করে তুলেছিল। যে-কোন মুহূর্ত্তে ভেঙে পড়তে পারে এমন একটা বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের নীচে আমরা আড্ডা নিয়েছিলুম। এর মধ্যেই শত্রুরা বেশ অব্যর্থ লক্ষ্যে এর উপর কয়েকটা গোলা চালিয়েছে। হঠাৎ সে লোকটা জামা খুলতে লাগলো—তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল—সে অমন করছে কেন? কিন্তু তাতে সে কান দিল না। পোষাক খুলে যেখানে খুব গোলা বৃষ্টি হচ্ছে সেইখানে সে ছুটে চলে গেল। একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল সে!

এই জন্যেই নিজের উপর করুণার সময় সাবধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তোমার কথা আর বেশী করে ভাববো না। এমন করে কাজে মন দিতে হবে যেন তোমায় আমি কখনও দেখিনি। আমায়—

কিন্তু এযে প্রকাণ্ড মুর্খামি! স্মৃতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাব কি করে? তোমায় যখন ভুলতে পারবো না, তোমার স্মৃতিটি—আমার কাজে লাগাবো। কে যেন বলেছেন বোধ হয় Epiclilus, যে প্রতি বোঝার দুটো আংটা আছে—একটা দিয়ে তাকে সহজে বহন করা যায়, অপরটা দিয়ে যায় না। জ্ঞানীরা সেই আংটার খবর জানেন যা দিয়ে বোঝা বহন করা সহজ। এই উপায়ে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কাজে লাগাবো। যুদ্ধের শেষে যদি বাঁচি, তোমায় আমি খুঁজে বার করবো; এই প্রতিজ্ঞাই আমার শেষ লক্ষ্য হবে। এখন কিন্তু তোমার সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখা আমায় বন্ধ করতে হবে। আমরা দুজনেই এমন একটা কাজে হাত দিয়েছি যা উভয়ের পক্ষেই সমান ভাবে নিঃসঙ্গ এবং এমন পল্‌কা যে, স্বার্থপরতার সামান্য আঁচেই তা নষ্ট হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

সপ্তাহখানেক আগে অদ্ভুত ঘটনাচক্রে একখানা বই পেয়েছি, তাতে আমার সঙ্কল্পটা আরও দৃঢ় হয়েছে। আমাদের পদাতিকদল যাতে এগিয়ে যাবার পথে বাধা না পায়, সেই জন্যে শত্রুদের তারের বেড়া কাটবার প্রয়োজন হয়। ম্যাপের বাঁকা লাইন দেখে, কোন্‌দিক থেকে বাস্তবিকই সত্যি তারটা দেখা যাবে, তা বলা ভারি কঠিন। শ্র্যাপনেল দিয়ে তার কেটে আর বন্দুকের গুলিতে খুঁটী উপড়ে দেওয়া অবশ্য সহজ, কিন্তু যার হাতে এ কাজের ভার থাকে তাকে সকল দিক বিবেচনা করে কাজ করতে হয়। উচ্চ-কর্ম্মচারীদের মধ্যে একদিন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, এ দুঃসাহসিক কাজের ভার নেবে কে? ট্রেঞ্চের ধারে ধারে ঘুরে আর অজানা দেশে বেরিয়ে পড়ে এমন একটা জায়গায় আঘাত করতে হবে, যাতে আমাদের কাজের সুবিধা হয়ে যায়। ম্যাপ ত আর সব সময় ঠিক আঁকা হয় না, তাই নিজেদের একবার ভাল করে দেখার প্রয়োজন হয়।

আমার একটা উঁচু জায়গা জানা ছিল। সেখান থেকে আমার অভিপ্রেত জায়গাটা দেখতে পাওয়া যায়। সেটা একটা কামানের গর্ত্ত, এখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। জায়গাটা আমাদের কি জার্ম্মাণদের তা

বলা শক্ত। একটা সঙ্কীর্ণ নালা দিয়ে সেখানে পৌঁছান যায়, কিন্তু একটু নাড়াচাড়া করলে শত্রুর দৃষ্টিপথে পড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা, কারণ তারা সব সময় বন্দুক নিয়ে ওৎ পেতে আছে। তাদের একজন এই নালার পথটা খুব আয়ত্ত করে তুলেছিল—আমাদের দলের লোকেরা তার নাম দিয়েছিল "বাচ্ছা বিলি"। যাতে সে লোকটা আমাকে গুলি করবার সুবিধা না পায়, তাই সকালে কুয়াশা কাটবার আগেই মাটিতে প্রায় শুয়ে শুয়ে সেইখানে পৌঁছলুম। সঙ্গে ছিল একজন টেলিফোন-ওয়ালা। ঠিক করলুম সারাদিন সেখানে থেকে, কাজ সেরে রাত্রে আড্ডায় ফিরবো।

সেখানে গিয়ে দেখি চারদিকে বীভৎস ব্যাপার। বুঝলুম এখানে খুব ভয়ানক একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রবেশ-পথে রাশিকৃত মৃত জার্ম্মান পড়ে আছে, যেন তারা বার হবার মুখেই—আমাদের লোক তাদের আক্রমণ করে মেরে ফেলেছে! হাত দিয়ে কেউ চোখ ঢেকে কেউ মুখ ঢেকে এমন অসহায় ভাবে পড়ে আছে, যে দেখলে মায়া হয়। এই গর্ত্তটার সম্বন্ধে আমি ভুল ধারণা করেছিলুম, কারণ ধূলো বালি ধ্বংস-স্তূপে এটা এত ভর্ত্তি হয়ে আছে যে ভিতরে যাওয়া অসম্ভব। পাশে একটা dugout ছিল—তার নীচে নামবার সিঁড়িও পেলুম। হেলানো কাঠের আবরণে আত্মগোপন করে সেখানে গেলুম, কিন্তু এতে করেও শত্রুর দৃষ্টিপথ অতিক্রম করেছি বলে মনে হলো না, তাই গর্ত্তের ভিতর ঢুকে চারদিক দেখতে লাগলুম।

সিঁড়ির নীচে সরু তারের মাচানওয়ালা একটা ঘর। ডান দিকে একটা সুড়ঙ্গ—সেটা এমন ভেঙে গেছে যে, পার হতে হলে হাতে পায়ে ভর দিয়ে কষ্টে যাওয়া যায়। এসব জায়গায় বাইরে যাবার দ্বিতীয় পথ জানা দরকার, কারণ একটা বোমা এসে গর্ত্তের মুখে পড়লেই তা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই জানুর উপর ভর দিয়ে সুড়ঙ্গের অপর মুখটা কোন দিকে তা দেখতে বেরলুম। কাজটা মোটেই সুখকর বোধ হ'ল না, কারণ উপর থেকে ময়লা পড়ে পড়ে এখানকার অনেকগুলি পুরাণো বাসিন্দাকে বেশ করে চাপা দিয়েছে, কাজেই আমাদের গুঁড়ি মেরে যাওয়াটা চড়াই-উৎরাই পার হওয়ার মত মনে হল। কুড়িগজ আন্দাজ গিয়ে দেখি আবার একটা কামরা। মৃতদেহ, ধ্বংসস্তূপ আর ভিজে মাটির হাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। মাথার উপরে অনেক দূরে আলোর আভাস পাওয়া গেল। কাছে বিজলী-বাতির ব্যাটারী ছিল, তার আলোতে যা দেখলুম তাতে চমক লেগে গেল।

মাচার ধারে একটা মস্ত জার্ম্মান বসে আছে। প্রায় তিন সপ্তাহ হলো সে মারা গেছে, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন জীবন্ত। মাটিতে একখানি বই পড়েছিল, তারই হাত থেকে খসে পড়েছে। সেটা কুড়িয়ে নিলুম। অদ্ভুত! তার মলাট আবার খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া—বইয়ের নাম The Research Magnificient. H. G. Wells-এর লেখা। পাতা উল্টে দেখতে লাগলুম। জার্ম্মান ভাষায় মন্তব্য লেখা একটা চিহ্নিত অংশ প্রথমেই আমার চোখে পড়লো। অংশটা হচ্ছে—"আমাদের সবায়েরই মতো জীবনকে সে

এক ভাবে নেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, কিন্তু অন্য সবায়ের যেমন হয়, জীবন তাকে অন্য পথে নিয়ে গেল। জীবনে তার অনেক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল....." সেইখানেই পেন্সিলের দাগ শেষ হয়েছে। আমি এই দার্শনিকের দিকে চাইলুম—আজ সবায়ের অজ্ঞাতে মাটির নীচে মরে পড়ে রয়েছে সে। দাড়ি বড় বড় হয়েছে, চোখ দুটো ভিতরে বসে গেছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, আর মাথাটা হাবার মাথার মত ঘাড়ের উপর নড় নড় করছে। তার রগের উপর একটা আঘাতের চিহ্ন, সেখানে একটা বোমার আঘাত লেগেছিল। মনে হল যেন শুনতে পাচ্ছি, তার মাথার ভিতর সেই কথা গুলো বাজছে—"জীবনে তার অনেক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। সবায়ের ভাগ্যে যা ঘটে তারও তাই ঘটলো—জীবন তাকে এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অপ্রত্যাশিত পথে নিয়ে গেল।" দৈহিক যন্ত্রণায় যেন আমি কাতর হয়ে উঠলুম—শুধু যে তার জন্যে তা নয়—এ পৃথিবীর সবায়ের জন্যেই। এর পরে আলকাতরার মত কালো সুড়ঙ্গের চড়াই-উৎরাই ঠেলে যাওয়া ভয়ানক বীভৎস বলে মনে হল।

প্রবেশপথের সর্ব্বোচ্চ ধাপে বসে আমি বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলুম। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর যে বই প্রকাশিত হয়েছে, এই জার্ম্মান সেই বই কেমন করে পেলে তাই ভাবছিলুম। পরে সব বুঝতে পারলুম। অন্য অনেক অংশ দাগ দেওয়া ছিল দাগের পাশে পাশে পেন্সিলে লেখা মন্তব্য—কিছু ইংরেজিতে, কিছু জার্ম্মানে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হাতের লেখা। চিহ্নিত অংশগুলি পড়তে লাগলুম—প্রায় সব অংশগুলি ভয় এবং ভয় জয় করা সম্বন্ধে। "ভয় জয় করাই হচ্ছে মহৎ জীবনের ভিত্তি।" এ-লাইনটা বেশ করে দাগ দেওয়া ছিল।

আবার, "বাল্যকালে মনে করতুম যে ভয়কে চিরকালের মত জয় করবো। তা কিন্তু হয় না। আমি সব সময়েই দেখেছি যে প্রতিবারেই নতুন করে ভয়কে দমন করতে হয়।" ইংরেজ ভদ্রলোকটীর মন্তব্য তার জাতের উপযুক্ত—"ঠিক তাই। কিন্তু সে কথা স্বীকার না করাই উচিত।" বইয়ের মালিক এই ইংরেজকে মেরে জার্ম্মান ভদ্রলোক তাঁর যা টীকা লিখেছেন, তা সে পাতা ভরে পরের পাত পর্য্যন্ত গেছে। জার্ম্মান-ভাষায় আমার দখল বড় বেশী নয়, কাজেই তাঁর মন্তব্য বুঝতে পারলুম না।

এইটি শেষ নির্ব্বাচিত উক্তি। জার্ম্মান ভদ্রলোক এবার চুপ করে গিয়েছেন, কিন্তু ইংরেজের মন্তব্য লিখে রাখবার মতো। উক্তিটা হচ্ছে—"ছেলেবেলা থেকেই ভয়কে Benham-এর একটা সুগভীর লজ্জার বিষয় বলে ধারণা ছিল এবং এই ভয়ের হাত থেকে মুক্তির জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতো। তার মনে হ'ত, যে ভয় পায় সে সম্ভ্রান্ত হতে পারে না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে বুঝতে পারলে যে, ভয় পায় সকলেই, কিন্তু প্রকৃত সম্ভ্রান্ত সেই, যে ভয়কে জয় করে এবং অগ্রাহ্য করে, একেবারে মন থেকে ছেঁটে ফেলে দেয় না।" ইংরেজের মন্তব্য হচ্ছে—"বেড়ে বলেছ, এইবার পথে এস ত খুড়ো!"

কুয়াসা এখনও পরিষ্কার হয়নি—পরিষ্কার হবার কোন চিহ্নই দেখছি না, কাজেই এই

অজানার দেশে এই শীতের সকালে আমি Benham নামে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের জীবনে মহৎভাবে বাঁচবার সমস্যাটার সম্যক্ আলোচনায় মন দিলুম।

নিজের মনের খানিকটা বুঝতে পেরে কখনও কি তুমি ভাবতে বসেছ—'কি অদ্ভুত আমি—আমি কি সত্যিই এমন'—এ-কথা কি কখনও তোমার মনে হয়েছে? অপরে যেমন করে তোমার সম্বন্ধে ভাবে, নির্ম্মম হয়ে তুমি নিজের সম্বন্ধে একবার তেমন করে ভাবতে বসো। বই পড়তে পড়তে আমার ঠিক ঐ রকম ভাব এসেছিল।

খুব কম করে বল্লেও আমার মনে হয় এই Benham-টি একটি আস্ত আত্মভরী লোক (prig), তার মুখের একটা ছবি আমার মনে জাগছে। সাদা মুখ—কপাল ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—মস্তিষ্কের পরিমাণ বেশী এবং দেহ সেই অনুপাতে ছোট। খুব কম বয়েসেই সে আবিষ্কার করলে যে তার ভিতরে কোথায় একটা গোলমাল আছে এবং ঠিক করলে জগতে সুসঙ্গতির অভাবই তার কারণ। সে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করলে যে নিজেকে ঠিক করতে হলে জগৎকে ঠিক করাই তার একমাত্র উপায়। অবশ্য জগৎ আদৌ সোজা ভাবে চলতে চাইলে না—সে কোনকালেই তা চায় না। চিরকালই সে তার যীশু খ্রীষ্টদের ক্রুশে বিঁধে মারে। এই Benham সত্যিই স্বপ্ন দেখলে যে সে দ্বিতীয় যীশু হতে পারে—এক রকমের দেব-মানব—যে প্রেমের চেয়ে বুদ্ধিশক্তিতে জাতিকে মহান্ করে তুলতে পারে। তার বিপদ ছিল যে, তার নিজের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য সিদ্ধান্তগুলোতে সে মহানও ছিল না, দেবতাও ছিল না। কোন জিনিষ সম্বন্ধে সে একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারতো না। সে ছিল ভীরু; সাহসের চেষ্টা সে করতো কিন্তু মরার দিন পর্য্যন্ত সে ভয়কে জয় করতে পারলে না। ছেলেদের উপর তার কোন সহানুভূতি ছিল না, অথচ শূন্যদৃষ্টিতে নিজেদের ছেলেবেলার কথা নিয়ে সে কেবলই বক্‌বক্ করেছে।

মেয়েদের নিজেকে ভালবাসতে সে বাধ্য করতো, কিন্তু মনে মনে ভালবাসবার উপর তার ছিল খুব বেশী লোভ; যে ভালবাসা সে লাভ করেছে তা ধরে রাখবার মত ধৈর্য্যের ছিল তার অভাব। রাশি রাশি লোককে বাঁচাবার জন্যে তার মন আকুল হয়ে উঠতো, কিন্তু হাতের গোড়ায় প্রতিবেশীকে বাঁচাবার তার কোন চেষ্টাই ছিল না। সব অবস্থায় এবং সব সময়ে সে তার সৎ ইচ্ছাগুলোকে বস্তু থেকে তফাৎ করে কেবলমাত্র ধারণার উপর বাজে-খরচ করে ফেলতো। সে সারা-জীবন ধরে নিজেকে শিক্ষা দিচ্ছিল বড় রকমের আত্ম-বিসর্জ্জনের জন্যে, অথচ সেটা কাজে করবার মত তার মনের জোর ছিল না। ছোট ছোট দয়ার কাজ ছেড়ে সে মহাদেশের দুঃখ নিয়ে নিজের জীবনটাকে তিক্ত করে তুলেছিল। নিজেকে এই বিশ্বের রাজা করাই ছিল তার স্বপ্ন। এই স্বপ্নের সফলতার চেষ্টায় সে মানুষের মধুর স্নেহ-প্রেমকে দূরে সরিয়ে দিলে। মনে দেউলে হয়ে সে মরে গেল। দাঙ্গাকারীদের উপর সৈন্যদের গুলি চালান নিবারণ করবার জন্যে নিতান্ত অদ্ভুত ও অক্ষম-ভাবে চাকরের গামছা নাড়তে নাড়তেই সে মরে গেল। মেঘে-বোনা পতাকা উড়িয়ে

কল্পনার রথে নিজেকে সময়ের মধ্য দিয়ে ছুটে যাবার স্বপ্ন সে দেখতো। বাস্তবিক দেখতে গেলে সে যা করছিল, তা হচ্ছে, ইন্দ্রের দিকে সে একটা চাকরের গামছা উড়াচ্ছিল তাঁর বজ্রনিক্ষেপ নিবারণ করবার জন্য! ইন্দ্র যখন তার আদেশ অমান্য করলেন, তখন তার বিরক্তির আর সীমা রইল না।

আমি এই অদ্ভুত Benham-কে নিয়ে খুব মজা করছি, অথচ অতীত-জীবনে তার থেকে আমি বিশেষ ভিন্ন রকমের ছিলুম না। যদি তাই ধর, তা হলে এখনও আমার মধ্যে Benham-ত্ব খানিকটা আছে। তোমাকে ভালবাসি, এই কথাটা বলবার জন্যে তোমায় চিঠি লিখছি, যা তুমি কোনকালেই পড়তে পাবে না; তোমায় মুখ ফুটে বলবার আমার সাহস নেই। সে যেমন নিজেকে বোঝাত, আমি তেমনি নিজেকে বোঝাচ্ছি যে, তোমার কাছে হৃদয় খুলে না দেখানই ন্যায় ও সুন্দর। পুরোপুরিভাবে মানুষের যা করা উচিত আমি তা করিনি, অথচ Jack Holt তার স্ত্রীকে লাভ করবার সময় তা সহজে করেছে। আমি বেশ আদর্শ অনুযায়ী কাজ করছি, কিন্তু জানো আমার নিজের মতলব সম্বন্ধে আমি খুব নিশ্চিন্ত নই। তুমি ত দেখেছ সব জিনিষকে দশদিক থেকে দেখবার আমার শক্তি আছে। সাধারণ লোকে যেখানে কাজ করে, সেখানে আমি শুধুই বিচার করি; এটা আমার দুর্ব্বলতা! জীবন আমায় পাশ কাটিয়ে চলে গেছে—না—চলে যায়নি, তবে যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত পাশ কাটিয়ে গেছে বটে।

কি বিচিত্র জীবন আমায় পাশ কাটিয়ে চলে গেছে! এখন মরণের সাম্‌নে সব সময়ে বেঁচে আছি কিনা তাই বুঝছি এতদিন জীবনের ধরা-ছোঁয়া পাইনি কেন! আমার স্বপ্নগুলো বাস্তবের সংস্পর্শে এসে পাছে কলঙ্কিত হয়, তাই ভারি ভয় পেতুম। Oxford ছাড়বার পরেই পার্লামেণ্টে যাবার চেষ্টা করলুম। আমার বিশ্বাস ছিল বছর দশের মধ্যে দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করে দেবে। দলের ভিতরে এসে দেখলুম রাজ-নীতির অন্তরালে পরস্পরের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির তাণ্ডব চলেছে। শুধু যখন ভোটের দরকার হয়, তখনই কেবল রাজনীতিজ্ঞেরা জাতির জন্যে ভাবতে বসেন। এর প্রতিবাদস্বরূপ আমি পার্লামেণ্টের আসন ছেড়ে কিছুকাল গরিবদের বস্তি মধ্যে বাস করলুম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলুম, দারিদ্র্য নিরাপদে বাস করছে এবং পরোপকার ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব নোংরা এবং অশ্রদ্ধেয়। আত্ম-সন্তোষের উপর হাড়ে চটে আমি রুশিয়ায় চলে গেলুম—সেখানে যে নব-বিদ্রোহ জেগে উঠেছিল তাতে যোগ দিবার জন্যে। আবার নিজেকে মোহমুক্ত করলুম—দেখলুম আমার সহানুভূতির কোন দরকার নেই সেখানে। দেখে অবাক হলুম, যুবারা সব নিজের নিজের চোখ উপড়ে ফেলে বলে বেড়াচ্ছে যে, রুষ-সম্রাট তাদের চোখ কাণা করে দিয়েছে, এবং অত্যাচার-প্রপীড়িত বলে দেশের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করছে। পৃথিবীতে এমন লোকের অভাব নেই, যারা নিজেদের বিকলাঙ্গ করে কুৎসিত করবার জন্যেই জন্মায় এবং পরের ঘাড়ে সে দোষ চাপাতে আদৌ দ্বিধাবোধ করে না।

আমি ত বলেছি, জীবন চলে যাচ্ছিল; আর ভবিষ্যৎ-যুগের মঙ্গল-সাধনার অতি আগ্রহে আমি প্রাত্যহিক জীবনের সহজ সুন্দর মাধুর্য্যকে অবহেলা করছিলুম।

তারপরই এই যুদ্ধ বাধলো। যে মিথ্যা ভদ্রতার আবরণে আমরা নিজেদের ঢেকে-ছিলুম, তা ছিঁড়ে ফেলে কর্ত্তব্যের বর্ম্মে আমাদের সজ্জিত করলুম। কেমন করে ভালভাবে বাঁচাতে হয় তা জানতুম না। ভগবান একটা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে মরবার সুযোগ দিলেন। জীবন নিয়ে আমাদের এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখে তাঁর শ্রান্তি এসেছিল, তাই নরকের শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেদিন থেকে সবই কত সত্য হয়ে উঠেছে! ঘৃণার অবিশ্বাসের সমস্ত ভূত আমাদের মন থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে--মানুষের চোখে যেন আত্মার অনির্ব্বাণ জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়েছে। যেখানে পাপকে দেখবো সেখানেই তাকে আঘাত করবার মত প্রাচীন ঋষিদের আদিম শক্তিটা যেন আমরা পুনরায় অর্জ্জন করেছি। আকাশ যখন ঢেকে যায় তখন আর সন্দেহ করি না যে, মেঘের ওপারে স্বর্গ ভেসে চলেছে।

"আমাদের সকলেরই মত জীবনকে সে একভাবে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সবায়ের ভাগ্যে যেমন হয়, জীবন তাকে একেবারে ভিন্ন পথে নিয়ে গেল—জীবনে তার অনেক উদ্দেশ্য ছিল..." এই অজানার দেশে যখন লুকিয়ে ছিলুম তখন এই সব কথাই ভাবছিলুম। জার্ম্মাণ ভদ্রলোকটিও মরবার আগে এই সব কথা ভেবে গেছেন এবং তাঁরও আগে এই-সব ভেবেছেন এই বইয়ের মালিক সেই ইংরেজ ভদ্রলোকটি। মহৎ কাজ করবার জন্যে তাঁরা দুজনেই প্রস্তুত ছিলেন—চেষ্টাও করেছিলেন তাঁরা—অথচ তাঁরা ছিলেন পরস্পরের শত্রু। যুদ্ধের আগে এই ভাব-বৈষম্য নিয়ে ভারি গোলে পড়তুম—এই দুটোর সমন্বয়ের নানা ব্যর্থ চেষ্টা করতুম। মনের মধ্যে একটা মহৎ করুণা লাভ করেছি, ত্যাগের কথা ভাবতে গিয়ে ছোটখাট মতলবের কথা আমি এখন ভুলে যাই। আমার বড় সাধ হচ্ছিল যে জার্ম্মানটি—যদি আমার মনের সব কথা জানতে পারতো!

কুয়াশা এখনও কাটে নি; খাবার সময়ও হয়ে এসেছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে সেই ভয়াবহ ঘরের ভিতর আবার গেলুম এবং তার পাশে খাবারের কিছু অংশ রেখে দিলুম। মনে হ'ল এতেই সে সব বুঝতে পারবে। মৃত্যুর স্পর্শে আমাদের সমস্ত বৈরতা লুপ্ত হয়েছে। বন্ধুর মত আমরা খাবার ভাগ করে খেয়েছি!

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বর্ষারাত্রে

শাওন গগন ঘেরা সিন্দূর মেঘে
পশ্চিম হতে বায়ু বহে ঘন বেগে।
ঝম্ ঝম্ চলে বারি গলি জলধরে
ছুটায়ে গিরির বুকে শত নির্ঝরে।

কলকল রবে ধেয়ে ছুটে চলে জল
সবুজে ভরায়ে তোলে মরুতৃণ দল।
বসন্ত জেগে ওঠে তৃণ-পল্লবে
ঝরে পড়ে নীপ-রেণু ঘন সৌরভে।

আঁধার গগন হ'তে নামি শিরশিরে
গুরু গুরু রবে মেঘ নিঘোষি ফিরে।
শ্রাবণ রজনী বুকে সঘন আঁধারে
স্বপনের আনাগোনা চলে অভিসারে।

বাহি কত জনপদ, কত দূরপথ
গিরি-দরি-প্রান্তর চড়ি মেঘ-রথ
ছুটায়ে তড়িৎ-কশা, স্বপনের হাতে
হাত ধরাধরি করি এলে এই রাতে?

হেথা কোথা অতীতের ছায়াময় ঘর!
এযে অবারিত মাঠ গিরি-প্রান্তর!
ঠেলি যুগ-যবনিকা দাঁড়াইলে আসি,
ঘন মেঘে খেলে মুহু তড়িতের হাসি।

চেতনে ও অচেতনে ওগো একি ভেদ,
মিশে গেছে কোন্‌খানে যুগবাহী ছেদ!
সেই সব—সেই সব—সেই দুইজন,
মাঝখানে মহাকাল হ'য়ে অচেতন!

শ্রীনিরুপমা দেবী

মরণ-বাঁচনের কথা

২

বাংলার গ্রাম

পৌষের (১৩২৭) "ভারতীতে" আমরা বাঙালী জাতির ধ্বংস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে লোকের দৃষ্টি এদিকে কতকটা পড়িয়াছে দেখিতেছি। যেরূপ দ্রুতগতিতে ও নিশ্চিতরূপে আমরা ধ্বংসের দিকে যাইতেছি—সরকারী রিপোর্ট হইতেই তাহার হিসাব দিতেছি:—

(ক) বাংলার কতকগুলি জেলার জন্ম-মৃত্যুর হার—

জেলার নাম	জন্মের হার (হাজার-করা)	মৃত্যুর হার (হাজার-করা)
বর্দ্ধমান	২১·২	৫০·৫
বীরভূম	২৩·৭	৬২·৩
মেদিনীপুর	২৪·২	৪০·১
কলিকাতা	১৮·৫	৪২·২
নদীয়া	২৫·৬	৪৩·০
মুরসিদাবাদ	২৮·৯	৪৭·৩
রাজসাহী	৩২·৮	৪১·৫
দিনাজপুর	৩১·৬	৪৩·৭
পাটনা	২৫·৭	৩৬·১

মালদহ	৩০·৫	৩৯·০
চট্টগ্রাম	৩০·১	৪১·৪
দার্জ্জিলিং	৩০·০	৪৮·৪

সমগ্র বাংলার ও বিলাতের জন্ম-মৃত্যু-হারের তুলনা করিলে ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট শুনা যাইবে—

(১৯১৯)

	জন্মের হার (হাজার-করা)	মৃতুর হার (হাজার-করা)
বাংলা দেশ	২৭·৫	৩৬·২
বিলাত	১৯·০	১৪·৩

এখন একবার দেখা যাক্ ম্যালেরিয়া ও কলেরা এই দুই যমের দূত কিরূপ ভাবে বাংলা দেশের লোক ধ্বংস করিতেছে ঃ—

বৎসর	কলেরা	ম্যালেরিয়া
১৯১৭	৪৫০২১	৮৮২৭৬৮
১৯১৮	৮২৩৭৯	১৩৫৭৯০৬
১৯১৯	১২৪৯৪৯	১২২৯২৫৭

বাংলা দেশের নেতারা স্বরাজ-স্বপ্নেই বিভোর, কিন্তু আর কিছুদিন এরূপ চলিলে বোধ হয় চিত্রগুপ্তের খাসমহলে স্বরাজের পার্লামেণ্ট বসাইতে হইবে।

যে মুষ্টিমেয় ধনী ও শিক্ষিত লোকেরা সহরে বাস করেন, তাঁহারা এই ভয়াবহ ব্যাপারটা ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছেন কিনা সন্দেহ। কারণ বাংলা দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক গ্রামে বাস করে, আর ধ্বংসের লীলা প্রধানতঃ বাংলার গ্রামেই চলিতেছে। কিন্তু ধড় ও মাথার যোগ-সূত্র ছিন্ন হইলে শরীরের যে অবস্থা হয়, বাংলার সমাজ-দেহের আজ সেই অবস্থা। যে অজ্ঞ ও গরিব লোকেরা গ্রামে বাস করে, সহরবাসী ধনী ও শিক্ষিতের সঙ্গে তাদের প্রাণের যোগ নাই। তারা মরিল কি বাঁচিল, খাইল কি না খাইল, এ কথা চিন্তা করিবার ক্ষমতা বা সময় সহরবাসীর নাই। তাই একদিকে শিক্ষিত সহরবাসী বিশ্বপ্রেম, স্বরাজ, নিখিল মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি বড় বড় কথা আওড়াইতেছে; —অন্যদিকে অনাহার-ক্লিষ্ট অর্দ্ধ-উলঙ্গ গ্রামবাসী দিনান্তে একমুঠা ভাতের যোগাড় করিতে না পারিয়া, স্ত্রী-পুত্রকন্যার শীর্ণ মলিন মুখের দিকে চাহিয়া, মানব জন্মকে ধিক্কার দিতেছে। যে জমিদারের প্রজারা দুর্ভিক্ষে পতঙ্গের মত মরিতেছে, তিনিই হয়ত মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া বিদূষক-সভায় রাজনীতির কূট তর্কে, ইংরেজী বক্তৃতার তুব্‌ড়ী-বাজীতে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিতেছেন। হতভাগ্য পরাধীন বাংলাদেশ ছাড়া এমন অস্বাভাবিক দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথায়ও দেখা যায় না।

এক শতাব্দী পূর্ব্বেও বাংলার গ্রাম স্বাস্থ্য ও সম্পদে পূর্ণ ছিল। খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিলনা। দুইবেলা পেট ভরিয়া দুমুঠা খাইয়া, অতিথি-অভ্যাগতকে প্রসন্ন মনে লোক সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিত। পাড়ায় পাড়ায় নিমন্ত্রণ মহোৎসব প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। গ্রামের অন্নপূর্ণারা সেই যজ্ঞে সকলকে রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাওয়াইয়া জীবনকে সার্থক মনে করিতেন। দোল-দুর্গোৎসব, বারমাসে তের পার্ব্বণ অনেক ভাগ্যবানের গৃহেই হইত। আর গ্রামের লোকেরা সকলে মিলিয়া তাহাতে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া যোগ দিত। যাত্রা, হাফ-আখরাই, পাঁচালী গ্রাম্য জীবনের বড় কম স্থান অধিকার করিত না। একাধারে সাহিত্য-রস, ও ধর্ম্মোপদেশ বিতরণ করিয়া সরল গ্রামবাসীর

মনের ক্ষুধা মিটাইতে ইহারাই চেষ্টা করিত। পুরাণ-পাঠ, কথকতা প্রভৃতিও এই সকল কাজে অনেক সাহায্য করিত। এদিকে জীবিকার জন্যও কমলার কৃপায় বাংলার লোককে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইত না। বাংলার কৃষক মাটী চষিয়া বসুন্ধরার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইত না। কামার, কুমার, কাঁসারী, ছুতার, তাঁতি, জোলা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পীরা গ্রামের লোকের প্রয়োজনের জিনিষ যোগাইয়া সুখে জীবন যাপন করিত। বণিক ও মহাজনেরা রেলপথে ও জলপথে বাংলার বাণিজ্য-বহর বহিয়া ঐশ্বর্য্যের আমদানী করিত। ধনধান্যপূর্ণ উৎসব-মুখরিত বাংলা-দেশে আধি-ব্যাধির প্রকোপও বিশেষ কিছু ছিলনা। প্রায় সকল গ্রামেই ৭০।৮০ বৎসর বয়সের সবলকায় বুড়ার দেখা পাওয়া যাইত। ডাক পড়িলে লাঠি কাঁধে করিয়া দাঁড়াইতে পারে, এরূপ জোয়ান ছোকরা ৪০।৫০ জন সকল গ্রামই যোগাইতে পারিত। বঙ্কিমবাবু যে লাঠির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন সে বিন্দু-মাত্রও কল্পনা নয়। এই বাঙালীই লাঠি হাতে করিয়া পর্ত্তুগীজ ও দিনেমার দস্যুদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। ক্লাইবের ঐতিহাসিক লাল পল্টনের দল ইহারাই গঠন করিয়াছিল। বেশী অতীতের কথার দরকার নাই। একশত বৎসর পূর্ব্বেও তখনকার বড়লাট বাংলার বল ও স্বাস্থ্যের প্রশংসা করিয়া ছিলেন।

একশত বৎসরের মধ্যে এই সব ভোজ-বাজীর ন্যায় কোথায় মিলাইয়া গেল! কোথায় আজ বাঙালীর সে সম্পদ, বল, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, ঐশ্বর্য্য? দুর্ভিক্ষ আজ বাংলা দেশে মোরসী-পাট্টা লইয়াছে। প্রতি বৎসরেই বাংলার কোন না কোন অঞ্চলে অনাহার-ক্লিষ্টের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে। আজ খুলনায়, কাল বাঁকুড়ায়, পরশুদিন ব্রহ্মণবেড়িয়া, নোয়াখালিতে। বাঙালী গৃহস্থ আর তেমন হাসি-সহৃদয়তার সঙ্গে অতিথির অভ্যর্থনা করিতে পারে না। সে ব্রত-উৎসব, পাল-পার্ব্বণ, খেলা-ধুলা, যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি আর নাই। বাংলার গ্রাম আজ ঘোর নিরানন্দে আচ্ছন্ন। বিজয়া দশমীতে তেমন কোলাকুলি আর হয় না। স্বাস্থ্য আজ বাংলার গ্রাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সকলেরই মুখে ব্যাধির রেখা অঙ্কিত। দশখানা গ্রাম খুঁজিলেও একটা সবল লোক পাওয়া কঠিন। আর দীর্ঘজীবী বৃদ্ধের দল ত লোপ পাইয়াছে। ৪০ বৎসরের জরাক্লিষ্ট যুবকেরাই আজ বৃদ্ধ বলিয়া গণ্য। কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় গ্রাম প্রায় লোকশূন্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদেরও অবস্থা কঙ্কালসার প্রেতমূর্ত্তির মত। দৃঢ়-মুষ্টিতে লাঙ্গল ধরিতে পারে, দু-মণ বস্তা মাথায় বহিয়া অক্লেশে পথ চলিতে পারে, এমন লোক বাংলার পল্লীতে বিরল। যেখানেই যাও দেখিবে, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে, খাল-বিল-ডোবায় পূর্ণ, গ্রামের চেহারা পরিত্যক্ত শ্মশানের মত। নদী-নালা শুষ্কপ্রায়, সেকালের দীর্ঘ পুষ্করিণী সব ভরাট হইয়া গিয়াছে। জলাভাবে বাংলার গ্রামবাসী একপ্রকার কাদা গুলিয়া খাইতেছে। যে-সব প্রাচীন প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল সেগুলির চিহ্ন ক্রমশঃ লোপ হইতেছে। বাংলার বিদূষক-সভার সদস্যেরা কলিকাতায় বা দার্জ্জিলিংএ বসিয়া, যে সব Village Improvement Scheme বা গ্রামের উন্নতির মতলব ফাঁদিতে-

ছেন, সেগুলা কাহাদের জন্য হইতেছে—তাহা বুঝা দুষ্কর। বোধ হয় নিষ্কর্ম্মা শিক্ষিত সহর-বাসীদের সময় কাটাইবার এও একটা উপায়।

গ্রাম্যশিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতিরা অতি দ্রুত-গতিতে লোপ পাইতেছে। সেকালে বাংলার বস্ত্র-শিল্প পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। অগণ্য তাঁতি ও জোলা ইহার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিত। কেবল তাহাই নয়—ইহাদের যথেষ্ট লক্ষ্মী-শ্রীও ছিল। আজ বস্ত্র-শিল্পের লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই সব তাঁতি-জোলার দল অন্নাভাবে কেহবা লাঙ্গল ধরিয়াছে—কেহবা চাকুরীজীবী হইয়াছে। গ্রামের কামার-কুমার, কাঁসারী, ছুতার প্রভৃতি শিল্পী-জাতিদেরও সেই অবস্থা। তাহাদেরও অনেককেই লাঙ্গল ধরিতে হইয়াছে। এদিকে ধোপা, নাপিত, ভুঁইমালী, বেহারা, হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতি গ্রাম্য শ্রমজীবীদের ধ্বংস দ্রুত বেগে হইতেছে। দশখানা গ্রাম খুঁজিলেও ধোপা বা নাপিত পাওয়া কঠিন। তাহাদের মধ্যে বিবাহের উপযুক্ত কন্যা পাওয়া এত কঠিন, যে প্রায়ই ৫০।৬০ বৎসরের বুড়োর সঙ্গে ৪।৫ বৎসরের বালিকার বিবাহ দিতে হয়। অনেক স্থলেই এই সব বালিকাকে অনেক মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। যে টাকার যোগাড় করিতে পারে না—তাহার বিবাহই হয় না। এই সব কারণে প্রায়ই এই সকল শ্রমজীবী জাতির বংশ নির্ম্মূল হইতেছে। ফলে বাঙালী মজুর বা শ্রমিক অনেক গ্রামেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উড়িয়া বা হিন্দুস্থানী শ্রমিকেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। উড়িয়া বেহারা, উড়িয়া ধোপা, হিন্দুস্থানী মাঝীমাল্লা অনেক গ্রামেই আজকাল দৃষ্টিগোচর হয়। সহরে বিদেশী চাকর, চাকরাণী, সুপকার প্রভৃতির কথা এত সুপরিচিত যে, সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সহরের নিকটবর্ত্তী কল-কারখানা প্রভৃতিতেও বাঙালী শ্রমিকের দর্শন পাওয়া দুর্ল্লভ। এই সকলের নানা কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু প্রধান কারণ যে বাঙালীর স্বাস্থ্য-নাশ,—তাহার দেহের ক্রম-বিবর্দ্ধমান অপটুতা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল ব্যাপার কি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয় না যে, বাঙালীজাতি—বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দুজাতি মরিতে বসিয়াছে?

বাংলার গ্রাম—বাঙালীর জাতির ধ্বংসের কারণ কি, তাহার বহু আলোচনা হইতেছে। আমরাও আজ দশ বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। সকলেরই প্রায় ঝোঁক দেখিতেছি কলেরা ও ম্যালেরিয়ার ঘাড়ে দোষ চাপানো। আবার কেহ কেহ বা বাংলার পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যতত্ত্বের অজ্ঞতা—তাহার সামাজিক কুসংস্কার প্রভৃতিকেই প্রধান কারণ বলিয়া মনে করেন। এ সকল কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইতে পারে। কিন্তু এই অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি লইয়াও ত বাঙালী-জাতি বহু সহস্র বৎসর বাঁচিয়া ছিল। আজ এগুলা হঠাৎ এমন মারাত্মক হইয়া উঠিল কেন? তাই মনে হয় এগুলা আনুসঙ্গিক কারণ হইতে পারে, কিন্তু প্রধান কারণ নয়।

বিজাতীর শিক্ষায় মস্‌গুল, আধা-ফিরিঙ্গি বাবুর দল যাহাই বলুন না কেন, সত্য এই যে—পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল সংঘর্ষই ইহার মূল কারণ। ইহার প্রবল ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া আমাদের জাতীয় জীবন-তরী আজ

টলমল করিতেছে। এই রক্তপিপাসু সভ্যতার তিন মুখ। এক মুখে এ আমাদের বহুকালের পরীক্ষিত আচার-ব্যবহার ও জীবন-যাপন-প্রণালীকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে। আর এক মুখে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম ও সংস্কারকে নাড়া দিয়া, সমাজের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত শিথিল করিয়া তুলিয়াছে। আর উহার মাঝখানে যে রক্তদন্ত, ধূম্রলোচন মুখটা আছে, সেইটা আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। কি করিয়া এই ত্রিশিরা দৈত্য আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন করে, তাহা আজ ইতিহাসের কথা; আমাদের পুনরুক্তি করিবার দরকার নাই। শুধু এই বলিলেই হইবে যে, আমাদের গ্রাম্য শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দেশব্যাপী দারিদ্র্য এই বণিক-সভ্যতার আক্রমণেই হইয়াছে। দেশব্যাপী ঘোর দারিদ্র্য ও অনাহারই, স্বাস্থ্যনাশ ও ম্যালেরিয়ার কারণ নয় কি? যাহারা খাইতে পারে না—তাহারা রোগ-প্রতিরোধ করিবে কি করিয়া? বাংলা দেশ ত চিরকালই নদী-নালা-বেষ্টিত নিম্নভূমি ছিল। তবে সেকালের বাঙালী নৌ-বহর সাজাইয়া প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিত কি করিয়া; আর বনের হাতী ধরিয়া তাহাকে অবলীলাক্রমে পোষ মানাইতই বা কোন্ উপায়ে? আমরা ত মরিতে বসিয়াছি। কিন্তু জানিয়া-শুনিয়া বিমাতার দেওয়া বিষ হাতে তুলিয়া খাইব কি? ডাইনী বুড়ীর ছেলে-ভুলানো ছড়া শুনিয়া রক্ষা-কবচটা যদি তাহার হাতে সঁপিয়া দিই, তবে স্বয়ং বিধাতাও আমাদের বাঁচাইতে পারিবেন না।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

যমের বাড়ীর কথা

(Dynamics of Psychology)

১

যে রকম সময় পড়িয়াছে তাহাতে যমের বাড়ী সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। এ সম্বন্ধে পুঁথি বেশী পাওয়া যায় না। বাল্মীকি, হোমার, ভার্জিল, দান্তে, প্রভৃতি নরক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আর্ত্তনাদের ভাগই বেশী। 'চন্দ্রশেখরে'ও তাই। দীনবন্ধুর 'আলয়ে জীয়ন্ত মানুষ' নামক গল্পে রঙ্গের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু অতি সামান্য। নচিকেতা যমের বাড়ী গিয়া উপনিষদের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অতিশয় আধ্যাত্মিক। ফলে, অনেকেরই অনুমান, যে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। এবং যমের portfolio কেবল নরক লইয়া। মিল্টনবর্ণিত Geography-ও অনেকটা সেই রকম। অতএব এ বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের দরকার।

যদি বিশ্বের 'পরিবর্ত্তন' রূপ নিয়তি মানিতে

হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, যমালয়ের সংগঠনও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবীতে পরিবর্ত্তন ঘটে, সৌরজগতে ঘটে, অথচ যমালয়ে ঘটে না, এ কথা ন্যায়সঙ্গত নহে—কারণ--Uniformity of law—একটা অকাট্য জিনিষ। যদি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগতে পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে ইন্দ্রিয়াতীত জগতেও নিশ্চয় ঘটিবে—নচেৎ দর্শনশাস্ত্রের Parallelism নামক সূত্র ব্যর্থ হইয়া যায়।

যাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ মানেন না, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে যমালয় "Psychologically" মানিয়া থাকেন। আমরা প্রথমতঃ যমালয়কে Imagination এর মধ্যে ধরিয়া লইব—অর্থাৎ কল্পনা করিয়া আমরা যমালয় সৃষ্টি করি, সেই কল্পনা অবশেষে ভয়ের কারণ হইয়া পড়ে। যেমন, শিশু অন্ধকার দেখিয়া "জুজুর" ভয় পায়।

যদি তাহাই ধরিয়া লওয়া যায়—তাহা হইলেও সকলে স্বীকার করিবেন যে, এহেন ভীতিপূর্ণ স্থান মানবের কল্পনা-ক্ষেত্রে বদ্ধ জলের মত দাঁড়াইয়া যাওয়া স্বাস্থ্যকর নহে। যদি এই সন্দর্ভের কোনো মূল্য না থাকে, অন্ততঃ এই Insanitary condition অর্থাৎ মনের অস্বাস্থ্যকর অবস্থাটুকু ঘুচাইয়া দেওয়া ইহার অভিপ্রায়। বোধ হয় একটু চেষ্টা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে পৃথিবী হইতে যমালয় শ্রেষ্ঠস্থান। হয়ত সেই "Unexplored bourne whence no traveller returns" (অনাবিষ্কৃত দেশ, যেখান হইতে কোন পথিকই ফিরিয়া আসে না), এই যুগের শিক্ষিত লোকের খুব বাঞ্ছনীয় বসতি স্থান, এবং সময় পাইলে অচিরাৎ emigrate করা উচিত—অন্ততঃ পরিদর্শনের জন্য। বাস্তবিক আমরা যতদূর জ্ঞাত হইয়াছি, জায়গাটা এখন খুব মনোরম, কোন নরক-যন্ত্রণা নাই, Sanitation perfect. বিরাট রাষ্ট্রতন্ত্র—যমরাজ তাহার নিত্য-স্বরূপ President এবং সকল জাতিরই সমান অধিকার—perfect community—সুতরাং কেহই শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে চাহে না। ইহার আর একটা প্রমাণ যে পৃথিবীতে এখন জন্ম হইতে মৃত্যুর চেষ্টা বেশী। যমালয় পৃথিবী হইতে আরামের স্থান না হইলে অনেকে ফিরিয়া আসিত। পূর্ব্বে প্রত্যেক Decadeএ (দশ বৎসরের মধ্যে) শতকরা ৫ জন additional লোক সখ্ করিয়া পৃথিবীতে আসিতেন, কিন্তু এখন আসিতে নারাজ। নিশ্চয় সেখানে কোন attraction (আকর্ষণ) আছে। যাদের ভালবাসি ও ভক্তি করি, এমন লোকও সেখানে অনেকে গিয়া জমা হইয়াছেন বোধ হয়, এবং তাঁহাদের পুণ্য-বলে যমালয়ের যে একটা Reform আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। "As above, so below"—কি বলেন? কল্পনা যদি করিতে হয়, তবে scientifically করাই ভাল। "Innocently to amuse the imagination in this dream of life is wisdom"—

Goldsmith.

২

প্রথমে দর্শনশাস্ত্রের ভাগটা সংক্ষেপে সারিয়া বিজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করা যাউক। যে আজন্ম 'মরণ' নামক অবস্থার দিকে টান

তাহার নাম যম। যমের চেহারা কি রকম, তাহার বর্ণনার আপাততঃ আবশ্যক নাই। যম যে টানে, তাহার প্রমাণ কি? উত্তর—নিজেই আমরা অনুভব করি। বার্দ্ধক্য নামক জীবনক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেই তাহা উদারভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কি যেন টানিতেছে। কি ধরিয়া টানে? উত্তর—মায়ু-যন্ত্র। প্রমাণ কণ্ঠশ্বাস। যমের আকর্ষণের বিপরীত দিকে একটা আকর্ষণ আছে নিশ্চয়। মনে করুন সেটা পৃথিবীর দিকে—'বাহ্য' আকর্ষণ। যমের টান্ মনে করুন 'আভ্যন্তরিক' আকর্ষণ। কিংবা বলিলে চলে, একটা ইহ-লোকের আকর্ষণ, আর একটা পরলোকের। টানাটানির মধ্যে "ইহ" এবং "পর" কেন? এইখানে দর্শন-শাস্ত্রের advice gratis। অর্থাৎ উভয় টানাটানির মধ্যে যে ভাবগ্রাহী জীব কেন্দ্রস্থ হইয়া তাহা অনুভব করেন তাঁহার নাম আত্মা। যেখানে সে ভাব গৃহীত হয় তাহাকে আমরা বলি 'মন'। এবং টানাটানি itself 'প্রাণ'। 'আমি যমালয়ে চলিলাম', কিংবা "পরলোকে চলিলাম" এই ভাব বেশীভাগ মানুষের মধ্যে আছে। সকলেই যে বসিয়া বসিয়া কল্পনা করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। 'প্রাণ রাখিতে গিয়া প্রাণান্ত' না হইলে এ ভাবের উদয় হয় না।

দর্শনশাস্ত্রের কল্পনা এই—টানাটানিতে দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। তার পর আত্মা—অর্থাৎ ভাবগ্রাহী জীব একটা সূক্ষ্মদেহ লইয়া যমালয়ের দিকে আকৃষ্ট হন। সে সূক্ষ্মশরীরও ক্রমে যমালয়ে বিলীন হয়। থাকে মাত্র 'অহং' ভাব। সেই 'অহং' ভাবকে আবার পঞ্চভূতে চাপিয়া ধরে, যমালয় হইতে পৃথিবীর দিকে টানিয়া আনে। অর্থাৎ পুনর্ব্বার জন্ম হয়। এই সব গতির পথ দেবযান, পিতৃযান, ইত্যাদি। ইহার তথ্য অত্যন্ত গভীর, এবং যোগবলে নাকি জ্ঞাত হওয়া যায়। একদিন হয়ত বিজ্ঞান-সম্মত হইয়া পড়িবে। কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমাদের সে সব কথা আলোচনা করা ধৃষ্টতা হইয়া পড়িবে। কেবল 'গতি' সম্বন্ধে কিছু বলিলেই চলিবে।

য—আ—পৃ

মনে করুন 'য'=যম। আ=আত্মা। পৃ=পৃথিবী, কিংবা আমার দেহ। 'য'র আকর্ষণে 'পৃ' অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ শিথিল হইয়া পড়িলে 'আ"=আত্মা দ্রুতবেগে যমের বাড়ী চলিয়া যাইবে(অর্থাৎ Psychologically মনে করিবে "আমি চলিলাম') ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু পূর্ব্ব-কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইলেও "পূব"দিকে আকর্ষণ যে একেবারে নষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না; শিথিল হয় মাত্র। এই জন্য বলা যায় যে, ইহলোকের মায়া রীতিমত শ্রাদ্ধ না হইলে এড়ানো যায় না। দশজন বন্ধু-বান্ধবও মায়া-রজ্জু দ্বারা আত্মাকে টানিতে থাকে। কিন্তু ফলে সে সময় যমের টান এত প্রবল যে পঞ্চভূত পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দেয়। তখন আত্মা নববধূর ন্যায় অশ্রুপরায়ণা হইয়া শ্বশুরালয়ের মতো একটা স্থানে কিংবা কেন্দ্রে গিয়া বসিয়া পড়ে। তাহাকেই আমরা মনে করি যমালয়। আবার সেখানে কিছু-দিন তিষ্ঠিয়া যখন ছেলে-পুলে হবার সম্ভাবনা হয়, তখন পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে। তখন পঞ্চভূতের টান প্রবল হয়। এই রকম ঘড়ির 'পেণ্ডুলমের' মত প্রত্যেক আত্মা চিরকাল

দুলিতে থাকে। যদি পিত্রালয়ে আর না আসে তবে সে "মুক্তাত্মা" হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটী দেবাখ্যাত নরবর্গের মধ্যে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেন্সসে দেখা গিয়াছে, যে মাত্র বত্রিশ কোটী বর্ত্তমান। ইহাতে বুঝিতে হইবে, বাকি এক কোটী মুক্তাত্মা। এ সকল অমর আত্মা শ্বশুরালয়ে সুখে দিন যাপন করিতেছে নিশ্চয়, নচেৎ দুলিতে থাকিত, 'প্রাণ' সম্পন্ন হইয়া পড়িত, এবং তাহার সঙ্গে ভাবগ্রাহী 'মন'ও তাহাকে অবগুণ্ঠনের মত ঘিরিয়া ইহলোকে লইয়া আসিত।

আরও অনেক কথা আছে, তাহার মধ্যে মোটামুটি দুই-একটা বলিলে চলিবে। টানা-টানি কেন? ভাবগ্রাহী কবি বলেন যে ইহা একটা বিরাট ছন্দে মনোহর নৃত্যের ব্যাপার! নৃত্যের উৎপত্তি কোথায়? উত্তর—আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা হইতে। পরমাত্মা কোন্ দিকে আকর্ষণ করেন? উত্তর—উভয় দিকে। তাঁহার আকর্ষণের ফলে জীবাত্মাবর্গ জন্ম ও মরণ রূপ বাহুযুগল তুলিয়া নৃত্যশীল! যখন জন্ম হয়, তখন আনন্দ হইতে নিরানন্দে আসিয়া কাঁদে, ও যখন মৃত্যু হয় তখনও আনন্দ হইতে নিরানন্দে গিয়া কাঁদে। তবে মধ্যস্থল, অর্থাৎ নৃত্যের অভিনয় আনন্দময়।

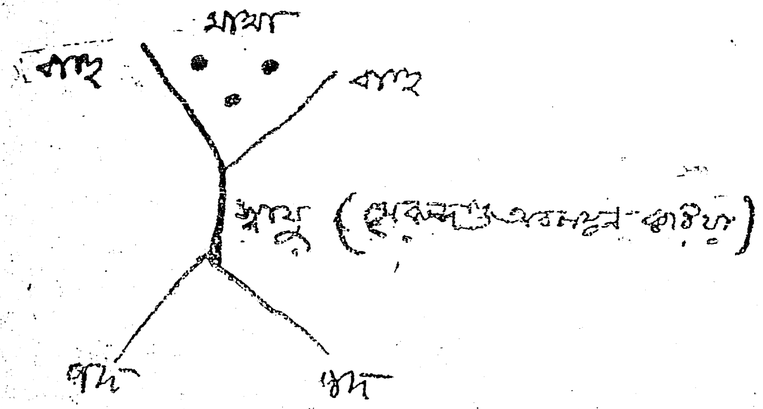

৩

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে এই গতি অদ্ভুত। অতএব ইহাকে আমরা Dynamics of Psycholgy বলিয়াছি। একবার দেখা যাউক যে এই নৃত্যের external evidence কি।

মানুষ যদি নাচিয়া বেড়ায় তবে অনেকটা এই রকম দেখায়, সকল জীবেরই স্নায়ু-যন্ত্র এক রকম; অন্ততঃ spinal chordএর বেলা। এবং এই spinal chord যে নাচিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, কিম্বা আত্মা যে নাচিবার জন্য ক্রমবিবর্ত্তনের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা psychologically বেশ বুঝা যায়।

Rationalistic অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের view ভাবিয়া দেখুন।

প্রথমতঃ, পঞ্চভূত অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা আত্মা আক্রান্ত হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। অত্যন্ত বিরক্তি-জনক বোধ হয়, এমন কি, ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হয়। মায়ার আবরণ হইতে মুক্তিলাভ করা আত্মার স্বভাব। এই মুক্তিলাভের জন্য জীবের হঠাৎ মেরুদণ্ড বাহির হইয়া পড়ে এবং সেই মেরুদণ্ড অবলম্বন করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করে। সৌরজগতের Binary stars এবং গ্রহ-উপগ্রহ সমূহ, এবং পৃথিবীক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ, পশু-পক্ষী এবং বৈরাগ্যযুক্ত নিরীহ মানব সকলেই এই আপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত মেরুদণ্ডের সাহায্যে গা-ঝাড়া দিয়া থাকেন। কিন্তু আত্মার ইহাতে মুক্তি হয় না। ফলে কি হয়?

৪

বংশবৃদ্ধি।

বিজ্ঞান ইহাকে 'হিষ্টলজি' বলেন। অর্থাৎ একই আত্মা হইতে পঞ্চভূতের সাহায্যে বহু আত্মা বীজ-স্বরূপ বাহির হইয়া পড়ে। যেমন স্বরবর্ণ হইতে ক, খ, গ, ঘ,—প্রভৃতির বিস্তার—এবং তাহা হইতে ভাষা,—এবং ভাষা হইতে অনর্গল বক্তৃতা—এবং সাহিত্য। জিনিষ একই—পরমাত্মা—কিন্তু পরমাত্মাকে পঞ্চভূতে বেষ্টন করিলে তিনি 'বিক্ষেপনী' (?) নামক শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেন। ইহাতে স্পন্দন উপস্থিত হইয়া একই পরমাত্মা বহু জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদের Psychology—আমরা 'পাড়াগেঁয়ে' কথায় প্রকাশ করিলাম মাত্র। এই পাঞ্চভৌতিক জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইবার জন্য শুনা যায় যে জীবাত্মা, রেচক, পুরক, কুম্ভক প্রভৃতি নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন

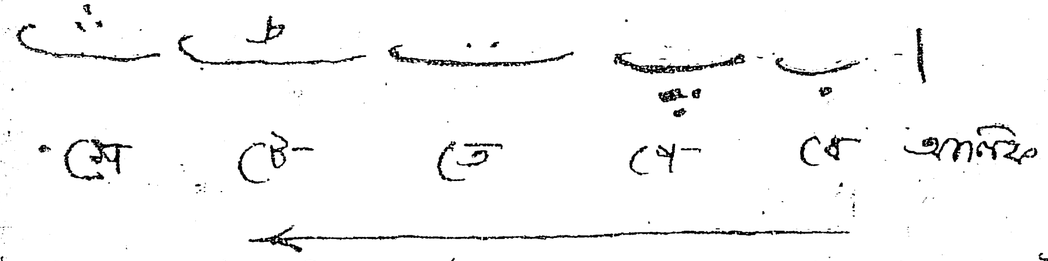

ইত্যাদি। কিন্তু দ্বৈতবাদীগণ দেখাইলেন যে নিরানন্দের মধ্যে আনন্দ আছে। কলহের মধ্যে সঙ্গীত আছে। সাহিত্যের মধ্যে কাব্য আছে। দৌড়ঝাপের মধ্যে ছন্দ আছে। কীট-পতঙ্গ ও সৌরজগৎ যখন তাহাদের মেরুদণ্ডে ঘুরে, মৎস্য যখন মেরুদণ্ডের সাহায্যে জলে সাঁতার দিয়া ডিম পাড়ে, মশামাছি যখন আমাদের দংশন করিতে আসে, বানর যখন দন্তবিকাশ করিয়া আমাদিগকে করেন। কিন্তু যতদিন এই মুক্তিতত্ত্ব Rationalistic ভাবে যোগীপুরুষের মনে উদয় না হয়, ততদিন সকলিই পণ্ডশ্রম। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, এই মুক্তি-চেষ্টা ও যমের আকর্ষণ একই। চিত্রের বামভাগের "য"র আকর্ষণ ইহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি। যাহারা না বুঝিয়াছে, এক সময় বুঝিতে পারিবে। দ্বন্দ্ব, কলহ, হিংসাদ্বেষ-মূলক গালাগালি, অনর্থক চীৎকার ও বক্তৃতা দ্বারা মানব-জগৎ অবিশ্রান্তভাবে সকলকে এই যমালয়ের আকর্ষণ বুঝাইবার জন্য ব্যস্ত। অনেকে বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়।

ইহার মধ্যে যদিও Dynamics সম্পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান, সেটা কিন্তু আনন্দময় নহে।

যেন দক্ষিণ হইতে বামদিকে জীবাত্মাবর্গ সংগ্রামরত হইয়া, মারামারি কাটাকাটি করিয়া, ফার্সি হরফের মত দৌড়িতেছে!

সম্ভাষণ করে, এবং মানব যখন প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বাহু তুলিয়া নাচে, তখন বুঝিতে হইবে যে দেবভাষার মত কতকগুলি অক্ষর আবার বাম হইতে দক্ষিণে আসিয়া ফার্সি হরফের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনে রত হয়। জীবাত্মা পরমাত্মার ভাব প্রাপ্ত হয়।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, দর্শন-শাস্ত্র যাহা ব্যক্ত করেন তাহা বিজ্ঞানসম্মত। যদি মানববংশ ক্রম-বিকাশের

শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া থাকে, তবে নৃত্য গীত সাহিত্য, বক্তৃতা ও অভিনয় প্রভৃতি দেখিয়া বোধ হয় যে ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্যই বাহু তুলিয়া সংকীর্ত্তন। সার্কাসে দেখা গিয়াছে যে পশুগণকে হাত তুলিয়া খাড়া করিয়া দিলে তাহারা খুসি হয়। শিশু হামাগুড়ির অবস্থা পার হইতে হাঁটিতে শিখিলে, দশজনকে ডাকিয়া নৃত্যের ভাব প্রকাশ করে। সমস্ত দিন আপিসে কাজ করিয়া, সন্ধ্যার সময় দশজনকে ডাকিতে ইচ্ছা করে। শৃগালেরা যখন মাঠে একত্র হইয়া তাহাদের মনের কথা বলে, হয়ত কুক্কুরবর্গ তাহাদের প্রতিবাদ করে। মানবের মধ্যেও বাদ প্রতিবাদ করিয়া আত্মা প্রকৃতিস্থ হয়। ঝাড়া দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া মনের কথা বলিয়া ফেলিলে, psychologically জোলাপের কাজ হয়। ক্রমে বাহু তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলে আনন্দের ভাব জাগ্রত হয়। এই ভাব (Hedonistic), ইচ্ছাশক্তিকে (will) জগতের দিকে টানে। তাহাতে সৃষ্টি রক্ষা হয়। নিরানন্দের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হয়। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর দিকে হেলিয়া পড়ে না। যমালয়ের দিকে যে Rationalistic আকর্ষণ (necessity) সেটা Hedonistic আকর্ষণকে counterbalance করে, এই জন্য ইহাকে আমরা "যম" (সংযম) বলিয়া থাকি। যমের function নিবৃত্তিমূলক।

কিন্তু অদ্বৈতবাদই হউক এবং দ্বৈতবাদই হউক, মুক্তিলাভের চেষ্টা থাকুক কিম্বা নাই থাকুক, সকল আত্মাকেই যে যমালয়ে যাইতে হইবে এটা আমরা বিলক্ষণ জানি। ইহার মূলে যে বিশেষ কোন departmental secret আছে তাহা নয়। ইহার কারণাবলী অতিশয় সোজা, ও বিজ্ঞান-সম্মত।

১। Every action has re-action। অর্থাৎ সকলে মিলিয়া কখনো অনন্তকাল বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে পারে না। ক্রমে ব্যাধি জন্মায়, ও তাহা হইতে বৈরাগ্য উদ্ভূত হয়।

২। যাহারা নৃত্যের উপযোগী নহে, এ রকম দর্শকবৃন্দ, সংকীর্ত্তনের দলে মিশিয়া গাধার মত চীৎকার আরম্ভ করে, কিংবা ভল্লুকের ন্যায় আক্রমণ করে, ইহাতে আনন্দবিহ্বল অধিকারী মহাশয়েরা সশিষ্য রঙ্গস্থল হইতে যমালয়ের দিকে পলায়ন-পরায়ণ হন। এমন কি রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি হইয়া পড়ে।

৩। Economical laws অনুসারে উভয় পক্ষের খাদ্য নির্দ্দিষ্ট। আনন্দ অনন্ত হইতে পারে, খাদ্য অনন্ত নহে, সুতরাং ধরার আনন্দ সসীম।

যেটুকু আভাস দেওয়া গেল, তাহাতে বোধ হইবে যে যমালয়ে যাইবার গতি (Dynamics) আমরা Introspection দ্বারা খানিকটা বুঝিয়া লইতে পারি। হঠাৎ মারা যাই, কিংবা লজ্জা-দুঃখে আত্মহত্যা করি, কিংবা সম্মুখ-সমরে পড়িয়া বীরবাহু বীর-চূড়ামণির মতো যখন স্বর্গ-পুরী চলিয়া যাই, এমন একটা স্থান আছে, যে তথায় বৈতরণী নদী পার হইতে হইবে।

এই স্থলে বিজ্ঞানের সঙ্গে একটু মতভেদ হইতে পারে। কোন বৈজ্ঞানিক বলিবেন যে, বহির্জগৎ হইতে আমার Perception

ক্রমশঃ যতগুলি Concept সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে যমালয় আছে কি? আমাদের মতে, যে stream of consciousnessএর মধ্যে concept-গুলি বর্ত্তমান তাহাই বৈতরণী নদী। তার ওপারে যমালয়। কিন্তু যমালয়ের stream of consciousness ব্যক্তিগত নয়। যদি পৃথিবী সত্য হয়, তবে তাহার counterpart যমালয়ও থাকিবে। সেটা নরকশালাই হউক, কিংবা "ঐ দেখা যায় আনন্দধাম"ই হউক, তাহার ব্যবহারিক না হউক, প্রাতিভাসিক অস্তিত্ব থাকা খুব সম্ভব। তবে ইহার প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় আমরা পুরাণো স্মৃতিগুলি সাবধানে জড়ো করি। এবং যেমন সুদক্ষা গৃহিণী হাঁড়ি, কলসী, ঝাঁটা, মালমশলা প্রভৃতি জড়ো করিয়া স্বামীর সহিত বিদেশে চলিয়া যান, সেই রকম হয়ত আমরা সংস্কারগুলি লইয়া যাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে এই বৈতরণী পারের ব্যাপার যদি বাস্তবিকভাবে বিশ্বাস না করেন তবে কাল্পনিকভাবেই ধরুন, এবং দেখুন যে যমালয় বাস্তবিক যন্ত্রণাময় স্থান কি না।

৫

যাঁহারা মনোময় জগতে প্রজ্ঞার সাহায্য লইয়া যমালয় পরিদর্শন করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে "Visitor's pass" নামক অনুজ্ঞাপত্রের বিধান আছে। যাঁহারা Psychology তে তেত্রিশ 'পার্সেণ্ট' মার্ক (বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়) রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দরখাস্ত করিলেই 'পাশ' প্রাপ্ত হন। যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে মৃত্যু লইয়া 'নাড়াচাড়া' করেন, (যেমন—ডাক্তার, উকীল ডেপুটি প্রভৃতি) তাঁহাদের পক্ষেও Free pass। বৈতরণীর খেয়াঘাটে পঁহুছিলে, মাঝি জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার কোন title আছে?' তখন বলিতে হয় যে আমি 'রায় বাহাদুর"—কিংবা "রায় সাহেব" কিংবা 'মহামহোপাধ্যায়' ইত্যাদি, এবং সেই সঙ্গে যদি B.A, M.A, প্রভৃতি যুক্ত থাকে, তবে এমন কি একটা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়াও পার হওয়া যায়, মাশুল (Ferry Toll) লাগেনা। এই সুবন্দোবস্ত ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 'বৈতরণী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড মিটিংএ' Majority of Votes দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট গ্রহদেবতা 'শনি'। কিন্তু পাছে তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়া কাহারও মাথা উড়িয়া যায়, সেই জন্য প্রত্যেক মিটিংএ তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকেন। তবে যদি কোনো অনাথ আতুর আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া বলে, 'হুজুর! আর এ ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, মুক্ত করিয়া দিন', তবে তিনি করুণা-পরবশ হইয়া সেই জীবের দিকে তাকাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা উড়িয়া বৈতরণীর জলে পড়ে, এবং সে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পায়। কারণ, মাথা না থাকিলে "বদ্ধ," "মুক্ত" এ-সব ভাব আসে না।

বৈতরণী পার হইয়া, খানিকটা 'চড়া' ভাঙ্গিয়া গেলে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখা যায়, তাহার মাথায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—

INQUIRY OFFICE
(Head Assistant
B. C. Chatterji 1920)

অর্থাৎ সেই 'ইনকোয়ারী' আপিসের

অধুনাতন বড় বাবু বি, সি, চাটুর্য্যে। চাটুর্য্যে মহাশয় পূর্ব্বে 'থিয়সফিকাল্ সোসাইটির' Branch Inspector ছিলেন, এবং নিজগুণে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরের Manager এর মতো নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিতেছেন।

তাঁহাকে দূর হইতে 'যমরাজ' মনে করিয়া আমরা দক্ষিণ বাহু দ্বারা, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটা salute করিলাম্। সেই দাস্যভাব দেখিয়াই হউক, কিংবা বাহুর সুচারু automatic action দেখিয়াই হউক, তিনি খুব খুসি হইয়া বলিলেন, 'আস্তে আজ্ঞা হউক'।

আমরা পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া দেওয়াতে—তিনি নম্রভাবে বলিলেন—'এখানে ঘুস্ চলেনা'।

আমরা। কতদিন এ Reforms জারি হইয়াছে?

বড়বাবু। এখানে কোনো জিনিষের মূল্য নাই, অতএব টাকার দরকার হয় না। যাহার যা সংস্কারজাত অভাব, তাহা Elementals (পঞ্চভূত) পূরণ করিয়া দেয়।

আমরা। এটা কি Astral world?

বড়বাবু। একটা অংশ। আপনি বিশ্বাস করেন?

আমরা। নিশ্চয়, নচেৎ আসিতাম না।

বড়বাবু। আপনি ডেপুটি?

আমরা। হাঁ, ইনি আমার বন্ধু ভূতনাথ বাবু। Public Prosecutor, M.A. B.L.

ভূতনাথ বাবু। আমাদের বিশ্বাস Evidenceএর উপর সংস্থাপিত। একপক্ষের সাক্ষী যমালয় বিশ্বাস করে না, অপর পক্ষের সাক্ষী করে। যাহারা করে, তারা খুব reliable witness। প্রজ্ঞাবলে আমরা টের পাইয়াছি।

আমরা। এখানে Politics এর গোলমাল নাই ত?

বড়বাবু। মোটেই না। যেখানে Economics নাই, সেখানে Politics এর দরকার কি? এখানকার Policy যে, বিষয়ের আকর্ষণে জীব যাহাতে আবার সংসারে না যায় তাহার চেষ্টা করা।

আমরা। অনেকটা Non-co-operation?

বড় বাবু। যাই বলুন—পথটা নিবৃত্তির।

ভূতনাথ বাবু। Successful হইয়াছেন কি?

বড়বাবু। প্রায় Five per cent রাজি হইয়াছে, বাকি সব দুর্দ্দম্য ভাব ও রসের জন্য সংসারে যাইতে চায়। আপনারা বিশেষ কোন কাজে আসিয়াছেন?

ভূতনাথ। প্রথমতঃ যমালয় দেখা, দ্বিতীয়তঃ আমার একজন Rival Pleader সম্প্রতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার স্ত্রী অনেক করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

বড়বাবু। আর আপনি?

আমি। আমার একটি শিশু-সন্তান ছেলেবেলা সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে।

বড়বাবু টেলিফোন দ্বারা "গুপ্ত" সাহেবকে আহ্বান করিলেন। চিত্রগুপ্তকে আপনারা সকলেই জানেন—অতিশয় পুরাতন অমর আত্মা। তিনি অবিলম্বে একখানা Studebaker কারে আরূঢ় হইয়া উপস্থিত।

তাঁহার করস্পর্শ অতি কোমল। এত polite gentleman আমরা কখন দেখি নাই। রাস্তায় ভূতনাথ বাবু বলিলেন—প্রথমে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা যাউক।

মিষ্টার গুপ্ত। তিনি বোধ হয় এখন pleader's chamber-এ চা-পান করিতেছেন।

চেম্বারে প্রবেশ করিয়া বড় বড় আল্মারি দেখা গেল। 'অপটু-ডেট্' যত রিপোর্ট ও জর্নাল সকলই বর্ত্তমান।

ভূতনাথ বাবু। এ-সব আপনারা কোথায় পান?

গুপ্ত (হাস্য করতঃ)। নরলোকের যত ideas যমালয় হইতে সঞ্চারিত হয়, এবং সেগুলি Wireless Telegraphy-র সাহায্যে সকলের মাথায় প্রবেশ করে।

আমি। আমাদের স্বাধীন Judgment কি একেবারে নাই?

গুপ্ত। যাহা নিয়তি, তাহার বিরুদ্ধে গেলে আপীল আদালতে রায় বাহাল থাকে না।

ভূতনাথ বাবু। উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব?

গুপ্ত। এক পক্ষের argument যমালয় হইতে সঞ্চারিত হয়, ও অন্য পক্ষের সওয়াল জবাব empirical। উভয় পক্ষের কাটাকাটি হইয়া যাহা থাকে, তাহা আদালতে মাথায় বসিয়া গেলে, যমালয়-প্রেরিত suggestion Brain Complex-এর দ্বার হইতে বাহির হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। ফলে, মাথার মধ্যে 'তোলপাড়' শেষ হইলে 'রায়' নামক মন্তব্য বাহির হয়।

৬

ভূতনাথবাবু তাঁহার বন্ধু বিপিনচন্দ্র কর M. A. B. L.-কে দেখিয়া পরম-প্রীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক পায়চারি করিতেছিলেন। তিনি গঙ্গারাম ডেপুটি। তাঁহার সঙ্গে আমার মেদিনীপুরে আলাপ হয়। তিনি নরলোকে কর্ণে কম শুনিত, কিন্তু আমি আহ্বান করাতেই তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

বরং বিপিনবাবুকে একটু বধির বলিয়া বোধ হইল। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম ক্ষীণকায় গঙ্গারাম ডিপুটি এখন স্থূলকায়, এবং স্থূলকায় বিপিনবাবু এখন ক্ষীণকায়।

এ-বিষয় Remark করাতে বিপিনবাবু বলিলেন, ইহার মধ্যে একটু গোলযোগ। বৈতরণী নদীর ধারে আমরা একত্রে বেড়াইতে গিয়া হঠাৎ শনির দৃষ্টিবশতঃ উভয়ের মাথা উড়িয়া গিয়াছিল। পরে ছানি তজবিজ্ দ্বারা শনির কৃপায় আমার মাথা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার মাথা দাদার স্কন্ধে এবং দাদার মাথা আমার স্কন্ধে লাগিয়া গিয়াছে। তখন একটু 'টিপ্সি' থাকাতে এটুকু 'মার্ক' করিয়া দেখি নাই।

আমি। কি দুর্ভাগ্য!

ভূতনাথ। এতে কিছু অসুবিধা হয় নাই ত?

বিপিন। খানিকটা হইয়াছে বৈ কি! আমি কানে কম শুনি, এবং মেজাজটা ডেপুটির মত। উনি কানে বিলক্ষণ শুনেন, এবং মেজাজটা উকীলের মত। যখন তর্ক-বিতর্ক হয়, তখন ইচ্ছা হয় দাদার কান টানিয়া আমার স্কন্ধে বসাইয়া দিই।

আমি। এখানে operation করিবার কোন বড় ডাক্তার নাই ?

বিপিন। যত ভূতপূর্ব্ব surgeon, সকলে এখানে। কিন্তু এখানকার আইন বড় কড়া। স্ত্রীর অনুমতি ভিন্ন স্বামীর মাথায় 'অপারেশন' একেবারে মানা। তাই আমরা অপেক্ষা করিয়া আছি।

ভূতনাথ। এ-খবর তাঁকে দেব।

বিপিন। তবে আপনারা for good আসেন নাই ?

ভূতনাথ। কবে আসিব, সে খবরটা এখানে পাওয়া যায় না ?

গঙ্গারাম। মিষ্টার গুপ্ত বড় Taciturn। এই যমালয় সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে চালাইতেছেন, অথচ ইহার আভ্যন্তরিক Science af administration এ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

বিপিন। আজকাল্ মক্কেল ফীস্ কত দেয় ?

ভূতনাথ। শতকরা পঞ্চাশ কমিয়া গিয়াছে। মামলা মোকদ্দমা ও ফীস্ উভয়ই।

বিপিন। সেটা আমরা যমালয়ে এ-কয় মাসের লোকের আমদানি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। আমার ছেলে-পুলে কষ্টে পড়িয়া নাই ত ?

ইহা বলিয়া বিপিনবাবু মাথা হস্তে চাপিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

আমরা। ব্যাপার কি ?

বিপিন। এখানে রুল নং ১, যে পার্থিব মায়া-সম্বন্ধে কথা কহিলেই মস্তকে বৃশ্চিকদংশন করে।

ভূতনাথ। এইটুকু মানবের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ।

গঙ্গারাম। রুল ১০ অনুসারে protest করিয়া আপনি নরলোকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে পারেন।

আমি। তবে আপনি নিজে ফিরিয়া আসেন না কেন ?

গঙ্গারাম। ক্ষুদ্র শিশু হইয়া ফিরিয়া গেলে স্ত্রী সনাক্ত করিতে পারিবে না। Most miserable situation! সুতরাং অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা আসিলে অগত্যা পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ফিরিতে হয়।

আমি। এমন কোন লোক এখানে নাই, যার স্ত্রীও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং উভয়ে আবার জন্মগ্রহণ করিবার পরামর্শ করিতেছেন ?

বিপিনবাবু। মিষ্টার লাহিড়ী একজন সেই রকম লোক। তাঁর বাসায় গেলে অনেক সংবাদ জানা যাইবে। তিনি সম্প্রতি Mesopotamia Commisariat-এ চাকরি করিতে গিয়া গোলাগুলিতে মারা পড়িয়াছিলেন।

৭

যমালয়ের এ-তল্লাটে যত বাড়ী দেখা গেল তাহার মধ্যে মিষ্টার লাহিড়ীর বাংলা অতি সুদৃশ্য ও আরামের। সম্মুখে সোনালি টবে নানাবিধ জিরানিয়ম ও ফুলের চারা, সাদা জলের কল, ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান্ ও আলো, কেতাবে-ভরা আল্‌মারি, স্নিগ্ধ মলয়-বায়ু সঞ্চার বাটীর চতুর্দ্দিকে। সম্মুখের রাস্তা দক্ষিণে হেলিয়া বিরাট শুভ্র পন্নগের মতো সুনীল গগনপ্রান্তে মিশিয়া গিয়াছে। তার দুইধারে ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পপোষ্ট ও মধ্যে লোবোর ব্যাণ্ড্! বামদিকে হেলি

একটা অতি সুন্দর রক্তবর্ণ পথ কোথায় গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন সন্ধ্যার অবসান! বহুদূরে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছিল। বোধ হইল যেন সেই পথ চন্দ্রলোকে গিয়াছে।

বিপিনবাবু বুঝাইয়া দিলেন যে দক্ষিণ-দিকের পথ দেবযান ও বামদিকের পিতৃযান। "প্রাতঃকালে দেখিতে পাইবে যে অনেক নর-নারী হাতে পিণ্ডের সরা লইয়া এই বাম পথে চলিয়া যাইতেছে।"

আমি। কোথায় ?

গঙ্গারাম। চন্দ্রলোকে। সেখানে পিণ্ড-প্রয়াসী পিতৃলোক বসতি করেন।

আমি। কিন্তু চন্দ্র-লোকে রাস্তা কি বাবর মিশিয়া গিয়াছে ?

বিপিন। মাঝে একটা 'গ্যাপ' আছে, সেটা ইরোপ্লেনে পার হইতে হয়।

আমি। যদি কেহ পড়িয়া যায় ?

গঙ্গারাম। বৈতরণী নদীর মধ্যে পড়িবে। আপনি যমালয়ের বিজ্ঞানটুকু সহজে বুঝিতে পারিবেন না। এখানে centre of gravity অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ বিপরীত দিকে। চন্দ্রলোক পরিশ্রেণী, হ্রদ ও কমলবনে পরিপূর্ণ। সেখানে প্রফুল্লাননে বসিয়া সৃষ্টি করিতেছেন!

ভূতনাথ। যে সব জাতির পিণ্ড দেওয়ার custom নাই ?

বিপিন। এবার যে Nationality form হইতেছে, তাহাতে পিণ্ড দেওয়ার প্রথা উঠিয়া যাইবে। কেবল শ্রদ্ধাপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা সকলে পরস্পরের পিণ্ড দিলে চলিবে। প্রজাপতি প্রথম যুগে এক মুখে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। ক্রমশঃ কলিযুগে চতুর্ম্মুখে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, চারি বিষয় খোলসা বুঝাইয়া দিতেছেন। সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় Special Pass প্রাপ্ত না হইলে সেখানে যাওয়া অসম্ভব। মিষ্টার লাহিড়ী সম্মুখ-সমরে পড়িয়া যমালয়ে আসাতে, তিনি পাশ পাইয়াছিলেন।

মিষ্টার লাহিড়ী চমৎকার লোক! প্রত্যেক ঘণ্টায় একবার করিয়া Orange pekoe পান করেন। Introduced হইয়া আমরা উপবেশন করিলাম। তিনি আনন্দ সহকারে আমাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

টেবিলের উপর অপক্ক খর্জ্জুরের গুচ্ছ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি কি আপনার বাগানের ?"

লাহিড়ী। এখানে একটা কল্পবৃক্ষ, কিংবা কল্পনাবৃক্ষ আছে। যাঁহার যেমন সংস্কার, তিনি সেই অনুসারে বাঞ্ছিত ফলফুল নিমেষের মধ্যে প্রাপ্ত হন। আমি মেসপটেমিয়াতে খর্জ্জুর খাইতাম বলিয়া একগুচ্ছ প্রত্যহ পাড়িয়া রাখি।

আমি। সেই রকম সুমিষ্ট ?

লাহিড়ী। সে সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ আছে। আপনি গোটাকতক কলা খাইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

গোটা কতক মর্ত্তমান্ কলা খাইয়া আমার বোধ হইল যে তাহাদের taste ঠিক কলিকাতার মত নহে।

ভূতনাথ। কিন্তু আপনার তুলনার standard কি ?

লাহিড়ী। ঐটুকুই crucial point।

perception ঠিক থাকে, স্মৃতিও থাকে, কিন্তু পৃথিবীর রস হইতে এখানকার রস অধিকতর মধুর কি না তাহা জানিবার যো নাই।

বিপিন। তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমি যদি সস্ত্রীক এখানে মরণের পর আসি, তবে এ সম্বন্ধে তাঁর মত ও আমার মত ঠিক এক কিনা তাহা জানা যাইতে পারে।

আমি লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলাম, 'আপনার সহিত আমার অনেক মনের কথা আছে।'

'মনের কথা' শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের সুন্দর মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'প্রত্যেক জীবের মনের কথা নিজস্ব। সেটা অন্তরের। হয় ত আমার মনের কথার সহিত আপনার মনের কথা মিলিবে না।'

৮

আমি বলিলাম, 'আপনি একটু চা খান।' চা পান হইলে আমি আবার বলিলাম, 'ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ কথা বলিতে কেহ যমালয়ে আসে না। জগতে যাহা দেখি শুনি তাহার বর্ণনা সকলের পক্ষেই এক রকম। কিন্তু মনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলে, 'এ সম্বন্ধে আমার curiosity বড় উত্তেজিত হইয়াছে।'

লাহিড়ী। আপনি জিজ্ঞাসা করুন।

আমি। প্রথমে গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা করি। এখানে নরক বলিয়া কোন স্থান বিশেষ আছে?

লাহিড়ী। এখন আর নাই। এখানে হিংসা-দ্বেষ নাই, সেই জন্য নরক ক্রমে obsolete হইয়া গিয়াছে।

আমি। তবে আপনি আর মর্ত্যধামে ফিরিতে চাহেন না?

লাহিড়ী। আমার ফিরিবার ইচ্ছা খুব।

আমি। সস্ত্রীক?

লাহিড়ী। নিশ্চয়।

আমি। কেন?

লাহিড়ী। বোধ হয় সমগ্র জগতের সঙ্গে আমাদের কি একটা সম্বন্ধ আছে। সকলের সঙ্গে একত্র না হইলে প্রাণে ও মনে সুখ নাই। আমরা 'একাকী', এ কথা কখনো মনে করিতে পারি না। কোটি তারার মধ্যে একটা তারা খসিয়া গেলে যেমন সৌর জগতের বেদনা হয়, জগতেরও বোধ হয় আমাদের অভাবে সেই রকম হয়। আমিও তাদের না দেখিয়া থাকিতে পারি না। ইহার প্রমাণ 'স্মৃতি'। সকলই আমার ছিল, তাহা মনে পড়ে। কোথায় ছিল, এখন তাহারা কতদূর, তাহাদের স্নেহ-যত্ন করিবার কত লোক আছে, তাহারা কি করিয়া হাসে, কাঁদে, ভাল বাসে, রোগে-শোকে-দুঃখে পড়িয়া কাতর ভাবে চাহে, যমালয় হইতে তাহা জানিতে পারি না। এখানে আমাদের সকল সুখই আছে, কিন্তু সে সুখ অলীক। জগতের দুঃখ-নিবৃত্তির ব্রতই সুখ।

আমি। শুনিয়াছি, এখান হইতে মুক্তাত্মা স্বর্গে যায়।

লাহিড়ী। যাইতে পারে। কিন্তু স্বর্গে সুখ নাই, কেননা ঈশ্বরের লীলাস্থল জগৎ সেখানেই যত মুক্তাত্মা আবার ধাবিত হয়। স্বর্গের Palace of Art এর মধ্যে বসি থাকে না।

আমি। তবে কি জগৎ মায়া নহে?

লাহিড়ী। এই মায়া আছে বলিয়াই আমরা ঈশ্বরে বদ্ধ। ঈশ্বর জগৎময়, মায়াময়।

আমি। তবে পাপ কেন?

লাহিড়ী। পাপের মধ্যে পুণ্য ফুটানো, দুঃখের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার, মিথ্যার মধ্যে সত্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপন, আমার বোধ এই experiment-এর নাম লীলা। সেইটুকু মাঝে মাঝে মনে করাইয়া দিবার জন্য যমালয়।

আমি। তবে আপনি আবার সস্ত্রীক ফিরিয়া দলে মিশিতে ব্যাকুল?

লাহিড়ী। ভয়ানক। আপনি যদি যমালয়ে আসিয়া সুখভোগ করিতে চাহেন, তবে অল্পদিনেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন, অথচ সংসারে সুখভোগ করিতে গিয়া দল ছাড়িয়া দিলেও, সেখানেই যমালয়ের দুঃখ। ফলে আত্মত্যাগের দুঃখটা খুব অভ্যস্ত হইয়া গেলে সুখ। যেমন প্রাণপণে তিনক্রোশ হাঁটিলে ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

আমি। এখানে আপনার সামাজিক দুঃখ কি?

লাহিড়ী। এখানে সকলেই স্বার্থপর, কেননা অভাব নাই ও অভাব-জনিত দুঃখ নাই। কিন্তু স্বার্থপর বলিয়াই ঘোর দুঃখ। এ স্বার্থ ঘুচাইবার জন্য জগৎ। যখন এখানে নরক-যন্ত্রণা ছিল, তখন স্বর্গ-লোক নরকস্থ জীবের বেদনা দেখিয়া কাঁদিত। সে দুঃখ নিবারণের কোনই উপায় ছিল না। এই inhuman practice ক্রমে উঠাইয়া দিবার জন্যই আবার জগতের মায়ার মাত্রা বাড়ানো হইয়াছে। জিনিষের দর বাড়িয়াছে, মানবাত্মার দর কমিয়াছে। ক্রমে সকলে একত্র হইয়া মানবাত্মার দর বাড়াইয়া দিবে, জিনিষের দর কমাইবে। এই যুগের সেই মহাযুদ্ধ।

আমি নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিলাম, এমন সময় একটি শিশু বাহু তুলিয়া অন্য কতকগুলি শিশুর সহিত নৃত্য করিতে করিতে লাহিড়ী-মহাশয়ের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়া কোলে লইলাম। এ যে আমাদেরই স্নেহের খোকা।

লাহিড়ী-মহাশয় তাহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোর বাবাকে চিন্‌তে পাচ্ছিস্?'

খোকা চিনিতে পারিল না, কিন্তু বুকে ঘুমাইয়া পড়িল।

লাহিড়ী। ঐটুকুই আসল চেনা। ইন্দ্রিয়-স্মৃতি না থাকিলেও প্রাণ আসিয়া প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যায়। সকলে আমার স্ত্রীর নিকট আসিয়া আনন্দে খেলা করে। তার ছেলেপুলে নাই। ইহারাই তার জগতের সন্তানবৃন্দ।

আমি ধীরে ধীরে আসিয়া লাহিড়ী ও তাহার স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'কালই পৃথিবীতে ফিরিয়া চলুন। সেখানকার দারুণ দুঃখ ভাল, এমন মরুপ্রদেশের স্বর্গও ভাল না।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

শিক্ষার মিলন

একথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েচে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করচে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখচি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্চে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাক্‌লে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি যে-মানুষটা খাচ্চে ওটাকে একবার সুযোগমত পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ঐই আমাদের পেয়ে বসেচে; সুযোগ এপর্য্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পৌঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েচে? নিশ্চয়ই সে কোনো একটা সত্যের জোরে। আমরা কোনো উপায়ে দল বেঁধে বাইরে থেকে ওদের খোরাক বন্ধ করে নিজের খোরাক বরাদ্দ করব কথাটা এতই সোজা নয়। ড্রাইভারটার মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনি আমার বশে চল্‌বে একথা মনে করা ভুল। বস্তুত ড্রাইভারের মূর্ত্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা এঞ্জিন চালাচ্চে। অতএব শুধু আমার রাগের আগুনে এঞ্জিন চল্‌বে না বিদ্যাটা দখল করা চাই তা হলেই সত্যের বর পাব।

মনে কর, এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি করে? অন্য ছেলেটি ভাল মানুষ, সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন্ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্চে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরো-পুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে ঊর্দ্ধস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারিলে। গাড়ি চালাবার সখ দিনরাত এমনি তাকে পেয়ে বস্‌ল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁসই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে-রথের রথী তাঁর ছেলেও যে সেই রথেরই রথী এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালমানুষ ছেলে দেখ্‌লে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়াগাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্চে, তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং,—তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বল্‌লে, আমার আর কিছুতে দরকার নেই।

কিন্তু দরকার নেই বলে কোনো সত্যকার দরকারকে যে-মানুষ খাটো করেচে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই

একটা মর্য্যাদা আছে সেইটুকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্চে পরীক্ষায় পাশ করা।

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সেদিকে তার বাঁধা নিয়মে একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি নিজেকেই ফাঁকি দিয়েচে; অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেচে, শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেচে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েচে। বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে। সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর পথ হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে, যে, তাদের ভাগ্যে, হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে-বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেচে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কম্‌বে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু একথা যদি বল, শুধুত বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সয়তানীও আছে, তাহলে বলতে হবে ঐ সয়তানীর যোগেই ওদের মরণ। কেননা সয়তানী সত্য নয়।

জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড় স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড় গৌরবের পদ দখল করে বসেচে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেচে বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্ত্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেচে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য কর্ত্তে পারে তাহলেই সে আর ঘটনার দলে থাক্‌বে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্ত্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্র তন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল জগতে যা-কিছু ঘটচে এসমস্তই একটা অদ্ভুত জাদু-শক্তির জোরে; অতএব তারও যদি জাদু-শক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগে সে কর্ত্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা সুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্চে মান্‌ব না, মানাব। অতএব যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেচে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েচে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাক্‌তে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই

বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেচে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সঙ্কট তরে' যাচ্চে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায়, এবং দায়ে ঠেক্‌লে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাহিরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরচে, তারা আর কর্ত্তৃত্ব পেলনা।

পূর্ব্বদেশে আমরা যে-সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাক্‌চি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়চ্চি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্চি শীতলা দেবীর পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেচি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শুনেচি নাকি, মন্ত্রগুণে পাল্‌কে-পাল্ ভেড়া মেরে ফেলা যায়; সে কি সত্য?" ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, "নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।" য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদুমন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মর্‌তে পারি।

আজ একথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বশক্তি হচ্চে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে; এই জন্যে এই নিয়মের পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেচি। বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মান্‌তে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না, তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশ্ন করতে চায় না,—তখন সে বাইরের দিকে কর্ত্তাকে খুঁজে বেড়ায়, এই জন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠক্‌চে, পুলিসের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্য্যন্ত। বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্চে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।

পশ্চিম দেশে পোলিটিকাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েচে কখন্ থেকে? অর্থাৎ কখন্ থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেচে যে রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিষ নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেচে। যখন থেকে তারা জেনেচে সেই নিয়মই সত্য যে-নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। বিপুলকায় রাশিয়া সুদীর্ঘকাল রাজার গোলামী করে এসেচে, তার দুঃখের আর অন্ত ছিল না। তার প্রধান কারণ, সেখান-

কার অধিকাংশ প্রজাই সকল বিষয়েই দৈবকেই মেনেচে নিজের বুদ্ধিকে মানে নি। আজ যদি বা তার রাজা গেল, কাঁধের উপরে তখনি আর-এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্ত সমুদ্র সাঁৎরিয়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষের মরুডাঙায় আধ-মরা করে পৌঁছিয়ে দিলে। এর কারণ, স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাহিরে নয়, যে-আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম, "সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল একখানা চালাও বাঁচাতে পারলিনে কেন?" তারা বল্‌লে, "কপাল!" আমি বল্‌লেম, "কপাল নয়রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস্‌নে কেন?" তারা তখনি বল্‌লে "আজ্ঞে, কর্ত্তার ইচ্ছে হলেই হয়।" যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব তাদেরই জলদান করবার ভার কোনো একটি কর্ত্তার। সুতরাং যে-করে হোক্ এরা একটা কর্ত্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর সকল অভাবই থাকে কিন্তু কোনোকালেই কর্ত্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্ত্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেচেন, যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ অর্থের বিধান তিনি যা করেচেন সে বিধান যথাতথ, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বতকালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্চে অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্যে পাকা করে দিয়েচেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্ব্বল হয়ে থাক্‌তে হত; কেবলি এ-ভয়ে ও-ভয়ে সে-ভয়ে পেয়াদার ঘুস জুগিয়ে ফতুর হতে হত। কিন্তু তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েচে যে-দলিল সে হচ্চে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল,—তারই মহা আশ্বাসবাণী হচ্চে যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেচেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েচেন:—"বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চল্‌বে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম, একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম আরেক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম; এই দুয়ের যোগে তুমি বড় হও,—জয় হোক্ তোমার,—এ রাজ্য তোমারই হোক্—এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।" এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেচে, অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্ত্তাভজা, পলিটিকেল বিভাগেও কর্ত্তাভজা হওয়া ছাড়া তাদের আর গতি নেই। বিধাতা

স্বয়ং যেখানে কর্ত্তৃত্ব দাবী করেন না সেখানেও যারা কর্ত্তা জুটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আম্‌দানী হবে, কেবল ছোট্ট ঐ "স্ব" টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েচে তার বাসাটা পূর্ব্বেই হোক্ আর পশ্চিমেই হোক্ তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। দৈত্য বলচি আমি বিশ্বের সেই শক্তিরূপকে যা সূর্য্য নক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাঠিম ঘুরিয়ে বেড়ায় সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্য্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবনরক্ষা হয়, জীবন পোষণ হয়, জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই যথাতথ বিধির বিদ্যা, এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিল্‌বে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।

এই শিক্ষা থেকে ভ্রষ্টতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—হিন্দুর কুয়ো থেকে মুসলমানে জল তুল্‌লে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুস্কিলের কথা। কেন না পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের, আর কুয়োর জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি বলা যেত মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন অপবিত্র হয় তাহলে সেকথা বোঝা যেত কেননা সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা; কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বল্‌লে তর্কের সীমানাগত জিনিষকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। পশ্চিম ইস্কুলমাষ্টারের আধুনিক হিন্দু ছাত্র বল্‌বে "আসলে ওটা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা।" কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্বের কোনো অধ্যায়ে ত পবিত্রতার বিচার নেই। ইংরেজের ছাত্র বল্‌বে, "আধিভৌতিকে যাদের শ্রদ্ধা নেই আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে তাদের ভুলিয়ে কাজ করাতে হয়।" এ জবাবটা একেবারেই ভাল নয়, কারণ যাদের বাইরে থেকে ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে হয়, চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে হয়, নিজের থেকে কাজ করার শক্তি তাদের থাকে না সুতরাং কর্ত্তা না হলে তাদের চলেই না। আর একটী কথা, এই ভুল যখন সত্যের সহায়তা কর্ত্তে যায় তখনো সে সত্যকে চাপা দেয়। "মুসলমানের ঘড়া হিন্দুর কুয়োর জল অপরিষ্কার করে, "না বলে' যেই বলা হয় "অপবিত্র করে" তখনই সত্য নির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। কেননা, কোনো জিনিষ অপরিষ্কার করে কি না করে সেটা প্রমাণ-সাপেক্ষ। সেস্থলে হিন্দুর ঘড়া, মুসলমানের ঘড়া, হিন্দুর কুয়োর জল, মুসলমানের কুয়োর জল, হিন্দু পাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমান পাড়ার স্বাস্থ্য যথানিয়মে ও যথেষ্ট, পরিমাণে তুলনা করে' পরীক্ষা করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অন্তরের কিন্তু স্বাস্থ্যঘটিত দোষ বাইরের, অতএব বাইরে

থেকে তার প্রতিকার চলে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হিসাবে ঘড়া পরিষ্কার রাখার নিয়ম বৈজ্ঞানিক নিয়ম, তা মুসলমানের পক্ষেও যেমন হিন্দুর পক্ষেও তেমনি, সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ করে' উভয়ের কুয়ো উভয়েই ব্যবহার করতে পারে সেইটেই চেষ্টার বিষয়। কিন্তু বাহ্যবস্তুকে অপরিষ্কার না বলে অপবিত্র বলার দ্বারা চিরকালের জন্যেই এ সমস্যাকে সাধারণের বাইরে নির্ব্বাসিত করে রাখা হয়। এটা কি কাজ-সারার পক্ষেও ভাল রাস্তা? একদিকে বুদ্ধিকে মুগ্ধ রেখে আর এক দিকে সেই মূঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ চালানো এটা কি কোন উচ্চ অধিকারের পথ? চালিত যে তার দিকে অবুদ্ধি আর চালক যে তার দিকে অসত্য এই দুইয়ের সম্মিলনে কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? এই রকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্য্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি ও ঘরটা অপবিত্র তা হলে যে বিদ্যা বাহিরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে-বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোট করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশঙ্কা আছে। একথা অনেকে বল্‌বেন, পশ্চিম দেশ যখন বুনো ছিল, পশুচর্ম্ম পরে মৃগয়া করত তখন কি আমরা নিজের দেশকে অন্ন জোগাইনি, বস্ত্র জোগাইনি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এপারে ওপারে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত আমরা কি তখন স্বরাজশাসনবিধি আবিষ্কার করিনি! নিশ্চয় করেচি কিন্তু কারণটা কি? আরত কিছুই নয়, বস্তুবিদ্যা ও নিয়মতত্ত্ব ওরা যতটা শিখেছিল, আমরা তার চেয়ে বেশী শিখেছিলেম। পশুচর্ম্ম পরতে যে বিদ্যা লাগে তাঁত বুন্‌তে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার, পশু মেরে খেতে যে বিদ্যা খাটাতে হয় চাষ করে খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যা লাগে। দস্যুবৃত্তিতে যে বিদ্যা রাজ্য চালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা যদি একেবারে উল্টে গিয়ে থাকে তার মধ্যে দৈবের কোনো ফাঁকি নেই। কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে বনের ব্যাধকে আজ সিংহাসনে চড়িয়ে দিয়েচে সে ত কোনো দৈব নয় সে ঐ বিদ্যা। অতএব আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কম্‌বে না, ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পার্‌লে তবেই ওদের সাম্‌লানো যাবে। একথার একমাত্র অর্থ আমাদের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা-সমস্যা। অতএব শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্চে।

এই পর্য্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সাম্‌নে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়; "সব মান্‌লেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েচ?" না, পাইনি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেচি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্য্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বল্‌চিনে—ইংরাজিতে বল্‌তে হলে হয়ত বল্‌তেম, titanic wealth। অর্থাৎ যে ঐশ্বর্য্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সাম্‌নে বসে

থাক্‌তেম আর মনে মনে বল্‌তেম, লক্ষ্মী হলেন এক আর কুবের হল আর—অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্চে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে; কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্চে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মত লাফিয়ে চলে—সেই লাফের পাল্লা কেবলি লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে, তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরীর মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়। আর যে লোকে বাইরে বসে আছে তার যে কত পীড়া এইখানে তার আর একটা উপমা দিই।

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজ্‌রার জান্‌লায় বসে ছিলেম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অদূরে ডাঙার উপরে এক গহনার নৌকোর ভোজপুরী মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারো হাতে ছিল মাদল, কারো হাতে করতাল। তাদের কণ্ঠে সুরের আভাসমাত্র ছিল না কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল, সে-কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের নাচন ক্রমেই দূন চৌদূন চড়তে লাগ্‌ল। রাত এগারটা হয়, দুপুর বাজে, ওরা থাম্‌তেই চায় না। কেননা, থামবার কোনোই সঙ্গত কারণ নেই। সঙ্গে যদি গান থাক্‌ত তাহলে সময়ও থাক্‌ত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে, শান্তি নেই; উত্তেজনা আছে, পরিতৃপ্তি নেই। সেই তাল-মাতালের দল প্রতিক্ষণেই ভাবছিল, ভরপূর মজা হচ্চে। আমি ছিলেম তাণ্ডবের বাইরে, আমিই বুঝেছিলেম গানহীন তালের দৌরাত্ম্য বড় অসহ্য।

তেম্‌নি করেই আটলান্টিকের ওপারে ইট পাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেচে—"তালের খচমচর অন্ত নেই কিন্তু সুর কোথায়?" আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, এ বাণীতে ত সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটি-কুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্যের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলচে, ততঃ কিম্!

এ কথা বারবার বলেচি আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করিনে। আমি এই বলি,—অন্তরে গান বলে সত্যটি যদি ভরপূর থাকে তবে তার সাধনায় সুর তাল রসের সংযম রক্ষা করে—বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতা সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছৃঙ্খল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলেম তখন প্রাচীন

জাপানের যে-রূপ সেখানে দেখেচি সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েচে। কেননা অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন হৃৎপদ্মের মাঝখানে সুন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্ত বেশভূষা, কর্ম্মখেলা তার বাসা আস্‌বার, তার শিষ্টাচার ধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্তই একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে, সেই সুন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেচে। একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিষটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততাও নয় বহুলতাও নয়, তা পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মানুষের হৃদয়কে আতিথ্য দান করে; সে ডেকে আনে সে তাড়িয়ে দেয় না। আধুনিক জাপানকেও তার পাশাপাশি দেখেচি। সেখানে ভোজপুরী মাল্লার দল আড্ডা করেচে; তালের সে প্রচণ্ড খচমচ উঠেচে সুন্দরের সঙ্গে তার মিল হল না, পূর্ণিমাকে তা ব্যঙ্গ করতে লাগ্‌ল।

পূর্ব্বে যা বলেছি তার থেকে একথা সবাই বুঝবেন যে, আমি বলিনে, রেলোয়ে টেলিগ্রাফ কল-কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না, হৃদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে প্রকাশ হয় তৈরি হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষা বিদ্বেষ; এইখানে তার প্রাচীর, তার পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায় পরকে তাড়ায়; সুতরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অমৃত, যেখানে মানুষ, বস্তুকে নয়, আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে, সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না, সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্য-নিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যেদিকে চায় সেইদিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে, যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ মিল আছে। নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড় লাভ আছে। চা বাগানের ম্যানেজার কুলিদের পরে যে নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তাহলে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু বন্ধু সম্বন্ধে ম্যানেজারের ত পাকা নিয়ম নেই। তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে আয় নেই ব্যয় আছে। কুলির নিয়মটা আধিভৌতিক বিশ্ব নিয়মের দলে, সেইজন্যে সেটা চা বাগানেও খাটে। কিন্তু যদি এমন ধারণা হয় যে ঐ বন্ধুতার সত্য কোনো বিরাট সত্যের অঙ্গ নয় তাহলে সেই ধারণায় মানবত্বকে শুকিয়ে ফেলে। কলকে ত আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারিনে; তাহলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে-আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়? একরোখে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করতে করতে পশ্চিম দেশে এই আত্মাকে

কেবলি সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। এক-ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্ব্বলতায় কাৎ হয়ে পড়েচি, আর ওরাই কি এক-ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্চে ?

বিশ্বের সঙ্গে যাদের এম্‌নিতর চা-বাগানের ম্যানেজারীর সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে যে-সে লোকের পেরে ওঠা শক্ত। সুদক্ষতার বিদ্যাটা এরা আয়ত্ত করে নিয়েচে। ভালোমানুষ লোক তাদের সন্ধানপর আড়কাঠির হাতে ঠকে যায়, ধরা দিলে ফেরবার পথ পায় না। কেন না ভালোমানুষ লোকের নিয়ম-বোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস করবার নয় ঠিক সেইখানেই আগে ভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে, তা সে বৃহস্পতিবারের বারবেলা হোক্, রক্ষা-মন্ত্রের তাবিজ হোক্, উকীলের দালাল হোক্, আর চা-বাগানের আড়কাঠি হোক্! কিন্তু এই নেহাৎ ভালোমানুষেরও একটা জায়গা আছে যেটা নিয়মের উপরকার, সেখানে দাঁড়িয়ে সে বল্‌তে পারে, "সাত জন্মে আমি যেন চা-বাগানের ম্যানেজার না হই, ভগবান আমার পরে এই দয়া করো।" অথচ এই অনবচ্ছিন্ন চা-বাগানের ম্যানেজার-সম্প্রদায় নিখুঁৎ করে' উপকার করতে জানে; জানে তাদের কুলির বস্‌তি কেমন করে ঠিক যেন কাঁচি-ছাঁটা সোজা লাইনে পরিপাটি করে বানিয়ে দিতে হয়; দাওয়াইখানা, ডাক্তারখানা হাটবাজারের যে-ব্যবস্থা করে সে খুব পরিপাটি। এদের এই নির্ম্মানুষিক সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনফা হয়, অন্যদের উপকারও হতে পারে কিন্তু নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।

কেউ না মনে করেন আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বের সম্বন্ধ নিয়েই এ কথাটা বলচি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড় করে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেচে। কেননা স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুল্‌লে, অন্তরতম যে-আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে অথচ মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠা বাড়ী ওঠে। এদিকে সমাজ ব্যাপারে শিক্ষা বল, আরোগ্য বল, জীবিকার সুযোগ সাধন বল, নানা প্রকার হিতকর্ম্মেও মানুষের ষোলো আনা জিত হয়। কেন না পূর্ব্বেই বলেচি বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিষটা সত্য। সেই জন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় ফললাভের দিকে তাদের লোভের অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে, মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু লোভ ত একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্চে রিপু। রিপুর কর্ম্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধনলাভ করে, বললাভ করে, সুবিধা সুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্ব্বল করে।

একা মানুষ ভয়ঙ্কর নিরর্থক; কেননা, তার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে-এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন তাকে। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোট বড় সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি। আর্কিটেক্ট সাহেব নীলরঙের মোমজামার উপর বাড়ির প্ল্যান আঁকেন; তাকে ছবি বলিনে; কেননা সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আত্মিক সম্বন্ধ নয়, বাহির ফলের ব্যাবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল রচনা, প্ল্যান হল নির্ম্মাণ।

তেমনি ফললাভের লোভে ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, তবে মানব সমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড়গড় শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক্, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই, কেননা, কুবেরের পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই বলেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ ভক্তি করতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিম দেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেচে একথা সুস্পষ্ট। ভারতে আচারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েচে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জ্জীব করেচে, য়ুরোপে ব্যবহারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েচে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেচে। কেননা আচারই হোক্ আর ব্যবহারই হোক্ তারা ত তত্ত্ব নয় তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।

তত্ত্ব কা'কে বলে? যিশু বলেচেন, আমি আর আমার পিতা এক। এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে-ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যে-ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

পশ্চিম সভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেচে পূর্ব্বেই তার নিন্দা করেচি। কিন্তু নিন্দাটা কিসের? ঈশোপনিষদে তত্ত্ব-স্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েচে। ঋষি বলেচেন, মাগৃধঃ, লোভ কোরো না। "কেন করব না?" যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। "নাইবা মিল্‌ল, আমি ভোগ কর্‌তে চাই।" ভোগ কোরোনা, একথা ত বলা হচ্চে না। "ভুঞ্জীথাঃ" ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। "তাহলে সত্যটা কি?" সত্য হচ্চে এই, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" সংসারে যা-কিছু চলচে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা কিছু চলচে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর কিছুই না থাক্‌ত, তাহলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সব চেয়ে বড় সাধনা হত। তা'হলে লোভই

মানুষকে সব চেয়ে বড় চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েচেন এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা, আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়। সাতমাস ধরে আমেরিকায় আকাশের বক্ষোবিদারী ঐশ্বর্য্যপুরীতে বসে এই সাধনার উল্টো পথে চলা দেখে এলেম। সেখানে "যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্চে, আর "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" সেইটেই ডলারের ঘনধুলায় আচ্ছন্ন। এই জন্যেই সেখানে, ভুঞ্জীথাঃ, এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে; ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে।

ঐক্য দান করে সত্য, ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। তাছাড়া সে অন্তরাত্মাকে শূন্য রাখে। সেইজন্যে পূর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তেহয়; "আরো" "আরো" হাঁকতে হাঁকতে হাঁপাতে হাঁপাতে নামতার কোঠায় কোঠায় আকাঙ্ক্ষার ঘোড়-দৌড় করাতে করাতে ঘুর্ণি লাগে, ভুলেই যেতে হয় অন্য যা কিছু পাই আনন্দ পাচ্চি নে।

তাহলে চরিতার্থতা কোথায়? তার উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েচেন। তাঁরা বলেন চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে, একটা, দুটো, তিন্‌টে, চার্‌টে। আপেল পড়ার অন্তবিহীন সংখ্যা গণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় একথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধাক্কা দিয়ে বল্‌বে, "ততঃ কিম্।" তার দৌড়ও থাম্‌বে না, তার প্রশ্নের উত্তরও মিল্‌বে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল-পড়া যেমনি একটি আকর্ষণ-তত্ত্বে এসে ঠেকে অমনি বুদ্ধি খুসি হয়ে বলে ওঠে, বাস্, হয়েচে।

এইত গেল আপেল পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বরূপ প্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যায়? এই প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেচেন—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্ব্বভূতকে আপনারই মত দেখেন এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত, আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রী-বুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মান্‌লে না, সে অকুণ্ঠিত চিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেচে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম্ গিলিয়েচে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েচে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েচে এর চেয়ে স্পষ্ট করে ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি।

আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠ্‌বেন—"ঐ

কথাটাই ত আমরা বার্‌বার্ বলে আস্‌চি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এতবড় হাঁ করেচে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চল্‌তে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়,আমরা আধ্যাত্মিক, ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিষের মত পরিহার করা চাই। একদিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মোহকে সমর্থন করেন নি। তাই মনু বলেচেন,

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

"বিষয়ের সেবা ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়।" এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না, তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠ্‌তে হয়। তাই উপনিষৎ বলেচেন, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে,"—অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃতলাভ হবে। শুক্রাচার্য্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্য-পাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্চে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েচে। এইটে হচ্চে সাধনার সব নীচেকার ভিত,—কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামী করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতে আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এমনি করে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েচে যে উপরপানে মাথা তোলবার ফুরসৎ তার নেই বল্লেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপরতলা যখন উঠ্‌বে তখনই, হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত, তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেচেন, না জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্য-বন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া,—এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিম মহা-দেশ বাহ্যবিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করচে, সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে' সেইখানে লাগাচ্চে ঘা, এই হচ্চে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা। আর পূর্ব্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেচে সেই হচ্চে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব পূর্ব্ব পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষদ দিয়ে গেছেন—বলেচেন,

বিদ্যাং চাবিদ্যাংচ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—এইখানে বিজ্ঞানকে চাই; ঈশাবাস্য মিদংসর্ব্বং—এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেচেন তখন পূর্ব্ব পশ্চিমকে মিল্‌তে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্ব্ব দেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জ্জীব; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্বসম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে।, তাই যে-কথাটা একবার আভাসে বলেচি সেইটে আরেকবার স্পষ্ট বলা ভাল। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্ব্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌ হচ্চে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক-করা বলে প্রচার করে। পূর্ব্বে আমি বলেচি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তাহলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্বক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাক্‌লে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার শত ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর যুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উটল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোট ছোট জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবী প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে; সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে, আর তাদের মনে রাখতে হবে এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয় নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্যকে আপনার মত জেনেচে, ন ততো বিজিগুপ্‌সতে, তারাই প্রকাশ পেয়েচে এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি মানুষের দল পর্ব্বতসমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েচে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তাহলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মত কেবলি হানাহানি করেচে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েচে তারা কোন্ কালে লোপ পেয়েচে। আর যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ পেয়েচে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেচে, এত রথ ছুটেচে যে ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুট্‌ল, অম্‌নি মানুষের সত্যের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেচে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল ত ভালই, নইলে সে

দুর্য্যোগ। সেই মহা দুর্য্যোগ আজ ঘটেচে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু করে এগল, এক করবার আন্তরশক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল। ঠিক যেন গাড়িটা ছুটেচে এঞ্জিনের জোরে, বেচারা ড্রাইভারটা "আরে, আরে, হাঁ, হাঁ," করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়েচে, কিছুতে নাগাল পাচ্চে না। অথচ একদল লোক এঞ্জিনের প্রচণ্ড বেগ দেখে আনন্দ করে বল্‌লে," সাবাস, একেই ত বলে উন্নতি।" এদিকে, আমরা পূর্ব্বদেশের ভালোমানুষ, যারা ধীরমন্দগমনে পায়ে হেঁটে চলি, ওদের ঐ উন্নতির ধাক্কা আজও সাম্‌লে উঠতে পারচিনে। কেননা যারা কাছেও আসে তফাতেও থাকে তারা যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তাহলে পদে পদে ঠকাঠক্ ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয় অবস্থাবিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক্, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয়, যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্চে অথচ মিল্‌চ না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডীর ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডীর বাইরে তারা এক হতে শেখেনি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় বলেই, সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডীর পূজা ধরে, দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে, রাজাকে ভোলে দারোগাকে কিছুতে ভুল্‌তে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠ্‌ল সত্যের জোরে, কিন্তু ন্যাশনালিজ্‌ম সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডীদেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারিদিক থেকে নরবলির জোগান চল্‌তে লাগ্‌ল। যতদিন বিদেশী বলি জুট্‌ত ততদিন কোনো কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগ্‌তে আরম্ভ হল,—"একেই কি বলে ইষ্টদেবতা? এযে ঘর পর কিছুই বিচার করে না।" এ যখন একদিন পূর্ব্বদেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল, এবং "ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায়, ধরি ধরি চিবায় সমস্ত"—তখন মহাপ্রসাদের ভোজ খুব জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবচে, এর পূজো আমাদের বংশে সইবে না। যুদ্ধ যখন পূরোদমে চল্‌ছিল তখন সকলেই ভাবছিল যুদ্ধ মিট্‌লেই অকল্যাণ মিট্‌বে। যখন মিট্‌ল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেচে সন্ধিপত্রের মুখস পরে। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড ল্যাজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁৎকে উঠেছিল আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই ল্যাজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহশিক্ত কাগজ জড়ানো চলেচে, বোঝা যাচ্চে ঐটাতে আগুন যখন ধরবে তখন কারো ঘরের চাল আর বাকী থাক্‌বে না। পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বল্‌চেন, যে, যে-দুর্ব্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশনা-

লিজ্‌ম্‌, দেশের সর্ব্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্‌টোদিকে, অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েচে এই কথাটা যখন অস্বীকার করবার জো নেই, এতবড় সত্যের উপর যখন কোনো একটা মাত্র প্রবল জাতি আপন সাম্রাজ্যরথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় এ'কে ধূলো করে দিতে পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করতেই হবে তখন ঐ রিপুটাকে এর মাঝখানে আন্‌লে শকুনির মত কপট্‌ দ্যূতের ডিপ্লমাসিতে বারে বারে সে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

বর্ত্তমান যুগের সাধনার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার সঙ্গতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডী-দেবতার যারা পূজারী তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চ্চা করাকে কর্ত্তব্য মনে করে। জর্ম্মণি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেচে। পশ্চিমের কোন বড় নেশন্‌ এ কাজ করেনি? আসল কথা, জর্ম্মণি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেচে সেইজন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষা-বিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইন্‌ক্যুবেটার যন্ত্র সে বানিয়েছিল। তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্য-দেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দম্‌ অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়েছিল সেদিককার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের অধিকংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কি? জাতীয় আত্মম্ভরিতার কুশল কামনা করে' প্রতিদিন অসত্য পীরের সিন্নি মানা।

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সর্ব্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু, যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচার পদ্ধতি এর প্রতিকূল তা' আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য করে' তুল্‌বে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে একথা না ভোলায় যে, একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে-মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্চে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। শুন্‌তে পাচ্চি সমুদ্রের ওপারে মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করচে, "আমাদের কোন্‌ শিক্ষা, কোন্‌ চিন্তা, কোন্‌ কর্ম্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?" তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছক্‌, যে, "মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।

যস্মিন্‌ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কশ্‌শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

আমরা শুন্‌তে পাচ্চি সমুদ্রের ওপারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বল্‌চে "শান্তি চাই।" এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেচেন, "শান্তং শিবমদ্বৈতং।" অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে

আছে, সেই জন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয়, যে, অতীত যুগের যে-আবর্জ্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্র দেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগ্‌তে সুরু করেচে আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জ্জনার পীঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের প্রত্যূষেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তার অর্চ্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সর্ব্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্বোধন এনে দেবে না?

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতন পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুল্‌তে হবে এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়-লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটেনি, সহজে মিট্‌তেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চল্‌বে না, তার অতিথিশালা চাই, যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে, সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে শিক্ষার যতকিছু সরকারী ব্যবস্থা আছে তার পনেরো আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি, আতিথ্য করে না বলে' লজ্জা করাও তার ঘুচে যায়, সেই জন্যেই বিশ্বের আতিথ্য করে না বলে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে আমি ভিখারী আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারো নেই। কে বলে নেই? আমি ত শুনেচি পশ্চিমদেশ বারম্বার জিজ্ঞাসা করচে, "ভারতের বাণী কই?" তার পর সে যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে এত সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের মত শোনাচ্চে। তাইত দেখি আধুনিক ভারত যখন ম্যক্সমূলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্য্য সভ্যতার দম্ভ করতে থাকে তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়েরবাদ্যের কড়ি-মধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে সে যখন প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিমরাগেই তার সপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব্বভূভাগের সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি কিন্তু তার সাধন-সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্ত্তে সে বিশ্বের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে, কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্য নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্ম্মের মধ্যে

প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব, নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই :—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্কলন

নামের খেলা

প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখ্‌তে সুরু করে।

বহু যত্নে খাতায় সোণালী কালীর কিনারা টেনে তারি গায়ে লতা এঁকে মাঝখানে লাল কালী দিয়ে কবিতাগুলি লিখে রাখ্‌ত। আর খুব সমারোহে মলাটের ওপর লিখ্‌ত, শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

একে একে লেখাগুলিকে কাগজে পাঠাতে লাগ্‌ল। কোথাও ছাপা হ'ল না।

মনে মনে সে স্থির ক'রলে, যখন হাতে টাকা জমবে তখন নিজে কাগজ বের ক'রব।

বাপের মৃত্যুর পর গুরুজনেরা বার বার ব'ললে, "একটা কোনো কাজের চেষ্টা কর, কেবল লেখা নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।"

সে একটুখানি হাসলে আর লিখ্‌তে লাগ্‌ল। একটি দু'টি তিনটি বই সে পরে পরে ছাপালে।

এই নিয়ে খুব আন্দোলন হবে আশা ক'রেছিল। হ'ল না।

আন্দোলন হ'ল একটি পাঠকের মনে। সে হ'চ্চে, তার ছোট ভাগনেটি।

নতুন ক খ শিখে সে যে বই হাতে পায় চেঁচিয়ে পড়ে।

এক দিন একখানা বই নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মামার কাছে ছুটে এল। ব'ললে, "দেখ দেখ, মামা, এ যে তোমারি নাম।"

মামা একটুখানি হাসলে আর আদর ক'রে খোকার গাল টিপে দিলে।

মামা তার বাক্স খুলে আর একখানি বই বের ক'রে ব'ললে, "আচ্ছা, এটা পড় দেখি।"

ভাগ্‌নে একটি অক্ষর বানান ক'রে ক'রে মামার নাম প'ড়ল।

বাক্স থেকে আরও একটা বই বেরল, সেটাতেও প'ড়ে দেখে মামার নাম!

পরে পরে যখন তিনটি বইয়ে মামার নাম দেখ্‌লে, তখন সে আর অল্পে সন্তুষ্ট হ'তে চাইল না। দুই হাত ফাঁক ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলে, "তোমার নাম আরো অনেক অনেক অনেক বইয়ে আছে? একশোটা, চব্বিশটা, সাতটা বইয়ে?"

মামা চোখ টিপে ব'ললে, "ক্রমে দেখতে পাবি!"

ভাগ্‌নে বই তিনটে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ীর বুড়ি ঝিকে দেখাতে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মামা একখানা নাটক লিখেছে, ছত্রপতি শিবাজী তার নায়ক।

বন্ধুরা ব'ললে, "এ নাটক নিশ্চয় থিয়েটারে চ'লবে!"

সে মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।

আজ রবিবার। তার থিয়েটার-বিলাসী বন্ধু থিয়েটার-ওয়ালাদের কাছে অভিমত আন্‌তে গেছে। তাই সে পথ চেয়ে রইল।

রবিবারে তার ভাগ্‌নেরও ছুটি। আজ সকাল

থেকে সে এক খেলা বের ক'রেছে, অন্যমনস্ক হ'য়ে মামা তা লক্ষ্য করে নি।

ওদের ইস্কুলের পাশে ছাপাখানা আছে। সেখান থেকে ভাগ্‌নে নিজের নামের কয়েকটা সীসের অক্ষর ছুটিয়ে এনেছে। তার কোনোটা ছোট কোনোটা বড়।

যে-কোনো বই পায় এই সীসের অক্ষরে কালী লাগিয়ে তা'তে নিজের নাম ছাপাচ্চে মামাকে আশ্চর্য্য ক'রে দিতে হবে।

আশ্চর্য্য ক'রে দিলে। মামা এক সময়ে ব'সবার ঘরে এসে দেখে, ছেলেটি ভারী ব্যস্ত।

"কি কানাই, কি ক'রচিস্?"

ভাগ্‌নে খুব আগ্রহ ক'রেই দেখালে সে কি ক'রচে কেবল তিনটি মাত্র বই নয়, অন্ততঃ পঁচিশখানা বইয়ে ছাপার অক্ষরে কানাইয়ের নাম!

এ কি কাণ্ড! পড়া-শুনোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল খেলা! আর এ কি রকম খেলা!

কানাইয়ের বহু দুঃখে জোটানো নামের অক্ষরগুলি হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিলে।

কানাই শোকে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তার পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার পরে থেকে থেকে ঘুকায় ঘুকায় কেঁদে ওঠে, কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না।

বুড়ি ঝি ছুটে এসে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কি হ'য়েছে বাবা?"

কানাই ব'ললে, "আমার নাম!"

মা এসে ব'ললে, "কি রে কানাই, কি হ'য়েছে?"

কানাই রুদ্ধকণ্ঠে ব'ললে, "আমার নাম!"

ঝি লুকিয়ে তার হাতে আস্ত একটা ক্ষীরপুলি এনে দিলে, মাটীতে ফেলে দিয়ে সে ব'ললে, "আমার নাম!"

মা এসে ব'ললে, "কানাই, এই নে তোর সেই রেলগাড়ীটা।"

কানাই রেলগাড়ী ফেলে ব'ললে, "আমার নাম!"

থিয়েটার থেকে বন্ধু এল।

মামা দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কি হ'ল?"

বন্ধু ব'ললে, "ওরা রাজী হ'ল না।"

অনেক ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মামা ব'ললে, "আমার সর্ব্বস্ব যায় সেও ভাল, আমি নিজে থিয়েটার খুল্‌ব।"

বন্ধু ব'ললে, "আজ ফুটবল ম্যাচ দেখ্‌তে যাবে না?"

ও ব'ললে, "না, আমার জ্বরভাব।"

বিকেলে মা এসে ব'ললে, "খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।"

ও ব'ললে, "ক্ষিদে নেই!"

সন্ধ্যের সময় স্ত্রী এসে ব'ললে, "তোমার সেই নতুন লেখাটা শোনাবে না?"

ও ব'ললে, "মাথা ধ'রেচে!"

ভাগ্‌নে এসে ব'ললে, "আমার নাম ফিরিয়ে দাও!"

মামা ঠাস্ করে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিলে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মোসলেম ভারত, ভাদ্র ১৩২৮।

নতুন পুতুল

১

বছরে বছরে রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেচে।

এই গুণী কেবল পুতুল তৈরী করত; সে পুতুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জন্যে।

যখন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমন সময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষণলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কায়দা।

যে-পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়েনা, কিছু রং দেয় কিছু বাকি রাখে। মনে হয় পুতুল-গুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।

নবীনের দল বল্‌লে, "লোকটা সাহস দেখিয়েচে।"

প্রবীণের দল বল্‌লে, "এ'কে বলে সাহস? এ ত স্পর্দ্ধা।"

কিন্তু নতুন কালের নতুন দাবী। একালের রাজকন্যারা বলে, "আমাদের এই পুতুল চাই।"

সাবেককালের অনুচররা বলে, "আরে ছিঃ।"

শুনে তাদের জেদ বেড়ে যায়।

বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকাভরা পুতুল যেন খেয়ার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মত ওপারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, বুড়োর নাম সবাই ভুলেই গেল। কিষণলাল হল রাজবাড়ির পুতুল-হাটের সর্দ্দার।

২

বুড়োর মন ভাঙ্‌ল, বুড়োর দিনও চলে না। শেষকালে তার মেয়ে এসে তাকে বল্‌লে, "তুমি আমার বাড়িতে এস।"

জামাই বল্‌লে, "খাও দাও, আরাম কর, আর সব্‌জির ক্ষেত থেকে গোরু বাছুর খেদিয়ে রাখ।"

বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকন্নার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নৌকা বোঝাই করে সহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেচে সে কথা বুড়ো বোঝে না, তেমনই সে বোঝে না যে তার নাৎনীর বয়স হয়েছে ষোলো।

যেখানে গাছতলায় বসে বুড়ো ক্ষেত আগ্‌লায় আর ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে ঢলে পড়ে সেখানে নাৎনী গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে, বুড়োর বুকের হাড়গুলো পর্য্যন্ত খুসি হয়ে ওঠে। সে বলে, "কি দাদী, কি চাই?"

নাৎনী বলে, "আমাকে পুতুল গড়িয়ে দাও, আমি খেল্‌ব।"

বুড়ো বলে, "আরে ভাই, আমার পুতুল তোর পছন্দ হবে কেন?"

নাৎনী বলে, "তোমার চেয়ে ভাল পুতুল কে গড়ে, শুনি?"

বুড়ো বলে, "কেন, কিষণলাল!"

নাৎনী বলে, "ইস্। কিষণলালের সাধ্যি!"

দুজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েচে। বারেবারে একই কথা।

তারপরে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মাল-মসলা বের করে—চোখে মস্ত গোল চশ্‌মাটা আঁটে।

নাৎনীকে বলে, "কিন্তু দাদী, ভুট্টা যে কাকে খেয়ে যাবে!"

নাৎনী বলে, "দাদা, আমি কাক তাড়াব।"

বেলা বয়ে যায়; দূরে ইঁদারা থেকে বলদে জল টানে তার শব্দ আসে; নাৎনী কাক তাড়ায়; বুড়ো বসে বসে পুতুল গড়ে।

৩

বুড়োর সকলের চেয়ে ভয় তার মেয়েকে। সেই গিন্নির শাসন বড় কড়া, তার সংসারে সবাই থাকে সাবধানে।

বুড়ো আজ একমনে পুতুল গড়্‌তে বসেচে, ছঁস হল না, পিছন থেকে তার মেয়ে ঘন ঘন হাত দুলিয়ে আস্‌চে।

কাছে এসে যখন সে ডাক দিলে তখন চশ্‌মাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে অবোধ ছেলের মত তাকিয়ে রইল।

মেয়ে বল্‌লে, "দুধ দোয়া পড়ে থাক্, আর তুমি সুভদ্রাকে নিয়ে বেলা বইয়ে দাও! অত বড় মেয়ে, ওর কি পুতুল খেলার বয়স!"

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল, "সুভদ্রা খেল্‌বে কেন? এ পুতুল রাজবাড়ীতে বেচ্‌ব। আমার দাদীর যেদিন বর আস্‌বে, সেদিন ত ওর গলায় সোহরের মালা পরাতে হবে আমি তাই টাকা জমাতে চাই।

মেয়ে বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে, "রাজবাড়িতে এ পুতুল কিন্‌বে কে?"

বুড়োর মাথা হেট হয়ে গেল। চুপ করে বসে রইল।

সুভদ্রা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "দাদার পুতুল রাজ-বাড়িতে কেমন না কেনে দেখ্‌ব!"

৪

দুদিন পরে সুভদ্রা এক কাহন সোনা এনে মাকে বল্‌লে, "এই নাও আমার দাদার পুতুলের দাম।"

মা বললে, "কোথায় পেলি?"

মেয়ে বল্‌লে, "রাজপুরীতে গিয়ে বেচে এসেচি।"

বুড়ো হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "দাদী, তবু ত তোর দাদা এখন চোখে ভাল দেখে না, তার হাত কেঁপে যায়!"

মা খুসি হয়ে বল্‌লে, "এমন ষোলোটা মোহর হলেই ত সুভদ্রার গলার হার হবে।"

বুড়ো বল্‌লে, "তার আর ভাবনা কি!"

সুভদ্রা বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "দাদাভাই, আমার বরের জন্যে ত ভাবনা নেই।"

বুড়ো হাস্‌তে লাগ্‌ল, আর চোখ থেকে একফোঁটা জল মুছে ফেল্‌লে।

৫

বুড়োর যৌবন যেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে পুতুল গড়ে আর সুভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দূরে ইঁদারায় বলদে ক্যাঁ-কোঁ করে জল টানে।

একে একে ষোলোটা মোহর গাঁথা হল, হার পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

মা বল্‌লে, "এখন বর এলেই হয়।"

সুভদ্রা বুড়োর কানে কানে বল্‌লে, "দাদাভাই, বর ঠিক আছে।"

দাদা বল্‌লে, "বল্ ত দাদী, কোথায় পেলি বর।"

সুভদ্রা বল্‌লে, "যেদিন রাজপুরীতে গেলুম, দ্বারী বল্‌লে কি চাও? আমি বল্‌লেম, রাজকন্যাদের কাছে পুতুল বেচ্‌তে চাই। সে বল্‌লে, এ পুতুল এখনকার দিনে চল্‌বে না,—ব'লে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মানুষ আমার কান্না দেখে বল্‌লে, দাও ত, ঐ পুতুলের একটু সাজ ফিরিয়ে দি, বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মানুষটিকে তুমি যদি পছন্দ কর, দাদা, তাহলে আমি তাঁর গলায় মালা দিই।"

বুড়ো জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "সে আছে কোথায়?"

নাৎনী বল্‌লে, "ঐ যে বাইরে পিয়াল গাছের তলায়।"

বর এল ঘরের মধ্যে, বুড়ো বল্‌লে, "এ যে কিষণ-লাল।"

কিষণলাল বুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে বল্‌লে, "হাঁ, আমি কিষণলাল।"

বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বল্‌লে, "ভাই, একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে আমার হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটিকে।"

নাৎনী বুড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বল্‌লে, "দাদা, তোমাকে সুদ্ধ।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৮

অদৃশ্য আলোক

সেতারের তার অঙ্গুলি তাড়নে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। দেখা যায় তার কাঁপিতেছে; সেই কম্পনে বায়ুরাশিতে তরঙ্গ ঢেউ উৎপন্ন হয় এবং তাহার আঘাতে কর্ণেন্দ্রিয়ে শব্দ উপলব্ধি হয়। এইরূপে ত্রিবিধ উপকরণে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরিত ও উপলব্ধ হইয়া থাকে—প্রথমতঃ শব্দের উৎস কম্পিত তার, দ্বিতীয়তঃ বাহক বায়ু এবং তৃতীয়তঃ শব্দবোধক কর্ণেন্দ্রিয়।

সেতারের তার যতই ছোট করা যায়, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিয়া থাকে। এইরূপে বায়ুস্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০০ বার হইলে অসহ্য উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও খাট করিলে সুর আর শুনিতে পাই না। তার তখনও কম্পিত হয়, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সেই অতি উচ্চ সুর উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রবণ করিবার উপরের দিকে যেরূপ এক

সীমা আছে নীচের দিকেও সেইরূপ। স্থূল তার কিম্বা ইস্পাত আঘাত করিলে অতি ধীর স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন শব্দ শোনা যায় না। কম্পন-সংখ্যা ১০ হইতে ৩০,০০০ পর্য্যন্ত হইলে তাহা শ্রুত হয় অর্থাৎ আমাদের শ্রবণ-শক্তি একাদশ সপ্তকের মধ্যে আবদ্ধ। কর্ণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক সুর আমাদের নিকট অশব্দ।

বায়ুরাশির কম্পনে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, আকাশ-স্পন্দনে সেইরূপ আলো উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু একাদশ সপ্তক সুর শুনিতে পাই। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা আরও অধিক, আকাশের অগণিত সুরের মধ্যে এক সপ্তক সুর মাত্র দেখিতে পাই। আকাশ-স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে চারি শত লক্ষ কোটি বার হইলে চক্ষু তাহা রক্তিম আলো বলিয়া উপলব্ধি করে, কম্পন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলে বেগুনী রং দেখিতে পাই। পীত, সবুজ ও নীলালোক এই এক সপ্তকের অন্তর্ভূত। কম্পন-সংখ্যা চারি শত লক্ষ কোটির উর্দ্ধে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হয় এবং দৃশ্য অদৃশ্যে মিলাইয়া যায়।

আকাশ-স্পন্দনেই আলোর উৎপত্তি, তাহা দৃশ্যই হউক অথবা অদৃশ্যই হউক। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদৃশ্য রশ্মি কি করিয়া ধরা যাইতে পারে, আর এই রশ্মি যে আলো তাহার প্রমাণ কি? এ বিষয়ের পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জার্ম্মাণ অধ্যাপক হার্টজ সর্ব্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে আকাশে ঊর্ম্মি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তবে তাহার ঢেউগুলি অতি বৃহদাকার বলিয়া সরল রেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য আলো রশ্মির সম্মুখে একখানি ধাতু-ফলক ধরিলে পশ্চাতে ছায়া পড়ে, কিন্তু বৃহদাকার আকাশের ঢেউগুলি ঘুরিয়া বাধার পশ্চাতে পৌঁছিয়া থাকে। জলের বৃহৎ ঊর্ম্মির সম্মুখে উপলখণ্ড ধরিলেও এইরূপ হইতে দেখা যায়। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই, তাহা সূক্ষ্মরূপে প্রমাণ করিতে হইলে অদৃশ্য আলোর ঊর্ম্মির আকার ক্ষুদ্র করা আবশ্যক। আমি যে কল নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে আকাশোর্ম্মির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই কলে একটী ক্ষুদ্র লণ্ঠনের ভিতরে তাড়িতোর্ম্মি উৎপন্ন হয়। লণ্ঠনের সম্মুখে একটী খোলা নল, তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলো বাহির হয়। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয় ত অন্য জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই আলোকে উদ্ভিদ্ উত্তেজিত হইয়া থাকে।

অদৃশ্য আলো দেখিবার জন্য কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাণ আবশ্যক। আমাদের চক্ষুর পশ্চাতে স্নায়ু-নির্ম্মিত একখানি পর্দ্দা আছে, তাহার উপর আলো পতিত হইলে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে আলোড়িত করে এবং সেই আলোড়ন আমরা আলো বলিয়া অনুভব করি। কৃত্রিম চক্ষুর গঠন খানিকটা ঐরূপ। দুইখানি ধাতুখণ্ড পরস্পরের সহিত স্পর্শ করিয়া আছে। সংযোগস্থলে অদৃশ্য আলো পতিত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে বিদ্যুৎ-স্রোত বহিয়া চুম্বকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়। বোবা যেরূপ হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করে, অদৃশ্য আলো দেখিতে পাইলে কৃত্রিম চক্ষুও সেইরূপ কাঁটা নাড়িয়া সাড়া দেয়।

আলোক ও প্রকৃতি

এখন দেখা যাউক দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একবিধ অথবা বিভিন্ন। দৃশ্য আলোকের প্রকৃতি এই যে—

(১) ইহা সরল রেখায় ধাবিত হয়।

(২) ধাতু-নির্ম্মিত দর্পণে পতিত হইলে আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আইসে। রশ্মি প্রতিফলিত হইবারও একটা বিশেষ নিয়ম আছে।

(৩) আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য আলো-আহত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্ত্তিত হয়। ফটোগ্রাফের প্লেটে যে ছবি পড়ে, তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। প্লেটের উপর ডেভেলপারে ছবি ফুটিয়া উঠে।

(৪) সব আলোকের রং এক নহে, কোন আলো লাল, কোনটা পীত, কোনটা সবুজ এবং কোনটা নীল। বিভিন্ন পদার্থ নানা রং-এর পক্ষে স্বচ্ছ কিম্বা অস্বচ্ছ।

(৫) আলো বায়ু হইতে অন্য কোন স্বচ্ছ পদার্থের উপর পতিত হইয়া বক্রীভূত হয়। আলোর রশ্মি ত্রিকোণ কাচের উপর ফেলিলে ইহা স্পষ্টত দেখা যায়। কাচ-বর্ত্তুলের ভিতর দিয়া আলো অক্ষীণভাবে দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

(৬) আলোর ঢেউয়ে সচরাচর কোন শৃঙ্খলা নাই, উহা সর্ব্বমুখী অর্থাৎ কখনও ঊর্দ্ধাধ, কখনও বা দক্ষিণে-বামে স্পন্দিত হয়। স্ফটিকতজাতীয় পদার্থ দ্বারা আলোক-রশ্মির স্পন্দন শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে। তখন স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়। একমুখী আলোর বিশেষ ধর্ম্ম পরে বলিব।

দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই রূপ সে সম্বন্ধে পরীক্ষা বর্ণনা করিব।

প্রথমতঃ অদৃশ্য আলোক যে সোজা পথে চলে, তাহার প্রমাণ এই যে, বিদ্যুতোর্ম্মি বাহির হইবার জন্য লণ্ঠনে যে নল আছে সেই নলের সম্মুখে সোজা লাইনে কৃত্রিম চক্ষু ধরিলে কাঁটা নড়িয়া উঠে। চক্ষুটীকে এক পাশে ধরিলে কোন উত্তেজনা-চিহ্ন দেখা যায় না।

দর্পণে যেরূপ দৃশ্য আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আইসে এবং সেই প্রত্যাবর্ত্তন যে নিয়মাধীন, অদৃশ্য আলোও সেইরূপে এবং সেই নিয়মে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

দৃশ্য আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অদৃশ্য আলোক দ্বারাও যে আণবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আলোর বিবিধ বর্ণ

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দৃশ্য আলোক নানা বর্ণের; অনুভূতি শক্তি দ্বারা বর্ণের বিভিন্নতা সচরাচর ধরিতে পারি। কিন্তু বর্ণের বিভিন্নতা কেহ কেহ ধরিতে পারেন না। তাঁহারা বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ। বর্ণের বিভিন্নতা অন্য উপায়ে ধরা যাইতে পারে, সে বিষয়ে পরে বলিব। এখানে বলা আবশ্যক যে, মানুষের দৃষ্টি-সীমার ক্রম-বিকাশ হইতেছে। বহু পূর্ব্বপুরুষদের বর্ণজ্ঞান সঙ্কীর্ণ ছিল, তাহা অন্ততঃ একদিকে প্রসারিত হইয়াছে। আর অন্যদিকেও হয় ত কোন দিন প্রসারিত হইবে। তাহা হইলে এখন যাহা অদৃশ্য তাহা দৃশ্যের মধ্যে আসিবে।

সে যাহা হউক, অদৃশ্য আলোর রং সম্বন্ধে কয়েকটী অদ্ভুত পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জানালার কাচের কোন বিশেষ রং নাই, সূর্য্যের আলো উহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। সুতরাং দৃশ্য আলোকের পক্ষে কাচ স্বচ্ছ; জলও স্বচ্ছ। কিন্তু ইট-পাটকেল অস্বচ্ছ, আলকাতরা তদপেক্ষা অস্বচ্ছ। দৃশ্য আলোকের কথা বলিলাম; অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে জানালার কাচ ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া এইরূপ আলো সহজেই চলিয়া যায়। কিন্তু জলের গেলাস সম্মুখে ধরিলে অদৃশ্য আলো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম! তদপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। ইট-পাটকেল যাহা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে করিতাম, তাহা অদৃশ্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ। আর আলকাতরা? ইহা জানালার কাঁচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ! কোথায় এক অদ্ভুত দেশের কথা পড়িয়াছিলাম, সে দেশে মৎস্য জলাশয় হইতে ডাঙ্গায় ছিপ ফেলিয়া মানুষ শিকার করে। অদৃশ্য আলোকের দেশ হয় ত সেইরূপই অদ্ভুত হইবে।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দৃশ্য আলোকেও এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, তাহাতে ভড়াস্ত বলিয়া বিস্মিত হই না। সম্মুখের শাদা কাগজের উপর দুইটী বিভিন্ন আলো-রেখা পতিত হইয়াছে, একটী লাল আর একটী সবুজ। মাঝখানে জানালার কাচ ধরিলে উভয় আলোই অবাধে যায়। এবার মাঝখানে লাল কাচ ধরিলাম, লাল আলো অবাধে যাইতেছে, কিন্তু সবুজ আলো বন্ধ হইল। সবুজ কাচ ধরিলে সবুজ আলো বাধা পাইবে না, কিন্তু লাল আলো বন্ধ হইবে। ইহার কারণ এই যে, (১) সব আলো এক বর্ণের নহে; (২) কোন পদার্থ এক আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু অন্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ। যদি বর্ণজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলেও একইপদার্থের ভিতর দিয়া এক

আলো যাইতেছে এবং অন্য আলো যাইতে পারিতেছে না দেখিয়া নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতাম যে দুইটী আলো বিভিন্ন বর্ণের। আলকাতরা দৃশ্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ এবং অদৃশ্য আলোর পক্ষে স্বচ্ছ ইহা জানিয়া অদৃশ্য আলোক যে অন্য বর্ণের তাহা প্রমাণিত হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইলে ইন্দ্রধনু অপেক্ষাও কল্পনাতীত অনেক নূতন বর্ণের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতাম। তাহাতেও কি আমাদের বর্ণের তৃষা মিটিত?

মৃত্তিকা-বর্ত্তুল ও কাচ বর্ত্তুল

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আলো এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তুর উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। ত্রিকোণ কাচ কিংবা ত্রিকোণ ইষ্টকখণ্ড দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য আলো যে একই নিয়মের অধীন তাহা প্রমাণ করা যায়। কাচ-বর্ত্তুল সাহায্যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুদূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে প্রেরণ করা যায়। তবে এজন্য বহুমূল্য কাচ-বর্ত্তুল নিষ্প্রয়োজন, ইট-পাটকেল দিয়াও এইরূপ বর্ত্তুল নির্ম্মিত হইতে পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে যে ইষ্টক-নির্ম্মিত গোল স্তম্ভ আছে তাহা দিয়া অদৃশ্য আলো দূরে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। দৃশ্য আলো সংহত করিবার পক্ষে হীরকখণ্ডের অদ্ভুত ক্ষমতা। বস্তুবিশেষের আলো সংহত করিবার ক্ষমতা যেরূপ অধিক তাহার আলো বিকীরণ করিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে বহুল হইয়া থাকে। এই কারণেই হীরকের এত মূল্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চীনা বাসনের অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার ক্ষমতা হীরক অপেক্ষাও অনেকগুণ অধিক। সুতরাং যদি কোন দিন আমাদের দৃষ্টি-শক্তি প্রসারিত হইয়া রক্তিম বর্ণের সীমা পার হয়, তবে হীরক তুচ্ছ হইবে এবং চীনা বাসনের মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িবে। প্রথমবার বিলাত যাইবার সময় অভ্যস্ত কুসংস্কার-হেতু চীনা বাসন স্পর্শ করিতে ঘৃণা হইত। বিলাতে সম্ভ্রান্ত ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম যে, দেওয়ালে বহুবিধ চীনা বাসন সাজান রহিয়াছে। ইহার কি মূল্য, যে এত যত্ন? প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি যে ইংরেজ ব্যবসাদার। অদৃশ্য আলো দৃশ্য হইলে চীনা বাসন অমূল্য হইয়া যাইবে। তখন তাহার তুলনায় হীরক কোথায় লাগে! সে দিন সৌখীন রমণীগণ হীরকমালা প্রত্যাখান করিয়া পেয়ালা-পিরিচের মালা সগর্ব্বে পরিধান করিবেন এবং অচীনধারিণী নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন।

সর্ব্বমুখী এবং একমুখী আলো

প্রদীপের অথবা সূর্য্যের আলো সর্ব্বমুখী অর্থাৎ তাহার স্পন্দন একবার ঊর্দ্ধাধ অন্যবার দক্ষিণে-বামে হইয়া থাকে। লঙ্কাদ্বীপের টুর্মালিন স্ফটিকের ভিতর দিয়া আলো প্রেরণ করিলে আলো একমুখী হইয়া যায়। দুইখানি টুর্মালিন সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়া যায়, কিন্তু একখানি অন্যখানির সম্মুখে আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না।

অদৃশ্য আলোকও এইরূপে একমুখী করা যাইতে পারে। তাহা বুঝাইতে হইলে নীতি-কথার বক ও শৃগালের গল্প স্মরণ করা আবশ্যক। বক শৃগালকে নিমন্ত্রণ করিয়া পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিল। লম্বা বোতলে পানীয় দ্রব্য রক্ষিত ছিল। বক লম্বা ঠোঁট দিয়া অনায়াসে পান করিল; শৃগাল কেবলমাত্র সুরুনী লেহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরের দিন শৃগাল ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিল। পানীয় দ্রব্য থালাতে দেওয়া হইয়াছিল। বক ঠোঁট কাৎ করিয়াও কোন প্রকারে শোষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। বোতল ও থালার দ্বারা যেরূপ লম্বা ঠোঁট এবং চেপ্টা মুখের বিভিন্নতা বাহির হয়, সেইরূপে একমুখী আলোকে পার্থক্য ধরা যাইতে পারে, তাহা লম্বা কিংবা চেপ্টা, ঊর্দ্ধাধ অথবা এ-পাশ ও-পাশ।

বক-কচ্ছপ সংবাদ

মনে কর দুই দল জন্তু মাঠে চরিতেছে—লম্বা জানোয়ার বক ও চেপ্টা জীব কচ্ছপ। সর্ব্বমুখী তদৃশ্য আলোকও এইরূপ দুই প্রকারের স্পন্দন-সঞ্জাত। সম্মুখে লোহার গরাদে খাড়াভাবে ধরিলে

জেই দুই প্রকার জীবদিগকে বাছিয়া লওয়া যাইতে রে। জন্তুদিগকে তাড়া করিলে লম্বা বক সহজেই গার হইয়া যাইবে, কিন্তু চেপ্টা কচ্ছপ গরাদের পাশে পড়িয়া থাকিবে। প্রথম বাধা পার হইবার র বকবৃন্দের সম্মুখে যদি দ্বিতীয় গরাদে সমান্তরালে ধরা যায়, তাহা হইলেও বক তাহা দিয়া গলিয়া বে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদেখানাকে যদি আড় ভাবে া যায়, তাহা হইলে বক আটকাইয়া থাকিবে। রূপে একটা গরাদে অদৃশ্য আলোর সম্মুখে ধরিলে লো একমুখী হইবে, দ্বিতীয় গরাদে সমান্তরালভাবে রিলে আলো উহার ভিতর দিয়াও যাইবে—তখন ীয় গরাদেটা আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইবে। ন্তু দ্বিতীয় গরাদেটা আড়ভাবে ধরিলে আলো তে পারিবে না, তখন গরাদেটা অস্বচ্ছ বলিয়া ন হইবে। যদি আলো একমুখী হয়, তাহা হইলে ান কোন বস্তু একভাবে ধরিলে অস্বচ্ছ হইবে, ন ৯০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া লো যাইতে পারিবে।

পুস্তকের পাতাগুলি গরাদের মত সজ্জিত। াতে রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনে বক্তৃতা করিবার সময় লের উপর একখানা রেলের টাইম-টেব্‌ল্ অর্থাৎ ুশ ছিল তাহাতে ১০ হাজার ট্রেণের সময়, ভাড়া এবং অন্যান্য বিষয় ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত । উহা এরূপ জটিল যে, কাহারও সাধ্য নাই হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় বাহির করিতে পারে। পুস্তকের তমসাচ্ছন্নতা কিছু না মনে করিয়া ার সময় দেখাইয়াছিলাম যে, বইখানাকে এক- করিয়া ধরিলে ইহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে না; কিন্তু ৯০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া ধরিলে পুস্তকখানা বারে স্বচ্ছ হইয়া যায়। পরীক্ষা দেখাইবামাত্র র রোল হলে প্রতিধ্বনি হইল। প্রথম প্রথম বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম। রেলী আসিয়া বলিলেন যে ব্র্যাড্‌শর ভিতর এ পর্য্যন্ত কেহ আলোক দেখিতে পায় নাই। করিয়া ধরিলে আলো দেখিতে পাওয়া যায় ইহা াইলে জগৎবাসী আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে। আমার বৈজ্ঞানিক লেখা পড়িয়া কেহ কেহ স্তম্ভিত হইবেন, দন্তস্ফুট অথবা চক্ষুস্ফুট করিতে সমর্থ হইবেন না। তাহা হইলে বইখানাকে ৯০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া ধরিলেই সব তথ্য একেবারে বিশদ হইবে।

আলো একমুখী করিবার অন্য এক উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যদিও এলোমেলোভাবে আকাশ-স্পন্দন রমণীর কেশগুচ্ছে প্রবেশ করে, তথাপি বাঁহির হইবার সময় একেবারে শৃঙ্খলিত হইয়া যায়। বিলাতের নরসুন্দরদের দোকান হইতে বহু জাতির কেশগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ফরাসী মহিলার নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। এ বিষয়ে জার্ম্মান মহিলার স্বর্ণাভ কুন্তল অনেকাংশে হীন। পারিসে যখন এই পরীক্ষা দেখাই, তখন সমবেত ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলী এই নূতন তত্ত্ব দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বৈরী জাতির উপর তাহাদের প্রাধান্য প্রমাণিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে তাহাদের কোন সন্দেহই রহিল না। বলা বাহুল্য, বার্লিনে এই পরীক্ষা প্রদর্শনে বিরত হইয়াছিলাম।

যে সব পরীক্ষা বর্ণনা করিলাম, তাহা হইতে দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই, তাহা প্রমাণিত হইল।

তার-হীন সংবাদ

অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘর-বাড়ী ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালার লেপ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম মেকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ-উর্ম্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটী রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল। ১৯০৭ সালে মার্কণী তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত

অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উন্নতি সাধনে কৃতিত্ব দ্বারা পৃথিবীতে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়াছে। পূর্ব্বে দূরদেশে কেবল তারের সাহায্যে সংবাদ প্রেরিত হইত, এখন বিনা তারে সর্ব্বত্র সংবাদ পৌঁছিয়া থাকে।

কেবল তাহাই নহে। মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও বিনা তারে আকাশ-তরঙ্গ সাহায্যে সুদূরে শ্রুত হইতেছে। সেই স্বর সকলে শুনিতে পায় না, শুনিতে হইলে কর্ণ আকাশের সুরের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়। এইরূপে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অহোরাত্র কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কাণ পাতিয়া তবে একবার শোন। "কোথা হইতে খবর পাঠাইতেছ?" উত্তর —"সমুদ্র হইতে, তিন শত হাত নীচে ডুবিয়া আছি। টর্পিডো দিয়া তিনখানা রণতরী ডুবাইয়াছি আর দুইখানার প্রতীক্ষায় আছি।" আবার এ কি? একেবারে লক্ষ লক্ষ কামানের গর্জ্জন শোনা যাইতেছে, অগ্ন্যুৎপাতে যেন মেদিনী বিদীর্ণ হইল। পরে জানিলাম মহাসাম্রাজ্য চূর্ণ হইয়াছে, কল্য হইতে পৃথিবীর ইতিহাস অন্য রকম হইবে। এই ভীষণ নিনাদের মধ্যেও মনুষ্যকণ্ঠের কত মর্ম্মবেদনাধ্বনি, কত মিনতি, কত জিজ্ঞাসা ও কত রকমের উত্তর শোনা যাইতেছে। ইহার মধ্যে কে এক জন অবুঝের মত বার বার একই নাম ধরিয়া ডাকিতেছে,—"কোথায় তুমি—কোথায় তুমি?" কোন উত্তর আসিল না—সে আর এই পৃথিবীতে নাই।

এইরূপে দূরদূরান্ত বাহিয়া আকাশের সুর ধ্বনিত হইতেছে। মনে কর কোন্ অদৃশ্য অঙ্গুলি বৈদ্যুতিক অর্গ্যানের এক দিক হইতে অন্য দিকের বিবিধ ষ্টপ আঘাত করিতেছে। বাম দিকের ষ্টপে আঘাত করাতে এক সেকেণ্ডে একটী স্পন্দন হইল। অমনি শূন্যমার্গে বিদ্যুতোর্ম্মি ধাবিত হইল। কি প্রকাণ্ড সেই সহস্র ক্রোশব্যাপী ঢেউ! উহা অনায়াসে হিমাচল উল্লঙ্ঘন করিয়া এক সেকেণ্ডে পৃথিবী দশবার প্রদক্ষিণ করি ইহার পর দ্বিতীয় ষ্টপে আঘাত পড়িল এবং এ সেকেণ্ডে আকাশ দশবার স্পন্দিত হইল। এইর আকাশের সুর ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতরে উঠিবে, স্পন্ সংখ্যা এক হইতে দশ, শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি বৃদ্ধি পাইবে। আকাশ-সাগরে নিমজ্জমান র আমরা অগণিত ঊর্ম্মি দ্বারা আহত হইব, কিন্তু ই মধ্যেও কোন ইন্দ্রিয় জাগরিত হইবে না। আকা স্পন্দন আরও ঊর্দ্ধে উঠুক তখন কিয়ৎকালের জন্য ত অনুভূত হইবে। তাহার পর চক্ষু উত্তেজিত হ রক্তিম, পীতাদি আলোক দেখিতে পাইবে। এই দৃশ্য এক সপ্তক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সুর আ উচ্চে উঠিলে দৃশ্যশক্তি পুনরায় পরাস্ত হইবে, অনুভূ শক্তি আর জাগিবে না। ক্ষণিক আলোকের প অভেদ্য অন্ধকার।

তবে ত আমরা এই অসীমের মধ্যে একে দিশাহারা! কতটুকুই বা দেখিতে পাই? এক অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরি এবং ভগ্ন দিক-শলাকা লইয়া পাথার লঙ্ঘন করি প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্ত পথের যাত্রি, তবে সম্বল তোমার?

সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস, বিশ্বাস-বলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহা রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সম্রাজ্য এইরূপ অস্থি তিল তিল করিয়া গঠিত হইতেছে। আঁধার ন আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, কেবল মাঝে দুই একটী আলো-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায় ঘন কুয়াসা অপসারিত হইবে এবং এক দিন বিশ্ব জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

মোস্‌লেম ভারত, ভাদ্র ১৩২৮

বেদুঈন

এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আমরাই প্রজা আমরা রাজা!
আমাদের গ্লানি হিংসা যে করে আমাদের হাতে পাবেই সাজা।
তাঁবু আমাদের পশ্চিমে-পুবে কালো ক'রে আছে সফেদ বালি,
শাদা হাতে যেন উল্কির দাগ—পোড়া হাঁড়ি আর চুলার কালি!
কোমরে-বাঁধা সে ভারী তলোয়ার আধা-সিধা আর আধেক বাঁকা,
হাতে জল-তোলা দড়ির মতন দীঘল বর্শা রক্ত-মাখা!
বেকর-জোসম-মা'দের গোষ্ঠী—জানে তারা খুবই মোদের কিরা,
শত্রু-নিপাত না ক'রে আমরা ভিজাই না চুল, খুলি না গিরা।
হেজাজ্-বংশে ভেজাবে না মুখ ঘোলা কাদা-মাখা 'দেদা'র জলে,
আমাদের উট দুধে-ভরা-বাঁট চরে না শুক্‌না কাঁটার দলে।
এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আমরাই প্রজা আমরা রাজা!
আমাদের সাধে বাদ সাধে যেই, আমাদের হাতে পাবেই সাজা।

ভোরের তারাটী ওঠে নি যখনো—পাহাড়ের তলে শিক্‌লে-বাঁধা,
হাওয়ারা সবাই ঘুম থেকে জেগে সবে ফের সুরু ক'রেছে কাঁদা।
বুড়ারা ঘুমায়, জোয়ানেরা জেগে খিম্‌খিম্-দানা খাওয়ায় উটে,
পরে, পেয়ালায় ঘোড়ারি দুধের শরাব সদ্য ফেনায়ে উঠে।
ভোরের পেয়ালা কাণা-ভোর ভরি' হাতে-হাতে দেয় হাসিনা-সাকী,
চোক্ জ্ব'লে ওঠে, আকাশেরো কোলে জ্ব'লে ওঠে লাল পুবের চাকী!
মস্‌লা-বাটা সে পাথরের মত চক্‌চকে-তেলা ঘোড়ার পিঠে
মালেক, কায়েস্, আমি—তিন জন লাফাইয়া ঠুকি পায়ের গিঁঠে।
ছোট-ক'রে-ছাটা চুলগুলি তার, গলাটী যেন সে তালের কোঁড়া,
পালক-লাগানো তীরের মতন ছুটে' যায় মোর আরব ঘোড়া।
সাম্‌নে বালুতে দাঁড় বুনে' দেয় ঝির্-ঝির্ ধীর ভোরের হাওয়া,
পিছনে কিছু না—সব মুছে যায়, ধূলা-কুয়াশায় যায় না চাওয়া!
ডাহিনে মিলায় মোগেমীর-গিরি, সিতাব্-কাতান্-তবির্-চূড়া,
'কানাবেল্'-বনে দাঁড়ায় সাথীরা, ধুয়ে লয় মুখে বালির গুঁড়া।
আমার ঘোড়া সে ছোটে পুরা দম—টগ্‌বগ্ সেই আওয়াজ বা কি!
বন্ বন্ বেগে উড়ে যায়, যেন ছেলেদের হাতে ঘুরণ্-চাকী!

মাঞ্জেল্-পাহাড় ওই দেখা যায়, হোথা কেহ নাই, কেহই নাই!
ওইখানে ছিল তব্‌রেজ-দলে দুধে-ধোয়া এক চমরী-গাই!
দড়ি-দড়া-খুঁটি উপাড়ি' তুলিয়া চ'লে গেছে কোন্ ভোরের রাতে,
রুটি সেঁকিবার পাথরের টালি ফেলে গেছে শুধু তাঁবুর খাতে!

নীল শিরা যেন ডেরার নিশানা লেগে আছে ওই বালির গায়,
থমামের পাতা ঝ'রে গেছে সব, মুড়া তাল গাছ—হায় রে হায়!
ওগো সুন্দরী সোথাম্-কুমারী—নবারা! আমার নয়ন-তারা!
কোন্ বালিয়াড়ী-গিরির আড়ালে সব জির বাগে হইলে হারা?
উটের দোলনে দুলে' দুলে' কেঁদে হুম্‌ড়িয়া ভেঙে বালির ঢেউ,
কোন্ দূর কালো রাত্রির দেশে চ'লে গেছ তুমি জানে না কেউ!
নিঝুম মরুর কোথা সাড়া নেই, শব্দ মিলায় পায়ের তলে—
তোমারি গোঙানি-ফোঁপানির তালে ঘুন্টি বাজে সে উটের গলে!
বুঝি বা সে-দিন আকাশের জিন্ তুলেছিল নীল তাঁবুর সারি,
পর্দ্দার ফাঁকে হাত-ছানি দেয় দশ আঙুলের ঝিলিক্ মারি'!
হঠাৎ তাদের তলা থেকে যেন আগুনের ধোঁয়া এগিয়ে আসে,
মাথার উপরে মেঘ-শকুনেরা ডানা মেলে যেন হাওয়ায় ভাসে!
মুখখানি গুঁজে' প'ড়েছিলে গিয়ে কোন্ সে কঠিন পাহাড়-পায়—
কত কি যে লেখা ভীষণ আঁখরে রাজাদের নাম তাহার গা'য়!
সেইখানে বুঝি ফুরিয়েছে সব শত্রুর হাত এড়া'তে গিয়ে—
চ'লে গেলে তুমি রাত্রির দেশে ঐ আকাশের কিনারা দিয়ে!

দূরে দেখা যায় ওই যে দেয়াল, মিনার উঠেছে কুয়াসা ফুঁড়ে'—
খাপ-খোলা যেন খাড়া তলোয়ার—আলোটী ঝলিছে তাহার চূড়ে!—
হিন্দার বেটা অমরু হোথায় পেতেছে শহর গোলামখানা,
ওইখান থেকে—বাচ্ছা বাঁদীর—আমাদের' পরে দেয় সে হানা!
মাটির বুরুজ, পাথরের টালি, দুয়ারে শিকল, লোহার বেড়া—
ফাটকে-আটক বাস করে হোথা হাজার হাজার মানুষ-ভেড়া।
ঘরে ঘরে করে দুষমনী ওরা, পিঠে মারে ছুরী পিছন থেকে,
বুকে বল্লম বেঁধেনি কখনো—লড়াই-এর কথা কাগজে লেখে!
কমজাত যত—রক্ত রেখেছে ঠাণ্ডা দেহের পিপের ভ'রে—
এক শরা তার করেনি খরচ, বুড়ো হ'য়ে যায় শুকিয়ে ম'রে!
রং-বেরঙের সাজ করে ওরা, শাদা চোখে হয় সুর্মা টানা,
মজ্‌লিসে ব'সে মিঠে মদ খায়, পিঠে ঠেস দিয়ে তাকিয়াখানা!
রেশম পশম মুক্তার মালা ঘরে ব'সে ওরা সওদা করে,
খুনের বদলে সোণার টাকায় ভোলায় ইমন্-সওদাগরে!
ভোর হ'তে সাঁঝ, সাঁঝ হ'তে ভোর ভন্ ভন্ করে মাছির পারা!
দিল্-তোল্‌পাড় জান্-আন্‌চান্ খুনের সোয়াদ পায় নি তারা!
বান্দামহলে সর্দ্দারী করে হিন্দার বেটা অমরু-রাজা—
আমাদের পায়ে জিঞ্জির দেবে!—শির-দাঁড়া দেখি বেজায় তাজা!

একবার পাই!—দাঁতে টুঁটি কেটে খাল খানা তার ফেলাই ফেড়ে,
হাড়-মাস করি পাখীর খোরাক, মুণ্ডুটা ফেলি বালিতে গেড়ে!

খুনে জ্ব'লে ওঠে বাজের আগুন, সাপটিয়া ধরি ঝড়ের ঝুঁটি,—
আস্‌মান-জোড়া পেয়ালায় মোরা রৌদ্র-শরাব হুপুরে লুটি।
বালির পাথার-কিনারায় ওঠে ঢেউ সে মোদের তাঁবুর সারি,
পলকে মিসায়, কোথা ভেসে যায়—দেখেছে এমন দুনিয়াদারী!
মাটির বাঁধনে বাঁধে না মোদের, পথহারা মরু-পান্থ মোরা—
বালির মালিক!—বুনিয়াদ কোথা? কোনো খানে নেই স্মৃতির ডোরা!
ঘর-বাঁধা আর মন-বাঁধা আর জান্-বাঁধা-রাখা কাহারো কাছে!—
ধিক্ ধিক্ ওরে হিন্দার বেটা! মোর হাতে তোর মৃত্যু আছে!
শম্‌শের? সে ত' মেয়েদের হাতে পাক-দেওয়া কিতা রেশ্‌মী দড়ি!
ঝক্‌ঝকে-মুখ বল্লম? সে ত' ছেলেদের হাতে খেলার ছড়ি!
মরণের ভয় নেই আমাদের, মুর্দ্দার তরে কে শোক করে?
বড় ঘৃণা হয়—মরদ কেহই ম'রে উঠে' ল'ড়ে ফের না মরে!
'নুর' কাজ নেই, 'নার' চাই মোরা—জীবনের সার উত্তেজনা,
ফুঁসে-ওঠা শুধু জ্বল্-জ্বল্-চোখ—এক দম খাড়া সাপের ফণা!
একটী নিমেষে শেষ ক'রে দেওয়া, বোমার মতন কলিজা-ফাটা!
এক চীৎকারে দম ছুটে' যাক্! এক লাফে শেষ রাস্তা-হাঁটা!
চুপ ক'রে থাকা মাটি পানে চেয়ে, একঘেয়ে বাঁচা দিনের দিন—
'আয়লা'র মাঠে সোঁতার মতন শুষে' যায়, শেষে থাকে না চিন্।
বুজ্‌দেল্ যত কম্‌বক্তেরা!—চোরের মতন বাঁচিবি কি রে!
এই হাতে আয় পর্দ্দান নিই, এই ছোরা আয় বসাই শিরে!
বান্দার দল! গর্ব্ব কিসের? আমাদের চেয়ে তোরা না বড়!
বুকের রক্ত মাথায় ওঠে না, শিরাও ফোলে না—কাঁদনে দড়!
পাঁজরে বিঁধিলে বর্শার ফলা—ভেঙ্গে যায় যবে হাড়ের পাশে,
দাঁতে ঠোঁট চেপে রক্ত গড়ায়, তবুও মোদের কান্না আসে!
জোয়ান যে জন শত্রু জিনিয়া বেঁধে নাহি আনে দু'দশ বাঁদী,
রমণী তাহার ধিক্কার দেয়, তাঁবুর দরজা রাখে সে বাঁধি'।
হারিয়া যে জন পলাইয়া আসে লুঠের বখ্‌রা ফেলিয়া দিয়া—
সন্তানে তার আছাড়িয়া মারে, স্তন মুখ হ'তে কাড়িয়া নিয়া!
চোখের ভিতরে কুটার মতন শত্রুর রিষ বুকেতে পোষে,
আপনার হাত ছুরিতে কাটিয়া খুন দেখে লয় অধীর রোষে!
রাত্রে যখন পুরুষেরা ফিরে' মদের পেয়ালা ভরিয়া তোলে,
বীরের জবান শুনিয়া তাদের মাতালের মত দেহটী দোলে!

দুনিয়ার সেরা আওরাত্ এরা—রমণী মোদের, কন্যা, মাতা—
এদের কণ্ঠে শিকলি পরা'বে ? অম্‌রু, তোমার কয়টা মাথা ?

ওই দেখা যায়, চলিয়াছে কারা ওগারা-বনের পথটী ধ'রে,
উটের বহর দুলে' দুলে' চলে বালির উপরে ছায়াটী ক'রে,
নামাল জমির পাড় বেয়ে চলে, কখনো আড়াল, কখনো নীচু—
মালেক, কায়েস্ ওই যে হোথায়—আরও তিন জন নিয়েছে পিছু।
এই ত' আগুন-খেলিবার বেলা, খুনের ওক্ত বাতাসে বাজে,
চরাচরময় তলোয়ার যেন আকাশে ঘুরায়ে কে ওই ভাঁজে !
খুনে-রোদ্দুর দু'চোখে আমার ঠিকরিয়া হানে আলোর ধাঁধাঁ,
ঠেলা দেয় বুকে আগল ভাঙ্গিতে, পাগল রক্ত মানে না বাধা।
ঝিম্ ঝিম্ করে আকাশ-কিনারে অলখ্-সেতার আগুন-গানে—
মায়াবী-মরুর ইব্‌লিশ্ ওই আর না কাহারো শাসন মানে !
দিকে দিকে নাচে তা-থেই তা-থেই, বালু-দেহ ধরি, 'দু'বাহু তুলি,'
এক পায়ে শুধু আঙুলে দাঁড়া'য়ে শিস্ দেয় দেখ ডাহিনে দুলি' !
তখনি আবার লুটাইয়া পড়ে, কিছু খন রহি' পারিল না যে !
সারাটা আকাশ একখানা যেন ঝাঁঝরের মত ঝিমিকি বাজে !

'হুর্ হুর্-হু-উ—' ডাকে দূরে ওই সাথীরা আমায় বর্শা তুলি,'
রক্তে আমার তুফান তুলেছে, বক্ষ আমার উঠিছে ফুলি' !
আগুনের কণা দু'দিকে ছিটায়ে বাতাস ফুঁড়িয়া ছুটেছে ঘোড়া,
মাথার উপরে চাকা ঘুরে' যায়, বোঁও বোঁও করে কাণের গোড়া।
ওরা আসে ওই !—ওই যে হোথায় দাঁড়াইল নামি' বালুর' পরে,
মেয়েরা র'য়েছে উটের উপরে পর্দ্দায়-ঘেরা হাওদা-ঘরে।
'হিরা'য় চলেছে ? নোমানের প্রজা ? গিয়েছিল কোথা বাঁদীর হাটে—
রূপ-জহরতে বোঝাই নিয়েছে, সোণা বেশী আর নেই ক' গাঁটে !
চট্‌পট্ সেরে নাও এই বেলা—আকাশে দেখি যে আঁধির ঘটা !
—হয়রান্ করে আরে বদ্‌জাত্ ! ছিঁড়ে ফেলে দিই মুণ্ড ক'টা !
কেয়াবাত্ ! আরে সাব্বাস্ ভাই !—লড়াই ? বাহবা ! এই ত' চাই !
খুন্-পিচ্‌কিরী চোখে মুখে দাও ! জান্ দাও, জান্ নাও রে ভাই !
খাঁ-খাঁ চারিদিক, ঝাঁ-ঝাঁ ঝিমি-ঝিমি আওয়াজ যেন সে আলোয় বাজে,
চিঁহিঁ-হিঁহিঁ-হিঁহিঁ—চীৎকার, আর হুঙ্কার ঘন তাহারি মাঝে !
আরে এই বার, বাস্ ! বল্লম ঢুকে গেছে কেটে মাথার খুলি—
কাঠের হাতল শিহরিয়া ওঠে, শিড়্ শিড়্ করে আঙুলগুলি !
ফাঁক হ'য়ে গেল মাথার খিলান্, চক্ষু-কোটর রক্তে ভরে,
মুঠা-মুঠা যেন নার্গিস্ ফুল কুটি-কুটি হ'য়ে দু'ধারে ঝরে !

পর্দ্দার ফাঁকে একখানা মুখ পলকে বাড়া'য়ে লুকা'ল ফের,
চোখে জল তার, হাসি মুখ তবু !—এমন তামাসা দেখেছি ঢের !
ছাঁৎ ক'রে তবু খুনের আগুন নিবে' গেল যেন নিমেষ তরে,
চোখ-জ্বালা-করা লাল কুয়াসায় ফিকে জাফ্‌রান-রংটী ধরে !
বাহবা ! অম্‌নি মেরেছে পাঁজরে দুষমন্ ওই জোর্‌সে ছুরী !
ভেঙ্গে গেল সে ত কাঁটার মতন, লাথি খেয়ে নিজে পড়িল ঘুরি'।
ঝুঁটি ধ'রে তার মাথাটী নামা'য়ে লইল মালেক একটী ঘা'য়ে,
ধড়্‌ফড়্ করে ধড়টা শুধুই, ঠোকাঠুকি করে দুইটা পায়ে !

সব শেষ ! আর একটা মরদ খাড়া নেই, সব ভিমি গেছে !
নাও দেখে নাও, জেবে ও থলিতে, ছালার ভিতরে কি সব আছে।
মদের মোশক, চামড়ার শিশি, ডোর-কাটা ওই ঘাঘ্‌রিগুলা !—
ওরে আর নয় ! আঁধির পাহাড় দেখা যায়—ওই উড়েছে ধূলা !
সব পয়মাল—লোকসান ভাই ! দিন যে নিবায় দুপুর-রাতে—
লক্ষ ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে আসে কারা ওই চাবুক হাতে।
শুধু ওরি হাতে নিস্তার নেই, জিন্-সর্দ্দার পাগ্‌লা ও যে,
ওর সাড়া পেয়ে আস্‌মানে ওই দিনের মালিকও আড়াল খোঁজে !
থাক্ প'ড়ে থাক্ উটের বোঝাই, সারি সারি ওই গোলাব-দানি,
পেয়ালা ভরিতে ঘাঘ্‌রি ঘোরাতে বড় মজ্‌বুত—খুব সে জানি !
তবু ফেলে চল্—দেখ্ না দখিনে ডাকাতের দল গ'র্জ্জে আসে !
দাপটে তাদের আলোর ফোয়ারা কালো হ'য়ে যায় ধোঁয়ার রাশে !
ছেড়ে দাও ঘোড়া, রাশ ফেলে দাও, ছুটে যাক্ ওর যেথায় খুশী !
আরে বেল্লিক ! কি হবে এখন হাওয়ার উপরে বৃথায় রুষি' ?
কথা না বলিতে ছুট্ দিল দেখ, জানোয়ার নয়—এরা যে পরী !
বাতাসেরও আগে আগাইয়া যায় বিপদের পানে পিছন করি'।
গলাটী বাড়ানো, সিধা, একরোখা, রক্ত চক্ষু ঠেলিয়া ওঠে—
চার পায়ে বাজে একটী আওয়াজ যেন সে মাটীতে ঠেকে না মোটে !
এইবার এল ! দমকি' দমকি' বালির ধাক্কা ধমক মারে !
একখানি কালো কাফনে ঢাকিল দুনিয়ার মুখ অন্ধকারে !
বাপ্ ! একি জ্বলে ! চোখে মুখে লাগে বালির কণা যে আগুন-দানা !
তারি মাঝে তবু ছোটে দিশাহারা, বাহাদুর দেখ মানে না মানা !
কোন্ পথে যায় কিছু বুঝি না যে, যায় শুধু এই সাড়াটী আছে !
আর সবাকার হাল কি যে হ'ল !—কত দূরে তারা রহিল পাছে !
আঁধির জোয়ার থেমে গিয়ে শেষে একাকার হ'ল রাত্রি দিবা—
আকাশের কানা ছাপায়ে এখন থির হ'য়ে দেখ রয়েছে কিবা !

থেমে যায় কেন হঠাৎ এখানে? দম হারাল কি—লুটাবে ভুঁয়ে?
ঘাড়-বুক এ যে ফেনায় ভ'রেছে! এখনি সটান্ পড়ে বা শুয়ে!
জিতা রও বেটা! মেরি জান্ ওহো! বুক রাখ্ তুই আমার বুকে,
আর কোথা নয়, এক পাও নয়! নহিলে আবার পড়িবি ধুঁকে'!
ঘোর কেটে যায়, আঁধিও ফুরায়, এইবার বুঝি ফর্সা হয়?
সর্-সর্ ক'রে পাতার উপরে বাতাস যেন না হোথায় বয়?
শুক্‌নো ডালের খড়্ খড়্ আর পাখীর পাখার শব্দ ও যে!
—ওরে শয়তান! সারা ময়দান ছুটেছিলি বটে ইহারি খোঁজে!
ওই দেখা যায় ওশারের সারি, খেজুরের বন ওই যে হোথা,
এ যে দেখি সেই ওগারা-বাগান—এমন ছায়াটী নেই যে কোথা!
কালো পশমের বোর্‌কা ছিঁড়িয়া দেখা দিল মোর সব্‌জা ছরী,
নাকে-মুখে মোর পিয়ালা পিয়ায়, পুরাণো সে গান হাওয়ায় পুরি'!
আয়, দুইজনে মুখ দেই জলে, পান করি ওই পিয়াস-পানি,
ঝর্ণা-ঝরা ও 'দারাত্-জুলে'র খুব চিনি নীল আয়নাখানি!
এইখানে এলে ঘুম্ ঘুম্ করে, দেহখানা যেন এলিয়ে যায়!
আগেকার কথা সব মনে পড়ে, কে যেন কোথায় লুকিয়ে চায়!
না না, মনে হয় এখনি ছুটিয়া ফের বুকে কা'রো বসাই ছুরি,
ছায়া-শরবৎ লাগে না যে মিঠা, গন্ধটুকুন্ গিয়েছে চুরি।
সেই মুখ, আর সেই চোক, আর চাউনি সে তার ভুল্‌ব না যে—
বাচ্ছার পানে হরিণীর মত ফিরে-ফিরে চাওয়া পথের মাঝে!
এই বনে ঠিক ওই খানটীতে জলের কিনারে প্রথম দেখা,
হয়রাণ হ'য়ে কেড়ে নিয়ে শেষে কত দূর ছুটে গেছিনু একা!
বুক ছিঁড়ে ফের কেড়ে নিয়ে গেল দুষ্‌মন্—তা'র তালাস করি,
এই ছোরা তার ছাতিতে বসাব! শান্ দিই দশ বছর ধরি'!
বুড়া হই—তবু মরিবার আগে একবার যদি ভাগ্যে জুটে,
সারাটা জোয়ান-বয়স আমার ছুরীর মুঠাতে আসিবে ছুটে'!
অনেক দেখেছি, অনেক খেলেছি আওরাত্ নিয়ে দিলের খেলা—
বর্শার চেয়ে ভর্সা-হারাণো চোট্ পেয়েছিনু তাহারি বেলা!
তারি মুখখানি মনে ক'রে আমি গান বেঁধেছিনু দিওয়ানা হ'য়ে,
তেমন ব্যথা যে পাইনি কোথাও! ছুরি-ছোরা? সে-ত গেছেই স'য়ে!
বড় ঘুম পায়, সেই গান গেয়ে ঘুমাই খানিক ঠাণ্ডা ঘাসে,
'দারাত্-জুলে'র নামে গাঁথা সেই সুরটী পরাণ ছাইয়া আসে!

গান।

ঠোঁটের কুঁড়ি সিরিঙ্গা-ফুল, চোখের দু'কোণ রাঙা,
দড়ির মতন মিহিন্ মাজা, হাঁসি ডালিম-ভাঙা!

রংটী যে তার খেজুর-মেতি চাইতে চমৎকার,
তাঁবুর-ডেরায়-আগুন-দেওয়া রূপের জলুস্ তার!
চম্‌কে ফিরে চাইলে পরে
রাতের আলো দিনেই ঝরে!
মুখের হাওয়ায় সুবাস হারায় ইরাক্-দেশের গুল্!
চুমার সোয়াদ—হায় রে, সে যে তুহার জলের তুল!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত্ জুল্-জুল্!

উটপাখী তার ডিম-জোড়া কি লুকিয়েছে ওই বুকে?
নাচ্‌তে গেলে পলার মালা দুই দিকে যায় ঠুকে
কাঁধ বেয়ে সে খেজুর-কাঁদি—মেহেদী-রং চুল
কোমর-বাঁধন পেরিয়ে যে যায় পিয়াসে আকুল!
ধ'রলে কাঁকাল মুখ সে ফেরায়,
বাপের চেয়ে ভাইকে ডরায়,
কইতে কথা থম্‌কে থামে বোল্-বলা বুল্-বুল্,
গলার আওয়াজ ঠিক যেন সে তোমারি কুল্-কুস্!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত্-জুল্-জুস্!

গাল দু'খানি টুক্‌টুকে হয় যখন শরাব পিয়ে,
বড় নরম নজর যখন আধেক বুঁজে গিয়ে,—
খসরু তখন খেয়াল হারায়, দব্ দবিয়ে রগ্
নেশার আগুন ভেল্কি লাগায়, দিল্ করে ডগ্-মগ্!
সবার মাঝে লাফিয়ে প'ড়ে
ছিনিয়ে নে' যাই ঘোড়ায় চ'ড়ে,
পিঠে যখন বর্শা হানে—বুকে জড়াই ফুল!
তুহার পানেও চাই নে ফিরে'—এম্‌নি সে হয় ভুল!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত্ জুল্ জুল্!

ঘুম ভেঙে যায়, ওকি ও হোথায়—আঁধারে কে দেয় মশাল জ্বালি'!
রূপালি জলের ঝাপ্‌টায় ধুয়ে সাজায় আকাশে তারার ডালি!
রাত হ'য়ে গেছে, হাওয়ারা আবার থেকে থেকে সব ঘুমিয়ে পড়ে,
ধূ ধূ চারিধার! শাদায়-কালোয় ঢেউ তুলে' যেন বাতাসে নড়ে!
কালি-ঝুল-ভরা খেজুরের ডাল, পিছনে সোনার মদের বাটী,
নীল শামিয়ানা উপরে দুলিছে, নীচে বালি-মোড়া দরাজ পাটী!
পরীদের রাণী ঘুম থেকে উঠে' খোলা পেশোয়াজ্ পরে না আর,
আস্‌মান্-গাঙে সিধা ঝাঁপ দেয়, দেখ না কেমন হ'তেছে পার!

স্বপনের মত শরাবের নেশা বিলাইছে দেখ আলোর সাকী !
সারা দুনিয়াটা গুল্‌জার করে, বুঁদ হ'য়ে যায় বনের পাখী।
এত আলো, তবু চোখে বেশী লাগে ছায়াটী—কেমন প'ড়েছে ঘাসে !
এত ঘন আর এত কালো, সে যে দোসরের মত র'য়েছে পাশে !
দূরে মাঝে মাঝে ঢালু বালুচর চক্‌-চক্‌ করে জলের মত,
পিপাসায় ভুলে ঘুরে উড়ে যায় ডানা ঝেড়ে ওই পাখীরা কত !
এত রাতে আর কাজ নেই মিছে কত দূর সেই তাঁবুতে ফিরে,'
ঘোড়া হুঁশিয়ার, কাণ খাড়া রেখে চরিবে হেথায় আমারে ঘিরে'।

রাতের চেরাগ্‌ নিবে গেলে হ'বে এই ময়দানে আরেক খেলা,
হুতাশী হাওয়ায় সওয়ার হ'য়ে ছুটিবে কাহারা নিশীথ বেলা।
ম'রে গিয়ে তবু গোরের আঁধারে ঘুম নাহি যায়, বেড়ায় রুখে—
দীঘল বর্শা আকাশে হানিয়া রক্ত ছুটায় তারার মুখে !
হুস্‌ হাস্‌ ক'রে কালো কালো ছায়া পলক ফেলিতে নিরুদ্দেশ।
জীবনে যাহারা বাঁচিতে জানেনি, মরাও তাদের হয়নি শেষ।
সাঁচ্চা জবান, জোয়ানের বাহু, বল্লম আর ঘোড়ার রাশ,
দুষমন্‌-লোহু, দোস্তি-শরাব আর খুলে-রাখা থলির ফাঁস,—
এই সব নিয়ে খোশ্‌নাম যার রটেনি কখনো আপন দলে,
বুজ্‌দেল আর কমজোরী হ'য়ে লুটিল না কিছু আকাশ-তলে,
হাল দেখ তার—হাওয়ায় ছায়ায় হায় হায় করে, ঘুম যে নাই !
মরদ্‌ না হ'য়ে মুর্দ্দা হ'য়ে সে সারা ময়দান ঘুরিবে তাই !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।
মোসলেম ভারত, ভাদ্র ১৩২৮।

প্রত্যাবর্ত্তন

নবম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে অরুণের পরীক্ষার ফল বাহির হইল। কাগজে দেখা গেল, সে পনেরো টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। গ্রামের পাঠ এইখানে তাহার শেষ হইল। এইবার তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। পাশের খবর শুনিয়া হিমু প্রথমে খুব খুসী হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিল—তুলসী-তলায় মাটী খুঁড়িয়া তিন-মাস-পূর্ব্বে-পোঁতা পয়সাটি উদ্ধার করিয়া বাতাসা আনাইয়া হরির লুট দিল, তারপর অরুণের বিদেশ-যাত্রার কথা শুনিয়া মুখ ভার করিয়া কথা বন্ধ করিল, আড়ি দিল, পরে "ভাব" স্মরণ করিয়া ভাব করিতেও বিলম্ব হইল না। অনুনয় করিয়া সে কহিল, "কি-ই হবে খালি খালি অত পড়ে! তুমি এই

খানে পাঠশালাটালা কিছু করো না বাবু। যেতে হবে না তোমায় কোথাও।"

অরুণ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "পুরুষ মানুষ মূর্খ হয়ে থাক্‌ব? লেখা-পড়া না শিখ্‌লে খাবই বা কি,—তাও ত চাই।"

হিমু এবার কল-ঝঙ্কারে কহিল, "বেশ ত বিদ্যে তোমার। লেখাপড়া শেখনি বই কি! অত ত গাদা গাদা শিখেচ। মুখ্যু হলেই হোল কি না! না বাবু, তোমাদের এ জঙ্গুলে দেশে আমি কক্ষনো একলা থাক্‌তে পার্‌ব না—তা তোমায় কিন্তু পষ্টই বলে দিচ্চি।"

অরুণ হাসিল, কোন উত্তর দিল না। হিমু যে এতদিন সহরের নিন্দা করিয়া এই "জঙ্গুলে" দেশেরই স্তুতি গাহিয়া আসিয়াছে! এখানকার মেয়েদের স্বাধীনতার অর্থাৎ যথেচ্ছাচার-ভ্রমণের সুযোগের সুখ্যাতি করিয়াছে! সে সব অতীত কথা স্মরণ করাইয়া অরুণ কিন্তু এতটুকু কলহের সৃষ্টি করিল না। অরুণের অভাব-বোধ বালিকাকে কতখানি অসহায় করিয়া তুলিতেছে, এইটুকু বুঝিয়াই সে তাহার বেদনার মধ্যেও একটু বিমল আনন্দ অনুভব করিল। তাহার জন্য ভাবিবার, তাহার অভাব অনুভব করিবারও তবে এ সংসারে কেহ কোথাও রহিল!

হিমুর স্পষ্ট কথা সত্ত্বেও অরুণকে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। তাহার পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইলে আলোক-নাথকে অব্যাহতি দিয়া সে তাঁহার সাহায্য-গ্রহণ ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে না বলিয়া জানাইয়াছিল। সর্ব্বস্ব যে ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহার আর এ মুষ্টি ভিক্ষার প্রয়োজন কি! বাহিরে রাজধানীর বক্ষে সে কাজ জুটাইয়া লইবে। যেমন করিয়া তাহার ন্যায় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারও সেইরূপ হইবে। কাজ কি আর পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা!

যাত্রা-কালে সে মুক্তাঠাকুরাণী ও মালতীকে প্রণাম করিলে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে পত্র দিতে অনুরোধ করিলেন। মালতী দেবী তাহাকে ছুটির সময় এখানে আসিবার কথা বলিলে, অরুণের দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল। মুখে সম্মতি জানাইতে না পারিয়া সে তাই মাথা হেলাইয়াই স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। হিমু তাহাকে মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "এসো অরুণদা। ছুটি হলেই কিন্তু এসো তুমি, একদিনও সেখানে দেরী করতে পাবে না, তা কিন্তু বলে দিচ্চি। পাশ হয়েছেন বলে বাবুর আর কথা শোনাই হোল না,বল্লুম,যেয়ো না—তা হোল না—!" অরুণ হিমুর মাতার উদ্দেশে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিল, "আস্‌ব বই কি হিমু। মাকে বলো,—তাঁদের কাছ ছেড়ে ছুটি কাটাবার জায়গাও ত আমার নেই আর কোথাও—।"

আজ প্রথম হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সে তাহার অন্তরের প্রবল দৈন্য বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সে যে কত দীন—সে কথা জগতের কাছে প্রকাশ করিতেও সে অসমর্থ। মানুষের ক্ষত যেখানে গভীর, স্বভাবতঃই সে সেখানে সতর্ক। আপনার অজ্ঞাত জীবন-রহস্যের গভীর বেদনা তাই বুকের ক্ষতের মতই সে গোপনে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। সমবেদনার "আহা"টুকু

সহিবার শক্তিও যেন তাহার কুলাইত না। সেখানে হিমুরও প্রবেশাধিকার ছিল না। অরুণের বাহিরের সদানন্দ ভাব দেখিয়া সকলেই প্রতারিত হইয়া মনে করিত, বুঝি অতীত জীবনের ন্যায় তাহার চিন্তাকেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। হিমু তাহার অশ্রুবদ্ধ গাঢ়স্বরে ব্যথিত হইল। তাছাড়া নিজের চোখের জল সাম্‌লাইতেই সে তখন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় অরুণের কথার মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাই সেবিষয়ে কোন তর্কও সে তুলিল না। দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া মালতী দেবীও বারবার আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, যদি উপায় থাকিত! হা ভগবান, এমন জিনিষ, এমন লোভের ধন হাতে পাইয়াও হারাইতে হয়! সমাজ ত ইন্দ্রনাথের দেওয়া ব্রাহ্মণের অধিকার তাহার কাড়িয়া লয় নাই। শুধু গোত্র পদবীর দাবী? সংসারে সেই কি সব! একমাত্র মেয়ের মুখ চাহিয়া এই গোত্রের দাবী তিনিও কি ছাড়িতে পারিবেন না? মালতী দেবীর মাতৃ-স্নেহ কহিল, এখনি তিনি তাহা ছাড়িতে পারেন। কিন্তু হিন্দু কন্যার সংস্কার কহিল, সে হয় না! তা যদি সম্ভব হইত তবে অরুণ কেন—যে কোন জাতি হইতেই উপযুক্ত পাত্র বাছিয়া লইলে হয়ত অর্থাভাবে তাঁহার সুন্দরী মেয়ের বিবাহের ভাবনা ভাবিতে হইত না। সমাজের বিরুদ্ধে একটু যুদ্ধ-ঘোষণার শক্তি তাঁহার ন্যায় অনাথার কি সম্ভব? না, তাই উচিত? অপ্রাপ্য ভাল জিনিষটিতে লোভ করিতে গেলে চলিবে কেন?

দশম পরিচ্ছেদ

জনারণ্য মহানগরীর মাঝখানে পড়িয়া অরুণ প্রথমটা যেন দিশাহারা হইল। এত বড় সহর, এত গাড়ী-ঘোড়া, মোটর-ট্রাম—এ-সব তাহার কল্পনারও অতীত, অভাবনীয় ব্যাপার! এই অট্টালিকা-সমুদ্রের মধ্যে বাসস্থান খুঁজিয়া লওয়া তাহার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে কেমন করিয়া যে সম্ভব হইতে পারে, সে যেন তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিল না। তাহার স্কুলের সহপাঠী ইন্দুভূষণের সাহায্যেই সে এখানে অভিজ্ঞতা-লাভের ভরসা রাখিয়াছিল। কার্য্যকালে দেখা গেল, ব্যাপারটা যত কঠিন মনে হইয়াছিল—আসলে সেরূপ নয়। বরং পল্লীগ্রাম অপেক্ষা এ সকল বিষয়ে এখানে সুবিধাই বেশী। কেবল প্রকাণ্ড অসুবিধা একটা ছিল, সেটা পয়সার। এখানে সুবিধায় সবই মেলে তবে বড় বেশী মূল্য দিতে হয়! ভরসার মধ্যে ত তাহার জলপানির পনেরোটি মাত্র টাকা! ইহার উপর নির্ভর করিয়াই সে এই ব্যয়-বহুল উচ্চ শিক্ষালাভের আশায় দেশ ছাড়িয়া অজানিত স্থলে আসিয়াছে। লোকে হয়ত তাহার এই দেশ ছাড়ার কথা শুনিলে হাসিবে! কিন্তু যে দেশে হিমু বাস করে,—যেখানকার পথের ধূলা ইন্দ্রনাথের পদ-স্পর্শে পবিত্র হইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রতি ভালবাসা যে অরুণের প্রতি শোণিত-বিন্দুর সহিত মিশাইয়া রহিয়াছে! তিনি যদি তাহার জননী জন্মভূমি নাও হন, তবু যে অরুণের জীবন-মরুর শান্তি-নিকেতন,—তাহার প্রার্থনার

কাম্য ভূমি,—সে কথা ত সে অস্বীকার করিতে পারিবে না। উৎসাহহীন ভবিষ্যতের পানে চাহিয়াও তাই সে আনন্দোজ্জ্বল অতীতকেই স্মরণ করিতে থাকে।

ব্যাপার সেই চির-পুরাতন। উচ্চ শিক্ষার আশায় পূর্ব্ববর্ত্তী দরিদ্র সন্তানেরাও সকল দুঃখ সহিয়া যে ভাবে দিন কাটাইয়া গিয়াছে, অরুণের জন্য ভাগ্য তাহার কিছু ব্যতিক্রম করে নাই। তবু ইহাতেও বুঝি বিশেষত্ব বা নূতনত্ব কিছু ছিল। যাহারা জীবন-যুদ্ধে জয়-লাভের আশায় বিদেশে আসিয়াছে, তাহারা দেশ, আত্মীয়-স্বজন, গৃহ, ভূমি কিছু না কিছু ফেলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অরুণের পিছনে তাকাইবারও কিছু নাই!

কলিকাতার একটি ছাত্রাবাসের অপেক্ষা-কৃত অল্পমূল্যের একতলার একখানি ঘরে সে তাহার নূতন জীবন প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাতে বৈচিত্র্য ছিল না, আনন্দ ছিল না। তবু সে তাহার ধ্রুব লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য পূরা মাত্রায় পালন করিতে প্রস্তুত হইল। সময় সময় মনে হইত, পরীক্ষা-সাগর পার হইয়া সে তাহার জীবন-তরণীখানি কোন অনির্দ্দেশ উপকূলে ভিড়াইবে। আবার ভাবিতে বসিলে ভাবনার কূলও পাওয়া যাইত না। তাই এ অনির্দ্দেশের ভাবনাকে সে বিভিন্ন চিন্তায় ডুবাইয়া রাখিত। ঘরখানি একতলায়—বায়ু ও আলোর অভাব সেখানে অনুমিত হইত প্রচুর। স্যাঁৎ-সেঁতে মেঝে। তবু ইহার ভাড়া কম ও একটি মাত্র "সিট্" বলিয়া নির্জ্জনতাপ্রিয় অরুণ এই ঘরখানিই পছন্দ করিয়াছিল। পুরাতন তক্তাপোষের উপর সে তাহার কম্বল ও চাদরখানি বিছাইয়া পরিচ্ছন্ন শয্যাটি বিছাইয়া অনেক সময় তাহার উপর চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, আর বর্ত্তমানের ভাবনা ভাবিত।

আজ্‌ও সে সেই কথাই ভাবিতেছিল। ঘরের ভাড়া, খাবার খরচ, কলেজের বেতন জমা দিয়া কেমন করিয়া যে সে তাহার প্রয়োজনীয় বইগুলির জোগাড় করিবে, তাহাই সে ভাবিতেছিল! আসিবার সময় মুক্তাঠাকুরাণী তাহাকে বই কিনিবার জন্য কুড়িটি টাকা দিয়াছিলেন। তাহাতে কতটুকু অভাবই বা মিটিবে? তবু স্নেহময়ীর স্নেহের দানটি সে নিতান্ত অনিচ্ছায় কুণ্ঠিত হস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সত্যই যে তাহার বড় অভাব! আর এও যে তাহার প্রতি অযাচিত করুণা, ইহার কোনটাই ত এমন অবস্থায় তাহার ত্যজ্য নহে!

তখন ভরসার মধ্যে ইন্দ্রনাথের দেওয়া তাহার পৈতার সময়ের মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী আর তাহার জন্ম রহস্যের শেষ নিদর্শন একখানি সুবর্ণ পদক। এ ছাড়া নিজের বলিতে এমন কিছুই ছিল না, যাহা বিক্রয় করিয়া উপস্থিত অভাবের কথঞ্চিৎ দায়ও সে মিটাইতে পারে! হীরকাঙ্গুরীর মূল্য সে জানে না, হয়ত বেচিতে গিয়া ঠকিয়া আসিবে। অথবা চোরাই মাল বলিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িবে—দুইটাই ঘটা সম্ভব! এখানকার অবস্থা-ব্যবস্থা কিছুই ত তাহার জানা নাই। অরুণ দেখিয়াছে, প্রাইভেট টিউসনী করিয়া অনেক ছেলেই নিজের বাসা-খরচ চালাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার জন্যও সুপারিশ চাই। কে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া গৃহ-শিক্ষকের পদ দিবে! তাহার পরিচিত "আত্মীয়-বন্ধু

কেহই নাই। ইন্দুভূষণ নিজেই একজন উমেদার,—তাহার নিকট সাহায্য পাইবারই বা আশা কোথায়? তাই কেমন করিয়া সে তাহার দারুণ অভাবের বোঝা সে কোথায় নামাইবে বিষণ্ণ চিত্তে তাহাই ভাবিতেছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

পল্লী-সমাজ সংস্কার *

রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না রেখে পল্লী-সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া এখন সঙ্গত, আমি এমন কথা বলেছিলুম বলে' কোনো কোনো বন্ধু কৈফিয়ত তলব করেছেন। এই বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্।

যেখানে আমাদের জীবনী-শক্তির মূল একেবারে অসাড় হ'য়ে আছে, সেখানে শক্তি সঞ্চার করতে হবে। এই হ'ল সকল চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের লোকের চিত্ত উদ্বুদ্ধ করা চাই; তা' না হ'লে শক্তির সঞ্চার হবে কেমন ক'রে? পল্লী-সমাজ যাদের নিয়ে গড়তে হবে তাদের চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলাই হচ্চে প্রধান কাজ; পল্লীকে সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে শ্রীমণ্ডিত যদি করতে চাই তবে এই কাজে মন দিতে হবে।

এ-কাজটা হচ্চে সৃজনের কাজ। সৃষ্টি হচ্চে Positive অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশ এর ধর্ম্ম। এইজন্য সৃষ্টির কাজে সব জিনিষকে গ্রহণ করতে হয়।

কোনো প্রকার উত্তেজনা যদি মনকে অধিকার করে' বসে তবে সৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটেই; কেন না মানুষের চিত্ত তখন জীবনের গভীর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বাইরের কোনো আশ্রয়কে অবলম্বন করতে চায়। এমন অবস্থায় কোনো সমস্যাই তলিয়ে দেখবার অন্তর্দৃষ্টি আর থাকে না। ভাসা-ভাসা যা' কিছু দেখ্‌তে পায়, তারই উপর তখন নির্ভর; আশু ফল পাবার লোভে পথ ও পাথেয় খোঁজা তখন তার সব চেয়ে জরুরী কর্ত্তব্য হয়ে ওঠে। সে কল্পনা করে যে যদি কোনো বিশেষ একটা পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে, যদি বাইরের কোনো ব্যবস্থা পাওয়া যায়, তা হলেই সমস্ত জাতির কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু কল্যাণ ত বাইরের জিনিষ নয়। অতএব কেবলমাত্র বাইরের আয়োজনে কল্যাণ নাই। চাই অন্তর্দৃষ্টি; চাই জাতীয়-জীবনে প্রবুদ্ধ চৈতন্য। আজ আমাদের এমন দুর্দ্দশা কেন,—তার প্রধান কারণ ইংরেজের শাসন ও বিদেশীয় বণিকদের অর্থ-শোষণ নয়। আমরা সত্যকে হারিয়ে সমস্ত জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছি—আর যে-দিন থেকে এ জাতি লক্ষ্যহারা হ'ল তখনই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, কাজের দোহাই দিয়ে অপকাজ, সমস্ত সমাজের

* [২৭শে আগষ্ট, রবিবার কর্ম্মি-সঙ্ঘের বৈঠকে পঠিত]

স্তরে স্তরে এত আবর্জ্জনা স্তূপাকার করে' জমিয়ে গেল যে জাতীয় জীবন আজ তার পথ খুঁজে পাচ্চে না। আমাদের মন সংকীর্ণ, বুদ্ধি অসাড় ও শক্তি ক্ষীণ হয়ে উঠেছে কেন আপনারা এ-বিষয়ে চিন্তা করুন। আজ আমরা শক্তির উৎস খুঁজ্‌তে গিয়ে হাত্‌ড়ে মরছি; আজ আমরা কাঙ্গাল,—পৃথিবীর অস্পৃশ্য জাতি! এ-দৈন্য-দশা ঘট্‌ল কেন? আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরটা দুর্ব্বল, নির্জ্জীব ও আত্ম-অবিশ্বাসী হয়ে আছে ব'লে নয় কি?

বাইরের দৈন্য আমাদের অন্তরের দৈন্যকেই প্রকাশ করে। যে পরিমাণে আমরা অন্তরের দারিদ্র্য ঘুচাতে পারব সেই পরিমাণেই আমাদের অভীষ্ট পথ মুক্ত হবে। যাকে আমরা সভ্যতা বলি তা' কোনো জাতির বিশেষ প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র—অতএব সেই প্রকাশ যদি কুশ্রী হয় তবে এ-কথা মান্‌তেই হবে যে, জাতীয়-জীবনের অন্দর-মহলে কোথাও নিশ্চয়ই শ্রী-হীন ব্যবস্থা রয়ে গেছে। শুনেছি জাপানীদের ঘর-দুয়ার খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; গ্রামগুলি দেখ্‌তে সুন্দর। আর রাস্তা-ঘাট ঘর-বাড়ীর পারিপাট্য আছে। এর কারণ শুধু এই নয় যে, জাপানীদের ঘরে টাকাকড়ি আছে; জাপানীরা স্বভাবতই সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাদের জীবনের অন্দর মহলে সৌন্দর্য্যের ভাব বর্ত্তমান আছে বলেই এদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রায় ব্যবস্থার পারিপাট্যের ত্রুটী নেই। জর্ম্মানির জাতীয় জীবন সাধনা করেছিল militarism—তাই তার সকল ব্যবস্থা এরই শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

আজ আমরা স্বরাজ চাই। কার কাছ থেকে চাই? দেবার মালিক কে? যদি বলি, স্বরাজ বাইরের একটা দান-সামগ্রী, আমরা সেই দান পাবার জন্যে হাত পেতেছি, তা'হলে আমার মতে সে স্বরাজে কোনো প্রয়োজন নেই। স্বরাজ কেউ দিতেও পারে না, নিতেও পারে না। আমরা জাতীয়-জীবনে যে-সাধনা করব, জীর্ণ-ভিতের উপর যে-আদর্শে পাকা গাঁথনি তুল্‌ব, তাই হবে আমাদের স্বরাজ।

আমাদের নিজেদের হাতে গড়ে তুলতে হবে বলেই পল্লী-সংস্কারের কাজকে আমি সৃজনের কাজ বলে মনে করি। কোন্ আদর্শে গড়ব, তার উপলব্ধি হবে অন্তরে ও সেই উপলব্ধি রূপ ধরে বিকশিত হয়ে উঠবে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে।

অতএব আমাদের চিন্তা ও ভাব কোনো উত্তেজনার দুরন্ত ঝঞ্ঝাবাতে যদি তার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। এই জন্যই আমি বলেছিলাম যাঁরা পাকা ভিত্তি গাঁথ্‌বার কাজে মন দিতে চান্, যাঁদের কাজ কিছু গড়ে-তোলা, রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ না রাখাই কল্যাণকর। আয়র্ল্যাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে কবি এই বলেছেন:—

"Our excited controversies, our playing at militarism, have tended to bring men's thoughts from central depths to surfaces. Life is drawn to its frontiers away from its spiritual base, and behind the surface we have little to fall back on."

ভাবার্থ :—"রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে তর্কবিতর্কের উত্তেজনা, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে লড়বার এই আস্ফালন, এতে মানুষের চিত্তকে গভীর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাইরের দিকে নিয়ে আসে। জীবন আধ্যাত্মিক মূল থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লে বাইরের আশ্রয়ের উপর নির্ভর করা চলে না।"

দ্বিতীয় কারণ হচ্চে :—রাজনৈতিক অন্দোলনের গতি এমন আকার ধারণ করে যে, তাতে কেবলই উত্তাপের সৃষ্টি হতে থাকে। কাগজে-কলমে বিধিব্যবস্থায় যাই জাহির করি না কেন, দাবী-দাওয়া নিয়ে ক্রোধের উৎপত্তি হবেই। একবার ক্রোধের উত্তেজনা আমাদের মনকে অধিকার করলে আমরা একেবারে দৃষ্টিহারা হয়ে পড়ব। তখন জাতীয় জীবনের সমস্যার সত্যমূর্ত্তি চোখের আড়ালে পড়ে যাবে; মনে হবে কোনো উপায়ে ক্ষুধিত, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, শক্তিহীন, অশিক্ষিত দেশবাসীর ঘাড়ের উপর পড়ে' তাদের জাগাবার চেষ্টা করাই সব চেয়ে বড় কাজ।

কিন্তু মুক্তির সাধনা এমন করে' হয় না। সৃষ্টির কাজে ত মেকী মাল চলে না, সে মালের আধিভৌতিক গুণ থাকলেও না। আমরা পল্লী-সংস্কারের কাজ হাতে নিয়ে কি দেখ্‌ছি? দেখ্‌ছি নানা রোগে পল্লীর পনর আনাই রুগ্ন; তাই সংক্রামক ব্যাধি একবার লাগ্‌লে আর রক্ষা নাই। কত ভিটে উচ্ছন্ন গেছে ও যাচ্চে। বন-জঙ্গল, পানাপুকুরে গ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট করচে, কিন্তু সে কথা জেনেও কোনো প্রতীকার করা যাচ্চে না। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কৃষকেরা ধান চাল কলাই যা' জন্মায় সহরের ব্যাপারী ও গ্রামের মহাজনের হাতে তা' তুলে দিতে হয় দেনার দায়ে। তারপর ঐ ধানচালই কৃষককে মাড়োয়ারীর গোলা থেকে বেশী দাম দিয়ে কিনে খেতে হয়! এ-ছাড়া আরো কত উৎপাত উপদ্রব আছে তার সীমা নেই। পুরোহিত থেকে পুলিস সকলেই পল্লীবাসীর শত্রু, এ-কথা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন?

তাই আমাদের প্রথম কাজ, আত্মস্থ হয়ে এই দুরূহ সমস্যার সত্য-মীমাংসার পথ আবিষ্কার করা। দেশের পনর আনা লোক যারা পল্লী-সমাজে বাস করে, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে, আর যে-অনুপ্রেরণা নিয়ে জাতীয়-জীবনের উদ্বোধন করা চাই, তাদের চিত্তে সে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। এই হ'ল ভিত্তি। এখানে দৃষ্টি না দিলে পথ খুঁজতে খুঁজতেই আমরা পৃথিবী থেকে লোপ পাব। ক্রোধাবিষ্ট হ'লে আমরা সত্যদৃষ্টি হারাব এইজন্যই আমি মনে করি, পল্লী-সংস্কারের কাজে যাঁরা ব্রতী হবেন তাঁদের পলিটিক্যাল্ রেষারেষির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা শ্রেয়।

তৃতীয় কারণ :—রাজ-শক্তির সহিত সংঘর্ষণে একদিকে কাজ ব্যর্থ হয়, আর এক-দিকে অশিক্ষিত জন-সাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। সেবারে লর্ড কার্জ্জনের শাসনের ধাক্কা খেয়ে যখন আমাদের মন একটু সতেজ হয়ে উঠেছিল, তখনও আমরা গ্রামের দিকে ছুটেছিলুম। জীর্ণ পল্লীগুল'কে নতুন করে' গড়ব এ উদ্দেশ্যটা খুব স্পষ্ট ছিল না—ছিল দেশের কথা সকলকে জানাব এই সংকল্প। রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তর্গত নানা সভা-

সমিতির তক্‌মা পরে' আমরা এ-কাজে নেমেছিলুম। তার পর সিয়াইডির উপদ্রব সুরু হ'ল; যাঁরা নেতা হ'য়ে দেশকে উত্তেজিত করলেন তাঁরা ত মিণ্টো-মর্লি-রিফর্ম পেয়ে খুসি, আর সমস্ত দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত বয়ে গেল তরুণ বাঙ্গালীর উপর দিয়ে। যাঁরা তখন প্রাণ বিসর্জ্জন করলেন বা নির্ব্বাসিত হলেন, তাঁদের সেই দৃষ্টান্তে-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নির্জ্জীব প্রাণে কিছু জীবনী-শক্তির সঞ্চার হ'ল বটে, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা হ'তে বঞ্চিত দেশবাসী মনে করল, রাজার সঙ্গে লড়তে গিয়ে "ছেলে বাবুরা" হার মেনেছে। অতএব পুলিসের দারোগাবাবুকে সে আরো ভয় ক'রে চলে; তার পর "ছেলে-বাবু"দের পরিচালিত জাতীয়-বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হ'তে বিলম্ব হ'ল না।

তাই আমার মনে হয়, এবার পল্লী-সংস্কারের কাজে যাঁরা হাতে দিয়েছেন তাঁরা কোনো পলিটিক্যাল্ সভা-সমিতির তক্‌মা বুকে না পরে' খাঁটি জিনিস গড়ে তুল্‌বার দিকে মন দিন্। চরকা-প্রচলন করতে গিয়ে দেখেছি অনেকে চরকা ঘরে তুল্‌তে ভয় পায়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, "চরকা হচ্চে স্বরাজের প্রতিমূর্ত্তি।" আমি চরকার সঙ্গে অসহযোগিতা বা জালানওলাবাগের দুর্ঘটনা বা খিলাফত এমন কি স্বরাজেরও নাম জড়াতে চাইনে। যথেষ্ট সূতা দেশে তৈরি হয় না অথচ এই গরীব দেশে অধিকাংশ গৃহস্থ যদি সূতা কাটে তবে অনেক সূতা পাওয়া যাবে। বড় বড় মিল চালাবার টাকা হয় ত আমাদের নেই; তা' ছাড়া যদি উচ্চ শিল্প (cottage industry) স্থাপন করে' আমাদের প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারি তাহ'লে যথার্থ কল্যাণ হয়। চরকার সূতা দিয়ে বোনা কাপড় একটু মোটা হবে—তা হোক্, দেশের লোকের পক্ষে তাতে ক্ষতি নেই। তাই আমরা প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে চরকা চালাবার ব্যবস্থা করে' দেব; তাঁতিদের ডেকে তাঁত বসাব; বাইরে থেকে যা'তে কাপড় কিন্‌তে না হয় এমন আয়োজন করব। তারপর, তুলার চাষ হ'তে পারে এমন জমি নির্ব্বাচন করে' ভাল বীজ আনিয়ে দেব। প্রত্যেক পল্লী খাওয়া-পরার জন্য সম্পূর্ণভাবে আর কারো উপর নির্ভর করবে না এই আদর্শ মনে রেখে আমরা পল্লীর আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করব।

চতুর্থ কারণ :—যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক তাঁরা পল্লী-সংস্কারের কাজে কোনো পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিতে পারেননি। ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে ছেলের দল বেরিয়ে এসে যখন কাজ চাইল, কর্ত্তা বল্‌লেন "village organisation" করতে হবে। উত্তম প্রস্তাব,—ছেলের দল রাজি হ'ল। তারপর কংগ্রেস-কমিটি থেকে পল্লী-সংস্কার করবার যে কার্য্য-সূচী পাওয়া গেল, তা'তে চরকা চালাও, কংগ্রেসের সভ্য-তালিকা ভুক্ত কর, তিলক-স্বরাজ্য ফণ্ডে টাকা আন ইত্যাদি আদেশ (mandate) ছিল। যে-আদর্শে গ্রামগুল'কে গড়ে তুল্‌তে হবে সে-সম্বন্ধে কারো মুখে কিছু শোনা গেল না। শোনা যাবেই বা কি করে? যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনের রথী, তাঁরা অনেকেই সহরের হাওয়ায় মানুষ। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে দেশের যে-টুকু স্থান ছিল তা' হচ্চে ইংরেজী পুঁথিতে আর প্রফেসারের দেওয়া নোটে।

গ্রামবাসিদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই, তাই তাঁরা পল্লী-সমস্যারও কোনো মীমাংসা দিতে পারেন না।

তাই বল্‌ছিলুম যাঁরা এ-কাজে নেমেছেন তাঁদের প্রথম কাজ, নিজেদের প্রস্তুত করা, আর দ্বিতীয় কাজ সমস্যার সত্য-মীমাংসার পথ আবিষ্কার করা। সেইজন্য চাই বুদ্ধির উদ্বোধন। বাঁধি-বুলি কপ্‌চিয়ে হৈ-চৈ ক'রে স্বদেশ-প্রীতির আতিশয্যে আমাদের শক্তি অপব্যয় করলে দেশকে গড়ে-তোলা দূরে থাক্, আমরা অনিষ্ট করব। এই অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালী-যুবকেরা উত্তেজনার তাপে অথবা উচ্ছ্বাসের আবেগে এমন সব কাজ করেছেন, যা' থেকে জাতীয়-জীবনের ভাণ্ডে কিছু সঞ্চয় ত হয়নিই, বরং বর্ত্তমান আন্দোলনকে ছোট করা হয়েছে। ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দেশের কাজ করতে উপদেশ দিলেন গান্ধীজি। দলকে দল ছেলে বেরিয়ে এল—কিছুদিন তারা ফর্‌বস্ ম্যান্‌সনে ভীড় করল। তারপর মিটিংএ স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করা ছাড়া আর তাদের অন্য কাজ ছিল না। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে চাষাভুষোদের সকল অবস্থা তদন্ত করবার প্রস্তাব নিয়ে আমি অনেকের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম; তাঁরা প্রস্তাবটাতে আশু ফলের সম্ভাবনা না দেখে সে-কথা কানে তুললেন না। কিন্তু এঁদের মধ্যেই একদল ছাত্র দ্বারভাঙা বিল্ডিংএর সাম্‌নে শুয়ে পড়ে পরীক্ষার্থিদের যাবার পথ রোধ করে' মনে করলেন দেশের একটা কাজ হ'ল। তারপর বাঙ্গলা খবরের কাগজে যখন এঁদের প্রশংসা ছাপান হ'ল, তখন এঁদের উৎসাহ একেবারে ছাপিয়ে উঠল। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে দাস-মনোবৃত্তি (slave mentality জন্মায়, ছাত্রদের মুখে এই বুলি শোনা গেল।

আসল কথা বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ বলেই তাকে এমন কোনো স্রোতে ভাসিয়ে দিলে চলবে না যার টান সে সাম্‌লাতে পারে না। একটুখানি রসের আমেজ পেলেই হ'ল—সে তখন প্রশ্ন করে না, নির্ব্বিবাদে সব মেনে নিতে চায়। মেনে-নেওয়ার প্রবৃত্তির প্রাধান্য আছে ব'লে তার বুদ্ধি-বিচারের দিকটা পরিণতি লাভ করতে পারেনি। এই চালাতে পারবার শক্তি লাভ করতে পারব এমন সাধনায় আমাদের প্রবৃত্ত হ'তে হবে।

আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনা থেকে দূরে থেকে পল্লীসংস্কারের কাজে মন দেবার পক্ষপাতী বলে' আপনারা মনে করবেন না, আমার মন এই আন্দোলনে সায় দিচ্ছে না। আজ সমস্ত দেশ-জোড়া এই জাগরণ কার মনকে না উদ্বুদ্ধ করেছে? কিন্তু একে ব্যর্থ না করি শক্তির অপচয় ঘটিয়ে। স্বাধীনতার জন্য মানুষের যখন আকাঙ্ক্ষা জাগে, যখন অন্তর-দেবতা ডাক দিয়ে বলেন "আমি মুক্ত; যতক্ষণ তুমি মুক্ত না হও ততক্ষণ আমার মুক্তি নেই," তখন মানুষের জীবনে যে পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ঘটায়, আজ তার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে' মনকে আশান্বিত করেছে। যাকে বলে Material movement, অর্থাৎ জাতীয়-জীবনের প্রকাশকে বাধামুক্ত করবার জন্য যে গতি, তার একটা নিজস্ব ধারা আছে। বাঙ্গলা-দেশে সাহিত্যের রসাল কুঞ্জে তার প্রথম প্রকাশ —সেই আনন্দমঠের গানে "বন্দে মাতরং;" তারপর নানা পথ দিয়ে নানাভাবে এই মন্ত্রটি কাজ করেছে, আমাদের চিন্তায় ভাবে কর্ম্মে।

আমাদের অলক্ষ্যে অগোচরে ঐ গানেরই সুর বেজেছে, তারপর যে-দিন ঘোরতর অপমানের ব্যথা বুকে বাজ্‌ল, তখন আমাদের কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ পেল সেই শক্তি যা' এতদিন গোপনে কাজ করছিল। আজ আবার এক সুযোগ এসেছে—এবার দেশের জন-সাধারণের হৃদয়ে সাড়া পাওয়া গেছে; অতএব এবার আমাদের সংযত হ'য়ে, বুদ্ধি ও মনকে জাগ্রত রেখে কর্ম্মে ব্রতী হ'তে হবে। বাইরের উত্তেজনা আমাদের চিত্তকে স্থির হ'তে দেয় না;—যথার্থ অনুপ্রেরণার পথে বাধা ঘটায়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গ-রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা *

অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদেষু

হে কবীন্দ্র! সুদীর্ঘ প্রবাস হইতে বিদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি বহন করিয়া, আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন—স্বদেশী সাহিত্যের সর্ব্বায়তন এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে আজ অভিনন্দন করিতেছে।

পরিষৎ নানা প্রকারে আপনার নিকট ঋণী। পরিষদের শৈশবে আপনি অজস্র স্নেহদানে ইহাকে পোষণ করিয়াছিলেন—পরিষদের কৈশোরে আপনি সহায় হইয়া, ইহার শ্রী ও সম্পদ্ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন—আজ পরিষদের যৌবনে আপনি ইহার অকৃত্রিম 'সুহৃৎ সখা'। যখনই অমিত্র-নীরদের ঘন-ঘটায় পরিষদের পক্ষে 'পন্থ বিজন অতিঘোর' হইয়াছে, তখনই শুভ পথ প্রদর্শন করিয়া, আপনি ইহাকে ঋতমার্গে পরিচালন করিয়াছেন। সেই জন্য আপনার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে বঙ্গের সাহিত্যিকগণের মুখস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দন করিয়া বিশ্ব-পিতার নিকট আপনার শতায়ুঃ কামনা করিয়াছিল।

যাঁহার অর্চ্চনার জন্য সাহিত্যের এই পুণ্য-পীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হে বরেণ্য! আপনি সেই বাণীর বরপুত্র। যুগ-যুগান্তের সাধনার ফলে দেবী সারদা আপনার চিত্ত-সরোজে তাঁহার রক্তচরণ চিহ্নিত করিয়াছেন। সেই জন্য সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই আপনি বিজয়ী; সেই জন্য আপনি সাহিত্যের যে বিভাগ যখন স্পর্শ করিয়াছেন, স্পর্শমণির করস্পর্শে সেই বিভাগই স্বর্ণময় হইয়াছে। বীণাপাণির সপ্তস্বরার শততন্ত্রীতে যে বিশ্ব-

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৯ ভাদ্র ১৩২৮।

সংগীত নিয়ত ঝঙ্কৃত হইতেছে, হে মহাকবি! আপনার হৃদয়-বীণায় তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

মানব অমৃতের পুত্র—অতএব কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সে চিরদিন অমৃতত্বের প্রয়াসী। প্রাচীন ভারতের স্নিগ্ধ তপোবনে যে অমৃতের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, সেই পুণ্যপীযুষ পান ভিন্ন কোন মতে তাহার অদম্য ব্রহ্মতৃষার নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া জীবনের ছায়াময় অপরাহ্নে মহর্ষি-সন্তান আপনি কুলোচিত ব্রত গ্রহণ করিয়া, জগৎকে সেই অমৃতবারি মুক্তহস্তে পরিবেষণ করিতেছেন।

বিদ্যাপক্ষিণীর দুই পক্ষ—দর্শন ও বিজ্ঞান। এই পক্ষদ্বয়ে নির্ভর করিয়া, সে প্রজ্ঞানের পর-ব্যোমে নির্ভয়ে বিহরণ করে। পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে বিজ্ঞান আহরণ করুক, পূর্ব্ব পশ্চিমকে দর্শন বিতরণ করুক। এই আদান প্রদানের পূর্ণতায় যে বিদ্যার প্রপূর্ত্তি হইবে, সেই বিদ্যার দ্বারাই "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" সেই জন্য আপনি "বিশ্ব-ভারতীর" প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে রাখিবন্ধনে সংযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

হে রবীন্দ্র! আপনি সাহিত্যাকাশের দীপ্ত ভাস্কর—জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। যিনি 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ,' পরম জ্যোতিঃ যাঁহার উর্জ্জিত বিভূতি আপনাতে দেদীপ্যমান—সেই সত্য শিব সুন্দর আপনাকে জয়যুক্ত করুন। ওঁ।

গুণমুগ্ধ
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

রবি-প্রশস্তি

রঞ্জিত করি পশ্চিমতট দীপ্ত প্রতিভাজালে
সূর্য্য আজিকে উদিল পূর্ব্ব উদয়গিরির ভালে;
পুণ্য পরশ লভি' আজি তার জাগ্ ও-রে
তোরা জাগ্—
বিশ্ব-সবিতা সেই রবি-করে দে রে দে যজ্ঞভাগ!
সহস্রদল বাণীর কমল মুদিত মানস-সরে
দিক্‌দিগন্ত মুগ্ধ করিয়া ফুটিল যাহার বরে,
অমৃতগন্ধ আনন্দরূপে দান করি' যে বা লোকে
নবজীবনের দীপ্তি আনিল মৃত্যু-আহত চোখে
তাহারি মুক্ত মিলনাঙ্গনে জাগ্ ও-রে
তোরা জাগ্—
বিশ্ববিজয়ী সেই রবি-করে দে রে দে যজ্ঞভাগ।

খণ্ডিত নয় এ মহাযজ্ঞ, অনন্ত অফুরণ,—
এই বিশ্বের লোকে লোকে আজ আলোক-
নিমন্ত্রণ;
শক্তির মোহ মিথ্যার মায়া সবলে করিয়া দূর
ভুবনধন্যা জীবনবন্যা বহে আজি ভরপূর;
আয় রে পূর্ব্ব আয় পশ্চিম, আয় তোরা সবে
আয় বিশ্বভারতী-মন্দির-তলে মিলন-মধুরচ্ছায়।
যা কিছু যাহার কলঙ্ককালি, যাহা 'অচলায়তন,'
সত্য-আলোকে ধুয়ে নে রে লভি' সে দীপ্ত
বরিষণ।
মর্ম্মপুটের মণির মুকুর উচ্চে তুলিয়া ধর্—
সবার ঊর্দ্ধে জ্বলুক্ সে আজি শাশ্বত ভাস্কর।

জগৎ-সভায় রবি তুমি আজ নহ শুধু আর কবি,
অমৃত-প্রতিভা ভাণ্ডার-ভরা তুমি আলো-
করা রবি;
তোমারি প্রভায় উজল সপ্ত সাগর, সাগর-পার,
পূর্ব্বোত্তর দক্ষিণদিশি উজ্জ্বল চারিধার;
কুরুক্ষেত্র-কালরাত্রির তমসার অবসানে
তোমারি কিরণ দূর পশ্চিমে নব জাগরণ হানে!
বিশ্ব-সভার মহা-রাজসূয়ে তুমি পুরুষোত্তম,
কর্ম্মের রথী ধর্ম্ম-সারথী জ্ঞানে মানে অনুপম;
শিশুপাল ছাড়া তোমারে সকলে বরিষ্ঠ সম্মানে
অর্পিছে আজি প্রাণের ভক্তি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যদানে।

লহ ওগো লহ আজি এ অর্ঘ্য ঊর্দ্ধ আকাশপথে
যেথা তব মহাবিজয় যাত্রা শুভ্র আলোকরথে;
চন্দ্র যেথায় অতন্দ্র চোখে সাজায় বরণডালা,
কাতারে কাতারে শোভিছে লক্ষ নক্ষত্রের মালা,
জ্যোৎস্না বিছায় অঞ্চলবাস ছায়া-পথখানি পরে,
মেঘেরা মিলিয়া চরণের তলে শঙ্খধ্বনি করে,
সঙ্গীতে মাতি গ্রহেরা ফিরিছে অনুগ্রহের লাগি';
নাচে ছয় ঋতু মোহন নৃত্যে চির দিনরাত জাগি,
জানি না সেথায় পঁহুছিবে কি না এ ক্ষীণ
কণ্ঠস্বর—
জানি শুধু দীন যাত্রী-জনের তুমি চিরনির্ভর।
কেন দীন বলি? আমারি কণ্ঠে স্বাগত
জানায় মাতা,
সাত কোটি নিজ সন্তান সাথে উন্নত যার মাথা,
যাহার যশের কীর্ত্তি আজিকে ঘোষিছে জগৎময়,
ভিক্ষুক যে-বা শিক্ষক হয়ে ভুবন করিল জয়—
সে যে সেই রাণী বঙ্গবাণীরই বুক-আলো-
করা ধন,
বিশ্বভুবন নন্দিত-করা বন্দিত নন্দন।

সেই বাণী আজি আমারি কণ্ঠে পাঠায়
তাহার বাণী,
অক্ষম হোক্, তবু তোমা তরে গাঁথা এ
মাল্যখানি;—
পর' আজি গলে—দেখুক বিশ্বসাহিত্য-পরিষৎ,
বঙ্গবাণীরই কোলে দোলে আজ ভুবন-
ভবিষ্যৎ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

নমস্কার

নমস্কার! করি নমস্কার!
কবিতা-কমল-কুঞ্জ উল্লসিত আবির্ভাবে যার,—
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,—
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী বহে তরঙ্গিতে,—
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত্য হ'ল স্ফূর্ত্তি-পারাবার,—
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!
ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে—
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যুহারা তানে;
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধা পান;
তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার
নমস্কার! করি নমস্কার!
চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,—
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার

বেণু-বীণা জিনি মিঠা বাণী যার খনি সুষমার
চিত্ত-প্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার।
নমস্কার! করি নমস্কার!

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অভিচার-নিশি,
আবেদনে-আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,
শোণিত নিষেক-শূন্য নৈষুজ্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি ভারতের বৈজয়ন্ত-হার
নমস্কার! করি নমস্কার!

রুদ্ধকণ্ঠ পঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী-অমরাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অত্যাচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজরোষ উপরাজে দিল সে ধিক্কার
নমস্কার! তারে নমস্কার!

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য-ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য
কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা!"
ছিন্নমস্তা ইস্নোরোপা শোনে বাণী স্বপ্নহত পারা—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র,—তাথে নিজ রক্তের
ফোয়ারা—
শিহরি কবন্ধ মাগে যার আগে শান্তিবারি ধারা—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য বিদেশে যে রাজারও অধিক
মুখরিত যার গানে সপ্তসিন্ধু আর দশদিক,—
বিশ্বকবিচ্ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,—
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব
জগৎপ্রিয়,—
নিত্য-তারুণ্যের টীকা ভালে যার চিত্ত-চমৎকার
নমস্কার! তারে নমস্কার!

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার
নিশীথে মশাল জ্বেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতার
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার
দ্বন্দ্ব ভুলি' 'হুন্' 'গল' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার! তারে নমস্কার!

নয়নে শান্তির কান্তি হাস্যে যার স্বর্গের মন্দার
পক্ককেশে যে লভিল বরমাল্য রম্যা অরোরার;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য সহচর
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্ত্তি স্বদেশ-
আত্মার"
বারম্বার তারে নমস্কার!

চারি মহাদেশ যার ভক্ত,—করে ভক্তি নিবেদন;
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব-সাধনার
নমস্কার! নমস্কার! বারম্বার তারে নমস্কার!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গান

উঠলো ভরে সারা গগন যার সুরে গো যার গানে
তার তরে আজ গান খুঁজে পাই কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে!
অবাক্ দেখি এ মোর হৃদয়,
ভাষাও সে যে হলো নিদয়,
হতাশ হয়ে চাইতে গিয়ে চাই যে কেবল তার পানে—
উঠলো ভরে সারা গগন যার সুরে গো যার গানে।
তোমার ছাড়া গান কি আছে!
গাইব কি আর তোমার কাছে!
তোমার সুরে যাই যে ভেসে, মন উতলা সেই টানে—
তোমার তরে গান খুঁজে পাই কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে।
বিশ্বহৃদয় জয় করেছ জগৎজয়ী হে কবি!
পূর্ণ হলো শূন্য জীবন সে গৌরবে গৌরবী।
জগৎ জুড়ে তাই তো শুনি
তোমার গুণের গান যে গুণী!
সেই সুরে আজ সুর মিলিয়ে গাইতে হবে মন মানে
নইলে কোথায় সুর খুঁজে পাই, কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

রাজপুত্তুর

১

রাজপুত্তুর চলেচে, নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাতরাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

সে হল যে-কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই শেষও নেই।

সহরে গ্রামে আর সকলে হাট বাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে; যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুর সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়।

কেন যায়?

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খাল বিলের জল খাল বিলের মধ্যেই শান্ত।

কিন্তু গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না। রাজপুত্তুরকে তার রাজ্যটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখ্‌বে কে? তেপান্তর মাঠ দেখে সে ফেরে না, সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যায়।

মানুষ বারেবারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারেবারে নতুন করে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, আমরা সেই রাজপুত্তুর।

তেপান্তর মাঠ যদিবা ফুরোয় সাম্‌নে সমুদ্র। তারই মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈত্যপুরীতে রাজকন্যা বাঁধা আছে।

পৃথিবীতে আর সকলে টাকা খুঁজচে, নাম খুঁজচে, আরাম খুঁজচে; আর যে আমাদের রাজপুত্তুর সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েচে। তুফান উঠ্‌ল, নৌকো মিল্‌লনা, তবু সে পথ খুঁজচে।

এইটেই হচ্চে মানুষের সব গোড়াকার রূপকথা, আর সব শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেচে, দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জ্জয়, আর ছোট মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করচে বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।

বাইরে বনের অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে, আর ছোট ছেলেটি চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, দৈত্যপুরীতে আমাকে পাড়ি দিতে হবে।

২

সাম্‌নে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মত। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু যেম্‌নি মাটিতে পা পড়া অম্‌নি এ কি হল? এ কোন্ জাদুকরের জাদু?

এ যে সহর। ট্রাম চলেচে। আপিস-মুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশিওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেচে।

আর রাজপুত্তুরের এ কি বেশ? এ কি চাল? গায়ে বোতাম-খোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহরে পড়ে টিউশানি করে বাসা খরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়?

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপা ফুলের মত রঙ নয়, হাসিতে তার মাণিক খসেনা। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নব বর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারি সঙ্গে।

মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। বাপ ছিল গরীব, অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না, মেয়ের বয়স গেল বেড়ে। সকলে নিন্দে করলে।

বাপ গেচে মরে, এখন মেয়ে এসেচে খুড়োর বাড়িতে।

পাত্রের সন্ধান মিলল। তার টাকাও বিস্তর, বয়সও বিস্তর, আর নাতি নাৎনীর সংখ্যাও অল্প নয়। তার দাব-রাবের সীমা ছিল না।

খুড়ো বল্‌লেন, মেয়ের কপাল ভাল।

এমন সময় গায়ে-হলুদের দিনে মেয়েটিকে দেখা গেল না, আর পাশের বাসার সেই ছেলেটিকে।

খবর এল তারা লুকিয়ে বিবাহ করেছে। তাদের জাতের মিল ছিলনা, ছিল, কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।

লক্ষপতি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে সোনার সিংহাসন মানৎ করে বল্লেন "এ ছেলেকে কে বাঁচায়!"

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকীল প্রবীণ সব সাক্ষী দেবতার কৃপায় দিনকে রাত করে তুল্‌লে। সে বড় আশ্চর্য্য!

সেই দিন ইষ্ট দেবতার কাছে জোড়া পাঁটা কাটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজ্‌ল। সকলেই খুসি হল, বল্‌লে কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম্ম এখনো জেগে আছেন।

৩

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু দীর্ঘপথ আর শেষ হয় না। তেপান্তর মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গিহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুন্‌তে হল, হাঁউমাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। মানুষকে খাবার জন্যে চারিদিকে এত লোভ।

রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থাম্‌ল।

সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি যম।

সেই যমের সোনার কাঠি যেম্‌নি ছোঁয়ানো অম্‌নি এ কি কাণ্ড! সহর গেল মিলিয়ে, স্বপন গেল ভেঙে।

মুহূর্ত্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্তুর। তার কপালে অসীমকালের রাজটীকা। দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুল্‌বে।

যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায় সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চল্‌ল। তার সাম্‌নের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জ্জন করচে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ,—সে রাজপুত্তুর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ষা-মঙ্গল

(গান)

মেঘের কোলে-কোলে যায় রে চ'লে বকের পাঁতি।
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি-গাঁথি।
সুদূরের বীণার স্বরে
কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে—
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগ্‌লামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি।
ওদের ঘুম ছুটেচে ভয় টুটেচে একেবারে
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের,—পিছন পানে তাকায় না রে।
যে বাসা ছিল জানা
সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাইরে মানা;
ওরা দিনের শেষে দেখেচে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি।

১৭ই ভাদ্র ১৩২৮

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে
সেই আগুনের কালোরূপ যে
আমার চোখের পরে নাচে।
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে,
তার কালো আভার কাঁপন দেখ
তালবনের ঐ গাছে গাছে।
বাদল হাওয়া পাগল হল
সেই আগুনের হুহুঙ্কারে।
দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায়
মাঠ হতে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে
কদম্ববন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ
আমার গানের পাখার পাছে॥

১৫ই ভাদ্র ১৩২৮

তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি'
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
আজি সঘন শর্ব্বরী মেঘমগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝ'রি' ঝরিছে জলধারা,
তমালবন মর্ম্মরি' পবন চলে হাঁকি।
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
যে-কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি
জানিনা কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী।
রয়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিঁড়িব, যাব বাটে,
যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে!
কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি,
কে তুমি মম অঙ্গনে, দাঁড়ালে একাকী॥

১৩ই ভাদ্র ১৩২৮

ওগো আমার শ্রাবণ-মেঘের খেয়াতরীর মাঝি!
অশ্রুভরা পূরব-হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়
বোঝা তাহার নয় ভারী নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি।

ভোরবেলা যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে,
মনে ভাবি তার ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমারি সারি-গানে
সেই আঁখি তার মনে আনে
আকাশভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।

১১ই ভাদ্র ১৩২৮

বাদল-মেঘে মাদল বাজে
গুরু গুরু গগন মাঝে।
তারি গভীর রোলে
আমার হৃদয় দোলে
আপন সুরে আপ্‌নি ভোলে।
কোথায় ছিল গহন প্রাণে
গোপন ব্যথা গোপন গানে,—
আজি সজল বায়ে
শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকল খানে
গানে গানে।

১০ই ভাদ্র ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিলিতোনা

৩

আন্দ্রে সেই ছোক্‌রাটাকে যে কাজের ভার দিয়াছিল সেই কাজ হাসিল হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আন্দ্রে একটা গলিতে অপেক্ষা করিতেছিল।

কুণ্ডলী-পাকানো চুরুটের নীলবর্ণ ধূমরাশি সম্মুখে উদ্‌গীরণ করিতে করিতে, আন্দ্রে নিজের মনকে একবার যাচাই করিয়া লইল; বুঝিল যে, প্রকৃত প্রেমের আকর্ষণ না থাকিলেও, সেই রূপসীর চিন্তায় তাহার মন একবারে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে; রূপসীর রূপে যতটা মুগ্ধ না হোক, জুয়াঙ্কোর সেই বিপদের পর, তরুণীর সেই কথা গুলিতে আন্দ্রের মনে একটা অপূর্ব্ব রহস্যের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে—এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য যুবক-সুলভ তাহার একটা অদম্য কৌতূহল হইয়াছে। ডন্ কুইক্‌শোট না হইলেও, বিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবকেরা নারীদিগকে অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য সততই উন্মুখ হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও আন্দ্রের মনে ঐরূপ একটা ক্ষাত্রভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল।

ফেলিসিয়ানা এমন সুশিক্ষিতা রমণী, এই সব ব্যাপারের মধ্যে সে এখন কোথায়? তাহাকে লইয়া আন্দ্রে একটু মুস্কিলে পড়িয়াছে। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এখনও তাহার বিবাহ হইতে ছয় মাস বিলম্ব আছে। তত দিনে বোধ হয় তাহার এই ক্ষুদ্র প্রেমলীলার অভিনয় সাঙ্গ হইবে—সব চুকিয়া-বুকিয়া যাইবে। তাছাড়া এই রকম ধরণের গুপ্ত প্রেম লুকাইয়া রাখা খুবই সহজ। ফেলিসিয়ানা আর এই তরুণী—উহারা ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন অবস্থার লোক—উহাদের মধ্যে কখনই দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে না। ইহাই আমার বাল্য-সুলভ শেষ চপলতা বা বাতুলতা। কোনও মোহিনী রূপসীকে ভালবাসিলে লোকে বলে, উহা বাতুলতা; আর, একটা কদাকার চটা মেজাজের রমণীকে বিবাহ করিলে লোকে বলে—উহা সুবুদ্ধির কাজ। তার পর বিবাহ করিয়া তুমি ঋষিমুনির মত, সন্ন্যাসীর মত, বৈরাগীর মত, নিস্পৃহভাবে নির্লিপ্তভাবে জীবন যাপন কর না কেন, তাহাতে কি আসিয়া যায়।

এই সব কথা মাথার মধ্যে সাজাইয়া গুছাইয়া লইয়া, আন্দ্রে একটা সুখের স্বপ্নে গা ঢালিয়া দিল। ফেলিসিয়ানার প্ররোচনায় আন্দ্রেকে বাহ্য ভদ্রতার ধরণ ধারণ অবলম্বন করিতে হইত, সুরুচিসূচক আমোদ-প্রমোদে অনুরাগ দেখাইতে হইত। কিন্তু এ সমস্ত আন্দ্রের নিকট একটা বিষম বোঝা বলিয়া অনুভূত হইত। অথচ প্রতিবাদ করিতেও তাহার সাহসে কুলাইত না। কতকগুলা ইংরাজী অভ্যাস ও ধরণ-ধারণ অনুসারে তাহাকে চলিতে হইত। চা খাওয়া, পিয়ানো বাজানো, হল্‌দে দস্তানা পরা, সাদা 'কলার'-পরা, নাচের ভঙ্গিতে পা-ফেলা, মুখ বার্ণিস

করা, নূতন ফ্যাশানের কাপড় সম্বন্ধে কথোপ-কথন করা—এই সমস্তই তাহার করিতে হইত। অথচ এই সমস্ত বাঁধা-বাঁধি ধরণ ধারণ ও আমোদ-প্রমোদের উপর আন্দ্রের একটা স্বভাবসিদ্ধ বিতৃষ্ণা ছিল। আত্ম-সম্বরণের যতই চেষ্টা করুক না, আন্দ্রের ধমণীতে প্রবাহিত স্পেনীয় শোণিত, উত্তর-য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে এক একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিত।

সার্কাসের সেই তরুণীর ভালবাসা পাইয়াছে মনে করিয়া আন্দ্রে মনে মনে নানাপ্রকার সুখের কল্পনা করিতে লাগিল। সে যেন কল্পনায় দেখিল, তরুণী নিজ-গৃহের একটি ছোট্ট কামরায় জাঁকালো পোষাক ছাড়িয়া, একখানা আটপৌরে কাপড় পরিয়া মিষ্টান্ন কমলালেবু, ফলের মোরব্বা প্রভৃতি আহার করিতেছিল; একটা পত্‌লা কাগজে কতকটা তামাকের কুটা ভরিয়া সেই কাগজ সুন্দররূপে গুটাইয়া সিগারেট তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে যেন অর্পণ করিল। তাহার পর সেই তরুণী দেয়ালে আট্‌কানো গিতার যন্ত্র দেয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া যেন তাহার হাতে দিল। এবং হাতে একজোড়া কাঠের কর্‌তাল বাঁধিয়া, বেশ চটুলতার সহিত, হাবভাব প্রকাশ করিয়া পুরাতন স্পেনীয় ধরণে নৃত্য করিতে লাগিল—সেই নৃত্যে আরব-দেশ-সুলভ একটু অবসাদের ভাব মিশ্রিত—এবং নাচিতে নাচিতে, মধ্যে মধ্যে খাপছাড়া রকমে এক-একটুকরা মর্ম্মস্পর্শী গজলের তান ছাড়িতে লাগিল।

আন্দ্রে যখন এইরূপ সুখ-স্বপ্নে ভোর হইয়া, কল্পিত কর্‌তালের তালে তালে তুড়ি দিতেছিল, তখন সূর্য্য দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করিয়া অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ভোজনের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কারণ আজকাল মাদ্রিড-নগরে অবস্থাপন্ন লোকেরা প্যারিস্ কিংবা লণ্ডনের সময় অনুসারে আহার করিতে বসে। আন্দ্রের দূত এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। এতক্ষণে তাহার আসা উচিত ছিল। বিলম্ব দেখিয়া আন্দ্রে বিস্মিত হইল এবং তাহার মৎলব একটু ওলট-পালট হইয়া গেল। তাহার দূতকে আবার কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? এমন একটা সুখের উদ্যম গোড়াতেই ভণ্ডুল হইয়া গেল। একবার খেই হারাইলে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল—তাহার পথের কোন নিদর্শন নাই, চিহ্ন নাই। লোকটার নাম পর্য্যন্ত জানা নাই। দৈবাৎ যদি তাহার দেখা পাওয়া যায়, এখন কি শুধু এই ভরসায় থাকিতে হইবে?

আন্দ্রে মনে মনে ভাবিল, "হয়ত, পথে তাহার কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করা যাক।"

আসল কথা;—যখন সার্কাস হইতে মিলিতোনাকে লইয়া গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল, আন্দ্রের দূত সেই অদ্ভুত ধরণের ছোক্‌রাটা গাড়ীর পিছনের স্প্রিং ধরিয়া কোন রকমে ঝুলিয়া ছিল, পাঠকের বোধহয় স্মরণ আছে। এ-গলি সে-গলি পার হইয়া গাড়ী যখন একটা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল, কোচম্যান জানিতে পারিল গাড়ীর পিছনে একটা লোক ঝুলিয়া আছে, জানিতে পারিয়াই তাহার মুখের উপর শপাৎ করিয়া এক ঘা চাবুক কসাইয়া দিল।

ছোক্‌রাটা চাবুক খাইয়া কাঁদিতে

লাগিল—তাহার পর চোখের জল মুছিয়া ফেলিল, তখন গাড়ীটা একেবারে রাস্তার শেষে গিয়া পড়িয়াছে; গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ কমিয়া আসিয়াছে। ছোক্‌রার নাম পেরিকো। পেরিকো সকল স্পেনীয় যুবকেরই মত খুব দৌড়াইতে পারে। তাহার দৌত্য-কার্য্যের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে খুব ছুটিয়া চলিল; ঠিক্ সিধা গেলে গাড়ীকে নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু একটা বাঁক ফেরায় ক্ষণেকের জন্য গাড়ীটা তার দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া পড়িল—সে আবার যখন সেই বাঁকটায় ফিরিল, তখন গাড়ীটা অন্তর্হিত হইয়াছে। পেরিকো অলি-গলি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল;—যদি কোন দরজার সম্মুখে গাড়ীটা আসিয়া দাঁড়ায় এই আশায়। কিন্তু সে আশায় নিরাশ হইল। কেবল দেখিল একটা খালী গাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে—এবং একটা চাবুকের আস্ফালন শব্দ করিয়া অন্য আরোহী লইবার জন্য চলিয়া গেল।

আন্দ্রে যাহা বলিয়াছিল যদিও তাহা পেরিকো করিতে পারে নাই, তথাপি সে এমন সব রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যেখানে তাহার সেই পরিচিত দুই আরোহীর গাড়ী হইতে নামিবার সম্ভাবনা আছে। দক্ষিণ য়ুরোপের ছেলেগুলা স্বভাবতই একটু ইঁচড়ে-পাকা হইয়া থাকে। মনে করিল, অমন সুন্দরীর নিশ্চয়ই কোন হৃদয়-বল্লভ আছে। স্বীয় গৃহের জান্‌লা হইতে কোন না কোন সুন্দরী আপন প্রিয়তমকে দেখিবার জন্য বোধ হয় নিশ্চয়ই আগ্রহান্বিত হইবে।—আর, এই মাড্রিড্ নগরে বৃষ যুদ্ধের দিন,—একটা সাধারণ আমোদ-আহ্লাদের দিন, বেড়াই-বার দিন, সকলেই বাড়ীর বাহির হইবে। এই অনুমানটা যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা নহে। বস্তুত, অনেকগুলি সুন্দরী জান্‌লা হইতে মুখ বাড়াইয়া মৃদুমৃদু হাসিতেছিল। কিন্তু পেরিকো যাহাকে খুঁজিতেছিল তাহাকে দেখিতে পাইল না। শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পেরিকো রাস্তার ধারের ফোয়ারার জলে চোখ্ ধুইয়া, যেখানে আন্দ্রের অপেক্ষা করিবার কথা, সেই দিকে চলিল। আন্দ্রেকে ঠিক্ ঠিকনাটা বলিতে না পারিলেও, ৩৪ টা রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তায় তাহারা নামিয়াছে,—ইহা নিশ্চয় করিয়া সে বলিতে পারিবে মনে করিল।

আর কয়েক মিনিট সেখানে থাকিলে, পেরিকো দেখিতে পাইত, আর একটা গাড়ী বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া—বেশভূষায় ভূষিত, 'ম্যাণ্টো' জোব্বার কাপড়ে চোখ্ ঢাকা—একটি লোক গাড়ী হইতে লঘুভাবে লাফাইয়া পড়িল—এবং গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। লাফাইয়া পড়িবার সময় গাত্রবস্ত্র একটু সরিয়া যাওয়ায় দেখা গেল ভিতরে কতকগুলা চুম্‌কি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে এবং তার এক পায়ের রেশ্‌মি লম্বা মোজায় রক্তের দাগ লাগিয়াছে।

অবশ্য তোমরা বুঝিয়াছ, এ জুয়াঙ্কো ভিন্ন আর কেহ নয়। কিন্তু জুয়াঙ্কোর সহিত মিলিতোনার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, পেরিকো তাহা জানিত না। সুতরাং জুয়াঙ্কোকে ঐখানে নামিতে দেখিয়া সে মিলিতোনার আবাস-গৃহের কোন নিদর্শন পাইল না। তাছাড়া, এমন হইতে পারে, জুয়াঙ্কো নিজ গৃহেই প্রবেশ করিল। ইহাই অধিক সম্ভবপর। সেই ভীষণ বৃষ-যুদ্ধের

পর, জুয়াঙ্কোর নিশ্চয়ই একটা বিশ্রামের দরকার, এবং ক্ষত স্থানে পটি বাঁধাও আবশ্যক হইয়াছে। কেন না, ষাঁড়ের শিঙের আঘাত অত্যন্ত বিষাক্ত এবং উহার ক্ষত সারিতে বিলম্ব হয়।

একটা সূচাগ্র চতুষ্কোণ স্মৃতি-স্তম্ভের নিকট অপেক্ষা করিয়া থাকিতে আন্দ্রে পেরিকোকে বলিয়াছিল। এক্ষণে পেরিকো সেই সংকেত-স্থানের অভিমুখে চলিল। আবার একটা বাধা। আন্দ্রে একা ছিলনা। ফেলিসিয়ানা তাহার একটি সখীর সহিত, বাজার করিতে বাহির হইয়াছিল। ফেলিসিয়ানা তাহার গাড়ী হইতে দেখিল, তাহার ভাবী পতি একটু উদ্বেগের সহিত অধীর হইয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে; তখনি সে গাড়ী হইতে নামিয়া, সখীর সহিত, আন্দ্রের নিকটে আসিল। ফেলিসিয়ানা আন্দ্রেকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কোন কবিতার গজল রচনা করবার জন্যে এই গাছের তলায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ? কেননা, যারা কবিত্ব-রসের ভাবুক নয় তারা এই সময়ে আহার করিতে বসে, এই তাদের ভোজনের সময়।" অভিনব প্রেমলীলার আরম্ভেই ধরা পড়ায়, আন্দ্রের মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল এবং নারী-মনোরঞ্জন-সুলভ কতকগুলা সচরাচর ধরণের ফাঁকা কথা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিল। আন্দ্রের ওষ্ঠাধরে মৃদু মধুর হাসি লাগিয়া থাকিলেও, ভিতরে ভিতরে আন্দ্রে রুষ্ট হইয়াছিল। এদিকে পেরিকো কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া উহাদের চারিদিকে ঘুরপাক দিতে লাগিল। বয়স খুব অল্প হইলেও, পেরিকোর এ জ্ঞান ছিল যে, ফরাসী ধরণে এমন সুন্দররূপে সজ্জিত একজন তরুণীর সম্মুখে শিল্পজীবী-শ্রেণীর কোন রমণীর ঠিকানা কোন যুবককে বলা ঠিক্ নহে।

শুধু সে বিস্মিত হইল, এমন সুন্দরী মহিলাদের সহিত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি না একজন আলখাল্লাধারী নিম্নশ্রেণী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

—ও ছোক্‌রাটা কি চায়? ও তোমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে—যেন ওর বড় বড় কালো চোখ দুটা দিয়ে তোমাকে গিলে খাবে।

আন্দ্রে উত্তর করিল:—

আমি কখন্ আমার এই নিবে-যাওয়া চুরোটের শেষ-টুক্‌রাটা ফেলে দেব,—ও ছোক্‌রাটা তারই অপেক্ষায় আছে। এই কথা বলিয়া চুরোটের টুক্‌রাটা আন্দ্রে তার নিকট নিক্ষেপ করিল—আর সেই সঙ্গে একটু ইসারা করিল—যাহার অর্থ:—আমি যখন একা থাক্‌ব, তখন এখানে আবার ফিরে আস্‌বি।

ছোক্‌রাটা চলিয়া গেল। যাইবার সময় পকেট হইতে চক্‌মকির বাকস্ বাহির করিয়া, চুরুটে আগুন ধরাইল। এবং পাকা চুরুট-খোরের মত বেদম চুরুট ফুঁকিতে লাগিল।

আন্দ্রের কষ্ট এইখানেই শেষ হইল না। ফেলিসিয়ানা দস্তানা-আঁটা হাতে আপন কপালে আঘাত করিয়া স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় বলিলেন:—"কি সর্ব্বনাশ! আমাদের সেই যুগলবন্ধ গানটা নিয়ে এমন ব্যাপৃত ছিলুম যে, তোমাকে বল্‌তে আমি ভুলে গিয়েছিলুম, বাবা আমাদের ওখানে আজ রাত্রে তোমাকে

খেতে বলেছেন। আজ সকালে তোমাকে লিখ্‌বেন মনে করেছিলেন; কিন্তু আমি তাঁকে বল্লুম, আজ অপরাহ্ণে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, আমি মুখে বল্‌ব, লেখ্‌বার দরকার নেই।" নখের মত একটা ক্ষুদ্র হাত-ঘড়িতে সময় দেখিয়া বলিলেন:—"এমনিই যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠে পড়, আমার বন্ধুকে ওঁর বাড়ীতে পৌছে দিয়ে, আমরা দুজনে এক সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে ফিরে আস্‌ব।"

একজন সুশিক্ষিতা তরুণী, এক যুবককে তাঁর গাড়ীতে উঠাইয়া লইলেন—ইহা দেখিয়া যদি কেহ বিস্মিত হন, তাহা হইলে আর একটি লোকের দিকে আমরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, তিনি আর বিস্মিত হইবেন না। গাড়ীর সম্মুখস্থ আসনে একজন ইংরেজ গভর্ণেস বসিয়া ছিলেন—খোঁটার মত খট্‌খটে, কাঁকড়ার মত লাল, গায়ে ফিতা-বাঁধা লম্বা আঁটসাট্ আঙ্গিয়া। উহার চেহারা দেখিলে ফুল-ধনু, ধনু ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়।

আর পিছাইবার উপায় নাই। ফেলিসিয়ানা ও তাঁর সখীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া, আন্দ্রে গাড়ীর সম্মুখ-আসনে, গভর্ণেসের পাশে গিয়া বসিলেন।

পেরিকোর আনীত সংবাদ শুনিতে পাইলেন না বলিয়া তিনি রাগে গর্‌গর্ করিতেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, পেরিকো সমস্ত সন্ধান লইয়া আসিয়াছিল। আবার কবে যে তাঁর প্রাণের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, মিলিতোনার ওখানে গিয়া গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদ করিতে পারিবেন—তার আর স্থিরতা নাই। সে সুখের দিন অনির্দ্দেশ্যরূপে পিছাইয়া গেল।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে যে-ভোজনের নিমন্ত্রণে আন্দ্রে যাইতেছেন সেই ভোজন-ব্যাপারের বর্ণনা শুনিতে তোমাদের বোধ হয় তেমন ঔৎসুক্য হইবে না—তার চেয়ে বরং, মিলিতোনা কি করিতেছে তারই সন্ধান করা যাক্—এ-বিষয়ে পেরিকোর অপেক্ষা বোধ হয় আমরা বেশী সফল-প্রযত্ন হইব।

বস্তুতঃ আন্দ্রের গুপ্তচর যে রাস্তাটা আঁচিয়াছিল, মিলিতোনা সেই রাস্তাতেই বাস করে। মিলিতোনার বাড়ীটা অদ্ভুত-রকমে নির্ম্মিত। সম্মুখের জানালাগুলা সব অসমান। বাড়ীর সম্মুখের প্রাচীর সমস্তই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, এবং স্বীয় ভারে দমিয়া গিয়াছে, বসিয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ীগুলা উহাকে যদি ঠেসিয়া না রাখিত তাহা হইলে অচিরাৎ ধরাশায়ী হইত সন্দেহ নাই। বাড়ীর উপরের ভাগটার অবস্থা কতকটা ভাল এবং প্রাচীন গোলাপী রং-এর কিছু নিদর্শন এখনো বর্ত্তমান আছে—ঠিক যেন বাড়ীটা স্বকীয় দুরবস্থায় লজ্জিত হইয়া একটু লাল হইয়া উঠিয়াছে। টালির ছাদের একটু নীচে একটা ছোট গবাক্ষ; তার চারি পাশে সম্প্রতি আধ-খাঁচ্‌রা রকমে চূণকাম করা হইয়াছে। ডাইনের এক খাঁজে একটা 'বটের' পাখীর মূর্ত্তি—বামদিকে লাল ও হল্‌দে কাচের মুক্তায় বিভূষিত একটি ছোট্ট খোপের মধ্যে একটা ঝিঁঝি পোকার মূর্ত্তি। কেননা আরবদের অনুকরণে, স্পেনের লোকেরা, এক-ঘেয়ে সুরে, ও সম-বিভক্ত তালে বটের পাখী ও ঝিঁঝি পোকার উদ্দেশে রচিত গান গায়িতে ভালবাসে। একটা ফোঁপরা মাটির কুঁজা একটা রসি দিয়া উপর হইতে ঝোলানো

রহিয়াছে—কুঁজার গায়ে মুক্তার ন্যায় বিন্দু বিন্দু বাষ্প-ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কুঁজার জল সন্ধ্যার বাতাসে ঠাণ্ডা হইতেছে, এবং দুইটা নিম্নস্থ পাত্রের উপর টপ্‌টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই গবাক্ষটা মিলিতোনার কাম্‌রার গবাক্ষ। এই নীড়ে যে একটি তরুণ বিহঙ্গ বাস্‌ করে, নীচের রাস্তা হইতে কোন দর্শকের তাহা বুঝিতে বোধ হয় তিলার্দ্ধ বিলম্ব হয় না। রূপ ও যৌবন নির্জ্জীব জড় পদার্থের উপরেও একটা আধিপত্য বিস্তার করে, তাহাদের উপর আপনা হইতেই যেন একটা শিলমোহরের ছাপ পড়িয়া যায়।

একটা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে যদি তোমরা ভয় না পাও, তাহলে আমার সঙ্গে এসো। মিলিতোনা এখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছেন, এসো আমরা তাঁর অনুসরণ করি। সিঁড়ির ধাপগুলা খুব খট্‌খটে শক্ত, সিঁড়ির গরাদে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। মিলিতোনা কুরঙ্গিনীর মত লঘু-গতিতে লাফাইয়া লাফাইয়া সিঁড়ির ধাপগুলা লঙ্ঘন করিতেছে; এইবার মিলিতোনা উপরিতন ধাপের মুক্ত আলোকে আসিয়া পড়িয়াছে। তখনো বৃদ্ধা আল্‌দঞ্জা প্রথম ধাপগুলার অন্ধকারের মধ্যেই আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। একটা দেবদারু কাঠের দরজা—দরজার সম্মুখে একটা দড়ি ফেলা আছে, তরুণী দড়ির আগাটা উঠাইয়া লইল এবং চাবি লইয়া দরজাটা খুলিল।

এমন দীন-ধরণের কাম্‌রা দেখিয়া কোন চোর প্রলোভিত হইতে পারে না এবং উহা বন্ধ-সন্ধ করিয়া বেশী সাবধান হইবারও কোন আবশ্যকতা নাই। মিলিতোনা যখন বাহিরে যাইত, তখন ঘরটা খোলাই থাকিত, ঘরের ভিতর আসিলে তখন খুব যত্নে ঘরটা বন্ধ করিত। তবে কি না, এই ক্ষুদ্র কোটরটিতে একটি বহুমূল্য রত্ন নিহিত—চোরের চোখে উহা রত্ন না হউক; প্রেমিকের চোখে রত্ন বটে।

ঘরের দেওয়াল কাগজে মোড়া নয়, কিংবা রং-করা নয়—শুধু সাদাসিধে রকমে চূণ-করা। একটা আয়না আছে—কিন্তু তাহার উপর সুন্দরীর কমনীয় মূর্ত্তির অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব পতিত হয়। একজন সিদ্ধ-পুরুষের ক্ষুদ্র একটি মূর্ত্তি, তার সঙ্গে কৃত্রিম পুষ্পভূষিত দুইটা ফুলের টব; একটা দেবদারু কাঠের টেবিল, দুইটা কেদারা; একটা ছোট পালঙ্ক, তার উপর একটা মস্‌লিনের তোষক পাতা—এইগুলি ঘরের একমাত্র আস্‌বাব। তা ছাড়া কাঁচের উপর আঁকা মেরি-মাতার ছবি, ঋষিমুনির ছবি রহিয়াছে; এবং একটা খঞ্জনী, গীতার (এক প্রকার সেতার) যন্ত্র হইতে ঝুলিতেছে।

মিলিতোনার কাম্‌রাটি এইরূপ ভাবে সজ্জিত। যাহা জীবনযাত্রার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এই প্রকার জিনিস ছাড়া উহার ভিতর আর কোনও জিনিস না থাকিলেও উহার মধ্যে দুঃখ-দুর্দ্দশা-সুলভ একটা নীরস কঠোর ভাব লক্ষিত হয় না। একটা আনন্দের রশ্মিচ্ছটায় সমস্ত কাম্‌রাটি যেন আলোকিত। লাল ইঁটের মেজে বেশ নয়ন-রঞ্জন, ঘরের ধব্‌ধবে কোণগুলায় চাম্‌চিকার কালো ছায়া পড়ে না। চাঁদোয়া-ছাদের কড়ি-বর্গার ভিতরে কোন মাকড়সা জাল বিস্তার করে নাই।

চারি দেওয়ালে ঘেরা এই কাম্‌রাটির ভিতর

সবই বেশ নয়নানন্দকর, হাস্যময় ও উজ্জ্বল। ইংলণ্ডে, আস্‌বাবের এই অপ্রাচুর্য্য নগ্নতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু স্পেন-দেশের লোকের চোখে ইহাই আয়েষের পরাকাষ্ঠা। বৃদ্ধা এতক্ষণে হাঁস্‌ফাঁস করিয়া কোনপ্রকারে সিঁড়ির শেষে আসিয়া পৌঁছিল। তারপর মিলিতোনার এই রমণীয় কোটরটিতে প্রবেশ করিয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িল। দেহভারে চৌকিটা মড়মড় করিয়া উঠিল—মনে হইল ভাঙ্গিয়া পড়ে বুঝি।

"দেখ মিলিতোনা, ঐ জলের কুজোটা নাও দিকি, আমি একটু জল খাবো, আমার যেন দম আট্‌কে যাচ্চে, সেই ষাঁড়ের-লড়ায়ের জায়গার ধূলোয় আর সেই পুদিনার লজিঞ্জিস্‌ খেয়ে আমার গলা যেন পুড়ে যাচ্চে।"

তরুণী সহাস্যমুখে, বৃদ্ধার ঠোঁটের উপর জলপাত্রটা নোয়াইয়া ধরিয়া উত্তর করিল :—

—অত মুঠো মুঠো লজিঞ্জিস্‌ না খেলেই ভাল হ'ত।

আল্‌দঞ্জা তিন চার ঢোঁক জল পান করিল তাহার পর হাতের উল্‌টা পিঠ্‌টা দিয়া মুখ মুছিয়া দ্রুত-তালে হাত-পাখা নাড়িয়া বাতাস খাইতে লাগিল। তারপর একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল :—

"লজিঞ্জিসের কথায় মনে পড়ে গেল, জুয়াঙ্কো আমাদের দিকে কি ভয়ঙ্কর ভাবে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল! আমি নিশ্চয় করে বলছি সেই সুশ্রী ভদ্রলোকটি তোর সঙ্গে কথা কচ্ছিল বলে, জুয়াঙ্কোর হাত ফস্‌কে গিয়েছিল, তাই ষাঁড়টাকে মারতে পারেনি। জুয়াঙ্কোর বাঘের মত সন্দিগ্ধ মন, যদি সে ভদ্রলোকটিকে আবার দেখ্‌তে পেত, তাহলে তাকে কিছু শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ত না। সে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারত কিনা সন্দেহ।"

—আশা করি, জুয়াঙ্কো কারও উপর ও-রকম দারুণ অত্যাচার করবে না। আমি সেই যুবা পুরুষটিকে খুব অনুনয় করে বলেছিলুম—আমার সঙ্গে যেন আর একটি কথাও না বলেন। তখন থেকে আমাকে তিনি কোন কথাই বলেননি। আমি ভয় পেয়েছি বুঝ্‌তে পেরে আমার উপর তাঁর দয়া হয়েছিল। কিন্তু জুয়াঙ্কোর এই ভীষণ ভালবাসার কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার!

বৃদ্ধা উত্তর করিল :—

"এ ত তোরই দোষ! তুই এত রূপসী হলি কেন?"

এই দুই রমণীর মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় লোহার আঘাতের মত দরজায় একটা জোরাল ঘা পড়িল। কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। মানুষ-ভোর উচ্চে, স্পেন দেশের প্রথা অনুসারে একটা উঁকি দিয়া দেখিবার গরাদে-দেওয়া রন্ধ্র-গবাক্ষ আছে, বৃদ্ধা উঠিয়া তাহার ভিতর দিয়া দেখিতে গেল। সেই রন্ধ্র দিয়া জুয়াঙ্কোকে দেখিতে পাইল। তাহার রৌদ্র-দগ্ধ মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা আল্‌দঞ্জা দরজার কপাট খুলিয়া দিল, জুয়াঙ্কো প্রবেশ করিল। সার্কাস-রঙ্গভূমিতে তাহার চিত্ত যে প্রচণ্ড আবেগে আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনো যেন তাহার মুখে প্রকাশ পাইতেছে। একটা দারুণ রোষ তাহার হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়াছে স্পষ্টই বুঝা যাইতে

জুয়াঙ্কো স্বভাবত অভিমানী লোক। প্রথম পরাভবে দর্শকেরা ধিক্কার দিয়াছিল, তাহার পর আবার জয়ী হইলে তাহারা বাহবা দেয়—কিন্তু এই শেষের সাধুবাদে পূর্ব্বদত্ত ধিক্কারের অপমান জুয়াঙ্কোর হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই। সে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিল।

বিশেষত সেই যুবাপুরুষ মিলিতোনার সহিত কথা কহিতেছে দেখিয়া তাহার রোষ চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল, এবং রঙ্গাঙ্গন হইতে বাহির হইয়া কখন সেই যুবককে পাকড়াও করিবে তজ্জন্য সে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। এখন তাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? নিশ্চয়ই সে মিলিতোনার অনুসরণ করিয়াছে—তাহার সহিত আবার কথা কহিয়াছে।

এই কথা মনে হইবামাত্র, ছোড়ার সন্ধানে তাহার হস্ত যন্ত্রবৎ একবার কটিবন্ধটা হাত্‌ড়াইয়া দেখিল। জুয়াঙ্কো ঘরে প্রবেশ করিয়া দুইটা চৌকীর একটা চৌকীতে বসিল। মিলিতোনা জান্‌লায় ঠেস্ দিয়া, একটা ঝরিয়া-যাওয়া লাল জবার বীজ-কোষ কাটিয়া লইতেছিল; বৃদ্ধা আপন মুখের উপর পাখার বাতাস দিতেছিল। এই তিন জনের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজমান। প্রথম বৃদ্ধাই এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। সে বলিল:—

"তোমার হাতের ব্যাথাটা কি সর্ব্বদাই থাকে?" মিলিতোনার প্রতি একটা সুগভীর কটাক্ষ নিঃক্ষেপ করিয়া জুয়াঙ্কো উত্তর করিল:—

—"না"।

তখনি কথাবার্ত্তাটা থামিয়া না যায় এই উদ্দেশে বৃদ্ধা আবার বলিল:—

—"ঐ জায়গাটায় নুনজলের পটি বাঁধ্‌লে ভাল হয়।"

কিন্তু জুয়াঙ্কো কোন উত্তর করিল না। একটি মাত্র চিন্তা যাহা তাহার মনকে দখল করিয়া বসিয়াছিল তাহার দ্বারা চালিত হইয়া জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে বলিল:—"বৃষযুদ্ধের রঙ্গভূমিতে তোমার পাশে যে যুবকটি বসেছিল সে কে?"

—"তার সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ; আমার সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় নেই।

—"কিন্তু তুমি কি চাও তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে?

—এ অনুমানটা বেশ ভদ্র রকমের অনুমান দেখ্‌ছি। ভাল, আলাপ পরিচয়টা কখন হবে বল দিকি?

—আলাপ পরিচয় হবে কি,—আগেই ত হয়ে গেছে।

বার্ণিস্-করা বুট-পরা, সাদা দস্তানা-পরা, শোভন কোর্ত্তা-পরা সেই লোকটাকে আমি খুন করব।"

—জুয়াঙ্কো তুমি যে পাগলের মত কথা বলচ। আমার সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিত হয়ে কারও উপর সন্দেহ করবার অধিকার কি আমি তোমাকে দিয়েছি? তুমি বলে থাক, তুমি আমাকে ভালবাসো; সে কি আমার দোষ? আর তুমি আমাকে সুন্দরী বলে মনে কর বলেই আমি কি তোমাকে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে পূজো করতে বস্‌ব?"

বৃদ্ধা বলিল:—"সে কথা সত্যি; এর

ভিতর ত কোন জোর-জবর্দ্দস্তি নেই; কিন্তু তবু আমি বলি, তোমাদের যোড়াটি দিব্যি মানাবে। ঠিক যেন মাধবীলতা তমাল গাছকে জড়িয়ে থাক্‌বে। তোমরা দুজনে হাতধরাধরি করে যখন নৃত্য করবে, তখন তা দেখ্‌তে স্বর্গের অপ্সরারাও নীচে নেমে আস্‌বে।

—"হাবভাব দেখিয়ে তোমার মন ভোলাতে আমি কি কখন চেষ্টা করেছি জুয়াঙ্কো? অপাঙ্গ কটাক্ষ করে' মুচ্‌কি হাসি হেসে, মোহন অঙ্গভঙ্গি করে তোমার মন আকর্ষণ করতে কখনো কি চেষ্টা করেছি?"

গভীর কণ্ঠস্বরে জুয়াঙ্কো উত্তর করিল:—

—"না"।

—আমি কখনো তোমার কাছে কোন অঙ্গীকারে বদ্ধ হই নি—তোমাকে কোন রকম আশাও দিই নি। আমি তোমাকে বরাবরই বলে আস্‌ছি, "আমাকে ভুলে যাও"। তবে কেন তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিচ্চ; কেন অকারণে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে আমাকে বিরক্ত করচ? আমাকে তোমার ভাল লেগেছে বলে আমি কারও পানে তাকাতে পারব না—আর তাকালেই একজনের মৃত্যুদণ্ড ভোগ কর্‌তে হবে—এ কেমন কথা? তুমি-কি চাও, একটা গভীর বিজনতা আমার চারিদিক্ ঘিরে থাকে? "লুলে" নামে একটি ভাল ছোক্‌রা যে আমাকে আমোদ দিত, আমাকে হাসাত, তুমি তাঁকে খোঁড়া করে দিলে; তোমার বন্ধু "জিনে" আমার হাত একটু ছুঁয়েছিল বলে তুমি মেরে তার হাড় ভেঙ্গে দিলে। এতে কি মনে কর তোমার কোন সুবিধা হবে? আজ আবার সার্কাসে তুমি কি বাড়াবাড়িই করলে;—আমার উপর নজর রাখ্‌তে গিয়ে ষাঁড়টা তোমার কাছে এসে পড়ল—তুমি ভাল করে তাকে আঘাত করতেই পারলে না।"

—"কিন্তু আমি যে মিলিতোনা তোমাকে ভালবাসি, সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি; তোমা ছাড়া আমি যে জগতে আর কাউকে দেখি না। যখন তুমি আর একজনের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌ছিলে, তখন ষাঁড়ের সিঙের দারুণ আঘাত পেয়েও আমি তোমা থেকে চোখ্ ফেরাতে পারি নি। একথা সত্যি আমার নরম প্রকৃতি নয়; কেননা, আমি হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে আমার সারা যৌবনটা কাটিয়েছি। প্রতি দিনই আমি প্রাণী হত্যা করি কিংবা নিজে হত হবার মত সঙ্কটাবস্থায় আপনাকে স্থাপন করে থাকি। রমণীর মতো সেই সব সুকুমার ক্ষীণকায় যুবক যারা সমস্ত দিন কেশ কুঞ্চিত করে, সংবাদ পত্র পাঠ করে সময় কাটায়, তাদের মতো মিষ্টি নরম ভাব আমার নেই। তুমি যদি আমার না হও, অন্ততঃ তুমি আর কারও হতে পাবে না!"—একটু থামিয়া এবং টেবিলে সজোরে একটা ঘা মারিয়া জুয়াঙ্কো এইরূপ উত্তর করিল। তাহার পর, চট্ করিয়া উঠিয়া এই কথা-গুলি গুন্‌গুন্ করিয়া বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল,—"আমি তাকে পাকড়াও করবই করব আর তার চোখে তিন ইঞ্চি গভীর ছোরা না বসিয়ে ছাড়ব না।"

এখন আবার আন্দ্রের নিকট ফিরিয়া যাওয়া যাক্। আন্দ্রে পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া সেই যুগলবন্ধ গানের অন্তর্গত তার অংশটা

বেসুরো গায়িতেছে। তাহাতে ফেলিসিয়ানা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। অমন সৌখীন সান্ধ্য-সম্মিলন—কিন্তু আন্দ্রের কিছুই ভাল লাগিতেছে না—সবই তাঁর নিকট বিরক্তিকর ঠেকিতেছে। আন্দ্রে মনে মনে মার্কিসকে বারম্বার জাহান্নামে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, একথা বলা বাহুল্য।

তরুণী মিলিতোনার সেই অনিন্দ্য সুন্দর পাশের মুখ, তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশি তাহার আরবী ধরণের নেত্র-যুগল, তাহার জংলী ধরণের মাধুর্য্যশ্রী, তাহার চিত্রশোভন পরিচ্ছদ—এইসব মনে করিয়া, মার্কীসের সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ সভায় সমবেত সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া বেশভূষায় ভূষিতা প্রৌঢ়াদের সঙ্গ আন্দ্রের আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। তাঁহার বাগ্‌দত্তা ভাবী পত্নীও তাহার চোখে নিতান্ত কুৎসিত বলিয়া মনে হইল। মিলিতোনার প্রেমে একেবারে আত্মহারা হইয়া আন্দ্রে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য আন্দ্রে যে রাস্তা দিয়া চলিতেছিল, সেই রাস্তায় কে-যেন পিছন হইতে তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল। সে আর কেহ নহে—সে পেরিকো। সে সম্প্রতি যে-নূতন আবিষ্কার করিয়াছে, বক্‌শিসের আশায় আন্দ্রেকে সেই সংবাদ দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি আসিয়াছে। ছোক্‌রাটা বলিল :—

"কর্ত্তা, "পোডার" রাস্তার ডান্ দিকের তিনটে বাড়ীর পরে তার বাড়ী। জল ঠাণ্ডা করবার জন্য একটা জলের কুঁজো হাতে করে জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌লুম।

ক্রমশঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান্ধিজী

*

দিনে দীপ জ্বালি' ওরে ও খেয়ালী! কি লিখিস্ হিজিবিজি?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী!' 'গান্ধিজী!'
বাতায়নে ত্থাখ্ কিসের কিরণ!—নব জ্যোতিষ্ক জাগে!
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ,—কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে!
জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশান-ধারী,
পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নর-নারী!
কৃষাণের বেশে কে ও কৃশ-তনু,—কৃশাণু পুণ্য ছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি!

কৌঁসুলি-কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি
কার মৃদুবাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী!
ক্রোর টাকা কার ভিক্ষা-ঝুলিতে,—অপরূপ অবদান,—
আগুলিয়া কারে ফেরে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান!
আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁঝি
কেরে ও খর্ব্ব সর্ব্বপূজ্য?—'গান্ধিজী!' 'গান্ধিজী!'

* *

মহাজীবনের ছন্দে যে জন ভরিল কুলিরও হিয়া,
ধনী-নির্ধনে এক ক'রে নিল প্রেমের তিলক দিয়া;
আচরণ যার কোটি কবিতার নির্ঝর মনোরম,
কর্ম্মে যে মহাকাব্য মূর্ত্ত, চরিতে যে অনুপম;
দেশ-ভাই যার গরীব বলিয়া সকল বিলাস ছাড়ি,
'গড়া' যে পরে গো ফেরে খালি পায় শোয় কম্বল পাড়ি,
তপস্যা যার দেশাত্মবোধ ছোটোরও ছোটোর সাথে,
দিন-মজুরের খোরাকে যে খুসী তিন আনা পয়সাতে,
স্বেচ্ছায় নিয়ে দৈন্য যে, কাছে টানিল গরীব লোকে,—
ভালো যে বাসিল লক্ষ কবির ঘন অনুভূতি-যোগে,
অহিংসা যার পরম সাধনা হিংসা-সেবিত বাসে,
আসন যাহার বুদ্ধের কোলে টলষ্টয়ের পাশে,
দীনতম জনে যে শিখায় গূঢ় আত্মার মর্য্যাদা,
চিত্তের বলে লঙ্ঘিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাধা,
বীর-বৈষ্ণব—বিষ্ণু তেজেতে উজল যে জন ভিজি,
ওই সেই লোক ভারত-পুলক ওই সেই গান্ধিজী!

* *

কাফ্রির ভিটা আফ্রিকা-ভূমে প্রিটোরিয়া নগরীতে,
বারে বারে ক্লেশ সহিল যে ধীর স্বদেশবাসীর প্রীতে,
উপনিবেশের অপহুজুরের না মানি' জিজিয়া-কর,
মুদি-মাকালিরে আত্মার বলে শিখাল যে নির্ভর,
বারণ যাদের ওঠা ফুট্‌পাথে তাদেরি স্বজাতি হ'য়ে
ফুটপাথে হাঁটা পণ যে করিল গোরার চাবুক স'য়ে,
মার খেয়ে পথে মূর্চ্ছা গিয়েছে পণ যে ছাড়েনি তবু,
বারে বারে যারে জরিমানা ক'রে হার মেনে গোরা প্রভু—

রদ্ ক'রে বদ্ আইন চরমে রেহাই পেয়েছে তবে!
ধীরতায় বীর সেরা পৃথিবীর, নাই জোড়া নাই ভবে!
প্লেগের প্লাবনে কুলি-পল্লীতে নিল যে সেবা-ব্রত,
বুয়ার-লড়াইয়ে জুলুর যুদ্ধে জখমী বহিল কত,
কৌঁসুলি-কুলি-মুদি-মহাজনে পল্‌টন গ'ড়ে নিয়ে
উপনিবেশীর কথা-বিশ্বাসে খাটিল যে প্রাণ দিয়ে,
কাজের বেলায় ইংরেজ যারে মেনেছিল কাজী ব'লে
কাজ ফুরাইলে পাজী হ'ল হায় বর্ণ-বাধার গোলে!
কথা রাখিল না যবে হীনমনা কথার কাপ্তেনেরা,
কায়েম রাখিল বকেয়া যুগের জিজিয়া—ক্ষোভের ডেরা,
তখন যে জন কুলির ধাতুতে বৈষ্ণবী সেনা সৃজি,
ধৈর্য্য-বীর্য্যে মোহিল জগৎ এই সেই গান্ধিজী!

* * * *

সাগরের পারে স্বদেশের মান রাখিল যে প্রাণপণে,
গোরা-চোষা দেশে নিগ্রহ সহি' নিগ্রো-কুলের সনে,
বিদেশে স্বদেশী বটের চারায় রোপিয়া যে নিজ হাতে
বিশ্বাস-বারি সেচনে বাঁচাল বাওবাব-আওতাতে,
ভারত-প্রজারে চোরের মতন থানায় থানায় গিয়ে,
নাম লেখাইতে হবে শুনে, হায়, আঙুলের টিপ্ দিয়ে,
যে বিধি অবিধি তারে নির্ম্মূল করিবারে বিধি ঠেলে
দেশ-আত্মায় অপমান হ'তে বাঁচাতে যে গেল জেলে,
গেল চ'লে জেলে জ্বালাইয়া রেখে পুণ্য-জ্যোতির জ্বালা
ভয়-তরণের সুধা-ক্ষরণের উদাহরণের মালা!
ধায় দেশী কুলি দেশী কুঠিয়াল না শোনে কাহারো মানা,
দেখিতে দেখিতে উঠিল ভরিয়া যত ছিল জেলখানা,
মর্দ্দে-মেয়েতে চলিল কয়েদে দলে দলে অগণন,
স্বেচ্ছায় ধনী হ'ল দেউলিয়া,—তবু ছাড়িল না পণ!
ক্ষুধিত শিশুরে বক্ষে চাপিয়া দেশ-প্রেমী কুলি-মেয়ে,—
ইঙ্গিতে যায় কষ্টের কারা বরণ করেছে ধেয়ে,
দীক্ষায় যার নিরক্ষরেও সাঁতারে দুঃখ-নদী,
বুকে আঁকড়িয়া সত্য-লব্ধ মর্য্যাদা-সম্বোধি!

তামিল-যুবক মরিয়া অমর যে পরশ-মণি ছুঁয়ে
চির-পদানত মাথা তোলে যার মন্ত্র-গর্ভ ফুঁয়ে,
পুলকে পোলক্ মিতালি করিল যাঁর চারিত্র্য-গুণে,
ভারতে বিলাতে আগুন জ্বলিল যার সে দীপক শুনে;
বাঁধিল যাহারে প্রীতি-বন্ধনে বিদেশীরও রাখী-সূতা
ভেট যারে দিল প্রেমী অ্যানড্রুজ্ অযাচিত বন্ধুতা।
আপনার জন বলি' যারে জানে ট্রান্স্‌ভাল হ'তে ফিজি,—
জীর্ণ খাঁচার গরুড় মহান্!—এই সেই গাজিন্ধী!

* * * * *

এশিয়া যে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা,—
কুলিতে জাগায়ে মহামানবতা নর-নারায়ণ সেবা,—
ধৈর্য্যে ও প্রেমে শিখাল যে সবে কায়-মনে হ'তে খাঁটি,
সত্য পালিতে খেল যে সরল পাঠান চেলার লাঠি,
বিশ্বধাতার বহে যে পতাকা উজল জিনিয়া হেম,
"সত্য" যাহার এক পিঠে লেখা আর পিঠে "জীবে প্রেম,"
সত্যাগ্রহে দহিয়া সহিয়া হ'য়েছে যে খাঁটি সোনা,
দেশের সেবার সাথে চলে যার সত্যের আরাধনা,
অযুত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি,
শবরমতীর বরণীয় তীরে ধ্যানের আসন করি',
অর্জ্জন যার ব্রহ্মচর্য্য, তপের বৃদ্ধি কাজে,
উজ্জ্বল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আঁধির মাঝে,
মেথরের মেয়ে কুড়ায়ে যে পোষে অশুচি না মানে কিছু;
চাকরের সেবা না লয় কিছুতে,—নরে সে যে করা নীচু,
ক্ষুদ্রে মহতে যে দেখেছে মরি আত্মার চির জ্যোতি
দাস হ'তে, দাস রাখিতে যে মানে চিত্তের অধোগতি,
প্রেমময় কোষে বসে যে দেশের শক্তি-বীজের বীজী
অন্তরে বৈকুণ্ঠ যাহার এই সেই গান্ধিজী!

* * * * * *

দর্পীতাপন ভারত-পাবন এই সে বেণের ছেলে,
শুচি-মহিমায় দ্বিজকুলে ম্লান করিল যে অবহেলে,—
কুণ্ঠা-রহিত বৈকুণ্ঠের জ্যোতি জাগে যার মনে,
সাজা নিতে নয় কুণ্ঠিত কর্ত্তব্যের আবাহনে,

নীলকর আর চা-কর-চক্রে কুলির কান্না শুনি,
ফেরে কামরূপে চম্পারণ্যে অশ্রু-মুকুতা চুনি'।
কায়রা-আকালে শাসনের কলে শেখালে যে মর্ম্মিতা,
নিজে ঝুঁকি নিয়া খাজ্‌না রুখিয়া রায়তের চির-মিতা ;
রাজা-গিরি নয় কেবলি হুকুম কেবলি ডিক্রিজারি,
হাল-গোরু ক্রোক আকালেরও কালে করিতে মালগুজারি,
এ যে অনাচার এর ঠাঁই আর নাই নাই ভূভারতে,
রাজায় প্রজায় একথা প্রথম বুঝাল যে বিধিমতে,
সাতশত গাঁয়ে বাজায়ে অমোঘ সত্যাগ্রহ-ভেরী,
প্রজার নালিশ বোঝাতে রাজারে হ'ল নাক যার দেরী,
অভয়-ব্রতের ব্রতী যে, সকল শঙ্কা যে জন হরে,
বিশ্বপ্রেমের পঞ্চপ্রদীপে কুলির আরতি করে ;
আদর্শ যার সুধন্বা আর প্রহ্লাদ মহীয়ান্,
পিতারও হুকুমে করে নাই যারা আত্মার অপমান,
পূজনীয়া যার বৈষ্ণবী মীরা চিতোরের বীণাপাণি,—
রাজারও হুকুমে সত্যের পূজা ছাড়েনি যে রাজরাণী ;
জপমালে যার সারা দুনিয়ার সত্য-প্রেমীর মেল্,
গ্রীসের শহীদ্ সক্রেটিস্ আর ইহুদীর দানিয়েল্,
যার আলাপনে বন্দী মনের বন্ধন হয় ক্ষয়,
তার আগমনী গাও কবি আজ গাও গান্ধির জয়।

* * * * * * *

এশিয়ার হক্, হারুণের স্মৃতি, ইস্‌লাম্ সম্মান,—
মর্ম্ম-বীণার তিন তারে যার পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,
দরাজ বুকেতে সারা এসিয়ার ব্যথার স্পন্দ বহি
সব হিন্দুর হ'য়ে যে, খোলসা খেলাফতে দিল সহি,
চিত্ত-বলের চিত্র দেখায়ে পেল যে পূর্ণ সাড়া
সত্যাগ্রহ-ছন্দে বাঁধিল ঝড়েরে ছন্দ-ছাড়া,
প্রীতির রাখী যে বেঁধে দিল দুহুঁ হিন্দু-মুসলমানে,
পঞ্চনদের জালিয়াঁর জ্বালা সদা জাগে যার প্রাণে,
ভারত-জনের প্রাণ-হরণের হরিবারে অধিকার
নৈযুজ্যের হ'ল সেনাপতি যে রথী দুর্নিবার,

বিধাতার দেওয়া ধর্ম্ম্য-রোষের তলোয়ার যার হাতে
সোনা হ'য়ে গেছে সত্যাগ্রহ-রসায়ণ-সম্পাতে ;
ঘোষি' স্বাতন্ত্র্য শাসন-যন্ত্র আম্‌লা-তন্ত্র সহ
অভয়-মন্ত্র দিয়ে দেশে দেশে ফিরিছে যে অহরহ ;
মহাবাণী যার শকতি-আধার অনুদার কভু নহে
লুকানো ছাপানো কিছু নাই যার, হাটের মাঝে যে কহে,—
"স্বরাজ-প্রয়াসী জাগো দেশ-বাসী, স্বরাজ স্থাপিতে হবে
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়েম করিব তপে।
যা' কিছু স্ববশে সেই তো স্বরাজ, সেই তো সুখের খনি,
আপনার কাজ আপনি যে করে,—পেয়েছে স্বরাজ গণি ;
স্বপাকে স্বরাজ, স্বরাজ স্বকরে নিজের বসন বোনা,
স্বরাজ স্বদেশী শিল্প-পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,
স্বরাজ আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ স্ব-রীতে চলা,
স্বরাজ যা' কিছু অশুভ তাহারে নিজের দু'পায়ে দলা ;
স্বরাজ স্বয়ং ভুল ক'রে তারে শোধরানো নিজ হাতে,
স্বরাজ প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার দুনিয়াতে।
সেই অধিকারে ন্যায় যারা হাত প্রেষ্টিজ্-অজুহাতে
স্বরাজ সে নৈযুজ্য তেমন আম্‌লা-তন্ত্র সাথে।
হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা স্বরাজ স্বপ্রকাশের পথে,
স্বরাজ সে নিজ বিচার নিজেরি স্বদেশী পঞ্চায়তে,
চারিত্র্য-বলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা
কর-গত তার সারা দুনিয়ার সব দৌলৎ-শালা,
হাতেরি নাগালে আছে এর চাবী আয়াস যে করে লভে
অক্ষম ভেবে আপনারে ভুল কোরো না।" কহে যে সবে
আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত্ত যে প্রত্যয়,
পরাজয় আজো জানেনি যে, সেই গান্ধির গাহ জয়।

** ** ** **

হেস না হেস না হ্রস্বদৃষ্টি, হেস না বিজ্ঞ হাসি,
মূর্ত্ত তপেরে শেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসের বিষ-নিশ্বাসে হয় যে প্রাণের ক্ষয়
বিশ্বাসে হয় বিশ্ববিজয়, বিদ্রূপে কভু নয়।

ব্যাঙ্গমা! তোর ব্যঙ্গ এবং বঙ্গ-বাখান রাখ্,
গুঞ্জনে শোন্ ভরি' ভুরি' ওঠে ভারতের মৌচাক,
ভীম্রুলও হ'ল মৌমাছি আজ যার পুণ্যের বলে
তার কথা কিছু জানিস্ তো বল্, মন দোলে কুতূহলে,
জানিস্ তো বল্ মোহনদাসেরে মহাদুষ্মন্ গণি'
কি ফিকির আঁটে সুরা-রাক্ষসী পুতনা বোতল্-স্তনী,
বোতল কাড়িয়া মাতালের, গেল কোন্ তেলি কারাগারে,
কোন্ লাট ঢাকে আশোকের লাট মদের ইস্তাহারে!
জানিস্ তো বল্ কি যে হ'ল ফল আব্কারী-যুদ্ধের,
মঘ-জাতকের অভিনয় সুরু হ'ল কি মগধে ফের!
ওরে মূঢ় তুই আজ্কে কেবল ফিরিস্নে ছল খুঁজে,
খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উতোর যুঝে,
গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল সে কলহ আজ রেখে
ভারত জুড়ে যে জীবন জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।
পারিস্ যদি তো শুচি হ'য়ে নে রে স্নান ক'রে ওই জলে,
চিনে নে চিনে নে মহান্ আত্মা মহাত্মা কারে বলে।
এতখানি বড় আত্মা কখনো দেখেছিস্ কোনোদিন?
—দেশ জুড়ে যার আত্মীয়-প্রিয়—তবু বিশ্বাস-হীন?
দূরবীণ ক'সে বিজ্ঞেরা ঘোষে, "সূর্য্যের বুকে পিঠে
আছে মসী-লেখা!" আলোর তাহে কি হয় কমি এক ছিটে?
সেই মসী নিয়ে হাস্যে তপন বিশ্ব ভরিছে নিতি
রশ্মির ঋণ বাড়ায়ে শশীর ফুলে ফুলে দিয়ে প্রীতি।
কুটিরে কুটিরে মহাজীবনের জেলেছে যে হোমশিখা
দিনমজুরের জনে জনে সঁপি মর্য্যাদা-শুচি টীকা।
পৌঁছে দেছে যে পৌরুষ নব চাষীদের ঘরে ঘরে,
যার বরে ফিরে শিল্পীর গেহ কাজের পুলকে ভরে।
যার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে রে তিরিশ কোটির মন,
দেশের খতেনে যশের অঙ্ক লেখে সাধারণ জন,
আত্ম-বিলোপী কর্ম্মী-সঙ্ঘ যার বাণী শিরে ধরি'
নীরবে করিছে ব্রতের পালন দুঃসহ দুখ বরি',
ছাত্রের ত্যাগে স্বার্থের ত্যাগে পুলকিয়া বহে হাওয়া,
রাজ-ভৃত্যের বৃত্তির ত্যাগে রাজপথ হ'ল ছাওয়া,

যারে মাঝে পেয়ে কাজিয়া থামায়ে হিন্দু ও মোস্লেম,
'আত্মদমন স্বরাজ' সমঝি ভুঞ্জে পরম প্রেম,
মহম্মদের ধর্ম্ম্য-শৌর্য্য যাহার জীবন মাঝে
বুদ্ধদেবের মৈত্রীতে মিলি স্ফুরিছে নবীন সাজে;
সারাটা জীবন খ্রীষ্টদেবের ক্রুশ যে বহিছে কাঁধে,
বিক্ষত পদে কণ্টক পথে 'সত্য' ব্রত যে সাধে;
যার কল্যাণে কুড়েমি পালায় প্রাণমিয়া চরকারে
ভরে ভারতের পল্লী-নগরী কবীরের 'কাল্চারে;'
যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্মহলের খিল্,
পূরা হ'য়ে গেছে যার আগমনে তিরিশ কোটির দিল্,
তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী! গৌড়বঙ্গময়
গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আঁধি

১৮

বেলা তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভুবনেশ্বরীর জোর-তাগিদে সুষমা স্নান সারিয়া ভিজা চুলগুলাকে পিঠের উপর মেলিয়া দিয়া নিখিলের শিয়রে আসিয়া বসিল। নিখিলের জ্বর তখন ছাড়িয়া গিয়াছে, বিছানায় শুইয়া দিদিমার হাত হইতে আঙুর লইয়া একটা-দুইটা করিয়া সে মুখে দিতেছিল। সুষমা শিয়রে বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। নিখিল সুষমার পানে চাহিয়া বলিল,—একটা গল্প বল না মা।

নিখিলের শীর্ণ গালে হাত বুলাইয়া সুষমা সস্নেহে বলিল,—কি গল্প বল্ব, বল?

—সেই শঙ্খমালার গল্পটা, মা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তাহলে তুমি মার কাছে থাকো দাদা, আমি স্নান করে আসি,—কেমন?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল বলিল,—হ্যাঁ।

অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিয়া বলিলেন,—একবার টেম্পারেচরটা দেখলে হয় না? ডাক্তারকে স্নান করতে পাঠালুম, সারা রাত জেগেছে—আর তাও ত একটা রাত নয়, ক'দিনই চলছে। বেচারী নেয়ে কিছু খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিক্। নিখিল দিব্যি কথা কচ্ছে ত! ও ভালই আছে বোধ হয়? বলিয়া তিনি নিখিলের কপালে হাত রাখিলেন। নিখিল বাপের মুখের দিকে চাহিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কেমন আছ,বাবা? ভাল আছ এখন—না?

নিখিল বলিল,—হ্যাঁ।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আর অসুখ করবে না! এবার সেরে উঠবে—সেরে উঠলে রেলে চড়ে কত দূর-দেশে বেড়াতে যাব'খন, কেমন?

নিখিল বলিল,—মার সঙ্গে যাব আমি, বাবা।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আচ্ছা।

সুষমা থার্ম্মোমিটর ঝাড়িয়া অভয়াশঙ্করের হাতে দিলে ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—এখন ভালই আছে, বাবা। আর কেন ওকে কাটি-মাটি নিয়ে জ্বালাতন করছ?

অভয়াশঙ্কর থার্ম্মোমিটরে দেখিলেন,—টেম্পারেচর ৯৭ ডিগ্রী। তিনি বলিলেন,—কি ইচ্ছে কচ্ছে এখন, বল দেখি?

নিখিল বলিল,—মার কাছে গল্প শুনব, বাবা।

নিখিলের স্বর একটু যেন কুণ্ঠিত—ব্যাকুল নিবেদনে ভরা।

অভয়াশঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিলেন না, মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া নিখিলের পানে চাহিলেন, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—তুমি যাও না বাবা, স্নান-টান করে নাওগে। তোমারো ত আর এক-রাত্তিরের ধকল্ যাচ্ছে না। যাও বাবা, এখানে সুষু রইল, আর তোমায় কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে না। তুমি পুরুষ মানুষ, এ-সব কি তোমার কাজ! নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলের ভার তুমি ওর হাতে দিতে পারো। ছেলেও, দেখো, এবার সেরে উঠবে'খন,। আর কোন ভয় নেই, আমি বল্‌চি।

অভয়াশঙ্কর কোন কথা বলিলেন না—নিখিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া-চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি তাহলে নাইতে যাই, বাবা? এদের কাছে তুমি থাকো—কেমন! গল্প শোনো।

নিখিল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—হ্যাঁ।

অভয়াশঙ্কর চলিয়া গেলেন। ছেলে আরাম হইয়া উঠিয়াছে, আর বোধ হয় জ্বর আসিবে না—ইহা ভাবিয়া মনটা হাল্‌কা হইলেও একটা চিন্তা বেদনার বোঝা লইয়া ক্রমাগত ধাক্কা দিতে লাগিল। এই ছেলেকে তিনি প্রাণের অজস্র আদর আর স্নেহ দিয়াও ভুলাইতে পারেন নাই, আর আজ সুষমাকে দেখিবামাত্র তাহার শরীরে-মনে সর্ব্বত্র কি এ হাসির জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল!

ইহাতে দুঃখ কি! বেদনাই বা কেন! নিখিলকে আরামে রাখিবার জন্যই ত সুষমাকে গৃহে আনা! তবে? ছেলেকে সে ভালো রাখিবে, বুকে পূরিয়া রাখিবে—তাহার অত-বড় বেদনাটা মাথা ঝাড়া দিয়া আর না দাঁড়াইতে পারে!

ছেলের আরামের জন্য এই যে আর-একজনকে আনিয়া হৃদয়ের আসনে বসাইয়াছেন, বাপের ইহাতে কতখানি ত্যাগ, কতখানি দরদ—তবু সেই বাপকে সুষমার জন্যই না ছেলে উপেক্ষা করিতেছে! এই অত্যন্ত হীন ক্ষুদ্র চিন্তাটা উদয় হইবামাত্র অভয়াশঙ্করের সমস্ত মন একান্ত কুণ্ঠিতভাবে ছি-ছি করিয়া উঠিল। অতি-বড় দাতার আসনে বসিয়া যে এতখানি দান করিতে পারে, সে এই ছোট্ট দান-টুকুর জন্যও কুণ্ঠিত হয়! অভয়াশঙ্কর জোর করিয়া এ চিন্তাটাকে দুই পায়ে

চাপিয়া মাড়াইয়া দিয়া স্নান করিতে গেলেন।

স্নানান্তে নিখিলকে আবার দেখিতে আসিয়া যখন তিনি দেখিলেন,—নিখিলের পাশে সুষমাও আড় হইয়া শুইয়া তাহাকে গল্প বলিতেছে—নিখিলের সমস্ত প্রাণ সে গল্পে কেমন সাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সে যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সুষমার গল্পের রস প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছে,—সুষমার ভিজা চুলের রাশি বালিশের উপর এলানো! তাহার মুখে-চোখে আনন্দের কি সে দীপ্তি! সহজ সরল কথায় বার্ত্তায় নিখিলকে সে এমন মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে নিখিলের সমস্ত অবয়বে রোগের পাণ্ডুরতা মুছিয়া একটা স্বচ্ছ হাসির লহর খেলিয়া যাইতেছে—তখন তাঁহার প্রাণটা মুহূর্ত্তের জন্য অসহ্য কি এক ভাবের উত্তেজনায় থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ভুবনেশ্বরী তখন অন্যত্র ছিলেন। অভয়াশঙ্করকে দেখিয়া সুষমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—তুমি একটু জিরোওগে,—নিখিল এখন ভালই আছে। আমি ত রয়েছি,—ও বেশ গল্প শুনছে!

অভয়াশঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিলেন, এই পর-মেয়েটির কাছে তাঁহার মাতৃ-হীন পুত্র কি চমৎকার পোষ মানিয়াছে! এতটুকু অস্থিরতা নাই,—কি সহজ প্রফুল্ল ভাব তাহার! আহা, যে ছেলের সুখের জন্য, আরামের জন্য তিনি ব্যাকুল, সেই ছেলেকে সুষমাই ত এমন আনন্দ দিতে পারিয়াছে! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে চিন্তা সমস্ত মনটাকে দংশনের জ্বালায় জর্জ্জরিত করিতেছিল, সে চিন্তার গলা টিপিয়া তিনি মন হইতে দূর করিয়া দিলেন, মনকে বলিলেন,—না, সুষমার কাছে ইহার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা চাইই,—সুষমাকে আর উপেক্ষা করা হইবে না, উপেক্ষা করা চলিবে না!

১৯

দশ-বারো দিন পরে নিখিল পথ্য পাইলে ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—আমায় এবার তোরা ছুটী দে, মা। আমার কাজ সাঙ্গ হয়েছে। এবার অভয়কে দেখে আমার দুশ্চিন্তাও কেটে গেছে—তোর আর ভয় নেই, সুষু।

শেষের কথাগুলার দিকে মনের কিছুমাত্র ঝোঁক দেয় নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া সুষমা বলিল,—তুমি কোথায় যাবে, পিশিমা?

ভুবনেশ্বরী কহিলেন,—বলেচি ত তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব। আমার আর সংসারে থাকা সাজে না মা, থাকা উচিতও নয়।

সুষমা এবার আসিয়া অবধি একটা জিনিষ লক্ষ্য করিতেছিল, সেটা—তাহার প্রতি অভয়াশঙ্করের অতিরিক্ত মনোযোগ, যত্ন! তাহার খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্ব লওয়া, তাহার বিরুদ্ধে মানদার দলের ভিতর হইতে কোনরূপ অভিযোগ উঠিলে গভীর তাচ্ছিল্যে সেগুলাকে উপেক্ষা করা, নিখিলকে তাহারই সঙ্গ দেওয়া—এ-সবগুলায় অভয়াশঙ্করের কি সুগভীর মনোযোগ!

তবু বয়স ত তাহার তরুণ, এই আদর-যত্নের মধ্যে স্বামীর ভালবাসার চেয়ে কৃতজ্ঞতার ভাগটাই যেন বেশী,—এটুকু সে স্পষ্টই বুঝিল। বুঝিয়া সে নিজের মনকে ঠিক করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল! সে যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে আসিয়াছে—অভিনয় করিবার জন্য তাহাকে যে পালাটুকু লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই-টুকুই সে বলিয়া যাইবে! যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী

টানিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারি মধ্যে সে তাহারি শেখানো-মত অভিনয়টুকু সারিয়া যাইবে,—নিজের মনটাকে সে অভিনয়ে মিশাইতে গেলে চলিবে না। আনন্দে মন ভরিয়া উঠিলেও যদি তখন করুণ রসের ভূমিকা অভিনয়ের পালা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে মুখে-চোখে করুণ ভাব ফুটাইতেই হইবে, তেমনি আবার মনটা বেদনায় ভাঙ্গিয়া ছেঁচিয়া গলিয়া গেলেও কৌতুক রসের পালা আসিয়া পড়িলে সেই ভাঙ্গা-ছেঁচা মনটাকেই জোড়া-তাড়ায় খাড়া করিয়া তাহাতে হাসির ফুল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে! হায়রে, এ-জন্মটা এমনি কলের পুতুলের মতই তাহাকে সারা জীবন শুধু অভিনয় করিয়াই যাইতে হইবে!

ভুবনেশ্বরী বাহিরটাই দেখিতে ছিলেন, মনের ভিতরকার অলি-গলির অত তত্ত্ব রাখেন নাই, কাজেই সেদিক্‌কার কিছুই তিনি জানিতেন না। তাই অভয়াশঙ্করের ব্যবহার দেখিয়া ব্যাপারটা তিনি ভাল বলিয়াই বুঝিলেন। সুষমাও ভিতরকার কথা ভাঙ্গিল না—সে মেয়ে মানুষ, স্বামীর ভালবাসা কি বস্তু, আর যন্ত্রটাই যে কি,—এ-দুইটা জিনিসে প্রভেদ কোথায়, সে তাহা খুবই বোঝে। ভুবনেশ্বরী যে সে-সবের কোন সন্ধান পান্ নাই, ইহা দেখিয়া সে আরাম পাইল। আহা, বেচারী! এটুকু জানিয়াই তিনি শেষের কয়টা দিন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দিন্। দুঃখ যা-কিছু, তা' তাহারই থাকুক! নিজের মনটাকে ভাঙ্গিয়া থেঁতো করিয়া বেদনা যতটুকু পাইবার, তাহা পাইয়াও যদি নিখিলকে সে সুখে রাখিতে পারে, নিখিলকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে, তবেই তাহার জীবন সার্থক হইবে! ইহার বেশী কিছু এ-জন্মে সে চাহেও না ত!

ভুবনেশ্বরী বলিলেন—কি বলিস্ তুই? অভয়কে কাল রাত্রে আমি বলেচি, তার অমত নেই। তুইও অমত করিস্ নে মা, আর আমার পায়ে শেকল এঁটে রাখিস্ নে! ভালোয়-ভালোয় বেরিয়ে পড়ি—এর পরে আবার কোন্‌দিন কি ঘটবে, কে জানে! আমি কানেও কিছু শুন্‌তে চাইনে, চোখেও কিছু দেখ্‌তে আস্‌ব না।

সুষমা বলিল—না পিশিমা, তুমি তাই যাও। সত্যিই ত, আমরা নিজেরা যদি পরে কোনোদিন দুঃখই পাই, তাবলে তার মধ্যে তোমায় আর জড়িয়ে আনি কেন! তুমি পরকালের কাজ করগে।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—বেঁচে থাকো, সুখী হও, সবাইকে সুখে রাখো মা। মা-কালীর কাছে এই প্রার্থনা করি, তোমার যেমন বড় মন, এমনি বড় সুখেই সুখী হও তুমি! তবে মধ্যে মধ্যে খোঁজটা খবরটা দিও—নিয়ম করে খপর চাচ্ছি না, তার বড় দোষ,—তবে ন'মাসে ছ'মাসে খপরটা পেলেই চলবে।

সুষমা বলিল—তাই হবে, পিশিমা।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন—নিখিলের সম্বন্ধে তোমায় কোন কথা বলবার নেই—তবে এইটুকু বলে যাই মা, অভয়ের মেজাজ বড় ভালো নয়। তোমার দামও সে বোঝেনি। বুঝ্‌বে বলে মনেও হয় না। যদি কোন দিন বোঝে, তাহলে তার নিজেরই মঙ্গল হবে তাতে—ও সেই দাম বোঝেনি বলেই বল্‌চি, যদি নিখিলকে নিয়ে কোন দিন ওর দুর্ব্বাক্য

এমন হয়ে ওঠে যে তোমার পক্ষে তা সওয়া অসম্ভব, তবু আমায় মনে করে তা সহ্য করো। এইটুকু জেনে রাখিস্ সুযু, যতদিন তুই, ততদিনই নিখিল। তুই যদি কোনদিন নিখিলকে ত্যাগ করিস্ ত জানিস্ সেদিন তার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! তুই ছাড়া তাকে কেউ রাখতে পারবে না।

সুষমা বলিল—তুমি থামো, পিশিমা। এ-সব কি বক্‌তে বস্‌লে, বলো দেখি। আমার কি হয়েচে যে তাকে আমি ছেড়ে যাব! আর যাবই বা কোথায়, পিশিমা? সে ঠাঁইও কি ছাই আছে! বলিয়া সুষমা হাসিয়া উঠিল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন—বলেচি ত মা—ধৈর্য্যের বাড়া গুণ আর নেই। যত বড় কষ্টই পাও, সহ্য করো। সহ্য করাই মনুষ্যত্ব। যে সহ্য করে, ভগবান তার মুখ চাবেনই একদিন,—দুঃখ তার কাটবেই। অধৈর্য্যে সর্ব্বনাশ। সংসারে অধীর হলে চলে না। যে অধীর, সে কোনদিন সুখী হতে পারে না।

শেষের কথাগুলা সুষমার কানেও গেল না। সে ভাবিয়াছিল, কত-বড় আশা লইয়া সে এ-ঘরে ঘর করিতে আসিয়াছিল! এই নিখিল তাহার হইবে, এই নিখিলকে সে সম্পূর্ণ আয়ত্তে-অধিকারে পাইবে, ইহাকে সে নিজের মনের মতই মানুষ করিয়া তুলিবে। ছেলে-বেলায় পুতুল লইয়া খেলিতে বসিয়া তাহাকে যেমন যেমন-খুসী নাড়িয়া চাড়িয়া শোয়াইয়া বসাইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া আরাম পাইয়াছে—সে বিষয়ে কেহ কোনদিন একটা কথাও বলিতে আসে নাই—তেম্‌নি ভাবেই নিখিলকে লইয়া আজ মানুষ করিবে—কেহ সে ব্যাপারে হাত দিতে আসিবে না, বাধা দিবে না! কিন্তু হায়, এ কোথা দিয়া কি হইয়া গেল! সে অন্ধের মত ভবিষ্যৎটাকে হাৎ-ড়াইয়া দেখিতে লাগিল—অন্ধকার, গাঢ় অন্ধ-কার! এখনকার এই যে এই আলোর স্ফুরণ—এ ত বিদ্যুতের ক্ষণিক রেখা রে, শুধু!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে আকাশের দিকে চাহিল। ধৈর্য্য—ধৈর্য্য তাহাকে ধরিতেই হইবে! মস্ত বড় কর্ত্তব্যের ভার সে হাতে লইয়াছে, যেমন করিয়া হোক্, সে কর্ত্তব্য তাহাকে পালন করিতেই হইবে! নিজের গোপন বেদনায় বুক যদি ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, তবু সে তাহাকে ভাঙ্গিতে দিবে না!

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

৫

কুক্ষণে রবীন্দ্রনাথের পনেরো বৎসর পূর্ব্বের লেখা দিয়ে বর্ত্তমান আন্দোলনটীকে সমর্থন করতে গিয়েছিলেম। জবাবদিহির আর অন্ত নাই। ঘরে পরে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হওয়ার যো হ'য়েছে। প্রথম প্রশ্ন এই ঃ—এতদিনে রবীন্দ্রনাথের মতের যে কোনও পরিবর্ত্তন হয়নি তার প্রমাণ কি? প্রশ্ন খুবই সমীচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরিবর্ত্তনই জীবনের ধর্ম্ম। বিশেষতঃ

রবীন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ প্রাণ-মনোময়ী প্রতিভার পরিণতি শেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থগিত হয় না। সাধারণ লোকের মতো বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে মনের সমস্ত পরিণতি সমাধা ক'রে বাকী জীবনটা মিউজিয়মের জীবের মতো তাঁরা কাটান না।

কিন্তু জীবনের পরিণতি প্রাণধর্ম্ম অনুসারেই হয়ে থাকে। পরিবর্ত্তন মূল প্রকৃতিরই অনুসরণ করে। সে তো বাহির হ'তে আসবাব সংগ্রহ ক'রে জীবনটাকে সাজিয়ে তোলা মাত্র নয়। ভিতরের ব্যক্তিটীই বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আপনাকে ক্রমশঃ ফুটিয়ে তোলে। আমি রবীন্দ্রনাথের যে মতগুলি তুলেছি, অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন, সেগুলি তাঁর মূল প্রকৃতির—তাঁর ব্যক্তিত্বেরই অনুগত। তাদের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু আমূল পরিবর্ত্তন একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া ওগুলি লেখার পর থেকে এ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু লেখেন নি বা বলেন নি, যা-থেকে এরূপ পরিবর্ত্তন অনুমান করা সঙ্গত হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—না হয় স্বীকার করা গেল যে, বর্ত্তমান আন্দোলনের মূলতত্ত্ব ও মোটামুটি পদ্ধতিটি বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাতেই প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু আজ যখন সমস্ত দেশ তাঁর ধ্যানলব্ধ সত্যটীকে কাজে পরিণত করার জন্য প্রাণপণ সাধনা আরম্ভ করেছে তখন তিনি নীরব কেন? এর কৈফিয়ৎটা যে আমার দেয় নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই দেয়, সে কথা লেখাই বাহুল্য। কিন্তু ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রেমের ক্ষেত্রে কতকটা সাযুজ্যলাভ স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই কেউ যদি গুরুর কাজের জন্য ভক্ত শিষ্যের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ দাবী করেন, তবে তাঁকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। সুতরাং আমাকেও একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। সেটী এই—যাঁদের সঙ্গে সত্যের মুখোমুখী পরিচয় হয়, তৃতীয় ব্যক্তির মারফতে ঘটে না, তাঁদের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের চোখে একটা জটিল সমস্যার মতই ঠেকে। তাঁদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্যটী তাঁদের সমস্ত চেতনার ক্ষেত্রটীকে এমনি অধিকার ক'রে বসে, যে অন্যান্য অনেক গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়ও তাঁদের নিকট কতকটা অবাস্তব হয়ে ওঠে। কায়মনোবাক্যে সেই সত্যটীকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলাই তাঁদের পক্ষে একমাত্র ব্রত মনে হয়। আমরা সকলেই সহযোগিতা-বর্জ্জন ব্যাপারটার আলোচনা নিতান্ত অমায়িক ভাবেই করে থাকি, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর চেতনায় ও জিনিষটী যে কি মূর্ত্তিতে প্রকট হয়েছে সেটা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বমানবের জ্ঞানের মিলনের সত্যটীও রবীন্দ্রনাথের চেতনায় ঠিক সেইরূপ ভাবেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' জেগেছে। এরূপ অবস্থায় অন্যান্য বিষয়ে কতকটা ঔদাসীন্য মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারেই ঘটে থাকে।

কথাটা মিথ্যা নয় এবং প্রশ্নকর্ত্তারাও নিরস্ত হয়েছেন, কিন্তু আমার নিজের মনে যে সম্পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করেছি একথা ঠিক অকপট চিত্তে বলতে পারিনে। কৈফিয়ৎটার মধ্যে একটা বড়গোছের ফাঁক আছে এবং সেটা আর যারই দৃষ্টি এড়াক্ না

কেন, গুরুদেবের আমোঘ দৃষ্টির সম্মুখে যে আত্মগোপন করতে পারবে না সেকথা নিশ্চয়। সমস্ত ভারতবর্ষের চিত্ত-সমুদ্র এমন ভাবে আলোড়িত কখনো হয়নি এবার যেমন হয়েছে। এ মন্থনে বিষও উঠতে পারে, সুধাও উঠতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর উপদিষ্ট পথে বা লক্ষ্যে যদি কোনও ভুল বা ত্রুটি থাকে, সমস্ত জাতির পক্ষে তার ফল যে কিরূপ সাংঘাতিক হয়ে উঠছে সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নিখিল ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন কেহ নাই যিনি সেই ভুল বা ত্রুটি দেখিয়ে দিতে পারবেন বা দেখিয়ে দিলে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তা শুন্‌তে প্রস্তুত হবে। আর মহাত্মা গান্ধীর উপদিষ্ট লক্ষ্য ও পথ যদি মোটের উপর ভুল-প্রমাদ-শূন্য হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ও অনুমোদন আন্দোলনটাকে কি পর্য্যন্ত যে বল দান করবে, সে কথা লেখার অপেক্ষা রাখে না। যারা "বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করিছে" তাদের সমস্ত দ্বিধা দূর হবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিপুল মঙ্গল-যজ্ঞে সকলেরই ডাক পড়েছে এবং সকলের জন্যই যোগ্য কর্ম্মক্ষেত্র প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আসন যদি আর ক্লেশাদিন খালি প'ড়ে থাকে, তাহলে যজ্ঞের অঙ্গহানি হওয়া সুনিশ্চিত। আন্দোলনটীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত দেশকে প্রেমের রূপে ধর্ম্মের রূপে আত্মার রূপে বলী ক'রে তোলা। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষেই প্রেম ও ধর্ম্মের শক্তি কাহিনীমাত্র, মুখে তারা যতই non-violence প্রচার করুক। ধর্ম্মের বল প্রেমের বল বিশ্বজয়ী এ কথা মুখে বললেও তারা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারে না। আমাদের কামান বন্দুক নাই বলেই আমাদিগকে এই পথ অগত্যা অবলম্বন করতে হচ্ছে—তাদের সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়েই এই কথাটা ফুটে বেরুচ্ছে। এই দুর্ব্বলতাটুকুকে সম্বল ক'রে যারা সঙ্কটের দুর্গম পথে যাত্রা করেছে তারা বল পাবে কোথা হ'তে? জয়ী হবে কিসের জোরে? সুতরাং প্রেমের ধর্ম্মের সত্যের মৃত্যুঞ্জয়-শক্তির প্রতি সমস্ত দেশের একনিষ্ঠ বিশ্বাস জাগিয়ে তোলাই এ আন্দোলনের সব্ চেয়ে বড় কাজ। এই সব্ চেয়ে বড় কাজের আসন শূন্য পথ চেয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের আগমনের জন্য।

আরো একটা গুরুতর কথা আছে। পঞ্জাবের লোমহর্ষণ কাণ্ডের পর সমস্ত দেশ যখন আতঙ্কে জড়ীভূত হয়ে পড়েছিল, তখন রবীন্দ্রনাথই বীর্য্য-দৃপ্ত অকুণ্ঠিত কণ্ঠে তার পুরুষজনোচিত প্রতিবাদ ক'রে দেশের সেই হতবুদ্ধি ভয়-স্তব্ধতা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদ যতই গৌরব-দীপ্ত হোক্ না কেন, তা কথা মাত্র এবং কোনও কথাতেই পঞ্জাবী কাণ্ডের যথার্থ শেষ হতে পারে না। একটা প্রকাণ্ড 'ততঃ কিম্?' পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ভাবের পথের সাধক; সুতরাং এই ততঃ কিম্-এর উত্তর তাঁর নিকট হতে কেউ প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু আজ মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের বুকের ভিতর হতে যে কর্ম্মরূপী উত্তর অভিব্যক্ত ক'রে তুলছেন, তার উপর যদি ভাব-সাধকের ভাবের অরুণ-রেখা-পাত না

হয়, তাহলে যে ছন্দে পঞ্জাব-অত্যাচারের প্রতিবাদ উদ্গীরিত হয়ে উঠেছিল অকস্মাৎ সেই ছন্দ ভঙ্গ হওয়ার দারুণ পীড়ায় সমস্ত দেশের চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠবে। *

যাই হোক এ একটা অবান্তর কথা অর্থাৎ প্রবন্ধের বিষয়-সম্পর্কে, লেখক-সম্পর্কে মোটেই নয়, তাহলে পাঠকদের সময়ের প্রতি এ জুলুমটা করতেম না। এখন আসল বিষয়টীর অনুসরণ করা যাক।

ইংরেজ এত-বড় বিপুল দেশটাকে হস্তামলক ক'রে রেখেচে, এ একটা প্রকাণ্ড এবং কঠোর সত্য। দল বেঁধে চরকার মহিমা কীর্ত্তন করলে এবং গোটা-কতক লোক খদ্দর পরলেই এত-বড় সত্যটা মিথ্যা হয়ে যাবেনা। এই ব্যাপারের পিছনে কাজ করছে ইংরেজের ক্ষমতা এবং আমাদের অক্ষমতা। সুতরাং তাদের প্রভুত্বটাকে কায়েমী করার জন্য দরকার, এই দুটো জিনিষকেই বাড়িয়ে তোলা। তাদের সমস্ত পলিশির শেষ লক্ষ্যই তাই। ইংরাজের ক্ষমতা নির্ভর করছে প্রধানতঃ তাদের বাহুবল ও বুদ্ধিবলের উপর। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বাহুবল মানে ঢাল খাঁড়া ধনুর্ব্বাণ বা বন্দুক কামান মাত্র নয়। রেল টেলিগ্রাফ এরোপ্লেন কলকারখানা সমস্তই বাহুবলের সামিল। অর্থনীতি শাস্ত্রের নিয়ম গুলিকেও এর মধ্যে ফেললে বোধ হয় বিশেষ ভুল হবে না। জড়শক্তির বিচিত্র লীলা মানুষের বুদ্ধির নিকট যতই ধরা পড়েছে বাহুবলের এলাকা ততই বেড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ ব্যাপারে মানুষের ব্যক্তিগত সাহস বীর্য্য এবং সংখ্যাধিক্যের প্রভাব সেই অনুপাতেই কমছে। ফলে দেখা যাচ্ছে বাহুবল ক্রমেই বুদ্ধিবলে পরিণত হয়ে উঠছে।

ইংরাজের বুদ্ধিবলটাকে ডিপ্লোমেসী নামে উল্লেখ করলেই ও-জিনিষটার যথার্থ পরিচয় দেওয়া হবে। ইংরাজ রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই ও-জিনিষটার বহুদিন হতে অনুশীলন ও সেবা করে এসেছে এবং ওতে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। আমাদের মত নগণ্য জাতির তো কথাই নাই, পৃথিবীর বড় বড় দুর্দ্ধর্ষ জাতিগুলোকেও অবহেলে দাবার বোড়ের মতো চেলে সে কিস্তিমাৎ করে আসছে। বিগত জর্ম্মণ যুদ্ধে আমেরিকা যে কি করে দলে ভিড়িয়ে নিয়ে যুদ্ধের গতিটা একেবারে বদলে দিলে, সে কথা সকলেই জানেন। ডিপ্লোমেসী জিনিষটা হচ্ছে পরের ও নিজের শক্তি ও দুর্ব্বলতার কেন্দ্রগুলিকে সম্যকরূপে জেনে সেই জ্ঞানটাকে কাজে লাগানো। আমাদের শক্তি ও দুর্ব্বলতার কেন্দ্রগুলি ইংরাজের নখদর্পণে বিরাজ করছে। আমাদের চেয়ে এ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান এত বেশী যে তুলনাই হয় না। তারা ভারতবর্ষের জমিটাকে যেমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে Exploit করছে, আমাদের শক্তি ও দুর্ব্বলতার ক্ষেত্রগুলিও আমাদের চরিত্রকেও ঠিক সেই ভাবেই Exploit করছে।

এই ডবল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ইংরাজ যে প্রকাণ্ড আধিপত্যের ইমারত খাড়া

* ইঙ্গিতজ্ঞেয়া যাই মনে করুন, সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে যে দুচারটে কথা বলেছেন, তা থেকে এ অনুমান করা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বতন মতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটেছে অথবা বর্ত্তমান আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি নাই।

করে তুলেছে তার দিকে নজর পড়লে আমাদের কোনও কিছু ভরসা করার জোর-টুকু পর্য্যন্তও একেবারে উড়ে যায়, মনটা দারুণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবস্থাটা দাঁড়ায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরু-পাণ্ডবের সজ্জিত সেনার মধ্যে অবস্থিত অর্জ্জুনের মতো—যে মানসিক অবস্থাটাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্লৈব্য বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মানুষের আত্ম-মর্য্যাদাবোধ নিজের কাছেও ক্লৈব্যটা একরার করতে রাজী নয়। কাজেই সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য বড় বড় ভাব ও কথার আমদানি করতে হয়—অনেক সময়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই। কুলক্ষয়ের দোষ; মিত্র-দ্রোহের বা অধর্ম্ম ও রাজ্যলাভের হেয়তা ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের যে সকল কথা অর্জ্জুনের মুখ হতে অজস্র ফুটতে লাগল, সেগুলি যদি তাঁর পক্ষে সত্য হতো, তা'হলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অত-বড় আয়োজনটাই সম্ভবপর হতো না। এই আকস্মিক মৈত্রীভাবের উচ্ছ্বাসটা মিথ্যা বলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহ সকরুণ মৃদুব্যঙ্গের সহিত বললেন—

"অশোচ্যানন্ব শোচন্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতা॥

আজ যখন কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আমাদের আহ্বান করছে, আমাদের অনেকেরই অর্জ্জুনের মতো দশা উপস্থিত হয়েছে। যতদিন আমাদের বড় বড় নেতারা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বীর-রসাত্মক ভীমার্জ্জুনের পালা অভিনয় করতেন, ততদিন সে সব বড় বড় উদার ভাব তাঁদের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে সাহস করতো না, আজ সেইগুলির দোহাই দিয়েই তাঁরা আমাদের মনের মধ্যে দ্বিধা এবং নিষ্ঠার মধ্যে দুর্ব্বলতা সঞ্চারের চেষ্টা করছেন। কোনও ভক্ত চূড়ামণি ইংরাজের অধীনতা-পাশের মধ্যে জগৎ-বিধাতার মঙ্গলময় অঙ্গুলির নির্দ্দেশ দেখে আপনাদের অফিস-আদালতের অভ্যস্ত কাজের মধ্যে আত্মপ্রসাদ-লাভের ব্যবস্থা করছেন। এই সকল ভক্ত-জীবনদের নিকট আমার একটী মাত্র সানুনয় প্রশ্ন আছে—তাঁরা পাঞ্জাব উৎপীড়নের মধ্যে ভগবানের কোন অঙ্গুলির নির্দ্দেশ, দেখেছেন? অঙ্গুষ্ঠ না তর্জ্জনীর?" কেউবা প্রতিমাপূজা, জাতিভেদ, বাল্য-বিবাহ, বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন, পতিত জাতির দুরবস্থা, পূর্ব্বরাগমূলক বিবাহের অসদ্ভাব, অবরোধ প্রথা ইত্যাদি যত প্রকার বাস্তবিক বা কাল্পনিক সামাজিক কুপ্রথা আছে বা আছে বলে মনে করেন তার একটা লম্বা ফিরিস্তী বের করে বলেন—"তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঃ—আগে এই সব সামাজিক কুপ্রথা দূর কর, তার পর রাষ্ট্র-নৈতিক স্বাধীনতার কথা মুখে এনো।" যেন পৃথিবীর যে সব দেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে বা ভোগ করছে তারা সকলেই বদরিকাশ্রমের নবসংস্করণ এবং সেখানকার মানুষেরা সকলেই ঈশা মুসা দায়ুদ নবীর অবতার। যেন ক্যাপিট্যালিস্‌মের জীয়ন্ত রায়টার প্রচণ্ড থাবাটা জাতিভেদের উপবাস-কৃশ বুড়ো সিংহটার গলিত নখর শিথিল কবলের চেয়ে কিছুমাত্র কম ভয়ানক এবং lynch pawটা যেন সুসভ্যতম জাতির সহৃদয়তাপূর্ণ পরিহাস মাত্র। আবার সব চেয়ে রহস্যের বিষয় এই—আমাদের সামাজিক কুপ্রথার এই লম্বা ফর্দ্দটা তখনি বেরোয় যখনি সমাজসংস্কার ছাড়া অন্য কোনও কাজ সুরু

করার আয়োজন হয়। এ ছাড়া এ সকল বিষয়ের জন্য যে কারো বিন্দুমাত্র সত্যিকার মাথা ব্যথা আছে, মাসিক পত্রের দু-চারটে দন্তস্ফীত প্রবন্ধ ছাড়া, কোনও প্রেমধৈর্য্য নিষ্ঠাপূর্ণ শুভ অনুষ্ঠানের মধ্যে তার বড় পরিচয় পাওয়া যায় না। কেউবা কোট করে বসেন, যতদিন দেশের তেত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে একজনও নিরক্ষর থাকবে, ততদিন রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির জন্য তাঁরা এক পাও নড়বেন না—মানুষের সহজ সদ্বুদ্ধির চেয়ে কেতাবী বাঁধি গতের উপর তাঁদের এমনি অগাধ বিশ্বাস। এই সব "তোতা-কাহিনী"র নায়কদের নিজেদের প্রতি নজর পড়লে কেতাবী বিদ্যার উপর এমন অগাধ শ্রদ্ধা টিঁকে থাকে কিসের জোরে, সেইটে বুঝতে আমার বিষম ধাঁধা লাগে। কিবা চরিত্রের দৃঢ়তা! কিবা বুদ্ধির সতেজ স্বাধীনতা! কিবা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা! কিবা সত্য-প্রিয়তা! কিবা সার্ব্বজনীন সহানুভূতি! কিবা কঠিন ত্যাগ-স্বীকার!

কারো কারো সূক্ষ্ম বেদনা-বোধ রাষ্ট্র-নৈতিক স্বাধীনতা-লাভের সকল প্রকার প্রকোপের মধ্যেই বিদেশী বিদ্বেষের আঘ্রাণ পেয়ে একেবারে শিউরে ওঠেন। তাঁদের ভাবখানা দেখে মনে হয় যেন দেশবাসীদের নিজেদের মধ্যে দ্বেষ হিংসা বিরোধের লেশ-মাত্র নাই, সকলেই পঞ্চপাণ্ডবের মতো ভ্রাতৃপ্রেম-পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছেন, কেবল বিদেশী কৌরবদের প্রতি বিদ্বেষ-বশতই তাঁদের দেবচরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ হচ্ছে—যেন প্রকাণ্ড একজালা প্রেমের দুধে (Milk of human kindness) এক বিন্দু বিদেশী বিদ্বেষের চোণা পড়ে সমস্ত দুধটা নষ্ট হওয়ার যো হয়েছে। যে জগদ্দল পাথরটা সমস্ত দেশের বুকের উপর চেপে বসে শ্বাসরোধের উপক্রম করেছে—সেটাকে যথাসম্ভব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলার চেষ্টামাত্র দেখে বাল্মীকির মতো তাঁদের মুখ দিয়ে সকরুণ অনুষ্টুপ ছন্দে উদ্গীপিত হচ্ছে, "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বম গম শাশ্বতী সমা—আহা কর কি, কর কি! পাথরটার গায়ে যে বাজবে।" আশা করি পাঠকেরা এ থেকে অনুমান করবেন না আমি কোনও রূপ বিদ্বেষের সমর্থন করি। সেরূপ করলে মাসের পর মাস পরিশ্রম স্বীকার করে এই প্রবন্ধটী লেখার কোনই তাৎপর্য্য থাকত না।

কেউ কেউবা আপনাদের মনের কল্পময়ী কল্পনার সঙ্গে তুলনায় কংগ্রেসের আরব্ধ কাজগুলিকে সংকীর্ণ ও ছোট দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করছেন; ভুলে যাচ্ছেন—

মনোভাব

যতক্ষণ মনে থাকে দেখায় বৃহৎ
কার্য্যকালে ছোট হয়ে আসে।
বহুবাষ্প গলে গিয়ে এক বিন্দু জল।

কিন্তু হায়! এক বিন্দু হলেও উহা জল,—যাতে মর্ত্ত্যজনের তৃষ্ণা নিবারিত হয় কিন্তু বাষ্পময়ী মূর্ত্তির উপর রংএর বৈচিত্র্যের লীলা যতই মধুর হোক না কেন, পৃথিবীর পক্ষে তা বন্ধ্যা।

পশ্চিম খণ্ডে "ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং—ধূমকেতুনিব কিমপি করালং" মহাযুদ্ধরূপী যে কল্কি অবতারের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর ললাট-দেশ হতে League of Nations নামে যে মহাপুরুষের উদ্ভব

হয়েছে; রবীন্দ্রনাথ League of Robbers ও League of steam-rollers বলে যাঁর সম্বর্দ্ধনা করেছেন, অনেকে তাঁকেই ভূভার-হরণার্থ বিষ্ণুর একাদশ অবতার মনে করে, পশ্চিম-মুখো হয়ে তাঁরি শুভাগমনের প্রতীক্ষা করে বসে আছেন। তিনি এসে আমাদের হাতের পায়ের মাথার বুকের শিকল মোচন করবেন, এই তাঁদের বিশ্বাস। হায়রে পর-নির্ভরপরতা! রঙ্গভূমির নটের মতো ক্ষণে ক্ষণে বেশ বদ্‌লে কত বিভিন্ন মূর্ত্তিতেই তুমি আসরে অবতীর্ণ হও। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন তুমি আমাদের সেই চিরকেলে চেনা সারথি যিনি গাড়ীর পিছন দিকে ঘোড়াটাকে জুড়ে মনু-পরাশরের আশ্রমের দিকে ফিরে যাওয়ার অসাধ্য চেষ্টাতেই দুর্ল্লভ মানব-জন্মের অনেকটা অংশই বৃথায় কাটিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক এঁদের নিকট আমার একটী মাত্র সানুনয় নিবেদন আছে—কল্কি অবতারের আসল কাজটাই এখনো বাকী আছে—ম্লেচ্ছ নিবহ নিধন ব্যাপারটা এখনো চোকেনি এবং এই League of Nationsএর আবির্ভাব তারি পাকা পোতা রকম বন্দোবস্তের জন্য। আর সংসারটা মিনার্ভা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ নয় যে পট উত্তোলন করবা-মাত্রই স্বর্গ ও সত্যযুগের সশরীরে আবির্ভাব ঘটে থাকে।

অনেকে আবার বিজ্ঞানের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে একেবারে ঠিক করে বসেছেন, নাঃ, আর কিছুতেই কিছু হবে না, ঐ বিজ্ঞানের ওষুধেই রোগী চাঙ্গা হয়ে উঠে ওদের সঙ্গে লড়তে পারবে। দানবীয় অস্ত্র প্রতিহত করতে দানবীয় অস্ত্রেরই প্রয়োজন। (দান-বীয় শব্দটী রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত অর্থে ব্যবহার করেছি সে কথা বলাই বাহুল্য।) সুতরাং আর সব কাজ ছেড়ে দেশ জুড়ে লেবরেটরী স্থাপনের কাজে লেগে থাক।

দিব্যাস্ত্রের তুলনায় দানবীয় অস্ত্রগুলি হাতে বহরে খুব প্রমাণ-সই দেখে তাদের শক্তি সম্বন্ধে খুব একটা উঁচু ধারণা জন্মানোটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হলেও এটা ভুল এবং খুব বড় বড় শাস্ত্রীরাও এ ভুল করলে ভুলটা অশাস্ত্রীয় ভুলই হবে। কারণ,কোনো শাস্ত্রেই লেখে না যে শেষ পর্য্যন্ত দানবীয় অস্ত্র জয়লাভ করেছিল। সকল অস্ত্রের যিনি দম্ভ চূর্ণ করেছেন, সেই ইন্দ্রের হাতের—দম্ভোলি, তিনি গড়ে উঠেছিলেন দধীচি মুনির আত্ম-বিসর্জ্জনে। আত্মোসৎ-সর্গই দিব্যাস্ত্রের রাজা।

এ হতে কেউ যেন মনে না করে বসেন আমি বিজ্ঞান-শিক্ষার তিলমাত্র বিরোধী। ভগবান যখন এত-বড় বিশ্বজগৎটা রচনা করেছেন, তখন নয়ন মেলে এর সৌন্দর্য্যটাও দেখতে হবে এবং মন মেলে এর গঠন-কৌশল ও শক্তির লীলাও বুঝে নিতে হবে।

মুক্তি মানে নিখিলের সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগের নিবিড় উপলব্ধি। অন্য কথায় একেই ভূমালাভ বলে। বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ প্রেম ও বিশুদ্ধ কর্ম্ম ভূমা-লাভের এই তিন পথ। এই তিন পথ পরস্পর নিরপেক্ষ কি না জানিনে। খুব সম্ভব নয়। কারণ মানুষ গঠিত হয়েছে জ্ঞান প্রেম ও কর্ত্তৃত্ব শক্তি এই তিনের সম্মিলনে। সে যাই হোক জ্ঞান একটা শক্তি। যখন

কেবল মাত্র জানার জন্য জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তখন এই শক্তিটা কাজ করে মনের বন্ধন-মোচনে। কিন্তু যখন কোনও বিশেষ ফল-লাভের লোভে জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তখন সেই শক্তিটা ব্যয় হয় সেই ফল-লাভের কাজে। সুতরাং মনের বন্ধন মোচন হয় না, ভূমা বা মুক্তি লাভ ঘটে না। যখন এই উদ্দিষ্ট ফলটা লোকহিত হয়, তখন জ্ঞানের দিক দিয়ে যে যতটা হয়, মৈত্রী ভাবনা দ্বারা তার কতকটা পূরণ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন এই শক্তিটা পরপীড়ন পরদ্রোহ বা বিলাস-বাসনা চরিতার্থতার কাজে লাগে; তখন মতিটা তিন দিক দিয়েই হয়ে থাকে—মানুষ একেবারে মূলে হাবাত হয়ে যায়। প্রাচীনেরা এই সত্যটী বেশ ভাল করেই বুঝেছিলেন। অথর্ব্ব বেদে বেদ মন্ত্র—অভিচার ঐশ্বর্য্য-লাভাদি কার্য্যে নিয়োজিত হয়েছে বলে উক্ত বেদ বেদ-সমাজে এক ঘরে হয়ে রয়েছে। তন্ত্রের সম্বন্ধও এ কথা খাটে। অনেকগুলি তন্ত্রে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞানের আলোচনা আছে। তা সত্ত্বেও তন্ত্র শাস্ত্র জ্ঞানী সমাজে হেয় হয়ে আছে—মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি ব্যাপারের জন্য শোনা যায় তপোবলকে ব্রহ্ম উপলব্ধি ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করলে তপস্বীদের তপঃক্ষয় হতো। তপঃক্ষয় মানে কোনও ধনক্ষয় নয়—ভূমা-লাভের শক্তির অপচয়। জীবের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ুক্ষয়ে যে ক্ষতি, আত্মার পক্ষে তপঃক্ষয়ে ঠিক সেই ক্ষতি। বিজ্ঞানকে একান্ত ভাবে হীন উদ্দেশ্য সাধনের কাজে নিয়োজিত করার ফলে য়ুরোপের বুকের ভিতর যে ব্যর্থতার আর্ত্তনাদ জাগছে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম চেতনাকে তা অতি-মাত্রায় ব্যথিত করেছে। জাপানও ঐ অবস্থার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে। আমরাই বা এমন কি পুণ্য করেছি যে আমাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল লাভ হবে? সুতরাং যাঁরা ইংরাজকে পরাভব বা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা দেশকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথেই আহ্বান করছেন। হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিজ্ঞানের ভূত-পন্থা তন্ত্রোক্ত পিশাচ পন্থার চেয়ে কোনও অংশেই শ্রেষ্ঠ নয়।

এখনো কেউ বলতে পারেন, হলোই না হয়, ওটা পিশাচ-পন্থা, আমরা ঐ পন্থাই অবলম্বন করবো, ওই পথে রাষ্ট্রীয় স্বরাজ-লাভ যদি নিশ্চিত হয়। চিরবন্দীর মুক্তির লোভ বড় প্রবল, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বড়ই দুর্নিবার। না হয় ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে দিন কতক ধামাচাপা দিয়েই রাখা গেল। কিন্তু ও পথে ফল-লাভের আশা যে বিন্দুমাত্র নাই। আমাদের বিজ্ঞান-চর্চ্চা যতদিন নির্ব্বিষভাবে চলবে, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় তপস্বীরা যতদিন বিশুদ্ধ জ্ঞান-রাজ্যের সীমানা-বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত থাকবেন ততদিন কোনও গোল হবে না। বরঞ্চ ইংরাজ কতকটা সহায়তাই করবে। কিন্তু যেদিন বিষ দাঁত গজাবার সন্দেহ মাত্র হবে সেই দিনই up-to-date বিংশ শতাব্দীর প্রণালীতে সেই বিষ দাঁতের কিরূপ Surgical operation হবে, সে কথা সহজেই অনুমান করতে পারা যায়

ইংরাজকে অর্দ্ধচন্দ্র-প্রদানের এত দিন যে সব ব্যবস্থার চেষ্টা হয়ে এসেছে, সেগুলি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হয় নি, যদি শুধু এই মাত্র তার আপত্তি হতো তাহলেও না হয় মনে করতে পারা যেতো যে বিজ্ঞান-ভক্ত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সুরু মাত্র দেখে খুসী হয়ে আর কোনও আপত্তি না করে, আপনার ঘাড়টাকেই কেবল অর্দ্ধচন্দ্র-গ্রহণের যোগ্যও করতে থাকবে। কিন্তু সেরূপ মনে করার যে কোনও রূপ যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে তা বোধ হয় না। আর যদিই বা ইংরাজের চোখে ধূলা দিয়ে দৈবগতিকে গোটা কতক বিষাক্ত গ্যাস ও শতঘ্নী অস্ত্র প্রস্তুত করে নিতে পারি তাতেই বা কাজ এমনি কে এগোবে? একটা রীতিমত সংঘর্ষ ভিন্ন তো কাজ হাসিল হবে না। বর্ত্তমান কালের এরূপ একটা সংঘর্ষের আয়োজন যে কিরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপার, গত জর্ম্মণ যুদ্ধের কল্যাণে তা কারো আর জানতে বাকী নাই। সেরূপ বিরাট আয়োজন যে বজ্রধরের সহস্র চক্ষুর তলায় বসে কোনও রকমেই হতে পারে, সে কথা কল্পনা করাও যায় না। সে ফাঁড়াও যদি দৈব-গতিকে কাটে তার পরে আস্‌বে সংঘর্ষের মরণালিঙ্গন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে একটা বড়গোছের যুদ্ধদেবতাকে তৃপ্ত করতে গেলে কত লক্ষ নরবলি ও অন্যান্য বলির প্রয়োজন হয় সে কথা লেখাই বাহুল্য। বর্ত্তমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই সব বিজ্ঞান-ভক্তদের একটী প্রধান আপত্তি, এতে কাল্‌চার Culture নষ্ট হবে। চরকার একঘেয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দে কাল্‌চারের পাতাবাহারের গাছের উপর কোনওরূপ বিষের প্রতিক্রিয়া হয় কি না সে কথা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বা শব্দব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক প্রমথ মুখোপাধ্যায় মশায়ই বলতে পারেন। কিন্তু বন্দুক কামানের বারুদের ধোঁয়ায় যে বড় বড় ফলবান বৃক্ষও শুকিয়ে ওঠে একথা সকলেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যদি ওকালতী চাকরী ক্লব কলেজ বজায় রেখে পান চিবোতে চিবোতে স্বরাজ-লাভ সম্ভব না হয় তাহলে বর্ত্তমান আন্দোলনটাই প্রশস্ততর। যদি নরবলি দিতেই হয় তাহলে বর্ব্বরভাবে যুদ্ধ-দেবতার কাছে না দিয়ে ভদ্রভাবে বিচার দেবতার কাছে দিলে বলিও লাগ্‌বে কম, এর কাজটাও হবে পাকা-পোক্ত রকমের। আর একটা ভাব্‌বার কথা আছে। বিজ্ঞান-দেবতাকে মানুষের মগজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সময় বড় কম লাগবে না। ততদিন রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য কোনও চেষ্টা না করে পাঞ্জাবী অত্যাচার বা ততোধিক অত্যাচারগুলিকে নীরবে যদি হজম করতে থাকি, তাহলে বিজ্ঞানের জ্ঞানটা চলন-সই-মতো লাভ করার পূর্ব্বেই জাতির আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানটা এতটা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে যে যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টি সৎকার করাটাই তখন তার সম্বন্ধে একমাত্র কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। আর ইত্যবসরে ম্যালেরিয়া, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও মুক্তি-প্রদানের emancipation কাজটি কতকটা এগিয়ে দেবে, সেটাও ভোলার কথা নয়।

আসল কথা, বিজ্ঞানের দ্বারা কোনও জাতি জয়লাভ করে না—জয়লাভ করে চরিত্রের দৃঢ়তায়, ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, একাগ্র অধ্যবসায়ে, কষ্ট-সহিষ্ণুতায়, ত্যাগ-স্বীকারে

গ্রীকেরা ও ফিনিসিয়েরা রোমকের চেয়ে বিজ্ঞানে অনেক উন্নত ছিল, কিন্তু জুয়টা হলো রোমকের। আবার বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও রোমকেরা ভাণ্ডাল গথ প্রভৃতি জাতিদের প্রবল আক্রমণের স্রোতের মুখে আত্মরক্ষা করতে পারলে না। কারণ তখন তারা কেটো সিসিরো ব্রুটস সিনসিনিটাসের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ দৃঢ় চরিত্রের উন্নত আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। ইংলণ্ডের অধিবাসীদের চেয়ে আমেরিকার উপনিবেশিকেরা শিক্ষার দীক্ষায় জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে নিশ্চয়ই অনেক হীন ছিল, তা সত্ত্বেও তারাই যে জয়লাভ করল তার একমাত্র কারণ তারা Pilgrim Fathers অর্থাৎ ধর্ম্ম যাত্রীদের বংশধর। যে কাজ একমাত্র চরিত্রের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই সাধ্য তা বিজ্ঞানের দ্বারা সেরে নেওয়ার আশা করাই মূঢ়তা।

অসহযোগের আধ্যাত্মিক ভিত্তি :—

ইংরাজ যে একটী বিপুল শক্তির দ্বারা তাদের এই প্রকাণ্ড আধিপত্যকে ধারণ করে রেখেছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং সেটাকে কিছু মাত্র ঠাই-নাড়া করতে হলেও আমাদের পক্ষে দরকার আর-একটা বিপুলতর শক্তির। যিনি যাই বলুন এই শক্তির সন্ধানটাই এখন আমাদের সব-চেয়ে বড় কাজ। বাংলার অতি সুকুমার "স্পর্শ-ক্লেশ-সকাতর" শিরীষ-পেলব কাল্‌চার "(culture) এ কথাটার মধ্যেও বিদ্বেষের গন্ধ পাবেন এমন আশঙ্কা হয়। সুতরাং অত্যন্ত সোজাসুজি খুলি ভাবেই সত্য কথাটা জানিয়ে দেওয়া মনে করচি। ইংরাজের সঙ্গে আমাদের যেরূপ অস্বাভাবিক সম্বন্ধ তাতে যিনি বলেন বিদ্বেষ নাই, তিনি হয় জড়, নয় মিথ্যাবাদী, নয় আত্মপ্রতারিত। এই দেশ-জোড়া বিদ্বেষের বিষে জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সমস্ত দেশটাই মৃত্যুমুখে যেতে বসেছে। সুতরাং বিষয়টাকে মেনে নিয়েই তাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ডাকসাইটে সাপের বিষের ওঝা এসে বললেন—"বলো, নাই" অমনি রোগীও বললেন "নাই," বিষ-ঝাড়ার জন্য যদি এই চিকিৎসাই অবলম্বিত হয়, তাহলে যথা-সময়ে বিষের ক্রিয়ায় রোগী যে ঢলে পড়বে, সে কথা নিশ্চিত। এই বিষ ঝাড়ার একমাত্র উপায় এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধটাকে দূর করে স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করা। অসহযোগ আন্দোলন এই কাজই করতে চাচ্ছে। ইংরাজ বিপুল বোঝার মতো সমস্ত দেশটায় ঠিক মাথার উপর বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে বসে আছে। ফলে দেশের মাথাটা ক্রমেই মাটীর দিকে ঝুঁকে পড়ছে—মাটীসাৎ হওয়ার আর বড় বেশী বিলম্বও নাই। অসহযোগ ইংরাজ-রূপী বোঝাটাকে একেবারে সমুদ্র-পারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়না—তাকে বন্ধুভাবে পাশে বসাতে চায়। এই মাথায় থেকে নামিয়ে পাশে বসানোর চেষ্টাকে ইংরাজ ও তাঁর পরাসক্তেরা যতই বিদ্বেষ-সূচক মনে করুন না কেন, সনাতন ধর্ম্মের দৃষ্টিতে উহাই একমাত্র মঙ্গলের সেতু—উভয় পক্ষেরই। ইংরাজ যদি বিদেশী বিজেতা না হয়ে আমাদের পরম প্রেম-পাত্রী প্রেয়সীও হতেন এবং দৈব-শাপে তাঁকে মাথায় বোয়ে দুর্গম সংসার-পথে চলাটাই আমাদের ললাট

লিপি হতো তাহলেও প্রেমের অমৃতরস বিদ্বেষের বিষরসে পরিণত হয়ে উঠতে বড় বেশী দিন লাগতো না এবং ঐ শাপ মোচন করার কঠোর তপস্যাটাই প্রেমকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র উপায় হোতো।

সে যাই হোক্, কথাটা হচ্ছিল শক্তি-সন্ধানের। মানুষ শক্তি-দম্ভে "আমার শক্তি, আমার শক্তি" বলে যতই আস্ফালন করুক্ না কেন, শক্তিটা কারো একচেটিয়া মহল নয়। সকল শক্তিই সেই পরম শক্তি স্বরূপের। তাকে কালীই বল, হরিই বল বা আর যাই বল তাতে কিছুই যায় আসে না। সংসারে যেখানে যত-কিছু শক্তি সে ঐ একই ঐশী শক্তি। এই এক শক্তি পাত্র-ভেদে জড় শক্তি, প্রাণ শক্তি, বুদ্ধি শক্তি, প্রেম শক্তি বা অধ্যাত্ম শক্তিরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করে তুলেছে। যেদিন মানুষের মধ্যে অধ্যাত্ম শক্তির আবির্ভাব হলো জগতের পক্ষে সে একটা স্মরণীয় দিন। সেদিন জলে স্থলে আকাশে সর্ব্ব-চরাচরে সর্ব্বত্র একটা আনন্দ কোলাহল পড়ে গেল। সে দিন মানুষের প্রতি ঘোষণা প্রচারিত হলো—"বৎস! তোমার জয় হোক! সকল শক্তির উপরই তোমার অধিকার রইল কিন্তু তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আধ্যাত্মিক শক্তির অনুগত করেই সব শক্তিগুলিকে চালনা করো। মানুষের সঙ্গে মানুষের আপন সম্বন্ধ—সত্য সম্বন্ধ—আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। সুতরাং মানুষের প্রতি আধ্যাত্মিক শক্তি প্রেমের শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির প্রয়োগ করোনা।" এই ঘোষণা যে হয়েছিল তার সাক্ষী বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, কবীর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং আরো অনেক মহাপুরুষ। তাঁরা স্বকর্ণে শুনেছেন এবং আজও শুনছেন।

"দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে,
সেই তো বধিরতম শুনেও শোনেনা
সে বাণী।"

এই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশের অবমাননাই মনুষ্য সমাজের সব চেয়ে বড় বিপদ—সব চেয়ে বড় অমঙ্গল এবং সকল অমঙ্গলের নিদান। রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, সমাজতন্ত্র, পরিবার তন্ত্র, এমন কি ধর্ম্মতন্ত্রেও আধ্যাত্মিক শক্তির কাজ বুদ্ধিশক্তি বা জড় শক্তির দ্বারা সারবার চেষ্টার দরুণই মনুষ্য সমাজ জটিলতার আবর্ত্তে পাক খেয়ে খেয়ে মরছে—কিছুতেই অগ্রসর হতে পারছেনা—অন্তত আশানুরূপ নয়। অথচ এই ঘূর্ণিপাকের গতিকেই অগ্রসর হওয়া মনে করে মানুষ দম্ভে স্ফীত হয়ে উঠছে। বিপুল-কায় জটিল গঠন spinning mills এর স্থলে অতি সরল চরকাকে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করলে তাতে মানুষের ইষ্ট হবে কি অনিষ্ট হবে তা ঠিক জানিনে—লব্ধ শক্তির অব্যবহারের ঋণ তাকে সুদ-সমেত শোধ করতে হবে কিনা সে কথাও ঠিক বলতে পারিনে। কিন্তু এ কথা জোর করে বলতে পারি, আধ্যাত্মিক শক্তির অব্যবহারের জন্য মানুষ মনুষ্যত্বের উচ্চ পদবী হতে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমেই জীবত্বে ও জড়ত্বে পরিণত হচ্ছে। এই অধোগতিই মানুষের সব-চেয়ে বড় অমঙ্গল—সব-চেয়ে বড় বিপদ। জড়ত্ব প্রাপ্তিই মানুষের পক্ষে যথার্থ মৃত্যু—পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ধরণীর ঋণ শোধ মাত্র।

সুতরাং যে খোকা হাঁটতে শিখেছে সে যাতে অভ্যাসের জড়ত্ব বশতঃ আ

মাটীতে হামাগুড়ি দিয়ে না বেড়ায়—সেই ব্যবস্থা করাই আজ মানুষের সব চেয়ে বড় কাজ রেডিয়সের গুপ্ত গুণাবলীর আবিষ্ক্রিয়া বা League of Nations গঠন করা নয়।

অতএব এ কথা নিশ্চিত যে স্বরাজ-লাভের উদ্দেশ্যে ইংরাজের প্রতি আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তি ব্যবহার করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। কর্ত্তব্য নয় কথাটার আসল মানে "করবো না, কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্যক্রমে এই আসল মানেটা অনেক বাজে কথার আড়ালে চাপা পড়ে যায়। কর্ত্তব্যের সঙ্গে কাজের এই বিচ্ছেদ সংসারের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

আমার এই লেখাগুলি কোনও প্র্যাকটিক্যাল অর্থাৎ কাজের লোক পড়েন কিনা জানিনে। যদি আমার লেখার সে সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরা ধৈর্য্যরক্ষা করে এসে থাকলেও আর যে পারবেন না, সে কথা একরূপ নিশ্চিত।

তাঁরা বলবেন, "এ-সব বিশুদ্ধ ভাব সম্ভোগের কথা কাব্যেই শোভা পায়, ধুলো-মাটির পৃথিবীতে এর কোনও স্থান নাই। আধ্যাত্মিক শক্তি সাত রাজার ধন মালিক হতে পারে, তাই বলে ঠোকাঠুকি লাগলে লোহার উপর সে যে জয়ী হবে, তার প্রমাণ কি? আধ্যাত্মিক শক্তি যে জড় শক্তি ও বুদ্ধি শক্তির চেয়ে বেশী বলবান এ কথা বিশ্বাস করচো কিসের জোরে?" যখন হাতে-আঙ্গুলে সেরে মণে মেপে ছোট বড় ঠিক করা মানুষের সনাতন অভ্যাস, তখন জড় শক্তির তুলনায় আধ্যাত্মিক শক্তিকে হীনবল মনে করলে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। যাই হোক একবার ভাল করে দেখা যাক।

সমস্যাটির মীমাংসার পূর্ব্বে আমি গোটা-কতক গোড়ার বিশ্বাসের কথা বলা উচিত মনে করি।

(১) আমি বিশ্বাস করি, ভগবান আছেন এবং তিনি প্রেমস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, সত্যস্বরূপ এবং শক্তিস্বরূপ।

(২) আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বের সংস্থান ধর্ম্ম সংস্থান (Moral order), সুতরাং প্রেম, ন্যায় ও সত্যের জয় সুনিশ্চয়।

(৩) আমি বিশ্বাস করি, কোনও মানুষই একেবারে ধর্ম্মজ্ঞান-বিবর্জ্জিত ভগবান পরিত্যক্ত নয়। কারো ধর্ম্মজ্ঞান কিছু প্রস্ফুট, কারো বা কিছু প্রচ্ছন্ন।

এই কয়টী মূল বিশ্বাসের উপর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত। সে কথা পরে আলোচনা করবো।

এই মূল বিশ্বাসগুলি যে সত্য বলে মানে তার কাছে এ প্রশ্নের অর্থই থাকে না—জড়শক্তি প্রবল না অধ্যাত্মশক্তি প্রবল? বাহুবল বড় না ধর্ম্মবল বড়? প্রশ্নটা প্রকৃত প্রস্তাবে দাঁড়ায়—সমস্তটা বড় না অংশবিশেষ বড়? কারণ সবশুদ্ধ সমস্ত বিশ্বকে যা ধারণ করে আছে, তাই ধর্ম্ম। কিন্তু মানুষের প্রমাণ-প্রমেয়ের জ্ঞানটা এমনি টনটনে হয়ে উঠেছে—যে মূল বিশ্বাসগুলিকেও—Logic দিয়ে যাচাই করে না নিলে তার তৃপ্তি হয় না এবং দিব্বি ভালো মানুষ লোকও খামকা বলে বসে—"ঈশ্বরাসিদ্ধে। প্রমাণাভাবৎ।" কিন্তু তিনি নিজে এত বড় স্বয়ং-সিদ্ধ হয়ে উঠলেন কিসের জোরে, লজিক সেই ঝঞ্ঝাটে

প্রশ্নটি তোলা অনাবশ্যক মনে করেন। যাহোক লজিকের নেশাটা মানুষ যখন এতটা অভ্যাস করে ফেলেছে—তখন তাকে একেবারে বঞ্চিত করাটা কিছু নয়—বেচারা ছটফট করে মরবে। সুতরাং দেখা যাক।

মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি যে অন্য সব শক্তির চেয়ে বেশী বলবান তার প্রথম প্রমাণ—মানুষের মধ্যে ঐ শক্তির যে আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয়েছে এই ব্যাপারটা। দ্বিতীয় প্রমাণ মানুষের সমাজের অস্তিত্ব। তৃতীয় প্রমাণ বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রচার ও প্রমাণ। আগামী বারে এই প্রমাণ ও নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

পারুল চাঁপা

সাতটি ভায়ের সব সে ছোট, একটি চাঁপা ফুল—
উঠলো জেগে ভোর না হতে, ডাক দিলে পারুল;
দেখ্‌ছিল সে স্বপ্ন তখন—একটি শাদা জুঁই,
ছোট্টো কচি বল্‌চে তাকে আয়না কাছে তুই;
"পারুল দিদি, পারুল দিদি, এমন সময় ডাকো?"
"রাজার বাড়ী দুর্গা পূজো তাও কি জানিস্‌নাকো?
চল্‌না পাবি রাণীর হাতে দেবীর পায়ে ঠাঁই!"
—"পুণ্যি অত চাইনে দিদি, ভক্তি অত নাই!"

"এমন কথা বলতে আছে?"—পারুল গেল চলে,
ফিরল যখন রক্তগগন স্বর্ণ পড়ে গোলে,
আপন নীড়ে চল্‌ছে পাখী বইচে বাতাস ধীরে,
কাঁপ্‌চে আলো আঁধার যত ঘনিয়ে আসে ঘিরে,
রাজ-বাগানে ফুলের মালি ফিরছে সাজি হাতে,
দেখিয়ে তারে পারুল দিদি কয় কি ইসারাতে;
"রাজবাড়ীতে চাইনে যেতে, আঙুল-নাড়া রাখো,
বড়দা গেছে সকাল বেলা মেজ দাদাকে ডাকো।"

"তারিফ করে রাজকুমারী বাঁধ্‌বে বড় খোঁপা
মোতির মালা জড়িয়ে তোরে রাখবে কেমন তোফা!

ভাগ্যিতে নেই।" বলে পারুল দৌড় দিল রাগে,
দুদিন গেলেই আবার হাজির রাত পোহাবার আগে,
বাজচে তখন বিয়ের বাড়ী নবৎখানায় বাঁশী,
জল সইতে যাচ্চে কারা সঙ্গেতে দাস-দাসী,
পারুল বলে, "ও ভাই চাঁপা, ওদের বাড়ী যাবি—
বাসর-ঘরে রং-তামাসা দেখতে অনেক পাবি!

শুয়ে রূপোর ফুলদানিতে শুনবি পেতে কাণ
হাসির কত ফিনিক ছোটে তরুণ গলার গান,
দেখবি কেমন বিয়ের কনে একটি পলকেই
নিলে চিনে এতদিনের অচেনা বর সেই!
বুকখানি তার কাঁপচে ভয়ে আনন্দে থর্ থর্,
ভাবছে বসে কেমন কোরে আপন হ'ল পর।
থামিয়ে কথা বল্লে চাঁপা—"ব্যাথ্ খানাটা রাখো,
বড়দা গেছে মেজ্ দা গেছে সেজ্ দাদাকে ডাকো।"

দুপুর বেলা গাটা তখন করছে মাটি মাটি,
বিছিয়ে নিয়ে সবুজ রংএর পাতার শীতলপাটি,
তন্দ্রা-আতুর চোখে চাঁপা দেখতেছিল চেয়ে
গাছের তলায় করছে খেলা পাড়ার ছেলে-মেয়ে,
কেউ পরেছে সোনার হেঁসো কেউ বা নীলাম্বরী,
খড়্কে ডুরে কেউ পরেছে কারুর খোঁপায় জরি,
এমন সময় পারুল এসে বল্লে—"চাঁপা শোন্,
ঠেলিস্‌নিকো দিদির কথা, লক্ষ্মী-সোনা-ধন্!

দশ-আনিদের ছোট ছেলের ফুলশয্যে আজ
ডাক্ পড়েছে রং-বেরঙের ফুল কে কোথায় সাজ,
শ্বেত চামেলি সই কামিনী বেলার বড় বোন,
শিউলি পিসি গোলাপ মাসি গেছে এতক্ষণ,
খঁপর শুনে তোরেও আমি ডাকতে এলুম তাই,
ভায়ের ভাল খুঁজে মরা বোনের স্বভাবটাই।"

"চাইনে দিদি তোমার ভালো, আমার কথা রাখো—
থাকতে বড় যায় কি ছোট? ন-দাদাকে ডাকো।"

"অডিকলম ল্যাবেণ্ডার আতর গোলাপজল,
ফুলের পাখায় আলোর মালায় হাসিতে রিচঞ্চল,
ঘুমের-প্রবেশ-নিষেধ ঘরে নতুন বউ আর বর
প্রথম পরিচয়ের আজি পেয়েছে অবসর,
বউ-দিদিরা পাতচে আড়ি দাঁড়িয়ে দরজায়—
বর কি কোরে বউএর গালে প্রথম চুমো খায়!
সব তামাসা দেখতে পাবি ঘরের ভিতর বসে!"
চাঁপার মন সে তেম্‌নি নারাজ, পারুল জ্বলে রোষে।

পরদিনেতে রাখাল ছেলে ফিরতেছে গান গেয়ে,
ত্রয়োদশীর চাঁদটি আছে তাহার পানে চেয়ে,
এক হাতে তার খড়ের আঁটি আর এক হাতে বাঁশী,
টুপ্ করে তার পোড়লো চাঁপা পায়ের কাছে আসি,
ফুলটিকে সে কুড়িয়ে নিয়ে রাখলো কানে গুঁজে,
ঘরে ফিরেই সব-প্রথমে বউটিরে তার খুঁজে,
সাজিয়ে দিল মুখটি তুলে পরিয়ে কালো-চুলে
চাঁদের আলোয় কুড়িয়ে-পাওয়া একটি চাঁপা ফুলে!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা

কলির কালনিমে।—শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। কলিকাতা, মানসী প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য মাতসিকা; এখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস'—বাঙলার পল্লী-জীবনের কাহিনী। একান্নবর্ত্তী বাঙালী পরিবারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'উড়নচণ্ডী' শ্যালক শ্যামসুন্দরের ধূর্ত্তামি ও ইতরামি কি করিয়া বিপ্লব ঘটাইতেছিল, তাহারই কাহিনী অবলম্বন করিয়া উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। প্লটটিতে জান্ তেমন নাই, ব্যাপারটাও কেমন একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামসুন্দর গেঁয়ো বদমায়েস—এই চরিত্রটিই শুধু ফুটিয়াছে। তা ছাড়া পল্লীর হাট-বাজার, পথ-ঘাট, অন্তঃপুর এই কয়টির ছবি বেশ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পল্লীচিত্র হিসাবে 'কলির কালনিমে' ফুটিয়াছে ভালো, তবে উপন্যাস

হিসাবে বহিখানি যে খুব উৎরাইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারি না। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই খুবই ভালো হইয়াছে।

বিশ্ব-সংহিতা। বা খৃঃ বিংশ শতাব্দীর মানব-সমাজ-বিধি। প্রণেতা ও প্রকাশক, শ্রীযুক্ত রামবুদ্ধ দেব। বরিশাল, সারদা যন্ত্রে শ্রীপ্রমদাকান্ত ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র স্বার্থ ও বিবাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়া মানব জাতি কিরূপে এক মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শাখা-সমিতির অধীনে থাকিয়া সামাজিক সর্ব্ববিষয়ে নূতন-গঠিত বিধিসমূহ মানিয়া বিরাট মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহারই আভাষ এই পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

নানা চিন্তা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তি-নিকেতন। বীরভূম, শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি প্রবন্ধ-পুস্তক; সাধনা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বিদ্যা ও জ্ঞান, সাধনের সত্য, আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত, সভাপতির অভিভাষণ, উপসর্গের অর্থবিচার এবং দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব—এই সাতটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। মনস্বী লেখকের চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্য ভারত-বিশ্রুত—প্রবন্ধগুলিতে সেই চিন্তাশীলতা পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ গবেষণার পরিচয় পূর্ণভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। সাধনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—প্রবন্ধ লেখক সবিস্তারে ঐতিহাসিক ধারা-পরম্পরায় এই দ্বিবিধ সাধনার যে সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়—আলোচনার ভাষা যেমন সহজ তেমনি মধুর, ভঙ্গীও তেমনি সরল এবং যুক্তি-তর্কের সমাবেশও ইহাতে তেমনি প্রচুর সুশৃঙ্খল ও মনোজ্ঞ; দার্শনিকতায় তাহা তেমনি মণ্ডিত। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন—"ফাল্‌তো মায়া-কান্না মায়া-ভক্তি, মায়া-চাতুরী ছাড়ো। সাহসে ভর করিয়া এপক্ষ এবং ওপক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হও; সেই বিবাদী ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সত্যদ্বারা অসত্যকে জয় কর—অনুরাগ দ্বারা বিদ্বেষকে জয় কর—মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গলকে জয় কর—এইরূপ কর যে তোমার তাহাতে মঙ্গল হইবে—পৃথিবীর তাহাতে মঙ্গল হইবে।" বিদ্যা এবং জ্ঞান প্রবন্ধে লেখকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত হইয়াছে—তাঁহার মতে সার সত্যের নাগাল পাওয়ার প্রধান উপায় চিত্তশুদ্ধি। গায়ত্রীধ্যান চিত্তশুদ্ধির পরম সহায়। পাণ্ডিত্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া মনকে বালকের ন্যায় নির্ম্মল করিতে হইবে, তবেই সে নির্ম্মল চিত্তে প্রকৃত সত্যের ছায়া পড়িবে। সাধনের সত্য—দার্শনিক প্রবন্ধ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের বিশদ ও সূক্ষ্ম আলোচনায় যে সত্য লেখক নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অবিসম্বাদীভাবে পাঠকের চিত্ত অধিকার করিবে। আর্য্য এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংঘাত প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। সভাপতির অভিভাষণে—বাঙ্গালার সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব—প্রবন্ধে স্বদেশের কার্য্যে বঙ্গীয় যুবকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের যে উপায় লেখক বলিয়া দিয়াছেন, তাহা লেখকের স্বদেশানুরাগের জ্বলন্ত চিত্র, আজি-কালিকার দিনে বিশেষ করিয়া সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রবীণ বিজ্ঞ লেখকের অসাধারণ মনীষা পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যে সব পাঠক উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গসাহিত্যে চিন্তাশীল প্রবন্ধের অভাব বলিয়া অনুযোগ করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে প্রভূত জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ভারতী

৫৫৬/৪৫শ

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৪৫ শ বর্ষ, ২য় খণ্ড

সম্পাদক—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৩২৮ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩৸০

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৮ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
অভিভাষণ	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬০১
অভিনেত্রী (গল্প)	...	শ্রীসোমনাথ সাহা	...	৮১৩
আলো-আঁধারে (গল্প)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬১৬
আঁধি (উপন্যাস)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল		৬৬৪
				৭৭৪, ৮৬৪, ৯৫০, ১০৩৯, ১১৫১
আবেস্তা সাহিত্য	...	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ		৮৭৯, ১০৬৩
আলোচনা—				
বাংলা ভাষার বর্ণ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব		শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী	...	৯১৭
বাংলা ভাষার বর্ণ	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১০৫৩
বাঙ্গালী হিন্দুনারীর মর্য্যাদা	...	শ্রীবেণীমাধব দত্ত বিদ্যাবিনোদ	...	১১০৬
আন্দারের বেড়ি (কবিতা)	...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়এম-এ, বি-এল		৯৮৩
আদি কথা (কবিতা)	...	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়	...	১০৫৪
ইরাণী (কবিতা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	...	৭৯৭
ইরাক্কিস্থানে বাঙালী-মল্ল (সচিত্র)		শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৮৪৫
কয়াধু (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৯৩৯
কলঙ্কের আলো (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	...	৯৯২
খুনী (গল্প)	...	শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু	...	৮৩৫
গরু (কবিতা)	...	"বনফুল"	...	৭২২
গল্পের আরম্ভ (গল্প)	...	শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	৭৩৬
গজল্ গান (কবিতা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	...	৭৬১
চয়ন—				
অভিব্যক্তির নূতন মত (সচিত্র)		শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৬৪৫
আনাতোল ফ্রান্স (সচিত্র)	...	ঐ	...	৮৫৬
এগারোতালা সহর (সচিত্র)		ঐ	...	৬৪৮
ক্যারুসোর কণ্ঠনালী (সচিত্র)		ঐ	...	৮৬৩
কার্কস্থলী-হীনা নারী	...	শ্রীসোমনাথ সাহা	...	৬৫৩
পৃষ্ঠপটে উল্কী চিত্র (সচিত্র)		শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৯৯৪
বিছানায় পড়ার নিয়ম (সচিত্র)		ঐ	...	৭৬৭
বিজ্ঞানের গোয়েন্দা-গিরি	...	ঐ	...	৭৭১

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
চয়ন				
বিপরীতগামী রেলগাড়ী (সচিত্র)		শ্রীসত্যবতী বাঈ দুবে	...	৯৪৪
মেক্সিকোর বিচিত্র অতীত (সচিত্র)		শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৬৫০
মাথা ভাসানো গলা বন্ধ (সচিত্র)		ঐ	...	৬৫২
মানুষের চোখের রহস্য-রশ্মি (সচিত্র)		ঐ	...	৭৬৩
মৎস্য-যুগে ফিরে চল (সচিত্র)	...	ঐ	...	৭৬৮
রূপলক্ষ্মীর দুরদৃষ্ট	...	ঐ	...	৮৬০
ষাট-হাজার বছর আগে (সচিত্র)		ঐ	...	৭৬৫
সাহিত্যসেবীর খেয়াল	...	ঐ	...	৬৫১
সামুদ্রিক জন্তুর চামড়া	...	শ্রীসোমনাথ সাহা	...	৬৫২
স্বপ্ন-নিদ্রা (সচিত্র)	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৮৬১
চরকার আরতি (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৮৩৩
চিরন্তনী (কবিতা)	...	শ্রীজীবনময় রায়	...	১০২০
চিত্রশিল্পী ক্যালডেরণ (সচিত্র)	...	শ্রীমধুব্রত	...	১১৪৬
ছিন্নলিপি (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	...	১১৭২
ছেঁড়া খাতা (কবিতা)	...	শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ	...	৭৫০
জীবন-রহস্য (গল্প)	...	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	৬২৩
জাতের লজিক (কবিতা)	...	শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী	...	৮৯৯
জরু (কবিতা)	...	শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার	...	৯৩২
জাপানী শ্রাদ্ধবাসরে	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৯৬১
দাম্পত্য-সম্বন্ধের আদর্শ বিচার	...	বঙ্গনারী	...	১০৯০
দেনদার (কবিতা)	...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল		৮৪৩
দ্বিতীয় শৈশব (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	...	৯৬৫
ধারা শ্রাবণ (গল্প)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৬৫৩
ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মবিচার	...	শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়	...	৯৮৫
ধ্রুব সত্য (কবিতা)	...	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	...	১১২৪
নিরুপদ্রব সহযোগিতা-বর্জ্জন	...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম-এ		৬৮২, ৭৫৩, ১০৭৯
নিঃসঙ্গ (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	...	৮২৫
নির্ব্বাণ ও জন্মান্তরবাদ	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	১১৯
নবীনের নিবেদন (কবিতা)	...	"বনফুল"	...	১০৬০
পথের সুর (কবিতা)	...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	...	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রত্যাবর্ত্তন (উপন্যাস) ...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৫৯৪,৬৯৭,৮২৮,৯৩৩,৯৬৯, ১১৩৩
পারিজাত (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	১০৮৮
পাশাপাশি (গল্প) ...	শ্রীভূপতি চৌধুরী ...	৬৯০
প্রকৃতির প্রতিশোধ (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	৬৯৩
পল্লী সংস্কার-সমস্যা ...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এস-সি	৭০১
প্রিয়ার উদ্দেশে ...	শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় এম-এ ...	৮২১
পুত্রদান (গল্প) ...	শ্রীমতী নীহারবালা দেবী ...	৮৮৯
পক্ষপাত (কবিতা) ...	"বনফুল" ...	১০০১
বিদেশীর বিপদ ...	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ...	৬৯২
বিক্রমপুর নামের পুরাতত্ত্ব ও তাহাতে ইতিহাসের সূত্র ...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ ...	৭৯৯
বিবাহে পণ-প্রথা ...	"বঙ্গনারী" ...	৮১১,৯৮০
বাঙ্গালী হিন্দুনারীর মর্য্যাদা ...	শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল	৮১৬
ব্রিটিশ শাসনের একযুগ ...	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল	৯০০, ১১২৫
ভীমজননী (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৬০৫
ভিখারিণী (গল্প) ...	শ্রীভূপতি চৌধুরী ...	৮২৬
ভারতের আরতি (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	১০৩৭
মীনু ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৯১
মিলিতোনা (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬০৮, ৭২৩, ৭৮৭, ৯১৯, ১০২১, ১১০৯
মাঠ কোঠায় ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৮০৯
মূল্য (কবিতা) ...	শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা ...	৮২৭
মহামানব (কবিতা) ...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ ...	৯০৭
মেয়েদের শিক্ষা (সচিত্র) ...	শ্রীগৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ,পি-এইচ-ডি পি, আর, এস ইত্যাদি	৯০৯
মারিয়ানা (নাটিকা) ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৯২৫, ৯৯৩, ১০৯৫
মরণ বাঁচনের কথা ...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল ...	১০০২
[illegible] দুর্গোৎসব (চিত্র) ...	শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী	৬৭৪,৭০৭
[illegible]ছানায় [illegible]থের উদ্দেশে (কবিতা) ...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ ...	৭৭২
বিজ্ঞানের		

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রক্তের লেখা (গল্প) ...	শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	১০১৪
লছমন-ঝোলা (সচিত্র) ...	শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় বি--এ ...	৭১৫
লক্ষ্মীছাড়ার দল ...	শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় এম-এ ...	৯০৪
শেষ চিঠি (গল্প) ...	শ্রীসোমনাথ সাহা ...	১০৭৭
সাহিত্যের প্রাণ ...	শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার ...	৫৯৮
স্কন্দ-ধাত্রী (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৬৩৮
সমালোচনা ...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা	৬৯৪, ৭৮৪, ৮৭৪, ১০৫৫
স্ত্রী-শিক্ষার কথা ...	"নব্যশিক্ষানুরাগী" ...	৭২৮
সঙ্কলন—		
আমাদের সঙ্গীত ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬৬১
আওরংজীবের রাজত্বের হিন্দু ঐতিহাসিক ...	শ্রীযদুনাথ সরকার ...	১০০৬
তুর্কীজাতি ...	মোহম্মদ ফুৎকর রহমান ...	১১২৯
খেলা-ভোলা (কবিতা) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৪৭
নক্ষত্রতত্ত্ব (কবিতা) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৪৬
নারীর আর্থিক স্বাধীনতা ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...	১০১০
নেপালে নেওয়ারদিগের ভাই পূজা	শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ...	৯৬৫
পট ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬৬০
ভুল স্বর্গ ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৪৮
মা-হারা (কবিতা) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৪৪
মূর্খ (কবিতা) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৪৫
যাত্রার আয়োজন (কবিতা) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৪৬
রবিবার (কবিতা) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৪৩
শাস্তি (কবিতা) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৪৪
সুখের সাহারা (কবিতা) ...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল	৭৩৩
স্রোতের মুখে (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	৭৮২
সুশ্বেতা (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৮০৫
হাফিজের অনুসরণে (কবিতা) ...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ ...	৮৫৫
হুরী (কবিতা) ...	শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ...	১০৭৮

চিত্র সূচী

অলস বেলায় (বহুবর্ণ)
শ্রীযামিনীরঞ্জন রায় অঙ্কিত ... ৭৮৫
আনাতোল্-ফ্রান্স ... ৮৫৭
উপরি উপরি এগারোটী সহর ... ৬৪৮
এই-ভাবে পড়া অনুচিত ... ৭৬৭
এই-ভাবে পড়া উচিত ... ৭৬৮
ওরাংউটাং ... ৬৪৬
কর্ণকুন্তী পরিচয় (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত ... ১০৬১
কার্পেনটিয়ার ... ৮৪৫
ক্যারুসোর কণ্ঠনালী ... ৮৬৩
গৌতমের আশ্রমে সত্যকাম (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা অঙ্কিত ... ৬৯৫
গোবরবাবু ... ৮৪৭
চোখের রশ্মিতে সম্মোহন ... ৭৬৪
চোখের ক্ষমতা ... ৮৬২
জল লীলার বিপুল পুলক ... ৭৭০
জাপানী মেয়ে স্কুলের এক পার্শ্বের দৃশ্য ... ৯১১
টোকিও সহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের বিদ্যালয় ... ৯১৩
দ্বৈপায়নহ্রদে যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত ... ৫৮৯
দক্ষিণ এসিয়ার গিবন ... ৬৪৬
দাসখৎ (বহুবর্ণ)
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ... ৮৭৭
ধ্বংসাবশেষের গুটিকয়েক নমুনা ... ৬৫০
নদীর উপরে বিপরীতগামী রেলগাড়ী ... ৯৪৫
নাক্ষস-দ্বীপে আরিআড্‌নী ... ১১৪৬
পি, ডবলু-ডি খাঙ্গালা ... ৭১৬
পর্ব্বত উপত্যকায় চটি ... ৭২০
পৃষ্ঠ-পটে উল্কি-চিত্র ... ৯৪৯
প্রোভেন্স দেশের গোলাপ ... ১১৪৯
মধ্য আফ্রিকার গরিলা ... ৬৪৭
মাথা ভাসানো গলাবন্ধ ... ৬৫২
মিস্ কেলারম্যান জলে ঝাঁপ দিতেছেন ... ৭৬৯
রেলের পুলের নীচে বিপরীতগামী রেলগাড়ী ... ৯৪৬
রুথ ও নাওমি ... ১১৪৭
রুথ ... ১১৪৮
শিল্পাঞ্জি ... ৬৪৬
শিলা-যুগের একটি ট্রাজেডী ... ৭৬৬
সঙ্করের উপর দিয়া বিপরীতগামী রেলগাড়ী ... ৯৪৭
সর্ব্ব-সমর্পণ ... ১১৪৯
বাসন্তী ... ১১৫০
হৃদ্‌বিহারী শিল্পীর হাড়ের উপরে আঁকা, সাবেক মানুষের ছবি ... ৭৬৫



দ্বৈপায়ন হ্রদে অর্দ্ধজলমগ্ন দুর্য্যোধনের সহিত
যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন।
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত

ভারতী

৪৫শ বর্ষ]　　কার্ত্তিক, ১৩২৮　　[সপ্তম সংখ্যা

মীনু

১

মীনু পশ্চিমে মানুষ হয়েচে। ছেলেবেলায় ইঁদারার ধারে তুঁতের গাছে লুকিয়ে ফল পাড়তে যেত; আর অড়র-ক্ষেতে যে বুড়ো মালী ঘাস নিড়োত তার সঙ্গে ওর ছিল ভাব।

বড় হয়ে জৌনপুরে ওর বিয়ে হয়। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল, তার পরে ডাক্তার বল্‌লে, "এও বাঁচে কিনা সন্দেহ।"

তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে এল।

ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মত ওর কাঁচা প্রাণ শক্ত করে পৃথিবীর বোঁটা আঁক্‌ড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব তার পরেই ওর বড় টান।

আঙিনায় তার আট-দশ হাত জমি, সেইটুকুতে তার বাগান।

এই বাগানটি ছিল যেন তার কোলের ছেলে। তারি বেড়ার পাশে ঝুম্‌কো লতা লাগিয়েছিল এইবার সেই লতায় কুঁড়ির আভাস দিতেই সে এসেচে।

পাড়ার সমস্ত পোষা এবং না-পোষা কুকুরের অন্ন আর আদর ওরই বাড়িতে। তাদের মধ্যে সব-চেয়ে যেটিকে সে ভালবাসত তার নাক ছিল খাঁদা, তার নাম ছিল ভোঁতা।

তারই গলায় পরাবে বলে মীনু রঙীন পুঁথির মালা গাঁথতে বসেছিল। সেটা শেষ হল না। যার কুকুর সে বল্‌লে, "বৌ-দিদি, এটিকে তুমি নিয়ে যাও।"

মীনুর স্বামী বল্‌লে, "বড় হাঙ্গাম, কাজ নেই।"

২

কলকাতার বাসায় দোতলার ঘরে মীনু শুয়ে থাকে। হিন্দুস্থানী দাই কাছে বসে কত কি বকে; সে খানিক শোনে, খানিক শোনেনা।

একদিন সারারাত মীনুর ঘুম ছিল না। ভোরের আঁধার একটু যেই ফিকে হল সে দেখ্‌তে পেলে তার জান্‌লার নীচেকার গোলক-চাঁপার গাছটি ফুলে ভরে উঠেচে। তার একটু মৃদু গন্ধ মীনুর জানলার কাছটিতে এসে যেন জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন আছ?"

ওদের বাসা আর পাশের বাড়িটার অল্প একটুখানি ফাঁকের মধ্যে ঐ রৌদ্রের কাঙাল গাছটি, বিশ্বপ্রকৃতির এই হাবা ছেলে কেমন-করে' এসে পড়ে' যেন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লান্ত মীনু বেলায় উঠ্‌ত। উঠেই সেই গাছটির দিকে চেয়ে দেখ্‌ত সেদিনের মত আর ত তেমন ফুল দেখা যায় না। দাইকে বলত, "আহা দাই, মাথা খা, এই গাছের তলাটি খুঁড়ে দিয়ে রোজ একটু জল দিস্!"

এই গাছে কেন যে ক'দিন ফুল দেখা যায় নি একটু পরেই বোঝা গেল।

সকালের আলো তখন আধ-ফোটা পদ্মের মত সবে জাগচে এমন সময় সাজি-হাতে পূজারি ব্রাহ্মণ গাছটাকে ঝাঁকানি দিতে লাগ্‌ল, যেন খাজনা আদায়ের জন্যে বর্গির পেয়াদা।

মীনু দাইকে বল্‌লে, "শীঘ্র, ঐ ঠাকুরকে একবার ডেকে আন্।"

ব্রাহ্মণ আস্‌তেই মীনু তাকে প্রণাম করে বল্লে, "ঠাকুর, ফুল নিচ্চ কার [illegible]?"

ব্রাহ্মণ বল্‌লে, "দেবতার জন্যে।"

মীনু বল্‌লে, "দেবতা ত ঐ ফুল স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েচেন।"

"তোমাকে?"

"হাঁ, আমাকে। তিনি যা দিয়েচেন সে ত ফিরিয়ে নেবেন বলে দেন নি।"

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভোরে আবার সে যখন গাছ-নাড়া দিতে সুরু কর্‌লে তখন মীনু তার দাইকে বল্‌লে, "ও দাই, এ ত আমি আমি চোখে দেখ্‌তে পারিনে। পাশের ঘরের জান্‌লার কাছে আমার বিছানা করে দে!"

৩

পাশের ঘরের জান্‌লার সাম্‌নে রায়চৌধুরীদের চৌতলা বাড়ি। মীনু তার স্বামীকে ডাকিয়ে এনে বল্‌লে, "ঐ দেখ, দেখ, ওদের কি সুন্দর ছেলেটি! ওকে একটিবার আমার কোলে এনে দাও না!"

স্বামী বল্‌লে, "গরীবের ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন?"

মীনু বললে, "শোন একবার! ছোট ছেলের বেলায় কি ধনী-গরীবের ভেদ আছে? সবার কোলেই ওদের রাজ-সিংহাসন।"

স্বামী ফিরে এসে খবর দিলে, "দরোয়ান বল্‌লে বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।"

পরের দিন বিকেলে মীনু দাইকে ডেকে বল্‌লে, "ঐ চেয়ে দেখ্, বাগানে একলা বসে খেলচে। দৌড়ে যা, ওর হাতে এই সন্দেশটি দিয়ে আয়!"

সন্ধ্যাবেলায় স্বামী এসে বল্‌লে, "ওরা রাগ করেছে।"

"কেন, কি হয়েচে?"

"ওরা বলেচে, দাই যদি ওদের বাগানে যায় ত পুলিসে ধরিয়ে দেবে।"

এক মুহূর্ত্তে মীনুর দুই চোখ জলে ভেসে গেল। সে বল্‌লে "আমি দেখেচি দেখেচি! ওর হাত থেকে ওরা আমার সন্দেশ ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে ওকে মার্‌লে! এখানে আমি বাঁচব না। আমাকে নিয়ে যাও!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রত্যাবর্ত্তন

একাদশ পরিচ্ছেদ

ক্লাশে একটি ছেলের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল। ছেলেটির নাম জলদ-কান্তি। নামের সহিত তাহার চেহারার কোন সামঞ্জস্যই ছিল না। ছিপ্‌ছিপে একহারা গঠনের স্নিগ্ধ গৌর-কান্তি নাতি-দীর্ঘ ছেলেটিকে দেখিলে ঘনঘোর বর্ষা-মেঘের পরিবর্ত্তে সকাল বেলার কৌতুক-হাস্যোজ্জ্বল নর্ত্তনশীল রৌদ্র-রেখাটিকেই যেন বেশী করিয়া মনে পড়ে। ছেলেটি গায়ে পড়িয়া সাধিয়া আপনি আলাপ করিয়াছিল। অরুণ যে মেসে বাসা লইয়াছিল, সে তাহার খান তিন-চার বাড়ীর পরে থাকিত। ক্লাশে অনেকের সঙ্গেই তাহার আলাপ ছিল। আলাপ করিবার শক্তি তাহার যেমন অসাধারণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবার ক্ষমতাও তেমনি তাহার অনায়াস-লভ্য। তাহার ঠাট্টা-বিদ্রূপে ছেলেদের কাছে সে এমনি সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল যে এখন আর সে সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কেহই আর রাগ করিতে পারে না, করেও না। এই নূতন বন্ধুটিকে অরুণের বড় ভাল লাগিয়াছিল। তবু নিজের সঙ্কোচপূর্ণ স্বভাবের জন্য অল্পদিনের বন্ধুত্বে সে সম্পূর্ণ-রূপে নিজেকে বন্ধুর হাতে সমর্পণ করিয়া দিতে পারে নাই। তাহার মনের অভাব যত বড়ই হউক্, বাহিরের অভাবও যে কতখানি সে কথাও সে লজ্জায় কাহাকেও জানাইতে পারিতেছিল না। অথচ কোন একটা উপায় না করিলেও নয়। বিছানায় পড়িয়া সে এই নূতন বন্ধুটির কথাই তখন ভাবিতেছিল। মনে হইল, জলদকে সে তাহার অভাবের কথা জানাইয়া কোন একটা ছেলে পড়ানোর কাজ যদি জোগাড় করিয়া লইতে পারে, তবেই সুবিধা হয়। সঙ্কোচ কিন্তু মাথা নাড়িয়া বাধা দিল, না, কাজ নাই। কি জানি, বন্ধু যদি মনে করেন, বন্ধুত্বের ভাণ কেবল স্বার্থলাভের পন্থা! সেই বা তাহাকে কতটুকু চিনিয়াছে? আরও একটি ছেলের সহিত অরুণের আলাপ হইয়াছিল,—এ ছেলেটির নাম প্রফুল্ল। ক্লাশে খুব ভাল ছেলে বলিয়া ইহার সুনাম ছিল। হিন্দুস্কুলে ফার্ষ্ট হইয়া কম্পিটিশন স্কলারশীপ লইয়া সে গত বৎসর পাশ করিয়াছে। প্রফুল্লর বন্ধুত্ব অনেকেই কামনা করিত। কিন্তু সে নিজে স্বেচ্ছায় কাহারও সহিত মিশিতে চাহিত না। তাহার তরুণ মুখে গাম্ভীর্য্যের ছাপ পড়িয়াছিল। কথাও সে সাধারণতঃ খুব অল্পই কহিত। যেখানে 'হাঁ, বা 'না' বলিলে চলিত, সেখানে সে দ্বিতীয় কথা ব্যবহার করিত না। সর্ব্বদা যে লেখাপড়া লইয়াই সে থাকিত, এমন নয়। তবু সকলের সহিত একত্র থাকিয়াও সে যেন সকলের কাছে হইতে দূরে থাকিত। ছেলেরা তাহাকে ভাল বাসিত, ভয়ও করিত। পড়া-শুনার জন্য কেহ তাহার সাহায্য চাহিলে সে খুসী হইয়াই তাহাকে পড়া বলিয়া দিত। ব্যস! তারপর আর কোন সংস্রব সে রাখিত

না। প্রফুল্লকে শিক্ষকেরাও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই পরচ্ছিদ্রান্বেষী দুষ্ট বালকেরা ইচ্ছা থাকিলেও তাহার সহিত শত্রুতা করিতে পারিত না। তবু এই ছেলেটিকে উপলক্ষ্য করিয়া দুইটি দল হইয়া ছিল। এক দল তাহার স্বপক্ষে—অন্য দলটি বিপক্ষে। যাহাকে লইয়া দল,—সে কিন্তু কোন দলেই যোগ দিত না; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নিজের কার্য্য করিত, অল্প সল্প সকলের সহিতই মিশিত। নিজের চারি ধারে এমন একটা গাম্ভীর্য্যের গণ্ডী রচনা করিয়া সে বাস করিত, যেখানে তাহার মনের নাগাল কেহই পাইত না। অরুণের সে এক ক্লাশ উপরে পড়ে, বয়সেও কিছু বড়।

এই ছেলেটিকে প্রথম দর্শনেই অরুণের বড় ভাল লাগিয়াছিল। সে তাই সকলের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বার বার ইহারই পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। দু-এক বার দুইজনের দৃষ্টি-বিনিময়ও হইল। অরুণ নিজের দৈন্য স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আলাপ করিতে সাহসী হইল না, চোখ নামাইয়া লইল। কিন্তু সুযোগ আপনা হইতেই সুলভ হইয়া দেখা দিল।

সেদিন কি-একটা ব্যাপার উপলক্ষে ছেলের দল ক্লাশের বাহির হইয়াছিল। কেহ বেড়াইতে ছিল, কেহ গল্প করিতেছিল। আবার ফার্ষ্ট ইয়ারের কতকগুলি গুণ্ডা ছেলে পরস্পরের সহিত কলহ বাধাইয়া তামাসা দেখিবার সুযোগ-খুঁজিতেছিল। নবাগত অরুণ এ সমস্ত দলের কোনটিতেই যোগ না দিয়া বাহিরে একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া নিজ পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া পড়িতেছিল। তাহার হাত কয়েক দূরে কতকগুলি আমোদ-প্রয়াসী ছেলে একটি নূতন ছেলেকে লইয়া তখন গম্ভীর ভাবে রহস্য চালাইতেছিল। নূতন ছেলেটির বাড়ী বীরভূম। তাহার ভাষায় যথেষ্ট জড়তা ছিল, ইহাই তাহার অপরাধ। প্রথমটা সহপাঠিদের দুষ্ট মতলব সেও বুঝিতে পারে নাই, তাই সরলভাবে তাহাদের কথার উত্তর দিতেছিল; এবং ছেলের দল তাহার কথার সুরের উপর জোর দিয়া তাহাকে সমর্থন করার ভঙ্গীতে পরস্পরের পানে চাহিয়া হাসিয়া কৌতুকের ইঙ্গিত করিতে-ছিল। যেন এমন বেকুব তাহারা জন্মে আর কখনো দেখে নাই। বড়ই একটা মজার জানোয়ার! ছেলেটির নাম জগন্নাথ, পদবী নন্দন। এ তত্ত্ব তাহার পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়া রসিক কমলা লেবুর খোসা ছাড়াইতে গিয়া তাহাকে শুনাইয়া অথচ তাহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া কহিল, "হ্যাঁ হে ধীরু, জগন্নাথের নন্দনটি কে, বল দেখি ভাই? পুরাণ টুরাণে ত কই এঁর কোন খোঁজ-পাত্তা পাওয়া যায়নি! হঠাৎ ভুঁইফোড় রূপে এঁর আবির্ভাব দেখি যে!"

ধীরু ওরফে ধীরেন্দ্র নামোচিত ধীরতা রক্ষা করিয়া মিহি সুরে জবাব দিল, "মা—যা-ছিলেন, মা যা-হয়েচেন—মা-যা-হবেন। নন্দনটি এখনো জন্মান নি, মনে হচ্চে।" সতীশ পরমভক্তির অভিনয়ে মাথা নেয়াইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "বাবা জগড়নাথ চড়নে গড় হঁইচি।"

ছেলের দলে একটা হো হো হাসির কলরব উঠিল। সত্যব্রত জমীদারের ছেলে। মনে তাহার ধন-গর্ব্বও বিলক্ষণ ছিল। সে সাধারণ দলে না মিশিয়া একটু তফাতে

থাকিত। শান্তিপুরে ধুতির উপর ঢাকাই মসলিনের চুড়িদার পাঞ্জাবী ঝুলাইয়া সর্ব্বদাই ফিটফাট হইয়া আসিত। মাথায় সিঁথি, বাঁ হাতে সোনা-বাঁধান রিষ্ট ওয়াচ। চোখে সোনার চশমা। চেহারাটিও সুশ্রী। রোগাটে লম্বা গড়ন, ফর্‌শা! চুলগুলি পাতলা ও ধূসর রঙের হইলেও নরম—ঢেউ খেলানো থাকায় মুখখানি মানাইত বেশ। সে এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া আড় চোখে চাহিয়া বেচারী নন্দনের দুরবস্থা দেখিতে ছিল ও মনে মনে হাসিতেছিল। এই ছেলেটির গর্ব্বিত ভাব ও গম্ভীর মুখ সহপাঠি-দলের চক্ষুশূল হইলেও এই পরম ধৈর্য্যশালী মানুষটিকে কেহ কখন রাগাইত বা তাহার গাম্ভীর্য্যের একচুল বাহিরে আনিতে পারিত না। আজ এমন একটা সরস আন্দোলনে যোগ না দিয়া সে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করায় রসিক মনে মনে ভারি চটিয়া গেল। নন্দনকে কাঁদ-কাঁদ দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া সত্যব্রতর প্রতি মনোযোগী হইল, কহিল, "ও মশাই, এদিকে আসুন।" ডাক শুনিয়া সত্যব্রত গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে দলের কাছে আগাইয়া আসিল। সত্যব্রত রসিকের মেসের ত্রিতলের বাসিন্দা। মেসের সব কিছু লইয়া রাতদিন খুঁত খুঁত করা তাহার স্বভাব, রসিক তাহা জানিত। সে কহিল, "আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনার এ কলেজের মেসটা অত্যন্ত সাদা সিদে!" কণ্ঠস্বরে তাহাকে অনুকরণ করিয়া তেমনিই অলস ভঙ্গীতে সতীশ কহিল, "ভারী সাদাসিদে আর নোংরার এক শেষ।" সত্যব্রত পরিহাস না বুঝিয়া কহিল, "ছেলেদের জন্য একটা আলাদা বস্‌বার ঘর, লাইব্রেরী ক্লাব এমন সভ্য জায়গাতে অন্ততঃ এগুলো সকল মেসেই আশা করা গেছল।"

ধীরেন্দ্র কহিল, "হচ্চে, হচ্চে, এত ঘাব্‌ড়াবে না মশাই! একটা কেন, প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা একটা করে ড্রয়িং রুম তৈরী হচ্চে যে। তার সাজ-গোজও সব এসে পড়েচে, লাল ভেল ভেট-মোড়া স্প্রীংয়ের কৌচ, কেদারা ইলেক্‌ট্রিক্ আলো পাখা—চমৎকার চমৎকার সব ছবি—" সত্যব্রত উদাস ভঙ্গীতে গড়ানো সুরে কহিল, "ওঃ, ঠাট্টা কচ্চেন বুঝি।"

"না, না। সে কি কথা! ঠাট্টা কর্‌তে পারি! আপনার কাছে একটু ঠাট্টা শুন্‌তে চাইছিলুম মাত্র। ঠিক্ এম্‌নিটি হলেই বোধ হয় আপনি খুসী হতেন,—না? আপনার অভ্যাস ছিল বোধ হয় এই রকমই সব!"

সত্যব্রত তেমনি ভাবেই উত্তর দিল, "না, এর চেয়ে অনেক বেশীই!" বিনয় বিনয়ে ভূমিতে নতপ্রায় হইয়া কহিল, "তাহলে দয়া করে আপ্‌নার পরিচয়টি দিয়ে এই সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে কৃতার্থ করবেন!"

সত্যব্রত গম্ভীর মুখে কহিল, "আমার বাবা চন্দনার জমিদার।"

"তাই না কি—" বলিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হাসিয়া রসিক কহিল, "আপনি ত তাহলে আমাদের জাতির আমাদের দেশের গৌরব, আমাদের কলেজেরও গৌরবের সামগ্রী। বাই জোভ, আপনার বাবা যে শীঘ্রই রাজা উপাধি পাচ্চেন,—রাজভক্তির চোটে আপনাকে দলে পেয়ে আমরা শুধু গৌরবান্বিতই হইনি, একেবারে ধন্য হয়ে গেছি!"

সত্যব্রত খুসী হইবে কিনা ভাবিয়া সন্দিগ্ধ

হইয়া কহিল, "আমার কাকা হচ্চেন সিভিলিয়ান, সি, সি, রায়।"

ধীরেন্দ্র বলিল, "তিনি আবার ঐ না কি যিনি কালা আদ্‌মী দেখলে ক্ষেপে ওঠেন। ওঃ, আপনারা ত তাহলে সব স্বনাম-ধন্য পুরুষ,—অদৃষ্ট-ফেরে এমন জায়গায় এসে পড়ে আপনার যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে, পড়েচে তার সন্দেহ কি!" "বড়ই দুঃখের বিষয় সত্যব্রত বাবু। আপনার মত মানুষকে এমন সব জায়গায় থাকতে হয়—" বলিয়া ধীরেন্দ্র দুঃখিত ভাবে মুখ মলিন করিয়া রহিল। সত্যব্রত কহিল, "শীঘ্রই আমি বাসা নেব। রামঃ, এখানে কি বাস করা যায়?" এ সব ব্যঙ্গ বিদ্রূপেও তাহার আত্মম্ভরিতায় আঘাত দিতে না পারিয়া আনন্দ-লোভী ছেলের দল তাহাকে ছাড়িয়া অন্যদিকে মনোযোগ দিতে গিয়া সহসা অরুণকে দেখিতে পাইয়া খুসী হইয়া উঠিল। এই ছেলেটিকে তাহারা কয়দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। তবু ইহার বিশেষ পরিচয় কিছু লওয়া হয় নাই। আধ-ময়লা দেশী মিলের মোটা ধুতি ও টুইল সার্ট পরা ছেলেটিতে মনোযোগের মত অন্য কিছু না থাকিলেও এমন কিছু ছিল যাহাতে অনেক ছেলের মধ্য হইতেও বিশেষ করিয়া তাহার দিকেই আগে চোখ পড়ে। সুন্দর তরুণ মুখ—তাহাতে বিষাদের একটি করুণ ছায়া মাখানো—দৃষ্টিমাত্রই মনকে আকৃষ্ট করে।

রসিক কহিল, "আপনাকে নূতন দেখচি না?"

অরুণ নম্রভাবে কহিল, "আমি অল্পদিনই ভর্ত্তি হয়েছি।" ইহাকে কিভাবে আক্রমণ করা হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ পথটিই সে বাছিয়া লইল, কহিল, "আপনার এখানটা কেমন লাগ্‌চে, বলুন দেখি! বিশেষ আমাদের হতভাগা নোংরার একশেষ এই মেশটা?" কথাটা তামাসার হিসাবে বলিয়া বলা তাহাতে মিথ্যার ভাগ অল্পই ছিল। অরুণ কিন্তু নিজ বিশ্বাস-মত মৃদু হাসিয়া কহিল, "বেশ ত! কলেজের পড়ানোও খুব ভাল।"

ধীরেন্দ্র কহিল, "ওঃ পড়ার কথা যদি বল্লেন মশাই, তাহলে বলি, পড়ানো যদি বল্‌তে হয় ত এ কি আবার পড়ানো, না পড়া। এ একটা আড্ডা-বাড়ী বৈ ত নয়।"

বিনয় সবিনয়ে কহিল, "ওঃ আপ্‌নি বুঝি একজন ভাল ছেলে।" কথাতে হাসিবার কি ছিল বোঝা গেল না, ছেলেরা কিন্তু পরস্পরের মুখ চাহিয়া হাসিতে লাগিল। লজ্জা ও অপ্রতিভ হওয়ায় অরুণের মুখখানা সকালবেলাকার অরুণের মতই লাল হইয়া উঠিল। ছেলেরা যে তাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে ইহা বুঝিয়া সে ব্যথিতও হইল। মনে হইল, গরীব বলিয়াই তাহাদের তাহার প্রতি এ আক্রমণ। সত্যব্রতর ক্ষণপূর্ব্বেকার দুরবস্থা সে লক্ষ্যও করে নাই, করিলে এ ভ্রম তাহার জন্মিত না।

এমন সময় প্রফুল্ল আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে তাহার কয়েকখানি এক্‌সারসাইজ বুক। সে বোধ হয় খাতা কিনিতেই বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় সপ্তরথী-বেষ্টিত বিপন্ন বিব্রত অভিমন্যুর অবস্থাপন্ন অরুণকে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ ব্যাপার বুঝিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

এক একটা মানুষের মধ্যে কেমন এক প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য থাকে, যাহাতে অনিচ্ছাতেও লোকে তাহাকে ভয় করে। প্রফুল্ল ছেলেটিকে সহপাঠিদলে মনে মনে একটুখানি যে ভয় করিত—সে কথা আগেই বলিয়াছি। তাহার আবির্ভাবে ছেলের দল নিমেষে ভাল মানুষের মত যে যাহার কাজে ব্যস্ত হওয়ায়—অরুণ কৃতজ্ঞ চোখে পরিত্রাতার পানে চাহিয়া দেখিল। তাহার ভয় হইতেছিল। এখনি যদি উহারা তাহার বংশাবলীর বিবরণ শুনিতে চায়। আত্ম-পরিচয় দেওয়াই যে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ।

প্রথম আলাপেই প্রফুল্ল এমন সহজ ও সঙ্কোচহীন ভাবে তাহাকে কহিল, "আসুন, ক্লাশে গিয়েই একটু গল্প-সল্প করা যাক্—" যে অরুণ এতটুকু দ্বিধা না করিয়া খুসী মনেই তাহার অনুবর্ত্তী হইল।

সেদিন ক্লাশের ঘণ্টা পড়িবার পূর্ব্বেই প্রফুল্লর সহিত পড়াশোনা সম্বন্ধেই অরুণের অনেক কথা হইয়া গেল। অরুণ দেখিল, প্রফুল্লর পাণ্ডিত্য, তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, বহিঃ-সংসারের জ্ঞান তাহার চেয়ে অনেক বেশী। সে বিস্তর বই পড়িয়াছে। সম্প্রতি সে জার্ম্মান্ শিখিতেছে। ফ্রেঞ্চ লাটিন প্রভৃতি আরও কিছু কিছু শিখিবার তাহার ইচ্ছা আছে। এ সব তত্ত্ব অবশ্য একদিনেই অরুণের আয়ত্ত হয় নাই, ক্রমে হইয়াছিল। তবে সেইদিনই প্রফুল্ল অরুণকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

ক্লাশে ধীরেন্দ্রকে একটা ধাক্কা দিয়া রসিক হাসিয়া কহিল, "বেড়া নীচু দেখ্‌লেই মানুষের ডিঙ্গুতে সাধ যায়। প্রভুত্বের নেশা এমনি!" বলিয়া যে পর পর প্রফুল্ল অরুণের পানে চাহিয়া রসিকতার ভাবে মুচ্‌কিয়া হাসিল। তাহাদের দলের মধ্যেও একটা চাপা হাসির হিল্লোল অর্দ্ধব্যক্তরূপে বহিয়া গেল। প্রফুল্ল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও অরুণের চোখে তাহা এড়াইয়া গেল না। লজ্জায় ও সঙ্কোচে তাহার মুখ আবার রাঙা হইয়া উঠিল।

কিশোরী বিনয়ের পানে চাহিয়া অরুণকে শুনাইয়া মৃদু কণ্ঠে সুর করিয়া আবৃত্তি করিল, "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওটি লজ্জাবতী লতা।

একান্ত সঙ্কোচভরে, একধারে সরে আছে ছুঁয়োনা উহারে কেহ, রাখ মোর কথা।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সাহিত্যের প্রাণ

(১)

প্রকৃতির গুপ্ত সম্পদ্ কোনো প্রচ্ছন্ন পরিত্যক্ত স্থানে নাই, আছে মানবের হৃদয়ে। এই যে সৌন্দর্য্য যাহার পিপাসায় মানুষ এত কাতর, তাহাও তাহার অন্তরে। মন আপনার ভিতরের রসের আবেশে সকল দৃশ্য সুন্দর করিয়া তুলে ও দেখে; বাহিরের নিসর্গ চিত্রাবলী চিত্তের মূলে আঘাত করিয়া তাহাকে সজীব, সজাগ ও উন্মুখ করে মাত্র; অর্থাৎ মন যাহা দেখে, তাহা আপনার ভিতর

হইতে দেখে, পরন্তু, দেখিবার যে চেষ্টা, তাহাকে প্রকৃতি কেবল বাড়াইয়া তোলে,—মন দর্শক, প্রকৃতি প্রণোদক। মানস-তাটনীর উৎস কোথায় কেহ তাহা জানে না, কিন্তু তার আবেগ-উচ্ছ্বাস সকলের কাছে ধরা পড়ে। এই সব আবেগ-উচ্ছ্বাসের মূলে তৃষ্ণা; এই তৃষ্ণা নানাভাবে আসিয়া মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, মিলন-লাভের তৃষ্ণায় প্রণয়, সত্যলাভের তৃষ্ণায় জ্ঞান; সৃষ্টি করণের তৃষ্ণায় শিল্প, আরও কত প্রকারের তৃষ্ণা আছে, তার ইয়ত্তা নাই। যে অনন্য প্রেরণায় সাহিত্য-শিল্প জীবন লাভ করিয়াছে, তাহাও হৃদয়ের এক উদ্দাম পিপাসা—সেটি শুধু আত্মপ্রকাশ করিবার প্রবল বাসনা, মানুষের ভাবনা-বেদনা, জল্পনা-কল্পনা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম যাহা কিছু তার নিজস্ব, তাহা সে অন্যকে জানাইতে চায়! এই যে অন্যকে জানাইবার চেষ্টা, শুধু অন্যকে জানিবার ও অন্যের সহানুভূতি পাইবার ইচ্ছায়, অর্থাৎ জানান শুধু জানিবার জন্য, প্রদান শুধু আদানের লোভে, বিশ্বাস-স্থাপন শুধু অন্তরঙ্গতার বিনিময়ে। মানুষ স্বভাবতঃই সঙ্গপ্রিয়; আত্ম-গোপন করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ; আত্মজ্ঞাপন করা তার স্বভাবসিদ্ধ, একমত বা একচিত্ত হওয়া তার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। সমাজ এই মিলন-ধর্ম্মের অধিষ্ঠান-ভূমি, সাহিত্য ইহার ইতিহাস। স্বাভিব্যক্তির যে চেষ্টা, তাহা নানাভাবে, নানা পন্থায়, নানামূর্ত্তিতে মানুষের সমাজে, শিল্পে, বিশেষতঃ সাহিত্যে দেখা দিয়াছে ও দিতেছে। আত্মপ্রকাশের গতিবেগ বিচিত্র, ধারা বিচিত্র, ভঙ্গী ও পদ্ধতি বিচিত্র, তাই সাহিত্যের রূপ বিচিত্র, রীতি বিচিত্র, আদর্শ বিচিত্র। কাব্য, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিবিধ রূপ বা অঙ্গ মানুষের বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করিবার প্রবাহিকা বা পথ মাত্র। হৃদয়গত ভাব ও অনুভব এবং তাহাদের প্রকাশের চেষ্টা যতই গভীর ও সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, কাব্য, নাটক প্রভৃতি প্রণালী-সমূহ ততই উন্মুক্ত ও প্রশান্ত হইয়া পড়ে।

সাহিত্য জীবন-ব্যাপারের প্রত্যক্ষ দর্শন ও আলোচনা মাত্র, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইহার ভিত্তিভূমি। মানুষ যাহা তার নিজের জীবনে দেখিয়াছে, ভাবিয়াছে, ভোগ করিয়াছে, তাহারই জীবন্ত ইতিহাস—সাহিত্য। এক কথায়, মানুষকে জানাই সাহিত্যের বিষয় ও লক্ষ্য; কিন্তু মানুষ যাহা করিয়াছে, শুধু তাহা দিয়া তাহাকে জানা যায় না; কারণ মানব-জীবন কতকগুলি কাজের সমাবেশ মাত্র নহে। একদিকে মানুষ যেমন কাজ করে, অন্যদিকে সে তেম্‌নি কত বড় বড় আদর্শ মনে-মনে ভাঙ্গে-গড়ে; যাহা আছে তাহা ধরিয়া বসিয়া থাকে না, যাহা নাই তাহাও চায়, তারও সন্ধানে ফিরে, বাহিরে তার কর্ম্ম, অন্তরে তার সুখ-স্বপ্ন। কিন্তু কর্ম্ম অপেক্ষা তার স্বপ্ন বেশী, শক্তি অপেক্ষা তার আশা বেশী; তার কর্ম্মের সীমা আছে, কিন্তু স্বপ্নের সীমা নাই। সে বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যতের দিকে, বাস্তব ছাড়িয়া আদর্শের দিকে সততই ধাবমান্। এখন মানুষকে বুঝিতে হইলে, তার কাজ-কর্ম্মের অন্তরালে যে প্রাণ-শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহারই সন্ধান লইতে হয়; সেই প্রাণ-শক্তি আর কিছুই নহে, কেবল তার মহতী আশা, উচ্চ আদর্শ। মানুষের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ত্তব্য, প্রীতি, শ্রদ্ধা, সভ্যতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি যাহা-কিছু তার প্রাণের জিনিস ও

তার কাছে খুব বড় জিনিস, তাহা সবই এক একটি আদর্শ হইতে প্রসূত ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য এই আদর্শগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে। এ জগতে সব জিনিস চলিয়া যায়, কিন্তু আদর্শ রহিয়া যায়; এমন কি, মানুষ মরিয়া যায়, আদর্শ বাঁচিয়া থাকে। সাহিত্য চিরস্থায়ী আদর্শকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া সর্ব্ব-গত, সর্ব্বপ্রিয় ও নিত্য, ইহা অলীক কল্পনার ক্রিয়া নহে, অক্ষয় আদর্শের আশ্রয় বা নিদর্শন। কোন্ প্রাচীন যুগে মানুষ সত্য ও সৌন্দর্য্যের সুন্দর উজ্জ্বল ছবি স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এবং স্বপ্নের ঘোরে সেই ছবিকে নশ্বর প্রস্তরে, চিত্রে ও সাহিত্যে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখনও সেই চেষ্টা মানুষকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। যে জাতি এই দুইটি মহান আদর্শের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, যে জাতি ওই স্বপ্নের দ্বারাই গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, রামায়ণ ও মহাভারতের "মানুষ" যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সেই স্বপ্নেই ভারত গড়িয়া উঠিয়াছে। সে স্বপ্ন এক অমর অলৌকিক স্বপ্ন। সেই স্বপ্নে ভারত জানিতে পারিয়াছিল যে, মানুষ তার পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ লইয়া দেবতা হইবে, এ যেন ঘন মেঘমালার মধ্যে নির্ম্মল আলোকের ন্যায়, চিন্তাতপ্ত প্রাণে শ্রান্ত হৃদয়ে উজ্জ্বল আশার স্বপ্ন। মানুষ যুগে যুগে আদর্শকে কল্পনা করে, আদর্শ আবার মানুষকে বা তার জাতীয়তাকে গঠন করে। এই আদর্শ,—যাহা সমাজ-তরুকে উন্নীত করে, জীবন-বৃন্তকে পুষ্পিত করে,—ইহাই সাহিত্যের জীবনী-শক্তি। অতি কঠিন বাস্তব-জীবন ইহার দেহ—ভাবময়ী ছন্দময়ী ভাষা ইহার পরিচ্ছদ, সুখ-দুঃখ-খচিত দৈনন্দিন জীবনে ও তার সুগভীর জ্ঞানে ইহার মূল, উচ্চ ভাব বা আদর্শের সংরক্ষণে ইহার পরিণতি, ভাষার সৌন্দর্য্যে ও অবাধ গতিতে, ছন্দের লীলা তরঙ্গে ও বৈচিত্র্যে রূপ ও আভরণ। সাহিত্য জাতীয় আদর্শের সাক্ষ্য দেয়, জীবন ও তার স্বপ্নের কাহিনী গায়। ইহা যতই রহস্যময় বিপুল মানব-জীবনের উপরের আবরণ খুলিয়া তার সুগভীর গহনে নামিয়া তার সুখ-দুঃখ, সত্য-অসত্য ও মনুষ্যত্বের স্পর্শলাভ করিতে ও প্রকাশ করিতে পারে, ততই ইহা প্রাণান্বিত হইয়া ওঠে। এই জীবন্ত সাহিত্য অনুজ্জ্বল, নীরস, সাধারণ জীবনের ক্ষীণ ও সঙ্কীর্ণ বাস্তবতা ও অসমতা পশ্চাতে ফেলিয়া বিস্তৃত উদার চরিত্রের অভিমুখে মানুষকে লইয়া যাইতে পারে;—ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যক্তিকে মহতের সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিতে পারে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার।

অভিভাষণ*

য়ুরোপে আমি সমাদর পেয়েচি এবং য়ুরোপকে আমি সমাদর করেচি, কিন্তু হৃদয় আমার উৎকণ্ঠিত ছিল ভারতের জন্যে। শিশুকাল থেকে ভারতের আকাশ দুই চক্ষু ভরিয়ে আমার মনকে যে-আলোক পান করিয়েচে তার তৃষ্ণা আমার মনে নিয়ত জেগে ছিল; আর যারা আমার আপন দেশের লোক, তাদের কাছ থেকে প্রীতি পাবার যে-আকাঙ্ক্ষা সে কি আমার মিটেচে, কিম্বা কোনোকালে মিটবে? তাই অনেক-দিন পরে দেশে ফিরে এসে আপনাদের কাছ থেকে এই যে অভ্যর্থনা লাভ করলেম এ আমার কাছে উপাদেয়।

আমার বয়স যেদিন পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছিল সেদিন আমার যা-কিছু সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি সে ত এই বাংলা দেশের সীমানা পার হয় নি। কিন্তু সেদিন এই বাংলা-সাহিত্যপরিষদই আমার সম্বর্দ্ধনা করে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। সে কথা আমি ভুলব না। কেননা সেদিন আমার একমাত্র পরিচয় বাংলা ভাষার মধ্যে বাঙালীর কাছে, অর্থাৎ সে ছিল আত্মীয়ের পরিচয় আত্মীয়ের কাছে। এই অতি-নিকটের পরিচয়ে সকল সময়ে সুবিচারের আশা থাকে না; যে বরমাল্য পাওয়া যায় তাতে কারো-কারো ভাগ্যে ফুলের চেয়ে কাঁটার অংশই বেশি থাকে; এবং যেহেতু তা আত্মীয়ের হাতের দান এইজন্যে তার মধ্যে যে পীড়া থাকে তার বেদনা দুঃসহ। তাই সেদিন সাহিত্যপরিষৎ আমাকে উপলক্ষ্য করে যে কবি-প্রশস্তি-সভা ডেকেছিলেন সে আমার পক্ষে যেমন বিস্ময়ের তেমনি আনন্দের বিষয় হয়েছিল। সেদিন এই পরিষদের কাণ্ডারী ছিলেন আমার পরমবন্ধু স্বর্গগত রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর বুদ্ধির গভীরতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য্য দুইই ছিল অসামান্য; সেদিন তিনিই বাঙালীর প্রতিনিধি-রূপে এই বরণ-সভা আহ্বান করেছিলেন, এই আনন্দ এবং গৌরব সকলের চেয়ে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। জনসভার অনেক অংশই আনুষ্ঠানিক, প্রায় তা কাঠ-খড়েই তৈরি, একদিন তার সমারোহ, পরদিন তা বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দেবার যোগ্য। কিন্তু সেই আমার বন্ধুর নির্ম্মল হাস্যে এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় সেদিনকার সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ বাণীর মধ্যে আমার পক্ষে এই আশ্বাস ছিল যে এই প্রীতি বর্ত্তমানের সমস্ত বিরোধ-বিদ্বেষ, সমস্ত কলহ-কলুষের উপরকার জিনিষ, এই প্রীতি সেই ভবিষ্যতের যা বাহির থেকে নিকটের মানুষকে দূরে নিয়ে গিয়ে অন্তরের দিকে তাকে নিকটতর সত্যতর করে। আজ তিনি স্বয়ং শাশ্বতলোকে গমন করেচেন, সেখান হতে তাঁর প্রসন্ন হাস্যের অভিনন্দন আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করি।

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত

দশ বৎসর হয়ে গেল। এখন আমি ষাট উত্তীর্ণ হয়েচি। সাহিত্য-পরিষদে আজ আপনাদের এই অভিভাষণ কিসের উপলক্ষ্যে? আজ এখানে কেবল স্বাদেশিক আত্মীয়-সভার মঙ্গলাচরণ নয়। ভৌগোলিক ভাগ-বিভাগের দ্বারা মানুষের যে আত্মীয়তা খণ্ডিত আজ সেই আত্মীয়তার চতুঃসীমানার মধ্যে এই সভার অধিবেশন বসেনি। যে আত্মীয়তায় আত্মপরের বিচ্ছেদ, দূর-নিকটের ভেদ-ব্যবধান দূর হয়ে যায় আজ সেই আত্মীয়তার মাল্য আপনারা আহরণ করেচেন এই কথাই আমি মনে অনুভব করতে চাই।

আপনারা হয়ত মনে ভাবেন যে, দেশের সাহিত্যকে আমি বিদেশে যশস্বী করে এসেচি, দেশের লোকের কাছে আজ সেই দাবীতেই আমার বিশেষ সম্মান। কিন্তু এই যশকে আপনারা খুব বেশি বড় করে দেখ্‌বেন না। আমি নিজে, সকলের চেয়ে যেটিকে আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি, সে এই সাহিত্যের যশ নয়। য়ুরোপে আমার কাছে যারা হৃদয়ের অনুরাগ অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত করেচে তাদের অনেকেই সাহিত্যরস-ব্যবসায়ীদলের কেউ নয়। তারা কেবলমাত্র সাহিত্যের বাজার যাচাই করে' আমাকে যশের মূল্য চুকিয়ে দেয় নি, তারা আমাকে প্রীতি দিয়েচে যা সকল মূল্যের বেশি। অর্থাৎ তারা ওস্তাদ বলে আমাকে শিরোপা দিয়ে বিদায় করেনি, তারা আমাকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করেচে। সেই আত্মীয়তা নিয়ে আত্মশ্লাঘা করা চলে না, তাকে নিয়ে নম্র মনে আনন্দ করাই যায়।

দ্বিজত্ব লাভ করবার একটি তত্ত্ব আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তাতে এই কথা বলে, যে, মানুষের প্রথম জন্ম নিজের অহঙ্কারের ক্ষেত্রে। সেই "আমি"র ক্ষুদ্র সীমার আবরণ ও বন্ধন ভেদ করে মানুষ যখন অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে অসীমের মধ্যে জন্মলাভ করে তখনই হয় তার দ্বিতীয় জন্ম। যেমন অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে তেমনি সংসারের মধ্যেও মানুষের দুটি জন্ম। একটি হচ্চে নিজের দেশের মধ্যে, আরেকটি সকল দেশে। এই দুটি জন্মের সামঞ্জস্যেই মানুষের সার্থকতা। নিজের হৃদয়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বের মিলন সাধন করাতে পারলে তবেই হৃদয়ের মুক্তি।

পঞ্চাশোর্দ্ধে, সংহিতাকার যখন বনব্রজনের ব্যবস্থা করেচেন, সেই সময়ে আমি পশ্চিম-মহাদেশে গিয়ে পৌঁছলেম। দেখ্‌লেম সেখানে আমার বাসস্থান আছে। দেখ্‌লেম সংসারে এই আমার দ্বিতীয় জন্মের মাতৃক্রোড় পূর্ব্ব হতেই প্রসারিত। আপন দেশ থেকে দূরে, যেখানে জন্মগত কোনো দাবী নেই, কর্ম্মগত কোনো দায় নেই, সেইখানে যখন প্রেমের অভ্যর্থনা পাওয়া যায় তখনি আমরা বিশ্বজননীর সুধাস্পর্শ পেয়ে থাকি। আমার ভাগ্যক্রমে সেই স্পর্শের আশীর্ব্বাদ লাভ করেচি এবং মাতৃভূমিতে বহন করে এনেচি বলেই, আমার রচনার পরে বিশ্ববাণীর প্রসন্নতা লাভ করেচি বলেই, আজ আপনারা আমাকে নিয়ে বিশেষ-ভাবে আনন্দ করচেন।

ভেবে দেখ্‌বেন, এই আনন্দের মধ্যে একটি মুক্তির উৎসাহ আছে। দেশ যখন আপনটুকুকে নিয়েই আপনি নিবিষ্ট তখন সে বিশ্বের অগোচরে থাকে। এই বিশ্বের

অগোচরতা একটি মস্ত কারাপ্রাচীর। সঙ্কীর্ণ-বাসের অভ্যাসে একথা আমরা অনেক সময়ে ভুলেই থাকি। হঠাৎ যখন একটা বন্ধ দরজা কোনো একটা হাওয়ায় খুলে যায় তখন মন খুসি হয়ে ওঠে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর যে-আবিষ্কার নিয়ে প্রথম বিশ্বসভার আহ্বান পেলেন, তাঁর সে আবিষ্কার যে কি তা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই এখনো স্পষ্ট করে বোঝেনি—কিন্তু দেশের মন হঠাৎ খুসি হয়ে উঠ্‌ল। তার কারণ এই যে,একদিকের দরজা খুলে গেল। সহসা অনুভব করলেম যে, আমরা বিশ্বের মানুষ, কেবলমাত্র দেশের মানুষ নই; আমাদের প্রাণের সঙ্গে বিশ্বের হাওয়ার, মনের সঙ্গে বিশ্বের আলোর সুগভীর যোগ আছে। স্বাদেশিক প্রাচীরের বদ্ধ জান্‌লা খোলবামাত্র হঠাৎ সামনে দেখতে পাই সর্ব্বজন-বিধাতার রূপটি। এই রূপটি দেখবার জন্যেই আমাদের মানব-জন্ম।

সাহিত্যের কলা-কৌশল বিচার করে আমার লেখার কি মূল্য সে কথা দূরে রেখে আজ আমাকে এই গৌরবটুকু ভোগ করতে দিন যে, আমার গানে বা অন্য রচনায় সর্ব্বজন-দেবতার রূপ হয়ত কিছু প্রকাশিত হয়েচে, সেইজন্যেই অন্য দেশের লোকে আমাকে আপন বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। এই নিখিলদেবের সাধন-মন্ত্র ভারতের কবির কানে পৌঁচেছিল কোথা থেকে? ভারতবর্ষেরই তপস্বীদের কাছ থেকে। তাঁরাই একদিন বলেছিলেন, "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা-মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"। যিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বজনের হৃদয়-বাসী সেই দেবতাই মহাত্মা; এবং তিনি কর্ম্মা অর্থাৎ তাঁর সকল কর্ম্মই বিশ্বের কর্ম্ম, ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয়।

আজ আপনাদের যে-আতিথ্য লাভ করচি এ আমি একলা নিতে পারবনা। কেন-না একলা আমি কোনো আতিথ্য কোনো সমাদরের যোগ্য নই। আমার রচনায় আমি মহামানবের বাহন এই বলে যদি আমাকে সমাদর করেন তবে তাঁর আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাঁকে ফেরাবেন না; বল্‌বেন না, আজ আমাদের দুঃসময়, আজ আমাদের দরজা বন্ধ। যখন পশ্চিমে ছিলেম তখন গৌরব করে সকলকে বলেচি, আমি আমার মাতৃ-ভূমির নিমন্ত্রণপত্রের ভার নিয়ে এসেচি। বলেচি, যেখানে মাতার অমৃত অন্নের পরিবেষণ হয় সেইখানে এস। এসেছিলে একদিন আমাদের কয়লার খনিতে, আমাদের পণ্যের হাটে। যা সংগ্রহ করে নিয়ে গেছ তাই নিয়ে তোমাদের পাড়ায় পাড়ায় ঈর্ষার আগুন জ্বলচে। পরস্পরের প্রতি সন্দেহে তোমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র কাঁটাবনের জঙ্গল হয়ে উঠেচে। আজ এস সেই ভাণ্ডারে, যেখানে অন্ন ভাগ করলে তার ক্ষয় হয় না।

য়ুরোপে শুনে এলেম কত জ্ঞানী গুণী সাধক বল্‌চে তাদের আত্মা ক্ষুধিত। তারা খুঁজচে শোকের সান্ত্বনা, ক্ষতবেদনার শুশ্রূষা। এই সন্ধানে যদি তারা পূর্ব্বমহাদেশে যাত্রা করে তবে যেন দেখ্‌তে পায় আমাদের দ্বার খোলা আছে। আমরা যেন না বলি, "আমরা নিজের ভাবনায় মরচি, পর আমাদের কাছে আজ অত্যন্ত পর, হৃদয় আমাদের বিমুখ।" এতদিন আমরা পরের দিকে তাকিয়ে ছিলেম ভিক্ষা করবার জন্যে, তাতে

লজ্জার পর লজ্জা পেয়েচি, অভাব পূরণ হয়নি। আজ যদি ধিক্কারের সঙ্গে বলতে পারি পরের কাছে ভিক্ষা কর্‌ব না, সে ত ভাল কথা। কিন্তু সেই ক্ষোভে যদি বলি, পরের আতিথ্য কর্‌বনা, তবে আরো বেশি লজ্জা। ভিক্ষায় যে দীনতা, অতিথির প্রত্যাখ্যানে দীনতা তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। ভিক্ষায় যে আত্মাবমাননার অপরাধ তারও অভিশাপ আছে, আর অতিথির প্রত্যাখ্যানে যে বিশ্বাবমাননা তারও অভিশাপ কঠিন। আমাদের পিতৃঋণ শোধ হবে কি করে? পিতৃগণের কাছ থেকে আমরা যে উত্তরাধিকার পেয়েচি সে কি কেবল আমাদের নিজেরই জন্য? সে কি আমাদের ন্যস্ত ধন নয়? আমরা যদি বিশ্বের কাছে তার পূর্ণ ব্যবহার না করি তবে তাতে করে আমাদের পিতামহদের অগৌরব।

শকুন্তলা ছিলেন তপোবনের কন্যা। সেই তপোবনের কুটীর-দ্বারে বসে তিনি আপন-জনের কথাই ভাবছিলেন, বিশ্বজনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। ভোলবার কারণ ছিল, কেননা কঠিন দুঃখে তাঁর মন ছিল অভিভূত। এমন সময় অতিথি এল তাঁর দ্বারে, বল্‌লে, "অয়মহং ভোঃ।" সে ডাক কানে পৌঁছলনা। তখন তাঁকে বাইরের শাপ লাগল, অসম্মানিত অতিথির শাপ। সে শাপ এই যে, যে-আপনজনের ভাবনায় তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে সেই আপন-জনকেই হারাবে। বিশ্ব যদি আজ আমাদের দ্বারে এসে বলে "অয়মহং ভোঃ" তবে কি আমরা বল্‌তে পারি যে, "আজ নিজের ভাবনা কঠিন হয়ে উঠেচে, অন্যমনস্ক আছি?" এ জবাব খাটবেনা। নিজের দুঃখধন্দার তাড়ায় বিশ্বকে যে ফিরিয়েচে বিশ্বের শাপ তাকে লাগবেই—তার আপনটুকু কেবলি ক্ষীণ হবে, আচ্ছন্ন হবে, নষ্ট হবে। যে-সব জাত বিশ্বের অগোচরে নিজের মধ্যে বদ্ধ তারা নিজেকে হারিয়ে বসে আছে, অথচ এত বড় ক্ষতি অনুভব করবার শক্তি পর্য্যন্ত তার লুপ্ত হয়েচে।

যখন সাহিত্য-রচনায় আমি নিবিষ্ট ছিলেম তখন বাহিরের কোনো সহায় আমার দরকার ছিলনা। কবির আসন নির্জ্জনে। সেখানে অনাদরে ক্ষতি করে না, বরঞ্চ জনাদর অনেক সময় মত্ত হস্তীর মত সরস্বতীর পদ্ম-বনের পঙ্ক উন্মথিত করে' তোলে। কিন্তু যজ্ঞ ত একলা হয় না। তাতে সর্ব্বলোকের শ্রদ্ধা ও সহায়তা চাই। ঘরে যখন উৎসব তখন বিশ্ব হন অতিথি। এইজন্যে পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই এই কাজকে আপনার কাজ বলেই গ্রহণ করেন। কর্ম্মকর্ত্তা দরিদ্র হলেও সেদিন দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে সকলকে ডেকে ডেকে বলেন, "এস, এস!" কিসের জোরে বলেন? সকলের জোরে। দেশের হয়ে আমিও আজ একটি যজ্ঞের ভার নিয়েচি। সত্যের সাধনায় আমাদের সঙ্গে একাসনে বসবার জন্যে। সেই জন্যেই আজ আপনাদের কাছ থেকে আমি যে-অভ্যর্থনা পাচ্চি এ'কে আমি কবির অভ্যর্থনা বলে একলা গ্রহণ করতে পারবনা। এই অভ্যর্থনাকে ভারতের নবযুগে অতিথি-সমাগমের প্রথম মঙ্গলাচরণরূপে আমি সকল আগন্তুকের হয়ে গ্রহণ করচি—আপনাদের সকলের সহযোগে মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে বিশ্বচিত্তের একটি মিলনাসন প্রতিষ্ঠিত হোক্!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভীম-জননী

[ভীম-জননী কুন্তী যখন পঞ্চপুত্রসহ একচক্রাপুরে অজ্ঞাত-বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে একচক্রার রাজচক্রবর্ত্তী বক-রাক্ষসের নিয়মে প্রজাদের ভিতর হইতে প্রতিদিন এক-এক জনকে রাজার আহার্য্য হইতে হইত। কুন্তী যে গৃহে ছিলেন একদিন সেই গৃহের সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারেন যে, সেদিন ঐ পরিবারের মধ্যে কোনো-একজনের রাক্ষসের মুখে যাইবার পালা। কুন্তী আশ্রয়দাতা গৃহস্বামীকে অনেক বুঝাইয়া নিজ পুত্র ভীমকে বকের কাছে পাঠান।]

গায়ের রোয়াঁ যায় না গ্যাখা, সন্ধ্যা হলো, রাত্রি আসে;
কুয়াসা কি জমাট গ্যাখো, একটি তারাও নেই আকাশে!
পাখীর ডাকা ঘুমিয়ে গেল, ঝিঁঝির ডাকা ঝিমিয়ে জাগে;
ডাল্‌-পালাতে অন্ধকারের অন্ধ হাওয়ার উছট্ লাগে।
শব্দ কি ও? ভীম কি এলো?···কেউনা, বুঝি নেক্‌ড়ে তবে—
সাঁঝ না হ'তেই গাঁয়ের পথে শুক্‌নো পাতায় ফিরচে, হবে।
ব্রাহ্মণেদের বাস্তু এ গ্রাম বাণের শঙ্কা নাইক মোটে,
তাই শীকারের অন্বেষণে জনপদেও আপদ জোটে।
নাই সাহস একচক্রাপুরে ধরতে ধনুক কেউ না জানে,
নইলে কি বক-রাক্ষসে রাজচক্রবর্ত্তী-মানুষে মানে?
পালা ক'রে গাঁয়ের লোকে রাক্ষসে খায় মানুষ খেতে,
শকট ভ'রে অন্ন জোগায় প্রত্যূষে হায়, প্রত্যেকেতে।
পালা এল এই ঘরে আজ কান্নারোলের মধ্যিখানে—
ঠাঁই দিলে যে নিরাশ্রয়ে রাক্ষসে আজ তাদের টানে।
মাথা গুঁজে যাদের ভিটায় নির্ব্বাসনের ক্লেশ ভুলেছি,
তাদের মুখে কী শুনি আজ?···চম্‌কে গেছি, চম্‌কে গেছি!
রাজায় প্রজায় খাদ্য-খাদক! কেমন রাজা! কেমন প্রজা!
এ অনাচার সয়না প্রাণে স্পষ্ট ব'লে দিলাম সোজা।
কাঁচা মাথা খাজ্‌না নেবে? এই কি, ছি ছি, রাজার রীতি,
নইলে পরে শাস্তি দেবে জ্বালিয়ে ভিটা জাগিয়ে ভীতি!
চম্‌কে গেলাম ব্যাপার শুনে, অনার্য্য এ, অনার্য্য এ;
অব্রহ্মণ্য ব্রহ্মাবর্ত্তে! ব্রাহ্মণেরে বুঝিয়ে ক'য়ে—
উপরোধে পথ রুধে তার,—অনুরোধের আঁচল গলে,—
না—ভীমকে পাঠিয়ে দিলাম তার বদলে

ভয়-বিজয়ী ভীমকে আমার আশীর্ব্বাদের কবচ দিয়ে,
ধনুর্ব্বাণে সাজিয়ে নিজে বীর যে এ মোর পীযূষ পিয়ে।
বনবাসের দুর্গ যে মোর, মত্ত হাতীর বল যে ধরে,
বৃকের প্রতিমল্ল যে বীর, পাঠিয়েছি সেই বৃকোদরে।
জয়ী হবে পুত্র আমার মুখ তুলে চান্ দেব্‌তা যদি,
হবে সে একচক্রাপুরের চক্রবর্ত্তী দৈত্যে বধি'।

ঠাকুর! ঠাকুর।···চ্যাঁচায় প্যাঁচা!···বুকের ভিতর মুচ্‌ড়ে ওঠে,
গায় কাঁটা দ্যায়···ভীমকে আজি পাঠিয়েছি রাক্ষসের কোটে।
বালাই!···বালাই!···কি ছাঁই ভাবি···ডেকেছে কর্ত্তব্য তাকে,
নিত্য ভয়ে দ্যায় যে অভয় বিপদে তায় দেব্‌তা রাখে।
তাজা বুকের রক্ত যে চায় খাজনারূপে প্রজার কাছে,
কাঁচা মাথার মজ্জা যে খায়, নিত্য নরমাংস যাচে,
তার দাবীতে সই দিয়ে লোক বেঁচে মরে রয় কি ক'রে
কেমন ক'রে বাঁচে মানুষ কাঁটার শেযে সাপ-শিয়রে!
শুনেছি ক্রূর রক্ষা করে এ গ্রাম পর-চক্র হ'তে
গলাতে কেউ নারে মাথা হেথায় নাকি কোনোই মতে;
পারে না কেউ দাঁত বসাতে এম্‌নি নাকি জলুস্ দাঁতে,
প্রজার মাথা খরচ শুনি দাঁতের জলুস রক্ষা-খাতে!
শাসন কড়া, শান্তি চরম, যেমন শান্তি যমের ঘরে,
রাক্ষসের এই রাখালীতে জীয়ন্তে লোক রয় রে ম'রে।
পরের চক্র ব্যর্থ করার বেতন বড় নিচ্ছে বেশী,
তপস্বীদের খাচ্ছে মাংস পশুর মতই এ রাজ-বেশী।
পালা ক'রে প্রাণ দিতে যায় অজগরের-দৃষ্টি-জরা,
বরাদ্দ রোজ একটি মানুষ!—রাক্ষসের কী রক্ষা করা!
বাঁধা-বিধান নিত্য-সেবার আজ ছেলে যায় কাল্‌কে পিতা,
নইলে ঘটায় অনর্থ হায়, ঘরে ঘরে শোকের চিতা।
নাই মানুষ একচক্রাপুরে, এমন নিদেশ নইলে মানে?
খাজ্‌না নেবে ছেলের মাথা মানুষ হয়ে সইবে প্রাণে!

ভীম গিয়েছে···তার কাছে আজ···আপ্‌নি দিতে প্রা··· দেয়;
আমার ছেলে,···বীর সে···ছুঁতে··· কে।

মূর্ত্ত পাতক মানুষ-খাদক নষ্ট হবেই; দেবতা আছে;
ধর্ম্ম্য ক্রোধের দীপ্ত পাবক পারবেনাকো ভীমের কাছে।
জয়ী হ'য়ে ফির্‌বে ছেলে, দিব্য চোখে দেখ্‌ছি আমি,
শুন্‌ছি কানে জয়ধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি আস্‌ছে নামি।
সংশয়ে মন ন্যায়না আমল, ন্যায়নাক ঠাঁই আশঙ্কারে,
ব্যথাই পেলাম, পেলাম না ভয় যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারে।
যতই আমায় দুষ্‌ছে লোকে, বল্‌ছে যতই দুঃসাহসী,
টল্‌ছে না মন আজ সে যেমন অত্যাচারের মৃত্যু-অসি!
আজ সে যেন বিধির বজ্র, স্বয়ং জোগান্ বল বিধাতা,
আজ দেখেছি ছেলের দেহে অভয়-ব্রতী অভয়-দাতা!
তাই পেরেছি পাঠিয়ে দিতে মূর্ত্তিমন্ত মৃত্যু-মুখে,
অন্যায়ে যার প্রতিষ্ঠা তার করতে পরখ দুর্গে ঢুকে।
পাঠিয়েছি আজ কিশোর পুত্রে ক্রূরের ঘরে কৃপাণ-পাণি,
প্রাত্যহিকী হত্যালীলা দেখ্‌তে নারি ক্ষত্রিয়াণী।
সর্ত্তে বেঁধে শুষ্‌বে রক্ত!···রাজস্বে প্রাণ করবে দাবী!
আতঙ্কে লোক সঙ্কুচিত নরলোকে নরক ভাবি'!
অনার্য্য এ রাক্ষসী রীত···এর সাথে নয় কোনোই রফা,—
অজগরের গরাস হ'য়ে পাংশু-মুখে ইষ্ট জপা।
হ'ক না সে একচক্রাপুরে দৈত্য একছত্র প্রভু,
পরের চক্রে বাঁচায় ব'লেই কুক্রিয় নয় মান্য কভু!
মানুষ যে খায় মান্‌বনা তায় অন্যায়ে সে কায়েম করে,
নিত্য পাপে সিক্ত সে নীচ বিধির বজ্র তার উপরে;
সে বজ্র আজ পুত্র আমার—ক্ষুদ্র মানুষ মাত্র সে নয়,
রাক্ষসেদের সেই প্রতিযোধ আজ বিধাতার নিশান সে বয়।
নিশ্বাসে তার ছিন্ন হবে অন্যায়েরি কুজ্ঝটিকা,
নৃশংস বক-রাক্ষসেরি লুপ্ত হবে রাজার টীকা;
ভয়ের গুমোট্ কাট্‌বে, আবার প্রসাদ-বাতাস বইবে ফিরে,
এ বিশ্বাসেই পাঠিয়েছি তায়, সাজিয়ে তারে ধনুক-তীরে।
দেবতা যদি মুখ তুলে চান্, ফির্‌বে সে মোর সগৌরবে,
রুদ্র যদি রোদন পাঠান সইতে হব, সইতে হবে।
হৃদয় না···বুঝ্‌ছে শ্রেয় তাই বরেছি সরল মনে,
···ছি রোধ তার মরণে।

সাপের মুখে পাঠিয়ে ছেলে দিয়েছি আজ অভয় চিতে,
নগর-জোড়া অভিশাপের আওতারি ঘোর ঘুচিয়ে দিতে।
জয়-পরাজয় হাত কারো নয়, যুঝ্‌তে হবে শ্রেয়ের লাগি ;
অজগরের দাঁড়িয়ে ঘরে লড়াই, বিধির আশিস্ মাগি।
আশীবিষের বিষ দাঁতে হাত···বীব যে হবে,...সেই লাগাবে,
ওপ্‌ড়াতে দাঁত পারুক্ হারুক্, ম'লেও জগৎ কীর্ত্তি গাবে।
এই তো জানি ক্ষত্র-রীতি, ক্ষত্রিয়াণীর এই সে বাণী,
জয় না হ'লেও মানব না ভয়, আসুক বিপদ্, আসুক হানি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মিলিতোনা

৪

নিদ্রাকালেও মিলিতোনার মধুর মূর্ত্তিখানি আন্দ্রের চিত্তাকাশে দুই একবার দেখা দিয়াছিল। জাগিয়া উঠিয়া আন্দ্রে মনে মনে ভাবিল : কপোতীর নীড়টির সন্ধান পাইলেই যথেষ্ট হইবে না—তাহার নিকট উপনীত হওয়া চাই। কি করিয়া সেখানে যাওয়া যায়? এক উপায় আছে,—যদি আমি তার বাড়ীর সম্মুখে একজায়গায় আড্ডা গেড়ে বসে' তার আটঘাট অন্ধিসন্ধি ভাল করে নজর করে দেখি। কিন্তু আমি যদি, এখন যে কাপড় পড়ে আছি সেই কাপড়েই যাই, অর্থাৎ প্যারিসের হাল-ফ্যাশানের কাপড় পরে যাই—তাহা হইলে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে, আমার অনুসন্ধানে ব্যাঘাত হবে। একটা কোন বিশেষ সময়ে, মিলিতোনা নিশ্চয়ই বাড়ী থেকে বের হবে কিংবা বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌বে। কেননা, একেবারে ৬ মাসের মতন তাঁর ভাড়ার ঘরটিতে মেওয়া-মোরব্বা যে সঞ্চিত আছে তা আমার বিশ্বাস হয় না। যখন সে বাড়ী থেকে বেরুবে, কিংবা বাড়ীতে ঢুক্‌বে, সেই সময়েই আমি লগ্নমাফিক একটা সুরচিত রসালো বাক্যে তাকে অভিনন্দন করব। তাহলে দেখ্‌তে পাব, বৃষযুদ্ধের রঙ্গালয়ে মিলিতোনা যেরূপ আমার সহিত বাক্যালাপে কঠোর ভাব ধারণ করেছিলেন, এখনও সেইরূপ করেন কি না। আচ্ছা তাহলে পুরোনো কাপড়ের দোকানে যাওয়া যাক, সেখানে গিয়ে শ্রম-শিল্পী শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে কাপড়ের "ফ্যাশান" বর্ত্তমানে প্রচলিত সেই কাপড়ের ছদ্মবেশ পরা যাক। তাহলে কারও সন্দেহ উদ্রেক হবে না। অনায়া[illegible] আমার প্রিয়তমার সম্বন্ধে সমস্ত খ[illegible] পার[illegible]"

[illegible] কো[illegible]

উঠিয়া পড়িল এবং এক পেয়ালা জল-চকোলেট্ পান করিয়া সেই পুরানো কাপড়ের দোকানের অভিমুখে যাত্রা করিল। সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায়—কিন্তু সব পুরাতন।

নানাপ্রকার ফন্দি ভাবিতে ভাবিতে আন্দ্রে একটা পুরাতন কাপড়ের দোকানে আসিয়া পৌঁছিল। এখানকার কাপড়গুলা পুরাতন হইলেও ভদ্রলোকের অব্যবহার্য্য নহে। উহারই মধ্য হইতে ম্যানোলা-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত টুপি কোর্ত্তা পায়জামা—প্রভৃতি সৌখীন পরিচ্ছদ আন্দ্রে বাছিয়া লইল। দোকানে একটা বড় আয়না ছিল, সেই আয়নায় আন্দ্রে দেখিল পোষাকটা বেশ মানিয়াছে। কাপড়ের মূল্য দিয়া এবং কাপড়গুলা রাখিয়া, আন্দ্রে দোকানদারকে বলিল, সন্ধ্যার সময় দোকানে আসিয়া এই পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। এই ছদ্মবেশ পরিয়া নিজ গৃহ হইতে বাহির হইতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

যে রাস্তায় মিলিতোনা থাকে, আন্দ্রে গৃহে ফিরিবার সময় সেই রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে একটা জানলা দেখিতে পাইল, তার চারিধারে চুনকাম করা ; এবং পেরিকো যেরূপ বলিয়াছিল—একটা জলের কুজো ঝোলানো রহিয়াছে। কিন্তু এমন কিছুই দেখিতে পাইল না, যাহাতে জানিতে পারা যায়, ঘরের মধ্যে কোন লোক আছে। বাহির দিক হইতে, একটা মস্‌লিনের পর্দ্দা দিয়া জানলাটা ঢাকা—ভিতরের কিছুই দেখা [illegible]

"বোধ [illegible] কোন কার্য্য উপ[illegible] তন না [illegible] আগে ফিরিবে না। হয়ত সে সেলাইয়ের কাজ করে, চুরোট বিক্রী করে, মোজা-বুননের কাজ করে কিংবা ঐ রকম আর-কিছু।"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আন্দ্রে চলিতে লাগিল।

মিলিতোনা বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই। একটা টেবিলের উপর, একটা জামার বিভিন্ন অংশ বিছানো রহিয়াছে ; মিলিতোনা সেই টেবিলের ধারে বসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া কাজ করিতেছে। পাছে জুয়াঙ্কো আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় মিলিতোনা ঘরে খিল দিয়াছে। তাতে আবার বৃদ্ধা এখন গৃহে নাই, এই সময়ে জুয়াঙ্কো আসিলে আরও বিপদ।

শেলাই করিতে করিতে মিলিতোনা সেই যুবা পুরুষের কথা ভাবিতেছিল,—যে গত কল্য সার্কাসে, এমন জ্বলন্ত অথচ মধুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে তাকাইয়াছিল এবং কতকগুলি কথা এমন মধুরস্বরে বলিয়াছিল যে যাহা এখনো যেন তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"আমার সঙ্গে আবার দেখা করবার জন্য আমার খোঁজ না" করে ত ভাল হয়—যদিও খোঁজ করলে আমি খুসী হই। কিন্তু জুয়াঙ্কো নিশ্চয়ই তার সঙ্গে একটা ভয়ানক ঝগ্‌ড়া আরম্ভ করে দেবে ; হয়ত তাকে খুন কর্‌বে কিংবা ভয়ানক জখম্ করবে—পূর্ব্বে যে কেহ আমার মন পাবার চেষ্টা করেছে, তারই উপর সে এই রকম অত্যাচার করেছে। জুয়াঙ্কো এক নগর হতে নগরান্তরে আমার অনুসরণ করেছে, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়েছে—পাছে যে হৃদয় জুয়াঙ্কোকে দিতে অস্বীকার করেছিলুম, সেই হৃদয় অন্যকে আমি দিয়ে

ফেলি। সেই যুবাপুরুষ আমার শ্রেণীস্থ নয়। তার চাল-চলন দেখ্‌লেই বুঝা যায় সে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক ও ধনবান; আমার উপর তার যদি কিছু ভালবাসা পড়ে' থাকে সে একটা ক্ষণিক খেয়াল বৈ আর কিছুই না; এরই মধ্যে সে আমাকে নিশ্চয়ই ভুলে গেছে।"

এইখানে আমরা সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতেছি, এই সময়ে এই তরুণীর ললাটের উপর দিয়া একখণ্ড লঘু মেঘ চলিয়া গেল, এবং তাহার একটা নিঃশ্বাস দীর্ঘ নিশ্বাসের মত বোধ হইল।

"নিশ্চয়ই তাঁর কোন প্রেয়সী আছে, বাগ্‌দত্তা ভাবী পত্নী আছে—যে তরুণী, যে সুন্দরী, রূপলাবণ্যবতী, যার ভাল ভাল টুপি আছে, বড় বড় শাল আছে। রঙ্গিন রেশমের ফিতা দেওয়া রূপালী বোতাম দেওয়া ফতুয়ায় কেমন তাঁকে মানাবে। রেশমের একটি সুন্দর কোমরবন্ধে কোমর বাঁধ্‌লে, তাঁর শরীরের গড়নটি আরও কত সুন্দর দেখ্‌তে হবে।"—মিলিতোনা আপন মনে এইরূপ বলিয়া যাইতেছিল এবং মুগ্ধ হৃদয়ের মায়া-জাল বুনিয়া, আন্দ্রেকে নিজ শ্রেণীসুলভ পোষাক পরাইতেছিল। মিলিতোনা এইরূপ সুখস্বপ্নে যখন বিভোর,—বৃদ্ধা আসিয়া তাহার কামরার দরজায় ঘা দিল। এবং মিলিতোনাকে বলিল ঃ—

"তুই কি জানিস্‌নে? সেই ক্রোধান্ধ জুয়াঙ্কো তার হাতের ক্ষতস্থানে পটি না বেঁধে, তোর জানলার সম্মুখে সমস্ত রাত্তির ঘুরে বেড়িয়েছে,—নিশ্চয় এই মনে ক'রে,—যদি সেই সার্কাসের যুবকটিকে ওখানে দেখ্‌তে পায়। তুই সেই যুবককে মিলনের সংকেত স্থান নিশ্চয় বলে দিয়েছিস—এই কথাটা জুয়াঙ্কোর মাথায় গজ্‌গ্‌জ করছিল। আচ্ছা জুয়াঙ্কো বেচারাকে তুই ভাল বাসিস্‌নে কেন বল দিকি? তুই যে তাহলে একটু শান্তি পেতিস্।"

—"ও সব কথা থাক্; যে ভালবাসা আমি কোন রকমে একটুও উস্‌কে দিই নি, সে ভালবাসার জন্য আমি দায়ী হতে পারিনে।" বৃদ্ধা আবার বলিল ঃ—"সার্কাসের সেই যুবকটি সুন্দর নয়, কিংবা সে নারীর সম্মান রাখ্‌তে জানে না—একথা আমি বল্‌ছিনে। খুব মিঠে ধরণে, আমাদের নারী-জাতের উপর খুব সম্মান দেখিয়ে, সে আমাকে এক বাক্‌সো লজিঞ্জিস্ দিয়েছিল; কিন্তু আমার মনের টান জুয়াঙ্কোর উপর। তাকে আমি বাঘের মত ডরাই। সে আমাকে কতকটা তোর অভিভাবক বলে' মনে করে। তুই যদি আর একজনকে বেশী পছন্দ করিস্, তাহলে সে তার জন্য আমাকে দায়ী করতে পারে। সে এত কাছে থেকে তোর উপর নজর রাখে যে, তার কাছ থেকে খুব সামান্য কথাও লুকোনো ভারী শক্ত।" লজ্জায় মিলিতোনার মুখ একটু লাল হইল। সে উত্তর করিল ঃ—

—"তোমার কথা শুন্‌লে মনে হয়, সেই ভদ্রলোকটি যার চেহারাও আমার মনে নেই,—তার সঙ্গে যেন আমার একটা রীতিমত কারবার চল্‌চে।"—"তুই যদি তাকে ভুলে গিয়ে থাকি [illegible] আমার [illegible] ভোলে নি, আমি বেশ [illegible] পার [illegible] সাহায্যে [illegible] সেই [illegible] কে।

ষাঁড়ের লড়ায়ের সময় সে তোকে ক্রমাগত দেখ্‌ছিল; মনে হল যেন মেরী মাতার কোন মূর্ত্তির সাম্‌নে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে।"

আন্দ্রের ভালবাসা এই বৃদ্ধার সাক্ষ্যে আরও দৃঢ়ীভূত হইল। মিলিতোনা ঝুঁকিয়া আবার সেলাই করিতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না।

জুয়াঙ্কোর হৃদয় এই সব কোমল ভাব হইতে বহুদূরে। জুয়াঙ্কোর হস্তে নিহত বৃষের মুণ্ডগুলা জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে উপহার দিতে গিয়াছিল, কিন্তু মিলিতোনা তাহা গ্রহণ করে নাই। কাজেই সে এখন অসি ও বৃষমুণ্ডে ভূষিত তাহার কামরায় বদ্ধ থাকিয়া এই সব জিনিষের মধ্যে কোন প্রকারে হতভাগ্য হতাশ প্রেমিকের ন্যায় সময় কাটাইতেছিল। সে বুঝিতেই পারে না মিলিতোনা কেন তাকে ভাল বাসে না। তাহার প্রতি মিলিতোনার এই বিরাগ তাহার নিকট একটা অসাধ্য সমস্যা বলিয়া মনে হইতেছিল; সে কিছুতেই তাহার সমাধান করিতে পারিতেছিল না। "আমি কি তরুণ-বয়স্ক নহি, সুশ্রী নহি, বলিষ্ঠ নহি, উৎসাহ ও সাহসে আমার হৃদয় কি পূর্ণ নহে? স্পেনের শত শত শুভ্র চারু হস্তের করতালি নাদে আমার প্রশংসা কি হাজার হাজার বার প্রতিধ্বনিত হয় নাই? অন্যান্য নির্ভীক বৃষ-মল্লের মত আমারও পরিচ্ছদ কি সোনার জরিতে বিভূ[illegible] ছিলনা? আর্টের বড় বড় ওস্তাদদি[illegible] ও ওড়নায় আমার ছবি [illegible] আমি যে রকম [illegible] তন না [illegible]

যত শীঘ্র বৃষকে ধরাশায়ী করতে পারি, সে রকম আর কে করতে পারে?

কেহই না। বৃষ-বধের মূল্য স্বরূপ, রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তগত হয়েছে। আমার তবে কিসের অভাব?" জুয়াঙ্কো আপনার দোষ ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন দোষ ত্রুটিই দেখিতে পাইল না। তার প্রতি মিলিতোনার এই উদাসীনতা,—এই বিরাগের তবে কি-কারণ হইতে পারে? সে হয়ত আর কোন ব্যক্তিকে ভাল বাসে, এ ছাড়া ত আর কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই মনে করিয়া জুয়াঙ্কো "সেই ব্যক্তিকে" সর্ব্বত্র অনুসরণ করিতেছে ঃ একটা সামান্য কারণেই তাহার ঈর্ষা ও ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, তাহার প্রতি এই তরুণীর অবিচলিত ঔদাস্য তাহাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে খুন করিয়া তাহার মোহিণী শক্তিকে নষ্ট করিবে—এই কথা জুয়াঙ্কোর মাথায় অনেক-বার আসিয়াছিল। এক বৎসরেরও অধিক—অর্থাৎ যে অবধি মিলিতোনাকে সে দেখিয়াছিল—তাহার এই উন্মত্ততা সমানভাবে ছিল। কারণ, তাহার প্রেম—অন্যান্য উদ্দাম অবেগেরই মতো শীঘ্রই চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

আন্দ্রেকে পাকড়াইতে হইলে, এখানকার প্রধান প্রধান নাট্যশালায়, সৌখিন কাফির আড্ডায় এবং অন্যান্য স্থানে যেখানে সম্ভ্রান্ত লোকেরা একত্র সম্মিলিত হয়—তাহার খোঁজ করা আবশ্যক। যদিও সম্ভ্রান্ত লোকেরা যে সব বস্ত্র পরিধান করে তাহার প্রতি জুয়াঙ্কোর বিষম বিদ্বেষ ছিল, তথাপি তাহার মৎলব

হাসিল করিবার জন্য সে ঐসব কাপড় কিনিবার জন্য একটা পুরাতন কাপড়ের দোকানে গেল। আন্দ্রে যে সময়ে পুরাতন কাপড়ের দোকানে গিয়াছিল, জুয়াঙ্কোও ঠিক সেই সময়েই গিয়াছিল। একজন বৈর সাধনের উদ্দেশে, আর একজন প্রেমের উদ্দেশে।

আজকাল আন্দ্রে অপরাধী প্রেমিকের মতো, ফেলিসিয়ানার ওখানে গিয়া ঠিক্ সময়েই হাজির হইয়া থাকে—তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না।

আন্দ্রে মার্কিসের গানের মজলিসে ভয়ানক বেসুরো গাহিয়াছিল, এবং ক্রমাগত অন্যমনস্ক হইতেছিল—এই সমস্তের উল্লেখ করিয়া ফেলিসিয়ানা আন্দ্রেকে ভর্ৎসনা করিল। "সেই যুগলবদ্ধ গান ও বাজনা কত যত্ন করে, কত কষ্ট করে', কতদিন ধরে' অভ্যাস করা গেল আর আসল দিনে কিনা সব ভণ্ডুল হয়ে গেল।"

আন্দ্রে আপনাকে সাফাই করিবার জন্য যথাসাধ্য তাহার ভ্রমভ্রান্তির কারণ দেখাইল। কিন্তু আন্দ্রের বাজনার ত্রুটি সত্ত্বেও, সেদিন ফেলিসিয়ানার গানে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। এমন কি তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া থিয়েটারে প্রসিদ্ধ গায়িকাদিগেরও ঈর্ষা হইয়াছিল। সেই জন্য ফেলিসিয়ানাকে সান্ত্বনা করিতে আন্দ্রের বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। প্রেমিকযুগল চিরন্তন বন্ধুর ন্যায় সদ্‌ভাবে প্রসন্ন মনে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

সায়াহ্নকাল সমাগত। জুয়াঙ্কো হাল-ফ্যাশানের পরিচ্ছদ পরিধান করায়, জুয়াঙ্কোকে এখন চেনা দুষ্কর। যে রাস্তায় মিলিতোনা বাস করে, জুয়াঙ্কো সেই রাস্তা দিয়া, জ্বর-রোগীর ন্যায়, অসমান পদক্ষেপে চলিতে চলিতে প্রত্যেক পথ্-চল্‌তি লোকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সকল থিয়েটারেই প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহকারে থিয়েটারের সঙ্গীত স্থান, "ষ্টেজ্-বক্স্" এবং দর্শকদিগের "বক্স্" সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। জুয়াঙ্কো কাফির আড্ডায় গিয়া সব রকমের কুল্লিই গলাধঃকরণ করিল, সকলদলের রাজনৈতিকদিগের সহিত কবিদিগের সহিত মিশিতে লাগিল; কিন্তু যে অতি মধুরস্বরে মিলিতোনার সহিত সেদিন সার্কাসে কথা কহিয়াছিল, তাহার মত কাহাকেই দেখিতে পাইল না। দেখিতে না পাওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল।

আন্দ্রে সেই পুরাতন কাপড়ের দোকানে, তাহার খরিদ করা সেই ছদ্মবেশের পোষাকটা পরিতে গিয়াছিল; সেখান থেকে ফিরিয়া মিলিতোনার বাস-গৃহের সম্মুখস্থ একটা সর্ব্বতের দোকানে আড্ডা করিয়া বেশ ধীরে-সুস্থে এক গেলাস বরফে-জমানো লেমনেড্ পান করিতেছিল এবং পেরিকোর সাহায্যে চারিদিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাছাড়া জুয়াঙ্কো আন্দ্রের সম্মুখ দিয়া গেলেও আন্দ্রে তাহার নজরে পড়িত না। আন্দ্রে শ্রম-শিল্পী শ্রেণীর পোষাক পরিবে এ কথা জুয়াঙ্কোর মাথায় কখনও আসিত না। মিলিতোনা আপন জান্‌লার কোণটিতে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, এক মুহূর্ত্ত প্রবঞ্চিত হয় নাই। বি[illegible] আমার [illegible] দিব্য দৃষ্টি বেশী। [illegible] পার [illegible] তই কে।

উৎকণ্ঠিত ছিল; সে আন্দ্রেকে সম্মুখস্থ দোকানে বসিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, নাজানি কি মৎলবে আন্দ্রে ওখানে আড্ডা গাড়িয়াছে; আন্দ্রের সহিত জুয়াঙ্কোর সাক্ষাৎ হইলে নিশ্চয়ই একটা ভীষণ কাণ্ড হইবে।

আন্দ্রে টেবিলের উপর কুনুই রাখিয়া পুলিসের টিক্‌টিকির মতো খুব মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল কে-কে মিলিতোনার গৃহে প্রবেশ করে। প্রথমে, অনেকগুলি স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, সকল বয়সেরই লোক গৃহে প্রবেশ করিল। (কেননা, ঐ বাড়ীতে অনেকগুলি পরিবার বাস করে); তাহার পর মাঝে মাঝে, একটু বিলম্বে বিলম্বে, লোক প্রবেশ করিতে লাগিল; ক্রমে রাত্রি আসিয়া পড়িল; তখন, কোনও কাজে যাহাদের বিলম্ব হইয়া গেছে, এইরূপ দুই একটি লোক প্রবেশ করিল। মিলিতোনার দেখা নাই।

আন্দ্রের দূত আন্দ্রেকে মিলিতোনার যে ঠিকানা দিয়াছিল, হয়ত তাহা ভুল—এইরূপ আন্দ্রে মনে মনে ভাবিতেছিল—এমন সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জান্‌লাটা আলোকিত হইয়া উঠিল; এবং দেখা গেল, কামরায় লোক আছে।

মিলিতোনা যে তাহার কাম্‌রায় আছে, এ বিষয়ে আন্দ্রের কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তাহাতে ত কোন কাজ আগাইবে না; আন্দ্রে পেন্‌সিল দিয়ে এক টুকরা কাগজের উপর দুই চারিটা কথা লিখিয়া পেরিকোকে ডাকিল; পেরি[illegible] সন্ধান করিবার জন্য চা[illegible] বেড়াইতেছিল। আন্দ্রে [illegible] চিঠিখানা লই[illegible] তন না[illegible]

পেরিকো ঐ বাড়ীর একজন ভাড়াটের মত সুড়্‌সুড়্ করিয়া গৃহে ঢুকিল; ঢুকিয়া একটা কালো সিঁড়িতে আসিয়া পড়িল; তাহার পর দেয়াল হাতড়াইতে হাতড়াইতে শেষে উপরকার সিঁড়ির মাথায় আসিয়া পৌঁছিল; দেয়ালের তক্তার ফাঁক দিয়া যে একটু-আধটু আলো আসিতেছিল, সেই আলোয় মিলিতোনার কাম্‌রার দরজাটা দেখিতে পাওয়া গেল; পেরিকো খুব সতর্কভাবে দরজায় দুইবার করাঘাত করিল। তরুণী খড়খড়ি খুলিয়া চিঠিখানা লইল; তাহার পর আবার খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

আন্দ্রে লেমনেডটা শেষ করিয়া, এবং দোকানদারকে উহার মূল্য চুকাইয়া দিয়া মনে মনে ভাবিল, "যদি সে পড়িতে জানে, তবেই ত।"

আন্দ্রে উঠিয়া, আস্তে আস্তে সেই জান্‌লার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। চিঠিতে এই কথা লেখা ছিল:—

"একজন তোমাকে ভুলতে পারে না, ভুলতে ইচ্ছাও করে না, সে তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চায়; কিন্তু তুমি সার্কাসে তাকে যে দুই একটা কথা বলেছিলে সেই কথা শুনে অবধি (আর তোমার জীবনযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হয় তাও সে জানে না)—সেই কথা শুনে অবধি তার ভয় হয় পাছে আমার এই চেষ্টায় তোমার কোন বিপর্য্যয় ঘটে। তার নিজের যতই বিপদ হোক্ না কেন, কোন বিপদই তাকে আটকাতে পারবে না। তোমার প্রদীপটা নিবিয়ে দিও, আর জান্‌লা থেকে উত্তরটা তার কাছে ফেলে দিও।"

কয়েক মিনিটের পর, প্রদীপটা অন্তর্হিত হইল, জান্‌লাটা খুলিয়া গেল, এবং মিলিতোনা তার কুজোটা হাতে লইয়া, একটা টিনের 'মগ্' নীচে নিক্ষেপ করিল; মগ্‌টা দীপ্তিচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া আন্দ্রের কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পতিত হইল।

ফুট-পাথের উপর যে শ্যামল মৃত্তিকা প্রসারিত ছিল, সেই মৃত্তিকার মধ্যে কি-একটা সাদা জিনিস্ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আন্দ্রে দেখিল।

সেই সময়, বল্লমের ডগায় একটা লণ্ঠন ঝুলাইয়া, একজন নৈশ-প্রহরী সেইখান দিয়া যাইতেছিল, আন্দ্রে তাহাকে ডাকিল এবং তাহার লণ্ঠনটা একটু নীচু করিয়া ধরিতে বলিল। ঐ লণ্ঠনের আলোয় আন্দ্রে নিম্ন-লিখিত কথাগুলি পাঠ করিল। লেখাটা কম্পিত হস্তে বড় বড় অক্ষরে বিশৃঙ্খলভাবে লিখিত ঃ—

"ওখান থেকে চলে যাও……আর বেশী লেখবার আমার সময় নেই। কাল দশটার সময় আমি "হঁসিড়োর" গির্জ্জায় থাক্‌ব। কিন্তু আমার কথা শোনো, এখনি প্রস্থান কর; এখানে থাক্‌লে প্রাণ যাবে।"

আন্দ্রে প্রহরীর হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল, "সেপাই সাহেব, বড়ই উপকৃত হলাম, এখন তোমার কাজে যেতে পার।"

রাস্তাটা একেবারে জনশূন্য। আন্দ্রে ধীর-পদক্ষেপে প্রস্থান করিতেছে এমন সময় একটা লোকের মূর্ত্তি তাহার নেত্রগোচর হইল। মূর্ত্তিটা একটা প্রাবরণ-বস্ত্রে আচ্ছাদিত, বস্ত্রের নীচে তীক্ষ্ণ কোণ-বিশিষ্ট একটা গিতার-যন্ত্র রহিয়াছে। আন্দ্রের কৌতূহল উদ্দীপিত হইল। আন্দ্রে একটা অন্ধকার কোণে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল।

লোকটা স্বীয় বস্ত্রাবরণের আঁচলগুলা কাঁধের উপর ফেলিয়া দিয়া, গিতার-যন্ত্রটা সাম্‌নে আনিল, এবং গিতারের তার টানিয়া তালে তালে একটা গুঞ্জনধ্বনি বাহির করিতে লাগিল। প্রণয়িনীর প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য প্রণয়িনীর গৃহগবাক্ষের নীচে দাঁড়াইয়া এইরূপ সঙ্গৎ-সহযোগে 'সেরিনেড্' গান গাওয়া হইয়া থাকে।

স্পষ্ট বুঝা গেল, গান্‌টার প্রথম অংশের উদ্দেশ্য কোন্ সুন্দরীকে জাগাইয়া তোলা। কিন্তু যখন মিলিতোনার জান্‌লা আর খুলিল না, তখন লোকটা অদৃশ্য শ্রোতার উদ্দেশে গাহিয়াই সন্তুষ্ট রহিল; যদিও একটা স্পেন্-দেশীয় প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কোন রমণী যতই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হোক্ না, গিতার-ধ্বনি শুনিলে জান্‌লা দিয়া মুখ না বাড়াইয়া থাকিতে পারে না। লোকটা প্রথমে গলা সাফ করিয়া লইবার জন্য খুব গম্ভীর স্বরে "হুম্ হুম্" করিয়া একটা কণ্ঠ ধ্বনি করিল, তারপর খুব ঝোঁক দিয়া-দিয়া একটা প্রণয়-গীতি গাহিতে লাগিল ঃ—

ওগো বালা,—

রাণীর গৌরব মুখে, একি অনাসৃষ্টি।
কপোতী তোমার কেন শ্যেন-সম দৃষ্টি?
যদি হেথা দেয় কেহ বীণার ঝঙ্কার
তখনি করিব তার পরাণ সংহার।
এ রাস্তায় আর কা[illegible] কি অধিকার
হেথা যে বস[illegible] আমার তোমার।
আন্দ্রে [illegible] পার

[illegible] কে।

না আছে এতে রস-কষ, না আছে কোনও কবিত্ব। নিশ্চয়ই মিলিতোনার উদ্দেশে প্রণয়-সঙ্গীতের নামে এই নৈশ কোলাহল সুরু করে দিয়েছে, দেখা যাক এই গানে মিলিতোনার মন গলে কি না। খুব সম্ভব এই ভীষণ প্রেমিকের অত্যাচারেই সে এত ভয় পেয়েছে। ভয় পাবারই কথা।"

আন্দ্রে গাছের ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিল,—গাছের ছায়া হইতে যেই একটু মুখ বাড়াইয়াছে অমনি একটা চন্দ্র-রশ্মি তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল; জুয়াঙ্কোর সজাগ দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল। আন্দ্রে মনে মনে ভাবিল ঃ—

"যাক্, আমি ধরা পড়িয়াছি,—এখন আমার মনের ভাব মুখে প্রকাশ হতে দেব না।"

জুয়াঙ্কো গিতারটা মাটিতে ফেলিয়া দিল; বাঁধানো ফুটপাতের উপর পড়িয়া গিতারটা বিষাদগম্ভীর রবে অনুরণিত হইল।

জুয়াঙ্কো আন্দ্রের অভিমুখে ছুটিয়া গেল—এবং চন্দ্রালোকে আলোকিত আন্দ্রের মুখ তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল। রোষ-কম্পিত-স্বরে জুয়াঙ্কো বলিল ঃ—

—এ সময়ে তুমি এখানে কি করতে এসেছ?

—আমি তোমার সঙ্গীত শুন্‌চি; শুনে মৃদু মধুর একটা আনন্দ অনুভব করচি।

—যদি তুমি ভাল করে শুনে থাক, তাহলে ত জান্‌তেই পে[illegible] আমি যখন গান করি সে সময় এ[illegible] নিষেধ।

আ[illegible] তিন না[illegible] বে উত্তর করি[illegible]

—স্বভাবতঃ আমি বড়ই অবাধ্য।

—আজই তোমার স্বভাব বদ্‌লে যাবে।

—কোন প্রকারেই না; আমার স্বভাব আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

জুয়াঙ্কো তাহার ছোরা বাহির করিয়া এবং হাতাহীন আলখাল্লাটা বাহুতে গুটাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল ঃ—

—"আচ্ছা বেশ, আপনাকে হয় রক্ষা কর, নয় কুকুরের মত মর্।"

আন্দ্রেও ক্ষিপ্রতার সহিত সতর্ক হইল, এবং আত্মরক্ষার্থ এমন একটা উত্তম প্রণালী অবলম্বন করিল যাহা দেখিয়া বৃষভমল্ল বিস্মিত হইল। কারণ আন্দ্রে ইতিপূর্ব্বে বড় বড় ওস্তাদের কাছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে অসি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। জুয়াঙ্কো বাঁ হাতটা বাড়াইয়া এবং সজোরে ছোরা মারিবার জন্য পিছন দিকে ডান হাতটা রাখিয়া আন্দ্রের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাঁ হাতটা মোটা কাপড়ে আচ্ছাদিত ছিল; কতকটা ঢালের কাজ করিতেছিল।

জুয়াঙ্কো একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে; একবার অতিকায়ের মত লম্বা হইতেছে, একবার বামনের মত খাটো হইতেছে; কিন্তু যতবার ছোরা মারিতেছে, ততবারই ছোরার মুখ আন্দ্রের গোটানো হাতা-হীন আলখাল্লায় ঠেকিতেছে।

জুয়াঙ্কো, একবার চট করিয়া পিছু হটিতেছে, আবার সবেগে ও সজোরে আক্রমণ করিতেছে; একবার ডাইনে লাফাইতেছে, একবার বাঁয়ে লাফাইতেছে; এবং বল্লমের মত ছোরাটা বাগাইয়া ধরিয়া খাঁচা মারিবার ভাবে ওঁচাইয়া রহিয়াছে।

আন্দ্রে এই আক্রমণের উত্তরস্বরূপ অনেকবার প্রতিপক্ষের আঘাত সাম্‌লাইয়া এমন তাক্-মাফিক ছোরা চালাইতে লাগিল যে জুয়াঙ্কো ছাড়া আর কেহ হইলে, তাহা সাম্‌লাইতে পারিত না। যেরূপ ভাবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহা পণ্ডিত দর্শকদিগের দেখিবার যোগ্য; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গৃহের সকল জান্‌লাই বন্ধ, রাস্তা একেবারে জনশূন্য।

দুজনেই খুব বলিষ্ঠ হইলেও, যুদ্ধশ্রমে দুজনেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; কপাল বহিয়া ঘাম টস্‌টস্ করিয়া পড়িতেছে, কামারের জাঁতা হাপোসের মত তাদের বক্ষদেশ উঠিতেছে পড়িতেছে, তাদের পা মাটিতে আর লঘুভাবে পড়িতেছে না, তাদের লক্ষে আর সে স্থিতি-স্থাপকতা নাই।

জুয়াঙ্কো অনুভব করিল, আন্দ্রের ছোরার মুখ তার জামার হাতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে;—তাহার রোষ বৃদ্ধি হইল। খুব একটা চেষ্টা করিয়া, প্রাণসঙ্কট স্বীকার করিয়াও শত্রুর উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আন্দ্রে চীৎপাত হইয়া ধরাশায়ী হইল; এই সময় মিলিতোনা-গৃহের অদৃঢ়-বদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। ঐ গৃহের সম্মুখেই এই যুদ্ধ চলিতেছিল। জুয়াঙ্কো ধীরপদক্ষেপে প্রস্থান করিল। ঐ রাস্তার কোণ দিয়া যে নৈশ প্রহরী যাইতেছিল সে হাঁকিয়া উঠিল:—

"নূতন আর কিছুই ঘটে নাই; রাত্রি সাড়ে এগারোটা; আকাশে তারা জ্বলিতেছে; কোন উপদ্রব নাই, সব শান্ত।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলো-আঁধারে

(গল্প)

১

যে-কালের কথা বলছি, সেকালের সঙ্গে আজকের এই তফাৎটা নজরে পড়ছে:—এ চৌরাস্তাটার ঐ-কোণে সমাজ-বাড়িটা তখন আশপাশের চেয়ে আয়তনে বিষম ফেঁপে উঠে আমার এই ছোট ঘরটার মধ্যেকার অন্ধকার দূর করবার পথটুকু একেবারে বন্ধ করেনি; রাস্তার দুসারি বাসা-বাড়িগুলোর সঙ্গে সে-সময়ে লম্বাই চওড়াই রং-ঢং কোনো দিক দিয়েই ঐ সমাজ-বাড়িটা ভিন্ন ছিলনা; আর ওর ভিতরকার মতভেদটাও তখন এতটা সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি—ওই বাজ-পড়া শিক-বসানো চুড়োটার মতো! ডাইনে বাঁয়ে বিলিতি-মাটীর সরু দাওয়া, তার মাঝে খুব নীচু গেরিমাটির রং-লেপা সদর-দরজাটি, তারই মাঝ দিয়ে তখন ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা, আচার্য্য উপাচার্য্য, এমন-কি তিন [illegible] করতেম; আর [illegible] সদর-দরজা [illegible] কে।

এক-সঙ্গে চায়ের পেয়ালা হাতে, কালেজের অব্রাহ্ম ছাত্র ও পাড়ার হিন্দু প্রতিবেশীদের কাছে উন্নতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতার সজীব দৃষ্টান্ত প্রচার করতেম। ঠিক ঐ সমাজ-বাড়িটার সামনেই সাবেকী যে মস্ত বাড়িটা দেখা যায়, সেটা ভেঙে পড়ছে; কিন্তু আজও হুজুগের মুখে লাখ-দুলাখ টাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছেনা। সেইখানে থাকতো: যে-মেয়েটির কথা বলবো—সে আর ঐ চৌমাথার মোড়েই যে-বাড়িটার চিহ্নও দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা সেইখানে থাকতো শ্যামাচরণ। এ ছাড়া পাড়ায় অনেক আইবুড়ো মেয়ে, বিয়ের যোগ্য ছেলেরও অভাব ছিলনা, যারা ঐ ব্রাহ্ম-সমাজের ঘরে-বাইরে ছুটির দিনে উন্নতদলের আচার্য্য-উপাচার্য্যদের ওখানে চা-পার্টিতে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন-সভায় এসে যোগ না দিত। এ বিষয়ে শ্যামাচরণও বাদ যায়নি। উপাচার্য্যের মেয়ে মিনির সঙ্গে শ্যামাচরণের আলাপ-পরিচয় বেশ জমে উঠেছিল—যদিও শ্যামাচরণ নামে যেমন, আসলেও তেমনি ঘোরতর শাক্ত এক বাঙাল-জমীদারের একটিমাত্র ছেলে। অবশ্য নব-ধর্ম্মে দীক্ষা না নিলে মিনিকে পাওয়া শ্যামাচরণের পক্ষেও শক্ত, যদিও সে সবদিক দিয়ে মিনির যোগ্য। কাজেই শ্যামাচরণ শীঘ্র দীক্ষা নেবেই—এইটে আমরা আশা করছিলেম।

সেই সময়ে একদিন, মনে নেই পূব-অঞ্চলের কোন্ গ্রাম থেকে শ্রীমতী মালতী-লতা এসে ঐ [illegible] বাড়িটায় দেখা দিলেন। আর তা [illegible] সেই শ্যামাচরণের মুখেই [illegible] কিন্তু চাল-চলন [illegible] তেন না। [illegible] চোখেও তাঁকে দেখলেম;—পাড়ার নত, উন্নত সুন্দরী ও সুরূপা যতগুলি ছিল, কেউ লাগলোনা মালতীর কাছে! আর ঠিক তারই জোড়া দেখলেম আমাদের শ্যামাচরণ! কেবল একটি বিষয়ে শ্যামাচরণের সঙ্গে মালতীর মিল হ'ল না। মালতী এসেই ব্রাহ্মসমাজের সব-ক'টা উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করলে, আর আমার বন্ধু তখন থেকে ঠিক তার উল্টো সুর ধোরে, ছিপ, বন্দুক, কুস্তি, যাত্রা—ফুটবল তখন ছিলনা—এমনি সব অত্যন্ত অনিত্য জিনিষ নিয়ে দিন কাটাতে লাগলো।

মালতীর বাড়িতে নিত্য উপাসনার সঙ্গে উপাচার্য্য আচার্য্য ভাই-ভগিনীদের যাতায়াত ক্রমেই বাড়ছে; প্রায়ই নিমন্ত্রণ হয়; আমিও বাদ যাইনে, শ্যামাচরণও নয়; আমি যাই, কিন্তু শ্যামাচরণ যায় দরজা পর্য্যন্ত, তার পর নয়। অথচ অন্য দিন দেখেছি, শ্যামাচরণ কলেজে যাবার সময় মস্ত বাড়িটায় ঢুকলো, একটা বন্ধ-গাড়ি চড়ে মালতীর সঙ্গে কালি-ঘাটের দিকে চলে গেল; কালেজ থেকে ফিরে এসে দেখি তখনো বন্ধু বাসায় ফেরেনি। এটা যে আমিই লক্ষ্য করেছিলুম তা নয়। তখন-কার দিনের সেই ছোটখাটো ব্রাহ্মসমাজের উন্নত দলটিও, খুব উপর থেকে বাজ-পাখীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে এই পিতৃ-মাতৃ-হীনা স্বাধীনা জমীদার-কন্যা ও শাক্তবংশীয় তার একান্ত অনুগত ভক্তটিকে বেশ-ক'রে বুঝে নেবার চেষ্টা করছিল। মালতী ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যাতায়াত করছে; স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে হিঁদুয়ানির আগড়টা সে বেশ সহজে খুলে বেরিয়ে এসেছে—অন্দর পেরিয়ে অনেকখানি;

বেশ বোঝা যাচ্ছে তার চোখ একটা যেন নতুন আলোর মুখে মুগ্ধভাবে চেয়ে রয়েছে—দিন রাত; যেন কি-একটা পাবার জন্যে তার মধ্যে ব্যাকুলতার অন্ত নেই। বাইরেটা যেমন, তেমনি অন্তরটাও তার যেন মুক্তির মাঝে ফুটে-ওঠার চেষ্টায় ছোট পাখীর সবে-ওঠা ডানাদুটির মতো আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছে; অথচ এও দেখছি নবধর্ম্মে দীক্ষা না নিয়ে উন্নতসমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে কালিঘাটে যাওয়া-আসা করছে মালতী—তাও আবার ঐ ভিতরে-বাইরে সম্পূর্ণ হিঁদু কিন্তু সম্পূর্ণ উদার এবং মিনির বিষয়ে উদাসীন না হ'লেও ব্রাহ্ম এবং তাদের সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ে সহসা একেবারেই বিমুখ শ্যামাচরণের সঙ্গে! এটা উন্নতসমাজের আচার্য্য উপাচার্য্য থেকে আরম্ভ ক'রে মিনির পর্য্যন্ত ভাবনার বিষয় হয়ে উঠলো।

এখানে যখন এই অবস্থা, ঠিক সেই সময় একদিন, সমাজের প্রধান-প্রচারক, বুড়ুলী-গ্রামে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও সেই সঙ্গে বুড়ুলী থেকে একশো ক্রোশের মধ্যে যে যেখানে ছিল সবাইকে—স্ত্রী-পুরুষ ছোট-বড়নির্ব্বিশেষে—মায় বুড়ুলীর জমীদারের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেটিকে পর্য্যন্ত নবধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে, সদর সমাজে এসে দর্শন দিলেন। বলা বাহুল্য, মালতীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হ'ল। প্রথম দিনেই প্রচারক বুঝলেন, যে-মহাবাণী তিনি প্রচার করতে চান্, সেটি সমস্ত হৃদয় দিয়ে যদি কেউ ধারণ করতে পারে তো সে মালতী। এবং উন্নতসমাজের দল-বলেরাও বুঝলে মালতীকে পূর্ণ জ্ঞানালোকে যদি কেউ আনতে পারে তো সে তাদেরই প্রচারকমহাশয়।

সেদিন রবিবারে প্রধান-প্রচারকের বক্তৃতার জন্য একটা বিশেষ-নিমন্ত্রণ নিয়ে উপাচার্য্য মালতীর ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমি আর শ্যামাচরণ তখন সেখানে বসে চা খাচ্ছি। উপাচার্য্য নিমন্ত্রণ দিতেই মালতী খুব উৎসাহের সঙ্গে বল্লে—"যাবো নিশ্চয়ই, যতবার তাঁর বক্তৃতা হবে আমাকে বলতে ভুলবেন না। এঁদেরও বোলে যান্, ওঁরাও যাবেন।"

শ্যামাচরণ আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু মালতী বাধা দিয়ে বল্লে—"না, না, যেতেই হবে, আমার বিশেষ অনুরোধ।"

বন্ধু বিনা-আপত্তিতে নিমন্ত্রণ নিলেন। উপাচার্য্য আমাকেও ঐ সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানিয়ে চলে-যেতে-যেতে হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে মালতীকে কাছে ডেকে বল্লেন—"সেদিন প্রচারকমশায় অনেককে দীক্ষা দেবেন, সেই সঙ্গে মা তোমারো দীক্ষাটা—"

"সে পরে হবে। আমি অত লোকের মাঝে দীক্ষা নিতে পারবো না। আমি যখন দরকার বুঝবো, দীক্ষা নেবো।"

"করুণাময় পিতার চরণতলে তোমাকে যেন শীঘ্র দেখতে পাই!"—ব'লে উপাচার্য্য বিদায় হতেই শ্যামাচরণ হোহো-ক'রে খুব খানিকটা হেসে উঠলো। আমি দেখলেম লজ্জায় মালতীর কানদুটো রাঙা হয়ে উঠেছে; সে আস্তে-আস্তে আমার কাছে এগিয়ে এসে বল্লে—"উনিতো যাবেন না, আপনাকে আজ সন্ধ্যার সময় আমাকে নিয়ে সমাজে যেতে হবে।"

শ্যামাচরণ হঠাৎ চৌকি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"আমি তো [illegible] যাবো। তুমি ঠিক-সময় [illegible] পার [illegible] সময় কে।

নিয়ে মালতী একবার বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখলে। কৌতুক কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা তিন মিলে একটা যেন বিদ্যুৎ ঘরের মধ্যে খেলে গেল। আমি চায়ের পেয়ালায় শেষ-চুমুক দিয়ে বিদায় হলেম।

২

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি মালতীর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখলেম মিনিও এসেছে—মালতীকে নিতে। কিন্তু শ্যামাচরণ অন্যদিনের মতো সেদিনও ফাঁকি দিলে। সে যে এতটা অভদ্রতা করতে পারে তা আমার বিশ্বাস ছিল না। আমার ভারি রাগ হ'ল কিন্তু মালতী দেখলেম বেশ সহজে শ্যামাচরণের না-আসার একটা কারণ আবিষ্কার ক'রে নিয়ে মিনিকে ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে সমাজ-বাড়িটায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং প্রচারকের বক্তৃতা খুব মন দিয়ে শুনে বাড়ি ফিরে এলো।

প্রায় একমাস ধ'রে সমাজ-বাড়িতে প্রচারকের প্রচার চলেছে। দিনের পর দিন প্রতিসন্ধ্যায় মালতীকে দেখতেম বেদীর ডান-পাশে তার বাঁধা-জায়গাটিতে বসে উপদেশ শুনছে। প্রায় সবাইকে দেখতেম মাটির দিকে চোখ নামিয়ে রয়েছে, কেবল মালতী—সে যেন তার ডাগর চোখের সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে প্রচারকের বুকের ভিতরে যে-ভাব গুম্‌রে উঠছে তা পর্য্যন্ত ধরতে চাচ্ছে। এক-একবার মনে হতো তার দৃষ্টি এই সমাজ-বাড়ির দেওয়াল পর্য্যন্ত ভেদ ক'রে এক স্বর্গলোকে [illegible] ক'রে দূর সুদূরে চলে গেছে [illegible] সহর, তখন [illegible] তিন না [illegible] একদিন দীক্ষা নিয়ে নিলেম। কাজেই কালিঘাট ছিপ ও বন্দুক-ভক্ত শ্যামাচরণের কাছ থেকে তার মালতীকে যে এরা একদিন সরিয়ে নিয়ে সমাজের মধ্যে টেনে নেবে তাতে আমার একটুও সন্দেহ রইলনা। উল্টে বরং মনে হতো ধর্ম্ম-বিশ্বাসে দুজনের যখন কিছুতেই মিল হবেনা তখন দুজন দুজনের কাছ থেকে সরাই ভালো। কিন্তু একজায়গায় আমায় গোলমাল ঠেকতো। ঐ মিনি, সেও তো ব্রাহ্মমেয়ে, শ্যামাচরণের সঙ্গে তারও তো ধর্ম্মগত তফাৎ অনেকখানি, তবু কেমন ক'রে এই কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতা চলছিল—সব জেনেও? বাস্তবিক বলছি, আমার বন্ধুর উপর একটা অশ্রদ্ধা তখন মনের এককোণে আমি পুষ্‌ছিলেম; এবং প্রার্থনা করছিলেম মালতী যেন ওই কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকটার হাতে না পড়ে! পরমপিতার কাছে নিজের জন্যে করুণা-ভিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে মালতী যে শ্যামাচরণেরও জন্যে একটুখানি প্রার্থনা জানাতে পারে—বেদীর পাশে তার নিজের আসনটিতে ব'সে, সেটা আমার জ্ঞান ছিলনা। কিন্তু হয়তো শ্যামাচরণ সেটা কোনো অদ্ভুত শক্তিতে জেনেছিল, কাজেই সে মালতীর ভালোবাসার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে আনন্দে বাস করছিল—একেবারে নির্ভয়! ব্রাহ্মসমাজের প্রধানপ্রচারক, তিনিও হয়তো সে-রহস্যটা ধরেছিলেন; আর সেইজন্যে তাঁর সমস্ত শক্তি ও একটা প্রকাণ্ড আহ্বান নিয়ে তিনি এই দিনের পর দিন এসে দাঁড়াতে লাগলেন!—একমাত্র যেন মালতীর জন্যেই সেই ব্রহ্মমন্দিরে তাঁর প্রচার চলেছে—এইটেই আমার বোধ হতো।

জানিনে এই আহ্বান মালতীর মনে গিয়ে পৌঁছবে কিনা, কিন্তু যেদিন পৌঁছবে সেদিন—শ্যামাচরণের পাঙাস মুখটাই আমার চোখের উপরে ভেসে উঠতো। আর আমি যেন শুনতেম সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ—ছেলেবুড়ো-মেয়ে ঐ এতটুকু মালতী-লতাকে উদ্দেশ ক'রে বলছে—"এসো অন্ধকার থেকে আলোয়। পিতা কোল পেতে দাঁড়িয়ে আছেন, একটি পা এগোও, ঝাঁপিয়ে পড় কৃপাময়ের চরণ-তলে! আসবেনা? ফিরবেনা সেদিকে, যেদিক থেকে আলো আনছে তাঁর সংবাদ, বাতাস বইছে তাঁর বাণী? যাত্রী চলবেনা সেই অনন্তধামের দিকে? পাপী ফিরবেনা সেই পাপহারী পবিত্র আশ্রমে? দেখছনা পিতা চেয়ে রয়েছেন!"

সে এক রবিবার, এমনি একটা বক্তৃতা, উৎসাহ আর উন্মাদনার মুখে আমি দেখলেম মালতী ভেসে গেল। একটা অদ্ভুত আকর্ষণে সে উঠে গিয়ে বেদীর উপরে প্রচারকের পায়ের তলায় গিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। এটা আমি চক্ষে দেখলেম। আর খুব স্পষ্ট ক'রে শুনলেম যা, তা বলি। প্রচারক মন্দিরের ছাতের দিকে দুই হাত তুলে বল্লেন—"ধন্য জগদীশ তুমি! ধন্য তোমার করুণা! অসীম তোমার শক্তি! শান্তিঃ শান্তিঃ!"

দু-তিন জন ধরাধরি ক'রে মালতীকে বাইরে নিয়ে গেল। মহা-উৎসাহে ধর্ম্মসঙ্গীত চল্লো। ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সবাই—যার সুর আছে সেও, যার সুর নাই সেও, গানে যোগ দিলে। বেসুরো বেতালা হ'লেও সেদিন আমার মনে। সবটা খুব গম্ভীর শোনালো। প্রাণেশ্বর, প্রিয়তম, হৃদয়নাথ, বন্ধু, প্রাণনাথ, সখা—এম্‌নি সব কথাগুলোকে খুব খানিক টেনে-টেনে কখনো কান্না, কখনো মিনতি—এমনি নানাভাবের জালের মধ্যে বুনে-বুনে টানা একটা লম্বা বক্তৃতায় হ'ল যা, তা বলবার নয়। আর্গিন-যন্ত্রের প্যাঁচ কসে দিলে যেমন আপনি তা থেকে নানারকম সুর-সার বার হতে থাকে, তেমনি কেউ করতে থাক্‌ল অনুতাপ, কেউ চাইতে লাগলো পরিত্রাণ। এ বলে—"উদ্ধার কর!" ও বলে—"শাস্তি, শাস্তি!" হঠাৎ কোনো ভক্ত দাঁড়িয়ে উঠে আকাশের দিকে চোখ তুলে কাতরস্বরে ডাক দিতে থাকলো—"প্রভু, প্রভু, আমি সন্দিহান! আমার সংশয় দূর কর, আমাকে পথ দেখাও, আলো দাও প্রভু আলো দাও।" কেউ বা দশা-পেয়ে গুম্‌রে-গুম্‌রে কাঁদতে থাকলো। "প্রভু, প্রভু, চরণে স্থান দাও!"—ব'লে আমারি পানে একজন বুড়ো ঝুঁকে পড়ে কেবলি মাটি হাতড়াচ্ছে দেখলেম। প্রধান-আচার্য্য এতক্ষণ কি একটা যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একেবারে সপ্তমে সুরু করলেন ধর্ম্ম-সঙ্গীত—

তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু,
তুমি ধাতা,—
আমাদের পার কর হে—
তোমার ধর্ম্ম-তরী ভরি ভরি
পাপীদের পার করহে—
ধর্ম্মতরী-ই-ই
আমাদের ধর্ম্মতরী ভরি ভরি
ধর্ম্ম[illegible]

খুব টানা [illegible] আমার [illegible] ক'রে একটা প্রকা[illegible] পার [illegible] শেষ [illegible]

তাত পেয়ে খৈগুলো যেমন একটার পর একটা ক্রমাগত ফুটে উঠতে থাকে, তেমনি সঙ্গীত আর বক্তৃতার উত্তাপ পেয়ে একটির পর একটি এমন কত যে পাপী, তাপী, অনুতাপী আমার চারিদিকে সেদিন ফুটে উঠলো তার সংখ্যা নেই। আমার এক-একবার মনে হ'তে লাগলো, বুঝি আমিই একমাত্র জগতের মধ্যে একটি সাধু বেঁচে আছি!

সভা-ভঙ্গের পরে প্রচারক স্বয়ং এবং আরো দুচার জন কাঁচা-বয়সের ব্রাহ্ম-ভ্রাতা-ভগিনী মালতীকে ঘিরে রাস্তার ওপারের মস্ত বাড়িটায় পৌঁছে দিলেন। আমি আর সেদিন আমোল পেলেম না। আর শ্যামাচরণ, সে যখন আমার মুখে শুনলে আজকের সমাজের কাণ্ডটা, তখন হো-হো-ক'রে খানিকটা হেসে বললে—"গেলে তো হতো আমারো!" আমি রেগে বল্লেম—"মালতীকে আমি বুঝতে পারি, কিন্তু তুই যে কি, তা আমি আজও ঠিক করতে পারলাম না। তুই বেরো!" শ্যামাচরণ হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনার পরদিন ভোরে মালতীর বুড়ো চাকর এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বল্লে—"আপনাকে আর শ্যামবাবুকে একবার ওখানে যেতে হবে। দিদিমণির শরীর ভালো নেই।" আমি তাড়াতাড়ি শ্যামাচরণকে ডাক দিতে ছুটলেম। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর শ্যামাচরণের বাসার ঝিটা ঘুম ভেঙে চোখ মুছতে-মুছতে এসে [illegible]—"বাবু তো কাল রাতের গাড়ি[illegible] কোথায় যে গেছে শ্যা[illegible] না। মালতীর [illegible] তেন না [illegible]

আসছেন। আমার কেমন ভয় হ'ল, শুধোলেম—"মালতীর খবর ভালো তো?" প্রচারক সোনার চশমা-জোড়াটা সিল্কের চাদরে মুছতে-মুছতে গম্ভীরভাবে বললেন—"শরীর মন্দ নেই কিন্তু মনটা এখনো সম্পূর্ণ ওলট-পালট অবস্থায় রয়েছে। মিনির সঙ্গে ওঁকে আমি কিছুদিন কার্সিয়াং পাহাড়ে আমাদের ব্রহ্মাবাসে কাটিয়ে আসতে উপদেশ দিয়েছি। ওঁরও ইচ্ছা দেখলেম সেইখানেই গিয়ে দীক্ষা নেওয়া। আপনার সঙ্গে শ্যামবাবু নেই যে?" লোকটার চোখ-মুখের মোড়লি-আনা ভঙ্গী এবং শ্যামাচরণের সম্বন্ধে প্রশ্নের ধরণটা আমার মোটেই ভালো লাগলো না। আমি কোনো জবাব না দিয়ে সোজা উপরে উঠে গেলাম। মালতীর কাছে মিনি বসে ছিল, আমি যেতেই দুজনে ব'লে উঠলো—"আপনাকে আর শ্যামবাবুকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

আমি হেসে বল্লেম—"কার্সিয়াং পাহাড়ের চূড়ো পর্য্যন্ত যেতে পারি, তার উপর নয়।" "আর শ্যামবাবু?"—ব'লেই মিনি আমার দিকে একবার কটাক্ষ করলে।

শ্যামাচরণ রাত থেকে অদৃশ্য শুনে মিনি একটু মন-মরা হ'ল, কিন্তু মালতী দেখলেম বেশ সহজ সুরে বল্লে—"আপনি তো আমাদের সঙ্গে আসবেন, তা হ'লেই হ'ল।"

কি জানি হঠাৎ কি কারণে মিনি তার মত বদলালে। ষ্টেশনে যাবার ঘণ্টাখানেক আগে তার ছোট ভাই এসে বলে গেল—"মিনির কলেজের পড়ার ব্যাঘাত হবে, তাই সে এখন পাহাড়ে যেতে পারবেনা।" কাজেই একা মালতীর সঙ্গে আমি রওনা হলেম। যাবার পূর্ব্বে শ্যামাচরণের বাসায় আর-

একবার খোঁজ নিয়ে জান্‌লেম, তখনো সে ফেরেনি, বোধ হয় ফিরবেনা শীঘ্র, কেননা কাপড়-চোপড় নিয়ে গেছে।

(৩)

পাহাড়-অঞ্চলে আমরা দুজনেই প্রথম যাত্রী, কাজেই বিছানা-পত্র প্যাঁটরা-বাক্স ইত্যাদি ছাড়া আর-কোনো-কিছু পদ্মার ওপার পর্য্যন্ত আমার মাথায় একেবারেই ঢুকতে পারেনি। জিনিষ-পত্রগুলো একবার জাহাজে তোলা, গাড়িতে ওঠানো,আবার সেখান থেকে অন্য গাড়িতে চালান দেওয়া এবং নিজেকে ও মালতীকে সাম্‌লে চলা—এম্‌নি নানা গোল-যোগের মধ্যে দিয়ে চ'লে আমার মনটা এমন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল যে, মেঘের উপরে অনেক হাজার ফুট কেমন ক'রে যে উঠে এলেম তা দেখবার অবকাশ মোটেই পাইনি। হঠাৎ একসময় মেঘ আর বৃষ্টির মাঝে টিনের ছাত আর কাঁচ আর ভিজে-ভিজে কালো তক্তা-মোড়া একটা বাজারের ধারে অত্যন্ত স্যাঁৎসেতে ও অত্যন্ত ছোট অন্ধকার একটা জায়গায় নেমে দেখলেম, বড়-বড় অক্ষরে লেখা কর্সিয়াং—অর্থাৎ সেকালের কার্সিয়াং! এই মেঘ আর অন্ধকারের মধ্যে ব্রহ্মাবাসটা খুঁজে নিতে হবে ভাবছি, মালতী একখানা লাল শাল মুড়ি দিয়ে একটা বাক্সের উপরে বসে মস্ত একটা ধোঁয়া আর কুয়াশার দিকে চেয়ে আছে, এমন সময় একখানা ট্রলি আর তার উপরে দু-চারটে বন্দুকধারী কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ ষ্টেশনে এসে ঢুকল। তার পরেই শ্যামাচরণের গলা পেলুম—"এ কুলি চ'লাও জল্‌দী!" "শাম যে!"—ব'লেই আমি মালতীকে জিনিষগুলো একটু আগলে থাকতে ব'লে যেখানে ট্রলিটা লেগেছিল সেদিকে দৌড়লেম। ঝুপ্‌ঝুপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে একটা ওয়াটার-প্রুফ মুড়ি দিয়ে দু-তিন জন কুলি আর শিকারীর সাহায্যে মস্ত একটা মরা বাঘ গাড়িটা থেকে নামাচ্ছে—আমাদের শ্যামাচরণ। "কিহে!"—ব'লে তার পিঠে একটা থাবড়া বসাতেই শ্যামাচরণ কট্‌মট্‌ ক'রে আমার দিকে চেয়েই তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—"একি! তুমি এখানে একা না কি?" আমি দুটো আঙুল্‌ তার নাকের সাম্‌নে উঠিয়ে বল্লেম—"দুজন! কিন্তু জিনিষ-পত্র অনেক, তাই মালতী সেগুলো ওখানে বসে আগলাচ্ছে!" শ্যামচরণ ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লে—"আমাকে তো আগে খবর দিলেই হতো! হঠাৎ এরকম ক'রে অচেনা জায়গায় আসাটা তো ভালো হয়নি! বাসা ঠিক হয়েছে তো? চল, চল, দেখি!" ব'লেই মরা বাঘটা কুলীদের জিম্মায় রেখে শ্যামাচরণ আমাকে টানতে-টানতে মালতী যেখানে একটি লাল পুঁটুলির মতো নানা রঙের সতরঞ্চ-জড়ানো বিছানা-পত্রের মধ্যে বসে আছে একেবারে সেখানে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"আসুন, ওয়েটিং রুমে কিছু খেয়ে নেবেন।" কুলীর সর্দ্দার এসে আমাদের জিনিষ-পত্র খালাস করবার, চালান করবার ডাণ্ডি ডেকে আমাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেবার সব ভার নিজের কাঁধে নিয়ে শ্যাম[illegible] দিকে মস্ত একটা সেলাম দিয়ে [illegible] আমার [illegible] হাঁপ-ছেড়ে একটা চুরুট [illegible] পার[illegible] বে।

আলো এসে পড়লো—জলে-ধোয়া চমৎকার দিনের পরিষ্কার আলো!

মালতী ব'লে উঠলো—"আঃ, আলো পেয়ে বাঁচা গেল!"

আমরা কজন ওয়েটিং রুমে ঢুকছি এমন সময় চশমা-চোখে কালো বনাতের কোট-পরা এক ভদ্রলোক কাঁচা-পাকা ঝাঁক্‌ড়া দাড়ির মধ্যে থেকে খানিকটা উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—"মশায়রা কি কলকতা হইতে আইছেন? ওনার নাম কি মালতী?"

শ্যামাচরণ খানিক ভুরু কুঁচ্‌কে বল্লে—"আপনি?"

লোকটা একটা ময়লা রুমালে মুখ মুছে বল্লে—"আমি এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সেক্রে-টারি, শ্রীমতী মালতীকে লইতে আইলাম।"

শ্যামাচরণ একবার মালতীর দিকে চাইলে। মালতী অমনি এগিয়ে এসে সে লোকটাকে বল্লে—"আমার নাম মালতী, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের বাড়িতে থাকতে আমার ইচ্ছা নেই, এখানে অন্য বাড়ি কি পাওয়া যাবে?"

"বাড়ি তো পাওয়া মুস্কিল!" ব'লে লোকটা আর-একবার ময়লা রুমালটা মুখে ঘসতে লাগলো। আমি শ্যামাচরণের দিকে ফিরে বল্লেম—"উপায় কি?" খানিক ভেবে শ্যামাচরণ বল্লে—"আমাদের এখানে একটা ছোট-খাটো বাড়ি আছে, একটু দূরে, প্রায় বনের মধ্যে, বড়ই নির্জ্জন! সেটায় যদি সুবিধে হয় তো থাক্‌তে পারো, আমি তো আজই নেমে চল্লেম।"

বলা বাহুল্য আমরা শ্যামাচরণের পরিষ্কার ছোটখাটো বাংলাটাতে গিয়েই উঠলেম। শ্যামা-চরণের শিকার-করা বাঘটা কল্‌কাতায় নেমে গেল; কিন্তু শ্যামাচরণ নিজে আর তার পকেটের মস্ত-একটা বাঘের-নখওলা চেনে-লটকানো ঘড়িটা ঠিক নিয়মিত সময়ে আমাদের খাওয়া বেড়ানো যাতে হয় সেই জন্যে রয়ে গেল কার্সিয়ং পাহাড়ে—আলোয়-অন্ধকারে দিনে-রাতে শীতে-গরমে! তারপর আষাঢ় মাসে পাঁজিতে ছাপানো শুভ-বিবাহের এক প্রশস্ত দিনে সানাইয়ের সুরে-ভরা রোশনাই-করা গোধূলিতে আমি তাদের দুজনকে নামিয়ে আনলেম। আর মিনি? সে—

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবন-রহস্য

(গল্প)

একদিন [illegible] চড়-চড়ে রোদে কাল-চক্রের [illegible] বিগড়ে গিয়ে দুপুর[illegible] [illegible]রের বুকের উপ[illegible] [illegible]ন না। [illegible] [illegible]ভ [illegible]ট।

রাস্তায় লোকজন গাড়ী-ঘোড়া কিছু নেই, কোথাও কোন বাড়ীর ছাতের আলসের নীচে দুই-একটা কাক বসে ঝিমোচ্ছে, আর মধ্যে মধ্যে ধরা-গলায় বিকৃত স্বরে এক-একবার ডাকছে।

রোদের ঝাঁজে ঘরে কিংবা বাইরে কোথাও তিষ্ঠুতে পারা যাচ্ছে না। এমনি সময়ে কলকাতা সহরের একটা মেসের তেতলার ঘরে খাটের ওপর বসে বসে রতিকান্ত ভাবছিল—অতঃপর কি করা যায়—!

খাটের ওপর বিছানা-চাদর কিছুই নেই, অনেকদিন হোল সেগুলো সব পুরোন-বাজারে আশ্রয় নিয়েছে। খাটখানাও যে সেখানে যায় সে সম্বন্ধে সে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি, তবে পুরোন-বাজারের লোকেরাও সেটাকে পুরোন বলে প্রশংসাপত্র দেওয়ায় সেটার আশা সে ছেড়ে দিয়েছিল।

হাঁটু-দুটোকে থুতনীতে ঠেকিয়ে রতিকান্ত দুলে দুলে ভাবছিল—অতঃপর কি করা যায়!

প্রায় বছরখানেক থেকে সে কর্ম্মহীন বেকার অবস্থায় বসে আছে। বাক্স, বই, জুতো, জামা, বিছানা ইত্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি তার যা-কিছু ছিল, তাই বিক্রি কোরে এতদিন সে মেসের দেনা চুকিয়ে এসেছে, স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে এই কেওড়া কাঠের তক্তাপোষটী শুধু পড়ে আছে।

আজ তিন মাস হোল, সে মেসে একটি পয়সাও দিতে পারে নি। মেসওয়ালারা আর কতদিন সহ্য করবে? আজ দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর তারা তাকে অন্যত্র জোগাড় দেখতে বলে দিয়েছে।

রতিকান্ত ভাবছিল—অতঃপর কি করা যায়!—সমস্ত জীবনটা কি তবে এমনি কোরেই কাটবে? সেই কবে ছেলেবেলায় সে সহায়-সম্পদহীন হোয়ে এই সংসার-সমুদ্রে ভেসেছিল, তার ওপর দিয়ে ঝড়ের পর ঝড় চলে গিয়েছে, এখনও কি কূল পাবার সময় হয় নি? ছেলেবেলা এর-তার বাড়ীতে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে, চার আনা আট আনা মাসিক চাঁদা ভিক্ষে নিয়ে নিয়ে সে পড়ার খরচ চালাত; ভিক্ষে করতে করতে বিরক্ত হোয়ে একদিন সে পড়াশুনা ছেড়ে চাকরিতে ঢুকেছিল। সে একদিন, আবার আজ একদিন—!

মেসে যে আর একদিনও থাকা চলবে না সেটা মেসওয়ালারা সেদিন তাকে বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল। বেলা পড়তেই সে দেওয়ালের পেরেক থেকে ঘেমো কোটটা খুলে গায়ে দিল, তারপর খাটের তলা থেকে জুতোজোড়া টেনে এনে পায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

রাজপথের দুকূল ছাপিয়ে তখন জনস্রোত বয়ে চলেছে। কেউ আস্তে, কেউ দৌড়ে, কেউ-বা ঘোড়ার গাড়ীতে, কেউ-বা মোটরে, কাজে অকাজে সবাই চলেছে। কারো কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই!

লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে রতিকান্ত গোলদীঘিতে ঢুকে পড়ল। গোলদীঘির চৌকো পুকুরের চারিদিকে লোকের মেলা। স্থানে স্থানে এক-এক-দল লোক গোল হয়ে বসে মজলিস জমাচ্ছে। এক-এক মজলিসে এক-এক রকমের আলোচনা চলেছে। কথা বলতে বলতে কেউ বা তৃণাসন ছেড়ে তড়াক্ কোরে দাঁড়িয়ে উঠে তারস্বরে খানিকটা চেঁচিয়ে আবার বসে পড়ছে, কেউবা হাসতে হাস্‌তে তৃণশয্যায় ঢলে[illegible]ছে, যেন দম্ দেওয়া পুতুল!

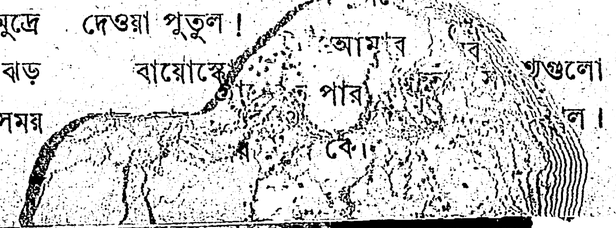

বায়োস্কো[illegible] আমার [illegible] শ্যগুলো [illegible] পার[illegible] [illegible]ল। [illegible] কে[illegible]

মধ্যে মধ্যে মজলিসগুলো থেকে এক-আধটা কথা ঠিকরে রতিকান্তর কানে এসে বাজ্‌ছিল, কোথাও বা মোহনবাগান কোথাও বা মহাত্মা গান্ধি।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগানের ভিড়ও পাৎলা হতে লাগ্‌ল। রতিকান্ত তখনও ঘুরছিল। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে তার ক্লান্তি এসেছিল, একটা ঝোপের পাশে নিরিবিলি একখানা বেঞ্চি পাতা রয়েছে দেখে সে সেখানে গিয়ে বস্‌ল।

ক্রমে বাগান একবারে ফাঁক হোয়ে গেল। রতিকান্ত সেইখানে বসে বসে ভাবতে লাগল—এতক্ষণ বোধ হয় মেসের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আর দরজা বন্ধ হোক্ বা না হোক্, তাতে তার কি? আজ ত তারা চরম জবাব দিয়ে দিয়েছে! তবুও ত ঐ মেসেই সে আট-দশ বছর কাটিয়েছে—

এতক্ষণ বোধ হয় ছাতের ওপর সবাই গুলজার হয়ে বসে গল্প করছে। তার কথা হচ্ছে কি? না, না,—আর কিসের জন্য তার কথা হবে? তবুও ত তারা প্রায় তিনমাস তাকে খাইয়েছে! তারা সংসারী লোক, আর কতদিন খাওয়াবে? কাল যদি চাকরিটা পাওয়া যায় তবে আবার গিয়ে—

—বাবু, উঠি পড়—

হঠাৎ তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। সে শুনলে, বাগানের উড়ে মালী তাড়া দিচ্ছে—বাবু, উঠি যাও, মু দুয়ার বন্ করিবি—

অবহেলার ভরে সে মালীকে জিজ্ঞাসা কল্লে—কট[illegible]

—[illegible]

[illegible] তিন না[illegible] আস্তে আস্তে [illegible]

রতিকান্ত বাগানের বাইরে চলে এল। রাস্তায় তখন লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। কোথাও ফুটপাথের ধারে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে একটা পাগলা পড়ে আছে, কোথাও বা তিন-চারটে মুটে সার-বন্দীভাবে পাশাপাশি রাস্তায় পড়ে ঘুমুচ্ছে। থেকে থেকে এক একটা মোটর গাড়ী রাস্তার কুকুরগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ধূলোর ঝড় তুলে ভীষণ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে—রতিকান্তর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তার পা-দুটো তাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই দিকেই সে চলেছে, ধীর মন্থর গতিতে!

ঘুরতে ঘুরতে সে গঙ্গার ধারে নিমতলার ঘাটের কাছে এসে পৌঁছল। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল, সে শব-বাহকদের বিশ্রাম করবার ঘরখানার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঘরের কোণে একখানা বেঞ্চি খালি রয়েছে দেখে সে তাড়াতাড়ি সেখানা দখল করে সটান শুয়ে পড়ল।

ঘরের মেঝেয় আট-দশজন লোক পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছিল। তাদের মধ্যে জন দুয়েক গাঁজা টিপছে আর মন্ত্র আওড়াচ্ছে—

—নয় টিপ তিন কাটে
পটাপট্ কল্‌কে ফাটে—

রতিকান্ত শুয়ে শুয়ে তাদের কাণ্ড দেখতে লাগ্‌ল। মিনিট-কয়েক সেই ভাবে পড়ে থেকে সবার অলক্ষ্যে জুতোজোড়া কোটে মুড়ে মাথার বালিশ করে সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে তার একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় মেঝে থেকে দু-তিন জন লোক উঠে এসে তাকে ধাক্কা দিতে লাগল—মশাই, ও মশাই—শুনছেন?

নাড়া পেয়ে রতিকান্ত ধড়্‌মড় কোরে উঠে বসল

—এক টান হোক্—

রতিকান্ত হাত জোড় কোরে কাতরস্বরে তাদের বল্লে—আমাকে রেহাই দিন মশায়—

—খাবেন না কি রকম? শ্মশানে এসে বাবার জিনিষে অভক্তি—

মেঝেতে যারা বসেছিল তারা কথাটা শুনে তড়াক্ কোরে ভূমি-শয্যা ছেড়ে রতিকান্তর সামনে এসে দাঁড়াল। সকলের মুখেই এক কথা—বাবার অপমান করতে নেই!

রতিকান্ত জন্মে কখনো এমন ফ্যাসাদে পড়ে নি। সে দেখ্‌লে, দশ-বারোজন লোক রক্তনেত্রে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, আর একজন গাঁজার কল্‌কেটা তার নাকের কাছে ধরে—সে বেচারা জীবনে কখনো এ-সব জিনিষের স্বাদ জানেনি। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি উদরান্নের সংস্থান করতেই তার কেটে গিয়েছে, নেশা করবার সময় কোথা! রতিকান্ত ভয়ে ভয়ে তাদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

তাদের মধ্যে থেকে একজন লোক ধম্‌কে বল্লে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? কল্‌কেটা হাতে দে না।

রতিকান্ত মন্ত্র-চালিতের মত কল্‌কেটা হাতে নিয়ে তাতে কোন রকমে একটা টান দিয়ে কাশ্‌তে কাশ্‌তে সেটা ফিরিয়ে দিতে গেল।

—সে কি কথা—?

তারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল—সে হবে না দাদা, রাজা হতে হবে—রাজদ্বারে শ্মশানে চ—একটানে কি হবে?

—এক টানেতে যেমন-তেমন
দু-টানেতে মজা!
তিন টানেতে মদনমোহন
চার টানেতে রাজা—

তাদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কোন রকমে সে চারটে টান মেরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কল্‌কেটা ফিরিয়ে দিয়ে আবার বেঞ্চিতে গা ঢেলে দিলে। শুয়ে শুয়ে তার মনে হতে লাগল, সমস্ত ঘরখানা যেন নাগর-দোলার মত দুল্‌তে সুরু করেছে। ক্রমে তার ভাবনা-চিন্তাগুলো সব এলিয়ে পড়তে লাগ্‌ল। তুরিতানন্দের কৃপায় ত্বরায় সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়্‌ল।

ঘরের মধ্যে কিসের একটা ভয়ানক গোলমালে তার ঘুমটা চট্ করে ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বেঞ্চির ওপর উঠে বসে ভাবতে লাগল—এ আবার কোথায় এলুম! তার মনে হচ্ছিল যে, সে মেসের ঘরেই শুয়ে আছে। ঘরের এক কোণে চারটে মাতাল হাল্লা কোরে মদ খাচ্ছিল, রতিকান্ত তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল, এত লোক তার ঘরের মধ্যে ঢুকল কোথা থেকে!

কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে রতিকান্তর মনে পড়ে গেল, মেসের ঘরে সে নেই, এটা নিমতলার ঘাট, এই সেই জানলা, ঐ সেই ঝিলমিলি।

—দাদা একটু কারণ করবে না?

একটা মাতাল দল ছেড়ে উঠে এসে রতিকান্তকে জিজ্ঞাসা [illegible] দাদা একটু কারণ করবে না [illegible] আমার [illegible]

বিরক্তি [illegible] পার [illegible] বলে [illegible] কে।

সে আবার বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল। রতিকান্তর বিরক্তি দেখে মাতালটার মনে বোধ হয় দুঃখ হলো। সে তার হেঁড়ে গলাটাকে যতদূর সম্ভব করুণ করে তান ধরলে—

গঙ্গা যদি মদ হোত মা-আ-আ
মদ বোলে মা সবাই খেত—
আর হাতী যদি হতো পাঁটা
মদের মুখে লাগ্‌তো ভাল—

মাতালদের গোলমাল আর সহ্য করতে না পেরে রতিকান্ত কোটে জড়ানো জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘাটে গিয়ে বস্‌ল।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ঘাটে দু'-একজন করে লোক স্নান করতে আস্‌ছে। রতিকান্তর মাথাটা ভয়ানক ভারী বোধ হচ্ছিল, সে ঘাটের এক কোণে জুতো আর জামাটা রেখে নদীতে গোটাকয়েক ডুব দিয়ে এল।

সেদিন এক অফিসের বড়বাবুর সঙ্গে তার দেখা করবার কথা ছিল। চাকরি হবার ভরসা তিনি কিছু দেন নি, তবে একবার দেখা করতে বলেছিলেন। সকালবেলাটা খানিক ঘাটে বসে খানিক রাস্তায় পায়চারি করে বেলা এগারোটার সময় সে বড় বাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে।

বড়বাবু তাকে অপেক্ষা করতে বলে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। রতিকান্ত বাবুদের জলখাবারের ঘরে গিয়ে বসল।

চব্বিশ [illegible] তার পেটে কিছু পড়ে [illegible] কদিন কাটিয়ে দেও [illegible] তেন না [illegible] তেমন কষ্ট হচ্ছিল না, কিন্তু বসে থেকে থেকে তার শরীরটা ঝিমিয়ে আসতে লাগ্‌ল। হেলান দিতে দিতে ক্রমে সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

কি একটা স্বপ্ন দেখে রতিকান্তর ঘুমটা চট্ কোরে ভেঙে গেল। তখন বেলা পড়ে গিয়েছে। অফিস থেকে দু' একজন করে লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি মুখে-চোখে জল দিয়ে কোঁচার খুঁটে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে আবার বড়বাবুর কাছে গিয়ে হাজির হলো।

বড়বাবু তখনও ব্যস্ত। রতিকান্তর কথা শুনে তিনি খাতা থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিলেন—না বাপু, তোমার জন্যে কিছু করতে পারলুম না। তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।

আশাহত রতিকান্ত একবার বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে—অন্য কোথাও খালি আছে, জানেন কি?

বড়বাবু হিসাবের খাতাটা দেখতে দেখতে বল্লেন—তাত জানিনে বাপু—

অবসন্নভাবে টল্‌তে টল্‌তে সে আপিস থেকে বাইরে বেরিরে এল।

বিকেলবেলা গড়ের মাঠে লোকের ভিড়। জলস্রোতের মত জনস্রোত চলেছে, হেলে দুলে ঢেউ খেতে খেতে—খেলার ময়দানের দিকে। রতিকান্তরও দিনকয়েক এই খেলা দেখার বাতিক হয়েছিল কিন্তু পয়সার টানাটানিতে সে বাতিক আপনিই থেমে গিয়েছিল।

একটা বড় বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার থাম ধরে রতিকান্ত বাইরের জগৎটার দিকে অবাক্ হয়ে দেখতে লাগ্‌ল। সে ভাবছিল

তার চারদিকে এই যে আনন্দের উৎসব, এই যে ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি চলেছে, সে কি তারই দীনতাটা মনের মধ্যে ভাল করে ফুটিয়ে তোলবার জন্য? এই যে রাজপথ বেয়ে লোক ছুটেছে—হাস্‌তে হাস্‌তে, গলা গলি করে, এই আনন্দের মধ্যে তার কি কোন অংশ নাই? এদের সঙ্গে তার কি কোনও সংশ্রব নেই, কোথাও কি কোন মিল নেই? তবে কি সে একটা সৃষ্টিছাড়া জীব!

থামটা ছেড়ে সেও সেই ভিড়ের মধ্যে গা ঢেলে দিয়ে এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

কেরাণীর কিচিমিচি, মোটর গাড়ীর ভোঁ ভোঁ আর রাস্তার ধূলোয় সন্ধ্যের বাতাস ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছিল। রতিকান্তর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগ্‌ল। অল্পক্ষণ হাঁটার পরই সে রাস্তা ছেড়ে মাঠের বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল।

বাগানের মধ্যে একখানা বেঞ্চিও খালি নেই দেখে রতিকান্ত ঘাসের ওপরে গিয়ে বস্‌ল। ঘাসের ওপরে এখানে সেখানে আরও অনেক লোক বসেছিল। প্রফুল্ল শতদলের মতন ছোট ছোট ইংরেজের ছেলে-মেয়ে ঘাসের ওপর ছুটে ছুটে খেলা করছে,—যেন স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি, আনন্দের তুব্‌ড়ি। একটা ছেলেকে ধরে আদর করবার জন্য রতিকান্তর বুকের মধ্যে একটা নূতন অনুভূতি জেগে উঠ্‌তে লাগল। এ-রকম অনুভূতি আগে তার কখনো হয় নি। ঐ ছোট নরম গালে দুটো চুমু—একবার মাত্র বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরা—একটি ছেলে কাছে আসতেই সে হাতটা বাড়িয়ে তাকে ধর্‌তে গেল। ছেলেটি তার ভঙ্গি দেখে ভয় পেয়ে দূরে সরে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রতিকান্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

সন্ধ্যে হবার আগেই চারদিকে আলো জ্বলে উঠল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর একটা অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হোয়ে পড়্‌ছিল, ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে সে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ কিসের একটা আঘাতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে সে দেখে, একজন পাহারাওয়ালা রুলের গুঁতো দিয়ে তাকে মধুরভাবে সম্ভাষণ করছে আর বাগান থেকে উঠে যেতে বল্‌ছে। পাহারাওয়ালাকে দেখেই তার ইচ্ছে হলো, একটি ঘুসি মেরে তার নাকটা থেঁতো কোরে দেয়, কিন্তু কোন রকমে সে ইচ্ছাকে দমন করে সে বাগান থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

ঘুমের ঘোরে সে দাঁড়াতে পাচ্ছিল না। তার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, রাস্তার মাঝখানেই শুয়ে পড়ে, কিন্তু চারিদিকে পাহারাওয়ালা গিজ্‌গিজ্‌ করছে। সে অবশ চরণে টলতে টলতে গঙ্গার ধারের রাস্তা বেয়ে এগিয়ে চলতে লাগল।

নিমতলার ঘাটে গিয়ে শোবার চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হবামাত্র কাল্‌কের কথা মনে পড়ে গেল। সে ভাবলে, আর যেখানেই হোক্, সেখানে আর যাওয়া নয়। এমনি করে চল্‌তে চল্‌তে এক জায়গায় গিয়ে মুখ থুব্‌ড়ে পড়বো, ব্যস্, তার প[illegible]বে।

রাস্তায় চ[illegible] আমার [illegible]টা সমস্ত জগতের [illegible] পার[illegible] উঠতে [illegible] কে।

লাগ্‌ল! কেন, বড়বাবু কি ইচ্ছে করলে তাকে একটা চাকরি দিতে পারতো না? নিশ্চয় পারতো—অত্যাচার! অবিচার! শক্তির অপব্যবহার! এই যে লক্ষ্যহীন হয়ে রাত দুপুরে সে সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—কেন? কিসের জন্য? বাগানে শুয়ে থাকলে কার কি ক্ষতি হত?

ভাবতে ভাবতে তার মনে হোতে লাগল, সেই বা দুর্ব্বল কিসে? তার মধ্যে যে শক্তি আছে, তাতে সে পৃথিবীটাকে ওলট্ পালট্ করে দিতে পারে। চল্‌তে চল্‌তে রাস্তার দু-পাশের বাড়ী, ঘর, দোকান মাল-গুদাম, যা কিছু চোখে পড়ছিল তার মনে হচ্ছিল সেগুলোকে ভেঙে তছ্‌নছ্ করে দিয়ে সেই ভগ্নস্তূপের ওপর ধেই ধেই করে খানিকক্ষণ নেচে বেড়ালে বোধহয় সে একটু শান্তি পায়! নিষ্ফল আক্রোশে হাত দুটোকে মুঠো কোরে সে বাতাসে ঘুসি ছুঁড়তে লাগল।

অবসন্ন পা-দুটোকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে তার মনে হতে লাগল এ নিরুদ্দেশ যাত্রার কখন্ শেষ হবে, কবে শেষ হবে, কোথায় কেমন করে শেষ হবে? দিব্যি ত বাগানে শুয়েছিলুম—যে পাহারওয়ালাটা তাকে সেখান থেকে তুলে দিয়েছিল, তার ওপর তার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল। মূর্খ, দশ টাকা মাইনের চাকর, দুনিয়া দৃক্‌পাত নেই! সেইখানেই তাকে উচিত শিক্ষা দিলেই হোত। তার অন্তর থেকে কে যেন বলতে লাগল—সে জানে না যে, [illegible]গেছিল। তাকে কিছু [illegible] হয় নি; হয়ত তার [illegible]তন না [illegible] লাঞ্ছিত হবে। ভবিষ্যতে যাতে সাবধানে চলে সেইভাবে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। রতিকান্ত সেখান থেকে আবার বাগানের দিকে ফির্‌ল।

হাত দুটোকে জোরে দুলিয়ে খট্ খট্ করে পায়ের আওয়াজ করতে করতে আবার সে মাঠের দিকে এগিয়ে চল্‌লো।

পথের পাশে এক জায়গায় কুণ্ডলী হয়ে একটা কুকুর পড়ে ঘুমোচ্ছিল, রতিকান্তর পায়ের খট্ খট্ আওয়াজ শুনে সেটা জেগে উঠে শুয়ে শুয়েই ধমকের সুরে একবার ভেক্ করে চেঁচিয়ে উঠল, যেন সে বলতে চায়—আঃ, জ্বালালে দেখ্‌চি!

রতিকান্ত কুকুরটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, ঐ রকম ডাক শুনে সে আবার ফিরে এসে তার পেটে সজোরে দুই লাথি কষিয়ে দিলে।

রাত্রের নিস্তব্ধতা চৌচির করে চিরে দিয়ে চীৎকার করতে করতে কুকুরটা সেখান থেকে উঠে দৌড় দিলে। তার সেই আর্ত্তনাদ রতিকান্তর কানের মধ্যে ঢুকে তার সমস্ত শরীরে যেন বরফ-গলা জল ঢেলে দিলে। তার মনে হল—আহা, বেচারী!

সহানুভূতিতে তার হৃদয়টা গলে যেতে লাগল।

বাগান পর্য্যন্ত আর যাওয়া হলো না। সেইখান থেকে আবার সে আগের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলতে লাগল।

আবার তার মাথার মধ্যে চিন্তা-চক্রের সেই একঘেয়ে ঘুর্ণিপাক সুরু হোল। আজকের রাতটা কোথায় কাটাই? আর ত চলতে পারি না। পৃথিবীতে তার কেউ নেই! বন্ধু-বান্ধব,

আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পদ—কেউ নেই! এতদিন যে ছাতের তলায় সে মাথা গুঁজে পড়েছিল, মাথার ওপর থেকে তাও আজ সরে গিয়েছে। সে একবার ঘাড় তুলে আকাশের দিকে চাইলে। তার মনে হতে লাগল—ঐ কালো অন্ধকার থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যত কিছু অভিশম্পাত সবই তার মাথার ওপর ঝরে পড়্ছে। এ' থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই, সে যে গৃহ-হীন;—তার মাথার মধ্যে কে যেন তালে তালে হাতুড়ি পিটে বলতে লাগ্‌ল—গৃহ-হীন—গৃহহীন—

রতিকান্ত দুই হাতে দুই কান চেপে ধরে রাস্তার ধারের একটা রোয়াকের ওপর বসে পড়ল।

সেইখানে বসে বসে সে তার সমস্ত জীবনের ইতিহাস আলোচনা করতে আরম্ভ করলে। বহুদিন আগে আর একবার তাকে গৃহ-হীন হতে হয়েছিল। তখন তারা মায়ে-পোয়ে এই সহরেরই একটা পল্লীতে একখানা খোলার ঘর ভাড়া করে থাকত। বিধবা মা ভিক্ষে-সিক্ষে করে যা পেতেন, তাই দিয়ে কোন রকমে তাদের দিন গুজরান হোত। একবার বাড়ীওয়ালার ভাড়া বাকী পড়াতে তারা বাড়ী থেকে তাদের বের করে দিয়েছিল। সেদিনকার সেই ছবিটা তার মনের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

সেদিনের সেই সকালবেলায় তারা যখন তাকে আর তার মাকে রাস্তায় বের করে দিলে—তখন সে কতটুকু! মার একখানা হাত ধরে সে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে গাড়ী ঘোড়া দেখছিল; সেইখানে সেইরকম ভাবে দাঁড়িয়ে সহস্র রকম অর্থহীন প্রশ্নে সে মাকে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুল্‌ছিল, কোন উত্তর না পেয়ে সে বার বার মার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। থান-কাপড়-পরা গলা-অবধি-ঘোমটা-দেওয়া রাস্তায়-দাঁড়ান মায়ের সেদিন যে মূর্ত্তিখানা সে দেখেছিল বিস্মৃতির বুক ফুঁড়ে সজীব হয়ে আজ সেই মূর্ত্তি তার মনের সামনে এসে দাঁড়াল। উঃ—মার জীবনে সেদিন কি সাংঘাতিক পরীক্ষাই এসেছিল!

অনেকক্ষণ ভাবনার পর সে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল—যাক্ মা আজ এ পৃথিবীতে নেই।

রোয়াকের উপর আর বেশীক্ষণ চুপ কোরে বসে থাকা চল্‌ল না। রতিকান্ত সেখান থেকে উঠে পড়ে আবার এগিয়ে চল্‌তে আরম্ভ করল। চল্‌তে চল্‌তে তার ভাবনাগুলো মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে পড়ছিল। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে একেই শরীর শ্রান্ত, তার ওপরে ক্ষিদেয় তার পেটের মধ্যে একটা বিশ্রী যন্ত্রণা হতে লাগল। যন্ত্রণাটা ভুলে যাবার জন্য সে ফুটপাথ থেকে রাস্তার মধ্যিখানে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগ্‌ল।

—হেইও—আভি গিয়াথা, শুনতা নেই—ভোঁ ভোঁ শব্দ করে একখানা মোটরগাড়ী রাস্তায় একটা ছোটখাট আঁধিয়া তুলে চলে গেল। রতিকান্ত এক মনে ভাবতে ভাবতে চলেছিল, পেছন দিকে যে মোটরগাড়ী এসে পড়েছে তা সে টের পায়[illegible] হঠাৎ কানের কাছে গোলমাল [illegible] ফিয়ে এক দিকে সরে [illegible] আমার [illegible] চলে [illegible] পার [illegible] জন্য [illegible] কে।

বড্ড বেঁচে গিয়েছ, তা না হলে রক্তাক্ত দেহে এতক্ষণ ঐখানটায় মরে পড়ে থাক্‌তে হোত। মৃত্যুর কথা মনে হতেই তার অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। সে সন্তর্পণে ফুট-পাথের এক ধার ঘেঁসে চলতে লাগল।

চলেছে ত চলেইছে,—রাত্রিরও শেষ নেই, চলারও বিরাম নেই। সে ভাবছিল, এ সহরে তার মত আর ক'টি অভাগা এমনি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তার মত কত অভাগা যে এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে রাস্তায় পড়ে মরে গিয়েছে, তার ঠিকানা নেই। কত অভাগার পাঁজরা গুঁড়ো করে দিয়ে ধনীর মোটর গাড়ী চলে গিয়েছে—এই যে রাস্তার ধুলো যা মাড়িয়ে সে চলে যাচ্ছে, তাদের দেহ এই ধূলোয় মিশে রয়েছে! কত অভাগার শোণিতে এই পথ কতবার কর্দ্দমাক্ত হয়েছে, কে জানে! এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার সময় তাঁদের অতৃপ্ত আত্মা যত কিছু অভিশম্পাৎ দিয়ে গিয়েছিল, এই ধূলোর প্রত্যেক কণায় কণায় তা মিশিয়ে রয়েছে। ধনীর অত্যাচার, শক্তির অত্যাচার আর কতদিন কত কাল ধরে এই পৃথিবীর বুকে বসে রাজত্ব করবে? এর কি শেষ নেই?

ভাবতে ভাবতে তার ভাবনার সূত্রে জোট পাকিয়ে যেতে লাগল;—মাথাটা যেন তার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা থেকে চন্‌চন্ করে রক্ত টেনে নিয়ে নিজের খোলের মধ্যে জমা করতে সুরু করেছে। মাথার মধ্যে তার উন্মাদ ঘূর্ণন আরম্ভ হোল।

পাগলের [illegible] পাথ থেকে লাফিয়ে রাস্তার [illegible] থেকে জুতো-জো[illegible] তন না [illegible] দিলে [illegible]

তারপর রাস্তা থেকে মুঠো মুঠো করে ধুলো তুলে নিয়ে মাথায়, বুকে, সর্ব্বাঙ্গে মাখতে লাগল।

একটা পেঁচার তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানের মধ্যে যেতেই তার চমক ভেঙে গেল। সে প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজের দেহের দিকে তাকিয়েই ভাবলে—এ কি! আমি এ কি করেছি! তবে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি না কি? পাগল হওয়ার কথা মনে হতেই তার সমস্ত অন্তরটা চীৎকার করে বলে উঠল—না, না, আমি পাগল হব না, আমি পাগল হতে চাই না। হে প্রভু, হে দীনশরণ, তোমার এই আনন্দময় ধরার মাঝে আমি বাঁচতে চাই, সুখে বাঁচতে চাই, আমায় পাগল করো না প্রভু, আমায় বাঁচতে দাও। আমার চতুর্দ্দিকে এই যে আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে, এ কি আমার জন্য নয়? যুগ-যুগ ধরে লোকে এই আনন্দের আস্বাদ পেয়ে আসছে—সেই প্রথম যেদিন তরুণ-অরুণ হাসতে হাসতে উদয়-অচলের শিখরে এসে দাঁড়িয়েছিল, বালসূর্য্যের প্রথম কিরণ-সম্পাতে যেদিন এই মৃত ধরণীর বুকে প্রাণ-স্পন্দন আরম্ভ হয়েছিল, যেদিন এই ধরার কঠিন কঙ্করময় বুক ফুঁড়ে ফুল ফুটেছিল, পাষাণ ভেদ করে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হয়েছিল—সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্তরে-বাহিরে এই আনন্দ পুঞ্জে পুঞ্জে বেড়েই উঠেছে—এই আনন্দের মধ্যে আমিও বাঁচতে চাই প্রভু—আমায় বাঁচতে দাও। কিংবা তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে পৃথিবীর বুক থেকে আমার অস্তিত্ব মুছে ফেলে দাও—আমায় পাগল করে দিও না—

রতিকান্ত সেইখানে সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ দূরে পাহারাওয়ালার রোঁদের আওয়াজ শুনে সে দৌড় দিলে। কাছেই একটা চাতাল-দেওয়া ঘাট ছিল, সেখানে গিয়ে সে পাণ্ডাদের একটা বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে ঢুকে সে হাঁফাতে লাগল।

সকালবেলা ঘাটের লোকজনদের গোলমালে তার ঘুম ভেঙে গেল। সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ বেদনায় সে পাশ ফিরতে পারছিল না, জোর করে মাথাটাকে বার-কয়েক ঝেঁকে নিয়ে সে উঠে পড়ল। তারপর আবার এ-গলি সে-গলি—

ক্ষিদেয় তার পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছিল! রাস্তাটা একবার একটু নিরিবিলি হতেই সে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল। দোকানদার মহা চিন্তিত-ভাবে খাতায় মুখ জুব্‌ড়ে বসে হিসাব করছে—

রতিকান্ত আস্তে আস্তে বল্লে,—মশায় কিছু ভিক্ষা দিন—তিনদিন আমার খাওয়া হয়-নি—

—এসেছ বাবা? সকাল বেলা জ্বালাতে এসেছ, সরে পড়।

রতিকান্তর ইচ্ছা হচ্ছিল যে, লোকটার গলা টিপে মেরে ফেলে বাক্সের মধ্যে যা কিছু আছে নিয়ে দৌড় দেয়। সে একটু জোর করে বল্লে—দিন না মশায়, একটা পয়সা—

—ওঃ ব্যাটার জমিদারী আছে এখানে—বেরো,—নইলে জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেবো বল্‌ছি।

প্রহৃত কুকুরের মত সুড়-সুড় করে দোকান থেকে নেমে সে আবার চলতে আরম্ভ করলে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটের মধ্যে ক্ষিদের যন্ত্রণা বেড়ে উঠতে লাগল। পথের দু-ধারের দোকানে থরে-থরে থালায় করে খাবার সাজানো রয়েছে। সেগুলোর দিকে দেখে-দেখে তার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, লাফিয়ে একটা থালার ওপর পড়ে যত খুসী খাবার খেয়ে ফেলে! কি হবে তাতে? না হয় জেল হবে। ফাঁসি ত আর হবে না। হোক্‌গে জেল! আগে প্রাণ, তারপর মান—

দু-তিনবার মনে মনে সংকল্প করে সে একবারও একটা দোকানে ঢুকতে পারলে না। তার ভিতর থেকে কে যেন প্রতিপদে তাকে বাধা দিতে লাগল। চিরন্তন সংস্কার-বশে এই বাধাটাকে সে এতদিন সুমতির ব্যবস্থা বলে মেনে এসেছিল, আজ সে দেখ্‌লে, জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এই সুমতিই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চায়, আর কুমতি বলে, মরবে কেন? সামনে খাবার, খেয়ে ফেলো।

সহরে এক ধনীর প্রাসাদে নিত্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হোত। এজন্য দেশময় এদের খুব নাম-ডাক ছিল। চল্‌তে চল্‌তে রতিকান্ত ভাবতে লাগ্‌ল—তবে কি আমায় সেইখানে যেতে হবে? তাতেই বা ক্ষতি কি! দিন-ভিখিরীর চেয়ে আমি কিসে উঁচু? বংশের মর্য্যাদা কি জাতের গৌরব কাউকে খেতে দেয় না ত!

পাছে আবার কোন রকম চিন্তা এসে তাকে বাধা দেয়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি সেই প্রাসাদের দিকে [illegible] দিকে যেতে যেতে হঠাৎ টে[illegible] আমার [illegible] একটা বিজ্ঞাপনের [illegible] পার[illegible] [illegible]নের [illegible] কে।

ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—"কর্ম্মখালি"।

বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়তেই মন বলে উঠল—ভগবান তুমি আছ! কে বলে, তুমি নেই?

সমস্ত প্রাণটা কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে দিয়ে ছুটে এসে সে বিজ্ঞাপনটা পড়তে লাগল—

কর্ম্মখালি

পাল কোম্পানির পারদ-বিহীন দাদের মলম, কাপড়ে দাগ লাগে না।

রতিকান্ত আর পড়তে পারলে না। লেখাগুলো যেন মাকড়সার বাচ্ছার মতন কাগজখানার ওপর কিল্‌বিল্ কোরে নড়ে-চড়ে বেড়াতে আরম্ভ করে দিলে। সে নখ দিয়ে কাগজখানাকে থাম থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চল্‌ল।

তখনও দরিদ্রদের খেতে দেওয়া হয়-নি। প্রাসাদের সামনে প্রকাণ্ড ময়দানে সহরের যত ভিখিরী এসে জড়ো হয়েছে। সুস্থ, অসুস্থ, অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠি, পাগল—কেউ বা বসে, কেউ বা শুয়ে, কেউ বা দাঁড়িয়ে—হাঁ করে সব তাকিয়ে আছে—কখন্ অন্ন দেওয়া হবে—কখন্ খাবার ডাক পড়বে!

রতিকান্ত জীবনে এ দৃশ্য কখনো দেখে-নি। সহরে এত দরিদ্রও আছে!

নারায়ণের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তার বুকের মধ্যে কিসের একটা কাঁপুনি ধরল। তার মনে হলো, যেন মূর্ত্তিমন্ত দারিদ্র্য তার কঙ্কালসার গলি[illegible] দেহখানা নিয়ে অসাড় হয়ে পড়ে [illegible] ক্ষত থেকে অবিরল [illegible] তারি গন্ধে সেখা[illegible] তন না [illegible]

রতিকান্ত নাকে কাপড় দিয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে রাস্তা করে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে পায়ের তলায় কি একটা নরম জিনিস ঠেকতেই সে ফিরে দেখে, সে একজনের পা মাড়িয়ে দিয়েছে, লোকটার নাকের গোড়া থেকে চিবুক পর্য্যন্ত নেই—সমস্ত খসে গিয়েছে—একটা বিশ্বগ্রাসী হাঁ নিয়ে সে পলক-বিহীন নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ক্ষয়ে-যাওয়া মুখের সমস্ত দুঃখ তার চোখের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে! লোকটার দিকে চোখ পড়তেই তার ভিতর থেকে কে যেন চীৎকার করে বলে উঠল—ওর মুখই গিয়েছে, অন্তরটা এখনও ঠিক আছে—কিন্তু তুমি এখানে কেন? পালাও, পালাও—বাঁচতে যদি চাও, তবে এখান থেকে পালাও!

চিন্তাকে আর মুহূর্ত্তমাত্র অবসর না দিয়ে সে সেখান থেকে ছুট দিলে।

দৌড়···দৌড়···দৌড়! রতিকান্তর দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তবু সে থামতে পারছিল না। থামলেই যেন সেই বীভৎস মূর্ত্তিটা এসে তাকে চেপে ধরবে! দৌড়তে দৌড়তে একেবারে বেদম হয়ে সে এক জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

* * * *

অবশ রতিকান্ত রাত্রিবেলা পাণ্ডাদের কাঠের বাক্সের ওপর শুয়ে শুয়ে ভাবছিল—অতঃপর কি করা যায়?

আজ পাঁচদিন অনাহারে কেটে গেল। কালকে বিকেলে বাজারের ধার দিয়ে আসবার সময় সে রাস্তায় একটা আম কুড়িয়ে পেয়েছিল, কিন্তু আমটা খাওয়ামাত্রই বমি

হয়ে উঠে গেল। নিজের বমি দেখে সে শিউরে উঠেছিল। আজকে একটা পানের দোকানের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেকেই সে চিনতে পারে-নি।

এবার মৃত্যু নিশ্চিত! কালই হোক কি দুদিন পরেই হোক এই সহরের কোন এক রাস্তার ওপর সে মুখ থুবড়ে পড়বে—দেখতে দেখতে তার চারিদিকে হাজার হাজার লোক জমা হয়ে যাবে। হয়ত এই চোখ দুটোতে তখন আর দৃষ্টি থাকবে না। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হয়ত এই ক্ষুদ্র জীবনের প্রতি নিমেষের কাহিনীগুলো অন্তর-লোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কিংবা এই চোখের দৃষ্টি যদি একেবারে অন্ধ হয়ে না যায় তবে সেই ভিড়ের মধ্যে একটা পরিচিত মুখ দেখবার জন্য তার অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠবে। হয়ত বা দু'-একটা পরিচিত মুখ চোখে পড়তেও পারে—কেউ হয়ত বলবে—আহা! কেউ হয়ত দয়া করে তার তৃষাতুর শুষ্ক কণ্ঠে এক গণ্ডুষ জল ঢেলে দেবে। তারপর ধীরে ধীরে এই চোখ থেকে পৃথিবীর আলো নিভে যাবে!

সেদিন রতিকান্ত কাগজে একটা চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দেখেছিল। সে ভাবতে লাগ্‌ল—কাল যদি সেখানে চাকরীটা পাওয়া যায়! তবে বোধ হয় এ যাত্রা আর মরতে হয় না! কিন্তু সে কাজ সেই বা পাবে কেন? কতদিন ধরে তারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, কে জানে? তার আগে কত লোক সেখানে গিয়ে দরখাস্ত করেছে। চাকরী! চাকরী!—দুর্লভ দুরাশা! আজ এক বছর ধরে সে তাকে কত আশার গানই শুনিয়েছে। আশা করবার সাহসও যে তার ফুরিয়ে গিয়েছে। তবু—তবু—

সকালবেলা ঘুম ভেঙে যেতেই রতিকান্ত দেখলে যে তার হাত-পা সব অসাড় হয়ে গিয়েছে। দু' একবার চেষ্টা করেও সে উঠতে পারলে না। তার মনে হলো, এইবার বোধ হয় মৃত্যু হবে। মৃত্যুর কথা মনে হতেই তার বুকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি হতে লাগল। তারপর শরীরের সঙ্গে মনের যুদ্ধ! তার বিদ্রোহী মনটা শরীরকে প্রাণপণে ঠেলা দিয়ে বলতে লাগল, আর যাই হোক, এখানে মরা হবে না। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সে উঠে দাঁড়াল।

সকালটা অনেকখানি এগিয়ে পড়ে ছিল। পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেই তার মনে হোল, আজকে সেই চাকরীটার সন্ধানে যেতে হবে। কাগজে যে ঠিকানাটা দেওয়া ছিল, দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে জানলে যে, সে জায়গাটা সহর থেকে অনেক দূরে—বেলা এগারোটার মধ্যে সেখানে গিয়ে দেখা করবার কথা—রতিকান্ত চলতে আরম্ভ করলে।

প্রায় বারোটার সময় সে তার লক্ষ্য স্থলে এসে পৌঁছল। সহরতলীর প্রান্ত সীমায় একখানা প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ী। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে সে জানলে যে বাবু এখন খেয়ে-দেয়ে আরাম করছেন, বেলা তিনটের আগে দেখা হবেনা। তিনটে অবধি অপেক্ষা করে একেবারে বাবুর সঙ্গে দেখা করে যা[illegible] দরোয়ানের ঘরে বসে র[illegible] আমার [illegible] পার[illegible] —সহর থেকে বাড়ীটা বড় দূরে। এখানে যদি চাকরীটা হয়ে যায় তবে অনেকটা পথ রোজ হাঁটতে হবে। বড়লোকের বাড়ী—হয়ত বাড়ীতেই থাকবার যায়গা দেবে!

ভাবতে ভাবতে বেলা পড়ে গেল। রতিকান্ত আবার দরোয়ানকে খোসামোদ করে খোঁজ নিতে পাঠালে। আধঘণ্টা পরে দরোয়ানজী এসে বল্লে—বাবু সেলাম দিয়েছে।

প্রকাণ্ড বাড়ী, তারপর লম্বা বাগান। বাগানের পেছন দিকে ছবির মত ছোট্ট একখানা একতলা বাড়ী। এইটেই বাবুর বৈঠকখানা। দরোয়ান রতিকান্তকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আগে ঘরের ভিতরে ঢুকল, তারপর বেরিয়ে এসে তাকে নিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে তার চমক লেগে গেল। এমন সাজান ঘর সে কখনো দেখেনি। ঘরের চারিদিকে বড় বড় আল-মারিতে থাকে-থাকে ঝক্‌ঝকে বাঁধানো বই সাজানো রয়েছে, দেওয়ালের গায়ে বড় বড় ছবি টাঙান, এখানে সেখানে ছোট বড় নানা রকমের পাথরের মূর্ত্তি। সে বেশ বুঝতে পারলে যে, তার জামা কাপড়ের সঙ্গে এ স্থানটা মোটেই খাপ খাচ্ছে না।

বাবুটির প্রকাণ্ড চেহারা। পূর্ণিমার চাঁদের মত নিটোল গোল মুখের আধখানা প্রকাণ্ড একখানা বইয়ের আড়ালে ঢাকা। তিনি একমনে কি পড়ছিলেন, ঘরের মধ্যে যে একজন লোক এসেছে, সে জ্ঞানই তাঁর নেই।

[illegible] রতিকান্ত ভাবতে ল[illegible] তেন না। [illegible] পা পা করে [illegible] সে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় বাবুটি মুখ তুলে চাইলেন।

রতিকান্ত কোন রকমে একটা নমস্কার সেরে নিয়ে বল্লে—আপনি একজন লোকের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

নাক-টেপা চশমা খুলে নিয়ে বাবুটি বল্লেন—ও তুমি সেইজন্য এসেছ? বসো।

রতিকান্তর বুকের মধ্যে আবার আশার নৃত্য সুরু হোল। কোন রকমে ধূতিখানার ছেঁড়া জায়গাগুলো ঢেকে সে গদীর এক কোণে গিয়ে বস্‌ল।

বাবুটি বল্‌তে লাগলেন—দেখ, আমি একখানা উপন্যাস লিখছি, মস্ত বড় উপন্যাস; সর্ব্বসমেত বোধ হয় চৌষট্টিখণ্ডে সেখানা শেষ হবে। আমি বলে যাব আর তোমায় লিখে যেতে হবে। তোমার হাতের লেখা কেমন?

সামনেই দোয়াত-কলম ছিল, রতিকান্ত তার দুর্ব্বল উৎকণ্ঠিত হাতে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে এক লাইন লিখে দেখালে।

লেখা পড়ে তিনি বল্লেন—এই লেখাতেই হবে, তবে আরও একটু সাবধানে লিখলেই চলবে।

কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল এসে গেল। সে কোন রকমে ঢোক গিলতে গিলতে বল্লে—আপনি—আপনি আমায় বাঁচালেন। চাকরী-হীন হয়ে বড় কষ্টে পড়েছি—

—যাক, যাক, ও-সব কথা যাক। তোমায় কি করতে হবে, শোন। চৌষট্টিখণ্ডের মধ্যে দেড় বছরে আমার আটখণ্ড লেখা হয়েছে। বাকী আছে ছাপ্পান্ন খণ্ড—

রতিকান্ত দুই-একখানা উপন্যাস পড়ে ছিল। সে বল্লে—একখানা উপন্যাস এত-বড়?

বাবুটি একটু জোর দিয়ে বল্লেন—হ্যাঁ—একখানা—একটু আশ্চর্য্য হবার কথাই বটে। জগতে এত-বড় উপন্যাস আর কখনও লেখা হয়নি। আমার এই বই বেরুলে পৃথিবীতে উপন্যাস লেখা বন্ধ হয়ে যাবে। রোঁমা রোঁলার জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাস চারখণ্ডে শেষ হয়েছে, কিন্তু চারখণ্ডে কি মানুষের সমস্ত অবস্থা আর চরিত্র বর্ণনা করে শেষ করা যায়! আমি অনুমান করছি যে আমার এই "জীবন-রহস্য" চৌষট্টিখণ্ডে শেষ হবে। হয়ত দুই এক খণ্ড বেশীও হতে পারে।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করলে—তাহলে আমায় কখন আসতে হবে?

লোকটা আবার নাকে চশমা লাগিয়ে বল্লে—এই সকাল সাতটার সময় আসবে, এগারোটা অবধি লিখ্‌বে। তারপর বাড়ী গিয়ে খেয়ে-দেয়ে বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার সময় আসবে। সকালবেলা যা লিখে যাবে, এই সময় তা দেখবে, কোথাও বানান-টানান ভুল গিয়েছে কিনা। দুপুর বেলা এই কাজ ছাড়া আর কোন কাজ নেই। সে সময়টা আমি মস্তিষ্ককে একটু বিশ্রাম দিই। তারপর বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে থেকে সন্ধ্যে ছটা অবধি আবার লিখতে হবে। তারপর বাড়ী গিয়ে চা-টা খেয়ে এসে আমায় একটু পড়িয়ে শোনাতে হবে। দশটা এগারোটা অবধি পড়ে বাড়ী চলে যেও, তার বেশী আর তোমায় আটকে রাখবো না।

রতিকান্ত হিসাব করে দেখলে যে, ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি বারোটা অবধি চাকরী। এর মধ্যে যেটুকু ছুটি তা ত বাড়ীতে যেতে আসতেই কেটে যাবে। তার উৎসাহটা ক্রমে নিভে আসতে লাগল—কিন্তু বাঁচতেও ত হবে।

সে জিজ্ঞাসা কল্লে—আমাকে কত দেবেন?

লোকটি বল্লে—দেখ আমি যখন প্রথম চাকরীতে ঢুকি তখন আমার আট টাকা মাইনে হয়েছিল। আজকে আমার যা কিছু অর্থ-সামর্থ্য দেখছো সব আমার নিজের চেষ্টায় হয়েছে। সেই আট টাকায় জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে আজ আমার মাসিক আটাশ হাজার টাকা আয়। তবে এখনকার চেয়ে তখন জিনিষ-পত্তর ঢের সস্তা ছিল। সেদিকে আমায় অবিবেচক মনে করো না। আমি তোমায় বারো টাকা মাইনে দেবো—মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে কিন্তু। একটা কথা ভুলে যেও না, এই "জীবন-রহস্যের" সঙ্গে চিরকাল তোমার নাম পৃথিবীতে থেকে যাবে। সেটা একটা মস্ত লাভ।

রতিকান্ত এতক্ষণ ধরে মনে মনে যে আশার তাজমহল গেঁথে তুল্‌ছিল নিমেষের মধ্যে তা ভূমিসাৎ হয়ে গেল। বারো টাকা! বারো টাকায় যে দুবেলা খেতেই কুলোবে না! এবার তবে মৃত্যু নিশ্চিত। তার বুকের মধ্যে রক্তটা টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করলে। মরতেই ত হবে, কিন্তু মরবার আগে এই লোকগুলোকে একটু শিক্ষা দিয়ে যে[illegible] সাংঘাতিক একটা কিছু [illegible] সে হাঁটু গেড়ে [illegible] কে।

উল্টে ফেলে কি যেন খুঁজতে আরম্ভ করলে।

হঠাৎ তাকে ঐ রকম করে জিনিষ-পত্র নাড়া-চাড়া করতে দেখে লোকটা একটু বিরক্তির সঙ্গে বল্লে—কি হচ্ছে? বড় অস্থির লোক ত তুমি!

দাঁতে দাঁত চেপে সে উত্তর দিলে—হুঁ, এইবার সব স্থির করে দিচ্ছি! শয়তান! চালাকি পেয়েছো আমার সঙ্গে!

হাতের কাছে কিছু না পেয়ে রতিকান্ত দুই হাত দুই পকেটের মধ্যে পুরে দিলে। কোটের পকেটে পুরোণ কাঠের বাঁটওয়ালা একখানা ছুরি পড়েছিল, রতিকান্ত তাড়াতাড়ি সেটাকে বার করে তার ফলাটা টেনে খুলতে লাগল।

ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের সম্মুখে খাবার পড়লে তার মুখের ভাবটা যেমন হিংস্র হয়ে ওঠে, রতিকান্তর মুখের চেহারাটা ঠিক সেই রকম হয়ে উঠল। তার রক্তবর্ণ কোটরাগত চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করলে।

তার ঐ রকম মূর্ত্তি আর ছুরি খোলা দেখে লোকটি চেঁচিয়ে উঠল—কি—কি খুন করবি নাকি? এই কোন্—

খবর্দ্দার!—রতিকান্ত ছুরিটাকে খুলে একেবারে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বল্লে—খবর্দ্দার, একটু টুঁ শব্দ করেছ কি তোমার বুকে এই ছুরি বসিয়ে দিয়েছি! ওখান থেকে এক পাও নড়তে চেষ্টা করো না—কোথায় তোমার "জীবন-রহস্য"

এক[illegible] খানকয়েক মরকে[illegible] তিন না[illegible] ছিল

লোকটা আঙুল তুলে সেইদিকে দেখিয়ে দিলে।

রতিকান্ত সেখান থেকে খাতাগুলো নামিয়ে এনে পড়্‌পড়্‌ করে সেগুলো ছিঁড়তে লাগল।

লোকটা নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে তাকে দেখতে লাগল।

খাতা ছেঁড়া শেষ হয়ে গেলে সে বল্লে—তোমার জীবন রহস্যও আজকে শেষ করে দিয়ে যেতুম, তবে সেটা আর করব না, অন্য কেউ এসে একদিন তা শেষ করে দিয়ে যাবে,—ভয় নেই!

ছুরিটাকে মুড়ে নিয়ে আস্তে আস্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীল সাগরের বেলাভূমিতে তখন ফাগের খেলা সুরু হয়েছে। রতিকান্ত বাগবাজারের গঙ্গার ধারে রেল-পুলের ওপরে বসে বসে ভাবছিল—অতঃপর কি করা যায়!

করবার আর কিছুই নেই! আশার বাতি নিভে গিয়েছে, আবার তাকে জ্বালিয়ে তোলবার ধৈর্য্য নেই, সাহসও নেই।

সর্ব্বনাশ! আজ ত নরহত্যা করে বসেছিলুম!

রতিকান্ত কোটের হাতাটা তুলে নিজের শির-বের-করা হাতখানার দিকে দেখতে লাগ্‌ল! তারপর পকেট থেকে ছুরিখানা নিয়ে ছুড়ে নদীতে ফেলে দিলে।

গঙ্গার ধারে তখন অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খেলা করছিল। রতিকান্ত বসে বসে আপন-মনে তাদের খেলা দেখতে লাগল। একটি ছোট্ট মেয়ের গলায় একখানা

সরু সোনার হার চিক্‌চিক্ করছিল। মেয়েটির দিকে দেখতে দেখতে তার মনে হতে লাগল, ঐ-হারখানা পেলে বোধ হয় তার ছ-মাসের খরচ চলে যায়। হারখানা ওর গলা থেকে ছিনিয়ে নিলে কেউ দেখতেও পাবে না—রাস্তা ত ফাঁকা! যন্ত্র-চালিতের মত সে টপ্ করে দাঁড়িয়ে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার বসে পড়ল।

লাল সূর্য্য তখন অস্ত-অচলের গা গড়িয়ে ওপারে নেমে গিয়েছে, কিন্তু দিনান্তের উৎসবের চিহ্ন তখনও আকাশের গায়ে মিলিয়ে যায় নি। পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা অবসাদে তার অঙ্গ ভেরে আসতে লাগল। দু-হাতে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে উঠে একবার অলস চোখে তার চারিদিকটা দেখে নিলে, তারপর চোখ বুজিয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

দুটি ছোট্ট ঢেউ পোলের নীচে শান-বাঁধানো দেওয়ালে ছপ্ ছপ্ করে লেগে ফিরে গেল।

নিশার অন্ধকার তখন পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে… … …

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

স্কন্দ-ধাত্রী

[সপ্তর্ষির পত্নীদের মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী বাদে বাকী ছয়জনের পত্নীর নাম,—যথাক্রমে বর্ষয়ন্তী, অভ্রয়ন্তী, অম্বা, দুলা, নিতত্নী ও চুপুনীকা। এ রাই শরবনে পরিত্যক্ত ইন্দ্রের শত্রু তারকাসুরের ভাবী-দমন-কর্ত্তা রুদ্রের পুত্র স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয়দেবের ধাত্রী। এঁদের অন্য নাম কৃত্তিকামণ্ডলী।]

*

কই রে কোথা বর্ষয়ন্তী? অভ্রয়ন্তী কই?
—নাম ধ'রে আজ আকাশ-বাণী ডাক দিয়েছে ওই!
শূন্য নভে বুলাস্ নে আর ব্যথার অনিমেষ,
দৈব হ'ল সদয়, বুঝি হবে ব্যথার শেষ।
প্রাণে পুষিস্ স্নেহের ক্ষুধা হৃদয় উপোষী,
শুনিস্ নে কি শিশুর কান্না কাঁদায় ক্রন্দসী?
গর্ভে ছেলে ধরি নি তাই শূন্য রবে কোল?
শুকিয়ে যাবে সব মমতা? শুন্‌ব না মা-বোল্?
এমন কঠোর ন'ন্ বিধাতা আকাশ-বাণী আমার [illegible]
ডাক দিয়েছে সফল হ'তে চল্ ছ'রে [illegible]

খুঁজে দেখি তিন ভুবনে কোথায় সে কুমার,
রুদ্র-তেজে জন্মে যে কোল পায়নিক উমার।
এই দিকে আয়, এই দিকে আয়, এই দিকে আয়, বোন্
কচি ছেলের পাস্ কি আওয়াজ? কান পেতে ভাই শোন্।
সন্দেহে সৌভাগ্য-হারা আমরা অভাগী
একটি শিশুর একটু পরশ ছয় বোনে মাগি।

* *

এই দিকে আয়!…ওই দ্যাখা যায়! আহা চমৎকার!
চোখের পলক কেড়ে-নেওয়া মুখ দ্যাখো বাছার!
সাগর-সেঁচা মাণিক এযে সাতটি রাজার ধন,
দৈব-বাণী ভুল বলে নি, ভুল বলে নি, বোন্!
এ যেন রে নিখিল-নারীর মাতৃ-হিয়ার সাধ,
স্বপ্নে-গড়া মূর্ত্তিমন্ত জীবন্ত আহ্লাদ!
এ যেন রে দিব্যছটা মৃত্তিকা 'পরে
ভানুর ভ্রূণ ভোরাই মেঘের সূতিকা-ঘরে!
জন্মেছে এই ফুল্‌কিটুকুন্ নেহাৎ অসহায়,
দৃষ্টিবিষা বিষধরে ঘেরা বনের ছায়।
নাইক গেহ মায়ের স্নেহ নাইক বাছার নীড়,
খাগ্‌ড়া-শরের খাঁড়ার মতন পাতার খালি ভিড়।
ভিড় ক'রে কি করিস্ তোরা? সর্ তো দেখি, দে,
দেখিস্ নে কি দুধের বাছার পেয়েছে ক্ষিদে?

* * *

ছয় মা দেবে পীযূষ, ছেলের একটি সবে মুখ;
কোন্ মাকে দুখ্ দিবি, ছেলে? কার ভরাবি বুক?
ছয় মায়েরি পীযূষ-ব্যথা, সোয়াস্তি নেই আর!
হঠাৎ একি! দ্যাখ্ দিদি দ্যাখ্! এ কি চমৎকার!
সত্যি এ? কি স্বপন দেখি? একি রে বিস্ময়!
দেখ্‌তে-দেখ্‌তে নতুন মুখ আর নতুন অধর হয়!
এক আকাশে উদয় যেন হ'ল রে ছয় চাঁদ,
এক লহমায় মিটিয়ে দিতে ছয় জননীর সাধ!
[illegible] কেন বোন্ বর্ষয়ন্তী আর কেন বিমন?—
[illegible] ক্ষোভ মিটাতে কুমার যে নন।

* * * *

ছয় জননী স্তন্য পিয়াই চাঁদ-ঝোলানো দোলাতে,
ছয় বোনে হিম্‌শিম্ খেয়ে যাই একটি ছেলে ভোলাতে।
কচি-কচি ঠোঁট রয়েছে হৃদয়-সুধার সন্ধানে,
চোখ দেখে ওর হয় গো মনে ও আমাদের মন জানে!
সবার কাছেই নিচ্ছে ও যে নিচ্ছে পরম আগ্রহে,
জীবন্ত মৌচাক ও যেন চিত্ত-মধুর সংগ্রহে!
উঠ্‌ছে বেড়ে পীযূষ কেড়ে মধুর ভারে টুপ্‌টুপে,
খুশীতে মন তুষ্ট ক'রে নেবার যা সব ন্যায় চুপে।
পিয়াই ওরে আট-পহরে আনন্দেরি ছন্দ গান;
ওর দে'-আলার দীপ্ত আলোয় চন্দ্রতপন স্পন্দমান!
পিয়াই স্মৃতি, পিয়াই আশা, স্বপ্ন পিয়াই স্তন্য সাথ,
তরুণ আঁখির তারায় হেরি অরুণ আলোর সুপ্রভাত।
সেরা-সেরা তারায় ঘেরা হিন্দোলা ওর প্রশস্ত,
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় ধ্রুব, রূপার কাঠি অগস্ত্য!
নিদ্-মহলে সিঁদ কাটে ও স্বপ্নে চীয়ায় সুপ্তকে!
পরম লোভী হাত বাড়িয়ে ধরতে ও চায় 'লুব্ধকে'!
ত্রিপুর-বধের বিপুল ধনু হ'য়েছে ওর খেল্‌না সে,
কৃপাণ-পাণি কাল-পুরুষের খড়্গ দেখে খুব হাসে।
হাস কুমার! খেল কুমার! অপ্রসূতির আঁতুড়-ঘরে,
দুর্ভাগাদের আঁচল-আড়ে, বঞ্চিতাদের ধন্য ক'রে।
ছয়-ধারাতে স্তন্য পিয়াই শক্তি চীয়াই ছয় ধারাতে,—
—রক্ত হিয়ার ক্ষীর মমতায়,—সঞ্চারি বল স্তন্য সাথে,—
শক্তি যাতে রয় নিহিত—সেই শুভ—সেই স্বতঃস্ফূর্ত্তি—
আত্মাহীনে আত্মা যে ত্যায়—পুণ্যেরি যে ভিন্নমূর্ত্তি।
মূর্ত্তিমন্ত সান্ত্বনা মোর শক্তিতে হও ওতঃপ্রোত;
স্তন্য পিয়াই আত্মপ্রদ, পীযূষ পিয়াই বলপ্রদ।

* * * *

পীযূষ সনে কে পিয়ালি প্রাণের জ্বালা রে,
ছয় বোনেরি গলায় মোদের জ্বালার মালা রে,
অকারণে নির্ব্বাসিত স্বামীর সন্দেহে,
অন্যায়েরি দহন দহে মোদের মন দেহে।

স্পষ্ট ক'রে ভাব্‌তে না চাই, ভাব্‌লে হারাই জ্ঞান,
অভিশাপের তাপে পাছে হয় রে অকল্যাণ!
অগ্নিকে হায় তুষ্‌লে স্বাহা মোদের রূপ ধ'রে,
ঋষির মনে লাগ্‌ল ধোঁকা, দিলেন দূর ক'রে,
সন্দেহে মন বিষিয়ে গেল স্বামী হ'লেন পর,
ঋষি স্বামীর পুরুষ-রিষে বিষম আথান্তর।
ঘর হারালাম বর হারালাম আমরা ছ'জনা,
পণ্ড হ'ল নারী-হিয়ার শিশুর কামনা!
প্রাণের যে সাধ,—আচম্বিতে পঙ্গু নেহারি,
আকাশে নিশ্বাসের জ্বালা বিকল বিথারি।
ক্ষুব্ধ শরীর ক্ষুব্ধ শোণিত ক্ষোভের পীযূষ পান
করছে কুমার, অন্যায়ে সে করবে অবসান।
বাছা ওরে কার্ত্তিকেয়! দুলাল কৃত্তিকার,
সুরাসুরের করবে তুমি অন্যায়ে সংহার।

* * * * * *

রুদ্র তেজে জন্মেছে যে আভ্যুদয়িক তার,
সময় ব'য়ে যায় যে, ভাখা নাইক পুরোধার;
কই পুরোহিত? কই পুরোহিত? অন্বেষি মহী,
ঐ যে ঋষি বিশ্বামিত্র বিশ্ববিদ্রোহী!
উনিই হবেন যাজক মোদের সকল ক্রিয়াতে,
পারেন উনি আপন গুণে শক্তি চীয়াতে;
দৈব-জয়ী ঐ যে মুনি, ঐ যে তপোধন,—
ছয় বোনে চল্ প্রণাম করি, জানাই নিবেদন।

* * * * * *

আভ্যুদয়িক না হ'তে শেষ কাণ্ড এ কি, হায়,
দিগ্‌গজেদের পাক্‌ড়াতে শুঁড় দামাল ছেলে ধায়!
পাঁচোট পূজার দিন বাছনি আছড়ালে হাতী,
আচোট আকাশ উঠ্‌ল কেঁপে চাঁদতারার পাঁতি!
[illegible]পল সাগর আর ধরাধর বাসুকী চঞ্চল;
[illegible]য় অস্থিরতায় ত্রস্ত অসুর দল।
[illegible]ন না [illegible]ক্র-দাপে—কাঁপে অসুর-রাজ;
[illegible]গ্রহ শিশুর দেহে আজ।

বালক-বীরের অলীক ভয়ে ইন্দ্র ব্যাকুল মন,
হাজার আঁখি মেলে কেবল ত্যাখে অলক্ষণ !
তারক-নিপাত রইল মাথায়, রক্ত-নয়নে—
বজ্র নিয়ে ইন্দ্র এলেন শিশুর দমনে !
অসুরে যে রাজ্য নেছে, নাই সে খেয়াল হায় ;
রোষের ভরে শিশুর 'পরে বজ্র নিয়ে ধায়।
বাছার গায়ে বাজ হানে রে !···বুজ্‌তে গেলাম চোখ,
মুদ্‌ল না নক্ষত্র-নয়ন—পড়ল না পলক !
দেখ্‌তে হ'ল বাধ্য হ'য়ে···কিন্তু কী দেখি !···
বিস্ময়ে বাক্ রুদ্ধ,—অবাক—কুমার করে কী !
বজ্র লুফে ধর্‌ল হাতে—আঙুল চিরে তার
পড়ল যত বিন্দু তত রুদ্র-অবতার।
হুঙ্কারে দিক কাঁপিয়ে দাঁড়ায় কুমারকে ঘিরে
রুষ্ট চোখে ওষ্ঠে চেপে উদ্ধত শিরে
স্কন্দে বলে, "ইন্দ্র হ'য়ে ত্রিলোক তুমিই নাও,
ঈশ্বরতার ঈর্ষ্যাজরা ইন্দ্রকে তাড়াও।"
রুদ্র-সেনায় ইন্দ্র-সেনায় যুদ্ধ আসন্ন,
এমন সময় কে আসে ওই মরাল-নিসন্ন।
মাঝে এসে বলেন তিনি, "সম্বরো দেবরাজ,
কী বিপরীত বুদ্ধি, মরি, দেখি তোমার আজ।
শত্রু তোমার মার্‌বে যে হায় শত্রু ভেবে তায়
যুদ্ধ কর ? বজ্র হানো রুদ্র-শিশুর গায় ?
অসুর-কুলের অভিযানের অন্যায়ে-জর্জ্জর
অন্যায়ে চাও জয়ী হ'তে অন্য জনের পর !
রুদ্র-রোষে স্বর্গ-মর্ত্ত্য হবে যে ছারখার,
অস্ত্র রাখো ; এই বালকে দিয়ে সেনার ভার
রথ ঘুরিয়ে একলা তুমি যাও ফিরে দুর্গে,
এই শিশু কাল বধ্‌বে জেনো তারক-অসুরকে।"

** ** ** **

রুদ্র-সেনার জয়-রবে কে ফিরল হরষে—পারি
জন্ম যাহার রুদ্র তেজে বহ্নি-উরসে।

ঘুমে আলা দুলাল আমার লড়াই খেলিয়ে,
ময়ূর জাগে তারায়-ঘেরা পেখম মেলিয়ে।
লক্ষ তারা শিশুর সমর ত্যাখার প্রত্যাশে
চোখ চেয়ে সব ঘুমিয়ে গেছে আকাশ-ফরাশে।
হিন্দোলাতে স্কন্দ ঘুমায়, চন্দ্র জেগে থাক্ !
ব্রাহ্মী-নিশার প্রহর গণি ছয় বোনে নির্ব্বাক !
চতুর্ম্মুখের বাক্য স্মরি' আশায় আশঙ্কায়
আন্দোলিত চিত্ত মুহু, মন কত কি গায়।
ব্রহ্মবাণী মিথ্যা হবার নয়কো, তবে কি—
অত্যাচারের অন্তকারী বালক হবে কি ?—
বজ্রকাটা আঙুলে যার জ্যোৎস্না জড়িয়ে
পাড়িয়েছি ঘুম ঘুম-পাড়ানি মন্ত্র পড়িয়ে,
সে মোর হবে দৈত্যজয়ী ?···পূরবে মনের সাধ ?···
অন্যায়েরি বন্যাজলে পারবে দিতে বাঁধ ?···
অন্যায়ে কেউ বালক-বধের ফন্দী আঁটে, হায়,
শিশুর দেহেও শত্রু দেখে খামোকা চমকায় !
অন্যায়ে কেউ হত্যা করে নারীর নারীত্ব,
পুরুষ-রিষের বিষে-জরা জীবন ও চিত্ত।
অন্যায়ে কেউ ইন্দ্রলোকের কর্ত্তা হ'তে চায়।
অন্যায়েরি বন্যাধারায় জগৎ ভেসে যায়।
অন্যায়েরি অভিযানে স্বর্গ সে ত্রস্ত ;—
অন্যায়ে হায় অস্তপ্রায় আজ পুণ্য সমস্ত !
অন্যায়ের এই সৈন্য ঘটায় একলা এ বালক—
কর্‌বে ছিন্ন ? তিন-লোকে ফের জ্বাল্‌বে সত্যালোক ?
আন্‌বে শ্রেয় কার্ত্তিকেয় ?···কখন্ হবে ভোর ?···
পথ চেয়ে রই সূর্য্য-রথের, ভাবনাতে বিভোর।
কোন্ হোরা ওই ঘুম-চোখে যায় ? সুধাই আয়, সখী !
অন্ধকারের আঁচল ভিজে উঠল আলোয় কি ?

*** *** ***

তিন নাশ ফিঁকে হ'তে-হ'তেই আঁধার ! একি হায় !
ঘড়া উল্টো দিকে অরুণ ফিরে যায় !

সূর্য্যে প্রবেশ করলে শশী! সকল আলো লোপ!
অকাল-রাহু-অসুর আসে মূর্ত্তিমন্ত কোপ!
আঁধার নভ পাপের ভিড়ে, বিশ্বে জাগে ত্রাস,
বাঘের রথে গ্রসন্ আসে করতে জগৎ গ্রাস!
ত্রসন্ আসে পিশাচ-রথে, জম্ভ-কুজম্ভ,
নিশানে কাক কালনেমি সে জীবন্ত দম্ভ!
ভ্রূকুটিতে ভুবন ভ'রে তারক সে দুর্ম্মদ
যোজনজোড়া হাজার ঘোড়ার ছোটায় বিপুল রথ!
অমাতিথির অতিথি ওই প্রচণ্ড ধূর্ত্ত
রোদনে দিক ভরিয়ে চলে রৌদ্র মুহূর্ত্ত!
রথের ধূলায় ছায় নভতল, রাত্রি অকালে,
ঊর্দ্ধে ধ্রুব নিম্নে তপন সবায় ঠকালে।
ছুঁচ গলে না এম্‌নি জমাট ভরাট অন্ধকার,
গ্রাসের ত্রাসের আসন্নতায় বিশ্বে হাহাকার!
পলক-ভোলা তারার আঁখি তাও সে অন্ধপ্রায়
কোলের মানুষ যায় না ছাখা, এম্‌নি আঁধার, হায়!
কোথায় গেলি অভ্রয়ন্তী!···বাজ পড়ে মাথে,
সাতটি দিনের বাছা মোদের নাইরে দোলাতে!
ঘুমন্তে কে কর্‌লে চুরি!···ঘট্‌ল অনিষ্ট,···
হায় লো মেঘয়ন্ত্রী! মোদের মেঘ্‌লা অদৃষ্ট।

* * * * * * * * * *

অন্ধকারের বুক চিরে ও কাদের সিংহনাদ
ভয়ের আঁধার ছিন্ন-করা জাগ্‌ল কি!···আহ্লাদ!
বিদ্যুতেরি হাজার-নরী দুলিয়ে তমসায়
সংশয়েরি তমস্বিনীর করলে কেরে সায়!
কে আসে নিঃশঙ্ক মনে ময়ূর-বাহনে
অসুর-ছায়া-পিণ্ডী-কৃত-তিমির-দহনে!
ইন্দ্রদেবের মুকুট-বোঝা তারণ ক'রে যে,
তারক নামে আপ্‌নাকে হায় জাহির ক'রেছে,
তাগ ক'রে তায় বাণ হানে কে শৌর্য্য-অবতার?
গ্রসন-ত্রসন-জম্ভ-মহিষ আরম্ভে চীৎকার!
ছয় মায়েরি দুলাল ও যে বালক ষড়ানন!

অসুর সাথে শিশুর লড়াই! অপূর্ব্ব এই রণ!
পল্টনে কার হানে কুমার শক্তি শতঘ্নী—
লক্ষ নাগের জিহ্বা যেন উগারে অগ্নি!
বধির ক'রে হাজার বজ্র গর্জ্জে যুগপৎ,···
টুট্‌ল বুঝি তিমির কায়া···দৈত্য হ'ল বধ!···
কুড়িয়ে-পাওয়া কুমার মোদের অসুর-জয়ী ভাই,
জয়ধ্বনি ক'রতে তোরা কাঁদিস্ কেন, ছাই!
ছোঁয়াচে এই সুখের কান্না···কাঁদ্‌তে···জেগেছি···
অম্বা! দুলা! নিতম্বী! বোন্ স্বপ্ন দেখেছি।
তোলাপাড়া ক'রতে মনে পদ্মযোনির বাণী
কখন যে হায় ঘুমিয়ে গেছি কিছুই নাহি জানি।
ভোরের আলো, ছাখ্ সুমেরুর গায় কি লেগেছে?
ছয় জননীর স্নেহের নীড়ে কুমার জেগেছে?
ঊষার-হাসি মলিন!···মেঘে সূর্য্যে ডুবে যায়—
এযে আমার স্বপ্নে ছাখা, স্বপ্নে ছাখা হায়!
স্বপন আমার ফল্‌তে সুরু হয়েছে মন কয়,
ভোরের স্বপন সফল হবে হবে রে নিশ্চয়।
ক্লেশের এবার শেষ হবেরে শঙ্কা ফুরাবে।
ছয় জননীর ভাগের ছেলে ভাগ্য ফিরাবে।
অপরাজের রাজমহিমায় ছাই দেবে এই ঠিক—
আনন্দ ছয় কৃত্তিকার এই অনিন্দ্য কার্ত্তিক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চয়ন

অভিব্যক্তির নূতন মত

সাধারণ কথা কে কে যদি সুধানো যায়, ভিয়েনার এক নামজাদা পণ্ডিত প্রফেসর "মানুষের পূর্ব্ব তবে জবাব Linckewicz এই মতের এক নূতন পাওয়া যাবে তেন না কিন্তু সংপ্রতি আলোচনা করেছেন।



ওরাং-উটাং—"বোর্ণিওর বনমানুষ" নামে বিখ্যাত। মানুষের নকলে ওস্তাদ। দৈর্ঘ্যে ৪৷৷০ ফুট।

তিনি বলেন, "মানুষ যে কেবলমাত্র বানরের বংশ-ধর তা নয়; পরন্তু, মানুষই বানরের পূর্ব্বপুরুষ!

ঐতিহাসিক কালের আগে একজাতীয় মানুষ অতি-সভ্যতার মহিমায় ক্রমেই অধিকতর অসভ্য হয়ে পড়ে; তারপর অসভ্যতা থেকে একেবারে বর্ব্বরতার মধ্যে ডুবে, শেষটা আবার বানরে পরিণত হয়ে যায়!

পৃথিবী এখন ক্রমাভিব্যক্তির দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে অগ্রসর হয়েছে। মিথ্যা শিক্ষা ভুলে, ধ্বংসের দিক থেকে আমরা যদি এখন আবার সহজ স্বাভাবিকতার দিকে ফির্‌তে চেষ্টা না করি, তবে আর দু' হাজার বৎসরের মধ্যে বানররাই ফের পৃথিবীর বাসিন্দা হবে।



দক্ষিণ এসিয়ার গিবন। দাঁড়ালে মাটিতে হাত ঠেকে। ছিপ্‌ছিপে গড়ন।



শিম্পাঞ্জি। হাতের মাপে ও দাঁতের সংখ্যায় মানুষের কাছাকাছি। লম্বায় ৫ ফুট।

চীন, মিশর, রুসিয়া, ইতালী ও অন্যান্য দেশে নব নব আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্য যখন সমুদ্রের তলায় মগ্ন, তখন পৃথিবীতে এমন এক সভ্যতা ছিল, বয়সে যে আটলান্টিক মহা-সাগরের চেয়েও বেশী প্রাচীন।

তখন পৃথিবীতে যে মনুষ্য জাতি বাস কর্‌ত, আদিম বা[illegible] পঞ্চাশ শতাব্দী-ব্যাপী ক্রমাভিব[illegible]দের উৎপত্তি।

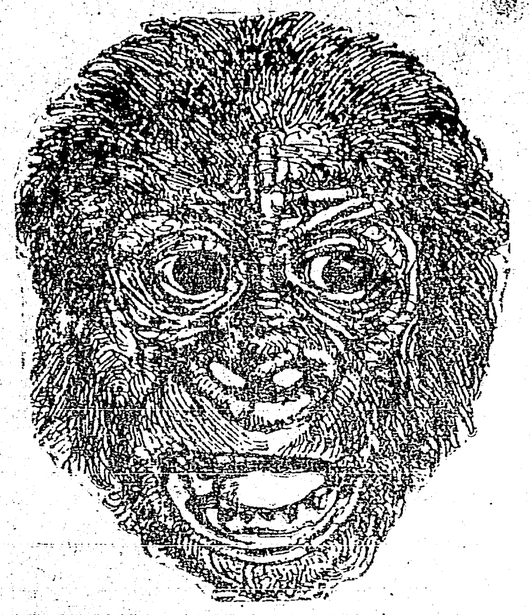

মধ্য-আফ্রিকার গরিলা। মস্ত-বড় দেহ, ভয়ানক জোর। লম্বায় ছয়ফুট।

আধুনিক সভ্য মানুষদের চেয়ে তারা (ভিন্ন ভাবে হ'লেও) অধিকতর সভ্য ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তখন 'টেলিফোন' না থাক্‌লেও, মানুষরা মানসিক বার্ত্তাবহ বা 'টেলিপাথি'র দ্বারা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কথা, বা ভাবের আদান-প্রদান কর্‌তে পার্‌ত। বর্ত্তমান যুগে কেবল ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসীদের মধ্যেই সেই প্রাচীন শক্তির শেষ-বিকাশ দেখা যায়।

অতি-সভ্যতার ফলে সে-যুগের মানুষ যখন মহা-মানব হয়ে উঠ্‌ল, তাদের মস্তিষ্কের শক্তি যখন সীমাকেও ছাড়িয়ে গেল, তখন আচম্বিতে তারা বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পড়ল। তারপর কামুকতা, পশুত্ব, ও মারামারি-কাটাকাটির ফলে তারা আবার যা ছিল তাই—অর্থাৎ বানর—হয়ে দাঁড়াল।

আমার মতের সত্যতা সপ্রমাণ করা শক্ত নয়। একটি নবজাত শিশুকে কেবলমাত্র বানরদের সংসর্গে রেখে পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত লালন-পালন করুন। তারপর পরীক্ষা কর্‌লে দেখবেন, বানরদের সমস্ত অভ্যাস সে গ্রহণ করেছে। বানরদের মত কিচির-মিচির শব্দ করা ছাড়া সে আর কোন কথাবার্ত্তা কইতেও পারবে না। তখন কোন বানরের (ape) সঙ্গে তার সংসর্গ ঘট্‌লে, তার সন্তানরাও পূরোদস্তর বানর হয়েই দাঁড়াবে।

অতএব বানর-মাত্রকেই বলা যায়, নির্ব্বোধ মানুষ—বহুশতাব্দীর পাগলামিতে যারা অবনত হয়ে পড়েছে।"

সংপ্রতি নিউ গিনির অজ্ঞাত বন্য প্রদেশে একজাতীয় বিচিত্র মানুষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের দেখ্‌লে প্রফেসর Linckewiczএর মত দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। জলাভূমিতে বাস করে ব'লে তাদের পায়ের ব্যবহার হয় না। কেবল হাত ব্যবহার ক'রে ক'রে তাদের পা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। সোজা হয়ে তারা দাঁড়াতেও পারে না,—চলে-ফেরে ঠিক মস্ত-বড় বন-মানুষের মত, হেলে-দুলে, কষ্টে-সৃষ্টে। এই অদ্ভুত বানর-মানুষরা গাছের উপরে কুঁড়ে-ঘর বেঁধে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে।



এগারোতালা সহর

প্রাচীনকালে প্যালেষ্টাইনে বেথ-স্যান নামে এক সহর ছিল, এখন তা খোঁড়া হচ্ছে। খুব-সম্ভব, এর চেয়ে পুরাণো সহর পৃথিবীতে আর নেই, এবং এক-জায়গায় এত যুদ্ধও বোধ হয় আর-কোথাও হয়-নি।

খালি বেথ্-স্যান্ নয়, এক হাঁড়ীর উপরে রাখা আর এক হাঁড়ীর মতন, এখানে মাটির ভিতরে উপর-উপরি অন্তত এগারোটি প্রাচীন বিখ্যাত সহরের সমাধি আছে। সেকালে পরে পরে যত বিজেতা এখানে এসেছেন, তিনিই তাঁর অগ্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠিত সহর ভেঙে-চূরে সেই স্থানে নূতন নগর স্থাপন করেছেন।

বিশেষ ক'রে এই জায়-গাটির উপরেই প্রত্যেকের লোভ হোলো কেন? কারণ, এ জায়গাটির অবস্থান সুন্দর। এখান থেকে এসিয়া মাইনর ও মিশর-প্রদেশে যাতায়তের বিশেষ সুবিধা ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা ঐ এগারোটি সহরকে আবার খুঁড়ে বার করতে চান। আমরা পরে পরে নগর-গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলুম,—পাঠকরা এ-থেকে চিন্তার খোরাক যথেষ্টই পাবেন, আশা করি।

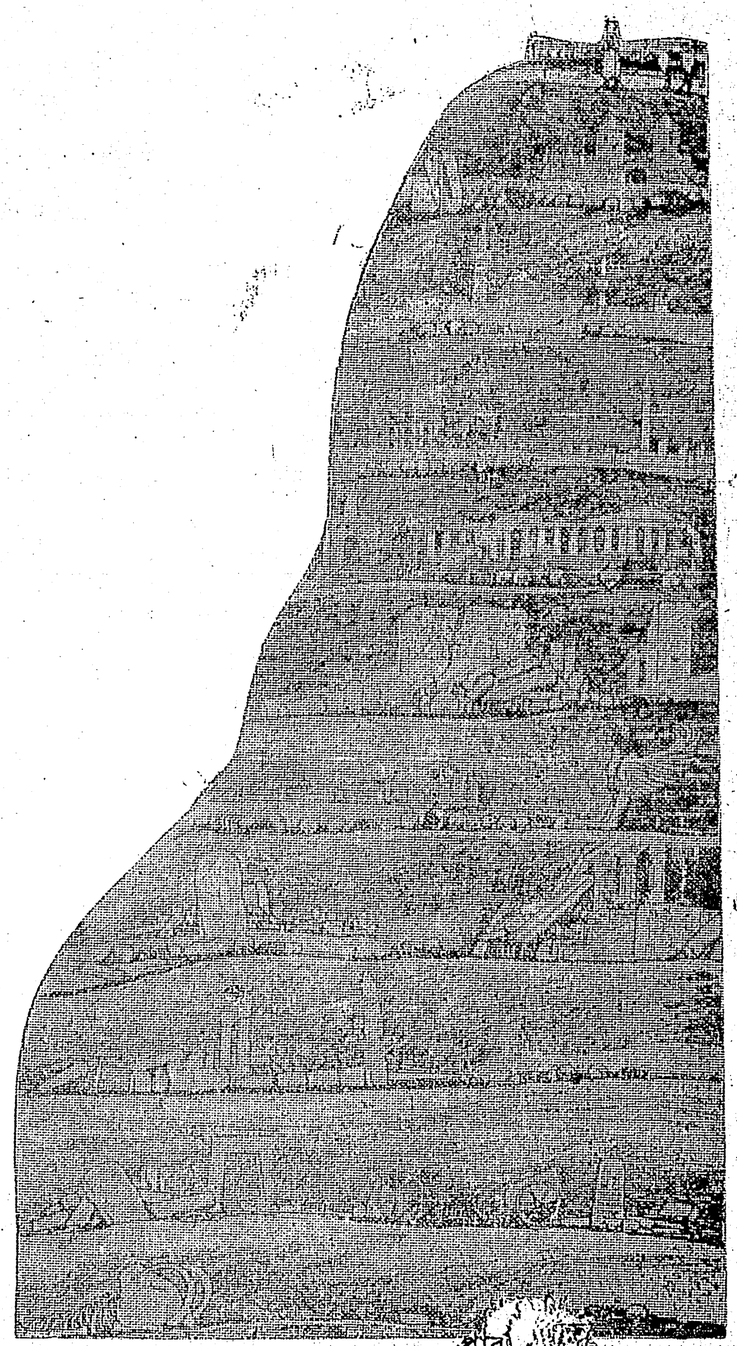

উপর-উপরি এগারোটি সহর।

১। সব-চেয়ে নীচে, মান্ধাতার আমোলের সহর—যাযাবররা নানাদেশ থেকে এসে এখানে আড্ডা গেড়ে বসে। খুব-সম্ভব, এইটিই মানব-সভ্যতায় প্রথম স্থায়ী সহর। কুগঠিত পাথুরে তীরের ফলা ও কুড়ুল প্রভৃতি এবং বড় বড় সেকেলে জীবজন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সম্ভবত, সহরের আরো নীচে অধিকতর প্রাচীন জীবজন্তুর কঙ্কালাবশেষ পাওয়া যেতে পারে।

২। আমোরাইট সহর—চার হাজার বছর আগে। বাসিন্দারা তখন লোহার রথ তৈরি করতে পারত। এই সময়েই যুদ্ধে প্রথম ঘোড়ার ব্যবহার সুরু হয়।

৩। মিশরীয় সহর—৩,২০০ বছর আগে। মিশরের রামেসিস্ দি গ্রেট এখানে বিজেতা-রূপে এসে নূতন নগর স্থাপন করেন। মিশরীয় আদর্শের প্রাসাদ, মন্দির, চিত্র ও ভাস্কর্য্য। লেখার কাগজের ও দাড়ী-পাল্লার উদ্ভাবনা।

৪। ইজ্রেলাইট বা ইহুদী সহর—২,৯১০ বছর আগে। লিষ্ঠুর ও পৌত্তলিক আমোরাইট্ এবং ফিলিস্টাইনরা রাজা সলোমনের যুগে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় ও বাধ্যতা স্বীকার করে। পৌত্তলিকের দেবালয়ের স্থানে ইহুদীদের উপাসনালয়ের প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানী মোসেসের প্রণীত আইনের চলন।

৫। আসীরীয় সহর—২,৬৪৩ বছর আগে। বিখ্যাত যোদ্ধা Sennacheribএর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সচল দুর্গ, দুর্গপ্রাচীর-

ধ্বংসের ঢেঁকি-কল প্রভৃতির উদ্ভাবনা। লোহার তরোয়ালের প্রথম চলন।

৬। বাবিলনীয় সহর—২,৪০৭ বছর আগে। নেবুচাঁদনেজ্জারের দ্বারা স্থাপিত। ইহুদীদের বন্দী ক'রে তিনি বাবিলনে নিয়ে যান। ইটের উপরে বই ছাপা হোতো। ঝুলন্ত বাগান। প্রাসাদাদি নরসিংহের মূর্ত্তিতে শোভিত হোতো। দূরবীন।

৭। গ্রীসীয় সহর—২,২৪০ বছর আগে। আলেকজান্দার দি গ্রেটের সময়ে। জল-ঘড়ীর উদ্ভাবনা। সহরের কাছে দৌড়ের ময়দান। জল-প্রণালীর দ্বারা প্রত্যেক বাড়ীতে জল সরবরাহ।

৮। রোমীয় সহর—১,৯৮০ বছর আগে। জুলিয়াস সীজারের সময়ে। আম্পিথিয়েটার, রঙ্গভূমি, গ্রাডিয়েটরদের প্রতিযোগিতা, নাটকীয় দৃশ্য ও রথ-দৌড় প্রভৃতি। বাড়ীতে বাড়ীতে প্রথম স্থায়ী-স্নানাগারের প্রতিষ্ঠা।

৯। আরবীয় সহর—১,৯৮০ বছর আগে। কালিফ হারুণ-অল-রসিদের সময়ে। সুদৃশ্য মস্‌জিদ, স্তম্ভ ও হারেম। বীজগণিত, উচ্চতর গণিত ও অঙ্কবোধকের উদ্ভাবনা।

১০। ক্রুসেডারদের সহর—৮২১ বছর আগে। খৃষ্টান যোদ্ধাদের দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ ও গীর্জ্জাদির প্রতিষ্ঠা। সম্মিলিত যন্ত্র-সঙ্গীত ও গোথিক স্থাপত্যের উদ্ভাবনা।

১১। তুর্কী সহর—৬৪১ বছর আগে। পূর্ব্বতন সভ্যতার ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শনের দ্বারা উচ্চ মসজিদ ও হারেম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা।



তন না

মেক্সিকোর বিচিত্র অতীত

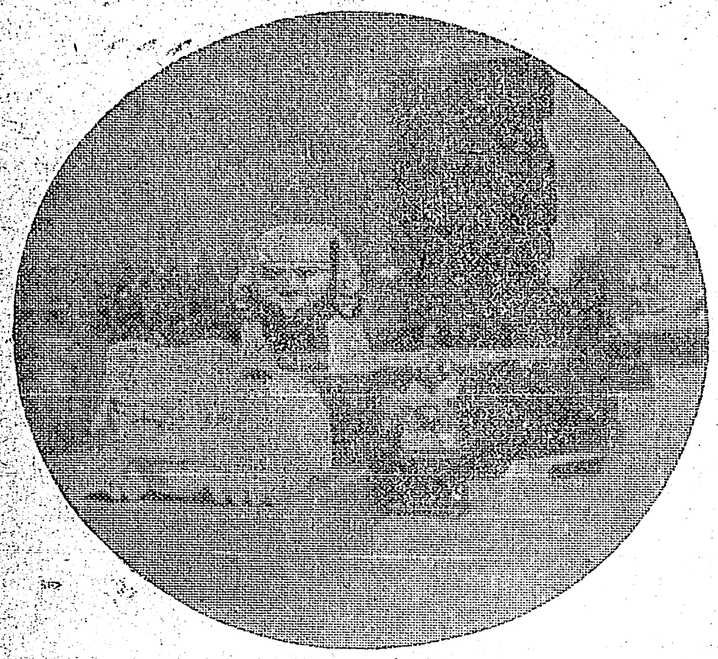

ধ্বংসাবশেষের গুটিকয়েক নমুনা

হুণ অ্যাটিলার (৪০৬—৪৫৩ খৃষ্টাব্দে) কবলে প'ড়ে রোম যখন আর্ত্তনাদ কর্‌ছিল, উত্তর আমেরিকার নিউ মেক্সিকোতে তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধরণের এক সভ্যতা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের অসভ্য ব'লে এখন তুচ্ছ করা হয়। কিন্তু আজকাল মাটির ভিতর থেকে হরেক-রকমের প্রমাণ বের ক'রে প্রত্নতাত্ত্বিকরা দেখাচ্ছেন যে, রেড-ইণ্ডিয়ানরা বরাবরই এমন অসভ্য ছিল না। নিউ মেক্সিকোর পিকোস নদীর তটে মান্ধাতার আমোলেও যে সভ্যতার পূরন্ত বিকাশ ছিল, এ-বিষয়ে এখন আর কোনই সন্দেহ নেই।

বৈজ্ঞানিকরা এখানে তিনশোরও বেশী গোর খুঁজে প্রায় এক হাজার কঙ্কাল পরখ করেছেন। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপরে পিকোসের ইণ্ডিয়ানরা নতুন নতুন ঘর বানিয়ে এতদিন বাস কর্‌ছিল। কিন্তু কবরের মড়ার সংখ্যা ক্রমেই এমন বেড়ে ওঠে যে, পানীয় জল পর্য্যন্ত দূষিত হয়ে পড়ে। কাজেই আশীবৎসর আগে বাসিন্দারা মড়কের ভয়ে তাদের হাজার বছরের পুরাণো সহর ছেড়ে অন্য যায়গায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়।

পুরাকালে অনেকেই পাহাড়ে বাস কর্‌ত। পাহাড়ের উপরে এখনো হাজারটি ঘর আছে। সেই-সব ঘরে সেকালের মৃৎশিল্প ও তৈজস-পত্রের সুন্দর সুন্দর নমুনা পাওয়া গেছে। মধ্য-আমেরিকায় প্রাচীন মায়া-সভ্যতার অপূর্ব্ব বিবরণ বৎসর দুই-তিন আগে "ভারতী"তে প্রকাশিত হয়েছে। এখানকার আবিষ্কৃত কোন কোন বিষয়েও পণ্ডিতরা মায়া-সভ্যতার প্রভাব অনুভব করেছেন। পিকোসের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শাঁখ ও শুক্তির অনেক রকমের গয়না, মস্ত-বড় তামাকের নল, হাড়ের বাঁশী ও কাঠের তাজ প্রভৃতি পাওয়া গেছে। যে-সব পাথরের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের দেখ্‌লেই মনে হয়, এগুলি যেন প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীর হাতে গড়া—কারণ গঠনাদর্শ প্রায় অভিন্ন। তাদের কাহিনীরও সঙ্গে মিশরীয় পৌরাণিক কাহিনীর মিল আছে।

Dr. Carl E Guthe,—মায়া-সভ্যতা নিয়ে এতদিন যিনি লিপ্ত ছিলেন— এখানে যে-সকল প্রমাণ যোগাড় করেছেন, তাতে দুই হাজার বৎসর আগে নগর-প্রতিষ্ঠা থেকে সুরু ক'রে বাসিন্দাদের দেশত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের কথা জান্‌তে পারা যায়।

আমেরিকার চারিদিকে বিকীর্ণ প্রাচীন সভ্যতার যে-সকল ভগ্নাংশ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা দেখে এটা অনুমান করা কিছুমাত্র শক্ত নয় যে, প্রাচীন মিশর, বাবিলন, আসীরীয়া, ভারতবর্ষ, চীন ও গ্রীস্ প্রভৃতি দেশের মত এখানেও এক বিপুল ও পরাক্রান্ত সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল এবং সেকালের অন্যান্য সভ্যদেশের সঙ্গে যে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ছিল, এ-কথাও মনে করা খুবই স্বাভাবিক।

সাহিত্যসেবীর খেয়াল

অধিকাংশ শক্তিধর সাহিত্যসেবীর নামের মত, তাঁদের খেয়াল বা পছন্দ-অপছন্দের কথাও প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

আমেরিকার বিখ্যাত লেখক ব্রেট্ হার্ট যখন কিছু লেখ্‌বার জন্যে মেতে উঠ্‌তেন, তখন যতক্ষণ না কালি-কলম নিয়ে বস্‌বার ঝোঁক হোতো, ততক্ষণ রাত্রির অন্ধকারে একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে পথে পথে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতেন।

জোর্ণসন্ দুই পকেট ভ'রে গাছ-গাছড়ার বীচি নিয়ে রোজ সকালে বেড়াতে বেরুতেন এবং দুইহাতে বীচি ছড়াতে ছড়াতে পথ চল্‌তেন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হ'লেও তাঁদের দলে টান্‌বার জন্যে বল্‌তেন, "ওহে, তোমরাও বীচি ছড়াচ্চ না কেন?"

রবার্ট ব্রাউনিং স্থির হয়ে ঘরের ভিতরে বসে থাক্‌তে পারতেন না। অনবরত আনাগোনা করার দরুণ তাঁর ঘরের কার্পেট ছেঁদায় ছেঁদায় ভ'রে উঠ্‌ত। ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলা কিছুতেই রাত্রে আঁহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না।

কাউণ্ট টলষ্টয় মাথায় টুপী পর্‌তেন না। তিনি ফরাসী সুগন্ধের পক্ষপাতী ছিলেন। লেখ্‌বার সময়ে তাঁর টেবিলের উপরে একটি-না-একটি ফুল থাক্‌তই। নিজে ধনী হলেও তিনি খুব কম-দামী জামা-কাপড় পর্‌তেন।

আলেজান্দ্রি ডুমা (ছোট) একখানি নতুন বই প্রকাশিত হ'লেই একখানি ক'রে নতুন ছবি কিন্‌তেন। এড্‌গার আলেন পো বিড়াল না কোলে ক'রে ঘুমোতেন না। ডিস্‌রেলি কর্সেট পর্‌তেন। বুড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছোক্‌রা সাজ্‌বার সাধও বেজায় বেড়ে উঠেছিল। লেখবার সময়ে তিনি দুই কানে দুটি কলম গুঁজে বস্‌তেন। ডিকেন্স জাঁকালো জড়োয়ার অলঙ্কার পর্‌তে ভালো বাস্‌তেন। হথোর্ণ প্রত্যেকবার স্ত্রীর পত্র পড়্‌বার আগেই জল দিয়ে হাত ধুতেন।

যে বাসায় ব'সে "ভ্যানিটি ফেয়ার" নামে বিখ্যাত উপন্যাসখানি লিখেছিলেন, তার সুমুখ দিয়ে থ্যাকারে যখনি যেতেন, তখনি সসম্মানে মাথার টুপী খুলে ফেল্‌তেন। ডারুইন বইকে বই ব'লে বড় যত্ন কর্‌তেন না। পড়্‌বার

সুবিধে হবে ব'লে নতুন বইকে তিনি ছিঁড়ে দুভাগ ও ছোট ক'রে নিতেন।

ওয়াসিংটন আর্ভিং তাঁর বাগ্দত্তা বধূর মৃত্যুর পরে আর-কখনো তাঁর নাম মুখে আনেন-নি। অন্য কেউ যদি তাঁর সাম্নে সে নাম উচ্চারণ কর্তেন, তবে তিনি তখনি সেখান থেকে চলে যেতেন। ভিক্টর হুগো কথা কইতেন খুব কম। কথা কইবার সময়ে বেশীর ভাগ জিজ্ঞাসাসূচক কথাই বল্তেন।

কীট্স কড়া-ক'রে-ভাজা পাঁউরুটির টুক্রোর উপরে লাল-মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে খেতে ভালোবাস্তেন। লংফেলো সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময়ে নিয়ম ক'রে বেড়িয়ে আস্তেন। তিনি বল্তেন, এই দুই সময়েই তাঁর মনে উচ্চ ভাবের উদয় হোতো। রবার্ট লুইস্ ষ্টিভেনসন অবসর-কালে ব'সে ব'সে বাঁশী বাজাতেন—সুরের মিলে মনের ভাবের সাড়া পাওয়ার জন্যে। এফ, মেরিয়ন ক্রফোর্ড যেখানেই যেতেন—নিজের বিশেষ কাগজ, কালি ও কলম সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখ্তেন। তিনি উপন্যাস লিখেছেন অগুন্তি—কিন্তু জীবনে এক কলম ছাড়া দ্বিতীয় কলম ব্যবহার করেন-নি।

মাথা-ভাসানো গলাবন্ধ

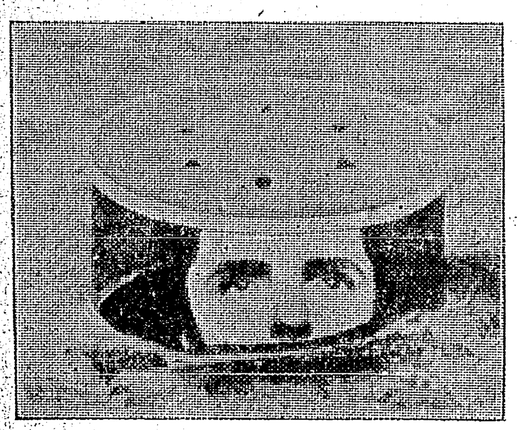

মাথা-ভাসানো গলাবন্ধ

প্রথম সাঁতার শেখ্বার সময়ে শিক্ষার্থীদের মাথা জলের তলায় ডুবে যায় ব'লে বড়ই মুস্কিল হয়। সেই অসুবিধা দূর কর্বার জন্যে একরকম সাঁতারের গলাবন্ধ উদ্ভাবিত হয়েছে। এই গলাবন্ধ খুব হাল্কা এবং এটি প'রে জলে নাম্লে মানুষের মাথা জলের তলায় ডুবে যেতে পারে না।

প্রসাদ রায়।

সামুদ্রিক জন্তুর চামড়া

অনেকদিন থেকে উভচর কুমীরের চামড়া অনেক কাজে ব্যবহার হয়ে এসেছে। গত যুদ্ধের সময় স্থলচরের চামড়ার অপ্রতুলতার জন্যে জলচরের চামড়ার উপর মানুষের দৃষ্টি পড়েছে। তখন থেকে দেখা গিয়েছে যে, কয়েক রকম মাছ আর হাঙরের চামড়া বেশ কাজের উপযুক্ত। ভ্যাঙ্কুবার, ইষ্ট ইণ্ডিজ ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই জন্যে এরি মধ্যে সামুদ্রিক জন্তুর চামড়ার ব্যবসা সুরু হয়েছে।

সামুদ্রিক ভীষণ জন্তুদের মধ্যে ডেভিল

ফিসের চাম্ড়া বেশ কার্য্যোপযোগী। এরা ওজনে প্রায় পনের মণ পর্য্যন্ত হয়। এদের তিমি-মাছ-ধরা শড়কি গেঁথে ধরা হয়। হাঙরের চামড়ার জন্যে তারের জাল দিয়ে হাঙর ধরা হয়। ডেভিলফিস্ বা হাঙরের প্রায় কোন অংশই নষ্ট হয় না। এদের চামড়া ট্যানারীতে যায়। মাংস খাওয়া হয়। রক্ত থেকে শিরিষ পাওয়া যায়। নাড়ীগুলো বাদ্যযন্ত্র, টেনিস, র‍্যাকেট ইত্যাদি প্রস্তুত কর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। আর অন্য যে সব অংশ আর কোন কাজে লাগে না, সেগুলো জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত হয়। হাঙরের দাঁতেও কাজ মেলে। একটা ৫।৬ মণ ওজনের হাঙরের গা থেকে প্রায় ১০ স্কোয়ার ফিট চামড়া মেলে।

তিমি মাছ থেকেও চামড়া আজকাল নেওয়া হচ্ছে। উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে তিমিরা সংখ্যায় বেশী এবং তাদের ধরা সহজ। তিমিদের চামড়া খুব পুরু, একখানা চামড়া থেকে পাঁচ-ছ' পর্দ্দা ব্যবহারোপযোগী চামড়া বেরোয়।

পাকস্থলী-হীনা নারী

প্যারী সহরের অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ ভিক্টর সম্প্রতি একটি মেয়ের কথা বলেছেন, যার পাকস্থলী নেই। মেয়েটি অনেকদিন তার পাকস্থলীতে নালী-ঘা নিয়ে ভুগছিলেন। তাই তাঁর পাকস্থলী একেবারে বাদ দিয়ে কণ্ঠনালীর সঙ্গে অন্ত্রের যোগ করে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ মানুষ যা খায়, তা কণ্ঠনালী দিয়ে পাকস্থলীতে আসে, তারপর ছোট এবং বড় অন্ত্রের পাক ঘুরে মল হ'য়ে বেরিয়ে যায়। এঁর কিন্তু খাবার কণ্ঠনালী দিয়ে একেবারেই অন্ত্রে এসে পড়ে। অস্ত্র হবার প্রথম সপ্তাহটা তাঁকে কিছু খেতে দেওয়া হয় নি। তারপর তিনি স্বাভাবিক খাওয়াই খাচ্ছেন এবং ওজনে দু'বছরের মধ্যে প্রায় এগারো সের বেড়েছেন।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

ধারা-শ্রাবণ

ক

মানিনা, মানিনা—ভগবানকে আমি মানিনা!..... তর্ক কর্তে চাও? শাস্ত্রের বচন তুল্তে চাও? আমার আপত্তি নেই। হয়ত ভগবান ব'লে কেউ আছেন। কিন্তু তাঁকে আমি মানিনা!

কেন মান্ব? মান্বার যদি কোন সঙ্গত কারণ থাকে, তবে আমার পক্ষে তাঁকে না-মান্বারও কি যথেষ্ট কারণ নেই? মানুষ কি অকারণে বিদ্রোহী হয়? যে একথা বলে মানুষকে সে চেনে না।

ভগবানের চেয়ে অনেক মানুষকে আমি বরং শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করি। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য! জীবের মঙ্গলের জন্যে এঁরা

যত কেঁদেচেন, এঁরা যত ভেবেচেন, এঁরা যত স্বার্থত্যাগ করেচেন, ভগবানের মধ্যে তেমন করুণা কোনদিনই আমার চোখে পড়ে নি।……এঁদের নিজস্ব মহত্ব আর বিশ্বপ্রেমকে দেখিয়ে তোমরা ঈশ্বরকেই বড় ক'রে তুল্‌তে চাও। তাতেও আমার আপত্তি আছে—বিশেষ আপত্তি! কারণ ভগবান আর যা-হোন তা-হোন, করুণাময় কখনো নন্।

ঠগীর চেয়ে তিনি বেশী নিষ্ঠুর। ঠগী তো দম বন্ধ ক'রে দু-এক মুহূর্ত্তে নরহত্যা করে, কিন্তু ভগবান আমাদের হত্যা করেন দিনে দিনে, র'য়ে-ব'সে, আজীবন ধ'রে। অবোধ বালকও ভাঙ্‌বার জন্যে পুতুল গড়ে না। এখানে সেও ভগবানকে উঁচিয়ে গেছে। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব'লে ভগবানের পূজো কর্‌চ। কিন্তু এ পূজো এখনি থামিয়ে দাও। কারণ তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব'লেই তো তাঁর নির্ম্মমতা বেশী দারুণ হয়ে বুকে এসে বাজে। এ দুনিয়ায় মৃত্যুই সব-চেয়ে নিশ্চিত। তবু ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেন কেন, তা ভেবে দেখেচ? আবার সকলকে ধ্বংস কর্‌বার জন্যে। তিনি পিতা? তাহ'লে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ হত-পুত্রের বুকের রক্তে তাঁর হস্ত রাঙা হয়ে উঠ্‌চে—কিন্তু তাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই—তিনি আবার নতুন সৃষ্টি কর্‌চেন, আবার নতুন হত্যার আনন্দ উপভোগ কর্‌বার জন্যে। ভগবান মানুষের বিচারক? কিন্তু তাঁর বিচারক কে?

খ

ধনীর সন্তান আমি, যে-নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে বাস কর্‌লে মানুষ ঈশ্বর-ভক্ত হ'তে বাধ্য, ছেলেবেলায় আমার অদৃষ্টে তার কিছুরই অভাব হয়-নি।

সে-দিন আজ থাক্‌লে আমিও ভগবানকে হয়ত না-মেনে পার্‌তুম না!……কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারেই আমাদের সংসারের উপরে সর্ব্বশক্তিমানের নির্দ্দয় হস্তের ছায়া ধীরে ধীরে নেমে এল। সে ছায়া এখনো সরে-নি, বরং দিন-কে-দিন বেশী ঘনীভূত হয়ে নিরেট অন্ধকারে পরিণত হ'তে চলেছে।

এই ভেবেই আমি আশ্চর্য্য হই যে, কেবল কি আমাদের সংসারের উপরেই ঈশ্বরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এমন স্থিরভাবে প্রসারিত হয়ে আছে? দুর্ভাগ্যের এমন বৈচিত্র্য থাক্‌তে পারে, তা আমি কখনো ভেবে দেখি-নি। এ বৈচিত্র্যের অতলে এখনো-থই পাচ্ছি না। আরো কত কি দেখ্‌ব তা কে জানে?

আমার দুর্ভাগ্যের গোটাকতক প্রধান ঘটনা তোমরা শোনো। হয়ত তোমরা শুনেও সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না,—তবু শোনো।

'স্পেকুলেসনে' বাবার সর্ব্বস্ব গেল। আমাদের হাল-চাল অনেকটা পথের ভিখারীর মত হয়ে পড়্‌ল—সে দৃশ্য বাবা বেশীদিন প্রাণ ধ'রে দেখ্‌তে পার্‌লেন না—তাই এপারের মায়া একেবারে কাটিয়ে চ'লে গেলেন পরপারে, পরলোকে। তারপর গেলেন দাদা—যাঁর রোজগারে তখনো যেমন-তেমন ক'রে আমাদের সংসার চল্‌ছিল।

আগেই বলেছি,—প্রথম জীবনে দুঃখের স্বোয়াদ আমি কোনদিনই পাই-নি। যাকে বলে আদুরে ছেলে, সংসারের মধ্যে আমি ছিলুম ঠিক তাই।

সর্ব্বদাই বাবার সঙ্গে-সঙ্গে ফির্‌তুম। নিজের কাজে বাবা দু'বার বিলাতে গিয়েছিলেন। পাছে আমার জন্য মনে-কেমন করে, সেই ভয়ে আমাকেও তিনি ফেলে যেতে পারেন-নি। আঁতুড়-ঘরেই আমি মা-মরা ছেলে—মানুষ হয়েছি বাবারই কোলে-পিঠে। বোধ করি, বাবা আমাকে সেইজন্যেই এতটা ভালোবাস্‌তেন।

বাবা ছিলেন ইংরেজী-মেজাজের লোক, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে থেকে আমারও প্রথম জীবনটা বিলাতী আব্‌হাওয়ার ভিতরেই কেটে গিয়েছিল। ষোল বছর বয়সের মধ্যেই দু-দুবার বিলাতে গিয়ে এবং কল্‌কাতাতেও সাহেবী স্কুলে প'ড়ে আমার একটি শক্তি হয়েছিল এই যে, আমি অনেক ইংরেজের চেয়েও ভালো ইংরেজী লিখ্‌তে পার্‌তুম। বাল্যকাল থেকেই আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী যশ অর্জ্জন কর্‌ব।

দাদা যখন মারা গেলেন, তখন এই যশটুকুই আমার একমাত্র সম্বল। ভারতের ও বিলাতের অনেক ইংরেজী সাময়িক পত্রে আমি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখ্‌তুম। আমার চার-পাঁচখানা উপন্যাস বিলাতেও মন্দ আদর পায়-নি। সে-সব লেখায় আমি ভারতীয় জীবনের ছবিই দিতে চেষ্টা করেছি। হয়ত সে ছবির নূতনত্ব সমুদ্রের ওপারেও কৌতূহল আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু এই ইংরেজী সাহিত্যই যে কখনো আমার জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় হ'তে পারে, এ-কথা কোনদিনই ভাবি-নি। দাদার মৃত্যুর পর দিন যখন চলে না, তখন একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ পেয়ে ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছিলুম; সে কথা আজও আমি ভুলি-নি। কিন্তু তখন জান্‌তুম না যে, ধন্যবাদে ভগবান ভোলেন না! মনুষ্য-মৃগয়ায় কোনদিন তিনি ক্ষান্ত দেন না।

বেশ মোটা মাইনে পেতুম। তারই উপরে নির্ভর ক'রে বিবাহও কর্‌লুম। কিছু-কাল নূতন প্রেমের কল্পলোকে আনন্দের যে আভাস পেয়েছিলুম, এখানে কবির ভাষায় তা প্রকাশ ক'রে লাভ নেই। কারণ আমি সুললিত প্রণয়-কাহিনী লিখ্‌তে বসি-নি, তা লেখ্‌বার মতন মনের হালও আমার নয়।

বিবাহের পর চারবছর কেটে গেল—ভাবলুম, নিয়তির কোপ-দৃষ্টি থেকে এতদিনে বুঝি খালাস পেলুম।

ভুল—ভুল! কলেরা এসে আমার ভ্রম আবার ভেঙে দিলে। আমাকে ভুলোবার জন্যে ভগবান আনন্দের যে মায়ামৃগকে আমার ঘরে পাঠিয়েছিলেন, ফাঁকি দিয়ে আবার তাকে কেড়ে নিলেন। বিপত্নীক আমি,—প্রাণপণ আলিঙ্গনের মধ্যে শূন্যতাকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে ধূলি-শয্যায় প'ড়ে হাহাকার কর্‌তে লাগ্‌লুম।…… ……

কেঁদে কেঁদে কেঁদে কিনা জানিনা, কিন্তু এটা বুঝ্‌তে পারলুম—আমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে। বড় বড় ডাক্তার দেখালুম—সবাই এককথাই বললেন, "তোমার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে—আর কোন উপায় নেই!"

উঃ, সে কি কষ্ট! জন্মান্ধ যে, তার

দুঃখ আমার তুলনায় কত তুচ্ছ! পৃথিবীর পরতে পরতে এই রঙের খেলা, রূপের মেলা যে কখনো স্বচক্ষে দেখে নি, সে কেমন ক'রে বুঝ্‌বে যে, এথেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ কি?... ...আমার চোখের সাম্‌নে অন্ধকারের পর্দ্দা ক্রমেই বেশী পুরু হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। দিনে দিনে দেখ্‌তে লাগলুম, প্রকৃতির মধুর রূপের ছবি, বিচিত্র রঙের ঢেউ, ছন্দিত গতির লীলা আমার সাম্‌নে থেকে জলের আঁকের মত মুছে, মুছে, মুছে মিলিয়ে যাচ্ছে! ঊষার সিঁদুর-লেখা, ভোরের শিশু রবি, গোধূলির মায়া-কিরণ, ভাঙা-মেঘে চাঁদের আলো, বাদলের ব্যাকুল মেঘ, শীতের সোনালী রোদ, বসন্তের পুষ্পিত উপবন, শরতের অম্লান প্রভাত,—বিদায়, বিদায়, তোমাদের কাছে চির-বিদায়,—হে বন্ধু, চির-বিদায়!

গ

অন্ধ! অন্ধতার এই অন্ধকূপে দশবৎসর মগ্ন হয়ে আছি।

প্রিয়তমার ছোট্ট স্মৃতি—আমার এই ছায়া। বিবাহের একবৎসর পরেই তাকে পেয়েছিলুম—এখন তার বয়স তেরো বৎসর। ভাগ্যে ছায়া ছিল, তখনো তাই ভগবানকে ভুলি-নি।

তেরো বছরের মেয়ে ছায়া—আমার এই ভগ্নচক্র জীবন-যানকে সেইই তার ছোট ছোট দুখানি দরদভরা স্নেহকোমল বাহু দিয়ে কোনরকমে কায়ক্লেশে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ছে! বাছা আমার কোনদিন বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে পুতুল-খেলাও কর্‌তে পায়-নি, জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত সে পাকা গিন্নি, এই কাণা অথর্ব্ব বুড়ো ছেলেটির সেবায় তার কচি কচি হাত-দুটি সর্ব্বদাই জোড়া থাক্‌ত।

সম্পাদকী অনেকদিন ঘুচে গেছে। তবে আমার জন্যে দয়াপরবশ হয়ে কাগজের সত্বাধিকারী গোটাকতক টাকার মাসিক ভাতার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন, এজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার আগে-লেখা ইংরেজী উপন্যাস-ক'খানার কিছু কিছু বিক্রী এখনো আছে। কোনরকমে সংসার চ'লে যাচ্ছে।

বর্ত্তমানই আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে। আর কিছু ভাব্‌তে পারি না—ভাব্‌তে ভয় হয়। অতীতের দিকে চাইলেই দেখি, নিজের হাতে সাজানো সারি সারি চিতা দাউ দাউ জ্বল্‌ছে,—কত বন্ধু, কত স্বজনের হারা-মুখ সেখানে শ্মশানের ধোঁয়ায় কলঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছে! ওঃ—চোখ নেই, কিন্তু এই অন্তর্দৃষ্টিও সেইসঙ্গে মুছে গেল না কেন?

ভবিষ্যতের কথা ভাব্‌তে গেলেই খালি একটি সত্যই মনে প'ড়ে যায়,—ছায়ার আমার বয়স হচ্ছে, তারও বিয়ে দিতে হবে, কে এক পরের ছেলে এসে এই অন্ধের নড়িকে কেড়ে নিয়ে যাবে! কী ক্রূর এই সমাজের বিধি! এই অসহায়তা, এই জীবন্মৃত অবস্থার মধ্যে আমি প'ড়ে আছি, আমাকেও মেয়ের বিয়ে দিতে হবে কেন?

ঘ

ভগবান এখনো আমাকে ভোলেন-নি!

ভেবেছিলুম, দুর্ভাগ্যের শেষ-ধাপে নেমে এসেছি, এর পরে আমার নিজের মরণ ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। ভগবান আবার আমার ভুল সুধ্‌রে দিলেন। নইলে বোধ হয়

এই একটুখানি ফাঁকের জন্যে তাঁর এত-বড় বিশ্ব-সৃষ্টিটা দস্তুরমত ব্যর্থ হয়ে যেত!

আমার এই ধারাবাহিক দুঃখের কাহিনী নিশ্চয়ই কারুর ভালো লাগ্‌বে না। কেউ কেউ হয়ত ভাব্‌বেন, আমি অত্যুক্তি কর্‌ছি। কিন্তু তা নয়—আমার একটি কথাও মিথ্যে বা বাড়িয়ে লেখা নয়! ভগবানের উপরে অতি-ভক্তিতে মানুষ অন্ধ হয়ে আছে। চোখ থাক্‌লে সে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেত, পৃথিবীতে ভগবানের অবিচারের আর অত্যাচারের ইতিহাস কী বিরাট! লক্ষ লক্ষ মহাভারতেও তা কুলায় না। কাণ পেতে শোনো, পৃথিবীর এই বাতাস আর তরুর অনন্ত মর্ম্মর, কোটি কোটি অত্যাচারিত আত্মার দীর্ঘশ্বাস আর আর্ত্তস্বর দিয়ে গঠিত কিনা! যাদের মরা উচিত তাদের উপরে নয়, যাদের বাঁচা উচিত তাদের উপরেই ভগবানের সদা-সচেতন মৃত্যু-দণ্ড অতর্কিতে আচম্বিতে নেমে এসে পড়ে!

যাক্—দুঃখের কথা আর বাড়াব না, এবার যা বল্‌বার খুব সংক্ষেপেই তা সেরে নেব।

হঠাৎ একদিন ছায়া অসুখে পড়্‌ল। জ্বর। প্রথমে ধরা পড়ে-নি, তারপর জানা গেল, টাইফয়েড।

ঘরপোড়া গরু যখন সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লেই ভয় পায়, তখন এত-বড় বিপদের কথা শুনে আমার মনের ভাব কি-রকম হোলো, এখানে তা খুলে না বল্‌লেও চল্‌বে।

একে আমার এই নাচার অবস্থা, তায় অর্থাভাব। আমার কপালে বিপদ সর্ব্বদাই চরমে উঠেছে, তাই ছায়ার আশা আগে থাক্‌তেই আমি ছেড়ে দিলুম—আমার এই আঁধার ঘরের মাণিকটিকে হাতে পেয়েও মরণ যে তাকে পিছনে ফেলে রেখে বিদেয় হবে, এমন দুরাশা আমি কিছুতেই কর্‌তে পার্‌লুম না।

তবু একবার শেষ চেষ্টা তো কর্‌তে হবে! ছায়াকে বাঁচাতে হ'লে ভালো ডাক্তার ডাকা দরকার। ভালো ডাক্তার ডাক্‌তে হ'লে যথেষ্ট অর্থের দরকার। কিন্তু কিন্তু অর্থ কোথায় পাব? শেষটা কি টাকার জন্যে চিকিৎসার অভাবে আমার এই শেষ-মায়ার পুতুলীটিকে শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌তে হবে? এ-কথা মনে হ'লে বাপের বুক কেমন করে, তা কি তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছ?

আমার অন্ধ চক্ষু অশ্রুজলে ভিজে উঠ্‌ল। ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগলুম। টাকা, টাকা, টাকা! টাকা পাব কোথায়, কে আমায় টাকা দেবে—যে-টাকায় আমার ছায়াকে আবার মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে আন্‌ব?

একটা কথা স্মরণ হোলো। মাসখানেক আগে একজন প্রকাশক (বোধ হয় তিনি আমার অবস্থার কথা জান্‌তেন না) আমার কাছে প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছিলেন যে, আমার কোন ইংরেজী উপন্যাস থাক্‌লে তিনি তা প্রকাশ কর্‌তে সম্মত আছেন।

অন্ধ হয়ে পর্য্যন্ত আমি আর উপন্যাস লিখ্‌তে পারি-নি। লেখ্‌বার শক্তিও ছিল না, লেখ্‌বার মত মনের অবস্থাও ছিল না। যদিও কাগজে-কলমে লেখ্‌বার ক্ষমতা আমার নেই, তবু বিলাতী লেখকদের মত 'টাইপ-রাইটারে' রচনা করা তো আমার পক্ষে এখনো অসম্ভব নয়। 'টাইপ-রাইটার' ব্যবহারে আমি

বরাবরই নিপুণতার পরিচয় দিয়েছি। এখনো মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে থাকি।

আজ বিপদে প'ড়ে আমার মাথায় এই বুদ্ধি এল। তখনি প্রকাশককে চিঠি লিখে জানালুম যে, দিন-দুয়েকের মধ্যে আমার লেখা একখানি ছোট উপন্যাস পেলে তিনি অন্তত দেড় হাজার টাকায় তার 'কপিরাইট' কিনে নিতে এবং হাতে হাতে টাকা চুকিয়ে দিতে রাজি আছেন কিনা ?··· ··· উত্তরে জান্‌লুম, আমার সর্ত্তে প্রকাশকের কোনই অমত নেই।

তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হোয়ো না যে, সেই সু-খবরে আমি ভগবানকে কায়মনোবাক্যে ধন্যবাদ দিলুম—একবার নয়, অনেকবার!

৬

বিকাল-বেলায় আমি আমার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিলুম। চাকরের উপরে মানা রইল, আমি নিজে ঘর থেকে না বেরুলে কেউ যেন আমাকে বিরক্ত কর্‌তে না আসে।

বন্ধুর বাড়ী থেকে একটি ভালো 'টাইপ-রাইটার' চেয়ে আনিয়েছি। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের উপরেই আজ আমার ছায়ার প্রাণরক্ষার ভার! একে না পেলে আমাকে হয়ত আত্ম-হত্যা কর্‌তে হোতো!

আমি খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা ও রচনা কর্‌তে পারি। হিসাব ক'রে দেখ্‌লুম, যদি একটানা ষোলো-সতেরো ঘণ্টা পরিশ্রম করি, তবে কাল সকালে আটটা-নয়টার মধ্যে ছোটখাটো একখানি উপন্যাস লিখে ফেল্‌তে পার্‌ব।

'টাইপ-রাইটারে'র সাম্‌নে গিয়ে বস্‌লুম। লেখা সুরু কর্‌লুম নিজেরই দুঃখের কাহিনী ধ'রে। সেইসঙ্গে নানা কল্পিত ঘটনা মিশিয়ে আমার প্লটকে অবশ্য যথেষ্ট ঘোরালো, চিত্তাকর্ষক ও মর্ম্মস্পর্শী ক'রে তুল্‌তেও চেষ্টার ত্রুটি কর্‌লুম না। কারণ আমি জানি, আমার নিজের যে-কাহিনী আজ তোমাদের সকলের কাছে ব'লে বুকের বোঝা হাল্‌কা কর্‌বার চেষ্টা পাচ্ছি, তার মধ্যে কিছুমাত্র বৈচিত্র্য নেই—তা অত্যন্ত বাস্তব এবং নিত্য-শ্রুত। সংসারে এমন মানুষ লাখো-লাখো রয়েছে, যাদের ললাটের উপরে বিধাতা আমারই কাহিনীর পুনরুক্তি স্পষ্ট ক'রে লিখে রেখেছেন। সে কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখ্‌তে হ'লে আরো বেশী রং ফলিয়ে আমাকে খোদার উপরে খোদ্‌কারি কর্‌তে হবে। একঘেয়ে সাদাসিধে সত্যকথাও বারংবার সহ্য করা অসম্ভব।

লিখ্‌তে লাগ্‌লুম—প্রাণপণে। এমন ক'রে জীবনে আর-কখনো লিখি-নি,—লেখ্‌বার দরকারও হয়-নি। এ লেখার উপরে কেবল আমার সাহিত্যিক যশ নয়—আমার নিজের মরণ-বাঁচন, আমার অন্ধ প্রাণের হাসি-কান্না—এককথায়, আমার ইহলোকের ভালো-মন্দ সমস্ত নির্ভর কর্‌ছে। তাই লিখ্‌ছি, লিখ্‌ছি, আর লিখ্‌ছি—বিকেল গেল, সন্ধ্যে উৎরোলো, রাত হোলো, চারিদিক নিসাড় থম্‌থমে হয়ে এল, আমার কিন্তু সে-সব ভাব্‌বার এক মুহূর্ত্ত ছুটি নেই।

পাশের ঘর থেকে ছায়ার ও 'নার্সে'র সাড়া পেলুম। ছায়া চেঁচিয়ে প্রলাপ বক্‌ছে, 'নার্স' তাকে ঠাণ্ডা কর্‌তে চেষ্টা পাচ্ছে। লিখ্‌তে লিখ্‌তে একবার থাম্‌লুম।··· ···ছায়া আপন মনেই বল্‌ছে, "ওকি বাবা, ওদিকে যেও না—ওদিকে যেও না, ওদিকে ছাতের

আল্‌সে,এখুনি প'ড়ে যাবে যে!··· ···হ্যাঁ বাবা, তুমি যে বড় এখনো জেগে বসে আছ, অসুখ হবে যে,—শোও-গে যাও, এখনো গেলে না? না বাবা, তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে বাবা!··· ··· হ্যাঁ বাবা, সত্যি ক'রে বল দেখি বাবা, তুমি আমাকে বেশী ভালোবাসো, না আমার মাকে?—আমাকে? ইস্—তোমার নিজের চেয়েও?··· ···থাখো বাবা, তোমার জন্যে কেমন ফুলের মালা গেঁথেচি! সবে-ফোটা বেলফুল—গন্ধ পাচ্চো তো?··· ···বাবা, তুমি চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থাকো, আমাকে চুমু খাবার জন্যে অত দুষ্টুমি কোরো না—রও, আগে তোমার চুলটা ভালো ক'রে আঁচ্‌ড়ে দি, মাথাটা ভারি নোংরা হয়ে রয়েচে যে, লোকে দেখ্‌লে নিন্দে কর্‌বে—অত-বড় ধাড়ী মেয়ে, বাপের যত্ন নেয় না"··· ··· ···

আমার ছায়া, আমার ছায়া! পিতৃময় জগতে সে একান্তে বাস করে—প্রলাপেও বাপের কথাই বল্‌ছে, অচেতনেও বাপের ভাব্‌নাই ভাব্‌ছে! এমন মেয়ে কার আছে?

সজল চোখে ফের লেখা সুরু কর্‌লুম। প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সঙ্গে হয়ত ছায়ার জীবন একটু-একটু ক'রে ক্ষয় হচ্ছে!··· ···বাতাসের শীতলতায় বুঝ্‌ছি, রাত ক্রমে ফুরিয়ে আস্‌ছে, বোধহয় এখন চাঁদ মুখ রাঙা ক'রে পশ্চিম আকাশের মৌন-রহস্যের মধ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে! আমার লেখার কল কিন্তু সমান চল্‌ছে, চল্‌ছে আর চল্‌ছে! মাথা দপ্‌দপ্ কর্‌ছে, দেহ এলিয়ে পড়্‌ছে, দুহাত অসাড় হয়ে আস্‌ছে—তবু কিন্তু থাম্‌বার যো নেই! সারারাত্রের নিস্তব্ধতাকে ঠকাঠক্ শব্দে চঞ্চল ক'রে তুলে আমার অশ্রান্ত কল তাই চলেছে তো চল্লেছেই!

সকাল হোলো। তখনো লিখ্‌ছি। এক-একখানা পৃষ্ঠা 'টাইপ' হ'য়ে যাচ্ছে, আর আমি সেখানা পাশের চুব্‌ড়ীর ভিতরে ফেলে দিয়ে, কলের ভিতরে তাড়াতাড়ি আর-একখানা সাদা কাগজ পূরে দিচ্ছি,—এম্‌নি ক'রে অনেক পাতা লেখা হ'য়ে গেছে।··· ··· বেলা প্রায় ন'টার সময়ে গভীর একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমার লেখা শেষ করলুম!·····সে যে কি বিপুল মুক্তির আনন্দ, তা আর বল্‌বার নয়! সেই আনন্দের স্বরূপ বর্ণনা কর্‌তে পার্‌লেও আর-একখানা চমৎকার উপন্যাস লেখা যায়! দেহের অবস্থা তখন শোচনীয়, কিন্তু সে-সব কষ্ট-গ্লানি আমার আনন্দের উচ্ছ্বাসকে একটুও দমাতে পার্‌লে না। আমার আর কিছু ভাব্‌বার নেই—উপন্যাস শেষ করেছি, ছায়ার চিকিৎসার উপায় হয়েছে, তাইই যথেষ্ট! আমার আর-একটি মস্ত তৃপ্তির কথা, আজ্‌কে যে উপন্যাস আমি একাসনে ব'সে সমাপ্ত কর্‌লুম, এর আকার ছোট হ'লেও এর চেয়ে ভালো বই নিশ্চয়ই আমি আর-কখনো লিখি-নি! এর পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আমার প্রাণের কতখানি যে চোখের জলের সঙ্গে ঢেলে দিয়েছি, তা সুধু আমিই জানি—আমিই জানি! লেখক কি মন নিয়ে এ-লেখাটি লিখেছে তা কেউ জান্‌বে না বটে, কিন্তু বিলাতের পাঠক-সমাজে নিশ্চয়ই এর বিশেষ আদর হবে।

চ

ঘরের দরজায় কে ধাক্কা মার্‌লে।

আমি উঠে দরজা খুলে দিতেই, বন্ধু

নির্ম্মল এসে ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "ওহে, ছায়াকে দেখ্‌তে এসেছিলুম। তার অসুখ যে আরো বেড়ে উঠেচে!"

আমি বল্‌লুম, "আজ্‌কেই কল্‌কাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের হাতে ছায়াকে সঁপে দেব। আমার যা সাধ্য তা কর্‌ব।"

নির্ম্মল আমার উপন্যাসের কথা জান্‌ত। সে বল্‌লে, "তবে কি তোমার লেখা শেষ হয়েচে?"

আমি বল্‌লুম, "হ্যাঁ। এখন লেখাটা তোমাকে একবার চেঁচিয়ে পড়্‌তে হবে—কিছু-কিছু সুধ্‌রে আজ্‌কেই প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে টাকা নিয়ে আস্‌ব। লেখা কাগজগুলো চুব্‌ড়ীর ভেতরে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। তুমি ভাই ওগুলো তুলে সাজিয়ে-গুছিয়ে ফেল তো!"

নির্ম্মল খানিক পরে বল্‌লে, "ওহে, তোমার লেখা কাগজ কোথায়?"

—"কেন, ঐ বেতের চুব্‌ড়ীর ভেতরে!"

নির্ম্মল আরো-কিছুক্ষণ খুঁজে বল্‌লে, "চুব্‌ড়ীর ভেতরে অনেকগুলো কাগজ রয়েচে বটে, কিন্তু সব যে দু-পিঠ-সাদা!"

একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, "কি বল্‌চ হে, ভালো ক'রে ছাখো, ভালো ক'রে ছাখো!"

নির্ম্মল বল্‌লে, "চুব্‌ড়ী আর দেখ্‌তে হবে না, কি হয়েচে আমি বুঝেচি!" ব'লেই সে কলটা একবার চালালে। তারপর বল্‌লে, "চমৎকার অদৃষ্ট তোমার! কলের ভেতরে কালির ফিতে নেই!"

কালির ফিতে নেই! দু-পিঠ-সাদা কাগজ! তবে কি বিকেল, রাত, সকাল ধ'রে একাসনে ব'সে আমি এই পণ্ডশ্রম—

পাশের ঘর থেকে ছায়া আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—আমি মাথা ঘুরে মাটির উপরে আছ্‌ড়ে পড়্‌লুম!... ... ...

—তারপর? আমার জীবন-কাহিনী আর বল্‌তে চাই না, কি হবে তা শুনে? তা বিস্বাদ, তিক্ত, দুঃসহ! এইটুকু কেবল শুনে রাখো,—তারপর থেকে আমি ভগবানকে মানি না! এ-জীবনে আর কোনদিন মান্‌বও না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সঙ্কলন

পট

যে-সহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্ব্ব পরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যবসা।

সে মনে ভাবে, ধনী ছিলেম, ধন গিয়েচে, হয়েচে ভালো। দিন-রাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই দান কে কাড়তে পারে?

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আন্‌লে। সেদিন তাই নিয়ে সহরে খুব ধুম।

কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চল্‌ল না।

নতুন রাজমন্ত্রী, এই ত সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরামের বাপ মানুষ করে' নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিঁধকাঠি, তাই দিয়ে বুড়োর সর্ব্বস্ব সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।

যে-ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুর ঘর; সেখানে গিয়ে হাতজোড় করে' বল্‌লে, "এই জন্যেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে স্মরণ করে এলেম? এতদিনে বর দিলে কি এই অপমান?

২

এমন সময় রথের মেলা বস্‌ল।

সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিন্‌তে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লস্কর।

সে একটি পট বেছে নিয়ে বললে, "আমি কিন্‌ব।"

অভিরাম তার নফরকে জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলেটি কে?"

সে বললে "আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।"

অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বললে, "বেচব না।"

শুনে ছেলের আবদার আরো বেড়ে উঠ্‌ল। বাড়ীতে এসে সে খায় না, মুখ ভার করে থাকে।

অভিরামকে মন্ত্রী থলিভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে, মোহরভরা থলি মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

মন্ত্রী মনে মনে বললে, "এত বড় স্পর্দ্ধা!"

অভিরামের উপর যতই উৎপাত হতে লাগ্‌ল, ততই সে মনে মনে বল্‌লে, "এই আমার জিৎ।"

৩

প্রতিদিন প্রথম্‌ সকালেই অভিরাম তার ইষ্ট-দেবতার একখানি করে' ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোন পূজা সে জানে না।

একদিন দেখ্‌লে, ছবি তার মনের মত হয় না। কি যেন বদল হয়ে গেচে। কিছুতে তার ভাল লাগেনা। তাকে যেন মনে মনে মারে।

দিনে দিনে সেই সূক্ষ্ম বদল স্থূল হয়ে উঠ্‌তে লাগল। একদিন হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌লে "বুঝতে পেরেচি।"

আজ সে স্পষ্ট দেখ্‌লে, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মত হয়ে উঠ্‌চে।

তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বল্‌লে, "মন্ত্রীরই জিৎ হল।"

সেই দিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বল্‌লে, "এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "কত দাম?"

অভিরাম বল্‌লে, "আমার দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।"

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পার্‌লে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র ভাদ্র, ১৩২৮।

আমাদের সঙ্গীত *

সঙ্গীত-সঙ্ঘ থেকে যখন আমাকে অভ্যর্থনা করবার প্রস্তাব এসেছিল, তখন আমি অসঙ্কোচে সম্মত হয়েছিলেম; কেননা সঙ্গীত-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী নেত্রী এবং ছাত্রী সকলেই আমার কন্যাস্থানীয়া—তাঁদের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে। আমাকে কিছু বল্‌তে অনুরোধ করা হয়েছিল, তাতেও আমি কুণ্ঠিত হই নি। তারপরে সহসা যখন সংবাদপত্রে দেখলেম, এ সভায়

* সঙ্গীত-সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে উক্ত।

সর্ব্বসাধারণের নিমন্ত্রণ আছে এবং আমার বক্তৃতার বিষয়টি হবে ভারতীয় সঙ্গীত,—তখন আমি মনে বুঝলেম এ আমার পক্ষে একটা সঙ্কট। বাল্যকাল থেকে আমি সকল বিদ্যালয়েরই পলাতক ছাত্র, সঙ্গীত-বিদ্যালয়েও আমার হাজিরা-বই দেখলে দেখা যাবে আমি অধিকাংশ কালই গরহাজির ছিলেম। এই ব্যাপারে আমার ব্যাকুলতা দেখে উদ্যোগ-কর্ত্তারা কেউ কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, তোমাকে বেশি বলতে হবে না, দু'চার কথায় বক্তৃতা সেরে দিয়ো। আমি তাঁদের এই পরামর্শে আশ্বস্ত হই নি। কেননা, যে-লোক খুব বেশি জানে, সেই মানুষই খুব অল্পকথায় কর্ত্তব্য সমাধা করতে পারে,—যে কম জানে তাকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলতে হয়। যাই হোক, এখন আমার আর ফেরবার পথ নেই, অতএব "যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" এই সদুপদেশ পালন করবার সময় চলে গেছে।

বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়ীতে গানের চর্চ্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ছিলেন সঙ্গীতের আচার্য্য, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্ব্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অত্যন্ত যাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না, অর্থাৎ সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়ে নি;—কিন্তু কালোয়াতি সঙ্গীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক; গীতরসের যে-সঞ্চয় বাল্যকালে আমার চিত্তকে পূর্ণ করেছিল, স্বভাবতই তার গতি হল কোন্ মুখে, তার প্রকাশ হল কোন্ রূপে, সেই কথাটি যখন চিন্তা করে দেখি, তখন তার থেকে বুঝতে পারি সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রকৃতি কি। আজ সভায় আমি সেই কথাটির আলোচনা করব।

আমার মনে যে সুর জমে ছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে, তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপ সে রচনা করলে না, সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট বোঝা গেল না।

আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা-বর্ষণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সঙ্গীতেরও এইরকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্চে বিশুদ্ধ সঙ্গীত আকারে, আর হচ্চে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে. সেই ভেদ অনুসারে সঙ্গীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলা দেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা দেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক্, সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত; বাণী তার "ছায়েবানুগতা।" ভজন সঙ্গীতের কথা যদি ছেড়ে দেই, তবে দেখতে পাই পশ্চিমে সঙ্গীত যে-বাক্য আশ্রয় করে, তা অতি তুচ্ছ। সঙ্গীত সেখানে স্বতন্ত্র, সে আপনাকেই প্রকাশ করে।

বাংলা দেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"—সে দেখতে পাচ্চি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে। বাণীর প্রতিই বাঙালীর টান; এই জন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সব চেয়ে বেশি হয়েচে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে ত মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না—এই জন্যে বাংলা দেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।

এর প্রমাণ দেখ আমাদের কীর্ত্তনে। এই কীর্ত্তনের সঙ্গীত অপরূপ। কিন্তু সঙ্গীত যুগলভাবে গড়া—পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা।

পদাবলীর সঙ্গেই যেন তার রাসলীলা; স্বাতন্ত্র্য সে সইতেই পারবে না।

সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য মন্ত্রে সব চেয়ে প্রকাশ পায়। বাংলার আপন কোনো যন্ত্র নেই এবং, প্রাচীনকালেই হোক্ আর আধুনিক কালেই হোক, যন্ত্রে যাঁরা ওস্তাদ তাঁরা বাংলার নন্। বীণ রবাব শরদ্ সেতার এস্রাজ সারেঙ্গি প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশী বা বৈরাগীর একতারা কিছুই নয়। তা ছাড়া গড়ের বাদ্যের বীভৎস ব্যঙ্গরূপে বাংলা দেশে কন্সর্ট নামক যে-যন্ত্রসঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েচে, তাকে সহ্য করা আমাদের লজ্জা এবং তাতে আনন্দ পাওয়ায় আমাদের অপরাধ।

এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয়, বাংলা দেশে কাব্যের সহযোগে সঙ্গীতের যে বিকাশ হচ্চে, সে একটী অপরূপ জিনিষ হয়ে উঠবে। তাতে রাগ রাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না, যেমন কীর্ত্তনে তা নেই; অর্থাৎ গানের জাত রক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাক্‌বে, কেন না তাকে বাণীর দাবী মেনে চল্‌তে হবে। কিন্তু এননতর পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্যে উভয়পক্ষেরই নিজের জিদ কিছু কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না। এই জন্যে গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়। যাই হোক্, বাংলা দেশে এই একজাতের কাব্যকলা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। অন্ততঃ আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই—গান রচনা, অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম সংযমের যে-শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে; কিন্তু পরম্পরাগত সঙ্গীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতেও ছন্দের রীতি আছে—সে রীতি কোনো বড় কবি নিখুঁৎ ভাবে সাবধানে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেন না—অর্থাৎ তাঁরা নিয়মের উপরেও কর্ত্তৃত্ব করেন—কিন্তু সেই কর্ত্তৃত্ব করতে গেলেও নিয়মকে স্বীকার করা চাই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা, সেখানে কলা-বিদ্যার স্থান নেই। এই জন্যে নিজের সৃজন শক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই, শিক্ষা ও সংযমশক্তির বেশি দরকার হয়।

সঙ্গীত-সঙ্ঘ আমাদের দেশের সঙ্গীতকে দেশের মেয়েদের কণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার নিয়েচেন। তাঁদের এই সাধনার গভীর সার্থকতা আছে। আমাদের দুই রকমের খাদ্য আছে, একটি প্রয়োজনের আরেকটির অপ্রয়োজনের,—একটি অন্ন, আরেকটি অমৃত। অন্নের ক্ষুধায় আমরা মর্ত্ত্যলোকের সকল জীবজন্তুর সমান, অমৃতের ক্ষুধায় আমরা সুরলোকের দেবতাদের দলে। সঙ্গীত হচ্চে অমৃতের নানাধারার মধ্যে একটি। দেশকে অন্নের পরিবেষণ ত মেয়েদের হাতেই হয়, আর অমৃতের পরিবেষণও কি তাঁদের হাতেই নয়?

এ কথা মনে রাখতে হবে, যা অমৃত, যা প্রয়োজনকে অতিক্রম করে আপনাকে প্রকাশ করে, মনুষ্যত্বের চরম মহিমা তাতেই। যে জাতি পেটুক, সে কেবল-মাত্র নিজের প্রতিদিনের গরজ মিটিয়ে চলেচে, মৃত্যুতেই তার একান্ত মৃত্যু। গ্রীস্ যে আজও অমর হয়ে আছে, সে তার ধনে-ধান্যে রাষ্ট্রীয়প্রতাপে নয়, আত্মার আনন্দরূপ যা-কিছু সে সৃষ্টি করেচে, তাতেই সে চিরদিন বেঁচে আছে। প্রত্যেক জাতির উপরে ভার আছে, সে মর্ত্ত্যলোকে আপন অমরলোকের সৃষ্টি করবে। গ্রীস্ সেই নিজের অমরাবতীতে আজও বাস করচে। সঙ্গীত মানবের সেই আনন্দরূপ—সে মানবের নিজের অভাব মোচনের অতীত বলেই সর্ব্বমানবের এবং সর্ব্বকালের;—রাজ্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এই আনন্দরূপ চিরন্তন।

যে-সকল ঘোরতর প্রবীণ লোক ওজন-দরে জিনিষের মূল্য বিচার করেন, সারবান বলতে যাঁরা ভারবান বোঝেন, তাঁরা সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাকে সৌখীনতা বলে অবজ্ঞা করে থাকেন। তাঁরা জানেন না, যাদের বীর্য্য আছে সৌন্দর্য্য তাদেরই। যে শক্তি

আপনাকে শক্তিরূপেই প্রকাশ করে, সে হল পালোয়ানি কিন্তু শক্তির সত্যরূপ হচ্চে সৌন্দর্য্য। গাছের পূর্ণ শক্তি তার ফুলে; তার মোটা গুঁড়িটার মধ্যে সে কেবল আপনিই থাকে, কিন্তু তার ফুলের মধ্যে সে যে ফল ফলায় তারই বীজের ভিতর ভাবীকালের অরণ্য, অর্থাৎ তার অমরতা। সাহিত্যে, সঙ্গীতে সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যায় প্রাণশক্তি আপন অমরতাকে ফলিয়ে তোলে, আপিস আদালতে কলে কারখানায় নয়। উপনিষদ বলেচেন, জন্মেচে বলেই সকলে অমর হয় না, যারা অসীমকে উপলব্ধি করেচে অমৃতাস্তে ভবন্তি। অভাবের উপলব্ধিতে কাপড়ের কল, পাটের বস্তার কারখানা,—অসীমের উপলব্ধিতেই সঙ্গীত। অসীমের উপলব্ধিতেই আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা। যে-সৃষ্টিকর্ত্তা চন্দ্র-সূর্য্যের সিংহাসনে বসে দরবার করচেন, তিনি যে-গুণী জাতিকে শিরোপা দিয়ে বলেন, "সাবাস, আমার সুরের সঙ্গে তোমার সুর মিলচে"—সেই ধন্য, সেই বেঁচে যায়, তাঁর অমৃত সভার পাশে তার চিরকালের আসন পাকা হয়ে থাকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র ভাদ্র, ১৩২৮।

আঁধি

২০

দশ-বারো দিন পরে ভুবনেশ্বরী চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে একবার বলাইদের সঙ্গে দেখা-শুনা করিয়া কাশী-হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে-তীর্থে ঘুরিয়া শেষে কাশীতে কি বৃন্দাবনে বাকী কয়টা দিন স্থায়ীভাবে কাটাইয়া দিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়।

ভুবনেশ্বরী চলিয়া যাইবার পর অভয়াশঙ্করও নিখিল ও সুষমাকে লইয়া পশ্চিমে গেলেন। চুনার, মুঙ্গের, মিহিজাম প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া নির্জ্জন জায়গা বাছিয়া শিমুলতলায় আসিয়া আস্তানা পাতিলেন।

সুষমা ও নিখিল এখানে আসিয়া বর্ত্তাইয়া গেল। গাড়ী-ঘোড়ার চিহ্ন নাই,—পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে রাস্তা,—কোথাও দোতলার সমান চড়াই উঠিয়াছে, কোথাও বা একেবারে নীচু হইয়া সেই পাতালে গিয়া ঠেকিয়াছে,—দুইধারে গাছপালা, পুকুর, ঠিক যেন ছবির মত! পথে লোকের ভিড় নাই! সকালে-বৈকালে একটা ভৃত্য সঙ্গে লইয়া দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইয়া কতদূরে চলিয়া যায়—কোন ঝঞ্ঝাট নাই। ষ্টেশনের ধারে-ধারে ছোট-ছোট পাহাড়—সেই সব পাহাড়ে চড়িয়া দুইজনে বসিয়া থাকে। মাথার উপর স্বচ্ছ নির্ম্মল নীল আকাশ। সম্মুখে বহুদূর অবধি মুক্ত প্রান্তর তাহার অভিনব বৈচিত্র্য ফুটাইয়া পড়িয়া আছে—তাহারই বুকের উপর দিয়া খেলাঘরের ছোট্ট গাড়ীগুলির মতই ট্রেন আসিয়া দেখা দেয়—সেই ট্রেনই কত শত যাত্রী লইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোথায় কত দূর-দেশে চলিয়া যায়!

সেদিন তাহারা বেড়াইতে বাহির হইলে ভৃত্য বংশী বলিল—মা, এখানে একটা নদী আছে, মহাজোড়—সেখানে বেশ একটি ঝরণাও আছে—দেখ্‌তে যাবেন মা?

ঝরণার নাম শুনিয়া নিখিল একেবারে

আহ্লাদে নাচিয়া উঠিয়া সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—হ্যাঁ মা, চলো মা। ঝর্‌ণা দেখ্‌ব।

মহাজোড়ের রাস্তা ঠিক যেন ব্রাহ্মণের গায়ে সূক্ষ্ম পৈতাটির মত সহরের বুকের উপর দিয়া ঈষৎ বাঁকিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে। সুষমা ও নিখিল সেই পথে নদী দেখিতে চলিল। পথের দুইধার ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে—দুইধারেই গভীর খাদ। সম্মুখে বহুদূরে প্রকাণ্ড পাহাড়—যেন ওদিক্‌কার সমস্ত জগৎটাকেই সে ঢাকিয়া রাখিয়াছে! অনেকটা হাঁটিয়া এক জায়গায় বালুময় চরের মাঝখানে জলের একটা শীর্ণ রেখা কোথা হইতে বহিয়া আসিয়া আগাছার অগভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছে। জলটুকু বরফের মতই শীতল।

সুষমা ও নিখিল গিয়া বালু খুঁড়িতে জলের ছোট ছোট কুণ্ড ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। নিখিল মহা-খুসী হইয়া বলিল—মা, এইখানেই রোজ রোজ আমরা বেড়াতে আসব এবার থেকে, কেমন?

ওদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে সুরু করিল। বংশী বলিল,—মা, আর দেরী কর্‌বেন না। এখানকার লোকে বলে, ঐ জঙ্গলে নাকি বাঘ বেরোয়!

হাসিয়া সুষমা বলিল—দূর, কি খেতে বাঘ বেরুবে রে? এখানে মানুষ কোথায়?

বংশী বলিল—কেন মা, এই যে রাস্তা,—এই রাস্তার ওধারে করো বলে গাঁ, আর এই রাস্তা দিয়ে সিধে গেলে বদ্দিনাথে পৌঁছুনো যায়। কত লোক চলে।

বাঘের নাম শুনিয়া নিখিলের কৌতূহল এমনি বাড়িয়া গেল যে সে হাতের কঞ্চিগাছা লইয়া ছোট জঙ্গলের গাছ-পালা ঠেঙ্গাইতে সুরু করিয়া দিল। ওদিকে করোগাঁয়ের দিক হইতে কয়েকটি সাঁওতাল রমণী আসিতেছিল—তাহাদের কাহারো কাঁখে ছোট কলসী, কাহারো মাথায় মাটি-লেপা ছোট ধামা। কলসী আর ধামায় ছিল ঘী কিম্বা তেল, আর ধামায় আনাজ-তরকারী। রমণীদের বিচিত্র বেশ আর হাস্যময় মুখ-চোখ দেখিয়া সুষমা একজনকে কাছে ডাকিল, বলিল,—হ্যাঁ রে, এধারে বাঘ আছে না কি?

সাঁওতাল রমণীরা সুষমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কোন জবাব দিল না।

বংশী বলিল—ইধার শের হ্যায়?

রমণীদের মধ্যে বয়সে যেটি কিশোরী, সে অগ্রসর হইয়া ভাঙ্গা বাঙলাতে কথা কহিল, বলিল,—না মা, শের কুথাসে আসবে! এই হামরা রাত-বিরেতে সব এই পথে যাওয়া-আসা করি, শের তো দেখিনি। তবে লোকে বলে, হামরা চোখে দেখিনে। হেথা চোর আছে, মা, তুমি জেবর গায়ে দিয়ে এধারকে এসো না। তোমার বাড়ী কলকাত্তায়,—না মা?

—হ্যাঁ। বলিয়া সুষমা হঠাৎ পাশের দিকে ফিরিয়া দেখে, নিখিল কাছে নাই। কোথায় গেল? সুষমা শিহরিয়া উঠিল, ডাকিল—নিখিল, নিখিল—।

খানিকটা দূরে জঙ্গলের ওধার হইতে নিখিল সাড়া দিল,—যাই মা। আমি ঝরণা খুঁজচি।

সুষমা তখন রমণীদের জিজ্ঞাসা করিল,—

আপনাকে শক্তি
কিন্তু ঝরণা কোথায় আছে রে? ঝরণা
জানায় এমনি বিস্ময়ের দৃষ্টি লইয়া রমণীরা তাহার পানে চাহিল, যে সুষমা অবাক হইয়া গেল। সে ভাবিল, ঝর্‌ণা কথাটার অর্থ বোধ হয় ইহারা জানে না! তখন ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিয়া সুষমা বলিল,—ঝর্‌ণা বুঝ্‌চ না? পাহাড়ের গা থেকে পানি পড়ে না? তাকেই বলি, ঝরণা!

—ওঃ—হাঁ—হাঁ বলিয়া তাহারা জঙ্গলের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিল; পরে বলিল,—ঐ উরি ভিতর আছে। কিন্তু আজ দেরী করোনা, মা—এখানকার লোক ভারী গরীব আর শয়তান আছে! খেতে তো পায় না। দু' তিন পয়সার জন্য জান্ মেরে লেয়! ঘর্‌কে যা মা—এই কথা বলিয়া তাহারা আর অপেক্ষা না করিয়া গাঁয়ের দিকে চলিয়া গেল।

কথাটা শুনিয়া সুষমার একটু ভয় হইল। সে ডাকিল,—নিখিল—

ঠিক তাহার ডাকের প্রতিধ্বনি তুলিয়াই যেন জঙ্গলের মধ্য হইতে একটা শব্দ উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গে নিখিলের ক্রন্দন-জড়িত চীৎকার ভাসিয়া আসিল—ওগো মা— গো!

ভয়ে ধড়মড়িয়া সুষমা বংশীর দিকে না চাহিয়াই চীৎকার লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া গেল। ছোট ছোট শিশু-গাছের ডাল-পাতা সরাইয়া এধারে চাহিয়া ওধারে ঝুঁকিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়া সুষমা দেখে, পাথরের কয়েকটা উঁচু ঢিবির পাশে নিখিল হুমড়িয়া পড়িয়া আছে।

—ও বংশী, আয় রে—বলিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া সুষমা কাছে গিয়া দেখে, নিখিলের কপালের কাছটা পাথরে ছেঁচিয়া গিয়াছে,—তাহার মুখে রক্ত, ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছে, নিখিল কাঁদিতেছে। সুষমা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কাছে আসিয়া দুই হাতে ধরিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করে এ কাণ্ড হলো?

কাঁদিয়া নিখিল বলিল,—পড়ে গেছি।

বংশী আসিয়া সুষমার কাছ হইতে নিখিলকে তুলিয়া আপনার কোলে লইল। সুষমা বলিল—চ', জলের ধারে নিয়ে চ'। ছি বাবা, একলাটি চুপি-চুপি কেন চলে এলে, বল দেখি! না এলে ত আর এ অনর্থ ঘটত না। এখন কি যে করি—

নিখিলকে লইয়া বংশী বালির উপর বসিল, আর সুষমা কাপড়ের আঁচল জলে ভিজাইয়া সেই ভিজা আঁচল দিয়া তাহার কপালের ও নাকের-মুখের রক্ত ধুইয়া মুছাইয়া দিল। মুছাইয়া দেখে, উপরের-ঠোঁটের কোণটা ফুলিয়া মার্ব্বেলের মত হইয়াছে!

সুষমা বলিল,—এখন বাড়ী যাই, চল। এতটা পথ হেঁটে যেতে পারবে কি নিখিল, তাই আমি ভাব্‌চি। কেন যে মরতে এধারে এলুম!

সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদো-কাঁদো মুখে নিখিল বলিল—বাবা মার্‌বে। বাবাকে তুমি বলোনা মা।

সে স্বরে আশ্রয়-ভিক্ষার এমন করুণ মিনতি ঝরিয়া পড়িল যে সুষমার সমস্ত প্রাণটা একেবারে মমতায় গলিয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা বলিল—না, না, মারবেন কেন! আমি তাঁকে বলব'খন—নিজের দোষে ত পড়নি—!

নিখিল বলিল—বাবা শুনবে না, মা।

হায়রে, সুষমাও এ কথা ভালো করিয়া জানে! তাই জোর গলায় ছেলেকে সে কোন ভরসাই দিতে পারিল না। সে কে—তাহার এমন কি জোর আছে যে নিখিলকে সে আশ্বাস দেয়! একটা কথা তাহার মনে হইল, এতদিন সময়টা এখানে বেশ এক-রকম কাটিয়া যাইতেছিল, কোন জ্বালা ছিল না। নিখিলকে একেবারে অন্তরে পাইয়া সে যেন বাঁচিয়াছিল! শুধু আসিবার পর একদিন সেই যা-একটু গোল বাধিয়াছিল! ষ্টেশনের ওধারে নার্শারির কাছে সেই যে বাড়ীটা,—সেই বাড়ীর গৃহিণী তাহাদের ডাকিয়া সেদিন আলাপ করিতেছিল। তাই কথায় কথায় রাত্রি হইয়া যায়—নিখিলকে লইয়া সুষমা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। অভয়াশঙ্কর সেদিন একটিও তিরস্কার করেন নাই, গম্ভীর হইয়া ছিলেন। অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিবার পর শুধু একটি মাত্র বক্রোক্তি করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন,—স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে না বলেই ত এদেশের মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা করে না। বেড়াতে বেরুলো ত বাড়ী ফেরবার কথা আর মনেই থাকবে না—এ যে সর্ব্বনেশে বেড়ানো!

সুষমা এ মন্তব্যের অর্থ বুঝিয়া শুধু বলিয়াছিল,—একজনরা ডেকে আলাপ করলেন,—নিখিলকে তাঁদের গাইয়ের দুধ দুইয়ে সেই দুধ জ্বাল দিয়ে না খাইয়ে কিছুতে ছাড়লেন না—!

অভয়াশঙ্কর অমনি ছোট একটা ঝঙ্কার তুলিয়া জবাব দিলেন,—বটে! বাড়ীতে ফিরতে রাত হলে সব রাগ করবে, এ কথা বললে কোন্ লোক ধরে রাখতে পারে!

সুষমা এ কথার আর কোন জবাব দেয় নাই! কি জবাবই বা দিবে? অভয়াশঙ্কর বুঝিবেন কি,—পরের কাছে এ কথা বলিতে মেয়েমানুষের কতখানি বাজে। নিজের ঘরে নিজের জনের উপর এটুকু শক্তিও তার নাই কি! সে এমনি হতভাগিনী! এ কথা পাঁচ জনের কাছে সে বলিয়া বেড়াইবে কোন্ মুখেই বা!

লোকে তাহার স্বামীকেই বা ভাবিবে কি! ভাবিবে, এমনি মেজাজ যে পাণ হইতে চূণটুকু খসিলেই সর্ব্বনাশ! সত্যই ত, এমন করিয়া কেহ কখনো সংসার-ধর্ম্ম পালন করে না। একটু প্রেম, একটু প্রীতি, একটু সহানুভূতির চোখে দেখিলে কি আর এটাকে ত্রুটি বলিয়া মনে হয়! অভয়াশঙ্কর নাই মানুন, তবু লোকের চোখে সে ত তাঁর স্ত্রী! স্ত্রী বলিয়া তাহার ত একটা দায়িত্ব-বোধ আছে! সত্যই সে কিছু জেলখানার কয়েদী নয় যে হাজিরার ঘড়ি ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় মিলাইয়া দেওয়া চাই!

আজ নিখিলের এই অভয়-প্রার্থনায় সুরে সেদিনকার কথাটা সুষমার মনে পড়িয়া গেল। মুখে সে সান্ত্বনা দিয়া ছেলেকে বলিল ঝটে,—কোন ভয় নেই বাবা, আমি সব ঠিক করে দেব'খন! কিন্তু তাহার অন্তরাত্মাই বুঝিল, ঠিক করা তাহার পক্ষে সহজ নয়—বড় কপাল-জোর হইলেই রক্ষা, নহিলে আজ গৃহে গিয়া ইহার জন্য আর-একটা ছোট-খাটো তাল হয়তো তাহাকে সামলাইতে হইবে!

বংশী বলিল,—এসো বাবু, কোলে এসো। এত পথ হাঁটতে পারবে না! হেঁটে গেলে বহুৎ রাত হোয়ে যাবে।

নিখিল বলিল,—না, আমি হেঁটেই যাবো, মা। দেরী হবে না।

তিনজনে আসিয়া বাড়ীর কাছে পৌঁছিলে সুষমা ভাবিল, যদি কিছু ভৎর্সনাই মেলে! চাকরের সাম্‌নে বলিয়া ত অভয়াশঙ্কর রেয়াৎ করিবেন না! রাগ করিয়া এমন সব কথা বলিয়া বসিবেন, যেগুলা তীরের মত তাহার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিবে। সে কথার বাণ একান্তে সে অনেকগুলাই নিঃসঙ্কোচে বেশ গ্রহণ করিতে পারে, তবে চাকর-বাকরের কাছে এই সব! বড় লজ্জা করে সে! নিজে হইতে ত সে হেঁট হইয়াই আছে, তবে আর ইহাদের কাছে অতখানি খাটো করা কেন! তাই সুষমা বংশীকে বিপদের মুখ হইতে সরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিল,—তুই যা ত বংশী, সেই গজেনবাবুর বাড়ী—সেই যে ষ্টেশনের কাছে বাঙলাখানা রে। তাঁরা আজ ভালো পাণ দেবেন বলেছিলেন। বাবু আবার শুক্‌নো পাণ খেতে পারেন না কি না—সেই পাণ নিয়ে আয়গে, বাবুর জন্যে।

২১

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জ্বালা! অভয়াশঙ্কর আলোর সম্মুখে একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। সুষমা নিখিলকে পাশের ঘরে দাঁড় করাইয়া নিজে শুধু অভয়াশঙ্করের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমাদের আজ ফির্‌তে একটু দেরী হয়েচে, না?

সুষমা বলিল,—হ্যাঁ, অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিলুম। ও-ধারে কেমন একটী নদী আছে, দেখে এলুম। তুমি গেছ কোনদিন?

—ঐ করো গাঁয়ের দিকে ত?

—হ্যাঁ!

—ওকে বল, নদী! ও ত নর্দ্দামা! আমি দেখে এসেচি। তা সে ত অনেকটা দূরে। নিখিল অতদূর হাঁটতে পার্‌লে?

—বেশ হেঁটেচে। বংশী কোলে নিতে চাইলে, তা গেল না। হাঁটা ত ভালো। নয় কি?

খবরের কাগজটা মেঝেয় ফেলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হাঁটা ভালো, তবে সামর্থ্য বুঝে হাঁটা চাই! তারপর কাল সকালে উঠে না বলে, পায়ে ব্যথা হয়েছে! তোমরা সীমা ঠিক রাখতে পারো না, এইটেই তোমাদের মস্তদোষ! এই জন্যেই তো তোমাদের বলি, অবুঝ!...যাক্, নিখিল গেল কোথায়?

—ও-ঘরে আছে। এইটুকু বলিয়াই সুষমা তাহার অত্যন্ত ভীত-কুণ্ঠিত মনটাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া কোনমতে সবল করিয়া তুলিয়া একেবারে অভয়াশঙ্করের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল ও তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া পরক্ষণে মুখ নামাইয়া খুব মৃদু স্বরেই বলিল—আজ সে একটা অন্যায় করে ফেলেচে। তুমি বক্‌বে না? মাপ কর্‌বে, বল!

অভয়াশঙ্কর সোজা হইয়া বসিলেন; বসিয়া বলিলেন—কি, অন্যায়? তাঁহার গলার স্বর যেন একটু কঠিন, কিন্তু অকম্পিত! তিনি বলিলেন,—কিছু হারিয়ে এসেছে নাকি?

কুণ্ঠিতভাবে সুষমা বলিল,—না।

—তবে? অভয়াশঙ্কর শিকারীর মতই অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিলেন, তারপর বলিলেন,—কি! নিখিল কোথাও পড়ে-টড়ে গেছে বুঝি?

সুষমার সমস্ত প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল,—কোনমতে সে ভয়কে ঠেলিয়া সরাইয়া মৃদুস্বরে সে কহিল,—হ্যাঁ।

—কোথায় পড়ল? ডাকো তাকে, দেখি!—নিখিল—

পিতার আহ্বানে নিখিল আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল,—তাহার সজল দুই চোখ এমন করুণ, এমনি কাতর অনুনয়ে ভরা যে তাহা দেখিবামাত্র সুষমার সমস্ত অন্তর একেবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নিখিলকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল,—এই যে ঠোঁট আর রগের কাছটা পড়ে কেটে গেছে। জল দিয়ে ধুইয়ে দিয়েচি—এখনি একটু আইডিন দিয়ে দিচ্ছি। পাথর ছিল কিনা, তাইতেই কেটে গেছে।

অভয়াশঙ্কর নিখিলকে কাছে আনিয়া ক্ষত স্থান দেখিলেন, পরে বলিলেন,—বংশী সঙ্গে রয়েচে, তুমি নির্জে আছ,—তবু এমন পড়ল কি করে?

কথার এই যে ভঙ্গীটুকু, তাহা সুষমার প্রাণে মুগুরের ঘা মারিল। এ ত ছেলের দোষে মাকে ভৎর্সনা নয়, এ যে চাকরের সঙ্গে তাহাকে এক পৈঠায় দাঁড় করাইয়া বিচারকের কড়া কৈফিয়ৎ-তলব!

সুষমা বলিল—আমি একজনের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, ও ঝর্‌ণা দেখতে গিয়ে অমনি চিৎ হয়ে পড়ে গেছে। তারপর সংক্ষেপে ব্যাপারটা সে খুলিয়া বলিল।

অভয়াশঙ্কর গম্ভীর হইয়া সমস্ত শুনিলেন, পরে আরো গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—হুঁ! তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন,—কাল থেকে ও আমার সঙ্গেই বেড়াতে যাবে। তুমি আলাদা যেয়ো—ও সঙ্গে থাক্‌লে তোমার গল্প-সল্প কর্‌বার ব্যাঘাত হয়, দেখ্‌চি। সেদিন রাত হয়েছিল, আর আজ এই কাণ্ড! আমি এটা আগে বুঝিনি, তাই তোমাকে দিয়ে ওর চৌকিদারী করাচ্ছিলুম! আজ শেষ—কাল থেকে তোমার ছুটি! পরে নিখিলকে ডাকিয়া বলিলেন—নিখিল, কাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে! ওদের সঙ্গে গেলে তোমার বদমায়েসি বড় বাড়ে। দেখি, আমার সঙ্গে বেড়িয়ে শান্ত-শিষ্ট হতে পারো কি না। এখন যাও, ও-পোষাক ছেড়ে তোমার ঘরে বই নিয়ে বসো গে!

এই বয়স হইতেই নিখিল পিতার আদেশ শক্তিমান্ রাজার দুর্লঙ্ঘ্য আদেশের মতই মানিতে শিখিয়াছিল। আদেশ শুনিয়া সে সে-ঘর হইতে চলিয়া গেল। বাপের কাছে মার বা বকুনি খাইতে হইল না বলিয়া মনটা খুসী হইলেও মা যে এই অনর্থক এতটা তিরস্কার ভোগ করিল, আর সে শুধু তাহারই দোষে—এই অপ্রসন্নতা আগুনের হল্‌কার মতই তাহার মনটায় ছাঁকা দিয়া অস্বস্তি জাগাইয়া তুলিল।

নিখিল চলিয়া গেলে অভয়াশঙ্কর কাগজ-খানা হাতে লইয়া তাহারই অক্ষরগুলার পানে আবার মনঃসংযোগ করিলেন, আর সুষমা পুতুলের মত নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে আসিয়া একেবারে অভয়াশঙ্করের পায়ে হাত রাখিয়া বলিল,—তুমি রাগ করেচ? বল।

—না, রাগ কি! আর কেনই বা রাগ কর্‌ব! বিশেষ তোমার উপর রাগ করতে পারি কখনো? তুমি আমার ছেলেকে অত-বড় সঙ্কট-পীড়া থেকে আরাম করে তুলেছ—!

—ছি, ও কি কথা বল্‌চ! ক্ষুব্ধ অভিমানে সুষমার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন—ও যদি তোমার পেটের ছেলে হতো, তাহলে কি আর ঐ জঙ্গলের ধারে তার কথা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারতে তুমি!

সুষমার চোখের সম্মুখে কি কতকগুলা অস্পষ্ট ধোঁয়ার মূর্ত্তি কুণ্ডলী পাকাইয়া ছোট-বড় মূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য সুরু করিয়া দিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—কি করে তোমায় বোঝাব, বল—কি কর্‌লেই বা তুমি বুঝবে! কিন্তু বড় ভুল বুঝচ তুমি। এই ভুলের জন্যে নিজে কষ্ট পাও, আমায় কষ্ট দাও, ছেলেটা অবধি সে কষ্ট থেকে বাদ পড়ে না! কেন যে এ ভুল বোঝো তুমি, অত বিদ্বান হয়ে, বুদ্ধিমান হয়ে—!

সুষমার দুই চোখ দিয়া হু-হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়ল।

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই অভয়াশঙ্কর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, বলিলেন—যাই, নিখিলের পড়াটা একটু দেখে দি—ওর মাষ্টার মশায় আরো পাঁচ-সাতদিন পরে আসবেন, লিখেচেন। এর মধ্যে আসা ঘট্‌বে না। ভালো কথা, নিখিল আজ আমার সঙ্গেই খেতে বসবে'খন—অর্থাৎ তোমার ঘাড়ের বোঝা যতটা হাল্‌কা করতে পারি! অনেক ঋণেই ত ঋণী আছি—আরো কেন ঋণের বোঝা ভারী করে তুলি!

সুষমার মনটা এই সব কথার খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া হু-হু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, আর কোন কথায় থাকা নয়—দাসী-চাকরের মতই শুধু সে এ-সংসারে কর্ত্তব্য সারিয়া যাইবে! স্নেহের আব্‌দার তুলিয়া এমন করিয়া স্নেহ বস্তুটার অপমান ঘটিতে দিবে না! কিন্তু কি করিয়া তা হয়? হায়রে, সে উপায় যদি থাকিত!

তাই মনের ক্ষতের সে জ্বালা কোনমতে চাপা দিয়া কুণ্ঠিত স্বরে সুষমা বলিল,—লুচি খেতে কি ও পারবে?—ঠোঁট কেটে গেছে! ওর জন্যে গাইয়ের দুধ দুইয়ে আন্‌তে পাঠিয়েচি—সে এলে দুধ নিজে আমি জ্বাল দিয়ে দেব—

শুধু দুধ! বেশ—বলিয়া অভয়াশঙ্কর সে-ঘর হইতে চলিয়া গেলেন, আর সুষমা একলা তেমনি করিয়াই পুতুলের মত নিঃশব্দে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

বংশী আসিয়া যখন তাহাকে বলিল,—দুধ ত এনেচি মা। আপনি রান্নাঘরে একবারও গেলেন না,—ঠাকুর জিগ্‌গেস করচে, একসঙ্গে ও দুধ জ্বাল হবে, না, আলাদা হবে?—তখন তাহার হুঁস হইল। চমকিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে দেখে, ন'টা বাজে! তাই ত, কতক্ষণ এমনি কাঠের মত সে দাঁড়াইয়া আছে! অপ্রতিভ হইয়া সুষমা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ছুটিল।

২২

পরের দিন সকালে উঠিয়া পোষাক পরিয়া নিখিল আসিয়া যখন সুষমাকে ডাকিল,—মা, বেড়াতে যাবে না? বা রে, এখনো তুমি কাপড়-চোপড় পর-নি যে!—তখন সুষমার

মন এক অসহ্য বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। নিখিলের পানে চাহিয়া সে বলিল,—আমার শরীরটা আজ ভালো নেই, বাবা। আজ আর বেড়াতে যাব না, মনে কর্‌চি!

নিখিল সুষমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কি অসুখ করচে মা?

সুষমা দুই হাতে তাহার মুখের পরশ লইয়া সস্নেহে বলিল,—এমন কোন অসুখ নয় রে, পাগলা। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়-নি কি না, তাই বেড়াতে যেতে কেমন ইচ্ছে কর্‌ছে না!

—আমি তবে কার সঙ্গে যাব? বাবার সঙ্গে সত্যিই বুঝি যেতে হবে! না মা, বাবার সঙ্গে যেতে ভয় করে! আমিও যাবনা মা বেড়াতে।

সুষমা বিপদে পড়িল,—স্পষ্ট করিয়া তাহাকে যে বলিবে, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও, সে শক্তি তাহার নাই। সেই যে কাল রাত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, আজ হইতে নিখিল তাঁহার সঙ্গেই বেড়াইতে যাইবে—কি জানি, সে কথা যদি ভুলিয়া গিয়া থাকেন! তাহা হইলে আজ আবার এ কথা তুলিতে গেলে হয়তো নূতন একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি হইতে পারে এবং সেই হাঙ্গামায় আরো কত কথার হুল তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিবে! সে নিখিলকে বলিল—আজ বংশীর সঙ্গেই বেড়াতে যাও না হয়!

নিখিল বলিল,—না মা, থাক্ গে, বেড়াতে আর যাব না। তার চেয়ে আমি ওই বাড়ীর বাগানেই বেড়াইগে, কেমন প্রজাপতি ধরব'খন, সে বেশ হবে। তুমিও একটু পরে এসো।

—আচ্ছা।

নিখিল একটা বল লইয়া লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া গেল। সুষমা এক-দৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। নিখিল চোখের আড়ালে গেলে সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তোকে পেটে ধরি-নি, নিখিল, এ কি কম দুঃখ আমার! তোর উপরে কোন জোর, কোন অধিকার খাটে না রে! যদি তুই আমার এই পেটের হতিস্, তাহলে দেখতুম, কে তোকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়, এম্‌নি উল্টো হুকুমে মার প্রাণ কেমন বেঁধে রাখতে পারে!—আমি বেড়াতে যাব না, শুনে ঐ যে তুই বল্‌লি, তুইও যাবি না,—এত দুঃখেও এইটুকুই আমার মস্ত সান্ত্বনা—না হলে এত দিন আমি পাগল হয়ে যেতুম!

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া সে বিছানায় বসিয়া খোলা জানলার মধ্য দিয়া বাহিরে পথের পানে চাহিয়া রহিল। সাম্‌নেই পরিচ্ছন্ন রাস্তা,—বাঁকিয়া কতদূরে সেই দুইটা উঁচু টিলার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধ রৌদ্রে চারিধার ঝলমল করিতেছে! সেই পথে, মাঝে মাঝে ঐ কত লোক চলিয়াছে। জোয়ান সাঁওতালেরা গরু মহিষ তাড়াইয়া গৃহে-গৃহে দুধ জোগাইতে চলিয়াছে! আনাজ-তরকারীর ঝুড়ি মাথায় সাঁওতাল-রমণীরাও চলিয়াছে,—আবার ঐ যে একটি বাঙালী বাবু স্ত্রী-পুত্র লইয়া মৃদু মন্দ-গতিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে! ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নাচিয়া-ছুটিয়া সঙ্গে চলিয়াছে, আর বাবুটি স্ত্রীর হাত ধরিয়া পিছনে চলিয়াছেন। সুষমা একদৃষ্টে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল! বহুদূর হইতে ছেলেমেয়েদের চীৎকার আর

হাসির ঝাপ্‌টা ফুলের গন্ধের মতই ভাসিয়া আসিতেছিল। সুষমা ভাবিল, ইহাদের জীবনই সার্থক,—সংসার করাও কি আরামের! ছোট-বড় কোন ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কোন পক্ষ হইতে কোন কৈফিয়ৎ-তলব নাই—সঙ্কোচ বা ভয় ঐ শুভ্র জীবন-পথে এতটুকু কালি ছিটাইতে পারে না! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবনার সাগরে ঝাঁপ দিল। এ ভাবনার কি আর তার শেষ আছে, না সীমা আছে!

নিখিল বাহিরে ওদিকে তখন বল লইয়া খেলা করিতেছিল। বাগানের বেড়ার ধারে করবী গাছের শ্রেণী। বড় বড় গাছগুলায় লালরঙের করবী ফুটিয়া চারিধার আলো করিয়া রাখিয়াছে। মালী ফুল তুলিতেছিল—বড় একটা করবীর গুচ্ছ তাহার কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া নিখিল মার কাছে ছুটিল। মা ফুল ভালবাসে, মাকে দিবে। এমন সময় কে ডাকিল—নিখিল।

পরিচিত স্বর। সে স্বরে চমকিয়া নিখিল চাহিয়া দেখে, সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইয়া অভয়াশঙ্কর। অভয়াশঙ্কর বলিলেন—এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? বেড়াতে যাওনি যে!

নিখিল মৃদু কণ্ঠে কহিল,—না।

—কেন?

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সে কহিল—মার অসুখ করচে। মা আজ বেড়াতে যাবে না!

অভয়াশঙ্কর মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হইয়া রহিলেন, পরে শুধু ছোট-একটা জবাব দিয়া বলিলেন,—হুঁ।

ইহার পর কোন পক্ষেই আর কোন কথা হইল না। কিছুক্ষণ পরে নিখিল পা টিপিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অভয়াশঙ্কর বলিলেন—চলো, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। যাবে?

প্রবল রাজার আদেশ প্রজা যেমন বিনা-দ্বিধায় মাথায় তুলিয়া পালন করিতে ছোটে, তেমনি ভাবেই নিখিল বলিল,—যাব।

অভয়াশঙ্কর নিখিলকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। খানিকদূর গিয়া নিখিল দেখিল, একটা বাগানের ফটকের সাম্‌নে ছোট হাত-গাড়ীতে ভারে ভারে ফুল বোঝাই হইতেছে। লাল, নীল, হরিদ্রা—নানা বর্ণের ফুল—যেন রাশি রাশি রামধনু ফুটিয়াছে! তাহার শিশু-চিত্ত তীব্র কৌতূহলে ভরিয়া উঠিল,—এ ফুল উহারা গাড়ীতে বোঝাই করিতেছে কেন? কি হইবে? কাহার ফুল? কিন্তু কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করে? মা সঙ্গে থাকিলে ছোট-বড় নানা প্রশ্নে মাকে সে কত অস্থির করিয়া তুলিত, মাও তাহার প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিত! এ ত মা আজ সঙ্গে নাই! পিতা যে-গম্ভীর মুখে পথ চলিয়াছেন—তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিতে ভয় করে! এখনই বকুনি খাইতে হইবে। সেদিনকার কথা এখনো তাহার মনে আছে ত! সেই যে যেদিন শিমুলতলায় আসা হয়, তার পরদিন সকালে বাবা মা দুই-জনের সঙ্গেই সে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। পথে গাড়ী-ঘোড়া নাই দেখিয়া সে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—হ্যাঁ মা, একখানাও গাড়ী দেখতে পাচ্চি না কেন! কাল ষ্টেশন থেকে হেঁটে এলুম—কেন মা? তারপর রাস্তায় নানারকমের গাছপালা দেখিয়া, লোকজনের বিচিত্র বেশ দেখিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে-ছিল—ওটা কি ফুল, মা? গন্ধ আছে?—

দেখ মা, কি রকম ফল ঐ গাছটায়—ও কি ফল মা? হঠাৎ পিতা রুদ্রস্বরে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—বেড়াতে যাচ্ছ, বেড়াতে চল, তা না সাত সতেরো কথা! ও-সব জ্যাঠামি করলে কোনদিন বেড়াতে আস্‌তে পাবে না।—সে ভৎর্সনা আজো সে ভোলে নাই। কাজেই কোন প্রশ্ন না তুলিয়া দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত নির্ব্বাক হইয়াই সে পিতার পিছনে-পিছনে পথ মাড়াইয়া বহুদূর অবধি বেড়াইয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া মার ঘরে গিয়া দেখে, মা সেখানে নাই। সুষমা রান্নাঘরে। সে রান্নাঘরে গিয়া সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—তুমি রান্নাঘরে কেন মা? তোমার অসুখ সেরে গেছে?

তাহার মুখে চুমু দিয়া সুষমা বলিল,—হ্যাঁ, বাবা, সেরে গেছে।

নিখিল আবার ডাকিল,—মা।

—কেন মাণিক?

নিখিল কোন জবাব দিল না। আজি-কার সকালটা তাহার যে নিরানন্দময়তার মধ্যে কাটিয়াছে, তাহার বেদনায় মনটা তাহার তখনো টাটাইয়া ছিল।

সুষমা বলিল,—এইবার ও-পোষাক ছেড়ে ফেলে একটু বসে জিরোও। জিরুনো হলে আমি নাইয়ে দেব, কেমন? ব্যস্, তারপর ভাত খাবে।

নিখিল কোন কথা কহিল না; ম্লান চোখের ম্লান দৃষ্টি লইয়া সুষমার পানেই সে চাহিয়া রহিল। সুষমা তখন রান্নাঘরে দ্বারের কাছে বসিয়া নিখিলকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিল—কেমন বেড়ানো হল নিখিল? কোন্ দিকে গেছলি রে আজ?

নিখিল মার কাপড়ের আঁচলটা লইয়া আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল—আমি মা, বাবার সঙ্গে আর বেড়াতে যাব না। একটা কথা কবার জো নেই! কেবলি ভয় করে!

—ছি বাবা, ও কথা বলতে আছে কি! বলিয়া সুষমা তাহার মুখে আবার চুমু দিলেন।

বাহির হইতে অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—নিখিল, এদিকে এসো···নাইবে এসো।

এ কথার উপর কথা কহিতে মা বা ছেলে, কাহারো সাধ্য ছিল না। নিখিল উঠিয়া স্নান করিতে গেল, আর সুষমা রান্না-ঘরের দ্বারে হতভম্বের মতই বসিয়া রহিল! হায়রে; এই যে ক'দিন আকাশটা ফরসা দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল, বর্ষার মেঘ তবে এবারের মত কাটিয়া গেল! কিন্তু এ কি, আবার ঐ সগর্জ্জনে মহা-আড়ম্বরে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে যে! গগনে-পবনে এ কি আবার তার ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য দেখা দিল! এ মেঘ কি কখনো কাটিবে না? এ আঁধার ঘুচিয়া শরতের স্নিগ্ধ আলো কি কোনদিনই ফুটিবে না রে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রাঢ়ের দুর্গোৎসব

(চিত্র)

আর পূজার বেশী দেরী নাই। আজ তৃতীয়া। শম্ভু দত্ত কুটুম্ব আনিতে দিক্‌দিগন্তরে লোক পাঠাইতেছেন। কোথাও পাল্কী বেহারা যাইল, কোথাও ডুলি-বেহারা গেল, কোথাও গো-গাড়ী গেল, আবার কোথাও বা তেনা বাগ্দীর মা পত্র লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া হাজির হইল।

শম্ভু দত্তর তিন ভগ্নী সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছে। তাহারা না আসিলে কাজ-কর্ম্ম করিবে কে? জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবতারিণী, মধ্যমা জগত্তারিণী ও কনিষ্ঠা দিনতারিণী। তিন ভগ্নীতে পিত্রালয়ে আসিয়া কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়াছেন। অন্যান্য কুটুম্বদিগকে আনিতে পাল্কী-বেহারা গেল। বেহারাদের আজ আর বিরাম নাই, পাল্কী করিয়া লোক আনিতেছে, আবার অন্য গ্রামে ছুটিতেছে। এই সব বেহারাকে তেল, জল-খাবার সবই গৃহস্থকে দিতে হয়, কাজেই পূজা উপলক্ষে মুড়ি-মুড়কি খরচের জন্য বাড়ীর ভিতর চালায় মুড়ি-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। বারোটা উনানে মুড়ি ভাজা হইতেছে, ছয় জন স্ত্রীলোক মুড়ির চাল নাড়িতেছেন আর ছয় জন স্ত্রীলোক ছাঁকিতেছেন। উনানের বামদিকে দুগ্ধফেননিভ হৃদয়-শীতলকারী দন্তের জড়তা-হারী মুড়ির রাশি পড়িয়া রহিয়াছে। অপর দিকে বড় বড় কটাহে গুড় পাক হইতেছে, খর্জ্জুর পত্রের চাটার উপর স্তূপাকারে খই রহিয়াছে। গুড় পাক হইলে তিন চার জনে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, পাক ঠিক হইয়াছে কিনা। একজন বলিল, পাক ঠিক হইয়াছে। তখন গুড় শীতল করিয়া খইয়ের উপর ঢালা হইল, অম্‌নি তিন জনে তাড়ুর দ্বারা মাখিতে লাগিল, খইগুলি গুড় পাইয়া এলাইয়া পড়িতে লাগিল। যেখানে মুড়কি পাক হইতেছে, সেখানে বড় গোলযোগ নাই, কারণ ভিয়ান করিতেছেন কেবল পুরুষেরাই। পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকের আড্ডা অপেক্ষা পুরুষের আড্ডায় দলাদলির ব্যাপার ছাড়া গোলযোগ কম হয়, কেবল গোটা চারি-পাঁচ হুঁকা যুটিয়া বড় গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছে! বহির্ব্বাটীতে নারিকেল সন্দেশ ভিয়ান হইতেছে, জন দশ-বারো পুরুষ-মানুষ নারিকেল কুরিতেছে। ইহাদের মধ্যে দত্তদিগের ভাগিনেয়, জামাতা ও শ্যালকপুত্র ইত্যাদি কুটুম্ব আছেন। জন-কতক ছোটলোক নারিকেল ছুলিতেছে, কতকগুলা লোক নারিকেল নিংড়াইয়া একটা পিত্তলের গাম্‌লায় নারিকেলের দুধ জমা করিতেছে, তথায় কতকগুলা বালক-বালিকা নারিকেলের মালা হাতে করিয়া নারিকেলের দুধ খাইবার জন্য গোলযোগ করিতেছে, আর মাঝে মাঝে এক-একটা তাড়া খাইয়া পিছাইয়া যাইতেছে, আবার সকলে দল বাঁধিয়া দুধের গামলা ঘিরিয়া চীৎকার করিতেছে।

মহেন্দ্র কহিল, "নারিকেল কতগুলো কোরা হল বড়দা?"

রাম কহিল, "হয়েছে অনেক। তুই গুড় নিয়ে আয়।"

মহেন্দ্র বাড়ীর মধ্যে গুড় আনিতে গেল।

সত্য কহিল, "কি রকম হিসাবে গুড় দেবে কত্তা-দাদা?"

বড় দাদা তারাপ্রসন্ন রায় ভিয়ান কলেজের প্রফেসার। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বিজ্ঞতার সহিত এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল, "নারিকেল-পিছু তিন পা গুড় দিলেই ঠিক হবে।"

"সে কি ঠাকুরদা, গুড়ের নাড়ু হবে যে!"

"আরে ভাই, তা হোক, তা নইলে কি ভাল হয়?"

সত্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "মুড়কিগুলো সাদাটে হলো কেন?"

"ওর নিয়মই তাই, মুড়্‌কিতে যত গুড় কম্ হবে আর নারিকেলে যত গুড় বেশী হ'বে, তত জিনিষ ভাল হবে।"

সত্য একটু হাসিয়া কহিল, "ও নিয়মটা তাহ'লে এই দেশেরই, অন্য দেশে ঠিক এর উল্টো নিয়মই শোনা যায়," বলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, মহা হুলুস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। বড় গিন্নি চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "হেই মা, কি সব্বনাশ মা! মালা গুল সব বই হ'য়ে গেল? হ্যাঁরে মহেন্, তোরা সব কি কচ্ছিলি? তোদের কি হুঁস্ পবন নেই! ও মা কি হবে মা, যত পোড়া-কপালিরে সব হা করে থাকে!"

মহেন্দ্র বলিল, "আর বাবু দুটো মালার জন্যে কি ঝগড়া কত্তে যাব? তুমি গুড় বার করে দাও।"

সত্য বলিল, "দাদা, তুমি গুড় নিয়ে যাও, ওদিকে ঠাকুর-দাদা বকচেন।"

"আরে ভাই, বক্‌লে কি হবে, গুড় যে দিচ্চে না, দুটো ছ্যাঁদা ফুটা মালার জন্যে বড় মামি বকাবকি কচ্চেন।"

সত্য বলিল, "মালা নিগ্‌গে, কিন্তু দুধ নিয়ে ছড়াছড়ি করে ছেলেগুলো সব নষ্ট কচ্চে।"

গৃহিণী সক্রোধে কহিল, "হেইমা, কি হবে মা! তোরা থাক্‌তে সব দুধ্‌টা গেল গা! হায় হায়, আমি যাব নাকি? মিন্সে কোথা, কিছু বলছে না?"

সত্য। বটে! তুমি না হয় ক্ষেপেছ, মামা ত আর ক্ষেপেন নি। কোথায় কে একটা ছ্যাঁদা মালা নিলে কি একটু দুধ নিলে, তাই নিয়ে সব কাজ ফেলে রেখে ঝগড়া কত্তে যাবেন? সামান্য মালার ওপরে যদি এত মায়া, তবে দুর্গোৎসব কত্তে এসেছ কেন!"

গৃহিণী একটু থামিলে ভবতারিণী আসিয়া ভাঁড়ার ঘর হইতে গুড় বাহির করিয়া দিলেন।

যেখানে মুড়ি ভাজা হইতেছে, পাঠিকা, চল, সেইখানে যাই। ঐ দেখ, বারোজন রমণীর খোলায় যেমন হাত চলিতেছে, তেমনি মুখও চলিতেছে! মুড়ির চড় চড় শব্দ ও অনর্গল বকুনির শব্দ মিশিয়া বেশ এক অপরূপ শব্দ চালার ভিতর হইতে উত্থিত হইতেছে।

প্রসন্ন বলিতেছে, "আমার কথা লোকে ক'বে ক্যানে? আমি কি নবাবি কর্চি? আমি কষ্ট ক'ত্তে পাল্লাম না, লোকের বাবার কি?"

রাণী বলিল, "তা কর্ত্তে হয়!" দেওরের ঘরে থাকলে অনেক কষ্ট করে থাকতে হয়, নইলে ভাত হয় কি মাণিক্?"

প্র। আমি ত দেওরের ভাত খাই নাইক, ক্যানে, আমার কি বিষয় নাই ?

রা। বিষয় থাকলেই বা, বিষয় থাকলেই কি আর ডোকলামো করে খেতে হয় ?

প্র। ক্যানে খাবনা, ক্যানে ? কার নেগে রেখে যাব, আমার কটা বেটি কাঁদবে ? এবার হতে রেতে আলো জ্বেলে গুড় দিয়ে মুরি খাব। খাবনা, অম্‌নি খাব না ? ক্যানে খাবনা, ক্যানে ?

যে কয়জন রমণী মুড়ি ভাজিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সকলেই বিধবা। পল্লীগ্রামে বিধবার সংখ্যা অধিক দেখিয়াছি। যেখানে যত স্ত্রীলোক সমবেত হয় তন্মধ্যে শতকরা আশী জন বিধবা। এই বিধবারা সকলেই নিষ্ঠাবতী, একাহারী, রাত্রে মুড়ি ভিন্ন তাঁহাদের জল-যোগের আর কিছুই বড়-একটা জোটেনা। যে বড় ভাল খায় সে মুড়ির উপর গুড় খায় ও দুধ খায়। আর বড় লোকের কন্যা ব্যতীত প্রায় সকলেই অন্ধকারে জলযোগ করে, ইহাতে তাহারা অসুখী নহে। সেই জন্য প্রসন্ন নবাবির মাত্রা বাড়াইয়া বলিয়াছে, 'রাত্রে গুড় দিয়ে আলো জ্বেলে মুরি খাব।' এই বিধবা শূদ্র-কন্যারা প্রায়ই কর্ম্মিষ্ঠা, সচ্চরিত্রা, কলহ-প্রিয়া, তেজস্বিনী ও কৃপণা হয়। যে সামান্য কথা লইয়া রাণী ও প্রসন্নতে কলহ করিতে-ছিল ও গালাগালি দিতেছিল, অত সামান্য কথায় শিক্ষিতদের মধ্যে ওরূপ কলহ হয় না। একজন রাগিলেও আবার একজন চুপ করিয়া যায়। কিন্তু রাণী ও প্রসন্নর মধ্যে কেহই চুপ করিল না, অপর যাহারা সেখানে ছিল তাহারা রগড় বাধাইবার জন্য একবার এ-পক্ষে, একবার বা ও-পক্ষে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিল, ফলে তাহাদের বিবাদ ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে এইরূপ রগড় বাধানোর প্রথাটা খুব বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রসন্ন কহিল, "তোর ঘরকে ত খেতে যাই নাই।"

রাণী। তোর ঘরকেও আমি যাই নাই।

প্র। তোর মাতায় ঝেঁটা মারি।

রা। তুওর মাতায় ঝেঁটা মারি ; ক্ষেমারে গেলে তুওর ঠেং ভাঙ্গব।

প্র। আমি রা কাড়ি নাই, তুই আমাকে রাকাড়বি ক্যানেলা ?

রা। আমি আত সামাই করে থাকি, তবু আমাকেই সব নাতা নেঙ্গোড়া কর্ব্বে, নেগোড়-খাকিরা (নেগোড় পিতৃবংশ)।

গোলযোগ শুনিয়া ভবতারিণী তথায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "বলি কানে কানে, গোণ্ডোল কানে ? হাঁই-গা তো-দিকেন বেগোত্তা করি, আক্‌টুকুন থাম্, আখুনি যত মরদেরা দোরে আসবে, কত মুক্ করবে, হাঁই-মা, থাম্।" ভবতারিণীর ব্যাকুলতায় অগত্যা উভয় ধৈর্য্যবতীকে নীরব হইতে হইল। তাহাদের চ্যাঁচানির চোটে সেখানে অনেক স্ত্রীলোক জমা হইয়াছিল। এখন তাহারা সকলেই স্ব-স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিল।

ভবতারিণী একচোখে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আর খোলা বন্ধ দিলে হতোনা,—বেলা হয়েচে।"

আর একজন রমণী একটা কেনেস্তারায় মুড়ি তুলিতে তুলিতে বলিল, "আর খোলা

চড়াতেও হ'বে না, ইতিই ঢের হ'বে, ২৫ সলি চেলে মুড়ি হ'য়েচে, আর কানে ?" (২৬ সলি ১২৷৷০ মণ)

বেল যখন ৩টা, সেই সময় মুড়ি-ভাজুনীরা মুড়ির আসবাব উঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

ভব বলিল, "গৌরী যে চাল-খোলাটা নাড়চে, ঐটে ভেজে আজ বন্ধ দাও।" এমন সময় গৌরী চাল নাড়িতে নাড়িতে "ওগো মাগো, কোথা এলেম গো" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, সকলে চমকিয়া বলিল, "কি হ'ল কি হ'ল ?" গৌরী সভয়ে বলিল, "আমাকে নিশিতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল !" সকলে হাসিয়া বলিল, "তুই যাচ্ছিলি কেন ? আর দুপুরবেলা নিশি কোথায় পেলি ? তুই কি ঘুমচ্ছিলি ?"

গৌরী। না বুন্, ঘুমাই নাই,চাল নাড়্‌তে নাড়্‌তে গাটা দুল্‌ছিল, আর কে যেন আমাকে ডাক্‌লে, গৌরী বৈঁচি খাবি আয়।

মোহিনী হাসিয়া বলিল, "আ মর্, আশ্বিন মাসে বৈঁচি কোতা ?"

গৌরী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কি জানি বুন !"

যাই হোক, সে দিনকার মত বালিভাজা বোঁদের ভিয়ান বন্ধ রাখিয়া সকলে এক-একটা নারিকেলের মালাতে একটু একটু তেল লইয়া কালি-মাখা হাতে স্নান করিতে গেল।

এদিকে দত্তবাড়ীর বড় গিন্নি উহাদিগকে পৃথক পৃথক মালায় তেল লইতে দেখিয়া রাগে গরগর করিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, "যত মানুষ তত মালা, যত মানুষ তত মালা ! ঠাকুরঝির যেমন কাজ নাই, একটা মালায় কি আর-সবাইকে তেল দিলে হ'ত না", ইত্যাদি।

আজ পঞ্চমী। শম্ভু দত্তর বাড়ী অনেক কুটম্ব আসিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ভবতারিণী, জগত্তারিণী ও দিনতারিণী এই তিন ভগ্নী আসিয়াছেন এবং তাঁহারা গৃহিণীপনা করিতে-ছেন। জগত্তারিণী শঙ্করকে বকিতেছেন।

শঙ্কর। আমি কি কর্ব্বো, পরশু দিনে গাড়ী পাঠিয়েচি, আজও তাদের দেখা নাই।

জগত্তারিণী। তুই কোতা কোতা গাড়ী পাঠিয়েচিস্ ?

শ। বড় গিন্নীর বাপের বাড়ী, মেজগিন্নীর বাপের বাড়ী আর আমার শ্বশুর-বাড়ী, আর তোমাদের তিন বোনের বেহাই-বাড়ী,—আর কোথা পাঠাব ? আর সব জায়গার কুটুম্ব এসেছে।

দিনতারিণী বলিল, "দাদা, সব জায়গার কুটম্বতে ত কাজ হইবে না, তোমাদের শালিরে না এলে হেসেল চল্‌বে কি ?"

জগত্তারিণী বলিল, "ঐ গাড়ীর শব্দ হ'ল, কে আস্‌চে, দেখি !" সব বালক-বালিকা সদর দিকে ছুটিল, দিনতারিণী ও জগত্তারিণী পাছু পাছু যাইয়া সদর দিকে দাঁড়াইল।

দুইখানা চাটা-ঘেরা গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়োয়ান "হা-হা" শব্দ করিয়া গাড়ী থামাইল ও নিজে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া গরুর কাঁধ হইতে গাড়ীর যোয়াল খুলিয়া দিয়া মোড়টা মাটিতে নামাইয়া ফেলিল। অমনি গাড়ীর ভিতর হইতে "মা গো, বাবা গো, মাথা ঠুকে গেল, ঘাড়ে পুঁট্‌লি পড়ে গেল, দিদি তুই আমার উপর পড়্‌লি কেন ? দাদা সরে যা না" ইত্যাদি একটা মহা-কোলাহল উঠিল, পরে কিল বিল করিয়া ছেলে-মেয়ে সেই চাটাই-ঘেরার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে

লাগিল। তাহাদের রূপ-বর্ণনা আর কত করিব, সংক্ষেপে একটু পরিচয় দি। ছেলে-মেয়ে, সকলকারি কোরা কাপড় পরা। ছেলেগুলার গায়ে কোট ও কামিজ আছে, তাহার বোতাম নাই। কাহারও জামা পুঁটুলিরূপে কক্ষ মধ্যে, কাহারও জুতা হাতে, চাদর স্থূল উদরের উপর বেষ্টিত। বালিকাদের তেল-ধরা ফিতা ও চুলের দড়ি জড়ানো খোঁপা, তাহাতে রূপার পান, মাছ, গুঁজিকাঠি, লোহা ও তাম্রের কাঁটা কাহারও বা বড় বড় বাতাবি লেবুর ও সজারুর কাঁটায় মস্তক সজ্জিত হইয়া আছে। কানে ময়লা-ধরা কপিপাতা, মরা সোনার মাকড়ী, নাকে মাকড়ি আছে, নোলক নাই। কাহারও বা নোলক অধর পর্য্যন্ত লম্বিত, জ্যোতিহীন। বিবাহিতা বালিকাদের কণ্ঠে পাঁচনলি, অবিবাহিতা বালিকাদের পদক,মাদুলী,কাঁকালে রৌপ্যনির্ম্মিত বোরপাটী, পায়ে সকলকারই মল।

পরে কয়েকজন গৃহিণী নামিলেন। সধবাদের মধ্যে শাঁখা-হাতে দুই-চারিখানি অলঙ্কার যাহা আছে তাহা খুব পূর্ব্বকালের। চারিজন বিধবা নামিলেন, তাঁহাদের দেখিবামাত্র জগত্তারিণী ও দিনতারিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কুটুম্ব হয়ে এলেন্ ভোজ খেতে, তোয়ের করে কে? তিনদিন গাড়ী গেছে, আজ এলেন পূজা দেখ্‌তে—"

কুটুম্বিনীরা নানা মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন; ক্রমে সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সহর-অঞ্চলে কর্ম্ম-বাটীতে অগ্রে শ্যালক-শ্যালিকা তৎ পুত্র-কন্যা আসার পর কর্ম্মের দিনে "ছাত্রী ভৃত্য রহিতে নাগন্তব্যম্" মর্ম্মে নিমন্ত্রণ-পত্র যাইবার পথ রোধ করিয়া ভগ্নীর কাছে যায়। কিন্তু পল্লীগ্রামে তাহা নহে। অগ্রে ভগ্নী-ভাগিনেয় আসার পর অন্য কুটুম্বরা আসেন।

এদিকে কুটুম্বেরা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলে পর একটা মহা হাউ-চাউ পড়িয়া গেল। বাড়ীর ছেলেরা ও পাড়া-প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়েরা কুটুম্বদের ঘেরিয়া গোলযোগ করিতে লাগিল। বড়-গিন্নী সকলকেই জলখাবার দিতে গেলেন, প্রত্যেকের অঞ্চলে মুড়ি-মুড়কি ও নারিকেল-নাড়ু দিলেন, ছেলেরা মহা আনন্দে ঠাকুর দেখিতে গেল, কারণ ঠাকুর সাজাইতেছে।

আজ ষষ্ঠী। দেশ-দেশান্তরে তত্ত্ব লইয়া কত-লোক যাতায়াত করিতেছে। কত গ্রাম হইতে দত্ত বাড়ীতে তত্ত্ব আসিল,বাতাসা, কদ্‌মা,ওলা। কত ইতর পুরুষ ও রমণী দত্ত-বাড়ীতে প্রবেশ করিল, শান্তিপুরে, ঢাকাই, বরাহ-নগরের, লালবাগানের কাপড় আসিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও মন উঠিল না। সকলেই বলিল "সুতার কাপড় দেওয়া কেন? উওকি আজকাল রেওজ আছে! এখন বোম্বাই, পার্শী, মান্দ্রাজি কাপড় উঠেছে।"

ভবতারিণী বলিল, "তখনকার কেরাপের কাপড় আর বেলোয়ারি চুড়ি, তার কাছে কেউ নয়!"

আর এক বৃদ্ধা বলিল "নীলাম্বরী কাপড়ের কাছে কোন কাপড় নয়!"

মধ্যম গৃহিণী রন্ধন-শালা হইতে কালী-হরিদ্রা-মাখা বস্ত্র পরিধান করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, "না বাবু, কাপড় বেশ দিয়েচে, খাসা দিয়েচে, কিন্তু ঐ ছোঁটনের শিশিটা না

দিয়ে মাথা-ঘষা দিত আর রেশমি চুড়ি না দিয়ে যদি শাঁখা দিত, তাহলে সোন্দর দেওয়া হ'ত।" যেমন বলা অম্‌নি যুবতী-মহলে হাস্য-ধ্বনি ও করতালি উঠিল। ইহা সাধারণের পক্ষে বিশেষ কিছু না হইলেও বৃদ্ধার পক্ষে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তাঁহার পক্ষসমর্থন করা দূরে থাক্ তাঁহার বহু কনিষ্ঠা কন্যাতুল্যারা ঠাট্টা করিতেছে দেখিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়া রন্ধন-শালায় পলাইলেন।

এদিকে সদর-বাটীতে পূজার আয়োজন হইতেছে। আজি ষষ্ঠ্যাদি। কল্ল, আজ ছেলেরা জামাতারা সকলেই উপস্থিত। পূজা-মণ্ডপে দুইজন ভট্টাচার্য্য গুরু-গম্ভীর ভাবে গুড়ুক টানিতে টানিতে উদ্যোগীদিগকে ফরমাস্ করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে একটি একটি সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়িয়া কিসের স্থলে কি দেওয়া যাইতে পারে, তাহার প্রমাণ দিয়া নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন।

পূজক বলিলেন, "দেখ মহেন, কা-কা-কা কাপড়—আন।"

মহেন্দ্র বলিল, "কাপড় নয় দাদাঠাকুর, গামছা, একখানা গামছার দর কত জান?"

পূজক। গা-গা-গা গামছা দিয়ে পূজো! আমরা কি বেগার দিতে এসেচি?

মহেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, তন্ত্রধারক বাধা দিয়া বলিল, "বানু বরণের কাপড় চাই না? বরণের কাপড়!"

মহেন্দ্র বলিল, "বরণ কিসের ঠাকুর? তুমি ভারি পণ্ডিত আর আমরা মুরুক্ষু নাকি? আমি তিন বছর মামার বাড়ীতে পূজার যোগাড় কচ্চি, আমি জানি না? আমাদের আজ বরণ হয় না, সেই অষ্টমীর দিনে বরণ হয়।"

তন্ত্র-ধারক বলিলেন, "বরণ আজই হয়, তুমি জাননা।"

মহেন্দ্র চটিয়া গিয়া বলিল, "আমি আবার জানিনা কি? নারিকেল সন্দেশ মুড়কি ভিয়ান ক'রে ক'রে হাতে কড়া পড়ে গেল, আর তুমি—"

এমন সময় রামপদ আসিয়া পড়িয়া বলিল, "কিরে মহেন, গোল কচ্চিস্ কেন?"

"ঠাকুর-মশাই বলচে আজ 'বরণের কাপড় আন।' আজ বরণ কিসের?"

রাম বিনীতভাবে বলিল, "আচ্ছা দাঁড়ান্, বাবাকে ডাকি", বলিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণে শম্ভু ও শঙ্কর রামের সহিত পূজার দালানে আসিল।

তন্ত্রধারক বলিলেন, "দত্ত-মশাই, আজ কি তোমাদের বরণ হয় না?"

শম্ভু। ওটা কি জানেন ভট্‌চায্-মশাই, প্রথম যেবার পূজা হয় সেবার বরণের কাপড় কিন্‌তে ভুল হয়, সেইজন্যে পুরোহিত-মশাই আমাদের নিকট পান-সুপারি-পইতে ইত্যাদি নিয়ে ব্রতী হয়েছিলেন,পরে অষ্টমীর দিন কাপড় দেওয়া হয়েছিল, সেই অবধি প্রতি বৎসর অষ্টমীর দিন কাপড় দেওয়া হয়।

তন্ত্র। সেই বৎসরই না-হয় কাপড় উপস্থিত ছিল না, তার পর বৎসর থেকে কেন ষষ্ঠীর দিন কাপড় দিয়ে বরণের ব্যবস্থা করেন নি?

শ। সেটায় আমার দিদির বেশ মন ওঠে না। দিদি বলে যেটা প্রথম বৎসর হয় সেইটা প্রতি বৎসর কত্তে হয়, দিদির মনটা বড় খুঁৎখুঁতে।

তন্ত্র-ধারক হাসিয়া বলিলেন, "এক-বৎসর

অভাব ছিল ব'লে যে প্রতি বৎসর সেই অভাবই রাখতে হবে, সেটা ঠিক নয়।"

শ। তা দেখুন, প্রথম বৎসর পূজার মাছ ধর্‌বার সময় পুষ্করিণী থেকে পোনা মাছের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর মাগুর মাছ পড়েছিল সেই অবধি প্রতিবার পুকুর মাগুর মাছ না উঠলেও যে-কোন উপায়ে যোগাড় কর্ত্তে হয়, দিদি বলে হঁদ (হঁদ পূর্ব্ব প্রথা) নড়াতে নেই।

তন্ত্র। দেখ, তোমার কথা শুনে আমাদের পাড়ার একটা ঘটনা মনে পড়ল, আমাদের পাড়ায় একঘর গৃহস্থ আছেন, তাঁদের বাড়ীতে কাজ-কর্ম্ম হ'লে তারা একটা বিড়ালের মাথায় ঘী মাখিয়ে ছেড়ে দেয়। কারণ জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম, পূর্ব্বকালে তাদের একটা বিড়াল পোষা ছিল, কোন কাজ-কর্ম্ম হ'লে বিড়ালটা ভারি জ্বালাতন করত, সকল দ্রব্যে মুখ দিত। সেইজন্য বাড়ীর কর্ত্তা একবার বিড়ালটাকে ধরে তার মাথায় ঘৃত মাখিয়ে বাটী হ'তে তাড়িয়ে দেন। বিড়ালটা সমস্ত দিন বাড়ীর বাইরে বসে মাথায় হাত বুলায়, আর হাত চাট্‌তে থাকে, যতক্ষণ ঘৃতের গন্ধ পায়, ততক্ষণ ঐরকম হাত চাট্‌তে থাকে। অনেক দিন হ'ল সে বিড়ালটা মরে গেছে, কিন্তু তারা পূর্ব্ব-প্রথা বজায় রাখ্‌বার জন্যে অন্য একটা বিড়াল এনে তাহার মাথাতেই পূর্ব্ব-প্রথা বজায় রাখে।

দত্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কি করি বলুন, দিদির অমত, তা আজ পান, সুপারি-পৈতা দিয়ে বরণ হোক, সেইদিন কাপড় দেওয়া যাবে।"

অগত্যা তাহাই হইল। শম্ভুদত্ত বরণ-কার্য্য শেষ করিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ্‌ মহেন, পূজার সমস্ত আয়োজনের ভার তোর উপর রইল, যেন পুরোহিত-মহাশয়দের কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি না হয়, আবশ্যক হ'লে আমাকে ডাকবি। আমি ওদিক দেখিগে।"

শম্ভু চলিয়া গেল, ঠাকুর-দালানে সত্য-কিঙ্কর ও মহেন পূজার উদ্যোগী রহিল। তন্ত্র-ধারক বলিলেন, "মহেন, ষষ্ঠী আর বেশীক্ষণ নাই, দশটার পর সপ্তমী পড়্‌বে, যোগাড় ক'রে দাও, ষষ্ঠ্যাদি কল্প হয়ে যাক্।"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সেকি ঠাকুর-মশাই, এইত মোটে জল-খাবারের বেলা, এখনি কল্প কি-রকম!"

তন্ত্র। আর মহেন, তুমি কি পণ্ডিতই হ'য়েচ! পাঁজিতে লিখচে যে, ৯॥০ ঘটিকার সময় সপ্তমী পড়্‌বে, আর তোমার মতে দুপুর-বেলা, সকল বিষয়েই অত বাহাদুরি কর কেন?"

ম। অত পাঁজি-পুঁথি বুঝিনে মশাই, যেবার পূজা আসে সেবার কৃষেণ রাখাল বেল নিয়ে গেল, আর কল্প আরম্ভ হ'ল।

পূজক এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, আর তিনি থাকিতে পারিলেন না, সক্রোধে বলিলেন, "তো-তো-তো-তোমার এত বা-বা-বাক্‌চাতুরী কেন হে! যা-যা-যা বল্‌চি তাই শো—শোন!"

পূজকের তো-তো চেঁচামেচি শুনিয়া সেখানে কালীপদ ও শঙ্কর আসিল ও ব্যাপার বুঝিয়া মহেন্দ্রকে বলিল, "মহেন, তুই এখানে থাকলে ত চল্‌বে না! জেলে আসে নি! পুকুরটায় দু খেপ জাল ফ্যা ল্‌না।"

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে সদর দোরে গাড়ীর

শব্দ পাইয়া কালীপদ ও আরও দুই-একজন ব্যক্তি তথায় গিয়া দাঁড়াইল। শ্যামাপদ, হরিপদ, বামাপদ ও দুর্গাপদ এই কয় ভাই বর্দ্ধমানে থাকে। শ্যামাপদ ও দুর্গাপদ ইহারা চাকরি করে, বামাপদ ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে, হরিপদ স্কুলে পড়ে। ইহারা আজ পূজায় উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিল, এক গাড়ীতে আপনারা আসিল ও অন্য গাড়ীতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিল। নূতন আলু, ফুলকপি, গাঁট্‌রি-গাঁট্‌রি কাপড়, ছোট জুতা, জামা, সীতা-ভোগ মিহিদানা খাজা, সবেদা বেসম ময়দা সুজি চিনি ঘৃত নানা দ্রব্য আনিয়াছে। নৈবেদ্যে দিবার জন্য বাদাম পেস্তা আঙুর আখরোট্ কিসমিস্ ইত্যাদিও আনিয়াছে। ভ্রাতারা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীতে একটা গোলযোগ পড়িয়া গেল। কৃষাণেরা মোট বহিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। সকল রমণীই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমরা আজ এলে কানে? এত দেরী হ'ল কিসের লেগে? রাম আর কালি দুটি ভেয়ে সারা হ'য়ে গেল।"

শ্যাম। কেন মহেন-দাদা, সত্য, সুরেন, তিনকড়ি যেতে তারা আসে নি?

ভব। এয়েচে বইকি, তারা এই দুদিন এয়েচে।

দুর্গা। আসবো কি পিশিমা, আম আঙুর আর তরমুজ আনবো ব'লে মেজদাদা এত দেরি ক'রে এলেন! আগে থাক্‌তে এলে সেগুলো সব নষ্ট হ'বে সেইজন্যে আজ ষষ্ঠীর দিন এলাম।

ভব। হ্যাঁরে দুগ্‌গা! আঙুল কেমন, সে কি-রকম দেখাস্ দেখি?

হরি। আঙ্গুল নয় পিশিমা আঙুর—সে তুমি দেখ নি, দেখাব এখন।

ভবতারিণী বলিল, "ও জগৎ, ছেলে-দিকেন জল খেতে দে।"

বাড়ীর বউ-ঝী সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি মোট পুঁটুলি খুলিতে বসিল। বড়গিন্নি ও ছোটগিন্নি দুইজনে সমস্ত দ্রব্যাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিল।

যত কুটুম্ব আসিয়াছে তাহাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মস্ত এক কাজ পাইয়াছে; গাড়ু-বাল্‌তি লইয়া ছাদের উপর ক্রমাগত জল তুলিতেছে আর ঢালিতেছে, নল দিয়া জল পড়িতেছে, সকলে অবাক হইয়া দেখিতেছে। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে যখন যাহার চোখে পড়িতেছে, সে এক-একবার তাড়া দিতেছে। বাড়ীময় মুড়ি-মুড়কি ছড়াছড়ি, বধূরা অনবরত ঝাঁট্ দিয়া তাহা পরিষ্কার করিতেছে। বড় গিন্নি নিজ পুত্রদের ও দেবর-পুত্রদের বলিল, "হ্যাঁরে, অত ঘি-ময়দা বেসম-চিনি কানে? যত সব বাজে খরচ!"

শ্যা। মা, অন্য বৎসরে নারকেল-নাড়ুতে সব সারা হয়, আমরা সহরে থাকি আমাদের ইচ্ছা যে এবার ভালরকম ক'রে সকলকে খাওয়াব। অন্য বৎসর কেবল আমাদের জাত ও ছোটলোক খাওয়ান হয়, এবার আমাদের ইচ্ছা যে, ব্রাহ্মণদের মেয়ে ও পুরুষদিগকে লুচি ক'রে খাওয়ানো সেইজন্যে ওই সব কিনে এনেচি।

গ্। কানে, আত কানে? ও বাপ্‌রে, "পায় না সেয়ান মুড়ি লুচি-মোণ্ডা গড়াগড়ি!" আমি এবার মনে, করেচি চিঁড়ে-দই ক'রে বামুন-দিকেন খাওয়াব—তাতে ও-সব কানে?

দুর্গা। কেন জ্যেঠা-মশাইকে বাবাকে বড়দাদাকে আমরা ত পত্র দিয়ে জেনেচি, তাঁরা ত কেউ অমত করেন-নি!

গৃ। তাদের কি বল, তারা ত টাকাগুলো সব বাজে ছড়াবে ওড়াবে।

শ্যাম। (বাধা দিয়া বলিল) তা বটে, বাবা ওড়াচ্চেন, আর যত রোজগার কর্‌চেন মা। ঘরে বসে বসে যত উপায় মায়ের!

গৃহিণী সক্রোধে বলিলেন, "তা বল্‌বো না? অত খাজা গজা আন্‌লি কানে, উয়োগুলো বাজে-খরচ নয়?"

শ্যা। বাজে-খরচ কিসে মা? ওই সব জামাই এসেচে, এদিকে জল খেতে দিচ্চ কি? দেশে একে কিছু মেলেনা, ঐ-সব জিনিষ জামাইদের জল খেতে দিও।

গৃ। কানে, মুড়ি-মুড়্‌কি ভিজিয়ে দি, আবার কি খেতে হয়! ভারি ত বড়লোকের বেটা সব!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা-বর্জ্জন

(৬)

কথাটা হচ্ছিল আধ্যাত্মিক শক্তির বলবত্তার বিষয়ে। গতবারে তিনটী প্রমাণের উল্লেখ করেছিলেম। (১) আধ্যাত্মিক শক্তির আবির্ভাব ও ক্রমশঃ অভিব্যক্তি। (২) মনুষ্য সমাজের প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব। (৩) বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রচার ও প্রভাব। প্রমাণগুলির একটু আলোচনা করা দরকার।

(১) আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ—কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন্ শুভক্ষণে মানুষের জীবচেতনার কালো কঠিন নিকষের উপর স্বর্গীয় প্রেমের সোনার রেখা প্রথম ফুটে উঠেছিল তা জানিনে। বোধ হয়—জানার উপায়ও নেই। তবে লক্ষ যুগের শিক্ষা, সাধনা ও সংযমের পরও মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলির যেমন প্রবলতা আজও দেখা যায়, তাতে এ কথা নিশ্চয় যে, সে সময়ে মানুষ বন্য জন্তুর চেয়ে বিশেষ শ্রেষ্ঠ ছিল না। এই আদিম মানুষের চরিত্রটাকে ভীষণ শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য বলে বর্ণনা করলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। এই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে কোথা হতে এসে পড়ল—সরল সুন্দর শুভ্র এক স্বর্গীয় দেব-শিশু—এত সুকুমার, এত অসহায় যে দেখলে মনটা করুণায় আপনা হতেই ভরে উঠতে পারত। মনে হতো, আহা, এই সুকুমার দেহে বাঘ-ভালুকের খর নখদন্তের কথা দূরে থাক্, তাদের নিশ্বাসটুকুও যে সইবেনা। ঠিক যেন মেনকা-পরিত্যক্ত সদ্যোজাত শকুন্তলা! কে কল্পনা করতে পারতো, এই অতি সুকোমল দুধের ফেনার মতো মেয়েটী সব-রকম বাধা-বিপদ কাটিয়ে একদিন ভারতবর্ষের সম্রাটের জননী হবে। ব্যাপারটী আরো সুন্দররূপে ফুটে উঠবে—যদি তপস্যা-নিরত ধ্রুবের ছবিটী মনে করা যায়। এই যে সুন্দর সুকুমার শিশু প্রতি মুহূর্ত্তের সম্ভবপর মৃত্যুর ঠিক মুখের সামনে বসে তপস্যা করছে—ওরি জন্য রচিত হচ্ছে এমন এক দিব্য লোক, এই সাগরাম্বরা ধরণীর একটী ধূলিকণা অবশিষ্ট না থাকলেও, যা সমান মহিমাতেই বিরাজ করবে।

এই যে ছবিটী দিলাম, এটী কেবল মানুষের অন্তরের প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের ছবি। বাইরের প্রতিকূলতাটা আবার তার চেয়েও প্রবল। এই দু' রকম প্রতিকূলতার দুর্জ্জয় বাধা কাটিয়ে যে আপনাকে বিকশিত করে তুলতে পেরেছে, তার বল যে ঐ প্রতিকূলতার শক্তির চেয়ে অনেক বেশী, সে কথা লেখাই বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে একটা অবান্তর কথা মনে উঠছে। ধর্ম্মবোধের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে কোনো কথা উঠলেই অনেকে অত্যন্ত কাজের লোকের মতো গুরু-গম্ভীর গলায় উপেক্ষাভরে বলে ওঠেন —"রেখে দেন মশায় ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচারের কথা। ও-সব বাবুগিরি তাদেরি পোষায়, যাদের বালামের ভাবনা ভাবতে হয় না।" এই সব অতি-বিজ্ঞদের নিকট আমার এই মিনতি, তাঁরা আদিম মানুষের বালামের ভাবনা ও আপনাকে বাঁকিয়ে রাখার অবিশ্রান্ত দুরন্ত চেষ্টার কথাটা স্মরণ করে দেখবেন। অথচ সেই অবস্থার মধ্যে দিয়েই মানুষের ধর্ম্ম-বোধ ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

২। আধ্যাত্মিক শক্তির বল যে অন্য সকল শক্তির চেয়ে ঢের বেশী, মানুষের সমাজই তার দ্বিতীয় প্রমাণ।

মানুষ কবে যে কেমন করে সমাজ গড়া সুরু করলে, সে একটা দুর্ভেদ্য রহস্য। সে কোন অলঙ্ঘণীয় শক্তির প্রচণ্ড আত্মবিস্মৃত অন্ধ প্রেরণা যার বশে মানুষ আপনার দুর্দ্দমনীয় আদিম প্রবৃত্তির মুখে লাগাম পরিয়ে দশজনের সঙ্গে মিলে-মিশে বাস না করে থাকতে পারলে না, তা ঠিক করে বলা কঠিন! প্রাচীনেরা এই মিলনের তত্ত্বের মধ্যে ঐশী শক্তির প্রেরণা দেখতেন। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে বিরাট পুরুষ বা ব্রহ্মাণ্ড দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গস্বরূপ যে তাঁরা দেখতেন বা সেই সব অঙ্গ হতে উদ্ভূত বলে বর্ণনা করতেন—সে কেবল তাঁদের অভ্যস্ত রূপকের ভাষায়—এই তত্ত্বটীরই প্রকাশ। সোজা ভাষায় বলতে গেলে মানুষ যে মানুষের সঙ্গে মিশেছে, সে একটা গভীর গোপন প্রাণের টানে। নইলে তার একে-বারেই চলতে পারে না। চলতে পারে না মানে যে তার কারবার কারখানা কাগজ বা ওকালতিটাই চলতে পারে না, শুধু তাই নয়; তার আসল কাজটাই অচল হয়ে পড়ে। তার আসল কাজটা যে ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল বেগে ছোটার ক্ষমতা লাভ বা হাজার লোকের কাজ দশজন লোকের দ্বারা সারা নয়, সে কথা বোধ হয় বলার দরকার নেই। সে আসল কাজ হচ্ছে সকলের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করে তোলা—আপনার পরম চরিতার্থতা লাভ করা। সুতরাং কেবল স্বার্থরক্ষার জন্য নয় পরমার্থ লাভের জন্যই আরো বিশেষ করে সমাজ-রচনা অপরিহার্য্য।

কবির ভাষায়—

Nothing in the World is single
All things by a law Divine
In one another's being mingle.

এইটেই হলো সমাজ-রচনার গোড়ার কথা।

কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া তাঁরা এক পাও চলেন না, এইটেই হলো নব্যদের সব-চেয়ে গর্ব্বের বিষয়। সেইজন্য পরমার্থ জিনিষটাকে তাঁরা একরূপ নিরর্থকই মনে করেন। অন্য পক্ষে স্বার্থ পদার্থটীর মানে একেবারে সুস্পষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট। সে মানে কঠিন পাষাণের মতোই গায়ে বাজে। কাজেই স্বার্থের পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে যে এই বিরাট সমাজ-সৌধটী গেঁথে তোলা হয়েছে, এইটে প্রমাণ করার জন্য তাঁরা কোমর বেঁধে লেগে পড়েন। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন প্রণালীর সঙ্গে নব্য প্রণালীর তুলনা করে দেখবার লোভটা ছাড়তে পারচিনে। প্রাচীনেরা কল্পনা বা অত্যুক্তির নিতান্ত কাঁচা বনেদের উপর গড়ে তুলতেন এমন-একটা চির সত্যের বিপুল পুরী, মানুষ যেখানে চিরদিনের জন্য অনায়াসে আশ্রয় লাভ করতে পারত। কিন্তু সাবধান! ভিত্তিটাকে যেন নাড়া দিওনা, তাহলেই বিপদ। আর নব্যেরা ভিতরটাকে এমন পোক্ত করে গড়েন যে হাজার গণ্ডা কামানের গোলাতেও তার চূণটুকু খসাতে পারে না। কিন্তু পুরীটি যা গড়ে তোলেন তা নিছক মরীচিকা-পুরী। চিরদিনের আশ্রয়-যোগ্য হওয়া দূরে থাক্, তাতে পান্থশালার কাজটাও ভাল করে চলতে পারে না।

স্বার্থের পর সুবিধা-বোধের উপর সমাজের পত্তন, এ মতটা বহু পণ্ডিত বহুপ্রকারে প্রচার করেছেন। এইসব থিওরিগুলির মধ্যে যাদের সরলতার গুণটা আছে তাদের দোষ-ত্রুটি-গুলিও সহজে চোখে পড়ায় তারা একরূপ বাতিল হয়ে গেছে। Hobbes এর Social Compact বা সামাজিক চুক্তির থিওরিটা আজকাল স্কুলের ছেলেদেরও হাস্য উদ্রেক করে। কিন্তু যেগুলির বর্ণনায় রকমারি ও পারিপাট্য আছে, তারা আজও এক রকম পশার রক্ষা করে চলছে। তাদের ছদ্মবেশটা এখনো তেমন ভাল রকম ধরা পড়েনি।

স্বার্থ-বোধের উপর সমাজের পত্তন এই মতটাকে ঠিক মতো মানতে হলে আদিম মানুষের মন যে পরার্থপতা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি ভাবের অতি ক্ষীণ রেখাপাতটুকু হতেও সম্পূর্ণ মুক্ত এই কথাই মানতে হবে; এক মন হতে আর এক মনে যাওয়ার ছোট খিড়কী দুয়ারটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করার যো নাই! সেখানে আছে কেবল আপনার স্বার্থ-বোধ ও কতকটা বুদ্ধি। এই দুটী উপাদানের হরেক রকম সংমিশ্রন ও ঘাত-প্রতি-ঘাত হতে গড়ে উঠেছে বিপুল জটিল মানব সমাজ ও মানুষের সামাজিক মন। এই গড়ে ওঠার পদ্ধতিটা এই রকম—সকলেই নিজের নিজের স্বার্থের তাড়নায় দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। এইরূপ দিশাহারা ছুটাছুটির ফল যে ঘন ঘন পরস্পরের মাথা ঠোকাঠুকি, সে কথা বুঝতেই পারছেনে। এই মাথা ঠোকা-ঠুকি ব্যাপারটী মোটেই আরামের নয়, কাজেই ছুটাছুটির পাল্লাটাকে চৌহদ্দী-বদ্ধ করে নিতে হলো। এই চৌহদ্দীটা হলো অপরের স্বার্থ। সম্ভবতঃ এরূপ League of Tribes বা League of Clans বা League of Individuals বা ঐ রকম কোন একটী অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

সে যাই হোক এই চৌহদ্দীটা একটা প্রকাণ্ড নিষেধ একটা বিরাট না রূপে তার স্বার্থের চারিদিক আগলে রইল। না হতে কখনও হাঁ জন্মে না। লক্ষ বৎসরেও না। পরের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের বাধা-বিঘ্নরূপে দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময়ে তার উপর দরদ জন্মে গেল, একটা থিওরি প্রচারের উৎসাহ না থাকলে এ কথা কিছুতেই সহজে মনে হয় না। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, এই দরদটাই সমাজকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছ। মহাপুরুষদের তো কথাই নাই—তাঁদের পরের স্বার্থের উপর দরদটা এত বেশী যে তার খাতিরে নিজের চূড়ান্ততম স্বার্থ অর্থাৎ প্রাণটাকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে থাকেন। সাধারণ লোকের মধ্যেও পরের স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা সচরাচরই দেখা গিয়ে থাকে। এত সচরাচর যে যাদের মধ্যে দেখা যায় না তারা সমাজের চোখে হেয় হয়ে পড়ে। এই শ্রদ্ধা জিনিষটা একটী ভাবাত্মক পদার্থ। সুতরাং নিষেধ যত সনাতনই হোক না কেন, এ ভাবের জন্ম সে দিতে পারে না। আসল কথা রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে যাকে 'তত্ত্ব' বলেছেন, স্বার্থ-বোধ সেরূপ একটা 'তত্ত্ব' নয়। এর মধ্যে সৃষ্টির বীজ নাই—গড়ে তোলবার শক্তি নাই। ঠিক এই কারণেই League of Nations এর মতো অত বড় ব্যাপারটীও রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেনি।

আশঙ্কা হয় এ প্রণালীর বিচারটা অনেকের মনঃপূত হবে না। তাঁরা একে ভাবুকের ভাবোচ্ছ্বাসের ভাবেই দেখবেন। ধরতে ছুঁতে পারা যায় এমনতরো মোটাসোটা গোছের প্রমাণ তাঁরা চান। সুতরাং একবার কঠিন মাটীতে নামা দরকার। একথা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবেন না যে শিক্ষায় দীক্ষায় বিদ্যা-বুদ্ধি সংযমে এখনকার মানুষ সেই আদিম যুগের মানুষের চেয়ে অনেক উন্নতি লাভ করেছে! সুতরাং বুদ্ধির বলে, স্বার্থরক্ষার প্রেরণায় স্বার্থত্যাগ করে বিবাদ মেটানো যদি সম্ভবপর হতো তাহলে ও জিনিষটা ঘর-ঘর দেখতে পাওয়া যেতো। কিন্তু ব্যক্তিগতই হোক বা জাতি-গতই হোক প্রায় কোনও বিপদেরই প্রায় এরূপ ভদ্রজনো-চিত মীমাংসা হতে দেখা যায় না। ন্যায়বাগীশ সার্ব্বভৌম Ph.D.LL D, ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মনি আমেরিকা এবং সাঁওতাল ভীল নাগা কুকি, এরূপ ক্ষেত্রে সকলের আচরণই হরেদরে একরকম। বরঞ্চ বিদ্যাবাগীশ মশায়দের আচরণটাই আরো অদ্ভুত মনে হয়; কারণ তাঁরা নিশ্চিত সর্ব্বনাশের চিত্রটী আরো দেদীপ্যমান রূপেই দেখতে পান। মকর্দ্দমায় কোনও পক্ষেরই লাভ হয় না, এ কথা বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষই বেশ জানেন; অথচ আদালতের বহর ও বাহার সকল সভ্য দেশেই উত্তরোত্তর বেড়েই চলেচে। এত বড় জল-জীয়ন্ত ব্যাপারটা অনুক্ষণ চোখের সামনে জেগে থাকা সত্ত্বেও এই সব প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞানাভি-মানীরা—স্বার্থ-বোধের দ্বারা স্বার্থের সংকোচ ঘটেছে এই অদ্ভুত কল্পনাটাকে যে কি করে

বৈজ্ঞানিক সত্য বলে চালান, সে কথা বুঝে ওঠা শক্ত !

কিন্তু সমাজ যখন আছে, তখন এ কথা একেবারে নিশ্চিত যে মানুষকে প্রতিপদেই আপনার স্বার্থকে সংযত করে চলতে হচ্ছে। বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ স্বার্থরক্ষার সুবিধা-বোধের দ্বারা সে কাজ যে হতে পারে না, পূর্ব্বেই তা দেখানো হয়েছে। সুতরাং সে কি শক্তি, যার দ্বারা এটা সম্ভব হয়েছে—এই প্রশ্নের মীমাংসা দরকার। যে শক্তি মানুষের অনুভূতিকে আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই পাক খাইয়ে শুধু ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করে, সে শক্তির যে এ সাধ্য থাকতে পারেনা, সে কথা লেখাই বাহুল্য মাত্র। এ সেই শক্তি, যা মানুষকে আপনার মধ্য হতে টেনে বাইরে নিয়ে আসে—তার অনুভূতিকে সকলের অনুভূতির সঙ্গে যোগ করে দেয়, অপরের সুখ-দুঃখের তালে তার মনের ছন্দ বেঁধে দেয়। এই ছন্দই সমাজের গভীর প্রাণের ছন্দ। সংসারে হিংসা-দ্বেষ দম্ভ লোভ প্রভৃতি বিরোধী শক্তির অন্ত নাই—তা সত্ত্বেও সমাজ যে ছিন্ন-ডোর মালার মত খসে পড়েনি, এ হতে অকাট্যরূপে প্রমাণ হয় যে ঐ সব বেতালা গণ্ডগোলের চেয়ে সমাজের অন্তরের মিলনের ছন্দ অনেক বেশী শক্তিশালী। যখন খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচার করা যায়—ব্যক্তিগতভাবে মানুষের উপর নজর পড়ে, তখন "দোষ গণইতে নাহি গুণলেশ মিলব" এবং মনটা একেবারে নিরাশায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু অখণ্ডভাবে দেখলে তখনি বুঝতে পারা যায় যে ঐ-সব দোষ-ত্রুটি অসম্পূর্ণতার মধ্যে দিয়েই ধর্ম্ম ও প্রেম ক্রমশঃ জয়ী হয়ে উঠেছে। এ এক অদ্ভুত রহস্য !

প্রেম ও আধ্যাত্মিক শক্তির বল যে কত বেশী কোনও সমাজের অরাজক অবস্থার ইতিহাস গভীর ভাবে আলোচনা করলে তা আরো স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। অনেক পণ্ডিত লোকের বিশ্বাস যে মানুষ শায়েস্তা থাকে কেবল পুলিশের ভয়ে আর পেনাল কোডই ধর্ম্মজ্ঞানের জন্মদাতা ! কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। চূড়ান্ত অরাজকতার অবস্থায় পুলিশ থাকে না—পেনাল কোড তো নয়ই। কিন্তু তবুও সমাজ থাকে। সে অবস্থাতেও চোর ডাকাত বদমায়েসরা সমাজের বাহিরেই থাকে। যদিও সে সময় তাদের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়, তবুও সমাজভুক্ত লোকের সংখ্যার তুলনায় সে সংখ্যা একরূপ নগণ্যেরই সামিল। সমাজের অন্তরে অন্তরে ধর্ম্মের শক্তি স্বার্থ লোভ প্রভৃতি বিরোধী শক্তির উপর জয়ী হয়ে কাজ না করলে এরূপ কখনই হতে পারত না।

ধর্ম্মই যে জয়ী হয়, মানুষ এ কথাটা এত গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে ধর্ম্মভাব না থাকলেও জয়ের লোভে সে তার ভাণ করতে বাধ্য হয়। এই জন্যই সমাজে এত কপটতা আর ভণ্ডামি। ওই ভণ্ডামি জিনিষটা যতই হেয় ও নিন্দিত হোক না কেন, ওটা আসলে অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্মের প্রতি পূজা-নিবেদন—ধর্ম্মের শক্তি যে বেশী সেইটেই স্বীকার করা। গত মহাযুদ্ধের সময় উভয় পক্ষই প্রাণপণ আগ্রহে কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে ন্যায় ও ধর্ম্ম তাঁরই পক্ষে। League of Nations খুব ভাল রকমই জানেন যে তাঁর আসল বল নির্ভর করছে লোকের শ্রদ্ধার উপর। সেই জন্যই আসল উদ্দেশ্যটাকে

গোপন করে, বার বার তাঁকে গলা বাহির করে ঘোষণা করতে হচ্ছে—তাঁর একমাত্র ব্রত জগতে চিরশান্তি-সংস্থাপন। ঠিক এই কারণেই ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে মাঝে মাঝে রাজকীয় ঘোষণা পত্রের অবতারণা করে ধর্ম্মাশোকের রাজত্বের অভিনয় করতে হয়, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ন্যায় বিচার হচ্ছে, এই কথাটা শোনাবার জন্য গলা সাধতে হয়, বাঁধনের মোটা সন্তবতঃ অনাবশ্যক কাছি-গুলি কেটে দিয়ে, সূক্ষ্ম অদৃশ্য পাশগুলিকে আরও দৃঢ় করে বেঁধে মুক্তির মোহ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হয়। এটা সে বিলক্ষণ জানে যে তার ধর্ম্মের ছদ্মবেশটা খসে পড়লে তার ভারত-শাসনের বলও অন্তর্হিত হবে।

(৩) আধ্যাত্মিক শক্তির বলাধিক্যের তৃতীয় প্রধান প্রমাণ জগতের বড় বড় ধর্ম্মগুলির প্রচার।

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসটা ভাল করে আলোচনা করে দেখলে প্রমাণটা যে কত পাকা, তা বুঝতে বিলম্ব হবে না। ব্যাপারটা একদিক থেকে নিতান্তই সোজা। সেটা মোটামুটি এই। বেথেলহ্যামের এক নগণ্য পান্থশালার প্রান্তে এক অতি দীন ছুতার রমণীর কোলে এক আঁধার রাত্রে নিতান্ত অসহায় শিশুরূপে দিব্যধাম হতে এলেন এক অপূর্ব্ব অতিথি—জগতের মহা-পান্থশালার পথিকদের ঘরের পথ চেনাবার জন্য। অতি সহজভাবে সহজ কথায় তিনি বললেন—"তোমরা যে ভাই ভাই—তোমাদের যে পরস্পরকে ভাল বাস্‌তে হবে"। কথাটা নূতনও নয়, অসাধারণও নয়। পণ্ডিতে এ নিয়ে অনেক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেছে—কবি কবিত্বের মাধুর্য্য বিস্তার করেছে—ধর্ম্মোপদেষ্টা গম্ভীর উপদেশ দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। কিন্তু সে কেবল পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও উপদেশ। সে তো ভালবাসা নয়। প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির যে পরম সহজত্ব তারই অভাবে কথাটা এতদিন কাণে গিয়েছে—প্রাণে পৌঁছয়নি। কথা ছিল ; কিন্তু ছিল না সেই সুর, যাতে তাকে অর্থের সংকীর্ণ কারাগার থেকে উদ্ধার করে ভাব ও সঙ্গীতের সত্যলোকে বিপুল মুক্তিদান করতে পারে। সে সুর এসে থাকে কেবল এমন প্রাণ হতে, যে-প্রাণের কোথাও কোনও ব্যবধান নাই। এতদিন পরে তেমন একটী প্রাণের মধ্যে ঐ ঐ অতি-প্রাচীন কথাটী নূতন জন্ম লাভ করে নূতন শক্তিতে বিশ্ব-বিজয়ে যাত্রা করল। যারা সোজা লোক, তারা এই সোজা জিনিষ-টীকে সোজাভাবে গ্রহণ করে অমরত্বের পথে যাত্রা সুরু করেছিল। যারা বড়লোক, যাদের প্রাণটা ধন-মান পদ-গৌরব পাণ্ডিত্য কবিত্ব কাল্‌চারের শতেক আবরণে আবৃত—সেই সমস্ত আবরণের ভিতর দিয়ে এই সহজ উদার মধুর সুরটা তাঁদের কাণে বেজে উঠল প্রলয়ের বিষাণ ধ্বনির মতো। তাঁরা সহজ সংস্কার-বশে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করলেন, যদি এই ভালবাসার বাণীটা এখন সত্য সুরে বাজতে থাকে তাহলে এই যে বিপুল সভ্যতার সৌধ লক্ষ গুণী জ্ঞানী বীর আকাশ-স্পর্দ্ধী করে যা' গড়ে তুলেছেন—হাজার কবি শিল্পী চিত্রকর প্রাণপণ-যত্নে যাকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, তা যে একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। কারণ এর ভিত্তি যে লক্ষ কোটি দরিদ্রের ক্ষুধার উপরে—আর্ত্তের হাহাকারের

উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ ভিতের তলার নিদারুণ ছবিটা অনেক সময় চোখের বা মনের আড়ালে থাকে বলে, মানুষের আপনাকে ভুলিয়ে রাখার অসাধারণ ক্ষমতা আছে বলে, মানুষের হৃদয় নিয়ে আরামে বসে ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লেখা, চিত্র-কলা রচনা করা সম্ভব হয় এবং বুদ্ধি ফলিয়ে দর্শনের তর্কও অনায়াসে চল্‌তে পারে। কিন্তু দৈবাৎ যদি মনের পর্দ্দাটা সরে গিয়ে ঐ ভিত্তির নীচেকার দুঃখ দারিদ্র্য যন্ত্রণার অনাবৃত ছবিটা একেবারে অব্যবহিতভাবে চেতনার ক্ষেত্রে জেগে ওঠে তাহলে কোথায় থাকে সুখ, সম্পদ, আরাম, অবসর—কোথায় থাকে দর্শন বিজ্ঞান কাব্য-কলা! তখন ঐ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার প্রতিকারের চেষ্টা করা ভিন্ন মানুষের মন কিছুতেই শান্ত হতে পারে না। কাজেই ঐ পর্দ্দাটা সরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা মাত্র সভ্যতার পাণ্ডারা আত্মরক্ষার অন্ধ সংস্কার-বশে আতঙ্কে একেবারে শিউরে ওঠেন এবং ভয়-বিমূঢ়ভাবে নিষ্ঠুরতার পালা অভিনয় করতে সুরু করেন। এরা সকলেই যে মন্দপ্রকৃতির লোক এরূপ মনে করলে গুরুতর ভুল হবে। এঁদের মধ্যে উদার স্বভাব মহানুভব লোকও অনেক থাকেন। মার্কাস অরেলিয়সের (Marcus Auralius) মতো উদার ধীর প্রভৃতির লোক কেবল রাজকুলে নয়, সমস্ত মানব সমাজেরই গৌরব। অথচ তিনিও খ্রীষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য রুদ্র নীতি অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। সে যাই হোক্ সভ্যতার পাণ্ডারা স্থির করলেন যে ঐ সাংঘাতিক বাণীটার প্রচার বন্ধ করতেই হবে, এবং যে কণ্ঠে ঐ বাণী এমন সুরে বেজে উঠেছে সে কণ্ঠকে চিরদিনের মতোই নীরব করে দিতে হবে। আয়োজনও সেরূপ করা হল। কিন্তু কণ্ঠ নীরব হলেই যে সুর থেমে যাবে—এটা জড় বুদ্ধির একটা অন্ধ কুসংস্কার মাত্র। সে সত্যের প্রমাণ পেতেও তাঁদের বড় বেশী বিলম্ব হলো না।

মানুষের মধ্যে প্রেমের মহাসত্যকে চির দিনের মতো অমরত্ব দান করার পক্ষে কেবল একটীমাত্র অনুষ্ঠান বাকী ছিল—নিষ্পাপীর বিশুদ্ধ রক্তে তার অভিষেক। ক্যালভারীর Calvary পবিত্র পাহাড়ে সে অনুষ্ঠানও সমাধা হলো। এই রক্তের রাজটীকা লাভের পর দলে দলে ভক্ত নরনারী যখন এই সত্যের নিকট রাজ-কর দিতে সুরু করল, তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রোম সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তির সঙ্গে নিবিড় সংঘর্ষ সুরু হলো। ভ্রষ্টচরিত্র রোম সে সময়ে নিষ্ঠুরতাকেও একটা বিশাল কলায় পরিণত করে তুলেছিল। এক সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদ ও জনসাধারণের আমোদ-বিধানের জন্য, লক্ষ লক্ষ দর্শকের সম্মুখে এই সব নিরীহ খৃষ্টানদের সাপ বাঘ সিংহ ভালুক মত্ত ষাঁড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হলো। আগুন ও অস্ত্রের প্রয়োগের দ্বারা নরদেহে যতদূর তীব্র যন্ত্রণা জন্মাতে পারা যায় তার চূড়ান্ত পরীক্ষা হতে লাগল। প্রথম প্রথম দর্শকেরা আমোদও পেল যথেষ্ট।

কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলেছি মানুষ কোনও সময়েই একেবারে ভগবান-পরিত্যক্ত সম্পূর্ণ ধর্ম্মবোধ-শূন্য হতে পারে না। হঠাৎ

এক সময় এই সব নিষ্ঠুর পশুপ্রকৃতি দর্শকদের মনের এক কোণে এই প্রশ্ন উঁকি মারতে সুরু করল।—"না জানি, সে কি শক্তি যা এই সব নিরীহ গ্রাম্য চাষাদের চরিত্রেও সিপিয়ো কেটো ব্রুটসেরও অনধিগম্য বীরত্ব জাগিয়ে তুলেছে! সে কি আনন্দ যা যন্ত্রণাময় মৃত্যুকেও উৎসবের বেশে সাজিয়ে দিল!" এই দুর্নিবার প্রশ্ন মানুষের প্রসুপ্ত ধর্ম্মবোধকে ক্রমাগত আঘাতে আঘাতে জাগিয়ে তুলে তার মুখ দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর আদায় করে নিল। বিপুল রোম-সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক শক্তির জয়ধ্বনি ঘোষিত হতে আর বিলম্ব হলো না।

খ্রীষ্টধর্ম্মের আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট রোম সাম্রাজ্যের প্রকাণ্ড দলের পরাভবের বিষয়টা কিছু বিস্তৃত ভাবে লিখেছি। এটা হয়তো অনেকের চোখে একটু অসঙ্গত বলে ঠেকতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ নয়। ব্যাপারটা অতীত ইতিহাসের এমন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় যা বাস্তব জগতে লোক-লীলা সংবরণ করে ইতিহাসের জীর্ণ পাতার কবরের মধ্যে চিরবিশ্রাম লাভ করেছে! এই একই সংগ্রাম অবিশ্রাম চলছে—যুগযুগান্ত হতে। আজো শেষ হয়নি—কখনও শেষ হবে কিনা তাও জানিনে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যুদ্ধের চেহারাটা কেবল বদলাচ্ছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটেনি। রোমসাম্রাজ্যের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের সেই সংগ্রামই আজ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগীদের সংগ্রামের মূর্ত্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। সেই একদিকে সত্য ও প্রেম এবং আর একদিকে অসত্য দম্ভ ও সংকীর্ণতা। অস্ত্র-শস্ত্রের অবশ্য অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু সে এক পক্ষের। প্রথম পক্ষের নির্ভর এখনো সেই সব সনাতন অস্ত্র-শস্ত্রের উপর—সেই ধৈর্য্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সন্তোষ ও ত্যাগ। আর এই নির্ভর যতদূর সম্পূর্ণ হবে,—জয়ের সম্ভাবনাও ততই বেশী হবে। দ্বিতীয় পক্ষের অস্ত্র-শস্ত্রগুলি বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বৈচিত্র্য ও ভীষণতায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেজন্য ভয়, নৈরাশ্য বা দ্বিধার কারণ বিন্দুমাত্র নাই। অনেক অল্প-বিশ্বাসী লোক মনে করেন যে সেকালে যাই হোক না কেন একালে উন্নত বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আধ্যাত্মিক শক্তি যে জয় লাভ করবে, এরূপ আশা করা মূঢ়তা! কিন্তু এটা তাঁদের বিষম মোহ। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, তার পক্ষে ধনুর্ব্বাণও যেমন সাংঘাতিক, বন্দুক-কামানও ঠিক তেমনি। বিন্দুমাত্র তারতম্য নাই। যে লোক অমৃত-লাভের জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে—মৃত্যু যে মূর্ত্তিতেই আসুক না কেন, তাতে তার বিন্দুমাত্র যায় আসে না। সুতরাং কোন লেবরেটরীতে কোন বিষাক্ত গ্যাসটা প্রস্তুত হলে সেটা জানার জন্য তার তিলমাত্র মাথা-ব্যথার কারণ নাই।

এর পর বোধ হয় আর বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না, আমরা যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে বরণ করতে যাচ্ছি, সে কেবল আধ্যাত্মিক শক্তি বরেণ্য বলেই। যাঁরা অন্য-শক্তির অভাব-বশতঃ নিরুপায়ভাবে আধ্যাত্মিক

শক্তিকে আশ্রয় করে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান্, তাঁদের নিকট আমার এই সানুনয় নিবেদন, তাঁরা যেন বুঝে দেখেন, এতে মোক্ষ বা স্বরাজ লাভতো হবেই না, কারণ 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ,' অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের তুষ্টি সাধন করলে যে অর্থ ও কাম লাভ হতে পারতো তা হতেও বঞ্চিত হবেন। তাঁরা যদি বাহু-বলকেই অধিক বলশালী বলে মনে করেন, তাহলে কি ভরসায় যে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছেন সেটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনে। তাঁরা বোধ হয় "মধ্বভাবে গুড়ম্ দদ্যাৎ" এই শাস্ত্রবাক্যটীর অনুসরণ করতে চান! কিন্তু যেখানে মধুর বিশেষ গুণের উপরই ওষুধের সঞ্জীবনী শক্তিটা নির্ভর করছে, সেখানে এ বচনের অনুসরণ করা কেবল যে গুড়টাকে অনর্থক নষ্ট করা—শুধু তাই নয়, হয়তো বিষ-ক্রিয়া হওয়ারও আশঙ্কা আছে। আসল কথা, আধ্যাত্মিক শক্তি যে কাকে বলে, এবং তার প্রভাব যে কতদূর, সে সম্বন্ধে তাঁদের কিছুমাত্র ধারণা নাই। "ধিক বলং ক্ষত্রিয় বলং ব্রহ্ম বলং বলম্—"বিশ্বামিত্রের মুখ দিয়ে এই কথা যে বেরিয়েছিল, সে বহু দুঃখে, বহু অভিজ্ঞতার ফলে। সেদিনও ও কথা যেমন সত্য ছিল, আজও ঠিক তেমনি সত্য আছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন,—

"বাহু-বল দুর্ব্বলতা করায় স্মরণ!"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী।

পাশাপাশি

জমিদারের সাত-মহল বাড়ীর পাশে একটা খোড়ো ঘর। জলে ভিজে, রোদে পুড়ে শিশিরের স্পর্শে, চালের খড়গুলো সব জীর্ণ বিবর্ণ হয়ে গেছে। বৃষ্টির জল এই দুর্ব্বলতা ভেদ করে একেবারে গিয়ে পড়ত ছিন্ন শুষ্ক শয্যায়—যেখানে এই দরিদ্র দম্পতী সুখে রাত্রি যাপন কর্‌বার আশা কর্‌ত। সারা রাত তাদের অনিদ্রায় কেটে যেতো।

সকাল বেলায় ঐ খোড়ো ঘরের মালিক এক মিস্ত্রী যখন কোনো রকমে নাকে-মুখে দুটী ভাত গুঁজে কাজের তাড়ায় বেরিয়ে যেত, জমিদার বাবুর বাড়ীতে তখন সকলে ঘুম থেকে উঠে চা খাবার ধুম বাধিয়ে দিত।

এম্‌নি ভাবে দুটো সংসারের জীবন-যাত্রার স্রোত পাশাপাশি বয়ে যাচ্ছিল।

একদিন হঠাৎ মিস্ত্রী বেচারা জ্বরে পড়ল। রোজ্‌কারের রোজগার তার বন্ধ হয়ে গেল। তিন দিন তিন রাত ঐ দরিদ্র দম্পতী উপোস করে রইল।

পাশে জমিদারের বাড়ীতে ঐ তিনদিন অন্নপ্রাশন না কি-এক কাজ-উপলক্ষে খুব একটা হৈ-হৈ ধূম-ধাম ব্যাপার হয়ে গেল—পাঁচ-সাতশো লোক খেলে, দশ-বারোশো কাঙালী বিদায় হলো। চীনে না স্পেনে দুর্ভিক্ষের জন্য হাজার টাকা দান করা হলো; কিন্তু পাশের বাড়ীতে যে একটা দরিদ্র পরিবার অন্নাভাবে উপোস করে আছে, এক মুঠো খই দিয়েও ও-বাড়ীর কেউ তাদের খবর নিলে না।

ক্রমে সব জিনিষ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। মিস্ত্রী সুস্থ হয়ে

আবার আগের মত সকালে কাজে বার হত। জমিদারের বাড়ীতেও পূর্ব্বের মত সারাদিন ঐশ্বর্য্যের উৎসব চলত। সন্ধ্যায় কুটীরে যখন মৃৎ-প্রদীপ জ্বলে উঠত, শঙ্খ ধ্বনি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত, জমিদারের প্রাসাদ তখন বিদ্যুতের আলোয় ঝল্‌মল্ করে উঠত, কক্ষ থেকে নানা রকমের শব্দ তরঙ্গিত হয়ে বাইরে প্রকাশ পেত।

মিস্ত্রী তার কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত দেহখানি নিয়ে ফেরবার পথে ঐ বাড়ীর গাড়ী, জুড়ি, আলো, গান, বাজনার দিকে চেয়ে বুকে যেন একটা কিসের ভার নিয়ে নিজের দোরে এসে ঘা দিত!

প্রতীক্ষা-কারিণী বধূ তার এসে দরজা খুলে দিত। সেই মুহূর্ত্তে তার বুকের বোঝা কোথায় যে উড়ে যেত! বুকে শান্তি আর মুখে হাসি নিয়ে সে ঘরে ঢুক্‌ত।

প্রতিদিনের মত সেদিনও সে ফেরবার পথে ও-বাড়ীর দিকে চেয়ে ফির্‌ছে। বাড়ীর দিকে চাইতেই আজ হঠাৎ তার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল! প্রতিদিনকার সে ঐশ্বর্য্যের তীব্রতা আজ ত জ্বালাময়ী হয়ে তার চোখে আঘাত কর্‌ছে না! ঐ ত বাড়ীর দরজায় গাড়ী, মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐ ত ঐশ্বর্য্যের সাজ! কিন্তু এ কি, বাড়ীতে যে আজ একটা ভীষণ নীরবতা! ও কে বাড়ী থেকে বার হয়ে গাড়ীতে উঠল? ডাক্তার, না? হ্যাঁ, ডাক্তারই ত বটে। ঐ যে হাতে সেই যন্তর্। কারো অসুখ করেছে, বোধ হয়! কার অসুখ? এই কথা জানবার জন্য তার মন অস্থির হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে প্রাণপাখীটা দারুণ অস্বস্তিতে যেন ঝট্‌পট্ কর্ত্তে লাগল। কাছেই একজন খানসামা দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছে গিয়ে অপরাধীর মত আস্তে আস্তে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কার অসুখ?

খানসামা একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে উত্তর না দিয়ে চলে গেল। এমন সময় বেরিয়ে এল এক বুড়ো ঝী। তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তেই সে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—অসুখ গো, বড্ড অসুখ, আমাদের খোকাবাবুর। বংশের শিবরাত্রের সল্‌তেটুকু,—তাও বুঝি আজ নিভে যায়!

ম্লান মুখে সে ঘরে ফিরে এল। নিজের দরজায় ঘা দিতে তার সাহস হল না, পাছে শব্দ হয়। ধীরে ধীরে জানলার ধারে গিয়ে আস্তে আস্তে খুব চাপা গলায় সে তার স্ত্রীকে ডাক্‌লে,—ওগো—!

বদ্ধ কুটীরে সে বেচারীও স্থির থাক্‌তে পারছিল না। কোন কাজে তার মন বসছিল না। ও বাড়ীর খবরটুকু পাবার জন্যে সেও অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছিল, স্বামীর সেই মৃদু আহ্বানেই এসে দরজা খুলে দিলে। বুকে তার বিষম ব্যাকুলতা। সেই আবেগে তখনি সে সংবাদটুকু পাবার ব্যগ্রতা চেপে রাখতে পার্‌লে না!

বাড়ীর একমাত্র ছেলে—তারই অসুখ। তখনি তার মনে পড়ল—তার মৃত্যু-কবলিত প্রথম সন্তানের কথা। অমনি তার দু' চোখ জলে ভরে উঠল। অতীত দিনের শোকের জ্বালা মনে করে, মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতায় সে বলে উঠল—হে, ঠাকুর, বংশের ঐ একটীমাত্র প্রদীপকে নিভিয়ে দিয়ো না!

পাশের বাড়ীর মোটরখানা তখন শব্দ কর্‌তে কর্‌তে এ-শব্দটাকে ডুবিয়ে চলে গেল।

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

বিদেশীর বিপদ

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে, আমাদের যে কার্পাস-বস্ত্র রাজ-ভাণ্ডারে রত্ন-পর্য্যায়ে হীরা-জহরতের সঙ্গে সমান মর্য্যাদা পাইত, রোমের অভিজাত-বর্গ যে কাপড় সোনার ওজনে কিনিয়া পরিতেন, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সৌখীন সমাজে সেই 'শব্-নম্' বা 'নিশির শিশির', 'আব্-রুয়াঁ' বা 'সোঁতের পানি' প্রভৃতি কাপড়ের খুব রেওয়াজ বা ফ্যাশান চলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের 'বিলাতী' অর্থাৎ সে-দেশের বিদেশী কাপড়ের আমদানী ইংলণ্ডে খুবই বাড়িয়া ওঠে। ফলে ব্রিটিশ বস্ত্র-শিল্পের সসেমিরা অবস্থা দাঁড়ায় এবং ইংরেজ তাঁতিকুলের বৃত্তিলোপের সঙ্গে সঙ্গে 'ধরম ছুটিয়া' যাইবার উপক্রম হয়। দারিদ্র্যের তাড়নায় নিরীহ শিল্পজীবীর দল দায়ে পড়িয়া ক্রমশঃ চোর-ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে। অবস্থা যে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়াছিল, বর্ত্তমান ভারতের তাঁতিদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। এই দেশব্যাপী শোচনীয় দুরবস্থার সংস্কার-কল্পে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত একজন ইংরেজ তাঁতি ফাঁশীর মঞ্চ হইতে তাহার স্বদেশবাসীকে যে কথাগুলি বলিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আমাদের প্রত্যেকেরই সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে Gentleman's Monthly Intelligencer নামক বিলাতী মাসিকপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

"আজ চুরি অপরাধে মাইকেল কারমডি নামক এক ব্যক্তির ফাঁসি হইয়া গেল। এই উপলক্ষ্যে, দেশের জনসাধারণের, বিদেশী (অর্থাৎ ভারতীয়) কার্পাস বস্ত্র ব্যবহারের শোচনীয় অভ্যাসের ফলে, যাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, সেই ঊর্ণা-বস্ত্র-শিল্পজীবী ব্রিটিশ তন্তুবায়-সম্প্রদায় সমবেত হইয়া অপরাধী, জল্লাদ ও ফাঁশীর মঞ্চ বিদেশী কার্পাস বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে। বিদেশী কাপড়ই যে দেশের বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বনাশ করিয়া, নিরীহ তাঁতিদের দুর্দ্দশায় ফেলিয়া, ক্ষুধার তাড়নায় লঘু গুরু নানা অপরাধের মধ্য দিয়া ক্রমশ উহাদিগকে বধ-মঞ্চের দিকে জল্লাদের কবলে ঠেলিয়া দিতেছে, এই কথাটা সাধারণের চোখে স্পষ্ট করিয়া তোলাই, ফাঁসীর মঞ্চ বিদেশী কাপড়ে মুড়িবার তাৎপর্য্য। আর যাহারা বিদেশী কাপড় ব্যবহার করিতেছে তাহারাই যে পরোক্ষভাবে দেশের শিল্পীদের পক্ষে জল্লাদের তুল্য, জল্লাদকে বিদেশী কাপড় পরাইয়া ইহারা এই কথাটাই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছে।

তারপর অপরাধীকে বিদেশী কাপড়ে মণ্ডিত করার অর্থ বোধহয় এই যে, যে অজগর বেচারাকে জড়াইয়াছে তাহাকে আইনের জবানীতে 'অপরাধ' বলিতে পার, 'পাপ' বলিতে পার, কিন্তু আসলে তাহা বিদেশী কাপড়ের নাগপাশ ভবিষ্যতে যাহাতে ইংলণ্ডের লোক

ভারতের কাপড় না ব্যবহার করে, দেশের শিল্পীর মুখ চাহিয়া, দেশের কাপড়ই পরে, এ সমস্ত করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাই। বধ্যভূমিতে অপরাধী যে আশ্চর্য্য বক্তৃতা করে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, মিনিট কয়েকের মধ্যেই যাকে মর্‌তে হবে, মাথা পেতে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ কর্‌তে হবে, সেই হতভাগ্য অপরাধীর গোটাকয়েক কথা একটু মন দিয়ে আপনারা শুনুন্। আমি স্বীকার কর্‌ছি, অভাবে প'ড়ে অনেক রকমের অনেক গুরু অপরাধ আমি করেছি। আমি বেশ জানি, আমার অভাবই এর জন্যে ষোল আনা দায়ী। আমার অন্নাভাবের কারণ অর্থাভাব এবং অর্থাভাবের কারণ দেশে স্বদেশী কাপড়ের অনাদর।

"খৃষ্টানমণ্ডলী, একবার ভেবে দেখুন। বিদেশী তুলার কাপড় ব্যাভার ক'রে যদি আপনারা স্বদেশী বস্ত্র-শিল্পের প্রসার রোধ করেন, আমার বিশ্বাস তা' হ'লে আপনারাই আপনাদের স্বদেশকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত কর্‌বেন। ফলে আমার মতন অপরাধীর দলে দেশ ছেয়ে যাবে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনাদের সাবধান হ'তে বল্‌ছি; এর পরে আমার মতন প্রত্যেক অপরাধীর প্রাণদণ্ডের জন্যে ভগবানের কাছে আপনারাই দায়ী হবেন। যে মানুষ মরণের সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে, দু' এক মিনিটের মধ্যেই যার সব ফুরিয়ে যাবে, আপনাদের কাছে তার প্রার্থনার যদি কোনো মূল্য থাকে, ত' আমি অনুরোধ করছি যে, যে তুলার কাপড়ে আমার মৃত্যুমঞ্চ আচ্ছাদিত, জল্লাদের কাছ থেকে-তা' আর কিন্‌বেন না। কারণ, যা' আমাকে দুর্দ্দশা থেকে চৌর্য্যে এবং চৌর্য্য থেকে অকাল-মৃত্যুতে ঠেলে নিয়ে এসেছে, যদি আপনারা সেই বিদেশী কাপড়ই পর্‌তে থাকেন, তা হ'লে আমি কবরেও শান্তি পাব না। দেশের প্রতি ভদ্র-সম্প্রদায়ের মমতা নেই, জানি। তবুও তাঁদের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্যে আমি মিনতি কর্‌ছি, তাঁদের ছেলেপুলে বা চাকর-বাকরদের আর যেন তাঁরা বিদেশী কাপড় ব্যবহার করতে না দ্যান। কারণ এর পর ও-কাপড় পর্‌বে কেবল ফোতো বাবুর দল, ফ্যাশানের চাকরাণী, পেশাকর-সম্প্রদায়, জেলখানার কয়েদী, বজ্জাত বদ্‌মায়েশ আর সরকারী জল্লাদ।"

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

ছাত্রাবাসেতে এক হয়েছে চুরি,
ডাকাতির মত গোল ভবন জুড়ি!
চুরি গেছে সুন্দর ফুলুট বাঁশী
উলট-পালট ঘর করিছে আসি!

ধরিতে চোরেরে চলে ফন্দী কত,
বন্দী সে হ'ল না ত সাধুর মত।
'নলচালা' এলো তাই পোহালে নিশি,
আর কোথা রবে চোর দলেতে মিশি।

বহু জল ছিটাইয়া, মন্ত্র পড়ি,
বাঁকারির নল ফেরে চোরকে ধরি।
ঘুরে ঘুরে অবশেষে উপর-তলে,
নবাগত বালকেরে ধরিল গলে।
গ্রাম থেকে আসিয়াছে দু'দিন মোটে,
সকলে করিল ঠিক্ সেই সে বটে!
করেনা সে প্রতিবাদ, চাহিয়া রহে,
ম্লান মুখ, লজ্জাতে কথা না কহে!
বাক্স পেট্‌রা তার উলটি দেখে,
নাই বাঁশী কোথা হায় এসেছে রেখে।
বাঁশী যার সে বলিল নিদয় হাসি,
চোর চেনা গেল, আর চাহিনে বাঁশী!
চোর যে সে হেসে গেল তাহারি সাথে,
গ্রামের বালক কাঁদে ফুঁপায়ে রাতে।
বিনা অপরাধে তার কি গুরু ব্যথা,
দুখেতে যে পড়ে তার লুটিয়া মাথা।

* * *

চলে গেছে বহুদিন, ভেঙেছে বাসা,
কে কোথা গিয়াছে লয়ে নবীন আশা।
সেদিন হয়েছে খুণ চল্‌তি ট্রেণে,
পুলিস আসামী দুটি এনেছে টেনে।
দারোগা কবুল নাহি করাতে পেরে,
আজি তাই আদালতে এনেছে ধরে।
হাকিম চাহিয়া কন্ তাদেরি পানে,
দোষী কিনা? এ খুনের কিছু কি জানে?
আসামীরা বলে মোরা জানিনে কিছু,
ফেলে শ্বাস, কাঁদে মাথা করিয়া নীচু।
হাকিম বলেন তবে পুলিসে ডাকি,
কি ফল এদেরে বৃথা আটকি রাখি।
আমারও এখন ঠিক হতেছে মনে,
এসেছি এঁদেরি সাথে সেই সে ট্রেণে।
প্রণমি আসামী বলে বুঝিনে কেন,
অকারণে পেনু মনে বেদনা হেন?
বেদনা দিলেই হয় পেতে যে ব্যথা
বুঝিনু তা ঠিক্ নয়, কথার কথা।
হাকিম বলেন তার প্রমাণও আমি,
বিনাদোষে কাঁদায়েছ কত যে যামি।
আসামীরা বিস্মিত; হাকিম হাসে,
সে 'নল-চালার' কথা মনে কি আসে!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সমালোচনা

সরল হিন্দীশিক্ষা। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত। কলিকাতা শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা বণিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত। যাঁহারা হিন্দীভাষা শিক্ষা করিতে চান, হিন্দী ভাষায় প্রত্যয় বিভক্তি, ধাতু, বাক্যরচনা প্রভৃতি শিখিতে চান, তাঁহারা শিক্ষকের সাহায্য-ব্যতিরেকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অনায়াসে তাহা শিখিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি বেশ সহজ প্রণালীতে লেখা এবং এ গ্রন্থ-পাঠে অনায়াসেই প্রচুর ফল পাওয়া যাইবে।

পত্রিকামালা। পত্রিকা নং ১ ও ২। দিহরতায় সোসাইটি বোম্বাই। কলিকাতা মার্কাণ্টাইল প্রেসে মুদ্রিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা দুটীতে শ্রীহরনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী হইতে কয়েকটি ভগবৎ-বাণী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

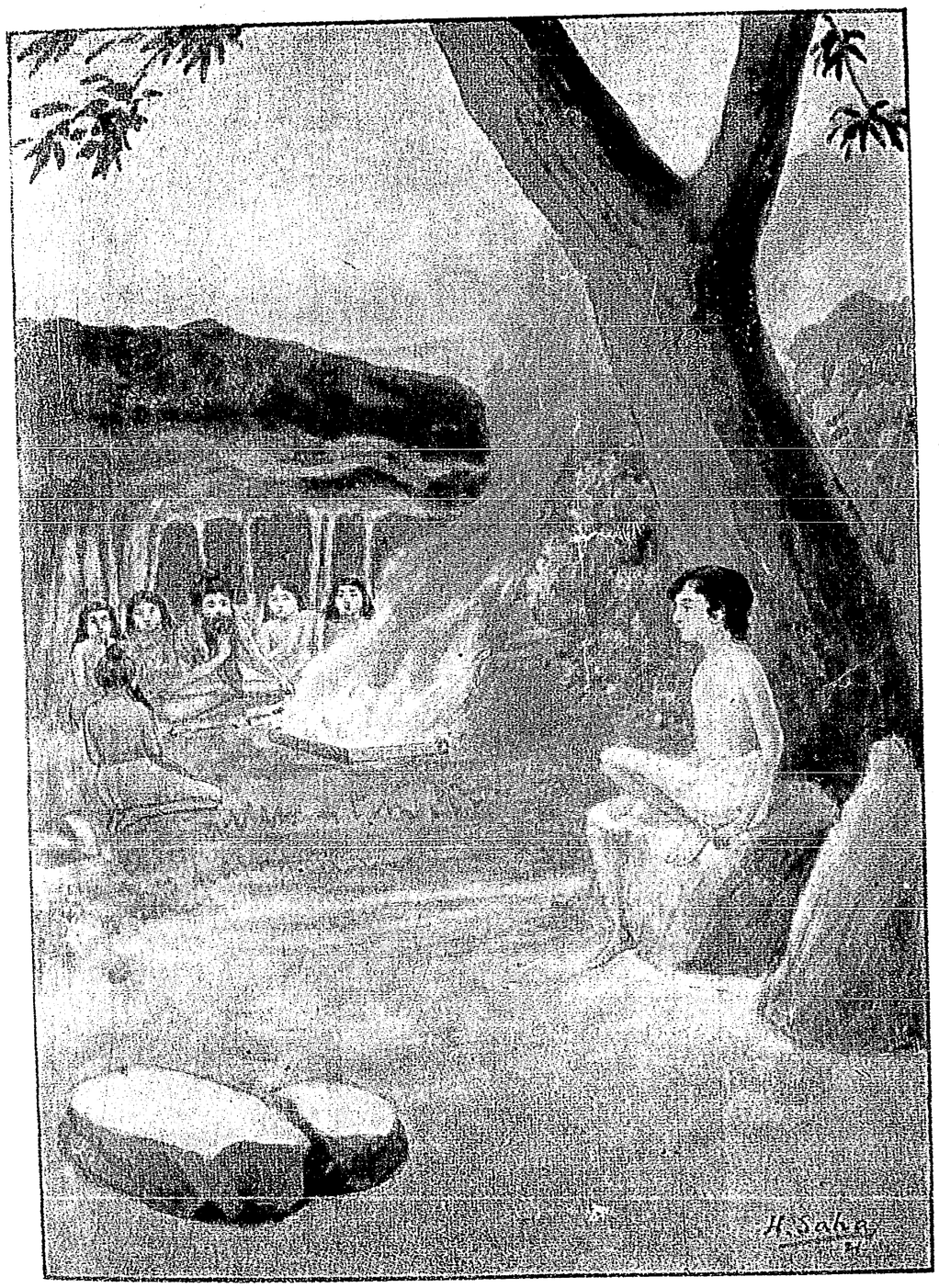

গৌতমের আশ্রমে সত্যকাম
শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা অঙ্কিত

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ [অষ্টম সংখ্যা

প্রত্যাবর্ত্তন

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল মেসের দোতলার ঘরে থাকে। লোকের সহিত মেলা-মেশা তাহার খুব কম। অরুণের সঙ্গেও তাহার সর্ব্বদা দেখা হইত না। কলেজেও সে ভিন্ন ক্লাশের ছাত্র। তাই ইচ্ছা-সত্ত্বেও অরুণ তাহাকে বড় বেশী কাছে পাইত না; তবু যেটুকু সময় পাইত, সেই সময়টুকুর জন্যই উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিত। প্রফুল্লর গম্ভীর দূরত্ব-ভাব যাহা সাধারণের নিকট হইতে তাহাকে তফাতে রাখিত অরুণের কাছে তাহাই যেন সমধিক আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জলদকে সে যেমন সম্পূর্ণ কাছে পাইয়াছিল, প্রফুল্লকে তেমন পায় নাই। আবার পায় নাই বলিয়াই যেন তাহার আকর্ষণও তাহার কাছে এত অধিক মিষ্ট লাগিত। জলদকে সে ভালবাসিত; প্রফুল্লকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত, আবার ভয়ও করিত। কোন কিছু অন্যায় কাজ করিতে লোকে অভিভাবককে যেমন ভয় করে, নিজের সামান্য কোন ত্রুটি বা পড়ার কোন ভুল প্রমাণ হইলে অরুণ প্রফুল্লর কাছে তেমনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। অরুণ বুঝিতে পারিত, প্রফুল্লও তাহাকে ভাল বাসিতে সুরু করিয়াছে। তবু দুইজনের মাঝখানে কি-একটা ব্যবধানের দেওয়াল যেন সর্ব্বদাই মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! কেহ কাহারো মনের নাগাল সম্পূর্ণরূপে পাইত না।

অরুণ ইহাতে দুঃখ পাইত কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায়ও খুঁজিয়া পাইত না। সে মনে করিত, তাহার দুর্ভাগ্য জীবনই এ বৈষম্যের মূল। প্রফুল্ল আপনা হইতে কোনদিন তাহার বাড়ীর খবর কিছুই জানিতে চাহে নাই।

অরুণও কৌতূহল চাপিয়া রাখিয়া এ বিষয়ে বন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিত। প্রফুল্লকে এখন সে 'দাদা' বলিতে সুরু করিয়াছে। দাদা বলিয়া ডাকিয়া সে তৃপ্তি পাইত। আগা-গোড়া সারা জীবনটাই যে তাহার 'পাতানো' সম্পর্ক লইয়াই গঠিত! তবে দাদা ডাকের ক্ষোভটুকুই বা থাকিয়া যায় কেন! প্রফুল্লও যে ইহাতে খুসী হইয়াছিল, সেটা তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যাইত। অরুণকে সে যথার্থই ভাইয়ের মত স্নেহ করিত। তাহার পাঠের উন্নতির জন্য যত্ন লইত; বাছিয়া নিজের দুই-একখানি ভাল বইও পড়িতে দিত। দুইটি অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়া অরুণের বর্ত্তমান জীবন বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে সে ভয় পাইয়াছিল, কেমন করিয়া নীরস কর্ম্মক্ষেত্রে দিন কাটাইবে —সেজন্য ভাবনাও হইয়াছিল। জলদ ও প্রফুল্লর বন্ধুত্বে তাহার উদাসীন চিত্ত ধীরে ধীরে সংসারের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল। প্রফুল্ল বলিয়াছিল, সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন জ্ঞানানুশীলনেই কাটাইবে। সংসারী সাজিয়া সংসার-ধর্ম্ম করা তাহার আদর্শ নয়!

কথাগুলি অরুণের ভাল লাগিয়াছিল। সে যেন তাহার কুহেলিকাচ্ছন্ন জীবনের গতি খুঁজিয়া পাইল! সেও কেন এই আদর্শই গ্রহণ করুক না! সংসারের সহিত দেনা-পাওনা না রাখিয়া সন্ন্যাসীর কঠোরতা না সহিয়াও যদি আনন্দময় জীবন-যাত্রার পথ পাওয়া যায় ত, তাহাতে ক্ষতি কি! এই ত ভাল। অরুণ মনে মনে সেই দিনই প্রফুল্লকে গুরু-পদে বরণ করিয়া লইল।

ঘরের দরজা আধখানা ভেজানো ছিল। বাকী অংশ দিয়া বাহিরের কতকটা দৃশ্য অরুণের চোখে আসিয়া পড়িতেছিল। সিঁড়ি দিয়া কত লোক উঠা-নামা করিতেছে, কেহ বা তাহার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়াও যাইতেছিল। অরুণের ইচ্ছা হইতেছিল উঠিয়া দোরটা ভেজাইয়া দেয়। কিন্তু আলস্যবশতঃ তাহা আর ঘটিয়া উঠিতেছিল না।

ঘরখানির দেওয়াল হইতে ভাঙ্গা ডেক্‌স পর্য্যন্ত এ গৃহের পূর্ব্বাধিকারীর স্থপতি-বিদ্যার প্রতি গভীর অনুরাগের যতই পরিচায়ক হউক, পরিচ্ছন্নতার প্রতি যে তাহার তিলার্দ্ধ অনুরাগ ছিল না, তাহা ঘরের দিকে চাহিলেই বুঝা যাইত। দেওয়ালের গায়ে পানের পিক চারিদিকে পেরেক পুঁতিয়া আবার তাহা তুলিয়া লওয়ায় বহুস্থলে গর্ত্ত হইয়াছে—টেবিলের উপর কালিঢালার চিহ্ন বিদ্যমান। উপস্থিত উত্তরাধিকার-সূত্রে অরুণ যে কব্জা-ভাঙ্গা বার্ণিশ চটা কাঠের ডেক্‌সটি পাইয়াছে, তাহার ভিতর হইতেও আবর্জ্জনার রাশি সলজ্জে বাহিরে উঁকি দিয়া উহার সত্ত্বাধিকারীর অমনোযোগিতার প্রমাণ দিতেছিল। ডেক্‌সটির ভিতর এখনও এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা কোন কলেজে-পড়া জেণ্টল্‌ম্যানের ডেক্‌সয় থাকা উচিত নয়। পূর্ব্বাধিকারী দেওয়ালে কত অসংখ্য কীট-পতঙ্গ সরীসৃপ লতা-পুষ্প দেবীর নাম, কবিতার অর্দ্ধ চরণ আরও কত কি যে আঁকিয়া ও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে —তাহার আর সংখ্যা নাই! টেবিলে ছুরি দিয়া খুঁদিয়া নিজের নাম-ঠিকানা অধিষ্ঠান তিরোধানের সাল-তারিখটি লেখা থাকা দেওয়ালে চুণ ফিরাইলেও যে পরবর্ত্তী অধি

বাসীকে তাহাকে স্মরণে রাখিতেই হইবে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছিল।

এই বিচিত্র গৃহসজ্জার পানে চাহিয়া অরুণ নিজের ভাগ্য চিন্তা করিতেছিল। দরজার বাহিরে জুতার শব্দের সহিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "অরুণ বাবু জেগে না ঘুমিয়ে? আস্‌তে পারি?"

স্বর শুনিয়াই অরুণ বুঝিল, আগন্তুক জলদ। "আসুন" বলিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। জলদ ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই গলির দিকের জানালাটি খুলিয়া দিল। অল্প-পরিসর স্থান, তবু কাঠের তক্তা-মারা ছোট জানালাটি খুলিয়া দিতেই ঘরের মধ্যে একটু আলো ও বাতাস প্রবেশ করিল। ইতস্তত চাহিয়া দেওয়ালের হুকে টাঙ্গানো তালপাতার ছোট পাখাখানি পাড়িয়া আনিয়া এইবার সে তক্তা-পোষের উপর অরুণের পাশেই কায়েমিভাবে স্থান গ্রহণ করিল। বার-কতক পাখা নাড়িয়া হাওয়া খাইয়া জলদ কহিল, "আঃ, বাঁচা গেল। আচ্ছা অরুণবাবু, এমন সময় জানলা এঁটে ঘরে শুয়ে আছেন যে! অসুখ-বিসুখ করেনি ত কিছু?"

অরুণ কহিল, "এইবার উঠ্‌ব-উঠ্‌ব ভাবছিলুম। জান্‌লাটা—ওটা বন্ধই ছিল কি না, আর খোলা হয়ে ওঠেনি—"

জলদ কহিল, "দেখুন, আপনার কাছে আমি একটা দরকারেই এসেচি। মনে করে-ছিলুম, আপনি হয়ত এতক্ষণে বেরিয়ে গেছেন, বাসায় এখন আপনাকে পাব না, আবার সন্ধ্যার পর আস্‌তে হবে, কিন্তু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এই দুর্জ্জয় গরমে বাইরে না গিয়ে বন্ধ ঘরে শুয়ে থেকে আমার পরিশ্রমটি বাঁচিয়ে দিয়েচেন!" বলিয়া সে মৃদু হাসিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে পুনরায় কহিল, "যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা বলি।" তাহার সঙ্কোচপূর্ণ ভাব দেখিয়া অরুণ বিস্মিত হইল। এমন কি কথা, যাহা বলিতে এতটা সঙ্কোচ আসে? জলদ তাহার কাছে টাকা ধার চায় না কি? অরুণের ত এই দুটি সঙ্কোচের হেতুই জানা আছে। এক, বংশের পরিচয় লওয়া, আর এক, অর্থ প্রার্থনা করা,—তবে অরুণের মত দুর্ভাগা কিছু জগতে অনেক নাই! টাকা ধার চাহিতে, প্রয়োজন হয়ত ভিক্ষা করিতেও অনেককেই হয়। কিন্তু পিতৃ-পরিচয় জানেনা এমন হতভাগার সংখ্যা অল্পই। মনের চিন্তা মনে চাপিয়া সে কহিল, "বলুন।"

জলদ কহিল, "কথা এমন কিছু নয়—পিশে মশাই আমায় ভারী মুস্কিলে ফেলেচেন। তাঁর ছোট দুটি নাতি-নাতনিকে পড়াবার জন্যে একজন মাষ্টার চাই। বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক জোগাড় করা তাঁর পছন্দ নয়। অথচ জানা-শোনা একটি ছেলে চাই। আমার উপর পড়েচে খুঁজে দেবার ভার। এক মাস ধরে ভাই, তাঁকে ত স্তোক দিয়ে রেখেচি, খুঁজচি-খুজ্‌চি করে—কিন্তু আজ একেবারে তিনি নাছোড়বন্দা, আর কোন কথাই শুন্‌বেন না। তাঁর নাতি-নাত্‌নি ভারী বে-শায়েস্তা হয়ে উঠ্‌চে। একে ত ঠাকুমার আদর তার উপর পড়া-শোনা মোটে নেই। একেবারে বনমানুষ হয়ে যাচ্চে। হাস্‌চ যে—তাঁর ব্যাখ্যা-মতই আমি বল্‌চি। আপনি যদি দিন-কতকের জন্যও অন্ততঃ তাদের গুরুগিরি করে দেখেন, তাহলে

সময় পেলে আমি খুঁজে পেতে তখন দেখতে পারি। বুনোহুটো আমায় যে একটুও মানে না, নৈলে আমিই না হয় কিছু দিন চালিয়ে নিতুম।—অসুবিধে হবে কি বেশী—?" বলিয়া জলদ উত্তরের আশায় অরুণের মুখের পানে চাহিল।

বন্ধুর এই অযাচিত অনুগ্রহে তাহার সহৃদয়তারই প্রমাণ পাইয়া কৃতজ্ঞতায় অরুণের চোখে জল আসিল। আত্ম সম্বরণে অসমর্থ হইয়া মৃদুস্বরে সে কহিল, "মনে মনে কাজ ত আমি খুঁজছিলুমই। অসুবিধা বোধ কল্লে চল্‌বে কেন? বরং আপনার নিজে হতে—"

জলদ বাধা দিয়া কহিল, "শুভস্য শীঘ্রম্! উঠে পড়ুন তাহলে, আজই ও হাঙ্গামাটা মিটিয়ে দিয়ে আসা যাক্।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া অরুণের মনটি বেশ প্রফুল্ল হইয়া রহিল। কাল সন্ধ্যায় সে জলদের সহিত গিয়া নূতন কার্য্যে বাহাল হইয়া আসিয়াছে। কাজটি তাহার বেশ পছন্দও হইয়াছিল। বাড়ীর কর্ত্তা প্রিয়নাথ বাবু মানুষটিকে ভাল লোক বলিয়াই অরুণের ধারণা হইয়াছিল। তাঁহার বয়স পঞ্চান্ন বৎসর হওয়াই সম্ভব। কাঁচা-পাকা চুল। গোঁফেও পাক ধরিয়াছে। দাড়ি কামানো। রংটি কাঁচা সোনার মত। গঠন দোহারা,—কোমলতাময়। মুখে গুড়গুড়ির নলের সহিত হাসিটি সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। মন খোলা, সদানন্দ পুরুষ—পূর্ব্বে ডেপুটি ছিলেন. বছর খানেক হইল পেন্‌সন লইয়া বাড়ী আসিয়া বসিয়াছেন। গৃহে স্ত্রী ও দুটি পৌত্র-পৌত্রী! পুত্র পাবনার মুনসেফ্। তাঁহারা নাতি-নাতনীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়াও বটে, তাছাড়া বাহিরে বাপের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইলে পড়াশোনার ক্ষতি হয় এ কারণেও বড় ছেলে-মেয়ে দুটি পিতামহের কাছে ও ছোট দুটি বাপ্-মার কাছে থাকিত। অরুণ এই ছেলে-মেয়ে-দুটির গৃহ-শিক্ষকের অধিকার পাইল।

ছেলেটির বয়স নয় বৎসর; মেয়েটির বয়স আন্দাজ বারো হইবে। মেয়েটির নাম বরুণা। উপন্যাসের নায়িকার ন্যায় অনুপমা সুন্দরী না হইলেও তাহাকে সুশ্রী বলা চলে। বসন্তের কাঁচা পাতার মত কোমল শ্যামল লাবণ্য শ্রী মণ্ডিত বালিকার সুগঠিত ক্ষীণ তনুখানি দেখিলে কালিদাস-বর্ণিত সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতার কথাই মনে পড়ে। ইহাকে প্রথম দর্শনে অরুণ একটু কুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের আলাপেই বুঝিল, কুণ্ঠার কোন কারণই বর্ত্তমান নাই। মেয়েটি দেখিতে খুব ছোট-খাট না হইলেও আসলে একটি পাঁচ বছরের খুকির মতই মনটি তাহার সরলতায় ভরা। ছাত্র প্রদ্যুম্ন হৃষ্ট-পুষ্ট গৌরবর্ণ, সদা-চঞ্চল সদা-সহাস্য মুখ। এক ঘণ্টার মধ্যেই সে মাষ্টার মহাশয়ের সহিত প্রগাঢ় সখ্য করিয়া ফেলিল। দাদামহাশয়কে জানাইয়া আসিল, এবারকার মাষ্টার মহাশয় খুব ভাল। ইঁহার সহিত সে খুব শিষ্ট ব্যবহার করিবে; এবং পূজার পূর্ব্বে লেখাপড়া দিদিকে ছাড়াইয়া গিয়া বাবা আসিলে তাঁহাকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া দিবে।

মাষ্টারের বয়স এত অল্প দেখিয়া গৃহিণী মহাশ্বেতা দেবী কেবল একটু অপ্রসন্ন হইয়া আপত্তি তুলিয়াছিলেন। মেয়ে 'ডাগর

হইতে চলিয়াছে—এখন কি আর এমন ছেলে ছোক্‌রা মাষ্টার রাখা ভাল? যদি মেয়েকে নিলেবতী করিবারই এত সখ, তবে দেখিয়া শুনিয়া একটি বুড়া সুড়া-গোছ পণ্ডিত রাখিলেই ত ভাল হইত। জলদের কাছে তাড়া খাইয়া শেষে তাঁহাকে চুপ করিতে হইল। প্রিয়নাথ বাবু গুড়গুড়ির নল হইতে মুখ সরাইয়া আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "খুকীর জন্য ভাবচ! রামঃ! ও ত বাচ্ছা! আহা, ছেলেটিকে দেখেই কিন্তু কেমন মায়া হচ্চে—থাক্। জলদ বলছিল, ওর অভাব নাকি বড্ড।" ইহার পর গৃহিণীও আর কোন আপত্তি তুলিলেন না।

পরের সপ্তাহে জলদ পিশিমার মুখে শুনিল, মাষ্টারটি ভারী ভাল। মুখ দেখিলেই মায়া হয়।

জলদ দুষ্টামি করিয়া বুড়া পণ্ডিত মহাশয় আনিয়া দিতে চাহিলে গৃহিণী কহিলেন, "বাপ্‌রে, তা কি হয়! বিনি-অপরাধে এক জনের অন্নে হন্তারক হতে আছে কি? ও যদি নিজে থেকে যেতে না চায় ত আমার খোকা-খুকীদেরই সামিল হয়ে থাক্‌বে।"

জলদ পিশিমাকে চিনিত। এ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

পল্লী সংস্কার-সমস্যা

দরিদ্রের পরম বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবের মুখে শুন্‌লুম্, ফিজিদ্বীপ থেকে যারা স্বদেশে ফিরে এসেছিল, তারা আবার সেখানে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। অনেকে নিজেদের গ্রামে গিয়ে সেখানে টিঁকতে পারে নি; যারা বাপের ভিটের মায়া কাটাতে পারেনি, তারা গ্রামে বাস করবার আয়োজন করে তারপর সব ফেলে ফিজি যাবার জন্য আড়কাঠিদের অফিসে ভিড় করছে। ঘটনাটি আমাদের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, কিন্তু যারা পল্লী-জীবনকে সঞ্জীবিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে হাত দিয়েছেন বা দেবেন, ঘটনাটি তাঁদের ভাল করে' বোঝা দরকার।

প্রাচীন কালে সমৃদ্ধির দিনে আমরা সমুদ্র-পাড়ি দিলেও সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার আছে। শাস্ত্রে নাকি সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ, অতএব যারা এ ব্যবস্থা না মানে তাদের জাত যায়, সমাজ তাদের গ্রহণ করে না। কিন্তু নিষেধ ও শাসন-সত্ত্বেও আমাদের দেশ থেকে কুলি আমদানি করে ফিজিদ্বীপে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকায়, মালয় রাজ্যে, ধনী বণিকেরা জমি চাষ করছে, খনি খুঁড়ছে, রবারের বাগান ফাঁদছে! তারা ভারতবর্ষীয় কুলি-মজুরদের নিয়ে চাষ-বাস ব্যবসা-বাণিজ্য করছে দেখে আমরা রাগ করি; কুলি-মজুরদের পায়ে দাসত্ব-শৃঙ্খল পরালে আমাদের মনে উত্তেজনা আসে,

তাদের সঙ্গে তুলনা করে ঐ-সকল দেশ-বাসীরা ভারতবাসীদের একটু হীন চোখে দেখে বলে' আমাদের অভিমান হয়। কিন্তু এ-কথা মনে হয় না, এরা মাতৃভূমি ছেড়ে গেল কেন? কেন এদের দু'মুঠো ভাত, দু'খানি কাপড় সুজলা সুফলা দেশে জুটল না? কিসের জন্য এরা ভিটে-মাটির মায়া কাটিয়ে বিদেশে কুলির লাঞ্ছনা সহ্য করে? মোটামুটি ধরতে গেলে আন্দাজ বিশ লক্ষ ভারতবাসী পেটের দায়ে দেশান্তরে বাস করছে; তাদের মধ্যে অধিকাংশই কুলি; কেউ দোকানদার—কেউ-বা একটু-আধটু বাণিজ্য করছে।

বিদেশে তারা কি অবস্থায় আছে ও সরকার-পক্ষ থেকে তাদের কল্যাণার্থ কি-চেষ্টা করা হয়েছে, তার বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, তবে আগেকার চেয়ে তাদের অবস্থা এখন ঢের ভাল হ'য়েছে; কুলিদের দু'একটা দাবী কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা শুনেছেন। এতকাল যে সর্ত্ত করে এদের আমদানি করা হতো সে-ব্যবস্থা এখন আর নেই। ভারতবর্ষীয় কুলিদের অবস্থা উন্নত করবার চেষ্টা করে গভর্ণমেণ্ট বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন; তা না হলে ফিজি, মরিসাস্, প্রভৃতি স্থানে আকের ক্ষেতে বা মালয়-রাজ্যে রবারের বাগিচায় খাটত কারা? চাষ-বাসের বৈজ্ঞানিক প্রণালী যতই প্রচলিত হোক্ না কেন, মানুষের হাত চাই-ই। আক, তুলা, চা, নীল, রবার, প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৃষি-জাত দ্রব্যের বড় কাটতি; কিন্তু ফসল উৎপন্ন করবার ব্যয়টা কম হওয়া চাই। তাই যাদের অল্প পয়সায় বেশী খাটানো যেতে পারে, তাদের না হলে আক, তুলা, চা, নীল, রবারের চাষে লাভ হয় না। ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজের প্রফে-সার মিঃ টড্ এইজন্যই এই সব ফসলের নামকরণ করেছেন "Blackman's crop" অর্থাৎ কালা আদ্‌মির পরিশ্রম-লব্ধ ফসল। যে কালা আদ্‌মি নিজের ভিটা-মাটি-ক্ষেত ছেড়ে গেছে, কৃষি-প্রধান দেশে জন্মেও নিজের ক্ষেতে ফসল তুলে যে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারল না, সেই কালা আদ্‌মিই সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে পরের ক্ষেতে সোনা ফলিয়ে দিচ্চে। এমন কেন হয়,—আপনারা পল্লীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলুন দেখি। আমাদের দেশে কৃষি-মজুরেরা ভাল কাজ-কর্ম্ম করতে পারে না অনেকের মুখে এমন অভিযোগ শোনা যায়; অথচ এরাই দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে নেটাল উপনিবেশের উন্নতি-সাধনে সহায় হয়েছে! নেটালের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্যর লীজ হুলেট এ কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বল্‌ছেন:—

"The condition of the colony before the importation of Indian labour was one of gloom, it was one that then and there threatened to extingnish the vitality of the country and it was only by the Government assisting the importation of labour that the country began at once to revive. The coast had been turned into one of the most prosperous parts of South Africa. They could not find in the whole of the Cape and the Transval what could be found on the coast of Natal—10,000 acres of land in one plot and in one crop—and that was entirely due to the importation of Indians. Durban was absolutely built up by the Indian population.

ভাবার্থ:—ভারতবর্ষ থেকে শ্রমিক আমদানি করবার পূর্ব্বে উপনিবেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এমন সময় সর-কার পক্ষ থেকে ভারতীয় শ্রমিক আন্‌বার উদ্যোগ হল বলেই উপনিবেশ যেন প্রাণ ফিরে পেল; আজ এদের পরিশ্রমেই নেটাল দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সব-চেয়ে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে; এক সঙ্গে ত্রিশহাজার বিঘে ভুঁইয়ে একই শস্য উৎপন্ন হচ্চে—এমন দৃষ্টান্ত সমস্ত দেশের কোথাও দেখা যায় না; এ-কাজ সম্ভব হয়েছে ভারতবর্ষীয় শ্রমিকদের পরিশ্রম-ফলে। ডারবান্ সহর এরাই গড়ে তুলেছে।

এই কারণেই ত বিচক্ষণ ধন-কুবেররা ভারতবর্ষ থেকে কৃষি-মজুর আমদানি কর-বার পাকা বন্দোবস্ত করতে এত উদ্‌গ্রীব! তারা লক্ষ্য করেছে যে আমাদের পল্লী-সমাজে ভাঙ্গন সুরু হয়েছে; ছোট ছোট জোতদারেরা দেন'র দায়ে জমি হস্তান্তর করে দিয়ে এখন মজুর খাটে; গাঁয়ে এমন কোনো শিল্প নেই যার উপর নির্ভর করে একদল লোক খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে; সহরে বড় বড় কল-কারখানায় মজুর চাই কিন্তু সে-সব মজুরদের কলের কাজ কিছু-জানা দরকার। যারা ছেলে বেলা থেকে চাষ্‌বাস করছে, তাদের ও-কাজে মনও নেই। এমন অবস্থায় আড়কাঠিদের জালে এরা অনায়াসেই ধরা পড়ে। বিদেশে "রাম-রাজত্বে" বাস করবে, এমন সব মন-ভোলানো কথা শুনিয়ে উপনিবেশের বেতন-ভোগী আড়কাঠিরা তাদের কুলির দলে ভর্ত্তি করে নেয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আড়কাঠিদের আড়ৎ আছে। যে-যে প্রদেশে কৃষি ও কৃষিপল্লীর অবস্থা শোচ-নীয়, সেখান থেকেই বেশী লোক জোটে। ফিজি, মরিসাস্, বৃটিশ গুয়ানা প্রভৃতি দেশে প্রায় শতকরা ৭৪জন কুলি যায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশ থেকে,—সেইজন্যেই হয়ত সব-চেয়ে বড় আড়ৎ হচ্ছে কাশীধামে। মাদ্রাজ থেকে অধিকাংশ কুলি যায় বর্ম্মায় ও মালয় রাজ্যে; আর বোম্বাই থেকে যায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায়।

যখন কোনো দেশের জন-সংখ্যা এত বেড়ে ওঠে যে, দেশের মাটিতে বাস করে আর খোরাক জোটে না; অথবা যখন পল্লী-সমাজের ভিত্তি ভাঙ্গতে থাকে তখন শ্রমিক জন-সংখ্যা দলে দলে স্বদেশ থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইতালীতে আয়-র্ল্যাণ্ডে, রুসিয়ায়, এমন কি ইংলণ্ডে এই উপসর্গ দেখা দিয়েছে; এ-সব দেশ থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে যাত্রীরা আমেরিকায় যায়। কিন্তু তারা যায় স্বাধীন মানুষ স্বাধীন দেশে—কোনো বাধা-বাঁধন নেই, কোনো কঠিন আইন-কানুনের শাসন তাদের মান্‌তে হয় না। আর ভারতবর্ষের

কিনারা থেকে যারা যায়, তারা যে বিধাতার অভিশপ্ত জাতি! তাই তাদের দাসখত দিতে হয়!

অনেকে মনে করেন, এরা দাসখত দিয়েও দেশের চেয়ে বিদেশে থাকে ভাল; এমন কি জীবিকা নির্ব্বাহ করে দু'পয়সা উদ্বৃত্ত রাখ্‌তে পারে। এর জবাব দিয়েছিলেন মহাত্মা গোখ্‌লে তাঁর সেই তেজস্বিনী ভাষাতে ব্যবস্থাপক সভার বৈঠকে দাঁড়িয়ে। তিনি হিসেব করে দেখিয়ে দিলেন যে, যারা দেশে ফিরেছে, তাদের হাতে পাঁচ বছরের পুঁজি গড়ে দেড়শ' টাকার বেশী থাকে না; অর্থাৎ ত্রিশ টাকা বছরে; অথবা আড়াই টাকা মাসে!

যাই হোক্, উপনিবেশে ভারতীয় কুলিদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে বিদেশে গিয়ে তাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে না। প্রশ্ন এই, তবু কেন যায়? আর ফিরে এলেও তারা নিজের গাঁয়ে কেন থাকতে পারে না?

যে-সব কারণ আমাদের চোখে পড়ে তার গোটাকয়েক নাম করলেই এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী—এ-সব কারণ ত আছেই, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য আরো তলিয়ে আবিষ্কার করা দরকার। যারা রাজনীতি-বিশারদ অর্থাৎ যাদের বলি Statesmen, তারা এখনও ঠাওর করে উঠতে পারেননি যে, কেমন করে গাঁয়ের লোকদের গাঁয়েই সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখা যেতে পারে? সমস্যাটি যাদের চোখে পড়ে তারা কখন কখন হীনশ্রী পল্লীগুলো লক্ষ্য করে আক্ষেপ করেন; কখনও বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও য়ুনিয়নের পঞ্চায়ৎদের ডেকে উপদেশ দেন। সে উপদেশ অনেক স্থলেই বইয়ে-পড়া বাঁধি-বুলির আবৃত্তি মাত্র। পঞ্চায়েৎরা উপদেশের খুব তারিফ্ করলেও সরকার-পক্ষ থেকে বড় বেশী সায় পাওয়া যায় না; তার কারণ, এই-সব উপদেশের মধ্যে কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্গত ব্যবস্থার উল্লেখ থাকে না। থাক্‌লেই বা কেমন করে? আমাদের রাজনীতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তার হিসাব ও খাঁটি খবর আমরা এখনও রাখিনে। যাঁরা একটু-আধটু রাখেন তাঁদের মধ্যে সমস্যার মীমাংসা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে; আর যারা ভুক্তভোগী তারা ত অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে যা হ'বার তাই হবে মনে করে বসে আছে!

এ-জন্য কাউকে দোষী করা যেতে পারে না। সব দেশেই পল্লী-সংস্কার-সমস্যাগুলো সবে-মাত্র দেখা দিয়েছে; পল্লীতে বসবাস করেও কোন্ ব্যবস্থার সাহায্যে বর্ত্তমান কালের সুযোগ ও সুবিধাগুলো পল্লীবাসীরা সম্ভোগ করতে পারে, এই নিয়ে বহু আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। যে-জাতির চিন্তাশক্তি জাগ্রত, তারা কিন্তু বসে নেই! নগরীর আকর্ষণ থেকে পল্লীকে রক্ষা করবার নানা উপায় তারা উদ্ভাবন করছে। মায়ের বুক থেকে ছেলেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে নগরের ইট-পাথরের আবেষ্টনে তাকে পিষে মারবার কল-কারখানা সৃষ্টি করেছে যে সভ্যতা, আজ তার গলদ চোখে পড়েছে। কবি তাই আক্ষেপ করে

বলেছেন, "There has been no fine civilization, no really well-organised system of rural society. Civilization has passed the farmer by."

ভাবার্থ এতকাল যে-সভ্যতা গড়ে উঠ্‌ল তাতে পল্লী-সমাজের বিশেষ স্থান নেই; তার সকল ব্যবস্থা সুচারুরূপে গঠিত হতে পারেনি। ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করে যারা অন্নের সংস্থান করে' দেয় তাদেরই এড়িয়ে চলা হয়েছে।

কিন্তু আজ বোঝা যাচ্ছে, তাদের না হলে সভ্যতার ভিদ্ পাকা হবে না। ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষ দিক থেকে এ-কথা যাঁরা বুঝেছিলেন, তাঁরা ভুল শোধরাবার নানা পথ নির্দ্দেশ করেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিশেষ বদল করতে পারেননি,—ধনীদের প্রবল স্বার্থের প্রলোভন থেকে কৃষক ও শ্রমজীবিদেরও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাই ক্রমাগত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, বিরোধের উত্তেজনা, পৃথিবী-জোড়া অশান্তি—তাই সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আসন চঞ্চল হয়ে উঠেছে—তিনি বল্‌ছেন, "এবার ফিরাও মোরে।" ভোগ-ঐশ্বর্য্যের বিপুল পূজার আয়োজনেও তাঁর তৃপ্তি হলো না। যারা দেশের মাটি আশ্রয় করে জীবিকা অর্জ্জন করে, যারা সমস্ত দেশে অন্ন জোগায়, অন্নপূর্ণা দেবীর পাদ-পীঠ ত তাদেরি ঘরে; তার সঙ্গে সভ্যতার প্রকৃত মিলন না হলে কল্যাণ নেই! কেমন করে' এই মিলন সম্ভব, এই হচ্চে সব চেয়ে দুরূহ সমস্যা—পৃথিবীর সকল জাতিই আজ এই নিয়ে ভাব্‌ছে। আমাদেরও অন্নবস্ত্রের সমস্যা মিটবে যদি আমরা পল্লী সমাজ এমন করে' গড়ে তুল্‌তে পারি যেখানে জীবন পুরোপুরি তার খোরাক্ পেতে পারবে, যেখানে মানুষের বিকাশ কোনোপ্রকারে বাধাগ্রস্ত হবে না!

বর্ত্তমান সভ্যতার জাঁক-জমকের আবেষ্টনে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত বিজ্ঞ বন্ধুরা বল্‌বেন, "কথাটা শুন্‌তে ভাল বটে, কিন্তু কৃষিপল্লীকে কি তেমন করে গড়া সম্ভব?" এর উত্তরে সুধু বল্‌তে হয়, "যদি তা সম্ভব না হয়, তবে দু-পাঁচটা আইনের ধারাতে কোনো বিশেষ ফল হবে না।" ঋণদান জমি-জমা ও স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত আইনের ত অভাব নেই তাতে পল্লীর উন্নতি সাধন হচ্চে কই? কৃষকের দুর্গতি ঘুচ্‌ল কোথায়? জমির ফসলে তার সংসার চলেনা, গাঁয়ে এমন কোনো কাজ নেই যাতে তার আয়-বৃদ্ধির উপায় হতে পারে! তাই সহরের কল-কারখানার বাঁশী শুন্‌তে পেয়ে সে ছুটে যায়, চা-বাগিচার আড়কাঠির হাতে সে অনায়াসেই নিজেকে সঁপে দেয়, দাস-খত লিখে দিয়েও সে বিদেশে কুলির কাজ কর্‌তে রাজি হয়!

কেবলমাত্র আইন-কানুনের বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা যে এই সমস্যার মীমাংসা হয় না, তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ও আয়র্ল্যাণ্ডে। বিশেষভাবে এই দু'টি দেশের খবর কিছু জানি বলেই তার কথা মনে পড়ল। সুধু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা কোনো দেশেরই পল্লী-সমস্যা যথাযথভাবে পূরণ হয়নি। কৃষিজীবিকে পশ্চিম দেশের রাষ্ট্রনীতি বহু প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, তার কর্ম্মে সাহায্যও করেছে কিন্তু তবু যুক্ত রাজ্যের নানাস্থানে দেখা যায়, কৃষিপল্লী কৃষকেরা ছেড়ে গেছে। আয়র্ল্যাণ্ডে প্রজাসত্ত্ব

সম্বন্ধীয় আইন জাহির হল, জমিকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ভাগ করা হল, তবু কৃষিপল্লীগুলো থেকে দলে দলে ছেলেমেয়ের পাল বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ত এখনও পল্লী-সংস্কারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়নি; অতএব আমাদের সমস্যা আরো জটিল। আশঙ্কা হয়, না জানি,কতকাল এই অবস্থায় কাটাতে হবে। আমরা নিঃশব্দে কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে এই নিয়ে আক্ষেপ করে বলে থাকি, সেকাল—সে কি ছিল! তখন চালের দর শস্তা ছিল, পল্লীর বাইরে কাউকে যেতে হতো না; সকলেই নিজের ভিটা বজায় রেখে দিন কাটাতে পারত। অতীতের অবস্থা কি ছিল বা কি ছিল না, তা নিয়ে আজ আমরা যতই আক্ষেপ করিনা কেন, সে অবস্থা ফিরে পাবার কোনই আশা নেই। আজ আমরা ইচ্ছা করলেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডীর মধ্যে ঢুক্‌তে পারবনা। বাইরের ধাক্কাতেই যদি পল্লীর ভিদ্ ভেঙ্গে গিয়ে থাকে, তবে সে শক্তিকে শয়তানী শক্তি বলে' উপেক্ষা করলেই সব দুঃখ দূর হবে না। পৃথিবীর সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়ায় যদি আমাদের ক্ষতি হয়ে থাকে, সেজন্য দোষটা পৃথিবীর নয়; আমরা বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজেদের ঘর সাম্‌লাতে পারিনি বলেই এত দুঃখ!

প্রয়োজন হলেও সেকালে পল্লী ছেড়ে যাবার উপায় ছিল না। রাস্তা-ঘাট ছিল দুর্গম, আর পথ চলাতে আশঙ্কার কারণও ছিল প্রচুর। তারপর সম্ভবত দেশ-দেশান্তরে যাবার কিছু সুযোগ ঘট্‌তেই শাস্ত্রের শাসন পথ রোধ করে বল্‌ল, "বিদেশে গেলে জাত যাবে।" এমনি করে পল্লী-সমাজ বাইরের টান ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল, আজও করছে, কিন্তু এ অসম্ভব। জল স্থল ও আকাশের পথ দিয়ে দিয়ে মানুষ ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করেছে, এখন চলাচল বন্ধ রাখা আর চলে না। পল্লী-সমাজের সীমার মধ্যে যখন পল্লীবাসীর জীবন স্ফূর্ত্তি পায় না, তখন তাকে পথ দেখিয়ে সহরের মাঝখানে এনে ফেল্‌বার আয়োজনের অভাব নেই, তাই আমাদের পল্লী ক্রমশঃ জনহীন হয়ে উঠ্‌চে।

সহরের কেন্দ্রে যে-সভ্যতা গড়ে উঠ্‌ল তার শক্তির মূল হচ্চে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজকরবার আয়োজন, ব্যূহ-বদ্ধতা—organisation. যারা এ-শক্তির সন্ধান পেলেনা বা পেয়েও ব্যবহার করলেনা তারাই পিছিয়ে পড়ল। পল্লীসমাজ un-organised, তার চাষ-বাস, কেনা-বেচা, শিল্প ইত্যাদি সকল ব্যবস্থাই এলো-মেলো; এই জন্যেই বাইরের ধাক্কা সাম্‌লানো গেলনা—যারা organised, তাদের হাতে একে-একে আমাদের পুঁজিটুকু পর্য্যন্ত তুলে দিতে হচ্চে।

এই সমস্যার মীমাংসা হতে পারে কেবলমাত্র orgainsation-এর দ্বারা। কেমন করে এই কাজে হাত দিতে হবে, সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাঢ়ের দুর্গোৎসব

২

আজ সপ্তমী পূজা—ব্রাহ্মণেরা পূজায় বসিলেন। মহেন্দ্র আজ ঠাকুর দালানে নাই। পাড়ার ছেলেরা, জামাতারা ও অন্যান্য কুটুম্বের ছেলেরা পূজার জায়গায় আছে। জন তিন-চার রমণী সপ্তমী পূজার নৈবেদ্য করিতেছেন। তাঁহারা প্রাতঃস্নান করিয়াছেন, পরিধানে পট্ট বস্ত্র, নাসিকায় তিলক, হরিনামের মালা গলায়। একখানা বড় গামলায় একজন কতকগুলা আতপ তণ্ডুল ধৌত করিতেছেন, দ্বিতীয়া একখানা বড় বঁটি লইয়া ফল কুচাইতেছেন। বাতাবি লেবু—খোসা ফেলিয়া যেমন আম ছাড়ানো হয়,—তদ্রূপ ফেলিয়া টুকরা করা হইল,—পেয়ারার খোসা ছাড়াইয়া শতেক কুচি করা হইল। খোসা-শুদ্ধ বড় পাকা শসা চক্রাকারে তিন ছে করা হইল। একখানা খুরিতে পাঁচ কলাই সাজানো হইল, আর একখানা খুরিতে একটু মিছরি, নারিকেল-কুঁচি, একটি মনেক্কাও একটু একটু ক্ষীর ছানা দেওয়া হইল। তৃতীয় রমণী বাদাম-আখরোট হাতে করিয়া বলিল, "এ আবার কি করে দেয়? যে শক্ত!"

প্রথমা চাল ধুইয়া বার্কোসে তুলিতে তুলিতে বলিল, "একটা ভেঙ্গে দেখ না, ভিতরে কি আছে?" তৃতীয়া একটা আখরোটে শাঁকের ঘা দিয়া বলিল, "ওলো হিমি, এ যে ভেঙ্গে গিয়ে খোলার ভেতর নেগে রইল—দুর, দুর—টেনে বেরুচ্চে না!"

দ্বিতীয়া বলিল, "কাজ কি বাপু! তুই অমনি দে, বল্, মা দুগ্‌গা, ভেঙ্গে খেয়ো।"

কাজেও তাই হইল। একবার একটা আখরোট ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইল, আবার কে বাদাম ভাঙ্গিতে সাহস করে? সেই জন্য ও-সব অমনি দেওয়া হইল। বেদানার গোটা কতক দানা দেওয়া হইল, প্রত্যেক নৈবেদ্যে দুইটি করিয়া কলা দেওয়া হইল; একখানা বারকোসে তিনখানা করিয়া নৈবেদ্য হইল। দ্বিতীয়া বলিল, "মুগের ডাল ভিজুনো নেই।" তৃতীয়া বলিল, "না থাক্‌গে,—মুগের ডেলে বড় গন্ধ, উও আর দিতে হবে না—দে উওতে আকের ফালা দেয়, তা হইলেই হইব।" নৈবেদ্য প্রস্তুত হইল। নবাত মুণ্ডি তণ্ডুল স্তূপের উপর দিয়া তাহাতে ঘৃত ও মধুর ছিটা দিল, পরে তিন জনে নৈবেদ্য বহিয়া দেবীর পার্শ্বে রক্ষা করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা! হেই মা দেখো মা, নিজগুণে খেয়ো মা, যেন অপরাধ নিয়োনা!"

আর এখানে কেন,—চল পাঠিকা, অন্দরে চল—রাঢ়ের ভোজ দেখিবে। তোমরা সহুরে লোক, সহরে থাক, নিমন্ত্রণে যাও, লুচি-পোলাও খাও, রাঢ়ের ভোজ দেখ নাই, খাও নাই। খাও না খাও, একবার দেখিবে, চল।

দত্তদিগের বাটীর ভিতরে দুই দিকের রোয়াকে খান ১২।১৩ ঝুড়ি পড়িয়াছে—১২।১৩ জন রমণী তরকারী কুটিতেছে, আর পরস্পর গল্প করিতেছে। কতকগুলি লোকে গৃহীণের সুখ্যাতির ছলে তোষামোদ করিতেছে। আর কতকগুলা লোকে ঝগড়ার সূচনা তুলিতেছে—আর কেহ কেহ প্রাণ খুলিয়া পরনিন্দা করিতে

বসিয়াছে—কেহ বা নিজেরই বাহাদুরী করিতেছে—এমন সময় দিনতারিণী গোটা আষ্টেক ফুলকপি ও একটা নূতন ঝুড়ি করিয়া সের আড়াই নূতন আলু আনিয়া তথায় রাখিল। জগত্তারিণী এক ঝুড়ি কচু আনিয়া ঢালিয়া দিল। সেখানে কুমড়া, মোচা, গেঁড়ো, চাল্‌তা বিস্তর রহিয়াছে, আর উঠানের একপাশে বোঝা-বোঝা কচুর ডাঁটা আর গাড়ী-খানেক পুতিকা গাদা হইয়া রহিয়াছে। ত্রৈলোক্য তাড়াতাড়ি বঁটি লইয়া কপি কুটিতে গেল। হেমকুমারী বলিল, "কপি বানাতে জানো?"

ত্রৈলোক্য। কখনো কুটি নি—দেখি, পারি কি না।

—"ও বড্ড কুচি কুচি করে মোচার মত কুটতে হয়।"

ত্রৈলোক্য সভয়ে কহিল, "না বাপু, কাজ নাই—আবার খারাপ করে ফেলব। পার্ব্বো কি না পার্ব্বো, তার চেয়ে চাল্‌তা কুটিগে, যাই।"

ত্রৈলোক্য ফুলকপি রাখিয়া চাল্‌তা কুটিতে বসিলেন। পাঠিকা চল, একবার রন্ধন-শালায় যাই। কি রকম এদেশের রাঁধুনিরা রাঁধেন, তাহা একবার দেখিবে না? ঐ দেখ, জগত্তারিণী, মধ্যম গৃহিণী ও পাড়ার আট-দশজন রমণী রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত; এবং অনেকেই ভাবিতেছে, কপি রাঁধিবে কে?

জগ। জানিনা বাপু! শ্যাম দুগ্‌গার যেমন কাণ্ড, বর্দ্ধমান হোতে কপি আনলি আর বর্দ্ধমান হোতে একজন বামুন আনলেই ত ভালো হত।

মোক্ষদা বলিল, "অত ভাবিস না,—আমি কপি রাঁধব।"

রাঁধুনীরা সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বড় গিন্নি তথায় আসিয়া বলিল, "কি রান্না হলো, ঠাকুরঝি?"

জ। আখন ত কিছু সাঙ্গ হয় নাই, কতক কতক হচ্চে।

ব-গি। কি রান্না হবে?

জ। হবে? আঞ্চার ঝাল, ডিংলির ঝাল, পঁই চড়চড়ি, মোচার ঝাল, কপির ঝাল।

বড় গিন্নী বলিল, "কপির ঝাল ত হবে না,—দুগ্‌গা যে বলছিল, কপি দে মাছ দে হবে। উও কি তোমরা রান্‌তে পারো? দুগ্‌গার বন্ধু এয়েচে বর্দ্ধমান হতে, সেই রান্‌বে —তোমাদিকে কপি রান্‌তে হবে না।

যাই হোক, কপি রাঁধিতে হইবে না শুনিয়া রাঁধুনীরা নিশ্চিন্ত হইল ও সকলে একবাক্যে কহিল, "সেই ভাল।"

জগত্তারিণী বলিল, "কেন নিরিমিষি দিকে এক কড়া হবেনা?"

বড় গৃহিণী বলিল, "তা হোক কেন্না, রাঁধুনীরা খাবে।"

মোক্ষদা বলিল, "না, না, আমরা কপি গিলতে নারি,—কেমন ধারা গন্ধ কয়।"

এমন সময় নিস্তারিণী আসিয়া বলিল, "জেঠিমা, দেগ্‌গা কুমড়োর খোলাগুলো মাছের আঁসগুলো সব লোকে নে গেল।"

বড় গিন্নী সক্রোধে বলিল, "তবে আর পঁই চড়চড়ি হবে কি দিয়ে? যে দিকে না যাব সেই দিকে সব যাবে!" বলিয়া চলিয়া গেল। চালায় যেখানে মুড়ি ভাজা হইয়াছিল, সেইখানে কতকগুলা পুরুষ মানুষে ভাত ও কলাইয়ের ডাল রাধিতেছে। খেজুর পাতার ও তাল পাতার চাটা পাতিয়া তাহার উপর ভাত

ঢালা হইয়াছে, তাহার সন্নিকটে বড় বড় মাটির গামলায় কলাইয়ের ডাল ঢালিয়াছে। উঠানে মণ দুই মাছ পড়িয়া রহিয়াছে; যে যুবকেরা ভাত-ডাল রাঁধিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে হাস্য-পরিহাস আমোদ-আহ্লাদ চলিতেছে। দুইটি বাণ কাটা হইয়াছে, একটা বাণে ছয়টা করিয়া বড় বড় তোল হাঁড়ি চাপাইয়াছে,—বারোটা হাঁড়িতে ডাল ও ভাত হইতেছে—চারিজন বলবান পুরুষে কুড়ুল কাটারি লইয়া মাছ কুটিবার যোগাড় করিতেছে। বড়গিন্নী দ্রুত আসিয়া বলিল, "মাছ বানাচ্চে কে রে? আঁসগুলো সব নুটে নিয়ে গেল!"

শক্তি বলিল, "ছেলেরা মাছ ঘাঁটচে, তার কি বলব? তুমি বাড়ী যাও।"

বড় গিন্নী সর্গর্জ্জনে ফিরিলেন। কৃষাণেরা কচুগাছ বোঝা-বোঝা কাটিয়া আনিয়া জড় করিতে লাগিল। এদিকে পূজা শেষ হইয়া গেল—বাড়ীর বেটা ছেলেরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠিয়া গেলে বাড়ীর মেয়েরা ও কুটুম্বিনীরা যথাসাধ্য সাজ-পোষাকে শোভিত হইয়া মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিল ও প্রত্যেকে দুই-এক পয়সা করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিল; পরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মুড়ি-মুড়কি ও নারিকেল নাড়ু লইয়া জল-যোগে বসিল।

বাড়ীর মধ্যে একটা ঘরে মুড়ির ভাণ্ডার ও অপর একটা ঘরে নারিকেল নাড়ু টানা মিঠাই ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আছে। এই সব ঘরে শঙ্করের স্ত্রী শ্যামের স্ত্রী ও দিনতারিণী ভাণ্ডারী আছেন। দিনতারিণী বড় কাজ-কর্ম্ম করেন না, ফাঁকি দিয়া এঘর ওঘর করিয়া বেড়ান। শম্ভু ও শঙ্করের শালী-শালাজ যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহবা রাঁধিতেছে, কেহবা উদ্‌যোগ করিয়া দিতেছে, কেহবা পরিবেষণ করিতেছে। সকলে মনে করিতেছে যে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সমাধা হইয়া গেলেই ভাল,—যেন নিন্দা না হয়, যেন কিছু অপচয় না হয়! কৃতীর শালি-শালাজ থাকিতে ভগ্নী আসিয়া গৃহিণীপনা করা আর সহরে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পল্লীগ্রামে এ প্রথা এখনও আছে। বাড়ীর ছেলে ও মেয়েদের শ্বশুরালয় হইতে যত কুটুম্বিনী আসিয়াছে, তাহারাও কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত আছে। সহরের কুটুম্বিনীদের কাজ-কর্ম্ম করিবার জন্য লোক ভাড়া করিয়া আনিতে হয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে কুটুম্বিনী আসিলে আর কাজের লোকের ভাবনা থাকে না।

হরিপদ বলিল, "মা, আজ যে সব মাছ ধরা হয়েছে, ও-সব কি হবে?"

বড় গৃহিণী বলিল, "কপি দিয়ে কিছু হোক্ আর অম্বল হোক্।"

ভবতারিণী বলিল, "না, না, সবই অম্বলে হোক।"

হরিপদ হাসিয়া বলিল, "সে কি পিশিমা, সব অম্বল হবে কি? কাল যে চারমণ মাছের সব অম্বল হয়েছে! আজও দু'মণ মাছের সব অম্বল হবে? আবার ঐ গেঁড়ো চাল্‌তার বংশ নির্ব্বংশ হবে ত—কত টক্ চাই? তাই বর্দ্ধমান জেলার টক্ খাওয়ার চিরকেলে অখ্যাতি। হ্যাঁ পিসিমা, তাই কি তোমার বাবা আম কাঁঠালের গাছ কেটে লাগাও তেঁতুল বাগান করে গেছে?"

ভবতারিণী সক্রোধে বলিলেন, "হ্যা দেখ্ তুই টকের ব্যাখ্যি করিসনে ত। টক্ আছে,

তাই পিথ্যিমির রাঁড়ে বেঁচে আছে। খাওয়ার সময় দেখিস্ আখুনি, আক্‌সের চেলের ভাত আর আক্ মালসা কলাইয়ের ডেলের ঝোল আবার আক সরা করে টক্—ইয়ে নইলে উওরা খায় কি দিয়ে?"

বড়গিন্নি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন বলিলেন, "তাইত বটে—কপি সপি এনে আকটা যাচ্ছে-তাই যা হয় কর্‌গা বাপু।"

হরিপদ রাগে গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেল। বড় গিন্নী বলিল, "আখনকার ছেলেদের কি রোখা মেজাজ হয়েছে, বাপু।"

মোক্ষদা মাথা নাড়িয়া বলিল, "উওর দোষ কি? চাক্‌রে কিনা—চাক্‌রি কল্লেই একটু মেজাজ গরম হবে—উও যে হতেই হবে।"

ভব। হ্যা দেখ্ বউ, তুই রাগ করিস না—ছেলেরা হোতে কৈলিক্ পেথা সব উঠবে। পূজোয় কপি আমাদের কখন হয় নাই—তাই গুচ্ছের এনে হাজির কল্লে! তা হোক কেন্না বর্দ্ধমান হোতে উওদের বন্ধু এয়েচে কিনা, তাতেই কপি কচ্চে—তা করুক কেন্না! বামুনদিকেন বেশ চিঁড়ে খাওয়ানো হতো। এরার একটা বাব্ বাড়ালে, লুচি খাওয়াতে হবে—তা খাওয়া কেন্না মজা দেগ্‌গা—আমার কি।" ভব বকিয়া আপনিই থামিল।

সপ্তমীর পূজা হইয়া গেল। পুরোহিতেরা বলিলেন, "রামপদ, পাঁটা কই হে?"

রামপদ বলিল, "তাইত, পাঁটাটা যে এইখানে বাঁধা ছিল—কোথা পালাল?"

অভয় বলিল, "পাঁঠা কই?"

এইরূপ সকলেই পাঁঠা কই পাঁঠা কই শব্দে মহা হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়া দিল। অনেকে পাঁঠা খুঁজিতে রাস্তায় বাহির হইল। নরেন্দ্র শম্ভু দত্তর তৃতীয় জামাতা,—মদ্য-পানে ভক্তিমান্ হইয়া একগাছা দড়ি লইয়া পাঁঠা খুঁজিতে বাহির হইল এবং পরক্ষণে একটা বড় কালো কুকুর বাঁধিয়া টানিতে টানিতে হাঁফাইতে হাঁফাইতে পূজা-মণ্ডপে আসিয়া হাজির হইল।

মহা বিভ্রাট—শম্ভু ও শঙ্কর সভয়ে ছুটিয়া গিয়া পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের সংবাদ দিল, "শিগ্যির যা—সর্ব্বনাশ হলো! নরেন মদ খেয়ে কি করছে, দেখ্।" যে যেখানে ছিল সকলে বহির্ব্বাটীতে গিয়া হাজির হইল। সকলেই একবাক্যে বলিতেছে, "নরেন, ছাড়ো, ছাড়ো—সব নষ্ট হলো! এখুনি সব ছুঁয়ে মাটী কর্ব্বে—ওটা পাঁঠা নয়, কুকুর—ছাড়ো।"

নরেন্দ্র মহাস্ফূর্ত্তিতে চীৎকার করিতেছে, কুকুরও ভয়ে কেঁউ কেঁউ করিয়া চীৎকার করিতেছে—লোক দেখিয়া আঁচড়াইতে কামড়াইতে যাইতেছে। কেহ ভয়ে কুকুরের নিকট যাইতে পারিতেছে না, পাছে কামড়াইয়া দেয়! নরেন কুকুরটাকে টানিয়া লইয়া প্রতিমার সম্মুখে গিয়া হাজির হইল। কুকুরটা যত লাফায় তত চীৎকার করে, আর নরেন জড়িত স্বরে বলে, "শালা,—ঘাস খেয়ে এত ভারী, ভাত খেলে আরও কত হতো! দেখিস্ বেটা, নৈবিদ্যি খাস্‌নে যেন!"

পুরোহিতেরা সভয়ে "গেল, গেল, ছুঁলে" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কুকুরের চীৎকারে আরও পাড়ার গোটা দুই-তিন কুকুর জুটিয়া গেল ও চীৎকার আরম্ভ করিল। অধিকাংশ লোকেই হায়-হায় করিতে লাগিল।

পূজা-মণ্ডপে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। রামপদ বলিল, "নরেন, কর কি, কর-কি? ছেড়ে দাও। কুকুর নিয়ে সব নষ্ট কল্লে—আঁচড়ে-কামড়ে দেবে, নৈবিদ্যি ছড়াবে—ছেড়ে দাও।"

নরেন্দ্র। কুকুর কে বলে? যে বলে, সে নিজে কুকুর! পাঁঠা চিন্‌তে পার না? ও বেটা চালাক কত! ক্ষুর লুকিয়ে থাবা পরে বসে আছে,—তোমরা চিন্‌তে পারনি! আমি যেই চালাক ছেলে, তাই দেখেই ধরে ফেলেছি।

দুর্গা। ভাল মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে—কেড়ে নিতেও পাচ্চি না ত। ভয় করছে কাছে যেতেও। নরেন, শোনো, ও যে কেঁউ কেঁউ কচ্চে—কুকুর নয় ত কি ও?

নরেন্দ্র। আরে ভাই, কারে পড়লে সব শালাই কেঁউ-কেঁউ করে, তা জানো?

দুর্গা। তুমি খুব বুদ্ধিমান, দাও, ছেড়ে দাও।

নরেন্দ্র। নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান, আমি পরের নাড়ী টিপে খাই—কুকুর সেজে আমায় এড়াবে? ঠিক ধরে ফেলেছি।

এদিকে কুকুর লাফালাফি করিতে করিতে দড়ি খুলিয়া পলাইল। নরেন কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই পা ছুটিয়া গিয়া হতাশ ভাবে কহিল, "যা বেটা, তোর মা যেই দুয়োর বন্ধ করেছিল, বেটা বড্ড বেঁচে গেছিস্।" ভয়ে কেহ কুকুরের কাছে যাইতে পারিতেছিল না—এইবার সকলে নরেনকে ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল। নরেন্দ্র যাইবার সময় ভট্টাচার্য্যদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "হোলই না হয় কুকুর—ষষ্ঠীর দিন বচন ঝাড়ছিলে বাবা, মধু-অভাবে গুড় ক দত্তাৎ—আজ পাঁঠা-অভাবে কুকুর দত্তাৎ হয় না, বাবা? ওটাতে মালে বাড়তো কত—" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে সে বাড়ীর মধ্যে গেল।

নৈবেদ্য বিলি হইল। নাপিতেরা লইয়া ব্রাহ্মণ-বাড়ী দিতে গেল—ব্রাহ্মণেরা সকলেই আপত্তি করিয়া বলিলেন, "ও কুকুর-ছোঁয়া নৈবেদ্য, আমরা নেব না।"

অগত্যা নৈবেদ্য ফেরৎ আসিল। নৈবেদ্য ফেরৎ আসিল দেখিয়া কর্ত্তারা বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ ত পরের কথা বরং অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, "সে কি কথা—নৈবিদ্যি ফিরিয়ে দিলে! বামুনদের এত-বড় আস্পর্দ্ধা কবে হল? আমাদিকে তা হলে বামুনদের চাইনা? ধান্ বাড়ি (বাড়ি-ধার, ফর্দ্দ) কর্ত্তে আর আস্‌তে হবে না ত!"

গৃহিণীর তর্জ্জন-গর্জ্জন ক্রমশঃ প্রচার হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা যেই শুনিলেন যে ধান-বাড়ি পাওয়া যাইবে না, তখন তাঁহারা ভীত হইলেন; আর এক ভাবনায় চঞ্চল হইয়াও উঠিলেন—বোধ হয়, অষ্টমীর দিন লুচি ক'পাত পাওয়া যাইবে না—তখন সকল ব্রাহ্মণই গৃহিণীর প্রচণ্ড রোষানলের নিকট ভস্মীভূত হইবার ভয়ে কোন কথা উত্থাপন না করিয়া গোপনে হরিকে কেহ-বা দুর্গাকে ঘুষ দিতে স্বীকৃত হইলেন।

এদিকে পাঁঠা না পাওয়া যাওয়ায় সকলে বিব্রত হইয়া পড়িল। অনেক খোঁজ করার পর জানা গেল যে বাগ্দী পাড়ায় যাহার বাটী হইতে পাঁঠা কেনা হইয়াছিল, পাঁঠাটি সুযোগ পাইয়া সেই মন্নিবের বাড়ীতেই পলাইয়াছিল।

যাই হোক, অপরাহ্নে বলি শেষ করিয়া পূজা সমাপন করা হইল এবং লোক-জন খাওয়াইবার জন্য সদর বাড়ীতে ভিতর বাড়াতে খামারে ও যেখানে-সেখানে পাতা দেওয়া হইল—পাতার মধ্যে অধিকাংশ পদ্মপাতা, শালপাতা খুব কম। গ্রামের ও ভিন্ন গ্রামের নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত স্বজাতি বিস্তর আসিল—জলপাত্র সকলেই নিজ নিজ বাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছে। এদেশে জল লইয়া প্রায়ই নিমন্ত্রণ খাইতে আসে। পাতা হইয়া গেলে সকলেই খাইতে বসিল। জন পনেরো লোক পরিবেষণ করিতে গেল—মাথায় বা কাঁকালে কেহ কেহ ভাতের ঝুড়ি লইয়া দুইটি সারের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল আর একজন সরা করিয়া ঝুড়ি হইতে ভাত দিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত ডাল ও তরকারি মাছ অম্ল প্রভৃতি পরিবেষণ হইল। রন্ধন ভাল হওয়ায় সকলেই তৃপ্তি-পূর্ব্বক খাইতে লাগিল—পরে গুড় দেওয়া পরমান্ন আসিল। পরিবেষণ ও আহার চলিতে লাগিল। দুই শত ওঠে, একশত বসে—এরূপ করিয়া সেদিন দত্ত-বাড়ীতে প্রায় ছয়শত লোক খাইল। এই সকল ভোজে মিষ্টান্ন মোটেই নাই, কিন্তু সেজন্য কোন নিন্দাও নাই। খাইয়া সকলে বিশেষ পরিতোষ পাইয়া সানন্দ চিত্তে সুখ্যাতি করিতে করিতে তামাকের খোঁজ করিতে লাগিল; কেহই পাণের খোঁজ করিল না, পাণ হোক আর নাই হোক, তামাক পাইলেই হইল।

ভাই পাঠিকা, তুমি কি নিমন্ত্রণ খাওয়া দেখিয়া নিন্দা করিবে? আমি কিন্তু করিব না, কারণ কচু কুমড়ার ঘণ্ট ও কুমড়া-বড়ির টক্ আর কলাইয়ের ডালের ঝোল, মিষ্টান্নের মধ্যে পরমান্ন—ইহা লইয়া লোকে সন্তুষ্ট হয় বলি পল্লীগ্রামের লোকে সামান্যতেই ভোজ কা করিতে পারে। আর তোমাদের দেশের ম মিষ্টান্নের ও ব্যঞ্জনের প্রোগ্রাম ছাপাই হইলে গরিব বা সামান্য লোকে খাওয়ান কথাটা ভুলিয়া গিয়া কেবল খাইতে ও নিন্দ করিতে শিখিবে—কারণ, যাহারা মধ্যে মধ্যে খাওয়ায়, তাহারা খাইয়া আসিয়া নিন্দা করে না, যাহারা কখনও খাওয়ায় না, জানে, কেব খাইতেই হয়—তাহারাই নিন্দা করে, করিবে চিরকাল। যাহার যেমন অবস্থা তাহার সেইরূপ আয়োজন করিয়া লোক খাওয়ান উচিত। আর যাঁহারা বড়লোকের বাড়ী প্রোগ্রাম পড়িয়া খাইয়া আসেন, তাঁহাদের উচিত গরিবের বাড়ী শাক ডাল সুক্ত আহার করিয়া সমান সুখ্যাতি করা; নহিলে খাওয়ানো ব্যাপারটা ক্রমশ উঠিয়া যাইবে—নিন্দা হইবার ভয়ে সামান্য লোকে সাহস করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে না।

সপ্তমীর যজ্ঞ-আহারাদি শেষ হইতে সন্ধ্যা হইল। আবার আরতির সময় আসিল—রমণীরা সাজ-সজ্জা করিতে লাগিল, বাদ্যকরগণ নব-উৎসাহে স্বকার্য্য-সাধনে মন দিল। ধূপ ধুনাতে ঠাকুর দালান পুরিয়া উঠিল, রমণীগণ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া দালান নিরেট করিয়া ফেলিল। জগত্তারিণী ও ভবতারিণী পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া চামর হস্তে দেবীর দুই পার্শ্বে দুই ভগিনী আসিয়া দাঁড়াইল—আরতি আরম্ভ হইল।

আজ অষ্টমী—বহির্ব্বাটীতে পূজার ও ভিতর বাটীতে লুচির অয়োজন হইতেছে

কয়েকজন শূদ্রা স্নান করিয়া আসিয়া ময়দা মাখিতেছে। আজ বেশী লোক খাইবে না—কেবল একশত আন্দাজ পুরুষ মানুষ খাইবে, তাহাদেরই মত কুটনা বাটনা হইতেছে, চালায় দুইটা উনানে আগুন দেওয়া হইল। দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া উনানে কটাহ বসাইয়া ঘৃত ঢালিয়া দিল। মহেন্দ্র লুচি বেলিতে লাগিল। একখানা কটাহে লুচি ভাজা হইতে লাগিল, আর-একখানায় লবণ-বিহীন কচু-কুমড়ার ঘণ্ট সিদ্ধ হইতে লাগিল। যেমন লুচির গন্ধ বাহির হইল, অমনি গ্রামের ব্রাহ্মণ-পাড়ার ছেলে-মেয়ে তথায় আসিয়া আশ্রয় লইল। পাড়ায় আর ছেলে দেখিবার যো নাই! সব দত্ত বাড়ীর উনান-সালে হাজির, অথচ তাহাদের মাতা-পিতা বলিতে লাগিল, "আমার ছেলে তেমন নয়, লুচির কাছকে যাবে নাই।"

এদিকে লুচির গন্ধে আমোদিতা হরমণি ঠাকুরাণী তিনুমাসির নিকট সাবাস্ লইবার মানসে তিনু ঠাকুরাণীর নিকট গিয়া বলিল, "হাঁ তিনি মাসী, আজ মহা-অষ্টমী, মুড়ি ভিজিয়ে খেতে আছে কি? না রুটীই গড়ব?"

তিনু। ক্যানে? আজ দত্তবাড়া বামুনদের মেয়ে-পুরুষদিকেন খেতে বলেচে যে।

হরমণি কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত বলিল, "বটে! আমি ত জানিনা। কে জানে মা, আমি এ্যাত খোঁজ রাখি না, মরুকৃগে লুচির লেগে কেবা কানচে!" বলিয়া মহা-আনন্দে বাটী ফিরিয়া বধূদিগকে এই শুভ সংবাদ দিল।

বেলা দুইপ্রহরের মধ্যে অষ্টমী পূজা শেষ হইল। ব্রাহ্মণদের ডাক পড়িল। পূজক ব্রাহ্মণ পূজা সারিয়া ব্রাহ্মণ ডাকিতে বাহির হইলেন। এদিকে পাতা প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্মণগণ তিন বৎসরের সাবালক পুত্র ও পঞ্চদশ বর্ষীয়া নাবালিকা কন্যা লইয়া আসিয়া পাতা জমকাইয়া বসিলেন। পরে সব পরিবেষণ হইতে লাগিল—লুচি, কুমড়ার ডালনা, আর নারিকেল নাড়ু—ইহাই ব্রাহ্মণ দিগকে দেওয়া হইল। ঐ উপকরণেই ব্রাহ্মণেরা তেরো-চোদ্দ গণ্ডা লুচির গালে চড় মারিয়া উঠাইলেন।

ব্রাহ্মণদিগকে ভাল দ্রব্য কিছুই দেওয়া হয় নাই দেখিয়া হরিপদ পিশিমার নিকট যাইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ পিশিমা, এ কি ব্রাহ্মণ-খাওয়ানো গো! কৈ, ব্রাহ্মণদের মাছ, কপির তরকারি—কিছুই দেওয়া হয় নি! সুধু তো কুমড়োর ঘাঁট দেখছি।"

ভব। জানিনা, তোর মা কি করতে দিয়েচে, দেখ্ গা।

হরিপদ তাহার মাতাকে ঐ কথা বলায় বড়গিন্নী বলিল, "হ্যাদে উতিই ভাণ্ডার উজোড় হ'ল—আবার মাছ? বকিস্ না।"

হরিপদ বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। সেদিন আর বড় কিছু হইল না।

নবমীর দিন সকাল করিয়া পূজা-হোম শেষ হইল। আজও তিনশতের বেশী লোক খাইবে। বেশ রান্না-বাটনা-কুটনা চলিতেছে। আজ বাড়ার সকলেই বড় ব্যস্ত,—কারণ বাগ্দারা ধরিয়াছে—আজ মশাইয়ের বাড়ী আমরা মনসার গান করব। গৃহিণীরা বারণ করিতেছেন যে মনসার গানে কাজ নাই; কিন্তু বাগ্দীরাও ছাড়িবেনা, আর বাড়ীর বউ ও মেয়েগুলাও ছাড়িবে না। যাই হোক, দিনট

খাওয়া-দাওয়ার গোলমালে বেশ এক রকম কাটিয়া গেল। ভবতারিণী এখন হইতেই কান্না ধরিয়াছেন—মা কাল কইলুসে যাবেন! তাহার মনে সুখ নাই! আজ আরতির সময় যতক্ষণ চামর ব্যজন করিয়াছে, ততক্ষণই কাঁদিয়াছে, "আহা, মা আমার কইলুসে যাবেন!"

এদিকে যেমন আরতি শেষ হইল, অমনি উঠানে আসর পড়িল। শতরঞ্চের উপর ডুগি তবলা ও একখানা কাপড়ের পাড় জড়ান ভাঙ্গা বেহালা লইয়া কাল কাল ঝাঁকড়া চুল-ওয়ালা গোটাকতক লোক বেসুরা বেতালা বাজাইতে লাগাইল। পরে তাহার মধ্য হইতে দুইজন লোক উঠিয়া পাছা পেড়ে কাপড় পরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল ও গান ধরিল—

"বিপদ-বারণ
তুমি নারায়ণ,—
লোকে বলে ক্যানে করুণা-নিধান!"

শ্রোতারা "হো-হো" শব্দে হাসিয়া উঠিল। যাই হোক, নাচিয়েরা খেলো হইল না—খুব নৃত্য-গীত লাগাইয়া দিল। কতক লোক দেখিতে লাগিল, কতক বা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। নরেন ছুটিয়া গিয়া যাহারা উঠিয়াছিল তাহাদের পথ আটকাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কে উঠে যাচ্চিস্ রে?"

পলাতকদের মধ্যে একজন উত্তর করিল, "এঁজ্ঞে বাড়ী যাচ্চি মশাই—কদিন আত জেগে শড়ীলটা দাবা হয়েছে সড়দী কড়েছে, আর গান ভাল লাগচে না।"

নরেন্দ্র। হুঁ, এখন অনেক ব্যায়রাম হবে! কেন—কই আমাদের বাড়ী খাসনি?

—"এজ্ঞে, পেসাদ পেয়েচি বই কি!"

নরেন্দ্র। তবে উঠে পালাচ্চিস্—চালাকি না কি? চল্, গান শুন্‌বি, চল্, খাবার সময় অর্থাৎ বোঝাই নেবার সময় শড়ীল দাবা (দাবা-ভারি) হয়নি? তখন বুঝি হালকা হয়েছিল,—এখন বসে বসে গান শুনে উপকার করবে, তাই ভারী হচ্চ!

নরেন লোকগুলাকে লইয়া মাতলামি আরম্ভ করিয়া দিল। এদিকে নাচের গান শেষ করিয়া একজন বেহালা রাখিয়া উঠিল এবং দর্শকদের দিকে চাহিয়া কহিল, "কোথায় হে লিদ্রে!"

দোয়ারগণের মধ্যে একজন চীৎকার করিল, "এঁজ্ঞে হুজুর।"

বেহালা-বাদক। বেউলার কোন্দে চাপনা লায়ে।

দোয়ার। এঁজ্ঞে এই যে চন্নাম।—বলিয়া সে বসিয়া পড়িল। অমনি একখানা গান আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-পাতালব্যাপী বড় বড় হাঁ করিয়া একের পর এক করিয়া দুই-এক জন লোক রাগ-রাগিণীটাও সারিয়া লইল এবং দলের সকল লোকে এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া হা-হা-হা-হা করিয়া গান শেষ করিল, পরে বেহালা-বাদক স্কন্ধের বেহালা নামাইয়া আবার হাঁকিল, "কোথায় হে কালিলাগ!"

দোয়ার। হাঁ, হাঁ।

বেহালা-বাদক। লকিন্দরকে ডংসে দিয়ে এসো গে।

দোয়ার। এঁজ্ঞে চন্নাম।

তখন একজন দৈবক সাজিয়া গান ধরিল, "এক মাস্ দুইমাস তিন মাস হইল, দৈবক চলিয়ে যায়।"

রামপদ বাধা দিয়া কহিল, "হ্যাঁরে ও গান যে নকিন্দরের জন্মাবার আগেকার।"

বে—বা। এঁজ্ঞে, তাই বটে। তবে কি ওটা আমড়া অগ্‌গেড়ে গীদ ধড়তে ভুলে ছেনাম।

রামপদ কহিল, "যা, আর গান করতে হবে না—খুব গেয়েছিস্! রাত জেগে আর বসেও পারা যায় না,—তোরাও বাড়ী যা—আমরা একটু শুই।

বে—বা। এঁজ্ঞে, আমরা আর একটু খেলা দেখাব।

"খুব খেলেছিস্,—আর খেলেনা—যা" বলিয়া রামপদ বাড়ীর ভিতর উঠিয়া গেল। অগত্যা খেলা দেখাইবার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া দলকে উঠিতে হইল। সকলে ঠাকুর প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।

লছমন ঝোলা

২

কতকদূর উঠিয়া একটি চটি দেখিলাম, সেখানে একটু দুধ পাওয়া গেল। অতি চমৎকার দুধ—যেন অমৃতের ধারা! হায়রে কলিকাতার সাদা জল! কোন রকমে রঙ রাখা, তবু তুই টাকায় দুই সের! দুধই বলুন আর অমৃতই বলুন, তাই পান করিয়া লুপ্তশক্তি ফিরিয়া পাইলাম। বসিয়া পড়িলে চলিবে না, পথ অনন্ত! আবার চড়াই ঠেলিতে লাগিলাম। সে তেমনই চড়াই; মাঝে মাঝে মোড় ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। একটি বাঁকের কাছাকাছি আসিলেই মনে হয়, আর চড়াই নাই, ইহার পর বরাবর সরল সমতল রাস্তা পাইব! কিন্তু এ কি! মোড় ফিরিয়া দেখি, দূরে অতি উচ্চে আকাশের কোলে গগন-লগ্ন পর্ব্বতের গায় একটি অতি সূক্ষ্ম রেখা—আমাদের গন্তব্য পথ। "জয় বদ্রীবিশাল-কি জয়!" দাও প্রভু, শক্তি দাও, নহিলে ত আর পারি না। প্রভুর কি দয়া—নবীন উৎসাহে প্রাণ ভরিয়া গেল। আবার চলিতে লাগিলাম।

এত ক্লান্তিতেও কি একটা সুখের আভাষ পাইয়াছি, এত কষ্টের মাঝেও কি এক মহিমা দেখিয়াছি! এই পর্ব্বত-মালার স্তরে স্তরে কার অনন্ত রূপরাশির মধুর লীলা-লহর অবলোকন করিয়াছি! তাই সকল কষ্ট ভুলিয়া বিপুল রূপোচ্ছ্বাসের মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিতে পারিয়াছি। নতুবা এই কঠিন কর্কশ পর্ব্বত-গাত্রে বিচরণের উৎসাহ পাই কোথা হইতে! ক্লান্ত নিথর চরণে কে শক্তি আনিয়া দেয়? কে প্রাণ ভুলাইয়া দেয়? কে মন মজাইয়া দেয়? কি জানি, কি রূপের রাশি, কি মধুর হাসি আলোর তরঙ্গের মত দিগ্‌দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে! চোখ ফিরাইব কি? চোখ যে ইহার অণুতে অণুতে লাগিয়া গিয়াছে! এই দিগ্‌দিগন্ত, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ছাওয়া বিপুল মাধুরীর মাঝখানে মানুষকে নিশ্চল পুত্তলিকার মত স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়। এই



পি, ডবলুই, ডি'র ইন্‌স্পেক্‌সন বাঙ্গালা

বিনা খরচায় কলের জল ; ঝরণার মুখে লোহার নল লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লগ্ন মাধুরীর মাঝখানে আপনার যা-কিছু সবই হারাইয়া যায়!

এইরূপে চলিতে চলিতে একটি চটি পাইলাম, নাম বড় বিজলি। বোধ হয়, যে পাহাড়ের উপর চটিটি অবস্থিত, তার নাম "বিজলি পাহাড়", এই কারণে চটিরও নাম হইয়াছে বিজলি চটি। চটিটি মোনা চটির তিন মাইল উপরে। যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় আটটা কি সাড়ে আটটা হইবে। চটিটিতে নানা রকমের জিনি আছে, দুই-এক রকমের মিষ্টান্নও দেখিলাম একটি পাত্রে রাশীকৃত মটর ভাজা রহিয়াছে। খুব একটা বড় কড়ায়ে দোকানে এক পাশে দুধ গরম হইতেছিল ; একটু এক দুধ ও মিষ্টান্ন খাইলাম। চটিটি মন্দ না যাত্রীদের অবস্থানের পক্ষে অনেকটা সুবিধ জনক। গঙ্গার জল সেখানে পাওয়া যা না, গঙ্গা অনেক নীচে। ঝরণার জ

যাত্রীদের সম্বল। ঝরণার সঙ্গে যোগ করিয়া 'পাইপ' লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সেই পাইপের মুখ দিয়া অনবরত জল পড়িতেছে। সেখানে দুই-এক ঘর পাহাড়ী লোকের বাস আছে। তাহারা চাষ-বাস করিয়া থাকে।

আবার চলিতে লাগিলাম। চড়াই তেমনই আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। গঙ্গা আর দেখা যায় না বলিলেই হয়। চারিদিক ধোঁয়ার মত। সকল দিক যেন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। অভ্রভেদী পর্ব্বতমালার শিখর-বাহী পথ পর্য্যটন-কালে যে অভিনব সৌন্দর্য্যরাশি নয়ন-পথে পতিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত, শুধুই ভাবগম্য! যে কখনও দেখে নাই তাহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব! দূরে অতি নিম্নে নীরব প্রবাহিনী ক্ষীণ সূত্রাকারে বহিয়া চলিয়াছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল, মহাকবির সেই ছন্দোময়ী বাণী—

"ক্বচিৎপথা সঞ্চরতাং ঘনানাং ক্বচিৎ খগানাম্।"

বার বার বিধাতার সৃষ্টি-কুশলতার তারিফ্ করিতে লাগিলাম।

চারিদিকেই দেখি, একটির পর একটি অনন্ত পর্ব্বত ক্রমে ক্রমে দূরে অতি দূরে আকাশের গাঢ় নীলিমার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে আরও উঠিতে লাগিলাম ; মনে হইতে লাগিল, বুঝি, স্বর্গের পথে চলিয়াছি! এই রকমে কিছুদূর গিয়া এমন একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়াইলাম যে খানে সমগ্র পর্ব্বত-মালা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ইহার পরই পশ্চাতের পর্ব্বতরাজি আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মহা বিভাগ-স্থলে একটি ক্ষুদ্র কুটীর দেখিলাম। কালী কম্লীওয়ালার বিশ্ব-করুণার (humanity) বিমল নিশান শিরে ধরিয়া এই কুটীর দাঁড়াইয়া আছে। এই কুটীর-দ্বারে পিপাসাতুর পথশ্রান্ত পথিকের জন্য অজস্র অমৃত-বিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। এই করুণাবারি মহাত্মার শুভ্র যশোরাশির ন্যায় চির-নির্ম্মল। সোনায় সোহাগা, এখানে একটু দুধও মিলিল।

এস্থলে একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, সকল কথাই বলিতে বসিয়াছি, একটি মহত্ত্বের কথা, একটি আদর্শ হৃদয়ের কথা কেন না বলিব? জলদাতাকে দুই-একটি পয়সা দিতে গেলাম ; সে লইতে চাহিল না, নমস্কার করিয়া বলিল, "মাপ করিবেন। বাবার কীর্ত্তি কলুষিত করিব না। ভাইকে জল দিতেছি, পয়সা লইব কি—?" ধন্য হৃদয়! অগণিত বাহিনীর অধিনায়ক দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার জগৎকে ভীত ত্রস্ত করিয়া কীর্ত্তিমান হইয়া ছিলেন ; সিজার, অগষ্টাস্, জারেক্‌সেস্ প্রভৃতি মহাপুরুষের কীর্ত্তি-গাথা ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে! সে কীর্ত্তির ফল কি? অহঙ্কার, লোকক্ষয়! তাহাকে কি humanity বলিতে পারেন? এই জল-হীন অরণ্যপথে মানবের জন্য অশ্রুত্যাগ, সর্ব্বস্বত্যাগ, আড়ম্বর-বিহীন করুণা-কীর্ত্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই, ইহা আর্ত্তজনের অন্তরে অন্তরে অমৃত অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে!

ধীরে ধীরে কুটীরটি পশ্চাতে ফেলিয়া চলিতে লাগিলাম।

চলিয়াছি, তেমনই চলিয়াছি, মন হারাইয়া, বিচার হারাইয়া, দর্প-অহঙ্কার সব চূর্ণ করিয়া দিয়া—তেমনই চলিয়াছি। চারিদিক নীলিমায়

আচ্ছন্ন, মেঘের কোলে মেঘ জমাট বাঁধিয়া নীচের পর্ব্বতের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। পর্ব্বতের পর পর্ব্বত কোন্ দিগন্তের কোলে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে। গঙ্গার দূর নীরব ক্ষীণ ধারাটি এক একবার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে।

বিজলি হইতে আরও তিন মাইল চড়াই উঠিয়া প্রায় দশটার সময় কুণ্ডা চটিতে পৌঁছিলাম। চটিটি রাস্তার একটু নীচে; একটি 'কুণ্ডার' জলই যাত্রীদের সম্বল। সামনেই রাস্তার উপর সাধুত্তম কালী কম্লী-ওয়ালার অমৃতময় করুণা-নির্ঝর পিপাসিতের পিপাসা দূর করিতেছে। ধন্য মহাপুরুষ! তুমি দেবতার হৃদয় লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলে! আজ তোমার করুণা উৎস শত শত যাত্রীর জীবন রক্ষা করিতেছে!

এই চটিতে আসিয়া শুনিলাম, ইহার পর বরাবর উতরাই। এই সংবাদে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম, প্রাণের বোঝা অনেকটা নামিয়া গেল। ইচ্ছা ছিল, এই চটিতেই থাকি, কিন্তু চটিওয়ালার মধুর ব্যবহারে এত কষ্টেও তখনই সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। ইঙো পোঁ আর অগ্রসর হইতে রাজি নয়। ভদ্র লোক ভয় পাইয়াছে। একে ত রাস্তার ঐ অবস্থা, তার উপর তাহার সঙ্গে একটি ছোট বাক্স; নিজেকে সামলাইতেই প্রাণের বাঁধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে, তার উপর বাক্স বহা! তাহার কষ্ট দেখিয়া মাঝে মাঝে অনেক সময় তাহার হাতের বাক্সটি নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছি। ইঙোপোঁ কিছুতেই আর যাইবে না,—আমাদেরও ইচ্ছা নয়, তাহাকে ছাড়িয়া যাই! কিন্তু কি করি? চটিওয়ালা যে মন চটাইয়া দিয়াছে। আমাদের দোষ অতি সামান্যই। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ গো বাবু, রান্না-বাড়া হবে কি করে? জল কোথা?" চটিওয়ালা মহাপুরুষ অমনই গরম হইয়া উত্তর করিলেন—"দেখ্‌তা নেই, আঁখ কি নেহি হৈ?" মনে মনেই করিলাম, "ধন্য বাবা তোমার মধুর ভাষা, হাতে একটা লাঠি নিয়ে খাড়া থেকো, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে দু'-এক ঘা বসিয়ে দিও।" প্রকাশ্যে বলিলাম, বাপজান, বোধ হয় তোমার দোকানে চিনিও নাই। মিষ্টির সঙ্গে যে তোমার জন্মেও আলাপ নাই, তা তোমার মধুমাখা কথাতেই বুঝিয়াছি।"

অনুমান সত্য, চিনি জুটিল না—আর এক অঞ্জলি—বাবা কম্লীওয়ালার দান—অমৃত-বারি পান করিলাম। দেবলোকের অমৃত অপেক্ষাও মধুর আর একটা জিনিষও অদৃষ্টে জুটিয়া গেল। কাণ্ডীওয়ালারা তামাক খাইতেছিল, তাহারা আমাকেও এক কলিকা সাজিয়া দিল।

তিন মাইল নীচে বন্দর চটি। পা আর চলিতেছে না, বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছি। তবুও সে কষ্টটুকু স্বীকার করিতে রাজি হইলাম, চটিওয়ালার কথাটা বড়ই প্রাণে লাগিয়াছিল। সমস্ত পথই উতরাই—নামিতে তত কষ্ট হইবে না। নামিবার সময় তত কষ্ট হয় না; নামিতে নামিতে মনে হয়, কে যেন পিছু হইতে ঠেলা দিতেছে, কে যেন সামনের দিক্ হইতে জোরে আকর্ষণ করিতেছে! এমনই প্রবল মাধ্যাকর্ষণ। উঠিবার সময় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেই আত্মাপুরুষ কাঁপিয়া উঠে, নামিবার সময় নীচের

দিকে চাহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। বাঙ্গালার সমতল সুমার্জ্জিত পথগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বাঙ্গালার পথে ঘাটে তার শ্যামল শস্যে-ভরা মাঠে কি এক বৈচিত্র্য আছে, কি এক প্রাণ-স্পর্শী স্পন্দন আছে—অভাবের সময় তাহা বেশ বুঝিতে পারি! তার কোলে শুইয়া যখন ঘুমাইয়া পড়ি, তার বুকের উপর যখন ছুটাছুটি করি, তখন সেই আনন্দ-স্পন্দনটুকু বুঝিয়া উঠিতে পারি না!

দুইটির অবশ্য তুলনা করা যায় না, দুইটি ভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন ভাবের; আপন আপন ঐশ্বর্য্য লইয়া অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয় স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখিয়া মানুষের মন লইয়া অনাদিকাল হইতে টানাটানি করিতেছে। শৈলমালার এই সুন্দর বিশাল বিরাট নগ্ন মূর্ত্তিটি শীর্ষে তার বিজয়-উষ্ণীষ ধারণ করিয়া আধিপত্যের গরিমায় দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে! 'দিগন্তের' যাত্রী আজ স্বপ্নোত্থিতের মত শৈলরাজের চরণে বিস্ময়ে আনত!

ভুলিয়া যাইতেছি, 'কি বলিব' ভুলিয়া যাইতেছি। কত ঊর্দ্ধে বসিয়া আজ আমরা কয়টি প্রাণী,—পাগল হাওয়ায় সৌন্দর্য্যের লহর চারিদিকে উধাও হইয়া ছুটিয়াছে। ক্ষুধায় পিপাসায় মন চন্ চন্ করিতেছে, তবু যেন কোথাকার কি "মোহের স্বপন" আসিয়া অবাক মনটিকে ঘুম পাড়াইয়া দিতেছে, সমস্ত শরীর ছাইয়া কি এক সুখের ঢেউ ছুটাইয়া দিতেছে!

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালার দুইটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের দেখা হইয়াছিল, আবার আজ এখানেও দেখা হইল। আবার বাঙ্গালার স্নেহ, পাহাড়ের কোলে বসিয়া আবার বাঙ্গালার সেই মধুমাখা স্বর!

"কি বাবা এসেছ? এই তোমাদের কথাই হচ্ছিল।"

বলিলাম, "হ্যাঁ মা এসেছি। আপনারা ভাল আছেন?"

—"হ্যাঁ বাবা! বাপ মা কেমন করে তোদের ছেড়ে দিলেরে? নিশ্চয়ই বাবা, তোমরা লুকিয়ে এসেছ। নইলে কি আর আসতে দিত? কোথায় বাবা বুড়ো বয়সে বাপ-মাকে তীর্থ করাবে, না, নিজেরাই এসেছ! কেন এমন করলে বাবা?"

—"না মা, তাঁদের মত নিয়েই এসেছি।"

—"না বাবা, কথাটা ভাল লাগছে না বল্লে কি আর ছেড়ে দিতোরে বাবা! মাকে না পাঠিয়ে নিজেরা এলি বাপ? না জানি, বুড়ো বাপ-মা কত ভাবছে।"

"আসি মা।" বলিয়া রওনা হইলাম। তবু সেই মধুর স্বর মাতৃস্নেহের মত সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল—"খুব সাবধানে যেও বাবা।"

একটু দাঁড়াইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ মা।"

মনটা একটু টলিয়া গেল। এই স্নেহটুকু আজ এখানে নিতান্ত দুর্লভ। তাই মন গলিয়া গেল। চলিয়াছি, তখনও তাঁদের কথা শুনিতে পাইলাম—তাঁহারা বলিতেছেন, "কিছুতেই না, লুকিয়ে চলে এসেছে।"

উতরাই সুরু হইল; নামিয়াই চলিয়াছি, নামিয়াই চলিয়াছি। পাহাড়ের পর পাহাড়, ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছি, বায়স্কোপের মত এক একটি ছবি চোখের সামনে আসিতেছে আবার সরিয়া যাইতেছে। ঐ আবার "ভুবন-ভুলানো চোখ-জুড়ানো" আর [illegible] চোখের



পর্ব্বত উপত্যকায় চটি

সামনে ভাসিয়া উঠিল ও সকল কষ্ট ভুলাইয়া দিল। এ কি সৃষ্টি! সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার! প্রত্যেকটি সুন্দর, প্রত্যেকটি নূতন! বিস্ময়ের কি আর সীমা থাকে!

বিহ্বল চিত্তে চলিয়াছি, আপনা ভুলিয়া চলিয়াছি। কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; দৃষ্টি নীচের দিকে। দূরে, অতি-দূরে গঙ্গার কূলে কূলে সৌন্দর্য্যের ঢেউ খেলিতেছে! একটা কি "মোলায়েম" আবরণ প্রকৃতির অঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, একটা কি নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে! পথ তেমনই ঘুরিয়া ফিরিয়া নামিয়া গিয়াছে। আমরাও নামিতেছি। হু হু শব্দে নামিতেছি, সঙ্গীরা সব পিছনে পড়িয়াছে, তবুও আর পথ শেষ হইতে চায় না। নামিতে নামিতে একটি বাঁকের মাথায় আসিয়া একটি কুটীর, কালী কম্লীওয়ালার জলসত্র। উদর পুরিয়া জল খাইলাম। গঙ্গা সেখান হইতে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; চটিটিও দেখা যাইতেছে, ক্ষীণকায় গঙ্গা-তটে একটি নীরব চিত্রের মত!

জল-পানান্তে কুটীরের সামনে বসিয়া বসিয়া দেখিতে পাইলাম, কলসী মাথায় একটি লোক ধীরে ধীরে চড়াই ঠেলিয়া উঠিতেছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, লোকটি এক মাইল পথ নীচে হইতে গঙ্গার জল লইয়া আসিতেছে। পথিকের পিপাসার জন্য এতটা কষ্ট বেচারা মাথা পাতিয়া লইয়াছে।

প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় বন্দরঘাটে পৌঁছিলাম। চটিটি গঙ্গার উপরেই; অত্যধিক যাত্রীর সংখ্যা, পাঁচ-সাতখানি চালা ঘর, সবগুলি যাত্রীতে ভরিয়া গিয়াছে। কেহ তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেছে, কেহ-বা গাছের তলায় বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছে।

বহুকষ্টে একটু বিশ্রামের স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

বিশ্রাম করিব কি, পেটের ভিতর অগ্নিদেব জ্বলিয়া উঠিয়াছেন! খাইবার চেষ্টায় মন দিতে হইল। প্রথমেই সেই চটির চিনি আর সেই গঙ্গার জল (এ যেন গুরুচণ্ডালে যোগ) মিশাইয়া ঢালাঢালি করিয়া দুইজনে দুই ঘটি সরবৎ খাইলাম। স্বামীজির আশ্রমে একটা বেল গাছে প্রচুর বেল ধরিয়াছিল; আশ্রমে অবস্থিতি-কালে নিত্যই সেই বেলের অমৃতময় সরবত পান করিতাম, চটিওয়ালার ভেজাল চিনির নিঃস্বাদ সরবৎ পান করিতে করিতে স্বামীজির সেই বেলের সরবৎ মনে পড়িল, চোখের পাতাও অমনি একটু ভিজিয়া আসিল।

তারপর ঠাঁই করিয়া আহারের ব্যবস্থা। রাঁধিলাম খিচুড়ী, বড় চমৎকার! অন্নপূর্ণার নাম লইয়া রাঁধিতে বসিলে বোধ হয় নূনটাও কম হইত না! কোন রকমে ত খাইলাম। তারপর শয়ন। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' দলে দলে মক্ষিকা-সেনা অনাবৃত স্থানসমূহ আক্রমণ করিতে লাগিল, বহু চেষ্টাতেও ঘুমাইতে পারিলাম না। গুরুজী আপাদ-মস্তক রেশমি চাদরে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন; অবিলম্বেই তাঁর নাসিকাধ্বনি শুনিতে পাইলাম; গুরুজীর এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, স্নানান্তে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিয়াছেন। মুখে ঢাকা দিয়া শোওয়া আমার কখনও অভ্যাস নাই, ঘুম হইল না; গঙ্গার গুরুগম্ভীর ঐক্যতানে মন মিলাইয়া দিয়া কোন্ সুদূর রাজ্যে চলিয়া গেলাম!

আর একদিনের একটা কথা বলিতেছি, একটা নেঙটা মানুষ শুইয়া আছে, তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরটা মাছিতে ঢাকা,—ঘাট চটি পার হইয়া একটা ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতর লোকটাকে দেখিয়াছিলাম। সে যেন একটা মাছির মানুষ! অদ্ভুত তার ধৈর্য্য, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, নড়েও না চড়েও না, মড়ার মত চুপচাপ পড়িয়া আছে!

বেলা পাঁচটার সময় বন্দর চটি ছাড়িয়া রওনা হইলাম। এইখানে আর একটি নূতন কাণ্ডিওয়ালা জুটিল। মৌনা চটির ছোঁড়াটা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। এটিও ঠিক কাণ্ডিওয়ালা নয়, ইস্কুলের ছাত্রের মত একটি ফুট্‌ফুটে ছোক্‌রা; আমাদের সঙ্গে সেই তিনটি বাঙ্গালীবাবু। নানারূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে, গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়াছি। গঙ্গার কূলে কূলে রূপের হাট বসিয়া গিয়াছে। প্রবাহিণীর অনন্তরূপময়ী মনোহারিণী স্নিগ্ধ শ্রী প্রাণের ভিতর অবিরাম আনন্দ স্পন্দন আনিয়া দিতেছে; শরীর শিথিল হইয়া আসিতেছে। কথা বলিব, এমন শক্তিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; প্রাণের ভিতর বিদ্যুতের চমক ছুটিতেছে। আমার নেত্রযুগ অশ্রুসিক্ত হইল,—এই বিপুল উচ্ছ্বাসময় সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে কাহার যেন ভুবন-ভরা রূপের শান্ত আলোক জাগিয়া উঠিল। রাস্তার এক পার্শ্বে কর্কশ নিরস্তপাদপ এক মহাকায় পর্ব্বত—সেদিকে চাহিলেই প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত খাঁ খাঁ করিতে থাকে, বামে স্নিগ্ধ চারু তরুমণ্ডিত স্বচ্ছ তটময়ী গঙ্গা শিলা-সঙ্কুল গিরিমূল ধৌত করিয়া ছল-ছল কল-কল স্বরে বহিয়া চলিয়াছে,—দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? হৃদয়-তন্ত্রীগুলি ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া ছিঁড়িয়া [illegible] হারা দর্শক

আপনার সংচ্ছিন্ন অস্তিত্বটুকু প্রকৃতির মহা-ভাবময় সৌন্দর্য্যের মধ্যে হারাইয়া ফেলে।

আবার চড়াই—উন্মুক্ত রৌদ্রের তাপে সমস্ত শরীর পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার উপর চড়াই। গুরুজীকে লইয়াই বেশী বিপদ। সেদিন তাঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। সোজা পথে তিনি বেশ চলিতে পারেন, তখন তাঁহাকে পায় কে?

অনেকটা চড়াই,—ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। কোন রকমে ত উঠিলাম। তখন পিপাসায় সকলেই কাতর হইয়া পড়িয়াছি। পথের ধারে একটা ঝরণাও ছিলনা যে সেই জল পান করিয়া পিপাসার শান্তি করি। চড়াইএর উপর একখানি গৃহ দেখিলাম। সেখানে একটু জল চাহিলাম, তখনই গৃহস্বামী অতি যত্নে আমাদের জল দিলেন; ইহা কালী কম্লীওয়ালার মৃত সঞ্জীবনী। রাস্তার ধারে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া আছি, এমন সময়ে বালকের কণ্ঠধ্বনি আমাদের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" "নিকট গঙ্গা বহত নির্ম্ম শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্" এই গান গাহিতে গাহিতে বালক আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটু পূর্ব্বে পিপাসায় কণ্ঠাগত-প্রাণ, কঠিন কর্কশ প্রস্তরময় জগৎ দেখিতেছিলাম, এখন সেই প্রস্তর ভেদ করিয়া যেন মিষ্ট বারিধারা নির্গত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বালকণ্ঠের মধুমাখা সঙ্গীত-রব পর্ব্বতশ্রেণী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

এইরূপ চড়াই উতরাই ঠেলিয়া পথ হাঁটা যেমন ক্লেশকর তেমনই বিস্ময়োদ্দীপক,—যেমন একদিকে অত্যন্ত কষ্ট, তেমনই অন্য দিকে কষ্টের অপনোদক দৃশ্য-মাধুর্য্যও অতি সুন্দর! সেই উন্নত হিমাদ্রি-বক্ষে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে চাহিলেই সব কষ্ট নিমেষে কোথায় চলিয়া যায়! মনে হয়, এ কি এক অপূর্ব্ব মহিমাময় সুন্দর ভাবের রাজ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি!

শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

গরু

মানুষ তোমায় বেজায় খাটায়
টানায় তোমায় লাঙল, গাড়ী—
একটু যদি গোল করেছ
অম্‌নি পড়ে লাঠির বাড়ি!

আপন জিনিস বল্‌তে তোমার
নেইক কিছুই এ বিশ্বেতে
তোমার বাঁটের দুধটুকু তা'ও
বাছুর তোমার পায়না খেতে!

মানুষ তোমার মাংস খাবে,
অস্থি দেবে জমির সারে,
চামড়া দিয়ে পরবে জুতো,
বারণ কে তা'য় করতে পারে!

তোমার 'পরেই এ অত্যাচার
হে মরতের কল্পতরু,
কারণ, নহ সিংহ কি বাঘ,—
কারণ তুমি নেহাৎ গরু!

"বনফুল"

মিলিতোনা

৫

আন্দ্রে মরিয়াছে, কি শুধু আহত হইয়াছে ইহা ঠিক্ নির্দ্ধারণ না করিয়া, নৈশ-প্রহরীর হাক্ শুনিয়াই জুয়াঙ্কো প্রস্থান করিল; সে মনে করিয়াছিল, তাহার অব্যর্থ আঘাতে আন্দ্রে নিশ্চয়ই নিহত হইয়াছে। এই যুদ্ধে কোন কাপট্য ছিল না, কোন বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না, সুতরাং অনুতাপ করিবার কোন কারণ নাই। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে তাহার পথ হইতে অপসারিত করিতে পারিয়াছে সর্ব্বোপরি এই সুখের কল্পনাটাই তাহার মনের উপর একাধিপত্য করিতেছিল। একটা গোলমালের শব্দ শুনিবামাত্র মিলিতোনা জানলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং যুদ্ধের সমস্তক্ষণ তাহার যেরূপ ভাবনা হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। একবার মনে করিল, চীৎকার করিয়া উঠিবে কিন্তু তাহার জিহ্বা তালুতে আট্‌কাইয়া রহিল, ভীতি লৌহ-কঠিন হস্তে তাহার কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরিল; টলিতে টলিতে জ্ঞান-হারা হইয়া পাগলের মত এলোধাবাড়ি রকমে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, অথবা তাহার জড়বৎ দেহ যেন অজ্ঞাতসারে পিছলিয়া চলিল। যে সময় আন্দ্রে মাটিতে পড়িয়া যায় ঠিক সেই সময় মিলিতোনা আসিয়া দ্বারের কপাট খুলিয়াছিল।

সৌভাগ্যক্রমে তরুণী যেরূপ নৈরাশ্য ও ব্যগ্রতার সহিত ছুটিয়া আসিয়া আন্দ্রের শরীরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা জুয়াঙ্কো দেখে নাই; তাহা হইলে একটা খুনের বদলে সে দুইটা খুন করিত।

মিলিতোনা আন্দ্রের হৃৎপিণ্ডের উপর হাত দিয়া দেখিল, হৃৎপিণ্ডটা অতি ক্ষীণভাবে স্পন্দিত হইতেছে। সেই সময় নৈশ-প্রহরী তাহার একঘেয়ে ধুয়া আওড়াইতে-আওড়াইতে সেইখান দিয়া যাইতেছিল। মিলিতোনা সাহায্যার্থ তাহাকে ডাকিল। প্রহরী ছুটিয়া আসিল এবং তাহার লণ্ঠনটা আহতের মুখের উপর ধরিয়া বলিল;—

"ওঃ—এ যে সেই লোকটি—যে একটা চিঠি পড়বার জন্য আমার কাছ থেকে লণ্ঠনটা নিয়েছিল।" এই কথা বলিয়া মরিয়াছে কি, এখনো বাঁচিয়া আছে দেখিবার জন্য, আন্দ্রের শরীরের উপর সে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল।

এই প্রহরীর মুখ দেখিতে কর্কশ হইলেও, লোকটা আসলে ভাল; এই তরুণী, যে মোমের মত সাদা এবং যাহার কালো ভুরু মুখের পাণ্ডুতাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে; এই নির্জ্জীব আহত ব্যক্তি, যাহার মস্তক তরুণীর কোলের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে—এই মূর্ত্তি-সমবায়টি দেখিলে "রাম্ব্রাঁ" চিত্রকরের তুলিকাও প্রলোভিত হইত সন্দেহ নাই। বিশেষত মিলিতোনাকে দেখিলে মনে হয় যেন শোকের প্রতিমা একটা কবরের সম্মুখে নতজানু হইয়া রহিয়াছে।

নৈশ-প্রহরী কয়েক মিনিট পরীক্ষা করিয়া বলিল;—"এখনো নিঃশ্বাস পড়িতেছে; এইবার ক্ষতস্থানটা দেখা যাক্।" তাহার পর মূর্চ্ছিত আন্দ্রের কাপড়গুলা একধারে সরাইয়া দিয়া একপ্রকার ভক্তি[illegible] বলিয়া

উঠিল ;—"আঘাতের ঠিক্ নিয়মানুসারেই আঘাতটা নীচু হইতে উপর দিকে উঠেছে ; এ নিশ্চয়ই একজন ওস্তাদের হাতের কাজ। আমি ত অনেক আঘাত ইতিপূর্ব্বে দেখেছি—কিন্তু এমন সাফ্ হাত কারও দেখি-নি! কিন্তু এখন এই যুবকটিকে নিয়ে কি করা যায়? একে ত বয়ে' নিয়ে যাওয়া যাবে না ; কোথাই বা এ-কে নিয়ে যাওয়া যায়? ও-ত আমাদিগকে ওর ঠিকানাটা বল্‌তে পারবে না।"

মিলিতোনা বলিল,—"আমার বাড়ীতে উঠিয়ে আনা যাক্ ; যে হেতু ইহার সাহায্যের জন্য আমিই প্রথমে আসিয়াছি, অতএব····· এই আহত ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষার অধিকার একমাত্র আমারই।"

ঐ প্রহরী একটা হাঁক দিয়া ডাকিবামাত্র তাহার সাহায্যার্থে তাহার এক জুড়িদার আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দু'জনে মিলিয়া উহাকে ধরাধরি করিয়া মিলিতোনার গৃহের আবড়ো-খাবড়ো সিঁড়ি দিয়া উঠাইতে লাগিল। বেচারা আহত ব্যক্তির পাছে ঝাঁকানি লাগে, এই ভয়ে মিলিতোনা তাহার ছোট হাতটি দিয়া তাহাকে ধরিয়া, পিছনে পিছনে চলিল এবং বুটি-তোলা কাজ-করা মস্‌লিন-কাপড়ের পালঙ্ক-পোষবিশিষ্ট তাহার ক্ষুদ্র কুমারী-সুলভ নিষ্কলঙ্ক পালঙ্কের উপর অতি সন্তর্পণে তাহাকে শুয়াইয়া দিল।

দুইজনের মধ্যে একজন প্রহরী অস্ত্র-চিকিৎসককে আনিতে গেল, আর একজন আন্দ্রের পকেট হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিল, যদি পকটে কোন কার্ড কিংবা চিঠি পাওয়া যায় যাহার দ্বারা তাহার সনাক্ত হইতে পারে। কিছুই পাওয়া গেল না। ইত্যবসরে মিলিতোনা একটা কাপড় ছিঁড়িয়া কতকগুলি ক্ষত-বন্ধন ও মলম লাগাইবার পটি প্রস্তুত করিল। পূর্ব্বে মিলিতোনা আন্দ্রেকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য একটু লিখিয়া যে কাগজের টুক্‌রা তাহার জান্‌লা হইতে আন্দ্রের নিকট নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কাগজের টুক্‌রাটা জুয়াঙ্কোর সহিত ধস্তাধস্তি করিবার সময় আন্দ্রের পকেট হইতে পড়িয়া যায়—এবং উহা বাতাসে উড়িয়া দূরে নীত হয়। তাই, যতক্ষণ না আহত ব্যক্তির চৈতন্য হইল, পুলিস আন্দ্রের ঠিকানার কোন নিদর্শনই পাইল না।

মিলিতোনা শুধু এই কথা বলিল যে, সে ঝগ্‌ড়ার একটা গোলমাল ও একজন লোকের পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। সে আর কিছুই বলিল না। যদিও মিলিতোনা জুয়াঙ্কোকে ভালবাসিত না, তথাপি সে অপরাধের অনিচ্ছাকৃত হেতু সে নিজে, সেই অপরাধের জন্য জুয়াঙ্কোকে দোষী করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

অবশেষে অস্ত্রচিকিৎসক আসিলেন এবং আহতের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আঘাতটা খুব গুরুতর নহে, ভয়ের কোন কারণ নাই। ছোরার ফলাটা পাঁজরার একটা হাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সজোর আঘাত ও ভূতলে পতনের দরুণ, বিশেষতঃ রক্ত ক্ষয় হওয়ায় আন্দ্রে হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষত স্থানের ধারে ডাক্তারের শলাকা স্পর্শ হইবামাত্র আন্দ্রের জ্ঞান হইল। চোখ খুলিয়া আন্দ্রে প্রথমেই দেখিল, মিলিতোনা হাত বাড়াইয়া ডাক্তারকে একটা

ক্ষত-বন্ধনের কাপড় দিতেছে। আলদঙ্গা মাসী, শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল, তাকিয়ার আর এক পাশে দাঁড়াইয়া, অর্দ্ধস্ফুটস্বরে দুই চারিটা সান্ত্বনার কথা বলিল।

ডাক্তার পটি বাঁধা শেষ করিয়া, কাল আবার আসিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

আন্দ্রের মাথাটা ক্রমশঃ খোলসা হইয়া আসিতেছিল ; অস্পষ্ট দৃষ্টিতে সে তাহার চারিপাশ একবার দেখিয়া লইল। দেখিল—এই ধব্‌ধবে কাম্‌রায়, এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর, এক দেবী ও এক ডাইনীর মাঝখানে সে অবস্থিত। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায়, তাহার স্মৃতি-প্রবাহের মধ্যে এক জায়গায় একটু ফাঁক হইয়া পড়িয়াছিল। সে জুয়াঙ্কোর সহিত যুঝাযুঝি করিতেছিল ইহাই তাহার মনে ছিল। রাস্তা হইতে সে কেমন করিয়া ইতিমধ্যে মিলিতোনার অধ্যুষিত সুরম্য স্বর্গ-ধামে আসিয়া উপস্থিত হইল,—সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

"আমি তোকে ত আগেই বলেছিলুম, জুয়াঙ্কো একটা কিছু অনিষ্ট করবেই। সে সময়ে সে আমাদের উপর কেমন খট্‌মট্ করে তাকিয়েছিল। তখনি মনে হল, একটা কিছু ও করবেই। আমরা বেশ একটা খিচুরী পাকিয়েছি! আর যখন সে জান্‌তে পারবে তুই ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এই ঘরের ভিতর এনেছিস্ ···!" মিলিতোনা উত্তর করিল ;—

"—আমিই যে তার দুর্দ্দশার কারণ, আমি কি তাকে আমার দরজার সাম্‌নে মর্‌তে দিতে পারি? তাছাড়া জুয়াঙ্কো কিছুই বল্‌বে না। সে তার উচিত শাস্তি এড়াবার জন্য খুবই চেষ্টা করবে।" বুড়ী বলিল ;—

"এই যে, রোগীর আবার জ্ঞান হয়েছে দেখ্‌ছি ; ছাখ্, ও চোখ্ খুলেছে ; গালেও একটা রঙ ফিরে এসেছে।"·····আন্দ্রে অস্ফুট-স্বরে দুই-চারিটা কথা কহিবার চেষ্টা করায় মিলিতোনা বলিল ;—

"কথা কইবার চেষ্টা করবেন না, ডাক্তার নিষেধ করেছেন।" শুশ্রূষাকারীরা যেরূপ একটা কর্ত্তৃত্বের ভাব ধারণ করে, সেই কর্ত্তৃত্বের ভঙ্গীতে মিলিতোনা যুবকের রক্তহীন ঠোঁটের উপর স্বীয় হস্ত স্থাপন করিল।

গায়ক বিহঙ্গকুলের আহ্বানে যখন ঊষার গোলাপ-রক্তিম আলোকচ্ছটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন যে-একটি ছবি ফুটিয়া উঠিল তাহা দেখিলে জুয়াঙ্কো নিশ্চয়ই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিত ; মিলিতোনা আহতের শয্যার শিয়রে বসিয়া ভোরপর্য্যন্ত জাগিয়াছিল ; রাত্রির শ্রমে ও মনের আবেগে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এবং ঘুমের ঘোরে অজ্ঞাতসারে তাহার মাথাটা আন্দ্রের তাকিয়ার কোণে ভর দিয়া ছিল। তাহার সুন্দর কৃষ্ণ কুন্তল আলুলায়িত হইয়া ঢেউ খেলাইয়া শুভ্র শয্যাস্তরণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আন্দ্রে জাগিয়াছিল ; সে একটী কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ লইয়া তাহার আঙ্গুলে জড়াইতে ছিল।

এ কথা সত্য, ইহার কোন খারাপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। কারণ যুবকটী আহত এবং মাসীবুড়ী সম্মুখেই অবস্থিত।

যদি জুয়াঙ্কোর একটুও সন্দেহ হইত যে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করা দূরে থাক্, মিলিতোনার গৃহে তাহার যাইবার একটা উপায় করিয়া দিয়াছে, মিলিতোনার শয্যায়

তাহাকে স্থাপন করিবার সাহায্য করিয়াছে; মিলিতোনার সেই ঘরটীতে আন্দ্রে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছে,—যে ঘরে সূর্য্যের আলোক পর্য্যন্ত ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করে,—তাহা হইলে সে রাগে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া, নিজের নখ দিয়া নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করিত সন্দেহ নাই।

আন্দ্রে মিলিতোনার নিকটে যাইবার জন্য পূর্ব্বে কত চেষ্টা করিয়াছিল, কত ফিকির-ফন্দী করিয়াছিল, কিন্তু এই উপায়টা কখনো তার স্বপ্নেও মনে হয় নাই।

তরুণী জাগিয়া উঠিল; লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আবার কেশপাশ সুবিন্যস্ত করিয়া গ্রন্থিবদ্ধ করিল; তারপর রোগীকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন বোধ করিতেছেন। আন্দ্রে, প্রেম ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে মিলিতোনার পানে চাহিয়া উত্তর করিল;—"ভাল।"

আন্দ্রে বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া আন্দ্রের ভৃত্যেরা মনে করিল, কোথাও সায়াহ্ণ-ভোজনের নিমন্ত্রণে গিয়াছেন অথবা পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন; এই মনে করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল। নিত্য-নিয়মিত সময়ে ফেলিসিয়ানা আন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল,—কিন্তু আন্দ্রে আসিল না। ইহার জন্য পিয়ানো বেচারীকেই কষ্ট ভোগ করিতে হইল। ঝাঁকানি সহকারে এলোমেলো ভাবে পিয়ানোর পর্দ্দার উপর হাত পড়িতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় বাগ্‌দত্তা "নব্যার" সহিত সাক্ষাৎ না করে, তাহা হইলে স্পেন দেশে ইহা একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহাকে বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। ফেলিসিয়ানা যে একেবারে উন্মত্তভাবে আন্দ্রের প্রেমে পড়িয়াছিল, তাহা নহে। ফেলিসিয়ানার প্রকৃতিতে আবেগ জিনিসটাই ছিল না; সে উহা অসুবিধাজনক বলিয়া মনে করিত। কিন্তু আন্দ্রের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা তাহার অভ্যাসের সামিল হইয়া পড়িয়াছিল; এবং ভাবী পত্নীত্বের অধিকার-সূত্রে আন্দ্রেকে সে নিজস্ব সম্পত্তির হিসাবে দেখিত। সে বিশবার পিয়ানো হইতে উঠিয়া জানলার ধারে গেল এবং ইংরাজী প্রথার বিরুদ্ধে জানলা হইতে মাথা বাড়াইয়া আন্দ্রে আসিতেছে কিনা দেখিতে লাগিল।

আপনাকে প্রবোধ দিবার ছলে ফেলিসিয়ানা মনে মনে ভাবিল:—

"আজ সায়াহ্ণে, "প্রাদো"তে নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পাব,আর খুব কসে' "লেক্‌চার" শুনিয়ে দেব।"

গ্রীষ্মকালে সায়াহ্ণ সাতটার সময় "প্রাদো" সর্ব্বসাধারণের সুন্দর বেড়াইবার স্থান। ইহার মত শীতল সুচ্ছায় কিংবা চিত্রবৎ সুন্দর স্থান যে আর কোথাও নাই, একথা বলা যায় না। কিন্তু এরূপ জীবন-চাঞ্চল্যে সজীব ও আমোদ-উল্লাসময় জনতার স্থান আর কোথাও নাই। উপবন অপেক্ষা ইহাকে একটা সৌখীন লোকের বৈঠকখানা বলিলেই ঠিক হয়। খর্ব্ব স্থূলাকার সারি-সারি বৃক্ষ;—উহাদের ডাল ছাঁটিয়া শাখাপল্লবের বিস্তার জোর করিয়া বর্দ্ধিত করায়, উহারা প্রচুর ছায়াদানে ভ্রমণকারীর তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে।

পাথরে বাঁধানো একটা উচ্চ পথ যাহা

গাড়ী দাঁড়াইবার জন্য রক্ষিত সেই পথের ধার দিয়া সারি-সারি কেদারা ও শাখান্বিত দীপস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। এই বাঁধানো পথে নানা প্রকারের গাড়ী আসিয়া ভিড়িতেছে।

সৌখীন অশ্বারোহীরা ডুল্‌কি-চালের ইংরেজী ঘোড়ার উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, অথবা সুন্দর আস্তালুসীয় ঘোড়ার উপর চড়িয়া ঘোড়াকে নাচাইতেছে; এই সব ঘোড়ার ঘাড়ের চুল বিনুনী করা ও লাল রঙে রঞ্জিত; এবং উহাদের তরঙ্গায়িত গতিভঙ্গী আরব দেশীয় নর্ত্তকীদের নিতম্ব আন্দোলনের ন্যায়।

এই খোলা "বৈঠকখানায়" পিপীলিকার সারির ন্যায় দলে দলে লোক অবিশ্রান্ত আসিতেছে। জন-স্রোত নদীর স্রোতগুলার ন্যায় পরস্পর বিপরীত দিকে বহিয়া স্থানে স্থানে জনতার ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করিতেছে।

সাদা কিংবা কালো 'লেস্'-দেওয়া ম্যান্টিলা-ওড়নার লঘু ভাঁজে সুন্দরীদিগের মুখমণ্ডল পরিবেষ্টিত। এখানে কুৎসিত মুখ দৈব-দুর্ঘটনার মত অতীব বিরল। যাহাদিগকে সুন্দরী বলা চলে না তাহারাও সুশ্রী। সুন্দরীদিগের শোভন হাতপাখাগুলা সোঁ সোঁ শব্দে কখন খুলিতেছে, কখন বন্ধ হইতেছে; যাত্রা-পথে অভিবাদনের সঙ্গে সঙ্গে মৃদু-মন্দ মধুর হাসি ও ছোটখাটো হাতের ইসারা চলিতেছে। এই স্থানটা, কতকটা কার্নি-ভ্যালের সময়কার অপেরার সাজ-ঘরের মতো।

পক্ষান্তরে, যাহারা লোকের গোলমাল ভালবাসে না, সেই সব মানব-সঙ্গ-বিরাগী কতকগুলি ধুমপায়ী এখানকার সুচ্ছায় নির্জ্জন সংকীর্ণ পথে বিচরণ করিতেছে।

ফেলিসিয়ানার পিতা ডন্-জেরোনিমোর পার্শ্বে ফেলিসিয়ানা খোলা গাড়িতে বসিয়া বেড়াইতেছিলেন, যদি অশ্বারোহীদিগের মধ্যে তাঁহার ভাবী পতিকে দেখিতে পান এই অভিপ্রায়ে। কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। আন্দ্রে অন্যদিনের ন্যায় আজ তাঁর বাগ্‌দত্তার গাড়ীর পাশাপাশি থাকিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া আসে নাই। দর্শকেরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, শ্রীমতী ফেলিসিয়ানার গাড়ি, পাথর-বাঁধানো পথের চতুর্গুণ দীর্ঘ পথ যাতায়াত করিতেছে, অথচ তাঁহার নিত্যকার রক্ষক তাঁহার সঙ্গে নাই।

কিয়ৎকাল পরে ফেলিসিয়ানা অশ্বপৃষ্ঠে আন্দ্রেকে দেখিতে না পাইয়া, মনে করিল হয়ত আন্দ্রে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। তাই ফেলিসিয়ানা তার পিতাকে বলিল, সেও হাঁটিয়া বেড়াইবে। "বৈঠকখানা" ও তাহার অলি-গলিতে দুই-চার বার ঘোরা-ফেরা করিয়া, ফেলিসিয়ানার দৃঢ়বিশ্বাস হইল, আন্দ্রে আসে নাই।

কাহারও সুপারিসে ডন-জেরোনিমোর সহিত পরিচিত হওয়ায় এক ইংরেজ যুবক ডন-জেরোমিনোকে অভিবাদন করিবার জন্য আসিল এবং কপ্‌চাইতে কপ্‌চাইতে, ঢোক্ গিলিতে গিলিতে, ইংরিজি টানে যে রকম ইংরেজেরাই ভাষা না জানিয়াও বিদেশীয় সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে সেইরূপ তাঁহার সহিত স্পেনীয় ভাষায় কষ্টে-সৃষ্টে কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দিল। এই বিষয়ে ইংরেজের অধ্যবসায় অসাধারণ। ফেলিসিয়ানা—যে

Vicar of Wakefield পড়িয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিত—সে এই সময় এই দ্বৈপিক যুবকের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া তাহার ভীষণ ঘ্যান্-ঘ্যানানির প্রতি অজস্র মৃদু মধুর হাসি বিতরণ করিতে লাগিল। তাহার পর নিকটস্থ থিয়েটারে গিয়া, 'ব্যালে' জিনিসটা কি তাহা ঐ যুবককে বুঝাইয়া দিল, এবং থিয়েটারের বসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলির নাম কি তাহাও বলিয়া দিল।.....তখনও আন্দ্রের দেখা নাই।

বাড়ী গিয়া ফেলিসিয়ানা তাহার পিতাকে বলিল :—

"আজ আন্দ্রের দেখা পাওয়া গেল না।"

জেরোনিমো বলিলেন :—

—"তাই ত; আমি তার বাড়ীতে খোঁজ করতে লোক পাঠাচ্চি। বোধ হয় পীড়িত হয়েছে।"

আধঘণ্টার মধ্যেই ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল :—

"আন্দ্রে-মহাশয় কাল থেকে বাড়ী আসেন নি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্ত্রীশিক্ষার কথা*

অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে দু-একটী কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত দু-একখানা পুস্তিকা পাঠ করিয়াছিলাম। ঐ সকল পুস্তিকাতে যে আদর্শে চরিত্র চিত্র করার প্রয়াস দেখিয়াছিলাম, তাহা "সেকালের" ক্ষুদ্র অন্তঃপুরের আদর্শ বলিয়া মনে হয় নাই। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য ক্ষুদ্র অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা উপলক্ষে বৃহৎ মানব সমাজের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছিলাম এবং তাঁহার উদ্যমের সাফল্য কামনা করিয়াছিলাম। আজ তিনি প্রাচীনাদের পক্ষ লইয়া "নব্য-শিক্ষিতাদের" বিরুদ্ধে খড়্গহস্তে বক্তৃতা-মঞ্চে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

"উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ইতিহাস ও ভূগোল" আলোচনা করিলে দেখা যায় রমণীর আসন কেবলমাত্র "ঘরের ভিতরে" অন্তঃপুরে আবদ্ধ নয়। কোন দেশেই প্রাচীনকালে নারীজাতি অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র সীমার আবদ্ধ ছিল না। বর্ত্তমান সময়েও একমাত্র বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য কোন স্থানেই স্ত্রীলোক আবদ্ধ নহে। যে কারণে ও যে সময়ে বঙ্গদেশে অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য শিক্ষা থাকিলেই জানা যায়। সে লজ্জাকর ব্যাপারের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন যে

* এই প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের জন্য পাঠানো হইয়াছিল; 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক কিছুকাল রাখিয়া 'ছাপা হইবে না' বলিয়া প্রবন্ধটি ফেরত পাঠান্। লেখিকা।

প্রতিবাদ-সূত্রে লেখা হইলেও একালের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লেখিকা অনেক তর্ক ও প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সেইজন্য এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। ভাঃ সঃ।

সময় ও সে অবস্থা আর নাই এবং সে প্রকার অবরোধ-প্রথাও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। যে দেশ হইতে এ প্রথা আমদানী হইয়াছিল, সেখানেও এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। "গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিলেও" কেহ কালের প্রবাহ রোধ করিতে বা সমস্ত নারী-জাতিকে কেহ ঘরের ভিতরে আবদ্ধ করিতে পারিবে না। লেখিকা যে মাতাজীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যখন প্রকাশ্য বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করিয়া নগ্ন মস্তকে অসংখ্য পুরুষ-শ্রোতার নিকট অবরোধ-প্রথার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন এবং নবম বর্ষে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বধূরূপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাই গৃহস্থ-কন্যার কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিতেন, তখন ভাবিতাম, এই বিদুষী তপস্বিনী মারহাট্টা রমণী আজন্ম স্বাধীনতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া এবং অন্তঃপুরের অবরোধে কোন দিন মাথা না গলাইয়াও কি কারণে এই আদর্শ বঙ্গদেশে প্রচার করার জন্য অসাধারণ শক্তি, সামর্থ্য ও আজীবন তপস্যার অপব্যয় করিতেছেন! বঙ্গদেশের ধনীলোকদের 'বাহবা' পাইয়া ভ্রমে পতিত হন্ নাই ত? 'বাহবা' অনেক সময়ে লোকের মতিভ্রম ঘটায়!

লেখিকা নব্য-শিক্ষিতাদের উপর খড়্গহস্ত এবং সেকালের মেয়েদের পক্ষপাতিনী। কাল অনাদি অনন্ত, কালের বিভাগ করাও সম্ভবপর নয়। একজন প্রাচীন লোক একটী যুবককে পাঁওরুটী খাইতে দেখিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন যে, আজকাল ছেলেরা একেবারে অনাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "মশায় কি কলের জল খান্, না গঙ্গোদক?" প্রাচীন বলিলেন, "কেন, কলের জলে দোষ কি?" যুবক বলিল, "না, দোষ কিছু নাই, কিন্তু প্রাচীনতর কোন ব্যক্তি শুনিলে আপনার মতই দুঃখপ্রকাশ করিতেন।" লেখিকা মেয়েদের শ্যাময় লেদার ও সিল্কের ষ্টকিং-এর প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন, বিদ্যাসাগর-জননী ও ভূদেব-জননী চটি জুতা, সেমিজ জ্যাকেট ও পরিষ্কার পোষাকী সাড়ী পছন্দ করিতেন কি না সন্দেহ! লেখিকা বি-এ, এম-এ,-দের প্রতি বিরূপ; প্রাচীনারা বর্ণশিক্ষারও ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বিদ্যাসাগর-জননী প্রবন্ধ রচনা পছন্দ করিতেন কিনা সন্দেহ। প্রাচীনে-নবীনে বিরোধ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল চলিবে, কিন্তু চিরকালই নবীনের জয়।

লেখিকা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, শিল্প-কলা ইতিহাস-ভূগোল, সাধারণভাবে কিছু গণিত ও রামায়ণ, শাস্ত্র, উত্তমরূপে "স্বাস্থ্য তত্ত্ব" শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছেন। নূতন কলেজ না হইলে এ শিক্ষা কি প্রকারে দেওয়া যায়, তাহা চিন্তার বিষয়। দেশের যে অবস্থা তাহাতে স্কুল-কলেজে না পাঠাইলে মেয়েকে এই শিক্ষা দিতে কে পারে? এই সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে মেয়েকে স্কুল-কলেজে পাঠানো ছাড়া গত্যন্তর দেখি না। বিশেষতঃ যাঁহারা এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দান করিবেন, সাধারণভাবে তাঁহাদের কোন বিষয় শিক্ষা করিলে চলিবে না; উত্তমরূপে শিক্ষা করা প্রয়োজন এবং বি-এ, এম্-এ, পাশ করা একান্ত আবশ্যক। এই সকল বিষয় উত্তম রূপে শিক্ষা করিলে পরীক্ষায় পাশ করা শক্ত হয় না। কোন [illegible] না করিয়াও

যাঁহারা শিক্ষিতা বলিয়া অভিমান করিতে চাহেন, তাঁহাদের পরীক্ষা না দেওয়াই বিধেয়।

"পরীক্ষার ফাঁদে পড়িয়া মেয়েদের স্বাস্থ্য স্ফূর্ত্তি ও আয়ু কর্পূরের মত উবিয়া যাইতেছে" ও "সজীবতা জলের মত অপব্যয় হইতেছে" বলিয়া লেখিকা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু উপায় কি? মশারিতে কোন কারণে ছারপোকা হইলে মশারিটা চুল্লীতে নিক্ষেপ করা সুগৃহিণীর লক্ষণ নহে। আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীতে যদি বাস্তবিক ঐ প্রকারের ক্ষতি হয়, তবে তাহার প্রতিকার না করিয়া স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা শুভ লক্ষণ নহে। যাঁহারা স্কুল-কলেজের ত্রিসীমানায় পদার্পণ করেন নাই, তাঁহারা কি স্বাস্থ্য, স্ফূর্ত্তি, আয়ু ও সজীবতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন? আমাদের দেশে কয়টী মেয়ে স্কুল-কলেজে পড়ে? কয়টী মেয়ে শিক্ষিতা-শ্রেণী-পদ বাচ্য? রুগ্না স্ত্রী বা রুগ্ন ছেলে মেয়ে লইয়া বিব্রত হইতে হয় না, এমন সৌভাগ্যবান লোক কয় জন! স্কুল-কলেজের ছেলেদের স্বাস্থ্যহীন হওয়ায় সমাজ-হিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বহু গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, শারীরিক পরিশ্রম না করা, মুক্ত বায়ু সেবন না করা প্রভৃতি কারণে এই প্রকার ক্ষতি হইতেছে। মেয়েদের সম্বন্ধেও কি এই কথা বলা যায় না? লেখিকা মেয়েদের জন্য গৃহের মধ্যে যে স্থানটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইটীই স্বাস্থ্যের প্রধান অন্তরায়। পিতা-মাতা যদি এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি দেন ও [illegible]রেন তাহা হইলে পরীক্ষা পাশ করিয়াও স্বাস্থ্য, স্ফূর্ত্তি, আয়ু সজীবতা অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব নহে। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মনে করেন, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব ও অর্থাভাবই এই সকল বিপদের মূল কারণ। লেখিকা সমস্ত দোষ স্কুল-কলেজ ও নব্য শিক্ষিতাদের উপর আরোপ করিলেও বিধাতা "প্রাচীনা" ও "সেকালের শিক্ষিতা অভিভাবিকাদিগকে" অব্যাহতি দিবেন না।

"স্কুল-কলেজে ধর্ম্ম-শিক্ষার বালাই নাই" পক্ষান্তরে "বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গিনীদের কল্যাণে দরিদ্র কন্যার সৌখীন রুচি হয় বলিয়া তাহার জীবন পর্য্যন্ত শান্তিপূর্ণ হয় না" বলিয়া লেখিকা দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "নৈতিক চরিত্র নির্ভর করে কতকটা বংশ, পিতা-মাতা ইত্যাদির উপরে।" কন্যাদিগকে যদি ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে তাহা স্কুলের উপর অর্পণ না করিয়া "পিতা-মাতা ও বংশের" উপরই থাকা বাঞ্ছনীয়। শিবপূজা, ব্রত-উপবাসে সংযম শিক্ষা হয় বলিয়া যদি লোকের মনে বিশ্বাস থাকিত তবে স্কুল-কলেজ থাকা সত্ত্বেও এ সকল উঠিয়া যাইত না। এই নকল সংযম ও সৌখীন রুচি শিক্ষা দেওয়ার ভার এখনও নব্য শিক্ষিতাদের উপর আসিয়া পড়ে নাই, এখনও সেকালের মেয়েদের হাতেই সংসার ও সমাজের ভার রহিয়াছে, এখনও তাঁহারাই গৃহের কর্ত্রী।

সঙ্গিনীর প্রভাব যদি পিতা-মাতা বংশ ও সমাজের প্রভাব অপেক্ষা প্রবলতর হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, পিতা-মাতা মেয়েকে স্কুলে পাঠাইয়া সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লইয়াছেন মনে করেন। এ

প্রকার দায়িত্ব-বোধের অভাব কোনও শিক্ষিতা নারীর নিকট হইতে আশা করা যায় না।

নব্য শিক্ষিতাগণের বিলাসিতা ও ধনী কন্যাদের শ্যাময় লেদার স্যু, সিল্কের বিচিত্র ফিতা ও নিত্য নূতন ফ্যাসানের পেটী কোট আমদানী লেখিকাকে মর্ম্মাহত করিয়াছে। শুনিয়াছি, কোনও জেলায় একজন প্রধান উকীল এই প্রকার অভিযোগ করায় অন্য একজন মুখর উকীল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার যে নাত্‌নীটী প্রতিদিন বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া বাহির হন্, তিনি ও তাঁহার মা কতদূর লেখাপড়া করিয়াছেন?" তদবধি নাকি তিনি আর এ বিষয়ে কোনও দিন কোনও কথা বলেন নাই। লেখিকা যে বৈঠকে এই বক্তৃতা পাঠ করেন, সেখানে ঐ-রকম ধনী-কন্যা কেহ ছিলেন কি না, জানি না। পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াই বিলাসিতার বিচার করা চলে না। যাঁহাদের লোক-সমাজে মিশিতে হয়, তাঁহাদের সুন্দর শোভন, পদ মর্য্যাদা ও অবস্থার অনুরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ আবশ্যক আর যাঁহাদের ঘরের ভিতরেই স্থান, তাঁহাদের সোনার অলঙ্কার করিয়াই টাকা ফেলিয়া রাখাও একান্ত অসঙ্গত। বিলাসিতা আমাদের দেশে চিরকালই নিন্দনীয়, এবং নব্য-শিক্ষিতা বি-এ, এম্-এ-গণও তাহা জানেন। তাঁহাদের সংখ্যা এত কম, যে নখাগ্রে গণনা করা যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের সন্তান। লেখিকা ধনী-কন্যাদিগকে তাঁহাদের সহিত একত্র করিয়া যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের উপর গভীর অবিচার করা হইয়াছে। বিলাসিতাকে নব্য-শিক্ষার ফল না বলিয়া কুশিক্ষা ও "অপশিক্ষার" ফল বলা যাইতে পারে। অনেক ধনী-কন্যাকে অবস্থানুসারে নানা বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইতে হয় এবং তাহা তাঁহাদের পক্ষে অনেক সময়ে প্রয়োজন। তাঁহাদের মধ্যেও গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা, সুগৃহিণী, দয়াবতী, মনস্বিনী অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহাদের সহিত পরিচিতা হইলে লেখিকাও তাঁহাদের নিকট সম্ভ্রমে মাথা নত করিবেন।

লেখিকা নব্যশিক্ষিতাদিগকে "অসরলা" ও "অহঙ্কৃতা" বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব 'আহা'তেই পর্য্যবসিত হয় বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। নব্য-শিক্ষিতারা যার তার কাছে স্বামী-পুত্র ও অদৃষ্টের নিন্দা করা বা অনাবশ্যক গল্প-গুজব করা ভাল না মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কাহারও সহিত হৃদয় দিয়া মিশিতে পারেন না বা কোনও কাজে হৃদয়-মন ঢালিয়া দিতে পারেন না, এ কথা কি সত্য? শুনিয়াছি, একজন যুবক শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি দোষারোপ করিলে মহামতি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, "তুমি কয়জন শিক্ষিতা নারী দেখিয়াছ জানি না, আমি অনেক দেখিয়াছি এবং অনেককে জানি,—আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু তোমার অভিজ্ঞতার মত নয়। তোমার অভিজ্ঞতা যদি সত্য হয়, তবে তোমার জন্য আমি দুঃখিত হইতেছি।" আমাদের দৃঢ়-বিশ্বাস, লেখিকাও যদি নব্য-শিক্ষিতাদের সঙ্গে সরলভাবে [illegible]ভাবে সমস্ত সঙ্কোচ

পরিত্যাগ করিয়া মিশিবার সুযোগ পান, তবে তাঁহারো এ ভ্রম দূর হইবে। আজকাল লোক-সেবা-ব্রতের যে বিপুল-আয়োজন হইতেছে, শিক্ষা-দান, চিকিৎসা ও ধাত্রীর কার্য্য, চিত্রাঙ্কন, বস্ত্র-বয়ন, ক্ষুধিতকে অন্নদান, বস্ত্রহীনের লজ্জা-নিবারণ, রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি সাধু কার্য্যের যে সকল সূচনা হইয়াছে, তাহাতে নব্যশিক্ষিতা নারীগণ মনঃপ্রাণ শক্তি-সামর্থ্য ঢালিয়া দিয়া সখীত্বে সমপ্রাণ হইয়া ঐ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। সমস্ত দেশ আশা করিতেছে যে, সর্ব্বপ্রকার শুভ কার্য্যে ভারতের নারীরা প্রাণ প্রতিপণ করিয়া সকল কার্য্যকে শোভন, সুন্দর ও মঙ্গলপূর্ণ করিয়া তুলিবেন। গৃহ-মধ্যে কেবলমাত্র স্বামী-পুত্রের সেবা করিয়া তাঁহাদের নারী-হৃদয় তৃপ্ত হইবে না; সাহিত্যে, শিল্প-চর্চ্চায়, রাজনীতি-ক্ষেত্রের ঘোরতর সংগ্রামে, ভবিষ্যৎ বংশের শিক্ষা কার্য্যে, সমাজ ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবারূপ মহাব্রতে, জগতের সকল প্রকার দুঃখ-শোক-মোচনে নারীগণ অগ্রসর হইয়া পুরুষের সকল ব্যর্থ চেষ্টায় সাফল্য প্রদান করিবেন—শোক-তাপ-ক্লিষ্ট নর-নারীর উষ্ণ কপালে তাঁহাদের শীতল হস্ত প্রদান করিবেন, সর্ব্ব-সন্তাপহারী জননী-মূর্ত্তি সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিবেন।

এই সকল কার্য্যে নব্যশিক্ষারই প্রয়োজন। প্রাচীনের প্রতি ভক্তি কল্যাণপ্রদ, কিন্তু অন্ধ আসক্তি জাতীয় জীবন নষ্ট করে। নব্য শিক্ষা অতি অল্পদিন আরম্ভ হইয়াছে। তাহার বিচারের সময় এখনও আসে নাই। লেখি অতীতের দিকে চাহিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এ নিরাশ হইলেন কেন এবং এই নব্য শিক্ষা স্কুল-কলেজকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে বলি ছেন কেন, জানি না। দেশের এই দুর্দ্দি এই অজ্ঞান-তিমিরাবৃত দেশে যে স মহিলা জ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মিও হৃদ পাইয়াছেন, তাঁহারা পরস্পরের গলা-কাটাকা না করিয়া কি-ভাবে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণা দোষ-শূন্য হইতে পারে সে বিষয়ে উপা উদ্ভাবন করিতে প্রয়াসী হউন। এতখানি চি করার সময় বা অবকাশ যাঁহার না থা তিনি অত্যল্প অবকাশটুকু শিক্ষার অকল্য চিন্তা করিয়া নষ্ট করিবেন না। ভবিষ্যতে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আশা-উৎফুল্ল চিত্তে আম যেন অগ্রসর হই। নব্য শিক্ষিতা কবির সহি এক সুরে বলি—

"অতীতের কথা কহি বর্ত্তমান যদি যায়
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়।"

দূর অতীত যতই মনোরম হউক না কে সেদিকে ফিরিবার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করি সকলে যেন সমস্বরে বলি—

"চাহিনা ফিরিতে আর
কৈশোরের লীলাগার—
তৃষিত হৃদয়-আগে
যে দিব্য আলোক জাগে—
তাহাকেই লক্ষ্য করি চলি অনিবার—
ধর ক্ষীণ-হস্ত তুমি হস্ত বিধাতার।"

"নব্য-শিক্ষানুরাগী

সুখের সাহারা

স্বর্গে সেদিন উৎসব-দিন আসন্ন ঘন সন্ধ্যা,
সহরের পথে ছোটে লাখো লোক,—ফুল্ল অলকনন্দা;
ইন্দ্র-সভায় করিবে নৃত্য উর্ব্বশী চারু-অঙ্গী,
সোনার-নূপুর-ঝুমুর-ঝুমুর-চরণে ললিত ভঙ্গী;
বিজলী-বরণী অপ্সরী নানা মন্দার-মালা বক্ষে,
মেনকা রম্ভা গান গাবে নীল মেঘের কাজল চক্ষে;
মন্দাকিনীর কূলে এসে নামে তরণী-বোঝাই যাত্রী,
চিরবসন্ত বারমাস সেথা জ্যোছনা-প্লাবিত রাত্রি।

প্রতি বনে বনে পারিজাত ফুল করে মন প্রাণ ফুল্ল,
ভিড়ে জনতায় সব রাস্তায় পুষ্প-পরাগ উড়্‌লো;
ফুলে-মোড়া পথ ভেলভেটবৎ নাইক ধূলির চিহ্ন,
কল্পনাতীত অন্যের কারো স্বর্গের-বাসী ভিন্ন;
চির-যৌবন বাঁধিয়া যাহারা রেখেছে আপন অঙ্গে,
ভুলেছে জন্ম-মৃত্যুর স্বাদ রোগ-শোক সেই সঙ্গে,
যাদের স্বচ্ছ নয়নে ঝলকে কী এক অতুল দীপ্তি,
বুক-ভরা খাঁটি সন্তোষ-মধু অন্তর-ভরা তৃপ্তি।

তোরণে তোরণে উড়িল কেতন রচিত দিয়া সে স্বর্ণ;
নহবৎ বাজে মধুর মধুর শ্রবণে জুড়ায় কর্ণ;
নর-নারী যত ধায় অবিরত করিয়া রত্ন-সজ্জা,
যার কাছে হায় ম্লান হয়ে যায় কোহিনূর পায় লজ্জা,
এত উৎসব উল্লাস-মাঝে একাকী চিন্তামগ্না,
মন্দাকিনীর নির্জ্জন তীরে মণি-শিলা তট-লগ্না,
হরিণ-নয়নী কে ঐ তরুণী সজল আনত দৃষ্টি?
—কান্ত-কোমল পারিজাত-সম অমৃত-সমান মিষ্টি!

সহচরী কয়—কম মেয়ে নয়! এইখানে কিনা শেষটা?
এ-পাড়া ও-পাড়া খুঁজে দিশেহারা হনু আমি সারা দেশটা!
কার পরে রোষে একলাটি বসে? দেখে জ্বলে ওঠে অঙ্গ,
বাঁধিস্‌নি চুল পরিস্‌নি দুল্ কত না জানিস্ রঙ্গ,

বেলা বয়ে যায় ইন্দ্রসভায় নাচগান সুরু হয়তো,
যাবি যদি চল্ না যাবি ত বল্ একা আমি যাই নয়তো ;
কস্‌নেকো কথা কেন ওলো সখি ? কেনলো মেজাজ রুক্ষ ?
একি ! একি ! তোর চোখে কেন জল ? স্বর্গে কিসের দুঃখ ?

"স্বর্গে আবার দুঃখ কিসের ? সুখেরি ঘূর্ণাবর্ত্তে
পড়িয়া সখিলো সাধ যায় পুনঃ ফিরে যেতে সেই মর্ত্ত্যে !
—আলোর পিছনে ছায়া খেলে যেথা সুখের পিছনে দুঃখ ;
স্বর্গ-ভোগের বিষম শাস্তি চায় যে ভীষণ মূর্খ।
এ ত সুখ নয়, সুখের সাহারা—তপ্ত হাসির দীপ্তি !
অশ্রু-বিহীন মরু-প্রান্তর—সীমাহীন ধূ-ধূ তৃপ্তি !
এর চেয়ে ঢের ভাল সে আমার হাসি-অশ্রুর তৈরী—
অতীত প্রাচীন মর্ত্ত্য-জীবন—যে সুখে দেবতা বৈরী !

সখিলো, মোদের ঘরখানি ছিল কী সুখের যদি জান্‌তে !
হাটতলা ফেলে পশ্চিমে হেলে গাঁয়ের একটি প্রান্তে,
সাম্‌নেই এক মস্ত পুকুর—মুখ-দেখা যেন আরসী,
জল সর্‌তুম সেই পুকুরের—আটঘর পাড়া-পড়শী ;
কামিনী মালতী আমি তিনজন দেখে লোকজন অল্প,
জল তোলবার মিছে ছল ক'রে জুড়তুম সেথা গল্প ;
ডাইনে একটু ছোট্টবাগান, পিছনে জামের বন লো,
ফাঁক্ ফাঁক্ মোরা পড়্‌শী ক'ঘর ছিনু এক-প্রাণ-মন লো।

সদর উঠানে আমলকি গাছ কত্‌বেল গাছ ঝাঁক্‌ড়া,
করবী ফুলের ঝোপটির পাশে ফোল্‌তো বিলেতী আম্‌ড়া ;
ভিতর-উঠানে ধানের মরাই নেবুগাছ—চিনে কাগ্‌জী,
ফোল্‌তো সেখানে নাউ ও কুম্‌ড়ো নানাবিধ শাক-সব্‌জী ;
গোয়ালঘরের একটু পাশেই ছিল তুলসীর মঞ্চ,—
মোর অতীতের প্রাচীন কাহিনী মন দিয়ে সখি শুন্‌চো ?
খিড়কির ধারে পুকুরটি ছিল ছোটখাট একরত্তি
চক্‌চকে যেন রূপোর দু' আনি মৌরলা মাছে ভর্ত্তি।

পাঠশালা আর পোষ্টো আপিস ছিল গ্রামটির মধ্যে,
[illegible]তে যেত পাঠশালে মোদের বাড়ীর পথ দে' ;

তাদেরি হাত দে' ফেল্‌তে দিতেম চিঠি-ভরা মোর কান্না—
বিধবা মায়ের প্রবাসী মেয়ের হাজারো রকম বায়না ;
কাছ-ছাড়া এই একটি মেয়ের বিরহ তাঁহারে বাজ্‌তো,
এত-বড় এই বুড়ো মেয়েটার আব্দার কিলো সাজ্‌তো ?
ফুলকপি আর কড়াই সুঁটি উঠ্‌তো প্রথম যাই লো,
লুভী মেয়েটার জন্যে তাঁহার পাঠিয়ে দেওয়া চাইই লো !

সুদূর প্রবাসে পল্লীজীবন কাহার প্রণয়স্পর্শে
হয়েছিল রাঙা এত মনোরম ? সখিলো আমার বর সে !
সখিলো সে মোর প্রিয় প্রিয়তম দেবতা আমার স্বর্গ—
হৃদয়-কানন-কুসুম চয়নে রচেছিনু তার অর্ঘ্য !
পূজারিণী মোর পূজা সারা শেষ হোলোনা হোলোনা জন্মে,
ব্যর্থতা শুধু বিঁধিয়া রহিল চিরতরে প্রাণে মর্ম্মে ;
বিদ্রোহী প্রাণ ছাড়া পেতে চায় ছিঁড়ে দে' সুখের শিক্‌লি,
ঢের ভাল ছিল সে মোর জীবন সুখে-দুখে পাঁচ মিশ্‌লি।

সখিলো, সে আজ কেঁদে কেঁদে পথে শিরে কর তার হান্‌চে,
আমি যে এখনো ভুলিনি তাহারে ভালবাসি সে কি জান্‌চে ?
সে ছিল কে জানে কেমন মানুষ কাঁদিয়ে আমায় হাস্‌তো !
ব'লে ছল ক'রে রূঢ় কথা মোরে মনে মনে ভালবাস্‌তো !
আমার গায়ের একটু আঁচড়ও সইত না তার বক্ষে,
সারারাত ধরে পাখা ক'রে ক'রে ঘুম নাই তার চক্ষে ;
ফরমাস্ তার মিনিট মিনিট একটা না হয় একটা—
—এই ছিল নেই পাণের ডিপেটা, এই কোথা মনি-ব্যাগটা ?

সখিলো, সে মোরে করেছিল দান দু'খানি হীরের টুক্‌রো—
এতটুকু কচি তিল একরাতি ফাউ-পাওয়া যেন খুচ্‌রো !
সমস্ত প্রাণ আলো ক'রে তারা ভরেছিল মোর চিত্ত,
হরেছিল মোর জীবনে যা-কিছু নীরস যা-কিছু তিক্ত ;
—মিটি মিটি হাসি কালো কালো চুল কোলে ছুটে আসা ঝাঁপিয়ে,
মা মা ক'রে সেই আদুরে কান্না ঠোঁটটি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে !
এখনো দেখিলো স্বপ্নে তাদের কোলে শুয়ে ঠিক তেমনি,
ল ক'রে যাই চুমু খেতে চাই জেগে উঠি ভাই [illegible]

ওথ্‌লানো দুধ উপ্‌চে উঠলো তোলপাল করে বক্ষে,
টন্‌ টন্‌ করে প্রত্যেক শির ;—অশ্রু বহে দু'চক্ষে ;
অভিশাপ দিই বিধাতার পর—এ কি নিষ্ঠুর শাস্তি !
সুখের খেলনা হাতে দিয়ে তুলে কাড়েন মুখের গ্রাসটি !
সখিলো তোরা ত দিব্যি আছিস্‌—নাইক দুঃখু ভাবনা,
আমারি এ পোড়া চক্ষে কেন লো জমে আছে যত কান্না ?
সঙ্গিনী মম, বন্দিনী সম কাটাই দিবস-রাত্রি,
হায় লো আমরা মাটির মানুষ অমৃত-লোকের যাত্রী !"

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

গল্পের আরম্ভ

স্বত্বের মামলা কর্‌তে আমার সেদিনের মহকুমা-যাত্রাটার মাঝখানে যে এমন রসে-রঙে অপরূপ একটী গল্প জ'মে উঠ্‌তে পারে, টিকিট কিনে ট্রেনে ওঠ্‌বার সময় একবারও তা মনে হয়নি। ঘটনার রাজযোটকে মাণিক-যোড় ঠিক ঠিক মিলে গেল—ঈশ্বরদী ষ্টেশনে।

যুগলের দুটীতেই কিন্তু পুরুষ মানুষ। চোয়াড়ী চেহারা ; কালো রঙ। একজনের বেশ ছোক্‌রা বয়স, আর একজনের পঞ্চাশের কাছাকাছি। ছোক্‌রাটী বেঁটে, মোটা ; হোঁদল-কুৎকুতের মত হাঁড়িপানা মুখ, ছোট ছোট চোখ, বুকের পাঞ্জা সত্যি করেই ডবল-বহর। কিউ ক্ল্যাসের এঞ্জিন তার উপর দিয়ে সিটী মেরে চলে গেলেও পাঁজরার হাড়ের একখানাও একটু দোমড়াবেও না। আ[illegible] বাবুটীর বুক, পিঠ, কোমর মাঝারি মাপের, ভুঁড়িটী কি যেন দম-ভারী, কারণ পরে খোঁজ নিয়ে তাঁর পরিচয় পেলাম—রাজশাহী, কি মালদা, মীরাট না—কি জালিয়ানওয়ালা বাগ—এম্‌নি কোন্‌খানকার যেন তিনি "আসিষ্টাণ্ট" সরকারী উকীল—পয়সাও কিছু আছে, কিন্তু মাথার তেলোয় তেল দেন না ;—জল খান চানাচুর ; মৃত-দার, সুতরাং সাড়ী, ব্লাউজ, গয়না, গন্ধ কেনার বালাই থেকেও ভগবান রক্ষা করেছেন ! দেহখানা দোহারা, গর্দ্দানটী অতি-পুষ্ট—লংক্লথের সার্টের ব্যাণ্ড কলারের উপর দিয়ে ঘাড়ের থল্‌থলে মাংসের ঝুল্‌নি কুঁচ্‌কে নেমেছে—অনেকটা দুম্বোর পেছনটার মত। ছোক্‌রাটী তাঁর "জুনিয়র" কি জামাই ঠিক বোঝা গেল না—তবে তিনি যে "his valet, his dog, his man Friday"—তা বেশ টের পেলুম। গাড়ী

আস্‌বার তখনও দেরী ছিল। উকীলবাবু তাই পায়ের টেরিটী-বাজারের মুখ-বন্ধ জুতো যোড়ায় কচ্‌মচ্‌ আওয়াজ তুলে "একসারসাইজ" অর্থাৎ ব্যায়াম করার ভঙ্গীতে "মেন্‌" প্ল্যাট-ফর্ম্মের উপর উত্তর দক্ষিণ ক'রে জোরে জোরে অনবরত চল্‌তে লাগলেন—আর ছোকরাটীর গলায় বগলসের সঙ্গে বাঁধা শিকলগাছা উকীল বাবুর হাতে ধরা না থাক্‌লেও তিনিও ঠিক ঐ একই রকম দমে-দাপটে তাঁর "বুল্‌ডগ" মার্কা জুতো যোড়াটা শাণের উপর ঠকঠকিয়ে বরাবর হাঁটতে লাগ্‌লেন—একেবারে প্রভুর পায়ে-পায়ে।

আমি চায়ের দোকানে সেই উষ্ণ, তরল, বাদাম্বী নেশা ভরপূর এক পেয়ালা চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ করে তখনো চেয়ারখানার উপর বসে ছিলুম। খানিকটা এই প্রৌঢ়-তরুণ কাণ্ডের অদ্ভুত রস নিঃশব্দে উপভোগ করে আর ভাল লাগলো না। মধ্য-রাত্রির নিঃসঙ্গ জাগরণের মাঝখানে কল্পনার তুলি বুলিয়ে গোলাপ ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—এই চায়ের দোকানটা যদি সে-কালের ইরাণ দেশের একটা সরাবখানা হোত আর গুচ্ছে-বাঁধা চাঁপার কুঁড়ির মত আঙুল ক'টীতে সেই ফিকে সোনালি মিঠে সিরাজী দুখানি ঠোঁটের মিলন-তীর্থে তুলে ধরবার জন্য রূপসী কোনো তরুণী এখানে সাকী থাক্‌তো তো আমি শুধু মুগ্ধ দুটী চোখ তুলে লালস-রভসে সেই আঁখি-যুগলের পানে অনিমেষে তাকিয়ে থাক্‌তুম—দেখতুম, তার মুখের উপর-দিয়ে বুঝি একখানা গানের মূর্চ্ছনা সুরে সুরে শিউরে উঠে রূপের আলোর কোণে কোণে আবছায়া স্বপ্নের মত এলিয়ে পড়েছে ! কুতূহলী পথিক কেউ আড়াল থেকে চুরি করে আমার ঠোঁটের উপর সরবতি সুরার রক্ত ছোপ্‌ মোটা দাগে ফুটে রয়েছে দেখে ভাব্‌তো, সাকী বুঝি এই মাত্র তার মেহেদী পাতার বুক-ছেঁচা খুনে লাল করা ঠোঁট দুখানি আল্‌গোছে ছুঁইয়ে আমার অধর-সঙ্গমে চুমো খেয়ে গিয়েছে ! কি ভয়ানক মিথ্যে কথাটাই সে সত্যি বলে মনে কর্‌তো !

হঠাৎ আপিস ঘরের ভিতর থেকে—"হ্যাঁ ;—প্রাইভেট নাম্বার ?" কথাটায় আমার এমন হীরের কুচি চমকিয়ে-তোলা স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। আবার শুন্‌লুম :—"আমার তের—আপনার ?"—আবার—"তের—থার্টিন—একের পিঠে তিন। আপনার ?" এমন সময় ছোক্‌রাটী সেই "জুনিয়র" বা জামাইটী আর কি—ঠিক আমার সোজাসুজি এসে একটু থম্‌কে দাঁড়ালেন—জুতোর পাশ দিয়ে পাথরের কুচি বোধ হয় দু-একটা ভিতরে ঢুকেছিল—একটা আঙুল গোড়ালির ফাঁক দিয়ে একবার পূরে আবার বার করে এনে উঠে দাঁড়ালেন—আমি হঠাৎ জিগ্‌গেস কর্‌লুম, "মশাই, আপনারা কোথায় যাবেন ?"

ছোক্‌রা আমার দিকে কি এক রকম ভাবে খানিকটা হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, সে চাওয়ার ভিতর খানিকটা বিস্ময় আর অনেকটা তাচ্ছিল্য ছিল। তার কারণ বোধ হয় তিনি ভাব্‌লেন যে—এই ময়লা মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবী গায়, দাড়ি ঝোলানো, চশ্‌মা-পরা, রোগা হাঙলা লোকটার এমন করে আমাকে "রাইট্‌"

আছে? আমি সে ভাবটা বুঝেছি বলে তাঁকে জান্‌তে না দিয়ে আবার জিগ্‌গেস্ করলুম, "আপনারা কোথায় যাবেন!"

এবার ছোকরা সঙ্ক্ষিপ্ত উত্তর দিলে ঃ—বললে, "হ্যাটো—।" ভাগ্যিস তখনি একখানা মালগাড়ীর গার্ড সাহেব গাড়ী ছাড়ার বাঁশীটা বাজালেন—"সুঃ-র্-র্-র্" তাইতেই জায়গার নামের পার্ট-পূরণটুকু হয়ে গেল। ভিতরে ছোটবাবু তখনো কথা কইছিলেন, এবার শুনলুম, "একুশ—? আচ্ছা গাড়ী কোথায়?" ইন্ সাইট? আচ্ছা! জমাদার জমা—দার।"

বাইরে থেকে তিনি জবাব দিলেন, "হুজুর।"

"প্যাসেঞ্জার আসছে"—

"তেরি পাসিন্‌জার"—বলে জমাদার উঠে হাঁকলেন ঃ—"এ রঘুয়া, আরে ঘন্টি দে হো, পাসিন্‌জার আতা হ্যায়।"

ছোকরাটী তাড়াতাড়ি লাফিয়ে পা ফেলে চার-পাঁচ ধাপ এক সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লেন ঃ—"গাড়ী আস্‌চে, গাড়ী আস্‌চে।" উকীলবাবু অমনি পিছন ফিরে উত্তর কর্‌লেন, "আস্‌ছে?" গাড়ী কিন্তু তখনো পাক্‌সীতেই পৌঁছোয়নি। চকিতে—এ কি—চমৎকার! নিটোল অঙ্গে তার নবযৌবন স্বপ্ন জাগিয়ে জমে উঠেছে—! এ যে এক সুন্দরী!

সে প্রগল্‌ভা রমণী, তন্বী। নীল সাড়ী কুঁচি দিয়ে পরা, আঁচ্‌লাটায় সাঁচ্চার কাজ করা; ফেরোজা ব্লাউজের বুকের কাট্‌টা "চোলির" ধরণে নামিয়ে টেনে কাটা। পায়ে জরির চটী, গলায় নেকলেসের সোনার উপর জহরী [illegible] আছাড় খেয়ে পড়্‌ছে—হাতে দু'গাছি করে সোনা চুড়ি।

তরুণী স্বচ্ছন্দ লঘু পায়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে উকীল বাবুর সাম্‌নে গিয়ে বেশ বিনয় ভাবে বল্‌লেন, "দেখুন,—নমস্কার! যদি কিছু মনে না করেন—একটা কথা—"

উকীল বাবু তাড়াতাড়ি দু'হাত যোড় করে বুকের একটু উপরে তুলে বল্‌লেন,—

"নমস্কার—নমস্কার। বলুন, বলুন—যদে করবার আর কি আছে?"

ছোকরাটীও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠ্‌লেন,— "নমস্কার! বলুন, বলুন।" এখন বেশ পুট্ পুট্ করে কথা ফুট্‌লো!

তরুণী বল্‌লেন,—"আমি একটু মুস্কিলে পড়েছি—এক রকম বিপন্ন বল্‌লেই চলে—"

উকীল ও সঙ্গী ছোক্‌রা বাবুটি একসঙ্গে বলে উঠ্‌লেন, "কি রকম? কি রকম?"

"একজন—আপনারা হিন্দু, নিশ্চয়—?"

"হ্যাঁ।"

"ব্রাহ্মণ?"

দুজনে একসুরে যেন "কনসার্ট" বাজিয়ে উত্তর দিলেন, "বৈদ্য।" তরুণী বল্‌তে লাগ্‌লেন—"একজন ব্রাহ্মণ, বুড়ো, গরীবও বোধ হয়; পূর্ব্ব বাঙলায় বাড়ী, নেহাৎ সাদা সিদে ভাল মানুষ—তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নাম্‌তে যাচ্ছিলেন—ভিতর থেকে মোট ধরে একটা কুলি পিছনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো,—"হট্ যাও, হট্ যাও বাবু, উৎরেগা!"

ছোক্‌রাটী টিপ্পনী কাট্‌লেন ঃ—"বি impertinent!"

উকীলবাবু জিগ্‌গেস করলেন—"হ্যাঁ তারপর?"

—"ঠাকুর যা-যা বল্লেন আমি তাই ঠিক তেম্‌নি করেই বল্‌ছি। ঠাকুর উত্তর করলেন ঃ—"রহ রহ—বাবু, যাতা হয় তো কি হোতা হয়? আমি যাতা হয় না?"

"ওঃ নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে—তা হলে?" বলে ছোক্‌রা ফিক্ করে হাস্‌লে, আর ঠোঁট দুখানা সাইকেল রেঞ্চের স্ক্রু ঘোরালে যেমন হয় তেমনি ধাঁ করে একটু ফাঁক হয়ে গেল।

তরুণী বল্‌লেন,—"হ্যাঁ, সাবেকী লোক, তা ঠিক। ঠাকুরের কথা শুনে কুলিটা আর জবাব কিছু না করে এক ধাক্কা মায়্‌লে, ঠাকুর অমনি হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। চটীর একপাটী ছিট্‌কে কোথায় গিয়ে পড়্‌লো—ঠাকুর চটে আগুন হয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন ঃ—"পাজী, হারামজাদা, হালা, যাইবো যাইবো চটী—আমি হালাকে দেখুম" ব'লে আর একপাটী চটী নিয়ে রুখে উঠতে গেলেন কিন্তু পারলেন না—বেচারীকে ব'সে পড়্‌তে হল—মাথাটা ফেটে গিয়ে রক্ত ছুটছিল—"

উকীল বাবু বল্‌লেন,—"সত্যি নাকি? এ যে প্রায়—"বল্‌তেই ছোক্‌রা কথাটা শেষ করে বল্‌লে,"—culpable homicide।"

সুন্দরী মুচ্‌কি হেসে উত্তর দিলেন ঃ—"Not amounting to murder"—বাঁ পাটাতেও খুব চোট লেগেছে—পাতাটা ফুলে উঠেছে।"

ছোকরাটী বলে উঠ্‌লেন—ডাক্তারি কেতায় —"ফুলে উঠেছে! তা হলে compound fracture।"

তরুণী ছোক্‌রার বিদ্যের বহর বুঝে এ কথায় আর কিছু উত্তর না করে উকীল বাবুর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,— "এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকেই মজা দেখ্‌ছিলেন—কুলীটা তো পিছনের দরজা খুলে অনেক আগেই ভাগোয়া হয়েছিল—এবার আর ঠাকুরের কথা কারো ভাব্‌বার ফুর্‌সুৎ হলোনা —যে যার মত গুটী সুটী স'রে পড়লেন। সব-শেষে প্লাটফর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে ছিলুম আমি—বেচারী বুড়োকে ধরে তুলতে গেলুম— বুড়ো অমনি বলে উঠ্‌লেন ঃ—"রাহেন, রাহেন —করেন কি? করেন কি? পর-স্ত্রী পর-পুরুষ স্পর্শ করবেন না।" আমি বল্লুম, "আপনি আমার বাবার বয়সী লোক, কিছু ভাবনা নেই। আপনি আসুন"—আমি বুড়োকে ধরে কোনমতে ওয়েটিং রুমে এনে জল-টল দিয়ে একটু সুস্থির করেছি, কিন্তু ব্যথাটা তার বড্ড বেড়েছে।"

উকীল বাবু বলে উঠ্‌লেন,—"এ যে দস্তুরমত Case চলে। কেন, ষ্টেশনের বাবুরা কি Railway police কেউ এদিকে দেখ্‌লে না? কি আশ্চর্য্য, irresponsible লোক সব! আপনি report করুন।"

তরুণী বল্‌লেন,—"প্লাট্‌ফর্ম্মের একেবারে শেষের দিকে ঘটনাটা ঘটেছিল আর এত রাত্তির—ওঁরা হয়তো কেউ খবরই পান নি—আমিও তাঁদের notice-এ এ-কথা আনি নি, কারণ তাতে লাভ-ফলের চেয়ে হায়রাণই বেশী।"

এর ভিতর ছোট বাবু সাদা সুট্‌টী পরে বেরিয়ে এলেন; তাঁর পিছনে তার-বাবু। জমাদার তো অনেকক্ষণ হলো গা মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সুন্দরীর রোশ্‌নাই-রাঙা মুখের পানে কেবলি তাকাচ্ছিল, কখনো

বা ঘাড়-মাথা নেড়ে "হাঁ, হাঁ" করে মাঝে মাঝে সুন্দরীর রূপ ও কথার তারিফ কর্‌ছিল। বাবুরা বেরিয়ে এসে আর জিগ্‌গেস করবেন কি, তরুণীর মুখের উপর কার গোলাপী রঙ বুলিয়ে টানা সে-রূপের আল্‌পনার দিকে কেবলি তাকাতে লাগলেন। সুন্দরী নিতান্ত অবহেলার দৃষ্টিতে একবার-মোটে সে-দিকে তাকিয়ে উকীল বাবুকেই তাঁর নিবেদন জানালেন যে—ঠাকুর নাটোর যাবেন, আর শুনেছেন, ওঁরাও যখন নাটোরেই যাচ্ছেন—যদি দয়া করে আহত বুড়ো বেচারীকে সঙ্গে নিয়ে ঠিকানায় পৌঁছে দেন, তা হলে তিনি নিতান্ত বাধিত হন।

কথা শুনেই উকীল বাবু আস্তে আস্তে পাশে সরে গিয়ে বল্‌লেন,—"আমি নাটোরেও যেতে পারি—সেখান থেকে আবার রাজসাহী যাবার কথা আছে,—কাজেই ওঁকে সঙ্গে নেওয়া তেমন সুবিধা হবে—" বলতে বলতেই সুন্দরীকে এড়িয়ে-ছাড়িয়ে তিনি অন্যদিকে এগিয়ে সরে গেলেন।

তাঁর ছোকরা সঙ্গীটী—"আর সেখান থেকে আমরা ড্যার্‌জিলিংও যেতে পারি, বুঝলেন—আচ্ছা, নমস্কার!"—বলে প্রভুর পাছু নিলেন। চোখের পলক তুলে তাকাবার ফাঁকটুকুর ভিতরেই দেখি, রেলের বাবু দুটী আবার ঘরের মধ্যে ঢুক্‌ছেন। আমি প্রথম থেকেই সব শুন্‌ছিলুম, এবার তরুণী একটু কিন্তু-মতন হয়ে আমার দিকে দৃষ্টিটা ফেরাতেই আমি বল্লুম—"নমস্কার, চলুন তো ঠাকুরটীকে একবার দেখে আসি।"

সুন্দরী যেন অনেকখানি আশ্বাস পেয়ে নম্রভাবে নমস্কার নিবেদন করে কৃতজ্ঞতা-ভরা স্বরে বল্‌লেন, "যাবেন? দয়া করে আসুন তা হলে।"

আমি তাঁর পিছনে পিছনে ওয়েটিং রুমে ঢুকে দেখি, একটা আরাম কেদারার উপর ঠাকুর হেলান দিয়ে কাত হয়ে আছেন,—মাথায় জল-পটী, এক খানা হাতে হেম দিয়ে সুতো বার করে "ট্রিম" করা আদ্ধির গোটা রুমালেই পটী দেওয়া হয়েছে। পায়েও জলপটী আছে। কিন্তু ব্যথাটা বোধ হয় বড্ড বেড়েছিল, ঠাকুর কাত্‌রাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে ঠাকুর ব্যথা-ভরা ভারী গলায় বলে উঠ্‌লেন, "গেছি, গেছি বাবু, আরে গ্যাছিগো—"

আমি বল্লুম, "না, যাবেন কেন? আপনার কিছু ভয় নেই। আর গেছে কি?"

"হুক্কাডা মশায়, হুক্কাড়া একবারে দুই খণ্ড অইছে। আহাঁ, এমন উত্তম হুক্কাডা—বাবু পেতি বিনাইএর মাথাডার মত ছট্টুদ্দা খুলিডা।"

এটা করুণ রস হলেও উত্তরে হাস্যই প্রবল হয়ে আসা স্বাভাবিক। আমি অনেক কষ্টে মুখ টিপে হাসি চেপে নিয়ে বল্লুম, —"আহা, হুঁকো গেছে—আবার হবে।"

"অয় অইব। মশয়, সেইডীর মতন কি আর অইব?"

তরুণীও অনেক কষ্টে মুখ ফিরিয়ে হেসে হাসি চেপে নিয়ে বল্‌লেন, "ও কথা এখন থাক্ ঠাকুর মশাই, আপনার মাথার কাটা আর পা-টা এঁকে একবার দেখান।"

"পাও দেখাইমু? আপনি ব্রাহ্মণ?"

"না। আপনি দেখান।"

দেখে মাথায় জলপটী দিলেই বে

উপকার হবে বুঝলুম; কিন্তু পায়েই একটু রক্ত লেগেছিল। ব্যথা যা তা পায়েই, বুঝতে পারলুম। তরুণীকে সেইখানেই বস্‌তে বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে সোরাবজীর দোকান থেকে এক "পেগ" ব্র্যাণ্ডি এনে পায়ে খুব করে ঢলে দিলুম। ওষুধটার নাম আর ঠাকুরকে বল্‌লুম না; কারণ সাত্ত্বিক লোক, ওষুধের জন্য আবার প্রায়শ্চিত্ত না কর্‌তে হয়! মালিস করার পর ঠাকুর যেন একটু আরাম বোধ কর্‌লেন। আমি সুন্দরীকে এইবার জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

তরুণী একটু হেসে বল্লেন,—"আমার একটী বন্ধুকে এগিয়ে দেবার জন্য আমি এই অবধি এসেছিলুম। তিনি অনেকদিনের জন্যে বিলেত যাচ্ছেন—আমি আবার এই next ট্রেণেই মৈমনসিং ফিরে যাব।"

বন্ধুর কথা শুনে আঁৎকে ওঠবার আমার কোনো কারণই ছিল না; শুধু ঠাকুর একবার কথাটা শুনে হঠাৎ চোখ মেলে তরুণীর পানে চাইলেন, তারপর বল্‌লেন—"অবিবাহিতা?"

কিছু না বলে সুন্দরী আবার মুচ্‌কে হাস্‌লেন। আমি সে রূপের প্রশংসা করবার লোভ কিছুতেই সাম্‌লাতে পারলুম না, বল্লুম, —"দুঃসাহস আর ধৃষ্টতা ক্ষমা কর্‌বেন—হাসির সঙ্গে গালে টোল্‌টী পড়ে, মনে হয় যেন কোন ছবিওয়ালা রংএর তুলি আলগোছে বুলিয়ে চট্ করে ওটুকু বসিয়ে দেয়!"

সুন্দরী সম্পূর্ণ সপ্রতিভভাবেই আবার হেসে উত্তর করলেন,—"আপনারা বুঝি সেইটে খুব সুন্দর দেখেন?"

"না, আমি আর ও-সব সুন্দর দেখিনে, তবে যাদের দেখবার চোখ আছে, অধিকার আছে, তারা দেখে কি না, তাই বল্‌লুম।"

"আমার মান বাড়ালেন! ধন্যবাদ। এখন মন রাখ্‌বার কিছু ব্যবস্থা কর্‌বেন না? ঠাকুর মশাইএর পক্ষে একলা যাওয়া থার্ড ক্লাশের ভিড়ের ভিতর—"

আমি কথার পিঠে উত্তর দিলুম, "সে ব্যবস্থা হয়েই আছে। আমিই ঠাকুরমশাইকে নিয়ে নাটোরে তাঁর ঠিকানায় রেখে আস্‌বো।"

"আমার বড় অন্যায় যে আপনার ঘাড়ে এ বোঝা চাপাচ্ছি, তবে এটা একটী ভদ্র মহিলার সত্যিকার-একজন পুরুষের দয়ার কাছে বিনীত দাবী!—বোধ হয়, কিছু মনে কর্‌লেও দোষ নেবেন না!"

"তা হলে আর নিজে যেচে আসবো কেন?"

"ঠিক কথা। যদিও প্রথমে যখন আপনিই ভদ্রতার সূক্ষ্ম গণ্ডীটা সরু এক সুতো এড়িয়ে গিয়েছেন, তখন আমারও সেটা অমন strictly observe করার দরকার আছে বলে মনে করিনে। তাই বলচি, যদিও মন্দ লোকে এর পিছনে একটা কিছু সরস কথা আছে বলে মনে কর্‌তো—"

"সেটা তারা বড্ড অন্যায় করে একটা মিথ্যা কথা ভাবতো—"

"একেবারেই মিথ্যা কথা। সত্যি!"

এমন সময় ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ হুস্ হুস্ করে এসে প্ল্যাটফর্‌মে থাম্‌লো। আমি ঠাকুর মশাইকে ঘাড়ে ভর দিয়ে উঠ্‌তে বল্‌লুম।

তরুণী ও আমি ধরাধরি করে ঠাকুরকে

এক রকম ঘাড়ে তুলে নিয়েই গাড়ীতে এনে তুল্‌লুম। আমার টিকিট ছিল না—নেমে গার্ডকে বলে এসে আবার গাড়ীতে উঠে ঠাকুরকে আরাম-মত শুইয়ে দিয়ে জানালার কাছে বস্‌লুম।

"এই আপনার যাবার ভাড়াটা—আর ঠাকুর মশাইএর থার্ড ক্লাশের উপর সেকেণ্ড ক্লাশের Fareটা নিন্"—বলে সুন্দরী একখানা দশ টাকার নোট আমার হাতের কাছে তুলে ধর্‌লেন। আমি বল্‌লুম ;—"আমি গরীব, কিন্তু তবু এ অপমানটা না করাই আপনার উচিত ছিল।"

"অপমানটা তো আপনিই আগে করেছেন।"

"একটা কথা হঠাৎ বলে ফেলেছিলুম বলে বারে বারে খোঁচা মারছেন! আচ্ছা, এইবার শোধ-বোধ।"

"কিন্তু আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে।"

"আপনার বিশেষ দয়া—"

"আর এই যে উপকার করলেন—এ কথা কখ্‌খনো ভুল্‌বোনা।"

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লুম, "ও কথা আপনি বল্‌বেন না। ঠাকুর মশাই আপনারও যা, আমারও তা।"

"হ বাবা ঠিক কইছ। আমি তোমাগোর ক্যাডা? কিন্তু যে দয়া করছ আমি তা ভুলুম না। মা, আমার আশীর্ব্বাদ লও, মা, জননী জগদ্ধাত্রী মা, আশীর্ব্বাদ করি, বন্ধু তোমার সুস্থ থাক্যা ল্যাখা-পড়ি শিখ্যা হ্যাশে ফিইর‍্যা সুখে থাক্।"

তরুণী নীচে থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন —"আপনাকে প্রণাম, ঠাকুর মশাই। কে থাকেন, আমাকে চিঠি লিখ্‌বেন—মৃণালি ব্যানার্জ্জী, পণ্ডিত-পাড়া রোড, মৈমনসি বলে।"

"হ, হ, লেখুম" বলে ঠাকুর চো বুজলেন।

গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমি সুন্দরীকে বল্‌লুম,"আমাদের শুভ ইচ্ছা- নমস্কার। আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো এই খানে এমন অবস্থায়! স্মৃতিটা অনেকদি মনে থাকবে।—এ একটা চমৎকার গল্পে আরম্ভ—"

তরুণী নমস্কার করে বল্লেন—"হ্যাঁ, চমৎকার আরম্ভ কিন্তু শেষ হবে এ কোথায় যে—?"

"সে বুঝি আর হবে না, কেন না তা হবা যো নেই। আমি একটী কালো বউ বিয়ে করেছি আর পুত্র-কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা—এই নজীরে দশ বৎসরে পাঁচটী। আপনারও যে বন্ধুটীকে এগিয়ে দিতে এতদূর এসেছিলেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি ফিরে আসুন, তারপর আপনার হৃদয় তাঁর হউক, তাঁর হৃদয় ইত্যাদি। আর এই বিবাহিত জীবনের সাহস ও জোরেই অমন নিঃসঙ্কোচে আপনার সঙ্গে কথা বলেচি,—ক্ষমা করবেন।"

তরুণী এবার একটু জোরেই হেসে উঠে বল্‌লেন, "কিন্তু এ যে আগাগোড়া ভাই! আপনাদের ভুল হয়েছে—বন্ধুটী আমার পুরুষ নন্, নারী। আর আমার স্বামী পশ্চিমে এক্‌জিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ার।"

আমি হঠাৎ অবাক হয়ে একটু চুপ করে

থেকে তরুণীর সিঁথির উপর সিন্দুর-রেখাটি লক্ষ্য করে বল্‌লুম,—"আচ্ছা, তবে আসি। সৌরীন বাবুকে লিখবো'খন—তিনি যদি কোন রকমে এ গল্পের শেষ করে দিতে পারেন!"

তরুণী হেসে বল্‌লেন,—"বেশ, তাই লিখবেন। এখন ধন্যবাদ। নমস্কার!"

"নমস্কার! তা হলে আসি।"

"আসুন। au-revoir—ও রিভোয়া।"

বল্‌তে বল্‌তেই গাড়ী বাঁশী বাজিয়ে ষ্টেশন ছেড়ে ছুট্‌লো।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সঙ্কলন

রবিবার

১

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়া-গাড়ি।
রবিবার সে কেন, মাগো,
এমন দেরি করে?
ধীরে-ধীরে পৌঁছয় সে
সকল বারের পরে।
আকাশ-পারে তার বাড়িটি
দূর কি সবার চেয়ে?
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে?

২

সোম মঙ্গল বুধ এরা চায়
থাক্‌বারি জন্যেই,
বাড়ি ফেরার দিকে এদের
একটুও মন নেই।
রবিবার সে কেন, মাগো,
এমন তাড়া করে?
ঘণ্টাগুলো বাজে যেন
আধ ঘণ্টার পরে।
আকাশ-পারে বাড়িতে তার
কাজ আছে সব চেয়ে।
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে?

৩

সোম মঙ্গল বুধের যেন
মুখগুলো সব হাঁড়ি,
ছোট ছেলের সঙ্গে তাদের
বিষম আড়াআড়ি।
কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেম্‌নি উঠি জেগে
রবিবারের মুখে দেখি
হাসিই আছে লেগে।
যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে
মোদের মুখে চেয়ে।
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮।

মা-হারা

১

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেল্‌তে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কি সুর গুন্‌গুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিশোয় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোল্‌না ঠেলে-ঠেলে;
মা গিয়েচে, যেতে-যেতে
গানটি গেচে ফেলে।

২

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলি-বনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে?
কবে বুঝি আন্‌ত মা সেই
ফুলের সাজি ব'য়ে,
পূজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হ'য়ে।

৩

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে,
জান্‌লা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে,
মনে হয় মা আমার মুখে
চাইচে অনিমিখে।
কোলের পরে ধরে' কবে
দেখ্‌ত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেচে
সারা আকাশ ছেয়ে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮।

শাস্তি

সাত-আট্‌টে সাতাশ আমি
বলেছিলুম বলে'
গুরুমশায় আমার পরে
উঠ্‌ল রাগে জ্বলে'।
মাগো, তুমি পাঁচ পয়সায়
এবার রথের দিনে
সেই যে রঙীন পুতুলখানি
দিয়েছিলে কিনে
খাতার মধ্যে ছিল ঢাকা;
দেখালে এক ছেলে,
গুরুমশায় রেগে-মেগে
ভেঙে দিলেন ফেলে।
মাগো, আমি জানাই কাকে?
ওঁর কি গুরু আছে?
আমি যদি নালিশ করি
এক্ষণি তাঁর কাছে?
ওঁর কি কোনো নেইক পুতুল?
করতে গিয়ে খেলা
কোনোরকম পড়ায় উনি
করেন নি কি হেলা?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে
বল্ দেখি, মা, ওঁর মনে তা'
কেমনতরো লাগে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮।

মূর্খ

১

নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোসাঁই,
আমি ত, মা, চাইনে হ'তে
পণ্ডিত মশাই।
না যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
ডুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটিপোকার গুটি,
মুখ্যু হয়ে রইব তবে,
আমার তাতে কিইবা হবে?
মূর্খ যা'রা তাদেরি ত
সমস্ত-খন ছুটি?

২

তারাই ত, মা, রাখাল-ছেলে,
গোরু চরায় মাঠে,
নদীর ধারে বনে-বনে
তাদের বেলা কাটে।
ডিঙীর পরে পালটি তুলে'
ঢেউয়ের মাথায় দুলে-দুলে
তারাই ত যায় ঝাউ কাটতে
নদীপারের চরে।
তারাই মাঠে মাচা পেতে
পাখী তাড়ায় ফসল-ক্ষেতে,
বাঁকে করে' দই নিয়ে যায়,
বেচে ঘরে-ঘরে।

৩

কাস্তে হাতে, চুবড়ি মাথায়,
সন্ধে হলে পরে
ফেরে গাঁয়ে কৃষাণ-ছেলে,
মন যে কেমন করে!
যখন হাতে নিয়ে খড়ি
পাঠশালাতে লিখি-পড়ি,
গুরুমশাই দুপুর-বেলায়
বসে-বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে কা'রা গোরুর গাড়ি
গান গেয়ে যায় গলা ছাড়ি'
শুনে আমি পণ করি যে
মুখু হব বলে'।

৪

দুপর-বেলায় চিল ডেকে যায়
দূর-আকাশের পারে,
হঠাৎ-হাওয়া বাঁশি বাজায়
বাঁশ-বাগানের ধারে।
পুবের দিকে বনের কোলে
বাদল-বেলার আঁচল দোলে,
ডালে-ডালে উছ্‌লে ওঠে
শিরীষ-ফুলের ঢেউ।
এরা যে পাঠ-ভোলার দলে
পাঠশালা সব এড়িয়ে চলে,
আমি জানি, এরা ত, মা,
পণ্ডিত নয় কেউ।

৫

যাঁরা অনেক পুঁথি পড়েন
তাঁদের অনেক মান।
ঘরে-ঘরে সবার কাছে
তাঁরা আদর পান।
সঙ্গে তাঁদের ফেরে চেলা,
এম্‌নি কাটে সারাবেলা,
আমি ত, মা, চাইনে আদর
তোমার আদর ছাড়া।
তুমি যদি, মুখু বলে'
আমাকে, মা, না নাও কোলে
তবে আমি পালিয়ে যাব
বাদ্‌লা মেঘের পাড়া।

৬

সেখান থেকে বৃষ্টি হয়ে,
ভিজিয়ে দেব চুল।
ঘাটে যখন যাবে তুমি,

রাত থাক্‌তে অনেক ভোরে
আসব নেমে আঁধার করে',
ঝড়ের হাওয়ায় ঢুক্‌ব ঘরে
দুয়ার ঠেলে' ফেলে'
তুমি বল্‌বে মেলে' আঁখি
"দুষ্টু দেয়া ক্ষেপ্‌ল না কি ?"
আমি বল্‌ব, "ক্ষেপেচে আজ
তোমার মুখু ছেলে !"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮

যাত্রার আয়োজন

১

দেখ চ না কি, নীল মেঘে আজ
আকাশ অন্ধকার,
সাত সমুদ্র তেরো নদী
আজকে হ'ব পার।
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,
নাইক হরিশ খোঁড়া,
তাই ভাবি যে কা'কে আমি
করব আমার ঘোড়া ?
কাগজ ছিঁড়ে এনেচি এই
বাবার খাতা থেকে,
নৌকো দে না বানিয়ে, অমনি
দিস্‌ মা ছবি এঁকে।
রাগ করবে বাবা বুঝি
দিল্লি থেকে ফিরে ?
ততক্ষণ যে চলে যাব
সাতসমুদ্র-তীরে !

২

এম্‌নি কি তোর কাজ আছে, মা,
কাজ ত রোজই থাকে।
বাবার চিঠি এক্ষণি কি
দিতেই হ'বে ডাকে ?
নাইবা চিঠি ডাকে দিলে,
আমার কথা রাখো,
আজ্‌কে না-হয় বাবার চিঠি
মাসী লিখুন নাকো !
আমার এ যে দরকারী কাজ
বুঝতে পারো না কি ?
দেরি হলেই একেবারে
সব যে হবে ফাঁকি !
মেঘ কেটে যেই রোদ উঠ্‌বে
বৃষ্টি বন্ধ হ'লে
সাত সমুদ্র তেরো নদী
কোথায় যাবে চ'লে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮

নক্ষত্রতত্ত্ব

১

ঐ যে রাতের তারা
জানিস্‌ কি মা কা'রা ?
সারাটি-খন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
[illegible]-ধারা।
আমার যেমন নেইক ডানা,
আকাশেতে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তেম্‌নি ওদের পা নেই বলে'
পারে না যে আস্‌তে চলে'
এই পৃথিবীর পরে।

২

সকালে যে-নদীর বাঁকে
জল নিতে যাস্‌ কল্‌সি-কাঁখে
সজ্‌নে-তলার ঘাটে
সেথায়, ওদের আকাশ থেকে'
আপন ছায়া দেখে-দেখে'
সারা পহর কাটে।
ভাবে ওরা চেয়ে-চেয়ে
হতেম যদি গাঁয়ের মেয়ে
তবে সকাল-সাঁজে
কল্‌সিখানি ধরে' বুকে
সাঁৎরে নিতেম মনের সুখে
ভরা নদীর মাঝে।

৩

আর আমাদের ছাতের কোণে
তাকায় ওরা আপন মনে,
যেথায় দুয়োরাণী
সঙ্গে ছেলে মেয়ে দুটো,
কুড়িয়ে নিয়ে কাটা-কুটো
বাঁধ্‌লে কুঁড়েখানি।
ভাবে ওরা, আকাশ ফেলে'
হ'ত যদি তোমার ছেলে,
এইখানে এই ছাতে
দিন কাটাত খেলায়-খেলায়,
তার পরে, মা, রাতের বেলায়
ঘুমোত তোর সাথে।

৪

যেদিন আমি নিষুতরাতে
হঠাৎ উঠি বিছানাতে
স্বপন থেকে জেগে',
জান্‌লা দিয়ে দেখি চেয়ে
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
ঝাপ্‌সা আছে মেঘে।
বসে-বসে ক্ষণে-ক্ষণে
সেদিন আমার হয় যে মনে
ওদের স্বপ্ন বলে'।
অন্ধকারের ঘুম লাগে যেই
ওরা আসে সেই পহরেই,
ভোরবেলা যায় চলে'।
আঁধার রাতি অন্ধ ও যে
দেখ্‌তে না পায়, আলো খোঁজে,
সবই হারিয়ে ফেলে।
তাই আকাশে মাদুর পেতে'
সমস্ত-খন স্বপনেতে
দেখা-দেখা খেলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৌচাক, কার্ত্তিক ১৩২৮।

খেলা-ভোলা

১

তুই যে ভাবিস্‌, দিন রাত্তির
খেল্‌তে আমার মন,
কক্ষনো তা সত্যি না, মা,
আমার কথা শোন্‌।
সেদিন ভোরে দেখি উঠে'
বৃষ্টি-বাদল গেছে ছুটে',
রোদ উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে
বাঁশের ডালে ডালে,
ছুটির দিনে কেমন সুরে
পূজোর সানাই বাজ্‌চে দূরে,
ঝগ্‌ড়া করে তিনটে সালিখ্‌
রান্নাঘরের চালে;
খেল্‌নাগুলো সাম্‌নে মেলি'
"কি যে খেলি," "কি যে খেলি,"
সেই কথাটাই সমস্ত-খন

লাগ্‌ল না ঠিক কোনো-খেলাই,
কেটে গেল সারা বেলাই,
রেলিং ধরে' রইনু বসে'
বারান্দাটার কোণে।

২

খেলা-ভোলার দিন, মা, আমার
আসে মাঝে মাঝে।
সেদিন আমার মনের ভিতর
কেমন যেন বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাতের পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগ্‌নি রঙের শাড়ী;
চেয়ে চেয়ে চুপ্ করে' রই,
তেপান্তরের পার বুঝি ঐ,
মনে ভাবি, ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।
থাক্‌ত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া,
তক্ষনি যে যেতেম, তারে
লাগাম দিয়ে কষে'।
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় বসে'।

৩

একেক দিন যে দেখেচি তুই
বাবার চিঠি হাতে
চুপ্ করে' কি ভাবিস্ বসে'
ঠেস্ দিয়ে জান্‌লাতে।
মনে হয় তোর মুখে চেয়ে
তুই যেন কোন্ দেশের মেয়ে,
যেন আমার অনেক কালের
অনেক দূরের মা।
কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই,
হারিয়ে-ফেলা মা যেন তুই,
মাঠপারে কোন্ বটের তলার
বাঁশির সুরের মা।
খেলার কথা যায় যে ভেসে.
মনে ভাবি, কোন্‌কালে সে
কোন্ দেশে তোর বাড়ী ছিল
কোন্ সাগরের কূলে।
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
অজানা সেই দ্বীপের ঘরে,
তোমায় আমায় ভোরবেলাতে
নৌকোতে পাল তুলে'।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২৮।

ভুল স্বর্গ

১

লোকটি নেহাৎ বেকার ছিল।

তার কোনো কাজ ছিল না, কেবল সখ ছিল নানা রকমের।

ছোট ছোট কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোট ছোট ঝিনুক সাজাত। দূর থেকে দেখে মনে হত—যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখীর [illegible] খেব্‌ড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চর্‌চে; কিম্বা উঁচু নীচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি ঝর্‌না হবে, কিম্বা পায়ে চলা পথ।

বাড়ীর লোকের কাছে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে পণ করত পাগ্‌লামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগ্‌লামি তাকে ছাড়্‌ত না।

২

কোনো কোনো ছেলে আছে সারা বছর পড়া ফাঁকি দেয় অথচ পরীক্ষায় খামকা পাস করে ফেলে। এর সেই দশা হল।

সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল অথচ মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর।

কিন্তু নিয়তি স্বর্গের পথেও মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। দূতগুলো মার্কা ভুল করে' তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল।

এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।

এখানে পুরুষরা বল্‌চে, "হাঁফ ছাড়্‌বার সময় কোথা?" মেয়েরা বল্‌চে, "চল্‌লুম ভাই, কাজ রয়েচে পড়ে।" সবাই বলে, "সময়ের মূল্য আছে;" কেউ বলে না, "সময় অমূল্য।" "আর ত পারা যায় না" বলে' সবাই আক্ষেপ করে, আর ভারি খুসি হয়। "খেটে খেটে হয়রান হলুম" এই নালিশটাই সেখানকার সঙ্গীত।

এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম করে' বস্‌তে চায় শুন্‌তে পায় সেখানেই ফসলের ক্ষেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেচে। কেবলি উঠে যেতে হয়, সরে' যেতে হয়।

৩

ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।

পথের উপর দিয়ে সে চলে' যায় যেন সেতারের দ্রুত তালের গতের মত।

তাড়াতাড়ি সে এলো খোঁপা বেঁধে নিয়েচে। তবু দুচারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে পড়ে তার চোখের কালো তারা দেখ্‌বে বলে' উঁকি মার্‌চে।

স্বর্গীয় বেকার মানুষটি একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল চঞ্চল ঝর্‌ণার ধারে তমাল-গাছটির মত স্থির।

জান্‌লা থেকে ভিক্ষুককে দেখে রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, এ'কে দেখে মেয়েটির তেম্‌নি দয়া হল।

"আহা, তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই!"

নিশ্বাস ছেড়ে বেকার বল্‌লে, "কাজ কর্‌ব তার সময় নেই।"

মেয়েটি ওর কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না। বল্‌লে, "আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও?"

বেকার বল্‌লে, "তোমার হাত থেকেই কাজ নেব বলে দাঁড়িয়ে আছি?"

"কি কাজ দেব?"

"তুমি যে ঘড়া কাঁখে করে' জল তুলে নিয়ে যাও তারি একটি যদি আমাকে দিতে পার।"

"ঘড়া নিয়ে কি হবে? জল তুল্‌বে?"

"না, আমি তার গায়ে চিত্র কর্‌ব।"

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, "আমার সময় নেই, আমি চল্‌লুম।"

কিন্তু বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পার্‌বে কেন? রোজ ওদের উৎসতলায় দেখা হয়, আর রোজ সেই একই কথা, "তোমার কাঁখের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র কর্‌ব।"

হার মান্‌তে হল, ঘড়া দিলে।

সেইটিকে ঘিরে ঘিরে বেকার আঁক্‌তে লাগ্‌ল, কত রঙের পাক, কত রেখার ঘের।

আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে' ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌লে। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "এর মানে?"

বেকার লোকটি বল্‌লে "এর কোনো মানে নেই।"

ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।

সবার চোখের আড়ালে বসে' সেটিকে সে নানা আলোতে নানারকমে হেলিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌লে। রাত্রে, থেকে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জ্বেলে চুপ করে' বসে' সেই চিত্রটা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তার বয়সে এই সে প্রথম এমন কিছু দেখেচে যার কোনো মানে নেই।

তার পরদিন যখন সে উৎসতলায় এল, তখন তার দুটি পায়ের ব্যস্ততায় একটু যেন বাধা পড়েচে। পা দুটি যেন চল্‌তে চল্‌তে আন্‌-মনা হয়ে ভাব্‌চে —যা ভাব্‌চে তার কোনো মানে নেই।

সেদিনও বেকার মানুষ একপাশে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি বল্‌লে, "কি চাও?"

সে বল্‌লে, "[illegible] কাজ চাই।"

"কি কাজ দেব?"

"যদি রাজি হও, রঙীন সুতো বুনে বুনে তোমার বেণী বাঁধবার দড়ি তৈরি করে' দেব।"

"কি হবে?"

"কিছুই হবে না।"

নানারঙের নানাকাজ-করা দড়ি তৈরি হল। এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধতে মেয়ের অনেক সময় লাগে। কাজ পড়ে' থাকে, বেলা বয়ে যায়।

৪

এদিকে দেখতে দেখতে কেজো স্বর্গে কাজের মধ্যে বড় বড় ফাঁক পড়তে লাগল। কান্নায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে' উঠল।

স্বর্গীয় প্রবীণেরা বড় চিন্তিত হল। সভা ডাকলে। তারা বললে, "এখানকার ইতিহাসে কখনো এমন ঘটেনি।"

স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার করলে। সে বললে, "আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেচি।"

ভুল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙীন পাগড়ি আর কোমরবন্ধের বাহার দেখেই সবাই বুঝলে, বিষম ভুল হয়েচে।

সভাপতি তাকে বললে, "তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।"

সে তার রঙের ঝুলি আর তুলি কোমরে বেঁধে হাঁফ ছেড়ে বললে, "তবে চললুম।"

মেয়েটি এসে বললে, "আমিও যাব।"

প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখলে এমন একটা কাণ্ড যার কোনো মানে নেই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৮।

ছেঁড়া খাতা

একখানি ছেঁড়া খাতা পথে পড়ে' আছে অনাদরে,
আঁকা বাঁকা রুল টানা, হিজিবিজি সদরে অন্দরে,
একতিল ফাঁক কোথা নাই।
কোনো পাতা কালি-ঢালা একেবারে সকলখানাই
কোন্ শিশু-হৃদয়ের শ্যামল সোহাগ-রস মাখা।
কোনো পাতে আঁক কষা। কোনো পাতে সযতনে আঁকা
দূর পাহাড়ের ধারে গুটি-দুই কুটীরের ছবি,
পশ্চাতে উদিছে কিম্বা অস্তাচলে চলিয়াছে রবি,
এককোণে তন্বী চন্দ্রলেখা,
শুপারি বনেরে ছুঁয়ে চলে' গেছে দীর্ঘ পথরেখা
কোন্ সুদূরের পানে
কেউ নাহি জানে,
ফুটেছে দীঘির জলে কুমুদ কমল ফুলদুটি,
ঘাটে চলে যায় গ্রামের বধূটি।

আকাশে পাখীর ঝাঁক, গাভীদল মাঠে,
একটি পাতার বুকে কত আর আঁটে!
তারি মাঝে একপাশে ঘেঁষাঘেঁষি বহু শ্রম করে'
কবিতার ছন্দে লেখা সুন্দর সরল হস্তাক্ষরে,
'যে কেহ এ বহিখানি মালিকেরে না বলিয়া নিবে,
অনন্ত নরক পরলোকে তার নিশ্চয় জানিবে!'
এত বড় ভয়!
নহে কারা দ্বীপান্তর, পিলরি কি গিলোতিন্, একেবারে অনন্ত নিরয়!
চতুর্ব্বিংশ বৎসরের ছোট ছোট সাধ-আশা, দুদণ্ড সঞ্চিত হাসি-গান,
চুকাইয়া দুদিনের ভালোবাসা দেওয়া-নেওয়া,—তারপরে লভিব নির্ব্বাণ
চির-জনমের লাগি' অজানা আঁধার দেশে কোন্ মহা-বিভীষিকামাঝে!
তবুও এ খাতাটিরে করিবারে হাত-ছাড়া পরাণে ক্ষতির মতো বাজে।

না-জানি কি লাগি' আছি, না-জানি কি লাগি' পথ চলি,
কোথা চলি কার পানে, কি লাগিয়া ছলি
মনেরে মানস-গড়া স্বরগের লোভ-ছবি দিয়া,
কি-হেতু আশ্বাস জাগে; রথচক্রে আমারে বাঁধিয়া
দুঃখ-সুখ দুই অশ্ব কে চালায় অলক্ষ্যের পানে,
কোথায় সে উতরিবে তীব্র তমিস্রার মাঝখানে,
কি মহা-বিনাশ-মাঝে ফেলে যাবে, চিরকাল ধরি'
কি বোঝা বহিতে হবে, কি ক্লেশ সহিতে হবে। নিতে সাধ হয় সাথে করি'
পরিচিত প্রিয় এই ক্ষণিকের জীবনের স্মৃতি,
ক্ষণিকের দুঃখ-সুখ, মান-অভিমান স্নেহ-প্রীতি,
ক্ষণিকের জীবনের সমস্যায় সংশয়ে আকুল
ছোট ছোট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ছোট ছোট ভুল,
এই খাতাটিতে করি' সে চির আঁধার-পথে পাথেয়ের মত;
অনন্ত নিরয় ভয় লোভে মূর্চ্ছাগত!···

সহসা কে ডাকে কলভাষে!—
চোখ তুলে চাহি চমকিয়া, চারিপাশে
যাহা-কিছু পড়ে চোখে, যা-কিছু নিরখি,
বলে সবে, ভুলেছ কি

আমি যে তোমারে ভালোবাসি!
আমি আলো, দিছি হাসি।
আমি বারি, বেদনার স্নিগ্ধ সরসতা।
আমি নভঃ দিছি শান্ত প্রসন্ন স্তব্ধতা
তব বক্ষ-তল জুড়ে। আমি বায়ু, দিয়েছি নিশ্বাস
নিবিড় জীবনে ভরি'। মোদেরে কোরো না অবিশ্বাস!
বলে তা'রা,
অনন্তের বুক থেকে কোথা পাবে ছাড়া?
কোথা আর স্থান আছে? সব জোড়া আমাদের স্নেহ।
আলোয় আলোয় ছাওয়া এ নিখিল, ভরা এর দেহ
আমাদের সোহাগে সোহাগে; তুমি তারি এক কণা।
ছেড়ে মোরা দিব ত না
তোমারে নিমেষ লাগি'।
মোদের প্রহরা আছে জাগি'
সকল সুখের পথ, সকল দুঃখের পথ জুড়ি',
ক্ষতি মোরা সহি না কিছুরি,
সহি না ধূলির অপচয়!

ধীরে রাত হয়।
ধীরে এসে পশি গৃহে। অঙ্গনে নিস্তব্ধ অন্ধকার
লজ্জিতা বধূর মতো অসতর্কে কহি' আপনার
লুকানো প্রেমের কথা আছে যেন অবনত মুখে!
স্বর্গ-নরকের দ্বন্দ্ব ভুলে যাই। পরিপূর্ণ সুখে
শয়ন লভিয়া বুক ভরি'
বিপুল বিস্ময়ে ভরা আপনারে অনুভব করি।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

(৭)

ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি—

আধ্যাত্মিক শক্তির বলের মাত্রাটা তো দেখা গেল। যে ক্ষেত্রে সেই শক্তিটার প্রয়োগ হবে সেটাও একটু ভালরকমে বুঝে দেখা দরকার। মনের জোরে জগতে অনেক অসাধ্য সাধন হয়েছে, একথা যেমন সত্য, চারিদিকের প্রতিকূলতার মাত্রা খুব বেশী হ'লে—বাধা একান্ত দুলঙ্ঘনীয় হ'লে, ব্যর্থতার আশঙ্কাও যে সেই পরিমাণে বাড়ে একথাটাও তেমনি সত্য। সুতরাং ইংরেজ অধিকারের অন্তস্তলে একটু প্রবেশ করা দরকার। কাজেই ইতিহাসের পাতা দুচারটী ওল্‌টানো দরকার।

ইংরাজের ভারত-অধিকার জগতের ইতিহাস একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার। একরূপ ঐন্দ্রজালিক ঘটনার সামিল। যে মুষ্টিমেয় বণিক সম্প্রদায় এখানে বাণিজ্য করতে এসে অল্পদিনের মধ্যে গোটা দেশটাকে গ্রাস ক'রে বসেছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারাও বোধ হয় ঠিক ক'রে বলতে পারতনা কাণ্ডটা ঘটল কি ক'রে। সে কোন্ আলাদিনের প্রদীপ, যার কল্যাণে এ অঘটনটা ঘটা সম্ভব হয়েছিল। জিঙ্গোশ্রেণীর ইংরাজরা অবশ্য কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য তলোয়ার আস্ফালন ক'রে শুনিয়ে থাকেন যে, আলাদিনের প্রদীপটা ব্রিটিশের বীর-হস্তের তরবারি। কথাটা যেমন দাম্ভিকতা-পূর্ণ তেমনি মিথ্যা। মিথ্যাটা আবার এম্‌নি ক্ষণভঙ্গুর যে সামান্য একটা জেরার আঘাতেই কাৎ হয়ে পড়ে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁদের সুদূর দ্বৈপায়ন পিতৃগৃহ হতে কতগুলি তরবারি আমদানী করেছিলেন এবং সমস্ত ভূভারতে সে সময়ে তরোয়াল চালাবার শাদা হাতই বা কখানি ছিল, তার নিকাশ তলব করলেই আওয়াজটা যে কত-বড় ফাঁকা আওয়াজ বুঝতে কারো বাকী থাকবেনা।

তাছাড়া আরো একটা কথা আছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাতে হ'লে খরচ-পত্রের যে কিছু কিছু দরকার হয়ে থাকে ইংলণ্ডের সে অভিজ্ঞতা যথেষ্টই আছে। নেপোলিওনীয় যুদ্ধের ব্যয়-ভারের চোটে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় দেহে যে ক্ষত হয়েছিল—সে ঘা সারতে অন্ততঃ এক শতাব্দী লেগেছিল। জর্ম্মণ-যুদ্ধের-ঘা কোনও কালেই সারবে কিনা সে সম্বন্ধে বড় বড় ক্ষত চিকিৎসকদেরও বিশেষ সন্দেহ আছে। কিন্তু ভারত অধিকার করতে এক পয়সা খরচও ইংলণ্ডের পাকা বা কাঁচা রোকড়ে কোন ঐতিহাসিক গবেষণাই যে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে, এরূপ শোনা যায়নি। অন্য পক্ষে মহম্মদ ঘোরী হতে আরম্ভ ক'রে অন্য যে কোনও বিদেশীকে সত্য সত্যই তরবারির সাহায্যেই এদেশে একছটাক জমিও দখল করতে হয়েছে, তাকে ঘরের রেস্ত কিছু না কিছু খরচ করতেই হ'য়েছে। এমন কি তৈমুরলঙ্গের নাদির সাহের মতো যারা এদেশটাকে মাছ-ভাজা করতে এসেছিল, তারাও সে কাজটা যে পুরোপুরি মাছের তেলেই সেরেছিল এমন মনে হয় না। মধ্য এসিয়ার তেল তাদের একটু না একটু সঙ্গে ক'রে আনতে হয়েই ছিল।

অনেকেরই ধারণা পলাশীর যুদ্ধের পর হতেই এদেশে ইংরাজের অধিকারের পত্তন হয়েছে। কিন্তু ওটা একটা ঐতিহাসিক কুসংস্কার মাত্র। সকল রকম কুসংস্কারেরই যে কারণে উৎপত্তি ঘটে এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে—অর্থাৎ ভাসা ভাসা উপর-টপকা পল্লবগ্রাহী জ্ঞানের দরুণ। সমসাময়িক ঘটনা গুলি একটু তলিয়ে দেখলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, পলাশীর যুদ্ধের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে মুর্শিদাবাদের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করার কল্পনা সুদূর স্বপ্নেও ক্লাইবের মনে উঠেনি। উঠলেও তাতে যে বিশেষ ফল হতোনা ক্লাইবের মতো সুচতুর লোকের পক্ষে সেটা বুঝা মোটেই শক্ত ছিলনা।

সিরাজদ্দৌলার বদলে মীর জাফরকে মেনে নেওয়া লোকের পক্ষে তেমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার ছিলনা। মুর্শিদাবাদের নবাবী মসনদে এরূপ ওলট-পালট কাণ্ড পূর্ব্বেও কয়েকবার হয়েছে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার যায়গায় ক্লাইব বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে মেনে নেওয়া এদেশের লোকের পক্ষেও সহজ হতোনা। ক্লাইব সেটা বিলক্ষণ জানতেন। পলাসীর যুদ্ধের আট বৎসর পরেও আপনাদের প্রতিষ্ঠা ও শক্তি-সামর্থ্যের ধারণা ক্লাইবের মনে এতটা জাগেনি যে, বাংলার শাসন-দণ্ড অবলীলাক্রমে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার কথা তাঁর মনে উঠতে পারত। সেরূপ উঠা সম্ভব হলে, রীতিমত প্রণালীতে কুর্ণিশ ক'রে নজর দিয়ে বাদসাহের দরবার হতে বাংলার দেওয়ানীর সনদ লাভ করতে ছুটতেন না। আসল কথা, পলাশীর যুদ্ধের পরও অনেক দিন ইংরাজের আকাঙ্ক্ষার দৌড় কারবারের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে বেশীদূর এগোতে সাহস করেনি। দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে হাতের পুতুল ক'রে রাখার জন্য রীতিমত প্ল্যান ও চেষ্টা হয়েছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কোন্ বাণিজ্যের সুবিধালাভের জন্য।

পলাশীর যুদ্ধজয়ের সঙ্গে এদেশে ইংরাজের আধিপত্য স্থাপনের সম্বন্ধটা যে তেমন ঘনিষ্ঠ নয়, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। উক্ত যুদ্ধে জয় ও ইংরাজের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভের মধ্যে কয়েকজন নবাব বাংলার শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ যদি বুদ্ধিমান কার্য্যদক্ষ মানুষের মতো মানুষ হতেন, তাহলে ইংরাজের ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাটা "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে" হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকতনা। ইংরাজের পরম সৌভাগ্য যে এঁদের 'নবাবী'টা এঁদের মনুষ্যত্বকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল।

যেটুকু লিখেছি তাহ'তেই সকলে অনায়াসে বুঝতে পারবেন, এদেশে ইংরাজ অধিকার স্থাপন সম্বন্ধে বাহুবলের সপক্ষে যে দাবী উত্থাপিত করা হয়, সে দাবী সম্পূর্ণ ভুয়ো ও ভিত্তিশূন্য। ঘটনা মাত্রেই বিবিধ কারণ-পরম্পরার সহযোগে ঘটে থাকে। এদেশে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠারও অনেকগুলি কারণ আছে। সেই সকল কারণের মধ্যে কাউকে যদি মুখ্য কারণের মর্য্যাদা দিতে হয় তাহলে বলতেই হবে সেই কারণ এদেশের লোকের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সম্মতি। এদেশের লোক ইচ্ছে ক'রেই ইংরাজের অধীনতা পাশ বরণ ক'রে নিয়েছে। এই

প্রায় সার্ব্বজনীন সম্মতিই ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠার আলাদিনের প্রদীপ। সম্মতিটা যে কেন দিয়েছিল এবং কাজটী ভাল হয়েছিল কি মন্দ হয়েছিল সে কথা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সম্পর্কে সে আলোচনায় বিশেষ লাভও নাই।

সম্মতি শব্দটী একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। একথা নিশ্চয়ই সত্য নয় যে এদেশের লোকেরা ভোটের দ্বারা ইংরাজকে শাসনকর্ত্তা রূপে নির্ব্বাচিত করেছিল। আসল ব্যাপারটা এই:—অনেক লোক অর্থলোভে বা অন্যবিধ স্বার্থ-সিদ্ধির কামনায় ইংরাজকে অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রীতিমত সাহায্য করেছিল, কতক লোক মুসলমান শাসনের প্রতি অরুচি বশতই নিছক মুখ বদ্‌লানোর উদ্দেশ্যেই ইংরাজ অধিকার কামনা করেছিল এবং অধিকাংশ লোকই এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। মোট কথা ইংরাজের সম্বন্ধে প্রতিকূল ভাব বিস্তীর্ণভাবে কোথাও ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে—প্রতিকূলতার অভাবই গৌণ-ভাবে সহযোগিতা। ইংরাজ সূচ হয়ে প্রবেশ ক'রে নিজগুণে ফাল হয়ে বেরিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সূচ হয়ে প্রবেশ লাভটাই ঘটত না, যদি তেমন বিস্তৃত ভাবে প্রতিকূলতা কোথাও থাকত। সুতরাং সত্যশীল ইতিহাসকারকে এ কথা বলতেই হবে যে, এদেশের লোকের সহযোগিতার উপরই ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে দেশটা ইংরাজের হাতে তুলে দিয়েছি।

এই তুলে দেওয়া ব্যাপারটাকে অনেকে তাহা ডাইনীর হাতে ছেলে সঁপে দেওয়া বলেই মনে করেন—যার ফলে ছেলে ক্রমশঃ শুকিয়ে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে উঠছে। অনেকে আবার বলেন—মনের মধ্যে কি ভাবেন জানিনে, কারণ, পর-চিত্ত অন্ধকার—না, এ হচ্ছে বিশ্বামিত্রের হাতে দশরথের রামচন্দ্রকে সমর্পণ। এর ফল ইংরাজরূপ বিশ্বামিত্রের নিকট ভারতবর্ষরূপ রামচন্দ্রের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ দিব্যাস্ত্র শিক্ষা, কুসংস্কার-রূপিণী তাড়কাবধ এবং উপসংহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-রূপিণী সীতা লাভ। সীতার সঙ্গে তুলনা ক'রে আমি এই উন্নতিটাকে ভূইফোঁড় বলে কোনও রূপ গূঢ় ইঙ্গিত করছি, আশা করি পাঠকেরা সেরূপ কিছু মনে করবেন না। আমি নিতান্ত সরল চিত্তেই তুলনাটা করেছি।

এই দুই দলেই বিস্তর হোমরা-চোমরা বড় বড় লোক আছেন—সুতরাং কোন্ মতটা সত্য তা ঠিক ক'রে বলা আমার মত সাধারণ লোকের পক্ষে নিতান্তই কঠিন। হয়তো দুই মতের মধ্যেই আংশিক ভাবে সত্য আছে। যাই হোক এ প্রসঙ্গের আলোচনায় আমার কোনও লাভ নাই। কারণ, আমি এই প্রবন্ধের পোড়াপত্তন করেছি—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্" মনুর এই মহাবাক্যের উপর। ইংরাজের অধীন থেকে বা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সামিল হয়ে আমরা হয়তো কোনও কোনও বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করতে পারি, কিন্তু মানুষের আসল শ্রী-স্বাধীনাতাকে খুইয়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারা যায়, কোনও শ্রীবৃদ্ধিরই এতটা মূল্য নয়। শ্রীবৃদ্ধি যে কার ভোগে

লাগে সেটা ত ভাবার কথা। বন্য-গোরুর চেয়ে গ্রাম্য গোরু দুগ্ধদান বিষয়ে অনেক শ্রীবৃদ্ধি লাভ ক'রে থাকে। কিন্তু সেইজন্য মানুষের গোয়ালে ঢুকে তার যে বিশেষ লাভ আছে, সেরূপ মনে হয় না। গোরুর পক্ষে মানুষের গোয়াল যেমন, আমাদের পক্ষে ব্রিটিশ এম্পায়ারও ঠিক তেমনি। আসল কথা স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব যেমন, মানুষ মাত্রেরই পক্ষে স্বাধীনতাও ঠিক তেমনি। কোনও অবস্থাতেই এবং কোনও কারণেই ও-জিনিষ-বেচা যেতে পারেনা।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথার উল্লেখ করলে বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হবেনা। উপরে যে দুই দলের কথা বলেছি, তাঁদের মতটা সত্য হোক মিথ্যা হোক স্পষ্ট বুঝা যায়। আর এক দল লোক আছেন, তাঁদের মতটা ঠিকমত বুঝে উঠা বিষম সমস্যা। তাঁরা যখন নানাবিধ Statistics ও অঙ্কপাতের দ্বারা ভারতবর্ষের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান দারিদ্র্যের ছবিটী আঁকেন, তখন ছেলে ডাইনীর হাতে পড়েছে সে বিষয়ে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকেনা। কিন্তু যখন প্রতীকারের কথা উঠে তখন তাঁরা constitutional agitationএরই দোহাই পাড়েন। বোধহয় তাঁরা মনে করেন, ডাইনী যে এতকাল ধরে ছেলেটীকে শোষণ ক'রে আসছে সে কেবল পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক এতদিন কৃতাঞ্জলিপুটে তাকে নিরস্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেননি ব'লেই; নতুবা এ বিষয়ে তার নিজের লাভালাভের কোনও কথাই নাই। হয়তো বা তাঁরা এটাও ভাবতে পারেন, ছেলেটা যে দিন দিন [illegible], ডাইনী তা টের পায়নি। সুতরাং অঙ্কপাতের দ্বারা ঐ ব্যাপারটা একবার প্রমাণ ক'রে দিলেই আর কোনও ভাবনা থাকবেনা—ডাইনি তার দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিবে। এঁদের এই দু-কূল রাখা ভাবটা যে কি-রকম ছেলেমানুষী, একটু ভেবে দেখলেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এঁদের যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র যে সমস্ত Statistics, তার সকলগুলিই তো গবর্ণমেণ্টেরই সঙ্কলিত। সুতরাং সেগুলির যা প্রকৃত সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্ট তা জানেন না, এরূপ মনে করা বোধহয় কোনও বয়স্ক লোকের পক্ষেই শোভা পায়না। Digby, রমেশ দত্ত, দাদাভাই নৌরজী প্রভৃতি মনস্বীদের ভারতের দারিদ্র্য-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ যে আমার লক্ষ্যীভূত, সে কথা খুলে বলার প্রয়োজন দেখিনা। শেষোক্ত মহাত্মা যে দীর্ঘ জীবনের কল্যাণে আপনার ভ্রম-সংশোধনের অবসর পেয়েছিলেন, সে কথাও অবশ্য পাঠকেরা জানেন।

আসল বিষয়ে ফিরে যাওয়া যাক্। এদেশের ইংরেজের অধিকার প্রতিষ্ঠা যে এদেশের লোকের সাহায্যে ও সম্মতি-ক্রমেই হয়েছে সে কথা পূর্ব্বে বলেছি। সেই অধিকার যে ক্রমশঃ দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠছে এবং তাদের শাসনের ফলটা যে এমন অব্যাহত সুচারু ভাবে চলছে, সেও ওই সম্মতি ও সাহায্যেরই কল্যাণে। চোখ খুললেই যে জিনিষটা দেদীপ্যমান হয়ে উঠে তার আর অন্য প্রমাণের দরকার হয় না। ইংরাজের আফিস, আদালত, কারখানা, স্কুল-কলেজ, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রমাণগুলি ভারত জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা ইংরাজকে আমাদের পক্ষে এমনি

অত্যাবশ্যক ক'রে তুলেছি যে ইংরাজের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা অতি-বড় অসহযোগীর পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠেছে—সাধারণ লোকে তো কল্পনাতেও আনতে পারে না। এই যে ইংরাজের প্রতি একান্ত নির্ভরের ভাব, ইংরাজের আধিপত্য স্থাপনে আমরা কি পরিমাণে সহায়তা করেছি এইটেই তার সব-চেয়ে বড় প্রমাণ। তাদের প্রতি নির্ভর ও তাদের আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা করা একই ব্যাপারের দুই দিক।

ইংরাজ অবশ্য এই সহায়তার কথাটা যথাসাধ্য চেপে যান। আমরাই তাঁদের উপর নির্ভর করছি কিন্তু তাঁরা নিজে স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ংম্ভব আমাদের মনে এই সংস্কারটা জন্মানোর জন্য তাঁরা সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তাঁদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে এই সংস্কারটা যে একান্ত প্রয়োজনীয়! ভালমানুষ সাহেবেরা তাঁদের অলৌকিক শাসন-ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য-গঠন প্রতিভার দোহাই দেন। কিন্তু আসল জনবুল খোলাখুলি বলে ফেলেন, তাঁদের শার্দ্দূল স্বভাবের (Tiger qualities) গুণেই দেশটা তাঁরা করতলগত ক'রে রেখেছেন এবং ওরি উপর তাঁদের চরম ভরসা। এই মিথ্যা স্পর্দ্ধাটা এতই দুর্ব্বল, নিরস্ত্র ও অসহায় যে, এর উপর কোনও রূপ অস্ত্র-ক্ষেপ করা কেবলমাত্র অস্ত্রের অপব্যয় নয় কাপুরুষতাও বটে। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে এরূপ মিথ্যা দম্ভ সহ্য করাও কঠিন। কাজেই দু-একটা কথা বলতে হলো। কেবল মাত্র বাহুবলের দ্বারা এদেশে ইংরেজের আধিপত্য রক্ষিত হ'তে পারে কিনা আলোচনা ক'রে দেখা যাক।

কোনও বিষয়ের সত্যতা নির্ণয় হয় তিনরকম প্রণালীতে। (১) Theoretically অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্যক জ্ঞান-জনিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ-নির্ণয়ের দ্বারা। (২) নজীর-লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা। (৩) Experimentally অর্থাৎ হাতে-কলমে পরীক্ষা ক'রে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় চোখে পড়ে। (১) ভারতবর্ষ হতে ইংলণ্ডের দূরত্ব। বিজ্ঞানের কল্যাণে দূরত্বের অসুবিধা বহুল পরিমাণে দূর হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজিত রাজ্যকে আয়ত্তাধীন রাখার পক্ষে এটা একটা বিষম বাধা। তার উপরে য়ুরোপে যদি কোনও গোল বেধে উঠে তাহলে বাধাটা কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, গত জর্ম্মণ-যুদ্ধের সময় তার পরীক্ষা হয়ে গেছে (২) ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের আয়তন ও লোক-সংখ্যার একান্ত পার্থক্য। ভারতবর্ষ সরকারী বেসরকারী সকল রকমের ইংরেজ কত আছে ঠিক জানিনে। সম্ভবতঃ লাখদুয়েক হবে। হাজার চেষ্টা করলেও এই সংখ্যা ইচ্ছামত বাড়ানো ইংরাজের সাধ্যাতীত। সুতরাং সিভিল মিলিটারী সকল বিষয়েই তাকে প্রধানতঃ এদেশের লোকের উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে ও চিরকালই হবে। (৩) এদেশের লোকের ভাষা ধর্ম্ম আচার ব্যবহার সংস্কার সম্বন্ধে ইংরাজের দ্বৈপায়ন (Insular) অজ্ঞতা। (৪) এদেশের আবহাওয়া। এ আবহাওয়া এদেশে ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপনের একেবারেই অনুকূল নয়। (৫) আর্থিক সমস্যা। এক [illegible] প্রকাণ্ড দেশকে

কেবল ফৌজের বলে দখল রাখতে হলে যে পারিমাণ অর্থের আবশ্যক, ইংলণ্ডের পক্ষে তা সংগ্রহ করা অসম্ভব। তার উপর জর্ম্মন-যুদ্ধের ফলে ইংরেজের অর্থকৃচ্ছতা যেরূপ সঙ্গীন হয়ে উঠেছে তাতে ও-কথা মনে স্থান পেতেই পারে না। (৬) আয়ারলণ্ড ও মিসরের অন্তর্দ্রোহ। আফগানিস্থান, জাপান প্রভৃতি দেশের ঈর্ষা। ভারতবর্ষের লোক ইংরাজের অনুগত, কেবলমাত্র এই বিশ্বাসেই তারা ঈর্ষাটাকে কোনরূপে চেপে রেখেছে।

সুতরাং কিরূপ সাংঘাতিক প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইংরাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে সে কথা সহজেই অনুমেয়। এই প্রতিকূলতার তীব্র বিষ কেটে যাচ্ছে কেবলমাত্র এদেশের লোকের অনুকূল ভাবের দ্বারা। যদি কোনও কৌতুক-প্রিয় দেবতা ক্রীড়াচ্ছলে একদিন শেষরাত্রে লোকের মন হ'তে এ ভাবটা সম্পূর্ণ মুছে দেন এবং সকালে উঠে কেহই ইংরাজকে কোনও বিষয়ে সাহায্য করতে যদি সম্মত না হন, তাহলে একদিনের মধ্যেই কিরূপে অপূর্ব্ব কাণ্ডটী ঘটে, পাঠকেরা সেই ছবিটী মনে মনে আঁকতে চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন, ইংরাজের অধিকার পদ্মপত্রে জলের মত কিরূপ টলমল করছে। বুঝতে পারবেন তলোয়ার দিয়ে আধিপত্য রক্ষা করার স্পর্দ্ধা-বাক্যটা কতই মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্য। তাঁদের হালফ্যাসনের বড় বড় কামানগুলি হয়তো ঘণ্টায় দশহাজার লোকের দফারফা করতে পারে, কিন্তু সেগুলি ফোর্ট হ'তে বাইরে আসার সুযোগলাভ করতে পারবে কিনা সেই সম্বন্ধেই ব্যাপারটা যদি এইরূপই দাঁড়ায় এবং কর্ত্তারা যদি ভালমানুষের মতো এদেশে থাকতে গররাজী হন, তাহলে চিরস্থায়ী ফার্লো নিয়ে দেশের দিকে পাড়ি দেওয়া ভিন্ন তাঁদের উপায়ান্তর থাকবেনা। পোটলা-পুটলি কিছু সঙ্গে ক'রে বেঁধে নিয়ে যেতে পারবেন সে আশা খুবই কম—কম্বল-বস্ত হয়েই আপনাদিগকে ভাগ্যমন্ত মনে ক'রে সন্তুষ্ট হতে হবে। আর সেই মহাচাঞ্চল্য ব্যাপারের জন্যও খুব সম্ভব এদেশের লোকের সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে।

যাঁরা দম্ভ ক'রে বলেন যে, হোকনা সমস্ত দেশের লোক প্রতিকূল, আমরা ফৌজ দিয়ে সব ঠাণ্ডা ক'রে রাখবো, তাঁরা ও-কথা বলার সময় একটা সামান্য বিষয় ভুলে যান—ফৌজে সাদা সৈনিকের সংখ্যা সাধ্যমত বাড়াবার চেষ্টা সত্ত্বেও এখনো তার $\frac{৩}{৫}$ অংশ ভারতবর্ষীয়। একথা অবশ্য স্বীকার করি, তারা আপনাদিগকে ভারতবাসী বলে যতখানি জানে, ইংরেজের নিমোকখোর ব'লে মনে করে তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে জানা-অজানার রাজ্যে যেরূপ ওলোট-পালোট কাণ্ড লেগে গেছে, তাতে তাদের আপনাদিগকে ভারতবাসী ব'লে জানতে এবং ইংরাজের নিমকটাকে Liverpool salt না ভেবে ভারতীয় সৈন্ধব মনে করতে খুব বেশী বিলম্ব নাও হ'তে পারে।

(২) নজীর :—একটা দেশের সঙ্গে আর-একটা দেশের সকল বিষয়ের মিল আশা করা অসম্ভব। সুতরাং ষোল-কলায় খাপখাওয়া নজীর প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু আসল বিষয়টীর নজীরের অভাব নাই। আসল বিষয়টী হচ্ছে এই :—

কোন দেশকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশী দিন আয়ত্তাধীনে রাখা অন্য দেশের পক্ষে সম্ভব নয়, বিজেতা দেশ শৌর্য্য-বীর্য্য ধন-বিভবে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হলেও নয়।

প্রথম দৃষ্টান্ত ইটালী। ইটালী যখন অষ্ট্রীয়ার অধীন ছিল তখন শৌর্য্য-বীর্য্য পরাক্রমে অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে তার তুলনাই হতে পারতনা। অষ্ট্রীয়া ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য—ইটালী খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। দুই দেশ পরস্পর-সংলগ্ন। এরূপ সুবিধা সত্ত্বেও ইটালীকে বেশী দিন কবলে রাখা অষ্ট্রীয়ার পক্ষে যে সম্ভব হয়নি তার একমাত্র কারণ ইটালী ও-ভাবে থাকতে মোটেই রাজী হয়নি।

ইটালীর তুলনায় অষ্ট্রীয়ার যে-সব সুবিধা ছিল, ভারতবর্ষের তুলনায় ইলণ্ডের যে তার একটীও নাই পূর্ব্বেই তা দেখিয়েছি। সুতরাং যদি কোনও দিন ভারতবাসী ব্যাপক ভাবে ইংরাজের সঙ্গে রাজা-প্রজা খেলা করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে খেলা যে আর এক দণ্ড চলতে পারিনা সে কথা লেখাই বাহুল্য। খেলা ভাঙ্গতে ইটালীকে যে বেগটুকু পেতে হয়েছিল ভারতবর্ষকে তার সিকি পরিমাণও পেতে হবেনা।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, হল্যাণ্ড :—স্পেনের সে সময়ে ভুবন-বিজয়ী প্রতাপ। তার বিক্রমে সমস্ত য়ুরোপ সন্ত্রস্ত। ওলন্দাজেরা নিরীহ ব্যবসাদারের জাতি। যুদ্ধ-বিদ্যায় কোনও কালেই তারা খ্যাতি লাভ করতে পারেনি। তথাপি এই নিরীহ দেশটাকে আয়ত্তাধীনে রাখা স্পেনের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৩। Experimental method বা হাতে-হাতিয়ারে পরীক্ষার প্রণালী :—

এদেশে এরূপ হাতে-হাতিয়ারে পরীক্ষা তেমন ভাবে হয়নি। সুতরাং ফলাফল সম্বন্ধে জোর ক'রে কিছু বলা যায় না। তবে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় নিতান্ত আংশিক ভাবে পরীক্ষাটা হয়ে যেরূপ ফল হয়েছিল, তাতে বিস্তৃতভাবে হ'লে ব্যাপারটা যে অন্যরূপ দাঁড়াতো, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই। উক্ত বিদ্রোহ কেবল মুষ্টিমেয় সিপাহীর বিদ্রোহ। এমন-কি দেশী ফৌজেরও অনেক অংশ ইংরাজের অনুকূল ছিল। মোটামুটি বলতে গেলে সমস্ত দেশই তখন ইংরাজের দিকে ছিল। এদেশের লোকের সহায়তাতেই বিদ্রোহটা থামানো হয়েছিল। এ বিষয়ে যদি কারো সন্দেহ থাকে, Colonel Chesneyর "Indian Polity" নামক বইখানি প'ড়ে দেখতে পারেন। নিঃসন্দেহ হবেন। যদি এখনকার মত দেশাত্মবোধ ভাব দ্বারা সে সময়ের লোক অনুপ্রাণিত হতো, তাহলে বিদ্রোহ নিবারণ করা যে কিছুতেই সম্ভব হতো না, সে কথা বোধ হয় প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা।

উপসংহারে আচার্য্য সীলির Expansion of England গ্রন্থ হ'তে দু-একটী অংশ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। পাঠকেরা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন, অসহযোগ-নীতির দ্বারা ভারতবর্ষ যে ইংরাজের কবল হ'তে মুক্তিলাভ করতে পারে—এটা কেবল মহাত্মা গান্ধীর খেয়াল মাত্র নয়—বিজ্ঞ ইংরাজ ইতিহাস-কারের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও তাই। তবে তিনি ইংরাজকে এই আশ্বাসটুকু দিয়েছেন—ভারতবর্ষের লোকের মনে দেশাত্মবোধ কোনও

দিনই ছিলনা এবং তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কোনও দিনই কাজ করেনি। অর্থাৎ তিনি পাকে-প্রকারে জানিয়াছেন, ন-মণ তেল পোড়ানোর যখন কোনই সম্ভাবনা নাই তখন রাধার নাচও প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। কিন্তু সামান্য কারণেই ইংরেজ উত্তেজিত হয়ে যেরূপ বীভৎস হিংস্রকাণ্ডের অভিনয় করেন তাতে অনায়াসেই বলতে পারা যায়, তাঁরা ঐ আশ্বাস-বাক্যে বিন্দুমাত্র আস্থা রাখেন না। আর কেমন ক'রেই বা রাখবেন! ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যা ঘটেনি—বিংশ শতাব্দীতে যে তা ঘটবেনা এ-কথা কে জোর ক'রে বলতে পারে? উপযুক্ত কারণ ও পারিপার্শ্বিকের সমবায় হ'লে ব্যক্তির চরিত্রও যেমন পরিবর্ত্তিত হয় জাতির চরিত্রও ঠিক সেইরূপ হয়ে থাকে। সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ার চেয়ে না হওয়াটাই অধিকতর আশ্চর্য্য মনে হয়। ইতিহাস নিবিষ্ট-চিত্তে পড়লে জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটা কৌতূকের কথা মনে হচ্ছে। যাঁরা ভারতবাসীর চরিত্রের ভালোর দিকে পরিবর্ত্তন একেবারেই বিশ্বাস করতে পারেন না, মন্দর দিকে পরিবর্ত্তন বিশ্বাস করতে তাঁদের বিন্দুমাত্র বাধা হয় না। গ্রীক ও চৈনিক পর্য্যটকদের অঙ্কিত ভারতবাসীর চরিত্র-চিত্র ও বর্ত্তমান য়ুরোপীয়দের অঙ্কিত চিত্র তুলনা ক'রে দেখলেই এ-কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

(১) If there could arise in India a nationality movement similar to that which we witnessed in Italy, the English power could not even make the resistence that was made in Italy by Austria, but must succumb at once.

... ...

Now if the feeling of common nationality began to exist there only feebly,—if without insiring any active desire to drive out the foreigner, it only created a notion phat it was shameful to assist him in maintaining his dominion,—from that day almost our Empire would cease to exist;

... ...

P. P. 262 & 263

(2) The moment India began really to show herself what we so idly imagine her to be, a conquered nation, that moment we should recognise perforce the impossibility of retaining her.

P. 264

(3) But if such a rising took place, it would be put down by the native soldiery so long as they have not learned to feel themselves brothers to the Hindu and foreigners to the Englishmen that commands them.

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী।

গজ্‌ল্‌-গান

গুল্‌নার্‌-বাগে ফুল বিল্‌কুল্‌,
নাশ্‌পাতি
গালে গাল দিয়ে লালে-লাল হ'ল
বোস্‌তানে!
ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের
আব্‌ছায়া,
সরাইখানায় মেতেছে মাতাল
খোস্‌-গানে!
কহিল সহেলি, 'আজ যে গানের নওরোজা!
ফুল দলে' চল, কেন গো ফলের বও বোঝা?'
—সে কোন্‌ শরাবে করিলি বেহোঁস্‌-
মস্তানা—
নার্গিশাক্ষি! কি কথা আমার
কো'স্‌ কাণে!

বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভর্‌ সাকী!
হর্‌দম্‌ দাও! আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি?

তার সে ভুরুর একটুকু চাঁদ
আধ্‌ ঢাকা
'রোজা'র উপোস ভেঙে দিল যেন
'ইদ্‌'-রাতে!
রাত হ'ল দিন সেই আতশের
রোশ্‌না'য়ে—
দিন হ'ল রাত, নয়নে নামিল
নিদ্‌ প্রাতে!
ইয়ারা! তোমার পিয়ালা শপথ— সেই দিনই
শরাব-খানার পথটি প্রথম নেই চিনি'!
পথে বাহিরিনু, পিরাহান্‌ মোর
মদ-মাখা—

সেই দিন হ'তে ঠাঁই নাই আর
'ঈদ্‌গা'-তে !

বড় মিঠা মদ ! ফের পেয়ালায় ভর্ সাকী !
হর্‌দম্ দাও ! আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি ?

কালো-কস্তুরী—জুল্‌ফি যে তার
ঘা'ল্ করে !
বিছার মতন নড়ে সে গালের
গুল্‌বাগে !
চিবুকের সেই তিলটি যে তার
দিল্-দাগা' !—
এতদিনে মোর স্বস্তি-সুখের
ভুল ভাগে।
পিয়ারী ! ও তোর ঠোঁটের দু'খানি লাল চুনী
জুড়াবে দরদ্,—আমি সে স্বপন- জাল বুনি !
মজ্‌নুর গোরে এখনো যে তার
বুক জুড়ে'
লায়লী-অধর-'লালা'-ফুলটির
মূল গে !

বড় মিঠা মদ ! ফের পেয়ালায় ভর্ সাকী !
দম্ দাও ! আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি ?

লাব গুলা যে লাল হয় লাজে !—
মউ-ভরা
পিয়া ! কা'রেও পিলায়—এমন
দেখ্‌ছি নে—
পিয়াসী চামেলি বেলী যে মু'খানি
চুণ করে !
কতদূর হ'তে বুল্‌বুল্ আসে
দেশ চিনে' !
শিরীন্ শরাব বড় যে রঙীন্ ! কর সাকী,—
যত নেশা হোক্, রাতটি ফুরালে, রয় তা' কি ?

তোমার সুরত্-সুরায় যে জন
মস্তানা,
হুঁস্ হবে তার 'আখেরি-জমানা'-
শেষদিনে !

বড় মিঠা মদ ! ফের্ পেয়ালায় ভর্ সাকী !
হর্‌দম্ দাও—আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি ?

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

চয়ন

মানুষের চোখের রহস্য-রশ্মি

সংপ্রতি ডাঃ চার্লস রাস এক অদ্ভুত আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন, "মানুষের চোখ থেকে এমন এক শক্তিপূর্ণ রশ্মি-ধারা ফুটে বেরোয়, যার জোরে সে আর-একজন মানুষের দেহকে স্বেচ্ছামত চালাতে-ফেরাতে পারে।"

কাল্পনিক উপন্যাসে আর রূপকথায় এই ধরনের অনেক কাহিনী আছে। সে-সব কাহিনীকে আমরা অবসররঞ্জনের গালগল্প হিসাবেই গ্রহণ করি। কিন্তু ডাঃ রাসের আবিষ্কার যদি পরীক্ষার পর প্রামাণিক ব'লে গৃহীত হয়, তবে বিজ্ঞান-সমাজের অনেক সিদ্ধান্তই উল্টে-পাল্টে যাবে।

এক-একজন মানুষের চোখের দীপ্তি যে অত্যন্ত প্রখর এবং আমাদের মনকে সহজেই অভিভূত ক'রে ফেলে, আমরা অনেকেই বোধহয় তা লক্ষ্য ক'রে দেখেছি। নির্ব্বাসিত জার্ম্মান-সম্রাট, প্রিন্স বিস্‌মার্ক ও লর্ড কিচেনার প্রভৃতি জননায়কদের দৃষ্টির সাম্‌নে অনেক লোকই যে মুখ চাইতে পার্‌ত না, তাঁদের জীবনচরিতে পাঠ করেছি।

মহাবীর নেপোলিয়নের দৃষ্টি ই[illegible] প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ইংরেজের ভ[illegible] নেপোলিয়ন যখন বন্দী, তখনো তাঁর সাম্‌নে জেতা শত্রুরা সঙ্কুচিত হয়ে পড়্‌ত।

সেনাপতি নে'র সুমুখে নেপো[illegible] তাঁর এক দোষী কর্পোর্য্যালকে নি[illegible] আহ্বান করেন।

কর্পোর্য্যাল ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। নেপোলিয়ন তাঁর ধূসর চক্ষের পরিপূর্ণ দৃষ্টি তার উপরে স্থাপিত ক'রে জান্‌লার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লেন, "লাফাও !"

কর্পোর্য্যাল বিনাবাক্যব্যয়ে সেই উচ্চ গবাক্ষের দিকে ফির্‌ল এবং পর-মুহূর্ত্তেই লাফ দিয়ে মৃত্যুর কোলে গিয়ে পড়্‌ল।



চোখের রশ্মিতে সম্মোহন

নেপোলিয়নের দৃষ্টির এই অসাধারণ মতা সে-যুগের বড় বড় শক্তিবান পুরুষকেও কবারে গোলাম ক'রে ফেলেছিল। এই চিত্র দৃষ্টি-শক্তির কারণ কি? ডাঃ রাসের ত, মানুষের চোখ দিয়ে যে তীব্র রশ্মি র্গত হয়, অন্যের মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে তা জ করে।

মানুষের চোখ স্বচ্ছ এবং খোলা গবাক্ষের মত। গবাক্ষ-পথে অপরের দৃষ্টি স্নায়ু জালের মধ্য দিয়ে সোজা মস্তিষ্কের ভিতরে চ'লে যায়। চোখের দৃষ্টিতে বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। (কারণ আলোক মাত্রকেই electro-magnetic phenomenon বলা হয়।) এবং সেই বৈদ্যুতিক শক্তির জন্যেই একের দৃষ্টিতে অন্যে অভিভূত হয়ে পড়ে। চোখের দৃষ্টির সঙ্গে যে বিদ্যুতের সম্পর্ক আছে, তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ডাঃ রাসও অনেকবৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়েছেন। সাধার পাঠকের পক্ষে সে-সব দুর্ব্বোধ ব্যাপা চিত্তাকর্ষক হবে না ব'লে আমরা এখা অত-শত খুঁটিনাটির পরিচয় দিলুম না।

আমরা দৈনিক জীবন-যাত্রাতেই মানুষে চোখের দৃষ্টি-শক্তির অনেক পরিচয় পে থাকি। আপনি যখন ঘরের ভিতরে এক ব'সে থাকেন, তখন আর কেউ গোপ এসে যদি আপনার দিকে তাকায়, দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা না-জানতে

এবং তাকে দেখ্‌তে না-পেলেও, তার সেই দৃষ্টি আপনি অনেক সময়েই অনুভব কর্‌তে পারেন।

মা যখন ছেলেকে স্তন্য দেন, তখন অন্য কোন পুরুষের দৃষ্টি তাঁর উপরে পড়্‌লে, সেই পুরুষকে দেখ্‌তে না-পেলেও অনেক সময়ে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠে নিজের উন্মুক্ত বক্ষ আবার বস্ত্রাবৃত ক'রে ফেল্‌বেন। ঘুমন্ত মানুষের দিকে, বাইরের কেউ ঝুঁকে প'ড়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌লেও সে জেগে উঠ্‌তে পারে। আবার, এটাও আমরা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই যে, এক-একজন লোকের সঙ্গে চোখোচোখি ক'রে থাক্‌তে বিশেষ বেগ পেতে হয়।

এম্‌নি ছোটখাটো নানা প্রমাণে বেশ বুঝা যায়, মানুষের চোখের ভিতরে একটা কিছু রহস্যময় ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে।

'হিপ্‌নটিজম্' বা সম্মোহন-বিদ্যাও মানুষের চোখের শক্তিকেই জাহির ক'রে দেয়।

ষাট হাজার বছর আগে

দৈব-গতিকে ষাট হাজার বছর আগেকার একটি রহস্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সুইজার-ল্যাণ্ডে Neuchatel নামে একটি হ্রদ আছে। এ-বৎসরে হ্রদের জল হঠাৎ অত্যন্ত বেশীরকম শুকিয়ে গেছে। তার ফলে হ্রদ-গর্ভ থেকে স্মরণাতীত কালের অনেক রকমের জিনিষ বেরিয়ে পড়েছে।

পণ্ডিতদের মতে, সুইজারল্যাণ্ডের নানা স্থানে আগে হ্রদ-বিহারী মানুষ বাস কর্‌ত। ইতিহাস-পূর্ব্বকালে পৃথিবীর মানুষ-বাসিন্দাদের মধ্যে তারাই সব-চেয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন-গুজ্‌রাণ কর্‌তে পার্‌ত। জলের উপরে মাচান বেঁধে বসবাস কর্‌ত ব'লে, বুনো জন্তু আর শত্রুদের আক্রমণ থেকে তারা অনেকটা নিরাপদ হ'তে পেরেছিল। কিন্তু সেকালে যারা গিরিগুহায় থাক্‌ত, বাঘ, ভাল্লুক, নেক্‌ড়ের কবলে তাদের বিপদ ঘট্‌ত পদে পদে।

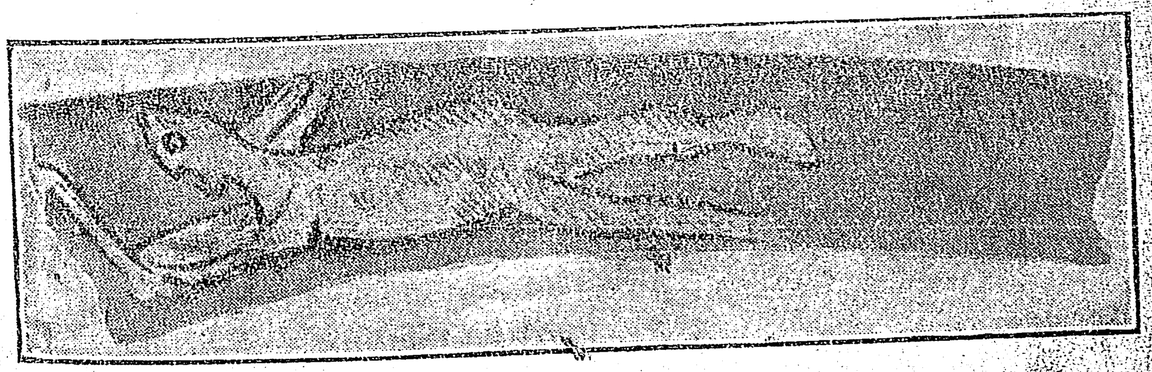

হ্রদবিহারী শিল্পীর হাড়ের উপরে আঁকা, সাবেক মানুষের ছবি

আমরা যে যুগের কথা বল্‌ছি, তাকে 'নূতন শিলা-যুগ' (Neolithic age) ব'লে ডাকা হয়। তখনকার কালে এই হ্রদ-বিহারীরাই নর-জাতির মধ্যে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পেরেছিল। তাদের জীবনী-শক্তি ছিল এতটা বেশী যে, ঐতিহাসিক কাল পর্য্যন্ত তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কেউ কেউ বলেন, সুইজারল্যাণ্ডের কোন আধুনিক পল্লীগ্রামে এখনো পর্য্যন্ত হ্রদবিহারী-দের বংশধররা বাস করে এবং এ-যুগেও তারা অতীতের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পদ্ধতি একেবারে ত্যাগ কর্‌তে রাজি হয়-নি! অবশ্য সভ্যতার বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে তারা যে অনেক বিষয়ে মান্ধাতার আমোলকে উঁচিয়ে গেছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

Neuchatel হ্রদ থেকে যে-সব জিনিষ পাওয়া গেছে, তার দ্বারা ষাট হাজার বছর আগেকার মানুষদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়। জানা গিয়েছে, তারা পাথরের তীর ব্যবহার কর্‌ত, দাঁড় দিয়ে নৌকো বাইত হাড়কে নানা ধাঁজে নিপুণভাবে কেটে তা উপরে ছবি আঁকৃত, বঁড়শী দিয়ে মাছ ধর্‌ত এবং রূপসীরা হাড়ের মালা প'রে প্রিয়তমে মাথা ঘুরিয়ে দিত;—এমন-কি তারা গরু-ভেড়া আর কুকুর পালন কর্‌ত, তা প্রকাশ পেয়েছে।

আর-একটি বিচিত্র জিনিষ পাওয়া গেছে—পাথরের পাঁজি। তারা চাঁ স্বাভাবিক নিয়ম-অনুসারেই বৎসরকে মাসে ও দিনে ভাগ ক'রে নিয়েছিল।

শীতের মাঝখানে দিন যে বেড়ে যায়, সেটাও তাদের চোখে এড়িয়ে যায়-নি। সাবেক কালের সব জাতির মত তাদের কাছে নববর্ষের প্রথম দিন সব-চেয়ে বড় উৎসবের দিন ব'লে বিবেচিত হ'ত—কার শীতের কষ্ট যে ফুরুতে আর দেরি নেই, এ শুভদিন সেই বার্ত্তাই বহন ক'রে আনে।

মাচানের উপরে বাড়ীগুলি তীর থেকে প্রায় একশোফুট তফাতে থাকৃত। মাচান থেকে তীরে আসা যাওয়া হ'ত জলের উপরে তক্তা ফেলে। তক্তাগুলো রাত্রে তুলে রাখা হ'ত—শত্রুদের আচম্‌কা আক্র মণে বাধা দেবার জন্যে। বাড়ীগুলির আকার হ'ত গোল। ডালপালা দিয়ে আগে কাঠামো ক'রে তাতে মাটির প্রলেপ দেওয়া থাকৃত। মেঝেতেও

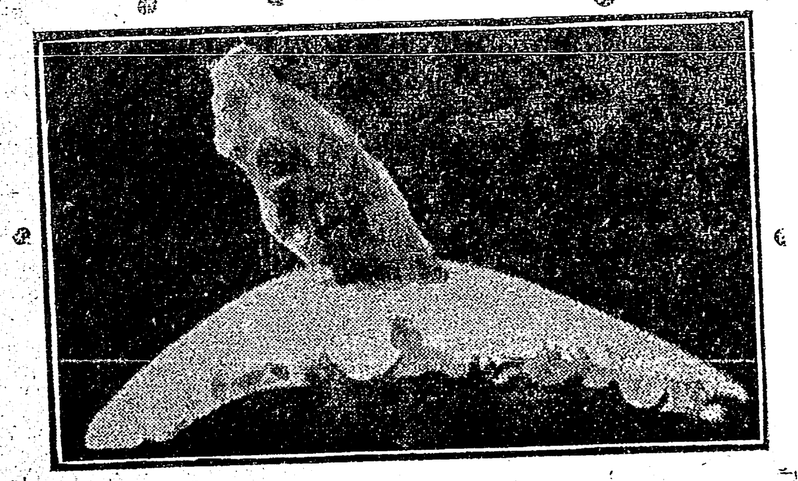

শিলা-যুগের একটি ট্রাজেডী। পাথরের তীরের ফলা মানুষের মাথার খুলিতে বিঁধে রয়েছে। এই খুলিটি সংপ্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে

কৃত মাটি আর কাঁকরের ছাউনি। দাদি দড়ি দিয়ে ছাদে ঝোলানো থাকৃত। রা শনের সুতোয় (খুব-সম্ভব) তাঁতে াপড় বুন্‌ত। কুমোরের চাকা তখনো াবিষ্কৃত হয়-নি ব'লে তারা হাতেই মাটি ল, নানানরকমের পাত্র আগুনে পুড়িয়ে ত। কাঠ কুঁদে' থালা তৈরি কর্‌ত। য়েরা কাঠের চিরুণীতে চুল আচ্‌ড়ে খোঁপা ধ্‌ত।

হ্রদবিহারীরা বোধহয় কোনরকম ধর্ম্মের াড়াও পেয়েছিল। কারণ মৃতের প্রতি ারা সম্মান দেখাত। মৃত যোদ্ধার দেহের পাশে তারা খাবার ও অস্ত্রাদি স্থাপন কর্‌ত। যে জাতি আত্মার অমরত্ব ধারণা কর্‌তে অক্ষম, তারা কখনোই মৃতের জন্য এতখানি মাথা ঘামাতে পারে না। নিশ্চয়ই তারা কোন উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস কর্‌ত।

সুইজারল্যাণ্ডের এই হ্রদ-বিহারী মানুষরা পৃথিবীর কোন্ অংশ থেকে প্রথম এসেছিল, সে কথা আজ আর কেউ জানে না। মাইল কয়েক তফাতে ফ্রান্সের গিরিগুহায় যে প্রাচীন মানুষরা বাস কর্‌ত, তারা ভিন্ন জাতির লোক। হ্রদবিহারীদের চেয়ে তাদের মাথা ছিল বেশী লম্বাটে।

বিছানায় পড়ার নিয়ম



এই-ভাবে পড়া অনুচিত

বিছানায় শুয়ে আপনার কি বই-পড়ার অভ্যাস আছে? তাহলে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে, বুকের উপরে বই রেখে বা তুলে ধ'রে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়ে কখনো পড়্‌বেন না। তাতে চোখ খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু বিছানার উপরে বসে, বালিসে ঠ্যাসান দিয়ে হাতে বই ধ'রে নিম্নদৃষ্টি হয়ে যদি পড়াশুনো করেন, তবে চোখের কোনই অনিষ্ট হবে না। দীপটি পিছন দিকে এমন ভাবে রাখবেন, যাতে তার আলো কাঁধের উপর দিয়ে আপনার কেতাবের উপরে এসে পড়ে। আলো যেন ম্লান না হয়।

মৎস্য-যুগে ফিরে চল

আসুন, ফের আমরা মাছ হই! জীবনের প্রথম উদয় সমুদ্র-গর্ভে। সুদূর অতীতে জলের ভিতর থেকেই আমাদের মেরুদণ্ড পরিণত হয়ে উঠেছে। মেরুদণ্ডী জীবদের মধ্যে মানুষ আজ সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করেছে। কিন্তু পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা কর্‌লে জানতে পারবেন যে, জীবসৃষ্টির প্রথম যুগে এই মানুষও আগে মৎস্যরূপে সাগরে সাগরে জললীলা ক'রে বেড়াত। তাই কি আমাদের প্রথম অবতার মৎস্যরূপী? এর মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত আছে কি?

ইউরোপের বিশেষজ্ঞরা সভ্যতার এই—চরম না হোক্—পরম উন্নতির যুগে তাই আবার বল্‌তে সুরু করেছেন,—আসুন, আমরা মাছ হই! আসুন, আমরা আরো বেশী সাঁতার দি! কারণ মানুষের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত ও পরিণত ক'রে তোল্‌বার পক্ষে সাঁতারের মত উপযোগী ব্যায়াম আর দ্বিতীয় নেই। লাফিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, এবং অনায়াসে হাতে-পায়ে জল কেটে আর ঠেলে অগ্রসর হোন! ঢেউএর তালে তালে আপনার প্রতি মাংসপেশী, প্রতি পেশী-বন্ধনী, প্রতি অস্থি, প্রতি রক্তবহা নলী এবং প্রতি স্নায়ুটি পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হ'তে থাক্‌বে। আমরা খাড়া ভাবে উঠি-বসি, চলি-ফিরি, কিন্তু জলের মধ্যে আমরা থাকি ঠিক তার বিপরীত ভাবে, উপুড় হয়ে। এতে যে আমাদের কতটা উপকার হয়, আমরা অনেকেই তা জানি না।



এই-ভাবে পড়া উচিত

সাঁতার দিবার সময়ে আমাদের ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য শরীর-যন্ত্রগুলি, এমন-কি চোখ ও নাক পর্য্যন্ত এই নূতন ব্যায়ামের মধুর প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। তার-উপরে দেহের রোমকূপগুলিও পরিষ্কার হয় এবং আরো নানারকমে আমাদের ত্বক উপকার লাভ করে। কিন্তু সাঁতারে সব-চেয়ে বেশী উপকার পায় আমাদের মেরুদণ্ড। বিলাতী ডাক্তার নাথানিয়েল বয়েড বলেন, "পরীক্ষার দ্বারা আমি জান্‌তে পেরেছি যে, সাঁতারে হাত-পা-দেহ নাড়্‌বার সময়ে মাছের মত মানুষেরও পিঠের শিরদাঁড়া কখনো সিধা হয়ে ওঠে, কখনো বা বেঁকে যায়, দুম্‌ড়ে পড়ে—এতে দেহের ও মস্তিষ্কের অনেক ত্রুটি সংশোধিত হয়। এইজন্যেই শ্রীমতী আনেট কেলার-

ম্যানের দেহ এমন নিখুৎ হয়ে উঠেছে। নারীরা যদি নিয়মিত সাঁতার অভ্যাস করেন, তবে তাঁদের সুন্দর গড়ন দেখে স্বর্গ-রূপসীরাও লজ্জা পাবেন। প্রত্যেকবার হাত-পা

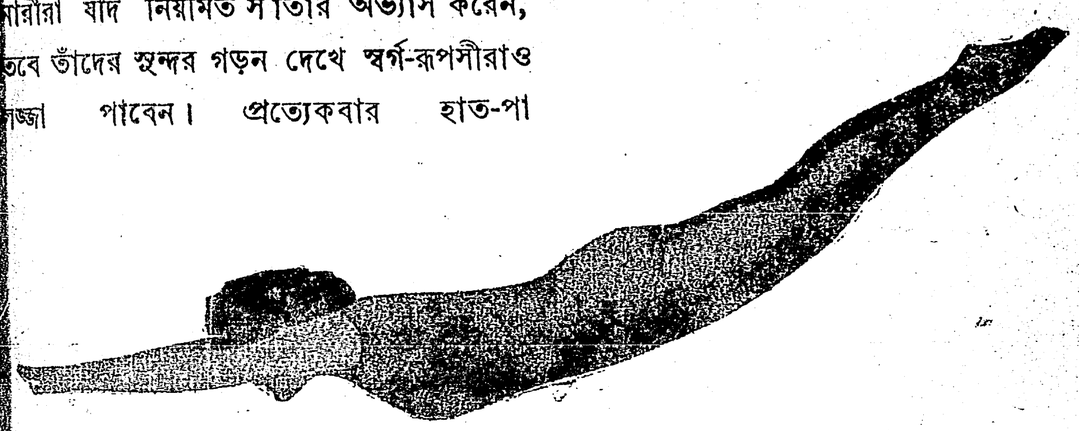

মিস্ কেলারম্যান জলে ঝাপ দিতেছেন

ছোঁড়বার সময়ে জলের যে ধাক্কা লাগে, সেই সংঘর্ষেই দেহ গড়ে ওঠে।

মেরুদণ্ড যখন এম্‌নি সঞ্চালিত হয়, তখন পাঁজ্‌রার হাড়গুলিও ঘুরে, বেঁকে যায় এবং তার ফলে বুকের নানাদিক পূরন্ত ও উপকৃত হয়। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ে পাঁজ্‌রার হাড়গুলি প্রসারিত এবং বক্ষ বিস্তৃত হয়—সঙ্গে সঙ্গে হয় তার মধ্যে রক্তের সমাগম। কাজেই তার ফলে ফুস্‌ফুসে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায় এবং শ্বাসের সঙ্গে বায়ুর আগম ও প্রশ্বাসের সঙ্গে carbon dioxideএর নির্গমনেরও যথেষ্ট সুবিধা হয়, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

অনেকে শুন্‌লে বোধ করি অবাক হবেনযে, অনেক ক্ষেত্রে সাঁতার কাট্‌বার ব্যবস্থা দিয়ে হৃদ্-রোগ (functional heart disease) আরাম করা যায়। সন্তরণের দ্বারা শোণিতের সম্প্রসারণ হয়, তাই হৃৎপিণ্ডের কর্ত্তব্য অনেকটা হাল্‌কা হয়ে পড়ে। তাছাড়া সাঁতারের সময়ে মানুষের দেহ জলের ভিতরে যে-ভাবে থাকে, তাতে ক'রে শরীরের সর্ব্বত্র রসের (lymph) প্রবাহ অনাহত ভাবে বইতে পারে। এক-কথায়, সাঁতারে শরীর রীতিমত তৈরি ও কর্ম্মোপযোগী হয়ে ওঠে এবং রোগের ভয় যথেষ্ট ক'মে যায়। সাঁতার খালি বাল্য বা যৌবনের নয়, মধ্য ও বৃদ্ধ-বয়সের পক্ষেও এটি একটি উপযোগী ব্যায়াম।"

নামজাদা ইংরেজ-সাঁতারু মণ্ট্যাগু এ, হোল্‌বিন তাঁর "Swimming" নামক পুস্তকে বলেছেন, স্নায়বিক রোগগ্রস্তদের পক্ষে সাঁতার হচ্ছে অত্যন্ত উপকারী ব্যায়াম। এতে মাংসপেশীর শক্তি বাড়ে। সাইকেল চড়ে যেতে যেতে একটি দুর্ঘটনায় আমার একখানি পা ভেঙে যায়। ডাক্তারের উপদেশে সাঁতার অভ্যাস ক'রে আমার সেই ভাঙা পা আবার ভালো হয়ে গেছে।

আমেরিকার Physical Culture নামে



জললীলার বিপুল পুলক !

মাসিকপত্রে প্রকাশ, সাঁতারে যে দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড সবল, বাঁকা শিরদাঁড়া সোজা আর জন্ম-রুগ্ন পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করে, তার অগুন্তি প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাঁরা অতিরিক্ত মোটা, নিয়ম ক'রে সাঁতার কাট্‌লে তাঁদের মাংস-বাহুল্য বিলক্ষণ কমে যায়। যাঁরা অতিরিক্ত রোগা, তাঁদের দেহের "বিধান-তন্তু" (tissue) ও মাংসপেশীগুলি সাঁতারে আশ্চর্য্য উপকার লাভ করে এবং ফলে অল্পদিনেই মাংসবৃদ্ধি ঘটে। অন্যান্য খেলা-ধূলার ক্ষেত্র থেকে অধিকাংশ ব্যায়াম-বীরকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই বিদায় নিতে হয়। কিন্তু সাঁতারের প্রতিযোগিতায় মানুষ যে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর বয়সেও বাহাদুরি দেখাতে পারেন, অনেক প্রৌঢ় সাঁতার তা প্রমাণিত করেছেন।

অবশ্য এখানে এটা বেশ মনে রাখ্‌তে হবে যে, যাহোক-তাহোক ক'রে নিজে খুসিমত সাঁতার কাট্‌লে দেহের কোনই উপকার হবে না। বিশেষজ্ঞ ওস্তাদের পরামর্শ না নিলে প্রথমে কিছুতেই চল্‌বে না। সব চেয়ে দরকার, আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে নিয়ম-সঙ্গত হস্ত-পদ সঞ্চালনের ভঙ্গি শিক্ষা করা। এরই উপরে সাঁতারের ভালো-মন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করে—খামখেয়ালে কোনই ফল হবে না।

বিজ্ঞানের গোয়েন্দাগিরি

আজকাল অপরাধী ধরবার জন্যে এত-রকমের উপায় আবিষ্কার করা হয়েছে যে, আইনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়া খুব চালাকের পক্ষেও শক্ত হয়ে উঠেছে।

অপরাধ-বিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ ফরাসী-ওস্তাদ বার্টিলিয়ন সর্ব্বপ্রথমে পাপীদের আঙুলের ছাপ ও দেহের মাপ্ নেবার পদ্ধতি প্রচলিত করেন এবং তার ফলে আজ-পর্য্যন্ত অনেক দোষী হাতকড়া পর্‌তে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞান যে এখন আরো কতদিকে উন্নত হয়ে উঠেছে, তা আর ব'লে শেষ করা যায় না।

এখন একগাছি চুলকেও ফ্যাল্‌না ভাবা চলে না। কিছুকাল আগে একগাছি চুল দেখে কেউ বিশেষ কোন অজানা কথা জান্‌তে পারত না। খালি বোঝা যেত, এই চুল যার, তার কেশের রং কি? এখন কিন্তু কোন হত-ব্যক্তির জামা-কাপড় বা হাতের মুঠোয় একগাছি মাত্র চুল পেলে অভিজ্ঞদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। কারণ অণু-বীক্ষনের সাহায্যে সেই চুল পরখ কর্‌লে, তাতে অনেক বিশেষত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানুষের চুলেই প্রভেদ থাকে যথেষ্ট। চুলের রং ছাড়া আরো বোঝা যায়, তা কর্কশ, মাঝারি, বা কোমল ও সূক্ষ্ম কিনা? তা গোল না চ্যাপ্টা, ছোট না বড় মণ্ডলে গঠিত? এ চুল কোন্‌জাতীয় লোকের? অনেক জাতির কেশেও জাতীয়তার ছাপ্ থকে। চুল যার, তার মস্তিষ্কের ত্বকে—যেমন ধরুন, টাক—কোন রোগ থাক্‌লে চুল দেখে তাও বোঝা যায়। এ-সব প্রকাশ হ'লে পাপী ধরা পড়্‌লে পর আইনের কবল থেকে আর তার রেহাই পাবার কোন উপায় থাকে না।

ধরুন, ঘটনাস্থলে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে খুনীর কোটের কাপড়ে খোঁচা লেগে গাছকতক সূতো ছিঁড়ে গেছে। প্রথমে অণুবীক্ষণে সেই সূতোগুলি দেখে বোঝা যাবে, তাতে কতটা পরিমাণে পশম, রেশম ও তুলো মেশানো আছে। সেই পশম কোন্ জাতীয়? তারপর রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে প্রকাশ পাবে, কোটের কাপড় রং করবার সময়ে কি-রকম রং ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর পুলিসের পক্ষে সেই কাপড়ের ব্যবসায়ীকে খুঁজে বার করা অনেক সময়েই সহজ হয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বিক্রেতা বা দর্জ্জীর নাম জানা যায়। এইভাবে পুলিস ধীরে ধীরে—কিন্তু নিশ্চিতরূপে—প্রকৃত অপরাধীর দিকে অগ্রসর হ'তে পারে।

আর-একটি নতুন উদ্ভাবনায়—"ফোটো-টেলিগ্রাফি"—আঙুলের ছাপের ফোটো সাধারণ টেলিগ্রামের মত অল্পসময়ের মধ্যে বহুদূরে পাঠানো যেতে পারে। আজকাল রঞ্জন-রশ্মি বা "এক্সরে"র সাহায্যে আঙুলের ছাপ নেওয়াও হয়—তাতে ভুলচুক হবার যো থাকে না। "মিথ্যা-ধরা-যন্ত্র"ও উদ্ভাবিত হয়েছে। আসামী মিথ্যা বল্‌লে এই যন্ত্র তখনি তাকে ধরিয়ে দেব।

এই যন্ত্রের নাম sphygmomanometer। এর দ্বারা রক্তের মধ্যে চাপ্ পড়্‌লে বা কোন পরিবর্ত্তন হ'লে তা তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়।

পুলিসের বা উকিলের অর্থপূর্ণ প্রশ্নের নির্দ্দোষ উত্তর পাকা অপরাধীরা খুব সহজেই দিয়ে থাকে। তার অবিকৃত মুখ দেখে মনের আসল কথা ধরা অসম্ভব। এইখানেই যন্ত্রটি সাহায্য করে।

সকলেই জানেন, উত্তেজনা বা ভয়ের সময়ে মানুষের মুখ অবিকৃত থাকলেও, তার মনের ভিতরে সেই ভাবের কতটা প্রভাব পড়ে। হৃৎপিণ্ডের গতি তখন—এক পলকের জন্যে হ'লেও—রক্তের চাপ বাড়ে। ভীতি কর প্রশ্নের মিথ্যা জবাব দেবার সময় অপরাধীর মনের ভিতরে সামান্য ও ক্ষণি উত্তেজনা বা ভয়ের সঞ্চার হ'লেই, পূর্ব্বো যন্ত্রটি তার নাড়ী ধ'রে সেটা স্পষ্টাস্পষ্টি প্রকা ক'রে দেবে। বারংবার এটা প্রমাণিত হ গেছে। যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ কোথাও মিথ্যা ধ' দিতে অক্ষম হন নি!

প্রসাদ রা

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

মূকেরে বাচাল করে—হেরি নাই, শুনিয়াছি—দেবতার বরে,
বাচালে অবাক্ করে—এ কথা যে সত্য, বুঝি অন্তর-অন্তরে,
যখন তোমার বাণী, তোমার ও প্রতিভার সীমাহীন ভাতি
সমগ্র ধরিতে মোর রসনার—রচনার—জাল খানি পাতি!
শুধু স্তব্ধ, শুধু মুগ্ধ, শুধু লুব্ধ, চিরদিন অতৃপ্ত-পিয়াসী—
তোমার ঝরণাতলে আমি নিত্য সুনির্জ্জনে যাই আর আসি!

তাই আমি কাব্য-গীতি-মুখরিত তব পূজা-উৎসবের দিনে,
লুপ্ত করি' আপনারে, একান্ত নিঃসঙ্গ যেন জনতা-বিপিনে,
বসেছিনু বাক্যহারা; গণি নাই মানি নাই কিবা প্রয়োজন
খুলি' দিতে কণ্ঠ মোর সে-সভায়, মুক্ত যবে নয়ন-শ্রবণ!
কত ভক্ত নিবেদিল পূজাঞ্জলি থরে থরে চরণে তোমার,
মন্ত্র পড়ি' পুরোহিত সমর্পিল অনবদ্য নৈবেদ্য-সম্ভার!
হেরি' মোর মূঢ় দৃষ্টি, রিক্ত হস্ত, নিরুচ্ছ্বাস নিষ্প্রভ বদন,
ডাকে নাই কেহ মোরে,—ধন্যবাদ! সে যে হ'ত বড় অশোভন!

তোমারে পূজিব আমি কোন্ মন্ত্রে, বুঝি না যে হে রবীন্দ্রনাথ!
যে বীজ যখনি জপি—ভুল হয়, হেরি' নিত্য নব রশ্মিপাত!

ধ্যানে মোর, জ্ঞানে মোর ধরিবারে চাই তোমা অখণ্ড-স্বরূপে,
তা' না হ'লে চিত্ত মোর প্রসন্ন হ'বে না জানি, দীপে আর ধূপে!
সত্য আর সুন্দরের যে বিগ্রহ গড়িয়াছ মানস-ভুবনে,
অসীমের রূপ-সীমা ফুটায়েছ আঁখি-আগে জাগ্রতে-স্বপনে—
হেরি তা'য় রাত্রি দিবা একাকার! ভেদ নাই আলো-অন্ধকার!
অধরে নির্ব্বাণ বাণা! মন্ত্রহীন তাই মোর গুরু-নমস্কার!

তোমারে বরেছি আমি আমা হ'তে বহুদূরে, আমার বাহিরে—
সত্যের শাশ্বতলোকে, শেষতীর্থে, নিস্তরঙ্গ পারাবার-তীরে!
যতটুকু যেই দিন অগ্রসরি পথে মোর—সেই মোর পূজা!
আনন্দ-আরতি মোর—সে যে তোমা নিত্য আরো বড় ক'রে বুঝা!
তোমার কবিতা-বিশ্বে অন্তহীন বিবিধ সে বিচিত্রের পানে—
দিকে-দিকে ধাই, তবু জানি তার সত্য এক!—সেই কোন্‌খানে
একবৃন্তে অগণন ফুটিয়াছে অবিচ্ছেদ! জানি, আমি জানি,
তোমার কবিতা মোরে দিবে সেই আদিমন্ত্র, একাক্ষরা বাণী।

ভারতের শেষ ঋষি! যে সাধনা অর্দ্ধ পথে গিয়েছিল থামি'
সহস্র বর্ষেরও আগে,—যে আলোক পূর্ণ হ'য়ে আসে নাই নামি'—
অসমাপ্ত সেই সিদ্ধি, পরমা সে ঋদ্ধি আজ দৈবী প্রতিভায়,
ফুলের মতন করি,' স্বচ্ছন্দ সতেজ বৃন্তে, ফুটাইলে গানে-কবিতায়!
রসে-রঙ্গে-রূপে তুমি, সম্বোধিলে সনাতন নিত্য সত্য-ধনে—
ধূলায় আসন রচি' বসিলা যে মহেশ্বর সহাস্য আননে!
সৃষ্টিপদ্মে যেই মধু মর্ম্মকোষে চিরদিন বিরাজে বিমল,
তারি বর্ণে গন্ধে স্বাদে ভরি' দিলে জন্ম-জরা—কটু-তিক্ত ফল!
সেই মন্ত্র প্রাণ-কর্ণে শুনিয়াছি হৃদয়ের গভীর অতলে,
জ্ঞানের ললাট-নেত্রে নেহারিব যেই দিন,—লয়ে করতলে
সেই সত্য পূজাঞ্জলি, বাহিরিব মহাহর্ষে উচ্চারিয়া জয়!
ততদিন র'ব মৌনী, অন্তরে বহিয়া শুধু ব্যাকুল বিস্ময়।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আঁধি

২৩

আরো চার-পাঁচদিন মুখ বুজিয়া পিতার সঙ্গে সকালে-বিকালে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর নিখিলের পানে ভগবান অবশেষে একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সেদিন বেলা দুপুরের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে নায়েব আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে বিস্তর কাগজ-পত্র-ভরা পোর্টম্যাণ্টো। অভয়াশঙ্কর তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,—কি হে শ্রীনাথ, তুমি হঠাৎ কি মনে করে? আগে কোন খপর পাইনি ত।

প্রভুকে প্রণাম করিয়া শ্রীনাথ বলিল,—আজ্ঞে, ভারী জরুরি কাজ পড়ল, তাই খপর দেবার আর ফুরসুৎ হলোনা, একেবারে নিজেই এসে হাজির হলুম।

—ব্যাপার কি?

শ্রীনাথ তখন ব্যাপার খুলিয়া বলিল! সুনন্দার জমিদার দেবদুর্ল্লভ বাবুর আর্থিক অবস্থা একেবারে খারাপ হইয়া পড়ায় তাঁহার যে জমিদারী অভয়াশঙ্করের কাছে বন্ধক রহিয়াছে, দেবদুর্ল্লভ এখন সেই জমিদারী বিক্রয় করিতে চায়। অভয়াশঙ্কর যদি কিনিতে না চাহেন, তাহা হইলে ওধারকার মহেশ্বর উকিলের জমিদারীটা কিনিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহাকেই অগত্যা বেচিয়া ফেলিতে হয়। এ সম্বন্ধে চিঠি-লেখালেখিতে অনেকখানি সময় নষ্ট হইতে পারে বলিয়া দেবদুর্ল্লভ বাবু একেবারে শ্রীনাথকে কাগজ-পত্রসমেত শিমুলতলায় গিয়া বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিতে বলেন,—সেইজন্যই সে আসিয়াছে; খপর দিবার আর অবসর ছিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমাদের পাওনা হয়েছে কত টাকা? দেবদুর্ল্লভ কি দাম চায়?

শ্রীনাথ পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া একখানা মোটা খাতা বাহির করিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া সেটা দেখিয়া-শুনিয়া হিসাব পাড়িয়া বলিল,—দর-কষাকষি করিয়া ঘর হইতে আর দশহাজার টাকা বাহির করিয়া দিলেই জমিদারীটা হস্তগত হয়। আর—

অভয়াশঙ্কর একটু উৎফুল্ল ভাবে বলিলেন—আচ্ছা, এখন ও-সব রাখো, তুমি নেয়ে-খেয়ে নাও, তার পর দুপুরবেলা হিসেব-পত্তর দেখা যাবে'খন। তার দলিল-দস্তাবেজ ত দেখাই আছে, তবে ইতিমধ্যে আর কোন নতুন দায় জড়িয়েছে কি না, রেজেষ্ট্রী অফিসে একবার সার্চ্চ করিয়ে দেখো।

শ্রীনাথের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া নিখিল বাহিরে আসিতেই শ্রীনাথ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। নিখিল খুসী হইয়া বলিল,—কি করে এলে তুমি এখানে? এ্যাঁ—এখানেই থাকবে ত? বেশ হবে'খন।

শ্রীনাথ বলিল,—কৈ গো খোকাবাবু, তুমি মোটা হওনি ত! যেমন রোগা ছিলে, তেমনিই আছ যে।

অভয়াশঙ্কর কহিলেন,—যাও হে শ্রীনাথ, এখন তুমি নেয়ে-খেয়ে নাও গে—এখন আর আলাপ-আপ্যায়িতের সময় নেই। অনেক বেলা হয়ে গেছে—যাও, যাও।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি। বলিয়া নিখিলকে কোল হইতে সে নামাইয়া দিল।

অভয়াশঙ্কর তখন নিখিলকে বলিলেন,—নিখিল, যাও দেখি, একটা চাকরকে ডেকে দাও, বাক্সোটা তুলে রাখুক, আর শ্রীনাথকে নাইবার জায়গা-টায়গা দেখিয়ে দেবে। যাও।

নিখিল চলিয়া গেল। শ্রীনাথ গায়ের মোটা কাপড়টা কাছেই দেওয়ালের একটা হুকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া জামা খুলিতে লাগিল। অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—সুনন্দা গ্রামখানা নদীর ঠিক উপরেই, না?

—আজ্ঞে হাঁ, বাঘমতী নদীর উপরে।

—গ্রামটা ভালো? ম্যালেরিয়া নেই?

—না। ঐখানেই দেবদুর্ল্লভ বাবু বাস করেন যে। তিনি নানা শোকে জর্জ্জরিত হয়ে পড়েছেন, তায় বিস্তর দেনা—সব বিক্রী-সিক্রী করে কাশী গিয়ে বাস করবেন, বলছেন। আপনি যদি জমিদারীটা লেন্, তাহলে তাঁর মনে তেমন দুঃখ থাকে না!

—বটে—বলিয়া অভয়াশঙ্কর কি চিন্তা করিতে বসিলেন।

২৪

শ্রীনাথের আহারাদি শেষহইলে অভয়াশঙ্কর তাহার সঙ্গে আবার কাগজ-পত্র পাড়িয়া বসিলেন; প্রত্যেক দলিল, প্রত্যেক কাগজখানি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। বেলা পড়িয়া আসিল; ওদিকে নিয়ম-মত নিখিল সাজিয়া গুজিয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া পিতার ঘরের সম্মুখ দিয়া কতবার ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল, অভয়াশঙ্করের সেদিকে এতটুকু লক্ষ্যও নাই। অথচ সে পিতার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, এমন সাহসও তাহার ছিল না। সে দেখিল, কখনো শ্রীনাথ কাগজ পাতিয়া হিসাব লিখিতে বসে,—অভয়াশঙ্কর তাহা টানিয়া লইয়া দেখিয়া শুনিয়া কাট্‌কুট্ করিয়া নানা আলোচনা পাড়িয়া কতকগুলা অঙ্ক পাড়িয়া বসেন, এমনিভাবে দুইজনে সেই বাক্স-ভরা কাগজ-পত্রের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেলেন,—বাহিরের জগতের দিকে কাহারো এতটুকু হুঁস্ রহিল না।

নিখিল ঘুরিয়া-ফিরিয়া শেষে মার কাছে গেল। সুষমা বলিল,—বেড়াতে যাওনি যে নিখিল।

—না।

—কেন? উনি কোথায়?

—বাবা কি-সব কাগজ দেখচে।

—তুমি ওঁর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াওগে না, তাহলেই দেখতে পেয়ে যাবেন'খন।

—না মা, বাবা যদি বকে—!

সুষমা এ কথার কোন জবাব দিল না। নিখিল বলিল,—তুমি আজ চলো না মা,—তোমার সঙ্গে বেড়িয়ে আসি।

—আমি আর আজ বেড়াতে যাব না, নিখিল।

—কেন? নিখিলের স্বরে অনেকখানি কাতরতা ফুটিয়া উঠিল।

সুষমা একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—আমার শরীরটা আজো তেমন ভালো নেই, তা-ছাড়া—

—কি অসুখ করেছে মা তোমার?

—কোন অসুখ নয়! এমনি শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না!

—তবে তুমি গরম জামা গায়ে দাওনি কেন?

সুষমা সস্নেহে নিখিলের গাল টিপিয়া দিয়া কহিল,—বেড়াতে যাবনা বলেই গায়ে দিই নি, বাবা।

—বা রে, বেড়াতে গেলেই বুঝি গরম জামা গায়ে দিতে হয়! আমি তবে দুপুর-বেলায় গরম জামা গায়ে দিয়ে থাকি কেন! এই ত এখন আমিও বেড়াতে যাচ্ছি না, তবে আমি কেন গরম জামা গায়ে দিয়ে থাকব? দেবো না ত।

এই নিতান্ত সহজ আব্দারের সুরে সুষমার মন একেবারে গলিয়া গেল। সে ভাবিল, হায়রে, যতই ইহারা তোর আর আমার মধ্যে বড়-বড় ব্যবধান তুলিয়া দুইজনকে পৃথক করিতে চায়, ততই তুই কি এ স্নেহের পাকে পাকে নিবিড় করিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিস্, নিখিল! এই যে বাঁধন আর মুক্তি—ইহারই মধ্য দিয়া ফাঁকে-ফাঁকে জীবনটা এ কোন্ পথে ছুটিয়া চলিয়াছে! শেষটা ইহার কি দাঁড়াইবে—ইহা ভাবিয়া সুষমার চোখের কোলে ফোঁটা-দুই জল গড়াইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি হাত দিয়া চোখের কোণ মুছিয়া নিখিলকে কোলে টানিয়া সুষমা তাহার মুখচুম্বন করিল।

নিখিল বলিল,—তুমি বেড়াতে যাবে না ত মা? তোমার অসুখ করছে বল্‌চ, বেশ, তাহলে চল, তুমি ঘরে শোবে, চল, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব'খন।

—নারে পাগলা, আমার এমন অসুখ করেনি যে মাথায় হাত বুলোতে হবে। তুমি ঐ বাড়ীর বাইরে বাগানে বরং খেলা করে বেড়াও গে নিখিল।

—না মা, তার চেয়ে তুমি ঐ বাইরের চাতালে চল, সেখানে বসে গল্প বলবে, আমি শুনবো। অনেকদিন তোমার গল্প শুনিনি মা।

—চল—বলিয়া নিখিলকে লইয়া সুষমা চাতালে গিয়া বসিল। ওধারে অস্তগামী লোহিত সূর্য্য তার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় দিকে দিকে রক্তের ঢেউ তুলিয়া বড় পাহাড়টার আড়ালে গড়াইয়া পড়িল। আকাশে কুয়াশার ক্ষীণ স্তর ভেদ করিয়া চাঁদের আলো ফুটিল—জ্যোৎস্নায় চারিধার অমনি নিমেষে ঝলমল করিয়া উঠিল। সুষমা এক-মনে গল্প বলিতেছিল আর সুষমার কোলে মাথা রাখিয়া তাহারই মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া-চাহিয়া নিখিল সেই গল্প শুনিতেছিল। গল্পের পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়া রাজপুত্রের মতই সাত-সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া তাহার শিশু-চিত্ত সেই কোন্ তেপান্তর মাঠের পারে গহন বনে অত্যন্ত ত্রস্ত শঙ্কিত পায়ে এমন উধাও হইয়া চলিয়া ছিল যে ওদিকে যে রাত্রি বাড়িয়া উঠিতেছে, সেদিকে দুইজনের কাহারো খেয়াল ছিল না। গল্পে রাজপুত্র আসিয়া যখন ঠিক বনের সীমান্তে রাক্ষস-প্রহরী-রক্ষিত কঠিন পাষাণ-দুর্গের দ্বারে দাঁড়াইয়াছে—এই খানটা শুনিতে শুনিতে নিখিলের গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল, সে উঠিয়া সুষমার বুকের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া তাহার মুখের পানে অধীর ভীত আগ্রহে চাহিয়াছিল, এইবারে কি হয়—হঠাৎ এমন সময় অভয়াশঙ্করের স্বর যেন সেই রাক্ষস প্রহরীর বজ্র-স্বরের মতই গর্জ্জিয়া উঠিল,—এই ঠাণ্ডায় বসে ওখানে তোমাদের ও কি হচ্ছে গা?

সুষমা ও নিখিল দুইজনেই এক সঙ্গে চমকিয়া উঠিল। সুষমা চমকিয়া গল্প থামাইয়া চারিধারে চাহিয়া দেখিল। চমকিয়া থামিয়া গেল। এতক্ষণ তাহার

চৈতন্য ছিল না, তন্ময় হইয়া গল্প বলিতেছিল। খেয়াল হইতে সে দেখে, তাইত, রাত্রি যে অনেকখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে! এই হিমে—ছি, ছি, এ কি করিয়াছে সে? সে কি পাগল হইয়াছিল—!

ধড়মড়িয়া উঠিয়া নিখিলের হাত ধরিয়া উঠাইয়া সুষমা বলিল,—ওঠো নিখিল, রাত হয়ে গেছে। হিম লাগ্‌ছে।

নিখিল উঠিয়া ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখে, অদূরে দাঁড়াইয়া পিতা! তাহার পায়ে কে যেন প্রেক্ আঁটিয়া দিয়াছিল—সে চলিতে পারিতেছিল না। সুষমা বলিল,—এসো নিখিল।

দুইজনে উপরের দালানে আসিলে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হিমে এতক্ষণ কেন বসে ছিলে দু'জনে?

সুষমা কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—নিখিল বেড়াতে যেতে পেলে না, গল্প শুনতে চাইলে, তাই আমি গল্প বলছিলুম,—এত রাত হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এমন বেহুঁস! হিম লাগ্‌চে তা খেয়ালই নেই!

ঘরের মধ্যে ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল। সুষমা ঠোঁটের কোণে জোর করিয়া একটু হাসি ফুটাইয়া বলিল,—বেশী নয়, এই আটটা বাজছে,—তবু ভালো! তা ওর গায়ে গরম জামা আছে ত—

অভয়াশঙ্কর কহিলেন,—দোষ হয়েছে, তবু স্বীকার করবে না! তাঁহার স্বরে আবার তেমনি আগুনের হল্‌কা!

সুষমা ভাবিল, হায়রে, যতই সহজভাবে সে এই সব বিশ্রী ব্যাপারগুলাকে উড়াইয়া দিতে চায়, ততই কি সেগুলা এমনি চাপিয়া ধরিবে! সে ঘরের দিকে যাইতেছিল, অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—নিখিলের বেড়াতে যাওয়া হলো না কেন, শুনি?

নিখিল ভয়ে চোরের মত একধারে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সুষমা তাহার পানে চাহিয়া বলিল,—ও ঠিক সময়েই সেজে-গুজে তৈরী হয়ে তোমার কাছে গেছল, তুমি ব্যস্ত ছিলে, তাই তোমায় ডাকতে সাহস পায়নি।

—বেশ ত, আমি যেন ব্যস্ত ছিলুম, তুমি ত ঘরেই ছিলে, তোমার সঙ্গেও যেতে পারত ত।

সুষমার বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ বেদনা গুমরিয়া উঠিল,—বটে, তাহারই দোষ বটে। হুকুম দিবার সময় হুকুমটুকু ত বেশ দিয়াছিলে! মাথায় কখন্ কোন্ খেয়াল চাপিয়া বসিবে, সুষমা ত জ্যোতিষ পাড়িয়া তাহা জানিয়া রাখে নাই! তুমিই হুকুম দিবে, আবার সে হুকুম অমান্য করিবার স্পর্দ্ধা সে দেখায় নাই বলিয়া কৈফিয়ৎও সুষমাকেই দিতে হইবে! এ যে চমৎকার বিধান! আজ এখন তাই সে ভাবিল, চুপ করিয়া এ সব আঘাতই বা বিনাদোষে সে সহিয়া মরিবে কেন! এত বড় আঘাত! নিঃশব্দে যতই সে গ্রহণ করে, ততই যে আঘাতেরও আর অন্ত থাকে না! আজ সে জোর করিয়া মুখ ছুটাইল। সুষমা বলিল,—তুমি যে ওকে বারণ করে দেছ, আমার সঙ্গে যেতে। নিজে নিয়ে বেড়াতে যাবে, বলেছ—

বাধা দিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—ও, তাই! একটা কথা রাগের মাথায় বলেই না হয় ছিলুম—সেটাকে কি এমনি রাজার

অটল আদেশের মতই শিরোধার্য্য করতে হয়! কেন, তুমি কি আমার সঙ্গে তর্ক করে জোর করে ওকে নিয়ে যেতে পারতে না! আমি কি তাতে 'না' বল্‌তুম! তুমি যদি আজ ওকে নিয়ে বেড়াতে যেতে, আর ফিরে এলে যদি আমি তার কৈফিয়ৎ তলব বল্‌তুম, তাহলে তুমি তার জবাবে এ কথা ত অনায়াসে বলতে পারতে,—তুমি কাজে-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকো, নিখিলকে নিয়ে কখন বেড়াতে যাবে? আমি মা, আমার ছেলে তার মার সঙ্গেই বেড়াতে গেছল—তাহলে আমি যে কোনো জবাব খুঁজে পেতুম না। আর তোমায় এমনি দেখলে আমারো যে কি আনন্দ হত! বুঝতুম, যে আসনে তোমায় এনে বসিয়েছি, সে আসনের মর্য্যাদাও তুমি ঠিক বজায় রাখছ, সুষমা—!

পরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অভয়াশঙ্কর আবার বলিলেন,—আমারি অন্যায়, সে প্রত্যাশা করা! পর কখনো আপনার হয় না, সুষমা! ও যদি তোমার পেটের ছেলে হোত, তাহলে কি আর আমার সে-হুকুম শুনে তুমি এমন উদাসীন থাকতে পারতে? কখনো না! তুমি আমার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে ওকে নিয়ে যেতে!

কথাটা বলিয়া অভয়াশঙ্কর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সুষমা মাটীর মূর্ত্তির মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এ কি, এ! এই যে অনর্থক কথা-কাটাকাটি, এই যে মনটাকে খুলিয়া কেহই কাহারো হাতে দিতে পারে না—এ-সবের পরিণাম কি? দুইজনে কি তবে দুইজনকে এমনি ভুল বুঝিয়া ঠোক্কর খাইতে খাইতেই জীবনের বাকী পথটা চলিবে! জোর করিয়া নিখিলকে সে ছিনাইয়া লইবে! হায়রে এতখানি স্পর্দ্ধা সে আজ দেখাইতে যাইবে, কিসের ভরসায়! একদিন তবু এ ভরসা, এতখানি জোর ফলাইবার এক্তিয়ার আছে বলিয়া বিশ্বাস তাহার মনেও ছিল! সে কি বিশ্বাস! তুমি নিষ্ঠুর আঘাতে তাহা চূর্ণ করিয়াছ, আর সে বুঝাইয়া দিয়াছ, নিখিলের উপর তাহার কোন জোর চলিবে না! সে ঐ ছবির মত মাটীর গড়া মূর্ত্তির মত শুধু খেল-ঘরের মত সাজিয়া নিখিলকে ভুলাইয়া রাখিবে মাত্র এছাড়া তাহার আর কোন অধিকার নাই এ কথা বারবার কাঁটার চাবুক মারিয়া বুকে বিঁধিয়া দিয়াও আজ তুমিই আবার এ অনুযোগ কর! হায়রে, এমন বেদ আগুনে নিরুপায়ভাবে জ্বলিবার পুড়িবার জন্যই কি বিধাতা তাহার এ জন্মটা সৃষ্টি করিয়াছিলেন!

নিখিল আসিয়া ডাকিল—মা!

সুষমা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। নিখিল বলিল,—ঘরে চলনা মা। তোমার শীত লাগচে, তুমি যে কাঁপচো মা।

সুষমা সত্যই কাঁপিতেছিল,—শীতে না, কি এক অদ্ভুত ভাবে তাহাকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল। সুষমা বলিল,—চলো নিখিল।

ঘরে গিয়া সুষমা নিখিলকে বলিল,—তুমি যাও ত বাবা, ঠাকুরকে বল, এই ঘরে তোমার খাবার দিয়ে যাক্, তুমি বসে খাও। আমার বড় শীত করচে, আমি আর ওদিকে যেতে পারচি না!

—না মা, তোমায় যেতে হবে না—আমি ঠাকুরকে বলচি। বলিয়া নিখিল ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২৫

পাঁচ-সাত দিন পরে অভয়াশঙ্কর শ্রীনাথকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন। যাইবার সময় সুষমাকে বলিয়া গেলেন, সুনন্দার জমিদারীটা দেখিয়া শুনিয়া কিনিয়া ফিরিতে প্রায় দশ-বারো দিন লাগিতে পারে। নিখিলের সমস্ত ভার সুষমার উপরই তিনি দিয়া গেলেন; আর বলিলেন,—নূতন যে মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গেও নিখিল বেড়াইতে যাইতে পারে, তবে সুষমাও যেন ঘরের কোণে বসিয়া না থাকে, তাহারো বেড়ানো চাই। নহিলে শরীর সারিবে কেন?

অভয়াশঙ্কর চলিয়া গেলে নিখিলের মনে হইল, তাহার চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীর উপর হইতে কে যেন একটা মস্ত নিবিড় আবরণ টানিয়া লইয়াছে—চারিধারে এত আলো, এত হাসি অবাধ মুক্ত অজস্র ধারে ফুটিয়া উঠিল যে তাহার মনে হইল, এ যেন আর এক কোন্ নূতন রাজ্যে সে হঠাৎ আজ পদার্পণ করিয়াছে! জীবনের ধারাই যেন আগাগোড়া বদ্‌লাইয়া গিয়াছে! মুক্ত চঞ্চল মৃগ-শিশুর মতই নাচিয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া তাহার আশা যেন আর মিটিতে চায় না!

এমনি চঞ্চল আনন্দে মাতিয়া যখন সে বাহিরে একটা ফুল গাছের নীচে কতকগুলা কাঠি-কুটা কুড়াইয়া ছোট কুটীর বাঁধিয়া, তাহার নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে জল ভরিয়া পুষ্করিণী তৈয়ার করিয়া নৃত্য সুরু করিয়াছে, তখন সুষমা ডাকিল,—নিখিল।

নিখিল ছুটিয়া আসিয়া সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—কি মা? কেন মা? ডাক্‌চ কেন মা?

—কি করছিলে নিখিল, বাইরে? ধুলো ঘাঁট্‌ছিলে বুঝি! হ্যাঁ, এই যে গা-ময় ধুলো!

—হ্যাঁ মা, বকোনা মা। আমার এমনি ভালো লাগ্‌চে মা যে—কি আর বলবো! দেখবে এসো মা, কেমন পুকুর করেচি, পাহাড় করেচি—দেখবে এসো।

কথাটা বলিয়া সুষমাকে এক রকম টানিয়াই সে আপনার হাতে গড়া কেল্লা পাহাড় দেখাইতে চলিল।

নিখিলের এই আনন্দ দেখিয়া পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের কথা সুষমার বেশী করিয়া মনে পড়িল। হায়, এই বিকাশোন্মুখ শিশু-চিত্তটিকে কঠিন শাসনের পাষাণ-তলে ফেলিয়া কি-ভাবেই না চূর্ণ করা হইতেছে! আহা, বেচারা শিশু! আজ যদি নিখিলের নিজের মা বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে এই কঠিন শাসন কি কখনও সে সহ্য করিত? না! পৃথিবীর এই অবাধ মুক্ত আলো-হাসি ও আনন্দ-গানের অজস্রতার মধ্যে সম্পূর্ণ বাঁধন কাটিয়াই তাহাকে সে-মা যে ছাড়িয়া দিত। স্বামীর এই কঠিন তর্জ্জনী-আস্ফালন একটি ভ্রূ-ভঙ্গীতে সে কোথায় ছাঁটিয়া ফেলিত! সুষমা ত নিখিলের নিজের মা নয়, ভাড়া-করা মা—এই সহজ সত্য কথাটাই সে আজ স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে গেলে চারিধারে অমনি রুদ্র গর্জ্জন ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে,—খবর্দ্দার!

কিন্তু না,—সে ভাবিল, সেদিন রাত্রিকার সেই কথাটাকেই সে এবার হইতে শিরোধার্য্য করিয়া লইবে! ছেলের উপর জোর না

থাকুক, তবু জোর সে করিবে! সে ত দেখিয়াছে, অভিনয়ের সাজা রাজা রাজা না হইয়াও বেশ কঠিন স্বরেই আদেশ দেয় ত! সেও এবার হইতে জোর করিয়া নিখিলের ঐ কঠিন বাঁধনগুলাকে দুই হাতে কাটিয়া দিবে। চুপ করিয়া থাকিলেও কু-কথা যখন সহিতে হয়, অথচ ছেলের অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলও তাহাতে হয় না, তখন আর সে চুপ করিয়া থাকিবে না! কথা যদি সহিতে হয়, হউক, তবু ছেলেটাকে এই নির্য্যাতন হইতে কতক বাঁচাইতে পারিবে ত! তাহার মনটায় আলো ও হাওয়ার ঝলক্ লাগিবে তবু!

সুষমা নিখিলের বন্ধনের দড়িগুলা কাটিতে সুরু করিল। সেদিন বেড়াইতে গিয়া পথে নিখিল দেখিল, কতকগুলা সাঁওতালী ছেলে একটা গাছের ডালে দড়ির দোলা খাটাইয়া ভারী আনন্দে দোল খাইতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। সুষমা বলিল,—দাঁড়ালে যে নিখিল?

—বেশ মা—কেমন দোল খাচ্ছে, দেখ।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নিখিলকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের খেলা দেখিতে দেখিয়া সাঁওতালী ছেলের দল আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ধরিল, বলিল,—এসো গো রাজা বাবু,—দোল খাবি?

নিখিলের মনটা তাহাদের সঙ্গে দোলায় দোল খাইবার জন্য লাফাইতে ছিল। কিন্তু বাপের যে-শাসনে সে এত বড় হইয়াছে, তাহাতে মন ছুটিলেও উপায় ছিল না। তবু আজ সেই বাপ কাছে নাই বলিয়া নিখিল দুই চোখে কাতর মিনতি ভরিয়া মার পানে চাহিল; মুখে কোন কথা বলিল না। সুষমা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিল,—দোল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে, না নিখিল?

—একটু দোল খাব মা? ওরা বলচে—

—যাও, ইচ্ছে হয় ত একটু দুলে এসো গে—

নিখিল সানন্দে গিয়া দোলায় বসিল—দুইটা সাঁওতালী ছেলে তাহার দুইপাশে বসিয়া সতর্ক রহিল, রাজাবাবু না পড়িয়া যায়,—আর দুই জনে দুই দিক হইতে দোলায় দোল দিতে লাগিল।

বহুক্ষণ দোলায় দুলিয়া নিখিল বাড়ী ফিরিবার সময় মাকে বলিল,—মা, আমাদের বাড়ীতে একটা দোলনা করে দিয়ো মা—তুমি দোল দেবে, আর আমি দুল্‌বো।

সুষমা বলিল,—আচ্ছা, উনি ফিরে আসুন—বলে দোলা খাটিয়ে দেব'খন।

ইহার পর ঐখানেই দুই বেলা বেড়াইতে যাইবার জন্য নিখিলের মন এমনি ঝুঁকিয়া উঠিল যে সুষমা কিছুতেই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। দুইবেলা সাঁওতালীদের সঙ্গে দোলায় দুলিয়া তাহাদের সহিত নিখিলের এমনি অন্তরঙ্গতা জন্মিয়া গেল যে একদিন দুপুরবেলা দুই-তিনটা সাঁওতালী ছেলে তাহাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নিখিল অত্যন্ত সঙ্কোচে ভয়ে-ভয়ে তাহাদের লইয়া ফটকের ধারে কাঠি-কুটা দিয়া যে পাহাড় গড়িয়া ছিল, দেখাইল; পরে সকলে মিলিয়া সেই পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছের ডাল পুঁতিয়া মাথার উপর নুড়ি পাথর সাজাইয়া প্রকাণ্ড কেল্লা তৈয়ার করিল। সাঁওতালী ছেলেরা ক্রমে প্রত্যহ দুপুরবেলা এমনি ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল যে

সুষমা প্রমাদ গণিল। স্বামীর ফিরিবার সময় হইয়া আসিল, তিনি আসিয়া যদি ইহাদের দেখেন—তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিবেন! তাঁহার ছেলে এই-সব বর্ব্বর ছোট লোক ছেলে-গুলার খেলার সাথী! অথচ কি বলিয়াই বা তাহাদের এ আনন্দে বাধা দেয়! আহা, গরিবের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়া উহারা এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, উহাদের সঙ্গ নীচে পশুর মত বর্জ্জন করিতে হইবে! সেই যেদিন তাহারা অমন আগ্রহে অতখানি স্নেহে-সম্ভ্রমে নিখিলকে দোলায় উঠাইতে চাহিয়াছিল,—সেদিন তাহারা যে কতখানি সরল উদার মনের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা শুধু সেই জানে!

সেদিন খেলা খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। কয়দিনের চেষ্টায় পাহাড় প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার তলা দিয়া সুড়ঙ্গ চলিয়া গিয়াছে, পাহাড়ের মাথার উপর বিচিত্র বর্ণের তক্‌তকে নুড়ি ও পাথর-কুচিতে কেল্লাটিও জম্‌কালো দেখিতে হইয়াছে, আর পাহাড়ের নীচে দিয়া তারের রেল-লাইন চলিয়া গিয়াছে। সাঁওতালীদের লখু কাঠ কাটিয়া গাড়ী তৈয়ার করিবার ভার লইয়াছিল। আজ সেই গাড়ী চলিবে। এজন্য আজ একটু ধূমধামেরও আয়োজন হইয়াছে—ছেলেরা রাজাবাবুর কাছে পুরী খাইতে চাহিয়াছে—পুরী খাইয়া গাড়ী চালাইবে। সুষমা ভিতরের রান্নাঘরে নিজে বসিয়া লুচি ভাজিতেছিল,—আর ছেলের দল বাহিরে কাঠের গাড়ীতে চাকা পরানো দেখিতেছিল, এমন সময় নির্ম্মল মুক্ত আকাশের কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। নিখিল সহসা সভয়ে চাহিয়া দেখে, ফটকের অদূরে অভয়াশঙ্কর কুলি-সঙ্গে বাড়ী আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে এমন ভয় পাইল যে সে যে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলের দল ওদিকে গাড়ীতে চাকা পরাইয়া মহা-কলরব জুড়িয়া দিল, আর ঠিক সেই সময় অভয়াশঙ্কর বাড়ীর ফটকের মধ্যে পা দিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত পরে রাগে জ্বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—এ কি এ! কারা এরা? কি হচ্ছে সব? তারপর নিখিলকে ঐ সংসর্গে দেখিয়া তাহার কাণ ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিলেন, কহিলেন,—বা, ক'দিনে বেশ চমৎকার উন্নতি হয়েচে, দেখচি যে! শূয়ার, বাড়ী চল্! তারপর সাঁওতালী ছেলেরা ব্যাপার বুঝিবার পূর্ব্বেই অভয়াশঙ্কর তাহাদের পানে চাহিয়া গর্জ্জন করিলেন—নিকালো!

ছেলের দল এই অতর্কিত আঘাতে ভীত হইয়া বাড়ীর বাহিরে পলাইয়া গেল—পলাইয়া দূরে গেল না, বাহির হইতে তাহাদের রাজা-বাবুর দুর্দ্দশা দেখিয়া বিস্ময়ে বেদনায় অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অভয়াশঙ্কর ঘরে আসিয়া বজ্র-হুঙ্কারে ডাকিলেন,—নিখিল।

নিখিল কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিলে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—ওরা তোমার বন্ধু, বুঝি! যাও, ওধারে গিয়ে ওদের বলে এসো, আর এ-বাড়ীতে কখনো যেন ওরা না ঢোকে!

আহা, বেচারারা! উহাদের কি অপরাধ যে এমনি লাঞ্ছিত করিয়া গৃহ হইতে উহাদের সে তাড়াইয়া দিবে! নিখিল ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অভয়াশঙ্করের কথা শুনিয়া সুষমা ছুটিয়া আসিল—আসিয়া ব্যাপার বুঝিল। কাতর স্বরে সুষমা বলিল—ওগো থাক্। আহা, ওরা লুচি খেতে চেয়েছে, কখনো খেতে পায়না ত—। আশা করে এসেছে, গরিব-দুঃখী, তায় ছেলেমানুষ—ওরা খেয়ে নিক্। তার পর আমিই ওদের বলে দেব, আর কখনো আসবে না এখানে।

সুষমাকে কোন জবাব দিয়া, তাহার প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়াই অভয়াশঙ্কর মুখ-হাত ধুইবার জন্য বাথরুমে চলিয়া গেলেন। সুষমা ছেলেদের ডাকিয়া লুচি তরকারী দিয়া ও মিষ্ট কথায় তাহাদের ভুলাইয়া বিদায় দিল; পরে অভয়াশঙ্করের আহার শেষ হইলে নিখিলকে রান্নাঘরের মধ্যে ডাকিয়া সে যখন বলিল—তোমাদের বন-ভোজনের লুচি ওরা খেয়েছে, তুমি এবার খাও বাবা,—তখন নিখিলের রুদ্ধ অভিমান সব বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিপুল ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল,—ও লুচি আমি খাব না মা, কখনো খাবনা!

সুষমা বলিল,—ছি বাবা, উনি শুনলে আবার বক্‌বেন! খাও—

—বকুক্, বাবা বকুক, আমায় তাড়িয়ে দিক্ বাড়ী থেকে—আমি চলে যাচ্ছি। আমি ঐ ছেলেদের বাড়ী গিয়ে ওদের সঙ্গে থাক্‌বো—আমি থাকতে চাই না এখানে—এখানে থাকতে চাই না আর—

—আচ্ছা পাগল ছেলে ত! বলিয়া সুষমা নিখিলকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নেহের ভাঁণ্ডার মুক্ত করিয়া দিল।

সন্ধ্যার দিকে নিখিল একটু ঠাণ্ডা হইয়া সুষমার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেছিল, অভয়াশঙ্কর আসিয়া কহিলেন,—দোহাই তোমাদের,—আমার যেগুলো ভালো লাগে না, সেগুলো আর করো না। ছোট লোকদের সঙ্গে মেলা-মেশা আমি মোটে পছন্দ করি না। স্বামী বলে আমার যদি একটুও মানো সুষমা, তাহলে, দোহাই তোমার, ছেলেটাকে ওদিকে আর প্রশ্রয় দিয়ো না।—আর ক'টা দিন—শীঘ্রই বাড়ী ফিরচি, তার পর স্থির করেচি, সুনন্দায় গিয়ে থাকবো। বাড়ী-ঘর মেরামত করারর বন্দোবস্ত করে এসেচি। ছেলে থাকবে মাষ্টারের জিম্মায়—ও-সব নাকি কান্না আর মায়া-মমতার মধ্যে ছেলে মানুষ করলে ছেলের চোখের পাতা চির-কাল ভিজেই থাকবে,—জল আর কোনকালে শুকোবে না! যতদিন সুনন্দায় না যাই, ততদিন দয়া করে আমার এই ইচ্ছাটার উপর একটু শ্রদ্ধা রেখে নিখিলের হেফাজতী করো, তাহলেই আমি কৃত-কৃতার্থ হব। বুঝলে?

কথাটা বিদ্যুতের মত একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া বিদ্যুতেরমতই অভয়াশঙ্কর বাহির হইয়া গেলেন। সুষমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে মনে সে বলিল, এক ত এই গোয়েন্দার মত খপর না দিয়া আসা—তারপর এই সব কথার জবাব লইবার এতটুকুও অবসর হইল না —!

নিখিল বলিল—বেড়াতে চলো না, মা—

—না বাবা, তুমি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে যাও আজ।

—এই ত, তুমি যাচ্ছিলে মা—

—না বাবা, দুষ্টুমি করোনা। যাও, আজ মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে যাও—কাল থেকে আমার সঙ্গে যেয়ো।

নিখিল বলিল,—তাহলে আমিও যাব না, মা—।

—যাও নিখিল, নাহলে উনি বকবেন।

—বকুন্ গে। আমি বুঝেচি মা,—বাবা বকলে বলে তুমি যাবেনা বল্‌চ, না?

—না রে, না।

—আমি জানি মা, সব জানি। বাবা যা বলে, আমি তা বুঝতে পারি—। আমি ত—কিছুক্ষণ সুষমার মুখের পানে চাহিয়া নিখিল বলিল,—হ্যাঁ মা, সত্যিই তুমি আমার মা নও?

সুষমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ এ কি কথা! সে পড়িয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি একটা আশ্রয় পাইবার জন্য নিখিলকেই প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও কথা বলিস্ নে, বলিস্ নে তুই নিখিল, আমি তাহলে পাগল হয়ে যাব, মরে যাব, বুঝলি!

সুষমার মুখে কাতর কম্পিত স্বর শুনিয়া নিখিল ভয় পাইল, সেও তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—না মা, তুমি মরে যেয়োনা মা, আর আমি ও-কথা বলব না। নিখিলের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

—আর কখনো বলিস্ নে—মনেও ওকথা আনিস্ নে, নিখিল—লোকে কখনো যদি অমন বিশ্রী কথা বলে ত তুই তা কাণেও তুলিস্ নে। তুই ও কথা মনে আনলে কি হবে—জানিস্?

অত্যন্ত সভয় দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া নিখিল বলিল,—কি হবে, মা?

নিখিলকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধস্বরে সুষমা বলিল,—তোর মা তাহলে মরে যাবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্রোতের মুখে

দেখ্‌রে ওই রাঙা রবি ডুবছে পূবে
পুরবীর সুরভি ওই যায় যে উবে।
সুদূরে তরুর শিরে
আলো যে নিভলো ধীরে
আজিকার ইঙ্গিতে তুই চল্‌বি রে বল্ সঙ্গী বিনে
আঁট্ দিতে আর ঘাট পাবিনে।

পিছনে রইলো যারা রইলো ঘরে,
ব্যথাতে ব্যাকুল এ বুক আকুল্ করে।
আগেতে যায় রে যারা
মেলে না তাদের সাড়া,
কালের এ বেলার বুকে রয়না কারো চরণ চিনে
আঁট্ দিতে আর ঘাট পাবিনে।

সুমুখে গহন রাতি আলোক-হীনা
জানিনে চন্দ্র-তারা উঠ্‌বে কি না?
তবু যে হবেই যেতে
উতরোল উৎসবেতে,
বিপুল ত তুফান্-স্রোতে ভাস্‌তে হবে রাত্রি-দিনে
আঁট্ দিতে আর ঘাট পাবিনে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সমালোচনা

বঙ্কিমচন্দ্র। জীবন, যুগ ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আলোচনা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন এম, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য লেখা নাই। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী-সম্বন্ধে যে দুই-একখানি গ্রন্থ আমাদের চোখে পড়িয়াছে, সেগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পাশ দিয়া সেই সব জীবনী-গ্রন্থের লেখকেরা নিজেদের খাড়া করিয়া তুলিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন; তাহার ফলে গ্রন্থে আনুসঙ্গিক নানা দোষ ঢুকিয়া সে সবগুলিকে প্রায় অপাঠ্য করিয়াই তুলিয়াছে। এ গ্রন্থের প্রধান বিশেষত্ব, লেখক ইহার সাহায্যে বঙ্কিমকে পাঠকের সম্মুখে দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। দ্বিতীয় গুণ, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে বাঙলা দেশের সমাজ ও সাহিত্য কিরূপ ছিল, তাহার একটা আদ্‌রা ছবি লেখক বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন;—ইহার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্য নির্দ্ধারণ করা পাঠকের পক্ষে বেশ সহজ হয়। তাহার উপর লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলির যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা মুরুব্বিয়ানার বোল-চালে ভারাক্রান্ত হয় নাই; লেখক বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনায় গ্রন্থ-সমূহের সৌন্দর্য্য বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন—Literary criticism এর ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রচনাটিতে শৃঙ্খলা ও সংযম বেশ মিশ্‌ খাইয়াছে এবং তাহার ফলে গ্রন্থখানি সুপাঠ্য ত হইয়াছেই; তা'ছাড়া বাঙ্‌লা-জীবনী বিভাগে এ গ্রন্থখানি বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্যতার যথেষ্ট দাবী করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

চিড়িয়াখানা। প্রথম ভাগ (পশু) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক, ইউ, রায় এণ্ড সন্স, ১০০, গড়পার রোড, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত। ইউ. রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এই গ্রন্থখানি বালক-বালিকাদের জন্য লিখিত। ইহাতে বানর, বনমানুষ, গিবন, হনুমান, মর্কট, মোনা ও ডায়না বানর, বেবুন, মাকড়সা, লজ্জাবতী বানর এবং মাংসাশী পশু—বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, হরিণ, ও ভাল্লুক; খুরী জন্তু,—মৃগ, কালসার কুরঙ্গ, নীলগাই, হরিণ, লাল হরিণ, সম্বর, চিতাহরিণ, কাকার, পাতিহরিণ, জিরাফ, উট, জলহস্তী, টেপির, গণ্ডার, জেব্রা, হাতী ও কাঙ্গারু এই জন্তুগুলির পরিচয় বেশ সহজ ভাষায়, সরল ভঙ্গীতে অতি মনোজ্ঞভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থে প্রত্যেক জন্তুর ছবি দেওয়া হইয়াছে। বহিখানির ছাপা কাগজ ছবি—সমস্তই বেশ সুন্দর। বহিখানির ভিতর বাহির পরিপাটী, মনোজ্ঞ—বালক-বালিকারা হাতে এ বহির যথেষ্ট সমাদর হইবে; হইয়াছেও—তাহা এ গ্রন্থের দুইটী সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় প্রমাণিত হইতেছে। যে যে গৃহে ছেলে-মেয়ে আছে সেই সেই গৃহেই এ গ্রন্থ বিরাজ করুক। আনন্দের সহিত ছেলে-মেয়েরা ইহা পাঠে জ্ঞানও লাভ করিবে প্রচুর।

স্বর্গীয়া রাজকুমারী দেবী। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে প্রণীত। কলিকাতা ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, দেবালয় কার্য্যালয় হইতে লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। এই মহিলা দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী। এই বঙ্গমহিলার জীবন-কাহিনী বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। লেখক তাঁহার নানা গুণের কথাও সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র জীবনী-গ্রন্থখানি বঙ্গীয় মহিলাগণের বিশেষ করিয়া পড়িয়া দেখা উচিত।

ঈশ্বরের আদেশ। পত্রিকামালা, পত্রিকা নং ১ ও ২। দি হরনাথ সোসাইটি বোম্বাই। কলিকাতা, মার্কাণ্টাইল প্রেসে মুদ্রিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা দুটীতে শ্রীহরনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী হইতে কয়েকটি ভগবৎ-বাণী সংগৃহীত ও হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

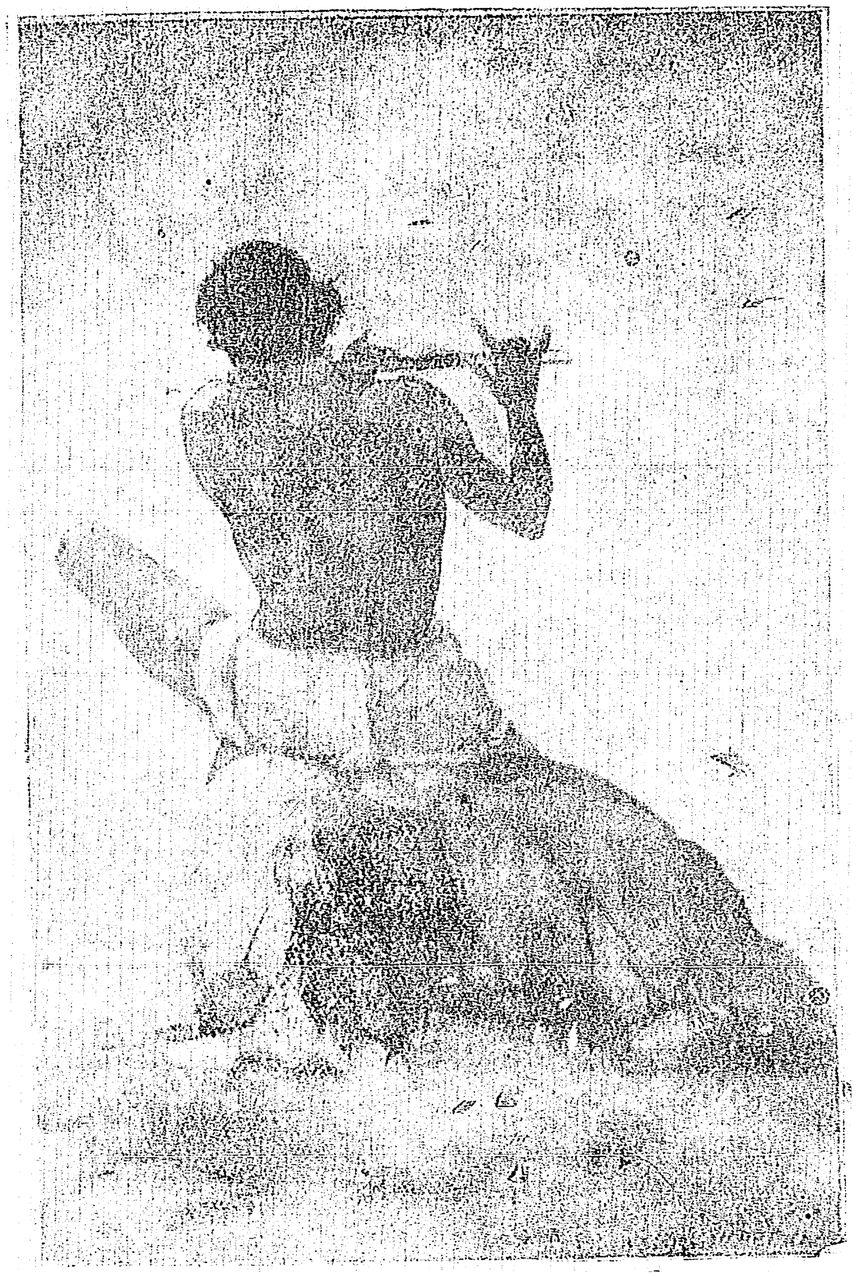

অলস দুপুরে

শ্রীরাসবিহারী রায় অঙ্কিত

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২৮ [নবম সংখ্যা

মিলিতোনা

৬

তাহার পরদিনও আন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তাহার সকল বন্ধুর বাড়ীতেই খোঁজ লওয়া হইয়াছিল, দুই দিন হইতে তাহাকে কেহ দেখে নাই।

ইহা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আন্দ্রে হঠাৎ হয়ত কোন জরুরী কার্য্য উপলক্ষে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, এইরূপ কেহ কেহ অনুমান করিলেন। ডন-জেরোনিমো তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা উত্তর করিল,—তাহাদের মনিব দুইদিন পূর্ব্বে সন্ধ্যা ৭টার সময় নিত্যানুসারে আহারাদি করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন। যাইবার জন্য কোন উদ্যোগ-আয়োজন করেন নাই এবং এমন-কোন কথাও বলেন নাই যাহাতে তিনি যাইতেছেন বলিয়া তাহাদের কোন সন্দেহ হইতে পারে। 'প্রাদোতে" বেড়াইতে যাইবার মত, একটা কালো কোর্ত্তা, একটা হলদে রং-এর ফতুয়া আর একটা সাদা পেণ্টুলন পরিয়াছিলেন।

ডন-জেরোনিমো ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আন্দ্রের কামরাটা একবার খোঁজ করিতে বলিলেন, যদি কামরায় কোন আস্‌বাবের উপর প্রস্থানের কারণ বলিয়া কোন পত্র রাখিয়া গিয়া থাকে।

কিন্তু খোঁজ করিয়া দেখা গেল, সিগারেটের কাগজ ছাড়া তার কামরায় আর কোন কাগজ ছিল না।

এই দুর্ব্বোধ্য অন্তর্ধানের আর কি-কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে?

আত্মহত্যা?

তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। কেন না, আন্দ্রের প্রেম-ঘটিত কোন কষ্ট ছিল না, ধনেরও কষ্ট ছিল না; যাহাকে সে ভালবাসে

তাহারই সহিত আন্দ্রের শীঘ্র বিবাহ হইবার কথা ; আর তাহার বাৎসরিক নিশ্চিত আয় একলক্ষ টাকার কম নহে। তবে কি, কোন শত্রু ওৎ পাতিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে ?

কিন্তু আন্দ্রের ত কোন শত্রু নাই ; অন্তত আন্দ্রে জানে না যে তাহার কোন শত্রু আছে। তাহার যেরূপ শান্তমধুর স্বভাব, তাহার যেরূপ সংযত-ব্যবহার, তাহাতে কাহারও সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আর সত্যই যদি কাহারও সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটিত, তাহা হইলে, মৃতই হউক, জীবিতই হউক তাহাকে নিশ্চয়ই তাহার বাড়ীতে আনা হইত।

অতএব ইহার ভিতর একটা কিছু রহস্য আছে—যাহার উদ্‌ভেদ একমাত্র পুলিসের লোকেরাই করিতে পারে।

সরল-অন্তঃকরণ ভালমানুষের মতন, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পুলিস সর্ব্বশক্তিমান ও অভ্রান্ত। তিনি পুলিসেরই শরণাপন্ন হইলেন।

পুলিসের কর্ত্তা, নাকে চষমা লাগাইয়া রেজিষ্টারি-বই দেখিতে লাগিলেন ; তাহাতে কিছুই পাইলেন না। যেদিন আন্দ্রে অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই তারিখের কোন রিপোর্টই তিনি পান নাই। সেই তারিখের রাত্রিটা খুবই শান্ত ছিল, কেবল কতকগুলা সিঁধ-চুরী, প্রাচীর-টক্‌কানো চুরী, কতকগুলা খারাপ জায়গায় গোলমাল, সুঁড়ীখানায় মাতালের ঝগ্‌ড়া-ঝাঁটি—ইহা ছাড়া মাদ্রিদ্ শহরে সে রাত্রিটা খুবই ভাল ছিল।

রেজিষ্টারি-বই বন্ধ করিবার পূর্ব্বে, গম্ভীর মেজিষ্ট্রেট বলিলেন, "কেবল একজায়গায় খুন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র ; ব্যাপারটা তেমন কিছুই গুরুতর নহে।"

জেরোনিমো ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"আপনি ঐ ব্যাপারটার সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে পারেন কি ?"

পুলিস মেজিষ্ট্রেট গভীর চিন্তার ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় তিনি কিরূপ পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন ?"

জেরোমিনো খুব উদ্বিগ্ন হইয়া উত্তর করিলেন ;—"একটা কালো কোর্ত্তা"।

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন ;—

"আপনি কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন, কোর্ত্তাটার রং কালো ছিল ? কাফ্রি-মুখের রং, সবুজ-তাঁবাটে রং, গেরুয়া রং, বাদামী রং ছিল না, এ-কথা কি আপনি ঠিক করে বল্‌তে পারেন ? রংটা ঘোর, কি ফিঁকে এ সমস্ত জানা খুবই দরকার।"

"আমি নিশ্চয় করে বল্‌ছি। কোর্ত্তার রং কালো ছিল। দেবতা সাক্ষী করে বল্‌ছি, ধর্ম্ম সাক্ষী করে বল্‌ছি, আমার ভাবী জামাতা কালো রং-এর কোর্ত্তাই পরেছিলেন। আমার কন্যা ফেলিসিয়ানা বলেন, ঐ রংটাই সম্ভ্রম-সূচক।"

ম্যাজিষ্ট্রেট অবান্তর প্রসঙ্গের হিসাবে বলিলেন, "আপনি যেরূপ উত্তর দিচ্চেন তাতে মনে হয় আপনি খুব ভাল রকম শিক্ষা পেয়েছিলেন। আচ্ছা, তাহলে আপনার দৃঢ়-বিশ্বাস, কোর্ত্তাটা কালো রং-এরই ছিল ?"

—"আজ্ঞে হাঁ, কালো রং-এরই ছিল।"

—"যাকে খুন্ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তার গায়ে তামাটে রং-এর একটা হাত-কাটা

মেরজাই ছিল।" মেজিষ্ট্রেট মনে মনে ভাবিলেন, রাত্রে একটা শাম্‌লা রং-এর মেরজাই, কালো রং-এর কোর্ত্তা বলে' ভুল হতেও পারে। "দেখুন, সে রাত্রে ডন্-আন্দ্রে কি-রকম হাত-কাটা জামা পরেছিলেন, সেটা পর্য্যন্ত কি আপনার স্মরণ হয় ?

"হল্‌দে রং-এর জামা।"

—"আহত ব্যক্তির গায়ে নীল রং-এর জামা ছিল ; হল্‌দে ও নীলের মধ্যে একটা নৈকট্য সম্বন্ধ আছে বলে ত মনে হয় না। ঐ দুই রং-এর মধ্যে মিল খুবই কম। আচ্ছা মহাশয়, তাঁর পেণ্ট্‌লনটা কি রকম ছিল ?"

—"সাদা পেণ্ট্‌লন। বুট্ জুতা পর্য্যন্ত নামিয়ে "ফিট্" করে তৈরী করা। আমি এ সমস্ত খুঁটিনাটি আন্দ্রের চাকরের কাছে শুনেছি।"

—"পুলিসের রিপোর্টে দেখা যায়, ধূসর রং-এর কাপড়ের চোওরা পেণ্টলুন ; বাছুরের চাম্‌ড়ার সাদা জুতো। আপনি যা বল্‌ছেন তা তো নয়। নৈশ-প্রহরী তার চেহারার যে বর্ণনা করেছে, তা এই ;—ডিম্বাকার মুখ, গোলাকার থুৎনি, সচরাচর-ধরণের কপাল, মাঝামাঝি আকারের নাক, কোন বিশেষ রকমের চিহ্ন নাই। এই বর্ণনা থেকে কি তাঁকে চিন্‌তে পারচেন ?"

ডন্-জেরোনিমো দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উত্তর করিলেন,—"একটুও না……কিন্তু কি করে' তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় ?"

—"তার জন্য চিন্তা নাই ; নগরবাসীদের উপর পুলিসের বেশ নজর আছে ; পুলিস সব দেখ্‌তে পায়, পুলিস সব শুন্‌তে পায় ; পুলিসের গতি সর্ব্বত্রই ; পুলিসের দৃষ্টি হতে কিছুই এড়াবার জো নেই ; ইন্দ্রের মতো পুলিসের সহস্র চক্ষু ; বাঁশি বাজিয়ে পুলিস্‌কে ঘুম পাড়ানো যায় না। অতল রসাতলের মধ্যে থাক্‌লেও আমরা আন্দ্রেকে আবার টেনে বের করব। দুই গোয়েন্দাকে আমি তার পিছনে লাগাচ্চি ; একজনের নাম আর্গম্‌শিল্লা ; আর একজনের নাম কোবাকুয়েল্লা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এর একটা কিনারা করবই।"

ডন্-জেরোনিমো ধন্যবাদ-সহ নমস্কার করিয়া খুব দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বাহির হইলেন। গৃহে ফিরিয়া, পুলিসের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সমস্ত তাঁহার কন্যাকে বলিলেন। শিল্পজীবী শ্রেণীর লোকের পোষাক-পরা আহত ব্যক্তি ফেলিসিয়ানার ভাবী পতি বলিয়া ফেলিসিয়ার এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে হইল না।

সদ্‌বংশজাত মহিলা-সুলভ সংযমের সহিত ফেলিসিয়ানা তাঁহা ভাবী পতির জন্য, "নব্যের" জন্য, একটু অশ্রুপাত করিলেন ; কেন না, নবযুবতীর পক্ষে কোন পুরুষমানুষের জন্য বেশী কান্নাকাটি করা অশিষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহার নেত্র-পল্লবের কোণে যে একটি অশ্রুবিন্দু অতি-কষ্টে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার 'লেসের'-পাড়-বিশিষ্ট রুমাল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন। "যুগলবন্ধ" গান সঙ্গীহীন হইয়া পড়িয়া আছে—পিয়ানো বন্ধ। ফেলিসিয়ানার নৈতিক অবসাদের ইহাই নিদর্শন। ২৪ ঘণ্টা কখন অতিবাহিত হইবে, কখন গোয়েন্দাদ্বয়ের সফল অনুসন্ধানের রিপোর্ট আসিবে তজ্জন্য ডন-জেরোনিমো অধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ঐ দুই চতুর গোয়েন্দা প্রথমে আন্দ্রের গৃহে গিয়া, আন্দ্রের অভ্যাসাদির কথা খুব নিপুণতার সহিত, আন্দ্রের ভৃত্যদের মুখ হইতে বাহির করিল। গোয়েন্দাদ্বয় অবগত হইল,—আন্দ্রে সকালে চকোলেট্ খায়, দুপুরবেলায় একটু নিদ্রা যায়, তিনটার সময় কাপড়-চোপড় পরিয়া ডনা-ফেলিসিয়ানার বাড়ী যায়, সেইখানে ৬টার সময় 'ডিনার' খায়, তারপর, বেড়াইয়া আসিয়া কিংবা থিয়েটার দেখিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে বাড়ী আসিয়া শয়ন করে। এই সব বিবরণ অবগত হইয়া গোয়েন্দদ্বয় অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইল। উহারা আরও জানিতে পারিল যে, আন্দ্রে "আলকালাব" রাস্তা ধরিয়া, "পেলিগ্রো" পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

গোয়েন্দাদ্বয় "পেলিগ্রোর" রাস্তায় গিয়া জানিতে পারিল, আন্দ্রে দুইদিন পূর্ব্বে, ৬টা কয়েক মিনিটের সময় ঐ রাস্তা দিয়া গিয়াছিল; খুব সম্ভব আন্দ্রে তাহার পর ডেলক্রুজ-রাস্তা দিয়া চলিয়াছে।

অনুসন্ধানের ফলে একটা খুব দরকারী কথা জানিতে পারিয়া এবং শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া উহারা একটা "আশ্রমে" ঢুকিল—মাদ্রিদ্ নগরে শুঁড়ীর দোকান আশ্রম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, এক বোতল সুরাপান করিতে করিতে উহারা তাস খেলিতে লাগিল।

তাসখেলা প্রভাত পর্য্যন্ত চলিল!

একটু ঘুমাইয়া লইয়া, উহারা আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল; এবং আন্দ্রে "রাষ্ট্রো" পর্য্যন্ত গিয়াছিল—এ সন্ধানও উহারা পাইল। তার পর আবার খেই হারাইল! কালো কোর্ত্তা, হল্‌দে ফতুয়া, সাদা পেণ্টুলন-পরা কোন এক যুবকের আর কোন খবর কেহই দিতে পারিল না। একেবারে সম্পূর্ণ অন্তর্ধান! সকলেই তাকে যাইতে দেখিয়াছে, কেহই তাহাকে ফিরিতে দেখে নাই···উহারা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

পূর্ণ দিবালোকে, মাদ্রিদ্ শহরের একটা লোকাকীর্ণ অঞ্চলে, তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, ইহাও সম্ভব নহে। তবে যদি তার চলিবার পথে পায়ের নীচে একটা খোলা ফাঁদ পাতা থাকে, আর তাহাতে পড়িবামাত্র সেই ফাঁদ বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে,—ইহা ভিন্ন তাহার অন্তর্ধানের আর কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না!

গোয়েন্দাদ্বয় "রাষ্ট্রোর" চারিদিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘোরা-ফেরা করিল; কতকগুলি দোকানদারকে প্রশ্ন করিল; কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে আর কোন কথা বাহির করিতে পারিল না। এমন-কি, যেখানে আন্দ্রে পোষাক বদলাইয়াছিল, সেই দোকানেও উহারা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন দোকানদার ছিল না, দোকানদারের পত্নী ছিল। দোকানদারই আন্দ্রেকে পোষাক বিক্রয় করে। সুতরাং দোকানদার-পত্নী কোনও খবরই দিতে পারিল না। এমন-কি উহাদের বদ্ চেহারা দেখিয়া উহাদিগকে সে দস্যু ঠাওরাইয়াছিল। কোন জিনিস ইতিমধ্যে হারাইয়াছে কি না, চারিদিকে একবার নজর করিয়া দেখিয়া চটা-মেজাজে উহাদের মুখের সাম্‌নেই ধয়াস্ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সমস্ত দিনের অনুসন্ধানের ফল এই ত হইল। ডন-জেরোনিমো আবার পুলিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলিস গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, অপরাধীদিগের খোঁজ করা যাইতেছে, বেশী ত্বরা করিলে সব কাজ নষ্ট হইবে।

ভালমানুষটি বিস্মিত হইয়া, গৃহে ফিরিয়া গিয়া, পুলিস যাহা উত্তর দিয়াছিল, ফেলিসিয়ানাকে বলিলেন। ফেলিসিয়ানা আকাশের দিকে চোখ্ তুলিল এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া শুধু এই কথা বলিয়া উঠিল;—"বেচারী আন্দ্রে!"

একটা অদ্ভুত কাণ্ড, এই দুর্ব্বোধ ব্যাপারটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিল। ১৪ বৎসর বয়স্ক একটা অদ্ভুত ছোক্‌রা আন্দ্রের গৃহে আসিয়া একটা বড় বোচ্‌কা রাখিয়া যায় এবং এই কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়;—"আন্দ্রে-মহাশয়ের জন্য"।

কথাটা ত সাদসিধা, কিন্তু যখন বোচ্‌কাটা খুলিয়া দেখা হইল, তখন গোয়েন্দাদিগের নিকট একটা নিষ্ঠুর পরিহাস বলিয়া মনে হইল।

বোচ্‌কাটার ভিতর কি ছিল অনুমান কর দেখি! উহার ভিতর ছিল আন্দ্রের একটা কালো কোর্ত্তা, একটা হল্‌দে ফতুয়া ও একটা সাদা পেণ্টুলন ও একজোড়া বার্ণিস-করা বুট জুতা। তাছাড়া একজোড়া প্যারিসের দস্তানা অতি-যত্নে গুটাইয়া রাখা হইয়াছিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া—অপরাধের ইতিবৃত্তে যাহার কোন দৃষ্টান্ত নাই—গোয়েন্দাদ্বয় বিস্ময়-স্তম্ভিত হইল। হতাশ ভাবে উহাদের মধ্যে একজন আকাশের দিকে দুই হাত তুলিল, আর একজন কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগে বাহুদ্বয় স্থাপন করিল। প্রথম ব্যক্তিটি বলিল;—"কালের কুটিলা গতি!" আর একজন বলিল,—"আজব কাণ্ড দুনিয়ার!" হত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় হত্যাকারী বেশ গুছাইয়া ভাঁজ করিয়া, বাঁধিয়া-সাঁধিয়া তাহার গৃহে ফেরত পাঠাইয়াছে—এরূপ মার্জ্জিত শঠতা কি বিরল নহে? একে ত গুরুতর অপরাধ, তার উপর আবার উপহাস!

গোয়েন্দাদ্বয় বোচ্‌কার কাপড়গুলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া আরও হতবুদ্ধি হইল।

কোর্ত্তার কাপড়টা বেশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; ছোরা কিংবা গুলি কাপড় ফুঁড়িয়া গিয়াছে, এইরূপ কোন তেকোণা কিংবা গোলাকার ছিদ্র কাপড়ে নাই। হয়ত লোকটাকে গলা টিপিয়া মারিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে ত একটা ধ্বাধ্বি হইত। তাহাতে ফতুয়া ও পেনটুলন এরূপ ফিট্-ফাট্ থাকিত না। উহা দুমড়াইয়া যাইত, ছিঁড়িয়া যাইত, কুটি-কুটি হইত। এরূপ কখনই সম্ভব নহে, যে ধনশালী আন্দ্রে তাহার কাপড়-চোপড় বাঁচাইবার জন্য কাপড় ছাড়িয়া তারপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এ যে অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা! ইহাতে গোয়েন্দাদ্বয়ের অপেক্ষা বড় বড় মাথাও ঘুলাইয়া যাইবার কথা।

এই দুজনের মধ্যে একজন একটু বেশী তর্ক-বাগীশ ছিল। পাছে তীব্র চিন্তায় তাহার প্রতিভা-দীপ্ত ললাট ফাটিয়া যায় এইজন্য দুইহাতে কপালের দুই রগ্ ১৫ মিনিট কাল ধরিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহার মুখ হইতে এই কথাটা মহা জয়োল্লাসসহকারে বাহির করিল;—

"যদি আন্দ্রে-মহাশয় না মরিয়া থাকেন,

তাহা হইলে অবশ্য তিনি বাঁচিয়া আছেন—কারণ মানুষের এই দুই রকম অবস্থা ছাড়া আর কোন অবস্থা হইতে পারে না। তৃতীয় কোন অবস্থা আছে বলে' আমি ত জানিনা।"

তাঁহার জুড়িদারও মাথা নাড়িয়া এই কথায় সায় দিল।

"যদি তিনি জীবিত থাকেন—আমার বেশ মনে হচ্চে তিনি জীবিত আছেন—তাহা হইলে তিনি কখন উলঙ্গ হয়ে যান নি। তিনি যখন বাড়ী হতে বাহির হন তখন তাঁর সঙ্গে কোন বোচ্‌কা-বুচ্‌কি ছিল না। এই কাপড়গুলা যখন তাঁহারই কাপড় তখন তিনি অবশ্যই এই কাপড়গুলা অন্যের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিলেন। কারণ এ কখনো মনে করা যাইতে পারে না যে, এই উন্নত সভ্যতার দিনে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া দিগম্বর হইবে।"

জুড়িদারের কথা দ্বিতীয় ব্যক্তি গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, তাহার এই অকাট্য যুক্তি যখন শুনিল তখন তাহার চোখদুটি অক্ষি-কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"আমার মনে হয় না যে, ডন্-আন্দ্রে, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহার পর, যে অঞ্চলে আমরা তাঁর "খেই" হারাইয়া ছিলাম, সেই অঞ্চলের কোন বাড়ীতে আসিয়া সম্ভবত ঐ পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন; তিনি নিশ্চয়ই নিজের কাপড়গুলা বাড়ী ফেরত পাঠিয়ে কোন পুরোনো-কাপড়ওয়ালার দোকান থেকে এই সব পুরোনো কাপড় কিনেছিলেন।"

তাহার জুড়িদার তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুই বুদ্ধিতে বৃহস্পতি; আয় তোকে আলিঙ্গন করি। আজ থেকে আমি আর তোর বন্ধু নই,—আমি এখন তোর গোঁড়া ভক্ত, আমি তোর কুত্তা, আমি তোর গোলাম, আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নে, যেখানে তুই যাবি, আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে যাব। সরকারের যদি ন্যায়-বিচার থাকৃত তাহলে সামান্য পুলিসের কর্ম্মচারী না হয়ে তুই রাজ্যের কোন বড় শহরে একটা মস্ত পদ পেতে পারতিস্। তবে কি না, কোন রাজ-সরকারই ন্যায়ের পথে কখনো যায় না!"

—তৈরী কাপড় যারা বিক্রী করে সেই সব পুরোনো কাপড়ের দোকানে এস আমরা যাই, আর সেইখানে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করি। তাদের বিক্রীর জাবদা বই সব ভাল করে দেখি, তাহলে ডন-আন্দ্রে-মশায়ের আর কোন নূতন পরিচয়-চিহ্ন পাওয়া যেতেও পারে। যে ছোক্‌রাটা কাপড়ের বোজ্‌কা এনেছিল তাকে যদি দরোয়ান আট্‌কিয়ে রাখ্‌ত তাহলে জান্‌তে পারা যেত, কে তাকে পাঠিয়ে দিলে, সে কোত্থেকে আস্‌ছে। কিন্তু এ-সব কথা কারও মনে হয়নি। চল ভাই এখন যাওয়া যাক্। তুমি "মেয়ারের" দর্জ্জিদের দোকানে যাও; আমি "রাষ্ট্রোর" পুরানো কাপড়ের দোকানে যাই।"

কয়েক ঘণ্টা পরে দুই বন্ধু মেজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিল।

উহাদের মধ্যে একজন উহার অনুসন্ধানের ফল তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করিল। বড় লোকের ধরণের পোষাক-পরা একব্যক্তিকে

খুবই উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছিল, সে একটা বড় দর্জ্জির দোকানে একটা 'ড্রেস-কোট্' ও একটা কালো পেণ্ট্‌লুন কিনেছিল। মূল্যের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।

আর একজন বলিল,—"রাষ্ট্রোর' একজন দোকানদার, কালো কোর্ত্তা ও সাদা পেনটুলন-পরা একব্যক্তিকে একটা ওয়েষ্ট-কোট্, একটা ফতুয়া ও একটা শিল্পজীবী-ধরণের কোমর-বন্ধ বিক্রী করেছিল। এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ডন-আন্দ্রে। দুজনেই দোকানের পিছন-দিকে গিয়ে কাপড় বদ্‌লে নতুন কাপড় পরে রাস্তায় বের হয়েছিল। তারা যে শ্রেণীর লোক তাতে মনে হয় দুজনেই ছদ্ম বেশ পরেছিল। একই দিনে, একই সময়ে একজন ভদ্রলোক, একজন নিম্নশ্রেণীর লোকের আংরাখা এবং একজন নিম্নশ্রেণীর লোক একজন ভদ্র লোকের ফতুয়া কি মৎলবে পরিয়াছিল, তাহা এই প্রহরীদ্বয় কিছুই স্থির করিতে পারিল না; ভাবিল, মেজিষ্ট্রেট মহোদয়ের তীক্ষ্ণ স্বচ্ছ বুদ্ধি এই রহস্য উদ্ভেদ করিতে অনায়াসেই সমর্থ হইবে।

কিন্তু উহারা ভাবিল,—এই যে রহস্যময় অন্তর্ধান, এই-যে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে একই সময়ে দুইজনের ছদ্মবেশ ধারণ, এই-যে স্পর্দ্ধার সহিত হতব্যক্তির গৃহে হত-ব্যক্তির কাপড়-চোপড় পুনঃপ্রেরণ—এই সমস্ত ব্যাপারের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বোধ হয় এ-একটা কোন বড়রকম ষড়যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ব্যাপার—বোধ হয় স্পেনের সিংহাসনে আর কোন দাবীদারকে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে। ছদ্মবেশ পরিয়া কতকগুলা অপরাধী এই উদ্দেশে যাতায়ত করিতেছে। এখন স্পেন একটা আগ্নেয়-গিরির উপর অবস্থিত;—কখন ফাটিয়া উৎপাত আরম্ভ হইবে তাহার ঠিকানা নাই। আমাদিগকে যদি কিছু দক্ষিণা দেওয়া হয়, আমরা এই আগ্নেয়-গিরির আগুন নিবাইয়া দিতে পারি—বিপ্লবকারীদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিতে পারি।

মেজিষ্ট্রেট প্রহরীদ্বয়ের রিপোর্ট যথোচিত মনোযোগে শুনিয়া উহাদিগকে বলিলেন;—

"ছদ্মবেশ ধারণ করবার পর ঐ ব্যক্তি কোথায় গেল সে বিষয়ে কি তোমরা কোন খোঁজখবর পেয়েছ?"

উহাদের মধ্যে একজন বলিল;—

যে—"শ্রমজীবী, ভদ্রলোকের কাপড় পরেছিল—সে "প্রাদোর" বেড়াবার জায়গায় বেড়াতে গেল—তার পর থিয়েটারে গেল, তারপর একজায়গায় কাফির কুল্লি খেলে।"

আর একজন বলিল;—

"ভদ্রলোকটি যে শ্রমজীবীর কাপড় পরেছিল সে "লাভাপির নগর প্রাঙ্গনে কয়েকবার ঘোরা ফেরা করলে, তারপর তারই সংলগ্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, জানলায় কোন শিল্পজীবী-শ্রেণীর সুন্দরী মুখ বাড়িয়ে আছে কি না, সেইদিকে নজ্‌রা মারতে লাগল। তারপর একটা সঙ্গীতের আড্ডায় গিয়ে এক গ্লাস বরফে জমাট্ লেমনেড খেলে।"

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন—"প্রত্যেকেই দেখ্‌ছি,—যার যে-রকম ছদ্মবেশ সেই ছদ্মবেশের অনুরূপ চরিত্রের অভিনয় করচে। একজন নিম্নশ্রেণী লোকদের মনোভাব তলিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা করচে; আর একজন

উচ্চশ্রেণী লোকদের সহানুভূতি পাবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু আমরা পুলিস—আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত। ষড়যন্ত্রী ভায়ারা—তোমরা নরমপন্থীই হও—আর গরমপন্থীই হও-আমাদের কাছে কোনও পন্থীরই জারিজুরী খাট্‌বে না। হা! হা। ইন্দ্র সহস্র-লোচন ছিল, কিন্তু পুলিসের লক্ষ লোচন। তাছাড়া, পুলিসের চোখে ঘুম নেই।" দেখ আর্গমস্থল্লা, তোমাদের পারিশ্রমিক তোমরা পাবে। কিন্তু তোমরা ত জান্‌তে পার নি, চলে যাবার পর সেই বদমাইশদের শেষে কি হ'ল?"

—"না, আমরা তা জানতে পারি নি। কারণ, সেই সময় অন্ধকার হয়ে এসেছিল। রাত্রি হবার পর থেকে আমরা তার খেই হারালাম।"

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন,

—"মোলো যা! বড়ই দুঃখের বিষয়।"

গোয়েন্দাদ্বয় খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল;—

"আমরা আবার তাদের খুঁজে বের করব।"

এই সময় ডন-জেরোনিমো কোন নূতন খবর আছে কি না জানিবার জন্য আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মেজিষ্ট্রেট বেশ-একটু শুষ্কভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। জেরোনিমো থতমত খাইয়া নানা ওজর দিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিলে পর, মেজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বলিলেন;—

"এরূপ প্রকাশ্যভাবে এতটা দরদ দেখিয়ে ডন-আন্দ্রের খোঁজ-খবর নেওয়াটা আপনার পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হচ্চে না। ডন-আন্দ্রে একটা মস্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত আছেন, আমরা দুদিন থেকে তারই সন্ধান করচি।"

ডন-জেরোনিমো বলিয়া উঠিলেন;—

—"আন্দ্রে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত!"

একজন পুলিসের কর্ম্মচারী বলিলঃ—"হাঁ তিনিই।"

—"ছেলেটি এমন ভাল-মানুষ, এমন শান্ত, এমন আমুদে, এমন নিরীহ!"

—"ব্রুটস্ যেমন পাগলামির ভাণ করেছিল আন্দ্রে তেমনি বাইরে ভালমানুষি দেখাত। লোকের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়ে আপনার মৎলব হাসিল করবার এ-একটা ফন্দি। আমরা পুরোনো ঘাঘি, আমরা ও-সব বেশ জানি। যদি তাকে আর না পাওয়া যায় তাহলেই তার পক্ষে ভাল। আপনি যদি তার ভাল চান ত ঐ কামনাই করুন।"

স্বকীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাব উপলব্ধি করিয়া, এবং অত্যন্ত 'মর্চ্চিভঙ্গ' ও লজ্জিত হইয়া বেচারী ডন-জেরোনিমো প্রস্থান করিলেন।

যে ব্যক্তি আন্দ্রেকে শিশুকাল হইতে জানিত, যাকে শৈশবাবস্থায় কোলে লইয়া নাচাইয়াছে, সেই ডন-জেরোনিমোর এখন একটুও সন্দেহ রহিল না যে এই আন্দ্রে একজন ভয়ানক ষড়যন্ত্রী। যে বিষয়ে ডন-জেরোমিনোর কখন লেশমাত্র সন্দেহ করেন নাই,—অথচ অপরাধীকে প্রতিদিন দেখিয়া আসিতেছেন—এমন কি, তাহাকে আপনার জামাই করিবেন বলিয়া প্রায় স্থির করিয়াছিলেন—এখন কিনা তার সম্বন্ধে এই গুপ্তকথা পুলিস এত অল্প সময়ের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছে! পুলিসের এই ভয়ানক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুরতা দেখিয়া, পুলিসের উপর

ডন-জেরোনিমোর ভীতি-বিস্ময়মিশ্র অপরিসীম ভক্তির উদয় হইল।

ফেলিসিয়ানা যখন জানিল যে, বহুশাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট একটা বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের নেতা, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য এত সাধ্য-সাধনা করিতেছে, তখন তাহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। আন্দ্রের খুব মনের জোর আছে বলিতে হইবে,—সে এমন উচ্চতর রাষ্ট্রনৈতিক কাজে ব্যাপৃত থাকিয়াও, কিছুই কাহাকে জানিতে দেয় নাই—বেশ ঠাণ্ডাভাবে সেই যুগলবন্ধ গানের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে! ইহার পর—শান্ত মুখের ভাব, শান্ত চোখের ভাব, হাসি-হাসি মুখ—এই সবের উপর আর কি বিশ্বাস করা যায়! সে যে ষাঁড়ের লড়ায়ে এত উৎসাহ দেখাইত—এই সব ছেলেমানুষি আমোদ ভালবাসে বলিয়া ভাণ করিত, সে শুধু তার আসল মনের ভাব গোপন করিবার জন্য কি নহে?

গোয়েন্দাদ্বয় আবার নবোদ্যমে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং অবশেষে অবগত হইল যে, যে যুবকটি আহত হইয়াছিল এবং মিলিতোনা যাহাকে আপন গৃহে লইয়া গিয়াছিল, সেই যুবকই "রাষ্ট্রীয়" পরিচ্ছদ ক্রয় করে। নৈশ-প্রহরী ও দোকানদারের কথিত বিবরণের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল ছিল। চকোলেট্ রং-এর ওয়েষ্ট-কোট, নীল ফতুয়া, লাল কোমরবন্দ—আর কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

আর্গমস্থল্লা ও কোভাচুল্লা, ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যে আশা মনে মনে পোষণ করিয়াছিল, এই নূতন আবিষ্কারে, সেই আশা একটু ভণ্ডুল হইয়া গেল। আন্দ্রে যদি একেবারেই অন্তর্ধান করিত, তার কোন কূল-কিনারা পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে উহাদের পক্ষে খুব সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন এই ব্যাপারটা একটা সাদাসিদা প্রেমের ষড়যন্ত্রে পরিণত হইল—ইহা সুধু প্রেমিক-প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের অতি তুচ্ছ সামান্য একটা কলহ মাত্র! প্রতিবেশীরা-'শেরি লেড' গান শুনিতে পাইয়াছিল। ইহা হইতে, আসল ব্যাপারটা কি হইয়াছিল সমস্তই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

কোভাচুল্লা, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল।—

"আমার জীবনে কখনই সৌভাগ্য লাভ হয় নি।"

অর্গম্‌স্থল্লা কাঁদো-কাঁদো স্বরে উত্তর করিল "একটা কুগ্রহে আমার জন্ম হয়েছিল।"

আহা বেচারা! ঐ বন্ধুদ্বয় একটা মস্ত ষড়যন্ত্র বাহির করিতে গিয়া কিনা শুধু একটা গুরুতর আঘাতের অপরাধের আবিষ্কার করিল! ইহাতে হতাশ হইবারই কথা।

এখন আবার জুয়াঙ্কোর নিকট ফিরিয়া যাওয়া যাক্। আন্দ্রের সহিত যখন তাহার যুদ্ধ হয়, সেই সময় হইতে আমরা জুয়াঙ্কোকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। এক ঘণ্টা পরে জুয়াঙ্কো বাঘের মত নিঃশব্দে পা ফেলিয়া, যুদ্ধ ঘটনার স্থলে আবার আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, আন্দ্রের মৃত শরীর ঐখানেই সে দেখিতে পাইবে। কিন্তু দেখিতে না পাইয়া জুয়াঙ্কো যার-পর-নাই বিস্মিত হইল। তবে কি, আহত অবস্থার, যন্ত্রণায় আবেশে নিজের শরীরটাকে টানিয়া-টানিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে? নৈশ-প্রহরীরা তাহাকে কি তুলিয়া লইয়া গিয়াছে? জুয়াঙ্কো কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিল না। এখন এখানে থাকা,—

না, এখান হইতে পলায়ন করা শ্রেয়? পলায়ন করিলে উহাকে অপরাধী বলিয়াই সকলে মনে করিবে। তাছাড়া, মিলিতোনা হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া, মিলিতোনাকে নিজের খেয়াল অনুসারে চলিতে দেওয়া—এই কল্পনাটা ঈর্ষা দগ্ধ চিত্তের পক্ষে অসহ্য। সে রাত্রিটা ঘোর অন্ধকার ছিল, রাস্তা জনশূন্য ছিল, কেহই জুয়াঙ্কোকে দেখে নাই। কে তাহার নামে অপরাধের অভিযোগ আনিবে?

তবে যুদ্ধটা এতক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছিল যে জুয়াঙ্কোর প্রতিদ্বন্দী জুয়াঙ্কোকে আবার দেখিলে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবে। কারণ অভিনেতাদের ন্যায় বৃষমল্লদেরও মুখ সর্ব্বজন পরিচিত। যদি আন্দ্রে না মরিয়া থাকে তাহা হইলে সে হয়ত জুয়াঙ্কোর নামে অপরাধের আরোপ করিয়াছে। জুয়াঙ্কো ছোরা চালাইতে সিদ্ধহস্ত একথা পুলিসের অবিদিত ছিল না; তাই জুয়াঙ্কো মনে করিল, যদি সে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে তাহা হইলে, আফ্রিকার কোন স্পেনীয় উপনিবেশে তাহার কয়েক বৎসর বাস করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই মনে করিয়া সে গৃহে গেল, গৃহে গিয়া তাহার ঘোড়া বাহির করিয়া আনিল এবং ঘোড়ার পৃষ্ঠে একটা বহু-বর্ণের কম্বল চাপাইয়া, তাহাতে চড়িয়া, ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল।

যদি কোন চিত্রকর দেখিত, একটা কালো ঘোড়ার পার্শ্বদেশ দুই পায়ে চাপিয়া একজন অশ্বারোহী রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; ঘোড়ার ঘাড়ের চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, ঘোড়ার পুচ্ছ অনল-শিখার মত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, অশ্ব-খুরের আঘাতে বাঁধানো রাস্তার অসমান ভূমি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠাইয়া নিস্তব্ধ সহরের মধ্য দিয়া, প্রশান্ত রাত্রে অশ্বারোহী সশব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা হইলে সেই চিত্রকর এই অশ্ব ও অশ্বারোহীর মূর্ত্তি চিত্র করিয়া দর্শকের নয়ন-মন নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিতে পারিত। কিন্তু তখন চিত্রকরেরা সকলেই নিদ্রামগ্ন।

জুয়াঙ্কো শীঘ্রই সহরের সীমা ছাড়াইয়া পল্লিগ্রামের বিষণ্ণ মাঠ-ময়দানে আসিয়া পড়িল। সেই স্থান মাদ্রিদ শহর হইতে ১২ ক্রোশ দূরে। তখন মিলিতোনার মুখখানি তাহার মানস-পটে উদয় হইল; তাহার পক্ষে এখন আর বেশী দূরে যাওয়া একেবারেই অসাধ্য হইল। তাহার মনে হইল, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আঘাত করিতে পারে নাই; সে হয়ত গুরুতর আঘাতে আহত হয় নাই। সে কল্পনা করিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আরোগ্যলাভ করিয়া এতক্ষণে স্মিত-হাস্যাননা মিলিতোনার আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইয়াছে।

শীতল স্বেদজলে জুয়াঙ্কোর ললাটদেশ পরিষিক্ত হইল। দাঁতে দাঁত লাগিয়া গেল ও স্নায়বিক আক্ষেপ-বশত তাহার জানুদ্বয় ঘোড়ার পার্শ্বদেশ এরূপ আঁটিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল যে ঘোড়ার দম বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঘোড়াটা থমকিয়া দাঁড়াইল। যেন কেহ অগ্নি-তপ্ত শলাকা তাহার বক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে, এইরূপ যন্ত্রণা তাহার অনুভব হইতে লাগিল।

জুয়াঙ্কো ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিয়া ঝড়ের বেগে সহরের দিকে ছুটিয়া চলিল। তখন রাত্রি তিনটা; জুয়াঙ্কো "পোভারের" রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। একটা পুরাতন প্রাচীরের কোণে তখনও, কম্পমান অকলঙ্ক তারকার

ন্যায় মিলিতোনার দীপ জ্বলিতেছিল। বৃষভ-মল্ল গলি-পথের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল—অসাধারণ বলসত্ত্বেও দ্বার ভাঙ্গিতে পারিল না।

মিলিতোনা পূর্ব্বেই ভিতর দিকে সযত্নে লৌহ-অর্গল নামাইয়া দিয়াছিল। ভীষণ অনিশ্চিততার মধ্যে যন্ত্রনায় প্রপীড়িত হইয়া হত ভাগ্য জুয়াঙ্কো গৃহে ফিরিয়া গেল। কারণ, মিলিতোনার পর্দ্দার উপর সে দুইটা ছায়া দেখিয়াছিল। তবে কি আসল লোককে না মারিয়া ভুলক্রমে আর কাহাকে মারিয়াছে!

রাত্রি প্রভাত হইলে মল্লবীর, আস্তিন-বিরহিত খাটো আলখাল্লা পরিধান করিয়া, ও টুপিটা চোখের উপর নামাইয়া দিয়া, রাত্রির ঘটনাসম্বন্ধে কে কি বলিতেছে শুনিতে আসিল। জানিতে পারিল, যুবকটি মরে নাই; এবং বহিয়া লইয়া যাইবার অবস্থা নহে বলিয়া, মিলিতোনা তাহাকে তুলিয়া নিজ কক্ষে রাখিয়া দিয়াছে। এই সদয় ব্যবহারের দরুণ কল্পনাপ্রিয় লোকেরা মিলিতোনার খুব প্রশংসা করিতেছে। বলিষ্ঠ হইলেও, জুয়াঙ্কো অনুভব করিল যেন তার পা টলিতেছে, সে বাধ্য হইয়া প্রাচীরে ঠেস্ দিয়া রহিল। তাহার প্রতিদ্বন্দী মিলিতোনার পালঙ্কে! তাহার জন্য এরূপ ভীষণ যন্ত্রণা অন্ধতম নরকও উদ্‌ভাবন করিতে পারে না। খুব দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া জুয়াঙ্কো মিলিতোনার গৃহে প্রবেশ করিল। এবং প্রবেশ করিয়া গুরুপদক্ষেপে ও সশব্দে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইরাণী

যৌবনেরি মউবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি,
দুপুর-বিজন ঝর্‌ণাতলায় একলা বসে চুল খুলি'।
পূর্ণিমারি ঢেউ উঠেছে রূপ-সায়রের মাঝখানে,
থির রহেনা মোতির মালা, উঠ্‌ছে কাণের দুল্ দুলি'।

ফুলের ফিতায় বিনায় বেণী ফাল্‌গুনেরি দিনটিতে,
দুষ্ট-অলক বশ মানে যে কঙ্কণেরি কিন্‌কি-তে!
হাত দু'খানি খোঁপার 'পরে, বাহুর বাঁকে জওসমের
ঝুম্‌কো দু'টি দুল্‌ছে, সে কি আলিঙ্গনের ইঙ্গিতে?

মখ্‌মলেরি বিছ্‌না'পরে ঘুমায় কোলে সারঙ্গী,
নীল্-রঙিলা কাচের থালায় আনার-আঙুর-নারঙ্গী—
একটি ছোট টুক্‌রা-ফালি টুক্‌টুকে-লাল তরমুজের
রাঙা ঠোঁটে ঠেকায় শুধু; মুখে দেওয়া বারণ কি?

কালোডানার শ্বেত-মরালী !—স্নানের ঘরে হাম্মামে
ছড়িয়ে পড়ে চুলের পালক শুভ্র-তনুর ডান্-বামে !
গোলাপফুলের তাজটি মাথায়, জাফ্‌রাণী-রং পায়জামা—
যুবতী নয়, বালক-কিশোর বস্‌ল এসে তাঞ্জামে !

রাতের বেলায় জ্বালিয়ে বাতি মুকুরে তার মুখ স্থাখে,
কাঁচল খানি খুলেই আবার মুচ্‌কি হেসে বুক ঢাকে !
দর্পণে সে চুম্ দেবে তার গালের টোলে লাজ-রাঙা—
ঠোঁটেই পড়ে ঠোঁটের চুমা, তাই ত' প্রাণে দুখ থাকে।

বাসর-দোসর বরের বুকে অঘোরে ঘুম যায় না সে,
স্বপন ভেঙ্গে হঠাৎ জেগে প্রিয়ের পানে চায় না সে,
সুর্ম্মা-ধোয়া দুখের শিশির গোলাপ-গালে গড়ায় না—
ফুট্‌লে হাসি বঁধুর মুখে, সুখের গজ্‌ল্ গায় না সে !

আপন প্রেমেই আপ্‌নি বিভোর, পর্-পিয়াসা পায় না যে !
রূপের ছায়া ধরবে চোখে—পুরুষ শুধুই আয়না যে !
হাওয়ায়-ওড়া ওঢ়না-আড়ে দৃষ্টি কি তার দুরন্ত !
গুরু উরুর গুমর-ভরা জোড়-পায়েলা পা'য় বাজে।

জ্যোৎস্না-জরীন্ ঘাসের ফরাস—ছায়ারা সব কোণ খুঁজে'
'সরো'র সারির তলায় জোটে, নিঝুম রাতির মন বুঝে' ;
তারার চোখে আলোর ধাঁধা—ঠাউরে' না পায় কোন্ তিথি,
বুঁদ হ'য়ে চাঁদ গড়িয়ে পড়ে বাদ্‌শা-বাড়ীর গম্বুজে।

'নিশি'র ডাকে তখন যে তার মন্-মহলের খিল খোলা !
সেতার খানায় কি সুর হানে ! দুল্‌ছে নিশার নীল দোলা !
ঝাঁপ্‌টাখানা দুল্‌ছে মাথায়, ফণির ফণায় মণির প্রায় !
শিরায় শিরায় গানের গমক—সুরের সুরায় দিল্-ভোলা !

গানের শেষে হাতটি ধরি হেনায়-রাঙ্গা তুল্-তুলে—
সকল বাঁধন শিথিল তখন, নিবন্ত চোখ ঢুল-ঢুলে !
সাহস-ভরে অধর 'পরে দিলাম চুপে দিল্-মোহর—
নুইয়ে প'ল গোলাপ-শাখা, ঘুমিয়ে প'ল বুল্‌বুলে !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বিক্রমপুর নামের পুরাতত্ত্ব ও তাহাতে ইতিহাসের সূত্র

ঢাকা-জিলা পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুর আবার ঢাকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও উন্নত স্থান। কেবল ঢাকা কেন, বিক্রমপুর সমগ্র বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষেও বিশেষ প্রখ্যাত। সুতরাং বিক্রমপুরের সুশিক্ষিত সন্তানেরা থাকিতে বিক্রমপুরের পুরাতত্ত্বের আলোচনায় হস্তক্ষেপ আমার মত ব্যক্তির পক্ষে যে অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা আমি বিশেষ রূপেই অনুভব করিতে পারিতেছি। বস্তুত বিক্রমপুরের দুইজন কৃতী সন্তানই 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' ও 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণয়ন করিয়া ঢাকা ও বিক্রমপুরের পুরাবৃত্ত-উদ্ঘাটনে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে বিক্রমপুরের নামতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহারা অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয়ই দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই নাম-তত্ত্ব-দ্বারা কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই, সুতরাং বিক্রমপুর ও ঢাকার ইতিহাসের ইহা একটী অসম্বদ্ধ প্রসঙ্গরূপেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বিক্রমপুরের নামতত্ত্ব বিক্রমপুর ও ঢাকার মূল ইতিহাসের সহিত অসংলগ্ন না থাকিয়া বরঞ্চ সুসংলগ্ন থাকাই উচিত। ঐতিহাসিক সূত্রযুক্ত এরূপ কোন নাম-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, এই ভরসাতেই আমি এই আলোচনাটী সাধারণের গোচরীভূত করিতে সাহস করিতেছি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় "ঢাকার ইতিহাস" প্রণয়ন করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রণয়ন করিয়াছেন। উভয়েই বিক্রমপুরের নাম-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, এবং উভয়েই উল্লেখ করিয়াছেন যে বিক্রমপুরে এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে বিক্রমাদিত্য রাজার নামানুসারেই বিক্রমপুর নাম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা এই প্রবাদটী অগ্রাহ্য করিয়া সেনবংশের আদি-পুরুষ "বিক্রম সেন" নামক রাজা হইতে বিক্রমপুরের নামকরণ হইয়াছে, ইহাই বিক্রমপুর নামের প্রকৃত তথ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। বিক্রম সেনকে বিক্রমপুরের স্থাপয়িতা বলিয়া প্রমাণিত করিতে হইলে তাঁহার সহিত বিক্রমপুরের কোন ঐতিহাসিক সংস্রব দর্শন করা একান্তই আবশ্যক। কিন্তু যতীন্দ্রবাবু বা যোগেন্দ্রবাবু এরূপ কোন ঐতিহাসিক সংস্রবের প্রমাণ যে দিতে পারিয়াছেন, তাহা আমাদের মনে হয় না। যোগেন্দ্রবাবু বিক্রম সেনকে বঙ্গের সেন-রাজগণেরই পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু সেনরাজদিগের বংশ-তালিকায় তাঁহার নাম দৃষ্ট হয় না। যতীন্দ্রবাবু গৌড়ের রাজারূপে এক বিক্রম সেনের উল্লেখ পাওয়া যায় বলিয়া লিখিয়াছেন—কিন্তু গৌড় রাজাদিগের মধ্যে তিনি সেই বিক্রমের স্থান বা সময় নির্দ্দেশ করেন নাই বা সেন-রাজগণের সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বিক্রম সেন যদি বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতাই হইবেন তবে

তাঁহার অসাধারণ বলবিক্রম বা কীর্ত্তি-কলাপের পরিচায়ক আখ্যা অবশ্যই প্রচলিত থাকিত। তৎপরিবর্ত্তে কেবলমাত্র ঃ—

"তদ্বংশে বিক্রম সেনোজাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতং সুধীঃ॥"

এইরূপ সামান্য একটী উক্তিতে তাঁহার পরিচয় অতি দুর্ব্বল প্রমাণই বলিতে হইবে। বিশেষতঃ যদি তিনি সেনদিগেরই একবংশীয় হইবেন বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষই হইবেন—তবে সেনবংশীয়দিগের অশেষ কীর্ত্তি-কাহিনীর বর্ণনা উপলক্ষে সর্ব্বাগ্রেই তদীয় গুণ-গরিমা সগৌরবে কীর্ত্তিত হইত। কিন্তু একমাত্র স্থল ব্যতীত আর কোথায়ও যে তাঁহার কথিত কীর্ত্তির কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না, অথবা সমসাময়িক কি পরবর্ত্তী কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে কিংবা কিম্বদন্তীতেও উহার অনুবর্ত্তন বা সমর্থন দেখা যায় না—তাহাতে বিক্রম সেনের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মে, তাহা নহে, প্রত্যুত সেনবংশ ও বিক্রমপুরের সহিত তাঁহার যোগ সম্পূর্ণরূপে আরোপিত বলিয়া দৃঢ় প্রতীতিই জন্মে।

বিক্রমাদিত্য রাজার নাম হইতে বিক্রমপুর নাম হইয়াছে—এই জনশ্রুতিকে আমরা সহজে উপেক্ষা করিতে চাই না; কারণ জনশ্রুতি একেবারে উপেক্ষণীয় হইলে "নহ্যমূলা জনশ্রুতি" এরূপ বাক্যের উৎপত্তি কখনও হইত না। কিন্তু জনশ্রুতি অমূলক না হইলেও তাহা নির্ব্বিকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য রাজার সহিত জনশ্রুতিটী সংযোজিত হওয়াই ইহার গ্রহণ সম্বন্ধে আপত্তির কারণ হইয়াছে। কারণ উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য কখনও এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন এরূপ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহা হইতে বিক্রমপুরের সহিত "উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের" যোগ ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য বিক্রমাদিত্যের যোগও যে ভ্রমাত্মক তাহা বলা যাইতে পারে না।

পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের ন্যায়ই প্রসিদ্ধ চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। আমরা চালুক্য বিক্রমাদিত্যকেই বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাই। তিনি চালুক্য-রাজ আহুর মল্ল বা ত্রৈলোক্য মল্লের পুত্র ছিলেন। শৈশবেই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের লক্ষণ সকল সূচিত হয়। বিশ্বকোষে এ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "এই পুত্রের অসাধারণ রূপলাবণ্য ও দেহ-জ্যোতিঃ দেখিয়া নৃপতি তাহার নাম রাখিলেন বিক্রমাদিত্য"। বিশ্বকোষকার তাঁহার আরও কয়েকটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তাঁহার আরও অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়, যথা—বিক্রমণক ও বিক্রমণকদেব, বিক্রমলাঞ্ছন, বিক্রমাদিত্য দেব, বিক্রমার্ক, ত্রিভুবনমল্ল, কলিবিক্রম ও পরমাভিরাম।"

সিংহাসন-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অতুলনীয় বিক্রমের খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষে তদীয় বিজয় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"বিক্রম পিতার আদেশ-ক্রমে দেশজয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ চোল রাজগণকে পরাস্ত করেন,

কাঞ্চী লুণ্ঠন করেন, ও মালব-রাজকে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন, এমন কি সুদূর গৌড় ও কামরূপ পর্য্যন্ত সেনা-বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিংহলের রাজা তাঁহার ভয়ে সুদূর বনে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি মলয়পর্ব্বতের চন্দনবন ধ্বংস করেন এবং কেরল-নৃপতিকে নিহত করেন। তিনি অসীম বিক্রম-প্রকাশ, গঙ্গাকুন্দ, বেঙ্গী এবং চক্রকোট প্রভৃতি প্রদেশ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাপতি, বিহ্লণ বিক্রমাদিত্যের জীবন-চরিত লইয়া সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত "বিক্রমাঙ্কদেব চরিত" নামক গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদ্ পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বুলার সাহেব এই বিক্রমাঙ্কদেব চরিতের একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে তিনি বিক্রমাদিত্যের গৌড় ও কামরূপ জয় সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"The assertion that Vikrama defeated the kings of Garuda and Kamrup sounds very strange, it is however possible that he made with his country a raid into their territories." p. 31 (preface)

বিক্রমাদিত্যের উল্লিখিত গৌড় কামরূপের বিজয়াভিযান স্মরণীয় করিবার জন্য তৎকর্ত্তৃক বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠার অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। উপরিউক্ত অভিযান ব্যতীত বিক্রমাদিত্য রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলে তদীয় সেনাপতি মহাবীর আঢ কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের স্পষ্ট উল্লেখই পাওয়া যায়। বিশ্বকোষে এতৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"এ ছাড়া তিনি কলিঙ্গ, বঙ্গ, মরু, গুর্জ্জর, চের ও চোলপতিকে চালুক্যপতির অধীন করিয়াছিলেন।"

প্রভুর জন্য রাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্মৃতিরক্ষার্থ বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি কর্ত্তৃক বঙ্গে 'বিক্রমপুর' নামক নগর স্থাপনও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যেরূপই হউক চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সহিত্যই বিক্রমপুরের যোগ থাকিতে পারে, প্রাগুক্ত প্রমাণ সকল হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

বৌদ্ধ গ্রন্থে বিক্রমপুরের নাম বিক্রমণীপুর পাওয়া যায় বলিয়া প্রকৃতিবাদ অভিধানে লিখিত হইয়াছে, যথা "সংস্কৃত বৌদ্ধ-গ্রন্থে ইহা বিক্রমণীপুর' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।" বিক্রমাদিত্যের নামান্তর যে 'বিক্রমণক' ও 'বিক্রমণকদেব' ছিল, তাহা আমার পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'বিক্রমণী' নাম এই বিক্রমণক নাম হইতেই রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয়। এইরূপে চালুক্য বিক্রমাদিত্যের নামে 'বিক্রমপুরের' বৌদ্ধনামের ব্যাখ্যা পাওয়াতে বিক্রমপুরের চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সহিত সংস্রবের বলবত্তর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে বলিয়াই আমরা মনে করি। বিশেষতঃ চালুক্য বিক্রমাদিত্য যে স্বনামে অপর একটী পুরী নিজদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। বিশ্বকোষ-কার লিখিয়াছেন, "তাঁহার অন্যান্য অগণ্য কীর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণুকমলা-বিলাসীর মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের সম্মুখে এক বিশাল সরোবর খনিত হয়। উহার পুরোভাগে তিনি বহুল দেব মন্দির ও সুরম্য হর্ম্ম্যাদিপূর্ণ বিক্রমপুর নামে এক বিশাল নগরী

নির্ম্মাণ করেন।” যিনি স্বদেশে নিজের স্মৃতি-রক্ষার্থ এরূপ ব্যগ্র ছিলেন—তিনি যে বিদেশে আত্মস্মৃতি-রক্ষার্থ আরও অধিক আগ্রহান্বিত হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

এক্ষণে ঐতিহাসিক সময়ের সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তের কিরূপ সামঞ্জস্য হয়, তাহাই আমরা একটু অলোচনা করিয়া দেখিব। বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয়ের সময় সম্বন্ধে যতীন্দ্র বাবু তদীয় ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—“কল্যাণের চালুক্যরাজ আহবমল্ল প্রথম সোমেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র কুমার বিক্রমাদিত্য ১০৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পিতার আদেশ-ক্রমে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গৌড় কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন।” ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২৭০ পৃঃ।

এই একাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এক্ষণে আমরা দেখিব, অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণে ইহার কিরূপ সমর্থন পাওয়া যায়। যতীন্দ্র বাবু ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ৯ম শতাব্দীতেও বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হয় নাই। তখনও তৎপরিবর্ত্তে সমতট নামেরই উল্লেখ পাওয়া যায়—

“বিশ্বরূপসেনের তাম্র-শাসন দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অনেকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ তৎসময়ে বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও এই স্থান সমতট নামে পরিচিত ছিল।” ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৬ পৃঃ।

বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন যে, পালবংশের সময়েই বিক্রমপুরের কথা জানা যায়, তৎপূর্ব্বে বিক্রমপুরের কথা জানা যায় না, যথা ঃ—

“অবশ্য বিক্রমপুর নামটী প্রাচীন পাল বংশের সময়ে বিক্রমপুর একটী প্রসিদ্ধ জনপদ বলিয়াই গণ্য ছিল। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, শিলালিপি বা তাম্র-শাসনে বিক্রমপুরের উল্লেখ নাই।”

এই সকল প্রমাণের দ্বারা নবম শতাব্দীর পরে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে পালদিগের রাজত্বকালেই যে বিক্রমপুরের নামকরণ হয়, তাহাই বলিতে পারা যায়।

হরিবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্র, বিজয় সেন প্রভৃতি যে সমস্ত বঙ্গ-রাজগণের তাম্র-শাসনে বিক্রমপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাদের কেহই একাদশ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্য অভিযানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত হন নাই। সুতরাং তাম্র-শাসনের প্রমাণও আমাদের অনুমানের বিসংবাদী হইতেছে না।

বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠা ও গৌড়বঙ্গে সেন রাজবংশের অধিষ্ঠান দুইটীই ঐতিহাসিক বিশেষ সমস্যা। দিগ্বিজয়ী চালুক্য বিক্রমাদিত্যকে বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিলে বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠা সমস্যার যেমন সুসমাধান হয়, তেমনই গৌড়বঙ্গে সেন বংশাধিষ্ঠান সমস্যারও সুসমাধান হয়। চালুক্য রাজ্য কর্ণাট দেশের সহিত অভিন্ন বলিয়াই ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেন-বংশের পরিচয়েও তাঁহারা কর্ণাটি ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সহিত সেন-বংশীয়দিগের একটী ঘনিষ্ঠ যোগেরই

সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেন-বংশীয়গণ চালুক্য রাজাদিগের সেনা-নায়করূপেই প্রতীয়মান হয়। “সেন’ খ্যাতিটী সেনার সহিত যোগের ইতিহাস স্পষ্টরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই যোগ হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, চালুক্য বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয়াভিযানে সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষই সেনাদিগের নেতা হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং গ্রীক্ মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের আশিয়ার দিগ্বিজয়ের পর তদীয় সেনাপতিগণ যেমন বিজয়লব্ধ রাজ্য আপনারা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন—তেমনই বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয়ের পর সেনবংশীয়গণই তদীয় বিজয়লব্ধ রাজ্যে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে এতৎ সম্বন্ধে আমাদের একজন প্রধান ঐতিহাসিকের আলোচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

“গৌড়রাজ-মালার লেখক মহাশয় এই সমুদায় প্রমাণ-পরম্পরা আলোচনা পূর্ব্বক প্রাচীন লিপির “কর্ণাট রাজ্য” কোথায় ছিল, তাহার পরিচয় প্রদান জন্য কল্যাণের চালুক্য রাজ্যকেই কর্ণাট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিহ্লন দেব রচিত “বিক্রমাঙ্ক চরিত” গ্রন্থের একটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া কল্যাণীয় চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সমরযাত্রার সহিত সামন্তসেনের বল আগমন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

* * *

“প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সামন্ত সেন শেষ-বয়সে কর্ণাট ত্যাগ করিয়া, তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। অথচ এই দুইটী লিপি প্রায় একই সময়ে রচিত। এইরূপ তুল্যকালীন লিপিতে এত বিরোধ কল্পনা অসম্ভব। কিন্তু যদি অনুমান করা যায়, রাঢ়দেশ কর্ণাট রাজ্যের পদানত ছিল, এবং কর্ণাটরাজ কর্ত্তৃক রাঢ়-শাসনার্থ নিয়োজিত, (লক্ষ্মণসেনের মাধাই নগর তাম্রশাসন কথিত) “কর্ণাট ক্ষত্রিয়” বংশজাত রাজপুত্রগণের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশেই কর্ণাটরাজ্যের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, তাহা হইলেই এই বিরোধের ভঞ্জন হয়। বিহ্লন-বিবৃত চালুক্য রাজকুমার বিক্রমাদিত্য, গৌড়াধিপের এবং (হয় ত গৌড়াধিপের সাহায্যার্থ আগত) কামরূপাধিপের পরাজয়-বৃত্তান্ত এই অনুমানের অনুকূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চন্দেল-রাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার (রাজত্ব ১০৪০—১১০০ খৃষ্টাব্দে) আশ্রিত “প্রবোধচন্দ্রোদয়”-রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র যাহাকে “গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া সেই রাঢ় দেশ গৌড়ারাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ় শাসনার্থ কর্ণাটি-রাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয়সেনা-নায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্তসেন তাহারই বংশধর।” (১)। ঢাকার ইতিহাস ২য় খণ্ড ৩০০—৩০২ পৃঃ।

গৌড়-রাজমালার উপরি-উক্তির অনুমোদন করিয়া বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

“সেন-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহে থাকিয়া কালক্রমে (দক্ষিণ

(১) গৌড় রাজমালা—(৪৬—৪৭) পৃঃ

রাঢ়ে কর্ণাট রাজ্যের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইবার পর) বাঙ্গালী প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচিত পাল-রাজবংশের প্রবল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র-মণ্ডলেও অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" —গৌড়রাজমালা। উপক্রমণিকা, ৮০ পৃষ্ঠা।

এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা বিক্রমপুর যে চালুক্য বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, বিশেষরূপেই এই মতের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে।

এক্ষণে বিক্রমপুরের সংস্থান কোথায় ছিল তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব। বিশ্বরূপ সেন ও কেশবসেনের তাম্রশাসনে "পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পাতি বঙ্গে বিক্রমপুর" ভাগে বা "ভাগপ্রদেশ" বলিয়া যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতেই বিক্রমপুরের প্রথম সংস্থানের রহস্যের আভাস নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ছিল। বিক্রমপুর এই উত্তর বঙ্গেই সংস্থিত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিশ্বকোষে বিক্রমপুরের উত্তর দিকের বিস্তার যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে আমাদের অনুমানের বিশেষ সমর্থনই পাওয়া যায়—

—"পাল ও সেন বংশীয়দিগের অধিকার-কালে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল।" শ্যামলবর্ম্মার রাজধানীর স্থান-নির্দ্দেশেও বিক্রমপুর গৌড়ান্তর্গত বলিয়াই জানিতে পারা যায়, যথা "গৌড়ান্তর্গত কান্ত বিক্রমপুরান্তে পুরীং নির্ম্মমে॥" শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার 'পুরাবৃত্তে' উদ্ধৃত রামদেবের "বৈদিক কুল-মঞ্জরী," এক্ষণে উত্তরবঙ্গের কোন স্থানে বিক্রমপুর স্কন্ধাবার বা রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই বিশেষ বিবেচ্য হইতেছে। করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেই পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ভৌগোলিক সংস্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।*

'বিক্রমপুর' করতোয়া নদীরই তীরে স্থাপিত হয় বলিয়া মনে করি। করতোয়া তীরে পালবংশের প্রথিতনামা রামপাল রামাবতী নামে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সম্ভবতঃ রামপাল এখানে পরাজিত হইয়া রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। গঙ্গা ও করতোয়া সঙ্গমে তাঁহার নূতন রাজধানী শ্রীরামাবতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" †

বিক্রমপুরের পূর্ব্বাধিষ্ঠানেই রামাবতীর নূতন পত্তন হয় বলিয়া আমরা মনে করি। বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে বিক্রমপুর নাম কল্পিত হয়, রামপাল ও তদনুকরণেই আপনার নামানুসারেই নগরীর নামকরণ করিলেন। অনুকরণ যে কেবল রাজধানীর নামকরণেই সন্নিবদ্ধ রহিল তাহা নহে, বিক্রমপুর নগরের নাম সেরূপ একটী পরগণার ও নামকরণ হইয়াছে রামপালও তেমনই রামাবতী নগরীর নামে একটী সমগ্র পরগণাই নাম রামাবতী প্রচারিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত পরেশ বাবু 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্তি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সরকার জিন্নতাবাদের অন্তর্গত রামাবতী

* বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত। † বিজয়া—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ৭ ভাদ্র ১৩২৮

নামক একটী পরগণার উল্লেখ আছে। আমাদের বিশ্বাস রামাবতী নগরীর নামানুসারে উক্ত পরগণার নামকরণ হইয়াছে। বিক্রমপুরের পূর্ব্বে যে শ্রী শব্দের প্রয়োগ তাম্র শাসনাদিতে পাওয়া যায়, রামাবতীর পূর্ব্বে সেই শ্রীশব্দটী পর্য্যন্ত সংযুক্ত হইয়া অনুকরণের পূর্ণতা স্পষ্ট সাক্ষ্যই যেন প্রদান করিতেছে। এই অনুকরণে বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি প্রচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করার গর্ব্বিত উদ্দেশ্য দ্বারাই রামপাল প্রণোদিত হইয়াছিলেন। সম্ভবত ইহারই ফলে বিক্রমপুরের প্রাচীন বিস্তাতের খর্ব্বতা সাধিত হয়। ইহাতে বিক্রমপুর রাজধানীর নামে বিরূপ পাইলেও বিক্রমপুর পরগণা সগৌরবে এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া রামপালের ব্যর্থ চেষ্টাকে উপহাস করয়াই যেন বিক্রমাদিত্যের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এইরূপেই বিক্রমপুর বিক্রমাদিত্য স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে সপক্ষ ও বিপক্ষভাবে সেন ও পাল রাজদিগের অতীত ইতিহাসের সূত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সুশ্বেতা

(বৌদ্ধ-যুগের একটি কাহিনী অবলম্বনে)

পথে যেতে আজ কুড়ায়ে পেয়েছি প্রাণের পরশমণি !
চির-অধন্য হ'য়েছি হঠাৎ সকল ধনীর ধনী !
আহ্লাদ মোর সকল অঙ্গে !—অঙ্গে ধরে না আর !
বন্ধ্যা এনেছি তব তরে স্বামী সন্তান-উপহার !
জঠরে ধরিতে স্থান্ নি যা' বিধি সে ধন পেয়েছি পথে
মন ছোটে আজ আট-ঘোড়া জুড়ে মনের মানস-রথে।
জগতের আগে আজিকে আমার লজ্জার অবসান,
আঁটকুড়া নাম দূর হ'ল, দেহে জেগেছে মায়ের প্রাণ !
স্নানে চলেছিনু শোণ্-গঙ্গার সঙ্গমে আজ প্রাতে
অশথে বাঁধিতে আঁচলের সূতা মাথার চুলের সাথে,
হারীতীর বরে সূতা ধ'রে সুত আঁচল ধরিবে এসে
এ ছিল কামনা ; তখন জানি না এত ত্বরা পূরিবে সে।
ছাড়ি 'সুগঙ্গ-প্রাসাদের ঘাট' 'সঙ্কর্ষণ-ঘাটে'—
স্নান সারি ভরি' লয়ে হেমঝারি অশথ-বটের বাটে,—
চলেছিনু জল-অঞ্জলি ডালি' ছায়াতরু মূলে যত—
ভুট্টার দানা ভিখ্ দিয়া দুটো ভুখারে রোজেরি মত।

মহা-পদ্মের নগর জুড়িয়া ধোঁকে আজ পালে পাল
কোটর-চক্ষু বারো-বছরিয়া আকালের কঙ্কাল।
কঙ্কাল-পাণি পেতে ব'সে কেহ, বলিবার নাহি বল,
অধর-ওষ্ঠ কেঁপে থেমে যায়, ঘোলা চোখ নিশ্চল।
জন্মের মত নেছে কেউ মাটি, চোখের মণিতে মাছি,
দাঁতে কাটে চানা অবিকারে কেউ ব'সে তারি কাছাকাছি!
মন করে যাই মাটিতে লুকায়ে; যেদিকে ফিরাই আঁখি
মহামরণের অট্টহাস্য আঁখি-জলে মাখামাখি।
আকালে বেহাল মানুষের পাল পলে পলে মেশে চুপে
মহাপদ্মের মহানগরের আবর্জ্জনার স্তূপে।
ধিক্কার বুকে ওঠে ঢেরি হ'য়ে, মানুষ-জনমে গ্লানি,
আয়ু না ফুরাতে টুটে প্রাণ-বায়ু অনশনে মরে প্রাণী।

বিক্ষত মনে স্খলিত গমনে চলিতে পথের বাঁকে
সহসা কি শুনি!···শিশুর রোদন!···কি নড়ে ঝোপের ফাঁকে?
কঙ্কাল-সার শবরীর কোলে চাঁদ সে পড়েছে খসি'!
সদ্য শিশুরে দংশিছে! আরে! প্রসূতি না রাক্ষসী!
ছেড়ে দে!···ছেড়ে দে!···লইনু কাড়িয়া;···সহজে কি ন্যায় ছেড়ে?
দশটা আঙুল বঁড়শীর মত মাংসে বসেছে গেড়ে!
লইনু কাড়িয়া ঝট্‌কান দিয়া; লট্‌কান রাঙা দাঁতে
জিভটা বুলায়ে বলে রাক্ষসী কর হানি বুকে-মাথে,
'মরি,···মরে যাই,···ক্ষিদের জ্বালায়,···বুকে পিঠে খিল ধরে
একে অনাহার তাহে লোহু ক্ষয় দেহ ঝিম্ ঝিম্ করে,
একমুঠা ভাত ভিখ্ পাওয়া ভার দুর্ভিক্ষের দিনে
ধিক্ দিল শুধু ভিখ্ দিল নারে সবারে নিয়েছি চিনে,
কেউ দিলে নাক',···বিধাতা দিয়েছে,···এ মোর মুখের গ্রাস
কোথা হ'তে এলি তুই চণ্ডালী!···কেড়ে নিয়ে কোথা যাস্?"
দাঁড়ানু থমকি' একহাতে রুখি' ক্ষুধা-উন্মাদ নারী
আর হাতে বুকে চাপিয়া শিশুরে ফেলিয়া জলের ঝারি।
আঁচলে যে ছিল ভুট্টা সেগুলো ছড়ায়ে পড়িল ভুঁয়ে;
মোরে ছেড়ে নারী ভুট্টার লোভে মাটিতে পড়িল নুয়ে।
ভুট্টার বেশী কাঁকর কুড়ায়ে চিবায় বিকৃত মুখে
ধক্-ধক্ পেট কুত্তা-ক্ষুধার দংশনে মুহু ধুঁকে।

হাঁকুপাঁকু করে কি যে গালে ভরে রুখু চুল লোটে ধূলে
চোখে জল এসে উবে গেল, তার দশা দেখে আঁখি-কূলে।
"হল না, হল না মিটিল না ক্ষুধা" সহসা ফুকারি কহে
"ফিরে দে মাংসপিণ্ডটা মোরে, খাইব তোরেই নহে।"
কথা শুনে তার আঁখি থির, ফেরে আঁখিতারা শিশু'পরে
পড়িল নজর মাংসপিণ্ড বন্ধ্যার পয়োধরে।
কহিলাম "ওরে! দিবনাক তোরে খেতে এ দুধের বাছা,
মাংসপিণ্ড চাস্ যদি নে রে এ মোর মাংস কাঁচা;
বৃথা মাংস এ বন্ধ্যার স্তন, আয় ক্ষুধাতুরা আয়
এতে ক্ষুধা যদি মেটে তোর কেটে নেরে তুই খাপ্‌রায়।
বাঁচুক প্রসূতি বাঁচুক কুমার বাঁচুক দু'দুটা প্রাণ,
বন্ধ্যার দানে বন্ধ হউক সন্তান বলিদান।
তা'সনে ঘুচুক বওয়া এ অপয়া পয়োহীন পয়োধর।"
বিস্ফারি' নারী কোটর-চক্ষু চাহে মোর মুখ 'পর!
ক্ষুধায় হন্যা বন্যের মত মুখে তার যুগপৎ
ফোটে বিস্ময়, বিশ্বাস, ভয় উল্লাস সুমহৎ।
"দেখি, দেখি, খুঁজি; না, না, না, পালাবি, আঁচলটা ধ'রে রাখি"
বলি' তরুমূলে খাপ্‌রা সে খোঁজে দুইমুখো দুটো আঁখি!
খোলা খুঁজে ফেরে ক্ষুধাতুরা নারী ঘোলা দুটা চোখ রাঙা,
দৈবে মিলিল শিকড়ের ভিড়ে আঁকষীর ফলা ভাঙা।
মুঠা ক'রে ধ'রে টুক্‌রা লোহার নেহাৎ নিকটে এসে
চোখে চোখ রেখে সুধায় "পারিবি?" নিশাসে নিশাস মেশে;
"পরের ছেলের পরাণ বাঁচাতে পারিবি সহিতে দুখ?
কাঁটাটি ফুটিলে কী ক্লেশ জানিস্?···কেটে দিবি নিজ বুক?"
"জানি রে পারিব; করিস্ না দেরী।" "বড় দেখি বুক দড়,
তার চেয়ে মোর পেটের ফসল দেরে খাই ক্ষুধা বড়।
পারবি না তুই আপনার দেহ কেটে দিতে, ঠাকুরাণী,
কেহ পারে নাক; শুধু ক্ষুধা-খেদ বাড়াইবি মোর, জানি।"
কহিনু "শবরী! আর্য্যের নারী যা' বলে কাজে তা করে;
দে' দেখি লোহাটা, মাংস কাটিয়া দিব আমি নিজকরে।"
লোহা-হাতে যেন কাঠের পুতুল চাহে সে মূঢ়ের মত
আঁকষীর ফলা দিতে মোরে করে ঈষৎ ইতস্তত।

মুঠা থেকে তার নিয়ে হাতিয়ার অধর চাপিয়া দাঁতে
দিনু বসাইয়া নিজের বুকের মাংসে নিজেরি হাতে।
ভোঁতা হাতিয়ারে ছেঁচে গেল গাটা, টপ্ টপ্ লহু ঝরে,
শিরে উপশিরে শিহরে তড়িৎ তীক্ষ্ণ ব্যথার ভরে!
আবার হানিনু,—নিশ্বাস রুধে; নাড়ী-ছেঁড়া একি ব্যথা,
চক্ষু ঠিকরে যন্ত্রণা ভরে ঝিম্ ঝিম্ করে মাথা।
টলমল মন, টলমল পণ, সজারুর কাঁটা—চুল,
সংজ্ঞা টুটিলে টুটে প্রতিজ্ঞা,—এই ভয়ে সমাকুল।
সহসা কাঁদিয়া উঠিল ছেলেটা, যন্ত্রণা গেনু ভুলে;
অশরণ সেই মুখ চেয়ে, আঁখি ঝটিতি ঊর্দ্ধে তুলে,
"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" কহিলাম মনে মনে
নিজেরে সঁপিনু বিশ্ববোধের বুদ্ধের শ্রীচরণে।
তারপর শুধু দৃঢ় করি মুঠা নিজেরে হেনেছি নিজে
জানিনা কখন লোহুর বদলে পীযূষে উঠেছি ভিজে!
পাগলের মত কেবলি হেনেছি, যন্ত্রনা-বোধ হারা,
জানি নাই ছেঁড়া হাজারো নাড়ীতে ঝরিছে দুধের ধারা!
মমতায় লোহু ক্ষীর যে হয়েছে জানিতে পারিনি আমি
বুদ্ধের বরে বন্ধ্যার বুকে পীযুষ এসেছে নামি!
হুঁশ ছিল নাক' দুর্দ্দম বেগে হেনেছি দু'চোখ মুদে,
জ্ঞানিনে বসনে রক্তের লেখা ধুয়ে গেছে দুধে দুধে!
ভাঙিল চমক শবরীর স্বরে, কহে সে "চমৎকার!"
অঞ্জলি ভরি পিয়ে ক্ষুধাতুরা বন্ধ্যার ক্ষীরধার!
ক্ষত-ক্ষীণ স্তনে পান করে মাতা ক্ষতহীন স্তনে ছেলে—
স্বপ্ন এ যেন দেখি জাগ্রতে বিস্মিত আঁখি মেলে!
ক্ষুধা-উপশমে কহিল শবরী "মা! তুই জীবনদাতা
উপোষে যে পশু হ'তে বসেছিল বাঁচাইলি তারে, মাতা!
তুই দেবী, তুই অঘট ঘটাস্; চরণে নোয়াই শির;
ক্ষীরমাতা ক্ষীরভবানী গো তোর লোণালহু মিঠা ক্ষীর!
এ ছেলে তোমার, নিয়ে যাও তুমি, জীবন দিয়েছ এরে,
আমি রাক্ষসী ক্ষুধার তাড়নে চেয়েছি ফেলিতে মেরে।
আমার বুকে মা স্তন্য নাহিক, আমার জঠরে ক্ষুধা,
পেটে যা ধরেছি বাঁচাতে পারি যে নাহি মা বুকে সে সুধা।

তাহার উপর ক্ষুধা বর্ব্বর, মানে না পেটের ছেলে,
জঠরে আগুন জ্বলিলে কি ঘটে জানিনা মা ক্ষুধা পেলে।
নিয়ে যাও ছেলে, দয়াময়ী দেবী, নিয়ে যাও তুমি ওরে,
বাঁচে যদি, বড় হয় যদি, মায়ী! রেখো কিঙ্কর ক'রে।
নিয়ে যাও মাতা; মায়ের মমতা কলিজায় জ্বালে বাতি,—
আপন মনের প্রভু নই মোরা অবর শবর জাতি।
ও ছেলে তোমার, কিনেছ ও তুমি নিজের মাংস দিয়ে
লোভ করিব না, চলে যাই আমি বাছার বালাই নিয়ে!"
এত বলি ছুঁয়ে শিশুর ললাট কঙ্কাল-করে খালি
স্খলিত গমনে মিলাইল বনে এলোকেশী কঙ্কালী।
আমি ফিরে এনু, ছেলে নিয়ে, স্বামী, সঁপিতে তোমার কোলে,
আর পায়ে তুমি ঠেলিতে আমারে নারিবে বন্ধ্যা ব'লে।
ভিখ্ দেছে দুর্ভিক্ষ আমারে নিধি দেছে আলো-করা,
বুকের মাংস বিনিময়ে, ত্থাখো, পেয়েছি কী!—বুক-ভরা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মাটকোঠায়

"জুতো খুলে উঠে বসুন।"

"না, বেশ আছি। এখুনি যাবো।"

"বসবেন না? তবে এলেন কেন?"

"এমনি।"

"পান খাবেন?"

"পান খাই না।"

"হাসছেন যে? আমার ঘরে গান্ধী-মহারাজের ছবি দেখে?"

"গান্ধী-মহারাজকে দেখে কি কেউ হাসতে পারে?"

"আচ্ছা, গান্ধী-মহারাজ নাকি গঙ্গা শুকিয়ে দিয়েছিলেন?"

"গঙ্গা? কোথাকার গঙ্গা?"

"বড়বাজারের?"

"তা তো শুনিনি।"

"সবাই তো বলছে। আচ্ছা, ওঁকে নাকি গুলি মেরেছিল, তাতেও নাকি মরেন নি?"

"গুলি মেরেছিল? কে? তাঁকে গুলি মারতে যাবে কেন?"

"কোথায় থাকেন? কাছেই নাকি?"

"কাছেও নয়, দূরেও নয়।"

"তবুও?"

"শ্যামবাজারে।"

"শ্যামবাজারে? আমিও তো সেখানেই ছিলুম, সাত বছর। ফড়েপুকুরে থাকতুম, হরি-মিত্তিরের কাছে। তারপর সে চোলে

গেল। তখন থেকে এই অবস্থা, মাটকোঠায় এসে ঢুকেছি।

"এই সেদিন ছাখা হয়েছিল। বল্লুম এসো। বল্লে—নাঃ আর কেন?

"হরি-মিত্তির গিলাণ্ডারের আপিসে কাজ করে। বুড়োর মত হয়ে গেছে। মনে তো সুখ নেই! অমন ছেলেটা অকালে মারা গেল!

"ছোটবেলা থেকেই ছেলেটার কী বুদ্ধি! একদিন আমার ঘরে এসে হাজির। বয়স তখন কতই বা, এগারো বারো হবে, বড় জোর তেরো। বল্লে, তুমি আমার বাবাকে কেন ধোরে রেখেছ? আমি বল্লুম, সে কি? ধোরে রাখতে যাবো কেন? সে বল্লে, বাবা কোথায়? আমি বল্লুম, সকালবেলা মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। বল্লে, মিথ্যে কথা বলছো, তোমার ঘর দেখবো। বোলে ঘরে ঢুকে তক্তাপোষের নীচে, বাকসো প্যাঁটরার পাশে, ঘরের এধার ওধার চারিদিক দেখলে, খুঁজে না পেয়ে বল্লে, নাঃ নেই। মা মোরে গিয়ে পর্য্যন্ত বাবাটা ভারি—হয়ে গেছে। কি একটা ইংরিজি কথা বল্লে। অতটুকু ছেলে ইংরিজি কথা শিখেচে! কী বুদ্ধি! বাঁচবেনা কিনা! তারপর বল্লে, তোমার ঘরের সব জিনিস বাবার, এসব নিয়ে যাবো। আমি বল্লুম, তোমার বাবার হবে কেন? সে রেগে বল্লে, হ্যাঁ আমি জানি, এ-সব বাবার। বোলে দেয়ালগিরিটা তুলে নিয়ে চোলে গেল। বাড়ীউলি বল্লে, যাকগে বাপু, আর গোলমাল করিসনি। খানিক পরে কি জানি কি মনে কোরে আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

"হরি-মিত্তির সব শুনে ছেলেকে ডেকে বলেছিলো, ছিঃ বাবা, ওখানে কি তোমার যেতে আছে? ছেলেও তেমনি! বলে কিনা, তুমি যাও কেন?

"হরি-মিত্তির যেদিন চোলে গেল মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা। ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর বোসে দুহাতে মাথাটা চেপে ধোরে কাঁদতে লাগলো। বল্লুম, ওকি, কাঁদছো কেন? কি হয়েছে? সে বল্লে, পঞ্চু মারা গেছে। আমার বাইস বছরের ছেলে, তিন-তিনটে পাশ দিয়েছিল! আমায় পথে বসিয়ে গেছে! অনেকক্ষণ কাঁদলে। বল্লুম, কেঁদে কি করবে! যাঁর জিনিস তিনিই নিয়েছেন! তুমি আমি কি করতে পারি! বল্লুম, একটা পান খাও। বল্লে, না আর পান খাবনা। যখন আসতুম যেতুম তখন পান খেতুম। এখন আর নয়। বল্লুম, তবে বিড়ি-টিড়ি কাছে থাকে তো খাও।

"একটা বিড়ি ধরিয়ে খেলে, তারপর চোলে গেল। আর আসে নি।

"ওকি? না না ও রাখুন, দিতে হবেনা। আপনি তো বসলেন না।"

"তাও কি হয়, তোমার এতটা সময় নষ্ট করলুম। নাও।"

"আপনার দয়া!"

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবাহে পণ-প্রথা

আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহে পণের অত্যাচারের আন্দোলন স্বর্গীয়া স্নেহলতা ও তাঁহার অনুবর্ত্তিনীদিগের আত্মাহুতিতেও থামিতে পারিল না। ইহাতে শাস্ত্র ও হিঁদুয়ানীর কোন সম্পর্ক না থাকিলেও বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার বিরুদ্ধেও প্রাচীন প্রথা চালাইবার চেষ্টাই তাহার প্রধান কারণ। পুরুষদিগের বিবাহের বয়সের কোন সীমা না থাকায় বিদ্যা ও অর্থ-উপার্জ্জনের সমস্যার সহিত তাঁহারা পূর্ব্বের মত অল্পবয়সে বিবাহ করিতে রাজি হইলেন না, অথচ মেয়েদের বিবাহের বেলায় আগের আদর্শই বজায় রহিল, সুতরাং বরদের ঘুষ দেওয়া আবশ্যক হইল। এদিকে ইংরেজী পাশের দর ও মাহাত্ম্যও অযথারূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতিভেদের সঙ্কীর্ণ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে প্রতিযোগিতা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। যখন একপক্ষে কোন তাগিদ নাই ও অপর পক্ষে গরজ এত অধিক, তখন অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম এখানেও যে কাজ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এইরূপে হিন্দুবিবাহের এত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা স্বত্ত্বেও আমাদের দেশে ইহা যেরূপ দোকানদারীতে দাঁড়াইয়াছে, এমন ত কোথায়ও আছে বলিয়া শোনা যায় না! ইহার জন্য বাধ্য হইয়া অনেক স্থলে মেয়ের বিবাহের বয়স কিছু বাড়িতেছে বলিয়া অনেকে শুভ চিহ্ন মনে করিতেছেন বটে, এবং তাহা কতকাংশে শুভ চিহ্নও, সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্দ হইতে অবশ্যম্ভাবীরূপে যে-ভাল অন্ধভাবে আসিয়া পড়ে, তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ ভালো ফল কখনও পাওয়া যাইতে পারে না। এক্ষেত্রেও তাহাই হইতেছে। প্রথমতঃ আগে যে সময়ে হইত, এখনও প্রায় সেইরূপ এগারো-বারো বৎসর বয়স হইতেই মেয়ের বিবাহের খোঁজ আরম্ভ হয়। টাকা ও পাত্র যাঁহারা যোগাড় করিতে পারেন, তাঁহাদের ঐ বয়সেই "দায়" উদ্ধার হইতে কোন বাধা থাকে না। কাজেই বিবাহের বয়স যে সম্পূর্ণরূপে বাড়িয়াছে তাহা বলা যায় না। এদিকে যেস্থলে বাধ্য হইয়া দেরী হইতেছে সেখানেও তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ তাঁহাদেরও একান্ত বালিকার মতই কোন মতামত না লইয়াই বিবাহের ব্যবস্থা হয়। বরং তাঁহাদের সম্বন্ধেই কোনরূপ নির্ব্বাচনের অবসর থাকে না। কারণ "দায়" তখন আকণ্ঠ, কোনরূপে উদ্ধার পাইলেই হইল! সুতরাং যে-সকল বালিকার বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হইতেছে, বিবাহ কি জিনিষ বুঝিতে শিখিতেছে, বাজারের বাছ-পড়া রদ্দি মালগুলিই তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। তাহার মধ্যে বিপত্নীকের দলই প্রধান।

কিন্তু এই সকল দুর্ভাগা মেয়ের মনের দিকে চাহিবার কথা কখনও কি কাহারও মনে আসিয়া থাকে? তাহারাও জন্ম-অপরাধী, আপনাদের মনের দিকে ভাল করিয়া তাকাইতেও কখনও বোধ হয় তাহাদের সাহস হয় না। কিন্তু তবু উহারই মধ্যে প্রকৃতি আপনার কাজ একেবারে বন্ধ করেন না। দেওয়াল, বেড়ার ফাঁকের মধ্য

দিয়া হয়ত তাঁহার বাণী তাহাদের কানেও পৌঁছিয়াছে। কালের বাতাসের ঢেউও তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ লাভ করিতেছে। তাহাদের মনে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা, জীবনের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা সকলই হয়ত অস্পষ্টরূপে জাগিয়াছে। এমন সময় গুরুজনদের সহিত দরে বনিয়া গেল, ও বর স্বয়ং আসিয়াই পরখ করিয়া দয়া হইলে পছন্দ করিয়া তাহাদের পিতৃমাতৃকুলের চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া গেলেন। এইখানে একটি কথাও না বলিয়া পারা যায় না, পূর্ব্বে দুইপক্ষই বালক-বালিকামাত্র থাকিত এবং গুরুজনে দেখিয়া সম্বন্ধ স্থির করিতেন। সে প্রথা এখনকার কালের হিসাবে যতই পশ্চাৎপদ হউক, তাহার পরস্পর-সঙ্গতি ছিল। কিন্তু এখন বর বয়স্ক, সুতরাং তিনি গুরুজনদের নির্ব্বাচন মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। এদিকে কন্যার বয়স সে আন্দাজে বাড়ে নাই, এবং যাহা বাড়িয়াছে, তাহাও কিছুমাত্র স্বীকার করা হয় না। সেটা বিবাহ-বাজারে তাহার একটা গুরুতর ত্রুটি মাত্র। সুতরাং এখন বিবাহে বর-কন্যার যে বৈষম্য ইহা আমাদের দেশেও আগে ছিল না। বাস্তবিক আমাদের জেদের বশে কালের প্রভাব অস্বীকার করিয়া সামাজিক সকল ব্যাপারেই যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে যে কত সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এবং তাহার ফল অবশ্য পনেরো আনা পড়িয়াছে মেয়েদেরই উপর। সুতরাং এই সমস্ত-পৃথিবী-ব্যাপী নূতন জাগরণের, মেয়েদের সকল-বিষয়ে মনুষ্যত্ব-লাভের দিনে আমাদের দেশে তাঁহাদের অবস্থা অনেক বিষয়ে অধিকতর শোচনীয়ই হইয়া উঠিতেছে। জেদ ছা
সকল বিষয় সত্যের আলোকে নূতন ক
দেখিবার চেষ্টা না করিলে রাজনৈতিক
যতই জয়লাভ হউক, দুর্গতি ঘুচিবার
অন্যায় যে ক্ষেত্রেই হউক, তাহার
সমস্ত সমাজে ও রাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়িবেই।

এই প্রসঙ্গে বিবাহের অন্য বিষয়ের সংস্কা
আভাষ মাত্র দিয়া অর্থনৈতিক সমস্যা
সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

মেয়ের বিবাহ নির্দ্দিষ্ট বয়সে দি
অবশ্য-বাধ্যতা দূর হইয়া বিবাহটাকে "দা
হিসাবে দেখার সংস্কার হইতে মুক্ত করি
পারিলে, ও ইংরাজী পাশের মাহাত্ম্য ক
আসিলে, বরের দর আপনা হইতেই ক
আসিবে। এদিকে (জাতিভেদ-প্রথা
সম্পূর্ণ দূর না হইলেও) নির্দ্দিষ্টশ্রেণীর
বিবাহের নিয়মের বন্ধন কিছু শিথিল হইবে
নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র অনেকটা প্রশস্ত হ
পড়িবে। এ কথা মনে রাখা উচিত, আমাদে
দেশে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার কোন বৈষম্য নাই
মেয়ের সংখ্যাই বরং কিছু কম, সুতরা
মেয়ের বিবাহের স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকত
আমাদের দেশে নাই। তাহার পর আমাদে
এই দরিদ্র দেশে বিবাহাদিতে যেরূপ অর্থ
ব্যয়বাহুল্য হয়, এই অর্থ-সঙ্কটের দি
কোনমতেই তাহার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে
এই সাবধানতার জন্য সামাজিক প্রথাগুলি
সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেও অর্থ-লালসা অনে
কমিয়া যাইতে পারে। কারণ অনেক সময়ে
দেখা যায়, পাত্রীপক্ষের রক্ত-শোষণ করি
যে টাকাগুলি আদায় করা হয়, তাহা
অধিকাংশই বরপক্ষ অপরপক্ষের বিবা

ধুমধাম করিয়া খরচ করিয়া ফেলেন। এই স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক মনে হয়। জোর করিয়া আদায় করা ঘৃণার্হ হইলেও কন্যার পিতার কন্যাকে অবস্থানুযায়ী অর্থালঙ্কারাদি দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রচলিত আইন অনুসারে কন্যা যখন সম্পত্তির অংশ পান না, তখন তাঁহাকে একেবারে বঞ্চিত করা কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ আজকালকার এই বস্তুতন্ত্রতার দিনে কন্যার নিজহস্তে জীবন আরম্ভ করাও গৌরবজনক নহে। সকল বিষয়ে অযথা অপব্যয় নিবারণ করিয়া, অলঙ্কার যেমন কন্যার আপন সম্পত্তি, সেইরূপ অবস্থানুযায়ী কিছু অর্থও কন্যার নিজ-নামে দেওয়া কর্ত্তব্য। বরপক্ষের অবশ্য তাহাতে কোনই অধিকার থাকা উচিত নহে। বাস্তবিক আমাদের দেশে মেয়েদের যখন উপার্জ্জন করার কোন পথই খোলা নাই, তখন ছেলেদের—যাহাদের নিজহস্তে উপার্জ্জন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করাই সর্ব্বথা হিতকর ও কর্ত্তব্য তাহাদের—জন্য অতিরিক্ত টাকা জমাইবার নেশা কখনই উচিত নহে। মানুষের জীবন অনিশ্চিত, সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত না তাহারা উপযুক্ত হয়, ততদিন যাহাতে তাহারা অভাবগ্রস্ত না হয়, তাহার জন্য, আপনার বৃদ্ধ বয়সের জন্য ও পত্নীর জন্যই সঞ্চয় আবশ্যক। উপযুক্ত পুত্রদের জন্য মৃত্যুর পর কতকগুলি টাকা রাখিবার চেষ্টা ন্যায় এবং কালধর্ম্ম সকলেরই বিপরীত। তাহাতে তাহাদের উপকার না হইয়া অনেক স্থলে অপকারই হইতে দেখা যায়। এ বিষয়ের নেশা ও মোহ কাটিলেই মেয়েকে দেওয়া সহজ হইয়া পড়িবে। এদিকে স্বভাবতঃই তাহাতে বিবাহ-বাজারে মেয়ের দাম বাড়িয়া যাইবে। বাস্তবিক আমাদের সকল কাজই যে কিরূপ মোহাচ্ছন্ন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা মেয়ের জন্য এতগুলি টাকাও খরচ করি, অথচ তাহার স্থায়ী সম্মান-লাভের কোন ব্যবস্থা করি না!

বঙ্গনারী।

অভিনেত্রী

সে ছিল অভিনেত্রী। কলুষিতা মায়ের কলঙ্কের নিশান! কলঙ্কের পশরা মাথায় করে সে জন্মেছিল। কলঙ্কিত নারীত্বের কলঙ্ক সে;—তবুও পাঁকে-ফোটা পদ্মের মতই সে ছিল পবিত্র, নির্ম্মল। বহির্জগৎ তাকে জান্‌ত অপবিত্রা ব'লে। দিন-রাত যেখানে রূপের ব্যবসা চলে, ভগবানের নারীত্বের যেখানে বীভৎস অপব্যবহার হয়—তার মাঝে কি কখনো পবিত্র জিনিস থাকতে পারে? কিন্তু তবুও সে ছিল নির্ম্মল—তবুও সে ছিল নিষ্পাপ। জ্ঞানের উন্মেষ থেকেই সে দেখে এসেছে রূপের ব্যবসা। রজনীতে যেখানে পৈশাচিক আনন্দের হর্‌রা, দিবসের আলোক-সম্পাতে সেখানে নরকের বীভৎস

প্রতিকৃতি। সারা-রজনীর উদ্দাম উল্লাসের পর প্রভাতের নেশা-জড়ানো ম্লান অবসাদ! সে দেখে এসেছে অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা প্রেমের কলুষিত পৈশাচিক অভিনয়—যেখানে হৃদয় নেই, প্রাণ নেই, রূপ নেই; শুধু মিথ্যা, শুধু প্রতারণা, শুধু অভিনয়! এই-সব দেখে এই-সবের ভিতরে বর্দ্ধিত হ'য়ে সে একটা নূতনত্বের মত চারিদিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হ'য়ে বর্দ্ধিত হয়েছিল। বুঝি সে শুন্‌তে পেয়েছিল পবিত্রতার সুখ; বুঝতে পেরেছিল সে প্রতারণায় বীভৎসতা। তাই বীভৎসতার মধ্যে বর্দ্ধিত হ'য়েও বীভৎসতা তার কাছে বীভৎসই ছিল।

তাই সে হয়েছিল অভিনেত্রী। যেখানে সত্য নেই, হৃদয়-ভরা সত্য ভালবাসার অবকাশও নেই, সেখানে অভিনয়ের ভিতর দিয়ে যদি সে নিজের হৃদয়ের অতৃপ্তিটাকে ঢাক্‌তে পারে! কলঙ্কিতার গর্ভজাত সে—জগতের নিয়মে ভালো কিছু পাবার যে তার অধিকার নেই। সেই অতৃপ্তির মাঝে, সেই আকুল বেদনার মধ্যে একটু তৃপ্তিও যদি সে পায়! তাই সত্যের মিথ্যা অভিনয়ের মধ্যে সে আপনাকে পূর্ণপ্রাণে ঢেলে দিয়েছিল। অভিনয়কেই সে তার জীবনের সার করেছিল। যখন সে অভিনয় কর্ত্তে নাম্‌ত, দর্শকবৃন্দ তখন আর অভিনেত্রী মলিনাকে দেখ্‌তে পেত না, তারা দেখ্‌তো—অভিনীত অংশের জীবন্ত নায়িকাকে,—কবির মূর্ত্তিমতী কল্পনাকে। সেখানে তার নিজের স্বরূপতা প্রকাশ পেয়ে ভেসে উঠ্‌ত। প্রাণের ভিতর থেকে তার গভীর ভাব ফুটে উঠ্‌ত—তাই বুঝি তাকে অমন ক'রে ভূমিকার সঙ্গে মিশ্‌ খাইয়ে দিত। ধীরে ধীরে অঙ্কের পরে অ কেটে যেত—ক্রমে অভিনয়-শেষে যবনি পড়ত, দর্শকেরা যে যার বাড়ী চ'লে যে তখন শূন্য রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে গভী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ত সেই রঙ্গমঞ্চে যে সে নিজেকে আবার সংসারে সত্য নায়িকা রূপে ফুটিয়ে তোলে! সে রঙ্গমঞ্চ তাকে যে তৃপ্তিটুকু দিয়েছিল—তা যে সে আর কোথাও পায়নি!

এম্‌নি ভাবেই তার দিন কেটে যাচ্ছিল—কেটেও তাই যেত হয়ত। অন্ধকারময় জীবনের পথে অন্ধের মত ভয়ে ভয়ে পা ফেলে ফেলে সে যাচ্ছিল—আলো দেখ্‌বার আশা সেখানে করেনি! মানব-চিত্তের প্রেমের ক্ষু তার পক্ষে সত্যের সত্যতায় পূর্ণ হ'বার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাই কল্পনার মধ্য দিয়েই সে দুর্লভকে পাবার চেষ্টা করেছিল। কল্পনাই তার ক্ষুধিত প্রাণের তৃপ্তি হ'য়েছিল। দিন হয়ত এম্‌নি ভাবেই কেটে যেত—এই আধ-তৃপ্তি নিয়েই। কিন্তু তা' হলো না। সে হঠাৎ আলোর আভাস দেখ্‌তে পেলে—প্রেমের জগতের উজ্জ্বল আলো একটা রশ্মি তার অন্ধকার ঘরের ছিদ্র প প্রবেশ করলে। সে ত তা চায়নি—চাইবার সাহসও যে তার ছিলনা! তবু এ সে পে ছিল।

দর্শকের আসনে বসে একজন তা দেখেছিল—ব্যর্থতার প্রতিমূর্ত্তি, অশ্রুর মূর্ত্তি মতী ছবি। অভিনয়ে তার হৃদয়-ভরা আবে তাকে সত্য-সত্যই অশ্রুময়ী নায়িকার জীব ছবিতে, সত্যকার মূর্ত্তিতে পরিণত ক' তুলেছিল। সমস্ত অভিনয়ের মধ্য দি

এক স্বপ্নরাজ্যের ব্যর্থ প্রেমিকা যে স্বপ্নময় ভাবে রঙ্গমঞ্চে আসছিল, যাচ্ছিল—প্রাণের তন্ত্রীর ঝঙ্কার কেঁদে কেঁদে যার ব্যর্থ প্রেমের বদ্ধ দুয়ার থেকে ফিরে যাচ্ছিল, সমস্ত দর্শকের প্রাণে সে ঝঙ্কার গিয়ে সত্যের মতই বেজে-ছিল। সব-চেয়ে বেজেছিল একজনের নির্ম্মল প্রাণের নিভৃত বন্দরে, যেখানে কোনও রেখাপাতি তখনও হয়নি। প্রথম প্রভাতের আলোক-রেখার মত; মূক স্তব্ধতার মাঝে সে প্রথম সুর-ঝঙ্কার একটা করুণ রাগিণীর মত তার তরুণ হৃদয়কে আলোড়িত ক'রে ফেলেছিল। একটা তীব্র অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস তার বুকের ভিতরে সাড়া দিয়ে উঠেছিল। সে ভেবেছিল, তার ক্ষুদ্র জীবনের অতি-ক্ষুদ্র শক্তিকণা দিয়ে সে কি একটা জীবনকেও পরিণত ক'রে তুল্‌তে পারে না? তার একফোঁটা অশ্রু কি অত-বড় শুষ্ক মরু-ভূমিকে তৃপ্ত কর্‌তে পার্ব্বে? কিন্তু একফোঁটা হ'লেও সে ছিল তার হৃদয়-গলা অশ্রু। সে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল।

মলিনার জীবনে সে কি মহা জাগরণের মুহূর্ত্ত! হতাশার মধ্যে তার সে কি আনন্দময় আশা-ভরা অনুভূতি! সে ত কিছু নয়! শুধু 'কিছু নয়' না—তার চেয়েও সে নীচে যে! কত যুগ-যুগান্তরের পবিত্রতার পিপাসা যে সেই মলিনা বালিকার অতৃপ্ত হৃদয়ে জেগে উঠেছিল, কে জানে? সেই তৃষ্ণার তৃপ্তি! মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিকও বোধ হয় জল দেখে অমন তৃপ্ত হয় না—যতখানি তৃপ্তি সে পেয়েছিল। তার ব্যর্থ নারীত্বের সম্মান সেখানে যে ধ্বনিত হচ্ছিল! তার জীবন যে ছিল অনন্ত ব্যথা—তার মাঝে কে এলো গো, হাতে নিয়ে পূর্ণ পরিত্রাণ! অনন্ত আশ্বাসে নয়ন তার অশ্রুতে ভরে এল, বুকে যে তৃপ্তির, সুখের অনন্ত তুফান উঠ্‌ছিল তাকে দমন করা ত সহজ কথা নয়।

পবিত্র সুন্দর বিবাহিত জীবনের আশা তার সম্মুখে। সে কি তৃপ্তি! সে কি শান্তি! কি আনন্দ! সারাজীবন যে সে এরই আরাধনা ক'রে এসেছে! হে চিরবরেণ্য প্রভু, তার হৃদয়ের ব্যথায় তুমি আশ্বাস-রূপে এসেছ; হাতে দিয়ে পাঠিয়েছ তার সারা-জীবনের কামনার পূর্ণ তৃপ্তি, অনন্ত আকাঙ্ক্ষার শান্ত সুন্দর সমাপ্তি! কিন্তু এত বড়, এত উচুঁ হৃদয় নিয়ে যে এসেছে—তার মাথায় কি সে তার এত-বড় ব্যর্থ জীবনের আকুল ব্যর্থতা তুলে দিতে পারে? তার অনন্ত অতৃপ্ত জীবনকে যে ফুলে-ফলে ভরে দিতে এসেছে, তার সারা ভবিষ্যৎকে কি সে ব্যর্থ ক'রে দিতে পারে? যে কলঙ্কের ভার বহন ক'রে সে জন্মেছে, সে নিজে পবিত্র—হ'লেও মানব-সমাজ যে তার পবিত্রতার অধিকার-দাতাকে হীন চোখে দেখবে! জীবনের প্রথম ঊষার অরুণ—তার ব্যর্থতা সে দেখ্‌তে পার্ব্বে না!

তীব্র পিপাসা তার! শীতল নির্ম্মল জলধারা তাকেই তৃপ্ত কর্ত্তে তারই দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। দূর থেকে সে একবার স্তব্ধ বিস্মিত নয়নে চেয়ে দেখ্‌লে। নব মিলনের আশা রাগিণীর শেষ রেশ তখনও মিলিয়ে যায় নি! নব-প্রভাতের অরুণ-রশ্মি তখনও তার হৃদয়-ভিত্তির উপর স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ কচ্ছিল। তার নিজের গড়া দেওয়ালে তখনও সে বাধা পায়নি, অনন্ত বাসনাময়

চোখ নিয়ে সে চেয়ে দেখ্‌লে—ফুটে উঠেছিল সেখানে অনন্ত তৃপ্তির অতৃপ্ত আভাষ। সে দৃষ্টি স্নিগ্ধ, সৌম্য, শান্ত, ত্যাগের মহিমায় তা' উজ্জ্বল।

নিজের গাঁথা ফুলের মালা নিজে সে ছিঁড়ে ফেল্‌লে! নিজের পোষা আশার বিহঙ্গটিকে নিজেই সে উড়িয়ে দিলে শীতের বরফ-গলা বাতাসে। নিজের হাতে সে পর্দ্দা নামিয়ে দিলে তার জীবন-সূর্য্যের আলো বন্ধ ক'রে। তার নারীত্বের পূর্ণ মহত্ত্ব ফুটে উঠ্‌ল সেইখানে। সেইখানে হ'ল তার ব্যর্থ নারী-জীবনের অপূর্ব্ব-সুন্দর পরিণতি!

* * *

স্তব্ধ নিশীথে মেঘে-ঢাকা চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় সাগর-বাহিনী নিজের ব্যথা গাইতে গাইতে ছুটে চলেছিল, দু'পাশে দাঁড়িয়ে তার গাছের সারি, দুর্ব্বোধ ভাষায় তারা কি-সব যেন কথা কচ্ছিল। চারিধারে বিরাজ কচ্ছিল এক মূক নীরবতা। এর মাঝে এক জায়গায় জলে একটু শব্দ হলো; একবার কতকগুলো বিপরীত ঢেউ নদীর স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তারপরে ধীরে ধীরে আপনাদের হারিয়ে ফেল্‌লে। তারপর আবার সব স্থির হয়ে গেল। আর এরই মাঝে একটা প্রদীপ অনন্ত মহিমা বক্ষে নিয়ে নিভে গেল। শুধু আকাশের কোলে তারাগুলোর চোখে একফোঁটা সহানুভূতির অশ্রু চিকমিক ক'রে উঠ্‌ল।

"অশোক"

বাঙ্গালী হিন্দু-নারীর মর্য্যাদা

পরাধীন ভারতবাসী যখন কংগ্রেস ইত্যাদি করিয়া রাশীকৃত আবেদন ও অশ্রুজল সাত-সমুদ্র তেরো নদীর অপর পারে পাঠাইয়া দিল, তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি না হইলেও এদিক-সেদিক হইতে সমালোচনা-বৃষ্টি যে হইয়াছিল তাহা আমরা জানি, আর তাহার ফলে যে ভারবর্ষের নাম দুই-একবার পার্লামেণ্ট মহাসভায় উঠানো হইয়াছিল এবং দেশবাসীর পক্ষ হইতে যে করুণ-পন্থীদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহাও আমরা জানি। কিন্তু সে আবেদন ও অশ্রুজলের কোনও প্রকৃত ফল ফলিয়াছিল কি? যাঁহারা বলিবেন ফলিয়াছিল, তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান ভারত ইতিহাসখানি আর একবার চশ্‌মা খুলিয়া পড়িতে অনুরোধ করি।

ঠিক ঐ-রকমের আবেদন ও অশ্রুজল লইয়া কয়েকজন লেখিকা মাসিক পত্রিকায় পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তবে পার্থক্য এই, সকল পাঠক-পাঠিকাই ঘরের লোক, আপনার জন। যাঁহারা সাত সমুদ্র তেরো নদীর অপর পারে বাস করেন তাঁহাদের মত ইঁহারা দেশের অবস্থা ও সমাজে অজ্ঞ ও সহানুভূতি-শূন্য নন। তবু এই প্রকার আবেদনে ও অশ্রুজলে যে কোনও সুফল ফলিবে তাহা আমাদের একবারেই মনে

হয় না। আবেদন ও অশ্রুজলের ফলে ভিক্ষা মিলিতে পারে, কিন্তু সে ভিক্ষাতে যে জগতের নর-নারী-আকাঙ্ক্ষিত মনুষ্যত্বই দলিত ও অপমানিত হইবে!

সকলেই জানে, বাঙ্গালী পুরুষ তাহার পুরুষত্ব দেখায় অন্তঃপুরে আসিয়া। বহির্জগতে তাহার প্লীহা সহজেই ফাটিবার অবকাশ পায়, সেখানে তাহার মান-সম্ভ্রম অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে রক্ষিত হয় না। রাস্তা-ঘাটে, খেলার মাঠে, রেল-ষ্টেশনে আর হাসপাতালে, আদালত ফৌজদারীতে—এমন-কি স্কুল-কলেজে পর্য্যন্ত কোন আসামী আপনার মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। কথায়-বার্ত্তায়, চাল-চলনে তাহার অপুরুষোচিত সঙ্কোচ, দুর্ব্বলতা ও সহায়-হীনতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। যে কারণেই হউক পুরুষের স্বভাব তেমন ভাবে বিকশিত হইতে পারে নাই। সেইজন্যই পুরুষ তেমন ভাবে নারীকে বহির্জগতে ডাকিয়া আনিতেও পারে নাই। নিজের অপমান পকেটে পূরিয়া রাখিতে পুরুষ অনেকটা শিখিয়াছে, কিন্তু নারীর অপমান এতই কষ্টপ্রদ ও অসহনীয় যে, সে অপমানের প্রতিশোধ না লওয়া পর্য্যন্ত পুরুষ ঠিক থাকিতে পারে না। কিন্তু পুরুষের বাহুতে শক্তি নাই, হৃদয়েও বল নাই, তাই নারীকে সে সঙ্গিনী করিতে পারে নাই; অন্তঃপুরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া সে নারীর সম্বন্ধে এক নূতন প্রকার নীতি-তন্ত্র গড়িয়া ফেলিয়াছে।

মুসলমান ভারতের কথা না বলাই ভাল। তখন আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মানের জন্য, শাস্ত্রের নিষেধের জন্য নয়, হিন্দুনারী অন্তঃপুরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হিন্দু ভারতের সময় পুরুষকে যুদ্ধ করিতে হইত, আর সেই পুরুষের জননী হইতে হইত নারীকে। নারী না হইলে নূতন যোদ্ধা আর জন্মিবে না, দলের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, সুতরাং নারীর আদর হইয়াছিল তখন অত্যন্ত অধিক, আর তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল অন্তঃপুরে বা গ্রামের মধ্যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের অনেক পশ্চাতে। আর বিবাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল অন্য গোত্রে বা ভিন্ন গ্রামে, আর অদল-বদলে অর্থাৎ নারী-প্রদানে ও নারী-গ্রহণে। তখন যুদ্ধে জয় লাভ করিলে জেতার দৃষ্টি পড়িত সর্ব্ব-প্রথমে নারীর উপর। সুতরাং প্রাচীন হিন্দু নারীকে দেখিত জননীত্বের দিক হইতে। সেই জন্য সমাজ বন্ধ্যা নারীকে অশুভ ও অকল্যাণের হেতু বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আর পুত্র না হইলে নারীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল পুন্নামক নরকে। আর সেইসঙ্গে গঠিত হইয়া পড়িয়াছিল সুপ্রজনন বিদ্যার রীতি-নীতি, যাহার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায় পঞ্জিকায় ও শাস্ত্র ইত্যাদিতে। সুতরাং দেখা যাইতেছে নারীকে অপমানিত করিবার জন্য ঐ সকল বিধি-ব্যবস্থা গঠিত হইয়া উঠে নাই। দলকে ও জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই ঐ সকলের সৃষ্টি হইয়াছিল।

আরও অনেক পূর্ব্বে সমাজের সকল শক্তিই ছিল নারীর হাতে। তখন পুরুষকে খাওয়াইতেন-পরাইতেন নারী। ঘরের কাজ ছিল পুরুষের হাতে, আর নারীর স্থান ছিল তখন বহির্জগতে। নারী যখন দেখিলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের কাজ-কর্ম্ম পুরুষের দ্বারাই ভাল

চলে, সন্তান প্রসব করিয়া পুরুষকে দুর্ব্বলও হইতে হয় না বা অসহায় হইয়া কত দিন বসিয়াও থাকিতে হয় না, তখন পুরুষকে নারী ক্রমে ক্রমে বাহিরে টানিয়া আর তাহাদিগকে যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত করিয়া আপনারা গৃহস্থালী সুরু করিয়া দিলেন। ক্রমে ঘর হইল বাহির আর বাহির হইল ঘর।

বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন কালের মত যুদ্ধ-বিগ্রহ আর নাই। এখন যে যুদ্ধ হয় তাহা বাণিজ্য লইয়া, জমি লইয়া, আর স্বাধীনতা বা সম্মানের জন্য। এ যুদ্ধে লোক-বল অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয় বুদ্ধি-বল, শাস্ত্র-বল ও অর্থ-বল। সেইজন্য লোকে নারীকে এখন জননীর দিক দিয়া না দেখিয়া দেখে স্ত্রীর দিক দিয়া, সুখের দিক দিয়া, প্রেমের দিক দিয়া। সেইজন্য প্রাচীন আদর্শে চলিয়া এখন নর-নারী সুখ পায় না। কাব্য না হইলে এখন আর চলে না। কিন্তু অন্তঃপুরে নারীকে আবদ্ধ রাখিলে এই কাব্যের ক্ষুধা মেটে না। আর জননী হিসাবেও নারীকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিলে সুফল পাওয়া যায় না। সে কথা সকলে আজ কিছু-না-কিছু বুঝিয়া ফেলিয়াছে। পুরুষের দিক হইতেই সে বিষয়ে নানা প্রকারের উদ্যোগ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু নারীই সেদিকে তেমন ভাবে সহানুভূতি দেখান নাই। "লেখাপড়া শিখিয়া আমরা কি অফিস যাইব না ডন-কুস্তি করিয়া পালোয়ান হইয়া লড়িব?" এ সব কথা নারীর দিক হইতে অনেকস্থলে অনেক প্রকারে বলা হইয়াছে। এখন নারীর আত্ম-বোধ জাগিয়া উঠিতেছে। অফিস্ যাওয়া আর কুস্তি লড়া তাঁহাদের চোখে সম্মানের হইয়া উঠিতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ। এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে এই আত্মবোধ আরও পরিস্ফুট হইতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক। নারী সম্বন্ধে শাস্ত্রকারের গল্প ও উক্তি লইয়া আর পুরুষের কলঙ্ক রটাইয়া কিম্বা আবেদনে অশ্রুজলে মাসিক-পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিলে নারীরও উপকার হইবে না, পুরুষেরও নয়। মাসিক পত্রের শতকরা নিরানব্বই জন পাঠক নিশ্চয়ই নারীর উন্নতির পক্ষপাতী। যেখানে আধুনিক উচ্চ-শিক্ষার আলোক এখনও পৌঁছে নাই সেখানে নর-নারীর তারতম্য খুব অল্পই আছে। সেখানে আছে শাস্ত্রের ব্যভিচার আর শস্ত্র ও শক্তি লইয়া গুণ্ডামি। তাহাদের সমাজ এ সমাজের বাহিরে। তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়াই আলোচনা ও নারীর পথ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক, কোন্ কোন্ স্থলে নারীর প্রতি সমাজ ও দেশ অন্যায় সাধন করিয়া যাইতেছে, আর কি কি উপায়ে তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ দেখিতে পাই, সমাজের পক্ষ হইতে পুরুষের শিক্ষার জন্য যতটুকু যত্ন লওয়া হয়, ততটুকু যত্ন নারীর জন্য লওয়া হয় না। পুরুষের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবক-গণ যতখানি যত্নশীল, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহারা ততখানি যত্নপরায়ণ নহেন ও বর্ত্তমান অবস্থায় হইতেও পারেন না। কিন্তু মানুষ-হিসাবে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষার প্রয়োজন। তবে শিক্ষা দিতে গিয়া মনে রাখিতে হইবে, মনের

বিকাশ কি করিয়া হয়, অবশ্য—জ্ঞাতব্য জ্ঞানের সহিত মানুষ কি করিয়া পরিচিত হইতে পারে আর কেমন করিয়া জীবন-সংগ্রামে সে অন্যের গলগ্রহ না হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে। সুতরাং আর্টের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী শিক্ষারও ব্যবস্থা স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

তারপর চোখে পড়ে নারীর শারীরিক ও মানসিক বলের অবস্থাটা। শারীরিক বল না হইলে যে মানসিক বল হইতে পারে না, তাহা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। এই উভয়বিধ বলের অভাবে স্ত্রীলোক যে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত হইতেছেন তাহা আমরা সাময়িক পত্রে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ডাম্বেল-ভাঁজার ব্যবস্থা নারীর পক্ষে আজ বিশেষ প্রয়োজনীয়। পুরুষের সঙ্গে হাতাহাতি সুরু হইলে নারী তাহাতে টিঁকিয়া থাকিতে পারেন সেজন্য নারীর পক্ষে সুনিয়মিত ব্যায়াম অত্যন্ত আবশ্যক। এবং সেইসঙ্গে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত নারীকে পরিচিত করানোও নিতান্ত দরকার; নতুবা শরীর কিছুতেই সুস্থ থাকিতে পায় না।

তারপর দেখিতে পাই, বর্ত্তমান বিবাহ-বিধিতে নারীর প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। অপরিপক্ক মস্তিষ্ক অপরিণত শরীর লইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মত অন্যায় ও পাপ বোধ হয় দুনিয়ায় আর নাই। কিন্তু অন্ধ সমাজ নারীর বিবাহ দেয় এমন অবস্থায়, যখন তাহাকে বালিকা বলিলেই চলে। এই নিন্দনীয় বিবাহ-প্রথা রদ না করিলে নারীর নিস্তার নাই, পুরুষেরও নাই। নারীর ব্যক্তিত্বে সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত লাগে, যখন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তাহার বিনা-মতে তাহাকে জুড়িয়া দেওয়া হয়। তের-চৌদ্দ কিম্বা পনের-ষোল বৎসরের নারীর মতামত তেমন সুস্থির ও সুস্পষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয়, সুতরাং বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন। অভিভাবকগণের পক্ষে পাত্র স্থির করিয়া তাহার মধ্য হইতে নারীকে বাছিয়া লইতে বলিলেই অভিভাবকগণের মর্য্যাদাও রহিয়া যায়, আর নারীর ব্যক্তিত্বেও আঘাত লাগে না।

আধুনিক সমাজে যৌথ পরিবারের অভাব-অভিযোগের মধ্যে পড়িয়া বিবাহিত নারীকে সময় সময় বড়ই নির্য্যাতিত হইতে হয়। আর প্রতিপালনে অক্ষম স্বামীর স্কন্ধে পড়িলে নারীর অসুবিধা ও দুঃখের সীমা থাকে না, সুতরাং প্রতিপালনে সক্ষম পুরুষকেই বিবাহ-করিতে দেওয়া সঙ্গত। অক্ষম পুরুষের সহিত বিবাহ দিয়া অভিভাবকগণ যে পাপ সঞ্চয় করেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিবাহের পূর্ব্বে নারীকে জানানো উচিত, যে ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ হইবে তাহার ঘর-বাড়ীর উপার্জ্জন ইত্যাদির অবস্থা কেমন। যদি জানিয়া-শুনিয়াও কোন নারী নিজের মতে অক্ষম পুরুষকে বরণ করেন, তবে সেজন্য অভিভাবকগণকে কেহ দায়ী করিতে পারিবেন না। নারীর পক্ষে আরও জানা আবশ্যক, যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে সে তাহাকে লইয়া পৃথক ভাবে থাকিতে পারিবে কিনা। একজনের মন যোগাইয়া চলাই অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য কাজ; তার উপর যদি নারীকে যৌথ

পরিবারের বাচ্ছা-কাচ্ছাটি হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়াবুড়ীর মন পর্য্যন্ত যোগাইতে হয়, তাহা হইলে নারীর অবস্থা যে কেমন শোচনীয় হইয়া পড়ে, তাহা যাঁহারা যৌথ পরিবারে বাস করেন তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝেন। আর এত লোকের মন যোগাইয়া চলাও একপ্রকার অসম্ভব, তাই যৌথ পরিবারে ঝগড়া মনোমালিন্য লাগিয়াই থাকে। এত লোকের মন যোগাইয়া চলিতে গেলে নারীর মধ্যে পদার্থ টুকু যাহা থাকে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়, আর সেখানে জাগিয়া উঠে এক অস্বাভাবিক দাস-মনোভাব অর্থাৎ slave-mentality।

আমরা যে দায়ভাগ মানিয়া চলি তাহাতে নারীর প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হইয়াছে দেখিতে পাই। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রেরই অধিকার থাকিবে, আর কন্যার—সে যখন বন্যার জলে ভাসিয়া আসা জীব, তখন তাহার অধিকারই বা থাকিবে কেন—আর স্ত্রী সে যখন স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী তখন স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মরাই উচিত ছিল, তাই তিনি যখন মরিলেন না তখন তাঁহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী করিয়া রাখিলেই ত যথেষ্ট হইল! এইরকম একচোখো বিচার দায়ভাগে অনেক আছে। এই সকলের প্রতিবিধান করা আবশ্যক।

স্বামী যে দেবতা—সাক্ষাৎ ঈশ্বর তাহা যে দিনের শাস্ত্র ছিল এখন আর সেদিন নাই। স্বামীর পাদ-পূজা, পাদোদক পান ইত্যাদি অনেক বস্তুই এখন নরনারী সকলেই ঘৃণাকর মনে করেন। স্বামী বদমায়েস হইলে কিম্বা কুরোগগ্রস্ত হইলেও যে নাক-চোখ বুজিয়া তাহার সঙ্গে টিকিয়া থাকিতে হইবে, তাহা এখন কেহ আর বিশ্বাস করে না এ অকর্ত্তব্য মনে করেন। বদমায়েস, অত্যাচা স্বামীর সহিত থাকাও অসহনীয়। নি আধুনিক নারী এরূপ স্বামীকে বরখাস্তও করি পারেন না কারণ নিজের পায়ে দাঁড়াইবা তাঁহার শক্তি নাই। তাই আত্মসম্মা জলাঞ্জলি দিয়া নারী এমন অবস্থায় অধিকা সময়ে নাকচোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকেন, আ যখন নিতান্তই অসহ্য হয় তখন কেরোদি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া বসেন।

এই সকল অবমাননা হইতে নারীর মর্য্যা রক্ষা করিতে হইলে নারীকে তাহার স্বামী উপার্জ্জনের কতকটা অংশের উপর আইন অধিকার দিতে হইবে। আর স্বামী চরিত্র হইলে কিম্বা অত্যাচারী হইলে যেন স্বামীর উপার্জ্জনের প্রাপ্য অংশ নষ্ট স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারেন, এমন ব্য করা উচিত। তেমনই আবার স্ত্রীরও ঐ সক কুগুণ থাকিলে স্বামী ইচ্ছা করিলে তাঁহা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন—এরূপ ব্যব আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ডিভোর্স প্রথা ঠিক প্রবর্ত্তিত না করিলে যাহাকে legal separation বলে তা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। এইরূপ ব্য না করিলে যে কেমন করিয়া নারী মর্য্যা লইয়া বাস করিতে পারিবেন তাহা বো অসম্ভব। সুতরাং এক কথায় দেখা যাইতে যে, শাস্ত্র ছাড়িতে হইবে। যেখানে শা মানিলে মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায়, মনুষ্যত্বের না কলঙ্ক পড়ে সেখানে শাস্ত্রকে গঙ্গায় ধু পরিষ্কার করিলে হিন্দুত্ব লোপ পাইবে বরং উজ্জ্বল ও পরিস্ফুটই হইবে।

এখন দেখা যাক, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে নারী এই অধিকার পাইতে পারেন। আইন-কর্ত্তা হইয়াছে এখন দেশের লোক, দেশের প্রতিনিধি। সুতরাং আন্দোলন করিতে হইবে দেশ জুড়িয়া। আর দেশের প্রতিনিধিগণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, নারীর পক্ষে কোন কোন অধিকার না হইলে তিনি আর মর্য্যাদার সহিত বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না। প্রতিনিধি দ্বারা এখন আইন গঠন করাইয়া লইতে হইবে এবং প্রতিনিধি-সভায় যাহাতে সে আইন পাশ হয় সে বিষয়ে ও যথেষ্ট যত্ন করিতে হইবে।

সুতরাং নারীর চতুর্দ্দিকে আজ যথেষ্ট কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। তাই বলিতেছি, গলাবাজীর সঙ্গে সঙ্গে সকলে গাছ-কোমর বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়ুন! ভগবান নিশ্চয়ই সুফল প্রদান করিবেন। আরও একটা সুবিধা আছে। সকলেই জানে, বাঙ্গালী ঘর-পোষা মানুষ। সুতরাং যে সমস্ত মানুষ আইন-সভায় প্রতিনিধি হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্তঃপুর যদি রুখিয়া দাঁড়ায় আর দিন-কয়েকের জন্য অসহযোগ নীতি অবলম্বন করে—তবে প্রতিনিধিগণ নিশ্চয়ই অন্ধকার দেখিবেন চোখে, আর নারীর পক্ষে চোখ বুজিয়া ভোটও দিয়া ফেলিবেন। নতুবা তাঁহাদের কাহারও যে নিস্তার থাকিবে না, তাহা আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছি।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

প্রিয়ার উদ্দেশে

৬

অবশেষে তোমার চিঠি, দীর্ঘ চিঠি! আজ সকালে সামনের লাইন থেকে ফেরবার পথে কামানের সারের কাছে গেলুম। আজ ঠিক সেই রকম দিন, যে-দিন মানুষ নিজের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের আশা করে। আকাশ যেন অনেক উপরে উঠে গেছে—সাদা মেঘের টুকরো ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে; কাদা শুকিয়ে যাচ্ছে, বাতাসে নবীন বসন্তের আমেজ পাচ্ছি। এমন দিনে আমরা লণ্ডনে প্রিমরোজ দেখবার আশা করি, আর নিউইয়র্কে—তোমাদের রাস্তায় কি ফুল বিক্রী হয়? একদিন, যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে, তুমি আমায় Fifth Avenueতে বেড়াতে নিয়ে যাবে, সেদিন তা জানা যাবে। এমন দিনেই ত লোকে কত রকম মতলব করে' ভবিষ্যতের কথা ভাবে, আর মনে-প্রাণে অনুভব করে যে, সে চিরকাল বাঁচবে।

আমরা যখন নিউইয়র্কে মিলবো, তখন প্যারিতে তুমি যে পোষাক পরেছিলে তার ফ্যাশন উঠে যাবে। তুমি কি-রকম সাজবে তাই ভাবছি। শুধু আমায় খুসী করবার জন্যে হয়ত তুমি—কি বল? না, না, এত বেশী যাওয়া আমার উচিত হবে না। কোন পুরুষকে খুসী করবার জন্যে কোন মেয়েই দু-বছরের পুরানো বাসন্তী ঢঙে সাজতে পারে না।

যুদ্ধটা কি-রকম তাহলে কিছু দেখছ? তুমি বেশ স্পষ্ট ক'রে আমায় লিখতে পারনি, কিন্তু তোমার লেখার ভিতর থেকে সেটা আমি বেশ বুঝে নিয়েছি। একমাস আগে গুজব শুনেছিলুম, ফরাসীদের একটা আড্ডা জার্ম্মাণ-আক্রমণে নষ্ট হয়েছে। তুমি যে সেখানে থাকতে পার এ-কথা আমার মনেই হয়নি। সেজন্যে কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। নিজে সাহসী হওয়া সহজ, কিন্তু তুমি বিপদের সীমার মধ্যে আছ খবর পেলে আমার পক্ষে তা অসহ্য হয়ে উঠতো। তোমার মনে আছে ত, যুদ্ধের প্রথম সারের খুব কাছাকাছি এক হাসপাতালে তোমায় পাঠাচ্ছে শুনে আমি কি-রকম প্রতিবাদ করেছিলুম! এত প্রতিবাদ করেছিলুম যে, তুমি প্রায় আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলে; আমাদের সঙ্গে এই মরণের খেলায় যোগ দেবার তোমার কি বিচিত্র আগ্রহ! তুমি তখন কি বলেছিলে তা আমি ভুলিনি—"তোমাদের পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের জীবনের দাম কম—জগতে মেয়ের অভাব হবে না। তোমরা যদি মরবার যোগ্য বলে ছাড়া পাও তবে আমরা কেন মরবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবো?" তোমার জন্যে আমার গর্ব্ব হচ্ছে—তোমার গৌরব করছি।

এতক্ষণে তোমার সুদীর্ঘ নীরবতার কারণ বুঝতে পেরেছি। সাধারণ লোকদের সহর ছাড়বার হুকুম আসবার পর থেকে তোমাদের চিঠি লেখা বন্ধ করতে হয়েছে। যাই হোক, যদি লেখবার বাধাও না থাকতো, তবু তোমার কাজও তো অনেক ছিল! আমি সেই-সব কষ্টকর দিনের মানসিক উদ্যোগ ও উত্তেজনার কল্পনা করছি, যেদিন জার্ম্মানরা লাইন ভেঙ্গে ভিতরে এল—কতখানি তা কে জানে! তোমায় যেন দেখছি—ambulance corps-এ তুমি চারিদিকে বেড়াচ্ছ—বোমার আঘাতে জীর্ণ ও ধ্বংসগামী সহরের অসহায় শিশু-রক্ষার ভার যে তোমার উপরে! তারপর সে কাজ যখন শেষ হ'ল, যুদ্ধের মধ্যে থাকবার আশায় তুমি আহতদের সেবার ভার নিলে। খরচের খাতায় নাম লিখিয়ে যারা গান করতে করতে যাত্রা করলে, সেই সব সৈন্যকে তুমি দেখেছ, পথের ধারে দাঁড়িয়ে তুমি তাদের উৎসাহ দিয়েছ, তারা মহা-স্ফূর্ত্তিতে হেসে তোমায় চুম্বন উড়িয়ে দিয়েছে, আর হাসি-মুখে তুমি সে চুম্বন ফিরিয়ে দিয়েছ! অনেকের পক্ষে তুমিই শেষ মেয়ে, যাকে তারা এ জগতে দেখে গেল। মহান ত্যাগের সাম্‌নে সব জিনিষ কত সরল কত সুখের! মার্কিন রেড ক্রশের উর্দ্দি-পরা তোমার ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছে—তোমার মাথার সাদা ওড়নাটা পিছনে উড়ছে—মুখখানি আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তোমার সামনে মৃত্যু-চিহ্নিত সৈন্যদল অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে, বীরত্বের আনন্দে সব জিনিষকে তুচ্ছ ক'রে! তুমিই আবার সেই দলকে ফিরে আসতে দেখেছ, সেই বিরাট প্রবাহের রক্ত-মাখা ছোট ছোট ঢেউগুলো—হাত নেই, পা নেই, চোখ নেই, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডুলিতে শুয়ে তাড়াতাড়ি সব হাসপাতালের মধ্যে ঢুক্‌লো। তুমি আমায় যা-সব বলেছ তার মধ্যে সব-চেয়ে বেশী আমার মনে বেজেছে সেই লোকটার কথা, যার ঠোঁট দুখানা উড়ে গেছে, অথচ কৃতজ্ঞতার আবেগে শুধু ব্যাণ্ডেজটা তোমার পোষাকের উপর চেপে

রলে। তুমি লিখেছ যদি তোমায় এখন
খি, তবে অনেক পরিবর্ত্তন দেখতে পাবো।
ত রাত যে বিনিদ্র কাটিয়েছ তার ফল
লছে, আগুনে যেমন ধাতুর পরীক্ষা হয়
তোমার সেই-মত পরিবর্ত্তন আমি দেখতে পাব,
াশা করছি।

তাহলে তোমার বন্ধুর মনোবাঞ্ছা এতদিনে
র্ণ হলো। চাপা ফুঁপিয়ে-কান্নার মত
ীব্র স্বরে তিনি যে কথাটা বলেছিলেন তা
মি কোনকালে ভুলব না—"তাকে বিয়ে
রলেই ভাল করতুম।" তাঁর প্রণয়ী যুদ্ধে
রা যাবার পর থেকেই তিনি কেবলই এগিয়ে
ছিলেন, ক্রমে ক্রমে বিপদের সীমানার দিকে।
র প্রিয়ের ভাগ্যে ভাগ বসিয়ে তিনি এখন
র খুসী হয়েছেন নিশ্চয়ই। এই যে ভাবনাটা
র মনকে ঘিরে ধরেছিল, এর ভিতর একটা
বেকের দংশন ছিল হয়ত, তোমার কি মনে
? হয়ত যুদ্ধে যাবার আগে সে বিয়ে
তে চেয়েছিল। ইনি রাজী হন নি।
মার ত তাই মনে হয়। মরণোন্মুখ
য়তমকে শেলের বৃষ্টি থেকে নিজের
হ দিয়ে রক্ষা করার মধ্যে ভারি একটা
ন্দর্য্য আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য যে
কবারে ব্যর্থ! তুমি ত লিখেছ যে, তিনি
নরকমে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার জন্যেই
-পরিকর হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর
র্থতা মরণকে আরও বীর্য্যময় ক'রে
লছে।

তাঁকে দেখে ত সে ধরণের মেয়ে বলে মনে
া না। তাঁকে প্রথম দৃষ্টিতে খুব দৃঢ়-চিত্ত,
র্থপর আর ভারী হিসেবী ব'লে মনে হতো;
র চরিত্রে খুব একটা দৃঢ়তা ছিল হয়ত, সব
সময়ে তিনি ও-রকম নন। তাঁর অন্তরের কোমলতা। শুধু সেই কথায় ধরা পড়েছিল "তাকে বিয়ে করতুম যদি।" যুদ্ধকে তুমি গালি দিতে পার, কারণ সাহসের বাজে-খরচ এর চেয়ে কোন কাজেই বেশী হয় না, অথচ এর মত আর কিছুতে শেখায় না, বন্ধুর জন্যে কেমন ক'রে মরতে হয়! সাধারণ লোকের মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন গৌরব আছে তা প্রকাশ ক'রে দেবার মত শক্তি শুধু যুদ্ধেরই আছে, শান্তির মধ্যে তার কণামাত্রও নেই।

এখন তুমি অপেক্ষাকৃত নিরাপদে আছ—সেটা কি রকম তাই ভাবছি। আবার তুমি লাইনের পিছনে অসহায় শিশুদের সেবায় মন দিয়েছ। লিখেছ, ছোট Gaston তোমার প্রিয়পাত্র। সে মোটে ছ'দিনের—আশিবছরের বুড়োর মত তার মুখ আর আকাশের মত নীল চোখ দুটি। তুমি যেখানে বাসা পেয়েছ সেটা ভয়ানক বদ্ধ আর অস্বাস্থ্যকর, অথচ তুমি খুব সুখে আছ! বেশ!

তোমায় একটা গোপন কথা বলবো? প্যারিতে যখন তোমার সঙ্গে ছিলুম তখন তোমার মনে স্থির-বিশ্বাস হয়েছিল যে, তুমি এ কাজে টিঁকতে পারবে না। যখন তুমি যুদ্ধের প্রথম সারের কাছ যাবে বল্লে, তখন আমার স্পষ্টই মনে হ'ল যে, তুমি যে-কাজ করতে যাচ্ছ, তার সম্বন্ধে একবিন্দু ধারণা তোমার নেই। তোমায় দেখে এমন কোমল, সুন্দর ও ভঙ্গুর মনে হয়! জীবনে তোমায় কোনদিন কাজ করতে হয় নি। তুমি শুধু সাজ-পোষাক করেছ, আর গাড়ী চ'ড়ে বেড়িয়েছ। কোন কাজ করতে হলে যতখানি ধৈর্য্যের প্রয়োজন তা তোমার ছিল না।

তোমার চোখে সাধারণ জীবন সম্বন্ধে যে অনভিজ্ঞতার দৃষ্টি দেখেছিলুম, তা কেবল সম্ভ্রান্ত জীবনেই সম্ভব, কারণ অনেক দাম দিয়ে তা কিনতে হয়, তার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা একসঙ্গে ভাবা যায় না। যুদ্ধের পশ্চিম রঙ্গভূমির বীভৎসতা তুমি বুঝতে পারনি—না, তার গৌরবটুকুও না। তোমার চার দিকে ছিল শান্তি আর বিরামের আবহাওয়া।

থিয়েটারে বা হোটেলে যখন তোমার পাশে ব'সে অন্য-সব লোকদের দিকে চাইতুম, তখন প্রায়ই মনে হ'ত, এই যে-সব লোক হাসছে আর মজা লুটছে, ছ' মাস পরে এদের অবস্থা কি-রকম হবে? সেই অজানার দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে এদের সব গাড়ী-থেকে পড়ে-যাওয়া বস্তার মত অসহায়ভাবে প'ড়ে থাকতে দেখেছি—তাদের মুখ কুৎসিত ভাবে বদলে গেছে আর পরিবর্ত্তনশীল আকাশের দিকে তাদের স্থির চোখ দৃষ্টিহারা হয়ে চেয়ে আছে।

ভেবেছিলুম, তুমি এ-সব জাননা। কোন কালে এ-সব জানবেও না। কোন মেয়েকে ভালবাসলে সবায়ের যেমন হয় আমারও তেমনি আন্তরিক সাধ ছিল, তোমায় অবাস্তবের খাঁচায় বন্ধ ক'রে রাখবো, জীবনের রূঢ়তার রুদ্রতার বীভৎসতার কোন খবরই তুমি পাবে না। কত অন্যায় করতুম—তাহলে তোমার এই ফুল-তনু করুণার অসি নিয়ে যুদ্ধের মাঝে আত্ম-বিসর্জ্জনে আসতে পারত না। আজ তুমি সৈনিকের স্ত্রী হবার যোগ্যতা দেখিয়েছ—তখন তুমি ছিলে শুধু খেলার জিনিষ!

আমার মনে আছে, একবার তুমি আমায় বলছিলে, "ধনী হয়ে জন্মানোয় কি কষ্ট! সব তৈরী! তোমার কাছ থেকে কেউ কি আশা করে না—তুমি যেন কিছু করতে আসনি।" তুমি চাইতে—কি যে চাইতে, তা তুমি নিজেই জানতে না; কিন্তু তোমার ঈপ্সিত বস্তুটি নিশ্চয়ই সুন্দর, তোমার মনের মত। বিবাহের রঙ্গমঞ্চে তাড়াতাড়ি ঢুকে প'ড়ে আবার নতুন ক'রে নিজে তোমার মায়ের ভূমিকা অভিনয় করবে, এ চিন্তা কোনদিন তোমার কাছে প্রীতিপ্রদ মনে হয়নি। তুমি চেয়েছিলে মাটী ছেড়ে উঠতে, উড়ন-জাহাজে চড়ে আকাশে উড়তে, তারায় তারায় ধাক্কা দিয়ে ফিরতে, আবার নতুন ক'রে গ্রহ-নক্ষত্রের খেলার মাঠের সন্ধানে যাত্রা করতে। জার্ম্মান আক্রান্ত সহরে গোলাবৃষ্টির মধ্যে থেকে এবং যে-সব সৈনিক মরণের মুখে ছুটে চলেছে তাদের হাসিমুখে বিদায় দিয়ে ভাল ক'রে তোমার স্বপ্ন সফল করেছ।

আমাদের কি সত্যই কষ্ট হয়? সন্দেহ হয় আমার। কাদা আর আঘাতের ক্ষত, দৈহিক যাতনা আর অসুবিধা যতই হোক, কি এসে যায় তাতে, মন যদি আগুনের শিখার মত আকাশের দিকে জ্বলে জ্বলে ওঠে। তুমি আর আমি দুজনেই বিভিন্ন রকমে জীবনকে ভয় করতুম; আজ একটা ন্যায়ের জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ভয় হারিয়েছি। এ সাহসের জগৎ। আমরা তফাৎ আছি ব'লে সাহস যেন আরও বাড়ছে। আমার পক্ষে সেইটিই যে সব-চেয়ে বড় ত্যাগ। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে নিজেকে 'না' বলবার জন্য মানুষের একটা ঝোঁক চেপে যায়; মানুষ বৈজ্ঞানিকের মত কুতূহলী হয়ে ওঠে

আবিষ্কার করতে—তার আত্ম-ত্যাগের সীমা-রেখাটা কোথায়!

যখন তুমি শিশুদের কথা লেখ তখন মনে হয়, তোমার শিশুদের যেন আমি পেয়েছি। এখানে কামান-গর্জ্জের পিছনে বসে দেখি, তুমি দু'হাত দিয়ে শিশুর ছোট দেহটীকে বেষ্টন করেছ, তাদের ছোট ছোট মাথা তোমার বুকে লুটিয়ে পড়েছে। তোমায় এখনও বালিকা ব'লে আমার মনে হয়, হাতীর দাঁত থেকে খুঁদে-বার-করা তন্বী প্রতিমার মত! একটা অবর্ণনীয় স্বর্গীয় পবিত্রতায় তুমি মণ্ডিত! ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে-ঘেরা তোমার ছবিখানি যখন মনে আসে, তখন এমন সব ভবিষ্য দিনের কথা মনে জাগে, যা কখনও আমাদের জীবনে ঘটবে না। মুহূর্ত্তের জন্যে আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠি। যারা মরে গিয়েছে, তাদের ছেলেরাই তাদের অমরত্বের বিজয়-নিশান। কত লোককেই দেখলুম সকালে জেগে উঠলো, আর রাত্রে চিরদিনের মত স্থির হয়ে শুয়ে পড়লো।

আমার এ-সব চিন্তা আমার অযোগ্য; তোমার দৃষ্টিগোচর হবার কোন অধিকারই এদের নেই!

তুমি লিখেছ—"বিদায়! যুদ্ধ যে কেমন তা দেখেছি বলেই লিখছি যে, নিজের সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন—যতখানি প্রয়োজন তার বেশী বিপদের মুখে এগিয়ে যাবেন না।" কিন্তু, বন্ধু আমার, যে-সব বিপদ লোকে এড়ায়, তাইতে সাহস ক'রে যাবার জন্যেই যে আমি এখানে এসেছি! ভাল সৈনিকের একমাত্র প্রমাণ যে সে আশার অতিরিক্ত করে! যাই হোক, তোমায় মিনতি ক'রে বলছি, যদি বেরিয়ে যাবার ভদ্র উপায় থাকে, তবে লক্ষ্মীটি, বোমা-বর্ষণের মধ্যে তুমি থেকো না!

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গ

পরশমণি হারিয়ে যাওয়া
কেমন করে সইবো?
ওই ফুরালো দিনের আলো
ওরে দারুণ দৈব!
আগিয়ে যাওয়ার সুখ নাহি আর
পশ্চাতেও নিবিড় আঁধার,
একলা বিজন পারের ঘাটে
কেমন করে রইবো?

২

নেইকো কোথাও আলোয় চিনে
যেথায় ফিরাই দৃষ্টি,
পারাপারের নৌকা সুদূর
নাম্‌লো শিলা বৃষ্টি।
আঁধার তীরে চকায় ডাকি
মরছে কেঁদে চক্রবাকী,
দিনের শেষে বিচ্ছেদেরি
যন্ত্রণা কি কইবো!

৩

আগিয়ে যেতে লজ্জা করে
কান্না আসে ফিরতে
হারিয়ে ফেলে অঙ্গুরীয়
অপ্সরারি তীর্থে।
যাবো বিপুল রাজসভাতে
কেমন করে শূন্য হাতে,
লজ্জা-ঘৃণার এই দেহভার
কেমন করে বইবো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ভিখারিণী

সকাল ছ'টা হবে। কলকাতা তখন নিস্তব্ধতার রাজত্ব না হলেও, ভাড়াটে গাড়ীর ঘড়-ঘড়ানি ও লোকের ভিড়ে সহর সরগরম হ'য়ে ওঠেনি। রাস্তা দিয়ে বেশী লোক চলাফেরা কর্চ্ছিল না। আর যারা চলছিল, তাদেরও মধ্যে শ্রমজীবিদের সংখ্যাই বেশী।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ধরে বাড়ী ফিরছি। অল্প অল্প বাতাস বইছিল। প্রভাতের পবিত্রতা মনটাকে বেশ-একটা প্রফুল্লতার আবহাওয়ার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। মনের আনন্দে শিষ্ দিতে দিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছে এসে দেখি—হাতের আঙুল-হীন, পায়ে নেকড়া-জড়ানো, ছেঁড়া কাপড়-পরা এক ভিখারিণী, একটা ছোট ছেলে বুকে ক'রে ভিক্ষা কর্চ্ছে।

দৃশ্যটা দেখে মনটা একসঙ্গে ঘৃণা, দয়া ও বিরক্তিতে ভ'রে উঠল। থম্‌কে দাঁড়াতেই ভিখারিণী হাত পেতে ভিক্ষা চাইলে।

বিরক্তি হ'ল নির্ম্মল প্রভাতের শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমনতর একটা বিশ্রী অসুন্দর দৃশ্য দেখে! দয়া ও ঘৃণা,—সে ভাবটাকে ঠিক দয়া ও ঘৃণা বলা চলে না বরং তাকে অনুকম্পা ও ক্রোধের সংমিশ্রণ বলা চলে। ভিখারিণীর শরীরের অবস্থা দেখলে সত্যিই মনে দয়া হয়, তাকে সাহায্য কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ঐ যে ছেলেটা, এইটেই ত যত গোল বাধালে! হায়রে, ভিক্ষান্নে যাদের জীবন নির্ভর কচ্ছে, তাদেরও মনে বংশ-বৃদ্ধির সাধ! এই যে ছেলেটা, শিক্ষার অভাবে, ও হবে একটা সিদ্ধহস্ত পকেট-মার বা বড় হ'লে প্রচণ্ড চোর অথবা গুণ্ডার সর্দ্দার। দেশে যে দুষ্ট ও দোষীর সংখ্যা বেড়ে যাবে, তার কারণ ত এরাই। সুতরাং এদের সাহায্য না করাই উচিত। কিন্তু তবুও কিছু না দিয়ে যেতে মন সরছে না। যুক্তির দিক দিয়ে দেখ্‌ছি না-দেওয়াটাই উচিত, কিন্তু হৃদয়ের আর-এক দিক দিয়ে ভাবতে গেলে কিছু দেওয়াটাই উচিত বলে মনে হচ্ছিল।

ভাবের এই দোটানার মধ্যে পড়ে পকেটে হাত দিয়ে, দেব কি দেব না ভাবছি, এমন সময় আমার চমক ভাঙ্‌ল, ভিখারিণীর একটা আশীর্ব্বাদে—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, বাবা।" দেখি, একটা মিঠাই-ফেরিওয়ালা তার ঝুড়ি থেকে একটা লাড্ডু দিয়ে মুখে প্রসন্নতার হাসি নিয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল।

লজ্জায় আমার মাথাটা হেঁট হয়ে গেল। কেমন একটা ভাবের আবেশে পকেট থেকে হাত দিয়ে যা উঠল,—সেটা আনি কি সিকি না দেখে তাই দিয়েই দ্রুত-পদক্ষেপে চলে এলুম।

বাকী পথটুকু ভাবতে ভাবতে এলুম—এটা পয়সার মায়া, না, বর্ত্তমানের পাষাণ সভ্যতা ও শিক্ষা, যা আমাদের হৃদয় ব'লে জিনিষটাকে গলা টিপে হত্যা কর্ব্বার উদ্যোগ কচ্ছে!

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

মূল্য

রায়-বাহাদুর হয়েছেন বাবু দিতেছেন ভোজ তাই,
পাঁচশত দিয়ে লক্ষ্ণৌ হতে এসেছে সিরাজী বাই;
ললিত লাস্য ফুল্ল হাস্য মাদক-মাখানো গান,
আজিকে নিশীথে সুখের সায়রে ডাকিয়াছে যেন বান!

বেজেছে ঘড়িতে বারোটা তখন হাঁকিলেন নব "রায়",
"জল্‌দী কর্‌কে সিরাজী বোলাও—খান্‌সামা কোন্ হায়!"
বার বার হাঁকি মিলিলনা সাড়া, "বাহাদুর" লাল রেগে,
ঘূর্ণিত আঁখি রক্তমূর্ত্তি বাহিরে এলেন বেগে।

দরজার পাশে বালক ভৃত্য পড়েছিল ঘুমে লুটি,
মারিলেন বাবু সবুট চরণ সজোরে ধরিয়া টুঁটি;
মারেন যতই বেড়ে যায় ক্রোধ ধরিবার নাই কেহ,
ভৃত্যেরা সব ভয়ে জড়সড় থরথর কাঁপে দেহ।

ঝলকে রক্ত উঠিছে মুখেতে দেখিয়া থামেন প্রভু;
চলে গেলে বাবু চুপি চুপি এসে উঠাতে যাইল "নবু।"
ডেকে অবশেষে গায় হাত দিয়ে পাইলনা কোন সাড়া,
তখন বালক গেছে বহুদূর—মুক্ত প্রভুর তাড়া!

বাজের মতন পশিল কথাটা মজলিস-মাঝে যেয়ে,
তখন ঠুংরি টপ্পা খেয়ালে দিতেছে বাইজী ছেয়ে।
একজন বাবু উঠিলেন ব'লে বড় আপশোষ-ভরে,
"এমন আমোদ মাটি ক'রে দিল হতভাগা ব্যাটা ম'রে।"

টাকা আছে যার বিশ্বভুবনে নাহিক তাহার পাপ,
দরোয়ান গিয়ে আনিল ডাকিয়া মৃত বেয়ারার বাপ।
বাবু চাহিলেন কিছু টাকা দিতে—হয়ে গেছে যাহা যাক্,
"হয়নাকো যেন গোলমাল কিছু, নোট্ পাঁচখানা রাখ্।"

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

প্রত্যাবর্ত্তন

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অরুণ চলিয়া গেলে হিমুর প্রথমটা ভারী কান্না পাইতেছিল। মা-দিদিমার চোখ এড়াইয়া সে তাই ঘুরিয়া আসিয়া অরুণের পরিত্যক্ত বাহিরের ঘরখানিরই শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিল। আজ সে ঘরে খালি তক্তাপোষ ছাড়া আর কোন-কিছুই ছিল না। তক্তাপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রথমে সে খুব খানিকটা কাঁদিয়া লইল; কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে অরুণের উপর অনেক রকম করিয়া রাগ করিল। ছুটিতে সে বাড়ী আসিলে কি উপায়ে তাহার সহিত বিবাদ বাধাইয়া তাহার মনে আঘাত দিয়া হিমু তাহাকে জব্দ করিবে, তাহারও একটা 'খসড়া' তৈয়ার করিয়া ফেলিল। তারপর উঠিয়া চোখ মুছিয়া সে ঘরের বাহির হইল। ছেলেমানুষের মনের বেদনা যেমন গভীর, তেমনি ক্ষণস্থায়ী! শীঘ্রই তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া সে যখন কেবল অরুণের স্মৃতি-চিহ্নই দেখিতে লাগিল, তখন মনে করিল, 'আড়ি' না দিয়া অরুণ ফিরিয়া আসিলে এবারকার মত না হয় 'ভাব'ই বজায় রাখিবে। উপস্থিত কাল সকালে ঝি যখন বাজারে যাইবে সে তাহাকে একখানি পোষ্টকার্ড কিনিয়া আনিতে বলিবে; এবং তাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসার জন্য অরুণকে লিখিয়াও দিবে। মা গো, এমন বুনো দেশে কি একা-একা মানুষ কখনো থাকিতে পারে? মা বলেন, "পাড়ায় কি আর ছেলে-মেয়ে নাই? সঙ্গীর অভাব কি!" ভারী ত সব সঙ্গী! উহাদের কি অরুণের মত ভাল! না, শুধু উহাদের সহিত রাতদিন খেলিতেই কাহারো ভাল লাগে? আর সে কি এখনও বড় হইতেছে না, যে এখনো রাতদিন কেবল খেলিয়া বেড়াইবে? লেখাপড়া না করিয়া মানুষ মূর্খ হইয়া থাকে, পৃথিবীর কোন কিছু ভাল জিনিষই জানিতে বা শিখিতে পারে না। অবশেষে তাহাকেও সেই মূর্খ হইয়া থাকিতে হইবে? কেই বা আর তাহাকে পড়া বলিয়া দিবে, কেই বা লেখা শুধ্‌রাইবে? মা ত এ-সব কিছুই বোঝে না। কিছুদিন মনের বৈরাগ্যে সে খেলাধূলা ছাড়িয়া খুব মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিল। অরুণকে এবার চমৎকৃত করিয়া দিতে হইবে। তাহার হাতের অক্ষর দেখিয়া অরুণ যেন মনে করিতে পারে যে হাঁ, হিমুরও মাথা আছে, বুদ্ধি আছে, সেও বোকা নয়।

অরুণকে সে প্রথম যেদিন চিঠি লিখিল, সেদিন সারা সকাল বেলাটাই তাহার ঐ একখানি পোষ্টকার্ড লিখিতেই কাটিয়া গেল। তবু অনেক যত্নে লেখা অক্ষরগুলি ঠিক মনের মতও হইল না। চিঠিতে কথা বড় বেশী কিছু ছিল না; অক্ষরগুলির ছাঁদ হিমুর যত মনের মতই হউক, আকারগুলা মোটেই তাহার পছন্দ হইল না। হিমুর মনের সব কথাই তাই অপ্রকাশিত রহিয়া গেল। শুধু ছুটি হইলেই অরুণ যেন

চলিয়া আসে, এই একটি মাত্র অনুরোধই করা হইল—দুই-তিন দফায়।

সময়ে চিঠির জবাব আসিল। অরুণ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে; এবং ছেলে পড়াইবার কাজ পাইয়াছে। পূজার ছুটির আর তিনমাস দেরী—এই তিনটি মাস কাটিয়া গেলেই সে বাড়ী আসিবে।

চিঠি পাইয়া হিমুর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার বয়সে এই প্রথম সে অপরের কাছ হইতে চিঠি পাইয়াছে। ঠিকানার উপর আবার তাহারই নাম প্রথমেই লেখা! চিঠি-খানি অনেকবার পড়িয়া পড়িয়া সে যখন তৃপ্ত হইল, তখন মা-দিদিমাকে দেখাইবার জন্য বাড়ীর ভিতর গেল। সেদিন অপরাহ্ণের মধ্যে হিমুর এই পত্র-প্রাপ্তি-সংবাদ জানিতে পাড়ার কোন ছেলে-মেয়েই বাকী রহিল না।

ক্রমে অরুণের বিচ্ছেদ-দুঃখ কমিয়া আসিলে সে আবার নূতন বন্ধু-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল; ঘোষেদের পঙ্কজিনীর সহিত সই, শৈবালের সহিত মকর ইত্যাদি পাতাইয়া খেলার মজলিস বেশ জাঁকাইয়া তুলিল। তবুও খেলাধূলার মধ্যেও অরুণকে সে প্রায়ই চিঠি লিখিত। তাহার নূতন বন্ধুদের কথা, ভট্টাচার্য্যদের বাতাবি লেবুর গাছে কিরূপ ফল ধরিয়াছে, মিনুদের বিড়ালের যে তিনটি বাচ্চা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কয়টি সাদা ও কয়টি ভিন্ন রঙের—এ সব কথারই উল্লেখ থাকিত। এবার সে আর একটি নূতন খবর লিখিয়াছিল—মুখুয্যেদের ভুবন এখন তাহাদের খেলার সঙ্গী।

হিমুর খেলার সাথী ভুবনকে অরুণ চিনিত। সম্প্রতি তাহার বাবা মারা গিয়াছেন লিখিয়া হিমু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। পিতৃহীনা বালিকা এ দুঃখটি ভাল করিয়াই বুঝিত। তাই সহানুভূতির অশ্রু নিজে মুছিয়াই শান্ত হইতে পারিল না। ব্যথার ব্যথী অরুণকেও সে-দুঃখের অংশ সে বণ্টন করিয়া দিল। ছুটিতে অরুণ আসিলে সেখানকার সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইয়া হিমু কহিল, "অরুণদা, বরুণার কথা তুমি ত আমায় কিছুই লেখনি—তার কথা সব বলনা ভাই।"

"তার কি কথা?" বলিয়া অরুণ হাসিয়া হিমুর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল।

"এই সব—সে কেমন দেখ্‌তে? কত বড়? আচ্ছা অরুণদা, সে তোমায় অরুণদা বলে ডাকে ত?"

"না—স্যার বলে।"

"সে কাকে বলে অরুণদা? আমি ত কারুকেই ও কথা বলি না। সে বুঝি ইংরিজি কথা?" বলিয়া বিপুল বিস্ময়মাখা চোখদুটি সে অরুণের মুখের উপর ন্যস্ত করিল। অরুণ কহিল, "তাই—তুমি ত বাংলার গণ্ডী পেরুবে না। হবে কি, বল! যদি ইংরিজি শিখ্‌তে আরও কত জান্‌তে বুঝ্‌তে পারতে। বরুণা এই ক'মাসেই খাসা কথা বল্‌তে পারে ইংরিজিতে।"

"তোমার সঙ্গে বলে? তার হাসি পায় না ইংরিজিতে কথা বল্‌তে?" বলিয়া হিমু নিজেই মুখে কাপড় চাপিয়া খিল খিল করিয়া একচোট হাসিয়া লইল। কিন্তু সে হাসিতে অরুণ ত যোগ দিলই না; বরং গম্ভীর মুখে রহিল দেখিয়া হাসি থামাইয়া চোখ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিয়া সে কহিল, "আচ্ছা গো, আচ্ছা, পড়াও না—কে বারণ করেচে? জানি আমি, সে যখন জানে

তখন আমায় জান্‌তেই হবে। তোমার হুকুম ত আর না হবে না। কিন্তু কেন বল ত—?" বলিয়া সে বিরক্ত মুখে উঠিয়া গেল।

এ কেনর উত্তর অরুণও দিল না, সেও যথার্থ ভাবে চাহিল না। পরদিন যথাকালে দেখা গেল, শিক্ষক ও ছাত্রী বিপুল মনোযোগে নূতন ভাষার চর্চ্চায় ব্যাপৃত। ছুটির অর্দ্ধেক কাল বন্ধু-গৃহের পূজা-উৎসবে কাটাইয়া আসায় শীঘ্রই অরুণের ফিরিবার সময় হইল। ফার্ষ্ট-বুকের অর্থ-পুস্তক ও বাংলা হাতের লেখায় হিমুর বুঝিবার পক্ষে সহজ সঙ্কেতে যথাসাধ্য বুঝাইবার প্রয়াস নিজে নিজে পাঠাভ্যাসের জন্য হিমুকে প্রস্তুত করিয়া দিয়া অরুণ বিদায় লইল। পরের বার ছুটিতে আসিয়া সে আশ্চর্য্য হইল, মেধাবিনী বালিকা অর্থ-পুস্তকের সাহায্যে ফার্ষ্টবুক শেষ করিয়া সেকেণ্ড বুক আরম্ভ করিয়াছে। আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে অরুণ কহিল, "তুমি যে খুব ভাল তা আমি জান্‌তুম। কিন্তু খুবটা যে কত বড় তাই কেবল জান্‌তুম না।" অরুণের প্রশংসায় হিমুর শ্রম সার্থক মনে হইলেও স্বভাব-বশে সে কহিল, "ভারী ত—বরুণার চেয়ে ত আর আমি ভাল নই।"

"নয় বই কি বরুণার কি! ভাল? তাকে চিরকাল ধরে চেষ্টা করে লোকে শেখাচ্চে তাই সে শিখেচে। পাখীকে কথা বল্‌তে শেখালে সেও কথা বলে। ওর বাহাদুরীটা কোন্‌খানে? যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও শিখ্‌তে পারে, সেই ত—আশা করি, বাংলা দেশ একদিন হিমানী দেবীর লেখা দেখে অবাক্ হয়ে যাবে।"

হিমু মনে মনে খুসী হইলেও মুখে কহিল, "তোমার কল্পনা কল্পনাই থেকে যাবে অরুণদা—"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পূজার ছুটি কাছে আসিয়া পড়ায় দেশ জুড়িয়া একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। অফিসের চাকুরে হইতে স্কুল-কলেজের ছাত্রদলেও এ ব্যস্ততার লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। অরুণদের মেসও এ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ছিল না। বাড়ী যাইবার আগ্রহে অনেকেই আগে হইতে জিনিষ-পত্র কেনা ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখাশুনা বিদায়-পর্ব্ব সারিয়া লইতেছিল। লম্বা ফর্দ্দ লইয়া বাড়ীর চিঠিও সকলের ঘন ঘন আসিতেছিল।

সারা মেসখানার মধ্যে কেবল দুইটি মানুষের মানসিক বিপ্লবের কোন সংবাদই বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেখা গেল না। প্রফুল্লর মানসিক উচ্ছ্বাস কোন-কিছুতেই বাহিরে কখনো প্রকাশ পাইত না, তাই ইহাতে কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট না হইলেও অরুণের প্রতি কাহারো কাহারো চোখ পড়িতেছিল যাহাদের পড়িতেছিল, তন্মধ্যে জলদই প্রধান।

কয়েকদিনের দ্বিধা কাটাইয়া একদিন সে কহিল, "অরুণবাবু ছুটিতে আপনি বাড়ী যাবেন ত?"

অরুণ একটু হাসিয়া একটু কাশিয়া সংক্ষেপে কহিল, "যাব।"

"কবে যাচ্ছেন? ছুটির গোড়ায়?" বলিয়া সে উৎসুক দৃষ্টিতে অরুণের মুখের ভাব বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিতেছিল।

"দেখি—" বলিয়া অরুণ এবারও এড়াইয়া উত্তর দিল। জলদ বুঝিল, বাড়ী যাইবার জন্য বন্ধুর খুব বেশী ত্বরা নাই। তাই খুসী

হইয়া সে কহিল, "আমাদের বাড়ী পূজো হয়। এ বছর কাকারা সকলেই দেশে আস্‌বেন। একটু বিশেষ রকম ধূমধামও হবে, শুল্‌চি। আপনিও চলুননা—সেখানে পূজোটা খুব আমোদে কাট্‌বে তাহলে। লক্ষ্মী পূজোর আগেই না হয় ফির্‌বেন।"

বন্ধুর আগ্রহ-ব্যাকুল দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিতে অরুণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারিল না। মনটি তাহার তখন ঝাল্‌দার পথেই অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। হিমু লিখিয়াছে, "আর কত দেরী করবে অরুণদা? ছুটি কি আর তোমার হবে না?" এ অনুরোধের পর কি আর দেরী করা যায়? তবু অরুণের আট-ঘাট-বাঁধা সতর্ক মন এমন অবস্থাতেও নিজ-অধিকারের সীমা বিস্মৃত হইল না। হিমু ছেলেমানুষ, সে নিজ খেয়াল-মতই না হয় ত্বরা দিয়াছে, কিন্তু তাহার মা দিদিমার ত্বরা কতটুকু, তাহা ত অরুণের বিশেষরূপে জানা নাই। তাই মনে কুণ্ঠা জাগিতেছিল,—পাছে মালতীদেবী কিছু মনে করেন! মুক্তা ঠাকুরাণী বিরক্ত হন্! উহাদের না দেখিয়া সেও যে থাকিতে পারিবে না। তবু দীর্ঘ ছুটিটায় নিজের সমস্ত ব্যয়-ভার সেই দুইটি অনাথা বিধবার স্কন্ধেই বা সে চাপাইবে কোন্ সাহসে? সেখানে তাহার কতটুকুই বা দাবী! কিসেরই বা দাবী!

ছুটিতে মেসের ঠাকুর-চাকর কেহ থাকিবে না, থাকিলে সে এখানেই কিছুকাল থাকিয়া দিন সংক্ষেপ করিয়া লইত। জলদের প্রশ্নের উত্তরে এই সব বিষয় তাহাকে মনে মনে আরও একবার ভাবিয়া লইতে হইল, তাই উত্তরে নিজের সম্মতি জানাইতে তাহার একটু বিলম্ব হইল। এখানেও যে সঙ্কোচে বাধিতে ছিল না, তাহা নহে; তবু বন্ধুর সে আগ্রহ-ব্যাকুল আহ্বান সে ফিরাইতে পারিল না। সে বুঝিত, জলদ তাহাকে ভালবাসে। সেও যে ভালবাসারই কাঙাল! তাই মন তাহার ভিন্ন পথে ছুটিতে চাহিলেও বন্ধুর অযাচিত স্নেহের আহ্বানটিকে সে ব্যথা দিয়া ফিরাইতে পারিল না।

এবারকার ছুটিটি যে কেমন আনন্দ-উৎসবে কাটিবে, তাহারই একটি সরস তালিকা মুখে-মুখে বানাইয়া লইয়া জলদ যখন এ সম্বন্ধে অরুণের নিরুৎসুক মনটিকেও একটু প্রলুব্ধ করিয়া ফিরিয়া গেল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। অরুণের স্বল্পালোক ঘরখানির মধ্যে অন্ধকার তখন পূর্ণাধিকারেই নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অরুণ প্রসন্ন মনে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে বেড়াইয়া আসিবার জন্য দড়ির আলনা হইতে খাকি রংয়ের সার্টটি পড়িয়া গায়ে দিয়া সে ধীর পদে বাহির হইয়া পড়িল।

ছুটির আগের দিন প্রফুল্লকে বাক্স গুছাইতে ব্যস্ত দেখিয়া অরুণ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, যদি সে কোন কাজে লাগিতে পারে! প্রফুল্ল মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "কি অরুণ, বাড়ী যাচ্চ নাকি?"

অরুণ কহিল, "জলদ নিমন্ত্রণ কল্লে, তাই আগে ওর ওখানেই যাব?"

"নেমন্তন্ন পেয়েচ—বাঃ! তাহলে ছুটিটা কাট্‌বে ভাল। বল?" বলিয়া সে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিল। অরুণ চুপ করিয়া তাহার পাশে বসিয়া কাজ দেখিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল। এ নীরবতা অরুণের ভাল লাগিতেছিল না; তাই প্রথমে সেই কথা কহিল, বলিল, "প্রফুল্লদা বাড়ী যাচ্চ ত?"

প্রফুল্লর আদেশ-মত অরুণ এখন তাহাকে আপনি ছাড়িয়া তুমি ধরিয়াছে। প্রফুল্ল মুখ না তুলিয়াই কহিল, "না।"

"তবে—কোথায় যাবে প্রফুল্লদা?" অরুণের প্রশ্নে বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হইল। প্রফুল্ল তাহা লক্ষ্য করিল। কাজে চোখ রাখিয়া অনাগ্রহভাবে সে কহিল, "বাইরে একটু ঘুরে আসা যাবে।"

অরুণ কহিল, "বাড়ী থেকে মত আনিয়ে নিয়েচ ত প্রফুল্লদা? তাঁরা হয়ত দুঃখিত হবেন কত, না যাওয়ায়।"

"হতে পারেন। না অরুণ, মত চাইলে তা তাঁরা দিতেন না, বিশেষ করে ঠাকুমা। কাকাবাবুও রাজী হতেন না। কিন্তু না চাইলেও বিদ্রোহ করবেন না, এও আমি জানি।" বলিয়া সে কাজ শেষ হওয়ায় বাক্স বন্ধ করিয়া এইবার ফিরিয়া বসিল; এবং ছুটিতে অরুণের পড়াশুনার কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত তাহারই আলোচনা করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাহাকে আর পূর্ব্বকথার পুনরাবৃত্তির অবকাশ দিল না। অরুণ মনে করিয়াছিল, এই অবসরে সে প্রফুল্লদার পারিবারিক জীবনের একটু খবর জানিয়া লইবে। কিন্তু প্রফুল্লর ভাবে তাহাকে এ সম্বন্ধে অনিচ্ছুক বুঝিয়া এ আলোচনাও সে আর তুলিতে চাহিল না। তাহার কথায় যে-দুইজনের উল্লেখ সে করিয়াছিল তাহাতে অরুণ বুঝিল, আপত্তি করিতে ঠাকুমা ও কাকাবাবু। তবে কি প্রফুল্লদাও তাহার মত ভাগ্যহীন! পিতৃমাতৃহীন অভাগা!

চিন্তার সঙ্গেই তাহার হাসি হাসিল। নিজের সহিত সে আবার অন্যের তুলনা করিতে চাহে! হউক পিতৃমাতৃহীন, তবু উহার ঠাকুমা আছেন, কাকাবাবু আছেন। নিজের বলিতে গৃহ-ভূমি—আত্মীয়-স্বজন সবই আছে,—তবু যেন, কেন কে জানে, অরুণের মনে হয়—প্রফুল্লদার মনেও যেন তাহারই মত একটা অভাবের ঝড় দিরারাত্রিই হাহাকার তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ওই মানুষটির পরম-সহিষ্ণু সংযত মুখে আবেগ-বর্জ্জিত ব্যবহারে সকলের প্রতি ভালবাসায়—উহার মনের যে নিরুপদ্রব ছবিটি প্রকাশ পায়, আসলে কিন্তু তা নয়। হইতে পারে, ইহা ভ্রম। অরুণ হয়ত ঠিক্ মত তাহাকে বুঝিতে পারে নাই। ইহা অমূলক হওয়াই তাহার একান্ত প্রার্থনীয়। তবু স্নেহ-দুর্ব্বল চিত্তের সংশয় যেন কাটিতে চায় না। প্রফুল্ল নিজেকে বুঝিতে দেয়না, নিজে হইতে অগ্রসর হইয়া বুঝিবার সাহসও অরুণের হয় না। বন্ধুর এই আত্মগোপন-চেষ্টায় ক্ষভিমানে অনেক সময় তাহার চোখে জল ভরিয়া আসে—মনে হয় প্রল্লফুদা এখনও তাহাকে পর মনে করে, তাই কিছু বলে না। বন্ধু কি সুধু সুখের সাথী—দুঃখের অংশীদারও কি নয়? অরুণের যে সংসারে বলিবার কথা কিছু নাই, তাই সে নির্ব্বাক। কিন্তু যাহার আছে, সে কেন বলে না?

সেদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রফুল্লর একটি কথা বার বার তাহার মনে উঠিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিয়াছিল, "মত চাইলে তাঁরা

দেবেন না। কিন্তু না চাইলেও বিদ্রোহ করবেন না।"

কেন তা করবেন না? প্রফুল্লর পারিবারিক জীবন কি তবে শান্তিপূর্ণ নয়? তাহার আত্মীয়েরা কি তাহার জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা অনুভব করেন না? খুব সম্ভব, তাই। সেই জন্যই প্রফুল্লদা বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হন্না।

অরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিল, কে জানে, দুঃখী কে? যাহার নাই? অথবা যাহার থাকিয়াও নাই? জগতে দুঃখ বুঝি স্বাভাবিক—তা সে যাহার পাশে যেরূপেই দেখা দিক্!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

চরকার আরতি

এস এস চির-চারু চির-চেনা চরকা!
এস ঘরে শ্রীর পাদপদ্মের ভোম্‌রা!
অপলক চক্ষের জ্বেলে কোটি দেউটি
তোমার আরতি করি ত্রিশকোটি আমরা।

শিবের ললাটে চাঁদ সে চাঁদের বক্ষে
অঙ্কিত তোমারি সে স্বস্তিক-মূর্ত্তি,
ঘরে ঘরে জ্বেলে দাও হরষের জ্যোৎস্না
ঢেলে দাও দেহে প্রাণে কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি।

খুল্লনা-হেন দীনা শ্রীহীনা এ বঙ্গ,
তুমি এলে ফিরিবে শ্রী,—ফিরিবে শ্রীমন্ত,
বাংলায় ফিরে এস পুরাতন বন্ধু
অশরণা দুখিনীর কর দুখ অন্ত।

এস বাস্তুর প্রিয়! গৃহমেধী শিল্পে—
জীয়াইয়া গৃহে গৃহে পাল হে গৃহস্থে,
বস্তির দস্তুর হ'য়ে যাক্ লুপ্ত,
দুর্ভিক্ষের রাহু যাক্ চির-অস্তে।

যে দেশে বানাত টুপি নিজ-হাতে বাদ্‌শা
পদতলে ছিল যার দিল্লীর তক্ত,
চরকার চর্চ্চায় সেথা কার লজ্জা?
হিন্দু ও মোস্‌লেম চরকার ভক্ত।

তোমারে করিয়া হেলা, শুনি চীন-পুরাণে,
বঞ্চিতা পতি-প্রেমে সূর্য্যের কুমারী;
হ'ল স্বামী-সোহাগিনী সেবি' পুন তোমা' সে,
পূজার প্রচার চীনে তদবধি তোমারি।

ময়দানবের দেশে ইন্‌কার পেরুতে
গৃহে গৃহে পূজা পেতে তুমি গৃহ-দেবতা,
পতিপ্রাণা পেনেলোপে ঘেরে পর-পুরুষে,—
বাঁচায়েছ তুমি তারে, কে না জানে সে কথা।

তোমারে নিধান ক'রে তিন বোন নিয়তি
রচে নিতি দুনিয়ার ভাগ্যের সূত্র,
অধনের ধন তুমি চির-যুগে ধন্য
অনাথার স্বামী তুমি অবীরার পুত্র।

সতী সে সগের রাণী সতিনীর কুৎসায়
হ'ল যবে বনবাসী, তুমি দিলে অন্ন;
সখী তুমি ব্রিটেনের রাণী আনী-বুলেনের
কাড়াকাড়ি যার বোনা 'মিটেনে'র জন্য।

কবি কবীরের মিতা সঙ্গীতে সঙ্গী
তোমারে বরণ করি কবীরেরি সঙ্গে,
কিং-লীয়রের কবি হ্যাম্‌লেট-স্রষ্টা
করেছে তোমার সেবা কৈশোর-রঙ্গে।

বুলবুল-কুল শোনো উল্লাস-অন্তর
রলিছে কি বস্‌রাই গোলাপের ফুলে লীন,—
"ইরাণের কবিবর জুলাহা-ই-অব্‌হর্
চরকার চর্চ্চায় মশ্‌গুল হর্-দিন।"

শুভ-সূচী! এস শুচি-জীবনের বন্ধু!
কর্ম্মীর হে সুহৃৎ! অকেজোর শুদ্ধি!
কৃষাণীর কি রাণীর যতনের রত্ন!
দানো ফিরে জনে জনে মর্য্যাদা-বুদ্ধি।

ভুখা যে তোমার বরে লভুক্ সে আরবার
আত্মবশের স্বাদ—আপনাতে নির্ভর;
যন্ত্রের যন্ত্রণা দূর হোক দুনিয়ার,
কলে-গড়া 'কম্‌ফর্ট্!'—খেসারৎ বিস্তর।

নগরের নোংরায় ডুবে যায় সম্ভ্রম
ম্লান করে মানুষেরে চিম্‌নীর নিশ্বাস,
অকুলীন 'কুলি' নাম—পঙ্কের অঙ্ক
মুছে দাও, দাও তুমি বিশ্বেরে আশ্বাস।

ভস্মলোচন নব ভব্যতা রুক্ষ
কল ক'রে গিলে খায় জোয়ানের জোয়ানী,
চুঁয়ে যায় ক্ষেত-ভুঁই চিম্‌নীর ধোঁয়াতে
গঙ্গা সে সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্কের ধোয়ানী!

ভূত-বাদুড়ের মত বুক চাপে বিশ্বের
বাষ্পীয় সভ্যতা ইস্পাত-দন্ত,
কারখানা মানুষের হাড়খানা বাদে আর
সব খায়, আয়ু বল সব করে অন্ত।

ঘর্ঘর কলঘর থর-থর ইমারৎ
বুক-দুর্ব্বল-করা অহরহ কম্প,
দানবের দাঁতগুলো ঝল্‌সিয়ে দৃষ্টি
নরমাংসের লোভে ছায় যেন লম্ফ!

বাঘের গলার হাড় বার করে চড়ুয়ে!
দানবের পেটে ঢুকে মানবেরা করে কি!
যাবে যে হজম হ'য়ে নিগমের আগেতেই!
হুঁস্ নাই! হাঁশ ফাঁশ্! ওঠে কি সে পড়ে কি!

সারি সারি খাটে কুলি স্ত্রী-পুরুষ এক্‌সা,
রাশ রাশ ওড়ে ফেঁশো পেটে গেলে যক্ষা;
ঘড়ঘোড়ে কল-ঘরে কার শিশু সুপ্ত?
ধূলো-তুলো রোধে শ্বাস, কেবা করে রক্ষা?

বাস্তুতে ঘুঘু চরে, তার ঠাঁয়ে বস্তি!
উবে গেল উড়ে গেল মমতার প্রিয় নীড়;
কুলিনী কোলের শিশু ফেলে স্বামী রুগ্ন
ভেগে যায় 'মেট্' সাথে অনাচার করে ভিড়।

পদে পদে বাড়ে শুধু হৃদয়ের লঙ্ঘন
ময়দানে কাঁদে কচি গোপনের পয়দা,
শহরের বিষ ঢোকে পল্লীর ঘর ঘর
লালসার লোল শিখা বাড়ে রে বে-ফয়দা।

ধ্বসা পশ্চিমা লেগে পচে যায় দুনিয়া,
ছেয়েছে কুকুর-লোভী কামনার ছোঁয়াচে,
শয়তান লেলিয়েছে বোতলের বেতালে,—
দহিছে আগুন-পানি, কে বাঁচাবে ও-আঁচে!

বিজ্ঞান-বিজ্ঞের বিজ্ঞতা-ঝট্‌কায়
উড়ে গেল 'ওপ্‌পাউ'! উপে গেল সত্ত্ব!
হাজারো নিরীহ প্রাণ অকারণ বলিদান
দেমাকে করাতে পান ডাকিনীর মত্ত!

জগৎ ফুকারি বলে, ক্ষমা দে রে আর না,
নাচাস্‌নে ভূত আর অভিচার-মন্ত্রে,
সাধনার শব জেগে সাধকের মুণ্ড
ঘন ঘন করে দাবী ভৈরব-মন্ত্রে।

ব্যথিত দুনিয়া কাঁদে; এস তুমি চর্‌কা!
কলবলে কাজ নাই, প্রাণ চায় শান্তি,
এসো ফিরে দুনিয়ায়, ধ্রুব হও বাংলায়
শিল্পীর ইজ্জৎ! শিল্পের নান্দী!

হিংসা-বিরাগী-জনে দিলে তুমি সুবসন,
ব্রাহ্মণে হে পুরোধা! দিলে তুমি পৈতা;
বাখানিতে তব গুণ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ,
বল দেখি কোন্ মতে এক মুখে কই তা'?

মিছিল সাজায়ে করি মোরা তব উৎসব
রত্ন-সবিতা তুমি ক্রোর-দাতা বঙ্গে,
আবুরুয়া, শব্‌নম্, জাম্‌দানী, মস্‌লিন্,
স্বপ্নের কিম্খাব নিয়ে এস সঙ্গে।

ঘরে ঘরে আরবার ঠাঁই নাও আপনার
চারুতায় ছাই দাও মিল্-মেড্ শিল্পে,
কারু-ছত্রের ছাতা! বিশাইএর হাতিয়ার!
গেঁথে তোলো গ্রামে গ্রামে ঋদ্ধির পিল্পে।

"যা কিছু নিজের বশে সেই সুখ-স্বর্গ"
প্রতি গৃহ-কোণে রহি দাও এই মন্তর,
চির-দুর্ভিক্ষের কর তুমি উচ্ছেদ
মর্য্যাদা-বোধে ভর গরীবের অন্তর।

শিশিরে যেমন ক'রে পালক গজিয়ে তোলে
প্রকৃতির ইঙ্গিতে পাখীদের অঙ্গ,
কল্যাণে চরকার আপনার দর্‌কার
পূরণ করুক আজ সেইমত বঙ্গ।

পর প্রত্যাশা ছার দূর হোক সবাকার
নিঃস্বে স্বয়ম্প্রভু হোক উদ্‌বুদ্ধ।
পতিতা ত্যজিয়া পাঁক সৎপথে ভাত পাক্
অবিরোধে মরণের দ্বার হোক রুদ্ধ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

খুনী

ঝঞ্ঝাময়ী রজনী। রুদ্ধদ্বার সুপ্তগৃহ নগরের বিজন পথে ক্ষুব্ধ বাতাস মৃত মত্ত আত্মার মত হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে, কাজল-মেঘ হইতে আকুল বারি-ধারা অবিশ্রাম ঝরিতেছে; কে যেন তাহার ঘন-কৃষ্ণ মুক্তবেণী দিয়া বিশ্ব-চরাচরকে বেষ্টন করিয়া আপন উন্মুক্ত কবরী বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল নখ দিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া বুভুক্ষু অন্তরের আর্ত্তনাদ-মুখর ঘন তমিস্রপুঞ্জে অবিশ্রাম অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

এই ঝড়ের রাত্রে হর্ষ-শঙ্কা-কম্পিতা চকিত-চরণা অভিসারিকার মত বৃষ্টি-স্নাত একখানি লাল মোটর-কার বৃক্ষশ্রেণী-মর্ম্মর মুখর বারি-কল-ধ্বনিময় নগরের জলপূর্ণ পথে পথে ঘুরিতেছে; ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে বড় রাস্তার এক রুদ্ধদ্বার অন্ধকারনিমগ্ন স্তব্ধ প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

দুয়ার খুলিয়া গেল। গৃহ হইতে বিদ্যুতের তীব্র আলোক-স্রোত বারিসিক্ত মোটরে পড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল। দ্বারবর্ত্তিনী এক সুন্দরীর লালসা-তীব্র মধুর কটাক্ষে ষ্টীয়ারিং হুইল ছাড়িয়া মোটরের দরজা খুলিয়া প্রিয়দর্শন তরুণ যুবক বসন্ত বাহির হইয়া,

রূপাজীবার পুষ্পবল্লীসম স্বর্ণবলয়াঙ্কিত হস্ত আপন হস্তে জড়াইয়া, রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষাফলসম লাল শাড়ী জড়ানো অরুণ তনুর উত্তাপ আপন জল-সিক্ত দেহে ছড়াইয়া প্রমুগ্ধ হইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সুন্দরী ধীরে রক্তগোলাপ রক্তপদ্মকদম্বকেতকী-বিকচ সুকোমল শয্যায় তাহাকে বসাইল, দ্বার বন্ধ করিয়া, বিদ্যুতের প্রখর আলোগুলিতে লাল-নীল কাপড়ের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া, বসন্তর পায়ের তলায় বসিয়া এস্রাজ লইয়া গান ধরিল,—

আজু রজনী হম ভাগে গমাওনু
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।

সঙ্গীতের সুরে-সুরে সুন্দরীর রক্তগোলাপ-মাল্যবিজড়িত মুক্তকৃষ্ণ কেশদাম, ঘনকৃষ্ণ চক্ষুতারা, উন্নত বক্ষস্থল, সুঠাম কটি, অলক্তক-রাঙা চরণ দুলিয়া উঠিতে লাগিল। বসন্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত গায়িকার দিকে চাহিয়া রহিল—সে এক সুধা-গরল-মিশ্রিত লালসা-তৃষ্ণাতপ্ত প্রেমাশ্রু-রক্ত ফেনিল জ্বালাময় পরম তৃপ্তি! সেই অনল-সম দেহসুধাভরা মোহিনী সর্পিণীসম সুন্দরীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বসন্তর তরুণ কোমল মুখ তপ্ত হইয়া উঠিল—কি সুতীব্র জ্বালাময় আনন্দে দেহ চঞ্চল হইল, উন্মত্তের মত উঠিয়া সে এস্রাজ-শুদ্ধ সুন্দরীকে জড়াইয়া ধরিল। এস্রাজের কয়েকটি তার ছিঁড়িয়া গেল, বাদ্যযন্ত্রের আঘাত গীতসুরদীপ্ত রক্তিম গণ্ডে লাগাতে সুন্দরী ভয়ে একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই দীর্ঘ আঁখিপক্ষ্মে বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠিল! এস্রাজ সরাইয়া যুবককে একটু ঠেলা দিয়া সে বসাইল। বসন্ত ধীরে তাহার সিল্কের পাঞ্জাবীর পকেট হইতে এক সোনার হার বাহির করিয়া সুন্দরীর গলায় পরাইয়া দিল, তারপর তাহাকে মাদক বেষ্টনে জড়াইয়া পুষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

পাইয়াছে, সুন্দরীকে সে পাইয়াছে তাহার বক্ষে,

জীবন-যৌবন সফল করি মানল
দশদিশি ভেল নিরনন্দা।

সুন্দরী তাহার, অনন্তকালের জন্য তাহার—এ সুখ-পাশ হইতে তাহাকে সে কখনও ছাড়িবে না! ধীরে ধীরে বসন্ত সুন্দরীর সাপের মত কোঁকড়ানো চুলগুলি মুক্তার হার জড়ানো সুন্দর গলায় জড়াইয়া তাহার সহিত সোনার হার জড়াইয়া খেলা করিতে লাগিল। সুন্দরী কোন্ অসহনীয় বেদনাময় সুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, মুখে কথা ফুটিতেছিল না, শুধু চোখদুটি বলিতেছিল, এ স্বর্গ! কোন্ মদিরাসম তীব্র সুখে পাগল হইয়া বসন্ত কেশে জড়ানো সোনার হার গলার দড়ির মত করিয়া টানিতে লাগিল। একবার সুন্দরী একটু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল, কিন্তু সে ব্যথায় নয়, অপরিমেয় অসহ্য সুখে। আরও নিবিড় আরও নিবিড় গভীর করিয়া বসন্ত সোনার হার গলায় জড়াইয়া টানিতে লাগিল—ধীরে সুন্দরীর নিশ্বাস রোধ হইল, শিরা-উপশিরায় রক্তের কল্লোল বন্ধ হইল, তপ্ত সুবাসময় তনু নিস্পন্দ হইয়া এলাইয়া পড়িল। কিন্তু বসন্ত দেখিতেছিল, তাম্বুলরঞ্জিত অধরে বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল নয়নে, এলায়িত তনুর রেখায়-রেখায় কি ছন্দে গান বাজিতেছে,—

আজু রজনী হম ভাগে গমাওনু
পেখল পিয়া-মুখ-চন্দা।

অন্তরের শিরা-উপশিরা কিসের প্রবাহে

উন্মত্ত হইয়া কলধ্বনি করিতেছে। গোলাপ-মালা-জড়ানো মাথা সে হাতে তুলিয়া লইল, মাথা এলাইয়া তাহার কোলে লুটাইয়া পড়িল। তখন সে কুসুম-শয়ন পাতিয়া অতিস্নেহের সহিত সুন্দরীর নিস্পন্দ তনু সুন্দরভাবে শয্যায় শোয়াইয়া পাশে বসিয়া ক্ষুধিত মুগ্ধ নেত্র দিয়া চাহিয়া রুদ্ধদ্বার স্তিমিত-রঙীন-আলোময় বিজন গৃহে মধুর মিলন-রাতি যাপন করিতে লাগিল।

বাহিরে শ্রাবণ-গগনে তিমির-শয্যা পাতিয়া কে ক্ষুব্ধ হাহাকারে অবিশ্রাম অশ্রুজলে আকুল করিয়া বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছে।

বাহিরে তখন বৃষ্টি ধরিয়াছে, মাতালের চোখের মত ঘোলাটে আকাশ—প্রভাতের আলো কালো মেঘের যবনিকার ভিতর দিয়া পৃথিবীতে পৌঁছাইবার কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

রুদ্ধ দুয়ারে কে যেন আঘাত করিল। বসন্ত পাগলের মত শান্তিহারা চঞ্চল হইয়া এতক্ষণ ঘরের এক কোণ হইতে অপর কোণে বাক্‌হীন লুকাইয়া বেড়াইতেছিল। কখনও এ কোণের চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করে, কিন্তু কিছুক্ষণ থাকিয়াই মনে হয়, সে সুন্দরী উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছে,—অমনি উঠিয়া গিয়া ও-কোণের টেবিলে মুখ গুঁজিয়া পড়ে। মনে হয়, ওই বুঝি শায়িত দেহ নড়িয়া উঠিল! আন্‌লা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত নয়নে শয্যাবলুণ্ঠিতার দিকে চাহিয়া থাকে,—সে দেহ কি একবারও একটুও নড়িবে না?

দরজায় আবার যেন আঘাত হইল। বসন্ত অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া কম্পিত পদে অবলুণ্ঠিত তনুর দিকে অগ্রসর হইয়া সুন্দরী-দেহের আনন-কপোল বক্ষ-হস্ত-পদ সব স্থান আপন তপ্ত হস্ত দিয়া স্পর্শ করিল। না, না, সে খুন করে নাই, কখনও খুন করে নাই—তবু হস্তে সে মাদক স্পর্শ কোথায়! বক্ষে সে সৌরভময় উত্তাপ কোথায়! কোথায় সেই দেহ-এস্রাজে রক্ত-ধারার ছন্দে মিলনের গান? ভীত নয়নে দরজার দিকে সে চাহিল, তারপর মৃত সুন্দরী-দেহের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সে পলাইতে চায়, পারিতেছে না, সুন্দরীকে আবার ছুঁইতে গেল, যেন কোন্ আলো-ছায়াময় পঙ্কিল পথে মৃত সাপের স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল! সুধা-গরল-মিশ্রিত সে স্পর্শ সে পঙ্কিল মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিতেছে, টানিতেছে, একবার পলাইয়া আবার ছুটিয়া আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে সে হস্ত বুলাইল, সুন্দরীর হাতে তাহার হাত পড়িয়া গেল, সেই শীতল কোমল হাত যেন তাহার হাত দুইটিকে অতি-দৃঢ় বাঁধিতেছে! জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া গিয়া সে দরজা খুলিল। সত্যই এ মৃতা! বসন্ত চেঁচাইতে চাহিল, 'খুন, খুন'—কে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। পিছনে কাহার পদশব্দ! ফিরিয়া দেখে, কেহ কোথাও নাই! গলিতে সে বাহির হইয়া পড়িল। সামনে মোটর পড়িয়া রহিয়াছে, উঠিয়া চালাইতে চাহিল, মোটর অচল হইয়া বসিয়া গিয়াছে, চলিতে কিছুতেই চায় না! ষ্টীয়ারিং হুইলে এ কাহার এলোচুল জড়ানো! চীৎকার করিয়া মোটর ছাড়িয়া বসন্ত লাফাইয়া পড়িল। ওই, আবার কাহার পায়ের আওয়াজ, গলির মোড়ে ও কাহারা চুপে চুপে কথা কহিতেছে! ফিরিয়া না তাকাইয়া সে সম্মুখে দৌড় দিল! গলির

বাঁকে মিউনিসিপ্যালিটির মেথরদের একখানা গাড়ী প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল,—মহিষের মত কালো এক মেথরের ছেলে তাহাকে মাতাল ভাবিয়া হাসিয়া উঠিল।

ছুটিতে ছুটিতে শ্রান্ত হইয়া বড় রাস্তায় পড়িয়া সে দাঁড়াইল। কিন্তু মোড়ের পুলিস তাহারই দিকে যেন চাহিয়া রহিয়াছে। সে হাঁফাইতেছে, পা ব্যথা করিতেছে, আর ছুটিতে পারে না, ধরুক্ তাহাকে;—সে ত সত্যই খুন করে নাই। পুলিস তাহাকে ধরিল না। সে সাহস দেখাইয়া পুলিসের গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। কিছুদূর গিয়া দেখিল, সেই পুলিসটা আর কয়েকজনের সহিত কি কথা কহিতেছে, তাহার দিকে চাহিতেছে। এবার নিশ্চয় জানিয়াছে—বসন্ত ছুট দিল!

ক্ষান্ত-বর্ষণ বর্ষা-প্রভাতে জন-বিরল পথ ধীরে ধীরে জনপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। পথের পাশে মুদির দোকান, খাবারের চায়ের দোকান একে একে সব খুলিতে লাগিল। গরুর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী মোটরকারের শব্দে মুখর জনস্রোতপূর্ণ হইয়া সহরের পথ সজাগ হইয়া উঠিল। বিপুল জনস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া, লোকের ভিড়ে আপনাকে লুকাইয়া, গাড়ীর ঘর্ঘরশব্দে মনকে ডুবাইয়া বসন্ত বারবার শান্ত হইতে চেষ্টা করিল, বার বার কোন্ অশান্তি ভূতের মত ভয়ের দুঃস্বপ্ন-জাল রচনা করিয়া কাণে কাণে বার বার বলে, পালাও, পালাও, আরো দূরে, আরো দূরে। কখনও সে লোক-প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া বরাবর সোজা চলে, কখনও কোন জন-বিরল গলি-পথে লুকায়, আবার বড়রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে। এই বেগবান জনপ্রবাহ তাহার কাছে ছায়া, কোন্ অবাস্তব মায়ার মত বোধ হইতে লাগিল,—যেন ছবির স্রোত ভাসিয়া, স্থূল বাস্তব জগৎ ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, সেই জগৎ-স্রোতে ভূতের মত সে ছুটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল, পায়ের তলায় মাটি যেন দৃঢ় শক্ত নয়, চারিদিকে ছায়াবাজির খেলা—এইবার বুঝি একটা সংঘাত-বিপ্লব হইবে, ওই মোটরের সহিত ঘোড়ার গাড়ীর, ট্রামের সহিত মহিষের গাড়ীর বুঝি ঠোকাঠুকি হয়! কিন্তু কিছুই হইল না দেখিয়া সে যেন একটু আশ্চর্য্য নিরাশ হইয়া উদাসভাবে তাকাইয়া থাকে। দূরে কয়েকজনে মিলিয়া চুপে চুপে কি পরামর্শ ষড়যন্ত্র করিতেছে, অমনি বসন্ত জোরে ছুটিয়া চলে। সে কোথায় যাইতেছে তাহার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, মগ্নচৈতন্য লোক হইতে কোন্ অজানা শক্তি তাহাকে চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে!

চলিতে চলিতে সহসা সে দাঁড়াইয়া পড়িতে ছিল। পথের উপর তাহার পায়ের সামনে ফুটপাথে সেই সুন্দরীর মন-মাতানো মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, ওই নড়িতেছে! চমকিয়া উঠিয়া নত হইয়া সে দেহ সরাইতে যায়, কর্দ্দমাক্ত ফুটপাথে দুই হাত বুলাইয়া পথের কাদা ঘসে, সে দেহ মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথা অদৃশ্য হইয়া যায়! কোন পথিক বলে, পকেট থেকে পয়সা পড়ে গেছে, মশাই! পানওয়ালী অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, মুসলমান ছেলের দল হাসিয়া ওঠে। বসন্ত বরাবর কাদা মাখা হাত ঘসিয়া ঘসিয়া দেখে, না, রক্তের চিহ্ন ত কোথাও নাই,

সে খুন করে নাই! ক্ষুব্ধ ব্যথিত হইয়া উদ্দীপ্ত নেত্রে চারিদিকের জনস্রোতের দিকে সে চায়। কি সৌন্দর্য্যহীন পথ, কি কুৎসিত জনপ্রবাহ! ওই জলের কলে যে নারীরা জল লইতেছে, কি কুৎসিত কদাকার তাহারা—কি কদর্য্য ওই বারাঙ্গনার মুখটা, ওই মুসলমানের কালো দাড়ি সে টানিয়া ছিঁড়িয়া দিতে চায়! অফিসের কেরাণীরা ছুটিতেছে, কাহারও মুখে একটুও সৌন্দর্য্য নাই। কেন মানুষের সহিত মানুষের ঘাতপ্রতিঘাতে একটা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হয় না? মোটরে কাহাকে দেখিয়া ভয়ে আবার সে চলিতে আরম্ভ করে।

এইরূপে মেঘসমাচ্ছন্ন প্রভাত ভীতোন্নত হইয়া ঘুরিয়া দ্বিপ্রহরে বসন্ত নগরের প্রান্তে জীর্ণ প্রাসাদ ও তৃণ-কুটীর-সমাকীর্ণ পল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। আকাশ সাপের কুণ্ডলীর মত কালো মেঘে ভরা, বাতাস আর্দ্র, পথ জনবিরল। অতি অবসন্ন হইয়া পথের পাশে গাছের তলায় সিক্ত ভূমিতে সে বসিয়া পড়িল। সে নগর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে, এখানে কোথাও কেহ নাই দেখিয়া মন কিছু শান্ত হইল। কিন্তু মনে শান্তি-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুক কিসের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল; তাহার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, কণ্ঠের তালু জ্বলিতেছে। জল, কোথায় জল? আকাশ ভরিয়া জল রহিয়াছে, দূরে পুষ্করিণীতে জল রহিয়াছে, কিন্তু তাহার মুখে একবিন্দু জল কে আনিয়া দিবে! সে এত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে উঠিয়া গিয়া জল পান করিবার শক্তি ছিল না, ভূমিতে মুখ গুঁজিয়া জলসিক্ত তৃণগুলি জিহ্বা দিয়া চাটিতে লাগিল। একটু জলের আস্বাদে প্রাণ আরও তৃষিত হইয়া উঠিল। দূরে পুকুরের পাড়ে একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। আপনাকে কোনমতে টানিয়া টানিয়া পুকুরের তীরে সে গিয়া পৌঁছিল, কিন্তু জলে মুখ দিতে গিয়া নিজের মুখের ছায়া দেখিয়া জলে মুখ দিতে পারিল না, আবার মুখের ছায়া দেখিল, আবার মুখ ফিরাইল। ওই কি তাহার মুখ! কিশোরীর মত কোমল গণ্ড এত দৃঢ়, এত রুক্ষ হইয়া গিয়াছে, নির্ম্মল চোখ এত কালি-ভরা। তাহার মাথায় ত সাদা চুল ছিল না, এ কি তাহার যৌবনের ব্যঙ্গ ছবি! অবাক হইয়া নিজের বেশভূষার দিকে সে তাকাইল। পায়ের লাল সেলিম সু ছিঁড়িয়া কাদায় ভরিয়া কালো হইয়া গিয়াছে, লালজরির পাড়ওয়ালা দেশী ধুতি ছিন্ন কর্দ্দমাক্ত, সিল্কের পাঞ্জাবী ভিজিয়া কাদার ছাট লাগিয়া কি কদর্য্য! সে শুধু কুৎসিত নয়, সে বীভৎস, ঘৃণার যোগ্য! কিন্তু আপন কদর্য্যতা সম্বন্ধে দুঃখভোগ করিবার সময় বেশী ছিল না, জলের তৃষ্ণায় গলা জ্বালা করিতেছিল, সকল দুঃখ ভুলিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিয়া বসন্ত শ্রান্ত হইয়া ঘাটে লুটাইয়া পড়িল।

তবু বুকের জ্বালা যায় না, পেট ঘড়ঘড় করিতেছে, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। যে প্রতিদিন চার-পাঁচবার করিয়া খায়, আজ বিশঘণ্টা কিছু খায় নাই। কেহ এক কাপ চা আনিয়া দেয় না? নিশ্চয় কাছে চায়ের দোকান আছে, কিন্তু উঠিবার যে একটুও শক্তি নাই। দূরে পথে কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করিয়া ভীষণ চীৎকার তুলিল, বসন্ত

মুখ ফিরাইয়া দেখিল, গাছের তলায় একটি মোটর দাঁড়াইল, তাহা হইতে তিনটি পুলিস কন্‌ষ্টেবল্ ও একটি ইন্‌স্‌পেক্টর নামিতেছে। আপনার অজ্ঞাতে সে দাঁড়াইয়া উঠিল, পাশের বাঁশবনের মধ্যে ছুটিয়া গেল—সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, কাদায় অর্দ্ধেক পা ডুবিয়া গিয়াছে, মাথায় পিঠে বুকে বাঁশের ডগা পাতা লাগিয়া দেহ ক্ষতবিক্ষত—সেই তৃষিত ক্ষিপ্ন ভীত কম্পমান মূর্ত্তি লইয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে শূন্য মোটরের দিকে সে চাহিয়া রহিল। পুলিসেরা গ্রামের ভিতর ঢুকিয়াছে। কত যুগ কাটাইয়া পুলিসের দল ফিরিল, মোটরে করিয়া নগরের দিকে চলিয়া গেল। মোটর-কারের শব্দ যখন আর শুনা গেল না, বসন্ত তখন ধীরে ধীরে বাঁশবন হইতে বাহির হইল। তথায় ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য। মরিতে হয়, না খাইয়া মরিবে না, খাইয়া সে পুলিসে ধরা দিবে।

কিছুক্ষণ পরে সেই রুক্ষকেশ শীর্ণমুখ কর্দ্দমাক্ত মলিন মূর্ত্তি এক খাবারের দোকানের সামনে গিয়া প্রদীপ্ত প্রখর দৃষ্টি দিয়া খাবার গুলির দিকে চাহিয়া অস্পষ্টস্বরে অস্ফুট ভাষায় কি বলিল। দোকানদার সে তরুণ যুবকের কদর্য্য মলিন মূর্ত্তির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া বুঝিল না, সে খাবার চাহিতেছে, না ভিক্ষা চাহিতেছে! ভিক্ষুক ভাবিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলে বসন্তর রাঙা চোখ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, কম্পিত হস্তে পকেটে হাত দিয়া টাকা বাহির করিতে গেল; কিন্তু কোন পকেটেই মণিব্যাগ খুঁজিয়া পাইল না, সকালে সহরে কখন্ পকেট-কাটা তাহার মণিব্যাগ চুরি করিয়াছে, তাহা সে কেমন করিয়া জানিবে! সঙ্গে চ
নাই দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইল,
জ্বলিতে লাগিল। দোকানী তাহার
সন্দিগ্ধ ঘৃণিত নয়নে তাকাইয়া
ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে আঙুল হইতে হী
খচিত দুই স্বর্ণ-অঙ্গুরী খুলিয়া দোকানীর
ধরিয়া ক্ষুব্ধস্বরে সে বলিল—খাবার। দোকান
বিদ্রূপ-হাসি হাসিয়া সে আংটি
রাজী হইল না। সে গরীব মানুষ,—সো
আংটি লইয়া কি চোর বলিয়া শেষ ধরা পড়ি
তাহার গায়ে ঠেলা দিয়া চলিয়া যাইতে ব
ক্ষোভে ক্রোধে ক্ষুধা-লজ্জা-ঘৃণায় বসন্তর
শরীর জ্বলিতেছিল, দোকানীকে সে মা
ছুটিল। সহসা দোকানের কোণে চা
পাঁচ জন কদাকার পুরুষ মিলিয়া সে
কি ফিস্‌ফিস্ করিতেছে দেখিয়া দ্রুত
বসন্ত দোকান ছাড়িয়া চলিল।

কিন্তু বেশী দূর তাহাকে যাইতে হইল
জন-হীন পথের ধারে এক গাছের
আসিতে কয়েকজন বলিষ্ঠ মুসলমান
ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়া আক্রমণ করিয়া
হইতে আংটি দুইটি ছিনাইয়া লইল।
প্রথমে একজনকে এক ঘুসি মারিল, তা
স্ব-ইচ্ছায় আংটি দিয়া জানাইল, তাহার
ক্ষুধা পাইয়াছে, সে কিছু খাইতে চায়।
লাল লুঙ্গি-পরা বসন্তের দাগভরা মুখ মুসল
হাসিয়া তাহাকে পথের কাদা দেখাইয়া
কিন্তু একটি তরুণ মুসলমান যুবক পকেট হ
একটি টাকা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া ফে
দিয়া চলিয়া গেল।

বসন্তর পা কাঁপিতেছে, বুক ধপ
করিতেছে, পেট গড় গড় করিতেছে,

স্তে পথের কাদা হইতে টাকাটি তুলিয়া
ইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই
াবারের দোকানের সামনে আসিয়া দোকানীর
ায়ে টাকাটা সে ছুড়িয়া মারিল। দোকানদার
থমে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তারপর তাহার
সহায় করুণ অবস্থা দেখিয়া ব্যথায় মন ভরিয়া
ল, এক টাকার খাবার ঠোঙায় করিয়া
াহার হাতে দিল। হিংস্রভাবে দোকানীর
াত হইতে খাবারের ঠোঙাটা ছিনাইয়া লইয়া
ন্ত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত অতি দ্রুতবেগে
চুরি সিঙাড়া সন্দেশ রসগোল্লা সব খাবার
্যগ্রভাবে মুখে পুরিয়া নিমেষের মধ্যে
ংশেষিত করিল। তাহাকে অত তাড়াতাড়ি
াইতে দেখিয়া দোকানদার ভয় পাইয়া বার
ার সাবধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোন
লই ফলিল না। খাবার শেষ করিয়া বসন্ত জল
াহিল। এক বড় ঘটির এক-ঘটি জল একেবারে
ান করিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে
নিঃশব্দে সে দোকান ছাড়িয়া গেল।

গ্রাম ছাড়িয়া সে বেশীদূর যাইতে
ারিল না, গা বমি-বমি করিতেছে, মাথা
ুরিতেছে, পা টলিতেছে; খালের ধারে
ক্ষেতের পাশে এক গাছের তলায় বসিয়া
পটের ব্যথায় অস্থির হইয়া ছটফট করিয়া
ার্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে
াহা খাইয়াছিল, সব বমি হইয়া গেল। সমস্ত
ন্তর ক্ষোভে বিদ্রোহে জ্বলিয়া উঠিল।
াহাকে যেন সে অভিশাপ দিতে চায়,
বদ্রোহ করিতে চায়। হায় বিধাতা, কি পাপ
স করিয়াছে, যে ক্ষুধার সময় সময় খাইবার
রিতৃপ্তি হইতেও সে বঞ্চিত! বিশ্বলক্ষ্মীর
াণ্ডারের দ্বার তাহার নিকট বন্ধ হইল!

বেশ. আজ সে সয়তানের পক্ষ লইয়া ঈশ্বরের সহিত লড়িবে, সেই প্রতিহিংসা-পরায়ণ স্তব-গানপ্রিয় শক্তিময় বিশ্ব-বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে।

সে জঘন্য স্থানে সে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়াও কিন্তু বেশীদূর যাইতে পারিল না, আর এক গাছের তলায় ক্ষিপ্ন অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়াও শান্তি নাই। কে তাহার পার্শ্বে শুইয়া তাহার তুষার-সম হিমস্পর্শে মাদক-বেষ্টনে তাহাকে জুড়াইতেছে। উঠিয়া পলাইতে গিয়া আবার সে ভূমে লুটাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে সুপ্তি আসিল, কিন্তু সে নিদ্রাও দুঃস্বপ্নময়। বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ জলাকার পথ দিয়া সয়তানের রথের মত সে মোটর হাঁকাইয়া চলিয়াছে, আর তাহার পাশে কে সুন্দরী সর্পসম বাহু-আলিঙ্গনে জড়াইয়া ষ্টীয়ারিং হুইলে ঘুরিয়া গেল, মোটর ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কোন ঘনতমিস্র-পুঞ্জে পড়িতেছে, পড়িতেছে,—একরাশ কালো চুল, তাহার মধ্যে এক সোনার সাপ খেলা করিতেছে!

এইরূপ দুঃস্বপ্নময় নিদ্রা যখন ভাঙিল, তখন রঙীন বর্ষা-সন্ধ্যা। দক্ষিণের আকাশ নীল, পশ্চিমে পুঞ্জীকৃত মেঘস্তূপে সন্ধ্যাসূর্য্যের রক্তিম আলোকচ্ছটা, উত্তরে মেঘের ঘন ঘোরঘটা। খালের কালো জল রাঙা হইয়া টলমল করিতেছে, সম্মুখে স্বর্ণ-শীর্ষ ধান্যক্ষেত্র গোধূলির আলোকে নাচিতেছে, বারি-স্নাত তৃণগুলি ঝিকিমিকি করিতেছে। কিন্তু এ অপরূপ সন্ধ্যাশ্রী বসন্তর চোখে পড়িল না, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলোক হইতে সে যেন নির্ব্বাসিত, মন ভয়-বিভীষিকাময় পঙ্কিলকারার

বেদনায় বন্দী। প্রদীপ্ত নেত্রে সে দেখিতে ছিহ ওই কালো মেঘরাশি কাহার মুক্ত কবরী, কাহার অরুণ-তনু পশ্চিমাকাশের স্বর্ণশয্যায় শুইয়া, আলোকরশ্মি স্বর্ণহারের মত তাহাকে জড়াইতেছে। তবু, এই স্নিগ্ধ বর্ণবৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যলোক তাহার মনকে শান্ত করিল।

সহসা এক বাঁশার শব্দে সে সচকিত হইয়া উঠিল। খালের ওপারে এক বাউল বাঁশী বাজাইতেছে। তাহার তপঃক্লিষ্ট মেদরিক্ত সুঠাম দেহ সন্ধ্যার আলোয় আকাশের রাঙা পটে এক কালো ছবির মত আঁকা, ব্যাকুল ধেনুর মত বাঁশীটি সুরের হাওয়ায় কাঁপিতেছে। বাউল বাঁশীর তানে সারা দিনের গান সন্ধ্যা দেবীর পায়ে নিবেদন করিতেছিল। প্রভাতে নীড়ে নীড়ে পাখী-কলরবে যে গান ধ্বনিত হয়, জাগ্রত শিশুর কলহাস্যে মঙ্গলকর্ম্ম-রতা গৃহিণী-কঙ্কণে গৃহে গৃহে যে গান বাজে, পথে পথে রথ-ঘর্ঘরে পথিকের পদধ্বনিতে যে গান ওঠে; বর্ষার বারি-ঝরঝরে বেণুবনের মর্ম্মরে খালের জলের কলধ্বনিতে প্রকৃতি-দেবীর পায়ের নূপুরের রিনিঝিনির মত যে সঙ্গীত—সুরে সুরে বাঁশী পুরিয়া বাউল একে একে সব গান গাহিতেছিল।

সে-বাঁশীর সুর শুনিতে শুনিতে বসন্ত আকুল হইয়া উঠিল, তপ্ত শুষ্ক চোখ জলে ভরিয়া আসিল, অস্ফুট আর্ত্তনাদে ভিজা ঘাসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাঁশীর তানে তাহার প্রাণে কান্নার জোয়ার আসিল। ধীরে ধীরে তাহার মনে পড়িল, কলেজের বন্ধুর কথা, সে যে-মেয়েটিকে ভালোবাসে তাহার কথা—ছোট বোন দাদা আসে নাই বলিয়া কত না রাগ করিয়াছে, কতবার দরজা ছুটিয়া আসিয়াছে, কতবার না মাকে জিজ্ঞাস করিয়াছে, আর তাহার মা পুত্র-হার হইয়া তাহারি মত বুঝি নিরন্না রহিয়াছেন। বাউল বাঁশী বাজানো শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। বসন্তর চোখের কান্না আর কিছুতে থামিতে চায় না। বেদনা, অসহনীয় জ্বালায় বেদনায় অন্তর ছিঁড়িয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া তীরে গিয়া সে জলে নামিতে আরম্ভ করিল, বুক ডুবিল, গলা পর্য্যন্ত ডুবিল, তবুও যাতনার নিবৃত্তি নাই!

দৃঢ় পদে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া নগরের দিকে দ্রুত সে চলিতে আরম্ভ করিল। সেই ক্ষিপ্ত পিপাসিত অবসন্ন ভীতি-ক্লিষ্ট দেহটাকে কোন্ অজানা প্রবল শক্তি টানিয়া লইয়া চলিল।

পথে যাইতে যাইতে, এক গলির মোড়ে সে দেখিল, ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া এক তরুণী মাতা শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া চাঁদ দেখাইতেছে। ইচ্ছা হইল, একবার যদি ওই নবীন কোমল শিশুকে তাহার বুকে দেয়, সে প্রাণ ভরিয়া চুমু খায়! ছুটিয়া গিয়া হয়ত শিশুকে ছিনাইয়া লইবে, এই ভয়ে সেখান হইতে সে ছুট দিল।

এক চায়ের দোকানে কয়েকটি যুবক আনন্দে চা পান করিতে করিতে গল্প করিতেছে। এক কাপ গরম চা এখন তাহার কাছে স্বর্গ! লোভ দমন করিয়া জোরে পথে চলিল।

সুসজ্জিত আলোক-দীপ্ত গৃহে সুন্দরী গায়িকা গাহিতেছে, পাশে এক তরুণ যুবক বসিয়া। কাল রাত্রে ওই যুবকের চেয়েও সে কত সুন্দর,

ত আনন্দে ছিল! নিমেষের জন্য মুক্ত দ্বারের কট দাঁড়াইল; তারপরে ভয় হইল, হয়ত গলের মত ওই তরুণীর দিকে সে ছুটিয়া ইবে। মাটি হইতে আপনাকে যেন সে ড়িয়া লইয়া চলিল।

রজনী আঁধার হইয়া আসিতে লাগিল। ছায়া, মায়া, স্বপ্ন,—এই কৃষ্ণ প্রাসাদ-শ্রেণী, কম্পিত আলোকমালা, এই বেগবান কটস্রোত, ধাবমান জনপ্রবাহ, সব কোন্ তলোকের বায়স্কোপের ছবির মত। সমস্ত জীবন একটা দুঃসহ দুঃস্বপ্ন, সুখ শুধু দ্রায়,—সে নিদ্রাও যে দুঃস্বপ্নময় হইয়াছে!

পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া বসন্ত লতে লাগিল।

রাত্রি গভীরা, আবার ঝঞ্ঝাময়ী উন্মাদিনী ইয়া উঠিল। শ্রাবণ-ধারায় আপনাকে াইয়া ভাসাইয়া বসন্ত চলিল।

মোটর লইয়া রূপাজীবার বাড়ীতে গতরাত্রে যখন পৌঁছিয়াছিল, ঠিক সেই সময় সেই বাড়ীতে আসিয়াই রুদ্ধদ্বারে সে আঘাত করিল। প্রহরী পুলিশ তখন বেশ নিদ্রা দিতেছিল, এরূপভাবে ঘুম ভাঙ্গাতে গালাগালি দিয়া চটিয়া সে দরজা খুলিল।

'আমি খুনী' বলিয়া কম্পিত পদে বসন্ত ঘরে ঢুকিল। তাহার বিপর্য্যস্ত দীর্ঘ কেশ ঝরিয়া সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া জল পড়িতেছে, বারিধারায় জামা-কাপড়ের সব কাদা ধুইয়া গিয়াছে, সিক্ত শুভ্র বসনে দীপ্ত মুখে বিদ্যুতের আলো ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। এ আবার কোন আপদ আসিল ভাবিয়া পুলিসটা ভ্রূকুটি করিয়া উঠিল।

শূন্য শয্যায় কয়েকটি শুক্‌নো-ফুল-পাতা পড়িয়া আছে। বাহিরের প্রমত্ত শ্রাবণ-রাত্রির মত উদ্বেলিত অন্তরের অশ্রু-বর্ষণে ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদে শূন্য গৃহ ভরিয়া বসন্ত শূন্য শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু।

দেন্‌দার

বাগান-বাড়ি বিকিয়ে গেছে—টান পড়েছে বাস্তুতে,
পুঁজি-পাটা যা ছিল তা লুটে নিল পাঁচভূতে,
এবার জ্বালিয়ে দিয়ে নীল বাতি
গাছতলা সার করতে হবে পরতে হবে পাঁচ-হাতি,
পালিয়ে বেড়াই ধরবে কবে আদালতের যমদূতে।

পাওনাদারে দিইনা-গালি, তার যেন না কেউ মরে,
পুত্র-পৌত্র তস্য পুত্র মনের সুখে ভোগ করে,
ওসে করলে বটে দিগ্‌দারি,
পাওনা-গণ্ডা কেইবা ছাড়ে? তারেই কেন গাল পাড়ি?
কেউ-বা আসল বাড়ায় সুদে কেউ-বা সুদের সুদ ধরে!

বাবার নিজের হাতের পোঁতা উঠোনে কৎবেলগাছে,
নতুন মালিক এসে যদি ভয় হয় কোপ্ ন্যায় পাছে !
মার লক্ষ্মীপূজোর ভোগ-ঘরে
নিত্য-ধোয়া গঙ্গাজলে ম্লেচ্ছয়ানী কেউ করে !
দেউলে যে জন তার কেন মন হয় গো এমন সাত-পাঁচে ?

পরিবারের গয়নাগাঁটি দিয়েছি ত সব ফুঁকে,
একরতি তিল নেইক সোনা চাইব যে ধার কোন্ মুখে ?
ওমা কেমন ক'রে দিন চলে !
ময়রা মুদি গয়লা এদের ঠেকিয়ে রাখি কোন্ ছলে ?
সাতশো কথা অপমানের মুখ ফুটে কয় বুক ঠুকে।

বন্ধুজনে এড়িয়ে চলে, ন্যায়না আমল আর মোটে,
দেখলে—ভাল ? কেমন ! ভাল ?—শুক্‌নো হাসি বয় ঠোঁটে,
তারা আদর-খাতির সব জানে,
মানুষ বুঝে যত্ন-আদর অবজ্ঞারি বাণ হানে,
ঘৃণার কাঁটা কোথাও,—কোথাও আপ্যায়নের ফুল ফোটে !

মেয়েটা এই ভুগ্‌ছে জ্বরে ভিজিট দেবো কোত্থেকে ?
ডাক্তারে চায় নগদ নগদ বাজার-খাতির নাই দেখে !
ওসে যায় যদি সে যাক্ মরে,
কাঠের পয়সা না জোটে তোর মাটি খুঁড়েই দিস্ গোরে,
ষাট্ ষাট্ ষাট্, বাছা আমার, অদৃষ্টে তোর এই লেখে ?

দুবেলা পেট চলতো যাদের ঠাকুরদাদার পায় ধরে,
তাদের বংশধরেরা আজ কর্‌বে আমায় একঘরে !
আমার এই দুনিয়ায় ঠাঁই কোথা ?
ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর মাটিতে আর নেই পোঁতা,
থাক্‌লে পরে বুঝে নিতুম ; লড়বো এখন কার জোরে ?

নেই কোন দোষ ভাগ্যদেবীর, লক্ষ্মী বড় চুলবুলে,
এই ছিল এই পালিয়ে গেল খিড় কি দোরের খিল খুলে,
ওমা এম্‌নি সে এক ছুট্ দিলে,
মিথ্যে তার আর পিছু ধাওয়া ; ফেল্লে বিষম মুস্কিলে !
দুষ্টু মেয়ে ফিরবে কি আর ? চাইবে ফিরে মুখ তুলে ?

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

ইয়াঙ্কি স্থানে বাঙালী-মল্ল

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রান্স কোন হোটেলের প্রান্তে বসে আহার কর্‌ছিলেন। এমনসময়ে চারিদিকে একটা সোরগোল উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, দিগ্বিজয়ী ফরাসী মুষ্টি-যোদ্ধা কার্পেনটিয়ারও সেই হোটেলের মধ্যে আস্‌ছেন—তাঁর পিছনে এক বিপুল জনতা !

জনতার মুখে কার্পেনটিয়ারের নামে উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি শুনে ফ্রান্সের এক ভক্ত বন্ধু দুঃখিতভাবে বল্‌লেন, "সাধারণ লোকের চরিত্র দেখুন ! আপনি অতুল পাণ্ডিত্য আর প্রতিভার অধিকারী,—কিন্তু ঐ জনতা কার্পেনটিয়ারের মত পালোয়ানকে যেমন আদর কর্‌বে, আপনাকে কখনোই ততটা কর্‌বে না !"

ফ্রান্স বল্‌লেন, "বন্ধু, এজন্যে দুঃখিত হবার



কার্পেন্‌টিয়ার

কোন কারণ নেই—এ তো আনন্দের কথা! কার্পেনটিয়ার যে সম্মান পাবার যোগ্য পাত্র! আমাদের এই বিংশ-শতাব্দীর বৈচিত্র্যহীন জগতে কার্পেনটিয়ারের মত পালোয়ানরাই যে অতীত যুগের অপূর্ব্ব বীরত্বের শরীরী অবতার হয়ে বিরাজ কর্‌ছেন—এই বীরত্বের প্রেরণাতেই যুগে যুগে বিশ্বের সাহিত্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে! এস, আমরাও বীর-পূজায় যোগ দি!" এই ব'লে আনাতোল ফ্রান্স সাগ্রহ আনন্দে আসন ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে, জর্জ্জেস কার্পেনটিয়ারের দুই হাত ধ'রে অভিবাদন কর্‌লেন!

বাঙালী কবে এই বীর-পূজার যথার্থ মর্ম্ম বুঝতে পার্‌বে! শিক্ষিত বাঙালী ম্যাড়ার লড়াইকে যে-ভাবে দেখে, মল্লযুদ্ধকে তার চেয়ে বড় বেশী উঁচুতে ঠাঁই দেয় না—এবং তার একমাত্র কারণ বোধ হয়, পালোয়ানদের নামের পিছনে বি-এ, এম-এ ডিগ্রী নেই! কিন্তু বাঙ্‌লাদেশে আজ যদি বীর-পূজা যথার্থভাবে প্রচলিত থাকৃত এবং বাঙালী যদি বরাবর শারীরিক বীর্য্যের চর্চ্চা রাখ্‌ত, তবে খুব-সম্ভব আজ তাকে দেহে-মনে ভারতের মধ্যে সব-চেয়ে পরাধীন জাতি রূপে দেখ্‌তে পেতুম না। ইউনিভার্সিটির এম-এ পাস-করা নন্দদুলাল হয়েও আজ আমরা স্বাধীনতার জন্যে হাহাকার করছি, এবং চল্লিশবৎসরেই বুড়িয়ে প'ড়ে অসহায় হয়ে পরকালের দুশ্চিন্তায় শিউরে উঠ্‌ছি, কিন্তু চেয়ে দেখুন ঐ সুদূর সীমান্তের প্রান্তে! বন-পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় শক্তির পূজক আফ্রিদীরা নিটোল দেহে অটল পদে বিচরণ করছে—তারা বি-এ এম-এর ধারও ধারে না, কিন্তু অকাল-জরা তাদের দেখ্‌লে লজ্জায় নরুদেশ হয় এবং স্বাধীনতা তাদের জন্মলব্ধ অধিকারের মধ্যে গণ্য! ইংরেজ সম্প্র এই পণ্ডিত বাঙালীকে পায়ের ত এনে ফেলেছেন, কিন্তু তার বিদ্য শক্তি, লক্ষ লক্ষ কামান-বন্দুক ও উড়ো-জাহাজ এতদিনেও এই মুষ্টিমেয় আফ্রি জাতিকে গোলাম বানাতে পার্‌লে না। খাঁচ পাখী যেমন শেখানো বুলি কপ্‌চাতে পারে বনের পাখীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, তেম্‌নি সাহে ফিলজফির কেতাবী পাঠ মুখস্থ না কর পার্‌লেও শক্তির পূজক স্বাধীন আফ্রিদ মনুষ্যত্বে বাঙালীর চেয়ে ঢের-বেশী শ্রেষ্ঠ।

আমরা লেখাপড়ার নিন্দা কর্‌ছি না কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, যার শরী তৈরি নয়, রোগ যার নিত্য-সঙ্গী, মৃত্যু-ভয় পদে পদে, সবলের কাছে নিয়তই যার অপমা শক্তির মহিমা যার ধারণার বাইরে, কেবলমা লেখাপড়া, আর কালেজী জ্ঞানের দ্বারা তা মনুষ্যত্ব কখনোই সার্থক হবে না! মনুষ্যত্বে দুই দিক – শারীরিক ও মানসিক। যে একদি দেহে-মনে সেরা, তাকেই বলি আস্ত মানুষ- নইলে একের অভাবে অন্যটি যে স্ফূর্ত্তিলা কর্‌তে পারে না, ভিন্ন-প্রবন্ধে আমরা দেখিয়েছি।

যে-সব কথা বল্‌লুম, এদেশের অনে জ্ঞানী বুড়োর কাছেও বোধহয় তা অশ্র কথা,— কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের কচি কচি ছেলে মেয়েরাও জ্ঞানলাভের সঙ্গে-সঙ্গেই এ-সব কথা শিখে নিয়েছে। তাই আজ সেখানে পালোয়ানী প্রায়-গুণ্ডামিরই সামিল নয় এ দেহ-চর্চ্চা কাঠখোট্টা দরোয়ানের কর্ত্তব্য ব'লে ধর্ত্তব্য হয় না। সেখানে মেটারলিঙ্ক, আন্দ্রে গোর্কি, ফ্রান্স ও হার্ডি প্রভৃতিরও সমাদ

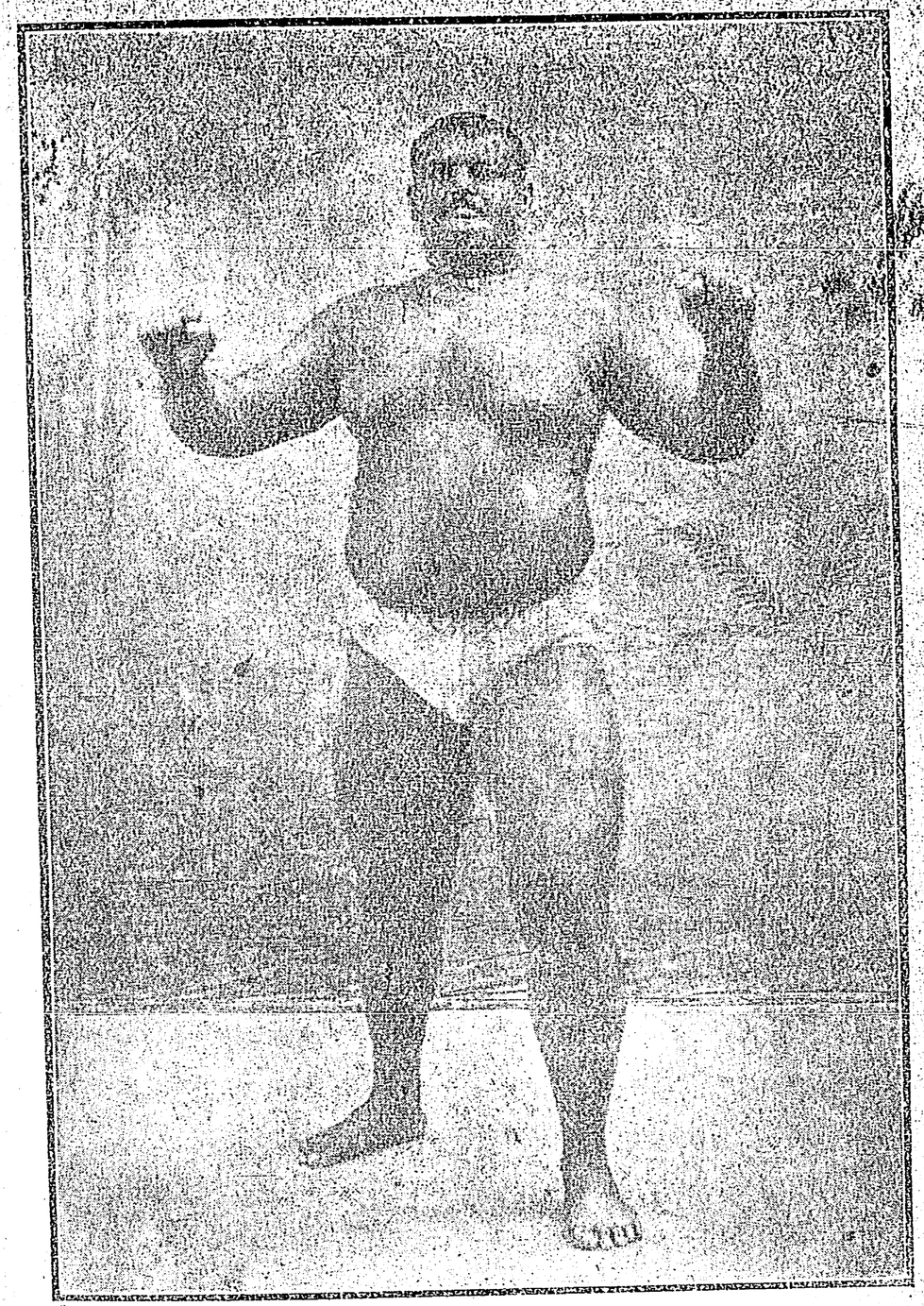

গোবরবাবু

আছে, আবার স্যাণ্ডো, স্যাক্সন, হেকেনস্মিথ, গচ্, বিস্কো, ডেম্প্‌সী ও কার্পেনটিয়ারের নামেও লোকে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। শরীর-চর্চ্চার বাহুল্যের জন্যে সেখানে মানস-চর্চ্চার কোনই ক্ষতি হয় নি। বরং দৈহিক শক্তির প্রতি বিমুখ ও সাহিত্য অনুশীলনে উন্মুখ বাঙালী তার স্বদেশী কবির জন্যে যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেছে, শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত পাশ্চাত্য জগতে তাঁর সম্মান ও সমাদর তার চেয়ে যে যথেষ্ট বেশীই হয়েছে,

এটা হাতে-নাতে প্রমাণিত হয়েও গেছে।

কিন্তু কেবল সাহিত্যে ও জ্ঞানে-বিজ্ঞানে নয়—দৈহিক শক্তিতেও বাঙালীকে এখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা কর্‌তে হবে। কারণ বাঙালীর প্রতিভার পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠতা তাতে ক'রে যতটা বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে, ততটা আর-কিছুতে নয়। ধর্ম্মে রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এবং বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র প্রমুখ পুরুষ-সিংহরা পৃথিবীতে বাঙালীর নাম বিখ্যাত ও অমর ক'রে এসেছেন, কিন্তু শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের বাইরে তো দূরের কথা, ভারতের ভিতরেও বাঙালীর নাম এতদিন কেউ মুখেও আনে নি। সবাই জানে বাঙালী শিশুর মত দুর্ব্বল, ভ্যাড়ার মত ভীরু। এ-বিভাগে অ-বাঙালীরা আমাদিগকে অস্পৃশ্যের মতই ঘৃণা করে।

অনেকদিন আগে বাঙ্‌লার ছেলে সুরেশ বিশ্বাস সমুদ্র-পারে গিয়ে সামরিক শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছিলেন। "কিঞ্চিৎ" বল্‌লুম ব'লে কেউ যেন রাগ না করেন। কারণ ক্ষাত্রবীর্য্যহীন বাঙ্‌লাদেশে সুরেশ বিশ্বাসকে নিয়ে আমরা যতটা গর্ব্বই অনুভব করিনা কেন, সামরিক প্রতিভার আধুনিক লীলাক্ষেত্র শ্বেতাঙ্গ-মুল্লুকে তাঁর মতন যোদ্ধা পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে দেখা যায়। প্রতীচ্য দেশে সুরেশ বিশ্বাসের নাম কেউ চিন্‌বে না—কারণ অসংখ্য পাশ্চাত্য যোদ্ধার মধ্যে তিনি বিশেষ-কিছুই অসাধারণত্ব দেখাতে পারেন নি।

কিন্তু সম্প্রতি আমরা এমন একজন বাঙালীকে পেয়েছি, দৈহিক শক্তির প্রতিযোগিতায় যিনি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেছেন এবং যাঁকে নিয়ে আমেরিকার পালোয়ান-সমাজ রীতিমত আন্দোলন সৃষ্টি গিয়েছে। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ। ভারতে তিনি "গোবরবাবু" নামে পরিচিত। তিনি এখন "লাইট-হেভি-ওয়েটে "পৃথিবী-জয়ী বাহাদুর" (Light heavy weight Champion of the World) নামে সম্মানজনক উপাধি লাভ করেছেন। সকলেই মনে রাখ্‌বেন, এই উপাধি গোবরবে লাইট-হেভি-ওয়েটে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় আসন দিয়েছে। বাঙ্‌লার মাটিতে যে কেব ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার চাষ হয় না, এখানে যে বিশ্বজয়ী শারীরিক শক্তির উপাদান আছে গোবর সর্ব্বাগ্রে কার্য্যক্ষেত্রে তা প্রমাণিত ক'রে দিলেন। তিনি আমাদের সকলকার শ্রদ্ধার পাত্র।

সংক্ষেপে গোবরের পরিচয় এই। কলিকাতার দর্জ্জিপাড়ার বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত গুহ-পরিবারে গোবরের জন্ম। এই ধনী পরিবার দৈহিক শক্তির জন্যে অনেকদিন থেকেই প্রসিদ্ধ। নামজাদা পালোয়ান স্বর্গীয় অম্বুচরণ ও ক্ষেত্রচরণ গুহ গোবরের পিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত।

ছেলেবেলা থেকেই গোবর দেহচর্চ্চা ক'রে আস্‌ছেন। ভারতের দিগ্বিজয়ী বিখ্যাত পালোয়ান রহমনি, কাল্লু, গামা, ইমামবক্স ও গুট্টা সিং প্রভৃতির সঙ্গে নিয়মিত-ভাবে কুস্তি ল'ড়ে তিনি নিজের দেহকে তৈরি ক'রে তুলেছেন। উপর উক্ত পালোয়ানদের কেউ কেউ মাহিনা নিয়ে তাঁর কাছে কাজ করেছেন। ষোল-সতেরো বৎসর বয়সে তিনি প্রথম-বার বিলাতে যান, কিন্তু নানাকারণে সেবারে সেখানকার মল্লক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হ'তে পারেন নি। দ্বিতীয়বারে য়ুরোপে গিয়ে, প্যারিস সহরের প্রতিযোগিতায় নানাদেশী শ্বেতাঙ্গ মল্লযোদ্ধার সঙ্গে গোবর কুস্তি ল'ড়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। তখন বিলাতে সব-চেয়ে বড় পালোয়ান ছিলেন জিমি এসন। এডিনবার্গ সহরে তাঁর সঙ্গে গোবরের কুস্তি হয়। ফলে গোবরই জয়লাভ ক'রে "সারা-ইংলণ্ড-জেতা বাহাদুর" উপাধি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন।

কিছুকাল বিশ্রামের পর গোবর পৃথিবীজয়ী পালোয়ান গামাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। কলিকাতায় গামার সঙ্গে কুস্তি লড়বার জন্যে গোবর যখন তৈরি হচ্ছিলেন এবং স্থান-কাল-পাত্র সবই যখন স্থির, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে দুরন্ত ডিপ্‌থিরিয়া রোগে হঠাৎ তিনি শয্যাগত হয়ে পড়েন। রোগ এতটা সাংঘাতিক হয়ে হয়ে ওঠে যে, ডাক্তাররা তাঁর প্রাণরক্ষার সম্বন্ধেও চিন্তিত হয়েছিলেন। যাহোক, অনেক চেষ্টার পর সে-যাত্রা তিনি প্রাণে বাঁচ্‌লেন বটে, কিন্তু সেই রুগ্ন-ভগ্ন দেহ নিয়ে গামার সঙ্গে কুস্তি লড়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হোলো না। কেবল তাই নয়, গামা ও ভারতের নানাদেশী পালোয়ানদের কল্‌কাতায় আনাতে, খোরাক যোগাতে ও মল্লক্ষেত্র নির্ম্মাণ কর্‌তে মাঝে থেকে গোবরের হাজার হাজার টাকা অকারণে লোকসান হয়ে গেল।

আবার কিছুকাল বিশ্রাম ক'রে গোবর গেল-বছরে ইয়াঙ্কিস্থান বা আমেরিকায় গিয়েছেন। শারীরিক বল-বীর্য্যের সকল ক্ষেত্রেই আমেরিকার মল্লবীররা এখন অদ্বিতীয়। য়ুরোপীয় পালোয়ানরাও ইয়াঙ্কিদের আর কোন ক্ষেত্রেই এঁটে উঠ্‌তে পারছে না। সুতরাং এখন আমেরিকার পালোয়ানদের হারাতে পার্‌লেই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হ'তে পারা যায়। প্রমাণ, ভারতেরই অন্যতম বিখ্যাত পালোয়ান, গামা।

গোবর একে 'কালা-আদ্‌মি,' তায় আমেরিকায় তিনি অপরিচিত। কাজেই প্রথম প্রথম তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পালোয়ান-দের সঙ্গে ল'ড়ে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হোলো। কিন্তু তাদের সবাইকেই তিনি যখন একে একে তুলে পট্‌কান দিলেন, তখন স্যান-ফ্র্যান্সিকো সহরের "লাইট হেভি ওয়েটে পৃথিবীজয়ী বাহাদুর" অ্যাড্ স্যাণ্টেল নামে প্রসিদ্ধ পালোয়ান তাঁর সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হোলো। আমরা আমেরিকার নানা খবরের কাগজে সেই মল্লযুদ্ধের যে বিবরণ পড়েছি, তাতে জান্‌তে পেরেছি যে, কুস্তির গোড়া থেকেই গোবরের হাতে অ্যাড্ স্যাণ্টেল সিংহের কবলগত মেষের মত অসহায় হয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, অল্পক্ষণের মধ্যেই অ্যাড্ স্যাণ্টেল পরাজিত হয়ে, গোবরকে "পৃথিবীজয়ী বাহাদুর" উপাধির দাবী ছেড়ে দিতে বাধ্য হোলো।

কিন্তু "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা"র তথাকথিত ভণ্ড সাধক শ্যাম-চাচা (ইংলণ্ডের 'জন-বুল'র মত এটি হচ্ছে আমেরিকার ডাক-নাম) কালো জাত-কে-জাতের উপরেই যতটা হাড়ে চটা, তার তুলনা আর-কোথাও মেলে না। ভারতের 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান'দের বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষও এর কাছে সামান্য ও আমেরিকার নগণ্য। নিগ্রো বেচারীদের একমাত্র অপরাধ, তাদের গায়ের চাম্‌ড়া কটা নয়। এই অমার্জ্জনীয় অপরাধে প্রত্যেক বৎসরেই খবরের কাগজের

হিসাবে দেখা যায়,শ্যাম-চাচার আদুরে ও গোরা ছেলে-মেয়েরা—একশো-দুশোও নয়—হাজার হাজার-নিগ্রোকে ধ'রে ক্রমাগত চাবুক মেরে, গুলি ক'রে, ফাঁশাকাঠে লট্‌কে, জীবন্ত পুড়িয়ে এবং জলের ভিতরে চুবিয়ে পরলোকে পাঠিয়ে দেয়। এ-সব হচ্ছে ইয়াঙ্কিদের ভারি সখের খেলা,—এ খেলায় মেয়েরাও সমান খুসিমুখে যোগ দিতে ছাড়ে না এবং সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পরম মৌখিক ভক্ত ইয়াঙ্কি-গভর্মেণ্ট আজ বৎসরের পর বৎসর ধ'রে এই সাংঘাতিক খেলা দেখেও নীরবে হাত গুটিয়ে ব'সে আছেন। কয়েক বৎসর আগে নিগ্রো মুষ্টি-যোদ্ধা জ্যাক্ জনসন (অদ্যাবধি এমন শক্তিমান মুষ্টিযোদ্ধা পৃথিবীর আর-কোথাও দেখা যায় নি) শ্বেতাঙ্গদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুই মুষ্টিযোদ্ধা বার্ণস্ ও জেফ্রিস্‌কে মেরে-ধ'রে হাড়-গুড়িয়ে মুখ থেঁতো ক'রে হারিয়ে দিয়েছিলেন। নিগ্রোর সেই জয়লাভে ইয়াঙ্কিরা ক্ষেপে উঠে নিগ্রো পল্লীতে আগুন তো লাগিয়ে দিয়েছিলই—তাছাড়া ন্যায় যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন ব'লে জনসন-বেচারীকে মিথ্যা অপবাদে সমস্ত সম্পত্তি হারাতে ও কারাদণ্ড ভোগ কর্‌তে হয়েছিল। তারপর থেকে ইয়াঙ্কিরা থেঁাতা মুখ ভোঁতা হবার ভয়ে "পৃথিবী-জয়ের প্রতিযোগিতায়" নিগ্রোদের আর কাছে ঘেঁষ্‌তে দেয় না। আজ ইয়াঙ্কি জ্যাক ডেম্প্‌সী মুষ্টিযুদ্ধে "পৃথিবীজয়ী বীর" ব'লে নামে কিনেছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ-মাত্রেই জানেন, আমেরিকায় এখন হ্যারি উইল্‌স্ নামে এমন বিপুলবপু একজন নিপুণ নিগ্রো-যোদ্ধা আছে,যার কবলে পড়্‌লে ডেম্প্‌সীরও কপালে খুব সম্ভব বার্ণস্ ও জেফ্রিসের মতই দুর্দ্দশা ঘট্‌তে বিলম্ব হবে না। কিন্তু হ্যারি উইল্‌সের কালো রঙের অছিলা তুলে ডেম্প্‌সী তাঁর সঙ্গে লড়্‌তে রাজি নয়! প্রৌঢ় জ্যাক্ জনসন এখনো অপরাজিত ও বর্ত্তমান। সংবাদপত্রে দেখ্‌লুম, এই প্রাচীন বয়সেও (৪৩ কি ৪৪ বৎসর) তিনি যুবক ডেম্প্‌সীকে মুষ্টিযুদ্ধে আহ্বান কর্‌তে সঙ্কুচিত হন নি। কিন্তু সে আহ্বানের উত্তরেও ডেম্প্‌সী শিলামূর্ত্তির মত নীরব! একেই বলে কেঁদে-ককিয়ে বীর-নাম কেনা! এমনধারা পৃথিবী-জয়ের বাহাদুরির মূল্য কতটুকু!

যাক্ সে কথা। শ্বেতাঙ্গদের অবিচার দেখাবার জন্যেই অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও উপরের কথা-গুলি বল্‌তে বাধ্য হলুম। তাছাড়া আমেরিকার ফেরৎ বন্ধুদের মুখেও শুনেছি যে, ইয়াঙ্কিরা ভারতবাসীদেরও কাফ্রি ব'লে ডেকে অপমান করে। ভারতবাসীর গায়ের রংও কালো, অতএব তারাও কাফ্রি নয় তো কি!

সুতরাং একজন কালা-আদ্‌মির হাতে অ্যাড স্যাণ্টেলের এমন শোচনীয় পরাজয়ে ইয়াঙ্কিদের দ্বিতীয় রিপু যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, তা সহজেই বোঝা যায়। এখন আমেরিকায় পৃথিবীজয়ী দুইজন পালোয়ান আছে। প্রথম ষ্ট্যানিস্‌লাস্ বিস্কো (বা ছোট বিস্কো) দ্বিতীয় ও 'ষ্ট্র্যাংলার' লিউইস। এর মধ্যে লিউইসকে খাড়া ক'রে দেওয়া হোলো গোবরের 'দর্পচূর্ণ' কর্‌তে।

লিউইসের একরকম বিশেষ প্যাঁচ্ আছে, তাতে দম-বন্ধ হবার ভয়ে বিরোধী পালোয়ান হার মান্‌তে বাধ্য হয়। সেই প্যাঁচে সিদ্ধ-হস্ত ব'লে লিউইসের নাম হয়েছে 'ষ্ট্র্যাংলার'। ষ্ট্র্যাংলারের আর-একটি গর্ব্বের ব্যাপার, আ-

পর্য্যন্ত কেউই তাকে চিৎ কর্‌তে পারে-নি।

গেল ৮ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকার উইচিটা নামে এক জায়গায় গোবরের সঙ্গে ষ্ট্র্যাংলারের কুস্তির বন্দোবস্ত হয়। এই মল্লক্ষেত্রে দর্শকের আসন ছিল পঁচিশ হাজার। সুতরাং সেটা যে কত-বড় সমারোহের ব্যাপার হয়েছিল, আপনারা সকলেই তা অনুমান কর্‌তে পারবেন।

রাত দশটার সময়ে বাঙালীবীর গোবরের সঙ্গে ষ্ট্র্যাংলারের কুস্তি সুরু হোলো। আমরা আমেরিকার চার-পাঁচখানা খবরের কাগজে এই কুস্তির যে বিবরণ পড়েছি, এখানে তারই সারোদ্ধার ক'রে দেব। কিন্তু তার আগে বিলাতী কুস্তির একটু বিশেষত্বের কথা এখানে খুলে বলা দরকার।

পাশ্চাত্য দেশে Cumberland and West-moreland Style, The Cornwall and Devon Style, The Græco-Roman Style ও The Lancashire or Catch-As-Catch-Can Style প্রভৃতি কুস্তির যে-সমস্ত পদ্ধতি চলিত আছে, তা ভারতীয় পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের। গোবরের সঙ্গে ষ্ট্র্যাংলারের কুস্তি হয়েছিল, শেষোক্ত পদ্ধতি অনুসারে। এতে ভারতের মত রদ্দা মারবার বা ল্যাঙট ধ'রে দাঁও কষ্‌বার (ভারতীয় পালোয়ানদের যা হচ্ছে একটি প্রধান প্যাঁচ্) কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া আরো অনেক ভারতীয় প্যাঁচ্ এই পদ্ধতিতে নিষিদ্ধ ব'লে গণ্য হয়। ভারতবর্ষের মত কোনরকমে প্রতিপক্ষকে একবার পলকের জন্যেও সামান্য-রকম চিৎ কর্‌তে পারলেই (বছর-কয়েক আগে কলিকাতায় গড়ের মাঠের মল্লক্ষেত্রে পালোয়ান হোসেন-বক্সকে এম্‌নি ক্ষণিকের জন্যে সামান্য রকম চিৎ ক'রেই গামা প্রায় ফাঁকি দিয়েই জয়ী নাম কিনেছিলেন।) এখানে কুস্তি জেতা যায় না। পালোয়ানের দুই কাঁধ মৃত্তিকা স্পর্শ করা চাই—তবেই তার হার হবে। গোবর যে সর্ত্তে কুস্তি লড়্‌তে রাজি হয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই; তিনবার কুস্তি হবে। তার মধ্যে যে বেশীবার প্রতিপক্ষকে চিৎ কর্‌তে পার্‌বে, সেইই জয়ী ব'লে সাব্যস্ত হবে।

বিশ্বজয়ী ষ্ট্র্যাংলারের নিজের মুখেই প্রকাশ, সে ঠাউরেছিল খুব সহজেই গোবর তার হাতে কাবু হয়ে পড়্‌বেন। কিন্তু আসলে ব্যাপার হোলো ঠিক উল্টো-রকম। কুস্তি সুরু হবার পরেই দেখা গেল, গোবরো প্যাঁচ্ যেমন সাফ্, পাঁয়তারা যেমন চমৎকার, গতি যেমন ত্বরিত, গায়ের জোরও তেমনি অসাধারণ! গোড়া থেকেই গোবরের নিপুণতা দেখে ষ্ট্র্যাংলার রীতিমত চম্‌কে ও ভড়্‌কে গেল, গোবরকে কাবু কর্‌বে কি, সে নিজেই ক্রমে কাবু হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। কয়েক-সেকেণ্ড-কম এক ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ষ্ট্র্যাংলারের পায়ে এক বিচিত্র প্যাঁচ্ মেরে, গোবর তাকে একদম চিৎ ক'রে ফেল্‌লেন। আগেই বলেছি, এর আগে ষ্ট্র্যাংলার জীবনে কখনো চিৎ হয়-নি। সুতরাং এই অপমানে সে রেগে একেবারে আগুন হয়ে উঠ্‌ল।

তারপর দ্বিতীয়বারের কুস্তি। এবারে ষ্ট্র্যাংলার দুই-দুইবার "হেড-লক" নামে বিষম শক্ত প্যাঁচে গোবরকে নীচে এনে চিৎ

করবার চেষ্টা পায়। কিন্তু এই দুই-দুইবারেই গোবর সে নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর গায়ের জোর ষ্ট্র্যাংলারের চেয়ে দুগুণ বেশী! এই সময়ে সুসভ্য ইয়াঙ্কি দর্শকরা উত্তেজিত হয়ে ভদ্র ভাষায় চীৎকার সুরু কর্‌লে—"ষ্ট্র্যাংলার, ঐ নিগ্রোটার ঘাড় মট্‌কে দাও তো হে!"—"ওকে খুন ক'রে ফেল" প্রভৃতি!

ইতিমধ্যে ষ্ট্র্যাংলার গোবরকে এক অন্যায় প্যাঁচ্ মেরে আধ্-চিৎ ক'রে ফেল্‌লে। কিন্তু গোবরের দুই কাঁধ ভূমি স্পর্শ কর্‌বার আগেই তিনি ষ্ট্র্যাংলারের হাত ছাড়িয়ে উঠে পড়্‌লেন। মধ্যস্থ পল সিক্‌নার তবু বল্‌লে, "ষ্ট্র্যাংলার, তুমি জিতেছ!"

গোবর, ষ্ট্র্যাংলারের দিকে পিছন ফিরে হাত নামিয়ে (যখন পালোয়ানের হাত নামানো থাকে, তখন তাকে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ) মধ্যস্থের কাছে নালিস কর্‌লেন, ষ্ট্র্যাংলার তাঁকে অন্যায় প্যাঁচ্ মেরেছে!

ঠিক সেই সময়ে, কোনরকম জানান্ না দিয়েই, ষ্ট্র্যাংলার পিছন্ থেকে অজ্ঞাতসারে গোবরকে আবার এক অন্যায় প্যাঁচে মাটিতে পেড়ে ফেল্‌লে। হঠাৎ এই অন্যায় প্যাঁচ্ মারার দরুণ গোবর তখনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তারপর কুড়ি মিনিটকাল তিনি আচ্ছন্নের মতন ছিলেন। কাজেই সেদিন তার তৃতীয় বারের কুস্তি হোলো না। কিন্তু মধ্যস্থ তবু ষ্ট্র্যাংলারকে জেতা ব'লে পুরস্কার দিতে লজ্জিত হলেন না।

আমেরিকার ইয়াঙ্কি খবরের কাগজেই প্রকাশ, গোবরকে দুই-দুইবার অন্যায় প্যাঁচ্ মারা হয়েছিল এবং এই কুস্তিতে ষ্ট্র্যাংলার জেতেনি, সুতরাং তাকে পুরস্কার দেওয়াও হয়েছে নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ।

অতএব ষ্ট্র্যাংলারের সঙ্গে গোবরের আবার কুস্তি লড়্‌বার প্রস্তাব হয়েছে। এখানে এটাও ব'লে রাখা দরকার যে, ষ্ট্র্যাংলারের কাছে যদি হতেন সত্যসত্যই পরাজিত তাহ'লেও গোবর "লাইট-হেভি-ওয়েটে পৃথিবীজয়ী বাহাদুর" থাক্‌তেন, কারণ ষ্ট্র্যাংলার "লাইট-হেভি-ওয়েট" শ্রেণীর পালোয়ান নয়।

ইয়াঙ্কি কাগজওয়ালারা যখন নিজেদের মুখেই স্বীকার কর্‌ছেন যে, গোবরের উপরে নিষিদ্ধ প্যাঁচ্ প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং হার-জিতের কোন মীমাংসা হবার আগেই ষ্ট্র্যাংলারকে অন্যায়-রূপে জেতা সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তখন কুস্তি না দেখেও আমরা অনায়াসে বল্‌তে পারি যে, গোবরের চামড়া কালো ব'লেই মধ্যস্থ পল সিক্‌নার ছলে কৌশলে তাঁকে হার মানিয়ে অপূর্ব্ব উপায়ে মার্কিন-বীরত্বকে রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা পেয়েছেন। এ-রকম উপায়ে শ্বেত-বীর-গর্ব্বকে অক্ষত রাখ্‌বার চেষ্টাও এই নতুন নয়। সকলের কাছেই এটা এখন প্রকাশ্য গুপ্তকথা যে, জ্যাক্ জনসন ন্যায়-যুদ্ধে মুষ্টিযুদ্ধে "পৃথিবীজয়ী বাহাদুর" ব'লে প্রমাণিত হবার পর, শ্বেত-মদ্দরা যখন কিছুতেই জনসন্‌কে আর হারাতে পার্‌লে না, তখন তারা গৌরাঙ্গের হেঁট মাথা উঁচু হবার এক বিচিত্র উপায় আবিষ্কার কর্‌লে। তারা কয়েক লক্ষ টাকা ঘুস দেবার লোভ দেখিয়ে, জনসনকে কোন শ্বেত পালোয়ানের কাছে মিছামিছি হার মানতে রাজী করালে। ফলে, অর্থলোভে জনসন স্বচ্ছায় জেস উইলার্ডের কাছে প্রকাশ্য

কৃত্রিম মুষ্টিযুদ্ধের অভিনয়ে নিজের হার মেনে নিলেন। অথচ আসলে উইলার্ড একজন যার-পর-নাই নিচুদরের মুষ্টিযোদ্ধা,—বিশেষজ্ঞমাত্রই স্বীকার ক'রে থাকেন যে, জনসনের সতিকারের ঘুসি খেয়ে উইলার্ড ছয়-সাত মিনিটও পায়ের উপরে ভর্ দিয়ে দাঁড়াতে পারে কিনা সন্দেহ! যে-দেশে এমন-সব উপায়েও শ্বেতাঙ্গরা মুখরক্ষার চেষ্টা কর্‌তে লজ্জিত হয় না, সেই দেশেরই মধ্যস্থ ও দর্শকদের কাছ থেকে কৃষ্ণাঙ্গ গোবরের ন্যায়পরায়ণতার আশা করাই পাগলামি ব'লে মনে হয়। এর চেয়ে বিলাত বরং মন্দের ভালো। কারণ ইংরেজ মল্ল জিমি এসনও কালা আদ্‌মির হাতে আছাড় খেয়ে চটে গিয়ে, কুস্তি লড়্‌তে লড়্‌তে গোবরের উপরে মুষ্টিবৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ইংরেজ মধ্যস্থ স্বজাতীয় পালোয়ানের এই অন্যায় সহ্য করেল-নি, তিনি তখনি গোবরকে জয়ী ব'লে মেনে নিয়ে, জিমি এসনকে মল্লভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

গোবরবাবু পালোয়ান বটে, কিন্তু সাধারণ পালোয়ানের মত তাঁর কাছেও 'ক' অক্ষর গোমাংস নয়। আধুনিক ইংরেজী ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত এবং এ-বিষয় নিয়ে তিনি যে-কোন উচ্চ-শিক্ষিত বাঙালীর সঙ্গে সমানভাবে আলোচনা কর্‌তে পারেন। যে রসবোধ ও 'কালচার' সাহিত্য-আলোচনার প্রধান সহায়, তাঁর মধ্যে তা প্রচুর পরিমাণেই আছে। পালোয়ানের এই মানসিক উৎকর্ষ দেখে শিক্ষাভিমানী ইয়াঙ্কিরাও অত্যন্ত অবাক হয়েগেছে। সে-দেশের সমস্ত সংবাদপত্রেই বিশেষ ক'রে গোবরের এই মার্জ্জিত ও শিক্ষিত মনের দিকে পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করা হয়েছে।

উইচিটার একখানি সংবাদপত্র থেকে এই কথাগুলি তুলে দিলুম।—"গোবরের বিপুল বপু অপূর্ব্ব সুন্দর। তিনি উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক—অন্তত যুক্তরাজ্যের সিনেটের সমধিক বিখ্যাত সভ্যদের চেয়ে ভ্রমণাভিজ্ঞতায়, শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞানচর্চ্চায় তিনি কিছুমাত্র কম যান না এবং যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের মন্ত্রণা-সভার সাধারণ সদস্যদের চেয়েও তাঁর দৃষ্টি অধিকতর প্রশস্ত।"...এমন একজন লোক—তিনিই কিনা কুস্তি-ব্যবসায়ী!

উইচিটার আর-একখানি সংবাদপত্র (The Wichita Beacon) লিখেছে:—"He (গোবর) is a well-educated Hindu gentleman who is informed of a large number of subjects. * * While at The Beacon office today he discussed Kipling, Hugo, India's ten-thousand-year old-civilization, Bolshevism, Rabindranath Tagore and other things comprehensively.

অতএব গোবরকে যাঁরা গোঁয়ার, কাঠ-খোট্টা একজন জোয়ান লোক ভাববেন, তাঁরা মস্ত ভুল করবেন। এই বৃহৎকায়, মাথায় ছয়ফুট তিনইঞ্চি-উঁচু ও ভীমের-মত-বলবান লোকটির প্রাণের ভিতরটি শিশুর মত কোমল, এবং কবির মত সরস। সকলকেই তিনি একদিনেই বন্ধু ক'রে নিতে পারেন—তাঁর ভাবে-ভঙ্গিতে কখনো হামবড়াই অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ পায় না। কুস্তিও সাহিত্যের মতন, সঙ্গীতেরও তিনি বিশেষ ভক্ত। নিজেও ককুভ খাঁ ও

করমতুল্লা খাঁ প্রভৃতি পৃথিবীবিখ্যাত ওস্তাদ রেখে সেতার-যন্ত্র বাজাতে শিখেছেন। আসলে, দেশের ও দশের মাঝে বিশিষ্ট হবার সমস্ত সৎগুণই তাঁর চরিত্রে আছে। অনেকের মনে মনে বিশ্বাস, শারীরিক বল-চর্চ্চায় মানুষের দেহকে কর্কশ আর বুদ্ধিকে মোটা ক'রে ফেলে। গোবরকে দেখ্‌লে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌লে সাধারণের এ ভুল-বিশ্বাসও দূর হবে। গোবর বেশ ভালো রকমই জানেন, মল্লভূমিতে নিছক পশু-শক্তির দ্বারা প্রাধান্য লাভের যুগ চলে গেছে! এ যুগ হচ্ছে নিছক মস্তিষ্কের যুগ,—এখন সকল ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের শক্তিই বিজয়ী হবে এবং দেহ-চর্চ্চার দ্বারা মস্তিষ্কের জোর দ্বিগুণ বাড়ে বৈ কমে না।

ষ্ট্র্যাংলার জুয়াচুরির দ্বারা জয়লাভ ক'রেও গোবরের হাতে মান বাঁচাতে পারে-নি। আমেরিকার নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে গোবরের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন। এমন-কি, ষ্ট্র্যাংলারের নিজেরা ম্যানেজার বিলি স্যাণ্ডো পর্য্যন্ত স্পষ্ট মান্‌তে বাধ্য হয়েছে যে, "অদূর-ভবিষ্যতের 'বাহাদুর' গোবর ছাড়া আর কেউ নয়।" The Kansas City Post" নামে সংবাদপত্রে সে মত প্রকাশ করেছে যে, "Gobar is the Greatest wrestler of modern times" (বর্ত্তমান যুগে গোবরই হচ্ছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর)। প্রতিপক্ষের এই স্বেচ্ছাকৃত প্রশংসার উপরে টীকা অনাবশ্যক।

আপাততঃ গোবরবাবু জো ষ্টেচার নামে আমেরিকার আর-একজন প্রথম শ্রেণীর নামজাদা বাহাদুর-পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন (হয়ত এতদিনে সে কুস্তিও হয়ে গেছে)। বিশেষজ্ঞরা আগেই মতপ্রকাশ করেছেন যে, এই মল্লযুদ্ধেও গোবরবাবুর সাম্‌নে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বেশীক্ষণ টিক্‌তে পার্‌বে না। তাই যেন হয়। কায়মনোবাক্যে কামনা করি, গোবরবাবু অচিরেই 'হেভি-ওয়েটের' প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রধান সম্মান পেয়ে তাঁর উজ্জল যশের শিক্ষা অধিকতর সমুজ্জ্বল ক'রে, নিরাপদে আবার সোনার বাঙ্‌লায় সরস মাটিতে ফিরে আসুন—সমগ্র বাঙালী জাতি আজ তাঁর মুখ চেয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছে।

কিন্তু খালি অপেক্ষা ক'রে থাক্‌লেও চল্‌বে না। আজ এই জাতীয় অধঃপতনের যুগে, শোচনীয় দুর্ব্বলতার দিনে বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে গোবরের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হোক্, প্রত্যেক বাঙালী বাপ-মা সন্তানদের খালি মনে নয়—দেহেও শক্তি-অর্জ্জনের সুযোগ ও ব্যবস্থা ক'রে দিন, সকলেই বুঝ্‌তে শিখুন যে, দুর্ব্বলের অধীনতা বিধাতার স্বাভাবিক বিধান,—দেহে যে অক্ষম, স্বপ্নেও সে স্বাধীনতা লাভের অযোগ্য—জগতে চিরদিনই গোলামের প্রয়োজন থাক্‌বে এবং সে প্রয়োজনের সাম্‌নে স্বেচ্ছায় মাটি কাম্‌ড়ে ধূলায় গড়াগড়ি দেবে খালি ঐ অশক্ত ও কাপুরুষেরই দল! বাঙালী, এ দলে নাম লিখিয়ে যদি ঘৃণিত না হতে না চাও, তবে এখন আর-সব ভুলে আগে শক্তি-সাধনায় মন দাও—শক্তি বিনা জাতি গ'ড়ে উঠ্‌বে না!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

হাফিজের অনুসরণে

আগর আঁ তুর্‌কে শীরাজী বেদস্ত্ আরদ্ দিলে মারা
বখালে হিন্-দুয়শ্ বখ্‌শম্ সমরকন্দ্ ও বোখারারা॥

শিরাজের সেই তুরাণী রূপসী
বে-দরদী,
যদি কোনো দিন দরদ্ বোঝে এ সুখহারার,
লাল সে গালের কালো তিল্‌টির বদলে গো,
দিয়ে দিতে পারি সমরকন্দ বোখারা আর!

যেটুক্ শরাব পড়ে' আছে শেষ—ঢালো সাকী!
বেহেশ্‌তেও সে জায়গা এমন আছে না কি?—
রোক্‌নাবাদের নীল নহরের
কিনারাটি—
গুল্-গলাগলি গলিটি এমন মুসল্লার?

বে-শরম এই ছুঁড়িগুলা সব চারিপাশে,
সারাটা শহর গুল্‌জার করে—ভারি হাসে!
ধৈরয মোর লুটে নেয় এরা—
করিব কি!
তাতার-দস্যু ভেঙ্গে ফেলে যেন ঘর-দুয়ার!

পিয়ারা আমার বড় যে রূপসী!—চাহে না সে—
এমন গরীব-অভাজন তারে ভালোবাসে,
কাজ নাই তার সুর্‌মা-মেহেদী,
জরী-ফিতা—
চায় না পরিতে টিপ্, পুঁতিমালা খোঁপায় তার!

চলুক শরাব, রবাবে ছড়িটি টানো সাকী!
আঁধার ধাঁধার জওয়াব মেলে না—জানো নাকি?
কেউ সে বোঝেনি, কেউ বুঝিবে না
কথাটা কি,
সারা দুনিয়ায় পাবে না খুঁজিয়া সমঝ্‌দার!

য়ুসুফের রূপ দিন-দিন যে গো ফুটে' ওঠে !
কুমারী-ধরম শরম যে তার পায়ে লোটে !
জুলায়্‌খার ঐ আব্‌রু এবার
গেল টুটে'—
ইজ্জত্‌ রাখা ভার হ'ল সেই লজ্জিতার !

আখেরে যাদের ভালো হয়, সেই যুবারা যে
প্রাণের অধিক জ্ঞান করে এই ধরামাঝে—
বুড়াদের কথা, নীতির বচন !
তবে শোনো
মন রে ! তোমার প্রাণের কথা সে চমৎকার !

গাল দিলে তুমি !—সেই যে আমার ভালো কথা !
বেঁচে থাকো তুমি, এমন সুহৃদ পাব কোথা ?
তবু মনে হয়, চিনি-গড়া ওই
চুনীদুটি
কেমনে ঢালে গো বিষ-কটু এই বচন-ধার !

গীত শেষ হ'ল—সারা হ'ল গাঁথা মোতিমালা !
এস গো হাফিজ ! গাও দেখি হেন সুধাঢালা—
শুনিতে শুনিতে নিশীথিনী যেন
দিশাহারা,
খুলে' ফেলে দেয় তারার জড়োয়া-সিঁথিটি তার !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ।

চয়ন

আনাতোল ফ্রান্স

এ-বৎসরে সাহিত্যে "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছেন, আনাতোল ফ্রান্স। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই।

গত ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে পারি সহরে আনাতোল ফ্রান্স জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর বাপের নাম Noel Thibault; দশম চার্লসের রক্ষী ফৌজে তিনি যখন সৈনিক, তখন সেনাদলে তাঁর

আদরের ডাকনাম ছিল—Pere France এবং সেই নামেই তিনি পরিচিত হন। সেই নাম থেকেই তাঁর ছেলের নামকরণ।

Pere France চিরদিন রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ও প্রজাবিদ্রোহের বিপক্ষে ছিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের পরে তাঁর দোকান-ঘরটি রাজতন্ত্রীদের প্রিয় আড্ডায় পরিণত হয়—সেখানকার আসরে যে-সব কথাবার্ত্তা ও আলোচনা চল্‌ত, বালক আনাতোল তা শুনতে পেতেন এবং তার প্রভাব জীবনে তিনি ভুল্‌তে পারেন-নি। শৈশবের সে ছবি তাঁর লেখার মধ্যেও মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে।

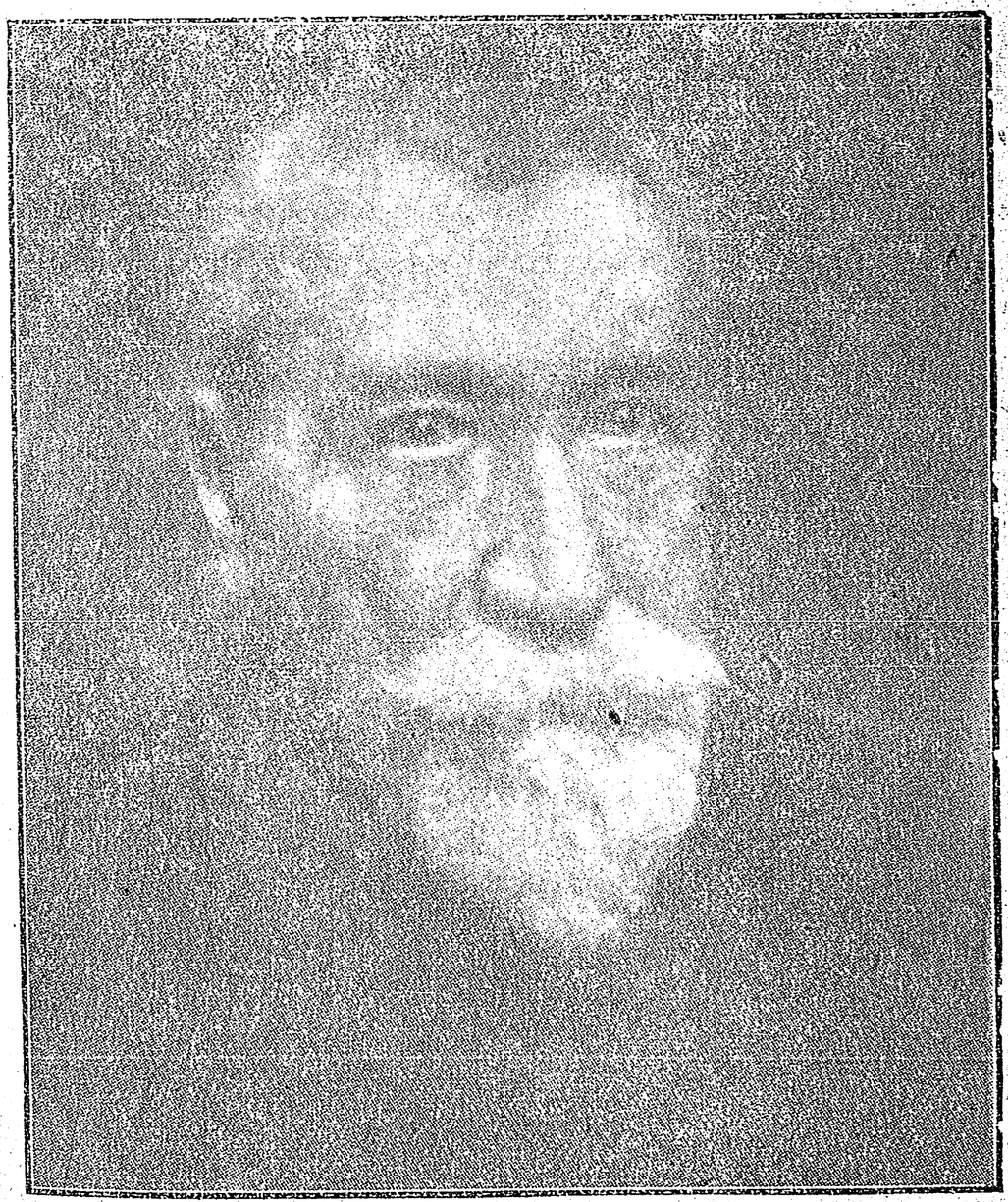

আনাতোল ফ্রান্স

আনাতোলের বাপ-মা দুজনেই ক্যাথলিক ছিলেন। মায়ের জানুর উপরে ব'সে তিনি সাধুদের জীবন-চরিত পড়তেন। সে-সব জীবনী তাঁর শিশু-চিত্তকে এতটা আলোড়িত ক'রে তুলেছিল, যে শৈশবে তাঁর প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, সাধু হবার জন্যে। তাঁর নিজের মুখেই প্রকাশ, শৈশবে বারকতক তিনি সাধুগিরি করবার জন্যে চেষ্টাও পেয়েছিলেন, কেবলমাত্র বাড়ীর লোকের উৎসাহের অভাবেই তাঁর চেষ্টা সফল হয়-নি। সাধুদের দেখাদেখি পশু-লোমের জামা পরবার মৎলোবে আনাতোল একদিন একখানা চেয়ারের ঘোড়ার-চুলের গদী ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলেছিলেন। সাধুতার সেই চেষ্টার জন্যে তাঁর মা তাঁকে বেত-মেরে ঠাণ্ডা বানিয়ে দেন, কাজেই সংসারে থেকে সাধু হওয়া অসম্ভব বুঝে আনাতোল শেষটা সে চেষ্টা ছাড়্‌তে বাধ্য হন।

পিতার রাজতন্ত্রের পক্ষপাতিতা এবং মাতার ধর্ম্মানুরাগ ছাড়া আর এক প্রভাব বালক আনাতোলের মনের উপরে কাজ করেছিল। এ প্রভাব হচ্ছে তাঁর ঠাকুরমার। তাঁর ঠাকুরমা নীতিকে রীতিমত হাল্‌কা ও যথেচ্ছ-ভাবে গ্রহণ করতেন। আনাতোলের মা জীবনের সব ব্যাপারকেই অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে নিতেন, তাই দেখে তাঁর ঠাকুরমার হাসিখুসি ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের অন্ত ছিল না। আনাতোল সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "আমার নাতি কখনোই তার বাপের মত হবে না।" তাঁর কথাই সত্য হয়েছে। আনাতোলের চরিত্র বাপের মত হয়-নি, হয়েছে ঠাকুরমায়ের মত।

যথাসময়ে আনাতোলের বিদ্যারম্ভ হয়। তাঁর বাপ-মা ধনী না হ'লেও ছেলেকে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে কোনরকম ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠিত হন-নি। সেই পড়া-সুরু সঙ্গে-সঙ্গেই আনাতোলের পথে পথে ঘোরাও সুরু হোলো। এই পথে-বেড়ানো এবং সহরের ভালো-খেলো ছোট-বড় সব ব্যাপার তন্ন তন্ন ক'রে দেখা, আনাতোলের একটা ভারি সখের কাজ ছিল। পারির চারিদিকে সম্পদের ও দারিদ্র্যের, আনন্দের ও বিষাদের এবং জম্‌কালো ও সাদাসিধে যে-সব চিত্র তিনি দেখেছেন, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তার প্রতিলিপি পাওয়া যায়। কালেজী জীবনেও তাঁর উপকার হয়-নি কম। এই কালেজে থেকেই তিনি গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এবং বিচার-শক্তিকে লাভ করেন।

ছাত্র-জীবনেই আনাতোলের চিত্তে সাহিত্যানুরাগ দেখা দিয়েছিল, পনরো বছর বয়সের সময়েই তাঁর মনে সাহিত্য-সেবার সাধ জাগে। কালেজে থাকতে থাকতে তাঁর জ্ঞানস্পৃহাও এতটা বাড়ে যে, নানা বিষয়ের নানা পুস্তক নিয়ে তিনি সর্ব্বদাই মেতে থাকতেন—যদিও তিনি কখনোই প্রথমশ্রেণীর "কেতাব-কীট" হয়ে দাঁড়াতে পারেন নি।

কালেজ ছেড়ে আনাতোল কয়েক বৎসর এ-কাজ সে-কাজ ক'রে বেড়ান। কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। কিছুকাল মাসিক-সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। কিছুকাল সম্পাদকী করেন। চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর লেখা আলফ্রেড ডি-ভিগ্নীর চরিত্রচিত্র প্রকাশিত হয়। এখানিই তাঁর প্রথম বই। এর দুই বৎসর পরে প্রুসিয়ানদের সঙ্গে ফরাসীদের

বাধে। পকেটে ভার্জ্জিলের কাব্য আর তে তরবারি নিয়ে মাতৃভূমির আহ্বানে তিনি ক্ষেত্রে যাত্রা করেন। রণক্ষেত্রের কামান-কের অবিশ্রাম গর্জ্জন ও অগ্নি-বর্ষণের ধ্য ব'সে, তিনি আর এক বন্ধুর সঙ্গে শ্চিন্ত প্রাণে ভার্জ্জিলের কাব্য-রসে ডুবে তেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আনাতোল ফ্রান্সের ীয় রচনা প্রকাশিত হয়। এখানি কবিতার । প্রথম কবিতা-পুস্তকেই যথেষ্ট সুখ্যাতি য়ে, তিন-বছর পরে তিনি আর একখানি বিতার বই প্রকাশ করেন। তার দ্বারা ব্য-সাহিত্যে তাঁর নাম-ডাক আরো বেড়ে ঠ। তারপর কিছুকাল তিনি প্রাচীন সাহিত্য-কাশের সম্পাদন-ভার নেন। এই সময়ে ন দক্ষ সমালোচক ব'লেও নাম কেনেন। কিন্তু কবি ও সমালোচক রূপেই আজ ন্সের এত নাম নয়। এতদিন পর্য্যন্ত হত্যে তিনি হাত-মক্স করেছিলেন মাত্র। ৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর লেখা প্রথম দুটি গল্প কাশিত হয়। তারপর তাঁর প্রথম দীর্ঘ ন্যাস "Le Crime de Sylvestre nnard" বাজারে বাহির হয় এবং এই উপন্যাস থেকেই তাঁর পৃথিবীব্যাপী র সূত্রপাত। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখেছেন, সে ত্তর বিশদ পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব ।

আনাতোল ফ্রান্স ঔপন্যাসিক এমিল লার বিরুদ্ধবাদী। জোলা-সম্বন্ধে তিনি ন, "আমি জোলার ঘৃণাকর যশের জন্য হিংসা করি না। মানবতাকে অবনত এবং সত্য ও সৎকে অস্বীকার করবার জন্যে আর কোন মানুষ এমন প্রাণ-পণ চেষ্টা করে-নি। মানুষের আদর্শকে আর কেউ এত উল্টোও বোঝে-নি।" কিন্তু এই জোলার মরণের পরে ফ্রান্স তাঁর স্মৃতির উপরে আন্তরিক ও মর্ম্মস্পর্শী শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমাদরের পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করতেও কুণ্ঠিত হন-নি।

প্রথম-জীবনে তিনি কুলীন-তন্ত্রের পোষকতা করতেন, কিন্তু শেষ-বয়সে ফ্রান্স রাজনীতিতে Socialist সম্প্রদায়-ভুক্ত হয়ে পড়েছেন। রুস প্রজাদের উপরে রাজতন্ত্রের অত্যাচার নিয়ে তিনি অনেকবার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছেন। সংপ্রতি নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকাই তিনি রুসিয়ার দুর্ভিক্ষ-তাড়িত প্রজাদের সাহায্যের জন্য দান ক'রে, রুস-প্রজার প্রতি নিজের অকৃত্রিম সহানুভূতির জলন্ত প্রমাণ দিয়েছেন। ফ্রান্স বরাবর প্যারি সহরে বাস করেছেন। প্যারিকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তাঁর প্রাণ কাঁদে। কিন্তু এমন দারুণ সহরে হয়েও তিনি জনসাধারণের সাম্‌নে প্রকাশ্যভাবে এসে দাঁড়াতে সঙ্কুচিত হন। হাল-ফ্যাসানের বিলাসী সম্প্রদায়ের সংসর্গ থেকে তিনি সর্ব্বাই তফাতে থাকতে ভালোবাসেন।

নোবেল পুরস্কারের উপরে তাঁর দাবী অনেকদিন আগে থাকতেই ছিল। কারণ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য কথা-সাহিত্যে তাঁর আর জুড়ী নেই। তাই এতকাল তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়-নি ব'লে চারিদিকেই প্রতিবাদ ও আন্দোলন চল্‌ছিল। এখন বাকি রইল খালি ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির দাবী।

রূপলক্ষ্মীর দুরদৃষ্ট

সমালোচকরা বলেন, পৃথিবীতে সব-চেয়ে সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি গ্রীক রূপলক্ষ্মী ভেনাস ডি মিলোর প্রতিমাটি। (ভারতীতে আগেই একাধিকবার এই প্রতিমূর্ত্তির ছবি বেরিয়ে গেছে, তাই আর এখানে দেওয়া হোলোনা।) ভেনাসের এই মূর্ত্তির হাতদুটি এখন আর নেই। কিন্তু সকলেই ব'লে থাকেন, নারীর নিখুঁৎ গড়ন কি-রকম হওয়া উচিত, ভেনাসের এই মূর্ত্তিটি দেখ্‌লে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সম্পূর্ণ অবস্থায় মূর্ত্তির হাতদুটি কোন্ ভঙ্গিতে কেমন ভাবে ছিল, বিশেষজ্ঞরা তাই নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন এবং অনেকরকম কল্পনা করেছেন, কিন্তু কেহই স্থির-সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারেন-নি।

খালি এই নিয়েই মতভেদ নয়—ভেনাসের মূর্ত্তি নিয়ে আরো অনেক রহস্য এখনো পরিষ্কার হয়-নি। এমন যে পরম সুন্দর নিখুঁৎ নারী-মূর্ত্তি,—যে শিল্পীর হাতে এটি কঠিন পাষাণের বুকে কোমল কমলের মত বিকসিত হয়ে উঠেছে, সে হাত নিশ্চয়ই উঁচুদরের ওস্তাদের হাত! কিন্তু কে তিনি? কি নাম? এ যে গ্রীক ভাস্করের কীর্ত্তি, তাতে আর সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় কি? এ-সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর বোধহয় আর-কখনো পাওয়া যাবে না।

ভেনাসের মূর্ত্তি কি ক'রে পাওয়া যায়, তার ইতিহাস এই। গ্রীসের অনতিদূরে মিলো নামে একটি ছোট দ্বীপ আছে। প্রায় একশো বছর আগে, মিলো দ্বীপের বোটোনিয়া নামে এক চাষী, একটি পাহাড়ে পাথর খুঁজ্‌তে গিয়েছিল। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সে হঠাৎ একটি পুরানো চোর-কুঠোরি দেখ্‌তে পায়। কৌতূহলী চাষা তার ভিতরে ঢুকে একেবারে অবাক হয়ে গেল। কারণ সেই অন্ধকারে আলো ক'রে শ্বেত-পাথরে গড়া এক অপূর্ব দেব-প্রতিমা একাকিনী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতাকে দু হাজার বৎসরের দীর্ঘতাও কিছুমাত্র মলিন করতে পারে-নি! এই মূর্ত্তিই এখন ভেনাস ডি মিলো নামে বিখ্যাত। বোটোনিয়া যখন ভেনাসকে প্রথম পায়, তখনো মূর্ত্তির হাতদুটি অভগ্ন ছিল। আরো-একটা জানবার কথা এই যে, ভেনাসের বাম হাত খানি এমন কৌশলে গড়া ছিল, যাতে-ক'রে তাকে ইচ্ছামাত্র কাঁধ থেকে খুলে নিতে লাগিয়ে দিতে পারা যেত।

আবিষ্কারের কিছুকাল পরে ফরাসীরা ভেনাসের কথা জান্‌তে পারে। একজন লোক বোটোনিয়ার কাছে গিয়ে মূর্ত্তিটি কেনবার প্রস্তাব করলে এবং বোটোনিয়াও তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। ফরাসীরাও তখনি মূর্ত্তিটিকে আন্‌বার জন্যে একখানি যুদ্ধ-জাহাজ পাঠিয়ে দিলে।

এর-মধ্যেই মিলো দ্বীপের গোড়লরা খবর ক'রে ফেল্‌লে, তারা কোন কাজ বাগাবার জন্যে একজন গ্রীক রাজকুমারকে মূর্ত্তিটি উপহার দেবে।

ফরাসী যুদ্ধজাহাজ যখন মিলো দ্বীপের বন্দরে এসে হাজির হোলো, তখন দেখা গেল একদল তুর্কী নাবিক ভেনাসকে একখানি গ্রীক-জাহাজে তুলে চালান দেবার যোগাড় করছে। ফরাসীরা তখনি নেমে প'ড়ে তা

বাধা দিলে। ভেনাসকে নিয়ে আগে গ্রীক দেবতাদের মধ্যেও লড়াই হয়ে গেছে, এখন তাঁর প্রতিমাকে নিয়ে পৃথিবীর মানুষদের মধ্যেও মারামারি বেধে গেল। দেবতাদের লড়ায়ে ভেনাসের নিজের কোন ক্ষতি হয়-নি বটে, কিন্তু মানুষদের মারামারির হাঙ্গামে প'ড়ে তাঁর প্রতিমা আর আত্মরক্ষা করতে পার্‌লে না। কারণ বিজয়ী ফরাসীরা ভেনাসের প্রতিমাকে যখন নিজেদের জাহাজে নিয়ে গিয়ে তুল্‌লে, তখন দেখা গেল যে, প্রতিমার হাত-দুটি আর নেই! রূপলক্ষ্মী ভেনাসের হাতভাঙা প্রতিমা এখন ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পশালায় সগৌরবে বিরাজ করছে এবং তার কাছে গিয়ে আজ পৃথিবীর আধুনিক রূপসীদের দেহের দেমাক্ নিত্যই চুর্‌মার হয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্ন-নিদ্রা

সম্মোহন বা hypnotismএর দ্বারা আজকাল মানুষের অনেক উপকার হচ্ছে। সম্মোহনের প্রথম সূত্রপাত ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে, ডাক্তার মেস্‌মারের দ্বারা। তিনি সম্মোহনের সাহায্যে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে অস্ত্রোপচার করতেন। তারপর গত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দুইজন ফরাসী ডাক্তারের কৃতিত্বে স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় আরোগ্য লাভের প্রধান উপায় ব'লে সম্মোহনকে এখন একটা বিজ্ঞান রূপে মানা হয়েছে। ন্যান্সি-সহরের "Suggestive Therapeutic Department আজ পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে পড়েছে।

সংপ্রতি ফ্রান্সের ডাঃ ষ্টিন এ-সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি সম্মোহন-শক্তিতে উৎপাদিত এই কৃত্রিম নিদ্রার নাম দিয়েছেন "psycho-anæsthesia"। একে "স্বপ্ন-নিদ্রা" ব'লেও ডাকা হয়। অধিকাংশ মানুষের ভিতরেই তাদের অজ্ঞাতে এমন অনেক জ্ঞান ও শক্তি অকেজো ও সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, "স্বপ্ন-নিদ্রা'র সাহায্যে যেগুলিকে আবার মনের অতল গভীরতা থেকে উপরে টেনে তুলে আনা যায়; যে-সব ব্যাপারের স্মৃতি অনেক-দিন আগেই আমি ভুলে গিয়েছি, সে-সব আবার আজকের ব্যাপারের মত তাজা হয়ে মনের চারিদিকে উঁকি মারতে থাক্‌বে। বোকা ছেলের পড়াশুনোর ক্ষমতা বাড়বে, ইচ্ছা-শক্তি জাগ্রৎ হবে, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দূরে যাবে এবং সদাই লাজুক ও থতমত-খাওয়া লোক আবার সপ্রতিভ হয়ে উঠবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

একটি যুবতীর গান গাইবার ক্ষমতা আছে অল্প। কিন্তু তার মনে মনে অর্দ্ধ-চেতন বিশ্বাস আছে যে, যদি তার আত্মনির্ভরতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে, তবে সে একজন উঁচুদরের কলা-কুশলী হ'তে পারবে। Psycho-anæsthesiaর দ্বারা জানা যেতে পারে, সে সত্যই শ্রেষ্ঠ গায়িকা হয়ে দাঁড়াবে, না, তার বিশ্বাসটা একেবারেই ভ্রান্ত! কিংবা ঐ যুবতীর মধ্যে গান গাইবার উচ্চ-শক্তি যদি অকেজো ভাবে সুপ্ত হয়ে থাকে, তাহ'লে তাকে অবিলম্বে কাজে খাটাতে বাধ্য করা যেতে পারে।

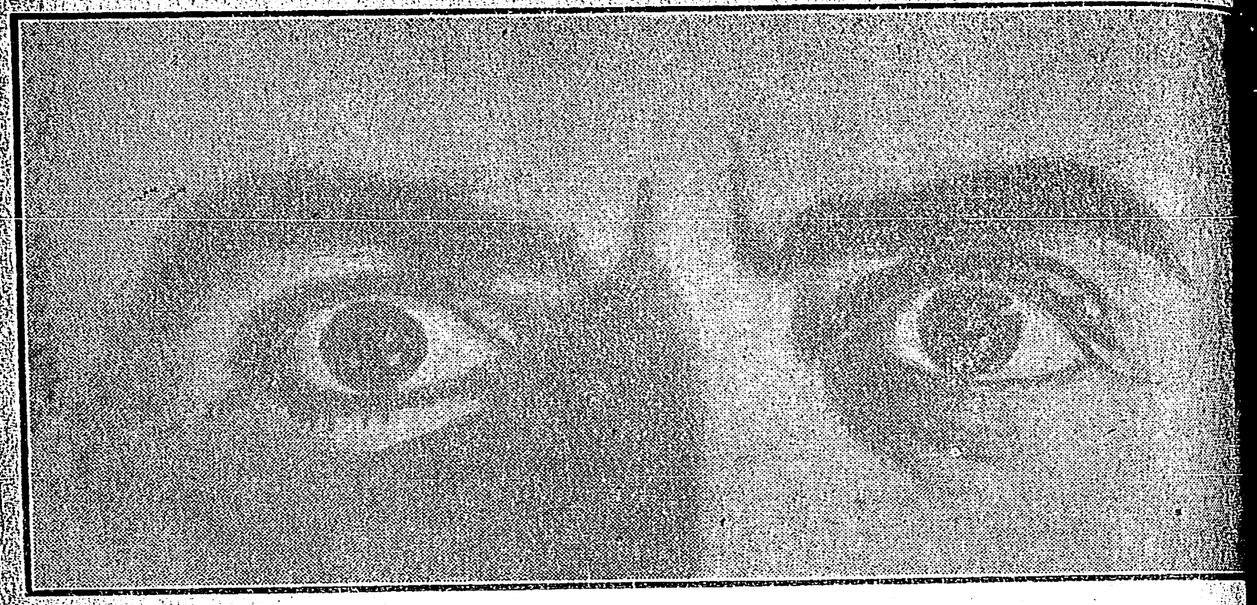

চোখের ক্ষমতা

তারপর ধরুন, একজন নেসাখোর নেসা ছাড়তে চায়, কিন্তু কিছুতেই সে বদ-অভ্যাস ছাড়তে পারছে না। "স্বপ্ন-নিদ্রা"র দ্বারা তার সে বদ-অভ্যাস খুব সহজেই দূর করা যাবে।

মনে করুন, সারাদিন ধরে আমি কোন সমস্যা নিয়ে ভেবে মরছি, কিন্তু কিছুতেই সমাধান করতে পারলুম না। অথচ আসল উত্তরটা আমার অজ্ঞাতে, হয়তো মনের মধ্যেই গুপ্ত হয়ে আছে। "স্বপ্ন-নিদ্রা"র ঘোরে এমন সমস্যার সুন্দর সমাধান হতে পারে।

ডাক্তার ষ্টিনের পদ্ধতিতে এম্‌নি-সব অনেক মুস্কিল আসান হচ্ছে। আর-একটি উল্লেখ-যোগ্য কথা এই যে, ডাক্তার ষ্টিন ঘুম-পাড়ানো লোকের সঙ্গে নিজের চিন্তাশক্তির সাহায্যে নীরবে এমন আলাপ করতে পারেন—স্বজ্ঞানে-শ্রুত কথিত বাক্য যার চেয়ে স্পষ্ট হয় না।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে একখানি ছবি দেওয়া গেল। এই ছবিখানি চোখ থেকে দু-ফুট তফাতে রাখুন এবং মিনিট পাঁচেক ধ'রে একাগ্রচিত্তে ছবিতে আঁকা চোখদুটির দিকে চেয়ে থাকুন। যাঁদের মন দুর্ব্বল, যাঁরা সহজেই অভিভূত হন, নির্নিমেষে, একমনে ছবির চোখের দিকে পাঁচমিনিট তাকিয়ে থাকলেই তাঁরা ঘুমিয়ে পড়বেন। যদি আপনার মাথা ধ'রে থাকে, যদি আপনি চরিত্রগত কোন বদ-অভ্যাস দূর করতে বা স্বভাবের কোন বিশেষত্ব বদ্‌লাতে বা কোন সুপ্ত শক্তি জাগাতে চান, ঘুমোবার আগে একমনে তা ভাবতে থাকবেন। খুব-সম্ভব ঘুম ভেঙে উঠে আপনার জিজ্ঞাসার সদুত্তর পাবেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, আপনার মনের একাগ্রতার উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে—চঞ্চল মন এ চেষ্টার ব্যর্থ হবে।

ক্যারুসোর কণ্ঠনালী

প্রতীচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক এন্‌রিকো ক্যারুসো সংপ্রতি পরলোকে গিয়েছেন। গান গাইতে গাইতে হঠাৎ তার গলার একটি শির ছিঁড়ে যায় এবং সেই দুর্ঘটনাই তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ!

প্রতীচ্যে ক্যারুসোর জুড়ী ছিল না। আমরা বিলাতী গান বুঝি না এবং ক্যারুসোর গান শুনবার সুযোগও আমাদের ভাগ্যে কখনো ঘটে-নি। কিন্তু শুনেছি, ক্যারুসো যখন গান গাইতেন, তখন স্বর্গ যেন মর্ত্ত্যে নেমে আস্‌ত।

সমুদ্রের ওপারে গুণীর আদর যথেষ্ট। তার ফলে, ক্যারুসো প্রতিমাসে—দু-এক হাজার নয়—লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার কর্‌তেন। তাঁর গান শোনবার জন্যে সারা য়ুরোপ আর আমেরিকা যেন পাগল হয়ে উঠত।

ক্যারুসো মারা যাবার সময়ে এক অপূর্ব্ব সম্পত্তি দান ক'রে গেছেন। সেটি তাঁর কণ্ঠনালী! ইতালির নেপ্‌ল্‌স্ সহরের যাদুঘরে এটি সযত্নে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে—সেই সুরক্ষিত অবস্থায় ভবিষ্য বংশের মঙ্গলের জন্যে চিরদিন তাকে টিকিয়ে রাখা হবে।

বাপ-মার বিশেষ কোন দৈহিক গুণ সন্তানে বর্ত্তাতেও পারে, না বর্ত্তাতেও পারে। স্যাণ্ডোর মত তাঁর ছেলেরও হাতের মাংসপেশী যে ঠিক ততটাই পরিপুষ্ট হবে, তার কোনই মানে নেই। অবশ্য দৈহিক বংশানুক্রমের দৃষ্টান্ত যে একেবারেই নেই, তাও

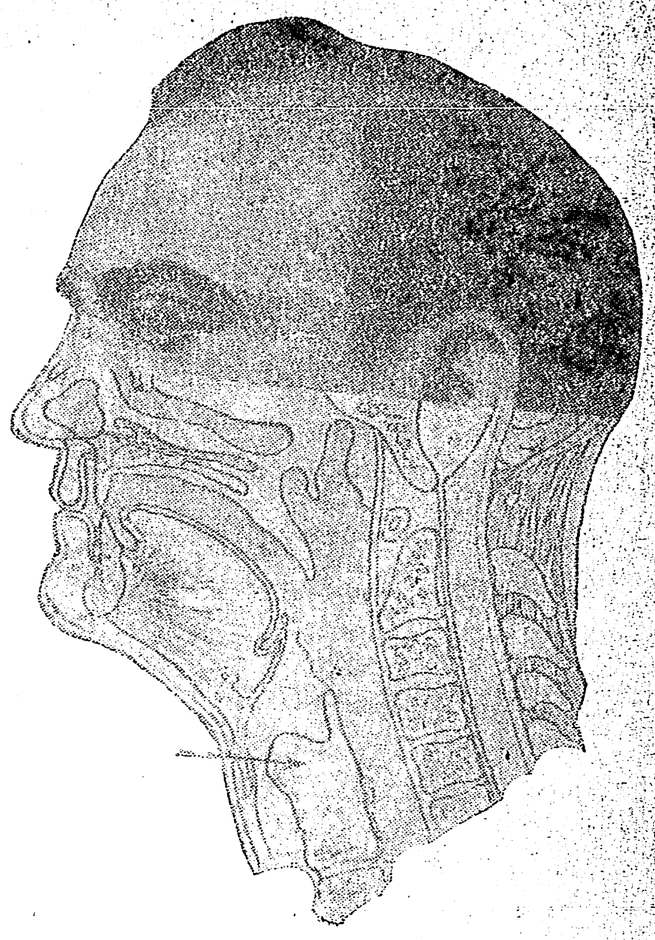

ক্যারুসোর কণ্ঠনালী

বল্‌ছিনা। কিন্তু ক্যারুসোর এই দানে ভবিষ্য সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের যে অনেক মঙ্গল হবে, সেটা এক রকম দৃঢ়নিশ্চিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই কণ্ঠনালীর বিশিষ্টতার গুণেই ক্যারুসোর গান অতটা নিখুঁৎ হ'তে পেরেছিল।

কয়েক বছর আগে কারুসোর ডাক্তার তাঁর চিকিৎসার সময়ে আবিষ্কার করেন যে, ক্যারুসোর কণ্ঠনালী এক অপূর্ব্ব ব্যাপার, এমন-কি অসম্ভব বল্‌লেও চলে। কণ্ঠনালী বা larynx হচ্ছে শ্বাসনালীর মধ্যে ঢুক্‌বার

একটি দরজা বা ছিদ্রের মত। যখন আমরা খাবার খাই, তখন এটি বন্ধ হয়ে ফুস্‌ফুস্‌কে রক্ষা করে। যখন আমরা নিঃশ্বাস টানি, তখন এটি খুলে যায়। তেম্‌নি, যখন আমরা কথা কই বা গান গাই, কণ্ঠনালী তখন এমন-ভাবে খুলে থাকে, যাতে-ক'রে শ্বাস-নালীর প্রান্তস্থিত স্বর-তন্ত্রীগুলির (vocal chords) উপর দিয়ে বহমান বাতাস সে-গুলিকে কম্পমান ক'রে তোলে—ধ্বনি জাগাবার জন্যে। স্বরতন্ত্রীর মাংসপেশীগুলিকে গায়ক যেমন-ভাবে সঞ্চালিত কর্‌তে পারে, কেবল তারই উপরে ঐ কম্পন নির্ভর করে না—পরন্তু, এই মাংসপেশীর আকারের তারতম্য অনুসারেও কম্পন কম বা বেশী হয়। এইখানেই ক্যারুসোর আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। সচরাচর মানুষের স্বর-তন্ত্রীর আকার হয় একইঞ্চির চার-ভাগের তিন ভাগ। ক্যারুসোর স্বর-তন্ত্রীর আকার পূরো এক ইঞ্চির উপরেও, একইঞ্চির ষোলভাগের তেরো ভাগ—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চেয়ে দু-গুণেরও বেশী! এই অসাধারণ ব্যাপার দেখে ক্যারুসোর ডাক্তার একবারে অবাক হয়ে যান। তাঁরই পরামর্শে ক্যারুসো মৃত্যুকালে জানিয়ে গেছেন যে, তাঁর কণ্ঠনালী যেন কেটে নিয়ে যাদুঘরে রেখে দেওয়া হয়।

ক্যারুসোর দেহের মধ্যে আরো অনেক এমন আশ্চর্য্য বিশেষত্ব আছে, যা প্রায়ই দেখা যায় না। তাঁর ফুস্‌ফুস্‌ও প্রকাণ্ড—দানবের ফুস্‌ফুসের মত! তাঁর গলার আওয়াজ যে অতদূর চড়্‌তে পার্‌ত, এই ফুস্‌ফুসের বিপুলতাই তার কারণ। একটি প্রকাণ্ড 'গ্র্যাণ্ড' পিয়ানোর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বক্ষ স্ফীত ক'রে তুলে, ক্যারুসো কেবলমাত্র বায়ু-সংঘর্ষণের জোরে পিয়ানোর চাবিগুলোকে নড়াতে পারতেন! ঘরের মধ্যে একটা কাঁচের গেলাস রেখে, গেলাসের সমতানে কণ্ঠস্বর বেঁধে নিয়ে, ক্যারুসো গলার আওয়াজের জোরেই গেলাসটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেল্‌তে পারতেন! এ-ছাড়া ক্যারুসোর স্বর-নালী ও দেহের হাড় প্রভৃতিতেও এমন-সব বিচিত্রতা ছিল, যাতে-ক'রে প্রমাণিত হয়, তাঁর আপদমস্তক ছিল সঙ্গীতেরই উপযোগী—তাঁর সারা-দেহই যেন একটি বাদ্যযন্ত্রের মত। ক্যারুসোর দেহ দেখে সেই পুরাণো প্রবাদটিকেও সত্য ব'লে বোঝা যায়, 'ঈশ্বর-দত্ত কণ্ঠ না থাক্‌লে গান হয় না।'

প্রসাদ রায়।

আঁধি

২

১

মার আদরে মনের সমস্ত যাতনা ভুলিয়া নিখিল বলিল,—আজ মা তুমি মাষ্টার মশায়কে বলে পাঠিয়ো মা, আমায় যেন শীগ্‌গির-শীগ্‌গির ছুটি দেন। তোমার কাছে সেই আগেকার মত গল্প শুন্‌ব একটু।

সুষমা বলিল,—আচ্ছা, তাই হবে। তুমি এখন পড়তে যাও। আমি তোমার জন্যে এখনি গিয়ে নিজের হাতে মোহন-ভোগ করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিস্‌মিস্‌ দেব মোহনভোগে—কেমন?

—হ্যাঁ মা, অনেক কিস্‌মিস্‌ দিয়ো—আমার বেশ লাগে। আর মা, একদিন সেই—সেই জিনিসটা তৈরী করো না মা,—বড্ড খেতে ইচ্ছে কচ্ছে!

—কি জিনিষ?

নিখিল বলিল,—সেই যে শিমুলতলায় তৈরী করেছিলে, ডিম দিয়ে—সেই পুডিং—

সুষমা হাসিয়া বলিল,—বেশ, ওবেলায় বেড়াতে যাবার সময় পুডিং খেয়ে যেয়ো—দুপুরবেলা তৈরী করব'খন।

নিখিল মাকে চুমু দিয়া পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল। সুষমাও তাড়াতাড়ি গিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া ছোট কড়া চাপাইয়া মোহন-ভোগ করিতে বসিল। খুন্তি দিয়া সুজি নাড়িতে নাড়িতে সে অতীতের কথা ভাবিতে-ছিল। শিমুলতলায় থাকিতে সেই যা ক'টা দিন নিখিলকে সে কাছে পাইয়াছিল। এখানে আসিয়া অবধি স্বামী নিয়ম-কানুনগুলা এমন দুরস্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন যে দুইজনকে একত্রে বসিয়া পরস্পরের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিবার একটু ফাঁক রাখেন্‌ নাই। প্রথম প্রথম এই ধরা-বাঁধা নিয়মগুলার বিরুদ্ধে সে একটু অনুযোগ তুলিয়াছিল, অভয়াশঙ্কর কিন্তু সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে গম্ভীর কণ্ঠে কি রূঢ় ভাবেই না তার জবাব দিয়াছিলেন! অভয়াশঙ্কর আরো বলিয়া দিয়াছিলেন, অন্দরে সুষমার বাঁচিয়া থাকাটা প্রয়োজন শুধু এই জন্যই যে নিখিল বুকের মধ্যে মা-নাই বলিয়া ফাঁকটা না বুঝিতে পারে! নহিলে তিনিও যেমন জানেন, সুষমাও তেমনি ভাল করিয়াই জানে, নিখিল মাতৃহীন! সুষমা সত্য সত্যই কিছু আর নিখিলের মা নয় যে নিখিলকে না দেখিলে দুই চক্ষে অন্ধকার দেখিবে!

এত বড় রূঢ় কথার ঘা খাইয়া তাহার ছোট্ট অভিমান-ভরা অভিযোগ-উদ্যত মনটা একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। তাহার এত স্নেহ, এই মমতা অভয়াশঙ্করের চোখে শুধু ভাণ মাত্র,—অভিনয়-মঞ্চের একটি রাত্রির অভিনয়ের মতই তাহা তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী! সত্য স্নেহের অধিকার যেখানে কেহ দিতে চাহে না, সেখানে স্নেহের দাবী করিতে যাওয়ার মত অপমানের ব্যাপার আর কিছুই নাই! বারবার ঘা খাইয়া সুষমা এ কথাটা ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিল, তবুও নিঃসম্বলের একটিমাত্র সম্বল বলিয়াই সে নিখিলকে স্নেহার্ত্ত দুই উদ্যত বাহুর বন্ধনে বাঁধিবার জন্য পাগলের মত ছুটিয়া যায়! তার উপর শুধু নিজের মনকে বুঝানোর ব্যাপার হইলেও সে বুঝাইয়া কোনমতে নিরস্ত করিতে পারিত, কিন্তু নিখিল—বেচারা নিখিল! অভাগা মাতৃহারা ছেলেটা যে তাহাকেই মা বলিয়া জানে! আর মা বলিয়া জানে বলিয়াই তো বাহিরের ঐ কঠিন বাঁধনের চাপে ব্যথিত জর্জ্জরিত হইয়া নিজের মনের পিপাসা মিটাইবার জন্য ছুটিয়া সে সুষমার কাছেই আসিতে চায়! অভয়াশঙ্করের কথায় প্রাণে পাষাণ বাঁধিয়া সুষমাও কি তাহাকে রূঢ় নির্দ্দয় ভাবে তাড়াইয়া দিবে, বলিবে, ওরে পলাইয়া যা রে, পলাইয়া যা!

তুই এ কাহার কাছে তোর ও-কিসের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে আসিস্! আমি তোর মা নই, মা নই—যে-মার কাছে তোর স্নেহের আব্দার রক্ষা পাইত, যে-মা তোর সমস্ত ভুল-চুক, সমস্ত যাতনা জুড়াইতে পারিত, সেই মা তোর মরিয়া গিয়াছে! সে নাই রে, সে নাই! দারুণ জ্বালায় অহর্নিশি নিজে তাই দগ্ধ হইতে থাকিলেও মুখ ফুটিয়া এ-সব কথা বলিয়া বা উপেক্ষা করিয়া নিখিলকে সে কিছুতেই সরাইতে পারিবে না!

কিন্তু বুকে টানিবার চেষ্টা করিয়াই বা ফল কি! অভয়াশঙ্কর কিছুতেই তাহা বরদাস্ত করিবেন না! কেন? ওগো, এ বিরাগ কেন? এই প্রশ্নটার কোনো সমাধানই সুষমা খুঁজিয়া পায় না! নিখিল অভয়াশঙ্করেরই পুত্র, নিখিলের সুখই তাঁহার একমাত্র কাম্য! সেই নিখিলের পায়ে কোথাও কাঁটা ফুটিলে অভয়াশঙ্কর সেখানে বুক দিয়া পড়িতে চান, এমনি গভীর তাঁহার ভালবাসা। তবে সেই নিখিলকে সুষমা ভালবাসিতে গেলে, সেই নিখিলকে সুখী করিতে গেলে কেন তিনি মাঝে পড়িয়া দুইজনকে দুইঠাঁই করিবার জন্য এতখানি চঞ্চল হইয়া ওঠেন? সুষমা যদি পেটে একটা ছেলে ধরিত, তাহা হইলেও নয় স্বতন্ত্র কথা ছিল! কিন্তু সন্দেহের সে মূলটাকে স্বামীর মন বুঝিয়াই না সে নিজে হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে! তবে? তবে? কেন গো তবে এই অমূলক শঙ্কা! অকারণ এই কঠিন শৃঙ্খলে বেচারার হাত-পা বাঁধিয়া দেওয়া কেন! ভাবিতে ভাবিতে সুষমার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

তার পর এই কাল রাত্রিকার ঘটনা! বৃষ্টিতে ছেলের ঘরে ফিরিতে দেরী হইয়া গিয়াছে। ছেলে না আসায় তাহার মনেও ভাবনা খুবই হইয়াছিল—নিজে পেটে না ধরিয়াও নিখিলের জন্য কাতর হইয়া কায়-মনে কেবলই সে ঠাকুরকে ডাকিয়াছে, এখানে-ওখানে চারিধারে লোক পাঠাইয়াছে, ঘর-বাহির করিয়া মরিয়াছে! সেই ছেলে ঘরে ফিরিয়া যখন না আসার স্পষ্ট কৈফিয়ৎ দিল—আর সে কৈফিয়তের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে-চোখে কত বড় অপরাধীর ক্ষমা-প্রার্থনার কি প্রকাণ্ড করুণ-মিনতি উছলিয়া পড়িতেছিল, তখন তাহাকে এমন রাক্ষসের মত কঠোর শাস্তি দেওয়া—এ কি মানুষের কাজ! সারারাত্রি নির্জ্জন ঘরে ছেলেটা খুনী-আসামীর মতই চাবি-বন্ধ পড়িয়া রহিল, মুখে একটু জল অবধি দিতে পাইল না—এ নৃশংসতা সুষমার বুকে বাজের চেয়েও ভয়ঙ্কর বাজিয়াছে! কিন্তু কিছু করিবার উপায় ছিল না! সে মা নয়, মা নয়! সে যদি নিখিলের মা হইত, তাহা হইলে দেখিয়া লইত, অভয়াশঙ্কর কেমন করিয়া ঐ দুধের ছেলেকে মার কোল হইতে ছিনাইয়া অমন হাজত-বন্ধ আসামীর মত ঘরে পুরিয়া রাখিত! সে ভাবিল, হায়রে, পাছে পরের মুখে ছেলে কোনদিন জানিয়া ফেলে, সুষমা তার মা নয়, তার মা মরিয়া গিয়াছে এবং জানিয়া কোনদিন সে পাছে অশান্তি ভোগ করে, এজন্য বাড়ীর সমস্ত জঞ্জাল বাড়ীতে রাখিয়া স্বামী আসিয়া এই নির্জ্জন গ্রামে সুনন্দায় সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ার মধ্যে নূতন বন্দোবস্তে জীবন-যাত্রার নূতন পালা আরম্ভ করিয়াছেন! কিন্তু এই যে ব্যবহারগুলা—ইহাতে ছেলের কি আর সে দুর্ভাগ্যের কথা জানিতে কিছু

বাকী থাকিবে? এই যে সুষমার প্রতি ব্যবহার—এই দাসীর মত, বাঁদীর মত,—ছেলের মা বলিয়া বাহিরে লোকের সাম্‌নেও এতটুকু সম্মানের চোখে স্বামী তাহাকে দেখিতে পারেন না—এগুলার কারণ কি ছেলে কোনদিন খুঁজিতে যাইবে না? আর পাঁচটা বাড়ীতে এবং তাহার পড়িবার বইগুলাতেও ত সে মা আর ছেলের সম্পর্কের কথা নিত্যই দেখিতেছে, পড়িতেছে! তবে?

ভাবিতে ভাবিতে সুষমার মন শেষে তাতিয়া উঠিল। এটুকু সম্ভ্রম, এটুকু সম্মান দিবার শক্তিই যদি না রহিল, তবে লোককে মিথ্যা স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া মা-হারা ছেলেকে মায়ের অভাব জানিতে দিবে না বলিয়া ভড়ং করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া আনা হইল কেন! বিবাহের পূর্ব্বে তাহার সামনেও যে অত-বড় প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া ছিলে—আমার মা-হারা নিখিলের মা হয়ে তুমি থাকবে,—তোমাকেই সে নিজের মা বলে জানবে—সে কথা যখন রাখিতে পারিবে না, তখন কেন তাহার এ সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে? কেন তাহাকে আগুনে পোড়াইবার জন্য ধরিয়া আনিলে! কেন এ মাতৃ-হৃদয়া নারীর এ স্নেহের পিপাসা চিরদিনের জন্য অতৃপ্ত রাখিলে! সুষমা ত তোমার কাছে কোনদিন কোন অপরাধ করে নাই! তোমার করুণার প্রত্যাশী হইয়াও সে দিন সে তোমার পথে দাঁড়ায় নাই! হায়রে স্বার্থান্ধ পুরুষ,—নিজের সুখটাকে ইন্দ্রের মত সহস্র চক্ষু মেলিয়া বেশ দেখিতে পাও ত, আর ক্ষুদ্র নারীর মনের অত-বড় যে ক্ষুধা—সেটা তোমার চোখেও পড়ে না!

দামু আসিয়া বলিল—মোহনভোগ হয়েছে মা?

সুষমা ডিশে মোহনভোগ তুলিয়া একটা চামচ-সমেত ডিশটা দামুর হাতে দিয়া বলিল,—এইটে দিয়ে এসে খোকাবাবুর দুধ নিয়ে যেয়ো, দামু।

দামু গমনোদ্যত হইলে সুষমা জিজ্ঞাসা করিল,—খোকাবাবু পড়ছে ত?

—হ্যাঁ মা, পড়ছেন।

—তোর বাবু কোথায় রে দামু?

—কি জানি মা, কোথায় গেলেন যে! দুটি বাবু এসেছিল কোথা থেকে, তাঁদের সঙ্গে বেরুলেন।

২

নিখিল বসিয়া পড়িতেছিল,—C-l-o-u-d-s ক্লাউড্‌স্; ক্লাউড্‌স্ মানে মেঘসকল। G-a-t-h-e-r গ্যাদার; গ্যাদার মানে জড়ো হওয়া; In the sky মানে আকাশে। Clouds gather in the sky মানে আকাশে মেঘ জড়ো হচ্ছে। T-h-e-r-e দেয়ার; দেয়ার মানে সেখানে। w-o-u-ld উড্ b-e বী, would be মানে হবে। a—a মানে একটি। s-t-o-r-m ষ্টর্ম; ষ্টর্ম মানে ঝড়। There would be a storm মানে সেখানে একটি ঝড় হবে। তারপর হঠাৎ মাষ্টার মশায়ের পানে চাহিয়া সে বলিল—সেখানে কি মাষ্টার মশায়? কোন্‌খানে?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—ওখানে there কথাটা ইংরিজির মাত্রা—বুঝলে? ওটা idiom। ওর যে একটা বিশেষ-কোন মানে আছে, তা নেই,—অথচ there না দিলে ইংরিজি হবেই না। ও-সব ঘোর-প্যাঁচগুলো

একটু বড় হলে বুঝবে—এখন There would be a storm কথাটার মানে বলবে, ঝড় উঠবে।

ঝড়! নিখিলের অমনি মন পড়ার বই ছাড়িয়া কাল সন্ধ্যার সেই ঝড়ো হাওয়ায় গিয়া উঠিল। বিশাল নদী বাঘমতীর তীরে একটা গাছের তলায় কাল সন্ধ্যায় সেই সে দাঁড়াইয়াছিল। ঘন কালো মেঘে ওপার ঢাকিয়া গিয়াছিল, সেই মেঘের আঁধারে ওপারে গাছের শ্রেণী দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল, যেন প্রকাণ্ড একদল দৈত্য জলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাহার একটা ইঙ্গিতের আশায়! যেন সে ইঙ্গিতটুকু পাইলে এখনই ঝাঁপাইয়া পড়ে! নিখিল তন্ময় হইয়া ভয়-ভারাতুর মনে গাছগুলার দিকেই চাহিয়া ছিল। সহসা কোথা হইতে সোঁ-সোঁ গর্জ্জন উঠিল। আর সে-ব্যাপার বুঝিবার পূর্ব্বেই চারিধার ঝাপ্‌সা করিয়া কি সে বৃষ্টি নামিল! ভয়ে দিশাহারা হইয়া কোন্ দিকে যে পলাইবে কিছুই ঠাওর করিতে না পারিয়া একদিকে সে ছুট দিল। সে কি ছুট! তারপর সেই ঘন-ঘোর বৃষ্টির মধ্যে ছুটিতে ছুটিতে সে আসিয়া একটা কুটীরে আলোর একটু রশ্মি দেখিল, আর সেই কুটীরেই শান্ত-সুন্দর একটি গৃহকোণে তাহার আশ্রয় মিলিল—আহা, সেই গৃহকোণে সোনার, বনমালীর কি সে স্নেহ! কালিকার সেই দুর্য্যোগ রজনীর ভয়-গম্ভীর ভীষণতা আজ এ স্নিগ্ধ প্রভাতে স্মৃতির মাধুরীতে মাখিয়া কি সুন্দর ছবির মত মনে হইতেছে! সোনার সেই কল-কাকলী বাঁশীর তানের মতই মধুর বোধ হইতে লাগিল। সেই খড়ে-ছাওয়া, মাটীর দেওয়ালে ঘেরা, মিট্‌মিটে প্রদীপের আলো-জ্বালা স্যাঁৎসেঁতে ঘরের মধ্যে কি সুখেই না তাহার সে সময়টুকু কাটিয়াছিল! সোনা ভাবিয়াছিল, সে রাজপুত্র,—তাহার তালপত্রের খাঁড়া আছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে! নিখিল মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, সোনা নেহাৎ ছেলেমানুষ কিনা, তাই ও-সব গল্পগুলাকে সত্য বলিয়াই সে বিশ্বাস করে। তবু, হোক সে ছেলেমানুষ,—সোনার চলা-ফেরায় সে কাল যে স্বচ্ছন্দ সরল ভঙ্গীটুকু দেখিয়া আসিয়াছে, মুক্ত স্বাধীনতার যে অবাধ হিল্লোল তাহার কথার সুরে দৃষ্টির ভঙ্গীতে লক্ষ্য করিয়াছে, নিজে ছেলেমানুষ হইলেও সেটা হইতে সে-নিজে যে কি করুণভাবেই বঞ্চিত, তাহা সে বুঝিল। তাহার পিছনে এই যে মাষ্টার মহাশয়, দাসী, চাকর, দ্বারবান প্রভৃতির কড়া পাহারা, মাথার উপর পড়ার চাপ,—চলিতে ফিরিতে আইন-কানুনের কাঁটা আষ্টে-পৃষ্ঠে ফুটিয়া বিঁধিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছে, সোনাকে দেখিয়া তাহার অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া আজ যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কল্পনা-নেত্রে সে দেখিতে লাগিল, এই যে বৃষ্টি-ভেজা প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ আলোয় সে এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে এখন কতকগুলা ইংরাজী কথার মানে মুখস্থ করিয়া সারা হইতেছে, আর ওদিকে সোনা হয়ত এ-সময় পাড়ার ছেলে-মেয়েদের দলে মিশিয়া গাছতলায় ঝরা ফুল কুড়াইয়া আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছে!

সামনেই খোলা জানালার মধ্য দিয়া আপনার দৃষ্টিটাকে নিখিল বাহিরে প্রসারিত

করিয়া দিল,—ঘরের পাশেই ছোট বাগান,—গাছের পাতাগুলা ভিজিয়া ধুইয়া চক্‌চক্ করিতেছে, গাছের নীচে মাটীর শুষ্ক ঢেলা ভিজিয়া নরম হইয়া রহিয়াছে—দুই-একটা পাখী নিঝুমভাবে বর্ষা-স্নাত প্রকৃতির এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে। এ সময়টা একবার যদি সে ছুটি পাইত—! তাহা হইলে এখনই সে পা দিয়া দলিয়া পিষিয়া ঐ নরম মাটীর ভিজা স্তূপটাকে কেমন চোস্ত করিয়া ফেলিত—ভাঙ্গা ছেঁড়া গাছের ডাল-পাতা লইয়া নরম মাটিতে পুঁতিয়া ছোট-খাট একটা বাগান তৈয়ার করিয়া ফেলিত। —পথের ওধারে যে মস্ত নালা আছে, জলে সেটা নিশ্চয় পুরিয়া গিয়াছে, আর সেই জল নদীর স্রোতের বেগেই ছুটিয়া চলিয়াছে,—সেই নালার জলে কাগজের নৌকা ভাসাইয়া দিত! আঃ, কি মজাই যে হইত! হায়রে, সে যদি বড়লোক জমিদারের ছেলে না হইয়া ঐ বনমালীর ঘরে সোনা কি তাহাদেরি ঘরের অন্য-একটা ছেলে হইয়া জন্মিত! নৈরাশ্যের এক তীব্র নিশ্বাস নিখিলের শিশু চিত্তটাকে তোলপাড় করিয়া ছুটিয়া বাহির হইল!

মাষ্টার মহাশয় তখন কাছে বসিয়া একখানা ভূগোল পড়িতেছিলেন। হঠাৎ নিখিলকে এত-বড় নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া তাহার পানে ফিরিয়া চাহিলেন। নিখিল তখনো শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—বসে আছ কেন নিখিল? পড়ো। তারপর—কি? বলিয়া বই-খানার পানে চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন,—তারপর ঐ যে Birds are flying to their nests. Birds মানে পাখী—পড়ে যাও।

নিখিলের কল্পনার যে ফানুশ আকাশে উধাও হইয়া উড়িয়া চলিয়াছিল, মাষ্টার মহাশয়ের কথায় সে ফানুশ ছিঁড়িয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। মাষ্টার মহাশয়ের আদেশে সে আবার পড়িতে লাগিল,—B-i-r-d-s বার্ড্‌স্; বার্ড্‌স্ মানে পাখীগুলি।

বাহিরে দুই-চারিটা পাখী ভোরের আলোর দেখা পাইয়া রাত্রিকার দুর্য্যোগের কথা ভুলিয়া আনন্দে কলতান তুলিয়াছিল,—সে কলরবে নিখিলের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত আবার ঐ মেঘমুক্ত নির্ম্মল নীল আকাশের পথে উড়িয়া চলিল। মুখ শুধু মাষ্টার মহাশয়ের আদেশ-চালিত কলের গান গাহিতে লাগিল—B-i-r-d-s বার্ড্‌স্; বার্ড্‌স্ মানে পাখীগুলি—B-i-rd-s বার্ড্‌স; বার্ড্‌স্; এ—বার্ড্‌স্ মানে পাখীগুলি।

৩

সারা দুপুরবেলাটা নিখিল হাতের লেখা আর অঙ্ক কষায় অনেকগুলা ভুল করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের হাতে সেগুলা শুধরাইবার জন্য তুলিয়া দিল। মাষ্টার মহাশয় ভুল কাটিতেছিলেন, নিখিলের মন সেদিকে কিন্তু কিছুতেই সায় দিতে চাহিল না,—সে শুধু মাথা নাড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাঘমতীর তীরে কাজল-কালো মেঘের তালে নাচিতে নাচিতে গাছের তলায় ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট ওপারের সেই গাছের সারি, কালো জলে তরঙ্গের সেই মৃদু-মধুর বিচিত্র দোলে রঙ্গ-নৃত্য,—লাল

পেন্সিলের দাগের মত কালো আকাশ চিরিয়া বিদ্যুতের সে দাপাদাপি,—আর সোনাদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘর—অপূর্ব্ব রঙীন্ ছবির মতই তাহার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল, আজও সে ঐ-ধারেই বেড়াইতে যাইবে। সোনাদের বাড়ীতে নাই গেল, সোনাদের বাড়ীর সামনে দিয়া সেই নদীর ধারের জাম গাছটার তলায় গিয়া বসিবে,—ওপারের কোণ ঘেঁষিয়া নদীর বাঁক সেই ঘুরিয়া গিয়াছে,—নদীটাকে কি মস্তই না দেখায়! সেইখানে গিয়া সে বসিবে, আর দিনের আলোয় বনমালীদের বাড়ীখানাও ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে! বনমালীদের সঙ্গে মিশিতেই বাবার বারণ আছে, তাহাদের ঘর-বাড়ী দূর হইতে চোখে যদি সে দেখে, তাহাতে ত আর বারণ নাই!

কোনমতে রুটিনের বাঁধা সময়টুকু এ খাতা পাড়িয়া ও-বই নাড়িয়া কাটাইয়া দিয়া সে খাবার খাইবার জন্য অন্দরে গেল। সুষমা ডিমের পুডিং করিয়া রাখিয়াছিল, পুডিং ও খাবার খাইয়া মার কাছেই সাজগোজ করিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইল। সুষমা বলিয়া দিল, —একলা যেয়োনা যেন আজ বাবা, আর সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরো। না হলে জানো ত, উনি আবার রাগ করবেন!

—সে ভয় নেই মা। নন্দকে নিয়ে আমি বেড়াতে যাব। বলিয়া তীব্র আগ্রহে নিখিল অনুগত নন্দ-ভৃত্যকে লইয়া বাড়ীর বাহির হইল।

নন্দ বলিল,—কোন্ দিকে যাবে, দাদাবাবু?

—চল্ না, এক জায়গায় আমি নিয়ে যাই। বেড়ে জায়গা, দেখবি। কখনো দেখি নে।

আকাশে তখন মেঘ ছিল না—নন্দ সঙ্গে গল্প করিতে করিতে সে অগ্রসর হইল। হাটতলা পার হইয়া শিবের মন্দির ঘেঁষিয়া রায়েদের প্রকাণ্ড পানা-পড়া পুকুরটার পাড় ঘুরিয়া, অশথতলা দিয়া ক্রমে দুইজনে নদী-তীরের খোয়া-বাহির-করা পথে আসিয়া পড়িল। অদূরে 'গঙ্গা'যাত্রীর ঘাট, পাশেই শ্মশান। নন্দ বলিল—এই ঘাটে রাত্তির বেলায় আসতে পারো দাদাবাবু, তবেই বলি তুমি বীর!

নিখিল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কেনরে?

—বাবা, জানো না ত দাদাবাবু, এই ঘাটে মড়া পোড়ায়। রাত্রে এখানে ভূত-পেত্নীর মেলা বসে। ওঃ, সে সময় এধার দিয়ে চলে কার সাধ্যি!

কথাটা শুনিয়া নিখিল মজা পাইল। সে বলিল,—দূর, ভূত-পেত্নী বুঝি আবার আছে! সে শুধু বইয়ের গল্প, সব মিথ্যে।

নন্দ বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলিল,—তবেই তুমি ভারী জানো দাদাবাবু! একদিন শুনবে তবে, কর্ত্তাবাবু এধারে ঐ যে মহিষ ভশ্‌চাজি আসে, তার বাড়ী এইদিক দিয়ে যেতে হয়—তা তাকে রাত্রে লণ্ঠন ধরে এগিয়ে দিতে এসেছিলুম কিনা—তখন ত দু'জনে ছিলুম, কিছু হলো না। তার পর একলা যখন ফিরছিলুম, আমার অত মনে ছিল না,-গান গাইতে গাইতে আসছি, যেমনি এই ঘাটের সাম্‌নে এসেছি অমনি ভেতর থেকে এমনি-একটা আলো জ্বলে উঠল আর সঙ্গে-সঙ্গে ফটাফট্ ফটাফট্ কা ফাটার শব্দ! বাবারে কি লড়াই—আমি

ত চোঁচা দৌড় দিলুম। তারপর খানিক দূর এসেচি, আর পিছনে গোঁ-গোঁ আওয়াজ! আমি চালাক ছেলে, আর কি পেছন ফিরি? দৌড়, দৌড় দৌড়! একেবারে সেই হাটতলায় পৌঁছে তবে দাঁড়াই! তা তুমি দাদাবাবু এদিক্‌বাগে এলে বেড়াতে—! জানো না ত ব্যাপার!

নিখিল হাসিতে হাসিতে বলিল—তোর মিছে কথা নন্দ। আচ্ছা, আজ ত এদিকে এসেচি, সন্ধ্যার সময় তুই যদি ভূত দেখাতে পারিস, তাহলে তুই যা চাবি, তাই দেব।

নন্দ ভীতস্বরে বলিল,—না দাদাবাবু, আমি কিছু চাই না তোমার কাছে। ও দেখাতেও পারব না। বাবারে, শেষে মরি আর কি ভূতের হাতে! সেদিন যে পালান্ পালিয়েছিলুম!

এমনি গল্প করিতে করিতে নিখিল বনমালীর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। ভিতরের উঠান হইতে ছেলেমেয়েদের খেলার কলরব ভাসিয়া আসিতেছিল। নিখিলের মন অমনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, একবার বনমালীকে ডাকি! সোনা কি খেলা খেলিতেছে দেখিয়া যাইতে দোষ কি! কাল রাত্রে অত যত্ন অত আদর করিয়াছে। আহা! নিখিল দাঁড়াইয়া বনমালীর কুটীরের পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। নন্দ বলিল,—দাঁড়ালে কেন দাদাবাবু? চল।

নিখিল বলিল,—কাল রাত্রে এদের বাড়ীতে ছিলুম রে আমি। সেই যে যখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল—

নন্দর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এইখানে, সেই-ঝড় বৃষ্টির রাত্রে—আর অদূরে ঐ ঘাট, আর শ্মশান! কাল রাত্রে সে যখন বোসপাড়ার দিকে দাদাবাবুর খোঁজে বাহির হইয়াছিল, ঝড়ের গর্জ্জনে কি ভয়ই যে সে তখন পাইয়াছিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে নন্দ নিখিলের পানে চাহিল।

নিখিলের প্রাণ ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল,—একবার ওদের ডেকে দেখব নন্দ? কাল আমায় অত যত্ন করেছিল—একবার শুধু বলে আস্‌ব,—যে অত জলে ভিজে কোন অসুখ করেনি আমার। তারা জান্‌তে চেয়েছিল—এইটুকু বলিয়া কি চঞ্চল আগ্রহে সে এক মুহূর্ত্তও নন্দর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া একেবারে গিয়া বনমালীর কুটীরের দ্বারে ঘা দিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল,—কে? এ সোনার গলা, নিশ্চয়!

একটা অসহ্য আনন্দে নিখিলের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল, মুখ-চোখ হাসির ছটায় উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই দ্বার খুলিয়া সোনা চীৎকার করিয়া উঠিল,—ও-মা, দেখ, দেখ, কালকের সেই রাজপুত্তুর এসেছেন।

সোনার মা আসিয়া আদর করিয়া নিখিলকে ভিতরে লইয়া গেল। উঠানে পাড়ার একপাল ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া কাণা মাছি খেলিতেছিল, তাহারা নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই ইংরাজী পোষাক-পরা ফুটফুটে ধনী-সন্তানকে দেখিতে লাগিল। নিখিল বলিল,—সোনা, তোমার বাবা কোথায়?

সোনা খুব সপ্রতিভভাবেই জবাব দিল, বলিল,—বাবা গঞ্জে গেছে। এখনি ফিরবে।

কথাটা বলিয়া সগর্ব্বে সে ক্রীড়া-সঙ্গীদের পানে চাহিল, অর্থটা,—দেখ, রাজপুত্রের সঙ্গে আমার ভাবের মাত্রাটা তোমরা দেখ একবার!

সোনার মা একটা বেতের মোড়া আনিয়া উঠানের মধ্যে পাতিয়া দিলে নিখিল তাহাতে বসিল। নন্দ দাওয়ার উপর চোরের মত বসিল, দৃষ্টি রহিল, মাথার উপর আকাশে বহু ঊর্দ্ধে যে একটা চিল উড়িতেছিল, তাহার পানে। সোনা বলিল,—আজ যদি আবার বৃষ্টি আসে, তাহলে বেশ হয়, —না? তাহলে বেশ কালকের মত অনেক রাত্তির অবধি থাকো। বলিয়া সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

কথাটা শুনিয়া নিখিল মুহূর্ত্তের জন্য চমকিয়া উঠিল, একবার আকাশের দিকেও চাহিল—আকাশ আজ পরিষ্কার, কোথাও মেঘ নাই। আঃ! সে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিল।

তারপর সোনার সঙ্গে কত কথাই যে হইল—। কোনটা বইয়ে পড়া, কোনটা বা মার কাছে শোনা এমনি নানা গল্প বলিয়া নিখিল তাহার এই ক্ষুদ্র ভক্তটির চিত্ত-জয়ে প্রবৃত্ত হইল। সোনা স্থির হইয়াগল্প শুনিতে লাগিল, আর তাহার খেলুড়ির দল প্রথম-বিস্ময়ের মাত্রা কাটিলে দূরে বসিয়া পড়িল এবং রুদ্ধ নিশ্বাসে সে-সব গল্প শুনিতে লাগিল।

সোনা বলিল—মার কাছে সেই বুড়ো দত্যির গল্পটা শুনবে? বেশ গল্প। বল না মা, রাজপুত্তর সে গল্পটা শুনবে,—বলো—

সোনার মা ছোট একখানি পরিষ্কার ডালায় নারিকেলের কুচি ও সদ্য-ভাজা গরম মুড়ি আনিয়া নিখিলকে বলিল,—দুটি খাও, বাবা, খাও—নাহলে আমাদের মনে দুঃখ হবে। কাল ঐ রাতে তোমায় পাঠিয়ে অবধি মন এমনি হয়েছিল—যে বাছার আমার অসুখ না করে! সুখী প্রাণ, যে জল-ঝড় মাথার উপর দিয়ে গেছে! সোনার বাপ্ বলছিল, আজ রাত্রে গিয়ে খপর আনবে—সারাদিন ত আর একতিল ফুরসুত্ পায় না।—আর সোনা যে কত কথাই বলছিল—কেবলি বলছিল,—আমি রাজপুত্তুরের বাড়ী যাব, যাবই মা—কি আব্দারই যে ধরেছিল। সোনার মা নন্দকেও মুড়ি দিল—নারিকেল দিল; তারপর নিখিলকে বলিল,—গল্প শুনবে? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি গাইটেকে খড় দিয়ে এসে গল্প বল্‌চি।

সোনার মা কাজ-কর্ম্ম সারিয়া গল্প বলিতে বসিল। ও-দিকে সূর্য্যের আলো ম্লান হইয়া আসিয়া ক্রমে নিভিয়া গেল—বনমালীর উঠানও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। গল্প শুনিতে-শুনিতে নিখিল বা নন্দ কাহারো সেদিকে খেয়াল ছিল না। গল্প যখন থামিল, আকাশে তখন অনেক-গুলা তারা ফুটিয়াছে। দেখিয়া নিখিলের আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। এ কি—এ যে রাত্রি হইয়া গিয়াছে! সর্ব্বনাশ—আজ কি আর বাবার কাছে রক্ষা থাকিবে!

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, বলিল—রাত হয়ে গেছে, আমরা যাই।

সোনার মা বলিল,—একটা আলো দি বাবা,—যে অন্ধকার পথ!

নিখিল খুব ব্যস্ত হইয়া বলিল,—

না, না, আলোর দরকার নেই। আমি নন্দর সঙ্গে যাব। বলিয়া সে আর বিদায়ের কালে কোন কথা না পাড়িয়া একেবারে ছুটিয়া দ্বারের বাহিরে পথে গিয়া দাঁড়াইল—নন্দকে চুপি-চুপি বলিল—নন্দ, ছুট্‌তে পারবি? ছুটে যাই, চ, নাহলে বেশী রাত হলে বাবার কাছে বকুনি খাব।

নন্দরও ভয় হইতেছিল। সে বলিল—ছুট্‌তে পারব দাদাবাবু। দেখ দেখি, তুমি যদি গল্প শুনতে না বসতে!

—তুই ত আমায় বলিস্‌নে নন্দ, যে রাত হয়ে গেছে!

—বাঃ, আমিও যে গল্প শুনছিলুম—আমি কি খেয়াল করেচি যে রাত হয়েছে!

কথা কাটাকাটি করিয়া ফল নাই বুঝিয়া নিখিল বলিল,—আয়, ছুটে আয়। ছুটে গেলে কতক্ষণই বা লাগবে?

দুইজনে তখন ছুটিতে লাগিল। কিন্তু কত পথ ছুটিবে? খানিক ছুটিয়া নিখিল হাঁফাইয়া পড়ে, অমনি আবার ধীরে ধীরে চলে—আবার যেই দেখে, অন্ধকার খুব গাঢ় ঘন হইয়া আসিয়াছে, ঐ যে গাছপালায় ঝোপে-ঝাপে ঝিঁঝিঁর রব রাত্রিটাকে আরো ভারী করিয়া তুলিয়াছে, তখন সে আবার ছুট দেয়। এমনিভাবে কখনো ছুটিয়া কখনো ধীরে চলিয়া আবার কখনো বা থামিয়া দম্ লইয়া নন্দর সঙ্গে নিখিল যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেশ রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

চোরের মত পা টিপিয়া সে ধীরে ধীরে পড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। সর্ব্বনাশ,—অভয়াশঙ্কর সেখানে বসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। সে ঘরে ঢুকিতেই অভয়াশঙ্কর গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন,—নিখিল।

—বাবা—বলিয়া নিখিল পিতার পানে চাহিল।

অভয়াশঙ্কর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—তুমি ঘড়ি দেখতে শিখেচো, না? ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, শিখিয়াছে।

দেওয়ালে ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কটা বেজেছে বল তো!

সর্ব্বনাশ! নিখিল ঘড়ির দিকে চাহিয়া চোখ নামাইল, কোন কথা বলিল না। অভয়াশঙ্কর গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—বল।

নিখিল ভয়-কম্পিত স্বরে বলিল,—ন'টা বাজতে বারো মিনিট—

—হুঁ। এখন পড়। রাত্রে দু'ঘণ্টা তোমার পড়বার কথা। এগারোটা বাজতে বারো মিনিট হবে যখন, তখন পড়া বন্ধ করে ভিতরে খেতে যাবে, তার আগে খাওয়া বা ঘুম কিছুই হবে না—বুঝলে! এ কথা মনে থাকবে?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, থাকিবে।

—বেশ। বলিয়া অভয়াশঙ্কর কক্ষ ত্যাগ করিলেন। নিখিল টেবিলের ধারে চেয়ারে গিয়া বসিয়া বই খুলিল।

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—ভূগোলখানা খোলো। আজ এশিয়াটা সব দেখে রাখো, কাল সকালে উনি ঐ পড়াটা নেবেন, বলে গেছেন।

নিখিল ধীরে ধীরে ভূগোল খুলিয়া বসিল। এতখানি পরিশ্রমের পর ক্ষুধায় কাতর দেহ, —চোখে ঘুমের ঘোর জড়াইয়া আসিতেছে,

তবুও সে চোখের কোণে জলও জমিয়া উঠিতেছিল,—সে জল শেষে এমনি ঠেলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল যে বইয়ের পৃষ্ঠা হইতে বড় বড় মোটা অক্ষরে লেখা এশিয়া কথাটা একেবারে অস্পষ্ট, লুপ্ত হইয়া গেল। কাণের কাছে ঘড়ির পেণ্ডুলামটা দুলিয়া-দুলিয়া এমনি শব্দ করিতে লাগিল যে নিখিলের মনে হইতে লাগিল, ঘড়িটা যেন রাজপুত্তুর-রাজপুত্তুর —এই কথাটাই বার বার বিদ্রূপচ্ছলে উচ্চারণ করিয়া তাহাকে শুনাইতেছে। রাজপুত্র! হাঁ, সে রাজপুত্রই বটে—বন্দী রাজপুত্র!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

রস-সাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের বাঙ্গালা সমস্যা-পূরণ। কবিভূষণ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট-সাগর বি-এ সংগৃহীত ও সম্পাদিত। প্রকাশক, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ভিক্টোরিয়া প্রেস ও গিরীশ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। সেকালে রাজসভায় কবির কিরূপ সমাদর ছিল, তাহা যাঁহারা ইতিহাসের সহিত একটুও সম্পর্ক রাখেন, তাঁহারা সকলেই জানেন। রস-কবি কৃষ্ণকান্ত কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্র তাঁহার স্বভাব-কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তিতে কৃষ্ণকান্তকে সভা-পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তিনি মুখে-মুখে পয়ার ত্রিপদী ও চতুষ্পদী ছন্দে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। কেহ কোন সমস্যা দিলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্র তাঁহাকে রস-সাগর উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি যেমন সুরসিক ও সুচতুর ছিলেন, তেমনি আমোদ-প্রিয় ও সুবক্তাও ছিলেন। দ্রুত রচনা সম্বন্ধেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সমস্যা-পূরণের কবিতাগুলি কবিত্বে মণ্ডিত। এই গ্রন্থে রস-সাগরের প্রায় তিনশতাধিক সমস্যা পূরণের কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। সম্পাদকের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম অসাধারণ—সন্দেহ নাই, এবং তিনি ভূমিকায় রস-সাগরের জীবনী ও কবিত্বের যে আলোচনা করিয়াছেন, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার মূল্য বড় অল্প নয়। রাজার সভায় নানান্ ধরণের লোক উপস্থিত থাকিতেন; কেহ একটা ছত্র করমাস করিলে রস-সাগর ছন্দোবদ্ধে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। দুই-একটী উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। একদিন শ্রীশচন্দ্র সভায় বসিয়া সমস্যা বলিলেন—'বধূর অধর নয় এত সুমধুর'—রস-সাগর অমনি কবিতা রচনা করিলেন,—

জামায়ের যে আদর শ্বশুর বাড়ীতে
আঙুরের সে আদর কাঠের কৌটাতে।
কৌটার ভিতরে তারে গদীর উপরে
থরে থরে শোয়াইয়া রাখে সমাদরে।
কি কব তাহার রূপ—বলা নাহি যায়,
কালিদাস হার মানে বলিতে তাহায়।
কোথা লাগে মুক্তা মালা আঙুরের কাছে,
ইচ্ছা করে গলে ধরি গাল যায় পাছে!
তুল্‌তুলে দেহখানি কিবা সুকোমল
টল্‌টল্ ঢল্‌ঢল্ করে অবিরল।
তাহার গুণের কথা কি কহিব আর—
গণ্ডা গণ্ডা মোণ্ডা খাও—তার কাছে ছার!
দাম শুনে গরীবের কালঘাম ছোটে
হাম্ হাম্ পুরে দেয় ভাগ্যবান পেটে!
ধন্য হে কাবুল, ধন্য তোমার আঙুর—
'বধূর অধর নয় এত সুমধুর'!

মহারাজ গিরীশচন্দ্র একদিন সভায় এক মূর্খ ব্রাহ্মণকে



দাসখৎ

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

(ক্যালক্যাটা রিভিউ-পত্রের সৌজন্যে)

ভারতী

৪৫শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২৮ [দশম সংখ্যা

আবেস্তা সাহিত্য

আধুনিক যুগের যাবতীয় বিষয়ের আলোচনার কেন্দ্রভূমি হইয়াছে ইউরোপ। আর আমাদের দেশে আলোচনার অভাবে দর্শন-বিজ্ঞান ইতিহাসাদি কেবল লোপ পাইয়াই আসিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এককালে জ্ঞান-গরিমা ও সভ্যতার আলোকে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন বলিয়া চিন্তা করিতে যে-আনন্দে আমাদের বুক নাচিয়া উঠে, সে কেবল আমাদের বহুকাল-বিস্মৃত প্রাচীন সভ্যতার সহিত আধুনিক যুগের অভিনব পরিচয় বশতঃ স্বাভাবিক আত্মতৃপ্তি বা আত্মশ্লাঘার নিদর্শন। যে বেদ লইয়া আমরা প্রাচীনতার অভিমানে উন্মত্ত, সে বেদ আমাদের ছিল কোথায়? বিস্মৃতির করাল কবল হইতে আমাদের বেদকে রক্ষা করিয়াছেন ইউরোপীয় প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ মনস্বিগণ। আমরা যাহা ভুলিয়াছি তাঁহারা তাহা আবিষ্কার করিতেছেন। আমাদের প্রাচীন কালে যে সভ্যতা ছিল, আধুনিক যুগে তাহা লুপ্ত। পশ্চিমে প্রাচীনকালে কিছু না থাকিলেও আধুনিক যুগে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার একত্র সঞ্চিত। সুতরাং প্রাচীন সভ্যতার অন্ধকারে বিচরণ করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের পন্থা অবলম্বনীয়। অতএব যে কোন বিষয়ের জ্ঞানালোচনা আমরা করিতে যাইব, সেই বিষয়েই পাশ্চাত্য দেশের আলোচনা, গবেষণা বা অনুসন্ধানের ইতিহাস আমাদের জানা আবশ্যক। তাই ইরাণীয় ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তার আলোচনা করিতে হইলেও ইউরোপে এ বিষয়ে কি আলোচনা হইয়াছে, তাহার ইতিহাস সর্ব্বপ্রথমে আলোচ্য।

আবেস্তা বা জেন্দ্-আবেস্তা অগ্নি-উপাসক পার্সীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বা বেদ। যীশুখ্রীষ্ট

যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই রূপ অতি প্রাচীন কালে ইরাণ বা পারস্য দেশের পূর্ব্বাঞ্চলে (বা তৎসন্নিহিত কোনও অজ্ঞাত দেশে) জরথুষ্ত্র (zoroaster) এই জরথুষ্ত্রীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পার্সীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ এই আবেস্তার সহিত তাঁহাদের ঋষি জরথুষ্ত্রের নাম যে ভাবে সংলিপ্ত, আমাদের বেদের সহিত সেরূপ কোনও একজন ঋষির নাম সম্পৃক্ত নহে। আমাদের বেদ যেমন অপৌরুষেয়, পার্সীদিগের আবেস্তাও তেমনি অপৌরুষেয়। কিন্তু আমাদের বেদমন্ত্র-সমূহের সহিত যেমন অসংখ্য ঋষির সম্পর্ক, আবেস্তার সেরূপ নহে। আবেস্তার একজন ঋষি জরথুষ্ত্র। এই জরথুষ্ত্র নামের অর্থ লইয়াও নানা মত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জরথ (√জৃ, আ√জর, জরাপ্রাপ্তি) ও উষ্ত্র (সং উষ্ট্র) লইয়া জরথুষ্ত্র শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'বৃদ্ধ-উষ্ট্র-রক্ষক', বা 'জরথ' (—সং হরিত) শব্দের 'পীত' বা 'হরিত' অর্থ করিয়া 'পীত-উষ্ট্র-রক্ষক।' পার্সী পুরোহিতগণ 'উষ্ত্র' শব্দ উষ্ দীপ্তৌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়া অর্থ করেন,'যাঁহার দীপ্তি হরিত বা সুবর্ণ বর্ণ।' ল্যাসেন (Lassen) ও উইণ্ডিশ্‌মান (Windischmann) 'স্বর্ণ-বর্ণ-তারকা' (golden star) বলিয়া জরথুষ্ত্র শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন।

আবেস্তা বেদের তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ এবং অতি প্রাচীনকালে সাইরস্ (Cyrus), দরিয়স্ (Darius), জরাক্সিস্ (Xerxes) প্রভৃতি আকিমিনীয় নরপতিগণ (Achaemenian kings) এই জর-থুষ্ট্রীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন ; কিন্তু খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ম্যাসিডোনিয়াধিপতি সিকন্দরের(Alexander) রণ-পিপাসায় সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল আবেস্তা গ্রন্থ, এবং জরথুষ্ত্রীয় ধর্ম্মাবলম্বী পার্সীগণ। বলদর্পী সিকন্দর অগ্নি-উপাসক পার্সীগণের ধর্ম্মগ্রন্থের অসংখ্য পাণ্ডুলিপির অগ্নিসংস্কার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। রণলীলার অবসানে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলে পর, জরথুষ্ত্রীয়-গণ নানা স্থান হইতে কুড়াইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের পুনঃসংস্কার পূর্ব্বক যেই নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন, অম্‌নি দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে মহম্মদীয় ধর্ম্মা-বলম্বীগণ রণোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া জরথুষ্ত্রীয়-গণের দেশে আসিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' করিয়া বলিল—"কোরাণের ধর্ম্ম গ্রহণ কর,অথবা তোমাদের উপাস্য দেবতা অগ্নিদেবের শীতল স্পর্শে নির্ব্বাণ লাভ কর।" দেশব্যাপী শোণিত-স্রোত ও অগ্নিকাণ্ডের ভয়ে এবং ততোধিক ধর্ম্মনাশের ভয়ে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জন্মভূমির মোহ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ জরথুষ্ত্রীয়গণ ভারতবর্ষের সুরাট ও বোম্বাই অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি তাঁহারা ভারতবর্ষে। বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের সংখ্যা ৩০০০০ হইবে। যাঁহারা মুসলমানদিগের নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অদ্যাপি ইরাণ দেশে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা হইবে আন্দাজ ১০,০০০।

পূর্ব্বে আবেস্তা গ্রন্থের সহিত পহ্লবীভাষায় অনুবাদ বা ব্যাখ্যা থাকিত, এবং মূল ও টীকার একত্র নাম ছিল 'অবিস্তাক্-প-জন্দ',

অর্থাৎ 'আবেস্তা ও তাহার ব্যাখ্যা'। 'অবিস্তাক্' বা 'আবেস্তা' শব্দের অর্থ বোধ হয় আমাদের 'বেদ' শব্দের তুল্য 'জ্ঞান, বিদ্যা, বা বেদ গ্রন্থ।' ফরাসী যুবক আঁকেতিল দু পেরঁ (Anquetil du Perron) এদেশে আসিয়া পারস্য ভাষা শিখিয়া তাহার সাহায্যে পার্সী পুরোহিতদিগের নিকট মূল আবেস্তার জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া এদেশ হইতে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া লইয়া ইউরোপে গিয়া যখন ফরাসীভাষার সাহায্যে সেই জ্ঞানের প্রচার করিয়া চিরস্মরণীয় হন, তখন তাঁহারই একটী প্রমাদও তাঁহার নামের তথা আবেস্তার আলোচনার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহারই ভ্রমবশতঃ ভাষার নাম জেন্দ্ (Zend) এবং গ্রন্থের নাম জেন্দ্-আবেস্তা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থের নাম আবেস্তা ও তাহার পহ্লবী টীকার নাম জেন্দ্। টীকা না থাকিলে 'সাদা' শব্দ বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন 'ভেন্দিদাদ্ সাদা'।

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইরাণের প্রাচীন অধিবাসিগণের আচার-ব্যবহার, সভ্যতা ও ধর্ম্ম বিষয়ে ইউরোপীয়গণের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। গ্রীক ও লাটিন ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে এবং খ্রীষ্টীয়গণের বাইবেল গ্রন্থে আবেস্তা ও আবেস্তা-ধর্ম্মিগণের স্থানে স্থানে উল্লেখমাত্র আছে। হেরোডোটস্ (৪৫০ পূঃ খ্রীঃ) তাঁহার ইতিহাস-গ্রন্থে পারস্য-বাসিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন। প্লুটার্ক (Plutarch), প্লিনি (Pliny) ও অগথিয়সের (Agathias) সময় (৫০০ খ্রীঃ অব্দ) পর্য্যন্ত ইরাণীয়গণের বিষয়ে এই প্রকার সামান্য সামান্য উল্লেখমাত্র হইয়াছে।

মুসলমানগণ-কর্ত্তৃক পারস্য-বিজয়ের পর মস্‌উদী নামক একজন আরবী ভাষার লেখক ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জেরদুস্তের আবেস্তা, জেন্দ্ নামক তাহার টীকা ও তৎসহ একটী পাজেন্দ্ টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। আন্দাজ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে আল্‌বিরুণী অবাস্তার উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে শাহরাস্তানী নামক জনৈক মুসলমান লেখক 'মগী' বা জরথুষ্ত্রীয়গণের ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ৯৬৩ খৃষ্টাব্দে বার্-বাহ্‌ল্‌ল-সংগৃহীত সীরীয়-আরবী অভিধানে 'জর্দুস্তের' 'আবস্তাক' গ্রন্থের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থ সাত ভাষায় লিখিত। সেই সাত ভাষা—সীরীয় (Syriac), পার্সী, অরমীয়, সেগেস্তানীয়, মার্ভীয়, গ্রীক ও হিব্রু। তৎপূর্ব্বে ৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত New Testament এর একখানি সীরীয় ভাষায় লিখিত টীকায় মোসুলের নিকটবর্ত্তী হদথ নামক স্থানের বিশপ ঈশোদাদ লিখিয়াছেন যে, জর্-দুশ্‌ত্ দ্বাদশ ভাষায় 'আভাস্তা' গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আবেস্তা বিষয়ে এই সকল উল্লেখ কেবল বিদেশীয়গণই করিয়াছেন ; ইরাণ দেশের কোনও বিবরণ এ পর্য্যন্ত (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত) ইউরোপীয়গণের অধিগত হয় নাই।

ইহার পর খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জরথুষ্ত্রীয়গণের ধর্ম্মগ্রন্থ বিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পারী (Paris) নগরে বার্ণাবি ব্রিসঁ (Barnabe Brisson) এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া De Persarum Principatu নামে

একখানি গ্রন্থ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। তাহার পরে ইটালী, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশের যে-সকল প্রাচ্য পর্য্যটক ইরাণীয়গণের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার লইয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পিয়েত্রো ডিলা ভেলি (Pietro della Valle, 1620), হেনরী লর্ড (Henry Lord, 1630), মাণ্ডেল্‌সো (Mandelso, 1658), ট্যাভার্ণিয়র (Tavernier, 1678), চার্ডিন (Chardin, 1721) ও ডু চিনন্ (Du Chinon) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অক্সফোর্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত টমাস্ হাইডের (Thomas Hyde, 1700) পরিশ্রম এ ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। তাঁহার গ্রন্থ লাটিন ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং তাহার নাম Historia Religionis veterum Persarum. ইনিও মূল আবেস্তা পাঠ করেন নাই। কেবলমাত্র পার্সীদিগের কৃত অনুবাদাদি দেখিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেন। মূল আবেস্তা একালে যে ইংলণ্ড দেশে ছিল না, তাহা নহে। Canterbury সহরে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'যশ্ন' গ্রন্থের একখানি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত ছিল। হাইড্ আবেস্তা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য প্রায়ই সকলকে অনুরোধ করিতেন। জর্জ বৌচর্ (George Boucher) নামক একজন ইংরাজ সুরাটে পার্সীদিগের নিকট একখানি 'ভেন্দিদাদ সাদা' সংগ্রহ করিয়া ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের বোডলিয়ন লাইব্রেরীতে (Bodleian Library) দুষ্প্রাপ্য বস্তু বলিয়া রাখিয়া দেন।

এ পর্য্যন্ত কেহই মূল আবেস্তা পড়িতে পারেন নাই। আঁকেতিল দু পের্রঁ নামক একজন উদ্যোগী ফরাসী যুবক বিচিত্র উপায়ে ভারতবর্ষে আসিয়া মূল আবেস্তা পাঠ করিতে শিক্ষা করেন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড হইতে একখানি আবেস্তার পাণ্ডুলিপির অঙ্কিত প্রতিলিপি পারীনগরে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়। তাহা দেখিয়া দুপের্রঁর মনে এক অদ্ভুত বাসনা জাগরিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, পারস্য কিম্বা ভারতবর্ষে যাইয়া পার্সী-পুরোহিতগণের নিকট এই বিদ্যা শিখিবেন। কিন্তু কি উপায়ে ? সুদূর ভারতবর্ষে যাইবার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া তিনি ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় সেনা-বিভাগে একজন সৈনিকরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ভারত যাত্রা করেন। তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য ও অদম্য উৎসাহের পরিচয় পাইয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সৈনিকের কার্য্য হইতে মুক্তি দান করেন ও ভারতবর্ষে যাতায়তের ব্যয়ভার বহন করেন। বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উদ্যোগী পণ্ডিত দুপের্রঁ সুরাটবন্দরে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু পার্সী পুরোহিতগণ তাঁহাকে আবেস্তা পড়াইতে রাজি হইলেন না। তিনি তাহাতে ভগ্নোদ্যম হইলেন না। পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি পার্সী পুরোহিতগণের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাদের সমাজে বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে পুরোহিতগণের চিত্তপ্রসাদন হইলে তিনি তাঁহাদের নিকট প্রথমে আবেস্তার ভাষা ও তৎপরে ধীরে ধীরে তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আচার-ব্যবহারের জ্ঞান লাভ করেন। সাত বৎসর এইভাবে কাটাইয়া তিনি মূল আবেস্তার পাণ্ডুলিপি লিখিয়া লইয়া ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা

করিলেন। পথে অক্সফোর্ড বোড্‌লিয়ন লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপির সহিত স্ব-কৃত পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া লইয়া বুঝিলেন যে, পার্সী পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক তিনি প্রতারিত হন নাই। তাহার পরে ঐ সকল পাণ্ডুলিপি লইয়া তাহার অনুবাদাদি কার্য্যে দশ বৎসর কাটাইয়া ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার এই অমূল্য পরিশ্রমের ফল, মূল জেন্দ্-আবেস্তার অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থ তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ, এবং তাহার নাম "Ouvrage de Zoroastre," 3 vols. Paris, 1771.

দুপের্রঁর এই সপ্তদশবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফল দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী সন্তুষ্ট হন নাই। ক্যাণ্ট (Kant) প্রভৃতি দার্শনিকগণ ইহাতে আশানুরূপ দার্শনিক তথ্য বা ধর্ম্ম তত্ত্ব-বৈচিত্র্য দেখিতে পাইলেন না। যাঁহারা ভাষা বা সাহিত্যের অপূর্ব্বত্বের জন্য উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের কৌতূহল-তৃপ্তির কোনও উপকরণ পাইলেন না। এইপ্রকারে দুপের্রঁর অনুবাদের সমাদর না হইয়া অবজ্ঞাই হইতে লাগিল। এইরূপ সময়ে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই হইল। সংস্কৃত নাটক যেমন গ্রীসের নাটকের অনুকরণে কল্পিত, প্রতারণা মূলক, অপ্রাকৃত সৃষ্টি বলিয়া মতবাদ উঠিয়াছিল, এবারেও তাহাই ঘটিল। দুপের্রঁর জেন্দ্-আবেস্তা জাল বলিয়া একদল পণ্ডিত প্রচার করিতে লাগিলেন। এই দলের অগ্রণী ছিলেন স্বনাম-ধন্য প্রাচ্য পণ্ডিত স্যর উইলিয়ম জোন্স্ (Sir William Jones)। তিনি ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে একখানি পত্র লিখিয়া প্রচার করিলেন যে, আঁকেতিল দুপের্রঁ প্রতারিত হইয়াছেন, তিনি জরথুষ্ত্র প্রণীত মূল ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পার্সী পুরোহিতগণ তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া মূলগ্রন্থের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অমূলক, অপদার্থ দিয়াই বিদায় করিয়াছে। ইংলণ্ডে রিচার্ড্‌সন (Richardson) ও স্যর জন চার্ডিন (Sir John Chardin) এবং জর্ম্মণীতে মৈনার্স (Meiners) স্যর উইলিয়ম জোন্সের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ফরাসীদেশে দুপের্রঁর প্রতিবাদ না করিয়া সকলেই তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থকে মূলগ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ক্লেকের (Kleuker) নামক একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত দুপের্রঁর পক্ষ-সমর্থন আরম্ভ করিলেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দুপের্রঁর গ্রন্থের জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদ করিয়া জর্ম্মণীতে প্রচার করিলেন এবং গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য হইতে আবেস্তা বিষয়ক মন্তব্য ও উল্লেখ-সমূহের আলোচনা করিয়া স্বদেশের ধর্ম্মতাত্ত্বিক (Theologians) ও দার্শনিকগণকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, দুপের্রঁর আবিষ্কৃত গ্রন্থই 'মাগী' বা 'জরথুষ্ত্রীয়গণের' ধর্ম্ম-গ্রন্থ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই সংগ্রাম চলিল। তবে ক্রমে ক্রমে স্যর উইলিয়ম জোন্সের মতের উগ্রতা কমিয়া আসিতে লাগিল।

পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পরে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইউরোপীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণ মূল আবেস্তা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও আবেস্তার ভাষার নৈকট্য ইতিপূর্ব্বেই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইয়াছিল ; কিন্তু ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে দেনমার্কের ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত রাস্ক (Rask) একখানি

ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আবেস্তার কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেন এবং প্রতিপন্ন করেন যে, ইহার ভাষা অতি প্রাচীন এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার অত্যন্ত নিকট-সম্বন্ধ হইলেও ভাষা দুইটী এক ভাষা নহে, পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। ইনি ইতিপূর্ব্বে পারস্যে ও ভারতবর্ষে পর্য্যটন করিয়া আবেস্তা গ্রন্থের ও তাহার পহ্লবী টীকার অসংখ্য মূল্যবান্ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া কোপেনহেগেন লাইব্রেরীতে প্রদান করেন। তিনি আবেস্তার বর্ণমালার বিষয়েও আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রায় এই সময়েই ফরাসীদেশীয় সংস্কৃত পণ্ডিত ইউজিনি বর্ণুফ (Eugene Burnouf) আবেস্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সংস্কৃত ও আবেস্তীয় ভাষার নৈকট্য অবগত হইয়া এবং বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে আবেস্তার মূল পাঠের পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার সাহায্যে তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই দেখিতে পাইলেন যে, আঁকেতিলের অনুবাদে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক বহু আসামঞ্জস্য সংঘটিত হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন যে, আঁকেতিল বহুস্থানে পার্সী পুরোহিতগণের উপদেশ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার অনুবাদের বহুস্থানে ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি এই ফরাসী অনুবাদমাত্রে নির্ভর না করিয়া খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে নারিয়ো সঙ্গ নামক একজন ভারতবাসী পার্সী কর্ত্তৃক লিখিত আবেস্তা গ্রন্থের অংশবিশেষের সংস্কৃত অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এ অনুবাদও মূলের অনুবাদ নহে, পহ্লবী টীকা হইতে সঙ্কলিত সংস্কৃত অনুবাদ। যাহাই হউক এই সংস্কৃত অনুবাদের সাহায্যে এবং তাঁহার ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক বিদ্যার সাহায্যে আঁকেতিল-কৃত বহু ভ্রম-প্রমাদের তিনি সংশোধন করেন।

বর্ণুফের আলোচনার ফলে আবেস্তা-চর্চ্চার প্রণালীতে এক অভিনব আলোকরশ্মি পতিত হইল। সেই অবধি আর কেহ পার্সী পুরোহিতগণের প্রবাদ ও কিম্বদন্তীমাত্রে নির্ভর করিয়া আবেস্তা-চর্চ্চা করেন না। যেখানে সন্দেহ উপস্থিত হয় সেইখানেই সংস্কৃতের সাহায্যে অর্থ নির্ণয় করা হয়। পার্সী পুরোহিতগণের নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও সংস্কৃত ভাষার সাক্ষ্য যদি অবিসম্বাদিভাবে মিলিয়া যায়, তবে আর অর্থ-নির্ণয়ে ভ্রমপ্রমাদ থাকে না। ফলে সংস্কৃত চর্চ্চারও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বৈদিক ভাষার অর্থগ্রহ আজকাল দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এই প্রাচীন আবেস্তা-সাহিত্য ও আবেস্তা-ভাষার সাহায্যে বেদের ভাষা ও সাহিত্যের বহু রহস্যের তুলনামূলক সমাধান হইতেছে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রোটফেণ্ড (Grotefend), বর্ণুফ, লাসেন, স্যর্ হেনরী রলিন্সন (Sir Henry Rawlinson) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পারস্যদেশে ক্ষোদিত লিপির আবিষ্কার হইয়াছে। এই সকল লিপির ভাষা এবং বিষয় আবেস্তার ভাষা ও বিষয়ের অনুরূপ। সুতরাং আবেস্তা-গ্রন্থকে আর কেহ জাল বা প্রবঞ্চনাসৃষ্ট সাহিত্য বলিতে সাহস করেন না।

বর্ণুফ যে আবেস্তা বিদ্যাসৌধের ভিত্তি-প্রস্তরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বপ (Boph) হাউগ (Haug), উইণ্ডিশ্মান (Windischmann), ওয়েষ্টার্গার্ড (Westergaard), রোথ (Roth), ও স্পীগেল (Spiegel) প্রভৃতি স্বনামধন্য ধুরন্ধর পণ্ডিতবর্গ সেই সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান যুগে বার্থোলোমাই (Bartholomae), দর্মেস্তেতর (Darmesteter), ডি হার্লেজ (de Harlez), হেবশ্মান্ (Hiibschmann) জুষ্টি (Justi), মিল্স্ (Mills), গেল্ড্নার (Geldner), ও জ্যাক্সন্ (Jackson) প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ ও এদেশীয় বহু পার্সী পণ্ডিত বর্ণুফ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসৌধের নানা প্রকার সংস্কার ও প্রসাধন করিতেছেন। সংস্কৃত ভাষাকে দর্পণ-স্বরূপ রাখিয়া পার্সী কিম্বদন্তী ও পহ্লবী অনুবাদের সাহায্যে ইহাঁরা আবেস্তা-গ্রন্থের একপ্রকার অবিসম্বাদী অর্থ-নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন; তবে সামান্য সামান্য বিষয়ে ব্যক্তিগত মতভেদ আছে এবং চিরকাল তাহা থাকিবেও।

অতঃপর অতি-সংক্ষেপে আবেস্তা-সাহিত্যের স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। এই বিরাট সাহিত্য ছয় ভাগে বিভক্ত :—

১। যশ্ন।
২। জীষ্পেরেদ।
৩। যশ্ত্।
৪। ক্ষোর্দা আবেস্তা।
৫। বেন্দিদাদ।
৬। নাস্ক সমূহ (হাধোখ্ত নাস্ক, প্রভৃতি)।

প্রথম পাঁচ বিভাগের আবার দুইভাগ। প্রথমভাগে বেন্দিদাদ, জীষ্পেরেদ, ও যশ্ন এবং দ্বিতীয়ভাগে ক্ষোর্দা আবেস্তা ও যশ্ত। বেন্দিদাদ, জীষ্পেরেদ ও যশ্ন লইয়াই প্রকৃত আবেস্তা। যজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে এই তিন গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য এই তিন গ্রন্থের দুইপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ হইয়া থাকে। উপাসনা ও অনুষ্ঠানের ক্রম-অনুসারে এক গ্রন্থের পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায় স্থানচ্যুত হইয়া অন্য গ্রন্থের পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ের সহিত মিশিয়া যায়। কারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান-ক্রমে এক গ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করার পর অন্য গ্রন্থের এক অধ্যায়, এবং তারপর অপর এক গ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করা আবশ্যক হয়। যেমন আমাদের ঋগ্বেদের সূক্ত-পর্য্যায় ও মন্ত্র পর্য্যায় ভাঙ্গিয়া ক্রিয়াকাণ্ডের সুবিধার জন্য যজুর্ব্বেদ হইয়াছে, এও কতকটা সেই প্রকার। বেন্দিদাদ, জীষ্পেরেদ ও যশ্ন গ্রন্থ যখন ক্রিয়াকাণ্ডানুযায়ী প্রয়োজন-অনুসারে একত্র মিশিয়া থাকে, তখন তাহাদের সহিত পহ্লবী টীকা বা অনুবাদ সংশ্লিষ্ট থাকে না, নতুবা প্রত্যেক গ্রন্থের সহিত একখানি করিয়া পহ্লবী টীকা বা অনুবাদ আছে। যখন টীকা সহ মিলিত না থাকে, তখন ইহাদের পৃথকরূপ নামকরণ হয়, যেমন 'বেন্দিদাদ সাদা' বা 'কেবলমাত্র মূল বেন্দিদাদ'। দ্বিতীয়ভাগ বা ক্ষোরদা আবেস্তা (ক্ষুদ্র আবেস্তা, Small Avestas) সমূহের সবগুলির পহ্লবী অনুবাদ বা টীকা নাই। এগুলি সম্পূর্ণ গ্রন্থও নহে।

প্রথম গ্রন্থ যশ্ন। যশ্ন শব্দ ও সংস্কৃত যজ্ঞ শব্দ অভিন্ন। জরথুষ্ত্রীয়গণের যজ্ঞ ও উপাসনার প্রধান গ্রন্থই যশ্ন। ইহারই অন্তর্গত আবেস্তার গাথা-ভাগই প্রাচীনতম এবং প্রাচীনতম ভাষায় লিখিত। সমগ্র যশ্ন ৭২ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা আবার তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম হইতে সপ্তবিংশ (১-২৭) অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ; অষ্টাবিংশ হইতে ত্রিপঞ্চাশত্তম (২৮—৫৩)

অধ্যায় পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ, এবং শেষ দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ। সর্ব্বপ্রধান দেবতা অহুরো মজ্‌দার আহ্বান দ্বারা প্রথম ভাগের আরম্ভ। তৎপরে জরথুষ্ত্র ধর্ম্মের অন্যান্য দেবগণের বন্দনা ও আহ্বান, তৎপরে 'জ ও থ্র' বা জল-শুদ্ধির প্রক্রিয়া, তৎপরে 'ররেস্ন' বা ইন্ধন-শুদ্ধি প্রক্রিয়া, তৎপরে হ ও ম বা সোম-রস প্রস্তুত প্রণালী ও তাহা উৎসর্গ করিবার প্রণালী এবং তৎপরে পিষ্টক ও মাংস উপহার দিবার প্রণালী প্রথম ভাগে আছে। দ্বাদশ যশ্ন পরোক্ষভাবে মাত্র যজ্ঞের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ১৯—২১ যশ্ন নবদীক্ষিতগণের শিক্ষার জন্য প্রশ্নোত্তরমূলক উপদেশ। দ্বিতীয় ভাগে গাথা বা মন্ত্র বা গান। জরথুষ্ত্রের প্রাণস্পর্শী উপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এই অংশে সংগৃহীত আছে। এইখানে জরথুষ্ত্র 'কু' ত্যাগ করিয়া 'সু' গ্রহণ করিবার বা অন্ধকার ত্যাগ পূর্ব্বক আলোক আশ্রয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই গাথা-সমূহ অত্যন্ত প্রাচীন এবং ইহার ভাষা সর্ব্বত্রই ব্যাকরণের শাসন মানে। আবেস্তার অন্যান্য অংশের ভাষা ও গাথা-সমূহের ভাষার বেশ একটু প্রভেদ আছে; প্রকৃত পক্ষে পাঁচটী গাথা এবং সেগুলি পদ্যে লিখিত। প্রত্যেক গাথার প্রথম শব্দ হইতে এই পাঁচটী গাথার ছন্দের নামকরণ হইয়াছে। এই পাঁচটী গাথায় (২৮—৩৪, ৪৩—৪৬, ৪৭—৫০, ৫১, ৫৩) মোট ১৭টী মন্ত্র। ৩৫—৪২, এই সাতটী গাথা নহে, গদ্যে লেখা; ইহাদিগকে যশ্ন হপ্তংঘাইতি বলে। ৫২ সংখ্যক যশ্ন তৃতীয় ভাগ বা 'অপরো যশ্নো'এর অন্তর্গত। এই তৃতীয় অংশে দেবগণের স্তব ও তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি আছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ জীষ্‌পেরেদ। ভাষা ও প্রণালী যশ্নের অনুরূপ। ইহাতে ২৪ অধ্যায় বা 'কর্দ' আছে। এবং সমগ্র জীষ্‌পেরেদ গ্রন্থ সমস্ত যশ্নের সপ্তমাংশ-পরিমাণ হইবে। যাবতীয় দেবগণের স্তব-স্তুতি ও আহ্বান-গীতি আছে। জীষ্পে রতবো—সর্ব্ব দেবগণ।

তৃতীয় গ্রন্থ যশ্‌ত। যেশ্‌তি (সং ইষ্টি) শব্দে 'স্তোত্র দ্বারা পূজা' বুঝায়। এই গ্রন্থে অসংখ্য দেবতা বা দেবদূতগণের (যজত,-পূজার্হ) স্তব-গান আছে। এইগুলি পদ্যে লেখা এবং উৎকৃষ্ট কাব্যরস-সম্পন্ন। পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক বহু কথা এই গ্রন্থে আছে। ফর্দুসীর শাহ্‌নামা কাব্যে এই প্রকার বর্ণনা আছে। যশ্‌ত সমূহের প্রধান—অর্দ্বি সূর-যশ্‌ত, জল-দেবী (৫), তিষ্‌ত্র্য তারকা, (৮) মিত্র বা সত্যদেব (১০), ফ্রজয়ী বা পরলোকগত সাধুগণের আত্মা (১৩), বিজয় বা জেরেথ্রঘ্ন (১৪), এবং রাজ-মহিমা বা ক্ষত্র (১৯)।

চতুর্থ গ্রন্থ প্রকীর্ণ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল কবিতা। ন্যাইষ, গাহ্‌, শিরোজহ্‌, আফ্রিঙ্গন্ প্রভৃতি প্রতিদিন বা নির্দ্দিষ্ট উৎসবের দিনে আবৃত্তি করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তব, কবিতা বা আশীর্ব্বচন।

পঞ্চম গ্রন্থ বেন্দিদাদ। 'দএব' বা দৈত্যগণের বিরুদ্ধবাদী বিধান। (বী-দ-এব-দাত)। পুরোহিতগণের আচার-ব্যবহার ও 'দ-এব' পূজার কুফল বর্ণনামূলক এই বিধি-সমূহ ২২ পরিচ্ছেদ বা ফার্‌গার্দে বিভক্ত। রচনা-রীতি ও রচনার কাল অনুসারে এই ফর্‌গার্দ-সমূহের মধ্যে মহান্ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ইহার অধিকাংশই অর্ব্বাচীন। আমাদের মহাভারতের ন্যায় এই গ্রন্থের রচনা বহু কাল ধরিয়া ও বহু ব্যক্তির দ্বারা হইবে। প্রথম পরিচ্ছেদ সৃষ্টিপ্রকরণ, সাংখ্যের দ্বৈত-বাদ-মূলক সৃষ্টি বর্ণনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যিমের রাজত্ব বা স্বর্ণযুগ (সত্যযুগ); এই পরিচ্ছেদে প্রলয়, ইরাণীয় বন্যাবিশেষ বা সৃষ্টি-ধ্বংসকারী শীতকালের বিবরণ আছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কৃষিকর্ম্ম। চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্মৃতি বা আইন-কানুন। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদে মৃতাশৌচের কথা। ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদে কুকুরের কথা। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত নানাবিধ অশৌচ হইতে শুদ্ধি বা মুক্তির কথা (অশৌচান্ত)। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে জরথুষ্ত্রের ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি। বিংশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত চিকিৎসা-বিষয়ক।

ষষ্ঠ গ্রন্থ বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহ বা ধ্বংসাবশেষ। এই খণ্ডসমূহকে নাশ্‌ক বা গ্রন্থ বা কোষ বলা হয়। ইহাতে হধোখ্‌ত নাশ্‌ক হইতে দু'একটী কাণ্ড, লুপ্ত নাশ্‌ক সমূহের সূচী, নানাবিধ লুপ্ত গ্রন্থের অংশ, এবং জন্দ্‌-পহ্লবী শব্দাদি সূচী আছে। সমস্তই আবেস্তা ভাষায় লিখিত এবং এক-কালীন বিরাট আবেস্তা-সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ। এইগুলি ছাড়া পহ্লবী সাহিত্যেও বহু বিলুপ্ত আবেস্তা গ্রন্থের অনুবাদ আছে সুতরাং আবেস্তা-সাহিত্য হইতে পহ্লবী সাহিত্য বাদ পড়ে না।

বর্ত্তমানে আবেস্তা-সাহিত্য যে আকারে পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। কিন্তু এই সাহিত্য যে এককালে অতি বিরাট ও বিশাল ছিল তাহা এই সাহিত্যের আভ্যন্তর-প্রমাণ ও ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। সাহিত্যের ভাষা ও ভাব দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহাতে বহুকালের বহু কবির সৃষ্টিশক্তির পরিচয় একত্র হইয়াছে। প্লিনী (Pliny) বলিয়াছেন যে, জরথুষ্ত্রের সাহিত্যে বিশ লক্ষ শ্লোক বা কবিতা ছিল। আরব ঐতিহাসিক তবরি (Tabari) বলেন, জরথুষ্ত্রের লেখা ১২০০০ গোচর্ম্মে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পার্সী-গণের কিম্বদন্তী সাধারণত দুইখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে—রিবায়ৎ ও ডিংকার্ড। (Din-kard) ডিংকার্ড গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সমগ্র আবেস্তার দুইখানি কাপি ছিল। একখানি পার্সিপলির রাজকীয় পুঁথিশালায় রক্ষিত ছিল। আলেকজন্দর যখন রাজপ্রাসাদ অগ্নিসাৎ করেন, সেই সময়ে ঐ পাণ্ডুলিপি রাজপ্রাসাদের সহিত ভস্মসাৎ হইয়াছে। আর একখানি পাণ্ডুলিপিও ঐ প্রকারেই গ্রীক-দিগের অত্যাচারে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সকল অত্যাচার ও ধ্বংস-কাণ্ডের পর প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ এই আবেস্তা-সাহিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণ্ডুলিপি ও পার্সী পুরোহিতগণের স্মৃতিমাত্রে সংরক্ষিত ছিল।

খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর ইরাণীয় নৃপতি খুস্রু অনোশির্বনের অনুশাসন-পত্রে জানা যায় যে, নিরোর (Nero) সমসাময়িক নৃপতি বল-খাশের (সম্ভবতঃ Volgoses) সময়ে আবেস্তা-

সাহিত্যের পুনরুদ্ধার চেষ্টা আরম্ভ হয়। আলেক্‌জন্দরের সর্ব্বধ্বংসী দিগ্বিজয়-বিক্রমের করাল করাঘাত হইতে দূরে অতি গুপ্ত-স্থানে লুকাইয়া যে-সকল আবেস্তার পাণ্ডুলিপি আত্মরক্ষা করিতেছিল, ইনি সেই সকল পাণ্ডুলিপি রাজভাণ্ডারে সমর্পণ করিবার আদেশ দেন এবং পুরোহিতদিগের মুখে শুনিয়া বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করাইতে থাকেন। ইনি অর্সাডীবংশীয় (Arsaciadae) নৃপতি ছিলেন। ইঁহাদের পরে ২২৬ খৃষ্টাব্দে সাসানিদীয় রাজগণ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইঁহারা জরথুষ্‌ত্র-ধর্ম্মী ছিলেন এবং জরথুষ্‌ত্রীয় ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ ইঁহাদের সময়েই হইয়াছিল। প্রথম সাসানীয় (Sassanian) নৃপতি আর্ত্তক্ষীর পাপাকান বা অর্দেশীর বাবগান (২২৬—২৪০) এবং তদীয় পুত্র প্রথম শাহ পুহর (২৪০—২৭০ খৃঃ) আবেস্তা-সাহিত্যের পুনরুদ্ধার-কার্য্যে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেন। দ্বিতীয় শাহ পুহরের রাজত্বকালে তদীয় অমাত্য আতুর-পাৎ মারাস্পন্দ কর্ত্তৃক আবেস্তা-সাহিত্যের শেষ সংস্কার কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং নাশ্‌ক্‌ বা ধর্ম্ম গ্রন্থসমূহের ক্রমিক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়।

রিবায়ত ও ডিঙ্কার্ড গ্রন্থে একবিংশতি নাশ্‌ক্‌ গ্রন্থের বা সমগ্র আবেস্তা সাহিত্যেরা বিবরণ আছে। আমাদের গায়ত্রী-মন্ত্রের ন্যায় পার্সীদিগেরও তিনটী অতি পবিত্র কার্দ বা মন্ত্র আছে—(১) যথা 'অহু বৈর্য্যো' বা 'অহুনা বৈর্য্যো' (যশ্ন ২৭।১৩), (২) অষেম্‌ জোহু' (যশ্ন ২৭।১৪), এবং (৩) 'যেঙ্‌হে হাতাম্‌' (যশ্ন ৪৭।৪)। 'অহুনা বৈর্য্যো' মন্ত্রে একবিংশতি শব্দ। সেই একবিংশতি শব্দের এক-একটী লইয়া একবিংশতি নাশ্‌ক্‌ গ্রন্থের প্রথম শব্দ হইয়াছে। এ যেন আমাদের কালিদাসের 'অস্তি কশ্চিদ্‌ বাগ্‌ বিশেষঃ' একবিংশতি নাশ্‌কের প্রতিপাদ্য বিষয় যথাক্রমে :—

১। (২২ অংশ) ধর্ম্ম ও পুণ্য।

২। (২২ অংশ) ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি।

৩। (২১ অংশ) মজ্‌দা-যশ্নীয় ধর্ম্ম এবং তাহার উপদেশ।

৪। (৩২ অংশ) ইহলোক ও পরলোক।

৫। (৩৫ অংশ) গণিতও জ্যোতিষ শাস্ত্র।

৬। (২২ অংশ) যজ্ঞকর্ম্ম ও তাহার ফল।

৭। (আলেক্‌জন্দরের পূর্ব্বে ৫০ অংশ, বর্ত্তমানে ১৩) রাজনীতি ও সমাজনীতি।

৮। (আলেকজন্দরের পূর্ব্বে ৬০ অংশ, বর্ত্তমানে ১২) ব্যবহার।

৯। (আলেকজন্দরের পূর্ব্বে ৬০ অংশ, বর্ত্তমানে ১৫) ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মানবের সহিত তাহার সম্পর্ক।

১০। (আলেকজন্দরের পূর্ব্বে ৬০ অংশ, বর্ত্তমানে ১০) নৃপতি গুষ্‌তাশ্‌পের রাজত্ব এবং জরথুষ্‌ত্রের প্রভাব।

১১। (আলেকজন্দরের পূর্ব্বে ২২ অংশ, বর্ত্তমানে ৬) ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মানবের সহিত তাহার সম্পর্ক।

১২। (২২ অংশ) আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক।

১৩। (৬০ অংশ) পুণ্যকর্ম্ম ও জরথুষ্‌ত্রের বাল্যজীবনের চিত্র।

১৪। (১৭ অংশ) অহুরো মজদা ও তাঁহার অমাত্যবর্গ।

১৫। (৫৪ অংশ) ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি, ওজন ও মাপ।

১৬। (৬৫ অংশ) নবানজ্‌দিষ্‌ত বিবাহ, অর্থাৎ নেদিষ্ঠ জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহ।

১৭। (৬৪ অংশ) ভবিষ্যতে প্রাপ্য দণ্ড বা কর্ম্মফল ; ফলিত জ্যোতিষ।

১৮। (৫২ অংশ) রাজশক্তি-পরিচালনে ধর্ম্মবুদ্ধি, নির্ব্বাণ ও পাপের ধ্বংস।

১৯। (২২ অংশমাত্র আছে) বেন্দিদাদ, শৌচাশৌচবিনিশ্চয়।

২০। (৩০ অংশ) মঙ্গল।

২১। (৩৩ অংশ) অহুরোমজ্‌দা ও তাঁহার অমাত্যবর্গের স্তব।

নৃপতি বলখাশ, সাসানীয় রাজবংশ ও অমাত্য আতুরপাৎ মারাস্পন্দের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আবেস্তা-সাহিত্যের পুনঃসংস্কার-কার্য্যে এবং প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপদ্ধতিতে কালের করাল প্রভাব সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহাও স্বীকার্য্য যে, বিরাট আবেস্তা-সাহিত্যের অংশমাত্র আধুনিক যুগের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে, সমগ্র সাহিত্য নহে। এই আধুনিক যুগে বর্ত্তমান সাহিত্যও যে বহুকালের মজ্‌দা যশ্নীয় মনস্বিগণের রচনায় পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যই যদি নানা যুগের নানা ঋষির রচনায় পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তবে এক ঘোর বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া যে সাহিত্য আজ সভ্যজগতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাতে যে অসংখ্য অজ্ঞাত মনস্বীর প্রভাব ও নানা যুগের নানাবিধ সমাজ-বিপ্লবের চিহ্ন পরিস্ফুট থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! ভাষার সাক্ষ্য হইতে বিচার করিলে এই মজ্‌দা-যশ্নীয় আবেস্তা-সাহিত্যের একটী কালানুযায়ী ক্রম পাওয়া যায়। যশ্ন গ্রন্থের পাঁচটী গাথা অর্থাৎ যশ্ন ২৮—৩৪, ৪৩—৪৬, ৪৭—৫০, ৫১ ও ৫৩, এবং যশ্ন ২৭।১৩ ও ১৪, ও ৫৪ কে অতি প্রাচীন কালের রচনা বলিয়া অনুমান হয়। ইহাই পরেই যশ্ন হপ্তাংঘাইতী (৩৫—৪২) ও যশ্ন ১২, ৫৮ ও ৪।২৬। তৃতীয় স্তরে যশ্ন যশ্‌ত্‌ ও বেন্দিদাদের প্রাচীন অংশ সমূহ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু গ্রন্থ এবং চতুর্থ স্তরে আবেস্তা-সাহিত্যের গদ্যাত্মক অবশিষ্টাংশ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পুত্রদান

১

যৌবন! যৌবন! যৌবন! এর চেয়ে বড় বালাই কি এ নারী-জীবনে আর কিছু আছে? আমার এই ক্ষুধিত তৃষিত জীবনেও আমি এই বিপদ নিয়ে পাগল হ'তে বসেছি গো! এই যে ভাঙ্গা বাড়ীর জীর্ণ দ্বারের আগড়টা খসে গেছে, গেলই বা! একটা বাঁশ-টাশ কিছু দিয়ে কি কাজ চালানো

হত না? কিন্তু না, তা সাহস হয় না। অকস্মাৎ দু'চারজন বন্ধু অযাচিত দয়া দেখিয়ে এই বিপন্না বিধবাকে সশঙ্কিত করে তুলেছেন, যা না ক'রলেই আমার বেশী উপকার করা হ'ত।

ওঃ ভগবান! ভগবান! কি কুৎসিত, কি ভীষণ করেই তুমি মানুষের প্রাণে এই হীন লালসার সৃষ্টি করেছিলে! রক্তলোলুপ শার্দ্দূলের চেয়েও এ নিষ্ঠুর—ভয়ানক!

এই যে আমার যৌবন, এই পঙ্কিল বিষ-নীর মন্থন করেই কি আমার এই বুকে ছ'টি শতদল ফুটে ওঠে নি! অমৃতের বন্যা কি আমার এ বিষদগ্ধ বুকে নামে নি! তবু আছে? তবু কি যৌবন ম'রে শুকিয়ে যায় নি?

হায়, কার দোষ দেব আমি? এ যে কেবল আমারই অদৃষ্টের দোষ, তা ছাড়া আর কিছুই নয়! যাকে লোকে এই পোড়া দেহের সৌন্দর্য্য ব'লে প্রশংসা করে—সব-চেয়ে বড় বিপদ হয়েছে তাই। কত লোক আছে, যারা নিত্যি দেহের রূপ বাড়াতে পাগল, তাঁরা থাকতে রূপের বালাই এখানে মর্‌তে এল কেন, কে জানে? আমি সত্যি বল্‌চি, রূপ আছে বলে দেমাক্ আমার কোনো দিনই হয় নি, বরং লজ্জায় মরে যাই আমি এর জন্যে।

আমার অন্ধ স্থবির বৃদ্ধ স্বামী আজ স্বর্গে। স্বর্গের অমৃত আলোয় যদি তিনি দেখবার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর ভিতরের মানুষটী আজ নিশ্চয়ই অনুতাপ করছে! সেখানে গেলে শুনেছি, মনের বিকার সেরে যায়।

শেষ-বয়সে আমাকে বিয়ে করার পর স্বামীর যখন চোখের দোষ হলো, তখন থেকেই নিতান্ত আত্মীয়া দু-একজন ছাড়া আর কারো মুখে আমার রূপের খ্যাতি শুনিনি, আজকাল তাও যেখানে-সেখানে যার-তার মুখে শুনতে পাই, ঘেন্নায় আমার সমস্ত শরীর শিউরে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

মা নেই, বাপ নেই, ভাই-বোন্ কেউ কোথাও নেই যে একদিনের জন্যেও একটু আশ্রয় পাব। এই শিশুদের আর নিজেদের জীবিকার সমস্ত ভার কেবল পরিশ্রমের উপর দিয়ে চালিয়ে নিতে যে কি ক'রে পারি, সে কেবল অন্তর্যামী ভগবানই জানেন!

সেদিন রাত্রে বেশ খানিক বৃষ্টি হয়ে ভাঙ্গা ঘরের সমস্তটা ভিজিয়ে দিয়েছিল। একে তো মাঘের শীত, ছেলেদের নিয়ে কি যে করি, ভেবে পাইনে! অনেক দিন মেরামত করা হয়নি, কোন্ দিন বা ঘরখানা ভেঙ্গে মাথায় পড়ে!

সকালবেলা, দিব্যি রোদ উঠেছিল। অনেক দিনকার রোদে-পোড়া মাটী থেকে সোঁদা-গন্ধ উঠে বাতাসটাকে ভরে দিয়েছিল। আমার পাঁচিলের গায়ের ঘুঁটেগুলি গ'লে-গ'লে কচু আর কুকুর-শোঁকার গাছগুলির উপর পড়েছিল।

ভিজে বিছানা-পত্তর রোদে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় পাড়ার এক বৌমা এসে ডাকলেন, "ওগো খুড়িমা—"

আমার এই বৌমাটি আমার চেয়ে বোধ করি ত্রিশ বছরের বড় হবেন, কিন্তু আমার স্বামীর সম্পর্ক ধরে আমি এঁর

খুড়িমা হতে বাধ্য। এগিয়ে গিয়ে দোর খুলে দিলাম, বল্‌লাম, "কি গা বৌমা, এমন সময়ে মনে পড়লো যে!"

বৌমা সৌজন্যে হেসে উঠে বল্‌লেন, "মনে কি আর তোমায় করিনে বাছা—তবে বড় একটা আসতে-টাস্‌তে পারিনে। আজ এই হলুদগুলো কুট্‌তে হবে, তাই বলি—"

চেয়ে দেখলাম তাঁর হাতের ডালিতে একরাশ হলুদ। শ্রমক্লান্ত মনটা একবার একটু গরম হলো, কিন্তু উপায় নেই, তাই হাত পেতে সেগুলি নিয়ে বললাম, "তা হ'লে আমার ছেলেদের এ বেলায় দুটী খাইয়ে দিও বৌমা, আমি এগুলো কুটে দি!"

ছেলেদের খেতে দেবার নামে বৌমার সেই পাকা মুখখানি প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌লো না। তা উঠ্‌বেনা আমি জানি, কিন্তু জেনেও আমার না বলে উপায় নেই। আমি যদি সারা দিন উপোষ করে হলুদ কুটি, তা হলে আমার বাছারা কি খাবে? বৌমা মুখ কুঁচকে বললেন, "হলুদ নিতে ওবেলায় আস্‌বো তো?"

বড় পরিশ্রম করতে হবে। তা হোক—বললাম, "আচ্ছা, সারাদিন খেটে দেখি, যদি শেষ করতে পারি, নিয়ে যেও।"

বৌমা উঠছেন-উঠছেন, এমন সময় আমি নিজেকে আর সামলে রাখ্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "রামনগর থেকে তোমার ভাসুর-ঝি এসেছে, নয় গা বৌমা?"

"হ্যাঁ।"

বুকের ভিতরটা আমার কেমন যেন জমে আসছিল। ব্যাকুল আগ্রহে বুক ফেটে যেতে চাইলেও মুখে কথা ফুটে বেরুল না।

কেন?

আমার বুকের প্রথম ফুল—আমার হৃদয়-সাগর-মন্থন-করা মাণিক, সে যে আজ সেই গাঁয়েরই জমিদারের ছেলে! খেতাবী রাজার পুষ্যিপুত্তুর বলে দেশের লোকে তাকে রাজপুত্র বলে!

যার রক্ত-মাংস দিয়ে তার রাজপুত্রের মত মোহন সুন্দর রূপখানি তৈরী, সেই দীন ভিখারিণী আজ আর তার কেউ নয়, কেউ নয়! তাইতো তার,—আমার নিজের পেটের ছেলের—কুশল-প্রশ্ন করতেও এ পোড়ামুখ আট্‌কে আসে!

বৌমা আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। হাজার হলেও তো তিনিও ছেলের মা। তিনি বললেন, "কি গো খুড়িমা, অনুর কথা বলবে বুঝি? তা সে বেশ ভালোই আছে, দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল হয়ে উঠেছে। এখানে না ছিল যত্ন, না ছিল খাওয়া-দাওয়ার সুখ, তাই তেমন বিচ্ছিরি মর্কুটে দেখাতো, এখন তো দেখলে চেনা যায় না—"

মনে একটু সান্ত্বনা পেলাম। সে ভাল আছে, সুখে আছে। আচ্ছা, আমাকে কি কখনও একটু-আধটু মনে করে সে? অতি অল্প, অল্প একটু? আমি তো ন' দশ বছর অবধি মানুষ ক'রে তারপর তারই সুখের জন্যে তাকে পরের ঘরে দিয়েছি। এই প্রাণহীনা পাষাণীকে মা বলে কি তার মনে পড়ে?

মা! আমাকে আর কেন সে মা বলবে? আমি তো আর তার মা নই। এখন যে চৌধুরীদের সোনা-রূপোয় মোড়া

রাণী তার মা। যে তাকে এই দারিদ্র্য-দুঃখ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাজা করে রেখেছে,—এখন তার মা সে,—আমি নই!

ওগো আমার স্বামী, ওগো আমার জন্ম-জন্মান্তরের অভিশাপ—না, না, ছি, ও-কথা যে মনেও আন্‌তে নেই, পরকালেও দেখছি আমার কপালে বিস্তর দুঃখ আছে।

বৌমা বললেন, "খুড়িমা, দুঃখ করোনা, তোমার কাছে থাকলে আর তার কি এমন ভাল হতো, বল! হয়তো বা দুঃখে-কষ্টে পড়ে একটা অমানুষ হয়ে দাঁড়াত, তার চেয়ে এ কত ভাল হয়েছে। তুমি না হয় মনে কর, তোমার সে ছেলেটা হয়নি—"

আর্ত্ত-গলায় বলে উঠলাম, "ও কি কথা বলছো গো, ও কথা কি ভাবা যায় কখনো? সে যে আমার প্রথম—"

"অত মায়া যদি, তবে বিলিয়ে দিতে গেলে কেন বাছা?"

কেন যে বিলিয়ে দিতে গেলাম, সে কথা আর নতুন করে লোককে কি বলবো। কাজেই আর জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম। গলার কাছে একটা শক্ত পুঁটলির মত কি ঠেলে উঠে যেন শ্বাস রোধ করে ধরছিল। কিন্তু আমি জানি, আমার মরণ নেই,—আর মরণের সাধ? তাও যে আর হয় না, তাহলে এই পাপের ফল পাঁকের পঙ্কজ ছেলেরা কোথায় কার দোরে ঘুরে বেড়াবে?

ঘরে ঢুকে দেখি, আমার অনু,—হোক সে রাজা, হোক সে এখন রাজা-বাহাদুর প্রতাপ চৌধুরীর ছেলে প্রদ্যোৎ—তবু আমার সে অনুপম। আমি তাকে অনুই বল্‌বো—ওই তার পুরোনো ছোট বালিশটা, ছেঁড়া দ্বিতীয় ভাগের পাতা-দুখানি, সুতো-খালি সুতোর কাটীমে গাঁথা মালা, সব আমার ঘরের শূন্যতা ভরে আছে—আর এরা বলে কি না, তাকে আমি ভুলে যাব?

মেজ ছেলে নিরু এসে ডাকলে, "মা—"

"কি বাবা?"

"এই ছাখ মা, এটা কি ফুল বলতো,—ওই ওধারের বাগানে ফুটেছিল, আমি চেয়ে আন্‌লাম।"

দেখলাম, ছেলের হাতে একটী রজনীগন্ধা ফুল। বল্‌লাম, "ওতো রজনীগন্ধা ফুল দেখছি। কিন্তু ফুল নিয়ে কি পেট ভরবে রে,—যা, রেখে দিগে।"

ছেলে মুখখানি ম্লান করে বল্‌লে, "মা, তুমি আর ফুল ভাল বাসো না?"

ছেলের মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, "না।"

২

সকাল বেলা ঘুঁটের জ্বালে ছেলেদের জন্যে ভাত চড়িয়ে দিয়ে আমি বাসি ঘর-দোর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেছিলাম।

বাড়ীর বাইরের দিকে একটা কুলগাছ ছিল, যত রাজ্যের ছেলেরা ভক্ত প্রজার মত তার তলায় পড়ে থাকতো। যতদিন না ফাগুনের শেষে পাকা কুল সব ফুরিয়ে যেত, ততদিন অকেজো ছেলের দল কেউই গাছটীকে একা থাকতে দিত না। আমার ছেলে ক'টিও ওই গাছতলায় গিয়ে জুটেছে, কেবল সব-ছোটটী ভাতের উনুনের কাছে বসে পেটের জ্বালায় একঘেয়ে কান্না সুরু করে দিয়েছে।

স্নান করে ভিজে কাপড় ছাড়তে যাচ্ছি এমন সময় দেখি, একজন অজানা লোক এসে আমার উঠোনের উনুনের কাছে দাঁড়িয়েছে, আমার ছোট খোকাটা একমুখ হাসি হেসে বল্‌ছে, "পূর্ণ বাবু, পূর্ণ বাবু—"

জানি, পূর্ণবাবু একজন নতুন দোকানদার। কিন্তু এই অসহ্য স্পর্দ্ধা দেখে রাগে আমার গা জ্বলে গেল। লজ্জাশীলার মত পালিয়ে যাওয়া আমার প্রকৃতি নয়, কঠোর স্বরে বললাম, "কে তুমি?"

লোকটা বিনীত ভাবেই বল্‌লে, "আজ্ঞে, আমার কিছু পয়সা পাওনা আছে, নিরু সেদিন চাল এনেছিল—"

"তাই তুমি বাড়ীর ভেতর এসেছ তাগাদা করতে! যাও, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও গে, নিরু তোমায় পয়সা দেবে।"

লোকটা তবু আমার খোকাকে আদর ক'রতে বস্‌ছে দেখে আমি রাগে চেঁচিয়ে নিরু বলে ডেকে ঘরের ভিতরে ঢুকতে গেলাম।

এই নীচাশয় লোকটার ধূর্ত্তামি-ভরা মুখ-খানি আমার তীব্র তিরস্কারে চাবুক-খাওয়া কুকুরের মত বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল। সে যাবে কিনা তাই বোধ হয় ভাবছিল, এমন সময়ে বাইরের দিক থেকে ডাক এলো, "অনুপম, ওহে অনুপম"!

কে ডাকছে আমার অনুপমকে? আহা, ও জানে না যে, অনুপমকে তার মা এ-ঘর থেকে জন্মের মত বিলিয়ে দিয়েছে, এ-ঘরে সে সেই অনুপম, পরের ঘরের রাজা সে আজ—!

একটু পরে নিরুর সঙ্গে এসে যে আমাকে প্রণাম করলে, তাকে আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। সে আমাকে বল্‌লে, "আমাকে চিনতে পারছেন না মা? আমি যতীন।"

যতীন আমার স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে। এরা দুই ভাই মামার বাড়ী মানুষ হয়েছিল। ছোটটী মারা গেছে, এইটী বড়। একে আমি দু-একবার দেখেছিলাম স্বামী থাক্‌তে, কিন্তু অকাল বার্দ্ধক্যে একে এমন জীর্ণ করে ফেল্‌ছে যে, হঠাৎ চিনতে পারি নি।

এই সব ছেলেরা কেউ আমাকে দেখতে পারে না। আমার অপরাধ? স্বামী আমাকে বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছিলেন বলে—কিন্তু সে দোষ কি আমার?

কেবলমাত্র হীন স্বার্থের জন্যে আমার এ নিরপরাধ নির্ম্মল জীবনও কি তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষার আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেন নি?

মেয়েদের প্রাণে বা হৃদয়ের যে একটা মূল্য আছে, এ যেন বেতালের আজগুবি কথা বলে চলে আস্‌ছে!

যতীনকে বস্‌তে বলে আমি রান্নাঘরে রাঁধতে গেলাম। চব্বিশ ঘণ্টা কি কঠিন পরিশ্রম ক'রে তবে আমার এই অন্নের যোগাড় করতে হয়!

খেতে বসে যতীন বললে, "কৈ, অনু কোথায়? সে খাবে না?"

"সে এ-বাড়ীতে নেই।"

"নেই? কেন, কোথায় গেছে সে?"

উত্তর দিচ্ছিল নিরু,—কিন্তু তার প্রত্যেক কথাটি যেন আমার বুকে শেল হান্‌ছিল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে হেঁসেলে ঢুক্‌লাম। বলুক, যা বলবার তা নিরুই বেশ বলতে

পারবে, আমি কেন আর ও দুর্ভোগ ভুগতে যাই !

ওদের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল। আমার সেদিন একাদশী ছিল। মাটীর উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লাম। চোখের জল ? সে অনেকদিন শুকিয়ে গেছে। কাল রাতে একখানা বই পেয়েছিলাম, খানিকটে প'ড়েও ছিলাম।

তাতে এক পঁচিশ বছরের বুড়ো মাগীর চোখে নূতন প্রণয়ের রং—আর বিরহ-মিলনের দুঃখ-মধুর লীলা দেখে মনে মনে খুব হেসে ছিলাম। কিন্তু আমার সদ্য-বঞ্চিত তৃষিত মনের কোনও গোপন ঘরে তার একটু রেশ ছিল হয়তো, আমি আমার কল্পনায় আঁকছিলাম যে, ওই নায়িকাটী যদি অত বয়সে বিবাহিতা না হতো আর আমার অনুর মত তার একটী ছেলে যদি থাকত !

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নিরু ডাকলে, "মা !"

"কেন রে ?"

"তোমাকে যতীন-দা ডাকছেন মা, উনি চলে যাবেন এখনি।"

"আচ্ছা, চল, যাচ্ছি।"

আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বেরুতেই যতীন বল্‌লে, "আপনাকে আবার বিরক্ত করলাম মা। আমি যাচ্ছি তাই একটু প্রণাম করে যাব বলে—"

"না বাবা, কিছু বিরক্ত হইনি,—তুমি কোথায় যাবে এখন ?"

"এই রামনগরে যেতে হবে। আমি ষ্টেশনে কাজ করি কিনা, এবার আমায় এইখানে বদ্‌লি ক'রেছে।"

"রামনগর ? রামনগর ?"

"হ্যাঁ।"

"সেখানে—"

"অনু আছে ? হ্যাঁ শুনলাম, সেখানে অনু আছে, কিন্তু এ কাজ আপনার মত বুদ্ধিমতীর উপযুক্ত হয়নি। যাক্, আমি ওখানে থাকলে তার খোঁজ-খবর পাবই।"

যতীন একখানি দশটাকার নোট দিয়ে আমাকে প্রণাম করলে। দশ টাকা! আমার এখনকার দুরবস্থায় এ বড় কম নয়! আমি টাকা হাতে করে নিয়ে বললাম, "এই টাকা তুমি আমাকে দিচ্চো ?"

"গরীব ছেলে মা আপনার—"

"এ টাকা আমি তোমাকে দিচ্ছি যতীন, এর বদলে তুমি একটীবার আমাকে রামনগরে নিয়ে চল, সাতদিন পরে আবার ফিরে আসবো,—যাবে আমায় নিয়ে ?"

আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, যতীনের মনটা সায় দিচ্ছে না, তবু তাকে নিস্তার পেতে দিলাম না। আমার মনটা যে সেই রামনগরের পথে-পথে ছুটছিল ! আমি এ লোভ দমন করতে পারলাম না। বললাম, "আমি সাত দিনের বেশী থাক্‌তে পারবো না। সাত দিন পরে তাঁর তিথি আস্‌ছে, সেদিন বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তো করাতেই হবে—"

অনেকক্ষণ কি ভেবে-চিন্তে যতীন, অনিচ্ছায় রাজী হ'ল। বললে, "সে এখন যাদের ছেলে, তারা এতে রাগ করবে কিনা, কে জানে ?"

"বাঃ ! তা করে, করবে—আমি তো আমার ছেলে বেচি নি !

বিবেকের শাসন প্রাণের ভিতর চোখ

রাঙিয়ে বললে, "বিক্রী করিনি সত্যি—কিন্তু তার চেয়ে বেশী করেছি যে ! নিজের বুকে-ফোটা ফুল ছিঁড়ে আমি দান করেছি, এখন এই যে শিরা-উপশিরা সব ব্যথায় টন্‌টনিয়ে উঠচে, এতে কাতর হলে চলবে কেন ?

মন বিবেকের শাসন মানলে না !

এর পরে এসে নিয়ে যাবে ব'লে যতীন সেদিন চলে গেল। নিরু আব্‌দার ধরলে, "আমি যাবো মা, ওঁর সঙ্গে,—দাদাকে দেখে আসবো—।"

যতীনও নিরুকে নিয়ে যেতে চাইলে, কিন্তু আমি রাজী হতে পারলাম না। একেই তো সৎ-বন্ধুরা আশেপাশে যে-রকম দয়া দেখিয়ে তটস্থ ক'রে তুলেছেন, তাতে সম্বল ঐ গুঁড়োটুকু, ওকে ছেড়ে দিয়ে থাকি কি নিয়ে ? বল্‌লাম, "না বাবা, তুই চলে গেলে যে আমায় বড্ড কান্না পাবে।"

ছেলে আমার হো-হো করে হেসে উঠে বললে, "তুমি কি ভীতু মেয়ে মা, আমাকেও বুঝি কোনো চৌধুরীরা ধরে নিয়ে যাবে, ভাব্‌চো ? সত্যি মা, ভাগ্যিস্ আমি রাজ-পুত্তুরদের মত দেখতে সুন্দর হইনি !"

এত দুঃখেও একটু হাস্‌লাম। রাত্রে ছেলেরা সব ঘুমিয়ে পড়লো। আমি আমার দেহ-মনের উত্তাপে জ্বলতে জ্বলতে বসে রইলাম।

ফাগুন রাতের পূর্ণেন্দুর একটুখানি আলোর কণা ঘরের ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে আমার মনটাকে উতলা করে দিচ্ছিল। বাইরে নীল নির্ম্মল আকাশ চাঁদের আলোয় ছেয়ে গেছে, পাতা-ঝরা ঘোড়া-নিমগাছের উপরকার হতোম-পেঁচার নিত্যিকার ডাক ছাপিয়ে পাপিয়ার করুণ-মধুর চীৎকার শুনে ইচ্ছে করছিল যে, একবার একটা দোর কি জানলা খুলে ভগবানের দান এই চাঁদের আলোই একটু উপভোগ করে নিই !

পারলে হয়তো একাদশীর দারুণ গায়ের জ্বালাটা একটু স্নিগ্ধ হত, মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ঘুমুতেও পারতাম, তাও না হলে ঘরে একজনের দেওয়া মণ-খানেক ধান আছে, চাল কুটে দিতে পারলে কিছু মজুরি পাওয়া যেত !

কিন্তু ভয়,—বিলক্ষণ ভয় করে আমার ! ভূত-প্রেতের ভয় বা পশুর ভয়ও করিনে, তবে মানুষের দেহের মধ্যেই যেখানে এক-একজনের মাঝে জাগ্রত পশু আছে, তারি ভয়ে আলো-বাতাস অবধি আমাকে মেপে মেপে নিতে হবে তা আমি বুঝে নিয়েছি। সংস্কারের গুণে এতে আর দুঃখও মনে হয় না !

৩

আমার উপরোধ এড়াতে না পেরে যতীন তার বাসাতে আমাকে এনেছে। রেল-লাইনের ধারেই ছোট পায়রার খোপের মত কোয়ার্টার্স। একটু দূরেই ছোট্ট ইষ্টিসান। আমার পাড়া-গেঁয়ে ছেলেরা রেলগাড়ী দেখে আর একদণ্ড ঘরে থাকেনা ! সব-কটি ইষ্টিসানের কাছে কাছে ঘোরে। কচি কচি সুন্দর মুখগুলি ষ্টেশন মাষ্টার থেকে কুলীদের অবধি বশ করে নিয়েছে।

এই ছোট্ট বাসাটীতে এর আগে যারা থাক্‌তো, তাদেরই লাগানো একটী তুলসী গাছ আর গোটাকতক গাঁদা ফুলের বাহারে গাছ ছিল। গাছগুলিতে ফুল ফুটে রংয়ের চটকে চারিদিক আলো করে থাক্‌তো।

বাড়ীর পূব-দিকে ষ্টেশন, আর পশ্চিম দিকে একটী সরু মেটে-রাস্তার ও-পারে মস্ত একটা মাঠের মত ছিল। এই শ্যামল মাঠটিতে বিকেলের দিকে অনেকগুলি ছেলে ফুট্‌বল্ খেলত, দেখতাম। এই মাঠটীর ও-ধারে একটু স'রে জমিদার বা রাজা প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ী; এতদূর থেকে সে প্রকাণ্ড বাড়ীর একটী কোণও সম্পূর্ণ দেখা যেতনা।

তিন দিন কেটে গেল। তবু যার জন্যে এই এত কাণ্ড করে এসেছি, তার দেখা পেতে পারিনি। নিরু রোজ বলে, "মা, কই দাদা এলো না কেন? তাকে ডেকে আন্‌বো মা?"

"কোথা থেকে ডেকে আন্‌বি রে?"

"কেন মা, ওই রাজাদের বাড়ী থেকে। আমি সেদিনে ওদের গেট অবধি গিয়েছিলাম, তা দাদাকে দেখতে পেলাম না। আনবো মা তাকে ডেকে? বলবো, মা ডাক্‌চে, চলো।"

"অমন করে ওদের বাড়ী তুই যাস্‌নে নিরু।"

আমার গলা বুঝি ভিজে ছিল, কিংবা কেঁপে গিয়েছিল, সে হঠাৎ ম্লান মুখে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, মা।"

আমার নিরুকে আমি বেশ জানি। সে একবার যখন স্বীকার করলে যে যাবে না, তখন সত্যি-সত্যি সে আর প্রাণান্তেও যাবে না! তবে কি করে কার সাহায্যে আমি অনুর দেখা পাব?

ওগো ভগবান, ওগো এই ব্যথাতুরা মাতৃ-হৃদয়ের স্রষ্টা অন্তর্যামী! আজ যদি একটু দয়া করে আমার বয়সটাকে বছর-কতক বাড়িয়ে দিতে, তাহ'লে মাথায় জরার নিশান এই সাদা চুল, আর শিথিল চামড়ার শরীরটা নিয়ে ওই দরোয়ান-পাইক-ভরা বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়তে আমার একটুও আটকাতো না। আমি একবার অনুকে বুকে চেপে ধরে আবার আমার সেই ভাঙ্গা ঘরে ফিরে যেতাম।

কিন্তু এখন যে তা পারিনে, শুধু এই জন্যে যে, ঘর থেকে বেরুতে না বেরুতেই হাজার-গণ্ডা চোখ হাঁ করে আমার পানে চেয়ে থাক্‌বে, সে আমি সইতে পারবো না। হয় তো দায়ে পড়লে একদিন পথে পথে ভিক্ষেও করতে হবে, কিন্তু এখনো তো সে অভ্যাস হয়নি!

আমি সারাদিন পথের ধারেই কাটাই, ছেলেরা পথে খেলা করে, তাই দেখি। সরু পথ, তার দুপাশে বড় বড় গাছ, একটী সজ্‌নে গাছে কচি কচি ডাঁটা ধরেছিল।

তার আর একটু দূরে একটা তরুণ আমের গাছে গুটি ধরেছিল, ছেলেরা ঢিলের ঘায়ে অনবরত গাছটীকে দুলিয়ে দুলিয়েও কাঁচা গুটি পাড়্‌তে পারছিল না।

একদিন ক' ভাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ যে দাদা! দাদা—"

আমার বিমূঢ় চোখের সুমুখ দিয়ে মাঠের উপরের রাস্তায় একখানা সাইকেল ছুটে চলে গেল। 'দাদা' ডাক শুনে তার যে আরোহীটি পিছন ফিরে চাইলে, তার মুখখানি আমার অনুর হলেও সে 'অনু' নয়! সে সত্যিই রাজা প্রতাপ চৌধুরীর রাজকুমার!

তার সর্ব্বাঙ্গে মূল্যবান পোষাক দেখেও

যে ছেলেরা তাকে দাদা বলে ডাকতে পেরেছে, এই ঢের!

ভায়েদের এই উচ্ছ্বসিত ডাক শুনে সে একটু চমকে গেল। কিন্তু থামলে না বা উত্তরে কোন কথাও বল্‌লে না। তখন বেলা তিনটে কি সাড়ে-তিনটে হবে, বোধ হয় সে স্কুল থেকে ফিরছিল। মিনিটের মধ্যে তার সাইকেল-খানি ওই প্রকাণ্ড গেটের মাঝে গিয়ে ঢুকলো, দেখলাম।

তার এখনকার মা, ওই রাজার রাণী, সর্ব্বাঙ্গে হয় তো তাঁর একঝুড়ি হীরে-মাণিকের বোঝা, কিন্তু বুক যেন মরুভূমি, এতটুকু পীযূষের ছিটেও কোথাও নেই! সেই মা কি মনে করে যে, সে এই পরের ছেলে পেয়েই মা হয়ে গিয়েছে? মাতৃত্বের এই যে যাতনা-ভরা সুখ,—সে কি যথার্থ মা না হয়ে পেতে পারে কেউ কখনো? নারীর জীবন ভরে শত দুঃখ-লাঞ্ছনা অপমানের মাঝেও মাতৃত্বের এই যে গৌরব, সে কি সহজ-লভ্য?

হয় তো ছেলে আস্‌ছে ব'লে এখন তিনি রূপোর থালে কতরকম রাজভোগ সাজিয়ে ছেলেকে খেতে ডাকছেন, আর কুটুম্ব-বাড়ীতে লোকে যেমন ক'রে নেমন্তন্ন খায়, তেমনি করে ছেলে এসে চুপচাপ সেগুলি খেয়ে যাচ্ছে, কোনো গোলমাল নেই, বকাবকি, মাথা-মুণ্ড অফুরন্ত তুচ্ছ খবরের গল্প নেই, কেবল আছে নিয়ম, দস্তুর, চুপচাপ!

৪

তার পরের দিন—যতীন তখন ভাত খেতে বসেছে, আমি তাকে ভাত দিয়ে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কি একটা কাজ করছিলাম, শুনতে পেলাম, অনু ডাকছে, "নিরু,—ওরে নিরু—"

ছুটে দুয়োর খুলে বেরিয়ে পড়লাম। সে কাল এইখানে ভায়েদের ডাক শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু বাড়ী বুঝতে পারেনি, তাই সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে নিরুকে ডাকছিল, আমাকে দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "মা? তুমি?"

রান্নাঘরের নোংরা কাপড় পরেই আমি আমার ছেলেকে বুকে চেপে ধরলাম। ভুলে গেলাম যে, জন-চারেক চাকরে তাকে সাজিয়েছে আর স্বয়ং রাণী অনেক পরিশ্রমে তার কোঁকড়া কালো চুলের থাক্ বাগিয়ে দিয়েছেন!

ছেলেরা আনন্দ-রোল তুলে ডেকে উঠ্‌লো, "দাদা এসেছে, দাদা—"

ভয়ে অনুর মুখ কালো হয়ে গেল। সে চারিদিকে চেয়ে দেখে বললে, "অমন করে চেঁচিয়ো না তোমরা, তাহলে ওঁরা জানতে পারলে আমাকে আর বেরুতেই দেবেন না।"

আমি ছেলেদের থামিয়ে বললাম, "কেমন আছিস্ অনু? এঁদের বাড়ী ভাল লাগে তো?"

সে কথার জবাব না দিয়ে অনু বল্‌লে, "তুমি এখানে এসেছ কেন মা? এখানে তোমার কি দরকার?"

মনে মনে ভাবলাম, এখানে যে আমার কি দরকার, তা তুই কি বুঝবি বাবা, আর তোকে বোঝাতে যাব, এমন পণ্ডশ্রমের দরকারই বা কি! বললাম, "আমার একটু দরকার ছিল।"

"কবে যাবে?"

শুক্‌নো গলায় বল্‌লাম, "দিন-পাঁচেক

পরে। হ্যাঁরে অনু, এই পাঁচদিন তুই রোজ একটু ক'রে আসতে পারবিনে?"

"পারবো মা। কিন্তু ওঁদের না বলে রোজ স্কুল যাওয়ার সময় আসবো, ফেরবার সময় আসা হবে না, আমার সঙ্গে তখন লোক থাকে।"

হঠাৎ পথের আর-একদিকে কাকে যেন দেখে সে চট্ করে সাইকেলে উঠে চলে গেল।

পর-পর তিন দিন রোজ একবার ক'রে অনু আমাকে দেখা দিয়ে যেত। হাজার হলেও সে অকপট শিশু, তার মনে তখনো ধনের ধোঁয়া ততটা জমে উঠতে পারে নি। আরও সে তার খেলার সাথী ছোট ভাইদের একেবারে ভুলে যেতেও পারেনি। দুদিন তার পকেট বিস্কুট আর ক্ষীরের নাড়ুতে বোঝাই হয়ে এসেছিল।

আমি বারণ করতে সে বললে, "আমি যখন মিষ্টিগুলো খাই, তখনি আমার খোকাকে মনে হয়। ও কি খুসী হয়ে মিষ্টি খায়, মা!"

বুঝলাম, সব সুখাদ্য খেতে গিয়েই তার এই দুঃখিনীর ধন ভায়েদের মনে পড়ে যায়!

চার দিনের দিন অনু আর এলো না। ছেলেরা সব তার পথ চেয়ে বসে আছে, আমি ঘরের ভিতর বসে ভাবছি যে, কাল তো আমায় ফিরে যেতে হবেই, তাঁর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তো করতেই হবে, তবে কেবল আজকের দিনটিই অনু কেন এলো না? ওরা কি জান্‌তে পেরে তাকে আট্‌কে রাখলে?

প্রতীক্ষা করে করে বেলা উৎরে গেল, সে এলোনা। হতাশ হয়ে মনটা যখন বড় বিস্বাদ লাগছে, তখন যতীন এসে বললে, "মা একজন লোক এসেচে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

"আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কে সে? জিজ্ঞাসা করে ত্যাখো, কি বলে।"

"আপনিই শুনুন মা, কি বলে সে। আমাকে বলতে আসেনি, আমাকে কিছু বলতে রাজীও নয়, আমি ডেকে দি তাকে।"

একজন প্রবীণ ভদ্রলোক আমার সামনে এসে কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। বোধ হয় আমাকে যেমন দেখবেন ভেবে ছিলেন আমি তেমন নই দেখে!

তিনি মুহূর্ত্তকাল চেয়ে থেকে নিজের পরিচয় দিলেন। বুঝলাম, তিনি রাজা প্রতাপ চৌধুরীর কর্ম্মচারী। আমাকে ওঁরা কিছু বলতে পাঠিয়েছেন। বললাম, "বলুন।"

ঢোক গিলে তিনি বললেন, "দেখুন, আপনি যখন ছেলেকে দানই করেছেন, তখন আবার কেন এমন করে তার মন বিগ্‌ড়ে দেবার চেষ্টা করছেন? যদি আপনি কিছু টাকা চান, তা হলে তা দিতে ওঁরা খুব রাজী আছেন। তবে ছেলে সম্বন্ধে আপনাকে একেবারে নির্লিপ্ত হতে হবে।"

আমি চুপ করে ছিলাম। আরো কি যেন কতকগুলি কথা সেই ভদ্রলোকটি বললেন, কিন্তু আমার কাছে তা বোধগম্য হলো না। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি অসাড় অবশ

হয়ে গিয়েছিল। তবু এইটুকু বুঝলাম যে, আমায় এ বয়সে যথেষ্ট সতর্ক হ'য়ে থাকতে হয় ইত্যাদি—

দয়া বলে কোনো পদার্থ কি পৃথিবীতে আছে গো? না, ভাগ্য-গুণে আমার নামেই জীবনের সব দয়া একেবারে শুকিয়ে যায়! জীবনের প্রথম থেকে এই এতকাল তো কেবল ফাঁকি নিয়েই চলে আসছে, মরণই বোধ হয় আসল পাব, কেন, না, তার আর নকল নেই!

অনেকক্ষণ পরে ভদ্রলোকটী চলে গেলেন।

তারপর! আমার সুমুখে এইগুলি যে কি তা আমি নিজের মুখেই বলছি, এ আমার ছেলে-বেচা টাকা! তবু আমি মরিনি, পাগল হইনি!—হা ভগবান!

পাছে স্নেহান্ধ হয়ে আবার কখনো ছুটে আসি, তাই এ শাস্তি হাত পেতে নিলাম, ভবিষ্যতের পথ বন্ধ করা হলো! এখন এ টাকা দিয়ে কি করবো? নিজের বুকের রক্ত বিক্রী করে সে টাকা দিয়ে কি করতে হয়?

আত্মা বা দেবতার পূজো? ভাল, তাই করবো। যে দেবতার নিষ্ঠুর সংসার-তৃষ্ণার মুখে এ প্রাণ জর্জ্জরিত, আজ যাচ্চি তাঁরই উদ্দেশ্যে, এই ছেলে-বেচা টাকা দিয়ে ভাল ক'রে শ্রাদ্ধ করতে!

আমি পাগল হয়েছি কি না জানিনে, কিন্তু কাছাকাছি হয়েছি, বোধ হয়!

অনেক দেবতা আছেন যাঁদের পায়ে রক্ত-মাংসে গড়া জীব কেটে রক্ত দিতে হয়! আমার তো এখনও ততদূর উন্নতি হয়নি, কোনো একটা ছেলে ধরে হাড়-কাঠে ফেলে কাটতে আমি পারিওনে, এখনকার আইনেও তা চলবেনা। তাই সন্তানের দাম দিয়েই এই দেবতাকে খুসি করতে চাই!

আমি জানিনে, হে আমার ভাগ্য-দেবতা স্বামী, এ পেয়েও তুমি খুসী হবে কি না?

শ্রীনীহারবালা দেবী।

জাতের লজিক্

চাঁড়াল সে নীচ জাতি, তাই
বাহিরেতে দিল তারে ঠাঁই।
বিড়ালটা খেয়ে তার পাতে
ঘরে এসে মুখ দিল ভাতে।
কর্ত্তা তো খেলো সেই ভাত,
তবু তায় বেঁচে রয় জাত!

সিদ্ধান্ত—
ছুঁলে ঘর মারা যায় হাঁড়ি,
প্রসাদে না নষ্ট হয় নাড়ী।

জের—
সাপ-জোঁক মুখে দিয়ে বিশুদ্ধ বিড়াল,
সদা মুখে হরি জপে' অশুদ্ধ চাঁড়াল!

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

ব্রিটিশ শাসনের এক যুগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হেষ্টিংসের সপক্ষে উইলসন্ সাহেবের যুক্তি আরও চমৎকার। তাঁহার মোটামুটি বক্তব্য এই যে ১৭৭৩ সালের সনদ পরবর্ত্তী ১৭৭৬ সালের সনদ দ্বারা রদ করা হইয়াছিল। ১৭৭৩ সালের সনদে বারাণসী-রাজকে রাজস্বের অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না এই কথা ছিল। তাহা যখন ১৭৭৬ সালে উল্টাইয়া গেল তখন আর চৈৎসিংহের পূর্ব্বসনদের অধিকার দাবী করিবার কোন যো নাই। উইলসনের এই মন্তব্য কিন্তু একেবারে ভুল। তাঁহার যুক্তির ভিত্তি হইতেছে ১৭৭৬ সালের সনদ দ্বারা ১৭৭৩ সালের সনদের আমূল পরিবর্ত্তন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত কাগজ-পত্র না দেখিয়া লেখাতে তিনি বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন। ফরেষ্ট সাহেবের State Papers গ্রন্থে প্রকাশিত চিঠিপত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে উইলসন্ সাহেবের যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে চৈৎসিংহের জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সনদ ও পাট্টা প্রস্তুত করান। ১৭৭৬ সালের ২১শে জুনের কাউন্সিলের সভার বিবরণী ফরেষ্ট State Papers গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে ৫৪৪ পৃষ্ঠায় ছাপিয়াছেন। তাহাতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে বারাণসীর রেসিডেণ্ট মিঃ ফুকের একখানি চিঠি কাউন্সিলে পড়া হইয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল যে রাজা "মুচলেখা" সম্বন্ধে সনদ ও পাট্টায় যে কথা লেখা ছিল, তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ফুককে আদেশ দিলেন যেন তিনি মুচলেখা কথা সনদ ও পাট্টা হইতে উঠাইয়া দেন। ফুক আবার ১৭ই জুলাই তারিখের পত্রে গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে রাজা তখনও পাট্টা ও অস্বীকার সনদ লইতে করিয়াছেন। রাজার অগ্রাহ্য করিবার দুটী কারণ—(১) সনদ হইতে কোন কথা উঠাইয়া দেওয়া (erase) এই দেশে অতি বিসদৃশ ব্যাপার, এবং (২) সনদে যে সর্ত্ত আছে যে তদ্দ্বারা পূর্ব্ব সনদ রদ করা হইবে তাহা এই দেশের প্রচলিত প্রথা-বিরুদ্ধ। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কিন্তু নিজেদের জেদ বজায় রাখেন নাই, রাজার কথা-মতই সেক্রেটারীকে আদেশ দিলেন যেন নূতন সনদ ও পাট্টা প্রস্তুত করা হয় এবং মুচলেখা বা পূর্ব্ব সনদ রদ করা সম্বন্ধে তাহাতে কোন কথা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট আরও সেক্রেটারীকে বলিলেন যেন নূতন সনদ ও পাট্টা ফুকের নিকট পাঠান হয় এবং পুরাতন পাট্টা সনদ ফেরৎ লওয়া হয়। (State papers vol II.P.549) এই পর্য্যন্ত উইলসন্ সাহেবের সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অতি অদ্ভুত। তিনি স্বীকার করেন যে ঐ প্রকার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার ধারণা যে সে আদেশ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ সদ্যুক্তি একবার তাঁহার নিজের ভাষায় পড়া উচিত—Whatever might at one time have been the disposition of the Council to accede to the Raja's wishes it does not appear that any actual measure ensued (মিলের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, উইলসন্ কৃত সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৬২ টীকা)। তাঁহার মোট কথা যে কাউন্সিলের যদিও রাজার অনুরোধ রক্ষা করিবার ইচ্ছা একবার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কাজে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অতএব উইলসন্ সাহেবের যখন মনে হয় না, তখন নিশ্চয়ই নূতন সনদ প্রস্তুত হয় নাই। এবং নূতন সনদ যখন হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই পুরাতন সনদই বলবৎ ছিল। আর তাহাতে যখন অতিরিক্ত দক্ষিণা আদায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা ছিল, তখন নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্ট রাজা চৈৎসিংহের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর ন্যায়-মত আদায় করিতে পারিতেন। যুক্তিটী সত্যই অদ্ভুত। ইংরাজ ঐতিহাসিক ইংরাজ শাসন-কর্ত্তাকে বাঁচাইবার জন্য কিরূপ সদ্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, একবার দেখুন। তিনি বেশ জানেন গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টভাষায় আদেশ দিয়াছেন যে নূতন সনদ প্রস্তুত হইবে এবং তাহাতে পুরাতন সনদের রদ্ সম্বন্ধে কোন কথা থাকিবে না। সুতরাং ইহা স্থির যে ১৭৭৬ সালেও গবর্ণমেণ্ট চাহেন যে চৈৎসিংহের পূর্ব্ব অধিকার বজায় থাকে। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায়, যে সেক্রেটারী ভ্রম-ক্রমে নূতন সনদ প্রস্তুত করেন নাই বা সেটী পাঠাইতে ভুলিয়াছিলেন, তাহাতে ঐতিহাসিকের পক্ষে কি আমলার ভুলের বা প্রভুর আদেশ অবহেলার সুবিধা লইয়া প্রভুর অন্যায় কার্য্য সমর্থন করা উচিত? ঐতিহাসিকের কাজ ত বিচারকের মত। ন্যায় অন্যায় তিনি স্থির করিবেন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে। দোষী বা নির্দ্দোষ স্থির করিবার পূর্ব্বে বিচারক প্রথমে দেখিবেন অভিযুক্তের মনোগত অভিপ্রায় কি? উইলসন্ সাহেব ত ইংরাজ, তাঁহার দেশের আইন প্রথম দেখে—"Intention of the accused" অর্থাৎ আসামীর মতলব কি? ইংরাজ হেষ্টিংসের কার্য্য আলোচনার সময় কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহার Intention বা অভিপ্রায় দেখিলেন না। ভুল-ভ্রান্তি সকলেরই হইতে পারে, উইলসনই বা অভ্রান্ত হইবেন কেন? হয়ত তিনি চেষ্টা করিয়াও নূতন সনদ প্রস্তুত হওয়ার প্রমাণ পান নাই! কিন্তু সত্যের খাতিরে ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য ঐতিহাসিকের আসনে বসিয়া তাঁহার ত এটুকু বলা উচিত ছিল যে ১৭৭৫ সালেও গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, রাজা চৈৎসিংহকে অতিরিক্ত কর-দান হইতে মুক্তি দেওয়া।

তাহা না বলিয়া তিনি নূতন সনদ আর পাঠানো হয় নাই বলিয়া ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ভৃত্যের একটা ত্রুটির সুবিধা লইয়া হেষ্টিংসকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, ভৃত্যের কার্য্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ত্রুটি হয় নাই। সেক্রেটারী গবর্ণমেণ্টের আদেশ-মত নূতন সনদ প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহা রাজার ইচ্ছানুরূপও হইয়াছিল। সেটী যে রাজাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ ত আমরা ফুকের ১৭৭৬ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে পাই। তাহাতে তিনি বোর্ডকে জ্ঞাত করান—"আমি তাঁহাকে

(রাজাকে) সেক্রেটারী অরিয়ল সাহেব কর্ত্তৃক ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেরিত সনদ দিই এবং তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্ব সনদ ফিরাইয়া লই। সেগুলি আমি ইহার সহিত পাঠাইলাম।" ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে উইলসন্ সাহেব এই চিঠিখানি না পড়িয়া ঘোরতর ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং তাঁহার যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন।

উপরিউক্ত সনদ পাট্টা কবুলতি প্রভৃতি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে রাজা চৈৎসিংহের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত বার্ষিক রাজস্ব ব্যতীত অতিরিক্ত ক্রোন কর আদায় করিবার কোম্পানীর আইনতঃ কোন অধিকার ছিল না। যাহা কিছু কোম্পানী আদায় করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে বে-আইনী এবং তাঁহাদের লিখিত ও স্বাক্ষরিত একরার-নামার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।

আইন আদালতের দিক্ হইতে আমরা কোম্পানীর কাজ যতই অন্যায় বলি না কেন, হেষ্টিংসের পক্ষে একটা কথা বলিবার আছে। দেশের মহাবিপদে শত্রু-দমনের জন্য অর্থবল বা লোকবল আদায় করিবার রাজার স্বভাবত অধিকার আছে। রাষ্ট্র যখন বিপন্ন, তখন রাষ্ট্রের অধিপতি কি আইনের সূক্ষ্ম যুক্তি দেখিয়া কড়া-ক্রান্তির হিসাবে রাজস্ব আদায় করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন? না, অধীন রাজন্যবর্গ বা ভূস্বামীদিগের নিকট হইতে সৈন্য-সামন্ত এবং অর্থ-সাহায্য চাহিবেন?

রাষ্ট্ররক্ষার জন্য সাহায্য চাওয়ায় কোন দোষ হইতে পারে না, যুগে যুগে দেশে দেশে রাষ্ট্রপতিরা এরূপ করিয়াও থাকেন। হেষ্টিংসের পক্ষে এই দিক্ দিয়া বারাণসী ঘটনার বিচার করা উচিত। কিন্তু রাজা যেমন গভীর বিপদের সময় অতিরিক্ত সাহায্য চাহিতে পারেন, প্রজাও সেইরকম অনায়াসে বলিতে পারেন, যে সাহায্যের পরিমাণ তাহার আনুকূল্যমত হওয়া উচিত এবং তাহার জন্য ন্যায্য সময়ও তাহার পাওয়া উচিত। দেখা যাক্, হেষ্টিংস সেরূপ অবসর রাজাকে দিয়াছিলেন কি না।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুলাই তারিখে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট প্রথমে স্থির করিলেন যে রাজা চৈৎসিংহকে যুদ্ধের ভার কিছু বহন করিতে হইবে এবং তাঁহাকে তিনটী সিপাহী পল্টন রাখিতে হইবে। (State Papers, Vol II, page 639), ১৭ই অগষ্ট তারিখে তাঁহার অতিরিক্ত কর ৫ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। এই অতিরিক্ত কর যে আইনতঃ চৈৎসিংহ দিতে বাধ্য ছিলেন না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অতিরিক্ত করটীর পরিমাণও বড় কম নয়, বার্ষিক রাজস্বের প্রায় চতুর্থাংশ। রাজা প্রথমে নানা অজুহাতে নিষ্কৃতি পাইবার বৃথা চেষ্টা করিলেন; তৎপরে ছয় মাস আরো সময় চাহিলেন। হেষ্টিংস ইহাতেই বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন, রেসিডেণ্টকে আদেশ দিলেন যে-প্রকারে হউক টাকা আদায় করা চাই। রাজা গত্যন্তর না দেখিয়া এই সর্ত্তে টাকা দিলেন যে ঐরূপ অতিরিক্ত কর তাঁহাকে আর দিতে হইবে না।

১৭৭৯ সালে ১৯ শে জুলাই রাজার নিকট পুনরায় ঐ কর চাওয়া হইল। রাজা অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। হেষ্টিংস একেবারে ক্ষিপ্ত হইলেন। তিনি বোর্ডে প্রস্তাব করিলেন যে সৈন্যদিগের দ্বারা তাঁহার উপর বল প্রয়োগ

করা উচিত এবং অধিকাংশ সভ্য তাঁহার পক্ষে ভোট দেওয়ায় স্থির হইল যে রেসিডেণ্ট লিখিলেই মেজর ক্যামাক দুইটী পল্টন লইয়া বারাণসী যাত্রা করিবেন। রেসিডেণ্ট বেচারা করেন কি? তিনি ত গবর্ণর জেনারেলের ভৃত্য! কিন্তু তিনি মস্তিষ্ক স্থির রাখিলেন, সৈন্যবল প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। হতভাগ্য রাজা আর কি করেন? বেগতিক দেখিয়া আবার টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং চার মাস সময় চাহিলেন। এত টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য এই সময়টুকু এমন কিছু বেশী নয়। রেসিডেণ্ট তাহা বুঝিলেন এবং সেই মর্ম্মে বোর্ডকেও সংবাদ জানাইলেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত, হেষ্টিংস ক্রোধোন্মত্ত হইয়া এক দুর্দ্ধর্ষ কাণ্ড করিলেন। তাঁহার আর একটুও দেরী সহিল না, রেসিডেণ্টকে আদেশ অবহেলা করার জন্য তীব্র তিরস্কার করিলেন এবং মেজর ক্যামাকের উপর আদেশ হইল, যেন তিনি দুইটী পল্টন লইয়া একেবারে বারাণসী যাত্রা করেন। তাঁর উপর কড়া হুকুম হইল যেন তিনি কোন প্রকারে না ফিরিয়া আসেন, কেবল রেসিডেণ্ট সব টাকা বুঝিয়া পাইয়া যদি সেই সংবাদ তাঁহাকে জানান, তবেই তিনি ফিরিবেন। রাজা ত চক্ষে একেবারে অন্ধকার দেখিলেন! কোন প্রকারে টাকার জোগাড় করিয়া ২২ শে অক্টোবর তারিখে পূরা টাকা দিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু তাহাতেও হতভাগ্যের নিস্তার নাই। আবার মেজর ক্যামাকের পল্টনের খরচ-বাবদ্ হেষ্টিংস ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা জরিমানা-স্বরূপ আদায় করিয়া লইলেন।

রাজার অপরাধ কতটুকু, পাঠক একবার দেখিবেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অগষ্ট প্রথম তাঁহার নিকট ৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর চাওয়া হইল। যদি ইহা ন্যায্যতঃ পাওনাই হয়, তাহা হইলে ত ১৭ই অগষ্ট ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে আবার টাকার কথা উঠিতে পারে। কিন্তু তাহার এক মাস পূর্ব্বেই ১৯ শে জুলাই আবার টাকা চাওয়া হইল! ১৭ই সেপ্টেম্বর সময় চাওয়াতে বিদ্রোহী রাজন্যকে যথারীতি শাস্তি-দানের জন্য ভারত-ভূমিতে ইংরেজ পল্টনের কুচ্ পরোয়ানাও হইয়া গেল। কিন্তু আপনারা দেখুন, তখন মোটে এক মাস মাত্র দেরী হইয়াছে। তারপর রাজা ত দ্বিতীয় বর্ষে পূরা টাকা চুকাইয়া দিলেন ২২ শে অক্টোবর তারিখে—মোটের উপর প্রায় দুই মাস দেরী। ইহাতেই বেচারাকে বিশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইল! স্বাধীন রাজার ক্ষমতা ভাল, আর রাজায় প্রজায় সম্বন্ধই বা কি সুন্দর!

পর বৎসর রাজা অসুবিধা বুঝিয়া অন্য চাল চালিলেন; একেবারে দুই লক্ষ টাকা হেষ্টিংসকে ঘুষ দিলেন। ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কোন ফল হইল না, টাকা রাজাকে দিতে হইল। রাজা ১৭৮০ সালের ৫ই অগষ্ট প্রথমে এক লক্ষ টাকা দিলেন। তখনও কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হইতে ১২ দিন বাকী। বাকী টাকাও অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ফেলিয়া দিলেন। ইহাতেও তাঁহার নিস্তার নাই। এই বৎসরও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হইল।

অন্যদিকেও আবার গোলযোগ আরম্ভ হইল—বার্ষিক রাজস্ব ২৩ লক্ষ ও অতিরিক্ত

কর ৫ লক্ষ ব্যতীত রাজাকে ২০০ সিপাহী কোম্পানীর জন্য ঠিক করিতে বলা হইল। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর হেষ্টিংস ২০০০ কমাইয়া ১০০০ সিপাহী চাহিলেন। রাজা নিরুপায় হইয়া ২০ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিতে চাহিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার অন্য অভিপ্রায় ছিল। তিনি তখন গোপনে নবাব-উজীরকে বারাণসী বিক্রয় করিবার জন্য দর-দস্তুর করিতেছিলেন।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্মীছাড়ার দল

প্যারী সহরের Latin quarter যে লক্ষ্মীছাড়াদের স্বর্গ, এ কথা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। এতদিন পরে নতুন মহাদেশের স্বর্গটা আবিষ্কৃত হয়েছে—সেটী নাম-জাদা New York সহর। তার অলি-গলি, তার রাস্তা-ঘাট আজ শত শত লক্ষ্মীছাড়ার কর্ম্ম-ক্ষেত্র। রামধনুর সাত রঙে আঁকা ভালবাসার ও খ্যাতির নেশায় বিভোর হয়ে তারা সেখানে নানা রকমে আশা-বৈতরণী পার হবার জন্যে প্রাণান্ত চেষ্টা করছে—কেউ বা সফল হচ্ছে তবে অধিকাংশ লোকই বাস্তব জীবনের রূঢ় বীভৎসতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে মরছে, নয়ত অভিশপ্ত জীবন-ভার বহন করছে।

জীবনের বাঁধা-ধরা পথের রেখা ধরে' যারা চলতে চায় না, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে' খাবার কল্পনাটা যারা কোনকালেই মনে মনে পোষণ করে না, এমন সব ছেলেই, শুধু আমাদের দেশে কেন, সকল দেশেই লক্ষ্মীছাড়া বলে' লোক-সমাজে পরিচিত। তারা মোটেই ভাল মানুষ নয়, তাদের রক্তের মধ্যে কি একটা ক্ষ্যাপামির বীজ আছে, তাই শান্ত-শিষ্ট হয়ে দশজনের মত তারা থাকতে পারে না। তারা লেখা-পড়া করে, কিন্তু গাড়ী-ঘোড়া চড়ে না,—দাস-দাসী অট্টালিকা যে মস্ত একটা প্রয়োজনীয় আসবাব, এ কথা তারা ভুলে যায়। এদের জীবনে সাধারণত কি ঘটে, তার একটু নমুনা দিই।

বাঁধা-ধরা কাজকে যারা সিদ্ধিদাতা গণেশের মত পূজা করে এবং জীবনের আনন্দকে সব-চেয়ে বড় পাপ বলে' ডরায়, এমনি একদল গোঁড়া কেজো-লোকের মধ্যে একটা ছেলে জন্মাল এবং গ্রহ-বৈগুণ্যে এই বিশেষ ছেলেটিই জীবনের চাঞ্চল্যে অভিভূত হয়ে পড়লো—তার চিত্তে কোথাকার সব কথা বেজে উঠলো,—গৌরবের বিপুলতর জীবনের কত অস্পষ্ট চিত্র তার মনের চোখে ভেসে উঠলো! দিনের কাজের শেষে সে লুকিয়ে বই পড়তে সুরু করলে, এবং তার মনের ভিতরকার কথা কাগজে চারিয়ে গেল—হয়ত বা জেলার খবরের কাগজে বেনামীতে দু-একটী লেখা ছাপাও হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ইহকালটি বেমালুম নষ্ট হয়ে গেল। সে এখন লিখতে চায়, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে পড়তে চায়। তার শক্তি হয়ত একেবারেই মাঝারি—তার রচনায় হয়ত এমন দোষ আছে যে সে কোন

কালেই নিজেকে ছাপিয়ে উঠতে পারবে না, কিন্তু তার লেখবার বাতিক থেকে তাকে কোন মতেই নিবৃত্ত করা যাবে না। বছরের পর বছর সে লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরবে, New York সহরে লক্ষ্মীছাড়ার দলে এসে জুটবে, অনশনে অনাহারে অনিদ্রায় জীবনকে তিক্ত করে' তুলবে, কিন্তু লিখতে তাকে হবেই। হয়ত এক যুগ কেটে যাবে তার বুঝতে যে তার শক্তি সামান্যই এবং এই অনর্থক কষ্টের পর তার মনে দশজনের মত বাঁধা পথে চলে' তাদের একজন হয়ে বসতে ইচ্ছেও হবে। এই যে আত্ম-বঞ্চনা, এ থেকে তার মুক্তি নেই, এ কষ্ট তাকে পেতেই হবে। এ হচ্ছে সেই পরশ-পাথর খোঁজবার প্রবৃত্তি, সমস্ত-পাওয়ার মাঝে সেই অপ্রত্যাশিতের জন্যে চির-জাগরূক অসন্তোষ, যা যুগে-যুগে মানুষকে চঞ্চল করে তুলেছে, জগতের আর সব থেকেই তাকে তফাৎ করেছে! শুধু তাই নয়, নিজেকে ছাপিয়ে ওঠবার প্রেরণা এনে দিয়েছে!

মধ্যযুগে কর্ম্মিক তার কাজের মধ্যে অন্তরের শিল্প প্রবৃত্তিকে ফুটিয়ে তুলতো, এখন এই কল-কারখানার যুগে আত্ম-প্রকাশের আর কোন উপায় নেই; তাই তার এই চাঞ্চল্য এবং এই অবশ্যম্ভাবী দুর্ব্বিষহ কষ্ট-ভোগ।

New York সহরে সাহিত্যিক স্কুলের ছড়াছড়ি—এই সব সবুজ ও অবুঝ সাহিত্যিকদের ওড়বার মত পাখা বানিয়ে দেবার কল-কাটী নাকি তাদের হাতে! কিন্তু চিরকাল যা ঘটে, তাই হচ্ছে—স্কুল চলে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে, আর মন চলে ঠিক তত বছর এগিয়ে। তাছাড়া মনের মধ্যে না আছে mechanism, না আছে routine; কিন্তু শিক্ষা-পদ্ধতির সেই হল বিশেষ বাহাদুরী, কাজেই এই কারখানার ভিতর থেকে যা বেরিয়ে আসে, তা আর সাহিত্যাকাশে বিচরণ করবার মত মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গম নয়, খবরের কাগজ লিখে পয়সা আনবার মত কেজো লোক! আনাতোল ফ্রান্স, মাক্সিম গোর্কি বা হুইটম্যান হবার আশা নিয়ে যারা আসে, তারা অবশ্য হতাশ হয়; কিন্তু কোন রকমে তারা বাঁচে এবং এমন কি অনেক সুবোধ সুশান্তদের মত গাড়ী-ঘোড়াও চড়ে, কিন্তু তাদের জীবনে সাহিত্যিক বা শিল্পী হবার চেষ্টার ব্যর্থতার কালিমা কোন কালেই ঘোচে না, হতাশার কারুণ্য তাদের কপাল ফুটেই থাকে।

প্রতি খবরের কাগজের আপিসে এমন দু'চারটে লোক মিলবেই, যারা জীবনে এই বড় জিনিষটা চেয়েছিল—আজ তারা ধনী-সমাজের সামাজিকতার রিপোর্ট লেখে, হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ছাপায়। কাজ কিছু মন্দ নয়—কিন্তু এ তারা কোন কালেই করতে চায়নি—দুয়ে দুয়ে চার করবার ইচ্ছে তাদের ছিল না—দুয়ে দুয়ে পাঁচ হবে এই ছিল তাদের অন্তরের আশা! এক দিন ছিল, যখন শিল্পী হবার সাধ নিয়ে মানুষ এত সহজে পরিত্রাণ পেত না—হয় সে Samuel Johnson এর মত অনাহারে কষ্ট পেত, Chatterton এর মত আত্মহত্যা করতো, কিম্বা Keats এর মত শিল্পী হয়ে উঠতো—সাহিত্যিকরা কষ্ট পেত এখনকার চেয়ে অনেক বেশী এবং শক্তিমান ব্যক্তিরই শুধু সাহিত্যের চর্চ্চা রাখতো।

অধিকাংশ লোক নিরাশ হলেও দুপয়সা সংগ্রহ করছে, কিন্তু ব্যর্থ-মনস্কাম সাহিত্যিকের সংখ্যাও অল্প নয়—বছরের পর বছর কেটে

চলেছে, নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে কর্ম্ম-ভারে নত দেহে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তারা পরিশ্রম করে' চলেছে, জীবন-পণে তারা শিল্পী হবার সাধনা করছে। তাদের দু'একজনের কথা আজ বলবো।

ইংরেজি সাহিত্যিকদের নামের তালিকায় John Masefield এর নাম আজ খুব উপরে। New York সহরে এখনও সে-সব দোকান ও হোটেল আছে, যেখানে অনেক বছর আগে তিনি দরোয়ানী ও দোকানদারী করেছেন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যে Knut Hamsun, তিনি একদিন এখানে ট্রাম চালিয়েছেন ও ডকের মজুরগিরি করেছেন। সে ডাক্তার এখনও বেঁচে আছেন, মার্কিন সাহিত্যিক Jack Londonকে সাহায্য করবার সুযোগ পেয়ে যিনি ধন্য হয়েছেন—Jack London তখন পথে পথে ভিখারীর মত ঘুরছেন! তাঁর জীবনের এই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পে উপন্যাসে তিনি গেঁথে রেখে গেছেন।

বর্ত্তমানে New York এর ডকে মস্ত জোয়ান এক মজুরের দেখা পাওয়া যায়। তিনি সাধারণ মজুরের মত সপ্তাহে দুদিন কফি ব্যাগ আর লোহার ডাণ্ডা বয়ে দেন এবং বাকি চার দিন কবিতা লেখেন।

ছোট-খাট একটি সংসার নিয়ে এক হাঙ্গারিয়ান্ এখানে এসে জুটেছেন। সারাদিন দোকানে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন এবং রাত্রে যখন স্ত্রী-পুত্র ঘুমায়, তখন তিনি বসে' বসে' নাটক লেখেন। তাঁর রচনা দিন দিন লোকের মন আকর্ষণ করছে।

এই সবুজ সাহিত্যিকদের খাদ্য-সংগ্রহের একটি প্রিয় উপায় হচ্ছে দুপরে খুব ভিড়ের সময় হোটেলে ডিস ধোওয়া। একটি ছোকরা আজ দুবছর ধরে' একটা উপন্যাস লিখছে—প্রতি সকালে দোকানে দাঁড়িয়ে চুরুট বিক্রী করাই তার কাজ। একজন টেলিগ্রাফার আবার কবিতা লেখেন এবং সাহিত্যের দরবারে তাঁর রচনার আসন পাবার আশু-সম্ভাবনা আছে। এই সে দিন কাগজে একজনের গ্রেপ্তার ও কারাবাসের খবর বেরিয়েছে,—তাঁর নাম John Coffey,—তিনি ভবিষ্য দর্শন (Futurist Philosophy) সম্বন্ধে একখানি বিচিত্র গ্রন্থ রচনা করছিলেন। তাঁর জীবিকা-আহরণ চেষ্টাটি ভারী অদ্ভুত—দোকান বা হোটেল থেকে fur coat চুরি করে' তিনি খাদ্য সংগ্রহ করতেন।

এই সব লক্ষ্মীছাড়ারা আধা পথের ধার দিয়েও যাবে না! খবরের কাগজে লোক-ভুলানো কথা লিখে তারা সন্তুষ্ট হবার পাত্রও নয়। নেহাৎ হতভাগা তারা, কারণ ইচ্ছে করে তারা অশন, বসন ও শয়নের ক্লেশ সহ্য করছে। কিন্তু যৌবনের গৌরব টীকা তাদের ললাটে প্রদীপ্ত, নিজেদের স্বপ্ন ও সঙ্গীত নিজেরা দেখবার ও শোনবার আশায় তারা বিভোর। তারা ত জীবনের ছোট-খাট সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে কাঁদছে না—জীবন নিয়ে পরখ করে' দেখবার আনন্দে তারা সব ভুলেছে। একদিন হয়ত তারা বুড়ো হয়ে ব্যর্থ জীবনের জন্যে অনুতাপ করবে! সেদিন এমনি একটি লোকের খবর পাওয়া গেল—ব্যর্থতার অনুশোচনায় যার-তার কাছে কাঁদতে আর ভিক্ষা চাইছে।

বর্ত্তমান যুগের প্রাণ-ধারণের এই অনন্ত বীভৎস সংগ্রাম ও কলকারখানার চিতাধূমের মাঝখানে বসে' সাহিত্য-সৃষ্টির স্বপ্ন দেখা বিত্ত-হীন লোকের পক্ষে একটা বিরাট স্পর্দ্ধা, কিম্বা পাগলামি, কিম্বা ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা বই আর কিছু নয়! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মানসীর ভক্ত সেবকের অভাব নেই! পরিণাম যাই হোক, এ সাধনা চলবেই—কতক হয়ত না খেয়ে মরবে, কতক বা পাগল হবে, আবার কতক বা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবে। কল্প-লোকের সন্ধান পাবে কিন্তু অল্প লোকেই।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

মহামানব

জন্ম তোমার হয়েছিল কবে ঋষির মনে,
এই ভারতের মহামনীষার তপের ক্ষণে!
সর্ব্বমানবে অভেদ করিয়া দেখিল যারা—
তারাই তোমায় দেখেছে প্রথম, জেনেছে তারা!
তারপর তুমি যুগে যুগে এলে মূরতি ধরি',
অমৃত পিয়া'লে মৃত্যু-সাগর মথিত করি'!
কুরুক্ষেত্রে বাজিল শঙ্খ মাভৈঃ-রবে!
প্রথম-প্রেমিক শাক্যসিংহ উদিল ভবে!
পাপ-পশ্চিমে ভগবদ্-কৃপা দানিল ঈশা!
আরও একজন মরু-সন্তানে দেখা'ল দিশা।
সেই এক বাণীমূর্ত্তি ধরিয়া আসিলে তুমি!—
হে জীব-ব্রহ্ম-অভেদ! তোমার চরণ চুমি।

হে প্রাণসাগর! তোমাতে সকল প্রাণের নদী
পেয়েছে বিরাম, পথের প্লাবন-বিরোধ রোধি'!
হে মহামৌনি! গহন তোমার চেতন-তলে
মহাবুভুক্ষাবারণ তৃপ্তি-মন্ত্র জ্বলে!
ধন্বন্তরি! মন্বন্তর-মন্থ-শেষ—
তব করে হেরি অমৃতভাণ্ড—অবিদ্বেষ!
জগত-জনের বেদনা-সমিধ্ কুড়া'য়ে সবই—
সেই ইন্ধনে ঢালিলে আপন প্রাণের হবিঃ!

পরিলে ললাটে মহাবেদনার ভস্মটীকা—
জীবন তোমার হোম-হুতাশন ঊর্দ্ধশিখা !
শঙ্কাহরণ আহিতাগ্নিক পুরোধা তুমি !
যজ্ঞজীবন দৈবত ! তব চরণ চুমি।

নিরাময় দেহে বহিছ সবার ব্যাধির ভার !
তুমি নমস্য, করিছ সবারে নমস্কার !
চির-তমিস্রা-হরণ তোমার নয়নকূলে
অন্ধ-আঁখির অন্ধকারের অশ্রু দুলে !
অর্দ্ধ-অশন বিরলবসন হে সন্ন্যাসি !
তুমিই সত্য সংসারতলে দাঁড়ালে আসি' !
আদিকাল হ'তে কতকাল তুমি এমনি রত ?
হে মহাজাতক ! জাতক-চক্র ঘুরিবে কত !
কতবার দিবে আপনারে বলি যাগের যূপে !
ছোট 'আমি' গুলি ভরিয়া তুলিবে তোমার রূপে !
চিনেছি তোমারে, যুগে-যুগে অবতীর্ণ তুমি !
হে বোধিসত্ত্ব ! বুদ্ধ ! তোমার চরণ চুমি।

ধ্যানীর ধেয়ানে আসন তোমার চিরন্তন—
ইতিহাসে যবে ধরা দাও, সে যে পরমক্ষণ !
দেশে-দেশে তব শুভ-আগমন-বার্ত্তা রটে,
তোমার কাহিনী কীর্ত্তন হয় দেউলে মঠে।
পুনরায় যবে তোমারে ভুলিয়া তোমার নাম
জপ করে সবে নিজেরি লাগিয়া অবিশ্রাম—
নরে ভুলে গিয়ে শুধু 'নারায়ণ'-মন্ত্র পড়ে,
মনের মতন স্বার্থসাধন মূর্ত্তি গড়ে—
জগত-অন্ধ জগদানন্দে করিয়া হেলা
রতনে-ভূষণে সাজায় কেবলি মাটির ঢেলা—
জগজ্জীবন-মূর্ত্তি ধরিয়া এস গো তুমি !
মানব-পুত্র ! মৈত্রেয় ! তব চরণ চুমি।

এস গো মহান্ অতীত-সাক্ষী হে তথাগত !
হের এ ধরণী মরণ-শাসনে মূর্চ্ছাহত !
কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া মানব-রাজ !
গাহ জয়, গাহ মানবের জয়, গাহ গো আজ !
মহাব্যাধিভার কর গো হরণ পরশি' কর,
ধন্য হউক নিজেরে নিরখি' নারী ও নর !
আর বার ডাক' ঘরে ঘরে, 'এস আমার পিছে,
ভয়ের সাগর হেঁটে পার হও, ভয় যে মিছে !'
মৃতজনে পুনঃ নাম ধরে' ডাক' মৃতক-নাথ !
—প্রেতভূমে আজি একি হুলাহুলি রোদন সাথ !
হোক্ জাতি-পীঠ সূতিকাক্ষেত্র—শ্মশানভূমি,
মহাদেব নয়, মহামানবের চরণ চুমি' !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

মেয়েদের শিক্ষা

শিক্ষা ও লোকমত।—দেশের বিদ্যা-পীঠগুলিই যে দেশের লোক-মত প্রতিফলিত করে, এ তথ্য অতি অল্পদিন মাত্র স্বীকৃত হইলেও উহা যে সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ কথা মানিয়া লইলে জাতীয় প্রচলিত অভিমত-গঠনের মূলে কি কি শক্তি কার্য্য করে তাহার সন্ধানে চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। উক্ত শক্তি বিভিন্ন শ্রেণীর। একটি তাহার উন্নতিশীল প্রভাবের দ্বারা অল্প কয়েকজন জ্ঞানী ও দূরদর্শীর ধারণাকে বহুর আদর্শ রূপে গড়িয়া তোলে; অন্যটি ঈপ্সিত পরিণতির গতিকে শিথিল করিয়া আনে। কারণ উহা যে-সমস্ত কুসংস্কার পোষণ করে তাহাতে শিক্ষা-সঙ্কটের প্রধান কারণগুলি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই দুই পরস্পর-বিরোধী সমস্যায় অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে। কি সমাজতত্ত্বে ও লোক-হিতসাধন কার্য্যে—কি শিক্ষা-দীক্ষা বা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র উহারাই সর্ব্বপ্রধান, বিশেষ আবার দৈনন্দিন জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কোনও বিষয় যখন সাধারণের বিচারের জন্য উপস্থিত হয়, তখন উহারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে।

গৃহিণী হইবার উপযোগী শিক্ষা।—মেয়েদের শিক্ষা যাহাতে তাহাদের মাতৃত্বের বিরোধী না হয়, এ দিকে সকলের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। আমরা শিক্ষা-পীড়িত মস্তিষ্ক

চাইনা, আমরা চাই প্রকৃতির প্রয়োজনোপযোগী সবল সুগঠিত দেহ। শিক্ষকগণের লক্ষ্য রাখা উচিত যে মেয়েদের যেন সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়,যাহা তাহাদিগকে সংসারে কল্যাণময়ী, গৃহকর্ম্মের উপযোগিনী করিয়া তুলিতে পারে এবং যে-শিক্ষার শক্তি ও মধুর প্রভাব অবিরাম বর্দ্ধনশীল। বস্তুতঃ তাহাদের অন্তরের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন শারীরিক শিক্ষাও সমতালে অগ্রসর হওয়া অত্যাবশ্যক, নতুবা ক্বচিৎ ব্যতিক্রম ব্যতীত সেরূপ শিক্ষা নিশ্চয়ই বিফল হইবে, এমন কি হয়ত উহা তাহাদের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক ও স্থায়ী দুর্দ্দশারও কারণ হইবে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের স্নায়বিক উত্তেজনার মাত্রা স্বভাবতঃই অধিক কিন্তু উহা উপযুক্ত শারীরিক উৎকর্ষের দ্বারা অনেকটা সুসংযত করা যাইতে পারে। নিয়মিত ও যথোচিত দৈনিক ব্যায়ামের অভাব মেয়েদের অসার ও নিরুদ্যম করিয়া তোলে, মুখের রং বিবর্ণ করিয়া দেয়, কোষ্ঠবদ্ধতা-জনিত মালিন্য লইয়া আসে, মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং কেমন যেন একটা মন-মরা ভাব আনিয়া দেয়। শারীরিক শক্তি সঞ্চয় করাটাও যে একটা প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে—স্নায়ুর অপেক্ষা মাংসপেশীর উন্নতি যে অধিকতর প্রয়োজনীয়. এই ভাবটুকু মেয়েদের মনের মধ্যে জাগাইয়া তোলাই শিক্ষক ও অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য। এবং এই উদ্দেশ্য সঙ্গত উপায়ে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াও তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তাহাদের শিখাইতে হইবে যে শ্রীমতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিমতী হওয়াও আবশ্যক ; কিন্তু সর্ব্বোপরি তাহাদের শিখাইতে হইবে যে চরিত্র-বলের দ্বারাই অনিয়মিত স্নায়বিক ক্ষয় হ্রাস করা যায়। যদি মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিরাপদ করিতে হয় তবে তাহাদের শারীরিক উন্নতি মনের উৎকর্ষ সাধনের পূরোবর্ত্তী করা প্রয়োজন। এই সাবধানতা ব্যতিরেকে উক্ত শিক্ষা প্রণালী কিছুতেই নিরাপদ হইতে পারে না ; কারণ স্ত্রীলোকের মানসিক শক্তির উৎকর্ষ তাহার অনেকখানি শারীরিক ক্ষতির বিনিময়ে সাধিত হয়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা না রাখিলে তাহাদের নারী জনোচিত দুর্ব্বল দেহ-যন্ত্র কিছু না কিছু গভীর অনিষ্ট ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত সাধনা সহ্য করিতে পারিবে না।

স্ত্রীলোককে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার সময় এটুকুও মনে রাখিতে হইবে, যেন তাঁহারা শক্তিশালী সন্তানের জননী হইতে পারে। কি করিয়া হইতে পারে, সে উপায় অবলম্বন করা অধিকতর প্রয়োজনীয়। উচ্চ অঙ্গের শারীরিক উৎকর্ষের দ্বারা মেয়েদের বলিষ্ঠ সুশ্রী ও সুঠাম করিয়া তোলা যায় কিন্তু উপযুক্ত শারীরিক শিক্ষা ব্যতীত—কেবলমাত্র মানসিক উচ্চশিক্ষার দ্বারা তাহারা অলস-বিলাসী অথবা বিকৃত স্নায়ু-বিশিষ্ট কিম্বা উভয়বিধ দোষে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

মেয়েদের ব্যায়াম-ক্রীড়ার আবশ্যকতা।—মেয়েদের প্রয়োজনীয় শারীরিক উৎকর্ষ যাহাতে সুসংসাধিত হইতে পারে, সেজন্য এই ব্যবস্থাগুলির আমরা অনুমোদন করি,—

ক। মেয়েদের দৈনিক বা আশ্রম-পাঠাগারে—এক-একটী ক্রীড়াভূমির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এমন দিন ছিল যখন এ বিষয়ের উল্লেখমাত্র কোন তরফ হইতে পরিহাস ও বিদ্রূপের অট্টহাসি শুনা যাইত

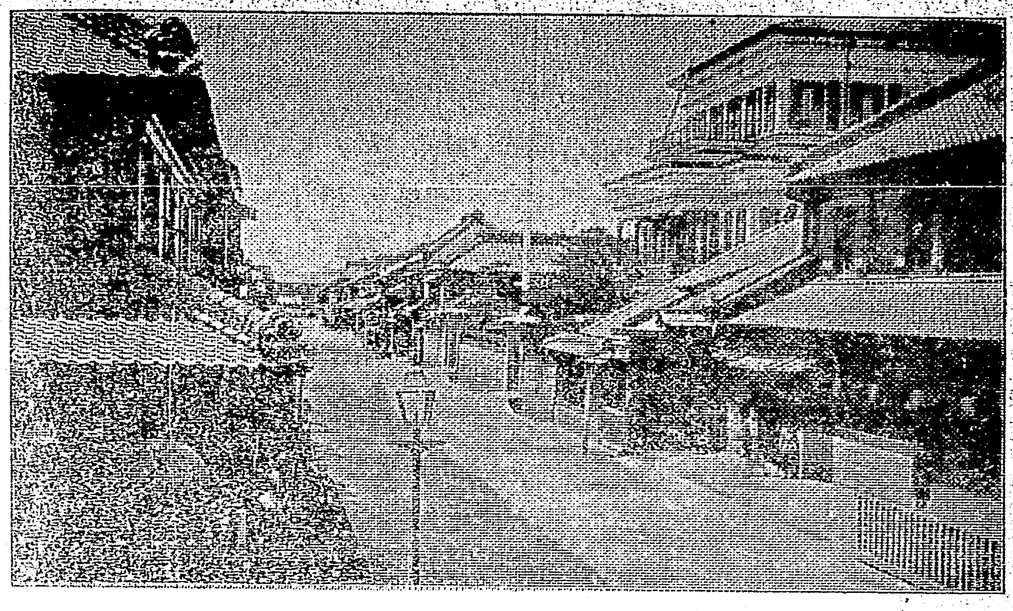

জাপানী মেয়ে স্কুলের এক পার্শ্বের দৃশ্য

এবং এখনও বাংলা দেশের অধিকাংশ মেয়ে-স্কুলে প্রকৃতপক্ষে খেলা-ধূলা করিবার মত কোন বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা নাই।

খ। খেলার জন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কোন বালিকাকেই একাদিক্রমে একঘণ্টা কালের অধিক ইস্কুল-ঘরে আটকাইয়া রাখিলে চলিবে না। তাহাদের দ্রুত-বর্দ্ধনশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহাতে মাঝে-মাঝে ছাড়া পায়, ফুসফুসের ক্রিয়া যাহাতে কিয়ৎক্ষণ পূর্ণ বেগে চলে এবং আবার একটি নূতন বিষয় অধ্যয়নের পূর্ব্বে যাহাতে তাহারা কতকটা মানসিক বিশ্রাম লাভ করিতে পারে, সে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হাঁটা, ছোটা, দোল খাওয়া, লাফানো ইত্যাদি ব্যায়ামই উহাদের পক্ষে চমৎকার—। হাঁটা কিন্তু সহরের বাহিরে গ্রামের মুক্ত প্রান্তরেই হওয়া উচিত। চলার গতি-নির্দ্ধারণ ও নিজের সঙ্গিনী-নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ার সম্বন্ধে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, এবং কখনই যেন উহাকে বাধ্যতামূলক ও নিয়মাধীন যন্ত্রে পরিণত করা না হয়। মেয়েদের পক্ষে সাঁতারের মত অমন উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে উপযোগী ব্যায়াম আর নাই। এ ছাড়া বাগানের কাজ ও সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে ঘোরাও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং আমোদজনক।

জাপানের স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতি।—মহিলা বিদ্যাপীঠের প্রধান অধ্যাপক জিঞ্জো নারুশে (Prof. Jinzo Naruse) তাঁহার ছাত্রীগণের নিকট যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা হইতে জাপানের স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতির ধরণ কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

তিনি বলিয়াছেন, "শিক্ষা সম্বন্ধীয় রাজ অনুজ্ঞা পত্রে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় আদেশ অনুসারে তাহারা সর্ব্বদা পরিচালিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন্ লক্ষ্য ও কি উদ্দেশ্য লইয়া স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়মকানুনগুলিও অবিচলিতভাবে পালন করিবে। আত্মবুদ্ধি ও আত্মশাসনাধীন হইবার চেষ্টা করিলেও সুহৃদগণের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। অলস ও অসংযত জীবন যাপনের প্রবৃত্তি হইতে সতত তাহাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে। অপরকে তাহারা সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং নিজেরাও আত্মসম্মানী হইবে। সামাজিক আচার-ব্যবহারে বিনয়ী ও ভদ্র হইতে হইবে। তাহাদের রীতি-প্রকৃতি যেন গর্ব্বোদ্ধত না হয়। তাহারা শান্ত, নম্র, ধীর এবং সত্যবাদী হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং হঠকারিতার কার্য্য হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও মহৎ আকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইবে, যে যে গুণ নারীকে প্রিয় ও পূজনীয় করিয়া তোলে, তাহার সকলগুলির অধিকারিণী হইবার জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জন ও কলা-বিদ্যা-শিক্ষা-প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব নিজেদের শক্তি ও বিচার-বুদ্ধিকে খাটাইয়া নিজেদের চেষ্টায় শিখিবার ও বুঝিবার অভ্যাসটাও রপ্ত করিতে হইবে। এই উপায়ে শিক্ষকের অভিমতগুলিই অন্ধভাবে মানিয়া লওয়ার যে দোষ, অল্পবয়স্কা-ছাত্রীগণের মধ্যে প্রায়ই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—উহাও বিদূরিত হইবে। বিবিধগুণে গুণবতী ও সবজান্তা হইবার প্রয়াস না করিয়া বস্তু ও বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ ও উহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিবার ও তাহার আভ্যন্তরীন রহস্যটুকু জানিবার এবং জ্ঞান ও শিল্পকলার মূল তত্ত্ব ও তাহার চরম পরিণতি অবধারণ করিবার শক্তিটিই তাহাদের অর্জ্জন এবং লালন করিতে হইবে। ইহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইবার পরও পঠদ্দশায় যাহা শিখিয়াছিল, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে অবাধে প্রয়োগ করিয়া সুফল পাইবে, এবং সর্ব্ব শক্তিতে শক্তিময়ী।

"দেহের স্বাস্থ্যে সুস্থ মন।" দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত নারী কেবলমাত্র যে নিজেই দুর্ভাগিনী, তাহা নহে; যে-গৃহের সে কর্ত্রী, সে গৃহেরও সে দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া উঠে। কিন্তু সেইখানেই তাহার অপরাধ শেষ হইয়া যায় না। সে তাহার পশ্চাতে ভবিষ্যদ্বংশধরগণের জন্যও দুঃখ রাখিয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কাও আছে এবং এই জন্য সমাজেরও সে এক অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। সুতরাং ছাত্রীরা যাহাতে প্রচুর ব্যায়াম চর্চ্চার দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকে, এবং আহার, নিদ্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ও অধ্যয়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বাস্থ্যতত্ত্বের নির্দ্ধারিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করে, এই দিকেই সমধিক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

টোকিও সহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের বিদ্যালয়। টোকিও সহরে অভিজাত সম্প্রদায়ের কন্যাদের জন্য যে-বিদ্যালয়টি আছে, মিকাদোর সাম্রাজ্যের ভিতর—সমুদয় সরকারী বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। রাজ-পরিবারের ও সম্ভ্রান্ত বংশের

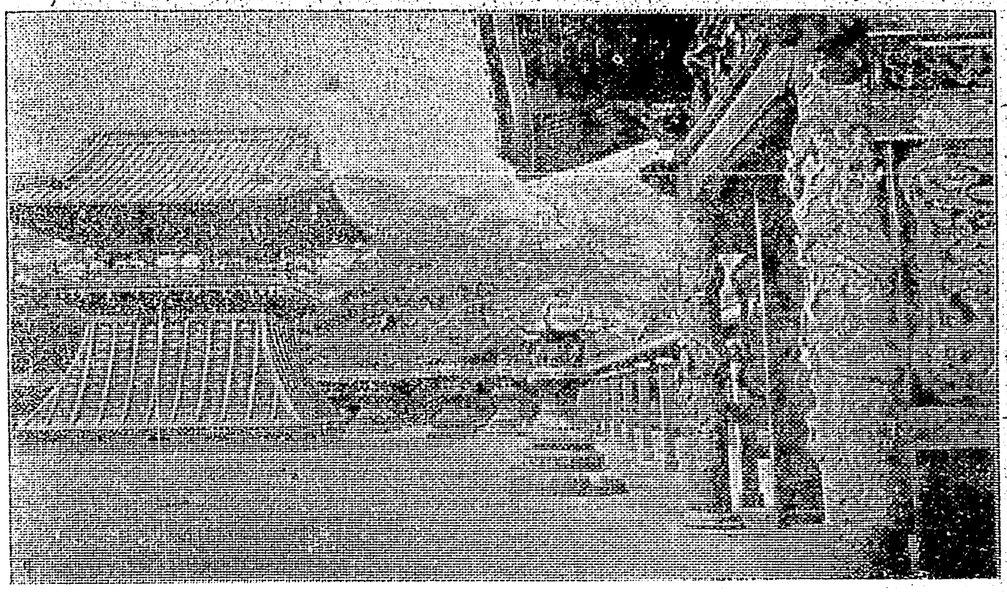

টোকিও সহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের বিদ্যালয়

কন্যাদের কল্যাণের জন্য সম্রাজ্ঞী হারুকোর পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উহা সহরের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত এবং য়ুরোপীয় আদর্শে নির্ম্মিত। অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলাগণের এই বিদ্যালয় নব্যতন্ত্রের শিক্ষা-সদনগুলির একটি হুবহু প্রতিরূপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জাপানী মেয়েদের শিক্ষার জন্য এই ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে।

স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের স্বজাতির অর্থাৎ অপর স্ত্রীলোকের প্রশংসা করিতে বিধিমতে কার্পণ্য করেন, কিন্তু অল্পকয়েকজন বিদেশিনী, যাঁহারা জাপানী মহিলাদেরও আপনার বন্ধু সংখ্যার মধ্যে গণনা করিতে পারেন—তাঁহারা কেহই শ্রীমতী হিয়ু ফ্রেজারের অভিমতটি সমর্থন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না,—যে—"প্রকৃত-নারীত্বের মানে,—জ্ঞান, বুদ্ধি মাধুরী, বীর্য্য ও বিনয়ের উচ্চ সমাবেশ!.....এই সকল গুণে জাপানী নারী পৃথিবীর যে কোন নারী জাতির সমযোগ্য এবং তুলনায় অধিকাংশকে অতিক্রম করিয়া যায়।'

'শীনওন্না দায়গাকু' বা স্ত্রীলোকের নূতন প্রয়োজনীয় বিদ্যা। পূর্ব্বে জাপানী মেয়েদের শিক্ষা যে পরিমাণে অবহেলিত হইয়াছে—তাহার তুলনায় দেখিতে গেলে এই অর্দ্ধশতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে এই বিভাগে কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর! তবে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে দেশে পাশ্চাত্য গতিবিধি সুরু হইবার অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষার কলকব্জা যদিও চলন-সই রকমের পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তথাপি শিক্ষার আদর্শ ও আনুমাণিক পদ্ধতির মধ্যে অনেকটা অনৈক্য থাকিয়া গিয়াছিল। মেয়েদের শিক্ষায় প্রকারান্তর করিবার জন্য কতকগুলি

বিদ্যালয় যে হালে স্থাপিত হইয়াছিল ইহা সত্য—কিন্তু কন্‌ফ্যুশীয় মতবাদ সমূহই যে তখন বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং একটা প্রভুত্বের প্রভাব চালাইয়াছিল, এ কথা আজও অবিসম্বাদী সত্য রহিয়াছে। 'ওন্না—দায়গাকুর' মধ্যে যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ ছিল, কেন্‌বোরাইয়োশই (বিজ্ঞ জননী আর চমৎকার স্ত্রী) প্রভৃতি অস্পষ্ট ও অনেকটা অপরিণত ধারণা-মূলক প্রবাদগুলিই তাহার প্রমাণ। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় ফুকুজাওয়া 'শীন ওন্না দায়গাকু' (স্ত্রীলোকগণের নূতন প্রয়োজনীয় বিদ্যা) নাম দিয়া 'ওন্না দায়গাকুর' একটি সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি 'ওন্না দায়গাকুর' সমস্ত অসঙ্গতি উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন; এবং উহার উপদেশাবলীকে সেকেলে বা—বর্ত্তমান যুগের অনুপযোগী—বলিয়া প্রকাশ্যে নিন্দা করিয়াছেন। স্ত্রীলোক ও তাহাদের মানুষ করিয়া তোলার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ফুকুজাওয়া—তাঁহার অভিমত তেইশটি অনুশাসন বা সূত্রের আকারে বিভক্ত করিয়া স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।—স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে পরস্পর মেলামেশার সুযোগ তিনি আরও বিস্তৃত করিয়া দিতে বলিয়াছেন। পিতা মাতা ও তাঁহাদের বিবাহিত পুত্র-কন্যার ভিন্ন সংসারে এবং পৃথকভাবে বসবাস, স্ত্রীর সম্বন্ধে শ্বশুরালয় সম্পর্কীয় কুটুম্বগণের হস্তক্ষেপ নিষেধ,—বিবাহ-ব্যাপারে স্ত্রীলোকগণেরও সমান অধিকার আছে ইত্যাদি অনেক উপদেশ দিয়াছেন। বিবাহ যে একটা চুক্তির সামিল, এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই স্ত্রীলোকগণের প্রতি তাঁহার উপদেশাবলী রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—এবং সেই কারণেই বোধ হয় তিনি বিবাহ সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকারের সত্ত্ব সাব্যস্ত করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরিবারের কন্যারা এবং হিন্দু ও মুসলমান গৃহের যে সব পর্দ্দানশীন মেয়েদের বাড়ীতে লেখা-পড়া শিখানো হয়, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে বাংলাদেশের মেয়েদের পড়াশুনা প্রায় চৌদ্দ বছরের মধ্যেই অথবা তার আগেই খতম হইয়া যায়। ঐ সব মেয়েদের ছাত্রীজীবন যদিও অল্পদিনমাত্র স্থায়ী, কিন্তু অন্যভাবের ও অন্য এক প্রকারের নিয়মাধীন হইয়া তাহারা যে শিক্ষা পায় তাহা প্রায়ই অত্যন্ত কঠোর। বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বৎসরে স্বামী-গৃহে বর্ষীয়সী নারীগণের শাসনাধীনে থাকিয়া তাহারা যে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা লাভ করে, তাহা যথার্থই কঠোর। যৌবনে সেই একই বয়সের য়ুরোপীয় মেয়েরা যেরূপ নিয়মে শিক্ষাধীন থাকে, ইহাদের নিয়মের বাঁধাবাঁধি ঠিক তাহার বিপরীত ধরণের হইলেও উহারও একটা সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। উহা ব্যক্তিগত প্রকৃতির পার্থক্য-অনুযায়ী যতটা সম্ভব প্রত্যেককে জীবনের একটা কোন আদর্শের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে, বংশপরম্পরা যে ধারা মানিয়া আসিতেছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে, এবং এমন কতকগুলি ধর্ম্মবিধান, যাহার ব্যবস্থা বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত থাকায় এখনও চলিয়া আসিতেছে উহাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয়। এই রকমের যে শৃঙ্খলা, যদিও ইহার মধ্যে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তিত

বুদ্ধি-বৃত্তির উন্মেষক কোন ব্যবস্থা নাই, তা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে ইহা এক প্রকার উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা-বিধি। যে আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই শিক্ষার ব্যবস্থা, সে সম্বন্ধে আমাদের যে অভিমতই থাকুক না কেন এবং অল্প বয়সের মেয়েদের দেহের অপরিপুষ্টতা ও বোধশক্তির দিকে সস্নেহ ও সযত্ন দৃষ্টি না রাখিয়া—উক্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ যে পরিমাণেই কঠোর হইয়া উঠিবার আশঙ্কা থাক না-তথাপি এ কথা কিছুতেই আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না যে উক্ত পদ্ধতির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে একটা সুনির্দ্দিষ্ট শিক্ষার সুযোগ আছে। এ শিক্ষা একটু সেকেলে ধরণের, অনেকটা যেন কারখানায় থাকিয়া মিস্ত্রীর কাজ শেখার মত, সংসাদের মধ্যে থাকিয়া গৃহ-কর্ম্ম শিক্ষা করা!

মেয়েদের প্রধান তিনটি সহজাত প্রবৃত্তি। ভারতীয় কন্যাদের প্রকৃতির মধ্যে তিনটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও শক্তি অসাধারণ সৌন্দর্য্য লইয়া বিকশিত হইতে দেখা যায়। অতি অল্প বয়সেই তাহাদের অন্তরের মধ্যে মাতৃভাবের অন্তর্নিহিত গুণটি ফুটিয়া উঠিতে থাকে। যে হিন্দু পরিবারের মধ্যে তাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তথাকার শিক্ষা উপদেশ ও নীরব অনুভাবের প্রভাবে তাহাদের এই সহজাত চিত্ত-বৃত্তিটি অধিকতর উদ্রিক্ত ও প্রবল হইয়া উঠে। ভারতীয় কন্যাদের প্রকৃতির মধ্যে এই মাতৃত্বের সহজাত প্রবৃত্তির সহিত আর একটি প্রবল শক্তি জড়িত থাকে,—সেটি ধর্ম্মভাব। পবিত্র হিন্দু যে কোন সুচরিতা মহিলার দৈনন্দিন প্রত্যেক কার্য্যটিই ধর্ম্মানুশাসিত হইয়া থাকে। সাংসারিক কার্য্যে ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দু রমণী হোমশিখার ন্যায় নিষ্পাপ! সে কোনরূপ যশের প্রত্যাশী নয়, সে নিরহঙ্কার এবং আপন লক্ষ্যে সতত সুদৃঢ় ও অচঞ্চল। সেখানে তাহার কর্ত্রীত্বের অপেক্ষা আদেশ-পালনের আনন্দটুকুতেই সমধিক আগ্রহ। তাহাদের এই স্বেচ্ছায় ও সগর্ব্বে বরণ করিয়া লওয়া যে অধীনতা, ইহা তাহাদিগকে সেবা করিবার একটা বিশুদ্ধ শক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি আনিয়া দেয়। এই ধর্ম্মপরায়ণা ভারত-ললনাদের তৃতীয় প্রধান স্বতঃ-প্রবৃত্তি হইতেছে, আদর্শকে রূপ দিবার শক্তি। যে কোন তুচ্ছ ও সামান্য বস্তুতেও সে একটা নিগূঢ় রহস্যময় রূপকের বিশেষত্ব আরোপ করে এবং সেই প্রতীকের ভিতর দিয়া সে অরূপকে প্রত্যক্ষ করে। তাহার নয়ন-মন বস্তুর মধ্যেই দৃষ্টির অগোচরকে সন্ধান করিয়া ফিরে। পরিশেষে আত্মসংযমের দ্বারা ও বিধি-নিষেধের নিয়মাধীন থাকিয়া তাহারা গভীর ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি লাভ করিতে পারে—এবং চিত্তবিক্ষেপী দুশ্চিন্তার শৃঙ্খলজাল অতিক্রম করিয়া এমন এক শান্তির মধ্যে আসিয়া পড়িতে পারে, যাহা বুদ্ধিরও অগোচর!

আধুনিক শিক্ষার কুফল। হিন্দু সম্প্রদায়-ভুক্ত অনেকেরই বিশ্বাস যে আধুনিক স্কুল-কলেজের শিক্ষার কতকগুলি প্রচলিত ধারা ও ব্যবস্থা তাঁহাদের কন্যাদিগের যে-সকল স্বাভাবিক গুণ ও বিশেষ ক্ষমতা থাকে তাহার পক্ষে হানিকর। তাঁহারা মনে করেন যে পাশ্চাত্য প্রথানুবর্ত্তী শিক্ষা-পদ্ধতির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রকরণ পল্লীর ধর্ম্ম-

সম্বন্ধীয় হিন্দু আদর্শের বিরোধী। তাঁহারা আরও মনে করেন যে চিত্তাকর্ষক অন্যান্য বিষয় ও পরীক্ষায় পাশ করা প্রভৃতি অপরাপর উদ্দেশ্য মেয়েদের মনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে যে প্রাচীন মতে স্ত্রীলোকের যাহা প্রধান কার্য্য, অর্থাৎ পত্নীর কর্ত্তব্য,—তাহা শিক্ষা করা ঘটিবেই না। এ কথাও বলা হয় যে, অন্য এক পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনীর তীব্র প্রভাব পারিবারিক প্রাধান্যের প্রতিবন্ধকতা সাধন করিবে। প্রতিদিন য়ুরোপীয় আদব-কায়দার অনুবর্ত্তী স্কুল এবং হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুর এই দুইয়ের পরস্পর-বিরোধী পৃথক পৃথক বিধি-নিয়মের অনুশাসন মানিয়া চলার যে ক্লান্তি, তাহাতে ছাত্রীদের স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে এ আশঙ্কাও অনেকে করেন। (কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশনের তদন্ত-পত্র—১৯১৭—১৯ সাল, ১ম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, ১০৩—৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান কারণই ভারতীয় নারীগণের উচ্চ শিক্ষার অন্তরায়-স্বরূপ—

ক। অত্যন্ত অল্প বয়সে বিবাহ।

খ। অত্যন্ত অল্প বয়সে সন্তানবতী হওয়া।

গ। অবরোধ-প্রথা।

ঘ। স্বতন্ত্র সামাজিক গঠন ও পারিপার্শ্বিক সংস্থান বিশেষ।

ঙ। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার একান্ত অসচ্ছলতা।

বিধান। ভারতে স্ত্রীশিক্ষা স্বতঃই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, যেমন—

১। যে সব মেয়েরা নিয়মিত স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে চায়, তাহাদের শিক্ষার জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা হওয়া উচিত, যেখানে ভারতীয় নারী-চরিত্রের বিশেষত্ব-রক্ষণোপযোগী পঠন-পাঠনের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে। কতকগুলি সংক্ষিপ্ত এবং দুর্ব্বোধ পারিভাষিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রম-শিল্প রসায়ণ শাস্ত্র, ভূবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা, প্রাকৃতিক জ্যোতিষ ইত্যাদির পরিবর্ত্তে অল্প আয়ে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করা, সুশৃঙ্খলে গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করা, রন্ধন-বিদ্যা, স্বাস্থ্যনীতি, শিশু-মনস্তত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, কলাবিদ্যা প্রভৃতি মেয়েদের শিক্ষার অঙ্গীভূত এবং তাহাদের উপাধি পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

২। যে সব মেয়েরা অবরোধের মধ্যে বাস করে এবং সামাজিক ও আর্থিক কারণ বিশেষে, সাধারণ পাঠাগারে যোগ দান করিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য আমরা প্রস্তাব করি যে তাহদের যোগ্যতা-অনুসারে এবং স্বতন্ত্র প্রয়োজনুযায়ী বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত টিকারীর মহিলা বিদ্যালয়ের মত একেবারে সম্পূর্ণ পর্দ্দানশীন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেখানে মেয়েদের ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত এই আট বৎসরের মধ্যে উপর্য্যুক্ত শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে দেওয়াইতে হইবে।

প্রাদেশিক জাতীয় ভাষাকেই বালিকা ও স্ত্রীলোকদের শিক্ষার বাহন করা উচিত এবং পরীক্ষা প্রভৃতিও তাহাদের মাতৃভাষায় প্রচলিত লওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

বাংলা ভাষার বর্ণ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব

সাহিত্যিক-দরবারে আজ একটা নতুন কথা পাড়্‌ব। মঞ্জুর হবে কি-না-হবে, জানিনা, তবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বিস্তর মাথা পেতে নিতে হবে, তা জানি। কারণ সনাতন প্রথার বিরুদ্ধে কিছু কর্‌তে গেলেই বিপদ! কথাটা এখন খুলে বলি। প্রস্তাবটা হচ্ছে, "আ" থেকে "ঔ" পর্য্যন্ত বর্ণগুলোকে ভাষা থেকে উঠিয়ে দেওয়া। অনেকে হয়ত হেসে বল্‌বেন, ছেলেমানুষী আর কি! স্বরবর্ণ হলো ব্যঞ্জনে নুন, আর তাকে কি না ভাষা থেকে তুলে দিয়ে নতুন কিছু কর্‌তে হবে! উত্তরে আমি বল্‌ব, নুনের অভাব মোটেই হবে না, এ-কে বাদ দিয়েও ভাষা-কার নুনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, আমি তা ধরিয়ে দেব মাত্র।

ইংরাজিতে A, E, I, O, U দ্বারা স্বরের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়ে থাকে। আমরা কিন্তু (অবশ্য সংস্কৃতকার) এর দুটা রূপ বা রকম করে নিয়েছি। একটা স্বরূপ, আর একটা তার সঙ্কেত বা Symbol (কিন্তু অ এর বেলা নয়)। এই Symbol যথা া, ি, ী, ু, ূ, ে, ৈ, ো, ৌ—এতে করে আমরা যে উপকৃত হয়েছি তাও নয়, বরং গোটা কয়েক বর্ণের বোঝা বাড়িয়েছি মাত্র। ইচ্ছা কর্‌লে এদের যে কোনো এক প্রস্থ বাদ দিয়েও আমরা অনায়াসে কাজ চালাতে পারি। ভাষার বর্ণগুলোকে যত কমানো যায় ততই ভাল, বিশেষ রকমে ভাল, বিদেশী শিক্ষার্থীর পক্ষে।

আমি সঙ্কেতটার কথাই এখন বল্‌ব। সঙ্কেত ব্যবহার এক জায়গায় কিন্তু চলে না, সে হচ্ছে "অ" এর বেলা। তার মীমাংসা "অ" যেমনি আছে তেমনি রাখা. নয়ত তার একটা Symbol সৃষ্টি করা। কিন্তু এখানেও গোল মেটে না। মুস্কিল আরো যে না আছে, তা নয়। যেমন লিখতে হবে, "বেআমল"। এ-কে যদি Symbol দিয়ে লিখি তবে তা হয়ে বসবে "বোমল"। যদি লিখতে হয় "এটা" তবে Symbol দিয়ে লিখতে গেলে তা হয়ে বসে "টো।" লিখ্‌তে হলে "ইন্দ্র" তা হবে "ন্দ্রি" ইত্যাদি। এ মুস্কিলেরও একটা আসান বের করা যেতে পারে। যেখানে এরকম গোলমালের আশঙ্কা থাকে, সেখানে "—" এরূপ ইংরেজী হাইফেন এর মত চিহ্ন ব্যবহার করা। যেমন "তেইশ" একে লেখা চলে "তে-শি", এই চিহ্ন-দ্বারা "তেশি"র গোলমাল থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। তেম্‌নি এক (ে-ক), ইন্দ্র (ি-ন্দ্র), বে-আমল (বে-ামল)। নীচে আরো খানিক বিস্তারিত ব্যবহার দেখিয়ে আলোচনা শেষ কর্‌ব।

(ক) "সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।"

(খ) মুহূর্ত্তে ঘনান্ধকারে সম্মুখ ে-নং পশ্চাৎ লেপিয়া ে-কাকার হই-য়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণে ে বামে সীমান্তরাল-প্রসারিত বিপুল দাম জলস্রোত ে-বং তাহাি- পর তীব্রগতিশীলা ে ক্ষুদ্র তরণীটি ে-বং কিশোর-বয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেি অপরিমেয় গম্ভীর রূপ পলব্ধি করিবার বয়স তাহা নহে, কিন্তু সে কথা ামি আজিো ভুলিতে পারি নাি।

দৃষ্টান্ত বোধ হয় এতেই যথেষ্ট হয়েছে। গোড়াতেই বলে রেখেছি যে এটা প্রস্তাব মাত্র। আইন গড়্‌তে যাওয়ার দুঃসাহস আমার নেই। প্রস্তাব করার অধিকার সকলেরই আছে, তাই করেছি। যুক্তির বলে প্রস্তাবটা কেউ বাতিল কর্‌তে পারেন তো তাতে আমার মোটেই ক্ষোভ হবে না। পক্ষান্তরে যুক্তির সম্মান করে প্রস্তাবটা কাজে লাগালে সুখী হব।

আমার জনৈক বন্ধু আপত্তি করে ছিলেন যে, ওরকম লিখ্‌লে বিশ্রী দেখাবে। আমি বলি, পুরাতনকে ভাঙ্গতে গেলেই জিনিষটা বিশ্রী ঠেকে। কিছুদিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুন্দর হয়ে যায়। সুন্দর কুৎসিত তো মনের কাছে। সংস্কার-বদ্ধ মনের নিকট নতুন বা কিছু, সবই কুৎসিত।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

নির্ব্বাণ ও জন্মান্তরবাদ

(বৌদ্ধমত)

বৌদ্ধমতে পুনর্জন্মবাদ ও নির্ব্বাণ ঃ—বৌদ্ধমতে মৃত্যুতে বাসনা ও কর্ম্মফল বিনষ্ট হয় না। আমার বাসনা হইতে একটি নূতন জীব জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করে; কর্ম্মফল অপরিহার্য্য। আমার বর্ত্তমান জীবন ও আমার মৃত্যুর পর আমার বাসনা-সম্ভূত জীবের জীবন একই জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অবস্থা মাত্র। কি প্রকারে আমার বাসনা হইতে একটি নূতন জীব উৎপন্ন হইয়া আমার কর্ম্মফল ভোগ করিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া পালি-ভাষাবিদ্ বৌদ্ধদর্শনে-পণ্ডিত Mr. T. W, Rhys Davids Hibbert Lectures 1881, গ্রন্থে লিখিয়াছেন "It is a mystery known only to the Buddhists.—এই রহস্য আমাদের অজ্ঞাত"। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভিন্ন দিক হইতে দেখিলে ইহার আর একটা অর্থও আছে। পিতা সন্তান-রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বপুরুষের সর্ব্ববিধ দোষ ও গুণ লইয়া (শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক) সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বর্ত্তমানে Eugenic Science (সুজনন বিদ্যা) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে—"Parents undoubtedly live over again in their offspring." জায়া শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এইরূপ।

কোন চিৎশক্তিসম্পন্ন অবিনাশী আত্মার স্থান বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার "Civilisation in the Buddhist Age" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আত্মার পরিবর্ত্তে বাসনা দ্বারা পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফলভোগের মীমাংসার চেষ্টা বৃথা, কথার মার-প্যাঁচ মাত্র। কোন কোন পাঠক আত্মার অভাবে পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফল-ভোগ সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট আমার উত্তর এই—আত্মার দ্বারাও পুনর্জন্মের মীমাংসা হয় না; কারণ স্মৃতিযোগেই ব্যক্তিত্বের একত্ব। স্মৃতির অভাবে ব্যক্তিত্বের একত্ব ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। রাম পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়া এ জীবনে, হরি-রূপে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এস্থলে হরির পূর্ব্বস্মৃতির অভাবে দুই ভিন্ন ব্যক্তির একত্ব অনুমান করা অসম্ভব। রাম করিল পাপ, আর শাস্তি পাইল হরি? ইহা ঘোর অবিচার। এজন্য পরবর্ত্তী বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'জাতিস্মর' কল্পনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধমতে রামের বাসনা-জাত হরি পূর্ব্ব জীবনের অর্থাৎ রামের পাপের ফলে অন্ধ হইয়াছে। হরি রাম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন; যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ বীজ হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। কার্য্য এবং কারণ একই বস্তুর ভিন্ন বিকাশ মাত্র। হরির জীবন রামময় বাসনা ও কর্ম্ম দ্বারা যুক্ত হইয়া রামের সহিত এক হইয়াছে। এই অর্থে রামের পুনর্জন্ম বৌদ্ধমতে স্বীকৃত হইয়াছে। (Buddhism—By Mr. Rhys Davids PP 91, 99, 124,135,144,and Budhism by Mr. T. W. Rhys Davids PP 103, 105 and Sacred Book of the East—Vol—Questions of King Milinda—ইত্যাদি গ্রন্থ আলোচ্য)। আমার কর্ম্মফলে এক নির্দ্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাইবে ইহা ভাবিতেও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভয়েই মানব পাপ হইতে বিরত হইবে; নরকের ভয়ে নহে। Mr. Rhys Davids এর মতে ইহাই বৌদ্ধনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব। "নির্ব্বাণ" লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। Rhys Davids ও Maxmuller বলেন, নির্ব্বাণ লাভের অর্থ বাসনার বা তৃষ্ণার বিনাশ দ্বারা পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভ এবং স্বীয় অন্তরের বিশুদ্ধি-সাধন ও প্রকৃত জ্ঞানদ্বারা ইহ জীবনেই প্রকৃত শান্তিলাভ। (Budhism—T. W. Rhys Davids pp 111,120,125,149, দ্রষ্টব্য)

বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর স্বীকৃত হন্ নাই, তজ্জন্য কোন কোন পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। তাহার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি,—বেদান্ত বলেন—শঙ্করাচার্য্যের মতে, আমা হইতে ভিন্ন, আমার অতীত, কোন ঈশ্বর আছে মনে করা মায়ার কার্য্য অবশ্য পারমার্থিক ভাবে। 'অহং ব্রহ্মোহস্মি' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আমিই একমাত্র সত্য বস্তু। জগৎ অধ্যাস আমারই মায়া-কল্পিত। আমিই জগৎ-স্রষ্টা ও জগৎ-বিধাতা। সাংখ্যকার "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অজ্ঞেয়বাদেরই সমর্থন করিতেছেন। নৈয়ায়িক ও মীমাংসকের মতে ঈশ্বর থাকিলে 'তটস্থ', জীবের কল্যাণ ও অকল্যাণে সম্পূর্ণ উদাসীন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত গীতায় ঈশ্বরবাদ, প্রফেসর শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস কৃত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্করদর্শন (১ম ভাগ) গ্রন্থদ্বয়ে ও স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কৃত 'জিজ্ঞাসা'র 'মুক্তি' প্রবন্ধে এই বিষয় বিশদরূপে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মিলিতোনা

৭

দোতালার সিঁড়ির মাথায় পৌঁছিয়া জুয়াঙ্কোর পা টলিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল; সেইখানে থামিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। জুয়াঙ্কো আপনাকেই ভয় করিতেছিল, যে সব কাণ্ড এখনই ঘটিবে তাহা মনে করিয়াই ভীত হইয়াছিল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পদ-দলিত করিলেই কি যথেষ্ট হইবে? মিলিতোনাকে কি হত্যা করিব? ঘরে কি আগুন লাগাইব? এইরূপ ভীষণ, অসঙ্গত, নানা প্রকার পাগলামি তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য চৈতন্যোদয় হইলে, জুয়াঙ্কো নীচে নামিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু ঈর্ষা-রাক্ষসী সেই সময় তাহার তীক্ষ্ণ শলাকা দিয়া জুয়াঙ্কোর হৃদয় বিদ্ধ করিল। তখন সে আবার সেই রূঢ় ধরণের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

একথা সত্য, জুয়াঙ্কোর মত বলিষ্ঠ লোক প্রায় দেখা যায় না। গ্রীবা থামের মতো গোলাকার ও সুদৃঢ়। মল্ল-সুলভ স্কন্ধের সহিত তাহার শক্তিমান মস্তক সংযুক্ত। তাহার দুর্জ্জয় বাহুদ্বয়ের উপর দিয়া আড়াআড়িভাবে ইস্পাতের মত পেশী-জাল প্রসারিত, তাহার বক্ষদেশ যেন সেকেলে গ্ল্যাডিয়েটারদের পাষাণবৎ বক্ষগুলাকে স্পর্দ্ধার সহিত যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। একহাত দিয়া কোনও ষাঁড়ের শিং সে অনায়াসে উৎপাটিত করিতে পারে এমনই তাহার বাহুবল। কিন্তু এই-সব সত্ত্বেও উৎকট মানসিক কষ্ট, এই দৈহিক বলকে একেবারে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। জুয়াঙ্কোর কপালে ঘাম ছুটিল, পায়ের উপর ভর দিয়া যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না: ঝলকে ঝলকে রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। চোখের উপর দিয়া যেন অনল-শিখা চলিয়া যাইতেছিল। পাছে সিঁড়ির উপর দিয়া গড়াইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে অনেকবার বাধ্য হইয়া সিঁড়ির গরাদে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। কি ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিল, ইহা হইতেই বেশ অনুমান করা যায়। সিঁড়িতে উঠিবার সময় প্রত্যেক ধাপের উপর হিংস্র জন্তুর মত দাঁত কিড়মিড়

করিতে করিতে এই কথাটা পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল ;—

"তার শোবার ঘরে !···তার শোবার ঘরে !"···এবং তাহার কটিবন্ধ হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া, যান্ত্রিকভাবে একবার খুলিতেছিল, একবার বন্ধ করিতেছিল। অবশেষে দরজার কাছে পৌঁছিয়া, নিশ্বাস রোধ করিয়া কর্ণপাত করিতে লাগিল।

কক্ষের ভিতরটা সব চুপ্‌চাপ্‌। নিজের বুকের ধুক্‌ধুক্‌ শব্দ ছাড়া জুয়াঙ্কো আর কিছুই শুনিতে পাইল না।

তাহার শত্রু ও তাহার মধ্যে এখন এই দরজার ব্যবধান আছে মাত্র। "দরজার পিছনে এই নিস্তব্ধ কক্ষে না জানি কি হইতেছে !" আহত ব্যক্তির কষ্টে কাতরও উদ্বিগ্ন হইয়া মিলিতোনা আহতের কষ্ট-লাঘবের জন্য, তাহার নিদ্রার প্রতীক্ষায় তাহার পালঙ্কের দিকে নিশ্চয়ই ঝুঁকিয়া আছে। সে মনে মনে ভাবিল ঃ—

"যদি আমি জানিতাম কেবল একটা ছোরার আঘাতই তোমাকে খুসী করিতে পারে, তোমার মনকে আর্দ্র করিতে পারে, তাহলে আমি তাহার উপরে ছোরা না চালাইয়া তোমার দরজার সাম্‌নে মরবার জন্য আমার নিজের বুকেই ছোরা বসাইতাম। কিন্তু তুমি আমার কষ্ট নিবারণের জন্য কিছুই করতে না, আমি রাস্তার উপর পড়ে থেকেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতুম। কেননা, সাদা দস্তানা-পরা কাটা-ছাঁটা লম্বা কোর্ত্তা-পরা, আমি ত একজন সুশ্রী ফিটফাট্‌ যুবা-পুরুষ নই !"

এই কল্পনায় তাহার রোষানলকে আবার উদ্দীপিত করায় তাহার হৃদয় খুবই ব্যথিত হইল।

আন্দ্রে পালঙ্কের উপর ক্ষতের যন্ত্রণায় শিহরিয়া উঠিতেছিল। মিলিতোনা তাহার শয্যার পাশেই বসিয়াছিল,—সে যেন কলকাঠির দ্বারা চালিত হইয়া একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। বুড়ী আল্‌দঞ্জা, স্বীয় বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ চুম্বন করিয়া ক্রশের চিহ্ন প্রদর্শন করিল।

দরজার বাহির দিক হইতে খুব একটা ঘা পড়িল,—ঐ আঘাতটা এমন সংক্ষিপ্ত, এমন জোরালো, এমন অনুজ্ঞাব্যঞ্জক যে দ্বার উদ্‌ঘাটন করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। দরজায় ঐরূপ আর একটা ঘা যেই পড়িল, অম্‌নি ভিতর দিক হইতে দরজার অর্গলটা নামিয়া গেল। আল্‌দঞ্জা বুড়ী, কম্পমান হস্তে, উঁকি-রন্ধ্রের কপাট খুলিয়া, সেই চৌকোণা রন্ধ্রের ভিতর দিয়া, জুয়াঙ্কোর মাথা দেখিতে পাইল। দেখিয়া বুড়ী বেচারী ভয়ে আঁৎকিয়া উঠিল। জুয়াঙ্কোকে ভিতরে ডাকিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহার শুষ্ক কণ্ঠ হইতে সে একটি শব্দও বাহির করিতে পারিল না। আঙ্গুলগুলা ছড়ানো, দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ, মুখ-বিবর খোলা—এই ভাবে বৃদ্ধা পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

এ কথা সত্য, ঐ বৃষ-মল্লের মুখ নিরীক্ষণ করিলে নির্ভয় হওয়া যায় না, কোনও ভরসা পাওয়া যায় না। তাহার চোখের চারিদিকে একটা লাল রেখার ঘের ; মুখ নীলবর্ণ ; এবং গালে রক্ত না থাকায় দুই গালে দুইটা সাদা দাগ পড়িয়াছে। নিজ বধ্য শিকারকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় হিংস্র পশুদের যেরূপ

হয়, সেইরূপ তাহার নাসারন্ধ্র ফুলিয়া-ফুলিয়া স্পন্দিত হইতেছিল। দন্তের দংশনে ঠোঁটের উপর দন্তের ছাপ্‌ পড়িয়াছিল। এই বিপর্য্যস্ত মুখমণ্ডলের উপর রোষ ও প্রতিহিংসা যুঝাযুঝি করিতেছিল।

বৃদ্ধা বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল ঃ—

"মেরী-মা রক্ষা কর, রক্ষা কর। যদি মা তুমি আমাগিকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর, তাহলে তোমাকে ৯দিনের পূজো দেব, ঝালোর-ওয়ালা একটা মোমবাতী দেব, আর একমুঠো মখ্‌মল্‌ দেব।"

যে বিপদে আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই, সেই বিপদ উপস্থিত হইলে খুব নির্ভীক লোকদিগেরও যেরূপ মনের ভাব হয়, আন্দ্রে খুব সাহসী হইলেও তাহার ঐরূপ মনের ভাব হইয়াছিল। যেন কোন-একটা অস্ত্র খুঁজিতেছে এইভাবে সে যন্ত্রবৎ হাত বাড়াইল।

জুয়াঙ্কো যখন দেখিল, কেহ দরজা খুলিতেছে না, তখন সে তার কাঁধের ঠেস্‌ দিয়া দরজায় খুব একটা চাপ দিল ; দরজার তক্তাগুলা মড়মড় করিয়া উঠিল। কব্‌জা ও তালার চারিদিক্‌ হইতে পলস্তারা খসিয়া পড়িতে লাগিল।

মিলিতোনা, আন্দ্রের সম্মুখে, দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে ও শান্তভাবে ভীতিবিহ্বলা বৃদ্ধাকে বলিল ঃ—

"আল্‌দঞ্জা, দরজা খুলে দাও, আমি বল্‌চি দরজা খুলে দাও।"

আল্‌দঞ্জা অর্গল খুলিয়া, দেয়ালের দিকে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটা কবাট উল্টাইয়া দিয়া তাহার ভিতর গা-ঢাকা দিয়া রহিল।

জুয়াঙ্কো মনে করিয়াছিল, উহাকে সহজে প্রবেশ করিতে দিবে না—কিন্তু কোন বাধা না পাইয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইল। এখন সে ধীরপদক্ষেপে প্রবেশ করিল। কিন্তু যখন দেখিল, আন্দ্রে মিলিতোনার পালঙ্কে শুইয়া আছে, তখন তাহার প্রচণ্ড রোষ আবার ফিরিয়া আসিল। অন্তিমকাল উপস্থিত মনে করিয়া বৃদ্ধা যে কপাটের আড়ালে লুকাইয়া ছিল, সেই কপাটটা সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল। এক্ষণে বেচারী বৃদ্ধার সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও, জুয়াঙ্কো সেই কপাটটা ধরিয়া জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর দরজায় পিঠ দিয়া, বক্ষের উপর বাহুদ্বয় আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধা বিড়বিড় করিয়া বলিল ঃ—

"বাবারে ! ও আমাদের তিনজনকেই খুন করবে দেখ্‌ছি। এই জান্‌লা দিয়ে পুলিস ডাক্‌ব কি ?" বৃদ্ধা জান্‌লার দিকে এক পা আগাইয়া গেল। কিন্তু জুয়াঙ্কো, তাহার মৎলব বুঝিতে পারিয়া, চট্‌ করিয়া গিয়া উহার কাপড়ের খুঁট ধরিয়া ফেলিল এবং উহাকে হড় হড় করিয়া টানিয়া আনিল। "দেখ্‌ ডাইনী, চ্যাঁচাস্‌ যদি, মুর্গির মতো তোকে গলা টিপে মারব। আমার শত্রু ও আমার মধ্যে যদি তুই এসে আমার কাজে বাধা দিস্‌, তাহলে তোকে একেবারে পিষে ফেলব।" আন্দ্রেকে দেখাইয়া সে এই কথাগুলা বলিল। আন্দ্রের মুখ পাণ্ডুবর্ণ, দেহ যার-পর-নাই দুর্ব্বল। আন্দ্রে বালিস হইতে মাথাটা একটু উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

অবস্থাটা বড়ই ভীষণ ; কোন গোলমাল নাই, কোন শব্দ নাই, যে তাহা শুনিয়া পাড়া-পড়সীরা ছুটিয়া আসিবে। তাছাড়া, জুয়াঙ্কো

রুষ্ট হইয়াছে জানিতে পারিলে প্রতিবাসীরা ভয়ে গৃহ হইতে বাহির হইব না—এই ঝগড়ায় কখনই হস্তক্ষেপ করিবে না। পুলিস ডাকিয়া আনিতে গেলে, অনেক বিলম্ব হইবে; কোনো বাহিরের লোককে ত জানানো আবশ্যক; কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইবার যে কোন উপায় নাই!

ছোরার আঘাতে আহত বেচারী আন্দ্রে রক্তস্রাবে ক্ষীণ লইয়া পড়িয়াছে; তাতে আবার এখন নিরস্ত্র; অস্ত্র থাকিলেও অস্ত্র চালনা করিবার মতো তাহার অবস্থা ছিল না, এক্ষণে ক্ষত-বন্ধনের কাপড় ও লেপ-কাঁথার ভারেই সে জড়সড়, আত্মরক্ষণের কোন উপায় নাই—নির্দ্দয় শত্রুর ঈর্ষা ও রোষের ফল এখন অগত্যা ভোগ করিতে হইবে! আর এই সমস্ত ঘটিল সার্কাশে শুধু শ্রমজীবী-শ্রেণীর একটি সুন্দরী রমণীর পার্শ্বমুখ দেখিয়া! এই সময় এক মুহূর্ত্তের জন্য, পিয়ানোর জন্য, চায়ের জন্য, সভ্যতার নিতান্ত গন্ত ধরণের আচার-ব্যবহারের জন্য তার একটু অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল, বোধ হয় এই কথা এখানে স্বীকার করিতে কোন দোষ নাই। তথাপি আন্দ্রে মিলিতোনার উপর একটি অনুনয়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—তাহার ভাবার্থ এই, যেন মিলিতোনা তার জন্য নিষ্ফল যুঝাযুঝি না করে। মিলিতোনার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহার এই ভীতি-জাত পাণ্ডুবর্ণে তাহার সৌন্দর্য্য যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সব বিপদ সত্ত্বেও, আন্দ্রের মনে হইল, মিলিতোনার সহিত পরিচয় হওয়ায় সে আদৌ দুঃখিত নহে—বরং ইহা তাহার পরম সৌভাগ্যের

মিলিতোনা সেইখানে দাঁড়াইয়া এক হাতে আন্দ্রের পালঙ্কের কিনারা ধরিয়া আছে, আর এক হাত, মহিমাময়ী রাজরাণীর মতো আদেশের ভঙ্গীতে দ্বারের অভিমুখে প্রসারিত;—মিলিতোনা কম্পিতস্বরে জুয়াঙ্কোকে বলিল:—

"—নর-হত্যাকারী পিশাচ, কি জন্য তুমি এখানে এসেছ? তুমি প্রণয়ীকে খুঁজচ—কিন্তু এই ঘরে একজন আহত ছাড়া আর কেউ নেই। এখনি প্রস্থান কর। তোমার কি ভয় হয় না, তুমি উপস্থিত থাক্‌লে, ক্ষতস্থান দিয়ে আবার রক্তস্রাব হতে পারে। হত্যার চেষ্টা করেও যথেষ্ট হল না, আবার গুপ্ত হত্যা?"

তরুণী বালা এই "গুপ্তহত্যা" কথাটার উপর এমন একটা বিশেষ ধরণে ঝোঁক দিয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে এমন একটা মর্ম্মভেদী চাহুনী চাহিয়াছিল যে, জুয়াঙ্কোর চিত্ত বিচলিত হইল, লজ্জায় উহার মুখ লাল হইল, এবং তাহার হিংস্র-ভীষণ মুখের ভাবে ব্যাকুলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। খানিক-ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর, আটকিয়া-যাওয়া ভাঙাভাঙা স্বরে বলিল;—"দেবতা সাক্ষী করে, মাতৃদেবীকে সাক্ষী করে, শপথ কর্ যে, এই যুবককে তুই ভাল বাসিস্ নে, তাহলে এখনি আমি এখান থেকে চলে যাব।"

তরুণী কোন উত্তর দিল না।

তরুণীর ঈষৎ-রক্তিম মুখমণ্ডলের উপর তাহার কৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি আনমিত হইল।

এই নিস্তব্ধতা আন্দ্রের পক্ষে মৃত্যুদণ্ডের নীরব ঘোষণা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আন্দ্রে উদ্বিগ্নচিত্তে মিলিতোনার উত্তর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোন উত্তর দিল না

দেখিয়া আন্দ্রের হৃদয় অনির্ব্বচনীয় সন্তোষে পরিপ্লাবিত হইল।

জুয়াঙ্কো আবার বলিল:—

"যদি শপথ করতে না চাস, শুধু একটা মুখের কথা বল্। তাহলেই আমি বিশ্বাস করব। তুই কখনও মিথ্যা কথা বলিস্ নি। এখনো তুই চুপ্ করে রয়েচিস?—তবে তোকে খুন করব।"…এই কথা বলিয়া জুয়াঙ্কো ছোরা খুলিয়া পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হইল…"তুই ওকে ভালবাসিস্!" তরুণীর চোখ্ হইতে যেন আগুন ছুটিতে লাগিল,—সে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল,—"আমার জন্য ওর যদি মরতেই হয়, তাহলে অন্ততঃ ও এইটুক জানুক যে, ও আমার ভালাবাসা পেয়ে মরেচে। এই কথাটা ওর কবরের মধ্যে নিয়ে যাক্—এই ওর পুরস্কার-স্বরূপ হবে, আর তোর পক্ষে এই হবে মৃত্যুদণ্ড।"

জুয়াঙ্কো এক লাফে মিলিতোনার পার্শ্বে আসিয়া সজোরে তাহার বাহু ধরিল।

"এখন যা বল্লি, আবার যেন এই কথা মুখ দিয়ে বের না হয়—যদি ফের এই কথা বলিস্, তাহলে আমার এই ছোরা তোর বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে, ঐ হতভাগার শরীরের উপর তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।"

নির্ভীক বালা বলিল,—"তাতে আমার কি এল-গেল? তুমি কি মনে করচ ও মরে গেলে, আমি বাঁচব?"

আন্দ্রে পালঙ্কের উপর একবার উঠিয়া বসিতে খুব চেষ্টা করিল। খুব উচ্চৈঃস্বরে কি-একটা কথা বলিবে মনে করিল। কিন্তু ঠিক্ এই সময়ে একটা লাল গাঁজ্‌লা ঠোঁটের উপর উঠিল; ক্ষতস্থানের মুখ আবার খুলিয়া গেল। আন্দ্রে বালিসের উপর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

আন্দ্রের এই অবস্থা দখিয়া মিলিতোনা বলিল:—

"তুমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে না যাও, তাহলে আমি মনে করব, তুমি অতি নীচ, নির্লজ্জ ও ভীরু; আমি তাহলে বিশ্বাস করব,—যখন সার্কাসে ষাঁড়টা দোমাঙ্গের বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছিল, তুমি তাকে অনায়াসে বাঁচাতে পারতে, কিন্তু নীচ ঈর্ষার বশে তুমি তা কর নি।"

—"মিলিতোনা! মিলিতোনা! তোমাকে আমি যতটা ভাল বেসেছি কোনো পুরুষ কোনো রমণীকে কখনো তেমন ভাল বাসে নি,—তবু আমার প্রতি বিরাগ দেখাবার অধিকার তোমার আছে; কিন্তু আমাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তোমার নাই। দোমাঙ্গকে কিছুতেই বাঁচানো যেতে পারত না!"

—"তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে গুপ্ত-ঘাতক মনে করব না, তাহলে এখনি এখান থেকে প্রস্থান কর!"

জুয়াঙ্কো বিষণ্ণস্বরে উত্তর করিল;—

"আচ্ছা,—যতদিন না ও সেরে ওঠে, আমি অপেক্ষা করব; ভাল করে' শুশ্রূষা কর!…আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি বেঁচে থাক্‌তে, তুমি আর কারও হতে পাবে না।"

যখন এই বাদানুবাদ চলিতেছিল, বৃদ্ধা দরজার কপাট খুলিয়া, পাড়ার লোকদের সাহায্য চাহিয়া সঙ্কেতধ্বনি করিয়াছিল তখনি পাঁচ ছয় জন লোক আসিয়া জুয়াঙ্কোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জুয়াঙ্কো ঘর হইতে

বাহির হইল। লোকগুলা তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। জুয়াঙ্কো এক-এক ঝাঁকুনি দিয়া তাহাদিগকে দেয়ালের উপর ছিটকাইয়া ফেলিতে লাগিল।

তাহার পর জুয়াঙ্কো রাস্তার সানের উপর দিয়া ধীর-পদক্ষেপে ও শান্তভাবে চলিতে লাগিল।

এই সমস্ত ব্যাপারে আন্দ্রের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিল। আন্দ্রে উৎকট জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি এবং পরদিন পর্য্যন্ত প্রলাপ বকিতে লাগিল।

মিলিতোনা প্রেমপূর্ণ উদ্বেগ-ভরে খুব সন্তর্পণে ও সযত্নে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এই সময়ে,—পাঠককে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর আর্গমসুল্লা ও কোভাচুল্লা জানিতে পারিয়াছে যে রাস্তায় সেই আহত ব্যক্তি আন্দ্রে ছাড়া আর কেহ নহে। ঐ অঞ্চলের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটও ডন্ জেরোনিমোকে লিখিলেন,—যে যুবকের সংবাদ জানিবার জন্য আপনি খুব উৎসুক ছিলেন, তাহাকে, একজন 'ম্যানোলা'র (শ্রমজীবী শ্রেণী রমণী) গৃহের দরজার সম্মুখে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সেই ম্যানোলা রমণীর গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু জানি না, তখন তাহার শরীর শ্রমজীবীর পরিচ্ছদে কেন আবৃত ছিল।

এই সংবাদ পাইয়া ফেলিসিয়ানার মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল,—কোন বাগ্‌দত্তা তরুণী, পিতাকে কিংবা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া, গুরুতর আঘাতে আহত তাহার ভাবী পতিকে দেখিতে যাইতে পারে কিনা। একজন সুশিক্ষিতা নব যুবতী কোন পুরুষ মানুষকে তাহার পালঙ্কে বিবাহের পূর্ব্বে দেখিলে একটা ভয়ানক কেলেঙ্কারি হইবে না কি? যদিও রোগ-যন্ত্রণার পবিত্রতা রোগশয্যাকেও নিষ্কলঙ্ক করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি কোনও অকলঙ্ক সতী কুমারীর পক্ষে ইহা কি বর্জ্জনীয় নহে? কিন্তু আন্দ্রে যদি মনে করে আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি—আর সেই দুঃখেই যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেটা বড় দুঃখের বিষয় হইবে। ফেলিসিয়ানা বলিল:—"বাবা, বেচারী আন্দ্রেকে আমাদের একবার দেখতে যাওয়া উচিত।"

তাহার সদাশয় পিতা উত্তর করিলেন:—"আমি এতে খুব রাজি। আমিও তোকে এই প্রস্তাব করতে যাচ্ছিলাম।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মারিয়ানা

ব্যক্তিগণ

ক্লোদিও (Claudio)—হাকিম
কেলিও (Cœlio)
অক্তাভ (Octave)
তিবিয়া (Tibia)—ক্লোদিওর অনুচর
পিপ্পো (Pippo)—কেলিওর অনুচর
মালভোলিও (Malvolio)—হেরমিয়ার গোমস্তা
সরাইখানার ছোকরা
মারিয়ানা (Marianne)—ক্লোদিওর পত্নী
হেরমিয়া (Hermia)—কেলিওর মাতা
চিয়ূতা (Ciuta)—জনৈক বৃদ্ধা
ভৃত্যবৃন্দ

ঘটনা নেপলস (Naples) সহরে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ক্লোদিওর বাটীর সম্মুখে একটি রাস্তা। মারিয়ানা উপাসনা-পুস্তক হাতে করিয়া বাটী হইতে বাহির হইতেছিল; চিয়ূতা তাহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল।)

চিয়ূতা। ভদ্রে, আপনাকে একটা কথা বল্‌তে পারি কি?

মারিয়ানা। কি চান আপনি?

চিয়ূতা। এই সহরের একটি ছেলে আপনার প্রেমে পাগল; পুরো একটি মাস ধরে সে আপনাকে কথাটা জানাতে বৃথায় সুযোগ খুঁজে বেড়িয়েছে; নাম তার কেলিও; বনেদী ঘরের ছেলে সে, নিজেও দেখ্‌তে সুপুরুষ।

মারিয়ানা। হয়েছে, হয়েছে। আপনাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে গিয়ে বলবেন, সময় ও শ্রম তাঁর অযথা নষ্ট হচ্ছে, এ ধরণের কথা আমায় শোনাতে যদি তিনি আবার সাহস করেন তবে আমার স্বামীকে তা জানাবো।

(প্রস্থান)

কেলিও। (প্রবেশ করিয়া) কি হ'ল, চিয়ূতা? কি বল্‌লে?

চিয়ূতা। তেমনি সাধ্বী, তেমনি গরবিনী সে। বল্‌লে, যদি বেশী বিরক্ত করা হয় তবে তার স্বামীকে জানিয়ে দেবে।

কেলিও। হায়! কি হতভাগ্য আমি! আমার এখন মৃত্যুই শ্রেয়। ওঃ! এমন নিষ্ঠুর রমণীও আছে! আর কোন্ উপায় আমার থাক্‌তে পারে? তুমি আমায় কি কর্‌তে বল, চিয়ূতা?

চিয়ূতা। আমি তোমায় সবার আগে বলি, এখান থেকে স'রে যেতে। ঐ যে তার পেছনে আসছে তার স্বামী।

(উভয়ের প্রস্থান। ক্লোদিও এবং তিবিয়া'র প্রবেশ)

ক্লোদিও। তুমি কি আমার অনুগত সেবক, আমার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর? শোন তবে, আমায় একটা ভীষণ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

তিবিয়া। আপনার অপমান?

ক্লোদিও। হ্যাঁ, আমারই। নইলে, এই বেহায়া সেতারগুলো আমার স্ত্রীর জানলার তলে গুণ-গুণ কর্‌বে কেন?

আচ্ছা, সবুর। এখানেই সব শেষ হচ্ছে না। —এদিকে ফেরো একটু; লোকজন রয়েছে, আমাদের কথা শুন্‌তে পাবে। তোমাকে যে গুণ্ডার কথা বলেছি আজ সন্ধ্যার সময় তাকে নিয়ে আস্‌তে হবে।

তিবিয়া। কিসের জন্যে ?

ক্লোদিও। আমার বিশ্বাস, মারিয়ানা'র গুপ্তপ্রণয়ী আছে।

তিবিয়া। আপনার বিশ্বাস ?

ক্লোদিও। হাঁ। বাড়ীটার চারদিকে গুপ্ত প্রণয়ীর কেমন একটা গন্ধ বেরিয়েছে। আমার ফটকের সামনে দিয়ে কেউ সহজভাবে চলে যায় না। সেতারের ঝন্‌ঝনানিতে কুট্‌নীর আনাগোনায় সব সরগরম হয়ে উঠেছে।

তিবিয়া। কেউ যদি আপনার স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে প্রেমের ছড়া গায়, তা কি আপনি ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারেন ?

ক্লোদিও। না, তা পারি নে; কিন্তু খিড়কী দোরের পেছনে আমি লোক বসিয়ে রাখ্‌তে পারি, আর তাকে দিয়ে যিনিই প্রথম ঢুকবেন তাঁর গর্দ্দানটি নেওয়াতে পারি।

তিবিয়া। ছিঃ। আপনার স্ত্রীর প্রণয়ী কেউ নেই। তা হ'লে আমারও প্রণয়িনী আছে, আপনি বল্‌তে পারেন !

ক্লোদিও। কেন তোমার তা থাক্‌তে পারে না, তিবিয়া ? তুমি দেখ্‌তে খুব কুচ্ছিৎ বট, কিন্তু বুদ্ধি রাখ ঢের।

তিবিয়া। তা বটে, তা বটে !

ক্লোদিও। দেখ, তিবিয়া, তুমি নিজেই স্বীকার করছ। না, সন্দেহ কর্‌বার আর যো নেই, আমার অপমান জানাজানি হয়ে গেছে।

তিবিয়া। জানাজানি হ'ল কেমন করে ?

ক্লোদিও। বল্‌ছি জানাজানি হয়েছে।

তিবিয়া। কিন্তু সারা সহরটাতে আপনার স্ত্রী ত সতী-সাধ্বী বলে খ্যাত। তিনি কা'রো সঙ্গে দেখা করেন না, এক উপাসনার সময় ছাড়া আর কখনও বাসা থেকে বের'ই হন না।

ক্লোদিও। যা বলি আমি, তাই শোনো।—তিবিয়া, একটা ভয়ঙ্কর মৎলব বসে বসে ফাঁদছি আমি। কি যন্ত্রণা,—আর বুঝি বাঁচিনে।

তিবিয়া। ও কি কথা !

ক্লোদিও। তোমাকে যা বলি তা অনুগ্রহ করে বিশ্বাস করে নিও।

(উভয়ের প্রস্থান)

কেলিও। (পুনঃপ্রবেশ করিয়া) ধিক্ তার জীবনে, ভরা যৌবনের মাঝে যে হতাশ-প্রণয় নিয়ে মজেছে ! ধিক্ তার জীবনে, যে একটা মধুর কল্পনার আবেশে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে, অথচ জানে না—এ অলীক স্বপ্ন কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে, জানে না প্রতিদানে তার কিছু মিল্‌বে কি না। তরণীর উপর আরামে সে শুয়ে, আস্তে আস্তে তীর হ'তে সরে গিয়েছে, সুদূরে দেখ্‌ছে মায়ার কানন, সবুজ প্রান্তর, তার স্বর্গের ক্ষীণ মরীচিকা। বাতাস তাকে নিঃশব্দে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, কিন্তু সত্যের স্পর্শে জেগে উঠে দেখ্‌বে, যে-তীর ছেড়ে এসেছে তা থেকে সে যতদূরে, লক্ষ্য-স্থান থেকেও ঠিক ততদূরে সে পড়ে আছে—আর সাম্‌নেও চলবার উপায় নেই, পিছনেও ফের্‌বার উপায় নেই।

(রাজনার শব্দ শোনা গেল)

ও কিসের সঙ্ ? অক্তাভকে দেখ্‌ছি না ?

(অক্তাভের প্রবেশ)

অক্তাভ। বন্ধুবর মহাশয়, আপনার বিরহ-শ্রী আছেন কেমন ?

কেলিও। অক্তাভ ! কি পাগল তুই ! গালের ওপর তোর যে একহাত পুরু লাল রং ! তোর এ সাজ কেন ? ভরা দিনের মধ্যে তোর লজ্জা করে না ?

অক্তাভ। কেলিও ! কি পাগল তুই ! গালের ওপর তোর যে একহাত পুরু সাদা রং ! তোর এ কালো পোষাক কেন ? ভরা-উৎসবের মধ্যে তোর লজ্জা করে না ?

কেলিও। কেমনধারা জীবন তোর ! হয় তুই মাতাল, না হয় আমিই বা মাতাল।

অক্তাভ। হয় তুই প্রেমে পড়েছিস্, না হয় আমিই বা পড়েছি।

কেলিও। চিরদিন যেমন, তেমনি সুন্দরী মারিয়ানার প্রেমে।

অক্তাভ। চিরদিন যেমন, তেমনি শীপ্রা-দেশের মদের প্রেমে।

কেলিও। তোর বাসায় যাচ্ছিলুম, এই পথে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল।

অক্তাভ। আমি যাচ্ছিলুম আমার বাসায়। আমার বাসাটা আছে কেমন ? এই আট দিন তাকে দেখি নি।

কেলিও। তোকে আমার একটু উপকার করতে হবে।

অক্তাভ। কি বল, কেলিও বাছাধন, আমার। টাকা চাও ? তা আর আমার নেই। বুদ্ধি চাও ? আমি মাতাল। আমার তরোয়ালখানা চাও ? এই ধর, একখানা ভোঁতা লাঠি। বল, বল, আমায় নিয়ে যা খুসী কর।

কেলিও। কতদিন এ ভাবে যাবে ? আট-দিন বাসায় নেই ! তুই মারা পড়্‌বি, অক্তাভ।

অক্তাভ। কখ্‌খনো নিজের হাতে নয়; না, ভাই, কখ্‌খনো নয়। আমি মর্‌তে রাজি, কিন্তু আমার নিজের গায়ে নিজে আমি হাত তুল্‌বো না।

কেলিও। তোর যে জীবন, তা কি এক-রকম আত্মহত্যাই নয় ?

অক্তাভ। মনে কর, দড়ির ওপর নাচ-ওয়ালা একজন, পায়ে নাল-বাঁধা বুটজুতো হাতে লম্বা বাঁশ, পৃথিবী আর আকাশের মাঝখানে দোল খাচ্ছে; তার ডাইনে বাঁয়ে রয়েছে যত জরা-জীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার ছোট্ট ছোট্ট চেহারা, যত শুক্‌নো পিংশে শ্বেতমূর্ত্তি, চতুর দেন্‌দারের দল, আত্মীয়-স্বজনের, বারবনিতার দল; বিকট রাক্ষসদের একটা পুরো পল্টন তার কাপড় ধরে ঝুলে পড়ছে, তাকে ফেলে দিতে চারদিক থেকে টানাটানি করছে; ঘোর লম্বা লম্বা কথার বহর, বড় বড় শব্দের স্তূপ তাকে ঘিরে যেন কদমে ছুট্‌ছে; ভবিষ্যৎবাণী সব মেঘের মত কালো পক্ষ বিস্তার করে তাকে অন্ধ করে ফেলেছে। তবুও লঘুপদে সে পূব হতে পশ্চিমে তার পথে চলেইছে। নীচের দিকে যদি তাকায়, তবে পা ফস্‌কে যায়। বাতাসের আগে সে চলেছে; চারিদিক থেকে যত হাতই প্রসারিত হোক না কেন, সে যে আনন্দের পাত্র নিজে হাতে ধরে রয়েছে, তা কেউ উল্‌টে ফেলতে পারবে না। ভাই, এই হচ্ছে আমার জীবন, আমার নিজের হুবহু চিত্র।

কেলিও। তুই পাগল, কি সুখী তুই!

অক্তাভ। তুই সুখী নোস্, কি পাগল তুই! আচ্ছা বল্‌ত দেখি, তোর কিসের অভাব?

কেলিও। আমার অভাব শাশ্বত, সেই মধুর নির্ভাবনার—যার প্রসাদে জীবনটা হয়ে দাঁড়ায় একখানা আরশীর মত, তাতে সব জিনিষেরই ছবি এক নিমেষে ফুটে ওঠে, আবার সবই পিছলে পড়ে যায়। কিন্তু আমার কাছে এক একটা কর্ত্তব্য মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা। ভালবাসাকে তোমরা আর সকলে একটু ক্ষণিক আমোদ বলে মনে কর, আমার কিন্তু তাতে সমস্ত জীবনটা উদ্ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভাই রে, তুই কখনো জান্‌বি নে, আমার মত করে ভালবাসার অর্থ কি? আমার কাজ-কর্ম্ম সব আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি; একটা মাস ধরে দিনে রাত্তিরে এই বাসাটির চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আহা! চাঁদ যখন উঠ্‌তে থাকে, তখন ঐ বাগানটির ঐ কোণে, ঐ ছোট ছোট গাছগুলির তলায় আমি আমার ক্ষুদ্র গানের দলটি জড় করি, নিজে তাল দিতে দিতে শুন্‌তে থাকি তাদের মুখে মারিয়ানার রূপ-কীর্ত্তন; কি আবেশেই না তখন আমি মুগ্ধ হয়ে যাই! কিন্তু সে ত কোন দিন জানালায় এসে দেখা দিলে না, কোনদিনও ত ঘুলঘুলির উপর তার সুন্দর কপালটি ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল না!

অক্তাভ। কে মারিয়ানা? আমার আত্মীয়াটি কি?

কেলিও। সে-ই। বৃদ্ধ ক্লোদিওর স্ত্রী।

অক্তাভ। আমি তাকে কখনো দেখি নি, তবুও সে আমার আত্মীয়াই বটে। তোর কাজের ভার সব আমার উপর দিয়ে দে ত, কেলিও।

কেলিও। কত রকমে তাকে আমার ভালবাসা জানাতে চেষ্টা করেছি, সব বিফল। কন্‌ভেণ্ট থেকে শিক্ষা পেয়ে সে বেরিয়েছে; পতির উপর অগাধ ভক্তি, কর্ত্তব্যের উপর বড় নিষ্ঠা। তার বাসায় সহরের কোন যুবক যেতে পায় না, তার কাছেও কারো ঘেঁসবার জো নেই।

অক্তাভ। বটে! দেখ্‌তে কেমন—সুন্দরী? কি বোকা আমি! তুই যখন তাকে ভালই বাসিস্, ওতে কি আর এসে যায়? আচ্ছা, আমার দ্বারা কি হতে পারে?

কেলিও। প্রাণ খুলে বল্‌ব? হাসবি না?

অক্তাভ। আমি না হয় হাস্‌ব, তুই প্রাণ খুলে বল্।

কেলিও। তুই তার আত্মীয়, সে বাড়ীতে নিশ্চয়ই ঢুক্‌তে পার্‌বি।

অক্তাভ। পার্‌ব কি? তা জানিনে। ধরে নে, ঢুক্‌তে পারি। কিন্তু সত্য কথা কি, আমাদের স্বনাম-ধন্য পরিবারটি পাটের গাঁট নয় অর্থাৎ আমাদের পরস্পরের গা-মাখামাখি একটু কম, ছোঁয়াছানি যা চলে, চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে। তবু যা হোক্, মারিয়ানা আমার নাম জানে। চোর হয়ে তাকে কিছু বল্‌তে হবে কি?

কেলিও। বিশবার তার মুখোমুখি হ'তে আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাছে গিয়ে বিশ বারই আমার পা টলে গেছে। বাধ্য হয়ে শেষে চিয়ুতা বুড়ীটাকে পাঠিয়েছি. তাকে দেখ্‌লে, আমার গলা চেপে আসে, নিশ্বাস

বন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ঠোঁট অবধি ঠেলে এলো।

অক্তাভ। আমিও এ-রকমটি অনুভব করেছি। এম্‌নি করেই, যখন গভীর অরণ্যের ভিতরে শুষ্ক লতাপাতার উপর দিয়ে শিকারী কুকুরটি অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে থাকে আর শিকারী শুন্‌তে পায় তার পাঁজরা ঘেঁষে তৃণগুল্ম সব একখানা পাতলা ওড়নার মত সর্ সর্ করে সরে যাচ্ছে, তখন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে ওঠে, নিঃশব্দে, একটি পা না বাড়িয়ে দিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ ক'রে, সে তার অস্ত্রটি তুলে ধরে।

কেলিও। আমার এ অবস্থা কেন? লম্পটদের মধ্যে একটা পুরোণো কথা চলিত আছে না যে, সব মেয়ে-মানুষই এক ধরণের? তবে সব ভালবাসা এক ধরণের নয় কেন? বাস্তবিক অক্তাভ, তুই যেমন ভাবে এ মেয়েটিকে ভালবাস্‌বি, কিম্বা আমিই আর একটিকে যেমনভাবে ভালবাস্‌ব, তেমনিভাবে একে কিন্তু আমি ভালবাস্‌তে পার্‌ব না। তবুও ভেবে দেখ্‌লে মোটের উপর ও জিনিষটা দাঁড়ায় কি? দুটি নীল চক্ষু, দুখানি সিঁদুরে ঠোঁট, একখানি সাদা সাটি, দুখানি ফুট্‌ফুটে হাত। আচ্ছা, তোকে যে জিনিষ উৎফুল্ল ও উত্তেজিত করে তুল্‌বে, চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নেয় তেমনি করে টেনে নেবে, আমাকে সে জিনিষ বিষণ্ণ অবসন্ন করে ফেলে কেন? কে বল্‌তে পারে—এতে আছে সুখ, আর ওতে আছে দুঃখ? সত্য যাকে বল, তা ছায়া মাত্র; কল্পনাই নাম দাও আর পাগলামীই নাম দাও—তা'ই ও-জিনিষটিকে একটা দিব্যমূর্ত্তি দিয়ে গড়ে তুলেছে। পাগলামীই সৌন্দর্য্যের সার। প্রত্যেক মানুষ চলেছে একখানা স্বচ্ছ জাল দিয়ে মাথা হতে পা অবধি আপনাকে ঢেকে, সে মনে কর্‌ছে কত বন, কত নদী, কত সুন্দর মুখ! তার দৃষ্টিতে সমস্ত প্রকৃতিই ঐ মায়াবী জালের আলো-ছায়া-সম্পাতে কত বিচিত্র হয়ে উঠ্‌ছে। অক্তাভ! অক্তাভ! আমাকে তুই রক্ষা কর্।

অক্তাভ। তোর ভালবাসাকে আমি ভালবাসি, কেলিও! মদের মত তোর মাথার ভিতরে তা ফেণিয়ে ফেণিয়ে উঠ্‌ছে। আয়, দেখি, তোকে আমি উদ্ধার কর্‌ব। সবুর কর একটু, মুখে আমার হাওয়া লাগ্‌ছে, বুদ্ধিও ফিরে আস্‌ছে। হ্যাঁ, মারিয়ানাকে আমি চিনি; সে আমায় না দেখেই ভয়ানক ঘৃণা করে। ছোট্ট পুতুলটি, ভগবানের নাম অনর্গল বিড়্ বিড়্ কর্‌তেই লেগে আছে।

কেলিও। যা খুসী তোর তাই কর, আমায় শুধু ঠকাস্ নে, এই এক ভিক্ষা তোর কাছে। আমায় ঠকানো খুবই সহজ; নিজে আমি যে কাজ কর্‌তে চাই না, পরে যে আবার সে কাজ কর্‌তে পারে এমন বিশ্বাস ত আমার হয় না।

অক্তাভ। আচ্ছা, তুই যদি দেয়াল টপ্‌কে পার হ'স?

কেলিও। আমার আর তার মাঝখানে আছে যে একটা মনের দেয়াল, সেটাকে আমি টপ্‌কে পার হতে পারি নে।

অক্তাভ। তুই যদি তাকে চিঠি লিখিস?

কেলিও। আমার চিঠি সে হয় ছিঁড়ে ফেলে, নয় ফিরিয়ে দেয়।

অক্তাভ। তুই [illegible] একজনকে

ভালবাসিস্? আয়, আমার সঙ্গে রোজালিন্দের ঘরে চল্।

কেলিও। আমার জীবনের দীপ যে মারিয়ানার কাছে; মুখের একটি কথায় সে তাকে নিবিয়ে ফেল্‌তে পারে, জ্বালিয়েও তুল্‌তে পারে। আমার পক্ষে, আর একজনের জন্যে বেঁচে থাকা, তার জন্যে মরার চেয়েও বেশী কঠিন। হয় তাকে আমি পাব, না হয় প্রাণ দেব। চুপ্! ঐ যে সে রাস্তার মোড় ঘুরে আস্‌ছে।

অক্তাভ। তুই স'রে যা, আমি তাকে ধর্‌ছি।

কেলিও। সত্যি সত্যি? ঐ রকম পোষাক নিয়ে? মুখটা মুছে ফেল্, তোকে যে পাগলের মত দেখাচ্ছে।

অক্তাভ। এই নে, হ'লো ত? নেশা আর আমি, এমন বন্ধু আমরা দুজনে, ভাই কেলিও, যে আমাদের কখন ঝগড়া-ঝাঁটি হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সে চলে আমার কথায়, আমি চলি তার কথায়। ও বিষয়ে কিছু ভয় করিস্ নে। ইস্কুলের ছেলেরাই ছুটির মধ্যে একটা দিনে ভোজ পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে বসে, নেশার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। কিন্তু আমার স্বভাবই যে মাতাল হয়ে থাকা; আমার পক্ষে, ভেবে-চিন্তে কিছু করা, অর্থ না ভেবে-চিন্তে চলে যাওয়া; আমি এইভাবে এখনি রাজার সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে আস্‌তে পারি, দেখ্‌না, এই যেমন চল্লেম তোর প্রেয়সীর কাছে।

কেলিও। যেন কেমন কেমন বোধ হচ্ছে—না, [illegible]।

অক্তাভ। কেন?

কেলিও। কেন, তা বল্‌তে পারিনে; আমার মনে হচ্ছে, তুই আমায় ঠকাবি।

অক্তাভ। এই তোকে ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমার শক্তিতে যদি কিছু হয়, তবে মারিয়ানা হবে তোরই, নয় ত কারো হবে না।

(কেলিরও প্রস্থান।—মারিয়ানার প্রবেশ, অক্তাভ তাহার সম্মুখে গিয়া)

অক্তাভ। দেবি! আপনি মুখ ফিরিয়ে যাবেন না, রাণী! এই অধম দীনের উপর আপনার কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

মারিয়ানা। আপনি কে?

অক্তাভ। আমার নাম অক্তাভ, আপনার স্বামীর আত্মীয়।

মারিয়ানা। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন? আসুন, ঘরে চলুন, তিনি ফিরে এলেন ব'লে।

অক্তাভ। তাঁর সঙ্গে আমি দেখা কর্‌তে আসিনি, ঘরেও আমি চল্‌বো না। ভয় হচ্ছে, যে জন্যে এসেছি, তা বল্‌লে হয়ত এই মুহূর্ত্তেই আবার আমায় বের করে দিবেন।

মারিয়ানা। তবে সে কথা না-ই বল্‌লেন, আমাকেও আর দাঁড় করিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই।

অক্তাভ। কিন্তু না-বলেও আমার পার্‌বার জো নেই, সুতরাং আপনিও দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনে যান, এই আমার ভিক্ষা। নিষ্ঠুর মারিয়ানা! তোমার চোখের চাহনি যে বিষম ব্যাধির সৃষ্টি করেছে, তোমার মুখের কথা কি তার কিছুই উপশম কর্‌তে পারে না? কেলিও তোমার কি করেছে?

মারিয়ানা। আপনি কার কথা বল্‌ছেন? আমি কি ব্যাধি সৃষ্টি করেছি?

অক্তাভ। সে ব্যাধি বড় দারুণ, কারণ তার প্রতীকার নাই। বড় ভীষণ, কারণ এ ব্যাধি নিজের খেয়ে নিজে পুষ্ট, হিতাকাঙ্ক্ষীর হাত থেকে সঞ্জীবনী পানীয় পর্য্যন্ত ঠেলে ফেলে দেয়। এ ব্যাধি অমৃতের চেয়েও মধুর একটা হলাহলে ওষ্ঠাধর নীলবর্ণ করে ফেলে, মুক্তার মত কঠিন হৃদয়কেও এক অশ্রুবর্ষণে গলিয়ে দেয়। এ এমন ব্যাধি, পৃথিবীর যাবতীয় ওষধ, মানুষের সমস্ত শাস্ত্র তাকে আরাম কর্‌তে জানে না। তাকে আহার দিয়ে পুষ্ট কর্‌ছে, ঐ বাতাসের এক দম্‌কা, একটা শুষ্ক গোলাপের সৌরভ, একটা গানের অন্তরা। মৌমাছি যেমন বাগানের প্রতি কেওড়া থেকে তার মধু আহরণ করে, এ ব্যক্তিও তেমনি তার যাচনার চিরন্তন আহার চুষে নেয় চারিদিকে যা কিছু আছে সেই প্রত্যেক জিনিষটি হতেই।

মারিয়ানা। এ ব্যাধির নামটা আমায় বল্‌বেন কি?

অক্তাভ। সে নাম উচ্চারণ কর্‌বার যোগ্য যে, সেই যেন তা বলে। তোমার নিশীথের স্বপ্ন, ঐ সবুজ লেবুগাছ, এই শীতল জল-প্রপাত তোমাকে সে নাম শিখিয়ে দিক্। এক মধুর সন্ধ্যায় তুমি যেন তাকে খুঁজতে বেরুতে পার, তা হ'লে তোমার নিজের অধরের উপরেই তাকে পাবে। তার থেকে তার নাম আলাদা নয়।

মারিয়ানা। মুখে বল্‌তে তা কি এম্‌নি বিপদজনক, তার ছোঁয়াচ এমনই ভয়ঙ্কর যে, যে জিহ্বা তার গুণকীর্ত্তন কর্‌ছে সে-ই তার ভয়ে সন্ত্রস্ত?

অক্তাভ। কানে শুন্‌তে তা কি এমনি মধুর, বোন, যে তুমি জান্‌তে চাচ্ছ? তুমি ত কেলিওকে তা শিখিয়েছ!

মারিয়ানা। সে তবে অজানিতে—আমি একেও চিনিনে, ওকেও চিনিনে।

অক্তাভ। তাদের দুটিকেই যেন এক সঙ্গে চিন্‌তে পার, কখনো যেন তাদের তুমি আলাদা করে না দাও, এই আমার অন্তরের কামনা।

মারিয়ানা। সত্যি-সত্যি?

অক্তাভ। কেলিও আমার প্রাণের সখা—যদি তোমার ঈর্ষা উদ্রেক করা আমার উদ্দেশ্য হ'ত, তবে বল্‌তাম, সে প্রভাতের মত সুন্দর তরুণ গরিমাময়,—আমার এ কথা তবুও মিথ্যা হ'ত না। কিন্তু আমি যে চাই তোমার করুণা উদ্রেক করতে, তাই তোমাকে বল্‌ব, যে দিন থেকে তোমায় দেখেছে, সে দিন থেকে সে মরণের মত শ্রীহীন।

মারিয়ানা। একি আমার দোষ যে, সে শ্রীহীন?

অক্তাভ। একি তার দোষ যে তুমি শ্রীময়ী? সে যে তোমা বই আর কিছু জানে না। সব সময় তোমার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। তুমি তোমার জানলার নীচে কাউকে কখন গান কর্‌তে শোন নি? মাঝ-রাত্রিতে কখনো ঐ ঘুল্‌ঘুলি, ঐ পর্দ্দা তুলে দেখ নি?

মারিয়ানা। ও জায়গাটা সকলেরই, রাত্রিতে ওখানে সবাই গান কর্‌তে পারে।

অক্তাভ। সবাই তবে তোমাকে ভাল বাস্‌তে পারে? কিন্তু [illegible] বল্‌বার যো

নেই তোমায় তোমার বয়স কত, মারিয়ানা ?

মারিয়ানা। বেশ প্রশ্ন ! যদি বলি আমার কেবল এই উনিশ বছর, তবে আপনার মতে আমার কি করা উচিত ?

অক্তাভ। তা হলে, এখনও পাঁচ ছ-বছর তুমি ভালবাসা পেতে পার, আট-দশ বছর ভাল্‌বাসতে পার—আর বাকীটা ভগবানের জন্যে রেখে দিতে পার।

মারিয়ানা। বটে ! তবে সময়ের আমার সদ্ব্যবহারই হচ্ছে। আমি ভালবাসি ক্লোদিও'কে —আপনার আত্মীয়, আমার স্বামীকে।

অক্তাভ। আমার আত্মীয় আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে গ্রামের মোড়লটি ছাড়া আর বেশী কিছু তৈরী কর্‌তে পারবেন না। ক্লোদিওকে তুমি কখনও ভালবাস না।

মারিয়ানা। কেলি'ওকেও না, এ কথা আপনি তাকে স্পষ্ট বল্‌তে পারেন।

অক্তাভ। কেন তুমি কেলি'ওকে ভালবাস্‌বে না ?

মারিয়ানা। কেনই বা ক্লোদিওকে ভালবাস্‌ব না ? তিনি আমার স্বামী।

অক্তাভ। কেনই বা কেলি'ওকে ভালবাস্‌বে না ? সে তোমার প্রণয়ী।

মারিয়ানা। আরও বল্‌তে পারেন কি, কেনই বা আমি বসে বসে আপনার কথা শুন্‌ছি ? তবে আসুন এখন—রসিকতাটা বড় বেশীক্ষণ ধরে চলেছে। [প্রস্থান

অক্তাভ। তাই ত ! তাই ত ! চোখদুটি কিন্তু তার বড়ই সুন্দর ! [প্রস্থান

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

জরু

পুরুষ তোমায় বেজায় খাটায়
কাজ করে নেয় গৃহস্থালীর,
সকাল থেকে সকল বেলা
যেন বলদ কলুর ঘানির !

আপন জিনিষ বলতে তোমার
আছে কেবল হাঁড়ি হাতা,
শোবার তরে ছেঁড়া মাদুর
শীতে একটু ছেঁড়া কাঁথা !

এই মেহনৎ,—পুরস্কার এর
কত রকম গালাগালি,
মাঝে মাঝে লগুড়, আরো
মধুর অভিভাষণ,—শালী !

পাণ থেকে চূণ খস্‌ল যদি
জরু, তোমায় জরুর্ 'তালাক',
আবার একটা কর্‌বে বিয়ে
তাই এ ছুতো—এম্‌নি চালাক্ !

তোমার' পরে এ অত্যাচার
যেন তুমি হালের গরু,
কারণ তুমি জেতে নারী—
কারণ তুমি নেহাৎ জরু !

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।

* অ[illegible] প্রকাশিত 'গরু" শীর্ষক কবিতার অনুকরণে লিখিত—লেঃ।

প্রত্যাবর্ত্তন

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জমিদার ইন্দ্রনাথের বাড়ীখানা প্রভু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লোকের চোখে বিপুল বিস্ময় জাগাইয়া তুলিল। সাদাসিধা ছাঁদের চক্‌মিলানো চির-পরিচিত বাড়ীখানা মাস-কয়েকের মধ্যে বর্ণে ও গঠনে সকল রকমেই যেন আশ্চর্য্য রূপে বদলাইয়া গিয়াছিল। বাড়ীখানায় নূতন করিয়া বালি খসাইয়া রঙ লাগানো হইয়াছিল, জানালায় খড়খড়িতেও রঙের বাহার খুলিয়াছিল। কলিকাতা হইতে মিস্ত্রী-মজুর আসিয়া উপরে-নীচে সমস্ত ঘরগুলিতে ঘরের রঙের সহিত মিল রাখিয়া ফুল-পাতার নক্‌সা আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে। বাহিরের দিকে কাজ করা লোহার রেলিঙে ঘেরা বারান্দা তৈয়ার করাইয়া সেখানে বিচিত্র চীনা মাটীর টবে কৃত্রিম উদ্যানের শোভা সৃষ্টি করা হইয়াছে। বাগানে ফোয়ারা, মর্ম্মর বাঁধানো চত্বর এবং চারিদিকে লাল সুরকির সরু পথ। পথ-গুলির আরম্ভ ভাগে লতা-পাতার একটি করিয়া তোরণ-দ্বার। অধিকাংশ তোরণ দ্বার-গুলিতেই প্রস্ফুটিত ঝুমকালতা, মাধবী, মালতী ও তরুলতার বিচিত্র শোভা। পথগুলির দুইধারে স্থানে স্থানে জাপানী ছবি আঁকা চীনা মাটীর তৈয়ারি আসন উদ্যান-স্বামীর শ্রমাপনোদনের জন্য গ্রথিত। বাগানে বেশীর ভাগই বিলাতী ফুলের গাছ। পপি, জিনিয়া ষ্টার্চার প্যান্‌সী ক্যামেলিয়া য়্যাজেলিয়া বিচিত্র বর্ণের নানা প্রকারের লিলি প্রভৃতি ফুলের ও পাতা-বাহার ক্রোটন পাম্ ও নানা জাতীয় গাছের বাহার; কোথাও সার দিয়া, কোথাও ক্ষেত্রাকারে, কোনস্থলে বা গোলাকারভাবে সজ্জিত। উদ্যান-প্রাচীরের ধারে ধারে সবুজ গাছের ফাঁকে-ফাঁকে এতদিনের যে রক্ত জবা পথের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, পুরাতন স্মৃতি রক্ষা করিয়া, কেন, কে জানে, তাহারাই কেবল এখনো বিতাড়িত হয় নাই !

বৈঠকখানা হইতে বেতের কাষ্ঠাসনগুলি দূরীভূত হইয়াছে; সেখানে এখন মখমল-মণ্ডিত পুঁতির কারুঝালর লাগানো স্প্রিংয়ের সৌখীন কৌচ সোফা শোভা পাইতেছে। বিদ্যুত পাখা চালাইবার উপায় না থাকায় সেকালের টানাপাখা এখনও স্থানচ্যুত হয় নাই বটে, তবে তাহার মোটা পরিচ্ছদ খুলিয়া তাহাকে সৌখীন পোষাক পরানো হইয়াছে। মোটা দেশী ছিটের ও সতরঞ্চির পর্দ্দাগুলির জায়গায় এখন বাহিরের কক্ষগুলিতে সূক্ষ্ম কারু শিল্পের লেশ নেট ও সিল্কের পর্দ্দা সব রঙীন ফিতা বাঁধিয়া অর্দ্ধাবরিত ভাবে অবস্থিত। বসিবার ঘরে যে সকল নারী-চিত্র বিলম্বিত হইয়াছিল, তাহা সৌন্দর্য্য ও আর্টের দৃষ্টান্ত হইতে পারে, তবে সেগুলিকে সুরুচির পরিচায়ক বলা যায়না। বাঁয়া তব্‌লা এসরাজ হারমোনিয়ম, পিয়ানো প্রভৃতিতে গৃহস্বামীর সঙ্গীতানুরাগ প্রকাশ পাইতেছে। সঙ্গীত-বিদ্যায় আলোকনাথের খ্যাতি ছিল; সম্প্রতি বাদ্যশিক্ষাতেও সে মন দিয়াছে। সজ্ঞতজ্ঞ ব্যক্তিরা জমিদার বাবুর প্রিয়পাত্র হইবার আশায় প্রতি সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় মজলিস্ করিতে আসিতেছে। [illegible]

আলোকনাথের বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। দেহখানি লম্বার চেয়ে চওড়ায় বেশী। মুখ গোল ভাবের, চোখদুটি বড় বড়। বুদ্ধির দীপ্তি নাই থাক্, চোখে উজ্জ্বলতা আছে। মাথার পশ্চাদ্‌ভাগের চুলগুলি ঘন, সম্মুখ ভাগের চুল পাতলা। সেই পাতলা চুলে বহু নৈপুণ্যে টেড়ী কাটিয়া আলোকনাথ ত্রুটি ঢাকিবার চেষ্টা করিত।

বাগান-বাড়ীতে প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে 'গহর বিবির' আগমন হয়। আলো, আনন্দ ও মধুর নারীকণ্ঠের সুর-তরঙ্গে সে রাত্রে পল্লীবাসীরা চমৎকৃত হইয়া উঠে, পথিকেরাও মুগ্ধ পুলকিত চিত্তে সেখানটায় কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া যায়। আলোকনাথের স্বপক্ষদল বলে, "ভগবান্ ইহাকে শুধু ধন দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহা ভোগের শক্তিও যথেষ্ট দিয়াছেন। 'যথের' ধন্ রহিল কি না রহিল, সে একই কথা।" আবার বিপক্ষ দল বলে, "এত দিনের জমীদার-বংশ—এইবার বিলাসের স্রোতে ভাসিয়াই বা যায়!" সংসারে ভাল-মন্দ দুই শ্রেণীরই লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ পরের সৌভাগ্যে সুখী, কেহ বা ঈর্ষান্বিত।

বৈঠকখানায় ও বাগান বাড়ীতে যাহাই ঘটুক, অন্দরে কিন্তু এ সব সৌখীন ব্যাপারের কোন পরিচয়ই যাওয়া যাইত না। আলোকনাথের মা বাঁচিয়া আছেন; নিজের শুচিতা ও গৃহকার্য্যের তদারকেই তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। স্ত্রী রুগ্না ও বন্ধ্যা, তাই সুখ ষোল কলায় পূর্ণ হইলেও সংসারে প্রকৃত মনের সুখ কাহারও ছিল না। আলোকনাথের জ্যেষ্ঠ তাঁহার বিধবা স্ত্রী পিত্রালয়ে। জ্যেষ্ঠের একমাত্র পুত্রটি কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল। আলোকনাথ ও তাঁহার জননীর ইচ্ছা ছিল না যে একমাত্র বংশধরকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে দেন। কিন্তু জেদী ছেলে কাহারও নিষেধ কানে তুলিল না। শাসন, আদর, অনুনয়—কিছুতেই সে দৃক্‌পাত করিল না। অগত্যা অনিচ্ছাতেই আলোকনাথকে তাহার মতানুবর্ত্তী হইতে হইল। তাই কি জমিদার বংশের-বংশধররূপে উপযুক্ত দাস-দাসী লইয়া সে বাসা করিয়া রহিল? 'খামখেয়ালি' ছেলে সাধারণের সহিত একটা সাধারণ মেসে সামান্যভাবেই দিন যাপন করিতেছে! বংশের কলঙ্ক,—যেমন ক্ষেত্রে জন্ম, তেমনি ত মতি-গতি হইবে! স্বাধীনচিত্তা মায়ের ছেলে গুরুজনের বশ্যতা মানিবে কেন?

আলোকনাথ এজন্য পারিষদ-মহলে সর্ব্বদাই দুঃখ করিত। প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর দল খুল্লতাতের স্নেহশীলতার প্রভূত প্রশংসা করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের নিন্দা করিত। তত্ত্বদর্শীরা বলিত, "ভোগ মানুষের কর্ম্ম-ফল। ভগবান্ হাতে তুলিয়া দিলেই কি মানুষ ভোগ করিতে পারে? যার যেমন পাওনা!" এই সকল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সহিত একটা নূতন তথ্যের আলোচনাও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। কোন কোন শুভানুধ্যায়ী আলোকনাথকে পুনরায় দার-পরিগ্রহে অনুরোধ করিতেছিলেন। রুগ্না ও বন্ধ্যা স্ত্রী শাস্ত্রানুসারে বর্জ্জনীয়া! সুতরাং ধর্ম্মতঃ এজন্য তাহাকে অপরাধীও হইতে হইবে না। সেই একটা 'অর্দ্ধ-উদাসীন' 'কেতাব-কীট' বালকের

মুখ চাহিয়া কেনই বা তিনি বসিয়া থাকিবেন? জমিদারী-রক্ষার উপযোগী বিষয়-বুদ্ধি কি আর তাহার ঘটে কখনো আসিবে? ভবিষ্যৎ-দর্শীরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেন, তাহা কখনই সম্ভব নয়। কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ক্রমে আলোকনাথের কাণেও বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছিল; এবং শুনিতেও মন্দ লাগিতেছিল না। আলোকনাথ যে স্ত্রীকে কখনো ভাল বাসিত না, এমন নয়। সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে যেমন সকল স্বামী নিজ-নিজ স্ত্রীকে ভাল বাসিয়া থাকে, সেও এক সময় স্ত্রীকে তেমনি বাসিত। হেমলতা মেয়েটিও অত্যন্ত সাধারণ। তাহার রূপের আলোয় ঘর আলো হইত না; গুণেরও কোন বাড়াবাড়ি পরিচয় ছিল না। স্বামীকে সে হিন্দুনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, ভাল বাসিত। কিন্তু সে ভালবাসা প্রকাশের জন্য কোন সাড়ম্বর উচ্ছ্বাস বা বাহ্যিক অনুষ্ঠান দেখা যাইত না। লেখাপড়া যৎসামান্য যাহা সে শিখিয়াছিল, তাহাতে বাংলা মাসিক পত্র হইতে রামায়ণ মহাভারত পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে পড়া চলে। চিঠি লিখিবার তাহার কোন প্রয়োজনই ছিল না। থাকিলে বোধ করি বাঙ্গালী ঘরের অন্যান্য মেয়েদের মতই সে কার্য্যও সে অনায়াসে চালাইয়া লইতে পারিত। রান্না-বান্না, সাংসারিক কাজ সে সবই শিখিয়াছিল, কিন্তু বছর দুই আগে নিউমোনিয়া হইয়া দীর্ঘ কাল রোগ-ভোগান্তে যখন সে পুনরায় চলা-ফেরা সুরু করিল, তখন দেখা গেল, পূর্ব্বের স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইবার নহে। বুকে একটা যন্ত্রণা সর্ব্বদাই রহিয়া গেল। আরও আনুসঙ্গিক অনেক রোগই ভগ্ন দেহে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল, এই সময় ভাগ্য সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া ইন্দ্রনাথের বিপুল বিষয়ের অধিকার আলোকনাথের আয়ত্তে আসিল।

বধূর বন্ধ্যাত্ব অপরাধের জন্য এ পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু এখন ভাগ্যচক্র-পরিবর্ত্তনের সহিত শাশুড়ীর মনে ক্রমেই অভাবের ক্ষোভ জাগিতেছিল। এত বড় বাড়ী, এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে শুধু বাল-কণ্ঠের হাসি-কান্নারই শব্দটুকু নাই! এত বড় জমীদার বংশের নাম ও মান রক্ষা করিতে সেই একটা পিতৃহীন অভাগা ছেলে। তাই বা তাহার উপর ভরসা কিসের? কাণ্ডজ্ঞান-হীন বালক—বিপদ লইয়াই যাহার খেলা—তাহার কাছে সংসারের দাবী কোথায়? কোথায় দুর্ভিক্ষের চাঁদা তুলিতে হইবে, কোথায় জল-প্লাবনে গৃহহীনদের সাহায্যের জন্য নদীর জলে সন্তরণ, পৃষ্ঠে খাদ্য-স্তূপ বহিয়া সাঁতার দিতে হইবে, আবার কোথাও রাজনৈতিক আন্দোলনে সভা-সমিতিতে যোগ দিতে হইবে, পুলিশের অন্যায় অত্যাচার,—ইহার সবগুলিরই প্রতিবিধান করিতে সে অগ্রণী! মৃত্যু ত তাহার পায়-পায় ফিরিতেছে। সাপের মুখে বাঘের মুখে যাইতেও সে ভয় করে না। অসম-সাহসিক—সেবার যুদ্ধে যাইবার জন্যই ত প্রস্তুত হইয়াছিল। কেবল পিতৃ-পিতামহের পুণ্যবলে ও আলোকনাথের গোপন চেষ্টা ও বিপুল অর্থব্যয়ে ডাক্তারী রিপোর্টে ফিরাইয়া দিয়াছিল না! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পিতামহী তাহার ভরসা একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছেন। মানুষের স্বভাব, সে এক হাতে ছাড়ে, অন্য হাতে ধরে; নহিলে বাঁচিতে পারে না। তাই তরুণ পৌত্রের উপর [illegible] ফিরাইতে

গিয়াই তাঁহার মনে হইল, এখনও এ ভুল সংশোধন করিয়া লওয়া যায়। ছেলের তাঁহার এমনই বা কি বয়স যে পুনরায় বিবাহ দেওয়া চলে না? বংশ-রক্ষার জন্য কত ষাট সত্তর বৎসরের বুড়াও যে দ্বিতীয় বার দার গ্রহণ করিতেছে। উপযুক্ত সন্তানের মৃত্যুতে—ভগবানের সহিত রেষারেষি করিয়া কত বুড়া বাপ যে পুনরায় বিবাহ করিয়া বংশ-রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এ ক্ষেত্রে তেমন কোন বিসদৃশ ব্যাপারও ত উপস্থিত নাই। এত বড় জমীদার-বংশের মান ও নাম যে বন্ধ্যা ও রুগ্না বধূ রক্ষণে সমর্থ হইল না—সুধু তাহার তরফ হইতে দেখিলেই ত চলিবে না! হেমলতাকে শুনাইয়া শুনাইয়াই আজকাল এ-সব কথা ওঠে, তাই আলোকনাথের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে হেমলতার মনে সুখ ও শান্তি ছিল না। যে অনর্থকর অর্থ হইতে সে স্বামী ও সৌভাগ্য দুই হারাইতে বসিয়াছে, কেমন করিয়াই বা সে-অর্থকে সে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিবে? অদৃষ্টের যে এ নির্ম্মম পরিহাস! অবসর পাইলেই সে তাই নির্জ্জনে চোখের জল মুছিয়া মনে মনে নিজের মৃত্যু কামনা করে।

সে একজন সাধারণ নারী, স্বামীর সখের বা শ্বশুর-বংশের মান-রক্ষার জন্য আত্মবলি দিবার মত মানসিক বল তাহার ছিল না। সে বুঝিতেছিল, স্বামীর মনেও এ দ্বন্দ্ব পৌঁছিয়াছে। এতদিন স্ত্রীর রূপ লইয়া আলোকনাথের মনে কোন ক্ষোভের অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই। এখন গহরের রূপে মুগ্ধ-চক্ষু স্বামী স্ত্রীর পুরাতন মুখে কোন আকর্ষণ আর দেখিতে পায় না। বিদ্যা বুদ্ধি আচার অনুষ্ঠানে [illegible] তাই অহরহ আবিষ্কৃত হইতেছিল। অথচ বছর কয়েক পূর্ব্বে ইহারই বুদ্ধি-বিবেচনা ভক্তি-ভালবাসায় মুগ্ধ তৃপ্ত স্বামী মনে করিয়াছিল, জগতে এমনটি আর হয় নাই হইবেও না। কাল ও অবস্থা মানুষের মনে কত পরিবর্ত্তন আনিতে পারে—মানুষ তাহার হিসাব জানে না বলিয়াই দুঃখ পায়।

মায়ের মনের ইচ্ছা যখন মুখেও প্রকাশ হইতে শুনা গেল, তখন প্রথমটা আলোকনাথ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়াছিল। এও কি একটা কথা না কি! এই শারীরিক অসুস্থতার উপর উহাকে আবার মনের এত বড় ব্যথা দেওয়া কখনো সম্ভব! বংশ-রক্ষার জন্য ভাবনা কি? দাদার ছেলে বাঁচিয়া থাক্! সেই ত এ বংশের বংশধর, এমন কথা শুধু মুখে নয়, মনেও সে অনুমোদন করিয়াছে। ভ্রাতুষ্পুত্রের স্বেচ্ছাচারিতা অনেক সময় বিরক্তি আনিলেও ভালবাসার হ্রাস হয় নাই। মাতৃ-পরিত্যক্ত এই ছেলেটিকে শিশুকাল হইতেই যে সে সন্তান-বাৎসল্যে মানুষ করিয়া আসিতেছে।

পনেরো বৎসর পূর্ব্বে যেদিন দেবর ও শাশুড়ীর সহিত কলহ করিয়া বিধবা বধূ চিরদিনের শপথ লইয়া স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান, সেদিন আলোকনাথও ভাবিয়াছিল, তাহাদের সকল সংস্রব ছাড়িয়া দিবে। মায়ের কাছে তর্জ্জন-গর্জ্জনে ভ্রাতৃজায়ার স্বেচ্ছাচারিতার দণ্ডস্বরূপ মাতা-পুত্রে ইহজন্মে আর তাহাদের মুখ দর্শন করিবেন না, এমন প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন। তাহার পর যে দুইটা রাত্রি কাটিয়াছিল—হেমলতা সারারাত শুধু স্বামীকে এ-পাশ ও-পাশ করিতে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে শুনিয়াছে। সাহস করিয়া সে কিছু বলিতে

পারে নাই। স্বামীও একটি কথাও বলেন নাই।

তৃতীয় দিনের প্রাতঃকালে আলোকনাথকে বাড়ীতে দেখা গেল না এবং তিন দিনের পর সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন আর একা নয়, সঙ্গে তাহার ভাইপো প্রফুল্ল। অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াও যখন ভ্রাতৃজায়ার প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারিল না, তখন আলোকনাথ ভাবিয়াছিল, এই সহজ উপায়ে তাহাকে সে বাধ্য করিবে। প্রফুল্লর মাতামহী ও মাতুল আলোকনাথের জেদে ছেলে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু মেয়ের অনিচ্ছায় মেয়ের মা মেয়ে পাঠাইতে রাজী হইলেন না। যখন ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ছিল না। শান্ত পল্লী-জীবনে সন্তান-হীন আলোকনাথ দম্পতী গভীর স্নেহে এই পিতৃহীন মাতৃ-পরিত্যক্ত ছেলেটিকে ভাল বাসিয়া সঙ্গ দিয়া তাহার মনের ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিত ও নিজেরাও তৃপ্ত হইত। সেদিনের এখন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ছেলে এখন নিজের ইচ্ছায় চলিতে শিখিয়াছে। তাহারও শান্ত নিরুপদ্রব মনের নদীতে অসময়ে প্লাবন আসিয়াছে। তবু সেই অতীত দিনের অভ্যাসের বশে পূর্ব্ব স্নেহ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। লুপ্ত না হউক, তাহার যে স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সংশয় ছিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হিমুর বয়স বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া তেরোয় পড়িল। ভয়ে ভাবনায় হিমুর মার বুকের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছিল, গলায় জল নামিতে চাহে না! কেমন করিয়া সহায়-সম্পত্তি-হীনা বিধবা মনের মত পাত্রে কন্যাদান করিবেন? গ্রামে বিবাহার্থী যুবকের অভাব ছিল না, সত্য। হিমুকে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিতেও কেহ অসম্মত নহেন। তাই বলিয়া গরীব বিধবার পুরুষ-প্রকৃতির এই দুরন্ত মেয়েটিকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা কাহারও মনে মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। যদি বা কাহারও ইচ্ছা হইত, সে পাত্র হিমুর মার পছন্দ হইত না। তাঁহার স্বর্ণলতা অবশেষে কি সেয়াকাঁটায় তিনি জড়াইয়া দিবেন!

মাসিমা কহিলেন, "কি কর্‌বি বাছা, যেমন ওর কপাল, তেমনি না হবে। হিঁদুর ঘরে অত বড় মেয়ে আর ত থুবড়ো রাখা যায় না। মুখুজ্জেদের গোবর্দ্ধনের সঙ্গেই দিয়ে দাও—ছেলে এমনিই বা মন্দ কি! বিয়ে হলে আবার রীত-চরিত্তির ভাল হয়ে যাবে।"

মালতী অশ্রু মুছিয়া মনে মনে স্বামীকে স্মরণ করিতেন,—তুমি বলিয়া দাও, তোমার বড় স্নেহের ধন্ হিমুকে আমি কেমন করিয়া জলে ভাসাইয়া দিব! ওগো আমি কি করি,—তুমি উপায় করিয়া দাও।

এমনি করিয়া ভয়ে ভাবনায় দিন কাটিতেছিল। কিন্তু যাহার জন্য এত ভাবনা, সে বেশ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে পথে পথে ছেলের দলে মিশিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমাগত শাসন তাড়না সহিয়া সহিয়া আজকাল তাহার চঞ্চল গতি অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়াছিল; তবে একেবারে সেটুকু সে ছাড়িতেও পারে নাই।

মা কহিলেন, "হিমু, এত করে তোকে বলি রাস্তাঘাটে খেলিস্ নে, তা কোন মতেই তুই শুন্‌বি না?"

একখানা ছোট কুশের ডালায় গোটা কয়েক কাঁচা আমড়া লইয়া হিমু তাহার খেলার সাথীদের উদ্দেশে বাহির হইতেছিল, ফিরিয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল "শুনি ত মা, আর কৈ খেলি? গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ি না,—দত্তদের গাছে এত পেয়ারা হয়েচে মা, যেমন মিষ্টি তেমন শাঁসালো—খোলা এত পাতলা আর ভেতরটা ঠিক যেন গোলাপফুলের রং! অরুণদা বলে, পরের জিনিষ নিলে চুরি করা হয়—হ্যাঁ মা, গাছ থেকে পেড়ে নিলে কি চুরি করা হয়?"

"তা হয়।—হিমু, লক্ষ্মী মা আমার, ঘরে বসে খেলা কর্। রাস্তা ঘাটে যাস্‌নি বাছা। লোকে নিন্দে করবে—বিয়ে হওয়া দায় হয়েচে যে—" বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "আয়, তোর চুল বেঁধে দি।"

চুল বাঁধিতে বাঁধিতে মা কহিলেন, "মাসিমা মাহেশে রথ দেখ্‌তে যাবেন, তুই যাবি হিমু?"

হিমু আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, কহিল, "মাহেশ! সে কোথায় মা?"

"সে এক জায়গায়! ওঁর কে বোন্‌পো আছেন, তাঁরা খুব বড় মানুষ, মস্ত বাড়ী—আগে সেখানে দু'চার দিন থেকে মাহেশে যাবেন। যাবি সেখানে?"

হিমু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিল, "খুব, খুব। দেখ মা, সেদিন তোমায় বললুম, নীলাম্বরী সাড়ীটা আমায় দিয়ো না,—তুমি শুন্‌লে না ত, যেমন কুশীদের বাড়ী গেছি, তা ওদের [illegible] বেরজায় পেরেকে না কিসে আট্‌কে গিয়েছিল না! যেমন টান দিয়েচি, অম্‌নি ফর্দ্দাফাঁই।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। তবু হাসির সঙ্গে একটুখানি ভয়ের আভাষও ছিল। সে জানিত, এই একমাত্র পোষাকী সাড়ীখানির দুররবস্থায় মা ত খুসী হইবেনই না, বরং বিরক্তই হইবেন। সেদিন ভয়ে বলিতে না পারিলেও এইবার যে তাহা প্রকাশের কাল আসিয়াছে তাহা সে মনে মনে বুঝিতেছে—কারণ এই নীলাম্বরী-খানি ছাড়া ত বাহিরে যাইবার মত আর কোন সৌখীন দ্বিতীয় বস্ত্র তাহার ছিল না! খবর শুনিয়া মা কেবল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, কোন অনুযোগ করিলেন না দেখিয়া হিমু খুসী হইয়া কহিল, "কবে যাবে মা সেখানে?"

মা কহিলেন, "আমি ত যাব না। তুই যাস্ মাসির সঙ্গে। উনি ওঁর কুটুম-বাড়ী যাবেন, তাঁরা বড় লোক, আমার কি সেখানে যেতে আছে—পাগল!"

"তবে আমিই বা কেন যাব, ওঁর কুটুম বাড়ী? আমিও যাব না।" বলিয়া হিমু অপ্রসন্ন মুখে চুল বাঁধার বিলম্বে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে লাগিল। মা তাঁহার এক-গুঁয়ে মেয়েটিকে ভালই চিনিতেন। জোর করিয়া যে ইহাকে বশে আনা চলিবে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ বোঝেন। অথচ তাঁহার যে কি বিষম দায়, তাহা তিনিই কেবল জানেন। মাসি আশা দিয়াছেন, তাঁহার বোন্‌ঝীর একটি পিতৃহীন পৌত্র আছে, ছেলেটি বড় সৎ। দুইটা না তিনটা পাশও করিয়াছে সে। মেয়ে দেখাইয়া তাহার মাতাকে যদি প্রসন্ন করাইতে পারা যায়, হয়ত অসম্ভবও সম্ভব হইয়া যাইতে পারে। মাতা-

পুত্র দুজনেই বড় ভাল। মাসীর বোনঝী তাঁহার সহোদরা; নহেন দূর সম্পর্কিতা; তবু সেখানে গেলে গরীব বলিয়া কেহ অনাদর করিবে না। তাঁহার কথার মান্যও তাঁহারা রাখিয়া থাকেন।

অনাথা বিধবা এই গোপন আশার কুহকেই মুগ্ধ হইয়া মেয়ের মন ফিরাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। নহিলে চোখের বাহিরে তাহাকে পাঠাইয়া তিনিই কি স্বস্তিতে থাকিতে পারিবেন! মার আগ্রহ ও প্রলোভনে হিমু শেষে দিদিমার সহিত মেলা দেখিতে যাইতে স্বীকার হইলে মা তাহাকে সেদিনের মত বাহিরে খেলিতে যাইবার অনুমতি দিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন, এমন কাণ্ড আর কখনো চলিবে না! সে এখন বড় হইয়াছে! এইবার গৃহ-কার্য্যে না থাকিলেও চুপ্‌চাপ ঘরে বসিয়াও তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে। মায়ের মুখের গাম্ভীর্য্যে ও কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় হিমু বুঝিয়াছিল, এ আদেশ তাহাকে মান্য করিতেই হইবে। এবারকার বারণ অন্য বারের মত ফাঁকা আওয়াজ নয় বুঝিয়া সেদিনের অযাচিত পাওয়া স্বাধীনতা-টুকু সে আর তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না। সংসারের সহিত যতই সে পরিচিত হইতেছিল, ততই বুঝিতেছিল, এখানে মনে দ্বিভাব রাখিয়া চলার নামই শিক্ষা ও ভদ্রতা। বয়সের সহিত এমনিধারা একটি নূতন ভাব ধীরে ধীরে তাহার মনে অস্পষ্টরূপে আকার প্রাপ্ত হইতেছিল। তাই এখন সে অসঙ্কোচে সকল কথা সবার কাছে বলে না—যাহা বলে, তাহারও পরিণাম-চিন্তা মনে উদয় হয়। সরলা হিমু এইবার জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইতে সুরু করিয়াছে,—ভয় হয়, আর হয়ত তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

কয়াধু

[দিতি ও কশ্যপের পুত্র অসুর-সম্রাট হিরণ্য-কশিপুর পত্নী কয়াধু। ইনি জম্ভাসুরের কন্যা ও মহিষাসুরের ভগিনী। ইহাঁর চারি পুত্র, প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদও অনুহ্লাদ।]

কার তরে এই শয্যা, দাসী, রচিস্ আনন্দে?
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে মোর দে রে আগুন দে।
পুত্র যাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে, হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের-ফেনা ফুলের-বিছানায়?



কুমার যাহার উচিত ক'য়ে সয় অকথ্য ক্লেশ
সে কি রাজার মন ভোলাতে পরবে ফুলের বেশ ?
দুলাল যাহার শিকল বেড়ীর নিগ্রহে জর্জ্জর,
জন্তুলিকা ! রত্ন-মুকুট তার শিরে দুর্ভর।
পার্‌ব না আর কর্‌তে 'শিঙার' রাখ্‌তে রাজার মন,
জঞ্জালে ডাল্ জঞ্জাল-জাল রাণীর আভরণ !
ফণীর মতন রাজার দেওয়া দংশে মণি-হার,
যম-যাতনা এখন এ মোর রম্য অলঙ্কার।
কেয়ূর-কাঁকন শিথ্‌লে দে রে খুলে দে কুণ্ডল
শিথ্‌লে দে এই মোতির সীঁথি শচীর আঁখিজল।
রাণীত্বে আর নাইরে রুচি নাই কিছুরই সাধ,
যে দিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ !
যে দিকে চাই মলিন অধর, উপবাসীর চোখ,
যে দিকে চাই গগন-ছোঁয়া নীরব অভিযোগ,
যে দিকে চাই ব্রতীর মূর্ত্তি নিগ্রহে অটল
সাপের সাথে শিশুর খেলা,—মন করে বিহ্বল।
মারণ-পটু মারছে বটু মারছে বাছারে
শস্ত্রপাণি দিচ্ছে হানা বালক নাচারে,
কাঁটায় গড়া মারছে কোড়া দুধের ছেলের গায়
ছাখ্‌রে রাঙা দাগ্‌ড়াতে ছাখ্ আমার দেহ ছায়।
প্রাণের ক্ষতে লোহুর ধারা ঝরছে লক্ষ ধার
আর চোখে নিদ্ আস্‌বে ভাবিস্ পালঙ্কে রাজার ?
গুমে গুমে পুড়ে যেন যাচ্ছে শরীর মন
ক্লান্ত আঁখি মুদ্‌লে দেখি কেবল কুস্বপন,
পাহাড় থেকে আছ্‌ড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—
প্রহ্লাদ মোর ; দিচ্ছে ঠেলে সাপের চাতরে।
জগদ্দলন পাষাণ বুকে ফেল্‌ছে তরঙ্গে,
চোরের সাজে সাজিয়ে সাজা চোরেরি সঙ্গে !
নির্দ্দোষেরে খুনীর বাড়া দিচ্ছে রে দণ্ড
কালনেমি, কবন্ধ, রাহু দৈত্য পাষণ্ড।
কভু দেখি ফেল্‌ছে বাছায় পাগ্‌লা হাতীর পায়
...হীদের প্রাপ্য সে আজ নিরীহ জন পায়।

চর্ম্মচোখে রক্ত ঝরে দারুণ সে দৃশ্যে,
মর্ম্মচোখে কেবল দেখি···নৃসিংহ বিশ্বে।

* * * *

হায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ !···হাহা রে আফ্‌শোষ,
অপ্রযুক্ত দণ্ড এ যে,···জাগায় বিধির রোষ।
কি দোষ বাছার বুঝ্‌তে নারি, অবাক্ চোখে চাই,
ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাই—
অন্য কোথাও অন্য কোথাও এ রাজ্যে আর নয়
ভাগ্যে আমার স্বর্গপুরী হ'ল ভীষণ ভয়,
চোখের আগে কেবল জাগে ছেলের মলিন মুখ,
খড়্গো-জেতা স্বর্গপুরে নাইরে স্বর্গ-সুখ।
বুঝ্‌তে নারি কী দোষ বাছার,···ভাবি অহর্নিশ,
ষণ্ড-গুরুর শিক্ষা পেয়েও ষণ্ডামি তার বিষ,···
এই কি কসুর অপাপ শিশুর ? হায় রে কে জানে
বিহ্বলতায় বিকল করে এ মোর পরাণে।···
ফিরে এল শিক্ষা-শেষে শিশু পুলক-মন,
ভীষণ সাপের আবর্ত্তে হায় এই সমাবর্ত্তন।
প্রশ্ন হ'ল "কি শিখেছ ?" রাজ সভা-মাঝে
কয় শিশু "তাঁর নাম শিখেছি রাজার রাজা যে ;
যাঁর আদি নাই অন্তও নাই যে জন চিরন্তন
সত্য-মূর্ত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তি অরূপ নিরঞ্জন,
তিন ভুবনের প্রভু যিনি প্রভু চার যুগে
শিখেছি নাম জপ্‌তে তাঁহার গাইতে সে মুখে।"
ছেলের বোলে রুষ্ট রাজা দেবত্ব-লোভী
ছেলের দেব-প্রেমে ছাখেন বিদ্রোহ-ছবি।
বিধির বরে দেব্‌তা মানুষ পশুর অবধ্য
মাতেন পিয়ে অহঙ্কারের অপাচ্য মদ্য।
ভাবেন মনে "হইছি অমর" অবধ্য ব'লেই !
পরের বধ্য নয় ব'লে, হায়, মৃত্যু যেন নেই !
দেব্‌তা মানুষ পশুর বাইরে কেউ যেন নেই আর
বলের দর্পে দণ্ড দিতে ; এম্‌নি ব্যবহার

দাবী করেন দেবের প্রাপ্য যজ্ঞ-হবির ভাগ
ভগবানের জয়-গানে হায় বাড়ে উহাঁর রাগ !
উনিই যেন রুদ্র, মরুৎ, উনিই সূর্য্য, সোম,
ক্ষণস্থায়ী রাজ্যমদে দণ্ডধারী যম।
ইন্দ্র উনি ইন্দ্রজয়ী, জয়ন্ত, জিষ্ণু,
একলা উনি সব দেবতা, নাসত্য, বিষ্ণু।
ছেলের বোলে ক্রোধোন্মত্ত দৈত্য ধুরন্ধর,
"আমার আগে অন্যে বলে ত্রিভুবনেশ্বর !
রাজদ্বেষী অমন ছেলে, ফল বা কি জীয়ে ?
ডুবিয়ে দেব নির্য্যাতনে নরক সৃজিয়ে।
খর্ব্ব করে রাজায় যে তার রাখ্‌ব না মাথা,
দণ্ডবিধান কর্‌ব, স্বয়ং আমিই বিধাতা।"
বাক্য শুনে বালক বলে বিনয়-বচনে
"হৃদয় আমার নিরত যাঁর অর্ঘ্য-রচনে,
পিতার পিতা মাতার মাতা রাজার রাজা সেই
সত্য তিনি নিত্য তিনি তাঁর তুলনা নেই ;
পিতা গুরু,···মান্য করি,···শ্রদ্ধা দিই ভূপে,···
তাই ব'লে হায় ভুল্‌তে নারি সত্য-স্বরূপে।
আত্মা···আপন বিশিষ্টতা···করব না ক্ষুণ্ণ,···
স্মরণে যার মরণ মরে,···কীর্ত্তনে পুণ্য,···
সে নাম আমি ছাড়ব নাক, ছাড়ব না নিশ্চয়,
অঙ্গে যিনি অস্ত্রে তিনি, শাস্তিতে কি ভয় ?"
কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধ্‌লে ক'সে তায়
শান্ত শিশু হাস্‌ল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায়।
চলে গেল শাস্তি নিতে নিরীহ প্রহ্লাদ
আত্মলাভের মূল্য দিতে প্রহারে সাহ্লাদ !
মিনতি-বোল্‌ বল্‌তে গেলাম দৈত্যপতিরে,···
বিমুখ হ'য়ে,···আঁক্‌ড়ে বুকে নিলাম ক্ষতিরে,
ছেড়ে এলাম সভাগৃহ বাক্য-যন্ত্রনায়
সিংহাসনের আসনে ভাগ ঠেলে এলাম পায়,
ভাব-দেহে যাই লাগ্‌ল আঘাত, হায়রে কয়াধু,
শরীরও মরিয়া হ'ল, টিক্‌ল না যাদু।

চলে এলাম রাজ্য রাজা ডুবিয়ে উপেক্ষায়
সত্য যেথা পায় না আদর চিত্ত বিমুখ তায়।
আসার পথে দেখে এলাম কেবল অলক্ষণ,—
বিম্বিল মোর বিধ্‌বা বেশ স্তম্ভ অগণন।
ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হ'ল বন্ধ
মশানে স্ব-মুণ্ডে লাথি ঝাড়্‌ছে কবন্ধ !
ক্ষিপ্ত-পারা আকাশে চাই সেথায় দেখি হায়,
রক্ত-স্নাত সিংহ-শীর্ষ পুরুষ অতিকায়,
অঙ্কে তাহার লুটায় কে রে মুকুট-পরা শির
সিংহনখে ছিন্ন অন্ত্র চৌদিকে রুধির !
দু'হাতে চোখ ঢেকে এলাম অন্ধ আশঙ্কায়
ভিত্তি পরে কপাল ঠুকে কেবল প্রতি পায়।
সেই অবধি শুন্‌ছি কেবল অন্তরে গুর্‌ গুর্‌
বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বাজায় বিপর্য্যয়ের সুর,
টল্‌ছে মাটি নাগ বাসুকী অধর্ম্মেরি ভার
হাজার ফণা নেড়ে করে বইতে অস্বীকার।
যে বিধি নয় ধর্ম্ম্য, বুঝি, তার আজি রোখ্‌-শোধ ;
বিধির টনক নড়ায় শিশুর শিষ্ট-প্রতিরোধ।
বিধি-বহিষ্কৃতের বিধি মান্‌বে না কেউ আর
ওই শোনা যায়, জম্ভলিকা ! নৃসিংহ-হুঙ্কার।
রেখে দে তোর শয্যা-রচন রাণীর পালঙ্কে,
হৃষিকেশের শাঁখ হৃদে শোন্‌ হর্ষে-আতঙ্কে !
ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,
সুখের বাসায় সুখের আশায় দে রে আগুন দে।
দুঃখ বরণ ক'রেছে মোর নির্দ্দোষী প্রহ্লাদ
সেই দুখে আজ আঁক্‌ড়ে বুকে চল্‌ করি জয়নাদ।
আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার,—
বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয় ন্যায্য অধিকার।
উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ
উচিত ক'রে পরতে হবে চোর-ডাকাতের সাজ,
চিত্ত-বলের লড়াই সুরু পশু-বলের সাথ
বন্যা-বেগের হানার মুখে কিশোর তনুর বাঁধ।

প্রলয়-জলে বটের পাতা! চিত্ত-চমৎকার!
তীর্থ হ'ল বন্দীশালা শিকল অলঙ্কার!
খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মাভৈঃ রব;
উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এই মম গৌরব।
কয়াধু তোর জনম সাধু, মোছ্ রে চোখের জল,
রাজ-রোষেরি রোশ্‌নায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চয়ন

বিপরীতগামী রেলগাড়ী

ইরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, —Necessity is the mother of invention, অর্থাৎ আবশ্যকতা আবিষ্কারের জননী। এমন এক সময় ছিল, যখন রেলগাড়ী ছিল না—তখন মানুষ পায়ে হাঁটিয়া অথবা অন্য যানবাহনাদির ব্যবস্থা করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিত। এখন আমাদের দেশের এমন প্রদেশ নাই—যে-প্রদেশে রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই। এখন সেই রেলপথে সহস্র সহস্র নরনারী নিরাপদে যাতায়াত করিতেছে। যদি কোন কারণে সেই রেলপথ দুই চারি দিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে যাত্রিগণের সম্পূর্ণ অসুবিধা ঘটে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের বৃদ্ধিতে মানুষ এক এক মিনিট সময় বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সময় যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে রেলগাড়ী অপেক্ষা [illegible] শীঘ্রগামী যানাদির প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইতেছে। এই প্রয়োজনের ফলে মোটর এবং ব্যোমযানের প্রচার দিন দিনই বাড়িতেছে।

আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ সকলেই রেলগাড়ী দেখিয়াছেন, কিন্তু রেলগাড়ীকে নিরাপদে চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে কত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে বোধ হয় তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। রেলগাড়ী বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য্য সাফল্য। উহা মানুষের শিল্প-নৈপুণ্যের চরম নিদর্শন। কোথাও উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর দিয়া রেলগাড়ী দৌড়িতেছে—কোথাও-বা সুপ্রশস্ত নদীর উপর দিয়া চলিয়াছে। কোথাও রেলগাড়ী যাতায়াতের জন্য পর্ব্বতের ভিতর দিয়া রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে—কোথাও বা নদীর নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা হইয়াছে, ও তাহার ভিতর দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করিতেছে। এই সকল কার্য্য বহু শ্রম ও

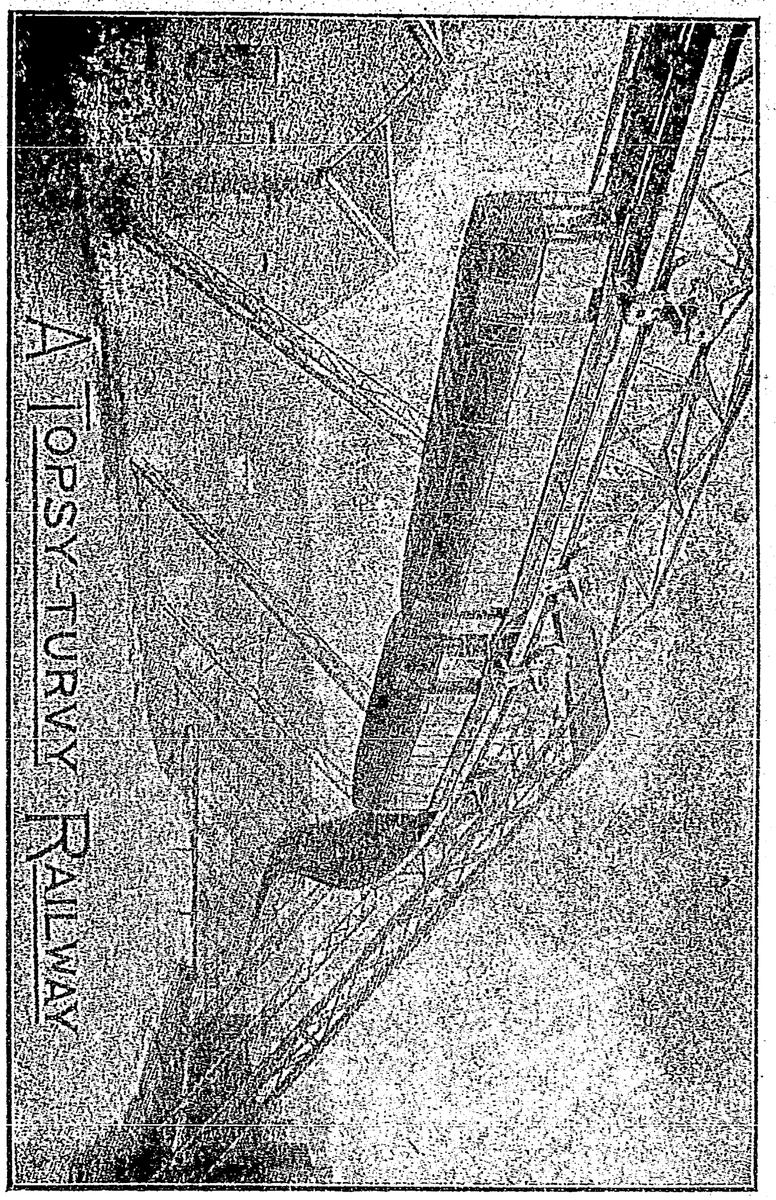

নদীর উপর বিপরীতগামী রেলগাড়ী।

অর্থব্যয় সাপেক্ষ। ঐ সকল রেলপথ প্রস্তুত করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন শত শত মনুষ্য জীবন দান করিয়াছে। ঐরূপ অর্থব্যয় ও জীবনদানের ফলে আমরা ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়িয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে হাতে একখানা উপন্যাস লইয়া এক আধ ঘণ্টার মধ্যে ঐ সকল ভীষণ বন-জঙ্গল পর্ব্বতময় স্থান পার হইয়া যাইতেছি।

ইটালি ও সুইট্‌জ্যারল্যাণ্ডের মধ্যে একটা খুব প্রশস্ত টানেল (পর্ব্বতমধ্যস্থ পথ) আছে। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ মাইল হইলেও এই টানেল প্রায় সাড়ে সাত বৎসরে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার প্রত্যেক গজ খুঁড়িতে [illegible] টাকা ব্যয়

হইয়াছিল। কিন্তু টেম্‌স্‌ নদীর নীচে দিয়া যে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার একগজ প্রস্তুত করিতে ১৮০০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল। এবং ১৮ বৎসরে তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়।

রেলগাড়ীর প্রচার কত বাড়িয়া গিয়াছে, ইহার একটা অনুমান করা যাউক। পৃথিবীতে এখন ৬৭০০০০ মাইল রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে এবং ঐ পথে রেলগাড়ী চালাইবার জন্য মানুষ ১২৫০০০০০০০ পাউণ্ড খরচ করিয়াছে। গ্রেটবৃটেনে প্রত্যেক মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে ৫১,৩০৮ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। প্রতিবর্ষে গ্রেটবৃটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রায় ১৬০০০০০০০০ যাত্রী রেলপথে যাতায়াত করিতেছে। ঐ যাত্রিগণের মধ্যে ৩,০০,০০,০০০ যাত্রী প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করেন। ভারতবর্ষে রেলপথের বিস্তার ৩৩০০০ মাইল। কিন্তু এখানকার রেলপথের যাত্রিগণের তালিকা জানাইবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণীতে ভিড়ের মধ্য দিয়া ধাক্কা খাইতে খাইতে মেষাদি প্রভৃতি পশুপালের মত বদ্ধ হইয়া লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী প্রতিদিন তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া আপনাদের জীবন সার্থক মনে করিতেছে। এইরূপে যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আমাদের দেশের রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন কত কষ্টের, আর জানেন তাহা অন্তর্য্যামী ভগবান। জানি না, আমাদের গবর্ণমেণ্টের সানুগ্রহ-দৃষ্টিতে কবে ভারতীয় রেলপথের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের গমনাগমন সুখকর হইবে। যাক্‌ সে কথা।

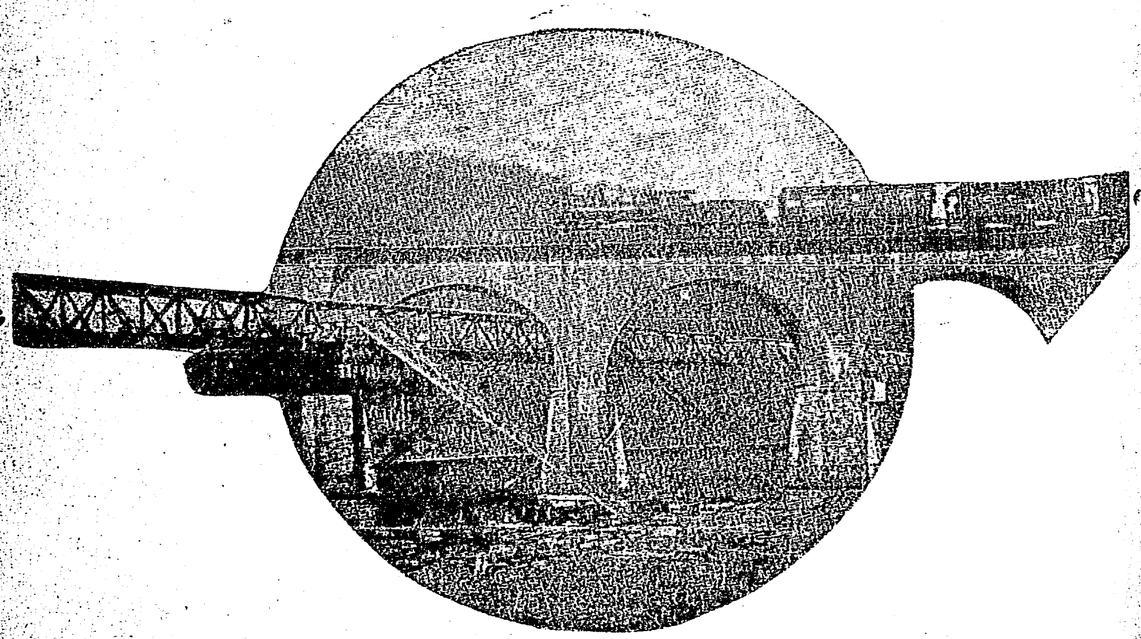

বলের পুলের নীচে বিপরীতগামী রেলগাড়ী

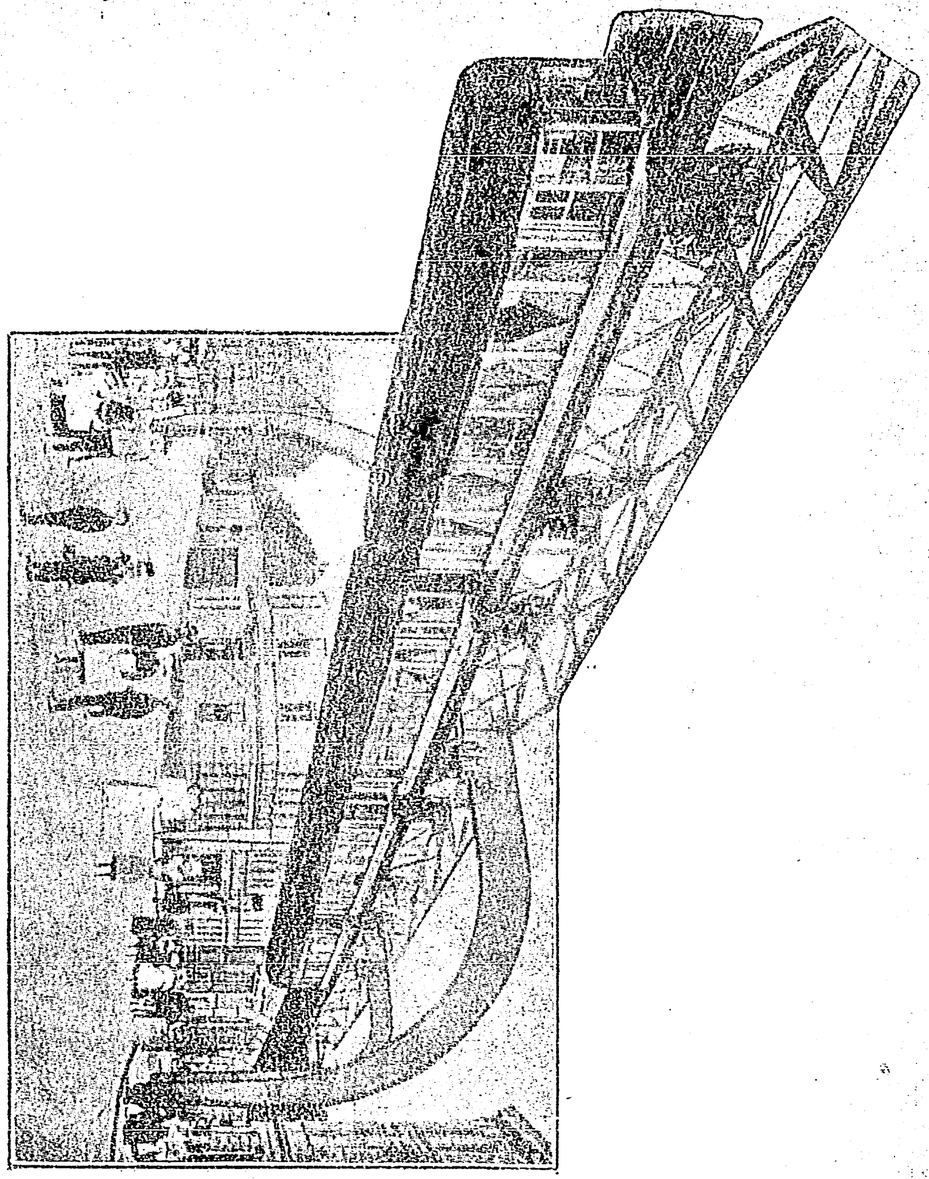

পর্ব্বতের উপর দিয়া বিপরীতগামী রেলগাড়ী

জর্ম্মনী-দেশে এল্‌বরফেল্‌ড্‌ এবং বার্ম্মেন নামে দুইটি গ্রাম আছে। ইহাদের মধ্যে রেলগাড়ী বিপরীতমুখী হইয়া চলে। সেতু উপরে, গাড়ী নীচে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ গাড়ী নদী পার হইবার সময়েই ঐ রূপ ভাবে চলে। ইহা দেখিয়া ঐ ট্রেণে আরোহণাভিলাষী যাত্রিগণের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—তাহাদের এইরূপ ভয় হয় যে, হায়, বুঝি এইবার নদীতে ডুবিয়া মরিলাম!

ওয়াহ উয়িংকিল ষ্টেশনে ট্রেণ পৌঁছিবামাত্র এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। রেলগাড়ী নদীর উপর [illegible] নীচে

আকাশের মধ্য দিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে চলিতেছে এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি আতঙ্কে ও বিস্ময়ে মগ্ন না হইবে! ইহার চাকাও বড় নিপুণ শিল্পে গঠিত। লৌহনির্ম্মিত চক্রনেমিতে দীর্ঘ দণ্ড পরস্পর গ্রথিত থাকে। ইহা দেখিতে তত সুন্দর নয়। যদি এই সময়ে গাড়ী আসিয়া যায় তবে আরোহিগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠেন। তখন এইরূপ মনে হয় যেন মাথার উপর দিয়া টরপেডো যাইতেছে।

এই গাড়ী মাত্র আট মাইল পথ চলে। ইহাতে কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা আছে। ভাড়া চার পেনি। সাধারণ গাড়ীতে এই রাস্তা যাইতে উহার দ্বিগুণ ভাড়া লাগে। ভাড়া কম বলিয়া অনেক লোক ঐ ভয়ঙ্কর গাড়ীতে চড়িয়া যাতায়াত করে। যদি এরূপ সুবিধা না থাকিত তবে ঐরূপ গাড়ীতে আরোহীর সংখ্যা খুব অল্পই হইত। কেননা এই গাড়ীতে আরোহণ করা আরোহীদের পক্ষে একেবারেই সুখকর নহে।

ষ্টেশনের নিকট উপস্থিত হইলেই ঐ গাড়ী একপ্রান্তে চলিয়া যায় এবং পুনরায় এক অর্দ্ধবৃত্তাকার পথ অতিক্রম করিয়া প্ল্যাটফরমে দাঁড়ায়। যখন ঐ গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকে তখন তাহা একটু ঝুঁকিয়া থাকে। মনে হয় যেন গাড়ী সুদীর্ঘ পথ আসিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাত্রিগণ গাড়ীর ভিতরে যাইয়া বসিল। যথাসময়ে সিগনল্ দেওয়া হইলে গার্ড সাহেব নীল পতাকা দেখাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। গাড়ী ছুটিতে লাগিল। আরোহিগণকে কোন ধাক্কাও লাগে না [illegible] অন্য কোনো প্রকার অসুবিধাও হয় না; কিন্তু জাহাজের যাত্রীদের সমুদ্র-পীড়ার মত তাহাদের একটা সামান্য কষ্ট বোধ হয়। যখন ঐ গাড়ী একটা মোড় পরিবর্ত্তন করে কেবল সেই সময়ে যাত্রীদের একটা ঝাঁকানি লাগে মাত্র।

যখন ঐ গাড়ী উইপর নদীর উপর উপস্থিত হয় তখন দেখিতে বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়।

ভগবান্ ঐ নদীকে পর্ব্বত ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু এখন ঐ নদীর উভয় তীরে বড় বড় কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে। সামান্য স্থানও খালি পড়িয়া নাই, সেতু রক্ষা করিবার স্তম্ভগুলি পর্য্যন্ত কারখানার দেওয়ালের ভিতর দিয়া কারখানার মধ্যে প্রোথিত আছে।

যখন ঐ গাড়ী ষ্টেশনের কিছু দূরে থাকে তখন গাড়ীর উপর হইতে উহার আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা যায়;—পাতলা পাতলা দুটিমাত্র কাষ্ঠখণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। মনে হয় কেহ যেন আকাশের মধ্যে ঘুড়ি উড়াইয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। যখন গাড়ী ঐ ষ্টেশনের খুব নিকটে আইসে তখন মনে হয়, বাস্তবিকই উহা ষ্টেশন—যেহেতু, তখন সেই তক্তার উপর মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়।

ঐ ট্রেণের আরোহিগণ বিভিন্নপ্রকার আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পান। রেলওয়ে ব্রিজ কখনো তাঁহাদের পায়ের নীচে, কখনো মাথার উপরে দৃষ্টিগোচর হয়। কখন সেই পথ দিয়া ট্রামগাড়ী চলিয়া যাইতেছে। কখনো ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে রেল-

গাড়ী চলিতেছে। যখন গাড়ী কোনো মোড়ের নিকটবর্ত্তী হয় তখন প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। তখন এরূপ মনে হয়, যে, এই রেলগাড়ীতে আর কখনো আরোহণ করিব না। যখন বার্ম্মেন ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায়, তখন মানুষ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। সকলে বলে, সাধারণ গাড়ী ইহা অপেক্ষা ভাল। ইহাতে ভাড়া কিছু কম বটে কিন্তু সাধারণ গাড়ীর অতিরিক্ত ভাড়াও যেন বাঞ্ছনীয়, আর আমরা এমন ফ্যাসাদে কখনো পড়িব নাই!

—সত্যবতী-বাঈ দুবে

পৃষ্ঠ-পটে উল্কি-চিত্র



পৃষ্ঠ-পটে উল্কি-চিত্র

এই যে লোকটিকে দেখ্‌ছেন, এর পিঠের পটে উল্কির ছবিখানির উপরেও একবার চোখ বুলিয়ে নিন্। এর-চেয়ে ভালো উল্কির ছবি পৃথিবীতে আর নেই। এই লোকটির নাম জ্যাক গোউল্ড। সে নাবিক। তার দেহের আগাপাশতলায় ছুঁচ ফুটিয়ে উল্কি-চিত্র আঁকা হয়েছে। পিঠের যে ছবিখানির প্রতিলিপি আমরা দিলুম, কেবলমাত্র সেই খানি আঁকাতেই সময় লেগেছে গোটা দুই বৎসর, এবং খরচ হয়েছে সাড়ে সাত হাজার টাকা।

উল্কির চলন পৃথিবীতে অনেকদিন। চার হাজার বছর আগেও মিশরীরা উল্কির ছবি আঁকত। এখন উল্কি আঁকা হয়, শোভার্থে। তখন কিন্তু উল্কিতে মালিকত্ব বুঝানো হোতো। মনে করুন, কারুর একটি কলসী আছে! এক্ষেত্রে সে তার গায়ে উল্কিতে কলসীর ছবি এঁকে সকলকে বুঝিয়ে দেবে, সে একটি কলসীর মালিক! একালে জাপানের উল্কি পটুয়ারাই নিপুণতায় আর-সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আঁধি

৪

আদেশ দিয়া অভয়াশঙ্কর আসিয়া যখন উপরের ঘরে ঢুকিলেন, সুষমা তখন সেই ঘরেই জানালার ধারে বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়াছিল। অভয়াশঙ্করকে একলা দেখিয়া সুষমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—নিখিল এলো না যে! সে খেতে গেছে কি?

গম্ভীরভাবে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—না।

সুষমা ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—তবে? সে যে ফিরেচে, শুনলুম।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হ্যাঁ, সে এই এখন ফিরেচে, তাই তার সাজা হয়েচে, এগারোটা অবধি পড়ে তবে সে খেতে পাবে, শুতে পাবে। তার আগে নয়।

সুষমা সে গম্ভীর স্বর শুনিয়া ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার মুখে একটিও কথা ফুটিল না। অভয়াশঙ্কর একটু থামিয়া বলিলেন,—কাল রাত্রে এই শাসনটা হলো, আবার আজ এই!

কথাটুকু বলিয়া অভয়াশঙ্কর বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সুষমা ভয়ে কাঠ হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সকালে সে কত করিয়া মনকে বুঝাইয়া শক্ত করিয়াছিল, যে নিখিলের উপর স্বামী কড়া শাসন প্রয়োগ করিলে সে যেমন করিয়া হৌক, শাসনের সে বাঁধনটাকে কতক শিথিল করিয়া দিবে, কিন্তু অভয়াশঙ্করের ক্রোধ-গম্ভীর স্বর ও কঠিন ভঙ্গী দেখিয়া [illegible] তাহা করিতে পারিল না, শুধু ভয়েই [illegible] রহিল।

অভয়াশঙ্কর শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ কি বিপদেই তিনি পড়িলেন, এই নিখিলকে লইয়া। ছেলে যদি একটুও তাঁহার মন বুঝিয়া চলিত! সে যদি বুঝিত, তাহাকে শাস্তি দিতে বাপের প্রাণে কতখানি বাজে! অথচ এ অপরাধ করার জন্য শাস্তি না দিলেও যে নয়! শাসন আল্‌গা করিয়া ছেলের ভবিষ্যৎটাকে তো আর মাটী করা যায় না। সুষমা যে আসিয়া তার মার আসনে বসিয়াছে, তা সেই-বা সে মার কাজ কোথায় করিতেছে! সে তো নিখিলকে বুঝাইতে পারে, কোন্ কাজগুলা তাহার করা সাজে না, করা উচিত নয়! ছেলেকে বুকে তুলিয়া ননী-ছানা খাওয়াইলেই তো আর ছেলে মানুষ করা হয় না! তিনি চান, ছেলে সুষমাকে মার মতই ভাল বাসিবে, আবার সেই মার মত ভয়ও করিবে! এই শাসনের ভারটা তাঁহার হাত হইতে সুষমা নিজের হাতে তুলিয়া লইলেই যে ভালো হয়! তাহা ত সুষমা বুঝিবে না! তিনি কি-ভাবিয়া সুষমাকে বিবাহ করিলেন, আর কাজে এ ঘটিল কি! নিখিলকে লইয়া যে বিশৃঙ্খলা, সেই বিশৃঙ্খলাই রহিয়া গেল।

অভয়াশঙ্কর সুষমার পানে চাহিলেন,—সুষমা তেমনি পুতুলের মতই স্থিরভাবে তখনো দাঁড়াইয়া ছিল। অভয়াশঙ্করের বিরক্তি ধরিল। এইখানেই তো প্রভেদ! নিখিলের এত-বড় শাস্তির কথা শুনিয়া সুষমা বেশ নিশ্চিন্তভাবেই দাঁড়াইয়া আছে ত! কেন, সে কি তাহার কাছে আসিয়া একবার মিনতি

করিয়া বলিতে পারে না, যে, ওগো, অত রাত্রে খাইলে ছেলেটার যে অসুখ হইবে,—খাইয়া সে এখানে আসিয়া একটু পড়ুক, তার পর যে ব্যবস্থা হয়, করিয়ো! হায়রে, এ কথা সে বলিবে কেন? সে তো কিছু আর সত্যই নিখিলের মা নয়! সে যে—

ভাবিতে ভাবিতে অভয়াশঙ্করের বিরক্তি বাড়িয়া উঠিল। তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সুষমা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া শেষে বলিল,—তুমি শুলে যে,—খাবে না?

বিরক্তির স্বরেই অভয়াশঙ্কর বলিলেন—না।

এ কথার পর কি বলিবে, কি জবাব দিবে, সুষমা তাহা ভাবিয়াও পাইল না। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার সেই জানালার ধারে গিয়াই বসিল। আকাশে ছোট-ছোট কয়েক টুক্‌রা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, পাশের বাগানের বড় বড় তাল-গাছের আড়ালে ক্ষীণ চাঁদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সদ্য-আরোগ্য-পাওয়া রোগীর মতই শীর্ণ বিবর্ণ মূর্ত্তি—ছোট মেঘগুলা কখনো চাঁদের গায়ে পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, আবার কখনো নিজেদের পাৎলা আবরণটুকু চাঁদের মুখ হইতে টানিয়া সরাইয়া লইতেছে। মেঘেদের এই লুকোচুরি খেলায় ক্ষীণ চাঁদ হাসিয়া সারা হইতেছে। শান্ত স্তব্ধ রাত্রি—অদূরে পল্লীর কোন্ আখড়া হইতে ছেলেদের গলার গানের শব্দ সে স্তব্ধতাকে মাঝে মাঝে চিরিয়া চিরিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। সুষমা ভাবিল, বেচারা নিখিল! কি বেদনা বুকে লইয়াই না সে এখন পড়ার বই মুখস্থ করিতেছে! মুখে পড়া বলিয়া গেলেও বেচারী হয়তো এ বিপদে সুষমার কথাই ভাবিতেছে—মা আসিয়া কখন্ তাহাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে! সে তো জানেনা, তার এ-মার শক্তি কতটুকু? একটা সামান্য দাসীরও যে অধিকার আছে, সেটুকু অধিকারও এ-মার নাই! সে কতখানি অসহায়, কত নিরুপায়। হায় রে—এমনি করিয়াই উনি ছেলেকে বুঝাইবেন যে, না, সে মাতৃহীন হয় নাই! তাহার কোনদিকেই কোন অভাব নাই! নিরুপায় চিত্তে সুষমা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। তার পর সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে আকাশের পানেই চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে ঐ একটা, দুইটা, অনেকগুলা নক্ষত্র ফুটিয়াছে। ছেলেবেলায় সে শুনিয়াছিল, ওগুলা চোখ! যে-সব লোক মরিয়া যায়, তাহারাই সন্ধ্যায় জগতের কোলাহল থামিলে প্রাণের অসহ্য মায়ায় চোখ মেলিয়া তাহাদের চির-পরিচিত সুখের নীড় এই পৃথিবীটুকুর পানেই চাহিয়া থাকে! ঐ নক্ষত্রের চোখ মেলিয়া নিখিলের মাও কি পৃথিবীর এক কোণে এই বাড়ীটির পানেই অধীর একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, এখন? ছেলেবেলাকার সেই সরল বিশ্বাসটুকু আজো যদি তাহার মনে তেমনি অটুট থাকিত! এই ছেলে-ভুলানো রূপ-কথাটা যদি নিছক কল্পনার না হইয়া সত্য হইত! সুষমা আবার একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার দুই অলস চক্ষু ঘুমের ঘোরে কখন্ যে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। হঠাৎ একটা দাসীর কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিলে সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল [illegible] বুঝিল,

তাইত,—সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল! আশ্চর্য্য! ঘুম আসিল কোথা হইতে!

উঠিয়া চোখ মুছিয়া সে চাহিয়া দেখে, শয্যায় অভয়াশঙ্কর নাই। সে বিস্মিত হইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবু কোথায় রে?

দাসী বলিল,—বাবু নীচেয় খেতে গেছেন, দাদাবাবুকেও খাওয়াচ্ছেন, তাই মা, তোমায় ডাকতে এলুম;—কি দরকার হয়, না হয়—!

সুষমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দাসীর পানে চাহিল,—দাসী ত জানেনা, স্বামীর সঙ্গে সুষমার কি সম্পর্ক! স্বামী উঠিয়া গিয়াছেন, সুষমাকে একবার ডাকাও উনি প্রয়োজন বুঝিলেন না! অভিমানের অসহ্য বেদনায় সুষমার বুক ফাটিয়া পড়িবার মত হইল! কিন্তু হায়, এ কার উপর কিসের তার অভিমান! তাহার দুই চোখের পিছনে যেন সাগরের জল বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঠেলিয়া আসিল। পাছে দাসীর কাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া নীচে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অভয়াশঙ্কর ও নিখিলের খাওয়া তখন চুকিয়া গিয়াছে। নিখিল আঁচাইতে ছিল, অভয়াশঙ্কর পাশে দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন—যা, যা বলেচি, সব এবার থেকে মনে থাকবে? একচুল এদিক-ওদিক হবে না আর?

আঁচানো শেষ করিয়া নিখিল অত্যন্ত মৃদু ভীত কণ্ঠে বলিল,—হ্যাঁ।

—আচ্ছা—বলিয়া অভয়াশঙ্কর নিকটস্থ আল্না হইতে একটা শুষ্ক তোয়ালে টানিয়া ছেলের হাতে দিলেন; নিখিল তোয়ালের মুখের [illegible] সরিয়া দাঁড়াইল। অভয়াশঙ্কর তখন আচমন শেষ করিয়া ছেলেকে বলিলেন,—আজকের মত তোমার ছুটী। এখন শোবে, চল—দশটা বেজে গেছে।

সেনাপতির আদেশ-চালিত সৈনিকের মতই নিঃশব্দে নিখিল পিতার আগে-আগে সিঁড়ির দিকে চলিল। অভয়াশঙ্কর যাইবার সময় সুষমার পানে চোখের এমনি একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন যে সে দৃষ্টি বিষ-মাখানো তীক্ষ্ণ শরের মতই তাহার হাড় অবধি বিঁধিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া দিল। সে কেমন মূর্চ্ছিতের মত হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইল, যখন ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিল—খেয়ে নাও মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? রাত ত অপ্প হলো না!

সুষমা মৃদুস্বরে বলিল,—আজ আমি কিছু খাবো না ভাই বামুন দিদি। তুমি খাবার তুলে রাখো—আমার বড্ড অসুখ করচে!

কথাটা বলিয়া তাহার উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত্তও সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া ঝড়ের বেগে আসিয়া সুষমা শয়ন-কক্ষে মেঝের উপর আপনার দেহভার লুটাইয়া দিল। চোখের জল আর বাঁধ মানিল না—সুষমার বুকের সমস্ত বেদনাটাকে গলাইয়া ভাসাইয়া দুই চোখ বহিয়া সে অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িল!

৫

সকালে স্বামীকে একান্তে পাইয়া সুষমা বলিল,—আ মার একটা কথা রাখবে?

অভয়াশঙ্কর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—কি কথা? বল।

সুষমা বলিল,—আমায় কোথাও পাঠিয়ে দেবে, দিন-কতকের জন্যেও অন্ততঃ?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কোথায় যেতে চাও তুমি?

সুষমা বলিল,—যাবার আর ঠাঁই কোথায়, বল? এক পিশিমার কাছে, আর না হয় দেশের বাড়ীতে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হঠাৎ এ খেয়াল হলো যে?

সুষমা বলিল,—খেয়াল নয়। আমি ঢের ভেবে দেখেচি,—এ ছাড়া আর-কোন উপায় নেই।

—কিসের উপায়?

—তোমার সুখের। আমায় এনে অবধি তুমি অত্যন্ত মন-কষ্টে আছ। নিখিলের জন্যেই আমায় আনা, সেই নিখিলের কিছুই আমি করতে পারি না, করিও না। তুমি বিরক্ত হও, সে বিরক্তির যা-কিছু ঝাঁজ, তা ঐ ছেলেটার উপর গিয়েই পড়ে। তার জন্যে মায়া হয়, এ কথা বলচি না। কেননা, তা বললে তুমি বিশ্বাসও করবে না, আমি ত আর তার মা নই,—তবে তার উপর এই যে অনর্থক অত্যাচার হয়, এ পাপের সব দায় আমার ঘাড়েই ত পড়ে! আর-জন্মে অনেক পাপ করেচি, তার জন্যে এ-জন্মে এই তিলে-তিলে পুড়ে মরচি, এ-জন্মে জেনে-শুনে আর এ পাপ করি, কেন?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—বুঝেচি, আমার হাতে পড়েচ, এটা তোমার মস্ত পাপের ফল বৈ কি!

সুষমা এ কথার কোন জবাব দিল না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—একটা কথা শুধু তুমি, শোনো—আমায় অপরাধী করো না। আমার অপরাধ কি? ভালো ভেবেই এ ব্যবস্থা আমি করেছিলুম। এ ব্যবস্থা করতে আমার বুকে কত বেজেছে, তা তুমি বুঝবেও না—কিন্তু মানুষে যা ভাবে, তাই কি ঘটে সব সময়? তুমি কোনদিন আমার মন বোঝবার চেষ্টা করলে না ত! যদি করতে, তাহলে তুমিও সুখী হতে পারতে, আমিও সুখী হতুম!

সুষমা একেবারে অভয়াশঙ্করের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল,—তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও গো, তুমি কি চাও? আমি জ্ঞানতঃ কখনো তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিনি ত। তবে আমি মেয়েমানুষ, বুদ্ধি আমার কম, তোমার মত লেখাপড়াও শিখিনি, এটা বোঝোত। যদি আমি কোথাও ভুল বুঝে থাকি ত সে ভুল আমার শুধ্‌রে দাও। আমাদের চারিধারে কালো মেঘ জমে আছে—যদি একটা কথার হাওয়ায় সে মেঘ কেটে আকাশটা ফরসা হতে পারে, তবে কেন তুমি সেকথা বলছ না গো? বল, আমার কোথায় ত্রুটি, কি ত্রুটি হয়েছে, আমি নিশ্চয় তা শুধরে নেব। চারিদিকের এ ঘোলাটে ভাবে আমার একলারই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠেনি শুধু, ছেলেটাও যায়, তুমিও কষ্ট পাচ্ছ।

অভয়াশঙ্কর আজ এখন এই সুষমার ত্রুটি দেখাইবার অবসর পাইয়া চারিধার হাতড়াইতে লাগিলেন। একটু পূর্ব্বে যে-সমস্ত ত্রুটিগুল প্রকাণ্ড জাঁতার মত মনের মধ্যে প্রচণ্ড রবে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, এখন হাতড়াইতে গিয়া কোথায় যে ছায়ার বিন্দুর মত সেগুলা সরিয়া পলাইয়া যায়—হাতে আর কিছুতেই আঁকড়াইতে পারা যায় [illegible] নাগালের

মধ্যে মনের কাছে-কাছে পড়িয়া ছিল, সে-গুলাকে কুড়াইয়া লইয়া অভয়াশঙ্কর দেখিলেন, এ যে অতি তুচ্ছ! সেগুলাকে লইয়া মস্ত-বড় তর্ক বা উপদেশ দেওয়া চলে না—উপদেশ দিতে গেলে তাহাদের নগণ্যতা, তাহাদের তুচ্ছতা দেখিয়া হাসি আসে, সেগুলার সম্বন্ধে কিছু বলিতে লজ্জা পায়, সঙ্কোচ হয়!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আচ্ছা, এক সময়ে বলবো'খন।

সুষমা বলিল,—তাই বলো। কিন্তু তার আগে একটা মিনতি করতে পারি কি? একটা কথা আমি বল্‌তে চাই শুধু,—শুন্‌বে?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—বল।

সুষমা বলিল,—নিখিলের সম্বন্ধে আমায় তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি? না পারলেও একবার চেষ্টা করে ছাখো। যত-বড় শপথ করতে বলো তুমি, আমি সেই তত বড় শপথ করেই বলতে পারি, আমার কাছে তার কোন অনিষ্ট কল্পনাও করো না, তুমি। আমি তার মা নই, সত্যি,—সাজা-মা—তবু আমি বলচি, মায়ের যত্ন না করি,—তবু সে আমার স্বামীর ছেলে একটিমাত্র ছেলে, তার মঙ্গলে আমার স্বামীর মঙ্গল, আমারো মঙ্গল, এটা ভেবেও ত তাকে আমি যত্ন করতে পারি!—এইটুকু ভেবেও যদি আমার এ কথাটা রাখো—!

অভয়াশঙ্কর একটু চমকিয়া বলিলেন,—কেন, তাকে ত তোমার কাছে আসতে আমি বারণ করি নি!

সুষমা বলিল,—মুখের কথায় বারণ করিনি, সত্যি—কিন্তু তার যে-ব্যবস্থা হয়েছে তাতে আমার কাছে দু'দণ্ড আসতে তার অবসর কোথা[illegible] এই বয়সে পড়ার অত চাপ তার উপর চাপিয়ো না গো—একটু হাঁফ ছাড়তে দিয়ো তাকে। সে ত আমাকেই মা বলে জানে—আমার কাছে দুটো-চারটে আদর-আব্দার করবার অবসর তাকে দিয়ো—তাতে তার মন ভালোই থাকবে। এ-বয়সে ছেলেরা মার কোল ঘেঁষেই থাকতে চায় বেশী, তা-থেকে তাকে একেবারে বঞ্চিত করো না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কি জানো, সুষমা, তবে সত্য কথাটাই খুলে বলি। আমি ঢের ভেবে দেখেচি, এ কৃত্রিম বন্ধন দিয়ে তাকে বেঁধে রাখবার যত চেষ্টা, যে-আয়োজনই আমরা করি না কেন, এ বাঁধন একদিন এম্‌নি অলক্ষ্যে আল্‌গা হয়ে যাবে, যে সেদিন ও-বেচারী আপশোষে একেবারে সারা হয়ে যাবে। ও সেদিন পৃথিবীতে আপনাকে অত্যন্ত প্রবঞ্চিত, অসহায় বলে' মনে করবে, আমাদের দু'জনেরি উপর ওর মন তিক্ত, বিষাক্ত, বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে, তাই ওকে তোমার কাছ থেকে একটু-একটু করে সরিয়ে নিচ্ছি, মনকে ও শক্ত করে নিক্,—স্নেহ-মায়া-মমতা এ-সব কোমল বৃত্তিগুলো ওর মনের উপর যেন কোন আধিপত্য না করতে পারে! বুঝলে?

সুষমা বলিল,—এই রকমে তুমি ওর মনের স্বাভাবিক গতিকে বেঁধে দিতে চাও? ওর মনকে একটা পাথরের মতই শক্ত করে দিতে চাও? আমি মেয়ে-মানুষ, তোমার মত অত বুঝি না—কিন্তু এতে ওর মন কত-বড় ঘা খাবে, ভাবো দেখি! ছেলেমানুষের ছোট্ট কোমল মনটুকু এত-বড় প্রকাণ্ড অস্বাভাবিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যে

একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে।

তারপর একটু থামিয়া দম্ লইয়া সুষমা আবার বলিল,—একটা কথা বলবো?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—বল।

সুষমা বলিল,—আগে থেকেই তুমি মন্দ দিক্‌টা অত ভাবচো কেন! আমাকে মা বলে জেনেই যদি ও বড় হয়ে ওঠে,—আর তার জন্যে তুমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছ, অনেক যুজেছ, তুমি মনে করোনা, আমি তা বুঝি না! সে আমি খুব বুঝি, আর বুঝি বলে তোমায় শ্রদ্ধাও আমি খুব করি—তাই জেনেই যদি ও বড় হয়ে ওঠে, তাতে এমন কি ক্ষতি হবে? আমি তোমায় এইটুকু বলতে পারি যে, আমার দিক থেকে এমন ব্যবহার ও কখনো পাবে না, যাতে করে তিলেকও ওর সন্দেহ হতে পারে যে, আমি ওর মা নই! তবে কেন মিছে মনে ও-সব কু গড়ে এত দড়ি-দড়া দিয়ে চারিধার এঁটে বেঁধে দিচ্ছ। এতে করে ও তোমাকে কতখানি নিষ্ঠুর বলে ভাবচে, বল দেখি। এখন ক্রমেই ও বড় হয়ে উঠচে, চারিধারে মা-বাপের কি প্রচুর স্নেহের মধ্যে যত ছেলে-মেয়েকে মানুষ হতে দেখচে—এ সব থেকে ওর মনকে তুমি আট্‌কে রাখতে পারবে?

বাধা দিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এই জন্যেই ত কারো বাড়ীতে ওর যাওয়া-আসা আমি পছন্দ করি না, বাইরের সঙ্গে মেলামেশায় আপত্তি করি!

সুষমা বলিল,—এত গণ্ডী টেনে ছেলে মানুষ করা চলে না। তার চেয়ে ওকে ছেড়ে দাও দেখি, বাহিরের অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে। চারিধারে এই যে প্রাণের মুক্ত হিল্লোল চলেছে, এর মধ্যে প্রাণ ভরে মিশুক ও! তার পর ভবিষ্যৎ! সে ভার আমার উপর দাও, ছাখো—

অভয়াশঙ্কর একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন,—আচ্ছা, ভেবে দেখব তোমার কথা। তবে ঐ যে বললে, তোমার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে নিচ্ছি, এটা ভুল কথা! আমি তা নিইনি। আর ঐ অবসর? সেটা তোমরা এরি ফাঁকে করে নিতে পারো যদি, ত তাতে আমার কোন আপত্তি নেই—কোনদিন ছিলও না!...

তারপর এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এত কথাই পাড়লে যখন, তখন শোনো,—তুমি সাধারণ মেয়েদের মত নও, তোমার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে—তুমি মিথ্যা অভিমান না করে, এ ব্যাপারের সূক্ষ্ম দিকটাও ধরতে পারবে,—তাই বল্‌চি, তোমার উপর ওকে সম্পূর্ণভাবে ফেলে দিতে আমার অনিচ্ছা নেই, আমি সেটা চাই-ও—কিন্তু আপাততঃ এমনি হয়েছে, যে যখনই ওটা ভাবতে বসি, তখনই কোথা থেকে লীলার ছল-ছল জল-ভরা দুটি চোখ আমার মনের সামনে জেগে ওঠে,—আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে যেন সে বলে,—আমার শেষ চিহ্ন, আমার স্মৃতি সব একেবারে লোপ করে দেবে?...সে দিক্‌টার সম্বন্ধে কি করি, বল দেখি, সুষমা?

সুষমা এ কথার জবাব দিতে পারিল না সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। একজনের স্মৃতি তাহারই জন্য একেবারে পৃথিবীর পট হইতে ধুইয়া মুছিয়া তবে তাহার আসন বিছানো! তাহার [illegible] বলিয়া

উঠিল,—না, না, না, এত বড় স্বার্থপর সে হইতে পারে না! হইতে চায়ও নাই কখনো! তবে—তবে? একটা কূল-হারা অসীম অকূলে তাহার সর্ব্ব-হারা মন দারুণ নৈরাশ্যে অতি ক্ষুদ্র একটু আশ্রয় খুঁজিয়া ভূতের মত অন্ধভাবে ঘুরিয়া মরিতে লাগিল।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমি একেবারে অমানুষ নই, সুষমা। সম্প্রতি আমার ব্যবহার দেখে তুমি হয়তো আমায় রাক্ষস মনে করছ। কিন্তু সত্যিই আমি রাক্ষস নই। কি করবো, বল? আমি যে কি বিষম বিপদেই পড়েছি, কোন দিকে সামঞ্জস্য আনতে পারছি না। নিজের সঙ্গে আমি অহরহ যুদ্ধ করছি। তোমার কাছে মুখ দেখাতে সঙ্কোচ বোধ করি, তাই হামেশা তোমার কাছে আসতে পারি না—তোমায় তাচ্ছল্য করে নয়। তোমায় দেখলে আমার কি মনে হয়, জানো? তোমার এ-জীবনটাকে আমি আমার সঙ্গে মিশিয়ে ধরে সেটাকে একবারে ব্যর্থ দুর্ব্বহ করে তুলেছি। তবু একটা জিনিষ মনে রেখো, তুমি যে কত-বড় ত্যাগী, কত উঁচুতে তুমি আছ, তা আমিও বুঝি। এই স্বার্থের দুনিয়ায় তুমি নিজের পানে একেবারে না চেয়ে কি-ভাবে আত্মবলি করেছ, তা আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝি, আর সে-জন্যে তোমায় যে কি শ্রদ্ধা করি আমি, তা বল্‌লে তুমি বিশ্বাস হয়ত করবে না।

কৃতজ্ঞতায় সুষমার দুই চোখে জল ছাপিয়া আসিল। মাথা নত করিয়া ভূমির দিকে সে চাহিয়া রহিল। চোখের জলে দৃষ্টি তাহার ঝাপ্‌সা [illegible]। অভয়াশঙ্কর ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পায়ের ধ্বনি সুষমার কাণে যেন কোন্ সুদূর দেশের পার হইতে একটা মুক্তির আভাষ আনিয়া দিল। সে একেবারে পাগলের মত ভূমে বসিয়া পড়িল, বসিয়া আঁচলে চোখের জল মুছিল। তাহার প্রাণ-মন ডুকরিয়া কাঁদিয়া বলিল—ওগো ভুল গো, তোমার ভুল। আমি ত্যাগী নই, ত্যাগী নই, এ মন আমার স্বার্থের বিষে ভরিয়া আছে। শ্রদ্ধা চাই না গো, আমি তোমার শ্রদ্ধা চাই না, শুধু ভালবাসা, একটু সহানুভূতি, একটু মমতা—ভালবাসার একটু অঞ্জন চোখে মাখিয়া আমার পানে চাহিয়ো—একটু শুধু মমতার দৃষ্টির প্রত্যাশী আমি গো!

৬

তার পর কয়েকটা দিন মন্দ কাটিল না। নিখিল হাঁফ ফেলিবার একটু অবসর পাইল, সুষমাও তাহার পিপাসাতুর মনটাকে তৃপ্তির সুধা পান করাইয়া বাঁচিল।

দুই-তিন মাস পরের কথা বলিতেছি। সেদিন দুপুর বেলায় নিখিল পড়িবার ঘরে বসিয়াছিল—মাষ্টার মহাশয় খাতায় রুল টানিয়া দিতেছিলেন; রুল টানা হইলে তাহাকে হাতের লেখা লিখিতে হইবে। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আজ চারখানা লেখা লিখতে হবে, নিখিল, বুঝলে? ইংরিজি টানা একটা, বড় এ-বি, ছোট এ-বি, আর বাংলা একটা। বুঝলে? তার পর হাতের লেখা হলে অঙ্ক কষবে। আজকে পড়া নেই, সকাল-সকাল ছুটি পাবে।

নিখিল বলিল,—কেন মাষ্টার মশাই?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—আজ চারটের পর বাড়ীর সাম্‌নে মাঠে বাঁশ বাজি হবে—দেখবে।

নিখিল বলিল,—বাঁশ বাজি কি, মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—সে দেখো তখন। একটা বাঁশ নিয়ে তার উপর একজন মানুষ চড়ে দুলবে, খেলা দেখাবে, বাঁশটা পুঁতবে না, অথচ—

নিখিল বিস্মিতভাবে কহিল,—পড়ে যাবে, না?

মাষ্টার মশায় বলিলেন,—না।

নিখিল অবাক হইয়া ভাবিতে বসিল। কল্পনা তাহার হাত ধরিয়া এক অপূর্ব্ব ক্রীড়া-মঞ্চের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। একটা বাঁশ লইয়া না পুঁতিয়া মাটীতে শুধু খাড়া রাখিয়া তাহার উপর চড়িয়া নানারকমের কসরৎ দেখাইবে! বাঁশ বাজির নামও সে কখনো কাণে শোনে নাই তাই কল্পনার সাহায্যে সে ব্যাপারটায় স্পষ্ট ধারণাও কিছু করিতে পারিল না। তবু সে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল—ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখের সাম্‌নে বাহিরের জগৎ একটা মস্ত বাঁশের ডগায় দোল্ খাইতে লাগিল—কল্পনা তাহাতে আর কোন-রকম রং ফলাইতে না পারিয়া সেই দোদুল জগৎটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ বাহিরে একটা কণ্ঠস্বর ধ্বনিয়া উঠিল—এই বাড়ী, বাবা?

এ কি, এ যে পরিচিত স্বর! এ স্বর সোনার না?

নিখিল উঠিয়া অতিশয় সন্তর্পিত পদক্ষেপে মাষ্টার মহাশয়ের অলক্ষ্যে জানালার পিছনে আসিয়া উঁকি দিয়া পথের পানে চাহিল। সত্যই ত, পথের ধারে দাঁড়াইয়া ঐ যে সোনা আর সোনার বাবা। সোনা বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার বাবার হাত ধরিয়া তাহাদের বাড়ীটার পানে চাহিয়া আছে। কাহাকে খুঁজিতেছে সে? কি চায়? নিশ্চয় নিখিলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। তাই ত, নিখিল এখন কি করে? দেখা দিবে কি? আহা, কতদূর হইতে সে আসিয়াছে! কিন্তু বাবা যদি দেখিতে পায়? তাহাকে সোনার সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়া বাবা যদি সোনাকে আর সোনার বাবাকেও তীব্র তিরস্কার করেন! নিজের মার সে সহ্য করিতে পারে, তিরস্কারেও কিছুই আসিয়া যায় না—কিন্তু ও বেচারীরা অনর্থক কেন বিনা-দোষে বকুনি খাইয়া মরিবে? শিমুলতলায় সেই সাঁওতালী ছেলে-মেয়েগুলার দুর্দ্দশার কথা তাহার মনে পড়িল। কি লাঞ্ছনাটাই না তাহারা ভোগ করিয়াছিল! অথচ তাহারা কোন দোষে দোষী ছিল না ত!

নিখিলের প্রাণটা অধীর হইয়া উঠিল। এই গ্রামখানির মধ্যে ঐ একটি মাত্র প্রাণীর বাড়ীর লোকদের সে জানে, শুধু—তাহারা নিখিলের কি সমাদরই না করিয়াছিল! আর সে? এমনি করিয়া একটা দেওয়ালের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়াই তাহাদের নীরবে বিদায় দিবে!

একটা কথা চকিতে তাহার মনে হইল। যদি উহারা বাড়ীর মধ্যে ঢোকে? ঢুকিয়া নিখিলের সঙ্গে দেখা করিতে চায়? কথাটা মনে হইতেই ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। উহারা ত জানে না, তাহার বাবার মেজাজ কেমন!

নিখিল ধীরে ধীরে পা টিপিয়া বাহিরে গেল। যাইবার সময় অত্যন্ত সতর্কভাবে মাষ্টার মহাশয়ের [illegible] গেল,—

মাষ্টার মহাশয় তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন কি না! না। মাষ্টার মহাশয় নিবিষ্ট মনে তখনো খাতায় রুল টানিতেছিলেন,—একটা, দুইটা, পাঁচটা, সাতটা পাতায় রুল টানিয়াই চলিয়াছেন। খাতাখানা নূতন বাঁধা হইয়াছিল—মাষ্টার মহাশয় সব পাতা-গুলাতেই রুল টানিয়া দিবেন, এখনি! তবে আর কি! নিখিল সতর্ক ভঙ্গীতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ যে সোনা দূরে দাঁড়াইয়া তাহার বাবাকে কি বলিতেছে।

চারিধারে চাহিয়া খুব সতর্ক মৃদু স্বরে নিখিল ডাকিল—সোনা—

সোনা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—রাজপুত্তুর—ঐ যে! সে বনমালীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—ঐ যে বাবা, রাজপুত্তুর। বলিয়াই ছুটিয়া সে একেবারে নিখিলের কাছে আসিল।

নিখিলের বুক তখন ভয়ে কাঁপিতেছিল। সে বলিল,—কোথায় যাচ্ছ তোমরা, সোনা?

হাসিয়া সোনা বলিল,—তোমাদের বাড়ীই দেখতে এসেচি ভাই, আমি। বাবাকে কত বললুম, বাবা কিছুতেই আসছিল না। শেষে খুব কাঁদতে লাগলুম—তখন মা বাবাকে বললে,—যাওনা গা নিয়ে—হুঁ-হুঁ, কেমন চলে এসেছি।

শুনিয়া আনন্দে মন ভরিয়া উঠিলেও ভয়ে নিখিল সারা হইয়া গেল। সোনা তাহার কাছে আসিয়াছে,—তাহার সঙ্গে খেলা করিবে বলিয়াই আসিয়াছে! কিন্তু সে—কি করিয়া খেলে সে? তাহার যে হাত-পা বাঁধা—এখন লেখা-পড়ার ঘণ্টা—খেলিবার অবসর কৈ? [illegible] ছাড়া বাবা বাড়ীতে আছেন! সোনার সঙ্গে এ-বাড়ীতে খেলা করা—সে যে অসম্ভব ব্যাপার।

সোনা বলিল,—চল না ভাই, তোমার মাকে দেখে আসি। আমার মাকে দেখেচ ত—তোমার মাকেও ভাই, আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। আর তোমার বাবা—রাজা। তাঁকেও দেখবো, ভাই।

সর্ব্বনাশ! সোনা এ বলে কি! তীব্র নৈরাশ্য নিখিলের বুকে পাহাড়ের মত প্রচণ্ড ভার লইয়া জমিয়া উঠিল। চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল। সোনার মনের এত-বড় আশা কি করিয়া দুই হাতে সে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়! কিন্তু হায়রে, সে যে একেবারে নিরুপায়!

ভিতর হইতে মাষ্টার মহাশয় ডাকিলেন,—নিখিল—

নিখিল ভড়কিয়া গিয়া বলিল,—এখন যাই ভাই, সোনা। মাষ্টার মশায় ডাকচেন—আমায় এখন হাতের লেখা লিখতে হবে কিনা। তুমি ভাই, বাড়ী যাও। আমি ওবেলায় তোমাদের ওখানে যাব'খন।

—তোমার মাকে দেখাবে না, ভাই? সোনার স্বর অভিমানে ভরিয়া উঠিল।

অত্যন্ত আদরে সোনার ছোট হাত দুখানি ধরিয়া নিখিল বলিল,—এখন নয় ভাই, আর একদিন দেখাব। আমি এখন আসি, সোনা,—হাতের লেখা লিখতে হবে আমাকে। তুমি ভাই এখন বাড়ী যাও।

কথাটা বলিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে নিখিল ছুটিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কাছে চলিয়া গেল। সোনা সেইখানেই হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল—ছেলেমানুষ অত-শত না বুঝিলেও,

তাহার মনে হইতে লাগিল, বুকের মধ্যে কি একটা যেন ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার দম বন্ধ করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে!

সোনা এক পাও নড়িল না দেখিয়া বনমালী বলিল,—আয় সোনা, বাড়ী যাবি না?

সোনা প্রায় কাঁদিয়াই জবাব দিল,—না বাবা, একটু থাকি বাবা।

বনমালী বলিল,—কি হবে মা থেকে! শুনলি ত, তোর রাজপুত্তুর এখন লেখাপড়া করছে। বড় লোকের ছেলে—ভদ্দর ঘরের—লেখাপড়া না করলে চলবে কেন মা?

সোনা কোন জবাব না দিয়া হতাশ নয়নে গৃহের প্রকাণ্ড দ্বারের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—ঐ দ্বার-পথেই নিখিল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

বনমালী বলিল,—আয় না সোনা, বাড়ী আয় না। তোর রাজপুত্তুর ত বিকেলে যাবে, বললে!

অভিমান-গাঢ় স্বরে সোনা বলিল,—না।

বনমালী বলিল,—এখন লেখাপড়ার সময় কি খেলা করে?

তবুও সোনার সেই একই উত্তর,—না।

বনমালী তখন পথের ধারে যে-একটা ঢিপি ছিল, তাহার উপর বসিল; আর সোনা কি সে অধীর দৃষ্টিতে প্রকাণ্ড বাড়ীটার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

কতক্ষণ এমনি ভাবে কাটিবার পর দামু বাহিরে কোথায় যাইতেছিল, হঠাৎ বনমালীকে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল,—তোমায় কোথায় দেখেচি না? তা এখানে কাকে খুঁজচ?

বনমালী বলিল,—আমার নাম বনমালী।

সেই যে তোমাদের খোকাবাবু একদিন ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে আমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন না—

দামু বলিল,—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমি দাদাবাবুকে নিয়ে আসছিলে, পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হলো—না? তা এদিকে আজ কোথায় এসেছিলে?

বনমালী উঠিয়া একটা আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া বলিল,—এইখানেই এসেছিলুম। মেয়েটা ক'দিন বায়না নিয়েছিল বাবুদের বাড়ী দেখবে বলে। আজ এমন ঝুলোঝুলি বাধিয়ে দিলে যে না এসে আর পারলুম না।

দামু বলিল—দাদাবাবু জানে?

বনমালী বলিল—হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন। এসেই চলে গেলেন,—বলে গেলেন, এখন লেখা-পড়া করছেন কি না, তাই চলে গেলেন।

দামু বলিল,—হ্যাঁ, এখন লেখাপড়া করছেন। এখন যে বেরুতে মানা আছে বাবুর—

বাধা দিয়া বনমালী বলিল,—তাই বোঝা-চ্ছিলুম ওকে যে এখন চ,—বিকেলে খোকাবাবু আমাদের ওদিকে যাবেন বললেন ত, তা মেয়েটা কিছুতে শুনবে না—বলে, রাণীমাকে দেখব—খোকাবাবুকে ও রাজপুত্তুর বলে কি না, বড্ড ভালবাসে।

হাসিয়া দামু বলিল,—বেশ মেয়েটি। রাণী-মাকে দেখবে? আচ্ছা, এসো। আমার ঘরে এসে তুমিও একটু তামুক খেয়ে যাও, আমি ওকে রাণীমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি—

বনমালী বলিল,—ওরে সোনা, চ'—তাহলে তোর রাণীমাকে দেখেই যাবি চ'।

বনমালী ও সোনা [illegible] দামু নিজের

ঘরে আসিল। এক ছিলিম তামাক সাজিয়া বনমালীর হাতে হুঁকাটা দিয়া সে সোনাকে বলিল,—এসো খুকী আমার সঙ্গে। তোমার রাণীমার কাছে নিয়ে যাই। রাণীমা দেখবে, এসো।

প্রসন্ন চিত্তে সোনা বলিল,—রাজপুত্তুর?

দামু হাসিমুখে বলিল,—রাজপুত্তুর যে এখন লেখাপড়া কচ্ছে, মা।

সোনাকে লইয়া দামু অন্দরে গেল। সুষমা তখন রান্নাঘরের দালানে খাইতে বসিয়াছিল। দামু সোনাকে আনিয়া অদূরে দালানের এক প্রান্তে দাঁড় করাইয়া বলিল,—ঐ তোমার রাণী-মা। দেখেচ?

দামুর সঙ্গে অপরিচিতা একটি বালিকাকে দেখিয়া সুষমা বলিল,—এ মেয়েটি কে, দামু?

দামু এ বাড়ীর বহু-পুরাতন ভৃত্য। তাই তাহার সম্মুখে সুষমার কোনদিনই সঙ্কোচ ছিল না। দামু সুষমার দিকে একটু আগাইয়া আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—সেই যে ঝড়ের রাত্রে সে-মাসে দাদাবাবুর বাড়ী আসতে খুব রাত হয়ে গিয়েছিল না? তা দাদাবাবু এদের বাড়ীতেই ছিলেন তখন! এই মেয়েটি আজ এসেছে রাণীমাকে দেখতে। কথাটা বলিয়া দামু মৃদু হাসিল,—পরে সোনার দিকে চাহিয়া হাসি-মুখেই বলিল,—এই তোমার রাণী-মা, খুকী, দেখেচ!

সোনা অবাক হইয়া গিয়াছিল। এই রাণী-মা! তাহার মারই মত সাদা-সিধা এক-খানি সাদা কাপড় পরা, তবে রংটা খুব ফর্সা, আর গায়ে সোনার কয়েকখানা গহনা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সে ভাবিয়াছিল, দেখিবে, রাণী-মার মাথায় প্রকাণ্ড মুকুট জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে, পরণে বড় বড় জরির ফুল-বসানো রাঙা কাপড়, আর রাণী-মা অমনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আশে-পাশে কত দাস-দাসী চামর ঢুলাইতেছে! তাহার পরিবর্ত্তে এ কি! রাণী-মা ঐ মাটীর উপরই একখানা কি-রকম ও আসন পাতিয়া তাহাতে বসিয়া ভাত খাইতেছেন!

প্রথমটা বিস্ময়ে তাহার কথা ফুটিল না। সুষমা দামুকে বলিল,—ওকে ঐখানে একখানা আসন-টাসন কিছু পেতে দাওনা, দামু—ও বসুক!

সুষমার কথা-মত দামু আসন পাতিয়া সোনাকে তাহাতে বসিতে বলিল, সে কুণ্ডলী পাকাইয়া আঁচলের ডগাটা মুখের মধ্যে পুরিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল।

দামু বলিল,—বসো খুকী—

খুকীর সে সঙ্কুচিত অপ্রতিভভাব তবুও কাটিল না।

সুষমা যখন বলিল—আসনে বসো খুকী—তখন তাহার শিশু চিত্তের অত্যন্ত সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত ভাব লইয়াই আসনে সে বসিয়া পড়িল, একাগ্র দৃষ্টিটুকু কিন্তু রাণীমার উপরই ন্যস্ত রহিল।

দামু বলিল—তুমি তাহলে বসো, খুকী, আমি বাইরে তোমার বাবার কাছে যাই।

মৃদু ঘাড় নাড়িয়া সোনা সম্মতি জানাইল।

সুষমা আহার শেষ করিয়া মুখ-হাত ধুইয়া সোনাকে লইয়া নিজের ঘরে গেল। অভয়াশঙ্কর তখন ঘরে বসিয়া কি-সব কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন। সে-ঘরে কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া সোনাকে লইয়া সুষমা তখন তাহার

বসিবার ঘরে গেল। সেখানে গিয়া সোনাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম কি খুকী?

সোনা কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—আমার নাম স্বর্ণময়ী। মা-বাবা কিন্তু আমাকে সোনা বলে ডাকে।

তারপর সুষমা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল,—তাহারা কোথায় থাকে, সে বাড়ী এখান হইতে কত দূরে? বাবা কি কাজ করে—মা সারাদিন কি করে? সে দুরন্তপনা করে কি না—এমনি করিয়া সোনাদের সংসারের প্রত্যেক খুঁটীনাটী খবর সংগ্রহ করিয়া দুই দণ্ডেই সুষমা সোনাকে আপনার করিয়া ফেলিল। তারপর নিখিলের সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল—নিখিল মাঝে-মাঝে তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে যায়, সোনার মা নিখিলকে কত জিনিষ খাইতে দেয়, তাহাদের কত গল্প বলে, নিখিল সোনার সঙ্গে কেমন খেলা করে। নিখিলের কথা বলিবার সময় কি গভীর শ্রদ্ধায়, অনুরাগে, কি বিপুল গর্ব্বে বালিকার ছোট্ট বুকখানি ভরিয়া উঠিতেছিল, তাহা সুষমার নজরে এড়াইল না। সে বুঝিল।

বুঝিয়া সুষমা জিজ্ঞাসা করিল,—নিখিলের সঙ্গে তোমার আজ দেখা হয়েছে? তোমার রাজপুত্তুর—?

সোনা বলিল,—হ্যাঁ। তারপর তাহার চোখ ছল-ছলিয়া উঠিল; সে বলিল,—রাজপুত্তুর চলে গেল,—আমায় বললে, তুমি এখন বাড়ী যাও, বলেই দৌড়ে চলে গেল।

সুষমা ইহার অর্থ বুঝিল, বলিল—এখন সে লেখাপড়া করছে কি না! আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সুষমা তখন একটা দাসীকে ডাকিয়া বলিল,—নিখিলকে একবার ডেকে আন্‌তো রে এখানে—বল্‌গে যা, মা একবার ডাক্‌চে, আবার এখনই চলে যাবে।

দাসী চলিয়া গেল। সুষমা তখন কাচের আলমারি খুলিয়া বড় একটা পুতুল বাহির করিয়া সোনার হাতে দিল। সোনা পুতুল পাইয়া আনন্দে সেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

সুষমা বলিল,—পুতুল পছন্দ হয়েছে ত?

ঘাড় নাড়িয়া এক মুখ হাসিয়া সোনা বলিল,—হ্যাঁ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জাপানী শ্রাদ্ধবাসরে

তোকাজি মন্দিরের বিপুল ঘণ্টা ক্ষণে ক্ষণে গম্ভীর সুরে নিনাদিত, যেন মিনিট-তোপ। ধাতুময় ঘণ্টার তীব্র গম্ভীর ধ্বনি হ্রদের জলে কাঁপন তুলে গৃহছাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিরিবেষ্টনীর শ্যামল বুকের উপর সকরুণ আর্ত্তনাদে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

আজ তরুণ ছাত্র য়োকোওির স্মৃতি-তর্পণ ভারি সুন্দর বড়ই মর্ম্মস্পর্শী এই অনুষ্ঠান। আদিম উৎপত্তি চীনে, কালক্রমে জাপানী বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ অনুষ্ঠান ব্যয়সাধ্য, য়োকোওির পিতা-মাতা দরিদ্র। তবুও স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের স্বেচ্ছাদত্ত

অর্থে কিছুরই ত্রুটি নাই। ইজুমোর জেন্-সম্প্রদায়ের সকল বিখ্যাত মন্দিরের ধর্ম্মযাজকেরাই উপস্থিত। বিরাট মন্দিরের সমুচ্চ বেদীর দক্ষিণে ও বামে শহরের যাবতীয় শিক্ষক ও ছাত্র উপবিষ্ট। মেঝে পুরু মাদুরে ঢাকা, তার উপর তাঁরা বসেছেন হাঁটু গেড়ে। বাহিরে প্রশস্ত সোপানশ্রেণী, তার ধাপে ধাপে হাজার জোড়া জুতা আর খড়ম।

মন্দিরের মুখোমুখি সিংহদ্বার। তার সামনে এক মঞ্চ। মঞ্চের উপর একটি মুক্তদ্বার আল্‌কোরা নূতন আলমারি—বুৎসুদান। তার মাঝে মৃত বালকের নামাঙ্কিত সোনালি-গালাকরা কাঠের ফলক ঝিকমিক করছে। এর নাম ইহাঈ। বুৎসুদানের সম্মুখে তেপায়ার উপর ধূপাধার, তার আশেপাশে ফলফুল পিঠে ও তণ্ডুলের নৈবেদ্য। বুৎসুদানের দুই পাশে মনোরম দীর্ঘাকার পুষ্পাধারে ফুটন্ত পুষ্পস্তবকের অনুপম সজ্জা। মন্দির-অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড দীপাধারে দীপ প্রজ্জ্বালিত। দীপাধারের সুমার্জ্জিত কাংস্যদণ্ডে সঞ্চরমান ভয়াল সরীসৃপের উৎকীর্ণ চিত্র—ঊর্দ্ধগামী বা অধোগামী ড্রাগন। ধূপধূম উঠছে কুণ্ডলাকারে নানা আকারের পাত্র হতে—কোনটি কূর্ম্মের ন্যায়, কোনটি বা বৌদ্ধপুরাণ-কথিত ধ্যানী ক্রৌঞ্চের ন্যায়। এ সবের পশ্চাতে বিরাট বেদীর আধ-আলো আধ-অন্ধকারে বোসে ভগবান বুদ্ধ হাসছেন পরিপূর্ণ বিরামের হাসি।

বুৎসুদান ও দীপাধারের মধ্যে ছোট একখানি টেবিল। তার দুই পাশে শ্রেণীবদ্ধ পুরোহিতগণ জানুর উপর ভর দিয়ে মুখোমুখি উপবিষ্ট। স্বর্ণ মণ্ডিত মস্তক, সিঁদুর-রঙের ঝলমলে রেশমী পোষাক আর সোনার পাড়-বসানো জোব্বা, যেন একখানি রঙিন ছবি।

বিপুল ঘণ্টা নীরব হল। লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে আহার্য্য-নিবেদন—সেঙাকি প্রার্থনা—উচ্চারিত হল। তারপর সহসা করুণ সুরে এক আবৃত্তি সুরু হল তান-লয়সহযোগে। তাল দেওয়া হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড দারুময় সোনালি-গালাকরা মাছের মাথার উপর। জাপানী ভাষায় তার নাম মোকুঙ্যো। আবৃত্তিটি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের এক পরিচ্ছেদ। তাতে পরম দেবতার আবাহন-গীতি অপূর্ব্ব সুন্দর—

"নির্ম্মল যাঁর নয়ন, দৃষ্টি যাঁর দয়া মমতা ও মাধুর্য্যে ভরা, হে সুন্দর! বড় সুন্দর তোমার নয়ন ও আনন!

"তুমি পবিত্র! তোমার আলোকে কোথাও কলঙ্ক নাই—তোমার জ্ঞানে কোথাও ছায়া নাই! চিরদিন তুমি সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল—তোমার মহিমা কে ব্যাহত করিবে? সূর্য্যের ন্যায়, তোমার করুণার পথে, তুমি অহরহ বিশ্বভুবন আলোকিত করিতেছ!"

নায়কদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট মধুর ও সমুচ্চ। পুরোহিতদলের অনুবৃত্তি গম্ভীর অনুচ্চ সুরে। তাদের কণ্ঠে ঐ মহাসঙ্গীতের আবৃত্তি যেন অনন্ত পারাবারের অস্ফুট কলরোল।

মোকুঙ্যো নীরব। মহাসঙ্গীতের সমাপ্তি। নায়কেরা এবং বিখ্যাত মন্দিরের প্রধান পুরোহিতেরা একে একে ইহাঈ-এর নিকট উঠে গেলেন। আনত হয়ে প্রণাম কোরে সূত্র আবৃত্তি করতে করতে একটি ধূপ জ্বালিয়ে

তাঁরা স্বল্পায়তন কাংস্যাধারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

ক্ষণকাল সভা নিস্তব্ধ। তারপর সুরু হল মৃত বালকের আত্মার উদ্দেশে সাইবুন বা অভিনন্দন-পাঠ। প্রথমে ছাত্রেরা, পরে শিক্ষকগণ। স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরই অভিনন্দন-পাঠের অধিকার। ক্রমান্বয়ে তারা সমুচ্চ বেদীর সামনে ছোট টেবিলটির কাছে এগিয়ে গিয়ে দেবোদ্দেশে প্রণাম কোরে বুকের কাছ থেকে এক একখানি কাগজ বার কোরে পাঠ করতে লাগলো। মনে হল যেন করুণ মিষ্ট সুরে মন্ত্রপাঠ চলছে। সকলেই বলতে লাগলো, যে চোলে গেছে তার প্রতি যারা পোড়ে আছে তাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসার কথা। সে-সব কথা শোকে করুণ, স্নেহে কোমল এবং অনির্ব্বাণ আশায় মর্ম্মস্পর্শী। সবার শেষে উঠলো শান্ত একটি মেয়ে। সে নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রী। তার কণ্ঠস্বর যেন পাখীর কাকলি, এমনি স্নিগ্ধ মধুময়।

এবার শিক্ষকদের পালা। ছোট টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ। তাঁর নাম কাতায়ামা। তিনি সর্ব্বজনপ্রিয়, চীনা ভাষার শিক্ষক। উপরন্তু তিনি একজন কবি। ছাত্রেরা তাঁকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। সভা একেবারে স্তব্ধ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো তিনি যখন 'অভিভাষণ সুরু করলেন—কো-শিমানে-কেন্-জিঞ্জো-চুগাক্কো-য়ো-নেন্-সেই……

"মেইজি-যুগের চতুর্ব্বিংশ বর্ষে দ্বাদশ মাসে ত্রয়োবিংশ দিবসে শিমানেকেন-স্থিত জিঞ্জো-চুগাক্কোর শিক্ষক, আমি কাতায়ামাযোকেই, শোকার্ত্ত হৃদয়ে মৃতের শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়া আমরি ছাত্র য়োকোঙি তোমিসাবুরোর আত্মার উদ্দেশে নিবেদন করিতেছি—

"তোমার অজ্ঞাত নয়, বিভিন্ন সময়ে দশ বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট ছাত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু যে-কোনো বিদ্যালয়ে যে-কোনো শিক্ষকের তোমার মত শিষ্যলাভ ভাগ্যের কথা—তোমার ন্যায় সহিষ্ণু, তোমার ন্যায় পরিশ্রমী, তোমার ন্যায় নিষ্ঠাবান, সর্ব্বথা তোমার ন্যায় সতর্ক ও বুদ্ধিমান শিষ্য। বিদ্যালয়ের সকল নিয়ম তুমি মানিয়া চলিয়াছ, কোনো নিয়ম কখনো লঙ্ঘন কর নাই—তোমার ব্যবহারে কখনো দোষ স্পর্শে নাই। সহপাঠীদের মধ্যে তুমি ছিলে স্ব-তন্ত্র, স্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

"প্রাচীনকালে কিহোকু-দেশ অশ্বের জন্য বিখ্যাত ছিল। অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব না মিলিলে সে দেশের লোকে বলিত—অশ্ব নাই। আমাদের ছাত্রগণের মধ্যে উত্তম ছাত্র অনেক আছে—অনেক তরুণ ও সুন্দর অশ্ব। হায়! কিন্তু সবার সেরাটিকে আমরা হারাইয়াছি।

"সপ্তদশ বৎসর বয়সে, শিক্ষালাভের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়ে, তুমি চলিয়া গেলে। এই অল্পকাল মধ্যে শিক্ষার দশটি ধাপের ছয়টি ধাপ অতিক্রম করিয়াছিলে! ভাবিলে দুঃখ হয়! আরো ক্লেশ হয় যখন মনে পড়ে তোমার শেষ পীড়ার কারণ পাঠে তোমার অক্লান্ত অনুরাগ। উপাদানে তুমি গঠিত

ছিলে তা দুর্লভ, অসাধারণ ছিল তোমার চরিত্র। তার সাহায্যে নিঃসন্দেহ তুমি গৌরবময় কল্যাণকর্ম্মে সার্থকতা লাভ করিতে, পিতৃপিতামহের নাম উজ্জ্বল করিতে পারিতে। কিছুই হইল না, সব পণ্ড হইল—বয়োবৃদ্ধির পূর্ব্বেই তরুণ বয়সে অকালে তুমি চলিয়া গেলে! এ দুঃখ রাখিব কোথায়?

"মানস-নয়নে দেখিতেছি, ক্লাসে বসিয়া আছি। তুমি হাত তুলিয়াছ, কি একটা প্রশ্ন করিবে। তারপর তোমার ছোট ডেক্‌সর উপর ঝুঁকিয়া তোমার এই দুর্ভাগা প্রাচীন শিক্ষকের মুখের উত্তর লিখিয়া লইতেছ! আবার দেখিতেছি শ্রেণীবদ্ধ বালক-দলে বন্দুক-কাঁধে সোজা দাঁড়াইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিতেছ! এখনো তোমার সহাস্য আনন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—যেন তুমি জীবিত রহিয়াছ! তোমার কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্ট শুনিতেছি—যেন তুমি এইমাত্র স্তব্ধ হইলে! তবু জানি স্মৃতিতে ভিন্ন আর তোমার কণ্ঠস্বর শুনিব না, সে হাসি-মুখ আর দেখিবনা। ভগবান! কেন সেই বিকাশোন্মুখ তরুণ জীবনটিকে অকালে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দিলে আর এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে কি প্রয়োজনে রাখিয়া গেলে! এ কী তোমার অবিচার! আমার দ্বারা তোমার কোন্ কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে?

"তোমার সহিত আমার শিষ্যগুরুর সম্বন্ধ মাত্র। তবুও আজ আমার কত দুঃখ কত বেদনা! আমার পুত্রের বয়স চতুর্ব্বিংশ, তোমাপেক্ষা সে অনেক বড়। সে অদূরপ্রবাসে, একান্ত নির্গুণ সে, তবুও তার স্মৃতি তার বৃদ্ধ পিতার অন্তরে নিয়তই জাগরূক। আর এই নম্র ধীর গুণবান মেধাবী বালকের তিরোধানে তার পিতামাতা ভাইভগ্নীর মনোভাব কে বর্ণনা করিবে! ভবিষ্যতেও চোখে জল আসে, অন্তর শোকে মুহ্যমান হয়, আর বলিতে পারি না।

"হায়! আমাদের পশ্চাতে ফেলিয়া তুমি চলিয়া গেলে! চিরদিনের মত চলিয়া গেলে! তোমার একাগ্রতা, তোমার সততা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণের নিকট দীর্ঘকাল আদর্শ হইয়া থাকিবে! এইমাত্র আমার সান্ত্বনা।

"আজ এখানে আমরা—তোমার শিক্ষকগণ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ—সমবেত হইয়া তোমার আত্মার কল্যাণকামনায় এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেছি। তুচ্ছ এই দান গ্রহণ করিয়া আমাদের স্নেহ-প্রীতিকে সার্থক কর।"

তারপর একটা রুদ্ধ বিলাপধ্বনি সহসা লুপ্ত হল প্রকাণ্ড মোকুঙ্যোর বুম্বুম্ শব্দে। অমনি— গায়কদলের নায়কেরা উচ্চকণ্ঠে নির্ব্বাণ-সূত্র আবৃত্তি সুরু করলেন—জন্ম-মরণের দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হবার গৌরব গীতি। মোকুঙ্যোর ফাঁপরা আওয়াজ আর নায়কদের উদাত্ত স্বরের অনেক তলে শত শত কণ্ঠে উচ্চারিত গীতি সাগর-গর্জ্জনের ন্যায়!

"শো-ঙ্যো মু-জো, জে-শো মেপ্পো—সবই ক্ষণস্থায়ী, সবই ভঙ্গুর! জন্ম হইলেই মরণ নিশ্চিত! যেদিন জন্মিলে সেইদিনই তো মৃত্যুর আহ্বান পাইয়াছ! মরণেই আনন্দ, কারণ মরণে শান্তি।" *

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* Lafcadio Hearn

দ্বিতীয় শৈশব

করতে বোধন বরতে অকাল শৈশবে
বন্ধুরা আজ কোথায় তারা? কই সবে।
অগস্ত্য তার আস্‌লো ফিরে আস্‌লো কি,
মগ্ন তরী আজ্‌কে হঠাৎ ভাস্‌লো কি?
কালের রথের চক্র কি আজ ঘুরলো হে,
ছিন্নপাখা মানস মরাল উড়লো হে?

শৈশবে এই? কই সে তাজা বর্ণ কই
সূর্য্য-করে কই সে কাঁচা স্বর্ণ কই?
আম-মুকুলে কই সে আকুল গন্ধ রে
কই সমীরে নৃত্য-দোদুল ছন্দ রে?
প্রাণের সুতায় নবীনতার মাঞ্জা কই,
আনন্দে সে অসীমতার পাঞ্জা কই?

ভোর ললিতে দূর বেহাগের সুর কেন,
দেব-প্রতিমায় এতই ভাঙা চুর কেন?
নয় ত আঙুর, নিষ্ফল এ তিক্ত যে,
রাজসূয়ের এ ভাণ্ডার হায় রিক্ত যে,
শুষ্ক বোঁটায় নামটী ফুলের রাখ্‌লে কে
চিত্ত-বলে ব্যঙ্গ ছবি আঁক্‌লে কে?

এই শিশুতে সেই শিশুতে তুল করা
মনকে সে যে ভুল বুঝিয়ে ভুল করা।
বিসর্জ্জনের ঠাটটি পড়ে আন মনে,
পূজার নিশির স্বপন দেখে, গান শোনে,
পশ্চিমেতে ডুব্‌ছে ছলছল্ রবি
চোখের জলে তুল্‌ছে বুড়া জলছবি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সঙ্কলন

নেপালে নেওয়ারদিগের ভাই পূজা

বাংলাদেশে যে পার্ব্বণকে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' বলে, নেপালে তাকেই 'ভাইপূজা' বলে। বাংলার বাইরে নেপাল ছাড়া অন্য দেশে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া'র রীতি আছে কিনা জানি না। কিন্তু এই পার্ব্বণের উদ্দেশ্য ও মাধুর্য্যের কথা ভাবলে স্বতই মনে হয় আমাদের এই নব জাগরণ—এই জাতীয় একতাসাধনের দিনে ইহা ভারতের জাতীয় উৎসব বলে গণ্য হওয়া উচিত। ইচ্ছা হয় এম্‌নি একটা উৎসবের দিনে ভারতের সকল দেশে প্রত্যেক বোন্ জাতী ধর্ম্মের দিকে না তাকিয়ে ভাইদের স্নেহে সিঞ্চিত করে মঙ্গলটীকা পড়িয়ে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ কামনা করুক।

নেপালে সকল জাতই ঠিক একই প্রথানুসারে 'ভাইপূজা' করে না। ব্রাহ্মণ ছত্রি প্রভৃতির নিয়ম এক-রকম, আর নেওয়ারদের প্রথা ভিন্ন। আমি আজ নেওয়ারদের ভাইপূজার কথাই বলব।

ভাই পূজা হয় সন্ধ্যার পর রাত্রে। ভাইপূজার দিন প্রথমে ঘরের মেঝেতে প্রত্যেক ভাইয়ের জন্য এক একটী মণ্ডল আঁকতে হবে। মণ্ডল আঁকবার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে জলের আলপনা দিয়ে তার উপরে তেলের দাগ দিতে হবে। এই তেলের দাগের উপরে আবার শুক্‌না চা'লের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে রেখা টানতে হবে। মণ্ডলের বাইরে চার কোণে এবং ভিতরে ঠিক মাঝখানে কিছু কিছু ধান রেখে তার উপরে

আস্ত চাল রাখতে হবে। এই চাল তৈরী করতে খুব সাবধান হতে হবে যেন একটুও না ভাঙ্গে। সেই চালের উপরে ফুল* ও ধুনা রাখতে হবে। এই সব রেখে তারপর সকলের উপরে রাখতে হবে 'যজন্‌কা।' আঙ্গুলে তৈরী ছোট পৈতার নাম ও দেশের ভাষায় বলে 'যজন্‌কা।'

এর পরে ভাই মণ্ডলের দিকে মুখ করে বসবে। বোন তখন 'সগুন্' বা 'সগোন' এনে একে একে ভাইদের হাতে তুলে দেবে।‡ মদ, মাংস, ডিম, আদা, রসুন ইত্যাদি মিশিয়ে তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ করে 'সগুন্' তৈরি করা হয়। ভাই ভক্তি ভরে তাহা হাতে নিয়ে আপন মাথায় স্পর্শ করাবে, এবং সেই সঙ্গেই (বোন্ বড় হলে) প্রণাম করবে। বোন্ যদি ছোট হয়, তবে বোন্ ভাইকে প্রণাম করবে। তারপর ভাই সেই 'সগুন্' খাবে। খাওয়ার নিয়ম এক একটি জিনিষ নিয়ে—তার সঙ্গে মদ মিশিয়ে খাবে। পরিমাণ অবশ্য খুবই কম।† যাঁরা দীক্ষিত—তাঁদের প্রত্যেকটী জিনিষ খাবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। কোন্ জিনিষটী আগে খেতে হবে, আর কোনটী পরে খেতে হবে তারও নিয়ম আছে। প্রথমে ডিম ইত্যাদি এবং শেষে আদা ইত্যাদি খাওয়ার নিয়ম। 'সগুন্' দেওয়া হলেই বোন্ ভাইকে 'টীকা বা সিন্' (অর্থাৎ ফোঁটা) দেয়। শ্বেত চন্দন, 'অক্ষতা' (চাল) দই এই তিন জিনিষ দিয়ে ফোঁটা দিতে হয়। আগে চন্দন দিয়ে, তারপর দই ও 'অক্ষতা' দিয়ে কপালে ফোঁটা দিতে হবে। 'সগুন্' খাবার সময় বোন্ খই এবং নানান্ ফলের টুকরা ভাইয়ের মাথায় এমন ভাবে ঢেলে দিবে যেন সেগুলি গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এর পরে মাটিতে যা পড়ল তা ঝাঁটি দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। তারপর একটি শালপাতার 'দোনা' অথবা 'টপরা' অথবা 'ঠাহরের' (ঠোঙ্গাকৃতি) মধ্যে নানান্ রকম ফল (তার মধ্যে আকরোট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বিমিরা লেবু থাকা দরকার) একটী শুপারি, পয়সা 'যজন্‌কা' (এটা ব্যবহারের উপযুক্ত) এবং ফুলের মালা রেখে সেই ঠোঙ্গাটী ভাইকে দিতে হবে। ভাই তাহা গ্রহণ করে রেখে দিবে।

এর পরে কয়েকটী পল্‌তে একত্র করে তার দুই মুখে আগুন ধরিয়ে বোন্ তাহা দু'হাতে ধরে ভাইয়ের নিকট আনবে। ভাই সেই আগুন স্পর্শ করে হাত মাথায় ছোঁয়াবে। বোন্ তারপর সেই পলতেগুলি মণ্ডলের উপর আড়াআড়ি করে এমন ভাবে রাখবে যেন চার জায়গায় ধানের উপর জ্বলতে থাকে। তখন মণ্ডলের উপর ধূপ জ্বালিয়ে দিতে হয়। এর পরে ঝাড় দিয়ে সব পরিস্কার করে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু সল্‌তে রাখবার পরে এবং পরিস্কার করবার মধ্যে বাতি নিভতে পারবে না।

সব পরিস্কার হলে ভাই নিমন্ত্রণ খাবে। এই খাওয়াটা দিবে বোন্। কিন্তু এ নিমন্ত্রণে ভাত খাওয়া চল্‌বে না। যে সব জিনিষ খাওয়া হয় তার মধ্যে চিড়াই প্রধান।

খাওয়ার শেষে ভাই বোন্‌কে টাকা ও শাড়ী ইত্যাদি উপহার দেয়।

ভাই পূজার দিন বোন্ সারাদিন উপবাস করে সব শেষ হলে তারপর খায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

পরিচারিকা, অগ্রহায়ণ ১৩২৮।

---

* যে কোন ফুল রাখলে চলবে না। পাহাড়ে যাকে 'শুপরি' ফুল বলে তাই প্রশস্ত। তা না জুটলে 'ছাইপত্রি' বা গেন্ধা ফুল দরকার।

নেওয়ার ভিন্ন অন্য জাতের ভিতরে 'সগুন্' খাওয়ার নিয়ম নাই।

† আজকাল গৃহস্থঘরে কেবল নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য অতি সামান্য পরিমাণে 'সগুন্' ব্যবহৃত হয়।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪৫শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২৮ [একাদশ সংখ্যা

ভারতী

প্রত্যাবর্ত্তন

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দিদিমার বোনঝির বাড়ী-ঘর সুখ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিমু মুগ্ধ হইল। গরিবের ঘরের মেয়ে সে—এমন সব বিলাস-ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর কখনো চোখে ত দেখেই নাই, কানেও বড় শোনে নাই। অরুণের মুখে বরুণাদের বাড়ীর যে-সব বর্ণনা খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছিল, তাহাই ছিল তাহার ধনী-গৃহের আদর্শ। তারপর জলদ বাবুর বাড়ীর বর্ণনা ও দুর্গোৎসবের বিবরণ শুনিয়া হিমু ভাবিয়াছিল, তাঁহারা ইহাদের কাছে কিছুই নন্। দুইদিন ত সুধু বাড়ীখানার ঘর কয়টা প্রদক্ষিণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেই কাটিয়া গেল; তারপর বাগান। এত বড় বাগান, এত রং-বেরঙের ফুল, এত বিচিত্র পাতা-গাছ,—কোন গাছের পাতার রং সিঁদুরের মত রাঙা, কোন গাছের পাতা বা গুটাইয়া চক্রাকার করিয়াছে, কোন গাছের পাতায় ঘুঙুর-মালার মত বাজনা বাজে। এ-সব গাছ পাতা ও ফুলের অর্দ্ধেকের নাম ত হিমু জানেই না, চোখেও কখনো এ-সব দেখে নাই। চিড়িয়াখানায় কত বাহারে পাখী—ময়ুর, পায়রা,—হরিণ, খরগোস, গিনিপিগ, সাদা ইঁদুর আরো কত-কি। এ-সব দেখিয়া হিমুর আনন্দ হইত, আবার দুঃখও হইত। মনে হইত, অরুণ যদি সঙ্গে থাকিত! ভাল জিনিষটি প্রিয়জনকে না দেখাইতে পারিলে মানুষের যথার্থ সুখ হয় না। তা ছাড়া এই বৃহৎ অপরিচিত রাজ্যে আনাড়ির মত সুধু হাতড়াইয়া বেড়াইতে তাহার ভাল লাগিতে ছিল না। গৃহকর্ত্রী দিদিমার বোন্‌ঝী প্রায় তাঁহার সমবয়সী। অনেক দিনের পর দেখা-শুনা হওয়ায় ও নিজের বর্ত্তমান সুখ স্বচ্ছন্দে দরিদ্র আত্মীয়কে দেখাইতে পাওয়ায় সুখী মনেই তাঁহাদের তিনি গ্রহণ করিলেন। হেমলতাও এই আনন্দময়ী সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়াই স্নেহমুগ্ধ হইল, শাশুড়ীকে নিভৃতে পাইয়া কহিল, "মা এটিকে আমাদের বৌ

করে ঘরে নিলে হয় না? কি সুন্দর রূপ, দেখেচ! সব-চেয়ে সুন্দর চোখ দুটি।"

মা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তেম্‌নি আমার কপাল কি না। সে ছেলে বিয়ে করে বৌ আন্‌বে, তবে আর ভাবনা ছিল কি? হাঁ বৌমা, ফুলু না আস্‌বে, লিখেছিল? তা এল কৈ?"

হেমলতা মৃদুস্বরে কহিল," যখন বলেচে তখন আসবেই। হয়ত আবার কিসের কাজে আটকে গেছে।"

"বাবা, আচ্ছা মা খুড়ী পেয়েছিল যাহোক্। বংশের মধ্যে একটা ছেলে, তবু সব এত অগ্যে-রাজ্জি! বিদ্বান মা ছেলেকে দিলেন দেশের কাজে উচ্ছুগ্যু করে। দেব্‌তার কাজে লোক মোষ-পাঁঠাই উচ্ছুগ্যু করে, জানি। ছেলে-বলি দিতে দেয়, এ ত কখনো শুনিনি। মায়ের এত দম্ভ—ভগবান্‌ও তাই নিচ্ছিলেন—ভাগ্যে কাকা ছিল তাই সে যাত্রা তরে এলো। আবার শুন্‌লুম, ছেলে স্বদেশী হয়েচে—কোম্পানি থেকে পুলিশ আস্‌বে ধর্‌তে! পুলিশে চোর-ডাকাতই ধরে নে যায়, তাই জানি,—এ কিরে বাবা!" বলিয়া গৃহিণী বিরক্ত মুখে বধূর পানে চাহিয়া দেখিলেন। যেন ইহার মূলে অনেকখানি বধূরই অপরাধ!

তা সে কথা তিনি মনে করিতেও পারেন। সুধু তিনি কেন, বাড়ীর সকলেই জানিত যে সেই যুবককে শাসন করিবার কিছুমাত্র শক্তি যদি এ-বাড়ীতে কাহারও থাকে ত সে তাহার খুড়িমারই। হেমলতার কথার উপর সে কখনও না বলিতে পারিত না। ছোটবেলায় কতদিন তাহাকে দুঃখ দিয়া সে নিজেই কাঁদিয়া হাট বসাইত। শেষ খুড়িমা আসিয়াই তাহাকে শান্ত করিত। তাই অভিমানে পূর্ণ হইয়া ঠাকুমা ভাবিতেন, বাহিরের লোক খুড়ী হইল আপন, আর হাতে করিয়া মানুষ করিয়া তিনি হইলেন পর! ইহাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইত। অথচ কেহ ভাবিয়া দেখিত না যে কতখানি সহিয়া কতদূর সাবধানে চলিয়া তবে হেমলতাকে এই অসাধ্য সাধন করিতে হইত।

প্রথম দেখাতেই হিমু হেমলতাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিল। হেম হাসিয়া কহিল, "আমি তোমার দিদি হই না, বৌদি হই।"

হিমু একটুখানি ঠোঁট কুঁচ্‌কাইয়া তাচ্ছল্যের সুরে কহিল, "উঁহু, তুমিই দিদি।"

আলোকনাথকে সে যে ভ্রাতৃ-সম্বোধনে সম্মত নয়, কথার ভাবে যেন ইহাই বুঝাইল। হেম হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া স্নেহমাখা কণ্ঠে কহিল, "সেই বেশ। আমি দিদি, আর উনি বোনাই। কেমন?"

হিমু বুদ্ধিমতী, কিন্তু সাংসারিক অনেক জ্ঞানেই অনভিজ্ঞা। বিস্মিত হইয়া সে কহিল, "উনি?"

"হ্যাঁ গো, আমার স্বামী! আমি দিদি হলে তিনি তোমার ভগ্নীপতি হলেন না?"

হিমু অনাগ্রহভাবে কহিল, "হলেন ত।"

এই মেয়েটিকে পাইয়া হেমও যেমন খুসী হইয়াছিল, হেমলতাকে দিদি বলিয়া হিমুরও তেমনি আনন্দ হইয়াছিল। ইহাকে না পাইলে এত বড় জাঁক-জমকের মধ্যে কেমন করিয়াই বা হিমুর দিন কাটিত! হিমু ছোট বেলায় একবার থিয়েটার দেখিয়াছিল, কি আশ্চর্য্য সাজ-সজ্জা—জরির পোষাক-পরা মুক্তার মালা

গলায় দোলানো সব রাজা আর রাণী। আসন গ্রহণ করিয়া হিমুর ভাবনা হইয়াছিল, এমন দৃশ্য কতক্ষণই বা আর দেখিতে পাইবে? যদি সারারাত্রি ধরিয়া চলিত, তবু হয়ত কতকটা ক্ষোভ মিটিতে পারিত। কিন্তু সে ভুল তাহার কত শীঘ্রই না ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! চঞ্চলা হিমু অভিনয়ের অর্দ্ধাংশ না হইতেই বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ভাবিয়াছিল—এত দীর্ঘ কাল কি ঐ একঘেয়ে রাজা-রাণী ও রাজ-ঐশ্বর্য্য ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিতে পারা যায়? সে তখন লেখাপড়া জানিত না। গল্পের বিষয় কিছুই বুঝিতে ছিল না, সুধু দর্শক মাত্র। মনে হইল, অরুণের কাছে সে আজ কত ঋণী। নহিলে সেদিনের সহিত এদিনের আজ কোন তফাৎ থাকিত না। আলোকনাথের সুসজ্জিত লাইব্রেরি-কক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে তাহার জ্ঞান-দাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। এ ঘরে বাংলা বইয়ের চেয়ে ইংরাজী বইই অধিক। বরুণা ইংরাজী জানে শুনিয়া বছর খানেক হইতে সে যে ইংরাজী শিখিতে সুরু করিয়া ছিল, তাহা আজ সার্থক বলিয়া মনে হইল। শিক্ষকের অভাবে কাব দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে নাই; ছুটিতে অরুণের কাছেই যেটুকু যা' পড়া হয়, তারপর কোন দিক হইতে কোন সাহায্যই আর পায় না। দুই-চারিটা শক্ত কথা বা বিশেষ কোন কঠিন মীমাংসা-স্থল চিঠিতে লিখিয়া সে অরুণের কাছে জানিয়া লয়। মেয়ের আগ্রহে মালতী দেবীর একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, পাড়ার স্কুল-মাষ্টারকে ধরিয়া যদি এ বিষয়ে কোন সাহায্য পান্! কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী দশনে অধর কাটিয়া বলিয়া ছিলেন,—"ক্ষমা দাও রাণু, শেষ কি মেয়ের সখের জন্যে কলঙ্ক কিন্‌বে! একেই ত পাড়ার লোকে নিন্দে করে, এত-বড় থুবড়ো মেয়ে দেখে—"

মালতী দেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, থাক্, কাজ নাই গরীবের মেয়ের এত সখে!

এখানে সঙ্গী-অভাবে প্রথম দুই চারিদিন হিমুর একটু কষ্ট বোধ হইয়া ছিল। হেমলতা বিছানা ছাড়িয়া বড় একটা উঠিতে পারে না। তাহার সঙ্গে হিমুর মত চঞ্চল প্রকৃতি মেয়ের কতক্ষণই বা মিষ্ট লাগে! দেখিবার জিনিষ এত আছে যে দেখিয়া শেষ করা দায়—কিন্তু বিনা প্রশ্নে শুধু চোখের দেখায় তুষ্ট হওয়া তাহার স্বভাব নয়। এই অভাবটা যখন সে পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছিল, এমন সময় সহসা এক অতর্কিত বন্ধু-লাভ হইল। সে দিন সকাল বেলা ভিজা ঘাসের জলে পা দুটি ভিজাইয়া হিমু আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, পথে উদ্যান-বায়ু-সেবনেচ্ছু আলোকনাথের সহিত দেখা হইল। হিমুর আঁচল-ভরা ফুলের রাশি—ইহারই বাগানের ফুল—হয়ত এত ফুল নষ্ট করায় বাবু বিরক্ত হইবেন—একটু তাই কুণ্ঠিতভাবে সে পথের ধারে সরিয়া দাঁড়াইল। মুখে সুধু একটু লজ্জা-জড়িত কুণ্ঠিত হাসি! আলোকনাথ কাছে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "এত ভোরে ফুল তুল্‌তে এসেছ? আর ফুল চাই না কি? দাঁড়াও, আমি তুলে দিচ্ছি।"

হিমু অবাক হইয়া গেল,—বকুনি ত খাইলই না, তাহার উপর ইনি আবার ফুল তুলিয়া দিতে চান! হিমু আলোকনাথের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া

কহিল, "বড় একটা রাঙা গোলাপ হলে মন্দ হতো না—মালার মাঝখানে দিতুম।"

"মালা গাঁথ্‌বে? এসো, আমি গোলাপ তুলে দিচ্চি। তা গোলাপ তুমি তোলোনি কেন?"

হিমু কহিল, "বড় মালী বল্‌ছিল, ও-সব গাছে হাত দিয়ো না—"

"ওঃ!" বলিয়া আলোকনাথ অগ্রসর হইলে হিমু ফিরিল। মালীরা ব্যস্ত হইয়া ফুল তুলিয়া দিতে আসিয়া ধমক খাইয়া সরিয়া গেল; এবং হিমুর সাক্ষাতেই বাবুর আদেশ প্রচারিত হইল—অতঃপর যে-কোন গাছের ফুল তোলায় কেহ যেন তাহাকে বাধা না দেয়।

ইহার পর প্রায়ই আলোকনাথ ও হিমুকে বাগানে দেখা যাইতে লাগিল। কোন্ পাখীটার কি নাম, কোন পায়রাটা কেমন করিয়া লোক চিনিতে শিখিল, ময়নাটাকে কে এত কথা শিখাইয়াছে—এই সকল প্রশ্ন ও ইহার সত্য-মিথ্যা উত্তর-প্রত্যুত্তরে এই তরুণী মেয়েটি ও প্রৌঢ় গৃহকর্ত্তার সকাল-সন্ধ্যা বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। মানুষ যা পায়—তাহাতেই যদি তুষ্ট হইতে জানিত, তবে সংসারে অনেক দুঃখ-অশান্তি কমিয়া যাইত। কিন্তু মানুষের স্বভাব ঠিক ইহার বিপরীত! আলোকনাথও ভগবানের অনেক করুণাই অযাচিতরূপে পাইয়াছিল। অবিমিশ্র সুখ-লাভ মানবের আয়ত্তের বাহিরে। যে অভাব ছিল, যাহা এতদিন অভাব-রূপে তাহাকে পীড়িত করিতে পারে নাই, আজ এই সুন্দর মেয়েটির সঙ্গ-মোহে সেই অভাব-দুঃখই তাহার সকল সুখের মাত্রা ছাপাইয়া উঠিল। মনে হইল, জীবনের তৃতীয়াংশ কাল বৃথাই ব্যয়িত হইয়াছে, দাম্পত্য জীবনের কোন সুখই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। মানুষ যখন অভাব অনুভব করে, তখন তাহা পূরণের ইচ্ছাও মনে ওঠে। আলোকনাথের মনে হইল, হিমুকে পাইলে তাহার জীবনের সুখ ষোলকলায় পূর্ণ হইবে। মা ত আভাষে ইহাই জানাইতেছেন। হিমুও তাহাকে অপছন্দ করে না। স্ত্রী? বহুকাল তাহার মুখ চাহিয়া সে সময় নষ্ট করিয়াছে—চিরদিনই বা পারিবে কেন?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রে বিছানায় শুইয়া অন্ধকারে হিমুকে একটু কাছে টানিয়া মুক্তাঠাকুরাণী গানের সুরে কহিলেন, "তোরা উলুধ্বনি দে। দময়ন্তী বিরহিণীর কপাল ফিরেচে। বলি, হ্যাঁলা হিমি, বর মনে ধরেচে ত?"

অন্ধকারে দিদিমার মুখ দেখা গেল না—সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া হিমু বিস্মিতভাবে কহিল, "বর! কার বর, দিদিমা—?"

দিদিমা রসিকতা করিয়া কহিলেন, "যার বিয়ে তার মনে নেই—পাড়া-পড়্‌শীর ঘুম নেই! নাত্‌নি লো, এবার আইবুড়ো নাম ঘুচ্‌ল যে। বর তোর, আবার কার!"

হিমু দিদিমার আর একটু কোল ঘেঁষিয়া সকৌতুকে কহিল, "কৈ দিদিমা, আমি ত দেখিনি।"

"না, তা কি আর দেখেচ! বর যে পায়ে পায়ে ফিরচে। গাছের ফুলটি ফলটি নিজের হাতে পেড়ে দিচ্চে। অত সব দামী সাড়ী আনিয়ে দিলে—কেন বল্ দেখি। মুখ চাঁদপানা মুখ দেখে বুঝি—ভেবে রেখেচ

না গো, তা নয়। বাবু বলেচেন, বংশ-রক্ষের জন্যে বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন তোমায় পেলেই কর্‌বেন, নইলে নয়!"

হিমু ঘোর অবজ্ঞাভরে উত্তর দিল, "তবে ত বয়েই গেল। ওর ত বৌ বেঁচে রয়েচে।"

দিদিমা কহিলেন, "সে ত মিথ্যে মানুষ,—ভাঙ্গা বাসন। তাকে নিয়ে কি সংসার-ধর্ম্ম বজায় থাকে! এত বড় সংসার—একটা ছেলে নেই! বুড়ো মা কবে আছে, কবে নেই—জল-পিণ্ডি চাই ত! আর তাও বলি বাছা, এ সংসারে যে পড়্‌বে, সে অনেক কল্প তপস্যা কর্‌চে।"

হিমু খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল, "দিদিমা, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন। ও বুড়োকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে যারা অনেক জন্ম তপস্যা করচে, তাদের জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে, চল, আমরা বাড়ী যাই। তোমার মেলা ত হবে না—আমার মার জন্যে মন কেমন কচ্চে।"

মেয়ের ভাব ভাষার ঊষ্ণতাতেই প্রকাশ পাইতেছিল। এই স্বাধীনচিত্তা আদুরে মেয়েটিকে তিনি বেশ ভাল করিয়াই চিনিতেন, তবু আশা ছাড়িতে পারিলেন না। অনাথার কন্যা বিনা-পণে যুবা-বরে যদি নাই বিকায়, বুড়ায় ক্ষতি কি? অর্থ-কষ্ট, অন্ন-কষ্ট ত কখনো পাইবে না। সতীন আছে—তা থাক্! কিছুদিন পূর্ব্বে এ ব্যাপার ত ঘরে-ঘরেই ছিল। দুই পুরুষের অনভ্যাসে মেয়েদের অত অসহিষ্ণু হইলেই বা চলিবে কেন? পেটে দুইটা হইলেই মন ভরিয়া যাইবে। সব দিকের সব সুবিধাই কি মানুষ পায়! মনের বিরক্তি দমন করিয়া শান্তভাবে মুক্তাঠাকুরাণী কহিলেন, "বুড়ো বলিস্‌নি তা বলে। ওর আর বয়স কত? চুলও পাকেনি, দাঁতও পড়েনি। বুড়ো দেখ্‌লি কোনখানটায়? তুইই বা কি খুকী, বল্ ত।"

হিমু দিদিমার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "ওর নাতনী হতে পারি তবু। তুমি বাপু গঙ্গাজোলেদের ভাব্‌না ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড় দেখি। সকাল হলেই উঠে ওর জিনিষ-পত্র সব ফিরিয়ে দেব তখন। কে জানে বাপু, এ-সব ঘুষ! আমি ত ভেবেছিলুম, বড়লোকদের কায়দা—বাড়ীতে যে আসে, তাকেই বুঝি এম্‌নি সব দিতে হয়। রামঃ, ও-সব আর আমি ছোঁব কি না।"

ইহার পর প্রবল প্রতাপান্বিতা মুক্তা ঠাকুরাণী আর দ্বিতীয় কথা কহিলেন না। তিনি জানিতেন, ইহার পর বাদ-প্রতিবাদের ফল যাহা ঘটিবে, তাহা উভয় পক্ষেরই সুখকর হইবে না। হয়ত অপরেরও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে।

দিদিমার অনুনয়-বিনয় ও উপদেশের মাত্রা ও বাড়ীর লোকদের আদর-যত্ন যতই অধিক হইতেছিল, হিমুরও সেই পরিমাণে এখান হইতে পলাইয়া যাইবার ইচ্ছায় মনটা ছটফট করিতেছিল।

এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্ত বাস করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না। আলোকনাথের সহিত বিবাহের কথা ওঠায় বাড়ীর সকলকার কাছেই সে এখন নিজেকে অপরাধিনী বলিয়া মনে করে। যে রুগ্না দিদি যথার্থ ভগ্নী-স্নেহে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছিল, সাপের মত তাহারই রোগজীর্ণ বক্ষে

সেই কি না শেষ ছোবল মারিল! ছি—ছি! কেমন করিয়া হিমু আর তাহার কাছে নিজের পোড়ার মুখ বাহির করিবে? তাই এ বাড়ীর একমাত্র আকর্ষণীয় মানুষটির সঙ্গ সে ইচ্ছা করিয়াই ত্যাগ করিয়াছে। প্রথম দুই তিনদিন হিমু মনে করিয়াছিল, হেমলতা হয়ত তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে। যদি ডাকে, সে কেমন করিয়া যাইবে? তবু এই ডাকের প্রতীক্ষাতেই সে উন্মনা হইয়া বসিয়া থাকিত। ক্রমে সে আশাও ফুরাইল, সেখান হইতে ডাক আসিল না। এ চিন্তায় হিমুর ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যথিত হইলেও প্রতিকারের পথ দেখিতে পাইল না। সে কি নিজ হইতে দিদির পায়ে পড়িয়া বলিবে, "আমার কোন দোষ নেই—ও-সব ছাইয়ের কথা আমার একটুও ভাল লাগে না। তুমি কর্ত্তাবাবুকে বারণ কর দিদি, ও-সব বল্‌তে,—"বাঃ তাও কি কখন হয়? ছি!"

হিমু এই চিন্তা চাপা দিবারই চেষ্টা করিল। দিদির সঙ্গ ছাড়া আর একটি লোভের জিনিষ ছিল, বাগানে ফুল তুলিয়া বেড়ানো। এ লোভও তাহাকে দমন করিতে হইয়াছিল। আজকাল হিমু বাগানে নামিলেই আলোকনাথের বায়ু-সেবনেচ্ছা বর্দ্ধিত হয়। প্রথম প্রথম না জানিয়া সে যখন ইহার সাহায্য লইয়াছিল—তখন খুসী হইয়াই লইয়াছিল। সরলা হিমু ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বুঝিত না। বাবুর এ অযাচিত অনুগ্রহেরও সে তাই কারণ-অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয় নাই। এই সব নূতন নূতন পাখী—হিমু ইহাদের নাম জানে না—গুণাবলী ত জানেই না। এত রকম যে ফুল,—ইহাদের সম্বন্ধেও তাহার অজ্ঞতার সীমা নাই। অরুণের কাছে এ সকলের গল্প করিবার সময় শুধু পরিপূর্ণ আনন্দোজ্জ্বল মনটুকু ছাড়া তাহার তহবিলে সঞ্চয় কিছুই হইত না। এমন সময় বাবু যখন অযাচিতভাবে তাহাকে সঙ্গ দিয়া সকল সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন স্বতঃই কৃতজ্ঞতায় তাহার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাবু তাহার দিদির স্বামী—তাঁহারই বাড়ীতে ইহারা অতিথি—তা ছাড়া সম্বন্ধ যখন হইল ভগ্নীপতি, তখন ইঁহার সঙ্গ খুসী হইয়াই বা সে গ্রহণ না কেন? করিবে। মনে ইঁহার প্রতি একটুখানি শ্রদ্ধাই জাগিল। এমনি করিয়া ঘনিষ্ঠতা যখন বর্দ্ধিত হইল, তখন সে দিদিমার মুখে শুনিল, বাবু তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন। দিদিমাকে ধমক দিয়া থামাইয়া দিলেও বাড়ীর গৃহিণী কর্ত্তা-মা হইতে সকলকার মুখেই ঐ একই কথা। এ বাড়ীর কর্ত্রীর আসন খালি নাই, অর্দ্ধ-মৃতা এখনও সেখানে সে পড়িয়া আছে যে! ধিক্কারে হিমুর আপাদ-মস্তক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। না জানিয়া, না বুঝিয়া সে এ কি কাণ্ড করিয়াছে? কাহাকে সঙ্গ দিয়া কাহার সঙ্গে লইয়া সে আজ লোক-চক্ষে নিজেকে এত অবহেলার পাত্র করিয়া বসিল! দিদিমা রথ না দেখিয়া কোন মতেই বাড়ী ফিরিবেন না। তাহারও এখনো কয়দিন দেরী রহিয়াছে। কিন্তু হিমু যে এখানকার বাতাসে আর স্বচ্ছন্দে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না! হরিণীকে বেড়া-জালে আবদ্ধ করিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, হিমুরও নিজেকে তেমনি অসহায় মনে হইতেছিল। আলোকনাথের মা এখন তাহাকে অধিক যত্ন দেখান, স্নানাহারের

তদারকে ব্যস্ত হন, দাসী-চাকরেরা সম্ভ্রম করিয়া চলে। তাহার নিজের জন্য সুসজ্জিত কক্ষ, ভাল ভাল কাপড়-চোপড়,—মুক্তা-ঠাকুরাণীরও আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হইতে ছিল না! তাঁহার মুখে প্রসন্নতার ছায়াই দেখা যাইত। তবু মুক্ত আকাশের পাখী সোনার পিঞ্জরের ভয়ে আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। কতক্ষণে এ রাজ-প্রাসাদের রাজ-ভোগ ছাড়িয়া সে তাহার কুটির-বাসিনী মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইবে, ইহাই ছিল তার প্রতি-মুহূর্ত্তের কামনা। ইহারই মধ্যে নিজের জন্য হিমু একটুখানি নিরাপদ আশ্রয় আবিষ্কার করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের লাইব্রেরি কক্ষ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে তাহার সব দুঃখ ভুলাইয়া দিত। সে জানিত, বাড়ীর অনেক কক্ষেই বাবুর শুভাগমন-সম্ভাবনা, কিন্তু এদিকটায় নাই। চাকরেরা সকাল বেলা ঘরে ঝাঁট দিয়া ঝাড়া-মোছার কাজ সারিয়া চলিয়া যায়। তাহার পর এ অংশের সহিত বাড়ীর লোকের আর কোন সংস্রব থাকে না। বাবুর ভাইপোর কড়া হুকুম, তাই, নহিলে বাড়ীর অন্য কাহারও সহানুভূতি এখানে বর্ত্তমান ছিল না। দিন-যাপনের জন্য হিমু এই নির্জ্জন স্থানটিকেই নিজের জন্য বাছিয়া লইল। বাবু যে আজকাল অনেক সময় অকারণে বাড়ীর ভিতর আসিয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া যান, সকালে সন্ধ্যায় কোন বনদেবীর আবির্ভাব-আশায় উন্মনা হইয়া বাগানে পদচারণ করিয়া ফিরেন, মুক্তাঠাকুরাণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা এড়াইয়া যায় না। কিন্তু তিনি আর করিবেন কি? বিধাতা যে এখানে সমানে সমান মিলাইয়া দেন। নাতনীটি ত বিক্রমে তাঁহার নীচে নয়,—শাসনে বাধ্য হইবে, সে পাত্রীও সে নয়। অগত্যা মনের ক্ষোভ মনে রাখিয়া তাঁহাকে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হইতেছিল। মায়ের মত হউক, দেখিয়া লইবেন—সে কত বড় জেদী মেয়ে—আর তিনিও মুক্তা বাম্‌নি কেও-কেটা নহেন। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দূরদর্শিনী ঠাকুরাণীটি জানিতেন যে দুইটা প্রবল গ্রহের ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাতেরই সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে সহিয়া থাকাই ভাল। সবুরেই মেওয়া ফলে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। লাইব্রেরী ঘরের জান্‌লা-দরজাগুলার অধিকাংশই বন্ধ রহিয়াছে। জানালার শিরোভাগের রঙ্গিন কাচাবরণের মধ্য দিয়া নীল লাল সবুজ রঙের আলোক-রশ্মি ঘরের দেওয়ালে ও স্থানে স্থানে রেখাপাত করিতেছিল। দক্ষিণের বড় দরজাটা খুলিয়া দিয়া তাহারই একদিকে পিঠ রাখিয়া অপর ভাগে পা বাড়াইয়া বসিয়া হিমু একখানি কাব্য-গ্রন্থ পড়িতেছিল। খোলা দরজাটার বাহিরে মার্ব্বেল-মণ্ডিত লম্বা দালান, তাহার শেষ অংশে চিত্র-করা লোহার রেলিং-ঘেরা—তাহার নীচেই বাগান। এ দিকটা বাড়ীর পিছন্ দিক। বাগানটি ফুলের নয়—ফলের। বড় বড় আম জাম কাঁঠাল জামরুল গোলাপ-জাম পিচ্ বাতাবি লেবু ফল্‌সা নারিকেল তাল আরও কত গাছ-পালা। বাগানের মাঝখানে পুকুর। তাহার বাঁধান চাতালের চারিপাশে সুপারি গাছের সারি। এ বাগানে হিমু বড় যাইত না। তাহার ভয়-ভয় করিত। বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা নির্জ্জন বীথি—বাতাসে গাছের পাতা দুলাইয়া হা-হা রব।

সঙ্গী থাকিলে তাহাকে ভয় না দেখাইয়া প্রলোভনেই ফেলিত। গাছে উঠিবার বিদ্যাটা এখানে প্রকাশের ইচ্ছা না থাকিলেও তলায় কুড়াইলেই যথেষ্ট; কিন্তু উপস্থিত মনোভাবে অথবা রাজভোগে পরিতুষ্ট রসনা এদিকে প্রলুব্ধ হয় নাই।

জামরুল গাছে বসিয়া একটা কালো কোকিল অনেকক্ষণ হইতেই হিমুর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার প্রয়াসেই বুঝি থাকিয়া থাকিয়া 'কুহু কুহু' করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। কাব্য-রসাস্বাদিনীর সেদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। ভিতরের দিকের খোলা দরজা দিয়া বলাইয়ের মা ঝী একখানি রূপার পাত্রে অনেকগুলি বাছাই করা ভাল ভাল ফুল ও একটি সুন্দর তোড়া সাজাইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে কহিল, "এই যে দিদিমণি, তুমি এখানে—তোমার জন্যে আমি মারা বাড়ীখান তল্লাস করে বেড়াচ্চি।"

হিমু মুখ তুলিয়া চাহিতেই ফুলের উপর চোখ পড়িল। গভীর বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া গেল; সে কহিল, "এত খোঁজাখুঁজির দরকার? আমি ত তোমাদের কিছু চুরি করে পালাইনি।" কথা-শেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃষ্টি পুনরায় বইয়ের অক্ষরে নামাইল।

বলাইয়ের মার বয়স কম—এখনও যৌবনের সবুজ হাওয়া তাহার শরীরের মধ্যে নাচিয়া ফিরে। সে বিধবা, তবু পাড়ওয়ালা সাড়ী পরে, হাতে তিনগাছি করিয়া কাঁচের চুড়ি, উপর হাতে সোনার তাগা, এবং সাড়ীর নীচে রূপার বিছা। ভাল করিয়া চূণ খয়ের দিয়া পান সাজিয়া পাতলা ঠোঁট রাঙা করিয়া রাখে, সুবিধা পাইলে ছড়া কাটে, গুণগুণ করিয়া গান গায়, বধূঠাকুরাণীর সহিত সময় বুঝিয়া একটা-আধটা রসিকতাও করিয়া থাকে। এ-ছাড়া তাহার আর কোন অপবাদ ছিল না। সে অল্প বয়সে বলাইকে কোলে লইয়া বিধবা হয়, সেই পর্য্যন্ত এই আশ্রয়েই কাটাইতেছে। হেমলতা তাহাকে ভালবাসিত। সাধারণ দাসীদের চেয়ে সে উচ্চশ্রেণীর। সে হেমলতার পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া দিত, দুপুরবেলার তাসখেলার সঙ্গী হইত; গৃহিণীর পাকা চুল তুলিত। সংসারের ছোট কাজ তাহাকে কিছু করিতে হইত না। এখন—বিধান সবই বদল হইয়া গিয়াছে। হেমলতা আর চুল বাঁধে না, তাস খেলে না, রসালাপ করে না, সে নিজের রোগ-যন্ত্রণাতেই কাতর—বলাইয়ের মার মন যেন হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের ভার আর বিষণ্ণ মুখ—এ যেন সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। হিমু আসায় দিনকতক কাটিয়া ছিল মন্দ না। আনন্দময়ী মেয়েটি নিজের আনন্দের আলো চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া কলকণ্ঠের হাস্যোচ্ছ্বাসে নিরানন্দ পুরীতে অমৃতের নির্ঝর বহাইয়া গৃহবাসীদের পাষাণ মনে যেন সোনার কাঠি বুলাইয়া ধীরে ধীরে আবার চেতনা ফিরাইয়া আনিতেছিল। মেয়েটির আত্ম-পর বিচার নাই, আব্‌দার-বায়নারও অন্ত নাই! এ বাড়ীতে যে এই জিনিষটিরই একান্ত অভাব। তাই মরা গাঙ্গে আবার জোয়ারের উচ্ছ্বাস সূচিত হওয়ায় বাড়ীর সব লোকই একটু তাজা হইয়া উঠিতেছিল। হেমলতার শীর্ণ অধরে হাসির রেখা প্রায়ই মিলাইবার অবকাশ পাইতেছিল না। মরণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ছাড়া আরও যেন

কিছু পাইবার আছে, এমনি একটা ভাবের উচ্ছ্বাসে রোগের গতিও দিন-কতক একটু মন্থর হইয়া পড়িতেছিল। স্বামীকে আজকাল আর কাছে পায় না—দিন-রাত একঘেয়ে রোগের ইতিহাসে বিরক্ত হইয়া অনেকদিন হইতেই স্বামী নিজের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। তবু অনেকদিনের অভ্যাস-দোষেও হয়ত কতকটা আকর্ষণও ইহার মধ্যে ছিল,—এক-এক দিন বাড়ীর ভিতর খাইতে আসিয়া স্ত্রীর সহিত স্বামী সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। এমনি একদিন অতর্কিত অবস্থায় এলোকেশী রূপের ডালি প্রস্ফুট-যৌবনা তন্বঙ্গী তরুণীকে দেখিয়া আলোকনাথের দৃষ্টি বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া গেল। সংসারে ভোগের জিনিষ অনেক পাইলেও তাহার মনে হইল, জীবনে এমনটি যে না পাইল, তাহার জন্মই বৃথা! অবশ্য সেই প্রথম দিনের প্রথম দর্শনেই এমন ভাব তাহার মনে আসে নাই। তখন কেবল সৌন্দর্য্যের আকর্ষণেই সে মেয়েটির পানে চাহিয়া দেখিয়াছিল। ক্রমে দর্শনের আকর্ষণ যতই বাড়িতে লাগিল, ও দ্রষ্টব্য যতই সুলভ হইয়া দেখা দিল, ততই মানুষের আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ দুর্বল মন প্রিয়পাত্রকে কাছে পাইবার জন্য অধীর হইতে লাগিল। মায়ের কাছে নির্জ্জনে নিজ অনুকূল প্রার্থনাই শুনিতে পাইল—"গরীবের মেয়ে পার হচ্ছে না—তোর নাম করে মাসী এসেচে। দে বাবা, ওর দায় উদ্ধার করে। খাসা মেয়ে—এমনিটি রাজার ঘরেই মানায়। আমার কি তেমন বরাত যে কথা দেব? সে ছোঁড়া নাই করুক্, তুই ওর দায় উদ্ধার কর্ত্তে পারিস্।"

সাগর-সেঁচা মাণিক এত সহজে বিকায়? আলোকনাথ লজ্জিত মুখে কহিল, "বুড়োকে অমন মেয়ে দিতে ওঁরাই বা রাজী হবেন কেন? বিশেষ সতীনে।"

"রাজী হবে না! শোনো কথা! তুই হলি বুড়ো! বেটা ছেলের কি বয়সের বিচার থাকে না কি? শোনো মাসী,—ছেলের কথা শুনে যাও। উনি বল্‌চেন, বুড়োকে তোমরা মেয়ে দেবে না—।"

মুক্তা ঠাকুরাণী বাহিরে দালানে বসিয়া দাইলের খুদ ঝাড়িতেছিলেন। গৃহিণীর আহ্বানে ললাট-ঢাকা ঘোমটা টানিয়া দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিলেন, "ওর তপিস্যে থাকে, তবে ত হবে। মা দুঃখী রাঁড়ী, উপায় নেই বলেই না পার হচ্ছে না। আর হোক না হোক, সত্যি কথা বল্‌ব বাছা, পুরুষ মানুষের চল্লিশ বছর কি আবার বয়স! এখনকার ছেলেরা সব পাশ করে চাক্‌রি করে যে বিয়ে করচে, তাদেরই কি আর বিয়ের বয়েস থাক্‌চে? সে সব ছিল সে কালে বটে। ছেলে-মেয়ে সবারই ছোট বেলায় বিয়ে হোত। এখন আর ও-সব নেই।" ইহার পর হেমলতার অনুমতি না লইয়াই—আলোকনাথ নিজ বিবাহে সম্মতি জানাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আলোকনাথ পাত্রীর সহিত আলাপ করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দেখিয়াছে, সেও তাহাকে অপছন্দ করে না। হেম? তাহার অনুমতি আশা করাই ভুল। সে যদি সন্তান দিয়া স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিত, তবে এ-সব ঝঞ্ঝাটের প্রয়োজনই বা কি ছিল? লোকে যাই বলুক, সত্যই ত, সে কচি ছেলেটি নয়। বোঝে সবই

—কিন্তু সবের উপর পিতৃ-ঋণ! আলোকনাথ পণ্ডিতের কাছে এই শ্লোকাংশটি শিখিয়া লইয়াছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড-প্রয়োজনঃ।" সকল সমস্যার মীমাংসা ত এই খানেই হইয়া গেল।

দাসী হাসিমুখে কহিল, "দিদিমণি চোখ নামালে যে—ফুল নাও। বাবু নিজের হাতে বেছে বেছে তুলে দিয়েচে। চেয়ে দেখ—"

হিমু অপাঙ্গে তাহার হাস্যময় মুখের পানে চাহিয়া বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া কহিল, "দিদির ঘরে দিয়ে এস। বাবুর তোলা ফুল—তিনি খুসী হবেন। আমার দরকার নেই।"

দাসী বুঝিল, হিমানী রাগিয়াছে। তবু এ রাগটা যে কোন্ দিক হইতে জন্মিল, তাহার সূত্র খুঁজিয়া না পাইয়া সে কহিল, "তাঁর ঘরে মালীরা রোজই ফুল পাঠায়, আজও পাঠিয়েচে —এ তোমার জন্যে—নাও, ধর।"

হিমু ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "তাঁকে ফিরিয়ে দাওগে—।"

"ওরে বাস্‌রে—তবেই হয়েচে আর কি! নাও বাপু, এই রইল তোমার ফুল, ফিরে দিতে হয়, তুমিই দিও—তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে পড়ে গরীব কি শেষে মারা যাব?"

হিমু মুখ তুলিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "বাবু আমায় ফুল পাঠান কেন? তাঁর বাড়ীতে যে কেউ অতিথ আসে, তাকেই কি তিনি এমনি করেন?"

দাসী তাহার উত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া থ' হইয়া গিয়াছিল, আম্‌তা আমতা করিয়া কহিল, "সবাই—সে আর কথা! বাবু তোমায় ভালবেসে দিয়েচেন, দিদিমণি—"

বাধা দিয়া সবেগে হিমু কহিল, "ভাল বেসে তাঁর স্ত্রীকে দিন গে—সে মরচে ও দিকে—আর বুড়োর খেলা পড়ে গেল।"

হিমু মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল দেখিয়া বলাইয়ের মা সহানুভূতির স্বরে কহিল, "যা বলেচ দিদিমণি —পুরুষ-মানুষদের দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেল—নৈলে ঐ বৌঠাকুরুণেরই কি এক দিন কম আদর ছিল! বাবু ত চোখে হারাত। যেন জোড়া পায়রা দুটি—এক দণ্ড কাছে কাছে ছাড়াছাড়ি ছিল না! তার জন্যে বৌঠাকুরুণকেই উল্টে মাঠাকুরুণের কাছে কত ফৈজত শুন্‌তে হোত! বাবু রাস্তায় বেরুত যদি, বৌঠাকুরুণ জান্‌লায় দাঁড়িয়ে থাকৃত—এই বলাইয়ের মা অনেকই ত দেখ্‌লে দিদি, এখন কালে-ভদ্রে খবর নিতে যান। তাও বিয়ের কথা উঠে অব্‌ধি ও রাস্তা আর মাড়াননি। যতই হোক্ সোয়ামী ত, এত তাচ্ছিল্লি কি সহ্য হয় গা! বৌঠাকুরুণ যাই মাটির মানুষ, তাই মুখটি বুজে সব সইচেন। তোমরা আমরা হলে কক্ষনো এ পারতুম না বাপু, তা হক্ কথা বল্‌ব।"

অতীতের আন্দোলনে বলাইয়ের মার চোখের পাতায় সহানুভূতিতে জলের আভাস ফুটিয়াছিল। হিমুরও অন্যমনস্কে ক্রোধের তাপটা একটুখানি কমিয়া আসিয়াছিল। তাহার মনে পড়িল, পুস্তকে পড়িয়াছে "দূত অবধ্য।" সত্যই ত, ইহারা বেতন লয়, মনিবের আদেশ-পালনে বাধ্য—ইহার প্রতি ক্রোধ-প্রকাশে ফলই বা কি! আহা, দুঃখিনী দিদিকে এখনও ও ভালবাসে।

হাত বাড়াইয়া ফুলের পাত্রখানা টানিয়া লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইলে বলাইয়ের মা আশ্বাসের

নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, যতই হোক, ছেলে মানুষ—এরি মধ্যে ফুল দেখিয়া রাগ ভুলিয়া গেল। কিন্তু এ চিন্তা সুধু মুহূর্ত্তের জন্য! বলাইয়ের মার নিষেধের পূর্ব্বেই হিমু উঠিয়া বারাণ্ডার রেলিংয়ের বাহিরে অন্ধকার বাগানের জঙ্গল-ময় অংশের দিকে ফুলগুলি উজাড় করিয়া ফেলিয়া দিয়া পাত্রখানা দাসীর হাতে ফিরাইয়া দিল। অল্পক্ষণের এই পরিচয়টুকুতে বলাইয়ের মা হিমুকে যতটুকু চিনিয়াছিল—তাহাতে ফুলগুলির পরিণাম সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া সুধু মৃদুস্বরে সে কহিল, "মুস্কিল কল্লে দিদিমণি! বাবু যদি কিছু সুধোয়—কি যে জবাব দেব?"

তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া প্রশান্ত স্বরে হিমু কহিল, "সত্যি কথাই বল্‌বে—তাঁর ফুল তোল্‌বার সখ্ মিট্‌বে, আমায়ও তোমাদের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে হবে না।"

"মিথ্যে বলনি দিদি-ঠাকুরুণ। তুমি একেবারে কেল্লার গোরা—বাবুর দেখচি, কপালে অনেক দুঃখু লেখা আছে—" বলিয়া দাসী এতক্ষণের বাক্‌বিতণ্ডার পর একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

হিমু বইখানা মুড়িয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। রৌদ্রালোক ম্লান হইয়া সন্ধ্যার সূচনা জানাইতেছিল। গাছ-পালার ছায়ায় এদিক্‌টা ইহারই মধ্যে বেশ্ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। মুক্ত আকাশে কদাচিৎ দুই-একটি পাখী উড়িয়া যাইতেছে। চিম্‌নীর পথ দিয়া কখনও পাখীর আওয়াজ কানে আসিয়া বাজিতেছিল। বাহিরে প্রচুর স্বাধীনতা! তবু কি অসহায় সে! পৃথিবীটার এ-সব অংশের সহিত তাহার পরিচয় নাই। মনেও সে কখনো এমন সব বিষয়ের কল্পনা জাগায় নাই—আশ্রয় নাই! একমাত্র আশ্রয় দিদিমা—তিনিও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছেন! তবে কে তাহাকে এ বিপদে রক্ষা করিবে—? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে জুতার আওয়াজ শোনা গেল। হিমু মুখ ফিরাইয়া লইল। মনে হইল, বাবু এইবার সশরীরে তাহার অবাধ্যতার দণ্ড বিধান করিতে আসিয়াছেন। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া সে তাহার তীক্ষ্ণ-ধার রসনাকে সংযত করিল। ছি, উহাঁরই বাড়ীতে বসিয়া উহাঁর সহিত কি কোমর বাঁধিয়া মেছুনীদের মত ঝগড়া বাধাইবে সে? বাড়ী ছাড়িয়া একবার যাইতে পারিলে তখন কেই বা আর তার নাগাল পাইবে? হিমু ভাবিতেছিল, মার কোলে মুখ লুকাইলে কেহ আর তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল—খুব বেশী সময় নয়। তবু চুপ করিয়া কৌতূহল সহ্য করা হিমুর স্বভাব-বিরুদ্ধ। রাগের মূলীভূত ফুলগুলা এখনও ময়লা গাদার পাশে পড়িয়া আছে—সুতরাং অন্তরেও তাহার কৌতুক-হাস্যের একটি সুর বাজিতেছিল। সে মুখ ফিরাইয়া অপমানিতের রোষ-দীপ্ত মুখের পানে চাহিতে গিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। যে আসিয়াছিল, সে একজন যুবাপুরুষ। হিমু তাহাকে এ-বাড়ীতে আর কখনও দেখে নাই—বাহিরের আমলা-কর্ম্মচারীরা, বাবুর মোসাহেব-বৃন্দ সকলেই যে তাহার পরিচিত, তাহা নয়—তবু অন্দরে যাহাদের যাতায়াত চলে, তাহাদের সকলকেই হিমু চেনে। বাহিরে কেদারা কৌচ সোফার বাহুল্য-সত্ত্বেও কেহ যে সাধ করিয়া মাটিতে বসিয়া পুস্তকাধ্যয়ন করিতে

ছিল, সম্ভবতঃ আগন্তুকের তাহা খেয়ালেও আসে নাই। বাহিরের অন্ধকার দালান হইতে ঘরে ঢুকিয়া প্রথমটা সে ঘরের দিকেই চাহিয়াছিল। পরে যখন হিমুর উপর দৃষ্টি পড়িল—হিমুর বিস্মিত দৃষ্টি তখন তাহারই উপর ন্যস্ত। "আমি বুঝ্‌তে পারিনি, ঘরে কেউ আছেন।" নিজের অনুচিত আগমনের স্বপক্ষে এই একটিমাত্র কৈফিয়ৎ দিয়াই আগন্তুক কুণ্ঠিত ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া গেলে হিমু তাহার চলিয়া যাওয়া পথের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী

বিবাহে পণ-প্রথা

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আমরা ইতিপূর্ব্বে এদেশের বিবাহ ও পণ-প্রথা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখন আগে ঐ-বিষয়ে যে সকল কথা বলা হয় নাই, তাহারই কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে বিবাহ ধনের পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া অনেকস্থলেই গৌরব করিতে শোনা যায়। কিন্তু তাহা কি যতটা মনে করা যায় বাস্তবিকই সেইরূপ হিতকর? ধনের পরিমাণের সমতাতেও কতকগুলি স্বাভাবিক এক রকম অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ঐরূপ অবস্থার পরস্পরের মধ্যে বিবাহ স্বাভাবিক ও সুখকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমাদের প্রচলিত সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-প্রথায় উভয়পক্ষের অবস্থার স্বাভাবিক সমান ভাব কিছুই থাকিতে পারে না। এখন আর জাতিভেদে ব্যবসায়-ভেদ নাই। সুতরাং একজাতির (তাহার সঙ্কীর্ণ শাখা-প্রশাখার) মধ্যে ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, সুন্দর, কুৎসিত, রক্ষণশীল, উন্নতিশীল ইত্যাদি সকলরকম লোকই থাকিতে পারেন। বিবাহ ঐ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে তাহাদের নিজের অবস্থা, প্রকৃতি ইত্যাদির সহিত মিলিতে পারে এমন পাত্র-পাত্রী পাওয়া কঠিন হয়। এদিকে পণপ্রথা চলিত হওয়ায় ধনের কুফল অন্য সকল দেশ অপেক্ষাই এখানে বিষময় হইয়াছে। ধনী ব্যক্তিরা আপনাপন কন্যার বিবাহে ইচ্ছামত মূল্যে পাত্র খরিদ করিয়া থাকেন। সুতরাং সঙ্কীর্ণশ্রেণীর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রগুলি তাঁহাদেই এক-চেটিয়া হইয়া পড়ে। দরিদ্র, এমন কি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের যতই রূপ গুণ থাকুক, যোগ্য পাত্র মিলিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বরের বাজারের দরও তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিতে পারে না। এদিকে ধনীরাও যে সব সময়ে তাঁহাদের ইচ্ছামত পাত্র পাইয়া থাকেন, তাহা নহে। তাঁহাদেরও আপনাদের অনুরূপ অবস্থাপন্ন ঘরেই প্রধানতঃ মেয়ের বিবাহ দিতে ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা হয়ত নিজশ্রেণীর মধ্যে অল্পই থাকে। সুতরাং তাঁহারা অগত্যা বিদ্যা বা রূপ দেখিয়াই পাত্র

নির্ণয় করিতে বাধ্য হন। তাহাতে ধনী-কন্যাকে অনেক সময়েই মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র-গৃহে পড়িতে হয়,—তাহা যে কোনপক্ষের পক্ষেই বিশেষ সুখকর হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। ধনী পিতা আজকালকার দিনে বিবাহ-পণের মূল্য ব্যতীত পরে আর কিছু বড় দিয়া উঠিতে পারেন না, দিলেও তাহা তাঁহার কন্যার পক্ষে কখনই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। এদিকে বরাবর কন্যাকে সাহায্য করিতে তিনি ক্রমেই কাতর হইতে থাকেন। পিতার অভাবে ভ্রাতার কর্ত্তৃত্বেও ঐ সকল ধনী-কন্যার অবস্থা অনুমান করিলেই হয়। বড় মানুষের জামাই হইয়া পাত্রটিরও অনেক সময়েই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা তেমন হয় না, উপর উপর জামাই-আদরে দিন কাটাইয়া পরে যখন চৈতন্য হয়, তখন সে আপনার পত্নীর উপরই তাহার শোধ লইয়া থাকে। তাহার পর ধনী-কন্যা কুৎসিত হইলে সুন্দর বরের পরে তাহাকে মনে না ধরাই সম্ভব।

এদিকে সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের দেশে মতভেদ এতই গুরুতর ও তাহার ভিন্নতায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রকারভেদও এতই বিষম যে আপনার শ্রেণীর মধ্যে মনের মিল থাকিতে পারে এমন পরিবারের পাত্র-পাত্রী পাওয়া একরকম অসম্ভব বলিলেও হয়। তবে পাত্রীর ক্ষেত্রে তাহার, বা তাহার পরিবারের মতামতে বরপক্ষের বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, কারণ তাহা যেমনই হউক, তাহাকে আপনাদের মত করিয়াই চালানো হইয়া থাকে। যদিও সে ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে আক্ষেপ করিতে শোনা যায়। কিন্তু পাত্রীর পক্ষে একভাবের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থী পরিবারের মধ্যে পড়িলে যে তাহার দশা কেমন হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারো সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করাই কঠিন।

এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, পণপ্রথা আমাদের সমাজ-ব্যাধির একটী চিহ্ন মাত্র। তাহার মূল দূর করিতে না পারিলে কেবল সাধু ইচ্ছার দ্বারা ইহা যাইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে একজাতির সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নিয়ম ও কন্যার বিবাহের অবশ্যবাধ্যতা দূর করিতে হইবে, এবং বিবাহে গুরুজনের সম্মতির সহিত বরকন্যার পরস্পরের মনোনয়নপ্রথা প্রচলিত করিতে হইবে। ইহার সহিত বর্ত্তমান পণপ্রথা দূর করিয়া পুত্র-কন্যা ন্যায়তঃ পিতামাতার সম্পত্তির সমান অধিকারী-জ্ঞানে কন্যাকেও পিতামাতার অবস্থানুযায়ী সম্পত্তির অংশ দিবার ব্যবস্থা করা উচিত হইবে। সম্প্রতি বিলাতে পুত্র, কন্যা পিতামাতার সম্পত্তি সমানভাবে পাইবার আইনতঃ ব্যবস্থাও হইয়াছে। আমাদের দেশেও আইন-প্রণয়ন যখন দেশী লোকের হাতে আসিয়াছে, তখন তাঁহাদের এবিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু আইন না হওয়া পর্য্যন্ত সকলের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে পিতামাতার আপনা হইতেই এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। বিশেষতঃ কন্যার যখন আপনার উপার্জ্জন করিবার সুবিধা নাই, তখন তাহাকে সাধ্যমত কিছু দেওয়াই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তবে তাহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বিশেষ সম্বন্ধ না থাকায়

ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়াই বিরত হইলাম।

এই সূত্রে আর একটী কথা বলাও প্রয়োজন। মেয়েদেরও নিজেদের পুরাপুরি দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত হওয়ার আগেই যে সকল বিবাহ সম্বন্ধ কেবল টাকার জন্যই হইয়া থাকে, তাহাতে দৃঢ়ভাবে অমত জানাইবার সাহস জানাইতে হইবে। ইহার মধ্যে বিপত্নীক, দুশ্চরিত্র ও স্ত্রী বর্ত্তমানেও যাহারা বিবাহ করে, তাহাই প্রধান। এইরূপ বিবাহের প্রধান কারণ যে অর্থ-নৈতিক, একটু খোঁজ করিলেই তাহা দেখা যায়। অবশ্য ইহার জঘন্যতা অভ্যাসের বশ কাহারও তেমন বাজে না বটে, তবু একটু বুঝাইলেই সকলে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিবাহই মেয়েদের জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়, তাহার সহিত বিবাহের বাধ্যতা-মূলক পণপ্রথার যোগ হইয়া সোনায় সোহাগা হইয়াছে। এই বিবাহ কেন দিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে বলিয়া উঠেন, "মেয়ের বিবাহ ত দিতেই হইবে, এটী কমে পাইতেছি, ইহার ঊর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা নাই।" এরূপ অবস্থায় মেয়েদের চিরকুমারী থাকিয়াও ঐ-সকল বিবাহে অসম্মতি জানাইতে সাহস করিতে হইবে।

বাস্তবিক ঐসকল পুরুষের প্রতি মেয়েদের যে স্বাভাবিক ঘৃণা সমাজের চাপে সচেতন হইয়া উঠিতে পায় না, তাহা জাগাইতে হইবে। ঐরূপ অশুচি লোককে বিবাহ করিলে যে তাঁহাদের নারীত্ব ও কুমারীত্বেরই অপমান ও আপনাদেরও অশুচি ও কলুষিত হইতে হইবে, এই জ্ঞান জন্মানো দরকার। অভিভাবকেরা ঐরূপ সম্বন্ধ উপস্থিত করিলে ধিক্কারের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহাদের থাকা প্রয়োজন।

বিপত্নীকেরা কুমারী-বিবাহের সুযোগ না পাইলেই বিধবা বিবাহের পথও কতকটা খুলিয়া যাইতে পারে। তাহারও যে কতটা প্রয়োজন, ন্যায় ও সত্যের দিকে চাহিলে কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালী গঠন করিতে অর্থকরী বিদ্যা ও বিষয়-সম্পত্তি পরিচালন করিতে যে ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন তাহাও বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। মেয়েদের শিক্ষা কেবল পোষাকী accomplishment ভাবে হওয়া আজকালকার দিনে আর চলিবে না, চলিতে দেওয়া উচিতও নহে। বাহিরের জগতের সহিত সম্পর্ক রাখিতে হইলে ইংরাজী শিক্ষাও অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং তাহার ব্যবস্থাও প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়ে থাকা উচিত। শিক্ষার ব্যবস্থা কালোপযোগী হইলে মেয়েদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য বিবাহের প্রয়োজন হইবে না, সুতরাং বিবাহে মনোনয়ন তাহাদের সম্ভব হইয়া আসিবে। Bigami Lawও আমাদের সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত। যাঁহারা মনে করেন, বহুবিবাহ প্রথা বিনা-আইনেই দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে,-তাঁহারা ভিতরে অবস্থা একটু খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবেন। তবে এই আইনের সাহায্যে আমাদের কিছু হওয়া যে কতটা সম্ভব, তাহা এ-পর্য্যন্ত কাউন্সিলে উন্নতিশীল কোন বিল উপস্থিত হইলেই তাহার যে দশা হয়, তাহা লক্ষ্য করিলেই জানিতে

পারিবেন। এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া আমাদের বাঙ্‌লা দেশের সুনাম অন্য প্রদেশেও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা এখন উন্নতিশীল কোন আইন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে বাঙ্‌লাকে বাদ দিয়াই তাহা করিতে থাকেন। শেষগিরি মহাশয় উত্তরাধিকার আইনের যে পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাতে বাঙ্‌লা বর্জ্জন ও তাহার কারণের কথা স্পষ্টই উল্লেখিত আছে। যাহা হউক, সকল জানিয়াও চেষ্টা ছাড়িয়া দেওয়া প্রকৃত মানুষের লক্ষণ নহে। সুতরাং চেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে, লক্ষ্য আদর্শ বড়ই রাখিতে হইবে।

বঙ্গনারী

আব্দারের বেড়ি

সাধবোনা মনে করি
বোঝে কই প্রাণ ?
পদে পদে সই তাই
এত অপমান !
অবেলায় বাদলায়
মানুষ কি যায় ?
মাথা খাও রাখ কথা
ধরি দুটি পায়।
আর কোন দিন যদি
করি অনুরোধ,
শুনোনাকো শুনোনাকো
দিও প্রতিশোধ!
চেয়ে দেখ আকাশের
চোখ ছল্-ছল্,
মেঘ ডাকে গুরু গুরু
এলো বুঝি জল !

কাল রাতে ভাল করে
হয়নিক ঘুম,
কাঁদবে যে খোকা, তা কি
আগে জানতুম ?
শোবো তারে নিয়ে আজ
আলাদা না হয়,
দেখো দেখো হবে ঘুম
আজ নিশ্চয়।
কথা তুমি শোনোনাক
এই ভারি দোষ,
ব্যথা দিলে পরে মনে
পাবে আফ্‌শোষ,
তাই বলি কাল যেও
থেকে যাও আজ,
ঐ দেখ বিদ্যুত
পড়ে বুঝি বাজ !

এতখানি ময়দা যে
একা মাখলুম!
লুচি হবে বলে নেচি
কেটে রাখলুম !
হাট থেকে বেছে বেছে
আনালুম পান !
দূর করে দাও ; হোক্
সব লোকসান।

কাজ আছে ? কাজই বড় ?
কাজ নেই কার ?
ক্ষতি হয় তার আমি
দেব গুনগার।
ঐ দেখ খোকা করে
চোখ ছলছল,
কী জানি কি বুঝেচে ও
পড়ে বুঝি জল !

সেই সেদিনের কথা—
বেশীদিন নয়,
কত ভালবাসতে যে
তাকি মনে হয় ?
মার কাছে সে বছর
যবে আমি যাই,
মনে পড়ে কেঁদেছিলে
কত কান্নাই ?
আমি বল্লুম—ছি ছি
এত দুর্ব্বল !
ফিরবো ত দুদিনেই
চোখে কেন জল ?
এখন বিদায় দিতে
বাধেনাক আর,
হাসিমুখে চলে যাও—
কপাল আমার !

আমি যেন পর, তবু
খোকা ত আপন,
ছাখো লেখা চোখে ওর
মৌন বারণ !

বলতে পারেনা কথা
বোঝে সব ঠিক,
তুমি চলে যাবে চেয়ে
আছে অনিমিখ !
যাও যাও গায়ে হাত
দিওনাক ওর,
হয়েছে হয়েছে ঢের
যত্ন আদর !
বাজে কথা কয়ে কেন
মিথ্যে ভোলাও ?
সরো সরো কাজ আছে
হাত ছেড়ে দাও।

আয় খোকা, তোরে নিয়ে
দূরে সরে যাই,
শুয়ে শুয়ে ছড়া গান
গল্প শোনাই,
হোস্‌নেক তুই ওর
মত নিষ্ঠুর,
বউমা যা বলে, দিস্
সায় মঞ্জুর।
একি ! একি ! জামা জুতো
খুলচো হঠাৎ ?
যাবে না ? দাসীরে দয়া
হোল কি নেহাত্ ?
মেঘ সরে গিয়ে ঐ
ওঠে বুঝি চাঁদ ;
পালাবে আবার ; খোকা
বাঁধ্ ওরে বাঁধ্ !

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম্মরাজের ধর্ম্ম-বিচার

মহাভারতের ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরিত্র সমর্থনের জন্য আজ একটি উকিল নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে (আদর্শ-বিপর্য্যয়, ভারতী, শ্রাবণ)—তাই কি ব্যাসদেব বা কৃষ্ণের মতই উকিল ?—সে এই দীন লেখকের মত একজন উকিল। কল্পনায় বেশ একটু humour আছে—ভারতীর পাঠক-পাঠিকা মাত্রকেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এই যুধিষ্ঠির চরিত্রটী কোন্ দিক হইতে কি ভাবে বিচার করা উচিত, জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে আমি তাহারই একটু আভাষ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম মাত্র। কিরূপে ইহার কদর্থ করা যাইতে পারে, চাটুজ্জ্যে-মশা'য়ের কথা-গুলিতে তাহার একটা ধারণা হইয়াছে, তাই এই প্রসঙ্গে আমাকে আরও দুই-একটা কথা বলিতে বাধ্য হইতে হইল। আশা করি, মহাভারতের একটি প্রধান নায়কের চরিত্র-সমালোচনার প্রসঙ্গ ইতিমধ্যেই বিরক্তি-কর হইয়া উঠিবে না।

ভারতীর পাঠক-পাঠিকাদিগের মহাভারতের সহিত পরিচয়-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া ও তাঁহার মতের বিরুদ্ধবাদীর সত্যানুসন্ধিৎসার প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি যতই সৎসাহসের বড়াই করুন না কেন—তাঁহার নিজের ছিদ্রান্বেষণের প্রবৃত্তিটাই যেন তাঁহার বিদ্রূপাত্মক-ভাষার মধ্য দিয়া ক্রমাগত আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে চাটুজ্জ্যে-ম'শায়ের চার্জ্জ-গুলি এই :—(১) তিনি নিশ্চেষ্ট, অদৃষ্টবাদী ও সুযোগপন্থী ; (২) তিনি ভীরু, কাপুরুষ, ক্লীব এমন কি জড়পদার্থবৎ ; (৩) তিনি ঈর্ষা-বিদ্বেষপরায়ণ ও স্বার্থান্ধ। পূর্ব্ব-প্রবন্ধে তিনি যাহাই বলুন না কেন—এই চার্জ্জগুলি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মনোভাব গোপন করেন নাই। যাহা হউক, আমরা এখন একটী একটী করিয়া এই চার্জ্জগুলির বিচার করিয়া দেখিব।

তিনি সুযোগপন্থী কিরূপে তাহা চাটুজ্জ্যে মশায় না বুঝাইয়া বলায় "begging of the question" দোষ ঘটিয়াছে। যুধিষ্ঠির নিজ-সত্যানুসারে বনবাসে কাল যাপন করিয়া, নিজরাজ্য-উদ্ধারের যাহা ন্যায়সঙ্গত চেষ্টা, তাহাই করিয়াছিলেন ; উদ্যোগ-পর্ব্বটা মন দিয়া পড়িয়া দেখিলে এ-বিষয়ে ভ্রম থাকিতে পারেনা। তিনি তো কৈ আওরঙ্গজেবের মুরাদকে প্রতারিত করিবার মত কিছু করিয়াছেন বলিয়া জানি না—বা Hamlet-এর মত ক্রমাগত To be or not to be বলিয়া কল্পনা করিয়াও ত চলেন নাই ! অবশ্য তিনি সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়াও কখনও কার্য্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। আর যদি তিনি সুযোগের অপেক্ষাই করিতেন, তবে সভা-পর্ব্বেই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিতেন—কারণ তখনও তিনি রাজা এবং দুর্য্যোধন অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন, কিম্বা অন্যত্র চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের হাত হইতে দুর্য্যোধনকে মুক্ত না করিয়া সেই অবসরেই রাজ্যটা দখল করিতে পারিতেন। আর সুযোগপন্থীর ত সুযোগকালীন একটা কার্য্যতৎপরতা থাকা চাই, তাঁহার সহিত

নিশ্চেষ্টতার কিরূপে সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে? তবে যুধিষ্ঠির অদৃষ্টবাদী কিঞ্চিৎ ছিলেন, একথা অস্বীকার করিলে অসত্য কথা বলা হইবে। উপনিষদের জ্ঞানবাদ যখন ভক্তিবাদের রসে সরসতা প্রাপ্ত হইয়া মানবমাত্রেরই মনে ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধের একটা যন্ত্রী-যন্ত্র ভাবের ধারণার সৃজন করিয়া দিয়াছে, তখন দৈব বা অদৃষ্ট মানা স্বাভাবিক। মিল্টনও তাঁহার Paradise Lostএ স্বাধীন ইচ্ছা (free will) ও দৈব (destiny) লইয়া একটু গোলযোগে পতিত হইয়াছেন। ভীষ্ম, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, সঞ্জয়—সকলেরই মুখে আমরা অদৃষ্টেরই অধিকতর প্রাবল্যের কথাই শুনিতে পাই। এ যুগে Napoleonও অদৃষ্টবাদী ছিলেন। নিশ্চেষ্টতা অদৃষ্টবাদিতার অপরিহার্য্য বিশেষণ হইতে পারে না।

তারপর, যুধিষ্ঠির ভীরু ইত্যাদি। সভাপর্ব্বেই যুধিষ্ঠিরের প্রতি চাটুজ্জ্যে-মশায়ের রাগটা ভীম সেনের ক্রোধকেও বুঝি ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাই সেখানে মহাভারত-কার "যেন অচেতন প্রায় হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন" বলিয়া অচেতন-প্রায় হওয়ার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন—চাটুজ্জ্যে-মশায় সেখানে "যেন" কথাটী উঠাইয়া দিয়া তাঁহার মনের মত তাৎপর্য্য ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিবেন, যুধিষ্ঠির তখনও দ্রৌপদীকে "রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সমীপবর্ত্তিনী" হইতে বলিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন। দ্রৌপদীও বলিতেছেন, "ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মে অবস্থিত আছেন, আমি ভর্ত্তার গুণগান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরমাণুমাত্র দোষস্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না"(সভাপর্ব্ব, ৬৩ তম অধ্যায়) এবং যুধিষ্ঠির যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অর্জ্জুন—এমন কি "ক্রোধস্বভাব ও অসহনশীল" ভীমসেনও স্বীকার করিয়াছেন (সভাপর্ব্ব, ৬৪ তম অধ্যায়)। দ্রৌপদীকে পণে রাখার অধিকার বিষয়ে বিদুরই সর্ব্বপ্রথমে তর্ক উঠাইয়াছিলেন (সভাপর্ব্ব, ৬২ তম অধ্যায়)। বিরাট-পর্ব্বে পঞ্চাশ অধ্যায়ে ভীষ্ম বলিতেছেন, "যদি অসদুপায় দ্বারা রাজ্যভোগের অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে পাশাক্রীড়া-সময়েই তাহারা বিক্রম প্রকাশে উদ্যত হইত, পরন্তু ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকায় যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়-ব্রত হইতে বিচলিত হয় নাই!" এস্থলে দ্রৌপদী ও ভীষ্মের কথাটা গ্রাহ্য করিতে চাটুজ্জ্যে-মশায়ের ক্ষতি কি? যুদ্ধে শল্যকে নিহত করাতেও যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে বীরত্ব সম্বন্ধে চাটুজ্জ্যে-মশায় কোন প্রশংসা-পত্র দিতে নারাজ। তিনি সমসাময়িক সহোদর আত্মীয়-পরিজনের উক্তির উপরেই বেশী নির্ভর করিতে চান। সহোদর অর্জ্জুন, যিনি ভীম অপেক্ষা যুধিষ্ঠিরকে একটু বেশী চিনিতেন, বলিতেছেন, "ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপ, শৌর্য্য ও ধীশক্তি বিষয়ে সকলের অগ্রগণ্য, সংগ্রামে ইনি যেমন অস্ত্র সকলে অভিজ্ঞ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিলোকী মধ্যে তেমন আর কোন পুরুষই জানেনা ও কস্মিনকালে জানিবে না...পাণ্ডবদিগের মধ্যে ইনি অতিরথ, মহর্ষিকল্প, দীর্ঘদর্শী, অতিমাত্র তেজস্বী—বলবান, ধৃতিমান, কার্য্যদক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়—(বিরাটপর্ব্ব, ৮৬ অধ্যায়), তাঁহার আত্মীয়-পরিজন মধ্যে ভীষ্মের মতে যুধিষ্ঠির "কৌরবগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ধৃতি, দম, ক্ষমা, ধর্ম্ম, তেজ, বল...ইহাঁতে প্রতিনিয়ত বিরাজমান" ইত্যাদি (শান্তিপর্ব্ব ৫৫শ অধ্যায়), ধৃতরাষ্ট্রের মতে তিনি "ধৈর্য্যশীল, সত্যনিষ্ঠ, বিজয়াসক্ত, অক্ষয় ধনুর্দ্ধর, দান্ত ও দুর্দ্ধর্ষণীয়" (দ্রোণপর্ব্ব)। বিদুরের মতে "যুধিষ্ঠিরের কোপ প্রবৃদ্ধ হইলে আকাশে বক্রভাবে পতিত ধূমকেতুর ন্যায় এই সমস্ত লোকের ধ্বংস উৎপাদন করিতে পারে" এবং তিনি "প্রতিভা দ্বারা ধর্ম্মাত্মা—"(উদ্যোগপর্ব্ব) এই সব উক্তি হইতে কি মনে হয়? তিনি সমসাময়িক কাহারও চক্ষে ভীরু ছিলেন না। আধুনিক সঙ্করুচি-দিগের কাছেই তাঁহার বীরত্ব ভীরুতা বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধে জয়-পরাজয় দেখিয়া যদি বীরত্বের পরিমাপ করিতে হইত, তাহা হইলে বীর খুঁজিতে গিয়া রোঁয়া বাছিতে কম্বল উজাড় হইত, ভগবান বিষ্ণু হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক হিণ্ডেনবার্গ পর্য্যন্ত কে যে যুদ্ধে পরাজিত হন নাই—তাহা ত জানি না। শল্য, কৃতায়ুধ প্রভৃতি বীরগণের নাশ করার কথা ছাড়িয়া দিলেও, দ্বৈরথ সংগ্রামে যুধিষ্ঠির দ্রোণকে নিবারিত করিয়াছিলেন (দ্রোণপর্ব্ব); পরাজিত হইলেও একাধিকবার কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন ভীমের বধ্য বলিয়াই কেবল ভীমের কথায় তাঁহার হস্ত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন (কর্ণপর্ব্ব), ঘটোৎকচ বধের পর নিজেই কর্ণকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। এগুলা নিশ্চেষ্ট বীরত্বের নিদর্শন কি না, তাহা তিনি চাটুজ্জ্যে-মশায় একটা সচেষ্ট বীরের নিদর্শন দিলে ভাল বুঝিতে পারা যাইত।

ইহার উপর যুধিষ্ঠিরের শারীরিক বল হইতে প্রকৃষ্টতর একটা অন্যপ্রকারের তেজ

ছিল বলিয়া মহাভারত-কার উল্লেখ করিয়াছেন—যাহার জন্য তিনি বনবাস-কালে নয়ন আবৃত করিয়াছিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র যাহার ভয় করিয়া বলিয়াছিলেন, "যে মহাবাহু ভীষণ দৃষ্টিপাত করিয়াই দুর্য্যোধন সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন, অধিক কি দৃষ্টিপাত-মাত্রে সৃষ্টি বিনাশ করিতে সমর্থ (দ্রোণপর্ব্ব ৯ম অধ্যায়)। যক্ষের কোপের কাছে ভীমার্জ্জুনের বীরত্ব যখন নিষ্ফল, তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাদের ত্রাতা, আবার ভীম যখন অজগর-রূপী নহুষের পাল্লায় পড়িয়া শারীরিক পরাক্রমের ব্যর্থতায় হাহাকার করিয়াছিলেন, তখন ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া-ছিলেন, অর্ব্বাচীন পুত্র যেমন পিতার দ্বারা রক্ষিত হয় তাঁহারাও ধর্ম্মরাজের দ্বারা সেইরূপে রক্ষিত। চাটুজ্জ্যে-মশায়ও যুধিষ্ঠিরের দর্প দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দর্পটা যে দীনবন্ধুবাবুর বক্রেশ্বরের ন্যায় নিরপরাধ কদলী বৃক্ষের উপর দিয়াই ব্যয়িত হয় নাই, তাহাও দেখাইলাম। এ-হেন যুধিষ্ঠির কাপুরুষ ও তাঁহার ক্ষমা অশক্তের ক্ষমা! যে ভীত ত্রস্ত বিরাট-রাজাকে তিনি সুশর্ম্মার হাত হইতে নিজে যুদ্ধ করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, তাঁহাকে না হয় অক্ষপ্রহারের প্রতি-প্রহার করিতে পারিতেন না,—কিন্তু ভীম যখন জয়দ্রথের মাথা ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত, তখন তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার হুকুম দিতেও কি অশক্ত? না, চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের হাত হইতে দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়া দিয়া শক্তিহীনতারই পরিচয় দিয়াছিলেন? তিনি কি কুপিত নয়নে একবার চাহিয়াও অনিষ্ট করিতে শক্তিহীন ছিলেন?

এই যুধিষ্ঠিরের ঈর্ষা-বিদ্বেষও নাকি

খুবই ছিল! যখন কর্ণ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া বিশ্রাম লইবার জন্য শিবিরে আগমন করেন ও কর্ণের অমানুষিক পরাক্রম-দর্শনে রণজয় সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন অসময়ে অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া কর্ণবধ হইয়াছে বোধে আলিঙ্গন করিতে গিয়া যখন শুনিলেন, তিনি ভীমকে সঙ্কটময় যুদ্ধে একাকী রাখিয়া শিবিরে আসিয়াছেন, তখন অত্যধিক উত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কর্ণ-ভয়ে ভীত বোধে কটুবাক্য বলিয়াছিলেন—তখন তিনি কাহার হিংসা করিতেছেন? অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে? না, কর্ণের বিরুদ্ধে? তাঁহার বিরুদ্ধে শস্ত্রধারী হইয়া তাঁহাকে কি উপায়ে হনন করা যাইবে চিন্তা করা যদি হিংসা বা বিদ্বেষ হয়, তবে ত যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়াই যত দোষ করিয়াছেন! আর যে স্থলে দ্রৌপদী ভীম বা অর্জ্জুন তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া কটূক্তি করিয়াছেন, সে স্থলে তাহারা পরে লাঞ্ছিত হইয়া ক্ষমা চাহিয়াছেন কেন? তাঁহারা ত বীরধর্ম্মী, সত্য বলিতে কুণ্ঠা কেন? আর সে সমস্ত সত্য হইলেও তাঁহার প্রতি তাঁহার বীর ও সত্যপরায়ণ ভ্রাতাদের যেরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে, তাহার সহিত জ্যেষ্ঠের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে এবং সাধারণ লোকের বা শত্রুদেরও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায় কিরূপে? আর অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনচিত্ততার সময় আত্মীয়-স্বজনের বিরাগভাজন হওয়ার উদাহরণ জগতের ইতিহাসে যুধিষ্ঠিরই একমাত্র নহে।

দুর্য্যোধন যখন বিশ্রাম লইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে হ্রদশায়ী হইয়া পাণ্ডবদিগের চক্ষে ধূলি দিয়াছেন ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতেছেন, তখন যুধিষ্ঠির সন্ধান লইয়া তাহার নিকট গিয়া কি করিলেন?—ভীমসেন যেমন তাড়াইয়া জয়দ্রথের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা করিলেন না—তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "তুমি গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর, তুমি আমাদিগকে পরাজিত করিয়া রাজা হও বা পরাজিত ও নিহত হইয়া শয়ন কর, বিধাতা তোমার নিমিত্ত এই পর-ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব মহারাজ, তুমি যথার্থরূপে রাজা হও।" তখন দুর্য্যোধন একটু মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, "অদ্যাপি তোমাকে জয় করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই, এই শূন্যপ্রায় পৃথিবী তোমারই হউক, তুমি নিরীশ্বরা বসুন্ধরা ভোগ কর" (শল্যপর্ব্ব, ৩১ অধ্যায়)। ইহাই নাকি দুর্য্যোধনের ক্ষমা চাওয়া, আর তখন ক্ষত্রবীর যুধিষ্ঠির যীশুখৃষ্টের মত কোল পাতিয়া দেন নাই,—এখানে চাটুজ্জ্যে-মশায় চটিয়া গিয়া কিরূপ রস-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সমালোচকেরা বিচার করিবেন। যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিলেন, "যদিও তুমি দান করিতে সমর্থ হও, তোমার প্রদত্ত অবনী শাসন করিতে আমি কামনা করি না—প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে, তোমাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য লইব। আর তুমি অনীশ্বর হইয়া কি প্রকারে পৃথিবী-দানে ইচ্ছা করিতেছ—অভিযুক্ত হইয়া কোন্ রাজা মেদিনী দান করিতে পারে?" আরও দু-একটা পূর্ব্ব আচরণের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়া দিলেন,

তিনি সর্ব্বথা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেই অভ্যস্ত। এই কথাগুলাই নাকি "বেচারী দুর্য্যোধনকে মরণের মুখে ছুটে যাবার জন্যে বিষিয়ে তুলেছিল" যুধিষ্ঠিরের প্রতি দারুণ হিংসাও ইতিপূর্ব্বেই দুর্য্যোধনকে "বিষিয়ে তুলেছিল" বলিয়া জানি, সে দোষটাও কি যুধিষ্ঠিরের? আর যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে বীর, যাহা তোমার অভিলষিত তাহাই তোমাকে দিতেছি—তুমি আমাদের একজনকে হত করিয়া রাজা হও" ইহাতেও কি বেচারী দুর্য্যোধনের প্রাণটা "বিষিয়ে উঠেছিল?" কিন্তু বেচারী যুধিষ্ঠিরের ত এত করিয়াও ক্লীবত্বের কলঙ্ক ঘুচিল না! আচ্ছা, বিচিত্রবীর্য্য যেমন ভীষ্মের সাহায্যে বিবাহ করিয়াছিল এবং দুর্য্যোধনও যেরূপ কর্ণের সাহায্যে কন্যা হরণ করিয়াছিল, তেমনি যুধিষ্ঠিরও ভীমার্জ্জুনের সাহায্যে কি একটা বিবাহ পর্য্যন্তও করিতে পারিতেন না—তাহা হইলেও ত চাটুজ্জ্যে-মশায়কে আর ক্লীবত্বের প্রমাণ খুঁজিতে কষ্ট পাইতে হইত না।

যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে আর-একটা চার্জ্জ আছে, সেটা একটু গুরুতর, বোধ হয় চাটুয্যে-মশায়ই সেটা প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন। সেটা দ্রৌপদীর প্রণয় লইয়া অর্জ্জুনের সহিত প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা (rivalry),—বোধ হয় কতকটা জগৎসিংহ-ওসমানি ভাব এবং স্বর্গারোহণ পর্ব্বে দ্রৌপদীর পতনের কারণ নির্দ্দেশ-স্থলে সেটা নাকি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চ-স্বামীর পত্নী হইয়া একের প্রতি অনুরাগ যে কিরূপ দোষাবহ, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "দ্রৌপদী" সমালোচনায় এটা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এখানে সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

সংস্কার—সেটা বিপক্ষেই হউক বা স্বপক্ষেই হউক—নিরপেক্ষ বিচারের পরিপন্থী। সেদিন Archer সাহেব ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় বর্ব্বরতা ছাড়া বিশেষ আর কিছু দেখিতে পান নাই। চাটুজ্জ্যে মশা'য়ও গালাগালির যুধিষ্ঠিরটীকেই সত্য করিয়া দেখিয়াছেন, আড়ম্বর করিয়া মহাভারত খুলিয়াছেন, কিন্তু চক্ষুর উপরকার রঙিন্ কাঁচখানা খুলিতে পারেন নাই। তাই, ক্রোধান্ধ ও আচ্ছন্ন বুদ্ধির ভিতর যুধিষ্ঠিরের যে বিকৃত চিত্রটী প্রতিফলিত হইয়াছে, ও সেই বিকৃত চিত্রের যে কটূক্তি-পূর্ণ বর্ণনা, প্রধানতঃ তাহা হইতেই মালমসলা লইয়া তাঁর সংস্কারের যুধিষ্ঠিরকে তিনি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন; ক্রোধের উক্তিতে নিরপেক্ষ বিচার ও যথার্থ বাক্য অন্বেষণ করা কতটা মনোবিজ্ঞান-সম্মত, তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। তাই যখন যুধিষ্ঠির সত্যবদ্ধ হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তখন তিনি কাপুরুষ, নিশ্চেষ্ট, জড় পদার্থ! আর যখন কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনের শোণিত-যজ্ঞের বীভৎস দৃশ্যে তাঁহার প্রাণবান হৃদয়ের তারে নির্লিপ্ত বৈরাগ্যের একটা প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছে—তখন সেটা একটা ভণ্ডামি বা ন্যাকামি বোধ হইয়াছে দেখিয়া গল্পের দাদামহাশয়ের নাতি-নাতনীর দল সমগ্র মহাভারত পাঠ করিয়া কেবল পিতামহকে মারিয়া রাজ্য লওয়া ও দ্রৌপদীর পঞ্চ-পতিত্ব-টুকুই শিখিয়াছিল—তাহাই মনে পড়িল। কবি এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়াই—"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা

লিখ"-টা লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। মহাভারতের ঘটনা-পরম্পরা এই পাণ্ডবদিগকে কেন্দ্রীভূত করিয়া গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে; আর পাণ্ডবদিগের কার্য্যকলাপ যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়াই সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিত্ব আর সমস্ত পাণ্ডবদিগকে যে আচ্ছন্ন করিয়া আছে—তাহা সমুদয় মহাভারত পাঠ করিলেই অনুভব করা যায়। যুধিষ্ঠিরকে ছাড়িয়া পাণ্ডব—কানু-ছাড়া গান। ভীমের শারীরিক পরাক্রম ও অর্জ্জুনের তেজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মজ্ঞান দ্বারা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে—ভীষ্মও যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব স্বীকার করেন। (বিরাটপর্ব্ব) বাস্তবিক পঞ্চপাণ্ডব যেন একটা Organised personality ,মহাভারত-কারও এটা প্রচ্ছন্ন রাখেন নাই, বরং স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, "যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাদ্রুম, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রী-সুতদ্বয় পুষ্প-ফল, কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ ইহার মূল। (মহাভারত; আদিপর্ব্ব ১ম অধ্যায়)। শ্রীকৃষ্ণ এই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন (উদ্‌যোগপর্ব্ব ২৯ অধ্যায়)। এই যুধিষ্ঠিরকে পরিস্ফুট করিবার জন্য "মন্যুময় দুর্য্যোধনের" অবতারণা। এখন মহাভারত-কারের ধর্ম্মরাজের মূর্ত্তি গড়িবার অভিপ্রায়টা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে চাটুজ্জ্যে-মশায়ের মতানুসারে তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। যিনি ভীমার্জ্জুনের মত ধার্ম্মিক ও ক্ষত্রিয়-বীর ভীষ্মের মত ব্রহ্মচারী বীর, সুভদ্রা-দ্রৌপদীর মত বীরাঙ্গনার পরিকল্পনায় অক্ষম ছিলেন না—তিনি কেবল ধর্ম্মরাজ গড়িতে গিয়াই অকৃতকার্য্য হইলেন—অর্থাৎ কাব্যশিল্পে তাঁহার অধিকার থাকা সত্ত্বেও যে এই অক্ষমতা তাহা তাঁহার যথেষ্ট ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব-হেতু নিশ্চয়ই। মহাভারত-কারকে ধর্ম্মানভিজ্ঞ বলিলে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি হইতে পারে বটে—কিন্তু সত্য কথা কতটা কতদূর বলা হয়—তাহার বিচার পাঠক-পাঠিকাদের উপরই থাকিল। অথচ চাটুজ্জ্যে-মশায়ের যুক্তি-মত অন্য সিদ্ধান্ত হওয়া অসম্ভব। প্রকৃত কথা, চাটুজ্জ্যে মশায় যুধিষ্ঠিরকে কাব্য-সৌন্দর্য্যের দিক হইতে দেখিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহা করেন নাই—বা পারেন নাই। কাব্য-সমালোচনার গোড়ার কথা হইল, Sympathy অর্থাৎ প্রাণ দিয়া প্রাণের অনুভূতি—এবং ইহার মূলে চাই বিদ্বেষ-বিহীন হৃদয়ের উদার প্রসারতা। তাই ইংরাজ সমালোচক Raleigh এক স্থানে বলিয়াছেন, সেক্ষপীয়রের সমকক্ষ (peer) না হইলে সম্পূর্ণভাবে সেক্ষপীয়র বুঝা যায় না। কর্ম্মসমষ্টির অন্তরালে যে রসময় মূর্ত্তিটী অম্লান সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছে, তাহাকে তাঁহার অখণ্ড ঐক্যের (integral unity) দিক হইতে ভাব দিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে হইবে, সরস প্রাণের অনুরঞ্জনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই সমস্ত কার্য্য কেবল বিচারের বিষয়ীভূত করিয়া দেখিতে গেলে সেই "কপি খুঁজিতে গিয়া কপির পাতা খোঁজা" হইবে। যে সহস্রদল ঢলঢল সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার প্রত্যেক দলটীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্কেল্ কম্পাসের মাপে ফেলিলে দেখা যায়, ছোট বড়। সে সত্যানুরাগ ও অবিচলিত নিষ্ঠা

দৈনন্দিন কার্য্য-কলাপকে সুসঙ্গতি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠির-জীবনে নিয়মচক্রে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল—সেই প্রাণ-স্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যুধিষ্ঠির-চরিত্র বিচার করিতে যাওয়ায় চাটুজ্জ্যে-মশায় পাইয়াছেন ভাটপাড়ার শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্রাহ্মণের শুষ্ক আচার। বিচারের মধ্য দিয়া বস্তুর প্রাণের সন্ধান করিতে যাওয়াটাই ভুল। আমি যুধিষ্ঠিরকে মানুষ ধর্ম্মরাজ বলিয়াই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু যে কবির কল্পনায় এই মূর্ত্তি প্রতিভাত, তাহা যে আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত, সেটা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? আধ্যাত্মিকতাটা হিন্দুদের "safety valve" বলিয়া একটী তুড়ি মারিলেই কি সেটা ধোঁয়ার মত উড়িয়া যাইবে? আধ্যাত্মিক সত্যটাও যে সত্য—সকলে না মানিলেও। আর কবির প্রেক্ষণার দিক হইতে না দেখিলে তাঁহার সৃষ্টির রস গ্রহণই হইবে না—আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

এই যুধিষ্ঠিরের শান্তরসাস্পদ মূর্ত্তিটি সত্য ক্ষমা ধৃতি তিতিক্ষা মূর্ত্তিতে সংহতবীর্য্যের অলৌকিক ঔজ্জ্বল্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—ইহা ত্রিভুবন শাসনের উপযুক্ত রাজলক্ষণ-বিশিষ্ট—ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য তাঁহার অধিকারে, সমগ্র রাজবৃন্দ তাঁহার কাছে কর-দাতা, তাঁহাতে ক্ষমতার চাপল্য নাই। টেনিসনের আর্থারও কতকটা যেন এইভাবের; তিনিও বীর্য্যসম্পন্ন রাজা,—তাঁহার round table এর নেতা। এখানে ল্যান্সিলটের শস্ত্রবীর্য্যটা (Knighthood) অর্জ্জুনের প্রতাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শারীরিক বলের প্রকাশ যুধিষ্ঠির ও আর্থার উভয়ের মধ্যেই আধ্যাত্মিক শৌর্য্যে আত্মগোপন করিয়াছে।

শারীরিক ক্ষমতা যখন অন্যকে আঘাত করা অপেক্ষা আঘাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সহিষ্ণুতার মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়—তখনই ইহা মহান, এই সত্যটাই প্রাণের কথা। রামায়ণের রাম হইতে বুদ্ধ চৈতন্য পর্য্যন্ত সকলেরই জীবনে এই সত্য প্রকট হইয়াছে। যুদ্ধটা যুধিষ্ঠিরের চক্ষে অপ্রিয় কর্ত্তব্য। বাঙ্গলার তত্ত্বদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার "ঘরে বাইরে" নামক উপন্যাসে নিখিলেশের শান্ত সমাহিত সহিষ্ণু চরিত্রের সহিত সন্দীপের উদ্দাম রণোন্মুখ মত্ততার বৈষম্যের মধ্য দিয়া এই বাণীই পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং আধুনিক ভারতে এই তিতিক্ষার ধর্ম্মটাকেই চিনিবার চেষ্টা হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের আত্মাকে Oliver Lodge কিংবা Conan Doyleএর হাতে সঁপিয়া চাটুজ্জ্যে মশায় hewers of wood and drawers of waterএর পদ হইতে প্রমোশন পাইয়াছেন বলিয়া জ্ঞাত নহি। সন্দীপের মত একটা দল আছে, তাহাদের নিকট জবরদস্তিই পুরস্কার—এমন-কি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিটাই দুর্ব্বলতা। ইহার মধ্যে কিন্তু বিলাতী সুরার উগ্র গন্ধটুকু সময়ে সময়ে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কালের নিকষ পাথরে এই আদর্শ দৃষ্টির তারতম্যানুসারে চিরকালই উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল ঠেকিবে, কিন্তু পরীক্ষা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, সাহসটা বিবেক-বুদ্ধির সংস্পর্শ-শূন্য হইলে—যে পথেই লইয়া যাক্—সেটাও উন্নতির পথ নহে। *

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়

* অতঃপর এই প্রবন্ধ-সম্বন্ধে আর-কোন কথা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইবে না। ভাঃ সঃ।

কলঙ্কের আলো

মারা গেছেন মুন্সী সাহেব, শুন্‌বে কে কি পেলে ?
জমিদারীর আধেক পেলে বাঁদীর ছোট ছেলে।
হরেক রকম নূতন গুজব উঠ্‌ছে চারিপাশে,
বাঁদীর কাঁচা বয়স শুনে মুখ টিপে কেউ হাসে।
কেউ বা বলে বৃথায় করো মিঞার অপযশ
দেখ্‌ছি মোরা আঙুর চেয়ে আখ্‌রোটেতে রস।
লুপ্ত প্রেমের গুপ্ত লীলা সব পেয়েছে টের,
শেষ বয়সে মক্কা যাওয়ার রহস্যও ঢের।
কালকে হবে উইল খোলা ঢাকবে কতক্ষণ,
হাজি কেমন সত্য বলেন শুনবে জগজ্জন।

এটর্ণি তাঁর খুল্‌লো উইল গোপন চিঠিখান
বল্‌লে সবাই গুপ্ত ও থাক্ বজায় থাকুক মান।
কেউ বা বলে, পড়ুন পড়ুন, ওটা পড়াই চাই—
শোনার আগেই শুনেছি সব, নূতন কিছুই নাই।
লিখে গেছেন,—আজও আমার স্মরণ আছে বেশ
খুন করিয়া ভাইপো যেদিন হলেন নিরুদ্দেশ—
নিত্য ঘরে পুলিস ঘোরে হুলিয়া ঘর-ঘর,
কোথাও তাহার চিহ্ন নাহি, উধাও অতঃপর।
এড়াতে হায় নিত্য নূতন হাস্য-উপহাস,
গ্রাম ছাড়িয়া করতে এলাম কল্‌কাতাতে বাস।

তখন থেকে এই বাঁদী মোর দশ বছরের মেয়ে,
রইলো ঘরে আনন্দেতে আমার স্নেহ পেয়ে।
কার্য্যে তাহার নিষ্ঠা অতুল, সব জিনিষে খোঁজ,
সময় পেলেই পড়তো কোরাণ ভক্তিভরে রোজ।
চক্ষু ভরি উঠতো তাহার জম জমেরি জল,
বুকের পরে পড়তো ঝরে মুক্তা সুবিমল।

বয়স যখন উনিশ কুড়ি হাইদী অকস্মাৎ
করলে সাদী, মোসাফির এক কারিগরের সাথ।
প্রাণেশ তাহার সুরূপ যুবা, রাজা না হক, রাজ,
সম্মুখে ওই মসজিদেতে করতো কারু কাজ।

একটী দিবস হাইদী হঠাৎ আমার কাছে আসি
দাঁড়ালো হায় কাতরভাবে নয়ন জলে ভাসি ;
বললে, হুজুর কাহিল স্বামী দেখতে তোমায় চায়,
হেকিম দেছে জবাব, বেশী সময় নাহি, হায়।
বিষম ব্যাকুল দেখেই তারে গল্‌লো হাদি স্নেহে
তাহার সাথেই সেই পোষাকে গেলাম তাহার গৃহে।
শীর্ণ দেহ, উজল আঁখি করুণ স্বরে রাজ
বললে, জনাব, চাই যে ক্ষমা, বিদায় মাগি আজ।
আমিই তোমার অযোগ্য সেই পুত্র, খুনি হীন,
পাপী কসুর মাপ চাহিছে, চরণ-ধূলা দিন্।
লহুন তাহার মাথার টুপি ভিক্ষা সে যে চায়
পাপীর টুপি পায় যেন ঠাঁই, কাবার আঙিনায়।

মুদলো আঁখি, মূর্চ্ছা পিয়ে পড়ল বাঁদী ভূমে
আমার কোলে উঠলো শিশু, নিলাম মুখে চুমে।
বাঁদীর ছেলে নয়রে, এ মোর ভগবানের দান,
আমার ভ্রাতার স্মৃতির স্মৃতি, স্নেহের অভিজ্ঞান।
পিতৃহীনের পুত্র এ যে শুষ্ক তরুর ফুল,
আধেক তালুক রইলো তাহার,—কে তার সমতুল ?

পাঠের শেষে এটর্ণি কন্ ধন্য বিরাট বুক !
চুপটী করে নিন্দুকেরা রইলো অধোমুখ।
চোখ্ তুলে চা আত্মীয়েরা, বুক ভরে আজ কাঁদ,
কলঙ্ক নয়, দেখ্ সুমুখে রমজানেরি চাঁদ !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মারিয়ানা

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেলিওর গৃহ

হেরমিয়া, কয়েকজন ভৃত্য, মালভোলিও।

হেরমিয়া। ফুলগুলি যে ভাবে বলেছি সেইভাবে সাজিয়ে রেখো। তারপর, বাজিয়েদের আস্‌তে বলা হয়েছে কি ?

জনৈক ভৃত্য। আজ্ঞে হাঁ, মা ঠাকরুণ! তারা খাওয়ার সময়েই এসে উপস্থিত হবে।

হেরমিয়া। ঘুল্‌ঘুলি সব বন্ধ, বড় অন্ধকার হয়েছে—আলো আস্‌তে দাও, দেখো আবার রোদ্দুর যেন না পড়ে। বেশী ফুল আর বিছানার উপর ছড়াতে হবে না। রান্নাটা ভাল রকম হয়েছে ত! আমাদের প্রতিবেশিনী ঘেরগোলী-গৃহিণী আস্‌ছেন কি ?···বাছা আমার বেরিয়ে গেল কখন ?

মালভোলিও। বেরিয়ে যেতে হলে আগে ঘরে ফেরা দরকার। রাত্তিরটা তিনি বাইরে-বাইরেই কাটিয়েছেন।

হেরমিয়া। কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। কাল রাত্রে আমরা দুজনে' এক সঙ্গে খেয়েছি, তারপর সে আমায় সঙ্গে করে বাড়ীতে ফেরে। আচ্ছা, সকালে যে ছবিখানা কিনেছি, সেটা তার ঘরে টাঙ্গানো হয়েছে ?

মালভোলিও। আজ যদি তার বাপ বেঁচে থাকত, তা হলে সে আর এ-রকমটি হতো না। লোকে দেখে বল্‌বেই বা কি, আমাদের বাকরুণটির বয়েস এখনও আঠারো বছর পেরোয় নি, আর তিনি তাঁর আদুরে ননী-গোপালটির জন্যে হাঁ করে পথ-পানে চেয়ে রয়েছেন!

হেরমিয়া। আজ তার মা চেয়ে আছে তাই সে এ-রকমটিই হয়েছে, মালভোলিও। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, তার স্বভাব-চরিত্রের ওপর পাহারাদারী কর্‌বার ভার তোমায় কে দিয়েছে ? মনে রেখো একটা কথা, কেলিও যেন চোখের সাম্‌নে কখন কোন অলক্ষুণে মুখ না দেখ্‌তে পায়। ভাগাড়ের কুকুর হাড়ের লোভানি পেলে তা চিবুবার জন্যে যেমন করে মুখ বুঁজে গর্-গর্ করতে থাকে, তেমনি ধরণের তোমারও গরগরানি যেন কখনো তার কানের কাছে না পৌঁছোয়। তা হলে, বলে দিচ্ছি, তোমাদের কেউ আর এক রাত্রিও এখানে আশ্রয় পাবে না।

মালভোলিও। আমি কিছুর জন্যেই গর্-গর্ করিনে। আমার চেহারাও অলক্ষুণে নয়। আপনি জিজ্ঞেস করলেন, মনিবটি আমার কখন বেরিয়ে গেছেন ; উত্তরে আমি বল্‌লেম, তিনি ফেরেনই নে। যে দিন থেকে তাঁর মাথায় লভ্ ঢুকেছে, সেদিন থেকে হপ্তায় চারটিবারও তাঁর দেখা পাওয়া যায় না।

হেরমিয়া। বেশ, তা এই বইগুলো ধূলোমাখা কেন ? ও জিনিষ-পত্তরগুলোই বা এলোমেলোভাবে রয়েছে কেন ? কিছু দরকার হ'লে আমরাই বা ক'রে মিলে নিতে হয় কেন ? নিজের কাজ অর্দ্ধেক করে ফেলে রেখেছেন, আর পাঁচজনকে তা সেরে নিতে হচ্ছে, তোমারই ত সাজে পরের কথায় সর্দ্দারি করা! যাও, চুপ করো।

(কেলিওর প্রবেশ)

এই যে বাছা আমার, এসো, এসো। আজকে তোমার কি ইচ্ছে হচ্ছে, বল ত ?

(ভৃত্যদের প্রস্থান)

কেলিও। তোমার যা, তাই, মা।

(উপবেশন)

হেরমিয়া। তা বেশ, কিন্তু ইচ্ছের বেলায় এক ঘরে, অনিচ্ছের বেলায় নয়, এরকম ভাগাভাগি যে অন্যায়, কেলিও। আমার কাছ থেকে তোমার গোপন কর্‌বার কিছু থাকে, তা নয় থাক্‌ল,—কিন্তু তোমার বুক যাতে ক্ষয়ে যাচ্ছে, যাতে ক'রে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তুমি উদাসী হয়ে পড়্‌ছ, এমনতর জিনিষ ত গোপন করবার নয়।

কেলিও। গোপন করবার আমার কিছু নেই! যদি কিছু থাক্‌তো, তবে ভগবানকে বল্‌তেম তাতে এমন ধরণের শক্তি দিতে, যেন আমায় একটা পাথরের মূর্ত্তি করে সে ফেল্‌তে পার্‌তো।

হেরমিয়া। তুমি যখন দশ বার বছরটির ছিলে, তখন তোমার সব কষ্ট, তোমার ছোটখাট বেদনা আমারই সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। আমারই এই চোখের একটি কঠোর বা কোমল দৃষ্টির উপর নির্ভর করে ফুটে উঠ্‌তো তোমারও ও চোখে কান্না কি হাসি। তোমার ছোট্ট দেহটুকু কি একটা সূক্ষ্ম তার ধরে তোমার মায়ের হৃদয়খানি আঁকড়ে ছিল! আর এখন, বাছা রে আমার, আমি ত শুধু একজন স্থবিরা আত্মীয়ামাত্র—তোমার দুঃখে শান্তি দেবার শক্তি আমার নেই; কিন্তু তাই বলে তার ভাগও আমি কিছু নিতে পারি নে, তা তুমি মনে করো না।

কেলিও। মা, তোমারও ত এককালে রূপ ছিল। এই যে শুভ্র কেশ-দাম তোমার গরিমাময় ললাটের ওপর ছেয়ে পড়েছে, এই যে দীর্ঘ বিলম্বিত বস্ত্রখানি তোমার ঢেকে রেখেছে, সে সবের ভিতর দিয়ে এখনও যে চোখে লাগে সম্রাজ্ঞীর গতি-ভঙ্গী, কোন্ এক দেবীর সুঠাম অঙ্গের গঠন। মা গো! তুমিও ত ভালবাসা পেয়েছিলে। তোমার ঈষৎ-উন্মুক্ত গবাক্ষের নীচে বীণা মৃদুমন্দ্রিত হয়ে উঠেছিল—এমনি সব কোলাহল-মুখরিত প্রমোদ-উদ্যানে, এমন সব চঞ্চল উৎসবের ক্ষেত্রে তুমিও দেখিয়ে বেড়িয়েছ তোমার নিশ্চিন্ত গর্ব্বিত যৌবন। নিজে কিন্তু তুমি কখনো ভালবাস নি; আমার পিতার একজন আত্মীয় তোমার প্রেমে প্রাণ দিয়েছে।

হেরমিয়া। কি সব কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ তুমি আমায় ?

কেলিও। আহা! সে বেদনা যদি বুকে ধরে কম করতে পার, যদি তাতে চোখের জল তোমায় ফেল্‌তে না হয়, তবে ঘটনাটি আমায় বল ত, মা গো, সব খুলে বল ত দেখি।

হেরমিয়া। সেই প্রথম। তার আগে তোমার পিতা আমায় কখনো চোখে দেখে নি। তিনি আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন; তাঁর যুবক অর্শিনি যে আমায় বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছিল তা মঞ্জুর করিয়ে নেবার ভার তিনি গ্রহণ করলেন। পদমর্য্যাদা অনুসারে তাঁকে আমার পিতামহ আদি

অভ্যর্থনা করলেন, আর মুহূর্ত্তের মধ্যেই দুজনে দুজনার অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। অর্শিনি যোগ্য পাত্রই ছিল, তবুও তাকে আমি প্রত্যাখ্যান করলেম। তোমার পিতা তার হয়ে যে-ভাবে বক্তৃতা করলেন, তাতে দু-মাস ধরে অনবরত চেষ্টায় যে ভালবাসাটুকু আমার হৃদয়ে অর্শিনি জাগিয়ে তুলেছিল, তা সব পণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু আমার উপর টান তার যে কত গভীর ছিল তখন, তা বুঝ্‌তে পারি নি—আমার উত্তর পেয়ে সে তোমার পিতার কোলের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। এর পরে সে দূর বিদেশে চলে যায় এবং বহুকাল অনুপস্থিত থাকে, আর সে-অবস্থায় অনেক টাকা-কড়িও করে। তাতে মনে হয় তার শোকও ক্রমে মুছে আসে। তোমার পিতা তখন ফিরে আর এক ভাব ধরলেন—অর্শিনির জন্যে যে জিনিষ চেয়ে তিনি পান নি, নিজের জন্যে তাই চেয়ে বস্‌লেন। তাঁর উপর আমার সত্যকার ভালবাসা ছিল, আর আমার আত্মীয়-স্বজনের মনে এমন শ্রদ্ধা তিনি জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইতস্ততঃ করবার উপায়ও আমার আর থাকল না। সেই দিনই বিবাহের পাকা কথা হল আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়ে গেল। এই সময়ে অর্শিনি ফিরে এল। সে তোমার পিতার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলে আর মুখের উপর বল্‌লে যে তিনি বিশ্বাসঘাতক, নিজে পাবার জন্যেই অপরকে প্রত্যাখান করিয়েছেন। তার শেষ কথা এই, "আমার মৃত্যুই যদি তোমার ইচ্ছা, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে"। এ কথায় ভয় পেয়ে তোমার পিতা আমার পিতার কাছে এলেন, অর্শিনির ভুল দেখিয়ে দেবার জন্যে তাঁকে সাক্ষী মান্‌লেন—হায়! তার সময় হ'ল না, লোকে গিয়ে দেখলে, অভাগা যুবক তার ঘরের মধ্যে ছোরার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে রয়েছে!

তৃতীয় দৃশ্য

ক্লোদিও'র বাগান

ক্লোদিও এবং তিবিয়ার প্রবেশ।

ক্লোদিও। তুই ঠিক বলেছিস্—স্ত্রী আমার পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি। বেশী কি বল্‌ব, সে জাগ্রত সতীত্ব!

তিবিয়া। সত্যি সত্যি তা বিশ্বাস করেন ?

ক্লোদিও। তুই-ই বল্‌না, তার খড়খড়ির তলায় কেউ যদি বসে গান গায়, তবে কি সে তা বন্ধ কর্‌তে পারে? আর এই গানের দরুণ তার মনটাতেও ভিতরে ভিতরে যদি কিছু চাঞ্চল্য জেগে ওঠে, তবে সে জন্য তার স্বভাবটাই দায়ী। আর এক কথা, তার মায়ের মনটাও আজ নেড়ে চেড়ে একটু দেখ্‌লেম, কিন্তু তিনিও সরাসরি আমারই মতে মত দিয়ে ফেললেন।

তিবিয়া। কি বিষয়ে ?

ক্লোদিও। এই যে—লোকে তার খড়-খড়ির তলায় গান গায়।

তিবিয়া। গান গাওয়া ত দোষের নয়, আমিও ত সময়ে-অসময়ে বসে বসে গুন্ গুন্ করি।

ক্লোদিও। কিন্তু ভাল ক'রে গাইতে পারা একটু শক্ত ব্যাপার।

তিবিয়া। শক্ত আপনার আমার কাছে,

আমাদের গলা নেই আর চর্চ্চাও কখন করি নি; কিন্তু দেখুন ত থিয়েটারের লোক-গুলোকে, কেমন খাসা ও কাজটা তারা সেরে ফেলে।

ক্লোদিও। জীবনটাই যে তারা কাটিয়ে দেয় ঐ তক্তার উপরে।

তিবিয়া। আচ্ছা, বছরে কত আয় হ'তে পারে, বলুন ত?

ক্লোদিও। কার? সহর-কোটালের?

তিবিয়া। না, এক-এক জন গাইয়ের।

ক্লোদিও। তা কে জানে! আমার পদের যে মূল্য, তার তিন ভাগের এক ভাগ পায় সহর-কোটাল, আর তার অর্দ্ধেক পেয়ে থাকেন সহকারীরা।

তিবিয়া। আমি যদি বড় আদালতের বড় হাকিম হতেম আর আমার স্ত্রী যদি নাগর করত, তবে তাদের আমি নিজেই দণ্ড দিতেম।

ক্লোদিও। কত বৎসর দ্বীপান্তর?

তিবিয়া। ফাঁসি। ফাঁসির হুকুম জোরে পড়্তে কি মজা!

ক্লোদিও। হাকিম নিজে তা পড়েন না, পেশ্‌কারে পড়ে।

তিবিয়া। আপনার আদালতের পেশ-কারের স্ত্রীটি খুব সুন্দরী।

ক্লোদিও। না, আমার আদালতের হাকিমের স্ত্রী সুন্দরী। কালই ত তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি।

তিবিয়া। পেসকারের স্ত্রীটিও সুন্দরী। আজ সন্ধ্যাবেলায় যে গুণ্ডাটার আস্‌বার কথা আছে, সে পেশকারের স্ত্রীর জার।

ক্লোদিও। কোন্ গুণ্ডা?

তিবিয়া। আপনি যাকে চেয়ে পাঠিয়েছেন।

ক্লোদিও। তোকে বল্লেমই ত, এখন আর তার দরকার নেই।

তিবিয়া। কি বল্‌লেন?

ক্লোদিও। আমার স্ত্রীর কথা।

তিবিয়া। ঐ যে তিনি স্বয়ং!

(মারিয়ানার প্রবেশ)

মারিয়ানা। তুমি ত বেশ চরে বেড়াও, কিন্তু এদিকে আমার কি হয়, তার খোঁজ রাখ কি? তোমার এক আত্মীয় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

ক্লোদিও। কে সে? নাম বল ত?

মারিয়ানা। অক্তাভ। তিনি তাঁর বন্ধু কেলিও'র পক্ষ হয়ে আমার কাছে প্রেম জ্ঞাপন করতে এসেছিলেন। কে এ, কেলিও? তুমি চেনো কি? কিন্তু এর বন্দোবস্ত কর, যেন তিনি বা অক্তাভ কেউ আমার বাড়ীতে আর পা না দেন।

ক্লোদিও। কেলিওকে চিনি—আমাদের প্রতিবেশী হেরমিয়ার ছেলে। আচ্ছা, যে কথার উত্তর তুমি কি দিলে?

মারিয়ানা। আমি কি উত্তর দিলেম না দিলেম, তা নিয়ে কিছু দরকার নেই, যা বল্‌লেম, বুঝ্‌লে ত? তোমার চাকরকে ডেকে হুকুম দাও, যেন তারা ও লোকটি কি তার বন্ধুকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে না দেয়। এদের হাতে আমার অপমানের সম্ভাবনা আছে, তাই দূরে থাকাই আমার পক্ষে মঙ্গল।

[প্রস্থান]

ক্লোদিও। কাণ্ডটা দেখে তুই কি বুঝ্‌লি, তিবিয়া? নিশ্চয়ই একটা ফন্দী কিছু এর ভিতরে আছে।

তিবিয়া। আপনি তাই মনে করেন?

ক্লোদিও। কি উত্তর দিয়েছিল মারিয়ানা তা বল্‌তে চাইলে না কেন? প্রস্তাব করাটা বেয়াদবী নিশ্চয়ই, কিন্তু উত্তরটাও ত জানার জিনিষ। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেলিওই ও-সব গান-বাজনার পাণ্ডা।

তিবিয়া। ও লোক দুটির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র উপায়, ওদের কারুকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে না দেওয়া—

ক্লোদিও। সে আমি বুঝ্‌ব। কথাটা কিন্তু শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে একবার জানাতে হবে। আমার মনে হয় আমার স্ত্রীটি আমায় প্রতারণা করছে। এ-সব গল্প একেবারে মন-গড়া, উদ্দেশ্য আমায় দিশেহারা করে দেওয়া, আমার সব ধারণা গুলিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

একটি রাস্তা

অক্তাভ ও চিয়ূতা'র প্রবেশ।

অক্তাভ। তুমি বলছ সব ছেড়ে ছুড়ে দিলে সে?

চিয়ূতা। আহা, বেচারী ছেলে! ভালবাসা কি তার কমেছে? বরং আরও বেড়েছে। সে কিন্তু মনে করছে তার দুঃখের কারণ ওটা নয়, আর একটা কি বস্তু। আমার ত মাঝে মাঝে মনে হয় আপনার উপর আমার উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তার অবিশ্বাস জন্মে গেছে।

অক্তাভ। না, কখ্‌খনো না। এই পণ করলেম, আমি কিছুতেই ছেড়ে-ছুড়ে দেব না। হ্যাঁ, আমি যেন দ্বিতীয় মারিয়ানা হয়ে উঠেছি। এক-গুঁয়ে হতে আনন্দ আছে বটে। কেলিও সফলকাম হবে, নয়ত আমার জিভা খসে পড়বে।

চিয়ূতা। কেলিও'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি চল্‌বেন?

অক্তাভ। হাঁ, আমার ইচ্ছা-অনুসারেই চল্‌ব, আমার ইচ্ছা তার ইচ্ছার বড় ভাই। কাজী ক্লোদিও বেটাকে জাহান্নামে পাঠাব; তার পা থেকে চুলটি অবধি প্রত্যেক অঙ্গ আমার দু'চক্ষের বিষ।

চিয়ূতা। আচ্ছা, আপনার উত্তর কেলিও'র কাছে আমি নিয়ে যাব, কিন্তু এর মধ্যে আমি আর নেই।

অক্তাভ। বন্ধুর শত্রুকে উৎসন্ন দিতে, কেবল নিজেকে কেন, বন্ধুকেও যদি উৎসন্ন যেতে হয়, তা পর্য্যন্ত আমি করে ফেল্‌তে পারি, এমন ধরণের লোক আমি।

(কেলিওর প্রবেশ)

অক্তাভ। সে কি, কেলিও, তুই নাকি হাল ছেড়ে দিয়েছিস?

কেলিও। কি করতে বলিস্ তবে?

অক্তাভ। আমার উপর তোর অবিশ্বাস? তোর হয়েছে কি? তুই যে বরফের মত সাদা মেরে গেছিস্? তোর মনে হচ্ছে কি, বল্ দেখি?

কেলিও। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। তুমি যা ভাল বোঝো তাই কর। যাও, মারিয়ানার সঙ্গে দেখা কর গিয়ে। তাকে বলো, আমাকে প্রতারণা করার অর্থ আমাকে মেরে ফেলা, আমার জীবন নির্ভর কচ্ছে তারই একটা চাউনির উপর।

[প্রস্থান]

অক্তাভ। কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত!

চিয়ূতা। চুপ করুন। সন্ধ্যা-আরতি বাজছে। বাগানের দুয়োরটা ঐ খুল্‌ল। মারিয়ানা বাইরে চলেছে—ঐ যে আস্তে আস্তে এদিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

[চিয়ূতার প্রস্থান, মারিয়ানার প্রবেশ]

অক্তাভ। সুন্দরী মারিয়ানা, তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখন ঘুমুতে পার—কেলিও আর একজনকে তার হৃদয় দিয়েছে, তোমার জানলার তলে আর সে গান গাইবে না।

মারিয়ানা। কি পরিতাপ! কি দুর্ভাগ্য! তার মত মানুষের সঙ্গে আমার ভালবাসাবাসি হলো না! দেখুন ত, ঘটনাচক্রে সব আমার কেমন উল্টে-পাল্টে গেল। আমি যে তাঁকে ভালবাস্‌তে যাচ্ছিলেম।

অক্তাভ। সত্যি!

মারিয়ানা। সত্যি, এই বুকে হাত দিয়ে বল্‌ছি। আজ সন্ধ্যাবেলায় কি কাল সকালে, খুব দেরী হলে এই রবিবারেই আমি তাঁর হয়ে যেতেম। আপনার মত প্রতিনিধি যে পেয়েছে, সে কি আর না জিতে থাক্‌তে পারে? কিন্তু বল্‌তে হবে, আমার উপর আপনার বন্ধুর অনুরাগটা চীনা বা আরবীর মত কিছু হবে! কারণ দোভাষী ছাড়া একে অমনি বোঝা যায় না!

অক্তাভ। কর ঠাট্টা, ঠাট্টা কর, আর তোমাকে আমরা ভয় করি নে।

মারিয়ানা। অথবা ও ভালবাসাটি ছিল যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু, আর আপনি ধাই হয়ে তাকে বনের ধারে রেখে আসতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু সহরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন।

অক্তাভ। না, ধাই তা করেনি; সে কেবল শিশুটিকে সেই দুধের খানিকটা খেতে দিয়েছিলেন—যা তোমার ধাই তোমাকে নিশ্চয়ই মুক্তহস্তে ঢেলে দিয়েছিল—তোমার মুখে এখনও তার এক ফোঁটা লেগে আছে, তোমার প্রতি কথার তা বেরিয়ে আস্‌ছে!

মারিয়ানা। এমন অত্যাশ্চর্য্য দুধটির নাম কি?

অক্তাভ। উদাসীনতা! তুমি ভালও বাস্‌তে জান না, ঘৃণাও করতে পার না। মারিয়ানা, তুমি যেন বাংলাদেশের গোলাপের মত, তাতে কাঁটাও নেই, গন্ধও নেই।

মারিয়ানা। চমৎকার বলেছেন। উপমাটা কি আগে থেকেই তৈরী করা ছিল? আপনি যদি আপনার বক্তৃতাগুলির পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে না ফেলেন, তবে অনুগ্রহ করে আমায় দেবেন, তোতা পাখীটিকে তা শেখাব।

অক্তাভ। ব্যথা লাগ্‌বার মত তোমায় আমি কি বল্লেম? গন্ধ না থাক্‌লে ফুল যে কিছু কম সুন্দর হয়, তা নয়; বরং তার উল্টোই—সব চেয়ে সুন্দর ফুলকেই বিধাতা গন্ধহীন করে গড়েছেন। আর তোমারও—নারী-শিরোমণি বলে—যে দিন প্রস্তর মূর্ত্তি গড়া হবে, সে দিন ভাস্কর্য্যের কি নিঁখুৎ আদর্শই না সৃষ্টি হবে, তখন বাকী থাক্‌বে কেবল কোন দেবমন্দিরে তোমাকে স্থাপনার জন্য একটি বেদী প্রতিষ্ঠা করা।

মারিয়ানা। মহাশয়, মেয়েদের অবস্থা দেখে আপনার কি কিছু দয়া হয় না? এই দেখুন না, আমারই কি রকম নিয়তি। নিয়তির লেখা, তাই কেলিও আমায় ভালবাস্‌লে অথবা ভালবাসে বলে মনে করলে, সেই কেলিও তার

বন্ধুদের বল্‌লে, সেই বন্ধুরা ব্যবস্থা দিলেন আমাকে তার উপপত্নী হ'তেই হবে, নতুবা আমার ফাঁসি। নেপ্‌ল্‌স্ সহরের যুবক-সম্প্রদায় অনুগ্রহ করে মহাশয়ের মত যোগ্য পুরুষকে তাদের প্রতিনিধিরূপে আমার কাছে পাঠালেন, আমার উপর এই পরওয়ানা জারী কর্‌তে,—উপরি-উক্ত কেলিও মহাশয়কে আজ থেকে আট দিনের মধ্যে ভালবেসে ফেল্‌তে হবে। আচ্ছা, কথাটা আপনই একটু ভেবে দেখুন দেখি। যদি আমি রাজী হই, তবে লোকে কি বল্‌বে? যে রমণী এমনধারা হুকুম ঠিক সময়-মত সর্ত্ত-মত হুবহু পালন করতে যায়, সে কি অতি হীন-প্রকৃতির নয়? লোকে কি তাকে দাঁতে কেটে ছিঁড়ে ফেল্‌বে না? চার আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে না? মাতালেরা তার নামে ছড়া বাঁধবে না? তার-পর সে যদি অঙ্গীকারই পায়, তবে তার মত রাক্ষসী দুনিয়ায় নাই, সে যে পাথরের মূর্ত্তির চেয়েও হৃদয়হীন। আর যে-লোক তার সঙ্গে কথা বলছে, হাতে উপাসনার বই দেখেও যে লোক রাস্তার মাঝখানে তাকে দাঁড় করাতে সাহসী হয়েছে, সে লোকটিরও কি অধিকার নাই তাকে বল্‌তে, "তুমি হচ্ছ বাংলার গোলাপ—কাঁটাও নেই, গন্ধও নেই"?

অক্তাভ। বোনটি আমার! বোনটি আমার! রাগ করো না।

মারিয়ানা। বলুন ত, দেবতা সাক্ষী করে যে প্রতিজ্ঞা করা আছে, তার উপর নিষ্ঠা বড়ই হাসির জিনিষ নয় কি? হাসির জিনিষ নয় কি একটি বালিকার শিক্ষাদীক্ষা, একটি প্রাণের মর্য্যাদাবোধ? সে বিশ্বাস করে নিয়েছে তার কিছু একটা মূল্য আছে, সে এই আশা পোষণ করছে যে, তার হৃদয়-কুসুম যদি শুকিয়েই ঝরে পড়ে, তবে আগে যেন সে দেখতে পায়, অশ্রুতে অশ্রুতে তা ভরে গিয়েছে, সূর্য্যের একটুখানি আলো পেয়ে ফুটে উঠেছে, কার একখানা কোমল হাতের স্পর্শে দুচারটি পাপড়ি মেলে দিয়েছে; কিন্তু এ সবই কি স্বপ্ন নয়—সাবানের বুদ্‌বুদ্ মাত্র নয়? এ বুদ্‌বুদের উচিত নয় কি, রাজপুত্তুর হয়ে যিনিই আসুন, তাঁর প্রথম দীর্ঘ নিশ্বাসটি পড়্‌তে পড়্‌তেই উড়ে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া?

অক্তাভ। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, কেলিওকেও ভুল বুঝেছে।

মারিয়ানা। মেয়েমানুষ মোটের উপর কি পদার্থ? এক মুহূর্ত্তের ওয়াস্তা—একটা ঠুন্‌কো পাত্র, তাতে আছে এক ফোঁটা শিশির, লোকে একটিবার তাকে মুখে তুলে ধরে আর দূর করে ফেলে দেয়। এ ত একটু আমোদ করা বই নয়। নারীর সম্মুখে যে পুরুষ চক্ষু নত করবে, মনে মনে বল্‌বে, "এই যে একটি জীবন-ভরা মূর্ত্তিমতী সুখ-শান্তি" আর পথ ছেড়ে দাঁড়াবে—যে পুরুষ এমন কাজ করবে সে কি কাঁচা শিক্ষানবীস মাত্র নয়?

(প্রস্থান)

অক্তাভ। তা না, তা না, তা রে রে না! কি অদ্ভুত মেয়ে! ওহে, কে আছ?

(একটি সরাইখানার দরজায় ঘা দিয়া)

এই যে, এই কোণ্‌টায় আমার জন্যে এক বোতল যা হয় কিছু নিয়ে এস।

ছোকরা। আপনার যেমন রুচি। লাক্রিমা ক্রিস্তি (খৃষ্টের অশ্রু) দেব কি?

অক্তাভ। আচ্ছা, তাতেই হবে। শোন, তুমি এই চার পাশের রাস্তা ক'টা একটু

ঘুরে এস ত, কেলিও ব'লে কোন ভদ্রলোককে দেখ্‌তে পাও কি না—তাঁর গায়ে কালো লম্বা কোট, আর পরণে তার চেয়েও কালো পেণ্ট্‌লন। তাঁকে বল্‌বে যে তাঁর একজন বন্ধু এখানে একলাটি বসে বসে লাক্রিমা ক্রিস্তি পান করছেন। তারপরে, তুমি একটু বড় বাজারে যাবে, গিয়ে একটি মেয়েকে নিয়ে আস্‌বে—নাম তার রোজা লিন্দ, রং লাল টকটকে, সব সময়ে জানালার ধারে বসে থাকে।

(ছোকরার প্রস্থান)

গলার নলীটাতে কি হ'ল বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। আমি যেন ঠিক শ্মশান-যাত্রার মত করুণ-রসাত্মক হয়ে পড়েছি।

(মদ্যপান করিতে করিতে)

এখানে রাতের খাওয়াটাও শেষ কর্‌লে হয়। বেলা দেখ্‌ছি গড়িয়ে এল। তা রে তা ক্‌! আরতিটা কি বদখৎ জিনিষ! ঘুম পাচ্ছে কি আমার? বোধ হচ্ছে সর্ব্বাঙ্গে খিল্‌ ধরেছে।

(ক্লোদিও ও তিবিয়া'র প্রবেশ)

তাত ক্লোদিও! বড় চমৎকার বিচারপতি আপনি। এমন অনর্গল যাচ্ছেন কোথায়?

ক্লোদিও। তার অর্থ, বৎস অক্তাভ?

অক্তাভ। তার অর্থ আপনি একজন হাকিম আর আপনার বাঁধুনী বড় সুন্দর।

ক্লোদিও। ভাষার না শরীরের?

অক্তাভ। ভাষার, ভাষার। আপনার পরচুলা বাগ্মিতায় ভরপুর, আর আপনার দুখানি ঠ্যাং যেন দুটি মনোহর বন্ধনী।

ক্লোদিও। তবে তোমায় বলে রাখি, বৎস অক্তাভ, আমার দরজার কড়া দেখে স্পষ্টই বোধ হয় যে তার কৃপায় তোমার আঙ্গুল গুলোতে ফোস্কা পড়ে গেছে।

অক্তাভ। কোন আইনে, বিজ্ঞ কাজি?

ক্লোদিপ। ঘন ঘন নাড়্‌তে গিয়ে, চালাক ভাইটি!

অক্তাভ। তা হাকিম-মশায়, স্বচ্ছন্দে তার ওপর নতুন রং ফেরাতে পার, আমার আঙুল ময়লা হবার কোন ভয় নেই।

ক্লোদিও। কোন্‌ আইনে, রসিক ভাইটি?

অক্তাভ। কখনও নাড়্‌ব না বলে তিতকুট কাজি!

ক্লোদিও। কিন্তু তাও তোমাকে করতে হল; যেহেতু আমার স্ত্রী চাকরদের হুকুম দিয়েছেন যে, আর একটিবার গেলে পরেই যেন তোমার মুখের উপর কবাট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অক্তাভ। তোমার চশমা দেখছি কাণা, দয়াল কাজি! তুমি যে কার গুণ কার ঠিকানায় এসে গাইছ!

ক্লোদিও। আমার চশমা ঠিকই আছে, ওরে কথার ঝুড়ি! তুই আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রেম ভিক্ষা করিস্‌ নি?

অক্তাভ। কোন্‌ উপলক্ষে, সূক্ষ্মবুদ্ধি কাজি?

ক্লোদিও। তোমার বন্ধু কেলিও'র উপলক্ষে? ভায়া হে, দুঃখের বিষয়, আমি সব শুনেছি।

অক্তাভ। কোন্‌ কান দিয়ে, ধর্ম্মাধিপ ধুরন্ধর?

ক্লোদিও। আমার স্ত্রীর কান দিয়ে, সে আমায় সব খুলে বলেছে; বুঝেছ লম্পট-শিরোমণি!

অক্তাভ। একেবারেই সব? সে সুন্দর কানের ভিতর কিছুই থেকে যায় নি, বউ-পাগলা বুড়ো?

ক্লোদিও। হ্যাঁ, আছে, তোমার প্রাপ্য উত্তরটা, ভাঁটিখানার খুঁটি! আর তা বলবার ভার আছে আমার ওপর।

অক্তাভ। তা শোনবার ভার আমায় ওপর নেই, মূর্ত্তিমান জবানবন্দী।

ক্লোদিও। তাহ'লে আমার দরজার কাছে মলা পরামর্শ কর্‌তে যেও, সেই তোমাকে শুনিয়ে দেবে নেংটে জুয়ারী!

অক্তাভ। তাকে আমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাই, ফাঁসির হুকুম! তার কাছে না গিয়ে ত আমি আর পার্‌ছি নে!

ক্লোদিও। তাই যেন পারিস্‌, মদের জালা। যা, তোর বহুৎ ধন-দৌলত হোক্‌।

অক্তাভ। সে বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাকিস্‌, জেলখানার খিল! আমার ঘাড়ে কোনরকম আপদ বালাই চাপবার জো-টি নেই, থিয়েটারে শ্রোতার দল দেখেছিস ত, সেই রকম নির্ভাবনায় আমি এখন নাক ডাকাচ্ছি।

(ক্লোদিও ও তিবিয়ার প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

পক্ষপাত

চিঠি-লেখার লোক ত' তোমার
আমি ছাড়া অনেক আছে,
এবং তুমি প্রায়ই চিঠি
লিখে থাকো তাঁদের কাছে,
তোমার চিঠির জবাব তাঁরা
ফেরৎ ডাকে দেন্‌না ত কই,
আমার একটু দেরী হলেই
তবে এত রাগ কেন সই?
তাঁদের বেলায় হয় না কিছু
কাটাও ত' বেশ নিরুদ্বেগে,
আমার একটু দেরী হলেই
অম্‌নি কেন ওঠ রেগে?
অম্‌নি কেন অভিমানে
নয়নে জল ঝর-ঝর,
সাধাসাধি ক'রে ক'রে
আমি গরীব মর-মর!
এতখানি এক-চোখোমি
ভাল কি গো দেখায় এটা?
আমি না হয় সয়ে গেলাম
ধর্ম্মে কি গো সইবে সেটা!

"বনফুল"

মরণ-বাঁচনের কথা

তিন

বাঙ্গলার ভদ্রলোক

১

বাঙ্গলার ভদ্রলোক-সম্প্রদায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। কথাটা বড় সহজ নহে। সংখ্যায় অল্প হইলেও—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কৃতিত্বে—ইহারাই বাঙ্গালী-সমাজের মধ্যমণি। ভাবে-চিন্তায় ও কর্ম্মে ইহারাই অগ্রণী; সাহিত্যে ও শিল্প-কলায় ইহারাই নায়ক; ধর্ম্মের পোষণে ও রক্ষণে ইহারাই জাতির গৌরব। এক কথায় জীবদেহের যেমন মস্তিষ্ক,—আমাদের সমাজদেহে ভদ্রসম্প্রদায় তেমনই। এই মস্তিষ্কহীন হইলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। বাঙ্গালী-সমাজের আজ সেই আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলার ভদ্র-সম্প্রদায় বেশ সুখে ছিল। বঙ্গমাতার স্নেহে-ঘেরা শ্যামল পল্লীতে ইহারা শান্তিতে জীবন কাটাইত। দালান-কোঠার তখন তত বাহুল্য ছিল না। কিন্তু পল্লীর বড় বড় খড়ের ঘরে ও আটচালাতেই লক্ষ্মীর প্রসাদে ইহারা বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিত। বড় বড় ধানের মরাই ও গোলা এই সকল গৃহস্থের আঙ্গিনার শোভা বাড়াইত। গোশালা দুগ্ধবতী গাভীতে পূর্ণ থাকিত। বাড়ীর পাশে মাছে-ভরা পুকুরে ও দীঘিতে কাকচক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল জলে মৃদু তরঙ্গ উঠিত। দোল-দুর্গোৎসব ইহারাই করিত। ক্রিয়াকাণ্ডে গ্রামের লোক ইহাদের বাড়ীতেই জমা হইত। অতিথি-অভ্যাগত আসিলে ইহারাই খাইতে দিত। অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য যে ইহাদের কিছু ছিল, তাহা নহে। মোটা ধুতি-চাদর, এক জোড়া খড়ম—বড়-জোর একজোড়া চটী,—ইহাই ছিল ইহাদের বেশভূষা। লুচি পুরী সন্দেশ-মিঠাই ইহারা কদাচিৎ চোখে দেখিত। কিন্তু মোটা চালের ভাত, নির্জ্জলা দুধ, বাগানের আম জাম কাঁঠাল খাইয়াই ইহারা বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিত। ঘরে ঘরে তত ব্যারাম পীড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল না। গ্রামের যে কোন বৈদ্যের বড়ী ও পাঁচন খাইয়াই তাহাদের দেহ নীরোগ ও সুস্থ থাকিত। আজকালকার বাবুরা নাক সিঁটকাইয়া হয়ত ইহাদের বুনো অশিক্ষিত বলিবেন। কিন্তু যাত্রা-গান-কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া ইহারাই সঙ্গীত-কলার চর্চ্চা বজায় রাখিয়া ছিল। সেক্সপিয়ার-গেটে-ভিক্টর হুগো নাহোক, বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস বা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কবিকঙ্কণের কিছু কিছু খবর ইহারা রাখিত। ব্রাহ্মণেরা এখনকার মত জুতার দোকান করিয়া লক্ষপতি না হইলেও, টোলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও যজমানী করিয়া পরম তৃপ্তিতে থাকিতেন; খড়ের কুটীরে মাটীর দাওয়ায় বসিয়া বেদ-বেদান্ত স্মৃতি-পুরাণের গভীর তত্ত্ব ও আলোচনা লইয়া মাতিয়া থাকিতেন। মোকদ্দমা দলাদলি গ্রামে এত বেশী ছিল না। প্রতিবেশীর কলহে, ভ্রাতৃ-বিবাদে, জ্ঞাতি-শত্রুতায় চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াই মুখে মুখে মিটমাট হইয়া যাইত। ষ্ট্যাম্প কিনিয়া আদালত পর্য্যন্ত ক্বচিৎ কেহ কখন দৌড়াইত। উকীল ব্যারিষ্টারেরা তাঁহাদের ধারালো নখর লইয়া তখনও এত ভীষণ হইয়া উঠেন নাই। গ্রামের তখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই ছিলেন মোড়ল ও মাতব্বর লোক! দশজন তাঁহাদের কথা মানিয়া চলিত।

২

কিন্তু বাঙ্গলার গ্রামে এ-সকলের চিহ্নও এখন দেখা যায় না। গ্রামের যাঁহারা গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত লোক, গ্রাম ছাড়িয়া সহরে যাইয়া তাঁহারা বাস করিতেছেন। যে সব ভদ্রপরিবার কায়ক্লেশে গ্রামে এখনও আছেন তাঁহাদের দেহ ম্যালেরিয়ায় অসাড়বৎ, অনাহারে অস্থিচর্ম্মসার। তাঁহাদের অনেকেই হয়ত অর্দ্ধাশনে থাকেন; রাতে উনানে হাঁড়ি চড়ে না। কিন্তু লোকের কাছে কোনমতে সে কথা লুকাইয়া মান রক্ষা করেন। তাঁহাদের জোতজমা যাহা ছিল, প্রায় সবই নমঃশূদ্র ও মুসলমান চাষীদের হস্তগত। বড় বড় আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ বড় দেখা যায় না; বাগবাগীচা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। যে-সব বাড়ী লোকজনে রাতদিন গমগম করিত, সেখানে ২।১ জন ঝিঙ্কা ছাড়া হয়ত আর কেহ নাই। অনেক বাড়ীতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে কি না সন্দেহ। পুরাতন বনিয়াদী বংশ লুপ্তপ্রায়। যে বাড়ীর লোক-দের নিমন্ত্রণ করিতে হইলে সংখ্যা-বাহুল্যে লোকে ভয় পাইত, সেখানে খুঁজিয়া-পাতিয়া এখন ২।৪ জন মানুষ পাওয়া কঠিন। পুরুষ অপেক্ষা মেয়ের সংখ্যা, মেয়েদের মধ্যে আবার অল্পবয়স্কা বিধবার সংখ্যা মধ্যবিত্ত পরি-বারে বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিবাহে ও ক্রিয়া-কর্ম্মে আগে পাঁচ-দশখানা পাল্কীসোয়ারী এ গ্রামে সে গ্রামে যাতায়াত করিত। আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব ছেলেমেয়ের আনা-গোনায় একটা উৎসব লাগিয়া যাইত। আজ দশখানা গ্রাম খুঁজিলেও পাল্কী-সোয়ারী পাওয়া কঠিন। বোধ হয়, প্রয়োজনের অভাবে বেহারারা সব পাল্কী ছাড়িয়া লাঙ্গলের মুঠী ধরিয়াছে।

৩

কেন এমন হইল? বাঙ্গলার সেই শ্যামল পল্লী, সেই মাঠ, সেই ঘাট, আমবাগানের ছায়ায় ঘেরা সেই নদীতীর, সবই ত আছে। বাঙ্গলার জমিও হঠাৎ অনুর্ব্বর হইয়া যায় নাই। তবে কেন এমন হইল? একথা বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। কিন্তু সকল কথার বড় কথা—যে পাশ্চাত্য-সভ্যতার ধাক্কায় আজ আমরা বেসামাল, তাহার সব-চেয়ে বড় ধাক্কাটা লাগিয়াছে ভদ্রসম্প্রদায়ের উপর। কেননা এরাই যে সমাজের অগ্রণী। পশ্চিম সভ্যতা যখন তাহার বিজয়-বাহিনী লইয়া এদেশে পদার্পণ করে, তখন এরাই সকলের আগে যাইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তার পর ঐ ডাইনী-সভ্যতা ছাউনী গাড়িয়া বসিয়া সুধার নামে যে বিষ পাত্র ভরিয়া পরিবেষণ করিয়াছে, তাহার বেশীর ভাগ এই ভদ্র-সম্প্রদায়ই উদরস্থ করিয়াছেন। তাই তাহার মাথার ঠিক নাই! বিলাতী নেশার উগ্র বীর্য্যে এখনও সে মাতাল।

৪

বিলাতী সভ্যতার বিলাস-বিষে জর্জ্জরিত বাঙ্গলায় ভদ্রসম্প্রদায় এক অদ্ভুত জীবে পরিণত হইয়াছেন। ইঁহারা আজকাল প্রায়ই সহরবাসী বাবু। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহিরের আড়ম্বরটা ইহারা ভাল করিয়াই নকল করিয়াছেন।

সাহেবেরা এদেশে আসিয়া বড় বড় চাকরী ও ব্যবসা করিয়া বাদসাহী চালে চলে; অতএব ইঁহারাও সেইটা করিতে সুরু করিয়াছেন। বড় বড় দালান কোটা নহিলে ইঁহাদের মন উঠে না। গাড়ী ঘোড়া মোটর ট্রাম নহিলে ইঁহাদের চলে না। গণ্ডায় গণ্ডায় দাস দাসী না হইলে ইঁহাদের আরাম-বিলাস হয় না। আহারে বিহারে ইঁহারা আধাসাহেব, নিজেদের সরল জাতীয় পোষাক ইঁহাদের কাছে বড়ই বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়, তাই দেশী-বিলাতী মিশাইয়া ইহারা এক অদ্ভুত খিচুড়ী পোষাকের সৃষ্টি করিয়াছেন। শুনিতে পাই, সকল জাতিরই নিজস্ব পোষাক ও ভাষা আছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত বাবুদের ওই দুইটা জিনিষেরই অভাব। তাঁহাদের ভাষায় যেমন ইংরেজী বুকনী মিশিয়া তাহার মিষ্টত্ব নষ্ট করিয়া দিয়াছে, পোষাকেও তেমনি ফিরিঙ্গিয়ানীর নকল সৌন্দর্য্য আমদানী করিতে গিয়া, উহা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। আর এই পোষাকের ঠাট বজায় রাখিতে এত ব্যয়-বাহুল্য হয় যে, অনেকেরই প্রাণ তাহাতে ওষ্ঠাগত। মেয়েদের মধ্যে পর্য্যন্ত এই বাবুয়ানার বিষ ঢুকিয়াছে। মোটা সাড়ীতে আর তাঁহাদের কুলায় না। জ্যাকেট ব্লাউজ পেটীকোট জুতা মোজা প্রভৃতি অনাবশ্যক আবর্জ্জনাগুলা তাঁহাদের পক্ষেও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যে মূর্ত্তিমতী কল্যাণীরা অন্নপূর্ণার মত মধ্যবিত্ত হিন্দুর গৃহ আলো করিয়া থাকিতেন, আজকাল তাঁহাদের বড় আর দেখা পাওয়া যায় না। যাঁহাদের দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রায়ই বিলাতি রোজ-লিলিরই নকল সংস্করণ! হীন সাহিত্যের আসরে নবীন যুবকেরা যে-সব গল্প ও উপন্যাস লিখিতেছেন, তাহাতে ইহাদেরই প্রভাব দেখি। সেখানে তরুণীরা কথায় কথায় মোটরে চড়েন, "বয়" বলিয়া ডাকেন ও চায়ের টেবিলে বসিয়া গানের সুর ভাঁজেন। যেন দেশে আর গরিব মানুষ নাই, আর তাদের মধ্যে তরুণী কিশোরীরা দেহ ও মনের সৌন্দর্য্যে একেবারেই বঞ্চিত, অথবা যৌবন-বসন্তের হিল্লোল দার্জ্জিলিং বা কলিকাতার অট্টালিকা ছাড়া আর কোথাও বহে না! ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হয়, এ-সব দেশের তরুণ-তরুণীদের অতৃপ্ত বিলাস বাসনারই বিকার মাত্র।

বাপ-মায়েদের নিকট হইতে এই বিলাসিতার বিষ শিশুদের মধ্যে যাইয়া সংক্রামিত হইতেছে। কোন সহরের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইলে, ছেলেমেয়েরা ফিরিঙ্গী কি বাঙ্গালী, তাহা বোঝা কঠিন; তাহাদের কোমল অঙ্গ নিকার-বোকার ফ্রক, হাফ-প্যাণ্ট প্রভৃতিতে এমনই কণ্টকাকীর্ণ! আবার আমাদের বিলাতী শিক্ষিত ডাক্তারদের পরামর্শে এই-সব সোনার চাঁদ ছেলেমেয়েদের নানারূপ "ফুড" ও "মিল্ক" প্রভৃতি খাওয়াইয়া গোড়া হইতেই ইহাদের জীবনী-শক্তি একেবারে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইতেছে। ছেলে-মেয়ের জন্ম হইলে আগে ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আনন্দ হইত। এখন পোষাক-পরিচ্ছদ, ঔষধ-পত্র যোগাইবার চিন্তাতেই মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

৫

এই বিলাস-ব্যসন, সাজসজ্জা ও আড়ম্বরের তাল সামলাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। তাই সহর-বাসী বাবুরা অর্থের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া হাঁস-ফাঁস করিয়া

মরিতেছেন। অথচ যে উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিলে দেশের কিছু ধনাগম হয়, সেদিকে ইহাদের দৃষ্টি নাই। সে সব পথে বিদেশী বণিক বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক—যেমন মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, ভুটীয়ারাই যাত্রী। আমাদের বাবুদের অবলম্বন ডেপুটীগিরি, মুন্সেফী, কেরাণীগিরি, ও মাষ্টারি প্রভৃতি ছোট-বড় চাকরী, অথবা ব্যারিষ্টারী, ওকালতী, মোক্তারী প্রভৃতি আধা-চাকরী। এগুলা বিলাতী সভ্যতার কলে প্রস্তুত বিদেশী রাজশক্তির আমদানী। এ সকলের মধ্যে অর্থ যে বড় বেশী আছে তা নয়। কর্ত্তাদের ঈপ্সিত বাবুয়ানা ইহাতে বড় চলে না, প্রায়ই ঋণ করিতে হয়। কিন্তু ক্ষমতা, পদ-গৌরব ও কল্পিত সম্মানের একটা মোহ আছে। অবশ্য ইহাদের ভগবান,—সাহেবই ইহাদের ধ্যান-জ্ঞান। সাহেব উঠিতে বলিলে ইঁহারা উঠেন, বসিতে বলিলে বসেন। নিজেদের স্বাধীন মত, ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোন জিনিষ ইঁহাদের নাই। ঠিক যেন কলের পুতুল! এই যে মনের অবস্থা, ইহাকেই মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে বলা যায় খাঁটী দাসভাব বা slave-mentality। আভূমি-প্রণত হইয়া যে সেলাম করে সেই যে কেবল দাস, তা নয়। কিন্তু মনোরাজ্যে যে বড় পঙ্গু, স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোন জিনিষ যার নাই, নিজের জাতির হীনতার ভাব যার মনকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে, প্রভুর অনুগ্রহ-লাভের জন্য যে সর্ব্বদা লালায়িত—সেই ত প্রকৃত পক্ষে দাস। আর ঠিক এই ভাবগুলি আমাদের চাকরীজীবি বাবুদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই যে মনের দাসত্ব, ইহাই সকল রকম দাসত্ব ও দুর্দ্দশার মূল।

৬

এর জন্য আমাদের আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে অনেক পরিমাণে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শিক্ষাই মনোরাজ্যে আমাদের দাস করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের মন যদি সবল ও সুস্থ থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় এমনটী ঘটিত না। কিন্তু বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় বোধ হয় আগে হইতেই আমাদের মন মুষড়িয়া গিয়াছিল; তাই এত সহজে বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের মনকে জয় করিতে পারিয়াছে। সর্ব্ব বিষয়ে যে আমরা হীন, এই শিক্ষা সেই ভাবটাই আমাদের মনে জাগাইয়া দিতেছে। নিজেদের সাহিত্য ও শিল্পকলার আদর আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালী জাতির যে একটা স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সাধনা ছিল, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। মধ্যযুগের বা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার বিবরণ আমরা অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারি। কিন্তু বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত ধর্ম্মের ভাব-স্রোতে বাঙ্গলা দেশে যে অপূর্ব্ব সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কোন খবর আমরা রাখি না। এর চেয়ে চরম দুর্গতি আর কি হইতে পারে?

এ দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহিরের দিকের যে জাঁকজমক, আড়ম্বর ও বিলাসিতা, তাহার প্রভাবটা প্রথম হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় আমাদের মনে বসিয়া যাইতেছে। পল্লী-গ্রামের যে-সব ভদ্র গৃহস্থের ছেলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বড় বড় ইন্দ্রপুরী তুল্য হোটেলে,

বিজলী আলো ও পাখার ঐশ্বর্য্য এবং আরামের মধ্যে বাস করে, গ্রামে ফিরিয়া তাহাদের পিতৃ-পিতামহের সেই সামান্য খড়ের ঘর কিন্তুত-কিমাকার বলিয়াই বোধ হয়; আর সেখানকার আহার-বিহারের ব্যবস্থায়ও মনটা একেবারেই দমিয়া যায়। ফলে আরাম ও বিলাসের মশলা যোগাইবার জন্য, তাহাদের মন সহর ও চাকরীর দিকেই ছুটিতে থাকে।

সব-চেয়ে সর্ব্বনাশের কথা, এই শিক্ষা আমাদের জাতির ধর্ম্মভাবের হ্রাস করিয়া দিতেছে। পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষবাদ ও পরীক্ষা-মূলক শিক্ষাপ্রণালী বহির্জগতের কতকগুলি সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দিতেছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে মনটা এক-প্রকার সূক্ষ্ম অজ্ঞেয়বাদে ও সংশয়বাদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। যে গভীর ভাগবত ভাব প্রাচীন হিন্দু সমাজের আত্মা, তাহা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। তাহার স্থানে ক্ষমতা-লিপ্সা ও অর্থোপার্জ্জনের বাসনাই আমাদের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিতেছে। আজ যে আত্মম্ভরিতা স্বার্থপরতা, কপটতা ও স্বেচ্ছাচারিতা, আমাদের সমাজের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, বিজাতীয় শিক্ষায় ধর্ম্মভাবের হ্রাসই তাহার মূল।

৭

এমনই করিয়া সকল দিকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা পরাজিত হইয়া বাঙ্গলার ভদ্র সম্প্রদায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছেন। সাজ-সজ্জা, বিলাস-ব্যসনের আড়ম্বর তাঁহাদের প্রয়োজনের অধিক হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহা মিটাইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া অর্থের কাছে আত্মবিক্রয় করিতে হইতেছে। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ও মস্তিষ্ক-চর্চ্চায় তাঁহাদের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নানারূপ নূতন নূতন রোগ আসিয়া অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিতেছে। এদিকে পুরাতন চাল-চলন ছাড়িয়া জোর করিয়া কতকগুলি বদ অভ্যাস করিতে গিয়া, জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠিলে যে অবস্থা হয়, তাঁহাদের তাহাই হইয়াছে। বাহিরের দিকে যেমন পরাধীনতা, মনোরাজ্যেও তেমনই তাঁহাদের শৃঙ্খল পড়িয়াছে। দাসভাব ও আত্ম-বিশ্বাসহীনতায় তাঁহাদের মন আচ্ছন্ন। জগতে যে তাঁহাদের জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাঁহারাও যে স্বাধীনভাবে কিছু করিতে পারেন, সে বিশ্বাস তাঁহাদের লোপ পাইয়াছে। নিজেদের অতীতের সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ, বর্ত্তমানের উপর সংশয়াপন্ন, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কৌতূহল-হীন। ফলে বাঙ্গলার ভদ্র সম্প্রদায় অধঃপতিত। তাঁহাদের সংখ্যাও ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; তাঁহাদের পরিণাম ঘোর অন্ধকারে অদৃশ্য।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

সঙ্কলন

আওরংজীবের রাজত্বের হিন্দু ঐতিহাসিক

সম্রাট আওরংজীবের রাজত্বকালে (১৬৫৭খৃঃ-১৭১০ খৃঃ) ঠিক সেই সময়ে হিন্দুদের লেখা, দুইখানি ফার্সী ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। ইতিহাস হিসাবে গ্রন্থদুখানি বহুমূল্যবান। একখানির নাম নুস্‌খা-ই-দিল্‌কশা, অপরখানির নাম ফতুহাৎ-ই-আলমগিরি। প্রথম খানির লেখকের নাম ভীম সেন। ইনি জাতিতে সাক্‌সেনা শ্রেণীস্থ কায়স্থ; জন্মস্থান বুরহানপুর। দ্বিতীয় খানির রচয়িতা ঈশ্বরদাস। ঈশ্বরদাসের পুঁথির একটী মাত্র প্রতী (কপি) এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মের ফার্সী হস্তলিখিত পুঁথির তালিকার অতিরিক্ত সংখ্যক ২৩,৮৮৪ পুঁথি এইখানি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১টী করিয়া লাইন আছে; ৩২৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত। বইদুখানি ঐতিহাসিকের চক্ষে এইজন্য মহামূল্যবান যে, গ্রন্থকারদ্বয় সম্রাট দরবারের কোনও মোসাহেব ছিলেন না অথচ সেই সময়কার বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় থাকায় অনেক ঘটনার সঠিক সংবাদ পাইতেন।

ঈশ্বরদাস জাতিতে নাগর ব্রাহ্মণ, সুরা গুজরাটের পট্টন (অর্থাৎ বিখ্যাত প্রাচীন হিন্দু রাজধানী আন্‌হিল্‌ওয়ারা পট্টন) নগরের অধিবাসী। এই নগর বর্ত্তমানে গায়কোয়ারের রাজত্বে। যৌবনকাল হইতে ৩০শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি সেখ-উল্‌-ইস্‌লামের অধীনে চাকরী করিতেন। সেখ-উল্‌-ইস্‌লাম ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কাজী। সর্ব্বদা তিনি সম্রাট আওরংজীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ঈশ্বরদাসকেও প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে হইত। এইরূপে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের এবং তাদের অনুচরদিগের নিকট হইতে তিনি সঠিক খবর পাইতেন। আওরংজীবের রাজত্বের সরকারী ইতিহাস মাসির্‌-ই-আলমগীরি হইতে জানা যায় যে, সেখ-উল্‌-ইস্‌লাম তাঁহার পিতা ওহ্‌হাবএর মৃত্যুর পর পিতার সর্ব্বপ্রধান কাজীত্ব প্রাপ্ত হন। ইনি ১৬৭৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাস হইতে ১৬৮৩ খৃঃ নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই সর্ব্বপ্রধান কাজীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি কাজীত্ব স্বইচ্ছায় ত্যাগ করেন, কারণ সম্রাট তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া স্বধর্ম্মী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মুসলমান সুল্‌তানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোর্‌—আনের মতে মুসলমানের সহিত মুসলমানের যুদ্ধ করা পাপ। ১৬৮৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে সেখ্‌ মক্কায় হজ্‌ করিতে যান। এই সময় ঈশ্বরদাস সেখের কাজ ছাড়িয়া গুজরাটের শাসনকর্ত্তা শুজায়েত খাঁর (শাসন-কাল ১৬৮৪ খৃঃ ১৭০১ খৃঃ) অধীনে চাকরী লন। ঈশ্বরদাসের বয়স তখন ৩০শ বৎসর। সুতরাং তিনি ১৬৫৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৩১ খৃঃ তিনি বই লেখা শেষ করেন; তখন তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর। খাফি খাঁর সুবিখ্যাত মুঘল রাজত্বের ইতিহাস ইহার চারি বৎসর পরে সমাপ্ত হয়।

শুজায়েৎ খাঁ ঈশ্বরদাসকে যোধপুর পরগণার কতকগুলি মহলের আমীন ও শিক্‌দার নিযুক্ত করেন। ১৬৭৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর আওরংজীব এই যোধপুর পরগণা অধিকার করেন। এই কাজের জন্য ঈশ্বরদাসকে রাঠোরদের সহিত বিশেষভাবে সংসৃষ্ট হইতে হইল; ফলে তাহাদের বন্ধুত্বও বেশ জমিয়া উঠিল। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ অবশেষে তিনি মন্‌সবদারের পদে উন্নীত হইবার সুযোগ পান।

আওরংজীবের চতুর্থ পুত্র মুহম্মদ আকবর ১৬৮১ খৃঃ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন! কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রথম তিনি মারাঠাদের আশ্রয় লন, অবশেষে পারস্যে পলায়ন করেন। পলায়নকালে শিশু পুত্র বুলন্দ আখ্‌তর ও কন্যা সফিয়ৎ-উন্‌-নিসাকে রাজপুতদের হস্তে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

রাঠোর দুর্গাদাস গোপনে ইহাদের মানুষ করিয়া তোলেন। দুর্গাদাস ছিলেন যশোবন্ত সিংহের পুত্র নাবালক অজিত সিংহের অভিভাবক ও রক্ষক। বংশের সম্মান রক্ষার জন্য আওরংজীব পৌত্র ও পৌত্রীর উদ্ধারে একান্ত উদ্বিগ্ন ও সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন। দুর্গাদাসও এই সময় মুঘলদের সহিত যুদ্ধে শ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উভয় পক্ষ যখন এই অবস্থায় তখন একটা মিটমাট সহজ হইল। ইহার বিবরণ দিতে গিয়া ঈশ্বরদাস বলিতেছেন :—

"দুর্গাদাসের কষ্টের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ১৬৯৮ খৃঃ দুর্গাদাস গ্রন্থকারকে লিখিয়া পাঠান যে,... সম্রাটের কাছে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার দরখাস্তের উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত শুজায়েৎ খাঁ যদি তাঁকে নিরাপদে যাইতে দেন এবং তাঁর বাড়ীঘর নষ্ট করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন, তবে তিনি সফিয়ৎ-উন্-নিসাকে সম্রাট দরবারে পাঠাইয়া দিবেন। দুর্গাদাসের এই প্রস্তাবে সম্রাট তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। সম্রাটের নিকট হইতে উত্তর আসামাত্র খাঁসাহেব ঈশ্বরদাসকে দুর্গাদাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গাদাস এই সময় একটী দুরধিগম্য স্থানে বাস করিতেন। ঈশ্বরদাস অতিকষ্টে সেখানে উপস্থিত হইয়া দুর্গাদাসকে অনেক উপদেশ দিয়া বুঝাইলেন যাহাতে তাঁহার মতের আর কোনও পরিবর্ত্তন না হয়। তারপর গ্রন্থকার ফিরিয়া আসিয়া যানবাহনাদি সংগ্রহ করিয়া বেগমকে আনিতে গেলেন। বেগম দুর্গাদাসের ব্যবহারে অতিমাত্র প্রীত ছিলেন। তিনি আসিবার সময় দুর্গাদাসকে তাঁর সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইয়া বেগম সম্রাটকে জানাইলেন যে, দুর্গাদাস তাঁহাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন; এমন কি আজমীড় হইতে একজন মুসলমান শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। তিনি কোর্-আন পড়িয়া ফেলিয়াছেন, এমন কি মুখস্থ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। সম্রাট ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দুর্গাদাসের সমস্ত পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিলেন। এবং বেগমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুর্গাদাস কি পাইলে সন্তুষ্ট হয়?" বেগম বলিলেন, "ঈশ্বরদাস তাহা জানে।" শুজায়েৎ খাঁর বন্ধু কাজী আব্দুল্লার উপর তখনই সম্রাট আদেশ দেন যে, আমাকে বাদশাহ দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। পরদিন আমাকে সম্রাট সমীপে লইয়া যাওয়া হইল। আমি দুর্গাদাসের মাসোহারার ও মন্‌সবদারীর প্রার্থনা নিবেদন করিলাম। সম্রাট এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। এবং এই অধম ধূলিকণা (অর্থাৎ ঈশ্বরদাস) ও ২০০ খত অশ্বারোহীর পদ ও খিলাৎ পাইল। আমার উপর আরও হুকুম হইল যে, দুর্গাদাস ও বুলন্দ আখ্‌তরকে সম্রাটসমীপে উপস্থিত করিতে হইবে। তাহার পর আমি আহমদাবাদে ফিরিলে শুজায়েৎ খাঁও আমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন।

দুর্গাদাসের সহিত অনেকবার দেখা করিয়া খাঁ সাহেবের অভয় দানের প্রতিশ্রুতি দিলাম। দুর্গাদাস জায়গীর প্রাপ্তির পরোয়ানা পাইয়া এবং পরোয়ানা অনুযায়ী মহালের দখল পাইয়া প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিলেন ও আহমদাবাদে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাহাজাদা অর্থাৎ বুলন্দ আখ্‌তর ও দুর্গাদাসকে সঙ্গে করিয়া সুরাটে উপস্থিত হইলাম। সম্রাট প্রেরিত কয়েকজন কর্ম্মচারী এখানে শাহাজাদার অপেক্ষা করিতেছিল। শাহাজাদাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে এবং সম্রাট দরবারের আদব কায়দা শিখাইতে তাঁহারা আসিয়াছিলেন। কিন্তু শাহাজাদা জড়বুদ্ধি গণ্ডগ্রামবাসীর মত ব্যবহারে এ পর্য্যন্ত অভ্যস্ত ছিলেন। সম্রাট-প্রেরিত হকিমেরা ইহার কোনই প্রতিকার করিতে পারিলেন না।

দুর্গাদাস যখন দেওয়ান-ই-আমের বারন্দায় উপস্থিত হইলেন, সম্রাট তাঁহাকে অস্ত্রহীন করিয়া দরবারে আনিতে আদেশ দিলেন, যেমন বন্দী বা সন্দেহজনক ব্যক্তিকে করা হয়। দুর্গাদাস ক্ষণমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব না করিয়া তরবারি খুলিয়া ফেলিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সম্রাট পুনরায় আদেশ দিলেন, আচ্ছা, অস্ত্র লইয়াই দুর্গাদাসকে আসিতে দেওয়া হোক। শিবিরে প্রবেশ করিলে অর্থসচিব রুহুল্লার কাছে দুর্গাদাসকে সম্রাট-সকাশে উপস্থিত করিতে বলা

হইল। খাঁ সাহেব দুর্গাদাসের হাত রুমাল বাঁধিয়া সম্রাট সকাশে উপস্থিত করিলেন। তখন অপরাধীকে ঠিক যুদ্ধ-বন্দীর মত এইরূপ কৃত্রিম সাজে সম্রাটের কাছে ক্ষমা চাহিতে হইত। তৃতীয় এডোয়ার্ডের কাছেও পরাজিত ক্যালে (Calais) নগরের ফরাসী অধিবাসীবর্গের প্রতিনিধিদিগকে গলায় ফাঁস পরিয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। মুঘল দরবারে ইহা কেবল ব্যাহ্নিক অভিনয় ছাড়া কিছুই ছিল না। এইরূপে সম্রাটকে মান্য দেখাইয়া সন্তুষ্ট করা হইত।

সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া দুর্গাদাসকে অস্ত্রে সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে ৩০০০ হাজার সৈন্যের মন্‌সবদার পদে উন্নীত করিলেন। একখানা রত্নখচিত হীরা, একটী সোনার পদক, মুক্তার মালা উপহার দেওয়া হইল ও খাজাঞ্চীখানার উপর নগদ একলক্ষ টাকা দিতে হুকুম হইল।

গ্রন্থকারও বাদ গেলেন না। তিনিও যথেষ্ট পুরস্কৃত হইলেন। তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া আরও ৫০০ জন অশ্বারোহীর নেতা করা হইল; এবং খিলাৎ ও মারবাড়ে আজমীড়ের পশ্চিমে জায়গীর দেওয়া হইল।

নিজ মন্ত্রণা-কৌশলের সাফল্যের জন্য ঈশ্বরদাস ২৫০ জন অশ্বারোহীর মন্‌সবদারের পদ পাইলেন। ঈশ্বরদাসের নিজের সম্বন্ধের এই বিবৃতি অপর এক ফার্সী ইতিহাস (মিরাট-ই আহমদী, ৩৫০-৩৫১ পৃঃ) সমর্থন করিয়াছেন। ঈশ্বরদাস সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। পুঁথির শেষ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, তিনি ২১শে রবি উল-আর্ব্বলে মুহম্মদ সাহের রাজত্বের দ্বাদশবর্ষে ১১৪৩ হিজরীতে (১৭৩১ খৃঃ) বইখানি শেষ করেন। তিনি এই লিখিয়া শেষ করেন যে, "নাগর-জাতীয় ঈশ্বরদাস কর্ত্তৃক তার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এবং লালা-খুশ-হালের জ্ঞাতার্থ এই বইখানি লিখিত হইল।" এই লালা-খুশ হাল কে?

দস্তুর-উল্-আলম্‌শাহানশাহী নামক একখানি ফার্সী গ্রন্থে লালাসাহেব বলিয়া এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই লালাসাহেব ঈশ্বরদাসের পুত্র বলরায়ের পুত্র। যদি লালাসাহেবই লালা-খুশ-হাল হন, তাহা হইলে মনে হয় যে, বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বরদাস পৌত্রের অনুরোধে আওরংজীবের সমসাময়িক স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই হস্তলিখিত পুঁথির সূচী এইরূপ :—

ঈশ্বর ও সম্রাটের বন্দনা।

গ্রন্থকারের নিজের চাকরীর খতিয়ান ও সমসাময়িক ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা।

সাজাহানের অসুস্থতা ও শূজার প্রথম পরাজয়।

যশোবন্ত ও দারার পরাজয় ও সাজাহান বন্দী।

মুরাদ বন্দী এবং দারা ও শূজার পতন।

মীরজুমলাকে বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া ফর্‌মান প্রদান।

শিবাজীর প্রথম কার্য্যাবলী।

আওরংজীবের মন্দির ধ্বংস; মথুরার নিকট জাঠদের বিদ্রোহ; জাঞ্জিরার সিদ্দিদের সহিত শিবাজীর যুদ্ধ; জয়সিংহের নিকট শিবাজীর পরাজয়; শিবাজীর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ ও পলায়ন।

দাক্ষিণাত্যের সুবেদার শাহাজাদা শাহআলমকে দিলির খাঁর অমান্য।

সালের দুর্গের নিকট শিবাজীর সহিত মুঘলদের যুদ্ধ।

সৎনামী জাতির বিদ্রোহ।

আফঘানীস্থানে সম্রাট-সৈন্যের ধ্বংস।

যশোবন্তসিংহের মৃত্যু; যশোবন্তের পুত্রকন্যার পলায়ন; জিজিয়া কর-স্থাপন; রাজপুতদের সহিত যুদ্ধ; আকবরের বিদ্রোহ

রাঠোরদের সহিত যুদ্ধের বিবরণ।

বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুবরাজ আজমের অভিযান, এবং কঙ্কণে শাহ আলমের প্রবেশ।

গোলকুণ্ডা অধিকার।

শিরোঞ্জে পাহাড়সিং গৌড়ের বিদ্রোহ।

বিজাপুর অধিকার।

শাহাজাদা আকবর ও শম্ভুজীর কার্য্যাবলী।

শাহাজাদা শাহ আলম বন্দী।

রামসিজ ও সালের অধিকার।

বুন্দেলখন্দে বিদ্রোহ।

দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্খলাহীন যুদ্ধ।

আকবরের পারস্যে পলায়ন।

দুর্জ্জনসিংহ হাড়ার বিদ্রোহ ও রাজপুতনায় গণ্ডগোল।

তাদুনী অধিকার।

ব্যাঙ্গালোর অধিকার।

আগ্রার নিকট রাজারাম জাঠের বিদ্রোহ।

গোয়ালিয়রের নিকট গোপাল সিংহ গৌড়ের বিদ্রোহ।

সনসানীতে চুড়ামন জাঠের বিদ্রোহ।

শাস্তা ঘোরপাড়ী কর্ত্তৃক রুস্তম খাঁ বন্দী।

রূপা ভোঁসলা কর্ত্তৃক সিদ্দি আব্দুলকাদিরের শিবির লুট।

বিশ্বাসঘাতক সম্রাটের হকিম কর্ত্তৃক গাজী উদ্দীন খাঁ বাহাদুর ফিরোজজঙ্গের চক্ষু উৎপাটন। শম্ভুজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

শম্ভুজীর বন্দীত্ব ও মৃত্যুদণ্ড।

বহু মারঠাদুর্গ অধিকার।

শম্ভুজীর ভ্রাতা রাজারামের পলায়ন।

আগ্রার নিকটে আঘর খাঁর হত্যা।

দুর্গাদাসের পরাভব; ঈশ্বরদাসের সম্রাট সাক্ষাৎ ও পুরস্কার প্রাপ্তি।

মুঘলদরবারের অন্যান্য ইতিহাসের মত ইহা সম্রাটের আদেশে কিংবা তাঁহার মুখ চাহিয়া রচিত হয় নাই; অনেক ঘটনা গ্রন্থকার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য ঘটনার সত্য বিবরণ জানিবার তাঁর যথেষ্ট সুযোগ ছিল, জাতিতেও তিনি মুসলমান ছিলেন না, এই সব কারণে ইতিহাসখানি পক্ষপাতদুষ্ট হয় নাই ও কোথায়ও সত্যের অপলাপ করিতে হয় নাই। সত্য রক্ষাই ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার সত্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ঐতিহাসিকদের চক্ষে বইখানি মহামূল্যবান।

শ্রীযদুনাথ সরকার

প্রভাতী শীত-সংখ্যা, ১৩২৮

নারীর আর্থিক স্বাধীনতা

নারীর স্বাতন্ত্র্য বাস্তব হইয়া উঠিতে থাকিবে তখনই যখন সে পাইবে আর্থিক (economic) স্বাধীনতা। প্রথমে অবশ্য চাই ভিতরের স্বাধীনতা, মনের মুক্তি, গতানুগতিক সংস্কার হইতে অভ্যাস হইতে অব্যাহতি, চাই অন্তরের এবং অন্তরের অন্তরে স্ব'এর, ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন; এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষা এবং শিক্ষারও বেশী দীক্ষা। কিন্তু ভিতরের জিনিষ রূপ লইতে পারে বাহিরেরই আশ্রয় অবলম্বনে; বাহিরের একটা প্রতিষ্ঠা না পাইলে, অন্তরের সত্য পাকা হয় না, প্রকাশের পথ পায় না। সুতরাং নারীর আত্মার ও মনের স্বাতন্ত্র্যকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাকে লাভ করিতে হইবে শরীর ও প্রাণধারণের স্বাতন্ত্র্য। এই কথাটা পাশ্চাত্যের এক জন স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী নারী বড় সুন্দর ও সরলভাবে বলিয়া ফেলিয়াছেন—How can you be courageous when you have not a penny and are incapable of carning one—হাতে যখন একটি পয়সা নাই, একটি পয়সা উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতাটি পর্য্যন্ত নাই, তখন তোমার জোর আসে কোথা হইতে! ফলতঃ ইউরোপে বা আমেরিকায় মেয়েরা সমাজে নিজেদের যতটুকু স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে, তার মূলে আছে তাহাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যেদিন Married Woman's Property Act পাশ হইল, সেইদিন হইতেই ইংলণ্ডে মেয়েদের সামাজিক জীবনে নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

আমাদের দেশের মেয়েরা অন্নবস্ত্রের জন্য পুরুষের যে কতখানি দাস তা বলাই বাহুল্য। বিবাহের

মন্ত্রের মধ্যেই মস্ত একটা আধ্যাত্মিকভাবে মণ্ডিত করিয়া—ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, পুরুষের ভার নারীর ভরণপোষণ আর নারীর ভার পুরুষের সেবা। স্বাধীন উপজীবিকার কথা দূরে থাকুক, দানস্বরূপ হউক আর উত্তরাধিকার স্বরূপেই হউক নারীর ধন-সম্পত্তি-গ্রহণে ও ভোগে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা যত সব আঁটঘাট বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যটাই কেবল ফুটিয়া উঠিয়াছে—ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। স্ত্রীধন সম্বন্ধে কাত্যায়ন এই সাধারণ নিয়মটি করিয়া দিয়াছেন—

প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্বিত্তং প্রীত্যাচৈব যদন্যতঃ।
ভর্ত্তুঃ সাম্যং তবেৎ তত্র শেষস্তু স্ত্রীধনং স্মৃতং॥

অর্থাৎ, স্ত্রী চেষ্টা করিয়া নিজে যা উপায় করুক অথবা অপরে তাহাকে যা দান করুক, সে সমস্তে স্বামীরও অধিকার আছে; তবে স্ত্রীর নিজস্ব ধন বলিতে যদি কিছু বুঝায় তবে তাহা হইতেছে ঐ শেষোক্ত দানের ধন। অবশ্য একথাটাও এখানে উল্লেখ না করিলে ব্যবস্থাকারদের প্রতি অন্যায় করা হইবে যে, তাঁহারা এমন স্ত্রীধনেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যাহার উপর স্ত্রীদের পূর্ণ ও যথেচ্ছ অধিকার আছে, তাহাতে পিতা পুত্র ভ্রাতা এমন কি স্বামীরও পর্য্যন্ত দান-বিক্রয়ের কোন সত্ত্ব নাই। কিন্তু তবুও ফাঁক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—এমন অজুহাত সব হাতে রাখা হইয়াছে যাহার বলে স্ত্রীর এই অধিকার বিশ্লেষে বাতিল হইয়া যায়। সে যাহা হউক শাস্ত্রে যাহাই থাকুক, কার্য্যতঃ আমরা দেখি, স্ত্রীর নিজস্ব কিছু থাকা বা অর্জ্জন করা যেন পুরুষের কাছে একটা ভীষণ অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, স্ত্রীর যাহা সব তাহার উপর পুরুষের জন্মগত ভাগ্য-গত অধিকার আছে। গল্প শুনা যায়, ইংলণ্ডে স্ত্রী-স্বাধীনতার হৈ-চৈ দেখিয়া শুনিয়া একটি গেঁয়োলোকে চটিয়া গিয়া টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—Do you mean to tell me that if my missus had a hundred pounds left her I couldn't spend it without asking her first, "তোমরা কি বলতে চাও আমার বৌকে শ'খানেক গিনি যদি কেউ রেখে যায় তবে তাকে আগে জিজ্ঞেস না ক'রে সেটা আমি খরচ করতে পারিনে?" অনেক শিক্ষিত লোকেই যে এই গেঁয়ো লোকটির মতে—মুখে না হউক মনে মনে—মত দিবেন, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিয়া দিতে পারি।

আমাদের দেশে তথাকথিত ছোটলোকের ঘরের মেয়েদের যা কিছু বা স্বাধীন উপজীবিকার প্রয়াস ও অবকাশ আছে; কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েদের তাহা পর্য্যন্ত নাই। শুধু তাই নয়, ভদ্র ঘরের মেয়েদের পক্ষে রোজগার করা এক-রকম অপমান। অন্নহীন বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকিব, তাও ভাল, কিন্তু নিজে উপার্জ্জন করা শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ! মৃত্যুকে বরং বরণ করিয়া লইব, কিন্তু পুরুষের ধর্ম্ম নিজের উপর লইব না। আপত্তি যে কেবল মেয়েদের দিক হইতেই তাহা নয়; সমাজের একটা সমবেত চাপ—মেয়েদের ইচ্ছা থাকিলেও, সে ইচ্ছাকে দাবিয়া চাপিয়া রাখে। আমরা একটি ঘটনা জানি, সেটি উল্লেখ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন আমাদের কি রকম অবস্থা। একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-ঘরের নিতান্ত সহায়হীন দুটি মেয়ে আর কিছু উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে ঘরে বসিয়া বাঁশের চুপড়ি বানাইত আর একটি সহৃদয় ছেলেকে দিয়া সে সব বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দিত; ইহাতে যাহা কিছু আয় হইত তাহাতেই কোনরকমে উভয়ের দিন চলিত। কিন্তু কথাটা যখন সমাজপতিদের কানে উঠিল, তখন তাঁহারা সকলে একেবারে মার-মার করিয়া আসিয়া পড়িলেন; "এ কি অনাচার! কি ঘোর কলিকাল! ব্রাহ্মণের মেয়ে হাড়ি-ডোমের কাজ করে!" তাঁহারা ছেলেটাকে শাসাইলেন, মেয়ে দুটিকেও ভয় দেখাইলেন—আবার এ কথাও বুক ফুলাইয়া বলিলেন, তাঁহারা থাকিতে ব্রাহ্মণ-কন্যার অভাব কিসের? কিন্তু তার পর অভাগা মেয়ে দুটির অনাহারে প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল—ভাগ্যগতিকে একটা উপায় হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা যে কোন অবস্থায় কোন রকম স্বাতন্ত্র্য পাইবার উপযুক্ত নয়, সনাতন ধর্ম্মের সে ব্যবস্থার এ একেবারে চূড়ান্ত প্রয়োগ।

কিন্তু তবুও কথাটা কেবল জীবন-ধারণের কথা নয়। এই একান্ত পরবশ্যতা, শুধু পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা, ইহাতে নারীর অন্তঃকরণ কতখানি দীন হইয়া থাকে, তাহার মন প্রাণ কতখানি অজ্ঞানের মধ্যে ডুবিয়া যায়, সেই কথাটির উপরই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কথায় আছে, অভাবে স্বভাব নষ্ট। বাস্তবিক নারী যখন জানে অনুভব করে তাহার কিছুই নাই, আছে কেবল অভাব, আর সেই অভাব পূরণ করিয়া দিতেছে ও দিতে পারে কেবল পুরুষে, তখন তাহার স্বভাব তাহার নারীত্ব অনেকখানি সঙ্কুচিত অনেক খানি আপ্না-হারা হইয়া যায়। স্বভাবের সত্য স্বরূপ সেখানে ফুটিয়া উঠিতে পারে না, তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি বিকৃত সংস্কার, কতকগুলি মিথ্যার ময়লা সেখানে জমিয়া যায়। কি রকমে, বলিতেছি।

আমাদের দেশ নাকি সীতা সাবিত্রীর দেশ। আমাদের সমাজের বিশেষত্ব এই যে, নারীর এমন অকুণ্ঠিত আত্মদান, এমন অটুট একনিষ্ঠা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; আমাদের নারীর নারীত্ব জগতে অতুলনীয়। বাহির হইতে যখন দেখি কথাটা যেন খুবই সত্য বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিতে গেলে, ব্যাপারটার মধ্যে এমন সব জিনিষ ধরা পড়ে যাহাতে আমাদের সে সহজ সরল বিশ্বাসকে অনেকখানিই টলাইয়া দিয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি আমাদিগের মেয়েদিগকে কতখানি ধরিয়া বাঁধিয়া সতী সাবিত্রী করিয়া তোলা হইয়াছে, উপায়ান্তর নাই দেখিয়াই তাহারা কতখানি তাহাদের প্রশংসিত পুণ্যধর্ম্মগুলি আপনার করিয়া লইয়াছে—they have made a virtue of necessity, আপনাকে চিনিবার জানিবার আগে হইতেই আমাদের মেয়েরা শুনিয়াছে, দেখিয়াছে, শিক্ষা পাইয়াছে যে পুরুষের উপর-সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা ছাড়া তাহাদের অন্য গতি নাই; সমাজের আবহাওয়া, অতীতের অভ্যাস মেয়েদের প্রাণে অজানিতেই এই সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে যে পুরুষের গলগ্রহ তাহাকে হইতেই হইবে —এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। কেবল ভাবজগতে—মনে প্রাণে এই সংস্কারটি থাকিলেও বা কতক রক্ষা ছিল; কিন্তু বাস্তব ব্যবস্থাও এমন করা হইয়াছে যে, শরীরটিকেও ঐ সংস্কার-অনুযায়ী বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই, নিজের নিজত্বের সহিত যখন সে কিছুমাত্র পরিচয় স্থাপন করিতে পায় নাই তখনই আমাদের সমাজের মেয়েকে একটা জড়-পুঁটুলির মত পুরুষের সাথে উদ্বাহ-সূত্রে গাঁথিয়া দেওয়া হয়—পুরুষকে উদ্বাহ হইয়াই সে ভারটি বহন করিতে হয়। শিশুকাল হইতেই পরের উপর যে একান্ত নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইতে থাকে, হঠাৎ একদিন জ্ঞান হইলেও সে দেখে এই পর ছাড়া সে একেবারে নিরুপায়, দাঁড়াইবার তাহার স্থানও নাই সামর্থ্যও নাই: কাজেই এই জ্ঞানটিকেও চাপা দিয়া ফেলিতে চায়, ইহার চারিদিকে একটা ধর্ম্মের পুণ্যের জাল বুনিয়া ফেলে। "স্বামীর অভাবে আমার কি উপায় হইবে"—মেয়েদের এই চলিত কথাটির মধ্যে যথার্থ প্রাণের অর্থাৎ অন্তরাত্মার সহিত অন্তরাত্মার মিলের টান কতখানি আর কতখানিই বা নেহাৎ আধিভৌতিক অর্থাৎ আশ্রয়ের অন্নবস্ত্রের আশঙ্কা লুকাইয়া আছে, সে প্রশ্ন আমাদের আত্মাভিমানকে আঘাত দিতে পারে, কিন্তু সত্যকে ত বদলাইতে পারে না। শত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিলেও মানুষের বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবার বৃত্তিকে, গ্রাসাচ্ছাদনের প্রেরণাকে কেহ নাকচ করিয়া দিতে পারে না—এ একেবারে মানুষের গোড়ার বৃত্তি, গোড়ায় প্রেরণা। সুতরাং যখন দেখি আমার এই বৃত্তি এই প্রেরণা আর এক জনকে ভর করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, তখন যে তাহাকে দ্বিগুণ জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব তাহা খুবই স্বাভাবিক। তবে মানুষ পশু নয়, তাই আদিমকোর প্রাকৃত বৃত্তিকে প্রেরণাকে একটু ঢাকিয়া ঢুকিয়া সাজাইয়া রঙাইয়া ধরে, অথবা বড়-জোর বাস্তবিকই অন্য কতকগুলি উচ্চতর বৃত্তির সাথে মাখাইয়া মিশাইয়া দেয়; কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের অস্তিত্ব যে থাকে না বা তাহাদের জোর কিছুমাত্র কমিয়া যায়, তাহা মনে করা বিষম ভুল, সেটা আত্ম-প্রবঞ্চনা। আমাদের সমাজে নারীত্বের আত্মদান একনিষ্ঠা প্রভৃতি বড় বড় কথার নীচে এইরকম অপ্রীতিকর গোপন

ইতিহাস' একটা ট্রাজেডিই আছে তাহা কেহ খোঁচাইয়া দেখিয়াছেন কি? আমাদের মেয়েরা পতিকে দেবতা মনে করিয়া ভক্তি করে কিন্তু সেই ভক্তির উৎস কতখানি যে ভয়—দেবতা হারাইলে পাছে দেবতার ভোগের প্রসাদ লইতে বঞ্চিত হই—এ কথাটা খুব রূঢ় শুনাইতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসুর ত তাই বলিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া চলেনা।

মেয়েরা যে গোড়াতেই পুরুষদের কাছে, যাহাকে বলে, ভাতে মরিয়া রহিয়াছে। এই গোড়ার বন্ধনটি মুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে নারীর স্বভাব স্বধর্ম্ম কি চায়, কি ভাবে চলে; পুরুষের সহিত তখন সে যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে তাহার মধ্যে আর কিছু না থাকুক দাতার ও গ্রহীতার, মনিবের ও দাসের যে একটা অস্বস্তিকর অস্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ সেটির কোন ছায়া পড়িবে না—উভয়ের মধ্যে দুটি মুক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ সত্তার সত্য সম্বন্ধ দাঁড়াইবার সুযোগ হইবে। আধ্যাত্মিক হিসাবে ইহাতে নারীরও মঙ্গল পুরুষেরও মঙ্গল; সমাজেরও ব্যবস্থা একটা নূতনতর স্বাভাবিকতর সত্যতর রূপকে ফলাইয়া ধরিতে পাইবে। আধিভৌতিক হিসাবেও —বিশেষতঃ বর্ত্তমানের অন্নকষ্টের দিনে সকলের সুবিধা হইবে। আমাদের হিন্দুসমাজের অসহায় বালিকাদেরও আর যেন-তেন প্রকারে বলিদান দিতে হইবে না, পুরুষদেরও যে ভার ক্রমে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে তাহার লাঘব হইবে—সমাজের যে অর্দ্ধেকভাগ এখন কেবল খরচই করিয়া আসিতেছে তাহারও জমার দিকে কিছু নজর দিলে গোটা সমাজ সমৃদ্ধতরই হইয়া উঠিবে। নারীর স্বাধীন উপজীবিকার বিরুদ্ধে একটা হেতু দেখান হয়, তাহার মাতৃত্বের ভার। এই হেতু একটা ছুতা মাত্র; কারণ, আমরা চোখের সম্মুখে নিত্যই দেখিতেছি নিম্নতর শ্রেণীর অশিক্ষিত ঘরের মেয়েরা এই মাতৃত্বের ভার সত্ত্বেও কত উপায়ে কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিতেছে, আর আমাদের ভদ্র ঘরের মেয়েরা পরিশ্রম হিসাবে কি কিছু কম করিতে পারে? সে পরিশ্রমটার মধ্যে একটু কৌশল, একটু সাজান গোছান, একটু ইচ্ছা ও উদ্যোগ থাকিলেই যে তাহাকে উপজীবিকার উদ্দেশ্যে খাটান যায় না তাহা নয়; আর যাঁহারা গালগল্প করিয়া শুইয়া গড়াইয়া বা বাজে কাজে সময় কাটান, তাঁহাদের ত কোন অজুহাতই নাই। তারপর এই মাতৃত্বের ভার মেয়েদিগকে সারা জীবনের প্রতিদিন কিছু বহন করিতে হয় না—প্রয়োজন-মত অবসর ত লওয়াই যাইতে পারে, এই অবসর ছাড়াও আরও যে যথেষ্ট সময় পড়িয়া থাকে, সেটির সদ্ব্যবহার কয়জন করিতে চাহে বা পারে?

আমাদের দেশে মেয়েদের "ভোট" অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতিক অধিকার লইয়া একটা আন্দোলন সম্প্রতি বেশ উঠিয়াছে—বর্ত্তমান যুগের হাওয়া আমাদের সনাতন সমাজের বুকের উপর দিয়া যে চলিতে সুরু করিয়াছে, ইহা তাহারই প্রমাণ। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিক অধিকার তখনই সত্যকার হইয়া উঠে যখন তাহার পিছনে থাকে অর্থনীতিক অধিকার। তাই আমরা মনে করি পলিটিক্যাল স্বাধীনতা অপেক্ষা ইকনমিক স্বাধীনতাই মেয়েদের পক্ষে বেশী জীবন্ত জিনিষ, এই বস্তুটিই নারীর প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের গোড়া ঘেঁসিয়া চলিয়াছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে পরমুখাপেক্ষী, তাহার একটা স্বাধীন মতামত ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় না, আর কোন স্বাধীন মতামত থাকিলেও তাহা প্রকাশ করিবার বা তদনুসারে কার্য্য করাইবার পথ থাকে না—উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দারিদ্র্যানাং মনোরথাঃ। রাষ্ট্রে অথবা আরও বড়ভাবে সমাজে মেয়েদের স্বাধীন স্বতন্ত্র স্থান করিয়া লইতে হয়, রাষ্ট্রের সমাজের ব্যবস্থার উপর নারীরও হস্ত-চিহ্ন থাকা যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে আগে অর্থ সম্বন্ধে আত্মবশ হইতে হইবে। সমাজের এই আন্দোলন আমরা আগে দেখিতে চাই। তাহা হইলে বুঝিব নারী-রাষ্ট্রনীতিক অধিকারের আন্দোলনটাই কেবল যে খাঁটি হইয়া উঠিতেছে তা নয়, নারীর সমগ্র জীবনের স্বতন্ত্রতাও সত্যকার ভিত্তি পাইতেছে। পুরুষেরা এই আন্দোলনে কতখানি যোগ দেয় তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিব নারীর যথার্থ মুক্তির অধিকারের জন্য পুরুষের প্রাণের সায় কতখানি আছে।

তাই বলিয়া নারীর অর্থাধিকারকেই যে আমরা সর্ব্বেসর্ব্বা করিতেছি তাহা কেহ মনে করিবেন না। আরম্ভেই আমরা বলিয়াছি গোড়ার কথা হইতেছে মনের মুক্তি, অন্তরাত্মার উদ্বোধন—শিক্ষা ও দীক্ষা। এই ভিতরের

জিনিষ ব্যতিরেকে বাহিরের সব আসবাবই বিফল। বর্ম্মায়, আমাদের দেশে, খাসিয়াদের মধ্যে নারীর অর্থাধিকার যথেষ্টই আছে, কিন্তু তবুও তাহাদের সমাজ যে খুব সমৃদ্ধ বা উন্নত ধরণের তাহা মনে হয় না; কারণ সেখানে অভাব এই গোড়ার জিনিষটির—তবুও নারীর স্বাতন্ত্র্য সমাজ-শৃঙ্খলার অন্তরায় যাঁহারা বলেন, তাঁদের দৃষ্টি আমরা ঐ সমাজের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই—পুরুষের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ছাড়া নারীর কর্ত্তৃত্ব যে সমাজ গাঁথিয়া তুলিতে পারে, সমাজকে একটা ভিন্ন রকম মূর্ত্তিই দিতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ ঐখানে পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

উপাসনা,—পৌষ, ১৩২৮।

রক্তের লেখা

নীরদ স্বপ্নেও ভাবেনি যে নীলফামারীতে তার মহকুমার বড় হাকিমীর প্রথম দিনেই এজলাসে মেজদার সঙ্গে এমন আকস্মিক দেখা হয়ে যেতে পারে। নীরদের কোর্টে একটা ডাকাতি মকদ্দমায় মেজদা এসেছিল আসামীর পক্ষ হয়ে বক্তৃতা কর্‌তে।

পুষ্পর বিয়ের পর ইংরেজ-সরকারের ডেপুটীরূপ অস্থাবর সম্পত্তি নীরদ ঝিনেদা, বন-গাঁ, কুষ্টে, নাটোর ক'রে কেবলি চ'লে বেড়িয়েছে আর বিলেত থেকে আইন পাস ক'রে এসে মেজদা কায়েমী পাট্টা নিয়ে হাইকোর্টে বসে গিয়েছিল। নবীন কৌঁসুলীদের ভেতর তার নাম আর পসার দুটোই বেশ জম্‌কে উঠেছিল ব'লেই সে কলকাতায় একেবারে স্থাণুর মতন আট্‌কে পড়েছিল। তাই দুজনে দেখা হবার মত "মধু-যামিনী" এর আগে আর আসে নি।

নীরদ প্রীতি-অভিনন্দন দিয়ে মেজদাকে সঙ্গে ক'রে তার বাংলোর নিয়ে গেল। তখন ঘরের ভেতর সন্ধ্যার আলো জ্ব'লে উঠেছে। বাংলোর বারান্দায় অরকিডগুলোর গায় গায় তুলে-দেওয়া লতা-মালঞ্চের নীচে চায়ের টেবিলের দুপাশে দুজনে মুখোমুখি হ'য়ে বস্‌লো। সাম্‌নে গোল ক'রে বেড়া দেওয়া বাগানের ভেতর রক্ত গোলাপটীর বুকের উপর প'ড়ে জ্যোৎস্না সন্ধ্যার চাঁদিনী চুমোর দাগ, ফুটন্ত ফুলের পাপড়িগুলির উপর চক্‌চক্ কচ্ছিল। বেয়ারা এসে চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের ওপর রেখে গেল। নীরদই আজ হোষ্ট—টি-পট থেকে এক পেয়ালা চা ঢেলে বিস্কুটের টিনটা মেজদার সাম্‌নে ঠেলে দিয়ে নীরদ বস্‌লো। তার মুখের উপরকার হাসির রঙ্ খেলা হঠাৎ যেন চোখের জলের বৃষ্টি নেমে ধুয়ে গেল। সে ধরা-ধরা গলায় বল্‌লে—"মনে আছে মেজদা, তুমি একদিন আমায় চায়ের নেমন্তন্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে গেছ্‌লে?"

মেজদা একটা কি টন্‌টনে ব্যথায় ঘাঁ ক'রে দমে গিয়ে বল্‌লে—"মনে আছে নীরদ, কিন্তু কেন আর সে কথা ভাই?"

নীরদ এবার জোর ক'রে মুচ্‌কি হেসে

বল্‌লে,—"না, আর কেন সে কথা। কিন্তু আর কিছু মনে আছে মেজ-দা?"

মেজদা নীরদের মুখের পানে মুখ তুলে তাকাতে পার্‌লে না, মাথা নীচু ক'রেই জবাব দিলে—"হ্যাঁ, পুষ্প এসে চা দিয়ে গেল। কিন্তু থাক্ সে কথা—"

"হ্যাঁ, থাক্ মেজদা,—সেদিনও এম্‌নি জ্যোৎস্না-রাতের সন্ধ্যা রুপোর ফটিক ভেঙে ছাদের উপর, কার্ণিসের ধারি ধ'রে খেলা কচ্ছিল। সেদিনও আমি ছিলাম একেবারে একা—আজও তাই।"

মেজদা বল্‌লে—"তোকে আমি প্রণাম করি নীরদ—আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এ ব্যথা ভুলে যা।"

সে আজ বছর এগারো আগেকার কথা। মেজদাদের বাড়ীর সাম্‌নের বাড়ীটার জান্‌লার পাশটীতে বসে মোটা মোটা ইংরিজী বইএর পাতার উপর চোখ ঠিক্‌রে রেখে নীরদ তার পাশের পড়া তোয়ের কর্‌তো। ও বাড়ীতে পুষ্পরাণীর নানান্ আলাই-বালাই, রাজ্যের যত কাজ তা ঐ ঘরখানার ভিতরেই। মেজদার পড়ার টেবিল এখনও এলোমেলো হয়ে থাকে; ঝেড়ে গুছিয়ে ঝর্‌ঝরে, তক্‌তকে করে দিতে হয়; ছবিগুলো ধুলোয় ধুলোয় ময়লা ধ'রে যায়, পুষ্প মুছে না দিলে আর কে তা দেবে! ম্যাটিং-করা ঘরের মেঝে ঝী-মাগি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার কর্‌তে পারে না—সে ভার তাই পুষির,—পুষ্পিটার। ড্রেসিং টেবিল একখানাই মোটে মেজদার ঘরে আছে—তার পাশে আরসি সাম্‌নে করে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে বেণী জড়িয়ে খোঁপা তার ঐ ঘরেই বাঁধ্‌তে হয়। রাস্তায় মিত্তিরদের বাড়ীর ফিটন গাড়ীর জুড়ী ঘোড়া টগবগিয়ে চলে যায়,—আধখানা খোলা জান্‌লার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে গিয়ে চকিতে তার চোখে পড়ে—ঐ জান্‌লার কাছে ফুট্‌ফুটে কে যেন! সুন্দর, তাজা মুখখানা! তার মুখের উপরকার সোনা-চম্‌কানো গোলাপ-ছোপের চেয়েও গোরা তাঁর রং। ডাগর চোখদুটী—চমৎকার। পুষ্ট, পেশল তনু, দীর্ঘ বিলোল হাতদুখানা চওড়া বুক—পরিপুষ্ট। একেবারে উদলো গায় ধ্যানীর মত মগ্ন মনোযোগে পাতার পর পাতা উল্টে বই পড়ে চলেছেন। তখন তো পুষ্প জান্‌তো না, উনি পথের কাঙাল। ও-বাড়ীর ছেলেটীকে পড়িয়ে ঐখানে থাকেন, ওরা দুবেলা দু-মুঠো ওঁকে খেতে দেয়। দেখে দেখে পুষ্পর হঠাৎ মনে হয়েছে—এই এত ক'রে মাথা কুটে পড়া ওঁর কার জন্যে?—ছি! কানের পাশ দিয়ে গালের উপরটা অবধি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌তেই জান্‌লা বন্ধ করে দিয়ে সে সরে যেতো।

কিন্তু পড়াই যে ছিল নীরদের সব! কেউ ছিল না বেচারীর আপন জন, আত্মীয়-বন্ধু। জলপানির টাকা দিয়ে কলেজের মাইনে কুলিয়ে গেছে। বই কিন্‌তে পারে নি, হাতে লিখে নিয়েছে। এম্‌নি ক'রেই 'ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স' সে পেয়েছিল, কিন্তু জলপানি তো পেলে না—এম, এ পড়া কি ক'রে চলে! অনেক ক'রে এই বাড়ীতে ছেলে-পড়াবার কাজ জুটিয়ে নিয়ে সে এইখানে এল। সারাটী দিন-রাত পড়ারই তপস্যা কর্‌তো। সে পুষ্পর কোন কথা অত-শত কিছুই জান্‌তো না। তেমন কিছু এতদিন তার চোখেও পড়েনি।

হঠাৎ সেদিন পড়ার ফাঁকে দৃষ্টিটা তুলে ও-বাড়ীর উপরের ঘরখানার মধ্যে তাকাতেই নীরদ দেখলে,—ঝাঁক্-বাঁধা ভ্রমর-দলের মতন নিবিড় একরাশ কালো চুল কে পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে সিঁথির দু'পাশে আঁচ্‌ড়ে বাহার ফুলিয়ে তুল্‌ছিল,—ঝুম্‌কো-লতার মত জড়িয়ে পাকিয়ে ওঠা ডগাগুলি তার রঙীন্ শাড়ীর ধারি ধ'রে মিহি ময়ূরকণ্ঠী কাজ-করা জরির পাড়টীর উপর গোছা বেঁধে রয়েছে! চোখ, মুখ, রঙ তার—সে আর বলা যায় না। নীরদ ভাব্‌লে—কার স্বপ্ন-লোকের আলোর ভুবনখানা, রূপ-ভঙ্গিমার ফাগ-পোরা কুঙ্কুমটীর বুক-ফাটা লালে রাঙা ক'রে আশা-আবেশের মোহন-মঞ্জরী রক্ত ভেঙে ফুটিয়ে তুল্‌বে—কনক-বরণী এ কল্প-লতাটী! নব-যৌবনের সুর-সপ্তক, তনুখানির সাত-তারার তারে তারে কুলবধূর মন-ভোলানো মল্লিকা-ফুলের রেণু-গন্ধে, পঞ্চবাণের মন্ত্র বুলিয়ে বাঁধা একখানা কুহক-গানের মৌন বাণী মুখর ক'রে জাগিয়ে তুলেছে—কার মরমের উপকূলে বর্ষাকালের শাসন-আল্‌গা বন্যা-স্রোত উদ্বেল ক'রে আন্‌বার জন্যে গো? কার জন্যে? —দূর! এও কি কথা? চকিতে এত বেশী পন্থই সে ভেবে ফেল্‌লে। কেন না, এর আগে নীরদ প্রণয় কি কিশোরী দুই-এরই দিকে একেবারে অমনোযোগী ছিল—মেয়েদের মুখের পানে চোখ তুলে সে ক্বচিৎ চেয়েছে।

তারপর দিন থেকেই তরুণ এখন কান পেতে শোনে, ও-বাড়ীর কার কণ্ঠে কেঁপে কেঁপে মধুর মধুর কথা আর সুরে কি রাগিণীটি লহরে নাচিয়ে-তোলা মূর্চ্ছনায় বেজে ওঠে! কার আঁচলের সে ঈষৎ অরুণিম আভাষ যদি আর একটীবার চোখে পড়ে! ভঙ্গিম অঙ্গ দুলিয়ে চলে যাবার ছন্দে-লয়ে মন্দ তার পায়ের ধ্বনি যদি একবারটী কানে আসে! ঐ মেয়েটীর চুড়ির রুনুরুনি আর তার এলো চুলের গন্ধ ব'য়ে দখিণ হাওয়া দমকা এসে তার খোলা জান্‌লা দিয়ে ঘরে ঢুকে নীরদের তপ্ত গায় যদি বাতাস ক'রে যায়! কিন্তু কল্পনার কিছুই সত্যি হয়ে উঠ্‌তো না। বেচারী ব্যর্থ নিশীথ রাতে জেগে ব'সে বেহালাখানি বেঁধে নিয়ে সেই রাগিণীটা তেম্‌নি মিঠে ক'রে বাজায়। ও-বাড়ীর মেয়েটীর গলায় যা সকল গানে সকল-বাণী-হারা সুরের স্বপ্ন বুলিয়ে বেজে ওঠে। নীরদের যন্ত্রের তারে, তার আঙুলের যন্তের আঘাতে গায়িকার গলার সে কোমল নিখাদে কড়ি চড়ায় ঝঙ্কার দিয়ে চম্‌কে ওঠা গমকটী অবধি খাঁটি হ'য়ে ফুটে ওঠে। করুণ সে মিশ্র রাগিণীর কল-আলাপ, গভীর রাতের নীরব সুপ্তির মাঝখানে তার বাঁধন-হারা বুকে মৌন কাঁদন এমনি ভাবেই ব্যক্ত ক'রে তুল্‌তো। পুষ্পরাণীও কি আর এক-একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে শুন্‌তে শুন্‌তে চোখের জলের ঝরণা ঝরিয়ে বুকের আঁচল ভিজিয়ে ফেল্‌তো না!

এমনি ক'রে ক'দিন পরে পুষ্প একদিন বিকেল বেলা মেজদার টেবিলের উপর জল-খাবারের রেকাব আর চায়ের বাটিটী রেখে পাশের আধ-খোলা জান্‌লাটা একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়ে দাঁড়ালো। মেজদা, একটু

অবাক হ'য়ে যেন বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"জান্‌লাটা আবার বন্ধ ক'রে দিলে কেন?"

পুষ্প দুখানা ঠোঁটের উপর ঈষৎ হাসিটুকু চেপে নিয়ে বল্‌লে—"ও-বাড়ীর জানলা খুলে দিয়ে পাশে ব'সে একজন কে সারাদিনই পড়েন!"

মেজদা চম্‌কে গিয়েছে যেন—এম্‌নি ভাব দেখিয়ে বল্‌লে,—"সে কি কোনো দিনও তোর মুখের পানে চোখ তুলে কি ভুরু বেঁকিয়ে চেয়েছে?"

পুষ্প শুধু বল্‌লে—"না।"

মেজদা বেশ সোজা হয়ে উঠে ব'সে বল্‌লে—"হ্যাঁ, তা আমি জানি। তবে যদি তোদের কখনো চোখে চোখে প'ড়ে গিয়েও থাকে—সে হঠাৎ—ও তা mean করেনি! কেমন—না, তুই বল্‌তো সত্যি কথা?"

পুষ্প মুখখানা নীচু ক'রে উত্তর দিলে—"তাও শুধু এক দিন—একটীবার মোটে।"

গম্ভীর হয়ে গিয়ে মেজদা বল্‌লে,—"তুই জানিস্ নে—ও কি ছেলে! আমাদেরই সঙ্গে পড়ে, এবার ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট—ওই-ই হবে।"

"হবেন?" বল্‌তে আহ্লাদে পুষ্পর সারা অঙ্গে যেন একটা স্পন্দন সাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। মেজদা তা লক্ষ্য করেও ভাবটা বুঝ্‌তে না দিয়ে বল্‌লে,"ফার্ষ্ট যদি ও না হয়—তা হ'লে বুঝ্‌বো, ভগবান নেই। অমন পরাণ-পণ-করা পড়ার সাধনা ব্যর্থ হতে পারে না। ওর যে কি কষ্ট, পুষ্প! দুবেলা পেট ভ'রে খেতেও পায় না। পরের বাড়ী—তারা কি আর তেমন যত্ন করে! জলখাবার দুটী মুড়ীমুড়কিও ওর জোটে না। নেহাৎ গরীব—পয়সা নেই যে খাবার কিন্‌বে!"

পুষ্প কেন যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, "আহা।"

মেজদা বলেই চল্‌লো—"কলেজ থেকে এসেই মুখটী গুঁজে পড়তে বসে—কত রাত পড়েই কাটিয়ে দেয়। কেন না এর-ওর বই চেয়ে নিয়ে, নয়ত হাতে লিখে যে ওর পড়া তোয়ের কর্‌তে হয়। চেয়ে-আনা বই সময়-মতন আবার ঠিক ফিরিয়ে দেয়! সখের ভিতর ওর আছে শুধু একটু বাজানোর খেয়াল। একজনকে একখানা note নকল করে দিয়ে দশটা টাকা পেয়েছিল, তাই দিয়ে সেদিন একখানা বেহালা কিনেছে। প'ড়ে প'ড়ে যখন বড় শ্রান্ত হয়, তখনই যন্ত্রটী নিয়ে বসে—বাজায়ও বেশ।"

পুষ্প জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তুমি শুনেছ মেজদা, ওঁর বাজনা?"

"শুনেছি বই কি!"

পুষ্প একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ফেল্‌লে—"আমায় শোনাবে একদিন ওঁর বাজনা—মেজদা?"

—"আচ্ছা, বল্‌বো নীরদকে।"

পুষ্প এবার মেজদার ঘাড়টীর উপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "মাঝে মাঝে কলেজের পর ওঁকে নিয়ে আসনা কেন, মেজদা? এখানে তো একটু চা খেয়ে যেতে পারেন্।"

মেজদা বল্‌লে—"তাইত রে—এ কথাটা কিন্তু আমার একবারও মনে হয় নি। আচ্ছা, আমি কালকেই নীরদকে ডেকে আন্‌ব—কিন্তু—"বলে মেজদা হেসে ফেল্‌লে।

পুষ্প জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কিন্তু বলে হাস্‌ছো যে!"

"তুই বেরোবি তো তার সুমুখে?"

"বেরোবো।"

মেজদা হেসেই বল্লে—"রাখ্ তোর কথা! কোনো ফাঁকে যদি একবারটী দেখে ফেলে, সেই ভয়ে জান্‌লাটা অবধি খুলিস্‌নে—তুই আবার সাম্‌নে বেরোবি!"

"বেরোবো বল্লুম, তুমি দেখো—যদি তুমি মত দাও।"

মেজদা জান্‌তো, নীরদের স্বভাব স্ফটিক-শিলার মত। কলঙ্কের কাজল-আঁচড় সে চরিত্রের উপর একটা তিলও কালো করে তুলতে পারে না। তার মুখে অশ্লীল কথা একটী দিনও সে কখনো শোনে নি। কতদিন রাস্তায় একসঙ্গে বেরিয়ে গাড়ীর ভিতরকার কোনো তরুণীর চোখের কথা নিয়ে গল্প জম্‌কে তুলেছে—কিন্তু নীরদ একবারটী সে দিকে তাকিয়েও দেখেনি, কিম্বা তাদের কথায় যোগ দিয়ে কোন জবাবও করেনি। নীরদকে নিঃসন্দেহে, নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস কর্‌তে পারে বলেই মেজদা বল্‌লে—"হ্যাঁ—আমি পুরোপুরি মত দিচ্ছি—বুঝলি! আর—"

দুষ্টুমির হাসি হেসে "ও-ও ত ব্রাহ্মণ, আমাদেরই স্বশ্রেণী।" বলে মেজদা কথা শেষ কর্‌লে।

"তোমার মুণ্ডু"—বলে পুষ্প পালিয়ে গিয়ে দোরের পাশ থেকে বল্‌লে—"কাল তবে ওঁকে ডেকে এনো মেজদা!"

চেঁচিয়ে উঠে মেজদা ডাক্‌লে, "এই শোন্, শোন্ পুষি—এরি মধ্যেই—ওঁকে—আলাপ না হতেই?—আচ্ছা,—ওঁকে কাল ডেকে আনবো—"

এবার পুষ্প ছুটে চলে গেল। যাবার সময় তার কচি হাতখানার কোমল মুঠোটী পাকিয়ে মেজদাকে একটী কিল দেখিয়ে গেল। মেজদা নিজের মনেই নিজে হেসে উঠে ভাবলে, লক্ষ্মী বোনটী আমার—নীরদও কি ছেলেটী খারাপ!

তার্‌পর দিন মেজদা নীরদকে নিয়ে এল। আজ প্রথম দু'জনে মুখোমুখি দেখা হলো, এত কাছাকাছি। নীরদ একবার মুখ তুলে পুষ্পর দিকে তাকাতেই লজ্জায় সে মুখখানা নামিয়ে নিলে—টেবিলের উপর চায়ের বাটিট রাখ্‌বার সময় হাতখানা কেঁপে গিয়ে এক ঝলক চা "সসার"-খানার উপর চল্‌কে পড়লো—বুকের ভিতরে একটা যেন কি কেমন করে শিউরে উঠ্‌ছিল—নীরদও আর মুখ তুল্‌লে না—তার মাথার ভিতর কি যেন ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছিল।

মেজদা বল্লে, "নীরদ, আমার বোন্ পুষ্প, আর পুষ্প—বাবু নীরদশঙ্কর বাগচী বি, এ, আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড!"

পুষ্প ছোট্ট ক'রে বল্‌লে,—"নমস্কার।" তার হাত দুখানি আস্তে আস্তে উঠে কপালে গিয়ে ঠেক্‌লো। নীরদ তার চেয়েও ছোট ক'রে প্রতি-নমস্কার নিবেদন কর্‌লে। মেজদা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কেমন দেখ্‌ছিস্ নীরদ, বোনটীকে আমার?"

নীরদ বুঝি মনে মনে ঠিক তাই-ই ভাব্‌ছিল—চট ক'রে বলে ফেল্‌লে—

A violet under the mossy stone
Half-hidden from the eye!"

পুষ্প তখন মেজদার পিছনে আলমারীটীর পাশে দাঁড়িয়েছিল। কথাটা শুনে মুখ একেবারে নীচু ক'রে লজ্জায় একটু সরে দাঁড়ালো। মেজদা হো-হো করে হেসে উঠে বল্‌লে—"এমন ক'রে তুই পুষির সাম্‌নে আমায় অপমান কর্‌লি—"under a mossy stone! আমি কালো বলেই কি mossy stone রে হতভাগা?"

পুষ্প মুচ্‌কে হেসে উত্তর দিলে, "কিন্তু খুব apt quotation"

"হ্যাঁ, তা বই কি—তুমি একেবারে ফুটন্ত violet!"

মেজদা এই কথা বল্‌তেই "পান নিয়ে আসি" ব'লে পুষ্প বেরিয়ে গেল।

তারপর থেকে নীরদ বিকেল বেলা প্রায় রোজই এসে পুষ্পদের বাড়ী চা খায়। পুষ্পর মা তাকে "বাবা" বলে ডাকেন। রঙ-বোলানো গল্প, ভুল-ভোলানো গান, আর পুষ্পর ফুল-ফোটানো হাসিতে সন্ধ্যা অবধি বেশ কাটে। মেজদা তার নানান কারু চক্‌মকিয়ে চিকন ডোরে বাঁধা "অ্যালবাম" খুলে কত ঢংএর ছবি দুজনকে দেখায়;—কখনো বা নীরদের কাছে এলিজাবেথান পিরিয়ডের নাটকগুলির টুক্‌টাক্ খুঁটিনাটী, যত রকমের সমালোচনা তার হ'তে পারে—মন দিয়ে শোনে, আর পুষ্প পাশে বসে নীরদের মুখের দিকে তাকিয়ে তার বলার ভঙ্গী, এত জানা-শোনা ভেবে মনে মনে মনটাকে হারিয়ে ফেলে। নীরদ বেহালার তারে সুর বাজায়, পুষ্প একমনে বসে শোনে—আবার নীরদের হাতের "কেদারা-খানি" পুষ্প এস্রাজে কেমনটী তুলেছে, মেজদা আর নীরদের কাছে তার পরীক্ষা দেয়। নীরদ যখন তার প্রশংসা ক'রে বলে ওঠে, "চমৎকার!" পুষ্পর তখনই কেন যেন "কোমল"টা পড়ে গিয়ে বাজনা ভুল হয়ে যায়—আর মেজদা অম্‌নি হেসে ওঠেন।

এম্‌নি ক'রে এত কাছাকাছি থেকে দুজনকারই দূর-থেকে হারিয়ে-যাওয়া আত্মা একান্ত মেশামিশি হয়ে যাবার জন্য দিন দিন আকুল হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু শুধু ইঙ্গিতে, আভাসে ছাড়া সে চঞ্চলতার নিগূঢ় নিবেদন কেউ-ই স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত হতে দিলে না; তবু নীরদের নাম শুনেই পুষ্পর চোখের তারা একটা যে অপরূপ আলোক-লোকের পুলক-স্পর্শে চঞ্চল হয়ে চকিতে বিজলী-দেয়ালীর হীরক জ্বালার মত জ্বলে উঠতো—পুষ্পর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে, নীরদের মুখের ভিতর প্রশ্নটা কি-যেন কেমন জড়িয়ে আস্‌তো, মেঝদা তাই থেকে ঠিক-ই ধরে ফেলেছিল যে, তরুণ-তরুণীর অন্তরের কল্প-পটে একটা মোহন-স্বপ্নের যাদু-তুলি—গাঢ় একটা কাঁচা রঙ সবুজ ফলিয়ে বুলিয়ে গিয়েছে। এদের দুখানি হাতে ফুলের মালার বাঁধন দিয়ে অন্তরের তার দুটী একান্ত এক সুরে এবার বেঁধে দিতে হবে।

এই ভেবে এম, এ পরীক্ষা হ'য়ে গেলে মেজদা রাঁচিতে চলে গেল—সেখানে তার বড়দা বড় আপিসের বড় বাবু।

নীরদ গোটা-কতক টাকা যোগাড় করে নিয়ে পাহাড়ে চলে গেল চাকরির তদ্বির ক'র্‌তে, আর পুষ্প এদিকে যখন-তখনই মেঝদার পড়ার ঘরে বসে এস্রাজটীতে তার সেই "কেদারা" খানাই ঘুরে ঘুরে, ঝর ঝরে

তাল-বাহারের তালে দুলিয়ে হাতের গয়নার রনন-শিঞ্জন আর গলার সুর-গুঞ্জনের সঙ্গে ঝঙ্কৃত করে তুলে নীরদের মুখখানি মনে করে—তার হাসির স্মৃতি-রেখায়—নামটী প্রিয়ের, মর্ম্মের পাতায় তার, মাণিকের কিরণ দিয়ে লিখে নেয়।

প্রায় তিনমাস পরে এম,এ পরীক্ষার ফল বেরোলো যেদিন, মেজদা সেইদিন রাঁচি থেকে ফিরে এল। পুষ্প ছুটে এসে পায়ের ধূলো নিতেই মেজদা বল্লে, "পুষ্পি, নীরদ first হয়েছে—আর আজকের গেজেটেই বেরিয়েছে ইউনিভারসিটী নমিনেসনে সে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট appointed হল—কিন্তু—"

এই চিন্তার ভিতর একটা কি ক্ষোভের কাতরতা ক্রন্দনের গুরু লাঞ্ছনায় গুঞ্জরিত যে হয়ে উঠ্‌ছিল! পুষ্পর ঠোঁটের উপর দিয়ে আধখানা ফুটে-ওঠা হাসিটুকু মেজদার ঐ কথার কান্না-ভেজা ব্যথার সুরে চট ক'রে কালো হয়ে গেল। সে কিছু না বলে মেজদার পানে তাকিয়েই রইল, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা তার তখন কি-যেন এক অজানা আশঙ্কায় দপ দপ করছিল। মেজদার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল, টল্‌টল ক'রে এলো—সে অতি আস্তে আস্তে বল্‌লে,—"বড়দাকে অনেক ক'রে বুঝিয়েছিলাম পুষ্প, কিন্তু কিছু হলো না।"

পুষ্প নীরবে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে মেজদার বিছানার উপর নীরদ যেখানটায় এসে বস্‌তো, সেইখানে উপুড় হয়ে পড়ে বালিসে মুখ গুঁজে রইল। মেজদা তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লে,—"কাঁদো পুষ্প, বিধাতা যে আমায় তোর বড়দা করেন নি—"বলে কান্না চাপ্‌তে না পেরে বেরিয়ে গেল।

সেইদিনই বড়দার তার এলো, মীর্‌-গঞ্জের ধনী জমিদার বগলা বাবুর এল, এ পড়া ছেলের সঙ্গে পুষ্পর বিয়ে, মাঘ মাসের চৌঠো তারিখে।

চৌঠো তারিখেই বৈকালে, সূর্য্য যখন ডুবে যাচ্ছিল, সেই সময় মেজদার লেখা এই প্রাণ-ভাঙা কাঁদাকাটীর শেষে নীরদ পুষ্পর হাতের দু-ছত্র লেখায় পড়লে :—

"সমাজের পাওনা নাকি প্রাণের দাবীর চেয়েও ঢের বেশী, তাই বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দিলাম—তুমি আমার স্বগোত্র!"

সব-শেষের হরফ্‌ কটী পিংশে লালে লেখা।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

চিরন্তনী

যে দিন প্রথম ঊষা সৃজনের মহাসিন্ধু-তীরে
আঁধারের তটরেখা বিদীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে
আপনার পরিপূর্ণ সুধাময় আলোক-উচ্ছ্বাসে
উদ্ভাসিয়া উঠেছিল,—মহাপ্রাণ অমৃত প্রকাশে
চেতনা বিতরি বিশ্বে ;

তোমায় আমায় সেইদিন—
স্তব্ধ, শান্ত, সুপ্রসন্ন ঊষার আলোকে, বাধাহীন
উন্মুক্ত আকাশতলে—নয়নে নয়নে পরিচয়।
চির-অন্বেষণ-ক্লান্ত পথশ্রান্ত পান্থ এ হৃদয়
প্রথম-আলোক-মুগ্ধ, দাঁড়াইল তোমার দুয়ারে
বহু যুগযুগান্তের আলোহীন সাধনার পারে
দোঁহাকার।

সেই তুমি, নহ তুমি নহ ক্ষণিকের।
সৃষ্টির কল্পনা মাঝে তুমি আমি প্রথম বিশ্বের।

শ্রীজীবনময় রায়।

মিলিতোনা

৮

আন্দ্রের দৈহিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ হওয়ায় এবং মিলিতোনার অবিশ্রান্ত সেবা-শুশ্রূষায় আন্দ্রের শরীর শীঘ্রই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইল। এখন আন্দ্রে কথা কহিতে পারে, একটু উঠিয়া বসিতেও পারে। সে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা আবার অনুভব করিতে লাগিল। বড়ই মুস্কিল,—অবস্থাটা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

আন্দ্রে ঠিক্‌ অনুমান করিয়াছিল যে, তাহার অন্তর্ধানে ফেলিসিয়ানা, ডন্‌ জেরোনিমো এবং তাহার বন্ধুবান্ধবেরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন—এবং এই উদ্বেগ নিবারণের জন্য সে এখনো কোন চেষ্টা করিতেছে না বলিয়া, মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিল। তথাপি, সে যে একজন সুন্দরী তরুণীর কক্ষে রহিয়াছে, সেই তরুণীর জন্যই সে ছোরার আঘাতে আহত হইয়াছে, এই-সব কথা তাহার "নব্যাকে" বলিতে বড় একটা গা করিল না। এ কথা কবুল করা বড়ই শক্ত, অথচ কবুল না করাও অসম্ভব।

আন্দ্রে প্রথমে যখন এই কপাল-ঠোকা কাজে প্রবৃত্ত হয় তখন উহা এতদূর গড়াইবে বলিয়া মনে করে নাই। সে মনে করিয়াছিল একজন নগণ্য বালিকার সঙ্গে গোপনে প্রেম করা—এ-ত অতি তুচ্ছ লঘু ব্যাপার। কিন্তু মিলিতোনার সেবাপরতা, আত্মোৎসর্গ ও সাহস মিলিতোনাকে আর-এক পংক্তিতে স্থাপন করিয়াছে। যখন মিলিতোনা জানিতে পারিবে যে, আন্দ্রে পূর্ব্বেই আর এক রমণীর সহিত বাগ্‌বদ্ধ তখন সে কি বলিবে? ফেলিসিয়ানা রাগ করিবে; ইহা অপেক্ষা মিলিতোনা কষ্ট পাইবে এই কথাই আন্দ্রের মনে বেশী জাগিতেছিল। ফেলিসিয়ানার নিকট ইহা একটা অযোগ্য শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কাজ বই আর কিছুই নয়—কিন্তু মিলিতোনার পক্ষে ইহা দারুণ নৈরাশ্য। মহা বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও মহত্ত্বের সহিত যদি এই প্রেমের কথা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ইহাই কি তাহার পুরস্কার হইবে? জুয়াঙ্কো আবার যদি আসিয়া মিলিতোনাকে আক্রমণ করে—তাহার উপর জোর-জবর্দ্দস্তি করে? তাহা হইলে আমায় কি তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে না?

আন্দ্রে মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি করিতে লাগিল; এবং এইরূপ চিন্তা করিবার সময়, মিলিতোনার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল। মিলিতোনা জানালার ধারে বসিয়া সূচিকর্ম্ম করিতেছিল। কষ্টের প্রথম মুহূর্ত্তগুলা কাটিয়া গেলেই, সে আবার তাহার নিত্য-নিয়মিত জীবিকা-নির্ব্বাহের শ্রমসাধ্য কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। একটি ঈষদুষ্ণ নির্ম্মল আলোক-কিরণ মাতার স্নেহ-আদরের ন্যায় তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই আলোক-কিরণের ঈষৎনীলাভ মৃদুকম্পন মিলিতোনার কেশ-বন্ধনের ফিতাগুলার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। তাহার সেই প্রচুর কুন্তলরাশি মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে জড়ান ছিল। কর্ণমূলের উপর বিন্যস্ত একটি লালরঙের

গোলাপ, ঐ কৃষ্ণবর্ণকে আরো যেন ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সবশুদ্ধ মিলিতোনাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহাতে আবার নীল আকাশের একটা কোণ, যাহার উপর টবে-রক্ষিত পত্রপুষ্পের রেখাবয়ব অঙ্কিত ছিল,—সেই নীল আকাশের কোণটি যেন তাহার সুন্দর মুখচিত্রের পশ্চাদভূমিস্বরূপ হইয়াছিল। ঝিল্লি ও বারুই পাখী পালা করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছিল, টবের সুরভি পত্রপুষ্পের সৌরভে পরিসিক্ত হইয়া সুমন্দ গন্ধবহ ঘরের ভিতর একটা মৃদুমন্দ সুগন্ধ বহিয়া আনিতেছিল।

ঘরের ভিতরকার সাদা দেয়াল, জ্যাবড়া রংকরা কতকগুলি জন-প্রিয় খোদাই ছবিতে বিভূষিত। ঘর আলো করিয়া মিলিতোনা ঘরে থাকায় ঘরের একটা অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। ইহাই আন্দ্রেকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই অকলুষ দৈন্য, এই কুমারী-সুলভ নগ্নতায় আন্দ্রের অন্তকরণ পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। নির্দ্দোষ ও গর্ব্বিত দারিদ্রের মধ্যে একটা কবিত্ব আছে। একজন সুন্দরী ললনার জন্য কত অল্প জিনিসই দরকার!

এই সাদাসিধা ঘরটির সহিত ফেলিসিয়ানার আড়ম্বর-বহুল কামরা ও খারাপ রুচির তুলনা করিয়া ফেলিসিনিয়ার কামরার দেয়াল-ঘড়ি, পর্দ্দাগুলা, ছোট ছোট মূর্ত্তি ও কাচের ছোট ছোট কুকুরগুলা আন্দ্রের নিকট আরো বেশী হাস্যজনক বলিয়া মনে হইল।

এই সময় রাস্তায় একটা টিং-টিং টুং টাং শব্দ শোনা গেল।

মিলিতোনা হাতের শিল্পকাজটা টেবিলের উপর রাখিয়া সহর্ষে বলিল :—এই যে আমার প্রাতর্ভোজনের খাদ্য-সামগ্রী এল বুঝি। আমি নীচে নেমে যাই—আসবার পথে ওদের আট্‌কাতে হবে। আজ একটা বড় পাত্রে খাবার-গুলা নিতে হবে—কেননা, আজ আমরা দুজন আর ডাক্তারও তোমাকে কিছু খেতে বলে গেছেন।

আন্দ্রে একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল :—

-- আমার মত অতিথির উদর পূরণ করা তোমার পক্ষে শক্ত হবে না।

—ও কি কথা! 'খেতে খেতেই খিদে হয়',—বিশেষতঃ যদি রুটিটা সাদা হয় আর দুধটা খাঁটি হয়; যে লোকটা আমাকে এ-সব জিনিসের যোগান দেয়, সে আমাকে কখখনো ঠকায় না।

এই কথাগুলি বলিয়া মিলিতোনা একটা পুরাতন গীতের একটা চরণ গুনগুন স্বরে গাহিতে গাহিতে অন্তর্হিত হইল। কয়েক মিনিট পরে আবার ফিরিয়া আসিল। গাল দুটি লাল হইয়াছে, আস্তে-খাস্তে সিঁড়ির ধাপ দিয়া আরোহণ করায় নিঃশ্বাস খুব জোরে পড়িতেছে—হাতের তেলোর উপর, সফেন দুগ্ধে পূর্ণ একটা বাসন ধরিয়া আছে।

—আশা করি, আপনাকে আমি অনেকক্ষণ একলা রেখে যাই নি মহাশয়। ৮০ টা ধাপ দিয়ে নামা—বিশেষতঃ ওঠা!

—তুমি পাখীর মত চটুল চট্‌পটে। এই কালো সিঁড়িটা দেখছি এখানে স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে দাঁড়াবে।

একটা হেঁয়ালি ভাবিয়া নিতান্ত সরলভাবে মিলিতোনা জিজ্ঞাসা করিল :—

—কেন?—ঠিক সেই সময় মিলিতোনা দুধের দুই ভাগ করিয়া সবেমাত্র রাখিয়া

দিয়াছে। আন্দ্রে তাহার একটি হাত আপন ঠোঁটের দিকে টানিয়া লইয়া উত্তর করিল :—

—কারণ ঐ সিঁড়ি দিয়ে একজন দেবী নেমে গিয়েছিলেন।

—প্রশংসা থাক্, এখন দুধটুকু আর এই রুটিটা খান দিকি মশায়, এর পর আর যখন কিছু পাবেন না, তখন আমাকে বোধ হয় স্বর্গের রাণী বলে ডাক্‌বেন।" এই কথা বলিয়া মিলিতোনা একটা শাম্‌লা রংঙের সুস্বাদু চ্যাপটা ও নিরেট পাঁউরুটির চতুর্থ অংশে একটা শাম্‌লা পেয়ালা অর্দ্ধেক ভরিয়া সেই রংঙের পিয়ালাটা আন্দ্রের সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল! রুটিটা স্পেনীয় ধরনের,—খুব ধব্‌ধবে সাদা।

আহা! বড় রোগা হয়ে গেছ; তুমি যখন সামান্য লোকের পোষাক পরেছ, তখন তাদের মত তোমাকে আহারও করতে হবে। তাহলে তোমার ছদ্মবেশটা পূরাপুরি রকমই হবে।

এই বলিয়া মিলিতোনা পেয়ালার উপরি-ভাগে দুধের যে ফেণা উঠিয়াছিল তাহার উপর ফুঁ দিতে দিতে এক এক ঢোঁক্ দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। তাহার টুক্‌টুকে ঠোঁটের উপর দুগ্ধের একটা সুন্দর সাদা রেখা পড়িয়া গেল।

মিলিতোনা বলিল :—

—ভাল কথা,—এখন ত তুমি কথা কইতে পারচ, এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি। তোমাকে প্রথমে যখন সেই ষাঁড়ের সার্কাসে দেখেছিলাম, তখন তোমার গায়ে একটা সুন্দর লম্বা কোর্ত্তা ছিল, তুমি সেই সময়ে প্যারিসের হাল-ফ্যাসানী পোষাক পরে ছিলে; কিন্তু যখন তোমাকে আমরা আমার বাড়ীর দরজার সম্মুখে দেখ্‌লাম, তখন তোমার গায়ে শ্রমজীবির পোষাক ছিল। কখন না-জানি তুমি এই রকম ছদ্মবেশ করলে? যদিও বহির্জগতের সঙ্গে আমার বেশী পরিচয় নেই, তবু আমার বিশ্বাস, তোমাকে যে পোষাকে প্রথমে দেখেছিলাম, সেই পোষাকটাই তোমার আসল পোষাক। তোমার হাতদুটি ছোট ছোট ও সাদা; এতেই প্রমাণ হচ্চে তোমায় কখনো খেটে খেতে হয় নি।

—মিলিতোনা, তুমি ঠিক বলেছ; তোমাকে আবার একবার আমি দেখ্‌ব,—আর তুমি কোন বিপদে না পড় এই মনে করেই পোষাক পরেছিলুম। আমি যে কাপড় সচরাচর পরি, সে কাপড় দেখলে শীঘ্রই এ অঞ্চলের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাই এই কাপড় পরে আমি জনতার মধ্যে ছায়ার মত মিশে গিয়াছিলাম। ঈর্ষার দৃষ্টিতে না দেখ্‌লে আমাকে কেহই চিন্‌তে পারত না।

লজ্জায় মিলিতোনার মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল—মিলিতোনা আবার বলিল :—

—ঈর্ষার দৃষ্টি শুধু নয়, প্রেমের দৃষ্টিও বটে। তোমার ছদ্মবেশ আমাকে এক মিনিটের জন্যও ঠকাতে পারেনি। আমি মনে করেছিলাম, তোমাকে যে আমি সার্কাসে আমার সঙ্গে কথা কইতে বারণ করেছিলাম, তাতেই তুমি একেবারে থেমে যাবে। তখন আমি তাই চেয়েছিলাম বটে, কেননা যা পরে ঘটবে তা আগে থাক্‌তেই আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। কিন্তু তবু তুমি যে অতটা আমার কথার বাধ্য হবে সে জন্যও আমি দুঃখিত হয়েছিলাম।

—সেই ভয়ঙ্কর জুয়াঙ্কো সম্বন্ধে আমি যদি তোমাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাহলে বল্‌বে কি ?

মিলিতোনার নেত্র অবোধ সরলতার আলোকে আলোকিত—তাহার ললাট আন্তরিকতার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল—মিলিতোনা আন্দ্রের দিকে ফিরিয়া উত্তর করিল :—

—ওঁচানো ছোরার মুখে, আমি কি তোমাকে বলিনি,—আমি তোমাকে ভাল বাসি ? ও-সবের উত্তর আমি কি তোমাকে আগেই দিইনি ?

জুয়াঙ্কোর সহিত মিলিতোনার গুপ্ত-প্রণয় সম্বন্ধে আন্দ্রের যাহা-কিছু সন্দেহ ছিল, সমস্তই বাষ্পের মত উবিয়া গেল।

—তাছাড়া, যদি তোমার শুন্‌তে ভাল লাগে, তাহা হলে দুই-চার কথায় আমার ও জুয়াঙ্কোর ইতিহাস তোমাকে আমি বল্‌ব। প্রথমে আমার নিজের কথা থেকে আরম্ভ করা যাক্। আমার পিতা, সামান্য একজন সৈনিক, ঘরোয়া-যুদ্ধের সময়, এক দলের পক্ষ নিয়ে, যুদ্ধে বীরের মতো নিহত হন। কোনও সঙ্কীর্ণ গিরি-কণ্ঠে এই যুদ্ধ না হয়ে, যদি একটা প্রসিদ্ধ বড় যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধটা হত, তাহলে কবিরা নিশ্চয়ই তাঁর বীরত্ব কীর্ত্তন করত। আমার মা আমার পিতার বিয়োগে আর অধিক দিন বাঁচলেন না। ১৩ বৎসর বয়সে আমি অনাথা হলেম। তখন থেকে আল্‌দঞ্জা ছাড়া আমার আর কোন আত্মীয়া রইল না। তবে, আমার অভাব খুব কমই ছিল ;—জননী জন্মভূমি স্পেন—যিনি সূর্য্য দিয়ে, আলো দিয়ে তাঁর সন্তানদের পোষণ করেন, তাঁর স্নেহপূর্ণ আকাশের তলে, আমি হাতের কাজ করে জীবিকানির্ব্বাহ করতে লাগলেম। আমার সব-চেয়ে বেশী অর্থব্যয় হত, প্রতি সোমবারে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যাওয়ার দরুণ ; আর, সচরাচর ভদ্র মহিলাদের মতো আমাদের ত আর পাঠাগার নেই, পিয়ানো নেই, থিয়েটার নেই, সন্ধ্যা-সম্মিলনী নেই ; আমাদের ভাল লাগে শুধু সাদাসিদা ধরণের তামাসা, জমকালো ধরণের তামাসা,—যেখানে মানুষের সাহস, প্রচণ্ড পাশব হিংস্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেই তামাসার জায়গায় জুয়াঙ্কো আমাকে দেখেছিল ; আর আমাকে দেখে, আমার উপর তার প্রচণ্ড-উগ্র, অন্ধকারময় একটা ভালবাসা পড়েছিল। তার পুরুষজনোচিত রূপলাবণ্য সত্ত্বেও, তার জাঁকালো ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ সত্ত্বেও, তার অতিমানবিক কীর্ত্তিকলাপ সত্ত্বেও, আমার মনে সে কখন কোন-কিছুর উদ্রেক করতে পারে নি···যা কিছু সে করত, তাতে আমার মর্ম্মস্পর্শ করা দূরে থাক্, তার উপর আমার বিরাগ আরও যেন বেড়ে যেত।

"তবু, সে আমাকে এতটা ভাল বাসত —দেবতার মত পূজো করত যে, অনেক সময়, আমার মনে হ'ত, তার ভালবাসার একটু সায় না দিলে, আমার অকৃতজ্ঞতা হবে। কিন্তু ভালবাসা ত আমাদের ইচ্ছাধীন নয়! ভগবানের যখন মর্জি হয় তখনই তিনি আমাদের কাছে ভালবাসা পাঠিয়ে দেন। জুয়াঙ্কো যখন দেখ্‌লে আমি তাকে ভাল বাসিনে, তখন তার মনে অবিশ্বাস সন্দেহ ও ঈর্ষার ভাব এসে পড়ল।

সর্ব্বদা আমাকে ঘিরে থাক্‌ত, আমার উপর সর্ব্বদা নজর রাখত, আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করত, এবং সর্ব্বত্র নিজের মন-গড়া প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে বেড়াত। আমার চোখের উপর, আমার ঠোঁটের উপর, নিয়ত তার দৃষ্টি থাক্‌ত।

আমার একটা দৃষ্টিতে, একটা কথায়, সে ঝগড়া করবার একটা ওজর খুঁজে পেত। সে আমার চারিদিকে একটা বিজনতা গড়ে তুলেছিল এবং এমন একটা বিভীষিকার গণ্ডির মধ্যে আমাকে বন্ধ করে রেখেছিল, যে কেউ তা লঙ্ঘন করতে সাহস করত না।"

—আশা করি, ঐ গণ্ডিটা আমি চিরকালের মত ভেঙে দিয়েছি। কেননা, আমার মনে হয়, জুয়াঙ্কো এখন আর আস্‌বে না।

—অন্তত শীঘ্র আসবে না বটে ; কারণ, যতদিন না তুমি সেরে ওঠো, সে পুলিসের হাত থেকে এড়াবার জন্য পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। কিন্তু সে যা হোক্ এখন বল দিকি তুমি কে ? এই কথা জিজ্ঞাসা করবার বোধ হয় সময় হয়েছে—হয় নি কি ?

—আমার নাম হচ্চে, সাল্‌সেডো-র আন্দ্রে। আমার এতটা ধন-ঐশ্বর্য্য আছে যে, জীবিকার জন্য আমার কোন কাজ করা আবশ্যক হয় না, কারও উপর নির্ভর করতে হয় না।

মিলিতোনা একটু উদ্বেগ ও কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল :—

—"বেশ রূপবতী, বেশ বেশ-ভূষায় ভূষিতা, বেশ ধনশালিনী তোমার কি কোন নিন্দা নাই ?"

মিথ্যা কথা বলিতে আন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলাও শক্ত ; তাই আন্দ্রে অস্পষ্টভাবে একটা উত্তর দিল।

মিলিতোনা আর কিছু বেশী জেদ করিল না। কিন্তু তার মুখ একটু বিবর্ণ হইল, একটু চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল।

"আমাকে একটা কলম আর একতক্তা কাগজ আনিয়ে দিতে পার কি ? আমার কতকগুলি বন্ধুকে আমি লিখ্‌তে চাই। আমি হঠাৎ অন্তর্ধান করায় তাঁরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। আমার বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলে' আমি তাঁদের আশ্বস্ত করতে চাই।"

তরুণী খোঁজ করিয়া কিয়ৎকাল পরে তার ডেক্‌সের দেরাজ হইতে, এক তক্তা পুরাণো চিঠির কাগজ, একটা ট্যারা-বাঁক কলম, একটা দোয়াত—যাহাতে কালি শুকাইয়া একেবারে কাঁই হইয়া গিয়াছে—আনিয়া দিল।

কাদার মত কালিতে দুই-চার ফোঁটা জল মিশাইয়া একটু তরল করিয়া লইয়া, কাগজখানা কোলের উপর রাখিয়া ডন্-জেরোনিমোর নামে এই পত্রখানি লিখিল :—

"আমার অন্তর্ধানে উদ্বিগ্ন হবেন না ; একটা দৈব দুর্ঘটনা—যার পরিণাম গুরুতর নহে—কিছুকালের জন্য আমাকে এই গৃহে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। ঐ দুর্ঘটনার পর আমাকে এই গৃহে উঠাইয়া আনা হয়। আশা করি, আর কিছু দিনের মধ্যেই, ফেলিসিয়ানার চরণ-তলে আমার প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য যাইতে পারিব। ইতি

"সাল্‌সেডো-র আন্দ্রে"

একটু চাণক্যনীতি-দুষ্ট এই চিঠিখানায় বাড়ীর কোন ঠিকানা ছিল না, ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া কোন কথাই বলা হয় নাই, ঘটনাদির উপর পরে আবশ্যকমত একটু রং-চং ফলাইবার অবকাশও রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আন্দ্রে মনে করিল, ইহাতে একটু সময়ও পাওয়া যাইবে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর্গমস্থল্লা ও কোভাচুল্লার কৃপায় ডন্-জেরোনিমো আন্দ্রের সম্বন্ধে সমস্ত খবর যে পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, এ-কথা আন্দ্রে অবগত ছিল না।

আল্‌দজা মাসী চিঠিখানা লইয়া ডাকে দিতে গেল। আন্দ্রে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া, মধুর কবিত্বের উচ্ছ্বাসের প্রবাহে আপনাকে অবাধে ভাসাইয়া দিল। মিলিতোনার অধিষ্ঠানে এই দরিদ্র কক্ষটি আন্দ্রের চক্ষে, অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

আন্দ্রে প্রকৃত প্রেমের সেই অপরিসীম আনন্দ, বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিতে লাগিল—যাহা কোন প্রথাবদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না—যাহার ভিতর আত্মাভিমানের প্ররোচনা প্রবঞ্চনা, পরচিত্ত-বিজয়ের গর্ব্ব, কল্পনার অলীক জল্পনা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না; সেই প্রেম যাহা যৌবন, সৌন্দর্য্য, ও নির্দ্দোষ সরল হৃদয় এই স্বর্গীয় ত্রয়ীর যথাযোগ্য সামঞ্জস্য হইতে জন্মলাভ করে।

মিলিতোনা আন্দ্রের প্রতি স্বীয় ভালবাসা আন্দ্রের নিকট একেবারেই খপ্ করিয়া প্রকাশ করায়, দুনিয়ার রমণীরা যেরূপ বিনাইয়া-বিনাইয়া মধুর কথায় ছয় মাস ধরিয়া স্বীয় প্রেম প্রণয়ীর নিকট ক্রমশঃ ব্যক্ত করে, এবং তজ্জনিত প্রেমের মধুর রস অল্পে অল্পে প্রণয়ী চাখিয়া চাখিয়া আস্বাদ করিতে পায়, এক্ষেত্রে আন্দ্রে সেই মধুর রসপানে বঞ্চিত হইল! কিন্তু মিলিতোনা যে দুনিয়ার রমণী নহে। সে তাহার হৃদয়ের ভাব একেবারেই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

ডন্-জেরোনিমো আন্দ্রের পত্র পাইয়া, ঐ পত্রখানা তাঁহার দুহিতার নিকট লইয়া গেলেন এবং মহা উৎফুল্ল ভাবে বলিলেন :—

"এই লও ফেলিসিয়ানা, তোমার ভাবী পতির কাছ থেকে পত্র এসেছে—"

৯

ফেলিসিয়ানার পিতা ফেলিসিয়ানার হাতে যে পত্রখানি দিলেন, ফেলিসিয়ানা তাহা নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিল। কাগজের কোথাও একটু চেক্‌নাই দেখিতে না পাইয়া বলিল :—

"চিঠিতে লেফাফা নাই, শুধু একটা গালার টিপ্ দিয়া বন্ধ করা! ভদ্র আচরণের খুব বিরুদ্ধ! কিন্তু যেরূপ অবস্থায় পড়েছে তাতে একটু-আধটু ক্ষমা করা উচিত বেচারা আন্দ্রে! কি? একটা ভালো গালার কাঠিও নেই? বড়ই দুর্ভাগ্য বলতে হবে।" চিঠিটা পড়া হইয়া গেলে প্রাভোর একটি সম্ভ্রান্ত যুবককে কথায়-কথায় বলিলেন "এ-রকম বিশ্রী কাগজ কেহ কখন মনে ধারণা করতেও পারে কি, Sir Edwards?"

আন্দ্রের অনুপস্থিতি-কালে এই ভদ্র যুবক ফেলিসিয়ানার গৃহে বেশ-একটু পশার জমাইয়া লইয়াছিল। দ্বীপ-গণ্ডী-বদ্ধ ইংরাজটি অবশ্য

সূচক চাপা হাসি হাসিয়া অতি কষ্টে স্পেনীয় ভাষায় বলিল :—

"অষ্ট্রেলিয়ার বুনো-লোকেরাও ওর চেয়ে ভাল কাগজ তৈরী করতে পারে! এটা শিল্পের নিতান্ত শৈশবাবস্থার নমুনা। লণ্ডনে এই কাগজে চর্ব্বির বাতিও কেউ মুড়বে না।"

ফেলিসিয়ানা বলিল :—

"Sir Edwards, আপনি ইংরেজী বলুন, আপনি ত জানেন, আমি ইংরেজী বুঝ্‌তে পারি।"

—"না, আপনার যে ভাষা সেই স্পেনীয় ভাষাটাই আমি ভাল করে শিখ্‌তে চাই।"

এই রসিকজন-সুলভ চাটুবচনে ফেলিসিয়ানার ঠোঁটে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। বস্তুত এই ইংরাজ যুবকের কথাবার্ত্তা ফেলিসিয়ানার বড় ভাল লাগে। বেশপারিপাট্য ও সুখসুবিধা সম্বন্ধে মিলিতোনার মনে যে-একটা উচ্চ-আদর্শ ছিল, আন্দ্রে অপেক্ষা ইংরাজ যুবকটি তাহা বেশী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। যুবকটি খুব শিষ্ট না হইলেও খুব সভ্যভব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা কিছু ইনি পরিধান করিতেন তাহা খুব হাল-ফ্যাসানের ও খুব উৎকৃষ্ট। তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছদ উদ্ভাবকের নূতন উদ্ভাবনা অনুসারে প্রস্তুত করা এবং ঐ পরিচ্ছদের পেটেণ্ট করা কাপড়—জল ও আগুনের দুষ্প্রবেশ্য। তাঁহার কলম-কাটা ছুরি—একাধারে খুর, কাক্-ইস্‌ক্রু, চামচে, কাঁটা ও জলপানের গেলাস। তাঁহার টেবিল সাজাবার টুকি-টাকি জিনিষ—মোমবাতি, দোয়াৎ সিলমোহর, ও গালার বাটি প্রভৃতিতে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার ছড়িকে চৌকি করা যায়, ছাতা করা যায়, তাঁবুর খোঁটা করা যায়, এবং আবশ্যক হইলে ডোঙাও করা যায়। শ্বেতদ্বীপের বিশ্বাস-ঘাতক সন্তানেরা, খোপ্-খোপ্-করা অসংখ্য বাক্‌সের মধ্যে পূরিয়া এইরূপ আরও অনেক নবোদ্‌ভাবিত জিনিস সুমেরু হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত বহন করে।

উহারা ঘোর সংসারী লোক; জীবন ধারণের জন্য উহাদের বিস্তর সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি দরকার হয়।

যদি ফেলিসিয়ানা লর্ড-যুবকটির প্রসাধনের টেবিলটা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে একে-বারেই বশীভূত হইয়া পড়িত। তাহার যে-সব ভীতিজনক অদ্ভুত আকারের বাক্‌স ছিল, সেরূপ আকরের বাক্‌স, অস্ত্রচিকিৎসক, দন্ত-চিকিৎসক, পায়ের কড়া-ছেদক চিকিৎসকদের বাক্‌স সমস্ত একত্র করিলেও মেলেনা। আন্দ্রে বড়লোকের মত জীবন যাপনের বহুচেষ্টা সত্ত্বেও সেই উচ্চ আদর্শের কাছ দিয়াও যাইতে পারে নাই।

"বাবা, যদি আমরা আন্দ্রেকে দেখ্‌তে যাই তাহলে Sir Edwards আমাদের সঙ্গে থাক্‌বেন। তাহলে আমাদের দেখা করাটা ততটা সামাজিক বলে' মনে হবে না। কারণ, আমি তার বাগদত্তা হলেও একজন যুবা পুরুষকে দেখ্‌তে যাওয়া আমার পক্ষে সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ।"

কন্যার এই কথায় সামাজিক আব্রুরক্ষার একটু বাড়াবাড়ি দেখিয়া, জেরোনিমো উত্তর করিলেন :—"তোর যদি মনে হয়, আন্দ্রেকে দেখ্‌তে যাওয়া তোর পক্ষে দস্তুরমত কাজ হবে না, তাহলে আমি বরং একলাই যাব, আর আন্দ্রের ঠিক্ খবরাখবর সমস্তই তোকে এসে বল্‌ব।"

ফেলিসিয়ানা আবার বলিল; "যাকে ভালবাসা যায় তার জন্য কিছু আত্মত্যাগ করা আবশ্যক।"

ফেলিসিয়ানা যতই সুশিক্ষিতা হোক না কেন, তবু ত সে নারী। আন্দ্রের উপর তেমন কিছু ভালবাসা না থাকিলেও, একজন শিল্পকারী রমণী যাকে সবাই সুন্দরী বলে—সেই রমণীর গৃহে আন্দ্রেকে দেখিতে যাইবে মনে করিয়া, তাহার চিত্ত খুবই বিচলিত হইয়াছিল। তাই সে আন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি তুলিল না। কোন নারীর হৃদয় যতই শুষ্ক হোক্ না, তাহার ভিতর এমন একটা তন্তু থাকে যাহা আত্মাভিমান ও ঈর্ষার স্পর্শে আবার স্পন্দিত হইয়া উঠে।

ফেলিসিয়ানা, কে জানে কেন খুব আড়ম্বরের সহিত জাঁকালো রকমের সাজগোজ করিল। এই সব সাজ-সজ্জার উদ্যোগ উদ্যম নিতান্ত অস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অতটা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। একটা যুঝাযুঝি হইবে অনুমান করিয়া ফেলিসিয়ানা তাহার কাপড়ের আলমারা হইতে সেরা-সেরা কাপড় বাহির করিয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আপনাকে বর্ম্মাবৃত ও সুসজ্জিত করিল। একজন সামান্য শিল্পজীবী রমণীর দ্বারা সে পরাভূত হইবে, একথা তাহার মনে হয় নাই—ফেলিসিয়ানা মনে করিয়াছিলেন, এইরূপ জাঁকালো সাজ-সজ্জা দেখিয়া আন্দ্রে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে। আন্দ্রের হৃদয়ও তাহার প্রতি আরও সহজেই আকৃষ্ট হইবে।

ফেলিসিয়ানার সাজ-সজ্জা দেখিলে দুনিয়ার দর্জ্জিনী ও পরিচারিকারা নিশ্চই বলিয়া উঠিত:—"আহা! আহা! ঠাকরণ, আপনাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে।"

ফেলিসিয়ানা তাহার বড় আয়নায় একবার শেষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল এবং সন্তোষসূচক মৃদু মধুর হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল। পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রাদিতে পরিচ্ছদের যে হাল-ফেসিয়নের ছবি থাকে, ফেলিসিয়ানার পরিচ্ছদ হুবহু তাহার অনুরূপ হইয়াছিল, তাহা হইতে একটুও তফাৎ হয় নাই।

Sir Edwardsও হাল-ফ্যাসানের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ফেলিসিয়ানাকে স্বকীয় বাহু-অবলম্বন দিলেন।

এরূপ মানানসই যুগলকে রাস্তা দিয়া পাশাপাশি চলিতে কেহ কখন দেখে নাই। উভয়ই যেন উভয়ের জন্য গঠিত; উভয়ের সাজ-সজ্জায় উভয়েই বিস্ময়মুগ্ধ।

অবশেষে উহারা 'পোভায়ের' রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। যাইতে যাইতে ফেলিসিয়ানা, বাঁধানো পদ-পথের জঘন্য অবস্থা, রাস্তাদির সংকীর্ণতা, কোঠা-বাড়ীগুলার মুখ-গোম্‌সা ভাব, এই-সব বিষয় সম্বন্ধে অনুযোগ অভিযোগও না করিয়াছিল এরূপ নহে। ইংরেজ যুবকও এই সকল অনুযোগের ধুয়া গাহিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তাহার জন্মভূমির সান-দিয়া-বাঁধানো অথবা আলকাত্‌রা গঠিত প্রশস্ত পদ-পথের বড়াই করিতে ক্ষান্ত হইল না।

ফেলিসিয়ানা ঘৃণার ভাবে বলিল:—"কি! ছদ্মবেশী আহত আন্দ্রেকে এই বিশ্রী ভাঙাচোরা বাড়ীর সম্মুখে পাওয়া গিয়েছিল!

এই জঘন্য অঞ্চলে না জানি সে কি রকমে এসেছিল।"

লর্ড যুবকটি স্পেনীয়-ইংরেজী খিচুড়ী ভাষায় উত্তর করিলেন:—

"লোকের আচার-ব্যবহার তাত্ত্বিক ভাবে আলোচনা করবার জন্য, অথবা আমি যেমন লণ্ডনে করি,—ছোরা আঘাতের জোর পরীক্ষা করবার জন্য হয়ত এখানে এসে থাক্‌বেন।"

জেরোনিমো বলিলেন:—

"ব্যাপারটা কি, এখনি জান্‌তে পারা যাবে।"

কুলমান-গর্ব্বিতা ফেলিসিয়ানা যে বাড়িটাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং যাহার ভিতর এমন একটি নারী-রত্ন ছিল যাহা বড় বড় হোটেল খুঁজিলেও পাওয়া যায় না—সেই বাড়ীর গলি-পথের মধ্যে উহারা তিন জন ঢুকিয়া পড়িল।

এই গলি-পথ পার হইবার সময় ফেলিসিয়ানা অতি-সাবধানে নিজ কাপড়ের খুঁট হাতে করিয়া চলিয়াছিল।

সিঁড়ির কাছে আসিয়া ফেলিসিয়ানা ভয়ে শিউরিয়া উঠিল, কি করিয়া এই তৈল-সিক্ত রজ্জুর উপর তাহার হাতের অমল-ধবল নূতন দস্তানা স্থাপন করিবে! তাই সে আবার Sir Edwardsএর বাহু-অবলম্বন প্রার্থনা করিল।

একজন নিকট-বাসী অনাহূত কার্য্যোৎসাহী লোক আসিয়া রজ্জুটা তুলিয়া সিঁড়ির মুখ খুলিয়া দিল। এইবার বিপদ-সঙ্কুল আরোহণ সুরু হইল। "তোমরা কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে ডন-জেরোনিমো যখন বলিলেন—"আমরা শান্ত-শিষ্ট লোক" তখন দরজা খুলিয়া গেল। জুয়াঙ্কোর আক্রমণের পর হইতে বৃদ্ধা আলদঞ্জা সর্ব্বদাই সতর্কভাবে কাণ খাড়া করিয়া থাকিত। বৃদ্ধাই আগন্তুকদিগকে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল,—ঐ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া আন্দ্রেও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, আন্দ্রে প্রথমে Sir Edwardsকে দেখিতে পাইল—তিনিই অগ্ররক্ষী হইয়া আসিয়াছিলেন। তারপর প্রবেশ করিলেন ডন-জেরোনিমো;—সর্ব্বশেষে সাজসজ্জায় অতিসজ্জিতা ফেলিসিয়ানা।

সব চেয়ে সেরা আতস্-বাজির মত জ্বলিয়া উঠিয়া চোখ ঝল্‌সাইয়া দিবেন মনে করিয়া ফেলিসিয়ানা সকলের শেষে দেখা দিলেন। তিনজন ক্রমে ক্রমে আসিলেন—হয়ত এই মনে করিয়া—পাছে ফেলিসিয়ানাকে হঠাৎ দেখিলে আন্দ্রের সুখের মাত্রা ছাপাইয়া ওঠে এবং দুর্ব্বল আন্দ্রে তাহা বরদাস্ত করিতে না পারে। ফেলিসিয়ানা প্রথমে প্রবেশ করিয়া যদি দেখিত, একজন যুবা পুরুষ ঘরে শুইয়া আছে, তাহা হইলে সেটা নিজ আব্রু-রক্ষার হিসাবে ঠিক্ হইত না।

ফেলিসিয়ানা যেরূপ মনে করিয়াছিল, সেরূপ নাটকীয় ধরণে খুব একটা চমক্ লাগাইতে পারিল না।

আন্দ্রের চোখ্ ঝল্‌সিয়া যায় নাই শুধু নহে, তাহার হৃদয় একটা বিশুদ্ধ প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না। একজন সুসজ্জিতা তরুণী প্রাণান্ত শ্রম স্বীকার করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া তিন তলায় উঠিয়াছে, ইহা মনে করিয়াও আন্দ্রের নেত্র হইতে এক বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইল না। বরং

তাহার মুখে একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইল।

ধনুকের তীর ধনু হইতে ছুটিয়া তাক্-মাফিক লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে পারিল না,—একেবারেই ফস্‌কাইয়া গেল।

এই তিন ব্যক্তিকে দেখিয়া মিলিতোনা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বৃদ্ধকে তরুণীরা যেরূপ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে সেই রূপ সমাদর করিয়া জেরোনিমোকে একটা চৌকিতে বসিতে বলিল এবং আর একটা চৌকি ফেলিসিয়ানাকে এগাইয়া দিবার জন্য আল্‌দঞ্জাকে ইসারা করিল।

পাছে ময়লা হয় যেন এই ভয়ে ফেলিসিয়ানা স্বীয় পরিচ্ছদের প্রান্তভাগটা একটু গুটাইয়া লইয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া একটা বেতের চৌকিতে বসিয়া পড়িল এবং রুমাল দিয়া আপনাকে বাতাস করিতে লাগিল।

"ওঃ! কি উঁচু! এখানে আস্‌তে আমার দম বেরিয়ে গিয়েছিল!"

—"ঠাকুরাণীর জামাটা বোধ হয় একটু আঁট্ হয়েছে—তাই।" নিতান্ত সরলভাবে মিলিতোনা এই কথা বলিল।

ফেলিসিয়ানা শীর্ণকায় হইলেও জামায় খুব আঁটসাট্ করিয়া ফিতা বাঁধিত। এইরূপ স্থলে রমণীরা বেশ জানে, কিরূপ গলার স্বরে উত্তর দিলে ঠিক্ হয়। তাই একটু মিঠে-কড়া স্বরে ফেলিসিয়ানা উত্তর করিল:—

"আমি কখনই আঁট্ করে জামা পরিনে।" নিশ্চয়ই—ব্যাপারটা একটু খারাপ দিকে গড়াইল।

ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিতা তরুণী, তুলনায় যেন একটু হীন হইয়া পড়িল, একটু খাটো হইয়া পড়িল।

মিলিতোনা একটা কালো স্পেনীয় ঢং-এর রেশমী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিল; তাহার সুন্দর বাহুদ্বয় অনাবৃত ছিল। ইহার পাশা-পাশি ফেলিসিয়ানার আড়ম্বরময় সাজসজ্জায় কুরুচি আরও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ফেলিসিয়ানাকে দেখিলে মনে হয়, রবিবারের বেশভূষায় সজ্জিতা যেন একজন সামান্য ইংরেজ-পরিচারিকা; আর মিলিতোনা যেন একজন ছদ্মবেশী রাজকন্যা।

ফেলিসিয়ানা মিলিতোনার নিকট হইতে অনিচ্ছাকৃত যে মুখ-থাব্‌ড়া পাইয়াছিল তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ জেরোনিমো-দুহিতা, শ্রমজীবী ললনাকে আকুল করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে তাহার মুখের পানে খুব একটা অবজ্ঞা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু শ্রমজীবী কন্যার অনাকুল স্থির ও সলজ্জ দৃষ্টির সম্মুখে ফেলিসিয়ানারই নেত্রদ্বয় আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল।

মিলিতোনা মনে মনে ভাবিল, এই রমণীটি নাজানি কে! ইনি কি আন্দ্রের ভগিনী? না, তাহলে এঁর মুখে এইরকম উদ্ধতভাব থাকৃত না।

জেরোনিমো পালঙ্কের কাছে গিয়া একটু স্নেহের স্বরে বলিলেন:—

"ভাল, আন্দ্রে! তুমি ত বেশ বেমালুম পালিয়েছিলে, এখন আছ কেমন বল দিকি?"

আন্দ্রে উত্তর করিল, "শ্রীমতীর সেবাযত্নে একরকম ভালই আছি।"

ফেলিসিয়ানা আন্দ্রের কথায় বাধা না দিয়া বলিল।

"উনি যেরূপ কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার পুরস্কার স্বরূপ একটা কিছু জিনিস এঁকে

উপহার দেওয়া যাক্—একটা সোনার ঘড়ি, একটা আংটি কিংবা ওঁর পছন্দমত আর কোন অলঙ্কার।"

অতুল রূপলাবণ্য, ঐ রূপসী ললনাকে যে উচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছিল, তাহা হইতে নামাইয়া আনাই উপরি-উক্ত বাক্যের গূঢ় উদ্দেশ্য।

মিলিতোনা এইরূপে আক্রান্ত হইয়া, এখন সহজ স্বাভাবিকভাবে একটা রাজকীয় গাম্ভীর্য্য ধারণ করিল, তাহার নেত্র হইতে রাজমহিমা-ব্যঞ্জক এমন একটা তড়িৎপ্রবাহ ছুটিল যে, ফেলিসিয়ানা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

ফেলিসিয়ানা যে ইংরাজি জানিত তাহা ভুলিয়া গিয়া, Sir Edwards অর্দ্ধস্ফুটস্বরে এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না—"She is a very pretty girl" অর্থাৎ তরুণীটি বড়ই সুশ্রী।

শুষ্ক কণ্ঠে আন্দ্রে উত্তর করিল:—

"এরূপ সেবা-যত্ন মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় না।"

জেরোনিমো আবার বলিলেন:—

—"তা নিশ্চয়। মূল্য দেবার কথা কে বল্‌ছে? এ শুধু একটা কৃতজ্ঞতার স্মৃতি। এই মাত্র।"

এই দরিদ্র গৃহের যে সব অভাব-ত্রুটি ছিল, তাহা এক নজরে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া ফেলিসিয়ানা আবার বলিল:—

"আন্দ্রে, এখানে তোমায় থাক্‌তে কখনই ভাল লাগ্‌বে না।"

—"এখানে ওঁর খুবই অনুগ্রহ। কষ্ট হচ্চে বলে উনি কখনই আক্ষেপ প্রকাশ করেন নি।" এই কথা বলিয়া মিলিতোনা জান্‌লার ধারে প্রস্থান করিল। ফেলিসিয়ানাকে দুর্ব্বিনীত বাক্য প্রয়োগের পূর্ণ অবসর দিবার জন্যই মিলিতোনা তাহাকে মৌনভাবে যেন এই কথাগুলি বলিল:—

"তুমি আমার বাড়ীতে আছ, আমি তোমাকে তাড়িয়ে দেব না—তাড়িয়ে দিতে পারিও না। কিন্তু তোমার অপমান-সূচক বাক্যগুলা আর গৃহকর্ত্রীর ধৈর্য্য—এই দুয়ের মধ্যে ত একটা সীমা-রেখা আছে!"

মিলিতোনার সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া, ফেলিসিয়ানা একটু থতমত খাইয়া গেল। সে তাহার ছাতার হস্তিদন্তের প্রান্তভাগ দিয়া, স্বকীয় বুট্-জুতার অগ্রভাগের উপর পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিল।

তাহার পর একটা নিস্তব্ধতা আসিল।

ডন্-জেরোনিমো তাঁহার নস্যদানীর কোণ হইতে এক টিপ পীত নস্য উঠাইয়া লইয়া, সন্তোষের ভঙ্গীসহকারে স্বকীয় বয়স সমুচিত স্বকীয় নমস্য নাসিকায় সযত্নে গুঁজিয়া দিয়া সুখের সেকালের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

Sir Edwards কোনরূপ "ধরা-ছোঁয়া" না দিবার অভিপ্রায়ে, ফেলিসিয়ানার হতবুদ্ধি হইবার ভাবটা এমন হুবহু নকল করিয়াছিল, যেন এ ভাবটা তাহার বাস্তবিকই নিজের। আল্‌দঞ্জা মাসীর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছে। ঠোঁট ঝুলিয়া পড়িয়াছে; ফেলিসিয়ানার জম্‌কালো সাজসজ্জা সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছে। আসমানি নীল, পীত, গোলাপী, সবুজ এই সব মিশ্র রংএর ঘটা দেখিয়া বৃদ্ধার

তাক্ লাগিয়া গিয়াছে। সে হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছে। এরূপ জমকালো পরিচ্ছদ সে ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখে নাই।

আর আন্দ্রের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আশ্রয়দানের জন্য যেন সে সদা-প্রস্তুত—তাহার সুদীর্ঘ প্রেমের দৃষ্টি মিলিতোনাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। মিলিতোনা তখন কক্ষের অপর প্রান্তে থাকিয়া সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিল। আন্দ্রে ভাবিতেছিল, ফেলিসিয়ানা আসলে যে-রকম তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া ফেলিসিয়ানাকে বিবাহ করিবার কথা তাহার মাথায় কেন যে আসিয়াছিল—ইহাই আশ্চর্য্য। এই নারী-রত্ন বোর্ডিংইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও কাপড়ের দোকানদার—এই উভয়ের হাতে-গড়া জিনিস বই আর কিছুই নহে।

এদিকে মিলিতোনা মনে মনে ভাবিতেছিল :—

"এ ভারি অদ্ভুত! আমি যে কাউকেই কখনো বিষ-দৃষ্টিতে দেখিনি, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি আমার ঘরে যখনই প্রথম পদক্ষেপ করেছে তখন থেকেই—একজন অজ্ঞাত শত্রু কাছে এলে যে-রকম হয়—আমার বুকে সেই রকম একটা কাঁপুনি উপস্থিত হয়েছে। আমার কিসের ভয়? আমি বেশ জানি, আন্দ্রে একে ভালবাসে না। আন্দ্রের চোখ দেখেই আমি তা বুঝ্‌তে পেরেছি। স্ত্রীলোকটা দেখ্‌তে সুশ্রী নয়,—আর অতি নির্ব্বোধ। তা নৈলে কি, একজন গরিবের বাড়ীতে, একজন রোগীকে দেখ্‌তে এরকম সাজসজ্জা করে আসে? আস্‌মানী নীল রঙের গাউন, তার উপর সবুজ রঙের খাটো বহির্বাস—রুচিবোধের কতটা অভাব! এইরকম ঢ্যাঙ্গা মেয়েমানুষকে আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারিনে... এখানে কি করতে এসেছে? ওর নব্যকে (ভাবীপতি) ধর্‌তে এসেছে? এ নিশ্চয়ই কোন একজন বাগদত্তা রমণী। আন্দ্রে ত আমাকে একথা পূর্ব্বে বলেনি...যদি আন্দ্রে একে বিয়ে করে, তাহলে আমার বড় কষ্ট হবে! কিন্তু আন্দ্রে একে বিয়ে করবে না—তা অসম্ভব। এর চুল বিশ্রী কটা; ওর গালে এক-একটা লাল রঙের পোঁচ। আন্দ্রে আমাকে বলেছে, সে কালো চুল ছাড়া আর কোনো চুল ভাল বাসে না—আর সে গালের সমান রকম রং ভাল বাসে।"

পক্ষান্তরে, ফেলিসিয়ানা আবার এইরূপ মনে মনে ভাবিতেছিল। কোন একটা খুঁৎ বাহির করিবার জন্য ফেলিসিয়ানা, মিলিতোনার রূপ-লাবণ্যের বিশ্লেষণ করিতেছিল। কোন খুঁৎ পাইল না বলিয়া তাহার বড় আপশোষ হইল। কবিদের ন্যায় রমণীরাও তাদের আসল মূল্য,—তাদের প্রকৃত শক্তি বেশ জানে, কিন্তু কখনো তাহা স্বীকার করেনা। মিলিতোনার বদ্ মেজাজটা আরও বৃদ্ধি পাইল, এবং বেশ-একটু কর্কশস্বরে বেচারা আন্দ্রেকে এই কথাগুলা বলিল :—

"যদি তোমায় ডাক্তার কথা কইতে বারণ করে' থাকে তা'হলে তোমার দুর্ঘটনা সমস্ত বিবরণ আমাদের কাছে খুলে বল; কারণ আমরা যা জান্‌তে পেরেছি, তা একটু ঘোলাটে রকমের, তেমন স্পষ্ট নয়।"

ইংরেজ বলিল :—

—"হাঁ হাঁ—তোমার ঔপন্যাসিক ঘটনার বিবরণটা বল্‌তে চেষ্টা কর।"

জেরোনিমো পিতৃবৎ বাৎসল্যসহকারে, এই কথায় বাধা দিয়া বলিলেন :—

—"তোমরা ওকে কথা কওয়াতে চাচ্চ, কিন্তু দেখ্‌ছনা এখনো কতটা দুর্ব্বল!"

—"ওতে উনি বেশি কিছু শ্রান্ত হবেন না, আর আবশ্যক হলে শ্রীমতী ওঁকে সাহায্য করবেন। শ্রীমতী ত সমস্ত ঘটনাই জানেন।"

এই-সব কথার পর, মিলিতোনা উহাদের নিকটে আসিল।

আন্দ্রে বলিল :—

"আমার মাথায় একটা খেয়াল চাপ্‌লো যে, আমি শিল্পজীবীর ছদ্মবেশে, সহরের পুরাতন অঞ্চলটা একবার ঘুরে আসি, আর ইতর-সাধারণের সুঁড়িখানা ও নাট্য-শালায় সজীব ভাব-খানা একটু উপভোগ করে আসি। কারণ, ফেলিসিয়ানা, তুমি ত জানোই, সভ্যতার উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাক্‌লেও আমি পুরানো স্পেনীয় আচার ব্যবহার ভালবাসি। তারপর এই রাস্তা দিয়ে যখন আস্‌ছিলেম, একজন গোম্‌শামুখো সেরিনেড-গায়কের সঙ্গে দেখা হল। সে একটা ছুতো করে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে; তার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল, সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ন্যায়-নিয়মানুসারে, আমাকে ছোরার আঘাতে সে আহত করলে। আমি সেই আঘাতে ধরাশায়ী হলেম। শ্রীমতী তাঁর বাড়ীর দরজায় সাম্‌নে অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন।"

—"কিন্তু তুমি এ বেশ জেনো আন্দ্রে, এই ঘটনাটা খুব ঔপন্যাসিক ধরণের, এবং ওতে একটু কবিত্বের রং চড়ালে, দিব্যি একটা করুণরসাত্মক বিষয় হয়ে উঠ্‌বে। একজন সুন্দরীর গৃহ-গবাক্ষের নীচে দুই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীর পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘট্‌ল..." এই কথা বলিয়া, ফেলিসিয়ানা মিলিতোনার দিকে তাকাইয়া একটা দুষ্টামির কাষ্ঠ হাসি হাসিল..."ওরা পরস্পরের মাথায় "গিতার" ভাঙ্গে, তার পর মুখের উপর ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত করে,—এই দৃশ্যটা যদি কাঠের উপর খুদে', উপন্যাসের গোড়ায় দেওয়া হয় তা হলে খুব চটক্‌দার হবে।"

মিলিতোনা গম্ভীরভাবে বলিল :—

—"দেখুন, আর দুই আঙ্গুল নীচে হলেই, ছোরার ফলাটা হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করত।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু যা চিরকাল হয়ে আস্‌ছে—এই সব ছোরা একটু পিছ্‌লে গিয়ে শুধু একটা সুন্দর আঁচড় কেটেই ক্ষান্ত হয়—"

তরুণী উত্তর করিল—"আর যাই হোক, আপনার দেখ্‌ছি এই আঘাত সম্বন্ধে বড় একটা দরদ নেই।"

—"আমার সম্মান রক্ষার জন্য ত এই আঘাতটা পাওয়া হয়নি; তাই তোমার এতে যতটা দরদ হবে আমার তা হবে না। তবু দেখ, আমি তোমার আহতকে দেখ্‌তে এসেছি। তুমি যদি ইচ্ছে কর, আমরা দুজনে পালা করে' আহতের শুশ্রূষা করব! সে বেশ হবে।"

মিলিতোনা উত্তর করিল—"এ পর্য্যন্ত আমি একলাই ওঁর শুশ্রূষা করেছি—এখনো করব।"

—"তোমার পাশে, আমাকে লোকে একটু উদাসীন বলে ঠাওরাতে পারে। কিন্তু একজন

পুরুষকে রাস্তার থেকে তুলে নিজের বাড়ীতে আনা—এমন কি, বুকে একটা সামান্য আঁচড় লাগার জন্যও আনা—আমার মতে শিষ্টাচার নয়।

—"লোকনিন্দার ভয়ে আপনি কি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ওঁকে রাস্তায় ফেলে আস্‌তে পারতেন?

—"সবাই ত তোমার মত স্বাধীন নয়; তাদের ঘর-সংসার সাম্‌লাতে হয়; গেরস্তের মত থাক্‌তে হয়। যাদের একটু মানমর্য্যাদা আছে, তারা সহজে তা' হারাতে চায় না।"

মিলন-কামী জেরোনিমো বলিলেনঃ—

"না না, ফেলিসিয়ানা, তুমি যে সব কথা বল্‌চ তাতে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখ্‌ছি; তুমি অনর্থক রাগ কর্‌চ। ও-সমস্তই আকস্মিক ঘটনা। এই দুর্ঘটনাটার পূর্ব্বে আন্দ্রে শ্রীমতীকে কখনো দেখেনি। মিছামিছি ওর উপর তুমি সন্দেহ করোনা।"

পিতার কথায় দৃকপাত না করিয়া ফেলিসিয়ানা গর্ব্বিতভাবে আবার বলিলঃ—

—"বাগ্‌দত্তা রমণী ত আর উপপত্নী নয়।"

এই শেষ অপমান-সূচক বাক্যে, মিলিতোনার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল। একটা তরল জ্যোতিতে তার চোখ্‌ দুটি জ্বলিয়া উঠিল, বুক ফুলিয়া উঠিল; বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু মিলিতোনা সামলাইয়া লইল। সে কোন উত্তর করিল না, কেবল ফেলিসিয়ানার প্রতি একটা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

—"এসো বাবা, আমরা এখান থেকে চলে যাই। এস্থান আমাদের নয়। একজন পতিতার গৃহে আর আমি ক্ষণমাত্রও থাক্‌তে পারব না।"

আন্দ্রে মিলিতোনার হস্তধারণ করিয়া বলিলঃ—"ফেলিসিয়ানা, শুধু এই কারণেই যদি এখান থেকে তোমার চলে যেতে হয়—তাহলে একটু সবুর কর। ডনা ফেলিসিয়ানার নিকট আমার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী মিলিতোনার পরিচয় করে দিচ্চি। এখন বোধ হয় এখানে একটু বিলম্ব করলে কোন ক্ষতি হবে না। আমার দ্বারা তোমার কোন অসুবিধা হলে আমি অত্যন্ত দুখিত হব।"

"জেরোনিমো বলিয়া উঠিলেন ঃ—"কি! আন্দ্রে তুমি বল্‌ছ কি? ১০ বৎসর থেকে তোমার সঙ্গে বিবাহ হবে বলে' ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে আছে! তুমি পাগল হলে না কি?"

আন্দ্রে বলিলঃ—"আমি বুঝেসুঝেই এই কথা বল্‌চি। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারচি, আমি আপনার কন্যাকে কখনই সুখী করতে পারব না।"

আন্দ্রেই তাঁহার ভাবী জামাতা এই ধারণা জেরোনিমোর মনে বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হওয়ায়, তিনি আবার বলিলেনঃ—

"ও কি-প্রলাপ বক্‌চ, কি-সব আজগুবি কথা বল্‌চ! তোমার বোধ হয় অসুখ করেছে—তোমার জ্বর হয়েছে। তাই খেয়াল দেখ্‌চ।"

জেরোনিমোর আস্তিন টেনে ইংরেজ-যুবক বলিলঃ —

—"মশায়! কোন চিন্তা নেই; জামাতার অভাব কি। আপনার কন্যা এমন রূপসী, এমন সুবেশী!"

জেরোনিমো আবার বলিলেনঃ—

—"ধন-ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে তোমাদের এমন মিল হয়েছিল…"

আন্দ্রে উত্তর করিলঃ—

"হৃদয়ের মিল অপেক্ষা ঐ মিলটাই বেশী হয়েছিল। আমার মনে হয় না, ডনা—ফেলিসিয়ানা আমাকে না পেলে বেশী-কিছু কষ্ট অনুভব করলেন!

ফেলিসিয়ানা উত্তর করিলঃ—

—"তুমি খুব বিনয়ী; আমার কষ্ট হবে না, তাই এখন মনে কর। আর কিছু না হোক্, তাহলে অনুতাপের হাত থেকে এড়াতে পারবে। বিদায়, ঘরকন্না পেতে সুখী হও। শ্রীমতী, তোমাকে নমস্কার। এসো বাবা; Sir Edward আমাকে তোমার বাহু-অবলম্বন দেও"।

ইংরেজ যুবক এক বাহুর দ্বারা ফেলিসিয়ানার কটিদেশ বেশ শোভনভাবে বেষ্টন করিল এবং উভয়ে বুক ফুলাইয়া সগর্ব্বে বাহির হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডের দ্বীপ-গণ্ডীবদ্ধ দ্বৈপিক যুবকটির মুখ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। যে সকল আশা এতদিন ডানা মেলিতে পারে নাই এই ঘটনায় সেই সব আশা তাহার চিত্ত-গগনে আসিয়া উদিত হইল। যাহার প্রেমানলে যুবকটির হৃদয় ভিতরে-ভিতরে জ্বলিতেছিল, সেই ফেলিসিয়ানা এখন মুক্ত! সে মনে-মনে ভাবিল, দীর্ঘকাল হইতে যে বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহা ভাঙ্গিয়া গেল! স্পেনের রমণীকে বিবাহ করা—আর! সে ত আমার জীবনের স্বপ্ন! আর এমন-এক স্পেনীয় ললনা, যার চিত্ত ভাবাবেগময়, যার হৃদয় প্রেমানলে প্রজ্জ্বলিত, আর যে,—আমার মনের মতন চা তৈরী করতে পারে…Lord Byronএর মতের সঙ্গে আমার খুব মেলে, উত্তর-য়ুরোপের পাণ্ডুমুখী সুন্দরীরা পিছনে পড়ে থাক্, আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমি একজন ভারত কিংবা ইতালী কিংবা স্পেনের ললনাকে বিবাহ করব—স্পেন-দেশের ছোট ছোট মহাকাব্যের জন্য, ও স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য, স্পেনের রমণীই আমার সব-চেয়ে পছন্দ। আমি অনেক স্পেনের রমণী দেখেছি যাদের হৃদয় প্রচণ্ড আবেগে পূর্ণ, কিন্তু তারা আমার প্রণালী অনুসারে চা তৈরী করতে পারে না। তারা নিয়মের এমন ব্যতিক্রম করে যা দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়। তা ছাড়া ফেলিসিয়ানা কেমন সুশিক্ষিত! লণ্ডনে নৃত্যোৎসবে, নিমন্ত্রণ-মজলিসে ফেলিসিয়ানা খুবই চটক্ লাগাতে পারবে। কেউ বিশ্বাস করবেনা, ফেলিসিয়ানা মাদ্রিডের রমণী। আ! আমি কত সুখী হব! কলিকাতায় কিংবা উত্তমাশা অন্তরীপে—যেখানে আমার একটা প্রমোদ-কুটীর আছে—সেইখানে গিয়ে আমরা দুজনে গ্রীষ্ম যাপন করব! কি আনন্দ!"

ফেলিসিয়ানকে গৃহে পৌছাইয়া দিবার সময়, Sir Edwards জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

এদিকে ফেলিসিয়ানাও এইরূপ নানাপ্রকার সুখের কল্পনায় গা ঢালিয়া দিয়াছিল; যে ঘটনাটা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে তাহাতে অবশ্য ফেলিসিয়ানা বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়াছে। আন্দ্রে তাহার হাত-ছাড়া হওয়ায় তাহার যে বেশী-কিছু দুঃখ হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু আন্দ্রে প্রকাশ্যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তাহার আত্মাভিমানে একটু খোঁচা

লাগিয়াছিল। যে পুরুষকে কোন রমণী ভালবাসে না, সেই পুরুষ যদি রমণীকে পরিত্যাগ করে তাহলে ভালবাসা না থাকা সত্ত্বেও সেই রমণীর কখনই তাহা ভাল লাগে না। তাছাড়া যখন হইতে Sir Edwardsএর সহিত পরিচয় হইয়াছে, ফেলিসিয়ানা আন্দ্রের বন্ধনটাকে আর তেমন অনুকূল দৃষ্টিতে দেখে না।

ফেলিসিয়ানা, Sir Edwardsএ স্বীয় আদর্শ মূর্ত্তিমান দেখিতে পাইয়া, বুঝিতে পারিল, সে কখনো আন্দ্রেকে ভাল বাসে নাই!

যেরূপ ইংরেজ তার স্বপ্নের জিনিস ছিল, Sir Edwards ঠিক্ সেইরূপ ইংরেজ! চাঁচা-পোঁচা গোঁপদাড়ি কামানো, সিন্দুরের মত মুখের রং, চক্‌চকে-ঝক্‌ঝকে, বুরুজ করা চিরুণী-দিয়ে-আঁচড়ানো, পালিশ-করা চুল, ধব্‌ধবে সাদা 'নেক্-টাই', ইংরেজী বর্ষাতী ও "ম্যাকিন্‌টশ"! সভ্যতার চরম অভিব্যক্তি!

তাছাড়া ইংরেজ যুবকটি সংকেত-স্থানে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে কেমন সময় নিষ্ঠ, গণিতের কষা অঙ্কের মত কেমন ঠিক্‌ঠাক নির্ভুল। খুব ভাল-সময়-রাখা ক্রনমেটর ঘড়ীকেও তার কাছে হার মানিতে হয়! আমার ইংরেজি রূপার বাসন-কোসন হবে, আমার ওয়েজ-উডের চীনে-বাসন হবে, সমস্ত ঘরময় কার্পেট বিছানো থাকবে, পৌডার মাখা চাকর বাকর থাকবে, হাইড পার্কে বেড়াতে যাব, আমার স্বামী চৌঘুড়ী হাঁকাবেন—আর আমি তাঁর পাশে বসে যাব। সায়াহ্নে রাণীর থিয়েটারে যাব, জাঁকালো আসনে বসে ইটালিয়ান সঙ্গীত শুন্‌ব। আমাদের প্রাসাদের সবুজ ছাঁটা ঘাসের জমিতে পোষা হরিণরা খেলা করবে; আরও হয়ত খেলা করবে কতকগুলি সাদা সাদা গোলাপী রং-এর শিশু। খাঁটি King Charles-জাতীয় কুকুরের পাশে, গাড়ির সম্মুখ দিকে শিশুরা বস্‌লে কেমন মানাবে!"

উপরি-উক্ত যুগলটি—যারা উভয়ের মনের মত গঠিত—উহাদের এখন পথ ধরিয়া চলিতে দেও; এখন এস, পোভার রাস্তায় গিয়া মিলিতোনা ও আন্দ্রে কি করিতেছে দেখা যাক্।

ফেলিসিয়ানা, ডন জেরোনিমো, ও Sir Edwards চলিয়া যাইবার পর মিলিতোনা, আন্দ্রের স্কন্ধের উপর মস্তক রাখিয়া হা পাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু এ অশ্রুপাত আনন্দের অশ্রুপাত; সেই অশ্রুবিন্দুগুলি মুক্তার ন্যায় পেলব গালদুটি দিয়া গড়াইতে লাগিল।

বেলা পড়িয়া আসিল; অস্তকালের লাল মেঘে আকাশ রঞ্জিত হইল। গিটারের গুঞ্জন, নর্ত্তকীদের নূপুর শিঞ্জিনী খঞ্জনীর এবং কাষ্ঠ-করতালের তালধ্বনি দূর হইতে শুনা যাইতে লাগিল। সাবাস, সাবাস! বাহবা, বাহবা! রাস্তার সব কোণ ও চৌমাথা হইতে স্পেনদেশীয় নৃত্যসংযুক্ত সুললিত গানের সুর-ধারা দম্‌কায় দম্‌কায় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল এবং এই সব আনন্দধ্বনি প্রেমিক-যুগলের নিকট বিবাহ গীতির পূর্ব্বাভাস বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। রাত্রি সমাগত হইল। মিলিতোনা আন্দ্রের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া আনন্দে বিভোর হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের আরতি

(ছালিক্য ছন্দের অনুসরণে)

জয় জয় ভারত! জয় জয় মাতা!
ঋদ্ধির নিধান! সিদ্ধির দাতা
অক্ষয় তোমার কীর্ত্তির গাথা! জয়! জয়!

দুর্দ্দম তোমার শৌর্য্যের বরে
পর্ব্বত দাঁড়ায় গর্ব্বের ভরে
সূর্য্যের গমন রোধ্‌বার তরে! জয়! জয়!

উদ্দাম সাগর মন্থন করো!
আজো 'বরুণ-ছত্তর' ধরো!
সিংহল শ্রীভোজ লাখ্ দ্বীপ ভরো! জয়! জয়!

রাঘব-মৌর্য্যের প্রসূ!
ক্ষত্রের স্বরগ! বৈশ্যের বসু!
আয় তোর লুটায় হিংসার পশু! জয়! জয়!

তোমার ডিণ্ডিম ওঠে
কাশগড় খোটান কাম্বোজ লোটে
তোমার গৈরিক ফোটে! জয়! জয়!

কান্ধার, ইরাণ, মিজ্রাম্, মিতান্,
সূত্রের তোমার কীর্ত্তির নিধান;
চীন, শ্যাম, জাপান, শিষ্যের বিতান! জয়! জয়!

পুণ্যের অমল দর্পণ তুমি!
বিশ্বের হৃদয়-তর্পণ তুমি!
কর্ম্মের ফলের অর্পণ-ভূমি! জয়! জয়!

মুক্তির গরুড়! ভক্তির চাতক!
আত্মার গভীর শান্তির সাধক!
নৈরাশ-হরণ উজ্জ্বল পাবক! জয়! জয়!

জয় জয় ভারত! বিশ্বের স্তুতা!
ধরণীর তিলক! তীর্থভূতা!
সংসার-মুকুল! নন্দন্-চ্যুতা! জয়! জয়!

ঋক্ সাম তোমার কুণ্ডল কানে!
দিগ্‌গজ তোমার কিঙ্কর স্থানে!
মেঘ-দূত তোমায় সঞ্জীর দানে! জয়! জয়!

ছয় ছয় ঋতুর পল্লব-গাঁথা
ফুলময় তোমার কিঙ্খাব পাতা;
লাখ্ লাখ্ যুগের শিল্পীর মাতা! জয়! জয়!

মন্দির-গোপুর-চৈত্যের-বীথি!
পর্ব্বত-পটের গৌরব স্মৃতি!
বল্মীক-শয়ান উল্লাস-গীতি! জয়! জয়!

রথ তোর নকল গ্রীকগণ করে
সুশ্রুত সুদূর বোগ্‌দাদ ভরে
দর্শন জ্ঞানের নির্ঝর ঝরে! জয়! জয়!

অঙ্গন তোমার চম্পক-ঢাকা,
অঙ্গের পরশ চন্দন-মাখা,
চৌরস ললাট চন্দ্রক আঁকা! জয়! জয়!

ব্রহ্মার আদিম ওঙ্কার তুমি!
মুক্তির বীণার ঝঙ্কার তুমি!
হিন্দোল-বিলাস-গঙ্গার তুমি! জয়! জয়!

বিক্রম-প্রতাপ-বাপ্পার দেবী!
বুদ্ধের বোধন! জয় নির্লেপী!
বিশ্বের প্রেমেই ওই পদ সেবি; জয়! জয়!

জয় জয় ভারত! যজ্ঞের মাতা!
আত্মার আপন অন্নের দাতা!
উষ্ণীষ তোমার ধুস্তুর-গাঁথা! জয়! জয়!

বিশ্বের নাথে বল্লভ বরি'
নিষ্ঠুর ফণী-কঙ্কণ পরি'
গৌরীর গায়ে গৈরিক, মরি! জয়! জয়!

চিত্তের গভীর নৈমিষ মাঝে
তন্ময় শোনো 'ওম্' 'ওম্' বাজে
নিত্যের নিদেশ উজ্জ্বল রাজে! জয়! জয়!

আত্মার অমল দীপ্তির খনি!
পৃথ্বীর মাঝে অদ্বয় গণি;
কৌটায় তোমার কৌস্তভ মণি! জয়! জয়!

পদ্মের মেলায় লক্ষ্মীর ছবি!
কাব্যের কবির তুই বান্ধবী!
নিষ্কাম যাগের নির্ম্মল হবি! জয়! জয়!

আত্মের গুরু অর্দ্ধেক ধরার!
মৃত্যুর ডেরায় মুক্তির করার!
চিন্ময়!···অতীত্ তন্দ্রার ত্বরার! জয়! জয়!

নির্ম্মল তোমার নির্ভয় আঁখি,
কল্যাণ করে মৈত্রীর রাখী,
সংসার-নীড়ে স্বর্গের পাখী! জয়! জয়!

অর্হৎ-শ্রমণ-তীর্থঙ্করে
গৌরব তোমার কীর্ত্তন করে,
সৌরভ তোমার অম্বর ভরে, জয়! জয়!

জয় জয় ভারত! বুদ্ধের মাতা!
নিষ্ঠার নিধান! শুদ্ধির দাতা!
অক্ষয় তোমার শান্তির গাথা! জয়! জয়!

দর্পীর দুলাল ধৃষ্টের আগে
অক্ষোভ তোমার অক্রোধ জাগে!
বিশ্বের হিয়ায় বিস্ময় লাগে! জয়! জয়!

নিত্যের প্রেমে দুষ্কর করো
সত্যাগ্রহে লাঞ্ছন বরো
হেমহার ফেলি' শৃঙ্খল পরো! জয়! জয়!

তপ তোর অটুট তাণ্ডব-নাচে!
দুর্ব্বোধ দাঁড়াস্ শত্রুর কাছে!
পায়-পায় ফিরিস্ মৃত্যুর পাছে! জয়! জয়!

মৃত্যুর পারের নিত্যের লাগি
ক্লেশ তুই সহিস যুগ যুগ জাগি—
যুগ যুগ অসীম দুঃখের ভাগী! জয়! জয়!

বুদ্ধের ধারায় যুদ্ধের ধারা
চেষ্টায় তোমার হয় ফের হারা!
গঙ্গায় গ্লানি-পঙ্কের পারা, জয়! জয়!

ক্ষুদ্রের পরম দুর্ভোগ তুমি
ধূর্ত্তের চরম দুর্য্যোগ তুমি
সত্যের কৃপাণ নির্ম্মোঘ তুমি! জয়! জয়!

অম্লান তোমার আত্মার বাণী!
অক্ষয় তোমার আশ্বাস, জানি,
বিশ্বাস-কিরীট বিশ্বের রাণী! জয়! জয়!

জয় জয় ভারত! আত্মার দাতা!
আক্‌বর-অশোক-ভীষ্মের মাতা!
অক্ষয় তোমার কল্যাণ-গাথা! জয়! জয়!

জয় জয় ভারত! সংশয়-ত্রাতা!
চিত্তের অমোঘ শক্তির দাতা!
ত্রিশ ক্রোর ব্রতী পুত্রের মাতা! জয়! জয়!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আঁধি

১

নিখিল কলের পুতুলের মত বসিয়া হাতের লেখা লিখিতেছিল; মনটা বাহিরে অবাধ মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলার মাঝখানে সতর্ক গতিতে লুকাইয়া ফিরিতেছিল। গাছের ডালে পাখীর কলরব, পথে মাঝে মাঝে অজানা পথিকের কণ্ঠ হইতে দুই-চারিটা কথার টুক্‌রা ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে—তাহাতে মুক্তির সে কি হাওয়াই না বহিয়া চলিয়াছে! সকলের উপর সোনার দুই-চোখের আকুল অধীর সেই দৃষ্টিটুকু! নিজের চারিধারে নিয়মের এই যে বাঁধন—সেগুলা নিখিলের দেহে-মনে আজ এমন চাপিয়া ধরিতেছিল! অথচ সে বাঁধন কাটিবার কোনই উপায় নাই! হায়রে, ইহার চেয়ে সে যদি ঐ সব পথের লোকদেরই একজন হইত! তাহার ছোট মন এক অসহ্য পীড়ার ভারে যেন হাঁফাইয়া উঠিতেছিল! এমন সময় মার ডাক আসিয়া পৌঁছিল। লেখা ছাড়িয়া নিখিল মাষ্টার মহাশয়ের পানে চাহিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—যাও, মা কি বলছেন, শুনে এসো!

এসো! যে-বাঁধন মুহূর্ত্তের জন্য একটু আল্‌গা হইয়া আসিয়াছিল, তাহা আবার কে যেন অলক্ষ্যে চাপিয়া আঁটিয়া ধরিল। মাষ্টার মহাশয় আবার বলিলেন,—যাও, শুনে এসো নিখিল, মা কি বলছেন।

নিখিল উঠিয়া দম-দেওয়া পুতুলের মতই মন্থর গতিতে অন্দরের দিকে চলিল।

মার ঘরের কাছে আসিয়া সে শুনিল, মা ঘরে কার সঙ্গে কথা কহিতেছে! নিখিল ডাকিল,—মা!

ভিতর হইতে সুষমা বলিল,—এদিকে এসো নিখিল।

নিখিল ঘরে ঢুকিল। সেখানে গিয়া সোনাকে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক অজানা আশঙ্কায় সারা অঙ্গ তাহার ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। সোনা এখানে? সর্ব্বনাশ! বাবা যদি দেখিয়া ফেলে! নিজের জন্য ভয় ততখানি নয়, যত ভয় এই বেচারী সোনার জন্য! সে ত নিখিলের বাবাকে জানে না—এখনি একটা কঠিন রূঢ় কথার ঘায় বেচারীর ঠোঁটের ঐ অম্লান শুভ্র হাসিটুকু কোথায় যে উবিয়া যাইবে!

নিখিলকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সুষমা বলিল,—এ মেয়েটি কে, বল তো নিখিল?

ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি টানিয়া নিখিল বলিল,—সোনা।

সুষমা বলিল,—বেশ মেয়েটি, না? তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছিল—তা তুমি এখন পড়ছ কিনা, তাই আমার কাছে এসেছে। তোমার পড়া হলে এর সঙ্গে খেলা করবে—কেমন?

সোনার সঙ্গে খেলা করিবে সে,—এই বাড়ীর মধ্যে! সর্ব্বনাশ! বাবা তাহা হইলে দুইজনের কাহাকেও কি আর আস্ত রাখিবে? সে বলিল,—না মা, আমি এখন খেলতে পারব না। আমায় হাতের লেখা লিখতে হবে, তার পর অঙ্ক কষা আছে, পড়া

আছে। তারপর আবার চারটের পর বাঁশবাজি হবে—

সোনার ডাগর চোখদুটি নিখিলের এ-কথায় নিবু-নিবু দীপের মত ম্লান হইয়া গেল, চোখ ছলছলিয়া উঠিল! নিখিল তাহা লক্ষ্য করিল। বেচারী, বেচারী সোনা! আহা! এ কি সোনার বাবা যে তাহাকে দেখিয়া একেবারে খেলার ছুটি দিয়া দিবে?

সুষমা বলিল,—আচ্ছা, ও এখন থাকুক ত—তারপর বাঁশবাজি দেখে বাড়ী যাবে'খন। আমি ততক্ষণ সোনার সঙ্গে গল্প করি, ওর চুল বেঁধে দি—বলিয়া সুষমা সোনার ঝুঁটি-বাঁধা চুলগুলা খুলিতে লাগিল।

সোনা কাঠের পুতুলের মত স্থিরভাবে নিখিলকে লক্ষ্য করিতে লাগিল—আর নিখিল উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কখন্ সমস্ত বাড়ী কাঁপাইয়া পিতার পায়ের শব্দ কি কণ্ঠের বজ্র-ধ্বনি জাগিয়া ওঠে! তার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল।

সুষমা তখন সোনাকে কৌচের উপর নিজের পাশে বসাইয়া তাহার ছোট কোঁকড়ানো চুলগুলা বিনাইতে সুরু করিল দেখিয়া নিখিল বলিল,—মা, সোনার কাঁচের পুতুল নেই মা,—শুধু মাটীর পুতুল। ওকে দুটো কাঁচের পুতুল দিয়ো, মা।

সোনা এ কথায় খুসী হইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল,—তোমার মা ভাই আমায় পুতুল দিয়েছেন ত। এই দেখ, বেশ পুতুল—না? আমি ভাই এটিকে তুলে রেখে দেব, এ নিয়ে খেলা করবো না। যদি ভেঙ্গে যায়! এ-রকম খোকা-পুতুল আমি কখনো দেখিনি। পুঁটি খেঁদি ওরাও কেউ দেখেনি। বলে, আমরা গরীব মানুষ—এ-সব পুতুলের যে অনেক দাম, পাব কোথা? বাবা বলেচে ভাই, এবার কলকাতায় যাবে যখন, তখন আমার জন্যে ভালো একটি কাঁচের পুতুল কিনে আনবে। কাঁচের পুতুলের কেমন নীল-নীল চোখ—না? এক-নিশ্বাসে এতগুলা কথা সে বলিয়া গেল; বলিয়া সুষমার দেওয়া পুতুলটিকে বুকে চাপিয়া আদর করিতে লাগিল।

নিখিল বলিল,—দিয়ো মা, সোনাকে আর দুটো কাঁচের পুতুল দিয়ো। কি হবে? আমি ত পুতুল নিয়ে খেলি না—শুধু আল্‌মারিতেই তোলা থাকে। তার চেয়ে—এই অবধি বলিয়া নিখিল হঠাৎ থামিয়া গেল। কথা আর তাহার শেষ হইল না—ওদিকে সেই মুহূর্ত্তে পিছনে পিতার কণ্ঠস্বর ধ্বনিয়া উঠিল,—কি হচ্ছে তোমাদের?

ভয়ে নিখিলের আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। তার সব কথা এইবার প্রকাশ হইয়া যাইবে! বাহিরে কাহারো বাড়ী যাওয়ায় পিতার নিষেধ, কাহারো সঙ্গে কথা কওয়া বা মেলা-মেশা করা ত দূরের কথা। আর এই সোনা কি না—নিখিল ভয়ে মত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, কথা কহিবার বা নড়িবার শক্তিটুকুও তাহার একেবারে যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এ মেয়েটি কে?

সুষমা বলিল,—এইখানকারই একজনদের মেয়ে—আমাদের বাড়ী ঘর দেখতে এসেছে।

—তার মানে?

সুষমা বুঝিল, স্বামীকে সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি খুবই বিরক্ত হইবেন,—আর সে বিরক্তির যা-কিছু ঝাঁজ গিয়া পড়িবে

বেচারা নিখিলের উপর। স্বামীর দিকে লক্ষ্য করিয়া সুষমা দেখিল, স্বামীর মুখে-চোখে ঈষৎ অপ্রসন্নতারও ছায়া পড়িয়াছে। অথচ কথাটা একেবারে লুকাইয়া রাখা চলে না! সুষমা তখন ব্যাপারটাকে যতখানি সম্ভব হাল্‌কা করিয়া লইয়া বলিল,—সেদিন বৃষ্টির সময় নিখিলকে যারা এগিয়ে দিতে এসেছিল,—এটি তাদেরই মেয়ে।

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—হুঁ, নিখিলের বন্ধু তাহলে! কথাটা বলিয়া অভয়াশঙ্কর জোরে খানিক হাসিলেন, হাসিয়া একবার সোনার পানে চাহিয়া পরক্ষণেই নিখিলের পানে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

পিতার সে হাসির শব্দে নিখিলের মন শীতার্ত্তের মতই হি-হি করিয়া উঠিল। তার পর নিজেকে সামলাইয়া লইবার পূর্ব্বেই পিতার স্বর কাণে বাজিল—হাতের লেখা সব হয়েছে, নিখিল?

নিখিল ভয়ে-ভয়ে মুখ তুলিয়া পিতার পানে চাহিয়া বলিল,—না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—যাও, লেখা শেষ কর' গে। তারপর আমি আজ পড়াও নেব। বিদ্যে কেমন অগ্রসর হচ্ছে, দেখতে চাই। যাও—

ঝড়ের মুখে কুটার মতই নিখিল সরিয়া গেল।

নিখিল চলিয়া গেলে অভয়াশঙ্কর সোনাকে বলিলেন, কার সঙ্গে তুমি এসেচ এখানে?

সোনা মানুষের এমন রুদ্র কঠোর মূর্ত্তি তাহার জীবনে কখনো দেখে নাই। যেটুকু এখানে এখন দেখিল, তাহাতে ভয়ে সে যেন কাঠ হইয়া গিয়াছিল। সভয়ে সে একটু সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—বাবার সঙ্গে। এবং কথাটা শেষ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার দুই চোখে জল আসিল।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কোথায় তোমার বাবা?

—নীচেয়।

সুষমা বলিল,—তুমি যাও। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওর বাপের কাছে।

দাসীকে ডাকিয়া সোনাকে তাহার সঙ্গে নীচে পাঠাইয়া সুষমা স্বামীর পানে চাহিল, স্বামীর দুই চোখে কি সে বিরক্তির কঠিন দৃষ্টি! সে নিজেকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অপমানিত বোধ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—সুষমা।

সুষমা থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—কি?

—একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—বল।

—তুমি বসো দেখি। একটু স্থির হয়ে সে কথা শুনতে হবে।

৮

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—আমার রুক্ষ মেজাজ বলে তুমি অনুযোগ কর, না? কিন্তু এটা কি ঠিক হচ্ছিল?

সুষমা বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—কোন্‌টা ঠিক হচ্ছিল না?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তুমি জানো, নিখিলের সঙ্গে বাইরের কোন ছেলে-মেয়ের মেলা-মেশা আমি পছন্দ করি না—এ জেনেও তুমি এ-সবের প্রশ্রয় দিচ্ছ!

সুষমা বাণ-বিদ্ধের মত ব্যথিতা হইয়া বলিল,—এই ছোট্ট সরল নির্দ্দোষ মেয়েটি কি আগ্রহ নিয়ে যে নিখিলকে একবার দেখতে

এসেছে,—তার বাড়ী-ঘর, তার মা-বাপ কেমন, দেখতে! তার এ সরল আনন্দটুকু ভেঙ্গে চুরমার করে দেব, এমন কড়া জান্ আমার নয়!

—কড়া জানের কথা হচ্ছে না, সুষমা। একটা নিয়ম মেনে যদি চলতে হয় ত তার জন্যে সময়-সময় কঠিন ত হতেই হবে। আর ছেলের সম্বন্ধেই যখন এই নিয়ম, তখন তা রক্ষা করা আমাদের দুজনেরই উচিত নয় কি?

সুষমা বলিল,—এইখানে আমাদের সাম্‌নে ও যদি নিখিলের পানে দু'দণ্ড তাকিয়েই দেখে, কি তার সঙ্গে দুটো কথাই কয়, তাতে কোনদিক থেকেই নিখিলের কোন ক্ষতি হতে পারে না। তোমারো মান-হানি তাতে ঘটতে পারে না!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এই ত তুমি সব বড়-বড় কথা এনে ফেল্‌চ! এগুলো রাগের কথা, সুষমা। তুমি স্থির হয়ে সব বোঝ, বুঝে কথা বল।

সুষমা বলিল,—রাগ! আমি রাগ করব! কার উপর রাগ করব, শুনি? তাও আবার নিখিলের বিষয় নিয়ে— যার উপর আমার কোন অধিকার নেই!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এ কথা বল্‌চ কেন আবার? আমি ত নিখিলকে তোমার হাতেই সঁপে দিয়েছি, সুষমা।

সুষমা একটু বিরক্তির সুরে বলিল,—মুখে দিয়েছ, স্বীকার করি, অন্তরের সঙ্গে দিতে পারতে যদি, তাহলে এ গোয়েন্দাগিরিটুকুও ছাড়তে!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন—রাগ-অভিমান না করে স্থির হয়ে শোনো দেখি, বোঝো সব। ছেলেকে আমি কি-ভাবে মানুষ করতে চাই, তুমি জানো, সে বিষয়ে তোমার সাহায্যও চেয়েছি আমি। তাতে সাহায্য না করে তার উল্টো পথে চলা কি বিশ্বাস-ভঙ্গ নয়?

—বিশ্বাস! সুষমা বলিল,—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বিশ্বাস করো না আর আমায়। আমি কি কিচ্ছু বুঝি না, ভাবো? তুমি বাহিরে কোনমতে একটা ঠাট বজায় রাখবার জন্যে নিখিলের ভার আমার হাতে দিয়েছ বটে, কিন্তু স্পষ্টই বলছি ও মুখের ভারের কাজ নয়। মনে-মনে প্রতিমুহূর্ত্তই তোমার দারুণ সন্দেহ। —পাছে কি করে ফেলি!...এ না করে যখন সেই আমায় ওর মার আসনই দিয়েছ, তখন অন্তরের সঙ্গেই ওর ভার আমার হাতে ছেড়ে দাও দেখি! তা যদি না পারো ত এ লোক-দেখানে ভার দেওয়ায় কোন ফল হবে না। ছেলেটা মানুষ, ও মাটীর পুতুল নয়—সত্যি! এই যে ছেলেটা মুখ চুণ করে চলে গেল, আমি ওকে পাঁচ মিনিটের জন্যে এখানে ডাকিয়ে এনেছিলুম, তাই ও এসেছিল—তুমি যে চোরের মত তাকে এই তাড়িয়ে দিলে এতে সে ভাবলে কি? যেন কত-বড় অপরাধই না সে করেছিল! এটাতে কি ভাববে না যে ওর মা একটা মাটীর পুতুল মাত্র, তার কথার এখানে কোন দাম নেই। তার কথা শুনে কোন কাজ করতে গেলে আর-একদিক থেকে বিষম তাড়া খেতে হবে? তার মার কথার যা, একটা দাসী-বাঁদীর কথারও সেই দাম?

ক্ষোভে উত্তেজনায় সুষমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল, চোখে জল আসিল।

অভয়াশঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সুষমা স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার বলিল,—আর এই মেয়েটি—কি অপরাধ করেছে সে? বেচারী কি ভাবলে!...সাধে বলি, এ বাড়ীতে একটা দাসী-বাঁদীরও যে অধিকার আছে, আমার তাও নেই। আমায় পাঠিয়ে দাও, সত্যিই কোথাও পাঠিয়ে দাও। এ-বাড়ীর বদ্ধ হাওয়ায় প্রাণে যেন আমার গুমট্ ধরে উঠেছে, বাহিরের ফাঁকা হাওয়ায় দু'দিন ঘুরে একটু দম নিয়ে আসি। সত্যি বল্‌চি, আমার বাইরেটা তুমি এমন চক্‌চকে করে সাজিয়ে রেখেছ যে লোকে দেখলে আমার সৌভাগ্যে হয়তো হিংসা করবে,—কিন্তু ভিতরটা কি রকম যে পুড়িয়ে ছাই করে দেছ!—সুষমা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

অভয়াশঙ্কর তবুও নিরুত্তর রহিলেন, কথার কোন জবাব দিলেন না।

সুষমা তখন সে ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৯

উৎসবের জন্য রঙীন্ ফুলে-পাতায় সজ্জিত শুপ অকস্মাৎ ঝড়ে ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে কলের প্রাণ যেমন করুণ হাহাকারে ভরিয়া উঠে, পিতার সেই আকস্মিক আবির্ভাবে ও তিরস্কারে নিখিলের মনের মধ্যে আনন্দের উৎসব-মণ্ডপটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেটিও তেমনি ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া সেখানে আর্ত্তনাদের হাহাকার জমিয়া উঠিল। সোনা কি মনে করল? তাহার পিতাকে এতটুকু সম্ভ্রমের আসন দেবার আসন পাতিয়া সোনার সামনে আর কখনো সে তাঁহাকে বসাইতে ত পারিবেই না—সোনার মন তাহার উপরও না জানি ইহাতে কতখানি তিক্ত হইয়া উঠিল। বেচারী সোনা! সদরে সে নিজেও তার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহিল না! কেন কহিল না, সোনা কি তাহা বুঝিবে? মার কাছে একটু আদর পাইয়া স্নেহ পাইয়া ব্যথা-হত মনটাকে সে যখন সুস্থ করিয়া লইতেছে, ঠিক সেই সময়—

নিখিলের বুকের মধ্যটা দারুণ ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। মাষ্টার মহাশয় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—ও কি নিখিল, লেখা যে লাইনের উপর চলে যাচ্ছে। মন দিয়ে লিখচ না, বুঝি?

নিখিল লক্ষ্য করিয়া দেখে, সত্যই ত, লেখা লাইনের উপর উঠিয়া গিয়াছে। সে আবার লেখার দিকে মন দিল।

নিঝুম দুপুরে বাহিরে গাছের ডালে বসিয়া একটা ঘুঘু করুণ গান ধরিয়াছিল—খোলা জান্‌লা দিয়া তপ্ত হাওয়ার ঝলক্ ঘরে আসিয়া ঢুকিতেছিল। নিখিল একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল,—বাঙলা হাতের লেখা বই দেখে লিখব কি, মাষ্টার মশায়?

—লেখো।

নিখিল তখন কথামালা খুলিয়া শৃগাল ও দ্রাক্ষাকুঞ্জের গল্পটি খাতায় তাহার হাতের গোটা-গোটা অক্ষরে লিখিতে লাগিল। লিখিতে লিখিতে ভাবনার রাশি আসিয়া তাহার ছোট মনটিকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল। সোনা এখন কি করিতেছে? চলিয়া গিয়াছে, নিশ্চয়! তাহাদের বাড়ীতে গেলে সোনার মা-বাপ তাহাকে কত আদর,

কত যত্ন করে, এখানে সোনা সে আদর-যত্ন না পাক্—একটা মিষ্ট কথাও বাবা তাহার সঙ্গে কহিল না! ইহার পর সোনাদের কাছে সে মুখ দেখাইবে কি বলিয়া? তবু দেখা করিতেই হইবে। সোনাদের সে বুঝাইবে, বাবার আচরণের সহিত তাহার কোন যোগ ছিল না, কোন যোগ নাই-ও! সোনাকে সে ভালবাসে, সত্যই ভালবাসে, খুব, খুব ভালবাসে। সোনার সঙ্গে মিশিয়া নিজের বাড়ীতে সে যে তাহাকে লইয়া খেলা করিতে বা তাহার সঙ্গে দুই দণ্ড কথা কহিতে পারে নাই, গল্প করিতে পারে নাই--ইহার জন্য তাহার নিজের মনে যে কত দুঃখ হইয়াছে! যেমন করিয়া হোক, বাড়ীর এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে করিবেই—সোনাদের বাড়ীতে আজই সে যাইবে, স্থির করিল। এখানে বাঁশবাজি হইবে—হোক—সে তা দেখিতে চায় না। আজ বৈকালে সে সোনাদের বাড়ীতে যাইবেই—ইহার জন্য তিরস্কার প্রহার সহিতে হয় যদি ত সে তা' সহিবে—সারা রাত্রি আবার যদি অন্ধকার ঘরে বন্দী থাকিতে হয় ত তাহাতেও সে কাতর নয়! কেন এমন করিয়া বাবা কুকুর-বিড়ালের মত সোনাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিল? এদেশে এই একটিমাত্র মেয়ে—যে তাহাকে দেখিলে সুখী হয়, তাহার এই একটি মাত্র বন্ধু—না, তাহার প্রতি এ আচরণের শোধ যেমন করিয়া হোক, সে লইবেই! নিখিলের মনে একটা বিদ্রোহের ঝড় উঠিল—এ শাসন, এ বাঁধন আর সহ্য হয় না—ইহা সে কাটিয়া ফেলিবে।

অমনি তাহার মনে পড়িল—মার কথা। বেচারী মা—তাহার সুখের জন্য মার কি প্রাণপণ আগ্রহ! সে আগ্রহে পিতার কি এ নিষ্ঠুর বাধা দেওয়া! মার কাছেও দুই দণ্ড বসিয়া সে গল্প করিতে পায় না। কেন? সে কি মার কেহ নয়? এমনি নানা উদ্ভট চিন্তা আজ প্রথম তাহার ছোট মনটির মধ্যে কোথা হইতে ভিড় করিয়া আসিয়া সশস্ত্র সৈন্যের মত রুখিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—কাটো এ বাঁধন—বিদ্রোহ কর, বিদ্রোহ কর! তাহাদের চীৎকারে নিখিলের সমস্ত মন একেবারে তাতিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

পথে এক বৃদ্ধ ভিখারী ছোট একটি ছেলেকে লইয়া গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল। সে গাহিতেছিল,—

বেলা যে তোর ফুরিয়ে এলো,
কি করিস্ ভাই বসে?
ঘরের কোণ ছেড়ে আয়, আয় চলে আয়—
বাইরে পুলক রসে!

স্তব্ধ নিঝুম দুপুরের বেলা। গোপীযন্ত্রের মিঠা-করুণ বাজনায় গানের এই ছত্রগুলা নিখিলের তপ্ত প্রাণে যেন অমৃত ছিটাইয়া দিল। তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দ্দিকে এই ঘরের কোণ ঘেরিয়া কে যেন লোহার গারদ তুলিয়া ধরিয়াছে, আর সেই গারদের বাহিরে গানের প্রত্যেক কথাগুলা আনন্দের নিশান তুলিয়া সুরের ধারায় সাগ্রহে তাহাকে ডাকিতেছে, আয় রে, ও-ঘরের কোণ ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আয়!

কি সুন্দর গান! বাহিরের মুক্ত হাওয়ায় সত্যই ত, ও কি সুখ! ঐ ছেলেটি

—বাঃ, এই স্তব্ধ দুপুরে পথে-পথে কি আনন্দেই না ও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কোথা হইতে আসিতেছে, কত পথ বহিয়া কত-দূরে যাইবে—চারিধার শ্যামল ঘন গাছের-পাতার ছায়ায় ঘেরা, কত-কত কলরব-মুখরিত পল্লীর ঘাট-বাট অতিক্রম করিয়া নব-নব রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াই যে ও চলিবে! এ যাওয়ার যেখানে বিরাম হইবে, না জানি, সেখানে কি স্নেহ-নির্ঝর-তলে উহার পথ চলার সকল শ্রান্তি ঘুচিয়া যাইবে! ঘরের মধ্যে তাহার মত বন্দী হইয়া উহাকে থাকিতে হয় না! কি করিলে বড় লোকের এই কঠিন পাষাণ-ভবনের দ্বার ঠেলিয়া দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সেও অমনি অবাধ মুক্ত পথে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে! ভাবিতে ভাবিতে নৈরাশ্যের দীর্ঘ কালো ছায়া মেঘাক্রান্ত আকাশের মতই তাহার মনে নিবিড় ঘন হইয়া জমিয়া উঠিল। ঘরে-বাহিরে এ কি বিরাট অন্ধকার গো! শাসনের এ কি কঠিন চাপ, নিশ্বাস যে বন্ধ হইয়া আসে, মা!

বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিখিল বাহিরের দিকে তাকাইল। দূর হইতে ভিখারীর গোপীযন্ত্রের সুরে গাওয়া গানের কলি তখনো বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। নিজের মনে ভিখারী গাহিয়াই চলিয়াছে—

এই যে পাখী ডাকছে গাছে,
আকাশ আলোয় ভরে আছে,—
এই গানে আর আলোর সুরে
সকল বাঁধন খসে!

নিখিলের বন্ধন-ব্যথাতুর চিত্ত প্রাণপণে চীৎকারিয়া উঠিল—আলো, আলো, ওগো আলো! ঐ আলো-হাওয়ায় আমিও যেতে চাই গো, আমায় নিয়ে চল গো!

বাঙ্‌লা হাতের লেখা শেষ করিয়া নিখিল ডাকিল,—মাষ্টার মশায়—

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কি নিখিল?

নিখিল বলিল,—একদিন দুপুরবেলায় বাবাকে বলে আমায় ছুটি দেওয়াবেন, মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কেন নিখিল?

নিখিল বলিল,—দুপুরবেলায় একদিন আমি পথে-পথে ঘুরে চারিধার দেখে বেড়াব, এ দেশের কোথায় কি আছে।

নিখিলের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—দেখে কি হবে?

নিখিল কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—বাইরের আলো-হাওয়া কেমন লাগে, দেখব।

বৃদ্ধ ভিখারীর গান মাষ্টার মহাশয়েরও কানে গিয়াছিল। তিনি বলিলেন,—তাতে দেখবার মত কিছু এমন নেই, নিখিল।

দুই চক্ষে কাকুতি ভরিয়া নিখিল বলিল,—তবু একবার দেখব, মাষ্টার মশায়।

নিখিলের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

সমবেদনায় মাষ্টার মহাশয়ের মনও ভরিয়া উঠিল। বালকের বুকে-পিঠে নিয়মের নিগড় এমনি জড়ানো যে বেচারী একটু বাহির হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে চায়—মাষ্টার মহাশয় এ ইচ্ছার মর্ম্ম বুঝিলেন। তিনি বলিলেন,—আচ্ছা, ওঁকে বলে ছুটি দেওয়াব। এখন লেখা হয়ে গেল ত—এবার অঙ্ক কষ।

আবার সেই নিয়মের বাঁধন! একটার পর আর-একটা—কত দড়ি-দড়া দিয়াই মনটাকে বাঁধিয়া দিয়াছে রে!

নিখিল শুষ্ক বিরস মনে শ্লেট পাড়িয়া বসিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—নাও, অঙ্ক নাও—বারো হাজার সাতশো তিপ্পান্নোকে ন'হাজার চারশো আট দিয়ে গুণ কর। আজ পাঁচটা গুণ কষবে, ব্যস্—তারপর পদ্যপাঠ পড়বে, তাহলেই ছুটি। বুঝলে?

শেষের কথাটা নিখিলের কানেও গেল না। সে শ্লেটে আঁক পাড়িয়া বসিল—তারপর আঙুলে সংখ্যা গণিয়া শ্লেটে ছাঁদ্ পাতিতে লাগিল।

১০

সেদিন বৈকালে নিখিলের আর বাহিরে যাওয়া হইল না। বাঁশবাজি দেখিবার জন্য মাষ্টার মহাশয় ভুলাইয়া তাহাকে চোখে-চোখে রাখিলেন। নিখিল পুতুলের চিত্র-করা দুই চোখ লইয়া বাঁশবাজি দেখিল—একটা বংশ-দণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া ছায়ার মত কতকগুলা মানুষের অঙ্গ-ভঙ্গী চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া গেল, মনের দ্বারে একটিও ঘা দিতে পারিল না।

তারপর দুই-চারিদিন মাষ্টার মহাশয় নিখিলকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইয়া আসিলেন। পথের ধারে-ধারে কত ঝোপ-ঝাড়, ভাঙ্গা মন্দির, পানা-পড়া ডোবা-পুকুর—মাঝে মাঝে কোন ঝোপ হইতে তীব্র কটু গন্ধ আসিতেছে—নিখিলের চোখে মায়াপুরীর মত এগুলা নিঃশব্দ রেখাপাত করিয়া গেল। বেড়াইয়া আসিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কেমন লাগল, নিখিল?

নিখিল বলিল,—ভালো।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কাল আরো দূরে যাব, নিখিল।

নিখিল বলিল,—দুপুরবেলায় ছুটি দিইয়ে দিলেন না, মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—দুপুর বেলায় যে রোদ্দুর, নিখিল।

নিখিল বলিল,—কিছু হবে না রোদ্দুরে, মাষ্টার মশায়। আপনার যাবার দরকার নেই। আমি একলাই শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াব।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আচ্ছা, এই রবিবারে ছুটি দেওয়াব'খন।

তারপর একদিন বৈকালে বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে নিখিল বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখে, সুষমা বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছে। সে বলিল,—মা, তুমি চুপ করে বসে আছ কেন মা?

সুষমা বলিল,—শরীরটা ভালো নেই, বাবা। তুমি বেড়াতে যাওনি, নিখিল?

নিখিল সুষমার কোলের কাছে বসিয়া বলিল,—বাবা বাড়ীতে নেই, মা, তাই একটু তোমার কাছে আসতে ইচ্ছে হলো।

সুষমা সস্নেহে তাহার মুখে-চোখে হাত বুলাইয়া কহিল—না, একটু বেড়িয়ে এসো, সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ আছ, একটু বাহিরে ঘুরে এসোগে—নাহলে শরীর ভাল থাকবে না।

নিখিল মার মুখের পানে চাহিল, কি একটা কথা বলিবার জন্য মন অধীর হইয়া উঠিল—কিন্তু মুখে তাহা ফুটিল না। সুষমা বুঝিল, নিখিল কি একটা কথা বলি-বলি করিতেছে, অথচ তাহা বলিতে পারিতেছে না।

সুষমা বলিল,—আমায় কোন কথা বলবে কি, নিখিল?

—মা—নিখিলের কাতর কণ্ঠে আর স্বর বাহির হইল না।

সুষমা বলিল,—কি বলবে, বল না, বাবা। আমাকে ভয় কি?

নিখিল বলিল,—সোনাকে কি বাবা সেদিন বকেছিল মা?

—না। বক্‌বেন কেন? বকেন নি ত।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। মিছে কথা কেন বলবো আমি, বাবা? সোনাকে তিনি বকেন্ নি।

নিখিলের বুকের উপর হইতে মস্ত একখানা ভারী পাথর যেন সরিয়া গেল। এ-কয়দিন বেড়াইতে বাহির হইয়া মন তাহার প্রতিক্ষণে সোনাদের বাড়ীর দিকে ছুটিতে চাহিয়াছে, শুধু চক্ষু-লজ্জায় সে যাইতে পারে নাই! আজ বুকের উপর হইতে পাথরখানা সরিয়া গেলে তাহার ইচ্ছা হইল, হাওয়ার গতিতে সে যদি সোনাদের বাড়ীতে যাইতে পারিত! পরক্ষণেই সুষমার মলিন মুখ চোখে পড়িতেই ভাবিল,—না, আজ থাক্। মার অসুখ করিয়াছে, মাকে ছাড়িয়া আজ আর দূরে যাইবে না।

সুষমা বলিল,—যাও বাবা, তুমি বেড়িয়ে এসোগে।

নিখিল বলিল—না মা, আজ আর আমি কোথাও যাব না। তোমার অসুখ করেছে, বললে যে। আজ আমি বরং বাগানেই খেলা করিগে—তাহলেই হবে, সেখানেও ত খোলা হাওয়া আছে, মা।

সুষমা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিখিলের পানে চাহিয়া রহিল। সোনা ছেলে, চাঁদ ছেলে! তাহার উপর কি মায়া, কত মমতা! সস্নেহে নিখিলের মুখচুম্বন করিয়া হাসিয়া সে বলিল,—আমার এমন কিছু অসুখ নয় রে। তা বেশ, তুমি বাগানেই নয় বেড়াও গে যাও।

নিখিল চলিয়া গেল। সুষমা তাহার পথের পানে অনেকক্ষণ চাহিয়া বসিয়া রহিল, পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এই ভাঙ্গা-জোড়া, জোড়া-ভাঙ্গা—এ ঠিক এমনিভাবেই সমানে চলিবে—কোন দিনই ইহার বিরাম হইবে না! এই যৌবনে নারী-হৃদয়ের যা-কিছু বাসনা-কামনা, সব ত্যাগ করিয়া জীবনের বসন্ত-কালটুকুকে দুই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অন্তরে-অন্তরে যে সন্ন্যাসের সাধনা সে করিতেছে, তপঃ-ক্লিষ্ট চিত্ত এ-সাধনার পুরস্কার ত আর কিছু চায় না—সে চায়, শুধু এই নিখিলকে প্রাণে-মনে সর্ব্বময়ভাবে বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিতে! হায়রে, পৃথিবীর হিংস্র প্রবৃত্তি কোথা হইতে ইহাতে বাদ সাধিয়া তপস্বিনীর এ-তপেরও বিঘ্ন করিতেছে! তবুও সে এবার একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে, হিংসার রক্তটুকুকে সমূলে শুধু এই ভালবাসার শুভ্র ধারায় ধুইয়া মুছিয়া দিতে পারে কি না! কাহারো বিরুদ্ধে সে আর কোনদিন কোন অনুযোগ তুলিবে না। বেদনার ঝড় তাহারই উপর দিয়া বহিয়া যাক্—তাহার একান্ত স্নেহের তলে-আসীন এই বেচারা মাতৃ-হীন বালকের গায়ে শুধু স্নিগ্ধ হাওয়ার পরশ লাগুক, এ ঝড় তাহার গায়ে না পড়ুক!

নিখিল বাগানে গিয়া গাছের ফাঁকে-ফাঁকে বাগানের পথে ছোট একটা বাঁখারির ঘায় লোহার চাকা ঠোঙ্গাইয়া লাফাইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। মার কাছেই

সে এ খেলা শিখিয়াছে। মা কেমন—শুধু বাবাকেই না ভয়। খানিকক্ষণ খেলা করিবার পর বাগানের বেড়ার ওধারে একটা পরিচিত স্বর ভাসিয়া উঠিল,—ও ভাই রাজপুত্তুর—!

এ কি স্বপ্ন! নিখিল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—না, স্বপ্ন ত নয়—ঐ যে সোনা—বাগানের বেড়ার বাহিরে রাঙ চিত্রের ঝোপের ধারে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতেছে। নিখিল একবার চারিধারে চাহিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল, অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিল,—সোনা?

—হ্যাঁ ভাই, আমি। বাবার সঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি—মাতু পিসীর বাড়ী। বাগানে ঢাকা গড়ানোর শব্দ শুনে উঁকি মেরে দেখছিলুম—অমনি তোমায় দেখতে পেলুম, ভাই।

—ভিতরে এসো না ভাই সোনা। এখন ত আমায় পড়তে হবে না, খেলা করবো'খন।

সোনা মুখ ভারী করিয়া বলিল,—না ভাই, যে তোমার বাবা, ভাই—আমার ভারী ভয় করে।

নিখিলের মনে দুম্ করিয়া কে যেন মুগুরের ঘা মারিল। পিতার স্বপক্ষে বলিবার কথা একটাও নাই সত্য, তবু বাহিরের লোকের মুখে এ কথা আজ নূতন শুনিয়া প্রাণ তাহার ব্যথিত হইয়া উঠিল। নিখিল বলিল,—বাবা ত এখন বাড়ী নেই, শুধু মা আছে।

সোনা বলিল,—রাণী-মা খুব ভালো—কিন্তু তোমার বাবাকে ভারী ভয় করে ভাই। আমি ভিতরে যাব না। তুমি একদিন আমাদের বাড়ী যেয়ো না ভাই। আর ত তুমি যাও না আদবে! আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি, মা রোজ বলে, আসবে রে, আসবে, কিন্তু তবু ত তুমি আসো না—!

নিখিল বুঝিল, এতদিন না যাওয়া ভালো হয় নাই। সে ত যাইবে বলিয়া রোজই ভাবিয়াছে; কিন্তু কেন যায় নাই, সোনা ত তা' বোঝে না অথচ তাহাকে এ কথা খুলিয়া বলাও চলে না! সে বলিল,—যাব ভাই সোনা, কালই আমি যাব। কেমন?

—আমি তাহলে যাই ভাই। ঐ বাবা এসেছে। আবার নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরতে হবে ত। মাতু পিসির ছেলে হয়েছে, আজ আটকড়ায়ে। কেমন ছোট্ট চুবড়ি পাব, আর কত মুড়কি, বাতাসা, সব দেবে। তোমার জন্যেও একটা চুবড়ি চেয়ে নিয়ে আমি রেখে দেব'খন—কেমন? তুমি কাল গিয়ে খাবে ভাই। যেয়ো ভাই। যাবে ত?

নিখিল বলিল,—যাব।

সোনা বেড়ার ধার হইতে সরিয়া গেলে নিখিলও ঢিপি হইতে আবার বাগানে নামিল—নামিতেই তাহার চোখে পড়িল, ঝোপের ধারে লাল-টক্‌টকে একটি সদ্য-ফোটা গোলাপ। তাড়াতাড়ি ফুলটা ছিঁড়িয়া সে আবার বেড়ার সেই ভাঙ্গা ফাঁকটার কাছে আসিয়া দেখিল,—সোনা ঐ যে সে ঐ গলির পথে পুকুরের পাড় ধরিয়া তার বাপের সঙ্গে চলিয়াছে। নিখিল ডাকিল, সোনা, সোনা—

সোনা যাইতে যাইতে পিছন-পানে ফিরিয়া তাকাইতেছিল। নিখিলের ডাক শুনিয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। নিখিল আবার ডাকিল,—সোনা—

সোনা অমনি ছুটিয়া আবার বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিখিল বলিল,—একটি জিনিষ নেবে, সোনা? একটি গোলাপ-ফুল? কেমন রাঙা আর কেমন গন্ধ, দেখো—বলিয়া ফুলটি সে সোনার হাতে তুলিয়া দিল।

সোনা ফুলের ঘ্রাণ লইয়া উল্লাসে হাসিয়া উঠিয়া কহিল,—বেশ ফুল, ভাই—বাঃ! এবং পরক্ষণেই সে পিতার দিকে ছুটিল, ডাকিল—বাবা, ও বাবা, এই দেখ বাবা, রাজপুত্তুর আমায় কেমন ফুল দিয়েছে, দেখ,—রাঙা গোলাপফুল!

সার পথে আনন্দে হাসি ছিটাইয়া সোনা চলিয়া গেল। তাহার সে হাসির সুর অনেকক্ষণ ধরিয়াই নিখিলের মনের মধ্যে প্রাণের মধ্যে এক অপরূপ ঝঙ্কার তুলিয়া বাজিতে লাগিল। নিখিল সে সুরে মুগ্ধ স্তব্ধ হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল,—যখন সে আসিয়া আবার বাগানের পথে নামিল, তখন বড় বড় ঝাউগাছের পাতা বহিয়া সন্ধ্যার ঘন ছায়া বাগানে নামিতেছে। নিখিলের খেলা আর ভাল লাগিল না। সে ধীরপদে বাড়ী চলিল, মার কাছে। মার অসুখ—মা একলা আছে, এখন কেমন আছে, কে জানে? যদি অসুখ বাড়িয়া থাকে? তার উপর সোনার খবরটাও মাকে একবার দিতে হইবে! সেদিনকার পিতার আচরণের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত সে করিয়াছে ত!

১১

পরের দিন সোনাদের বাড়ী নিখিলের আর যাওয়া হইল না। অভয়াশঙ্কর নদীতে নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া সুষমা ও নিখিলকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অপরাহ্নের সূর্য্য-কিরণ নদীর জলে বিচিত্র বর্ণের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। নদীর তীরে গ্রামের মেয়েরা কাপড় কাচিতে, জল লইতে আসিয়াছে। কেহ বা জল লইয়া গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে,—তৃণে-ছাওয়া সবুজের মধ্যে চলা-পথের সাদা রেখা, তরুণীর কালো কেশে সিঁথির মতই—জলের কোলের একটু উপর হইতে জাগিয়া আছে—সেই পথে জলের রেখা আঁকিয়া গ্রাম-নারীরা গৃহে চলিয়াছে। পাড়ে উচ্চ গাছপালার উপর রৌদ্র-কিরণ যেন ফাগের ঝালর ঝুলাইয়া দিয়াছে—সুন্দর দৃশ্য! অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কেমন লাগছে, নিখিল?

উদাসীনভাবেই নিখিল বলিল,—ভালো।

এ নূতন বিচিত্র সৌন্দর্য্য কিন্তু নিখিলের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। সোনাকে সে কথা দিয়াছিল, আজ তাহাদের বাড়ী যাইবে—বেচারী তাহার পথ চাহিয়া আছে—! কথা দিয়াও সে-কথা সে রাখিতে পারিল না, এ কি কম দুঃখ! সে গোলাপফুলটা এখনো সোনা রাখিয়া দিয়াছে কি? ফুল লইয়া সে কি করিল? সোনার মা সে ফুল দেখিয়া কি বলিল? এ-সব জানিবার আগ্রহও যে তাহার প্রাণে খুবই! তাই এ দৃশ্য-বৈচিত্র্যে তাহার প্রাণ ভিজিল না।

ফিরিবার সময় চারিধার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। অভয়াশঙ্কর বাহিরে বসিয়া ছিলেন; পান্‌সীর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া মার কাছে বসিয়া নিখিল বলিল,—একটা গল্প বলো না মা—। তোমার আজ আর অসুখ করেনি?

হাসিয়া সুষমা বলিল,—না। অসুখ করবে কেন?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমরা ভিতরে ঢুকে রইলে কেন? বাইরে এসো না।

সুষমা বলিল,—চুপ করে বসে থাকা যায় না বাবু। তার চেয়ে নিখিল গল্প শুনতে চাচ্ছে—

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তা এইখানে এসেই গল্প বল না, আমিও একটু শুনি।

সুষমা বলিল,—চলো নিখিল।

নিখিল মার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সুষমা এ নিষেধ বুঝিল, বুঝিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—কোন ভয় নেই, নিখিল,—এসো। তার পর আরো মৃদুকণ্ঠে বলিল,—নৌকোয় বেড়ানো ভাল লাগল না, নিখিল?

ঘাড় নাড়িয়া নিখিল জানাইল, না। সে মৃদু কণ্ঠে বলিল,—আজ মা, সোনাদের বাড়ীতে আমি যাব বলেছিলুম না? সেই যে তোমায় বলেছিলুম।

—কাল যেয়ো'খন! এখন এসো, বাইরে এসো। কোন ভয় নেই, আমি গল্প বলব, বসে শুনবে।

নিখিলকে লইয়া সুষমা বাহিরে আসিয়া অভয়াশঙ্করের কাছে বসিল। বাহিরে তখন বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে—সুষমা এক রাজা-রাণীর গল্প সুরু করিল। পাড়ে গাছের ঝোপে-ঝাড়ে আঁধারের মেলা, নদীর জলে দাঁড়ের তালে মৃদু সঙ্গীত-রব, চারিধারে মৃদু জ্যোৎস্নার আলো—আর এমনি সময়ে নৌকার উপর সুষমার কোন্ সেই অজানা দেশের রাজা-রাণীর গল্প—! নিখিলের কল্পনা-রঙীন্ চোখের সাম্নে এক বিচিত্র স্বপ্নপুরী ফুটিয়া উঠিল।

নৌকা হইতে নামিয়া নিখিল দেখে, ঘাটে দাদু ও নন্দ হারিকেন লণ্ঠন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অভয়াশঙ্কর সুষমাকে কহিলেন—এই নৌকোখানি কিনব ভাবচি, সুষমা! বেশ বেড়ানো যাবে তাহলে, না?

সুষমা ছোট্ট জবাব দিল, বলিল,—বেশ হবে।

তারপর আরো পাঁচ-সাতদিন এম্নি নৌকা করিয়া বেড়ানো চলিল। নিখিল হাঁফাইয়া ভাবিল,—এ কি হইল! এ যে পাহারা আরো কড়া করিয়া দিল! বাড়ীতে এতটুকু স্বাধীনতা ছিল না বটে, তবু বৈকালে নিজের স্বাধীন খেয়াল-মত যেখানে-সেখানে যে বেড়াইতে পারিত ত! এখন সে-বেড়ানো টুকুতেও পিতার শাসনদণ্ডের ইঙ্গিত আসিয়া দেখা দিল! তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। পান্সীতে বেড়ানো,—সে ত বেশ লাগে। কিন্তু এমন ভয়ে-ভয়ে গম্ভীরভাবে—এ কি বেড়ানো! নিখিল ভাবিল, কি করিয়া এ বাঁধন কাটা যায়?

হঠাৎ ভগবান সুযোগ করিয়া দিলেন। সেদিন অভয়াশঙ্কর সুষমাকে কহিলেন,—আমার রোজ-রোজ বেড়ানো পোষাবে না, তোমরা দুজনে যেয়ো। বরং একটা চাকরকে সেই সঙ্গে নিয়ো, লণ্ঠন নিয়ে যাবে। ঘাট থেকে আসবার সময় অন্ধকারে কোন অসুবিধা হবে না তাহলে।

একদিন, দুইদিন—মার সঙ্গে পান্সীতে বেড়াইয়া তৃতীয় দিনে অস্থির হইয়া নিখিল, মাকে বলিল—মা, আজ সোনাদের বাড়ীতে যাব আমি, পান্সীতে যাব না।

সুষমা বলিল,—উনি যদি জানতে পারেন?

নিখিল বলিল,—না মা, বাবা জানবে না।

তুমি এক কাজ করো। তুমি নৌকোয় যেয়ো, আর আমি সোনাদের বাড়ী ঘুরে ঘাটে আসব। দাদুকে বারণ করে দেব, দাদু বাবাকে বলবে না তাহলে। তুমিও যেন বলো না—

সুষমা এ কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল—এতখানি ছলনার কথা অনেক ভাবিয়াই নিখিলের মনে উদয় হইয়াছে! সে ভাবিল, হায়রে, কত দুঃখে যে আজ এই মিথ্যা ছলনার আশ্রয় সে গ্রহণ করিয়াছে! সোনাদের বাড়ী যাওয়ায় অপরাধই বা আর কি! তবে নিখিল যদি সতর্ক হইতেই চায় ত বেশ তাই হোক।

সুষমা বলিল—বেশ, তাই হবে'খন। দাদু নয় তোমার সঙ্গে যাক্। আমি নৌকোয় থাকব,—কিন্তু তুমি দেরী করো না, নিখিল। রাত হয়ে গেলে উনি বক্‌বেন, তা যেন ভুলে যেয়ো না।

নিখিলের সর্ব্বশরীর আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সে বলিল,—আচ্ছা মা। কিন্তু দাদু না মা, নন্দকে আমার সঙ্গে দিয়ো। নন্দ ওদের বাড়ীও চেনে। একদিন সে গেছল আমার সঙ্গে।

সুষমা বলিল,—তাই যাক্।

১২

সেদিন বৈকালে সুষমাও গিয়া নৌকায় উঠিল, আর নিখিল ওদিকে নন্দকে লইয়া সোনাদের বাড়ী গেল। এই পথ আজ এত দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে—পাও যেন আর চলিতে চায় না!

হাঁটিয়া হাঁটিয়া অনেকখানি পথ আসিল, —ঐ যে, এবার বাড়ী দেখা যায়! বড়-বড় তালগাছগুলার পিছনে ঐ যে, সোনাদের বাড়ী। আঃ! নিখিল আরামের নিশ্বাস ফেলিল। রাজ্যের আরাম তার এ বিশ্বে ঐ বাড়ীর মধ্যটিতেই আছে! দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নিখিলের গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। এমন স্তব্ধ! কাহারো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না যে!

নিখিল ভাবিল, মন্দ নয়। বাহির হইতে সে কাহাকেও ডাকিবে না—একেবারে দম্‌ক হাওয়ার মতই অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিবে, সকলকে একেবারে চম্‌কাইয়া দিবে। সে ভারী মজা হইবে।

নন্দকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া নিখিল গিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এ কি, উঠানে কেহ নাই ত! সোনা কি তবে আজও নিমন্ত্রণে গিয়াছে না কি!...

না, ঐ যে ঘরে কে রহিয়াছে? সোনার মা!

নিখিল ছুটিয়া হুড়মুড় করিয়া একেবারে গিয়া ঘরের সামনে দাঁড়াইল। এ কি, সোনার মার এ কি মলিন বেশ! চুলগুলা রুক্ষ, আলু-থালু—মুখে-চোখে কালির বিশ্রী দাগ! এ যে তাহাকে চেনা যায় না!

রুদ্ধ নিশ্বাসে নিখিল বলিল—সোনা? সোনা কোথায়?

সোনার মা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—এসেছ বাবা! সে যে রাজপুত্তুর-রাজপুত্তুর করে কেঁদে চলে গেল! দু'দিন আগে যদি আস্‌তে বাবা, তাহলে মা আমার চোখের দেখাও দেখে যেত!

নিখিলের সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল।

অধীর আগ্রহে সে বলিল—সোনা? কোথায় গেছে সোনা?

সোনার মা কাঁদিয়া বলিল—জন্মের মত সে আমাদের ছেড়ে গেছে রে বাবা! আর আসবে না ধন, সে-আর আসবে না!

এ কি কথা! জন্মের মত ছাড়িয়া গিয়াছে—আর আসিবে না? এ কথার মানে কি? কোথায় গেছে সে? কেন আসিবে না? রাগ করিয়া গিয়াছে, বুঝি? নিখিল নিজে গিয়া যদি ডাকিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া আনিতে চায়, তবু সে আসিবে না? যত রাগ করিয়াই যাক্, নিখিলের কথায় সে না আসিয়া কোথাও কখনো থাকিতে পারিবে না!

নিখিল রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল,—কোথায় গেছে সে, বল না আমায়?

সোনার মা দুই বাহুর নিবিড় বাঁধনে টানিয়া নিখিলকে বুকে চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—পাঁচদিন আগে মার আমার জ্বর হয়—কি কাল জ্বরই যে হলো! জ্বলে পুড়ে গেল মা আমার—যাতনায় খালি ছট্‌ফট্ করেছে, আর মুখে শুধু এক কথা,—রাজপুত্তুর-রাজপুত্তুর! ওমা, আমার রাজপুত্তুর এলো না কেন? তোমার দেওয়া গোলাপফুলটি বুকে করে সর্ব্বক্ষণ কেবলি কেঁদেছে। তাকে বাঁচাতে পারলুম না, বাবা, বাঁচাতে পারলুম না। কি কাল রোগেই যে ধরেছিল! স্বপ্নেও ভাবিনি, মা আমার চলে যাবে! কালও যদি বিকেলে একবার আসতে বাবা! রাত দশটা বাজল, মারও আমার সব খেলা সাঙ্গ হয়ে গেল!

নিখিল অবাক হইয়া গেল। সোনা নাই! বাঁচিয়া নাই? মরিয়া গিয়াছে? স্বর্গে গিয়াছে! স্বর্গে গেলে মানুষ তো আর ফিরিয়া আসে না! কিন্তু এত-ছোট, সে স্বর্গে গেল কেন?

অসহ্য যাতনায় বুক তার ফাটিয়া গেল, দুই চোখ বহিয়া জলের ধারা নামিল। কাঁদিতে কাঁদিতে নিখিল বলিল,—কেন সোনা মরে গেল? না, না, তুমি তাকে ডেকে দাও—আমি তার সঙ্গে খেলা করতে এসেছি যে!

সোনার মার হাতের বাঁধন ছিঁড়িয়া বুক হইতে নামিয়া হাত-পা ছুড়িয়া পাগলের মত সে চীৎকার করিতে লাগিল,—সোনা, সোনা, আমি যে তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেচি ভাই। ওগো, দাওনা গো, তাকে ডেকে—এবার থেকে আমি রোজ রোজ এসে তার সঙ্গে খেলা করবো! সত্যি বল্‌চি গো। বাবা মেরে বাড়ী থেকে আমায় তাড়িয়ে দিলেও আমি শুনবো না,—ওগো, দাও, তাকে ডেকে দাও—নাহলে আমি কেঁদে অনর্থ করবো, বাড়ী-ঘর সব ভেঙে চুরমার করে ফেল্‌বো।

নিখিল হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্না শুনিয়া নন্দ ভিতরে আসিল, আসিয়া চোখে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মুখে কথাও ফুটিল না। সে থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভুঁয়ে পড়িয়া বাণ-বিদ্ধ হরিণের মতই নিখিল ছট্‌ফট করিতে লাগিল। সোনার মা তখন নিজের শোক ভুলিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া বুঝাইতে বসিল,—ছি বাবা! শোনো বাবা, লক্ষ্মীটি, অমন করে কি

ছি, শোনো—তোমার জন্যে সে একটী ছোট চুব্‌ড়ি ভরে মুড়কি-বাতাসা রেখেছিল—রোগে পড়ে কেবলি বলেছে, মা, রাজপুত্তুর এসে এই চুব্‌ড়ি করে মুড়কি-বাতাসা খাবে, বলেছে!—চুপ কর বাবা, কেঁদোনা। ছি-লক্ষ্মী মাণিক ছেলে, চুপ কর।

এ কথায় বালকের প্রাণ কি প্রবোধ মানে! সে উঠিয়া বসিল, বসিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল! সোনা, সোনা, সোনা! নাই গো, সে নাই! হাজার ডাকিলেও সে আর নিখিলের সঙ্গে খেলিতে আসিবে না।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া নিখিল অবশেষে বলিল,—কৈ আমার জন্যে যে চুবড়ি করে সে মুড়কি-বাতাসা এনেছিল, দাও, ওগো সেটি দাও আমাকে।

সোনার মা সেল্‌ফ্ হইতে চুবড়ি পাড়িয়া দিল। নিখিল হাতে লইয়া দেখে, চুব্‌ড়িতে পাঁচখানি বাতাসা—পিঁপড়ায় দুই-একটা কুরিয়া খাইয়া ফোঁপ্‌রা করিয়া রাখিয়াছে। নিখিল বলিল,—এগুলো আমি নেব।

নিখিল একখানি বাতাসা মুখে পুরিয়া চুবড়ি হাতে লইয়া বলিল—আমি যাই, আবার কাল আসবো।

সোনার মা বলিল,—এসো বাবা, তাই এসো! তোমায় বুকে করে এ-জ্বালা তবু ভুলতে চেষ্টা করবো।

নিখিল বলিল,—আসবো মা।

মা! নিখিল মা বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিল!

আবেগে নিখিলকে বুকে করিয়া সোনার মা বলিল,—কি বল্‌লে বাবা?—মা! আবার বলো, আর একবার ডাকো আমায় মা বলে! আমার সোনা তোমার গলায় আবার আমায় ডাকবে। ডাকো, আর-একবার মা বলো—আমার শোক-তাপ জুড়িয়ে যাক!

নিখিল দুই হাতে সোনার মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, গাঢ় কম্পিত স্বরে ডাকিল—মা, মা—

—গোপাল আমার, বাছা আমার—বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সোনার মা আঁচলে চোখের জল মুছিল—মুছিয়া নিখিলের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল,—দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো, বাবা, আমার মাথার চুল যত, এমনি পরমায়ু হোক্! এর বাড়া আশীর্ব্বাদ সন্তান-হারা মা আর কি করবে?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা

বাঙলা ভাষার বর্ণ

ভারতীর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'বাংলা ভাষার বর্ণ সম্বন্ধে প্রস্তাব' পাঠ করিলাম। লেখক গৌর-চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন, 'সনাতন প্রথার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলেই বিপদ।' আমাদের বক্তব্য, লেখক এই বিপদ ডাকিয়া না আনিলেই পারিতেন। তিনি এই বিধান দ্বারা ভাষার কোন একটা অভাব পূরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ; আর তাঁহার, 'সুনের' ব্যবস্থা মোটেই

তৃপ্তিকর হইবে না, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বর্ণগুলিকে বাদ দিয়া তিনি যে উদ্ভটতার সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে বাংলা ভাষায় গোলমাল ভিন্ন উন্নতির কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না। তিনি বাংলা ভাষার উন্নতি-কল্পে এই প্রস্তাব জন-সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

'সুন্দর-কুৎসিত তো মনের কাছে' লেখক মহাশয় এই উক্তির দ্বারা বিদ্রোহীর মাথায় শান্তি-জল ছিটাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু আমরা বলি পরিবর্ত্তনের আবশ্যক কি? লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, 'বিদেশী শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাল।' বিদেশী শিক্ষার্থীর জন্য আমাদের ভাষাটাকে বিকৃত করিয়া কোন লাভ নাই। ইহাতে আমাদের অসুবিধা মোটেই কমিবে না—বরং আমাদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে।

লেখক 'সংস্কার-বদ্ধ মনের' উপর আঁখিপাত করিয়াছেন, কিন্তু সংস্কারের বাঁধন হইতে কোন জাতি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে কিনা, জানি না। যদি লেখক মহাশয় কিছু নূতন সত্য দিতে পারিতেন, তবে সংস্কার-বদ্ধ মনকে ফিরাইতে পারা যাইত। কিন্তু তিনি নূতন কিছুই দেন নাই অথচ গোলমাল বাড়াইয়াছেন অনেক। জিনিষটার ভিতরে কিছু লোভনীয় না থাকিলে লোকে কেমন করিয়া সেইটীর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিবে তাহা আমাদের ধারণায় আসে না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কল্পনা-শক্তির আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু লিপিবদ্ধ করিবার আগে তাঁহার চিন্তা করা উচিত ছিল যে এই প্রস্তাব পেশ করিয়া তিনি ভাষার কি উন্নতি সাধন করিবেন! স্বরবর্ণগুলি বর্ত্তমান থাকাতে আমাদের অসুবিধাটা কি, লেখক মহাশয় তাহা দেখাইয়া দিলে ভাল করিতেন। 'বর্ণের বোঝা' কমাইয়া ভাষার ভিতর হঠাৎ অশান্তি আনিতে আমরা চাহি না। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া কিছু যদি নূতনের সন্ধান পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিতাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আদি কথা

সম্মুখেতে সীমহীন স্তব্ধ ধরাখানি,
তারি মাঝে বাণীহারা শুধু দুটি প্রাণী।
সীমাহীন প্রকৃতির নির্জ্জন নিলয়ে,
আদি নর-নারী শুধু কাঁপিছে বিস্ময়ে।

পরিপূর্ণ যৌবনের শতদল-দলে
নগ্না নারী দাঁড়াইয়া মৌন কুতূহলে।
কুতূহলী চিত্তখানি দুটি চক্ষে রাখি,
পুরুষ দাঁড়ায়ে স্থির নির্নিমেষ আঁখি!

দুটি দুগ্ধ হৃদয়ের মর্ম্ম-কোষ টুটি
গান সে উঠিতে চাহে প্রাণ-সম ফুটি।
নিষ্ফল আবেগ শুধু গভীর হতাশা—
কোথা ভাষা—কোথা হায়, প্রকাশের ভাষা!

সহসা কণ্ঠের মাঝে একি গো বিস্ময়,
মানব মনের বাঞ্ছা তারি হ'ল জয়!
প্রথম উঠিল গাহি আদি নারী-নর,
জগতের আদি কথা "সুন্দর, সুন্দর"।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

সমালোচনা

অযোধ্যার বেগম। নাটক। শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য দেড় টাকা।

"অযোধ্যার বেগম" এ দেশের একাধিক সহস্র রজনীর একটী রাত—তাহার দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের একখানি পাতা। "অযোধ্যার বেগম"—নাটকখানির নাম কিন্তু ইহার গৌণ লক্ষ্য—বাংলার শেষ নবাব অতি-লোভী মীর কাশেম আলি খাঁর করুণ পরিণাম। ইতিহাসে কেবল বহিরঙ্গের বিকাশ, নাটকে অন্তরঙ্গের প্রকাশ। তরঙ্গে যেমন নদীর কূল ভাঙ্গে গড়ে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তেমনি ভাগ্যের বিপর্য্যয় ঘটে। দৈব ও পুরুষকার মিলিয়া এই অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার সৃষ্টি করে এবং সেই বহিঃসংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বিষম সমস্যায় পড়িয়া মানবের অন্তস্তলে ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকের প্রধান চিত্র, এবং কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে (Action & Nemesis) যে সম্বন্ধ আত্মগোপন করিয়া থাকে, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন নাট্যকবি সেই ছবি পরিস্ফুট করেন, সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের পুষ্টি এবং রসের সৃষ্টি হয়।

নবাবী আমলের শেষভাগের বাংলা যেন শাক্ত-ভক্ত-গৃহে নবমী পূজার রুধির-কর্দ্দমাক্ত প্রাঙ্গন। দুর্জ্জয় দুরাকাঙ্ক্ষার বেদীতে মীরজাফর সিরাজকে বলি দিলেন। এই বলির পশু সংগ্রহ করিয়াছিলেন—মীর কাশেম। কিন্তু যাহাদের কুচক্রে এই দুষ্ক্রিয়া সাধিত হইল, তাহারাই আবার ষড়যন্ত্র করিয়া মীরজাফরের শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইয়া মীর কাশেমকে দিল। শ্বশুরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীর কাশেম কিন্তু পাপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য অধিকদিন ভোগ করিতে পারিলেন না। ষড়যন্ত্রকারীর দল আবার নবাব বদল করিবার জন্য অনর্থ বাধাইল। কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালা দিয়া রক্তস্রোত বন্যার মত বহিয়া গেল। সারা বাংলার মাটী রাঙা হইয়া উঠিল। নবাব এ দৃশ্যের উপর চক্ষু মুদিলেন। কিন্তু মুদিলে কি হইবে? চোখ বুজিলেও যে দেখা যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে নবাব সে দৃশ্য দেখিতেছেন—"বাঙ্গলার মাটী রাঙ্গা হয়েছে, পলাশীর প্রাঙ্গন রাঙ্গা হয়েছে, নবাবী তখ্ত্ রক্তের উপর ভাসছে।" [৫অ—৭দৃ] মীর কাশেম অযোধ্যাভিমুখে পলাইয়া গেলেন। সেখানে দিল্লীর অস্তমিত সাম্রাজ্যের উজীর, অব্যবস্থিত-চিত্ত সুজার সঙ্গে সৌহৃদ্য-সূত্রে তাঁহার স্বার্থের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। বনবাসী নবাব স্ত্রী-পুত্রসহ সুজার আশ্রিত হইলেন। এত হইয়া গেল, তবু সংযমে অনভ্যস্ত নবাবের দুর্দ্দমনীয় লোভপরতন্ত্র চিত্ত বুঝিল না যে, তাঁহার সিংহাসন-শীকার শেষ হইয়া গেছে। তিনি নিজেই এমন দৃঢ়পণ দুর্ভাগ্যব্যাধের শীকার হইয়াছেন, এবং সেই অলক্ষ্য শত্রুই তাঁহাকে সমধর্ম্মী আর-এক কাম-কাঞ্চন-শীকারীর সঙ্গে সম্মিলিত করিয়াছে। মীর কাশেম সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। সিংহাসন-প্রাপ্তির সম্ভাবনা চির-বিলুপ্ত হইল। অবশেষে জীবন সঙ্কট। প্রাণরক্ষা করিলেন রোহিলা-বীর ফয়জুল্লা।

নবাব সিংহাসন, স্ত্রী-পুত্র, সর্ব্বস্ব হারা। আঘাতের পর আঘাতে তাঁহার হৃদয় চূর্ণ। কোন আঘাতেই যা মরে না, সে আশাও আর নাই। কেবল দুরাশামাত্র সম্বল করিয়া মীরকাশেম রোহিলা গেলেন। কিন্তু অভাগা যেখানে যায়, স্বয়ং লক্ষ্মী সেখানে লক্ষ্মীছাড়া হন। হতভাগ্য মীরকাশেমকে আশ্রয় দিবার জন্য রুষ্ট গ্রহের ন্যায় সুজা চোখ রাঙ্গাইলেন। রোহিলা-রাজ্য তখন শান্তিময়, প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থিত। বিশেষ অযোধ্যারাজ্যের সঙ্গে রোহিলাদিগের একটা কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধও আছে। তাই রোহিলা-মন্ত্রণা-কক্ষে প্রবীণ ওমরাহ নিয়ামৎ ফয়জুল্লাকে তিরস্কার করিলেন—"তুমি বালকোচিত কাজ করেছ, রাজ-নীতিজ্ঞের মত কাজ করনি।" [২অ—১দৃ] বাস্তবিক রাজনীতি দিয়া ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাটী স্বতন্ত্র। যাহাতে সমষ্টির অনিষ্ট, তাহাতে ব্যষ্টির ধর্ম্ম

উপেক্ষণীয়। মহাকবি সেক্সপীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকে এ সত্য বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধ হাফেজ রাষ্ট্রের ইষ্টানিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিলেন—"কিন্তু রাজনীতির অপেক্ষাও আর একটা মহত্তর নীতি আছে—"[২অ—১দৃ] সেই মহত্তর নীতি অনুসারে হতভাগ্য মীর কাশেমকে আশ্রয় দিয়া রোহিলারাজ্য সমূলে ধ্বংস হইল।

কিন্তু অন্যায় করিয়া কেহ ত পার পায় না। সতীত্বাপহারী, সতীর অবমাননা কারী, পরধন-লুব্ধ, মিত্র, অতিথি ও আশ্রিতদ্রোহী সুজারও পাপের ফসল পাকিয়াছে, আহরণের দিন সন্নিকট। দণ্ড-বিধাত্রীরূপে জিঘাংসার বিষাক্ত ছুরি ধরিয়া আততায়ী নারী শোণিত-তৃষাতুরা সিংহীর ন্যায় শীকার অন্বেষণে তাঁহার পিছনে ফিরিতেছে। ধর্ম্মপ্রাণা, চিরহিতৈষিণী সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত সুজা আজ যে ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিয়াছেন, সে জালে ধরা পড়িয়াছেন আপনি। তাঁহার শরীর-রক্ষার্থ চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরীর প্রাচীর। কিন্তু, হায়, ধর্ম্মের শর যে সপ্ততাল ভেদ করে! আততায়ী ছায়া তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিবার পূর্ব্বে গর্ব্বোল্লাসে বলিল, "আগুনের মধ্যে থাক, মনে করেছ গায়ে আঁচ লাগ্‌বে না? সাপ নিয়ে খেলা কর, মনে করেছ সে নির্ব্বিষ? তাও কি কখনো হয়?" [৩অ—৫দৃ] শ্রীরামচন্দ্রের চোরাবাণের ন্যায় ধর্ম্মের দণ্ড যে কখন কার উপর অলক্ষ্যে পতিত হয়, কেহ বলিতে পারে না। তাই সুজা অন্তিম সময়ে বলিতেছেন—"কবে কোথায় অজ্ঞাতে কি পাপ করেছিলেম—প্রায়শ্চিত্ত হ'ল তার কতদিন পরে!" [৪অ—৫দৃ] আবার আশ্চর্য্য এই, ভোগ যখন তৃপ্তির সীমা অতিক্রম করিয়া তিক্ত হইয়াছে, সুজা যখন রমণী-হৃদয়ের সুশীতল প্রেমাশ্রয় খুঁজিতেছেন, তাঁহার জীবনের এই সন্ধিস্থলে বিধাতায় বজ্রাঘাত!

এই ছায়া-চরিত্র ঐতিহাসিক নহে, নাট্যকারের সৃষ্টি। শীকারে গিয়া তৃষার্ত্ত সুজা হাত ধরিয়াছিলেন, তাহাতেই কুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে। তারপর—তায়পর ছায়া ইহার নাম নয়—নাম দুলালী। কিন্তু—"হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে নাম অনেক দিন ডুবে গেছে—এখন তার ছায়া, প্রেতিনী।" [৪অ—২দৃ] খোর্দ্দমহলে সুজার বাঁদীদিগের নিকট ছায়া আত্ম-পরিচয় দিতেছে—"হাত ধল্লে—বল্লে জাত গেল। গায়ে ফোস্কা হয় নি, তবু লোকে বল্লে দগদগে ঘা। বাপ তাড়িয়ে দিলে, মা চোখ মুছলে, দেশের লোক মুখ ফেরালে। যে হাত ধল্লে, তাকে কিন্তু কেউ কিছু বল্লে না। আমার জাতও গেল, ভাতও গেল।" [১অ—২দৃ]

"কিন্তু তাকে কেউ কিছু বল্লে না"—পুরুষের পাপে কেবল নারীই নিপীড়িত হয়। সকল দেশের সকল সমাজেরই বিচার এইরূপ—তখনও, এখনও। বিলাতের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হল্ কেন্ সমাজের এই অন্যায় আচরণের ভিত্তির উপর তাঁহার শেষ উপন্যাস (Master of Man) রচনা করিয়াছেন।

নাটকের মর্ম্ম আরম্ভেই উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে। ডাকিনীত্রয়ের মন্ত্রণায় ম্যাক্‌বেথের সূচনা। প্রতিহিংসা-প্রয়াসী প্রেতাত্মার আবির্ভাবে হ্যাম্‌লেটের আরম্ভ। শকুন্তলার সূচনা—শীকারে—যে প্রেম-মৃগয়া নাটকের আখ্যান-বস্তু, তাহারাই পূর্ব্বাভাস। 'অযোধ্যার বেগম' নাটকের আরম্ভ—মৃগয়ায়। সমগ্র নাটকখানি একটা মৃগয়ার ক্ষেত্র। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্য—ব্যাধ রিপুচালিত মানব—মৃগ। অতি লোভের উৎকট প্রয়াসে, হতাশে, হুতাশে, বিশ্বাস-ভঙ্গের বিজয় হাস্য, রোষের নিষ্ফল দন্তঘর্ষে, জিঘাংসার পৈশাচিক উল্লাসে, শোকের হৃদিভেদী উচ্ছ্বাসে এই দৃশ্যকাব্যের আকাশ আচ্ছন্ন, বাতাস ভারাক্রান্ত। ইহার তলে কালীঢালা উপরে মেঘমালা, মাঝে মাঝে বাতুলতার বিদ্যুচ্চমক আর সর্ব্বোপরি বিধাতার উদ্যত বজ্র।

এই ঝঞ্ঝা-সংক্ষুব্ধ সাগরে আলোকাগারের (Light-house) স্থির জ্যোতির ন্যায় অযোধ্যার বউ বেগমের উজ্জ্বল মূর্ত্তি বিপন্ন পোতকে যেন নিরাপদ বন্দর প্রদর্শন করে। প্রথম অবির্ভাবেই ইনি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—"বাল্যকালের স্মৃতি, যৌবনের অতিমাত্র আমাকে এই শিখিয়েছে—সম্রাট বা নবাব-মহিষী সুখ-দুঃখের অতীত, এদের সুখও নেই দুঃখও নেই। * * * নিজের বলে এদের কোন জিনিষ নেই।

স্বামী নিজের নয়, ছেলে নিজের নয়, আত্মীয়-স্বজন নিজের নয়, সত্য কথা বলে—এমন সখী কেউ নেই, সিংহাসন চিরস্থায়ী নয়!—এই ভীষণ অবস্থার মধ্যে আশ্রয় করে বেঁচে থাকবার একটী জিনিষ আছে বোন্, সে ধর্ম্ম।" [১অ—৩দৃ] এই ভিত্তির উপর এই চরিত্রের স্থিতি। সে রমণী সুজার ন্যায় অব্যবস্থিতচিত্ত স্বেচ্ছাচারী স্বামীকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন—"এ নিমিত্ত যদি আমাকে তোমার বিরাগভাজন হতে হয়, সে বিরাগ আমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মতই মাথা পেতে নেব, তবু আমি স্ত্রীর কর্ত্তব্যপথ থেকে কখনও বিচলিত হব না"—[৩অ—৩দৃ]—সে চরিত্রের ক্ষয় নাই, পুষ্টি নাই, আছে কেবল বিকাশ। তাহারই পূর্ণতা আমরা দেখিতে পাই, সুজার মৃত্যুকক্ষে। নপুত্রা-পুত্রকে সিংহাসন দিবার জন্য স্বামীকে ব্যর্থ অনুরোধ করিয়া বেগম স্বীয় পুত্রকে বলিলেন—"পুত্র, অনন্ত-পথ-যাত্রী তোমার ঐ পিতার সম্মুখে আমি তোমার কাছে একটী ভিক্ষা চাচ্ছি। * * * তুমি এ সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ কর।" [৪অ—৫দৃ] লোক-কল্যাণময়ী এই নারী-চরিত্রে কোথাও আবিলতা বা চাঞ্চল্য নাই। পর্ব্বতবক্ষে শরাঘাত করিলে বাণ যেমন ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে, এই মহিমময়ী নারীকে তেমনি কোন আঘাতই লাগে না। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে ইনি যেমন গৌরবে প্রতিষ্ঠিতা, পুত্র কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও আশ্রয়-বিহীনা বেগম পথের ধারেও তেমনি আত্ম-মহিমায় অবস্থিতা—ইঁহার পদযুগল অস্থিমেদ-রুধিরাক্ত ধরণীর উপর, কিন্তু ধর্ম্মের অক্ষয় মুকুট-মণ্ডিত ইঁহার মস্তক খোদার চরণপ্রান্তে লীন।

এই নাটকে আমরা দেখিতে পাই যে, পাপ আপনার অন্তর্দ্দাহে আপনি দগ্ধ হয়, পুণ্যের দুর্লভ পুরস্কার চিত্ত-প্রসাদ। আর দেখিতে পাই, আশা সকল অবস্থার বিপর্য্যয়ে ভালবাসার গতি অব্যাহত। কিন্তু তাহার মিলন-ভূমি মৃত্যুর উর্ব্বরক্ষেত্র শ্মশানে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

পাখীর কথা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, পি, এইচ, ডি, প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, কলিকাতা। কালিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকার ঐতিহাসিক; তবে পাখীর কথা তাঁহার খুব ভাল লাগে বলিয়া তিনি এ সম্বন্ধে যে বহু গ্রন্থ পাঠ ও বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতেই পাখীর সম্বন্ধে নানা কথা এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। পাখীদের আদি-পুরুষের আলোচনা হইতে সুরু করিয়া তাহাদের Specialisation, পালকের কারণ, গঠন, শ্রেণী-বিভাগ—নখর, চঞ্চু, বেশভূষা প্রভৃতি খুঁটিনাটি ব্যাপারের বিশেষত্ব ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি—এত জ্ঞাতব্য কথা এমন সরসভাবে এই গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে বইখানি উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। দেশী-বিদেশী সকল শ্রেণীর পাখী, তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনের কথা, ডিম, ছানার কথা—কোন কথাই লেখক বাদ দেন্ নাই। রচনার গুণে বইখানি ছেলে-বুড়া সকলেরই চমৎকার লাগিবে। নানা গুণের মধ্যে একটি ত্রুটি চোখে পড়িল, বইখানিতে ছবি নাই। নানারকমের পাখীর কয়েকখানা ছবি দিলে বইখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে এ ত্রুটিটুকু সংশোধিত হইবে।

ব্যক্তি ও সমাজ। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী বি, এ প্রণীত। বিপ্র কুটীর, চন্দননগর। কলিকাতা সাথী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক আমাদের বর্ত্তমান সমাজের কয়েকটি সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। এই কয়টি সন্দর্ভ এ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে,—(১) ব্যক্তি—স্বামী ও স্ত্রী। (২) সমাজ ও ব্যক্তি। (৩) যুগধর্ম্ম। (৪) ভারত সমাজের প্রকৃতি। (৫) বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রকৃতি। (৬) যুগধর্ম্মের অনুষ্ঠান। (৭) কর্ত্তব্য ও তাহার স্তরভেদ। (৮) আচার। (৯) স্ত্রীলোকের কর্ম্মক্ষেত্র। (১০) সহধর্ম্মিণীর আদর্শ। সন্দর্ভগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে কাজের কথা প্রচুর আছে। 'আচার' সন্দর্ভে ঘরোয়া নানা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া লেখক

বুঝাইয়াছেন,—সমাজ দাঁড়াইয়া নাই, আচারও অপরিবর্ত্তিত নাই—এই পরিবর্ত্তনই সমাজের জীবনের সূচনা করে। এই পরিবর্ত্তনকে অস্বীকার করিতে যাওয়া আর নিজেকে অন্ধ বলিয়া প্রচার করা একই কথা। সহধর্ম্মিণীর আদর্শ—সন্দর্ভে লেখক একটা কথা ঠিকই বলিয়াছেন, আজকাল কনে-বৌয়ের দিন গিয়াছে। 'স্ত্রীলোকের কর্ম্মক্ষেত্র' লেখক যেটুকু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেটুকু সঙ্কীর্ণ বলিয়া আমাদের মনে হয়—সে ক্ষেত্র আমরা আরো বাড়াইয়া দিতে চাই। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সমাজহিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিন্তার বহু খোরাক যোগাইবে।

স্মৃতি-মন্দির। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। বিউটী প্রেস ও দেবকীনন্দন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি উপন্যাস। কুলি-পল্লীর চিত্রটুকুই ইহার যা' একমাত্র বৈচিত্র্য—তাছাড়া প্লট একটা আজগুবি অসম্ভব রকমের সামান্য চিঠির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে ভিত্তিটুকু নেহাৎ ভঙ্গুর—তাহার উপর চরিত্র গড়া বা ঘটনা-সৃষ্টি চলে না। উপন্যাসের রাজ্যে Psychologyর প্লাবন আসিয়াছে—এখন এ-সব আজগুবি প্লট লইয়া মামুলি ছাঁদে বিনাইয়া-বিনাইয়া মরা আদর্শ-রচনা চলিবে না, জীবন্ত গোটা মানুষ চাই।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ৪।এ মোহনলাল ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এ বইখানির পরিচয় লইতে গেলে ভূমিকাটুকু ভালো করিয়া পড়া দরকার—সেটুকু এই গ্রন্থের Key—'ব্যাখ্যা পুস্তক'। লর্ড কার্জ্জনের ভারত-শাসনের শেষে বাঙলায় বিপ্লব-বাদের যে উত্তেজনা-স্রোত বহিয়াছিল; তাহাই আধার-বিশেষে ঘূর্ণাবর্ত্তে পরিণত হইয়া বিপ্লব-কেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল—সেইসময় মাণিকতলার বাগানে বোমার ব্যাপার লইয়া দেশের যে কয়টি সন্তান আদালতের বিচারে 'দ্বীপান্তরিত' হইয়া ছিলেন, এই গ্রন্থের লেখক উপেন্দ্রনাথ তাঁহাদের একজন। সেদিনের ইতিহাস বাঙলার এক স্মরণীয় পৃষ্ঠা,—না করিয়া কেহ আপনার কাঁচা মাথা লুটাইয়া দিতে যা নাই—! সেই অতীত দিনের ইতিহাসটুকু দেখে ফিরিয়া গ্রন্থকার এই নির্ব্বাসিতের আত্ম-কথায় ব্য করিয়াছেন। লেখকের রচনা এমন সরস, হাত এত মিঠা যে আমরা এ গ্রন্থখানি একাসনে বসিয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া শেষ করিয়াছি। রচনার কোথাও এতটু অত্যুক্তি বা উগ্র উচ্ছ্বাস নাই, কোনরূপ বাগাড়ম্বর না আপনাকে বড় করিয়া ধরিবার দুশ্চেষ্টাও কোথা নাই—রচনা যেমন সরল, বর্ণনার ভঙ্গীও তেমনি সহজ মর্ম্মস্পর্শী ও মনোজ্ঞ। বাঙালীর স্বরাজ-লাভের ইতিহাসে বাঙালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এই নির্ব্বাসিতে কাহিনী অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকিবে। ব খানির ছাপা-কাগজ চমৎকার—সবই ভালো, অ একটু সংক্ষিপ্ত, এই যা' দুঃখ!

স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর প্রণীত প্রকাশিত। কলিকাতা, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়া মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। স্বর্গীয় অম্বিকাচ রাজকর্ম্মে ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেশন জজ ছিলেন; কিন্তু ইহা তাঁহার পরিচয় নয়। তিনি ধর্ম্মে ও জ্ঞানে এব বরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। এই ক্ষুদ্র জীবন-বৃত্ত তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্বটুকু লেখক সহজ ভা উপাদেয় ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থে কয়েকখ চিত্রও সংগৃহীত হইয়াছে।

ভাগ্যলেখা বা লালা গোলকচাঁদ (প্রথম খণ্ড) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু (ভি নিরানন্দ) প্রণীত ও প্রকাশিত। এমারেল্ড ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত নাটকের উপন্যাসা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। প্রিণ্টার্স ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, মূল্য প্রতিখণ্ড আট আনা।

কৃষ্ণ-কথা। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বি দাস বি-এ প্রণীত। কলিকাতা, মেট্‌কাফ মুদ্রিত।

বস্ত্র-সমস্যা। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত চট্টো

এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ময়মনসিংহ, লিলি প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীকেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে কার্পাসের চাষের কথা মোটামুটি বর্ণনা করিয়া, কার্পাসের চাষে কোন্ দিকে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, কোথায় বাধা-বিঘ্নের আশঙ্কা—এই সব কথার আলোচনা করিয়া লেখক চরকার উপযোগিতা ও প্রচলন সম্বন্ধে সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বরাজ ও খলিফৎ। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত। ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। গোবর্দ্ধন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা। বহু বৎসরের ঘটনা-পরম্পরায় দেশের এখন যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়া লেখক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমগ্র ভারতবাসীকে মানুষ হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এ দুর্দ্দিনে মানুষ হইতে হইলে কুলি-মজুর চাষা প্রভৃতি দেশবাসীকে লইয়া হিন্দু-মুসলমানকে একতায় বদ্ধ হইতে হইবে, হিন্দু মুসলমানকে পরস্পরের সহিত মিলিবার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে—এবং স্বরাজ লাভ লক্ষ্য করিয়া মহাত্মার উপদেশ-মত আমাদের সকলকে চলিতে হইবে।

লেনিন। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ঘোষ মেশিন প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বোলশেভিক্ নেতা লেনিনের জীবন-কথা, তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব এবং কার্য্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সারা বিশ্বেই মানুষ মাত্রেরই আজ মানুষ হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা চলিয়াছে। সমাজ হইতে সর্ব্বপ্রকার হীনতা ও দুর্নীতির উচ্ছেদ-সাধন,—বিশেষতঃ দরিদ্রের দারিদ্র্য-মোচন ও যথেচ্ছাচারী প্রভুত্বের মূলচ্ছেদ—ইহাই হইল মনুষ্যত্ব-লাভের পথে সাধনার মন্ত্র। লেখক একটি পরিচ্ছেদে মহাত্মা গান্ধি ও লেনিনের মতের তুলনা করিয়াছেন—সেটুকু বিশেষ করিয়া অনুশীলন-যোগ্য।

যুগশঙ্খ। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব; কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। এ গ্রন্থে ফাগুন লেগেছে বনে বনে, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাসলীলা, নারায়ণের ডিগবাজি, উন্নতি কিসে, আধ্যাত্মিকতা বনাম কর্ম্ম এই কয়টি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত।

পষ্ট কথা। যুক্ত হেমন্তকুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ আনা। এখানিও সন্দর্ভ-সংগ্রহ; ইহাতে এই কয়টি সন্দর্ভ সংগৃহীত হইয়াছে,—আধ্যাত্মিক হুঙ্কাহুয়া, ইংরেজীর বদহজম, সমাজের টোপাপানা, ভিতরের গোলামি, আমাদের স্বদেশ, বাঙালী, ব্যবসাদারী, ও গোলামখানার শিক্ষা। প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতার ছাপ আছে—তবে সেগুলি একটু সংক্ষিপ্ত। লেখকের দেশের কথা ভাবিবার মন আছে, শক্তি আছে; এবং তাঁহার কথা শুনিবার যোগ্য।

উল্টো কথা। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মেটকাফ প্রিণ্টি ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্য, আর্টের সমজদারী, আর্ট ও জীবন, হাল্‌কা সাহিত্য, মরণ-লীলা, কাব্যে একটি নূতন সুর, বারীন্দ্রের দ্বীপান্তরের বাঁশী, সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজন, বাঙালীর আর্য্যামি, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের স্থান, ভারতের সাধারণ ভাষা এবং বিশ্বের দরবারে ভারত—এই বারোটি সন্দর্ভ সংগৃহীত হইয়াছে। এই বইখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্য, আর্টের সমজদারি আর্ট ও জীবন, বাঙালীর আর্য্যামি এবং বিশ্বের দরবারে ভারত—এই কয়টি প্রবন্ধ-পাঠে লেখকের চিন্তাশীলতার যেমন পরিচয় পাইয়াছি, তেমনি বুঝিয়াছি, লেখক সাহিত্য ও আর্টের একজন বিচক্ষণ সমজদার। বাঙলা সাহিত্যে বাঙালীর জাতীয় জীবনের ছবি ফোটেনা বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ করিয়াছেন, সে আক্ষেপের কারণ বাস্তবিকই আছে। 'আর্টের সমজদারি

সন্দর্ভে লেখক খুব একটি খাঁটি কথা বলিয়াছেন,—আর্টের সমজদারি শেখার বিষয়। কাব্য বুঝিতে হইলে মনকে শিখাইতে হইবে, গান শুনিতে হইলে কানকে তৈয়ারী করিতে হইবে। চিত্র বুঝিতে হইলে চোখকে ঠিক ঠিক দেখাইতে হইবে,—তবে সমজদারি সম্পূর্ণ হইবে। শুধু কতকগুলি পোষা ধারণায় মনকে বাঁধিয়া রাখিয়া অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সন্দর্ভগুলির রচনায় লেখকের ভঙ্গীটুকুও বেশ উপভোগ্য। বাজে অবান্তর কথার ভারে বক্তব্য কোথাও ভারী বোঝা হয় নাই—বলিবার কথাটুকু বেশ সরল সহজ ও হৃদয়গ্রাহীভাবেই তিনি বলিয়া গিয়াছেন—এইটুকুই এ সন্দর্ভ-গ্রন্থখানির মনোরম বিশেষত্ব।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা

নবীনের নিবেদন

(প্রবীণের প্রতি)

প্রবীণ তুমি প্রণম্য গো, বয়স তোমার অনেক বড়,
ভাল-মন্দ অভিজ্ঞতা অনেক তোমার আছে জড়,
অনেক বৃষ্টি, অনেক তুফান, তোমার পরে গেছে ব'য়ে
অনেক বিসদৃশ ব্যাপার চোখে তোমার গেছে সয়ে।
দেখেছ গো অনেক তুমি, শুনেছ গো অনেক-আরও,
এই পৃথিবীর প্রাচীন কথা অনেক তুমি বল্‌তে পারো।
এই পৃথিবীর বর্ষা-শরৎ সবই যদি আছে জানা
তবে কেন চোখ রাঙিয়ে করতে আস নোদের মানা ?
তুমি যখন নবীন ছিলে (সত্য যুগের সকাল বেলা !)
মলয় এসে ফুলের বনে করত নাকি এমনি খেলা ?
শরৎ-কালে এমনি শশী উঠ্‌ত নাকি তোমার নভে ?
পাহাড়-কেটে নির্ঝরিণী ছুট্‌ত নাকি ছন্দ-রবে ?
চিরকালই তুমি কি গো বৃদ্ধ ছিলে এমনি ধারা ?
এমনি নীরস, এমনি কঠিন, এমনি বিরসতায় ভরা !
কমল ফুলের কোমল শোভা কক্‌খনো কি তোমার মনে,
কোন মুখের স্মৃতির ছবি জাগায় নি কি সঙ্গোপনে ?
বাজ্‌লে পরে দূরের বাঁশী জ্যো'স্নাময়ী গহন রাতে
মনের বাঁশী ব্যাকুল হ'য়ে বাজ্‌ত নাকি তাহার সাথে ?
আস্‌লে পরে গগন ছেয়ে সজল কালো ভরা ভাদর,
হৃদয় তোমার চাইত নাকি গোপন কারও সোহাগ-আদর ?
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-রাধা
চিরকাল কি তোমার কাছে আধ্যাত্মিক—সুরেই বাঁধা ?
এ-সব কথা ভেবে দেখো ওগো প্রবীণ পূজনীয়,
তার পরেতে পারো যদি উপদেশের পড়া দিয়ো !

"বনফুল"

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

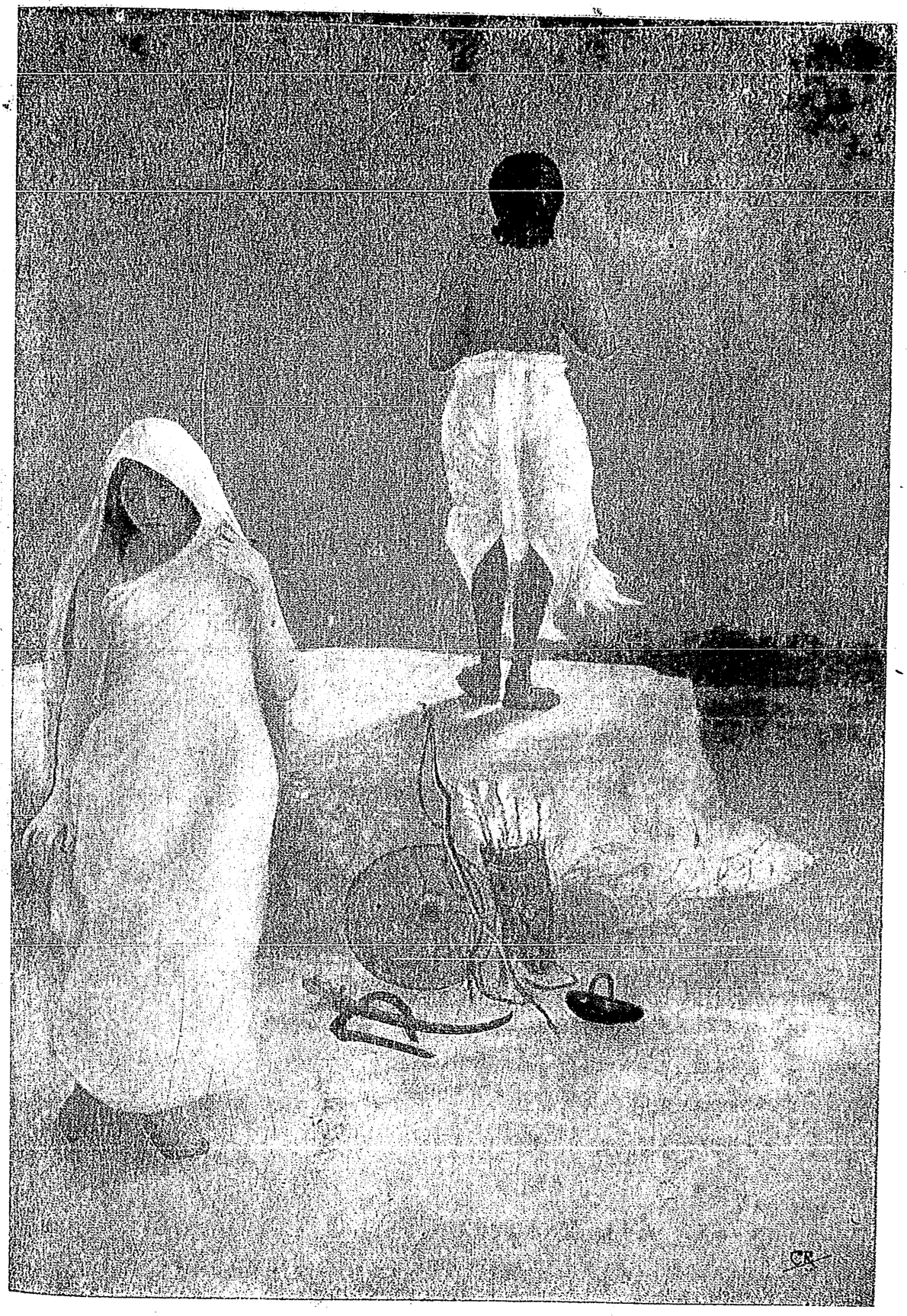

কর্ণ প্রতি কহে কুন্তী গদ-গদ বচন।
সূর্য্য-বরে তুমি বৎস, আমার নন্দন॥ —মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব

ভারতী

৪৫শ বর্ষ]　　চৈত্র, ১৩২৮　　[দ্বাদশ সংখ্যা

আবেস্তা সাহিত্য

অতঃপর ইহাদিগের দেবতা ও অপদেবতার কথা। জরথুষ্ত্র অতি প্রাচীনকালেই দেখিয়াছিলেন যে আবহমান কাল হইতেই মানব প্রকৃতিতে দুইটী তত্ত্ব লীলাবিকাশ করিয়া আসিতেছে—একটী 'কু' ও অপরটী 'সু'। কোনও একটী কাজ করিতে গেলেই মানব-মনে এই দুই তত্ত্বে বিবাদ বাধিয়া যায়। 'কু' যদি বলে—'কর', 'সু' বলে—'না, না; বিপদ আছে।' অবশেষে এই উভয়ের বিবাদে যে জয়ী হয়, তাহারই আদেশানুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। তবে 'সু'র পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলে অবশেষে কুফল অবশ্যম্ভাবী। এই 'কু' ও 'সু'-র দ্বৈতবাদ লইয়াই জরথুষ্ত্রীয় ধর্ম্ম। জরথুষ্ত্রীয় ধর্ম্মে মানব-মনের প্রকৃতির অনুরূপ স্বর্গরাজ্যের অলৌকিক অধিবাসি-গণেরও প্রকৃতি। আধ্যাত্মিক জগতেও এই 'সু' ও 'কু'। এখানেও আমাদের দেবতা ও অপদেবতার অনুরূপ 'বোহু মইন্যু' ও 'অংগ্র মইন্যু' গণের প্রতিষ্ঠা। 'বোহু' শব্দের অর্থ 'সু', এবং 'অংগ্র' শব্দের অর্থ 'কু'। 'অংগ্র মৈন্যু'গণ 'বোহু-মৈন্যু'গণের শত্রু। সুতরাং অধ্যাত্ম-জগতেও দ্বিবিধ জাতির সত্তা। 'বোহু মৈন্যু' গণের শ্রেষ্ঠ 'অহুরো মজ্‌দা' এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমে 'কু'র প্রভাবে 'সু' পরাভূত হইলেও পরিণামে 'সু'র জয় ও 'কু'র পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যই সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরো মজ্‌দা উপাস্য। কিন্তু 'অংগ্র মৈন্যু' ও 'দএব' নামে বিদিত তাঁহার অনুচর-বর্গ ভীতির কারণ হইলেও উপাস্য নহেন। অহুরো মজ্‌দার সভায় ছয়জন অমাত্য, ইহাদিগকে 'অমেষ স্পেন্ত' অর্থাৎ সদাচারী অমরবৃন্দ বলা হয়। সুতরাং পরলোকের প্রধান নিয়ন্তা অহুরো মজ্‌দার সভা নিম্নরূপঃ—

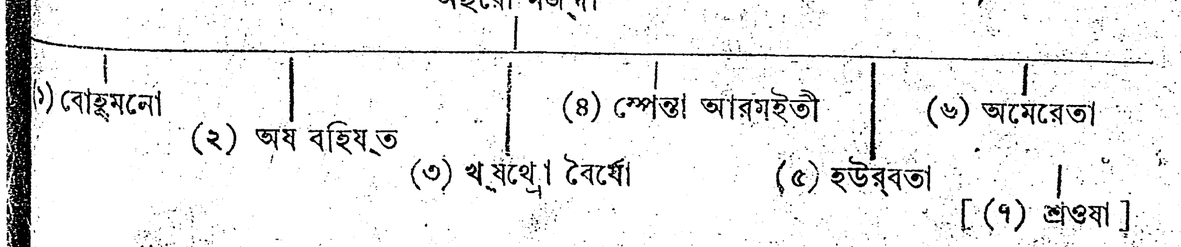

(১) 'বোহূমনো' শব্দের অর্থ 'ভাল মন'। বিবেক, সৎপ্রবৃত্তি বা ধর্ম্মবুদ্ধির মূর্ত্তি-কল্পনা বা personificationএ হইয়াছে বোহূমনো। পরে 'করুণা' বা 'পরোপকার প্রবৃত্তি'ই ইহার ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। অবশেষে পশুর প্রতি করুণা ইহার ধর্ম্ম হওয়ায় ইনি পশুপালনের দেবতা হইয়াছেন। আধুনিক ভাষায় ইনি 'বহমন'।

(২) 'অষ বহিষ্‌ত' শব্দের অর্থ 'শ্রেষ্ঠ সত্য' বা 'অতি মঙ্গল-ময় তত্ত্ব'। সংস্কৃত 'ঋত', ইংরাজী 'right' ও আবেস্তার 'অষ' এক। বহিষ্‌ত শব্দ বোহূ (= মঙ্গল, 'সু') শব্দের উত্তর ইষ্ঠ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। ইনি পবিত্রতা বা মঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি। 'আগ্ন' যখন জরথুষ্‌ত্রীয়গণের পবিত্রতার চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইলেন, তখন হইতে ইনি অগ্নিদেব। ইনি অহুরো মজ্‌দার প্রধান মন্ত্রী এবং স্বর্গরাজ্যের তালা-চাবি ইহার জিম্মায়।

(৩) 'খ্‌ষথ্র বৈর্য' শব্দে 'শ্রেষ্ঠ রাজত্ব' বুঝায়। 'খ্‌ষথ্র' (সং ক্ষত্র) শব্দে রাজত্ব। বৈর্য = বর্য্য, বরণীয়, শ্রেষ্ঠ। ইহার অন্যনাম 'বোহু খ্‌ষথ্র' আধুনিক নাম 'শহরিয়র'। ইনি অহুরো মজ্‌দার সুশাসনের প্রতিমূর্ত্তি। 'কু'র বিনাশের জন্যই এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। অবশেষে খ্‌ষথ্রো বৈর্যো ধাতুজগতের (minerals) অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জরথুষ্‌ত্রীয়গণের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ জাতির মধ্যে কোনও অনৈক্য বা বৈষম্য নাই! ইঁহাদের সমাজে পুরুষের যতখানি অধিকার, স্ত্রীলোকেরও তাহাই। সুতরাং অহুরোমজ্‌দার পরিষদে তিনজন পুংদেবতা থাকিলে তিনজন স্ত্রী দেবতাও আবশ্যক। নতুবা ভোটের কম-বেশ হইবে যে! তাই অমেষ-স্পেন্ত গণের প্রথম তিনজন পুরুষ ও শেষের তিনজন স্ত্রীদেবতা।*

(৪) 'স্পেন্ত আরমৈতী' (আধুনিক স্পেন্দার্মদ) শব্দে শান্তি বা সুশৃঙ্খলা বুঝায়। ইনি পৃথিবী ও স্ত্রীজাতির অধিষ্ঠাত্রীদেবী। ইনি আমাদের লক্ষ্মী ও সরস্বতী একাধারে।

(৫) হৌর্বতাৎ (আধুনিক খুরদাদ) সম্পূর্ণতা বা Salvation এর বাচক। ইনি জলদেবী, স্বাস্থ্য-বিধাত্রী। আমাদের সর্ব্বমঙ্গলা-স্থানীয়া।

(৬) 'অমেরেতাৎ' (আধুনিক অমের্দাদ) অমরতা বা immortalityর বাচক। প্রথমে দীর্ঘজীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী থাকি অবশেষে বৃক্ষদেবতা হইয়াছেন। বোধ হয় উদ্ভিদের রোগনাশক শক্তিই ইহার কারণ। শেষোক্ত এই উভয় দেবীর নাম প্রায়ই একত্র ব্যবহৃত হয়। ইহারা উভয়ে স্বাস্থ্য-সলিল ও আয়ু-বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী।

জরথুষ্‌ত্রীয় ধর্ম্মে 'শ্রওষা' (শুশ্রূষা বা সেবা) অমেষ স্পেন্তগণের মধ্যে না হইলেও অর্ব্বাচীন যুগে ইহার আসন অতি উচ্চে, এবং ছয়জন অমেষ-স্পেন্তের নামের সহিত ইহার নাম জুড়িয়া সাত সংখ্যা পূর্ণ করা হয়। ইহার কার্য্য সর্ব্বত্র চৌকি দেওয়া। ইনি পাপ-পুণ্যের প্রত্যক্ষদর্শী এবং মৃত্যুর পর ইহার সাক্ষ্যেই পরলোকগত আত্মার পাপ-পুণ্যের বিচারকালে ইনি অমেষ স্পেন্তগণের সহিত বিচারাসনে উপবিষ্ট হন। আধুনিক ভাষায় ইনি অহুরে

* মূলতঃ প্রথম তিনটী নাম নপুংসক-লিঙ্গ ছিল পরে পুংলিঙ্গ হইয়াছে।

মজ্‌দার Police Commissioner. পার্সীদিগের মৃত্যুর পর তিনদিন যাবৎ এই শ্রওষার গান (যশ্ন ৪৭) গীত হয়।

'কু'-রাজ্যের অধীশ্বর 'ক্রজ্‌' বা 'অংগ্রো মৈন্যু'। অহুরোমজ্‌দার ন্যায় ইহারও সপ্ত অমাত্য—১। অকমনো, ২। ইন্দ্র, ৩। শৌর্ব, ৪। তরো-মৈতী, ৫। তৌরু, ৬। জৈরিচা, ৭। অএষ্মা।

'অকমনো' বোহুমনো'র প্রতিদ্বন্দ্বী। অকমনো = কুমন। তরোমৈতী = ঔদ্ধত্য। অএষ্মা = ক্রোধ। সয়তানের এই সকল অমাত্য অহুরোমজ্‌দার অমাত্যগণের শত্রু স্থানীয়।

আবেস্তা সাহিত্য ও জরথুষ্‌ত্রীয় ধর্ম্মপদ্ধতি হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে আমাদের ঋগ্বেদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ ও আবেস্তা-ধর্ম্মিগণের মধ্যে এককালে ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া ভয়ঙ্কর বিবাদ বাধিয়াছিল। তাহার ফলে আমাদের অসুর তাঁহাদের 'অহুর' অর্থাৎ দেবতা, এবং আমাদের দেব তাঁহাদের 'দএব' অর্থাৎ অপদেবতা হইয়াছেন। দেব শব্দ যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেবতা-বাচী ছিল তাহা লাটিন, গ্রীক ও অন্যান্য ভাষার সাক্ষ্য হইতেই বুঝা যায়, যেমন ইংরাজী deity, কিন্তু অসুর শব্দের 'দৈত্য' অর্থ প্রাচীন নহে। অসু শব্দের অর্থ প্রাণ, জীবন, বল। অস্ত্যর্থ র-কারের যোগে অসুর শব্দের অর্থ 'বলবান্' হইতে পারে। দৈত্যগণের অদ্ভুত বল বা প্রভূত পরাক্রম বলিয়া পরে 'অসুর' দৈত্যবাচক হইতে পারে। কিন্তু আমাদের 'সুর' শব্দটীর সত্তা কোথায়? অসুর শব্দের অকারকে নঞর্থক কল্পনা করিয়া পরে তাহার লোপে সুর শব্দ যখন গড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তখন ইরাণ ও ভারতে বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। আমাদের আরও অনেক দেব-দেবী ইরাণীয়গণের নিকট দানব দানবী হইয়াছেন। সুতরাং এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদকারী কলহের কারণ ধর্ম্ম-চিন্তায় মতভেদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে অন্য কোনও কারণ যে ছিল না তাহা আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে?

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ইহারাও সোমপায়ী ও হওম-উপাসক। আমাদিগের ন্যায় ইঁহাদিগেরও ত্রিবিধ দ্বিজ ও এক শূদ্র ভেদে চারি বর্ণ—আথ্‌ব (অগ্নি-উপাসক, পুরোহিত), 'রথএষ্‌ত্রা' রথী বা ক্ষত্র-ধর্ম্মী ও বাশ্‌ত্র্য (বা কৃষিজীবী) এই তিন বর্ণ দ্বিজ। এবং হুইতয়্‌ বা কারিগর চতুর্থ বর্ণ। আমাদের ন্যায় ইঁহাদেরও ধরিত্রী হপ্তো-কর্ষয়ী বা সপ্তদ্বীপা। ইঁহাদের এই সাত কর্ষয়ের অবস্থানেও অনেক ভাবিবার উপাদান আছে। ইঁহাদের পৃথিবীর কেন্দ্রস্বরূপ কর্ষয় (বা দেশ) 'খ্‌ষ্বনিরথ'। এইটীই হপ্তথ বা সপ্তম কর্ষয়। ইহারই মধ্যে হরবরেজৈতি বা মেরু পর্ব্বত। আবার এইখানেই 'ঐর্য়নো বএজো' বা 'প্রত্নৌকস্‌' অবস্থিত। পূর্ব্বে 'সবহী' বা পূর্ব্ব দেশ। পশ্চিমে 'অরেজহী' বা পশ্চিম দেশ। এই উভয় দেশের নাম একত্র করিয়া দ্বিবচনে ব্যবহৃত হয়। 'সবহী'র অর্থ আলোর দেশ, আর অরেজহীর অর্থ 'আঁধারের দেশ'। পূর্ব্বদিকে আলোকের উৎপত্তি বটে, কিন্তু পশ্চিমে অন্ধকারের উৎপত্তি ত বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ পিতৃ-পিতামহের বাস ছিল বলিয়াই পূর্ব্বদেশ 'আলোর দেশ'। দক্ষিণে 'ফ্রাদৎফ্‌স্‌ু' অর্থাৎ 'পশু (গরু) যেখানে পাওয়া যায় এমন দেশ,' এবং 'বীদৎফ্‌স্‌ু' অর্থাৎ 'যে দেশে পশু আছে'। উত্তরে 'বৌরুবরেষ্‌তি' ও 'বৌরু-

জরেষ্‌তি' অর্থাৎ যেদেশে পর্ব্বত আছে। অন্য কথায় ইঁহাদের পূর্ব্বে আলোক, পশ্চিমে অন্ধকার, দক্ষিণে পশু ও উত্তরে পর্ব্বত ছিল। ইহার কি কোনও রূপক অর্থ বা meta-phorical meaning নাই? আমাদের দক্ষিণের লঙ্কাদ্বীপ যেমন রাক্ষস-রাজ দশাননের রাজত্ব, ইঁহাদের উত্তর-পশ্চিমের 'মাজনা' দেশও সেইরূপ রাক্ষসদিগের রাজত্ব। আমাদের ন্যায় ইঁহারাও কৃষিকর্ম্ম ও গোসেবায় অনুরক্ত। ইঁহাদের গোদেবতা 'গেউষ্‌ উর্বান্‌'। বৈবস্বত যম ও বৈবস্বতী যমী যেমন আমাদের আদি মানব—মানবী, 'যিমো বিবংহৎ' সেইরূপ ইঁহাদেরও আদিপুরুষ।

আবার সব-চেয়ে বেশী সাম্য ভাষায়। সংস্কৃত ও আবেস্তা ভাষা অভিন্ন বলিলেই হয়। আবেস্তার বর্ণমালায় ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ল ও স নাই। ঋ, ৯, ঐ, ঔ নাই। অবশিষ্ট সংস্কৃত বর্ণমালা আবেস্তায় আছে। বর্ণ বিনিময় প্রণালী নিম্নরূপ।

অ, ই, উ, বা আ, ঈ, ঊ, সংস্কৃত ও আবেস্তার ভাষায় অভিন্ন; তবে কখনও কখনও হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘতা ও দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বতা হয়।

সং—তনু, তনূ—দারু—বাহু—
আং—তনু—দাউরু—বাজু
দ্বারম্‌—অথর্বা—সম—বিশ্ব—শ্রুত
দ্বরেম্‌—আথ্রবন্‌—হম—বীশ্‌প—শ্রাত
সং অনীক—যুক্ত—উপরি—
আং অইনিক—যুখ্‌ত—উপইরি
ইষু—ইষ্টি—মিত্র—পুত্র—প্রীত
ইষু—ইষ্‌তি—মিথ্‌—পুথ—ফ্রীত

সংস্কৃত ঋকার স্থানে আবেস্তায় 'এরে', 'অরে'; এবং ঋ বা ইর, উর, স্থানে র, অরে, এরে, অইর্‌, অউর্‌, হয়।

সং—কৃণোতি—মৃত্যু—সকৃৎ—
আং—কেরেনোইতি—মেরেথ্যু—হকেরেং—
অনৃতৈঃ—বৃক্ষম্‌—ঋষ্টি (বর্শা)
অনরেতাইষ্‌—বরেষেম্‌—অর্‌শ্‌তি
সং—হিরণ্যস্য—গিরিঃ—দীর্ঘম্‌—
আং—জরন্যেহে—গইরিষ্‌—দরেঘেম্‌—
রজতম্‌—ঋতুম্‌—কৃত—মৃত।
এরেজতেম্‌—রতূম্‌—কেরেত—মেরেত।

সংস্কৃত এ—ও — ঐ — ঔ

আবেস্তা অএ, ওই—অও, এউ—আই—আউ
সং—এতৎ—বেদ—
আং—অএতৎ—বএদ (জানে)—
প্রেষয়তি—বেথ—শেরে
ফ্রএ ষ্যে ইতি—বোইষ্‌ত (জান)—শোইরে
(তাহারা শয়ন করে)
সং—যে—কে—তে—
আং—যোই (যাহারা)—কোই—তোই—
মে—দেব—দেবী—ওজঃ—প্রোক্তঃ
মোই—দএব (দৈত্য)—দএবী
(দানবী)—অওজো—ফ্রওখ্‌তো
সং ক্রতোঃ (ষষ্ঠী ১র)—মন্যোঃ—
আং খ্রতেউষ্‌ (জ্ঞানের)—মইন্যেউষ্‌—
মন্ত্রৈঃ—গৌঃ (১মা ১ব)—সোম—
মন্থ্রাইষ্‌—গাউষ্‌ (গরু)—হওম
সং ক চ ত প—আবেস্তা ক চ ত প।
সং কতরঃ—তাপয়তি—পতন্তি—
আঃ কতরো—তাপয়েইতি—পতেন্তি—
চরতি—পশ্চ (পশ্চাৎ, বৈদিক)
চরইতি—পশ্চ॥—

সংস্কৃত খ থ ফ—আবেস্তা খ থ ফ

সং খরম্‌ (গর্দ্দভ)—সখা—গাথা—
আং খরেম্‌—হখা—গাথা—
শফাসঃ (খুর)—প্র—তর্পিত
শফাওঙ্‌হো—ফ্র—থ্রংফেধ
সং ক, ত, প—আং, খ, থ, ফ।
সং ক্রতুঃ—ক্ষত্রম্‌—সত্যঃ—
আঃ খ্রতুয্‌—খ্‌ষথ্রেম্‌—হইথ্যো—
প্র—প্রোক্তঃ
ফ্রা—ফ্রওখ্‌তো
সং গ, দ, ব, জ—আং গ, দ, ব, জ;
সং গ, দ, ব—আং ঘ, ধ, ভ; সং ঘ, ধ, ভ,—আং ঘ, ধ, ভ।
সং গাম্‌ (গো, ২য়া ১ব)—দূরাৎ—গ্রীবা—
আং গাঁম্‌—দূরাৎ—গ্রীবা—
বর্হিষ্ঠ—জ্যা—জঙ্ঘাম্‌—ধারয়ৎ
বরেজিশ্‌তো—জ্যাও—জঙ্‌গেম্‌
(leg ২য়া ১ব)—দারয়ৎ
সং ভ্রাতা—ভূমিস্‌—দীর্ঘম্‌ (২য়া ১ব)—
আং ব্রাতা—বূমীম্‌—দরেঘেম্‌, (দরেগেম্‌, প্রাচীন)
বিদ্বান্‌—মেঘম্‌—গর্ভম্‌ (২য়া ১ব) অভি—বিধ্বাও—মএঘেম্‌—
গরেভেম্‌—অইভি
সং র, ল—আং র। আবেস্তায় ল নাই।
সং রথম্‌ (২য়া ১ব)—শ্রীল (বৈং শ্রীর)
আং রথেম্‌—শ্রীর—
কল্পতে—ক্লিপ্ত (ক্লপ্ত)—নরম্‌ (২য়া ১ব)
খ্রপইতী (প্রাচীন) কেরেপ্ত—নরেম্‌
সং শ য স হ—আং শ ষ শ হ; সং স—হ।
সং শফাঃ (খুর, বৈ, শফাসঃ)—শাস্তি
আং—শফাওঙ্‌হো—শাশ্‌তি (লট্‌ তি)—
ইষবঃ—বস্তে—আস্তে—সপ্ত—সোম
ইষবো—বশ্‌তে—আশ্‌তে—হপ্ত—হওম

এ পর্য্যন্ত কোনও বিশৃঙ্খলা নাই; বর্ণ বিনিময় দ্বারা সংস্কৃত শব্দকে আবেস্তার ভাষায় পরিণত করা অনায়াস-সাধ্য। কিন্তু ভাষায় বর্ণমালার ব্যবহার-প্রণালী এত সরল নহে। কুম্ভকার তাহার চক্রের উপর তরল মৃৎপিণ্ড রাখিয়া তাহার কোনও একস্থানে দাগ দিলে সে দাগ যেমন চক্রাকারে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, এক ভাষা হইতে ভাষান্তরে বর্ণমালার ব্যবহারও কতকটা সেই প্রকার। এখানে বর্ণমালা স্থির ভাবে থাকে না; সর্ব্বদা চঞ্চল বা dynamic conditionএ থাকে। সুতরাং একস্থানে পরিবর্ত্তন ঘটিলেই তাহার প্রভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ঈষৎ-তরল মৃৎ-পিণ্ড চালিত হইলে যেমন চালনা শক্তির প্রভাবে তাহার সর্ব্বত্রই আকারের পরিবর্ত্তন হয়, ভাষায় বর্ণমালার অবস্থানও কতকটা সেইরূপ। সুতরাং সংস্কৃত ভাষাকে আবেস্তার ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিতে হইলেও আমাদিগকে আবেস্তার ভাষার dynamic condition লক্ষ্য করিতে হইবে। পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেও সংস্কৃত শব্দের এই প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমরা সংক্ষেপে আবেস্তার ভাষার এই dynamic condition লক্ষ্য করিব।

(১) পদান্ত ম কারের পূর্ব্ববর্ত্তী ই উ দীর্ঘ হয়। পইতীম্‌, পিতূম্‌, তায়ুম্‌, মইধীম্‌ (মধ্যম্‌)।

(২) এক-মাত্র-স্বর-বিশিষ্ট শব্দ দীর্ঘ-স্বরান্ত। জী (সং হি), নী, নূ, ফ্রা (সং প্র)।

(৩) বহু-অক্ষর-বিশিষ্ট (Poly-

syllabic) শব্দের অন্ত্য স্বর (দীর্ঘ ও ব্যতীত) হ্রস্ব। আফ্রিতি (বৈং আ-প্রীতী, তথা ১ব,-আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক), দংহ্য (দস্যু,-দুইটী দেশ, দস্যু শব্দ দেশ বাচক); দ্ব এরেজু (দ্বা ঋজূ-দুইটী অঙ্গুলি)।

(৪) প্রাচীন আবেস্তার ভাষা বা গাথা ভাষার অন্ত্যস্বরমাত্রই দীর্ঘ। অহুরা (হে অসুর), কুথ্রা (কুত্র) অহী (অসি), উতা (উত), যএষূ (যেষু)।

(৫) ন, ম, বকারের পূর্ব্বে অ স্থানে এ হয়। বিন্দেন্ (অবিন্দন, তাহারা পাইল), উপমেম্ বা উপেমেম্ (উপমম্, সর্ব্বোৎকৃষ্ট), এবিষ্‌তী (প্রাচীন) (অবিত্তি, অজ্ঞাতসারে) সেবিষ্‌ত (সবিষ্ঠ), বরেন্তো (ভরন্তঃ), ইত্যাদি। সংস্কৃতেও ন, ম ও জ কারের প্রভাবে অকারের দীর্ঘতা হইত। বৃক্ষাণাম্, গচ্ছামঃ, গচ্ছাবঃ।

(৬) ওষ্ঠ্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণও ওষ্ঠ্যতা প্রাপ্ত হয়। দামোহু (ধামসু, সৃষ্ট জীবসমূহে), বোহু (বসু),

(৭) তালব্য বর্ণের পরবর্ত্তী বর্ণও তালব্যতা প্রাপ্ত হয়। যিম্ (যম্), বাচিম্ (বাচম্); বঞ্জিন (ভাজন), যেশ্নে (যজ্ঞে), যেহ্যা (যস্য, প্রাং)।

(৮) সংস্কৃতের ন্যায় আবেস্তায়ও স্বর ও অর্দ্ধস্বরের গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ ও সন্ধি হয়।

(৯) ন ও ম কারের পূর্ব্বে অ বা আ স্থানে আঁ হয়।

(১০) হ স্থানে জ বা জ. (z) এবং জ স্থানেও জ. (z) হয়। জ.ন্তারম্ (হন্তারম্) হজ.ঙ্‌র (সহস্র), জ.ত (zata, জাত), জ.ইন্তি (হন্তি), অরেজ.ইতি (অর্হতি), জ.শ্‌ত (zasta হস্ত)।

(১১) শ্ব স্থানে শ্‌প হয়। অশ্‌পো (অশ্বঃ, পার্সী আস্‌প্‌), শ্‌পা (শ্বা, কুকুর)।

(১২) ছ স্থানে শ হয়। জশইতি (গচ্ছতি), যশইতি (যচ্ছতি), ইশইতি (ইচ্ছতি)।

(১৩) স্বরবর্ণের পূর্ব্বে পদাদি স স্থানে হ হয়। হপ্ত (সপ্ত), হওমো (সোমঃ), হূখ্‌তেম্ (সূক্তম্)।

(১৪) অ আ এ ও ওই আঁ এবং অএ-চ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী 'অস্' স্থানে 'অঙ্‌হ্' হয়। বঙ্‌হনেম্ (বসনম্), নেমঙ্‌হা (নমস্যা), বঙ্‌হেউষ্ (বসোঃ ৬ষ্ঠী ১ব), অবঙ্‌হো (অবসঃ,-সাহায্যের, রক্ষার), রাওঙ্‌হঙ্‌হোই (রাসসে-তুমি দিতে পার), উষঙ্‌হাঁম্ (উষসাম্), অবঙ্‌হচ (অবসে চ)। একটী ব্যতিক্রম—দহাকো (অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধ নরাকৃতি রাক্ষসের নাম)।

(১৫) ঐরূপ স্থলে 'আস্' স্থানে 'আওঙ্‌হ্' হয়। আওঙ্‌হ (আস-ছিল), থ্রাওঙ্‌হয়েইতে (ত্রাসয়তে), নাওঙ্‌হাবা (নাসাভ্যাম্), মাওঙ্‌হেম্ (মাসম্-চন্দ্রকে), আওঙ্‌হাঁম্ (আসাম্)।

(১৬) ই ঈ উ ঊ পরে থাকিলে (১৪), (১৫) সূত্রের স স্থানে হ হয়। অহি (অসি), পাহি (পাসি)।

(১৭) ক্ষ স্থানে খ্‌য বা ষ হয়। উখ্‌ষানেম্ (উক্ষানম্, ষাঁড় ২য়া ১ব), বখ্‌ষা (বক্ষ্যামি, বলিব), মোষু (মক্ষু L-at mox, শীঘ্র), দষিণ (দক্ষিণ)। এইরূপ সংযুক্ত স্থানে প্রাকৃতে 'খ' বা 'ছ' হয়। 'ক্ষণ' স্থানে

ঋণ (মুহূর্ত্ত) ও ছণ (উৎসব); বৃক্ষ-রুক্‌খ, বচ্ছ ; দক্ষিণ-দক্‌খিণ দচ্ছিণ দহিণ।

(১৮) দ্বিগুণিত ব্যঞ্জন (এক বর্ণ দুইবার) আবেস্তায় নাই। দুষিতি (দুষ্‌যিতি স্থানে-দুরবস্থা ক্ষিতি) উষহ্ব (উষহ্‌হ্ব উষঃসু-অ), বুনেম্ (বুধ্নম্ ভিত্তি)।

(১৯) দন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী দন্ত্য ব্যঞ্জন স্থানে শ্‌ হয়। চিশ্‌তি (চিৎতি, জ্ঞান) রওশ্‌ত (রুধ্‌+ত, রূঢ়=উৎপন্ন) চকারের পূর্ব্বেও হয়। যশ্চ (যৎ+চি, যচ্চ রএব শ্চিথ্রা (রএবন্ত্‌+চিথ্রা, ধনবান্ পরিবার, ভাল গৃহস্থ)।

(২০) খ্‌ত বা র্ত্ত স্থানে কখনও কখনও ষ হয়। অষেম্ (ঋতম্), পেষনাও (পৃতনাঃ, বাষারেম্ (ভর্ত্তারম্), অষবনেম্ (ঋতবন্তম্, সত্যবাদী, পবিত্রাত্মা)।

(২১) অ কারের পূর্ব্বে গ, ব্যঞ্জনদ্বয়ের মধ্যে দ, শকারের পর য, ম ও র কারের মধ্যে হ লুপ্ত হয়।

(২২) য কারের পূর্ব্বে কখনও কখনও খ্‌ আগম্ হয়।

(২৩) পদান্তে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত বর্ণসমূহ থাকিতে পারে।—স্বরবর্ণ, ৎ, ন, ম, র, শ্‌ ; যুক্তবর্ণ খ্‌য্‌, ফয্‌, য্‌ৎ, শ্‌ৎ।

(২৪) য, ত, ন, ম, য, র, ব, ভ বর্ণের পূর্ব্বে অল্প-প্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ হয়। পুথ্রা (পুত্র), খ্‌যথ্রা (ক্ষত্র), উখ্‌ত (উক্ত), থ্‌বাঁম্ থ্‌বাঁম্ (ত্বাম্), মন্ন (মগ্ন=নগ্ন), জয়্‌ম্যাম্ (আমি যাইতে পারিতাম, গগম্)। শব্দের প্রথমাংশে ক্ক, চ্ব, জ্জ, থাকিলে হয় না। ণ্ড, শ্‌ত, য্‌ত, বা জ্‌দ—এই কয়টী যুক্তবর্ণ অপরিবর্ত্তিত থাকে।

(২৫) ন বা ন পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী দন্ত্য ব্যঞ্জন বা উষ্ম বর্ণ অঘোষ-বর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ম এ জ্‌+মন্—মএশ্‌মন্ (মূত্র √-মিহ্‌), অ এধ্‌+ম— অএশ্‌ম (ইন্ধন), উরুধ্‌+ম্যা-উরুধ্‌ম (বৃদ্ধিমান্ রুহ-মন্) তচ্‌-ম—তখ্‌ম (শক্ত, √-তষ্ট্‌) তপ্‌—নু-তফ্‌নু (তাপ, জ্বর)।

আবেস্তার ভাষার উচ্চারণ-প্রণালী অতি বিচিত্র। যদি স্বাভাবিক কারণে এই প্রকার উচ্চারণ-প্রণালী উদ্ভূত হইয়া থাকে তবে বলিতে হয় যে তাঁহাদের জিহ্বা ক্ষুদ্র ছিল। জিহ্বার দীর্ঘতা থাকিলে স্পর্শ বর্ণের উচ্চারণে কেবলমাত্র জিহ্বামূলের সঙ্ঘর্ষণ দ্বারা শ্বাস-বায়ু ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কি আরাম পাইতেন? 'খ্‌যতূম্', 'খ্‌য্‌মই', 'যশ্নাওঙ্‌হো, বীদ্বাওঙ্‌হো 'রওচয়েইতি' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ কি প্রকারে সরল হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। স্বরের পাশে স্বর তিন চারিটী বসিবে, আবার দুরুচ্চার্য্য ব্যঞ্জনও দুই তিনটী একত্র হইয়া পদের আদি স্থান অধিকার করিবে। খ থ ফ ঘ ধ ভ spirant বা উষ্মবর্ণ হইলে তাঁহাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়; অথচ ছ ঝ বা ল তাঁহারা উচ্চারণ করিতে পারেন না। টবর্গ-টা একেবারেই আপদ দূর হইয়া রহিয়াছে। অথচ জ. (z) ঝ. (zh) 'খ্‌য্‌' তাঁহাদের সরল উচ্চারণ। এই ত গেল বর্ণমালার কথা। আবার বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয়, স্থিতি পরিবৃত্তি স্বর-ভক্তি প্রভৃতিরও উদাহরণ ভাষায় ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। স্বরভক্তির একটু ছড়াছড়ি। আমাদের ঋক্ প্রাতিশাখ্য দুরুচ্চার্য্য ব্যঞ্জন দ্বয়ের উচ্চারণের সুগমতার জন্য অনুমোদন করিলেন যে অর্দ্ধমাত্রা বা চতুর্থমাত্রা স্বর

ব্যঞ্জন-দ্বয়ের মধ্যে উচ্চারণ করা চলিবে, তাহাতে মন্ত্রের উচ্চারণে দোষ হইবে না। অথর্ব প্রাতিশাখ্য ইহারও অর্দ্ধেক পরিমাণ স্বর অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু আবেস্তার ভাষায় স্বরের পার্শ্বে স্বর স্বরভক্তি রূপে শোভা পায়। ছন্দের জন্য অক্ষর বা মাত্রার পরিমাপ কালে কিন্তু ইহাদের কাহারও স্বাধীন সত্তা থাকে না। পূর্ব্ববর্ত্তী তালব্যবর্ণ ও পরবর্ত্তী ওষ্ঠ্য বর্ণের প্রভাবে ই বা উ বর্ণের আগম সাধারণতঃ হইয়া থাকে। র বা ঋ বর্ণের সরলতার জন্য এ (হ্রস্ব) আসিয়া পূর্ব্বে বসে। সংস্কৃতের ন্যায় যুক্তবর্ণের সরলতার জন্যও স্বরভক্তির ব্যবহার হয়।

শব্দরূপ সংস্কৃতেরই অনুরূপ। লিঙ্গ, বচন কারক, সংস্কৃতের ন্যায়। বিভক্তি সমূহ নিম্নরূপ ঃ—

একবচন ঃ—প্রথমা। বিভক্তি-স্ (ষ্); কিন্তু প্রায়ই ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অকারান্ত শব্দ ওকারন্ত হয়। অন্য শব্দে বিভক্তির চিহ্ন প্রায় থাকে না। ক্লীবলিঙ্গে ম্ (সর্ব্বনামে 'ৎ') হয়। অশ্‌পে, রথএষ্‌তাও, গইরিষ্, বীষ্, (বিট্), যশ্নশ্চ, অশ্‌পশ্চ, ইমৎ অএতৎ, কৎ, যৎ, চিৎ, বশ্‌ত্রেম্।

দ্বিতীয়া। বিভক্তি ম্; পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যশ্নেম্, দএনাম্, গইরীম্, মইন্যুম্, বীশেম্ (বিশম্)। ক্লীব সর্ব্বনামে-'ৎ',-তৎ।

তৃতীয়া। বিভক্তি—আ; বীশা (বিশা; যশ্‌ন (-বৈঃ যজ্ঞা); গইরি-রী (বৈঃ গিরী); থ্বা (বৈ, ত্বা, ত্বয়া), তা (তেন), অন (অনেন); আয়, অয় (বৈঃ অয়া, অনয়া)। সংস্কৃতের 'এন' বা-'না' প্রত্যয় আবেস্তায় নাই। পণ্ডিতগণ বলেন সংস্কৃতের এই ন্-যুক্ত প্রত্যয় মৌলিক নহে। নকারান্ত শব্দের অনুকরণ-জাত।

চতুর্থী। বিভক্তি 'এ' বা 'আই' (সং 'এ' বা 'ঐ'। চ-যোগে 'অ এ চ' হয়। যশ্নাই, দ এ ন য়াই, অ ষ ও ন্যাই, ম ই ন্যবে, তনুয়ে, বীশে, বেরেজইতে, ফেদ্রোই (পিতরে ওই = এ), বচঙ্‌হে, যহ্‌মাই (যস্মৈ), অইঙহাই (অস্যৈ)।

তৃতীয়ার আ (বা অ) এবং চতুর্থীর এ বিভক্তি পরে থাকিলে উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ স্থানে স্থানে 'ম্' আগম হয়।

পঞ্চমী। বিভক্তি 'ৎ'। সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দেই এই 'ৎ' বিভক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আবেস্তায় সর্ব্বত্র। গরোইৎ (গিরেঃ), মইন্যওৎ (মন্যোঃ), বীশৎ (বিশঃ), ব চ ঙ্‌হৎ (বচসঃ), অইঙ্‌হাৎ (অস্যাঃ), অবইঙ্‌হাৎ (অমুষ্যাঃ)।

ষষ্ঠী। বিভক্তি 'ও' (অশ্চ'), 'ষ্', 'এউষ্' 'অহে,' 'হে'। যশ্নহে, গরোইষ্ (গিরেঃ; ওই এ), মইন্যেউষ্, তন্বো, বীশো,' দাথ্রো (দাতুঃ, ধাতুঃ), বীহুযো (বিহুযঃ) অহে (অস্য), অ ইঙ্‌হাও (অস্যাঃ)।

সপ্তমী। বিভক্তি ই। উকারান্ত, অন্ ভাগান্ত ও অন্যান্য কতিপয় শব্দে সপ্তমী বিভক্তিতে কোনও প্রত্যয় নাই। অতিরিক্ত অকারের যোগে কখনও 'অয়' ও 'অর' হয়।

অহুর (অসুরে), দ এ নে (ধোনয়াম্), গরো (গিরৌ), গর (গিরৌ), বঙ্‌হাউ (বসৌ), বীশি (বিশি-), অইপ্য (অপ্সু, আবেস্তায় 'অপ্' শব্দ একবচন), বচহি (বচসি), যহ্‌মি (যস্মিন্), অইঙ্‌হে (অস্যাম্)।

সম্বোধন। প্রায়শঃ কর্ত্তৃকারকের ন্যায়। অনেকস্থলে কোনও বিভক্তি নাই। দ্বিবচন, বহুবচনেও কর্ত্তৃকারকের অনুরূপ।

দ্বিবচন। প্রথমা, দ্বিতীয়া, সম্বোধন। 'অ' বা অন্ত্যস্বর দীর্ঘতা। বীর (বৈং বীরা), উর্বইরে (উর্বরে বৃক্ষদ্বয়), মইন্যু, মইন্যূ (মন্যূ)।

তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী। 'ব্য' 'ব্যা' সং ভ্যাম্। বীরএইব্য, পশুব্য, বাজুবে (বাহুভ্যাম্) আব্যা (আভ্যাম্)।

ষষ্ঠী। —'আও' 'আওশ্চ'। বীর-রাও, মইনিবাও।

সপ্তমী। 'ও'। উবোয়ো, (উভয়োঃ), অঙ্‌হো (অসোঃ)।

অধিকাংশ স্থলেই দ্বিবচনের পদ পাওয়া যায় না।

বহুবচন। প্রথমা। আ, ও, আওঙ্‌হো (বৈং আসঃ, দেবাসঃ)। যশ্নে ওঙ্‌হো (যজ্ঞাসঃ) যশ্ন, দএনাও (ধেনাঃ) গরয়ো (গিরয়ঃ) অষওনীষ্ বৈং দেবীঃ তন্‌বো (তন্বঃ) বেরেজন্তো (বৃহন্তঃ), বীদ্বাওঙ্‌হো বিদ্বাংসঃ।

ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার বহুবচনে কোনও বিভক্তিই নাই। সর্ব্বনামে পুং-নপুংসক লিঙ্গে 'এ' হয়। ইবে, অবো যোই (ওই = এ), তে; অএতে। স্ত্রীলিঙ্গে 'আও'; —ইমাও' অবাও।

দ্বিতীয়া। প্রায় সংস্কৃতের অনুরূপ। কেবল নকারান্ত প্রত্যয়ের অভাব। যশ্না (যজ্ঞান্), দএনাও (ধেনাঃ), গইরীষ্ (গিরীন্) দাতারো (দাতৃন্), ইমা (ইমান্),

তৃতীয়া। বিষ্ বীষ্। অকারান্ত শব্দে 'আইষ্'। যশ্নাইষ্ (যজ্ঞৈঃ), দএনাবীষ, হিজ্‌বীষ্ (জিহ্বাভিঃ); বীজিবীষ্ (বিড্‌ভিঃ) দামেবিষ্ (ধামভিঃ) বচেবিষ্, অএইবিষ্ (এ ভিঃ), আবীষ্ (আভিঃ)।

চতুর্থী, পঞ্চমী। 'ব্যো', অ। যশ্নএইব্যো, দ এ না ব্যো, গইরিব্যো, মইন্যুব্যো, বীজিব্যো যএইব্যো, তএইব্যো, যাব্যো (যাভ্যঃ), অএইব্যো, আব্যো।

ষষ্ঠী। আঁম্। স্বরান্ত শব্দে নাঁম্। যশ্ননাঁম্, উর্বরনাঁম্ গইরিনাঁম্, বীশাঁম্ বচঙ্‌হাঁম্, বীথুষাঁম্ (বিদুষাম্), অএষাঁম্ আওঙ্‌হাঁম্।

সপ্তমী। হু, যু। কখনও কখনও একটী অতিরিক্ত অ- কারের যোগ হয়। বীরএষু উর্বরাহু, গাথাহ্ব, বঙ্‌হুষু, বঙ্‌হুষ্ব, তনুষু, বীরত বচহু, বচহ্ব, অএষু, অএষ্ব, আহু, আহ্ব।

বহুবচনে কারকবিভক্তির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বিরল। ক্লীবলিঙ্গে বহুবচনের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। সময়ে সময়ে তৃতীয়ার বহুবচন দ্বারা সকলবিভক্তির বহুবচনের কার্য্য-নির্ব্বাহ হয়। অন্ ভাগান্ত শব্দ সমূহের ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন আঁ (অন্) প্রত্যয়ান্ত রূপ দিয়া সময়ে সময়ে সকল বিভক্তির কাজ চলে। ঈষ্, ঊষ্ প্রত্যয়ান্ত (স্ত্রীং বহু) পদ সময়ে সময়ে সাধারণ বহুবচনের পদ বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়ার ও সপ্তমীর বহুবচনে অনেক ক্লীবলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ হয়। সংস্কৃতের ন্যায় আবেস্তার কারকের অধিকার সীমাবদ্ধ নহে। এক কারকের স্থানে অন্য কারকের ব্যবহার খুব চলে। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অনেক সময় স্বরান্ত (প্রধানতঃ অকারান্ত) শব্দের ন্যায় রূপ হয়।

ক্রিয়াপদের ব্যবহার

সত্তাব্যঞ্জক, (Indicative) অনুজ্ঞাব্যঞ্জক (Imperative) সম্ভাবনাব্যঞ্জক, Subjunctive

ও ইচ্ছাব্যঞ্জক (Optative) রীতিভেদে সংস্কৃতের ন্যায় আবেস্তার ভাষায়ও ধাতুরূপের চারি পর্য্যায়। সত্তা ও অনুজ্ঞার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয় আছে। কিন্তু সম্ভাবনা ও ইচ্ছা প্রকাশের জন্য ধাতুর উত্তর একটী অতিরিক্ত অকার বা যকারের যোগ হয়; তার পর প্রত্যয় জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই চারি পর্য্যায় ক্রমে ধাতুর উত্তর বিহিত প্রত্যয় প্রাথমিক প্রত্যয়ঃ—

পরস্মৈপদ

	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ	—
এক	সং	তি	সি	মি
	আং	তি	হি	মি এক
দ্বি	স	তস্	থস্	বস্
	আ	তো, থো—		বহি দ্বি
বহু	স	ন্তি	থ	মসি (বৈ)
	আ	ন্তি	থ	মহি বহু

আত্মনে পদ

এক	স	তে	সে	এ
	আ	তে	যে, ঙ্হে	এ এক
দ্বি	স	আতে	আথে	বহে দ্বি
	আ	আথে	——	——
বহু	স	ন্তে	ধ্বে	মহে
	আ	ন্তে	থ্বে	মইদে বহু

অপ্রাথমিক প্রত্যয়।

পরস্মৈপদ

এক	স	ৎ	স্(ষ্)	ম্
	আ	ৎ	স্(ষ্)	ম্ এক
দ্বি	স	তাম্	তম্	ব
	আ	তেম্	——	ব দ্বি
বহু	স	ন্	ত	ম বহু
	আ	ন্	ত	ম

আত্মনেপদ

	প্রথম	মধ্যম	উত্তম	
এক	সং ত	স	ই, অ	এক
	আং ত	ঙ্হ্(ষ)	ই, অ	
দ্বি	সং আতাম্	আথাম্	বহি	দ্বি
	আং আতেম্	—	—	
বহু	সং ন্ত	ধ্বম্	মহি	বহু
	আং ন্ত	ধ্বেম্	মইদী, মইদে	

অনুজ্ঞা, পরস্মৈপদ

	প্রথম	মধ্যম	উত্তম	
এক	সং তু	ধি হি	×	এক
	আং তু	ধি	×	
	×	×	×	দ্বি
বহু	সং ন্তু	ত	×	বহু
	আং	ত, না		

অনুজ্ঞা, আত্মনেপদ

এক	সং তাম্	স্ব(ষ)	×
	আং তাঁম্	ঙ্হ(ষ)	
দ্বি	×	×	×
বহু	সং ন্তাম্	ধ্বম্	×
	আং ন্তাঁম্	ধ্বেম্	

পরোক্ষা, পরস্মৈপদ

অ	থ	অ
অতরে	—	—
অরে, অরেষ্	অ	ম

পরোক্ষা, আত্মনেপদ

এ	—	এ
অইতে	—	—
—	—	—

সম্ভাবনা-ব্যঞ্জক রীতি (Subjunctive mood)

পরস্মৈপদ

অইতি	অহি, আহি, আই	আনি, অ	এক
অৎ	ও, আও		
অতো	—	আব	দ্বি
অতেম্			
এস্তি	অথ	আম	বহু

আত্মনেপদ

এন্				
অতে, অত	অঙ্হে	আনে, আই	এক	
—	—	—	দ্বি	
এন্তে, অইরে	—	আমইদে	বহু	

ইচ্ছাব্যঞ্জক রীতি (Optative mood)

পরস্মৈপদ

এক, ওইৎ, যাৎ	ওইষ্ যাও	—, যাঁম্	
বহু, অয়েন্, যাঁন্	যারে যারেষ্	অএত, যাত	
		[অএম, যাম	

আত্মনেপদ

এক	অএত, ঈত	অএষ, ঈষ	অয়, য
বহু	অয়ন্ত,—	ওই ধ্বেম্,—	ওই মইদী, ওই
		[মইধি, ইমইদী	

সংস্কৃতের ন্যায় আবেস্তায়ও ধাতু সমূহ দশ-গণে বিভক্ত। (১) ভ্বাদিগণে ধাতুস্বরের গুণ হয় ও অকার আগম হয়, ববইতি। (২) অদাদিগণে ধাতুমাত্রের উত্তর প্রত্যয় যোগ হয়, জইন্তি। (৩) জুহোত্যাদিগণে ধাতু অভ্যস্ত হয়। দদাইতি। (৪) দিবাদিগণে যকারাগম হয়। নশ্যেইতি (নশ্যতি) (৫) স্বাদিগণে নু আগমহয়। কেরেনওইতি (কৃণোতি)। (৬) তুদাদিগণে অকারাগম। ভ্রুজইতি। (৭) রুধাদিগণে নকারাগম। ইরিনখতি। (৭) তনাদিগণে উকারাগম। তনওইতি। (৯) ক্র্যাদিগণে না আগম। গেরেভ্নাইতি। (১০) চুরাদিগণে ও কারণজ (Causative) ক্রিয়াতে 'অয়' আগম হয়। রওচয়ে ইহি। গণের মিল থাকিলেও অনেক সময় এক গণীয় ধাতুর রূপ অন্য গণীয় ধাতুর ন্যায় হয়।

আবেস্তার ছন্দঃসমূহও অনেকটা সংস্কৃতের ন্যায়। প্রভেদ এই যে আবেস্তার ছন্দে সংস্কৃতের ন্যায় মাত্রা লইয়া মারামারি নাই। লঘু-গুরু নাই। আছে কেবল অক্ষর বা syllable গণনা। এই অক্ষর গণনার স্বরভক্তি বিহিত (anaptyctic) স্বর সমূহ বাদ পড়ে। আবার বেদের ন্যায় অনেক সময় 'য' ও 'ব' কে ভাঙ্গিয়া 'ইয়' 'উব' করিয়া লইতে হয়। সেটার বোধ হয় আর একটা কারণ লিখন প্রণালীর জটিলতা। আবেস্তার লিখন প্রণালীতে পদমধ্যে 'য' লিখিলেই 'ইয়' এবং 'ব' লিখিলেই 'উব' হয়। লিপির দিক দিয়া বিচার করিলে 'য' বা 'ব' লিখিতে দুইটী 'ই' বা দুইটী 'উ' পাশাপাশি বসাইতে হয়। তিনটী এক প্রকারের লিপি আবেস্তার লিখন প্রণালীতে একত্র স্থান পায় না। আবেস্তার অধিকাংশ ছন্দই সংস্কৃত 'অনুষ্টুভ্' ছন্দের ন্যায় অষ্টাক্ষর পাদের চারি পাদে সমাপ্ত। উদাহরণঃ—"যি-ম-হে-খ্য-থ্রে-অউ-র্-হে! নোইৎ-অত্ত-তেম্-আওঙ্-হ-নোইৎ-গরে-মেম্॥" কিন্তু আবেস্তার ছন্দ বলিলে ইহার প্রাচীন গাথার পাঁচ প্রকার ছন্দকে বুঝায়। (১) অহুনবইতি ছন্দঃ (যশ্ন ২৮-৩৪)। ইহার প্রতি শ্লোকে তিন পাদ; প্রতিপাদে ষোড়শ অক্ষর, সপ্তম অক্ষরে যতি। উদাহরণঃ—"অ-হ্যা-যা-শা-নে-মঙ্-ঘা। উশ-তা-ন-জশ্-তো-র-ফেদ্র-হি-ম্যা॥" এই এক

পাদ। অহুনবইতির সাত সূক্ত বা হাস্। (১) অহ্যা যাশা, (২) খ্ষ্মইব্যা, (৩) অৎতা বখ্ষ্যা, (৪) তাবে উর্বাতা, (৫) খ্ষএতুমইতি, (৬) যথা-আইষ্-ইথা, এবং (৭) যাক্ষ্যওথ্রা। সূক্তের প্রথমাংশ লইয়া নামকরণ হইয়াছে। (২) উষ্তবইতি ছন্দ (যশ্ন ৪৩-৪৬)। ইহার প্রতি শ্লোকে পাঁচ পাদ; প্রতিপাদে একাদশ অক্ষর: চতুর্থ অক্ষরে যতি। উদাহরণঃ—"আৎ-হ্বো-বঙ্-হেউষ্। ব-হ্যো-না-অই-বী-জম্-য়াৎ॥" এই এক পাদ। ইহার চারি সূক্ত ব হাস্। (১) উষ্তবইতি, (২) তৎস্বা পেরেশা, (৩) অৎস্রবখ্ষ্যা, (৪) কাম্নেমোই জাঁম্। (৫) স্পেন্তামইন্যুষ্ ছন্দঃ (যশ্ন ৪৭-৫০)। ইহার প্রতি শ্লোকে চারি পাদ; প্রতিপাদে উষ্তব-ইতির ন্যায় একাদশ অক্ষর; চতুর্থ অক্ষরে যতি। উদাহরণঃ—"খ্ষ্-থ্রা-খ্ষেন্-তাম্। মা-নে-দুষে-খ্ষ্-থ্রা-খ্ষেন্-তা॥" এই এক পাদ। ইহার চারি সূক্ত। (১) স্পেন্তামইন্যুষ্, (২) যে জিদা, (৩) অৎমায়ব, (৪) কৎমোই উর্বা। (৪) বোহুখ্ষথ্র ছন্দ (যশ্ন ৫) ১ ইহার প্রতি শ্লোকে তিন পাদ, প্রতিপাদে চতুর্দ্দশ অক্ষর; সপ্তম অক্ষরে যতি। উদাহরণঃ-দাই-দী-মোই-যে-গাঁম্-ত-যো। অ-প-শ্চা-উ-র্ব-রাও-শ্চা॥" এই এক পাদ। (৫) বহিষ্তো-ইষ্তি ছন্দ (যশ্ন ৫৩)। ইহার প্রতি শ্লোকে চারি পাদ বা পঙ্ক্তি। প্রথম দুইপাদের প্রতিপাদে দ্বাদশ অক্ষর; শেষের দুইপাদে ঊনবিংশতি অক্ষর। সপ্তম ও চতুর্দ্দশ অক্ষরে যতি। উদাহরণঃ—"শা খে নীব জ্য ম্না ব্যো। কই নি বিয়ো ম্রাও মী॥ খ্ষ্মই বি যা চা ব দে ম্নো। মে ঞ্চা ঈ ম্াঁজ্ দজ্ দু [বে] ম্॥ বএ দো দু [বে] ম্ দএ না বীষ্। অ বি যশ্ তা অ হু ম্ [অঙ্ ঘু বাঁম]॥ বঙ্ হেউষ্ ম নঙ্ ঘো॥ অ শা বে অ ন্যো অই নীম্। বী বেঙ্ ঘ তু তৎ জী হোই। হু যে নেম্ অঙ্ ঘৎ॥" এই এক শ্লোক।

ইরাণ ও ভারতের আধুনিক অধিবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সে এক কালে একজাতি ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এইকালেই তাঁহাদের সভ্যতা, ইতিহাস, ভাষা ও ধর্ম্মপ্রণালী অভিন্নভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহারা কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালন করিতেন এবং ইঁহাদের নাম ছিল 'আর্য্য' জাতি। 'আর্য্য' শব্দের মূল অর্থ 'কৃষিজীবী'। গ্রীক 'অরোত্রেন্' লাটিন 'অরত্রম্', আইরিশ 'অরথর্', প্রাচীন নর্মান 'অর্ধম্' প্রভৃতি 'হল' বা 'লাঙ্গল' বাচক শব্দে কৃষি কর্ম্মের বাচক 'অর' বা 'ঋ' ধাতু বিদ্যমান। আমাদের 'অরিত্র' দ্বারা নদী বা সমুদ্রে 'হল চালনা' রূপ রূপক অর্থ প্রকাশ পায়। গো জাতি আর্য্যগণের অতি মূল্যবান্ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল। গোপালন গৃহস্থধর্ম্ম এবং গো শব্দ রক্ষা ও মঙ্গলের বাচক ছিল। 'গোপাল' বা 'গোপ' বা 'গোপা' আমাদের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু দেবতার নাম। হলায়ুধ রামভদ্র তাঁহার অগ্রজতুল্য সহায়। ইরাণীয়গণের নিকট গোজাতির আত্মা (গেউষ্ উর্বন্, সং গোঃ আত্মা) রক্ষা ও মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং আমাদের 'মাযষ্ঠী' বা সর্ব্বমঙ্গলার ন্যায় গৃহস্থমাত্রেরই পূজা ও ভক্তির অধিকারিণী। জিনিস পত্রের মূল্য বা দান উপঢৌকনাদির পরিমাণ দশগো, শত গো প্রভৃতি ভাষায় গো শব্দের দ্বারা অভিহিত হইত। অতি প্রাচীনকালে কৃষিকর্ম্ম সম্ভবতঃ রমণীগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল, এবং পুরুষগণ

পরিশ্রম সাধ্য মৃগয়া কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাই দুহিতা গোদোহন করিতেন। প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে উপনয়ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবং তাঁহারা 'দ্বিজ' বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেন। আধুনিক ভারতীয় পার্সীগণ উপনয়ন সংস্কারকে 'নবজোত' (=নবজন্ম) বলেন। ইরাণীয়গণের উপনয়নের কাল সাত হইতে পনর বৎসরের মধ্যে। আমাদের যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ইঁহারা এক প্রকার পশমী সূতার ফিতা মেখলা রূপে ধারণ করেন। ১২ টী সূতা তিন ভাগে ফিতার আকারে বুনিয়া ইঁহারা উপনয়ন সংস্কারের দিন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কটিদেশে ধারণ করেন। এই ফিতার নাম 'কুষ্টি'। আবেস্তায় যজ্ঞোপবীত—মেখলার নাম 'অইব্যা ও হ' (সং অভিষাস, বা মেখলা)। আর্য্যগণ একত্র বসবাস কালে অসুর মিত্র, বরুণ, বৃত্রঘ্ন, অপাংনপাৎ প্রভৃতি বহু দেব দেবীর উপাসনা করিতেন। বৃত্রহা (বেরেথ্রাঘ্ন) অহি (অঝি) নামক একজন প্রবল দৈত্যকে সংহার করিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণ করিয়াছিলেন। বিদ্যুদ্দেবতা অপাংনপাৎ (জলের নাতি) উভয় জাতিরই উপাস্য ছিলেন। অগ্নির উপাসনা উভয়জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই অগ্নি উৎপাদনের জন্য (অরণী ঘর্ষণ দ্বারা) একজাতীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারাই (ইরাণী আথ্রবন্, ভারতীয় অথর্বন্) যজ্ঞ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতেন এবং দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে পেশ্কার স্থানীয় ছিলেন। ইঁহারা সোম (আবেস্তার 'হওম') রস পান করিতেন এবং সোমাধিষ্ঠিত দেবতার অর্চনা করিতেন। সৎপ্রবৃত্তির ও সৎসাহসের হেতুভূত সোমরস ইহারা দেবতাদিগকে উপহার দিতেন। বিবস্বৎপুত্র যম (যিমো বীবঙ্হতো পুথ্রো) আদি মানব ছিলেন, এবং বহু বর্ষ ধরিয়া অতি সুখে জীবন যাপন করিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন। প্রেতরাজ্যে প্রথম গিয়াছেন বলিয়া তিনিই সে রাজ্যের অধীশ্বর। অতি প্রাচীনকাল হইতে মানবের সহচর কুকুর যমেরও ভৃত্য। ইরাণীয় গণের নিকট কুকুরের অতি সমাদর; গো অপেক্ষাও ইহাদের অধিক প্রিয় শ্পা (শ্বা)। পৃথিবী আর্য্যগণের নিকট অতি পবিত্র দেবতা ছিলেন এবং রক্ষা বাচক গো শব্দের দ্বারা ইনিও অভিহিত হইতেন। ইরাণীয়গণ পৃথিবীকে এত পবিত্র মনে করেন যে মৃত নরদেহ অপবিত্র বলিয়া তাহা মাটিতে রাখেন না, কুকুর ও শকুনকে 'বলি' রূপে প্রদান করেন।

আর্য্যগণের ধর্ম্মমতের মূল সূত্র ছিল সৎকর্ম্ম ও সৎচিন্তা। বেদ ও আবেস্তা এই সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্মের উপদেশ দেন। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপর ঋত (আং অষ) নামক এক অপরিবর্ত্তনীয় শক্তির অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন। দেবগণও এই ঋত-শক্তির প্রভাবের অধীন ছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা 'মন্ত্র' বা 'শব্দ-সমষ্টির' অমোঘ শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন। এই মন্ত্র-বলে কেবল যে ভূত পিশাচ বা দৈত্যগণকে বশীভূত করা যাইত, তাহা নহে। দেবগণও মন্ত্রবলের বশীভূত ছিলেন। ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার বিষয়ে আর্য্যগণ একটু বেশীমাত্রায় চিন্তা করিতেন। ধর্ম্মমত ও দর্শনচর্চ্চায় তাঁহাদের ভাবুকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই

চিন্তাপ্রবণতা হইতেই ভারতীয় ও ইরাণীয়-গণের মধ্যে মহান্ প্রভেদ সঙ্ঘটিত হয়। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মিগণ বলিলেন, "পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত জগৎ; সুতরাং সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়; পরমেশ্বর পরমাত্মা, সেই পরমাত্মা হইতে মানবাত্মা জীবাত্মা সমুদ্ভূত। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নিত্য বা সত্য; তদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ মিথ্যা বা মায়া। সুতরাং সেই পরমাত্মায় বিলীন হইতে পারিলেই জীবাত্মার মুক্তি বা মোক্ষ। যতদিন না সেই মিলন হয়, ততদিন কেবল কর্ম্মভোগও কষ্ট। সুতরাং এ জগৎ বা ইহ জন্ম মায়া মাত্র, সমস্তই অনিত্য কেবলমাত্র দুঃখহেতু। ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইলেও তাঁহার বিচ্ছেদে মানব জীবন। সুতরাং এজগৎটা কিছু-না।" ইরাণীয়গণের মতের মিল হইল না। জরথুষ্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীত মতের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার মতে ইহ জীবন 'কিছু-না' নহে, জীবনে সুখ ও আনন্দ আছে; সেই আনন্দ উপভোগ্য। ফলে দুইটী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল, বিবাদ চলিতে লাগিল, অবশেষে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে 'দেব' শব্দ দেবতাগণের বাচক, ইরাণীয়গণ সেই 'দএব' শব্দে ব্রাহ্মণ্যদিগের উপাস্য দেবতা অর্থাৎ দৈত্য অর্থ দিলেন। আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মিগণ যে 'অসুর' শব্দ তাঁহাদের দেবতা-দিগের বিশেষণরূপে অসীম শক্তির নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহার করিতেন (অসু+র), সেই অসুর তাঁহাদের দেবকুলের শত্রু হইলেন। সেই অবধি হিন্দুদিগের দেব-অসুর ও ইরাণীরদিগের অহুর-দএব স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইলেন। হিন্দুদিগের দৈবতা প্রেমের দেবতা, ইরাণীয়দিগের দেবতা ভয় ও ভক্তির পাত্র। জরথুষ্ত্র তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরের অসীম পরাক্রমে মুগ্ধ হইয়া দৈনন্দিন শুভকর্ম্মের জন্য তাঁহার সাহায্য কামনা করিলেন এবং হিন্দু-দিগের মায়ার দেবতা 'দএব'গণ অহুরের শত্রু বংশ বলিয়া বিদিত হইলেন। ফলে স্বর্গরাজ্যে 'সু'ও 'কু'র অধীশ্বর দুই জাতি হইল—অহুর ও দএব। হিন্দুদিগের অসংখ্য দেবদেবী বিধর্ম্মীর দেবতা বা অপদেবতা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইন্দ্র ও নাওঙ্হইথ্য (নাসত্য) অপদেবতারূপে পরিগণিত হইলেন। এবং ঋগ্বেদেও যে বরুণদেব অসীম শক্তি ও জ্ঞানের আধার এবং 'অসুর' বিশেষণে অভিহিত, তিনি মরুদেব জরথুষ্ত্রের জ্ঞানের দেবতা বা অহুর মজ্দাও (অসুর মেধাঃ) নামে বিদিত হইলেন। কিন্তু অহুর মজ্দা 'সু'র অধীশ্বর হইলেও 'দএব'গণের শক্তি-নিরপেক্ষ নহেন।—তিনি অনবরতঃ 'কু'র অধীশ্বর অঙ্গ্রো মইন্যু (অহ্রিমন বা অর্য্যমা) ও তাঁহার কুমন্ত্রীদিগের সহিত চিরযুদ্ধে ব্যাপৃত। কিন্তু জরথুষ্ত্রের প্রবল বিশ্বাস এই যে অবশেষে 'সু'র অধীশ্বর 'অহুর'গণের জয় এবং 'কু'র অধীশ্বর 'দএব'-গণের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এবং যখন তাহা হইবে, তখন চিরযুদ্ধের অবসানে চিরশান্তি আসিয়া স্বর্গ-মর্ত্তের প্রভেদ দূর করিয়া দিবে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শেষ চিঠি

রাণীর চিঠি ফিরে এসেছে। কত জায়গা ঘুরেছে এ চিঠি! প্রত্যেক জায়গায় প্রায় ব্যর্থতার চিহ্ন এর বুকে একেবারে তারিখ এবং সময় শুদ্ধ আঁকা রয়েছে! চিঠির এক কোণে এক পিয়নের হাতের পেন্সিলে লেখা আঁকা-বাঁকা অক্ষর—অনেকখানি তার মুছে গিয়েছে বোধ হয় লিখেছিল, চিঠির মালিককে পাওয়া গেল না। চিঠির বুকে পিঠে অনেক গুলো গোল-গোল ছাপ, তার মধ্যে একটা সবার চেয়ে স্বতন্ত্র চৌকো ছাপ নিজের স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। তার ভিতরে খুব মোটা হরফে লেখা—ডি, এল্, ও। সেটা ডেড্ লেটার অফিসের মোহর। চিঠির খামের মুখ খোলা—এবং সেখানা একখানা বড় ব্রাউন রঙের খামে মোড়া। তার ওপরে রাণীর নাম লেখা। কিন্তু রাণী এখন যে ঠিকানায়, সেখানে এ চিঠিকে পৌঁছুতে হ'লে যে কোন্ পোষ্ট অফিসে'র সাহায্য নিতে হবে, মানুষ এখনও তা বলতে পারে নি।

আজ এই চিঠি দেখে শুধুই মনে হচ্ছে—মানুষ কি পাগলামী করে, যখন সে একজনের মুখের দিকে চেয়ে ভাবে—'ওকে না হলে আমার চলবে না। ওকে না হলে আমি বাঁচব না। কারণ এক ওকেই আমি ভাল-বাসি, আর ভালবাস্‌ব আজীবন!'—যেন পৃথিবীর যা-কিছু বরণীয় সব দিয়ে ভগবান শুধু ঐ একটিমাত্র মানুষকেই সাজিয়ে দিয়েছেন!...

ভালবাসি! আমিও ঠিক ওই কথাটাই অনেক বার রাণীর কানের কাছে গুঞ্জন করে-ছিলাম! আর পাঁচজন পাগলের মত আমিও একদিন ভেবেছিলাম, এক রাণীকে ছাড়া আর-কাকেও ও-কথাটা আর কোন দিন বল্‌তে পারব না! কিন্তু আমার সে চিন্তা যে কতখানি অসত্য, তার জলন্ত জীবন্ত প্রমাণ আমার চোখের সামনে, আমারই বিছানায়। রাণী আমার চলে গিয়েছে, কিন্তু তার স্থান-শূন্য থাকেনি! ঠিক রাণী যেমন করে যেখানে শুয়ে থাকত, ঠিক তেমনি করেই সেখানে মীনুও আজ ঘুমিয়ে আছে—আমি মীনুকে ভারি ভালবাসি!

রাণীর চিঠি এই ভয়ানক মিছে কথাটাই আমাকে বারে-বারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে! প্রায় ছ'বছর আগে হয়ত এই টেবিলে বসেই রাণী এই কটা কথা লিখেছে। লিখ্‌তে লিখ্‌তে চিঠির কাগজকে তার ব্যথার সাক্ষী রেখে তার চোখের জল ঝরে পড়েছে। আর আজ তিন বছর পরে তার অশরীরি কান্না আমার কানের কাছে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছে—আমার চোখ দিয়ে তাই আজ জল ঝরে পড়ছে! বেচারী রাণী! কি মিছে কথা গুলোই তাকে বলেছি—আর তাই বিশ্বাস করে তার বুক এই শেষ চিঠি লেখবার দিনেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে।

প্রায় তিন বছর আগে সে এই চিঠি লিখেছে! তার চিঠির প্রতি পংক্তি তার বুকের দীর্ঘশ্বাসের ব্যথা বয়ে নিয়ে ফিরছে! সে লিখচে—তোমাকে এই তিন মাস দেখিনি! তুমি কি বুঝতে পাচ্ছনা, কি অনন্ত বলেই মনে হ'চ্ছে আমার কাছে এই তিন মাস সময়! তোমাকে একটিবারও অন্ততঃ দেখতে আমার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে—একটিবার শুধু এসো গো, শুধু একটিবার তুমি এসো!

লিখতে লিখতে যে সে কেঁদেছে, তার ইতিহাস চিঠির পাতার অমর হয়ে রয়েছে।

এ চিঠি যখন সম্বলপুরে আমার ঠিকানায় গিয়েছে, তখন আমি রামনগরের ডাকবাঙলায়—আর রামনগরের ছাপ যেদিন এর বুকে আঁকা হয়েছে, সেদিন আমি কল্‌কাতায়—রাণীকে হারিয়ে কেমন করে বাঁচা সম্ভব, সেই সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত!

তারপর এ চিঠি তিন বছর ধরে ডেড্ লেটার অফিসের কোন্ অজানা কোণে লুকিয়েছিল! আর এই তিন বছরে আমার জীবনে রাণীর স্থান পূর্ণ হয়ে গিয়েছে! রাণীর চিঠি কিন্তু তার বুকের অশ্রু-মাখা বার্ত্তা ভোলেনি! সে আমার সন্ধান না পেয়ে-পেয়ে যখন ব্যর্থ হ'য়ে আবার রাণীর কাছে ফিরে চলেছে, তখনই তার কাজ পূর্ণ হয়েছে! তার দীর্ঘ দিনের যাত্রা আজ সার্থক হয়েছে!

রাণী ডেকেছিলো—শুধু একটিবার এসো! সে ডাক আমার কাছে পৌঁছয় নি! আমি তার সেই একটিবার দেখবার সাধ পূর্ণ কর্ত্তে পারিনি! তার চিঠির বুকে ঝরা জল তার অপূর্ণ সাধের সমস্ত তীব্রতা নিয়ে আমার বুকে আঘাত কচ্ছে!

রাণী যেমন করে আমাকে চেয়েছিলো—অমনি আকুলভাবে আমি কি তাকে চাইতে পেরেছি? তার কাছে যে-কথা বলে ছিলাম—তোমাকে ছাড়া এ পৃথিবীতে কাউকে আর চাই না,—সে কথা কি আমার মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যায় নি? রাণীকে যে-কথা যেমন ভাবে বলেছিলাম, মীনুকেও আবার সেই সব কথাই বলেছি, তেমনি করেই!

আজ মীনুও ঘুমিয়েছে—রাণীও ঘুমিয়েছে! এখন মীনুকেও দেখতে পাচ্ছি—আর রাণীর সেই অশ্রুসজল চোখ দুটোও আজ মনে পড়্‌ছে! এখন মনে হচ্ছে—আমি দুজনকেই ফাঁকি দিয়েছি! দু'জনের কাউকেই আমি সত্যি কথা বলিনি!

শ্রীসোমনাথ সাহা।

হুরী

আমরা হুরী রূপের নূরী,
স্বর্গপুরীর ফুল্‌ঝুরি;
হাওয়ায় উড়ি ভুবন ঘুরি
কর্‌ছি যে গো মন্ চুরি।
ফুলের পাখায় ঘুমিয়ে থাকি,
নদীর সুরে সুর ধরি;
মোদের লীলা-নৃত্যে ওঠে
বনের বীথি মর্ম্মরি।
চাঁদের হৃদয় মন্থি আনি
জ্যোছনা-সুধা অঞ্চলে,—
বসাই মাঠে মণির মেলা,
রূপের ভেলা দি জলে।

'ঘুমপাড়ানী'র গান গেয়ে যে
ধরার চোখে ঘুম আনি,
শোকের কাজল মুছিয়ে দিয়ে
হাসির রেখা দিই টানি।
স্বপন্-কাঠির পরশ দিয়ে
সবার ব্যথা নিই হরে,
আমরা রহি দ্বারের দ্বারী
চৌকি দিতে রাত্ ভরে।

* * *

আমরা হুরী রূপের নূরী,
স্বর্গপুরীর ফুল্‌ঝুরি;
হাওয়ায় উড়ি ভুবন ঘুরি
কর্‌ছি যে গো মন্ চুরি।

শ্রীঅতিপ্রসন্ন ঘোষ।

নিরুপদ্রব সহযোগিতা বর্জ্জন

(৮)

পূর্ব্বে আমি একস্থানে বলেছি, জগৎ ধর্ম্মের রাজ্য। এর মানে অবশ্য এমন নয় যে, জগতে কোন রকম অধর্ম্ম নাই বা অধর্ম্মের দ্বারা ধন-সম্পত্তি প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ হয় না। মানুষকে ভগবান যখন হাতের পুতুল করে' না গড়ে স্বাধীনতার মর্য্যাদা দিয়ে মানুষ করে' গড়েছেন, তখন তাকে অন্যায় করবার প্রচুর অবকাশও সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন; চোখ বুজে যাওয়ার মতো একটীমাত্র সোজা পথ গড়ে রেখে দেননি। আর ধন-মান-প্রভুত্ব ইত্যাদি লাভ হয় তাদের নিজের নিয়ম-অনুসারেই, ধর্ম্মের নিয়মে নয়। সুতরাং সে নিয়ম ধর্ম্মানুগত হোক্ বা না হোক্ এবং যারা সেই নিয়ম মেনে চলে তারা ভাল লোক হোক্ বা মন্দ লোকই হোক্, ফলের তারতম্য হওয়ার কারণ নাই। ইস্পাত যদি ভাল হয়, সিঁদ-কাঠি গড়তে গেলেই যে তা ভোঁতা হয়ে যাবে এবং চোরাই খাঁটি-সোনা যে চোরের হাতের স্পর্শে পিতলে পরিণত হবে, প্রকৃতির এমন কোন নিয়ম নাই। অর্জ্জনের বেলায় যে নিয়ম, রক্ষার বেলায়ও ঠিক তাই। যে সেই নিয়ম মেনে চলবে সেই ও-সব জিনিষ রক্ষা করতে পারবে। মহাপাপী বলেই যে কারো হাত হতে তা গলে পড়ে যাবে, এমন কথা নাই।

কথা উঠতে পারে, জ্ঞানীরা যে চিরকাল বলে আসছেন—"অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।" অর্থাৎ অধর্ম্মের দ্বারা আপাততঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাততঃ মঙ্গল দেখা যায়, আপাততঃ শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়, এ কথাটা কি মিথ্যা? না, নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়, একেবারে নিছক এবং খাঁটী সত্য। কিন্তু ওরূপ সমূলে যে বিনাশপ্রাপ্তি ঘটে—তা ধর্ম্মের কোনও বিশেষ নিয়মের অলৌকিক প্রভাবে নয়, পূর্ব্বে যে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লেখ করেছি, তারই উল্লঙ্ঘনের ফলে। অধর্ম্মের দ্বারা ফল লাভ ক'রে সে অধর্ম্মকে এম্‌নি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে যে, আর কাউকে বিশ্বাস করা বা আর কারো সুখ-দুঃখের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত করাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থায় ধনসম্পত্তি রক্ষার উপযোগী নিয়ম তার দ্বারা পালিত হতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

যাহোক্ এ একটা অবান্তর কথা। আসল কথাটা এই—যা-কিছু আছে, যা-কিছু হচ্ছে, সকলেরই ভিতর দিয়ে একটা বিপুল তাৎপর্য্য মণিহারের সুতোর মতো বিরাজ কচ্ছে। যা-কিছু এই বিপুল বিরাট তাৎপর্য্যের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে নিতে পারে, তাই সার্থক হয় এবং টিঁকে থাকে। বাকী সব ঝরে-পড়া মুকুলের মতো ব্যর্থতার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই বিশ্বের অন্তরের ঐক্য-সূত্র—এই বিপুল তাৎপর্য্য, এই বিরাট এক—ইহাই ধর্ম্ম, যা নিখিলকে ধারণ ক'রে রেখেছে। উপনিষদ যে বলেছেন, "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যা জগৎ" অর্থাৎ সংসারে যা-কিছু চলছে, তার সমস্তই ঈশ্বরের

দ্বারা আচ্ছন্ন—এ-কথার তাৎপর্য্যও ঠিক ওই—জগতে যা-কিছু চলছে তার সকলই কেবলমাত্র ঘটনা। তা চরম সত্য নয়। তাদের চরম সত্য ব'লে ভুল করলেই সৃষ্টির আসল তাৎপর্য্যের হিসাবে ব্যর্থ হতে হবে, ভিতরের সেই সনাতন সূত্র হতে খসে পড়তে হবে; অর্থাৎ ধর্ম্ম আর তাকে ধারণ করবেন না।

এই ধর্ম্ম কথাটার মতো নটখটে ভেজালে কথা মানুষের ভাষায় আর দ্বিতীয়টি আছে বলে মনে হয় না। এই কথাটার চার ধারে নানামতের কুয়াশা, নানা বাদ-প্রতিবাদ গালাগালি মারামারি, এমন-কি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত চিরদিন ধরে পুঞ্জীকৃত হয়ে উঠেছে এবং আজও উঠছে। এটা খুবই লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই—তাই ব'লে তো আর অস্বীকার করার যো নাই। আর এমনটা যে ঘটছে তার কারণও যথেষ্ট বিদ্যমান আছে।

সংসারে জাতিবাচক শব্দের অপ্রতুল নাই। সভ্যতার পরিণতি ও ভাষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ শব্দের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জগতে 'জাতি' বলে কোনও কিছুর সত্যিকার অস্তিত্ব নাই। ওটা আমাদের কল্পনা মাত্র। জ্ঞানের কারবারটা ভালরূপ চালাবার জন্য ও-জিনিষটার আমরা প্রয়োজন-মত সৃষ্টি করে থাকি। যার সত্যিকার অস্তিত্ব আছে, সে হচ্ছে ব্যক্তি বা Individual। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার উপলব্ধি, অনুভূতি ও চেতনার সীমানা দ্বারা অপর ব্যক্তি হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একজনের উপলব্ধির মধ্যে অপরের প্রবেশের ছোট বা বড় কোনরূপ পথই নাই। সে সম্বন্ধে যা-কিছু জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে তা পরোক্ষ ভাবে শোনা কথায়। কিন্তু নিজের উপলব্ধিটাকে ঠিক-মতো অপরের নিকট প্রকাশ করা একটা বিশেষ কঠিন কাজ, একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বললেই হয়। সংসারের যত রকম গোলযোগের মূল ঐখানে। আপন আপন মানসিক প্রকৃতি, শিক্ষা ও সংস্কার-অনুসারে মানুষ বিশ্বের এক-একটা বিশেষ দিকে ঝোঁক দিয়ে ফেলে। সেইটাকেই সে সব-চেয়ে বড় মনে করে। কাজেই তার ধর্ম্মের ধারণা সেই অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম প্রধানতঃ প্রাকৃতিক নিয়ম ও বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসকের নিকট হাইজিনের নিয়ম পালনই প্রধান ধর্ম্ম। ন্যাসনালিষ্ট যেন-তেন-প্রকারেন নিজের দেশটাকে সকল রকমে বড় ক'রে তোলাই ধর্ম্ম মনে করেন। যাতে গার্হ জীবনের কাজ সুশৃঙ্খল রূপে চলে, গৃহজীবা ধর্ম্মের ধারণা সেই ছাঁচে গড়া। অথচ বিগ এই, সকলেই এক ধর্ম্ম কথা দিয়ে আপন আপন অনুভূতি ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করে থাকে।

কিন্তু দ্বন্দ্ব-গোলযোগ তো আর শাশ্বত জিনিষ হতে পারে না। একটা 'সামঞ্জস্য ও মিলন কোন স্থানে আছেই। সেটা কি পূর্ব্বে যে "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" মহাবাক্যের উল্লেখ করেছি,— ঐ মন্ত্রের সাধনার মধ্যে সকল গোলযোগে মিল আছে। যে মহা এক সমস্ত খণ্ডে সমস্ত বিচিত্রকে ধারণ ক'রে রেখেছেন তিনি ওদের সত্য ক'রে তুলেছেন। এক অব্যক্ত অগণ্য ব্যক্তি রূপে আপনাকে বিকাশ করতে করতে চলেছেন। পূর্ব্বে

বলেছি, ব্যক্তি সত্য, সে কথাটা আংশিক ভাবে সত্য। পূর্ণ সত্য এই যে অব্যক্ত ব্যক্তিরূপে আপনাকে ফুটিয়ে তুলছেন, অরূপ রূপের মধ্যে আপনাকে বিকাশ করছেন। ঐ একের দিক দিয়ে, অব্যক্ত অরূপের দিক দিয়ে দেখলে অভেদ্য স্বাতন্ত্র্যের মাঝখানে একটা মিলনের পথ খুলে যায়।

গীতায় ভগবান বলেছেন,

ভূমিরাপো অনলো বায়ু মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কারং ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা ॥
অপরেমিতয়ন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিত্বমেপরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো য়য়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার প্রকৃতি এই আটরূপে বিভক্ত। হে মহাবাহো, ইহা কিন্তু অপরা নিকৃষ্টা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চেতনাময়ী আমার একটী প্রকৃতি অবগত হও—সে প্রকৃতি এই জগতকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে বা রক্ষা করিতেছে। আমি যে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেম এই দুটী শ্লোকে তা সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে ঐশী প্রকৃতির যে আটরূপ বিভাগের কথা বলা হয়েছে অনেকে ঐগুলিকেই চরম মনে করেন এবং ঐকান্তিক ভাবে ঐগুলির অন্তর্নিহিত নিয়মের অনুশীলন দ্বারা শক্তিলাভ করাকেই চরম সার্থকতা মনে করেন। পশ্চিমের লোকেরা ঐ-পথের একাগ্র সাধনা দ্বারা বললাভ ক'রে আজ জগতে জয়ী হয়েছে অর্থাৎ আপনাদিগকে জয়ী মনে করছে এবং আমরাও মূঢ়তা বশতঃ ওদের জয়ী মনে ক'রে ঈর্ষার বিষে জ্বলে পুড়ে মরছি। কিন্তু সে জয় ভগবানের পরা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে, তাঁর অপরা প্রকৃতির উপরই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে জয়ের মুখোস খুলে গিয়ে তার যথার্থ মূর্ত্তি প্রকাশ হতে যে খুব বেশী বিলম্ব হবে, এমন মনে হয় না। জড় শক্তির সাহায্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে জড়শক্তির সাধনাকে যাঁরা জীবনের মুখ্য ব্রত ক'রে তোলেন, পরিণামে তাঁদের জড়ত্বপ্রাপ্তি একেবারে সুনিশ্চিত। গীতায় ভগবান যে বলেছেন—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তিভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনো পি মাম্।

দেবার্চ্চনাকারীগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃগণের অর্চ্চানাকারীগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, ভূতপূজাকারীগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন—আমার ভক্তেরা আমাকেই পান। এ শ্লোকের তাৎপর্য্য ভাল ক'রে ভেবে দেখতে সকলকেই অনুরোধ করি।

এখানে অবান্তর ভাবে একটা কথার একটু আলোচনা করা উচিত মনে করছি। জড়বিজ্ঞানকে আয়ত্ত ক'রে জড়শক্তির সাহায্যে জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করবো কি না? নিশ্চয়ই করবো। কারণ জড়ের শক্তিও একটা সত্য জিনিষ। সুতরাং সম্পূর্ণ সত্যকে লাভ করতে হলে জড়কে একেবারে নস্যাৎ ক'রে দিলে চলবে না। আর ইচ্ছে করলেই যে তা করতে পারবো, সে ক্ষমতা আমাদের নাই। কারণ জড়ের শক্তিও ব্রহ্মের শক্তি; গীতার ভাষায় ভগবানের অপরা প্রকৃতি। পরা ও অপরা ভগবানের এই উভয় প্রকৃতিকে সম্যক জানলে তবেই ব্রহ্ম-উপলব্ধি যথার্থ হবে। তা ভিন্ন হওয়ার উপায় নাই। আসল কথা, জড়বিজ্ঞানকে

তার যথার্থ সীমার মধ্যে আটক ক'রে রাখা নিয়ে, অর্থাৎ জড়শক্তি বা ভগবানের অপরা প্রকৃতিকে তাঁর পরা প্রকৃতির অনুগত ও অধীন করে দেখলেই যথার্থ ভাবে দেখা হবে। আত্মোপলব্ধিই মানুষের চরম সার্থকতা। সব সময়ে মনে এই লক্ষ্যটা জেগে থাকলেই জড়ের অনুশীলন কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। যাঁরা এই বিষয়ের আরো পরিষ্কার ধারণা করতে চান, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধটী পড়লে বিশেষ সাহায্য পাবেন। ঐ প্রবন্ধের চারদিকে যে বাগ্বিতণ্ডার ধুলো উড়েছে—তা-সত্ত্বেও এ কথা বলতে সাহস করতে পারি।

এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাটা করলেম সে কতকটা জমি তৈয়ার করার মত। এখন আসল বিষয়ে ফিরে যাওয়া যাক্।

গীতা বলেছেন, ভগবানের পরাপ্রকৃতি বিশ্বকে ধারণ ক'রে রেখেছে। উহাই ধর্ম্ম। অন্য ভাষায় ওকেই জগতের আধ্যাত্মিক সংস্থান বা moral ও spiritual order বলতে পারা যায়।

আপাত-দৃষ্টিতে ভৌতিক শক্তির ক্ষমতা যতই বেশী বোধ হোক্, আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে তাকে মাথা নীচু করতেই হবে। চিরকালই সেইরূপ ক'রে এসেছে। বিশ্বের যা আধ্যাত্মিক সংস্থান—যা ধর্ম্ম, তার বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায় তাকে ধারণ ক'রে রাখার কিছুই থাকে না। সে যে শূন্যের উপর দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে মরছে সে কথা বুঝতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—"The dumb fury of the down-trodden finds its awful support from the universal law of moral balance. ... ... Politicians calculate upon the number of mailed hands that are kept on the sword-hilts; they do not possess the third eye to see the great invisible hand of the helpless and waits its time. The strong form their league by a combination of Powers, driving the weak to form their own league alone with their God."

আরামবাগীশেরা ও তথাস্তবাদীরা বলবেন, তবে আর ভাবনা কি! আমরা যাই করিনে কেন, ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইংরেজ যদি বিশ্বের সনাতন ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন ক'রে থাকে, ধর্ম্মের অমোঘ শক্তি নিজের গরজেই তার প্রতিবিধান করবেন। ধর্ম্মকে লঙ্ঘনজনিত গতির বেগেই ইংরেজের দম্ভ ধূলিসাৎ হবে। দুর্গতির চরম দুর্গতি এইরূপ ধর্ম্ম বা দৈবের উপর বরাত দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকার মনোভাব। আর এজন্য যদি বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব করার অভ্যাসটাও থাকত, তাহলেও আশা করতে পারা যেত একদিন এর প্রতিকার হবে। কিন্তু সেরূপ হওয়া দূরে থাক্, এই ঘোর তামসিক ঔদাসীন্যকে আধ্যাত্মিকতা মনে ক'রে, স্বয় হৃষিকেশ ইত্যাদির ঘুম-পাড়ানোর মন্ত্র আওড়ে মনটাকে একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে রাখবার চেষ্টাই অহরহ হয়ে থাকে। সুতরাং এ জিনিষটার একটু আলোচনা করা দরকার।

ধর্ম্মের অমোঘ বিধি লঙ্ঘন ক'রে যে

পার পেতে পারেনা, এ কথা ধ্রুব সত্য। ইংরেজ যদি ধর্ম্মের বিধি লঙ্ঘন ক'রে থাকেন তাঁকে সে ঋণ কড়াক্রান্তিতে শোধ করতে হবে! কিন্তু এই কর্জ্জ-আদায়ের জন্য যে শ্রীসুদর্শন চক্র মাঝে মাঝে মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করে থাকেন, এরূপ বিশ্বাস রূঢ় কুসংস্কার মাত্র। তার প্রয়োজনও নাই। যে ধর্ম্মচক্র জগতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তার আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিচার অহরহ চলেছে। যে শক্তি ধর্ম্মের বিধি লঙ্ঘন করে চলেছে, সেই শক্তিই আপনার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করে যাচ্ছে। খুব ধীরে নিঃশব্দে এ কাজ চলেছে বলে মানুষ মনে করচে যে কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার শক্তিটা জমতে জমতে মাত্রা পূর্ণ হলে যে দিন পায়ের নীচেকার মাটী টলমল করে কেঁপে ওঠে, তখনই তার চমক লাগে। কোনও রকমে আপনাকে বাঁধবার ব্যর্থ চেষ্টায়—সে তখন ছুটোছুটি করে মরে।

মানুষের মধ্যে দিয়েই ধর্ম্মের অমোঘ বিধান পূর্ণ হয়। মানুষই বিধাতার হাতের অস্ত্র। আমাদের বহুযুগব্যাপী জাতীয় পাপের শাস্তির বোঝা ইংরেজ-রূপে আমাদের ঘাড়ে চেপে খাজনা আদায় করতে এসেছে। তার পাওনার শেষ পাই পয়সা পর্য্যন্ত আমাদের শোধ করে দিতে হবে। প্রকৃতির আইনে তামাদির সুবিধাটাও নাই। আবার ইংরেজ যদি ধর্ম্মের বিধি লঙ্ঘন করে থাকেন, তবে তাঁকেও সে ধর্ম্মের দেনা মায়-সুদ শোধ করে দিতে হবে। আমরাই হবো সে ব্যাপারে বিধাতার হাতের অস্ত্র। হবো বলাটা ঠিক হলোনা, গোড়া হতেই হয়ে আছি। আর অস্ত্র কথাটা শুনে চমকে ওঠার কারণ নাই। Salvation Army যে হিসাবে army, এটাও সেই হিসাবে অস্ত্র।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি, মানুষের সঙ্গে মানুষের একমাত্র যথার্থ ব্যবহার, ধর্ম্ম-সঙ্গত ব্যবহার। অর্থাৎ আত্মার ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এক, এই ভাবটা সব সময়ে মনে জেগে থাকলে যেরূপ ব্যবহার স্বভাবতই হয়ে থাকে, সেইরূপ ব্যবহার। মানুষকে আপনার উপকরণ সামগ্রীর মতো করে দেখলে এই সনাতন ধর্ম্মের হানি হয়। তখন ধর্ম্মের অমোঘ বিধির নিকট তার মার পাওনা হতে থাকে! ইংরেজকে সেই মার আমাদের হাত দিয়েই অর্থাৎ আমাদের সংস্রবের মধ্যে দিয়েই পেতে হবে। আমরা ভয়ে লোভে বা ঔদাস্য-বশতঃ ইংরেজের সকল রকম অবিচার ও অন্যায় যদি নির্ব্বিচারে সহ্য করি, তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক হিসাবে মৃত্যু বা জড়ত্ব প্রাপ্তি হতে বেশী বিলম্ব হবে না, এ কথা নিশ্চিত। কিন্তু এটাও তেমনি নিশ্চিত যে, ইংরেজকেও আমাদের সঙ্গে সেই আধ্যাত্মিক মৃত্যুতে সহমরণে যেতে হবে। আধ্যাত্মিক জগতের মাধ্যাকর্ষণের টান এড়িয়ে যাবেন, এমন ক্ষমতা ইংরেজেরও নাই! এই গেল এক রকমের মার।

আর একরকমের মার হলো দাবানলের মার। মানুষ যদি পলে পলে আপনাকে অবিচার-পীড়িত বলে মনে করে, অথচ তার প্রতিকার করার উপায় খুঁজে না পায়, মনের সঞ্চিত আক্রোশ মুখ ফুটে খুলে বলার সাহস

অবকাশ ক্ষমতাও না থাকে, তাহলে সেই রুদ্ধ আক্রোশ হতে যে বিষাক্ত বাষ্প জমে ওঠে, একদিন তা ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতরূপে আপনাকে প্রকাশ করবেই। রবীন্দ্রনাথ যাকে Dumb fury of the down-trodden বলেছেন, এই দাবানল তারই প্রকাশের একটা রূপ। যে জাতির সামাজিক সংস্কার খুব দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে এরূপ আকস্মিক উৎপাত যে সহজ হয় না, একথা খুব ঠিক। কিন্তু তাই বলে যে হবেই না, এমন কোন কথা নাই। বিশেষতঃ সমস্ত পৃথিবীর হাওয়াতে যেমন আগুনের ঝল্‌কা খেলে বেড়াচ্ছে, তাতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার কোনই উপায় নাই। অগ্রপশ্চাৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটবেই।

এই দাবানলের মার বড় ভীষণ মার। এর লেলিহান অগ্নিশিখায় দুই পক্ষেরই যুগযুগান্ত সঞ্চিত কলুষ যে নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়ে যাবে, একথা ধ্রুব সত্য, কিন্তু পাপের সঙ্গে সঙ্গে পাপীর তিরোধান হয়ে যাওয়াটাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। জগতের ইতিহাসে একথা অনেকবার প্রমাণ হয়ে গেছে। সুতরাং এই দাবানলের দাহ হ'তে দেশটাকে বাঁচাতেই হবে। আর অসহযোগ আন্দোলন তারই বিধি-বদ্ধ চেষ্টা মাত্র।

কাজেই ইংরেজ ধর্ম্মের বিধি লঙ্ঘন করলে ধর্ম্মের অলঙ্ঘ্য নিয়মেই শাস্তি পাবে, এ বিশ্বাসে সান্ত্বনার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। আমি পূর্ব্বেই লিখেছি, ইংরেজ আমাদের যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত পাপের শাস্তির বিগ্রহরূপী। এই গেল প্রথম দফা। ইংরেজ আমাদের সম্বন্ধে যদি কোন অধর্ম্ম করে থাকে, তার দায়িত্বও উভয় পক্ষের প্রায় তুল্য-মূল্য। আমরা অন্যায়ের বোঝা এখন অনায়াসে বহন করলেই সে বোঝা এমন বেড়ে চলে যাওয়ার অবসর পায়। সুতরাং এ পাপ হতে আমরাও মুক্ত নই। এই হলো আমাদের দ্বিতীয় দফার পাপ। সুতরাং ভূভার-হরণের জন্য যখন বিষ্ণুর আবির্ভাব হবে, তখন তাঁর সুদর্শন চক্রের কাছে হ্যাটকোট ও ধুতি-চাদরের তারতম্য যে বড় বেশী হবে, এমন মনে হয় না!

আর যদি মনে করাই যায়, ইংরেজের পাপের শাস্তি ইংরেজ একাই ভোগ করবে, আমরা যেমন আছি ঠিক তেমনিটিই থেকে যাব, তাতেই বা কি? আমরা যেমন আছি ঠিক যদি তেমনি থেকে যাই, তাহলে ইংরাজের বিপুল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলেও আমাদের বিন্দুমাত্র লাভ নাই। হয়তো অ-লাভই আছে। যতক্ষণ বাবাটা বেঁচে থাকবে ততক্ষণ গুরুমশাই মরে কোনই লাভ নাই। পরেকার গুরুর ঠেঙ্গার বহর আরো বেশী হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়! সুতরাং ঐ বাবার অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থার যা জনক, তার মৃত্যুর ব্যবস্থাটা করাই পাকা কাজ। মানুষের উপর বরাতের তো কথাই নাই, স্বয়ং বিধাতার উপর বরাত দিলেও সে কাজ চলবে না। আপনার হাতেই তুলে নিতে হবে।

কাজটাও বড় সোজা নয়। হাজার বছর ধরে যে মিথ্যা ও মোহের নাগপাশ-বন্ধন আমাদের জীবনের চারধারে লক্ষ ফেরে

জড়িয়ে গেছে, তার পাকগুলি একটী একটী করে খুলে ফেলে মনের মুক্তির ব্যবস্থা। মনের মুক্ত লাভ হলে বাইরের স্বাধীনতা লাভটা বড় বেশী কথা নয়। তাছাড়া মুক্তিটা কেবল এক পক্ষের নয়। ইংরেজের মুক্তির ব্যবস্থাও আমাদেরই করতে হবে। ইংরেজের মুক্তিটা আমাদের মুক্তিরই উল্‌টো পিঠ। ইংরেজের মুক্তির ভাবটাও আমাদেরই তুলে নিতে হবে—এ কথাটা শুনতে প্রলাপের মতো লাগতে পারে, কিন্তু কথাটা বড়ই সত্য।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। যা-কিছু সত্য সম্বন্ধ উপলব্ধির পথে বাধা দেয়, তাই মানুষের পক্ষে বিষম বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজের স্পর্শার মানুষের সঙ্গে এই সত্য সম্বন্ধ-উপলব্ধির পক্ষে একটা বিষম অন্তরায়। এই জন্য অনেক চিন্তাশীল ইংরেজ এই সাম্রাজ্যকে ইংরেজের পক্ষে শনি-স্বরূপ জ্ঞান করেন। চরিত্রের যে-সব মহৎ গুণের জন্য ইরেজ চিরদিন মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছে, এই সাম্রাজ্যের হ্যাঁপায় পড়ে তা সে একে একে খেয়াতে বসেছে। এরূপ যদি চলতে থাকে, তাহলে ইরেজের চরিত্রের চরম অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকা ইংরেজের একটা ফাঁড়া কাটিয়ে দিয়েছে আপনার পায়ের শিকলি কেটে। কিন্তু সব চেয়ে বড় ফাঁড়াটাই এখন বাকী আছে। উপনিবেশগুলির সংস্পর্শে ইংরেজের নৈতিক অবনতির তেমন আশঙ্কা নাই। তারাও যে ঐ ঝাড়ের বাঁশ! সেখানে জুলুম-জবরদস্তি বা বকধার্ম্মিকত্ব—এ দুটোর কোনটাই তেমন চলে না। দরকার হলে তারা খোলাখুলি জানাতে পারে, "তোমভি মিলিটারী, হামভি মিলিটারী"। আয়ার্লাণ্ডের সহিত সংস্রবটাও তেমন মারাত্মক নয়। হাজার হোক্ ওদের গায়ের চামড়াও শাদা! তাছাড়া ও বিষটা বহুশতাব্দী ধরে অভ্যাস হয়ে গেছে। আর তারা যেরূপ মরিয়া হয়ে উঠেছে—তাদের পায়ের শিকল ছিঁড়ল ব'লে। সুতরাং আসল সমস্যা ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষ—বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষকে নিয়ে।

এই ভারতবর্ষের সংস্রবই ইংরেজের চরিত্রের পক্ষে বিষম সাংঘাতিক বিষের মত কাজ করছে। দেশটা যেমন বড়, লোক-সংখ্যাও তেমনি অগণ্য। কাজেই নানা উপায়ে এখানে যতগুলি ইংরেজকে পালন করতে পারা যায়, এমন আর কোন স্থানে নয়। কিন্তু এখানকার মানুষগুলির চিত্ত বহুযুগের অধীনতার ফলে আলো ও হাওয়ার স্পর্শ হতে বঞ্চিত হয়ে মহাবিষের আকর হয়ে উঠেছে। তার উপর এরা আবার একান্ত নিরীহ এবং এদের সহ্য করার শক্তিও অসীম। সুদিনে সাত্ত্বিকতার যোগে যে-সব গুণ আত্মার বল-লাভের সহায় ছিল, এখন তামসিকতার প্রভাবে সেইগুলিই ভীরুতা, কাপুরুষতা ও নীচতায় পরিণত হয়েছে। কাজেই এখানে যথেচ্ছাচারের অবকাশ একরূপ অসীম। এই কোটি কোটি অধঃ-পতিত মানুষের চরিত্রের কেন্দ্র হতে দাস-ভাবের যে জমাট বাষ্প শ্বসিত হচ্ছে, বিজেতার পক্ষেও তার সংস্পর্শ বড় নিদারুণ। আরো বিপদ এই, এখানকার লোকগুলো একেবারে বর্ব্বর নয়। এদের মধ্যেরই কাউকে বা

পৃথিবীর লোক আধ্যাত্মিকতায় গুরু ব'লে মানছে, কাউকে বা বিজ্ঞানের রাজ্যে রাজপদে অভিষেক করার আয়োজন করছে। কাজে কাজেই খোলাখুলি সোজাসুজি প্রভু-দাসের সম্বন্ধটা স্বীকার করা উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সমস্ত আকাশটা ছল-কপট-মিথ্যাচরণের বাষ্পে একেবারে জরে উঠেছে। এর মাত্রা এতদূর বেড়ে গেছে যে, আমার সময় সময় সন্দেহ হয়, অন্যদেশের মুক্ত আলো-হাওয়ার জীব একজন এসে বেশী ক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে কিনা! খুব সম্ভব, এখানকার লোকেরা (দুইপক্ষই) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কল্যাণে মাছের মতো নিশ্বাস লওয়ার কোন কৌশল আয়ত্ত করেছে।

মিথ্যার বাষ্পটা সমস্ত দেশের উপর কেমন চেপে আছে, একটা দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে। দৃষ্টান্তটি খুঁজে বের করতে হয়নি, উপস্থিত-মতো আপনি হাতের নাগালে জুটে পড়েছে। ইংলণ্ডের রাজপুত্র পৈতৃক জমিদারীতে শীকার খেলতে বা বেড়াতে আসবেন, এ বেশ ভাল কথা। উৎসাহ-প্রবণ যুবজনের চিত্তে ওরূপ সখ হয়েই থাকে। সুতরাং এখানকার নায়েব-মশায় শীকার ও আগমনী-খরচা বাবদ মাথট্ বসিয়ে যদি উৎসব সম্পন্ন করতেন, তাতে কারো কিছু বলার থাকত না। কিম্বা সরকার বাহাদুর যদি এমন হুকুম জারি করতেন যে, রাজপুত্রের আগমন উপলক্ষে যে ব্যক্তি উৎসব করবে না, সে আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় হবে, তাহলেও বোঝার কিছু গোল হতোনা। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস-বশে যেখানে কেবল আইনের সম্পর্ক, সেখানে হৃদয়-বৃত্তির লীলা দেখার জন্য তাঁরা লোলুপ হয়ে উঠলেন। লোকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে উৎসবে মেতে উঠেছে; এই ছবিটার মাধুর্য্য তাঁদের কাছে বড়ই মিঠে বোধ হলো। কিন্তু রাজভক্তি যদি স্বতঃস্ফূর্ত্ত না হয়, তাহলে? তাহলেও স্বতঃস্ফূর্ত্ত রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে উৎসব করতে হবে—সেই রাত্রে দুধ-চিঁড়ে-ভোজী লোকটির মতো—দুধ না জুটলেও যার গঙ্গাজল দিয়েও দুধ-চিঁড়ের ফলারে ব্যাঘাত হতোনা—কারণ সেটা যে তার অভ্যাস! কিন্তু কোনও হতভাগ্যের যদি দুধ জিনিষটার উপর সত্যি কার দরদ থাকে এবং জল-চিঁড়ের ফল করতে মন রাজী না হয়? তার পর? তার পরে আর কি—নটে গাছটি মুড়োলো। কিন্তু এটা আমি রাজপুত্রের রূপকথার ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছি। আসল কথা, তারপরে যে কি, সে কথা কেউ ঠিক জানে না। নটে-গাছটী মুড়ানোর কোন আদেশ বা ইঙ্গিত সরকার করেছেন, এ কথা বলতে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলা হবে। কিন্তু কিছুই ঠিক জানেনা ব'লে ঐ "তারপরে" সম্বন্ধে লোক নানারূপ কল্পনা ক'রে ভয় পেয়ে বসে। কিন্তু লোকে তো অন্ধকারে তুলসীগাছকেও ভূত ভেবে ভয় পেতে পারে! সেতো নিশ্চয়ই মিথ্যা ভয়। *

* রাজপুত্রের আগমনের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারের কোনওরূপ সংস্রব নাই—লর্ড-রেডিং এ বিশেষ করে বলেছেন, আশা করি পাঠকদের সেটা অবিদিত নাই। লেখক।

ইংরেজের পক্ষে ইংলণ্ডের রাজার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাভাবিক মনোভাব। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের যেটুকু ঐ সিংহাসনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাতে হিন্দু-মুসলমানের গৌরব বা সান্ত্বনা অনুভব করার তো কিছুই নাই! রামচন্দ্র, অশোক বা আকবরের বংশধরদের নামে এখানকার লোকের হৃদয় ভেদ ক'রে যে ভক্তি ও প্রীতির ধারা আপনা হতেই উৎসারিত হতে পারতো, নর্ম্মান উইলিয়মের বংশধরের চারিদিকে কলের সাহায্যে সেই উৎসবের লীলা দেখার জন্য সরকারের এত মাথাব্যথা কেন, এটা কিছুতেই বুঝতে পারিনে। এদেশের সঙ্গে ইংরেজের যে সত্য সম্বন্ধ তাতে ইংরেজ দুটি জিনিষ অনায়াসে দাবী করতে পারেন—রাজ-ভয় ও রাজ-কর। তার চেয়ে বেশী কিছু দাবী করে বসলেই প্রকৃতি বেচারাকে নাহক বিপদগ্রস্ত করে তোলা হয়। বেচারা মেয়ে মানুষ, অতিথিকে বিমুখ করতে স্বভাবতই কুণ্ঠিতা। কাজেই রাজভয় জিনিষটাকে কোন মতে রাজভক্তি বানিয়ে তাড়াতাড়ি হাজির ক'রে দেয়। কিন্তু সে জিনিষ যে কি অপূর্ব্ব, তা যিনি দেখেছেন তিনিই জানেন, এবং দেখেন নি এমন লোকও তো দেখিনে। আমার আশ্চর্য্য লাগে, ইংরেজের মতো খাঁটী রাজ-ভক্তি-রস-গ্রাহীর চোখে সেই ভেজাল মাল রোচে কি করে? *

যাই হোক যেটুকু লিখলেম তাহ'তেই পাঠকেরা অনায়াসে বুঝতে পারবেন, ভারতবর্ষের সংস্পর্শে এসে অপ্রতিহত ক্ষমতা-পরিচালনের অবকাশ পেয়ে ইংরেজের চরিত্র কিরূপ শোচনীয় অধঃপতনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। অনেক ভাল ভাল ইংরেজ যাঁদের Little Englander বলত, এই নিয়ে অনেক আক্ষেপ করেছেন এবং এখনও কেউ কেউ করছেন। কিন্তু আক্ষেপ করা মিছে। ক্ষমতার মোহ বড় বিষম মোহ, তার উপর যদি অর্থলাভের অজস্র সুবিধা থাকে, তাহলে তো কথাই নাই। সুতরাং ইচ্ছে ক'রে এই মোহের বন্ধন নিজের হাতে কাটা ইংরেজের সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু ইংরেজের মতো একটা অত-বড় জাতের অধঃপতন সমস্ত মনুষ্য-সমাজের পক্ষেই একটা গুরুতর বিপদ। কাজেই ওদের রক্ষা করার ভারটাও আমাদেরই তুলে নিতে হবে। ভগবান আমাদের উপরই সেই ভার দিয়েছেন। স্বতন্ত্রভাবে কিছু করতে হবে না—কেবল এইটুকু সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে, আমাদের মুক্তির চেষ্টা কেবলমাত্র আমাদের জন্যই নয়। † ধর্ম্মই সকলকে রক্ষা করেন। আমরা আমাদের ধর্ম্মকে রক্ষা করতে পারলে ইংরেজের ধর্ম্মও রক্ষা পাবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

* রসজ্ঞ পাঠককে খুলে বলার প্রয়োজন নাই, উপরে যা বলেছি, সে কেবল মেকি জিনিষ সম্বন্ধে। খাঁটি ভক্তি আমি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখেই দেখে থাকি। সকল প্রকার অকপট প্রীতির ন্যায় ওর দ্বারাও চিত্তের উৎকর্ষ লাভ হয়ে থাকে। লেখক।

† আর এই ভাবটা মনে সব সময়ে জাগিয়ে রাখতে পারলে বিদ্বেষের একেবারে মূলোৎপাটন হয়ে যায়। লেখক।

পারিজাত

স্বপন দেখিছে ঘুমাইয়া মনু
দশ বছরের ছেলে,
সহসা সেখানে ছোটপরী এক
আসিল পাখ্না মেলে'।
চাঁপার মতন বরণ তাহার,
সোনার মতন পাখা,
দৃষ্টিতে হয় জোছনা বৃষ্টি,
বুকে রামধনু আঁকা।
মনুর খেলার সঙ্গিনী টুনু
ভালবাসে তারে কত,
স্নিগ্ধ পরীর মুখখানি ঠিক
দেখিতে তাহার মত!
হাসি বলে, "মনু কোথা পেলে টুনু
এমন সোনার পাখা?
হস্তে তোমার ওকি ফুল ভাই?
তুমি লবে বুঝি একা!"
পরী রেগে বলে, "টুনু বল কারে
আমি যে প্রণয়-পরী—
পারিজাত যদি থাকে দরকার
এসো, ওঠো ত্বরা করি।"

বাহির হইয়া চলেছে দুজনে
সুদূর আকাশ-পানে,
কোন্ দিকে হায় নিয়ে যাবে তারে
পরীই বুঝি না জানে!
উড়িয়া উড়িয়া অবশেষে তারা
আসিল নূতন দেশে,
কত বিচিত্র মোহন চিত্র
দেখিল সেখানে এসে।

দেখিল সেখানে ভাঙা হরধনু
শ্রীরাম-সীতার স্মৃতি,
দ্রুপদ রাজার মৎস্য-চক্র,
সব্যসাচির প্রীতি।
চিন্তা দেবীর বরণ-মাল্য
সাবিত্রীর সে শাঁখা,
দময়ন্তীর কনক মরাল
কমল-পরাগ মাখা—
ভ্রমেন সেথায় পদ্মিনী দেবী
জহর-ব্রতের পরে,
সঙ্গিনী সব মানস-সরসে
ফুটে আছে থরে থরে।
মনু বলে ডাকি "পৃথিবী হইতে
এসেছি আমরা দুটী,
শুধু গুটি দুই পারিজাত দাও
ভরে দুজনার মুঠি।"
অশরীরী বাণী বলে, "হেথা মেলে
ঝরে-পড়া পারিজাত,
ধরার বাতাসে খসিয়া পড়িবে
কেমন ঠেকিবে হাত!"

আবার দুজনে ভাসিয়া চলেছে
আলোক-তুফান দিয়া,
রূপের বন্যা কাটাইয়া উঠে,
তপোবনে এক গিয়া!
খণ্ড-চাঁদের শুভ্র আলোকে
ঢেকেছে সে দেশখানা,
বেত্রহস্তে দাঁড়ায়ে নন্দী
প্রবেশ সেথানে মানা।

মদন সেথায় যোগ ভাঙ্গিবারে
এসেছিল পুরাকালে,
ভস্ম হইল বিরূপাক্ষের
ললাট-বহ্নিজ্বালে।
দাঁড়াইয়া মনু নন্দীর কাছে—
বলে, "এনু ধরা হতে,
আমরা দুটীতে অনেক কষ্টে
দুটী পারিজাত লতে।"
নন্দী বলিল, "ফোটা পারিজাত
এখানে মেলেনা বাছা,
এখানে যা আছে অস্ফুট তাহারা
এখনো নেহাৎ কাঁচা।"

তারপর দোঁহে পেলে পথে যেতে
শিখণ্ডী মৎ গিরি,
গৌরী যেখানে শিবকে পেলেন
তপশ্চর্য্যা করি।
পঞ্চতপের যোগের আসনে
নোয়াইল দোঁহে শির,
মাথায় দিলেক বাপীর সলিল
সতী-নয়নের নীর।
ক্লান্ত পক্ষ উড়িতে উড়িতে
অবশেষে দুইজনে,
পঁহুছিল আসি চির-অভিরাম
সেই নন্দন বনে।
হাত ধরি দোঁহে স্ফটিক বেদীতে
দাঁড়াইল তরুমূলে,
অপ্সরীগণ পায়ে ঢেলে দিল
দুধে-আলতায় গুলে।
ইন্দ্র বলেন, "পারিজাত লবে
কি আছে এমন বল?
পুষ্প-সায়কে হারাতে পারিলে
তবে সে ফলিবে ফল।"
মনু বলে রাগি, "খড়্গ হানিব
ঐরাবতের শিরে,
বজ্র তোমার ব্যর্থ করিয়া
পারিজাত লব ছিঁড়ে।"
ইন্দ্র বলেন চুমা দিয়া মুখে,
"বট তুমি বট বীর,
দিব পারিজাত, তিষ্ঠ ক্ষণেক
হও তুমি হও স্থির।
পারিজাত হেথা ফোটেনাক জেনো
আসে তা ধরণী হতে,
ইচ্ছা করিলে বাগানে তোমার
এই পারিজাত পেতে।"

বালক মনুর বিক্রম দেখি
দেবদেবীগণ হাসে,
নৃত্য থামায়ে স্নিগ্ধ-নয়না
উর্ব্বশী কাছে আসে।
বরুণ বলেন, "আমার তটিনী
দোঁহারে শোনাবে গান",
পবন বলেন, "আমার অনিল
পরিমল দেবে দান।"
চন্দ্র বলেন, "দেব সুধা-ধারা
কুসুম-শয়ন মিঠে",
রবি বলে, "আমি ফোটাবো কমল
তোমাদের কোলে-পিঠে।"
ব্রহ্মা বলেন, "সৃজন করিব
ও বুকে নূতন ধরা",
বিষ্ণু বলেন, "পুণ্য-পীযূষ
দিব যে কুম্ভভরা।"

সকলে মিলিয়া আশীষ করিয়া
পারিজাত দিল করে,
জাগি দেখে মনু সে আছে শুইয়া
তাহারি আপন ঘরে।
কোথা পরীরাণী মিলাইয়া গেল
ইন্দ্রধনুর সনে!
স্বপ্নকে তবু সত্য বলিয়া
লাগিছে মনুর মনে।

প্রভাতে এসেছে খেলাইতে টুনু
মনু বলে তারে রাগি
"কালিকার সেই পারিজাত তুমি
নিয়ে গেলে কার লাগি।"
টুনু কোনো কথা বুঝিতে পারেনা—
মনু বলে, "দাও ফুল—"

টুনু যত হাসে মনু রাগে তত
অকারণ করে ভুল।
ঠাকুমা তাহার হেসে লুটালুটি
ক'ন্, "হয়ে যাক্ জানা
কাহার লাগিয়া হানা দিয়ে এই
পারিজাত হ'ল আনা।"

আট্‌টী বরষ কাটিয়া গিয়াছে
মনু টুনু বধূ-বর,
নন্দনবন নামিয়া এসেছে
নবীন ধরণী পর,
সুমুখে তাদের পারিজাত ফোটে
একি রে দারুণ ব্যথা,—
তুলিতে গেলেই ম্লান হয়ে যায়
মিলাইয়া যায় কোথা!*

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

দাম্পত্য-সম্বন্ধের আদর্শ বিচার

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি আদর্শ অত্যন্ত ফাঁকা ও মিথ্যা হইলেও সে সম্বন্ধে যখন এত বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে আপততঃ যেটী মনে আসিতেছে সেটার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। সেটী হইতেছে অন্যের সহিত স্বামীর বিবাহ দেওয়াই আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখানো। অন্যের সহিত স্বামীর বিবাহ দেওয়ায় যে উভয়েরই ধর্ম্মহান, তাহার উপর যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া হয় তাহারও ধর্ম্মহানি, এ সকল প্রত্যক্ষ নৈতিক সত্য ঐ সকল সতী-মহিমা-কীর্ত্তন-কারীদের মনেও স্থান পায় না! বাস্তবিক, আত্মত্যাগ জিনিষটীই বড় বিপজ্জনক। আমরা এ সংসারে আত্মত্যাগের জন্য আসি নাই, আত্মার পরিপূর্ণতাতেই আমাদের জীবনের প্রধানতম সার্থকতা। সেই উচ্চতম পরিপূর্ণতার জন্য যেখানে আত্মত্যাগ আবশ্যক, সেইখানেই কেবল তাহা সমর্থন-যোগ্য। সে আত্মত্যাগ প্রকৃতপক্ষে ত্যাগও নয়। তাহা বৃহত্তর আত্মার পরিপূর্ণতা ও রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থবিসর্জ্জন মাত্র। যীশু আত্মত্যাগ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাকে জীবন দিতে হইয়াছিল। "আত্ম" বলিলেই তাহা হীন স্বার্থপরতা বুঝায় না, যথা আত্মার সহিত যাহার সম্বন্ধ তাহা শস্তা পরার্থ পরতার চেয়ে অনেক উপরের জিনিষ। শা ও দেশাচারের যন্ত্রচালিত অনুবর্ত্তনে আমাদে

* "ব্লু-বার্ড" অবলম্বনে

দেশে যে মোহান্ধ সংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে স্বামীর শ্রেয়কেই স্ত্রীর শ্রেয় বলিয়া ধরিয়া লওয়াতেই, নৈতিক আদর্শের এতটা বিকৃতি ঘটিয়াছে। স্বামীকে পাঁচটা সুখাদ্য ভোজ্য দিয়া স্ত্রী যেমন তৃপ্তি লাভ করেন, একটী বালিকা বা যুবতী দিয়াও তিনি তেমনি আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা যে কতটা নিম্নস্তরের মনের পরিচয় তাহা তাঁহাদের বুঝানো অসম্ভব। কারণ প্রত্যক্ষ সত্য না দেখিলে কেহ তাহা দেখাইতে পারে না। যাহা হউক, সংক্ষেপে কিছু বলিবার চেষ্টা করা যাক্।

প্রথমতঃ, রসনাতৃপ্তির সহিত অন্যটীর তুলনা হইতে পারে না, অপর প্রবৃত্তির চরিতার্থতা আমাদের সমস্ত চরিত্র, মনের সহিত সম্বন্ধ। তাহাকে যতই উন্নত করিতে পারা যায়, ততই আমাদের চরিত্রের বিকাশ হইতে থাকে, অন্যথা আমাদের পশুর অপেক্ষাও অধম করিয়া ফেলে। এই-খানেই ত পশু ও মানুষে প্রধান প্রভেদ। মানুষের যত উন্নত হইবার সম্ভাবনা আছে, পশুর তাহা নাই—এদিকে আবার মানুষ যত মন্দ হইতে পারে, পশুও তত পারে না। কারণ তাহাদের ইচ্ছাশক্তি ও ন্যায়-অন্যায়-বোধ নাই, তাহারা প্রকৃতি-চালিত হইয়া তাহারই অভিপ্রায়-মত জীবন যাপন করে মাত্র। বাস্তবিক, মানুষের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটীর মধ্যে প্রকৃত যে কত নিগূঢ় অর্থ আছে, তাহা সম্প্রতি-মাত্র মানুষ ঠিক-মত বুঝিবার চেষ্টা পাইতেছে। বলিলে সকলেই খড়্গহস্ত হইবেন জানি, কিন্তু শাস্ত্রকারদেরও এ বিষয়ে তেমন উচ্চ ধারণা ছিল না। মানুষের কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি তখন এতটা বিকাশ লাভ করে নাই। মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণার বিষয় তো বলিতে যাওয়াই বৃথা। আর এক পক্ষকে বুঝিতে ও জানিতে না পারিলে অপর পক্ষের সহিত তাহার সম্বন্ধের ব্যবস্থাও কখনই ঠিক হইতে পারে না। মনুষ্য-প্রকৃতির সাধারণ আদর্শও তখন এতটা উচ্চ ও বিস্তৃত হইতে পারে নাই। তাঁহাদের সময়ে হয়ত তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য লোকের শ্রদ্ধাও লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং সে সময়ের লোকেরা তাহাতে উপকৃতও হইয়াছিল। পরে দেশের অবনতির সহিত আর কেহ তাঁহাদের অপেক্ষা উন্নততর ব্যবস্থা আবিষ্কার করিতে না পারায় ও বংশ-পরম্পরায় তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার সংস্কারটী সংক্রমিত হইয়া লোকে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিবার সাহসও হারাইয়া ফেলিল। তাহার পরিবর্ত্তে একপ্রকার আতঙ্ক-মিশ্রিত অন্ধ ভক্তি তাঁহাদের উপদেশ ও ব্যবস্থাগুলিকে আঁকড়াইয়া রহিল। নিতান্ত দায়ে ঠেকিলে তাহার একটী নূতন ব্যাখ্যা ভিন্ন আর কিছু করিতে কাহারও সাহস থাকিল না।

এক্ষেত্রে কথা উঠিতে পারে যে, উপনিষদের মধ্যে যে "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি" ইত্যাদি ভাবের শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় এবং কাব্যাদিতে স্থানে স্থানে যে পবিত্র, একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের চিত্র দেখিতে পাই, তাহা তবে কেমন করিয়া আসিল? এ সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়, আমাদের দেশে একসময়ে মনীষীবৃন্দের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান বাস্তবিকই পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত সাধারণ মনুষ্য ও সমাজের কোন যোগ

না থাকায় তাহা সত্য পৃথিবীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে নাই। তাই দেখিতে পাই, যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে পত্নীর সহিত আলোচনা করিতেছেন বটে, কিন্তু এক সঙ্গে দুই পত্নীর উপস্থিতির অসামঞ্জস্য ধরিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের আলোচনা গুরুশিষ্য-সংবাদ হইয়াছে, কিন্তু দুই আত্মার প্রেমের মিলনে যে একটী স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ ও সত্যদর্শন জীবনের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইতে পারে নাই। এ সত্যদর্শনের জন্য তাঁহার পত্নীদ্বয়ের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, তিনি শিষ্যদের সঙ্গেও ঠিক এইরূপেই আলোচনা করিতে পারিতেন, এবং পত্নীদ্বয়ও পত্নী না হইয়া শিষ্যা হইলে কোনই ক্ষতি হইত না। তবু এই সময়েই সত্যদর্শন বিশুদ্ধতম থাকায় স্ত্রী-পুরুষের ব্যক্তিত্বেরও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা-লাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বকালের শাস্ত্রাদির মধ্যে অনেক জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকিলেও কেবল তাহার সুদেই যদি আমাদের চালাইতে হয়, তাহা হইলে আমাদের দারিদ্র্য ঘুচিতে পারে না। এখন জীবন-যাত্রা সকল দিকেই অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং কেবল পুরাণ-পুঁজিতে আর চলিতে পারে না, মূলধনও বাড়াইতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে অনেকদূরে আসিতে হইয়াছে। এইস্থলে বলা আবশ্যক, কাব্যাদিতেও যে আমরা দুইচারিটি আদর্শ প্রেমের ছবি দেখিতে পাই, তাহা শাশ্বত মানব-মনের আদর্শ,—হঠাৎ সকল বাধা-সংস্কার ভেদ করিয়া দেখা দেওয়ার দৃষ্টান্ত, কিন্তু তাহা সেই সময়কার সংহত মানব-সমাজের চিত্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। তাহাদের ঔৎকর্ষও দশজন তেমনটি বুঝিয়াছিল কি না সন্দেহ। তবে ঐগুলি সনাতন মানবকে অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়াই হয়ত তাহাদের মহিমাই পরে লোকের উপর ধীরে ধীরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল।

বাস্তবিক, সর্ব্বাপেক্ষা স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যেই যে গলদ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ নারীর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণাই এ পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজে পরিস্ফুট হয় নাই। মানুষের সত্যপ্রকৃতির সংস্কারবশে সময়ে সময়ে তাহার মধ্যে আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমের বিকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যেন কেমন আকস্মিক ঘটনার মত! সমাজ, আইন ইত্যাদি সংহত মানব-মনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যেন তাহা হইয়াছে। ভালবাসার অনুশীলন করিবার ক্ষেত্র, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শিক্ষা কিছুই এপর্য্যন্ত মানুষ পায় নাই!

এইবার আমাদের পূর্ব্ব কথায় ফেরা যাউক। এতক্ষণ দম্পতীর দুইজনের চরিত্রের আদর্শের দিকে দেখিতে গেলে অন্যাকে স্বামী-দান যে কতটা বিকৃতবুদ্ধির পরিচায়ক তাহারই একটু আভাস দিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। তাহা স্বামীর এবং আপনার উচ্চতম ও সত্যতম আদর্শ-লাভের একান্ত পরিপন্থী। তার পর মানুষের ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা ও অধিকার স্বীকার করিলে ইহা কি বলিয়া দিতে হইবে যে, তোমার স্বামীর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য একটী পূর্ণ পবিত্র কুমারী-জীবনকে বলি দেওয়ায় তোমার কোনই অধিকার থাকিতে পারে না? ভোজ্যদ্রব্যের সহিত সমশ্রেণীতে ফেলিয়া তাহাকে কি-চক্ষে দেখা হয় তাহাও

কি আঙুল দিয়া দেখাইতে হইবে? তাঁহার পুত্রোৎপাদনের যন্ত্র মাত্র করিয়া দিলেও তাহার বিশেষ সম্মানিত পদবী লাভ হইতে পারে না! "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" কথাটী স্ত্রীর সম্বন্ধে বিশেষ গৌরবজনক নহে। বাস্তবিক, পুত্রকে অন্ধভাবে বড় করিয়া দেখার দিন ত গিয়াছে, পিণ্ডদান না করিলে চতুর্দ্দশপুরুষ নরকস্থ হইবেন, অর্থাৎ আমরা মরিয়াও অনির্দ্দিষ্ট ও একান্ত অসহায়ভাবে পুত্রের দেওয়া খাওয়ার অনুপযুক্ত কতকগুলি খাদ্যের অপেক্ষায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকিব, ইহা বিশ্বাস করানো ও তাহা লইয়া কোমর বাঁধিয়া তর্ক করিতে যাওয়া, হাস্যকর মনে হয়। তবে পুত্রের দ্বারা পিতৃ-ঋণ-শোধের যে কথা আছে, তাহার অন্য অর্থ করা যাইতে পারে। সে পিতৃঋণের সহিত সমাজ ও রাষ্ট্রের ঋণও জড়িত এবং তাহা সন্তান মাত্রের দ্বারাই শোধ হইতে পারে। কিন্তু এখনকার দিনে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষ সামাজিক জীব, জীব হিসাবে তাহার কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকিলেও আপনার উচ্চতম বিকাশের পরিপন্থী কোন কর্ত্তব্যই তাহার থাকিতে পারে না। এইস্থলে একটী কথা মনে পড়িল—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর পৃথ্বীরাজ নামক পুস্তকের একস্থানে পৃথ্বীরাজ-পত্নীরা যখন তাঁহাকে যুদ্ধ-জয়ের পর বরণ করিতেছেন, তখন প্রথমা মহিষী না আসায় তাঁহাকে সংযুক্তা ডাকিয়া আনিবার সময় বলিতেছেন;—

"যদি, দিদি রূপমোহে থাকে অন্যে
আসক্তি তাঁহার,
কি ক্ষোভ তোমার তাহে? যজ্ঞে, ব্রতে,
পুণ্যকর্ম্মে জ্যেষ্ঠা তুমি, তব অধিকার।
হোক না অপর কেহ, ক্রীড়ায়, কৌতুকে,
রঙ্গে ভূপতির ভোগের সঙ্গিনী;
কিন্তু দিদি! ধর্ম্মে, কর্ম্মে
তোমারই প্রথম স্থান।" ইত্যাদি।

এই অংশটী অনেক স্থলে উদ্ধৃত হইতে দেখা গিয়াছে। যদি ইহা কেবল তখনকার সময়ের নৈতিক অবস্থা বলিয়াই ধরা হইত, তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু ইহা একটী বিশেষ গৌরব ও প্রশংসাজনক উক্তি বলিয়াই সর্ব্বত্র দেখানো হইতেছে এবং এই ভাবের কথা অনেকস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়! ইহাতেই সাধারণতঃ সহধর্ম্মিণীত্বের অধিকার ও গর্ব্ব ভুলিয়া স্ত্রী স্বামীকে ভোগের বা সন্তানের জন্য আরও বিবাহ করিতে পরামর্শ দিয়া বা তাহাতে সম্মত হইয়া থাকেন। আমাদের সমাজের পুরুষদের এ কৌশলটী মন্দ নয়। কিন্তু বাস্তবিকই ধর্ম্মের নামের চাকচিক্য থাকিলেই কি সত্য অমনি মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে? ধর্ম্মের অর্থ কি? যাহা শাশ্বত মানব-মনের উচ্চতর ধর্ম্মের বিরোধী, তাহাকে জোর করিয়া ধর্ম্ম নামে অমনি অভিহিত করিলেই হইল! স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক উভয়বিধ মিলনের পূর্ণতাই বিবাহের ধর্ম্ম। ইহা যতটা উচ্চভাবে বিকাশলাভ করিতে পারিবে ততই তাহার সার্থকতা। সন্তান লাভ (পুত্রমাত্র নহে) ইহার একটী বাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। তার পর শারীরিক সম্বন্ধ একান্ত বর্জ্জন করিয়া বা মধ্য স্ত্রী অন্যের দ্বারা কলুষিত করিয়া ইহার মধ্যে অন্যের সংস্পর্শ ঘটিলে যে ইহার পবিত্রতা নষ্ট হইল, ইহাও কি আবার বলিয়া বুঝাইতে হইবে? সংস্কারে অন্ধ না হইলে স্বামী একবার আপনার অন্তরের

দিকে চাহিলেই বুঝিবেন, তাঁহার ঐ "পুত্রার্থে" অথবা স্ত্রী বা মাতার অনুরোধ ও তাঁহাদের সেবার জন্য পুনরায় বিবাহ করিবার প্রকৃত কারণটী কি? এই সকল "ধর্ম্ম" ও "কর্ত্তব্য" ভেদ করিয়া গোপনে তাঁহার মনটী উল্লসিত হইয়া উঠে কেন, তাহার খোঁজ লইতে গিয়া কোনদিন তিনি দেখিয়াছেন কি—সে উল্লাসটী সম্ভবতঃ নিছক "ধর্ম্ম" নহে? কারণ তাহার দুর্গন্ধ চাপা দেওয়া কঠিন। তার পর আর একটী বিশুদ্ধ বালিকা-জীবনের কথা যে কাহারও একবার মনেও পড়ে না, এই নিষ্ঠুরতা দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। সে ত তথাকথিত সহধর্ম্মিণীত্বেরও দাবী করিতে পারে না, তবে তাহার স্থান কোথায়, জানিতে পারি কি? তবে তাহাকে খাদ্যদ্রব্যের সহিতই ত সমান করিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে—বড় জোর সে না হয় পুত্রোৎপাদনের যন্ত্র মাত্র!

বাস্তবিক আধ্যাত্মিকতা যেখানে সগৌরবে ঘোষিত হয়, মোহান্ধতা সেইখানেই দৃঢ়ভাবে রাজত্ব করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে দুর্নীতিগুলি সকলে দূর করিতে না পারিলেও ভাল লোকে সেগুলি মন্দ বলিয়াই জানেন। কিন্তু আমাদের দেশে তাহা বলিবার যো নাই। তাহারো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া "ধর্ম্ম" নামে চালাইতেই হইবে। দুঃখের বিষয়, ইহাতে সব দিক দিয়া বাঁধা পড়িয়াছে প্রধানতঃ মেয়েরাই।

বঙ্গনারী।

পথের সুর

ডাকে দূর গহন, দীর্ঘ পথ,
দ্বারে দাঁড়িয়ে ওই যাত্রা-রথ,—
যত মিথ্যে-সুখ, মিথ্যে-দুখ
চক্রে তার গুঁড়িয়ে দে।
হেথা কাউকে তোর নেইক ভয়,
পথে ত্যাখ্ নতুন সূর্য্যোদয়,
সবে ধর্‌বি হাত, চল্‌বি সাথ,
জয়-নিশান উড়িয়ে রে।
হাসে সাম্‌নে তোর গৌরী মা,
মরি, নেইক তাঁর শ্রীর সীমা,
ঝরে মার স্নেহের দূর্ব্বা-ধান,
লুটিয়ে শির, কুড়িয়ে নে।
তোরা কর্‌বি লাভ দৈব বর
যার স্পর্শে নর হয় অমর,
ওরে মৃত্যুজিৎ পুত্র তুই
শান্তিজল ছড়িয়ে দে!

এক শ্রেষ্ঠ সাম— সত্য-ধন
ধ্রুব মন্ত্রবীজ কর্ গ্রহণ,
জানি ফল্‌বে তোর তীর্থফল
মুক্তি-স্নান গৌরবে।
জাগে যুগ্-যুগের মাঙ্গলিক
মহা দীক্ষাগীত দিগ্‌বিদিক্,
পাবি দৈবতের যজ্ঞভাগ
আত্ম-ধূপ-সৌরভে।
নিতি দিচ্ছে ডাক হিম-গিরির
ওই শুক্ল-কেশ তুঙ্গ-শির;
গাহে নীল গভীর সিন্ধুনীর—
"কর্ বরণ সৎ শ্রেয়ঃ।
ওরে মন-কমল কর্ অমল
হোক্ যোগ-জীবন পূর্ণ বল,
আজি অর্পি চল্, কর্ম্মফল
তুই নিখিল-মৈত্রেয়।"

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মারিয়ানা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্তাভ। (একাকী) ওটা কেলিও না, ও যে আস্‌ছে ওদিক্ দিয়ে? কেলিও! কেলিও! মর্, লোকটা চলেছে কোথা?

(কেলিওর প্রবেশ)

জান কি, বন্ধু, তোমার রাজকন্যে কি মজার খেলাটাই খেলছেন আমাদের নিয়ে। তিনি তাঁর স্বামীকে সব বলে দিয়েছেন।

কেলিও। জান্‌লি কি করে?

অক্তাভ। সে আর ভুল হবার যোটি নেই, এই আমি ক্লোদিওর কাছ থেকে সবে আস্‌ছি। কথা এই, মারিয়ানাকে যদি আর ত্যক্ত-বিরক্ত কর্‌তে মানস করি, তবে আমাদের মাথার ওপর তার দরজায় হুড়্‌কো পড়্‌বে।

কেলিও। মারিয়ানার সঙ্গে তোর ত একটু আগে দেখা হয়েছিল, সে কি বল্‌লে?

অক্তাভ। যা বল্‌লে তার মধ্যে এ সংবাদটির ইঙ্গিত কিছু ছিল বলে টের পাই না, তবে তাতে ভাল কথাও বড় ছিল না! শোন্ কেলিও, তুই এ মেয়েটাকে ছেড়ে দে। কি আছ? আর এক-গেলাস!

কেলিও। কার জন্যে?

অক্তাভ। তোরই জন্যে। দেখ্, মারিয়ানা একটা ভণ্ডতপস্বিনী। সকাল বেলায় সে কি বল্‌লে তার কিছু যদি বুঝে থাকি! আমি যেন একেবারে বোকা বনে গেলেম, একটা কথারও জবাব দিতে পারলেম না। দূর হোক্, ওদিকে আর মন দিস্ নে। কেমন, রাজী ত? ও বেটিকে যদি আর কখনো একটা কথাও বলি, তবে যেন আমার মুণ্ডপাত হয়। বুক বেঁধে দাঁড়া, কেলিও, ওদিকে আর মন দিস্ নে।

কেলিও। আমি তবে যাই।

অক্তাভ। কোথা যাস্?

কেলিও। রাত্তির বেলা সহরে আমার একটু কাজ আছে।

অক্তাভ। তোর চেহারা দেখে মালুম হয়, তুই যেন গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিস্। কেলিও, তুই ভাবছিস্ কি? পৃথিবীতে আরও কত মারিয়ানা আছে। আয়, আমার সঙ্গে খেয়ে দেয়ে একটু ফুর্ত্তি কর্, ও মারিয়ানা-টাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দি।

কেলিও। না, এখন যাই; আমি থাক্‌তে পাচ্ছিনে, কাল দেখা হবে ভাই।

(প্রস্থান)

অক্তাভ। কেলিও! কেলিও! শোন্ দেখি। একটা মারিয়ানাকেই খুঁজে এনে দিচ্ছি—সে বড় শান্ত হবে, বড় শিষ্ট হবে, বিশেষতঃ কোন পূজা-অর্চ্চনার ধার ধার্‌বে না। আঃ! আপদ ঘণ্টাগুলো! প্রাণটা টেনে-হিঁচড়ে না বের ক'রে থামবে না, দেখ্‌ছি!

(ছোকরার প্রবেশ)

ছোক্‌রা। মশাই! সে লাল টুক্‌টুকে মেয়েটি জানলার ধারে নেই; আপনার নিমন্ত্রণ সে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে না।

অক্তাভ। চুলোয় যাক্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড!

তবে কি লেখা আছে, আজকে একাই আমায় ভোজন নির্ব্বাহ করতে হবে? রাত তো দেখি যেন ঘোড়ায় ছুটে আস্‌ছে। এখন করি কি ছাই? বেশ! বেশ! আমার এতেই চলে যাবে।

(মদ্যপান)

আমার দুঃখগুলোকে এই মদের মধ্যে—তা না হয়, অন্ততঃ এই মদ্যটাকে আমার দুঃখ-গুলোর মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারি। আঃ! না হোক, উপাসনা ত শেষ হ'ল। ঐ যে মারিয়ানা ফিরছে।

(মারিয়ানার প্রবেশ)

মারিয়ানা। আপনি এখানে? এর মধ্যেই বসে গেছেন। কি একা একা মাতাল হওয়াটা বড় সুবিধা লাগে না, না?

অক্তাভ। জগৎশুদ্ধ সবাই আমায় পরিত্যাগ করেছে। তাই সেখানে জোড়া জোড়া দেখবার চেষ্টায় আছি, তা হলে অন্ততঃ আমিই আমার সাথী হতে পারবো।

মারিয়ানা। সে কি? আপনার এ দারুণ নির্জ্জনতা দূর করবার জন্যে? একজন বন্ধুও নেই, একটি মেয়ে-মানুষও নেই?

অক্তাভ। তবে মনের কথা বল্‌ব কি? রোজালিন্দ বলে একটি মেয়েকে ডেকে পাঠালেম—সে মাঝে মাঝে আমার কাছে থাকে। কিন্তু সেও নাকি আজ সম্ভ্রান্ত মহিলা হয়ে সহরে নিমন্ত্রণে বেরিয়েছে।

মারিয়ানা। বড়ই দুঃখের কথা, আপনার প্রাণটা ভয়ানক ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে নিশ্চয়ই।

অক্তাভ। তা আর বলবার নয়—এই প্রকাণ্ড ভরা-গেলাসের মধ্যে সে ফাঁকটাকে যে ধরাতে এত চেষ্টা করছি তাও পারছি নে। তারপর আবার তোমার ঐ শব্দ আমার মাথার খুলি চৌচির করে দিয়ে বিকেলের খাওয়ার দফা পর্য্যন্ত শেষ করেছে।

মারিয়ানা। আচ্ছা, বলুন ত, আপনি যে মদ খাচ্ছেন তিনি কি ধান্যেশ্বরী?

অক্তাভ। তামাসা ক'রো না; ইনি স্বয়ং খৃষ্টের অশ্রু।

মারিয়ানা। আশ্চর্য্যের কথা, আপনি ধান্যেশ্বরী খান না। একবার খেয়েই দেখুন না।

অক্তাভ। কেন তা খেতে বল্‌ছ তুমি, শুনি?

মারিয়ানা। একবার আস্বাদ করবেন শুধু। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি দুটোর কোন পার্থক্য নেই।

অক্তাভ। হ্যাঁ, এই সূর্য্যে আর প্রদী যেমন।

মারিয়ানা। না, দুটো ঠিক একই জিনি বলছি আমি।

অক্তাভ। কি যে কথা! আমাকে নিয়ে মজা করছ?

মারিয়ানা। আপনি তবে অনেকখানি পার্থক্য দেখ্‌ছেন?

অক্তাভ। নিশ্চয়ই।

মারিয়ানা। আমার বিশ্বাস ছিল, ম আর মেয়েমানুষ বুঝি একই ধরণের। মেয়ে মানুষও কি এই শুভ্র বোতলটির মত ছিপি আঁটা একটা বহুমূল্য পাত্র নয়? যে গুণ ও শক্তি, সেই অনুসারে তারও ভিত নাই কি একটা পাশবিক অথবা দি মাদকতা? সে জাতের মধ্যেও নাই ছোটলোকের মদ আর যে মদ হচ্ছে খৃষ্ট

অশ্রু? কি নীচ ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ আপনাদের, আপনারা আবার কোন্ মুখে তাদের উপদেশ দিতে যান? ছোট লোকে যে মদ খায় আপনারা সে মদ খাবেন না, অথচ ছোট লোকে যে মেয়ে মানুষ চায়, আপনারাও চান সেই মেয়েমানুষ। এই যে সোনালী পাত্রের মধ্যে রয়েছে একটা উদার কবিত্বময় তেজ, এই যে অলৌকিক রসধারা—আতপ-তাপিত ভিসুভিয়স তার ধাতুশ্রাবের উষ্ণতা দিয়ে তৈরী করেছে, তার বশে নাকি আপনারা সব শক্তি হারিয়ে টল্‌তে টল্‌তে সামান্যা গণিকার কোলে গিয়ে পড়্‌বেন; কিন্তু সামান্য দরের মদ খেতে আপনাদের লজ্জা হয়, গলা উল্‌টে আসে। জিভ্‌ আপনাদের বড় সৌখীন, কিন্তু প্রাণটা এত শস্তায় মস্‌গুল্‌ হয়ে যায়। আসি তবে মশাই। প্রার্থনা করি, রোজালিন্দ আজ রাত্রেই ঘরে ফিরবে।

অক্তাভ। অনুগ্রহ করে দুটিমাত্র কথা শুনে যাও, মারিয়ানা—আমার উত্তরটা খুবই সংক্ষিপ্ত হবে। আচ্ছা, বল দেখি, এই যে বোতলটি রয়েছে, এর অনুগ্রহ পেতে কতটা সাধ্য-সাধনা করতে হয়? তুমি বল্‌ছ, এ একটা দিব্য তেজে ভরপুর; চাষার সঙ্গে রাজার যে সাদৃশ্য এর সঙ্গে ছোটলোকের মদের ঠিক সেই সাদৃশ্য। বেশ, তবুও এই দেখ তাকিয়ে, একে নিয়ে যা খুসী করতে পার, কিছু আপত্তি করবে না! আমার ত বিশ্বাস, এ কোন দীক্ষা পায় নি, এর কোন ধর্ম্মজ্ঞান নেই। দেখ ত কেমন শান্তশিষ্ট মেয়েটি এ! এক কথাতেই সে তার আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসেছে, গায়ে ধুলো-বালি-মাখা অবস্থাতেই সে ছুটে পালিয়েছে, নিজেকে বলি দিয়ে আমায় কিছুক্ষণের জন্য নির্ভাবনা করতে। একটুও তার দেরী হল না, সুগন্ধ নাসারঞ্জি সতীমুকুট তার ধূলোয় গড়িয়ে পড়্‌ল—না, কথাটা আর ঢাকতে পাল্লেম না, প্রথম চুম্বনের তপ্ত আবেগে সে তার সবখানি নিয়ে আমার অধরের ভিতরে গলে যাবার উপক্রম করেছিল।

মারিয়ানা। আপনি মনে করেন কি, ও জিনিষটার দর আরও বেশী কিছু? কিন্তু বাস্তবিকই, আপনি যদি ওর এমন সত্যিকার প্রণয়ী হন, আর ওটি তৈরী করবার ব্যবস্থাপত্রখানা আপনার যদি হারিয়ে যায়, তবে আপনি কি তার একটিমাত্র ফোঁটার জন্যে আগ্নেয় গিরির মুখে অবধি ছুটে চলেন না?

অক্তাভ। ওর দর যা তাই, বেশীও নয়, কমও নয়? ও জিনিষটি জানে, খেতে সে বড় ভাল, আর সে তৈরীই হয়েছে খাবার জন্যে। বিধাতা তার উৎপত্তি স্থান একটা দুরারোহ পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপরে কি একটা পুকুরের তলে লুকিয়ে রাখেন নি, তিনি তাকে আমাদের পথের ধারে ধারে সোনালী রঙের স্তবকে লুকিয়ে রেখেছেন; সেখানে থেকেই সে তার প্রেমের ব্যবসা চালাচ্ছে—পথিকের হাতখানা একটু ছুঁইয়ে বুলিয়ে দিচ্ছে, তার নিটোল গালটি সূর্য্যের আলোকে ধরে দেখাচ্ছে, চারদিকে তার সন্ধ্যা-সকালে মৌমাছি আর ভোমরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুণ গুণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃষ্ণায় আসন্ন পথিক তার সবুজ ডালপালার তলে শুয়ে বিশ্রাম করতে পারে; সে ত কখনও পথিককে নিরাশ করে রাখে নি, যে মধুর

অশ্রুবিন্দুতে তার বুকখানা ভরা তা ত কখনও দিতে সে অস্বীকার করে নি! হায়! মারিয়ানা, সৌন্দর্য্য বিধাতার বড় ভীষণ দান! যে সৌন্দর্য্য বিজ্ঞতার বড়াই করে,-আসলে সে কৃপণমাত্র। নিষ্ঠুর যে সৌন্দর্য্য তার চেয়ে দুর্ব্বল যে সৌন্দর্য্য তারই ওপর ভগবানের করুণা। আসি তবে বোন; কেলিও যেন তোমায় ভুল্‌তে পারে।

[অক্তাভ সরাইখানায় আর মারিয়ানা নিজ-ভবনে চলিয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভিন্ন একটি রাস্তা

কেলিও, চিয়ূতা

চিয়ূতা। দেখুন, অক্তাভকে বিশ্বাস করবেন না। সে না বলেছিল মারিয়ানা তাকে বাসায় ঢুকতে দেয় না!

কেলিও। হ্যাঁ, ঠিকই ত। তাকে বিশ্বাস করবো না কেন?

চিয়ূতা। এই একটু আগে, পথে যেতে যেতে, একটা সরাইখানার মধ্যে পর্দ্দার আড়ালে তাকে মারিয়ানার সঙ্গে বসে কথা বল্‌তে দেখেছি।

কেলিও। তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? সে হয়ত মারিয়ানার গতি-বিধির ওপর নজর রেখে ছিল আর সুবিধা পেয়ে আমার সম্বন্ধে কিছু বলাবলি করছিল।

চিয়ূতা। আমার কথার অর্থ, তারা খুব বন্ধুভাবে আলাপ করছিল, যেন দুজনার মধ্যে খুব মাখামাখি আছে।

কেলিও। ঠিক বলছ, চিয়ূতা? তা হ'লে আমার মত সুখী কে আর? সে বোধ হয় প্রাণ ঢেলে দিয়ে আমার হয়ে বল্‌ছিল।

চিয়ূতা। ভগবান আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

(প্রস্থান)

কেলিও। হায়, আমার কেন যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগে জন্ম হ'ল না। তাহ'লে মারিয়ানার নাম আমার পতাকায় এঁকে নিতেম, আমার রক্তে সে পতাকা রঞ্জিত করে দিতেম! আহা! লড়বার জন্যে যদি এক-জন প্রতিদ্বন্দ্বী পেতেম, একটা সেনা-বাহিনী যদি যুদ্ধে আহ্বান করতে পারতেম; আমার জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে যদি তার কিছু উপকার করতে পারতেম! আমি কথা বল্‌তে জানি নে, আমি জানি কাজ করতে। আমার জিভ্ আমার হৃদয়ের অনুগত নয়। মূক যেমন করে কারাগারে প্রাণত্যাগ করে, তেমনি হয়ত আমারও জীবন যাবে, কিন্তু প্রাণের কথা কখনো বুঝিয়ে বলা হবে না।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ক্লোদিওর বাড়ী

ক্লোদিও, মারিয়ানা

ক্লোদিও। তুমি মনে কর কি আমি একটা কেলে হাঁড়ি, পৃথিবীতে আছি কেবল যত কাকগুলোকে ভয় দেখানোর জন্যে?

মারিয়ানা। এমন সরস ভাবটা তোমার মনে এলো কি হেতু?

ক্লোদিও। তুমি মনে কর কি, একজন হাকিম কোন্ কথার কি মূল্য তা জানে না,

সরল মন ভিখারীর মত লোকে তাকে যা তা বিশ্বাস করাতে পারে।

মারিয়ানা। আজ আবার কার সঙ্গে লাগলো তোমার?

ক্লোদিও। তুমি মনে কর কি, তোমার নিজের মুখে আমি বল্‌তে শুনি নি, যে সেই লোকটা কি তার বন্ধু যদি আমার দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ায়, তবে যেন তাকে ঢুকতে না দেওয়া হয়? আর তোমার বিশ্বাস, তুমি তার সঙ্গে সন্ধ্যার পরে পর্দ্দার আড়ালে বসে মুখ ছুটিয়ে আলাপ করবে, আর আমি সে জিনিষটাকে বেশ ভাল বলে মনে করবো?

মারিয়ানা। তুমি আমাকে পর্দ্দার আড়ালে বসে থাকতে দেখছ?

ক্লোদিও। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এই যে চোখ-দুটো দেখছো এই দিয়েই, একটা শুঁড়িখানার পর্দ্দার মধ্যে; একজন হাকিমের স্ত্রীর পক্ষে আলাপ-সালাপ করবার জন্যে শুঁড়িখানার পর্দ্দার আড়াল খুব প্রশস্ত যায়গা নয়, নিজে যখন লজ্জা-সরম ত্যাগ করে বাইরে বাইরে চরে বেড়াচ্ছ, তখন ঘরের দরজা এঁটে বন্ধ করে রাখবে কোন্ প্রয়োজনে?

মারিয়ানা। তোমারই আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলা কবে থেকে আমার বারণ হয়েছে?

ক্লোদিও। যবে থেকে আমার আত্মীয়েরা তোমার প্রণয়ী হয়ে উঠেছেন।

মারিয়ানা। অক্তাভ! আমার প্রণয়ী! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? জীবনে সে কারও সঙ্গে ভাল-বাসাবাসি করতে যায় নি।

ক্লোদিও। তার স্বভাব-চরিত্র অতি খারাপ, সে কেবল শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে।

মারিয়ানা। ঠিক এই কারণেই সে—তোমার মিষ্ট ভাষায়—"আমার প্রণয়ী" কখনো হতে পারে না। কিন্তু আমার খুসী আমি শুঁড়িখানার মধ্যে পর্দ্দার আড়ালে বসে বসে অক্তাভের সঙ্গে আলাপ করবো।

ক্লোদিও। বাড়াবাড়ি করে, শেষটা একটা বিশ্রী কাণ্ড-কারখানা করে ফেলতে আমায় বাধ্য করো না। কি কর্‌ছ ভেবে দেখ।

মারিয়ানা। কি কাণ্ড-কারখানা? আমার জান্‌তে বড়ই কৌতূহল হচ্ছে, কি তুমি কর্‌বে।

ক্লোদিও। তার সঙ্গে তোমার দেখা-শুনা বন্ধ করবো। একটা কথাও তার সঙ্গে বলাবলি করতে পাবে না, তা আমার বাড়ীতে হোক্, কি আর কোন বাড়ীতেই হোক্, কিম্বা মাঠে-ঘাটেই হোক।

মারিয়ানা। অ্যাঁ, তাই নাকি, সত্যি! এটা একটা নতুন কিছু বটে! দেখ, অক্তাভ তোমারও যেমন আত্মীয়, আমারও তেমনি আত্মীয়; আমার যখন খুসী তখন তার সঙ্গে গিয়ে আলাপ করবো, তা মাঠে-ঘাটেই হোক আর যেখানেই হোক্—সে যদি এ বাড়ীতে আসতে চায়, তবে এ বাড়ীতেই।

ক্লোদিও। তুমি যে এই শেষ-কথাটা মুখ ফুটে বল্‌লে, তা বেশ করে মনে রেখো। এর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আমি করছি, তুমি আমার ইচ্ছায় চল্‌ছ না।

মারিয়ানা। আমার নিজের ইচ্ছায় ত চল্‌ছি, তাই ভাল। যে ব্যবস্থা তোমার খুসী হয় ক'রো। ভয় দেখাও কি?

ক্লোদিও। মারিয়ানা, তর্ক এখন থাক্। শুঁড়িখানায় পা দেওয়াটা যে সুবিধা নয় তা বুঝে নিও, নইলে আমার স্বভাবের বিরুদ্ধে হলেও কি যে করে ফেল্‌বো, ঠিক নেই কিন্তু।

(প্রস্থান)

মারিয়ানা (একাকী)

কে আছ ?

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

এই রাস্তা দিয়ে বরাবর ঐ সরাইখানায় যাও, গিয়ে দেখ্‌বে একটা টেবিলের পাশে একজন ভদ্রলোকের ছেলে বসে আছেন; তাঁকে বল্‌বে তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে, একটু কষ্ট করে যেন এই বাগানটার ভিতরে তিনি আসেন।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

হ্যাঁ, নতুন কিছু বটে! আমায় ভাবে কি ? দোষটা হ'ল কোথায় ? এ পোষাকটা আজ কি পরেছি ? কি বিশ্রী! ও কথার অর্থ ?—কি যে করে ফেলবে! কেন, কি করবে ? মা'র সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাতেই কি হতো ? সে যা বল্‌বে মা ত তাতেই সায় দেবে। ইচ্ছে হচ্ছে, কারো সঙ্গে হাতাহাতি করি! ঠেঙ্গিয়ে দি লোকগুলোকে।

(চেয়ারগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া)

আমি বাস্তবিকই দেখছি একবারে নির্ব্বোধ! ঐ যে অক্তাভ আস্‌ছে! ওর সঙ্গে যদি তার এখন একবার দেখা হ'তো!- উঃ, এই তবে সুরু হ'লো নাকি, লোকে ত আগেই বলেছিল।—আর আমিও ত জান্‌তেম, ওর অপেক্ষাতেই বসে ছিলেম! সবুর! সবুর! আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কর্‌বে—কি প্রায়শ্চিত্ত শুনি ? দেখি, কি বলতে চায় ?

(অক্তাভের প্রবেশ)

বসুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অক্তাভ। বসি কোথা ? চেয়ারগুলো যে আকাশে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎ হয়ে আছে। কি হয়েছিল এখানে ?

মারিয়ানা। কিছুই না।

অক্তাভ। কিন্তু বোন, চোখ ত তোমার বল্‌ছে অন্য কথা!

মারিয়ানা। আপনার বন্ধু কেলিও সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আমি আবার ভেবে দেখলুম। আচ্ছা, বলুন ত তিনি নিজে এসে সব খুলে বলেন না কেন ?

অক্তাভ। কারণ খুবই সোজা—যে চিঠি লিখেছিল, তা তুমি ছিঁড়ে ফেলেছ; লোক পাঠিয়েছিল, তুমি জবাব দাও নি; তোমার জানলার নীচে এসে ধন্না দিলে, তুমি ফিরেও তাকালে না। তারপর কি করে, গেল চুলোর দুয়োরে—কিন্তু চুলোয় যেতে হলেও এতখানি দরকার হয় না।

মারিয়ানা। অর্থাৎ তিনি আপনার শরণাপন্ন হলেন।

অক্তাভ। হ্যাঁ, তাই।

মারিয়ানা। বেশ, বলুন তবে তার কথা।

অক্তাভ। সত্যি ?

মারিয়ানা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি! এই যে আমি শুন্‌ছি।

অক্তাভ। তুমি তামাসা করছ।

মারিয়ানা। কেমনতর উকিল আপনি?

বলে যান না, আমি তামাসাই করি বা যাই করি আপনার তাতে কি ?

অক্তাভ। তুমি একবার এদিক আর একবার ওদিক দেখ্‌ছ কি ? তোমার যে রাগ হয়েছে!

মারিয়ানা। আমার একজন প্রণয়ী চাই, অক্তাভ প্রণয়ী না হোক, অন্ততঃ সাথী একজন। আপনি আমায় কি পরামর্শ দেন ? আপনার পছন্দেই আমার হবে—কেলিও হোক আর যেই হোক, কিছু আস্‌বে যাবে না; কাল থেকে না, আজ এই রাত্তির থেকেই চাই; যারই মর্জি হবে আমার জানলার ধারে এসে গান করবে, সেই আমার ঘরের দরজা খোলা পাবে। ধরুন, এই আমার ওড়না—যার খুসী সেই যেন আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে দেয়।

অক্তাভ। মারিয়ানা, যে কারণেই হোক্, এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি তোমার প্রাণে দয়ার উদ্রেক হয়ে থাকে, তুমি আমাকে ডাকলেই যদি, আমার কথা শুন্‌তে রাজি হলে যদি, তবে কৃপা করে আর একটি মুহূর্ত্ত এই ভাবে থাক, আমাকে বল্‌তে দাও—

(জানু পাতিয়া উপবেশন)

মারিয়ানা। কি বল্‌তে চান আপনি ?

অক্তাভ। পৃথিবীতে কেউ যদি তোমাকে বোঝবার যোগ্য হয়ে থাকে, তোমার জন্যে বাঁচ্‌বার, তোমার জন্যে মরবার যোগ্য হয়ে থাকে, তবে সে মানুষ হচ্ছে কেলিও। আমার মূল্য বেশী কিছু নয়, কোন দিন ছিলও না; আমি বিনয় করে বল্‌ছিনে, এটা সত্যি কথাই—প্রেমের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করছি বটে কিন্তু সে দিব্য বৃত্তিটির ব্যাখ্যা করা আমার মত অক্ষম হতভাগার সাজে না। হায়, মারিয়ান! যদি জান্‌তে, দেবতার মত কোন্ বেদীর ওপর স্থাপিত হয়ে তুমি পূজিত হচ্ছ! এমন সুন্দর এমন তরুণ এমন নির্ম্মল তুমি, তোমাকে কি না একটা নিরিন্দ্রিয় নির্দ্দয় স্থবিরের কাছে ধরে দেওয়া হয়েছে! তুমি যদি জানতে, কোন্ আনন্দের উৎস, কি একটা অফুরন্ত সুখের আকর নিভৃতে রয়েছে তোমার মধ্যে—আর তার মধ্যে! যৌবনের এই নবীন ঊষার মধ্যে, জীবনের এই স্বর্গীয় শিশির-কণাটির মধ্যে, দুটি যুগল হৃদয়ের এই প্রথম মিলনের মধ্যে- তার কষ্টের কথা বল্‌ব না, তোমার অকরুণ ব্যবহার সত্ত্বেও, সে তার মধুর বিধুর বিরহ নিয়ে পড়ে আছে, তা নিয়েই কেন অনুযোগ না করে শেষে জীবন বিসর্জ্জন দেবে। সত্যি মারিয়ান, এতেই তার প্রাণ যাবে। আর তোমায় বল্‌ব কি ? আমার কথায় যে শক্তি নেই, সে শক্তি তাকে দিতে আমি কোন্ রসায়ন তৈরী করব ? প্রেমের ভাষা আমি জানিনে। দেখ, তোমার প্রাণের ভিতরে তাকিয়ে—তার ভাষা সেই বল্‌বে! তোমার হৃদয় গলাতে পারে, এমন শক্তি কোথাও আছে কি ? তুমি ত ভগবানকে ডাক্‌তে জান, বল ত এমন মন্ত্র আছে কি, যা আমার বুক-জোড়া কথা প্রকাশ করে ধরতে পারে ?

মারিয়ানা। আপনি উঠে দাঁড়ান। কেউ যদি এসে পড়ে এখানে; সে কি আপনার কথা শুনে ভাববে না যে, আপনি নিজের জন্যই ভিক্ষা চাচ্ছেন ?

অক্তাভ। মারিয়ান! মারিয়ান! দোহাই

তোমার, আর তামাসা করো না। এই বোধ হয় প্রথম তোমার হৃদয়ে বিজলীর আলো খেলে গেল! দাও, তাকে আস্‌তে দাও হৃদয়ের দুয়োর আর বন্ধ করো না। এই করুণার খেয়ালটি এই দিব্য মুহূর্ত্তটি চলে গেল বলে! তুমি কেলিওর নাম মুখে নিয়েছ, তার কথা ভেবেছ পর্য্যন্ত, বল্‌ছ। আহা! এ যদি খেলাও হয়, তবুও তা আর নষ্ট করো না, একজন মানুষের সুখ-শান্তি এর ওপর নির্ভর করেছে!

মারিয়ানা। আপনি বল্‌তে চান, তামাসা পর্য্যন্ত করবার অধিকার আমার নেই?

অক্তাভ। না, তুমি ঠিক বল্‌ছ। বন্ধুত্বের টানে কত কি যে ভুল করছি তা আমি জানি। আমি জানি, জানি কি, প্রাণে প্রাণে তা অনুভব করছি। ঠিকই ত, আমার মুখে ও-সব কথা ঠাট্টার মত শুনবে বৈ কি! আমার কথার আন্তরিকতা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হচ্ছে—আমি যে লোকের বিশ্বাস জন্মাতে পারিনা, সে দুঃখ আজ এই মুহূর্ত্তে যেমন অনুভব করছি আর বোধ হয় তেমন করি নি।

মারিয়ানা। তা কেন হবে? দেখলেনই ত, আমি আপনার কথা শুনছি। কেলিওকে আমার পছন্দ নয়, তাকে আমি চাই নে। আর কারো কথা বলুন, আপনার যাকে ইচ্ছে হয়। আপনার বন্ধুদের মধ্যে থেকে আমার উপযুক্ত একজন সাথী পছন্দ করে দিন; আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, কেমন? দেখুন, আমি আপনারই কথা অনুসারে চল্‌ছি।

অক্তাভ। হায় নারী, শতবার তুমি নারী! কেলিওকে তোমার পছন্দ নয়, কিন্তু আর একটা যে হোক্ সে হোক্ তাকেই তোমার পছন্দ! যে মানুষ তোমায় একটি মাস ধরে ভাল বেসে আস্‌ছে, যে তোমার পায়ে পায়ে চল্‌ছে, যে তোমার মুখের একটি কথায় হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দেবে, সে হ'ল তোমার অপছন্দ! সে তরুণ, সুপুরুষ, ধনী, সব বিষয়েই তোমার উপযুক্ত; কিন্তু তাকে তোমার অপছন্দ, আর যে কেউ একটা হোক্ তাকেই তোমার পছন্দ!

মারিয়ানা। আপনাকে যা বল্‌লেম, তাই করবেন, নয়ত আমার সাথে আর দেখা করতে আসবেন না।

(প্রস্থান)

অক্তাভ। তোমার ওড়নাখানা বড় সুন্দর, মারিয়ানা, আর তোমার ঐ অভিমানের টুক্‌রোটুকু শুভমিলনেরই একটি বাঁধন। কথাটা ত বুঝতেই পাচ্ছি—ওটুকু দেমাক আমারও বোধ হয় আছে। এখন দরকার সামান্য একটু জুয়াচুরী—তাতে কেলিওরই হবে লাভ।

চতুর্থ দৃশ্য

কেলিওর বাড়ী

কেলিও, একজন ভৃত্য

কেলিও। নীচে দাঁড়িয়ে আছে, বলছ? উপরে আসতে বল। যাও, শীগ্‌গির নিয়ে এস।

(অক্তাভের প্রবেশ)

কি ভাই, খবর কি?

অক্তাভ। এই ছেঁড়া কাপড়টা বাঁধ্ তোর ডান হাতে। নে তোর বীণ, তোর তলোয়ার—তুই মারিয়ানার প্রণয়ী।

কেলিও। দোহাই তোর, আমায় নিয়ে আর খেলিস্ নে।

অক্তাভ। বড় সুন্দর রাত। দিনান্তে চাঁদ উঠতে যাচ্ছে। মারিয়ান একলা, তার দরজা আধ-খোলা। তোর বড় ভাগ্যি, কেলিও।

কেলিও। সত্যি?—সত্যি? অক্তাভ, তুই আমার প্রাণ—নয়ত তোর দয়া নেই।

অক্তাভ। তুই এখনও রওনা হ'স নি? তোকে বলছি কি, সব ঠিক-ঠাক। জানলার তলে একখানা গান শুধু। মুখটা একটু ঢেকে নিস্, বৌ-পাগলার চণ্ড চরেরা আবার না চিনে ফেলে। তুই ভয় করিস্ নে, তবেই লোকে ভয় করবে। মারিয়ান যদি বাধাও দেয় তবে দেখিয়ে দিবি, ও-সবের সময় চলে গেছে।

কেলিও। ওঃ, ভগবান! আমার যে বুক কাঁপছে।

অক্তাভ। আরে, আমারও ত—আমার আধপেটা খাওয়া হয়েছে শুধু। পুরস্কার-স্বরূপ যাওয়ার সময় বলে যাস, যেন আমার জন্যে এখানে খাবার এনে দেওয়া হয়।

(উপবেশন)

চুরুট আছে? কাল সকালে এখানে আবার দেখা হবে। ওঠ, ভাই ওঠ! রওনা হও! ফিরে এসেই কোলকুলি করিস্ এখন। ওঠ্ ওঠ্, রাত হয়ে যাচ্ছে।

(কেলিও'র প্রস্থান)

অক্তাভ। (একাকী) হে ভগবান! স্বর্গের খাতায় আজকের রাত্রিটা ধর্ম্মতঃ আমারই নামে তুমি জমা করে নিও। স্বর্গ বলে সত্য সত্যই কিছু আছে কি? বাস্তবিক, মেয়েটি বেশ সুন্দর, তার রূপটুকুও তাকে মানিয়েছিল ভাল। কিন্তু কেন এ রূপ? তা কে জানে! আমি যে নম্বর ডেকেছি, ঠিক সেই নম্বরটাই কি করে কাগজে উঠলো, তা জেনে আর লাভ কি? লোকের কাছ থেকে মেয়ে মানুষ ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আসা ত আমার নিত্য-নৈমিত্তিক খেলা। সে মেয়ে-মানুষ যদি মারিয়ানই হয়, তাতে আর আমার কি এল গেল? কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে ভোজন; কেলিও ত উপোস করেই আছে। মারিয়ান, আমি যদি তোকে ভালবাসতেম, তুই আমায় কি না ঘৃণা কর্‌তিস্, আমায় দেখে কি ক'সেই না দরজায় খিল্ দিতিস্, আমার তুলনায় তোর ও হতচ্ছাড়া স্বামীটাও তোর কাছে কি না পরম সুপুরুষ বলে মনে হ'তো! কিন্তু কেন এ-রকম হয়? এই চুরুটের ধোঁয়া বাঁ-দিকে না গিয়ে, ডান দিকে কেন যায়, সব জিনিষেরই কারণ ঐ রকমই! পাগল। এক-শ বার পাগল। বেঁধে রাখতে হয় তাকে, যে নিজের আশার কথাগুলোই কেবল ভাবে, নিজের পক্ষের যুক্তিগুলোই কেবল দেখে। কিন্তু ভগবান যে একটা দাঁড়িপাল্লা ধরে আছেন; সে দাঁড়িপাল্লায় ভুলটি হবার যো নেই। তবে তার বাটখারাগুলো সবই ফাঁপা; কোনটার মধ্যে আছে একটা টাকা, কোনটার মধ্যে বা বিরহের দীর্ঘশ্বাস, এটার মধ্যে আছে মাথার বেদনা, ওটার মধ্যে সুসময় কি দুঃসময়—মানুষের সব কাজই পাল্লায় উঠ্‌ছে নামছে ঐ ওজনের খাম-খেয়াল অনুসারে।

জনৈক ভৃত্য (প্রবেশ করিয়া)

মশায়, আপনার নামে এই একখানা

চিঠি আছে; খুব জরুরী, তাই আপনার এখানে নিয়ে এসেছে। চিঠি যিনি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আপনি যেখানেই থাকুন না, আজ রাতেই ওটা আপনার হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

অক্তাভ। আচ্ছা, দেখি ত।

(পড়িতে পড়িতে) "আজ রাতে আস্‌বেন না। আমার স্বামী বাড়ীটাকে গুণ্ডা দিয়ে ঘিরে রেখেছে। আপনাকে যদি তারা পায়, তবে আর রক্ষা নেই।

—মারিয়ান"

অক্তাভ। হায় রে কপাল! আমি করেছি কি? আমার জামা! আমার টুপিটা! হে ভগবান! আর একটুখানি সময় দাও। এস, তুমি—তোমরা যে যেখানে আছ, এস, চল সকলে আমার সঙ্গে! তোমাদের মনিবের জীবন-সংশয়।

(বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

ক্লোদিও'র বাগান—রাত্রিকাল

ক্লোদিও, দুইজন গুণ্ডা, তিবিয়া

ক্লোদিও। প্রথমে ঢুক্‌তে দিও, তারপর যেই এই ঝোঁপটার কাছে আস্‌বে অমনি পড়্‌বে গিয়ে।

তিবিয়া। যদি ঐ দিকটা দিয়ে ঢোকে?

ক্লোদিও। তবে দেয়ালের কোণটায় দাঁড়িয়ে থাক।

একজন গুণ্ডা। যে আজ্ঞে।

তিবিয়া। ঐ যে আসছে। দেখুন, দেখুন, ছায়াটা তার কি প্রকাণ্ড! লোকটা বেশ লম্বা-চওড়া।

ক্লোদিও। চল, আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই—সময় হ'লেই লাগাবো।

(কেলিও'র প্রবেশ)

কেলিও। (ঘুলঘুলিতে ঘা মারিয়া) মারিয়ানা! মারিয়ানা! আছ কি?

মারিয়ানা। (জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া) পালাও, অক্তাভ। আমার চিঠি তবে তুমি পাও নি?

কেলিও। হা ভগবান! কা'র নাম শুন্‌লেম?

মারিয়ানা। বাড়ীটা গুণ্ডায় ঘিরেছে। আমার স্বামী সন্ধ্যাবেলা তোমাকে এখানে ঢুক্‌তে দেখেছে, আমাদের কথাবার্ত্তাও শুনেছে। আর যদি এক মিনিট দাঁড়াও, তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

কেলিও। এ কি স্বপ্ন? আমি কেলিও।

মারিয়ানা। অক্তাভ! অক্তাভ! দোহাই তোমার, আর দাঁড়িয়ে থেকো না! এখনও বোধ হয় পালিয়ে বাঁচ্‌তে পার। কাল, দুপুর বেলা, গীর্জ্জায় এস, আমিও থাক্‌ব।

(ঘুলঘুলি বন্ধ হইল)

কেলিও। মৃত্যু! তুমি যখন এসেছ, তখন আমাকে উদ্ধার কর। অক্তাভ! বিশ্বাসঘাতক অক্তাভ! এর প্রায়শ্চিত্ত তোর যেন করতে হয়। তুই জানতিস্, আমার কপালে এখানে কি আছে—নিজে না এসে আমায় পাঠিয়েছিস্! আচ্ছা, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। মৃত্যু! এই তোমার জন্যে কো পেতে দিয়েছি—এতদিনে আমার দুঃখের শে

(প্রস্থান। বাগানের ভিতরে চাপা কণ্ঠস্ব আর দূরে-দূরে একটা কোলাহল শোনা গে

অক্তাভ। (বাহিরে) খোলো, না হয় দরজা ভাঙ্গলেম।

ক্লোদিও। (দরজা খুলিয়া, বগলের নীচে তলোয়ার-খানা রাখিয়া) কি চাও তুমি?

অক্তাভ। কেলিও কোথায়?

ক্লোদিও। এ বাড়ীতে তার শোওয়ার যে অভ্যাস আছে, তা ত আমার মনে হয় না।

অক্তাভ। তুমি যদি তাকে খুন করে থাক, ক্লোদিও, তবে সাবধান! এই হাতে তোমার ঘাড়টি আমি মটকে দেব।

ক্লোদিও। তুমি পাগল, না তোমায় ভূতে পেয়েছে?

অক্তাভ। তুমিই পাগল, তোমাকেই ভূতে পেয়েছে; নইলে এ সময়ে তলোয়ার বগলে করে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

ক্লোদিও। যদি চাও, বাগানটা খুঁজে দেখ, আমি ত কাউকে ঢুক্‌তে দেখিনি। আর যদিই বা কেউ ঢোকবার চেষ্টা করে থাকে, তবে তাকে দরজা না খুলে দেবার অধিকার বোধ হয় আমার আছে।

অক্তাভ। (তার লোকদের প্রতি) এস, খোঁজ চার দিকে।

ক্লোদিও। (তিবিয়াকে জনান্তিকে) যেমন বলেছি, তেমনি ত সব হয়েছে?

তিবিয়া। আজ্ঞে, নিশ্চন্ত হোন্—যত খুসি খুঁজতে পারে।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

সমাধি-স্থান

(একটি সমাধির পাশে অক্তাভ ও মারিয়ানা)

অক্তাভ। পৃথিবীতে আমিই শুধু তাকে চিনেছিলেম। এই যে শ্বেত শুভ্র মর্ম্মরের পাথরখানি, একটা দীর্ঘ কালো পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা—এই তার আসল ছবি। এই ভাবেই একটা স্নিগ্ধ বিষাদের ছায়া তার কোমল প্রেমিক হৃদয়ের অনুপম গুণরাশি ঢেকে রেখেছিল। এই মূক জীবনখানির যত রহস্য, তা কেবল আমারই কাছে কিছু গোপন ছিল না। কত দীর্ঘ রজনী আমরা দুজনে এক সঙ্গে কাটিয়েছি, ঊষর মরুভূমির মাঝে শ্যামল ক্ষেত্রের মত সে সব যেন জেগে আছে; সমস্ত জীবনে যে কয়েক বিন্দু শীতল শিশিরকণা আমার প্রাণে পড়েছিল, তা ঢেলেছে সেই ক'টি রাত। কেলিওই ছিল আমার জীবন, কেলিওর সঙ্গে তা স্বর্গে চলে গেছে! আর এক যুগের মানুষ সে; ভোগ কাকে বলে সে জান্‌তো, তবুও সে একলা থাক্‌তেই চাইত; কল্পনা যে কি ভুল করায়, তা সে জান্‌তো, তবুও বাস্তব ছেড়ে কল্পনার দিকেই ছিল তার আকর্ষণ। যে রমণী তাকে ভালবাস্‌তে পারতো, সে বড় সুখী হ'ত!

মারিয়ানা। তোমাকে যে রমণী ভালবাসবে, অক্তাভ, সেও কি সুখী হবে না?

অক্তাভ। আমি ভালবাস্‌তে জানি নে, তা জান্‌তো কেলিও। যে ভস্মটুকু এই সমাধির ভিতর রয়েছে, পৃথিবীতে এক তাকেই আমি ভালবাস্‌তেম, এক তাকেই ভালবাস্‌বো। সেই শুধু জান্‌তো নিজের প্রাণে যে আনন্দের উৎস রয়েছে তা কি করে নিঃশেষে আর একটি প্রাণের মধ্যে ঢেলে দিতে হয়। অপার নিষ্ঠার ক্ষমতা এক তারই ছিল; যে রমণীকে সে ভালবাস্‌তো, তার জন্যে সমস্ত জীবন সেই কেবল উৎসর্গ করে দিতে পারতো, সেই

রমণীর জন্যে তেমনি সহজেই সে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারতো। আমি ত লম্পটমাত্র, আমার হৃদয় নেই, নারীর মর্য্যাদা আমি বুঝি নে! আমি দিতে পারি যে রকম ভালবাসা, আমি ফিরেও পাই তেমনি ভালবাসা—স্বপ্নের মত একটা ক্ষণিক নেশা। সে যে সব গুপ্ত রহস্য জান্‌তো, আমি তা জানিনে। আমার হাসি নটীর মুখোসের মত। হৃদয় আমার স্থবির। ইন্দ্রিয় আমার অবসাদগ্রস্ত—ভোগ আর তারা চায় না। কিন্তু, কি কাপুরুষ আমি, তার মৃত্যুর প্রতিশোধ এ পর্য্যন্ত নেওয়া হ'ল না।

মারিয়ানা। নাই হ'ল—তোমার জীবনকেও আবার বিপন্ন করবে কেন? তারপর ক্লোদিও ত তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধের বয়স তার পার হয়ে গেছে, আর তুমিও তার কিছু করতে পারবে না—সহরে তার অপ্রতিহত প্রভাব।

অক্তাভ। কেলিও কিন্তু আমার মৃত্যুর শোধ নিত,—সে যেমন করে আমার জন্যে মরেছে, আমি যদি তেমনি করে তার জন্যে মরতেম। না, এ আমারই সমাধি! আমাকে তার এই হিম-শীতল পাথরের নীচে শুইয়ে রেখেছে; আমার জন্যেই তারা তলোয়ারে শাণ দিয়েছিল, আমাকেই তারা খুন করেছে। বিদায়, আমার যৌবনের আমোদ, খোস-খেয়াল, পাগলামী—বিদায়, ভিসুভিয়সের কোলে আমার সে মুক্ত উল্লসিত জীবন! বিদায়, কলমুখরিত উৎসব-মধুর-সন্ধ্যা সম্মিলন, সোনালী জানলাতলে প্রেম-গান! বিদায়, নেপ্‌ল্‌স সহর! বিদায় নেপ্‌ল্‌স্ সহরের রমণীকুল, মশালের আলোতে সঙের মিছিল, বনের ছায়াতলে পান-ভোজন! বিদায়, ভালবাসা! বিদায় বন্ধুত্ব! পৃথিবীতে আমার স্থান শূন্য হ'ল।

মারিয়ানা। কিন্তু আমার হৃদয়ে ত নয়, অক্তাভ। কেন বল্‌ছ তুমি, বিদা ভালবাসা?

অক্তাভ। আমি তোমাকে ভালবাসি না, মারিয়ান—ভালবাস্‌তো কেলিও।

সমাপ্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

আলোচনা

"বাঙ্গালী হিন্দুনারীর মর্য্যাদা"

পৌষ মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত মহাশয় "বাঙ্গালী হিন্দুনারীর মর্য্যাদা" শীর্ষক প্রবন্ধে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা-রক্ষা-কল্পে লেখনী ধারণ করিয়া মর্য্যাদা-হানির কতকগুলি কারণ জন্মাইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

লেখক মহোদয় "নারীজাতির শারীরিক বলবৃদ্ধি কল্পে ডাম্বেল-ভাঁজার ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পুরুষজাতির শারীরিক শক্তি বিকাশ করিবার যেমন সহজ উপায় আছে, স্ত্রীজাতির শারীরিক বল-বৃদ্ধির সেরূপ কোন উপায় নাই কি? লেখক যদি কোন হিন্দু-পরিবারভুক্ত হন, কিংবা যদি তিনি কখনও কোন হিন্দুপরিবারের সংস্পর্শে যাইয়া থাকেন, তবে অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, হিন্দু-রমণীগণের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার ও মানসিক

প্রফুল্লতা সম্পাদন করিবার স্বাভাবিক সহজ উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। হিন্দুরমণীগণ নদীর ঘাট, পুকুরের ঘাট হইতে জলপূর্ণ কলসী বহন করিয়া গৃহে আনয়ন করেন, কূপ হইতে জল তোলেন, বাটনা বাটেন; এ-সব কার্য্যে ডাম্বেল ভাঁজার ন্যায়ই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন হইয়া থাকে। অবরোধপ্রথার ফলে যে নারী-জাতির মানসিক বৃত্তি বিকাশ পায় না লেখক মহোদয় তৎপ্রতিও কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুগণ তাঁহাদের মহিলাদিগকে সর্ব্বদা বাহিরে যাইয়া যথেষ্ট বিচরণ করিতে না দিলেও সময় সময় তাহাদিগকে দূরবর্ত্তী তীর্থপর্য্যটনে লইয়া যান। প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুর তীর্থ সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বলবতী। এমন কি, এজন্য শত শত মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। এই তীর্থভ্রমণের সুযোগ হইতে নারীজাতি বঞ্চিতা হন নাই। এতদ্ব্যতীত দেশে রথযাত্রা ও রাসপূর্ণিমা প্রভৃতির সময় অনেক স্থলে মেলা হয়, তাহাতেও হিন্দুললনাগণ যাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে নারীজাতির পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বহুদর্শিতা ও মানসিক উন্নতি লাভ হয়। হিন্দুসমাজে অবরোধ-প্রথা বর্ত্তমান থাকিলেও ললনাগণ কেবল অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকেন না, স্নানার্থ বা জল আনয়নার্থ নদী বা পুকুরে যাইতে, নিমন্ত্রণাদিতে একবাড়ী হইতে অন্যবাড়ী যাইতে যতটুকু মুক্ত বায়ু সেবন করিতে পান, তাহাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এতদুপরি প্রত্যেক স্বাস্থ্যকামী গৃহস্থ-ভবনেই উপযুক্ত মুক্ত বায়ু ও আলোক গমনাগমনের ব্যবস্থাও থাকে। যে গৃহে এরূপ ব্যবস্থা না থাকে তাহা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই সমান অনিষ্টকর। আমাদের দেশে সদাসর্ব্বদা মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিলেও এবং বলবৃদ্ধিকল্পে ডন, কুস্তি প্রভৃতি অভ্যাস করিলেও এখনও স্ত্রীজাতির শারীরিক শক্তির তুলনায় পুরুষ তেমন উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিতে পারেন নাই। যৌথপরিবারে রন্ধনশালায় রন্ধন কার্য্য অন্নব্যঞ্জনাদি পরিপূর্ণ—বড় ডেক্ গামলা অনেক ক্ষীণকায়া রমণীও অনায়াসে উত্তোলন করিয়া থাকেন এবং নদী বা পুকুর ঘাট হইতে বড় বড় জলপূর্ণ কলসী কটিতে বহন করিয়া আনেন। ইহা পরীক্ষিত সত্য ঘটনা। অনেক স্থূলাকার পুরুষ এইরূপ জলপূর্ণ কলসী উত্তোলন করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন তাহাও আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

লেখক-মহাশয় বর্ত্তমান বিবাহ-বিধিতে নারীজাতির প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বীকার করি আমাদের সমাজে নরনারীর যে বয়সে বিবাহ হইত তাহা উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু আজকাল আর তেমন বাল্য-বিবাহের আধিক্য নাই। এখন স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের ফলেই—হিন্দুসমাজে কন্যার বিবাহ কোন পিতামাতাই ইচ্ছা থাকিলেও তেমন অল্পবয়সে দিতে পারেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা অনেকটা ইচ্ছা করিয়াই ১৪।১৫ বৎসর বয়সে মেয়ের বিবাহ দিয়া থাকেন। নানা কারণে ১৪।১৫ বৎসরের বেশী বয়সে মেয়েকে অবিবাহিত রাখা আমাদের বিবেচনায় সঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে অসম্ভব।

লেখক-মহাশয় বলিয়াছেন যে, "নারীর ব্যক্তিত্বে সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত লাগে তখন, যখন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তাহার বিনামতে তাহাকে জুড়িয়া দেওয়া হয়।" পুরুষের পক্ষেও কি তাহাই নহে? সব পুরুষই কি নিজ ইচ্ছামত পাত্রী বাছিয়া লইয়া বিবাহ করেন? পুরুষ যখন হাজার হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া কন্যার বাপকে সর্ব্বস্বান্ত করেন, তখন তাহার ব্যক্তিত্বটাই বা যায় কোথায়? লেখক-মহাশয় কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি যুগপৎ নারীর ব্যক্তিত্ব ও নিজের ব্যক্তিত্বে আঘাত করিয়া পাণিগ্রহণ কার্য্য শেষ করেন নাই? নারীর নারীত্ব রক্ষা হইবে সেইদিন, যেদিন পুরুষ তাহার পুরুষত্ব ষোলআনা বুঝিতে পারিবেন, অর্থাৎ বিনাপণে বিবাহ করিবার সৎসাহসে প্রণোদিত হইবেন। লেখক রমণীদিগকে নিজ ইচ্ছামত বর মনোনীত করিবার ক্ষমতা দিতে চান! বেশ ভাল কথা! কিন্তু যে দেশে পিতামাতা নিতান্ত অপছন্দ পাত্রকেও কন্যা সম্প্রদান করিতে সর্ব্বস্বান্ত হন, সে দেশে যদি নারীগণ ইচ্ছামত বর পাইতে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেন, তবে তাহার 'মেও' ধরিবে

কে? পুরুষ এখন নারীজাতির নিকট আত্মবিক্রীত টাকার বিনিময়ে—সুতরাং Slave-mentality বা দাস-মনোভাব এখন পুরুষেরই অস্থি-মজ্জাগত। পুরুষ আগে তাহার এই দাস-মনোভাব দূর করুক, তারপর যেন নারীর নারীত্ব রক্ষায় যত্নশীল হয়।

লেখক-মহাশয়ের মতে "যৌথ পরিবারে বাস নারীর মর্য্যাদারক্ষার আর এক মস্ত অন্তরায়।" এটা একটা সর্ব্বনেশে কথা। মানুষ দশজনের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া, দশের সেবায়, দশের সন্তোষ বিধানে জীবন যাপন করিবার জন্যই—ভগবান কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন :—

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

সেইজন্যই মানব সমাজবদ্ধ ও পরিবার-বদ্ধ জীব। ইংরেজের অনুকরণে স্ত্রী লইয়া পৃথক বাস করিবার প্রস্তাব শুধু অভিনব নহে, আকস্মিক ও অদ্ভুত বটে। লেখক এখানে যৌথপরিবারের বুড়াযুড়ী, অর্থাৎ বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীকেও আক্রমণ করিয়াছেন। যাহারা আজ বুড়াবুড়ী দু'দিন আগে তাঁহারাই যুবক যুবতী ছিলেন—তাঁহাদের দেহে শক্তি ছিল, হৃদয়ে বল ছিল। আজ যে তাঁহারা স্বভাবতঃই সেবাশুশ্রূষা ও দয়ার পাত্র। দুর্ব্বলের সেবা কি পাপ? যদি পাপই না হইবে তবে আমরা নারীজাতির স্বাভাবিক কোমলবৃত্তি, যাহা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই দুর্ব্বলের পরিত্রাণে অগ্রসর হইতে চায়—তাহা রোধ করিবার ব্যবস্থা করিব কেন? দশজনকে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া, শিশু-সন্তানদিগকে আদর-যত্নে লালন পালন করিয়া, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সেবাশুশ্রূষা করিয়া হাস্য-কোলাহল মুখরিত যৌথ-পরিবার বাস করা ভাল,' না পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায়—একাকী এক বাটীতে পৃথক বাস করাই ভাল? দশজনের মন যোগাইয়া চলাটা কি খুব দোষাবহ? কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষকেও কি অনেক সময়ই—উপর-ওয়ালার মন যোগাইয়া চলিতে হয় না? মন যোগাইয়া চলা অনেকটা বাধ্যতার নামান্তর মাত্র। বাধ্যতা দোষ নহে, গুণ; এ গুণ অর্জ্জন করা হৃদয়বান লোকের কাজ, হৃদয়হীন লোকের কাজ নহে।

উপসংহারে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "স্বামী বদমায়েস কিংবা কুরোগগ্রস্ত হইলেও যে নাক-চোখ বুজিয়া তাহার সঙ্গে টিঁকিয়া থাকিতে হইবে—তাহা এখন আর কেহ বিশ্বাস করে না এবং অকর্ত্তব্য মনে করে।" এইখানেই আমরা লেখকের উদ্দাম কল্পনার চরম পরিণতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই। রোগ সকল সময়েই মানবের স্বকৃত দোষের জন্য নহে। অনেক সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকের অনেক কুরোগ জন্মিয়া থাকে। এইরূপ রোগ নারীরও হয়, পুরুষেরও হয়। নারী যদি কুরোগগ্রস্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত পত্যন্তর গ্রহণে সুবিধা পায়, তবে পুরুষই বা কুরোগগ্রস্ত পত্নীকে পরিত্যাগ না করিবে কেন? এইরূপে তাহা হইলে সংসার বিড়ম্বনাস্থল হইয়া পড়ে; স্বামী-স্ত্রী যে পরস্পর সুখদুঃখের সমভাগী, তাহা মিথ্যা হইয়া পড়ে, সেবাবৃত্তি লোপ পায় এবং ভালবাসা একটা কথার কথা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়।

এরূপ করিলে ত ভালবাসা বা দাম্পত্য প্রেম একটা ঠুনকো জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ আশার দাস। রোগাক্রান্ত স্বামী নিরাময় হইবেন কিংবা চরিত্রহীন স্বামী পুনরায় সচ্চরিত্র হইবেন, এই আশায় নারী শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর সাহচর্য্য ত্যাগ করেন না। বর্ত্তমানে যাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কামনা করেন, তাহাদের উচিত স্ত্রীজাতিকে নৈতিক ও কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করা এবং সমাজ হইতে কুৎসিত পণপ্রথা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ষিতা রমণী যাহাতে সমাজে স্থান পায় তাহার ব্যবস্থা করাও প্রত্যেক মনুষ্যেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এই কয়েকটী বিষয়ের অব্যবস্থাই নারীজাতির উন্নতি ও ঐহিক সুখের প্রবল অন্তরায়; এই সকল বিষয়ে যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সাধারণের অনুকূল দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে, তাহাই করা প্রত্যেক সুধীব্যক্তির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

শ্রীবেণীমাধব দত্ত বিদ্যাবিনোদ।

মিলিতোনা

১০

আমাদের বন্ধু জুয়াঙ্কো একটু আমাদের নজরের আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে এখন খুঁজিয়া বাহির করা যাক্; কেননা সে মিলিতোনার ঘর হইতে এরূপ ক্রোধান্ধ হইয়া বাহির হইয়াছিল যে তাহার সেই ক্রোধ কতকটা উন্মাদের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বিড়বিড় করিয়া অভিসম্পাৎ করিতে করিতে, পাগলের মত মুখভঙ্গী করিতে করিতে, অজ্ঞাতসারে সে মাঠ-ময়দান পার হইয়া একেবারে হিযেবরোর বন্দরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল।

মাড্রিড্ নগরের আশপাশগুলা শুষ্ক ও উজাড়; রাস্তার দুধারের ইতস্ততঃ-নিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলার দেয়ালে মেটে রং; এবং সেই সব অস্বাস্থ্যকর শ্রম-শিল্পের কাজ চলিতেছে, যে সকল শ্রম-শিল্পকে বড় বড় নগরগুলা আপন বক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এখানে কদাচিৎ কোথাও উদ্ভিজ্জের নিদর্শন দেখা যায়। শুষ্ক নদী-নালা মাটির উপর দিয়া ভীষণ খাদ কাটিয়া গিয়াছে; পাহাড়ের গায়েও হরিৎ দৃশ্য একটুও নাই। চারিদিকে একটা বিষাদের ভাব বিরাজমান।

দুই এক ঘণ্টা পথ হাঁটিয়া, চিন্তা-ভারে ভারাক্রান্ত অসাধারণ বলিষ্ঠ জুয়োঙ্কো একটা গর্ত্তের উপরকার মাটির উপর উপুড় হইয়া,—মুখটা হাঁটুর উপর ভর দিয়া, থুৎনি ও গাল দুই হাতে ধরিয়া সম্পূর্ণ অবসন্ন ও নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিল।

জুয়াঙ্কো দেখিল,—তাহার নিকট দিয়া গরুর গাড়ি সারি সারি চলিয়াছে—রাস্তার ধারে একটা শয়ান শরীর দেখিয়া গরুরা ভড়কাইয়া একপাশে সরিয়া যাওয়ায়, গাড়োয়ানেরা তাহাদের পৃষ্ঠে অঙ্কুশের খোঁচা দিতেছে। খড়ের বোঝাই লইয়া গাধারা চলিয়াছে। দস্যুর মতো চেহারা কৃষকেরা, ঘোটক পৃষ্ঠে গর্ব্বিতভাবে উপবিষ্ট হইয়া জঙ্ঘা ও জিনে বাঁধা বন্দুকের উপর হাত রাখিয়া চলিয়াছে। কর্কশ-চেহারা চাষাণী একটা মর্কটকে টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। গ্রাম্য লোকেরা ১০।১২ ক্রোশ দূর হইতে ২।৩ টি কাঁচা আপেল ও এক গুচ্ছ লঙ্কা লইয়া যাইতেছে।

জুয়াঙ্কো তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। তাহার নেত্র হইতে বিগলিত এই প্রথম অশ্রুবিন্দু সামান্য বৃষ্টি-বিন্দু রূপে ধরণী পান করিল। তাহার বিশাল বক্ষদেশ, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল—সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত শরীর উঠিয়া পড়িতেছিল। এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত সে আর কখন হয় নাই। তাহার মনে হইল, ধরণীর যেন অন্তিম দশা উপস্থিত। সে সৃষ্টি ও জীবনের কোন উদ্দেশ্যই দেখিতে পাইল না। এখন-হইতে সে কি করিবে?

যাহা হৃদয় স্বীকার করিতে কিছুতেই রাজি হইতে ছিল না, সেই মারাত্মক সত্যটা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য জুয়াঙ্কো বারম্বার এই কথা আবৃত্তি করিতেছিল!—"সে আমাকে ভাল বাসে না, সে আর একজনকে ভাল বাসে। ইহা কি সম্ভব? ইহা কি

বিশ্বাসযোগ্য ? সে কী গর্ব্বিত, কী নিষ্ঠুর, সে একজন অপরিচিত লোকের প্রতি হঠাৎ আসক্ত হইয়া পড়িল; আর আমি যে এই দুই বৎসর তাহারই জন্য জীবন ধারণ করিতেছি, ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিতেছি, আমার জন্য কি তার মুখ হইতে একটিও মমতার কথা শুনিতে পাইলাম না, তাহার মুখে একটু অনুগ্রহের হাসি দেখিতে পাইলাম না! এই জন্য আমি কত দুঃখ করিয়াছি; কিন্তু আজ যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, ইহার কাছে সে দুঃখও স্বর্গ। আমাকে যদি সে ভাল না বাসে, সে যেন আর কাহাকেও না ভালবাসে।

"আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারতেম; কিন্তু সে আমাকে চলে যেতে বল্লে, আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না বল্লে; আমি তাকে রাহুর মত আচ্ছন্ন করে' রেখেছি, সে আমার উৎপীড়ন আর সহ্য করতে পারে না। যাই হোক্, আমি যখন চলে এলেম তখন সে একলা ছিল। প্রেমে উন্মত্ত হয়ে, বাসনার মদে মত্ত হয়ে, সারারাত আমি তার গবাক্ষের নীচে ঘুরে বেড়িয়েছি; আমি জানতেম, তার সেই ছোট্ট কুমারী-সুলভ পালঙ্কের নিষ্কলঙ্ক শয্যায় সে বিশ্রাম করচে; তার পর্দ্দার ও-ধারে দুটো ছায়া দেখ্‌ব বলে আমার কখনো ভয় হয় নি। হতভাগ্য আমি—আমার মত এই তিক্ত-মধুর রস ইতিপূর্ব্বে আর কেহই আস্বাদ করে নি। এই অমূল্য নিধি আমার হয়নি সত্য, কিন্তু আর কেহ তার চাবিও পায়নি!

"আর এখন—এখন আমার সব শেষ হয়ে গেছে; আর কোন আশা নেই! যখন সে আর কাহাকে ভাল বাসে নি, তখন সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; কিন্তু এখন, আর একজনের উপর তার ভালবাসা পড়ায় আমার প্রতি তার বিরাগ না-জানি আরও কত বৃদ্ধি হয়েছে। পূর্ব্বে যারা-যারা ওর রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের আমি কেমন সহজে সরিয়ে দিয়েছিলেম—আমার কৃপনের ধন রক্ষা করবার জন্য আমি কেমন চারদিকে পাহারা দিতেম—। বেচারা 'লিনে', বেচারা 'লুকা', বিশেষ কিছুই করে নি, অথচ তাদের আমি কতই পীড়ন করেছি! আর, যে বাস্তবিক ভয়ানক লোক, যাকে এই দণ্ডেই হত্যা করা উচিত, তাকে কি না আমি অনায়াসে ছেড়ে দিলেম!

ধিক্ এই হাত, আমার এই অদক্ষ অনিপুণ হাত,—তোর কর্ত্তব্য তুই করতে পারলি নে—এখন তার শাস্তি ভোগ কর্।"

এই কথাগুলা বলিয়া জুয়াঙ্কো নিজের ডান হাতে এমন এক কামড় দিল যে, রক্ত ঠিকরিয়া বাহির হইবার মত হইল।

"যখন ও ভাল হয়ে উঠ্‌বে তখন আর একবার ওকে রাগিয়ে দিতে হবে, তখন আর কিছুই আমি বাকি রাখ্‌ব না। কিন্তু আমি যদি ওকে হত্যা করি, তাহলে মিলিতোনা আমার আর মুখ দর্শন করবে না। যে দিক্ থেকেই দেখা যায়, মিলিতোনা আমার হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। একথা ভাবলে পাগল হয়ে যেতে হয়; আর কোন উপায় নেই। যদি হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা হয়ে সে কোন স্বাভাবিক কারণে মরে,—যেমন গৃহদাহ, বাড়ী চাপা-পড়া, ভূমিকম্প, পেলেগ—তাহলে……কিন্তু সে সুখ আমার ভাগ্যে

নেই। যখন আমি ভাবি, ঐ মোহিনীর হৃদয়-খানি, তার অনিন্দ্য সুন্দর দেহ, তার সেই সুন্দর চোখ, তার সেই স্বর্গীয় মধুর হাসি, তার সুগোল ও সুনম্য গ্রীবা, তার পাতলা ছিপছিপে গঠন, শিশুর মত তার পা-দুখানি—এই সমস্ত আমার হবে না—তখন, তখন… সে লোকটা যখন ওর হাত ধরে, সে তো তার হাত সরিয়ে নেয় না; যখন সে তার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকে, তখন সে ত ঘৃণার সহিত মুখ ফেরায় না। আমি কি দোষ করেছি যে আমাকে এইরকম শাস্তি দেওয়া হচ্চে। স্পেনের কত সুন্দরী আমার ভালবাসা পাবার জন্য লালায়িত। আমি যখন রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করি, তখন কত সুন্দরীর হৃদয় আবেগে স্পন্দন করে ওঠে; কত ধবধবে সাদা হাত বন্ধুতার সঙ্কেত করে" আমাকে অভিবাদন করে। আমার সাহস ও আমার খুবসুরৎ চেহারায় মুগ্ধ হয়ে কত আমীরওম্‌রার বেগমেরা তাদের হাত-পাখা, তাদের রুমাল, তাদের চুলের ফুল আমার উপর নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু সে সব আমি অবজ্ঞা করেছি। তাদের আদর-যত্নে আমি ভ্রুক্ষেপ করি নি। এত ভালবাসার মধ্যে আমি কিনা বেচে বেচে একটা বিদ্বেষকে বরণ করলেম। দুর্জ্জয় দুর্ব্বিপাক! কাল নিয়তি! দুষ্ট বিধাতা! আমি "আমাদের দেবী"র সম্মুখে মোমবাতি জ্বালাই নি, তাই বোধ হয় আমার এই শাস্তি। হা ভগবান! হা ভগবান! এখন করি কি? এই পৃথিবীতে আমি কখনই আর শান্তিতে থাক্‌তে পারব না। দমিঙ্গেও মিলিতোনাকে ভাল বাস্‌ত, ষাঁড়ের শিংএর আঘাতে সে মারা গেছে—মরে' সে সুখী হয়েছে। আমার যথাসাধ্য আমি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেম। আর মিলিতোনা কিনা বলে,—আমি তার বিপদের সময় আমি তাকে পরিত্যাগ করেছিলেম! এই জন্য সে আমাকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না—শুধু তা নয়—আমাকে সে হতশ্রদ্ধা করে। একথা মনে হলে, রাগে উন্মাদ হয়ে যেতে হয়।"

এই কথা বলিয়া এক লাফে সে উঠিয়া পড়িল এবং মাঠ-ময়দানের মধ্য দিয়া আবার চলিতে লাগিল।

বুদ্ধি লুপ্ত-প্রায় চোখ কোটরস্থ, মুষ্টি সঙ্কুচিত—এইরূপ ভাবে জুয়াঙ্কো সমস্ত দিন ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে খেয়াল দেখিতে লাগিল, যেন আন্দ্রে ও মিলিতোনা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, মদালস দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া আছে; সেই সব অবস্থায় রহিয়াছে যাহা দেখিয়া কোন ঈর্ষান্ধ প্রেমিক কখনই সহ্য করিতে পারে না! এই-সব দৃশ্য এরূপ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠিল, এরূপ বাস্তব বলিয়া মনে হইল যে, আন্দ্রের বুকে যেন সে ছুরি বসাইবে এই ভাবে কতবার সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন তার আঘাত শুধু শূন্যের উপর আসিয়া পড়িল, তখন তার চমক ভাঙ্গিল।

তাহার দৃষ্টির সম্মুখে বস্তু-সমূহের আকার পরস্পর মিশিয়া যাইতে যাইল; তাহার কপালের রগ্ টানিয়া ধরিল। একটা লোহার চাকা যেন তাহার মাথায় চাপ দিতেছে; তাহার চোখ যেন আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে; এবং তাহার মুখ বহিয়া ঘাম

ঝরিতে থাকা সত্ত্বেও, জুন মাসের প্রখর সূর্য্যের উত্তাপ সত্ত্বেও তাহার শীত করিতে লাগিল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান,—যার গাড়ী একটা বড় পাথরে ঠেকিয়া উল্টাইয়া পড়িয়াছিল—সেই গাড়োয়ান জুয়াঙ্কোর নিকট আসিয়া তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া তাহাকে বলিল :—

"ওহে, মিঞাসাহেব তোমার গায়ে খুব জোর আছে বলে মনে হয়, এই গাড়িটা ওঠাতে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে কি? আমার বেচারী গরুগুলো আর পারচে না।" জুয়াঙ্কো নিকটে আসিল এবং কোন কথা না বলিয়া গাড়ীটা উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তখন তাহার হাত কাঁপিতেছিল, পা টলমল্ করিতেছিল, তাহার অজেয় পেশীগুলা আর তাহার ডাকে সাড়া দিল না। সে গাড়ীটা একটু উঠাইয়াছিল, কিন্তু শ্রমে অবসন্ন হওয়ায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাত ছাড়িয়া দিল—গাড়ীটা আবার পড়িয়া গেল।

জুয়াঙ্কোর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া গাড়োয়ান বিস্মিত হইয়া বলিল;—"আমি মনে করছিলুম মিঞাসহেব, তোমার মুঠোর জোর এর চেয়ে অনেক বেশী।"

জুয়াঙ্কোর বাহুতে আর বল ছিল না। জুয়াঙ্কো পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল।

তথাপি গাড়োয়ানের কথায় তাহার আত্মসম্ভ্রমে একটু আঘাত লাগিল; এবং "গ্ল্যাডিয়েটার" বলিয়া তাহার পেশীর দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাহার যে অহঙ্কার ছিল, সেই অহঙ্কারে উত্তেজিত হইয়া, প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তাহার দেহের অবশিষ্ট সমস্ত বল একত্র করিয়া, গাড়িতে এমন এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, যে সেই ধাক্কাতে গাড়ীটা আবার অন্য দিকে উল্টাইয়া পড়িবার যোত্র হইল।

গাড়োয়ান বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া বলিয়া উঠিল :—

"বাহবা! সাবাস! হার্কুলিস্ অতবড় পালোয়ান, সেও এমন কাজ করতে পারত না।"

কিন্তু জুয়াঙ্কো কোন উত্তর করিল না। রাস্তার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া গেল।

গাড়োয়ান ভীত হইয়া বলিল :—"শরীরের কোন রক্তের শিরা ছিঁড়ে যায় নি ত! যাই হোক, আমার সাহায্য করতে গিয়েই যখন এর এই দুর্ঘটনা হয়েছে, তখন আমিই ওকে আমার গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে কো পান্থশালায় রেখে আসি।"

জুয়াঙ্কোর মূর্চ্ছা অল্পক্ষণই ছিল। তার "সল্ট" শুঁকিতেও হয় নাই—সুরা পান করিতেও হয় নাই—গাড়োয়ানের কাছে ও-সব জিনিস ত সাধারণতঃ থাকেই না। বৃষভমল্ল ত আর সুকুমার-দেহ ললনা নহে।

গাড়োয়ান তার বহির্বস্ত্রে জুয়াঙ্কোকে ঢাকিয়া রাখিল। জুয়াঙ্কোর জ্বর হইয়াছিল তাহার লৌহবৎ শরীরে এতদিন যাহা কখন অনুভব করে নাই সেই রোগে অনুভূতি এই তাহার প্রথম হইল!

একটা পান্থশালায় আসিয়া, সে একটা শয্যা চাহিয়া লইল, এবং সেই শয্যায় শুইয়া জড়পিণ্ডের মত নিশ্চল হইয়া অঘো ঘুমাইয়া পড়িল, এবং তাহার শারীরি

যন্ত্রণা হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইল। ১২ ঘণ্টা দীর্ঘনিদ্রার ফলে জুয়াঙ্কো অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। যখন উঠিল তখন আর জ্বর নাই, মাথা-ব্যথা নাই—আছে কেবল দুর্ব্বলতা। চলিবার সময় পা টলে, চোখে আলো সহ্য হয় না, একটু আওয়াজেই মাথা ঘুরিয়া যায়; তার বোধ হইতে লাগিল, যেন তার অন্তঃকরণটা, তার অন্তরাত্মাটা একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে; তার ভিতর যেন একটা মস্ত ভাংচুর হইয়া গিয়াছে; যেখানে প্রেম গজাইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে একটা গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে—সে গহ্বর আর কিছুতেই পূরণ হইবার নহে।

সে এই পান্থশালায় একদিন মাত্র ছিল। একটু ভাল হইয়াই সে একটা ঘোড়া যোগাড় করিল, এবং সেই ঘোড়ায় চড়িয়া মাড্রিড-অভিমুখে যাত্রা করিল। চলিতে চলিতে নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল;—মনে করিল, ক্ষতস্থানে বিষপ্রয়োগ করিয়া ক্ষতটা আরও বিষাক্ত করিয়া তুলিবে, আরও বাড়াইয়া তুলিবে; অথবা আপনার বুকে ছুরী বসাইয়া দিবে। এইরূপে শরীরকে নির্য্যাতন করিয়া মনের যন্ত্রণা ভুলিতে চেষ্টা করিবে।

জুয়াঙ্কো যে সময়ে তাহার দুঃখ-কষ্ট লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, সেই সময় পুলিসের টিক্‌টিকিরা চারিদিকে তাহার খোঁজ করিতেছিল। কেন না, সাধারণের মধ্যে সকলেই বলাবলি করিতেছিল যে, জুয়াঙ্কোই আল্‌সেডোর মহামান্য আন্দ্রে-মহাশয়কে ছোরা মারিয়াছে। কিন্তু আন্দ্রে তাহার নামে কোন অভিযোগ আনে নাই।

জুয়াঙ্কো যাহাকে ভালোবাসিত, আন্দ্রে তাহাকে পাইয়াছে—ইহাই আন্দ্রের পক্ষে যথেষ্ট। টিক্‌টিকিরা যে জুয়াঙ্কোর পিছুপিছু ফিরিতেছে তাহাও আন্দ্রে জানিত না।

অর্গমসুল্লা ও কোভাচুল্লা অপরাধীকে গেরেফতার করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। এবং খুব সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিতেছে। একজন গোয়েন্দা উহাদিগকে বলিয়াছিল যে, জুয়াঙ্কোকে ষাঁড়ের আড্ডায় প্রবেশ করিতে সে দেখিয়াছে। তাই, সেইদিকে উহারা চলিল।

যাইতে যাইতে আর্গমসুল্লা, তার জুড়িদারকে বলিল :—

"দেখ ভাই কোভাচুল্লো, একটু বিবেচনা করে' চোলো; তোমার বীরত্ব একটু কমিয়ে এনো, তুমি ত জানো সেই পালোয়ানটার হাত কেমন সাফাই। তুমি পুলিসের মধ্যে সব-চেয়ে একজন বড় লোক,—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশুর মত লোকে তোমার গায়ে আঁচড় কাটবে—সেটা ত ভাল হবে না। তাই একটু গা বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে ভায়া।"

কোভাচুল্লো উত্তর করিল :—

"সে বিষয়ে আমি খুবই চেষ্টা করব—তোমার বন্ধুকে তা আর বল্‌তে হবে না। নিতান্ত দরকার না হলে, আমি সাহস দেখাব না। ভদ্রতায় যতদূর হয়, প্রথমে তাই করতে হবে।"

জুয়াঙ্কো বাস্তবিকই সার্কাশ-ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল। যে সময় সে অঙ্গনটা পার হইতেছিল, সেই সময় আর্গামসুল্লা ও কোভাচুল্লো, একদল পাহারা-ওয়ালা সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোভাচুল্লো আদব কায়দা-দুরস্ত-বাক্য প্রয়োগ করিয়া, খুব ভদ্রতার সহিত জুয়াঙ্কোকে জানাইল যে, উহাকে এখন জেলখানায় যাইতে হইবে।

জুয়াঙ্কো অবজ্ঞা সহকারে কাঁধ ঝাঁকাইয়া চলিতে লাগিল। থামিল না।

পুলিস কর্ম্মচারীর সংকেতে, দুইজন পাহারা-ওয়ালা বৃষ-মল্লের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; কিন্তু বৃষমল্ল আস্তিনের ধূলা-কণার ন্যায় উহাদিগকে এক ঝাঁকুনিতে ঝাড়িয়া ফেলিল।

তখন সমস্ত পাহারাওয়ালার দল জুয়াঙ্কোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জুয়াঙ্কো উহাদের চারিটাকে ধরাশায়ী করিল, চারিটাকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিল। কিন্তু সংখ্যার বল বেশী হওয়ায়, জুয়াঙ্কো একা আর পারিয়া উঠিল না। জুয়াঙ্কোর মুখ লাল হইয়া উঠিল; আস্তে আস্তে কৌশল করিয়া বৃষভদের ঘরের নিকট আসিল এবং হাতের এক ঝাঁকানি দিয়া, বৃষভ-গৃহের দরজা খুলিয়া ফেলিল। এবং ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া সেইখানে রহিল।

আক্রমণকারীরা জোর করিয়া সেখান হইতে উহাকে বাহির করিবার জন্য দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল। দরজটা ভাঙ্গিয়া গেল। জুয়াঙ্কো তাড়া করায়, একটা ষাঁড় একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া, মাথা নিচু করিয়া পাহারওয়ালাদিগের নিকট ছুটিয়া আসিল।

ভীতি-বিহ্বল পাহারাওয়ালারা বেড়ার নীচে দিয়া লাফ দিয়া কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইল। উহাদের মধ্যে একজনের, শিং-এর গুতায় মোজা ছিড়িয়া গিয়াছিল। আর বেশী কিছু হয় নাই।

আর্গসুল্লা ও কোভাচুল্লা বলিল,—"নিয়ম-অনুসারে এখন দেখছি দুর্গ-অবরোধের ব্যাপার উপস্থিত।"

—আর একবার আক্রমণ করে দেখা যাক্।"

এইবার, দুইটা ষাঁড় একসঙ্গে বাহির হইয়া আক্রমণকারীদিগের অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু ভীতি-সুলভ ক্ষিপ্রতার সহিত উহারা ইতস্তত সরিয়া পড়িল। তখন হিংস্র জন্তু দুইটা আর কোন শত্রুকে সম্মুখে দেখিতে না পাইয়া, পরস্পরের উপর গুতাগুতি আরম্ভ করিল, পরস্পরকে উল্টাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খুব সাবধানে দরজার কপাটটা ধরিয়া কোভাচুল্লো জুয়াঙ্কোকে বলিল:—

"ভায়া, আরও ৫টা ষাঁড় এখনো ছেড়ে দিতে পার। তোমার যুদ্ধের সরঞ্জাম যা আছে আমরা তা জানি। তা ফুরিয়ে গেলে তোমাকে ধরা দিতেই হবে, বিনা-সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তুমি এখন আপনা হতে বের হয়ে এসে সুড়সুড় করে' আমাদের সঙ্গে জেলখানায় চল, তোমার হাতে হাতকড়িও লাগাব না, পায়ে বেড়ীও দেব না। আর তুমি আমাদের কাজে যে বাধা দিয়েছ সে কথাও কর্ত্তৃপক্ষকে জানাব না। কেননা, তা জানালে তোমার বেশী শাস্তি হবে। আমি যা বলচি,—ভাল কথা নয় কি?"

জুয়াঙ্কো এখন মুক্তির জন্য তেমন লালায়িত ছিল না—তাই উহা লইয়া আর

বেশী বিবাদ করিল না, আর্গসুল্লা ও কোভাচুল্লোর হাতে সে আত্মসমর্পণ করিল। উহারা জুয়াঙ্কোকে সসম্মানে সহরের জেলখানায় লইয়া গেল।

যখন দরজার তালার চাবি লাগাইবার কেঁচ্‌কেঁচানি শব্দ থামিয়া গেল, তখন জুয়াঙ্কো তাহার খাটিয়ায় লম্বা হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল:—যদি তাকে আমি খুন করতেম! যে দিন তার বাড়ীতে আন্দ্রেকে দেখেছিলেম সেই দিনই তাকে খুন করা উচিত ছিল। তাহলে পূরাপূরি শোধ তোলা হত; তার সামনে তার প্রেয়সীর বুকে ছোরা বসিয়ে দিলে, তার নিশ্চয়ই ভয়ানক যন্ত্রণা হত; কিন্তু সে দুর্ব্বল, রোগশয্যায় আবদ্ধ, সে কখনই আত্মরক্ষা করতে পারত না; সুতরাং তাকে আমি মারতেম না। ও-রকম অপরাধ আমি কখনো করতেম না। মিলিতোনাকে খুন করে' আমি পাহাড় পর্ব্বতে পালিয়ে যেতেম কিংবা পুলিসের পাছে আত্মসমর্পণ করে' শাস্তি বুক পেতে নিতেম। এখন, না এদিক্, না ও দিক্।

আমায় বাঁচতে হলে, তার মরা দরকার; আর, তার বাঁচতে হলে, আমার মরা দরকার। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

সে সময় আমার হাতে ছোরাটা ছিল, তার এক ঘা দিলেই সব শেষ হয়ে যেত; কিন্তু তার চোখে এমন একটা আলো জ্বলছিল, তাকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, আমার বল, ইচ্ছাশক্তি, সাহস সমস্ত যেন একেবারে লোপ পেয়ে গেল। সেই আমি—যে পূর্ব্বে সিংহের খাঁচায় সিংহের দিকে তাকিয়ে, সিংহের চোখের পাতা নামিয়ে আন্‌তো হিংস্র বুনো ষাঁড়দের কুকুরের মত মাটিতে পেড়ে ফেল্‌তো, সেই আমার কিনা এই দুর্দ্দশা!

"কিন্তু কি! আমি তার অমন সুন্দর বক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে ফেল্‌ব? আমার ছোরায় ঠাণ্ডা ইস্পাতের ফলাটা তার হৃদয়কে অনুভব করাব? আর তার সেই ধব্‌ধবে সাদা রংএর উপর দিয়ে তার সুন্দর সিন্দূরবর্ণের রক্ত গড়িয়ে পড়বে—আর আমি তা' স্বচক্ষে দেখ্‌ব? না, না, এরূপ বর্ব্বরতা আমি কখনই করব না, বরং সেই কাফ্রি যেমন তার প্রেয়সীকে বালিস্ দিয়ে চেপে মেরেছিল—আমি একটা থিয়েটারে দেখেছিলুম,—সেই রকম করাও বরং ভাল। কিন্তু সে ত আমাকে প্রতারণা করেনি, আমার কাছে মিথ্যে শপথও করেনি, সে শুধু মর্ম্মান্তিক উদাসীন ভাবে আমার সম্মুখে বসে থাকৃত—সে ত একই কথা; আমি তাকে এত বেশী ভাল বাসি যে, তার উপর আমার মৃত্যুর অধিকার আছে!"

জেলখানায় জুয়াঙ্কোর মনে এই ধরণের নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনা চলিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে আন্দ্রে বেশ একটু সুস্থ হইয়া উঠিল। সে শয্যা হইতে উঠিয়া ছিল, এবং মিলিতোনার বাহুর উপর ভর দিয়া, ঘরের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, জানালার কাছে গিয়া হাওয়া খাইত। শীঘ্রই সে এতটা বল লাভ করিল যে নীচে নামিয়া আসিতে পারিল; এবং আসন্ন বিবাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য, রাস্তা দিয়া চলিয়া নিজ গৃহে উপনীত হইল।

এদিকে Sir Edwardsএর বিবাহ বিঘো-

ষিত হইল। Sir Edwards ফেলিসিয়ানার পাণিপ্রার্থী হইয়া দস্তুরমত ডন জেরোনিমোর অনুমতি চাহিয়াছিলেন—ডন্ জেরোনিমোও আগ্রহের সহিত উহার অনুমোদন করেন। Sir Edwards দান-সামগ্রীর সংগ্রহে এখন ব্যাপৃত। তিনি লণ্ডন হইতে সুরুচি-সঙ্গত সুশোভন বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা আনাইলেন—লাহোরে তাঁহার শালের দুটো কারখানা ছিল; সেখান হইতেও খাঁটি কাশ্মীরী শাল আনাইলেন। ফেলিসিয়ানার অন্তরাত্মা এক্ষণে অসীম আনন্দ-সাগরে সাঁতার দিতে লাগিল।

এদিকে মিলিতোনাও যার পর নাই সুখী হইলেও, তাহার একটু আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তাহার মনে হইল, সে যে শ্রেণীর লোক, সম্ভ্রান্ত-বংশীয় আন্দ্রেকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে শোভা পায় না। সে তাহার যোগ্য নহে। কিন্তু সে যাহাই মনে করুক, আসলে, বোর্ডিংস্কুলের কোন শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়িয়া ঈশ্বরের সৃষ্টি এই, নারী-রত্নটির সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই; শিক্ষা সহজ-সংস্কারের স্থান অধিকার করে নাই। মিলিতোনার হৃদয়ে অকৃত্রিম সুন্দরের ভাব, মঙ্গলের ভাব, কলা-সৌন্দর্য্যের বোধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বোধ, কবিত্ব-বোধ, পুরামাত্রায় ছিল; কিন্তু উহা ভাবমাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল। তার সুন্দর হস্ত পিয়ানোর হস্তিদন্ত-পর্দ্দায় কখনও আঘাত করে নাই। বিশুদ্ধ মধুর-কণ্ঠে গান গাহিতে পারিলেও সে কখনো সঙ্গীতের স্বরলিপি পাঠ করিতে পারিত না তাহার সাহিত্যিক জ্ঞানের সীমা কতকগুলা গল্প-উপন্যাসেই বদ্ধ ছিল। লিখিতে সেযে বানান ভুল করিত না, সে শুধু স্পেণীয় ভাষার সরল বানান-পদ্ধতির কৃপায়। সে মনে মনে ভাবিল:—

আমার ইচ্ছা নয়,—আন্দ্রে আমার জন্য লজ্জা পায়। আমি লেখা-পড়া শিখ্‌ব, বই পড়্‌ব; আমি আপনাকে তাঁর যোগ্য করে তুল্‌ব। আমার যে একটু রূপ আছে তা আমার বিশ্বাস হয়; আন্দ্রের চোখের দৃষ্টিতেই আমি তা বুঝ্‌তে পারি। আর কাপড়-চোপড়ের কথা যদি বল;—আমার কাপড়-চোপড় অনেক আছে,—আর সেই কাপড়-চোপড় আমি বড় ঘরের মেয়েদের মত পর্‌তে জানি। গুটিপোকার যতদিন না পাখা বেরোয়, গুটিপোকা যতদিন না প্রজাপতি হয়ে ওঠে, ততদিন আমরা কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে বাস করব। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে! আকাশটা এখন বেশ নীল, তাই আমার ভয় হচ্ছে; আর, জুয়াঙ্কো,—তার হ'ল কি? সে আবার কোনো পাগ্‌লামির কাজ করবে না ত?"

মিলিতোনার এই কথাটা অজ্ঞাতসারে মুখদিয়া বাহির হইয়াছিল। আলদনজা-মাসী হহা শুনিতে পাইয়া উত্তর করিল:—

"তার কোন ভয় নেই। জুয়াঙ্কো এখন জেল-খানায়। আন্দ্রেকে হত্যা করেছে বলে তার নামে নালিশ রুজু হয়েছে। জুয়াঙ্কো যে রকম গোঁয়ার বলে প্রসিদ্ধ, মোকদ্দমাটা তার বিরুদ্ধে যেতেও পারে।"

—"আহা এখন জুয়াঙ্কোর জন্যে আমার দুঃখ হয়। আন্দ্রে যদি আমায় ভাল না বাস্‌ত, তাহলে আমার খুবই কষ্ট হত!"

জুয়াঙ্কোর মোকদ্দমার অবস্থাটা এক

খারাপ দিকেই গেছে। সেদিনকার নৈশ যুদ্ধটা আদালতে, ওঁৎ-পাতিয়া খুন করা অথবা নরহত্যার চেষ্টা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। লোকটা যে মরে নাই,—তার কারণ জুয়াঙ্কোর হত্যা করিবার যে ইচ্ছা ছিল না, তাহা নহে। এইরূপ ভাবে বিচার করায়, ব্যাপারটা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে, আন্দ্রে আদালতে এই ব্যাপারে যেরূপ কৈফিয়ৎ দিল তাহাতে গুপ্ত হত্যার স্থলে, শেষে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বলিয়াই সাব্যস্ত হইল। তা ছাড়া আঘাতটা গুরুতর হয় নাই, আন্দ্রে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে; আর এই বিবাদে, গোড়ায় আন্দ্রেরই দোষ ছিল; আন্দ্রের সৌভাগ্য যে ইহার পরিণামটা একটু আঁচড়ের উপর দিয়াই গিয়াছে। আর বেশী দূর গোড়ায় নাই। গুপ্তহত্যার অভিযোগে, হত্যাকারী যাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত, সেই ব্যক্তি যদি সুস্থ-সবল থাকে এবং সে নিজে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়া দুইকথা বলে, তাহা হইলে সেই মোকদ্দমা কখনো বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। সুতরাং জুয়াঙ্কো কিয়ৎকাল পরেই খালাস পাইল। তবে জুয়াঙ্কোর এই দুঃখ, যে তার পরম শত্রু যাহার নিকট হইতে সে কোন উপকার পাইতে ইচ্ছা করে না, তাহারই কথায় কিনা সে মুক্তি লাভ করিল!

জেলখানা হইতে বাহির হইয়া, মুখ অন্ধকার করিয়া সে এই কথা বলিল:—

"এখন আমি এই উপকারে আবার আবদ্ধ হয়ে পড়লেম; এ কি দুর্দৈব! আমি এখন যদি তার কোন অনিষ্ট করি তাহলে আমার মত নরাধম কাপুরুষ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। এর চেয়ে যদি আমার নির্ব্বাসন দণ্ড হ'ত তাহলে আমি খুসী হতেম। তাহলে ১০ বৎসর পরে আবার ফিরে এসে আমি তার উপর শোধ তুল্‌তে পারতেম।"

আজ হইতে জুয়াঙ্কো অন্তর্হিত হইল। কেহ কেহ বলিল, একটী কালো ঘোড়ায় চড়িয়া, আন্দোলুসির দিকে যাইতে তাহাকে দেখিয়াছে। ফলকথা, তাহাকে আর মাদ্রিদে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

মিলিতোনা আরামে নিশ্বাস ফেলিল। কেননা সে বিলক্ষণ জানিত, জুয়াঙ্কো এখানে থাকিলে অনিষ্টের আশঙ্কা কিছুতেই দূর হইবেনা।

দুই বিবাহের অনুষ্ঠান একই সময়ে এবং একই গির্জায় সম্পন্ন হইল। মিলিতোনা ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহার বিবাহের পরিচ্ছদ সে আপন হাতেই তৈয়ারী করিবে।

তাহার হাতে অতি সুন্দর পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইল। দেখিলে মনে হয় যেন "লিলি"ফুলের পত্রে গঠিত।

ফেলিসিয়ানার খুব জম্‌কালো সাজ-সজ্জা; তাহা তৈয়ারি করিতে বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে।

গির্জা হইতে বাহির হইয়া, ফেলিসিয়ানা সম্বন্ধে সবাই বলিতে লাগিল:—"কি সুন্দর পরিচ্ছদ!"; এবং মিলিতোনা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, 'আহা কি সুন্দর মুখখানি!'

১১

একটা প্রাচীন মঠের নিকট একটা ছোট পাহাড়ের ঢালু-অংশের উপর একটা সাদা ধব্‌ধবে বাড়ী। চারি ধারে সবুজ গাছপালা। সবুজের মধ্য হইতে এই বাড়ীটা একটা বৃহৎ রৌপ্যখণ্ডের মত দীপ্তি পাইতেছে। উদ্যান-

প্রাচীরের মাথার উপর দিয়া দ্রাক্ষালতা ও অন্যান্য লতা উদ্দামভাবে উঠিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়া রাস্তায় কিয়দংশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ফটকের গরাদের ভিতর দিয়া, একপ্রকার চক্-মিলানো স্তম্ভ-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহা নানা বর্ণের প্রস্তরে বিভূষিত; এবং তাহার পর, ভিতরকার একটা অঙ্গন; উহা স্পষ্টই মূর-জাতীয় বাস্তুশিল্পের নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

গোটা-পাথরের ছিপ্‌ছিপে সাদা মার্ব্বেল-স্তম্ভ। থামের মাথ্‌লাগুলায় ফুলকাটা আরবী অক্ষর খোদিত,—এখানো উহার সোনার গিল্টি কোথাও কোথাও ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। এই সকল স্তম্ভ-সংযুক্ত খিলান, ঢাকা-বারাণ্ডার আকারে অঙ্গনকে বেষ্টন করিয়া আছে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটা চৌবাচ্চা; চৌবাচ্চার ধারে ধারে ফুলগাছের টব; একটা ফোয়ারার সূক্ষ্ম জল ধারা টবের চিক্‌চিকে গাছগুলার উপর মুক্তা ছড়াইতেছে, এবং যূঁথী ও গোলাপের কানে-কানে অস্ফুট মধুরস্বরে যেন প্রেমের গুপ্তকথা কহিতেছে। অঙ্গন-কুট্টিমের উপর একটা জাজিম বিছানো রহিয়াছে, ইহাই যেন বাহিরের বৈঠকখানা। এইখানে একটি স্বচ্ছ ছায়া ও সুরম্য শৈত্য বিরাজ করিতেছে। দেয়ালের গায়ে একটা গিতার-যন্ত্র আট্‌কানো রহিয়াছে এবং একটা পালঙ্কের উপর সবুজ-ফিতায় ভূষিত একটা বড় "ষ্ট্র-হ্যাট্" রহিয়াছে। যতই স্থূলদর্শী হউকনা এই রাস্তা দিয়া চালবার সময় সকলেই এই স্থানটি দেখিয়া এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না—"এইখানে কতক-গুলি সুখী লোক বাস্ করে"। সুখসৌভাগ্যই গৃহগুলিকে আলোকিত করে এবং এমন একটা শ্রী ফুটাইয়া তোলে যাহা অন্য গৃহে অতীব বিরল। গৃহবাসী মানব-আত্মার প্রকৃতি অনুসারে, গৃহের দেয়ালগুলা হাসিতেও পারে, কাঁদিতেও পারে, আমোদ দিতেও পারে, বিরক্তি উৎপাদন করিতেও পারে। এই গৃহখানি নিশ্চয়ই তরুণ প্রেমিক-যুগল কিংবা নব-দম্পতীর দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ফাটক বদ্ধ নহে; এস-না, ফাটকের দরজা ঠেলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। অঙ্গনের শেষ-প্রান্তে আর একটা দরজা, এ দরজাটাও খোলা; এই দ্বার দিয়া একটা উদ্যানে উপনীত হওয়া যায়। এই উদ্যান না ফরাসী, না ইংরাজী ধরণের, এ ধরণের উদ্যান কেবল গ্রেনাডা-অঞ্চলেই দেখা যায়;—মেদী, কমলালেবু, ডালিম, লতা-গোলাপ, চামেলী, বাদাম প্রভৃতি গাছের যেন অর বিশেষ; মাঝে মাঝে ঝাউগাছ নীল আকাশে নীরবে মাথা তুলিয়াছে; ঠিক্ যেন আনন্দের মধ্যে কতকগুলা বিষাদের চিন্তা।

এখানে আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই—দারুচিনী গাছের একটা বীথিকা প্রসারিত, উহার ধারে দুইটি পৃষ্ঠসমন্বিত মার্ব্বেলের বেঞ্চি এবং ধবল-প্রস্তর নির্ম্মিত লহরের মধ্য দিয়া দুইটি জল-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই বীথি-পথের শেষ প্রান্তে অসূর্য্যম্পশ্য নিবিড় নিকুঞ্জ; তাহার মধ্য হইতে একটা অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-ভূষিত তাম্র-আকারের একটি মুক্ত-দ্বার মণ্ডপ-গৃহ সমুত্থিত; সেখান হইতে সুদূর-প্রসারিত প্রান্তর, বনভূমি, গিরি-নদী রমণীয় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

এই সময় সূর্য্য অস্তগত হইল এবং নীহার মণ্ডিত গিরি-চূড়াগুলিকে এক অপূর্ব্ব গোলাপী

রঙে রঞ্জিত করিল। সেরূপ গোলাপী রঙের আভা আর কোথাও দেখা যায় না—বুঝি-বা স্বর্গে অথবা একমাত্র গ্রেনাডাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঠিক্ এই সময় একটি যুবক ও একটি তরুণী বাতায়ন-বারাণ্ডায় পাশাপাশি বসিয়া এই গম্ভীর মহান্ দৃশ্যের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, তরুণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন যে সুন্দর মুখখানি দৃষ্টিগোচর হইল, পাঠকগণ বোধ হয় অনুমান করিতে পারিতেছেন, সে কাহার মুখ। ইনিই এক্ষণে শ্রীযুক্ত আন্দ্রের গৃহিণী, ভূতপূর্ব্ব মিলিতোনা। আর এই যুবকটি যে আন্দ্রে তাহাও বোধ করি আর পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না।

বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হইবামাত্র, আন্দ্রে পত্নীকে লইয়া গ্রেনাডায় আসিয়াছে। সে তাহার এক খুড়ার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে এই বাড়ীটি পাইয়াছিল। ফেলিসিয়ানা Edwards-এর সহিত লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছে। উভয় দম্পতী আপন আপন সহজ রুচির অনুসরণ করিয়াছে। প্রথমটি মুক্ত আলোক ও কবিতার প্রয়াসী; দ্বিতীয়টি সভ্যতা ও কুয়াসার ভক্ত।

মিলিতোনা পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, আন্দ্রের সহিত বিবাহে তাহার সামাজিক মর্য্যাদার বৃদ্ধি হইলেও বিবাহের পরেই সে লোক-সমাজে বাহির হইবে না—এই জন্য যে, পাছে তাহার অজ্ঞতায় আন্দ্রে লজ্জা পায়। তাই, তাহার অবস্থা-উপযোগী যোগ্যতা, অর্জ্জন করিবার জন্য সে এক্ষণে এই বিজন নিবাসের আশ্রয় লইয়াছে।

এইখানে আসিয়া মিলিতোনার শরীর ও মন দুই-ই বেশ একটু উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহার রূপ-লাবণ্য এমনিই ত অসাধারণ ছিল—এখন আবার আদর-যত্নে উহার লালিত্য ও মাধুর্য্য যেন আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার সুখী অন্তঃকরণ বিকশিত হইয়া মুক্ত-ভাবে চারিদিকে সৌরভ ছড়াইতেছে। যে রমণীকে আন্দ্রে ভাল বাসিত সেই রমণীর অভ্যন্তরে যেন আর এক উন্নততর রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া আন্দ্রে অত্যন্ত সুখী হইল।

বাঞ্ছিত বস্তু হস্তগত হইলে অনেক সময় পূর্ব্বের মোহ ছুটিয়া যায়; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। প্রতিদিন মিলিতোনার নব নব গুণ, নব নব সৌন্দর্য্য আন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। আন্দ্রে মনেমনে নিজ সাহসের তারিফ্ করিল; লোক-নিন্দা গ্রাহ্য না করিয়া সে যে এমন নারীরত্ন লাভ করিতে পারিয়াছে, ইহা সে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিল।

আন্দ্রে ও মিলিতোনার সুখের মাত্রা পূর্ণ হইল। কেবল মিলিতোনা কখন কখন বেচারা জুয়াঙ্কোর কথা ভাবিত; জুয়াঙ্কোর ত আর কোন খবর পাওয়া যায় না। মিলিতোনা চাহিত না যে তাহার সুখে আর কাহারও নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। এবং হতভাগ্য জুয়াঙ্কো কি দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহা মনে করিয়া, আনন্দের মধ্যেও মিলিতোনার চিত্তে একটু বিষাদের ছায়া পড়িত। মিলিতোনা এই চিন্তা-প্রবাহ রুদ্ধ করিবার জন্য মনে মনে এই কথা বলিত, "জুয়াঙ্কো নিশ্চয় আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে;

কোন এক অজ্ঞাত দূর—দূর দেশে চলিয়া গিয়া থাকিবে।"

বাস্তবিকই কি জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে ভুলিয়া গিয়াছিল? ইহা সন্দেহস্থল। জুয়াঙ্কো যতটা দূরে গিয়াছে বলিয়া তরুণী মনে করিয়াছিল, আসলে জুয়াঙ্কো ততদূরে যায় নাই। কেননা, যে মুহূর্ত্তে মিলিতোনা এইরূপ ভাবিতেছিল, সেই সময় মিলিতোনা, উচ্চ পাহাড়ের পার্শ্বস্থ প্রাচীরের চূড়ার দিকে যদি তাকাইয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত তরুপল্লবের মধ্য দিয়া বাঘের মত দুইটা জ্বলন্ত চোখ একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

আন্দ্রে মিলিতোনাকে বলিল,—"জেরা-লিফের" দিকে তুমি কি বেড়াতে যাবে? সেখানে গোলাপের গন্ধে চারিদিক আমেদিত। আর সেখানে ঝাউ গাছের উপর, ওক্-গাছের উপর ময়ূরদের মৃদু মৃদু কেকারব শোনা যায়।" মিলিতোনা উত্তর করিল—

"এখনও খুব গরম। তাছাড়া এখনো আমি বেড়াবার কাপড়-চোপড় পরি নি—"

"সেকি! তোমার এই সাদা পরিচ্ছদে, তোমার এই পলার ব্রেস্‌লেটে, তোমার এই কানের ফুলে তোমাকে বেশ দেখাচ্চে। কেবল, এই পরিচ্ছদের উপর একটা ম্যান্‌টিলা-ওড়না ফেলে দেও, তাহলেই হবে। প্রিয়ে, তুমি যখন এই বেশে "অ্যাল্‌হাম্ব্রা" প্রাসাদের ভিতর দিয়ে যাবে, তখন মূর-রাজারা তোমাকে দেখ্‌বার জন্য কবর থেকে উঠে পড়বে।"

মিলিতোনা মৃদু হাসিয়া, তার ওড়নার ভাঁজগুলা গুছাইয়া লইল, স্পেনীয় মহিলাদের যাহা নিত্য সঙ্গী সেই হাত-পাখাটি লইল, এবং তাহার পর এই দম্পতী 'জেরালিফের' অভিমুখে চলিতে লাগিল। ইহা একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত,—এই পাহাড়টি আবার আর একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের সহিত গিরিসঙ্কটের দ্বারা সংযুক্ত—যাহার মাথায় অ্যালহাম্ব্রার লাল মিনার-স্তম্ভ সমূহ মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। দৃশ্যটি ছবির মত অতি সুন্দর। এইখানে একটি পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে; তাহার ধারে ধারে উদ্দাম উদ্ভিজ্জ পথটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই পথে শাখা পল্লবের নীচে দিয়া নব দম্পতী শিশুর মত আনন্দে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। একস্থানে একটা বটগাছের নিবিড় শাখাপল্লবে পথটি রাত্রির ন্যায় অন্ধকার—এই বটগাছের গুঁড়ির পিছনে ও কী দেখা যায়? ওটা কি চোখের ভুল? মনে হয় যেন একটা বন্দুকের কুঁদো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আর বন্দুকটা যেন নীচের দিকে বাগানো রহিয়াছে!

একটা লোক ঝোপঝাপের মধ্যে মধ্যে বাঘের মত মাটির দিকে মুখ করিয়া গুঁড়ি মারিয়া শুইয়া আছে;—যেন এক লম্ফে কোন শিকারের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িবে বলিয়া তাগ্‌বাগ্ করিতেছে। এ লোক আর কেহ নহে—এ হচ্চে জুয়াঙ্কো। জুয়াঙ্কো দুই মাস হইতে গ্রেনাডার গুহা-গহ্বরে লুকাইয়া বাস করিতেছে। এই দুই মাসে সে দশ বৎসরের মত বুড়াইয়া গিয়াছে। এখন মুখের রং কালো, গালে গর্ত্ত পড়িয়াছে, চোখদুটা আগুনের মত জ্বলিতেছে।

যে ব্যক্তি দিবা-রাত একই চিন্তায়—সর্ব্বগ্রাসী একমাত্র চিন্তায় নিমগ্ন, তাহারই অনুরূপ এই সকল লক্ষণ, দেখা যাইতেছে।

সেই চিন্তাটি কি?—না, মিলিতোনাকে খুন করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে বিশবার সে তাহার মৎলব হাসিল করিতে পারিত;—কেননা, সে অদৃশ্য ও অপরিজ্ঞেয় ভাবে, গোপনে মিলিতোনার চারিদিকে শিকারীর মত ঘুরিয়া বেড়াইত—কিন্তু কার্য্যকালে শেষ-মুহূর্ত্তে তাহার সাহসে কুলাইত না; হাত যেন অসাড় হইয়া পড়িত।

এইবার সে এইখানকার ঝোঁপঝাপের ভিতর গুঁৎ পাতিয়া লুকাইয়াছিল; কেননা সে লক্ষ্য করিয়াছিল, আন্দ্রে ও মিলিতোনা প্রতিদিনই একই সময়ে এই রাস্তা দিয়া যাতায়াত করে। জুয়াঙ্কো এইবার শপথ করিল, তাহার ভীষণ সংকল্প সিদ্ধ করিয়া চিরকালের মত সব শেষ করিয়া দিবে।

তাই সে বন্দুকে গুলি ভরিয়া, বন্দুকটা তাহার পাশে রাখিয়া দিয়াছিল; দূরে পদশব্দ শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া মনে করিল, এইবার বুঝি চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে।

"সে আমার আত্মাকে হত্যা করেছে, আমি তার শরীরকে হত্যা করব!"

বনপথের শেষপ্রান্তে একটা সুস্পষ্ট হাসির আওয়াজ শুনা গেল!

জুয়াঙ্কো শিহরিয়া উঠিল, জুয়াঙ্কোর মুখ নীল হইয়া গেল। তাহার পর সে বন্দুকের ঘোড়া উঠাইল।

মিলিতোনা তাহার স্বামীকে বলিল,—"আমার মনে হয়, আমরা এই পথ ধরে একটা ভূ-স্বর্গে এসে পড়েছি—কী ফুলের বাহার, কী সুগন্ধ, পাখীর কী মধুর গান, কী কিরণচ্ছটা!"

এইকথা বলিতে বলিতে মিলিতোনা সেই কালস্বরূপ বটবৃক্ষের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

"এস্থানটি কী সুন্দর, কেমন বেশ ঠাণ্ডা। আমার শরীর হাল্কা মনে হচ্চে—আমি এখন বড়ই সুখী"—এই সময়ে সেই অদৃশ্য বন্দুকের মুখটা ঠিক্ মিলিতোনার মাথার দিকে ফেরানো ছিল।

বন্দুকের টিপ্-কলের উপর আঙ্গুল রাখিয়া জুয়াঙ্কো গুণ গুণ স্বরে বলিল:—

"এইবার—আর দুর্ব্বলতা নয়। এইমাত্র শুনিলাম, সে বলিল:—"আমি এখন খুব সুখী—এমন সুযোগ আর পাব না। মরুক এইবার তবে—"

মিলিতোনার এইবার বুঝি সব শেষ হইল;—পত্রপল্লবে প্রচ্ছন্ন বন্দুকের মুখটা প্রায় মিলিতোনার কর্ণস্পর্শ করিল। আর এক মুহূর্ত্ত—তাহার পরেই মিলিতোনার মস্তক উড়িয়া যাইবে এমন যে সৌন্দর্য্যরাশি তাহা, কেবল কতকটা রক্ত-মাংস-অস্থিতে পর্য্যবসিত হইবে।

কিন্তু পুতুলটি ভাঙ্গিবার সময়, জুয়াঙ্কোর হৃদয় আর্দ্র হইল; তাহার চোখের উপর দিয়া যেন একখণ্ড মেঘ চলিয়া গেল। তাহার ইতস্তত ভাবটা ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইল। আন্দ্রে-পত্নী জানিত না, তাহার কী বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল; তাই সে সম্পূর্ণ প্রশান্তচিত্তে "জেনেরালিফের ভ্রমণ শেষ করিল।

ঝোঁপঝাপের মধ্য দিয়া পলায়ন করিতে করিতে জুয়াঙ্কো বলিল,—"আমি নিশ্চয়ই একজন কাপুরুষ। আমার যত সাহস শুধু

ষাঁড়দের সহিত যুদ্ধে, শুধু পুরুষের সহিত যুদ্ধে"।

কিয়ৎকাল পরে, একটা খুব গুজব রটিল যে, আমেরিকা হইতে একজন বৃষভ-মল্ল আসিয়াছে—তার দক্ষতা ও সাহস নাকি অসাধারণ, তার মত 'গোঁয়ার্ত্তুমি' কাজ কেহ কখনো দেখে নাই। সান্তা মারিয়ার বন্দর-নগরে এক্ষণে তাহার যুদ্ধক্রীড়া দেখানো হইতেছে।

আন্দ্রে সেই সময় তাহার পত্নীর সহিত, একজন বন্ধুকে বিদায় দিতে 'ক্যাডিক্‌সে' গিয়াছিল। সেইখানে উক্ত নবাগত মল্লবীরের খ্যাতি শুনিয়া তাহার মল্লক্রীড়া দেখিবার জন্য স্বভাবতই তাহার ঔৎসুক্য হইল।

'ক্যাডিক্‌স' হইতে 'পুয়ের্ত্তো'য় যাইবার এক বাষ্পীয় জাহাজ ধরিয়া উহারা দু'জনে 'পুয়ের্ত্তো' নগরে আসিয়া উপনীত হইল। মিলিতোনার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইলেও, মিলিতোনা ফরাসী কিংবা ইংরাজি ধরণের পরিচ্ছদ পরিত না—তখনও তাহার স্পেনীয় পোষাক ও স্পেনীয় রীতি নীতির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

'পুয়ের্ত্তোর' অধিবাসীরা উজ্জ্বল বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া নগর অঙ্গনে, পান্থ-শালায় মল্লক্রীড়া দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রমণীরা ওড়নার উপরেও একটা লাল শাল পরিয়াছে, তাহার ঘেরের মধ্য দিয়া উহাদের পাণ্ডুবর্ণ মুখগুলি সুন্দর দেখাইতেছে।

সহরের প্রধান ব্যক্তিরা একপ্রকার দো-ফেঁকড়া ছড়ির উপর ভর দিয়া কেহ বা গদাই-নস্করি চালে চলিয়াছে, কেহ বা উহাদের প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্বরবর্ণে গঠিত অস্থিহীন প্রাদেশিক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে। মল্লক্রীড়ার সময় নিকটবর্ত্তী হইল; লোকেরা তাড়াতাড়ি গিয়া ব্যগ্রভাবে রঙ্গালয়ের স্থান অধিকার করিল।

রঙ্গশালায় প্রবেশ করিয়া আন্দ্রে ও মিলিতোনা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট 'বক্‌স'-আসনে গিয়া বসিল। মল্লক্রীড়া সুরু হইল।

বিখ্যাত বৃষ-মল্ল কালো রঙের পোষাক পরিয়াছে। তাহার জামা কালো-জেট্ পাথর ও রেশমী অলঙ্কারে বিভূষিত; তাহার ভীষণ কঠোর চেহারার সহিত এই পোষাক বেশ খাপ খাইয়াছে। একটা হল্‌দে কোমর-বন্ধ তাহার শীর্ণ পঞ্জরকে ঘিরিয়া আছে; তাহার এই দেহ-কাঠামে পেশী ও অস্থি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

তাহার শ্যামল মুখের দুই তিন জায়গায় নখের আঁচড়ের মত বলি-রেখা পড়িয়াছে; মনে হয় বয়সের দরুণ নহে; পরন্তু মনের কষ্টে। যদিও মুখে যৌবনের লক্ষণ দেখা যায় না, তথাপি উহার উপর পরিপক্ক-বয়সের ছাপ পড়িয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।

এই মুখ, এই দেহ-গঠন আন্দ্রের নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু ঠিক্ স্মরণ করিতে পারিল না।

মিলিতোনা এক মুহূর্ত্তও ইতস্তত করে নাই। পূর্ব্বের সহিত সাদৃশ্য খুব কম হইলেও মিলিতোনা জুয়াঙ্কোকে তখনই চিনিয়া ফেলিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখিয়া মিলিতোনা ভীত হইল। মিলিতোনা বুঝিল মনের কতটা আবেগ, জুয়াঙ্কোর মত লোহার দেহকে চূর্ণ করিতে পারে।

মিলিতোনা তাড়াতাড়ি হাত-পাখাটা খুলিয়া আপনার মুখ ঢাকিল এবং পিছনে গিয়া আন্দ্রেকে বলিল:—"ও জুয়াঙ্কো।"

কিন্তু পিছনে যাইবার পূর্ব্বেই, জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং হস্তের ইঙ্গিতে এক প্রকার অভিবাদন করিয়াছিল। আন্দ্রে বলিল:—

"এ জুয়াঙ্কোই বটে! বেচারা ভয়ানক বদ্‌লে গেছে; দশ বছরের মত বুড়িয়ে গেছে। একজন নূতন মল্ল এসেছে বলে' যার কথা লোকে এত বলাবলি করছিল, এখন সে হয়ে দাঁড়াল কিনা জুয়াঙ্কো! আবার দেখ্‌ছি জুয়াঙ্কো তার পুরাণো ব্যবসা ধরেছে।"

মিলিতোনা তার স্বামীকে বলিল:—

—"এসো ভাই আমরা এখানে থেকে চলে যাই। জানি না কেন—আমার মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে; আমার মনে হচ্চে, কি যেন একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটবে।"

আন্দ্রে উত্তর করিল:—

—আর কী ঘটতে পারে;—ঘোড়সওয়ার রক্ষীরা ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে পারে, ষাঁড় গুঁতিয়ে ঘোড়ার পেট চিরে দিতে পারে। এর বেশী আর কি হবে?

—আমার ভয় হচ্চে পাছে জুয়াঙ্কো একটা কিছু বড়াবাড়ি করে—ক্রোধান্ধ হয়ে একটা ভীষণ কাণ্ড করে।

—তার সেই ছোরার আঘাতের কথাই দেখছি তোমার সর্ব্বদাই মনে হয়—তার ভয় নেই। তা কখনই হবে না। এতদিনে সে নিশ্চয়ই তার মনকে শান্ত করতে পেরেছে।

জুয়াঙ্কো রঙ্গাঙ্গনে অদ্ভুত কাণ্ড করিতে লাগিল। ষাঁড়ের লেজ ধরিয়া ষাঁড়কে ঘুরপাক খাওয়াইতে লাগিল। দুই সিং-এর মাঝে পা রাখিয়া, তারপর একলাফে নীচে নামিয়া পড়িল। ষাঁড়ের গা হইতে সাজসজ্জা ছিনাইয়া লইতে লাগিল, ষাঁড়ের ঠিক্ সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল; এরূপ দুঃসাহসিকতার কাজ করিতে লাগিল যাহা এ পর্য্যন্ত কোন মল্লকে কেহ কখন করিতে দেখে নাই।

লোকেরা উন্মত্তভাবে বাহবা দিতে লাগিল—বলিল, এরূপ অদ্ভুতকাণ্ড এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই।

বৃষ-মল্লদের অশ্ববৃন্দ, দৃষ্টান্তে সহসা উত্তেজিত হওয়ায়, মনে হইল যেন তাহারা আর বিপদের আশঙ্কা করিতেছে না। বল্লমধারী রক্ষীগণ অঙ্গনের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত নির্ভয়ে অগ্রসর হইতেছে। জুয়াঙ্কো সমস্তক্ষণ সকলকেই সাহায্য করিতেছে; হিংস্র পশুটার মনোযোগ অন্যদিক হইতে ফিরাইয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। জুয়াঙ্কোর একবার পা পিছলাইয়া যাওয়ার পর ষাঁড়টা তাড়া করিয়া আসিল; জুয়াঙ্কো যদি একটু পিছু হাঁটিয়া না যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিং দিয়া গুঁতাইয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিত।

জুয়াঙ্কো ষাঁড়দিগকে যে সব ছোরার আঘাত করিতেছিল, তাহা উচ্চ হইতে নীচে ও ষাঁড়ের কাঁধের মাঝখানে; আঘাতের ঘায়ে ষাঁড়গুলা বজ্রাহত হইয়া বসিয়া পড়িতেছে।

আন্দ্রে বলিল:—

"জুয়াঙ্কো দেখছি 'মন্তে', 'অর্চ্চনা' 'লাঠি' প্রভৃতি বিখ্যাত বৃষমল্লদেরও হারিয়েছে।

মিলিতোনাও "বাহবা না দিয়া থাকিতে পারিলনা। আন্দ্রে ভূতলে পায়ের আঘাত করিতে লাগিল। আনন্দ-উচ্ছ্বাস চূড়ান্ত-সীমায়

উঠিল ; জুয়াঙ্কোর প্রত্যেক চলা-ফেরায় উন্মত্ত প্রশংসাধ্বনি চারিদিক হইতে উত্থিত হইল।

এইবার আর একটা ষাঁড়কে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—এটা সংখ্যায় ষষ্ঠ।

এই সময় একটা অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। জুয়াঙ্কো ষাঁড়টাকে বেশ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া, কয়েকবার সুদক্ষভাবে ছোরা চালাইয়া, শেষে অসি গ্রহণ করিল ; লোকে মনে করিল, এইবার জুয়াঙ্কো ষাঁড়ের গলায় অসি বিদ্ধ করিবে ; কিন্তু জুয়াঙ্কো তাহা না করিয়া অসিটা এত জোরে উপর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিল যে উহা ঘুরিতে ঘুরিতে জুয়াঙ্কোর বিশ কদম দূরে পড়িয়া মাটিতে গাড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দিক হইতে সবাই বলিয়া উঠিল :—"জুয়াঙ্কো করবে কি ? এ তো সাহস নয়, ডাহা পাগ্‌লামি! এই নূতন কৌশলটা না জানি কি ? শেষে নাকের উপর একটা টোকা মেরে ষাঁড়টাকে মারবে নাকি, ?…"

যেখানে মিলিতোনা বসিয়াছিল, জুয়াঙ্কো সেই দিক্‌পানে একটা করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; সেই দৃষ্টিতে তাহার সমস্ত প্রেম ও হৃদয়ের সমস্ত যাতনা কেন্দ্রীভূত ছিল ; তাহার পর সে ষাঁড়ের সম্মুখে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পশুটা মাথা নোয়াইল। তাহার সমগ্র শিং জুয়াঙ্কোর বক্ষদেশে প্রবেশ করিল, এবং আমূল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া শিং-দুইটা বাহির হইয়া আসিল।

দশ সহস্র কণ্ঠ হইতে আতঙ্কের চীৎকার ঊর্দ্ধদিকে সমুত্থিত হইল।

মিলিতোনা, মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া, চৌকীর উপর উল্টাইয়া পড়িল। এই চরম মুহূর্ত্তে মিলিতোনা জুয়াঙ্কোকে ভাল বাসিয়াছিল।

সমাপ্ত

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধ্রুব সত্য

দিল্-ভাঙ্গান নীল শাড়ী যার
পাগল-করা ডাগর আঁখি
মোটেই আমার নয় সে প্রিয়
আছে তা' কার জান্‌তে বাকী!
কোঁকড়া কালো চুল্ বুনে যে
বেণীর ছলে দোলায় ফাঁসি
তার সনে মোর একটি দিনো
হয় না ভাল'বাসাবাসি।
ফুলধনুর গুণ দিয়ে সে
গড়্‌বে রুলি—পরবে হাতে,
হতেই কভু পারেনাক'
প্রণয় আমার তাহার সাথে!

অচিন্ প্রাণের সব-নেওয়া পায়
পদ্মরাগের আল্‌পনাকে
বলে যেজন আল্‌তা-রেখা
চাইনা আমি—চাইনা তাকে।
করেছিত' গদ্যে-পদ্যে
অনেক মিথ্যে বিশ্বে প্রচার,
সরল ভাষায় সহজ সত্য
কর্ব্বোনা ভয় কইতে এবার—
তা' ব'লে যে এমন্‌টি ঠিক্
কেউ না যেন তাহার কাণে
ঘুণাক্ষরে এ সব তুলে
সর্ব্বনাশটি ডেকে আনে!

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ব্রিটিশ-শাসনের একযুগ

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

এখন দেখা যাক্, রাজার বিরুদ্ধে ইংরাজ-কোম্পানীর সত্য কি অভিযোগ ছিল ? হেষ্টিংস যখন বারাণসী যাইবেন স্থির করিলেন, তখন কৌন্সিলের একটী সভা ডাকিলেন। সভাটী বড় সুন্দর! আর তাঁহারা ব্যবস্থাও করিলেন ততোধিক সুন্দর। কৌন্সিলের সভ্য তখন মোটে দুইজন—হেষ্টিংস স্বয়ং এবং হুইলার সাহেব। আবার যদি দুইজনে কখনও মতভেদ হয়, তাহা হইলে সভাপতির একটী অতিরিক্ত ভোট ছিল। অতএব ইহা কেবল নামমাত্র লোক-দেখানো কৌন্সিলের সভা ছিল। সেই হেষ্টিংস-হুইলার সভা গভীর গবেষণা করিয়া ১৭৮১ সালের ২১ শে মে স্থির করিলেন যে, হেষ্টিংস বারাণসী গিয়া চৈৎসিংহ-সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা স্থির করিবেন এবং ভবিষ্যতে কোন গোলযোগের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য হেষ্টিংসের ক্ষমতাও নির্দ্ধারিত করা হইল। ফরেষ্টের State Papers গ্রন্থের তৃতীয়-খণ্ডে ৭৭৫ পৃষ্ঠায় কৌন্সিলের ৩রা জুলাই-এর কার্য্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে। সেই সভায় স্থির হইল যে, হুইলার সাহেব হেষ্টিংসের অনুপস্থিতিকালে লাটসাহেবের এবং কৌন্সিলের সমস্ত অধিকার ভোগ করিবেন এবং হেষ্টিংস্ বারাণসী-রাজের সহিত তাঁহার সন্ধি-সর্ত্ত-অনুসারে যাহা উত্তম ব্যবস্থা হয়, তাহা করিবার পূরা অধিকার পাইলেন। ইহাতে কিন্তু ইহাই বুঝা যায় যে, হেষ্টিংস রাজা চৈৎসিংহের সহিত আপোষে একটা ন্যায্য ব্যবস্থাই করিবেন।

হেষ্টিংস ১৪ই অগষ্ট বারাণসী পৌঁছিলেন। আর রাজাকে একটী চিঠি লিখিলেন ; তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সব লিপিবদ্ধ হইল :—

(১) রাজা ১৭৮০ সালের অতিরিক্ত কর যথাসময়ে দেন নাই। তাহাতে ইংরাজের মালব-যাত্রী সৈন্যের ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হইয়াছিল। —এই অভিযোগটী যেন কথামালার মেষ-শাবকের বিরুদ্ধে ব্যাঘ্রের অভিযোগের মত শুনায়!

(২) রাজা ১০০০ পদাতিক দেন নাই।

(৩) রাজা ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন।

(৪) রাজা রাজস্ব চালাইতে পারেন নাই—কারণ কাশীতে প্রত্যহ খুন ও ডাকাতি হয়।

রাজা তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর দিলেন। তাহাতে অভিযোগগুলির জবাব ছিল ;

(১) রাজা লিখিলেন যে তিনি ১,৭০,০০০ হাজার টাকা রেসিডেণ্টকে যথাসময়ে দিয়াছিলেন এবং বক্রী টাকার জন্য সময় চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু সে কথার কোন উত্তর পান নাই। রাজার কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করা উচিত—"টাকা মালব-যাত্রী সৈন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ভার ত আমার উপর ছিল না। যদি দেরী হইয়া

থাকে, তাহার জন্য আমি দায়ী নই। যদি টাকা দেওয়া ছাড়া তাহা পাঠানোর ভারও আমার উপর থাকিত, তাহা হইলে অত দেরী হইত না।"

(২) দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে রাজা লিখিলেন যে, তিনি ৫০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ বরকন্দাজ সংগ্রহ করিয়া মার্কহাম সাহেবকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন উত্তর পান নাই।

(৩) রাজা উত্তর দিলেন যে, তাঁহার পক্ষে আবদুল্লা বেগ ভিন্ন আর কেহ কলিকাতায় যায় নাই। আর আবদুল্লা হেষ্টিংসের নিকটই গিয়াছিল।

(৪) রাজা লিখিলেন যে, ডাকাতি বন্ধ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং অপরাধীকে শাস্তিও দিয়াছেন।

হেষ্টিংসের চরিতাখ্যায়ক ফরেষ্ট্ সাহেব চৈৎসিংহের পত্র সম্বন্ধে এক-কথায় রায় দিয়াছেন—"The answer was false in all its parts." অর্থাৎ উত্তরের প্রত্যেক কথাটি মিথ্যা। ঐতিহাসিক যে এরূপ নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচার কিরূপে করিলেন, তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না! হেষ্টিংস ত পত্র পাইয়াই অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন। কলিকাতার বোর্ডকে অর্থাৎ তাঁহার সহযোগী হুইলারকে জানাইলেন যে, রাজার চিঠিখানি—"not only unsatisfactory in substance but offensive in style" অর্থাৎ শুধু যে ভিতরের কথায় অসন্তোষজনক তাহা নয়, আবার লেখার ভঙ্গীতেও অপমানকর।

হেষ্টিংস আর মস্তিষ্ক স্থির রাখিতে পারিলেন না, রেসিডেণ্টকে আদেশ দিলেন যেন রাজা চৈৎসিংকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৭৮১ সালের ১৬ই অগষ্ট প্রাতঃকালে রেসিডেণ্ট রাজাকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং দ্বারে ইংরাজ সৈন্য প্রহরী রাখা হইল। রেসিডেণ্ট গবর্ণর-জেনারেলকে লিখিলেন—"রাজা স্থিরভাবে বন্দী হইলেন এবং আমাকে বারবার আশ্বাস দিলেন যে, আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তিনি তাহা প্রাণপণে পালন করিবেন। তিনি আশা করেন যে আপনি তাঁহাকে একটা বৃত্তি দিবেন। কিন্তু আপনি যদি চান, তাহা হইলে তিনি তাঁহার জমিদারী, তাঁহার দুর্গসমূহ, এমন কি তাঁহার ধনসম্পত্তি প্রাণ পর্য্যন্ত আপনার পদতলে দিতে ইচ্ছুক।" এইরূপ স্বাধীনতা-অভিলাষী বিদ্রোহী রাজার শাস্তির জন্য হেষ্টিংস্ অস্থির হইয়াছিলেন!

এইস্থানে আমাদের ধীরভাবে বিচার করা উচিত, এই ব্যাপারে কাহার কতটা দোষ? কারণ চৈৎসিংহের বন্দী হইবার পর যে ঘটনা ঘটে, তাহার জন্য হেষ্টিংসকে বা রাজাকে দোষী করা চলে না। রাজাকে তাঁহার প্রজাবর্গের সম্মুখে নিজের প্রাসাদে বন্দী করা যে নিতান্ত নিষ্ঠুর এবং অবিবেচকের কাজ হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোম্পানীর আইনতঃ এবং তাহাদের নিজেদের পাট্টা সনদ অনুসারে অতিরিক্ত কর আদায় করিবার কোন অধিকার ছিল না। তারপর সেই করের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী ধার্য্য হইয়াছিল এবং অযথা বলপ্রয়োগ দ্বারা সেই আদায় করা হইয়াছিল। রাজাকে বন্দী করার জন্য হেষ্টিংসকে অত্যন্ত লাঞ্ছনা ভো

করিতে হইয়াছিল। এমন-কি তাঁহার প্রভু ডাইরেক্টর সভা অতি তীব্র ভাষায় এই কাজটীর প্রতিবাদ করেন—"improper, unpolitic and unwarrantable"—অন্যায়, অযৌক্তিক এবং সমর্থন করিবার অযোগ্য!

রাজার বিরুদ্ধে সত্য কি অভিযোগ ছিল? ১৭৭৩ সালে হেষ্টিংস্ রাজার সপক্ষে অনেক লিখিয়াছিলেন। রাজার সম্বন্ধে স্বয়ং লিখিয়াছিলেন যে, তিনি ইংরাজের একজন নিশ্চিত মিত্র—"a sure ally." ১৭৭৭ সালের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটিল, যাহার জন্য রাজা হেষ্টিংসের বিরাগভাজন হইলেন? একটি ঘটনার সন্ধান ঐতিহাসিকেরা পাইয়াছেন যে, রাজা ১৭৭৭ সালে জেনারেল ক্লেভারিংএর নিকট কলিকাতায় একটী লোক পাঠাইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ গবর্ণর-জেনারেলের পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ডাইরেক্টরগণ ক্লেভারিংকে ঐ পদে নিয়োগ করেন। সেই সংবাদ এ দেশে পৌঁছিতে রাজা তাঁহার কর্ত্তব্য মনে করিয়া যথারীতি নূতন লাটকে সম্মান জ্ঞাপন করিবার জন্য একটী লোক পাঠান। হেষ্টিংস্ কিন্তু সত্য পদত্যাগ করেন নাই। তিনি পরে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করেন এবং ক্লেভারিংএর নিয়োগ শুধু কাগজ-পত্রেই ছিল, কাজে কিছুই হয় নাই। কিন্তু হতভাগ্য রাজার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তিনি হেষ্টিংসের চক্ষুশূল হইলেন। হেষ্টিংস্ নিজেই একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

"In June 1777, he had deputed a man named Sumboonath, with an express commission to my opponent and the man had proceeded so far as Moorshedabed, when, hearing of the change of affairs he stopped and the Raja recalled him." ১৭৭৭ সালের জুন মাসে রাজা শম্ভুনাথ নামে এক ব্যক্তিকে একটী বিশেষ বার্ত্তা দিয়া আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সেই লোকটী মুর্শিদাবাদ অবধি আসিয়াছিল, সেইখানে সে ঘটনা-পরিবর্ত্তনের সংবাদ পায় এবং রাজা তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলেন।"

এই সামান্য ঘটনা হইতেই রাজা ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এই সংবাদের সৃষ্টি! হেষ্টিংস্ কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টে সত্য কথা গোপন করিয়া একটী অন্য যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন—"I will suppose for a moment, that I have erred, that I have acted with an unwarranted rigour towards Cheyt Sing and even with injustice. Let my motive be consulted: I left Calcutta impressed with the belief, that extraordinary means, and those exerted with a strong hand, were necessary to preserve the Companys' interests from sinking under the accumulated weight which oppressed them. I saw a political necessity for curbing the over-grown power of a great member of their dominions, and to make it contribute to the relief of their pressing

exigencies. If I erred, my error was prompted by an excess of zeal for their interests, operating with too strong a bias on my judgment."

ইহার ভাবার্থ এই—যদি ধরিয়া লওয়াই যায় যে আমি চৈৎসিংহের সম্বন্ধে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা হইলেও আমার অভিপ্রায় কি, দেখুন। আমি দেখিলাম যে আমাদের রাজত্ব রক্ষা করিতে হইলে রাজার অতি-বাড় নষ্ট করিতে হইবে এবং সেই অবসরে আমি আমাদের শূন্য ভাণ্ডারও পূরণ করিবার সুযোগ দেখিলাম। আমার যদি ভুল হইয়া থাকে ত সে ভুলের কারণ, কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমার বিশেষ প্রচেষ্টা।

এই কয়টী কথায় সত্য কতকটা প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু হেষ্টিংস প্রকৃত অভিপ্রায়টী ব্যক্ত করেন নাই। সত্য বটে কোম্পানীর তখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু অর্থাভাবই যদি মনোগত অভিপ্রায়, তাহা হইলে চৈৎসিংহের ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া যে ২৩ লক্ষ টাকা পাওয়া গেল, তাহা হেষ্টিংস্ কোম্পানীর তহবিলে আনিলেন না কেন? ইংরাজ সৈন্যদিগকে উপহার দিলেন কেন? তখন কি করিয়া কোম্পানীর এমন স্বচ্ছল অবস্থা হইল যে অতটা টাকা কোম্পানী দান-খয়রাৎ করিলেন? প্রকৃত কথা তাহা নয়। আর যে অতি-বাড়ের কথা, তাহাও অমূলক। বিরুদ্ধাচারী সামন্ত-রাজ এত বলশালী হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাঁহার আপন প্রাসাদে বন্দী করিতে ইংরাজকে কোন ক্লেশই পাইতে হয় নাই! এবং পরে তথা-কথিত বিদ্রোহ দমন করিতে অল্প-সংখ্যক ইংরাজ সৈন্যের সপ্তাহ কয়েক সময় লাগিয়াছিল।

প্রকৃত কথাটী হইতেছে, হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ। হেষ্টিংস একবার সে কথাটা বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন—"So long as I conceived Cheyt Sing's misconduct and contumacy to have me, rather than the Company, for its object, I looked upon a considerable fine as sufficient."

অর্থাৎ যতদিন আমি ভাবিয়াছিলাম যে চৈৎসিংহের বিরুদ্ধাচরণ আমাকেই লক্ষ্য করিয়া —কোম্পানীকে নয়—ততদিন আমি স্থির করিয়াছিলাম যে একটা বেশী-রকম জরিমানা করিলেই ঠিক্ হইয়া যাইবে। বার্ক এই কথাটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভিতরের কথা অনেকটা এখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্রোহী সামন্তের শাস্তি হেষ্টিংসের উদ্দেশ্য ছিল না, নিজের ব্যক্তিগত আক্রোশের বশেই তিনি ঐ কাজ করিয়াছিলেন। শম্ভুনাথ যে রাজার পক্ষে তাঁহার ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লেভারিংকে অভিনন্দন করিতে কলিকাতায় আসিতেছিল, হেষ্টিংস এ কথা কখনও ভুলিতে পারেন নাই; এবং সেইজন্য রাজার সর্ব্বনাশও হইল। সৌভাগ্যের বিষয়, আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা সত্যকে বেশী বিকৃত করিতেছেন না। ওআইট টিল্‌বি বা ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, হেষ্টিংস্ "picked a quarrel with the Raja"—রাজার সহিত ঝগড়া বাধাইয়াছিলেন; "এবং রাজার এত ভীষণ শাস্তির কারণও হইতেছে—"his personal resentment against the Raja"—"তাঁহার রাজার উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ।" কিন্তু স্মিথ্ তবুও লিখিয়াছেন—"probably" অর্থাৎ সম্ভবতঃ। ইংরাজ ঐতিহাসিক কি না—খুব ধীর, সংযতভাবে তাই এইরূপ কথা লিখেন! প্রকৃত কথাই কিন্তু এই। তবু স্মিথ্ বা টিল্‌বি ফরেষ্ট বা ট্রটারের চেয়ে অনেক ভাল! আমাদের এই শোচনীয় ঘটনার আলোচনায় এইটুকুই যা'সুখ।

শেষ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্কলন

তুর্কীজাতি

তুর্কী দেশের জন-সাধারণ সোলতানকে আদিকাল হইতে খোদার ছায়া (জিল্‌লুল্লাহ) বলিয়া মনে করেন। সম্রাট ইচ্ছা করিলে রাজ্য ও জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারিতেন, সে জন্য কেহ কোন কথা তুলিত না। মুফ্‌তী নামক জ্ঞানগুরু ধর্ম্ম-পণ্ডিতের কথা সোলতান সব সময়ে মানিয়া চলিতেন।

যে সমাজ শিক্ষিত, যাহাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ, সেখানেই যথেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সেকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব ছিল, সুতরাং প্রাচ্যের রাজন্যবর্গকে যথেচ্ছাচারী বলিয়া ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যে মাঝে মাঝে নিন্দা করিয়াছেন—তাহা না করিলেও হইত।

কোর-আন হাদীস ও রাজার প্রজা-পালনের সুবুদ্ধি শাসন-যন্ত্রের মেরুদণ্ড ছিল। তুর্কী ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাজা যেখানে স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন, সেখানে সুসভ্য বীর, মৃত্যু-ভয়-বিরহিত তুর্কীরা উত্তেজিত হইয়া রাজাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছেন। রাজার যথেচ্ছাচারকে কাপুরুষের ন্যায় মানিয়া লইয়া তুর্কী জাতি সব সময় নিজেদের দাবী ও মর্য্যাদা নষ্ট করেন নাই।

তুর্কী জাতির মধ্যে কোন আভিজাত্য ছিল না। সকল তুর্কী ভদ্রলোক। নীচতম ব্যক্তিও স্বীয় শক্তি, বুদ্ধি ও দক্ষতার গুণে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে পারিতেন—অতি বড় সুসভ্য জাতি ছাড়া মানুষের মূল্য এমন করিয়া আর কে স্বীকার করিবে?

জগতের কোন সিংহাসনে একাদিক্রমে চার শতাব্দী ধরিয়া তুর্কীদের প্রথম সম্রাট ওছমানের বংশধরগণ ছাড়া আর কেহ রাজত্ব করেন নাই। সোলতানের অধীনস্থ শাসন-কর্ত্তারা পরবর্ত্তীকালে অনেক সময় বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীন বলিয়া নিজদিগকে ঘোষণা করিলেও তাঁহারা কখনও ওছমান-বংশীয় রাজাদের আনুগত্য অস্বীকার করেন নাই, কিংবা কনষ্টান্‌টিনোপোলের সিংহাসনে কোন নূতন রাজবংশ-স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই।

তুর্কীরা বলেন—প্রধানতঃ চার শ্রেণীর লোক দ্বারা শাসন-কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে...যথা, প্রথম—উজীর, দ্বিতীয়—কাদিয়াস্‌কর (বিচারক) তৃতীয়—দফ্‌তরদার (কোষাধ্যক্ষ) চতুর্থ—কেরাণী। এ ছাড়া শাসন-কার্য্য পরিচালনার জন্য সৈন্য-শ্রেণী ও আমলা-শ্রেণীর প্রয়োজন হয়।

সম্রাট দ্বিতীয় মোহম্মদের চার জন উজীর ছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন সর্ব্বপ্রধান, সৈন্য ও কেরাণী বিভাগ তাঁহারই অধীনে থাকিত।

রাজ-দরবারের নাম ছিল দিভান। সম্রাটের অনুপস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। বিচারক বা আইন বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তারা এবং বাকী তিন মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর দক্ষিণ পার্শ্বে আসন লইতেন। কোষাধ্যক্ষ ও কেরাণীরা তাঁহার বাম পার্শ্বে বসিত। সকল বিভাগের সংবাদ যাহাদের নিকট থাকিত (তেস্‌কেরাদিস্), তাঁহারা প্রধান উজীরের সম্মুখে বসিতেন।

আগা শব্দের অর্থ যিনি শাসন করেন—সৈন্য বিভাগের কর্ম্মচারীরা এবং সিভিল বিভাগের অনেকেও এই উপাধিটি ধারণ করিতেন। যায়গীরদারদিগকে "বে" অথবা "বেলার বে" বলা হইত। যুদ্ধকালে ইঁহারা অশ্বারোহী সৈন্য-রূপে সম্রাটকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতেন। তুর্কীদের সম্বন্ধে "পাশা" শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। 'পাশা' শব্দের আদি অর্থ সম্রাটের পা। ইহা একটী সম্মানজনক উপাধি—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, সেনাপতি এবং কখনও কখনও সাহিত্যিক-দিগকে এই উপাধি দেওয়া হইত।

সম্রাটকে বাদশা বলা হইত। তুর্কী সম্রাটেরা কোন খৃষ্টান নরপতিকে এই গৌরব-জনক আখ্যায় আখ্যাত করিতে অপমান বোধ করিতেন।

প্রয়োজন হইলে বাদশা তাঁহার রাজত্ব হইতে এক লক্ষ অশ্বারোহী, পদাতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক পাইতেন। ইহা ছাড়া স্থায়ী পদাতিক সৈন্য-সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র ছিল। তৎকালে জগতের মধ্যে শৌর্য্য-বীর্য্য ও সমর-কৌশলে ইহাদের মত আর কেহই ছিল না। তাহারা ইতিহাসে জানীসারিজ (Janissaris) নামে অভিহিত।

জানীসারিজ সৈন্যদল পরাজিত জাতির কিশোর-বয়স্ক বালকদিগের ভিতর হইতে সংগৃহীত হইত। ইহারা শেষকালে স্বেচ্ছায় এস্‌লাম বা রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিত। ইহাদের সংগ্রহের জন্য বিশেষ কোন বল-প্রয়োগ প্রয়োজন হইত না। ইউরোপের খৃষ্টানেরা আপন আপন সন্তান-দিগকে জানীসারিজ সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

সৈন্য-চালন-পদ্ধতি, আশ্চর্য্য সমর-কৌশল, রসদ-সংগ্রহ, অস্ত্র শস্ত্রের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে তুর্কীরা যতখানি বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারিতেন, তৎকালে ইউরোপীয় কোন জাতিই সেরূপ পারিত না। এবং এই কারণেই তাহারা তুর্কী জাতির সম্মুখে টিঁকিতে পারে নাই—পদে পদে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে।

তুর্কীরা কোন দেশ জয় করিলে প্রধানতঃ তাহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেন। প্রথম ভাগের আয় বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও জন-হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। দ্বিতীয় ভাগ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। তৃতীয় ভাগের আয়—রাজকোষে যাইত। এই ভাগ হইতে কিছু সম্পত্তি প্রয়োজন-মত সম্রাট লইতেন, রাজমাতাকেও কিছু দেওয়া হইত। প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরাও অংশ লাভ করিতেন।

সমর-কুশল সৈনিক পুরুষকে তিন শত হইতে পাঁচ শত একর পর্য্যন্ত জমি লাখেরাজ (তিমার) দেওয়া হইত। এই পুরস্কার লাভ করিয়া সত্বাধিকারী বাদশাকে যুদ্ধের সময় সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিত। লাখেরাজ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে সম্রাটের অনুমতিক্রমে তাহা সাধারণতঃ যায়গীরদারেরা (বে) পাইতেন। "বে" উপাধিটি প্রথমে সম্রাট বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে প্রদান করিতেন, শেষে উহা বংশানুক্রমিক হইয়া পড়ে।

ইউরোপে অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী জমীদার-শ্রেণী রাজার প্রতি বিদ্রোহাচরণ ও সাধারণ মানুষের উপর বিলক্ষণ প্রভুত্ব করিবার নিষ্ঠুর প্রয়াস পাইয়াছে। তুর্কী দেশের জায়গীরদার শ্রেণী কখনও এরূপ করেন নাই। ইঁহারা জাতির সমবেত স্বার্থ-রক্ষার জন্য সম্রাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের যুগে তুর্কী-জমিদারেরা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখনও তাঁহারা সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন

নাই কিংবা সাধারণ মানুষের কাছে নিজ নিজ দলকে উচ্চশ্রেণী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেও চেষ্টা করেন নাই। তুর্কী জাতির মধ্যে বংশ-গৌরব মোটেই ছিল না, প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী এবং পথের মজুর—সকলেরই আসন একজায়গায়। ভদ্র-শ্রেণী ও ইতর-শ্রেণী বলিয়া তুর্কী জাতির মধ্যে কোন কিছু ছিল না। বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে অধিকতর সুখ-সুবিধা ভোগ করিবার কোন সুযোগ দেওয়া হইত না। সম্রাট ইচ্ছা করিলে এবং উপযুক্ত জ্ঞান করিলে পথের মজুরকে উচ্চাসনে বসাইতে পারিতেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না—এজন্য কেহ নাসিকা কুঞ্চন করিতে পারিত না।

প্রত্যেক গ্রামে স্বায়ত্ত শাসন (Local self Government) ছিল। শাসনের ছোট ছোট কাজ গ্রামবাসীরাই নিষ্পন্ন করিতেন। সকলে মিলিয়া একজন "প্রধান" নিযুক্ত করিতেন। তিনি চাঁদা আদায় করিতেন। সংগৃহীত অর্থের হিসাব-পত্র তিনিই রাখিতেন, তিনি ছোট ছোট গ্রাম্য মোকর্দ্দমার বিচার করিতেন এবং সম্রাটের কাছে কোন রাজকর্ম্মচারীর অন্যায় কার্য্যের সমালোচনা প্রয়োজন হইলে ইনিই করিতেন। তুর্কী জাতির গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা অতি উৎকৃষ্ট। গ্রীক, আরমিনিয়া এবং খৃষ্টান বুলগারেরা তুর্কীদের অনুকরণে নিজেদের দেশে এই প্রকার স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথার প্রচলন করেন।

দ্বিতীয় মোহাম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণ দেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ এ বিষয়ে অধিকতর আগ্রহশীল ছিলেন—তিনি বুঝিয়া ছিলেন, কোন জাতিকে জগতে টিঁকিয়া থাকিতে হইলে বাহুবল ছাড়া জ্ঞান-বল সংগ্রহ করা আবশ্যক। মোহাম্মদ নিজে পণ্ডিত ছিলেন, বিজ্ঞানে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি দেশের লোককে জ্ঞান, আলোচনা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

মোহাম্মদ বিচারক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। জীবনে যাহাতে তাঁহাদের আর্থিক অনটন-হেতুঃ নৈতিক অধঃপতন না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। প্রতি গ্রামে এক একটা পাঠশালা (মকতব) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশের সর্ব্বত্র স্কুল-কলেজ খোলা হইয়াছিল। এই সমস্ত কলেজের সাহায্যের জন্য রাজকোষ হইতে বহু অর্থ ব্যয়িত হইত। কলেজে ছেলেদিগকে দশটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত—(১) ব্যাকরণ (২) বাক্য-বিন্যাস-প্রকরণ (৩) তর্কশাস্ত্র (৪) মনোবিজ্ঞান (৫) ভাষাতত্ত্ব (৬) শব্দালঙ্কার প্রকরণ (৭) জ্যামিতি এবং (৮) খগোল বিজ্ঞান বা জ্যোতিষ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ড ও প্যারিসে এই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইত। এই কয় বিষয়ে আধিপত্য জন্মিলে ছাত্রদিগকে "দানেশ-মন্দ" উপাধি দেওয়া হইত। 'দানেশমন্দ' শব্দের অর্থ বুদ্ধিমান। দানেশমন্দ কোন সাধারণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইতে পারিতেন মাত্র। আলেম হইতে হইলে তাঁহাকে আরও অনেকগুলি পরীক্ষা দিতে হইত এবং তাঁহাকে আইন জ্ঞান লাভ করিতে হইত। উলামা শ্রেণীর সম্মান খুব বেশী ছিল। তাঁহারা বিপুল সম্মান, বহু অর্থ এবং সম্রাটের নিকট হইতে নানাপ্রকার অধিকার প্রাপ্ত হইতেন। উলামা শ্রেণী হইতে অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেন। রাজধানী ও মফস্বলের বিচারক (কাজী), প্রধান প্রধান নগরের বিচারক (মোল্লা) ইস্তাম্বুলে-এফান্দি (ইস্তাম্বুল (Constantinople) সহরের জজ, প্রধান পরিদর্শক) এবং মুফতীও এই উলামা শ্রেণী হইতে সংগ্রহ করা হইত। উলামা শ্রেণীকে এস্‌লাম ধর্ম্মের পরিচালক মনে করা ভুল। ইমাম, শেখ, ও প্রচারক ধর্ম্মকার্য্য করিতেন—তাঁহারা উলামা শ্রেণীর একটা সামান্য অংশ মাত্র। তুর্কী জাতির শাসন-ব্যাপারে ধর্ম্ম-কার্য্যরত ইমাম ও শেখদের প্রভাব নাই বলিলেও চলে।

তুর্কীদের মধ্যে অধ্যাপক ও শিক্ষিতদিগের অত্যন্ত সম্মান ছিল—ইউরোপের অন্য কোথাও অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা সাধারণের নিকট হইতে এত সম্মান পাইতেন না।

কোর-আন খৃষ্টান ও ইহুদীদিগকে ধ্বংস করিতে নিষেধ করিয়াছে। নত মাথাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করিবে না, ইহাই তুর্কীজাতির যুদ্ধনীতি। জনৈক মুফতীকে

একবার তুর্কীরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—যদি এগার জন মুসলমান একজন বাদশার অবিশ্বাসী প্রজাকে হত্যা করে, তাহা হইলে কি হয়? মুফ্‌তী আইনের কথার উত্তর দিয়াছিলেন, একশতজন মুসলমানও যদি এরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইবে।

বিজিত জাতির (রায়া) ধন-সম্পত্তি ও শরীরের উপর কেহ অত্যাচার করিতে পারিত না। তাহারা নির্ব্বিবাদে নিজেদের ধর্ম্মপালন করিতে পারিত।

তুর্কী জাতির অধীনস্থ খৃষ্টান প্রজাদিগকে কর দিতে হইত। তাহারা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না। জেতা মুসলমানদের নিকট তাহারা সম্মানে ছোট, ইহা তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হইত। *

তাহাদিগকে তুর্কী পোষাক পরিতে দেওয়া হইত না। খৃষ্টানদের অধীনে জুদের (Jew) যেরূপ দুরবস্থা ও অসম্মান হইত, তাহার তুলনায় খৃষ্টানেরা মুসলমান জাতির অধীনে সুখে ছিল। শেষকালে খৃষ্টানদের উপর বহু অত্যাচার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা তুর্কী শাসন ব্যবস্থার দোষে হয় নাই। খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ তুর্কী জাতির একটা দোষের কথা বলেন—বিজিত খৃষ্টানদের নিকট হইতে তাঁহারা খাজনা-স্বরূপ কিশোরবয়স্ক বালক সংগ্রহ করিতেন।

সেকালে অন্যান্য দেশের মত তুর্কী পরিবারে দাস-প্রথার প্রচলন ছিল। অন্যান্য দেশের ন্যায় দাসদের জীবন তত শোচনীয় ছিল না। দাসদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে তুর্কী আইনে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। আইন অপেক্ষা তুর্কীদের স্নেহ-মমতা দাসদের জীবনকে অধিক নিরাপদ করিয়া তুলিয়াছিল। ভৃত্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে কোর-আনে আদেশ আছে। কোর-আন আরও বলে, যে দাসকে মুক্তি দেয়, সে নিজেকে নরকের আগুন হইতে মুক্ত রাখে। দাস মুক্তি লাভ করিলে, এবং সে যদি অবিশ্বাসী না হয় তাহা হইলে তাহার গুণানুযায়ী তাহাকে উচ্চাসনে বসাইতে কেহ আপত্তি তুলিত না। তুর্কী শাসনের বহু রাজকর্ম্মচারী এই দাস-শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। গুণ ও শক্তি যেখানে তুর্কীরা পাইয়াছেন, সেইখানেই উপযুক্ত সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করেন নাই।

খৃষ্টানদের মধ্যে অনেক সময় উপযুক্ত ব্যক্তির গুণের আদর হইত না, এজন্য বহু খৃষ্টান স্বেচ্ছায় তুরস্কে আসিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। বাদশাহ কিম্বা তুর্কী জাতি খৃষ্টান বা ছোট লোক বলিয়া কখনও তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন না। মুসলমান হইলে আর কথা নাই—সমস্ত ভেদ সমস্ত স্বাতন্ত্র্য তখন নষ্ট হইয়া যাইত। বাদশাহ সোলেমান এবং দ্বিতীয় সেলিমের সময়—দশ মন্ত্রীর মধ্যে আটজনই ছিলেন প্রথমে খৃষ্টান। অন্যান্য বহু কর্ম্মচারী প্রথমে খৃষ্টান ছিলেন। ইঁহারা কখনও কোনও কাজে অবিশ্বাসের পরিচয় দেন নাই—ইঁহাদের কেহ কেহ খৃষ্টান জাতির পরম শত্রু ছিলেন, খৃষ্টান জাতিকে ধ্বংস করিবার জন্য জঘন্য পন্থা অবলম্বন করিতে ত্রুটী করিতেন না এবং প্রয়োজন হইলে অতি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিতেন।

তুর্কী জাতির নিজেদের বল-বীর্য্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে অসামান্য বিশ্বাস ছিল। সর্ব্বত্রে তাঁহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল। অধীনস্থ খৃষ্টান প্রজারা বিনাবাক্যে ও বিনা আপত্তিতে তাহাদিগকে সম্মান করিতেন। তুর্কীদের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান খুব প্রখর ছিল। তাঁহারা সাধু এবং সত্যপরায়ণ ছিলেন—বিচার-বুদ্ধি তাঁহাদের খুব প্রবল ছিল। তাঁহাদের প্রাণে অত্যন্ত দয়া এ কথা তুর্কী জাতির পরম শত্রুও স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা কুস্তন্‌তুনিয়ায় (Constantinopole) কিছু কাল বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। ঐতিহাসিক ক্রিসি বলেন, মুসলমান ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের বিধি-ব্যবস্থা তুর্কীদিগকে এত ভদ্রলোক করিয়াছে, যিনি সত্য মুসলমান তাঁহাকে সংযমী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দয়ালু, সত্যপরায়ণ ও দানশীল হইতে হইবে। সাধারণ তুর্কী চরিত্রে যে গুণরাশি পরিলক্ষিত হয়, তাহা অন্য মুসলমান জাতির মধ্যে দুর্লভ। ক্ষমতাপ্রাপ্ত তুর্কী

* "They were to obey regulation all tending to mark their inferior position."

কখনও কখনও দুরাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু অর্থ ও ক্ষমতা পাইলে অনেক মানুষেরই চরিত্রে কলঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সমস্ত খৃষ্টান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুর্কী জাতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাঁহারাই বেশী করিয়া অমানুষতার পরিচয় দিয়াছেন।

যুদ্ধকালে তুর্কীর সিংহ-বিক্রম, শত্রুর প্রতি তাহার নিষ্ঠুরতা দেখিয়া তাহাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু উহা সন্দেহ ছাড়া আর কিছু নহে। সামাজিক জীবনে তুর্কীরা অত্যন্ত শান্ত, বিনয়ী এবং দয়ার্দ্র হৃদয়। ধর্ম্মবিশ্বাস ও জাতির সত্যের জন্য তুর্কী প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া সিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করে—বীর-জীবনের ইহা অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

চতুর্দ্দিক হইতে অনবরত শত্রুকুল তুর্কীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে—সম্রাটের আহ্বানে জীবনের সকল আনন্দ হারাম জানিয়া তুর্কী অনবরত যুদ্ধ করিয়াছে—ইহা কি কম প্রশংসার কথা? লড়াইএর নামে তুর্কী মোটেই ভীত নয়—যুদ্ধের নামে তুর্কীর শিরা-ধমনী নাচিয়া ওঠে। সমস্ত দেশে একটা মহা উল্লাসের প্রবাহ ছুটে। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তুর্কী অধীর উন্মত্ত হইয়া উঠে। কোর-আনে লেখা আছে—বিনা কারণে মানুষ হত্যা করা খোদা ভালবাসেন না, মানুষকে খোদা সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহাকে হত্যা করিবার তুমি কে? এ কথাও কোর-আনে লেখা আছে—শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ফরজ। শত্রু-দমনে মুসলমানকে দেহ-মন ধন-সম্পত্তি উৎসর্গ করিতে হইবে। কাপুরুষের মত যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, সে খোদার শত্রু, খোদার জন্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় সে স্বর্গবাসী হয়। এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস তুর্কীর হৃদয়ে ও বাহুতে অজেয় শক্তি দিয়াছিল। তুর্কীর পক্ষে নারী এবং বালক-বালিকাকে হত্যা করা নিষেধ। নিষ্ঠুরতা এবং সন্ধিশর্ত্ত ভঙ্গ করা তুর্কীর পক্ষে পাপ। শত্রুর নিকট কোন প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা তাহাকে পালন করিতে হইবে। তুর্কী এস্‌লামের পক্ষে ক্ষতিজনক কোনও প্রকার সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইবে না। নিতান্ত বিপদে পড়িয়া এরূপ কোন সন্ধি করিলে তাহা তাহাকে পালন করিতে হইবেই।

মোহাম্মদ ফুৎকর রহমন।

সাধনা, কার্ত্তিক ১৩২৮।

প্রত্যাবর্ত্তন

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জলদ সুপারিশের জোরে বি-এ পাশ করিয়াই জলদ ডেপুটি হইয়া চট্টগ্রামে আসিল। সঙ্গে স্ত্রী ও মা আসিবেন বলিয়া স্থির ছিল, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ঘটিল না। জলদের মেজ বোন ঊষাঙ্গিনীর ছেলের অন্ন-প্রাশনের আর সতেরো দিন দেরী। সে প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতে পাঁচ-ছয়খানি চিঠিতে মা ও ভাজেদের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছে—খোকার ভাতে সকলকে যাইতে হইবে। বড়মানুষ কুটুম! তাহাতে আবার অত্যন্ত অমায়িক। বাড়ীর ছেলে-বুড়া সকলেই মাটীর মানুষ। প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশন। ঘটাঘটিও খুব হইতেছে। যাত্রা, থিয়েটার, রামকমলের কথকতা, বায়োস্কোপ, আরও কত-কি আয়োজন হইবে! তালিকা পাইয়া ছেলেমেয়ে ও বধূদের দলে উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া গেল। কর্ত্তা-গৃহিণী বুড়া বয়সে সখ মানায় না ভাবিয়া যেন

অনিচ্ছাতেও বাধ্য হইয়া ছেলে-মেয়েদের ইচ্ছায় ও কুটুম্বের আগ্রহে সম্মতি দিলেন। কেবল খুসী হইল না জলদের স্ত্রী সুনীতি। স্বামীকে ছাড়িয়া তাহাকে থাকিতে হইল ত বটেই, তা ছাড়া উপস্থিত সুযোগ হারাইলে আবার যে কবে সুযোগ মিলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? বড় সংসারে অসুখ-বিসুখ, তাছাড়া নিত্যই কত অন্তরায় লাগিয়া আছে! সকল দিকে সুযোগ ঘটিলে তবে ত বাহির হওয়া যাইবে। এই প্রথম সে বাসায় যাইবে। শাশুড়ী সঙ্গে গিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া না আসিলে চলিবে না। বড় খোকা আবার ঠাকুমার খুবই ন্যাওটা। তাঁহাকে ছাড়িয়া এক রাত্রিও সে কোথাও থাকিতে পারে না। সঙ্গে সুনীতির যাওয়া ঘটিল না বলিয়া জলদও ক্ষুণ্ণ হইল। তবু সে স্ত্রীকে উৎসাহ দিয়া কহিল,—"মাসখানেক দেরী হবে, তার আর কি করা যাবে? এক রকম করে কেটে যাবে। তোমার কি বল—কেমন মজা করে নিমন্ত্রণ খাবে, থিয়েটার, নাচ-তামাসা দেখবে, আমি বেচারাই কড়িকাঠ গুণে দিন কাটাব। চিঠিতে একটু আধ্‌টু আমাকেও ভাগ দিও, যদি ভুলে না যাও। শুনেও তবু পেট ভরানো যাবে। খোস-খবরের ঝুটাও ভাল।"

সুনীতি উদ্গত অশ্রু রুদ্ধ করিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—"ছাই আমোদ! আমার যদি একটুও ভাল লাগ্‌বে। তুমি হাস্‌চ! তোমার আমোদ হয়েছে খুব, আমার যাওয়া হলোনা বলে, না? বেশ, যাও, তুমি একলাই যাও! আমি ত যেতে চাইব না আর-কখনও, ফিরে এসেও না। থাকোগে না তুমি একলা গিয়ে! কে চায় তোমার কাছে থাকতে?"

ষোল বছরের ছেলে জলদের সহিত যখন দশ বছরের মেয়ে সুনীতির বিবাহ হয়, তখন অনেকেই পুতুল-খেলার সহিত এ বিবাহের উপমা দিয়াছিল। অবশ্য বিশ বছর আগে হইলে এ কথা উঠিতও না। বরং ইহার ব্যতিক্রমে লোকে নিন্দাই করিত। কিন্তু এখন মেয়েদের দশ বছরে বিবাহের কল্পনাও বড় কেহ করেন না। ছেলেদেরও উপার্জ্জন-ক্ষম হইবার আশায় অনেকে অপেক্ষা করেন।

জলদের বাপ-মার একটি ছোট মেয়ে আনিয়া পুতুল-খেলার সখ খুব না থাকিলেও ছোট মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ও তাহার ভালবাসা পাইয়া ইচ্ছানুরূপ তাহাকে গড়িয়া লইবার সাধটাই হইয়া ছল বেশী। বয়স্কা বধূ আনিয়া কৃতী পুত্রের সংসার গড়িয়া দেওয়া চলিতে পারে, তাহাকে লইয়া পাঁচজনের সংসারে মিলাইয়া পরিবারবর্গের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী করিয়া গড়িয়া তোলা বড় কঠিন। মাটি নরম থাকিলে গড়ার সুবিধা যতটা হয়, কঠিন হইয়া গেলে তেমন আর হয়না। সুনীতি মেয়েটিও বড় নমনীয়। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে মা-বাপের মতই ভালবাসিয়া একান্ত মনে তাঁহাদেরই হইয়া গেল। দেওর-ননদ অনেকগুলি; শাশুড়ী ইহাদের আদর-যত্নের ভার সুনীতির হাতেই ছাড়িয়া দিলেন। কোন জিনিষটি দিতে হইলে—"তুমি পছন্দ করে ওদের দাও", এই কথাই বলিতেন। কাজেই নিজের জন্য ভালটি রাখিয়া মন্দটি অপরকে

দেওয়া চলিবে না। ইহাতে পরার্থপরতায় মন আপনিই টলে। সমবয়সীদের সঙ্গে সময়-সময় ঝগড়া-বিদ্রোহ ঘটিলেও ভাল-বাসারও অভাব ছিল না। স্বামীকে বন্ধু-রূপে পাইয়া তাহার ক্ষুদ্র মন আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। বছর না ফিরিতেই তাহারা পরস্পরকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়া ফেলিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলদ কলিকাতায় গেল কলেজে পড়িতে। একটা শনিবার বাদ দিয়া সে বাড়ী আসিবার হুকুম পাইয়াছিল। ইহার মধ্যে সে স্ত্রীকে তিন-চারিখানি করিয়া চিঠি লিখিত, এবং যথা-কালে সে সব চিঠির জবাবও পাইত। লেখিকা সম্বন্ধে জলদের মনে কোন সংশয় না থাকায় হাতের লেখা সুনীতির হইলেও, রচনাটা ভগ্নী শৈলাঙ্গিনীর, বা শ্যালিকা তরলিকার, সে বিচারের প্রয়োজন তাহার হইত না। জলদ তাহার বিবাহিত বন্ধুদের অনুকরণে চিঠির ভিতর নানা গ্রন্থ হইতে গান ও কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইত—এগুলি রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিদের রচনা হইতেই সে সংগ্রহ করিত। কিন্তু চিঠিতে সে কথার স্বীকার-উক্তি না থাকায় সুনীতি আশ্চর্য্য হইয়া স্বামীর অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির কথা ভাবিত। ক্রমে বয়সের সহিত সে নিজে বসিয়া চিঠি লিখিতে ও কোটেশন করিতে গুরুর বিদ্যাকেও ছাপাইয়া উঠিল।

অতি-সুখেই তাহাদের জীবনের দিনগুলি জল-স্রোতের মত অনায়াসে বহিয়া যাইতে ছিল। সুনীতির মনে হইত, তাহার অত শিব পূজা সার্থক হইয়াছে। এমন স্নেহময় প্রেমময় উদার উন্নত-হৃদয় স্বামী কয়জন নারীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে! বড় খোকার জন্মের পর এ সুখ ষোল কলায় পূর্ণ হইল। তরুণ দম্পতী পিতা-মাতার স্থান গ্রহণ করিয়া পরস্পরকে যেন আরও নিবিড় বেষ্টনে বদ্ধ বলিয়া মনে করিল। খোকার হাসিটি কাহার মত? জলদ বলিত, ঠিক সুনীতির। সুনীতি তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিত। সে বড় হইলে কাহার মত দেখিতে হইবে? জলদ বলিত, সে ঠিক্ মার মত হইবে। সুনীতি আপত্তি তুলিত, তবে ত রূপ ধরিবে না! না, ও তোমার মত হইবে। স্বামীর সহিত তর্কে হারিলে সুনীতি শাশুড়ীকে মধ্যস্থ মানিত। মা পাগলী মেয়ের মন বুঝিয়া তাহার ইচ্ছানুরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। জলদ কৃত্রিম কোপে মাকে শাসাইয়া বলিত, "তুমি একচোখো, তাই বৌয়ের হয়ে বলচ। বেশ, বেশ, ঐ তোমার সব, আমি কেউ নই।" মা হাসিতেন। এমনি আনন্দ ও উৎসাহের মধ্য দিয়া শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইয়া এবার সে কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল।

বিদেশে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন জলদের একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিলেও শীঘ্রই সে ভাব কাটিয়া গেল। নিজে সে আনন্দ-ময়—কাজেই কোথাও তাহার সঙ্গীর অভাব ঘটিত না। এখানেও অনেকের সহিত আলাপ হইল। বৈকালে কোনদিন বা উকিল তারিণীবাবুর বাসায়, কোনদিন বা ডেপুটি মহেন্দ্রবাবুর বাসায় ছোট-খাট সভা বসিত। অনেক পদস্থ কর্ম্মচারী একত্র মিলিয়া তাস-পাশা গল্প-গুজবে তামাক টানিয়া সন্ধ্যা কাটাইয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিত। বাড়ী হইতে অনেকেরই চাকর লণ্ঠন লইয়া আসিয়া

বাবুর প্রতীক্ষায় চাকর বা সহিসদের আড্ডায় বসিয়া বাবুদের কাজেরই ছোটখাট অনুকরণ করিত। জলদও প্রথম-প্রথম সে সভায় যোগ দিত। মহেন্দ্রবাবু জলদকে একটু বিশেষ স্নেহ করিতেন। জলদ তাঁহার বড় ছেলে অমূল্যর সহপাঠী-বন্ধু। জলদ এখানে আসিয়াছে শুনিয়া অমূল্য খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বাপকে লিখিয়াছিল, ভাহার বন্ধুর যেন সেখানে যথোচিত আদর-যত্ন হয়। অমূল্য আইন পড়িতেছিল। মধ্যে কি একটা ছুটি-উপলক্ষে সে বাড়ী আসিল। জলদ এবার মহেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা ছাড়াইয়া দোতলায় উঠিল। অমূল্যর মা ও মেজ বোন কিরণবালাও ক্রমে তাহার সম্মুখে বাহির হইতে ও কথা কহিতে সুরু করিলেন। অমূল্যর ছুটি ফুরাইলেও জলদের আর সেখান হইতে ছুটি মিলিল না। তাহার সরল মিশুক স্বভাব, সদানন্দ ভাব, গল্প করিবার ক্ষমতা—এই সব গুণে ছেলেমেয়েদের দলে তাহার খাতির ও আদরের অন্ত ছিল না। মহেন্দ্রবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত সাদাসিধা মানুষ। ছেলের বন্ধুকে তাঁহারা ছেলের মতই যত্ন করিতেন। বিদেশে এমন অযাচিত পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-লাভে জলদের আত্মীয়-বিচ্ছেদ-ক্ষুব্ধ চিত্ত পরম পরিতোষ লাভ করিল। কিরণবালা অমূল্যর মেজ বোন্, ম্যাট্রিক্ দিয়া স্কুল ছাড়িয়াছে। এইবার বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে। মহেন্দ্রবাবুর মনে যতখানি ত্বরা আসিয়াছিল, বাহিরে তাহার দুই আনাও প্রকাশ পাইত না, তাই এ পর্য্যন্ত পাত্র খুঁজিবার সময় হয় নাই। কিরণ সুন্দরী, সুভাষিণী, লোক-রঞ্জিনী। জলদের সহিত তাহার অল্পদিনেই" ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়া গেল। উষাঙ্গিনীর ছেলের ভাতের পরও সুনীতির বাসায় আসা ঘটিল না। তাহার সন্তান-সম্ভাবনা বুঝিয়া শাশুড়ী আপত্তি তুলিলেন—একেবারে ছেলে কোলে লইয়া তখন যাইবে। জলদ তাই শূন্য গৃহের নিরানন্দ-ময়তা ভুলিবার উপায় মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই আবিষ্কার করিয়া কিরণ ও তাহাদের ভাই-বোনের সঙ্গেই সময় কাটাইতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুনীতির দুঃখ

বাসায় আসিয়া দুই-চারিদিন সেখানকার শৃঙ্খলা ও পরিপাট্য বিধানে শাশুড়ী-ননদের সহিত নিযুক্ত থাকার দরুণ সুনীতি তেমন করিয়া স্বামীর প্রতি মনো-যোগিনী হইবার অবকাশ পায় নাই। কাছে বসিয়া মা খাওয়ান, শৈল ও সে রান্নাঘরে ঠাকুরের কাজে সাহায্য করে, অথবা ঠাকুরকে বসাইয়া রাখিয়া তাহারা ননদ-ভাজেই কাড়াকাড়ি করিয়া এটা-ওটা রাঁধে। শাশুড়ীর আদেশ-মত স্বামীর পাতে নিজের হাতেই সব পরিবেষণ করিয়া দিয়া আসে। ছোট বেলায় বৌ হইয়া আসায় শাশুড়ীকে সে তেমন লজ্জা করিতে পারিত না, ঘোমটা তাহার ললাট ছাড়াইত না, কথাও দুই-চারিখানা দূরের ঘর হইতে শুনিতে পাওয়া যাইত। বড় হইয়া শৈল বা উষা যদি নির্লজ্জতার তর্ক তুলিত, তাহা হইলে সে হাসিয়া বলিত, "ওটুকু ঘোমটা যে দি, সে শুধু গুরুজনের মান্য রাখার জন্যে। মাকে লজ্জা করতে সত্যি বলচি ভাই আমার ভারী লজ্জা করে।"

শাশুড়ীও মেয়েদের শাসনে বধূর অত্যন্ত লজ্জার অভিনয় দেখিলে হাসিয়া বলিতেন, "যাকে যা সাজে না, তাকে তা ধরে করাস্ কেন বাপু! ও আমার পাগলী মা, ওকে কলা-বৌ দেখতে আমারও ভাল লাগে না বাপু!"

বাড়ীর সে এখন একটি বৌ,—তাই তাহার আদরও ছিল সবার কাছে। স্বামীও অতিরিক্ত আদর দিয়াছেন, সহসা আজ হাত গুটাইতে চাহিতেছেন দেখিয়া যেন তাই একটু বিস্ময়ের সহিত সে চাহিয়া দেখিল, দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইল।

সকালে কাছারি যাইবার পূর্ব্বে সে খোকাকে দিয়া জলদকে ডাকাইয়া আনাইয়া কোন্ বিখানি কোন দেওয়ালে টাঙ্গাইলে কেমন মানাইবে, টিপয়টি খাটের মাথার দিকে অথবা পায়ের দিকে রাখিবে, এই সকল বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করিয়া লইত। জলদও হৃষ্টচিত্তে ইহাতে যোগ দিত, হুকুম তামিল করিত; ছোট খোকার দোল্নার দড়ি ধরিয়া একটু টানিয়া দিত, বড় খোকার মামির প্রতি মনোযোগী হইত,—এমনি করিয়া হালেমালে সময় কাটাইয়া বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া জল খাইয়াই সে বেড়াইতে বাহির হইয়া যাইত। সন্ধ্যার পর যখন ফিরিত, তখন তাহার মনের অবস্থা বেশ প্রফুল্লই থাকিত। সুনীতিরও তাই স্বামীর মনের পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে বিলম্ব হইয়াছিল। প্রথম যেদিন এ পরিবর্ত্তন তাহার চোখে পড়িল সেদিন পান খাইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে জলদ বলিল, "কি ছাই পাণ যে সাজ, হয় তেত, নয় চূণ। কিরণের সাজা পাণ খেয়ে এসে এ পাণ আর মুখে দিতে ইচ্ছা করে না।"

সুনীতি হাসিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "সে কিরণটি কে? কাছারির পাণ-উলী বুঝি?"

"দূর! আমায় কি তেম্নি অব্রাহ্মণ পেলে নাকি যে পাণ-উলীর পাণ খাব? কিরণ মহেন্দ্রবাবু ডেপুটির মেয়ে। তার কথা তোমায় বলাই হয়নি, বুঝি—? যেয়ো বরং একদিন তাদের বাড়ী—পাণ সাজতে শিখে এস গিয়ে।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "অ্যাঁ! আহা—সে যখন পাণ দিয়ে প্রাণ ভুলিয়ে নিচ্চে, তখন যেতে হবে বৈ কি।" মানুষ কি এত সহজে সত্ত্ব ছাড়ে! স্বামীর পানে চাহিয়া যেন খুব একটা রসিকতা করিয়াছে, এমনি ভাবে সুনীতি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

জলদ তাহার হাসিতে যোগ না দিয়া যেন একটু ব্যস্ত-ভাবেই ছড়ি লইয়া উঠিয়া পড়িল। সেদিন তাহার মনে কোন ভাবান্তর না হইলেও দুই-এক দিনের মধ্যেই সুনীতির মনে হইল, তাহার সে স্বামী আর ঠিক্ তেমনিটিই নাই। শৈল ও গৃহিণী একদিন দুপুর বেলায় তারিণীবাবু উকিলের বাড়ী বেড়াইতে গেলেন। সুনীতি বাড়ীতে রহিল, জলদ আসিলে জল-খাবার দিবে। খাবার তৈয়ারীর ভারও সেদিন তাহার উপর রহিল। মা চলিয়া গেলেও ছেলের খাওয়ার যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহা অভ্যাসের জন্য শাশুড়ীর মনে পরীক্ষার ইচ্ছাও ইহাতে নিহিত ছিল। সুনীতি এ ব্যবস্থা সানন্দেই গ্রহণ করিল। অন্যদিন সে শুইয়া, বই পড়িয়া, শৈলর সহিত মিছামিছি কলহ করিয়া, তাহার ছেলে-মেয়েদের কখনো কাঁদাইয়া

কখনো কোলে লইয়া দুপুর বেলাটা কাটাইয়া দিত। কিছু দিন হইতে এ-সবেও সে আর মন দিতে পারিতেছিল না। আজ শৈলর ছেলে-মেয়ে ও বড় খোকা বাড়ী না থাকায় বাড়ী যেন নিস্তব্ধ হইয়া আছে। দিনটাও খুব দীর্ঘ মনে হইতেছিল। সুনীতির মনের শূন্যতা যেন ইহাতে বাড়িয়া তাহাকে আরও পীড়িত করিতেছিল। সে সকাল সকাল রান্নাঘরে খাবার তৈয়ার করিতে গেল। নিজের গুণপনা দেখাইয়া শাশুড়ী ও স্বামীকে খুসী করিয়া দিবে, এই ইচ্ছাই হইয়াছিল। সেদিন শনিবার। জলদও অন্য দিনের চেয়ে অবশ্য কিছু সকালে আসিবে, তাই ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। আজ সে স্বামীকে একা ঘরে পাইবে। আজ আর তাহাকে সে ছাড়িয়া দিবে না।

জলদ বাড়ী আসিলে সে কড়া নামাইয়া উঠিয়া আসিল; পাখা লইয়া কহিল, "আজ তুমি আমার চার্জ্জে—তা জানো?"

জলদ পোষাক খুলিয়া ইজি-চেয়ারে বসিয়া কহিল, "তনু, তপ্‌সী, বড় খোকা—কারো সাড়া পাওয়া যাচ্চে না যে! কোথায় তারা?"

"মার সঙ্গে বেড়াতে গেছে। ঠাকুরঝিও গেছে। আমিই শুধু রইনু বাকী।"

জলদ কহিল, "তুমিও গেলে না কেন?"

"আর তুমি এসে একলা থাকতে, শূন্য ঘরে? খাবার-টাবার দিত কে?"

জলদ কহিল, "সে ঠাকুর করতো। আমার জন্যে বসে থাক্‌বার কোন দরকারই ছিল না। আমি ত আবার এখুনি বেরুব।"

সুনীতি স্বামীর ডান হাতখানা নিজ করতলে চাপিয়া কহিল, "আমি যদি যেতে না দি?"

জলদ কহিল, "তা হলে যাব না।" কথাটা শুনিতে যেমন মিষ্ট, বক্তার মুখের উদাসীন ভাবের সহিত তাহা তেমন মধুর শুনাইল না। সুনীতির চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল। স্বামীর হাত ছাড়িয়া দিয়া "খাবার আনি" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল। মন যখন অভিমানে ভরিয়া থাকে, তখন একটুতেই সে ব্যথা পায়।

সেদিন কিরণের পাণের সুখ্যাতি শুনিবার পর কিরণের সম্বন্ধে অনেক কথাই তাহার জানা হইয়া গিয়াছে। সে কেমন দেখিতে, কেমন মিষ্ট স্বভাব, কত ছেলে-মানুষি ধরণ, গল্প করিবার কেমন সুন্দর পদ্ধতি, কত বিষয় তাহা জানা, দেশের প্রতি কেমন জলন্ত অনুরাগ, দেশ-বাসীর দুঃখে কি গভীর সহানুভূতি তাহার প্রতি কথায় ফুটিয়া ওঠে, ইংরাজী লেখা পড়া জানা থাকায় তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া কত আনন্দ পাওয়া যায় ইত্যাদি অনেক কথাই সে শুনিয়াছে। এবং প্রতি রাত্রেই সে দিনের বৈকালের বন্ধু সম্মিলনের সকল কথাই তাহাকে শুনিতে হয়। শুনায় কোন লাভ আছে কি না, বক্তার মনে সে প্রশ্ন আদৌ না উঠায় জলদ আপন মনেই বলিয়া যায়, উৎসাহ না পাইয়া কে এক সময় হঠাৎ থামিয়া সে অনুভব করে সুনীতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

স্বামীকে খাবারের থালা ধরিয়া দিয়া সুনীতি রান্নাঘরে গিয়াছিল, ফিরিয়া এসে বিস্ময়ের সহিত কহিল, "এ কি হল?

পড়্‌লে যে! আমি সরপুরিয়া কখানা উখ্‌ড়ে নিচ্ছিলুম,—বলে গেলুম, না এলে উঠোনা—"

জলদ গামছায় হাত মুছিয়া কহিল, "ভাঁড়ার যখন তোমার ক্ষুদ্র, তখন বিপুল দ্রব্য-সম্ভার ঢোকাতে চাইলেই বা ঢুক্‌বে কেন তা? কম-জম করে করলে আর আপশোষ কর্ত্তে হোত না।"

সুনীতি রাগিয়াছিল, স্বামীর রসিকতায় রাগিয়াই কহিল, "ভাঁড়ার ছোট কি বড়, সে খবর ভাঁড়ারের চেয়ে ভাঁড়ারীরই জানা আছে বেশী। সত্যি, তুমি দুখানা সরপুরিয়া খেতে পারতে না ওর উপর? তাও সিঙ্গেড়া কখানা ফেলে রেখেচ দেখ্‌চি। ক্ষিদের অভাব নয়, অভাব তোমার সময়ের। কিন্তু যাও দেখি তুমি, কেমন আজ বেড়াতে যাবে!" বলিয়া সে হাতের খাবার স্বামীর পাতের কাছে নামাইয়া রাখিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জলদের আজ সত্যই একটু তাড়া ছিল। ক্ষিতি, যতী, বুলু, বিনু, কিরণ সকলে মিলিয়া আজ তাহাকে তাহাদের সমুদ্র দেখাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। অমূল্য কলিকাতায় গিয়াছে। মহেন্দ্রবাবুও অল্পদিনের জন্য জলপাইগুড়িতে বদলি হইয়াছেন—বাড়ীতে অভিভাবকের অভাব, তাই ইহাদের দেখিতে যাইবার সখ আর মিটিতেছিল না। সেদিন যতীর মাথায় জলদ বাবুর কথা উদয় হওয়ায় সে তাঁহার ও মার মত লইয়া দিন স্থির করিয়া রাখিয়াছে। এতক্ষণে তাহারা হয়ত প্রস্তুত হইয়া পথ চাহিয়া বসিয়া আছে! জলদের বিলম্বে কিরণ না জানি কতই ব্যাকুল হইতেছে। এ সময় সুনীতি এমন অন্যায় জেদ ধরিয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল! তবু স্বভাবসিদ্ধ হাসি-মুখেই সে বলিল, "সব যদি জানো, তবে রাগই বা কর কেন? দাও দেখি এখন শালখানা। আজ হয়ত ফিয়তে একটু রাতও হতে পারে।"

সুষমা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জলদ কহিল, "যেতে দাও, চটপট। দেরী করে অনর্থক কষ্ট দিয়ে কি লাভ?"

"যাও।" বলিয়া সুনীতি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। জলদ ডাকিয়া কহিল, "শালখানা দিলে না? ওগো শুন্‌ছ, দিয়ে যাও। পরে রাগ করো অখন।"

পাশের ঘর হইতে সুনীতি কহিল, "যারা এত দিন দিত, তাদের বল। আমার এখন সময় নেই।"

কথাটা যে সত্য নয় এবং অভিমানের, জলদ তাহা বুঝিল। কিন্তু এ লইয়া সাধা-সাধি করিবার সময় তাহার ছিল না, সে সখও নাই। সুনীতির সব ভাল কিন্তু বড় উল্টা বুদ্ধি! মানুষ কিসে যে কি করে, তার যদি এতটুকু অর্থ থাকে! রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় কিরণকে সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ঠাওরাইয়াছে! ছি, এ-সব কি! এমন অন্যায় চিন্তা মনে আসিতে দেওয়াও ত উচিত নয়! সুনীতির সন্দেহে সে ব্যথিত হইলেও এমন লজ্জাকর ভ্রম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করা যে তাহার উচিত ছিল, সে কথা কিন্তু মনে হইল না। তুমি যদি পছন্দ না কর, নাই বা গেলাম সেখানে—কেন অনর্থক দুঃখ পাও! এমনই কোন সান্ত্বনার কথা বলিলে যেখানে সব অশান্তি মিটিয়া যাইতে পারিত, সেখানে সে কেবল সুনীতির এ-সব চিন্তা অন্যায় বলিয়াই নিজের

দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিল। নিজের দিকে কোন তর্কই রাখিল না। সুনীতির অপছন্দ করা ছাড়া সে যদি এখন মাথা খুঁড়িয়া রক্ত-গঙ্গা বহায়, তবুও যে কিরণের দেখা পাইবার লোভ সে ছাড়িতে পারিবে না—সে কথা তাহার মনেও হইল না।

সুনীতি কিন্তু ইহার ঠিক উল্টা পথ ধরিয়াই চলিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, বাঁচিয়া থাকার তাহার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই! স্বামীর প্রেম নিশ্চয়ই সে হারাইয়াছে। সেখানে তাহার জন্য আর কোন সান্ত্বনাই বর্ত্তমান নাই। এখন স্বামীর কোন বিশেষ স্নেহ-প্রকাশে বা আদরে সে আর আনন্দ ত পায়ই না, বরং মনে করে এ সব কৃত্রিম! সব ভূয়া! ঘুষ! ইহার অর্থ নাই, আছে শুধু শব্দ! প্রাণ নাই, আছে দেহ! কি এ দুর্ভাগ্যের ভোগ! মৃত প্রেমের শ্মশানে দাঁড়াইয়া তাহারা স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন হৃদয়ের অভিনয় করিতেছে! ঘৃণায় ধিক্কারে তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায়—কিন্তু হায়, চিরদিনের সংসার ভীরুতা ও সহিষ্ণুতার মুখোষ পরিয়া বলে,—ছি! কিসের প্রমাণে, কোন্ দলিলের বলে স্বামীকে তুমি এমন অপবাদ দিতে সাহস কর? তাই মুখে হাসি মাখিয়া বুকে বিছা পুষিয়া তাহাকে সংসারের কাছে যথা-পূর্ব্বভাবেই চলিতে হইতেছিল। রাত্রে স্বামী যেদিন তাহার প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকিতেন, মনে মনে সে বিরক্ত হইত, এখনই ও বাড়ীর কত কথাই তাহাকে শুনিতে হইবে। ঘুমাইয়া পড়িলে অভিমানে মন ভরিয়া উঠিত,—এখন আর আধ ঘণ্টাও জাগিয়া থাকিতে পারেন না! এখন সে এমনই অনাবশ্যক হইয়াছে! নিঃশব্দে মশারি ফেলিয়া সে শুইয়া পড়িত। সে রাত্রে চোখের জলে কেন যে বালিশ ও অঞ্চল ভিজিত, তাহার কোন সদুত্তর সে দিতে পারিত না; জাগিয়াই রাত কাটিয়া যাইত। প্রভাতে স্বামীর আনন্দোৎফুল্ল মুখের পানে চাহিয়া মনে হইত, সারা রাত্রি ধরিয়া সে বুঝি প্রকাণ্ড একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যেই ডুবিয়া ছিল। দিনের আলোয় পাখীর গানে ছেলেদের বিচিত্র কোলাহলে ভাব-রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত, বুঝি, কোথাও কিছু অঘটন ঘটে নাই! কিন্তু বৈকালে স্বামী বাহির হইয়া গেলেই তাহার মনে হইত, পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত সবটাই ফাঁকি। ইহার কোথাও কিছু সত্য নাই। এবং সেই সঙ্গে তাহার বাঁচিয়া থাকাটা একান্তই লজ্জাস্কর! জলদও এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া মনের সহিত লুকাচুরি খেলিতেছিল। সে ভাবিত, তাহাঁর বন্ধুদের কথা— সে যখন স্ত্রীর কাছে অকপটে সবই জানাইয়াছে, তখন স্ত্রীর পক্ষ হইতে তাহাকে দোষ দিবার কিছুই নাই! আর কিরণ যখন তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখিয়া তাহাকে সম্মানিত করিয়াছে, তখন তাহার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে সে বাধ্য। স্ত্রীর মন রাখিবার জন্য তাহাকে ব্যথা দেওয়া তাহারও কিছু কর্ত্তব্য নয়। দেবতার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য মাথায় রাখিবার জিনিষ—তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিবার নয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিষের ক্রিয়া

জলদ ও কিরণবালার দিনগুলি এক রঙীন নেশার মধ্য দিয়া বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল।

এই নেশার ঝোঁকে তাহারা যে পরস্পরের কতখানি কাছে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহার খবর লইতে দুই পক্ষেই কোন সন্দেহ উঠে নাই। বাহিরের লোক, যাহারা এ নেশার কাজল চোখে পরে নাই, তাহারা কি-ভাবে যে তাহাদের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিতেছে, সে সংশয়ও তাহাদের মনে জাগে নাই। মহেন্দ্রবাবু বদ্‌লি হইয়া জলপাইগুড়িতে গিয়াছেন। ক্ষিতি ও যতী এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে। তাই বাসা রাখিয়া তিনি সুধু একজন চাকর ও ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। এখানকার বাসার জন্য আর একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া লইবার কথা ছিল, কিন্তু বাড়ীর লোকের অনাগ্রহে প্রায় তিন মাসেও তাহার খোঁজ হয় নাই। ক্ষিতি বলিত, বেশ খাইতেছি। কি হইবে মিথ্যা লোক খুঁজিয়া? যতী মুখে স্পষ্ট কিছু বলে না, কাজেও কিছু করে না। অমূল্যর পরীক্ষা আসন্ন, তাই সে এ-সব চিন্তার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। জলদ অমূল্যর উদ্দেশে নিয়মিতই তাহাদের বাটী আসিত, এবং অধিকাংশ দিনই তাহার অভাবে কিরণের হাতের তৈয়ারী চা খাইয়া, তাহার সহিত গল্প করিয়া সন্ধ্যার অনেক পরে যে দিন যখন মনে পড়িত, সেদিন তখনই বাহির হইয়া যাইত। বিদায়-কালে কিরণ প্রত্যহই বলিত, "কাল্ আসবেন ত?" জলদ হাসিয়া বলিত, "ইচ্ছা ত রইল। দেখি।" অবশ্য ইচ্ছা-পালনে তাহাকে কোন দিনই বীতস্পৃহ দেখা যাইত না। ঠিক সময়েই সে হাজির হইত। কিরণ উপন্যাসের ভক্ত। সে জলদের কাছে একদিন বাংলা বই কিছু আছে কি না খবর লইয়াছিল। জলদের বাংলা উপন্যাসের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকায় এ পর্য্যন্ত সে তাহার সংবাদ রাখাও প্রয়োজন মনে করে নাই। পরদিন জানাইব বলিয়া বাড়ী আসিয়া সে সুনীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাংলা নবেল-টবেল আছে কিছু? দাও ত দু-একখানা—পড়ে দেখা যাবে।" কিরণ চাহিয়াছে বলিলে সোজা হইত, কিন্তু তাহা সে বলিল না; বলিল, নিজে পড়িবে।

সুনীতি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাংলা নবেল পড়বে?"

জলদ হাসিয়া কহিল, "দোষ কি! অমন অবাক্ হয়ে গেলে যে! অন্যায় হবে কি কিছু, পড়িই যদি?"

সুনীতি মুখ ফিরাইয়া উদাসীনভাবে কহিল, "খুঁজে দেখব।"

জলদের মনে হইল, অন্যায় কিছু আছে বটে! মনে পড়িল, বছর দুই আগে একদিন কি একখানা বাংলা উপন্যাস লইয়া সুনীতি জলদকে পড়িবার জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছিল, কিন্তু জলদ স্বভাব-বশে সে অনুরোধ রাখিয়া উঠিতে পারে নাই। পড়িবে বলিয়া বইখানি সে লইয়া ছিল সত্য, কিন্তু তার পর সেখানি যে কেমন করিয়া হস্তচ্যুত হইয়া কর্পূরের মত উবিয়া গেল, সে কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। মাস দুই পরে একদিন জেরায় সে বইখানি পড়েই নাই, উপরন্তু হারাইয়াছে—এ-কথা স্বীকার করিলে সুনীতি ঘোর-অভিমানে বলিয়াছিল, জন্মেও সে আর কখনো কোন বই তাহাকে পড়িতে বলিবে না। জলদও তাহাকে কাছে টানিয়া আদরে-সোহাগে আচ্ছন্ন করিয়া বলিয়াছিল, ভালই হইল, কাজ নাই তাহার বই পড়িয়া!

সে বইয়ের চেয়ে বৌকেই অধিক ভালবাসে। অকৃত্রিম কবিত্ব যখন তাহার করতল-গত, তখন কৃত্রিমতার প্রয়োজনই বা কি! আজ এই মুহূর্ত্তে সেই কথাটি দুজনেরই মনে পড়িয়া গেল। জলদ একটু লজ্জিতভাবে হাসিয়া কহিল, "ওঃ, পুরোনো রাগ! শোধ নাও, শোধ নাও—ছেড়ে কথা কইবে কেন?" সে মুখের তেমন হাসিতে রাগ করিয়া থাকা সুনীতির সাধ্য নয়! তাই অনেক সময় রাগ করিতে গিয়াও তাহার রাগ করা হয় না—অসাক্ষাতে স্বামীর বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি-তর্ক গুলাকে শানাইয়া সে যথাকালে প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখে, কার্য্যকালে তাহার একটাও খাটাইতে পারে না। স্বামীর সদা-প্রফুল্ল মুখের পানে চাহিয়া মনের তাপ কখন্ জুড়াইয়া যায়। মনে হয়, এমন মুখ যাহার, সে কি কখনো কোন ত্রুটি করিতে পারে? আর পারেও যদি, তবে সে কথা কি কখনো বলা যায়? ছি! ঘূর্ণ্যমান রথচক্রে নিষ্পেষিত ধূলিকণা ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইলে আবার ধূলিকেই সে আশ্রয় করিতে চায়, তার ত আর অন্য আশ্রয় নাই।

ইহার পর স্ত্রীর সাহায্য না লইয়া সে পুস্তকের দোকানের শরণ লইল। এবং মধ্যে মধ্যে কাছারির ঠিকানায় বই আনাইয়া নিজের অফিস-বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া যথা-কালে কিরণবালার কর-কমলে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল। যেখানে গোপনতা, সেখানেই পাপ। তবে কি জলদের মনে পাপ প্রবেশ করিয়াছে? সে যদি বইগুলি নিজের বাসার ঠিকানায় আনাইয়া স্ত্রীকে জানাইয়া কিরণবালাকে পড়িতে দিত, তবে কোন সংশয়ের কথাই উঠিত না। কিন্তু সুনীতির সেদিনকার সেই মুখ ও চোখের সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টি তাহার মনকে বাঁকা পথেই চলিতে উপদেশ দিল। মনে হইল, বুড়া বয়সে সন্দেহে পড়িয়া বৃথা নিজে দুঃখ পাইবে, অন্যকেও দিবে! সে তাহার সন্দেহ লইয়াই থাক্। আমিত সত্যই কোন অপরাধ করি নাই! মেয়েদের মন ভারী সংকীর্ণ! তারা কাকের মত কেবল আবর্জ্জনাই খুঁজিয়া বেড়ায়। জলদের মনে হইল, কিরণ এ শ্রেণীর বাহিরে। সে ত কই কথা-প্রসঙ্গেও কখনো কোন ত্রুটি আবিষ্কার করে না। অবশ্য সুনীতি সম্বন্ধে তাহাদের আলোচনাও বিশেষ কিছু হয় না। তা হইলেও দোষ খুঁজিব ভাবিলে দোষ পাইবার পক্ষে আর বাধা কি?

সেদিন কিরণের খুড়িমার ব্রত-উদ্‌যাপনের নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া সুনীতি জলদকে শুনাইয়া অনায়াসে বলিল, "কিরণ এত বড় ধেড়ে মেয়ে,—তা ওর বিয়ে দেয় না কেন?" জলদ হাসিয়া বলিয়া ছিল, "অমন মেয়ে ত যাকে-তাকে প্রাণ ধরে দিতে পারে না। যখন ওর উপযুক্ত বর পাবে, তখন নিশ্চয়ই দেবে।" তাহাতে সুনীতি উত্তর দিয়াছিল, "যে রকম পুরুষ-ঘেঁষা মেয়ে, নিজেই বর বেছে নেবে, বাপ-মাকে কষ্ট পেতে হবে না।" শুনিলে একবার হিংসার কথা! জলদ এ-কথা অবশ্য সহ্য করিতে পারে নাই। সে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, "যার যেমন মন, সবাইকে সে তেমনি দেখে।" সুনীতি ইহার কোন জবাব দেয় নাই।

কিন্তু সেদিন হইতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা মনোমালিন্য ঘটিয়া গিয়াছিল।

জলদ আর ইচ্ছা করিয়া কিরণের কথা স্ত্রীর কাছে নিজ হইতে কিছু তুলিত না। সেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। তবু দুইজনে একত্র হইলেই সেই এক-জনের কথাই দুইজনেরই মনে পড়িত। সুনীতি ভাবিত, স্বামী এখন কিরণের ধ্যানেই মগ্ন রহিয়াছেন। জলদ ভাবিত, সুনীতি যদি কিরণের মত উদার-চিত্ত হইতে পারিত! জলদ কিরণকে একটু স্নেহ করে, তাই সে ইচ্ছা করিয়াই তাহার সঙ্গ লইল না? বন্ধুত্ব করিল না? করিলে বুঝিত, সে ভাল বাসিবার মত মেয়ে কি না! এতদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভিতরে ভিতরে বিচ্ছেদের হাওয়া বহিতে সুরু করিলেও বাহিরে একটা স্বচ্ছতা ছিল। তাহার পর দুজনের মাঝখানে একটা অন্তরালের ব্যবধান রচিত হইল। জলদের মনে হইল, সুনীতি অকারণে অন্যায় তাহাকে সন্দেহ করে। কিরণের সহিত একটু গল্প করা, বা তাদের বাড়ী বেড়াইতে যাওয়া—ইহাতে তাহার ক্রোধের কারণ কিছুই থাকিতে পারে না। মনকে এত ক্ষুদ্র করা বড় অন্যায়। সুনীতি দেখিতেছিল, স্বামী বাহিরে তাহার প্রতি পুনরায় ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার অন্তরে তাহার স্থান ক্রমেই যেন সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। মানুষ দুনৌকায় পা দিয়া চলিতে পারে না—এক দিকে ঝোঁক্ দিতে গেলে তৌল দাঁড়ির অন্য দিকটা হাল্‌কা হইয়া উঠিয়া পড়ে। সে নিপুণ দৃষ্টিতে সমস্ত মন দিয়া ইহারই গতি-লক্ষ্যে চাহিয়া থাকে, ফাঁকটা আগেই তাহার চোখে ধরা পড়ে। স্বামীগত-প্রাণা সুনীতির যে স্বামীর চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই নাই! স্বামীর পরিপূর্ণ ভাল-বাসাই সে পাইয়াছিল। তাই স্বামীর স্বচ্ছ মনটিও সে দর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইত। সেখানে গোপনতার এতটুকু আবরণও কোনদিন কোথাও ছিল না ত! কিন্তু এখন যে তাহা ঘটিয়াছে, সর্ব্বান্তঃকরণে সে তাহা অনুভব করিতেছিল। তাই এক নিবিড় ঔদাসীন্যে সংসারের প্রতি মনও ক্রমে বিরস হইয়া উঠিতেছিল।

সুনীতির আর কিছুই ভালো লাগে না। সংসারের কাজ-কর্ম্মে সে মন নাই। বেশ-ভূষা সে ছাড়িয়া দিয়াছে। স্বামীর সেবা করে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বের সে আনন্দ-উন্মাদনা আর নাই। সে যেন অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়াই করিয়া থাকে। ছেলে দুটিকে বুকে চাপিতে চোখে অনেক সময় ব্যথার অশ্রুই ঝরিয়া পড়ে!

শাশুড়ীরও ফিরিয়া যাইবার সময় আসিল। সুনীতি মনে করিল, সেও যদি এই সঙ্গে বিদায় চায়, তবে কেহই তাহাকে আর ব্যাকুল হইয়া বাধা দিবে না। হয়ত,—হয়ত উনি ইহাতে খুসীই হইবেন! পূর্ব্বে এমন সুযোগ লইয়া মিছামিছি বাপের বাড়ী যাইবার ছুতা করিয়া কতদিন সে স্বামীর নিকট ব্যাকুল মিনতি আদায় করিয়াছে। কিন্তু আজ ত আর সেদিন নাই! এখন যে মিথ্যা করিয়াও সে কথা বলিতে সাহস হয় না! কি জানি, আবেদন যদি প্রার্থনামাত্রেই মঞ্জুর হইয়া যায়! স্ত্রীর প্রতি অনুরাগই না হয় পুরাতন হইয়া যায়। কত-শত রূপসী বিদ্যাধরীদের স্বামী যে সেওড়া-গাছের প্রেতিনীর মোহে মুগ্ধ হন্! কিন্তু ছেলেরা—অমন যে কুসুম-কোমল শিশু, উহাদের জন্যও ত আর কৈ তেমন ব্যগ্র

হন্ না! কাছারি হইতে আসিয়া উহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহেন না। পাছে সেখানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়, এই ভয়! অভিমানিনীর মান-ভঞ্জনেই ত তবে আনন্দের কালটুকু কাটিয়া যাইবে। আশ্চর্য্য হইয়া সুনীতি ভাবে, মানুষের মন এমনভাবে কেমন করিয়াই বা বদ্‌লাইয়া যায়? যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, তাহার শক্তি কেন এমন দুর্জ্জয়? ছেলেরা ত তাহারই, তবে উহাদের ভালবাসাও আর ভাল লাগে না? ছোট খোকাটাই হইয়াছে জন্ম-দুঃখী! ও ত বাপের আদর কখনই তেমন করিয়া পাইল না। আর উহার আবির্ভাবেই তাহার মায়ের দুঃখের সূচনা। এমন করিয়া দীর্ঘকালের জন্য স্বামীকে ছাড়িয়া না থাকিলে হয়ত সে মায়াবিনীর মোহিনী-মায়ায় স্বামীও এমন করিয়া বাঁধা পড়িতেন না। বাঁধন শক্ত হইয়া গেলে আর কি তা কখনো ছেঁড়া যায়? শুধু উহারই জন্য তাহার এবারকার নারী-জন্মটাই বৃথা হইয়া গেল! কখনো ভাবে, কিরণের বিবাহ হইলে সে যদি উঁহার সান্নিধ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলেই উঁহার চোখের নেশা কাটিয়া যাইবে—সে দিকেই বা আর কিসের আশা! মন ছাড়িয়া ত আর সে চলিয়া যাইবে না। আর ভূতুড়ে বাড়ীতে বাস করার যে আনন্দ, সে ত সে এখনই প্রতিপলে উপভোগ করিতেছে! এ জন্য সে গেল বা রহিল তাহাতে আর আসিয়া গেল কি? তবে এইটুকু ভাল যে, লোকে কিছু বলিতে পাইবে না। উনি যাই করুন্, তবু উঁহার বিরুদ্ধে যে কেহ কিছু বলে, এও ত আর সহা যায় না, অথচ এই কথাটিই যে আজকাল লোকের মুখে-মুখে। সেদিন মুন্‌সেফ বাবুর মেয়ে অমলা মুখের উপর স্বচ্ছন্দেই বলিয়া বসিল, "সিঁদুর-কৌটার সুশীর মত সতীনকে স্বামী দিয়ে তাদের সাজাতে যাবি না কি, লো বকুরাণী?" পোড়া কপাল তাহার! সে যাইবে আবার সতীনের ঘর সাজাইতে! ভাগ্যে সে সময় শাশুড়ী আসিয়া পড়িলেন, নহিলে কে জানে কি কটু উত্তরই সে দিয়া বসিত! এ-সব কথা তবে বাহিরেও উঠিয়াছে? এ কথা স্বামীকে বলা তাহার অবশ্য উচিতও—কিন্তু সুনীতির মনের দুর্ব্বলতা বলিল, বলিতে গিয়া সে যদি ঘুমন্ত বাঘকে চেতাইয়া তোলে! জলদ যদি এটা নিজের স্বপক্ষেই ধরিয়া লয়—আজকালকার অনেকগুলি ছোট-বড় উপন্যাসে-গল্পেও সে এমনি সব ভালবাসার, দ্বিতীয় বিবাহের বিবরণ পড়িয়াছে। উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষের মতামত এখানে নায়ক-নায়িকারা মান্য করে না। বিবাহ হইয়া গেলে কিছুদিন মন কষাকষির পর ঘরের ছেলে আবার ঘরেরটির হইয়াই ফিরিয়া আসে। তাহার আদরের বধূই সংসারের পাটরাণী হইয়া বসে। সতীন ভাণ্ডারণী হইয়া চাকর-দাসীর সর্দ্দারী করে, এবং স্বামী ও সতীনের মনোরঞ্জনার্থ নিজের গায়ের গহনা খুলিয়া সতীনকে পরায়, সতীনের সহিত গলাগলি ভাব করিয়া সংসারের সুখ-শান্তি বজায় রাখে। মা গো! এ-সব লেখাও কি আবার কখনও লিখিতে আছে! ঐ সব গল্প পড়িয়াই না ছেলেদের মনে অমনি সব নূতন প্রেমের সখ জন্মায়! তারপর ঠেলা যেখানে গিয়া পৌছায়, সে-ই বোঝে। ঠাকুর-ঝি ঠিক্‌ই বলিয়াছে, লেখকরা সব পুরুষ কি না,

তাই তাহাদের মনের ইচ্ছা কলমের মুখে প্রকাশ পায়! সতীনের জ্বালা সহিতে হইলে আর অমন উদারতার হাওয়া বহিত না! সুনীতির মনে পড়িল, নারীর লেখায় দু-একখানি এই জাতীয় উপন্যাস সে যেন পড়িয়াছে। গোড়ায় সতীনকে দিয়া বাঁদী-গিরি যথেষ্ট করাইয়া লইলেও লেখিকা তাহার শেষ দিকটায় রক্ষার চেষ্টাও করিয়াছেন। সুনীতির মনে হইল, সে যদি লিখিতে পারিত, তবে বিবাহিতের এই সব অন্যায় অনুরাগের বিরুদ্ধে খুব একটা তীব্র প্রবন্ধ লিখিত। কিন্তু ভগবান তাহাকে সে শক্তি দেন নাই! মন-প্রাণ সব দিয়া সুধু সে ভালবাসিতেই শিখিয়াছে। আঘাতের প্রতিকার-চেষ্টার সাধ্যও তাহার ছিল না—সে এমনি অক্ষম, এমনি নিরুপায়!

স্বামীর প্রতি অভিমানের বিরাগে সে অনেক সময় কাজে-কর্ম্মে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। তবু হতাশার দীর্ঘশ্বাস কখন্ বাহির হইয়া আসিত, তাহা সে নিজেই জানিতে পারিত না। এক-এক সময় কিরণের উপর বড় রাগ হইত। পরের জিনিষে এ কি অন্যায় তাহার লোভ! যাহাকে দুই দিন পরে অন্যের হইতে হইবে, সে যে এক দিনের অদর্শন সহিতে পারে না, এও ত কম মুস্কিল নয়! বন্ধু কি চাকরি ছাড়িয়া তাহার চোখের তৃষ্ণা মিটাইতে সঙ্গে যাইতে পারিবেন? যতটুকু রয়-সয়, ততটুকুই থাক্ না কেন—! সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইবার শক্তি যাহার নাই, তাহার কাছে নাই বা রহিল এতখানি দাবী!

প্রথম প্রথম জলদ যখন প্রতিদিনের সান্ধ্য ইতিহাস সুনীতির কাছে বর্ণনা করিত, তখন তাহাদের কোন্ দিন কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, সে খবর হইতে কিরণ কি রকম চুল বাঁধিয়াছিল, কি রঙের সাড়ী কোন্ ধাঁচে পরিয়াছিল, কি কথা কেমন সুরে বলিয়াছিল, এ-সকল খবরই সে পাইত। এ-তরফ হইতে উৎসাহের অভাবে অথবা দু-একটা খোঁচা খাইয়া অর্দ্ধ-চৈতন্য-লাভে সে এখন স্ত্রীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য এ সকল মনোমত ঘটনার বিশ্লেষণ বড় করিত না। স্ত্রীও শুনিবার জন্য মুখে কোন উৎসাহ দেখাইত না। তাই অন্য কথা ভুলিয়া যাওয়ায় আপাততঃ তাহাদের কথা বলাই প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে।

মানুষের স্বভাব, যতক্ষণ সে কোন বস্তু পায়, ততক্ষণ তাহার প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে করে, কিন্তু পাওয়া বন্ধ হইলেই পাইবার ইচ্ছা জন্মায়। সুনীতি যখন স্বামীর মুখে কিরণের প্রত্যেক খুঁটিনাটি খবর পাইত, তখন ঈর্ষায় জ্বলিয়া ভাবিত, উনি যেমন বিশ্ব-ভুবনে শ্যাম-রূপ দেখিতেছেন, মনে করেন, আমিও ওঁর কিরণের কথা শুনিবার জন্য তেমনই পাগল হইয়াছি—! কিন্তু এখন সে সব কথার আলোচনা বন্ধ হওয়ায় তাহার পত্নীত্বে আঘাত লাগিত। সে মনে করিত, স্বামী আমায় এমনি হীন-চিত্ত মনে করেন যে, সাহস করিয়া তার কথা আর বলিতেও পারেন না! পাছে আমি হিংসা করি, এই ভয়ে! কেন, সে কি আমার সতীন? আমার অধিকারে ত কেহ হাত দিতে পারিবে না। করুন্ না উঁহারা ছেলেখেলা!

মন কিন্তু এ যুক্তি-তর্ক মানিয়া বশে চলিতে চাহিত না। দুজনের মনের উপর আর এক জনের আড়াল যতই নীরবতার মধ্য দিয়া চাপিয়া বসিতেছিল, সুনীতির তত মনে হইতেছিল, সে যেন স্বামীর মনের সাড়াও সেই পরি-

মাণে ক্রমে হারাইয়া ফেলিতেছে। প্রেমহীন স্বামীর সহিত দাম্পত্য জীবন বহন করা তাহার যেন কঠিন দায়িত্ব বলিয়াই ক্রমে মনে হইতেছিল। অথচ ক্ষুধিত ব্যক্তি নিজে খাইতে না পাইলেও যেমন ভোক্তার পাশে বসিয়াও আনন্দ লাভ করে, তেমনি এক অতৃপ্ত সুখের মধ্যে থাকিয়াও সে স্বামীর সান্নিধ্য ছাড়িয়া আর কোথাও চলিয়া যাইতেও পারিতেছিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

চিত্রশিল্পী ক্যাল্‌ডেরণ

ফিলিপ্ এইচ্ ক্যাল্‌ডেরণ একজন নামজাদা বিলাতী চিত্রকর। ইহার লেখা ছবি অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। স্পেনদেশের বিখ্যাত নাট্যকার পেড্রো ক্যালডেরণের বংশে ইঁহার জন্ম। ইহার ছবিগুলিতেও সেই সাহিত্যিক পূর্ব্বপুরুষের অনেক গুণ তাই লক্ষ্য করা যায়। প্রাণময়তা, উদ্দীপনা, রঙের খেলা, এবং লেখার মধ্যে নানা ভঙ্গীতে চমক লাগাইবার চেষ্টা—এই রূপ কয়েকটি লক্ষণ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। যাহাকে নব্য (রোমান্টিক) নাট্য-কলা বলে, সেই জাতীয় প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী-শক্তি দুই শিল্পীরই প্রচুর আছে। ইতিহাসের ঘটনা হইতে আপনার মনের মত রূপ ও রং ফলাইয়া তোলার ক্ষমতা ক্যালডেরণের রচনায় বেশ দেখা যায়। এমন বিষয় নাই, যাহাতে তিনি হাত দেন নাই। বাইবেল-বর্ণিত ঘটনা, সার্ব্বজনীন হৃদয়-কথা, ধর্ম্মজীবনের চিত্র, ঐতিহাসিক তথ্য ও ঐতিহাসিক কল্পনা, গ্রাম্যজীবন—প্রভৃতি নানা বিষয়-চিত্র



নাক্ষস-দ্বীপে আরিআড্‌নী

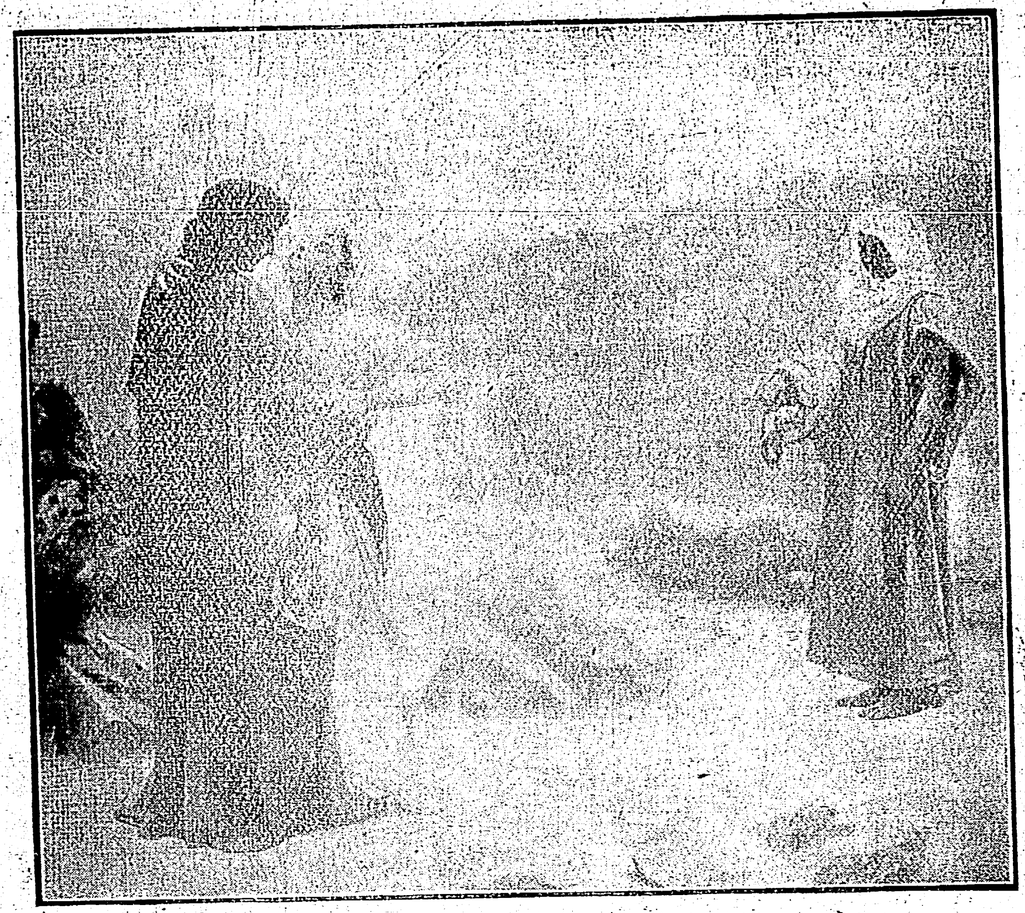

রুথ ও নাওমি

(subject pictures) এই চিত্রকরের তুলিকায় অভিনব ভঙ্গিতে ফুটিয়াছে। এবারকার 'ভারতী'তে তাহারই কয়েকখানি প্রকাশিত হইল।

'নাক্ষস-দ্বীপে আরিআড্‌নী'—এই চিত্রটির বিষয় পৌরাণিক; কিন্তু বিশেষ কোনো পৌরাণিকত্ব (বেশভূষা ছাড়া) ইহাতে নাই। শিল্পীর স্বাধীন কল্পনাই ইহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। আরিআড্‌নী রাজকন্যা; বিখ্যাত রাজবীর থিসিউস্‌কে ভালবাসিয়া তাঁহাকে রাক্ষসের মুখ হইতে রক্ষা করেন! ঐ রাক্ষসকে বধ করার পর থিসিউস্ প্রতিজ্ঞা-মত তাঁহাকে বিবাহ করিয়া দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নাক্ষস-দ্বীপে এত ভালবাসার প্রতিদানে, তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান—তখন আরিআড্‌নী অন্তঃসত্ত্বা। কাহারো মতে আরিআড্‌নী তার পরেও বহুদিন জীবিত ছিলেন! কেহ বলেন, তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। কাহিনী এইটুকু, ছবিতে আরও কম। নির্জ্জন সাগর-কূলে একটি রমণী উন্মাদিনীর মত জলে নামিতেছে। চিত্রকরের উদ্দেশ্য—ওই রং ও রূপ, আর ওই পটভূমিকার সুসমঞ্জস সৌন্দর্য্য। পৌরাণিক নামটি দেওয়া হইয়াছে—বিষয়টিকে উজ্জ্বল করিবার জন্য।



রুথ

'রুথ' এবং "রুথ ও নাওমি"—দুইখানিই বাইবেল-চিত্র, বিষয়ও প্রায় এক। 'রুথ' ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি আদর্শ বধূ-চরিত্র। সে বিধবা, তাহার বাপের বাড়ী দূরে। স্বামীর মৃত্যুর পর সে পুত্র-শোকাতুরা সহায়হীনা শাশুড়ীকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। পরের ক্ষেতে কৃষাণীর কাজ করিয়া সে নিজের ও বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিল। একখানিতে "রুথ" যেন বেলাবসানে মনিবের ক্ষেতের কাজ সারিয়া যবের শীষগুলির মধ্যে বসিয়া আছে। তাহার সুন্দর কার্য্যক্ষম দেহের

শ্রী, মাথার বসন, মুখের গভীর উদাস অথচ স্নেহ-সুকোমল ভাব—চিত্রটির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। শূন্য আকাশতলে গোধূলির-আলোয় নারী-সৌন্দর্য্যের একটি বিশিষ্ট রূপ প্রকটিত করাই যেন শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য। অপর চিত্রখানি সর্ব্বজন-প্রশংসিত; এ-খানি লিভারপুল সহরের



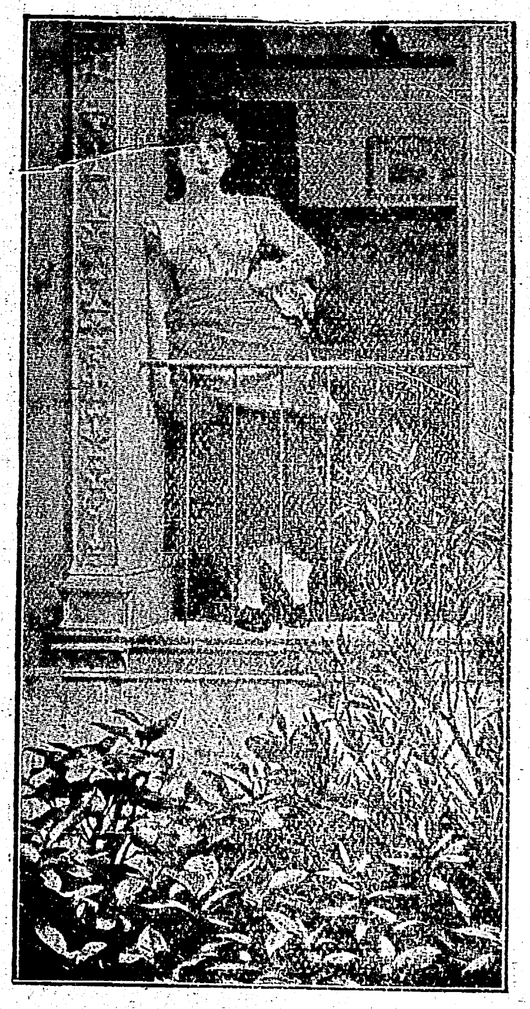

প্রোভেন্স্ দেশের গোলাপ

সর্ব্ব-সমর্পণ

'ওয়াকার আর্ট-গ্যালারী'তে রক্ষিত আছে। 'রুথ'সিরিয়া দেশেরমেয়ে; ওই-দেশীয় নারীর রূপ এই ছবিখানিতে বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটী শান্ত সংযত অবসাদ-সূচক মাধুরী—যাহা 'যিশু-জননী'র চিত্রগুলিতে প্রায় দেখা যায় —রুথের মুখভঙ্গিমায় সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। অনুর্ব্বর মরুপথ, নিকটে পাহাড়, চারিদিকে পাথর ছড়ানো—চিত্র-ভূমিকার এক পার্শ্বে ফণীমনসা-জাতীয় ক্যাক্‌টস্ গাছের ঝোপ। 'রুথ' যেন বিদায় হইবে না—পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া শাশুড়ীর গলা ধরিয়া অনুনয় করিতেছে। তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য যে আসিয়াছে সে একটু দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছে। 'রুথ' বলিতেছে—আমাকে তোমায় ফেলিয়া যাইতে অনুরোধ করিও না, সঙ্গে ফিরিতে দাও। তুমি যেখানে যাইবে, আমি সেইখানে যাইব; তুমি যেখানে থাকিবে আমি সেইখানে থাকিব, তোমার গোত্রই আমার গোত্র, তোমার ভগবানই আমার ভগবান।

'সর্ব্বসমর্পণ' নামক চিত্রটি আর একখানি



বাসন্তী

বিখ্যাত চিত্র। এখানি "ন্যাশন্যাল গ্যালারী অব্ ব্রিটিশ আর্ট"-গৃহে স্থান পাইয়াছে। মধ্যযুগের ধর্ম্মেতিহাসের একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই ছবিখানি অঙ্কিত হইয়াছে। পূতশীলা এলিজাবেথ খ্রীষ্টির 'দিব্যাবদানমালা' বা 'ভক্তমালে'র একটি প্রাতঃস্মরণীয় চরিত্র। সে কালের ধর্ম্ম-সাধনের একটি কঠিন দৃশ্য এই ছবিতে দেখানো হইয়াছে। আজন্ম তাপসী এলিজাবেথ সর্ব্বসমর্পণ করিয়া, সর্ব্বস্ব—এমন কি লজ্জা-বসন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন। মন্দিরমধ্যে, ইষ্টদেবতার বেদী স্পর্শ করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণ লুটাইয়া দিয়া, নারীর শেষ নিজস্ব লজ্জাটুকুও বিসর্জ্জন দিয়া এই আত্মোৎসর্গ করার

চিত্রটী যেমন হৃদয়দ্রবকর, তেমনি পবিত্র। মন্দিরের পুরোহিত ও মঠধারিণীরা এই পুণ্যাবদান সার্থক হউক বলিয়া একমনে প্রার্থনা করিতেছেন।

'প্রোভেন্স-দেশের গোলাপ'—এক ধরণের নারী-সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য আঁকা হইয়াছে। আমাদের দেশে ইরাণী-সুন্দরী বলিতে যে রূপের কথা মনে হয়, য়ুরোপে দক্ষিণ-ফ্রান্সের প্রোভেন্স্ দেশের সৌন্দর্য্যও সেইরূপ ভোগ-কল্পনার সামগ্রী। চিত্রখানি সুন্দর কি না, যিনি দেখিবেন তিনিই বলিবেন। এরূপ সৌন্দর্য্যের বিচার-কালে এই কথাটাই মনে রাখিতে হইবে যে, সৌন্দর্য্য দর্শকের চোখে বাস করে আর কোথাও নয়। প্রোভেন্স্-দেশ প্রাচীন কবিদিগের গান, সুরা, গোলাপ ও সুন্দরী রমণীর জন্য প্রসিদ্ধ।

'বাসন্তী'—চিত্রখানির পরিচয় আবশ্যক হইবে না। বসন্তকে কবি ও চিত্রকরেরা কত রূপে কল্পনা করিয়াছেন—এখানি তাহারই নিদর্শন। শ্রীমধুব্রত।

আঁধি

১৩

সোনাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া [illegible]রের মত ভারী মন লইয়া নিখিল যখন [illegible]ল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া [illegible]সারা পথ নন্দর সঙ্গে নিখিল একটা কথাও বলে নাই,—নন্দও বৈকালে সোনাদের বাড়ী গিয়া ব্যাপার দেখিয়া এমনি হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল যে তাহারো একটা কথা কহিবার শক্তি ছিল না। সমস্ত ব্যাপারখানা হেঁয়ালির মতই তাহার মনে হইতেছিল। সেই আর একদিন সে আসিয়াছিল ত, সেদিন ঐ কুঁড়েয় কি আমোদ আর উল্লাসের সাড়াই না পড়িতে দেখিয়াছিল, আর আজ? ছায়াবাজির মতই একটা ছোট প্রাণী কোথায় মিলাইয়া গেল, আর তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল এখানকার যা-কিছু আমোদ-উল্লাস, হাসি-গান, আর আলো-সুর! সে বেচারা কাহারো সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও করে নাই, তবু তাহার মন এমনি এক অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া গিয়াছিল যে সারা পথ সে ঐ নিখিলের গুম-হওয়া চলন্ত মূর্ত্তির পিছনে ষ্টীমারের পিছনে বাঁধা দাঁড়ি-মাঝি-হীন ছোট নৌকার মতই ভাসিয়া আসিতেছিল! নিখিলের এমন স্তব্ধ-গম্ভীর মূর্ত্তি সে জীবনে কখনো দেখে নাই! বাড়ীতে বাপের শাসন যতই থাক্, তা বলিয়া এমন! দেখিয়া শুনিয়া নন্দও তাই গুম্ হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে বলিয়া সুষমা একটু ব্যাকুল হইয়া নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোধূলির ম্লান আলোয় আশে-পাশে ঘন-বিন্যস্ত গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সুদূর পথে দুই চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল—কোথায় নিখিল? কাহারো চিহ্ন নাই! কেন পাঠাইলাম তাহাকে? রাত হইয়া গেলে বাড়ীতে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে—এই ভাবনাই সুষমার বেশী হইয়াছিল। নন্দর উপর রাগ ধরিতেছিল। কেমন লোক

সে? মনিবকে কি জানে না? মনিবের হুকুম কি সে শোনে নাই? সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহিরে থাকা হইবেই না—তা সে মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ুক, কি প্রলয়ের মেঘ দিক্-দিগন্ত আঁধারে ছাইয়া ফেলুক! এ ত মাথার উপর নির্ম্মল মেঘহীন আকাশ—গাছের আড়ালে ছোট-এক-টুকরা চাঁদও ঐ দেখা দিয়াছে!

এমনি ভাবনায় ভয়ে রাগে সুষমার মন যখন বিষম দোল খাইতেছিল, তখন নন্দর সঙ্গে ধীরে ধীরে নিখিল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুষমা বলিল,—এত দেরী করেছ! নন্দ, তুই কি লোক, বল্ দিকি! বাবু রাগ করবে তা হুঁসও নেই! নে, লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে চ।

লণ্ঠনটা পথেই বসানো ছিল। সেটা নন্দ হাতে তুলিয়া লইল। সুষমা তখন নিখিলের পানে চাহিয়া বলিল,—চল নিখিল,-বাড়ী চল—জোরে জোরে—এই অবধি বলিয়াই নিখিলের শুষ্ক শোকার্ত্ত মুখের উপর নজর পড়িতেই সুষমা শিহরিয়া উঠিল। এ কি শ্রী তাহার! বিস্ফারিত দুই চোখে বিস্ময় ও কৌতূহল পূরিয়া সুষমা নিখিলকে একরকম বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে নিখিল? অসুখ করছে না কি? না, গা ত ভালো।

মেঘ-গম্ভীর আকাশ যেমন এক দম্‌কা হাওয়ার বেগে ফাটিয়া বৃষ্টির ধারায় চরাচর ভাসাইয়া দেয়, সুষমার এই স্নেহের হাওয়া লাগিয়া নিখিলের রুদ্ধ শোক মুহূর্ত্তে তেমনি অশ্রুর সহস্র ধারায় ফাটিয়া ঝরিয়া পড়িল। শোকের বেগ সামলাইতে না পারিয়া দুই হাতে সুষমাকে জড়াইয়া নিখিল তাহার বুকে মুখ গুঁজিল। সুষমা তাহার মাথায় হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল,—কাঁদচো কেন নিখিল? কি হয়েছে? বল।

করুণ শোক প্রচণ্ড কান্নার ঢেউ তুলিয়া নিখিলের মনের মধ্যে গর্জ্জন করিয়া ছুটিতে লাগিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। বারবার প্রশ্ন করিয়া জবাব না পাইয়া সুষমা নন্দর পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে রে, নন্দ? নিখিল পড়ে-টড়ে গেছল না কি কোথাও? দুর্ভাবনায় সুষমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।

নন্দ বলিল,—যাদের বাড়ী গেছলুম, তাদের বাড়ীর সেই মেয়েটি মারা গেছে, মা।

এ্যাঁ—! সুষমাকে যেন কে আকাশে তুলিয়া হঠাৎ তখনি দুই হাতে ছুড়িয়া এক কঠিন পাহাড়ের গায়ে ফেলিয়া দিল। মেয়েটি—সোনা? সে নাই?

নিখিল সুষমাকে জড়াইয়া ধরি[illegible] মত তাহার বুকে মাথা কুটিতে [illegible] সুষমা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—শোনো শোনো—

—না, না—ওমা, সোনা? কোথায় সোনা? বলিয়া পাগলের মতই পথে দুই ঠুকিয়া সে বিষম কান্না জুড়িয়া দিল।

কোনমতে তাহাকে ভুলাইতে না পারি সুষমা বলিল,—কেঁদো না। শোনো নিখিল, ছি, রাস্তায় এমন করে কাঁদে কি! রাত হয়ে যাচ্ছে, চল, বাড়ী চল। জানো ত, নাহলে উনি বক্‌বেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে জড়িতস্বরেই নিখিল বলিল,—বকুক বাবা! আর আমি ভয় করি না। আমি বাড়ীতে থাক্‌তেও চাই না, থাক্‌ব না আর। বাড়ী থেকে আমি পালিয়ে যাব। সোনা

যেখানে গেছে, সেইখানে যাব। চাই না আমি, চাই না তোমাদের বাড়ী যেতে।

শিহরিয়া সুষমা তাহার মাথায়-মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—ছি বাবা, ও সব কথা কি বল্‌তে আছে? মাণিক আমার, ছি—চুপ কর, বাড়ী চল।

—না মা, বাড়ীতে আমি যাব না। নিখিল হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুষমার প্রাণেও এ সংবাদ কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল—সেই হাসির মত ছোট্ট সুন্দর মেয়েটি—মা-বাপের বাছা! আহা! জোর করিয়া সে কাঁটার বেদনা চাপা দিয়া সুষমা বলিল,—যাবে না বাড়ী? আমার কথা শুনবে না তাহলে? বেশ, আমিও তাহলে কাঁদি—কেমন? সুষমার কণ্ঠের স্বর ভারী হইয়া উঠিল।

সেটুকু নিখিলের লক্ষ্য এড়াইল না। [illegible] পানে চাহিল। চাহিতেই লণ্ঠনের [illegible]খিল, সুষমার চোখ যেন কেমন হ[illegible]াছে। সে ডাকিল,—মা, অ মা—

—কেন?

—সোনা কোথায় গেল?

সুষমা গাঢ়স্বরে বলিল,—স্বর্গে গেছে, বাবা, ভগবানের কাছে। তার জন্যে কি কাঁদে!

নিখিল বলিল,—বড় হলেই ত মানুষ ভগবানের কাছে যায়,—সোনা ত ছেলে মানুষ!

সুষমা অতিকষ্টে নিশ্বাস চাপিয়া বলিল,—যারা ভালো হয়, লক্ষ্মী হয়, ভগবান তাদের ভালবাসেন কি না, ভাল বেসে তাই নিজের কাছে নিয়ে যান্।

নিখিল একটু স্থির থাকিয়া বলিল,—আমি যদি খুব লক্ষ্মী হই? ভালো হই—?

বালাই! [illegible] সুষমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল,—রাত হয়ে যাচ্ছে নিখিল—আর এ পথে থাকে না। চারধারে ঝোপ-ঝাপ, সাপ-খোপ বেরোয় যদি? লক্ষ্মী বাবা আমার, বাড়ী এসো।

নিখিল স্থির হইয়া মার হাত ধরিয়া বাড়ীর পথে চলিল,—নন্দ আগে আগে লণ্ঠন দেখাইয়া যাইতেছিল।

খানিকটা পথ আসিয়া নিখিল বলিল,—তুমি বল্‌লে না মা?

—কি কথা বাবা?

—যা আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

—কি কথা?

—আমি যদি লক্ষ্মী হই, ভালো হই, তাহলে ভগবান আমাকেও ত তাঁর নিজের কাছে সোনার কাছে নিয়ে যাবেন?

আবার ঐ কথা! সুষমা ভয়ে কাঠ হইয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া নিখিলের মুখে চুম্বন করিয়া বলিল,—ছি বাবা, ও কথা বলতে নেই। মা-বাপ বেঁচে থাকলে ভগবান ছেলেমেয়েদের নিয়ে যান্ না—মা-বাপের মনে কষ্ট হবে যে তাহলে!

নিখিল বলিল,—সোনারও ত বাবা আছে, মা আছে,—সোনাকে তবে নিয়ে গেলেন কেন?

সুষমা বলিল,—সোনার বাবা সোনার মা হয়ত কোন পাপ করেছিল, সোনার মনে হয়ত সেজন্য দুঃখ হয়েছিল—

একটু উৎফুল্ল স্বরে নিখিল অমনি বলিয়া উঠিল,—আমার বাবা যখন তোমায় বকে, আমায় বকে,— তখন আমারো ত খুব দুঃখ হয় মা, আমিও কাঁদি ত—তাহলে ভগবান আমাকে কেন তাঁর কাছে নিয়ে যান না?

—আবার ঐ কথা নিখিল? ছি! আমি ভারী রাগ করব এবার। চুপ করে তাড়াতাড়ি এখন বাড়ী চল। রাত হয়ে যাচ্ছে, তা দেখচ কি!

নিখিল একেবারে দুমড়াইয়া গিয়া মিনতির সুরে বলিল,—না মা, রাগ করো না মা—আর আমি কখ্খনো ও কথা বল্‌ব না। তোমার কষ্ট হয় ওকথা শুনলে?

—হয় না?

—তবে আর বলবো না মা।

১৪

বাড়ী আসিয়া রাত্রে নিখিল বাঁধা নিয়মে বই খুলিয়া বসিল, কিন্তু একটা লাইনও পড়িতে পারিল না। বুকের মধ্যে কেমন একটা বেদনা যেন ক্রমাগতই ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, এত বড় পৃথিবীখানা হঠাৎ যেন চুপ্‌সিয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে, আর তাহার মধ্যে যত লোকজন ছিল, সকলের বুকে-বুকে মুখে-মুখে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিয়া থ্যাব্‌ড়াইয়া কাল-গোল পাকাইয়া সব বিশ্রী একাকার হইয়া গিয়াছে! গাছে গাছে পাখীগুলার কণ্ঠও সেই সঙ্গে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, হাওয়া বন্ধ, আলোও যেন চিরদিনের জন্যে নিবিয়া গিয়াছে; আর সুযোগ পাইয়া চারিধারে রাশি রাশি অন্ধকার অমনি জমাট বাঁধিয়া ক্রমেই যেন একটা দৈত্যের আকার ধরিয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে! অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া কোনমতে সেই কালো দৈত্যটার হাতের ফাঁক দিয়া গলিয়া ছুটিয়া সে এখন পলাইতে চায়—কোথায় আলো, ওগো কোথায় হাওয়া! চোখের কোণে জলও ঠেলিয়া-ঠেলিয়া আসিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা দুই চোখের সাম্‌নে জাগিয়া উঠিতেছিল, সেদিনকার সেই দৃশ্য—নিঝুম দুপুরে রৌদ্র-ছায়ায় ঘেরা পথের উপর সোনা আসিয়া তাহাদের বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়াছে! সঙ্গে তাহার বাপ বনমালী। সোনার করুণ চোখের অধীর দৃষ্টি এই প্রকাণ্ড বাড়ীময় নিখিলকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—আর নিখিল? সে যেন ছাদের এক কোণে ঘুলঘুলিটার ফাঁক দিয়া নীরব নত নেত্রে সোনাকে লক্ষ্য করিতেছে! দেখিতে দেখিতে সোনার দৃষ্টি যেন হাওয়ার মত ছাদের উপর ভাসিয়া উঠিল, আর নিখিলও ভয়ে-ভয়ে ঘুলঘুলির ধার ছাড়িয়া সারা ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, সোনার দৃষ্টির হাওয়াও অমনি [illegible] ঘূর্ণি বাতাসের মত তাহার পি[illegible] ছোটা সুরু করিয়া দিল।

হঠাৎ মাষ্টার মশায় বলিলেন,—তুমি আজ মোটে পড়ছ না নিখিল। পড়ায় তোমার আজ মন নেই, দেখ্‌চি।

নিখিল [illegible],—ঘুম পাচ্ছে, মাষ্টার মশায়

মাষ্টার মহাশয় [illegible] করিলেন, নিখিলকে আজ বড় শ্রান্ত দেখাইতেছে। কিন্তু কি করিবেন তিনি? তাঁহার উপর হুকুম আছে, এটা নিখিলের পড়ার সময়,—পড়ার নিয়ম ঠিক থাকা চাই [illegible] তাহার ব্যতিক্রম না হয়! জড়িতস্বরেই নিখিল

অথচ নিখিলের শরীর-মন আজ একান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়ের প্রাণ কাতর হইল। আহা, বেচারী! কিন্তু ছুটি

দিলে কর্ত্তা যদি রাগ করিয়া নিখিলের শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া বসেন! একটু ভাবিয়া মাষ্টার মশায় বলিলেন,—একটু পড়ো, তাহলেই ছুটি দেব। চেঁচিয়ে পড় দেখি—তাহলে ঘুমও ছেড়ে যাবে।

নিখিল বলিল,—চেঁচিয়ে পড়তে পারছি না, মাষ্টার মশায়!

নিখিলের চোখে এমন অসহ্য কাতরতা ফুটিয়া উঠিল যে মাষ্টার মহাশয় তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এমন শীর্ণ মুখ, শ্রান্ত দৃষ্টি! নিখিলের মুখ যেন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে!

মাষ্টার মশায় তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—কি অসুখ করছে নিখিল? আমায় বল দিকি।

নিখিল মাষ্টার মহাশয়ের বুকে মাথা [illegible]কেবারে প্রশ্ন তুলিল,—মানুষ মরে [illegible]াষ্টার মশায়! মরে তারা কোথায়

নিখিলের মুখে হঠাৎ এত বড় অভিনব প্রশ্ন শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। এ কথা কেন? এ কথার মানে? মাষ্টার মশায় চুপ করিয়া নিখিলকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কোন জবাব দিলেন না।

নিখিল বলিল,—বলুন না মাষ্টার মশায়, —মানুষ কেন মরে যায়? আর মরে তারা যায় কোথায়?

মাষ্টার [illegible]া, বলিলেন,—তা কি মানুষে কাছে নিয়ে যান! ?

নিখিল বলিল,—মা বলে, ভগবান যাকে ভালবাসেন, সেই মরে যায়—তা কি সত্যি? ভগবান তাহলে মা-বাপের মনে দুঃখ দিয়ে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের নিজের কাছে নিয়ে যান্ কেন? ছেলে-মেয়েদের ত কষ্ট হয়, মা-বাপকে ছেড়ে তাঁর কাছে যেতে? সেখানে মা-বাপের জন্যে তাদের মন কেমন করবে ত?

অত বড় কঠিন প্রশ্নের এমন সহজ সমাধান শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় অবাক হইলেন! বা, সুন্দর জবাব ত! মাষ্টার মহাশয় মুখে কোন কথা বলিলেন না,—শুধু আবাক হইয়া রহিলেন। যে-নিখিল খুব-প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া তাঁহার কাছে একরকম চুপ করিয়াই থাকে, সেই নিখিলের কণ্ঠ সহসা আজ এমন মুখর হইল যে! আবার তার উপর মুখে তাহার একেবারে মরণ-বাঁচনের এমন কথাই বা ফুটিল কেন!

নিখিল আবার প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, ভগবান ত স্বর্গে থাকেন? তা স্বর্গ কোথায়, মাষ্টার মশায়? মা বলছিল, ঐ আকাশের উপর! তাই কি? তাহলে মানুষ ওখানে যাবে কি করে? তা যদি হত তাহলে এই যে এরোপ্লেন হয়েছে, এতে চড়েই ত মানুষ স্বর্গে যেত—মরে আর সেখানে যেতে হত না!

এইটুকু বলিয়া নিখিল থামিল, তারপর আবার বলিল,—তা নয়। না? আকাশের উপর স্বর্গ নয়, থাকতেও পারে না। আকাশটা ত কিছুই নয়—আপনি বলেন, ও ফাঁকা—সেদিন বলছিলেন না, আকাশ শূন্য? এ্যাঁ? আমি সব বুঝি, মাষ্টার মশায়, স্বর্গ হচ্ছে সেই পৃথিবীর শেষে—অনেক দূরে—যেখানে পৃথিবী একদম শেষ হয়ে গেছে, তারপরই মস্ত পাঁচিলে ঘেরা স্বর্গ—না? সেখানে ঢোকবার শুধু একটি

ফটক আছে—না? শুধু যুধিষ্ঠির পৃথিবী পার হয়ে পাহাড় ঘুরে স্বর্গে গেছলেন, জ্যান্ত মানুষ আর কেউ অত কষ্ট করে স্বর্গে যেতে পারে নি। ভীম, অর্জ্জুন—এঁরাও পারেননি—না?

মাষ্টার মহাশয় আজ এই তরুণ ছাত্রটির কল্পনার উৎস এমন ভাবে খুলিতে দেখিয়া যেমন বিস্মিত হইয়াছিলেন, তেমনি মুগ্ধও হইতেছিলেন। বাঃ—কল্পনায় নিখিল এ যে চমৎকার স্বর্গ গড়িয়া তুলিয়াছে!

একটু থামিয়া নিখিল আবার বলিল,—আমি একদিন যাব মাষ্টার মশায়। দূরে, খুব দূরে হেঁটে হেঁটে সমস্ত পাহাড়-পর্ব্বত বয়ে, নদী পার হয়ে সাগর পার হয়ে হেঁটে হেঁটে পৃথিবীর ওপারে সেই স্বর্গে আমি যাব। গিয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করব, কেন তিনি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে নিয়ে যান্? তাদের যদি ভালই বাসেন, তাহলে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যান্ না কেন? কেমন হয় তাহলে—! যারা চলে যায়, তাদেরও—এখানে যারা পড়ে থাকে, তাদের জন্যে মন কেমন করে না! আর সব-ছেলে-মেয়েদের যদি স্বর্গেই নিয়ে যাবেন, তাহলে পৃথিবীতে মা-বাপের কাছে তাদের পাঠান্ কেন?

মাষ্টার মহাশয় ছাত্রের এ মুখরতায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন,—কিন্তু এ কথা কেন নিখিল, হঠাৎ, আজ—?

নিখিলের কল্পনার ফানুস মাষ্টার-মহাশয়ের এ কথায় সহসা ঘা খাইয়া ছিঁড়িয়া নীল আকাশের সান্নিধ্য ছাড়িয়া একেবারে পৃথিবীর বুকে আসিয়া পড়িল। অমনি সোনার শোক জীবন্ত হইয়া বুকে ফুটিল। নিখিল বলিল,—সোনা বলে একটি ছোট মেয়ে ছিল না—ঐ বনমালীদের? সে মরে গেছে। মরে স্বর্গে ভগবানের কাছেই গেছে ত সে? কিন্তু তার মা-বাবা এখানে দুঃখ পেয়ে যে কাঁদচে, ভগবান তা দেখ্‌ছেন না কেন? দেখে তাদের সোনাকে তাদের কাছেই আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন না কেন? বইয়ে লেখা আছে, ভগবান কারুণিক—কারুণিক মানে দয়ালু ত? তা এই বুঝি তাঁর দয়া!

নিখিল চিরদিনই মুখ-চোরা। কিন্তু এ কি! আজ তাহাকে সহসা এতখানি মুখর হইতে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় অবাক হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,—সেই বনমালী? সেই সেবার এক জল ঝড়ের রাত্রে যাদের বাড়ী তুমি বসেছিলে, তারপর তার সঙ্গে ফিরছিলে, পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হল—সেই না

নিখিল বলিল,—হাঁ।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—তা মারা গেছে?

নিখিল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আহা!

মাষ্টার মহাশয়ের এই সমবেদনার আ শুনিয়া নিখিল বলিল,—সেই ত সোনা। ভালো মেয়ে ছিল। আমাদের বাড়ী এক এসেছিল সে মাষ্টার মশায়—একদিন দু বেলায়—আমি তখন আপনার কাছে বসে পড়ছিলুম।

মাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন, সেই সমবয়সী মেয়েটির বিয়োগ-বেদনা নিখিলের প্রাণে খুবই বাজিয়াছে; বুঝিয়া তাহার পানে শুধু চাহিয়াই রহিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না।

নিখিল বলিল,—তবু আমি লুকিয়ে একবার বাইরে গেছলুম, তাকে বলতে যে আমি এখন পড়চি, বাড়ী যাও। বাবা দেখতে পেলে তাকে বকে যদি? তার পর একটু থামিয়া বলিল,—তাই হলোও। সে মার কাছে গেছল,—মা আমাকে সেই ডেকে পাঠালে না? সেই যে একদিন বিন্দে ডাকতে এলো, আপনি বললেন, যাও নিখিল, শুনে এসো। তার পর যেই উপরে গেছি, অমনি বাবা এল, —এসে আমায় এমন ধমক দিলে সোনার সাম্‌নে—নিখিলের দুই চোখে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মাষ্টার মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস বুকে চাপিয়া নিখিলের পানে কেমন বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিলেন। বড় লোকের ছেলে আইনের গণ্ডীতে বাঁধা নিখিল,—তাহার প্রাণে গরিবের মমতা!

ভাঙা স্বরে নিখিল বলিল,—সোনা বল্‌ত রাজপুত্তুর—মাকে বল্‌ত রাণী-মা। তার রাণী-মাকে সেদিন সে দেখতে এসেছিল।

নিখিলের মুখে আর কথা বাহির হইল না। দুই চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া শুধু জলের ফোঁটা খোলা বইয়ের পৃষ্ঠায় অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—যাও নিখিল, আজ আর পড়তে হবে না। আজ তোমার ছুটী।

নিখিল সজল চোখে মাষ্টার মহাশয়ের পানে চাহিয়া বলিল,—না। বাবা বক্‌বে।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—ভয় নেই, বকবেন না। বকেন যদি ত বলো, মাষ্টার মশায় ছুটী দিয়েছেন—তারপর যা বলবার, আমি বলবো।

কৃতজ্ঞতায় নিখিলের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে শুধু ডাকিল,—মাষ্টার মশায়—

মাষ্টার মহাশয় সস্নেহে নিখিলের পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন,—তুমি শোও গে নিখিল, আজ আর পড়তে হবে না।

নিখিলও তাই চাহিতেছিল। কোনমতে লোকজনের ভিড় ঠেলিয়া আড়ালে বিছানায় গিয়া যদি একবার সে ঢুকিতে পায়! তাহা হইলে এই রুদ্ধ বেদনাকে সে একবার প্রাণ খুলিয়া উজাড় করিয়া দেয়! সেই যে তাহার সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়া মলিন মুখে সোনা সেদিন ফিরিয়া গিয়াছে—তারপর বাগানে ফুল লইয়া গেলেও সোনার সেদিনকার সেই মলিন মুখের স্মৃতি ছুরির ফলার মতই আজ নিখিলের বুকে বিঁধিতেছিল। সমস্ত বুক ছিঁড়িয়া রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই ছুটী পাইয়া সে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

১৫

নিখিল চলিয়া গেলে মাষ্টার মহাশয় অনেক-ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিখিলের কথা মনের মধ্যে একটা দোল দিয়া ছিল। মনে হইতেছিল, মাহিনা খাইয়া শুধু ইহার পড়াই বলিয়া দিয়াছি,—কোনদিন মনের পানেও চাহিয়া দেখি নাই ত! এই ছোট শিশু—পড়ার ভারে নিয়মের চাপে বুক-পিঠ টন্ টন্ করিয়াছে, মনটা পিষিয়া ধুলা হইবার মত হইয়াছে, তবু ক্রমাগত তাহার মনে কামারের হাতুড়ি ঠুকিয়াছি,—পড়, পড়! ঘুমে চোখ তাহার আচ্ছন্ন

হইয়া গিয়াছে, অসুখে মাথা দপ দপ করিয়াছে, তবুও রেহাই দিই নাই—চোখে জল দেওয়াইয়া কট্-মট্ করিয়া বইয়ের পানে দৃষ্টিটাকে উপড়াইয়া বাহির করিয়া আনিয়া সজোরে শুধু হাতুড়ি চালাইয়াছি,—পড়, পড়! নিখিলও অমনি পড়িয়া গিয়াছে। উস্কখুস্ক বেশ, মলিন মূর্ত্তি—তবুও মাহিনা-ভোগী মাষ্টারের প্রাণে এতটুকু মমতা জাগে নাই! কেন—? না, এই পঞ্চাশ টাকার মাহিনা ও খোর-পোষের সব বাঁধন পাছে কাটিয়া যায়! তীব্র অনুশোচনায় আজ এই প্রথম মাষ্টার মহাশয়ের প্রাণ ভরিয়া গেল। এ কি মাষ্টার,—না, কসাইয়ের কাজ? ছি!

মাষ্টার মহাশয় ভাবিলেন, এই বাপ! বাপেরই বা এ কেমন প্রাণ! স্নেহের শীতল ছায়া, মিষ্ট কথার স্নিগ্ধ ঝারি—কোনদিন তাঁহার চোখেও পড়ে নাই! কেবলি শাসন, পেষণ, শাসনের তীব্র হুঙ্কার! ছেলেটা চারি দিকের এই কঠিন পাষাণের চাপ সহিয়াও বাঁচিয়া আছে কেমন করিয়া, আশ্চর্য্য! সাধে কি নিখিল সেদিন বলিয়াছিল,—মাষ্টার মশায়, একদিন দুপুর বেলায় আমায় ছুটী দেবেন, আমি চারিধার ঘুরে দেখে আসব!

ঠিক! শাসনের চাপ আর নিয়মের বাঁধনে প্রাণ তাহার জর্জ্জর হইয়া গিয়াছে—সে তাই চায় প্রকৃতির উদার বুকে একটু বেড়াইয়া শ্যামল তৃণ-দল, সবুজ শষ্প আর মুক্ত হাওয়ার পরশ লাগাইয়া প্রাণটাকে একবার চান্‌কাইয়া সরস করিয়া লইতে! বেশ, তাই হোক্! কালই সে-ছুটি তাহাকে দিতে হইবে! ইহাতে কর্ত্তার মেজাজ যদি বারুদের আগুন ছিটায় ত তিনিই তাহার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিবেন, নিখিলের গায়ে তাহার এতটুকু আঁচও লাগিতে দিবেন না!

মাষ্টার মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, প্রতিক্ষণেই কর্ত্তার জুতার শব্দ প্রতীক্ষা করিয়া! প্রত্যহই যে তিনি আসেন তা নয়, তবু আজ সেই দুই পায়ের শব্দই তিনি প্রতিক্ষণে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তা ছাড়া আবার কি জানি, ওধারে যদি ইতিমধ্যে সেই পরিচিত রূঢ় কণ্ঠে ভৎর্সনার তীব্র হুঙ্কার জাগিয়া ওঠে!

কিন্তু ভগবান রক্ষা করিলেন। সে শব্দ, সে হুঙ্কার জাগিল না! মাষ্টার মহাশয় আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া শুইতে গেলেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া নিখিল প্রতিদিনকার মত মার সঙ্গে দেখা করিল না, মুখ-হাত ধুইয়া খাবার খাইয়া একেবারে বাহিরে মাষ্টার মহাশয়ের কাছে চলিয়া গেল; মাফিক পড়ার বই খুলিয়া বসিল।

ফাল্গুন মাস। বাহিরে বেশ বাতাস বহিতেছিল এবং গাছের ডালে নানা পাখীর আনন্দ-কলরব সুরের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিল। বই খুলিয়া বসিলেও নিখিলের মন বাহিরে ফাল্গুনের সে উৎসব-কোলাহলে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আজো পড়তে ভাল লাগচে না, নিখিল? না! নিখিল কিছু না বলিয়া মাষ্টার মহাশয়ের পানে চাহিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—একটু পড়, তারপর দুপুর বেলা তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাব'খন। নিখিলের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। মুক্তির হাওয়া প্রাণে যেন স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া দিল। পরক্ষণেই সে হাওয়ায় একটু আগুনের

আঁচও দেখা দিল। নিখিল বলিল,—বাবা বকবে না?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—তাঁকে বলেই যাব—বুঝলে?

আঃ! কৃতজ্ঞতায় নিখিলের মন ভরিয়া গেল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া নিখিল বলিল,—আচ্ছা। এখন বেশ করে পড়ে নি তবে।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—হ্যাঁ, পড়। রোজ-রোজ পড়াশোনা করতে হলে মাঝে মাঝে ছুটি চাই বৈ কি। তা আজ তোমায় সে ছুটি দেব।

নিখিল বলিল,—আজ তাহলে নিশ্চয় ছুটি পাব? বাবা বারণ করবে না?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—না। আজ নিশ্চয় ছুটি পাবে।

—আমি তাহলে পড়ি মাষ্টার মশায়। খুব [illegible]ব, দেখবেন।

[illegible]হাশয় ভারী খুসী হইলেন, পড়ায় [illegible]াজ এই অত্যন্ত মনোযোগ দেখিয়া। ছুটির একটু আভাষেই মন যখন এমন হাল্‌কা হইয়া গেল, তখন ছুটি মিলিলে মনের কাগে আর এতটুকু ভার থাকিবে না! [illegible]র ফল কি সামান্য! এতদিন এ কথাটা যদি তিনি জানিয়া দেখিতেন! কি করিয়া দেখিবেন? তাঁহার চোখ ঐ মাহিনার টাকার পিছনে নিয়মের আগড়ে বাঁধা ছিল যে। ছি—ধিক্ এমন টাকায়! মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া বিবেক খোয়াইয়া এমন চাকরিতেও ধিক্!

নিখিল তখন ব্যাকরণ মুখস্থ করিতেছিল—আকারের পর উ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়—যথা, মহা ছিল উপকার, মহোপকার; ছায়া ছিল উপবিষ্ট, ছায়োপবিষ্ট।

১৬

দশটার সময় আহার সারিয়া নিখিল আসিয়া সুষমাকে ডাকিল—মা।

সুষমা তখন কি-একটা তরকারী কুটিয়া দিতেছিল, বলিল,—কেন নিখিল? ডাকচ?

নিখিল বলিল,—একটা কথা বলব মা?

—বল।

নিখিল সুষমার গলা জড়াইয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল,—আজ দুপুর বেলা আমার ছুটি। মাষ্টার মশায় ছুটি দিয়েছেন, পড়তে হবে না।

নিখিলের কালিকার সেই শোকার্ত্ত গুমট ভাব দেখিয়া সুষমা বিষম চিন্তিত হইয়াছিল। রাত্রে তাহাকে কত পীড়াপীড়ি করিয়াও এক বাটি দুধ ছাড়া আর কিছুই খাওয়াইতে পারে নাই; আজ সকালেও সে সুষমার সঙ্গে দেখা করে নাই! এজন্য সুষমার মন খুবই অস্থির হইয়াছিল। পরে আজ স্নান করতে আসিয়া অবধি তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া সুষমা একটু সুস্থির হইতে পারিয়াছিল। সকাল হইতে কোন কাজে যে-মন লাগাইতে পারে নাই, সে-মন একটু একটু করিয়া সাফ্ হইতেছিল—এখন নিখিলের এই স্বচ্ছ সরল উল্লাসে সে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, বলিল,—বেশ, এখন কি করবে?

নিখিল বলিল,—মাষ্টার মশায় আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলেছেন।

সুষমা বলিল,—বেড়িয়ে এসে আমায় গল্প বলো—কেমন?

নিখিল বলিল,—হ্যাঁ মা, বলবো।

নিখিল লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

সুষমা কাজ ফেলিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

বাহিরে গিয়া নিখিল মাষ্টার মহাশয়কে তাড়া দিতে লাগিল,—চান্ করুন না মাষ্টার মশায়। কখন যাবেন?

মন তাহার আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে পাখীর কলরব ও হাওয়ার ঝরণা মায়ার প্রলোভন তুলিয়া তাহাকে কেবলি ডাকিতেছিল, আয় রে, শীঘ্র বাহিরে চলিয়া আয়! মাষ্টার মহাশয় স্নান করিতে গেলেন—নিখিল একা ঘরের মধ্যে থাকিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। গাছে ফুলের কাছে কাছে দুইটা প্রজাপতি ঘুরিয়া ফিরিতেছিল,—লালে-নীলে কালোয়-সাদায় বাঙানো তাদের বিচিত্র পাখা! নিখিল প্রজাপতি ধরিতে তাহাদের পিছনে ছুটিল। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে পুকুর-পাড় ঘুরিয়া, মন্দির ছাড়াইয়া সে একটু দূরে গিয়া পড়িল। প্রজাপতিও শেষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে প্রজাপতি খুঁজিতেছে, এমন সময় কানে গেল, এক পাখীর ডাক। একটা ঘুঘু কোন্ গাছে পাতার আড়ালে বসিয়া করুণ তান ধরিয়াছিল, ঘু-ঘু-ঘু। সে ডাকে প্রাণ কেমন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হইল! মুগ্ধ নিখিল প্রজাপতি ছাড়িয়া তখন ঘুঘুর খোঁজে চলিল। আমের বোউলে গাছের ডালপালায় আকুল মদির গন্ধ ছুটিয়াছে,—মত্ত মৌমাছিরা অলস গুঞ্জনে সারা বন মুখর করিয়া তুলিয়াছে—নিখিলের মন সে গন্ধে সে গুঞ্জনে মাতাল হইয়া উঠিল। বাড়ী ভুলিয়া ঘর ভুলিয়া শাসন ভুলিয়া সে তখন বনে-বনে পাগল হাওয়ার মতই ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। এমনি ঘুরিতে ঘুরিতে সে, এক সময় বাগান-মাঠ পার হইয়া নদীর ধারে আসিয়া পড়িল। আঘাটায় দুই-চারিটী নারী স্নান করিতেছিল, তাহাদের একটি কালো ছেলে জলে সাঁতার দিতেছিল—নিখিল তীরে দাঁড়াইয়া সাঁতার কাটা দেখিতে লাগিল। ছেলেটা স্নান সারিয়া ক্রমে তীরে উঠিল এবং গা মুছিতে মুছিতে বনের পথ ধরিয়া গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিখিলও তখন নদীর ধার দিয়া বরাবর চলিতে লাগিল। নদীর এপারেই ক্রমে বনের শেষে খোলা মাঠ আসিয়া দেখা দিল। মাঠে একটা রাখাল-ছেলে বড় অশথ গাছের তলে ছায়ায় মোটা গুঁড়িতে ঠেশ দিয়া বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছিল। নিখিল সে বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পাশে বসিল। রাখাল-ছেলে বাঁশী রাখিয়া কথা কহিল। তাহার সঙ্গে নিখিলের তখন হইল—কোথায় ঘর, কে আছে? ে রাখাল-ছেলে আবার বাঁশীতে তা নিখিল বাঁশীর সুরে মুগ্ধ মনে সব ভুলিয়া সেইখানেই বসিয়া গেল।

যখন রাখাল-ছেলের বাঁশী থামিল, সূর্য্য তখন মাঠের মাথার উপরকার সমস্ত আকাশটাকে লাল রঙে রাঙাইয়া পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। রাখাল-বালককে বাঁশী রাখিয়া দল জড়ো করিতে দেখিয়া নিখিলের হুঁস হইল, তাইত, সে এ কি করিয়াছে! ছুটি, ছুটি—ছুটি ত মিলিয়াছিল, কিন্তু সে কি সর্ত্তে? আর মাষ্টার মহাশয়কে ফেলিয়া সে একা এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? সারা দিন ঘুরিয়া কোন্ পথে সে এ অজানা মাঠে আসিয়া পড়িল? কি করিয়া কোন্ পথেই বা এখন বাড়ী ফিরিবে?

রাখাল-বালক দল জড়ো করিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে মাঠ পার হইয়া ওদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। যতক্ষণ শুনা যায়, নিখিল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাঁশীর সুর শুনিল। সুর ক্রমে দূর-সীমান্তে মিলাইয়া গেল। এত বড় খোলা মাঠে নিখিল এখন একা! ওদিকে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিতেছে,—আকাশের এক কোণে ম্লান চাঁদ আসিয়া দেখা দিয়াছে! নিখিলের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিলেও চলে না! এখনই রাত্রি হইবে। দূরে তাল গাছের ঘন কুঞ্জ দেখা যাইতেছিল, নিখিল সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল,—ঐ পথে যদি গ্রামের কোন সন্ধান মেলে!

১৭

[illegible]র সময় মাঠে দাঁড়াইয়া নিখিল [illegible]ছেলের দূর হইতে ভাসিয়া-আসা [illegible]শায় সুরে পথ খুঁজিতেছিল, বাড়ীতে ওদিক তখন হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল। বেচারা বনমালী কন্যার শোকে কাতর [illegible]ত লইয়া জমিদার বাবুর মস্ত বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যদি একবার নিখিলের দেখা পায়! তাহাকে বুকে তুলিয়া, তাহার সঙ্গে দুইটা কথা কহিয়া প্রাণের বেদনা যদি একটু ঘুচাইতে পারে!

সারা বাড়ীতে তখন নিখিলের খোঁজ চলিয়াছিল। অভয়াশঙ্করের গর্জ্জনে মাষ্টার মহাশয় লোকজন লইয়া গ্রামময় নিখিলের খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সুষমা ঠাকুর-ঘরের দ্বারে ধর্ণা দিয়া পড়িয়াছিল, আর অভয়াশঙ্কর ব্যাকুল চিত্তে তপ্ত ঝাঁজ লইয়া ঘর-বাহির করিতেছিলেন—হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বনমালীকে দেখিলেন, দেখিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—কে তুমি?

অত্যন্ত করুণ কুণ্ঠিত স্বরে বনমালী নিজের নাম বলিল।

এই সে লোকটা! অভয়াশঙ্কর বলিলেন—নিখিল তোদের বাড়ী গেছে?

ভীত কুণ্ঠিত স্বরে বনমালী আবার বলিল—না।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কোথায় গেল সে তবে? সারাদিন খোঁজ নেই, খপর নেই?

বনমালী বলিল,—আজ তিনি আমার ওখানে যাননি ত। কাল গেছলেন বটে,—আসবার সময় বলে এসেছিলেন, আবার যাবেন। তা যাননি! কোথায় কার কাছেই বা যাবেন? আমার সে মেয়েটি ত নেই, মারা গেছে—অভয়াশঙ্করের তীক্ষ্ণ শ্রুতি এই কথাটার উপর থমকিয়া থামিয়া পড়িল। কাল গিয়াছিল? কাল? কেমন করিয়া গেল? কাল সে নৌকায় বেড়াইতে গিয়াছিল,—না?

অভয়াশঙ্কর খোলসা বুঝিবার জন্য আবার প্রশ্ন করিলেন,—কাল গেছল নিখিল? কখন গেছল?

বনমালী বলিল,—বিকেলে। আমি বাড়ী ছিলুম না, আমার পরিবার বললে। কাল ভোরে শ্মশান থেকে ফিরে বাড়ীতে আর টিঁকতে পারিনি, বেরিয়ে পড়েছিলুম। ঐ এক মেয়ে—আর ত নেই! এই অবধি বলিয়া একমুহূর্ত্ত থামিয়া বনমালী একটা নিশ্বাস ফেলিল; ফেলিয়া আবার বলিল,—রাত দশটার পর বাড়ী ফিরে শুনলুম, উনি গেছলেন। ওঁকে দেখে আমার পরিবার একটু ঠাণ্ডা হয়েছে

তাই এসেছিলুম দেখতে, আর বলতে,—কাল যদি বেড়াতে বেড়াতে একবার—

বনমালীর কথায় বাধা দিয়া অভয়াশঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—হবে না তা। আজ সে বাড়ী নেই। ফিরুক,—কাল থেকে ঘরের মধ্যে তাকে বন্ধ থাকতে হবে। কোথাও বেরুতে পাবে না—বেড়াতেও না! কথাটা বলিয়া শ্রোতার পানে তিলার্দ্ধকাল না চাহিয়াই অভয়াশঙ্কর বাড়ীর মধ্যে ফিরিলেন। বিরক্তির ঝাঁজে সমস্ত প্রাণ দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—ইচ্ছা হইতেছিল, এ আগুনে সারা বিশ্ব-সংসারটাকে যদি জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিতে পারা যাইত।

উপরে উঠিয়া এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া তিনি দোতলার খোলা ছাদে আসিলেন। ছাদের এক কোণে ঠাকুর-ঘর। ঠাকুর ঘরের দ্বারে সুষমা উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল!

অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—সুষমা—

সুষমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এসেছে নিখিল? এইমাত্র আমি স্বপ্ন দেখছিলুম, নিখিল বাড়ীর দোরে এসে—এই অবধি বলিয়াই সন্ধ্যার সেই ম্লান আলোতেই স্বামীর যে-মূর্ত্তি তাহার চেখে পড়িল, তাহাতে তাহার বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। তবে কি কোন দুঃসংবাদ··· ?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কাল নিখিল তোমার সঙ্গে নৌকোতেই ছিল বরাবর?

সর্ব্বনাশ! এ কথা কেন? তবে কি সে সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে! কিন্তু কেমন করিয়া হইল? নন্দ—? না, তা কখনই সম্ভব নয়! তবে?

তবে কি নিখিলই বাড়ী ফিরিয়া শাসন-যন্ত্রের চাপে সমস্ত কবুল করিয়া ফেলিয়াছে! সুষমা ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিল না, কাঁটা হইয়া রহিল। অভয়াশঙ্কর তীব্র স্বরে বলিলেন,—বল।

সুষমা বলিল,—এবারটি মাপ কর তাকে। তার সে মিনতি যদি তুমি কানে শুনতে, সেই কাতর চোখ—

অভয়াশঙ্কর গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—ঢের হয়েছে। আর মায়ায় কাজ নেই! আজ থেকে নিখিলের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক রইল না আর। ছুটী, ছুটী, আজ থেকে তোমার ছুটী! বারবার এমনি করে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে তুমি? এতখানি প্রশ্রয় তাকে তুমি যদি না দিতে, তাহলে আজ তার এমন আস্পর্দ্ধা কখনো হতো না যে, সে সারা দুপুর এমনি পথে-ঘাটে টো-টো ক[illegible] পারে! রাত হয়ে এল, তবু [illegible] টিকি দেখবার জো নেই!

সুষমা কাঠ হইয়া ঠাকুর ঘরের চৌকাঠে সামনেই বসিয়া রহিল। স্বামীর পানে মুখ তুলিয়া একটি কথা কহিবারও তাহার সামর্থ্য হইল না।

অভয়াশঙ্কর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কি জ্বালায় যে পড়েচি! চারিধারে সকলে মিলে যেন দারুণ ষড়যন্ত্র করে বসে আছে, জীবনটাকে ঘূর্ণী হাওয়ায় ঘুরিয়ে মারবে! তাও কি শুধু আমার জীবন? ছেলেটাও এ ঝড়ের মুখে চুবন খেয়ে মরছে! তারপর একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—বিমাতার কাছে স্নেহ প্রত্যাশা করা, হুঁঃ! অন্ধ মায়া পাওয়া যায়! সত্য স্নেহ? অসম্ভব! তার মনে যখন দিবারাত্রি কাঁটা ফুটে আছে, সে ভাবচে, এই ছেলে স্বামীর মনের দোরে মস্ত আগড়! এ ভাবনা যে বিমাতার মন থেকে কখনো দূর হয় না, কাজেই—

এ কথায় সুষমা আর স্থির থাকিতে পারিল না, একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিল,—কি! কি বললে তুমি!

অভয়াশঙ্করের রসনায় বিষ ছুটিয়াছিল, সে বিষ সামলাইবার তাঁহার সাধ্য ছিল না। তিনি বলিলেন,—তুমি কি জানো না, এই নিখিলকে এড়িয়ে তোমার পানে চাওয়া আমার পক্ষে কি রকম অসম্ভব ব্যাপার—?

বাধা দিয়া সুষমা বলিল,—এত নীচ আমায় ভাবো তুমি! কোনদিন তোমার কাছে কোন-কিছুর প্রত্যাশী হয়ে ভিক্ষাপাত্র ধরেছি আমি? কোন অভাব, কোন অনুযোগ [illegible] কখনো—? তবে? হায়রে, সে [illegible]লেন, তুমি কি জানবে?—তবু [illegible]ই ঠাকুর-ঘর—সেখানে নারায়ণ আছেন, আর আমায় তুমি ভালবাস না, অগ্রাহ্য কর,—জানি তবুও তুমি স্বামী, নারীর দেবতা, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে—এই দুই দেবতার সামনে বড় গলায় বল্‌চি আমি, যদি কখনও নিখিলের অহিত চিন্তা করে থাকি, কোন দিন স্বপ্নেও [illegible] আমি তার হিংসা করে থাকি, তাহলে [illegible] আমি, নারীর জীবনে যা সব-বড় অভিশাপ, তাই যেন বজ্র হয়ে আমার মাথায় পড়ে! আমি যেন বিধবা হই! শুধু বিধবা কেন? জন্ম-জন্ম আমি যেন পথে-পথে এক মুঠো অন্নের জন্যে ভিক্ষে করে বেড়াই, আর সে ভিক্ষেও আমার না মেলে—!

সুষমার সমস্ত অন্তরখানা যেন আগুনে জ্বলিয়া-জ্বলিয়া ছাই হইতেছিল।

অভয়াশঙ্কর স্তব্ধ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া সরিয়া যাইতেছিলেন, সুষমা একটু থামিয়া দম লইয়া বলিল,—দাঁড়াও, শুনে যাও।

অভয়াশঙ্কর যন্ত্র-চালিতের মত ফিরিলেন। সুষমা বলিল,—নিখিল ফিরুক! ভগবান করুন, তার যেন কোন অকল্যাণ না হয়! তবে ফিরলে তাকে কিছু বলো না, এবারকারের মত মাপ করো। তার মনে যে বেদনা জন্মেছে, তাতে তোমার শাসন এখন এতটুকু সে সহ্য করতে পারবে না। তার মঙ্গল ভেবে, তার মুখ চেয়ে, কালকের জন্যে তাকে মাপ করো। আমি সত্যিই তাকে ছেড়ে দিচ্ছি। রাক্ষসী আমি—আমার জন্যেই তার এই খোয়ার। ঠিক বলেচ, আমার সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই। আমিও রাখতে চাই না। শুধু দুদিন সবুর কর। আমি সরে যাচ্ছি,—দুদিন পরে আমি তোমার এ পুরী ছেড়ে চলেই যাব। বিশ্বাস না হয়,—এই ঠাকুর-ঘর, এই ঘরের চৌকাঠে মাথা রেখে শপথ করচি, আজ থেকে নিখিল মুক্ত, আমি তার মা নই, কেউ নই! তার জীবনে দুঃস্বপ্নের মত, অভিশাপের মতই এসেছিলুম। কোন মায়ায় তাকে আর বাঁধবোনা, বাঁধবার নামও করবো না কোন দিন। যদি করি, তাহলে যেন আমায় এমন দুর্ভাগ্য এসে গ্রাস করে, যা ভাবতে মানুষ শিউরে ওঠে!

অভয়াশঙ্কর বজ্রাহতের মত স্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুষমা তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—এবার বিশ্বাস হবে?

অভয়াশঙ্কর উত্তরে কি বলিতে যাইতে ছিলেন, হঠাৎ এমন সময় বাহির-বাড়ীতে কলরব উঠিল,—দাদাবাবু এসেছেন। কোথায়

ছিলে দাদাবাবু ? সারাদিন খুঁজে খুঁজে সকলে সারা হয়ে যাচ্ছি।

অভয়াশঙ্কর চলিয়া যাইতেছিলেন, সুষমা তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া বলিল,—তোমার পায়ে পড়চি, ভিক্ষে দাও গো,—এই শেষ ভিক্ষে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কি ?

—আজ ওকে কিছু বলো না, সব দোষ ওর ক্ষমা কর। কাল থেকে আর ত আমার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই থাকবে না! বল, এ ভিক্ষে দেবে ? ওকে বকবে না ? শাসন করবে না ?

অভয়াশঙ্কর ক্ষণেক শুব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—আচ্ছা।

সুষমা পা ছাড়িয়া ছাদেই বসিয়া পড়িল, অভয়াশঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

১৮

বাড়ীতে ঢুকিয়া নিখিল অনেকখানি রুদ্র শাসনই আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহা হইল না দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া অভয়াশঙ্কর শুধু বলিলেন,—ছুটী ভোগ করেছ ত! এখন খেয়ে নাও গে—খেয়ে বাইরের ঘরে আসবে। আজ রাত্রে আমার কাছে বাইরে দোতলার বৈঠকখানায় শোবে। আজ থেকে সেখানেই শোওয়া। বাড়ীর ভিতরে তোমার আর থাকা হবে না।

এ-কথায় নিখিল বুঝিল, শাস্তির এ এক নূতন ধারা আজ খোলা হইয়াছে! শাসনের ঝাঁজটা যা-কিছু, তা মায়ের উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছে! সে স্থির হইয়া পিতার শাসন মাথা পাতিয়া লইল।

পরদিন সকালে মাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইলেও সে দেখা করিল না। মার উপর একটু অভিমানও হইয়াছিল। বাবা এ দণ্ড দিয়াছে! তা দিক্,—তবু মা জোর করিয়া কেন তাহার উপর নিজের দখল খাটাইতে আসিল না ? বেশ, মা যদি তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে, তবে সেও বা আর না পারিবে কেন ?

দুই-তিন দিন এমনি কাটিল। তিনদিনের দিন—বেলা তখন ন'টা। অভয়াশঙ্কর পড়ার ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেলে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কাল অমন করে পালিয়ে গেলে কেন, নিখিল ? আমি ত সঙ্গে যাব বলেছিলুম—

নিখিলের দুই চোখের পিছনে জল একেবারে ঠেলিয়া আসিল। সবলে সে জল রুখিয়া সে বলিল,—অন্যায় হয়েছিল

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—ত
গুলো বকুনি খেতে হল!

চোখের জল আর বাঁধ মানিল না
ঐ একটি দিন মাষ্টার মহাশয়ের যে করুণা যে মমতার পরিচয় সে পাইয়াছে,মনেই গাঁথা আছে—সে তাহা কখনো ভুলিবে না। সজল চোখে সে বলিল,—আমায় মাপ করুন, মাষ্টার মশায়।

মাষ্টার মশায় [illegible],—মাপ চাইতে হবে না, বাবা। তোমর উপর কি আমি রাগ করতে পারি ? কাল যে তোমায় ফিরে পাওয়া গেছে, আর ভালোয়-ভালোয় সব দিক যে কেটেছে, উনি যে মারধোর করেননি, কি ঘরে বন্ধ করে রাখেননি,—এই মস্ত ভাগ্যি!

নিখিল বলিল,—সে ঢের ভালো হত, মাষ্টার মশায়—এইটুকু বলিয়াই সে কাঁদিয়া

ফেলিল। সে বলিতে যাইতেছিল, ঘরের মধ্যে বন্দী থাকা বা দুই ঘা প্রহার,—সে ত শরীরের উপর খানিকটা আঘাত দিয়াই ক্ষান্ত হইত। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে এই যে শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে, বাড়ীর মধ্যে যাইতে পাইবে না, মার সঙ্গে দেখা হইবে না—উঃ! নিখিলের মনের মধ্যে যাতনার ঝড় তীব্র বেগে ঠেলিয়া উঠিল। মনের যা-কিছু ভাবনা-চিন্তা সাধ-আশা সমস্ত ঐ বাগানের গাছপালার মতই মড়-মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে সব সাফ্ করিয়া মাটীতে লুটাইয়া সে ঝড় তীব্র শ্বাসেই বহিয়া গেল।

তার পর ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে আর সহিবে না! এই শাসন, এই নিষ্ঠুর অত্যাচার—[illegible] বাঁধন যেমন করিয়া পারে, সে [illegible] কাল বাহিরে সারা দিন ঘুরিয়া [illegible]য়াছে—খোলা মাঠে, খোলা [illegible] একটা বাঁশের বাঁশীর সুরে ক সুখ উছলিয়া বেড়ায়! আজ কি তাহার এ ঘর-দ্বারে, আজ কি এ রাজ-ভোগে! গরুর [illegible]ল লইয়া ঐ রাখাল ছেলের মতই সে অবাধ ঐ স্বাধীন গতিতে বায়ু-হিল্লোলের মতই মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইবে, গাছের ছায়ায় শুইয়া বাঁশী বাজাইবে।

তবে সে একা দোসর ছিল সোনা! সোনার কথা অমনি মনে জাগিল। কেন সে চলিয়া গেল ? স্বর্গে ভগবানের কাছে বসিয়া সে কি দেখিতে পাইতেছে না, নিখিলের এখানে কি কষ্ট! সে ভালো নয়, লক্ষ্মী নয়,—না হোক্, তবু সোনা ত ভগবানকে বলিতে পারে, ঐ নিখিলকে লইয়া এসো গো, আমি উহার খেলার সাথী, উহাকে ছাড়িয়া স্বর্গে আমি খেলিব কাহার সঙ্গে ?

কলের পুতুলের মত পিতার ইঙ্গিতে স্নান-আহার সারিয়া নিখিল আবার বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। মাষ্টার মহাশয় আহার করিতে গিয়াছিলেন। ঘরে সে একা,—বসিয়া সোনার কথাই ভাবিতেছিল। স্বর্গে সোনা এখন কি করিতেছে ? তাহাকে দেখিতে পাইতেছে ত! কে জানে!

নন্দ ঘরে আসিল। ধোপা বাহিরে বসিয়া আছে, মাষ্টার মহাশয়ের ময়লা কাপড়-জামা ঘরে জড়ো করা ছিল—সেগুলা লইয়া গিয়া ধোপাকে দিবে।

নিখিল ধীরে ধীরে ডাকিল,—নন্দ।

নন্দ ফিরিয়া চাহিল; নিখিল বলিল,—মানুষ মরে গেলে কি হয় রে নন্দ ?

নন্দ বলিল,—শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

নিখিল বলিল,—তার পর ত স্বর্গে যায় ?

নন্দ বলিল,—তার মনটা স্বর্গে যায়, সে কি আর যায় ? সে ঐ শ্মশানের আশে-পাশেই ঘুরে বেড়ায়! তবে স্বর্গেও যেতে পারে বটে—তখন তারা হাওয়ার মত থাকে কি না—

হাওয়া! শ্মশানের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়! সোনাও তাহা হইলে—

নন্দ ময়লা কাপড়-চোপড় লইয়া চলিয়া গেল। নিখিল ভাবিল, শ্মশান! সেই ত শ্মশান! নন্দ সেদিন দেখাইয়া দিয়াছিল! বেশ হইয়াছে! সেই শ্মশানে গিয়াই সে থাকিবে। শ্মশানের হাওয়ায় তাহা হইলে সোনার সঙ্গে একদিন-না-একদিন নিশ্চয় দেখা হইবে!

হাতের লেখা লিখিতে লিখিতে, অঙ্ক কষিতে কষিতে ঐ এক চিন্তাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। সে আজ বাঁধন কাটিবে, বাঁধন কাটিবেই আজ। কি সুখ এই এত বড় বাড়ীর মধ্যে, এত লোক-জনের ভিড়ে? কিছু না! সেই জনহীন শ্মশান, খোলা মাঠ,—সুখ যা-কিছু তা সেই সব জায়গাতেই আছে!

বৈকালে জলখাবার খাইয়া একটু ফাঁক পাইতেই সে চোরের মত সন্তর্পণে অন্দরে উঠিল। মা? মা কৈ? সে ত আর বাড়ী ফিরিবে না, তাই শেষ একবার মার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে চায়!

সুষমা নিজের ঘরে জানলার ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, নিখিল আসিয়া চোরের মত ঘরে ঢুকিল, অত্যন্ত মৃদু স্বরে ডাকিল, —মা।

সুষমা ফিরিয়া চাহিল—নিখিল! পিয়াসী মন অমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল, দুই বাহু নিখিলকে বুকে চাপিয়া ধরিবার জন্য অধীর উদ্যত হইয়া উঠিল। সুষমা জোর করিয়া সে চাঞ্চল্য থামাইল। নিখিল আসিয়া সুষমার গলা জড়াইয়া একেবারে তাহার কোলে লুটাইয়া পড়িল,—তাহার মুখে-বুকে মুখ ঘষিয়া মাথা ঘষিয়া সুষমার গলা ধরিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিল, ডাকিল,—মা, ও মা, মাগো—

সুষমা শিহরিয়া উঠিল। শপথ! কত-বড় শপথ সে করিয়াছে!—ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অপলক নেত্রে নিখিলের পানে চাহিয়া পুতুলের মতই নিঃশব্দে সে বসিয়া রহিল,—দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। অধীর ওষ্ঠ উদ্যত চুম্বনকে যেন বেড়ি দিয়া আটকাইয়া রাখিল।

নিখিল ভাবিল, মাও তবে রাগ করিয়াছে, তবে আর এ ঘরে কার মুখ চাহিয়া থাকিবে সে? সে উঠিল, উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সুষমাও অমনি ভূমির উপর লুটাইয়া আর্ত্ত ক্রন্দনে আপনাকে ডুবাইয়া দিল।

১৯

এই শ্মশান! জন-মানবের চিহ্নও নাই, নিখিল আসিয়া যখন শ্মশানে ঢুকিল, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। দূরে কাহারা হরি-ধ্বনি করিয়া চলিয়া যাইতেছে। একটা চুলী তখনো একেবারে নিবিয়া যায় নাই—আগুন তাহাতে গন্ গন্ করিতেছে—কয়েক কলসী জল পাইয়া একটা তীব্র ঝাঁজ তখনো চুলী হইতে উঠিয়া নিকটের বাতাসটাকে তপ্ত রাখিয়াছে! দুইটা কুকুর নিখিলকে দেখিয়া ল্যাজ গুটাইয়া সরিয়া গেল। এখানে-ওখানে পোড়া কাঠ ভাঙ্গা কলসী—নিখিলের চোখ কেমন অভিনব ঠেকিল। এইখানে সোনা মিশিয়া আছে! হাওয়া ফিরিতেছে! এই যে হাওয়া গায়ে লাগিল, এ কি তবে সোনার পরশ? না—ঐ যে একটা আগুনের প্রকাণ্ড চুলী, কে জানে, আবার কাহাকে ভগবান তাঁহার স্বর্গে লইয়া গেলেন, এ হাওয়া তাহারই পরশ বা?

পা টিপিয়া-টিপিয়া সে অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেল। শ্মশানের ওপারেই নদী। নদীটা এখানে বাঁকিয়া গিয়াছে। কোথাও কাহারো সাড়া নাই—এমন স্তব্ধ, এমন শান্ত! নদীর তীরে, বহু দূরে ঐ না একজন কে, মানুষের মত! মানুষ? না, ও একটা গরু। জল খাইতে আসিয়াছে, বুঝি। আশে-পাশে বাব্‌লা গাছ। তাহাতে অজস্র হলুদ রঙের ফুল

ফুটিয়াছে—কি হাল্‌কা পাপড়ি, আর কি বাহার তাহার মঞ্জরীতে! বাঃ! বাব্‌লার পাতা দোলাইয়া বাতাস সির্-সির্ করিয়া বহিয়া গেল —হলুদ ফুলের চূর্ণরেণু নিখিলের গায়ে ঝরিয়া পড়িল। নিখিল চারিধারে চাহিতে লাগিল। অতি সন্তর্পণে একরকম নিঃশব্দেই সে চলিতে-ছিল—কি জানি, হাওয়ায় সোনার কণ্ঠ কখন্ ভাসিয়া ওঠে! জোরে চলিলে যদি সে শুনিতে না পায়! কিন্তু কৈ সোনা? সে ডাকিল,—সোনা। গা অমনি ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল। ভয়ে স্বরও কেমন বাধিয়া গেল। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আবার চারিধারে সে চাহিল,—আবার ডাকিল—সোনা! প্রতিধ্বনি জবাব দিল—আ—া—, আর নদীর জল ঘুর্ণী ঢেউ তুলিয়া গাহিল, ছল্-ছল্।

শ্মশান হইতে নদীতে নামিবার জন্য [illegible]য়ে-পায়ে ঘাসের উপর পথের [illegible] পড়িয়াছিল। নিখিল ধীরে [illegible] রেখা-পথের পাশে ঘাসের [illegible]পাল। নদীর জলে পোড়া কাঠের কয়লার গুঁড়া ভাসিতেছিল, কিনারায় দু-একটা হাড় পড়িয়াছিল। দেখিয়া [illegible]য় নিখিলের বুকটা একবার ধ্বক্ করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে ভাবিল, কিসের ভয়! সোনাকে আবার ভয়!

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত [illegible]রে একটী পরিচিত ডাকের অপেক্ষায় [illegible] চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—বসিয়া বসিয়া চোখ ক্রমে ভারী হইয়া উঠিল, কানের কাছে নদীর ঈষৎ মৃদু একঘেয়ে সুর বাজিয়া চলিয়াছিল, আর দূরে থাকিয়া থাকিয়া এক-একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিতেছিল। নিখিল চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল, কখন্ সোনা আসিয়া পিঠে ছোট-একটা টোকা দিয়া ডাকে, রাজপুত্তুর!

কতক্ষণ এমন ভাবে কাটিয়াছিল, খেয়াল নাই—হঠাৎ এক সময়কার শীতল স্পর্শে নিখিল চমকিয়া উঠিল। চোখ চাহিয়া সে দেখে, স্তব্ধ রাত্রি—আকাশে তারার ছড়াছড়ি, আর কোণে সেই এক-টুক্‌রা চাঁদ। কখন সে এই শ্যামল তৃণের শয্যায় গা ঢালিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—আর এ কি! একটা কুকুর আসিয়া তাহার ঘ্রাণ লইতেছে! ভয়ে তাহার বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল—একটা চীৎকার করিয়া কুকুরটার দিকে কলের মত সে হাত উঠাইল। কুকুর ভয়ে পলাইয়া গেল।

বাড়ীর কথা নিখিলের মনেও পড়িল না, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই মনে হইল, ওধারে গাছের তলায় কাহারা যেন তাহারই পানে চাহিয়া কি বলাবলি করিতেছিল, তাহাকে উঠিতে দেখিয়া সরিয়া যাইতেছে। কারা ওরা? সে ডাকিল,—সোনা—। কোন সাড়া নাই! এবার আরো জোরে ডাকিল,—সোনা!

মনে হইল, কে যেন বহুদূর হইতে সাড়া দিল—যা—ই।

সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাগলের মত নিখিল তখন ছুটিল। কতদূর যাইবে? শ্মশানের বুকে সেই নিবন্ত চুলীর কাছে মোটা একটা গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল। মড়া পোড়াইবার জন্য কাহারা গাছ কাটিয়া এটাকে দরকার না হওয়ায় ফেলিয়া গিয়াছে, সেই গুঁড়িতে হুচট খাইয়া নিখিল পড়িয়া গেল—শ্রান্ত শরীর পড়িয়াই মূর্চ্ছিত হইল।

ওদিকে বাড়ীতে আবার সেই ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার মধ্যে রাত্রিটা যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, কেহ তাহা বুঝিতেও পারিল না—তবু নিখিলের কোন সন্ধানই নাই! অভয়াশঙ্করের রুদ্র মূর্ত্তি অজানা ভয়ে একেবারে পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, দাসী-চাকর যে যেখানে ছিল, সকলে সারা রাত্রি লণ্ঠন জ্বালিয়া,মশাল জ্বালিয়া সারা গ্রাম আর গ্রামের যত বন-বাদাড় ও পুকুর-পাড় ঘুরিয়া নিখিলকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছে। কালিকার মতই সুষমা আবার সেই ঠাকুর ঘরের দ্বারেই মাথা কুটিয়া ডাকিতেছে,—ঠাকুর, হে ঠাকুর,—

সকালে অভয়াশঙ্কর ক্লান্ত হইয়া বাহিরে ফটকের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, শুষ্ক মূর্ত্তি, চোখ দুটো সারারাত্রির দুশ্চিন্তায়-জাগরণে কোটরে গিয়া ঢুকিয়াছে—নিশ্বাস ফেলিয়া কেবলই ভাবিতেছেন, বুঝি, আমারি পাপের প্রায়শ্চিত্ত! মেয়ে-হারা বাপের দুঃখ বুঝি নাই—! আরও মনে হইতেছিল, বিশেষ করিয়া সুষমার কথা। তাহাকে কিছু দিই নাই, শুধু আদায়ই করিয়াছি। এ জগৎ যে দেনা-পাওনার উপরই চলিয়াছে! ফাঁকি দিয়া বা' আদায় করিয়াছি, এবার বুঝি তাহার দাম কড়ায়-গণ্ডায় শোধ হয়!

এমন সময় রাস্তার ওদিক হইতে নন্দ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—ঐ না দাদাবাবু?

অভয়াশঙ্কর চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—দাঁড়াইয়া দেখেন, দূরে কয়জন লোক—ঐ যে তাহারা এদিকেই আসিতেছে বটে! এক জনের বুকের উপর একটি ছেলে না? ছেলেটি—? তাঁহারই নিখিল? হাঁ, নিখিলই!

পাগলের মত অভয়াশঙ্কর অমনি সেই দিকে ছুটিলেন—আলু-থালু বেশ—কেমন এক মূর্ত্তি! ঠিকই ত,—কিন্তু নিখিল উহার বুকে কেন? তবে কি নিখিল—? সে যে লীলার একটিমাত্র স্মৃতি—শেষ স্মৃতি! ভগবান! তাঁহার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় ভীষণ ঝাঁকানি দিল। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

লোকগুলা কাছে আসিলে তিনি দেখেন, মাষ্টার মশায়, দামু আর সেই লোকটি—বনমালী। বনমালীর বুকে নিখিল। নিখিল মূর্চ্ছিত—না···? কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন—আছে ত? এ্যাঁ—?

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—হাঁ, ভয় নেই।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—কোথায় পেলে?

এবার বনমালী কথা কহিল। সে বলিল—শ্মশানে।

—শ্মশানে! শিহরিয়া অভয়া[illegible] পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহি[illegible] বলিলেন,—দাও, আমায় দাও, [illegible] করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার বড় কষ্ট [illegible] এতখানি পথ—

বনমালী বলিল,—কোন কষ্ট না বাবু।

—না, না, দাও। বলিয়া নিখিলকে ঘাড়ে করিয়াই অভয়াশঙ্কর [illegible]া ঢুকিলেন,—একেবারে দোতলায় অন্দ[illegible] আসিয়া তাহাকে খাটে শোয়াইয়া দিলে[illegible] গা তাহার পুড়িয়া যাইতেছে! বেহুঁস জ্বর! দুই গাল আপেলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে।

বনমালী, মাষ্টার মহাশয়, সকলেই সঙ্গে আসিয়াছিল। মাষ্টার মশায় বলিলেন,—আমি এখনি কলকাতায় টেলিগ্রাম করে দি, ভালো

ডাক্তারকে। মোটরে করে তিনি এখনি চলে আসুন।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তাই দাও, এখনই দাও। আমার নিখিলকে সারিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও তোমরা। আমি লক্ষ টাকা দেব, আমার সব দেব। তার পর বনমালীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, —শ্মশানে গেল কি করে, জানো কিছু?

বনমালী বলিল,—জানি না। তবে শেষ রাত্রে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হল। আমি স্বপন দেখছিলুম, আমার মরা মেয়ে সোনাকে। ঐ একটি মেয়ে—আর ত কেউ নেই আমার! স্বপন দেখছিলুম, যেন মা আমার চুলীর মধ্যে থেকে কেঁদে কেঁদে ডাকছে—বাবা গো বাবা গো গেলুম! স্বপ্নেই দেখলুম, কাঠ পড়ে তাকে চেপে রেখেছে সে তার মধ্যে থেকে কেবলি চেষ্টা করছে, পারছে না! ঘুম ভেঙ্গে প্রথমটা দোষ মেয়ে নেয়ে-উঠেছি। বুঝলুম, স্বপ্ন! স্বপ্ন বলেই উড়িয়ে দিতে গেলুম। তাকে ত পুড়িয়ে ছাই করে এসেচি, তবে আবার—মন কিন্তু এমন অস্থির হয়ে রইল, যে কিছুতেই সোয়াস্তি পাইনে, নিশ্বেস বন্ধ হয়ে আসছিল [illegible]র থাকতে না পেরে ভোরের আলে[illegible]র আগেই নিঃশব্দে শ্মশানে বেরিয়ে পড়লুম। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা গাছের গুঁড়ির পাশে অজ্ঞান হয়ে ইনি পড়ে আছেন!

অভয়াশঙ্করের সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিল। তিনি বনমালীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—আমার নিখিল তোমারই! তুমি ওকে বাঁচাও, ওকে বাঁচাও। তুমি বাঁচাতে পারবে, তোমায় নিখিল ভালবাসে!

অভয়াশঙ্কর পাগলের মত হইয়া উঠিলেন।

২৫

প্রাণপণে চিকিৎসা ও সেবা চলিতে লাগিল। টাকায় যতখানি করা যায়, অভয়াশঙ্কর তাহা করিলেন; আর টাকার উপর যে জিনিষ, অগাধ টাকার বিনিময়েও যাহা পাওয়া যায় না, সেই সেবা ও শুশ্রূষার ভার লইল সুষমা। বুক দিয়া নিখিলকে সে ঘিরিয়া রাখিল, কোন অমঙ্গল না তাহাকে স্পর্শ করে, মৃত্যু যেন প্রবেশের কোন ফাঁক না পায়!

ডাক্তার বলিলেন,—মেনিঞ্জাইটিস্! রোগীর কথা কিছুই বলা যায় না। বাঁচিয়া উঠিলেও হয়ত জড় হইয়া থাকিবে, একেবারে বোবা-হাঁবা, পুতুলের মত!

পনেরো দিনের পর জ্বর নরম পড়িলেও নিখিল কথা কহিল না। চোখ মেলিয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া কেমন এক ভাবে শুধু চাহিয়া থাকে, দেখিলে সমস্ত শরীর শিহরিয়া ওঠে, চোখ ফাটিয়া অতি-বড় পাষাণ যে, তাহারও চোখে জল ঝরিয়া পড়ে।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—এম্‌নি থাকে থাক্—তবু ত প্রাণে বেঁচে আছে!

ডাক্তার বলিলেন,—কথা যদি কখনো কয়, সে ভগবানের হাত। তবে সেরে উঠলে স্নেহ আর সহানুভূতির প্রচুর ধারায় ওর মনখানিকে যদি ভিজিয়ে ডুবিয়ে রাখতে পারেন সর্ব্বক্ষণ, এতটুকু শাসন নয়, এতটুকু বাঁধন নয়—একেবারে মুক্ত, স্বাধীন অবাধ গতি দিয়ে, তবেই যদি ফের ওকে মানুষ করতে পারবেন, নাহলে···।

—নাহলে কি?

—আপনার ঐ আলমারির মধ্যেকার কাঁচের পুতুলের মতই ও থাকবে, ঠিক অমনি। দাঁড় করিয়ে রাখেন, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসিয়ে দেন, বসবে, শুইয়ে দেন শোবে—বাড়ার ভাগ, নড়ে-চড়ে একটু বেড়াতে পারবে, তাও পক্ষাঘাত-গ্রস্ত পঙ্গুর মত!

সুষমা একদিন বলিল—ও কবে কথা কইবে ডাক্তারবাবু? আজ যে পঁচিশ দিন হয়ে গেল!

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—পঁচিশ দিন?

সুষমা বলিল,—আমি যে একটি-একটি করে দিন গুন্‌চি! আজও কি আশা দেবেন না?

ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—মিছে আশা কি বলে দি' মা? তবে ভরসা এই, আপনার শুশ্রূষায় মরা মানুষও বেঁচে ওঠে! আমাদের পুঁজি কিছুই নেই—শুধু তার-আশায় থাকলে আমি বহুদিন সরে পড়তুম। কিন্তু তোমার ঐ সেবায় আমার মন এখনো নিরাশ হয়নি। তবু যে সম্পূর্ণ আশা দিতে এখনো পার্চ্ছি না মা।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—যখনি ওর অসুখ হয়েছে, শক্তই হয়েছে—আর সে অসুখে কেবল আমার স্ত্রীই ওকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন!

ডাক্তার বলিলেন,—তাই ভরসা হচ্ছে, মা ওকে এবারও ফিরিয়ে আনবেন।

* * *

আজ চল্লিশ দিন। জ্বরটা কাল রাত্রি হইতে একেবারে ছাড়িয়াছে। আজ সকালেও জ্বর এখনো দেখা দেয় নাই। তারপর খানিকটা বেদানার রস কাল রাত্রে খাওয়ানো গিয়াছিল, আজও আধ পেয়ালা খাইয়াছে! ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—ভালোর দিকে ফিরচে বলেই মনে হচ্ছে। তোমার পুণ্যে আবার ওকে তাহলে পেলুম,মা—বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলে, অভয়াশঙ্কর আসিয়া সুষমার কাছে বসিলেন—সুষমার পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার এ কি চেহারা হইয়াছে! শীর্ণ একটি রেখার মতই ক্ষীণ দেহ,মলিন বিবর্ণ মুখ! একি সেই সুষমা—না, তার শীর্ণ একটু ছায়া? এ কয়দিন নিখিলকে লইয়া একাসনে বসিয়া যমের সঙ্গে কি প্রবল যুদ্ধটাই করিয়াছে!

যাক্, সে জয়ী হইয়াছে, আজ! আনন্দে অভয়াশঙ্করের চোখ ছলছলিয়া উঠিল। সুষমা তখন ভিজা তুলা বুলাইয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে নিখিলের মুখ-চোখ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। সে কাজ হইয়া গেলে সে দুই-হাঁ মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিল।

অভয়াশঙ্কর তাহার একটা হ হাতে তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন,—সু

সুষমার একটু তন্দ্রা আসিতেছিল, চে মেলিয়া সে বলিল,—কি?

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তুমিই ওবে সারিয়ে তুলেচ। যদি ওকে ফিরে পাই, তাহলে তোমারই হাতে ওকে দান করব এবার, একেবারে নিঃ—!

সুষমা সে কথার ... াব দিল না—এত দুঃখেও মুখে একটু হা... ফুটিল। দেখিয়া অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—ওঃ—তা হবার নয়, সুষমা—না?

—কেন?

—সেই যে শপথ করেছিলে, ঠাকুর-ঘরের দোরে বসে—

সুষমা আবার হাসিল, হাসিয়া বলিল,—শপথ! সেই শপথের কথা বল্‌চ! সে ত মুখের কথা মাত্র গো! সে শপথ যখন করেছিলুম, ঠাকুর কি তখন শুধু সেই মুখের কথাটুকুই শুনেছিলেন? আমার প্রাণ তখন কি বলছিল, তা শোনেন্ নি? তা যদি না শুনে থাকেন, তাহলে তিনি ঠাকুর নন্, আর তাহলে তাঁকে মান্‌বোও না! সে শপথ যে কত-বড় মিথ্যা, ঠাকুর তা তখনই বোঝেন্ নি?

অভয়াশঙ্কর একটা মস্ত আশ্বাস পাইয়া বলিলেন,—তুমি তাহলে ওর সব ভার নেবে? বল! ওর সম্বন্ধে কোন কথায় আর আমি থাকব না।

সুষমা আবার হাসিল! অভয়াশঙ্কর বলি... হাস হচ্ছে না? বলিয়া তিনি ...য়া ঘরের দেওয়ালে লীলার যে ...ছিল, হাত দিয়া সেই ছবি ছুঁইয়া ...এই ছবি ছুঁয়ে—আর ঐ আমার ...র আর বাবার ছ... ও দেওয়ালে—এই তিন ...বি সাম্‌নে রেখে বলচি,—নিখিলকে সারিয়ে ...ই ওকে নাও। ওর সব ভার তোমায় দিলুম—যেমন ভাবে ওকে মানুষ করতে চাও, কর— ...মি তাতে কোনদিন কোন কথা কব ...ন বাধা দেব না। যদি দি—

সুষমা খাট হইতে নামিয়া ছুটিয়া স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল; হাত চাপিয়াই কহিল;—ছি, তুমি স্বামী, দেবতা, আমার কাছে শপথ করতে আছে কি! কে বললে, তোমায় বিশ্বাস করি না? তা যদি না করতুম, তাহলে এ বাড়ীতে এক-দণ্ডও কি তিষ্ঠুতে পারতুম! তুমি জানো না, এ জগতে আমার আর কে আছে?—শুধু তুমি আর নিখিল! তোমরাই আমার সব।

অভয়াশঙ্কর বলিলেন,—তোমায় চিনিনি আমি, সুষমা, তাই মিথ্যা কুৎসিত নীচ সন্দেহ নিয়ে নিজেও পুড়েচি, আর সেই আগুনের ঝড় তুলে তোমাকে পুড়িয়েচি, নিখিলকে পুড়িয়েচি! তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, বলা হইল না ওদিকে হঠাৎ একটা ছোটস্বর দুইজনেরি কানে গেল—মা—

এ কি! এ কে ডাকে? নিখিল না?

ছুটিয়া দুইজনে খাটের পাশে আসিল। নিখিল কোনমতে আজ এই চল্লিশ দিনের দিন শ্রান্ত কাতর চোখদুটি আবার মেলিয়াছে। অভয়াশঙ্কর ডাকিলেন,—নিখিল, বাবা—

সুষমা তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল,—নিখিল।

নিখিলের চোখের পাতা কাঁপিতেছিল—ঠোঁট দুটিও কাঁপিতেছিল, প্রজাপতির হাল্‌কা পাখার মতই তুল্-তুল্ করিয়া। সুষমা আবার বলিল,—কি বলচ, বাবা—? বল।

নিখিল অতি-কষ্টে আবার ডাকিল,—মা—

নিখিল কথা কহিয়াছে! আবার সে কথা কহিয়াছে গো! ডাক্তার, ডাক্তার—

অভয়াশঙ্কর পাগলের মত ছুটিয়া বাহিরে গেলেন।

আবার যখন ঘরে ফিরিলেন, সঙ্গে ডাক্তার। দেখিয়া শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন,—ভগবান ওকে ফিরিয়ে দিলেন, তাই আবার কথা কয়েছে! আর ভয় নেই! তবে যা বলেছি,—ভারী সাবধানে রাখতে হবে

ওকে—সব বন্ধন কেটে দিয়ে, অবাধ-মুক্ত বাতাসের মত!

সুষমা নিখিলের মুখে-চোখে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। নিখিল হাতখানায় মুখ রাখিয়া সুষমার পানে চাহিয়া এবার বেশ স্পষ্ট কণ্ঠে ডাকিল,—মা—

—বাবা—বলিয়া সুষমা নিখিলের মুখে চুম্বন করিল।

ডাক্তার বলিলেন, Thank God! He is saved.—ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

অভয়াশঙ্কর ধীরে ধীরে খাটের পাশে আসিয়া ডাকিলেন—নিখিল—

নিখিল বাপের পানে চাহিল। অভয়াশঙ্কর তাহার মুখে চুমু দিয়া বলিলেন,—আমার মাণিক ছেলে, ধন ছেলে! বাবা আমার—বাবলা আমার! তুমি সেরে ওঠো, আর কখনো বকবো না তোমায়। এর ছেলে, এর কাছেই থাকবে তুমি! বলিয়া সুষমাকে দেখাইয়া দিলেন!

নিখিল আবার ডাকিল,—মা—

অভয়াশঙ্কর সুষমার পানে চাহিলেন, সুষমাও স্বামীর পানে চাহিল। দুইজনের কাহারো মুখে কথা নাই, শুধু চোখের কোণে মুক্তার মত বড় বড় জলের ফোঁটা!

শেষ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ছিন্নলিপি

একখানি ছেঁড়া চিঠির টুকরাগুলি পাঠালেম
পাঠাইলাম। আপনারা গুণী। যদি ইহাকে এ আমার
গুছাইয়া জীয়াইয়া কবিতা করিতে পারেন। পথ-ভোলা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। মরালে,

শ্রীহরি চৈত্র সুখী হই
অধীনী
—বরেষু,
একবার
ভাল আছি স্মরালে।
হাতে রোপা মালাগাছি
পাঠালেম।
সখাহে অপরাধ
মাথায়ে ক্ষমিয়ো— হে আমার
আঁখিজল প্রিয়তম,
পাবে কি হে চপল পরাণের
এ লিপি? অমি

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।